স্কেচ,
-শ্রীঅরবিন্দ দত্ত অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড

১ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৬০ (স্থাপিত ১৩২১) ৩২শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় ও সমুদ্র বড়। পাহাড় দেখেছি কিন্তু সমুদ্র দেখা হ'ল না। তবে একবার ষ্টীমারে আসবার সময় রূপনারায়ণ গাঙ দেখে (যেখানে দামোদর, গঙ্গা ও রূপনারায়ণের মিলন হয়েছে) আমার সমুদ্র দেখবার সাধ মিটে গেছে। ব্রহ্ম কি রকম জানিস; যেমন জলে জল, কূল কিনারা নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের পায়ের বিল্বপত্র ভক্ষণ ক'রে কিংবা মায়ের প্রসাদী দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না। যদি ঠিক ঠিক বোধ হয় তবে ত ফল হবে। আবার পেট চুঁই চুঁই করছে, তাতে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে। একে কলিকাল অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু। উপবাস ক'রে ওসব করা চলে না, তাতে ঠিক ঠিক মন বসে না। তাই আগে কিছু খেয়ে নিতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতাম,—আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম,—মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে,—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। আরও কত কি, তা কি বলবো! আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! "ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যখন বাইস তেইস বছর, (১২৬৪-৬৫ সাল) কালী ঘরে বললে,—তুই কি অক্ষর হতে চাস্? অক্ষর মানে জানি না,—হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম। হলধারী বললে, ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতাম। কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুজ্জ্যে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম। একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো। পূজার সময় আসতো আর দুই একটা গান গাইতে বলতো। গান গাচ্ছি—দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইলো। হলধারীকে বললাম—দাদা, একি স্বভাব হলো। কি উপায় করি। তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও স্বভাব গেলো।

জাগিল কি ঘুমলো সে—

পরিমল গোস্বামী

মৃত্যুর পর আমাদের কি হয় এ প্রশ্ন বহুদিনের। এই যে আমি সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করছি, পৃথিবীতে নিজ অধিকার বিষয়ে এত সচেতন, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বাড়ি-ঘর, আমার দেশ প্রভৃতি বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, সেই আমি এ পৃথিবীতে আর থাকব না, চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, অথচ চেতনা থাকবে না, দেহের বাইরে আমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাব, এ কল্পনা করতে ভাল লাগে না। অথচ মৃত্যুর মতো সত্য আর কি আছে? শুধু তাই নয়, এই মৃত্যু না থাকলে জীবকুলের বিবর্তন বা অগ্রগতিই সম্ভব হত না, এ সত্য উপলব্ধি করেও মন অবুঝ থাকতে চায়।

একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে সমস্ত বিশ্ব কোনো একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে তার পরিবর্তন ঘটছে—অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম পরিবর্তন, যা কোনো শক্তি রোধ করতে পারে না। এই পরিবর্তনের কোনো অংশ আমাদের প্রত্যক্ষ, কোনো অংশ প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, মৃত্যুর পথে এবং নবজীবনের পথে, রূপ হতে রূপান্তরের পথে। অকল্পনীয় বিরাট বিশ্বপরিকল্পনায় এই ভাঙা-গড়ার কাজ চলেছে, কেন চলেছে, কে আছে এই সৃষ্টির মূলে, কে এ সৃষ্টিতে এই গতি দান করল, কার কি উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হচ্ছে আজ পর্যন্ত মানুষ তার খবর পায়নি।

একটি কেন্দ্রগর্ভ পরমাণু, যা কি না কোনো বস্তু নয়, বিদ্যুতের পার্টিক্ল, বা শক্তিকণিকামাত্র, যা অদৃশ্য অনুমান-যোগ্যমাত্র, তাই বিবর্তনের পথে কি ভাবে, কি পরিমাণে, একত্র মিলে একটি জীবন্ত কোষ তৈরি হল, কি করে সে খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, নতুন কোষের জন্ম দেয়, আত্মরক্ষা করে, এ তথ্য মানুষের অজ্ঞাত।

মানুষ নিজেকেও জানে না, সে যদি কোনো একটা রহস্যও সম্পূর্ণ করে জানতে পারত—জন্মের অথবা মৃত্যুর—তা হলেও ঐ একটি প্রবেশ-পথে সে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত, অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারত। কিন্তু এখনও সে পথ অনেক দূরে।

জীবনের রহস্য সামান্যই সে জেনেছে চোখে দেখে। অর্থাৎ যেটুকু চোখে দেখে বা গৌণ পরীক্ষায় সে জানতে পেরেছে, তা অতি সামান্য, যা জানতে বাকী আছে তার পরিমাণ বিরাট। তা ভিন্ন তার প্রত্যক্ষ দর্শনেও অনেক ত্রুটি আছে। মানুষের দেহযন্ত্রের মধ্যে যে সব ক্রিয়া চলছে, যে পরিবর্তন অবিরাম ঘটছে, জীবন্ত দেহ উন্মুক্ত করে সেই সব ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা দিনের পর দিন লক্ষ্য করা আজও সম্ভব হয়নি। ভ্রূণ দেহ প্রথম দিন থেকে কি কৌশলে প্রতি কোষ বিভাজনের সাহায্যে বিচিত্র রূপ ধারণ করছে, জীবন্ত মানুষ থেকে সেই অংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই রূপায়ণের ধারা অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

যেটুকু জানা গেছে সেই পথ ধরে অনেক কিছু অনুমান করা যায়, অনেক কিছু প্রশ্ন তোলা যায়, আরও অনেক অতৃপ্তি জাগানো যায়, এবং আপাতত সেইটুকুই আমাদের লাভ।

মৃত্যু কি এবং তার শেষে কি,—প্রকৃতির লৌহ-যবনিকা ভেদ করে মানুষ হয়তো একদিন তা জানবে। তার আগে জীবন কি, তা বিজ্ঞানীর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে যেটুকু ধরা পড়েছে, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

জানা গেছে দুটি একক কোষদেহ মিলে মানুষের আদি দেহ তৈরি হয়। এই কোষের আকার অতি ক্ষুদ্র, মাইক্রোস্কোপ ভিন্ন দেখা যায় না। এই অদৃশ্য বিন্দু পরিমাণ জীবন্ত কোষ ক্রমশঃ বহু কোষের জন্ম দিতে থাকে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটি জটিল দেহযন্ত্র তৈরি করে ফেলে। ঐ অণুবীক্ষণদৃশ্য ক্ষুদ্র একটি নিষিক্ত কোষের মধ্যে মানুষের স্বভাব-চরিত্রের এবং বংশগত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন থাকে। এ এক কল্পনাতীত ব্যাপার।

একটি-কোষদেহ প্রাণীও পৃথিবীতে অগণিত। প্রথম একক কোষ প্রাণীতেই পৃথিবী আচ্ছন্ন ছিল, হয়তো তারও আগে আরও সরলপ্রাণ কণিকায় উদ্ভব হয়েছিল। প্রাণী এবং উদ্ভিদের আদি ইতিহাস এরাই। একটি মাত্র কোষ, অর্থাৎ তার একটি কেন্দ্র আছে, তাকে ঘিরে আছে জেলির মতো খানিকটা বস্তু, হাড়ও নয় মাংসও নয়, কতকগুলি কণিকার সমষ্টি। এই কোষই জীবন্ত বস্তুর ক্ষুদ্রতম ইউনিট। এর জীবনযাত্রা সরল। এই একটি কোষ খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, হয়তো ওদের রীতিতে স্ফূর্তি করে, তার পর সময় হলেই নিজেকে ভাগ করে দুটো হয়। এরা সবাই স্বাধীন, কিন্তু মানুষের দেহগঠনকারী এই কোষই নিজেদের স্বাধীনতা অনেকখানি বিসর্জন দিয়ে মানুষ নামক আর এক প্রাণীকে গড়ে তুলেছে।

সৃষ্টির আদিতে যখন পৃথিবী ছিল জলন্ত গ্যাস তখন সেই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে ছিল এই জীবনের সম্ভাবনা। সৃষ্টি কোন ধাপের পর কোন ধাপ এগোবে, তার সমস্ত প্ল্যান ঐ দশ হাজার কোটি ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যেই ছিল। বিবর্তন বাম্ পরিবর্তনের পথে জলন্ত গ্যাস থেকে এসেছে আজকের মাটি জল মেঘ গাছপালা জীবজন্তু-পূর্ণ মানুষ-শাসিত এই পৃথিবী।

কোনোটাই হঠাৎ হয়নি, আরম্ভ কোথাও একটা ছিলই, অনিবার্য পরিবর্তনের পথে, কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তন-শৃঙ্খলের বাঁধা পথে ১৯৫৩ সনের পৃথিবী এসেছে, এসে থেমে নেই, শুধু চলেছে, কিন্তু কোন্ লক্ষ্যে, আমরা জানি না।

প্রাণবিন্দু-পরিপূর্ণ পৃথিবী। অথবা প্রাণীবিন্দু। তারা

নিজেরা আত্মবোধ বা আত্মচেতনা বা চিন্তাক্ষমতাসম্পন্ন নয়, কিন্তু তারা যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলল তখন সেই মানুষ হল চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। এমন কি যে মস্তিষ্ক চিন্তাশক্তির আধার তারও উপাদান ঐ কোষ।

ঈশ্বর নামক কোনো পৃথক চৈতন্য বা শক্তি সৃষ্টির বাইরে আছে কিনা, মানুষের দেহ বা দেহের কোনো অংশ আত্মা বা চৈতন্য নামক দেহাতীত কোনো পৃথক বস্তুর আধার কি না সে তর্ক থাক। যদি বলা যায় ঈশ্বরও নেই, দেহবাসী দেহাতীত কোনো আত্মাও নেই, তাহলেও মানুষের যেটুকু অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ মানুষ, সে কি কম আশ্চর্য! যদি ধরা যায় দেহের বিবর্তনের পথেই তার আত্মবোধ ও চিন্তাশক্তি জন্মেছে, দেহও নেই আত্মাও নেই, তাহলেই বা ক্ষতি কি? রহস্য একই থেকে যায়।

কিংবা যাঁরা বলেন আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক, তা শুধু মানুষেই ভর করে; কিংবা যাঁরা বলেন সৃষ্টিতে দুটি সমান্তরাল অস্তিত্ব আছে—বস্তুর ও আত্মার, বিভিন্ন স্তরের দেহে বিভিন্ন স্তরের আত্মা এসে আশ্রয় নেয়, তাহলেও সৃষ্টিরহস্য একই থেকে যায়।

আসলে ঈশ্বর আছে কি নেই সে তর্ক হচ্ছে দর্শনের। মানুষের জীবন বা মৃত্যুরহস্য তার বাইরে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে পরীক্ষা ক'রে দেখায় বাধা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা পৃথক আত্মায় বিশ্বাসীও নন, অবিশ্বাসীও নন। পৃথক আত্মা থাকতে পারে. কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বরঞ্চ সেটি আবিষ্কার করার গৌরবও তাঁরাই নিতে চান. তাই দেহে আত্মার গুপ্ত বাস কোথায় তা তাঁরা সন্ধান করতে ব্যস্ত। বিভিন্ন ধর্মমতে ঈশ্বর বা মানুষের আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন যে সব ধারণা আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানীর কোনো বিরোধ নেই। ধর্মমতের বাইরে এসে বুদ্ধির পথে, পরীক্ষার পথে কতটা সত্য পাওয়া যায় তাই তাঁরা দেখছেন। যদি এমন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ পাওয়া যেত যার সাহায্যে একটি পরমাণুকে একটি বড় মুক্তার আকারে দেখা সম্ভব হত তাহলে কত না রহস্য ভেদ হতে পারত! যদি এমন চোখ থাকত, তাহলে সে চোখে পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণীকে দেখা যেত না, দেখা যেত শুধুই পরমাণুর জগৎ, কারণ তখন একটি সরষে পৃথিবীর চেয়েও বড় দেখাত কি না কে জানে। মানুষের একটি চুল সম্পূর্ণ করে দেখতে লক্ষ বছর কেটে যেত হয়ত। এক-একটি পরমাণু এক-একটি সৌরজগৎ বিশেষ। সেখানেও সূর্যকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে। কোনো পরমাণুই নিরেট বস্তু নয়, কোনো দুটি পরমাণুই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পরের গায়ে লেগে নেই। প্রত্যেকটি পরমাণু-কেন্দ্রকে ঘিরে বিদ্যুৎ-কণিকারা অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে, জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে তাদের জন্য। একটি পরমাণুর তুলনায় একটি কোষ তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! অতএব পরমাণু দেখবার মতো সাদা চোখ পেলে পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপ আর দেখা যেত না, সবই হত তখন একই চেহারার একঘেয়ে পরমাণু-পূর্ণ পৃথিবী।

এই পরমাণু জগতের সন্ধান মানুষ পেয়েছে, এবং বুঝেছে যে বিশ্বরহস্য বড়ই গোলমেলে, আদৌ সরল নয়। তাই শুধু হাতে বসে বসে কল্পনা ক'রে অনেক রকম তত্ত্ব খাড়া করা যেতে পারে, আসল রহস্যের সন্ধান তাতে পাওয়া সম্ভব নয়। হাতে-কলমে তবু তো খানিকটা সন্ধান পাওয়া গেছে, বাকীটা আর তবে শুধু বিশ্বাস করে লাভ কি? যে-কোনো অপরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করলেই হল, যে-কোনো মুহূর্তে। বিশ্বাস করার স্বাধীনতাও আছে, সময়ও পড়ে আছে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাস শিকেয় তুলে হাতে-কলমেই পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক না—এই হল বিজ্ঞানীর মনোভাব।

প্রথমতঃ জীবন বলতে কি বোঝায় তা দেখবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। জীবনের লক্ষণ এই—জীবন যার আছে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা নিজে করতে পারে, নিজের মতো প্রাণীদেহের জন্ম দিতে পারে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি তার আছে, একটা সীমা পর্যন্ত আহত হলে সেই আহত স্থান সারিয়ে তুলতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবচেয়ে সরল জীবনধারী হচ্ছে এককোষধারী প্রাণী, আর সবচেয়ে জটিল প্রাণধারী হচ্ছে মানুষ। মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সে চিন্তা করতে জানে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে জানে, তার মানসিক বৃত্তি অত্যন্ত জটিল, সে নিজেকে বিচার করতে জানে, আপন অনেক অভ্যাস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। হয়তো অন্যান্য প্রাণীও জানে, কিন্তু আমাদের বিচারে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষের এই মনই তাকে আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পৃথক আত্মা আছে কি না তাও একমাত্র মানুষেরই প্রশ্ন।

জটিলতম প্রশ্ন হচ্ছে পৃথক আত্মা যদি থাকে তবে তা দেহের কোথায় থাকে? অর্থাৎ কোন্ একটি মাত্র দেহ-অংশের বিকার ঘটলে আত্মা তাকে ছেড়ে যায়, তার মৃত্যু হয়? আত্মা সকল দেহে ছড়িয়ে থাকে, না এক জায়গায় থাকে? যদি একখানা হাত কেটে বাদ দেওয়া যায় তাহলে কি আত্মার কোনো অংশ নষ্ট হয়? কিন্তু হাত-পা কাটা পড়লেও মানুষ সম্পূর্ণ আত্মবোধ নিয়ে বেঁচে থাকে, তাহলে হাত বা পা অথবা নাক-কান কোথায়ও আত্মা থাকে না।

দেহের অভ্যন্তরের কথাও তাই। পিলেটা কেটে উড়িয়ে দিলেও আত্মা দেহছাড়া হয় না। লিভার-অ্যাবসেস হলে কেউ বলে না যে সোল-অ্যাবসেস হয়েছে। পেটের ভিতরকার দীর্ঘ অন্ত্রের খানিকটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ মানুষই থাকে। ফুসফুসের অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, হৃৎপিণ্ডেও অস্ত্রপ্রয়োগ করে দেখা গেছে মানুষ একই ভাবে বেঁচে থাকে। ফুসফুস অথবা হৃৎপিণ্ডে যে থাকে না তার আর এক প্রমাণ, ও দুটোরই কাজ [illegible]

ভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের সাহায্যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বড় আবিষ্কার হার্ট-লাঙ্ মেশীন।

আরও ঊর্ধ্বে ওঠা যাক। আত্মা মগজের মধ্যেই কোথায়ও থাকে এইটে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ হয়; কিন্তু এখানেও গণ্ডগোল। আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে মগজের কোন্ অংশ বাদ দিলে তবে মৃত্যু হয়? মগজেই যদি আত্মা থাকে তবে গলা কেটে মাথাটিকে পৃথক করলে মানুষ মারা যায় কেন? রক্তচলাচল বন্ধ হওয়াতে? তাহলে কি রক্তই আত্মার প্রধান খাদ্য? অর্থাৎ আত্মা রক্তপায়ী জীব? কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

এর উত্তরে বলা যায় স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল-সম্বলিত সুস্থ মগজ না থাকলে আত্মা সেখানে থাকতে পারে না, আত্মা নিজে রক্তপায়ী নয়। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? অনেক যোগীকে দেখা গেছে তাঁরা যোগবলে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত হৃৎস্পন্দন বা রক্ত-চলাচল সম্পূর্ণ থামিয়ে রাখতে পারেন, নাড়ীতে জীবনের লক্ষণ থাকে না, কিন্তু তবু তাঁরা জীবিত থাকেন। অনেক রোগীকে দেখা গেছে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার পর কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ায় সাহায্য করায় রুগী ফুটেঠেছে। আমার পরিচিত এক সুস্থ ব্যক্তিকে একটি ফোড়ার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্বে ক্লোরোফর্ম দেওয়াতে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ মারা গিয়েছিল। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে হৃৎপিণ্ডকে উস্কে দিতেই আবার সে বেঁচে উঠেছে। অনেক জলে-ডোবা 'মৃত' ব্যক্তিকে এইভাবে বাঁচানো হয়ে থাকে, সবাই জানে।

আত্মা বলতে আমাদের মনে যে অস্পষ্ট ধারণা আছে তার পৃথক অস্তিত্ব থাকলে তা বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত কি? তবে কি সে দেহের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে আবার দেহের সঙ্গে জেগে ওঠে? এবং ক্লোরোফর্ম দিলে আত্মা অজ্ঞান হয়? কিংবা মৃত্যুর পরেও আত্মা দেহেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে? যদি করে তবে কতক্ষণ করে? এবং কোথায় করে?

প্রশ্ন কিন্তু এখানেও শেষ হয় না। ভ্রূণ অবস্থায় যখন কোষসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পিণ্ডদেহ মানুষের আকার নিতে থাকে, সে সময় সে অবশ্যই জীবন্ত প্রাণী। কিন্তু আত্মা তাতে যোগ হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে ভ্রূণদেহের আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি নেই কেন? তবে কি আত্মারও শৈশব এবং বৃদ্ধত্ব আছে? এ কথা কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু এ কথা কল্পনা করা যায় যে মানুষের মগজ যত পরিপুষ্ট হয় তত তার চৈতন্য বা আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি স্পষ্ট হয়, কারণ মগজই তার চিন্তাশক্তির জন্ম দিচ্ছে। তার অর্থ, আত্মবোধ বাদ দিয়ে (যেমন ভ্রূণ দেহের) মগজ থাকতে পারে, কিন্তু মগজকে বাদ দিয়ে আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি থাকতে পারে না। এই চিন্তাশক্তি বা চিন্তাজাত নীতিবোধ বা আত্মবিচার ক্ষমতাই যদি আত্মা হয়, তাহলে আত্মাহীন মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব। প্রাণ এবং আত্মা তাহলে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এমন অনেক মানুষ বেঁচে আছে যাদের আত্মা নেই। অর্থাৎ আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়েছে বললেই যে মৃত্যু হয়েছে বোঝায়—সে কথা সত্য নয়। মানুষ আসলে মরে যখন সে প্রাণে মরে, আত্মায় নয়।

জে, বি, এস হলডেন বলেছেন, পৃথক সোল বা আত্মা যদি থাকে তবে তাকে এক এক টুকরো করে বাদ দেওয়া যায়। "It there is a detachable soul it can certainly be detached bit by bit." বহু রকম পরীক্ষাতে তিনি এ কথা বলেছেন। ব্রেন সার্জারি যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এ পরীক্ষা পুরাতন হয়ে গেছে।

তাঁরা দেখেছেন সম্মুখভাগের মগজের অনেকখানি বাদ দিলে মানুষ শুধু বেঁচে থাকে তাই নয়; তার স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি ও পেশীশক্তির বিশেষ কিছু হানি হয় না, শুধু কাজের উৎসাহ কমে যায়। সবখানি বাদ দিলে নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীর মতো বেঁচে থাকে।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অযুত নিযুত জীবিত কোষদ্বারা গঠিত দেহ পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা, কিন্তু তবু সকল কোষের মূল্য সমান নয় সমগ্র জীবন্ত মানুষের সম্পর্কে। দেহে যে কোষরাশি আছে তারা সঙ্ঘবদ্ধ—organized। এই সঙ্ঘবদ্ধ দেহে যত কোষ আছে, প্রয়োজন হিসাবে তাদের প্রাণধর্মের স্তরভেদ আছে। কোনো কোনো অঙ্গ নষ্ট হলে সে জন্য দেহের গুরুতর কিছু ক্ষতি হয় না। আবার কোনো একটি অঙ্গ নষ্ট হলে কোষদের সঙ্ঘবদ্ধতা নষ্ট হয়, এবং মানুষের মৃত্যু ঘটে।

যে অঙ্গের যা কাজ, তা পৃথক হয়েও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং কোনে কোনো ক্ষেত্রে একের ক্ষতি অপরের মারাত্মক ক্ষতি করে। ফুসফুস নষ্ট হলে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হতে পারে, হৃৎপিণ্ড নষ্ট হলে ফুসফুসের কাজ অচল হয়। এদের যে-কোনো একটি অকেজো হয়ে গেলে কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের দেহকোষগুলির সঙ্ঘবদ্ধতা ভেঙে যেতে থাকে। তারা সবাই মিলে যে ব্যক্তি-মানুষকে গড়ে তুলেছিল, তখন তারা নিজেরা জীবিত থেকেও ব্যক্তি-মানুষকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এবং কিছুকালের মধ্যে তারাও মরে যেতে থাকে।

আরও একবার জীবন কাকে বলা দেখা যাক।

তরল জিনিসে সাঁতার কেটে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে হাল-সংযুক্ত একক কোষের একটি জীব, আর একটি একক কোষের জীবের গায়ে মাথা ঠুকল গিয়ে। শেষোক্ত জীবটি তাকে বলল ভিতরে এসো। তাকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করল, কিন্তু বলল তোমার হালখানা বাইরে রাখ, এখন আর ওর দরকার নেই। হাল খুলে ফেলে ভিতরে আশ্রয় নেবা মাত্র তারা এক দেহ হয়ে গেল। এইবার চলল তাদের মানুষ গড়ার কাজ। এই একটি নিষিক্ত কোষ নিজেকে অদ্ভুত কৌশলে ভাগ ক'রে দুটো হল, তারপর সেই দুটো চারটে হল, চারটে আটটা, থামল না, চলল এই বৃদ্ধির কাজ। একটা

পিণ্ডবৎ কিছু গড়ে তুলল তারা কয়েক দিনের মধ্যে। প্রথম কোষ-বিভাগ আরম্ভের দিন থেকে তারা পরামর্শ ক'রে কেউ হল চেপ্টা, কেউ হল সুতোর মতো, কেউ হল পাত্নয়ার মতো, কেউ রইল আগের মতোই গোলাকার। একটি কোষ কত রকম কোষের জন্ম দিয়ে চামড়া, হাড়, রক্ত, মাংস, চুল, নখ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, কিডনি, মগজ, স্নায়ু, গ্ল্যাণ্ড, এবং ভবিষ্যৎ মানুষ সৃষ্টির উপাদান সম্বলিত একটি মানুষের জন্ম দিল। মগজহীন কোষ-ওয়ার্কশপের সব দিকের মোটামুটি গড়ন শেষ করতে ন'মাস আন্দাজ গোপনবাস দরকার, তারপর তাকে প্রকাশ্যে বের ক'রে দেওয়া হল। এবারে সে বাইরের প্রকৃতি থেকে সাহায্য নিয়ে বাকী গড়ার কাজটুকু শেষ করবে। মূলে সেই একটি অণুবীক্ষণদৃশ্য কোষের এই পরিণাম। বহু জীবন (কোষমাত্রেই জীবিত) মিলে একটি সঙ্ঘবদ্ধ জীবন। একটি কোষের আত্মবোধ নেই, কিন্তু সমস্ত কোষ মিলে যে ব্যক্তিকে গড়ল তার আত্মবোধ আছে।

দেহযন্ত্রের মধ্যেকার সকল কাজ সেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে ঘটে চলেছে, সে সব কাজ করার ভার কোষেরাই নিয়েছে, শুধু তারা খুব বিপন্ন হলে কোষাধ্যক্ষকে জানাবে, কোষাধ্যক্ষ তখন ডাক্তার ডাকবে। মানুষের দেহটা তাদের কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার। তাদের এখন নিজেদের স্বাধীন বৃদ্ধি আর নেই, শুধু যেখানে ক্ষয়, সেখানে মাত্র নতুন কোষ বৃদ্ধি হয়ে সেই ক্ষয় পূরণ। কোনো একটি কোষ অকারণ আর নিজেকে বিভক্ত ক'রে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে না। যদি কোনো কোষ আইন অমান্য ক'রে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে বাড়াতে থাকে, তাহলেই কোষাধ্যক্ষ মানুষটির বিপদ। এই রকম বৃদ্ধি ক্যানসারের মূর্তি ধরে। প্রথম দিকে ধরা পড়লে সেই বৃদ্ধিকে সমূলে কেটে বাদ দিতে হয়। তখন নিষ্ঠাবান কোষেরা নতুন কোষ তৈরি ক'রে ক্ষত স্থানকে জুড়ে দেয়। দেহস্থ কোষেরা স্বাধীনভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন বাদ দিয়ে বাড়ে না, কিন্তু দেহ থেকে সেল খুলে নিয়ে বৃদ্ধির উপযুক্ত পৃথক পরিবেশে রাখলে আবার সে স্বাধীন ভাবে বাড়তে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দেহের মধ্যেকার কোষদের পৃথক সত্তা ও জীবন যেমন সত্য, তাদের সামগ্রিক মিলনে যে ব্যক্তির আবির্ভাব তার ব্যক্তিসত্তাও তেমনি সত্য। ব্যক্তিকে গড়ে তোলার জন্যই তাদের সার্থকতা, তাই তারা নিজেদের খেয়াল বা স্বাধীনতা সবই প্রায় ঐ ব্যক্তির পায়ে সমর্পণ করেছে।

মানুষের এই ব্যক্তিসত্তাই মানুষের পরিচয়। সে জীবন্ত মানুষ। বলি না যে সে কোষের সমষ্টি। বিশ্বকোষের মাঝখানে তার ব্যক্তিসত্তা নগণ্য হলেও, পৃথিবীতে সে একটি উল্লেখযোগ্য কোষাধ্যক্ষ। তার সামগ্রিক ভাবে যে একটি পৃথক সত্তা আছে তারই অভাব হলে আমরা বলি মানুষ বেঁচে নেই।

গানের কথা ও স্বরলিপি বা যে সুর ঐ গানের জন্য নির্দি[illegible] হয়েছে, তাদের মিলনেই শুধু গান হয় না, গানের কথাগু[illegible] সেই সুরে গাইলে তবে তা গান। অর্থাৎ গান ঐ কথা[illegible] সুরকে আশ্রয় ক'রে অথচ অতিক্রম ক'রে তবে গান হয়[illegible] কথা ও সুর বাদ দিলে গানের কোনো অস্তিত্ব থাকে না[illegible] কথা ও সুরকে আশ্রয় ক'রে গান, বস্তুকে আশ্রয় ক'রে ব[illegible] তেমনি দেহকে আশ্রয় ক'রে জীবন বা আত্মা বা আত্মবো[illegible] বা চৈতন্য। কথা ও সুর-বিচ্ছিন্ন গান, বস্তু-বিচ্ছিন্ন [illegible] এবং ব্যক্তি-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা কল্পনা করা সম্ভব হয় না।

আধুনিক কালে ল্যাবরেটরিতে বা অস্ত্রবিদ্যার [illegible] যে সব পরীক্ষা চলছে তাতে কোনো প্রাণীর কি অবস্থা ঘট[illegible] তাকে মৃত বলা যায় তা এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

অনেক ব্যাধির জীবাণু বা জার্ম বা ব্যাক্টেরিয়া, জীবাণু[illegible] নাশক রাসায়নিক প্রয়োগের পর মরে যাবার ডাক্তার[illegible] সার্টিফিকেট পাওয়াই তাদের জীবনের শেষ মনে কর[illegible] হয়েছে এতদিন, কিন্তু আধুনিক পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে অনে[illegible] 'মৃত' জীবাণুই পুনরায় পৃথক কালচার মিডিয়ামে বা উপযু[illegible] আহার-বাসস্থানের পরিবেশে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান[illegible] মহলে এই আবিষ্কার কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

মানুষের মৃত্যুও অনেকখানি বিভ্রান্তি [illegible] করছে[illegible] মানুষের দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বের ক'রে নিলে মৃত্যু হয়[illegible] কিন্তু নতুন রক্ত দিয়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাচ্ছে[illegible] সদ্যোমৃত সৈনিককে এ ভাবে বাঁচানো হয়েছে। [illegible]দিন হ[illegible] কেপটাউনে একটি তিন বছরের ছেলের দশ বার রক্ত বদ[illegible] করা হয়েছে চার মাসের মধ্যে। খবরটি রয়টার প্রচা[illegible] করেছে গত ৫ই সেপ্টেম্বর। প্রত্যেক বারই তার দে[illegible] থেকে সমস্ত রক্ত বের ক'রে নেবার দরকার হয়েছিল। [illegible] এখন ভাল আছে।

১৯২৯ সনে রুশ মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ব্রিউখোনেনকো[illegible] এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি একটি কুকুরে[illegible] দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বের করে নেন এবং পুনরায় নতুন রক্ত[illegible] দিয়ে তাকে বাঁচান। শিরায় অক্সিজেনপূর্ণ নতুন রক্ত চালন[illegible] করা হয়েছিল। এর পর থেকে অনেকেই হার্ট-লাঙ[illegible] মেশিনের সাহায্যে 'মৃত' কুকুরকে বাঁচিয়েছেন এবং সে স[illegible] কুকুরের অধিকাংশই পরে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছে[illegible] এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্রের সাহায্যে, রক্ত চলাচলে[illegible] এবং নিশ্বাস নেবার স্বাভাবিক পথকে ঘুরিয়ে দিয়ে, মানুষে[illegible] দেহাভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসকে সাময়িক ভাবে ছুটি দেওয়া[illegible] সম্ভব হয়েছে—প্রয়োজনমতো অস্ত্রপ্রয়োগের সুবিধা[illegible] জন্য।

ডক্টর ব্রিউখোনেনকো কুকুর নিয়ে আরও ভয়াবহ এ[illegible] পরীক্ষা করেছেন। তিনি প্রথমে একটি কুকুরের গলা কে[illegible] মুণ্ডটি সম্পূর্ণ পৃথক করেন, তারপর তার রক্ত চলাচলের [illegible] বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে তাঁর কৃত্রিম যন্ত্রটি সংযুক্ত ক'রে অক্সিজে[illegible] পূর্ণ রক্ত চালনা করতে থাকেন তার ছিন্নমুণ্ডে। কৃ[illegible]

হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস এবং মাত্র সেই মুণ্ডটি। তবু দেখা গেল সেই মুণ্ডটি জীবিত কুকুরের মতোই ব্যবহার করতে লাগল। তার চোখ ছুঁয়ে দেখা গেল চোখ বন্ধ হয়, চোখের জ্র টানলে তা কুঁচকে যায়, নাকের মধ্যে কিছু প্রবেশ করালে ঝিল্লি সাড়া দেয়। তার পর তার মুখে খাদ্য দেওয়া হল, খেল সে সেই খাদ্য, যদিও অন্য দিক দিয়ে তা বেরিয়ে গেল।

এই যে ক্ষণকালের জন্যও মৃত জীবিতের মতো ব্যবহার করল, এর থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? মৃত্যু তবে কি?

'ডাক্তার রোগীর পাশে বসে মৃত্যু ঘোষণা করলেন ...., কারণ রোগী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, হৃৎপিণ্ড চলছে না, পাল্‌স্‌ নেই, অতএব রোগী মারা গেছে এই মর্মে তিনি সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রে এখন এই সার্টিফিকেট দেখেও জোর ক'রে বলতে পারছেন না যে, সত্যই মৃত্যু ঘটেছে কি না। শ্মশানে গিয়ে অনেক 'মৃত'কে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়েছে, এ কাহিনী আমাদের দেশে অনেক দিনের। একখানা আমেরিকান কাগজে মৃত্যু বিষয়ে একটি প্রবন্ধেও আশী বছর বয়সের এক বৃদ্ধের এই ভাবে বেঁচে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এই বৃদ্ধ মারা যাবার সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে কফিনে ঢোকার আগে বেঁচে উঠল, তারপর তাকে এক হাসপাতালে নেওয়া হল, এবং সেখানে কিছুক্ষণ জীবিত থেকে দ্বিতীয় বার মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিয়ে কফিনে ঢুকল।

এ ধরণের ঘটনা নতুন না হলেও অন্যান্য নানা পরীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে একে আবার নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, মৃত্যু-সম্পর্কে নতুন সব প্রশ্নের মীমাংসায় এই পুরাতন ঘটনাও সাক্ষ্য দিতে এসেছে।

মানুষের দেহযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ মাত্র। অকল্পিত-পূর্ব সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সার্জারি-বিদ্যার সাহায্যে মানুষের অনেক অঙ্গ প্রায় ঘড়ির কলকব্জা খুলে মেরামতের মতো মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। নষ্ট চোখ খুলে ফেলে-সদ্যোমৃতের অবিকৃত চোখের কলম দ্বারা দৃষ্টিহীনের চক্ষুদান করা পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে। দেহের সমস্ত রক্ত ঢেলে ফেলে নতুন রক্তের সাহায্যে যে মানুষকে নবজীবন দান করা হচ্ছে সে আর গর্ব ক'রে বলতে পারবে না যে, তার ধমনীতে পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত।

এই সব পরীক্ষার সাহায্যে দেহাতীত আত্মার সন্ধানও করা হচ্ছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ বিপরীতটারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই পথে চ'লে ভবিষ্যতে কখনও যদি নিশ্চিত প্রমাণ হয় দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মা নেই, তাহলে মানব-সমাজের খুব ক্ষতি হবে মনে হয় না। আর যদি প্রমাণ হয় আছে, তাহলে আপাততঃ মানুষের বহুদিনের বিশ্বাস নাড়া খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে, এবং বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে কাচপাত্রে আত্মা-কালচার করার সুযোগ পাবেন। বস্তুবিশ্লেষণের পথে সৃষ্টির মূল রহস্য তো অনেকখানিই ফাঁস হয়ে গেছে, শুধু কি অবস্থায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎকণিকা গঠিত পরমাণুর যোগাযোগ ঘটালে এবং সেই যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হলে সমচরিত্রের এবং সমব্যবহারের কোষ তৈরি সম্ভব হবে সেইটি জানা যায়নি। অর্থাৎ ভাঙা গেছে, গড়া যায়নি। গড়তে পারলে মানুষই একদিন বহু কোষবিশিষ্ট আত্মবোধসম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারবে।

উপাদান রহস্য সে জেনেছে, উপকরণ তার হাতের মুঠোয়, এখন গড়বার মন্ত্রটি জানতে পারলেই তার সাধনা সার্থক হবে। আরও একটি বড় সত্য সে তখন প্রমাণ করতে পারবে—প্রাণীকুলের ধারাবাহিকতা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন তার মৃত্যু নেই। সে নিশ্চিত প্রমাণ করবে একক কোষ প্রাণী দু'ভাগে ভাগ হয়, মরে না; বহুকোষ প্রাণী আপন উত্তর-পুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে বেঁচে থাকে, মরে না।

ঘুমের ছড়া

আয় ঘুম আয়
বাগদিপাড়া দিয়ে,
বাগদিদের ছেলে ঘুমোয়
জাল মুড়ি দিয়ে।

হাটের ঘুম বাটের ঘুম
পথে পথে ফেরে
চার কড়া দিয়ে কিনলাম ঘুম,
মণির চোখে আয় রে।

খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।

ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনার উপায় কি।
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

—প্রচলিত বাঙলা ছড়া

বাঙলা সাহিত্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা অধুনা বিরল। কয়েক জন মাত্র সাহিত্যিক আছেন যাঁদের ভাব ও ভাষায় সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় আছে, যেজন্য বর্ত্তমানে শুধু তাঁদের লেখা পাতে শুধু নয়, অমৃতও উঠছে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঋগ্বেদ-রূপান্তরের মহান্ ব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছেন বহু দিন পূর্ব্বে। মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সবিশেষ অনুরুদ্ধ হওয়ায় প্রবোধেন্দুনাথ শ্রীভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র মন্থন ক'রে গ্রহণ ও ব্যবহারযোগ্য নৃত্যশিল্পাংশের সানুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। "তাণ্ডব-বিধান" পাঠে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্ত হবেন। তদুপরি লাভবান হবেন তাঁরা, যাঁরা নৃত্যশিল্প-চর্চ্চা ক'রে থাকেন। এতৎসহ চিত্রসমূহ লেখক কর্ত্তৃক অঙ্কিত।—স।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

'ভারত-নটের' প্রবেশ

ভারত-নট। রঙ্গমঞ্চে আমি আজ প্রবেশ করেছি। মহোদয়গণ, যারা অধিকারী নয়, তারাই না জোর ক'রে স্থাপন ক'রে নেয় নিজেদের অধিকার? তাই, আমি এসেছি। মালী যখন বীজ
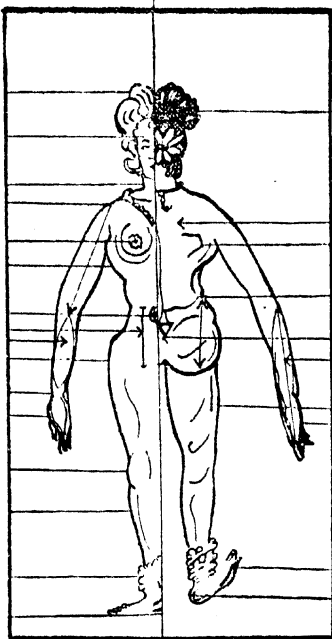
অঙ্গসংস্থা

রোপণ করল, তখন মৃত-প্রায় শুষ্ক-বীজ কি জানত, সে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে একদা, দুলবে বাতাসে, গন্ধ বিলোবে? হে রসিক সমাজ, সেই অঙ্কুরের স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রাণবন্যা নিয়ে আমি আজ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছি। বিশ্ব বিপুল, [illegible] নিন্ আমার আদিত্যাশ্রয়ী ভারতী-পুষ্পের। বর্ণাশ্রয় চাই। আমি জানি আমার এই ভারতীয় বীজের কৌসুমী [illegible] আপনাদের ভাল লাগবে, চোখে ধরবে। প্রকাশবিহ্বল হয়ে অঙ্কুর আজ পুষ্প হতে চলেছে নৃত্যের ছন্দে। জয় হোক মহাদেবের!

হে ধূর্জ্জটি, আমার পুষ্প-দেহে লাগিয়ে দিও তোমার ত্রি-লোচনের জ্যোতির্লিখন। হে তণ্ডু, শান্ত কর তোমার চারণিক কণ্ডুয়ন। আমাকে শেখাও। তোমার তাণ্ডবে আবার ফিরে আসুক ভারত-নৃত্যের কাণ্ডজ্ঞান। আর (মৃদুহাস্যে) [illegible] আমার ভবিষ্যনটীবৃন্দ, আমার নূপুর-চরণের রণৎঝঙ্কারে রঙ্গমঞ্চে সঞ্চালিত হবে যে রেণু, তার বাইরে ঐ প্রেক্ষাগৃহে উপবেশন ক'রে তোমরা রসাবেশে শিখে নাও এই অদীনপুণ্য নটের নৃত্য-কলা। একটু সোহাগের, একটু মোহের অঞ্জন পরে থেকো চোখে, চোখের পাতায়, পাতায়-ঘেরা তারার কণীনিকায়। প্রথমে বিচার করে দেখো। তারপরে যদি ভালো লাগে বাজিও তোমাদের নূপুর, দুলিও তোমাদের লতাহস্ত, যোগ দিও এই দিব্য তাণ্ডবে।

ঐ দেখুন, নৃত্যাচার্য্য ভরতমুনি আসছেন—। কী অনিন্দ্য তাঁর যৌবনবান দেহ, দেহের গঠন;—জ্যোতির সলিলে যেন স্নাত, বিগলিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শরণাগত শিষ্যকে এবার শিক্ষা দিন।

ভরতমুনি তখন উচ্চারণ করলেন—

"প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ।
নাট্য-শাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্।"

[দ্যুতিমান পিতামহ ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে
শেখর-প্রণাম ক'রে
• ব্রহ্মার উদাহরণ-স্থলাভিষেক-পুণ্য
নাট্যশাস্ত্র
আমি পরিভাষণ করছি প্রশস্তভাবে।]

(ভঃ নাঃ শাঃ ১—১)

*   *   *   *

এই নাট্যশাস্ত্রের যিনি টীকাকার তাঁর নাম 'অভিনবগুপ্ত'। স্বকীয় নাট্যবেদ-বিবৃতিতে শ্রীঅভিনবগুপ্ত নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেটি নিয়ে সংক্ষেপে গ্রথিত হল।

"আমার হৃদয়ে সংবেদন রয়েছে। আমি বিভাগ ক'রে দিয়েছি, চিত্র-শক্তি-পুঞ্জের গুণ স্থান ও সৌষ্ঠব। আমার মধ্যে হর্ষ এনেছে উল্লাস, পরম বিকার, এবং অর্থ-বিবেকের পরোত্তীর্ণতা। আমি দেখতে পেয়েছি বিশ্ববীজের অঙ্কুর, ঐ কল্যাণরূপকে। তিনিই মূলাধার। শিবম্। তাঁর বিচিত্ররূপের মধ্যে রয়েছে সঞ্চারণী-শক্তি;—ধর্ম। আমার ভাষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের পবিত্র মর্মস্থানের শুভ্র মর্মরতা। সুপূর্ণা আমার ভাষা।"

*   *   *   *

শ্রীভরতমুনি

চতুর্থ অধ্যায়

ভারত-নট। নূপুর বাজাবার আগে, হে আমার শিষ্যমণ্ডলী, তোমাদের দুটি চারটি গুহ্য-বাণী শোনাব। বিরক্ত হোয়ো না। এই বাণীসঙ্কেতগুলি না জানলে, অসম্ভব হবে নৃত্য-শিক্ষার প্রযোজনা। বৈদিক বংশধরদের মুখে যে ভাষার একদা প্রয়োগ হত, সে-ভাষা বহুরূপী হ'য়ে আজ বিকৃত এবং দাস-জন্ম নিয়েছে এই খৃষ্টীয় মহাযুগে। সেই বিকৃতি বিকল করেছে ভারতীয় মর্মার্থকে। তাই, পরিস্ফুট-ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমি তোমাদের হাতে উপহার দিতে চাই দুখানি "দেহ"-চিত্র।

আমি রঞ্জিত করিনি চিত্র। সুশ্রুত, ও মহাভারত—যে আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন—এবং যাতে পাই যাস্কমুনির নৈরুক্তীয় সমর্থন,—সেই মর্মার্থ এইখানে নিবদ্ধ করেছি। বাংলা-ভাষায় যে মানেটি আমরা বুঝি, দেখতে পাবে, কিছু প্রভেদ রয়েছে এর ব্যাখ্যায়। প্রণিধান করে গ্রথিত করে নিও চিত্তে। অতঃপর, দূর হবে কষ্টভোগ। এই শব্দগুলিই আমি ব্যবহার করবো আমার নৃত্য-পদ্ধতিতে। ভরতমুনির অনুসরণ ক'রে। বাধ্য হয়েছি ইংরাজি ভাষার সাহায্য নিতে।

দেহ। দিহ্ ধাতু; to plaster, to mould, to fashion.
রূপধারী মাংসপিণ্ডের সুগঠিত স্তূপ।

কর। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরিমিতির প্রান্তিক দ্বাদশ গুণ ব্যবহার করে যে মাপ পাওয়া যায়, 'করে'র তাহাই পরিমিতি।

পার্শ্ব। পাঁজরা (দুদিকের)।

চরণ। সম্পূর্ণ পা।

বক্ষঃ। ভার-বহনক্ষম উন্নত-শিখর স্তন-প্রদেশ।

হস্ত। কনুই থেকে মধ্যাঙ্গুলির শীর্ষ পর্য্যন্ত (২৪ অঙ্গুলি বা ১৮" পরিমিতি)।

বাহু। কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত।

নাভি। নভ ধাতু; to burst asunder, or into a·hole. দেহের রস-স্থান।

নাসিকা। নাক।

উরস্। বক্ষের বিশালতা।

মুখ। Mouth.

ত্রিক। Loins। Regis Sacra. Hips.

পক্ষ। পিঠের পাখনা।

গ্রীবা। The back part of the neck, Nape, The tendon of the trapezium muscle.

শীর্ষ, শিরস্। Skull, the head.

ললাট। The fore head, brow.

জঙ্ঘা। গুল্ফ থেকে জানু পর্য্যন্ত। নস্ (বেহারী)।

ভুজ। ভুজ ধাতু; to bend, curve.
স্কন্ধপ্রান্ত হইতে বঙ্কিম বাহু।

নিতম্ব। The buttocks or hinder part (esp. of a woman).

ঊরু। the thigh.

পার্ষ্ণি। এড়ি (বেহারী)। heel।

স্ফিক্। Buttocks, hips.
গাত্র। An instrument for the purpose of movement, a limb or member of the body.
পাদ। ১২ অঙ্গুলি পরিমিতি সঙ্কলিত চরণ।
পৃষ্ঠ। The hinder part or rear of anything.
জানু। Knee.
কটিদেশ। Loins.
গুল্ফ। Ankle ; পাইরী (বেহারী)।
অঙ্ঘ্রি। পায়ের কব্জির নীচের দুদিকের দুটি হাড়। নূপুর আটকাবার স্থান।

—:—

শ্রীভরতমুনি তখন পিতামহকে বললেন—

*　*　*　*

"হে বিভু, সাঙ্গ করেছি পূজা। জেনেছি, তুমিই ঐশ্বর্য্যের নিদানী। এখন, আমাকে ক্ষিপ্র আজ্ঞা দাও ;—নাটকীয় কোন্ প্রয়োগটি প্রযোজনা করতে হবে আমাকে ? (Sl. 1)

আমার কথায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল ব্রহ্মার মুখ। বললেন—

"প্রযোজনা করবে ? তাহলে, প্রযোজনা কর—"অমৃত-মন্থন"। এর মধ্যে রয়েছে উৎসাহ-জননী প্রীতি, প্রীত হবেন সুরগণ। সার্থক-সাধক হবে ধর্ম, অর্থ এবং কামের। হে বিদ্বন্, প্রযোজনা কর আমার পূর্ণগ্রন্থিত এই "সমবকার"টি। (Sl. 2-3)

দেবতা এবং দানবেরা সকলেই হৃষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন,—অনুদর্শন করেছেন,—কর্ম এবং ভাব। (Sl. 4)।

পদ্মের পাপড়িগুলি খুলতে খুলতে ক্ষণপরে ব্রহ্মা আমাকে বললেন—

"আমরা দেখাব ত্রিলোচনকে, এই নাট্যের প্রযোজনা। প্রকাশে কিন্তু চাই সুষ্ঠুতা।" (Sl. 5)

বৃষভাঙ্কের নিবেশনে উপনীত হলেন ব্রহ্মা। অর্চনা-শেষে মহাদেবকে পিতামহ বললেন— (Sl. 6)।

"হে সুরোত্তম, সৃষ্টি করেছি "সমবকার"। শ্রবণ এবং দর্শনদানে একে প্রসাদী করে দিন। আপনিই, অর্হনা এবং অর্হনীয়।" (Sl. 7)

দেবতাদের ঈশ্বর তখন দ্রোহধর্মী ব্রহ্মাকে বললেন— "আনন্দে দেখব। হে মহামতি ভরত, তুমি সজ্জিত হও, প্রয়োগ কর শিগ্র। (Sl. 8)

["সমবকার" :—

দেবাসুরসম্বন্ধি কোনো বৃত্তান্ত অবলম্বন করে এই রূপকের হয় রচনা। 'বিমর্ষ'-নামক চতুর্থ সন্ধিটি এতে থাকে না। তিনটি অঙ্ক এই রূপকের। প্রথম অঙ্কে 'মুখ' ও 'প্রতিমুখ' নামক দুটি সন্ধি করণীয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে একটি একটি সন্ধি সন্নিবেশিত হবে, যথা গর্ভসন্ধি ও উপসংহারসন্ধি। ধীরোদাত্তলক্ষণযুক্ত দ্বাদশটি দেবমানব নায়ক অভিনয় করবেন। ফল পৃথক্ পৃথক্। বীররস এখানে মুখ্য। কৌশিকী-বৃত্তির অল্প প্রয়োগ হবে। "বিন্দু" বা "প্রবেশক" নাই। ভাষায় ত্রয়োদশ বীথিই প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হবে থাকে। আদিতে গায়ত্রী ও উষ্ণিক্ ছন্দ ; পরে বিবিধ ছন্দের প্রয়োগ। ইত্যাদি— (সাঃ দঃ ৬)]।"

*　*　*　*

যে স্থানটিতে এই সমবকারের প্রযোজনা হয়েছিল সেই স্থানটি তুষার-মণি হিমাচলের পৃষ্ঠদেশ। সেই স্থানটিকে আকুল করে ঘিরে ছিল বহু-বরণ, বহু-রূপী পর্ব্বতদের দল। অবনম্র স্থলটিকে আকীর্ণ করে ছিল আম্রবৃক্ষের অসংখ্যতা এবং রম্য গুহার অজস্রতা। শ্রুতিমূলকে মধু-শ্রুতি শোনাচ্ছিল,—নির্ঝরের ঝর্ঝর-সঙ্গীত। (Sl. 9)

*　*　*　*

হে দ্বিজসত্তমগণ, আমি সেই মনোহরণ স্থানটিতে প্রয়োগ করেছিলুম আর একটি নাটক :—

(১) তার প্রথমেই,—পূর্ব্বরঙ্গ-ক্রিয়া ;
(২) "ডিম"-সংজ্ঞক এই নাটক।
(৩) নাম "ত্রিপুর-দাহ"। (Sl. 10

"ডিম"—সংজ্ঞাটির বিশেষ ব্যাখ্যা আছে :—

মায়া, ইন্দ্রজাল এবং সংগ্রাম নিয়ে, ও ক্রুদ্ধ পরিক্রমা ক'রে, উপরাগের সাহায্যে, প্রযোজিত হয় এই রূপক বিশেষ।

দেহ-চিত্র

মনুষ্য ব্যতীত অন্য সব প্রাণীই নট-নায়ক হতে পারে এই রূপকের। (সাঃ দঃ ৬)

* * * *

বাণী শুনে—মহাদেবের ভূত প্রমথগণ হৃষ্ট হয়ে উঠল। তারা বুঝতে পারল, সত্যই যথার্থ প্রয়োগ এবং কর্ম্মশৈলীর ব্যবহার এস্থলে হয়েছে। তারপরে, তারা যখন ভাবের অনুকীর্ত্তন দেখল, তখন ঐ অতীত চিত্রকারেরা (ভূতগণ) আরো হৃষ্ট হয়ে উঠল। প্রীতির প্রমোদে মহাদেব বললেন ব্রহ্মাকে— (Sl. I1)

"যা দেখালেন, সত্য, একেই বলে নাট্য।—নৃত্য-গীত-বাদিত্রের সমন্বয়। এই সৃষ্টি একমাত্র আপনিই আনতে পারেন। আপনার সৃষ্টি-প্রযোজনা নিয়ে আসে যশঃ, নিয়ে আসে কল্যাণ, পুণ্য, এবং শুভ্র বোধনার বিবর্দ্ধনা।

আজ মনে পড়ে যায়, সেদিনের সেই সন্ধ্যা। আমি মত্ত হয়েছিলুম নৃত্যে। প্রয়োগ করেছিলুম নানান্ "করণ,"—নানান্ "অঙ্গহার"। আহা, সেগুলি নৃত্যভূষণ। (Sl. 12. 13,)

"পূর্বরঙ্গবিধাবস্মিংস্ত্বয়া সম্যক্ প্রযোজ্যতাম্।
বর্ধমানকযোগেষু গীতেষ্বাসারিতেষু চ।
মহাগীতেষু চৈবার্থান্ সমাগেবাভিনেষ্যসি।
যশ্চায়ং পূর্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতশ্চায়ং চিত্রো নাম ভবিষ্যতি।
শ্রুত্বা মহেশ্বরবচঃ প্রত্যুক্তং তু স্বয়ম্ভুবা।" (Sls 14 এবং 15)

মহাদেবের এই পরিভাষণ নাট্যশাস্ত্রে বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। অর্থটি এই :—

"এই যে এখানে, পূর্বরঙ্গ-বিধি, অর্থাৎ রঙ্গদৈবতপূজনাদির যথাবিধি প্রয়োগ করা হোলো, এতেও ঐ করণগুলি এবং অঙ্গহারগুলির আশা করি সম্যক্ প্রযোজনা আপনি করবেন। সমীচীন হবে সেই প্রয়োগ। পূর্বরঙ্গে এই করণ এবং অঙ্গহারগুলির যখন প্রযোজনা হবে তখন সেই নৃত্যকালীন গীতের সঙ্গে "বর্ধমানক-যোগ"গুলি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, এবং তত্র সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য "আসারিত-তাল"-সঞ্চয়। "মহাগীত"গুলির সম্পাদনাতেও দেখবেন' এই করণ এবং অঙ্গহারগুলিই বাক্যার্থসম্পদ্‌কে পদে পদে পুষ্ট ক'রে অভিনয়ন ক'রে এগিয়ে দিচ্ছে সুন্দর মোহনতায়। এখন এই যে পূর্বরঙ্গটি আপনি প্রযোজনা করলেন সেটিকে আমি বলব "শুদ্ধ"। এই শুদ্ধ পূর্বরঙ্গে যদি বিমিশ্রিত করা হয়,—করণ এবং অঙ্গহার, তাহলে ভবিষ্যকালে এর নাম হবে "চিত্র"।

* * * *

ভারতনট।—মহাদেবের মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের কাছে মহাবাক্য। তাঁর প্রতি কথাটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। করণ এবং অঙ্গহারের প্রযোজনায় প্রথমেই আমরা স্পষ্ট অনুভব করছি একটি পারিপার্শ্বিকতার অস্তিত্ব। নেপথ্যেই হোক্ বা রঙ্গমঞ্চেই হোক্, কোথাও না কোথাও তাললয়মিশ্রিত বাদ্য এবং গীতের ধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই ধ্বনিপুঞ্জটিও নিশ্চিত বিদ্যমান ছিল ব্রহ্মা-কল্পিত "শুদ্ধ"-পূর্বরঙ্গে। কিন্তু মহাদেব সেই শুদ্ধ-ধ্বনিপুঞ্জে নব-সংযোগ করে দিচ্ছেন "বর্ধমানক-যোগ" এবং "আসারিত-তাল"। এই দুয়ের মাধ্যমিকতায়, সংশ্লিষ্ট করতে হবে অঙ্গহার ও করণের বিন্যাস।

এই অভাবটি ঘটেছিল "শুদ্ধ"-পূর্বরঙ্গে। শ্রীঅভিনবগুপ্ত 'শুদ্ধ'-শব্দের অর্থ করেছেন—"বৈচিত্র্যরহিত"। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে শুদ্ধ-শব্দের অর্থ হচ্ছে—"রাগান্তরামিশ্ররাগঃ"। শুদ্ধ-শব্দের মধ্যে পবিত্রতা, শোধন-প্রিয়তা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যসুরভি বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। কিন্তু মহাদেব,—বোধ হয় বিচার করে দেখেছিলেন যে, রূপক-প্রয়োগের মধ্যে কেবল-শুদ্ধত্বের স্থান নেই, তাতে পরিবেশন করতে হবে এতদতিরিক্ত কিছু মনোহারিতা, কিছু রঞ্জকত্ব। তাই তিনি অমিশ্রিতরাগ-প্রকাশের শুদ্ধবুদ্ধির উপরে চাপিয়ে দিলেন বিমিশ্রণের চিত্র-নীতি।

শ্রীশার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে সপ্তম নর্ত্তনাধ্যায়ে আমরা পাই—

"প্রয়োগম্ উদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ।" ইতি।

এই "উদ্ধত" শব্দটি লক্ষণীয়। মহাদেব যেন ঐ শুদ্ধত্বের মধ্যে ঔদ্ধত্যের ভাব দেখেছিলেন। শুদ্ধ প্রযোজনায় আসতেই হবে অব্যবহারিক উদ্ধত-ভাব। এই উদ্ধত-ভাবে বর্তমান থাকে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জনের মত এক গর্বিত অভিমানের দৈবী ধ্বনি-উল্লাস। কিন্তু মহাদেবের কথিত করণাঙ্গহার-কীর্ণ প্রযোজনায় প্রকাশ পাবে অনুদ্ধতভাব এবং সুকুমারতা। এই মতটিও সমর্থন করেছেন শ্রীঅভিনবগুপ্ত।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি,—পূর্বরঙ্গে নাচ হচ্ছে, মহাদেবের ভাষণ অনুসারে তাতে যোগ করা হোলো করণ ও অঙ্গহার, সেগুলির প্রযোজনা হচ্ছে গানের গুঞ্জনের (উপবাহন) সঙ্গে; সেই গুঞ্জনকে সমর্থন ক'রে প্রয়োজনানুসারে সহায়ক হয়েছে "আসারিত" নামক ত্রয়োদশবিধ তালসঞ্চয়; এবং প্রসারিত হচ্ছে চতুর্বিধ "আসারিত"-ভাস বর্ধমান-তাল।

সঙ্গীতরত্নাকরের পঞ্চম তালাধ্যায়ে, এই "আসারিত" ও "বর্ধমান" সম্বন্ধে লয়-কলা-সম্পাদিত বিবৃতি রয়েছে। ভরতনাট্যের চতুর্থ অধ্যায়ে ২৮১-২৯২ শ্লোকের ব্যাখ্যানে সেগুলি বলব, পরে।

এখন 'মহাগীত' বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণ "আসারিত"-তালবদ্ধ গীত যখন পুষ্কল-পদবীতে উন্নীত হয়, তখন তাকে 'মহাগীত' বলে। সাধারণটি লাভ করে অসাধারণত্ব। এটা কেমন করে হয়? কী এর কর্তৃত্ব? এই প্রশ্নই মনে আসে প্রথমে। "বর্ধমানক" তাল যখন ক্রমদ্রুতি লয়ের মাধ্যমে লাভ করে অনাদি-রূপত্ব,—তখন ক্ষুদ্র মনের গীতিধার্মিকতা অক্ষুদ্র সুর-বিপুলতার মধ্যে, অর্থাৎ বৃহত্তের বেদনার মধ্যে, অধ্যারোপিত হয়। সেই সৌষ্ঠব একমাত্র নিয়ে আসতে পারে নর্ত্তকগোষ্ঠী;—সমবায়িতা এবং একতানতার আশ্রয়ে। সার্থক হয়ে ওঠে বেণুবীণামৃদঙ্গের সুন্দরী ধ্বনির বিপুল অভ্যাস। "পিণ্ডীবন্ধ" নামে একেই নামাঙ্কিত করেছেন শ্রীভরত। পরে আসব সে সব কথায়। অতএব, করণ এবং অঙ্গহারগুলি যখন বহু-নর্ত্তকের নর্ত্তনের আশ্রয় নিয়ে সম্পাদ্য হয়, তখনি ঘটে "মহাগীতের" প্রচার।

অনেক কঠোর শব্দে বর্ণার্থ-যোজনা করে এতক্ষণ বাগ্মিতা করেছি। কিন্তু না বোঝাতে পারলে তৃপ্তি পায় না প্রাণ। এই শ্রদ্ধার, গুরুত্বের, এই শুদ্ধত্বের পরিমাণ-বোধনা যদি আমরা না অর্জ্জন করতে পারি তাহলে প্রথম থেকেই বলে রাখছি,—নর্ত্তনশাস্ত্রের মহনীয়তা প্রণিধান করা হবে দুষ্কর। আভিধানিক অগ্নি-বেদী আর্য্যেরা যখন অন্ন-চঞ্চল ভারতবর্ষের শস্যশ্যামল রূপ দর্শন ক'রে মুগ্ধ হয়ে উপগ্রহের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন,—তখন তাঁদের পণ্ডিতম্মন্যতার মধ্যে ছিল,— ঔদার্য্য নয়, ঔদ্ধত্য। ক্রমশঃ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো তিন

'ওরে কী শুনছি, থিয়েটারে সত্যি গৌর এল নাকি রে?' পদরত্নকে জিগগেস করলে তার বাপ। 'যা তো কলকাতায় গিয়ে একবার দেখে আয়।'

বাপ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

পদরত্ন গেল কলকাতা। যা দেখল তা আর যায় না দৃষ্টি থেকে। রঙ্গমঞ্চের পর্দা পড়ল কিন্তু চোখের আর পলক পড়ল না।

গিরিশকে আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে, 'গৌর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি থিয়েটার দেখতে যাব।'

সকলে তো অবাক। যেখানে পণ্যস্ত্রীরা অভিনয় করে সেখানে ঠাকুর যাবেন দেখতে? রাম দত্ত বললে, 'অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, যাবো। দেখব চৈতন্যলীলা।'

কে ঠেকায়! গৌর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। থিয়েটারের দরজার সুমুখে দাঁড়াল পালকি গাড়ি। গৌর নিজে এসেছেন থিয়েটারে।

কেন কে জানে গিরিশ নিজে গেল গাড়ির দিকে। তার আগেই নেমে পড়েছেন ঠাকুর। গিরিশকে দেখতে পেয়েই নত হয়ে নমস্কার করলেন। নমস্কার ফিরিয়ে দিল গিরিশ। তখুনি আবার ঠাকুরের নমস্কার। নমস্কারে পারবে ঠাকুরের সঙ্গে? কোনো কিছুতে পারবে? ছেড়ে দিল, হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের। যার শেষ নমস্কার তারই শেষ জয়।

শুধু গায়ের জোরে নমস্কার নয়। এ একটি বিনয়নমিতা দীনতার নির্ঝরিণী। ধারাবাহিকী দ্রবীভূতা প্রীতিসুধা।

উপরে একটি বক্সে জায়গা হল ঠাকুরের। এক পাখাওয়ালা এসে হাওয়া করতে লাগল।

নিমাই বলছে শচীমাকে:

'কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননি,
কেঁদো না নিমাই বলে—
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।'

সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। আবার এলেন জীবভূমিতে। আবার খানিকক্ষণ শোনেন। আবার সমাধিস্থ হন।

আচ্ছা, গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো? এখনকার দেখা নয়, যেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ। ঐ সেই দক্ষিণেশ্বরে, প্রথম দিক কার সাধনার পরিচ্ছেদে। কালীঘরে বসে আছি, দেখলুম একটি উলঙ্গ বালক নাচতে-নাচতে কাছে এল। কোমরে রূপোর পেটি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য হাতে সুধাপাত্র। কে তুই? হাঁক দিলুম। বললে, আমি ভৈরব। তা এখানে কেন? বললে, আপনারই কাজ করব বলে এসেছি। সেই ভৈরবই যে গিরিশ।

ব্রাহ্মসমাজের নাটকে সাধু সেজেছিল নরেন। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। সাধুবেশে যেই দেখলেন নরেনকে, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন আপন মনে, 'এই ঠিক হয়েছে। ঠিক মিলেছে।' তার পর ডাকতে লাগলেন হাতছানি দিয়ে। এ কি অসম্ভব কথা! সেজে আছে রঙ্গমঞ্চে, সে এখন নেমে আসবে কি! তখন কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন, এসো না নেমে!' উনি যেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম! কিন্তু, যাই বলো, নেমে আসতেই হল নরেনকে। ঠাকুর তার হাত ধরলেন, আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বললেন, তোকে এই বেশে এক দিন দেখিয়েছিল মা। ঠিক এই বেশে। সত্যি, মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক—

অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের

সামনে। যে এ পার্টে নামে, রোজ গঙ্গাস্নান করে হবিষ্যি করে নামে।

সে মেয়ে অভিনেত্রী। নাম বিনোদিনী।

বিনোদিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ঠাকুরকে। কল্পতরু ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'

তোমার চিত্তদর্পণের মার্জ্জন হোক, ভবদাবাগ্নির নির্বাণ হোক, মঙ্গলজ্যোৎস্নায় ভরে যাক মনোমন্দির। হৃদয়ে সত্য ও শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করো। হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সম্রাট। হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়স্পর্শে সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও।

রোগ বড় শক্ত, কিন্তু ভয় নেই, রোজাও বড় পোক্ত। রোজার নামেই রোগ পালায়।

হলাম গণিকা, তবু তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, আমি তাতেই ধন্য। আর কিছুই চাই না। গণ্য হয়েই ধন্য হলাম।

একটি স্ত্রীলোক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ব্রীড়ার সঙ্গে বিষণ্ণতা মিশে মুখখানি ভারি করুণ। কি চাই? স্বামী মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, সংসারে পয়সাকড়ি কিছু দেয় না, সব মদ খেয়ে নষ্ট করে। ঠাকুর যদি কিছু একটা ব্যবস্থা দেন। স্বামীর মন যাতে ভালো হয়।

ঠাকুর পরিচয় নিয়ে জানলেন শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। কালীপদ মানে দানাকালী, গিরিশের বন্ধু। এক গ্লাশের ইয়ার। জন ডিকিন্সনে বড় কাজ করে কিন্তু মাইনে যা পায় তা প্রায় অকাজেই শেষ হয়।

ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নহবতখানায়। সতীর দুঃখে সারদা বিচলিত হল। একটি পুজো-করা বেল-পাতায় ঠাকুরের নাম লিখলে। বউটিকে দিয়ে বললে, রেখে দিও নিজের কাছে, আর খুব নাম কোরো।

সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে।

তারপর এক দিন দানাকালী হাজির দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বউটাকে বারো বচ্ছর ভুগিয়ে তবে এখানে এল।'

কথা শুনে চমকে উঠল দানাকালী। তুমি কি করে জানলে? কিন্তু নিমেষে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে তো ভক্তিতে আসেনি, সে এসেছে কৌতূহলে। পাঁচজনে বলাবলি করছে, দেখে আসি কেমনতরো। সেই অলস উসখুসুনি।

'কি চাই তোমার? বলো না গো মুখ ফুটে।' ঠাকুর প্রশ্ন করলেন আত্মজনের মত।

দানাকালী এমন ছ্যাচড়, বললে, 'একটু মদ দিতে পারেন?'

'তা পারি বৈ কি। তবে এখানকার মদে এমন নেশা, তুমি সইতে পারবে না।'

দানাকালী হাসল। সে আবার সইতে পারবে না! বললে, 'কি, বিলিতি মদ?'

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণ-বারি।' ঠাকুর বললেন প্রসন্ন মুখে, 'এখানকার মদ পেলে আর বিলিতি মদ ভালো লাগে না। তুমি ঐ মদ ছেড়ে এখানকার মদ ধরতে রাজি আছ?'

দানাকালী স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'সেই মদ আমায় দিন যা পেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব।'

এমন কিছু দিন যা পেলে আর আমার কিছু পাবার থাকবে না। এমন ভ্রান্তি দিন যার পরে আর কোনো প্রত্যাশা নেই। এমন আনন্দ দিন যা সুখে-দুঃখে অবিচ্ছিন্ন।

ঠাকুর দানাকালীকে ছুঁয়ে দিলেন। ছোঁয়ামাত্র কাঁদতে লাগল দানাকালী। কত লোকে কত বোঝায়, তবু সে কাঁদে।

বাড়ি ফিরে এল বটে, মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। ক দিন পরে আবার গিয়ে হাজির। ঠাকুর বললেন, 'তুমি এসেছ? আমার একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে।'

'যাবেন?' দানাকালী উল্লসিত হয়ে উঠল: 'চলুন আমার সঙ্গে। ঘাটে বাঁধা আছে নৌকো।'

সঙ্গে লাটু, ঠাকুর উঠলেন এসে নৌকোয়। মাঝনদীতে এসে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'

দানাকালী জিব বের করল। আঙুলের ডগা দিয়ে কি তাতে লিখে দিলেন ঠাকুর।

মৌতাত ধরল বুঝি এতক্ষণে। মনে হল, এমন বোধ হয় কিছু আছে যা পেলে নিজেকে নিঃস্ব জেনেও আনন্দ হয়। চন্দ্রসূর্যহীন অন্ধকার গুহাও আলো হয়ে ওঠে। যার ঘর নেই, পথই তার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। যার সবাই পর, পরের মধ্যেই সে আপন জনের মুখ দেখে।

ঘাটে নৌকো লাগল। দানাকালী জিগগেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আবার! তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।'

আনন্দে বিভোর হল দানাকালী। গাড়ি করে ঠাকুরকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। শবরীর কুটিরে শ্রীরামচন্দ্র।

'স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী হয়', বললে লাটু, 'তা হলে সে স্বামীর জন্যে কঠোর করতে পেছপা হয় না। স্ত্রীর জন্যে উদ্ধার হয়ে গেল কালীপদ।'

স্ত্রীর সাধনায় কালীপদ ধ্রুবপদ পেয়ে গেল। বুঝতেও পারেনি স্ত্রীর রূপ ধরে কৃপা এসেছিল তার সংসারে। আর যা দীনতা আর প্রতীক্ষা, যা নিষ্ঠা আর আঘাতসহতা তাই স্ত্রী। সংসারে দীনা দাসীর বেশে রাজেশ্বরী বিরাজ করছে বুঝতেও পারেনি। বুঝতেও পারেনি পরিধানে যে চীরবাস আছে আসলে তা তপস্বিনীর রাজবেশ। বাইরে যা প্রতিবাদ অন্তরে তাই প্রার্থনা।

চিনতে পারল এত দিনে। বারো বছর ধরে যে নিশ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে সঞ্চিত করে রেখেছিল তাই এখন কৃপার শীতলবায়ু হয়ে প্রবাহিত হল। এবার নোঙর তোলো, নৌকো ছাড়ো। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সঞ্চিত ধন বেঁধে রেখেছিলে, সঞ্চিত ধন জলে ফেলে দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডকে এখন পাল করো। এত দিন তোমার স্ত্রী একা দাঁড় টেনেছেন, এবার হালে এসে বসেছেন স্বয়ং ভবার্ণবের কাণ্ডারী। আর ভয় নেই।

ঠাকুরের অসুখ কাশীপুরের বাড়িতে, নিরঞ্জন দরজা আগলে রয়েছে, অবান্তর লোক কাউকে ঢুকতে দেবে না। যে-সে ঢুকবে আর ঠাকুরকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে ঠাকুরের অসুখ বাড়িয়ে দেবে এ অসম্ভব। খুব কড়া মেজাজের ছেলে নিরঞ্জন। দেখতেও বেশ বলশালী। গয়নার নৌকোয় ফিরছে দক্ষিণেশ্বর, আরোহীরা খুব নিন্দা করছে ঠাকুরের। নিরঞ্জন প্রথম প্রতিবাদ করল, যুক্তিতর্কের রাস্তায় গেল, কিন্তু কেউই নিরস্ত হল না। তখন বললে, গুরুনিন্দা সইতে পারব না, নৌকো ডুবিয়ে দেব। শুধু মুখের কথা নয়, সাঁতারে ওস্তাদ নিরঞ্জন, জলে লাফিয়ে পড়ল, নৌকো ফেলতে গেল উলটিয়ে। তখন সকলে দেখলে মহৎ ভয় সমুদ্যত। করযোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল সকলে। করতে লাগল অনেক কাকুতি-মিনতি। তখন ছেড়ে দিলে। জল ছেড়ে ফের উঠল গিয়ে নৌকোয়।

কথাটা কানে উঠল ঠাকুরের। নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কে কি বলে না বলে তোর কী মাথাব্যথা পড়েছিল? ক্রোধ চণ্ডাল, তার কি বশীভূত হতে আছে? সৎ লোকের রাগ জলের দাগের মত, হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া হীনবুদ্ধি লোক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা কি গায়ে মাখতে আছে? তা ছাড়া—'

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে রইল।

'তা ছাড়া নৌকো যে ডোবাতে গিয়েছিলি, মাঝি-মাল্লারা কি দোষ করেছিল? নিরীহ গরিবের উপর অত্যাচার হয়ে যেত, খেয়াল আছে?'

আত্মগঞ্জনায় বিদ্ধ হল নিরঞ্জন।

তার পর নিরঞ্জন আবার মাতৃভক্ত। ঠাকুরের পথে এসেছে অথচ চাকরি করছে এ কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু চাকরি না করলে মার ভরণপোষণ হবে কি করে? আমার মুখের দিকে মা চেয়ে আছেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুর যদি জানতে পান?

'তোর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে।' ধরতে পেরেছেন ঠাকুর, 'আপিসের কাজ করিস কিনা।'

মুখের উপর যেন আরো এক পোঁচ কালি পড়ল।

'তার জন্যে মুখ ম্লান করছিস কেন? তুই তো তোর মার জন্যে কাজ করছিস, ওতে কোনো দোষ নেই। ওরে মা যে ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

বীর নিরঞ্জন, ভক্তিতে আর নির্মলতায় বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন. সে ঠাকুরের দ্বাররক্ষী হবে না তো কে হবে! অপ্রিয় কর্তব্য সমাধা করবার মত নির্বিকার সামর্থ্য শুধু তারই আছে।

দানাকালী তার এক সাহেব-বন্ধু নিয়ে হাজির। বললে, ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিরঞ্জন, তাকাল একবার সাহেবের হ্যাট-কোটের দিকে। খাস ইংরেজ নয় হয়তো, কিন্তু ফিরিঙ্গি বলতে আপত্তি হবে না।

সাহেব আর দানাকালী উঠে এল উপরে। ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে। মাথার থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সাহেব বললে, 'আমি বিনোদিনী! চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বলতে-বলতে সে কেঁদে ফেললে। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মুখ দেখে তার কান্না আরো উথলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়ে ঠাকুরের পায়ের উপরে মাথা রাখলে।

কিন্তু ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, "খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো! মেয়েছেলেকে একেবারে সাহেব সাজিয়ে। হ্যাটকোট পরিয়ে। খুব বাহাদুর তুমি কালীপদ!'

'নইলে ওকে যে আসতে দিত না আপনার ভক্তেরা।' বললে দানাকালী: 'কত দিন থেকে কাঁদছে, বলছে ঠাকুরের এমন অসুখ আমি একবার দেখতে পাই না? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার নিয়ে চলুন। ঠাকুরকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাই দয়া হল। নিয়ে এসুম আপনার কাছে।'

এতটুকু ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হলেন না ঠাকুর। বরং পরিহাসটুকু পরমরসিকের মত উপভোগ করলেন। তাঁর বীর ভক্তদল প্রতারিত হয়েছে বলে এতটুকু তাঁর জ্বালা নেই, বরং ভক্তি ও ব্যাকুলতাকে কেউ যে রুখতে পারে না তাতেই ভীষণ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি!'

'নইলে এমনি এলে ঢুকতেই দিত না যে। সাধারণ লোককেই দেয় না, আর এ তো অভিনেত্রী। বলে কিনা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে।' দানাকালী জোরের সঙ্গে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। যে পাপের জন্যে এখন অনুতাপ করছে তার স্পর্শে তো এখন শান্তি।'

নিচে খবর পৌঁছে গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে, দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দ্বারীকে কলা দেখিয়েছে। রাগে ফুলতে লাগল ভক্তদল। দানাকালী যতই ঠাকুরের আশ্রিত হোক, গিরিশের অনুগামী হোক, একবার দেখে নেবে তাকে।

কিন্তু কিসের প্রতিশোধ, কার উপর। ঠাকুর যে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ হাসি-পরিহাস করছেন। যা ঠাকুরকে এত আনন্দিত করছে তা তাঁর ভক্তদের ক্রুদ্ধ করে কি করে?

অগত্যা দানাকালী আর বিনোদিনীকে ছেড়ে দিতে হল দরজা।

কিন্তু এবার রাম দত্তকে ঠেকিয়েছে নিরঞ্জন। কিছু মিষ্টি আর মালা উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দিতে বলেছিল লাটুকে। হামাকে কেন, আপুনি নিজে যান না। বললে লাটু। তখন নিরঞ্জন বাধা দিলে। লাটু বললে, 'এঁকে যেতে দাও না। আপনা-আপনির মধ্যে এ সব নিয়ম কি জারি করতে আছে?'

নিরঞ্জন তবু অনড়। অনমনীয়।

তখন লাটু ফোঁস করে উঠল: 'সেবার যখন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তখন তো তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলে, আর আজ এঁর মত লোককে ছাড়তে চাইছ না? এর মানে কি?'

অগত্যা ছেড়ে দিল রাম দত্তকে।

লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর। কেউ তাঁর কাছে নালিশ করেনি তবু শুনতে পেয়েছেন অন্তর্যামী। বললেন লাটুকে, 'ছাখ কারুর কখনো দোষ দেখবিনি, ভুল দেখবিনি, কেবল গুণ দেখবি, ভালো দেখবি। বুঝলি?'

লাটু চুপ করে রইল। মনকে শাসন করলে ব্যথার চাবুক মেরে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভাই আমার মত মুখখুর কথায় দুঃখু করিসনি।' [ক্রমশঃ।

জিজ্ঞাসা

কৃষ্ণ ধর

সারা দেশে আজ কান্না, ইতিহাস তুমি মৌন
বহু রাত্রির জাগরণ, ইতিহাস তবু মৌন?
খণ্ডিত দেশ প্রান্তে, মানুষ হয়েছে পণ্য
এতো যে প্রাণের রক্ত, বলো তুমি কা'র জন্য?
মৈনাক তুমি লুপ্ত, সমুদ্র তুমি স্তব্ধ
আকাশে আষাঢ় এল না, প্রাণবন্যা কি অবরুদ্ধ?

গোটা দেশ জুড়ে কান্না, সারা মাঠ পুড়ে খাক
সবই কি রিক্তবিত্ত, এ দেশ যে নির্বাক্?
ঐ ঝড় এল বুঝি, হাওয়ায় কারা যে গর্জায়
লক্ষ প্রাণেরই ধ্বনি, শুনি এ-মনের দরজায়।
এ দেশের মনোপদ্মে, সূর্যের দ্যুতি চমকায়
ফসল ফলানো মাঠে, কৃষিপ্রাণ আজ ভাগ চায়।

হে মানুষ তুমি জান কি, এ মিছিল যাবে কদ্দুর
এ রাত্রির শেষ করে, দেখা দেবে কবে রোদ্দুর?

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[এই পর্য্যায়ে বান্ধব-সম্পাদক প্রভাত-চিন্তা নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যে যে কৃতী সাহিত্যিক পত্র লিখিয়াছেন তন্মধ্যে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺নবীনচন্দ্র সেন, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺অমৃতলাল বসুর ৪খানি পত্র প্রকাশিত হইল। অপরাপর পত্র ধীরে ধীরে "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না কেন, তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদিগের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া, পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যর অসলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে ভেড়া মার, গোবর-জল ছড়া দাও। কেহ বলে "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন্ পথে * * যান, আগে যারে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই-একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই—তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্ব্বমত দিক্ পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়—মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী, প্রসন্ন হইলেই আনন্দকণ্ঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ঠা বৈশাখ (সন উল্লেখ নাই)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের অপ্রকাশিত পত্র

নয়াপাড়া

পরমশ্রদ্ধাস্পদ দাদা মহাশয়,— ১৩।৫।০২

আপনার পত্রখানা পাইয়া কি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। যদিও জানি যে আপনার প্রতি মুহূর্ত্ত খুবই মূল্যবান্ তথাপি আপনার পত্রের আশায় যে উৎকণ্ঠিত থাকি তাহার একটি কারণ উহা আমার নিকটে অমূল্য আশীর্ব্বাদ। আমার নানা অশান্তির কথা ত আপনার অজ্ঞাত নয়, সেই কারণে আপনার উপদেশ পাইলে মনে অনেক বল পাই। আপনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন জানিয়া খুবই নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনি যদি জীবনের প্রতি বীতরাগ হন তাহা হইলে আমরা কাহার দিকে চাহিয়া থাকিব? আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের নেতৃত্ব করুন, ইহা শুধু আমার নয়, সকল সাহিত্যসেবীরই আকাঙ্ক্ষা ও জগদীশ্বরের চরণে আকুল প্রার্থনা।

এই গরীব ভ্রাতার প্রতি আপনার অসীম স্নেহ,—একমাত্র আপনার সমালোচনায় "পলাশির যুদ্ধ"* সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং আপনার উপদেশ মত উহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস সম্পর্কে আপনার অভিমত ও উপদেশ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিব। আপনার অবসর মত ঐগুলি পড়িবেন।... স্নেহাকাঙ্ক্ষী শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র

ওঁ

২০ চৈত্র †

আনন্দাশ্রম, রাইপুর

ভ্রাতঃ জেলা বীরভূম

অনেক দিনের পরে আপনার হস্তাক্ষর আমার মনশ্চক্ষে আপনার সেই পূর্ব্বতন মূর্ত্তি আনিয়া দিল—তেতালায় যখন দুই জনে নিরিবিলি বসিয়া রাজা উজির বধ করিতেছি—সেই দিন মনে পড়িল। কিন্তু চর্ম্মচক্ষের দেখা না দিলে আশ মেটে না। যা হো'ক্—কালের গতির জন্য আক্ষেপ বৃথা।

---

* ৺নবীনচন্দ্র সেনের অমর কাব্যগ্রন্থ "পলাশির যুদ্ধ"। 'বান্ধব' কাগজে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সুদীর্ঘ সমালোচনা "পলাশির যুদ্ধ" কাব্যের পরবর্ত্তী সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

† তারিখের উল্লেখ থাকিলেও এই পত্রে কোন সনের উল্লেখ নাই, তবে চিঠির খামে পোষ্টাফিসের সইমোহরে ৪ঠা এপ্রিল ১৯০২ (ইং) ডাক-তারিখ দৃষ্ট হয়।

আপনার এই বয়সের বান্ধব * আমি পাই নাই। একখানি মাত্র পত্র পাইয়াছি—বোধ করি দ্বিতীয় বারের পত্র। আমি এখন বীরভূমে Lion's den-এ বাস করিতেছি—সিংহ জমিদারদিগের বাগানের কুঁড়ে ঘরে। আমি এখন দন্তহীন old lion—শিকার অনুগ্রহ করিয়া মুখে পড়িলে তবেই তাহা আমার ভোগে আসে। আমি একপ্রকার পিঞ্জরে বদ্ধ; যদি খালাস পাই তবে আপনার পত্রিকায় রসদ যোগাইবার চেষ্টা দেখিব—কিন্তু এখন আমি পারিয়া উঠিতেছি না।

সৌহার্দ্দ ডোরে বাঁধা
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বান্ধব-কুটীর, ঢাকা

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার ২খানি স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। অনেক কথা বলিবার—অনেক কৈফিয়ৎ দিবার আছে। তাই একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিবার জন্য কয়েক দিন অবসরের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু সাংসারিক ও বৈষয়িক উভয় কার্য্যে আমি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। পরিবারস্থ ও সম্প্রদায় মধ্যে পীড়িতগণের তত্ত্বাবধারণে এত বিব্রত যে আমি স্থির হইয়া ক্ষণকাল বসিবার অবকাশ পাইতেছি না। অনুমতি করুন ত্বরায় সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিব। যে যে কারণে আপনার স্নেহপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতে পারিব না তাহাও সবিস্তারে নিবেদন করিব। এক্ষণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে আমি যদি আমার ব্যবসায়কে সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? যদিও জগদীশ্বরের অপার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে। তাঁহারই কৃপায় আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদ্রূপে আমার জীবনে আলোক প্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আপনি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারি কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখানো—যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকটে ষ্টা'র থিয়েটার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন বিশুদ্ধ ভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে আমি প্রাতঃকাল হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়াছি এখনও স্নানাহ্নিক হয় নাই। অনুমতি হয়তো এক্ষণে এইখানেই ইতি করি। † স্নেহাভিলাষী অমৃত—

হিমালয় অভিযানে বাঙালী তেনজিং

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইফ' পত্রিকার এভারেষ্ট সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার পর সংখ্যাটি সম্পর্কে কয়েক জন ভারতীয় ও বিদেশীয় উক্ত পত্রিকায় কয়েকটি পত্র লেখেন। তেনজিং এবং হিমালয়-অভিযান সম্পর্কে এই চিঠিতে কিছু কিছু অজ্ঞাত তথ্য আছে, যেজন্য পত্রগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করা হ'ল]

ভারতের পতাকা সম্মানের অধিকারী

মহাশয়,

বহু প্রতীক্ষিত সাফল্যমণ্ডিত বৃটিশ এভারেষ্ট অভিযানের বিস্ময়কর চিত্রাবলীর (লাইফ ইণ্টারন্যাশনাল, ২১শে জুলাই) জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

কেবল একটি মাত্র দুঃখের বিষয় এই যে, ১৮ পৃষ্ঠায় বাঁ দিকের ছবির পরিচিতিতে ভারতের পতাকা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। অথচ তেনজিং-এর জন্য ভারতের পতাকাও সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী
বিহার, ভারত

তেনজিং বাঙ্গালী

মহাশয়,

তেনজিং যে ভারতীয় সে সম্বন্ধে কখনও কোনও সন্দেহ উদয় হয়নি। তাঁর আদি নিবাস নেপাল এবং তিনি জাতিতে শেরপা হলেও তিনি বাঙ্গালার শৈলনিবাস দার্জ্জিলিং-এর সম্মানিত নাগরিক—এবং বাঙ্গালা নেপাল নয়।

চার্ল'স আইজ্যাক
আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া।

তেনজিং-এর পোষাক

মহাশয়,

অক্সিজেন কম থাকা সত্ত্বেও আপনার ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠার (লাইফ ইণ্টারন্যাশনাল, ১০ই আগষ্ট) ছবিগুলিতে দেখা যায় তেনজিং তাঁহার পোষাক পরিবর্ত্তনের সময় পেয়েছিলেন। তিনি হলদে পোষাক ছেড়ে নীল পোষাক পরেন।

মেরি ও ফ্লোরেন্স
এলিক্যাণ্ট, স্পেন।

পতাকা প্রোথিত করার কাহিনী

মহাশয়,

···প্রকৃত পক্ষে চারটি পতাকা ছিল—রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বৃটেন, নেপাল ও ভারতের। ছবিতে দৃষ্ট শীর্ষদেশ ও মাঝের ছবি দুইখানি স্পষ্টতই বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক ও নেপালী দুইটি ত্রিকোণ-যুক্ত পতাকার। সকলের নীচের ছবিটি অবশ্যই ভারতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা—যদিও মাত্র দুইটি রঙ দেখা যায়।

তেনজিং দার্জ্জিলিংএ বিদায়-সম্বর্দ্ধনার সময় যে ভারতীয় পতাকাটি পান, সেইটি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। সার জন হাণ্ট এ কথা জানতেন না, তবে এভারেষ্ট বিজয়ের পর ঘটনাটি সকলে জানতে পারে। বস্তুতঃ সার জন হাণ্ট নিজে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণীর উত্তরে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইভান্স ও বোর্দ্দিলন তাঁদের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দক্ষিণ তুষারশৃঙ্গমালায় পতাকা ফেলে এসেছিলেন। তেনজিং-এর সে কথা মনে ছিল এবং তিনি সেই পতাকাগুলি এভারেষ্ট শিখরে নিয়ে যান।

নয়াদিল্লী, ভারত। মনোহর মাথুর।

---

* নবপর্য্যায়ের অর্থাৎ ১৩০৮ সনের বান্ধব।

† এই পত্রে কোন তারিখ উল্লেখ নাই।

চারজন

মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী

(চীফ অব্ দি জেনারেল ষ্টাফ, আর্মি হেড কোয়ার্টার, নয়াদিল্লী)

নয়াদিল্লীর যে কোন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আপনি নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাতে পারেন। তা' বলে ভাববেন না যে নয়াদিল্লীর বাসে ধূমপান করা বেআইনী নয়। কলকাতার বহু আগেই এখানে ওটা বেআইনী হয়ে গেছে। তবুও বলছি আপনি নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাতে পারেন। হ্যাঁ, একটা, দুটো, তিনটে কখনো কখনো চার-চারটে গোটা সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেও আপনি দেখবেন বাস আসতে তখনো দেরী আছে। টেলিফোন করে আগেই জেনেছিলাম মেজর জেনারেল চৌধুরী সাড়ে আটটার সময় বেরিয়ে অফিস চলে যান। তার আগেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা। সাতটা থেকে ঝাড়া ৮টা অবধি বাস-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থেকেও বাসের টিকি দেখতে না পেয়ে আবার একটা টেলিফোন করা উচিত কিনা ভাবছি এমন সময় সরকারী বাস গজেন্দ্রগমনে হেলতে-দুলতে এসে হাজির। মেজর জেনারেল চৌধুরীর বাড়ীর সামনে নেমে দেখলাম ৮টা বেজে ২৫শ মিনিট। সর্বনাশ! প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে শুনলাম তিনি খেতে বসেছেন। বলে পাঠালেন 'বসুন'। বসলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখি তিনি বেরিয়ে এসেছেন। ছ ফুটেরও বেশী লম্বা, ফর্সা চেহারায় সামরিক পোষাক আর মাথায় জেনারেলদের জন্য বিশেষ টুপী-পরা এই মানুষটিকে দেখে প্রথমে তো একটু চমকেই গেলাম। অত চওড়া কপাল খুব কম মানুষেরই দেখেছি। বললেন, 'সময় নেই হাতে একটুও। আপনি কি সাইকেলে এসেছেন? না। বেশ, তা'হলে আমার গাড়ীতেই চলুন। আপনার যা দরকার সব অফিসেই মোটামুটি ঠিক করা আছে।' কলকাতার মস্ত বড় ব্যারিষ্টারের বাড়ীর বড় ছেলে তিনি। লেখাপড়া শিখেছেন প্রথমে কলকাতায় ও পরে লণ্ডনের হাইগেট স্কুলে। চিরকালই ইচ্ছা ছিল সামরিক-জীবন গ্রহণ করবার। সুযোগও এসে গেল। Sandhurst এর Royal Military College এ কমিশন পেয়ে গেলেন। ১৯২৮ সালে সপ্তম Light Cavalry তে তাঁর সামরিক-জীবনের সূত্রপাত।

১৯৪০ সাল থেকে তাঁর সামরিক-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু। Staff Collage থেকে পাশ করে বিখ্যাত পঞ্চম ভারতীয় ডিভিশন নিয়ে তিনি গেলেন সুদূর সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া এবং পশ্চিম-এশিয়ার মরু অঞ্চল ঘুরে সে সব দেশ ও তাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে। সে সময় মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় তিনি ছিলেন সহকারী Adjutant এবং Ouarter- master General.

১৯৪৩ সালে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এবার কোয়েটার Staff Collage এ G. S. O. I. দেড় বছর সেখানে কাজ করে ষষ্ঠ দেশ Light Cavalry র ভার পেলেন। কোন ভারতীয় অফিসারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে এই প্রথম রেজিমেণ্টটি এল। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর তিনি গৌরব। তখন বার্মায় যুদ্ধ হচ্ছে। তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে কোয়েটা থেকে মিকটিলা প্রায় তিন হাজার মাইল যান। পথে বহু বাধা-বিপত্তি আসে। কিন্তু অবশেষে বিশেষ কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়েই রেজিমেণ্টটি বার্মায় এসে পৌঁছয়। মধ্য-বার্মায় এক তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এই রেজিমেণ্টটি শ্রীযুক্ত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। এর পর তিনি ফরাসী ইন্দো-চায়না ও যাভার সামরিক বিভাগসমূহ পরিদর্শন করেন।

১৯৪৬ সালে মালয়ে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসাবে কাজে যোগ দেন। ভারতীয় ফৌজে তিনি তৃতীয় ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ডাক এলো ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজ থেকে উচ্চতর সামরিক শিক্ষালাভের জন্য। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতে ফিরে এলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হলেন Director of Military Operations and Intelligence।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে তিনি মেজর জেনারেল হন।

কিন্তু আমাদের মনে তাঁর কাজ সব চেয়ে বেশী স্মরণীয় হয়ে থাকবে হায়দ্রাবাদ অভিযানের সফলতায়। দেশীয় রাজ্যগুলি একদা যে জোট পাকিয়েছিল তিনি কঠোর হস্তে তা' দমন করেছেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হায়দ্রাবাদের সামরিক গভর্ণর হন। প্রায় এক বৎসর সামরিক গভর্ণর হিসাবে সেখানে তিনি কাজ করেছেন। ১৯৫২ সালে Adjutant General হয়ে তিনি নয়াদিল্লীতে ফিরে আসেন। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি চীফ অব দি জেনারে ষ্টাফ এই পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি মাসিক বসুমতীর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস

(পশ্চিম-বঙ্গের রিলিফ কমিশনার এবং সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরের সেক্রেটারী)

পাশ্চাত্যের উচ্চতম শিক্ষায় সুপণ্ডিত হয়েও প্রাচ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে যিনি কখনও বিচ্যুত হননি পরন্তু একে চিন্তা দিয়ে, সাধনা দিয়ে বড় করে তোলবার জন্য যাঁর প্রাণে রয়েছে সর্ব্ব সময়েই একটা তীব্র ব্যাকুলতা, এমন একজন মানুষ হলেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আই, সি, এস হিসেবে ইনি এখনও উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু বলতে কি, সেটাই তাঁর সর্ব্বোত্তম পরিচয় নয়। আমরা সত্যিকারের তাঁকে পাই যেখানে তিনি একজন নিরপেক্ষ ভাবুক ও দার্শনিক। বাইরের জগতে এই লোকটিকে দেখলে যাই মনে হোক, অন্তর্জগতে ইনি যে একজন খাঁটী বাঙ্গালী—একটু আলাপ-আলোচনাতেই তা' ধরা না পড়ে পারে না।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক রাখী-বন্ধন দিবসের পুণ্য লগ্নে হিরণ্ময়ের জন্ম। পিতা মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। পুত্রের উপর পিতার স্বাভাবিক প্রভাব বাল্যকালেই পড়ে। তাঁদের পরিবারটাই ছিল পণ্ডিতের। পুরুষানুক্রমে তাঁদের গৃহে সংস্কৃত চর্চ্চা হয়ে আসে—টোল, চতুষ্পাঠীও ছিল বহুকাল থেকে। সুতরাং বালক হিরণ্ময় প্রাচ্যের ভাবধারার মানুষ হয়ে উঠবেন সে ছিল অনিবার্য্য। তাঁর নিজের কথায়—"প্রাচ্যের ভাবধারায় আমি মানুষ। এই বিরাট প্রভাব থেকে আমি মুক্ত নই। আমার উপর প্রথম প্রভাব পড়ে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের। তার পর উপনিষদ্ ও বুদ্ধের মতবাদে আমি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হই। ১৭।১৮ বৎসর বয়স থেকেই আমি নিরামিষ-ভোজী—আজও পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থাই চল্‌ছে। আমার নৈতিক জীবন গঠনে পথ-প্রদর্শক হলেন আমার বাল্যজীবনের গৃহশিক্ষক শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। ইনি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একজন সদস্য। কলেজ-জীবনে বিশিষ্ট দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমায় পথের সন্ধান দেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁরই সান্নিধ্যে গিয়ে আমার জ্ঞানের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। আরও একজনের প্রভাব আমার উপর রয়েছে, তিনি হলেন আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় পণ্ডিত নলিনীমোহন শাস্ত্রী। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ রয়েছে।"

হিরণ্ময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। সরকারী পরিবেশের মধ্যে রয়েছেন বলে তাঁর এদিকটা হয়তো অনেকের কাছেই ধরা পড়েনি। কিন্তু তাঁর কথা বলতে গেলে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে চিনতে হলে এ জিনিষটার উল্লেখ না করলে নয়। বহু কবিতা, প্রবন্ধ, বিশেষ করে দর্শন-সংক্রান্ত প্রবন্ধ ইনি লিখেছেন। শুধু লেখাই নয়, সেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারও পেয়েছে। পিতার অসমাপ্ত পুস্তক "Genetic History of the Problems of Philophy" ইনিই উদ্যোগী হয়ে সমাপ্ত করেন এবং সেটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সাগ্রহে প্রকাশিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বরাবরই বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রী পরীক্ষায় এই শাস্ত্রেই ইনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দার্শনিক হিসেবে তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ-রচনা হচ্ছে "উপনিষদ-দর্শন", এর প্রকাশক হচ্ছেন বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ।

"উপনিষদ্-দর্শন" গ্রন্থখানির একটা ইতিহাস তাঁর কাছে শুনতে পাই। "আমি তখন অবিভক্ত বঙ্গের পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। সে সময় পাবনার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এ "উপনিষদ্-দর্শন" পুস্তকখানি পাঠ করেন। সন্তুষ্ট হলেন তাঁরা নিশ্চয়ই, কারণ দেখলুম এক দিন তাঁদের মাঝে আহ্বান করে তাঁরা আমায় "দর্শনশাস্ত্রী" উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেদিনের স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি—তাঁদের দেওয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ তাম্রফলকের উপাধি-পত্রখানি সযত্নে রক্ষা করছি।" হিরণ্ময়ের অপর একটি স্মরণীয় রচনা "রবীন্দ্র দর্শন" (সমালোচনা সাহিত্য)। বহু সুধী ও মনীষী ব্যক্তির প্রশংসা পেয়েছেন ইনি এর জন্য।

সমাজসেবী হিরণ্ময়কে আমরা দেখে থাকবো বিশেষ ভাবে পাবনায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্ম্মন্তুদ দিনগুলিতে। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদে সেদিনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিরণ্ময়ের মানুষ-প্রাণ কেঁদে উঠলো। তাই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্গত জনগণের সেবাব্রতে। সেই থেকে এখন অবধি সরকারী আওতার বাইরে একজন নীরব কর্ম্মী হিসেবে নানা ভাবে তিনি দুর্গত মানুষের সেবা করে চলছেন।

ডাঃ ফুলরেণু গুহ

(সমাজসেবিকা ও শিক্ষাব্রতা)

লক্ষ্য নিয়ে যে জীবন গড়ে উঠে—যে জীবন শত বাধা, বিপত্তি ও বিপর্য্যয়কে দলিত করে এগিয়ে যায়—সে জীবনই সুন্দর জীবন, আদর্শ জীবন। এমন জীবন লাভের সৌভাগ্য সকলেরই হয়তো হয় না কিন্তু যাঁদের হলো তাঁদের নাম ও খ্যাতি স্মরণীয় হয়ে থাকে। এখানে যাঁর কথা উল্লেখ করছি, তাঁরও জীবনের সূত্রপাত হয় একটা লক্ষ্য নিয়ে এবং সে লক্ষ্যে আজও তিনি অবিচলিত রয়েছেন বলেই তাঁর এতখানি প্রতিষ্ঠা।

ডাঃ ফুলরেণু গুহ—বাল্যে শ্রীহট্টের স্কুলে যখন পড়তেন তখন

মাতৃস্নেহ —কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগামী পৌষ সংখ্যার

প্রতিযোগিতা

ফুল ও পাতা

১৫ই পৌষ ছবি পাঠাবার শেষ দিন

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲

তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

ছবির পেছনে নাম ধাম লিখতে ভুলবেন না।
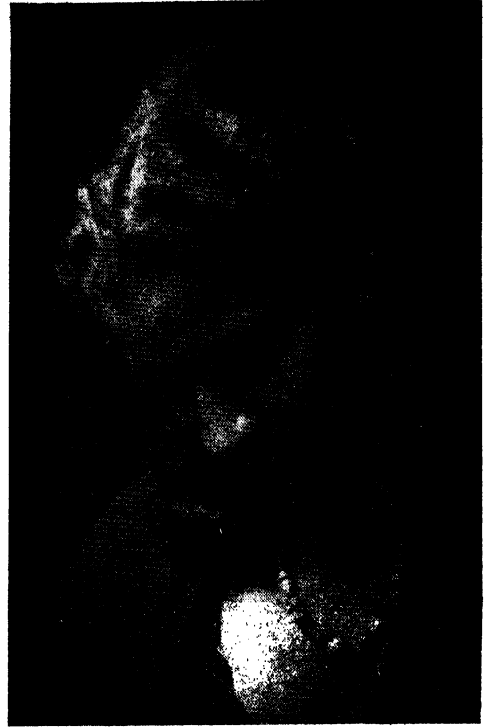
চিন্তামগ্না —পরিমল গোস্বামী

জেলিয়া —প্রশান্ত গুপ্ত

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
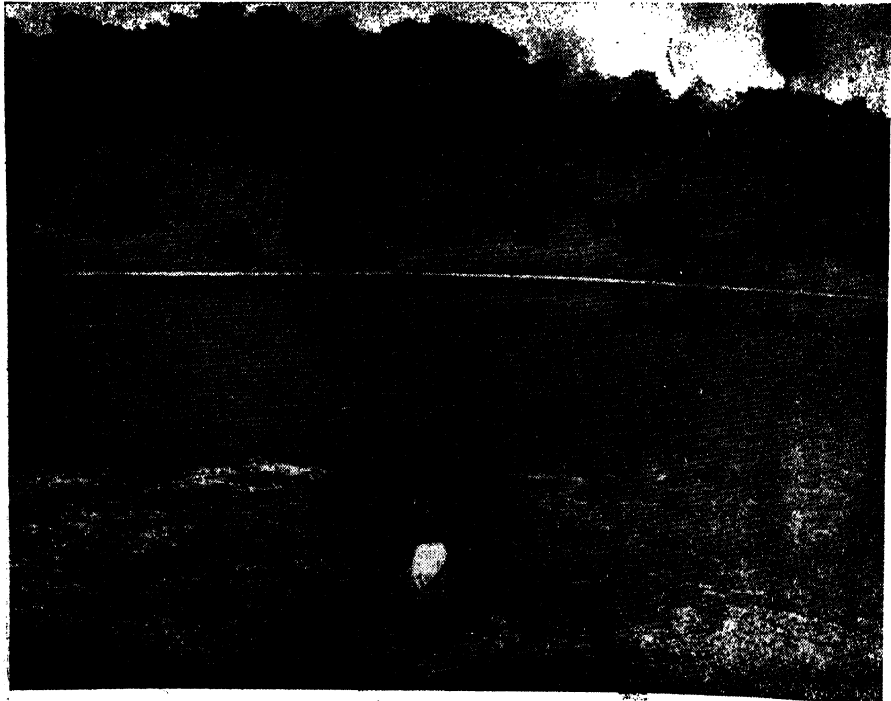
সমীচীন—উত্তম, ভদ্র, উৎকৃষ্ট, শ্রেয়ঃ।
সমীপ—নিকট, সন্নিধান, প্রত্যক্ষ, অন্তিক।
সমীরণ—বায়ু, পবন, বাতাস, মরুৎ।
সমীহা—বহু চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্রীড়া।
সমুখ—বাক্‌পটু, মুখামুখি, প্রত্যক্ষ।
সমুচিত—বিহিত, উপযুক্ত, ন্যায্য।
সমুচ্চয়—অনেকের মিলন, সংগ্রহ।
সমুদয়—সমুদায়, সমস্ত, সকল, তাবৎ।
সমুদিত—প্রকাশিত, উদয়প্রাপ্ত, উত্থিত।
সমুদ্র—জলনিধি, সাগর, মুদ্রাঙ্কিত।
সমূহ—অনেক, সংঘাত, নিকর, বৃন্দ।
সমৃদ্ধ—বর্দ্ধিত, ধনাঢ্য, সম্পন্ন, উন্নত।
সমেত—সহিত, সুদ্ধ, মিলিত, যুক্ত।
সম্পত্তি—সম্পদ, বিভব, ঐশ্বর্য্য, শ্রী।
সম্পদ—প্রতুল, ভাগ্য।
সম্পন্ন—প্রতুলান্বিত, শ্রীমান্‌, নিষ্পন্ন।
সম্পর্ক—সম্বন্ধ, অধিকার, সুপাইদ্‌।
সম্পাদক—নির্ব্বাহক, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সমাপক।
সম্পাদন—নিষ্পাদন, সমাপন, কর্ম্মসাধন।
সম্পূর্ণ—পরিপূর্ণ, সমাপ্ত, প্রচুর, অখণ্ড।
সম্পৃক্ত—যুক্ত, মিশ্রিত, মিলিত, সংশ্লিষ্ট।
সম্প্রতি—এখন, ইদানীং, অধুনা।
সম্প্রদান—দান, উৎসর্গ, অর্পণ।
সম্প্রদায়—দল, সমাজ, পরম্পরাগত ধর্ম্ম।
সম্বৎসর—হায়ন, বর্ষ, বৎসর, অব্দ।
সম্বন্ধ—সম্পর্ক, কুটুম্বিতা।
সম্বন্ধী—সম্বন্ধবিশিষ্ট, শ্যালক, সম্পর্কী।
সম্বরণ—নিবারণ, রোধকরণ, গোপন।
সম্বর্ত্ত—প্রলয়, যুগান্ত, যুগক্ষয়।
সম্বর্দ্ধক—মর্য্যাদক, বর্দ্ধনকারী, সম্ভ্রমকারী।
সম্বর্দ্ধনা—মর্য্যাদা, অভ্যর্থনা।
সম্বল—পাথেয়, ব্যয়োচিত দ্রব্য, সংগতি।
সম্বলিত—মিলিত, সমেত, ঘটিত, সঙ্গে।
সম্বাদ—বার্ত্তা, সমাচার, বৃত্তান্ত, বিবরণ।
সম্বুল—জটামাংসী, পেশী।
সম্বোধন—অভিমুখী করণ, আহ্বান।
সম্ভব—জন্ম, উৎপত্তি, কারণ, সপ্রমাণ।
সম্ভাবনা—উপায়, ঘটনা, হইবার যোগ্য।
সম্ভাষণ—আলাপ, কথোপকথন।
সম্ভূত—জাত, উৎপন্ন, উদ্ভূত, জন্মপ্রাপ্ত।
সম্ভোগ—বিষয়-সুখ গ্রহণ, মৈথুন, রতি।
সম্মত—অনুমত, স্বীকৃত, প্রিয়, সঙ্গত।
সম্মতি—অনুমতি, স্বীকার, আজ্ঞা, ঐকমত্য।
সম্মান—সমাদর, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম।
সম্মার্জনী—খেংরা, ঝাঁটা, ঝাড়ন।
সম্মীলন—মুদ্রিত হওন, সঙ্কুচিত হওন।

সম্মুখ—অভিমুখ, সমক্ষ, সাক্ষাৎ।
সম্যক—উত্তম প্রকার, উচিত, সমীচীন।
সম্রাট—রাজাধিরাজ, নিষ্কর রাজা।
সযোনি—জ্ঞাতী, গুবাককর্ত্তনাস্ত্র, সরতা, সখী, বয়স্যা।
সর—ঘনীভূত দুগ্ধসার, ক্ষীরসার।
সরণ—গমন, চলন, ক্ষরণ, দূর হওন।
সরজ—সর হইতে জাত, নবনীত প্রভৃতি।
সরজস্কা—ঋতুমতী, রজস্বলা, আগতার্ত্তবা।
সরমা—কুক্কুরী, বিভীষণ-পত্নী।
সরস্—সরোবর, তড়াগ, পুষ্করিণী।
সরস—রসযুক্ত, সজল, কোমল, সুস্বাদু।
সরসিজ—(পদ্ম দেখ)
সরস্বতী—বাণী, বাগ্‌দেবী।
সরিৎ—নদী, স্রোতস্বতী, নিম্নগা, সূত্র।
সরিষা—সরিষপ, সর্ষপ, রাজিকা।
সরু—তনু, সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, পাতলা।
সরূপ—আকারবান, সদৃশ, সমানাকৃতি।
সরোজ—(পদ্ম দেখ)
সর্গ—সৃষ্টি, স্বভাব, প্রকরণ, অধ্যায়।
সর্জ্জরস—ধূনা, শালবৃক্ষ বা তাহার রস।
সর্প—সাপ, ভুজঙ্গ, বিষধর, নাগ।
সর্পভ্রম—মিথ্যানুভব।
সর্পিস্—ঘৃত, হবিঃ, ঘি, আজ্য।
সর্ব্ব—সকল, সমস্ত, সমুদয়, তাবৎ।
সর্ব্বগ—সর্ব্বত্রগামী, বিশ্বব্যাপী, আত্মা।
সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্ববেত্তা, যিনি সকলই জানেন।
সর্ব্বতঃ—সর্ব্বথা, সর্ব্বপ্রকারে, চতুর্দ্দিগে।
সর্ব্বদা—সতত, নিরন্তর, সদা, অনবরত।
সর্ব্বনাম—সর্ব্ব বিশ্বাদি, পঞ্চত্রিংশৎ শব্দ।
সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বব্যাপক, বিশ্বব্যাপক।
সর্ব্বময়—তাবৎস্বরূপ, বিশ্বরূপ, সর্ব্বাত্মক।
সর্ব্বরী—রাত্রি, রজনী, যামিনী, নিশা।
সর্ব্বশক্তিমান—অসীমসামর্থ্যবান, ঈশ্বর।
সর্ব্বশুদ্ধ—একুনে, গড়ে, সর্ব্বসাকল্যে।
সর্ব্বাঙ্গ—সমুদায় শরীর, সমস্তাবয়ব।
সর্ব্বান্তর্যামী—সর্ব্বগ, বিশ্বময়, সর্ব্বব্যাপী।
সলগ্ন—সংযুক্ত, উপযুক্ত, সঙ্গত, যোগ্য।
সলিল—জল, উদক, পানীয়, নীর।
সশঙ্ক—ভীত, ত্রস্ত, ভয়শীল, সভয়।
সশা—ক্ষীরা, স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ।
সসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী, সগর্ভা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

একাদশ তরঙ্গ

"ধর্মরক্ষা"*

ঈর্ষা হইতেও হীনতর রিপু হইতেছে মদ বা গর্ব এবং মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা অপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে ধর্মের বা পর-কল্যাণের ভাণ। "প্রমথ চৌধুরী" প্রসঙ্গে বারংবার আক্রান্ত হইয়া আমরা অকারণে উদ্ধত ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্রতিপক্ষ দলে ঈর্ষা করিবার মত কাহাকেও না পাইয়া আমরা পাণ্ডিত্যমদভরে স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়কেই নস্যাৎ করিতে বসিলাম। পরশ্রীকাতরতায় প্রবৃত্তি না হওয়াতে সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া অতি-পাণ্ডিত্যের ভাণও করিয়া ফেলিলাম। আমাদের শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ এই বাড়াবাড়িতে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হইল না; তিনি সম্মানের উপহার অর্থাৎ "কম্‌প্লিমেণ্টারি" 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যা স্বহস্তে "রিফিউজড্"—"অগ্রাহ্য" লিখিয়া ফেরত পাঠাইলেন। প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের এই বিমুখতায় সাময়িক মদোন্মত্ত আমাদের শঙ্কা বা লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, আমরা চৌধুরী মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য আরও নির্মম হইয়া উঠিলাম।

অবশ্য কিছু উত্তেজনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতেও আসিয়াছিল। প্রমথ-প্রসঙ্গে যতই মনোমালিন্য ঘটুক, রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার একটা সুযোগ স্বয়ং মা সরস্বতী ঘটাইয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন—৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮, কলিকাতায় সিটি কলেজ সংলগ্ন রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার দাবিতে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের সংঘর্ষজনিত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। অন্যায় কারণে আন্দোলনের নামে ছাত্রসমাজের ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার ইহাই আরম্ভ, আমি আমার জ্ঞানে এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা ইহার পূর্বে ঘটিতে দেখি নাই। সুতরাং ইহা একটি গুরুতর জাতীয় শুভাশুভমূলক ঘটনা, ঘটনাটিকে ঐতিহাসিকও বলা চলিতে পারে। তদানীন্তন বহু স্থানীয় প্রসিদ্ধ নেতা অন্যায় জানিয়াও এই ব্যাপারে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া নেতৃত্ব কায়েম করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জি), শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতারা পুরোভাগে দাঁড়াইলেন, অমৃতলাল বসু, পঞ্চানন তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্তক বংশধর বিজয় সিংহ প্রভৃতি হিন্দু-কুলতিলকরাও কোমর বাঁধিয়া যোগ দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘোর লাল কালিতে ছাপা প্রাচীরপত্রে "হিন্দু রিলিজিয়ন ইন্‌সাল্টেড্, ডোণ্ট জয়েন সিটি কলেজ" প্রত্যাদেশের মত জনসাধারণের ভীতির সঞ্চার করিল। সিটি কলেজের যায়-যায় অবস্থা। চারিদিকে "সাজ-সাজ, মার-মার, ভাঙ-ভাঙ" রব উঠিল; কাট্‌তি-বৃদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র চমকপ্রদ ছবি এবং মিথ্যা ও কল্পিত সংবাদ ছাপিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পথে পথে, পার্কে পার্কে সভা; হ্যাণ্ডবিল এবং কেচ্ছা ও ছড়া-পুস্তক যে কত বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। সিটি কলেজের নিরীহ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণিলেন, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অকারণে এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া কোণঠাসা হইতে বসিলেন। ক্ষিপ্ত ছাত্রসমাজকে শান্ত

---

* গত সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'-'প্রবাসী প্রেস' প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুযোগ সম্পর্কে স্বয়ং সত্যকিঙ্কর এক দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি: "আমার ধারণা ছিল এবং সেই ধারণাটাই সত্য যে, শনিবারের চিঠি যত দিন পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসের ও আপিসের পক্ষপুটচ্ছায়ায় লালিত হইয়াছিল, তত দিন ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন রামানন্দ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন প্রবাসী আপিস ও প্রেসের 'বিজিনেস ডিরেক্টর' ছিলেন। এই অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস যে হরিহরাত্মা ইহা সকলেই জানিতেন, আমারও তাহা অজানা ছিল না। এই দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামানন্দ বাবুর কাছে 'অনুযোগ করা' খুবই দুঃসাহসিক কাজ সন্দেহ নাই এবং এতটা অতিবুদ্ধির পরিচয় আমি কখনো দেই নাই।" গত বারে প্রকাশিত স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র অন্য সাক্ষ্য দিলেও মাতুলের এই প্রতিবাদ ভাগিনেয় মানিয়া লইতে বাধ্য।—লেখক।

করিবার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার আসরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইলেন। 'শনিবারের চিঠি'র মারফতে আমরা কয়েকজনও সিটিকলেজ-পক্ষে যোগ দিলাম, তবে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ভূমিকায় নয়, কিঞ্চিৎ "যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি"ভাবে। আমাদের উষ্মা যে ন্যায়ানুমোদিত এই বিশ্বাস আমাদের ছিল। কেন ছিল তাহা বুঝাইতে আসল ঘটনার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কয়েকটি সংবাদ-পত্রের সংবাদে ও চিঠিপত্রে নিছক মিথ্যা বিবরণী তখন প্রচারিত হইয়াছিল। ঘটনা এই :—

রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র সেখানেই প্রতিমা স্থাপনপূর্বক সরস্বতী পূজা করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী হন না। পরে তাঁহাদের অনুমতি অনুসারেই স্থির হয়, ছাত্রাবাসের বাহিরেই পূজা হইবে। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রেরা রাতারাতি ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিলে ছাত্রাবাসের পরিচালক অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় তাহাতে বাধা দেন। ইহা সত্য যে, তিনি এই সময়ে অধ্যাপকোচিত স্থৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কারণে তিনি ও কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনধিকারী ছাত্রেরা অন্যায় অধিকার সাব্যস্তের এই সুযোগ ছাড়েন নাই, তাঁহাদের তাতাইবার লোকেরও অভাব হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শহরময় রটিয়া গেল যে, মৈত্র মহাশয় শুধু সরস্বতী প্রতিমাই ভাঙিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন নাই, লাঠির আঘাতে কলেজের দারোয়ানদের নিত্য-পূজিত শিবলিঙ্গও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্, আর যায় কোথায়! বহুদিনের বহু লোকের যত্নে ও অর্থে তিলে তিলে গড়িয়া তোলা একটি জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার পক্ষে সেদিন এই সম্পূর্ণ মনগড়া সংবাদই যথেষ্ট বিবেচিত হইল। এইরূপ ঘটনা সেই প্রথম বলিয়া আমরাও কোমর বাঁধিয়া প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়াছিলাম; আজ হইলে নিশ্চয়ই সে সাহস করিতাম না। তখনও "চল্‌বে না, চল্‌বে না" শ্লোগান বা ধ্বনির আবির্ভাব এদেশে ঘটে নাই।

যাহা হউক, এক-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলাম। রবীন্দ্রনাথ 'মডার্ন রিভিউ'-এ এক পত্র এবং ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে "সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধের মূল পাণ্ডুলিপি এবং পর পর দুইবার ব্যাপক পরিবর্তন সম্বলিত প্রুফ আমার নিকট আছে। অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, সত্য কথা বলিবার জন্যও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। আমরা বলিতে একা প্রায় আমিই, অন্যেরা ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কের দরুণ কড়া কিছু লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। আমি নির্ভেজাল হিন্দু, সুতরাং হিন্দুর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতে আমার দ্বিধা হইবার কথা নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দের নজির সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রধানদের সাময়িক সঙ্কীর্ণতার দরুণ তখন হিন্দুত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার মন্তব্যেও জোর পাইলাম। তিনি লিখিলেন—

'আমাদের দেশে বরযাত্রীরা প্রায়ই নিরুপায় কন্যাকর্ত্তার অতিথি-রূপে তাকে অন্যায় উৎপীড়ন করে থাকে। তাতে প্রমাণ হয়, যেখানে নিরাপদে জোর খাটাতে পারি সেখানে উপদ্রবের দ্বারা অন্যকে অপদস্থ ক'রে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণ করাতে আমাদের আনন্দ। এই মনোবৃত্তিকে গৃহস্থের ঘরে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রিক দলাদলিতে যদি আমরা সর্ব্বদা প্রবল হ'তে দেখি, যদি দেখি, পরের মতকে গায়ের জোরে চাপা দিতে, পরের বৈধ স্বাতন্ত্র্যকে অবৈধ উপদ্রবের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই, তবে সেটা কি গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়? প্রতিমাপূজার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে সিটি কলেজকে দেশের সকল সম্প্রদায় অনায়াসে এতকাল স্বীকার ও ব্যবহার ক'রে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস করে দেওয়া দুঃসাধ্য না হ'তে পারে কিন্তু এই আঘাতে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মনে যে কাঁটা-গাছ রোপণ ক'রে দেওয়া হবে, সেটা দিয়ে আমাদের এই শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন করাতে কি পৌরুষ আছে, না তাতে ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়? সবশেষে এঁদের কাছে আমার এই বক্তব্য, নীতিকথা যখন যেমন সুবিধা তখন তেমন ক'রে বলা চলে না। পরের প্রতি আমার ব্যবহারে ও আমার প্রতি পরের ব্যবহারে কর্ত্তব্য-নীতির পার্থক্য করা অসঙ্গত। ভারত-রাজ্য-শাসন যাঁদের হাতে তাঁরা খৃষ্টান,—জোর আমাদের সকল পক্ষের চেয়েই তাঁদের বেশি। সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি খৃষ্টানের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও খৃষ্টান কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের গৃহে, দেবালয়ে, বিদ্যায়তনে জোর ক'রে খৃষ্টান উপাসনা-বিধির প্রবর্ত্তন করেন নি।··· যাঁরা গোবর জল, পাঁক ও পানের পিকবর্ষণ, জুতোর মালা ও লগুড়াঘাতের সাহায্যে তাঁদের পবিত্র ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করবার পৌরুষ

প্রকাশে উন্মত্ত ও এই রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ে দেশাত্মবোধী ধার্ম্মিকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্চেন, অন্তত বাধা বা লেশমাত্র তিরস্কার পাচ্চেন না, একান্ত মনে আশা করি, তাঁদেরই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ গুরুদের কাছ থেকে আমাদের ম্লেচ্ছ কর্ত্তারা যেন ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করেন।'

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা আজিও নিঃশেষিত হয় নাই। অন্যায় অবাঞ্ছিত জবরদস্তি শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দিনে দিনে ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে একটি মারাত্মক কালাপাহাড়ী স্যাটায়ার "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসাল্‌টেড—(স্বপ্নদর্শন)" প্রকাশ করিলাম। অশোক "এই কি হিন্দু জাগরণ" এবং যোগানন্দ "নায়মাত্মা চৌর্য্যেণ বা লভ্যতে" লিখিলেন বটে কিন্তু আমার রাইফেলী বুলেটের তুলনায় সেগুলি মৃদু লাঠি-চার্জ মাত্র বলিয়া বোধ হইল। 'মধু ও হুলে' আমার নিবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রাবণে বাহির হইল আমার "ধর্ম্মরক্ষা"— সচিত্র ব্যঙ্গ-কবিতা। সিটি কলেজকে ধ্বংস করিতে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম। কবিতাটি সেকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল, নেতাদের সদৃশ-প্রতিকৃতি সম্বলিত কার্টুন আঁকিয়া শ্রীহরিপদ রায় বিশেষ বাহবা পাইয়াছিলেন। আমি যাবতীয় বক্তার কুলজী-কোষ্ঠী ধরিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। এই সিটি-কলেজের সরস্বতী-পূজা ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আমাদের "টার্গেট" হইয়াছিলেন, পরে দীর্ঘকাল প্রধানত এই রাগেই তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলাম। "ধর্ম্মরক্ষা" কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ

অ্যালবার্ট হলে মহতী সভা,
টিকিতে বাঁধিয়া রক্তজবা
আসে দর্শক, আসিল শ্রোতা—
যেন বর্ষার খরস্রোতা
গঙ্গা নদীর গেরুয়া বান,
টিকি খাড়া আর খাড়া যে কান।
সভা গমগম্ ষ্টেজের মতো,
গোটা ও অটুট চেয়ার যত,
দেয়ালে ছিল না পানের পীচ,
সমানে ভরিল উপর নীচ।
কেশব সেনের মূর্তিখানা
বক্ষে সবার দেয় যে হানা;
বামেতে দত্ত অশ্বিনীর—
তাঁর দিকটায় জমিল ভিড়!

* * * *

খোকা ভগবান আসিল নিজে
চোখের জলেতে বেজায় ভিজে।
বুকেতে কি জানি ঘটিল দোষ,
সাক্ষী বৈদ্য কুলীন বোস।
দেবদ্বিজে অতিভক্তিমান,
সন্ধ্যা করিয়া তামাক খান।
জগন্নাথের মহিমা জানে
চুল ছিঁড়ে আসে টিকির টানে।
ম্লেচ্ছেরে কহি প্যাক্ট-বচন
টিকির ধর্ম্মে দেছেন মন।

* * * *

কেম্‌ব্রিজে আজ গজায় টিকি,
এল নবযুগ বৈদ্যুতিকী।
ছোটে গোঠে গোঠে খোকার বাণী
নববেদ বলি তারে বাখানি।
পণ্ডিতে কয়, "কল্কি নিজে
ধারণ করিল বি-পি-সি-সি যে!"
বিবাহযোগ্যা পান নি ক'নে
কেহ নাই বামে সিংহাসনে।
পদধূলি দিয়ে সে দুখ ভুলে,
নাক ডাকে শুধু চিতিয়ে শুলে।
হিন্দুয়ানির পাণ্ডা পাঁড়—
জয়রব তাই উঠিল তাঁর।••••••

আমার 'বঙ্গরণভূমে' কাব্যে সম্পূর্ণ কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই প্রমথ-দূষণ-ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ শান্ত হইবেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। সেই শ্রাবণেরই (১৩৩৫) 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্র-নাথের খাস কলমচী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর নামে 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ বাহির হইল—"সাহিত্য-ব্যবসায়।" ইহা দক্ষতর হস্তের বেনামী লেখা বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিলেন। তবে হাতের লেখার মত রবীন্দ্রনাথের ভাষাও যে চক্রবর্তী মহাশয় অনুকরণ করিতে পারিতেন না, এমন কথা আমরা ভাবি নাই। তিনি যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছিলেন প্রবন্ধটির উদ্‌ধৃতাংশ হইতেই তাহা উপলব্ধি হইবে—

এ কথা সত্য, বাঙলা ভাষায় সম্প্রতি সহসা তারুণ্যের আস্ফালন সহকারে সাহিত্যবিকার দেখা দিয়েচে। সেটা বিলিতি ব্যাঙ্গো এবং দরিদ্র নারায়ণের আর্ত্তস্বর, কুশ্রী-কাল্পনিকতা, আত্ম-ঘোষণা ও মহত্ত্বের

প্রতি অশ্রদ্ধায় মিশ্রিত ব্যাপার। অতি-তারুণ্যের পিছনে যশোবণিক সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট ছিল, অধ্যাপনজীবীদেরও অসদ্ভাব ঘটেনি, কিন্তু মোটামুটি রচনায় তাঁরা প্রকাশ্যত বিধর্ম্মী; ধার্ম্মিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হ'ল সর্বশেষে। এই সমাজ-সংস্কারকের দল সাহিত্যের কমলবনে প্রবেশ করেন পঙ্কোদ্ধারের সাধুসঙ্কল্পে; রাতারাতি এঁরা সাহিত্যের নীতি, আদর্শ, গতিবিধির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন, প্রশংসাপত্র, ব্যঙ্গচিত্র অভদ্র সমালোচনা এঁদের হুকুম জারি, সাহিত্য-সিংহাসনে এঁরা শাসনদণ্ডধারী।...এই মলিন পন্থায় সাহিত্য-সমালোচনার সংযম ও শিষ্টাচার পরিত্যাগ ক'রে একদল বিত্তাদাম্ভিক লেখক দেশমান্য সাহিত্য-স্রষ্টা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে ইতর ভাবে আক্রমণ করলেন।

অর্থাৎ আমরা সরস্বতী-পূজার ব্যাপারে হিন্দুধর্ম-ধুরন্ধরদের চোখে হইলাম বিধর্মী কালাপাহাড় এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রানুকারীদের নিকট হইলাম ধার্মিক ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রনাথের কলমচীর খোঁচা খাইয়া আমাদের উত্তপ্ত মগজ উত্তপ্ততর হইয়া উঠিল; এভারেষ্টের দিকেও হাত বাড়াইব কিনা এইরূপ জল্পনা আমাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধের রচয়িতা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিল। ফলে যাহা ঘটিল ১৩৩৫ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। অশোক চট্টোপাধ্যায় "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধে দশ দফায় অমিয় চক্রবর্তীকে একরূপ "নিকেশ" করিয়া সর্বশেষে লিখিলেন—

ভবিষ্যতে অমিয় বাবু কিছু লিখিলে, আমাদের অনুরোধ যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা, অলঙ্কার ও ভাবের বৃথা অনুকরণের চেষ্টা না করেন। আটপৌরে সংস্কার ও সাধারণ বুদ্ধির কথা সহজ ভাষায় প্রকাশ করিলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা।

মোহিতলাল "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এই "আলোচনা"য় লিখিলেন—

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়েছেন যে, জনরব মিথ্যা, ও লেখা তাঁর নয় এবং ও লেখার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতিও নেই। জানি, জনরবটা বাইরের, আর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ব্যক্তিগত, অর্থাৎ ভিতরের, এতে ক'রে জনরবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সবটা প্রকাশ করবার অধিকার আমাদের নেই... এই মন্তব্য শুনে আমরা আবার ভালো ক'রে উক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধ প'ড়ে দেখলাম। এবারে আর সংশয় রইল না, সত্যই ত, এ লেখা রবীন্দ্রনাথের হ'তেই পারে না! অসম্ভব!

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার উপরেই রহিয়া গেলেন কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকে আমরা ছাড়িলাম না, জের চলিতেই লাগিল। আমরা যখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সচেষ্ট তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক "ভদ্রবিবুধমণ্ডলী" সমালোচনায় নিম্নোদ্ধৃত উচ্চ আদর্শ দেখাইতে লাগিলেন:

[সম্পাদক নীরদচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া লিখিত]

শনিবারে পাও বুঝি সজনীর চিঠি?
যাহা দেখ মার শুধু নাসিকার খোঁচা,
বোঁচা-নাক গুরুজীর ছাত্র তুমি ওঁচা।
কাছের কলেজে যাও নাম তার সিটি।
সজনী গায়েতে দেয় গোলাপী সেমিজ,
পছন্দ হয় না তব,—ভারি বেতমিজ!
কে জানে এমন তুমি ডাহা ইডিয়ট!

সুভাষচন্দ্র সরস্বতী-পূজা ব্যাপারে ছাত্রদের পক্ষে জেদ প্রকাশ করাতেই মামলা মিটিতে দেরি হইয়াছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক এবং তাঁহাকে জড়াইয়া আমি তখনই "মর্ত্ত হইতে সরস্বতী-বিদায়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম—

কাতরে ভারতী কন, "শুন শুন দেবগণ,
আমার দুর্গতি বাখানিব,
মর্ত্ত্যেতে বাঙ্গালা নাম আছে অনঙ্গের ধাম"—
সভাজন কহে, "শিব, শিব!"
"সেথায় তরুণ দল জীবনে হয়ে বিফল
ব্রতী হ'ল সাহিত্যিক-ব্রতে,
মাসিক ছাপিয়া তারা অধীনীরে করে তাড়া—
অঙ্গ মোর ভরি দিল ক্ষতে।
বঙ্গের কি গাব গুণ, তরুণ টানিছে গুণ,
নয়ন অরুণ বারুণীতে;
ভাসিতেছি বিভু স্মরি' কলার মান্দাস 'পরি
প্রগতি-কল্লোল-কালিন্দীতে।
অনঙ্গ ধরিয়া অঙ্গ শান্তি মোর করে ভঙ্গ,—
পীড়িতা নিতম্ব-স্তনভারে
লোলুপ-লালসা-লালা মুখ-বুক করে জ্বালা,
ডোবে পদ্ম পঙ্কের পাথারে।
মরাল বাহন মম হয়েছে শকুনি সম,
শ্মশানে করিছে শবাহার,
বীণা ফেলে ঝাঁটাগাছি দেছে, তাই ধ'রে আছি
শতমুখী সঙ্গীত-আধার।
বিমলিন নগ্ন গায় বসালো আমারে, হায়,
রাজপথে জনতার মাঝে,
কামাতুর দৃষ্টি হানি মোরে করে টানাটানি
বাঁচি আমি যদি মরি লাজে।
হংসপদ্মাসন যার আকাঙ্ক্ষিত কমলার,
বীণা যার মোহিল ত্রিদিব—
অনঙ্গের রঙ্গধামে মর্ত্ত্যে খ্যাত বঙ্গনামে"—
দেবগণ কহে, "শিব, শিব!"

—"সে নন্দন-নন্দিতার সীমা নাই লাঞ্ছনার
প্রজাপতি করহ বিহিত,
ক্লেদপঙ্কে করি' বাস ছিন্নদেহ নগ্নবাস,
সবি মোর লাগে বিপরীত।
আমার পূজার ছলে মিলেছে তরুণদলে
আমারে করিতে বহিষ্কার,
নিত্য যেথা পূজা মোর সেথায় পশিয়া চোর
ধর্ম্মছলে করে অধিকার।
পূজা যেথা সত্যকার সেথা ঢোকে মিথ্যাচার,
মোরে নিয়ে পিশাচের খেলা
সহে না হে চতুর্ম্মুখ, যন্ত্রণায় ফাটে বুক,
হে বিধি, বাঁচাও এই বেলা।"

নীরব চতুরানন সজল হ'ল নয়ন,
ক্ষণ পরে কন মৃদু হাসি,
"বন্ধ এবে যজ্ঞযাগ, দেবতার রাজ্যভাগ
জনগণ লইতেছে আসি;
তুমি মিছা কর শোক, দেবের এ দেবলোক,
মর্ত্ত্যলোকে দেবতা গণেশ
ভোগ পাবে সুরসাল গণবাদ যতকাল
প্লাবিত করিবে বঙ্গদেশ।
"খোকা ভগবান" নামে গজানন বঙ্গধামে
সম্প্রতি খুলেছে রাজ্যপাট,
তুমি মাতা এস চ'লে চড়ি' স্বর্গ-চতুর্দ্দোলে,
বঙ্গভূমি হউক স্বরাট্।"

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে আরম্ভ হইয়া প্রায় জুলাইয়ের শেষাশেষি আসিয়া সিটি কলেজের গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাক্কার পর এত দিন ধরিয়া এত অধিক ছাত্রকে আর শিক্ষাস্থানভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। ১৩৩৫ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বিবিধ প্রসঙ্গে" "সিটি কলেজে মিটমাট" শিরোনামায় লিখিলেন—

সিটি কলেজ সমস্যার উপযুক্তরূপ সমাধান হইয়া যাওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যে সময়ে বাংলার সমগ্র হিন্দুজাতি একজোট হইয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে এরূপ একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটিয়া আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, বহু অন্ধ বা স্বার্থান্বেষী প্রাচীনপন্থী লোক এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া যুবকমহলে নেতার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত বর্ত্তমান কালের উন্নতিশীল হিন্দুর আদর্শের বিরুদ্ধ হওয়াতে যুবকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ সুফলপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

দেখিতে দেখিতে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র বৎসর ঘুরিয়া গেল, ভাদ্র মাসে (১৩৩৫) উহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। অর্ধ বৎসর সাপ্তাহিক জীবনশেষে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে যে নকল "জুবিলী সংখ্যা" বাহির করিয়াছিলাম তাহারই ধারা ধরিয়া 'শনিবারের চিঠি' মাসিকের ঊননবনবতি-শতবার্ষিকী বেশ ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ অবাধ আড্ডা। সেকালে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজ উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দিতে জানিত। সুকিয়া ষ্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বোস ষ্ট্রীট) কান্তিক প্রেসে ভাঙা 'ভারতী' দলের আড্ডা, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গজেনদার (ঘোষ) বাড়িতে সর্বদলীয় সাহিত্যিকের কিঞ্চিৎ আদিরসাশ্রিত আড্ডা, পটলডাঙায় 'কল্লোল'-দলের বোহেমিয়ান আড্ডা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের উপর পাশাপাশি বরদা এজেন্সীতে 'কালি-কলমে'র এবং আর্য পাবলিশিং হাউসে শশাঙ্কবন্ধুদের অপেক্ষাকৃত উন্নাসিক আড্ডা, এম-সি-সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে শিশুসাহিত্য-স্রষ্টা, ভ্রমণবিশারদ ও যাযাবরদের রাজা-উজীরমারী আড্ডা। 'উপাসনা' কার্যালয়ে রাজনীতিগন্ধী সাহিত্যিকদের আড্ডা। 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসে লাপ্ সি-গেরুয়াভক্ত সঙ্কটত্রাণী সাংবাদিকদের পলিটিকো-সোশ্যাল-লিটারারি আড্ডা, 'বঙ্গবাণী' আপিসে বিশ্ব-বিদ্যালয়-আশ্রিত পণ্ডিত সাহিত্যিকদের আড্ডা এবং 'বিচিত্রা'য় অভিজাত সাহিত্যিকদের আড্ডা প্রধান ছিল—কয়েকটি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল, কয়েকটির ভাঙন-দশা। কিন্তু আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা রসে ও রঙে, চায়ে ও সিগারেটে অন্য সকল আড্ডাকে প্রায় ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যহ প্রায় অষ্টপ্রহরব্যাপী আড্ডা, মুখাগ্নি অনির্বাণ। স্বতন্ত্র ঘর বা আশ্রয় ছিল না, 'প্রবাসী' প্রেসের ম্যানেজারের অপ্রশস্ত কক্ষই আড্ডার জাদুস্পর্শে বৃহদায়তন হইয়া উঠিত। নীরদ, অশোক, যোগানন্দ ও আমি তো সর্বদাই থাকিতামই; মোহিত, হেমন্ত, গোপাল, হরিপদ, সুনীতিকুমার, কালিদাস এবং ঢাকা, রংপুর ও পাটনা হইতে আসিলে সুশীল, রবি ও রঙীন নিয়মিত আসিতেন। এতদ্ব্যতীত, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, অধুনা-নিরুদ্দিষ্ট কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, বন্ধু সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জীবনময় রায়, হিরণকুমার সান্যাল, দিলীপ সান্যাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ

জীবনকালী রায় সুবিধা পাইলেই আসিয়া যোগ দিতেন। আমাদের আড্ডা সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কৌতুককর কথা স্মরণে আছে। এক দিন তিনি একটু অসময়ে আপিসে আসিয়া আমার সহিত ছাপাখানা-সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই। তিনি তাঁহার স্বস্থানে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, "গিয়েছিলাম তো কিন্তু ধোঁয়ার চোটে বেলুনের মতো উড়ে ফিরে এলাম।" এই আড্ডাই 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিল। বিপিনবাবুর রেষ্টুরেণ্টে এবং মতিবাবুর চায়ের দোকানে (দুইটিই আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত) মাঝে মাঝে আড্ডা স্থানান্তরিত হইত, তখন খরচের ভার পালা করিয়া বহন করা হইত। আমরা ক্বচিৎ কদাচিৎ গজেনদার আড্ডায়, আনন্দবাজার গৌরাঙ্গ প্রেসের আড্ডায় অথবা 'কালি-কলমে'র আড্ডায় গিয়া যোগ দিতাম। অন্যত্র আমাদের গতিবিধি ছিল না। কিছুকাল পরে অবশ্য 'প্রবাসী' প্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরাই কান্তিক প্রেসের ভাঙা হাটে আসর জমাইয়াছিলাম। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহিত এই আড্ডাতেই পরিচয় ঘটে। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে।

'শনিবারের চিঠি'র শতবার্ষিকী-আড্ডা স্মরণীয়। এই আড্ডাতেই আমার "শনিবারের চিঠি centenery" কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেদিনকার সাহিত্য-পরিবেশের এবং আমাদের ভবিষ্যতের একটা ছবি ছিল, যাহা চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়:—

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নবনবতি বছর পরে শতেক হবে পার।

* * * *

বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বসবে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের রাত্রি হবে, যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী।
তাদের নাতি-নাতিনীরা কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউ বা চপল ঝরণা ঝিরি-ঝিরি—
যেথায় যত তরুণ আছে রঙিন হবে তোমার আঁচে,
'কালি-কলম,' 'প্রগতি' আর 'কল্লোল' সুচ্ছিরি!

"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি,
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পরিপাটি।
সেদিন নরেশ রাধাকমল বস্তি মাঝেই রইবে অমল,
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জটীরই চাটি।
জানি সেদিন 'হসন্তিকা' পরবে সত্য হাসির টীকা,
"সওগা" ছেড়ে 'ধূপছায়া' তার ভুলবে খুঁটিনাটি।
সেদিন তোমার আড্ডা-ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি,
"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবীদিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?
শৈলজা কি ছুটবে কাশী মুরলী কি ছাড়বে বাঁশি,
গজল-কবি ভজবে নবী ক্রমিক বিবর্তনে!
অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে,
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে?
কত কথাই জাগছে আজি মনে।

* * * *

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশার মিলবে কি সন্ধান?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনো মতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চলছে গেয়ে গান—
সেদিন শনিমণ্ডলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝবে কি হায়, গলায় প'রে বিজয়-মাল্যখান?
তুমি শুধুই জানবে সখি, কোন্ সোলা আর চকমকি
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান!

* * * *

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে,
নবতি-নব বছর পারের টুকরা কালের তীরে!
যেথায় মোরা কজন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিমসলিলে
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে।
তারা কি আর করবে মনে জন্মদিনের শুভক্ষণে
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে আসা আঁধার চিরে চিরে!
সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি'
মোদের ছন্দ সাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে?
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে!

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি,
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল, কাল সে নিরবধি।
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগরপানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী।
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি।

'শনিবারের চিঠি' নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারিবে কি না জানি না, আমার সেদিনকার আশার একের চার ভাগ পূর্ণ হইয়াছে; সবাই না আসুন অনেকে আসিয়াছেন এবং আমি নূতনদের হাতে সকল ভার সমর্পণ করিয়া কালের স্রোতে হারাইবার অপেক্ষায় আছি।

সিটি কলেজের হাঙ্গামা মিটিলেও 'শনিবারের চিঠি'র "ধর্মরক্ষা"র জের কিন্তু প্রথম বৎসরেই মিটিল না। বাংলাদেশের দুর্বলচিত্ত নরনারীদের ধর্মাশ্রম-ব্যাধির বিরুদ্ধে কঠিন সমরে অবতীর্ণ হইলাম—দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই। এই সর্বনাশা ব্যাধি তখনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; এখন যে প্রশমিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজনেতারা নিজেদের স্বার্থে এই বিষয়ে কখনই সচেতন হইতে চাহেন নাই, কিন্তু ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দিনে দিনে দুর্বল করিয়া বাঙালী জাতিকে অধঃপাতের চরম সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে। ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ মৃত্যুর প্রায় মুখামুখি দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি একা কি ভাবে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম সে কাহিনী এইবারে শুনাইব। [ক্রমশঃ।

একুশটা মেয়ে

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষা দেয় ওরা একুশটা মেয়ে—
ফাইনাল বি-এ পড়ে, হেঁজিপেঁজি নয়,
কত জ্ঞান, অনুভূতি, কত না বিস্ময়
কচি কচি মনে ভরা, একুশটা মেয়ে…
আপোসেতে যদি কিছু টোকাটুকি চলে,
পাছে ফিস্ ফিস্ করে কেউ কথা বলে,
শিয়রে যমের মত আমি আছি চেয়ে—
চলেছে ঘড়ির কাঁটা, বেজায় সে তাড়াতাড়ি,
খুব যেন আদাজল খেয়ে।
ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ধুম—ক'দিন পড়েছে রাতে জুলে জুলে চুলে চুলে,
কিছু পরে বসে বসে ঘুম, ক'দিন দিনের বেলা, পড়ার ওষুধ গেলা,
একঘেয়ে কাটা ঘায়ে নুণ—
কালো কালি চাঁদ যেন, দু'চোখের কোলে কালি,
ভয়ে ভাবনায় মুখ চুণ।
একুশটা মেয়ে ওরা কলম চালায়, একুশটা উসখুস একুশ জ্বালায়,
কারো মনে আসে নাকো, কারো বেশী কাটাকুটি,
কারো শেষে কেঁচে মরে একেবারে পাকা ঘুঁটি
কন্‌টেক্‌ষ্ট ভুল হয়ে যায়—
কারুর খাতায় খোলা দোয়াত গড়ায়।
কলেজের বাগানেতে দুপুর-ময়ূর
ছোপ ছোপ আলোছায়া মাখানো পেখম,
এই মেয়েদের মুখে থমথমে মেঘ দেখে,
নাচে, মাতালের মত রকম সকম…
কলেজের বাগানেতে দুপুরের ফুল
অনেক পাঁপড়ী নিয়ে ফুটে আছে ঐ,
এখানেতে এই হলে, বাইশ নিঃশ্বাস চলে,
একুশ মেয়ের শাড়ী রং থই থই…
দেখলুম অকস্মাৎ দশটা বছর পেরিয়ে এগিয়ে গেছি, আমি আর ওরা,
দশটা বছর লাগে, ছোপ ছোপ ধোঁয়া ধোঁয়া,
ছিটে ছিটে কিছু ডোরা ডোরা…

আমি তো দেখছি ওরা একুশটা ঘরে খুব কষে গিন্নিপনা করে—
ময়ূরটা নেচে নেচে এখানে-ওখানে গেছে, ফেলে ফেলে একুশটা পাখা,
কত ঝড়-ঝাপটায় ঝাপটানো জীবনের ভাঁজে ভাঁজে হাসি-গান ঢাকা—
বেশীটাই বিবাহিত, অনূঢ়া তো অল্প, বেশীটার জীবনের সাধারণ গল্প;
রয়েছে সম্ভাবনা—কারো কারো জীবনেতে এখনো,
কেউ কেউ আজো যেন দু'মনা—
বেশীটাই হাসিমুখ, মাঝে মাঝে শুকনো,
বেশীটাই নিজে করে রান্না,
স্বপ্নই বেশী বেশী, খেলার অবধি নেই,
প্রচুর গানের কলি, কম নয় কান্না…
* * * *
দেখলুম, দশ বছরের আগে সেই বাগানের
কে জানে কেমন করে খুলে গেছে খিল,
সেই সব ফুলগুলো হাসছে আগের মত
ডাকে সেই পুরোনো কোকিল…
দশ বছরের আগে যে সব কবিতাগুলো শুনিয়েছি ক্লাশে রোজ রোজ,
একুশটা মেয়ে করে বাগানের ঘাসে ফুলে আজ সেই কবিতার খোঁজ—
যে সব স্বপনগুলো পেয়েছিল কবিতায় চেয়েছিল যেগুলো জীবনে,
দশ বছরের পরে যদি ফিরে পাওয়া যায় এই আশা একুশটা মনে…
আজকের মত নাচে দুপুর-ময়ূর আজকের মত বয় হু-হু হাওয়া,
ওরা খুব লিখে চলে, আমি বসে বসে দেখি
দশ বছরের পরে পেছুন চাওয়া।
আমাকে আবার ওরা খুঁজবে নাকি,
আবার নতুন করে বুঝবে মানে?
আবার আসবে উড়ে আগের পাখী
দশ বছরের পরে এই বাগানে?
আজকের মত জ্বলে দুপুরের ফুল,
আজকের মত চলে দামাল হাওয়া,
কলেজের ঘরে ঘরে ওরা সব খুঁজে মরে,
আমাকে সেদিন আর যাবে না পাওয়া…

শরৎচন্দ্র ও চরিত্রহীন

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৭ সাল। চরিত্রহীন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৬ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি রেঙ্গুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরের একটি বাড়ীতে বাস কচ্চেন। তাঁর বয়স ৪১ বৎসর।

শরৎচন্দ্র বসে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে। তিন-চারটি যুবক একখানি "চরিত্রহীন" বই হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রথম যুবক—(শরৎচন্দ্রকে) দেখুন, এই রকম বই লিখলে এ-পাড়ায় আপনার থাকা চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া। লোকে বউ-ঝি নিয়ে ঘর করে।

দ্বিতীয় যুবক—গুয়ের পোকা যেমন ময়লা আর নোংরা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, আপনিও সমাজে সাবিত্রী আর কিরণময়ী ছাড়া আর ভাল চরিত্র দেখতে পান নি?

তৃতীয় যুবক—আপনার এই রকম বইএর পরিণাম কি হওয়া উচিত জানেন? এই দেখুন—

[একখানি চরিত্রহীন বইয়ের ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। বইখানা অনেকক্ষণ জ্বলে-জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র কোন কথা বললেন না। তিনি যুবকদের কাণ্ড দেখছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। যুবকরা চলে যাচ্ছে।]

শরৎচন্দ্র—শোন—

[যুবকেরা ফিরল]

—আমি বইখানার নাম দিয়েছি "চরিত্রহীন"। আমি গীতার টীকা লিখতে বসিনি। পাঠককে ত' আগেই আভাষ দিয়েছি এটা সুনীতি সঞ্চারিণী সভার জন্য নয়। টলষ্টয়ের 'রিসারেকসন' তিন ভলিয়ুম পড়েছ। সেখানা পৃথিবীর একখানা শ্রেষ্ঠ বই সেখানাও বেশ্যার কথা। সেখানা পড়লে চরিত্রহীন সম্বন্ধে আর কিছু বলবার থাকবে না। তা ছাড়া ভাল বই যা আর্ট হিসেবে, সাইকোলজি হিসাবে বড়, তাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকবেই থাকবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নেই? তোমাদের আপত্তি হ'ল সাবিত্রী আর কিরণময়ীকে নিয়ে কেমন ত'?

যুবক—হ্যাঁ।

শরৎচন্দ্র—বেশ, দেখ সাবিত্রী একটা মেসের ঝি। সে মেসের সর্ব্বময়ী, স্নেহে, যত্নে সে সবাইকে আপনার করে নিয়েছে। সতীশও তার আপনার হ'ল। সতীশ কত বার কত ভাবে তাকে কাছে টেনেছে, সাবিত্রী চিরকাল তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সতীশ

—শরৎচন্দ্রের মৃন্ময় মূর্ত্তি, শিল্পী মণি পাল নির্ম্মিত

একদিন তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেনি। সতীশ সগর্ব্বে যতীশ বাবুকে বলেছিল—"সাবিত্রী যদি নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যত দিন বাঁচতুম তাকে মাথায় করে রাখতুম।" সাবিত্রী সতীশকে অত্যন্ত ভালবেসেছিল অথচ সে বিশেষ ভাবে জানত যে যথার্থ প্রেম শুধু নিকটেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়। সাবিত্রীর ভোগ-লিপ্সা নেই, অর্থ-পিপাসা নেই, সামাজিক দাবী নেই, আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ। পথ ভুলে কিংবা আত্মীয় ভুবনমোহনের প্ররোচনায় যদি সে গৃহত্যাগ না করত, তবে কি সে হিন্দু-গৃহের আদর্শ মহিলা হ'ত না?

যুবক—তাহলে ত' আমাদের কিছু বলবারই থাকত না।

শরৎচন্দ্র—সাবিত্রী তার সর্ব্বস্ব নিবেদনের ভেতর দিয়ে সতীশকে সমর্পণ করেছিল। সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করল। ঘর থেকে বেরিয়ে-আসা একটা মেয়ে, তার রূপ ছিল বলে, চারি দিক থেকে মানুষ-প্রেতের দল তাদের লিক্‌লিকে জীভ বার করে কি না প্রলোভনই তাকে দেখাতে লাগল! এই সময়ে তার জীবনের কাল-রাত কেটে গেল, সতীশকে ভালবেসে। সে নতুন আলো পেল। সে নিজের জন্য কিছু চাইল না, কেবল বললে—"আমি দেহ-মনে অশুচি,—তবে আমি তোমার।" সতীশও তাকে ভালবাসল। সাবিত্রীর অকুণ্ঠ প্রেমের মন্দাকিনীতে স্নান করে সতীশের জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেল। সে ছেড়ে দিল মদ, ভাঙ, গাঁজা সেও পরের জন্যই নিজেকে বিলিয়ে দিল।

এই সাবিত্রীর ভেতর তোমরা ভাল কিছু দেখতে পাও নি? দেহটাই সব, অন্তরটা কিছু নয়? তোমরা বলতে চাও এই সাবিত্রীর চরিত্র সৃষ্টি করে আমি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করেছি?

যুবক—(নিরুত্তর)।

শরৎচন্দ্র—আমি কি সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে দিয়েছি? সাবিত্রীর অন্তরের মহত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব দেখানও কি অপরাধ? দেখ, সতীত্ব আর নারীত্ব এক জিনিষ নয়। ক্ষণিকের মোহে সাবিত্রীর সতীত্ব নষ্ট হতে পারে কিন্তু তার নারীত্ব আর মনুষ্যত্বের কি দাম নেই? তার আত্মত্যাগ আর সংযমের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি? এই কথাগুলো মনে রেখে তোমরা চরিত্রহীন-খানা আর একবার পড়ে দেখো।

যুবক—আচ্ছা, আর 'কিরণময়ী'র সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?

শরৎচন্দ্র—দেখ, কিরণময়ীর চরিত্রে আমি নারী-জীবনের ব্যর্থতা দেখাতে চেয়েছি। কিরণময়ী আর হারাণ বাবুর বিবাহ-জীবন বড়ই করুণ। স্বামীর ভালবাসা সে পেল না। বাড়ীর মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক। তিনি প্রাণপণে স্ত্রীকে পড়িয়েই খুসী। আর একজন ঘোর স্বার্থপর, পুত্রবধূকে খাটিয়েই সুখী। কিরণময়ী দুটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষ ও নারীর প্রেমহীন মিলনকে হিন্দুসমাজে বিধির নির্বন্ধ বলে মেনে নিতে পারল না। এইখানেই কিরণময়ীর জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হল। কিরণময়ীর মনে ভালবাসার অতৃপ্ত বাসনা—ভালবাসা পাবার। কিন্তু স্বামী রুগ্ন-শয্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, স্ত্রী তখন প্রতীক্ষা করছে অনঙ্গ ডাক্তারের। তৃষ্ণার্ত্ত কিরণময়ী নর্দ্দমার গাঢ় কাল জল অঞ্জলি ভরে পান করতে লাগল। তার পর এল উপেন—পরিপূর্ণ রূপ-যৌবন নিয়ে। উপেন্দ্র স্বচ্ছ সলিল, অবগাহন করে কিরণময়ী স্নিগ্ধ হ'ল। উপেন্দ্রকে ভালবাসল। সে ভালবাসা বাধা মানে না, সমাজ মানে না, সম্মান মানে না। কিন্তু উপেন্দ্র কিরণময়ীকে প্রশ্রয় দিল না। তখন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি কিরণময়ীর মনে জেগে উঠল। সে নিজেকে অপমান করেও দিবাকরের ভেতর দিয়ে উপেন্দ্রকে শাস্তি দিল—নিজেও কম শাস্তি পেল না।

যুবক—আপনি এত ভেবে চরিত্রহীন লিখেছেন তা ত আমরা ভাবতে পারি নি।

শরৎচন্দ্র—ভেবে দেখ দেকি—কিরণময়ী সব দিক দিয়েই বঞ্চিত। তারপর সে খুব রূপবতী আর বুদ্ধিমতী, রূপ কত বড় একটা মূলধন। মূলধন বেশী থাকলেই মানুষ উন্মনা হয়। তার অবস্থা সব দিক দিয়ে ভেবে দেখ দেখি—ও-রকমটা কি অস্বাভাবিক? সে হারাণ বাবুকে বিয়ে করেছে, অনঙ্গ ডাক্তারকে মজিয়েছে, উপেন্দ্রকে ভালবেসেছে, দিবাকরকে ঠকিয়েছে। শেষ কালে কিরণময়ী নিজের ভুল বুঝতে পারল। দিবাকরের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। সতীশ তাকে নিয়ে এল; পশু মারা গেল। উপেন এখন সাবিত্রীর হাতে। কিরণময়ী আর সইতে পারল না। তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। নারীর ব্যর্থ জীবনের একটা বাস্তব চিত্র—তার জীবনের পূর্ণতা পেল না। সে বিদ্রোহ করল। নিজের সারাটা জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেল। ব্যর্থ জীবনের এই পরিণতি দিয়ে আমি শেষ করিছি। আমার বইতে আমি ত কোথাও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি। শুধু কোথায় সমাজের গোঁড়ামির জন্য ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার রয়েছে—তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া সাহিত্য রসের ভেতর দিয়ে পাঠকের মনে যেমন সুবিমল আনন্দ সৃষ্টি করে তেমনি করতে পারে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য রসের নতুন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে ওঠে।

যুবক—আমরা আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে আপনার ওপর অবিচার করেছি। আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি এত বড়, এত মহৎ!

[একে একে শরৎচন্দ্রের পদধূলি লইয়া সকলের প্রস্থান।

"পড়াশুনা মানুষকে সম্পূর্ণ করে, আলোচনায় মানুষকে দেয় প্রস্তুতি এবং লেখা মানুষকে সঠিক করে।"

—ফ্র্যান্সিস বেকন

ভারতের দর্শন ও সমাজ

(বেদ)

শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য

দেশবিদেশের লোক বলে থাকেন, "ভারতের সবচেয়ে বড় গৌরবের বস্তু দর্শন। দর্শন ভারতের সখের জিনিস নয়—পোষাকী সাজসজ্জাও নয়। দর্শন এদেশের জীবনের চেয়েও বড় যদি কিছু থাকে তাহ'লে তাই। এদেশের মুনিঋষিরা হচ্ছেন প্রকৃত দার্শনিক। তাঁরা জগতের মূল তত্ত্ব প্রথমে জানেন, তার পরে দেখেন এবং সবশেষে সেই তত্ত্বে লীন হয়ে যান। অন্য দেশের দর্শন খানিকটা কল্পনা-বিলাস মাত্র, জীবনের সংগে সে দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। ভারতের লোক দর্শনকে আপনার করে নিয়েছে বলেই এখানকার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ দর্শনের মূল কথাগুলি জানে এবং সেই তত্ত্বের দিকে তাকিয়ে আপনাদের জীবনের গতির বিচার করে। এখানকার সাহিত্যে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে দর্শনের বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। এক কথায় ভারতীয় দর্শন অতি ব্যাপক ভাবে এখানকার সামাজিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে আকাশের স্থান অধিকার করে রয়েছে দর্শন। ভারতের নিরক্ষর চাষীও মায়ার কথা বলে। সে জানে, 'যত জীব তত শিব'। সে বোঝায় সংসারটা পুতুল-খেলা। আবার অদৃষ্ট যে কি, তাও সে জানে। অথচ বিশ্বাস করে 'আত্মা অমর'। আবার থেকে থেকে বলে, 'মানুষের কিছু করবার শক্তি নেই—ভগবান যা করান তাই হয়।' তার আরও বিশ্বাস আছে—ভগবান মানুষ হয়ে জন্মে সংসারের যা-কিছু আবর্জনা তা পরিষ্কার করে দেন। কখন কখন ভক্তির উপর ঝোঁকটা বেশী মাত্রায় দেখা যায়। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' এ প্রায় সর্বজনীন প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সব দর্শনের মতবাদ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ লোক বেদান্তের ও ভক্তিবাদের অনেকগুলি তত্ত্ব মিলিয়ে একটা জীবন-দর্শন গড়ে নিয়েছে। শঙ্কর ও চৈতন্য যতই দূর দিয়ে যান না কেন, জন-দর্শনে এঁরা গৌর নিতাই হয়ে পড়েছেন। 'অহিংসা পরমধর্ম' এই উপদেশটিকে খানিকটা আপোষ করে মানিয়ে নিয়েছে। কোন কোন দেশে মাছ-মাংস না খাওয়া বা মেরে না খাওয়া উক্ত ধর্মের সংসারী মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য সংস্করণ হয়েছে। ক্ষণিকবাদ একটু বয়স বাড়লে ধর্মভীরুর ঘাড়ে চেপে বসে, মৃত্যুভয়ে সে জপ-পূজার মাত্রাটা বাড়াবার চেষ্টা করে। জৈনদের কাছে থেকে নানা কঠোর ব্রত, নানা রকমের উপবাসের ঘটা বেশ জাঁক করে মহিলা-সমাজে দানা বেঁধেছে। পুরাণের প্রচারে তীর্থযাত্রা ও পুণ্যস্নান ভবনদী-পারের সুলভ পাথেয় হয়েছে। উপনিষদ ও দর্শনের দোহাই দিয়ে ভারতের বহু নর-নারী টাকা রোজগারের ক্লেশ এড়িয়ে ও সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যে মুখ ফিরিয়ে সন্ন্যাস নেওয়া ইজ্জতের কাজ মনে করেন। সংসারীর জীবনে পূজা, পার্বণ, দান, ধ্যান, ব্রত, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি ধর্মকার্য্যগুলি জানিয়ে দেয় যে, ভারতের মানুষ পরলোককে ইহলোকের চেয়ে বেশী সত্য মনে করে। এক কথায় গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে শ্মশানকৃত্য পর্য্যন্ত জীবনের প্রতি স্তর ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। মানুষের প্রাণিধর্মের উপর ধর্ম হুকুম চালাতে কসুর করেনি। কার জোরে ধর্মের এত বল? আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট ও কর্মবাদ, ভগবান ও শাস্ত্র—এই কয়েকটি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের কর্মপ্রবাহ। এই জন্যেই ভারতের নর-নারীকে বুঝতে হলে এদের নাড়ীর যোগ কোথায় তা দেখতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে, দর্শন-মেঘের বারিধারায় এখানকার চিত্তভূমি উর্বর হয়ে শস্য-শ্যামল হয়েছে। দর্শনের সংগে এখানকার মানুষের নিবিড় যোগ আছে বলেই দর্শনের কথা আলোচনা করছি।

নবজাতক যেমন ভূমিষ্ঠ হয়েই আলো দেখে, তেমনই কি মানুষ ধরাতলে উদ্ভূত হয়েই দর্শনের আলো দেখেছে? এই ভারতে অনেক আদিম অধিবাসীর গোষ্ঠী আছে, যারা এখনও দর্শনের আবছায়ার দেখাও পায়নি। আর্য্য জাতির লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টির সংগে সংগেই তাঁরা দর্শন পেয়েছেন। এই বিশ্বাসকে যাচাই করে নেবার সময় এসেছে। বিভিন্ন দর্শনের সূত্র-গ্রন্থে যেমন ভাবে মৌলিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়েছে, তেমনটি আমরা আর্য্য জাতির আদি-গ্রন্থে অর্থাৎ বেদে পাইনি। এদেশের অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়ে আর্য্য-সমাজে প্রচারিত হয়েছে এবং উপনিষদে নানা দার্শনিক মতবাদের ইঙ্গিত আছে। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। আমার প্রতিবাদের স্বপক্ষে শুধু বলতে চাই যে, বেদের মন্ত্রগুলিই আমরা একসংগে পাইনি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপর বৈদিক গ্রন্থের কথা তো বহু দূরে। বিভিন্ন বেদ-সংহিতার আমলে আমাদের দেশের দর্শনগুলি দানা বেঁধে ওঠেনি। সব বেদ-সংহিতাগুলি আলোচনা করে দেখলে দেখা যায়, পরবর্ত্তী দর্শনে প্রচলিত কয়েকটি কথা আমরা বেদে দেখতে পাই। আত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান, দিক, কাল, মনঃ, ইন্দ্রিয়, দেহ, অণু, প্রকৃতি, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ, ক্ষিতি প্রভৃতি শব্দ ঐ যুগে অজানা ছিল না। পরিণামবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কোন কোন সূক্তে নূতন সৃষ্টির সংকেতও দেখা যায়। আবার কোন সূক্তে এও বলা হয়েছে যে, এক শক্তির চালনায় সারা জগৎ চলেছে—এ জগতে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা কারও নেই। কোথায় বা বলা হয়েছে, জগতের মূল রহস্যে ঢাকা—আসল তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। জড় ও চেতনের মধ্যে তফাৎ পরে যত উৎকট হয়ে উঠেছে, বেদের যুগে ততটা হয়নি। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ বেশ পাশাপাশি থেকে একই সূক্তে ঘর-কন্না করতে দেখা যায়। কোথাও সারা বিশ্বের একটি অতি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে। আবার কোথাও স্থূল যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে। ঠিক ছাঁচে ফেলার আগে তরল পদার্থ যেমন থাকে—তার নিজস্ব অনমনীয় রূপ থাকে না, তেমনই বৈদিক যুগে ছিল দার্শনিক চিন্তাধারার অবস্থা। নানা কল্পনা তখন বেপরোয়া ভাবে জাল বুনছে। কল্পনার বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজন হয়নি। সত্য জ্ঞানের পথের আলোচনা-বিচারের বস্তু হয়নি। এ যেন দর্শনের স্বপ্ন-রাজ্য—সব কিছুই নির্ব্বিবাদে ঘটতে পারে। যদি আমরা বলি যে, সংহিতাযুগে দর্শন ছিল না

অর্থাৎ বিচারাত্মক দর্শন ছিল না, তাহ'লে খুব একটা অন্যায় বলা হবে না।

এবার আমরা বিচার করে দেখি সংহিতাযুগের মতবাদগুলি নিছক কল্পিত না সাধনা-দৃষ্ট বস্তু। ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন জিনিস যখন দেখি তখন কখনও কখনও দৃষ্টিকোণের ভেদ থাকাতে বিষয়টি আলাদা ভাবে দেখা যায়। যেমন উড়োজাহাজ থেকে একটি বাড়ী যদি দেখি, তাহ'লে তার চেহারা এক রকম। আবার সেই বাড়ীটি যদি সামনের থেকে দেখি, তাহ'লে সেটি আর এক রকম দেখায়। পেছন থেকে দেখলে সেটি আবার অন্য রকম দেখায়। এখানে বাড়ীটির নিজের মধ্যে ভেদ আছে এবং তার সবটা যে-কোন দৃষ্টিকোণ হ'তে দেখা যায় না। কিন্তু সাধনার দ্বারা যখন দেখি তখন সবটাকেই একসংগে দেখি। তা যদি দেখা না যেত তাহ'লে সাধনায় পাওয়া দৃষ্টির কোন দাম থাকত না, কারণ এতে তো আর সবটাকে জানা যায় না। সাধনায় যদি সবটা না জানা যায় তাহ'লে প্রত্যেক সাধনাই বস্তুর আবছায়া জ্ঞান মাত্র এনে দেয়। এক এক সাধনাকে আমরা এক-একটি দৃষ্টিকোণ বলতে পারি না। যার নিজের মধ্যে কোন ভেদ নেই, সেই বস্তুকেও আলাদা আলাদা করে ঋষিরা দেখে থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বলি। আত্মা ও পরমাত্মার নিজের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই আত্মা বা পরমাত্মাকে যাঁরা দেখবেন, তাঁদের দেখায় কোন তফাৎ থাকতে পারে না। কারণ তাঁদের দেখা তো আর সাধারণ দেখা নয়। এ যেন তৃতীয় নেত্র। এর কাছে দিক্‌কালের অতীত বস্তু একেবারেই ধরা পড়ে। কিন্তু কোন কোন ঋষি বলেন যে, আত্মায় ও পরমাত্মায় স্থায়ী ভেদ আছে। কেউ বা বলেন যে, ভেদ নেই। আত্মা যে দেখলেন তার স্বরূপটি কেমন, কেউ তো স্পষ্ট ভাষায় বললেন না। এঁদের না বলার কারণ কি? এঁদের দেখা কি স্পষ্ট নয়? না ভাষার ভাঁড়ার খুব ছোট বলে তারা তাঁদের জ্ঞান ঠিক ভাবে জানাতে পারেননি? ঠিক-ঠিক শব্দ না থাকলেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলাটা তো আর কঠিন নয়। পরের যুগে নিরক্ষর সাধকেরাও তো তাঁদের সাধনার ফল সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। দিব্যদৃষ্টি নিয়ে পরে অনেক বেশী আলোচনা করব। এখন এইটুকু শুধু বলে থেমে যাব যে, সংহিতাযুগে ঋষিরা সাধনার বলে যে বস্তু জেনেছিলেন, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দেবীসূক্তের বাগব্রহ্ম জেনেছেন বলে বলা হয়। কিন্তু তাঁর মনের গতি অতি প্রবল—এ স্থির ও শান্ত হয়নি। বৈদিক যুগের কল্পনা আকাশ থেকে নেমে আসেনি। সমাজের অন্য স্তরের চিন্তার সঙ্গে এ-সকল কল্পনার বেশ যোগ ছিল। সে সময়কার রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেকালের দর্শনচিন্তা হঠাৎ গজায়নি। আর্য্যেরা ভারতের সমতলে অনার্য্যদের প্রতিবেশী হয়ে বাস করেননি। তাঁরা অন্য দেশ থেকে এসেছেন বা আসেননি, তা জোর করে বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে অন্য দেশের পরিচয় বিশেষ কিছুই নেই। অতএব গায়ের জোরেই শুধু বলতে হয় যে, আর্য্যেরা ভিন্ন দেশ থেকে ভারতে এসেছেন। যা হোক, আর্য্যেরা অনার্য্যদের বসবাসভূমি যে জোর করে দখল করেছিলেন, সে বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আর্য্যদের প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান খুব উঁচুতে ছিল। এঁদের বিশ্বাস ইন্দ্রের জোরেই এঁদের জোর—তাঁরই সাহায্যে এঁরা যুদ্ধজয় করেছেন। অনার্য্যদের দেবতারা ইন্দ্রের কাছে নাবালক। জয়ের পরে অনার্য্যদের ইন্দ্রপূজা করতে বলেছেন। যারা ইন্দ্রে অবিশ্বাসী, তাদের বাঁচবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই। বহু অবিশ্বাসী অনার্য্য হত ও পর্বত-গুহায় চিরতরে বন্দী হয়েছে। এই ভাবে ইন্দ্রকে ধর্মজগতে একচ্ছত্র সম্রাটের পদে বসবসার বেশ প্রবল চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। আর্য্যদের একমাত্র দেবতা ইন্দ্র নয়। আর্য্যেরা নানা দলে বিভক্ত। বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। সব দল যে ইন্দ্রের একনায়কত্ব স্বীকার করে নিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং নানা আর্য্য-দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। এর থেকে এই অনুমানই প্রথমে মনে আসে যে, বিভিন্ন দল একমত হয়ে ইন্দ্রকে সবচেয়ে বড় বলে স্বীকার করে নেননি। অথচ আর্য্যদের নিজেদের মধ্যে যদি মন-কষাকষি চলতে থাকে, তাহ'লে অনার্য্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা খুব সহজ-সাধ্য হয় না। আর এক কথা, অনার্য্যেরা যে কেবল হেরেই চলল, তা নয়। সময়ে সময়ে তারা জিতেও ছিল। এর ফলে ইন্দ্রে বিশ্বাসীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়ে পড়লো। অথচ অনার্য্যেরা যদি জয়ী হতে থাকে, তাহ'লে আর্য্যদের ভারতে বাস করা কঠিন। আর্য্যদের অবচেতন মনে দেবতা-সমন্বয়ের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। মানুষের স্বভাবদত্ত প্রতিভা নানামুখী। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিভাবান্ ঋষিরা নানা কল্পনায় ব্যাপৃত হলেন। যাঁদের কল্পনা সফল ও বহুজন-গ্রাহ্য হল, তাঁদের মতবাদগুলি দর্শনের প্রথম ভিত্তি স্থাপনা করল। নানা মতের একটু নমুনা দিচ্ছি। সদ্ বস্তু একটি, তাকে কেউ ইন্দ্র বলেন, কেউ বা অগ্নি বলেন, আবার কেউ বা বায়ু বলেন। কিন্তু অনার্য্য-দেবতারা এই সদ্ বস্তু কি না, এ নিয়ে কোন বিচার আমরা দেখি না। ঐক্যের সন্ধান পাবার পথে তখনকার বিজ্ঞান সাহায্য করল। ভূমির অগ্নি, অন্তরীক্ষের বিদ্যুৎ ও সর্বোচ্চ আকাশের আদিত্য একই জিনিস, কারণ তাদের সকলের একই শক্তি রয়েছে অর্থাৎ দাহিকা শক্তি (পোড়াবার ক্ষমতা)। আগুনে জিনিস পোড়ে চোখে দেখা যায়। বিদ্যুতের আগুনে গাছপালা পোড়ে, তাও দেখা যায়। সে সময়ে কাচ বা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে সূর্য্যকিরণ জড় করে ঘুঁটে পোড়ান আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর ফলে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এক হয়ে যাওয়া আর কঠিন রইল না। এই ভাবে দেবতাদের ঐক্যের পথ প্রস্তুত হল। কেউ বা জগতের সব বস্তুকে এক অদ্ভুত ডিমের অনির্বচনীয় সন্তানের কার্য্য বলে বর্ণনা করেছেন। একটা সাধারণ ডিমকে কেন্দ্র করে ঋষির কল্পনা উচ্চ শিখরে উঠেছে। কারণ ডিমের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিরাট্। এই বিরাট্ সকল দেবতার সমষ্টি। সৎ হল সব দেবতার সূক্ষ্ম যোগসূত্র, বিরাট হল সকলের স্থূল যোগসূত্র।

সূক্ষ্ম যোগসূত্রকে ভাল ভাবে বোঝানো হয়নি। একে ধোঁয়াটে করে রাখা হয়েছিল। তাই সূক্ষ্ম ও স্থূল যোগসূত্রকে মেলাবার প্রয়োজন হল। সৎ হল পুরুষ। এই পুরুষই উপনিষদে ব্রহ্ম নামে পরিচিত। এ পুরুষ থেকে সব কিছুরই সৃষ্টি হয় বটে—এ বিরাটেরও জনক। পুরুষ দেশ ও কালের অতীত—সব জুড়ে থাকেন। বিশাল জগৎ এঁর ক্ষুদ্র অংশের কার্য্য। কিন্তু ডিমের এবং কারণসলিলের ভূমিকা পরিণামবাদের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছিল। কিন্তু পুরুষসূক্তে

পরিণামবাদ আবার ডুবে গেল। পুরুষসূক্ত সমাজের অন্য সমস্যা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করল। সেটা হল, আর্য্য-অনার্য্য মিশিয়ে —একটা জগতের কারণ ঠিক করা। আর্য্যদের রাজ্য ভারতে স্থায়ী হওয়ার পরে অনার্য্যদের সমাজদেহে যখন লীন করে নেওয়া হল অথচ তাদের খুসী করে সমাজের নীচু ধাপে রাখতে হবে, তখন আর্য্য-প্রতিভার দান হল পুরুষসূক্ত। স্থপতি-বিদ্যার যখন খুব উন্নতি হল, বড় শহর রাজারা পত্তন করতে থাকলেন, তখন জগৎকে একটা বিরাট শহররূপে ভাবা বৈদিক ঋষি-কল্পনায় খুবই স্বাভাবিক। তাই আমরা বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টার আবির্ভাব দেখি। এই বিশ্বকর্মাই কালে বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের পদ পেয়েছেন। আর এক কথা, বৈদিক সমাজে ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ভাল-মন্দ কাজের বিচার আরম্ভ হল। রাজশক্তির বিরোধী দলের কাজ মন্দ হতেই হবে। আর রাজার দলের লোকেদের কাজ ভাল না হয়ে যায় না। ধীরে-ধীরে সমাজে ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হল। এক দল লোকের সুবিধা হল। রাজশক্তির সাহায্যে তারা সুখে দিন কাটাতে লাগলো। আর দলের বাইরের লোকেদের নানা দুঃখ-কষ্টে দিন যেতে লাগলো। কখনও দুর্ভিক্ষ, কখনও বা বন্যা ইত্যাদি সমাজকে তচনচ করে বেড়াচ্ছে। সব লোক কাজ পায় না। চুরি-ডাকাতি এখানে-সেখানে ঘটে থাকে। অনার্য্যদের বিদ্রোহ করবার বেশ একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হল। এরূপ রাজশক্তির ভয়াবহ আবহাওয়ায় রাজাদের ও ধনীদের দক্ষিণাপুষ্ট ঋষিরা কল্পনার আলোকে কর্মবাদ আবিষ্কার করলেন। আগের জন্মের মন্দ কাজের ফলে এ জন্মে পাপীরা কষ্ট পাচ্ছে আর ভালো কাজের ফলে জন কয়েক সুখে আছে। পাপের হাত থেকে বাঁচতে গেলে তাদের কর্ত্তব্য কি? বৈদিক যুগে রাত্রি কি ভীষণ! রাস্তায় আলো নেই, পথে বাঘ, চোর, ডাকাত ও সাপের উৎপাত। এই রাত্রির দেবতা বরুণ, রাত্রির আঁধারের প্রতীকারও রয়েছে—তারা, নক্ষত্র ও চাঁদ। রাত্রির আঁধারের সহিত তুলনা করা যায় দারিদ্র্যের এবং জ্যোতির্ময় পদার্থের সংগে তুলনা করা যায় রাজা ও ধনীদের। বরুণ পক্ষপাতশূন্য দেবতা —এটা দেখাতে না পারলে অনার্য্যেরা শান্ত হবে না। সেই জন্যে ঋষি কল্পনার সাহায্যে সব সমস্যার চাবিকাঠি দেখলেন কর্মবাদে। বরুণ হলেন নীতি-জগতের সম্রাট। কর্মানুসারে ফল দেন। পাপীদের শাস্তি দেন ব্যাধি, দারিদ্র্য প্রভৃতির দ্বারা আর পুণ্যবানদের ধন-দৌলৎ ও নানা সুখের ব্যবস্থা করেছেন। কর্মশক্তি সকলের চেয়ে বড় শক্তি। প্রকৃতির সকল শক্তিই এই শক্তির অধীনে কাজ করে। এই শক্তিকে চালান বরুণ। পৃথিবীর রাজার উন্নত ধরণের সংস্করণ দিব্যলোকের রাজা বরুণ। এঁর করুণা ভিক্ষা ছাড়া দুর্গতদের বাঁচবার আর পথ নেই। বিদ্রোহী মন ক্ষিপ্ত হয়ে অনর্থ ঘটাবার আগেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। ঋষিরা দক্ষিণা পূজা পেলো। যে ধনী দক্ষিণা দিতে অস্বীকৃত হল, তার উপর ঋষির নিন্দা রোষ বর্ষিত হল। ধনত্যাগকাতর ধনীও আত্মনাশ হতে বাঁচবার পথ এই দক্ষিণাতেই দেখতে পেলেন। তাই আজও ধনীরা দান-ধ্যান, দেবালয়, ধর্মশালা প্রভৃতি ক'রে অভাব-পীড়িতদের শান্ত রাখতে পেরেছেন। সামাজিক নানা সমস্যার চাপে পড়ে কল্পনার সাহায্যে বহুবিধ সমাধান আর্য্যচিত্ত থেকে নির্গত হল। কিন্তু তখনকার মতবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেগুলি বিনা সামাজিক প্রয়োজনে হঠাৎ সাধনারত আর্য্যচিত্তে ধরা দেয়নি। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে আর্য্যচিত্তে প্রকাশিত হয়েছিল একথা যদি বা না হয় তাহ'লে তা মান্‌তে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কারণ জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য যখন আমরা আত্মহারা হয়ে কোন বিষয় ভাবি তখন কখনও কখনও ঘুমোতে ঘুমোতেও সমাধান মনের সামনে হাজির হয়। কল্পনাশক্তি যে তখন আত্মগোপন করে কাজ করে, তাতে আর কোন সন্দেহ আছে কি?

বৈদিক যুগে অদ্বৈতমতবাদ মাঝে মাঝে দেখা দিলেও কর্মবাদ, বহুদেবতাবাদ লোপ পায়নি। কর্মবাদকে সাব্যস্ত করবার জন্য যমলোক ও পিতৃলোক সৃষ্ট হল। পুণ্যবানদের মৃত্যুর পরে সুখময় বিশ্রামের স্থান কল্পিত হল। পাপীদের সেখানে প্রবেশ বন্ধের জন্য কুকুর-প্রহরী কল্পনায় গড়া হল। বৈদিক কর্ম এ জীবনে ফল দিতে পারছে না। অনার্য্যদের বিরোধিতাও কম নয়। মান বাঁচাতে গেলে পরলোক আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পরলোকের কথা মানতে গেলে স্থায়ী আত্মা না থাকলে চলে না। আবার কর্মের বিচারক চাই। তাঁর আবার সর্বজ্ঞও হওয়া চাই। তাঁর শক্তি হওয়া চাই অসীম। দেহ ও তার কারণগুলির এই শাসকের আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। এ শাসকের আবার যে দেহ আছে তা মানা হয়েছে। অনেক জিনিসের উৎপত্তি করতে গিয়ে আবার অনেক জিনিস এমন মানতে হয়েছে যাদের ওপর বিরোধী দলের বিরূপ সমালোচনা বন্ধ করা কঠিন। যম, পিতৃলোক প্রভৃতি জনসাধারণের জন্য, ভাবুকের জন্য নয়। সূক্ষ্ম চিন্তার স্থূল রূপ এ সকল চিন্তাধারা। পিতৃলোকে কত দিন যে মৃত ব্যক্তি বাস করে, তার নিয়মই বা কি? জন্মান্তর আছে কিনা? যদি থাকে, কি ভাবে হয়, এ সব নিয়ে ভালো আলোচনা বেদে নেই। বেদের যুগে আর্য্য ও অনার্য্যদের মতবাদের যে সংঘর্ষ হয় তার ফলে অন্য ধরণের মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতে আসার প্রথম দিকে আর্য্যেরা ইন্দ্রপূজায় মেতে ওঠেন। তাঁদের জয়ে নদী, বৃষ্টি ও বজ্রপাত বেশ সহায়তা করেছিল। তাঁদের বিশ্বাস যেমন বেড়ে গেল, জনসাধারণের মনেও তাঁদের বিশ্বাসের রেখা গভীর ভাবে পড়েছিল। অপর দিকে অনার্য্যেরা যত হারতে লাগল, ইন্দ্রের ওপর দ্বেষও তত বাড়তে লাগল। এরা ইন্দ্রপূজা লণ্ডভণ্ড করে বেড়াতে লাগলো। এক দিকে ইন্দ্রবাদ অপর দিকে অনিন্দ্রবাদ। অনার্য্যেরা নিজেদের মতবাদ প্রচার বন্ধ করে অনিন্দ্রবাদ স্থাপনে কোমর বাঁধল। শুধু 'নেই' বললেই লোকে শোনে না; তাই আর এক দল প্রচার করতে লাগলো যে, স্বর্গ ও পৃথিবী সব কিছুর বাপ ও মা।—একেবারে জৈব দৃষ্টিতে জগতের কারণকে দেখা। বোধ হয় এই দৃষ্টিরই প্রতীক শিশ্ন দেবতা। এই মত ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে জড়বাদে। অনার্য্যদের না নিয়ে আর্য্যসমাজ চলে না। চাষের লোক চাই—শহর গড়ার লোক চাই, হাতের নানা কাজ করার লোক চাই, রথ করা, ইট গড়া, বাড়ী গাঁথা, কাঠ কাটা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অনার্য্যদের পায়ে ঠেলা চলে না। অথচ তারা বৈদিক দেব-দেবীর উপর, বিশেষতঃ ইন্দ্রের উপর যেরূপ বিরূপ হয়েছে, তাতে নূতন মতবাদ না আনলে তাদের বশ করা কঠিন। যে-সব আর্য্যের অনার্য্যের প্রতি সহানুভূতি ছিল অথচ তাঁরা স্বজাতির স্বার্থকে একেবারে বলি দিতেও পারেন না, সে-সব আর্য্যদের মধ্য থেকে

... দল প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা প্রচার করতে লাগলেন—জগতের মূল তত্ত্ব জানা দুঃসাধ্য। তার স্বরূপটি অনির্বচনীয়। এ রকম বা ও-রকম নয় কোনটাই বলা চলে না। অথচ এটা আছে। এই দুর্জ্ঞেয়বাদ জড়বাদকে হটিয়ে দেওয়ার একটা সুকৌশল মাত্র। কিন্তু এই মতবাদের আর একটা দিক্ আছে। সেটা হচ্ছে যে, বৈদিক দেব-দেবীর জীবন-দীপ জ্বলে উঠলো। এই মতবাদের অধিক প্রচার হলে কর্মবাদ বেঁচে থাকা কঠিন। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদও কেঁপে উঠলো। অথচ আর্য্য জনসাধারণ একে খুশী করে নিতে পারে না, কারণ এ মতটি কুয়াশায় ঘেরা—কারণ কিছু আছে অথচ কি যে বলতে পারি না। অনার্য্য জনসাধারণ কিন্তু এই মতকে বরণ করে নিল। ইন্দ্র-বিদ্বেষে ভাঁটা পড়ল।

সংহিতার যুগের দার্শনিক মতবাদের অধিক আলোচনা আর করতে চাই না। শুধু এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে—ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান না থাকলে সমাজকে দৃঢ় বাঁধনে বাঁধা যায় না। দর্শন এদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। তাই পাপ-পুণ্য, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি সব বৈদিক দর্শনের সাধারণ সম্পত্তি হয়েছে। এই কর্মবাদকে বাতিল করলে আর্য্যসমাজের প্রাধান্য আর থাকে না। সমাজের যা কিছু বৈষম্য তা আইনসঙ্গত দেখাতে হলে কর্মবাদ একমাত্র চরম অস্ত্র। বিজিত অনার্য্যদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বশে রাখতে হলে কর্মবাদের মত আর কিছুই নেই। সার্কাসের বাঘ, সিংহ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুকে যেমন নিয়মিত আফিং খেতে দিয়ে বশ করা হয়ে থাকে, তেমনই কর্মবাদ অনার্য্যকে শিখিয়েছে আপনার অতীত জীবনকে ধিক্কার দিতে এবং বর্ত্তমান জীবনে আর্য্যদের অনুগত দাস হতে। 'দস্যু' কর্মমন্ত্রের প্রভাবে 'দাসে' পরিণত হয়েছে। আর্য্যেরা তাদের শ্রমের উচিত মূল্য না দিয়ে শুধু কর্ম দেখিয়ে সামাজিক প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছেন। তাই কর্মবাদকে বড়াও করে দেখান এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সংগে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করে দেওয়া আর্য্যসমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা। এই চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে কর্মকাণ্ডের দর্শন দেখা যায় ব্রাহ্মণগুলিতে। ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে কেমন করে করতে হয় তা দেখান হলো ব্রাহ্মণভাগে। নানা রকম যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এ সবগুলি অনুষ্ঠান করতে হলে যত খুঁটিনাটি বিষয়ের দরকার হয় তাও সব বলা হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক আলোচনাতেই ব্রাহ্মণের কাজ শেষ হয়নি। ক্রিয়াগুলি কি ফল দেয়—কেমন করে দেয়—কাকে দেয় এবং কে এই ফলগুলি দেন—তারও ভাল ভাবে আলোচনা আছে। সংহিতায় প্রজাপতি শুধু দেখা দিয়েছেন। তিনি তখন শিক্ষানবিশ। প্রজাপতি পাকা কাজের লোক হয়েছেন ব্রাহ্মণভাগে। ইনি, চেতন ও অচেতন চালক ও সংযোজক। যজমানকে স্বর্গে পাঠান ও মৃত্যুর পরে আবার নূতন দেহের সংগে আত্মার মিলন ঘটান ইত্যাদি প্রজাপতির কাজ। সে সময়ে এ ধারণা বদ্ধমূল করান হল যে, বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া পুণ্যজনক আর কিছুই নেই। বৈদিক ক্রিয়ার সংগে দেবতাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে গিয়ে দেবতাদের চিন্তা করার কথা এসে পড়লো। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগগুলিতে কর্মকাণ্ডের নিজস্ব দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

কন্দলী

(কাব্যে উপেক্ষিতা দুর্ব্বাসা-পত্নী)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

ছিলে নাকো তুমি মাতার দুহিতা, আত্মসম্ভূতা পিতার কন্যা,
অধরে তোমার ধরেনি স্তন্য কোন দিন কোন পীযূষ-তৃষ্ণা ;
ঊর্ব ঋষির কুটিরাঙ্গনে সঙ্গিনী তব কে ছিল বাল্যে ?
বসি' তপোবনে কিশোর-স্বপনে কোন্ বনফুল গাঁথিতে মাল্যে ?
কে দিল তোমারে "কন্দলা" নাম কোঁদল-নিপুণা এই কদর্থে ?
তাপসাশ্রম—তাও কি ছিল না কলহ-মুক্ত মলিন মর্ত্ত্যে ?
ক্রোধ রিপু যার হয়নি বিজিত, ক্ষমাগুণ যার অনভ্যস্ত—
কেন তব পিতা হেন জামাতার হস্তে তোমারে করিল ন্যস্ত ?

জানি, এ-বিবাহে পিতৃহৃদয় ছিল শঙ্কিত তোমার জন্য ;
শত অপরাধ ক্ষমা পাবে শুনে ভেবেছিল তাই নিজেরে ধন্য।
কোপন ঋষির তরুণী ঘরণী, পশিলে যেদিন পতির কক্ষে
আদর-সোহাগ-অনুরাগ-আশা গোপনে লুকায়ে নিভৃত বক্ষে
দুর্ব্বাসা কি গো দিয়াছিল আশা, রাখিতে তোমারে বিনিঃশঙ্ক ?
অথবা গণনা করিত সে বসি' এক দুই করি' "শতে"র অঙ্ক ?
শতাধিক যেই হ'ল ছলছুতা নিদারুণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা
ভস্ম করিয়া ভার্য্যারে ঋষি ভাবিল নিজেরে কৃতিৎকর্ম্মা।

সেদিনের সেই তরুণী ভস্ম বিষ্ণুর কৃপা-কণিকা-স্পর্শে
তরুরূপ ধরি' জাগিল বিশ্বে নূতন জীবনে নবীন হর্ষে—
কন্দলী হ'ল কদলী বৃক্ষ ; স্রষ্টা হেরিল শোভন দৃশ্য ;
পত্রে তাহার পাইল আহার দুর্ব্বাসা-সহ অযুত শিষ্য।
সহধর্ম্মিণী হওনি ভাগ্যে, পুড়িয়া গড়েছ আপন ধর্ম্ম—
জগৎ-সেবায় সঁপি আপনায় তুলেছ বিকশি' নারীর মর্ম্ম ;
ঐ তনুরুচি, ফল ফুল পাতা সকলি করেছো প্রাণীর ভোগ্য
থোড়-কুচি করি' প্রাণ কেটে কেটে সাধিয়া চলেছো জীবনযজ্ঞ।

মৃতপতি-সহ বেহুলা সতীরে—বুঝিয়া পতির জীবন-ভিক্ষু—
ভেলারূপে নিজ বক্ষে ধরিয়া পাথারে ভেসেছো, চির-তিতিক্ষু।
প্রসারি রেখেছো কল্যাণ-কর গৃহ-প্রাঙ্গণে তোরণে স্তম্ভে
লোকালয়ে যত মঙ্গলব্রতে, অন্নপ্রাশনে বিবাহারম্ভে।
শারদোৎসবে নবপত্রিকা, চিরকল্যাণি ! স্বয়ংসিদ্ধা !
চলেছো বিতরি' জীবনাদর্শে নারীর এ ভবে পরমা বিদ্যা।
দুর্ব্বাসা যদি কবি-দৃষ্টিতে শাসনদণ্ড বিধাতাস্পৃষ্ট
তুমি আমাদের সেবার প্রতীক, প্রীতির আসনে সুনীতিনিষ্ঠ।

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)
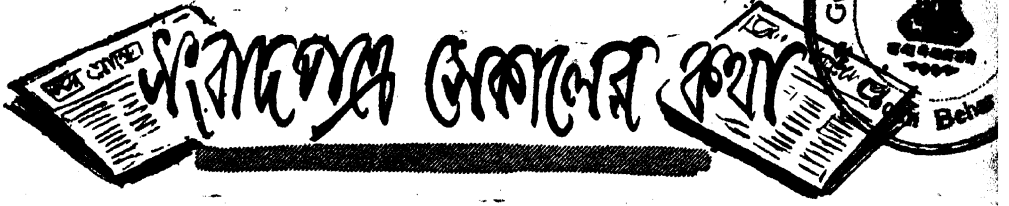
[হিকির বেঙ্গল গেজেটে কলকাতায় আগুনের খবর ঘন ঘন পাওয়া যায়। আজ কলকাতা প্রাসাদপুরী হলেও প্রথম যুগে খড়ের বাড়ীতে ছিল নাগরিকদের আস্তানা। দু'-একটি পাকা বাড়ী ছিল উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। পাশাপাশি খড়ের বাড়ীর যে কোন একটিতে আগুন লাগলে এক-একটি পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সংবাদে প্রায়ই দেখা যায় যে আগুন যেমন অনেক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ লেগেছে তেমনি কখনো কখনো দুষ্ট লোকও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ সম্বন্ধে ১৮৩১ সালে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তার অনেকগুলি বর্তমানেও ভেবে দেখা উচিত। জগৎ শেঠ সাধারণতঃ অর্থগৃধ্নুরূপেই বিদেশীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু ঢাকা থেকে এক জন ইংরেজ মুগ্ধচিত্তে জানাচ্ছেন যে, জগৎ শেঠ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিন লক্ষ টাকার দাবী ত্যাগ করেছেন।

১৬৬ বৎসর পূর্বে কোন্ কোন্ পর্বে আফিস ছুটি থাকত তার তালিকা থেকে সামাজিক দেব-দেবীদের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দুর্গোৎসব ও দোলোৎসব তখন সমান মর্য্যাদা লাভ করত। উভয় উপলক্ষেই পাঁচ দিন করে আপিস ছুটি। আবার দেখা যাচ্ছে যে দূর্বাষ্টমী, উত্থানৈকাদশী, তিলোয়া সংক্রান্তি ইত্যাদি পর্বে আপিস আবশ্যিকরূপে বন্ধ থাকলেও আজ এদের নাম পর্যন্ত অনেকের জানা নেই। আর্থিক দুর্দশার জন্যই হয়তো এখন ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীপূজার সমাদর; আপিস ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি এই উপলক্ষে দু'দিন ছুটি থাকে। কিন্তু সে যুগে লক্ষ্মীপূজাকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হতো না। লক্ষ্মীপূজার দিনে আপিসে অনুপস্থিত হবার জন্য আগে থাকতে দরখাস্ত করে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আজকাল বাঙলা দেশে পূজা হয় প্রধানতঃ স্ত্রী-দেবতার। পূর্বে গণেশ পূজা হতো বছরে দু'বার; এখন দেবীদের আধিপত্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে গণেশ ঠাকুর এবং অন্যান্য দেবতারা বাঙলা দেশ থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছুটির তালিকায় তারিখের গোলমাল আছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তির যথাযথ অনুবাদ দেওয়া হলো, সংশোধন করা হয়নি। Byunt পূজা কি কোনো পাঠক জানালে বাধিত হবো।

কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে চোরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো এই খবর অনেককেই বিস্মিত করবে। নৌকা ভাড়ার হার থেকে দেড়শ' বছর পূর্বের বাঙালী মজুরদের আর্থিক অবস্থা বোঝা যাবে।]

কলকাতায় আগুন

কয়েক দিন পূর্বে খড়ের ঘরে আগুন দিতে উদ্যত এক বাঙালী হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার তাকে গাড়ীর পেছনে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে কলকাতার রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। যে মারাত্মক অপরাধ করতে সে উদ্যত হয়েছিল সেই তুলনায় শাস্তি মৃদু হয়েছে বলতে হবে।

—হিকির বেঙ্গল গেজেট, ১১ই মার্চ, ১৭৮০।

সংবাদে প্রকাশ যে, সাম্প্রতিক আগুনের ফলে কলকাতায় পনেরো হাজারের অধিক গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে। দরিদ্র বাঙালীরা যে ভীষণ দুর্দশায় পড়েছে তা বর্ণনাতীত। বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে কিংবা ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রায় ১১০ জন লোক মারা গেছে। একটি বাড়ীতেই ষোল ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। আর এক বাড়ীতে দুটি স্ত্রীলোক ও একটি শিশুকে বাঁচাবার জন্য পাঁচ ব্যক্তি একে একে আগুনের বেড়াজালে প্রবেশ করে আর ফিরে আসতে পারেনি। প্রাচীন অধিবাসীরা বলেন যে, কলকাতায় এটাই সবচেয়ে বড় আগুন।

—হিকির বেঙ্গল গেজেট, ২৫শে মার্চ, ১৭৮০।

গত ২১শে এপ্রিল শুক্রবার বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় শোভাবাজার অঞ্চলে দেশীয় বারাঙ্গনাদের পল্লীতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয়। প্রসিদ্ধ নটী শান্তির মা সাংঘাতিকরূপে পুড়ে গেছে, তার বাঁচবার আশা নেই। সৌভাগ্যক্রমে আগুন লাগবার সময় আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য কয়েক জন ইংরেজ নাবিক সেখানে গিয়েছিল। তারা মেয়েদের পাঁজা কোলে করে ঘরের বাইরে এনেই ক্ষান্ত হলো না; আবার জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করে টাকা-কড়ি এবং পোষাকপূর্ণ কাঠের সিন্দুকগুলিও বাইরে নিয়ে এল। বারাঙ্গনারা কৃতজ্ঞ হয়ে প্রতিশ্রুতি দিল যে নতুন বাড়ী উঠলে তারা নাবিকদের নৃত্য ও সঙ্গীত দিয়ে, একদিন নৈশ ভোজের আয়োজন ক'রে এবং এক রাত্রির আতিথ্য দিয়ে নাবিকদের আপ্যায়িত করবে।

—হিকির বেঙ্গল গেজেট, ২২শে এপ্রিল, ১৭৮০।

পুলিশ বিভাগের সংস্কার

বাঙলা প্রেসিডেন্সির পুলিশের অযোগ্যতার কথা শুনে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গও চিন্তিত হয়েছেন। ১৮৩৩ সালের ২০শে জানুয়ারীর ডেস্‌প্যাচে তাঁরা এই অযোগ্যতার কারণ নির্ণয় করবার জন্য নির্দেশ

দি[illegible]ছেন। অযোগ্যতা এতই মারাত্মক হয়ে উঠেছে যে টাকার কথা [illegible]বে আশু সংস্কারের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন সিভিল সার্ভিসের সাত জন সদস্য। অনুসন্ধান সমাপ্ত করে কমিটি তাঁদের রিপোর্ট বাংলা সরকারের হাতে দিয়েছেন।

নিম্নবঙ্গে পুলিশের অবস্থা বৃটিশ শাসনকে কলঙ্কিত করেছে। কিন্তু পুলিশের এই শোচনীয় অবনতি একদিনে হয়নি! সম্ভবতঃ সংবাদপত্রে বর্তমানে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় সকলের দৃষ্টি পুলিশের কার্য্যাবলীর উপর পড়েছে। তা ছাড়া অপরাধের বিচার-পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকার জন্যও অপরাধীরা অবাধে চুরি-ডাকাতি করবার সুযোগ পায় এবং পুলিশের দুর্নাম হয়। বাঙলার ৩১টি জেলায় চৌকিদার নিয়ে মোট পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা এক লক্ষ আটাত্তর হাজারের অধিক। এদের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ৬৬ লক্ষ টাকারও বেশি। অন্য কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে গ্রাম্য চৌকিদারদের আটক করে রাখলেই হয়তো চুরি-ডাকাতি অনেক কমে যাবে বলে কমিটির ধারণা। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এফ, সি, স্মিথ কমিটির নিকট বলেছেন যে, এমন দারোগা চাকুরী করছে যাদের পা থেকে লোহার দাগ মিলিয়ে যায়নি। এমন একটা জেলা আছে যেখানকার সব দারোগাই জেল খেটেছে।

কমিটির অভিমত এই যে, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবই পুলিশের অযোগ্যতার মূল কারণ। ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর নানা কাজের এত চাপ যে পুলিশের তত্ত্বাবধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দারোগারা দুর্নীতিপরায়ণ; গ্রামের চৌকিদাররা দরিদ্র ও চরিত্রহীন,—তাদের দিয়ে কোন কাজই আশা করা যায় না। পুলিশ বিভাগের অযোগ্যতার প্রধান কারণগুলি কমিটির মতে এই—(১) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশেরও কর্তা। ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কালেক্টারের পদ। গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে খাজনা আদায়টা বেশি প্রয়োজনীয়। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট সে কাজে ব্যাপৃত থাকেন এবং শাসনের ভার থাকে প্রকৃতপক্ষে তাঁর সহকারীর উপর। খাজনা আদায়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, অন্য ব্যাপারে থাকে অবহেলা। (২) দ্বিতীয় কারণ হলো ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্রমাগত বদলী করা। জেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ না পেলে ভালো করে কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জেলাকে চিনতে পারার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী হয়ে যায়। স্থায়ী ভাবে থেকে যায় লোভী কর্মচারীরা; জেলার শাসন তাদের দিয়েই চলে। (৩) জেলাগুলির বৃহৎ আকারও অসুবিধার সৃষ্টি করে। সদর থেকে জেলার সীমান্ত অঞ্চল অনেক দূর, যাতায়াতে কয়েক দিনের সময় লাগে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সমগ্র জেলা তদারক করা সম্ভব নয়। কমিটি মনে করেন যে, জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং কয়েক জন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করে সমগ্র অঞ্চলের দায়িত্ব তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। বাঙলা দেশে এ রকম ৭১টি আঞ্চলিক অাপিসের ভার থাকবে ৭১ জন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর। এদের পাঁচ জনের ৬০০৲ টাকা, দশ জনের ৪০০৲ টাকা, এবং চৌষট্টি জনের ৩০০৲ টাকা করে মাসিক বেতন হবে। সবশুদ্ধ এই আপিসগুলির জন্য বার্ষিক ব্যয় হবে ৩,৮৯,৭৮৮৲ টাকা। সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের অপরাধীর সাজা দেবার এবং থানার উপর খবরদারী করবার ক্ষমতা থাকবে। জনসাধারণের মধ্যে বাস করে তাঁরা আশ্বাস দেবেন যে, পুলিশ আছে তাদের সেবার জন্যই। প্রথমে কয়েকটি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হবে। ক্রমশঃ সব জেলাতেই এর প্রসার করা যেতে পারে। (৪) আর একটি বড় কারণ হলো, থানাদারদের মধ্যে দুর্নীতি ও তাদের অযোগ্যতা। এই দুটি কারণে জনসাধারণ পুলিশের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়েছে। তাদের মধ্যে ধারণা এই যে, পুলিশের হাতে লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হবার চেয়ে চোরের হাতে যথাসর্বস্ব খোয়ানো বরং ভালো। পুলিশের মধ্যে দুর্নীতির জন্য গভর্ণমেণ্টেরও দায়িত্ব আছে। এদের মাইনে বড়ো কম। কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ঠিকই বলেছেন যে, ভদ্র ভাবে বাঁচতে গেলে সরকারের দেয় বেতনের অতিরিক্ত যে টাকাটা প্রয়োজন তা এরা অসদুপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করে। মাইনে তিন গুণ করে দিলেই পুলিশের লোক সাধু হয়ে যাবে এমন কথা বলা চলে না; কিন্তু বলা যায় যে, অসাধু হবার কারণটা দূর হবে; সুতরাং সহজ হবে সৎ পথে চলবার জন্য চেষ্টা করা। কম বেতন ছাড়া আর একটা বড় ত্রুটি এই যে, দারোগাদের চাকুরীর কোনো স্থায়িত্ব নেই। অনেক সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের খেয়ালের বশে তারা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে যায়; মিথ্যা অভিযোগ নথীভুক্ত হয় তাদের নামে। উপরওয়ালার কাছ থেকে প্রায়ই অভদ্র ব্যবহার পেতে হয় এবং দিতে হয় প্রচুর জরিমানা। তাই ভালো লোক দারোগার চাকুরীর জন্য পাওয়া যায় না। দারোগারা ভাবে, যে ক'দিন চাকুরী আছে তারই মধ্যে যে কোনো উপায়ে কিছু উপার্জন করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

সুতরাং কমিটি স্থির করেছেন যে, দারোগাদের যথাযোগ্য প্রমাণ ছাড়া যাতে বরখাস্ত করা না হয় এবং তাদের সঙ্গে যেন অভদ্র ব্যবহার করা না হয় তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কমিটি এদের বেতন-বৃদ্ধির সুপারিশও করেছেন। মোট ৪৪৪ জন দারোগার মধ্যে ৫০ জনের হবে ১০০৲ টাকা, ১০০ জনের ৭৫৲ টাকা এবং বাকী সকলের হবে ৫০৲ টাকা করে বেতন।

আর এক সমস্যা হলো পুলিশের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ। এক দল খাস সরকারের কর্মচারী। এদের মধ্যে আছে ৪৪৪ জন দারোগা, ৪৭৩ জন মোহরার, ৫৮০ জন জমাদার এবং বরকন্দাজ ৬,৬৯৯ জন। মোট ৮,১৯৬ জন পুলিশ কর্মচারীর জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় ছ'লক্ষ তেইশ হাজার টাকা। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার এবং তাদের পেছনে বার্ষিক ব্যয় ষাট লক্ষ টাকা। এই টাকাটা সরাসরি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আসত না,—পাওয়া যেত জনসাধারণের কাছ থেকে চৌকিদারী ট্যাক্স হিসেবে। প্রথম শ্রেণীর পুলিশ সরাসরি সরকারের অধীন; দ্বিতীয় শ্রেণী নামে মাত্র দারোগার অধীন থাকে। পুলিশের এই বিরাট সংখ্যা বৃটিশ-ভারতের স্থায়ী সৈন্য-সংখ্যার সমান। বাঙলার একত্রিশটি জেলার লোক সরকারকে যে কর দেয় তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হয়ে যায় এদের পেছনে।

গ্রামের চৌকিদারদের নিয়ে আসল সমস্যা। এখন জমিদার চৌকিদার নিয়োগ করে, জনসাধারণ বেতন দেয়, দারোগা করে নিয়ন্ত্রণ। চৌকিদার দিনে জমিদারের খাজনা আদায় করে,

রাত্রিতে পাহারা দেয়। চৌকিদারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে দাগী আসামীদের ; বখরা পায় চুরি-ডাকাতির। অনেক সময় তারা চুরি-ডাকাতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সরকারের নিজস্ব পুলিশের সংখ্যা মাত্র আট হাজার, অথচ জমিদারদের হাতে আছে এক লক্ষ সত্তর হাজার চৌকিদার। সুতরাং এদের নিয়ন্ত্রণ করাই হলো প্রধান সমস্যা।

চৌকিদার নিযুক্ত করা হয় প্রধানত: হাড়ী, বাগদী, বাউরী, দোসাদ, ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী থেকে। সমাজে তারা অস্পৃশ্য ; উপরওয়ালার কাছ থেকে পায় খারাপ ব্যবহার। সৎপথে এদের মাসিক আয় এক টাকা কিংবা দু'টাকা। সুতরাং বাধ্য হয়েই চোরাই মালে ভাগ বসাতে হয়। এই বেতন এবং উপরওয়ালাদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য ভালো লোক পাওয়া যায় না। কমিটিতে চৌকিদারদের নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষের মত এই যে, এদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জমিদারের উপর দেওয়া হোক্। কেউ বললেন, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎরা চৌকিদারদের কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু সকল শ্রেণীর পুলিশ একই নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকা বাঞ্ছনীয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে জনসাধারণের অসহযোগিতার জন্ম তাদের অযোগ্যতা এসেছে। কিন্তু উল্টোটাও কি সত্য নয়? অযোগ্যতার জন্য অসহযোগিতা? আজ পুলিশ জনসাধারণের যেরূপ শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই পরিমাণ যদি বন্ধু হতে পারত, আজ পুলিশ সৎলোকের মনে যে ভীতির সঞ্চার করে সে ভয় যদি দুষ্ট লোকের মনে জাগত, তাহ'লে সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তরের প্রত্যেকেই পুলিশের সহযোগিতা করতে দ্বিধা করত না। সুতরাং কমিটি মনে করেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করে পুলিশের অযোগ্যতা দূর করবার চেষ্টা হবে ভ্রান্ত পথ। আজ পুলিশ দেশের লোকের পক্ষে যেরূপ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তারা ততটা আশীর্বাদে পরিণত হবে তখন জনসাধারণ স্বতস্ফূর্ত ভাবে পুলিশের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, জানুয়ারী, ১৮৩১।

জগৎ শেঠের মহত্ব

এ দেশের হিন্দুদের সম্বন্ধে আমাদের যে খারাপ ধারণা আছে একটি ঘটনা তা অনেকটা দূর করবে। মহম্মদ রেজা খাঁ মৃত্যুশয্যায় ; জগৎ শেঠ একদিন তাঁর কাছে থেকে যে দয়া ও আশ্রয় পেয়েছিলেন তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রেজা খাঁর তিন লক্ষ টাকার ঋণপত্র মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিঁড়ে ফেললেন।

ইংলণ্ডের কুসীদজীবীদের মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত কয়টি দেখা যাবে?—(একটি পত্রাংশ)।

—ক্যালকাটা গেজেট, ১০ই জুলাই, ১৭৮৮।

কলিকাতায় লটারী

কলকাতা নগরীর উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে মোটা টাকা ঋণ করা হয়েছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলকাতায় যে সরকারী-লটারী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার লভ্যাংশ দিয়ে এই ঋণ শোধ করা হয়েছে। বর্তমানে ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হয়ে যাওয়ায় সংবাদপত্রে লটারী চালিয়ে যাবার ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। টাকার দাবী ত্যাগ করে গভর্ণমেণ্ট এই লটারী যে-কোনো সময়ে বন্ধ করে দিতে পারতেন। এখন নানা কারণে এই বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছে। লটারীর সঙ্গে শুধু টাকার প্রশ্ন জড়িত নেই, নীতির প্রশ্নও জড়িত। কলকাতার সরকারী-লটারী যে অবাঞ্ছনীয় তা বর্তমান সভ্য যুগে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। গভর্ণমেণ্ট-লটারী ছোট ছোট লটারী অনুষ্ঠিত হতে প্ররোচনা দেয়। এই সব লটারীর টিকিটের দাম শস্তা, তাই একান্ত নিঃস্ব না হলে সকলেই কিনতে পারে। এই লটারীগুলি সমাজের সকল স্তরে জুয়া খেলার প্রবৃত্তি বিস্তার করছে। সরকার যখন পুলিশী শাসনের সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছেন তখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতায় অপরাধের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, অপরাধের একটি বৃহৎ অংশ জুয়াড়ী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত এবং গভর্ণমেণ্ট-লটারী এই মনোবৃত্তিকে উৎসাহ দেয়। নাগরিকদের নীতিভ্রষ্ট করা অপেক্ষা কলকাতার বাহ্যিক উন্নতি বন্ধ হওয়া সহস্র গুণে ভালো। লটারীর সাহায্যে সজ্জিত নগরী মানবের সদ্‌গুণরাশির সমাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৩১।

১১৯৪ বঙ্গাব্দে সরকারী দপ্তরে ছুটি

নিম্নলিখিত হিন্দু পর্ব উপলক্ষে কর্মচারীদের দপ্তরের কার্যে যোগদান করতে হবে না। ১১৯৪ সালে কোন্ তারিখে কোন্ পর্ব পড়েছে এবং সেই পর্বে আপিস ক'দিন ছুটি থাকবে তার তালিকা দেওয়া হলো :

পর্বের নাম	তারিখ	মোট ছুটি
রথ যাত্রা	৫ই আষাঢ়	১ দিন
উল্টা রথ	১৩ই আষাঢ়	১ দিন
রাখী পূর্ণিমা	১৪ই ভাদ্র	১ দিন
জন্মাষ্টমী	২২শে ও ২৩শে ভাদ্র	২ দিন
দূর্বাষ্টমী ব্রত	৫ ও ৬ই আশ্বিন	২ দিন
মহালয়া	৭ই আশ্বিন (?)	১ দিন
দুর্গাপূজা	৩রা থেকে ৭ই কার্তিক	৫ দিন
কালীপূজা	২৬, ২৭, ২৮শে কার্তিক	৩ দিন
উত্থানৈকাদশীর উপবাস	৮ই অগ্রহায়ণ	১ দিন
তিলোয়া সংক্রান্তি	১লা পৌষ	১ দিন
বসন্ত পঞ্চমী	৩রা ফাল্গুন	১ দিন
শিবরাত্রি	২৬শে ও ২৭শে ফাল্গুন	২ দিন
বারুণী	৫ই চৈত্র	১ দিন
হোলি	১০—১৪ই চৈত্র	৫ দিন
চড়ক পুজা	চৈত্র সংক্রান্তি	১ দিন
রাম নবমী	১৪ই বৈশাখ, ১১৯৫	১ দিন
		মোট—২৯ দিন

নিম্নলিখিত পর্বগুলিও ছুটির দিন বলে গণ্য হবে ; কিন্তু যে সব কর্মচারী এই উপলক্ষে কাজে যোগদান করবে না তাদের অনুপস্থিতির জন্য আবেদন করতে হবে :

পর্বের নাম	তারিখ	মোট ছুটি
অক্ষয় তৃতীয়া	১০ই বৈশাখ	১ দিন
নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত	২১শে ও ২২শে বৈশাখ	২ দিন
দশহরা ও একাদশী	১৫ ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ	২ দিন
স্নানযাত্রা	২০শে জ্যৈষ্ঠ	১ দিন
শয়নৈকাদশী	১২ই আষাঢ়	১ দিন
শক্রোত্থান (পার্শ্বৈকাদশী)	৯ই ও ১০ই ভাদ্র	২ দিন
অরন্ধন	ভাদ্র সংক্রান্তি	১ দিন
গণেশ পূজা	১লা আশ্বিন	১ দিন
অনন্ত ব্রত	১২ই আশ্বিন	১ দিন
বুধ নবমী (?) (Boodh Noimmy)	২১শে আশ্বিন	১ দিন
নবরাত্রি	২৮শে আশ্বিন	১ দিন
লক্ষ্মীপূজা	১২ই কার্তিক	১ দিন
যম তর্পণ	২৫শে কার্তিক	১ দিন
কার্তিক পূজা	কার্তিক সংক্রান্তি	১ দিন
দুর্গানবমী	২রা অগ্রহায়ণ	১ দিন
রাসযাত্রা	১২ই ও ১৩ই অগ্রহায়ণ	২ দিন
নবান্ন	অগ্রহায়ণ মাসের যেদিন সুবিধা হবে	১ দিন
গণেশ পূজা	২রা ফাল্গুন	১ দিন
রটন্তী পূজা	২৬শে ফাল্গুন	১ দিন
মৌনী সপ্তমী ও ভীষ্মাষ্টমী	২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন	২ দিন
Byunt Poojeh (?)	৯—১৩ই বৈশাখ	৫ দিন
		৩০ দিন

সবশুদ্ধ হিন্দু পর্বে ছুটি ৫১ দিন।

নিম্নলিখিত পর্ব উপলক্ষে মুসলমান কর্মচারীরা ছুটি পাবে :

পর্বের নাম	মোট ছুটি
ইদলফেতর	১ দিন
ইদুজ্জোহা	১ দিন
সাব-ই-বরাৎ	২ দিন
মহরম	৫ দিন
বড়ে ওয়াফৎ	১ দিন
তাইরে তায়েজি	১ দিন
আখেরি চাহার শোম্বা	৮ দিন
নও রোজ	১ দিন
	মোট ২০ দিন

—ক্যালকাটা গেজেট, ৩রা মে, ১৭১৮।

চোরের প্রাণদণ্ড

জানবাজার অঞ্চলে এক বাড়ীতে চুরি করবার অপরাধে গোরাচাঁদ চণ্ডাল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। গত শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় যে বাড়ীতে চুরি হয়েছিল সে বাড়ীর সম্মুখে গোরাচাঁদের প্রাণদণ্ড জল্লাদ কার্যকরী করেছে। প্রাণদণ্ড দেখবার জন্য এক বিরাট জনতা সমবেত হয়েছিল। হতভাগ্য আসামী শান্ত ও সংযত ভাবে শাস্তি গ্রহণ করেছে।

—ক্যালকাটা গেজেট, ২রা জুলাই, ১৮০৭।

নৌকা ভাড়া

পুলিশ আপিস নিম্নলিখিত হারে সকল শ্রেণীর নৌকা ইত্যাদি ভাড়ার ব্যবস্থা করবে। এই ভাড়া ১৭৮১ সালের ১০ই মার্চ অনুমোদন লাভ করেছে। পুলিশ আপিস নৌকার মাঝিদের আচরণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে :

৮	দাঁড়ী	বজরার	দৈনিক	ভাড়া	২৲ টাকা
১০	”	”	”	”	২৷০ ”
১২	”	”	”	”	৩৷০ ”
১৪	”	”	”	”	৫৲ ”
১৬	”	”	”	”	৬৲ ”
১৮	”	”	”	”	৬৷০ ”
২০	”	”	”	”	৭৲ ”
২২	”	”	”	”	৭৷৷০ ”
২৪	”	”	”	”	৮৲ ”
২৫০	মণ	নৌকার	মাসিক	ভাড়া	২১৲ ”
৩০০	” ৭ দাঁড়ী নৌকার		”	”	৩৪৲ ”
৪০০	” ৮ ” ”		”	”	৪০৲ ”
৫০০	” ১০ ” ”		”	”	৫০৷০ ”

কলকাতা থেকে [?] জলপথে—

বহরমপুর	যেতে	লাগে	২০	দিন
মুর্শিদাবাদ	”	”	২৫	”
রাজমহল	”	”	৩৭ ½	”
মুঙ্গের	”	”	৪৫	”
পাটনা	”	”	৬০	”
বাণারস	”	”	৭৫	”
কানপুর	”	”	৯০	”
ফয়জাবাদ	”	”	১০৫	”
মালদা	”	”	৩৭ ½	”
রংপুর	”	”	৫২ ½	”
ঢাকা	”	”	৩৭ ½	”
লক্ষ্মীপুর	”	”	৪৫	”
চট্টগ্রাম	”	”	৬০	”
গোয়ালপাড়া	”	”	৭৫	”

—ক্যালকাটা গেজেট, ২১শে এপ্রিল, ১৭৮৫।

"তোমাদের সকল শক্তি তোমাদের একতায়
তোমাদের সকল বিপদ তোমাদের বিচ্ছেদে।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পশ্চিম মুখে

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

জুন মাসের গুমট এল।

স্বামীজির পথের বাধা-গুলো বেড়েছে বই এক তিল কমেনি। তা ছাড়া ইদানীং তাঁর মাথায় একটা ধারণা ঢুকেছে যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। বরাবরই বলতেন, 'আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।' তার উপর অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা। মঠের ভাণ্ডার একেবারে খালি। সঞ্চয় যা ছিল, গত প্লেগের হাঙ্গামা তা সব গিলেছে। সন্ন্যাসীরা অনেকেই ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। দু'জন গুজরাট থেকে হাজার টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। এখন একমাত্র পথ, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ভারতের জন্য কাজ করা।

ছ'মাস আগে মিস্ ম্যাকলয়েড আর মিসেস্ বুল এদেশ ছেড়েছেন। তাঁদের উপরোধ, স্বামীজি যত শীগ্‌গির পারেন তাঁদের কাছে চলে আসুন।

মঠের অবস্থা সত্যিই নৈরাশ্যজনক' পুরানো সাধুরা দারিদ্র্যের কঠোরতা সইতে প্রস্তুত, কিন্তু তিতিক্ষায় যাদের চরিত্র এখনও পোক্ত হয়ে ওঠেনি সেই সব নবাগতের কি হবে? স্বামীজি অল্পবয়সীদের আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কেবল ইতিমধ্যেই কাজের ভার দিয়ে যাদের যাচাই হয়ে গেছে তাদের রাখলেন।

মার্চ মাসেই নিবেদিতাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'আমাদের আর টাকা নাই, টাকা পাবার আশাও নাই। সব ভেঙে পড়বার আগেই আমাদের সংস্রব ত্যাগ কর।' নিবেদিতা রাজী হননি। স্কুলের অবস্থা ক্রমেই ভালর দিকে, মনে-মনে বুঝতে পারছেন বন্ধন-দশা ঘুচে এবার ডানা মেলবার দিন আসছে। বোধ হয় এ সবই তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু গুরুর নির্দেশের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে—একটি প্রশ্ন শুধু সাহস করে শুধোলেন, 'আপনি যদি বলেন আমি চলে যাব,—কিন্তু স্বামীজি, আমি কি অযোগ্যতার কোন রকম পরিচয় দিয়েছি?' উত্তর পেলেন, 'না, তুমি তোমার কাজ ভালই করেছ। আমরাই পারলাম না!'

এ সব হতাশার কথায় নিবেদিতার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এদেশের বিচ্ছিরি জলবায়ুর ফল বোধ হয় এই। 'বেশ জানি, কিছুতেই আমার মন দমত না, কিন্তু যা গরম—সমস্ত শরীর যেন নেতিয়ে পড়ে! আর এ-আবহাওয়ায় যারা জন্মেছে তারাও আমাদেরই মত কি তার চেয়েও বেশী কষ্ট পায় বোধ হয়!'

কিন্তু অসীম সাহস নিবেদিতার, সেই কবচে সুরক্ষিত হয়ে গুরুর সামনে এসে দাঁড়ান।

'স্বামীজি আপনি অপারগ হতে পারেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কি পরাজয় হতে পারে কখনও?'

'এ ভাবে আমি তাঁকে দেখি না। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা কিছু সৃষ্টিছাড়া। আমি তাঁকে ভাবি আমার ছেলে। জান তো, দলের মধ্যে আমি সব চেয়ে গুণ্ডা বলে আমার 'পরে সব সময় তাঁর একটা নির্ভর ছিল…'

দু'জনের মধ্যে সত্যি একটা ঝুটোপুটি লেগে গেল। নিবেদিতা আবার মিনতি করেন, স্বামীজি, 'আমার ছ'শ কুড়ি টাকা জমানো আছে, ওটা আমি ছুঁইনি…মনে হয় কাজ করবার যথেষ্ট সামর্থ্য আমাদের আছে, না হয় একসঙ্গে সবাই ডুবব। আপনি যে ভাবেন মাথা উঁচু রেখে বাঁচতে হবে এ তো লোক-দেখানো ব্যাপার! আমাদের লোককে দেখাবার কিছু নাই। আমার কি করে চলবে তা মোটেই ভাববেন না স্বামীজি…আমার যা আছে তাতে সেপ্টেম্বর অবধি আমায় চালাতে দিন…এমন ভাবে কাজ করে যাব যেন ক্ষয়-ক্ষতির কোনও সম্ভাবনাই নাই…কেন জানি মনে হয়, যা করছি ঠিকই করছি, শাশ্বত কালের জন্য কাজ করে যাচ্ছি…'

তখনই মিস্ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা লেখেন, 'আমি স্বামীজির একটা বোঝা হয়ে উঠেছি, টাকার চেষ্টায় বার হব ঠিক করেছি। বছরে এক'শ' পঞ্চাশ পাউণ্ড হলেই পাঁচটি ছেলে-মেয়ের একটা বিদ্যালয় চলতে পারে। আমার সঙ্কল্প স্থির। জীবনে এই প্রথম সাফল্যের একটা সুযোগ সত্যি-সত্যিই পেয়ে গেছি।' বান্ধবী লেখেন, 'স্বামীজিকে নিয়ে এখনই চলে এস।'

যাওয়ার দিন অনেক বার বদলান হল। শেষ পর্যন্ত মে'র শেষে নিবেদিতা স্কুল বন্ধ করলেন। স্বামী সদানন্দ পাড়ার মেয়েদের বললেন, 'তোমাদের আমরা ছেড়ে যাচ্ছি না। ফিরে এসে মস্ত ইস্কুল খুলব, তাতে বাগান থাকবে, বিধবাদের জন্যও ব্যবস্থা হবে।' ঝি আপাততঃ তার গাঁয়ে চলে গেল। সন্তোষিণী দু'চোখে অন্ধকার দেখল। নিবেদিতা সস্নেহে তাকে বলেন, 'কাঁদে না, জান তো তুমি আমার। তোমার ইংরাজী শেখাবার জন্য তোমার বাবার হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেলাম। যত দিন আমি থাকব না সন্ন্যাসীরা তোমায় দেখবেন।'

হিসাব করে দেখলেন, স্কুলের জন্য যে-টাকাটা দরকার, মাস আষ্টেকের মধ্যেই বোধ হয় তা জোগাড় করতে পারবেন। এর মধ্যেই ছ'মাসে যে কাজ হয়েছে, তারই ভিত্তিতে পাকা রকম পরিকল্পনা রচনা করেছেন; মঠের কাজের সঙ্গে সে-পরিকল্পনার যোগ থাকবে। আচার্য বললেন, 'হ্যাঁ, পরিকল্পনাগুলো লাগসই হয়েছে। পশ্চিম ঘুরে এসে এগুলো বাস্তবে পরিণত করবার টাকাও জুটবে তোমার। কিন্তু তা ছাড়া আরও কথা আছে মার্গট! কোন মতেই ভুলো না যে তুমি মায়ের মেয়ে। তুমি যখন তৈরী হবে তখন তোমার 'পরে অনেক ঝুঁকি পড়বে। আর দেরি নয়! তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ আমার সামনে মেলা দেখছি। কিন্তু এখন নম্র হও, মাথা নীচু করে থাক, মায়ের লক্ষ্মী মেয়ের মত তাঁর কথা শুনে চল।'

স্বামীজিকে বিদায় দিতে সন্ন্যাসীদের যে ভয় হচ্ছিল না তা নয়। তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনাতেই এঁরা একেবারে মুষড়ে পড়তেন। স্বামীজির একখানা কোষ্ঠী খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন সবাই। তার মতে আর তিন বছর মাত্র স্বামীজির আয়ু। সবাই প্রত্যাশায় ছিলেন, শেষ সময়ের কথা স্বামীজি নিজেই তাঁদের বলবেন। মৃত্যুশয্যায় স্বামীজিকে শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি গোপনে বলে গিয়েছিলেন; আমি নিজে এসে তোকে বলব, বাবা, এবার তোর কাজ শেষ হয়েছে। তোর জন্য যে-আমটি রেখেছি সেটি খাবি আয়।' সবাই জানতেন, স্বামীজি নিজেই একদিন বলবেন, 'আমি আমার আমটি পেয়েছি।'

নিবেদিতা ছাড়া আরেক জন সন্ন্যাসী, স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। ইনি এত দিন বাইরের কাজ থেকে নিজেকে তফাৎ রেখেছেন, ধ্যান-ধারণায় দিন কাটানোতেই তাঁর বেশী রুচি। স্বামীজি তাঁকে ডেকে বললেন, 'এই জন্যই তোমায় কাজে নামাচ্ছি। ও-দেশের লোকের বিদ্যাবুদ্ধি ঢের আছে। কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শকে জীবনে ফলিয়েছে এমন একজন সাধুই তারা চায়।'

যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় জন কয়েক গুরুভাইকে নিয়ে বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এলেন। সাধুরা মন্দিরে ঢুকলেন, নিবেদিতা বাগানে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধপীঠ পঞ্চবটীতে বসলেন। এইখানে বসেই ফি বার মাকে তাঁর প্রণাম জানিয়ে যান। এবার গুরুর জন্য মাকে ডাকেন, যাত্রাপথে মা যেন তাঁদের আগলে রাখেন। 'মা গো, সত্যিই যদি ওঁর চিরশান্তির দিন ঘনিয়ে এসে থাকে, তবে যাবার আগে একটু ওঁকে স্বস্তি দাও, একটু বিশ্রাম,—যে-কষ্ট ওঁকে দিতে চাও তা আমায় দাও মা······যত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন আর এদেশে থাকবেন আমি তাঁকে ছেড়ে দূরে যাব না। সে আমি পারব না···তিনি যে আমার ঠাকুর, আমি যে তাঁকে ভালবাসি। আমাকে তাঁর দরকার অথচ আমি তাঁর হাতের কাছে থাকব না—এত বড় ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। এই ক'বছরে তাঁর পায়ে পূজা নিবেদনের ভাবটি পলে-পলে কেমন করে দল মেলেছে তা ভাবতে গেলে আঁৎকে উঠি···কথাটা বলা ছেলেমানুষি, কিন্তু ভগবান যদি স্বামীজির শেষ মুহূর্তটি যন্ত্রণায় বিষিয়ে তোলেন, তবে অমন ভগবানকে আমি চাই না, তাঁকে এতটুকু ভালবাসতেও আমি পারব না। এই একটি সুকান্ত পুরুষের জন্য অনন্তকাল আমি সগুণের করে বন্দিনী হয়ে থাকব—নির্গুণের ভাবনায় আমার দরকার নাই। হ্যাঁ, তাঁর আর যে ভাবই থাক না, তিনি যে আমার ঠাকুর শুধু এরই জন্য আমি বেঁচে থাকব, আমরণ তাঁর কাজ করে যাব।···কিন্তু মা, আমাকে দূরে রেখে কিছুতেই তিনি চলে যাবেন না···সে যে পৈশাচিক নির্মমতা···'
—(৯ই এপ্রিল, ১৮৯৯এর চিঠি)।

নিবেদিতার চার দিকে গাছের পাতাগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে শিউরে উঠছে; তাদের মর্মরে যেন এক আনন্দের অজপা, 'রামকৃষ্ণ, ভক্তি-বিশ্বাস'···গঙ্গায় ঝিকিমিকিতে তারই অনুরণণ। বিবেকানন্দ ফিরে এসে গঙ্গাতীরে বসলেন। বললেন, 'মার্গট, প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলাম সেদিনের মতই আজ আমি মুক্ত। এখন মঠের কর্তৃপক্ষদের সংশ্রব ছেড়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে গাছতলায় গিয়ে বসতে পারি।' যাওয়ার আগে স্বামীজি মঠের সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে গেলেন। টমাস্-আ-কেম্পিসের মত মঠ গড়ায় আর স্বামীজির সখ নাই, তাঁর নজর পড়েছে সেই পুণ্যশ্লোক সাধুটির 'পরে। যিশুর কথাও বলেন। 'যিশু তিনি কি বলেছেন তা প্রচার করবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে তাঁর শিষ্যেরা যদি তিনি কি খেতেন, কোথায় থাকতেন, কি ভাবে সারা দিন কাটাতেন—এই সব আমাদের বলতেন! অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক'টি মূল সূত্র, তা তো আঙুলে গোনা যায়। আসল হল মানুষটা, শাস্ত্র বা সাধনার বুক ফুঁড়ে যে জন্মায়···হাতে কুয়াসার একটা তাল নিলে আর তাই থেকে ধীরে-ধীরে একটা মানুষ গড়ে উঠল—ঠিক যেন এই রকম। মুক্তি আসলে কিছুই নয়, ও হচ্ছে অন্তরের ঝোঁককে খাতে বন্দী করবার একটা উপলক্ষ মাত্র। স্বাতন্ত্র্যও তাই। ওতে যে মানুষ গড়ে ওঠে, সে-ই হল আসল চিজ।'

গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে থাকেন,···'বাস্তবিক, এ-জগৎটা যেন ছবির পর ছবি সাজানো রয়েছে, আর তার মধ্যে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক হচ্ছে মানুষ। আমরা সবাই দেখে চলেছি কেমন করে মানুষ মানুষ হয়ে উঠছে, এ ছাড়া দেখবার কি আছে?···(৮ই মে, ১৮৯৯এর চিঠি)। যারা সত্যি-সত্যি ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিল, তারা সেই ভাস্বর জ্যোতিতে অবগাহন করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গেছে। 'প্রত্যেকেই নিজের মনের রঙে তাঁকে রাঙিয়েছে, তার যেটুকু বোঝবার সাধ্য সেইটুকু বুঝেছে, যে যে-ভূমিতে আছে সেই মত তাঁকে ধারণা করেছে। তিনি মহাসূর্য, আমরা নানা জনে তাঁকে দেখছি নানা রঙের পরকলা দিয়ে, তাই এক সূর্যই এক-এক জনের কাছে এক-এক রঙের···'

বলতে-বলতে স্বামীজি চুপ হয়ে গেলেন। চোখ দুটি বুজে এল, গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। প্রচোদয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণের ভর্গ-জ্যোতিকে দেখেছেন বুঝি। ধ্যানভঙ্গে স্বামীজি সুর করে বলে ওঠেন, 'ওম্ তৎসৎ! হরিরোম্! এবার আমরা যাব। অনেকটা যেতে হবে।'

বিদায়ের দিনে সন্ন্যাসীরা যখন বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের শেষে এগিয়ে এলেন, হাতে কিছু ফুল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীজির দিকে তাকান,—তিনি কিন্তু দুর্জ্ঞেয় পুরুষ, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেন। নিবেদিতা তাঁর সামনে ফুল ক'টি দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন, ব্রহ্মচারীদের যেমন আশীর্বাদ করছিলেন তেমনি তাঁকেও আশীর্বাদ করলেন।

সমুদ্রের হাওয়ায় স্বামীজির স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হচ্ছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। কিন্তু জাহাজে যে ইউরোপীয়ানরা ছিল তাদের ঔদ্ধত্যে স্বামীজির মেজাজ খিটখিটে হয়ে স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা দিল। মেয়েরা নিবেদিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য খুবই উৎসুক ছিল, কিন্তু সাধু দু'জনের সঙ্গে নিবেদিতা ডেকে পায়চারি করছেন দেখলেই পুরুষেরা সরে যেত। অনেকগুলি আমেরিকান মিশনারী-পরিবার ছুটিতে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তারা এদের সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করল যে, নিবেদিতা তাদের সঙ্গী পাত্রীটিকে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন, এই হিন্দু দুটিও তাদেরই মত দু'জন ধর্মযাজক। তার পর থেকে সমস্তটা রাস্তায় উভয় পক্ষের মধ্যে নিতান্তই মেকী-ভদ্রতার খাতিরে একটা শুকনো শিষ্টাচারের আদান-প্রদান চলল।

কলম্বোতে তখন প্লেগের প্রকোপ। বিধি-নিষেধের কড়াকড়িতে জাহাজ থেকে নামাই শক্ত। কোনও রকমে নিবেদিতা আর সাধু দু'জন তীরে নামলেন। বন্ধুরা ভিড় করে ছিলেন সেখানে। 'গড়ের বাদ্যি' বাজিয়ে ওঁদের সম্বর্ধনা করে তোলা হল জন কয়েক শিষ্যের বাড়ি। তারা পয়সাওয়ালা লোক। এঁদের সম্মানার্থে ভোজের আয়োজন হল। স্বামীজি একটু ফল খেলেন, এক কাপ দুধও খেলেন নিবেদিতা আর স্বামী তুরীয়ানন্দ দুধে চুমুক দেবার পর। ওদের দেখালেন, এই বিদেশী ব্রহ্মচারিণী আর সাধু দুটির মধ্যে জাতিবর্ণের কোন বেড়া নাই। স্বামীজি বিদায় নিতে চাইলে জয়ধ্বনি করে তাঁদের জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হল—'পার্বতীনাথ মহাদেব কী জয়! বীরেশ্বর কী জয়! বিবেকানন্দ কী জয়!'

জাহাজ যতই পশ্চিমের দিকে এগুচ্ছে, ঝড়ের দাপট ততই বাড়ছে। আকাশ ভেঙে বাদল নামল, ডেকের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। গরমে যেন দম আটকে আসে। এততেও স্বামীজির কাজ করা বন্ধ হয় না। তিনি নানান ধরণের প্রবন্ধ লিখে চলেছেন একমনে।

নিবেদিতাও কাজ করছিলেন। এক বছর আগে রাস্তায় তাড়াতাড়িতে যে-সব নোট রেখেছিলেন তাই থেকে কাশ্মীর ভ্রমণের একটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। হঠাৎ গুরুর শিক্ষা ও উপদেশের একটা নতুন তাৎপর্য খুঁজে পান, মিস্ ম্যাকলয়েড বা মিসেস্ বুলকে যে-সব কথার জবাব দিয়েছেন তার মধ্যে একটা নতুন আলো দেখতে পান। এদিকে দু'দিন পরেই যে-কর্তব্যের সামনে দাঁড়াতে হবে তার জন্য নিজেকে তৈরী করেন। তার ফাঁকে-ফাঁকে কাশ্মীর যাত্রার সেই রোমাঞ্চক স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এ কাজে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য নিবেদিতার যা-কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ভারতে আসার পর, স্বামীজি সেগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখেন। খুঁটিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করেন যাতে কিছুই আবছা না থাকে। কোনও সমালোচনা না করেও চলল এক চুল-চেরা নিরীক্ষা; কিন্তু কোথায় যে ভুল তা বুঝতে পারবার মত সহজ প্রতিভা নিবেদিতার প্রচুর আছে। ঠাকুর-পরিবার' আর বোসেদের সঙ্গে যে তাঁর পরিপাটি বন্ধুত্ব তার মধ্যে খানিকটা গর্ববোধ নাই কি?

বিবেকানন্দ তাঁর অতি সূক্ষ্ম প্রসক্তিগুলিকেও যেন টেনে বার করেন। নিবেদিতার আপাতদৃষ্ট পরহিতব্রতের আড়ালে তারা গা ঢাকা দিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই স্বীকার করেন, 'এখনও সেবা করি ঝোঁকের মাথায়, কী আশ্চর্য! পরকে সাহায্য করবার জন্য নিজের যে-অদম্য ইচ্ছা সেইটার কথাই শুধু ভাবি, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামটা যে কি হতে পারে সে হিসাব করি না। সেবা-স্পৃহাকে আরও শুদ্ধ আরও শান্ত করতে হবে, ঠিক সময়টিতে যোগ্য ব্যক্তি এলে যখন চাইবে শুধু তখনই এ-বৃত্তির স্ফুরণ ঘটবে! কী শিক্ষাই যে পেলাম!'

কি করে এটা কাজে লাগাবেন, বিবেকানন্দকে এ প্রশ্ন করতেই তিনি কাশ্মীরে যা বলেছিলেন তা-ই আবার বললেন, 'ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে জানবার জন্য প্রাণপণ কর, এই হল আসল রহস্য। আরেকটা মস্ত কথা হল কারও নকল করো না, মাথা ঘামাতে যেও না, কারও সঙ্গে পাল্লা দেবারও দরকার নাই, পরকেও স্বাধীনতা দিতে পার এমন মানুষ হয়ে ওঠ।'

বৈরাগ্যের দীক্ষা নিয়ে একদিন নিবেদিতা ভারতবর্ষে অন্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ সেই ভিক্ষুণী চলেছেন অর্থসংগ্রহ করতে, তাঁর যারা পোষ্য তাদের জন্য। এতে তিনি খুশী। 'যে-কাজে হাত দিয়েছি তার জন্য বাঁদীর মত খাটব,' মিস্ ম্যাকলয়েডকে লেখেন, 'একটা অসীম শক্তি অনুভব করছি নিজের মধ্যে।'

সমুদ্রযাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল। বেশ কিছু দিন ধরে কুয়াশা-ঢাকা একটা পাণ্ডুর আকাশের তল দিয়ে জাহাজ চলেছে। একদিন ভোরে নিবেদিতা দূর-দিগন্তে কেন্টের ক্ষীণ তটরেখা দেখবার জন্য ডেকে গেলেন। স্বদেশকে অভিনন্দিত করতে দু'-একটি আদরের কথা, দু'-চারটি শৈশব-স্মৃতির জন্যে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে আর-এক চিন্তা এসে চেপে বসল, 'মনে হচ্ছে ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আমার মনে সমুদ্রের নোনা জল ফুলে-ফুলে উঠছে, জয় আমায় হতেই হবে··· কি করব আর কি করব না তা বোঝবার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছি।···আশ্চর্য! তোমায় আমি ভালবাসি, পূজা করি! কিন্তু এ-গৌরবও ছাড়তে হবে। কুঁড়ির মতন ফুল হয়ে আমায় ফুটতে হবে, এত দিন যা বুকে আঁকড়েছিলাম আজ তা বিলিয়ে দিতে হবে। এত দিন পরে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে কালকে তোমায় বলতে পেরেছি যে তোমার কাছ থেকে আমায় দূরে যেতে হবে, কাছে থাকলে আমি কিছুই করতে পারব না।'—(২১শে জুলাই, ১৮৯৯এর চিঠি।)

ওঁরা লণ্ডনে পৌঁছলেন ৩১শে জুলাই।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

লণ্ডনে

স্বামীজিকে, এমন কি তাঁদের সঙ্গী অচেনা সাধুটিকেও মেরি নোবল সানন্দে গ্রহণ করলেন। মেয়েকে যে কী খুশী হয়েই ঘরে নিলেন সে আর বলবার নয়। তাঁর বাড়িখানা যদি আরও বড় হত, সুন্দর হত, আরামের ব্যবস্থা যদি আরও বেশী থাকত তাহলে ওদের সবাইকে নিজের কাছে রাখতে পারতেন। অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন অনেক আগে থেকেই। শেষে পাড়ার একখানা বাড়ির মস্ত একটা ঘর ভাড়া করে দিয়ে যে মায়ের সমস্যা চুকিয়ে দিল।

বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল বিবেকানন্দের, লণ্ডনে এসে সেটা মিলল। মেরি ঠিক মায়ের মত আদর দিয়ে স্বামীজির মাথাটি খাবার যোগাড় করলেন। তাঁর কাছে স্বামীজি বলতেন, 'আমি ক্লান্ত, নিশ্বাস নিতেও আমার কষ্ট হয়। তোমার এই মাতৃ-হৃদয়ের আদর-যত্ন এ যেন মরুভূমিতে মরূদ্যান! এই তো এত দিন ধরে চাইছিলাম!'

স্বামীজির জন্য একটি সানন্দ বিস্ময় এখানে জমা ছিল। মিসেস্ ফ্রাঙ্ক আর ক্রিস্টিন্ গ্রিনষ্টিডেল স্বামীজির দুই আমেরিকান শিষ্যা তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁর সেবা করবেন, নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। মেরি নোবলের মুখ চেয়ে ওঁরা স্বামীজির কাছাকাছি উইম্বলডনেই বাসা

মিলেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে, কাজেই লণ্ডনের শিষ্যবর্গ বেশির ভাগই বাইরে। এঁদের মধ্যে মিঃ ষ্টার্ডি ওয়েল্সে সেদিন বিবাহ করেছেন। মতবিরোধের ফলেও এঁরা ছিটকে পড়েছেন। জন কয়েক আবার নিজেদের মনোমত বেদান্ত ব্যাখ্যা করবার জন্য ছোট-ছোট দল গড়েছেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টায় ফলও ফলেনি বা নতুন ধারারও সৃষ্টি হয়নি। এই করে কত শক্তির অপচয় হচ্ছে ভেবে স্বামীজি বিষণ্ণ হাসি হাসেন। বলেন, 'সব জায়গাতেই কি একই ব্যাপার! সংসারের লোক কেবল সংসার-চিন্তাতেই ব্যস্ত, দিন-রাত একটা কিছু করবার ধান্দায় ছুটেছে, ঈশ্বরের কথা শোনবার ওদের অবসর কই…'

নিজের আত্মীয়-স্বজনকে আবার দেখতে পাওয়ার আনন্দে নিবেদিতা গা-ভাসান দিলেন। মেরি নোবল যে স্নিগ্ধ মমতার দৃষ্টিতে তাকান ওঁর দিকে, সেই চাউনিতে বিচ্ছেদের ব্যথা মূর্ত হয়ে ওঠে! সে-ব্যথার কথা মুখ ফুটে কখনও বলেননি, বীরাঙ্গনার মত বুক পেতে তা সয়েছেন। বড় মেয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসেন, নীরবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বোনের সঙ্গে নিবেদিতার আগের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হল, কথা কইতে গিয়ে গলা বুজে আসে, উৎসারিত উচ্ছ্বাসকে চাপতে হয় বার বার। মের মন আসন্ন সুখের স্বপ্নে থরথর, সে তার বিয়ের কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না। নিবেদিতা যাতে বিয়েতে থাকেন এই জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথমে দিন স্থির হয়েছে। আর একটি ছেলেকে আত্মীয় পেয়ে পরিবারের বল বাড়বে, রিচমণ্ড যখন বুড়ো মায়ের ভার নেবে তখন আরও একটি দোসর হবে। কিন্তু সুখের দিনটা আরও তাড়াতাড়ি এলেই নিবেদিতার পক্ষে ভালো হত। তাঁকে দেখে যখন আনন্দ-রোল উঠল 'মার্গারেট ফিরে এসেছে', তখনই নিবেদিতা মনে-মনে বলেছিলেন, 'তোদের ভালবাসি, আনন্দ কর তোরা। প্রীতির আদান-প্রদান হ'ক। কিন্তু আমায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবেই, আমার বড় তাড়া…'

ফিরে-আসা অবধি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আর স্বামীজির অনুগামীদের আবারও দলবদ্ধ করবার চেষ্টায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, নিবেদিতার নিজের জন্য একটি মুহূর্তও ফাঁকা রইল না। দিনগুলো যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে টুকরো-টুকরো হয়ে। অথচ এদিকে গুরুর সান্নিধ্যে শান্তিতে বাস করবার দুরন্ত কামনা নিবেদিতাকে সব সময় পেয়ে থাকে। এক-এক দিন বিকালে মায়ের চোখ এড়িয়ে নিবেদিতা সরে পড়তেন; আমেরিকান শিষ্যা দুটি সর্বদাই স্বামীজির কাছে থাকেন, উনিও তাঁদের সঙ্গে মিলতেন। দু'জনের মধ্যে ক্রিষ্টিন একটু নিরীহ প্রকৃতির, তিনি একটু তফাৎ হয়ে থাকতেন। লণ্ডনের শিষ্যদের মুখে নিবেদিতার তীব্র সমালোচনা শুনেছেন, কাজেই খানিকটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক বশত তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু নিবেদিতার একটি কথাতেই তাঁর মন হাল্কা হয়ে গেল, 'গুরুকে ভালবাসি বলে তোমাকেও ভালবাসি। তোমার-আমার মধ্যে কিছুরই আড়াল নাই। তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য আমরা দাসীর মত খাটব পরস্পরের বন্ধু হয়ে, এটা কি মনে-প্রাণে অনুভব কর না?'

বিকেল বেলা বাগানের ছায়ায় অতিথিরা আর নোবল-পরিবারের বন্ধুরা জড়ো হতেন। নিবেদিতা সাগ্রহে তাঁর ভারত-বাসের কথা বলেন। গলার সুরটি এখনও ছোট্ট ছেলের মত মিষ্টি অথচ পরিষ্কার। তাঁর বলার ভঙ্গিতে একটা রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ভাবগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই সত্য যুগের পুরাণ কাহিনী বলতে গিয়ে কখনও-কখনও কি সত্যকে লঙ্ঘন করছেন না, সময়ের গণ্ডি পার হয়ে যাচ্ছেন না? নিবেদিতা চলে যান ভারতের পথে-পথে, রাস্তার দু'পাশে স্ফীতকাণ্ড গ্রন্থিল বটের সার। ঐ সব গাছ দেবতার কল্পলোক হতে পৃথিবীতে নেমে এসেছে, মাটির 'পরে বেণী পাকানো শিকড় বেয়ে চলেছে, যেন ঘুমন্ত অজগর। ঘন ঘাসের মধ্যে, জঙ্গলের ঝোপে-ঝোপে বন্য পশুরা শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। চাষা হেঁটে চলেছে, মাথায় কাঠের বোঝা, ভারে পিঠ নুয়ে পড়েছে—ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে বিশ্রামাগারের ছায়ায় সে থামল। ঘরে যেমন পাথরের বেদি, চৌমাথার মোড়ে-মোড়ে তেমনি সেবার জায়গা। চার দিক নিস্তব্ধ, দূর থেকে ভেসে আসে কপিকলের একঘেয়ে শব্দ, বিত্তহীনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ছন্দটা ওতে বাজছে যেন। অনেক দূরে কোথায় মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজল, সন্ধ্যারতির সময় এখন। মেয়েরা জল-ভরা কলসী কাঁখে পথ চলেছে। বাঁশী বাজছে। এ কি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী? ভক্ত কেঁদে বলে 'হরি হে, কোথায় তুমি? কোন্ বনের ছায়ায় খেলা করছ গোপনে? একবার দেখা দাও! তুমি যে আমার প্রাণারাম, হৃদয়ের ধন।' দেবতার জ্যোতির পরিবেষ এক হয়ে আছে চাঁদের সভার সঙ্গে, ধূলো-মাখা চোখে সে-আলো কি দেখা যায়? কী মাদকতা আছে এই মনমাতানো সুরে! ক্লান্তি দূরে যায়, পা দুখানা যেন উড়ে চলে। বোঝা যখন বড় ভারী ঠেকে, কৃষ্ণ নিজেই তা মাথায় তুলে নেন……'

নিবেদিতা সমস্ত রূপকগুলোকে বিশদ করে ভেঙে বলেন, নিজে তন্ময় হয়ে যান। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, ছোটখাট সব খুঁটিনাটিতেও ভারতীয় জীবনের কেমন একটা সুসঙ্গতি আছে। পুজকের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি প্রকৃতির ছন্দ হতে নেওয়া, মাটির বুক থেকে প্রতিটি কল্পনা সঞ্চারিত হয়েছে—যেমন জনকের লাঙলের মুখে জন্মেছিলেন সীতা। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতে ক্ষেতে আগুন জ্বলে, সেও এক অগ্নিযাগ; ধরিত্রী যা দিয়েছেন ভস্মাবশেষের ছলে অগ্নি তাঁকেই তা ফিরিয়ে দেন। বিশ্ব-বিধানের মোহিনী মায়া টোটবার নয়, সেই অচল স্মৃতির ছন্দে ভারতের প্রতিটি আচার-আচরণ বাঁধা।

মেরি নোবল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। হ্যাঁ, তাই তো! তাঁর মার্গারেট ছিল স্বপ্নবিলাসী, সে-স্বপ্ন তার সত্য হয়েছে। স্বামীজি ওখানে আছেন বলেই যেন নিবেদিতার উদ্বোধিত দেবলোক চাক্ষুষ হয়ে ওঠে। তার পর তিনিও ঝাঁপ দেন তার মাঝে, কত কাহিনী যে বলে যান—শুনতে ঠিক যিশুর বলা গল্পের মত। অনেক দেরিতে অনিচ্ছার সঙ্গে আসর ভাঙে। দু' বোন তখনও থাকেন। মের মনের সামনে অজস্র কল্পকথার ভিড়, সে-বেচারী যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিবেদিতা তাকে জড়িয়ে ধরেন তাঁর বুকে, আত্মরক্ষার উপায় খোঁজে সে, বলে, 'তোমার মনের জোর আমার চেয়ে বেশী, আমায় তুমি বাঁচাও। বুঝতে পারছি স্বামীজির শক্তিকে না ঠেকিয়ে রাখি যদি, এ

জীবনে আর সংসারী হতে পারব না। কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি, স্বামীজির কথা শুনলে তো আমার চলবে না।'

সারা বিকালটা রিচমণ্ড অধীর প্রতীক্ষায় থাকে কখন স্বামীজিকে নিয়ে বার হবার সুযোগ পাবে। শামুকের মত ধীর পায়ে হাঁটে রিচমণ্ড, সাধুর সঙ্গে তার এই যা-ইচ্ছা-তাই আলাপটা যত বিলম্বিত হয়! উনি ঈশ্বরের কথা বলেন, রিচমণ্ড শোনে। বাড়ির সবাই যে নিষ্করুণ প্রভুর কথা বলে, স্বামীজির ভগবান কিন্তু তা নন, তিনি যেন সন্তানবৎসল পিতা। ছেলেমানুষ রিচমণ্ড মুগ্ধ হয়ে যায়। অকপট বিশ্বাসে মুখ-চোখ জলজলে হয়ে ওঠে, নিজের মনের কথা খুলে বলে। পরে রিচমণ্ড লিখেছিলেন, 'স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় হলে মনে হয়, খৃষ্টের কিছুটা পরিচয় পেলাম।' স্বামীজিরও রিচমণ্ডকে ভাল লেগেছে। একদিন সে ঠাট্টার সুরে স্বামীজির কাছে নালিশ করল যে, ভারতবর্ষের রীতি মানতে গিয়ে তাদের বাড়িশুদ্ধ সবাই গোমাংস হতে বঞ্চিত হয়েছে। স্বামীজি প্রাণ খুলে খানিক হাসলেন। হা! হা! নিবেদিতা পরিবারের মধ্যে এ নিয়ম চালিয়েছে নাকি? সেই দিনই রিচমণ্ডকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। তার পর একটা সিককাবাব আনিয়ে বললেন, 'খাও বাবা, এ তোমার জন্য আনিয়েছি। নিবেদিতা তোমার যে-অধিকার হরণ করেছে, তা আমি আবার ফিরিয়ে দিলাম।'

স্বামীজি বেশী দিন লণ্ডনে রইলেন না। ১৭ই আগষ্ট আমেরিকান মহিলা দুটির সঙ্গে লণ্ডন ছাড়লেন। নিবেদিতাও রওনা হবেন মের বিয়ের পর।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন এসে পড়ল। অচেনা সব জ্ঞাতি ভাই-বোনদের নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে আত্মীয়-কুটুম্বরা এলেন। ফুলে-ফুলে বাড়ি ছেয়ে গেছে। মে-কে কী সুন্দর যে লাগছে, মুখে তার সুখের আভা! এক কাকা সম্প্রদান করলেন। বর-কনে যখন উঠে চলে যাচ্ছে তখন গোলাপ আর লিলির পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হল তাদের মাথার উপরে। সাদা আলপাকার মত পোষাকে নিবেদিতা সেজেছেন মিতকনে, হুডের উপর ফুলের গুচ্ছ আর ওড়না, তার আড়ালে ঝিকমিক্ করছে তাঁর দুটি চোখ। অভিনয় করে যাচ্ছেন চমৎকার, মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে করমর্দন করছেন সবার সঙ্গে।

কিন্তু নব-দম্পতী চলে যেতেই নিবেদিতা পোষাক ছেড়ে ভাঁজ করে বাক্সে তুললেন। বাক্সের ডালার উপর মিস্ ম্যাক্লয়েড (পোষাকটা তিনিই দিয়েছিলেন) লিখেছিলেন, 'সুন্দর করে সাজবে। তোমার লাবণ্য আর জৌলুস দেখলেই না লোকে তোমার সঙ্গে আলাপ করবে, তোমার মুখে স্বামীজির কথা শুনবে।' নিবেদিতা পড়ে হেসেছেন। বন্ধুর কথা রেখেছেন, কিন্তু এবার যেতে হবে। তাঁর জীবন সেবা-ব্রতে দীক্ষিত।

সেই রাত্রিতেই স্কটল্যাণ্ডের ট্রেণ ধরলেন। ওখান থেকে জাহাজে চড়বেন। মায়ের বিলাপে কান দিলেন না, নিজের 'পরে নিজেই কঠিন হয়ে মনে-মনে জপতে থাকেন, 'আর কোনও কাজের দায় আমার নাই। এখন শুধু মায়ের কাজের কথাই ভাবব।'

গুরুর কাছে পাঠান ছোট্ট একটি বার্তা শুধু, 'লড়াইএর জন্য অধীর হয়ে উঠেছি।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

গুপ্ত কবির কাব্যপ্রকাশ

(কলকাতা)

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়য়ে কলকাতায় আছি॥

(দেশপ্রেম)

"কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

(বাঙালী মেয়ে)

"সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জসী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥"

(মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে)

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না॥
আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।"

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত।

সা হি ত্য

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রামদয়াল মজুমদার—হিন্দুধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার। জন্ম—
১২৬৫ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ। পিতা—ঈশানচন্দ্র
মজুমদার। শিক্ষা—এম-এ (১৮৮৬)। কর্ম—অধ্যক্ষ, টাঙ্গাইল কলেজ,
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, আর্য মিশন ইন্‌ষ্টিটিউসন। গ্রন্থ—শ্রীগীতা,
গীতা-পরিচয়, ভারত-সমর, ভদ্রা, বিচারচন্দ্রোদয়, নিত্যসঙ্গী ও মনোবৃত্তি,
সাবিত্রী ও উপাসনাতত্ত্ব, অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী। সম্পাদক—
উৎসব (মাসিক, ১৩১৩—১৩৪৫)।

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ—গীতি-নাট্যকার। ইঁহার বহু
গীতিনাটক অভিনীত হইয়াছে। গীতিনাট্য—ভীষ্মবিজয়, মহারণে
রামানুজ, ভার্গববিজয়, মহামায়া, বাচস্পতি, পাঞ্চালী, হংসাবসান,
কালীবিজয়, পুষ্কল-মোচন, সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ, সত্যভামা, ভুবনেশ্বরী।

রামদেব বাগচী—কবি। গ্রন্থ—যদুকুল-ধ্বংস (কাব্য)।

রামনাথ তর্করত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—
বাসুদেববিজয়।

রামনাথ বিশ্বাস—ভূপর্যটক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ
পৌষ শ্রীহট্ট জেলায় বানিয়াচঙ্গ। পিতা—বিরজানাথ বিশ্বাস।
শিক্ষা—বানিয়াচঙ্গ হরিশ্চন্দ্র হাই স্কুল। কর্ম—ভারতীয় পল্টনে
কেরাণীর কর্ম (১৯১৮), ডিপ্লোমেটিক বিভাগে কর্ম লইয়া পারস্য
গমন, দোভাষীর পদে মালয়ে মেরিন কোর্টে ; ভারতীয় তথাকথিত
সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করায় চাকুরী হইতে পদচ্যুত। অতঃপর
বাইসাইকেল যোগে ভূপর্যটন আরম্ভ (১৯৩১, ৭ই জুলাই)।
সর্বপ্রথমে এসিয়া ভ্রমণের পর, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা,
প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন (১৯৪০, এপ্রিল)। গ্রন্থ—
আজকের আমেরিকা, তরুণ তুর্কী, ভয়ঙ্কর আফ্রিকা, বেদুইনের দেশে,
অন্ধকারের আফ্রিকা, সর্বস্বাধীন চীন, নিগ্রো জাতির নূতন জীবন,
ভিয়েৎনামের বিদ্রোহী বীর, মালয় এসিয়া ভ্রমণ, বিদ্রোহী বলকান,
জার্মেনী এবং মধ্য-ইউরোপ, কোরিয়া ভ্রমণ, জুজুৎসু জাপান, দুরন্ত
দক্ষিণ-আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি, ভবঘুরের গল্পের
ঝুলি, ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু, আফগানিস্তান ভ্রমণ, হলিউডের
আত্মকথা।

রামনাথ (রবি) মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসক। জন্ম—বাঁকুড়া।
রায় সাহেব। সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বাঁকুড়া-দর্পণ (পাক্ষিক
১৮৯২—১৯৩৮)।

রামনারায়ণ অগস্তি—কবি। গ্রন্থ—কবিতাবলী (১২৮৮)।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ।
রঘুনন্দনের সমসাময়িক। পিতা—শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি। টীকা-
গ্রন্থ—দায়ভাগটীকা, সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা, বিদ্বোন্মাদিনীর (রঘুবংশের
টীকা), শকুন্তলা-বিবৃতি (অভিজ্ঞান শকুন্তলার টীকা)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কবি। নামান্তর—নাটুকে রামনারায়ণ।
জন্ম—১২২৯ বঙ্গ (১৮২২ খৃঃ ২৬এ ডিসেম্বর) ২৪ পরগনার
অন্তঃপাতী হরিনাভী গ্রামে। মৃত্যু—১২৯২ বঙ্গ ৭ই মাঘ।
পিতা—রামধন শিরোমণি। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। বাল্যে
ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন
(১৮৪৩—১৮৫৩)। কর্ম—প্রধান পণ্ডিত, হিন্দু মেট্রোপলিট্যান
কলেজ (১৮৫৩—৫৫), অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ
(১৮৫৫—১৮৮২), অবসর গ্রহণের পর স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা
(১৮৮৪)। গ্রন্থ—পতিব্রতোপাখ্যান (১২৫৯), প্রকাশ্য বক্তৃতা
(১২৬০), কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক (১৮৫৪), বেণীসংহার নাটক
(সংবত, ১৯১৩), রত্নাবলী নাটক (সংবত, ১৯১৪), অভিজ্ঞান
শকুন্তলা নাটক (সংবত, ১৯১৭), যেমন কর্ম তেমনি ফল (প্রহসন,
(১৮৬৫), বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক (১৭৮৮
শক), মালতীমাধব নাটক (১২৭৪), উভয় সঙ্কট (প্রহসন,
১২৭৬), চক্ষুদান (ঐ, ১২৭৬), মহাবিদ্যারাধন (১২৭৮), রুক্মিণী-
হরণ নাটক (১২৭৮), আর্যাশতকম্ (১৮৭২), স্বপ্নধন নাটক
(১৯৩০ সংবত), ধর্মবিজয় নাটক (১২৮২), কংসবধ নাটক
(১২৮২), দক্ষযজ্ঞম্ ২ খণ্ড (১৮৮১-২)।

রামনারায়ণ দাস বাহাদুর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—A treatise
on Inflammation (১৮৭৫)।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—সংস্কৃত পণ্ডিত। গ্রন্থ—অদ্ভুত ইতিহাস
(১৮৫৯), গোপালকামিনী (১৮৫৬), উইলিয়ম টেল (১৮৬৭),
গোবীজ প্রয়োগ (১৮৫৭), পল ও ভার্জিনীয়া (১৮৫৬),
এলিজাবেথ।

রামনারায়ণ ষড়ঙ্গী—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায়
রোহিণী নামক স্থানে। কর্ম—ময়ূরভঞ্জ রাজ ষ্টেটের উচ্চপদস্থ
কর্মচারী। গ্রন্থ—হাস্যতরঙ্গ (১৯০৫)।

রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানবচিত্র, জীবন-
সংগ্রাম, ভবরামের উইল (১৩২০), আমার ভ্রমণ, শিলং পাহাড়,
দৈবীশক্তি, কুণ্ডেশ্বরী মাহাত্ম্য, সংসার চিত্র।

রামপ্রসন্ন ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। ভক্তিবিশারদ। সম্পাদক
—গৌড়ভূমি (ত্রৈমাসিক, মুর্শিদাবাদ, গোবরহাটী, ১৩০৮)।

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গীতবিদ্। পিতা—সঙ্গীতবিদ
অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাড়াজোল রাজ-পরিবারের সঙ্গীতনায়ক।
গ্রন্থ—সঙ্গীতকেশরী (রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁ সহ)।

রামপ্রসাদ সেন—ভক্ত কবি। জন্ম—১৭২৩ খৃঃ হালিশহরের
অন্তর্গত কুমারহাটি গ্রামে। মৃত্যু—১৭৭৫ খৃঃ। পিতা—রামরাম
সেন। ইনি সর্বদাই শ্যামাবিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ও
গীত রচনা করিতেন। কলিকাতায় এক ধনী ব্যক্তির নিকট কর্ম ও
ইঁহার ধর্মপ্রবণতা দেখিয়া উক্ত ধনী কর্তৃক ৩০৲ বৃত্তিলাভ।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি লাভ। 'কবিরঞ্জন'
উপাধি লাভ। গ্রন্থ—বিদ্যাসুন্দর (১২৯৩), কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন,
আগমনী, বিজয়া, সীতাবিলাপ।

রামপ্রাণ গুপ্ত—কবি ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ ১ই
ফাল্গুন ময়মনসিংহ জেলার কেদারপুর নামক গ্রামে। মৃত্যু—
১৩৩৪ বঙ্গ ২৭এ ভাদ্র, কলিকাতা। পিতা—কৃষ্ণপ্রাণ গুপ্ত।
মাতা—কাশীশ্বরী দেবী। শিক্ষা—শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায়—বিভিন্ন
স্থানে—গ্রাম্য পাঠশালায়, দিনাজপুর জিলা স্কুল, সন্তোষ স্কুল,

সাঁকরাইল স্কুল, রিপন কলেজিয়েট স্কুল। কর্ম—দিনাজপুর কালেক্টরীতে শিক্ষানবীশী, স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্ত গমন—পরে নিজ জমীদারী পরিচালনা। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, টাঙ্গাইল, মিউনিসিপাল কমিশনার। ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ। ইউনিয়ান স্কুল স্থাপন (টাঙ্গাইল)। গ্রন্থ—হজরত মুহম্মদ, প্রাচীন ভারত, প্রাচীন রাজমালা, ইসলাম কাহিনী, পাঠান রাজবৃত্ত, মোগল বংশ, ভারতমালা, ব্রতকথা, রিয়াজ-উস্-সালাতিন।

রাম বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণচন্দ্রজীবন।

রামভদ্র সার্বভৌম—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে। পিতা—জানকীনাথ চূড়ামণি। শিক্ষা—পিতার নিকট ও রঘুনাথ শিরোমণির নিকট। টীকাগ্রন্থ—ন্যায়রহস্য, গুণকিরণাবলী রহস্য, প্রকাশ (বর্ধমান উপাধ্যায় কৃত), মকরন্দ (রুচি দত্ত কৃত), পরিমল (শঙ্কর মিশ্র কৃত), পদার্থতত্ত্ববিবেচন-প্রকাশ, কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা, তর্কদীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণির ভাষ্য, সমাসবাদ, সিদ্ধান্তরহস্য, শব্দনিত্যতাবাদ, সময়রহস্য।

রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—রামরাম ন্যায়পঞ্চানন। টীকাগ্রন্থ—সুবোধিনী (শব্দশক্তি প্রকাশিকার টীকা)।

রামময় শর্মা—অনুবাদক। গ্রন্থ—মৃচ্ছকটিক নাটক (অনুবাদ, ১৮৭৫)।

রামমোহন কবিরাজ—আয়ুর্বেদবিদ। জন্ম—বহরমপুর। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায়ী। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—প্রত্যক্ষফলদায়িকা স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা (সংকলন, ১৮৭১), শিশু-চিকিৎসা (১৮৭০)।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—রামভক্ত ও কবি। নিবাস—নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটিয়ারি। পিতা—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—রামায়ণ (পদ্যানুবাদ, ১৭৬০ শক)।

রামমোহন রায়—ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক ও সমাজসেবী। জন্ম—১৭৭৪ খৃঃ ১০ই মে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৩৩ খৃঃ ২৭এ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে। পিতা—রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়)। মাতা—তারিণী দেবী (ওরফে ফুলঠাকুরাণী)। শিক্ষা—স্বগ্রামে পাঠশালায়। আরবী ও পারসী শিক্ষা পাটনায়, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সংস্কৃত শিক্ষা কাশীধামে; কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিন্দুদিগের প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উহার বিরুদ্ধে স্বীয় মত স্থাপন করিয়া 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী' নামক গ্রন্থ রচনা ১৫ বৎসর বয়সে। ইহাতে আত্মীয়-স্বজনের সহিত মতবিরোধ ও পিতা কর্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন এবং ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে উপস্থিত হন এবং পুনরায় চারি বৎসর পরে স্বগৃহে আগমন করেন। ইংরেজি শিক্ষা ২২ বৎসর বয়সে, এবং তৎপরে ফরাসী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু শিক্ষা। কর্ম—কলেক্টরিতে—রংপুর (১৮১০), পরে সেরিস্তাদার, অবসর গ্রহণ (১৮১৩)। কলিকাতায় আগমন করিয়া পুনঃ ধর্মান্দোলন ও বহু ধর্মগ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ। ব্রাহ্মিক্যাল ম্যাগাজিন স্থাপনা, 'আত্মীয় সভা' গঠন ও ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা (১৮২৮)। ভারতে 'সহমরণ প্রথা'র বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ও উহা রহিত করেন। বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে, এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮১৭)। 'রাজা' উপাধি লাভ (দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক, ১৮৩০), দ্বিতীয় অকবর শাহ কর্তৃক স্বীয় বৃত্তি হ্রাস হওয়ায় তাঁহার বৃত্তির বর্ধন উদ্দেশ্যে Board of Controlএ প্রার্থনার জন্য) ইনি ইংলণ্ডে (১৮৩০ খৃঃ, ১৫ই নভেম্বর) প্রেরিত হন। ইনি ইউরোপের বহু দেশ পর্যটন করেন—ফ্রান্সে (১৮৩১), ব্রিষ্টল সহরে (১৮৩৩) অবস্থান করেন। গ্রন্থ—হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী (১৭৮৯); তুহফাৎ-উল্-মুয়াহ হিদীন (আরবী-পারসী, ১৮০৩-৪), বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৬), তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮), ২য় সম্বাদ (১৮১৯), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৭), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণসেবধি বা ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সম্বাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), প্রার্থনাপত্র (১৮২৩), পাদরিশিষ্য সংবাদ (১৮২৩), গুরুপাদুকা (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬), বজ্রসূচী, ১ম নির্ণয় (১৮২৭), গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং (১৮২৭), ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮), অনুষ্ঠান (১৮২৯), সহমরণ বিষয় (১৮২৯), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩), ক্ষুদ্র পত্রী, আত্মানাত্ম-বিবেক, An Abridgement of the Vedant etc (১৮১৬) Trans. of the Cena Upanishada (ঐ), Moonduk Upanishada (১৮১৯), Kuth Upanishada (ঐ), Ishopanishad (ঐ), A Defence of Hindoo Theism (১৮১৭), ২য় (১৮১৭), A Conference between an Advocate for, and an opponent of, the Practice of Burning Widows alive, ১ম (১৮১৮), ২য় (১৮২০), An Apology or the Pursuit of Final Beatitude (১৮২০), The Precepts of Jesus (ঐ), An appeal in Defence of the Precepts of Jesus (ঐ), ২য় (১৮২১), ৩য় (১৮২৩), The Brahmunical Magazine (১৮২১-২৩), Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females (১৮২২), Humble Suggestions to his Countrymen who belive in the One True God (১৮২৩), A Vindication against the Schismatic Attacks of R. Tytler (ঐ), Petitions against the Press Regulations (ঐ), A Letter on English Education (ঐ), A Dialogue between a Missionary & three Chinese Converts (ঐ), A letter on the prospects of Christianity in India (১৮২৪), On different

modes of Worships (১৮২৫), A Trans of a Sanskrit Tract, inculcating The Divine Worship (১৮২৭), Answer of a Hindoo to the question, 'Why do you frequent a Unitarian place of Worship' (১৮২৮), Petition to Government against Regulation III for the Resumption of Lakheraj Lands (ঐ), The Universal Religion (১৮২৯), The Trust Deed of the Brahma Samaj (১৮৩০), Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows (১৮৩০), Essays on the Rights of Hindoos over Ancestral Property (ঐ), Letters on the Hindoo Law of Inheritance (ঐ), Address to Lord William Bentinck upon the passing of the Act for the Abolition of the Suttee (ঐ), Couter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee (ঐ), Exposition of the Practical Operation of the Judicial & Revenue Systems in India (১৮৩২)। সাময়িকপত্র পরিচালনা—ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ-সেবধি (ইংরেজি, ১৮২১, সেপ্টেম্বর), সম্বাদকৌমুদী (বাংলা, ১৮২১, ৪ঠা ডিসেম্বর), মীরাৎ-উল্-অখবার (১৮২২, ১২ই এপ্রিল)।

রামযাদব বাগচী—চিকিৎসক। এম-ডি। সম্পাদক—সাবিত্রী (মাসিক, ১৩০৩, মাঘ)।

রামযাদব মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রোগনাশক, ১ম (১৮৬৮)।

রামরত্ন দাস সরকার—কবি। গ্রন্থ—রসিকরতন (কাব্য, ১৭৮৬ শক)।

রামরাম বসু—গ্রন্থকার।—১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের গদ্যলেখক। ইঁহারই সহায়তায় কেরী, টমাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংকলন ও অনুবাদ করেন। ইনি প্রথমে টমাসের মুন্সী ছিলেন পরে কেরীর মুন্সি হন (১৭৯৩, ১১ই নভেম্বর—১৭৯৬-জুন) মালদহের মদনবাটীতে। গ্রন্থ—প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।

রামলাল চক্রবর্তী—কবি। গ্রন্থ—কবিতাকলাপ, ১ম (১৮৭৪), ২য় (১৮৭৩), পত্মমুকুল (১৮৭৪)।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও নাট্যকার। গ্রন্থ—কাল-পরিণয়, কমলা, অনাথিনী নাটিকা, বিদেশী, অভিবেক, প্রেমপাশ, চাঁদের হাট, অপরিচিতা, প্রেমের চিত্র, অদৃষ্ট, প্রলাপ (কাব্য, ১২৯২), অশ্রুপূজা (কাব্য, ১২৯১), নাচ।

রামলাল বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভূগোল পাঠ।

রামলাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শকুন্তলা সুললিত ইতিহাস।

রামলাল মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পাষণ্ডদলন।

রামলাল সরকার—চিকিৎসক। তেজপুর (ভামো) সরকারী মেডিকেল অফিসার। গ্রন্থ—নব্যবাঙালীর কর্তব্য, চীন দেশে সন্তান চুরি, সন্তান শিক্ষা, বিত্তারম্ভ, আমার জীবনের লক্ষ্য।

রামলোচন দাস—কবি। জন্ম—১১৯৮ বঙ্গ পৌষ মাস, মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাগমারি পরগনার অধীন তেরখি গ্রামের বৈষ্ণবংশে। মৃত্যু—১২৭৪ বঙ্গ ৪ঠা মাঘ তেরখি গ্রামে। পিতা—কৃষ্ণকান্ত দাস। মাতা—যমুনা দেবী। শিক্ষা—বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা নাটোর ও ঢাকায়; সংস্কৃত শিক্ষা—নাটোর। এতদ্ব্যতীত প্রতিমাগঠন, চিত্রবিত্তা, তারপাশা শিল্প শিক্ষা। কর্ম—মুন্সী গরি, বর্বাকপুর, আদালতের সেরেস্তাদার, দিনাজপুর। বহু সঙ্গীত রচনা। বিত্তানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুরে সুপরিচিত। কাব্যগ্রন্থ—প্রেমলহরী, সঙ্গীতরসোত্তর, সঙ্গীতামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (পত্যানুবাদ), কল্কিপুরাণ (পত্যানুবাদ)।

রামশঙ্কর রায়—নাট্যকার। জন্ম—১০শ শতাব্দীর শেষভাগে। ওড়িয়া-সাহিত্যের সেবক। বহু নাটক রচনা (১৮৮০—১৯১৭)। গ্রন্থ—কাঞ্চিকাবেরী (নাটক), বেদ (ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ)।

রামসদয় ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর (১৮৬৯), বিক্রমোর্বশী (১৮৫৯)।

রামসর্বস্ব বিত্তাভূষণ—সাময়িকপত্রসেবী। অধ্যাপক, মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সৃটিটিউসন। পণ্ডিত, পটলডাঙ্গা ট্রেনিং স্কুল। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক। সম্পাদক—কল্পলতিকা (পাক্ষিক, ১২৭৫), প্রতিবিম্ব (মাসিক, ১২৮২)। গ্রন্থ—আশমানের নক্সা (১৮৬৮)।

রাম সরস্বতী—অসমিয়া কবি। জন্ম—কামরূপ জেলার পচারিয়া গ্রামে। শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের সমসাময়িক। গ্রন্থ—মহাভারত (অসমিয়া পত্যানুবাদ), রামায়ণ (ঐ), পুরাণ (ঐ)।

রামসহায় কাব্যতীর্থ—কবি। কাব্যগ্রন্থ—মালধ।

রামসেবক বিত্তারত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গানুবাদ),

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২৯ খৃ: বর্ধমানের অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৪ খৃ: কাশীধামে। পিতা—রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। শিক্ষা—সিনিয়ার বৃত্তি (সংস্কৃত কলেজ), প্রবেশিকা (ঐ, ১৮৫৭), প্রেসিডেন্সী কলেজ। কর্ম—ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর অফ স্কুলস্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৫৮), অবসর গ্রহণ (১৮৯২) 'রায় বাহাদুর' উপাধি (১৮৯৯) লাভ। নানা জনহিতকর কর্মে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী (১৮৯২), পুলিস ও লোকরক্ষা (ঐ), আত্ম-চিন্তন (সংস্কৃত), আচারচিন্তন (সংস্কৃত)।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম—১৮৬৫ খৃ: ৩০এ মে বাঁকুড়া জেলায়। মৃত্যু—১৯৪৩ খৃ: ৩০এ সেপ্টেম্বর কলিকাতায়। পিতা—শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি-এ (১৮৮৭), এম-এ (১৮৮৯)। কর্ম—অধ্যাপক, সিটি কলেজ (১৮৯৩-১৮৯৫), কায়স্থ পাঠশালা কলেজ (১৮৯৫), পরে অধ্যক্ষ—(১৯০৫), শান্তিনিকেতনের অবৈতনিক অধ্যক্ষ। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৯১০), সভাপতি (১৯২২)। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (এলাহাবাদ, ১৯২৩, ১৯৩২), জাতিসঙ্ঘে নিমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপ গমন (১৯২৬)। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর পত্রে ইনি নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। প্রতিষ্ঠাতা—বিশাল ভারত (হিন্দী)। গ্রন্থ—আরব্যোপন্যাস, রাজা রবিবর্মার জীবনী। সম্পাদিত গ্রন্থ—রামায়ণ, মহাভারত। সম্পাদক—ধর্মবন্ধু (মাসিক, ১৩০৪), দাসী (মাসিক ১২৯৯), প্রদীপ (ঐ, ১৩০৪), প্রবাসী (১৩০৮), মডার্ণ রিভিয়ু (১৯০৭)।

[ক্রমশঃ।
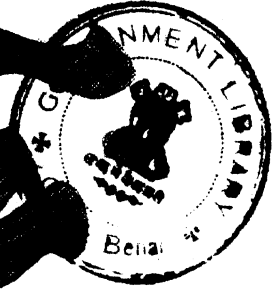
তারানাথ রায়

[ফরাসিসেরা যিশুবি ১৬৭২ সনে এতন্নগরাধিকারী হয়েন, এবং ডিউপ্লিক্স সাহেব এই নগরের ১৭৩০ সালাবধি ১৭৪২ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাধ্যক্ষ থাকিয়া তথায় ২০০০ ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার এক কেল্লা ছিল তাহাতে ৭০০ ফরাসিস ও ৭০০ সিফাই থাকিত, এই কেল্লা ১৭৪২ সনে নির্ম্মিত হয়। ফরাসিসদিগের সহিত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের ১৭৫৭ সনে তুমুল যুদ্ধ হইবায় কোম্পানির পক্ষ লর্ড ক্লাইব সাহেব ঐ সনের ২৩শে মার্চ বাসরে যুদ্ধজয়ী হইয়া ঐ নগর হইতে বার লক্ষ টাকা লুঠ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার পর সন্ধির দ্বারা ঐ নগর ফরাসিসদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও বক্তব্য যৎকালে (১৭৪০ সালে) ফরাসডাঙ্গা ৪০০০ অট্টালিকায় শোভিত তৎকালে কলিকাতা স্থাপিত হয় নাই বিশেষতঃ ফরাসিসেরা এদেশে এমত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের তুল্য অপর ইউরোপীয়েরা হয়েন নাই, অপিচ তাঁহারা এই ফরাসডাঙ্গাকে ভারতবর্ষের রাজধানী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বাধিপতি তাঁহারদিগকে এদেশে আধিপত্য দিবেন না, এ কারণ তাঁহারদিগের স্বজাতীয় কোন কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকতা করিবায় ইংরাজেরা ১৭৫৭ সনে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফরাসিসদিগের বাণিজ্য নষ্ট করিলেন।

—পুরাতন বিবরণী, ১২৬২ সাল]

১৭৪৩। গোলাম সওদাগর ঘুসে সোদে। পরমানন্দ তার টাউট। পরমানন্দ পাঠায় চর চারদিকে। তারা মানুষ কেনে, মানুষ চুরী করে, মানুষ গুম করে। পানের চুনে কি মিশিয়ে তারা মানুষ-শিকারকে বেহুঁস করে। কারও হাতে থাকে একটা বাক্স, বাক্সে থাকে এক রকমের রং, তা দেখিয়ে ওরা শিকারকে নাকি যাদু করে ধরে নিয়ে যায়। চারদিক থেকে মানুষ-ধরারা শিকারগুলোকে পাঠিয়ে দেয় পণ্ডিচেরীতে। ট্রাঙ্কুবারের কাছে এক গাঁয়ে মানুষ-ধরাদের বাড়ী। এক-এক বারে ৫০ থেকে ১০০ জনকে ওরা এই বাড়ীতে আটক করে রাখে। রাতারাতি নৌকোয় বোঝাই করে পাঠিয়ে দেয় পরমানন্দের বাড়ীতে। এখানে ওরা হতভাগ্যদের মাথা মুড়িয়ে দেয়, পরতে দেয় কাল কাপড়, এক পায়ে পরিয়ে দেয়

"Deaf Ghyretty's pictured ceiling
Sleeps beneath the jungle shade,
By the serpent-track revealing
Cornice-wreck and balustrade,
And the ghosts go ever stealing
Down the wind-bil esplanade.

* * *

Comes Dupleix-Dupliex forgetting—
(West and East, but France astord,—
Sun-dream with a cloud-wrapped setting)
Grasping still a broken sword
To a note of wail regretting
Wrung from some hid harpsichord."

—Chandernagore-Dāk.

দেয়। তার পর রাতারাতি চালান করে দেয় মুসে সোদের বাড়ীতে। সেখানে গোলাম কয়েদ। ফরাসী দাস-বণিকদের কয়েদখানায় ওদের আবদ্ধ করে রাখে, তার পর জাহাজে চালান দেয় দরিয়া পারে।

—[আনন্দরঙ্গ পিল্লাইএর রোজনামচা—২৫ জুন, ১৭৪৩]

ফরাসীদের গোলাম দ্বীপ বুরবোঁ। ইংরেজের গোলাম-দ্বীপ সেন্ট হেলেনা। ইংরেজ-বণিক বাংলা থেকে পুরুষ চালান দেয় সেন্ট হেলেনার আবাদে খাটাবার জন্যে। একবার এক বর্ব্বর ইংরেজ রাজার সখ হ'ল (১৬৮৩) তার চিড়িয়াখানায় মানুষ পুষবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররা বাংলার ইংরেজ কুঠিয়ালদের নির্দ্দেশ দিল—

"রাজার দুই গোলাম চাই—ভাল মুখ চোখওয়ালা ১৭ বছরের একটি ছেলে আর ১৪ বছরের এক মেয়ে। বেশ বেঁটে-খাট। কানে মাকড়ি, নাকে নথ, পায়ের মল সঙ্গে দেবে। সোনার না হয়। পাথর দেবে ঝুটো।"

ইংরেজ কোম্পানী সে সয়তান রাজাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। ("The old Company therefore strained every nerve to conciliate the monarch, and were anxious to indulge all the caprices of the royal and effete debauchee. They not only listened to his puerile request for toys with souls in them, but also would have them ornamented in such a manner as they supposed would satisfy the most fastidious taste." 1683)

য়ুরোপের আর এক লম্পট রাজার খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে ফরাসী বণিকরাও এমনি করে চালান দিয়েছিল বাংলার এক ৪ বছরের ছুলালকে।

বাংলায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। বাংলার নবাব তারই উপর পরগণায় পরগণায় পাইক পাঠিয়ে দেশ লুঠ করছে, রায়তদের পীড়ন করছে। '৩৫ সালের বর্গীর লুণ্ঠন। মারাঠারা বাংলার ঘরবাড়ী পোড়াচ্ছে, সারা দেশ শ্মশান করে ফেলছে। লোকজন সব গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।

তার পর ১৭৩৮ সালের ঝড়। এই ঝড়ে কলকাতা, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা অঞ্চলের একখানা বাড়ীও আস্ত রয়নি। '৩৯ সালে: famine smote where storm had desolated....The feeble inhabitants of Bengal displayed no capacity even for flight, and in great numbers fell victims to famine or wild beasts in the jungle." ঝঞ্ঝা-উপদ্রুত শ্মশানে আবার দুর্ভিক্ষ। বাংলার হতভাগ্যরা এত দুর্ব্বল, পালাতেও পারে না। দলে দলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে দেয় প্রাণ, বনের পশুরা এসে তাদের খেয়ে ফেলে। এর দশ বছর পর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোবিন্দরাম মিত্র জানাচ্ছেন (২০শে নভেম্বর, ১৭৫২)—"গেল ৬০ বছর তক্ এমন দেখিনি। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, না খেতে পেয়ে যে মানুষগুলো মরে গেছে এ কথা কে না জানে?"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতী ডিরেক্টাররা তাদের বাংলার প্রতিনিধিদের লিখেছিল পলাশী যুদ্ধের প্রায় ২৩ বছর আগে—

"Bengal is not only the cheapest part of India to live in, but perhaps the most plentiful country in the whole world. (৩১শে জানুয়ারী, ১৭৩৪)। বাংলার মত প্রাচুর্য্য দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। সেকালে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম দেশ বাংলা। এই সমৃদ্ধতম বাংলার মানুষগুলো সেদিন কি করে বিনা প্রতিরোধে ফিরিঙ্গী বণিক আর দেশপ্রীতিবর্জ্জিত নবাবের খেলা-লড়াইয়ের জয়-পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল, তার সন্ধান পেতে হলে এই পরিস্থিতির প্রতি নজর দিতে হবে। চলতি ঐতিহাসিকরা তা দেয়নি। পলাশী যুদ্ধের অন্ততঃ প্রায় ২৫ বছর আগে থেকে জনসাধারণের এই অবিরাম দুরবস্থার সুযোগ নিয়েছিল বিশেষ করে পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ আর ফরাসীরা। পলাশীর ২৫ বছর আগেও চন্দননগরে বাঙ্গালার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেসাতি হ'ত। ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও ফরাসী গবর্ণর দুপ্লের সই-করা এক ইস্তাহারে ক্রীতদাসের উপর কর স্থাপনের কথা দেখতে পাওয়া যায়—

"Les rentes d'esclaves sont d'une roupie et quart pour le papier et de cinq pour cent de prix de la vente de chaque esclave paiable par toutte personnes de quelque condition qu'elles soient." (30th Aug 1732)

প্রতি দাসখতের উপর ফরাসী কোম্পানীকে দিতে হ'ত পাঁচসিকা আর ক্রীতদাস যে দাম দিয়ে কেনা হ'ত, সেই দামের শতকরা ৫ ভাগ কর দিতে হ'ত।

'দিগ্বিজয় প্রকাশের' খলসানি। "খলসানি মহাগ্রামে যত্র রাজা চ ধীবরঃ।" সেই খলসানি, বোড়ো, গোন্দলপাড়া—তিনখানি গ্রাম নিয়ে পলাশী যুদ্ধের ৮৫ বছর আগে ফরাসী বণিকরা স্থাপন করেছিল চন্দননগর। ৫০ বৎসরের মধ্যে দুপ্লে ৪ হাজার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে চন্দননগরকে গড়ে তুলেছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম নগরীরূপে। দুপ্লের তখন ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা। লক্ষাধিক দেশী-বিদেশীকে চন্দননগরে স্থান দিয়ে এই নগরীকে সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী করবার আয়োজন করেছিলেন দুপ্লে। ক্লাইভ তার কোম্পানীকে সাবধান হতে বলেছিলেন, এই 'Grannery of the Island' থেকে।

চন্দননগরের ফরাসীদের দেখাদেখি ইংরেজরাও 'তিন গাঁইয়া কলকত্তা' স্থাপন করেছিল, আর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ও ফরাসী জেস্যুইটদের প্রদর্শিত পথে খৃষ্টান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবার ফাঁদ পেতেছিল সেই কলকাতায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে বাংলার তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে ত্রিধারা প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল, তার এক দিকে বাংলার ক্লীব সুবেদার দেশের জনগণকে নিপীড়িত করে সে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবী হারিয়েছিল—এক দিকে ফ্রান্সের ১৫শ লুই তথা দুপ্লের নায়কত্বে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের সম্পদ ও রাষ্ট্রগ্রাসী ষড়যন্ত্র। আর এক দিকে ফরাসী ও মুসলমান সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করে ছলে-বলে-কৌশলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে জালিয়াৎ ক্লাইবের প্রচেষ্টা। এই ত্রিধারা রাজনীতিক পাকচক্রের যবনিকার অন্তরালে খৃষ্টান মিশনারী ও দাস ব্যবসায়ীদের

যে গুপ্তলীলা চলছিল, তার কেন্দ্র ছিল চন্দননগর। চন্দননগরে আস্তানা গেড়ে জেসুইট বিশপ ক্রান্তয় লেনেজ স্বহস্তে ৩০ হাজার বাঙ্গালীকে যখন খৃষ্টান করেছিল, তখনও শ্রীরামপুর মিশনারী দলের পত্তনই হয়নি। তিব্বতের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই জেসুইটরা বাংলাকে ত জ্বালিয়ে ছিলই, রোমকে কেন্দ্র করে এরা ভারতে সর্বত্র খৃষ্টানী বিষ ছড়াচ্ছিল।

পলাশী যুদ্ধের ২৫ বছর আগে থেকে' ৭৬এর মন্বন্তর পর্য্যন্ত বাংলার দৈবদুর্বিপাক, প্রহার, লুণ্ঠন ও অন্নাভাব-ক্লিষ্ট বাপ-মার কাছ থেকে পয়সা দিয়ে চন্দননগরের এই জেসুইটরা ছেলেমেয়ে কিনে অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিল। ১৭৫৩তে চন্দননগরের এই অনাথাশ্রমে যে ১০৫ খানি বাংলার মেয়ে খৃষ্টানী পাঠ পাচ্ছিল তারা এমনি করেই কড়ি দিয়ে কেনা। ("they had been purchased from their parents who sold them out of distress") মন্বন্তরে এই চন্দননগরের শিশুরা যখন দলে দলে মরতে লাগল, তারই সুযোগে ইটালীর পাদরী শিশু লুঠ করেছিল—তাদের হাসপাতালে সেদিন স্থান পেয়েছিল "Young children sold by their parents in the great famine of 1770 whose death roll forms a melancholy chapter in the history of the settlement."

বাংলার এমনি দুর্দিনে, বাংলার এক দুলালকে চুরি করে ওরা চালান দিয়েছিল ফ্রান্সে। ১৭৭০। "The low-born beauty Madame de Barry"—নীচ-জন্মা রূপসী ১৫শ লুইয়ের শেষ উপপত্নী মাদাম দু বারির কুপ্রভাবে তখন ফরাসী সিংহাসন টলমল। ১৫শ লুই কুকুর, পাখী, বানরের সঙ্গে এই ১০ বছরের বালককে বকৃশিস দিয়েছিল তার উপপত্নীকে। ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেক-জাণ্ডার ডুমা বালককে ভুল করে নিগ্রো 'জামর' আখ্যা দিলেও, প্রকৃতপক্ষে সে বাঙ্গালী ছিল। মাদাম দু বারী এর নাম রেখেছিল লুই বেনেডিক্ট (লুইয়ের বখশিস) জামর। তাকে সে বেশ লেখা-পড়া শিখিয়েছিল, রাজার হালে তাকে রেখেছিল। তার প্রভাবে ১৫শ লুই জামরকে লোজান প্রাসাদ ও সম্পত্তির অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত করেছিল। এই রাজানুকম্পার জন্যে ফ্রান্সের আমির ও আমলারা যেমন জামরকে ঘৃণা করত, জনসাধারণও এই 'কালা' মানুষটাকে বিদ্রূপ করত।

এ সময় ফ্রান্সে নতুন বিপ্লবের ধ্বনি উচ্চারণ করলেন ভলটেয়ার, রুশো। জামরের কানে মুক্তিমন্ত্র ধ্বনিত হ'ল। অভিজাতদের ঘৃণা, কালা গোলামের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সুবিধাপ্রাপ্তদের পাশব ব্যবহারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সে নিজে। বিপ্লবী রুশোর লেখা তার ভাল লাগল। যে যুগে ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বময় বোম্বেটেগিরি ও দস্যুপণা করে নতুন ধনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতে ব্যস্ত, বাংলায় ইংরেজ আর ফরাসীরা আপন আপন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতা করেছে, ঠিক সেই সময় রুশোর "Institutions Politiques" য়ুরোপে চাঞ্চল্য এনে দিল।

রুশোর নতুন নতুন মত বাংলার এই তরুণের মনে মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করল। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, শ্বেতাঙ্গতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার মনে একটা অগ্নি ধূমায়িত হতে লাগল।

মাদাম দু বারী ওর মনের আগুনের পরিচয় পেল না। ১৫শ লুইর মৃত্যুর 'পর গণিকা মাদাম দু বারী রাজসংশ্রব থেকে বিতাড়িত হ'ল। লোজানে তখন তার গৃহে নিত্য ১৬শ লুইর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্য অভিজাতরা সমবেত হতে লাগল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব। অত্যাচারিত জনতা ক্ষেপে উঠেছে। বাংলার তরুণের বয়স তখন প্রায় ২৮ বৎসর। রুশোর এই মন্ত্রশিষ্য মাদাম দু বারীর মত গণিকার আলয়ে বসে ব্যভিচারী অভিজাতদের আর গোলামী করতে পারে না। সে গুপ্ত বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলে। অভিজাতদের কার্য্য-কলাপের উপর নজর রাখবার জন্যে ভার্সাইলে যে বিপ্লবী সমিতি গঠিত হ'ল, তার সেক্রেটারী হয় জামর। তার সহযোগী ইংরেজ বিপ্লবী গ্রীভ। মাদাম দু বারীর ঘরের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সব কথা দিনের পর দিন জামর গ্রীভকে জানাতে থাকে। গ্রীভের অভিযোগে মাদাম দু বারীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। কিন্তু প্রতিবেশীরা তাকে ছাড়িয়ে আনল। তখন গ্রীভ দু বারীর কুকীর্ত্তি ও ষড়যন্ত্রের সব কথা প্রকাশ করে দিল এক পুস্তিকায়। দু বারী এবার বুঝল, বাঙ্গালী গোলামের হাত আছে পুঁথিতে। তাকে ঘর থেকে সে বের করে দিল।

জামর এবার হয়ে উঠল প্রকাশ্যে ভয়ঙ্কর বিপ্লবী। ভার্সাইল বিপ্লব সমিতি মাদাম দু বারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের করল। গ্রীভ নিজে গিয়ে এই নারকী নারীকে টেনে এনে প্যারীর সঁপেলজি কারাগারে নিক্ষেপ করল।

বিপ্লবীদের অভিযোগ—মাদাম দু বারী বার বার ইংলণ্ডে যেত রাজনৈতিক মতলবে, ইংলণ্ডে পলাতক ফরাসী অভিজাতদের সে বিপুল অর্থ-সাহায্য করত, বিপ্লব ব্যর্থ করবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করত। মামলার অন্যতম সাক্ষী হল বাংলার তরুণ জামর।

অভিযোগে জামরের পরিচয়—"জামর ভারতবাসী। তার ৪ বছর বয়সে ১৫শ লুইর অনুচররা বাংলার নিভৃত পল্লীতে তার বাপ-মার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসে। ১৫শ লুই সামান্য কুকুর-বিড়ালের মত মাদাম দু বারীকে এই গোলাম বখশিস দেয়।"

১৭৯৩, ৬ই ডিসেম্বর বিচার। জামর তার জবানবন্দীতে বলল—"আমার নাম লুই বেনেডিক্ট জামর। বয়স ৩১। ভারতের অন্তর্গত বাংলায় আমার জন্ম। এখন আমি ভার্সাইলের কমিটি অব পাবলিক সেফটির আশ্রয়ে আছি। এক জাহাজের অধ্যক্ষ আমাকে ফ্রান্সে নিয়ে আসে। ১০ বছর বয়সে আমি আসামীর গোলাম হই। দেশভক্ত সংবাদপত্রাদিতে আসামীর প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হচ্ছে দেখে আমি তাকে তার কতক সম্পত্তি দেশের কাজে দান করতে বলি। সে তা শুনে না। তার গৃহে অনেক অভিজাত যাতায়াত করত। সাধারণতন্ত্রের পরাজয়ে তারা আনন্দ প্রকাশ করত। মাদাম দু বারীকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিলে, সে তা শুনে না। যখন সে জানল যে, গ্রীভের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে এবং গ্রীভ, ফ্রাঙ্কলি, মারাপ প্রভৃতি দেশভক্তের আমি সহযোগী, তখন সে রেগে আমায় বললে—তিন দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যাও।"

বিচারে হুকুম হ'ল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাদাম দু বারীকে হত্যা কর। বধমঞ্চে মৃত্যুভয়ভীতা দু বারীর প্রাণরক্ষার আর্ত্তনাদে নিত্য অপমানিত গোলাম বিচলিত হ'ল না। কিন্তু বিপ্লবীরা অভিজাত-গৃহে লালিত জামরকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। দু বারীর মৃত্যুদণ্ডের

তিন সপ্তাহ পর তাকেও কারাগারে পাঠান হল। বন্ধুবান্ধবরা ছ হপ্তার পর তাকে খালাস করল। আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার পর ফ্রান্সে কত কাণ্ড হয়েছে। গোটা য়ুরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে। কত রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, কত নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে। ওয়াটার্লু'র যুদ্ধও হয়ে গেছে। সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

হঠাৎ ১৮শ লুইর আমলে জামরকে দেখা গেল প্যারীর এক দরিদ্র জঘন্য পল্লীর এক জীর্ণ অন্ধকার ঘরে। শিক্ষকতা করে। মেজাজ বড় রুক্ষ। তার প্রহার সইতে না পেরে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সব পালিয়েছে।

দিন আর তার চলেনি। করুণা কেউ করেনি, অনাহারে, মর্ম্ম পীড়ায় বঙ্গজননীর ক্রোড়-বিচ্ছিন্ন হতভাগ্য জামর কুকুর-বিড়ালের মত ফ্রান্সের এক দরিদ্র পল্লীকুটিরে মরে পড়ে রইল। সে ছিল চির-বিপ্লবী, সেদিন সর্ব্বস্বহীন। কিন্তু মরবার পর তার ঘরে দুটি মহাসম্পদ কুড়িয়ে পাওয়া গেল—একখানা বিপ্লবী মারাটের ছবি আর একখানা বিপ্লবী রবসপিয়ারের ছবি।

সোনার বাংলাকে যখন ভারতের জাতীয়তার প্রতি দরদমাত্রহীন এক বিদেশী 'তুরুক' বাদশা আর এক বিদেশীর কাছে বাঁধা দিল, সে বিদেশী সঙ্কল্প করল মাত্র এক-একটা মানুষ লুঠে সওদাগরী করতে নয়, তারা গোটা জাতকে ক্রীতদাস করবার মতলব করল। বাংলায় এর প্রতিবন্ধক হয়েছিল চন্দননগর। মসনদ-সর্ব্বস্ব বাংলার নবাবরা অতি দেরীতে ভুল বুঝেছিল। আলিবর্দ্দী মরবার সময় নাতি নবাবকে বলে গেছল—"ইংরেজকে গোলাম বানিয়ে রাখ। ওদের ফৌজ ফ্যাক্টারী গড়তে দিও না। যদি দাও দেশ হবে তাদের, তোমার নয় (এপ্রিল, ১৭৫৬)। য়ুরোপীর রাজনীতির খবর আলিবর্দ্দীও রাখত, সিরাজও রাখত। তাই ইংরেজের শত্রু চন্দননগরের ফরাসীদের সাহায্য তারা নিয়েছিল। চন্দননগরে ফরাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের লোককে উত্তেজিত করছিল দেখে ফরাসীদের কাছে রবার্ট এডামস্ প্রভৃতি লিখেছিল "....you agitate, assist and excite the country people in friendship with us not only to take up arms, but appear with them against us in a hostile manner" (২১শে অক্টোবর, ১৭৩৬)। এ দেশের লোক যাদের সঙ্গে আমাদের ভাব আছে, আমাদের উপর হাতিয়ার উঠাতে তোমরা তাদের মধ্যে আন্দোলন করছ। তাদের সাহায্য করছ, তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছ। মাত্র তাই নয়, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেও গিয়ে দাঁড়াচ্ছ।" আইরিশ বিপ্লবী কাউণ্ট দা ল্যালি, বৃটেনের ১৬৮৮র বিপ্লবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আয়র্ল্যাণ্ড ও আইরিশ জাত ও ধর্ম্মকে ইংরেজ পদমর্দ্দিত করছিল। তাই ল্যালি ইংরেজ জাতকে তীব্র ঘৃণা করত। আইরিশ রেজিমেণ্ট নিয়ে ল্যালি চন্দননগরে এসে ইংরেজের দুষমণ ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

তলোয়ারের টানে কলকাতা নাম কেটে বাংলার নবাব যেদিন আলিনগর নাম লিখতে চাইল, তখন তার সেই কলকাতা আক্রমণে সাহায্য করবার জন্য চন্দননগর ২৫০ পিপে বারুদ পাঠাল। ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা দখল করতে নবাবের গোলন্দাজ ফৌজেও ফরাসীরা যোগ দিল। ফিরিঙ্গী-কলকাতা দখল করবার পর সিরাজ জানাল দিল্লীর বাদশাকে—অবশেষে বাংলা থেকে ইংরেজ দূর! কলকাতার নাম হ'ল খোদার বন্দর আলিনগর।

"The brutal Soubahdar informed his master, upon the tottering throne of Delhi, that he had expelled the English from Bengal, forbid Englishmen for ever to dwell within its precincts, purged Calcutta of the infedals and to commomerate the event called it by a new name Alinagar, the Port of God."

চন্দননগরেও ফরাসীদের ষড়যন্ত্র। ফ্রান্সের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ য়ুরোপে। চন্দননগরের প্রতি ফ্রান্সের নির্দ্দেশ, ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াও। কিন্তু মতলব গোপন করে চন্দননগরের ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজকে বলল, আমরা রইলাম নিরপেক্ষ। ক্লাইভের গুপ্ত-চররা কিন্তু সংবাদ দিল যে, সিরাজ ফরাসী সেনাপতি বুশিকে হীরা-মাণিক বখশিস দিয়ে জানিয়েছে ক্লাইভের বিরুদ্ধে সদলবলে শীগগির এসে তিনি যেন সাহায্য করেন। ক্লাইভের গুপ্তচররা সংবাদ দিল, ফরাসী ফ্যাক্টরীর মিঃ লকে নবাব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিহারে পাঠিয়েছে। ক্লাইভ তার কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে জানাল, "ফ্রান্সের সঙ্গে নবাবের যোগাযোগ আসন্ন। দুই দিনই হৌক, আর এক দিনই হৌক দেরী হলেই কোম্পানী রসাতলে যাবে।" ক্লাইব তাই চাইল চন্দননগর আক্রমণ করতে। সিরাজ চাইল, ইংরেজের শক্তির প্রতিষেধকরূপে ফরাসীদের সমর্থন করতে। ফরাসডাঙ্গায় নবাবের ফৌজদার আর ফৌজদারের দেওয়ান নন্দকুমার চাইল তিন যবনে লড়াই হয়ে ওদের সবারই শক্তিক্ষয় হৌক। তার পর তিন দুষমণদের শবের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে বাংলায় হিন্দুরাজ্য। ফরাসডাঙ্গায় বসে নন্দকুমার যবন-নাগপাশ থেকে জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে কূটনীতিক চাল চাললেন। বাংলার শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিক নন্দকুমারকে বিলেতে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। তাই দেখে ঐতিহাসিকরা অবাক হয়ে বললেন—"It is impossible to account for the way in which the influence of this bad Brahmin prevailed in London except by supposing that he had gained partizans in very high quarters by use of money in a way which disgraced the receipents."

ফৌজদার নন্দকুমার (ফরাসীরা ডাকত, Recu de-Nundcomar) চন্দননগরে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকেও টাকা ধার দিয়ে হাতে রাখলেন।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ নেবার মত বুদ্ধি ও শক্তি সে যুগে নন্দকুমার ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাই না। যবনাধিকার, যবনাক্রমণ থেকে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে রক্ষা করবার কেন্দ্র হয়েছিল সেদিন ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান নন্দকুমারের বাড়ী আর চৌধুরীপাড়ার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী। চন্দননগরে বসেই তিনি ফরাসী সামরিক সাহায্য

পাঠিয়েছিলেন সিরাজকে, চন্দননগরে বসেই মিতালী করেছিলেন ইংরেজের সঙ্গে, আবার এই চন্দননগরই ছিল দিল্লীর বাদশা, মারাঠা, ফরাসী, জঙ্গী সন্ন্যাসী দল আর বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধি হিন্দু বণিক ও জমিদারদের মুক্তি-ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। পলাশীর যুদ্ধের পর দশ বছরের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় তারও মূল কেন্দ্র হয়েছিল চন্দননগরে নন্দকুমারের বাড়ীতে। বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজা, রায়দুর্লভ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্রের চিঠি ইংরেজ ধরে ফেলেছিল। এখান থেকেই দিল্লীর বাদশার কাছে নন্দকুমার এই মর্ম্মে চিঠি লিখেছিলেন যে, "If he would drive the English out of the Country he would make him a Nazuarana of a Crore of Rupees and give up the Patna Provincc to his possession." পলাশীর ৫ বছরের মধ্যে ইংরেজ এই চিঠি ধরে ফেলে তাঁকে ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছিল।

ক্লাইভ চন্দননগরের বিপ্লব কেন্দ্র একেবারে ধ্বংস করবার আয়োজন করেছিল পলাশীর এক বছর আগে। ও চেয়েছিল ফরাসীদের বাংলা থেকে তাড়ালেই সিরাজকে তাড়ান সহজ হবে।

ক্লাইভ চন্দননগর সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সর্ব্বনাশ করে কোটি কোটি টাকা ক্লাইভ লুঠে নিয়েছিল। ফৌজদার নন্দকুমার ফরাসী-ইংরেজের অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার ভবিষ্যৎ কার্য্য-পরিকল্পনা পণ্ড করতে চাননি। সিরাজ বলেছিল, নন্দকুমারকে ইংরেজরা টাকা দিয়ে বশ করেছে। সিরাজ বুঝেছিল, তার অপশাসনের যারা প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর, তাদের নেতৃ-কেন্দ্র হচ্ছে ফরাসডাঙ্গা। ইংরেজের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ করবার আগে তাই নন্দকুমারকে সে পদচ্যুত করেছিল।

পলাশীর চরম আঘাতের আগে ইংরেজ চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রে ফ্রান্সের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দিল। তবু পলাশীর যুদ্ধে ফরাসীরা শেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুসে লর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ল অযোধ্যার নবাব, দিল্লীর বাদশার সাহায্যে নতুন রাষ্ট্রবিপ্লবের কল্পনা করেছিল।

"The French unostentatiously influencing all parties against the English, but their position was one of such commanding strength that none dared to strike the 1st blow..Band after band of Rohilla, Rajpoot, Mahratta, Sikh and Jaut moved about in concert or in conflict."

এর পর দেশের স্বাধীনতার জন্য যেন দুই রকমের সংগ্রামের ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। এক দলে বাংলার মুসলমান নবাব, ডাচ, ফরাসী, দিল্লীর বাদশা, অযোধ্যার নবাব, রোহিলা, রাজপুত, মারাঠা, শিখ ও জাঠ—এরা মুসলমান আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। ইংরেজের সঙ্গে এরা কোন মতেই সহযোগিতা করেনি। অন্য দলে মুসলমান শাসনতন্ত্রের অত্যাচারে বিপন্ন হিন্দু শ্রেষ্ঠগণ; এরা ইংরেজের সাহায্যে প্রথমে নবাব ও নবাবের বৈদেশিক মিত্রদের উৎখাত করে, রাষ্ট্রতন্ত্র হিন্দু-আয়ত্ত করবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু ইংরেজরা পলাশীর পর পণ্য গ্রাসে মত্ত না থেকে, যখন রাষ্ট্র গ্রাসের আয়োজন করল, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে এদের অভিযান সুরু হয়েছিল। ফরাসী ছুতোর ওয়ালটার রেনার্ড এ সময় চন্দননগরে ফরাসী সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। চন্দননগর ধ্বংসে সে মন-মরা হয়ে পড়ে থাকত বলে তাকে সবাই Sombre বলে ঠাট্টা করত, সেই থেকে তাকে সবাই সমরু বলে ডাকত। মুসে ল'য়ের সঙ্গে সেও অযোধ্যার নবাব সুফদারজঙ্গের সৈন্যদলে গুরগণ খাঁর সহায়তায় যোগ দিল মীর কাশেমের সৈন্যদলে, কখনও ভরতপুরে জাঠদের সঙ্গে, মারাঠাদের সঙ্গে অবশেষে দিল্লীর বাদশার সঙ্গে আপনার ফরাসী সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিশোধের সুযোগের সন্ধান করল সমরু। তারই অনুকরণে ভারতের সর্ব্বত্র সে যুগের ইংরেজবিদ্বেষী কতকগুলো দলের পত্তন হয়েছিল।

১৭৬৩। প্যারির সন্ধিতে য়ুরোপে ইংরেজের সঙ্গে ফ্রান্সের মিটমাট হলে চন্দননগর আবার ফিরে পেল ফরাসীরা। কিন্তু নতুন সংগ্রাম ধূমায়িত হচ্ছিল। ড্রেন মেরামতের অছিলায় চন্দননগরের চার দিকে গভীর খাদ তৈরী হতে লাগল (১৭৬৯)। ইংরেজের ধমকে মুসে শিভালিয়ার কান দিল না। যা-কিছু ধন-সম্পদ জাহাজে বোঝাই করে ফরাসীরা য়ুরোপে চালান দিতে চাইল। বাধা দিলে ইংরেজের গোলাম নবাব—চন্দননগর ঘিরে ফেলল। ফরাসীরা রীতিমত লড়াই করল, তাদের গোলায় অনেক মরল। ফলে চন্দননগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল।—("the consequence was the destruction of the town. The Nabab's people pulled down the houses and laid everything in ruins."

—(Col. Thomas, Dean Pearse's letter)

এর প্রায় ১০ বছরের মধ্যে আবার ইংরেজের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বেধে গেল। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে ফরাসীরা মারাঠা, বাদশা প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। বাদশা বাংলা দেশ ফিরে পাবার দাবী করল। ("It is the act French, and that the king of Mahrattas are in league with them against us."—Col. Pearse)

১৭৭৮এ বৃটেনে সংবাদ পৌঁছল ভারতে বৃটেন বিপন্ন। ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। আমেরিকায় স্বাধীনতার যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে তাতে ফ্রান্সের রাজা ১৬শ লুই সৈন্য সাহায্য করেছে। ইংরেজের রাজকোষ শূন্য। হেষ্টিংসের উপর হুকুম এল, যেমন করে পার টাকা লুঠে পাঠাও। সেকালের ভাষায়—"Hastings deliberataly medited a robbery". সে চৈৎ সিংএর যথাসর্ব্বস্ব যেমন লুঠল, বাংলায় ফরাসী বিপ্লব-কেন্দ্র চন্দননগর দখল করে সব অধিবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুঠে তাদের বর্ব্বরের মত বন্দী করে। কলকাতায় চোর-ডাকাতের জেলে দিনের পর দিন আবদ্ধ করে রাখল।

[Governor Genaral in Council, Fort William to Hon'ble The Chevalier de la Brittane, Governor Gencral of the Island of Mauritius and Bourbon. Dated 15. 2. 1778.

"In consequence of certain advices, which we had received from Europe of open hostilities between the Crown of France and Great Britain, it became our duty to take immediate possession

of the town of Chundernagore and to secure the inhabitants as prisoners of war."]

১৭৮১, এপ্রিল। 'হিকিজ গেজেটে' একজন পত্রলেখক (Anti Gallican) মিঃ হিকিকে লিখছেন—

"We had torn the peaceable merchants of Chandernagore from their wives, families, and dearest connections, had dragged them to Calcutta and committed them to a prison destined for the reception of falons."

পাঁচ বছর পর চন্দননগর ইংরেজরা ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ চন্দননগরবাসী আগামী মহাবিপ্লবের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আমেরিকায় চলছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফ্রান্সেও আরম্ভ হ'ল বিপ্লব-তাণ্ডব। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিপ্লবের ধ্বনি ভারতেও প্রতিধ্বনিত হ'ল। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য টলমল। ফরাসী রণ-তরীগুলো বিপ্লব-বার্ত্তা বহন করে ভারতের কূলে কূলে হানা দিতে লাগল। বঙ্গোপসাগরে নতুন ফরাসী নৌ-বহর আবির্ভূত হতেই মাদ্রাজ ও বাংলা কাঁপতে লাগল।

চন্দননগরে সেদিন যে গণ-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তা সর্ব্বপ্রথম।

গৌরহাটীর বাগান-বাড়ীতে গবর্ণর মুসে দা মন্টিসি আরাম করছেন। চন্দননগরের অধিবাসীরা দলে দলে চলল তার সন্ধানে। তারা গবর্ণরকে ধরে মহা বিজয়-উল্লাসে নিয়ে এল চন্দননগরে। আবদ্ধ করে রাখল 'Durance Vile'-তে।

গিলটিনের আশঙ্কায় ফরাসী গবর্ণর ইংরেজের কাছে আবেদন করেছিল। ইংরেজরা গিয়ে জনতার বিক্ষোভ দমন করে।

সমসাময়িক কলকাতা গেজেটের বিবরণ—

"....the chief (M. Fumeron) was for many months denied admission to the town by the people, who uniformly resisted his authority. So at length, seeing no hope of a change in the sentiments of those over whom he was intended to preside, he quietly embarked from Calcutta to Pondicherry." (ফরাসডাঙ্গার লোকে পণ্ডিচেরীর নাম দিয়েছিল "ফুলচুরি")।

বিপদের আশঙ্কা করে,—ইংরেজ আবার চন্দননগর দখল করে, ফরাসী সরকারের যত দামী সম্পত্তি লুঠে (এমন কি সরকারী পাল্কী পর্য্যন্ত) ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলামে বিক্রী করে দেশে টাকা পাঠাল।

তাহলে কি হবে ? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ফরাসী বিপ্লবের চন্দননগর বাঙ্গালার গণ-আন্দোলনকে প্রেরণা দিতে সুরু করল। ফরাসী প্রভাব ও উত্তেজনায় সমগ্র ভারত ইংরেজকে সমবেত ভাবে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। প্রধান সেনাপতি General Sir James Graig জানালেন—"the fate of our Empire in India probably hung by a thread of the slightest texture..A defensive war must even be ruinous to us in India and we have no means for conducting an offensive one."

ফরাসীরা সেদিন মুসলমান রাজ্যগুলোর সঙ্গেও মিতালী করে বাইরে থেকে ভারত আক্রমণের আয়োজন করছিল।

["It was feared that all Mahomedan India would rise in revolt at the appearance of an allied French and Mussalman force anywhere."]

সেপাই বিপ্লবের রাজনৈতিক কেন্দ্র কলকাতায় ইংরেজের কৃপাপুষ্টরা এক জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন চালালেও তা বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ কখনই ছিল না। বিপ্লব-আভাষ পাই ১৮৩০-এ, যখন ফরাসী বিপ্লবের ঝঞ্ঝা-প্রভাব কলকাতাকে আলোড়িত করে ইংরেজ মুনিব তথা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রচারক পাদরীদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল। ফরাসী প্রভাবে ও প্ররোচনায় গোটা ভারত তখন সমবেত ভাবে ইংরেজকে আক্রমণ করবার আয়োজন করেছিল। চন্দননগরেও তখন গুপ্ত আয়োজন। নেপোলিয়ান ভারত আক্রমণ করে ইংরেজের কবল থেকে দেশ মুক্ত করবেন, এ কম উল্লাসের কথা নয়। ঐতিহাসিক বলল—

"Under French influence and instigation all India seemed ripe for a combined attack upon the English.…It was feared that all Mahomedan India would rise in revolt at the appearance of an allied French and Mussalman force anywhere."

সেপাই বিপ্লব এই ফরাসী আয়োজনের পরিণতি। এই সময় বাংলার বিপ্লবী কবির প্রথম তূর্য্যনিনাদ—

"চল মম সঙ্গে চল, কহে বীরেন্দ্র গম্ভীরে—
এস বীরবৃন্দ এস, শত্রু দেখিব কীদৃশ ?
অদৃষ্টে যা আছে, হবে, মৃত্যু আলিঙ্গিব সুখে,
যথা মাতৃভূমি হায়, কবলিত শত্রুগ্রাসে ;
জননীর ঋণ শুধি, মারিব—মরিব নহে।"

লর্ড রিপণের স্বায়ত্ত-শাসন বিল কলকাতায় বিপ্লবোত্তর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যখন তুষ্ট করছিল, সঙ্গে সঙ্গেই চন্দননগরে মঁসিয়ে ক্রুহের ঘোষণা প্রকাশিত হ'ল: "রাজ্য-শাসনের প্রথম ও প্রধান কার্য্য এই যে, সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের স্বত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা ও তাহা কার্য্যে দেখান।" এই ঘোষণার প্রায় ৩ মাস পরেই চন্দননগরের জনসাধারণ ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধিনায়কের কাছে স্বাধিকারের আবেদন করেছিল। কি স্বাধিকার চাওয়া যাবে এই নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। এক জনসভায় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন ভাল বিদ্যালয়। প্রতিপক্ষ আপত্তি করে বলেছিল ওতে ভূদেব বাবুরই ভা'ল চাকরী হয়ত হবে। শেষে শ্রাদ্ধে উৎসর্গিত বৃষ সম্বন্ধে একটা হাস্যকর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু ভারতের প্রদেশে প্রদেশে তখন বিপ্লবের আয়োজন চলছিল, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল র‍্যাডিকাল সোসাইটী। এ সম্বন্ধে ভোলানাথ দাস, কালাচাঁদ পাল প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাদের কার্য্যকলাপ আজ লোক ভুলে গেছে। ফরাসী জেনারল কাউন্সিলে এঁরা অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যখন করেছিলেন তখন সে দাবীর কল্পনাই ছিল না ভারতের অন্য স্থানের বিপ্লবীদের।

এই র‍্যাডিকাল সোসাইটীর অনেক আগে থেকেই মতিলাল রায়, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, যোগেন সেন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি চন্দননগরকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অস্ত্রাগাররূপে পরিণত করেছিলেন।

কলকাতা থেকে বিপ্লবীরা চন্দননগরের কর্ণধারদের আস্তানায় অস্ত্র-সংগ্রহ ও দেশের নানা স্থানে অস্ত্র প্রেরণ করবার, অস্ত্র গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেছিল। সেকালের 'Englishman' পত্র লিখেছিল—"all the elements of disorder threatened to make Chandernagore its base of operation."

চন্দননগরে ইংরেজ-দ্রোহকর সভা সংগঠন সেদিন পুরো দমে চলেছিল। চন্দননগরের গুপ্ত-সমৃদ্ধ মেয়র সিঁও তারদিভেল বিপ্লবীদের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু ১৯০৮ (মার্চ্চ), বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের ট্রেণ চন্দননগরে ধ্বংস করবার চেষ্টা হতেই ইংরেজরা ফরাসী সরকারকে সতর্ক হতে বলল।

ইংরেজের চোখ-রাঙানীতে তারদিভেল সেদিন 'স্বদেশী সভা' নিষিদ্ধ করেছিলেন, অস্ত্র আইন স্থাপন করেছিলেন চন্দননগরে।

বিপ্লবীরা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বোমা মেরে হত্যা করবার আয়োজন করেছিল। ("Then followed that bomb outrage which has given an unwlcome notoriety to the neighbourhood of Rue Carnal, heretofore associated only with the romantic girlhood of Madam Grand."—১১ই এপ্রিল, ১৯০৮)

চন্দননগর বিপ্লবী-কেন্দ্রের পরবর্ত্তী চাঞ্চল্যকর কাহিনীর সব কথাই বাঙ্গালীর আজ জানা হয়ে আছে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের চির-সহচর ফরাসী জাত আর বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নাই। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সব অপকীর্ত্তি ফরাসীরা সমর্থন করতে বাধ্য হলেও, তখনও ভারতীয় বিপ্লবীরা চন্দননগরে আশ্রয় পেয়ে এসেছে। কিন্তু এ কথা বলব, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই ফরাসীরাই যদি আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের বিপ্লব আয়োজনের সংবাদ ইংরেজের কাছে বিক্রী না করত, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯১৯—১৯৪২এর সংগ্রামের কোন প্রয়োজনই হ'ত না

সংবাদপত্রের প্রচার কত ?

দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের নিয়মিত ও ব্যাপক রীতি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটেনের বাসিন্দাগণের মধ্যে যত বেশী প্রচলিত, অন্য কোন দেশে তত নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য সেখানে চলে ৬০০ দৈনিক সংবাদপত্র। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য ৩৫৬টি দৈনিক কাগজ আছে। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের দৈনিক কাগজের সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য। কোটি কোটি বাঙালীর জন্য দৈনিক কাগজ বাঙলা ভাষায় আছে মাত্র ৬খানি। সবচেয়ে কম কাগজ প্রকাশিত হয় কোথায় ? আফগানিস্থান—যেখানে প্রতি হাজার হাজার মানুষের জন্য আছে মাত্র একখানি দৈনিক সংবাদপত্র।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

তৃতীয় পর্যায়

১

প্যারিসের পথে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না সে বছরে। দেশ আলো করে রাজা তখনও ছিলেন বটে, কিন্তু পথঘাটের অসুবিধাই শুধু নয়—দিন বদলের অন্য ঝুঁকিও বড়ো কম ছিল না। সহরে-গাঁয়ে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গাদা বন্দুক নিয়ে বিপ্লবী ফৌজের ছোট ছোট দল টহল দেয়, আসা-যাওয়ার পথে লোকের ওপর নজর রাখে। সীমান্ত ডিঙিয়ে আসতে-যেতে হলে পথিককে কাগজ-পত্র দেখাতে হয়—সনাক্ত হতে হয়—জাহাজ জাহাজ কৈফিয়ৎ দিয়েও সন্তুষ্ট করতে না পারলে বিপ্লবীদের শাস্তি নিতে হয়। আর সে আইনে ইতিহাসের নতুন প্রত্যুষে নয়া পত্তনীর বনিয়াদ। লোকের মুখে তখন এক আওয়াজ—সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। আমাদের গণতন্ত্র এক অখণ্ড।

ফ্রান্সের জমিতে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ডার্নের বুঝতে বাকী রইল না যে, এর পর ইংলণ্ডে ফেরার পথ তার পক্ষে শাণিত দুরত্যয়া দুর্গম পথ। প্যারিসে গিয়ে এই সব প্রহরীদের যারা কর্তা তাদের নিজের কাগজ-পত্র দেখিয়ে তুষ্ট করতে না পারলে তার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কয়েক পা অন্তর অন্তর সে যেন হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগোচ্ছে। সর্বত্র সতর্ক সন্দিহান দৃষ্টি, কারা যেন বেড়াজাল দিয়ে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলছে। এক এক গ্রাম উজিয়ে যাচ্ছে সে, আর পিছনে লোহার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে কারা।

নজরে থেকে থেকে ডার্নের যেন হাঁফ ধরে যায়। এগিয়ে যাচ্ছে সে অন্য মনে, হঠাৎ দেখলে কারা যেন পিছন পিছন আসছে ছায়ার মত। কত বার তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের তলবে। এক পা এগোতে বিশ পা পেছোতে হচ্ছে।

এমনি একদিন হা-ক্লান্ত হয়ে ডার্নে এক গ্রামের পান্থশালায় বিশ্রাম নিচ্ছিল রাত্রে। এত দূর অবধি গ্যাবেলের চিঠিখানিই তাকে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এই গ্রামে এসে বিপ্লবীদের কথাবার্তা শুনে অবধি তার মনের শান্তি ঘুচে গেল। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা নিয়েই ঘুমোতে গিয়েছিল ডার্নে।

রাত্রে কাদের পায়ের আওয়াজে, গাদা বন্দুকের শব্দে চকিত হয়ে চোখ তাকাল ডার্নে। দেখলে মাথায় মোটা লাল টুপি, মুখে তামাকের পাইপ দিয়ে তিন জন লোক বন্দুক ঠুকে তার বিছানায় চেপে বসল।

—'আমাদের একজন নাগরিকের অধীনে তোমাকে প্যারিসে চালান দেবার হুকুম দিয়েছি আমি।'

'—প্যারিসে যাবারই ইচ্ছা আমার। তবে কোন সঙ্গী না হলেও চলবে।'

—'সে কি? তুমি হলে জমিদার—তোমার সঙ্গে লোক না দিলে কি হয়? অবশ্য তার খরচ জমা দিতে হবে আগে।'

ডার্নে শান্ত কণ্ঠে বললে—'তাতে আপত্তি করব না আমি।'

—'আমাদের হাতে পড়েছ, তাই বিচারের আশা আছে। নইলে সরাসরি স্বর্গে যেতে। যাক, চটপট তৈরী হয়ে নাও।'

দু'জন পাহারাদারের খরচা হিসেবে অনেক টাকা এখানকার ঘাঁটিতে জমা দিতে হোল ডার্নেকে। তারা তাকে ভোর তিনটেয় নিয়ে বেরুল। রাতের শিশিরে কুয়াশায় তখনও আকাশ-মাটি ভিজে। একটু পরেই তীরের ফলার মত বৃষ্টি নামল।

সারা দিন বিশ্রাম আর গা-আঁধারি সন্ধ্যে হলেই যাত্রা। সারা রাত যাওয়া আর ভোর হলেই বিশ্রাম। এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম উজিয়ে যেতে লাগল ডার্নে। সঙ্গে দু'জন পাহারাদার থাকায় অস্বস্তি হলেও নিজের নিরাপত্তার কোন আশঙ্কা ছিল না তার। প্যারিসে গিয়ে একবার পৌছলেই তার সমস্ত অস্বস্তি-অশান্তির অবসান ঘটবে। গ্যাবেলকে সে কারামুক্ত করবেই। মনুষ্যত্বের আবেদনে এত দূর সে ছুটে এসেছে, নিজের সামান্য অসুবিধায় কি করে এখন পিছিয়ে যাবে?

Beaurairs সহরেই ডার্নে প্রথম বিভীষিকা দেখলে। দু'জন পাহারাদারের সঙ্গে ঘোড়া বদলের জায়গায় নামতেই এক দল লোক তাকে ঘিরে ফেললে। তাদের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে ডার্নের বুঝতে বাকী রইল না যে, তারা কি চায়। 'দেশত্যাগীর খুন চাই।' জনতার চোখে হিংসা, মুখে হত্যার মাদকতা, কণ্ঠে এক আওয়াজ—'খুন চাই, খুন চাই।'

উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচবার আশায় স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডার্নে বললে—'দেশত্যাগী কি বলছেন আপনারা? দেখছেন না আমি স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছি দেশে।'

হাতের কুড়ুল উঁচিয়ে একটা লোক যেন তেড়ে এল তার দিকে—'দেশত্যাগী। দেশত্যাগী নও শুধু, তুমি হলে ঘৃণ্য জমিদার। তোমায় খুন করব আমরা।'

মারমুখী জনতার আক্রমণ থেকে ডার্নেকে বাঁচালে পোষ্টমাষ্টার। তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে সে সকলকে উদ্দেশ করে বললে—'তোমরা উতলা হচ্ছ কেন ভাই-বন্ধুরা? আগে প্যারিসে এর বিচার হোক্—তার পর যা হবার তা ত হবেই।'

ডার্নেকে নিয়ে লোকটা ভেতরে গিয়ে গেট বন্ধ করে দিলে। কিন্তু জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেটের ওপর। কাস্তে হাতুড়ী কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল লোহার দরজায়। কিন্তু তার পর কি জানি কেন সব ঝিমিয়ে গেল। পাতলা হয়ে এল জনতা।

সে রাত্রে সহর ঘুমোলে পাহারাদারদের নিয়ে নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল ডার্নে। এখানে থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য। আর গ্যাবেলকে বাঁচাতে এসে এ ভাবে পথে-বিপথে খুন হতে পারবে না সে।

ঠাণ্ডায় কুয়াশায় পালাতে লাগল ডার্নে দু'জন সঙ্গী নিয়ে। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে আলের ওপর দিয়ে ঝোপঝাড় পেরিয়ে সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে ভোরের আলোর সঙ্গে প্যারিসের গেটে এসে পৌছল ডার্নে।

সশস্ত্র সান্ত্রী প্রহরী বসে। তাদের দেখেই এক দল লোক এসে বললে—'কই, কয়েদীর কাগজ-পত্তর দেখি।'

—'কয়েদী!' অবাক হোল ডার্নে। 'কয়েদী আবার কে? আমি ফরাসী নাগরিক। দেশের এই অরাজক অবস্থায় পথের বিপদ বুঝে

দু'জন পাহারাদার নিয়ে এসেছি সঙ্গে। এদের খরচ-পত্তর অবধি আমি দিয়েছি। আমি কি করে দেশত্যাগী হলাম?'

কিন্তু সে কথার জবাব দিল না কেউ। প্রহরীর হাত থেকে ডার্ণের কাগজপত্র নিয়ে লোকটা গার্ড-রুমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কতক্ষণ পরে ডার্ণের ডাক পড়ল। ঘরের মধ্যে এক জন তাকে দেখিয়ে বললে—'কমরেড ডুফর্ণ, দেখ তো এই লোকটাই ডার্ণে কি না?'

—'হ্যাঁ—এই ত।'

—'তোমার বয়স কত?'

—'সাঁয়ত্রিশ হবে।'

—'বিবাহিত?'

—'হ্যাঁ'—

—'কোথায় বিয়ে হয়েছিল?'

—'ইংল্যাণ্ডে।'

—'তা ত বটেই। বৌ কোথায়?'

—'সে ইংল্যাণ্ডে আছে।'

—'বেশ, বেশ। লা ফোর্স জেলে চালান দাও কয়েদীকে।'

—'জেলে কেন?'

একের পর এক বিস্ময়ে ডার্ণে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বললে—'জেলে কেন যাব? আমার অপরাধ কি? কি আইনে আমায় তোমরা জেলে পাঠাচ্ছ?'

রূঢ় কণ্ঠের জবাব পেলে ডার্ণে:—'আইন? তুমি চলে যাবার পর এ দেশে নতুন আইন হয়েছে। অপরাধেরও মানে পালটেছে।'

—'আমি তোমাদের মিনতি করছি'—বললে ডার্ণে—'আমি শপথ করে বলছি যে, আপন ইচ্ছাতেই আমি ফ্রান্সে এসেছি। আমাদের দেশের একজন লোক বড় বিপন্ন হয়ে আমায় চিঠি লিখেছিল—সেই চিঠি রয়েছে পড়ে দেখ। কিন্তু আমায় তোমরা দেরী করিয়ে দিও না মিছিমিছি—তাকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। সে অধিকারটুকু দাও আমায়?'

—'অধিকার? দেশত্যাগীর আবার অধিকার কি? যাও।'

ডুফর্জের অনুসরণ করল ডার্ণে। রক্ষি-গৃহের বাইরে এসে প্যারিসের পথে পা দিয়ে ডুফর্জ নীচু-গলায় বললে—'ডাক্তার ম্যানেটের মেয়েকে আপনিই বিয়ে করেছেন?'

চকিত হয়ে মুখ তুললে ডার্ণে। অবাক কণ্ঠে সায় দিলে।

—'আমার নাম ডুফর্জ। প্যারিসে আমার মদের দোকান আছে। হয়ত বা আমার নাম আপনার শোনা থাকতে পারে।'

—'শুনেছি বই কি। আপনার বাড়ীতেই আমার স্ত্রী তার বাবাকে ফিরে পেয়েছিল।'

'স্ত্রী' এই কথাটিতে কি ছিল ডুফর্জ অনিশ্চিত অধীর কণ্ঠে বললে—'কিন্তু এখন এ ভাবে কেন ফিরে এলেন ফ্রান্সে?'

—'এই ত এখুনি বললাম। গ্যাবেলকে উদ্ধার করতেই হবে আমায়। সে আমাদের অনেক উপকার করেছে—সে বড়ো ভাল। কিন্তু আমার কথা বুঝি সত্য মনে হোল না?'

—সত্য হয়ত, কিন্তু আপনার পক্ষে বড় মর্মান্তিক সত্য।'

—'আমি নিজে কিছুই বুঝতে পারছি না'—নিমজ্জমান ডার্ণে আলাপের সূত্র ছাড়তে চাইলে না। বললে—'এবার এসে যা দেখছি এ সব আমার কল্পনার অতীত। যেন একটা ঘূর্ণিতে পড়ে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার পরিচিত—আপনি আমায় সাহায্য করুন।

—'আমার দ্বারা কোন উপকার হবে না'—ড্যফর্জ মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। লোকটির কপালের ক'টি কুঞ্চন-রেখাই শুধু চোখে পড়ল ডার্ণের।

তবু মিনতি-ভরা স্বরে বললে সে—'আর একটি অনুনয়। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্মচারী মিঃ লরি এসেছেন এখানকার শাখা-অফিসে। তাঁকে আমার বড়ো প্রয়োজন। তাঁকে আপনি এই খবরটুকু পৌঁছে দেবেন যে, চার্লস ডার্ণে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হয়ে লা ফোর্স জেলে আটক আছে। শুধু এই খবরটুকু তাঁকে পৌঁছে দেবেন। কথা দিন, দেবেন?'

—'দোবো'—বলে ডুফর্জ একটু ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বললে—'দেশের সেবক আমরা। বিপ্লবের সৈনিক। আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ। আপনার কোন উপকার আমার দ্বারা হবে না।'

আর কোন অনুনয় করা মিথ্যে জেনে নিঃশব্দে ডুফর্জের অনুসরণ করতে লাগল ডার্ণে।

আশ্চর্য লাগে সে এই দলে দলে বন্দীদের সম্বন্ধে লোকের যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেরাও নীরবে তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ময়লা জামা-কাপড় পরে চাষী-মজুররা ক্ষেত-খামারে কি কারখানায় যায়, এ দৃশ্য দেখা যেমন লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে—সুসজ্জিত ভদ্রলোকেরা আজকাল দলে দলে জেলে যাচ্ছে, ফাঁসীতে ঝুলছে,—সেও যেন লোকের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। তাই নতুনত্বের কোন কৌতূহল নেই লোকের চোখে।

একটা সরু গলির বরাবর আসতেই ডার্ণের কানে গেল বক্তৃতার আওয়াজ। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এক জন লোক উত্তেজিত কণ্ঠে রাজার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিল। রাজা ও রাজ-পরিবারের লোকেরা এত কাল ধরে দেশের লোকের কি সর্বনাশ করে এসেছে তারই হিসেব দাখিল করছিল লোকটা। বিষাক্ত তার ভাষা—কর্কশ তার ভঙ্গী।' এই প্রথম জানতে পারলে ডার্ণে যে, রাজা বন্দী হয়েছেন বিপ্লবীদের হাতে। সমস্ত বৈদেশিক রাজপুরুষেরা ফ্রান্স ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় বিপদের এতখানি গুরুত্ব বোঝেনি ডার্ণে। এত দিনে বিপদের সম্বন্ধে সচেতন হোল সে। বুঝল যে, ক্রমাগত বিপদের জালে সে জড়িয়ে পড়ছে—তলিয়ে যাচ্ছে বিপদ-সমুদ্রের গভীরতায়, যেখান থেকে মুক্তির আশা অস্পষ্ট। এমন জানলে কখনই সে এই ভাবে বিপদ বরণ করতে আসত না। স্ত্রী-কন্যার সুখ-নীড় থেকে ছিটকে এসে এমনি করে প্রাণ বিপন্ন করত না খুনীদের হাতে। গণদেবতার রোষ যে এমন নৃশংস ভয়াল, তা কি ভাবতে পেরেছিল সে এই ক'টা দিন আগে?

কিন্তু এক দিনে কতটুকুই বা জানতে পারলে ডার্ণে? দেখতে পেলে এখানকার নরক-লীলা? রক্তস্রোত আর মৃতদেহের স্তূপ তখনো ত চোখে পড়েনি তার—কানে আসেনি মৃত্যুর আর্ত্তনাদ আর জল্লাদী জনতার উল্লাস।

আতঙ্কের কালো ছায়ায় আবৃত তার চেতনার আকাশে সবই

যেন মায়াচ্ছন্ন। শুধু এই অনুভূতিটুকু স্পষ্ট যে, 'স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হোল। নিশ্চিত নিরাপদ গার্হস্থ্য জীবনের দিন-রাত্রি ফুরিয়ে গেল তার। তার পর? সে কথা ভাবার আগেই ত্যফর্জ তাকে লা ফোর্স জেলের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিল।

এক জন প্রহরীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ত্যফর্জ বললে—'মঁসিয়েদের আর এক জন?'

—'বটে! ওদের আরো কত আছে বাবা?'

প্রহরীদের পাহারা, কত অন্ধকার ঘর-বারান্দা পেরিয়ে, কত সিঁড়ি ভেঙে ডার্নে অবশেষে একটা বড় হলঘরে এসে দাঁড়াল। সেখানে একগাদা নারী-পুরুষকে বস্তার মত বন্দী করে রেখেছে প্রহরীরা। ডার্নে আসতেই সবাই একসঙ্গে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করলে। আর সে অভ্যর্থনারই বা কত রূপ কত ভঙ্গী! অন্ধকার চাপা নীচু ছাদের ঘরে দুর্গন্ধ আর ময়লার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সব বিচিত্র বিবিধ নারী-পুরুষের সাদর আপ্যায়নে ডার্নে যেন মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হোল। তবে কি জীবিত-লোক থেকে সে এসে পড়ল মৃত্যুলোকে? এরা কি সব প্রেত? সংসারের যত রূপ, যত দর্প, যত হাসি আনন্দ আভিজাত্য—যৌবন-জরার যত ধারা সব যেন এই প্রেতলোকে সমবেত হয়েছে। এরা কি সব জীবন্ত মানুষ, ভাবলে ডার্নে। জীবন্ত যদি তবে এদের চোখে এমন মৃতের চাউনি কেন? মরার আগেই তবে কি [illegible] নিশ্চিন্ত হয়েছে? ভাবতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতিহীন হয়ে গেল ডার্নের।

এলিয়ে এল সর্বাঙ্গ। তবে কি এই ক'দিনের নিরন্তর আতঙ্কে আতঙ্কে তার মনই দুর্বল হয়ে পড়েছে? স্বপ্ন দেখছে নাকি তার জরগ্রস্ত মন? এ মায়া না মতিভ্রম, কিছুই স্থির নির্দ্ধারণ করতে পারলে না ডার্নে।

প্রহরী যখন তার গায়ে হাত দিল, সম্বিত ফিরে এল ডার্নের।

—'চল'—

—'কোথায়?'

প্রহরী তাকে নিয়ে গেল লোহার গরাদ-দেওয়া নির্জন সেলে।

—'এখানে আমি একলা থাকব নাকি?'

—'তা জানি না।'

—'আমি কাগজ-কলম কিনতে পারব?'

—'তাও জানি না। তবে আপাততঃ খাবার কিনে খেতে পার। লোক আসবে সময় মত—তাকে জিজ্ঞেসা করলেই সব জানতে পারবে।'

প্রহরী চলে যাবার পর একলা ঘরে পায়চারী করতে লাগল ডার্নে। 'আর কি? ফুরিয়ে গেলাম আমি।' পায়ের নীচে পাতা ময়লা দুর্গন্ধ মাদুরে পোকা গিস্‌গিস্ করছে। দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলে ডার্নে—'এরা বোধ হয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। মরা অবধি কি আর ওদের তর সইবে?'

২

প্যারিসে যে [illegible] একাংশে টেলসন ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস, তার সামনে দেয়াল-ঘেরা মস্ত উঠোন। উঠোন পেরিয়ে লোহার শক্ত গেট। বাড়ীর যিনি জমিদার, মালিক ছিলেন; বিপ্লব সুরু হবার দিন থেকেই তিনি পলাতক। এক দিন যাঁর চর্ব্যচোষ্য-ভোজ্য-পানীয়ের ব্যবস্থায় চার জন পাচক-বামুন হিমসিম খেত, তিনি নিজে পাচকের ছদ্মবেশে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে বেঁচেছেন। বনে দাবাগ্নি জ্বলে উঠলে প্রাণভয়ে পশুরা যেমন পালায়, এই সব বড়লোকরা তেমনি বিপ্লব-বহ্নির ভয়ে কে কোথায় পালিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই।

যাবার সময় সবাই টেলসন ব্যাঙ্কে টাকা-জহরৎ গচ্ছিত রেখে গেছেন। কিন্তু যেদিন বিপ্লব শেষ হবে, সেদিন ক'জন আসবে দাবী নিয়ে? প্রাণের হিসেব পাওয়া যাবে ক'জনের? ঘাতকের হাত এড়িয়ে ফাঁসীর দড়ি থেকে পিছলে পড়ে, জনতার আক্রোশ বাঁচিয়ে যে ক'জন এখনো জেলে দুর্গে প্রাণ নিয়ে শুধছে—তাদের হীরে-জহরতে ধুলো জমছে ব্যাঙ্কের গোপন ঘরে। আর তারই হিসেব মিলিয়ে নিতে এসেছেন লরি এত দূর।

সারা বাড়ী এখন দখল করেছে বিপ্লবীরা।

সেদিন রাতের নিরালায় আগুনের ধারে বসে সেই সব হতভাগ্যদের কথা চিন্তা করতে করতে নির্ভীক মানুষটিরও সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠেছিল। কাচের জানলা খুলে, শার্সি তুলে একবার উঠোনের রক্তাক্ত খুনী যন্ত্রটার দিকে চোখ পড়তেই ত্রস্তে লরি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। শার্সি-জানলা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বসলেন।

উঁচু পাঁচীলের পাহারা ডিঙিয়ে নিশীথ রাতের কলরব ভেসে আসছে পথ থেকে। সে একটানা একঘেয়েমির মধ্যে এক-এক বার প্রেতকণ্ঠের অমর্ত আর্তনাদ উঠছে বুক কাঁপিয়ে, যেন মৃত্তিকার বুকফাটা কান্না কারা পৌঁছে দিতে চাইছে আকাশে।

—'ভগবানকে ধন্যবাদ! আজকের এই ভীষণ রাতে আমার কোন প্রিয়জন নেই এ সহরে। এ বিপদের দিনে ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন।'

একটু পরেই গেটের ঘণ্টা সশব্দে বেজে উঠতেই চকিত হয়ে লরি ভাবলেন—'ঐ আবার ওরা ফিরে এল।'

কান পেতে অনেকক্ষণ শুনলেন। কিন্তু উঠোন থেকে জনতার কোন উল্লাস-ধ্বনি এল না। শুধু একবার গেটের ভারী দরজা খোলার শব্দ হোল—তার পর সব নিঝ্‌ঝুম, চুপচাপ।

একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা পেয়ে বসল যেন। ব্যাঙ্কের প্রহরীরা সবাই বিশ্বস্ত। চারি দিকেই তাদের সশস্ত্র সতর্ক পাহারা। ভয়ের কিছু নেই। তবু এই নির্বান্ধব দেশে নিজের জীবনের চেয়ে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার কথাটাই শত বার করে লরির মনকে আলোড়িত করতে লাগল।

উঠে প্রহরীদের কাছে যাবেন কিনা ভাবছেন এমন সময় তাঁরই দরজা খুলে অচম্বিতে যে দু'জন নর-নারী তাঁরই ঘরে প্রবেশ করল, তাদের দেখে লরির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ডাক্তার ম্যানেটের সঙ্গে এসেছে লুসি। তার সারা মুখে-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতা। হাত বাড়িয়ে লরির আশ্রয়-ভিক্ষা করে যেন ছুটে এল লুসি। তাদের দেখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লরি বললেন—'তোমরা এখানে কেন? এখানে কি?'

বিপর্যস্ত বিবর্ণ মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতেই যেন জীবন-বিন্দু স্থির হয়ে আছে। আকুল কণ্ঠে কেঁদে বললে সে—'তিনি কোথায়?'

—'কার কথা বলছ তুমি ? কি হয়েছে চার্লসের ?'

—'সে যে এখানে এসেছে।'

—'এখানে, প্যারিসে ?'

—'তিন চার—ক'দিন হয়েছে ঠিক মনে নেই—কিছুই মনে করতে পারছি না আমি। কার চিঠি পেয়ে কাকে যেন উদ্ধার করতে তিনি, আসছিলেন প্যারিসে। আমরা কিছুই জানি না। সীমান্তেই নাকি তিনি ধরা পড়েছেন। ওরা তাকে জেলে আটকে রেখেছে।'

বৃদ্ধের অস্ফুট আর্তনাদ শুনলেন লরি আর সেই মুহূর্তে শুনলেন উঠোনে উন্মত্ত জনতার কলগর্জন এসে পড়ল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার ম্যানেট প্রশ্ন করলেন—'বাইরে ও কিসের আওয়াজ ?'

—'ওদিকে তাকাবেন না ডাক্তার ম্যানেট ! দোহাই আপনার। বাইরে মুখ বার করবেন না।'

এতক্ষণে ডাক্তার একবার ভয়হীন প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তার পর পর্দার দড়িতে হাত রেখে বললেন—'ভয় নেই বন্ধু। প্যারিসের সঙ্গে আমার বড়ো মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, জান। আর প্যারিসই বা বলি কেন, সারা ফ্রান্সে এমন কোন বিপ্লবী আজ নেই যে আমায় ব্যাস্টিল দুর্গের বন্দী জেনে আমার দেহ স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করেও, সে শুধু আমাকে বুকে করে জয়োল্লাস করবার জন্যেই করবে। [illegible]তন এক দিন সয়েছি, সেই আমার আজ রক্ষা-কবচ। তার [illegible] সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি। জানতে পেরেছি আমাদের চার্লসের খবর—আসতে পেরেছি এখানে। চার্লসকে আমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবই। সেই কথাই আমি বলছিলাম লুসিকে। কিন্তু তুমি বলো এ গোলমাল কিসের ?'

—'কথা শুনুন ডাক্তার। দয়া করে দেখা দেবেন না। না লুসি, তুমিও বাইরে মুখ বের করো না।' লুসিকে সাপটে নিজের কাছে টেনে নিলেন লরি। বললেন—'অত ভয়ের কি আছে ? চার্লসের কোন অমঙ্গলের কথা আমি শুনিনি। ও যে এই সময়ে প্যারিসে এসেছে এ কথা ঘুণাক্ষরেও আমি জানি না। কোন্ জেলে আছে সে ?'

—'লা ফোর্সে।'

—'শান্ত হও লুসি—এ আত্মহারা হবার সময় নয়। আমি যেমনটি বলব সেই রকম করো—দেখবে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। আজ রাত্রে আর কিছু করবার নেই। এখন বাইরে যাওয়া অসম্ভব। এসো তোমায় আমি পিছনের ঘরে লুকিয়ে রাখি। তোমার বাবার সঙ্গে একটু নিরিবিলি আলোচনা করতে দাও আমায়। জীবন-মৃত্যুর সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এমন অধীর হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

লুসিকে পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজায় চাবী দিলেন লরী। তার পর ডাক্তারের কাছে এসে জানলা খুলে দিলেন। পর্দা সরিয়ে দু'জনে তাকালেন উঠোনের দিকে।

দেখলেন সেই রক্ত-পিপাসিত নারী-পুরুষদের দিকে। এই উঠোনে বিপ্লবীরা বসিয়েছে এক শাণ দেওয়ার যন্ত্র। নিরিবিলিতে অস্ত্র শাণিত করে নিয়ে এরা ছুটে যাচ্ছে হত্যার নেশায়। আবার এক দল আসছে। নিরন্তর এই রক্ত-মিছিলের তরঙ্গ দোল খাচ্ছে এই উঠোনে। রক্ত-মাখা অস্ত্র দিয়ে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এক বীভৎস নারকী জীবন যেন পেয়ে বসেছে প্যারিসকে।

এক ঝলকে দেখে দু'জনে সরে এলেন জানলার কাছ থেকে। ডাক্তার একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন লরির দিকে।

—'এরা জেলের বন্দীদের হত্যা করছে। আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তবে আর দেরী করবেন না। এদের দেখা দিন—নিজের পরিচয় দিন। ওদের বলুন এখুনি আপনাকে লা ফোর্স জেলে নিয়ে যেতে। কত দেরী হয়ে গেছে জানি না—কি সর্বনাশ হোল বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর একটি মুহূর্ত নষ্ট হতে দেবেন না। যা করবার এখুনি করতে হবে।'

ডাক্তার ম্যানেট মুহূর্তে লরির হাতে মৃদু চাপ দিলেন। তার পর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লরি আবার জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

মানুষটির বয়সে পলিত-কেশে আত্মবিশ্বাসে কি ছিল কেমন করে জানবেন লরি, কিন্তু তিনি দেখলেন সবাই চাপা গুঞ্জনে তাঁর কথা শুনলে। তার পর সেই জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলেন ডাক্তার। রুদ্ধশ্বাস লরি কিসের প্রতীক্ষা করছিলেন—এমন সময় তার কানে এল—'বিপ্লবী ম্যানেট জিন্দাবাদ ! লা ফোর্সের বন্দীকে বাঁচাতে হবে। পথ দাও। পথ ছেড়ে দাঁড়াও।'

লরি শুনলেন উদ্বেলিত সহস্র কণ্ঠে জিগীরের প্রতিধ্বনি। ঘটনার এই আকস্মিক উত্তেজনায় কম্পিত বক্ষে লরি আবার জানলা বন্ধ করে দিলেন। পর্দা টেনে দিয়ে ছুটে গেলেন লুসির ঘরে। লুসিকে বললেন কেমন করে তার বাবা জনতার সাহায্য নিয়ে চার্লসকে খুঁজে বের করতে গেলেন।

এতক্ষণে লরী দেখলেন যে, লুসির সঙ্গে মিস্ প্রস ও তার কন্যাও এসেছে। কিন্তু লুসি তার কথা শুনল কিনা তা বুঝতে পারলেন না লরি। স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় মুহ্যমান নারী তাঁর পায়ের কাছে বসে রইল। রাত যেন জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর চেপে বসেছে।

শিশুটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার পাশে বসে থাকতে থাকতে কখন মিস্ প্রস নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ রাত কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে। অধীর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। নিস্তব্ধ রাত্রির পটভূমিকায় লুসির চাপা কান্নার অর্ধস্ফুট গোঙানি শুনতে লাগলেন লরি বসে বসে।

আরো দু'বার গেটের ঘণ্টা বেজেছিল। উত্তেজিত জনতার কলস্বর ছাপিয়ে শাণ-কলের ঘড়-ঘড় শব্দও শোনা গেল কতক্ষণ। লুসি ভয়-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করলে—'ও কিসের শব্দ ?'

এক সময় দিগন্তে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল। লরি আস্তে আস্তে লুসির কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সাবধানে জানলা খুলে বাইরে তাকালেন।

তাকিয়ে দেখলেন বাইরে। দেখলেন সূর্যের আলোয় পৃথিবীও রাঙা হয়ে গিয়েছে। উঠোনের ঐ যন্ত্রটির সর্বাঙ্গেও দেখলেন রক্তের দাগ। কিন্তু এ লাল সূর্যের আলোয় নয়। কোন দিন-শেষেই এ লাল মুছে যাবে না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

উপুড় হয়ে শুয়েছিল। হাত-পা প্রসারিত, কপোল ন্যস্ত একটি হাতে, আর এক হাতে সবুজাভ লিনেনের বালিশে ছোট ছোট ছিদ্র করছিল আনমনে লম্বা সোনার সূঁচ দিয়ে।

জেগেছে অনেকক্ষণ। মধ্যদিনের দুটি প্রহর অতীত হয়েছে। তন্দ্রালস দেহে শিথিল বিস্রস্ত শয্যায় শুয়েছিল একা। সেই শয্যার একটি দিক তার দীঘল চুলের ঢেউয়ে ঢাকা। ঝকঝকে, গভীর, পশমের মত নরম, কোমল, স্পর্শাতুর, অজস্র অসংখ্য চুলের রাশি প্রাণের উত্তাপে উদ্ভাসিত! পিঠের আদ্ধেকটা ঢেকে এই চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার নগ্ন দেহের নীচে, জঙ্ঘার শেষ সীমানাতে ঘন-কুঞ্চিত হয়ে তা অলঙ্কৃত করছিল আশ্চর্য্য দ্যুতিতে। এই অপরূপ কেশদাম যার নীচে এই তরুণী নারী প্রায় আবৃত হয়েছিল, এই ধাতব উজ্জ্বল অলক-গুচ্ছ, এরই জন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার নাগরিকারা তাকে বলত ক্রাইসিস। সিরিয়ার নাগরিকাদের মত চিক্কণ কেশ এ নয়, এশিয়াটিক নারীদের মত রঞ্জিত কেশও নয়, মিশর-সুন্দরীদের মত ধূসর-কৃষ্ণ চুলও নয় এ, এ অলকদাম আর্য্য জাতির কেশের মত, বালুবেলার পরপারের গ্যালিলিয়ানদের মত!

ক্রাইসিস! নামটা তার বড় প্রিয় ছিল। যে সব যুবকরা তার কাছে আসতো, তারা তাকে বলতো ক্রাইসে। কাব্যগাথার অ্যাফ্রোদিতির সঙ্গে তার তুলনা করতো, সকাল বেলা গোলাপ ফুলের সঙ্গে স্তুতির স্তবক অর্ঘ্য দিয়ে যেত তার দ্বারে। অ্যাফ্রোদিতিতে তার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু দেবীর সঙ্গে উপমিতা হতে তার বেশ ভালই লাগতো। প্রায়ই সে মন্দিরে গিয়ে দেবীকে গন্ধবারি আর ওড়না দিয়ে আসতো, লোকে যেমন দেয় বন্ধুকে উপহার।

জেনজারেথের হ্রদের তীরে সৌর-স্নাত প্রচ্ছায়-সঘন গোলাপ ফুলে ভরা এক দেশে তার জন্ম। প্রদোষ কালে তার জননী জেরুজালেম রোডে পথিক ও বণিকদের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে থাকতো, তার পর শব্দহীন প্রান্তরের তৃণরাশির মধ্যে আত্মদান করতো তাদের কাছে। গ্যালিলিতে এই নারীর কদর ছিল খুব। পুরোহিতেরা এড়িয়ে যেত না তার দরজা, কারণ ধর্ম্মে তার মতি ছিল, এবং দানেও ছিল সিদ্ধহস্ত! দেবতার দ্বারে উৎসর্গীকৃত পশুদের জন্য অর্থ দিতে কখনো সে অপারগ হয়নি, চিরন্তনের আশীর্ব্বাদ ছিল তার গৃহ-প্রাঙ্গণের 'পরে। সে যখন সন্তান-সম্ভবা হ'ল, দেহ হ'ল গর্ভভার-মন্থর, স্বামী ছিল না বলে ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে, নামকরা এক জ্যোতিষী তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে এমন এক কন্যার জননী সে হবে, যে কন্যা একটা জাতির সম্পদ-সম্ভার আর পূজার অর্ঘ্য মালার মত গলায় পরবে। এ কী করে সম্ভব হবে জননী তা বুঝে উঠতে পারলো না, কিন্তু কন্যার নাম দিল সে সোরা, হিব্রু ভাষায় যার মানে হ'ল—রাজকুমারী।

ক্রাইসিস এ সব কথা কিছুই জানতো না। জ্যোতিষী তার মাকে বারণ করে দিয়েছিল যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী লোকের কাছে প্রকাশ করলে বিপদ ঘটবে, কারণ তাদের ওপরই এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হবে। নিজের ভবিষ্যৎ ক্রাইসিস কিছুই জানতো না, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনারও তার শেষ ছিল না। অস্ফুট শৈশব-স্মৃতি অল্পই তার মনে ছিল, এ নিয়ে বলতেও তার ভাল লাগতো না। সব চেয়ে স্বচ্ছ স্মৃতি যেটা তার মনে আছে, সে হচ্ছে প্রতিদিনকার ক্লান্ত আর অনিঃশেষ প্রহরগুলির কথা যখন তার মা তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে যেত। আরো মনে আছে,

সেই গোল 'গবাক্ষের কথা যার মধ্য দিয়ে সে হ্রদের জল দেখতে পেত, দেখতে পেত প্রান্তরের ধোঁয়াটে নীলাভা, দেখতে পেত গ্যালিলি প্রদেশের স্বচ্ছ সুন্দর আকাশের অবকাশ! ঝাউ গাছ আর গোলাপী রঙএর অতসী গাছে ঘেরা ছিল বাড়ীটা। ছোট মেয়েরা স্নান করতো, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এক সরোবরে, সেখানে পুষ্পগুচ্ছের অন্তরালে দেখা যেত লাল লাল শুক্তি। ফুল ছিল জলে, ফুল ছিল চার দিকের প্রসারিত প্রান্তরে, আর পাহাড়ের ধারে ফুটতো বড় বড় লিলি ফুল।

বারো বছর বয়সের সময় এক দল তরুণ অশ্বারোহীর সঙ্গে সে পালিয়ে গিয়েছিল। ওদের দেখা পেয়েছিল গ্রামের কুয়োতলায়! ওরা যাচ্ছিল ট্যায়ারে গজদন্ত বিক্রী করতে। অশ্বের পুচ্ছদেশ নানা রঙএর গুচ্ছ দিয়ে সজ্জিত করার জন্য ওরা ইঁদারার পাশে নেমেছিল। তার মনে আছে, ওরা যখন ঘোড়ার পিঠে তাকে তুলে নিল তখন উত্তেজনায় সে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার আরো মনে আছে, সে রাত্তেই একটা নিরিবিলি জায়গা পেয়ে তারা যখন দ্বিতীয় বার নেমেছিল, আকাশে তখন নিবিড় অন্ধকার, একটি তারাও দৃষ্টিসীমায় ছিল না! ট্যায়ারে তাদের প্রবেশের কথাও সে ভোলেনি, সে ছিল তাদের পুরোভাগে ভারবাহী একটি অশ্বের পিঠের ওপরকার ঝুড়ির মধ্যে। মুঠি করে ঘোড়ার কেশর চেপে ধরেছিল সে। গর্ব্বিত ভাবে দুলিয়ে দিয়েছিল নগ্ন দুটি পা, যে শুষ্ক রক্তরেখা নেমে এসেছিল তার জানুর প্রত্যন্ত প্রদেশ দিয়ে, নগরীর নারীরা তা দেখতে পায় এই ছিল ওর মনের ইচ্ছে। সে রাত্তেই তারা মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল, আর গজদন্তের বণিকদের সে অনুসরণ করে এল আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে।

দু'মাস বাদে তারা তাকে একটা ছোট বাড়ীতে রেখে গেল। সে বাড়ীতে ছিল একটা অলিন্দ আর একটা ছোট স্তম্ভ-শ্রেণী! তার একটা ব্রোঞ্জের আয়না ছিল, কার্পেট ছিল, ছিল নতুন কুশন, আর ছিল নাগরিকাদের কেশ-বিন্যাসে নিপুণা প্রিয়দর্শনা এক হিন্দু ক্রীতদাসী!

তার গৃহ ছিল নগরীর একেবারে পূর্ব্ব সীমায়, ব্রাউসিয়নের তরুণ গ্রীকদের সেটা অবজ্ঞাত অঞ্চল। এরই জন্য ওর মার যে ধরণের মানুষের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, সেই বণিক ও পথিকদের ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে তার অনেক দেরী লেগেছিল। তার ক্ষণিকের প্রেমকে সে বেশী দূর টেনে নিত না। কি করে তাদের সঙ্গে ফূর্ত্তি করা যায় তা সে জানতো আর ভালবাসতে সুরু করার আগেই কি করে তাদের পরিত্যাগ করতে হয় তাও সে জানতো। কিন্তু তবু সে দীর্ঘস্থায়ী প্রেম উদ্দীপ্ত করতো। শোনা যায়, তার সঙ্গ-সুখ লাভের জন্য ক্যারাভানের মালিকরা তাদের পণ্যদ্রব্য তার কাছে যে কোন দামে বিক্রী করে মাত্র কয়েকটি রাতের মধ্যে ফকির বনে যেত। তাদের ঐশ্বর্য্যে সে মণিমুক্তা কিনলো, শয়নসজ্জা কিনলো, কিনলো দুর্ল্লভ গন্ধদ্রব্য, মণি-পুষ্প-খচিত পরিচ্ছদ আর চার জন ক্রীতদাস।

অনেক বিদেশী ভাষা সে বুঝতে শিখলো, প্রত্যেক প্রদেশের উপকথাও জেনে নিল। অ্যাসিরিয়ানরা তাকে শোনালো 'ডুনজি' আর 'ইসতারে'র প্রণয়কাহিনী, ফোনেসিয়ানরা বলল 'অ্যাসতোরাথ' আর 'অ্যাডোনিসের' প্রেমকথা। দ্বীপপুঞ্জের গ্রীক তরুণীরা আইফিসের কাহিনী আবৃত্তি করলো তার কাছে আর তারা শেখালো অনেক অদ্ভুত আশ্লেষ-কৌশল। প্রথমটায় এগুলো তার খুব অদ্ভুত লাগলেও পরে তার এত ভাল লাগলো যে, একটি দিনও ও-সব ছাড়া তার চলতো না।

আতালান্তার প্রণয়কাহিনী সে জানতো, আর তারই মত কি করে কৃশতনু কিশোরীরা বলিষ্ঠতম পুরুষের তেজকে ক্ষীণ করে আনে তাও সে জানতো। আর তার হিন্দু ক্রীতদাসী তাকে দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে ধীরে ধীরে পলিব্রোথার বারাঙ্গনাদের জটিল ও বহু-বিস্তৃত শৃঙ্গারকলার প্রতিটি বিষয় অতি নিপুণ ভাবে শিখিয়েছিল। সঙ্গীতের মত প্রেমও একটি শিল্পকলা। সঙ্গীতের মতই এ বস্তু মানুষের মধ্যে সুকুমার সুতীব্র ভাবাবেগ ও স্পন্দন সৃষ্টি করে। ক্রাইসিস এর সকল ছন্দ ও সূক্ষ্মতা সুচারু ভাবে জানতো। তাই নিজেকে সে প্লাঙ্গোর চাইতেও বড় শিল্পী বলে মনে করতো। যদিও প্লাঙ্গো ছিল মন্দিরের গায়িকা। সাতটি বছর সে এই ভাবে কাটিয়ে দিল আর এর চাইতে সুখের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অন্য কোন জীবনের কথা সে ভাবতেও পারতো না। কিন্তু বয়স তার বিশের কোঠায় যাবার একটু আগে, যখন কিশোরী থেকে সে নারীতে পরিণত হ'ল এবং বক্ষতলে সেই মধুর বিবর্দ্ধমানতার চিহ্ন পরিস্ফুট হ'তে দেখলো, যে চিহ্ন পূর্ণতার প্রারম্ভ, ঠিক তখন সহসা তার অন্তরে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগলো। এখন মধ্যাহ্নে দুটি প্রহর অন্তে যখন সে জাগলো, নিদ্রা-মন্থর দেহে উপুড় হয়ে শুয়ে পা দুটি দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, এক হাতে গাল চেপে অন্য হাতে দীর্ঘ সরু সোনার সূঁচ দিয়ে সবুজ লিনেনের বালিশে ছোট ছোট ছিদ্র করে একটা প্যাটার্ণ বুনছিলো।

চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। প্রথমে চারটে ছোট বিন্দুতে একটা চতুষ্কোণ তৈরী হ'ল, একটি তার কেন্দ্র-বিন্দু। তার পরে গাঁথলো সে বড় একটি চতুষ্কোণ। তার পর সে একটি বৃত্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সেটা কঠিন লাগলো। এখানে-সেখানে বালিশের ওপর ফোঁড় দিতে দিতে ডাকলো,—জালা, অ—জালা!

জালা তার হিন্দু ক্রীতদাসীর নাম। পুরো নামটা হ'ল 'জলন্ত-চন্দ্র-চপলা', যার মানে হ'ল জলের ওপর চন্দ্র-প্রতিবিম্বের মত সঞ্চরণশিলা। পুরো নামটা উচ্চারণ করতে ক্রাইসিসের আলস্য লাগতো।

ক্রীতদাসী এগিয়ে এল, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল দোরের পাশে।

—জালা, কাল কে এসেছিল রে?

—তুমি জান না?

—না, আমি তার দিকে তাকাইনি। সুন্দর চেহারা! আমার মনে হয় আগাগোড়াই আমি ঘুমোচ্ছিলাম। বড় ক্লান্ত ছিলাম। কিছুই মনে নেই। কখন সে চলে গিয়েছে? খুব ভোরে?

—হ্যাঁ, তখন ত সূর্য্য উঠে গিয়েছে? সে বলল।

—কি রেখে গেছে? অনেক? যাক্, বলতে হবে না। কি রেখেছে না রেখেছে তাতে কিছুই এসে-যায় না। কি বলে গেছে? আর কেউ কি আসেনি সে চলে গেলে পর? সে কি আবার ফিরে আসবে? ব্রেসলেট জোড়া দে ত।

ক্রীতদাসী সামনে একটা কাসকেট নিয়ে এল। ক্রাইসিস সেদিকে বিশেষ নজর না দিয়ে মাথার ওপর দু' বাহু উত্তোলিত করে বলল, জালা, জালা, অদ্ভুত সব ঘটনা কেন ঘটে না?
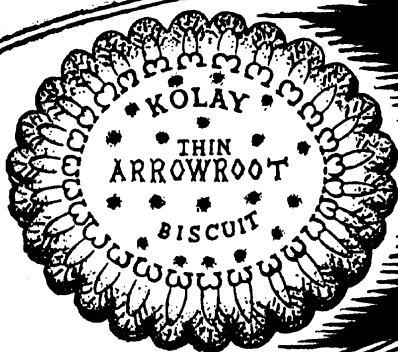
চায়ের সঙ্গে
চমৎকার!
KOLAY
THIN
ARROWROOT
BISCUIT
এরই মধ্যে
জনপ্রিয়তা
লাভ করেছে
কোলে
বিস্কুট
কোলে বিস্কুট কোম্পানী লিঃ
৩৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড — কলিকাতা-১
KOLAY
Kb
BISCUITS
বৈশিষ্ট্যের প্রতীক
K/O.P/B.1

জালা বলল—প্রতিটি বস্তুই অস্বাভাবিক, প্রতিটি বস্তু, কিম্বা কোন বস্তুই কিছু না। সব দিনই এক রকম।

—না, প্রাইসিস বলল, একটা সময় ছিল যখন এ রকম ছিল না। পৃথিবীর সব দেশে তখন দেবতারা নেমে আসতেন পৃথিবীতে, আর রাত্রির পৃথিবীর নারীর প্রেমে আবদ্ধ হতেন। হায়! কোন্ শয্যায় আমরা তাদের প্রতীক্ষা করব? মানুষের চেয়ে যারা অনেক বড় তাদের প্রত্যাশায় তাকাব আমরা কোন্ প্রান্তরের সীমানায়? কোন্ প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করলে তারা আসবে আমার কাছে, যারা আমাকে শেখাবে অথবা দেবে ভুলিয়ে? দেবতারা যদি আর নেমে না আসেন, জানব, যদি তাঁরা মরে গিয়ে কিম্বা স্থবির হয়ে গিয়ে থাকেন, আমি কি তা হ'লে সেই পুরুষের প্রেম না পেয়েই মরে যাব, যে-পুরুষ আমার জীবনে আনবে বিরাট অত্যাশ্চর্য বোনোর ট্রাজেডি?

চিৎ হয়ে শুয়ে সে আঙুল মোচড়াতে লাগলো।—যদি কেউ আমাকে পুজো করে, আমার মনে হয় প্রচণ্ড দুঃখ ওকে দিই, ও মরে যাক, তাতেই আমার আনন্দ। কিন্তু আমার কাছে যারা আসে তারা যে কেউ কাঁদানোর যোগ্যও নয়। আর দোষ ত আমারই। আমি তাদের নিজে ডেকে আনি। কি করে তারা ভালবাসবে আমাকে?

—আজ কোন্ ব্রেসলেট পরবে?

—সবগুলো। আর যা তুই চলে এখান থেকে। আমি কাউকে চাই নে। দরজার কাছে চলে যা, কেউ এলে বলিস আমি রয়েছি আমার প্রেমিক একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসের সঙ্গে, সে কেড়ে নেয় আমার অর্থ। যা চলে যা।

—আজ কি বেরুবে না?

—হ্যাঁ, বেরুবো, একাই বেরুবো! একাই পোষাক পরবো, আর ফিরে আসবো না, যা তুই।

প্রাইসিস কার্পেটের ওপর নামিয়ে দিল তার পা আর জালা নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়লো।

দুটি হাত গলায় পেছনে আড়াআড়ি ভাবে রেখে প্রাইসিস ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলো। হিমশীতল ভূমিতলে নগ্ন পায়ে ঘোরার বিলাসেই ও মগ্ন হয়েছিল, এত শীতল সে শিলাতল যে, সেখানে স্বেদবিন্দু পর্য্যন্ত জমে তুহিন হয়ে যায়। তার পরে ও স্নানে নামল।

জলের ভেতর দিয়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে থাকা ওর একটা অন্তরঙ্গ বিলাস ছিল। নিজেকে মনে হ'ত পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা বিশাল এক অনাবৃত শুক্তি। গাত্রচর্ম্ম হয়ে যেত স্বচ্ছ ও সুমিত বর্ণসুষমায় অতি মনোহর। পদরেখা দীর্ঘ হয়ে লীন হয়ে যেত স্বচ্ছ জলস্থলে নীল আলোতে। সারা তনু হয়ে যেত স্বচ্ছ তরল। হাত দুটি চেনাই যেত না। এত হালকা হয়ে যেত দেহ যে, দুটি আঙুলের ওপর নিজেকে তুলে ধরে ভেসে উঠতে পারতো, পরক্ষণেই আবার চিবুকের কাছে উত্তাল সুকোমল ঢেউয়ের নীচে মর্ম্মর শিলাতলে ডুবে যেত। চুম্বনের মত মৃদু কলতানে জল পিছলে যেত ওর কানের পাশ দিয়ে। প্রতি অঙ্গ জড়ে যেত সোহাগে নিবিড় ও আশ্লেষে মেদুর। এটা ছিল প্রাইসিসের আত্মরতির সময়।

দিন শেষ হয়ে গেল। স্নান সমাপনান্তে জল থেকে সে উঠে এল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। শিলা-সোপানে সিক্ত পদচিহ্ন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রইল। শ্রান্তিতে বেপথুমানা হয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে রইল দরজার খিলের ওপর হাত দুটি ছড়িয়ে দিয়ে। তার পর ভেতরে ঢুকে সিক্ত অঙ্গে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে দাসীকে বলল—গা মুছিয়ে দে আমার।

মালাবার-রমণী মস্ত বড় একটা স্পঞ্জ নিয়ে জলসিক্তি সেই সোনালি অলকদাম মুছে দিতে লাগলো। এমনি করে জল শুকিয়ে ফেলে গুচ্ছ গুচ্ছ করে চুলগুলো ধরে মৃদু আন্দোলিত করতে লাগলো। তার পর তেলের পাত্রে স্পঞ্জটা ডুবিয়ে তাই দিয়ে ওর কর্ত্রীর পা থেকে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে আব'র পুরু বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তা ঘষে মুছে ফেললো। সুকোমল অঙ্গ লাল হয়ে উঠলো ঘর্ষণে। শিহরিত দেহে মর্ম্মর আসনের শীতলতার মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রাইসিস মৃদুস্বরে বলল—চুল বেঁধে দে।

অলকদাম তার তখনো সিক্ত, তখনো ভারি, নিবে-যাওয়া দিনের তির্য্যক্ আলোতে তা সূর্য্যালোকে বৃষ্টিধারার মত ঝল-মল্ করছিল। দাসী সেগুলি গুছি করে ধরে সুগোল বিনুনীতে আবদ্ধ করল, বাঁধলো বলয়িত করে, তার পরে তা আটকে দিল দীর্ঘ সোনার কাঁটা দিয়ে। বেণী-বলয়-বদ্ধ কবরীকে মনে হচ্ছিল কুণ্ডলিত সর্প, সোনার তীরে বিদ্ধ তার অঙ্গ। দাসী তার পর তা বাঁধলো সবুজ ফিতেতে ভাঁজ করে। রেশমী-আভায় কবরী-শোভা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আর প্রাইসিস কর-ধৃত তাম্র-দর্পণের মধ্য দিয়ে অলস ভাবে দেখছিল দাসীটার কৃষ্ণ বাহু, ঘন কুন্তলের মধ্যে ওঠা-নামা করছে, করছে তা বেণী-বলয়িত, বেণীগুচ্ছ ধরে করছে কবরী-বন্ধ, কুন্তল-শোভা নিপুণ ভাবে রচিত করছে মৃত্তিকার ছন্দকলির মত। তার পর জালা তার কর্ত্রীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সামনের উদ্ধত গুচ্ছ কেটে সাফ করে দিল, প্রেমিকরা তার মধ্যে দেখবে নিরাবরণ নগ্ন ভাস্কর্য্য-রেখা।

প্রাইসিস আরো গম্ভীর হয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল,—এবার পেণ্ট করে দে।

'ডায়সকরিস' দ্বীপের ছোট্ট গোলাপী রঙএর কাঠের বাক্সে ছিল প্রত্যেক বর্ণের বিচিত্র অঙ্গরাগ। উটের লোমের তুলিতে দাসী তুলে নিল একটুখানি কৃষ্ণ অবলেপ, বুলিয়ে দিল তা বঙ্কিম আঁখি-পল্লবে, চোখ যাতে হয় আরো নীলাভ।

তুলিকার দৃঢ় দুটি টানে নয়ন হ'ল কোমল দীর্ঘায়ত। নীলাঞ্জন-চূর্ণ কৃষ্ণায়িত করল আঁখিপাত। দুই আঁখির প্রান্তসীমায় দিল উজ্জ্বল দুটি সিন্দূর-বিন্দু। অঙ্গরাগ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য মোম-তেলের অবলেপন করল কপোল ও বক্ষদেশে। সেরুজে (ceruse) ডোবান নরম তুলি দিয়ে বক্ষে বাহুতে আঁকলো সুগন্ধ শ্বেত-পত্র-লেখা। ছোট্ট তুলিতে কার্ম্মাইন নিয়ে মুখে দিল লাল রঙএর ছোঁয়া, আলতো ভাবে স্পর্শ করল সুগঠিত স্তনাগ্র-চূড়া। খুব সূক্ষ্ম লাল পাউডারের গুঁড়ো বুলিয়ে দিল গালে। তার পর কটিতটে আঁকলো তিনটি গভীর রেখা, সুন্দর দুটি টোল পড়ল সুগোল নিতম্ব-দেশে। সব শেষে জালা কনুইতে আঁকলো সূক্ষ্ম চিত্রলেখা, রঞ্জিত করল দশ অঙ্গুলির নখ।

সমাপ্ত হ'ল অঙ্গ-সজ্জা।

স্রাইসিস মৃদু হেসে দাসীকে বলল,—এবার গান শোনা দেখি।

মর্ম্মর কুশনে সোজা হয়ে বসল স্রাইসিস। খোঁপার কাঁটাগুলি বিকীর্ণ করতে লাগলো সোনালি আলো। গলার ওপরে রাখা করপল্লবের চিত্রিত নখর-শ্রেণী থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল পদ্মরাগমণির দ্যুতি। পাথরের ওপর পাশাপাশি ন্যস্ত ছিল তার শ্বেত-শুভ্র চরণ-কমল।

জালা দেয়াল ঘেঁষে বসে গাইতে লাগলো ভারতবর্ষের প্রেমের গান।

—স্রাইসিস, অলকদাম তোমার বৃক্ষশাখের ভ্রমরপুঞ্জ। দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়া দোলা দিয়ে যায় তোমার চুলে, নিশীথে ফোটা পুষ্পের সুবাসে বিধুর তোমার কেশ।

স্রাইসিস গাইলো আরো মধুর আরো নীচু সুরে,—আমার কেশপাশ অন্তহীন নদীপ্রবাহ, তার মধ্যে জ্বলন্ত সূর্য্যাস্তের শেষ সমারোহ।

—আঁখি দুটি তোমার বিকচ স্থল-পদ্ম, জলের ওপর ফুটে আছে অচঞ্চল, সুনীল আর বৃন্তহীন।

—পল্লবপ্রচ্ছায়ে আমার নয়ন-শতদল কৃষ্ণ বৃক্ষশাখার নীচে গভীর হ্রদের মত।

—ওষ্ঠপুট তোমার হরিণীর রক্ত-রঞ্জিত দুটি ক্ষুদ্র কুসুম।

—আমার ঠোঁট দুটি প্রজ্জ্বলন্ত কামনায় রঙীন।

—জিহ্বা যেন তোমার রক্তঝরা তরবারি, বিদ্ধ করে আছে তোমার মুখ-গহ্বর।

—আমার রসনা শোভিত মূল্যবান প্রস্তরে। লোহিত হয়েছে আমার ওষ্ঠ-ছায়াতে।

—গজদন্ত সম সুডৌল তোমার বাহু, কুক্ষিদ্বয় যেন সুগোল দুটি মুখ।

—আমার দীর্ঘ বাহুর গড়ন মৃণালদণ্ডের মত, চম্পক-অঙ্গুলি ফুটে আছে যেন পাঁচটি ফুলের পাপড়ি।

—জঙ্ঘা তোমার দুটি শ্বেতহস্তীর শুণ্ড-সম, চরণ-কমল বহন করেছে এমন ভাবে যেন দুটি রক্ত-রঙীন পুষ্প।

—আমার পা দুটি জল-পদ্মের পত্রদল, ঊরু দুটি আমার স্ফীত মৃণালদণ্ড।

—রূপার ঢালের মত তোমার যুগ্ম বক্ষ, যে ঢালের পেয়ালা রক্তে ভরপুর।

—আমার স্তন-যুগল চাঁদের মত, জলের ওপর চাঁদের ছায়ার মত।

—গোলাপি বালুর মরুতে কূপের মত গভীর তোমার নাভি, উদর তোমার মায়ের বুকে শুয়ে থাকা কচি শাবকের মত নধর নরম।

—উপুড়-করা পেয়ালার মধ্যে সুগোল একটি সুন্দর মুক্তা খচিত করলে যেমন দেখায়, তেমনি আমার নাভি। আর আমার নাভি-তলদেশের বঙ্কিম রেখা দূর বনান্তরাল থেকে দেখা স্বচ্ছ চন্দ্রকলার মত।

নেমে এল নৈঃশব্দ, হাত তুলে আ-ভূমি নত হয়ে অভিবাদন করল দাসী।

নগরাঙ্গনা গেয়ে চলল।

—মধুতে সৌরভে ভরপুর এ যেন একটি বেগুনি রঙএর ফুল।

—এ যেন একটি সাগর-ভুজঙ্গিনী, জীবন্ত, সরস, রাত্রির আকাশে উদ্যত এর ফণা।

—এ যেন একটি বিপুল আশ্রয়, মৃত্যুর পথে অভিযাত্রী-মানুষ সেখানে মাগে বিশ্রাম-শয়ন।

ভূমিতে প্রণতি-রতা দাসী বলল—

—এ এক বিপুল বিস্ময়! এ যেন মেডুসার মুখ! শিহরিত হয়ে দাসীটার গলার ওর পা তুলে দিয়ে স্রাইসিস বললে,—জালা!।

রাত্রি ঘনিয়ে এল আস্তে আস্তে, কিন্তু আকাশে এত উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছিল যে কক্ষটি একরকম নীলাভ আলোতে ভরে গিয়েছিল। স্রাইসিস নিজের অনাবরণ দেহের দিকে তাকালো। দেহের ওপর পড়েছে নিশ্চল আলো,, ছায়াগুলো ঘন কালো।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো।

—জালা, কি ভাবছি বসে? রাত হয়ে গেল, এখনো ত বেরুলাম না! বন্দরে এখন ঘুমন্ত নাবিকরা ছাড়া আর ত কেউ থাকবেও না।—বল্ ত জালা, আমি কি সুন্দরী? বল্ ত তুই আজ রাতের মত এত সুন্দর আর কখনো কি লেগেছে আমাকে? তুই কি জানিস আলেকজান্দ্রিয়ার সব মেয়েদের মধ্যে আমিই সেরা সুন্দরী? এ কি সত্যি নয় যে, আজ এখন আমার একটুখানি কটাক্ষপাতে যে কোন লোক কুকুরের মত আমাকে অনুসরণ করবে? আমি তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি, ইচ্ছে করলে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত বানাতে পারি? প্রথম আমি যাকেই দেখবো, তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবো সব চেয়ে দাসসুলভ বশ্যতা। নে জালা, আমাকে সাজিয়ে দে এবার!

জালা তার বাহুমূলে পরাল দুটি রৌপ্যময় সর্প-বলয়। পায়ে দিল পাদুকা, এঁটে দিল চামড়ার ফিতে দিয়ে। স্রাইসিস নিজেই নীবিতে বাঁধলো মেখলা। কানে পরল বৃহৎ দুটি কুণ্ডল। আঙুলে পরল অঙ্গুরীয়ক আর স্বনামাঙ্কিত মোহর। গলায় পরল তিন লহরী হার।

রত্ন-খচিত আপনার অনিন্দ্য-সুন্দর দেহের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাল স্রাইসিস। তার পর আলমারি খুলে বের করল স্বচ্ছ-সুন্দর পীতাভ লিনেনের বস্ত্র, পা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করল নিজেকে। পোষাকের চতুষ্কোণ ভাঁজগুলি স্পর্শ করছিল অঙ্গের বঙ্কিম রেখা, যে রেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্রের অন্তরাল থেকে। দৃঢ়-পিনদ্ধ বস্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি কনুই তীক্ষ্ণ ভাবে ফুটে উঠেছিল, অপর অনাবৃত হাতে পরিচ্ছদ তুলে ধরেছিল ভূমিতল থেকে ওপরে।

একটি পালকের পাখা হাতে তুলে নিয়ে সে পদচারণা সুরু করল।

প্রাঙ্গণের সিঁড়িতে একাকিনী দাঁড়িয়ে সাদা দেয়ালে হাত রেখে জালা তার কর্ত্রীকে চলে যেতে দেখলো।

চন্দ্রালোকসিক্ত জনশূন্য রাজপথের নিদ্রিত গৃহগুলি পিছনে ফেলে রেখে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। আর তার পিছনে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো চঞ্চল একটি ছায়া।

অনুবাদিকা—সবিতা সেনগুপ্ত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভোর না হোতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে! কোলিয়ারীর আপিসের তোরণ-দ্বারে আমের পল্লব লাগানো হয়েছে। বসানো হয়েছে পূর্ণঘট। আলপনা এঁকেছে সুমিতা। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। সকলের আগে সেজে-গুজে সে সবাইকে তাড়া দিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

যাদের ষ্টেশনে আসবার কথা একে একে সবাই হাজির হল। যোগেশ সকলকে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে। মেয়েরা দাঁড়ালো সামনে।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজল। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সবাই সজাগ সোজা হোয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করল।

ট্রেন থামল। ফার্ষ্ট ক্লাসের ছোট কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়। সস্মিত মুখ, প্রসন্ন দৃষ্টি।

চিনতে ভুল হল না কারুর। এই লোকটির জন্যেই তারা অপেক্ষা করছে। যোগেশ এগিয়ে গেল; দু'হাত তুলে বললে— মিঃ মুখার্জি? বোম্বাই থেকে?

—তাতে আর ভুল নেই। বলে সুপ্রিয় নামল প্ল্যাটফর্মে। আবার বাজল শাঁখ। খই ছড়িয়ে পড়ল আশে-পাশে। সুমিতার হাতের থালা থেকে মালা তুলে নিয়ে যোগেশ সুপ্রিয়র গলায় পরিয়ে দিলে। হাসিমুখে দু'হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সুপ্রিয়র গত্যন্তর রইল না। সে কিছু অভিভূত বোধ করছে বৈ কি!

অতঃপর পরিচয়ের পালা। যোগেশ প্রথমে নিজের পরিচয় দিলে। তারপর একে একে সুমিতা, নমিতা, শোভা এগিয়ে এল। তারপর অপিসের অন্য সকলে।

সুপ্রিয় বললে—আপনাদের দেখে আজ জীবনে সত্যিই একটি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন পরে নিজের হারানো আত্মীয়দের কাছে ফিরে এলাম।

যোগেশ প্রশ্ন করলে—মিঃ পারেখ? তিনি কোন্ কামরায়?

সুপ্রিয়র সঙ্গে তার সহকারীরূপে পারেখ নামে অপর এক ব্যক্তি আসবেন, জানা ছিল। মাথা নেড়ে সুপ্রিয় বললে—সে আমার সঙ্গে আসতে পারেনি। কাজে আটকে আছে। সম্ভবত কাল প্লেনে আসবে কলকাতায়। সেখানকার কাজ সেরে এখানে এসে পৌঁছোবে। আজ সন্ধ্যায় ফোন ক'রে জেনে নেব কখন সে আসবে।

যোগেশ হাঁক দিলে—রামলাল।

সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিল কুলির সর্দার রামলাল। বিস্ফারিত চোখে সে দেখছিল সুপ্রিয়কে। ডাক শুনে চমকে উঠল। ভয়ে যেন শীর্ণ হল। ঘাড় ঝুঁকে পড়ল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রামলাল। আভূমি-প্রণত সেলাম করলে। যোগেশ বললে—রামলাল! জলদি, সামান উতারো।

রামলাল ধীরে ধীরে কামরার মধ্যে ঢুকলো। যোগেশ বললে —চলুন, মিঃ মুখার্জি। আমরা এগুই। মাল-পত্তর সর্দার কুলির জিম্মায় রইল। ঠিকমতো পৌঁছোবে।

সুপ্রিয় বললে—ব্রীফ-কেসটা একটু দরকার। তারপর গলা বাড়িয়ে রামলালকে উদ্দেশ করে বললে—বিছানার ওপর যে লম্বা চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে সেটা দাও তো, কুলি।

উৎকর্ণ হোয়ে সে আদেশ শুনলে রামলাল।

—হিতেন, তুমি মেয়েদের নিয়ে যাও। আমি যাব এঁর সঙ্গে।

ব্রীফ-কেসটা আনতে রামলালের এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? হিতেন তাড়া দিয়ে উঠল।

মাথা নীচু ক'রে রামলাল বেরিয়ে এলো। এগিয়ে দিলে জিনিষটা সুপ্রিয়র দিকে। সুপ্রিয় হাত বাড়ালো। লক্ষ্য করলে, কুলিটার হাতখানা কাঁপছে। একটু বিস্মিত হল। তারপর ব্যাগটা টেনে নিলে।

যোগেশ বললে—চলুন।

ষ্টেশনের সম্বর্দ্ধনা-পর্ব্ব শেষ হল।

* * * *

বিকাল বেলা প্রমীলার বাড়ীর সামনে রামলালের সঙ্গে দেখা হল প্রমীলার।

—রামলাল যে! তোমাদের নতুন সাহেব এলেন তাহলে? বললে প্রমীলা।

মহা খুসী রামলাল। বললে—হাঁ, মাইজি! এসেছেন। আমিই তাঁর খিদ্‌মদ্‌গারীতে লেগেছি। তাঁকে দেখা-শোনা করবার সব ভার আমার ওপর পড়েছে। আমি তো সারাদিন তাঁর বাংলাতে ছিলাম।

—তাই নাকি! সাহেবটি কেমন?

—খুব ভাল, মা, চমৎকার! আর, সাহেব কোথায়? একদম বাঙালী আছেন! সবাইকার সঙ্গে ভাব হয়েছে। আপনি সকালে ষ্টেশনে গেলেন না তো মাইজি?

প্রমীলা হাসলো—আমি কেন যাব? আমি কি তোমাদের কোম্পানীর লোক যে, অভ্যর্থনা জানাতে যেতে হবে আমায়?

এক মুহূর্ত্ত রামলাল কী ভাবলে; তারপর বললে—ঠিক। ঠিক বলেছেন মাইজি! আপনি কেন যাবেন? ঠিক। আমি যাই মাইজি, সাহেব এইবার বোধ হয় বেড়াতে বেরুবেন। বলছিলেন, বড় গরম লাগছে, ফাঁকা জায়গায় একটু বেড়াবেন। ঐ যে, দূরে, মাইজি, ওই যে, সাহেব বোধ হয় এই দিকেই আসছেন।

প্রমীলা বললে—আচ্ছা, রামলাল, তুমি তোমার সাহেবের কাছে যাও। আমিও বাড়ী ফিরি।

এই ব'লে প্রমীলা সত্য সত্যই বাড়ীর দিকে চলে গেল।

* * * *

সুপ্রিয়র সম্বর্দ্ধনা-সভা।

অনুষ্ঠান-লিপি তৈরী হয়েছে এই ভাবে:—

১। স্বস্তিবাচন। ২। যোগেশ কর্ত্তৃক প্রধান অতিথি সুপ্রিয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন। ৩। প্রধান অতিথির ভাষণ। ৪। নৃত্য-গীতের বিচিত্রানুষ্ঠান।

সুসজ্জিত মঞ্চের এক ধারে প্রধান অতিথির আসন পাতা হয়েছে। তার দু'ধারে আর দু'-চারখানি চেয়ার। সুপ্রিয়র এক পাশে বসেছেন মুনসেফ-বাবু। অন্য পাশে যোগেশ।

নির্দ্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। বৃদ্ধ মহিম হালদার কম্পিত কণ্ঠে "স্বস্তিবাচন" পাঠ করলেন। তারপর যোগেশ উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তার সম্বর্দ্ধনার বক্তৃতা দান করলে। বক্তৃতায় সে বললে, সুপ্রিয়কে তাদের মধ্যে পেয়ে সবাই কৃতার্থ বোধ করছে।
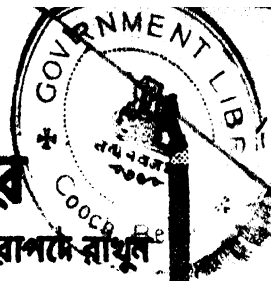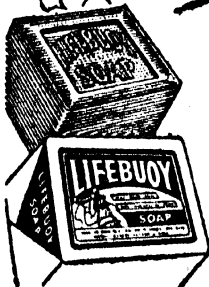
সুপ্রিয় যে তাদের [illegible]-ওয়ালা-রূপে এখানে এসেছে তাতে এই অধিবাসীদের [illegible] গৌরবান্বিত এবং আশান্বিত বোধ করছে। [illegible] ও বিশ্বাস, সুপ্রিয়র কাছে তারা সুবিচার পাবে, তাদের দুঃখ এবং অভাব দূর হবে।

মঞ্চের ভিতরে উইংসের পাশে মেয়েরা সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতার পালা শেষ হলেই তাদের পালা শুরু হবে।

স্বস্তিবাচন শেষ হবার পর প্রমীলা উপস্থিত হল সেখানে। তার আসতে দেরী হয়ে গেছে। মেয়েরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিল সে জন্যে। ইনস্টিটিউটে পৌঁছে সভাস্থলে না গিয়ে সে পিছনকার দরজা দিয়ে একেবারে সাজঘরে উপস্থিত হল। তাকে দেখে মেয়েরা কোলাহল ক'রে উঠল।

—কী অন্যায়। কী অন্যায়। এত দেরী? যাক। বাঁচা গেল। আমরা তো ভয়েই সারা। ইত্যাদি।

প্রমীলা বললে—অবেলায় ঘুমিয়ে প'ড়ে এই গাল-মন্দ খেতে হল। তোরা তো দেখছি সবাই প্রস্তুত। সুমিতা কই? এই যে। ইস। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ 'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে।'

নববধূর মতো সেজেছে সুমিতা। মাথায় পরেছে ফুলের মুকুট। কপালে এঁকেছে চন্দনের লেখা। সীঁথিতে দুলিয়েছে লাল-পাথর-বসানো স্বর্ণাভরণ। চোখে টেনেছে ঘন কাজলের দীর্ঘায়িত রেখা। 'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে,' এই গানের সঙ্গে আছে তার একক নৃত্য।

হেসে বললে প্রমীলা—"তেপান্তরের প্রান্ত পারায়ে কে তুমি এলে, আমার হৃদয়-সরসী কূলে। তোমারে চিনি না, তবু দেখি দুই নয়ন মেলে, কাঁপন লাগিছে মর্ম্মমূলে।" আমার মাথাই তো ঘুরে যাচ্ছে তোকে দেখে। অতএব অব্যর্থ হবে তোর শর-সন্ধান, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মেয়েরা হেসে উঠল। কপট কোপ ভরে সুমিতা বললে—যাও। কী যে যা-তা বল।

শোভা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললে—যোগেশদা বক্তৃতা দিচ্ছেন। চল না প্রমীলাদি, উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শুনি গে। তুমি তো চীফ গেষ্ট মিঃ মুখার্জ্জিকে এখনো দেখনি, না?

—না, কৈ আর দেখলাম। চল্। বলে প্রমীলা সাজঘর থেকে উইংসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শোভা বললে—ঐ দেখ। কী চমৎকার দেখতে, না? মালা পরে বসেছেন, যেন বর বসেছে বাসরে।

প্রমীলা তাকিয়ে দেখলে। এ কী হল। হঠাৎ তার চোখে কি ধাঁধা লাগল? মাথাটা ঘুরে উঠল যে। দৃষ্টির কী ভ্রম। এক মানুষকে অন্য মানুষ ব'লে ভুল করা।

কিন্তু ভুল তো নয়। গায়ে সেই ঢিলেঢালা গরদের পাঞ্জাবী; পায়ে সেই সাদা চামড়ার লপেটা; চুলের সেই চির-পরিচিত পরিপাটী। এ মূর্ত্তি কি ভোলবার? প্রমীলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার বাহ্যজ্ঞান বোধ হয় লুপ্ত হয়েছে।

শোভা কি বলবার জন্যে প্রমীলার মুখের পানে তাকালো। কিন্তু প্রমীলার একান্ত অন্যমনস্ক দৃষ্টি দেখে সে কিছু বললে না। মুখ টিপে হেসে পাশের সঙ্গিনীকে কি যেন ইঙ্গিত করলে।

সম্বিৎ ফিরে পেলো প্রমীলা। কিন্তু তার সমস্ত শরীরের এ কী অবস্থা হল। হঠাৎ সর্ব্বদেহ অসাড় পাষাণ হয়ে গেল না কি।

যোগেশের বক্তৃতার পর সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। চারি দিকে ঘন করতালি ধ্বনিত হল। মৃদু স্পষ্ট নম্র এবং উদাত্ত স্বরে সুপ্রিয় বললে—আজ আপনাদের কাছে যে সম্বর্দ্ধনা পেলাম, বিনয়-মধুর বাক্যে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে তার মূল্য দিতে চাই না। আপনাদের সম্বর্দ্ধনার পিছনে যে অন্তরের যোগ রয়েছে তার মায়া বিস্তারিত হয়েছে আমার মনে। তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রে ধন্য হলাম। আমি আশা ও কামনা করছি, আপনারা আমাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবেন, বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো। আপনাদের মধ্যে আমি খুঁজে পাবো আমার আপন-জন, আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্। আপনাদের কাছে থেকে, আপনাদের কাজে লেগে আমার জীবন সার্থক হবে।

ভাবগম্ভীর ভাষণের সহজ আন্তরিকতার সুর সভাস্থলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সকলে আর্দ্র স্তব্ধ-চিত্তে সুপ্রিয়র কথা শুনছে।

শুনছে প্রমীলা বিহ্বলের মতো। শুনছে যোগেশ, সুমিতা, নমিতা, শোভা। শুনছেন মুনসেফ-বাবু ঘাড় উঁচু করে।

আর শুনছে একজন। সে রামলাল। সভায় প্রবেশের সাহস বা অধিকার তার নেই। প্রেক্ষাগৃহের এক অন্ধকার কোণে আবর্জ্জনা-স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে সে চেয়ে আছে বক্তার দিকে। তার দুই চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে সে কী অপূর্ব্ব করুণ অভিব্যক্তি।

সুপ্রিয় বলতে লাগল—আপনারা আমার কাছে সুবিচার পাবার আশা করেছেন। আশা করেছেন, আপনাদের দুঃখ, আপনাদের অভাব-অভিযোগ আমি মোচন করতে পারবো। আমার একমাত্র প্রার্থনা, আপনাদের আশা ও বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমি যেন রাখতে পারি। মানুষকে সেবা করার মহৎ ব্রতের যে মহিমান্বিত প্রকাশ দেখেছি আমার পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষের জীবনে, তা আমার জীবনকে প্রেরণা দিয়েছে, গঠন করেছে, চরম সার্থকতার গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছে। মানুষকে সেবা ক'রে তার বিপদ ও দুঃখকে দূর করবার কাজে নিজের জীবনকে আহুতি দেবার প্রেরণা আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত আছে। এর বেশী বলার সাধ্য আমার নেই। সেই প্রেরণাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পরিশেষে সকলকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান শুভেচ্ছা জানাই।

ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হল। মুখর হল শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসার বাণী। গুঞ্জনধ্বনি উঠল চারি দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৃত্যগীতের বিচিত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হল। হিতেন সাজঘরের ভিতরে শিল্পীদের পরিচালনার কাজ করছিল। প্রমীলা তার কাছে গিয়ে বললে—প্রোগ্রাম থেকে আমার নামটা কেটে দিন, হিতেন বাবু।

—সে কি। আপনি গান করবেন না?

—না।

—কেন?

—বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। অসম্ভব মাথা ধরেছে। নামটা ঘোষণা করবেন না। প্লীজ।

—আচ্ছা। বলে হিতেন অন্য দিকে চলে গেল।

এলো যোগেশ। বললে—হঠাৎ শরীর খারাপ হল কেন? অ্যাসপিরিন আনিয়ে দেব?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রমীলা বললে—বাড়ী গিয়ে খেয়ে নেব। বড্ড খারাপ লাগছে। গাইতে পারবো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তবে থাক। তুমি বরং এই চেয়ারটায় বোসো। বলে যোগেশ ভিতরের দিকে একটা চেয়ার এনে দিলে। প্রমীলা বসল। সত্যই সে যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না।

দু'চার কথার পর যোগেশ চলে গেল অন্য দিকে। মেয়েরা একে একে এসে দুঃখ ও উদ্বেগ জানিয়ে গেল। প্রমীলা নীরবে বসে রইল। তার মনে হচ্ছে, তার আশে-পাশের মানুষগুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে সে যেন বহু দূরে দিক্‌-বিহীন প্রান্তরের শেষ সীমায় একাকিনী ব'সে আছে।

অনুষ্ঠান শেষ হোয়ে গেছে। সে খেয়াল তার নেই। হঠাৎ যোগেশের কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। যোগেশ বলছে—হিতেন, মিঃ মুখার্জ্জি আসছেন শিল্পীদের অভিনন্দন জানাতে। তুমি ওদের সারবন্দী ক'রে দাঁড় করিয়ে দাও। এসো প্রমীলা!

বিস্ফারিত চোখে প্রমীলা বললে—আমি কোথায় যাব?

উত্তরে যোগেশ বললে—যাঁর জন্মে আজকের অনুষ্ঠান তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ওই যে এসেছেন।

অদূরে সুপ্রিয় এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের নাচ-গান খুব ভাল হয়েছে। একে একে সকলকে সে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো যোগেশের সঙ্গে প্রমীলা এগিয়ে গেল। যোগেশ বললে—মিঃ মুখার্জি! আর-একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিস্ প্রমীলা চক্রবর্ত্তী। মেয়েদের নাচ-গানের যে সাফল্য তার মূলে আছেন ইনি। ইনিই এদের সব শিখিয়েছেন।

ঘুরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। মুহূর্ত্ত কাল। কিন্তু কী সুদীর্ঘ সেই মুহূর্ত্ত! নমস্কার শেষ ক'রে প্রমীলা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়। থামলো। দু'হাত একত্রিত করে বললে—নমস্কার! ভারী আনন্দ হল আজ।

যোগেশ বললে—মিস্ চক্রবর্ত্তী চমৎকার গাইতে পারেন। গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। আজ গাইবার কথা ছিল। শরীর খারাপ বলে গাইলেন না।

প্রমীলার দিকে তাকালো যোগেশ। তারপর অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে—যাই হোক, আশা করছি, শীগ্‌গিরই এঁর গান আপনাকে শোনাতে পারবো।

সুপ্রিয় বললে—সে তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

যোগেশের কথা শুনে কেঁপে উঠল প্রমীলা। সর্ব্ব শরীর হিম হ'য়ে গেল যেন। আবরণ রইল না আর। নিজেকে লুকোবার জায়গা নেই। সেই কবে কোন্ ত্রেতাযুগে কন্যার সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা বাঁচাবার জন্তে, জননী তুমি উঠেছিলে বিদীর্ণ হোয়ে, কোলে টেনে নিয়েছিলে তোমার সন্তানকে, সকল মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, আয়ত্তের অন্তরালে,—আজ প্রমীলার জন্তে আর-একবার পারো না দেখা দিতে তেমনি ক'রে, তার এই চরম লজ্জা আর অপার অসহায়তার মুহূর্ত্তের?

সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সকলকে আর-একবার নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাই। তাহলে এবার [illegible] হিতেন বাবু, একটু এগিয়ে দিন। পথের সঙ্গে [illegible] যাবার পালা। [illegible] পাকা হয়নি। [illegible] তেমন

—চলুন। এই দিকে।

চলে গেল সুপ্রিয়। যোগেশ বললে প্রমীলাকে—চল, তোমা[illegible] পৌঁছে দিয়ে যাই।

বাড়ীর দরজার কাছে এসে যোগেশ বললে—সত্যিই তোমায় খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করগে। আমি অ্যাসপিরিন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃদু কণ্ঠে প্রমীলা বললে—আছে আমার কাছে। খেয়ে নেব। একটু বিশ্রাম করলেই মাথাধরাটা কমে যাবে।

—আচ্ছা, চললাম। কাল দেখা হবে।

—আসুন। বলে প্রমীলা ভিতরে চলে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলাল। তারপর সোরাই থেকে এক গ্লাস, জল নিয়ে বেশ ক'রে ছিটিয়ে দিলে মুখে-চোখে কানে ঘাড়ের পিছন দিকে। শীতল জলের স্পর্শে আরাম বোধ করলে। সজীবতা পেলে। কী অভাবনীয় কাণ্ড! ব্যাপারটা এখনো যেন ভাল করে ধারণার মধ্যে ধরতে পারছে না সে।

পাশের ঘর থেকে পিসিমা ডাক দিলেন—প্রমীলা এলি?

—হ্যাঁ, পিসিমা এলাম। ব'লে প্রমীলা তাঁর ঘরে ঢুকলো। হঠাৎ মনের মধ্যে খুসীর ভাব জেগে উঠল নাকি?

শুয়েছিলেন পিসিমা। উঠে বসে বললেন—সভা, নাচ-গান শেষ হল?

—হল।

—কেমন হল?

—উত্তম হল।

পিসিমা ক্ষণেক নীরব থেকে বললেন—যোগেশ বলছিল, তাদের নতুন মনিবের সঙ্গে তোদের নাকি আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবে। আলাপ হল নাকি?

—আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি পিসিমা! শুয়ে পড় তুমি। আমি তোমার খাবার যোগাড় করি গে।

—এতো তাড়াতাড়ি খেতে পারবো না মা, একটু দেরী ক'রে আনিস্।

—আচ্ছা, তাই আনবো। ব'লে প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার আকাশের গায়ে তেমনি তারার আলপনা। শুকতারাটা তেমনি দপ্-দপ্ ক'রে কথা বলছে। প্রমীলা তাকিয়ে রইল আকাশের পানে। থেকে থেকে একটি প্রিয় কবিতা মনে পড়ছে তার:

"খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল, আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ, জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
ল'য়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার কণিকা!
ভেবেছিনু গেছি ভুলে, ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিলো সর্ব্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার·
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার।
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।"

এ-কবিতা কি প্রমীলার জীবনের আজকের এই দিনটির জন্যই লেখা হয়েছিল?

* * * *

পরদিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রমীলা ব'সে আছে নিজের ঘরে, সুমুখে সেলাইএর কল নিয়ে। পিসিমার শরীর ভাল নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভৃত্য বুধন সদর-দরজার কাছে বাঁধানো বেদীর ওপর ব'সে তারস্বরে রামায়ণ-গান করছে।

সকাল থেকে সারাদিন প্রমীলা বাড়ীর বার হয়নি। বিকালেও না। সারাদিন যেন তার গা ছম্-ছম্ করেছে। ঐ বুঝি কে এলো! ঐ বুঝি কে ডাকলে!—এক অভিনব বিচিত্র অনুভূতি।

সারাটা দিনের বেশী সময় সে কাটিয়েছে পিসিমার ঘরে। আজে-বাজে গল্প করেছে। পিসিমার কাছে নানা উপদেশ শুনেছে। শুনেছে যোগেশের সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা-মুখর মতামত। পুরোহিত ডাকিয়ে তিনি যে কাল-পরশুর মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলবেন, তাও সে জেনেছে।

সে যা হয় হোক। আজকের মতো আত্মগোপন করুক প্রমীলা। কাল রাত থেকে তার স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে এক অসহনীয় প্রতিক্রিয়ার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

টুকি-টাকি অনেকগুলি সেলাই বাকী ছিল। সময় কাটাবার উত্তম পথ। সেলাইএর জিনিষ-পত্র নিয়ে প্রমীলা গুছিয়ে বসল।

কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কৈ? ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে। হাতের টিপ সরে যাচ্ছে। সেলাই বসছে না ঠিকমতো। সেলাইএ বসছে না মন। কানের কাছে কে যেন অনবরত গুঞ্জরণ করছে:

"হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তাহলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দু'জনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তাহলে পরম লগ্নে সখি
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥"

ভৃত্য বুধন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মুখ না তুলেই প্রমীলা বললে—কি রে?

—দিদিমণি, কুঠির বড়বাবু এসেছেন!

কল থেমে গেল। আড়ষ্ট বোধ করলে প্রমীলা। প্রতিদিনের এই আসা-যাওয়া। প্রতিদিন সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। কেমন আছ? মাথা ধরেনি তো? ইত্যাদি। আজ কিন্তু কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। অপ্রিয়-সঙ্গ-সহনের চেয়ে নিঃসঙ্গতা সহ্য করা সহজ, বাঁকা কথার চেয়ে বাঁকা সেলাই ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে—চায়ের জল চড়িয়ে দিগে যা।

যোগেশ চায়ের বড় ভক্ত, দেরী হলে নিজেই বলবে, বাবা বুধুয়া, একটু চা কর।

সেলাই গুটিয়ে প্রমীলা উঠল। বুধন বললে—জলখাবার আনবো না?

তার প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হল প্রমীলা। যোগেশ প্রায় প্রত্যহই আসে। চা খায়। জলখাবারের আয়োজন তো হয় না কোন দিন! তার মুখের পানে তাকিয়ে বুধন বললে—কুঠির বড়বাবু এয়েছেন কি না, নতুন লোক, তাই যদি জলখাবার···

—কে এসেছে? ত্রস্ত ও চাপা কণ্ঠস্বরে প্রমীলা শুধালো।

বুধন বললে—সেই যে গো, যিনি তিন দিন আগে বেলাত থেকে এখানে এলেন; কাল যাঁর জন্যে থ্যাটার হল, তাঁর গলায় মালা দেওয়া হল—কুঠির বাবুদের নতুন মনিব···

সর্ব্বনাশ! লুকিয়ে থাকার সকল চেষ্টা এমন আচম্বিতে ব্যর্থ হবে তা কে জানতো?

আবার মুখোমুখী! প্রমীলাকে রক্ষা কর ভগবান! সে যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। হেরে না যায়।

—আচ্ছা, তুই যা। আমি যাচ্ছি।

বুধন চলে গেল। ধীরে ধীরে বিছানার ওপর বসল প্রমীলা। সামনের আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রইল। বিশীর্ণ আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু তা তো চলবে না। সহজ স্বাভাবিক প্রফুল্ল হোতে হবে।

টাইমপিসটা টিক্ টিক্ শব্দ করে চলেছে। কান পেতে প্রমীলা সেই শব্দ শুনলে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যাচ্ছে। নিজের কথার নিজেই যেন উত্তর দিচ্ছে প্রমীলা:

"হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান,
বঞ্চিত মুহূর্ত্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি;
চিহ্ন কোন রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি?"

এই কবিতাটার হাত থেকে কিছুতেই যেন নিস্তার পাচ্ছে না প্রমীলা। কি কুক্ষণেই কাল সন্ধ্যায় তার মনে উদয় হয়েছিল 'ক্ষণিকা'।

বুধন এসে ডাক দিলে—দিদিমণি!

চমকে উঠল প্রমীলা।

বুধন বললে—অনেক দেরী হচ্ছে যে দিদিমণি! চা ক'রে দিয়েছি। তিনি খাননি। বসে আছেন চুপ ক'রে।

নিঃশব্দে প্রমীলা ঘর ছেড়ে বেরুলো।

এ-ঘরে আসতেই তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। তারপর মুখস্থ পড়া বলার মতো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল—কাল তোমায় দেখে অবাক হোয়ে গিয়েছিলাম। কী যে বলব ভেবে পাইনি। হঠাৎ যে এ-ভাবে দেখা হবে তা কল্পনা করিনি। আজ সকালে যোগেশ বাবুর কাছে কাকাবাবুর কথা পাড়তেই তাঁর মুখে সমস্ত শুনলাম।

সুপ্রিয় থামল। প্রমীলা নিরুত্তর।

সুপ্রিয় বলতে লাগল—যাই হোক, মস্ত সান্ত্বনার কথা এই যে, তোমায় কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। যোগেশ বাবুর মতো হিতৈষী পাওয়া ভাগ্যের কথা। তিনি বললেন যে কাকাবাবুর কাছ থেকে তোমাদের দেখা-শোনার ভার পেয়েছেন। তিনিই এখন তোমাদের অভিভাবক। শুনে আনন্দ হল। ভাবলাম,

এত দূরে এসে যখন হোল দেখা হল তখন তোমার সঙ্গে দেখা করে না যাওয়াটা অকর্তব্য হবে। তাই এলাম। রামলাল তোমাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে।

কথা ফুরালো এক পক্ষের। অপর পক্ষ তথাপি নীরব। সুপ্রিয় বললে—তুমি বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ঘরের মধ্যে সামান্ত আসবাব। একখানি চতুষ্কোণ টেবিলের এক ধারে একখানা চেয়ার। তাতে বসেছিল সুপ্রিয়। অপর দিকে একটি ছোট বেঞ্চি। তারই হাতল ধ'রে দাঁড়িয়েছিল প্রমীলা। সুপ্রিয়র কথায় সে সেই বেঞ্চির ওপর বসল। বাধ্য ছাত্রী যেন শিক্ষকের আদেশ পালন করলে।

সুপ্রিয় বললে—বাবার কথা কিছু শুনেছো নাকি?

এতক্ষণে প্রমীলার কণ্ঠ দিয়ে স্বর নির্গত হল। মৃদু কণ্ঠে বললে—খবরের কাগজে পড়েছি।

অন্তমনস্ক ভাবে সুপ্রিয় বললে—বোম্বাই-এ ব'সে আমিও খবরের কাগজ মারফৎ জানতে পারলাম। এমন যে হবে তা কল্পনা করিনি।

টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা তেমনি পড়েছিল। চা খায়নি সুপ্রিয়। প্রমীলার দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সে বললে—গরম কালে সন্ধ্যার পর আমি চা খাই না, তা তুমি ভুলে গিয়েছো? চা-টা নষ্ট হল।

প্রমীলা কি যেন বলবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু বলা হল না।

"এ কী লজ্জা, এ কী মিছে ভাণ
কথা ছিল বলিবার, সময় যে হল অবসান।"

আবার সেই ক্ষণিকা! মনের মধ্যে এলোমেলো চিন্তা, এলোমেলো কথা। বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সুপ্রিয়র কথা কানে আসছে—যোগেশ বাবু বলছিলেন, কিছুদিন থেকে তোমার শরীর নাকি ভাল নেই। দেখছিও তাই, তোমাকে রীতিমতো কাহিল বোধ হচ্ছে।

আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। প্রমীলা বললে—না। আমি বেশ ভালই আছি।

—খুব ভাল কথা। শুনে আনন্দ হল। আচ্ছা, আজ তা'হলে উঠি। কয়েক দিন যখন থাকছি, তখন আবার হয়ত দেখা হবে।

অন্তমনস্কের মত প্রমীলা প্রশ্ন করলে—কত দিন থাকতে হবে?

উত্তরে সুপ্রিয় বললে—এখানকার সব কাজ দেখতে আর একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে মাস তিনেক লাগবে।

মনে মনে প্রমাদ গণলে প্রমীলা। তিন মাস! সে যে অনেক দিন।

উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। বললে—চলি তাহলে। একটা কথা জেনে আনন্দ হল। গানের চর্চা বজায় রেখেছো তাহলে। কাল তো তোমার গান গাইবার কথা ছিল। শোনা হল না। যোগেশ বাবু বলেছেন, একদিন তোমার গান শোনাবার ব্যবস্থা করবেন।

সুপ্রিয়র মুখে হাসি দেখা দিল। সে হাসি দেখলো প্রমীলা। কী লজ্জা, কী লজ্জা! শুধু লজ্জা না, রাগও। রাগে আর লজ্জায় প্রমীলা বিহ্বল হ'য়ে গেল। কিন্তু কিসেরই বা লজ্জা আর কেনই বা রাগ? হঠাৎ কণ্ঠস্বরে জোর এনে বললে—আমি আর গান করি না।

আবার হাসল সুপ্রিয়। বললে—সেটা উচিত নয়। ভগবানের কাছে যে দান পেয়েছো তা থেকে নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করা আনন্দের নয়।

উভয়ে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয় প্রস্থানোদ্যত। তার দৃষ্টি দরজার বাইরে। সেই ফাঁকে তার পানে এক চমক চাইলে প্রমীলা। বাঁ হাতের মণিবন্ধের ওপর দৃষ্টি পড়ল। একটা সাধারণ নিকেলের রিষ্টওয়াচ পরেছে সুপ্রিয়। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল প্রমীলা—হাতে একটা অন্য ঘড়ি দেখছি। সে-ঘড়িটা কি হল?

প্রশ্ন শুনে ঘুরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। ঈষৎ হেসে বললে—সে-ঘড়ি আর হাতে মানায় না। তুলে রেখে দিয়েছি। মনে করছি, বিক্রি করে দেব। চড়া দাম পাওয়া যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, কেমন?

কিছুই বললে না প্রমীলা। সুপ্রিয় চলে গেল। ঘর আর বারান্দা, মাঠ আর আকাশ, দুলতে লাগল প্রমীলার চোখের সামনে অনেকক্ষণ।

প্রমীলা যে-ঘড়ির কথা উল্লেখ ক'রে ফেলেছিল সেই ঘড়ির এক অবিস্মরণীয় মধুর ইতিহাস আছে। পথ চলতে চলতে সেই কথাই কি স্মরণ করতে লাগল সুপ্রিয়? সেই কথাই কি স্মরণ করতে লাগল প্রমীলা তার নির্জ্জন গৃহকোণে ব'সে?······

একদিন সকাল বেলা। সুপ্রিয় নিজের ঘরে ব'সে কয়েকখানা হিসাব-নিকাশের মোটা কেতাব নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখছিল এমন সময় এক ঝলক বসন্ত-বাতাসের মতো চারি দিকে মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো প্রমীলা।

বই বন্ধ করতে হল। চেয়ার ঘুরিয়ে নিলে সুপ্রিয়। টেবিলের কাছে এসে প্রমীলা বললে—ওই মোটা মোটা ধ্যাবড়া বইগুলো আমার চক্ষুশূল। যখনই আসবো তখনই দেখবো, পাহাড়ের মতো ওইগুলো দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আজ ওরা দূর হোক।

এই বলে সত্যিই সে দু'হাতে বইগুলো ঠেলে সরিয়ে দিলে। সুপ্রিয় হাসিমুখে তাকালো তার পানে। স্নান সেরে এসেছে প্রমীলা। কেতকী-কুসুমে সুরভিত কেশপাশ এলায়িত হয়েছে পিঠের ওপর। কপালে কুঙ্কুমের টিপ। পরনে সুশুভ্র বেশবাস।

সুপ্রিয় বললে:

"আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন গৃহকোণে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা আসিয়াছ কি কারণে?
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছো দেখা।"

ত্রস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি বললে প্রমীলা—ওই পর্য্যন্তই থাক। দোহাই তোমার। পরের লাইনগুলো যেন বোলো না। মারা পড়ব তাহলে!

—আচ্ছা, তবে থাক। বললে সুপ্রিয়—এখন তোমার আবির্ভাবের কারণ ব্যক্ত কর।

প্রমীলা বললে—আজ কোন কাজ নয়।

—কেন?

—দেওয়াল-পঞ্জীতে লক্ষ্য কর আজকের তারিখ।

—লক্ষ্য করছি।

—মাথায় ঢুকলো কিছু?

—ঢুকলো এতক্ষণে। আজ আমার জন্মদিন।

মাথা তুলিয়ে প্রমীলা বললে—তাই বলছি, আজ কোন কাজ নয়।

মুখ টিপে হেসে সুপ্রিয় বললে—কিন্তু ও-কথাটা বলব আমি। তোমার মুখে মানায় না। ওটা পুরুষের উক্তি। তোমার মুখে ব্যাকরণ আর মিল বজায় থাকবে না।

চোখে চোখ রেখে প্রমীলা বললে কৌতুকভরে—থাকতেও পারে। মিল বজায় রেখে বলতে পারি।

—অসম্ভব। বল তো শুনি।

প্রমীলা গ্রীবাভঙ্গী করলে—পারি না নাকি? শোন:

আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিও
ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়···

—ওয়ান্ডারফুল!

—এইও!

চকিতে দূরে সরে গেল প্রমীলা। দরজার বাইরে দৃষ্টি পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ভৈরব, ঠাকুরকে বলো তো বাবা, এখনি চায়ের জল বসিয়ে দিক। দু' কাপের মতো।

ভৈরব কি কাজে এদিকে আসছিল। হুকুম পেয়ে ফিরে চলে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কোপ-কটাক্ষ হেনে প্রমীলা বললে—মজাবে তুমি একদিন। চাকর-বাকরদের সামনে একটা কেলেঙ্কারি ঘটাবে কোন্ সময়। যাক্, শোন। এখনি আমার সঙ্গে বেরু... তৈরী হোয়ে নাও।

সবিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—এখন, এই সকালে? কোথায় যেতে হবে?

—দোকানে। আজ তোমার জন্যে একটি উপহার কিনবো।

—তাই নাকি। কি উপহার দেবে?

—তা বলব না এখন। তবে ভাল জিনিষই দেব। অকাজের নয়। কাজের। কাজে যখন মগ্ন থাকবে, ঘুরবে বাইরে, তখন সেটি থাকবে তোমার সঙ্গে, তার স্পর্শের মধ্যে দিয়ে তুমি অনুভব করবে আমায়, তা দেখে জানতে পারবে, আমার কাছে ফেরবার সময় হল কি না।

সুপ্রিয়র হাতঘড়ি ছিল না। অনেক বার সে বলেছে সুপ্রিয়কে ঘড়ি কিনতে, কিন্তু সে গা করেনি। তাই প্রমীলা স্থির করেছে, তাকে একটি সুন্দর রিষ্টওয়াচ উপহার দেবে এই সুযোগে। নিজের সামান্য কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, তারই সদ্ব্যবহার করবে সে। এই কথা যতই মনে হচ্ছে ততই আনন্দিত বোধ করছে প্রমীলা।

—বেশ তৈরী হচ্ছি। দাও ওই পিরাণটা।

—দাড়ি কামিয়ে নাও। আমি চা নিয়ে আসি।

দুই চোখ বড় ক'রে সুপ্রিয় বললে—আবার দাড়ি কামাতে হবে? তার প্রয়োজন নেই। দাড়ি গজায়নি। আজ না কামালেও চলবে।
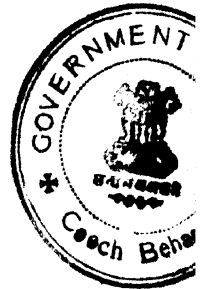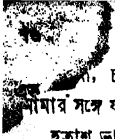
...া, চলবে না। দাড়ি গজিয়েছে। একগাল দাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে, সে হবে না।

হতাশ ভাবে সুপ্রিয় বললে—কি আশ্চর্য্য! আমার দাড়ি গজিয়েছে কি না তা আমি জানি না?

—না, জান না।

—নিশ্চয় জানি। গজায়নি দাড়ি। বিশ্বাস না হয়, অনুভব করে দেখ।

—ধ্যেৎ। ব'লে প্রমীলা চা আনতে পালাল।

ডালহাউসি স্কোয়ারে এক বিলাতী ঘড়ির দোকানের সামনে ট্যাক্সি এসে থামলো। সাহেব দোকানদার তখন সবেমাত্র দোকান খুলে শো-কেসে মালপত্র সাজিয়ে রাখছিল। দুই প্রিয়দর্শন খরিদ্দার দেখে হাসিমুখে বললে—সুপ্রভাত। আজকের দিনটি আমি ভালই আরম্ভ করলাম ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রমীলা সোজাসুজি পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে—এঁর জন্যে একটা হাতঘড়ি চাই। ভাল জিনিষই নেব। সোনার ঘড়ির সঙ্গে সোনার ব্যাণ্ড। পাওয়া যাবে?

ঘাড় হেলিয়ে দোকানদার বললে—নিশ্চয় যাবে। আশা করি, আপনি যে-রকম জিনিষ চাইছেন, ঠিক সেই রকম জিনিষ আপনাকে দিতে পারবো। এক মিনিট।

এই ব'লে দোকানদার পিছনের আলমারি খুলে ছোট একটি বাক্স বার ক'রে নিলে। তার ভিতর থেকে বেরুলো একটি সুন্দর সৌখিন চতুষ্কোণ সোনার ঘড়ি, তার ডালার মধ্যে সোনার হরফ, সঙ্গে চমৎকার সূক্ষ্ম কাজকরা সোনার ব্যাণ্ড।

ঘড়ি দেখে খুসী হল প্রমীলা। হাতে তুলে নিয়ে বললে—বেশ জিনিষ। আমার পছন্দ।

সুপ্রিয় মনে মনে ব্যস্ত হচ্ছিল। জিনিষ দেখেই বুঝেছিল, দাম হবে অনেক। বললে—এটা বড্ড বেশী সৌখিন আর দামী ব'লে মনে হচ্ছে। এর চেয়ে সাধারণ···

ঘাড় বেঁকিয়ে প্রমীলা বললে—এটাই আমি নেব।

দোকানদারের পানে চেয়ে সুপ্রিয় বললে—কত দাম?

দাম শুনে সুপ্রিয় আরও ব্যস্ত হল। বললে—বড্ড চড়া দাম। দেখ, এর চেয়ে কম দামের ···

শান্ত কণ্ঠে প্রমীলা বললে—ভাল জিনিষ পেতে গেলে চড়া দামই দিতে হয়।

তারপর দোকানীর দিকে ফিরে বললে—এটা নিলাম।

—ধন্যবাদ। ক্যাশ-মেমো কেটে দিই?

—কাটুন। ব'লে প্রমীলা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক গোছা নোট বার ক'রে দাম দিয়ে দিলে। বললে—প্যাক করবার দরকার নেই। বাক্সটা দিন আমার হাতে।

ঘড়ির কেসটি রাখলে ব্যাগের মধ্যে। তারপর ঘড়িটি নিয়ে সুপ্রিয়কে বললে—দেখি তোমার বাঁ হাত।

প্রমীলার কাণ্ড দেখে সুপ্রিয় অবাক হয়ে গেছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলে। মণিবন্ধে ঘড়ি পরিয়ে দিলে প্রমীলা।

সুপ্রিয় বললে—এত সৌখিন আর দামী জিনিষ হাতে মানায় না।

প্রমীলা জবাব দিলে—তা বটে। সবার হাতে মানায় না।

ঘড়ি পরানোর দৃশ্য দেখে খুসীতে দোকানদারের দুই চোখ ভরে উঠল। উভয়ের পানে তাকিয়ে বললে—বাক্‌দান, বিবাহ, জন্মদিন অথবা বিবাহ-বার্ষিকী, এই চার উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করতে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কিছু হ'তে পারতো না। আপনাদের ক্ষেত্রে কোন্ উপলক্ষ্যটি অনুমান করে নেব?

উত্তর দিতে গিয়ে অনির্ব্বচনীয় হয়ে উঠল প্রমীলা; মুখে-চোখে কৌতুকাভা বিচ্ছুরিত করে বললে—চারটে উপলক্ষ্যকেই একসঙ্গে অনুমান ক'রে নিতে পারেন।

উত্তরের বাক্-বৈদগ্ধ্যে শুধু সুপ্রিয় নয়, ইংরেজ বেচনদারও হাঁ হোয়ে গেল।

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রমীলা বললে—চলো যাই।

দু'জনে ট্যাক্সিতে উঠল। প্রমীলা বললে—বেশ লাগছে জায়গাটা। ঘুরে যেতে বল ট্যাক্সিকে দীঘির চার ধার।

—সে আবার কি! তোমার মাথা খারাপ হল নাকি? দুপুর রোদে লালদীঘিতে পাক খাওয়া?

আসনের কোণে গা এলিয়ে দিয়ে প্রমীলা জবাব দিলে—পূর্ণ-সলিলা পুষ্করিণী প্রদক্ষিণ করায় পুণ্য আছে।

সুপ্রিয় হেসে বললে—নির্ঘাৎ তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—তাহলে তো কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।

প্রমীলা তেমনি ভাবে বললে—তা গেলে মন্দ হয় না। তবে যে-সে ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে না। আমার নিজস্ব ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

—বেশ, বল তার নাম-ঠিকানা। সেখানেই না হয় যাই।

উত্তরে প্রমীলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুললে। একখানি ইংরেজীতে নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড বার ক'রে সুপ্রিয়র কোলের ওপর রেখে বললে—এই আমার ডাক্তারের নাম-ঠিকানা।

সুপ্রিয়র বিস্ময়ের শেষ নেই। বললে—এ তো আমার ভিজিটিং কার্ড! আশ্চর্য্য করলে তুমি। এ তোমার ব্যাগের মধ্যে কেন?

নিমীলিত দুই চোখে আবেশ নেমেছে। অস্ফুটে বললে প্রমীলা—ওটা আমার আইডেনটিটি কার্ড! মাঝে মাঝে পথে বেরুই। ওই কার্ড সঙ্গে থাকলে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না কোন দিন। রক্ষা-কবচও বলতে পারো।

স্তব্ধ হল সুপ্রিয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে—আজ তুমি একেবারে বর্ণনাতীত। তুমি অনন্যা।

মৃদু গুঞ্জনে প্রমীলা জবাব দিলে—আমি আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

আর কোন কথা হল না। নীরব রইল সুপ্রিয়। নীরবে দুই চোখ মুদে ব'সে রইল প্রমীলা। ভাষার অতীত-লোকে পৌঁছেছে দু'জনে।

সে এক দিনই গেছে।

সেই দিনের কথাই কি স্মরণে এলো দু'জনের, সে-রাত্রে বিনিদ্র রজনী যাপনের অবকাশে?

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

ছোটো থেকেই সুমিতার মনে কতো না সাধ! সব মেয়েই তো ছোটো বেলায় রাজ্যের পুতুল নিয়ে গৃহিণীপনার রাজ্যিপাট ছড়ায়, সুমিতার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু হাতের পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে তার মন ব্যস্ত ছিলো স্বপ্নের পুতুল গড়তে।

সুবিধাও ছিল। যে বয়সে মেয়েরা বেণী দুলিয়ে হালকা চালে স্কুলে যায়, সে বয়সে সুমিতা শিখলো অজস্র নভেল পড়তে। মহাভারত, রামায়ণ থেকে আরম্ভ ক'রে আরব্য-উপন্যাস পর্য্যন্ত কিছুই বাদ গেল না।

কিছু বোঝা না-বোঝায় মেশা সোনার শৈশব। কল্পনায় কখনো তুমি মিশরের রাজকুমারী হতে পার, কিম্বা ঘুঁটেকুড়ুনীর ঝিও হতে পার। কিন্তু মোটের উপর দুটোরই 'চার্ম' সমান। সেই চার্মের সঙ্গে আবার কখনো বা অ-দেখা রাজপুত্তুরের কল্পনা এসে মেশে।

একদা সখ হয়েছিলো, সুমিতা বেণী দুলিয়ে স্কুলে গিয়েছিলো। কিন্তু সে ওই মাস তিনেক। তার পরেই 'যথা পূর্বং তথা পরম্।' বাড়ীতে কিছু পাঠ্য-পুস্তক কিছু অপাঠ্য-পুস্তক পড়ে সে সময় কাটাতে লাগলো। আজ বুঝতে পারে, "জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।" নইলে সে দিনগুলো আজো তার মনে সোনার দাগের মতো জ্বলো-জ্বলো রইল কি ক'রে?

আত্মজিজ্ঞাসা

ছোটো কালে সুমিতার দেহ ছিলো প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ! ছেলেদের ছোটো বয়সের ঠিকুজী আলোচনায় তার মতো দুষ্টুমীর কথা অনেক শোনা যাবে, কিন্তু মেয়েদের? নৈব নৈব চ।

কঠিন অসুখে পড়ে একদা তার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হোলো। ক্লোরোফর্ম করা মাত্র তার মনে হোলো লাল, নীল বহু রঙের সরষে ফুলের সমাবেশে সে যেন কোন্ পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে মনে হোলো: আমি বাঁচব তো?

বাঁচল সে ঠিকই, কিন্তু সেই আত্মজিজ্ঞাসার সুরু হোলো। দ্বিধা, দ্বন্দ্বে, প্রেমে, সংশয়ে সেই প্রশ্নের আর অবসান হোলো না।

প্রথম কৈশোরে ততো দিনে সে পৌছে গেছে। সব মেয়েদের মতোই তারো ছিল স্নান-বিলাস, সাজ-বিলাস। কিন্তু তারি সাথে সাথে আরো একটা জিনিস ছিল তা হোলো তার দুর্লভ পাঠ-বিলাস। ও বিলাসটি মেয়েদের মধ্যে বড়ো বেশী পাওয়া যায় না।

নির্জন স্নানকক্ষে ঘন কুন্তলভার এলিয়ে দিয়ে স্নান করতে কি আরাম! সুমিতাই বা কে আর রাণী ক্লিয়োপেট্রাই বা কে তখন! কিন্তু এত আরামের মধ্যেও সুমিতা তার: 'আমি কে? আমি আর ক'দিন বাঁচব? যখন বাঁচব না তখন কি হবে? ততঃ কিম্?' এ প্রশ্ন ভুলল না।'

সাহিত্য

তবু তো আত্মজিজ্ঞাসা ক্ষণিকের, অন্তত সুমিতার বয়সে। কিন্তু সাহিত্য চিরকালের। সাহিত্যের রসানুভূতিও তাই, এমন কি সেই বয়সেও। নানা বই পড়তে ব্যস্ত সুমিতা তখন পেয়েছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদ। মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা রাজসিংহ পড়ে বুঝতে পেরেছে সত্যিকারের সাহিত্য কি।

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে"

পড়ে এমন কি তার আঁখিপল্লব সিক্ত হয়েও উঠেছে। অন্য বই পড়তে উৎসুক মনের এক ভাগ হয়ে উঠেছে সজাগ সমালোচক। শুধুই বঙ্কিমচন্দ্র? আরো বিস্ময় ছিলো তার জন্য অপেক্ষা ক'রে। বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র! তারি মাঝে মাঝে রমেশচন্দ্র, প্রভাতকুমার, অনুরূপা দেবী। সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী রাস্তার ওপরের মশলা। আহা! বইয়ের পৃথিবী এমনো হয়! আর এদের পৃথিবীর সঙ্গে সবুজ পৃথিবীর পার্থক্য কোথায়। এ-ও যা, ও-ও তাই। অতএব সুমিতা বিনা দ্বিধায় পৃথিবীকে ভালোবাসল।

এমন মেয়ে যদি স্কুল-পরীক্ষার সীমানা পেরোতে চায় তাহ'লে পাশ করা তার অদৃষ্টে অনিবার্য্য। সুমিতাও ভালো ফল করতে পারলো না, কিন্তু পাশ ক'রে গেলো।

জীবন-জিজ্ঞাসা

সাহিত্যের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার জীবন তাঁর মনে প্রশ্ন তুলেছে ততো দিনে। তখনো নিরাশার অঞ্জলি দেবার সময় হয়নি। জীবন তখনো মোহনীয় মধুর, হোলোই বা তা মরীচিকা। সুমিতাকে জীবন মুগ্ধ করেছে, বিচলিত করেছে, আত্মবিস্মৃতও করেছে। এ পৃথিবী কেন এমন? এতো ভালবাসার পাশে এতো ঘৃণা, এতো প্রেমের পাশে এতো অপ্রেম, এতো ভালোর পাশে এতো মন্দ থাকে কি ক'রে? তার মন বললো, ভালোটাই নিশ্চয় বেশী। মন্দের সংখ্যা কম। নইলে লেখকেরা এতো সান্ত্বনা, এতো শান্তি কোন্ উৎস থেকে খুঁজে পান?

কলেজে ঢুকে তার এই বিমূঢ়তা উত্তরোত্তর বেড়ে গেল। কেন

আর সমপাঠিনীরা এত পরশ্রীকাতর, কেন এই দ্বিধা-বিভক্ত জীবন-নীতি? সুমিতা সাহিত্যের বই খুললো।

তার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তা'পরে ছুটি নিব।"

মনে পড়লো, কিন্তু মন মানল না। মন বলল: আমি নিজেকেই যথেষ্ট সুন্দর ক'রে তুলতে পারি নে; অন্যের মনোভাব লাঘব করবার দায় আমার নয়।

রূপসজ্জা

সেই বয়সে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে, নিজের রূপকে সাজিয়ে তুলতে কার না সাধ যায়? সুমিতারো গেলো। অচেতন মন পারিপার্শ্বিকের প্রতি সচেতন হয়ে উঠলো। শুধু রূপের সাজ নয়, তার সঙ্গে অরূপের আকৃতিও আছে। সেই আকৃতির কিছু প্রকাশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জ্বালা-ভরা দিনগুলির মাঝে।

নানা রূপে, নানা অঙ্গসজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে তুলে মনে হয়: "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশী?" মনে জাগে প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস। মনে হয়, এ আর কী! আমি তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমার সৃষ্টির ভার নিয়েছেন স্বয়ং বিধাতাপুরুষ।

এই অহংকার সুমিতারো ছিল কিন্তু তাতে তার পদস্খলনের উপক্রম ঘটেও ঘটল না। আবার সে উপনীত হোলো নিজস্ব কেন্দ্রে।

মেয়েরা জাত-বিলাসিনী। এ বিলাস শুধু দেহ সাজিয়েই পরিতৃপ্ত নয়, আরো সুদূরে প্রসারিত হতে চায়। তবে? পুনর্বার সুমিতার মনে এলো প্রশ্ন—কী সাজাব? কাকে সাজাব? কেমন ক'রে?

আঠারো বছর পর্যন্ত দিনগুলো অভিসারের দিন। সে সময়ে কিশোরীর মন অস্থির ব্যগ্রতায় সন্ধান করে কোনো এক জনের—নানা রঙের দিনগুলো ভেসে চলে যায় কতো কামনায়, কতো দ্বন্দ্বে, কতো ভাবনায়, কতো ছন্দে। সুমিতারো তাই হোলো। প্রশ্নের নিরসন তখনো হোলো না কিন্তু কবিতা লেখার কালি পেলো। কলমও।

ভানুসিংহের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা ছোটো থেকে সুমিতার মনে দোলা দিয়েছে।

"গেলি কামিনি গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি,
ইন্দ্রজালক কুসুম শায়ক
কুহকি ভেলি বরনারি।"

ভাষার এই কারিকুরি, ছন্দের এই ইন্দ্রজাল অর্থ বোঝবার আগেই তার মনকে আবিষ্ট করেছে। নীল-বসনা মুক্তামালা-কণ্ঠী কোনো অচেনা সুন্দরীর অভিসারের বর্ণনা পড়তে পড়তে আঁখি হয়েছে অশ্রু-সজল। তারো পরে সুমিতা পড়েছিল জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি তার অলংকারের ঝংকারে বুদ্ধিকে স্তম্ভিত ক'রে রসের দ্বারে যা দিয়েছিলেন, চণ্ডীদাস সোজাসুজি মন হরণ করলেন। জ্ঞানদাস—তা তিনিও সেই পথেরি পথিক। তিনি আরো একটু অগ্রসর হয়ে উঁকি মেরে পথ-ঘাট দেখে নিয়ে বললেন:

"ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া আকুল পরাণ।"

ঘাট থেকে ঘর যাওয়া—সে তো একটুখানি পথ। সেই পথ কেন অফুরান হোলো সে ধাঁধা সুমিতা বুঝতে পারলো না; কিন্তু এই পথের আড়ালে যে রস ছিলো তাতে তার চিত্ত নিমগ্ন হোলো।

সব শেষে ভানুসিংহ। তিনি কিন্তু সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েছেন। মিলন-লগ্নে রাধার সজ্জার বর্ণনা দিয়েই তিনি খুসী নন,

"মোতিম হারে বেশ বনা দে সীঁথি লগা দে ভালে
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পক মালে।"

তাঁর রাধা বিরহের যন্ত্রণায় তিল তিল ক'রে মরতে রাজি নন্। এক কথায় তিনি বলে বসেন:

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"

সুমিতার মনে হোলো বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মকথা ধরা পড়েছে এই একটি লাইনের অভিব্যক্তিতে, মূর্চ্ছনায়। 'তুমিই আমার শ্যামের সমান'—শুধু দ্বিতীয় নাগরের কল্পনাই করা নয়, তাকে প্রথমের সমকক্ষ ক'রে তোলা—এতখানি দুঃসাহস আর কোনো কবি দেখাতে পেরেছেন?

সুমিতা ভেবেছিল পারেননি। কিন্তু পরে গোবিন্দদাস পড়ে তার সে ভ্রান্তির নিরসন হোলো। গোবিন্দদাস আরো চতুর। তাঁর মর্মকথা আরো গভীর। তিনি বলেন:

"প্রেমবতি প্রেমক লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ"

যে সব প্রেমবতীরা প্রেমের অভিমানে কথায় কথায় জীবন পরিত্যাগ করবেন বলে ভয় দেখান, আবার বলেন 'মরণই তাঁদের শ্যামের সমান', এ তাঁদেরই প্রতি শ্লেষ-তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সুমিতার মনে হোলো সেও একবার ছুটে গিয়ে জানিয়ে আসে "চপল জীবনে তাক সাধ।" জীবন চপল তবু তা মধুর। বিষাক্ত মধুর।

এমনি ক'রে পদাবলী-সাহিত্য পড়তে পড়তে সুমিতার কালি তৈরী হোলো। মাঝে মাঝে সে কালি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দোয়াত-খানি ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়নি। আবার প্লাবনে কালি ভরে উঠেছে।

কিন্তু কলম কোথায়?

কলম তৈরী করছিলেন সাগরপারের কবিরা। তাঁরা কেউ আবেগে উচ্ছল কেউ বা অলংকারে নিপুণ কেউ বা খাপখোলা তলবারের মতো ঋজু। Shelley, Keats, Tennyson, Browning. সুমিতা এক-এক জনের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হোলো, যেন এক-একটা রাজ্যে পদপাত করল। শুধু পদপাত নয় পরশ। শুধু আশা নয়, ভাষা। এমন ভাষা যা বড়ো বেদনার মতো বুকে এসে বাজে।

কাব্য-জিজ্ঞাসা

সুমিতা স্থির করলো সে লিখবে। কিন্তু কেন? এ 'কেন'র উত্তর সে তখনি ভেবে স্থির করতে পারল না। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি? না শুধু ভালো লাগা, ভালোবাসা? ভালোবাসব কাকে? সুন্দর পৃথিবীকে, সুন্দরতর মানব জাতিকে? কিন্তু

কালি-কলম নিয়ে বসলে বাইরের বসন্ত যে চলে যাবে! বিকেলের রং নিবে আসবে। এত কষ্ট করা কেন?

'কেন'র কারণ নিরসন করতে না পারলেও লেখিকা হবার পণ তার শিথিল হোলো না। তবে, সাহিত্য পড়া যতো সুখের, সাহিত্য করা ততো নয়। তার ষ্টাইল' আছে তার নীতি আছে। তার জন্য চাই প্রাণপাত পরিশ্রম, চাই অকৃপণ প্রেম। অথচ কিছু পাবার আশা করলে চলবে না। "মা ফলেষু কদাচন।" এর আস্বাদ নাকি ব্রহ্ম-স্বাদের সমতুল্য। অন্য ফল পাও বা না পাও মনে ক্ষোভ রাখতে পাবে না।

প্রথমেই ঠেকল নীতি নিয়ে। আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্, না, লাইফস্ সেক্? সুমিতার মন বিদ্রোহ ক'রে বলল: তা কেন, সাহিত্য নিশ্চয়ই সাহিত্যের জন্যই। শ্রাবণ-দিনে আকাশ জুড়ে যে নীলাঞ্জনের ছায়া ঘনিয়ে আসে তা কি শুধু চাষীর 'আরো ফসল ফলাও' এই স্কীমকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্য? শ্রাবণ-রজনীতে যে হঠাৎ খুশী মনে ঘনিয়ে আসে, তার কি কোনো কারণ আছে?

কক্ষনো না। সাহিত্যে নীতির প্রশ্নই অবান্তর। সাহিত্যকে আমি ভালোবাসি এই যথেষ্ট, কেন তাকে ভালোবাসি এ কারণ খোঁজার প্রয়োজন নাই।

নীতির সমস্যা সহজেই চুকোনো যায়। কিন্তু রীতি? তার উপমা, অলংকার, ছন্দ ও দ্বন্দ্ব। তার গদ্য এবং পদ্য? গদ্য-কবিতা ও পদ্য-কবিতার মধ্যে বিরোধ? এ সব সমস্যার সমাধান কোথায়?

সমস্যার সমাধান ঘটে লিখতে লিখতে। লিখতে সুরু করলে কলম তার আপন বেগে চলে, ষ্টাইল কিছু তৈরী করতে হয় কিছু বা আপনিই তৈরী হয়। কিন্তু তার জন্য চাই পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। সাহিত্যের সাথে প্রেমে পড়তে হবে। তাকে অর্চনা করতে হবে, নিশিদিন অনুধ্যান করতে হবে। "জীবন-বল্লভ মরণ অধিক তুঁহু" এই বলে অঞ্জলি দিতে হবে। সুমিতার সে দিন তখনো আসেনি। তার মাঝে মাঝে ষ্ট্রাইক্ ক'রে কফি হাউসে গিয়ে আড্ডা দিয়ে যথেচ্ছ গল্প করতে ইচ্ছে করে, কলেজ পালিয়ে ট্রামে ক'রে সারা কলকাতা ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে, অপাঠ্য কেতাবগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও মন্দ লাগে না, সর্বোপরি ভাল লাগে মউজ করে কোনো এক জনের কথা ভাবতে। মাঝে মাঝে কবিতা লিখবার ইচ্ছে হয়, তাও সবাকার জন্য নয়, এক জনের জন্য।

নারী

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সুমিতার মনকে নাড়া দিয়েছিলেন অন্য ধার দিয়েও। সুমিতার মনে ক্রমে ক্রমে এ তথ্য পরিস্ফুট হোলো যে, সে মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে হোলো এ দেশের নারী-সমাজ অত্যন্ত অবহেলিত। যেটুকু স্বাধীনতা তারা চাপাচাপি ক'রে আদায় করতে পেরেছে তাও নিতান্ত সামান্য। এবং, সমাজ সেটুকু দিতে বাধ্য হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে, তাদের প্রতি কোনো উদারতাবশত নয়।

তাই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নারী-চরিত্র তাকে মুগ্ধ করলো, শরৎ-চন্দ্রের কিরণময়ীর জন্য সে চোখের জল ফেলল। শরৎচন্দ্রের 'নারী' প্রবন্ধ পড়ে পড়ে এক প্রকার কণ্ঠস্থ করল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছু বৈরূপ্য তার মনে এলো, কেন তিনি এমনতরো আন্তরিকতা দিয়ে নারী-সমস্যা আলোচনা করেননি? রবীন্দ্রনাথেরো ভাগ্য, সুমিতারো ভাগ্য, এমন সময় তার হাতে পড়লো, "মহুয়া বনবাণী পুনশ্চ"—সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ কেমন করে সুমিতাকে ফাঁকি দিয়েছিলো কে জানে?

মহুয়াতে সুমিতা পেলো:

> "জীর্ণ মজ্জা কাপুরুষে
> নারী যদি গ্রাহ্য করে লজ্জিত দেবতা তারে দূষে।
> নারী—সে যে মহেন্দ্রের দান
> এসেছে পৃথিবীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।"

মহেন্দ্রের এক হাতে বজ্র অপর হাতে কল্যাণী! এক হাতে শাসন, অন্য হাতে সম্মান। সে সম্মানও শুধু বীরের জন্যই।

আরো পেলো সুমিতা:

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার
> হে বিধাতা?"

এ সব কি কবিতা! সুমিতার বক্ষ উদ্বেলিত হোলো, প্রতিজ্ঞা কঠোর হোলো। বীরের কণ্ঠেই সে তার বরমাল্য দেবে।

এক জন

এদিকে কালি-কলম তৈরী হয়ে রয়েছে। মন তখনো তৈরী হয়নি, শুধু ঢেউ খাচ্ছে। আশা, আশ্বাস, বেদনা! কিছু না লিখলেই বা চলে কেমন ক'রে? সুমিতাও খিলতে বসলো। গদ্য এবং পদ্য। কিন্তু চিঠির 'ফর্মে'। তার বীরের দেখা সে পেয়েছে। তাই "দিনের পরে যায় রে দিন! শ্রাবণের ছায়া তৃষার্ত প্রেমে ধরণীকে আলিঙ্গন করে। রাত্রির কারুণ্য নেমে আসে শ্যামল বনপ্রান্তে। কুমুদ-কহ্লারের প্রতীক্ষা বর্ষণ-শেষে সার্থক হয়। বসন্তের উজ্জ্বল সমারোহের পরে আসে শীতের রিক্ততা। জ্যৈষ্ঠ নিরাভরণা ধরণীকে সাজায় তাপসীর বেশে। ঋতুর পরে ঋতুর ডালি নিয়ে ভেসে চলা নানা রঙের দিনগুলি ধরা পড়লো সুমিতার কালি-কলমে।

তার সেই চিঠিগুলি। আহা, সে তো চিঠি নয়, যেন বন্ধ হৃদয়-দুয়ার বহু যতনে পরতে-পরতে উন্মোচন করা।

কতো ভাবনা, কতো বেদনা! কতো দ্বিধা, কতো সংকোচ! যেখানে মনোমত হয় না কিছুতেই, সেখানে গদ্যকে বিদায় দিয়ে কবিতার হাত ধরা। কতো ব্যাকুল কামনা ও অধ্যবসায় দিয়ে লেখা সেই চিঠি। এমন চিঠি লেখা চাই যা হাতে পড়লেই কথা কইবে। শুধু কথা কওয়া নয়, কানে কানে বলা। সে কথা সলজ্জ মধুর, সে কথা শুধু এক জনেরি।

কথা কওয়ার চেয়ে লেখায় সুমিতা চিরদিনই পটু। বাগ বাদিনী নামটা মেয়ের হওয়া উচিত নয় সেটা ওই প্রমাণ ক'রে দিতে পারে। তাই তার চিঠি হয়ে উঠলো সাহিত্য-রচনা অজ্ঞাতসারে এবং অনায়াসে।

কিন্তু আবার সাহিত্যের সেই রীতির প্রশ্ন। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' এ কথা কি সুমিতা মানবে না? আর তা যদি না হয় তবে শুধু তার চিঠি লেখার ভঙ্গিমা দিয়ে সে অপরকে

ভোলাল কি ক'রে। মনে হতেই তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে ওঠে।

শুধুই কি ভঙ্গিমা? তার আড়ালে কি বইছে না প্রেমের স্রোত? তবু তো সংশয় জাগে। মনে হয়, যদি আমি চন্দনসই রূপসী না হতেম, যদি হতেম কৃষ্ণকলি, "কালো যাকে বলে গাঁয়ের লোক" তাহ'লেও কি সে আমার প্রেমে পড়তো?

কিম্বা যদি আমি এমন ক'রে চিঠি লিখতে না জানতেম তাহ'লে? তাহ'লেও কি সে···

কিন্তু মনকে এ-সব ব্যাপারে বেশী দূরে ছেড়ে দিতে নাই। প্রেমের ক্ষেত্রে সংশয়ের মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই। সুমিতাও তার মনকে বকলো।

তবু তো কতো মধুরতা, কতো আবেশ! সকালে ঘুম ভেঙে তার কথা মনে পড়ে, তার স্মৃতি জড়িয়ে থাকে সৌরভ-উন্মীল নিশিগন্ধার মতো। ক্লাসে যায়, সে তো ক্লাসে যাওয়া নয়, প্রিয়-সন্দর্শনে যাত্রা। তাকে শুধু দেখাই যেন মূর্চ্ছার মতো মোহময়।

কথা কয়, সে যেন স্বপ্নে-বলা কথা। শোনেও তাই। পথচারীদের মনে হয় ওরা অসীম করুণার পাত্র। এত প্রেম, এত মাধুর্য্য, এত সুখও যে পৃথিবীতে আছে, তা কি ওরা জেনেছে কোনো দিন? কখনো না। এ শুধু সুমিতাই প্রথম জানল।

মর্ত্ত্যের সাথে প্রেম করতে গেলে অমর্ত্ত্যকে বিদায় দিতে হয়। সুমিতা সবে সাহিত্যকে ভালোবাসতে সুরু করছিল, হেন কালে এই বিপত্তি! সাহিত্য অভিমান ভরে এসে বলল, আমায় বিদায় দাও। সুমিতা আপত্তি করল না। সে তখন অনন্যচিত্তা মুগ্ধা নায়িকা। অন্য কথা ভাববার অবসর তার কই? দু'হাত তুলে সে বিদায়-নমস্কার জানালো।

এত দিন ভেবেছিলো সাহিত্যে রীতি ও নীতির কথা। এখন তাকে আবিষ্ট করল প্রেমের রীতি ও নীতি। প্রেমের রীতির কথা তো বলে কাজ নেই। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কি আর সাধে পিরীতি ওরফে প্রেমের গুণকীর্ত্তন ক'রে গেছেন? কিন্তু প্রেমের নীতি? সেটা কেমন জিনিস? প্রেম দু'টি চিত্তকে মুগ্ধ ক'রে একটি বাঁধনে বেঁধে দেয়; এমন প্রেম সমাজে কেন সব সময়েই স্বীকৃতি পাবে না? বলতে গেলে, কোনো প্রেমই সমাজে স্বীকৃতি পায় না। স্বীকৃতি পায় কেবল একটা ফর্ম—বিবাহ।

সমাজ এমনিতে বড়ো অসামাজিকরূপে কঠোর। তার উপরে আবার আমাদের সমাজ বড়ো উন্নাসিক, বড়ো বর্ব্বর। বিয়ের পরে দশ-বারোটি বাচ্চার আমদানী করলেও সে অপরাধীকে কিছু বলবে না, অথচ বিয়ে না ক'রে একটু চোখ তুলে অন্যের পানে চাইলেই সমাজের রাজ্যিশুদ্ধ রসাতলে চলে গেল। যাক গে, বয়েই গেল।

সিদ্ধান্ত এক, আর সংস্কার আর। সংস্কারের বাধায় হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, কতো রাত্রি বিনিদ্র কাটে শুধু স্মরণে, শুধু মননে, তার হিসেব রাখবে কে? মাঝে মাঝে যেন ভুল করে এক-আধটা কবিতার কলি মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ওঠে। কিন্তু সুমিতা আমল দেয় না। রাধার যৌবন ছিল অনন্ত। সুমিতার তো তা নয়। তিনি একশো বছর অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। একশোটা মিনিট অপেক্ষা করতে গেলে সুমিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অতএব এই দুর্লভ দিনগুলো সুমিতা ঘরে বসে লিখে আর কথার মালা সাজিয়ে অপচয় করতে পারবে না।

এখানে কিন্তু বলা প্রয়োজন যে, সুমিতার প্রেম দিয়ে কোনো গল্প আমি লিখতে বসিনি। আমার কথা সুমিতার অন্বেষণ। সেই যে কোন্ বিস্মৃত কৈশোরে এক প্রশ্ন সুমিতাকে দোলা দিয়েছিলো—আমি কেমন ক'রে বাঁচব—সেই প্রশ্নের উত্তর আজো সে নানা ভাবে খুঁজে চলেছে। কখনো প্রেমে, কখনো সাহিত্যে।

সাহিত্য চঞ্চলমতি প্রেমিক, এমন কথা শোনোনি? সাহিত্যের প্রেরণাও তাই। তবু মাঝে মাঝে পথভোলা প্রেরণা এসে সুমিতার হৃদয় মথিত করতো। অবশ্য সে-ও শুধু চিঠি লেখার প্রয়োজনে। কিন্তু কবিতা লিখতে হ'লেই আর এক বিপদ। কোন্ পথ সে নেবে? গদ্য-কবিতা না পদ্য-কবিতা, কোন্ ভাষায় কথা কইবে? হেঁটে চলবে, না নৃত্য-ছন্দে চলবে? ছোট থেকেই সুমিতাকে অনেকে বলতেন, তার চলন যেন ঠিক নাচের চলন। অর্থাৎ সে নিজেই একটি মূর্ত্তিমতী গদ্য-কবিতা। কিন্তু গদ্য অথবা আধুনিক কবিতাগুলো তার তেমন ভালো লাগত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সব সময়েই ভালো লাগা উচিত, তাই সে যথোচিত মুগ্ধ হয়ে তাঁর গদ্য-কবিতা প'ড়তো কিন্তু মন বলতো রামঃ! তাঁর পদ্য এবং গদ্য-কবিতার তফাৎ যেন আম আর জামের তফাৎ।

যাঁকে ভালোবেসে সুমিতা কবিতার ফর্ম নিয়ে এ-হেন গবেষণা করতো তিনি ছিলেন রাজনীতি-ভক্ত। যাঁরাই কাব্যের অনুরাগী তাঁরাই জানেন এমন পরস্পরবিরোধী দুটি বস্তু আর নাই। কবিতা আর রাজনীতি যেন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। এদের মধ্যে মিলন ঘটে কদাচন। আর তা পারেন কেবল তিনিই যাঁর আছে অসামান্য প্রতিভা। অন্যথায় রাজনীতি মনে রেখে কবিতা লিখতে গেলে অথবা কবিতা মনে রেখে রাজনীতি করতে গেলে বিপদ অনিবার্য্য।

জী'নে এ দিনগুলোর পরেও আরো কতো দিন এসেছে, গেছে। কিন্তু এমনটি আর নয়। পাঁচ বছর পরে এই দিনগুলোর কথা মনে ক'রে সুমিতা কবিতা লিখেছিলো। সেটা পড়লে হয়তো বা তার মনের গতির কিছু আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

"সবুজ কুহেলী হাওয়া আঠারো বছর,
ঝরো-ঝরো ধারাজলে ছোটো স্রোত নদী।
উন্মাদ উচ্ছল সেই আঠারো বছর
আর একবার, আহা, ফিরে পাই যদি।

আরক্ত বাসনা ভরা মধুর অধর।
বেদনা-বিলাসে বক্ষ কাঁপে থরোথর।
কুমারী নয়ন তুলে সচকিত চাওয়া।
তুমি সেই আঠারো বছর।

বৈশাখী দাহনে তপ্ত দিবস প্রখর।
ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে তবু বয় নদী।
হেনার সুরভিমাখা আঠারো বছর
স্মরণ-বিহ্বল ডাক দেয় নিরবধি।

কথনো মুখর প্রাণ, সচকিত ডাকি
চলে গেছো একেবারে, কিছু নাই বাকি !
সে দিনের কৃষ্ণচূড়া রক্তিম বরণ
উন্মথিত দুটি হিয়া, ব্যাকুল বন্ধন।
সবি গেছে, কিছু নাই ? দিবসের তাপে
মধুর অধর আজ ম্লান হয়ে কাঁপে।
ব্যথা-ভরা পরজন্মে আঠারো বছর
আর একবার, আহা, ফিরে পাই যদি !"

বলাই বাহুল্য, কবি সুকান্তের আঠারো বছরের প্রশস্তির সঙ্গে এ কবিতার অনেক অমিল।

পাঠ্য-জীবন থেকে বেরিয়ে এলেই সুরু হয় সংসার-জীবন। সেখানে অনেক সংঘাত, অনেক বঞ্চনা। পাঠকালে ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু স্বপ্নবিলাস উপভোগ করেছে, তার জন্ম কড়ায়-ক্রান্তিতে সংসারকে ঋণ শোধ দিতে হয়। সংসার কুসীদজীবী।

প্রেম করতে করতে যদি বা মাঝে মাঝে সাহিত্য নিয়ে মানস-কেলি করা চলতো, সংসারে তো তারো উপায় নাই। তার ওপরে, সুমিতার প্রেমিক অনেক দূরে। স্থান-কাল বিচার করলে উভয় ক্ষেত্রেই। আর, চিঠি লেখার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ, যা হারিয়েছে তার জন্ম উগ্র অকরুণ অশান্ত একটি বেদনা সমস্ত মনকে ছেয়ে আছে।

সুমিতা কবিতাকে আবার ডাকলো। কিন্তু সেও অভিমানিনী। বললো, নিজের মনকে শান্ত করো, তোমার মনে জীবনের চলমান ছায়া পড়ে কই ? যাবো কেমন ক'রে ?

সুমিতা দেখলো, ছোটো বেলার গড়া ধারণা সব ভেঙে পড়লো। সংসার বড়ো মন্দ। ভালো কেবল দু'-এক জন। সঙ্গে সঙ্গে এ অসাম্য তাকে বিপর্য্যস্ত করলো, প্রায় উন্মাদিনী করলো। কেন এ বিরোধ, কেন এ অশান্তি ?

এই অশান্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলো বহিরঙ্গ জনের সকরুণ সমালোচনা। মনে পড়লো তার—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।
এবং— যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

সুমিতার মনে হোলো সে তো ভুল ক'রে চায়নি, তার আকাঙ্ক্ষিতকেই চেয়েছিলো। তবে কেন তাকে পেলো না ? মনে হোলো, তার মতো দুঃখী কে ? যাকে ভালোবেসেছি তাকে ছাড়া কেমন করে এক দিনও বাঁচা যায় ? সংসার কি নিষ্ঠুর ! সমাজ কি নির্মম ! ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তবে তাঁর কি অবিচার !

ঋতুর পরে ঋতুর ডালি এসে বৃথাই ফিরে গেলো। পুরাতন পৃথিবী নতুনের সাজ পরে সুমিতাকে ডাকলো, নতুন প্রেম তাকে আহ্বান জানালো, কিন্তু সুমিতা বধির। অকথিত নিবেদনে যা ছিলো তার মনে, তা যদি কেউ না শোনে তবে সুমিতাও কারো ডাক শুনবে না।

ভালোবেসে যদি পাওয়ার প্রত্যাশা মনে রাখি, তাহ'লে অনেক বেদনা অনিবার্য্য। সুমিতা আঘাত পেলো, কারণ সে চাওয়া ও পাওয়ার এই সহজ তত্ত্বটুকু মনে রাখতে চায়নি। আমাদের যে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছে সে কি আমাদের কাছে কিছু চায় ? আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো ভালো হচ্ছি, মন্দ হচ্ছি, সে শুধু ব্যথিত সকরুণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে অনিমেষে চেয়ে রয়েছে। যাকে ভালোবাসি, তাকে সব দিতে পারি কিন্তু সব যে পাবই, এমন অসম্ভব আশা কেন করা ?

অনভিজ্ঞ কি সে সব বোঝে ? তার সবিস্ময় প্রশ্ন শুধু, কেন তাকে পেলাম না ?

তার প্রশ্ন আরো অনেক বেশী—কেন সৃষ্টির এই দ্বন্দ্ব ? চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে কেন এই বৈষম্য ? সাহিত্যকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিলো, এখন সে মন ফেরালো সংসারের দিকে। এই কেনোপনিষদের উত্তর সংসারই দেবে। কেন দেবে না ?

কিন্তু সংসারও তাকে নিরাশ করলো। এমন সব বড়ো বড়ো প্রশ্নের উত্তর দেয় সংসারের এমন ক্ষমতা নাই। উত্তর দিতে পারে জীবন আর সেই জীবনকে যে রসের রেখায় এঁকে দেখায়, সেই সাহিত্য।

রসের রেখায় যে জীবনকে আঁকে সেই হোলো সাহিত্য। কিন্তু আঁকার দোষে রূপ তো বিরসও হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে মননশীলতা আছে কিন্তু নেই তার সেই অবারিত দাক্ষিণ্য। তাই এ সাহিত্য আর পাঠককে সান্ত্বনা দেবার জন্ম হাত বাড়ায় না, পাঠককেই খুঁজে নিতে হয় কোথায় আছে এতটুকু নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ ছায়া।

সেই খুঁজে নেবার স্পৃহা আর সুমিতার ছিল না। তাই সব সাহিত্যই তার প্রতি বিমুখ হোলো। কিন্তু জীবন—এত দিনের সাহিত্যরসে পুষ্ট জীবন—বরাবর সুমিতার হাত ধরে ছিলো। পথে যেতে যেতে যত বার কষ্টে সুমিতার বুক ভেঙে যাবার মতো হয়েছে, শারীরিক মানসিক বেদনা তাকে বিভ্রান্ত বিচলিত করেছে, মনে হয়েছে তার কেউ নাই, কোথাও নাই, তার যাত্রা নিরুদ্দেশ, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ যাত্রারও শেষে কোনো অসম্ভব মধুরের কল্পনা নেই, আশা নেই, তত বার জীবন তাকে আদর করেছে, অবাধ্য মেয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুমিতা তা বুঝতে পারেনি। সে তখন আপন বেদনায় বিভোর। ছোটো ছোটো অনুকূল দাক্ষিণ্যের ক্ষণগুলি তার চোখে না পড়বারই কথা। অসম্ভব সুখের দিনেও সে অবাস্তব কল্পনায় মগ্ন ছিলো, জীবনের মুখোমুখী দাঁড়ায়নি ; তাকে অবহেলা করেছে। সাহিত্যেও তার প্রবেশাধিকার দেয়নি। বলেছে, "আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্ নট্ ফর্ লাইফ্ স্ সেক্।"

সমাজ তাই জীবনকে জনান্তিকে শুধোলো : তাহ'লে ? এত দিন পরে তোমার দিন এসেছে। মেয়েটার ওপর প্রতিশোধ নেবে না কি ? জীবন বললো : ছি ছি, তাও কি পারি ? ভুল ক'রেই হোক্ বা ঠিক ক'রেই হোক্ ও তো আমায় ভালোবেসেছে। তুমি ওকে যতো নিরাশাই এনে দাও না কেন, তাকে অমৃত ক'রে তোলাই আমার কাজ।

জীবন তার কথা রাখলো। অনেক দিন গেলো তারও পরে কেটে, মান-সম্মানের মোহ ছিলো সুমিতার, সে মোহ ভাঙলো।

পৃথিবীর উপর আশা ছিলো। সে আশা নিঃশেষ হয়েছে। শুধু শেষ হয়নি একটি বস্তু। সে তার প্রেম, সে তার বেদনা, তাই তার কালি শুকোলেও দোয়াত নষ্ট হয়নি। যেদিন সে তার বেদনা ভুলে যাবে সেদিন সোনার কলমেও মরচে ধরবে, কালির উৎস হবে ম্লান।

প্রত্যাবর্ত্তন

সংগীতকে সুমিত্রা চিরদিন ভালোবেসেছে। সেটা স্বাভাবিক। কবিতা ও গান, কথা ও সুর যেন দুই সখী। যে মর্ম্মজ্ঞ রসিক প্রিয়ম্বদার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করবেন, অনসূয়ার দিকেও তাঁকে চোখ মেলে চাইতেই হবে। একদা কেবল সুমিতা প্রতিবাদ করেছিল যখন Walter Pater তাঁর Appreciationএ বলেছিলেন, Music is the finest art, যদিও প্রাচীন ঋষিরা লিখে গেছেন 'গানাৎ পরতরং ন হি'। কিন্তু সুমিতার মন মানেনি। সাহিত্যের চেয়েও সংগীত বড়ো, এমন কি সর্ব্বোত্তম। এ কোন্ দেশী বিচার। তখন সুখের দিনে মন বিদ্রোহ করেছিল; দুঃখের দিনে চক্ষের জল যেই নামলো, সুমিতা বুঝলো কথাটা কি পরিমাণে সত্যি। সাহিত্যের প্রবেশ মননে। কিন্তু সেই মন যখন বিকল হ'য়ে যায় তখন সংগীত তার অধিকার ছড়ায় শ্রবণে, বচনে, হৃদয়ে। এক-একটা গান গায় আর চোখের জলে মনের সবটুকু ধুয়ে-মুছে নির্ম্মল হয়ে যায়। সুমিতা হার মানলো। সে যা চায়নি তাই দিয়েই তার বেদনার উপশম হোলো, আর যা ভালোবেসেছিলো, সেই সাহিত্য তার দুঃখের দিনে কোনো কাজেই এলো না।

"এলো না সে, আসিবে না কোনো দিনও
ফাল্গুনী দিন স্বপ্ন-সীমানা চায়।
কথামঞ্জরী সুর হয়ে ফুটে ওঠো
ভোলো তার স্মৃতি হায়।"

বহু বেদনায় বহু আরাধনায় যে কথামঞ্জরী এক-এক ক'রে ফুল হয়ে ফুটেছে, তা কি কোনো কাজেই আসবে না? শীতের রিক্ততায় ফাল্গুনের অজস্র সমারোহের স্মৃতিও কি মনকে উদাস ক'রে তোলেনি?

সুমিতা ভেবেছিলো, তার সেই এক জন ফিরে এলেই সব আসবে। তার আনন্দ, তার কবিতা সব কিছু। কিন্তু তাও কি হয়? তার দয়িত আবার এলো, কিন্তু এই দীর্ঘ দিনে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস দু'জনেরই কেটে গেছে। তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা জীবনের কাছে অনেক ট্রেণিং পেয়েছে। তাই এবারে দু'জনের চার চক্ষু শুধু মুগ্ধ হয়েই রইলো না, বিচারও করল। আর একথা কেই বা না জানে, বিচার করে আর সবই করা চলে, চলে না শুধু প্রেম।

তাই আবার বিচ্ছেদ এলো। শুধু সেবারে বিচ্ছেদের অন্তরালে ছিলো পুনর্মিলনের ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি। মেশানো ছিলো বিরহের অমৃত। এবারের বিরহ চিরকালীন। তার মধ্যে রইলো না কোনো সামান্যতম আশার আশ্বাস।

সেবারে সমাজ তাকে বাধা দিয়েছিলো। তাতে কিন্তু "পূজা-মূর্ত্তি" তার ব্যাঘাত পায়নি। কিন্তু এবার তার দয়িত তাকে নিরাশ করলো। সুমিতা আবিষ্কার করলো যে, যার উপর সে সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস স্থাপনা করেছিলো, সে তার কণা মাত্র বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নয়। পৃথিবী তাকে যত বঞ্চনা করেছে তার মধ্যে এই হোলো শ্রেষ্ঠতম।

শেষ কথা

কিন্তু, এই শেষ ছলনাতেও প্রেমের ওপরে সুমিতার বিশ্বাস টললো না। কিছুক্ষণ মূর্চ্ছাহতের মতো থাকবার পরে সে যখন সম্বিৎ পেলো, তখন দেখলো আকাশের 'পরে নীল, পাখীর কূজন বড়ো মধুর। বেদনার আড়ালে যে অমৃতের অঞ্জলি নিত্য পূর্ণ, তাকে যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করলো। আর তা যদি না করতো, তাহ'লে সুমিতাকে আজ আমরা পেতাম কোথায়?

তার বিশ্বাস হারালো না। শুধু হারানো অনেক বিশ্বাস একে একে ফিরে এলো। এবারে আর অশান্ত আশার বেদনা নয়, শান্ত সকরুণ একটি বিষাদ-চেতনা। এতো দিনে সুমিতা জীবনের দিকে চেয়ে চিনতে শিখলো:

"এত দিনে বুঝলেম যে কাঁদনে কাঁদলেম
সে কাহার জন্য"

যাকে ভালোবাসি সে যদি ভালোবাসার যোগ্য না-ও থাকে, ক্ষতি কি? তবু তো আমার পাত্র চিরদিনই পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তুমি যে এতো-বড়ো আঘাত আমায় দিলে, তা থেকে কি আমি কোনো ফুলই ফোটাতে পারব না? তা কি হয়? সুমিতা মনে মনে বললো।

কিন্তু গোলাপ ফুটবে কেমন ক'রে? সুমিতা আহ্বান জানালো তার প্রথম প্রিয়াকে—সে তার কবিতা, সাহিত্য। বাণীর কুঁড়ির অঞ্জলি দিয়ে সুমিতা বললো: তোমায় আর কোনো দিনও ভুলব না। আর কাউকে তোমার আসনে বসাব না। তুমি ফিরে এসো।

সাহিত্য সুমিতার কাছে ধরা দিল। এখনো তার রীতি-নীতি, অলংকার ও ভঙ্গী নিয়ে সুমিতার মনে দ্বন্দ্ব চলে কিন্তু দ্বিধার অবকাশ থাকে না। পথের শেষ সম্বন্ধে সে এখনো সচেতন নয়, কিন্তু পথ হারানোর ভয় তার আর নেই।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, লক্ষ বছর পরে যদি পৃথিবী আর এমনটি না থাকে, যদি এই হাসি-কান্না বিরহ-মিলন বিচ্ছেদ-মৃত্যু না থাকে? 'যদি সবই চিরমধুর হয়···তবে—'

সুমিতার রোমান্টিক মন মাথা নেড়ে বলে, না। তেমন পৃথিবী আমি চাই নে। আমি চিরদিন এমনি জীবনই চাই। জীবন আমায় পাওয়ার অতীত পাওয়া এনে দেবে, আবার কেড়ে নেবে। কখনো কাঁদাবে, কখনো হাসাবে। তারই মাঝে চলবে 'আমার অনুসন্ধান—আনন্দ কিসে, আনন্দ কোথায়? সৃষ্টির অন্তরে এই সন্ধানের বিলাস। এ বিলাস থেকে আমিও বঞ্চিত হতে চাই নে।

সুমিতার কথা এখানেই শেষ। কিন্তু তার সন্ধানের সবে সুরু হোলো, সারা যেদিন হবে, সেদিনও সে খবর জানাতে পারব আশা রাখি।
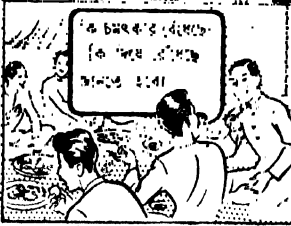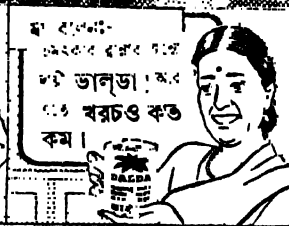
[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

ছাব্বিশ

সেদিন রাত্রে মিস রেবা রায়ের একখানা পত্র পায় কুন্তলা। তিলক এসেছে পাইলট হয়ে। মিষ্টার সেন বিশিষ্ট ক্যামেরাম্যান হয়ে ফিরেছে দেশে। কুন্তলা এখন কি করবে তাই প্রশ্ন করেছে রেবা। উড়ো জাহাজে চড়বে, না ফিলিমে নামবে? আরো নানা কথা লিখেছে দু'পাতা ভরে। প্রফেসার বন্ধু এখনও আসা-যাওয়া করে, হাল ছাড়েনি সম্পূর্ণ।...

কুন্তলা শয্যা গ্রহণের আগে আজ অযথা প্রসাধন করে অসাধারণ। হয়ত নানা কথা ভাবতে ভাবতে খেয়াল থাকে না। মুকুরে নিজেকে দেখে উন্মুক্ত করে।

'আজ আর আমি প্রজা-ভূম্যধিকারীর মধুর সম্পর্কের যুগে নেই রেবা। উড়ো জাহাজে চড়তে হয়, ফিলিমে নামতে হয়, তোরাই চড় অথবা নাম। প্রফেসারের জ্ঞানের মোহও আর আমার নেই।...যদি দিবাকরকে দেখতিস—ফিল্ করতিস্ এই অশিক্ষিত জন-নায়কের মনটা। হাউ ব্রেভ! বিপ্লবী পদে পদে। নিজের বিধবা বোনকে বিয়ে দিচ্ছে বারংবার। আবার সর্বহারা বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে চলেছে সংগ্রামের পথে এগিয়ে। ওরে মানুষ নয় রে রেবা—যেন একটা ষ্টরম্! বিয়ে করতে চাইছে নাকি এক সধবাকে।' প্রসাধন থামাল কুন্তলা। 'কেন সধবাকে বিয়ে করবে দিবাকর—একটা ছিনাল গেঁয়ো মেয়েকে? মুক্তার এমন কি গুণ আছে? জানে সে একটাও থিওরী? পারবে সে কোনও কিছুকে সংজ্ঞা দিতে? রেভলিউসন এভলিউসনের জ্ঞানে সে কিছু? পড়েছে সে হেগেল কিম্বা ডারুইন?' একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে কুন্তলা। গৌরবের দ্যুতি খেলে তার সারা কপোলে।

'কিন্তু দিবাকরও তো এ সব কিছু জানে না। যদি ও মাঝে মাঝে আসত, একটু একটু করে শিখে বুঝে নিত, তা হলে কী যে হত!...তারপর না হয় মর্জিমত বিয়ে করত। কত শেখার বোঝারই তো ছিল—তারপর না হয় চয়েস্ করত।'

কুন্তলা ওষ্ঠযুগলে গভীর রঞ্জন মাখে। চোখে টানে কাজল সুনিপুণ হাতে। সুমুখের মুকুরে অমনি প্রতিবিম্ব পড়ে হুবহু। সে বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে। এই ভিজা রঙিন অধর কি তার? কেন ভিজল আজ এমন করে? ভ্রূতে যেন আমেজ লেগেছে স্বপ্নের। সে ব্লাউজের হুক খোলা রেখে এগিয়ে গেল আরও খানিকটা। উজ্জ্বল করে করে দিল যত দূর দেওয়া চলে আলোটা উসকে। তেমন কোন হেতু নেই, প্রচুর অবকাশ—তাই কি সে এমন প্রসাধন করেছে? আজ সে যখন সেজেছে এত সুন্দর হয়ে, তখন সে তা কিছুতেই বিফল হতে দেবে না।

সফল করবে কি করে? তাই তো, কি করে করবে সফল? দুরু দুরু তার বুক স্পন্দিত হতে থাকে। উরুতে জাগে শিহরণ। নয়নে ঘনিয়ে আসে লোভাতুর চাহনি!

সে দ্রুত মুকুরকে আলিংগন করে একটা সুদীর্ঘ চুমো খেতে চায়, কিন্তু সে তা পারে না। কারণ সে নাকি এক সময় ভাল করে অধ্যয়ন করেছিল হিউম্যান সাইকোলজি।

ঘড়িতে তখন একটা একটা করে বারটা বাজে—শোনা যায় যেন একটানা কতগুলি ব্যংগধ্বনি।

সাতাশ

সমস্যা যখন আসে—আসে সব দিক দিয়ে ঘনিয়ে। কার্তিক মাসের প্রায় মাঝামাঝি। গাঁয়ের দু'-চার জন যারা ব্যবসা করত তারা ছাড়া সকলেই হাভাতে, অন্নহীন। এত দিন বিলে থৈথৈ করেছে বর্ষার জল, এখন একটু টান ধরেছে চরের পাশে পাশে। বাড়ীর কাছে বাঁশ ও ছৈলার ডাল এবং নারকেলের ঘন 'ছরা' যারা মাছের আশায় 'ঝাইল' দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছে তারা এখন পাগল। ঐ ডাল-পালার ভিতর চলন্ত মাছ এসে আশ্রয় নিয়েছে। বর্ষার যাযাবর শীতের লক্ষণ দেখে বাসা বেঁধেছে মনের আনন্দে। জলে তাদের নাচন দেখে পাগল হয়েছে কূলের ক্ষুধার্ত মানুষগুলো। বৌ ঝি ছেলে বুড়ো সবাই। ঐ মাছ ধরবে, খাবে, বিক্রি করে হাট থেকে চাল আনবে। কেউ কেউ আশা করে শাড়ীভুরি পর্যন্ত।

কিন্তু ছোবলের ভয়ে কাউর সাহস হচ্ছে না জাল ফেলতে। মাছ রাঙা, কিম্বা ডোরা বোরার ছোবলের ভয় নয়, ভয় খাস মহলের।

'কি করুম গোঁসাই?'

'ধরবা মাছ। বিলে ফসল থাকতে তোমরা কি মরবা?'

নানা মাপের নানা রঙের শত শত জাল নামে। বুড়োদের হাতে 'খুচইন' জাল, জোয়ান জেলেদের হাতে 'ঝাকি'। কেউ টাকি মাছ ধরে কাদার তলে হাত দিয়ে। যার যার বাড়ীর পাশের নিজস্ব চৌহদ্দির 'ঝাইল' তোলে—টেনে আনে যত ডাল-পালা। এর আগে অবশ্য খানিকটা খানিকটা বেড়া হয়েছে বেরা জাল অথবা গড়-জাল দিয়ে কূলের সংগে অর্দ্ধবৃত্তাকার করে। এখন ঝাইল টেনে মাছ ধরবে। জাল বেয়ে যত জঞ্জাল কুড়িয়ে তারপর ডুবও দেবে ইচ্ছামত।

আহ্লাদের সীমা নাই।

কানুর ছেলেটা তার মার কোল থেকে এক মুখ দুধ নিয়ে নামল টেনে হিঁচড়ে। পড়ল গিয়ে গড়িয়ে জলে।

'ধর ধর ধর।' সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

'না থাকুক, একটু জল খাইয়া শক্ত হউক। যে শয়তান!'

মার নিষেধ শুনে কেউ অগ্রসর হয় না। ছেলেটার কাণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখে। ওটা হাবুডুবু খেয়ে পারের মাটি ধরে দাঁড়ায়। ফের পড়ে, আবার খাড়া হয়। হাসে হিঃ হিঃ করে। মুখ-চোখ কাদায় একাকার। সন্তুষ্ট হয়ে মা এগিয়ে গিয়ে হাত একখানা ধরে। কোলে তুলে চুমো খায়। একজন জ্যান্ত একটা শর পুঁটি দেয় হাতে। 'ভাইজ্যা দিও বৌ।'

সকলের মনের আনন্দকে ছাপিয়ে দিবাকরের মনে আনন্দ হয় অপরিসীম। সে নিজের বাড়ীর উঁচু এক পাড়ে দাঁড়িয়ে দূর-দূরান্তরের টিলাগুলি পর্যন্ত চেয়ে থাকে। একটা অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে, গানের আসরে যেন ঐক্যতান বাজছে প্রথম অংকের—আহার্য আহরণের শুভ সংবাদ।

'কনক আইজ রান্ধন থুইয়া, একটু আইয়া চাইয়া দেখ—পলক ফেলা যায় না দুই চৌক্ষের।'

এঁটো খন্তিটা নিয়েই হাসতে হাসতে আসে কনক। ডান হাতখানা তার হলুদ মাখা।

'জীবন? জীবন কই রে?'

'গেছে বুঝি খুচইন লইয়া। তোমারও তো পরাণডা নাচে। যাবা নাকি গামছা পইর‍্যা?'

দিবাকর কিছু জবাব দেওয়ার পূর্বেই কেষ্ট কৈবর্ত ও রমজান তালুকদার এসে হাজির হয়। দু'জনার মুখে অদ্ভুত উত্তেজনা।

'এখনও নিষেধ কর দিবাকর, নাইলে আমি আইজ জবাই দিমু ছয়ত্রিশটা।' রমজান শাসায়।

রমজানের সংগে সংগেই কেষ্ট বলে, 'তা লাগবে ক্যান? এখনও আইন বাহাল আছে মহারাণীর। ডাক দিলেই পুলিশ আইবে— উৎসন্নে যাইবে ভিটামাটি।'

দিবাকর ঠিক বুঝতে পারে না কেন এরা বাদী হয়ে এসেছে। ওরাও তো ধরতে পারে মাছ।

কোথা থেকে জীবন যেন এসেছিল। সে বলল, 'ওনারা নাকি কবুলিয়ৎ দেছেন বহায় সেলামী দিয়া।'

দিবাকরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন চিড় খেয়ে গেল। অতি কষ্টে সে কিছুটা আত্মসংবরণ করে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, যাও যেখানে পারো—কেও আইজ আর মাছ না ধইর‍্যা কূলে ওঠবে না।' সে টিলার ওপর থেকে সজোরে নীচে নেমে একখানা ডোঙায় ঠেলা দেয়। নায়ের দুরন্ত গতির সংগে তাল রেখে সে 'হৈও' (যুদ্ধে আহ্বানের আওয়াজ) দিয়ে চলে। 'হইও রে রে রে।'

তার অবস্থা দেখে জীবন ফিরতে বলে। সে ডেকে ডেকে গলা ভাঙে। 'কনক, ঠাকুর গোঁসাই আইজ মইর‍্যা যাইবে। তুমি বাইরে আসো রান্ধন থুইয়া। চলো দুই জনে মিইল্যা ধইর‍্যা আনি।'

এমন সময় রমজান ও কেষ্ট চলে যায় বাড়ীর বিপরীত দিক দিয়ে। ওরাও নায়ে উঠে পালায় চোরের মত।

কনক বেরিয়ে আসে। 'ভয় নাই তোর—ও তিখার (ইস্পাতের) ধার পড়ে না অত সহজে। তুই ঘরে আইস্যা তামাক খা।'

জীবন ওর কথা মত ঘরে এসে তামাক সাজে বটে, কিন্তু টান দিতে পারে না। দূরে দূরান্তরে দিবাকরের প্রত্যুত্তরে 'হৈও' শোনা যায় সমবেত কণ্ঠের। ওরা মাছ না ধরে উঠবে না।

কনক বলে, 'কেষ্ট লাভ দেখছে কিন্তু ট্যাডা (তীক্ষ্ণ অস্ত্র) দেখে নাই। জোটের মহল ভিমরুলের বাসা আইছে খোঁচা দিতে!'

লাভ কি, একটু লাভ! সমস্ত বিলটা রমজান ও কেষ্ট বন্দোবস্ত নিয়েছে মাত্র সামান্য কিছু সেলামী দিয়ে। এখন ওরা আবার কর্মার অধীন কোল কর্মা পত্তন দিয়ে আদায় করবে দশ গুণ সেলামী। প্রচুর মুনাফা। মুদি কেষ্ট হবে মসনদদার। তালুকহীন রমজান এখন সত্যিকার হবে তালুকদার। লোকের অভাব কি! পয়সার প্রলোভনে যণ্ডাগুণ্ডা লেঠেল দাংগাবাজ জুটবে অনায়াসে। পুলিশ এবং আইন তো ওদের এখনই রয়েছে বশে? দুর্নিবার মোহ। এ মোহ কাটিয়ে ওঠাই বিষম দায়।

বাড়ী ফিরে দিবাকরের খেতে খেতে বেলা গেছে। ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাল কনক। জীবন দিল তামাক সেজে। এলেম তার বাড়ী গিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে এই কিছুক্ষণ হয় এসেছে। এখনও সে পা ধোয়নি। সে জীবনকে নিয়ে কোথায় জানি রওনা দিল আর বিলম্ব না করে।

'কনক, ওরা গেল কই?'

'আমি তো জানি না। তোমার এলেম যখন গেছে একটা কামেই গেছে।'

'আর জীবন তোর যায় বুঝি যত অকামে। ও না থাকলে অন্ন জোটত না বুইন। ও নীরব কর্মী। ঝক্কি সামলাইয়া রাখছে আমাগো।'

'কি জানি দাদা। আছে গরু যদি না বয় হালে, তা হইলে তো গেরস্থের দুঃখই ছাড়ে না কোনও কালে।'

'ওডা তয় গরু।' দিবাকর হাসে।

কনক মনে মনে যেন একটা ক্ষীণ আনন্দ অনুভব করে। ভিতর থেকে লজ্জারও একটা ধাক্কা মারে। 'আমি তা কইছি নাকি? দাদার কি যে ব্যাখ্যা!'

দিবাকর কনকের মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে যায়, 'একটু ভাল মত গরুডারে ফ্যান-জল খাইতে দিস। ওডা কিন্তু দেশী নয়, একেবারে সুরতী গাই। চাওয়া মাত্র ওলান দিয়া দুধ পড়ে দরদে।' দিবাকরের ভাষা নরম হয়ে আসে।

জল দেখা যায় কনকের চোখে। সে মনে মনে বলে, 'দাদার চক্ষু নাই, অবোধেরে কি কেউ তুচ্ছ করতে পারে?'

সন্ধ্যায় অন্ধকারে একটি-একটি করে মানুষ এসে জমায়েত হয়। দূরের যারা, তারা আসে একটু দেরীতে। নিকটের যারা, তারা এসেছে অনেক আগে। কেউ এত তাড়াতাড়ি এসেছে যে, ভিজা গামছা পর্যন্ত বদলাতে সময় পায়নি। তাদের মাথায় বাঁধা কাপড়। এখন কি করা কর্তব্য? বক্তব্যটা বুঝে দিবাকর উত্তর দেয়, এলেম আসুক।

এলেমের ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়। সন্ধ্যার চাঁদ আকাশের পশ্চিম কোণে ঢলে পড়ে। হাওয়া বইতে থাকে ঝিরঝিরিয়ে। বাড়ীর দাওয়া থেকে নিত্য মাছের ঘাউ শোনা যেত ঘাটে। একেবারে তোলপাড় করে ছাড়ত জল। আজ ভীতু মাছের দল যারা ধরা পড়েনি তাদের যেন সাহস হচ্ছে না বাড়ীর চৌহদ্দি ঘিঁষতে। তামাক পুড়তে পুড়তে ডিবা খালি হল। প্রদীপটাও নিবে গেল দপ করে জ্বলে উঠে।

সকলে বিরক্ত হয়েছিল প্রথম। এখন হল ভয়। মানুষ দুটো গেল কোথায়? এ বিলের তো পরিমাপ নেই। কত ঝোপ-ঝাপি আছে, আছে কত ভুল-ভ্রান্তির চক্কোর। মাঝে মাঝে টিলার ওপর বাড়ী—জ্বলে প্রদীপ। নইলে মনে হত দাম কচুরীপানা জংলা ঘাসের সাগর।

বিস্মিত হয়ে সকলে চেয়ে দেখল নিঃশেষিত-প্রায় চন্দ্রালোকে তিনটি মানুষ এসে হাজির হল। দু'জনকে প্রত্যাশা করছে সবাই। তৃতীয় ব্যক্তি কে?

রমজান এসেছে। দ্বিপ্রহরের শার্দূল রাত্রির অন্ধকারে শৃগালে রূপান্তরিত হয়েছে যেন। ব্যাপার কি?

দিবাকর সহজেই বুঝতে পারে এ কার মন্ত্র।

দাওয়ায় উঠেই রমজান তার হাতের লাঠিখানা দিবাকরের পায়ের কাছে রাখে। 'এই আমি লাঠি ছাড়লাম। বুঝি নাই কেষ্টর ফন্দি।

তোমাগো দোয়ায় আইজ আমার দুইডা পয়সা। তোমাগো বদ দোয়ায় (অভিশাপে) তা আবার খোয়ামু ক্যান। দরকার হইলে টাকা পয়সা দাদন দিমু। আমি কাক, কাকের দলেই থাকুম। পুচ্ছ পক্ষ না ময়ূরের। আমার কসুর (দোষ) মাপ কইর‍্যা লও ভাইজানেরা।' একে একে সবাইর হাত জড়িয়ে ধরে রমজান।

জীবন-সংগ্রামের একটা তীব্র মুহূর্ত। শত্রু পদানত নয়, বিবেকের কশাঘাতে জর্জরিত। তাকে মিত্র বলে একান্ত করে নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে কি! ওর চোখে জল নেই, কিন্তু বুকে যে চলেছে প্লাবন।

দিবাকর সকলের হয়ে বয়রা বাঁশের পোক্ত, রাঙা লাঠিখানা রমজানের হাতে তুলে দেয়। সে বলে যে ভুল-ভ্রান্তি মানুষেরই হয়, কেবল ভুল করে না নাকি শয়তানে। অতএব তার অপরাধ অপরাধই নয়। রমজান যেন এবার আর লাঠি ছাড়ে না, বিপ্লবীদের স্বপক্ষ থেকে কোন কারণে হটে না।

সবাই উঠে করমর্দন করে রমজানের দু'হাত জড়িয়ে।

জীবন শুধু একটু একটু হাসে আর নীরবে তামাক জোগায় এত বড় একটা সভার।

এলেম বলে, 'আইল না কেষ্ট—গেল স্থাবনগর।'

'স্থাবনগর গেল? গেছে চাইল্যা?' উত্তরের অপেক্ষা না করে গম্ভীর হয়ে থাকে দিবাকর। সবাই না বুঝলেও এলেম বুঝতে পারে যে ভিতরে ভিতরে একটা ভূমিকম্প হচ্ছে। বাইরে কিছু ওলট-পালট হচ্ছে না—শতধা বিদর্ণ হয়ে যাচ্ছে অন্তরের স্তরগুলো।

'ও বুঝি কিছু শোনল না—বুঝাইছ তো?'

রমজান বলে, 'যত দূর পারে তাতে গাফিলতি করে নাই ভাইজান, আমিও কইলাম, লও কেষ্ট, গিয়া ইস্তফা দিয়া আসি ছাইর কবলিয়তে। আমরা জোট ভাংগুম না। একটা, আর এক আঁটি বাঁশের টুনিরও (কঞ্চির) গল্প কইলাম।'

অনেকক্ষণ বাদে দিবাকর বলে, 'উঁইর পাখনা হয় কখন জান?'

সকলে মাথা নাড়ে। 'জানি, মরণকালে।'

আবার কিছু সময় পরে দিবাকর বলে, 'সময় ঘনাইয়া আইছে ওর—কিন্তু আমি হমু শুধাশুধু (মিছামিছি) নিমিত্তের ভাগী।'

কথাগুলির তাৎপর্য বুঝে এলেম শুধু শিউরে ওঠে। অপর সবাই ভাবে বাতকে-বাত কথা।

তখনকার মত সভা ভাঙে। দিবাকর উপদেশ দিয়ে দেয়, 'বন্ধুরা মচকাইবা তবু ভাঙবা না। ঝড় আইবে গুরুতর। দেখ না ঝউড়া কোনায় কালি লেপা।'

এলেম বলে, গোঁসাই, ঝড়ে আর যা-ই ক্যান ভাংগুক না, বাঁশ ঝাড় ভাঙে না। কোলকুঁজা বাঁশ আচ্ছা দড়। আমরা সব বয়রা বাঁশের বংশধর।'

শেষ রাত্রে কেউকে কিছু না বলে একখানা সুধার হাসুয়া নিয়ে দিবাকর কি যেন উদ্দেশ্যে কোন দিকে রওনা হয়।

এলেম টের পায়। সে বলে, 'গোঁসাই, কিছু তো অপরাধ করি নাই যে পায়ে ঠেইল্যা যাও।'

'সকলডির কাজও এক না, পথও এক না! তুমি এই গেরামডার দায়িত্ব নিয়া থাক।'

এলেমের কেন জানি মনে হয় ঠিক এমনি স্বাভাবিক ভাবে, এই সুদীর্ঘ মানুষটি আর বোধ হয় ওদের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। দিনের আলোতে আর পারবে না দেখা দিতে। সাধারণ মানুষের স্বাধীন অধিকার থেকে ও হবে বঞ্চিত। এলেমের অন্তরনিহিত এলেম ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা এবং কবিও বটে। তার চিত্ত বিগলিত হয়ে ওঠে। বাষ্পাকুল কণ্ঠে এলেম জিজ্ঞাসা করে, 'গোঁসাই, আবার ফেরবা কবে?'

'তোমার আমার মর্জি মত তো কোনও কাম হয় না। ইচ্ছা আছে সকাল সকাল ফেরার। ফিরতে পারি কাইলও।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

'তোমার কাছে কি ভাই কখনও মিথ্যা কইছি?' দিবাকর সস্নেহে এলেমের গায়ে হাত বুলায়।

'না, তা কখনও কও নাই। কিন্তু আজই যেন মনডা কেমন করে।'

'যে কামে নামছি আমরা, তাতে তো যখন-তখন ছাড়াছাড়ি হইতে পারে। প্রস্তুত থাকতে হইবে আমাগো সব ঝাপটা বাতাসের লাইগ্যা। কইলজা শক্ত কর ভাই। ঝড়ের সময় মাঝি-মাল্লার বেসামাল হইতে নাই।'

'যাও কই?'

'যাই ত জমিন ধন মান বাচাইতে—যমের গ্রাস ছাড়াইতে।'

সবই বলল দিবাকর, কিন্তু কোথায় কি জন্য যায় তা পরিষ্কার কিছুই যেন বোঝা গেল না।

আঠাশ

খুন, খুন—জ্বলছে যেন আগুন। দপ-দপ করে জ্বলছে, জ্বলছে সৃষ্টির লক-লক করে। এ কি অসহ্য জ্বালা! হৃৎপিণ্ডটা নেচে নেচে উঠছে। সৃষ্টির সেই অনির্বচনীয় আনন্দেও হৃদয় নাচে, কিন্তু এ নাচন যেন মহাপ্রলয়ের। হিংসা দ্বেষ প্রতিশোধের একটা প্রবল আগ্রহ। পিপাসা শার্দূলের।

আকাশের তারাগুলোও যেন বর্শার ফলার মত চেয়ে আছে বিলের কালো জলের দিকে। খুঁজে দেখছে কোন পথে চলেছে বিশ্বাসঘাতক। ইতি-উতি উঁকি মারছে নিশাচর পাখী। দেখতে পেলে তারাও বলে দেবে যেন।

কেষ্টকে চেনে সবাই। ও সাধারণের শত্রু।

ঘাসের কোলে চকবগ করে উঠছে মাছ। কানশা তাদের খাড়া, চোখগুলো সতর্ক।

কেষ্ট কোথায়?

আঁধার আর আঁধার নয় ঠিক। সেও আশ্রয় দিতে চায় না অমন অসৎ ব্যক্তিকে। তাই পুব আকাশে জ্বালিয়ে ধরল প্রভাতী তারার বাতি। মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করছে জোনাকীরা। পোকা-মাকড়, শামুক-ঝিনুকও যেন উৎকর্ণ।

এখন কোন পথে যাবে বিভীষণ?

ক্ষুদ্র একখানা একমাল্লাই টালাই নাও চলেছে বিদ্যুৎ বেগে। লগিতে এক একটা ঠেলা দিচ্ছে দিবাকর আর টালাই ছুটছে ঘাস, দাম, টগর, কচুরীর ওপর দিয়ে একটা কালো বকের মত উড়ে। চারিদিক অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের শেষ যাম, বিলটা নিরালা তবু পথ-ভ্রান্তি হচ্ছে না। দুর্বার গতিতে চলেছে নাও। সাধারণ

পরিস্থিতিতে এমন অপ্রমেয় গতি-বেগ দিবাকরেরও কল্পনাতীত। হিংসার হিম্মতে সে ফুঁপিয়ে চলেছে উল্কার মত। একটা দেশের গ্লানি, দশের শত্রু—বৈরী হিন্দু মুসলিম নর-নারীর।

মহাকাল ধ্বংস করেছে, প্রলয় মাতন মেতেছিল, সে যেন কোন যুগে—তখন তার হিংসা ছিল কিনা তা দিবাকর জানে না, কিন্তু সে আজ জিঘাংসায় ঝলছে। তাই লগির পর লগি পড়ছে—দিবাকর নিঃশ্বাস ফেলছে না।

খুন, খুন—রক্তের লোহিত গোলক মাঝে মাঝে দেখছে উন্মত্ত দিবাকর। ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে-বাতাসে।

সংস্কার আছে, জ্ঞান আছে, আছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা। কিন্তু কেন জানি কোনও বিরুদ্ধ বিচার-বিবেচনা তাকে আজ বাধা দিচ্ছে না। উদ্দাম চাঞ্চল্য জেগেছে প্রতি লোমকূপে।

অনেক আগে রওনা হয়ে গেছে কেষ্টা। নিশ্চয় গেছে সোজা পথ ধরে। দিবাকর তার চেয়েও সোজা পথে চলল—যে পথ দল-দাম-ঠাশা, সুস্থ মস্তিষ্কে যে পথ অগম্য।

ছর ছর করে পিছনে একটা শব্দ হলো। দিবাকরের নায়ের মত চলন্ত নৌকার শব্দ। ঠিক তাকেই অনুসরণ করে ধেয়ে আসছে গলুই জাগিয়ে সাপের কর্তিত ফণার মত।

'কে রে?'

'আমি জীবন।'

স্তম্ভিত হয়ে যায় দিবাকর। এমন সাদাসিধা মানুষটার হল কি? ও কোথায় যাবে, কি চায়?

'কোথায় যাবি?'

'কনক কইছে, তোমার সংগে যাইতে। তুমি যে দিকে নাও ফিরাবা, আমিও সেই বাঁকে বাঁকে ঘুরুম।'

এই অবস্থার মধ্যেও একটা হালকা রহস্য উপভোগ না করে পারল না দিবাকর। 'কনক কইছে, আর ও আইছে।' মূর্খের নিজের কোন ভাল-মন্দ উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞান নেই। দিবাকরের পিছন পিছন যাওয়ার আজ কি পরিণতি তা যদি ও বুঝত! একটা অনুকম্পার উদ্রেক হয় দিবাকরের মনে।

'তুই যাও কই জান? আমার সংগে যাওয়ার অর্থ বোঝ?' উত্তরের অপেক্ষায় দিবাকর নাও থামায়।

'জানি গোঁসাই। সব অর্থই তো তোমার ভগ্নী জানে।'

তবে তো জীবন বোকা নয়! এ তো প্রেম, এ যে অতুলনীয় ভালবাসা! নিজেকে বিচার না করে বিলিয়ে দেওয়ার দুর্দমনীয় ব্যগ্রতা। কনকের কথায় ও মরতে এসেছে! এসেছে সবই বুঝে অথচ আড়ম্বর নেই, বরঞ্চ রয়েছে নীরব উগ্রতা।

একদিন ওদের দুটির মিলন দেখে যেটুকু আনন্দ হয়নি, এই অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তা হল সহস্র গুণ। দিবাকর মনে মনে বলল, 'ধন্য রে জীবন, ধন্য!'

'কিন্তু জীবন তুই ফিইর‍্যা যা।'

'এ কি কও। কনক যে কইছে…'

'তার চাইয়াও আমি গুরুজন। কার কথা বড়?'

সত্যই সমস্যা। তবু জীবন জবাব দেয়, 'তোমার বুইনেই তো কইছে। ভাই-বুইনের মতি বোঝা ভার। এতখানি পথ আইস্যা আমি আর ফিরুম না গোঁসাই।'

এখনও নিক্তি ঝুঁকছে কনকের অনুকূলে। রাগ না হয়ে বরঞ্চ দিবাকর হয় সন্তুষ্ট। তারপর সে অনেক করে বোঝায়। ওঝা যেমন করে ঝেড়ে নামায় বিষ।

জীবন ফেরে—কিন্তু বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। 'ভাই হইয়া বুইনের কথা বোঝল না। কি আর কমু—আমি তবে যাই।' জীবনের আর লগি মারতে ইচ্ছা করে না।

ভোরের আকাশে প্রভাতী তারা আরও খানিকটা ওপরে উঠেছে। দিবাকরের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নাও ঠেলে। রক্তে জাগে আবার উল্লাস। কিছু দূর যেতে না যেতেই ত্রাস ঘনিয়ে আসে। কেমন করে গায়েব করবে লাস? কেমন করে ধুয়ে মুছে ফেলবে রক্ত? কেষ্ট কি একা যাচ্ছে? সংগে নিশ্চয়ই লোক-জন আছে। তারা যদি ধরে ফেলে? যদি ব্যতিক্রম ঘটে হাসুয়া চালাতে?

ফিরবে নাকি, ফিরবে নাকি দিবাকর?

কেন ফিরবে? চুরি-ডাকাতি তো করতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে গত্যন্তর নেই বলে পথ পরিষ্কার করতে। জঞ্জাল হটাতে।

ফাঁসীর দড়ি—ফর্সা চকচকে দড়ি যেন দেখা যায়। দিবাকর ঘন ঘন চোখের পালক ফেলে।

কিছুই তো নয়। ভয় হচ্ছে বুঝি কাপুরুষের। ধিক, ধিক!

আবার উদ্দীপনা আসে। উদ্দীপনা প্রতিশোধের—উদ্দীপনা অন্যায়ের জবাবের। দিবাকরের ভেঙে-পড়া মন হুংকার দিয়ে ওঠে। দশের শুভার্থে ওর মাথাটা চাই।

এ কি, পুনর্বার ওকি দেখা যায়? একটু থামে দিবাকর নিজের অজ্ঞাতে।

ফাঁসির কাল্পনিক মঞ্চ।

ফের সব সাদা, ফর্সা হয়ে যায় সব নিমেষে। আলোর উৎস দেখা যায় পূর্বাকাশে।

দিবাকর কি যেন লক্ষ্য করে এক ঠেলায় এগিয়ে লাফিয়ে পড়ে সুমুখে।

কেষ্ট দিবাকরের পায়ের তলায়। অবহেলায় তার গর্দানটা দু'ভাগ করা যেত। কিন্তু সে মিনতি জানাল। সাশ্রুনেত্রে বলল, 'তুমি আমার ধর্মের বাপ। অনুতাপ হয় বিপথে আইস্যা। আমিই তো তোমারে উস্কানি দিয়া এ পথে আনছিলাম পরথম। কী যে ভুল করছি।' তারপর সে বাইছাদের লক্ষ্য করে বলে, 'তোরা কি শোনো—বা, বা, চল বাড়ীর দিকে।'

দিবাকর ওর ভংগি দেখে নিজের নায় চলে যায়। মায়া হয়, বিচার-বুদ্ধি ফিরে আসে। সত্যিই তো এ আন্দোলনের গোড়া কেষ্ট। 'মহাজন, রমজানও আপুষে ফেরছে, তুমিও ফেরলা—এখন আর ডরাই কারে? তোমরা যাও, আমি একটু পরে যামু।'

'রমজানও ফেরছে!' কেষ্ট বিস্মিত হয়। তার কালিবর্ণ মুখ আরও জানি ঘোর কালিতে লেপটে যায়। 'তয় সেও ভুল বোঝছে।'

দু'দিকে দুখানা নাও ঘুরে যায়। ভোর হয়েছিল তবু একটু আকাশে মেঘ দেখা গেল—আলো হল না প্রচুর।

[ক্রমশঃ।

কনে দেখা

শীতাংশু মৈত্র

টিপি-টিপি বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ী থেকে বেরুতে হল, কেন না, ট্রেণের আর আধ ঘণ্টা বাকী। আকাশের মন ভালো হবার লক্ষণ যে নেই তা আগেই বুঝলেও, যদি একটু ঝিলিক মেরে ওঠে এই আশায় এতক্ষণ হিমাদ্রি ব'সে ছিল। নিখিল এসে বলল, 'কি, তৈরী ?'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠতে হল এবং ছুটে বাসও ধরতে হল।

নিখিলের সঙ্গে হিমাদ্রির আলাপ এই ক'দিনের এবং সে-ও ঐ মেয়ে-দেখার ঘটনাকেই কেন্দ্র ক'রে। হিমাদ্রি বিয়ে করতে নারাজ। নিখিলের সঙ্গে তর্কে সে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত—অনেক কারণই দেখাল ; শেষ পর্যন্ত প্রায় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েই বললে যে বাড়ীতে শোবার ঘর নেই এবং তার এমন সংস্থানও নেই যে বিয়ে ক'রে বাসা বদল করে, প্রশস্ততর গৃহে পাতে দাম্পত্যজীবন। নিখিলও সোজা প্রশ্ন করে, "তাহলে দেশের মেয়েগুলোর হবে কি ? বিশেষ ক'রে আপনারা যখন সব বুঝেও হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছেন ?"

হিমাদ্রি কথাটাকে অনায়াসেই উড়িয়ে দিতে পারত—বলতে পারত সে একা বিয়ে করছে না ব'লে অন্য সকলে ত চিরকৌমার্যের পণ করেনি ; বলতে পারত মেয়েকে চাকরি করতে দিন, কি পড়ান ; কিন্তু তা সে না ব'লে একটু গুরুত্বের সঙ্গেই প্রশ্ন করলে : "কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যে দরিদ্রতর মানুষ সৃষ্টি ক'রে কি লাভ বলুন ?"

"তারাও লড়াই করবে ব'লে।"

"পঞ্চাশ সালে সে লড়াই-এর রূপ ত দেখেছি।"

"তাহলে আপনি কি বলেন বিয়ে না করলেই সমস্যা মিটে যাবে ?"

"কিছুই বলি না। তবে এইটুকু জানি যে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই—এই কথাটা যারা বলে তারা বেশীর ভাগই জানে না ও-জিনিষটি কি।"

"বাপের ঘরেও খেতে পাচ্ছে না, আপনার ঘরেও পাবে না। তাতে সমাজের সামগ্রিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। বাপের বোঝাটা আপনি একটু লাঘব করছেন মাত্র। আর ও ঘর-টরের কথা ছেড়ে দিন। আজ-কাল যত লাগে তত ঘর কার আছে ?"

"সাহস নেই, নিখিল বাবু !"

এমন সময় হিমাদ্রির ছোট ভাই অংশুমালী অফিস থেকে ফিরে এদের সামনে দিয়েই বাড়ীর ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করে। নিখিল যেন কুটোটির আশ্রয় পায় ; জিজ্ঞাসা করে, "আপনার ভাই, না ? বিয়ে হয়েছে ?"

হিমাদ্রি হেসে উত্তর দেয়, "আপনার কাছে শুধু দুই শ্রেণীর লোক আছে পৃথিবীতে —সস্ত্রীক আর অস্ত্রীক।"

"কারে পড়লে বুঝতে পারতেন," ব'লে কি ভেবে নিয়ে নিখিল অম্লান বদনে জিজ্ঞাসা করে, "তা আপনি কেন ওঁর পথ আগলে ব'সে রয়েছেন ? নিজেও করবেন না, ওঁকেও করতে দেবেন না।"

হিমাদ্রি—"মোটেই না। আমি ওকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছি।"

নিখিল—"তাহলে আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিন।"

আলাপ হয় এবং অংশুর যে অমত নেই এ কথা জানতে পেরে নিখিল লাফিয়ে এসে প্রস্তাব করলে, "চলুন, তাহলে ভাইএর জন্যে মেয়ে দেখতে যাবেন ?"

"ভাইকেই বলুন না।"

"উনি একটু লাজুক। প্রাথমিক নির্বাচনের পর উনি ত যাবেনই।"

অতএব এই টিপি-টিপি বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ে হিমাদ্রি পশ্চিমের এক সহরের উদ্দেশে। বেশী টাকা সঙ্গে নেই, কেন না দায় যখন নিখিলের তখন খরচ সব তারই। ভাইঝির বিয়ে হচ্ছে—খরচ করবে না ? হিমাদ্রির আশা ছিল হয়ত এখান থেকে হাওড়া পর্যন্ত নিখিল তার আতিথেয়তার একটু পূর্বাস্বাদ দেবে—ট্যাক্সিতে চড়িয়ে ষ্টেশনে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাসেই উঠতে হল দেখে মনটা কেমন যেন বেতরিবৎ হয়ে গেল ; থাকতে হল দাঁড়িয়ে। অন্য সময় দাঁড়াবার জায়গা পেলেই অনেকে ব'তে' যায় কিন্তু এখন যে হিমাদ্রিকে বসাবার দায়িত্ব নিখিলের। এই রকম ক'রে মেয়ে-দেখানো পর্ব শুরু করলেই ত হয়েছে ! তবু মুখ ফুটে ত কিছু বলা যায় না। আধুনিক ছেলে হিমাদ্রি। সে কি ক'রে লজ্জার মাথা খেয়ে বরপক্ষীয়ের এই বিশেষ অধিকারের দাবী করবে ? এই মেয়ে দেখতে যাওয়াটাই ত একটা বিসদৃশ ব্যাপার ! তার নিজের বোন তপতীকে যখন পঞ্চদশ বার দেখানো হচ্ছে তখন সেই নিজে আপত্তি ক'রে, রাগারাগি পর্যন্ত ক'রে, তপতীকে গিয়ে বলেছিল, "না হয়, তুই বিয়ে নাই করলি তপু ! এত অপমানও তোরা সইতে পারিস !" তপতী কেঁদে ফেলেছিল। না জানি এই মেয়েটিকেই বা কত বার দেখানো হয়েছে। কত বারের প্রত্যাখ্যাতা এই মেয়ে আবার নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নতুন এক যাচনদারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, "দেখ ত, এইবার পছন্দ হয় কি না ?"

কিন্তু করাই বা যাবে কি ?

"স্বাস্থ্য কেমন ?" জিজ্ঞাসা করে হিমাদ্রি, ইণ্টার ক্লাস কামরায় আরাম ক'রে ব'সে।

"ঐ একটা জিনিষ যাতে মেয়ের খুঁত ধরতে পারবেন না।"

"বাংলা দেশে রাখলে এই অহংকারটুকু করতে পারতেন না। বাঙালী মশাতে স্রেফ শরৎ চাটুজ্যের জ্ঞানদা বানিয়ে দিত।" একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে, "ভাইএর হয়ে দেখতে যাচ্ছি— মেয়েটি দেখতে কেমন তা ত এতক্ষণ বললেননি ?"

"চেষ্টা ক'রে দেখুন...

লাক্স টয়লেট্ সাবান মেখে

...আপনি আরও সুন্দর

হ'তে পারেন।"

রেহানা বলেন।

"এ এক সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব সহায়," রেহানা বলেন, "লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সরের মত ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে, লাক্স্ টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বকের এক নতুন সৌন্দর্য্য এনে দেবে।"

LUX

TOILET SOAP

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

লাক্স টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের

সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 383-X52 BG

"সে ত গিয়েই দেখতে পাবেন", ব'লে মুচকি হাসল নিখিল।

তারপর জানলার বাইরে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বৃষ্টি আর একটু চেপে এলেও এখনও সোজা ধারায় পড়ছে ব'লে জানলা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। ট্রেণ চললে হয়ত এই বৃষ্টিই তেড়ে ঢুকবে জানলা দিয়ে। যেখানে-সেখানে জলতেষ্টা পায় ব'লে হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি নেমে কয়েকটা কমলালেবু কিনে নিয়ে এসে ছুটো দিলে ফেলে নিখিলের কোলের ওপর আর বাকী ক'টা পকেটে ভরে আপাততঃ পকেট থেকে একটা বড় এলাচ বের ক'রে চিবোতে সুরু করলে। কিন্তু আশ্চর্য্য কাণ্ড যে, এই ইণ্টার ক্লাস কামরাটায় আর কেউ একবার ওঠা ত দূরের কথা, উঁকি মেরেও দেখলে না। তিন দ্বিগুণে ছ'টা বেঞ্চিতে আরোহী মাত্র তারা হু'জন—শুয়ে, এ-পাশ ও-পাশ ক'রে, এ-বেঞ্চি থেকে ও-বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে দিয়েও জায়গার শেষ করা যাবে না। আর হু'জন মাত্র আরোহী দেখে হকারেরাও এদিক মাড়াবে না।

গাড়ীর প্রথম দোলনেই ঘুম আসে হিমাদ্রির। সে হেলান দিয়ে ব'সে পকেটের লেবুগুলি চটকে যাবার ভয়ে বাইরে বের ক'রে রেখে, চোখ বোঁজে। অপর জন যখন বৃষ্টি দেখতেই ব্যস্ত তখন তারই বা কি এমন দায় পড়েছে জেগে ব'সে থাকবার, আর যে মেয়েকে এখনও দেখেনি তার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে ভাববার? তার চেয়ে ভালো ক'রে ঐ বেঞ্চিটায় লম্বা হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; প্রয়োজন মত তাকে ওঠানো ত নিখিলের দায়িত্ব। ছোট বেলায় মা-মাসীর কোলে সেই যে ছুলে-ছুলে ঘুমোবার অভ্যাস হয়েছিল সেটা পরে প্রশ্রয়ের অভাবে ঝিমিয়ে ত পড়েইনি বরং যুগ্ম-দোলনের কল্পলোকে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে—বাইরে একটু ঠ্যালা লাগলেই সেই কল্প-লোকের অর্গল যায় খুলে—আরামে চোখ ছুটি বুঁজে আসে।

পশ্চিমের গাড়ী; ছোটখাটো ইষ্টিশানে তার নস্যি নেবারও সময় নেই—পাছে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। পরম আভিজাত্যে সে ছুটে চলে এদের নাকের ডগা দিয়ে আর তারা একে ধরার ছুরাশা প্রকাশ করে টিম্‌টিমে কেরোসিনের প্রদীপে বরণমালা সাজিয়ে। বহুদর্শী নাগরের তাতে মন গলবে কেন? সে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে থামে আলোয় ঝলোমলো মস্ত এক আসরে। নিখিল একবার তাকিয়ে দেখে হিমাদ্রি এখন সুষুপ্তির কোন্ স্তরে হাবুডুবু খাচ্ছে—একবার ডাকবে কি না কিছু খেয়ে নেবার জন্যে।

"পাঁচ-মিশালি পাঁচ-মিশালি,
খেয়ে দেখুন মন-মিতালি;
পাবেন না এই ফুরালি
হারাধনের পাঁচ-মিশালি
হারাধনের পাঁচ-মিশালি"

বলতে বলতে হারাধন একবার এই কামরায় উঁকি মেরে চ'লে যায়। এখানার সামনে তার চেঁচানিই শুধু সার—এই বয়েসী শিক্ষিত লপেটা ছোকরাগুলো চানাচুরের মর্ম কি বুঝবে? চেপে বৃষ্টি আসতে কাচ বন্ধ ক'রে দিয়ে এক কোণে হেলান দিয়ে ব'সে চোখ বোঁজে নিখিল—ঘুমোবার জন্যে নয়—কেমন-ধারা যেন মনমরা হ'য়ে। বৃষ্টির মধ্যে ত আর বাইরে থেকে কাচ ভেদ ক'রে ভেতরে ক'জন আছে দেখা যায় না; আর দেখা গেলেই বা এই জলে না উঠে লোকটা করত কি? তাই পিঠে, হাতে আর বাহুতে গোছা-গোছা মনোহারী জিনিষ নিয়ে দরজাটা খুলে হারাধন নং ২ হন্তদন্ত হয়ে উঠেই, কোনো দিকে না তাকিয়ে, অভ্যাস মত "নেবেন স্যর, মেড-ইন-জার্মাণীর তৈরী ছুরী আছে," বলতে বলতেই ঘরখানা দেখে নিয়েই আচম্বিতে থেমে যায়। ধপ ক'রে ব'সে পড়ে গদি-মোড়া বেঞ্চির ওপর। হিমাদ্রি একবার তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে শোয়।

জিনিষপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে ফেরীওয়ালা দ্বিধা করে নিখিলের কাছে এগিয়ে এসে বলে, বলে, "বাবু, বাবু!" নিখিল তাকায় কৌতূহলে। ফেরীওয়ালা বলে: "একটা কিছু জিনিষ নেন বাবু! এই বিষ্টির মধ্যে আজ আমার আসা-যাওয়ার খরচাটাও উঠল না। এই শালার জলে যেন সব খদ্দেরের পকেট গুটিয়ে গিয়েছে। বিকেল থেকে গলা ফাটিয়ে মোটে চার পয়সার বিক্রী।" নানা রকম জিনিস সে দেখাতে থাকে একে একে; শেষে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ে মিটির মিটির তাকিয়ে: "মা-ঠাকরুণ সঙ্গে থাকলে আজ আমাকে শুখো ফেরাতে পারতেন না।"

একটা ছু-আনি নিয়ে পরের ইষ্টিশানে সে নেমে গেল। নিখিল শুয়ে প'ড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। হিমাদ্রিকে নিয়ে অর্দ্ধেক পথ এসে এখন তার মনে আসছে একের পর এক সংশয় আর ঐ জানলার কাচের ওপর গড়িয়ে-যাওয়া বৃষ্টির ধারা সমানে মনে করিয়ে দিচ্ছে আত্রেয়ীর সেই শেষ অনুরোধ, "কাকা, তুমি আর কোনো দিন আমাকে আর কাউকে দেখাবে না, বল?"

সে দেখতে ভালো নয়—রংটা পর্যন্ত কালো। চুল কিছু আছে বটে কিন্তু লোকে ত আর মেয়ে দেখতে এসে আগে পিঠ দেখবে না। শেষবার তাকে দেখতে এসেছিলেন এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—দেহাতে প্র্যাকটিস করেন। মেয়েটিকে উদ্ধারের সদিচ্ছা নিয়েই তিনি এসেছিলেন কিন্তু নিজের কোনো দিন অসুখ হলে স্ত্রীকে দিয়ে ওষুধের কৌটা ফেলাতে গেলে পাছে সেই কৌটাটিতে স্ত্রীর গায়ের রং ধরে এই আশংকায় শেষটায় ছেড়ে দিলেন; নইলে তাঁর আর কোনো আপত্তি ছিল না। এইবার নিখিল অভিভাবককে কোনো খবর না দিয়েই হিমাদ্রিকে নিয়ে যাচ্ছে—আশা এই যে, প্রগতিশীল আধুনিক ছেলে হিমাদ্রি মেয়ের গুণটাও ত দেখবে। কিন্তু মাঝখান থেকে হিমাদ্রির ভাই এসে জোটায় সে এখন ভীত হয়ে উঠেছে। কাজটায় না এগোলেই বোধ হয় ভালো হত। শুধু শুধু মেয়েটাকে নিয়ে এই ভাবে টানা-হেঁচড়া করতে করতে শেষটায় যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়। এইবারেই যদি সে ব'লে বসে, "আমি বেরুব না কারও সামনে," তাহলে?

অস্বস্তিতে উঠে ব'সে জানলার কাচ একটু তুলতেই বৃষ্টির ঝাপটায় নিখিলের চশমার কাচ যায় ঝাপসা হ'য়ে। এ জানলার কাছ থেকে উঠে দূরের দিকের একটা জানলার কাচ তুলে সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে: এখন সে করবে কি? পৌঁছে হিমাদ্রিকে বলবে, "না ভাই, আপনাকে বৃথাই কষ্ট দিলাম; আমারই খবর না দিয়ে আপনাকে নিয়ে আসার এই ফল। আত্রেয়ী এখন মামার বাড়ীতে।" কিন্তু এর অর্থ হিমাদ্রির বুঝতে বাকী থাকবে না, শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা অভদ্রতার স্তরেও উঠতে পারে। কন্যাপক্ষকে একটুও খবর না দিয়ে একবারে বর নিয়ে গিয়ে ফেলে তাক লাগিয়ে দেবার ছেলেমানুষী কল্পনায় মশগুল হয়ে

এ সে কি কাণ্ড ক'রে বসল? অবশ্য খবর দিলেই আত্রেয়ী তাকে বারণ করে চিঠি লিখে রাগারাগি ক'রে মামার বাড়ী চ'লে যেত; বলত, কত বার আর তাকে এমনি ক'রে ক'রে পুরুষের খামখেয়ালীপণার শিকারে পরিণত করা হবে? সে কি বলির পাঁঠা? সে যে দেখতে খারাপ এ কি তার দোষ?

তবু ত দেখতে খারাপ মেয়েদেরও গতি হচ্ছে শ'এ শ'এ: বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে বাপকে রূপো দিয়ে রূপের কমতি পুরিয়ে দিতে হচ্ছে। আত্রেয়ী বাপকে তাও করতে দেবে না। নিশানাথও মেয়েকে আর জোর-করা ছেড়ে দিয়েছেন। ট্রেণখানা যত এগুচ্ছে আত্রেয়ীর সেই তিন মাস আগের কেঁপে-কেঁপে-ওঠা ঠোঁট তত বেশী ক'রে কেঁপে উঠছে নিখিলেশের চোখে। সে তখনই বলেছে, "আর কাউকে এমন ক'রে বলিনি কাকা, বলতে পারিনি। কিন্তু আর যেন তুমি আমার রূপ-যাচনদার এনো না। যদি আনো তাহলে পরের ঘটনার জন্যে আমাকে দোষ দিও না।"

বাইরের তরল অন্ধকার হঠাৎ কেমন অসাধারণ ঘন হয়ে ওঠে—যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়; এবং পরক্ষণেই দুই দিকের পাথরের দেয়াল চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে জানলার মধ্যে দিয়ে ঠিকরে-পড়া আলোয়। পাথরের দেয়াল বেয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে অবিরাম।

টানেলের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেছে। নিখিলেশ এসে বেঞ্চিতে ব'সে জোর ক'রে দ্বিধা কাটিয়ে হিমাদ্রিকে জাগিয়ে বলে, "কিছু খাবেন না?"

হিমাদ্রি—"আপনার ডাকের আশাতেই ত ঘুমিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

খাওয়া যখন বেশ জ'মে উঠেছে তখন নিখিলেশ সোজা ব'লে বসল, "মেয়েটি কিন্তু দেখতে খারাপ এবং অনেকেই পছন্দ করেনি।"

হিমাদ্রি বিরক্তি চেপে উত্তর দেয়, "আমি যে করব তা আগে থেকে ঠিক করলেন কি ক'রে? তারপর এ ক্ষেত্রে উদ্ধারের ভার ত আমার নয়, ভাইএর।"

সে ত বটেই; এর আর উত্তর কি দেবে নিখিলেশ?

"কিন্তু রূপটাই কি সব?"

"ওর পরে যেটা আছে সেটা পরেই বিবেচ্য। ভাঁড়ার-ঘরে কি আছে-না-আছে সেটা ধীরে-সুস্থে ঢুকে দেখতে হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই চাই ঘরের শ্রী, সৌষ্ঠব।"

"আর তারপরে যদি ঢুকে দেখেন অষ্টরম্ভা?"

"তখন অন্ততঃ মাকাল ফল ব'লে ক'ষে গাল দিয়েও ত আরাম পাওয়া যাবে। কুচ্ছিত হ'লে সে গুড়ে বালি।"

"তবু দুগ্‌গা ব'লে ঝুলে প'ড়ে শেষে যদি দেখেন গাল দেবার বদলে সামগ্রীটি হৃদয়ে ধারণ করারই উপযুক্ত, তখন?"

"অর্থাৎ আমায় আপনি risk নিতে বলছেন। কিন্তু আমি ত প্রযোজ্য কর্তা। বলি নিজন্ত ধাতু পড়া আছে?"

হঠাৎ নিখিলেশ হিমাদ্রির হাতখান ধ'রে বলে, "প্রযোজক কর্তাই হ'য়ে যান না হিমাদ্রি বাবু! আমি আপনাকে বলছি, সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই বলছি, আপনি আত্রেয়ীকে বিয়ে করলে ঠকবেন না। অবশ্য এ রকম কথা মেয়ের দিকের লোকেরা ব'লেই থাকে, কিন্তু আমি আপনাকে কি ক'রে বোঝাব যে আমি সে দলের নই? আপনিই বুঝে দেখুন, আমার কি এল-গেল, দূর-সম্পর্কের এক ভাইঝির বিয়ে হওয়া না হওয়াতে? সমস্যা ত তার বাবার। আমার শুধু দুঃখু এইখানে যে, এই রকম একটা ভালো মেয়ে শুধু রূপের আপাত-জৌলুষের অভাবে না খেতে না পরতে পেয়ে মারা যাবে?"

হিমাদ্রির হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় তার এক ইঁচড়ে-পাকা ছাত্রীর কথা। নিজে পড়ার বদলে সে হিমাদ্রিকেই পড়াত। একদিন সে হঠাৎ বললে, "জানেন মাষ্টার মশাই, আসল কথা হল টয়লেট—দেহের এবং মনের। কে ভালো, কে মন্দ, ঐ টয়লেটেই মালুম।"

হিমাদ্রি এই কথাটিকে আধুনিক জীবনের চরম সামাজিক সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েও জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিন্তু টয়লেটের খরচটা যে একতরফা। যার খাওয়া, যার পরা তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া, এঁ্যা?"

"দাঁতের গোড়া ভাঙলেও তাকে রাতারাতি দাঁত বাঁধিয়ে নিতে হবে। সেই ত টয়লেট।"

হিমাদ্রি এখন বুঝেছে এ মেয়ের মার নেই—জলে ফেললেও আর একজনকে ডুবিয়ে নিজে উঠে আসবে আর আগুনে ফেললেও আধপোড়া হ'য়ে হাসপাতালে গিয়ে টয়লেট ক'রে নেবে। নিখিলেশ কিন্তু আজ যে মেয়ের কথা বলছে তার টয়লেটের দরকার নেই; সে ভোলাতে চায় না—বলে, আমি যা আমি তাই, কারণ আমার টয়লেট করবার পয়সাও নেই, ইচ্ছেও নেই।

কৌতূহল জাগে হিমাদ্রির মনে: রূপ নেই জেনেও কেন এত ব্যাকুলতা, এত সাহস নিখিলেশের? তা ছাড়া, যুবতী মেয়ে, যত কুৎসিতই হোক না কেন, স্বাস্থ্যবতী যখন, তখন ক্ষণিকের আকর্ষণ সৃষ্টি করা তার পক্ষে খুব একটা নাগালের বাইরের ব্যাপার নয়; বিশেষ ক'রে সে যদি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলে যে আজ সে যেমন ক'রে হোক নিজের হিল্লে একটা ক'রে নেবেই। সেই সম্ভাবনার ওপর একটুও বিশ্বাস না রেখে, মেয়েটির দুর্বলতা সব এমনি ক'রে তাকে আগে থাকতে ব'লে নিখিলেশ ত নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। বোধ হয় অনভিজ্ঞতার জন্যেই।

সে আবার ব'লে ওঠে, কমলালেবু ছাড়াতে ছাড়াতে: "আরও একটা কথা আপনি শুনে রাখুন: এই যে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি এ ত তাদের না জানিয়ে। কেন না, তিন মাস আগে যখন আত্রেয়ীকে শেষ দেখে যায়, তখন সে আমাকে বলেছিল—কাকা, আর আমার রূপ যাচাই করতে লোক নিয়ে এস না। সত্যিই ত, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে ত! রূপ তার নেই তবু যেমন ক'রে হোক কোনো একটা লোককে যদি একটু ধোঁকা দেওয়া যায়। আমি আত্রেয়ীর সেই কথা অগ্রাহ্য ক'রে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

একটু থেমে কঠিন গলায় নিখিলেশ ব'লে ওঠে, "কিন্তু তাকে এই অপমান করার অধিকার আপনারও নেই, আমারও নেই। চলুন ফিরে যাই, হিমাদ্রি বাবু!"

হিমাদ্রির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিখিলেশ কাচ তুলে দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে; আধ-ছাড়ানো কমলালেবু ধরাই রইল হাতে।

এতক্ষণকার আলগোছে সমালোচনার মনোভাব একেবারে কেটে গিয়ে মনটা একান্ত অসহায় বিষাদে ভরে যায় হিমাদ্রির—নিজেকে বড় ছোট মনে হয়, বড় স্বার্থপর ঠেকে নিজের কাছে নিজেকে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে থমথমে অন্ধকার—মাঝে মাঝে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো আকাশে অন্ধকার ফুটো ক'রে উঠে যাচ্ছে—যেন বাসনায় বাসনায় পোড়া মনের ক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎক্ষেপ। দূরে ঘনতর কালোর রেখায় পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস কখনও কাছে এগিয়ে আসে আবার দূরে স'রে যায়। নিঃঝুম ইষ্টিশান পার হ'য়ে যায় গাড়ী; প্ল্যাটফর্মে শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দিয়ে কত মানুষ প'ড়ে—যেখানে যাবে ব'লে এরা অপেক্ষা করছে সেখানেই কি ঘরের আশ্রয় পাবে? ঐ গাছটার সবুজ পত্রপুঞ্জ পাশের আলোকস্তম্ভের প্রতিফলনে যেন চোখের জলে-ভেজা কোনো একখানি শ্যামল মুখ। গাড়ী ক্ষণেক থামতেই নিস্তব্ধতার ওপর দিয়ে কার যেন ক্রমক্ষীয়মাণ ডাক ভেসে গেল। ইষ্টিশানের নাম হেঁকে গেল ঘুমন্ত-গলায় কোনো কুলি; কেউ কিন্তু নামল না। যদি বা কোনো দিন কেউ নামে সে কি বোঝে কেন ঐ ডাকে নিশিগভীরের অতন্দ্র প্রতীক্ষার আবেশ!··· আবার এগিয়ে আসে একটা কালো পাহাড় ট্রেণের গতিরোধ করবে ব'লে, কিন্তু খানিকটা এসেই আবার বেঁকে অন্য পথে চ'লে যায়।

হিমাদ্রি ভাবে, আচ্ছা, সত্যিই মেয়েটি দেখতে কেমন? আমার নিজের বোন ত দেখতে সুন্দরী নয়, তবু কি তাকে আমি কম ভালোবাসি? না, তার কারণ ভালোবাসা নিয়েই ত তার দিকে প্রথম তাকিয়েছি। তার রূপ যাচাই ক'রে ত তাকে ভালোবাসিনি। তেমন ভালোবাসা নিয়ে, মানুষের প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত টান নিয়ে কি এই মেয়েটির দিকে তাকানো যায় না? কিন্তু সে টান গ'ড়ে ওঠে যে দীর্ঘ দিনের সান্নিধ্যে, পরিচয়ে, তার অবকাশ ত এখানে নেই—এখানে শুধুই এক লহমায় ক'ষে নেওয়ার ব্যাপার। একখানা কাপড় দেখে কিনতেও দশ মিনিট সময় লাগে আর এ কি না একটা আস্ত মানুষকে চিনে নিতে হবে, যে মানুষ পুতুলের মত ব'সে আছে কর্মহীন ঘরের এক আধো-অন্ধকার কোণে। এ অর্থহীন ব্যাপারের এইখানে শেষ হওয়াই ভালো। কেন তার অপমান-কাতর মনে আবার তেড়ে আঘাত দিতে যাওয়া?

"অথচ আশ্চর্য্যি এই যে, এই অবস্থার জন্যে তার কারও ওপর কোনো অভিযোগ নেই—এ নিয়ে সে রসিকতা পর্যন্ত করে", ব'লে থামল নিখিলেশ।

"এই রূপহীনাকে দেখতে হবেই একবার", ভাবে হিমাদ্রি। নিখিল হয়ত বা ক্ষোভের বশে বাড়িয়ে বলেছে; হয়ত বা সত্যিই অত কুৎসিত নয় মেয়েটা। হিমাদ্রিকে একটা surprise দেবার জন্যে পটভূমিকা তৈরী করতে গিয়ে একটু বেশী ক'রে ব'লে ফেলেছে আর কি। আসলে আত্রেয়ী বাংলা দেশের শাদা-মাটা মেয়ে; গুণের মধ্যে একটু পড়াশুনা করেছে।

নিখিল আবার বলে, "আপনাকে দয়া দেখাতে বলবার আমি কে? আর আপনিই বা দেখাবেন কেন? দয়া ক'রে দান করা যায় কিন্তু দয়া ক'রে বিয়ে করা যায় না।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে অপরাধীর মত সে পুনরাবৃত্তি করে: "চলুন, ফিরে যাওয়া যাক!"

একটু ভেবে আবার বলে: "বলা যায় না, ক্ষোভের বশে আপনাকেই হয়ত অপমান ক'রে বসতে পারে।"

হিমাদ্রি—"কিন্তু আপনারই বা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বলার কি দরকার যে আমরা মেয়ে দেখতে এসেছি? ওখানে ত লোকে বেড়াতেও যায়। আপনি বলবেন বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে এসেছি।"

মাঝখানে গাড়ী বদল ক'রে যখন গন্তব্য স্থানে তারা এসে পৌছায় তখন বেলা প্রায় দুপুর—লাল মাটি তেতে উঠেছে, আর মাথার ওপরে আকাশ কি নীল! কিন্তু নীচে, তেতে-ওঠা রাস্তার দুই পাশে ১৩৫০ সালের বাংলা দেশকে কে যেন এইখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে। এদের সাইকেল-রিক্সার পেছন পেছন খানিক খানিক পথ ছুটে আসবার চেষ্টা করছে ছেলে-বুড়ো, যুবা, নারী আর পুরুষ। প্রায় সকলেরই হলদে হলদে দাঁত কিছু পাবার আশায় অতি-প্রকট। এদের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় হিমাদ্রি একবার পকেটে হাত দিতে গিয়েছিল কিন্তু নিখিলের ইঙ্গিতে থেমে গেল। পয়সা একবার বের করলে যে আর এগোনো যাবে না তা চট ক'রে খেলে গেল হিমাদ্রির মাথায়। মানুষের পঙ্গপাল, এঁ্যা! পলিনেসীয় কি মেলানেসীয় দ্বীপপুঞ্জ কি বেলুচিস্থানের মরুভূমি থেকে আসেনি এরা; জোর ক'রে ব'সে প'ড়ে উর্বর মাঠের সোনার ফসল গোগ্রাসে খেয়ে ফেলতে পারে না এরা—প্রৌঢ় পুরুষগুলো শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—এত দিন খেতে পাচ্ছিলাম কি ক'রে? তাই ত—এত দিন খেতে পাচ্ছিল কি ক'রে—ভাবেহিমাদ্রি; ব'লে ওঠে, "দুর্ভিক্ষ।"

নিখিল বলে, "হ্যাঁ, আত্রেয়ী লিখেছিল। তবে এতটা ভাবিনি।"

দুর্ভিক্ষের বাতাস রিক্সাওয়ালার গায়েও ত লেগেছে। একটা চড়াই ভাঙতে তার জিভ বেরিয়ে গেল। দুই বন্ধুতে নেমে এল গাড়ী থেকে; ওকে মিটিয়ে দিল আট আনা পয়সা। এদের বদান্যতায় সে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আধুলিটা বাজাতে বাজাতে। কে জানে বাবুরা আবার বেশী দয়ায় অচল দিয়েছে কি না!

রাস্তার ধারের বিরল গাছগুলির সর্বাঙ্গে লাল ধুলোর প্রলেপ—পাতাগুলো তামাটে হয়ে উঠেছে। পথের দু'পাশের লোকগুলোকেও কোনো মোটো-বিহারী নিরন্ন না মনে ক'রে অনায়াসে গেরুয়াধারী সন্ন্যিসি মনে করতে পারে। কানে ধ'রে ব'লে দিলে এত বড় বড় চোখ মেলে বলবে, "বলেন কি, এত লোক খেতে পাচ্ছে না! কখখনও না। স্রেফ বড়লোকদের পেছনে লাগবার জন্যে না খাবার ভাণ ক'রে বেড়াচ্ছে।"

জামা-কাপড় আর জুতোর দিকে তাকায় হিমাদ্রি—সব কিছুতেই রং ধরেছে। নিখিলেশের সঙ্গে রসিকতা করে, "মেয়ে দেখবার আগেই রং লাগল সর্বাঙ্গে।"

নিখিল—"পথে বেরুলেই পথের রং লাগে। ঐ নিরন্নগুলো নিশ্চয়ই মেয়ে দেখার খুশীতে রঙিয়ে ওঠেনি।"

এত তীক্ষ্ণ উত্তর এই মুহূর্তে আশাতীত। কথার মোড়

দেয় হিমাদ্রি : "আপনি যেন পথ ভুলেছেন মনে হচ্ছে ? বেছে বেছে এই দুর্ভিক্ষের পথ দিয়েই যাচ্ছেন কেন ?"

"চোখ বুঁজে চলুন ; তাহলে আর দুর্ভিক্ষ চোখে পড়বে না। এই যে আমার হাত ধরুন." বলতে বলতেই, "এই, এই যে সেই তেমাথা। আসুন বাঁ-হাতি," ব'লেই বাঁ দিকে একটু দ্রুত পদে এগোয় নিখিলেশ ; এসে পৌঁছায় তারা আত্রেয়ীদের বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরের ঘরে ঢুকতেই রোগা, ফর্সা একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে, তার বহির্গমনের পথে বাধা পেয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে, "ও মা ! ন'কা যে !" বলেই অপরিচিত হিমাদ্রিকে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল।

নিশানাথ বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা ক'রে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হিমাদ্রির দিকে তাকাতে নিখিলেশ জবাব দিল, "হিমাদ্রি আমার বন্ধু। এই জায়গাটা দেখার ওর খুব ইচ্ছে—তাই দিন কয়েক ছুটি পেয়ে চ'লে এলাম।"

"বেশ বেশ," ব'লে নিশানাথ ডাকতে আরম্ভ করলেন, "মিনু, ও মিনি !"

"যাচ্ছি বাবা," কোমল গলায় রিন্ রিন্ ক'রে উত্তর বেজে উঠে।

"এই, ন'কাকাদের সব স্নানটানের ব্যবস্থা ক'রে দে !"

নিখিল ভেতরে চ'লে যায়। হিমাদ্রি স্বস্তিতে অথচ সকৌতূহলে ধীরে-সুস্থে জামা-কাপড় খুলতে থাকে যথাসম্ভব শোভন অঙ্গভঙ্গী ক'রে—কে জানে কে কোথায় কোন্ কোণ থেকে উঁকি মারছে। তারপর সে শুয়ে পড়ে চৌকিখানার ওপর।

নিশানাথ চশমাখানা চোখে দিতে দিতে বলেন : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু শুয়ে নেন। রোদ্দুর লেগেছে বড্ড।"

এ কথার বিশেষ কোনো জবাব না দিয়ে, হিমাদ্রি স্মিত-মুখে ভাবতে থাকে : ও মেয়েটি কে ? যদি আত্রেয়ীর বোন হয় তাহলে দিদি কুদর্শনা হবে এ ত ঝট ক'রে বিশ্বাস করা যায় না। নিখিল কি সত্যিই তাহলে তাকে নিয়ে এতক্ষণ মজা মারছিল ? মেরে থাকলেও তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই যদি সত্যিই মিনুর দিদির মত দিদি এই আত্রেয়ী হয়, নামটার মধ্যেও বেশ রুচির আভাস।

হঠাৎ নিখিল ঢুকেই সোজা নিশানাথকে প্রশ্ন ক'রে বসে : "কি ব্যাপার দাদা ? আমায় ত কিছু জানাননি !"

চমকে ওঠে হিমাদ্রি।

নিশানাথ আস্তে আস্তে বলেন, "জানাব জানাব ভাবছিলাম এমন সময় তোমরা এসে পড়লে।"

"কিন্তু ধরল কেন পুলিশে ?"

গাঢ় স্বরে নিশানাথ উত্তর দিলেন, "দুর্ভিক্ষ হয় হোক কিন্তু সে কথাটা বলা নিষেধ। আত্রেয়ী তা জানত না। ভুখা লোকগুলোকে ও ব'লে দিয়েছিল কার গুদামে চাল বোঝাই আছে।"

চশমা চোখে দিয়ে নিশানাথ জানলার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সামনের ঐ শেয়ালকাঁটা আর বিছুটিতে ভরা জমিটুকুর দিকে। শেয়ালকাঁটার হলদে ফুল রোদে ঝলোমলো। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করল : "জামীন পর্যন্ত দিলে না ?"

নিশানাথ উত্তর দিলেন, "একা সে জামীন নিতে চায় না।"

* * * *

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছোট এক টিলার একেবারে চূড়ায় প্রাচীন কোনো এক মহারাজার প্রাচীনতর এক প্রমোদ-ভবন। সেকালের ফুলগাছের সারির জায়গায় এখন চারি দিকে ঝোপ-ঝাড় ; মাঝে মাঝে এক-আধটা সুগন্ধ ফুল যেন সে কালের অর্ধস্ফুট স্মৃতি। মালী একজনা আছে, তবে সে যে কেন আছে তাই জানে না।

চূণবালি-খসা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই বন্ধুতে বসে চুপ ক'রে। সন্ধ্যা হয়-হয় তবু উঠবার নাম নেই। নীচে সহরের আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠল।

দ্বিধা কাটিয়ে উঠে হিমাদ্রি ব'লে ফেলল, "তা ছোট বোনটি ত দেখতে বেশ।"

নিখিল যেন চমকে উঠল, "কে মিনতি ? হ্যাঁ। ওকে দেখে ওর দিদিকে কল্পনা করা যায় না।"

তারপরেই তাকাল সে হিমাদ্রির দিকে ; সন্ধ্যার আবছায়ায় বন্ধুর মুখ দেখতে পেল না।

"বড় বোন বর না পেয়ে দুর্ভিক্ষের মিছিলে গেল। একেও কি সেই পথ ধরাবেন ?"

"আপনাদের মত বর পাবার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক ভালো।"

হিমাদ্রি—"আপনার আজ হয়েছে কি বলুন ত ? আমি কি সত্যিই ঐ অর্থে কথা বলেছি না কি ?"

নিখিল—"চলুন, ওঠা যাক।"

উৎরাই-এ নামতে নামতে নিখিল জিজ্ঞাসা করল, "মিনুকে পছন্দ করলেন নিজের জন্যে না ভাই-এর জন্যে ?"

হিমাদ্রি—"এইবার কিন্তু আমার রাগ করবার পালা।"

নিখিল—"আমি কিন্তু সত্যিই জিজ্ঞাসা করছি। কেন না, আপনি হলে কাকাকে আবার ছেলে দেখতে কলকাতা ছুটতে হয় না।"

হিমাদ্রি—"অপরের হয়ে পছন্দ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত ? আমি নিজের কথাটাই বলতে পারি।"

নিশানাথ বাইরের ঘরেই তাঁর মস্ত হোমিওপ্যাথিকের বাক্সের সামনে বসেছিলেন। এরা ঢুকতেই তিনি নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাস্তায় মিনুকে দেখলে না ?"

নিখিল—"কই, না ! সে আবার এখন কোথায় গেল ?"

নিশানাথ চশমা মুছতে মুছতে বললেন, "আত্রেয়ী ধরা পড়ার পর দিদির হ'য়ে মিনুই শুনছি মেয়েদের নাইট-স্কুল চালাচ্ছে ; মিছিল-টিছিলেও যাচ্ছে। আমি আর বারণ করি না।"

আরও একটু রাতে মিনু যখন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বাড়ী ফিরল তখন হিমাদ্রি কেন যেন তাকাতেই পারল না তার দিকে। মিনু ঢুকেই বাবাকে খবর দিলে, "বাবা, আজ লক্-আপে দিদিদের ওপর লাঠি চালিয়েছে।"

নিশানাথ চমকে উঠে তার নিজের মাথার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে সে "ও কিছু নয় ; হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম," ব'লে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল।

* * * *

পরের দিন সকালেই কলকাতার ট্রেণ ধরল হিমাদ্রি ; একা।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

নদী যখন এক দিক ভাঙে, আর এক দিক গড়ে তোলে শস্যশ্যামল। এক তীরের ভাঙন অন্য তীরকে করে বিস্তীর্ণ। কিন্তু মানুষের সমাজ-জীবনে যখন ভাঙন ধরে, তখন আর এক দিকের ভাঙন অন্য দিকের বিস্তারকে বাড়িয়ে তোলে না। সমাজের বুকে যে ভাঙন সুরু হয়, সে ভাঙন স্তরে স্তরে গিয়ে পৌঁছয় জীবনের অন্তস্তলে। হাজার হাজার বছরের বনিয়াদে নোণা ধরে যায়। আস্তে আস্তে খুলে পড়ে তার ভিতের শেষ প্রাচীরটুকুও। দেশ ভাগ ক'রে দিয়ে র‍্যাডক্লিফ ফিরে গেল স্বদেশে। এক দিকে কংগ্রেস, আর এক দিকে লীগ হাতে তুলে নিল খণ্ডিত ভারতের শাসনতন্ত্র। কিন্তু সেইখানেই দুঃখের সমাধি হলো না। যারা ভিটে-ছাড়া হয়ে দেশ ছেড়ে এলো দেশান্তরে, তাদের রিক্ত মনের বুভুক্ষা গিয়ে মিশলো যুদ্ধোত্তর সমাজের আসন্ন গ্লানির স্রোতে।

কলকাতার আশে-পাশে গড়ে উঠেছে আশ্রয়-প্রার্থীদের ছোট-বড় নানা কলোনী। কলোনী তো নয়, যেন রণক্ষেত্রের এক প্রান্তে পরাজিত সৈন্যবাহিনীর অসতর্ক ছাউনি! ইতস্তত কতকগুলো দর্মা-বেড়ার ঘর—কতক খাপড়া, কতকগুলো করোগেট-ছাউনির ছোট ছোট ঘর। ভিটে-ছাড়া মানুষগুলোর মাথা গুঁজবার মত একটু করে আস্তানা। সর্ব্বস্ব ফেলে এসে এখানেই তারা কোন মতে আশ্রয় নিয়েছে। বাঁচবার পথে নতুন অবলম্বন! দেশবন্ধু নগর, রামনগর, কলোনী বাঁশতলা, নব-ভিটা এবং আরও কয়েকটি কলোনী পাশাপাশি গড়ে উঠেছে।

নব-ভিটা কলোনীটি সর্ব্বেশ্বর আচার্য্যেরই সৃষ্টি। কুমারখালি গ্রামের শেষ প্রান্তে যে কয়েক বিঘে পতিত জমি ছিল, সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য কুমারখালির জমিদার নিশিকান্ত রায়ের কাছে সামান্য খাজনায় সেই জমি নিজের নামে বন্দোবস্ত নেন। তখন সবে দেশ ভাগ হয়েছে।—দেশের লোক তখনও ভিটে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়নি। তারপর ক্রমে ক্রমে শিকারীর বন্দুকে তাড়া-খাওয়া শেয়াল-কুকুরের মত গ্রামের ছোট-বড় সকলেই যেদিন ছুটে চলে এলো;—সেদিন সর্ব্বেশ্বর তাদের বুকে করে নিলেন। নিতাই মোড়ল, ছিদাম তাঁতী, দীনু গোয়ালা, প্রভৃতি সকলেই যে যা হাতে নিয়ে পথে বেরিয়েছিল, তার সবটুকু তুলে দিল আচার্য্যের হাতে। সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য তাদের দিলেন মাথা গুঁজবার ঠাঁই। ভিটে ছাড়া মানুষদের কাছে এ কি কম সম্পদ! সর্ব্বেশ্বরের দয়ার কথা তারা জীবনেও ভুলতে পারবে না।

আর সর্ব্বেশ্বর? তাঁর লাভের পরিমাণও কম নয়। জমিদারের খাজনার টাকা চতুর্গুণ হয়ে তাঁর হাতে উঠে আসে।

জলপ্লাবনের মত আশ্রয়প্রার্থীরা প্রবল বেগে আসতে শুরু করেছে। সে দুর্ব্বার গতি রোধ করে কার সাধ্য! এদের সীমা-সংখ্যা নেই। অগণিত, অসংখ্য, রিক্ত নিরাশ্রয় গ্রামবাসী। যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে একটু আশ্রয়—একটু মাটি তারা নিজের বলে চায়।

পরে যারা এলো তারা হাতে বেশ কিছু নিয়ে এসেছে, তবুও আচার্য্য তাদের জায়গা দিতে পারলেন না। রাগটা গিয়ে পড়লো তাদের উপর যারা আগে এসে কায়েমি হয়ে বসেছে। ছিদাম তাঁতী অতি কষ্টে দিয়েছিল তিনশ' তিরিশটি টাকা। যথাসর্ব্বস্ব বিক্রি করে হয়তো ছিদাম এই কয়টি টাকা সঙ্গে এনেছিল। সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য প্রথমে এত অল্প টাকায় জমি দিতে রাজী হননি। ছিদাম পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে বলেছিল—"বাবু, জীবন ভর আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।"

অবশেষে আচার্য্য মশায় খানা-ডোবার পাশে তাকে কাঠা তিনেক জায়গা দিয়েছিলেন ঘর তুলতে। সেই কাঠা তিনেক জায়গার দাম এখন উঠেছে প্রায় হাজারের কোঠায়। সেদিন হারাণ পোদ্দার এসে ফিরে গেছে। ছিদামের জায়গাটা হারাণ পোদ্দারকে দিলে লাভের পরিমাণ বেশ কিছু বেড়ে যেত, কিন্তু ছিদাম···। কিছুতেই উঠে যেতে চায় না। সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য কম চেষ্টা করেননি তাকে তুলে দিতে—কিন্তু ছিদাম কিছুতেই গা করে না। অত্যাচার-পীড়ন সব হাসিমুখে উড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাব্রতীদের সঙ্গে সে পরামর্শও করে। ছিদামের সঙ্গে তিনি কোন লেখাপড়া করে জমি দেননি। কাজেই ছিদাম যে কিছুই করতে পারবে না এ কথা সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য ভাল ভাবেই জানেন।

বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের ফিরিস্তি আর নক্সা দাখিল করে সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য অকৃস্যাণ্ড অফিস থেকে মোটা রকম সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামবাসীদের হয়ে তিনিই প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিছু টাকা হাতে এসেছে। আবার সুরু করেছেন হাঁটাহাঁটি। ফাঁকতালে হাতে যদি কিছু এসে যায়! যে টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, তাতে জায়গাটার সামান্য পরিবর্ত্তন হলেও, উদ্বাস্তদের বিশেষ কোন উপকার আসেনি। ঘর তৈরীর খরচা তারা কেউ পায়নি। অথচ সর্ব্বেশ্বর তাদের হয়ে সে টাকা নিজেই বুঝে নিয়েছে সরকারী সাহায্য তহবিল হতে।

বুদ্ধি খাটাতে পারলে বড়লোক হতে কি-ই বা লাগে! আনন্দে সর্ব্বেশ্বরের বুকখানা চওড়া হয়ে ওঠে। নিরক্ষর ওই গ্রামবাসীদের তিনি তিন তুড়িতেই উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ভয় তিনি করেন শুধু ওই সব সখের সেবাব্রতীদের—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান যাদের নেশা।

সর্ব্বেশ্বরের সব রকম মৌখিক তাগিদ ও চোখরাঙানি যখন ব্যর্থ হলো তখন সর্ব্বেশ্বর ধারণ করলেন উগ্রমূর্ত্তি। ছিদামের অনুপস্থিতিতে তার ঘরের মালপত্রগুলো টেনে বাইরে ফেলে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিলেন দুটো ভাড়াটে গুণ্ডাকে। ছিদাম যখন সপরিবারে ফিরে এসে দেখলে যে, তার শণের-ছাউনি কুঁড়ে ঘরখানি থেকে সে বেদখল হয়েছে, নিমেষে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন গরম রক্তের একটা প্রবাহ বয়ে গেল। একবার মনে হলো, তালা ভেঙ্গে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে আবার ঘরে তোলে। কিন্তু দরজার সামনে বসে যারা বিড়ি ফুঁকছিল আর মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তার দিকে চেয়ে হাসছিল, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে রাগটা সামলে নিয়ে, ধীরে-ধীরে আবার ফিরে গেল কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। ছিদামের চোখের জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে।

পরদিন বিকেলে ছিদাম একা ফিরে এলো আচার্য্য মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে দুটিকে দিন কয়েকের জন্য রেখে এলো বেলেঘাটায় পিসীমার বাসায়। মামলা করবার পয়সা তার আর নাই। এখন প্রতিদিনের ভাবনা শুধু তিন-চারটি প্রাণীর দৈনন্দিন আহারের সংস্থান কেমন ক'রে করবে! আচার্য্য মশায় যদি টাকা কয়টি ফেরৎ দেন, তা হলেই ছিদাম আজ কৃতার্থ হবে।

সাতপুকুরের ভিটে ছেড়ে আসার দুঃখ যখন সহ্য হয়েছে, তখন দু'দিনের আশ্রয় এই তালপাতার ছায়াটুকু মাথার উপর থেকে সরে যাওয়ার কষ্টও তার সইবে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা ক'রে আচার্য্য মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ যখন ছিদামের মিললো, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। সাজগোজ ক'রে সর্ব্বেশ্বর বেরুচ্ছিলেন সান্ধ্য-ভ্রমণে।

সামনে এগিয়ে ছিদাম তার পায়ের কাছে মাথাটা নোয়াতেই আচার্য্য মশায় চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন—"থাক্, থাক্ ছিদাম। আর পেন্নামের দরকার নাই।"

"কি দোষ করলাম আচার্য্য মশায় ?"—ছিদাম অপরাধীর কণ্ঠেই কথাগুলো উচ্চারণ করে।

"দোষ তুমি করবে কেন ছিদাম! দোষ করেছিলাম আমিই, অসময়ে তোমাদের ঠাঁই দিয়ে।"—সর্ব্বেশ্বর ফিকে একটু হাসে। ..."ভিটে-ছাড়া হয়ে এসে যখন স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে পথে দাঁড়িয়েছিলে, তখন জায়গা দিয়েছিলাম ব'লেই আজ কলকাতা সহরে বুক ফুলিয়ে চলে বেড়াচ্ছ!"

"ঠিকই বলেছেন, ঠাকুর মশায়"—ছিদাম হাত কচলায়। একটা ঢোঁক গিলে থেমে-থেমে বলে—"আমি গরীব মানুষ। আপনার দয়াধর্ম্ম আছে; বাড়-বাড়ন্ত হোক। গরীবের টাকা কয়টা ফিরিয়ে দিলে, গরীব কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আর কোথাও যেতো। চাল ছপ্পরের দামও কম হবে না। ওই কুঁড়েখানা তুলতে দু'তিনশো টাকা দফে দফে খরচ করেছিলাম।"

আচার্য্য মশায় যেন গাছ থেকে পড়লেন—"টাকা! টাকা কিসের ছিদাম ?"

"আজ্ঞে, যে তিনশো তিরিশ টাকা আপনাকে আগাম দিয়েছিলাম ছেলামি!"—ছিদামের গলার আওয়াজ ভারি হয়ে আসে।

"সেলামি! তুমি যা করেছ, তার জন্তে আক্কেল-সেলামি লাগলো না, সেইটাই যথেষ্ট মনে কর ছিদাম! তুমি আমার দেশের লোক না হলে, তোমায় শ্রীঘর দেখতে হতো।"—সর্ব্বেশ্বর গর্জ্জন করে ওঠেন।

"তা হলে টাকা কয়টা ফিরিয়ে দেবেন না ?"—ছিদাম অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করে।

"না। যা পারো, ক'রে নিও। যাও এখান থেকে। যাও—যাও—" আচার্য্য মশায়ের কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ সপ্তমে ওঠে।

ছিদাম ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। সর্ব্বেশ্বরের তর্জ্জন-গর্জ্জন দেখে সে হঠাৎ যেন হতবাক্ হয়ে যায়। আপন-মনে বিড়-বিড় করে বলে—"দুনিয়ার তাই নিয়ম।"

"ইনিই কি সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য? নব-ভিটা কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা ?"—

সর্ব্বেশ্বর ও ছিদাম দু'জনেই হকচকিয়ে ওঠে। পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, এক দল ভলান্টিয়ার। তাদের সঙ্গে ডক্টর সুবিমল সেন আর দুটি মহিলা।

অকস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরের মুখ চোখে যে ছায়া পড়লো, তা দেখে ইলা ও অণিমা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। লোকটা অদ্ভুত!

* * * *

উদ্বাস্তুদের বাড়ী বাড়ী ফিরে সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে সুবিমল, ইলা, আর অণিমা যখন রওনা হলো তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে-নটা।

দুঃস্থ নর-নারীর সাহায্য করবার ব্রত নিয়েও মানুষ কত রকম জাল-জুয়াচুরি আর ব্যবসাদারি ফেঁদে বসেছে, তা দেখে ওরা হতবাক্ হয়ে যায়। সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য শুধু মাত্র নব-ভিটা কলোনীতেই এক জন নয়, এই রকম সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বেশ্বর প্রতিটি কলোনী, প্রতিটি পল্লী, এমন কি প্রতিটি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে। রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিপর্য্যয় থেকে যদিও দু'-চারটি পরিবারকে রক্ষা করা যেত, এদের হাত থেকে তাদের বাঁচানো অতি দুঃসাধ্য। বিপন্ন মানুষগুলোর পিছনে এরা ভাম্পায়ারের মত লেগেছে। ডানার বাতাসে ঘুম পাড়িয়ে গায়ের রক্তটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিতে ব্যস্ত।

সুবিমল ভাবতে ভাবতে আসছিল, কেমন ক'রে এই অসহায় লোকগুলোকে বাঁচানো যায়। এক দিন যারা সব ছিল সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ, আজ তাদের ঘর নাই, বাড়ী নাই, নিশ্চিন্ত কোন আশ্রয় নাই। যার কুটীরে দু'খানা ছেঁড়া মাদুর আছে, তার পরনে কাপড় নাই। যার দু'বেলা খাবার জুটেছে তার থালা বাটি বাসন নাই। এরা যখন হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, তখন তাদের মুখপানে চেয়ে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে: 'এ কি হাসি!' নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে সুবিমল হন্-হন্ ক'রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ইলা ও অণিমা পিছিয়ে পড়েছে। চাপা-গলায় অণিমা গড়-গড় ক'রে অনর্গল বলে যাচ্ছিল তার অভিজ্ঞতার কথা। বেহালা স্কুলে দিন কয়েক শিক্ষয়িত্রীর চাকরী নিয়ে সে যেন এক নতুন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। চাকরী ছেড়ে দিয়েও মনের গ্লানি যায় না, এমনই তিক্ত তার অভিজ্ঞতা! পয়সা না হলে চলে না, তাই বাধ্য হয়ে আর কোন কাজ না পেয়ে নিয়েছে একটি ভাটিয়া প্রতিষ্ঠানে সেইল্‌স্ উয়োম্যানের কাজ। ছ'মাস ট্রেনিংএ থাকতে হবে। তারপর, মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতন, এখন পাবে মাসে চল্লিশ টাকা। ইলা স্তম্ভিত হয়ে শোনে তার কাহিনী।

কলোনী ছাড়িয়ে সহরের দিকে আসতে রাস্তার দু'পাশে কতগুলো খোলার বস্তি। সামনেটা আলো-আঁধারি। উত্তর দিকে বড় বস্তিটার পাশ দিয়ে ছোট একটা গলি বেরিয়েছে। গলির মাথায় পথটা যেন বেশ থম্‌থমে অন্ধকার। বিশেষ লোক চলাচল নাই। সুবিমল গলিটার মোড় ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই একটি স্ত্রীলোক পিছন থেকে কেমন একটা গলা-ঝাড়ার শব্দ ক'রে এগিয়ে যায়। সে শব্দে পথচারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

সুবিমল পিছন ফিরে চায়। মহিলাটি বোধ হয় ইলা ও অণিমাকে তখনও দেখেনি। সে তখন বড় রাস্তার ধারে এসে পড়েছে। চোখে-মুখে লাইট-পোষ্টের এক ঝলক আলো পড়তেই সুবিমলের অনুমান করতে বিলম্ব হয় না যে, মেয়েটি ভদ্রঘরের। বোধ হয়, কোন রিফিউজী, না-হয় বিপন্ন পরিবারের মেয়ে। সুবিমল থমকে দাঁড়ায়।

অচেনা মহিলাটি আরও দু'-এক পা এগিয়ে গিয়ে চাপা-গলায় জিজ্ঞেস করে—"আপনি কি আমারে কিছু বলবেন ?"

"না তো!"—সুবিমল বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখপানে চায়। মহিলাটি দু'-এক বার ঢোক গিলে আবার বলে—"আসুন না। একটু বসবেন আমাদের বাড়ীতে।"

সুবিমলের কেমন ধাঁধা লাগে : 'এ কি !' আবার পরক্ষণেই মনে হয়, হয়তো অত্যন্ত বিপন্ন। মুখখানা দেখলে মনে হয়, উপোসে উপোসে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে মহিলাটি মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

সুবিমল আরও কাছে এগিয়ে আসে। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কি সে বলতে চায়।

মেয়েটি সুবিমলের মুখপানে আর একবার চোখ তুলে চায়। কেমন যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টি। চটুল অথচ বেদনার্ত্ত।

সুবিমল এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"আপনি ?"—

"রিফিউজি"—মেয়েটির মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটে ওঠে।

সুবিমল কি বলবে, ভেবে উঠতে পারে না। মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে।

"আসুন না। যা পারেন, দেবেন। আজ দু'দিন কারো খাওয়া হয়নি।"—কথাটা বলে ফেলে মেয়েটি যেন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয়, দাঁড়াতে পারছে না। পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।

ইলা ও অণিমা ততক্ষণে একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওদের শব্দ পেয়ে মেয়েটি কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে। পিছন ফিরে চেয়েই থতমত খেয়ে যায়। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—"ইলা !"

নিমেষে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় গলির ভিতর দিয়ে। ইলার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা আকস্মিক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়। ক্ষিপ্রপায়ে গলির দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকে—মালতীদি'—মালতীদি !'

গলি ছাড়িয়ে মালতী ততক্ষণে বস্তির ভিতরে ঢুকে আত্মগোপন করেছে।

ইলা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম্ করে। সেই মালতীদি'! যার সব কিছু ছিল একদিন ওদের আলোচনার বিষয়। জীবনের পথে হঠাৎ কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছিটকে পড়েছে তার আদর্শ হতে। এই গলি, এই বস্তি, এর এক নিরালা কোণে দাঁড়িয়েছে জীবনের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে ক্ষুধাতুর ভাই-বোন আর বৃদ্ধ মা-বাপকে দু'মুঠো খাওয়াবে বলে : দু'দিন তারা কিছু খায়নি! ভাবতে ইলার মাথাটা ঘুরে যায়।

"ইলা !—ইলা !"—অণিমা গায়ে হাত দিয়ে ডাকে। ইলার সম্বিৎ যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসে। "তোর চেনা বুঝি ?"—অণিমা জিজ্ঞেস করে।

"না। হাঁ, চেনা। আত্মীয়—দূর সম্পর্কে আমার···" ইলা বলতে পারে না।

"মন খারাপ ক'রে তো লাভ নাই, ইলা ! এমনি অন্ধকারে কত জন তলিয়ে গেল, তার হিসেব কে রাখে, বল? তুই আর আমি কতটুকুই বা চোখে দেখেছি।"—অণিমা আক্ষেপের সঙ্গে বলে।

দীর্ঘশ্বাসে ইলার বুকখানা কেঁপে ওঠে—"তাই।"

"হাঁ, তাই। মাধবীকে চিনতিস্? চাকরি যাওয়ার পর, দিনের

পর দিন ষ্ট্রাগল্ ক'রে, শেষটায় ক্লিনিকে ঢুকেছে ঠিকে মাইনেয়। অচেনা পুরুষের হাত-পা টিপে—" অণিমা ইতস্তত করে।

"থাম্ থাম্ অণিমা! জানি—" ইলা অণিমার মুখে হাত চাপা দেয়।

একটু থেমে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—"সেদিন ট্রামে দেখা হয়েছিল। হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম ওর পরিবর্ত্তন। সংকোচে বলতে পারেনি।"

সুবিমল নিজেও কেমন হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ পর ইলার দিকে এগিয়ে এসে বললে—"ইলা, রাত অনেক হলো। আর দেরী ক'রো না।" তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। পথ-ঘাট জনবিরল হয়ে এসেছে।

* * *

এত দিন সরকারী ও সদাগরী অফিসের দরজায় ছেলেরাই কেবল মাথা-ঠোকাঠুকি করতো—কিন্তু আজ দলে দলে মেয়েরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। চাকরিতে ইনটারভিউ দিতে আসবার দিন ইলা যে আশঙ্কা নিয়ে এসেছিল, এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার হাতে ক'রে যখন এলো, তখন সে আশঙ্কা যেন দশ গুণ বেড়ে গেল। ওর বুকের ভিতর যেন সত্যি কেঁপে ওঠে। এত দিন নারীর অবাধ অধিকারের দাবীতে পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে চলেছে নির্ভীক পদক্ষেপে। কিন্তু জীবন-যুদ্ধের বাস্তব রণক্ষেত্রে সে দাবী কতখানি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে সেটাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। তবু ত ভয়ে পিছিয়ে গেল না। জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি কেন্দ্রীয় সরকারের সেই রাজস্ব বিভাগে সে এসে হাজির হলো তার নিয়োগ-পত্র হাতে নিয়ে, কিন্তু মন তার অনেকখানি সবল হয়ে উঠলো যখন অফিসে এসে দেখলো যে, সে একাই আসেনি। অরুণা, নিভা, সুতপা, রমা, বাসন্তী এবং আরও অনেকেই এসেছে, যাদের সঙ্গে সে স্কুলে, কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে পড়েছে। কালের ঘূর্ণাবর্ত্তে যারা অনেকেই ছিটকে পড়েছিল দূরে, তাদের অনেকেই এসে আবার জুটেছে এই হরি ঘোষের গোয়ালে। রমা আর সে একসঙ্গেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল কিন্তু রমা কবে ইনটারভিউ দিয়ে গেছে তা সে জানে না। দু'জনেই কিন্তু একসঙ্গে নিয়োগ-পত্র পেয়েছে। হঠাৎ রমাকে দেখে ইলার মনে যেন অনেকখানি বল ফিরে আসে। অচেনা পুরুষের ভিড়ের মাঝখানে চেনা মেয়েদের পেয়ে সত্যি অনেকটা আশ্বস্ত হয়।

সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল, কেমন করে অফিসের আবহাওয়া আর নানান্ দেশী পুরুষের মাঝখানে এই সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে নিজেকে। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, যারা কোন দিন পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশবার এতটুকু সুযোগ পায়নি, তারা মুখে যত সাহসই দেখাক, কাজে দশ বার পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু উপায় নাই। ভিক্ষে, ধার আর চুরির চেয়ে এই পরিবেশও অনেক ভালো। জীবন-সংগ্রামে বাঁচতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদ কোন বিধি-নিষেধের ধার ধারে না। ভাগ্য-বিপর্য্যয় যেমন রাজাকে সিংহাসন থেকে টেনে আনে পথে, নিমেষে চূরমার করে দেয় তার সব আভিজাত্য ও মর্য্যাদা, রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ও তেমনি বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের ঘর থেকে টেনে এনেছে বহির্জ্জগতের সংঘাতের মধ্যে। আজ পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে।

যারা এত দিন মেয়েদের শুধু দেখে এসেছে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরে, তারা আজ হঠাৎ যখন দেখলো যে, তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে একে একে মেয়েরাও এসে আসন করে নিয়েছে, তখন তারা চঞ্চল না হয়ে পারে না। মৌচাকে ঢিল পড়ার মত ভন্‌ভন্ করে উঠলো সব, কিন্তু তাদের মৃদু গুঞ্জন মেয়েদের কানে পৌঁছলো না। শুধু অস্পষ্ট আভাসে তারা কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলো, তাও নিতান্ত সাময়িক।

প্রথম দিন যথেষ্ট আড়ষ্টতার মধ্যেই কেটে গেল। কিন্তু আস্তে আস্তে ইলা অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এলো। ছেলেদের সম্বন্ধে মনের কোণে যে ধারণা জন্মেছিল তা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ইলা দেখলো, সামাজিক জীবনে যারা কেউ তার দাদা, না হয় ছোট ভাই, এখানেও তাঁরাই আগে থেকে এসে জীবন-সংগ্রামে নেমেছেন। এত কাল এঁরা শুধু একক সংগ্রাম করেছেন যাদের অন্নবস্ত্র যোগাতে, আজ তারাও এসে যোগ দিতে সুরু করেছে লড়াই-এ।

দেখতে দেখতে সবই সহজ হয়ে এলো। সত্যিই তো, ইলার দাদা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন—যাঁরা অফিসে অফিসে চাকরি করেন, এঁরা তো তাঁরাই। ইলার ছোড়দা, মেজো কাকা, জামাইবাবু, রমাপতি, গৌরাঙ্গ চাকরি করে রাইটার্স বিল্‌ডিংসে, অরুণদা, তপন, মাসিমার ছোট ভাই, এঁরাও সবাই কাজ করেন সরকারি ও সওদাগরি নানা অফিসে। কোন দিন কোন রকম সংকোচই হয় না তাঁদের সঙ্গে সামাজিক জীবনে পাশাপাশি চলতে। তবে কেন অকারণ সংকোচ হবে এঁদের কাছে? ধীরে ধীরে মন স্থির হয়ে আসে। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে, উদ্ধতন হাকিম-করণিকদের কাছে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে তার গতিবিধি। তবুও মনের কোণে কোথায় যেন ছোট একটি কাঁটা খচ-খচ করে: এই কি জীবনের শেষ পরিণতি! ইলা আপন-মনে নিজেকে বার বার শুধু এই প্রশ্নই করে।

চারতলার ছাদের একটি পাশে মেয়েদের টিফিন-ঘর। ছেলেদের বসবার জন্য ক্যান্টিনের সামনে বড় বেঞ্চ আর টেবিল পাতা। রোজ টিফিনের সময় ডিপার্টমেণ্টের আরও সব মেয়েদের সঙ্গে ইলার দেখা হয়। কেউ বিবাহিতা, কেউ কুমারী, কেউ বা সন্তানের মা। রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে সামাজিক জীবনে যে ভাঙ্গন ধরেছে তারই ঝাপটায় গৃহকোণ ছেড়ে সব দলে দলে বেরিয়ে এসেছে নীড়হারা পক্ষিণীদের মত। মান-সম্ভ্রম সবই নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর। প্রতিনিয়ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে হাত পাতার চেয়ে পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'মুটো ভাত আর পরনের দু'খানা কাপড় সংগ্রহ করা অনেক ভালো।

দেশ ছেড়ে আসার পর থেকে দিন দিন যে আর্থিক বিপন্নতায় সংসার জড়িয়ে পড়েছিল, তাতে ইলার চাকরি সংসারে একটা সান্ত্বনার মত এলো তাতে সন্দেহ নেই। ওর বাবা দীনেশ বাবু ছিলেন চিরদিনের প্রাচীনপন্থী। প্রথমটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও, তিনি মনে মনে অনেকখানি শক্তি পেলেন ইলা যখন সত্যি মাসের শেষে একগোছা দশ টাকার নোট তাঁর হাতে তুলে

দিল। টিউসানি আর চাকরি মিলিয়ে যে টাকা ইলা এখন থেকে মাস মাস আনবে তাতে সংসারের রেশন আর বাজার-খরচটা অন্তত চলে যাবে, দীনেশ বাবুর পক্ষে এটা কম নিশ্চিন্ততা নয়। একে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, তার উপর এই আর্থিক অনটন তাঁকে একেবারে পঙ্গু ক'রে ফেলেছিল।

ইলার চাকরিতে আর সবাই খুসী হলেও, খুসী হলেন না একজন। তার মা ইন্দিরা দেবী, তাঁর বুকের ভিতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। এই কি ইলার জীবন! কত আশা, কত কল্পনা নিয়ে তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন উপযুক্ত ঘরে তার বিয়ে দেবেন বলে। তাঁর সাধ ছিল, ইলার বিয়ে দেবেন আত্মীয়-স্বজনের চমক লাগিয়ে। কিন্তু হলো না। সব ব্যর্থ হলো। শরীর ও মন দুই-ই ভেঙ্গে পড়েছিল; এবার যেন আশা-আকাঙ্ক্ষাও ভেঙ্গে পড়লো।

মাটি বদলালে, চারা গাছকে আবার জল দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়। কিন্তু যে গাছ একবার ফলে-ফুলে ভরে উঠেছিল, জোর ক'রে তার শিকড় উপড়ে নতুন মাটিতে এনে আর তাকে বাঁচানো যায় না। ইন্দিরা দেবী ছিলেন বড়-ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন খেতাবওয়ালা সরকারী পেন্‌শনার; ভাইরা কেউ উকিল, কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ বা বিলেত-ফেরত ডাক্তার। শ্বশুর-গোষ্ঠী বনিয়াদী কুলীন পরিবার। এক কথায়, ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার মাঝখানে হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা। সেই প্রতিষ্ঠা হঠাৎ যেদিন ভেঙ্গে পড়লো, সর্ব্বস্ব হারিয়ে ছেলেমেয়ে ও স্বামীর হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন ক'লকাতার রাজপথে, সেই দিনেই হলো তাঁর প্রকৃত জীবনের অবসান। যেটুকু রইল, সেটুকু শুধু ফলন্ত গাছের ঝিমিয়ে-পড়া অর্দ্ধশুষ্ক ডালপালা।

ধীরে ধীরে ইন্দিরা দেবী শয্যাগ্রহণ করলেন। ডাক্তারেরা বললেন, লিভারের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শেষ চেষ্টা, অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কিছু করবার নাই। শুনে ইন্দিরা দেবী ফিকে একটু হাসেন। দীনেশ বাবুর কপালের শিরা দুটো ফুলে ওঠে। আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বলেন—"চিকিৎসা! হয় বেঁচে থেকে মরা, না-হয় ম'রে গিয়ে বাঁচা।···কোথায় পয়সা?"

ইলার মুখ কালো হয়ে আসে। ছোট ছোট ভাই-বোনদের চোখের দৃষ্টি ম্রিয়মাণ হয়। সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ইলা যেটুকু সময় পায়, মায়ের বিছানার পাশে ব'সে থাকে। স্তোত্র শুনতে ইন্দিরা দেবী ভালবাসেন, তাই তাঁরই শেখানো স্তোত্রগুলো ইলা মাঝে মাঝে আবৃত্তি ক'রে তাঁকে শোনায়।

* * * *

সকালে টিউসানি, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় সংসারের কাজ, মায়ের বিছানার পাশে ব'সে একটুখানি শুশ্রূষা করা—এই রুটিন-বাঁধা গতিতে ইলা চলে। দেহ ক্লান্ত হলেও মন ওর ক্লান্ত হয় না, তাই ছ্যাকড়া গাড়ীর মত কাজের বোঝা টেনে টেনে বেড়ায়। কিন্তু এমনি ক'রে বেশী দিন চলে না।

এত দিন সুবিমলের কাজে ইলা যেটুকু সাহায্য করতে পারতো, চাকরি পাওয়ার পর থেকে সেটুকু বন্ধ হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলতে সে যেন দু'মাসেই হাঁপিয়ে উঠলো। রোগ-শয্যায় শুয়েও ইন্দিরা দেবী সব খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। দীনেশ বাবু ছিলেন প্রাচীনপন্থী। যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়েদের যে প্রগতি আপনা থেকে এসে পড়েছে, তাকে আংশিক মেনে নিলেও, তিনি তাদের অবাধ মেলা-মেশা ও নির্বিচার গতিবিধি পুরোপুরি মেনে নিতে পারতেন না। তাই ইন্দিরা দেবী ইচ্ছে করেই সব কথা তাঁকে জানাননি, পাছে মনে ব্যথা লাগে। ইলাকে ইন্দিরা দেবী যতখানি চেনেন, তার বাবা তো ততখানি চেনেন না।

প্রতিদিন ইলা রিফিউজি ক্যাম্পের কাজ ক'রে এসে যে সব ফিরিস্তি মায়ের কাছে দিত, তাতে তিনি সত্যি মনে মনে আনন্দ পেতেন। মুখ ফুটে কোন দিন কিছু না বললেও, বুকের ভিতরটা তাঁর গর্ব্বে ভরে উঠতো। ইলা তো তাঁরই ছায়া। পথের হাওয়া গায়ে লেগে ইলার অন্তরের ভিত্তি টলবে না, এ বিশ্বাস ইন্দিরা দেবীর ছিল।

অফিসের ফেরৎ বাসায় এসে ইলা যখন মায়ের লাল পাড় গরদের শাড়িখানা প'রে লক্ষ্মীর সিংহাসনের সামনে ধূপ-প্রদীপ দিয়ে কাছে এসে বসে, ইন্দিরা দেবীর বুকের তলা আলোড়িত ক'রে ওঠে গভীর দীর্ঘশ্বাস। হঠাৎ এক দিন ইলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার মাথায় হাত রেখে, ইন্দিরা দেবী জিজ্ঞেস করলেন—"সুবিমলের ওখানে আর যাস্ না কেন, মা?"

অতর্কিতে মায়ের মুখে এ প্রশ্ন শুনে ইলা কেমন জড়সড় হয়ে গেল। মুখখানা নীচু করে ধীর কণ্ঠে বললে—"সময় কখন, মা? ছাত্রী পড়ানো, আপিস, সংসারের কাজ—"

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ইন্দিরা দেবী বলে উঠলেন—"কাজ কি সেটাও কম বড়, মা? আমাদেরই মত কত হাজার হাজার বিপন্ন পরিবার। হয়তো আমাদের চেয়েও দুঃস্থ। তাদের সেবা করবার সুযোগ পাওয়া তো ভাগ্যি।"

"দুঃস্থ ওরা সত্যি মা! কী দুরবস্থায় যে আছে তারা, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।"—ইলার কণ্ঠস্বর কাঁপে।

ইন্দিরা দেবী চোখ দুটো বন্ধ করে কি ভাবেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন—"তাই অনেকেই আবার ফিরে যাচ্ছে। শুনলাম, মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর মেয়েরা নাকি হরিদত্তের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল।"

"ফিরে কি সাধে গেল, মা! দিনের পর দিন আত্মীয়-স্বজনের দরজায় হাত পেতে কত কাল আর চলে বলো? মুকুন্দ কাকার বড় মেয়ে রেণু বললে, এর চেয়ে সেখানে গিয়ে জাত দেওয়াও ভালো। তাও তো মান-ইজ্জৎ নিয়ে একটা লেখাপড়া-জানা ছেলে বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করতে পারবে—" বলতে বলতে ইলার কণ্ঠস্বর কাঁপে।

"বলিস্ কি ইলা!"—ইন্দিরা দেবী চমকে উঠলেন।

ইলার মুখে আর যেন কথা ফোটে না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু শক্ত করে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে—"ওরা যা বলেছে, তা একেবারে মিথ্যে নয় মা! যুদ্ধের ধাক্কা বাংলা দেশ হয়তো সামলে নিত; কিন্তু স্বাধীনতার ধাক্কা সামলাতে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল।"

"তাই মা, তাই। সবই ছত্রিছন্ন হয়ে গেল।"—ইন্দিরা দেবী ইলার মুখপানে সজল চোখে চেয়ে থাকেন। ইলার চোখ দুটোও কেমন ছল ছল ক'রে উঠেছে। ইন্দিরা দেবী একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে

আমার বললেন—"চাকরি-বাকরি তো কিছু একটা যোগাড় ক'রে নিতে পারতো ওরা—"

"চাকরির অবস্থাও তাই। বেশী লেখাপড়া না জানলে সরকারী কাজ পাওয়া দুঃসাধ্য। প্রাইভেট চাকরিতেও মালিকের মন যোগানো কঠিন। আর—লোকের সাহায্য নিয়ে সংস্থানের আশা করতে গেলে, শেষটায় হয়তো আরও নীচে নেমে যেতে হবে। কত মেয়ে যে পেটের দায়ে সব কিছু বিকিয়েছে, কে তার হিসেব রাখে?···আমি নিজের চোখে দেখেছি, মা—" ইলা থেমে যায়। বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না। টপ-টপ ক'রে দু'ফোঁটা চোখের জল ইন্দিরা দেবীর বুকের উপর পড়ে।

ঝোঁকের মাথায় ইন্দিরা দেবী উঠে বসেন: "ইলা, তুই টিউসানি ছেড়ে দে। যেটুকু পারিস্ ওদের জন্তে কর মা। সুবিমল ভালো ছেলে। তার কাজে সহায়তা কর।"

"উঠো না—মা। ডাক্তারের নিষেধ। তুমি শুয়ে পড়। ভূমিকম্পে যখন বড় বড় বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে, তখন কি বাঁশের ঠেকা দিয়ে আটকে রাখা যায়?"

"তবুও চেষ্টা কর। সকলের চেষ্টায় কিছু না কিছু সুফল হবেই।—" বলতে বলতে ইন্দিরা দেবী আবার শুয়ে পড়লেন।—"জনসাধারণও তো সাহায্য করছে।"

"তা করে। তবে সাহায্যের চাপে অনেক সময় তারা বিপন্নও হয়। যে সব বিপন্ন পরিবারে বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে আছে, তাদের প্রতি অনেকেই অযাচিত করুণা দেখায়। তবে, শেষে উল্টো ফল হয়।··· যাক্, টিউসানি আমি ছেড়েই দেবো। বাবার হয়তো অসুবিধা খানিকটা হবে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না।"—ইলা মায়ের শয্যাপাশ থেকে উঠে যায়।

ইন্দিরা দেবী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন।

* * * *

আকস্মিক ভাবে বাইরের স্রোত এসে পুকুরের জল যখন ঘোলা ক'রে তোলে, তখন মাটির আগাছা চোখে পড়ে না। তারপর জল যখন ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে, মাটির শেওলা হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট। ইলারা যখন প্রথম চাকরি নিয়ে অফিসে এলো, অফিসের আবহাওয়া হয়ে উঠলো ঘোলাটে। ভিতরের অবস্থাটা ঠিক ওদের চোখে পড়লো না। তারপর আস্তে আস্তে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যত থিতিয়ে আসে, ওদের চোখে তত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বচ্ছতার আনাচে-কানাচে যে সব আবিলতা লুকিয়ে আছে।

এখানেও পক্ষপাত, কানাকানি, দলাদলি ও ঈর্ষা ঠাসাঠাসি জট বেঁধে আছে। উপরওয়ালাদের মন যুগিয়ে চলতে না পারলে, চোখে প্রলয় দেখা দেয়; চাকরি নিয়ে লাগে টান-পারাপারি। একজনকে এড়িয়ে আর একজনের সঙ্গে একটুখানি হেসে কথা বললে, বিষের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে অন্ত কোণে। আগে থেকে যাঁরা এক-একটি সেনানায়ক বা সামন্তের মত ঘাঁটি দখল ক'রে বসে আছেন, তাঁরা চান যে, মেয়েরা তাঁদের বাড়ীতেও যেমন তোয়াজ ক'রে চলেছে এত কাল, তেমনি গার্জেন বলে মেনে নেবে অফিসেও। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা উপরওয়ালাকে না জানিয়ে, সহকর্মীকে জানালে, উপরওয়ালা বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন দু'জনেরই পানে। কাঁচা-পাকা গোঁফের আড়ালে কেউ হয়তো ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসেন। কেউ বা মুচকি হেসে সবাইকে শুনিয়ে বলেন—"কালে কালে আরও কত দেখবো হে! সাধে কি বলেছে কলিযুগ! ···লজ্জা-সরম আজকাল আর নাই।"

বৃদ্ধ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট একটি ঝুনো লোক। রমা তার নাম দিয়েছে 'ঝুনু'। পাণ থেকে চুণটুকু খসলে তিনি ঠোঁট উল্টে হাসেন। নিবিয়ে-রাখা সিগারেটের টুকরোটা আবার জ্বালিয়ে নিয়ে, পাশের লোকটিকে ডেকে বলতে শুরু করেন তাঁর জীবনের নৈতিক আদর্শের কথা। লর্ড কার্জ্জনের আমল থেকে এ যুগ পর্য্যন্ত কি বিরাট পরিবর্ত্তনটাই না ঘটে গেল! ঘরের মেয়েরা দেখতে দেখতে কেমন ক'রে নেমে গেল অধঃপাতের পথে ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। পুরোন আমলের কেরাণীরা অধিকাংশই 'জল-উঁচু'র দল। বড়বাবু যা বলেন, সবাই নির্ব্বিচারে তাই সমর্থন করে। যারা নতুন কেরাণী, যুদ্ধ-ফেরত না-হয় তাজা কলেজী—পাশ ক'রেই এসে ঢুকেছে অফিসে, পোষাকে-পরিচ্ছদে তারা বেশীর ভাগই আধা হাকিম। মেজাজ রুক্ষ না হলেও মোলায়েম নয়। কারণে অকারণে রুখে ওঠে। অফিসে চাকরি করে, অবসর সময়ে হয়তো তাশ খেলে। টিফিন-রুম আর চায়ের টেবিলে সিনেমার গল্প বা কখনও খেলার খবর নিয়ে আসর জমায়। ইলা এদের বলে 'পোষ্টওয়ার ব্র্যাণ্ড'। ওরাও অবশ্য আড়ালে-আবডালে মেয়েদের সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করতে দ্বিধা করে না।

মেয়েদের ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে বয়েস থাকে না। তাই নানা বয়সের মেয়ে বয়স ভাঁড়িয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। চেহারায় বয়সের ছাপ এত পরিস্ফুট যে, রঙ-ঢঙে তাকে ঢেকে রাখা যায় না। ঠোঁট-কাটা ছেলেগুলো এদের শুনিয়েই বলে—"ডিস্‌পেন্সাল থেকে এসেছে।"

কেউ বা মুখ টিপে একটু হেসে বলে—"বড় পিসি।"

নানা জনের নানা মন্তব্যে কান দিলে অফিসে চাকরি করা চলে না। তাই অনেক কথা ওরা শুনেও শোনে না।

তবে একটা বিশেষত্ব ইলা লক্ষ্য করেছে যে, মেয়েদের চালচলনে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী কৃত্রিমতা, দু'-চার জন ছেলে বখাটে হলেও ভালোর সংখ্যাও তাদের ভিতর কম নয়। কিন্তু যে সব মেয়ে একদিন ছিল ইলার নিতান্ত অন্তরঙ্গ, আজ তাদেরও সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কর্ম্মজীবনে এসে যাদের সঙ্গে আলাপ হলো, তাদের দু'-চার জনকে ওর সত্যি খুব ভালো লাগে। সাজগোছে আড়ম্বর না থাকলেও তাদের ভিতর যে আন্তরিকতা ও বন্ধুপ্রীতি ইলা দেখেছে, তা ওর জীবনে চিরদিন মনে ক'রে রাখবার মত। যুদ্ধোত্তর বাংলায় আজ হয়তো অন্তরের মানুষ সত্যি চাপা পড়েছে বাইরের আবরণে।

অল্প-বিস্তর মন যোগাতে সরকারী অফিসেও হয়। ছোট-বড় যে সব খুদে হাকিম ও জাঁদরেল উপরওয়ালা আছেন, তাঁরা কারণে-অকারণে যখন-তখন তলপ করেন। ইচ্ছে না থাকলেও হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়াতে হয়; নইলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

নতুন আলাপের আড়ষ্টতা দিন দিন যত কমে আসে, ইলার প্রতি তার হাকিম দাস সাহেবের আলাপ-আলোচনার ভঙ্গী তত বদলে যায়। ইলা এটা খোলাখুলি ভাবে টের পেলো—যেদিন দাস সাহেব তার শাড়ির রঙের সঙ্গে ব্লাউজের মানানসই রঙ

এই যে বেরুলো বিস্ময়কর নূতন
EVEREADY
TRADE-MARKS
MINI-MAX
এভারেডী মিনিম্যাক্স
রেডিও ব্যাটারী
ব্যাটারী তৈরীর কায়দায় একেবারে নতুন উপায় আবিষ্কারের ফলে "এভারেডী" "মিনিম্যাক্স" রেডিও ব্যাটারী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আজ অবধি যত রকমের ব্যাটারী তৈরী হয়েছে তার কোনোটাতেই এত ঘনীভূত শক্তি পাওয়া যেত না, কারণ কোন ব্যাটারীতেই প্রতি ঘন-ইঞ্চি জায়গার মধ্যে এত বেশি কার্যকরী মালমসলা ঠাসা থাকত না। এই ব্যাটারীর সেলগুলো চ্যাপ্টা হওয়ার দরুন এগুলি গড়নে আঁটোসাটো ও ওজনে হাল্কা হয় আর তাছাড়া অন্যান্য ব্যাটারীর চেয়ে বেশি কাজ দেয়। "এভারেডী" "মিনিম্যাক্স" আপনার রেডিওর পক্ষে আদর্শ ব্যাটারী।
EVEREADY
MINI-MAX
আপনার রেডিও বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন "এভারেডী" "মিনিম্যাক্স" ইতিপূর্বে তৈরী সকল রেডিও ব্যাটারীর চেয়ে বেশী কার্যক্ষম?
বাজারে "এভারেডী" "মিনিম্যাক্স"-এর চেয়ে ভালো রেডিও ব্যাটারী পাবেন না, কারণ এই ব্যাটারী—
* খরচা কমায়
* অনেক ভাল কাজ দেয়
* অনেক বেশিদিন চলে
ন্যাশনাল কার্বনের তৈরী
NCM 3908
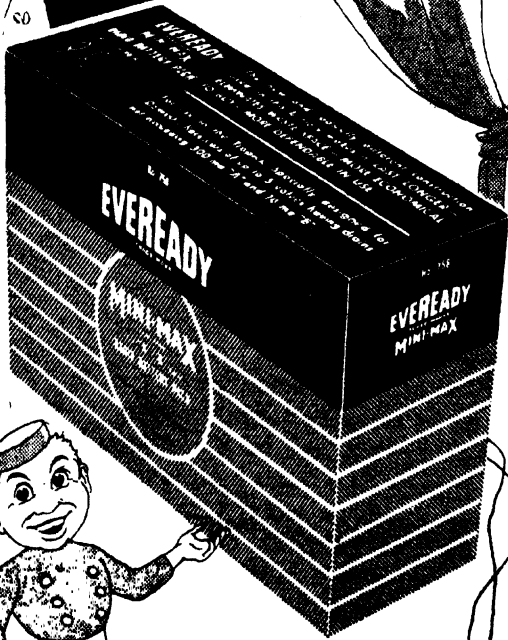
সম্পর্কে হঠাৎ মন্তব্য করলেন একটু মিষ্টি হেসে—"বা, বেশ ম্যাচ করেছে তো!"

ম্যাচ হয়তো সত্যি ভালো হয়েছিল, তবুও ইলার কানে এই অযাচিত প্রশংসা ভালো লাগলো না। কোন উত্তর না দিয়ে একটু মুচকে হেসে সে কথাটা এড়িয়ে গেল।

মিষ্টার দাস তরুণ হাকিম। লড়াইএর ফেরত সরকারী রাজস্ব বিভাগে এসে চাকরি নিয়েছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা। এখনও অবিবাহিত। এই দুর্দ্দিনের বাজারে মোটা মাইনের সরকারী চাকরি করেন। তাতে আবার গেজেটেড অফিসার। সুতরাং বাংলা দেশে পাত্র হিসাবে যে গরম ফুলুরির মত চাহিদা আছে তাতে সন্দেহ নাই। সে চাহিদা সম্বন্ধে দাস সাহেব নিজেও খুব সচেতন। তাই হয়তো সব সময়ই ভাবেন, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা তাড়ির দোকানের ক্রেতাদের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে তাঁর কাছে।

সেদিন ইলা কাগজপত্র সই করাবার জন্যে যখন সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, দাস সাহেব ফাইলের ভিতর থেকে মুখ তুলে চাইলেন, মুচকি হেসে বললেন—"বসো।"

কথাটা ইলার গায়ে চাবুকের মত সপ ক'রে লাগে। এর আগে কোন দিন দাস সাহেব তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেননি। তাই হঠাৎ সম্বোধনের এই পরিবর্ত্তনে ইলা ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট উত্তেজিত হলো। একটা প্রচ্ছন্ন অপমানে ওর সারা মন আলোড়িত হয়ে ওঠে।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে—"আপনি এখন ব্যস্ত, পরে না হয় আসবো আবার।"

ইলার আড়ষ্টতাটুকু দাস সাহেবের চোখে পড়লো কিনা কে জানে। "বসো—একটু গল্প করা যাক্"—চেয়ারে হেলান দিয়ে দাস সাহেব বলেন।

ইলা ততক্ষণে ঘামতে শুরু করছে। ভদ্রলোকের ধৃষ্টতা অসহনীয়। কিন্তু উর্দ্ধতন হাকিম! চাকরি করতে হলে হয়তো এর চেয়েও বেশী কিছু সইতে হয়। কাজেই, মনের ভিতরে বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করলেও ভদ্রতার খাতিরে মুখ বুজে সে স'য়ে যায়।

"কিন্তু আমার হাতে অনেক কাজ!" বিরক্তির সুরে ইলা বলে ওঠে। কি ভেবে ইলা মুখ তুলে একবার চায়। ইলার দৃষ্টিতে হয়ত ছিল ভয়, অপমান, বিরক্তি। দাস সাহেব কি বুঝলেন তিনিই জানেন—"আচ্ছা, যাও…" আর কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। "যাও" বললেও, ইলা যেতে পারে না; ইতস্তত করে। একটুখানি থেমে আবার বলে—"জরুরী কাজগুলো না হলে আপনারই অসুবিধা হবে। আপনিই তো বলেছেন—"

দাস সাহেব ইলার উত্তরে যেন একটু পুলকিত হয়ে ওঠেন। হাসিমুখে বলেন—"আচ্ছা, কাজগুলো সেরেই এসো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে পর্দাটা টেনে দেবার সময় দাস সাহেবের চোখে চোখ পড়তেই ইলার মনে আর এক ঝলক তিক্ততা উপচে উঠলো। দাস সাহেব বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকেই চেয়ে ছিলেন। সিগারেটের ধোঁয়াটুকু ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে ছেড়ে, মুখ টিপে একটু হাসলেন।

দ্রুতপদে ইলা অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা অস্বস্তির প্রবাহ বয়ে যায়। চাকরি-জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ইলা প্রাণান্ত হয়ে ওঠে।

* * * *

চাকরি-জীবনের গ্লানি যত বেশীই হোক, বেঁচে থাকবার জন্যে তার প্রয়োজনীয়তাও তার চেয়ে কম নয়। বাঁচবার তাগিদে পলে পলে মৃত্যুকে হজম ক'রে চলতে হয়। যারা পারে না, তারা বেছে নেয় আত্মনিগ্রহের পথ। সুনন্দা চাকরিকে বলে "কুত্তকী জিন্দগী"। সত্যি তাই! কুক্কুরীর জীবন। তবুও সে জীবনকে অস্বীকার করা চলে না। ইজ্জৎ বাঁচিয়ে জীবিকা অর্জ্জনের দিনমজুরি করতে পারলো না বলে, অণিমার ছোটখাটো চাকরিটাও গেল, ভাটিয়া প্রতিষ্ঠানের হুকুম তামিলি চাকরি সে বেশী দিন বজায় রাখতে পারলো না। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহও ভেঙ্গে পড়েছে। তবু চাকরি, না হয় যে-কোন জীবিকা আবার নিজে থেকে খুঁজে না নিলে চলে না। দু'মুটো খেয়ে বাঁচবার মত কোন আর্থিক সংস্থানই তাদের নাই আজ।

মা ও ছোট ভাই-বোন দুটি এত দিন কোন রকমে খুলনাতেই ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন যে আবহাওয়া হয়ে উঠলো, তাতে মান-সম্ভ্রম নিয়ে আর সেখানে থাকবার সাহস হলো না। আর্থিক বিপর্য্যয়ে হাবুডুবু খেয়ে যারা উপবাস-ক্লিষ্ট হয়ে পুনরায় ফিরে গিয়েছিল দেশে, তারাও ঘূর্ণী বাতাসের ঝাপটায় উড়ো খড়-কুটোর মত দলে দলে আবার এসে পড়লো পশ্চিম-বাংলায়। রাজনীতির লম্বা তক্তায় পিংপং বলের মত একবার এদিক, আর একবার ওদিক ক'রে কেউ তলিয়ে গেল, কেউ বা ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে ফিরে এলো রিফিউজি ক্যাম্পে রিক্ত হাতে।

অণিমার দাদা দেড়শো টাকা মাইনের একটা অস্থায়ী চাকরি নিয়ে বাংলার বাইরে চলে গেছেন। মাসে পঞ্চাশ টাকার বেশী পাঠাবার সামর্থ্য তাঁর নেই। বিদেশে কায়ক্লেশে শ'খানেক টাকায় নিজের খাওয়া-পরা চালিয়ে তিনি যেটুকু বাঁচিয়ে বাড়ী পাঠান, সেটুকু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হলেও সংসারের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চারটি প্রাণীর জীবনধারণের রসদ যোগাতে আজকালকার বাজারে অন্তত দেড়শো টাকা লাগে। তাতেও সংকুলান করা যায় না। ছোট ভাই ও বোনটি পড়ে স্কুলে। জামা-কাপড়, জলখাবার ছাড়াও লাগে তাদের স্কুলের বেতন, বই-খাতা-কলম-পেন্সিল। কি ক'রে দিনগুলো কাটবে, অণিমা ভাবতে পারে না।

প্রথম কয়েক দিন চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করেও যখন আর কিছু জুটলো না, অণিমার মন নিষ্ক্রিয় হয়ে এলো। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেল। পায়ে হেঁটে টালা-টালিগঞ্জ করবার শক্তিও তার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের এক প্রান্তে ছোট একখানা মাঠ-কোঠা ভাড়া নিয়ে অণিমা তার মা ও ভাই-বোন দুটিকে নিয়ে থাকে। হাতের চুড়ি দু'গাছা বিক্রি ক'রে রেশন আর নুণ-তেলের খরচ চালিয়ে কিছু দিন চললো। তার পর ধীরে ধীরে এলো জীবনের অচল মুহূর্ত্তগুলো।

জীবনকে অবিচলিত ভাবে মাথা পেতে বয়ে চলবার মত মনের জোর অনিমার ছিল, আজও আছে। কিন্তু নিঃসম্বল মন এবার ক্লান্ত হয়ে আসে। সুনন্দার কাছে টিউসানির চেষ্টায় কয়েক দিনই ঘুরেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তার কাছে ধার চাইবে। কিন্তু পারেনি। ইলার সঙ্গে আর দেখা হয় না, নিজে থেকে গিয়ে দেখা করবার মত উৎসাহও মনে ছিল না। ইলা ও সুবিমলের সঙ্গে যে কয় দিন উদ্বাস্তু-শিবিরে আর কলোনীতে কলোনীতে ঘুরে কাজ করবার সুযোগটুকু পেয়েছিল, সে সুযোগ সে নিজেই ছাড়তে বাধ্য হয়েছে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে প'ড়ে।

নিত্য অভাবের কথা দাদার কাছে জানিয়ে লাভ নাই ; তাকে আরও বিব্রত করা হবে। তাই সে লেখে না। মা আপনা থেকে যখন যেটুকু জিজ্ঞেস করেন, তার বেশী সে তাঁকে জানায় না, পাছে তাঁর হা-হুতাশ বেড়ে যায়।

সেদিন একাদশী। মায়ের নিরম্বু উপবাস। ভাই-বোন দুটোকে দিনে দিয়েছিল খিচুড়ি রান্না ক'রে। রাত্রে দিয়েছে দু'খানা ক'রে রুটি আর দিনের রান্না কয়েক টুকরো আলুচচ্চড়ি। নিজে ইচ্ছে করেই অনিমা কিছু খায়নি। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অনিমা হ্যারিকেন আলোটি নিয়ে ঘরের এক পাশে ব'সে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের পাতা উল্টাচ্ছিল আর ঘুরে-ফিরে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনগুলো দেখছিল।

মনে পড়ে মাধবীর কথা। মাধবীর সঙ্গে কয়েক দিনই তার দেখা হয়েছে। ওদের বাড়ীর আশে-পাশে টালিগঞ্জ কলোনীর ভিতর সে নিয়ত ঘোরাফেরা করে। পোষাকে-আষাকে অদ্ভুত পরিপাট্য। রকমারি শাড়ি আর ব্লাউজের বাহারে গ্রাম্য মেয়েদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

অনিমা সসংকোচে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—"কি কর মাধবী ?"

মাধবী মুচকি একটু হেসে বলেছিল—"প্রোফেসন্"।

"ল! ওকালতি পাশ ক'রেছ তুমি ?"—সেদিন মাধবীকে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল।

মাধবী খিল-খিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিল—"ল নয়, আন্-ল-ফুল! বুঝবে না।"

অনিমা সত্যি সেদিন বোঝেনি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে যা বুঝেছিল, তাতে এইটুকু সে জেনেছিল যে, মাধবী স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী গ্রাম্য মেয়েদের কাজ জোগাড় করে দেয়। দিন দশ টাকা পনের টাকা রোজগার করে এক-একটি অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। যারা ভিতরের খবর জানে না, তারা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে চেয়ে থাকে। যারা জানে, তারা হয়তো ঘৃণায় নাক সিঁটকায়।

অনিমা আগে জানতো না, পরে আস্তে আস্তে জেনেছে। মাধবী মেয়েদের নিয়ে সত্যি বে-আইনী কারবার করে। হয় মাসাজ হোম, না-হয় অন্য কোন জায়গায় তাদের ভিড়িয়ে দেয়। ভাবতে ভাবতে অনিমার মাথার ভিতরটা ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে। ছি! এত নীচে নেমে গেল ও! দেশের সমাজ-জীবনে কি গ্যাংগ্রীনের পচন ধরলো ? ভাবতে অনিমা শিউরে ওঠে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ! একবার, দু'বার, তিনবার। কে ডাকে? হয়তো পাশের বাড়ীর দরজায়, অণিমা কান পেতে শোনে, না, ওদেরই দরজায় কে কড়া নাড়ে।

বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁৎ করে ওঠে, কে এলো আবার? অতিথি নয় তো? ঘরে এক মুটো চালও নাই। কাল সকালে রেশন না আনলে ভাত হবে না।

অবসন্ন ভীরু-পায়ে অণিমা এগিয়ে যায়। হ্যারিকেনের দমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল।

'রতনদা!'—অণিমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা আকস্মিক ইলেকট্রিসিটি বয়ে যায়, পা দুটো থর-থর ক'রে কাঁপে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মনে হয় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাবে রতনের পায়ের কাছে, অনশন-ক্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যেন হঠাৎ অজ্ঞাত স্পর্শে ঝন্-ঝন্ করে উঠেছে।

—'অণিমা!'—রতনদার কণ্ঠস্বরে অপরিসীম ক্লান্তি ফুটে ওঠে।

চৌকাঠ ধরে অণিমা নিজেকে একটু সামলে নেয়। রতনদার মুখপানে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার স্নায়বিক শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। বার বার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠে শুধু একটি প্রশ্ন: আবার কেন! হঠাৎ অণিমা চম্‌কে ওঠে। এ কি! রতনদার চেহারাটা যেন পাগলের মত। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা অস্থিরতা।

অণিমা কোন প্রশ্ন করবার আগেই রতনদা ব'লে উঠলেন, "ঘরে চলো। একটু দরকার আছে।"

"ঘরে! কোথায় নিয়ে বসাবো?"—অণিমার মনে উদ্গত প্রশ্নটা চাপা পড়ে।

খোকন আর নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। উপবাসের অবসাদে মা-ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। অণিমা কি করবে ভেবে উঠতে পারে না।

রতনদা নিজে থেকেই ঘরের ভিতর পা বাড়ালেন। অণিমা মাদুরখানা সামনের দিকে টেনে দিল। কিন্তু রতনদা বসলেন না, একখানা চিঠি পকেট থেকে বের করে অণিমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন—"আমি ভুল করেছি বলে তুমি ভুল করো না।"

অণিমা থতমত খেয়ে যায়। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মনে হয়, মাথাটা বুঝি গোলমাল হয়ে যাবে। কোন রকমে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কি হলো হঠাৎ?"

"রীতা তার পার্টির কোন বন্ধুকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে চায়। সেইটাই তার শেষ সিদ্ধান্ত। তাই সে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেছে আমার বাড়ী থেকে। এই তার শেষ চিঠি"—এক নিঃশ্বাসে রতনদা কথাগুলো ব'লে ফেলে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

যন্ত্র-পুত্তলিকার মত অণিমা হাত পেতে চিঠিখানা রতনদার হাত থেকে নিল। ওর দুই চোখ তখন জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত অণিমা দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্ত্তে যেন সারা পৃথিবী মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। অজস্র প্রশ্ন বুক ঠেলে উঠতে চায়। অণিমা প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে।

যখন অণিমার সম্বিৎ ফিরে এলো তখন রতনদা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। রীতার চিঠিখানা কখন হাত থেকে মেঝেয় পড়ে গিয়েছে।

রতনদা চলে গেল! চলে গেল রতনদা! অণিমা বার বার অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে। কিন্তু কোথায় থাকেন তিনি? রতনদার ঠিকানাটাও তো সে জেনে নেয়নি।

খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক দম্‌কা বাতাস এসে পুরানো খবরের কাগজখানাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গেল।

অণিমা বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ভাবে, এ কি স্বপ্ন! না সত্য? রতনদা ঝড়ের মত এলো, ঝড়ের মত চলে গেল। তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন সে কল্পনাও করতে পারে না। কেমন ক'রে সম্ভব হলো রতনদার ফিরে আসা! অজস্র প্রশ্নে ওর সারা মন তোলপাড় করে।

"এখনও ঘুমোস্‌নি, মা?"

হঠাৎ মায়ের কণ্ঠস্বরে অণিমা চমকে ওঠে। হ্যারিকেনটা খবরের কাগজটা দিয়ে আড়াল ক'রে, ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ওর দুই চোখে তখন যেন অশ্রুর বান ডেকেছে। চিঠিখানার উপর হাত রেখে অণিমা নিশ্চল বসে থাকে পাথরের প্রতিমার মত।

[ক্রমশঃ।
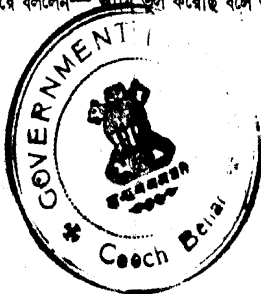
চাঁদ

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতকন্যেরা যখন ছড়ালো আবছা চুলের রাশি
আকাশ-সাগর-মাটির দু'চোখ ভরে:
কচি ফল আর লাজুক ফুলের হাসি
তখন, দেখি যে, কাঠবেড়ালীর লুকোচুরি হ'য়ে ঝরে।

তুলো তুলো মেঘ উড়ে উড়ে এসে রাত্রিকে দিলো ছোঁয়া
আকাশে আকাশে নীল পথ কেটে দিয়ে,
চাঁদপানা একখানা মুখ তারই মাঝে
উঁকি মারে, দেখি, এক মুঠো হাসি নিয়ে।

শিবচন্দ্র নন্দী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এ দেশে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে ইংরেজ যে সকল কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে যেগুলি কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত—রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ সে সকলের অন্তর্ভুক্ত। রেলগাড়ীর কথায় কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ভারতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ"—আর ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যখন (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) যুবরাজরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "ভারত-উচ্ছ্বাসে" রেলগাড়ীর ও টেলিগ্রাফের কথায় তাঁহার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুৎ বহে সমাচার;
তব পরশনে চলে রোষভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।"

রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ ইংরেজ এ দেশে আপনার শাসন-সুবিধার জন্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা দেশে যুগান্তর প্রবর্ত্তনে সহায় হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

লর্ড ডালহৌসী এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের গৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪ হাজার মাইল টেলিগ্রাফ তার স্থাপিত হয়; তাহার ব্যয় প্রতি মাইলে মাত্র ৭৫০ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল।

আপনার গৌরব বৃদ্ধির জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই এবং সেই জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লর্ড ডালহৌসীর নামের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে এক জন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকের নামোল্লেখ করিলেও যে বাঙ্গালী সহকর্ম্মীর অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম এবং অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাহস ব্যতীত এ দেশে দ্রুত টেলিগ্রাফ বিস্তার হইতে পারিত না—তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দান করা ত পরের কথা—অনেকে তাঁহার নামোল্লেখও করেন নাই। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে স্পেশ্যাল পেন্সন ও "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইল, মনে করিয়াছিলেন। কলিকাতায় একটি ছোট গলি রাস্তা তাঁহার নামে পরিচিত।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের পুস্তক পাঠ করিয়া ভারতীয় ছাত্র শিখিয়াছে, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী—ওসেউনেসী নামক রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক একজন বুদ্ধিমান ডাক্তারের সাহায্যে ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে "নাইট" পদবী প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন; কষ্টের কারণ, অধ্যাপক সামরিক কর্মচারীও ছিলেন না, সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়াও ছিলেন না। ওসেউনেসীকে যে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু যে বাঙ্গালী সহকর্ম্মীর সাহায্য ব্যতীত ওসেউনেসীর প্রচেষ্টা সফল হইলেও—বিলম্বে সফল হইত, সেই বাঙ্গালী বীর শিবচন্দ্র নন্দীর কথার উল্লেখ করা হয় নাই।

ইংরেজ বাকল্যাণ্ড তাঁহার সঙ্কলিত ভারতীয় জীবনী বিষয়ক অভিধানে সার উইলিয়ম ব্রুক ওসেউনেসীর বিবরণ দিয়াছেন—১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে "ডক্টর অব মেডিসিন" হইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হ'ন; ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনারেল পদ পাইয়া দ্রুত চারি দিকে টেলিগ্রাফ তার স্থাপিত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় জন লরেন্স মন্তব্য করিয়াছিলেন, "টেলিগ্রাফের জন্য ভারত রক্ষা পাইয়াছিল"; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ওসেউনেসী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই অভিধানে শিবচন্দ্র নন্দীর নাম নাই।

কেবল রোপার লেথব্রিজ তাঁহার ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি গোল্ডেন বুক অব ইণ্ডিয়া' পুস্তকে তাঁহার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন—সরকারী চাকরীতে দেশে টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের জন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করা হয়; তিনি সার উইলিয়ম ওসেওনেসীর অধীনে কলিকাতায় টাঁকশালে কাজ করিতেন এবং সার উইলিয়ম যখন টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন, তখন শিবচন্দ্রই পরীক্ষা-মূলক ভাবে

শিবচন্দ্র নন্দী

কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার প্রতিষ্ঠার ভার পাইয়াছিলেন। ইহাই এ দেশে প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহাকে টেলিগ্রাফ বিভাগের পরিচালক-পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা হইতে সরাসরি বোম্বাই পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা করিবার জন্য মীরজাপুর হইতে জব্বলপুরের পথে শিওনী পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের স্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ পাইয়াছিলেন।

পথব্রিজের পুস্তক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার ইংরেজ লেখকরা শিবচন্দ্রের কীর্ত্তির উল্লেখে বিরত ছিলেন। কি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পি, ভি, লুক ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ওসেউনেসীকে "ভারতে টেলিগ্রাফের জনক" বলিয়া উল্লেখ করিলেও শিবচন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। অথচ লুক টেলিগ্রাফ বিভাগে ডেপুটী-ডিরেক্টার-জেনারল ছিলেন; সুতরাং শিবচন্দ্রের কার্য্যের বিষয় তাঁহার অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে এবং তিনি বলিয়াছেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ বিভাগ ডাক বিভাগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই—আর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন এ দেশে প্রথম চারিটি টেলিগ্রাফ অফিস (কলিকাতা, ময়াপুর, বিষ্ণুপুর ও পরে কেডগেরী ও কুতবাহাটি) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন—

"The entire space of India's telgraph history is not too wide to be encompassed within living memory."

তবে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন যখন দিল্লীতে সিপাহী বিদ্রোহের টেলিগ্রাফ স্মারকের প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করেন, তখন শিবচন্দ্র সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল, তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, "রায় বাহাদুর" উপাধি তাহার যোগ্য পুরস্কার নহে—

"A Rai Bahadurship seems to have been a poor reward for his excellent services."

যদি reward না বলিয়া recognition বলা হইত, তবে আরও সঙ্গত হইত, সন্দেহ নাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় সুবর্ণবণিক-পরিবারে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়।

তখন ভাঙ্গা-গড়ার উত্থান-পতনের সময়—চারিদিকে অশান্তি—আশঙ্কা ও অস্থিরতা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া ইংরেজ প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তাহার পরেই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। তখন বাঙ্গালার অবস্থা ভয়াবহ; কারণ, তখন ইংরেজের অনুগ্রহে নবাব—বিশ্বাসঘাতক—"মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" সেই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালীর বহু দিনের বদ্ধমূল সমাজ ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্থনীতিক কাঠাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবে তখনও বাঙ্গালীর যে শক্তি ছিল, তাহাতে সে আবার আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। তখন ফরাসীর সহিত ইংরেজের—ভারতে—যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ যথাক্রমে ১৮০০ ও ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হয়; ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে নেপালের সহিত যুদ্ধ; ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী যুদ্ধ; ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাতে ইংরেজের লোকক্ষয় ২০ হাজার, অর্থব্যয়—২১ কোটি টাকা। দেশব্যাপী অশান্তি অনেকের মনে নূতন অবস্থার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতা ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র—ব্যবসার কেন্দ্রও বটে। আবার কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—নূতন নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হইতেছে।

কলিকাতায় যে সম্প্রদায় কৌলিক প্রথানুসারে ব্যবসায়ে অবহিত সেই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ে জন্মিয়া শিবচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন-চেষ্টায় চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া টাঁকশালে কেরাণীগিরী করিতে আরম্ভ করেন। তখনও মুসলমান বাদশাহ নামে বাদশাহ হইলেও কেবল দিল্লীর দুর্গে বিরাট শুদ্ধান্তে বাস করেন—ক্ষমতা কিছুই নাই। ইংরেজ কলিকাতায় টাঁকশালে টাকা করিতেছে।

এ দিকে ঐ সময় য়ুরোপে বৈজ্ঞানিকরা নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগতে অভাবনীয় পরিবর্তন প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন; আর সেই সকল আবিষ্কারের ফল ভারতে প্রযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তখন কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী পণ্ডিতদিগের আলোচনার ও বিচারের স্থান। সেই প্রতিষ্ঠানে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এডলফ বেজিম এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয়—"অপরিচালক পদার্থের বেষ্টনীর দ্বারা ৩০টি প্রবাহক তারের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বার্ত্তা প্রেরণ।"

এই প্রবন্ধই এ দেশে টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক রচনা। ইহাতে কিন্তু লেখক তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেও গবেষণাফল কার্য্যকরী করিবার উপায় নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তাহার পরেই ওসেউনেসীর প্রবন্ধ—

"Memoranda relative to the experiments on the communication of Telegraph signals by an induced Electricity."

প্রবন্ধলেখক তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক।

এই প্রবন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করেন, ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন অসাধ্য নহে।

তাঁহার এই প্রবন্ধের প্রতি ভারতে রাজকর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তখন (অর্থাৎ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনাই করেন নাই। তাঁহারা তখন বিপ্লব দমনে, শান্তি স্থাপনে, রাজ্য বিস্তারে ও লাভবান হইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট হইয়া এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার দীর্ঘ শাসনকাল ভারতে নানা পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা উপায়ে এ দেশে বৃটিশের রাজ্য বর্দ্ধিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রক্ষার উপায় চিন্তা করেন।

সেই চিন্তার ফলে তিনি বুঝেন, বিশাল রাজ্য যদি মুষ্টিমেয় ইংরেজের শাসনাধীন রাখিতে হয়, তবে এ দেশে—দূর-দূরান্তে অত্যল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ জন্য টেলিগ্রাফের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য তিনি ইংলণ্ডে কোম্পানীর পরিচালকদিগকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সহজে সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, যে শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে বলা হয়—"খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না"—কোম্পানীর পরিচালকগণ সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষ লাভের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেন।

কিন্তু লর্ড ডালহৌসী ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া, ইংরেজের স্বার্থরক্ষার্থ এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করিলেন এবং কোম্পানীর পরিচালকদিগকে নিজ মত বুঝাইবার জন্য ওসেউনেসীকে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং পরিচালকদিগকে পত্র লিখিলেন। তিনি পরিচালক-সঙ্ঘের নায়ককে লিখিলেন—

"আমার প্রস্তাবটির প্রতি দৃষ্টি দিতে আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুনয় করিতেছি। আমি আশা করি, আমার এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আপনারা অবিলম্বে আমাকে সাহায্য করিবেন। কি রাজ্য শাসনের দিক হইতে, কি ব্যবসার সুবিধার দিক হইতে—যে দিক হইতেই কেন বিবেচনা করা যাউক না, ভারতে এই উন্নতি প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন।"

ওসেউনেসীর পরিচালকদিগকে বুঝাইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। ওসেউনেসীও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার ও লর্ড ডালহৌসীর সমবেত আন্তরিক চেষ্টায় কোম্পানীর পরিচালকদিগের মতের পরিবর্ত্তন হইল। লর্ড ডালহৌসী কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বোম্বাই, আগ্রা, পেশাওয়ার ও মাদ্রাজ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফে সংবাদ চলাচলের যে প্রস্তাব ইংলণ্ডে মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ওসেউনেসীর পরিকল্পনানুযায়ী।

যাহাতে ভারতে আর কোন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ও তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের কার্য্য অগ্রসর হয়, তাহাই লর্ড ডালহৌসীর অভিপ্রেত ছিল। সেই জন্য কোম্পানীর পরিচালকদিগের সম্মতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের কাজ আরম্ভ করা হয় এবং পরবর্ত্তী ১৮ মাসের মধ্যেই ৩,১৫৬ মাইল তার খাটান এবং ৫৫টি টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হয়।

যদি এই সময়ে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত না হইত, তবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ হইত বলা যায় না। কারণ, ঐ বিদ্রোহকালে টেলিগ্রাফই এ দেশে ইংরেজের শাসন রক্ষা করিয়াছিল। মিরাটের টেলিগ্রাফ আফিস হইতে সংবাদ পাইয়া দিল্লীর টেলিগ্রাফ আফিসের কর্ম্মচারীরা নিহত টডের বিধবা ও শিশুপুত্রকে লইয়া স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আম্বালায় বিদ্রোহীদিগের দিল্লী অভিমুখে অভিযানের সংবাদ তার করিয়া দিয়াছিলেন এবং তথা হইতে চারি দিকে সংবাদ প্রেরিত হওয়ায় সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের কার্য্যভার লর্ড ডালহৌসী ওসেউনেসীর উপর সমর্পণ করেন। সে বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি কার্য্যভার পাইয়া বুঝিতে পারেন, তিনি যে দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ভারতীয়ের সহযোগ ব্যতীত তাহাতে সফলকাম হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তিনি এক জন উদ্যমশীল নির্ভরযোগ্য বাঙ্গালীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়া সেইরূপ লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট টাঁকশালের কেরাণী তাঁহার পরিচিত ২৬ বৎসর বয়স্ক শিবচন্দ্র নন্দী সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হইলেন।

মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে টেলিগ্রাফের কাজে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী যুবক শিবচন্দ্র ওসেউনেসীর সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়া বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করিয়া ৩৮ বৎসর চাকরীর পর ৬০ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শিবচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক এবং ভারতবাসী মাত্রেরই পাঠ্য। এক জন ভারতীয়কে সহকারী করিয়া না লইলে দেশের লোকের আচার, ব্যবহার, সংস্কার ও কুসংস্কার বুঝিয়া বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাজ করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিয়া ওসেউনেসী যখন সহকারী মনোনীত করেন, তখন তাঁহার শিবচন্দ্রকেই নিযুক্ত করিবার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। দূরদর্শী ওসেউনেসী বুঝিয়াছিলেন, তিনি যে কাজে সহকারীকে নিযুক্ত করিবেন, সে কাজে নানা স্থানে যাইতে হইবে এবং হয়ত নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইবে—কাজ কষ্টসাধ্য। তিনি তাঁহার পরিচিত বাঙ্গালী তরুণদিগের অনেককে অবস্থা বুঝাইয়া দিলে অধিকাংশই "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" মনে করিয়া তাঁহার অধীনে নূতন ও অজ্ঞাত বিভাগে চাকরী লইতে সম্মত হইলেন না। শিবচন্দ্র সাগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুঃসাধ্য কাজ করিতে আগ্রহশীল ছিলেন—সুযোগের অভাবে সেরূপ কোন কাজের ভার লাভ করেন নাই; সুতরাং তিনি চাকরী লইতে সম্মত হইলেন এবং চাকরীতে নিযুক্ত হইলেন। ওসেউনেসীর নির্ব্বাচন যে কত সঙ্গত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ৩৮ বৎসরের কর্ম্মবহুল জীবনে শিবচন্দ্র কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

ওসেউনেসী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে দুইটি কারণ দেখাইয়া কোম্পানীর পরিচালকসঙ্ঘ ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনে বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সে দুইটি উপেক্ষণীয় নহে। প্রথম কারণ, অর্থাভাব; দ্বিতীয় কারণ, ভারতে বিশেষজ্ঞের অভাব। তখনও য়ুরোপে টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে গবেষণা শেষ হয় নাই—নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছিল। সেই অবস্থায় ভারতে কিরূপে বিশেষজ্ঞলাভ সম্ভব হইবে? অর্থের অভাব মিটিলেও বিশেষজ্ঞের অভাব দূর করা দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু ওসেউনেসী, বোধ হয়, আপনার কথা বিবেচনা করিয়া সাহসী হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যুতের ব্যবহার সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই; চিকিৎসক হইয়া ইংলণ্ড হইতে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর ভারতবর্ষে আসিয়া অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক

রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটীতে পঠিত একটি প্রবন্ধে তাঁহার টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যে কৌতূহল উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্ম তিনি স্বয়ং টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে প্রাপ্য রচনা অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ অজ্ঞ হইতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের ভার পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শিক্ষা দিলে তিনি শিবচন্দ্রকে তাঁহার উপযুক্ত সহকারী করিতে পারিবেন। সেই বিশ্বাস ও সঙ্কল্প লইয়া তিনি শিবচন্দ্রকে স্বীয় গবেষণাগারে লইয়া যাইয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষাদানের উপকরণ যৎসামান্য—টেবলের উপর সরু সরু তার খাটাইয়া বিদ্যুৎ পরিচালন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই যে ভাবে মূলতত্ত্ব বুঝিয়া প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত হইলেন, তাহাতে গুরুর মনের সন্দেহের ও আশঙ্কার গুরুভার দূর হইল—বিশেষজ্ঞের অভাব এ দেশে হইবে না।

এই সময়ে ওসেঘনেসী শিবচন্দ্রকে যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিতে দিতেন—উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও শিবচন্দ্র সে সকল যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিতেন—অনুশীলনের ফলে তাঁহার পক্ষে সে সকল রচনার সার গ্রহণ করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। এই অধ্যয়নের অভ্যাস তিনি কখন শিথিল হইতে দেন নাই ; কারণ টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে কোথায় কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা তিনি জানিয়া কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। কখন কখন তিনি যখন টেলিগ্রাফের তার খাটাইবার জন্ম বিরলবসতি অরণ্যে তাঁবুতে থাকিতেন, তখন ঝিল্লীমন্দ্রমুখরিত অন্ধকারে যখন দূরে ও অদূরে হিংস্র জন্তুর গর্জ্জন শুনা যাইত, রক্ষীরা তাঁবু পাহারা দিত, তখনও তিনি আলো জালিয়া নূতন নূতন আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করিতেন।

শিবচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে যখন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথম টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল, তখন ওসেঘনেসী শিবচন্দ্রকেই তাহার ভার দিলেন। স্থির হইল, কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সংবাদ চলাচলের পরীক্ষা হইবে। শিবচন্দ্র ভার পাইয়া এই ৮০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত করিলেন। ইহাই ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন এবং ইহা বাঙ্গালা শিবচন্দ্রের কীর্ত্তি।

ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীগোপীনাথ নন্দী লিখিয়াছেন—

"মনে হয়, আজ একটা তুচ্ছ বিষয় শিখতেও ভারতবাসীদের ইয়োরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত ছুটতে হয়। আর তখন শিবচন্দ্র এত বড় যে একটা পরিকল্পনা অনন্যসহায় হ'য়ে ক'রে গেলেন সে কতটুকু শিক্ষার উপর নির্ভর ক'রে? কলেজে তিনি পড়েন নি। তাঁর ছাত্রাবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তখন এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার মত কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। শিবচন্দ্র স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন কেরাণীগিরি করবার জন্য। আর সেই কেরাণীরূপেই তিনি জীবন আরম্ভ করেন। তার পর হঠাৎ তাঁর মাথার উপর এমন এক গুরু কর্ত্তব্যের ভার এসে পড়ল, যা সুসম্পন্ন করতে হ'লে আজকের দিনে অনেকগুলি বিদেশী ডিগ্রীর প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু শিবচন্দ্র বিনা ডিগ্রীতে ও বিনা শিক্ষায় এটা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের স্ফুরণ করতে পারি, যার কাছে বাহিরের কোন শিক্ষারই তুলনা হয় না।"

লেখকের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া আমরা কেবল তাঁহার একটি উক্তিতে আপত্তি জ্ঞাপন না করিয়া পারি না। শিবচন্দ্র "বিনা শিক্ষায়" অসম্ভবকে সম্ভব করেন নাই—পরন্তু শিক্ষার অনুশীলনে আপনার মানসিক শক্তি প্রযুক্ত করিয়া সাফল্যের উৎসের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

লুক যদিও প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব শিবচন্দ্রকে দিবার মত উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই লাইন—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত—৫ বৎসর কার্যকরী ছিল।

লাইনের কাজ শেষ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে—নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংবাদ চলাচলের পরীক্ষা হইবে। সে কি আগ্রহ—কি উৎকণ্ঠা! দীর্ঘ ৮০ মাইল লাইনের এক প্রান্তে ডায়মণ্ডহারবারে শিবচন্দ্র —আর এক প্রান্তে কলিকাতায় ওসেঘনেসী, লর্ড ডালহৌসী ও কয়জন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডায়মণ্ডহারবার হইতে শিবচন্দ্র সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন কলিকাতায় ; তাহা পাওয়া গেল। সাফল্যে অভিভূত বড়লাট লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং সাঙ্কেতিক-ধ্বনি করিয়া সফলসাধন শিবচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

সে দিনটি স্মরণীয় : কিন্তু তাহা কবে তাহা জানা যায় নাই।

শতবর্ষ পরে টেলিগ্রাফ বিভাগ কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবারের পথে মৃত্তিকা খনন করিয়া শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সেই লাইনের সন্ধান পাইয়াছেন।

এই বৎসরেই আর একটি ঘটনায় ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের সন্দেহের স্থান আগ্রহ গ্রহণ করিল। এই বৎসর ভারতের সহিত ব্রহ্মের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সমুদ্রকূল হইতে কলিকাতায় দ্রুত সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১১শে এপ্রিল যুদ্ধারম্ভের সংবাদ লইয়া "র‍্যাটলার" জাহাজ কেডগেরী অতিক্রম করিতে না করিতে সে সংবাদ টেলিগ্রাফে কলিকাতায় পাওয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে তাহা যেমন বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইল, তেমনই জনসাধারণের অবগতির জন্য লিখিয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দ্বারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

ভারতে টেলিগ্রাফ লাইন প্রবর্ত্তনের কাজ আরম্ভ হওয়ার পরে লর্ড ডালহৌসীর ব্যবস্থায় ওসেঘনেসী আবার (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) য়ুরোপে যাইয়া তথায় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী শিবচন্দ্র এ দেশে থাকিয়াই পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণার দ্বারা টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে শিক্ষণীয় সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া অদম্য উৎসাহে সেই শিক্ষা ব্যবহারিক কার্যে সুপ্রযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত লাইন মাটীর নিম্নে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার স্থানে যখন খুঁটির উপর লাইন লওয়া সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন খুঁটির ব্যবস্থা কি হইবে এই সমস্যা দেখা দিলে শিবচন্দ্র তালগাছের খুঁটি পুতিয়া তাহাতে তার খাটাইবার প্রস্তাব করিয়া খুঁটির নক্সা আঁকিয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য। লর্ড ডালহৌসী

যখন লিখিয়াছিলেন (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে), ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের জন্ম যে সব অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে সে সকল য়ুরোপে কোথাও ভোগ করিতে হয় না—বিশেষ ভারতে যে সকল নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে শোণ ১১,৮৪০ ফিট ও তুঙ্গভদ্রা প্রস্থে প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত—তখন তিনিও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই—এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা—গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র ও বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা—অনেক হিসাব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সে সকল স্থানে শিবচন্দ্রকে অবস্থা বিবেচনা করিয়া—অভিজ্ঞতায় নির্ভর করিয়া—নূতন হিসাব করিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। তাঁহার শ্রমলব্ধ সেই সব হিসাব পরবর্ত্তী কালে কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের সম্মতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড ডালহোসী ওসেউনেসীর জন্ম নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ইন ইণ্ডিয়া) তাঁহাকে টেলিগ্রাফ বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকেই অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব ও অধিকার দিলে তিনি শিবচন্দ্রকে তাঁহার পদের অব্যবহিত নিম্নস্থ পদে (ইনস্পেক্টার ইন চার্জ্জ) নিযুক্ত করিলেন। পর-বৎসর টেলিগ্রাফ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে যখন টেলিগ্রাফ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হইল, তখন "ডিরেক্টার-জেনারল অব টেলিগ্রাফ ইন ইণ্ডিয়া" পদের সৃষ্টি করিয়া ওসেউনেসীকে সেই পদ দিয়া তাঁহার অধীনে দুই জন য়ুরোপীয়কে যথাক্রমে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" করা হইল ; আর বাঙ্গালী শিবচন্দ্র "ইনস্পেক্টার ইন চার্জ্জ অব দি লাইন" রহিলেন। অথচ তাঁহার উপরই নানা দিকে লাইন প্রতিষ্ঠার ও লাইনগুলি কার্যকরী রাখিবার দায়িত্ব অর্পিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের আপত্তির অন্যতম কারণ—অর্থব্যয়ে অনিচ্ছা। সে সমস্যার সমাধানেও শিবচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার মন্তব্যে শোণ ও তুঙ্গভদ্রা নদী দুইটির বিস্তারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু লোকের কীর্ত্তিনাশ করিয়া যে পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম লাভ করিয়াছিল, সেই পদ্মায় ৭ মাইল "কেবল" স্থাপনের কার্য্য শিবচন্দ্র যেরূপ অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। তিনি সে জন্য অনায়াসে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন—কেবল কার্য্যের আগ্রহে আর সাফল্যজনিত আনন্দের প্রেরণায়। "কেবল" ফেলিবার জন্য জাহাজ কোম্পানীর সর্ব্বনিম্ন দাবী যখন ১০ হাজার টাকা হইল এবং বুঝা গেল, কোম্পানীর কর্ত্তারা তাহাতে সম্মত হইবেন না, ফলে ঢাকা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বিস্তার করা যাইবে না, তখন শিবচন্দ্র জেলেডিঙ্গী লইয়া তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মায় ৭ মাইল "কেবল" স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি যে বিপদ অগ্রাহ্য করিলেন, সে অর্থের জন্য নহে, যশের জন্যও নহে—কর্ম্মের প্রেরণায়। তিনি দুঃসাহসিকের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া অতি অল্প ব্যয়ে "কেবল" স্থাপিত করিলে বিদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা ওসেউনেসীকে "নাইট" করিলেন আর সে কাজের সম্পূর্ণ গৌরব যাঁহার প্রাপ্য সেই বাঙ্গালী শিবচন্দ্র কেবল অভিনন্দিত হইলেন।

তিনি যখন অবসর গ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহাকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা বা ঐরূপ অর্থ পুরস্কাররূপে প্রদানের প্রস্তাবও শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই। তিনি কেবল "রায় বাহাদুর" উপাধি ও স্পেশ্যাল পেন্সান পাইয়াছিলেন। ঐ উপাধি অনেক পুলিস কর্ম্মচারী ও দপ্তরের কর্ম্মচারীও পাইয়াছেন। "জল, জঙ্গল, আঁধার রাত"—গ্রীষ্মের রবিকর, বর্ষার বর্ষণ, শীতের হিম এ সব শিবচন্দ্রকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং এবং শ্রমিকদিগকে কাজ করাইয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে কলিকাতা হইতে ইষ্ট বরাকর, তথা হইতে এলাহাবাদ, তথা হইতে বারাণসী ও বারাণসী হইতে মীরজাপুর এবং তথা হইতে যেমন টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনই আবার কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত সেই কাজ করেন।

এক দিকে অসীম সাহস আর এক দিকে সাধুতা শিবচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই জন্যই যখন তিনি নদীর ধারে বা জঙ্গলের পার্শ্বে শ্রমিকদিগকে লইয়া রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইতেন, তখন তাঁহাকে যেমন দস্যুর আক্রমণের জন্য তেমনই হিংস্র জন্তুর আক্রমণের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইত। অভ্যাসবশতঃ সামান্য শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। কখন কখন জাগিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছেন—তাম্বুর পার্শ্বে বাঘ বা অজগর সাপ। তাঁহার পার্শ্বে শয্যায় গুলীভরা বন্দুক থাকিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিতেন—তাঁহার অব্যর্থ-সন্ধানে ব্যাঘ্রাদি নিহত হইয়াছে। সে জন্য যে উপস্থিত বুদ্ধির ও ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন, তাহা যেন তাঁহার ধাতুগত ছিল। অথচ তিনি সেরূপ বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষার পরিবেষ্টনে লালিত পালিত হয়েন নাই ; সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারে তাঁহার জন্ম—সাধারণ বিদ্যালয়ে তাঁহার কেরাণীর চাকরী করিবার মত শিক্ষালাভ—তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ কেরাণীগিরীতে—কলম পেশায়—টেলিগ্রাফের তার স্থাপনে বা বন্দুক ব্যবহারে নহে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় শিবচন্দ্র যে সাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কার্য্যনৈপুণ্য ও প্রলোভন জয়ের ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। বিদ্রোহীরা যখন বুঝিতে পারে, টেলিগ্রাফের জন্য তাহাদিগের চেষ্টা বাধা পাইতেছে, তখন তাহারা নানা স্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই—শিবচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাহারা তাঁহাকে রাজ্যদানের প্রলোভনও দেখাইয়াছিল। কিন্তু শিবচন্দ্র প্রলুব্ধ হয়েন নাই।

এই বিদ্রোহের সময় শিবচন্দ্রকে কিছু দিন টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ওসেউনেসী তখন ইংলণ্ডে—কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট নামক সমর বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী তাঁহার স্থানে অস্থায়ী ভাবে বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারলের কাজ করিতেছেন। যুদ্ধের অগ্নিশিখা যখন চারি দিকে ব্যাপ্তি লাভ করিল, তখন সামরিক নিয়মে ষ্টুয়ার্টকে সেনাদলে ফিরিয়া কাজ করিতে আদেশ করা হইল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া শিবচন্দ্রকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী শিবচন্দ্র সেই কার্য্যভারে কোনরূপে বিচলিত বা বিব্রত হইলেন না। কার্য্য সুষ্ঠু ভাবেই পরিচালিত হইল।

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্রই নৈপুণ্য সহকারে ভারতে টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সে কৃতিত্ব অসাধারণ হইলেও বিদেশী শাসকগণ তাঁহাকে ঐ পদে স্থায়ী করেন নাই—তাঁহাকে আবার তাঁহার পূর্ব্বপদে কাজ করিতে হইয়াছিল এবং ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত তিনি আর কখন বিভাগের কর্ত্তার পদ লাভ করেন নাই—কারণ, তিনি ভারতীয়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র যখন টেলিগ্রাফ স্থাপনের কাজ আরম্ভ করেন, তখনও রেলপথ বিস্তার হয় নাই; হাওড়া হইতে প্রথম যে দুইখানি ট্রেণ বর্দ্ধমানে যায় তাহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের কথা। দেশ তখনও বিরলবসতি, চারি দিকে বন, বহু নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। দুর্গম পথে যাইয়া কাজ করার গুরু দায়িত্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এক বার তার খাটানর জন্য উপযুক্ত স্থান সন্ধান করিতে যাইয়া তিনি চোরাবালুতে পদক্ষেপ করায় দেখিতে দেখিতে বালুতে মগ্ন হইতেছিলেন—তাহার সঙ্গীরা কোনরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এক বার তিনি অজগরের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং কেবল উপস্থিত-বুদ্ধিবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এক বার এক দল উদ্ধত ইংরেজ সৈনিক অনাচার হেতু তাঁহার নিকট অপমানিত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বুদ্ধিতে ব্যর্থকাম হইয়াছিল। এক বার কোন সামন্ত নৃপতির অসঙ্গত আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করায় রাত্রিকালে তাঁহার তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া তাঁহাকে সদলে হত্যা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল।

এইরূপে দীর্ঘ ৩৮ বৎসরকাল তিনি বিপদসঙ্গী হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি যে ভারতে সমগ্র টেলিগ্রাফ বিভাগের পরিচালক ছিলেন এবং বিদ্রোহীদিগের প্রলোভন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি।

এ দিকে তিনি পারিবারিক জীবনে স্নেহশীল ও সামাজিক ছিলেন। তবে তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল কলিকাতার বাহিরে স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি তিনি ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। সে সময়ও অল্প হয় নাই। কারণ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল যখন তাঁহার মৃত্যু হয় (২৩শে চৈত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দ—অন্নপূর্ণা প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন), তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর।

পারিবারিক জীবনে তিনি একটি শোকে ব্যথিত হইয়াছিলেন—সে তাঁহার একমাত্র কন্যার—বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে—বৈধব্য। এই কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া কঠোর নিষ্ঠা ও সদাচারে দীর্ঘজীবন কল্যাণকর কার্য্যে অবহিত ছিলেন।

হয়ত অনেক সময় মাতার কাছে থাকিতে পারেন নাই বলিয়াই মাতার প্রতি শিবচন্দ্রের অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল।

যখন ৬০ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ—জরার আক্রমণ সুস্থ ও সবল দেহে লক্ষিত হয় না। তিনি তখনও বিশেষরূপে কার্য্যক্ষম। সরকার তাঁহাকে শিয়ালদহে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত করেন এবং তিনিও নিষ্ঠা সহকারে বিচারকার্য্য পরিচালিত করিতেন। মৃত্যুর ৫ দিন পূর্ব্বেও তিনি যথারীতি আদালতে যাইয়া এজলাসে কাজ করিয়াছিলেন। কারণ, যাহাকে ইংরেজীতে "সসজ্জ অবস্থায় মৃত্যু" বলে, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের নেতৃত্বে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মারক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে শিবচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সভাপতি লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতার পরে টেলিগ্রাফের তদানীন্তন ডিরেক্টার-জেনারল ম্যাকলীন সভা ও সভাপতির নিকট শিবচন্দ্রের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন :—

আমি টেলিগ্রাফের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—ভারতে টেলিগ্রাফ আফিসের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কর্ম্মচারী রায় শিবচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত আপনাদিগকে পরিচিত করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। পরলোকগত সার ওসেউনেসী যখন ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন করেন, তখনই ইনি টেলিগ্রাফ বিভাগে যোগ দেন। সার ওসেউনেসী টেলিগ্রাফের প্রথম ডিরেক্টার-জেনারল ছিলেন এবং এ দেশে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনে যে সকল অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, ইনি সে সকল অতিক্রম করিতে সার ওসেউনেসীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। আমরা যে সকল ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছি, সে সকলের সহিত রায় শিবচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি এই বিভাগের শৈশবে ভারতের নানাস্থানে মূল্যবান কাজ করিয়াছিলেন।"

ইংরেজের সেই দুর্দ্দিনে—দেশে পরিবর্ত্তনের সেই সন্ধিক্ষণে শিবচন্দ্রকে যে ভারতে টেলিগ্রাফের পরিচালনভার লইতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ কিন্তু এই পরিচয়ে প্রদান করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সে, বোধ হয়, তিনি ভারতীয় বলিয়া।

শিবচন্দ্র যখন ৮০ বৎসরে উপনীত তখনও তিনি সুস্থ ও স্বস্থ। সেই সময় কলিকাতায় বিউবনিক প্লেগ—মহামারী দেখা দেয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সেই রোগের অতর্কিত আবির্ভাবে আতঙ্কিত হইয়া পড়ে।

শিবচন্দ্র সেই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন এবং মাত্র ৩ দিনে তাঁহার জীবন-দীপ মৃত্যুর ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইল। নানা বিপদ যাঁহাকে দমিত করিতে পারে নাই, তিনি অসুস্থ হইয়া মাত্র ৩ দিন পরে ২৩শে চৈত্র (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সে বৎসরও তাঁহার গৃহে পূর্ব্বরীতি অনুসারে অন্নপূর্ণা পূজার আয়োজন হইয়াছিল। প্রতিমা গৃহে নীত হইবার পরেই তাঁহার রোগের লক্ষণ দেখিয়া পূর্ব্বাহ্নেই প্রতিমা বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা পুরোহিত করিয়াছিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবচন্দ্র এক দিকে যেমন যুক্তিবাদী অপর দিকে তেমনই সমাজের প্রচলিত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিতেন। সেই কর্ম্মযোগীকে কার্য্যব্যপদেশে বহু তীর্থক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তিনি স্নানও করেন নাই, দানও করেন নাই। অথচ তিনি সমাজের প্রচলিত

প্রথানুসারে অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়েও তাঁহার গৃহে অন্নপূর্ণা পূজা হইতেছিল। তিনি সমাজের প্রচলিত রীতির বিরোধী হইতেন না—সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার বিরোধী ছিলেন।

তিনি সকল সময়েই সকল বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন, বনভূমির নীরবতা—শ্বাপদের আক্রমণ, দস্যুভীতি, মানুষের অনাচার তাঁহার অসীম সাহস দমিত করিতে পারে নাই—তিনি বীরের মতই মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে হয়—

> জীবনের সর্ব্বকার্য্য করি সমাপন,
> সংসারে কর্ত্তব্য সব করিয়া পালন,
> যশের মুকুট শিরে করিয়া ধারণ
> অভিভূত যোদ্ধা আজ অনন্ত নিদ্রায়।

শিবচন্দ্র যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন অসাধারণ, তাঁহার সেই কার্য্য-সম্পাদন-প্রণালী তেমনই অভাবনীয়।

যখন এ দেশে টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তনের উপযোগী বিশেষজ্ঞের ও অর্থের অভাব, তখন তিনি দেখাইয়াছিলেন, আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকিলে সেই অভাবের সমস্যা সমাধান করা যায়—কোন বাধাই সমাধান অসম্ভব করিতে পারে না; বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়, কাজ করা যায়।

মেকলে বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া বর্ণনা করিবার পরে তাঁহার মতই যাঁহারা বেদবাক্যরূপে গ্রহণের সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই সেই সকল ইংরেজ লেখকের লিখিত ইতিহাসে বাঙ্গালী ছাত্ররা আপনাদিগের জাতির নিন্দাই পাঠ করিয়া আসিয়াছে এবং দীর্ঘ কাল পুনরুক্তিতে সেই মিথ্যাই সত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শেষে ইংরেজ যখন ভারতীয়দিগকে সামরিক ও অসামরিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীকে সামরিক শিক্ষার সুযোগেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী "অন্নপায়ী"—কেবল তক্তাপোষে দশ জন বসিয়া জটলা করিতে পারে। কিন্তু সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী যে পৃথিবীর যে কোন জাতীয় লোকের মত উৎসাহ, উদ্যম, সাহস, বীরত্ব দেখাইতে পারে তাহার প্রমাণের অভাব নাই এবং বিশ্বযুদ্ধেও বাঙ্গালী সৈনিকরা ইরাকের মরুভূমিতে ও ফ্রান্সে তাহার অনেক প্রমাণ দিয়াছে। বাঙ্গালী জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সামরিক কার্য্যে তাহার নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী নাবিকদিগের যে সকল কথা "কবিকঙ্কণ" বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল কিম্বদন্তীর উপর কল্পনার প্রলেপ বলা যাইতে পারে—কিন্তু তাহার ভিত্তি যে কিম্বদন্তী তাহা অস্বীকার করা যায় না। হাণ্টার মেকলেরই মত ইংরেজ। তিনি লিখিয়াছেন—সমতল ভূমিতে সমুদ্রের ও নদীর স্থান ও গতি পরিবর্ত্তন বাঙ্গালীর জলপথে অভিযান-বিরতির অন্যতম কারণ—

"Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the ocean."

ডক্টর ওসেউনেসী

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীরা যাহা ছিল আবার তাহা হইতে পারে, এ বিশ্বাস ইতিহাসপ্রসূত—

"To any one acquainted with the revolutions of races, it must seem mere impatience ever to despair of a people; and in maritime courage as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengel have a new career before them…"

ইতিহাসের এই শিক্ষা অব্যর্থ।

যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্ব অপেক্ষাও শান্তির পরিবেষ্টনে স্ফূর্ত্ত সাহস ও বীরত্ব অধিক লক্ষ্য করিবার বিষয়—কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক পরিবেষ্টনে যে বীরত্ব ও সাহস দেখা যায়, তাহা সংক্রামক—তাহা গোষ্ঠীর, শান্তির পরিবেষ্টনে যে সাহস ও বীরত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তাহা মানুষের ধাতুর—প্রকৃতির পরিচায়ক। সেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় বাঙ্গালী বহু ক্ষেত্রে—বন্যা, বাত্যা, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে কিরূপ দেখাইয়াছে, কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, কিরূপ বিপদ বরণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সরকারী কর্ম্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবক—কোন বাঙ্গালীই যশের আশায় কাজ করেন নাই—কল্যাণসাধনের আগ্রহে যে উৎসাহ উৎপন্ন হয়, সেই উৎসাহেই তাহা করিয়াছে।

যে সকল বাঙ্গালী কর্ত্তব্য পালন জন্য অসাধ্যসাধন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—শিবচন্দ্র নন্দী তাঁহাদিগের অন্যতম।

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শৈশবে ও যৌবনে সে পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল না। সেই জন্যই তাঁহাকে যৌবনে সামান্য বেতনে কলিকাতার টাঁকশালে কেরাণীর কাজ লইতে হইয়াছিল। যাহাকে বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ বলে, তাহা তাঁহার ভাগ্যে হয় নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ তিনি চাকরীতে প্রবেশের পূর্ব্বে করিতে পারেন নাই—সুযোগ বা অবসর ঘটে নাই। তিনি যে পারিবারিক পরিবেষ্টনে ছিলেন, তাহা অসমসাহসিকতার অনুশীলনের সহায় নহে। অথচ শিবচন্দ্র চাকরী লইয়া কেবল যে বিজ্ঞানের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছিলে এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সে কেবল নিজ চেষ্টায়। আর কোন বাধা তাঁহার নিকট অনতিক্রমণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তিনি যদি পরাধীন ভারতে বিদেশী শাসক-সরকারের অধীনে চাকরী না করিতেন, তবে ভারতে টেলিগ্রাফ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ ও কর্ত্তৃত্ব তাঁহার লভ্য হইত; কারণ, তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রায় অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দারুণ সঙ্কটকালে তাঁহাকেই বিভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—কার্য্য

সুষ্ঠু ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া কাজ শিখিয়াছিলেন—স্বদেশে বা বিদেশে শিক্ষালাভ করিতে কোথাও গমন করেন নাই। আর সেই জন্যই—"হাতে হাতিয়ারে" কাজ করিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহার কাজ ত্রুটিশূন্য হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত ৮০ মাইল পথ যে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে প্রথম পরীক্ষা এবং তাহা তাঁহারও "হাতেখড়ী" হইলেও এমন ত্রুটিশূন্য হইয়াছিল যে, ৫ বৎসরে তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। যে সময় তিনি বনে, জঙ্গলে, জলায় ও মরুভূমির মত স্থানে কাজ করিয়াছিলেন, তখন দেশ দুর্গম ও বিপদবহুল।

বাঙ্গালী যে "নারী সুকুমার" নহে, তাহা শিবচন্দ্র ও তাঁহার মত কর্ম্মীরা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা বাঙ্গালীর জন্য যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা গৌরবজনক। এবং আজ তাহা বাঙ্গালার নরনারী সকলেরই অনুকরণের ও অনুসরণের উপযুক্ত।

দারুণ পরিশ্রমেও শিবচন্দ্র তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অতর্কিত মৃত্যুর সময়ও তিনি সম্পূর্ণ সবল ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার সেই স্বাস্থ্যরক্ষার কারণও অনুসন্ধানের উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

এই স্মরণীয় বাঙ্গালীর আদর্শ বাঙ্গালীকে সাফল্যলাভে সচেষ্ট করিবে।

পবনদূত

(ধোয়ী)

শ্রীকালিদাস রায়

দূত হয়ে যবে উপজিবে তুমি রাজসমীপে
বোলো, সমীরণ, গৌড়াধিপে।
ললনাগণের নয়নানন্দবর্দ্ধনকারী হে মহামতে,
এই সাহসিনী মৃগলোচনার নয়নপথে
প্রথম যেদিন উদিত হইলে, সে স্মৃতি বহি'
সেই দিন হ'তে অন্তরতাপে মরে সে দহি'।
রম্যবস্তু যাহা কিছু ছিল সকলি হয়েছে ত্যাজ্য তার।
তুমি ত জান না বহিতেছে নিজ রাজ্যভার।

ধরা যায় যাতে মুঠির বেড়ে
এমন করিয়া রচিল বিধাতা যেই ললনায় কটিদেশেরে,
কুসুমায়ুধের শরাসন তার হবার কথা,
হে রাজন্, আজি তোমার বিরহে অতি দুঃসহ বেদনাহত।
শীর্ণতা লভি আজি তার তনু হয়েছে ধনুর মৌর্ব্বীলতা।

সখীজন যবে শুধায় তারে,
হৃদিমন্দিরে পুষিয়া যতনে পূজিছ কারে?
সে নব রতন কাহার মতন দেখিতে কেমন বল না শুনি,
অশ্রুপ্রবাহ কোন' মতে রুধি তাপিত নিশাস তাজে তরুণী।
কয় নাক' কথা চেয়ে রয় শুধু উদাস প্রাণে,
গৃহের ভিত্তি-গাত্রে লিখিত কুসুমায়ুধের চিত্রপানে।

প্রিয়সখীদের শ্রবণচ্যুত তালীপত্রেরে লইয়া করে
ভাবে সে বুঝি বা প্রণয়পত্রী পাঠায়েছ তুমি করুণা ভরে।
[illegible] জিজ্ঞাসা করে তোমার বারতা, এমনি ভুল।
আর্ত্ত কাতর প্রেমী[illegible] কভু বিচার করে কি জাতি বা কুল?

রম্য যা কিছু তার প্রতি নেই প্রীতির লেশ,
উৎপলে তাই তাহার দ্বেষ।
উৎপল সম আঁখি এত দিন কর্ণের ভূষা ছিল যা তার
আজি নিমীলিত, নহে তা এখন ভূষণ আর।
মাল্যের আর আদর নাই,
মাল্যের মত ভুজলতিকারে গুটায় তাই।
অনাদর তার পদ্মে আরো,
হৃদয়-নিহিত সন্তাপ তার এমনি গাঢ়
পদ্ম ভাবিয়া অঞ্জলিপুটে সখীর ভুজে
হেরি তা সহসা ভয় পেয়ে দুটি চক্ষু বুজে।

সুপ্ত র'য়েও সরস কুসুম কল্পতরুর সন্নিধানে,
স্বস্তি শান্তি পায় না প্রাণে।
দুইটি নয়নে ঝরে অবিরল অশ্রুধারা
নয়নকমলে মৃণালের রূপ ধরেছে তারা।
শোষিত পঙ্ক সরসী-অঙ্কে শফরী সম
বোলো সে রাজারে "দিন যাপে বালা, হে প্রিয়তম!"

অপ্রিয় লীলাকাননে বসতি, চন্দনজল বাড়ায় জ্বালা,
নলিনীপত্র তালবৃন্তের শীতল পবন চাহে না বালা।
বুদ্ধি করিয়া সখীরা এ সব সরায়ে রাখে—
মূর্চ্ছার বেগ হইতে'তবে ত বাঁচায় তাকে।

চন্দ্রে তাহার বড় বিদ্বেষ, কুন্তলপাশ বাঁধে না আর।
ছুড়ে ফেলে দেয় চন্দনরসসিক্ত হার।
বোলো সে রাজারে কি দশা তাহার বিরহতাপে,
গাঢ় উদ্বেগে কবিতা-চিন্তা করিয়া সে তার রজনী যাপে।

পক্ষ্মমালাকে স্তম্ভিত করি' নয়নের পথে প্রথম ঝরি',
গণ্ডযুগলে চুম্বন দিয়া বিম্ব অধরে পিপাসা হরি',
কণ্ঠ আঁকড়ি লভিছে শয়ন বালার উরোজ অঙ্ক-মাঝে,
অশ্রু তাহার, তোমার বিরহে কি না করিতেছে, মরে সে লাজে।
বোলো সমীরণ গৌড়নাথে
সখীগণ তার কদম-দলার শয্যা পাতে।
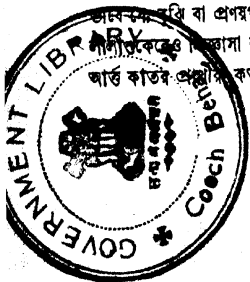
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

স্পষ্টই মনে আছে, ১৯৩৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এসে পৌঁছলাম আবার সেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই জেল থেকেই গিয়েছিলাম বহরমপুর বন্দীশিবিরে পাকা রাজবন্দীরূপে।

ইনসপেক্টার যতীন সেনগুপ্ত গভীর আশা ব্যক্ত করে যখন কেশিয়াড়ীতে বলে দিয়েছিলেন ঢাকা জেলে পৌঁছেই পাবো দ্বিতীয় মুক্তির ফরমান, মনে-মনে যে তখন একটুখানি খুশীই হয়ে উঠেছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারি নে। তাই জেল-অফিসে পৌঁছেই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলাম সেই মহার্ঘ দ্বিতীয় সরকারী আদেশ-পত্রের জন্য। তখন সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে। অফিসের উদ্ধত-ফণা কেরাণীকুল চলে গেছেন শম্বুকের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে আট ঘণ্টা কলম পিষে জর্জ্জরিত হয়ে। ডেপুটি জেলারদেরও কাউকে দেখতে পেলাম না। তাঁদেরই পরিত্যক্ত একখানা চেয়ারে উজ্জ্বল আশা নিয়ে বসে রইলাম। তখনো যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তবুও অনায়াসেই যেতে পারবো আমাদের গ্রামে ফিরে, কারণ গয়নার নৌকোর সদর-ঘাট ছেড়ে যেতে রাত আটটা হয়ে যায়।

এই গয়নার নৌকোয় গয়না কিন্তু থাকে না একখানাও। কোনো স্বর্ণকারের ভাসমান বিপণী নয় এ। বেশ বড় আকারের নৌকো। ব্যায়াম সমিতির প্রধান শিক্ষকের মতো স্বাস্থ্য—যেমন দীর্ঘ, তেমনি তার প্রস্থ। সুবারবান ট্রেণগুলি যেমন করে নিয়মিত ভাবে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, ঠিক তেমনি বর্ষাকালে জলমগ্ন বিক্রমপুরের সঙ্গে ঢাকা শহরের সংযোগ রক্ষা করে চলে এই গয়নার নৌকো। কী করে এর নাম গয়নার নৌকো হলো, হয়তো শ্রদ্ধেয় যোগেন গুপ্ত বা সুনীতি চাটুজ্জে তা বলতে পারেন। প্রতিদিন সকাল বেলা যেমন একখানা আপ নৌকো গ্রাম থেকে যাত্রা করে শহরাভিমুখে, ঠিক সেই সময় তেমনি একখানা ডাউন নৌকো বুড়ীগঙ্গার সদর-ঘাট ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে আসে। তেমনি সন্ধ্যা বেলা। রেল-লাইন নেই, কিন্তু এদের যাতায়াতের নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। ট্রেণের মতো এদের নির্দ্দিষ্ট কোনো ষ্টেশন নেই সত্যি, কিন্তু চলার পথে যে-কোনো স্থানে যে-কোন যাত্রীর জন্য এর গতি মন্থর করা হয়। সারা দিন বা সারা রাত এই নৌকো চলে। আপ নৌকো রাত তিনটেতে ঢাকা সহরে পৌঁছে গেলেও ঘাটে ভিড়তে পারে না। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই সদর-ঘাটের বিপরীত দিকে শুভড্যা গ্রামের প্রান্তে অবশিষ্ট রাতটুকু কাটাতে হয় নোঙর ফেলে। ডাউন যে নৌকোগুলো ঢাকা শহর ত্যাগ করে সন্ধ্যার পর, ট্রেণের মতো তার কোনো টাইম-টেবল্ নেই বলে এদের ঘাট ছাড়তে রাত আটটা বেজে যায়।

দেয়ালের ঘড়িতে দেখলাম তখন মাত্র সাতটা। আরও আধ ঘণ্টা পর ছেড়ে দিলেও দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ী অনায়াসে ঘাটে পৌঁছে দিতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর ডেপুটি জেলার রেজ্জাক সাহেব এলেন বোধ হয় সংবাদ পেয়ে। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: দ্বিজেন বাবু, দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। ডেটিনিউ ইয়ার্ডে আপনাকে রাখা যাবে না, কারণ আই-বি বোধ হয় আপনাকে বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দলভুক্ত করে নেবে।

বিস্ময় প্রকাশ করলাম: বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা!

কিছুই খবর পাননি বুঝি?—বলে রেজ্জাক সাহেব সংক্ষেপে যে বিহ্বলকারী সংবাদ প্রকাশ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, এই মামলার তোড়জোড় চলছে প্রায় দু'মাস ধরে। একটি একটি করে দশ-বারো জনকে গ্রেপ্তার করে এনে বিচারাধীন আসামী করে রাখা হয়েছে। ডাকাতি, নরহত্যা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কা'কে কা'কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলতে পারেন রেজ্জাক সাহেব?

জবাব দিলেন রেজ্জাক: সব নাম তো আমার মনে নেই, তবে বিপদভঞ্জন, সুবোধ, নেপাল না গোপাল চক্রবর্ত্তী—এমনি আরও জনকতক। বোধ হয় অনাথ নামেও কেউ আছে।...

চমকে উঠলাম মনে মনে। কিন্তু বাইরে খুব সহজ ভাব দেখিয়ে আর একটা প্রশ্ন করলাম: এরা সব আছে কোন্ ইয়ার্ডে? আমাকে এদের সঙ্গেই রাখবেন তো?

রেজ্জাক বললেন: ঠিক বুঝতে পারছি নে। এখন পর্য্যন্ত সরকারী কোনো আদেশ আসেনি। শুধু বিভূতি সাহা বলে গেছেন, আপনাকে যেন রাজবন্দীদের সঙ্গে না-রাখা হয় আর এই সব আসামীর সঙ্গেও যেন আপনার দেখা না হয়। কিন্তু এই ছেলেদের তো একসঙ্গে রাখা হয়নি। মনে পড়ছে, অন্ততঃ দু'জনকে ৪০ ডিগ্রিতে দেখেছি।

তাদের নাম মনে আছে?

কালাচাঁদ দাস আর বোধ হয়—রঙ্গলাল গাঙ্গুলী। রঙ্গলাল আপনার আত্মীয় নাকি দ্বিজেন বাবু? অনেকটা যেন আপনার মত দেখতে।

বললাম: কোথায় আমায় থাকতে হবে, সেইখানে নিয়ে চলুন রেজ্জাক সাহেব! খুব শ্রান্তি লাগছে। বাস্, ট্রেণ, ষ্টীমার, ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী—সব্বই তো চেপে এসেছি, শরীরে ব্যথা বোধ হচ্ছে।—চলুন।

এমন সময় এক জন জমাদার এসে নিবেদন করলো যে, সিভিল ইয়ার্ড খালি করে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে খাট, টেবিল ও চেয়ার বিছায়কে দিয়া গিয়া। অব—

রেজ্জাক উঠলেন: চলুন দ্বিজেন বাবু, আজ তো ওখানেই থাকুন। কাল বিভূতি বাবু এসে যা করবার করবেন।

চলতে-চলতে প্রশ্ন করলাম: বিভূতি সাহা কে?

আই-বি ইনস্পেক্টার, এই মামলা তদ্বির করছেন সরকারের পক্ষ থেকে।

ঢাকা জেলের সিভিল ইয়ার্ড বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ডাক-বাংলোর মতো। ছোট বারান্দা তার পরই মাঝারী আকারের শয়নকক্ষ, সংলগ্ন বাথরুম। চারি দিকে ইয়ার্ডের নিজস্ব কোনো দেয়াল নেই, অন্যান্য ইয়ার্ডের দেয়াল পর্য্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। সযত্নে বর্দ্ধিত গোটা কতক পাতাবাহার গাছ পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে রয়েছে বাংলোর

সম্মুখ ভাগে। যারা হাসপাতালে যায়, ৬ নম্বরে যায়, বিশ ডিগ্রীতে যায়, এমন কি চল্লিশ ডিগ্রিতে যায়, তাদের সবাইকেই যেতে হয় এই সিভিল ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে। চল্লিশ ডিগ্রির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের নালীগুলি ও পায়খানার সারি এই সিভিল ইয়ার্ডের প্রাঙ্গণ-মধ্যেই অবস্থিত বলা যায়।

ডাক-বাংলোর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এর জানালায় আছে লোহার শিক এবং তাও সুদৃঢ় গ্রিল নয়, মোটা ও মজবুত সৌন্দর্য্যহীন শিক। আর আছে এমনি শিকের দরজা, যা রাত্রিকালে তালাবদ্ধ হয়ে আক্রমণোন্মুখ ব্যাঘ্রের মত যেন তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা প্রদর্শন করে।···

পরিপাটি করে শয্যা বিছিয়ে দিয়ে গেল রাজবন্দী ইয়ার্ডের জনৈক ভৃত্য, কুঁজো ভর্ত্তি করে দিয়ে গেল পানীয় জল এবং সিপাইয়ের সঙ্গে ফিরে যাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি এতখানি পথ এসেছি, চা ও খাবার দেবে, না একবারে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করতে বলবে।

চট্ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল, বলে দিলাম: শোন, ম্যানেজার বাবুকে বলো চা ও গোটা দুই মামলেট যেন এখন পাঠিয়ে দেন, পরে খাবো ভাত। আর এক কাজ করো, গোটা দুই বাণ্ডিল 'জাহাজ' বিড়ি নিয়ে এসো। আমি আবার সিগারেট খাই নে; বিড়ি ভালো লাগে ও বেশী খাই। দু' বাণ্ডিল এনো, বুঝলে?

সিপাই প্রহরায় ভৃত্য চলে গেলে শয্যার প্রসারিত করে দিলাম শ্রান্ত দেহ। সরকারী দ্বিতীয় আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করলাম এতক্ষণে! বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা···প্রধান আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

সত্যিই কি অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে হবে আই-বির কাছে? বুক ঠুকে এত কাল যাদের চ্যালেঞ্জ করে এসেছি, যাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে চালিয়ে এসেছি এত কাল আমার গুপ্ত বিজয়-অভিযান, বুদ্ধির লড়াইতে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত, পর্য্যুদস্ত হয়ে যারা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, এতকাল পর আবার কি তারা গাণ্ডীব তুলে নিল? তাদের অস্ত্রনির্ম্মাণের কামারশালে কি আবার দ্বাপরের তৎপরতা জেগে উঠলো? সুরু হলো হাতুড়ীর ঠুকঠুক? মরণ-কামড় হানবার জন্য কি এরা এবার রণ-নায়ক করে পাঠালো জেনারেল ভন্ রুণ্ডেটকে পতনোন্মুখ জার্ম্মাণীর মতো?···কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলা কী করে সাজালো এরা? কোন্ কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে? কোথায় তার সাক্ষী? কী তার প্রমাণ? বেছে-বেছে আমারই অনুগামীদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো?—এমনি অসংখ্য প্রশ্ন জাগলো আমার মনে, যার জবাব তখনও কিছুই পেলাম না খুঁজে।

দেখা যাচ্ছে, বছর চারেক রাজবন্দীর জীবন কাটাবার পর যদি এই মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হয়ে যায়, তাহলেই এ জন্মের মত প্রত্যক্ষ কাজ শেষ হয়ে যাবে। অপেক্ষা করতে হবে পরজন্মের!···

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সংসারের যাঁরা ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী, ছোটবেলা থেকেই তো তাঁরা আমায় তেমনি একটি স্ফটিক স্তম্ভই তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের নীরকন্ঠ প্রচেষ্টার কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। প্রতিদানে কী দিয়েছি আমি তাঁদের? দিয়েছি দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি!···

১৯৩৪ সালে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন বাবার মৃত্যু-দৃশ্য আবার নতুন করে স্মৃতির পরদায় ভেসে উঠলো।···

স্পষ্ট মনে আছে, সাধারণ জ্বরের অষ্টম দিবসে বাবা সংজ্ঞা হারান, আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হবার পূর্ব্বে আমায় বললেন, সবাইকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করছে। তৎক্ষণাৎ আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম বড়দা অবিনাশ গাঙ্গুলীর কাছে, কাশীতে সুন্দরদার কাছে, কলকাতায় মেজদার কাছে, আরও কয়েকটি স্থানে। মেজদার কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে লিখে দিলাম: Father dying, Start immediately।

তৃতীয় দিবসে এর জবাবে পেলাম সেজদার ফুলদাকে সম্বোধন করে কড়া ভাষায় লেখা একখানা পোষ্টকার্ড: টেলিগ্রাম করলেই টাকা পাঠাবো, আমাদের কি টাকার গাছ আছে?

জবাবে আবার পাঠালাম টেলিগ্রাম: Horrified noticing calousness. start—father desires seeing you।

এদিকে মাঝে মাঝেই বাবা জিজ্ঞেস করছেন: কি রে, ওরা সবাই এল? গ্যানা বোধ হয় ছুটি পায়নি, ধীরেনেরও নতুন চাকরি—

বাধা দিয়ে বললাম: না, না, তাঁরা টেলিগ্রাম করেছেন—আসছেন।

কিন্তু এই সান্ত্বনা কি ব্যর্থ হবে? আমার জরুরী তারবার্তা কি এমনি ভাবে অবহেলা করবেন দাদারা? মৃত্যুর পূর্ব্বে সাত-সাতটি ছেলে, পুত্রবধূ, নাতী-নাতনী সবাইকে দেখে যাবার অন্তিম ইচ্ছা কি বাবার পূর্ণ হবে না?···বিচলিত হয়ে উঠি, ক্ষোভও মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে, কিন্তু মনের সমস্ত বেদনা ও সকল আবেগ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে চেপে রেখে আশার কথা শোনাই মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধকে: আসছেন, তাঁরা আসছেন।···

দলে দলে গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ এসে বাবাকে দেখে যাচ্ছেন, মুসলমান প্রজারা আসছে দল-বেঁধে, আসছেন গ্রামান্তরেরও অনেকে। অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই বৃদ্ধ। সে যুগের অনগ্রসর, সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া গ্রামের অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে বাবার আধুনিক মতবাদগুলি বিপ্লবের অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে দিত। হরিসভা থেকে সুরু করে ফুটবল প্রতিযোগিতার তিনিই ছিলেন স্থায়ী সভাপতি। গ্রাম্য যে সমাজের দাপটে সে যুগে দলাদলি ও রেষারেষি অহর্নিশি উত্তাল হয়ে উঠতো এবং যার ফলে গ্রামের সহজ ও শান্ত জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতো অসহ বিড়ম্বনা, আমার বাবা সে সমাজকে আদৌ পরোয়া করতেন না। বরং ঐ সমাজই তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে চলতো।···

মৃত্যুর পূর্ব্ব-দিন বিকেলের দিকে শেষ বারের মতো বাবার জ্ঞান ফিরে আসে। শয্যাপার্শ্বে আমায় দেখেই জিজ্ঞেস করলেন: কি রে, ওরা সব এসেছে?

আবারও মিথ্যে প্রবোধ দিতে হলো: লিখেছে কালই এসে পৌঁছবে।

আর কাল!—বলে চোখ বুজলেন বাবা।

তার পরের ঘটনা বেশ সরল। সারা রাত চললো যমের

সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার। টেনে তাকে ফেলে দিতে না পারলেও সে'ও পারলো না জয়লাভ করতে। সারা শরীরে কম্পন জেগেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, ক্ষীণায়মান নাড়ীর গতি, কিন্তু কী গভীর শান্তির দ্যুতি সারা মুখমণ্ডলে!···সারাটি রাত ঠায় বসে রইলেন তিন জন চিকিৎসক—বিলাস সাহা, বিজয় সেন আর রসিক কবিরাজ। বিলাস সাহা দিলেন ইনজেকশন, বিজয় সেন নাকে লাগিয়ে দিলেন আর্সেনিক আর রসিক কবিরাজ জিহ্বায় ঘসে দিলেন কস্তুরীঘটিত ঔষধ। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী যুগপৎ তিনটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধককে ঠেলে ফেলে দিতে পারলো না সর্ব্বজয়ী মৃত্যু অন্ততঃ সেই রাত্রির মতো।···কিন্তু পরদিন সকালে সাড়ে ন'টার সময় সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই বাবার ফুসফুসের ক্রিয়া চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল!

মৃত্যুর প্রাক্কালে ছুটে এলেন দেবেন কাকা, অতুল কাকা। বললেন যে, ঘরের মধ্যে মৃত্যু হলে নাকি আত্মা মুক্তি লাভ করতে পারে না! শাস্ত্রে বলে—

বললাম আমি: আপনাদের সে শাস্ত্র আমি মেনে নিতে পারি নে। খাটের ওপর যেমন শান্তিতে শুয়ে আছেন তিনি, তেমনি শান্তিতেই যাত্রা করুন পথিক মহাপ্রস্থানের পথে। টানাটানি করে তাঁর শান্তিতে ব্যাঘাত দেয়া অন্যায় হবে।···

পরদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে সর্ব্বাগ্রে হাজির হলেন সোনাদা। তখন সব শেষ হয়ে গেছে! খানিকক্ষণ কাঁদলেন তিনি হাউমাউ করে ছোট্ট ছেলের মতো মায়ের কোলে মাথা গুঁজে! তার পর চললেন আমায় নিয়ে ম্যান্দার বাড়ীর শ্মশানে বাবার চিতাভস্ম আনতে। সেখান থেকে এসে উঠলেন টিনের ঘরের দোতলায় বাবার শয়নকক্ষে। সব তেমনি সাজানো রয়েছে।—ড্রেসিং টেবিল, তার ওপর হেয়ার ব্রাস, ব্রাসে গুঁজে রাখা চিরুণী। গদী-আঁটা খাট, তার ওপর প্রসারিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা। মোটা মোটা দুটো পাশ-বালিশ। পায়ের নীচে ভাঁজ-করা সুদৃশ্য বালাপোষের চাদর। মাথার ওপর তোলা নেটের মশারি। ব্রাকেটে বাবার ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, চাদর ও তার নীচেই খুঁটির কোণে সেই বহু স্মৃতিজড়িত নিমের লাঠীগাছা।

সোনাদা পরম শ্রদ্ধাভরে ধীরে ধীরে তুলে নিলেন লাঠীখানা। বললেন: এটা আমি নিয়ে যাবো রে! এই সব জিনিষের মূল্য অনেক।·········

সোনাদার মুখেই তার পর শুনতে পেলাম কলকাতার মর্ম্মান্তিক অধ্যায়। আমার প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই কাশী থেকে সপরিবারে সুন্দরদা এসে হাজির হন কলকাতায় মেজদার বাসায়। সেখানে তেমন উদ্বেগ না দেখে বিস্মিত হন তিনি। তার পর প্রকাশ পায় আমার প্রথম টেলিগ্রামকে আমলই দেননি সেজদা। ফুলদা যে ভাবে মাঝে মাঝে কেয়টখালী থেকে লোমহর্ষণকারী পত্রাঘাত করে কলকাতায় দাদাদের ব্যস্ত করে দিয়ে টাকা চাইতেন অবশ্য সাংসারিক প্রয়োজনেই, সেজদা মনে করেছিলেন আমার নামে প্রেরিত এই টেলিগ্রাম সেই চালাকিরই আর-একটি শোচনীয়তর নিদর্শন। তাই এর কথা আর মেজদাকে না জানিয়ে তিনি নিজেই জবাব দেন পোষ্টকার্ডে।

আমার দ্বিতীয় টেলিগ্রাম মেজদার হাতে পড়ে। এবার তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, বাবার এমনি সংবাদের ওপর আস্থা স্থাপনের ফলে যদি বোকা বনতে হয়, তাও ভালো। তথাপি আর চুপ করে থাকা আত্মঘাতী অন্যায় হবে। সুন্দরদা বিশেষ কিছু নয় জেনে ফিরে গেছেন কাশীতে, মেজদারও সরকারী চাকরিতে ছুটি নিতে দু'দিন দেরী হতে পারে। তাই সোনাদাই যাত্রা করলেন সর্ব্বাগ্রে বৌদি ও পুত্রকন্যা সহ।

এই শোচনীয় ভুল বোঝাবুঝির ফলেই মৃত্যুকালের আশা পূরণ হলো না বৃদ্ধের, ছেলেরা, বৌমারা, নাতী ও নাতনীরা অনেকেই এসে পৌঁছোতে পারলো না সময় মতো।···

দ্বিধাহীন চিত্তে শুধু নয়, পরম শ্রদ্ধাভাবে আজ স্বীকার করি, ভাইদের মধ্যে সোনাদাই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর ছিল একটুখানি ব্যবধান, একটুখানি পার্থক্য চিরপরিচিত কালিমা-পঙ্কিল স্তরের একটুখানি ঊর্দ্ধে বিচরণ করতেন তিনি। সাংসারিক কূটনীতি ক্ষেত্রে যেমন একেবারে অচল ছিলেন তিনি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সুদুঃসহ সংগ্রামে যেমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে যক্ষ্মারোগে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তেমনি আমি নিজেই দেখেছি দক্ষিণ-কলকাতার সাদার্ণ মার্কেট অঞ্চলে কী জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর। ১৩৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বহু দিন বহু লোকের মুখে শুনেছি তাঁর অশেষ গুণাবলীর কথা আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বুক ভেঙে বেরিয়ে এসেছে একটি প্রিয়জন-ব্যথাতুর দরদী দীর্ঘনিঃশ্বাস!···আমি জানি এবং নিশ্চিত ভাবে জানি যে, অনাত্মীয়দের এই সহানুভূতি-সজল দীর্ঘশ্বাস অনাহত শান্তি দেবে তাঁকে পরলোকে, বিধবা সোনাবৌদি ও তাঁর পুত্র-কন্যার শিরে এই দীর্ঘশ্বাস আশীর্ব্বাদের শুভ্র ফুল হয়ে ঝরে পড়বে। যে প্রচণ্ড দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী, নীলাঞ্জন গাঙ্গুলীর জীবনে সে দুঃখের হবে সমাধি, সেই দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন রজনীর হবে অবসান!······

বাবু!

চমকে উঠলাম: কে?

আমি, বাবু। আপনার চা নিয়ে এসেছি। রাখবো টেবিলের ওপর?

রেখে যাও।

লোকটি বললো: আপনার জাহাজ বিড়ি কাল কিনে দেবেন বলে দিলেন ম্যানেজার বাবু। আজ পাঠিয়েছেন মসজিদ বিড়ি।

আচ্ছা, ওতেই হবে।

৫২

পরদিন সকালেই তলব এল জেল-গেট্ থেকে—আই-বি এসেছেন দেখা করতে।

প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এসেছে সংঘর্ষের আহ্বান। এবার আসরে নামতে হবে।

গেট-এ প্রবেশ করেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল স্বয়ং প্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে। বোধ হয়ে আমার অপেক্ষাই করছিলেন।

Hallo Mr. Ganguly, now you are caught in the trap. There is no way out now, do you understand?

আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড সবই করতে পারছি, কিন্তু পাণ্টা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড

না-করাতে পারলে কী আর শিখলাম এত কাল? ••বললাম: I don't know what do you mean by this.

মৃদু হাস্য করলেন গ্র্যাসবি সাহেব। একটু দূরে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন যে, তাঁর যা বলবার, তা সবই আমায় বলবেন ইন্‌সপেক্টার বিভূতি সাহা। উত্তরে আমার যা বক্তব্য, তা ওঁকে বলে দিলেই তিনি জানতে পারবেন।

দেখলাম, গ্র্যাসবির বেল্ট-এর দু'পাশে কালো ফিতেয় ঝোলানো একটি নয়, দুটি রিভলভার। খাপে ঢাকা নয়, একেবারে খোলা। প্রয়োজন হলে যাতে একটি সেকেণ্ডও দেরী না হয়ে যায়। আর বেশ উল্লসিত মনে হলো ওঁকে। হবারই কথা! ওঁদের আয়োজনের মরা গাঙে এসেছে জোয়ার, পালে লেগেছে হাওয়া, এবার জয়যাত্রা করবে সপ্তডিঙ্গা মধুকর!···

প্রকাণ্ড গেট খুলে গেল, গট-গট করে গ্র্যাসবি বেরিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন বিভূতি সাহা।

চলুন, সুপারের ঘরে গিয়ে বসি গে আমরা। নিরালায় কথা কওয়া যাবে'খন।

তার পর কথা সুরু হলো।

বিভূতি সাহা বললেন: গিয়েছিলাম মশাই, আপনাদের বাড়ীতে সার্চ করতে। দেখলাম আপনার ঘরখানা, আপনার বইয়ের প্রকাণ্ড আলমারীটা। উঃ, কী চমৎকার কলেকশন আপনার। বিশ্বের সেরা-সেরা বই সব সংগ্রহ করছেন। পড়েও ফেলেছেন সব নিশ্চয়ই?

ঘাড় নাড়লাম। বলতে লাগলেন সাহা: সত্যি, বিদ্যা ও জ্ঞানের জাহাজ আপনারা! আর কী পপুলার আপনি, তাও টের পেলাম আপনাদের গ্রামের অনেকের সঙ্গে কথা করে। দেখলাম, ওদিকের কোনো কাজেই আপনাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। নাটকে আপনিই নায়ক, খেলাধূলায় আপনিই ক্যাপ্টেন, লেখাপড়ায় আবার আপনিই ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, স্বেচ্ছাসেবক দলের আপনিই জি ও সি। জানতে পারলাম, গ্রামের প্রত্যেকটি ব্যাপারে, প্রত্যেকটি কাজে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয় না। কতখানি যে ভালবাসে ও ভক্তি করে আপনাকে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, গ্রামের বুড়োরা, গ্রামের যুবকেরা তারও পরিচয় পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি দ্বিজেন বাবু, আপনাকে না দেখেও সেই থেকে মনে মনে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। গ্রামের, সমাজের কল্যাণের জন্য আপনারই মতো নিঃস্বার্থ, কর্ম্মঠ ও জনপ্রিয় কর্ম্মীর আবশ্যক আছে।

এমনি ওজস্বিনী ভাষায় অবতরণিকার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে আদৌ দেরী হলো না আমার। বহু বার শুনেছি এদের মুখে। মোসাহেবী চাটুবাক্যের মধ্য দিয়ে এঁরা সহজেই এগিয়ে আসেন কাছে। তার পর সীমাহীন প্রশংসার মবিল অয়েল দিয়ে জাহান্নামে তলিয়ে যাবার পথটি বেশ পিছল করে দেন। তার পর আর কী? একটুখানি ঠেলে দিলেই ব্যস, একেবারে ন্যাওড়া গাছ থেকে সড়াক করে নেমে আসার মতো সড়-সড় করে নেবে যেতে হয় অধঃপতনের উৎরাই পথে। তার পরই শোনা যায় ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষীর কথা, মহামান্য ভারতেশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোতা পাখীর মতো সহকর্ম্মীদের তালিকা আওড়ে যান কালাচাঁদ দাস ও রঙ্গলালের মতো।···কিন্তু সবে ঢাকা শহরে এসেছেন বিভূতি সাহা, এখনও সম্যক্ মোলাকাত হয়নি আমার সঙ্গে, খড় গে খড় গে ভীম পরিচয়ের পালা এখনও বাকী রয়েছে। যাঁরা চেনেন আমায়, তাঁরাও বোধ হয় এঁকে সমঝে দেননি এখনও।

মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু বিভূতি সাহা তাঁর মামুলী প্রথায় সহস্রমুখে উচ্ছাস দিয়ে, অনুপ্রাস দিয়ে, উপমা দিয়ে, উৎপ্রেক্ষা দিয়ে আমার গুণকীর্ত্তন করে অবশেষে বুকভাঙা একটি দীর্ঘশ্বাস ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে বললেন যে, আমার মতো এমনি আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ যুবক দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারতো, যদি না ঐ চপলমতি গুণ্ডার দলে যোগ দিতাম। বললেন তিনি: দেশের স্বাধীনতা কে না চায় দ্বিজেন বাবু? ইংরেজকে কি আমরা ভালবাসি? এই গোলামী কি আমাদেরও ভালো লাগে? কিন্তু ঐ বোমা-রিভলভারের পথে কি স্বাধীনতা আসতে পারে?—স্বদেশী পরুন, তাহলেই এরা ভাতে মারা পড়বে ও দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

বললাম: আপনার নয়া থিওরি সম্বন্ধে একখানা থিসিস লিখুন না বিভূতি বাবু, যথাস্থানে পেশ করবো আমি।

থিসিস্!

তা ছাড়া কি! আপনাদের মতো চিন্তাশীল দেশহিতৈষী আর নেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে দেখছি এবার দেশের আই-বির দারোগা আর ইন্‌সপেক্টারদেরই স্থান দিতে হবে।—কিন্তু যাক্ সে কথা। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা নাকি সুরু হচ্ছে শীগগিরই কীসের ষড়যন্ত্র জানতে পারি কি?

বিভূতি সাহা দরদী বন্ধুর মতো বললেন: আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই দ্বিজেন বাবু, কারণ আপনাকে ভাইয়ের মতো ভালবাসি বলেই আপনার জন্য দুঃখ হয়। আপনার মতো জিনিয়াস্—

এমনি জিনিয়াস্ ক্রাইম কী ভাবে করতে পারে, এই তো আপনার বক্তব্য? কিন্তু কী সে ক্রাইম, তা জানাতে পারলে তবে তো বলবো আমার যা বলবার আছে।—বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলাম সাহার পানে।

বড় সাহেবের আহ্বানে বড়বাবু যেমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে কাছাটি হারিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনি ক্রাইমের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বিভূতি সাহা আই-বি জনোচিত ধৈর্য্য ও সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে বলে ফেললেন: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা তো বলবোই। তাই বলবার জন্যই তো এসেছি আপনার কাছে। সবই জানতে পেরেছি কালাচাঁদ আর রঙ্গলালের কাছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, আপনার প্রত্যেকটি কাজ। দেলভোগের হাট থেকে ব্যাপারীদের অনুসরণ করে কী ভাবে আপনি ছেলেদের নিয়ে ডাকাতি করেছিলেন, তার পর হাসাড়া, মালখানগর প্রভৃতি গ্রামের স্কুল-লাইব্রেরী ভেঙে কি ভাবে সব ক্লাশক্যাল বই চুরী করেছেন, দীনেশ গুপ্ত আর বিনয় বোস কেয়টখালীতে কত বার এসেছে—সব জানতে পারা গেছে ওদের মুখ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম: আর কিছু?

আরও অনেক।—বলে সাহা এবার আবেগ ঢেলে দিলেন কথার সুরে: কিন্তু ওদের দু'জনকে তাই রেখেছি আলাদা করে ভালো ভাবে।

অন্যায় যে স্বীকার করে, তাকে আপনারাও ক্ষমা করে থাকেন। আর আমাদের আইনে তো আছেই।—কিন্তু আমার বক্তব্য, বক্তব্য নয়, অনুরোধ দ্বিজেন বাবু, আপনিও কেন সব জানিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান না! আপনার মতো ব্রিলিয়্যান্ট বয়কে যারা এই মারাত্মক পথে টেনে নিয়ে এসেছে, তাদের নামগুলো শুধু জানিয়ে দিন আমায়, I promise you honourable release. The jail-gate is open for you my dear brother—আর সুবিধে হচ্ছে এই যে, পার্টির কেউ তো ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারবে না এ কথা, কিছু লিখে দিতে হবে না আপনাকে, শুধু নামগুলো, শুধু—

ভাবাবেগে সাহা একেবারে গদগদ হয়ে উঠছিলেন, তাই বাধা দিতে হলো: আপনি কত দিন এই আই-বি-তে আছেন বিভূতি বাবু?

দমে গেলেন তিনি কাঠখোট্টা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে, তবু জবাব দিলেন: তা প্রায় বিশ বছর হবে।

ঢাকা এসেছেন কদ্দিন?

তাও তো প্রায় এক বছর হতে চললো।

এবারে ক'টি মূল্যবান উপদেশ দিলাম সাহাকে: এক বছর হলেও আমার সঙ্গে এই আপনার প্রথম দেখা। কলকাতা এস-বির মণি বোসের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়ে গেছে, এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার বনবিহারীর সঙ্গেও। আপনার ঐ তোতা পাখীর বুলিই শুধু সেখানে শুনিনি, সেখানকার বয়লারে রীতিমত রোষ্ট হয়ে এসেছি। অর্থাৎ বয়লার-প্রুফ। বুঝলেন বিভূতি বাবু?

কাষ্ঠহাসি হাসলেন বিভূতি বাবু। পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁতের পাটি, হাসতে গেলেই সেগুলো বেশ দেখা যায় আর চোখ দুটোও ছোট হয়ে আসে। কিন্তু কী বুঝলেন তিনি জানি নে। দেখা গেল, আর বাক্যজাল বিস্তারের অপচেষ্টা না করে এবার কাজের কথাই পাড়লেন: তা হলে দ্বিজেন বাবু, আপনার সঙ্গে যখন বনলো না, তখন আসল কথাটাই জানিয়ে দিই। আমরা শীগগিরই বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করছি আর আপনিই হবেন সে মামলার প্রধান আসামী। অর্থাৎ বাছা-বাছা চোখা-চোখা তীর রেডি করে রেখেছি আমরা, এবার ছাড়লেই হয়।

বললাম: ভালো কথা। আপনারা তীর ছাড়তে থাকুন, আমিও দেখি কোনো বর্ম্ম-টর্ম্ম পাই কিনা। না পারি, শেষটায় শরশয্যা নোব আর আপনারও একটা প্রমোশন-টমোশন—

আবার সেই চোখ-বুজে-আসা কাষ্ঠহাসি।

উপসংহারে জিজ্ঞেস করলেন বিভূতি বাবু: তা হলে কী বলবো আমাদের সাহেবকে দ্বিজেন বাবু?

বলবেন দ্বিজেন গাঙ্গুলী এখনও সেই দ্বিজেন গাঙ্গুলীই আছে—he has not given up that abominable practice—আপনাদের সাহেবের ভাষাই বলে দিলাম বিভূতি বাবু!

সাহা ঢাকা-ভাঙা ছ্যাকরা গাড়ীর মত জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ফিরে এলাম সিভিল ইয়ার্ডে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শয্যায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে মনে হলো, রেজাক ঠিকই বলেছেন রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে অন্যান্যের সঙ্গে না রেখে ৪০ ডিগ্রিতে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু দেলভোগ ডাকাতি আর স্কুলের বই চুরী সে তো অনেক দিন আগেকার ঘটনা। এত কাল পর আবার তার খোঁজ কেন? এরা কিছু না বলে দিলে পুলিশের ধারণারই অতীত ছিল যে, কোনো বিপ্লবী দল এ কাজ করতে পারে। কিন্তু কেন স্বীকার করলো এরা? আই-বি অত্যাচার করেছে? তা তো করবেই। ফাঁসীর দড়িকে যারা গোখরো সাপ মনে করে না, মনে করে সম্বর্দ্ধনা-সভাকক্ষের দ্বারে প্রতীক্ষারত ভক্তের হাতের বেল-ফুলের মালা, এই তপশ্চর্য্যার সর্ব্বপ্রকার কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই তো তারা পথে নেমেছে!······

কারতার সিং বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো পরিষ্কার বাংলায়: বাবুজী, আপনি বিড়ি খান না নাকি?

চমকে উঠলাম: কেন বলুন তো?

দেখছি আপনার টেবিলের ওপর বিড়ির দু'-দুটো বাণ্ডিল পড়ে আছে, অথচ ভাত খাবার পরও আপনি বিড়ি খেলেন না?

না, না, এই তো খাবো-খাবো ভাবছি।—বলেই একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললাম এবং কারতার সিংকে অনুরোধ জানালাম: সিপাইজী, খাবেন একটা?

প্রথমত: সিপাইজী, দ্বিতীয়ত: খাবেন সম্বোধন, তার পর আবার ধূমপানের অনুরোধ; সুতরাং কারতার সিং সবিনয়ে হস্ত প্রসারিত করলো।

বিড়ি খেতে-খেতে নানা গল্প ফেঁদে বসলাম। এ-কথা সে-কথার মধ্য দিয়ে এক সময় সুযোগ বুঝে এসে পড়লাম ভাবাবেগ-সিক্তি

অত্যাচার···দেশকা লিয়ে যে-সব মরদ জরু-লেড়কা ছেড়ে কাজে নেমেছে, উনকা আদমী হিসেবে তাদের প্রতি কি কোনো কর্তব্যই নেই? জান না আপনি সিপাই, সরকারের নিমক খান, লেকেন দিলমে ভি ওদের জন্ম জরাসে দরদ থাকা চাই।·····তার পর হিন্দী বাংলা সংমিশ্রণে আরও করুণ করে বিবৃত করলাম আমার কথা—ছোট্ট একখানা চিরকুট, সামান্য দু'-চার লাইন লেখা, কোনো ক্রমে যদি—

কারতার সিং রাজী হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কী ভেবে বলে উঠলো: আচ্ছা দাঁড়ান, মৈমুদ্দীন মেট ঐ ৪০ ডিগ্রিতেই কাজ করে। ওকে দেখি পাই কিনা—বলে বেরিয়ে গেল সে।

এই অবসরে ফস্‌ফস্‌ করে লিখে ফেললাম দু'লাইন পেন্সিল দিয়ে। একটু পরই ফিরে এল কারতার সিং। বললো: পাঁড়েজীকে বলে এসেছি, হাসপাতালে গেছে। ফিরবে এই পথ দিয়েই।

সিপাইজীকে আবার বিড়ি দিলাম।

যথাসময়ে এসে হাজির হলো মৈমুদ্দীন। ময়মনসিংহের মুসলমান। আকৃতিই তার ডাকাতের মতো। যেমনি দীর্ঘ দেহ, তেমনি প্রত্যেকটি পেশী যেন চর্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দশ বছর সাজা হয়েছে প্রতিপক্ষ রেজা খাঁর নাবালিকা কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে। শুধু অত্যাচার নয়, অত্যাচারের ফলে মৃত বালিকাকে একেবারে মাটীর নীচে কবর দিয়ে রেখেছিল সে। সন্ধান আর পাওয়া যেত না যদি না সন্তু খালাসী একরারী হতো। বেশ অবলীলাক্রমে বলে গেল নিজের কীর্তিকাহিনী। তার পর মৃদু হেসে হস্ত প্রসারিত করে যেই আমার সেই চিরকুটখানা মুঠোর মধ্যে পুরেছে, এমন সময় অকস্মাৎ অদূরে শোনা গেল: সরকার—সেলাম। দেখা গেল রেজাক সাহেব সিভিল ইয়ার্ডে প্রবেশ করেছেন সদলবলে। কারতার সিং প্রমাদ গুণলেও মৈমুদ্দীন যেন তাঁদের দেখতেই পায়নি, এমনি ভাবে পেছন ফিরে বলে উঠলো: তাহলে এক কাজ করি, কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে বলে-কয়ে এখনকার মতো এক দাগ ওষুধ এনে দিই। ডাক্তার বাবু রাউণ্ড দিয়ে ফিরলেই নিয়ে আসবো'খন আপনার কাছে।

রেজাক আমার কক্ষে প্রবেশ করে বলে উঠলেন: অ্যাঁ, সে কি, ডাক্তার কেন? কী হলো আপনার দ্বিজেন বাবু?

অসুবিধে হলো না জবাব দিতে, কারণ মৈমুদ্দীনই তো পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বললাম: খুব কনষ্টিপেশন ধরেছে। রাত্রে বোধ হয় একটু জ্বরও হয়েছিল। তাই—

রেজাক বলে উঠলেন: মৈমুদ্দীন, যা না ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয় না। দেখে-শুনে ওষুধ দেয়াই তো ভাল!

মৈমুদ্দীন কিছু বলবার পূর্বেই বাধা দিলাম: এখনই আর না ডাকলেও চলবে। রেজাক সাহেব একটু এ্যাগাররেল নিয়ে আসুন। দেখি কী ফল হয়। না হলে কাল খবর দেব ডাক্তার বাবুকে।

আশ্বস্ত হয়ে রেজাক বেরিয়ে গেলেন। পেছনে মৈমুদ্দীন। রেজাককে হাসপাতালের দিকে পৌঁছে দিয়ে মৈমুদ্দীন ভালো মানুষটির মতো কোনো দিকে আর দৃক্‌পাত না করে সোজা গিয়ে ঢুকলো চল্লিশ ডিগ্রিতে।

দুপুরে আহারের পর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় সত্যি সত্যি এক শিশি ওষুধ নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করলো মৈমুদ্দীন। এবার পাহারা কারতার সিং নয়, আকবর খান। নামজাদা কড়া লোক। ডেটিন্যু বাবুলোগকো ঘরের ভেতর আসামীলোগ যে ঘুসতে পারে না, এই কানুন তার কণ্ঠস্থ। তাই সেও এসে দাঁড়ালো মৈমুদ্দীনের পাশে।

বিরক্তি বোধ হলো, বললাম: শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে যাও।

মৈমুদ্দীন তাতে রাজী নয়। সে বললো: না বাবু, ডাক্তার বাবু এখনই এক দাগ খেয়ে ফেলতে বললেন।

তবু বললাম: খাবো'খন, রেখে দাও।

সে নাছোড়বান্দা: তা হবে না। বাবু, ঠিক আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আর খাওয়া হবে না। ডাক্তার বাবু বার বার বলে দিয়েছেন—

আকবর খান ধমক দিল: লে শালা, আর দিক করিস নে। বাবুকো নিদ যানে দে। চল—

সিপাইজী, আপ কেয়া বল্‌তা হ্যায়—বলে মৈমুদ্দীন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, বেমারী খুব খটখটিয়া আছে। দাওয়াই এখনই দরকার।

ওর জিদ দেখে সন্দেহ হলো। তা হলে কি জবাব এনেছে কিছু?···উঠে বসলাম। মৈমুদ্দীন শিশিটি আমার হাতে দেবার সময় কৌশলে আমার হাতের মধ্যে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। বললো: ওহো, ওষুধের গ্লাসটা তো আনতে ভুলে গেছি। নিয়ে আসছি, দাঁড়ান।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকবর খানও বারান্দায় এসে আবার পায়চারী সুরু করলো। মলত্যাগের ভাণ করে আমি পায়খানায় গিয়ে প্রবেশ করলাম মগ-ভর্তি জল নিয়ে। সেখানে বসে টুকরো কাগজটি খুলে দেখি পেন্সিলে লেখা রঙ্গলালের পত্র:

তোমার চিঠি পেলাম। ছোটকোনদের সঙ্গে আমার রাগারাগি হয়ে যাওয়াতেই আমি ওদের নাম বলে দিয়েছি। দেখা হলে সব বলবো। কিন্তু বিভূতি সাহা তো বলেছিল তোমায় এতে জড়াবে না। কিন্তু এ কি মতলব পুলিশের?

এখন কী করলে ভালো হয় পত্রপাঠ জানিও। কালাচাঁদকে তোমার চিঠি দেখিয়েছি। সেও তোমার পরামর্শ চায়। ইতি

রঙ্গু।

সে কি! ছোটকোন অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের জন্য পুলিশকে সব জানিয়ে দেয়া হয়েছে? কেন কেশিয়াড়ীতে আমার কাছে সব লিখে জানানো হয়নি? ব্যক্তিগত মতভেদের মধ্যে আই-বিকে কেন ডাকা হলো? এমনি ভাবে গোখরো সাপের ল্যাজ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মূঢ়তা কেন? কে সামলাবে এই বিপদের ঝক্কি? এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবার পথ কোথায়? কে বলে দেবে পথের সন্ধান?···এমনি অনেক প্রশ্ন জাগলো মনে, অনেক জিজ্ঞাসা, যার জবাব পেলাম না খুঁজে। শুধু অন্তরে অন্তরে জানলাম যে, ঐক্যতান শেষ হয়ে গেছে, যবনিকা সরে গেছে, সহস্র দর্শকের অপলক চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে পড়েছে, এবার আসরে নামতে হবে। 'রণং দেহি' হুঙ্কার ছেড়ে আহ্বান জানিয়েছে প্রতিপক্ষ, এবার সুরু হবে ক্ষুরধার বুদ্ধির রক্তহীন সংগ্রাম—বাংলা সরকারের সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ বনাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী—**One against thousands**···

[ক্রমশঃ।

উৎসব অনুষ্ঠানে
ক্যালকেমিকোর অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ
কান্তা মনোমুগ্ধকর সুরভিসার, মনকে আমোদিত করে।
লাবণি স্নো দিনের প্রসাধনে চর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।
লাবণি ক্রীম রাত্রে শোবার আগে ব্যবহার করলে চর্ম্ম নরম ও মসৃণ হয়।
মলয় চন্দন সাবান ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল মধুর সুগন্ধি এই কেশতৈল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
CREAM
La-bonny
SNOW
CASTOROL

ডি. এচ. লরেন্স

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ধরণের ঘটনা হয়ে যাবার পর কিছুদিন অবধি মোরেল খুব শান্ত আর নম্র থাকত, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার ফুটে উঠত তার পুরনো স্বভাব—সেই গোঁয়ার্তুমি, সেই অন্যের সুখদুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য। তবু কোথাও যেন একটু সঙ্কোচ জেগে থাকত, একটু নরম হয়ে আসত তার আত্মপ্রত্যয়ের উগ্রতা। এমন কি তার চেহারাও কেমন যেন সঙ্কুচিত বলে মনে হ'ত, আগের সেই দৃপ্ত, বলিষ্ঠ পৌরুষ যেন আর নেই। মোটা হওয়া তার ধাতে নেই, কাজেই তার শিরদাঁড়া যখন একটু নুয়ে পড়ত, তখনই কেমন শীর্ণ আর ভেঙে-পড়া মত দেখাত তাকে। যেন তার গর্ব্ব ক্ষীণ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহেও ভাঙ্গন ধরেছে।

এতদিন পরে সে অনুভব করতে লাগল তার স্ত্রীর দুর্দ্দশার কথা। এই শরীর নিয়ে কত কষ্ট করে সে সংসারের খাটুনি খেটে যাচ্ছে। অনুতাপে তার সহানুভূতি আরও গভীর হয়ে এল। কি ক'রে তাকে একটু সাহায্য করবে, এই ভেবে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেদিন খনি থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল সে, সারা সন্ধ্যা রইল বাড়িতেই। পরদিনও তাই। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়িতে বসে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল তার কাছে। তবু দশটার মধ্যেই সে বাড়ি ফিরে এল, নেশা করার বিশেষ কোন লক্ষণ সেদিন দেখা গেল না।

নিজের সকালবেলার খাবার সে নিজেই তৈরি করে নিত। খুব ভোরবেলা সে উঠত বিছানা ছেড়ে, কাজেই হাতে তার সময় থাকত প্রচুর। অন্যান্য খনি-মজুরদের মত ভোর ছ'টার সময় স্ত্রীকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য করত না সে। ভোর পাঁচটার সময়, কখনো বা তারও আগে, তার ঘুম ভাঙত। ঘুম ভেঙে গেলেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ত, উঠে সোজা চলে যেত নিচে। যেদিন তার স্ত্রীর ভালো ঘুম আসত না, সেদিন এই সময়টুকুর জন্যেই অপেক্ষা করে থাকতেন তিনি। এইটুকু সময়ই তাঁর শান্তির। সে যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেত, কেবল তখনই নিরুদ্বেগ শান্তি পেতেন তিনি নিজের মনে।

নিচে নেবে গিয়ে উনুনের ধার থেকে পাজামাটা উঠিয়ে নিলে মোরেল। সারা রাত্ত উনুনের ধারে থেকে গরম হয়ে রয়েছে সেটা। তাদের বাড়িতে সারাক্ষণই আগুন জ্বালানো থাকত। মিসেস মোরেল শোবার আগে উনুনের কয়লা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতেন। আবার সকালবেলা মোরেল উঠে বাকি কয়লাটা ভেঙে উনুনে ঢেলে দিত। তার সেই উনুন জ্বালাবার খটাং খটাং আওয়াজই ছিল এ বাড়ির ভোরবেলার প্রথম শব্দ। কেটলিটাতে জল ভর্ত্তিই থাকত, উনুনের পাশ থেকে সেটাকে উঠিয়ে নিয়ে মোরেল জল ফোটাবার জন্য কেটলিটা উনুনের উপর বসিয়ে দিলে। টেবিলের উপর একটা খবরের কাগজে আগে থেকেই সব কিছু সাজানো ছিল—পেয়ালা ছুরি, কাঁটা, অর্থাৎ খাবার বাদে আর যা যা তার দরকার হবে সব কিছু। মোরেল তার খাবারটা তৈরি করলে, চা ভিজিয়ে নিলে, তারপর মোটা কম্বল দিয়ে দরজার নিচের ফোকরগুলো আটকে দিলে যাতে ভোরবেলার ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে না ঢুকতে পারে। এবার আগুনটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে সে এক ঘণ্টার জন্যে আরাম করতে বসল।

ছ'টা বাজবার মিনিট পনেরো বাকি থাকতেই সে উঠে পড়ল। দু'টুকরো পুরো রুটি কেটে তাতে মাখন লাগালে, লাগিয়ে তার শাদা কাপড়ের ব্যাগটায় রাখলে সেগুলোকে। তারপর তার টিনের বোতলটাতে চা ঢেলে নিলে। খনিতে কাজ করবার সময় দুধ ও চিনি ছাড়া শুধু চা খাওয়াই তার নিজের পছন্দ। এবার সার্টটা খুলে রেখে তার খনিতে কাজে যাবার জামাটি গায়ে চড়িয়ে নিলে—মোটা ফ্লানেলের জামা, গলা নিচু করে কাটা, আর সেমিজের মত হাত দুটো খুব ছোট।

মনে পড়ল স্ত্রী অসুস্থ। কী মনে করে এক কাপ চা নিয়ে সে সোজাসুজি উপরে উঠে গেল।

'ওগো, তোমার জন্যে এক কাপ চা এনেছি।' গিয়ে বললে সে।

মিসেস মোরেল তার জবাবে শুধু বললেন, 'এর দরকার ছিল না। তুমি জান চা আমি ভালবাসি না।'

'খেয়ে ফেল। দেখো কেমন আবার চট্ ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে।' মিসেস মোরেল হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিলেন। মোরেলের ভারী ভাল লাগল এই হাত বাড়িয়ে নেওয়া, এই আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা-টুকু খাওয়া। তার খুশির অবধি রইল না।

একটু চুমুক দিয়ে মিসেস মোরেল বলে উঠলেন, 'মা গো, এর মধ্যে একটুও চিনি নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি।'

মোরেল একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, 'আছে তো। বড় একটা চিনির ডেলা দিয়েছি যে।'

চুমুক দিতে দিতে মিসেস মোরেল বললেন, 'আশ্চর্য্য, কোথায় গেল সেটা!' তাঁর চুলগুলো খোলা থাকত যখন, তখন তাঁর মুখের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য ফুটে উঠত। আজকে তাঁর এই অভিযোগ মোরেলের ভারী ভাল লাগতে লাগল। আর একবার তাঁর দিকে চেয়ে থেকে, যাবার সময় কোন কথা না বলেই আচমকা সে চলে গেল। খনির কাজে যাবার সময় দু' টুকরো রুটি-মাখন ছাড়া আর কিছুই নিত না সে। কাজেই, যেদিন একটা কমলালেবু অথবা আপেল থাকত, সেদিন তার সমারোহের ভোজ। মিসেস মোরেল যেদিন একটি

কমলালেবু বা আপেল বের করে রাখতেন তার জন্যে, সেদিন তার মন খুশিতে ভরে উঠত। খনিতে যাবার সময় সে গলার উপর দিয়ে একটা পশমের গলাবন্ধ জড়িয়ে নিত, ভারী বুট-জোড়া পায়ে পরত আর গায়ে চড়াত লম্বা কোট—তার বড়ো বড়ো পকেটে খাবার ব্যাগ আর চায়ের বোতলটা বেশ ধরত। সকালবেলার তাজা, ফুরফুরে হাওয়াতে বেরিয়ে পড়ত সে। দরজাটা ভেজানো থাকত, তালা বন্ধ করবার প্রয়োজন ছিল না। সকালবেলা এই মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটা মোরেল-এর ভালো লাগত। হাঁটতে হাঁটতে সে গিয়ে হাজির হ'ত খনির মুখে, কোন কোন দিন একটা ঘাসের ডগা চিবিয়ে নিত যেতে যেতে, সেটা সারাক্ষণই থাকত তার মুখে—তাতে খনির নিচে মুখটা ভেজাও থাকত, আর ঐ মাঠ দিয়ে আসার আনন্দটুকুও যেন সে অনেকটা উপভোগ করতে পারত।···

এবার যতই নতুন শিশুটির আসবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই সে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার সব কাজই ভাসা-ভাসা। বেরিয়ে যাবার আগে কোন রকমে উনুনের ছাইগুলো পরিষ্কার করে, উনুনটাকে মুছে, ঘরের আবর্জনাগুলো দূরে সরিয়ে সে রেখে যেত। নিজের মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত এতে। একদিন উপরে উঠে গিয়ে সে স্ত্রীকে বললে, 'নাও, তোমার সব কাজ করে রেখে গেলাম। তোমার নড়বার-চড়বার কিচ্ছু দরকার নেই, বসে বসে বই পড়।'

মনে যতই বিরক্তি থাক না কেন, তার এ-কথায় না হেসে মিসেস মোরেল পারলেন না। বললেন, 'ও, বাকি দুপুরের খাবারগুলো বুঝি আপনা-আপনি সেদ্ধ হবে?'

—'বটে, তা দুপুরের খাওয়ার কথা আমি কিছু জানিনি।'

—'হ্যাঁ, খাবারটা মুখের কাছে তৈরি না পেলে বাধ্য হয়েই জানতে হ'ত।'

—'তা হবে।' বলে সে প্রস্থান করল।

নিচে নেমে গিয়ে মিসেস মোরেল দেখতে পেতেন, সব জিনিস বেশ সাজানো-গোছানো রয়েছে, কিন্তু ঘরের ময়লা একেবারেই পরিষ্কার হয়নি। ঘরটাকে পুরোপুরি পরিষ্কার না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পেতেন না তিনি, ময়লা রাখবার পাত্রটা নিয়ে ছাইগাদায় ফেলে দিতে যেতেন। আর ঠিক সেই সময়টিতেই মিসেস কার্ক তাঁকে দেখে নেবে আসতেন নিজেদের কলতলায়। এসে কাঠের রেলিং-এর পাশ থেকে ডেকে বলতেন, 'কি গো, দিব্যি কাজকর্ম করে চলেছ যে।'

—'হ্যাঁ।' মিসেস মোরেল অবজ্ঞার সুরে বলতেন, 'এর আর উপায় কি?'

'তোমরা কেউ হোজ-কে দেখছ না?' বলতে বলতে একটি অতি ক্ষীণকায়া গৃহিণী রাস্তার ওধারে এসে দাঁড়ালেন। এঁর নাম মিসেস অ্যান্টনি। চুলগুলো ঘন কালো, অদ্ভুত ক্ষীণ দেহ, তার উপর বাদামি ভেলভেটের আঁট-সাঁট জামা।

মিসেস মোরেল বললেন, 'কই না, আমি তো দেখিনি।'

—'সে আজ এলে বেশ হ'ত। কিছু কাপড়-চোপড় ছিল আমার···কোথায় তার ঘণ্টার শব্দ শুনলুম যেন।'

—'ওই তো। ওই যে গলির মোড়ে।'

সবাই গলির শেষ মাথার দিকে চেয়ে দেখলেন। 'বটমস্'-এর বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে একটি লোক, পুরনো জামা-কাপড় তার গায়ে। ফিকে হলুদ রঙের কতকগুলো কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলি তার হাতে। একপাল মেয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে—তারা সব হাত তুলে ডাকছে তাকে, তাদের কারু কারু হাতে কাপড়ের পুঁটলি। মিসেস অ্যান্টনির হাতেও একরাশ আ-ধোয়া ফিকে হলুদ রঙের মোজা।

'এ সপ্তাহে দশ ডজন তৈরি করেছি।' মিসেস মোরেলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন তিনি।

'অদ্ভুত, এত সময় তুমি পাও কি ক'রে?'

মিসেস অ্যান্টনি জবাব দিলেন, 'আহা, সময় করতে জানলেই সময় হয়।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু সময়টা কর কি ক'রে?' মিসেস মোরেল বললেন, 'আচ্ছা, এই এতগুলোর জন্যে কত দাম পাবে তুমি?'

—'ডজন প্রতি আড়াই পেনি ক'রে।'

—'বেশ কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ উপোস করে মরতুম, তবু আড়াই পেনির জন্যে বসে বসে চব্বিশখানা মোজা সেলাই করতে পারতুম না।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'শোন কথা। শুধু সেলাই করা হবে কেন, সঙ্গে সঙ্গে খুলে আবার মেরামত করাও চলে যে।'

ক্রমশঃ হোজ তার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এদিকে এসে পড়ল। উঠানে দাঁড়িয়ে সেলাই-করা মোজা হাতে নিয়ে সব গৃহিণীরা অপেক্ষা করছিলেন। লোকটা—একটা অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক—এসে রহস্য জুড়ে দিলে তাদের সঙ্গে, দাম নিয়ে ঠকাতে চাইলে তাদের, আর কড়া কথা বলতেও কসুর করলে না। ঘেন্না ধরে গেল মিসেস মোরেল-এর, তাড়াতাড়ি উঠান থেকে তিনি উপর চলে গেলেন।···

বাড়ির গৃহিণীদের মধ্যে এরকম একটা বোঝাপড়া ছিল যে, প্রতিবেশিনীকে কখনো ডাকতে হলে উনুনের গায়ে হাতল দিয়ে শব্দ করতে হবে; আর যেহেতু উনুনগুলো ছিল একেবারে গায়ে গায়ে, এদিকে আওয়াজ করলে অন্য দিকে শব্দটা বেশ ভাল রকমই শোনা যেত। একদিন সকালবেলা মিসেস কার্ক পুডিং তৈরি করার জন্যে ময়দা মাখছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন ওপাশের উনুনে খট্ খট্ করে শব্দ হচ্ছে। শুনে একেবারে চমকে উঠলেন। সেই ময়দা-মাখা হাতেই তিনি বেরিয়ে এলেন, পাশের রেলিং-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস মোরেল, তুমিই কি ভাই শব্দ করে ডাকছিলে?'

—'হাঁ, মিসেস কার্ক—একটু আসতে পারবে কি?'

মিসেস কার্ক ছুটে গেলেন। বললেন, 'কি গো, কেমন লাগছে তোমার?'

—'তুমি মিসেস বাওয়ারকে নিয়ে এস।'

মিসেস কার্ক উঠানে গিয়ে তাঁর জোরালো গলা আরও চড়িয়ে ডাকলেন, 'অ্যাগি! অ্যাগি!'

'বটমস্'-এর আর এক মাথা অবধি শোনা গেল তাঁর ডাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাগি দৌড়ে এসে হাজির হ'ল। তাকে মিসেস বাওয়ার-এর কাছে পাঠিয়ে তিনি নিজে রইলেন প্রতিবেশিনীকে নিয়ে। পুডিং তৈরি করা পড়ে রইল।

মিসেস মোরেল শুয়ে পড়লেন। উইলিয়ম আর অ্যানির দুপুর-বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল মিসেস কার্ক-এর ঘরে। মিসেস বাওয়ার তাঁর বিরাট বপু নিয়ে এদিককার সব ব্যবস্থা তদারক করে বেড়াতে লাগলেন।

মিসেস মোরেল বললেন, 'তোমার মনিবের দুপুরবেলার খাওয়ার জন্তে কিছু মাংস কেটে তৈরি করে নাও, আর তা দিয়ে একটু আপেল-চ্যারিয়টের পুডিং তৈরি করে রাখ।'

মিসেস বাওয়ার বললে, 'আজকের দিনটাতে তার পুডিং না হলেও চলবে।'

সাধারণতঃ মোরেল দেরি করে খনি থেকে ফিরত। যারা প্রথম দলে উঠে আসত তাদের মধ্যে সে কোন দিনই থাকত না। অনেক মজুর চারটে বাজতে-না-বাজতেই ব্যস্ত হয়ে উঠত। কিন্তু মোরেল যে খাদে কাজ করত সেটা প্রায় মাইল দেড়েক দূরে,—তাতে কয়লার পরিমাণও ছিল সামান্ত। কাজেই, তাকে প্রায় শেষ অবধি কাজ করতে হ'ত। আজকে কাজ করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। খনির নিচে সবুজ আলো সমস্তক্ষণই জ্বলত—তার আলোয় সে দেখলে ঘড়িতে ছটো বেজেছে। তারপর আবার আড়াইটার সময় সে ঘড়ির দিকে নজর দিলে। তার সাবল দিয়ে একটা পাথরের টুকরো কাটতে কাটতে সে বললে, 'উঃ!' তার সঙ্গে যে লোকটা কাজ করত তার নাম বার্কার।

সে বললে, 'কি হে, আজ তোমার শেষ হবে না নাকি?'

বিরক্ত হয়ে মোরেল বলে উঠল, 'এ কি আর শেষ হবে? সারা জীবনেও নয়।' ব'লে সে আরো জোরে জোরে পাথরটার উপর আঘাত করতে লাগল। তার সারা অঙ্গে গভীর ক্লান্তি।

বার্কার বললে, 'সত্যি এ বড় হাড়ভাঙ্গা কাজ!'

মোরেল এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে কথার আর জবাব দেবার তার ইচ্ছে হ'ল না। গায়ের সব জোর দিয়ে সে পাথরটাকে ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।

বার্কার বললে, 'ওহে ওয়ালটার, আজকে রেখে দাও। পাথর ভাঙতে গিয়ে নিজের হাড়গোড় ভেঙ না। বরং কালকে করলেই চলবে।'

'কালকে আর কোন শালা এ-কাজে হাত দেবে!' মোরেল চীৎকার করে উঠল।

বার্কার বললে, 'তুমি না কর অন্ত কারুকে করতেই হবে।'

মোরেল তবু আঘাতের পর আঘাত করেই চল্লো।

পরের খাদ থেকে লোকজন সব চলে যাচ্ছিল। তারা যেতে যেতে বলে গেল, 'ওহে আমরা চললুম!'

মোরেল তবু তার কাজ থামালে না। এর পর বার্কারও চলে গেল। সে চলে যাবার পর একা একা মোরেল যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে—ঘামে সারা শরীর গেছে ভিজে। সাবলটা রেখে এবার সে উঠল। কোটটা পরে নিয়ে, বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে, লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে চলে এল। দূরে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে অন্ত মজুররা হেঁটে চলে যাচ্ছে—তাদের হাতের লণ্ঠনগুলো দুলতে দুলতে চলেছে। অনেক লোকের কথা মিলিয়ে কেমন একটা গমগম আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে। এখনও মাটির তলা দিয়ে অনেকটা তাকে হেঁটে যেতে হবে।

খনির নিচে বসে বসে সে টের পেল উপর থেকে জলের বড় বড় ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছে। উপরে যাবার জন্তে অনেক খনির মজুর সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাদের গল্পগুজবে সেখানে কান পাতা দায়। মোরেলকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে অতি সংক্ষেপে রুক্ষভাবে তার উত্তর দিচ্ছিল।

বুড়ো গাইলস উপর থেকে খবর নিয়ে এসে বললে, 'ওহে, মশায়রা, বৃষ্টি পড়ছে যে।'

এবার মোরেল তবু একটু সান্ত্বনা পেল। তার পুরনো ছাতাটা উপরেই রয়ে গেছে, আলো রাখবার ছোট ঘরখানাতে। ছাতাটা তার বড় আদরের।···

খানিক বাদে সে ভারার উপর গিয়ে দাঁড়াল, আর এক টানে উঠে এল উপরে। সেখানে হাতের বাতিটাকে রেখে ছাতাখানা নিলে। সেবার নিলামে এক শিলিং ছ'পেন্স দিয়ে এই ছাতাটি সে কিনেছিল। ছাতাটি হাতে নিয়ে সে খনির শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলে অঝোর-ধারে বৃষ্টি পড়ছে। ধূসর জলের ধারা। খোলা গাড়ীর উপর ভিজে কয়লাগুলো চকচক করে উঠছে। কোম্পানীর নাম লেখা কয়লার গাড়িগুলোর উপর দিয়ে বৃষ্টির স্রোত বয়ে চলেছে। মজুররা সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে চলেছে, বৃষ্টির দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। রেল-লাইন ছাড়িয়ে তারা চলেছে মাঠের উপর দল বেঁধে। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে সব কিছু। মোরেল ছাতাটা খুলে ফেলল। টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছে ছাতার উপর—মোরেলের খুব আনন্দ হতে লাগল।

বেষ্টউড অবধি সারা রাস্তা মজুররা হেঁটে চলল। তাদের দেহ বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা, সারাদিনের খাটুনিতে ময়লা; কিন্তু তবু তাদের কথাবার্তায় প্রাণের অভাব নেই। মোরেলও একটা দলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল, কিন্তু তার মুখে কথা নেই। যেতে যেতে দু'-একবার সে বিরক্ত হয়ে মুখ-চোখ কুঁচকে তুললে। পথের মাঝখানে ছটো মদের দোকান—অনেক মজুর ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। কিন্তু মোরেল-এর মেজাজ আজ এত খারাপ যে, মদের নেশাও তাকে আকর্ষণ করতে পারলে না। সে হেঁটে চলল। পার্কের প্রাচীরের উপর টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছে পাশের গাছগুলো থেকে। তার নিচে দিয়ে গ্রীণহিল লেনের কাদা মাড়িয়ে সে এগিয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিসেস মোরেল বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন—তার সঙ্গে ভেসে আসছিল শ্রমিকদের ফিরে-আসার পদধ্বনি, তাদের কথাবার্তা, যখন তারা মাঠ পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকে তখন তাদের ফটকের খটাখট আওয়াজ। মিসেস বাওয়ারকে ডেকে তিনি বললেন, 'শোনো, ওই ভাঁড়ার ঘরের দরজার পেছনে কিছু বীয়ার আছে। তোমার মনিব যদি রাস্তায় কোথাও কিছু না খেয়ে আসেন, তাহলে বাড়ি ফিরে এলে তাঁকে কিছু পানীয় দিতে হবে।'

তার আসতে দেরি দেখে মনে মনে তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে নিশ্চয়ই সে কোথাও মদ খেতে বসে গেছে। তার উপর আজ আবার বাদলার দিন। স্ত্রী কিম্বা ছেলেপুলেরা কেমন রইল এ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার গরজ কি?

ছেলেপুলে হবার সময় মিসেস মোরেল খুব অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

বিবর্ণ, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শুয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হ'ল?'—

—'ছেলে গো, ছেলে।' [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সারিডন খেয়ে ব্যথা দূর করুন

এতে অ্যাস্‌পিরিন বা মাদকপদার্থ নেই

··খাওয়ার পর অবসাদ আসে না

মাথাধরা, দাঁতব্যথা বা শরীরে অন্য কোন রকম ব্যথা-বেদনা হলেই সারিডন খাবেন। কত তাড়াতাড়ি আর কেমন নিঃশেষে ব্যথা কমিয়ে দেয়, দেখে আশ্চর্য হবেন অথচ এ থেকে কোনো কুফলের আশঙ্কা নেই।

অ্যাস্‌পিরিন বা মাদকপদার্থশূন্য খুব সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট উপাদানে সারিডন তৈরী। কাজেই এর দাম একটু বেশী হলেও বেশী দেওয়াটা সার্থক হয়!

সর্দি আর জ্বরে: সারিডন জ্বর কমায়, সর্দিকাশির অস্বস্তি দূর করে। বিরক্তিকর ঘাম বা পেটের গণ্ডগোল আনে না।

যন্ত্রণাভরা দিন ক'টিতে: সারিডন খেলে মেয়েদের মাথাধরা, কোমরব্যথা ও ক্লান্তিভাব চট্ ক'রে দূর হয়।

মৃদু উত্তেজক: সারিডন খেলে আপনি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন, সুস্থ ও সবল বোধ করবেন। শারীরিক যন্ত্রণা বা অনিদ্রা-জনিত অস্বস্তি এতে সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।

VB 8453
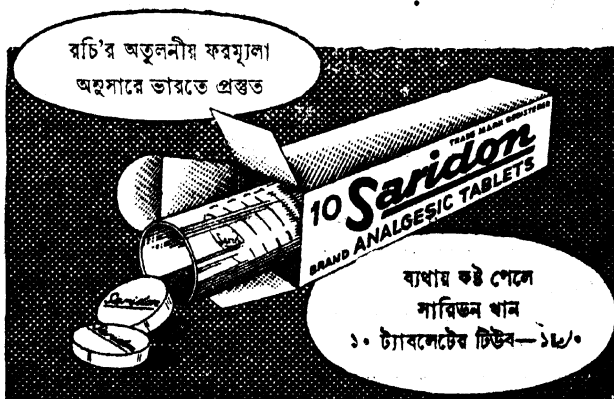
আনন্দময়ী মা

নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

তখন তিনি ছোট

এ মেয়েটাকে নিয়ে মহা জ্বালা। একেবারেই বেদিশে। কোন বুদ্ধিশুদ্ধিই ওকে বিধাতা দেননি। আমার যেমন পোড়া-কপাল।—বিধুমুখী মনের খেদে বলছেন। রোজই বলে থাকেন। নতুন কিছু নয়। ভাত খাওয়াতে বসালেই এই কাণ্ড।

তিন কি সাড়ে তিন বয়েস তখন। মেয়েটি কিছু বলতে পারতেন না বা বলতেন না। পরে বড় হলে এই সব কথা উঠলে বলছেন, "ছোটবেলায় ভাত খেতে বসালেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে মন্দ বলতেন, 'খেতে বসে খাওয়ার দিকে লক্ষ্য নেই, ওপর দিকে চেয়ে আছে।' আমি কিছু বলতে পারতাম না। এখন বলতে পারছি তাই বলছি, আমি দেখতাম কত দেব-দেবীর মূর্তি আসছে-যাচ্ছে।"

পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার খেওড়া গাঁ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। রাত প্রায় তিনটে। বিপিনবিহারী ভটচাজ্যি আর তাঁর স্ত্রী বিধুমুখীর (১) ঘরে জন্ম নিলেন এই মেয়েটি। বিপিন-বিহারীর সব মিলে আটটি ছেলেপুলে। প্রথম দু'জন মেয়ে, তারপর তিন ছেলে হয়ে দু'মেয়ে। শেষে এক ছেলে। ইনি দ্বিতীয়।

বিধুমুখীর প্রথম মেয়েটি অল্প দিনেই চোখ বুজল। নির্মলাসুন্দরী এলেন। বিধু ভয়ে ভয়ে বাঁচেন না, কি জানি কি হয়। পরদিন ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি তুলসী-তলায় দিয়ে আনলেন গড়াগড়ি। পুরো আঠারটি মাস রোজ চলল এই ধারা।

মার পেট থেকে পড়ে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় চীৎকার লাগিয়ে দেয়। নির্মলার সে সব নেই, একেবারে চুপ।

প্রথম মেয়ে হওয়ার কিছু কাল পরে কর্মকাজ পেয়ে বিপিনবিহারী বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকে বছর তিনেক তাঁর আর পাত্তা নেই। বিধুমুখী খেওড়াতে (১) পড়ে রইলেন। মেয়েটি গেল মারা। বিপিনের সাড়াশব্দ নেই। খবর কিন্তু যথাসময়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিন বছর বাদে ফিরলেন। এর কিছু দিন পরে ইনি গর্ভে আসেন। এ সম্বন্ধে বলেছেন নিজেই, "বাবার বৈরাগ্য-ভাবের মধ্যেই আমার জন্ম হয়।...শুনেছি বাবার অল্প বয়সেও সংসারের প্রতি আসক্তি খুবই কম ছিল। বিয়ের আগেও একবার বের হয়ে গিয়েছিলেন। ধরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। পরে বিয়ে করান হলে আবার বের হয়ে গিয়েছিলেন।...বাবা আমাদের নিয়ে মেশামিশি মোটেই করেননি।...আপন ভাবে ভগবৎ-ভাবের গানেই তিনি ডুবে থাকতেন। বিয়ে করবার পরও শুনেছি, অনেক রাত্রে তিনি বাড়ী আসতেন না, গানে কাটাতেন।"

বিপিনের মা নাকি কুমিল্লায় কসবার বিখ্যাত কালীবাড়ীতে নাতি হোক প্রার্থনা করতে গিয়ে নাতনি হোক করে ফেলেছিলেন। তার পরেই নির্মলা এলেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই কীর্তন শুনলে তাঁর শরীরটা কেমন করে উঠত। তিনি বলেছেন, (কীর্তন শুনে) "শরীরের অস্বাভাবিক একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘর অন্ধকার। বাবা-মা কেউ দেখতে পায়নি। আর আমারও কেমন একটা ভাব ভিতরে থাকত, কেউ যেন না দেখে।"

পড়শী চন্দ্রনাথ ভট্টচাজ্যির বাড়ী কীর্তন। শুনতে গেছেন বিধুমুখী, কোলে নির্মলা, দু'বছর দশ মাস বয়েস। ঢুলছেন ত ঢুলছেন, কেবলই ঢুলছেন মেয়ে। সাধন-জীবনে তাঁর মুখ থেকে এ সম্বন্ধে শুনতে পাওয়া গেছে, "এখনও যেমন কীর্তনে অবস্থা হয়, তখনও তেমনই হত। বোধ হয় সময় না হওয়ায় তখন প্রকাশ হয়নি।"

বড় হয়ে উঠেছেন। চলতি নিয়ম হিসেবে পাঠশালায় যাওয়া আরম্ভ হল। বিধু একদিন বললেন, যেখানে কমা বা দাঁড়ি আছে, পড়বার সময় সেখানে একটু থামতে হয়। আদেশ পালন করতে গিয়ে নির্মলা কমা বা দাঁড়ির আগ পর্যন্ত এক নিশ্বাসে হুড়মুড় করে সব পড়তেন। মাঝখানে নিশ্বাস পড়ে গেলে প্রথম থেকে আবার আরম্ভ হত।

ছোট বেলায় গ্রামে ভোর বেলা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা যখন খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে বাড়ী-বাড়ী গান গেয়ে যেত, নির্মলা তাদের পেছনে পেছনে দৌড়ে যেতেন।

বার বছর দশ মাস বয়েসের সময় খেওড়ায় এক দিন যথানিয়মে শাঁক বেজে উলু-উলু করে নির্মলার বিয়ে হয়ে গেল রমণীমোহনের সঙ্গে। বিক্রমপুরের (এখন পূর্ব-পাকিস্তানে) আটপাড়া গাঁয়ের জগবন্ধু চক্রবর্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী রমণীমোহনের বাপ-মা। রমণীরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন।

বিয়ের পর রমণীমোহন স্ত্রীকে পড়বার জন্যে দু'-একখানা বই এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু সংযুক্ত অক্ষর, লাইন, ছন্দ—বই পড়া তাঁর আর হয়ে উঠল না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় অতি সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলেন। তার পর আর কিছু হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে যে দু'-একখানা বই ছাপা হয়েছে তাতে পরবর্তী জীবনে তাঁর নিজের হাতের লেখা কিছু কিছু চিঠিপত্র বের হয়েছে। সেই সব চিঠিপত্রে অজস্র বানান ভুল থেকে তাঁর লেখাপড়া সম্বন্ধে এই ধারণাই করা যেতে পারে।

রমণীমোহন অল্প মাইনের পুলিশে কাজ করতেন। বিয়ের পরই

---

(১) আর এক নাম মোক্ষদাসুন্দরী।

(১) পৈতৃক ঘর বিদ্যাকূট গাঁয়ে, খেওড়ায় বিপিনের মামাবাড়ী।

সেটি গেল চলে। ক'বছর কেটে গেল; বেকার—কাজ নেই। রমণীর বড় ভাই রেবতীমোহনের কাছে নির্ম্মলা থাকতে লাগলেন। রেবতী রেলের ষ্টেশন-মাষ্টার, ঢাকা-জগন্নাথগঞ্জ লাইনে আজ এখানে কাল ওখানে করে বেড়াতেন। এই ভাবে চার বছর চলে গেল।

ভাসুরের কাছে নির্ম্মলাকে ঘর-সংসারের সমস্ত কাজই নিজের হাতে করতে হত। তা ছাড়া ভাসুরের যত্ন-আত্তি। রেবতীমোহনও তাই তাঁকে যার-পর-নাই ভালবাসতেন। নির্ম্মলা এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, সব সময় মাথায় থাকত ইয়া বড় এক ঘোমটা, পা আর হাতের পাতা ছাড়া আর কিছু দেখা যেত না। ভগবৎ-ভাবে এমন বেহুঁশ হয়ে থাকতেন যে, রান্না করতে গিয়ে কখন কখন মোটে খেয়ালই থাকত না। রান্নার জিনিষ প্রায়ই ধরে যেত। বাড়ীর লোকদের কাছ থেকে খেতেন বকুনি। তাঁরা মনে করতেন বউ বড় ঘুমকাতুরে। কিন্তু তর্কাতর্কি, প্রতিবাদ বা কর্কশ ব্যবহার করতেন না বলে এ সব সত্ত্বেও সকলেই তাঁকে ভাল না বেসে পারতেন না।

ভাসুর মারা যাওয়ার পর আটপাড়া, বিদ্যাকুট, অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর নানা জায়গায় বিভিন্ন সময়ে ছিলেন। উনত্রিশ বছর বয়স থেকে ঢাকায় বাস করতে লাগলেন। এখানে অনেক বছর একনাগাড় ছিলেন। আগে কারো সঙ্গে কথা কইতেন না। পরে স্বামীর আদেশে ও অনুরোধে আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে আরম্ভ করেন। ইনি কেবলই ভারতবর্ষময় ঘুরে-ঘুরেই বেড়ান; কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকেন না। বর্ত্তমানে বয়েস আটান্ন বছর।

সাধন যখন চলছে

"বেটি, তুই এত বড় পাষাণী! আমি এই এক বৎসর যাবৎ তোকে কথা বলবার জন্য বলছি, তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস না। আমি যদি পাষাণের কাছে গিয়ে এ ভাবে মা বলে ডাকতাম, পাষাণেও আমি প্রাণ-সঞ্চার করতে পারতাম। ছেলের কাছে মার লজ্জা, এ আবার কি কথা?"—হরকুমার রায় (১) এক দিন বলেই বসলেন নির্ম্মলাকে।

বাজার করা, শুকনো কাঠ এনে দেওয়া, যত রকমের সুবিধে করতে পারা যায় হরকুমার করতেন। আর রোজ দু'বেলা নির্ম্মলাকে প্রণাম, এ ত তাঁর একেবারে বাঁধা। নির্ম্মলা খেতে বসলেই প্রসাদের জন্যে হাত পেতে বসে থাকতে থাকতে হরকুমার হয়রাণ হয়ে যেতেন। কিন্তু প্রসাদ তাঁর হাতে পড়ত না। কথাও তাই। শত অনুরোধ-উপরোধ করেও কথাটি বলাতে পারতেন না।

আর এক দিন হরকুমার বলেছিলেন, "বেটি, তুই দেখবি, আমি তোকে মা বলে ডাকলাম, এক দিন জগৎ তোকে মা বলে ডাকবে।" তখন 'বেটি'র বয়েস আঠার-কুড়ি, থাকতেন অষ্টগ্রামে। হরকুমারের মা যে-ঘরে কিছু দিন আগে মারা গিয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই ঘরে নির্ম্মলার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হরকুমার সেই থেকে তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন।

বাজিতপুরের জানকীনাথ বসুর স্ত্রীর সঙ্গে ইনি 'দিদি' পাতিয়েছিলেন। এক দিন সেই উষা দিদি বলছেন, "তোমাকে আমার 'মা' ডাকতে ইচ্ছে করে।" এই মহিলা সেদিন উত্তর দিলেন, "তুমি কেন, এক দিন জগতের বহু লোক এ-দেহকে মা বলে ডাকবে।"

রমণীমোহনের কাছে কেমন ভাবে থাকতেন প্রশ্ন করে জানা গেছে, "পিতার কাছে পুত্রী যেমন থাকে, ভোলানাথের কাছে আমি তেমনই থাকতাম।

"প্রথম দিকটায় ভোলানাথ (রমনীমোহন) এই শরীরের ভাবগতিক দেখে বলতেন, তোমার বয়স কম, আরও একটু বয়স বেশী হলে তোমার সব ভাব ঠিক হয়ে যাবে। আরও একটু বেশী বয়সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। ভোলানাথ সেই আশাতেই ছিলেন। কিন্তু একটু বয়স হলেও যখন এই শরীরের ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন দেখলেন না, তখনই ডাক্তার দেখাবার কথা বলেছিলেন।

আনন্দময়ী মা

(১) ময়মনসিং-এ অষ্টগ্রামের জয়শঙ্কর সেনের শালা হরকুমার রায় ধার্মিক ও চাকুরিজীবী। মধ্যে মধ্যে মাথা ঠিক থাকত না, পাগল হয়ে যেতেন।

"কখনও আবার এমনও হয়েছে—কাঠ, পাথর বা গাছপালা ছুঁয়ে যেমন তৃপ্তি হয় না, সেরূপ এই শরীরটারও জাগতিক ভাবের কোনই সাড়া না পেয়ে (রমণীমোহন) আশ্চর্য হয়ে গেছে।"

পতিকেও ত্যাগ করে যাননি। এক বিছানাতে একসঙ্গে শুয়েছেন বহু দিন, নিশ্চিন্ত নির্ভয় নির্বিকার। বলেন, "কাকে কোথায় সরাব? জায়গা কোথায়? অন্য জায়গা বলে ত এই শরীরের কাছে কিছু নেই।"

ভোগে নিস্পৃহতা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল। তিনি বলেন, "এই যে একটা স্পর্শসুখ সকলেই ভোগ করে, পিতা-মাতা ভাই-বোন শিশুকে জড়িয়ে ধরে, এই শরীরটার গতি কখনও সেই রকম হয়নি। এখন চারদিকেই দেখি, এমন কি সন্তান মাকে জড়িয়ে ধরে কত আনন্দ পায়, আমি মার কাছে যে শুয়ে থাকতাম, মার দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকতাম।"

সাধন-যুগের কোন এক সময়ে, জানা গেছে, "অঙ্গস্পর্শ করার দরকার হত না। বিছানায় শুয়ে আছি, ভোলানাথের কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন মাত্রই এই শরীরটায় অস্বাভাবিক অবস্থা হত।

"যেমন সাধকদের নিকট কোন কুভাবাপন্ন লোক গেলে তা বুঝতে পারে, নিজের শরীরেই সেই উত্তাপ অনুভব করে তাই হত। ভোলানাথের ভিতরে কোন রকম জাগতিক ভাব জাগবা মাত্র এই শরীরে জ্বালা অনুভব হত, এমন কি কাছে বসলে পর্যন্ত শরীর কেমন হয়ে যেত। যেন অবশ অসাড় ভাবে এলিয়ে পড়ে যেত।"

রমণী হয়ত কাছে শুয়ে আছেন, মনের বিকারের এতটুকু আভাস মাত্রই নির্মলার শরীর বেঁকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া, কত রকম আসন আপনা থেকে আরম্ভ হয়ে যেত। তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা নেই, খাওয়া নেই, কিছু নেই। শরীর পড়ে আছে মড়ার মত! রকম-সকম দেখে কে না ভয় পাবে? রমণীমোহনের ত চক্ষু চড়কগাছ!

বিয়ের পরের ও সাধন-যুগের আগের সময়ের কথায় কোন রকম লজ্জার বালাই না রেখে বলেছেন, "ভোলানাথ ত এ-শরীর নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।"

নির্মলাসুন্দরীর মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভের এতটুকু কোন দিন না দেখে তাঁর স্বামী অবাক হয়ে ভাবতেন, এ কি অদ্ভুত, এ রকম শোনাই যায় না। ইনি কখন তাঁকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "হয়ত দরকার নেই।" সমানবয়েসী মেয়েদের কাছ থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের অন্ত থাকত না। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কেউ কোন দিন কিছু বলতে বা বোঝাতে দেখেনি, আপন মনে চুপচাপই থাকতেন।

এই পরিপূর্ণ সংযম তিনি চেষ্টা করে অথবা করা উচিত মনে করে যে পালন করতেন, তা মোটেই নয়। বলছেন, "এটা ভোগ বা ওটা ত্যাগ করব, এ ভাব কিন্তু নয়। এ পথ দিয়ে শরীরটা চলেছে, বোধ হয় তাই তোমাদের দরকার, তাই শরীরের গতি এরূপ হয়ে গিয়েছে। যদি বল, কেন সব ভোগ শরীর দিয়ে হল না, এই কেনর কোন অর্থ নেই।"

নিন্দুকের কোন দিনই অভাব হয় না। এই মেয়েটির সম্বন্ধে কেউ কেউ তেমনই নিন্দে করতে ছাড়েনি। তার উত্তর তীক্ষ্ণ ভাবে দিয়েছেন রমণী,—"তাঁকে (নির্মলাকে) যার বছর দশ মাস বয়েসে বিয়ে করেছি। আজ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা কখনও দেখিনি, তাই আমি নিঃসন্দেহে তাঁকে জগতের সকলের কাছে ছেড়ে দিয়েছি।"—নির্ভীক ভাবে ও নিঃসঙ্কোচে।

বিয়ে হল, ছেলেপুলে হচ্ছে না। পাঁচ জনে ভেবেই আকুল। হিতৈষী ও গুরুজনদের কেউ আনলে মাদুলি, কেউ করলে তুকতাক। স্বামী ভাবলেন, আবার বিয়ে করি। এক দিন বলেই বসলেন স্পষ্টাস্পষ্টি—"তোমার দ্বারা ত আমার সারা জীবনই এই ভাবে কাটল, এখন আমি অন্য বিয়ে করে আশ্রয় নেব কি না দেখি। স্ত্রী কিন্তু এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা-যত্নে লেগে থাকতেন যে, এ চিন্তা তাঁর মন থেকে শীগগিরই মুছে গেল।"

[ক্রমশঃ।

ট্রেন

ভেরা পানোভা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডাক্তার বেলভ ইগরের খবর পেলেন। লেনিনগ্রাদ থেকে একটা চিঠি এলো—এত দিনে ঐ একখানি মাত্র চিঠি। পাঁচই সেপ্টেম্বরের তারিখ দেওয়া। ডাঃ বেলভের হাতে চিঠিটা পৌঁছালো ১লা জানুয়ারী। নববর্ষের দিন। সোনেচকা লিখেছে ক্রমেই ভেঙে পড়ছে ও, কিন্তু তাই নিয়ে ডাক্তার যেন না ভাবেন। বাড়ীর তলায় একটা খুব ভালো আশ্রয় তৈরী করেছে বোমা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য। সোনেচকা আরও জানতে চেয়েছে, ডাক্তারের জামা-কাপড় কে কেচে দেয়—কিডনীতে যে পাথুরীর যন্ত্রণা হোতো সেটা কেমন আছে—(হায় ভগবান—নিজের কিডনীর কথা ডাক্তারের মনেই ছিল নাকি?)। সোনেচকা লিখেছে, এক দিন আগে ইগরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে। সে স্কোভ থেকে একটা ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে ফিরেছে। তবে জার্ম্মাণদের না হারিয়ে সে ঘরে ফিরবে না। "আমি ইগরের চিঠিতে একটুও আশ্চর্য্য হইনি", সোনেচকা লিখছে, "আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, তিন মাস আগেও ইগর রাত করে বাড়ী ফিরলে আমি দুশ্চিন্তায় পাগল হোয়ে উঠতাম আর আজ আমার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।"

চিঠির শেষে লায়লার হাতের কয়টি লাইন।—জানিয়েছে, মা ভালোই আছে আর সে একটা মিলিটারী হাসপাতালে রেজিষ্ট্রারের কাজ নিয়েছে। ইগর যা করছে সেটাতে লায়লা খুবই খুসী তবে ওর দুঃখ এই যে, ইগর একটি বারও বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলো না বাড়ীতে। এর পর আর কোনো চিঠি নেই।

যখন লেনিনগ্রাদ অবরোধের খবর এলো, তার পর শোনা গেলো খাদ্যের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে লেনিনগ্রাদে—সুরু হোয়েছে উপবাস, তখন ডাক্তার দুর্ভাবনায়, চিন্তায় পাগলের মত হোয়ে উঠলেন। আহারে রুচি চলে গেলো ডাক্তারের। সমস্ত খাবার যেন গলায় আটকে যেতো, খিদে থাকলেও খাওয়া যেতো না। এই সময় কিন্তু দানিলভ অনেক করেছিলো ডাক্তারের জন্যে।

—"আপনার পরিবার কি এখনও লেনিনগ্রাদে না বাইরে চলে গেছে?"

—"না, যায়নি"—ডাক্তার বললেন—"আমরা একেবারে ভাবতেই পারিনি এমন হবে—"

—"ঠিক আছে, চেষ্টা করছি যাতে একটা খাবারের পার্শেল পাঠানো যেতে পারে"—দানিলভের স্বরে আশ্বাস।

পারেও ঠিক সব ব্যবস্থা করতে। কত কাণ্ড করে, এক বন্ধুকে দিয়ে তার মেয়ের কোনো এরোপ্লেন-অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হোয়েছে, তার মারফৎ সোনেচকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে একটি খাবারের প্যাকেট। তাতে ছিলো অনেক কিছু—রাস্‌ক, ময়দা, মাখন, আরও কত কি। ডাক্তার জানতেও পারলেন না প্যাকেটটা পৌঁছালো কিনা, তবে পৌঁছেছে ভাবাই ভালো। আর পাঠাবার পরই মনে বেশ একটা তৃপ্তি হোলো, মনে হোলো যেন সোনেচকার আর লায়লার উপবাসক্লিষ্ট মুখে আহারের পরিতৃপ্তি এনে দিলেন। তার পর থেকেই ডাক্তার যখন যা পেতেন সোবোলের কাছ থেকে, বিস্কিট চিনি যাই হোক না, জমিয়ে রাখতে সুরু করলেন। মনে মনে ঠিক করলেন দানিলভকে দিয়ে আর একবার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কেটে গেলো অনেকগুলো দিন। কোনো খবর নেই, কোনো চিঠি নেই লেনিনগ্রাদ থেকে। মাসে দু'বার করে চিঠিপত্রের ডাক আসতো ট্রেনে। কিন্তু ডাঃ বেলভের একটি চিঠিও থাকতো না।

তবু ডাক্তার বেলভের প্রকৃতিটা ছিলো আশাবাদী। দুশ্চিন্তা হলেও খুব বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোয়ে পড়তেন না। লেনিনগ্রাদের অবস্থা ওরি মধ্যে একটু ভালো হোলো। অনেক লোকই লেনিনগ্রাদ ছেড়ে বাইরে আসতে পেরেছে। ডাক্তার নিজেই তো দেখেছেন এক ট্রেন বোঝাই···কিন্তু কী ভীষণ অবস্থা···উঃ, ধারণা করা যায় না কী অবস্থা! অত্যাচারিত মুমূর্ষু লোকগুলো, তার উপর না খাওয়ার দরুণ পেটের অসুখে ভুগছে প্রত্যেকে। বাচ্চাগুলোর চেহারা অবধি যেন শুকিয়ে গেছে। নেমে এসেছে অকালবার্দ্ধক্য ওদের দেহে-মনে।···কিন্তু সোনেচকা আর লায়লা? নাঃ, ওরা তো খাবার পেয়েছে। নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে এত দিনে—দানিলভ নিজে পাঠিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই তাহলে পেটের অসুখে ভুগছে না। শুধু চিঠিগুলোই যা এসে পৌঁছচ্ছে না।

কিম্বা হোতেও তো পারে যে, লেনিনগ্রাদের অবরোধের আগেই ওরা বেরোতে পেরেছে। সোনেচকা তো অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে··· এখন তাহলে ওরা বোধ হয় উরালের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। লায়লার চেহারা তো তাহলে আরও ভালোই হবে, একেই সুন্দর স্বাস্থ্য আর টুক্‌টুকে গোলাপী রঙ ওর···

শীগগিরই আসবে চিঠি। নিশ্চয়ই আসবে, এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। হয়তো আসছে ডাকেই এসে যাবে। একসঙ্গে একতাড়া চিঠি···একটা তার মধ্যে ইগরের চিঠিও থাকবে না কি আর? ওর মা নিশ্চয়ই এত দিনে এখানকার ঠিকানাটা ওকে পাঠিয়েছে। ইগরের বোধশক্তি আছে, তাছাড়া বড়ও হোয়েছে—ও কি বুঝবে না যে বাপের মনে আঘাত দিতে নেই। সোনেচকাই আবার ওদের মিল ঘটিয়ে দেবে।

কবে যে আসবে আবার সেই দিনটি। আবার সেই ছোট্টো খাবার-ঘরটিতে টেবিলের ধারে চার জনে বসবে। শেডের তলা থেকে আলো এসে পড়বে পরিচিত প্রিয়মুখগুলিতে···আসবে কি দিনটা? আবার আসবে···?

"হ্যাঁ আসবে"—চোখের সামনে ভেসে উঠে দানিলভের স্থির ঋজু আদেশব্যঞ্জক মূর্ত্তি। নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ভরা।—"এতে কোনো সন্দেহ আছে নাকি"—জুলিয়ার শান্ত গর্ব্বিত মুখের উঁচু করে তোলা ভ্রূ দুটিতে ঐ প্রশ্নটাই ফুটে উঠলো। "বা রে! সেদিন ফিরে আসবে বৈ কি, নিশ্চয়ই আসবে। আসবে। আসতেই হবে"—লেনার দুষ্টুমি-ভরা কৌতুকোচ্ছল মিষ্টি মুখখানা জেগে ওঠে। শুধু সুপ্রাগভের মুখখানা—না, কোনো আশ্বাস দেয় না—তার উপর লেখা সেই চিরন্তন—"কে জানে হয়ত আসবে···নাও আসতে পারে···"

যদি দানিলভকে জিজ্ঞাসা করা যেতো যে কত দূর লেখাপড়া তুমি করেছো, সে বলবে—প্রাথমিক বিদ্যেটুকুই।

ঠিক কথাই—গ্রামের চাষী-ঘরের ছেলে সে। আঠারো বছর বয়সের আগে কখনও গ্রামের বাইরে পা দেয়নি—লেখাপড়াও ঐ প্রাথমিক স্কুলে—তার দৌড় লিখতে শেখা, অঙ্ক কষা আর ধর্ম্মপুস্তক পড়া—একটি শিক্ষকই সব কিছুই শেখাতেন। কিন্তু কথাটা ঐখানেই শেষ নয়—কারণ, বিপ্লবের পর থেকে যখন সে কম্যুনিষ্ট যুবকসঙ্ঘে যোগ দিলে, তার পর পার্টিতে, আরও পরে রেড আর্মিতে—তখন থেকে তার পড়াশোনাও সমান ভাবে চালাতে হোয়েছিলো। বিভিন্ন চক্রে, বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাকেন্দ্রে। সারাক্ষণ কাজে ডুবে থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনার সংস্রব দানিলভ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়েনি—তাই জ্ঞানের পরিধিও ওর কিছু কম ছিলো না।

গ্রামে কাজ করার সময় কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা ও নিয়েছিলো। এখন 'হসপিটাল ট্রেনে' ওর সবচেয়ে উৎসাহ চিকিৎসা-বিষয়ক বইগুলির দিকে। ডাঃ বেলভ ওর আগ্রহ দেখে কয়েকখানি

বই ওকে পড়তে দিয়েছিলেন। প্রথমটা মোটা মোটা বইগুলো দেখে ওর মনে হোয়েছিলো, কি জানি ডাক্তারী ভাষাটা সব বুঝতে পারবে কিনা—কিন্তু পড়তে গিয়ে প্রথম থেকেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন জগৎ ওর কাছে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান দিলে। এমন কি, দানিলভের পড়তে পড়তে মনে হোলো আজ এই ১৯৪২ সালে বসে ওর যা চিন্তা —সেই ১৮৫৪ সালে সিবাস্তিপোল যুদ্ধের লোকেরা সেই একই চিন্তা করেছিলো।—সেটা হোলো আহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনার সুবন্দোবস্ত।

পিরোগভের বইটা পড়তে পড়তে দানিলভ ভাবলে নব্বই বছর আগে পিরোগভ কি আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত অপারেশনের যন্ত্রপাতি, ডিস্‌পেন্সারীশুদ্ধ এই রকম একটি 'হসপিটাল ট্রেনে'র কথা ভাবতে পেরেছিলো? কিন্তু এখনও আরও অনেক উন্নততর ব্যবস্থাই তো করা যেতে পারে—ভাবতে ভাবতে দানিলভের হাত দুটো আবার কিছু নতুন কাজ করবার জন্ম নিশ্‌পিশ্‌ করতে লাগলো।

হঠাৎ কেমন যেন ট্রেনটার উপর ওর বিতৃষ্ণা ধরে গেলো—প্রথমটা এর কারণটা বুঝতে পারলে না, পরে হঠাৎ মনে হোলো—ট্রেনের পর্দ্দা, চাদর, টেবলক্লথ ইত্যাদি যাবতীয় বস্ত্রখণ্ডগুলিই এর কারণ। কাচতে দেওয়া হয় যেখানে, সেখানে লোকের অভাব তাই ওগুলি ময়লা, ছেঁড়া অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে।

জুলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে দানিলভ।—"আচ্ছা, তোমার ডিসপেন্সারীর সব কাপড়, পর্দ্দা ইত্যাদি এত পরিষ্কার সাদা থাকে কি করে?"

—"ক্লাভা যে নিজের হাতে ও-সব কাচে। আমি কি ময়লা ওভারল পড়ে কাজ করতে পারি, না কোনো ডাক্তারকেই পরতে দিতে পারি?"

—"তুমি কি ভাবো, আহত রোগীরা ময়লা বিছানায় শুতে পছন্দ করবে?"

—"সে বিষয়েও আমি ভেবে রেখেছি—সবচেয়ে ভালো হয় যদি কাপড়-চোপড় কাচার ব্যবস্থাটা আমরা নিজেদের মধ্যেই করে ফেলি—"

—"আচ্ছা? তাহলে ভেবেছো যদি এত দিন চুপ করে ছিলে, বলনি কেন? তোমার বলা উচিত ছিলো—"

—"বেশ তো! আমার তো মনে হয় ট্রেনে আর কয়েকটা বন্দোবস্ত আমাদের করা উচিত। প্রথমতঃ একটা পরিশোধনাগার থাকা উচিত নয় কি?"

পরিশোধনাগার? অর্থাৎ বীজাণুনাশের ব্যবস্থা? কথাটা কিন্তু মন্দ বলেনি জুলিয়া, ভাবে দানিলভ। সত্যিই সবচেয়ে জরুরী সেটা। প্রায়ই তো দেখে, স্যানিটারী-কেন্দ্র থেকে যে সব ড্রেসিং-গাউন, কম্বল পাঠানো হয় সেগুলি লরীতে করে ষ্টেশনে আসে, তার পর হাতে হাতে ট্রেনে তুলতে দু'-একবার যে মাটীতেও লুটোয় না এমন নয়। প্রায়ই দেখা যায় তেলের দাগ, কয়লার দাগ লাগা। খুব উচিত ঐগুলিকে একবার শোধন করে রোগীদের ব্যবহার করতে দেওয়া।

এক সময় আসে সোবোল। দানিলভকে দেখে বলে—"আমি একটা কথা বলতে চাই। এত নষ্ট হোচ্ছে চারদিকে, দেখে সত্যিই আমার রীতিমত কষ্ট হয়—"

—"নষ্ট হচ্ছে? কি নষ্ট হচ্ছে?"

—"কেন? রান্নাঘরের আবর্জ্জনা"—সোবোলের গলার স্বর এবার মিইয়ে আসে। কিন্তু দানিলভের চোখে কৌতুক আর বিস্ময় জাগে।

—"কত জিনিস—সবজীর রাশীকৃত খোসা, খাবারের টুকরো, ঝোল, আরও কত জিনিষ থাকে—সব ফেলে দেওয়া হয়—"

—"সেগুলো নিয়ে কি করতে চাও বলো তো?" দানিলভের স্বরে আশ্বাস।

"কি করতে চাই বলবো"—আশ্বাসের পূর্ণ সুযোগটুকু নিতে চায় সোবোল, আবদারের ভঙ্গীতে বলে উঠে—"এই জন্তু-জানোয়ারগুলোকেও তো খাওয়াতে পারি।"

—"কিন্তু সোবোল এ সব করবে কোথায়? আমাদের তো চাকার উপর বাস করতে হয়—"

—"চাকার উপরই ওদের খাওয়ানোও চলতে পারে তো—"

সোবোলের কথাটা এতক্ষণে বোঝে দানিলভ। রাজী হয়ে যায়, ডাঃ বেলভকে জানায় যে টাট্‌কা মাংস পাওয়াটা 'হসপিটাল ট্রেনে'র পক্ষে ভালোই হবে।

মালগাড়ীতে একটা কামরা খালি করে দুটো শূয়োর পোষা হোলো। কস্ত্রাসিন এ সব বিষয়ে জানে ভালো—ওকেই এই সব কাজের ভার দেওয়া হোলো। সোবোলের মুখে হাসি আর ধরেই না,—"কমরেড কমিশার, আমাদের আর ভাবনা কি? এবার মুরগী পর্য্যন্ত পুষতে শুরু করে দেবো—"

করলেও তাই। কুড়িটা মুরগী আর একটা মোরগ আনা হোলো—তৈরী হোলো জালের ঘর। ডাঃ বেলভ দেখে বললেন,—"ওরা কি অমন করে থাকে? মাটীতে না চরতে পারলে কি হয়?"

—"সে তো সব মুরগীই চরে বেড়ায়, কিন্তু এই মুরগীগুলোকে নতুন পরিবেশে ডিম পাড়া শিখতে হবে—"

অবশ্য আড়ালে দানিলভের কাছে সোবোল স্বীকার করেছিলো ওর ভয়টা—চলন্ত ট্রেনে ওরা ডিম পাড়বে কি না কে জানে! অবশ্য পরে প্রথম ডিমটি হাতে করে এনে সবাইকে দেখিয়েছিলো। সেদিন ওর স্ফূর্ত্তি দেখে কে?

ট্রেনটা যখন খালি চলতো এমনি ভাবে, তখন দেখা যেতো প্রত্যেকটা লোক তুচ্ছ খুঁটিনাটী বিষয় নিয়ে সব সময় মাথা ঘামায়। এই সময় রোগীদের আনবার জন্ম এগিয়ে চলে ট্রেনটা। কিন্তু যেই আহতদের নেওয়া হয় ট্রেনে—মুহূর্ত্তে সমস্ত পরিবেশটাই যায় বদলে। কোথায় থাকে শূয়োরের খোঁয়াড় আর মুরগীর ডিমের চিন্তা···প্রত্যেকটি লোকের মনে জাগে একটা দায়িত্ববোধ, একটা অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, একটা বিরাট ভয়ঙ্কর কি যেন জানায় তাদের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে এই ভাবে, যত দিন না পরাজিত হয় শত্রুপক্ষ। যুদ্ধ যেন তার প্রকৃত রূপ নিয়ে জেগে ওঠে ট্রেনের প্রতিটি কামরায়, আহতদের জন্ম রাখা নরম বিছানার প্রতিটি ভাঁজে, তাদের যন্ত্রণায়, আর্ত্তনাদে, প্রতিটি ক্ষতের মুখে···

ঘাম আর নিঃশ্বাসের গন্ধে বাতাস ভারী হোয়ে ওঠে···পূব থেকে পশ্চিমের পথে যাত্রা শেষ করে ফিরে চলে ট্রেন—আহত সৈন্যদের পৌঁছে দিতে নিরাপদ এলাকায়··· [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

শিক্ষিতা মেয়েদের বেকার সমস্যা

শ্রীমতী রাধা মিত্র

আজকাল শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। আর্থিক অবস্থার অবনতির দরুণ মেয়েদের উপযুক্ত সময়ে পাত্রস্থ করা এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, বাপ-মায়ের সংসারে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিতে অধিকাংশ মেয়েকেই কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দাঁড়াতে হয়েছে। অধিকাংশ বিবাহিতা মেয়েকেও চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বামীর আয়ে সংসার প্রতিপালন সম্ভবপর নয়; তাই সংসারের নানা ঝামেলার মধ্যেও তাঁদের এগিয়ে আসতে হয়েছে কর্ম্মের সন্ধানে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মেয়েরা যে তুলনায় শিক্ষিতা হচ্ছেন, চাকুরীক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছেন সে তুলনায় অনেক কম। এর মুখ্য কারণ অবশ্য কর্ম্মক্ষেত্রের আয়তন প্রশস্ত নয়। কর্ম্মের পরিধি পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও লোকসংখ্যার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, শিক্ষার মান এত নীচু হয়ে গেছে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চাকুরীক্ষেত্রে জয়ী হওয়া অধিকাংশ মেয়েরই ক্ষমতার বাইরে। তাই বেশীর ভাগ মেয়েকেই দেখি, চাকুরীক্ষেত্রে হতাশার মনোভাব নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটাতে। প্রতি বৎসরই বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থ প্রবেশাধিকার তাঁরা পেয়েছেন কি? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বার হন চাকুরীর খোঁজে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তাঁরা পরাজিত হন। তাছাড়া, সব রকম কর্ম্মেরও তাঁরা উপযুক্ত নন। কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা খুবই কম। কেবল সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতা হওয়ার দরুণ তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর। মেয়েদের বেকার সমস্যা আজ সমাধানের পথ খোঁজে। সরকার-পক্ষ থেকে এর প্রতিবিধানের কোন পথ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর স্থান নেই। মেয়েদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মেয়েদের কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিতা করা। কল-কারখানায় কাজ করবার উপযুক্ত মেয়ের অত্যন্ত অভাব। শুধু সাধারণ শিক্ষায় সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হলেই জীবিকা সংস্থানের উপযোগী হওয়া যায় না। জীবিকার সংস্থান করতে হলে কোন না কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিনী হতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করবার উপযুক্ত কেবল তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যাবার প্রবেশাধিকার পাবেন। অল্পায়াসে ফাঁকি-ফিকির দিয়ে পরীক্ষকের চোখ এড়ানো যায়, শিক্ষালাভ হয় না।
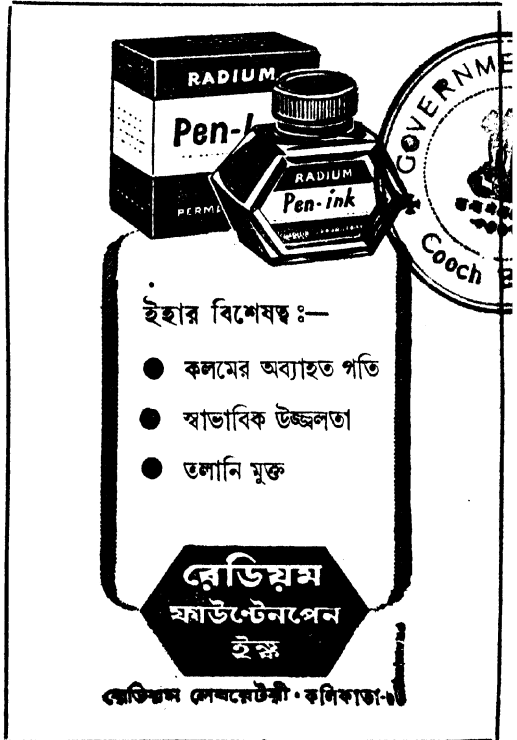
একজন মার্কিণ মহিলার সামনে অসংখ্য কর্ম্মপন্থা খোলা। টাইপিষ্ট, ফটোগ্রাফার, ওয়্যারলেস অপারেটর, টিচার, জার্ণালিষ্ট, সিনেমা আর্টিষ্ট, নার্স—যে কোন পদ তিনি বেছে নিতে পারেন। আমাদের মেয়েদের কর্ম্মস্থান সীমাবদ্ধ। যোগ্যতার ক্ষেত্রেও সকলে সুযোগ্যা নন। অনেক মেয়েকেই আজ নেমে দাঁড়াতে হয়েছে ছায়াচিত্র ক্ষেত্রে। সেখানেও ভীড়। নীতির প্রশ্নও তুলবেন অনেকে। কাজেই ভদ্র গৃহস্থের মেয়েদের চিত্রজগতে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও যোগ্যতা প্রয়োজন। জন্মগত প্রতিভা বা শক্তি না থাকলে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজ নয়।

মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতর করে তুলতে মেয়েদের কয়েকটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। সেখানে মেয়েদের বিভিন্ন কর্ম্মের উপযোগী করে ট্রেনিং দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু এ্যালাউন্স দেওয়া হবে। অধিকাংশ স্কুলেই দেখা যায়, মেয়ে-স্কুলের বা কলেজের সেক্রেটারী, প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদির স্থানে পুরুষ আসীন। মেয়েরা কি নিজেদের বিদ্যায়তনগুলি পরিচালনারও অযোগ্যা? স্কুল-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে সুযোগ্যা মেয়েদের ওপর। আজ মন্তেসরি ট্রেনিং-এর বিশেষ দরকার। ভারতের দু'-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত মন্তেসরি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা কোথাও নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এদিকে নীরব। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও খুব বেশী মেয়েকে দেখা যায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও এ বিষয়ে পৃথক বিভাগের প্রবর্ত্তন করেছেন, তবু মেয়ের সংখ্যা নগণ্য।

আজও দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাগুলির মহিলা-মহল পরিচালনা করেন পুরুষ সম্পাদক। মেয়েদের মত ও পথ মেয়েরা নিজেরা ব্যক্ত করুন—এটাই কি কাম্য নয়? সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে মেয়েদের অপ্রাচুর্য্যই এর কারণ। টাইপিষ্টের স্থানে, টেলিফোন অপারেটরের পদে কিছু মেয়েকে দেখা গেলেও পর্য্যাপ্ত নয়।

অনাথাশ্রম, ম্যাটার্নিটি নার্সিং হোম, চিল্ড্রেনস্ হোম ইত্যাদি পরিচালনার ভারও মেয়েদের ওপর থাকাই যুক্তিসঙ্গত।

বহু শতাব্দীর সংস্কারের বেড়াজালে জড়িয়ে আমাদের মনোভাব হয়ে গেছে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ। মেয়েদের শক্তিকে বহির্জগতে প্রকাশিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছি আমরাই। আজ সে বাধা প্রতি পদে জড়িয়ে ধরে। বৃথাই অপবাদ দিই অদৃষ্টকে।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগল-যুগের ভারত

[এই পত্রখানি ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ১৬৬৩ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের মঁশিয়ে দ্য লা ভেয়ারের কাছে লিখেছিলেন। নৃবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন দ্য লা ভেয়ার। তদানীন্তন ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। বার্নিয়ের ছিলেন দ্য লা ভেয়ারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভেয়ার যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বার্নিয়ের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বার্নিয়েরকে দেখেই মুমূর্ষু দ্য ভেয়ার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: "কি সংবাদ মঁশিয়ে, হিন্দুস্থানের মোগল সাম্রাজ্যের সংবাদ কি, বলুন!"]

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

দিল্লী ও আগ্রা (১)

(বার্নিয়েরের এই পত্রখানি কেবল মোগল সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য নয়, রাজ-দরবারের জীবনযাত্রা, তখনকার লোকসমাজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদির বিশ্বস্ত ও বিস্তৃত কাহিনী হিসেবেও অত্যন্ত মূল্যবান। এককথায়, এই পত্রখানিকেও মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লিখিত পত্রের মতন, ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা চলে)।

মঁশিয়ে,

আমি জানি আমি স্বদেশে ফিরে আসবার পর আপনি প্রথমেই আমাকে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা শহরের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সৌন্দর্যে, আয়তনে ও লোকজনের বসবাসের দিক দিয়ে ফরাসী শহর প্যারিসের সঙ্গে দিল্লী ও আগ্রার তুলনা হয় কি না, সেকথা জানবার জন্য এবং আমার কাছ থেকে শোনবার জন্য আপনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। আপনার সেই ব্যাকুলতা ও কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই আমি এই চিঠি লিখছি। শুধু শহরের বিবরণ নয়, চিঠির মধ্যে এমন আরও অনেক কথা প্রসঙ্গত বলব, যা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য-প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা আমি বলতে চাই। আমি দেখেছি, অনেক সময় ইয়োরোপীয় পর্যটকরা বেশ একটা উদাসীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিন্দুস্থানের এইসব শহরের কথা ব'লে থাকেন। তাঁদের মন্তব্য শুনে আমি অবাক্ হয়ে যাই। পাশ্চাত্ত্য শহরের সঙ্গে এই সব শহরের সৌন্দর্যের তুলনা করেন যখন তাঁরা তখন একটি কথা তাঁরা একেবারেই ভুলে যান যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্যের বিভিন্ন ষ্টাইলের বিকাশ হয়। প্যারিস, লণ্ডন বা আমষ্টার্ডামের স্থাপত্য আর হিন্দুস্থানের দিল্লীর স্থাপত্য এক ও অভিন্ন হ'তে পারে না। কারণ ইয়োরোপে যা বাসোপযোগী, হিন্দুস্থানে তা ব্যবহার্য নয়। কথাটা যে কতখানি সত্য তা রাজধানী স্থানান্তরিত করলেই বোঝা যেতে পারে। ইয়োরোপের শহর যদি হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে নতুন পরিকল্পনায় আবার গ'ড়ে তোলার দরকার হবে। ইয়োরোপের শহরের সৌন্দর্য অতুলনীয়, স্বীকার করি। কিন্তু তার একটা নিজস্ব রূপ আছে, যেটা শীতপ্রধান দেশের শহরের রূপ। সেইরকম দিল্লীরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যেটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের শহরের সৌন্দর্য। হিন্দুস্থানে গরম এত বেশী যে কেউ সেখানে পায়ে মোজা পরে না, এমন কি স্বয়ং সম্রাটও না। চটিই হ'ল পায়ের একমাত্র আচ্ছাদন। মাথার আভরণ পাগড়ি, তাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড়ের। অন্যান্য পোষাক-পরিচ্ছদও সেই অনুপাতে খুব সূক্ষ্ম ও হাল্কা। গ্রীষ্মকালে সাধারণত কোন ঘরের দেয়ালে হাত দেওয়া যায় না, অথবা কোন বালিশে মাথা দিয়ে শোয়াও যায় না। বছরে ছ'মাসেরও বেশী সকলে প্রায় বাইরের খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমায়। সাধারণ লোক রাস্তাতেই শুয়ে থাকে। বণিক বা অন্যান্য ধনিক ব্যক্তিরা তাঁদের বাগানে বা খোলা বারান্দায় শুয়ে নিদ্রা যান। তা না হ'লে ভাল ক'রে ঘরের মেঝে জলে ধুয়ে, তারপর ঘুমোন। এই অবস্থায়, একবার কল্পনা করুন যে আমাদের এই সব শহরের কোন রাস্তা যদি তার ঘিনুজি ঘরবাড়ীসহ হিন্দুস্থানের কোন শহরে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহ'লে কি হ'তে পারে? ঘিনুজি ঘরবাড়ী, তার উপর প্রত্যেকটি বাড়ীর উপরতলার শেষ নেই যেন। এইসব বাড়ীতে এইভাবে কি সেখানে মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভবপর? রাতে কি সেখানে এইসব বাড়ীর বদ্ধঘরে ঘুমিয়ে থাকা যায়, যখন বাইরে হাওয়া পর্যন্ত থাকে না এবং গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে? মনে করুন, একজন ঘোড়ায় চ'ড়ে বহুদূর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন। গ্রীষ্মের উত্তাপে তিনি প্রায় অর্ধমৃত, ধূলায় আচ্ছাদিত, নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছেন না। এমন অবস্থায় যদি তাঁকে একটি

সঙ্কীর্ণ ঘুপ্‌চি সিঁড়ি ভেঙে চারতলা পাঁচতলার কোন কক্ষে উঠতে হয় এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতে হয়, তাহ'লে কি অবস্থা হয় তাঁর? হিন্দুস্থানে এসবের কোন বালাই নেই। এক গ্লাস ভাল ঠাণ্ডা পানীয় পান ক'রে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে, মুখ-হাত-পা ধুয়ে আরামকেদারায় আপনাকে সেখানে শুয়ে পড়তে হবে এবং পাখাওয়ালাকে বলতে হবে, টানাপাখা টানতে। সে যাই হোক, এখন আমি আপনাকে দিল্লী শহরের আসল বর্ণনা সবিস্তারে দিচ্ছি, তাহ'লে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, দিল্লীকে সুন্দর শহর বলা চলে কি না, অথবা দিল্লীর কোন নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কি না।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্তমান বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের পিতা শাজাহান দিল্লী শহর গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন, নিজের নাম অমর করার জন্য। নতুন রাজধানীর নামকরণ তাঁর নামেই হবে, এই ছিল তাঁর বাসনা; করেছিলেনও তাই। দিল্লী শহর যখন নতুন তৈরী হ'ল, তখন তার নাম রাখা হ'ল 'শাহজাহানাবাদ', সংক্ষেপে 'জাহানাবাদ'। অর্থাৎ সম্রাট শাজাহানের বাসস্থান। শাহজাহান স্থির করলেন যে, নতুন দিল্লীতেই তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন, কারণ আগ্রার গ্রীষ্মের উত্তাপ এত বেশী যে, সেখানে তাঁর পক্ষে বাস করাই সম্ভব নয়। প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন দিল্লী নগরী গ'ড়ে উঠলো। হিন্দুস্থানে এখন আর কেউ দিল্লীকে "দিল্লী" বলেন না, "জাহানাবাদ" বলেন। যাই হোক্, 'জাহানাবাদ' নতুন নাম, এখনও বাইরে তেমন পরিচিত হয়নি, তাই 'দিল্লী' নামেই আমি এখানে তার বর্ণনা দিচ্ছি।

দিল্লী নতুন শহর, যমুনা নদীর তীরে বেশ প্রশস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। লোয়েরে নদীর সঙ্গে যমুনার তুলনা করা যায়। যমুনার তীরে শহরটি গ'ড়ে উঠেছে ঠিক যেন একফালি চাঁদের মতন, ছ'টি কোণ দুইদিকে এসে তীরের সঙ্গে মিশেছে। একদিকে নৌকার একটি সেতু দিয়ে অন্যতীরে যাওয়া যায়। যেদিকে যমুনা নদী প্রবাহিত, সেইদিক ছাড়া অন্য সর্বদিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর তেমন মজবুত নয়, এবং দুর্গের চারিদিকে যেমন খাত থাকে, সেরকম কোন খাতও নেই। প্রাচীরের পরে কেবল চারপাঁচ ফুট আন্দাজ চওড়া মাটির একটা প্ল্যাটফর্ম মতন আছে, আর প্রায় একশ'পা অন্তর তোরণ আছে একটি ক'রে। এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। আমি নিজে শহরের এই প্রাকার ঘুরে দেখেছি, তিনঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। যদিও আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরেছিলাম, তাহ'লেও ঘণ্টায় এক লীগের বেশী জোরে যাইনি। শহরতলীর কথা বলছি না, কেবল দিল্লী শহরের কথা বলছি। শহরের তুলনায় শহরতলীর আয়তন আরও অনেক বড়। শহরের একদিকে প্রায় লাহোর পর্যন্ত সারবন্দী গৃহশ্রেণী চ'লে গেছে—প্রাচীন শহরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এবং তিনচারটি ছোট ছোট শহরতলী অঞ্চল। এইভাবে শহরটি আয়তনে এত বড় হয়ে উঠেছে যে দিল্লীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরল রেখা টানলে প্রায় দেড় লীগ দৈর্ঘ হবে। বৃত্তের ব্যাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ শহরতলীতে বাগান ও খোলা জায়গা আছে যথেষ্ট। তাই সব মিলিয়ে, আয়তনের দিক দিয়ে দিল্লী শহরকে বেশ রীতিমত বড় মনে হয়।

অন্তর্দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, জেনানামহল আছে এবং আরও অন্যান্য সব রাজকীয় বিভাগাদি আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা যথাসময়ে করব। দুর্গটি অর্ধবৃত্তাকার। সামনে নদী। প্রাসাদ ও নদীর মধ্যে বালুকাময় প্রশস্ত ব্যবধান। এই প্রশস্ত স্থানে, নদীতীরে হাতির লড়াই হয়, বাদশাহ দেখেন। আমীর-ওমরাহ, রাজামহারাজাদের সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ হয়। রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে বাদশাহ এইসব ক্রীড়া ও কুচকাওয়াজ দেখেন। অন্তর্দুর্গের প্রাচীর ও তার গোলাকার গোপুরগুলি কতকটা বাইরের নগরের প্রাচীর ও গোপুরের মতন, কিছু অন্তর্দুর্গের প্রাচীর ইট ও লাল পাথরের তৈরী ব'লে আরও বেশী সুন্দর দেখায়। নগর-প্রাচীরের চেয়ে অন্তর্দুর্গের প্রাচীর অনেক বেশী মজবুত, দৃঢ় এবং তার মধ্যে ছোট ছোট কামান বসানো আছে, নগরের দিকে মুখ ক'রে। নদীর দিক ছাড়া অন্যান্য দিক পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখায় জল থাকে, মাছ থাকে আর তার সামনে থাকে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড। এসব অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে যতটা জমকালো, আসলে ততটা কাজের নয়। আমার ধারণা পরিমিত পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ নিয়ে এই ধরণের আত্মরক্ষার দুর্গ সহজেই ধূলিসাৎ করা যায়।

পরিখা-সংলগ্ন বিরাট উদ্যান, নানারকমের ফুল ও গাছপালায় সাজানো। বিশাল লাল রঙের প্রাচীরের পাশে এই সুবিস্তৃত সবুজের সমাবেশ অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। বাগানের পাশেই বাদশাহী বাগ এবং তার ঠিক উল্টোদিকে শহরের দু'টি বড় বড় রাজপথের সংযোগস্থল। যেসব হিন্দু রাজা মোগল বাদশাহের বাধ্যতা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর জায়গীর বা তন্‌খা পান, তাঁরা প্রতি সপ্তাহে যখন দিল্লীতে কুচকাওয়াজ করতে আসেন তখন এই বাগের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকেন। তাঁরা চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চান না—মুক্ত স্থানে স্বাধীনভাবে থাকতে চান। প্রধানতঃ এই রাজারা রাজপুত রাজা। দুর্গের মধ্যে সাধারণতঃ ওমরাহ ও মনসবদাররা কুচকাওয়াজ করার জন্য অবস্থান করেন।

এই স্থানেই বাদশাহের ঘোড়াগুলিকে নিয়ে নিয়মিত দৌড় করানো হয়। এখান থেকে বাদশাহী অশ্বশালা খুব বেশী দূর নয়। এখানেই যেসব অশ্ব নতুন আমদানি হয় বাদশাহের আস্তাবলে, তাদের পরীক্ষা করা হয়। যদি তুর্কী অশ্ব হয়, অর্থাৎ তুর্কীস্থান থেকে আমদানি হয় এবং যদি দেখা যায় যে তার যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য ও তেজ আছে, তাহ'লে তার উরুতে বাদশাহী মোহর অঙ্কিত ক'রে দেওয়া হয়। তাছাড়া যে আমীরের অধীনে সেই অশ্ব থাকবে, তাঁরও একটা ছাপ দেওয়া হয়। ছাপ দেগে দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল, একই ঘোড়া কুচকাওয়াজের সময় যাতে অন্যের ঘোড়ার সঙ্গে মিশে যেতে না পারে। (১)

---

(১) আকবর বাদ্‌শাহ অত্যন্ত অশ্বপ্রিয় ছিলেন। আকবরের আমলে ইরাক, রুম, তুর্কীস্থান, বাদকশান, সিরবান্, তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ থেকে ভাল ভাল অশ্ব হিন্দুস্থানে আমদানি হ'ত। আকবর বাদ্‌শাহের অশ্বশালায় সর্বদাই প্রায় বারহাজার অশ্ব প্রস্তুত থাকত। ভাল অশ্ব যখনই আমদানি হ'ত, তখনই তিনি পুরাতন অশ্ব আমীর-ওমরাহদের দান ক'রে দিয়ে নতুন অশ্ব কিনতেন। হিন্দুস্থানে যেমন ভাল ভাল অশ্ব ছিল, তেমনি অশ্ববিদ্যাবিশারদ

কাছেই একটি বাজার আছে যেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। বিচিত্র সব পণ্যদ্রব্য নানাদেশ থেকে আমদানি হয় সেখানে। জিনিসের মতন নানারকমের সব লোকজনেরও সমাবেশ হয় সেখানে। যতরকমের ভণ্ড, বুজরুক, হাতুড়ে বৈদ্য, জাদুকর ইত্যাদি রাজ্যে আছে সব এসে জমা হয় বাজারে। গণৎকার ও জ্যোতিষীদেরও বেশ ভিড় হয় এবং তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের এই সব বিচক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানীরা মাটিতে সতরঞ্চ বা আসন পেতে চুপ ক'রে বসে থাকে, হাতে থাকে নানারকমের কাঁটাকম্পাস, সামনে খোলা থাকে অদৃষ্ট-শাস্ত্রের একটি বিশাল গ্রন্থ এবং তার পাশে থাকে গ্রহ-উপগ্রহাদির স্থানাঙ্কিত একটি চিত্রপট। যাত্রীরা তাই দেখে আকৃষ্ট হয় এবং মনে করে যে গণৎকাররা যেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাদের মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হবে তা কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না, সাধারণ লোকের এ-বিশ্বাস আছে। অত্যন্ত গরীব যারা তারা হয়ত একটি পয়সা দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ জানবার সুযোগ পায়। সুযোগটা সামান্য নয়। গণৎকার প্রত্যেক মক্কেলের হাত ও মুখ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে, তারপর গণনার ভাণ ক'রে নানারকমের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব আবোলতাবোল বিড়্‌বিড়্ করে, বইয়ের পাতা উল্টোয়। দেখাতে চায় যেন সে কত বড় পণ্ডিত এবং গণৎকারিটা কত শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এইসব ভড়ং দেখিয়ে সে মক্কেলকে একেবারে বশ ক'রে ফেলে এবং তারপর সেই শুভ-মুহূর্তটির কথা তার কাণে কাণে ব'লে দেয়। অমুক মাসে অমুক দিনে, ঐ সময়ে যদি তার মক্কেল ঐ ব্যবসা আরম্ভ করে তাহ'লে তার সাফল্য ও উন্নতি সুনিশ্চিত, কেউ তার লাভের পথ রোধ করতে পারবে না। শুধু পুরুষ মক্কেলরাই যে হাত দেখাতে আসে তা নয়। আমি দেখেছি, স্ত্রীলোকরাও হাত দেখাতে, ভাগ্য গণাতে আসে। আপাদমস্তক সাদা ওড়নায় ঢেকে স্ত্রীলোকেরা বাজারে এসে গণৎকারের সামনে হাত বার ক'রে বসে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এমন কোন গোপন কথা নেই যা তারা ঈশ্বরের মূর্তিমান প্রতিনিধি এই গণৎকারদের কাছে বলে না। অপরাধীরা যেমন ক'রে তাদের অন্যায় স্বীকার ক'রে অনুতপ্ত হয়, ঠিক তেমনি ক'রে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সব গোপন কথা গণৎকারদের কাছে স্বীকার করে এবং মুক্তির পন্থা জানতে চায়। এইসব অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত লোকদের দৃঢ়বিশ্বাস যে গ্রহ-উপগ্রহের একটা বিরাট প্রভাব আছে মানুষের জীবনে এবং সেটা এই মাটির পৃথিবীতে গণৎকাররাই নিয়ন্ত্রণ করে।

এই গণৎকারদের মধ্যে একজনের কথা আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। একজন বিধর্মী পলাতক পর্তুগীজ গণৎকারের কথা। এই ব্যক্তিও ঠিক অন্যান্য গণৎকারদের মতন একটি আসন পেতে চুপ ক'রে ব'সে থাকত বাজারের মধ্যে এবং তারও যথেষ্ট মক্কেল ছিল, যদিও লেখাপড়া কিছুই সে জানত না। বহুদিনের পুরনো একটি নাবিকের কম্পাস ছিল তার একমাত্র সম্বল, এবং তাই দিয়েই সে অন্যদের মতন মানুষের নাড়ীনক্ষত্র ও ভাগ্য গণনা করত।(২) জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বই তার থাকার কথা নয়, জানেও না সে কিছু। পর্তুগীজ ভাষার পুরনো দু'একখানি প্রার্থনা-পুস্তক খুলে সে ব'সে থাকত এবং তার ভিতরের ছবিগুলি মক্কেলদের দেখিয়ে বলত—"এগুলো হ'ল গ্রহ-নক্ষত্রের পর্তুগীজ চিত্র"। লজ্জা-সরমের কোন বালাই ছিল না তার। একবার এক রেভারেণ্ড জেসুইট ফাদার তাকে বাজারের মধ্যে হাতেনাতে ধ'রে ফেলে জিজ্ঞাসা করেন: "এরকম বিধর্মীর মতন আচরণ করার কারণ কি?" উত্তরে পর্তুগীজ গণৎকারটি বলে, 'যস্মিন্ দেশে যদাচার—যে দেশের যা আচার, তাই পালন করা কর্তব্য'। ফাদার অবাক হয়ে চ'লে যান।

আমি শুধু এখানে প্রকাশ্য বাজারের গণৎকারদের কথা বললাম। যারা রাজা-বাদ্‌শাহ, আমীর-ওমরাহদের দরবারে আনাগোনা করে, তারা বাজারের গণৎকারদের মতন স্বল্পবিত্ত নয়। তারা রীতিমত ধনী ব্যক্তি এবং প্রতিপত্তিও তাদের যথেষ্ট। যেমন অর্থ তাঁদের, তেমনি তাঁদের খাতির ও খ্যাতি। শুধু হিন্দুস্থানে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্র আমি এই কুসংস্কারের মোহমুগ্ধ দেখেছি সাধারণ লোককে, সর্বস্তরের লোককে। রাজা-মহারাজারা, নবাব-বাদ্‌শাহরা এই সব জ্যোতিষী, গ্রহাচার্য ও গণৎকারদের রীতিমত উচ্চহারে বেতন দেন এবং সর্বব্যাপারে, তা সে যত সামান্যই হোক, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। গ্রহাচার্য ও গণৎকারদের আদেশ ছাড়া তাঁরা একপা'ও পথ চলেন না জীবনে। আচার্যরা পাঁজিপুথি দেখে, গ্রহ-উপগ্রহ গুণে, শুভযাত্রার বা কার্যারম্ভের দিনক্ষণটি ব'লে দেন। হিন্দুরা পাঁজিপুথি খুলে বলেন, মুসলমানরা বলেন কোরাণ খুলে।

বড় বড় পণ্ডিতও ছিলেন। ভারতের কচ্ছ প্রদেশে অতিউত্তম শ্রেণীর অশ্ব পাওয়া যেত, আরবী অশ্বের তুলনায় কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। বাংলার উত্তরে কোচপ্রদেশে তুর্কী অশ্বের ঔরসজাত এবং পাহাড়ী ভুটিয়া অশ্বিনী গর্ভজাত একপ্রকার অশ্ব জন্মাত, তার নাম ছিল "টাঙ্গন" অশ্ব। বাদ্‌শাহ এত অশ্বপ্রিয় ছিলেন যে, ভারতবর্ষে যেসব ব্যবসায়ী অশ্ব বিক্রী করতে আসতেন, তিনি তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করার জন্য "আমীর কারাভানসরাই" ও "তেপ্‌চকী" নামে দু'জন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। অশ্বশালায় সাধারণতঃ দু'টি বিভাগ থাকত—একটি খাস বিভাগ, আর একটি সাধারণ বিভাগ। খাস বিভাগে আরবী পারসী ও কচ্ছ প্রদেশের অশ্ব থাকত এবং সাধারণ বিভাগে থাকত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অশ্ব। মোগল আমলে অশ্বযান ব্যবহৃত হ'ত না, লোকে অশ্বের পিঠে আরোহণ ক'রে বেড়াত। অশ্বারোহণে অপটু পুরুষ সমাজে নিন্দনীয় হতেন। (বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের সময় যখন ইংরেজদূত সার টমাস্ রো ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি বাদ্‌শাহকে উপঢৌকন দেবার জন্য দু'তিনরকমের ঘোড়ার গাড়ী সঙ্গে এনেছিলেন। জাহাঙ্গীর সেই বিলেতী গাড়ীর নকলে কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ী তৈরী করান। এখনও আগ্রা অঞ্চলে সেই পুরাতন ঢঙের ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন এই সময় থেকেই হয়। তার আগে এক্কাগাড়ী ছিল বটে, কিন্তু তাতে ভাল অশ্ব বিশেষ জোতা হ'ত না—অনুবাদক)।—"আইন-ই-আকবরী" থেকে সংকলিত।

(২) নাবিকের কম্পাস চীনদেশের গণৎকাররা অনেক আগে থেকেই ভাগ্যগণনার জন্য ব্যবহার করতেন।

বাদশাহী বাগের সামনে শহরের যে দু'টি রাজপথ এসে মিশেছে ব'লে আগে উল্লেখ করেছি, তাদের প্রস্থ পঁচিশ ত্রিশ পা'য়ের বেশী নয়। আঁকাবাঁকা পথ নয়, সরল রেখার মতন সোজা পথ, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখা যায়। যেপথটি লাহোর ফটক পর্যন্ত গেছে তার দৈর্ঘ অনেক বেশী। ঘরবাড়ীর দিক থেকে দু'টি রাজপথের দৃশ্যই প্রায় এক। আমাদের দেশের "প্লেস রয়ালের" মতন, রাস্তার দুইদিকেই তোরণশ্রেণী। পার্থক্য শুধু এই যে হিন্দুস্থানের তোরণগুলি কেবল ইটের তৈরী এবং উপরে কেবল একটি চাতাল ছাড়া আর কোন গৃহ নেই। আমাদের 'প্লেস রয়ালের' সঙ্গে তার আরও একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ'ল এই যে একটি তোরণ থেকে অপর তোরণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ নেই। মধ্যবর্তী স্থানে খোলা দোকানঘর। দিনের বেলা এইসব দোকানঘরে নানাশ্রেণীর কারিগররা কাজ করে, মহাজনরা ব'সে ব'সে বাণিজ্যিক লেনদেন করে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখে। তোরণের ভিতর দিকে একটি ছোট দরজার মধ্য দিয়ে গুদামঘরে যাওয়া যায়। রাত্রে মালপত্র সব ঐ গুদামঘরেই বন্ধ থাকে।

তোরণের পিছন দিকে গুদামঘরের উপর বণিকদের বসতবাড়ী। রাস্তা থেকে বেশ সুন্দর দেখায় এবং মনে হয় বেশ বড় বড় কামরাওয়ালা বাড়ী। ঘরে যথেষ্ট আলোবাতাস আসে এবং রাস্তার ধুলো থেকে ঘরগুলি অনেক দূরে। দোকানঘরের উপরের ছাদে চাতালে তারা রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে। সারা রাস্তা জুড়ে ঘরগুলি তৈরী নয়। মধ্যে মধ্যে তোরণের উপরেও বেশ ভাল ভাল ঘরবাড়ী আছে দেখা যায়। সাধারণত সেগুলি খুব নীচু, রাস্তা থেকে বড় একটা দেখা যায় না, বা বোঝা যায় না। অবস্থাপন্ন ধনিক ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁরা অন্য মহল্লায় বাস করেন এবং দিনের বেলা কাজের সময় এখানে আসেন।

আরও পাঁচটি রাস্তা আছে শহরের মধ্যে, কিন্তু যেদু'টি রাস্তার কথা বলেছি আগে, তাদের মতন লম্বা বা চওড়া নয়। অন্যান্য দিক থেকে রাস্তাগুলি দেখতে প্রায় একরকমই বলা চলে। এছাড়া আরও অনেক ছোটখাটো রাস্তা ও অলিগলি আছে, তোরণও আছে অনেক রাস্তায়। কিন্তু রাস্তাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাবাদশাদের তৈরী ব'লে, তাদের পরিকল্পনার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় নেই। এইসব রাস্তার উপর আমীর-ওমরাহ, মনসবদার, কাজী, বিচারক, বণিক প্রভৃতির বাড়ীঘর বিক্ষিপ্তভাবে তৈরী। দেখতে মোটামুটি ভালই। ইঁট-পাথরের তৈরী বাড়ীর সংখ্যা খুব অল্প, অধিকাংশই মাটি ও খড়ের তৈরী বাড়ী। মাটি ও খড়ের তৈরী হ'লেও, বেশ খোলামেলা এবং দেখতে বেশ সুন্দর। বাড়ীর সামনে খোলা জায়গা ও বাগান এবং ভিতরেও ভাল আসবাবপত্র আছে। লম্বা লম্বা শক্ত ও সুন্দর বেতের উপর বেশ পুরু খড়ের ছাউনি। দেয়াল মাটির, তার উপর চুণের প্রলেপ দেওয়া। দেখতে সত্যিই সুন্দর।

এইসব সুন্দর বাড়ীর মধ্যে মধ্যে প্রচুর ছোট ছোট খড়ের চালাঘর। এইসব চালাঘর সাধারণ সৈনিক, সিপাই ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর সাধারণ ভৃত্যদের বসবাসের জন্য তৈরী। দিল্লী শহরের মধ্যে এইরকম অসংখ্য খড়ের চালাঘর থাকার জন্য এত ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন যখন লাগে এবং বছরে দু'একবার লাগেই, তখন চারিদিকে শহরময় অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। সারা দিল্লী শহর জুড়ে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে। এই গত বছরেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল দিল্লীতে, প্রায় ষাটহাজার খড়ের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মকালে যখন মধ্যে মধ্যে ঝড় বইতে থাকে, তখনই আগুন লাগে বেশী, এবং ঝড়ের জন্যই আগুন অতিদ্রুত ভয়াবহ ব্যাপক রূপধারণ করে। গত বছর এইভাবে তিনবার আগুন লাগে দিল্লী শহরে (অর্থাৎ ১৬৬২ সালে)। ঝড়ের জন্য এত দ্রুত আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে বহু ঘোড়া ও উটও আগুনে পুড়ে মারা যায়। প্রাসাদের ও হারেমের অনেক স্ত্রীলোকও আগুনের শিখায় দগ্ধ হয়ে বন্দী অবস্থায় মারা যায়। এইসব স্ত্রীলোক এত অসহায় ও লাজুক যে ঘরে আগুন লাগলেও বাইরে বেরিয়ে মুখ দেখাতে তারা লজ্জা পায়। সেইজন্য জেনানা-মহলের স্ত্রীলোকরা অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়।

দিল্লীর এইসব মাটির চালাঘরের আধিক্যের জন্য আমার সব-সময় মনে হয়, দিল্লী আধুনিক অর্থে শহর ও নগর নয়, কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। অথবা মনে হয়, দিল্লী একটি বিরাট সামরিক শিবির, তা ছাড়া কিছু নয়। সামরিক শিবিরে যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, দিল্লীতেও তাই আছে। তার বেশী কিছু নেই। আমীর-ওমরাহদের ঘরবাড়ী যদিও নদীর তীরে ও শহরতলীতেই বেশী, তাহলেও তার মধ্যে কোন পরিকল্পনার কোন চিহ্ন নেই। চারিদিকে সব ছড়ানো, অবিন্যস্ত ঘরবাড়ী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ী হ'ল উন্মুক্ত বাড়ী, চারিদিক খোলা বাড়ী। আলোবাতাস প্রচুর পরিমাণে যে বাড়ীতে পাওয়ার সুবিধা আছে, সেই বাড়ীই এখানে সুন্দর। সুতরাং ভাল বাড়ীর সামনে খোলা জায়গা, বাগান, গাছপালা, পুকুর, বড় হলঘর, ঠাণ্ডা নীচের ঘর ইত্যাদি থাকবেই। মাটির নীচে যে ঠাণ্ডা ঘর করা হয় সেখানে টানাপাখা টাঙানো থাকে এবং দিনের বেলা প্রচণ্ড উত্তাপের সময় সেখানে গৃহস্বামী আশ্রয় নেন। অনেকে দরজা-জানলায় খসখসের পর্দা ঝুলিয়ে রাখেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের বাড়ী খসখস তো থাকেই, তার কাছাকাছি জলের চৌবাচ্চাও থাকে, ভৃত্যরা সেখান থেকে জল নিয়ে খসখসের পর্দায় ছিটিয়ে

জেয়। খসখস সব সময় ভিজে থাকলে বাইরের গরম হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং ঘর ঠাণ্ডা থাকে। এখানকার লোক মনে করে যে বেশ সুন্দর আরামপ্রদ বসতবাড়ী যদি তৈরী করতে হয় তাহ'লে একটি সুন্দর ফুলবাগান তো বাড়ীর সঙ্গে চাইই, উপরন্তু বাড়ীর চারকোণে চারটি মানুষ-সমান উঁচু বসবার জায়গা থাকা চাই, যেখানে ব'সে সমস্ত শরীরে মুক্ত আলো-বাতাস লাগানো যেতে পারে। বাস্তবিকই প্রত্যেক ভাল বাড়ীতে এইরকম উঁচু চাতাল আছে এবং সেখানে গ্রীষ্মকালে বাড়ীর লোক-জন রাতে শুয়ে থাকে। বাইরের চাতাল থেকে ভিতরের শোয়ার ঘরে যাবার পথ আছে এবং সহজেই যাওয়া যায়। হঠাৎ বৃষ্টি হ'লে, বা বর্ষার দিনে, খাটিয়া স্বচ্ছন্দে শয়নকক্ষে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। কেবল বর্ষার সময় নয়, হিমের সময়ও এইভাবে বাইরে থেকে উঠে গিয়ে ভিতরে শোবার দরকার হয়।

এইবার ভিতরের ঘরের বর্ণনা দিচ্ছি। ভাল ভাল বাড়ীর ভিতরের ঘরের মেজের উপর প্রায় চার ইঞ্চি পুরু গদি পাতা, তার উপরে সাদা ধবধবে চাদর বিছানো থাকে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে সিল্কের কার্পেট। ঘরের বিশেষ কোণে আরও ছোট ছোট দু'একটি গদি পাতা থাকে, এবং তার উপর সুন্দর ফুললতাপাতার কারুকাজকরা চাদর বিছানো থাকে। এগুলি গৃহস্বামীর নিজের বসবার জন্য, অথবা তাঁর বিশেষ সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতের জন্য। এইসব ফরাসের উপর ভাল ভাল তাকিয়া ফেলা থাকে, দিব্য হেলান দিয়ে ব'সে গল্পগুজব করার জন্য। নানারকমের কারুকাজকরা ভেলভেটের তাকিয়া, মখমল ও সাটিনের তাকিয়াই বেশী। মেজে থেকে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি থাকে অনেক, নানা আকারের ও নক্সার কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গিতে নানারকমের জিনিসপত্র থাকে—ফুলদানি, গ্লাস ইত্যাদি। উপরের সিলিং গিল্টি ও রং করা, কিন্তু মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের কোন চিত্র অঙ্কিত নয়। মানুষ বা জানোয়ারের চিত্র সিলিং-এ আঁকা নাকি ধর্মনিষিদ্ধ। সেইজন্য শুধু গিল্টি-করা ও রং-করা সিলিংই বেশী দেখা যায়।

এই হ'ল সংক্ষেপে দিল্লী শহরের ঘরবাড়ীর বিবরণ এবং সুন্দর বাড়ীর বিস্তৃত পরিচয়। এইরকম সুন্দর বাড়ীঘর দিল্লী শহরে যথেষ্ট আছে। সুতরাং একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে, ইয়োরোপের শহরের প্রসঙ্গ উত্থাপন না ক'রেও, যে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী কুৎসিত নয়, যথেষ্ট সুন্দর এবং প্রচুর মনোরম ঘরবাড়ী দিল্লীতে আছে। ইয়োরোপের শহরের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই এবং তার সঙ্গে তুলনা করাও উচিত নয়। [ক্রমশঃ।

আত্ম-জিজ্ঞাসা ?

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

মুক্তির ধ্বনি, শান্তির বাণী, জীবনের জয়গান
আনিতে ধরায় মন তুই আজি চাস্ কি করিতে দান ?

হেথায় হোথায় যেদিকে তাকাও সেদিকে রুদ্ধ দ্বার।
ওরে মন মোর, চারিদিকে তোর কোথাও পাবি না পার।
তাই আজি তোরে নিতেই হবে রে দারুণ বিরাট ভার,
সকলের সাথে রক্তের হাতে খুলিতে হবে রে দ্বার।

ভাবের এ কোল ভোল্ আজি ভোল্ স্তাখ রে শুধুই চেয়ে,
আজি তোর মত ওই কত শত তরুণ আসিছে গেয়ে।
এখনো কি তুই ভাবছিস্ বসে আপন তরণী বেয়ে,
বলাকার পাখা ভর করে তুই চলবি কল্পলোকে ?

স্তাখ্ আজি তোর সম্মুখে ঘোর পুঞ্জিত মেঘরাশি,
তবু ওর পিছে ঐ যে খেলিছে অরুণের লাল হাসি।
চলে আয় আজ, ভোল্ রে এ লাজ তোল্ রে বিষের বাঁশি।
বিরাম-বিহীন কর্ম্মের বাণী ঘোষণা কর্ রে আজি।

জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে হ'বে অস্ত্র লইয়া হাতে,
মায়ের আশীষ বহন করিয়া লইবি রে তোর মাথে,
যুগ-যুগান্ত যারা বঞ্চিত তাহাদের নিয়ে সাথে,
করিবি রে তুই যাত্রা আজিকে আঁধারের কারা-পথে।

হবে রে সত্য, হবে রে মুক্ত তোর যাত্রার গান,
শত শতাব্দী-সঞ্চিত ক্ষোভ ধরিবে যে একতান।
সাথে সাথে তোর আসিবে রে ঐ অভাগার ভগবান।
রুদ্ধ দুয়ার খুলিতে রে মন, চাস্ কি করিতে দান ?
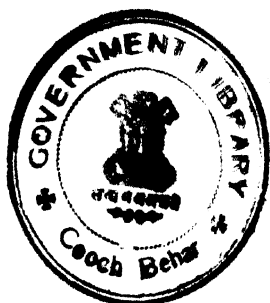
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

মিত্রার এতটা উত্তেজনায় প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল সৌমী। তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলল—'মা গো, চমকে উঠেছিলাম একেবারে। কিন্তু এত বড় একটা ধমক দিলে কেন শুনি? বিধবা শব্দটা যে শত বছরের গলিত শব, এ বিষয়ে কোন আপত্তি দেখেছো আমার? জলজ্যান্ত তোমার মামা বেঁচে—আমি ভাই, সমাজ-সংস্কারের মূল্য হিসাবে না হয়, ডাইভোর্স বিলটা উদাহরণ সহ সমর্থন করে দেখাতে পারি। কিন্তু বিধবা বাক্যটিকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য সহানুভূতি আর সহযোগিতা ছাড়া আমার তো কিছু করবার নেই? প্রয়োজনে সে সহযোগিতায় পিছু-পা হবো না। কিন্তু কি কথা বলবে বলেছিলে তাই বল।'

—'বলব। এ বলা কিন্তু মামী বলে হাল্কা হবার জন্য নয়—বুদ্ধি চাই। তোমার ধীর বিবেচনার উপর শ্রদ্ধা···মানে ভরসা আছে আমার।'

—'বুদ্ধি তোমারও ধীর-স্থির। তবে সাময়িক যখন একটা অস্থিরতার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে—তখন বিবেচনার ভারটা না হয় নেওয়াই গেল।'

কিছুটা সময় চুপ করে থেকে যেন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল মিত্রা। তারপর শান্ত সংযত কণ্ঠে, যোগ-বিয়োগশূন্য সত্য স্বীকৃতিতে বলে গেল ওর জীবনের নব-অধ্যায়।

সৌমীর কাছে এ কিছু বিস্ময়ের বিষয়-বস্তু শোনা নয়। ঘটনা বিস্তার না জানলেও যতটুকু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় তা সে জানে। আর তার মানেই প্রায় সব জানে। প্রস্তুত হয়েই ছিল। হেসে বললো—'বেশ; শোনা হল।'

—'এখন কি কর্ত্তব্য, অবহিত কর।'

···কর্ত্তব্য, উচিত-অনুচিতের চলতি জবাব তোমার অজানা নয় মিত্রা! সে কথা আমি ভাবছি নে, আমি ভাবছি—যেখানে পা দিয়েছ তার ভিৎটি নির্ভরযোগ্য কিনা।'

—'তোমার ভাবনা—স্থানটা যদি সমুদ্রের ভাসমান বরফ হয়?'

—'হ্যাঁ ভাই। এ সব ব্যাপারে ঘটনার গুরুত্বের চাইতে ব্যক্তির গুরুত্ব আমার কাছে বেশী।'

—'কি মনে হচ্ছে তোমার?'

কি যেন চিন্তা করে চলে সৌমী।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, জবাবের আশায় অপেক্ষা করে থাকে মিত্রা। কিন্তু সৌমীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, অধৈর্য্য কণ্ঠে বলে ওঠে—'বাবা, ধীর-স্থির বলেছি বলে কি তুমি যুগ লাগাবে নাকি একটা কথা বলতে—বিবেচনাটা বিবেচকের মতো করতে হলে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে, সময় নিয়ে করতে হয়—বুঝলে?'

ঘরে এসে ঢুকল রাণী। সাগ্রহে ওকে হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে বসাতে মিত্রা বলে—'এসো এসো। কিন্তু রাণী, তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন—শরীর সুস্থ নেই?'

প্রথমে দু'-তিনটা বড় বড় নিঃশ্বাসে বেশী পরিমাণে হাওয়া টেনে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিল রাণী। তার পর কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললো—'আমাদের মতো অভাগাদের অসুস্থ হয়ে সুখ কোথায়? তোমার মতো সেবা করবার লোক কি আর অদৃষ্টে জুটবে? বিশেষ করে এমন মামী!'

—'আমার মতো জা বুঝি ফেলা গেল?'

দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রাণী মিত্রাকে—'মা গো, কি বলে। তুমি ফেলা গেলে, তুলে রাখবার মতো রাণীর তফিলে আর কি জমা রইল!'

হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখবার ভ্রূভঙ্গিতে চাইল মিত্রা রাণীর দিকে—'ব্যাপারটা কি, শরীরের ওজনটা দু'জনার বলে বোধ হচ্ছে কেন?'

মিত্রার মুখের কথা টেনে নিল সৌমী—'আপনাকে দেখে আরো আগে থেকেই কিন্তু এ সন্দেহ আমার হচ্ছিল। ঠিকই বলেছ মিত্রা।' কথার শেষে ওদের কাছে অনুমতি নিয়ে উঠে গেল সে। কিছুটা দু'জনকে কথা বলতে দিয়ে, কিছুটা রাণীর জন্য চা-খাবার আনতে।

রাণী মিত্রাকে ঠেলে সরিয়ে শুতে শুতে বলে—'দেখি সর। একটু শুই। শুয়ে শুয়ে কথা বলি।'

—'দূর, তোমাদের মতো মেয়ের সঙ্গে কথা বলে কে।'

—'কেউ না। আমি নিজে পর্য্যন্ত না। একা থাকলেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলতেই হয়। আর সে ঘেন্নায়ই না পালিয়ে আসি তোমার কাছে।'

রাণীর গলার বিষাদিত স্বরে পরিহাস ছেড়ে ওর দিকে ফিরল মিত্রা। বললো—'হয়েছে কি রাণী? ছেলে হওয়াটা নিশ্চয়ই এতটা মন-খারাপের কারণ নয়। কিছুদিন ধরেই তোমার মুখে একটা কালো মেঘের ছায়া লক্ষ্য করছি। 'যা পেয়েছি—পেয়েছি, যা পাইনি—পাইনি,' আমাদের দেশের মেয়েদের চিরন্তন এই মনোবৃত্তি মনে নিয়ে, এক রকম চলে যাচ্ছিল তো তোমার মন্দ নয়। এর উপর আবার নূতন কি ঘটল? সত্য কথা বল। বলছি লুকোবে না।' যেন আদেশ করল মিত্রা।

—'এত দিন অসুস্থ ছিলে যে।···আচ্ছা, জানোয়ারের খাবার-খোঁজা মাটি শুঁকে চলা দেখেছ?' চোখের পাতা বন্ধ করে ঠাণ্ডা-গলায় বলল রাণী।

—'দেখেছি।'

—'ঠিক তেমনি একটা ক্ষুধার্ত সন্দিহান মন নিয়ে সমস্ত বাড়ীর মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছেন তোমার ভাসুর।'

—'কারণ?'

—'সেই চির পুরাতন কারণ—বাপের বাড়ীর চিঠি। ছোট্ট ভাইঝিটির বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে, আকার-ইকার-ছাড়া একখানা অতি মিষ্টি চিঠি। তার বক্তব্য—'ছোট পিসিকে দু'শ-পাঁচশ' টাকা পাঠাই, তাক্কে পাঠাই না কেন। ছোট পিসি, মা, বাবা, কেউ

ওকে কিরারিনের না—ওর রিবন নেই, কাঠি-লজেন্স খাবার পয়সা নেই, ডলপুতুলটা মা হতে পারছে না একটা ছোট্ট ডল নেই বলে'—এমন একটা মনঃকষ্টকর খবর শুনে ভাবছি একটা জ্যান্ত ডল দিলে সে দায়িত্ব নিতে সে রাজী আছে কি না, তাই জানতে চেয়ে চিঠি লিখি—

হঠাৎ পেছন থেকে মন্তব্য শুনলাম—'হু'শ-পাঁচশ'! বাব্বা!

হাতটা কেঁপে উঠে ভাই মাটিতেই পড়ে গেল চিঠিটা। সবিনয়ে সেটা তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'ভয় পাচ্ছ কেন? আমি টাকা দিচ্ছি না, আমার পকেটও তুমি মারছ না—মারলে টের পেতাম। আমার চটবার কারণ নেই। শুধু টাকাটা কে দিচ্ছে জানতে চাইব, তাকে একটা আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবার জন্য।'

বললাম—'সত্যি কি আমি এতো টাকা পাঠাই নাকি! একটা বাচ্চা মেয়ের চিঠি—'

—'সে জন্যই খাঁটি। ছল-চাতুরী আর মিথ্যে এখনও শেখেনি! এতো না হোক বিশই পাঁচ বারে শ' হয়। কিন্তু সে কথা নয়। আমার জিজ্ঞাস্য হল—পাচ্ছ কোথায়। চুরি করে নয় নিশ্চয়ই। তবে অন্য কোন উপায়ে—'

—'থামো রাণী।' কানে হাত চাপা দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মিত্রা।

—'রাণীর মুখ থামলেই আর তার জীবনটা থামছে না—বিপদ তো সেখানেই।'

মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়তে চাওয়া মনটা মিত্রার যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায়। রাণীকে বহু দুঃখে সে সান্ত্বনা দিয়েছে, করেছে বহু অসহায়তায় হাত বাড়িয়ে সাহায্য কিন্তু আজ ও কোন কথা খুঁজে পেল না তাকে বলবার জন্য। যে স্ত্রীকে অত্যাচারে অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একদিন স্বামীকে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা টেনে কথা বলতে হয়—তাকে বলবার জন্য বুঝি অভিধানেও কোন কথা থাকে না। কেবল বলল—'তুমি তোমার মার কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য ঘুরে এসো।'

—'তাই যাব ঠিক করেছি।'

—'হ্যাঁ, তাই চলো।'

—'চলো মানে?' বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে রাণী।

—'আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'

—'সত্যি!'

—'সত্যি। ডাক্তার নির্দ্দেশ দিয়েছে, আর একটু সেরে উঠলেই চেঞ্জে যেতে। তা তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব স্থির করে ফেললাম। কুমার-মুন্নী থাকবে মার কাছে। কি বল?'

কি আর বলবে রাণী? যেন আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠেছে সে। কে বলবে ক্ষণপূর্ব্বের রাণী আর এই রাণী এক। বলে চললো একমুখে সে একশ' কথা—অপ্রত্যাশিত আনন্দের ভারসাম্য-হারানো প্রলাপে।—সে লিখলেও নাকি কেউ বিশ্বাস করবে না—আবার বললো, না কিছু লিখবে না সে আগে থাকতে। হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়ে চমকে দেবে সবাইকে। ইস্, তোমায় দেখে বৌদির আর বোনটার মুখের অবস্থাটা কেমন হবে তাই ভাবছি। জান, জায়গাটার স্বাস্থ্য খুব ভালো। নইলে আমি কখনও রাজী হতাম তোমায় নিয়ে যেতে? শেষে কিছু হলে, কি আবার অসুখ বাড়লে, চিরকাল কথার তলে থাকবো!···কুমার-মুন্নী তো থাকবেই। ওদের দায়িত্ব কে নেবে বাবা।—তার পর যাবার সময় একমুখ হাসি নিয়ে মিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে বলে গেল,—দেখো, এত আশা দিয়ে আবার মত বদলে ফেলো না যেন। তাকে খুসী-মনে বিদায় দিতে পেরে মিত্রার মনের ভারও অনেকটা পাতলা হয়ে আসে। থাক্, ব্যবস্থাটা মন্দ হল না। রাণীর ছোট বোনটি দু'-তিন খানা চিঠি দিয়েছে একবার বেড়িয়ে যেতে। সে লেখায় কত কৃতজ্ঞতা, কত সঙ্কোচ! মামারা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন তাকে নিয়ে কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যায়, কেই বা নিয়ে যায় আর সঙ্গে থাকে!—এই ভালো হল।

ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে মিত্রা। এখন ওঠে হাঁটে চলে। খাওয়ার পথ্যের দিকে তাকিয়ে হাসে! বলে—'বলবৃদ্ধির জন্য যে পর্য্যন্ত প্রহর-ডাকা পাখীর নির্য্যাসের আভাস মিলছে, এর পর ও-বাড়ীতে লড়াইএ ডাক পড়লে বা অতর্কিত আক্রমণে খণ্ডযুদ্ধের মুখোমুখি পড়ে গেলে, তাকতের অভাব হবে না।'

দেহটা খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই, দুর্ব্বল মনটাকে নিয়ে পড়ল মিত্রা। প্রতিটি মুহূর্ত্তের চিন্তায় উপস্থিত থেকে, প্রতিটি দিনের উন্মুখ প্রতীক্ষায় নিরাশ করে, শমিত ওর মনকে যে চাঞ্চল্যে অস্থির করে তুলেছিল—সে চঞ্চলতাকে ও চাইল বাঁধতে—প্রায় বন্যার ঢলকে বাঁধবার মতোই কষ্টসাধ্য সে চেষ্টা মিত্রার।

কিন্তু রাণীর সঙ্গে যাওয়া ওর হল না। ভাসুর নাকি শুনেই ক্ষেপে উঠেছিলেন। যার শ্বশুরবাড়ী যার সম্পর্কে সম্পর্ক, তার

অমতে আর কি করে যাওয়া হয়। শুনে মিত্রার যেন জিদ চেপে আসতে চায়—কার সম্পর্কে সম্পর্ক, কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রথম পরিচয়—সেটা কি দু'জনের বন্ধুত্বের ভেতর চিরকাল স্মরণ করে চলতে হবে নাকি! ও ওর প্রিয়বন্ধুর বাড়ী যাবে। কিন্তু রাণীর সে শক্তি কোথায়? সে মিনতি জানালো—'না ভাই, এত সাহস নেই। তুমি চল ও-বাড়ী।—অনেক দিন একসঙ্গে থাকি না। আবার কবে আসব—অন্ততঃ মাস ছয়-সাতেকের আগে ফিরছি নে। কয়েক দিন একসঙ্গে থেকে যাই চল।'

ইচ্ছে থাক আর নাই থাক, রাণীর জন্ত আসতে হল মিত্রাকে আবার এ-বাড়ীর গেট পার হয়ে। প্রথমেই দৃষ্টি গেল বাড়ীটার তেতলার ঘরের জানালাটার দিকে। আর অমনি ওর বুকটা সশব্দে আছাড় খেল, শমিতের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের সম্ভাবনায়। এমনি একটা নিদারুণ কম্পে যেদিন গাঁটছড়া বেঁধে প্রথম প্রবেশ করেছিল ও নীলাকান্তের সঙ্গে—সেদিনও ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সেদিনের সেটা ছিল বলির পাঠার কাঁপ। আজ যেন মাঠভরা ঘাস-ফুলের সন্ধ্যা-বাতাসে কেঁপে ওঠা। হলও দেখা প্রথমে তারই সঙ্গে। লন পার হয়ে মিত্রাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বের হবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল শমিত। বিস্মিত ভাবে বলে উঠল—'বাঃ!' ওর মুখের এই 'বাঃ' শব্দটা মিত্রার সম্পূর্ণ সুস্থতার না রূপ-মুগ্ধতার—বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করল—'তা একেবারে ভালো হয়ে গেছ তবে।'

—'সে খবরটাই তোমায় দিতে এলাম।' চলতে চলতে বললো মিত্রা।

সঙ্গে যেতে যেতে হেসে জবাব দিল শমিত—'অশেষ দয়া। কিন্তু ভেবে দেখো, খোঁচাটা অন্তার মতো দিলে।···তা আসাটা থাকতে না বেড়াতে?'

—'থাকবো দিন কয়েক, রাণী যে পর্য্যন্ত আছে।'

—'একবার আশা করতে পারি আমার ঘরে?'

এ কথার জবাব দিল না মিত্রা। শুধু কুঞ্চিত ভ্রূতে যে দৃষ্টিতে শমিতের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকল ও, তাতে শমিতকে যেন ধূলোর উপর বসিয়ে রেখে গেল সে। বেরুনো আর তার হল না। আবার গিয়ে উঠল ওর তেতলার নির্জন ঘরটিতে। সাত দিন কেউ মুখও দেখল না আর শমিতের। সে কি মিত্রার সেই ভ্রূভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টিটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল? না—ও সে কথা ভুলেই গিয়েছিল। সেদিন চলে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ালে মিত্রা যে-দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল—তাতে শমিত অনুরাগ-বিহ্বল প্রথম রাতের মিত্রাকে আবার দেখতে পেয়েছিল। যে মেয়ে সমস্ত ভয়-ভাবনা দ্বিধা-সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে দু'-দুবার আত্মসমর্পণ করেছে—তার বাহ্য ব্যবহারটুকু নিয়ে শমিত মাথা ঘামায় না। সে ভাবছিল মিত্রাকে তার পেতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে, কি উপায়ে, কোন্ পথে? সেদিন মিত্রা বলেছিল—'অনেক ভাববার আছে।' সেই অনেক ভাবনা ভাবতে বসল সে কৌটো-কৌটো সিগারেট নিয়ে। কোনটার পুরোটা খায়। কোনটা দু'টান দিয়ে এসট্রের উপর রেখে উঠে গিয়ে পায়চারী আরম্ভ করে, তার পর ভুলে যায় সেটার কথা। সে সিগারেটটি কখন যে একটি সূক্ষ্মরেখায় ধূয়ো হয়ে কেঁপে কেঁপে যায় নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে, সে খেয়ালও জুড়ে থাকে না। ভাবে—ভালোবাসাটা—কি আশ্চর্য্য নিদ্রাপ্রদ! বেশীর ভাগ মানুষের জীবনেই সে দিব্য অলস ঘুমে ঘুমিয়ে পার করে দেয়। তাকে না যায় জাগানো, না পাওয়া যায় তার সাড়া। যাচ্ছিল তো তারও সেই মতোই দিন কেটে। বাঁচিয়েছে মিত্রা—ওকে ভালবাসতে দিয়ে। পশু ক্ষুধার পঙ্ক থেকে টেনে তুলেছে তাকে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরার জগতে। তাই না তেতলার ঘরে বসেও স্পন্দিত হচ্ছে সে শুধু মিত্রার এখানের উপস্থিতিতে, তার গলার স্বরে, হাসির টুকরোয়। সে শব্দ-স্পন্দন সঙ্গীতের আনন্দ হয়ে ঝঙ্কার তুলছে ওর মনে।

রাণী চলে যাবার সময় ওকে নিয়ে যেতে না পারার দুঃখটা যে ভাবে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, তাতে মনটা উঠল মিত্রার ভারাক্রান্ত হয়ে। আর ওর মন টিকতে চায় না এখানে। কিন্তু যাবার কথা তুলতে আপত্তি জানালেন স্বর্ণময়ী। বললেন—'রাণী চলে গেল। জয়ন্তীও যাচ্ছে তার দাদার বিয়েতে। বললাম তাকে এখানেই যখন বিয়ে, যাওয়া-আসার ভেতরই থাকে। তাতে দেখলাম তার মন ভার হয়। তা যাক্, আসুক ক'দিন ঘুরে। জয়ন্তী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি মা থেকে যাও। এ বাড়ীর ছেলেদের দেখা মেলাই ভার। দুটো বুড়ো মানুষ—রাজ্যজোড়া বাড়ীতে হাঁপিয়ে উঠি মা। বাচ্চা দুটো থাকলে বাড়ী-ঘর ভরে থাকে।'

রাজী হতে হল মিত্রাকে। সে জানে, কিছুটা হয়ত জয়ন্তীর যাওয়াটাই কারণ, তবু বেশীটাই ও আরো কিছুদিন থাকে এটাই স্বর্ণময়ী চাচ্ছেন। নীলাকান্ত কোথা দিয়ে যে একটি নরম মন মিত্রার জন্য রেখে গিয়েছে তার মনে—শত জল-রোদেও তা আর শক্ত হল না।

মিত্রাকে ঠিক এই অনুরোধটিই করবার জন্য আরেক জন যে অস্থির হয়ে উঠল—সে শমিত। জয়ন্তীর অনুপস্থিতির সুযোগটা ওর হারালে চলবে না কিন্তু রাণী চলে যাবার পর থেকে দুটিতে যেন জোড় বেঁধেই আছে। ওদের দু'জনের আবার কবে থেকে এমন হৃদ্যতা হল! একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্যে পেয়ে বসল শমিতকে। ডাকবে মিত্রাকে—না নিজেই গিয়ে বলবে, 'শোন, একটা কথা ছিল।' জয়ন্তীর চোখে সন্দেহ-কৌতূহল একসঙ্গে ঝলকে উঠবে না?······এমন সময় যেই ওর ডাক পড়ল সৌমীকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে, সানন্দে গায়ে পাঞ্জাবী চাপিয়ে নেবে এলো শমিত। যদিই বা মামীকে তুলে দিতে এলে মিত্রাকে একটু একা পাওয়া যায়। যদি সে কোন প্রয়োজনে একবার ও-বাড়ী গিয়ে, ফেরবার পথে একা ফেরে।

কথা বলতে বলতে লন পার হয়ে এলো সৌমী আর মিত্রা। সৌমী বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলে, এবার শমিত বেপরোয়া হয়ে মাত্র বলতে যাবে—'উঠে পড় মিত্রা, তুমিও না হয় একটু ঘুরে আসবে,' কিন্তু এমনি সময় প্রায় দৌড়ে এসে হাজির হল জয়ন্তী। শমিতের দিকে তাকিয়ে একটু অপেক্ষা করবার জন্য মিনতি জানিয়ে, গাড়ীর ভেতর মাথা গলিয়ে সৌমীকে বললো—'কি ভুল দেখুন তো! তখন থেকে বলে বলে, ঠিক শেষ পর্য্যন্ত ভুলেই গেছি মিষ্টি আমের রসায় বাঁধবার প্রণালীটা শুনে নিতে। বলুন ভাই চটপট্।'

মানুষ, মানুষ, মানুষ! মানুষের জন্তই পৃথিবীটা মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য স্থান হয়ে উঠেছে।

ষ্টিয়ারিং থেকে হাত নামিয়ে অলস ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলে শমিত। জয়ন্তী একান্ত মন-সন্নিবেশে শোনে সৌমীর মুখে মিষ্টি আমের রসান্ন-প্রণালী। আর মিত্রা দেয়াল-ঘেঁসা গাড়ীটার গায়ে হেলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো অনুভব করে ওর একটা হাত কি উপায়ে যেন মুঠো করে ধরল শমিত! সাহস নেই চোখ তুলে চাইতে, সাহস নেই যেন নিঃশ্বাস নিতে। দূরের গ্যাস-বাতিটার আলো সামান্যই এসে পৌঁছোচ্ছে এখানে, ওর কাছটা প্রায় অন্ধকারই। তবু যদি জয়ন্তীর নজর পড়ে! আতঙ্কে উদ্বেগে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল মিত্রা।

কিন্তু শমিত নির্ব্বিকার। এখন পাকা আমের রসান্ন-কথা রস-নিংড়ানো থেকে সুরু না করে, যদি ওরা আমের চারা বোনা থেকেও আরম্ভ করে, তাতেও তার আপত্তি নেই।

সৌমীর কথা প্রায় শেষ, তবু যে হাত ছাড়ছে না শমিত! অদম্য বুক-কাঁপুনির সঙ্গে ঘেমে জল হয়ে যেন পাতলা হাতখানা মিত্রার গলে বেরিয়ে আসতে চায়।

সৌমী থামতেই নিরুদ্বেগ ধীর-গলায় বললো শমিত—'হরিণের মাংসের টগ্‌বুঝোল রাঁধতে জান?'

—'সে বস্তু আবার কি?'

—বলছি শোন, হরিণের মাংস এনে হাঁড়িতে ভরে প্রথমে মাটিতে পুঁতবে। তার পর যেন মাংসটার রস টেনে নিতে পারে, এমনি ভাবে তার উপর লাগাবে—পুঁই গাছ। সেই পুঁই গাছের ফল যখন টইটম্বুর হয়ে পেকে উঠবে, তখন মাংস, গাছ দুই-ই মাটি থেকে তুলে, সেই পাকা পুঁই ফলের রসে সেই মাংস রান্না করবে।'

—'সত্যি?'

—'হাঁ। আচ্ছা এবার বল দেখি মালপোয়া কত রকমের হয়?'

জয়ন্তী জবাব দেয়—'ময়দা আর ছানা। এ ছাড়া মালপোয়া হয় না।'

—'হয়। ডিমের মালপোয়া অতি উপাদেয় খাবার।'

—'ডিমের!' আশ্চর্য্য-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে সৌমী।

মুখ ঘোরায় জয়ন্তী—'আহা, ঐ টগ্‌বুঝোল আর ডিমের মালপোয়া—সব ঠাট্টা করা হচ্ছে আমাদের!'

—'না, না, সত্যি বলছি। শোনই নিয়মটা। তৈরী করে দেখো—যদি ভালো না হয় তবে তো। আচ্ছা, ঝির বাসন মাজা হয়েছে? হয়ে থাকলে একখানা ধার-উঁচু থালা নিন্। নিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে—ওহো, তোমাদের যে আবার ও-বস্তু থাকে না। বিশ্ব-সংসার মোছ শাড়ীর আঁচলে। ছেলের সর্দ্দির নাক থেকে—খাবার থালা পর্য্যন্ত।'

সৌমী হেসে বলে—'থাক, আর দরকার হবে না। ওতেই বুঝে নিয়েছি। কাল ঠিক তৈরী করে পাঠিয়ে দেবো—মাংস নয় মালপোয়া।' তার পর মিত্রার দিকে তাকিয়ে বললো—'জয়ন্তীর ফিরে না আসা অবধি তবে তুমি এখানেই থাকছ?'

—'ভাবছি।'

এবার শমিত প্রথমে মিত্রার হাতখানা কঠিন চাপে চেপে, ঈষৎ ঝাঁকুনির সঙ্গে যেন কি নীরব মিনতি জানিয়ে নিল। তার পর মুঠো আলগা করে দিল গাড়ীর ষ্টার্ট দিতে। [ক্রমশঃ।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
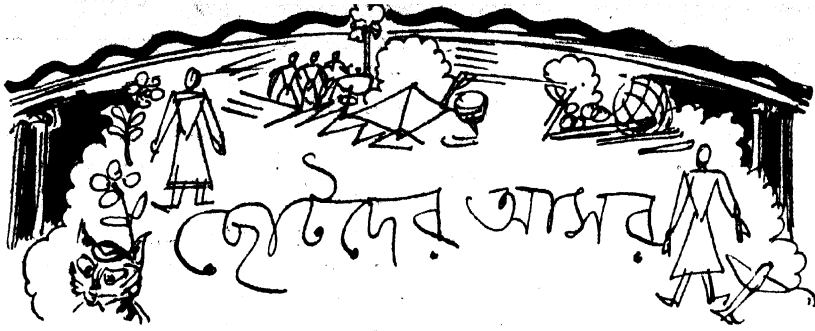
(চীন দেশের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

আজকের গল্প কাকে নিয়ে হবে জানো ?

আমি যদি নামটা বলি অমনি তোমরা বলবে মা গো ও আবার কি নাম! কিন্তু কি করবো বল—নাম, তার আর ভালো-মন্দ কি!

হানাসাকাজিজি! নামটা মস্ত বড় সত্যি কথা—কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে আসল গল্পটা শোনো।

হানাসাকাজিজি লোকটি কিন্তু বেশ ভালো—একলা একলাই থাকতো, কেবল তার একটা কুকুর ছিল—যেমন প্রকাণ্ড দেহ তেমনি ভয়ঙ্কর দেখতে। তার নাম ছিল শিরো।

শিরোকে নিয়ে হানাসাকাজিজি থাকতো। বন্ধু বলো আত্মীয়-স্বজন বলো যা বলো, তা হলো ঐ ভয়ঙ্কর কুকুরটা।

কুকুরটা দেখতে যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন—নির্ব্বিরোধ, ভাল মানুষ হানাসাকাজিজিকে সে যে কী ভালই বাসতো তা বলা যায় না। ছায়ার মত ওর পিছুনে পিছুনে ঘুরতো। এমনি করেই দিন যায়।

এক দিন হানাসাকাজিজি দেখলো তার কুঁড়ে-ঘরের সামনে যে জায়গাটায় একরত্তি একটু বাগান আছে, শিরো সেইখানে গিয়ে অনবরত পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর চেঁচাচ্ছে। হানাসাকাজিজি বুড়ো হয়েছে, তার উপর হঠাৎ শিরোর এ রকম ভাব কখনও সে দেখেনি তাই খুব অবাক হয়ে গেল—শিরোকে কাছে ডাকতে লাগলো—কিন্তু সে কিছুতেই আসে না, কেবল পা দিয়ে মাটি তুলতে থাকে আর চেঁচামেচি করে মনিবকে কি যেন বলতে চায়।

অবশেষে মনিব উঠে শিরোর কাছে গেল—তার কাজ কর্ম্ম দেখে মনে হলো শিরো যেন তাকে ঐ জায়গাটা খুঁড়তে বলছে। বুড়ো হানাসাকা কি ভাবলে, তার পর একটা কোদাল এনে সেইখানে বসাতেই ঠং করে উঠলো।

—আরে, শব্দ কিসের হলো? হানাসাকা নিজের মনে বলে উঠলো! শিরো শব্দটা শুনে আরো জোরে জোরে পা দিয়ে মাটি খুঁড়বার মত চেষ্টা করতে লাগলো। হানাসাকা আবার কোদালের ঘা বসালে—আবার ঠং!

আরো দু'বার কোদাল বসাতেই দেখা গেল সারি সারি মোহরের ঘড়া।

বিস্ময়ে হানাসাকার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না—এ কী! এত ধন-রত্ন কোথায় ছিল—কেমন করে শিরো এর খবর পেলো আর এ সব তার হলো!

হানাসাকা কিন্তু খুব সাদাসিদে আর সরল লোক ছিল তাই তার এ সৌভাগ্যের কথা কারুর অজানা রইল না। হানাসাকা আবার ম্যাজিক জানতো, তাই অনেকে বললে, ও-সব যাদু, আসলে কিছু নয়।

কিন্তু হানাসাকার পাশের প্রতিবেশীটি বড় সোজা লোক নয়। সে তার জানলা দিয়ে ঘটনাটা আগাগোড়া দেখেছিল—হানাসাকার এমন সৌভাগ্য দেখে সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো।

শেষে এক দিন থাকতে না পেরে সে হানাসাকাকে বললে, তোমার শিরোকে দু'-এক দিনের জন্য যদি আমার বাড়ী রাখো, বড় ভাল হয়,—ভারী চোরের উপদ্রব হয়েছে।

হানাসাকা ভালমানুষ লোক—তখনি শিরোকে পাঠিয়ে দিলে আর প্রতিবেশীটি তাকে তার কুটীরের সামনে ছোট বাগানটায় একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলে। হিংসুটে প্রতিবেশীটি মনে করেছিল শিরো ইচ্ছা করলেই তাকেও হানাসাকাজিজি'র মত সৌভাগ্যশালী করে তুলতে পারবে।

গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখাতে শিরো ভয়ানক রেগে গিয়েছিল, তাছাড়া এই লোকটাকে মোটেই সে পছন্দ করতো না। সে বেশ বুঝেছিল তার মনিবকে হিংসা করে সে তাকে এনেছে। রাগে বিরক্তিতে সে চীৎকার করতে লাগলো আর পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো।

প্রতিবেশী ভাবলো তাহলে তো এবার ঠিক হয়েছে—এই বলে সে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলো। মাটি তুলে তুলে মস্ত বড় গর্ত্ত হয়ে গেল—আর এদিকেও মাটির ছোটখাটো পাহাড় হয়ে গেল কিন্তু কোথায় ধন-রত্ন, কোথায় কি—কিছুই নেই! যত দূর দেখা যায় কেবলই মাটি!

প্রতিবেশীর তখন রাগে মাথার ভিতর কি রকম হচ্ছে—এই রকম করে দুষ্টু কুকুরটা তাকে ফাঁকি দিচ্ছে—রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাই সে কুকুরটাকে মেরে ফেললে।

শিরোকে মেরে ফেলার পর তার মনে হলো সে তো ওকে ধার করে এনেছে—এখন যদি হানাসাকাজিজি ওকে চায় তাহলে তো ভারী মুস্কিল হয়ে যাবে, কি বলবে সে। তাড়াতাড়ি শিরোর দেহটা নিয়ে একটা পাইন গাছের নীচে তাকে পুড়িয়ে দিলে।

হানাসাকাজিজি শুনলো, শিরো হঠাৎ মারা গেছে আর তাকে খবর না দিয়েই দেহটাকে প্রতিবেশী পুড়িয়ে ফেলেছে।

বেচারী বুড়ো হানাসাকাজিজি—মনের দুঃখে খানিকক্ষণ চোখের জল ফেললো শিরোর জন্ত, তার পর আস্তে আস্তে গিয়ে তার কবরের কাছে ফুল দিয়ে এলো—আর অনেকক্ষণ বসে বসে শিরোর কথা ভাবলে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো—চারি দিক নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে। হানাসাকাজিজি শিরোর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলো। তার পর বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখলো—শিরো এসে বলছে, ঐ দুষ্টু লোকটা আমাকে মেরে পুড়িয়ে ফেলেছে। যাই হোক, তুমি এক কাজ করো—পাইন গাছটা কেটে একটা ঢেঁকী তৈরী করো। তার পর তুমি যখন এটা ব্যবহার করবে তখন এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে।

ঘুম ভেঙ্গে হানাসাকা অনেকক্ষণ স্বপ্নের কথা ভাবলে, তার পর স্বপ্নে শিরোর কথামত কাজ করতে লাগলো।

পাইন গাছের ঢেঁকী দিয়ে যে ধান-ভানা হতো—দেখা গেল, সেগুলি সোনার ধান হয়ে যেতে লাগলো।

এ খবর প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছতে দেরী হলো না। দুষ্টু লোকটার মাথায় আবার দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো—সে গিয়ে আবার হানাসাকাজিজির কাছে ঢেঁকীটা ধার চাইলো। বললে, একটু বিশেষ দরকার পড়ে গেছে, ঢেঁকীটা আমায় কয়েক দিনের জন্ত ধার দাও।

সহজ সরল লোক হানাসাকা···তাড়াতাড়ি দিয়ে দিল ঢেঁকীটা। প্রতিবেশী এবার খুব আশা করে ঢেঁকী নিয়ে ধান ভানতে স্নুরু করলো। শেষে দেখলো তার ভালো ধানগুলি একেবায়ে ময়লা ধূলোয় পরিণত হয়েছে।

ভাল ধানগুলির এই অবস্থা হলো—সোনার ধান পাওয়া দূরের কথা। রেগে গিয়ে সে ঢেঁকীটাকে টুকরো করে ফেললে, তার পর তাকে জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই রাত্রে হানাসাকাজিজি আবার স্বপ্ন দেখলো—শিরো যেন এসে বলছে: ঢেঁকীটাকে প্রতিবেশী পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে, সেই ছাই নিয়ে তুমি খালি জমিতে ছড়িয়ে দাও।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গতেই হানাসাকাজিজি স্বপ্নে শিরোর কথা মত কাজ করলে। শুকনো অনুর্ব্বর জমিতে সেই ছাই ছড়াবা মাত্রই চারি দিক শস্ত-শ্যামল হয়ে উঠলো। শুকনো গাছগুলি ফুলের মেলায় ভরে গেল।

শিরো স্বপ্নে হানাসাকাজিজিকে যে উপায় বলে দিলে—তাতে তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমন একটা ক্ষমতাপন্ন লোককে কে না ডাকবে—কে না আদর করবে—কাজের জন্ত? কাজেই হানাসাকাজিজির নাম, যশ, অর্থ আর ধরে না।

এক দিন রাজা ডেকে পাঠালে তার অজন্মা জমির জন্ত। হানাসাকা গিয়ে বিনীত হয়ে নমস্কার জানালে, তার পর তার ঝুলি থেকে সেই ছাই বার করে ছড়িয়ে দিল। দেখতে দেখতে শুকনো খড়-ওঠা জমি ফুলে-ফলে নতুন সবুজ পাতার গাছে ভরে গেল, চারি দিক যেন ঝলমলিয়ে উঠলো।

রাজা অনেক পুরস্কার দিলেন হানাসাকাজিজিকে।

আবার দুষ্টু প্রতিবেশীর টনক নড়েছে। রাগে, হিংসায় জলে-পুড়ে মরছে সে। থাকতে না পেরে অবশেষে সে রটনা করলে, হানাসাকাজিজি কি আর করেছে তার চেয়ে ভাল ক্ষমতা তার আছে, সে বিশীর্ণ শুকনো জমিকে—গাছপালাকে সবুজ প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে।

এ কথা মুখে-মুখে প্রচার হতে হতে রাজার কানে পৌঁছল। রাজা পরীক্ষা করবার জন্ত তাকে ডেকে পাঠালেন—তার পর যখন সত্যিকারের কাজের সময় এলো—তখন সেই দুষ্টু লোকটা করলো কি, ছাই ফেলতে লাগলো—যেই ছাই ফেলা অমনি সেই ছাই চার-পাঁচ গুণ হয়ে ধূলোর ঝড় সৃষ্টি হতে লাগলো। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে রাজা তো প্রায় অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। কোন ক্রমে সে-যাত্রা পরিত্রাণ পেয়ে রাজা প্রাসাদে ফিরে গেলেন আর দুষ্ট লোকটার ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

পরের সুখ-সম্পদ দেখে হিংসা করলে—লোভ করলে তার এমনি সাজাই হয়।

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

মোটা মল্লের কাহিনী

স্বপন যে দেখেছিনু কল্য
তাল ঠুকে গোটা দুই মল্ল
দুই গোঁফে চাড়া দিয়ে ঝাড়া মাথা নাড়া দিয়ে
গা-হাত-পা ঝাড়া দিয়ে বল্লো:
"সেরা বীর মোরা দুটি ভাই রে
আমাদের জুড়ি কেহ নাই রে
আয় দেখি লড়্‌বি কে গুঁতো খেয়ে মরবি কে,
গুঁড়িয়েই করে দেবো ছাই রে।
শুধু জেতা আমাদের কারবার।
জোটা নেই একেবারে হার্‌বার।
দেখ্‌ছো বুকের ছাতি? এরি পরে নিই হাতী
বড়ো বড়ো সার্কাসে বার বার।
বনে বনে কত বাঘ সিংঘী
খিটমিটে, হিংসুটে, ধিঙ্গী,
খেয়ে আমাদের লাথ পড়ে থাকে চিৎপাত
ঠিক যেনো উলটানো ডিঙ্গী।
আমরা খাই যে সব খাদ্য
এত খাওয়া তোদের অসাধ্য
দুধ ঘি মাখন পাঁটা ডাল রুটী দই ডাঁটা
মুর্গী খাশীর করি শ্রাদ্ধ।
জলের বদলে খাই ডাব রে
হয়ে গেছে এমনি স্বভাব রে
পোলাউ পায়েস পিঠে তেতো টক্ ঝাল মিঠে
যাহা পাই তাহা দিই সাবড়ে।
জ্যাম জেলি মোরব্বা দরবেশ
কষে খাই পরোটার পর বেশ।
লেডিকেনি দানাদার গিলি যেন হানাদার
ভালবাসি ভাজামিঠে সব বেশ।

লুচি খাই সাড়ে কুড়ি গণ্ডা,
পেটে পুরি ঝুড়ি ঝুড়ি মণ্ডা,
পেটে খেলে পিঠে সয় কেতাবে কি লিখে কয় ?
চেহারা কি সাধে হয় ষণ্ডা ?
নই মোরা চুনোপুটি চ্যাংড়া
কত আম ফজলি ও ল্যাংড়া
মুখ দিয়ে চলে যায় সুট করে গলে যায়
যেমন সাপের পেটে ব্যাংরা।
যদি কেউ করো হাসি ঠাট্টা
ঠাস করে মেরে দেব গাঁট্টা।
দেখবে যে ভুল রে সর্বের ফুল রে
দু'হাজার আড়াইশো আট্টা।"
শুনে চটে-মটে দীনু দত্ত
চট্‌পট্ বলে: "এ কি সত্য ?
আয় বাজী ধরা যাক্ হাতাহাতি লড়া যাক,
বুঝি নে কো অতশত তত্ত্ব।
আমি তো তোদের মত খাই নে।
কেন না তা চাইলেও পাই নে।
ডাল ভাত খাই সোজা বাড়াতে পারি না বোঝা
অল্পই পাই কিনা মাইনে।
রোজ ভোরে কসরতে মন দি'
বেশ করে বৈঠক ডন্ দি'
মন করে সুস্থির শিখি প্যাঁচ কুস্তির
কতো যে যুযুৎসুর ফন্দী !
একাই তোদের সাথে লড়বো।
হেস্ত-নেস্ত আজি করবো।
দেখা যাক্ এইবার হিম্মৎ কত কার ;
আজ ঠিক মারবো কি মরবো।"
এই শুনে মোটা দুই মল্ল
পিঠটান দিতে দিতে বল্ল :
"যেতে হবে কাজে ভাই এখন সময় নাই,
আজ থাক্, দেখা যাবে কল্য।"

তুতুলের সংসার

দিলীপ দে-চৌধুরী

তুতুলরাণী পুতুল খেলে
কাপড় মেলে রোদ্দুরে—
সারা দালান-ঘর জুড়ে
শুকোয় শাড়ী, ইজের, ধুতি
বেনারসী, তসর, সুতি—
নানান্ রঙের হালফ্যাসানী
বেগুনী, লাল আর আশ্মানী!
রান্না চড়ায়
ছোট্ট কড়ায়
কোপ্তা-কাবাব-তরকারী
মাতিয়ে তোলে ঘর-বাড়ী !
কর্তা পুতুল অফিস যাবে,
খোকন যাবে ইস্কুলে
খাটুনীতে তাই উঠছে ঘেমে
মুখখানি তার তুলতুলে !
বাচ্চাটাকে চান করাতে
ভুল হয়ে যায় ফ্যান গড়াতে—
তেল জ্বলে যায় প্রথম আঁচে
এমন করে মানুষ বাঁচে ?
সর্দি জ্বরে ভুগছে মেয়ে
বদ্যি-হাকিম সুযোগ পেয়ে
দিচ্ছে কি ছাই জল পড়ে
নিচ্ছে টাকা করকরে !
রোগ সারে না
আর পারে না
সইতে এমন রোজ দু'বেলা
সংসারের এই সাত ঝামেলা।
বাটনা বাটা, কুটনো কোটা
বাসন মাজা, এটা-ওটা
সময় মাফিক জোগানো ভাত
কান্না থামাও সারাটি রাত—
কাণ পাকা এর
পেট ব্যথা ওর
ওষ্ঠাগত প্রাণ তুতুলের
সামলাতে সংসার পুতুলের।

আয় গো আয়

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-ভোরের রূপকথারা আয় রে আয়
খুকু তোদের সাথী হতে চায় রে চায়।
আয় রে হয়ে পাখীর গান আর বনের ফুল
ঢেউ হয়ে আজ রূপো নদীর ভর্ দুকূল।
স্বপন হয়ে ফুটিয়ে দে গো থল্-কমল।
সবুজ ঢেউয়ে মাঠে মাঠে চল্ চপল্।
ওপার হতে বাজিয়ে বাঁশী তোল্ রে সুর।
ব্যথা-ব্যাকুল লক্ষ হিয়া কর্ মধুর।
ফুলে ফুলে দে গো ঢেকে শিউলি-তল।
স্নেহের সুখে দে গো ভরে বন শ্যামল।
নতুন আলোয় উজল করো খুকুর মন।
ভাব করবে নতুন করে ভাই আর বোন্।
সবার স্নেহে উঠবে ভরে সবার বুক।
মায়ের পরশ পেয়ে সবার জাগবে সুখ।
শরৎ এলো বাদল রাত্তি যায় গো, যায়।
সোনার দেশের রূপকথারা আয় গো আয়।

গল্প হলেও সত্যি

যতীন্দ্রনাথ পাল

অনেক দিন আগেকার কথা।

একটি তেরো বছরের কিশোর পশ্চিমের কোন সহরে গিয়েছিল। গিয়েছিল রুগ্ন শরীর সারাবার জন্তে। কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে তার দেহ হল সুস্থ ও সবল। ভাল ভাবে সেরে উঠল সে। তার পর এক দিন ছেলেটি খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর বেলায় একটি ঘরে বিছানায় শুয়ে একখানি ইংরাজী বই হাতে নিল পড়বার জন্তে। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখল, আশ্চর্য কাণ্ড! পড়তে পারছে না সে, একেবারে ভুলে গিয়েছে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী ভাষার কোন অক্ষরই আর তার স্মরণে আসছে না। মুখ শুকিয়ে গেল তার ভয়ে, শরীর ভিজে উঠল ঘামে। সেই ঘরে ছিলেন তার বাবা। ছেলেটির সেই অবস্থা দেখে জিগগেস করলেন তার বাবা: কি হল তোমার, এত ঘামছ কেন তুমি?

ছেলেটি উত্তর দিল: কৃষ্ণনগরে যে জ্বর হয়েছিল আমার তা বোধ হয় পুরো সারেনি আগে, আজ ঘাম দিয়ে একেবারে ছেড়ে গাচ্ছে।

তার বাবা আর কিছু বললেন না।

কিন্তু ছেলেটি তখন বেজায় ভড়কে গিয়েছে। তার মাথার কোন অসুখ হল না তো? ইংরাজী ভাষার স্মৃতি লোপ হয়ে গেল না তো তার? মনে মনে সে ঠিক করল, দিন সাতেক আর কোন ইংরাজী বই স্পর্শ করবে না, দেখবে কি হয় তার পর। সাত দিন তার কাটল দারুণ দুশ্চিন্তায়। আবার এক আজব কাণ্ড সাত দিন পরে! সে দেখল, ইংরাজী ভাষায় তার জ্ঞান তখন পুরোপুরি ফিরে এসেছে। কি করে এমন হল ভেবে সে কোন কূল-কিনারা পেল না।

এই তাজ্জব ব্যাপারটি কার জীবনে ঘটেছিল জান? সুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে ঘটেছিল এই অদ্ভুত ঘটনাটি!

খুকুমণির ছড়া

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

খুকুমণি খুকুমণি মুখটা কেন ভার
সেই সকালে খেয়েছো ভাত, খাওনি কিছু আর
বেলা এখন ঠিক বারোটা কোথায় গেছে বাবা?
সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে পায় না কোন কাজ,
চাইলে পরে হাড়ের দিকে যায় না কিছু ভাবা।

খুকুমণি খুকুমণি গায়ের জামা নেই?
কোন্ ভাদরে পেয়েছিলে একটা জামা সেই!
আজকে কোথায় পাবে জামা খালি গায়েই থাকো;
টাকাগুলো কোথায় যেন করে আছে ভীড়—
তোমার তরে হয়নি টাকা, সে সব খবর রাখো?

খুকুমণি খুকুমণি পুতুল তোমার চাই?
কি সব্বোনাশ অমন কথা বোলো নাকো ভাই!
ও-সব হলো খারাপ কথা পাছে মুখে আনো,
শুনতে পেলেই তোমায় ওরা পুরবে নিয়ে জেলে,
তুমি হলে গরীব মানুষ, তা কি তুমি জানো?

খুকুমণি খুকুমণি জ্বল পড়ছে ঘরে?
সবাই মিলে জেগেছিলে সমস্ত রাত ধরে?
তাতে এমন হয়েছে কি, চ্যাচাচ্ছো যে অ্যাতো?
বুকের ভেতর কফ জমেছে? পথ্যি—ওষুধ চাই?
টাকা দিলেই ওষুধ পাবে ভাবছো কেন এতো।

খুকুমণি খুকুমণি গরীব যতো লোক
এতই বোকা বলব কি আর, মরার সে কি ঝোঁক!
ভাতের তরে মিছিল করে মরল গুলী খেয়ে,
ওদের নাকি আসছে গো দিন আজগুবি সব কথা—
মরণকে আজ তুচ্ছ করে রয়েছে তাই চেয়ে।

বসে বসে খুকুমণি ভাবছো তুমি কি।
এই দেখ না আমি কেমন ছড়া কেটেছি।
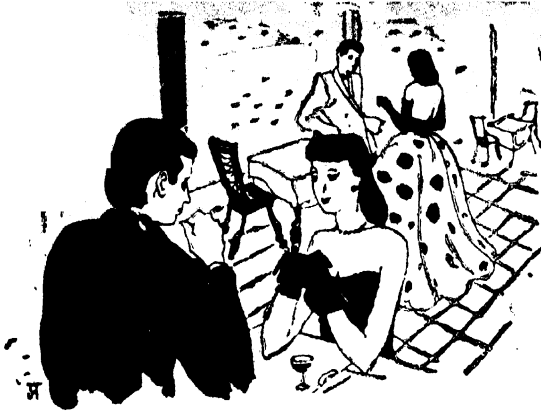
তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পাঁচ

ব্রাণ্ডির বোতলের দামের জন্য ওর তিনদিনের মাইনে কেটে রাখল আফতালিয়েন, কিন্তু ক'দিন ধরে মোদরু যতগুলি ছবি আঁকল সব নিয়ে নিল। সবগুলিই হারিকট রুজের প্রতিকৃতি। তার চুল, সোজা চোখ, আর উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ মোদরুর আঁকা ছবিতে আরো সুন্দর ও মনোরম হয়ে উঠছে।

সন্ধ্যার সময় ৎবরো এসে আফতালিয়েনের কাছ থেকে পাওনা বাবদ দশ ফ্রাঁ সংগ্রহ করে মোদরুকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেল, মেয়েটি সেখানে মোদরুর প্রতীক্ষায় বসে আছে।

তারপর কারিকরের মত অনাড়ম্বর খানা আর পানীয় শাদা জল, তারপর মোদরু ও হারিকট রুজ বেড়াতে বেরোয়।

কখনও বা ওরা 'রু কামপেন-প্রিমিয়েরে' ছোটো কানটিনে গিয়ে খানা সেরে নিত। সেইখানে দেওয়ালগুলি বিচিত্র চিত্রে পরিপূর্ণ। কোনোটা বাঘ, কোনোটি ফুল, অদ্ভুতাকৃতি স্ত্রীলোক, কিংবা মানুষ-আঁকা রেলওয়ে ট্রেন। একজন মডেল ও জনৈক দরিদ্র চিকিৎসকের মাঝামাঝি ওরা বসত।

তারপর 'লা অবসারভেটরি'র ছায়াবীথি ধরে শান্তিময় বুলভার্দে জুন মাসের আকাশের পানে তাকিয়ে ওরা বেড়িয়ে বেড়ায়। চেস্টনাট গাছের ঘন পত্রপুঞ্জের ফাঁকে তারারা উঁকি দেয়,—মেডিচি প্যালেস থেকে কারপো স্মৃতিস্তম্ভ, তার পিছনে ইতালীর ডোমের মত মানমন্দিরের চূড়া দেখা যায়,—নৈশ আকাশের সুনীল পটভূমিতে ধূসর অথচ স্পষ্ট।

মোদরুল্লো বলে—"ফ্রান্সটা চমৎকার লাগে, কারণ ফরাসীদের মাত্রাজ্ঞান আছে। কিন্তু তুমি যতক্ষণ পাশে আছো ততক্ষণ সবই সুন্দর! রাস্তার ঐ আলোটা সুন্দর, ঐ পাথরের টুকরাটাও চমৎকার। সৌন্দর্য কি? উ ট রো ঠিকই বলেছেন। কোথা থেকে আমরা ধারণা করে নিই একটি জিনিস সুন্দর আর অন্যটি কুৎসিত? আজ আমরা যাকে কুৎসিত মনে করি বাল্যকাল থেকে তাকেই যদি সুন্দর বলে শেখানো হ'ত তাহ'লে আজ তার সৌন্দর্যে আমরা পুলকিত হয়ে উঠতাম। গোলাপের মধুর গন্ধ আমাদের কাছে ভালো লাগত না যদি অন্য কোনো সুগন্ধির দিকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। এই সব বদ্ধমূল প্রাক্তন ধারণাবলী আমাদের পালটাতে হবে।

"সত্যি, আমাদের ভালোবাসতে শিখতে হবে, অপরকেও ভালোবাসা শেখাতে হ'বে। আজ সকালে তুমি চলে যাওয়ার আগে তামার পাত্রে যে ছবিটি এঁকেছিলে তুমি তার পিছনে কি গভীর ভালোবাসাই না ছিল!"

কিন্তু কি যে সব বলছে সে বিষয়ে মোদরুল্লোর নিজেরই তেমন ধারণা নেই, সে আবার বলে:

"চমৎকার শোনায়। কিন্তু রঙের মাধুর্য ফুটে উঠেছে যাকে আমি গভীর ভালোবাসা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি তার ভিতর, সে আমার বিষয়বস্তু নয়—সে আমার দারিদ্র্য। জানো, ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোকের একটি মন্তব্য আমাকে বড় পীড়ন করছে, যখন মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি যে দারিদ্র্যই প্রকৃত রসবস্তুর প্রকৃত উৎস, তখনই মনে পড়ে 'মাইনে পাওয়ার আগের দিনের বৈরাগ্য'।"

ওরা সব সময়ই যে সব চমৎকার রাস্তা বুলভার্দে এসে পড়েছে তারই একটি ধরে ফিরত। চমৎকার বাগানগুলির মধ্যে উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত ষ্টুডিয়োগুলি দেখা যায়—তামার বাসন আর সোনালি ছবির ফ্রেম চকচক্ করে। কোনো কিছু কথা না বলে ওরা নীরবে জিনিষগুলি দেখে। কোনোদিন এই সব বিলাস-সামগ্রীতে সমৃদ্ধ জীবন ওরা উপভোগ করতে পারবে কি না, সে কথা স্বপ্নেও ভাবে না। ওরা 'লা রোতন্দে'তে গেল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে। 'লা রোতন্দের' চতুর্দিকে আলো জ্বলছে আর জনতায় পরিপূর্ণ।

সেই সময় 'লা রোতন্দের' আসর জমজমাট। মার্কিণ, ইংরাজ, সুইডিস্ নর-নারী সেখানে ঝাঁক বেঁধে আসছে। স্বাধীন ও মুক্তছন্দ জীবনে সবাই আনন্দমুখর, পুরুষদের গলায় 'কলার' নেই, মেয়েদের

মাথায় নেই 'হ্যাট'। এই সব মুক্ত-আকাশ কাফে ওদের দেশে অজ্ঞাত, তেমনই ওদের দেশে নেই নৈতিক স্বাধীনতা, আর কালো চামড়ার মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে কণুই ঘষার মত ঘোরতর পাপ-কর্ম্মের প্রচলনও সেই দেশে নেই।

বহু জাতির বহু মানবের বহুবিধ খেয়ালের মিলন-ক্ষেত্র এই কাফে।

এখানে আছে নগ্নবাহু সুকেশী ভলকাইরিস, গায়ে তার ডোরাকাটা পোষাক, হ্রস্বচুলওলা একটি জোন অ আর্ক, ময়লা সোয়েটার পরা জনৈক বৃটিশ মহিলা, মোজাটায় গোলাপী ছাপ। একজন মার্কিণ মহিলা তাঁর গায়ে একরকমের স্পেনীয় শাল আর দু'কানে দু'রকমের ইয়াররিং, সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই ওদের জন্ম কিছু করতেন। একজন রাশিয়ান ইহুদী মহিলা—মুখে তার গাম্ভীর্য ও চাতুরীর ছাপ। দুটি জাপানী বন্ধুর একই রক্ষিতা, রক্ষিতাটিকে মাঝে রেখে পরস্পর তাকিয়ে থাকত কিন্তু কদাচিৎ তাদের কলহ হ'ত। দুটি কারণে সে কার্য মর্যাদাহানিকর—প্রথমতঃ তারা বিদেশে এসেছে, তাছাড়া একজন হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের সামুরাই পরিবারের সন্তান, অপরটি তোকিয়োর এক সাইকেলওলার ছেলে। একটি কোণে কয়েকজন মডেল তাদের ছবি তোলার পোষাক পরে বসে আছে, একজন চমৎকার সেজেছে। বিড়ালাক্ষী রমণীটিকে 'মানে'র আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। আর একজনকে মনে হচ্ছে যেন চীনের পুতুল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেই 'ক্যান্-ক্যান্' নৃত্যের ভলটীর ভংগীতে একজন বসে আছে। তারা পরস্পর আর সব দেশের ও সকল কালের সকল শ্রেণীর রমণীদের মত তাদের ছেলেমেয়েদের ও দরজিদের বিষয় আলাপ-আলোচনা করছে। খেয়ালীরা চলে গেল, রীতিমত বাতিকগ্রস্তের দল। কেউ বিরাট মহাত্মা। নগ্নপদ, চোখে 'মনোকোল', তাতে কাচ নেই।

চ্যাটিলোর মনুষটি তাঁর দিনের বেলার পায়জামা পরে আছেন। একজন পরেছেন রান্নাঘরের পরদা দিয়ে বানানো পোষাক। এই ধরণের পাগলামি সুরু হলে কোথায় যে তার শেষ হবে তা কেউ জানে না। অবস্থা এমনই আত্মহারা এবং আধুনিক আর্টের নেশার মত প্রগতিশীল ; "La verole Montparnasse" (মঁপারনাশীয় বসন্তরোগ)এর সমগোত্র।

ফুল-আঁকা অসংখ্য সার্ট আর ওয়েষ্টকোট, রেমব্রাণ্ডীয় বনেট, কাগজের গেঞ্জী। এই ধরণের খাম-খেয়ালীপনা সকলেই খুব উপভোগ করেন, সবাই সকলকে চেনেন, জানেন তাঁদের গুণাগুণ আর দুঃসাহসিকতার ইতিহাস।

ওরা পরস্পর মেলামেশা করেন কিন্তু খুব কম। এই সব বাতিক-গ্রস্তের দল নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠী রচনা করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। রাশিয়ানরা রাশিয়ানদের সঙ্গে। মডেলরা মডেলদের সঙ্গে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কিউবিষ্টরা নানা শ্রেণীর বাউণ্ডুলে আর বখাটদের সঙ্গে মিশে থাকে, আর যারা প্রকৃত আর্টিষ্ট, যথা :—মোদরুল্লো, লী জার, মেৎসিনগার, লা গার, লিওপোল্ড লেভী, চেরিয়ানে, ভ্যাসিলেফ ও রিজ, আর কালা স্প্যানিশরা সবাই একত্রে থাকে। এই কালা স্প্যানিয়ার্ডের দল এল গ্রেচোর গোপন রহস্যের সন্ধানের চেষ্টা করছে।

ওরা এক-একটি দল একে একে অন্য দলে বেড়াতে যায়। মোদরুল্লোর দল ভাস্কর ব্রাণকুসীর ষ্টুডিয়োতে বেড়াতে গিছল। ব্রাণকুসী সকল প্রকার আকারকে হ্রাস করে তাকে রূপায়িত করেছেন আদিম আকৃতি ডিমে।

ওরা কাসট্রোর কাছে গেল, সে গীট্যরের ছবি আঁকে। তার ষ্টুডিয়োর দেয়াল-গাত্রে এমনই প্রায় একশোটি বাদ্যযন্ত্র টাঙানো আছে। একটিমাত্র ক্যানভাসে তিনি এই ধরণের অন্ততঃ কুড়িটি যন্ত্র একত্রিত করে এঁকেছেন। বিভিন্ন পারিপ্রেক্ষিত অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা হয়েছে। একটিমাত্র বিষয়বস্তু যথা, গীট্যর, কিউব, বা মানুষের মাথা ফুটিয়ে তুললেই শিল্পীর কাজ শেষ হয় না। তাকে কেমন দেখায় শুধু সেইটুকু আঁকলেই চলবে না, চতুর্দিক থেকে কেমন দেখাবে তাই আঁকতে হবে।

যাদকিনের ছবি দেখতে গেল ওরা, তিনি স্থূলভাবে কাঠের কুমারী মূর্তি খোদাই করেছেন, তার মধ্যে নতুন মাধুর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন—রীতিগত দৈহিক সৌন্দর্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা। ব্যালে নর্তকীদের হাত এঁকেছে যেন বেতের ঝুড়ির হাতল, আঙুলগুলি অতি চমৎকার করে সাজানো।

ওরা লীজারের কাছে গেল, শিল্পী লীজার এই যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের আকার দিয়ে মানুষ আঁকার চেষ্টা করছেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে চেষ্টা করে অচেতন পদার্থের মাধ্যমে তিনি চেতন পদার্থ আঁকার সার্থক কৌশল আয়ত্ত করেছেন, পরিচিত রীতির 'রুচিসম্মত' ধারার সঙ্গে এর এতটুকু মিল নেই। লীজারের ষ্টুডিয়ো, মোটর, মেশিনের অংশবিশেষ, গ্যাস-মিটার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, তার ওপর তাঁর এমনই মমতা যেন সেগুলি হাতির দাঁতে তৈরী। এই শিল্পী এদিনের শিল্পের নব জন্মের মুহূর্তে যেন কার্পাচিয়োর মতই দুর্ধর্ষ ও অমিতবল। তাঁর মতে ইতিমধ্যেই এ'যুগের রেনেসাঁর যুগ ধরেছে।

মাঝে মাঝে ওরা সিনেমায় যেত—থিয়েটারে যেত না। এই সব গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তিরা আগামী শতাব্দীর জন্ম প্রস্তুত হচ্ছেন, তাই দরজির দোকানের ডামিদের বিগত যুগের পটভূমিতে সেই বাঁধাধরা রীতির অভিনয় ওদের আর ভালো লাগে না। রু ড লা গেইটেই একটি সিনেমা-হাউসে ওরা যায়, চলচ্চিত্রের মধ্যে একটা নূতন রস আছে, অতিশয় নির্বোধ কাহিনী সম্বলিত হলেও ওর মধ্যে জীবন দ্বিগুণিত হয়।

আশ্চর্য ! থিয়েটার অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে রাবিস নিক্ষেপ করেছে এই অতি আধুনিক আবিষ্কার তারই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। ছেলেমানুষী ভাব-বিলাস আর ফাঁকা রোমান্স ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সহসা এর শাদা রঙ প্রকাশ পায় পর্দার গায়ে—কোনো শিল্পী এমনটি কল্পনাও করেননি। চোখ যা ক্ষণকাল মাত্র দেখতে পায় মানুষ, বস্তু, নানা বিক্ষিপ্ত অংশ ক্যামেরা কেমন সহজে ধরে রাখে !

লীজার বলে ওঠে—"টেবলের নীচে ঐ পাখানা দেখছ। "এই প্রথম এই ভাবে একটা পা দেখা গেল। এর কি গুরুত্ব ! কি বৈশিষ্ট্য ! আঙ্গিকের কি অভিনবত্ব—কিংবা অঙ্গহীনত্ব। কোনো শিল্পী এই ধরণে যদি বিকলাঙ্গ পা আঁকেন তাহ'লে তাঁকে লোকে উন্মাদ বলবে। এই বিকৃতি যে বিন্যাসের ত্রুটীর ফলে ঘটেছে তা নয়—ক্যামেরার চোখে যা ধরা পড়েছে তারই প্রতিচ্ছবি। চোখ সব কিছু দেখে শতাব্দীব্যাপী শিল্পসম্বন্ধীয় বদ্ধমূল ধারণার চশমা দিয়ে—আহা—জীবনে কোনো ছবি কখনো দেখেনি এমন কেউ যদি ছবি আঁকত, কত শিক্ষাই আমাদের দিতে পারত—"

হারিকট রুজ চুপ করে সব শুনে যায়। মোদ্রুর ভঙ্গী উদাসীন। মাঝে মাঝে তার গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে মোদ্রু আর মেয়েটি তার হাতটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে।

তারপর আবার ৎবরোর বাড়িতে ফিরে যাওয়া। সমস্ত দলটি সঙ্গে চলেছে, ৎবরোর বাহুলগ্ন হয়ে চলেছেন তার স্ত্রী, লীজারের মাথায় ডার্বি হ্যাট, গায়ে জারসী। উৎবরো মাঝে মাঝে মদের দোকানে থামছে আর একে একে এক, দুই, তিন গ্লাস শেষ করছে।

হারিকট রুজ রুস্তমার মুদীর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রু দ্য লা গেইট সম্পর্কে তার স্মৃতিকথা বলে যায় :

"সকাল বেলা এটা হ'ল প্যারীর সবচেয়ে জনবহুল পথ, মনট্রুগ, ভানভে, ম্যালাকোফের সবটাই যেন এই এ্যাভিন্যু দ্যু মেইনের পথে ভেঙে পড়ে। এই পথ দিয়েই সবাইকে যেতে হয়, কারণ এ্যাভিন্যুটা পড়েছে গিয়ে গোরস্থানের সামনেই, সেখানে তেমাথা,—এই এ্যাভিন্যুটাই একমাত্র বেরোবার পথ। তাই সকাল ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত যেন মেলা বসেছে মনে হবে। এ্যাভিন্যু দ্যু মেইনের গাছগুলির ফাঁকে সূর্যালোক ভেঙে পড়েছে এডগার কুইনের বুলভার্দে। এ রকম একটা শোভাযাত্রা কোনো শহরতলীতে দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময় এত সব হৈ-চৈ নেই। লোকজন বাড়ি ফেরে আরো মন্থর গতিতে,—মদের দোকানগুলিতে আলো জ্বলে ওঠে, ছিট কাপড়ের অসংখ্য ফেরিওলা ঘুরে বেড়ায়, দেখ এই আনন্দময় পাড়ার সব বাড়ির সামনেই ইতালীর মত গাড়িবারান্দা—প্যারীর আর কোনো রাস্তার সাইনবোর্ড-এ এমন চমৎকার নাম নেই—ক'টি মদের দোকানের নাম A la Belle Polonaise, Aux Iles Marquises, Cafe Javanais—আর রাতে যা দেখছো সে কিছুই নয়। আমি যখন ছোট্ট মেয়ে ছিলাম তখন যদি দেখতে, তখনও সিনেমা এখানে আসেনি। তখন তিনটে বিরাট নাচের হল ছিল, গ্যালকের বিরাট অর্গান—ওদিকে কাফে-কনসার্ট, ববিনো তখন পথেই মিছিল বসাতো। জামিনের 'লা গেইট মঁপারনাশে' প্যারীর সমগ্র সাহিত্য ও শিল্পজগৎ এসে হাজির হ'ত। লাউট্রেক ওখানে প্রায় আসতেন, এইখানেই সেউরা তাঁর সেই বিখ্যাত ছবি এঁকেছিলেন। পিছনে একটা কাফে আছে জানো ত, একেবারে এ্যাভিন্যু দ্যু মেইনে গিয়ে পড়েছে। এই কাফেতে এ যুগের সব বড় বড় শিল্পীদের ছবি আছে, আমি শুনেছি এই সব ছবির নীচে আবার লাউট্রেক, সেউরা, ও সেরের ছবি আছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে মালিক করলেন কি, ওর ওপর আবার রঙ চড়ালেন, গঁকুর প্রভৃতি আরো অনেকের প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করলেন না।

আহা ! আমার একটা চমৎকার গল্প মনে পড়েছে—জাঁ লোরেন এখানে প্রায় আসতেন, সঙ্গে থাকতেন লেইন দ্য পউগী, দু'ঘোড়ার ভিক্টোরিয়া গাড়ি চড়ে আসতেন, কোচবাক্সে থাকত তকমা-পরা চাপরাশী, মহিলাটি সব সময়েই শাদা রঙের পোষাক পরতেন, বেলুন স্কার্ট, আর মাথায় বিরাট দুটি ডানাওলা টুপী। ঐ কালে ঐ রকম টুপীরই প্রচলন ছিল।

প্রতি সপ্তাহেই ওদের আসার প্রতীক্ষা করত সবাই, ডান দিকের একটা বক্স ওঁরা নিতেন। ভদ্রলোকটি আবার ওঁর চাইতেও সাজতেন বেশী। চোখের ঠিক ওপরেই এসে পড়ত কপিশ রঙের বিরাট পরচুল। লোকেরা শীষ দিত, বেরাল ডাকত, উনিও তা পছন্দ করতেন। আমার বাবা বলতেন, কারনোটের ভঙ্গীতে উনি অভিবাদন জানাতেন। কিন্তু একরাত্রে পিটের শ্রোতাদের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এবং সবাইকে 'মিলে-কলোনে' মদ্যপানে আপ্যায়িত করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারপর—

আমি বোধ হয় তোমাকে বিরক্ত করছি—না ?"

"না-না, তোমার গলার আওয়াজ আমার ভালো লাগে।"

"এই ছোট্ট টুপীর দোকানটা দেখ,—একটা গ্যাসের নীচে ঐ যে চারজন একত্রিত হয়ে আছে ওদের দিকে দেখ। বৃদ্ধটির বয়স আশীরও বেশী—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অভিযানে উনি ছিলেন। এই সব লোক কোনোদিন দোকান ছেড়ে বাইরে যায় না—কখনই নয়। পঞ্চাশ বছরের উপর ওরা রাস্তাটাও পার হয়নি। একবার আমার দিদি ওদের নিমন্ত্রণ করেছিল ওর সঙ্গে 'কনসার্ট' শুনতে যাওয়ার জন্য, ওরা এমনই বিস্ময়াহত হয়ে পড়ল, এমন ভাবভঙ্গী করল যেন দিদির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ঘটেছে।

ঐ দেখো, সব লেবেলগুলি হাতে লেখা। বৃদ্ধ মোটেই গুণতে পারেন না, কি করে দামের হিসাব ঠিক রাখে জানো ? জামার পকেট, মোজার ভিতর যার যত দাম ততগুলি ঢিল-পাটকেল রেখে দেয়, খরিদ্দার এলে ঐগুলি গুণে তার ওপর আর কিছু বেশী ধরে দাম বলে।"

"তুমি কি এখন খুশী হয়েছ ?"

ওর মুখের দিকে তাকায় মেয়েটি, চোখে জল এসে গেল। মোদ্রু ভ্রূ কুঞ্চিত করতেই দু'জনেই হেসে উঠে তারপর বন্ধুদের ধরার জন্য জোরে পা চালায়।

'লা রোতন্দে'র পাশ দিয়ে ওরা শেষ বারের মত চক্কর দেয়, তখনও সেখানে ভীষণ ভীড়, সিগারেটের ধোঁয়ায় কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে পিয়ানোর টুং টাং হচ্ছে সেখানেই মার্কিণরা গান ধরেছে, পোলরা দাবার ছক মেলে ঘুমাচ্ছে,—কাফের মেয়েরা বাদাম খেতে খেতে টেবল থেকে টেবলান্তরে ঘুরছে, প্রায় বারোজনের সঙ্গে করমর্দন করে ওরা ৎবরৌসকীর বাসায় ফিরল।

ওদিকে মোদরু আফতালিয়েনের ওখানে ছবি আঁকে, এদিকে হারিকট রুক্ষ রান্নার বাসনপত্রের ব্যবস্থা থেকে শয়ন-ব্যবস্থা পর্যন্ত গুছিয়ে রাখছে। এখনও ওদের বিছানায় চাদর নেই, তোয়ালে নেই, সকালে সূর্যের দিকে হাত নেড়ে গা শুকিয়ে নেয়। কিন্তু দশখানি প্লেট, ছুরি, কাঁটা, চামচ এমন কি একটা চায়ের পট পর্যন্ত হয়েছে।

মোদরু ও হারিকট রুক্ষ প্রতি রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে থাকে অথচ মানসিক বা শারীরিক প্রয়োজনে এতটুকু যৌন উত্তেজনা অনুভব করেনি।

ছয়

এইভাবে জুনমাস কাটলো। ৎবরৌসকী একটা দোকানে ঠিকানা লেখার চাকরী পেয়েছে, দিনে পাঁচশো ঠিকানা লিখলে তিন ফ্রাঁ পাবে।

মোদ্‌রুলো ক্ষেপে গেল।

"ছেড়ে দাও। এ কি কবির উপযুক্ত কাজ।"

ৎবরৌসকী আবার কবি, কবিদের দল একচল্লিশের শ্রেণীর সে গোষ্ঠীভুক্ত, আকাদেমী ও টিফলিসে এর উৎপত্তি—এখন সারা য়ুরোপ ও রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এটা হ'ল 'সংগঠনমূলক' কবিতা রচনার গোষ্ঠী। ছবির কিউবিজমের মত এর মধ্যেও চরমপন্থী আছে—আর তারা যা চরমপন্থী!

ক্রুটসেনিক, সমসাময়িক রাশিয়ান কবিদের মধ্যে বিশেষ প্রখ্যাত, তিনি আবিষ্কার করেছেন "জাকুমিয়ান" কবিতা, অর্থাৎ খাঁটি নিষ্কর্ষণের কবিতা, তার কোনো অর্থ হবে না তবে গান করা যায় নিছক গানেরই খাতিরে। তাই একে বলে ধ্বন্যাত্মক কবিতা।

ক্লিবনীকফ রচনা করেছেন the Treatise of the Supreme Impropriety—সোভিয়েট সরকারের হুকুমে বুর্জোয়া মনোভাব চাপা দেওয়ার জন্য সেটি রাশিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে। এই কাব্যের প্রথম পাঁচটি সর্গে লেখা আছে—"আমরা পুনর্গঠিত করার আগে সারা রাশিয়া ছিল অসার বস্তুতে বোঝাই—"

সভুর আবার ওদিকে প্রকাশ করেছেন "Bourgeois Poetics"—রীতিমত অভিজাত রুচিসম্পন্ন কাব্যগ্রন্থ।

ৎবরৌসকী ওদের নাইটিংগেল, এই বুলবুলের কবিতা যদিও প্রাচীন রাশিয়ার প্রাচীন কবিতার বিরোধী তবু তার ভিতর থেকে এক বেদনাময় স্মৃতি উঁকি দেয়। সভ্যতাকে সে ধ্বংস করেছে, কিন্তু স্বর্ণকারের নৈপুণ্যে মণিময় মুকুট সে সন্তর্পণে খোলে, প্রতিটি পাথর তাজা তুষারে চকচক্ করে ওঠে—।

কাফের এই ভিতরকার ঘরে কিন্তু সে সব কথা দূরে যাক, মুছে যাক! বিগত শতাব্দীর কথায় ফেরা যাক্, সংখ্যালঘু কয়েকজনের সুখ ও সুবিধার জন্য রাশিয়া ও পৃথিবীর সর্বত্র কোটি কোটি মানুষ বুভুক্ষা ও হিমজর্জর হয়ে ধুঁকেছে;—আজও যেমন এই সব কবিরা কেউ টানেলের ভিতর রেলের তেলের আলোর চিমনি পরিষ্কার করছেন, কেউ বা বুলভার্দের জনমুখরিত পথে দু'পাশে বিজ্ঞাপন স্যাণ্ডউইচ বোর্ড ঝুলিয়ে চলেছেন, যাঁরা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান তাঁরা রাসায়নিক দ্রব্য চূর্ণ করার কাজ করেন আর ৎবরো দিনের বেলা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে এক নোঙরা গহ্বরে বসে ঠিকানা লেখে, ওদিকে দরজার বাইরে—বসন্তের দিন চলে যায় পাতা খসানোর গান গেয়ে।

মোদ্রু রেগে বল্ল···"তুমি আর এসব কোরো না, এ আমি পছন্দ করি না! আমি যা রোজগার করছি তাতেই আমাদের সকলের বেশ চলে যাবে, আর দেখ নিজের কাজ করেই তা সংগ্রহ করছি। পাঁচ ফ্রাঁ পেলেই আমাদের চারজনের উত্তম আহারের ব্যবস্থা হবে, আর বাকী একশো সু দিয়ে অন্য সব কেনা যেতে পারে, 'লা রোতন্দের' দু'-চার কাপ কফির দাম দেওয়া যাবে।"

মৃদু গলায় প্রতিবাদ জানিয়ে ৎবরৌসকী বলে—"কিন্তু মোদ্রু, ঠিক কথা, তবে দু'চারদিনের মধ্যেই বাড়িভাড়া দিতে হবে, নইলে দূর করে দেবে। যদি রাজী থাক, আমি না হয় তোমার আঁকা দু'-চারখানি ছবি ফেরী করে বেড়াই।"

"না, এখন যে আমি আফতালিয়েনের কাছে চুক্তিবদ্ধ।"

"কিন্তু তুমি তো জানো ও তোমার মাথায় হাত বুলোচ্ছে।"

"আমি শ্রমিক মাত্র, ও আমাকে শ্রমিকের মজুরীই দেয়। বাকীটা স্বপ্ন, তার দাম আমি দিই।"

যাই হোক, ক'দিন ধরে আফতালিয়েন ওকে বড় বড় ক্যানভাস এনে দিচ্ছে ছবি আঁকার জন্য—এমনকি ওকে বলেছে:

"জানোই ত' তুমি বরাবর একই ধারায় কাজ করছ, আমার অনেকগুলো ক্যাসভাস জমে গেছে। এখন থেকে শুধু 'মাষ্টারপীস' ছাড়া আর কিছু চাই না।"

মাষ্টারপীস ছাড়া আর কিছুই নয়! [ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে টেলিগ্রাফে প্রথম বাঙালী কৃতীপুরুষের পুরস্কারপ্রাপ্ত সনদের প্রতিলিপি মুদ্রিত হ'ল। শিবচন্দ্র নন্দীর কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন সরকার তাঁর প্রতি যে উপাধি বর্ষণ করেন এই সনদ সেই উপাধিপ্রাপ্তির সরকারী স্বীকৃতিস্বরূপ—যেজন্য প্রচ্ছদে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যায় ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শিবচন্দ্র নন্দী সম্পর্কিত রচনাটি দ্রষ্টব্য।
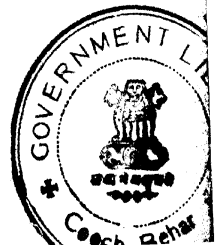
ছায়াছবির গতি-প্রকৃতি

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার

দক্ষিণ কলিকাতার লেক এভিনিউ-এর একখানি বাড়ী। পূর্ব্বেই জানতুম, বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার এখানে থাকেন। এক দিন সকাল বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করবো বলে গাড়ীতে চড়লুম। নেমে বাড়ীতে উঠতেই সুশীল বাবু এগিয়ে এসে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক ছুটো-একটা কথার মধ্যেই বুঝলুম, মানুষটি সদালাপী ও অমায়িক। পরিচালক ছাড়াও তাঁর মাঝে আমি একটি অন্য মানুষ দেখতে পেলুম। অধিক সময় নষ্ট না করে কাজের কথা আরম্ভ করার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি আমার প্রশ্নমালাটি তাঁর কাছে তুলে ধরলুম—অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে তিনি উত্তর দিয়ে চললেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনি এ পর্য্যন্ত কতগুলো ছবি পরিচালনা করেছেন এবং কোন্ ছবি পরিচালনায় আপনি সব চাইতে আনন্দ পেয়েছেন ও কেন পেয়েছেন? উত্তর হ'লো—এ পর্য্যন্ত আমি কম পক্ষে ১৫খানি ছবি পরিচালনা করেছি। "রিক্তা", "অভয়ের বিয়ে" ও "সর্ব্বহারা"—এ তিনখানি ছবির পরিচালনায় আমি সব চাইতে আনন্দ পেয়েছি। আরও ছু'-একটি ছবিতেও আমি যে বেশ আনন্দ পেয়েছি, সেও বলবো। ঠিক গতানুগতিক ধাঁচে আমি ছবি করিনি—জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বন ক'রে ছবি ক'রেছি। যেমন বলতে পারি, আমার পরিচালনাধীনে তৈরী "রিক্তা" প্রথম বাংলা সামাজিক ছবি, যার ভেতর বিয়োগান্ত ঘটনার সমাবেশ হয়। সে দিক থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের এ সুস্পষ্ট অগ্রগতি বলতে পারি। "অভয়ের বিয়ে"র কথা ধরুন। ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে সংসারে যে কি অবস্থায় পড়তে হয়, তা এ ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ছবিখানি একটি সুন্দর "কমেডী" (comedy), এ আমি বলবো। "রাত্রির তপস্যা"কে আদর্শবাদমূলক চিত্র বলা চলে। এতে রয়েছে, কি করে একটি মেয়ে শিক্ষার জন্য অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। দেশবন্ধুর যে স্মৃতি-সৌধ গড়ে উঠছে তার একটা প্রেরণা এ ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার একটা নয়া ব্যবস্থা এই ছবিতে রূপ গ্রহণ করেছে। আমার "সর্ব্বহারা" ছবির কথা বলতে পারি বাংলায় এটিই প্রথম প্রগতিশীল ছবি। গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় এটা তৈরী—এ সাধারণ মানুষের সত্যিকারের জীবন-আলেখ্য। হৃদয়ের খাঁটি আবেদন এর ভেতরে ছিল। তার পর "দিক্‌ভ্রান্ত" চিত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। সমাজে আর্থিক ব্যবস্থায় যে গলদ রয়েছে তারই একটা বিশেষ দিক এই চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায়, এ বিশ্বাসের উপর একটা ভালো লোককে দানব করে তোলা হ'লো—যাকে দিয়ে দেশের অনেক ভাল কাজ হতে পারতো তাকে তৈরী করা হ'লো একটা অপদার্থ। পুঁজিবাদ কি করে ধ্বংস আনয়ন করে তারও একটা দৃষ্টান্ত এ চিত্র। এ পাঁচটি ছবিই আমার ভাল লেগেছে এবং কেন ভাল লেগেছে সে বোধ হয় আর বলার প্রয়োজন হবে না।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়—আমার প্রশ্ন শুনে সুশীল বাবু জোর-গলায় বললেন—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান অতি উচ্চে। এটা ঠিক, ছায়া-ছবি সমাজের কল্যাণ যতটা করতে পারে অকল্যাণও করতে পারে ততখানি। ছায়া-চিত্র হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যাতে জ্ঞানার্জ্জনের অবকাশ আছে—যার ভেতর দিয়ে জনসমাজে শিক্ষা প্রচার করা যায়। এ হচ্ছে শিল্প ও কলার, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম বিকাশ।

সুশীল বাবু বলে চলেন—ছায়া-ছবির উৎকর্ষ সম্পর্কে আমার মতামত যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলবো, এর সত্যিকারের উৎকর্ষ হতে পারে তখনই যদি রাষ্ট্র অথবা সরকার একে আপনার বলে গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে এ শিল্পে ব্যবসা-প্রবণতাটাই বেশী এবং সে জন্যেই এর অগ্রগতি হচ্ছে ব্যাহত। রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ হয় না। কেন না সেখানে এ শিল্প নিয়ে ব্যবসা করবার ততখানি প্রবণতা নেই।

পরিচালক হিসেবে আপনি কিরূপ ধরনের ছবি আকাঙ্ক্ষা করেন, প্রশ্ন করলুম। শ্রীমজুমদার দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন, যাতে সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে সে ছবিই আমি চাই। নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, যার ভেতরে কোন বক্তব্য নেই এরূপ ধরনের ছবি আমি আজ পর্য্যন্ত করতে উৎসাহী হইনি। চলতি ছবিগুলোর মধ্যে ভাল-মন্দ সব রকমই আছে। তবে আমি বলবো প্রত্যেক ছবিরই মান আরও উন্নত হওয়া দরকার। হাসি-তামাসার নামে কোন কোন ক্ষেত্রে "বাঁদরামি" দেখান হয়েছে। এতে শিল্পের ক্ষতি বই ভাল হবে বলতে পারি নে। যেখানে লোককে আনন্দ দেবার নামে নিম্নস্তরের বিষয়-বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে তা আমার পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। আমি স্পষ্টই বলবো এ ধরনের ছবি যত না হয় ততই ভাল। "জ্যেঠামি"র ছবিগুলোও ঠিক একই কারণে আমি সমর্থন করতে পারি নে। নিছক আনন্দ-হাসির ছবিও তৈরী হতে পারে যেমন নাম করতে পারি "রজত জয়ন্তী"।

অপর একটি প্রশ্ন প্রসঙ্গে সুশীল বাবু বললেন—যে কোন চিত্রকে

সার্থক করে তুলতে হলে কয়েকটি উপাদান অত্যাবশ্যক। মানুষের যে কয়টি শাশ্বত ভাব বা অনুভূতি—যেমন হাসি, কান্না, আশা, আকাঙ্ক্ষা—এর প্রত্যেকটির নিখুঁত ছাপ থাকবে যে চিত্রে সে চিত্রই সাফল্য অর্জন করবে। মানুষের মনকে বা নাড়া দিতে পারে, হৃদয়ের যাতে একটা আবেগ সৃষ্টি হয় প্রত্যেক ছবিতেই সে শ্রেণীর উপাদান থাকা দরকার।

প্রশ্ন ধরে তুললুম আমি—এদেশের যে ধরনের ছবি চলছে রুচি ও প্রয়োজনের দিক থেকে সেগুলো প্রগতিমুখী বলে কি আপনি মনে করেন? সুশীল বাবু ধীরভাবে বললেন, কিছু কিছু ছবি আছে যাকে প্রগতিমুখী বলা চলে। বাংলা ছবিতে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটা ছাপ আছে। অপর দিকে বেশীর ভাগ হিন্দী ছবিই একরূপ রুচি-বর্জ্জিত।

প্রকৃত চিত্র-পরিচালক হতে গেলে কি কি গুণ না থাকলে নয় যদি প্রশ্ন করেন, শ্রীমজুমদার বলে চলেন, তবে আমি বলবো—পরিচালক তৈরী করা যায় না, পরিচালক হতে গেলে জন্মগত অধিকার থাকা চাই, এর জন্যে 'আর যা প্রয়োজন তা হচ্ছে দূরদৃষ্টি, প্রচুর ক্যামেরা-জ্ঞান, অভিনয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সুষ্ঠ সম্পাদনার ক্ষমতা।

যে ছবি মুক্তিপ্রতীক্ষায়

সতী

বার-লাইব্রেরীতে তুমুল কাণ্ড চলেছে! মুখরোচক পরচর্চায় উপস্থিত কয়েক জন উকিলই পঞ্চমুখ। ব্যাপার কি? না, সিনিয়র উকিল হরিশের অনুপস্থিতির সুযোগে এনারা একদফা হজ্‌মীগুলি সেবন করে নিচ্ছেন! মৃত জমিদারের পুত্রবধূ ও তদীয় উকীল হরিশ সম্পর্কে যে জনশ্রুতি পল্লবিত হয়েছিলো আজ কিছুদিন, তার নিশ্চয়তা প্রমাণ হয়ে গেছে। হরিশের সতী স্ত্রী নির্মলার আত্মহত্যার নিষ্ফল চেষ্টার মাঝে সেই অসমর্থিত সংবাদ পাবনা শহরের কোনো লোকেরই আর অজানা নেই।—আলোচনা যখন চরমে পৌছেচে সেই সময় স্বয়ং হরিশের আবির্ভাব! উভয় পক্ষের বাক্‌-বিতণ্ডা, শেষে হরিশ ও তার সহকারীর কক্ষত্যাগ!...

সমস্ত আলো জ্বলে উঠলো, বিস্তৃত ফ্লোরের অখণ্ড নীরবতার মধ্যে যথারীতি 'ষ্টার্ট ক্যামেরা, সাউণ্ড' ও 'কাট্‌' ধ্বনি। তার পর উকিল-বেশী বিভিন্ন শিল্পীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ। যেন সফলতার সংগে অগ্নি-পরীক্ষা শেষ হোলো।

এখানে বলা প্রয়োজন, উক্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনাটা ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োয় জ্যোতির্বাণীর প্রথম নির্মাণরত ছবি শরৎচন্দ্রের 'সতীর' চিত্রের আগে কাহিনীটি সংক্ষেপে জানিয়ে দিই।

একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম সর্বজনকাম্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উৎকট আত্মপ্রকাশে অসহায় স্বামীটির কি মর্মন্তুদ অবস্থা হয়ে থাকে, তারই আঘাত-সংঘাতের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর মরমী লেখনী চালনা করেছেন। রায় বাহাদুর রামমোহন-পুত্র হরিশ উকিল। ওকালতিতে দিন দিন পসার তার বেড়ে চলেছে এবং সেই সংগে সমান বেগে তো বটেই, বুঝি বা কিছু ত্বরিত গতিতে যেটি এগিয়ে চলেছে যেটি সেটি হোলো অশান্তি। বেচারী হরিশ! জীবনটা যেন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করে, অথচ এই হাহাকারের হাত থেকে উদ্ধার নেই। তাহলে কি স্ত্রী নির্মলার আচার-ব্যবহার কিছু মন্দ? না না, সে কথা এতো মনোকষ্টের মধ্যে হরিশও বলে না কিন্তু সব জিনিসেরই তো মাত্রা থাকা দরকার। অতিরিক্ত সব কিছুই যে নিন্দার দাবী করে। নির্মলা যদি তার একনিষ্ঠ প্রেমের বাঁধন একটু আল্‌গা করতো, তাহলে হরিশের অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে জীবনে খানিকটা আলো-বাতাস খেল্‌বার অবকাশ হোতো! কি কুক্ষণেই না মা তাঁর মেয়ে নির্মলার কানে কানে বলেছিলেন, 'পুরুষ মানুষকে চোখে-চোখে না রাখলেই সে গেল! সংসার করতে আর যা-ই কেন না ভোলো, কখনো এ কথাটি ভুলো না!'—সারা জীবন এই মহামন্ত্রের ধ্যান করে আসছে হরিশ-অর্ধাংগিনী নির্মলা। এবং পাড়ার সকলেই তার আদর্শ পত্নী-প্রেমের উপমা দিয়ে থাকে। সে হোলো সতী-কুলরাণী! হরিশের কোথাও যাবার উপায় নেই, কোনো মেয়ের সংগে কথা বলার উপায় নেই! ইত্যাদি—

অতি-বাস্তব এমনই বিষয়-বস্তুর সমন্বয়ে 'সতীর' কাহিনী গড়ে উঠেছে। একে চিত্রনাট্যাকারে সাজিয়ে দিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনার গুরুভার নিয়েছেন অমর মল্লিক। সুরসঙ্গতিতে সাহায্য করছেন অনিল বাকচী। শব্দযোজনা ও চিত্রগ্রহণ করছেন যথাক্রমে লোকেন বসু ও বিভূতি দাস। বিশিষ্ট চরিত্রগুলি এই ভাবে বণ্টন করা হয়েছে—হরিশ: ধীরাজ ভট্টাচার্য, হরিশের বাবা: কমল মিত্র, হরিশের মা: সুপ্রভা মুখার্জি, হরিশের বোন (উমা): সুদীপ্তা, নির্মলা (সতী): ভারতী দেবী, লাবণ্য: অরুন্ধতী মুখার্জি, নির্মলার মা: রেবা বোস, নির্মলার বাবা: তুলসী লাহিড়ী। ছোটোখাটো ভূমিকায় কানু বন্দ্যো, জহর রায় ...

'সতী' ছায়াচিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

চ্যাটার্জি (স্বামিজীখ্যাত), শ্যাম লাহা, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতিকে দেখা যাবে। প্রযোজনা করছেন নবগঠিত জ্যোতির্বাণী।

নির্মলা-রূপিণী ভারতী দেবী জানিয়েছেন কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা। নায়িকা নির্মলার চরিত্রটি তাঁর নাকি বিশেষ ভাবে মনঃপূত হয়েছে। এর আগে বহু ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন, বর্তমান চরিত্রের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, সেদিকটা তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে। কাজেই আশা করতে পারা যায় ভূমিকাটির সুবিচার হবে।

মনের ময়ূর

রমা ছায়াচিত্র লিমিটেডের দ্বিতীয় নিবেদন মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু রচিত 'মনের ময়ূর'-এর সর্ববিভাগীয় পরিচিতি এই রকম—পরিচালনায় সুশীল মজুমদার, সংগীতে সত্যজিৎ মজুমদার। চরিত্রায়ণে: অনসূয়া: ভারতী দেবী, অনসূয়ার মা: সুপ্রভা মুখার্জি, বিনয়: উত্তমকুমার, অবিনাশ: কানু বন্দ্যো, বিকাশ চৌধুরী: বিকাশ রায়, বিনয়ের দিদি: চন্দ্রাবতী, মণ্টু: বাবুয়া, মাণিক: ভানু বন্দ্যো। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মনী মজুমদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্র, জহর রায়, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, উৎপল বসু প্রভৃতি।

এই 'মাসিক বসুমতী'রই পাতায় গত বছরের গোড়ায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো 'মনের ময়ূর' উপন্যাসটি। কাজেই পাঠক-পাঠিকার কাছে এর গল্পাংশ সংক্ষেপে জানানো চলবে। বিনয় রায় লেখাপড়ায় একেবারে হীরের টুকরো। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এম-এ ডিগ্রি নিয়ে কিছুদিনের জন্তে এলো তার একমাত্র অভিভাবিকা দিদির কাছে। দিদি স্বপ্ন দেখেন ভাইটি তাঁর বিলেত থেকে আরো বিদ্যা শিখে আসবে, বড়ো হবে ইত্যাদি। সেই ব্যবস্থায় তাঁর সকল প্রয়াস ব্যয়িত হতে থাকে। বিনয়কে পেয়ে অনসূয়ার বাবা শিক্ষক অবিনাশ বাবু সামান্ত কিছুদিনের জন্তে তাঁদের ইস্কুলের শিক্ষকতার কাজে ধরে আনেন। বিনয়ের সাহায্য শুধু বাইরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, অবিনাশ বাবুর বাড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হতে দেখা যায়। সে অনসূয়ার পাশের পড়ার সাহায্য করতে থাকে। পুঁথির পাঠ দেয়া ও নেয়ার অবকাশে আর একটি অলিখিত বিষয়ের পাঠ এরা উভয়ে সারা করে ফেলে। মাটির পৃথিবী রঙে রঙে ভরে যায়, এই বর্ণবিকাশ চিরস্থায়ী করতে বিনয়-অনসূয়া কৃতসংকল্প হয়। যে বাধা জগদ্দল পাথরের মতো এই মিলনোৎসুক প্রণয়ি-যুগলের বুকের মাঝে চেপে বসে—তা হোলো জাতিভেদ প্রথা! যেখানে রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিয়ে আজও চালু হতে পারে না, সেই সমাজে কিনা বামুন-কায়েতের সামাজিক মিলন! যদিও বা অনসূয়ার মা-বাবার মত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো কিন্তু কাকা বিকাশ চৌধুরী তাঁর উকিলী প্যাঁচে বানচাল করে দিতে এলেন এদের স্বপ্ন। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পথ বেছে নিলো এরা—ঘরের মায়া ত্যাগ করে পাড়ি দিলো বন্ধুর পথে, বাসনা—আইনের সাহায্যে উভয়ের মিলন সিদ্ধ করে বাঁধবে তারা নীড়, করবে মর্ত্যে স্বর্গ রচনা। রূঢ় বাস্তবে কল্পনা-বিলাসের জ্বালা অনেক—নারীহরণের দায়ে অভিযুক্ত হোলো বিনয়। অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়েকে অসদুদ্দেশ্যে অপহরণের জন্তে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হোলো অবিলম্বে লাভ। রঙে রঙা দুনিয়া মুহূর্তে কালিবর্ণ হয়ে উঠলো—ভালোবাসার পেয়ালা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। তার পর? ষোলো বছরের পর যবনিকা উঠলে দেখা যায়—প্রৌঢ় বিনয় রায় রকফেলারের দেশ থেকে ভাগ্য ফিরিয়ে এনে মালাবার হিল্‌সে গেড়েছেন তাঁর আস্তানা। বিত্তের অভাব নেই একটুয়ো, কিন্তু চিত্ত? ষোলো বছরের স্মৃতির দংশনে আজো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। তবে আশার কথা বিমুখ গ্রহের অভাবিত অনুগ্রহে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ও জ্বালার অবসান হতে চলেছে। অনসূয়াকে তিনি ধর্মপত্নী হিসাবেই লাভ করবেন এবার।

"মনের ময়ূর" চিত্রে শ্রীমতী ভারতী দেবী

পরিচালক শ্রীযুক্ত মজুমদার জানালেন, লেখাটি ভারি মিষ্টি! বলার ভংগির মনোহারিত্ব তাঁকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া যে কারণ—তাকে প্রধানতমই বলা চলে, সেটি হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ। জাত নিয়ে কি হবে, বজ্জাত না হলেই তো হোলো!—

'মনের ময়ূর'এর স্যুটিং শেষ হতে আর সামান্তই দেরি আছে।

ছায়া ও কায়া

বসুমিত্র তারক গাঙ্গুলীর "সরলা" দ্বিতীয় বার ছায়াচিত্রে রূপায়িত ক'রেছেন। নির্বাক্ যুগেও চিত্রটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় "সরলা"র পরিচালক অমলকুমার বসু অসামান্ত দক্ষতার সঙ্গে "সরলা" ছবি তৈরী ক'রে দেখিয়েছেন পশ্চিম-বাঙলায়। যথাযোগ্য বিজ্ঞাপনের অভাব এবং কলকাতায় কোন প্রথম শ্রেণীর প্রেক্ষাগৃহে "সরলা" মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়ায় ছবিটি আমাদের মনে হয় মাঠে মারা গেছে এবং যোগ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অভিনয়ে পাহাড়ী, গুরুদাস, রেণুকা, শিপ্রা এবং আরও অনেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক কথায়, "সরলা" ছবিতে সত্যিকার বাঙালী-জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। শব্দ এবং আলোকচিত্র আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। বসুমিত্রের গঠনপথের ছবি 'সাদা কালো' শীঘ্র মুক্তি-লাভ করবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র কলকাতা ব্যতীত অন্ত কোন শহরে রঙ্গমঞ্চ নেই বললেই চলে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ আজকের নয়, বহুকালের। বর্তমানে কলকাতায় যে ক'টি রঙ্গমঞ্চ আছে তাদের মধ্যে "ষ্টার" মঞ্চটি সম্প্রতি শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্রের

তত্ত্বাবধানে নব কলেবর ধারণ করেছে। মহেন্দ্র গুপ্ত এণ্ড পার্টি এখন "লালপাঞ্জা" খেলছেন। কিন্তু খেলা তেমন জমছে না। ষ্টারে মুক্তিলাভ করেছে নিরুপমা দেবীর "শ্যামলী"—এক মূক ও বধির বাঙালী মেয়ের কাহিনী। নাটকে রূপান্তরিত করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। বোবা মেয়ের ভূমিকায় চপলমতি কুরঙ্গী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কথা না ব'লেও দর্শকদের বোবা বানিয়ে দিয়েছেন। সাবিত্রীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তরুণ অভিনেতা অনুপকুমার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চমৎকার। ছবির অনুপকুমার মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষমতাও যে ধারণ করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল "শ্যামলী"তে। জহর গঙ্গোপাধ্যায় হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণে পরিহাস ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংযত অভিনয় নাটকের গতিকে সাহায্য করেছে। রবি রায়, সরযূ, অপর্ণা ও রমা নবাগত নন, সুতরাং তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলবার নেই। তাঁদের আবির্ভাবই সার্থক হয়েছে। নাট্যকার অপূর্ব্ব এক রীতিতে বিরাট উপন্যাস "শ্যামলী"কে রঙ্গমঞ্চের জন্য প্রস্তুত ক'রেছেন। ষ্টারের "শ্যামলী" নাটক বহু দিন পরে বাঙলা নাটকের একঘেয়েমি ঘুচিয়েছে। মিত্র এবং মল্লিক মশাইদের উদ্যম সার্থক হোক, আমাদের এই কামনা। সব ভাল লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দৃশ্যসমূহ আমাদের আদপেই খুশী করতে পারেনি। ভবিষ্যতে ষ্টার শিল্প-অনুরাগের পরিচয় অবশ্যই দেবেন। মিহির ভট্টাচার্য্য, শেফালী দত্ত, সন্তোষ সিংহের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

—

শ্রীমতী পিকচার্সে'র "নববিধান" চিত্রের শুভ মহরৎ হয়ে গেছে সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। নববিধানের রচনাকার শরৎচন্দ্র। অভিনয়াংশে আছেন শ্রীমতী কানন দেবী, জহর গঙ্গো, মঞ্জু দে, কমল মিত্র ও জীবেন বসু প্রভৃতি। কলা-কৌশল চিত্রটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে।

—

দীর্ঘদিন পরে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স 'মা ও ছেলে' চিত্রগ্রহণে ব্রতী হয়েছে। ছবিটিতে ৪৩ জনেরও বেশী অভিনেতৃ সমাবেশ হয়েছে। বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন শ্রীমতী সাধনা বসু। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় নৃত্য এই ছবিতে শ্রীমতী বসুর আকর্ষণ বৰ্দ্ধিত করবে। নেপথ্যে সঙ্গীত গাইবেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন।

—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এ, এম প্রডাকসন্সের প্রথম অবদান। পরিচালনা দেবব্রত সরকার। অভিনয়াংশে আছেন রাজলক্ষ্মী, অমিতা, নিভাননী, তুলসী লাহিড়ী, জীবেন বসু ও হরিধন প্রভৃতি।

সাহিত্য পরিচয়

রাইটার্স বিল্ডিং-এ সাহিত্য-সভা

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বিগত ১ই অক্টোবর বাংলা দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী ও কলাকারদের এক সভায় নিমন্ত্রিত করে-ছিলেন। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা এই সমাবেশের উদ্দেশ্য। ডাঃ বিধানচন্দ্র যাত্রাগান, পাঁচালি, লোকনৃত্য, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতিকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে বলেন। এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য-তহবিল থেকে আগামী এপ্রিল পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি ভালোই, উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হলে হয়ত কিছু সুফল পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বেশ কলরব সুরু হয়েছে,—আলোচনা আরম্ভ হয়েছে—'ও পাতে কেন? এ পাতে দাও।'—পরিকল্পনাটি এখনও সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়নি,—ঠিক কারা কি ভাবে এবং কি বাবদ টাকাটা ব্যয় করবেন তারও একটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি, এর মাঝেই এতখানি হৈ-চৈ করাটা নিছক বোকামির পরিচায়ক। গঠনমূলক প্রচেষ্টায় সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হওয়া উচিত। লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য যদি এই প্রচেষ্টার ফলে আংশিক ভাবেও পরিপুষ্ট হয়, দেশের এই চরম দুর্দিনে সেইটুকুই নগদ লাভ। ডাঃ বিধানচন্দ্র বোধ করি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অধিকাংশকে চেনেন না। পঙ্কজ মল্লিকের সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়ার কথা তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করেছেন। তাই নিয়ে কলকাতার একটি সাপ্তাহিক দস্তুরমত এ্যান্টি-পঙ্কজ ক্যাম্পেন শুরু করে দিয়েছে। মাসিক বসুমতীতে এ সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা প্রকাশ করা হবে।

এসো, আমার প্রিয়—

ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যথাক্রমে একটি উপন্যাসের পটভূমিকা ও চরিত্র। উপন্যাসটি সবে প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম "Come, My Beloved," অর্থাৎ, "এসো আমার প্রিয়"।—উপন্যাসটির লেখিকা শ্রীমতী পার্ল এস্ বাক। গল্পাংশ, তিন জন ভীষণতম জেদী মানুষ, মানবতার সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃকে লাভ করবার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে। কাহিনী শুরু হয়েছে বোম্বাই নগরে। উপন্যাসটির প্রকাশক বলছেন যে, 'ভারত এবং ভারতীয়দের অতি চমৎকার ফুটিয়েছেন লেখিকা।' বাঙলা সাহিত্যে এই উপন্যাসের অবিলম্বে অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

জয়পুরে সাহিত্য-সম্মিলন

ইদানীং মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্মিলনের সংবাদ শোনা যায় আর দেখা যায়, সেই সব সমাবেশে সাহিত্যিকদের পরিবর্তে সাহিত্যরসিকদেরই ভীড় বেশী। সাহিত্যিকরা ইদানীং আর যত্র-তত্র সহজে যেতে বোধ হয় রাজী হন না। এই সব কারণেই একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সভাপতি ছাড়া প্রয়োজন হয় প্রধান অতিথির, তার পর উদ্বোধক আর প্রধান বক্তা। কিছু দিন আগে শান্তি-নিকেতনে সাহিত্যমেলা হয়েছিল তাতে নাকি সকল দল নিমন্ত্রিত হননি—জয়পুরের সাহিত্য-সম্মিলনেও নাকি নিমন্ত্রণ-পত্র ঠিকমত বিলি হয়নি। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরাও খুব খুসী ন'ন। শোনা যাচ্ছে, আই, সি, এস দেবেশ দাশ ছলে-বলে-কৌশলে এই সাহিত্য-মিলনকে শ্রেফ "বারোয়ারী সম্মিলনে" পরিণত করে ফেলেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক কথা বলার আর প্রয়োজন বোধ করছি না। সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্যিকরা যদি আগের দিনের মজলিসি মনোভঙ্গী না ফিরিয়ে আনতে পারেন তাহলে স্বর্গে গিয়েও আনন্দ পাবেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাহিত্য-সম্মিলন, সাংস্কৃতিক-সম্মিলন এ সব ত' লেগেই আছে, এ দলের সঙ্গে বিরোধ হলে ও-দল আবার একটা সভার আয়োজন করছেন। এতে করে সাহিত্য বা সংস্কৃতির কতখানি প্রসার হয় তা অনুসন্ধানের বস্তু, নগদ লাভ অবশ্য সুলভে প্রচার।

লেখক, পাঠক ও প্রকাশক

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে বড় সংবাদ যে, বাংলা দেশের প্রকাশক মহলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটছে। নতুন নতুন প্রকাশকরা উদ্যোগী হয়ে আসরে নামছেন। নতুন লেখকদের মধ্যেও যাঁদের রচনায় প্রতিশ্রুতি ও প্রতিভার ছাপ আছে তাঁরাও আজ অপাংক্তেয় নন। এটা অতি শুভ লক্ষণ। অবশ্য সর্বদাই যে ভালো রচনা সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা নয়, তবু প্রকাশকদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব এসেছে, তার ফলে দু'-চারখানি বাজে বই বাজারে বেরোলেও সার্থক সাহিত্যও পাওয়া যাচ্ছে অনেক। রুচির পরিবর্তন হচ্ছে এ কথা প্রকাশকরা জেনেছেন। উপরোক্ত বিষয় নিয়ে চিন্তাশীল লেখক বিনয় ঘোষ সম্প্রতি শারদীয়া 'উত্তরা'য় "বাঙালী, লেখক, পাঠক ও প্রকাশক" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। আরো অনেক কথার মধ্যে তিনি লিখেছেন: "দিন বদ্‌লাচ্ছে, হাওয়া বদ্‌লাচ্ছে, ইতিহাস বদ্‌লাচ্ছে। বই-পড়া শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ সত্য হ'ল, তাঁদের শুধু সংখ্যা বাড়ছে না, আত্ম-বিশ্বাস বাড়ছে, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি বাড়ছে, সবার উপরে দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাচ্ছে, বিচারের মানদণ্ড বদ্‌লাচ্ছে।" সুতরাং বাঙালী পাঠকের চোখে ধূলো দিয়ে বিভ্রান্ত করার দিন ক্রমেই কমে আসছে। প্রকাশকরা এই কথাটি যেন বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেন।

শারদীয় সাহিত্য

সাহিত্য-পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে বাংলা দেশে শারদীয় উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে শারদীয় সাহিত্য। এই সময়ে নানা পত্র-পত্রিকা নব-কলেবরে মহালয়ার দিন থেকে সুরু করে
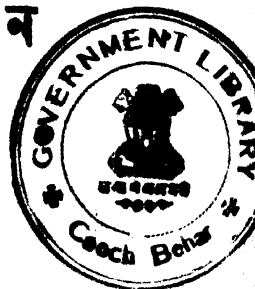
সকাল বেলায়
সারাদিন
খেলাধুলোর পরে
প্রফুল্ল
শোবার সময়
থাকতে...
স্নিগ্ধ, সুগন্ধ
হিমালয় বোকে
পাউডার
ব্যবহার করুন
দুটি সুষ্ঠু ইরাস্মিক্ পাউডার
Himalaya Bouquet
TALCUM POWDER
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বোকে স্নো ত্বক্‌কে সব ঋতুতে রক্ষার জন্য
'HBP. 7-X80BG
ইরাস্মিক্ কোং, লিঃ, লণ্ডনএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।
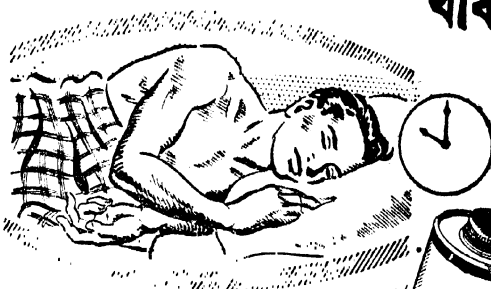
ষষ্ঠী বা অষ্টমীর দিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, বিচিত্র প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্য, সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ সৎসাহিত্যও পরিবেশিত হয়। বড়, ছোট, মাঝারি দরের সকল সাহিত্যিকই এই উপলক্ষে কিছু না-কিছু লিখেছেন। কেউ কেউ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত লিখেছেন দেখা গেল। এই কাল তাই সাহিত্যেরও মরশুম। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রের শারদীয়া সংখ্যা সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল থাকে। অনেকেই বাঁধাধরা ছকে যেন-তেন-প্রকারেণ একখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। মলাটটি ছিঁড়ে পাঁচ বছর আগের ঐ পত্রিকারই শারদীয়া সংখ্যার সঙ্গে যদি পাশাপাশি রাখা হয় তাহ'লে বোঝা শক্ত কোনটি কবেকার অর্থাৎ গতানুগতিকতাই তাঁদের আদর্শ। এই সব পত্রিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবু লক্ষ্য করা গেল শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় বৈশিষ্ট্যের ছাপ, দল-নিরপেক্ষ ভাবে রচনা নির্বাচনের নীতি পালন করে 'যুগান্তর' শুধু উদারতা নয় আধুনিক দৃষ্টি-ভংগীর পরিচয় দিয়েছেন। 'শারদীয়া দৈনিক বসুমতী' এই প্রতিষ্ঠানেরই পরিচালিত সুতরাং সেই সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা শোভন ও সঙ্গত নয় বলে আমরা এই আলোচনায় বসুমতীতে প্রকাশিত কোনো কিছুর উল্লেখ করছি না। তবে 'শারদীয়া দৈনিক বসুমতী'র "চ্যালেঞ্জ" যে রক্ষা করা হয়েছে সংখ্যাটি দেখলে যে কেউ তা স্বীকার করবেন। সংখ্যাটি সম্পর্কে 'যুগান্তরে'র মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। 'যুগান্তর' বলছেন যে, "চিত্র চয়নে, রচনা সংকলনে এবং মুদ্রণে— সব দিকেই অভিনবত্ব এবং একটি বিশেষ মনোযোগপূর্ণ প্ল্যানিংএর পরিচয় পাওয়া যায়।" এই প্ল্যানিং অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় নেই বলেই সেই সকল কাগজ জাতে এবং পাতে উঠছে না। বসুমতীর এই সংখ্যাটি পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করেছেন মাসিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক। 'দেশ' কাগজটি আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। 'স্বস্তিকা' পত্রিকাটি অল্প-পরিচিত হলেও উল্লেখযোগ্য। আর বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন 'যুগবাণী'র নির্ভীক সম্পাদক। তাঁর শারদীয়া সংখ্যায় গল্প, কবিতা, ছবি বা চোখ-ধাঁধানো বহু লেখকের নাম-গন্ধ নেই, আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ছোটদের বার্ষিকী 'বসুধারা', 'মুকুল', 'নতুন লেখা', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, সেই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিখ্যাত শিশু মাসিক 'মৌচাকে'র শারদীয়া সংখ্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র-বক্তৃতা

এই বছর শরৎচন্দ্র-বক্তৃতার বিষয় 'সাহিত্যের সংকট', বক্তা অন্নদাশঙ্কর রায়, বিগত বছর বক্তা ছিলেন অচিন্ত্যকুমার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এত দিনে যে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী সাহিত্যিকদের দূরে রেখেছিলেন তাঁদের স্বীকৃতি দিলেন, বিলম্বে হলেও এটা সুলক্ষণ।

সংবাদপত্রের অসাহিত্য-প্রীতি

সম্প্রতি কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সাহিত্য-পৃষ্ঠায় অশোভন এবং মূর্খামিপূর্ণ মন্তব্য করায় কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে আপত্তিজনক পত্র দিয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনলাম যে, জনৈক প্রকাশক-সাহিত্যিকের কোন এক গ্রন্থ সম্পর্কে উক্ত পত্রিকা হীন ও কদর্য্য মতামত প্রকাশ করায় এই প্রকাশক-সাহিত্যিক স্বয়ং গিয়ে হাজির হয়েছিলেন পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গালমন্দ ক'রেছিলেন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিচারবুদ্ধিকে। সব চেয়ে মজা এই, পত্রিকার সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের লেখা সম্বন্ধে পত্রিকাটি বিচারবুদ্ধিহীন প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, যা পড়ে বিদগ্ধ সমাজ গোপনে হাসাহাসি করছেন। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যদি এই অসৌজন্যসূচক ঘটনার পুনরাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তাহ'লে আসল রহস্য ও আসল আসামীদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সাধারণের কাছে ভবিষ্যতে পেশ করতে আমরা বাধ্য হব।

দুঃস্থ সাহিত্যিককে সাহায্য দান

দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য দান সম্পর্কে সরকারী তহবিলে নাকি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও এই তহবিলের অংশীদার হওয়া যে সহজসাধ্য নয়, তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে শ্রীজগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁর জন্য কয়েক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক দৈনিক কাগজে একটি আবেদন প্রকাশ করেন, এবং সরকারের কাছেও তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করেন প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু এই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও, দৃষ্টিশক্তিহীন এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জীর্ণ-শীর্ণ এই বৃদ্ধ সাহিত্যিকের প্রতি সরকারের কোন অনুকম্পার ভাবই প্রকাশ পায়নি। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে রামগড় কলোনীর একটি কুঁড়ে ঘরে তিলে তিলে আজ যাঁর জীবনপ্রদীপ ক্ষীয়মাণ হয়ে আসছে, তাঁর পক্ষে সুপারিশের জন্য পর্য্যাপ্ত কাঠ-খড় তৈল-তামাক সংগ্রহই করা সম্ভব হয়নি বলেই বোধ হয় যাঁরা সাহায্য-তহবিল আঁকড়ে বসে আছেন, বদান্যশীল সেই সরকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি।

হিমালয় অভিযান সম্পর্কে বাঙলা বই

'হিমালয়ের শীর্ষে আরোহণ' আমাদের যথেষ্ট সম্মান বর্দ্ধিত করলেও আমরা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা থেকে 'তেনজিং' ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না। ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশ এই বিশেষ সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেছে। বিখ্যাত সাময়িকপত্র ও প্রকাশক-সমূহ কেবল মাত্র আরোহণের রঙীন চিত্রসম্ভার প্রকাশ করেই লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছেন। কোন কোন সাময়িকপত্রের "এভারেষ্ট-সংখ্যা"-র চাহিদা দ্বিগুণ বেশী হয়েছিল। বাঙলায় মাত্র একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে হিমালয় আর তেনজিং সম্পর্কে। তাও এক জনের লেখা নয়, সাত-আট জনে মিলে লিখেছেন। শ্রীসুবোধ ঘোষ আর শ্রীসাগরময় ঘোষের সঙ্গে আরও কয়েক জন নবাগত। কার লেখা যে কোনটি তার কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি খুঁজে পাওয়া যায় না একখানিও দর্শনীয় ছবি। প্রকাশকের সজাগ দৃষ্টিই শুধু বইটির ছাপা, বাঁধাই ও অঙ্গসজ্জার প্রকাশ পেয়েছে।

আমেরিকার ভারত-প্রীতি

সম্প্রতি আমেরিকার 'অ্যাটলাণ্টিক' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাখানি একটি বিশেষ ভারত-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। সংখ্যাখানির প্রচ্ছদপটে নেহরু ভ্রাতা-ভগিনীর ছবিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য,

বাকী ভিতরে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্ত্তী, মুলকরাজ আনন্দ প্রভৃতি আরও ভারতীয় কয়েক জনের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ আছে আমরা এর চেয়েও মূল্যবান কিছু আশা করেছিলাম।

বইয়ের বিজ্ঞাপন

আপনারা যখন কাগজে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেন তখন কি দেখেন? দেখেন, যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন সে কাগজের সার্কুলেশন ভালো আছে কিনা, কিন্তু আপনি বা আপনারা পড়বার মত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কিনা, চোখে পড়বার মত টাইপ, লে-আউট, ব্লক বা লেখা সাজিয়েছেন কিনা, সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ একটুও ভাবেন না। বিজ্ঞাপনের থেকে কাজ পেতে হলে যেমন কাগজের প্রচারের কথা ভাবতে হবে, তেমনি আপনি বা আপনারা কি প্রচার করছেন সে সম্বন্ধেও ভেবে দেখবেন। পাঠক-পাঠিকারা বিজ্ঞাপন পড়বেন তখনই, যখন প্রথম দৃষ্টিতেই সে বিজ্ঞাপন তাঁদের আকৃষ্ট করবে।

হাল-ফিল

"দৃষ্টিপাত"-এর বিখ্যাত লেখক 'যাযাবর' সম্প্রতি স্বনামে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে একখানি সুন্দর সচিত্র বই লিখেছেন। বইখানির নাম 'খেলার রাজা ক্রিকেট'।***সৈয়দ মুজতবা আলী রম্য-রচনা ছেড়ে এবার নেবেছেন একেবারে ক্রিমিনোলজীর ব্যাপারে। তিনি সম্প্রতি ক্রাইম-ডিটেকটিভ নভেল লিখছেন।***অচিন্ত্যকুমার "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" শেষ হলেই নাকি তথাগতের জীবন নিয়ে এক দীর্ঘ জীবনী লিখতে সুরু করবেন।***প্রবোধকুমার এর পর কি করবেন এখনো মতিস্থির করতে পারেননি। সম্প্রতি ভূস্বর্গ থেকে নেমে এসে তিনি নাকি কিছু দিন এখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবেন।

পুস্তক-ব্যবসা সংক্রান্ত পত্রিকা

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আমাদের দেশে পুস্তক-ব্যবসায়ীদের বাংলা ভাষায় কোন সাময়িক পত্রিকা নেই। অথচ বাংলা দেশে বাংলা বইয়ের প্রকাশ-সংখ্যা কিছু অল্প নয়। নিত্য-নূতন প্রকাশকের আবির্ভাব ঘটছে, এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু এই ব্যবসাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন সম্পর্কে বা গ্রন্থ-জগৎ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভের কোন উপায় নেই। 'পাবলিশার্স এসোসিয়েশন' নামে কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশকদের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু তাঁদেরও কোন একটি মুখপত্র নেই। ব্যাপক ও বিশদ ভাবে 'পাবলিশার্স এসোসিয়েশন' বা অন্য যে-কোন একটি প্রতিষ্ঠানের এ কার্য্য করা উচিত বাংলা বইয়ের প্রসার ও প্রচারকল্পে।

জানলে ভালো

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হলবার্গ নামক এক জন ডেনিশ লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষ যদি কোন দিন আকাশে ভালো ভাবে উড়তে পারে তাহ'লে সে উপর থেকে মানুষেরই ক্ষতিসাধন করবে সব চেয়ে বেশী।—সম্ভবতঃ তিনি বোমা ফেলার কথাই ভেবেছিলেন।

* * * *

লর্ড মেকলে তাঁর দু'খণ্ড ইতিহাসের জন্য প্রকাশকের কাছ থেকে ২০,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিলেন।—আমাদের দেশে কত বই লিখলে এই টাকা হয়?

* * * *

ব্যা[illegible]কের হাতের লেখা এত খারাপ ছিল যে, মুদ্রাকরকে তাঁর লেখা ক[illegible] করাবার জন্ম আলাদা লোকের ব্যবস্থা করাতে হ'ত এবং এক[illegible] বেশী একসঙ্গে তারা কাজ করতে পারত না।—আমাদের দেশেও এমন দু'এক জন নামকরা সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের লেখা প্রেস ভালো করে অন্য লোক দিয়ে লিখিয়ে দিতে বলে।

* * * *

সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান শহর থেকে বহু দূরে কোয়েনকাটা নামক এক গ্রামের নগণ্য একটি লাইব্রেরীতে ১৬৭৪ সালে মুদ্রিত Paradise Lost-এর দ্বিতীয় সংস্করণ, magna charta-র প্রথম পাণ্ডুলিপি এবং Gilbert's Magnetism (১৬০০ সালে মুদ্রিত) যার মাত্র ১৪খানি কপি এ যাবৎ সারা পৃথিবীতে আছে বলে জানা যায়, তারও একখানি কপি আছে। আর আমাদের দেশে?

* * * *

চার্লস ডিকেন্সের পুরো নাম Charls John Huffham Dickens. আরভিং-এর পুরো নাম John Henry Brodrifb Irving. অস্কার ওয়াইল্ড-এর পুরো নাম হ'ল Oscar Fingal O'Flahertic.—নাম ছোট করার রেওয়াজ আমাদেরও আছে।

॥ প্রাপ্তি-স্বীকার ॥

বঙ্কিম রচনাবলী—(১ম খণ্ড) উপন্যাস। সাহিত্য সংসদ, ৩২।এ, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী—হেমেন্দ্রকুমার রায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

হে বিজয়ী বীর—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

কাঠগোলাপ—শ্রীনরেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

আলো আর আগুন—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

কান্না-হাসির দোলা—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—শ্রীক্ষুদিরাম দাস। পুঁথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দশ টাকা।

রঘুবংশ—ডাঃ অমলেন্দু গুপ্ত। প্রকাশিকা লিমিটেড, ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা।

নিশীথ রাতের সূর্য্যোদয়ের পথে—শ্রীসুষমা মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড এন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দু টাকা বারো আনা।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীবিদ্যা নিকেতন, ১৭৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

মৃগতৃষ্ণিকা—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী। বৃন্দাবন ধর বুক হাউস, ১৩৩।১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য দেড় টাকা।

মিলন গোধূলি—শ্রীপ্রবোধ সরকার। বাণীপীঠ গ্রন্থালয়, ৩৯।১, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য আড়াই টাকা।

হে মোর মানসী প্রিয়া—শ্রীপ্রবোধ সরকার। বাণীপীঠ গ্রন্থালয়, ৩৯।১, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য আড়াই টাকা।

পল্লীগীতি ও পূর্ব্ববঙ্গ—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। কতকথা, ৬৭।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

এতদিন যে বসেছিলাম—শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায় ও ইন্দিরা দেবী। ২২বি, জনক রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ছোটদের কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা।

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে—সুষমা মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দু'টাকা বারো আনা।

ভারত ও বাংলা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। বিনয়কুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চার আনা।

প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন—শ্রীবলাই প্রামাণিক। শ্রীননীগোপাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বর্গী এলো দেশে—শ্রীবরেশ গঙ্গোপাধ্যায়। সবুজ প্রকাশনী, ৪ শুঁড়া ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্য এক টাকা।

মৃত্যুর পরপারে—নবরত্ন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু। ৪৩৫ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (নর্থ), হাওড়া। মূল্য আট আনা।

কৃষ্ণাতিথির চাঁদ—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। দীপালী কার্য্যালয়, ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড। মূল্য দেড় টাকা।

শিশু বড় হয় কি করে—শ্রীউৎপল হোম রায়। উত্তর-কলিকাতা প্রাক্তন মণিচক্র। দক্ষিণা চার আনা।

রজনীগন্ধা—শ্রীস্বপনকুমার। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

শিল্প ও শিল্পী—শংকর মিত্র। সুলেখা প্রকাশনী, ১০৯, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য দশ আনা।

কোর্‌আন্-পরিচয়—ইবনে আওয়ালুদ্দীন আলী। প্রকাশক—হাফেজ মহম্মদ আজহার হাসান। মূল্য পাঁচ আনা।

জন্মান্তর—শ্রীসত্যচরণ ঘোষ। আসর প্রকাশিকা, ২।১এ, নারায়ণচন্দ্র সুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য আড়াই টাকা।

ছন্দ-পতন—শ্রীশৈলজা দত্ত। প্রকাশক—শ্রীনরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। মানভূম। দাম দুটাকা।

লবকুমার বসু

ক্রিকেট

ভারতে ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়ে গেছে। এ বছর ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাদের রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করবে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এদেশে ক্রিকেট খেলার তত্ত্বাবধানের জন্যে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার তারিখ নিয়ে অবশ্য মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারো মতে এটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে। আবার অনেকে বলেন ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরেই এই বোর্ড প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কন্‌ফারেন্স'-এ ভারতের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯২৬ সালে, অর্থাৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পুর্ব্বেই। যাই হোক, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ড প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে না পারলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, গত পঁচিশ বছরে এদেশে ক্রিকেট খেলার উন্নতিসাধনে বোর্ডটির দান যথেষ্ট। সে বিষয়ে দু'-এক কথা এখানে বলা প্রাসঙ্গিকই হবে।

ভারত প্রথম ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন তারিখে সরকারী টেষ্ট খেলায় অবতীর্ণ হয় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, লর্ডস মাঠে। পোরবন্দরের মহারাজার নেতৃত্বে সেদিন দলটি ওদেশে সফর করছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ সম্মিলিত শক্তিকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলাবার জন্যে মহারাজা এবং দলের সহ-অধিনায়ক লিম্বিডির যুবরাজ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেননি। ভারতীয় দলের প্রথম টেষ্ট খেলার পরিচালনা করার ভার ন্যস্ত হয়েছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সি. কে. নাইডুর ওপর। এর পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। বোর্ডের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশে ক্রিকেট খেলার প্রভূত উন্নতিও হয়েছে। তার আমন্ত্রণে চারটি সরকারী ও পাঁচটি বেসরকারী দল ভারত সফরে এসেছে। যেমন, (১) ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিনের অধীনে ইংলণ্ড দল, (২) ১৯৩৫-৩৬ সালে জ্যাক রাইডারের অধিনায়কত্বে পাতিয়ালার মহারাজার অষ্ট্রেলিয় একাদশ, (৩) ১৯৩৮-৩৯ সালে লর্ড টেনিসনের একাদশ, (৪) ১৯৪৫-৪৬ সালে হ্যাসেটের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয় সার্ভিসেস একাদশ, (৫) ১৯৪৮-৪৯ সালে জন গোডার্ডের অধীনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল, (৬) ১৯৪৯-৫০ সালে লিভিংষ্টনের পরিচালনায় প্রথম কমনওয়েলথ দল, (৭) ১৯৫০-৫১ সালে এমসের অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল, (৮) ১৯৫১-৫২ সালে হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল এবং (৯) ১৯৫২-৫৩ সালে কারদারের অধীনে পাকিস্তান দল। এ বছরও একটি কমনওয়েলথ দল বোর্ডের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভারত সফরে এসেছে। বেন বার্ণেট তার অধিনায়ক।

আমাদের খেলোয়াড়রাও গত পঁচিশ বছরে ছ'বার বিদেশে সফর করে এসেছে। যেমন,—১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৬ ও ১৯৫১ সালে ইংলণ্ডে, ১৯৪৭-৪৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় এবং ১৯৫৩ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে। এদের অধিনায়কত্ব করেছিলেন যথাক্রমে পোরবন্দরের মহারাজ, ভিজনগ্রামের মহারাজ, পাতৌদির নবাব, বিজয় হাজারে, লালা অমরনাথ এবং বিজয় হাজারে।

টেষ্ট খেলায় (বেসরকারী) ভারতীয় দল প্রথম জয়লাভ করে ১৯৩৫ সালে। জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে ভারত সফরকারী অষ্ট্রেলিয় দলের বিরুদ্ধে। লাহোরে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন ওয়াজির আলি। টেষ্ট খেলায় ভারত প্রথম 'রাবার' লাভ করে ১৯৪৯-৫০ সালে। হাজারে ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক এবং বিরোধী প্রথম কমনওয়েলথ দল পরিচালনা করেছিলেন লিভিংষ্টোন। ১৯৫১-৫২ সালে সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারত প্রথম সাফল্য লাভ করে হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে সফরকারী ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে; এবং গত বছর সরকারী টেষ্ট খেলায় আমাদের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে প্রথম 'রাবার' লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। অধিনায়ক ছিলেন লালা অমরনাথ। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা অনেকগুলি বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় লিখবো।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই এদেশে ক্রিকেট খেলার মান উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এখন আমরা সেই দিনটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি, যেদিন ভারত "জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" আশা করি, সেদিনটি খুব সুদূরে নয়। তাই ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং তার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বোর্ডের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ বছর এক কমনওয়েলথ দল এসেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেষ্ট উইকেট-কীপার বেন বার্ণেট হলেন দলটির নেতা। ম্যানেজার হয়ে এসেছেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন বিখ্যাত উইকেট-কীপার জর্জ্জ ডাকওয়ার্থ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডাকওয়ার্থ ইতিপুর্ব্বে অন্য দুইটি কমনওয়েলথ দলের ম্যানেজার হয়েও ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সম্বন্ধে তিনি যে সকল বিরুদ্ধ ও অন্যায় মন্তব্য করেছিলেন, তাতে ভারতে পুনরায় একটি সফরকারী দলের ম্যানেজাররূপে তাঁকে আনা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

বিদেশাগত জুবিলী দলের প্রথম খেলা শুরু হয় ৯ই অক্টোবর ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে, ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে। সি, সি, আই দলের অধিনায়কত্ব করেন উইকেট-কীপার মন্ত্রী। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবেই সম্পন্ন হয়। সি, সি, আই দলের প্রথম ইনিংসের ৩২৬ রাণের প্রত্যুত্তরে জুবিলী দল ৩৬৭ রাণ তোলে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অবশিষ্ট সময়ে পাঁচ উইকেটে ১২০ রাণ করে। ব্যাটিং-এ স্থানীয় দলের পক্ষে রামচাঁদ (৬১), মোদী (৪৭) ও দেশাই (৫০, ৪০ নট আউট) এবং জুবিলী দলের পক্ষে ওরেল (৭৬), মিউলিম্যান (৫৫), ব্যারিক (৯৬), সুব্বা রাও (৭৭) এবং বোলিং-এ রামাধীন, বেরী এবং মানকড় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় খেলা হয় পুণায় মহারাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট একাদশের বিরুদ্ধে। বৃষ্টির জন্যে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। মানকড় মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়কত্ব করেন। এই খেলায় জুবিলী দলের এড্রিচ (৬৪ নট আউট) এবং মহারাষ্ট্র দলের মুস্তাক আলি (৭৬),

দানী (৫৭) ও বোলিং-এ বোর্ডে (৬২ রাণে ৫টি) সাফল্য লাভ করেন। এর পর বিজয় হাজারের অধীনে বরোদা দলের সহিত খেলাটিও ড্র হয়। এ খেলায় হাজারে সফরকারী দলটির বিরুদ্ধে প্রথম শতাধিক রাণ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। ১৭৫ রাণ করে তিনি অপরাজিত থাকেন। অপর দিকে জুবিলী দলের হয়ে এই সফরে প্রথম শতাধিক রাণ তোলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (১০৪)। এ ছাড়া মিউলিমানও একটি সেঞ্চুরী করেন।

আমেদাবাদে মুস্তাক আলির অধীনে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে খেলায় কিন্তু সফরকারী দলটি পরাজিত হয়ে সকল ক্রীড়ামোদীকেই নিরাশ করে। ভারতীয় দল তিন উইকেটে জয়লাভ করে। জুবিলী দলের পক্ষে ওরেল শতাধিক রাণ করলেও তাদের অধিকাংশ খেলোয়াড় গুপ্তে ও প্যাটেলের স্পিন বোলিং-এ বিপর্য্যস্ত হন। প্যাটেল ও গুপ্তে এই ম্যাচে যথাক্রমে ১৫১ ও ১৬৯ রাণে ১০টি ও ৮টি উইকেট পান। এ খেলায় অধিনায়ক মুস্তাক আলি, লাসকারী, মঞ্জরেকার ও যতীন্দ্র শোধনের ব্যাটিং-সাফল্য ভারতীয় দলের জয়লাভের পথ সুগম করে।

হোলকার দলের বিরুদ্ধে খেলায় জুবিলী দল উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখায়। এই খেলায় ইংলণ্ডের চৌকস টেষ্ট খেলোয়াড় রেগ সিম্পসনের যোগদানে জুবিলী দলের শক্তিবৃদ্ধি হয়। সিম্পসন বিদেশাগত দলের হয়ে ভারত সফরের প্রথম খেলাতেই শতাধিক রাণ (১২৫) করেন। শেষ পর্য্যন্ত এ খেলাও অমীমাংসিত থাকে।

সফরকারী জুবিলী দলের পাঁচটি খেলা এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং এই পাঁচটি খেলায় জুবিলী দল ৫৮ উইকেটে ১৯৬৭ রাণ করে; অর্থাৎ গড়ে প্রতি উইকেটে ৩৩.১৪ রাণ। আর তাদের বিরুদ্ধে ৫৯ উইকেটে ১৮৭০ রাণ হয়, অর্থাৎ গড়ে প্রতি উইকেটে ৩১.৭৯ রাণ হয়।

জুবিলী দলের সঙ্গে ভারতের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলার কথা ছিল লক্ষ্ণৌতে, ৫ই নভেম্বর থেকে। কিন্তু ছাত্রবিক্ষোভ ও অন্যান্য নানা কারণে সেখানকার পরিস্থিতি খেলার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এমন কি, দুষ্কৃতিকারীরা টেষ্ট পিচ পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেয়। তাই সেখানকার খেলা বাতিল করে দেওয়া হয়। দিল্লীতে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার কথা থাকলেও সেইখানেই ১১শে নভেম্বর থেকে প্রথম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হবে। লক্ষ্ণৌ-এর ম্যাটিং উইকেটে টেষ্ট খেলার জন্যে যে ভারতীয় নির্ব্বাচিত হয়েছিল তা থেকে তিন জন খেলোয়াড়কে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। মুস্তাক আলি, ওমপ্রকাশ ও জাম্মু প্যাটেলের জায়গায় গোপীনাথ, অর্জ্জুন নাইডু ও গোলাম আমেদকে নেওয়া হয়েছে। মুস্তাক আলিকে বাদ দেওয়ার সঠিক কারণ সকলের কাছেই অজ্ঞাত। সম্প্রতি জুবিলী দলের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাতে ভারতীয় দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া সত্যই বিস্ময়কর। যাই হোক, উদীয়মান খেলোয়াড় পলি উমরীগড় প্রথম টেষ্ট খেলায় অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এর থেকে মনে হয়, তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতি ঝোঁক দিয়েছেন নির্ব্বাচক কমিটি। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু উমরীগড় ইতিপূর্ব্বে কখন এরূপ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় অধিনায়কত্ব করেননি; তাই একেবারে ভারতীয় টেষ্ট দলের অধিনায়কত্ব করতে দেওয়ার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় একাদশের পরিচালনার ভার তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল।

কলকাতায় ফুটবল ও হকীর মত ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ কথা আগেই বলেছি। এ বছর থেকে আবার সি, এ, বি, ক্রিকেট লীগ আরম্ভ হয়েছে। ফুটবল এবং হকীর মত ক্রিকেটেও ক্লাবগুলির মধ্যে আপন আপন দলের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্যে তোড়জোড় চলেছে। বাইরে থেকে টেষ্ট খেলোয়াড় আনার প্রচেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মঞ্জরেকার, গুপ্তে ও ফাদকার এসেছেন। তাঁরা লীগে—যথাক্রমে মোহনবাগান, কালীঘাট ও রাজস্থান ক্লাবের হয়ে খেলবেন। বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রত্যেক দলে মাত্র একজন করে পেশাদার খেলোয়াড় রাখবার অনুমতি দিয়েছেন। তাই উপরোক্ত খেলোয়াড়েরা পেশাদাররূপেই খেলছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর সি, এ, বি, কর্ত্তৃক 'নক-আউট' প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। ফাইনালে কালীঘাট দলকে পরাজিত করে মোহনবাগান বিজয়ী হয়।

ফুটবল

রেঙ্গুণে দ্বিতীয় এশিয়া চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ভারত কলম্বো এবং বর্ম্মা কাপ জয় করেছেন। ১৯৫১ সালে প্রথম এই প্রতিযোগিতা কলম্বোয় আরম্ভ হয়—সিংহল, বর্ম্মা, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। পাকিস্তান ও ভারত সমান সংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করায় যুগ্ম ভাবে বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়েছিল। এ বছর ভারত পাকিস্তানকে ১-০ গোলে, সিংহলকে ২-০ গোলে এবং সর্বশেষ খেলায় বর্ম্মাকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে। দলের অধিনায়ক মান্না এবং তাঁর সহকর্মীদের আমাদের সকলেরই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

ডুরাণ্ড কাপের পরিসমাপ্তির সঙ্গে এ বছরের ফুটবল মরসুমের ওপরও যবনিকা নেমে এল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই প্রতিযোগিতায় এবার বিজয়ী হওয়ার গৌরব লাভ করেছে কলকাতার জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব। ফাইনালে তারা নবাগত ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। এই প্রথম ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় এন্, ডি, এ, দল যোগদান করল। তরুণ খেলোয়াড়-দের নিয়ে গঠিত এই দলটি জয়লাভ করতে না পারলেও যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছে তা বিস্ময়জনক। গত দু'বছরের ডুরাণ্ড কাপ-বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দলকে তারা পরাজিত করে সকলকেই বিস্মিত করেছে। কিন্তু কেন জানি না, ফাইনালে তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারলে না। সম্ভবতঃ পর-পর তিন দিন খেলায় তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মোহনবাগান দল ডুরাণ্ড কাপের ৫১তম প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সাফল্য লাভ করল। ১৯৫০ সালে তারা ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হায়দারাবাদ পুলিশ দলের নিকট পরাজিত হ'ল। প্রথম দিনে তারা যখন ২-০ গোলে অগ্রগামী ছিল, সেই সময় হঠাৎ তাদের গোলকীপার আহত হয়ে পড়েন এবং দলের অন্য একজন খেলোয়াড় তাঁর স্থান অধিকার করেন। এই সময় হায়দারাবাদ দল দুটি গোল পরিশোধ করতে সমর্থ হয় এবং দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগানকে পরাজিত করে। এবারে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে ব্যাঙ্গালোর ব্লুজকে এবং সেমিফাইনালে হায়দারাবাদ পুলিশ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

'কিন্তু স্যার এই ব্যবস্থা কি ঠিক হলো', প্রণব বাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'বরং রাজপথে ছদ্মবেশী শান্ত্রীদের মোতায়েন করে আমরা হরণকারীদের প্রত্যেককেই ধরে ফেলে তাদের নিকট হতে গুণ্ডাদল সম্পর্কীয় সকল সমাচার অবগত হতে পারতাম।'

'এ কথা আমিও যে ভাবিনি তা মনে করো না, প্রণব,' মাথা নেড়ে নরেন বাবু বললেন, 'কিন্তু আমার মতে এতে ফল হতো বিপরীত। কারণ আমাদের ন্যায় ওদেরও গুপ্তচরের অভাব নেই। আমার নিশ্চিত ধারণা, এই থানার মধ্যেও ওদের গুপ্তচর মোতায়েন আছে, তা না হলে এখানকার প্রতিটি খবর মুহূর্তের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে যায় কি করে? তোমার মতানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ওরা চন্দ্রাকে হরণ করার চিন্তাও মনে আনতো না। তবে এ সম্বন্ধে আট-ঘাট না বেঁধে যে আমি এইরূপ এক ব্যবস্থা করেছি তা তোমরা মনেও স্থান দিও না। চন্দ্রাকে যে ঘোড়-পাড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার পিছন-পিছন যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ সহ মোটর-বাইক সহ গোয়েন্দা বিভাগের মাধব বাবুকে আমি নিযুক্ত করেছি। তিনি নিশ্চয় অপহারকদের ট্যাক্সী গাড়ীর পিছনে ধাওয়া করে তাদের গোপন আড্ডার অবস্থান কোথায় তা জেনে নিতে পেরেছেন। খুউব সম্ভবত তিনি এখুনিই এখানে এসে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের অবগত করাবেন। দেখো না এখোন কি হয়, চাল তো একটা চেলে দিলাম।'

উপস্থিত সকলে নরেন বাবুর এই সকল কথা যেন গিলে-গিলে শুনছিলেন, এমন সময় বাইরে মাটর-বাইকের একটা ফট-ফট আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই ডাক-পিওনের ছদ্মবেশ পরিহিত গোয়েন্দা বিভাগের মাধব বাবু আফিস-ঘরে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর পিছন-পিছন সেখানে এলেন ডাকহরকরার ছদ্মবেশে এক তাড়া চিঠিপত্র হাতে তাঁর আর্দ্দালী মোতাহের সেখ। স্মুখ মুখে নরেন বাবুর টেবিলের নিকট এগিয়ে এসে মাধব বাবু বললেন, 'সব কিছু কায়দা করে এনেছিলাম, কিন্তু শেষে স্যার, সবই ভেস্তে গেলো। তবে ওদের আড্ডাটা যে মীর বাগান বস্তীর মধ্যে তাতে আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। ওরা ঐ বস্তীর মুখে এসে ট্যাক্সীটা বিদায় দিয়ে একটা অপরিসর গলির পথ ধরে বস্তীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। সিপাহী মোতাহেরকে আমার বাইকের পিছনে বসিয়ে রেখেছিলাম। মোটর-বাইকটা তার জিম্মায় বাইরে রেখে আমি জাল টেলিতারের কাগজগুলো হাতে করে তখুনি বস্তীর মধ্যে ঢুকেও পড়লাম. কিন্তু তারা হঠাৎ মোড় ঘুরে যে কোথায় হারিয়ে গেল তা বহু চেষ্টা করেও আমি আবিষ্কার করতে পারলাম না।'

'দেখছি, ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যেই', প্রত্যুত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'ওদের পিছন-পিছন অগ্রসর না হয়ে তুমি ভালোই করেছো। গুণ্ডাদের আড্ডা-বাড়ীর অবস্থান শহরের কোন্ অংশে মাত্র এইটুকুই আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমি কিন্তু তোমার এই কাজে খুউব সন্তুষ্ট হয়েছি মাধব বাবু। এর পর যা কিছু করবার তা আমি নিজেই করবো আখুন। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রণব বাবুকেও আমি একটা কথা বলবো। খুকুরাণীকে উদ্ধার করাই এখোন বড়ো কথা নয়। তার ভাগ্যে যা ছিল তা এতোক্ষণে ঘটে গিয়েছে, অন্যথায় চন্দ্রা দেবীর উপস্থিতি তাকে সকল আপদ হতে উদ্ধার করতে পারবে। আমাদের এখোন প্রধান কর্ত্তব্য হবে এদের দলের প্রতিটি আড্ডা-স্থান খুঁজে বার করে একে একে এদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা। এই কায সুষ্ঠুরূপে করতে হলে নানা স্থান হতে বহু সিপাহী-শান্ত্রী ও অফসার আনিয়ে তাদের সাহায্যে রাত্রিযোগে একই ক্ষণে এদের প্রত্যেকটি আড্ডা-স্থানে আমাদের হানা দিতে হবে। এক একটি স্থানে পৃথক-পৃথক দিনে হানা দিলে এদের দলটিকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া আজ রাত্রে আমাদের অপর আর এক জরুরী কায আছে। মনে আছে তো যে আজ রাত্রে বারুণী উপলক্ষে বহু ধর্ম্মপ্রাণা নারী বাবুরাম সড়ক ধরে গঙ্গাস্নানে যাবে। আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে এই রাত্রে প্রাণধন বাবুর নৈশ কার্য্য-কলাপ পরিলক্ষ্য করতে চাই। যদি চন্দ্রা দেবীর কথা সত্য হয় তা'হলে ঘটনাস্থলে তার এই সব অপকার্য্যের বিধব্যবস্থা আমি নিজেই করে আসবো। এই সুযোগে ভদ্রলোকের নিকট হতে বিহারী বাবুদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্পর্কেও বহু তথ্য অবগত হতে পারা যাবে। এখোন এসো, এই সকল ঘটনা সম্পর্কে যেটুকু তদন্ত আমরা সমাধা করেছি, তার একটা স্মারকলিপি সকলে মিলে পরামর্শ করে লিখে ফেলি। এখন হতে লেখালেখি সুরু করলে তবে রাত্রি এগারটায় আমরা এই লেখার কার্য্য শেষ করতে পারবো। কেবল মাত্র তদন্ত করলেই তো হলো না। সেই সঙ্গে ডাইরিটিও গুছিয়ে লিখে ফেলতে হবে; তা না হলে আখেরে আদালতে মূল মামলাই হয়তো ফেঁসে যাবে। জানো তো, কায করার চেয়েও সে সম্পর্কে লেখালেখি করা আরও শক্ত।'

নরেন বাবুর এই সুযুক্তি উপেক্ষা করবারও ছিল না। অগত্যা তদন্তের ব্যাপারে যে যেটুকু কার্য্য করেছে তা তাঁরা নরেন বাবুর নিকট একে একে বিবৃতি করে যেতে লাগলেন এবং নরেন বাবু দেবাদিদেব-পুত্র গণেশের মত ত্বরিত গতিতে তা তারিখ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলেন। এমন সময় সকলকে চমকিত করে দিয়ে উপরের কোয়াটার হতে নেমে এসে নরেন বাবুর ঝি সারদামণি নরেন বাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানালে, 'বাবু একবার উপরে আসুন, মা কেমন কেমন

করছেন. জ্বরটাও আজ বেড়ে গেছে। তেনা আপনাকে এখুনি একবার উপরে যেতে বলে দিলেন।' প্রত্যুত্তরে নরেন বাবু খেঁকরে উঠে বলে উঠলেন, 'কাযের সময় বিরক্ত করো না বাপু! এখোন আমি মামলার ডাইরী লিখছি, তুমি মামা বাবুকে খবর দিয়ে এসো।' নরেন বাবু দ্বিরুক্তি না করে ডাইরী লেখার কার্য্যে মনোনিবেশ করলেন। এমনি লেখালেখির মধ্যে কখন যে রাত্রি তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাহা উপস্থিত কারও খেয়াল ছিল না. সহসা ঘড়ীর দিকে চেয়ে সময় দেখে নরেন বাবু তাঁর কলমের গতি থামিয়ে বললেন, 'এখন প্রায় চারটে যে বাজতে চললো, আর তো দেরী করা যায় না। গঙ্গাস্নানার্থিনীরা এতোক্ষণে বোধ হয় রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে! এসো আমরাও তা'হলে আর দেরী না করে এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলে নরেন বাবু ও প্রণব বাবু এবং দারোগা ওঝাজি দুই জন ছদ্মবেশী সিপাহীর সঙ্গে বাবুরাম সড়কের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাবু প্রাণধন মল্লিককে তাঁর নৈশ অপকার্য্যের সময় একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলা। প্রাণধন বাবুকে এরূপ এক কারে ফেলতে পারলে তিনি খুকুরাণী-হরণ সম্পর্কীয় তদন্তে পুলিশকে যে বাধ্য হয়ে সাহায্য করবেন, এইরূপ এক আশাও প্রণব বাবু অপর সকলের ন্যায় মনে মনে পোষণ করেছিলেন, তাই সারা রাত্রি জাগার পরেও তিনি সোৎসাহে অপর সকলের সঙ্গে নরেন বাবুর অনুগামী হলেন।

সকলে মিলে যখন বাবুরাম রোডে এসে উপস্থিত হলেন, তখন ভোর প্রায় চারটা হবে। গান গাইতে গাইতে ধর্ম্মপ্রাণ দেশবালী মেয়েরা সারবন্দী ভাবে পথের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছে। তাদের মুখে-চোখে আশু বিপদের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। ক্রমে ক্রমে মেয়েদের ভীড় পাতলা হয়ে এলো; দুই-এক জন স্নানার্থিনী কন্যা এলোমেলো ভাবে পথ চলছে মাত্র। সহসা এক জন জোয়ান লোক একটা খালি বাড়ী হতে বেরিয়ে এসে এক জন অল্পবয়স্কা গঙ্গা-স্নানার্থিনীর পিছনে এসে দাঁড়ালো এবং তার পর অতর্কিতে এক হাত দিয়ে তার দেহটা ও অপর হাতে তার মুখটি মুঠি করে ধরে নিমিষের মধ্যে তাকে শূন্যে তুলে খালি বাড়ীটার ভিতর ঢুকে পড়লো।

নরেন ও প্রণব বাবু এবং ওঝা বাবু এবং এক জন জমাদার পৃথক পৃথক দুইটি পর্দ্দা-ফেলা রিক্সায় বসে লোকটির কার্য্যকলাপ পরিলক্ষ্য করছিলেন। ওঁরাও রিক্সা হতে অবতরণ করে সেই খালি বাড়ীটির ভিতর ঢুকে পড়তে একটুও দেরী করলেন না। বাড়ীর ভিতরকার একটি কক্ষ হতে একবার একটি গোঙানির আওয়াজ এলো কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর কোনও আওয়াজই শোনা গেল না। কিছুক্ষণ এধার-ওধার খোঁজাখুঁজি করে শান্ত্রী দল একটা ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে একটি খাটের উপরে অপহৃতা কন্যাটি একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িতা এবং তার মাথার নিকট দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জন গুণ্ডা-প্রকৃতির পুরুষ। বাম হাতে একটা ধারালো ছোরা মেয়েটির বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে ডান হাতের একটি অঙ্গুলী ঠোঁটের উপর রেখে সে মেয়েটিকে নিস্তব্ধ করে রেখেছে। সকলে একত্রে ব্যাঘ্রপালের মত তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে নিমিষে তাকে নিরস্ত্র করে ফেলা মাত্র সে সভয়ে প্রণব বাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'আমি কি জানি না প্রণব বাবু, আমাকে আপনি

রক্ষে করুন। আমি যা-কিছু করেছি তা মালিকের মনস্তুষ্টি করবার জন্যে। কতো এমন মেয়ে তাঁর বাঁধাধরা আছে, কিন্তু তাতেও ওঁর মন উঠে না। জোর-জবরদস্তীর মধ্যে এলানীং এঁর যা কিছু আনন্দ। সহজলব্ধ জিনিস আজকাল আর উনি পছন্দ করেন না। তবে সত্য কথা আমি বলবো হুজুর, এদের হাতে তিনি প্রতিবারে এক হাজার টাকা গুঁজে দিয়েছেন, কিন্তু তারা নোট ক'টা মাটিতে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছে। এর পরদিন হতে আর একদিনও তারা গঙ্গাস্নান করতে বাড়ীর বার হয়নি। তবে আমি হুজুর ওঁর একটু ভোগের পর দুই-এক দিন প্রসাদ আদায় করে নিয়েছি, এই যা। আমাকে রক্ষে করুন হুজুর, সবই তো আমি স্বীকার করেছি তা না হলে যে আমি ধনে-প্রাণে মারা যাবো।'

'হুঁ, সবই তো বুঝতে পারলাম,' প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি লোকটা কে? মনিবটি তোমার প্রেসাদের বন্দোবস্ত না করে গেলেন কোথায়?' 'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশতজীব ঘোষ, রাজা প্রাণধন বাবু আমার মনিব'—প্রত্যুত্তরে লোকটি বললে, 'একটু দেরী করে এলে ওঁকে আপনারা এখানে দেখতে পেতেন। কিন্তু এখোন আর উনি এই বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও আসবেন না।'

অনেক চিন্তা করেও নরেন বাবু বুঝতে পারলেন না, কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শয়তান—রাজা প্রাণধন না তাঁর অনুগত ভৃত্য শতজীব বাবু। ক্রোধে এতোক্ষণ তাঁর দেহের প্রতিটি শিরা ও উপশিরা থেকে থেকে ফুলে উঠছিল। সহসা স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে তাঁর মধ্যে এসে গেল এক আদিম যুগীয় শোণিত-স্পৃহা। পেশীবহুল হাত দুটি নিয়ে প্রসারিত করে তিনি শতজীব বাবুর নিকট এগিয়ে এসে তাঁর লোকজনকে হুকুম দিলেন, 'এই বিছানারই চাদরটা উঠিয়ে এর মুখটা এখুনি বেঁধে ফেলে ওকে উপরের ছাদে নিয়ে যাও। একে গ্রেপ্তার করে থানা পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে আমার আর ইচ্ছে নেই।'

এতোক্ষণ বন্দিনী মেয়েটি বিছানা হতে উঠে ঘরের একটি কোণে দাঁড়িয়ে ভয়ে ও লজ্জায় আধমরা হয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছিল। এইবার মরিয়া হয়ে সে নরেন বাবুর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, 'আমাকে এখুনি আপনারা এখান হতে যেতে দিন, দেরী করে বাড়ী ফিরলে আর আমাকে কেউ ঘরে নেবে না।' সে নরেন বাবুর উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করে উঠি-পড়ি করে ঝড়ের মত ছুটে এই বাড়ী হতে বার হয়ে গেল। রক্ষীদের দুই-এক জন তাকে ধরে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নরেন বাবু ত্বরায় তাদের নিরস্ত করে বললেন, 'যেতে দাও ওকে এখান থেকে, ওকে আমাদের কোনও প্রয়োজনই নেই। এই মামলা কোর্টে পাঠালে ওর উপকারের চেয়ে অপকারই আমরা করবো বেশী। এমন কি হয়তো এই জন্য আখেরে সমাজবৃত্ত-চ্যুত হয়ে ওকে বেশ্যাবৃত্তি পর্য্যন্ত করতে হতে পারে। যে আইন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উপকারে আসে না সেই আইন আমি স্বীকার করি না। আমরা এখানে এসেছি মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, তাদের অমঙ্গলের জন্যে নয়। বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ধরণের অপরাধ-নিরোধের জন্য আমি এক সহজ উপায় চিন্তা করে রেখেছি। আমাদের এখোন আইনের ওয়ার্ডিং বা কথাবলী গ্রহণ না করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে শুধু আইনের স্পিরিট বা উদ্দেশ্য। এখোন নিয়ে চলো একে হিঁচড়ে টেনে তেতলার ছাদে।'

নরেন বাবুর নির্দ্দেশ মত সকলে মিলে তাকে এই খালি বাড়ীর ত্রিতলের ছাদের উপর টেনে হিঁচড়ে উঠিয়ে এনে শুইয়ে দেওয়া মাত্র নরেন বাবু জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রণব বাবুকে বললেন, 'এইবার প্রণব, তোমাদের এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, তোমরা তোমাদের মনকে এর জন্য প্রস্তুত করে নাও।' 'কিন্তু কিসের এই পরীক্ষা স্যার,' প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'একে থানায় না এনে এই খালি বাড়ীর ছাদে আনলেন কেন? আমি কিন্তু স্যার আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।'

'সব কথা খুলে বললেই বুঝতে পারবে, কিন্তু তার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি, তুমি সর্ব্বধর্ম্মের সার ভগবদ্গীতা পড়েছো কি? যদি তা পড়ে থাকো তাহলে তাতে শ্রীভগবান কি বলেছেন তা মনে আছে?' 'আজ্ঞে, আমি গীতা বহু বার পড়েছি এবং তার প্রতিটি উপদেশ আমার মনেও আছে। ভগবদ্-গীতার প্রধান উপদেশ হচ্ছে "ফলাফলের কথা চিন্তা না করে শুধু কাজ করে যাও," এই একটি মাত্র কথাই এই অমর গ্রন্থে শ্রীভগবান আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে স্যার, আমাদের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এই পুস্তকটিই আমার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে। পুস্তকখানি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়, বক্তব্য বিষয় বুঝি শ্রীভগবান মাত্র ভারতীয় পুলিশদের সংবোধের জন্যই বলে গিয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় পুলিশই এ অমর উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে থাকে।'

'ভালো ভালো, অতি উত্তম কথা, এ রকম এক উত্তরই আমি তোমার কাছ হতে প্রত্যাশা করেছি', ধীর-স্থির ভাবে নরেন বাবু বললেন, 'তা'হলে কোনও প্রশ্ন না করে আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করে যাও। এতে পাপ-পুণ্য যা-কিছু তা আমার, তোমাদের এতে ভাবনা করবার কিছু নেই। বরং আমার আদেশ মত কাজ করলে অনেক নির্য্যাতিতা সতীলক্ষ্মীর বিমল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবে। তা'হলে আর একটুও তোমরা দেরী করো না, এখুনি এই নরপিশাচকে চ্যাংদোলা করে ছাদের উপর হতে নীচের রাস্তার উপর ফেলে দাও। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এর প্রাপ্য শাস্তির কোনও সংবিধান নেই, তাই আমি এর সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম। মনে রেখো, যে দেশের লোক তাদের নারীর ও দেবতার অবমাননায় জাগে না, সে জাতির ভাগ্যে সহস্র বৎসর দাসত্ব-বৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।'

'ওরে বাপ রে বাপ, বলেন কি আপনি, স্যার,' দুই পা পিছিয়ে এসে এবং সেই সঙ্গে আঁতকে উঠে প্রণব বাবু বললেন, 'এ তো এক প্রকার খুন ছাড়া আর কিছুই নয়। তা'ছাড়া আপনি একটি অপরাধ নিরোধ করতে এসে অপর একটি অনুরূপ অপরাধ আমাদের দিয়ে কি করাবেন স্যার? একটা অপরাধ দিয়ে অপর একটা অপরাধ নিরোধ করা বা চাপা দেওয়া যে যায় না, এ তো পৃথিবীর এক পুরাতন পরীক্ষিত সত্য। অপরাধের ছোট-বড়ো বা প্রকারভেদ বা জাতবিচার নেই। অপরাধ অপরাধই এবং বিষ বিষই; পরিমাণ এদের যতোই স্বল্প হোক

না কেন, মানুষ মারতে তাই যথেষ্ট। না স্যার, এ কায আমি কিছুতেই করতে পারবো না।'

'করতে পারবে না মানে, আলবৎ করতে পারবে.' রক্তচক্ষু করে নরেন বাবু বললেন, 'এক জন না করতে পারলে অপর জনে তা করতে পারবে না, এ কথা তোমায় কে বললে? কায করবার যিনি প্রকৃত মালিক তিনিই তা করাবেন। তুমি-আমি তো নিমিত্তের ভাগী মাত্র, আমাদের নিজেদের ক্ষমতা কতটুকু? তুমি এ কায না পারলে ওঝাজী নিশ্চয়ই তা পারবে। ও'ঝা'জী—'

সহ-দারোগা ওঝাজী এতোক্ষণ নিবিষ্ট মনে নরেন এবং প্রণব বাবুর বাদানুবাদ শুনে যাচ্ছিলেন। নরেন বাবুর হুকুম পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর বলিষ্ঠ বাহু দুটি সম্মুখে প্রসারিত করে সোল্লাসে একটা বিকট হাঁক হেঁকে শতজীবকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিমিষের মধ্যে তাকে আলিসার উপর দিয়ে নীচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হতভাগ্য শতজীব একটি অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ বা সামান্য মাত্র চীৎকার করবারও সময় পেলে না। তার নশ্বর দেহটি ঘূরপাক খেতে খেতে সশব্দে নিম্নের রাজপথের মাটি স্পর্শ করলো। নীচের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে 'চোর চোর, পালালো, নীচে লাফিয়ে পড়লো, পাকড়ো পাকড়ো' ব'লে চীৎকার করতে করতে নরেন বাবু নীচের রাজপথে নেমে এলেন এবং তাঁর চীৎকারে সায় দিয়ে অনুরূপ ভাবে চীৎকার করতে করতে তাঁর সঙ্গে নেমে এলেন নরেন বাবুর সুযোগ্য সাকরেদ ওঝাজী এবং অন্যান্য অফসাররা। এতক্ষণে বহু পথচারী এবং পল্লীবাসীও রাস্তার উপর জড় হয়ে পড়েছে। সকলে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে উপস্থিত শাস্ত্রী দলের প্রতি তাকানো মাত্র নরেন বাবু ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে বাপ রে বাপ, কি আর বলবো মশাই! লোকটি হচ্ছে বলাৎকার মামলার এক জন আসামী। লোকটিকে জাপটে ধরেছি কি না সে একটি ঝটকান মেরে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লো। এমন করে আসামী আত্মহত্যা করবে তা কি করে আমরা জানবো বলুন!'

ভারতবর্ষের মানুষের মনে বলাৎকারকগণ যেরূপ বিতৃষ্ণা আনে, অন্য কোনও আসামী তাদের মনে সেরূপ বিকার আনেনি। এতক্ষণে শতজীব বাবুর উপর জনতার যা-কিছু সহানুভূতি এসেছিল, তা নরেন বাবুর উত্তরে এক নিমিষেই উবে গেল। অভিজ্ঞ অফসার নরেন বাবু বুঝে-সুঝেই জনতার নিকট এরূপ কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতার মধ্যে আহত শতজীব বাবুকে বেশীক্ষণ রাখা নিরাপদ নয়। নরেন বাবু উপস্থিত শাস্ত্রীদের তাড়া দিয়ে হুকুম দিলেন, 'দেখছো কি সব, এখোন একে খালি বাড়ীর ভিতরে এনে ফার্ষ্ট এইডের বন্দোবস্ত করো। তোমাদের এক জন এগিয়ে গিয়ে কোনও এক ফোন থেকে এম্বুলেন্সে ফোন করে দাও।'

ওঝাজী কয়েক জন শাস্ত্রীর সাহায্যে ধরাধরি করে শতজীবকে সেই খালি বাড়ীর মধ্যে পুনরায় নিয়ে এলে নরেন বাবুর নির্দ্দেশ মত অপর শাস্ত্রীরা জনতার মুখের উপর বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করে দিলে। শতজীব তখনও পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তার মুখটা হাঁ করছিল। এ দেখে প্রণব বাবু তাঁর মুখে একটু জল দিতে চাইলেন। নরেন বাবু এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'এ তুমি কি করছো প্রণব? ওকে একবারও হাঁ করতে দিও না, মুখ ও জীবনে যেন আর না খোলে। ও হাঁ করতে পারলেই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এদের দলের প্রত্যেককে এবার হাতে বাগে পেলে আমি গুলী করে হত্যা করবো, হাঁ করার অবসর এদের কাউকে আর আমি দেবো না। প্রয়োজন হলে বলবো এরা আমাদের মারতে এসেছিল তাই এদেরও আমরা মেরেছি। এই দেশের আইন এমন যে তা একমাত্র এমন দেশে সাজে যেখানে অন্ততঃ শতকরা নব্বই জন আইনানুরাগী সুসভ্য ব্যক্তি। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য আইন দিয়ে আর যাই করা যাক না কেন, এই রকম দুর্দ্দান্ত প্রভাবশালী ধনী অপরাধীদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না। এই সুসভ্য আইন-কানুন অনুযায়ী সাক্ষ্য-সাবুত এদেশে কবেই বা পাওয়া গিয়েছে; কয় জন ব্যক্তি এদের হাতে জীবন দিতে এগিয়ে আসবে, জীবনের ভয় সাক্ষীদের কার না আছে? এই সকল অপরাধীকে আদালতে পাঠালে অর্থের জোরে এরা সসম্মানে মুক্তিলাভ করবে, উপরন্তু আমাদের ভাগ্যে নানা কটূক্তি এবং বিরোধী মন্তব্যও জুটতে পারে। ঐ বাইরের রাস্তায় হর্ণের আওয়াজ আসছে, এম্বুলেন্সও বোধ হয় এসে পড়লো, ওঝাজী শতজীবকে হাসপাতালে পৌঁছে দিক, 'শেষ পর্য্যন্ত যেন ও ডাক্তারদের পাশে পাশেই থাকে। এসো তা'হলে, এই জড়পিণ্ডটা নিয়ে বার হয়ে পড়ি—'

ওঝাজী এম্বুলেন্সে করে অচৈতন্য ছিন্নভিন্ন-দেহ শতজীব বাবুকে নিয়ে হাসপাতালের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে গেলে, প্রণব বাবু একটু কিন্তু-কিন্তু করে এগিয়ে এসে নরেন বাবুকে বললেন, 'আমার অবাধ্যতার জন্যে কি আপনি রাগ করলেন, স্যার?' পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রণব বাবুর পিঠের উপর একটা স্নেহসূচক চাপড় দিয়ে নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'আরে না না, কি বলো তুমি? ওঝাজী ভালো জমাদার হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সে এক জন ভালো অফসার তো নয়। এই মামলা সম্পর্কে তোমার মত অফসারের কদর আরও বেশী। তুমি কিন্তু একটুতেই এতো বিচলিত হও কেন? খুকুরাণীর হরণ হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বিহারী বাবুর একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ যে আমরা গ্রহণ করেছি, তা এতো শীঘ্র ভুলে গেলে চলবে কেন? মনে রেখো, খুকুরাণীর মত একজন হিতৈষী বান্ধবীকে এখনও পর্য্যন্ত আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। বুনো ওলের মতন ক্ষেত্রবিশেষে বাঘা তেঁতুলেরও প্রয়োজন আছে। এ সব বাজে কথা আর না ভেবে চলো—থানায় ফিরে চলো, এখানকার যা কিছু কায ছিল তা আমরা শেষ করেছি, চলো।'

[ক্রমশঃ।

"মানুষের মধ্যে বিবেকই হ'ল ঈশ্বরের অস্তিত্ব।"—সুইডেনবর্গ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির চক্রান্ত—

পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রাক্কাল হইতে পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি সম্পর্কে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, তিনি ওয়াশিংটনে যাইয়া জেঃ আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ডুলেসের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর তাহা বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পাকিস্তানে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কথাটা নূতন নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গিলগিটে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার কথা শোনা গিয়াছিল, কিন্তু ইহা লইয়া কি ভারতের কি পাকিস্তানের কি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে কোন আলোচনা হয় নাই? সম্প্রতি পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেলের ওয়াশিংটন যাত্রা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র ৫ই নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় "পাকিস্তান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ

কোরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীদের ভারতীয় সৈনিক বহন ক'রে ব্যাখ্যা-কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছে

প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে একটা গোপনতা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেলের সহিত মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের কি আলোচনা বা কি চুক্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কোন সংবাদ এ দেশে প্রেরিত হয় নাই।

গত ১৫ই নবেম্বর সর্ব্বপ্রথম নেহরুজী সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানে মার্কিণ ঘাঁটি স্থাপনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। অতঃপর ১৬ই নবেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ মেহতা মিঃ ডুলেসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জানান যে, "পাকিস্তানকে সমর-সম্ভার ও সামরিক পরামর্শ দান সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। তবে এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদনের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।" মিঃ ডুলেস মিঃ মেহতাকে এই আশ্বাস দেন যে, এই চুক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক হইবে এবং উহা কোন দেশকে আক্রমণের জন্য নহে, স্বাধীন বিশ্বের রক্ষা-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার জন্য।" এই সংবাদের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর হইতে পি-টি-আইয়ের সংবাদে প্রকাশ, "পাকিস্তানের উচ্চতম মহল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক উপকরণ দিতে রাজী হইলে পাকিস্তান তাহার পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানে ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে দিতে রাজী আছে।" সুতরাং পাকিস্তানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি নির্ম্মাণের কথাটা অলীক কল্পনা নয়। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যকে অস্বীকার করাই রীতি। কাজেই মিঃ ডুলেস যদি আসল কথাকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন তবে বিস্ময়ের বিষয় না হইবারই কথা। তবে কি উদ্দেশ্যে এই পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি, তাহাই আসল কথা।

পাকিস্তানকে মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রহণ করা উহার একটি উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই। সামরিক চুক্তি দ্বারা পাকিস্তান যেমন সামরিক সাহায্য পাইবে, তেমনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাইবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পদ। মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই সন্দেহ নাই। কিন্তু সোভিয়েট পত্রিকা 'ইজভেস্তা'র যে প্রবন্ধটি 'টাস নিউজ এজেন্সী' গত ১৭ই নবেম্বর প্রচার করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বলা হইয়াছে: "The Western and Eastern parts of Pakistan are located on the flanks of India and, in the opinion of the American military leaders, could grip it in pincers, in case of necessity." অর্থাৎ 'পশ্চিম ও

পূর্ব্ব-পাকিস্তান ভারতের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। মার্কিণ সমর-নেতাদের অভিমত এই যে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে দুই দিক হইতেই ভারতকে চাপিয়া ধরা চলিবে।' 'ইজভেস্তা'র এই বক্তব্য যে দুশ্চিন্তাজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আবার বারমুডা—

গত ১০ই নবেম্বর (১৯৫৩) সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ জোসেফ লেনিয়েল ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বারমুডায় এক বৈঠকে সম্মিলিত হইবেন। গত জুলাই মাসে (১৯৫৩) বৃহৎ শক্তিত্রয়ের প্রধানদের যে-সম্মেলন বারমুডায় হাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের অসুস্থতার জন্য যে-সম্মেলন পরিত্যক্ত হয়, ডিসেম্বর মাসে বারমুডায় যে সেই সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি জুলাই মাসে যে-বারমুডা সম্মেলন হয় নাই এবং ডিসেম্বর মাসে যে-বারমুডা সম্মেলন হইবে, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই এ কথা বলা চলে না। এই পার্থক্যটা বুঝিতে হইলে না-হওয়া বারমুডা সম্মেলন এবং ভাবী বারমুডা সম্মেলনের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাবলীর কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১১ই মে (১৯৫৩) কমন্স সভায় চার্চ্চিল অবিলম্বে প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চস্তরে সম্মেলন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বারমুডায় বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের প্রধানদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলন আহূত হওয়ার পর স্যার উইনষ্টনের অসুস্থ হওয়াটা বিস্ময়কর বলিয়া মনে করার কারণ আছে। কারণ, তাঁহার অসুস্থতাকে উপলক্ষ করিয়া বারমুডা সম্মেলন বাতিল করা হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে ১০ই জুলাই ওয়াশিংটনে আরম্ভ হয় বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলন। এই সম্মেলন শেষ হয় ১৪ই জুলাই। এই সম্মেলনে বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ ইডেনের স্থলে প্রতিনিধিত্ব করেন লর্ড সেলিসব্যারি। তিনি প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সমস্ত নীতিই নির্ব্বিচারে মানিয়া লন এবং জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর মাসে এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়াকে যে-সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয় তাহা বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের উচ্চস্তরে সম্মেলন নয়, উহা শুধু বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন। তথাপি রাশিয়া সর্ত্তাধীনে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। রাশিয়া জার্ম্মাণী সম্পর্কে আলোচনা করিতে রাজী হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সমাধানের জন্য আলোচনাও ঐ সম্মেলনের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করে। রাশিয়া আরও দাবী করে যে, এই সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট চীনের যোগদান করা একান্ত প্রয়োজন এবং অন্য রাজ্যে বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ করাও সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু হইতে হইবে। এইগুলির একটিও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ইহার পরে আসিল সুপ্রীম সোভিয়েটে মঃ ম্যালেনকভের বক্তৃতা।

মঃ ম্যালেনকভ ৮ই আগষ্ট সুপ্রীম সোভিয়েটে যে-বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি জার্ম্মাণীকে নিউট্রেলাইজড (neutralized) করিবার দাবী করেন এবং সোভিয়েট রাশিয়াও হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিয়াছে, এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন। ফলে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদানের জন্ম রাশিয়াকে যে আমন্ত্রণ করা হয় তাহার উপরেই যেন হাইড্রোজেন বোমা বর্ষিত হইল। অতঃপর ১৬ই আগষ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্ম রাশিয়া এক নূতন প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে ছয় মাসের মধ্যে জার্ম্মাণী সম্পর্কে শান্তি-সম্মেলন আহ্বান করিবার এবং ইতিমধ্যে অস্থায়ী নিখিল জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং সমগ্র জার্ম্মাণীতে স্বাধীন নির্ব্বাচন হওয়ার দাবী করা হয়। ইহার কয়েক দিন পরেই ২০শে আগষ্ট (১৯৫৩) রাশিয়া ঘোষণা করে যে, সে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার উক্ত প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) তারিখে অনুষ্ঠিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ এডেন্আয়ুরের জয়লাভের মধ্যে কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা খুব সহজ নয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করণ এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ কর্ত্তৃক রাশিয়ার উপর চাপ প্রদানই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের উপায়, ডাঃ এডেন্আয়ুর এই নীতির সমর্থক। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার এই নীতিই জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সমগ্র জার্ম্মাণী পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগদান করিবে, রাশিয়ার পক্ষে ইহা সমর্থন করা সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্ম রাশিয়ার নূতন প্রস্তাবের পর ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট আর একখানি আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করে। ঐ পত্রে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৫ই অক্টোবর সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো সহরে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদানের জন্ম রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হয়। রাশিয়া এই আমন্ত্রণ-পত্রের যে উত্তর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদান করে সে-সম্বন্ধে মাসিক বসুমতীর আশ্বিন সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। রাশিয়ার উত্তর পাওয়ার পর অক্টোবর মাসের (১৯৫৩) তৃতীয় সপ্তাহে লণ্ডনে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের পররাষ্ট্র-সচিবগণ এক বৈঠকে সম্মিলিত হন। এই সম্মেলনের পর ১৮ই অক্টোবর যে আর একখানি পত্র তাঁহারা রাশিয়াকে দিয়াছেন, মাসিক বসুমতীর উক্ত সংখ্যায় তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে আশ্বাস দেওয়া এবং রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার কথাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের ১৮ই অক্টোবরের পত্রের উত্তর রাশিয়া ৩রা নবেম্বর (১৯৫৩) প্রদান করে। রাশিয়ার এই উত্তর পাওয়ার পর ১০ই নবেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে বারমুডায় পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের প্রধানদের আলোচনা-বৈঠক হইবে। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ওয়াশিংটন হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাশিয়ার মনোভাবের আলোকে জার্ম্মাণী সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী নীতি নির্দ্ধারণ করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সুতরাং আসন্ন বারমুডা সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রাশিয়ার শেষ উত্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, রাশিয়ার শেষ উত্তরই যে এই সম্মেলনের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গকে রাশিয়া কোনরূপ সুবিধা (concession) দিতে অস্বীকার করাই বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের প্রধানদের এই সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে।

পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের ১৮ই অক্টোবরের পত্রে ৯ই নবেম্বর লুগানোতে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে রাশিয়াকে যোগদানের আমন্ত্রণ করা হয়। এই আমন্ত্রণের উত্তরে রাশিয়া জানিতে চাহিয়াছে যে, ইউরোপীয় বাহিনী সংক্রান্ত চুক্তি এবং বন-চুক্তি কার্য্যকরী করিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অভিপ্রায় আছে কিনা এবং রাশিয়া স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছে যে, ইউরোপীয় বাহিনী সংক্রান্ত চুক্তি যদি অনুমোদন করা হয়, তাহা হইলে পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলন হওয়ার কোন সার্থকতা নাই। রাশিয়া ইহাও জানাইয়াছে যে, এই দুইটি চুক্তি অনুমোদিত হইলে যুক্তরাজ্যরূপে জার্ম্মাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। জার্ম্মাণী সম্পর্কে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন রাশিয়ার উত্তরে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ম শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন। দ্বিতীয়তঃ, অস্থায়ী নিখিল জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং সমগ্র জার্ম্মাণীতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণীর ঘাড়ে যে অর্থ নৈতিক এবং আর্থিক বোঝা চাপিয়াছে তাহা হ্রাস করা সম্বন্ধে বিবেচনা। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে এই তিনটি বিষয় আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, ইহাই রাশিয়ার দাবী। রাশিয়ার উত্তরে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ চলিতেছে তাহা দূর করা চীনের পিপলস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্কের

সুদানে গণভোট কমিশনে একজন বাঙালী। শ্রীসুকুমার সেন ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। ছবিতে শ্রীযুত সেন (প্রথম) ও অন্যান্য সদস্যদের দেখা যাচ্ছে।

মীমাংসা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার নায্য আসন দেওয়ার উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে। রাশিয়া তাহার এই উত্তরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং সমগ্র ভাবে পৃথিবীর সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্ত বৃহৎ শক্তিপঞ্চকের সম্মেলনের দাবীও পুনরায় উত্থাপন করিয়াছে। কোরিয়া সম্পর্কে রাশিয়া দাবী করিয়াছে যে, কোরিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্ত কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে নিরপেক্ষ জাতির যোগদানের প্রয়োজনীয়তায় উপর রাশিয়া বিশেষ জোর দিয়াছে। জার্ম্মাণ সামরিকবাদের পুনরভ্যুত্থানের বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া উহা নিরোধের জন্ত রাশিয়ার সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পাদিত চুক্তির কথাও উক্ত উত্তর-পত্রে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার উক্ত উত্তর-পত্রে রাশিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে পশ্চিমী শক্তির সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ এবং ইউরোপ এবং নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির উপর বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার জন্ত চাপ দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এইরূপ অবস্থা রাশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার এই উত্তরে স্পেন, গ্রীস ও ইরাণের কথা এবং নূতন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাশিয়ার উত্তর অত্যন্ত সরল এবং সুস্পষ্ট। উহার মধ্যে কোন কূটনৈতিক প্যাঁচ নাই। রাশিয়া এইরূপ স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে সব কথা বলায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে যে উহা ভাল লাগিবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। রাশিয়ার উত্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তো একরূপ ক্ষেপিয়াই গিয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "রাশিয়ার এই পত্রে একত্রে সম্মিলিত হইবার কোন অভিপ্রায় দেখা যায় না, যত বেশী সম্ভব বিঘ্ন সৃষ্টি করাই তাহার অভিপ্রায়।" বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন উহাকে 'ব্যাপক ও গ্রহণের অযোগ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ সকল সর্ত্ত যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে এবং জার্ম্মাণীর ঐক্য সাধন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।" এই প্রসঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবের ৩৬শ বার্ষিকী উপলক্ষে রুশ দেশরক্ষা মন্ত্রী মঃ বুলগানিন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মঃ ভোরোশিলভ কি বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। মঃ বুলগানিন বলিয়াছেন, "মার্কিণ ঘাঁটিগুলির ক্রমবিস্তৃতির সংবাদ ক্রমাগতই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হইতে হইয়াছে।" মঃ ভোরোশিলভ বলিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পিপলস্ রিপাবলিক-গুলিতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্য্য চালাইবার জন্ত প্রকাশ্যেই কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিতেছে।" এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে, উক্ত পত্রে চতুঃশক্তি বৈঠকে যোগদানের সর্ত্ত হিসাবে রাশিয়া উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি এবং ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি বাতিল করিয়া দিবার দাবী করিয়াছে। ঐগুলি বাতিল করিয়া দিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা যদি মিঃ ইডেন করেন, তাহা হইলে ঐগুলির অস্তিত্ব এবং রাশিয়ার চারিদিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির বিদ্যমানতা রাশিয়া তাহার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিবে না কেন? মিঃ ইডেন অবশ্য বলিতে পারেন যে, রাশিয়াকে

আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। কিন্তু রাশিয়ার যে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় আছে তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষার উপায়-বিহীন করিয়া তাহার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনাক্রমণ-চুক্তি করিবার মহৎ অভিপ্রায়ে রাশিয়া নিশ্চিন্ত হইবে কিরূপে? এই জন্যই রাশিয়া উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি এবং ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি বাতিল করিয়া দিবার দাবী করিয়াছে। রাশিয়ার উত্তরে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র জার্ম্মাণীকে পশ্চিমী রাষ্ট্র-গোষ্ঠীতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বারমুডায় সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। অখণ্ড জার্ম্মাণীকে যখন পাওয়া যাইবে না, তখন পশ্চিম-জার্ম্মাণী দ্বারাই অখণ্ড জার্ম্মাণীর অভাব পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে সশস্ত্র করিতে ফ্রান্সের আপত্তি আছে। ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা দ্বারা ফ্রান্সের আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। ডিফেন্স কমিউনিটি চুক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র অনুমোদনের জন্য এই সম্মেলনে ফ্রান্সের উপর যে যথেষ্ট চাপ দেওয়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের একাই মঃ ম্যালেনকভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার অভিপ্রায়ের অকাল-মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহা অবশ্য ঠিক বুঝা যাইতেছে না। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ প্রশমনের জন্য স্যার উইনষ্টন যদি প্রত্যক্ষ ভাবে মস্কোর সহিত আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স তাহাতে বাধা দিবে না, এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বারমুডা সম্মেলনের পূর্ব্বে তাঁহার মস্কো যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সম্মেলনের পরে সম্ভাবনা দেখা দিবে কি না সে-সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। স্যার উইনষ্টনের বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা যতই বলা হউক না কেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষেও মস্কো যাওয়া সম্ভব নহে। এই সম্মেলনে মঃ ম্যালেনকভ এবং মিঃ মাও সে-তুং-এর
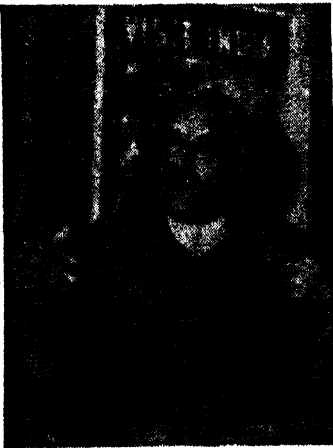
কোরিয়ায় ভারতীয় প্রতিনিধি জেনারেল থিমায়া।

সহিত আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে কিনা, তাহাও অনুমান করা অসম্ভব। তবে এই সম্মেলনে জার্ম্মাণীর প্রশ্ন ছাড়াও আন্তর্জ্জাতিক অন্যান্য সকল সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা হইবে সে কথা নিঃসন্দেহেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠী সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নীতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাও বারমুডা সম্মেলনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে যে-সকল বিষয় লইয়া মতভেদ হইয়াছে তন্মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন দানের প্রশ্ন অন্যতম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনের প্রারম্ভেই এই মতভেদ পরিস্ফুট দেখা গিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন দানের প্রশ্নটা এক বৎসরের জন্য মুলতুবী রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন এই প্রশ্নটাকে আগামী বৎসরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তিন মাস কাল মুলতুবী রাখিতে রাজী হয়। সাধারণ পরিষদ বৃটেনের প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আগামী জানুয়ারী মাসে (১৯৫৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্রশ্নটি আবার উত্থিত হইবে। সুতরাং ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণের প্রশ্নটা বারমুডা সম্মেলনে জরুরী বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু বৃটেন যে আগামী বৎসরে কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণে রাজী হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, এ সম্পর্কে কোন কথা উঠিলেই বৃটেন অনেক রকম সর্ত্তের উল্লেখ করিয়া প্রশ্নটা ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন যে, স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলই এই প্রশ্নটি বারমুডা সম্মেলনে উত্থাপন করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসারেই যে কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত ১১ই মে (১৯৫৩) স্যার উইনষ্টন রাশিয়া সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে একটা নীতি গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিপ্রায়ের যে সমাধি রচিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে অনেকের মনেই কোন সন্দেহ নাই। উহার মূলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপ রহিয়াছে, ইহাও মনে করা স্বাভাবিক। মারগেটে টোরীদলের বার্ষিক সম্মেলনে স্যার উইনষ্টন এবং মিঃ ইডেন যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে টোরী গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র-নীতি যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধামাধরা নীতি, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন শ্রমিকদলীয় সমালোচক তাঁহাদের ঐ বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'টোরী পররাষ্ট্র-নীতি ফুল্টনের ধারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে' এবং 'বৃটেন স্বাধীনতা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র উপগ্রহের পদবীতে ফিরিয়া গিয়াছে।'

বারমুডা সম্মেলনের ফলে আন্তর্জ্জাতিক ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার আশা করিবার মত কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তীব্রতা হ্রাসের জন্য প্রথম প্রয়োজন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে তাহার প্রাপ্য আসন দান। ইহার ফলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হইয়া যাইবে। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ মলোটভ গত ১৩ই নভেম্বর মস্কোতে এক সাংবাদিক

সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য যে সকল সম্মেলন হইবে তাহাতে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করিতে দেওয়া হইলে রাশিয়া সেই সকল সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে পঞ্চশক্তি সম্মেলনে যোগ দিতে দিলেই বোঝা যাইবে যে শান্তির পথে প্রকৃতই পাদক্ষেপ করা হইল। পঞ্চশক্তির বৈঠকে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে মার্কিণ-নীতি দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে। বৃটেন এবং ফ্রান্স তাহাই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবে।

ফিলিপাইনে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন—

গত ১০ই নভেম্বর (১৯৫৩) ফিলিপাইনে যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে বিরোধী দল নেশন্যালিষ্টাস-ডেমোক্র্যাটিক কোয়ালিশন পার্টির প্রার্থী সেনর র‍্যামন ম্যাগসেস, সেনর এল্‌পিডিও কুইরিনোকে পরাজিত করিয়া প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফিলিপাইন রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেণ্ট মেনুয়েল রোক্সাসের মৃত্যুর পর সেনর কুইরিনো সাড়ে পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই নির্ব্বাচনে তাঁহার পরাজয় এবং সেনর ম্যাগসেসের জয়ে ফিলিপাইনের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি এই নির্ব্বাচনে ম্যাগসেসের জয়লাভের স্বরূপটিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। ফিলিপাইন এশিয়ার একটি দেশ। এই দেশটি স্বাধীন রিপাবলিক হইলেও কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ। ফিলিপাইনের অতীত ইতিহাস, তাহার স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফিলিপাইনের শাসনতন্ত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে রচিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ন্যায় ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্টও গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

মিঃ ম্যাগসেস এক সময়ে লিবারেল দলে ছিলেন এবং ফিলিপাইনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে ইস্তাফা দেওয়ার পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "Merely killing dissidents will not solve the Communist problem. Its solution lies in the correction of social evils and injustice and in giving the people a decent Government, free from dishonesty and graft." অর্থাৎ 'বিরোধীদিগকে শুধু হত্যা করিলেই কম্যুনিষ্ট সমস্যার সমাধান হইবে না। সামাজিক দোষ-ত্রুটি এবং অবিচারের সংশোধন করিয়া এবং জনগণকে অসাধুতা এবং দুর্নীতি হইতে মুক্ত সুশাসন প্রদান করিয়াই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায়।' বস্তুতঃ কুইরিনো এবং তাঁহার লিবারেল দলের শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি এত ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে, উহার সম্মুখে চীনে কুয়োমিণ্টাং শাসনের দুর্নীতিও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময় জাপ-প্রতিরোধ কার্য্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া মিঃ ম্যাগসেস বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কুইরিনো গবর্ণমেণ্টে থাকিয়া হুকবালাহাপ আন্দোলন

মনেও তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সততার উপরেও লোকের গভীর আস্থা আছে বলিয়া প্রকাশ।

লিবারেল দলের শাসন-ব্যবস্থায় প্রবল দুর্নীতি প্রবেশ ফলে জনসাধারণের মনে সৃষ্ট হইয়াছিল গভীর অসন্তোষ। এই অসন্তোষ যে সেনর ম্যাগসেসের জয়লাভে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল, এ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এদিকে কুইরিনোর হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকার জন্য তিনিও নির্ব্বাচনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। নির্ব্বাচন উপলক্ষে হাঙ্গামাও বড় কম হয় নাই। ম্যাগসেস জেনারেল রুমোলোর সমর্থনও পাইয়াছিলেন। লিবারেল পার্টি জেঃ রুমোলোর দাবী উপেক্ষা করিয়া প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কুইরিনোকে প্রার্থী মনোনীত করায় তিনি দল ত্যাগ করেন। ম্যাগসেসের জয়লাভের প্রধান কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন। কুইরিনো পূর্ব্বেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারানো তাঁহার পরাজয়ের প্রধান কারণ, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না।

পরলোকে ইবন সাউদ—

সৌদি আরবের রাজা ইবন সাউদ গত ৯ই নবেম্বর ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুরা নাম আবদুল আজিজ আবদুর রহমান এল ফৈজল। তাঁহার মৃত্যুতে মধ্য-প্রাচীর আরব রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা মনে করিবার অবশ্য কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনকাহিনী যে একাধিক সহস্র আরব্য রজনীর গল্পের মতই চমকপ্রদ, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। মধ্য-প্রাচীর বর্ত্তমান আরব রাষ্ট্রগুলির আকার গঠনে বৃটিশের ন্যায় তাঁহার প্রভাবও বড় কম ছিল না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজা ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়াহবী সাম্রাজ্যের তিনিই স্রষ্টা। তাঁহার অভ্যুত্থানকে কতকটা নেপোলিয়ানের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে। আরবের তৈল-রাজা নামেও তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা আমীর আবদুর রহমান ছিলেন নেজদের রাজা আমীর ফৈজলের চারি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমীর ফৈজলের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের মধ্যে বিবাদের ফলে সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। উহার একমাত্র ফল হইল এই যে, ১৮৭৫ সালে তুরস্ক হাসা দখল করিয়া লয় এবং ইবন রসিদ ১৮৯১ সালে রিয়াধ অধিকার করেন। এই রিয়াধেই ১৮৮০ সালে ইবন সাউদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আমীর আবদুর রহমান পরিবারবর্গ সহ প্রথমে বাহরিনে চলিয়া যান এবং পরে কিউওয়াইটে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯০০ সালে তিনি রিয়াধ দখলের জন্য এক আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। আমীর আবদুর রহমান যাহা পারেন নাই, পুত্র আবদুল আজিজ শুধু তাহাই সুসম্পন্ন করেন নাই, আরবের বৃহত্তর অংশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার মত স্থানও আমরা পাইব না।

১৯০১ সালে মাত্র দুই শত সৈন্য লইয়া তাঁহার অভিযান আরম্ভ হয়। ১৯০২ সালে মাত্র ১৫ জন সৈন্য লইয়া যে-কৌশলে তিনি রিয়াধ দখল করিয়া নিজেকে নেজদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা চমকপ্রদ। ১৯০৬ সালে ইবন রসিদের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে ওয়াহবী রাজ্যের বিপদ যখন কাটিয়া গেল তখন তিনি বেদুইন সমস্যা সমাধানে মন দিলেন। আবদুল আজিজ বুঝিয়াছিলেন যে, বেদুইনদের ধর্ম্মোন্মত্ততাকে সুসংহত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ সামরিক শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে তাহাদের যাযাবর অবস্থা দূর করিয়া তাহাদিগকে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মরুভূমির যে-সকল স্থানে জল আছে সেই সকল স্থানে বেদুইনদের উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। প্রত্যেকটি বেদুইন উপনিবেশকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর এক-একটি ডিভিশন মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রথম বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বৃটেনের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু স্বনামধন্য লরেন্সের চেষ্টায় মক্কায় প্রধান শেরিফ রাজা হোসেনের বৃটিশের সহিত বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে থাকায় তিনি উদ্বিগ্ন না হইয়া পারেন নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর ধরিয়াই সমগ্র আরবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লইয়া আবদুল আজিজ (ইবন সাউদ) এবং রাজা হোসেনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। অনেক সময় তিনি বৃটিশের অসন্তুষ্টিকেও উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করেন নাই। খুরমা মরুদ্যান লইয়া ঠিক এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল। বৃটিশের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া তিনি উহা দখল করিয়া বসেন। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও সিদ্ধান্ত না করিয়া পারেন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অবস্থাকে মানিয়া লওয়ার মত বুদ্ধি ইবন সাউদেরও ছিল।

ইবন সাউদ সমগ্র আরবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন। বৃটিশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইহাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বৃটিশ মক্কার শেরিফ হোসেনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন তিনিই আরবের রাজা হইবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই হইল না। অবশেষে বৃটেন যখন শেরিফ হোসেন আবদুল্লা এবং ফৈজলকে যথাক্রমে ট্রান্সজর্ডান এবং ইরাকের রাজা করিল, তখন ইবন সাউদ নিরাশ হইলেও বুদ্ধিমানের মত উহা মানিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। ইহার পূর্ব্বেই তিনি হেজ্জাজ দখল করিয়াছিলেন। বৃটেন ইবন সাউদ ও শেরিফ হোসেনের মধ্যে একটা মিটমাট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। হোসেন দাবী করিয়াছিলেন, ১৯১৫ সালের সীমানাই সৌদি আরবের সীমানা হইবে। ফলে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং ওয়াহবী বাহিনী ১৯২৪ সালের অক্টোবরে মক্কা দখল করিয়া ডিসেম্বর মাসে জেদ্দা অবরোধ করে। ১৯২৫ সালের মধ্যে সমগ্র হেজ্জাজ রাজ্য ইবন সাউদের দখলে আসে। ২৩শে ডিসেম্বর মদিনা তাঁহার দখলে আসে। ঐ দিনই জেদ্দাও আত্মসমর্পণ করে। ১৯২৬ সালের ৮ই জানুয়ারী মক্কার মসজিদ হইতে তিনি নিজেকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ভাবে ইবন সাউদ সৌদি আরব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের আর্থিক উন্নতির সূচনা হয় মার্কিণ তৈল কোম্পানীকে সৌদি আরবের তৈলখনি ইজারা দেওয়ার পর। মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাজ্যগুলির মধ্যে ইবন সাউদ সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

ইবন সাউদ স্বৈরশাসক রাজা ছিলেন। তিনি দেশ শাসন করিতেন দৃঢ়হস্তে। প্রজার মনে ভীতি সৃষ্টি করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রায় ১৫০টি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৭টি পুত্র এবং ১২টি কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর সাউদ ছিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি। ইবন সাউদের মৃত্যুর পর আমীর সাউদকেই সৌদি আরবের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অতঃপর হাসামী-বংশীয়দের সহিত সৌদি আরবের শত্রুতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে ইহা মনে করা কঠিন। সৌদি আরবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি। ইবন সাউদ আরব লীগের সহিত মনে-প্রাণে সহযোগিতা করেন নাই। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠাও তাঁহার সমর্থন লাভ করে নাই। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে বিদেশী মূলধনের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ট্রাষ্টিশিপ কমিটি গত ১২ই নবেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জন্য একটি নূতন কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ-আফ্রিকার ম্যাণ্ডেটারী শাসনাধীন। প্রাক্তন জাতিসঙ্ঘ (The League of Nations) ম্যাণ্ডেটরী রাজ্যগুলির জন্য একটি ম্যাণ্ডেটস্ কমিশন গঠন করিয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এই কমিশনের নিকট দাখিল করিয়া আসিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের বিলোপের পর নবগঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকটেই এই রিপোর্ট দাখিল করা হইতেছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সাল হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকা এই রিপোর্ট দেওয়া বন্ধ করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তি এই যে, জাতিসঙ্ঘ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসঙ্ঘের উত্তরাধিকারী নহে। তাহার এই যুক্তিটা আসলে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ের উপর একটা আবরণ মাত্র। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের অভিমতও গ্রহণ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা যে-রাজ্যের উপর ম্যাণ্ডেটারী ক্ষমতা পাইয়াছে উহার আন্তর্জাতিক ষ্টেটাসের পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার তাহার একার নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে মতৈক্যের দ্বারাই শুধু এই ষ্টেটাসের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। জাতিসঙ্ঘের ম্যাণ্ডেট অনুযায়ী দক্ষিণ-আফ্রিকা যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এখনও সে দায়িত্ব তাহার রহিয়াছে এবং এই দায়িত্ব পালন করিতে সে বাধ্য।

দক্ষিণ-আফ্রিকা আন্তর্জাতিক আদালতের এই অভিমত এবং ট্রাষ্টিশিপ কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবকে আমল দিবে কি না তাহা বলা কঠিন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের চাপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে ভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে আস্কারা দিয়া আসিতেছে তাহাতে এই প্রস্তাবের ভাগ্য সম্পর্কে ভরসা করা কঠিন। দক্ষিণ-আফ্রিকার

পার্লামেণ্টে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি গ্রহণ করার সঙ্কল্পের কথা দক্ষিণ-আফ্রিকা ১৯৪৬ সালে এবং ১৯৪৭ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইলে ম্যাণ্ডেটের বিধান লঙ্ঘন করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাব দ্বারাই দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে কুক্ষিগত করিবার ক্ষমতা পরোক্ষ ভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে একবার এবং ১৯৫০ সালে আর একবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রাশিয়া এই মর্ম্মে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, উল্লিখিত কার্য্য দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা সনদের নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার এই অভিযোগ অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জন্য নয় জন সদস্যের কমিটি গঠিত হইলেও এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা উহার নিকট যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিলেও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার কুক্ষিগত করার যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতিকার হইবে না।

ত্রিয়েস্তে হাঙ্গামা—

নবেম্বর মাসের (১৯৫৩) প্রথম দিকে ত্রিয়েস্তে তিন দিনব্যাপী যে-হাঙ্গামা হইয়া গেল এবং রোমে ও ইটালীর অন্যান্য সহরে যে-বিক্ষোভ প্রদর্শন-করা হইল, তাহার মূল দায়িত্ব যে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হাঙ্গামার প্রথম উপলক্ষ সৃষ্টি হয় ৩রা নবেম্বর। মিত্রপক্ষীয় নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ত্রিয়েস্তের ইটালীয় মেয়র টাউন হলের উপর ইটালীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনটিতে ইটালী অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে ত্রিয়েস্ত দখল করে। পুলিশ উক্ত পতাকা অপসারণ করিয়া উহা বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ৪ঠা নবেম্বর ক্রুদ্ধ ইটালীয়রা পতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলে পুলিশ বাধা দেয়। উহা হইতেই হাঙ্গামার উৎপত্তি হয়। ত্রিয়েস্তের হাঙ্গামায় এবং রোমের বিক্ষোভ প্রদর্শনে বৃটিশ-বিরোধী ভাবটাই বিশেষ ভাবে প্রবল হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু মার্কিণ-বিরোধী মনোভাবের একান্তই অভাব ছিল।

অক্টোবর মাসের (১৯৫৩) তৃতীয় সপ্তাহে লণ্ডনে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্য পঞ্চশক্তির বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিবার পর এই হাঙ্গামা তাৎপর্য্যহীন নহে। এই বৈঠক আহ্বানের পূর্ব্বেই যাহাতে ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চল ইটালীর হাতে অর্পণ করা হয় সেই জন্যই এই হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

শান্তির নোবেল পুরস্কার—

এবার শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিণ সেনানায়ক মিঃ জর্জ্জ মার্শাল এবং সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল। তাঁহারা কেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তাহা সত্যই এক দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! সাহিত্য মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে স্যার উইনষ্টনের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কি যোগ্যতা আছে? তিনি সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এ কথা কেউই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু সে-সাহিত্যে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে আছে সাম্রাজ্যবাদী আত্মম্ভরিতাপ্রসূত মিথ্যা গৌরব। নোবেল কমিটি উহাকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবশ্য ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বিবেচনা করিলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু হয়ত নাই, কিন্তু স্যার উইনষ্টনকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দিয়া নোবেল কমিটি সাহিত্যকে উপহাস করিয়াছেন মাত্র।

শান্তির জন্য মিঃ জর্জ্জ মার্শাল কি করিয়াছেন যে, তিনি শান্তির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন? তিনি এক জন মার্কিণ সেনানায়ক, ইহা ব্যতীত শান্তির জন্য তাঁহার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আর কোন যোগ্যতা দেখা যায় না। এই যুক্তি অনুসারে জেনারেল ম্যাক আর্থারের বরং নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। তবে ইউরোপের ব্যাপারে জেনারেল ম্যাক আর্থারের কোন দান নাই, ইহাই হয়ত তাঁহার নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার কারণ। অথবা হয়ত আগামী বৎসর তাঁহাকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাহা হউক, মিঃ মার্শাল কেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উপেক্ষার বিষয় নহে।

মার্কিণ সেনানায়ক মিঃ জর্জ্জ মার্শাল দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে মিত্রপক্ষকে বিজয়ী করিতে সাহায্য অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহায্য না করিলেই মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিত না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার মত আরও বহু সেনানায়ক দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে মিত্রপক্ষকে বিজয়ী করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে রাশিয়ার হাতে হিটলার যদি পরাজিত না হইতেন, তাহা হইলে ইউরোপের যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ করা সম্ভব হইত কি না, তাহা বলা কঠিন। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বর্ষিত না হইলে জাপান অত সহজে আত্মসমর্পণ করিত না। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর শান্তি-প্রতিষ্ঠার সময় যখন আসিল তখন মিঃ মার্শাল কি ভাবে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন? তিনি চীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। চিয়াং কাইশেককে রক্ষা করা ব্যতীত শান্তির জন্য তাঁহার আর কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনার জন্য তাঁহাকে শান্তির নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক হইতে মার্কিণ উপনিবেশে পরিণত করিয়া উহাকে রাশিয়ার সহিত ভাবী যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত করাই যে মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল তাহা কাহারও অজানা নয়। প্রকৃতপক্ষে মার্শাল পরিকল্পনা ট্রুম্যান ডক্ট্রিনের উপর 'সুগার-কোটিং' মাত্র। মিঃ মার্শালের এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপ আজ মার্কিণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। গঠিত হইতে চলিয়াছে ইউরোপীয় রক্ষাবাহিনী। মার্শাল পরিকল্পনা ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের ভিত্তি গঠন করিয়াছে। ইহাই মিঃ মার্শালের শান্তির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা!

মাননীয় বিচারক প্রশান্তবিহারীর বৃথা উপদেশ

"যে সমস্ত সাদা পোষাকে সজ্জিত পুলিস এই আক্রমণ চালাইয়াছে ও গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদিগকে সনাক্ত করা যায় নাই বলিয়া কমিশন যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করা কষ্টকর। কে বা কাহারা মারধর খাইয়াছে অথবা কাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের দাবী জানানো হইলেও, কমিশনের মতে উহা তাহার এক্তিয়ার বহির্ভূত। ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে, কে বা কাহারা প্রহৃত ও গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহা তদন্তের দাবী করা সত্ত্বেও কমিশন উহা অনুসন্ধানের কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই।" —হিন্দু (মাদ্রাজ)।

"সংবাদপত্র তাহার কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য শ্রবণে সর্বদা প্রস্তুত থাকিলেও কমিশন এই বিষয়ে যে দীর্ঘ হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অবান্তর বলিয়া মনে হয়।" —ষ্টেটস্‌ম্যান।

পাকিস্তানের আত্মহত্যা

"পাকিস্তানের জনসাধারণের একটা বড় অংশ যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে পাকিস্তানের গাঁটছড়া বাঁধা পছন্দ করেন না—পূর্ব্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রস্তাবে শুধু যে আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করা হইয়াছে তাহাই নয়, পাকিস্তানের কমনওয়েলথ ত্যাগের দাবীও উঠিয়াছে। পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য যে সব বিরোধী দল আছে তাহারাও এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সহিত একমত বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তান আমেরিকা বা বৃটেনের যুদ্ধ-ঘাঁটি হইলে পাকিস্তানের লোকের যে সর্ব্বনাশ হইবে, একথা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রতিক বিবৃতিও নিশ্চয় পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের নূতন করিয়া চিন্তার খোরাক যোগাইবে। কিন্তু লীগের পাণ্ডাদের ইহাতে আক্কেল হইবে কি? অন্ধ ভারত-বিদ্বেষে তাঁহারা আজ যে পথে চলিতে চাহিতেছেন—তাহাতে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত নিজেদেরই কবর খুঁড়িবেন সন্দেহ নাই।" —দৈনিক বসুমতী।

সংস্কৃত শিক্ষা কর

"সংস্কৃত ভাষা যাহাতে স্কুলের শিক্ষার অবশ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়, তজ্জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন দেখা দিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে ভারতীয় লোকসভার উপাধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার এ বিষয়ে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর দেখিতেছি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৈলাসনাথ কাটজুর নিকট পুনরায় এই দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুত কাটজু সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতার সমর্থনে আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মতে, উহা কেবল স্কুলের আবশ্যিক পাঠ্যরূপেই নহে, সর্ব্বদেশীয় ভাষারূপে প্রচলিত হইবার যোগ্য। ভারতীয় লোকসভার উপাধ্যক্ষ মহাশয় এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষার সমর্থনে যেরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ উদ্যোগী হইয়া যদি সংস্কৃত ভাষাকে সেই ভাবে সমর্থন করেন এবং যাহাতে উহা স্কুলে অবশ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হয় তজ্জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সত্যই সাহায্য করা হইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

আলো, আরও আলো

"হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের কতকগুলি লাইনের ট্রেণে রাত্রিতে আলো থাকে না বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাহার উত্তরে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ বলিতে চাহিতেছেন যে, ব্যাপক ভাবে কিছু দিন ধরিয়া বৈদ্যুতিক আলোর নানাবিধ সরঞ্জাম চুরি হইতে থাকিলে, অনন্যোপায় হইয়া কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলেই যাত্রীদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাইতেছে যে, গত ছয় মাসের মধ্যে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭০৯ ফুট বেল্‌টিং চুরি হইয়াছে। ইহার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতিক তার চুরি হইয়াছে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮৬৭ ফুট, যাহার মূল্য ৬১ হাজার টাকা। কেন্ট-কাপলার চুরি হইয়াছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের। সমস্তই রেলের কামরার মধ্য হইতে চুরি হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ চোর ধরিবার এবং চৌর্য্য নিবারণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যাত্রী সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এ কার্যে সাফল্যলাভ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। রেল কর্তৃপক্ষের এই বিজ্ঞপ্তি হইতে বুঝা যাইতেছে অবস্থা কত শোচনীয়! রেলের সম্পত্তি জনসাধারণেরই সম্পত্তি। জনসাধারণের সম্পত্তি যাহারা চুরি করে তাহারা সমাজের ও দেশের শত্রু, অথচ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত চুরি বহু লোকে মিলিয়া না করিলে সম্ভব হয় না। যাত্রী সম্প্রদায়ের এবং স্থানীয় জনগণের একেবারে অজ্ঞাতসারেও এরূপ ঘটনা হইতে পারে না। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, যাত্রী ও জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত পাইকারী হারে অনুষ্ঠিত এই শ্রেণীর অপকর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে না এবং কেবল রেল পুলিশ দ্বারাও এই দুর্নীতি দমন অসম্ভব। অতএব রেল কর্তৃপক্ষের আবেদনে যাত্রীরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই সাড়া দিবেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে। তবে

রেল কর্তৃপক্ষ আপাততঃ আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া পুলিশী ও বেসরকারী সাহায্যে দুর্নীতি দমন ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে ভালো হয়।" —যুগান্তর।

জমিদার-পত্নীর দানসত্র

"কংগ্রেসের নবীন সাধিকা নদীয়ার মহেশপুরের জমিদার-পত্নী শ্রীইলা পাল-চৌধুরী কংগ্রেসের কল্যাণী অধিবেশন তহবিলে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-পতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের হাতে পনের সহস্র মুদ্রা নগদ দক্ষিণা দিয়ে নব-দীক্ষা নিয়েছেন। আর ভোট-যজ্ঞের ইন্ধন যোগানোর জন্য আরো পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বিতরণের সংকল্প করেছেন। অমন ত্যাগব্রতী, দানশীলা মহিলা এ যুগে আর ক'জন দেখা যায়, বলুন তো? এই দেখেই না অতুল্য বাবু, তারক বাবুরা এই মহিলাটিকে নবদ্বীপধামের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনীত করলেন। কিন্তু তাতেই কিনা নদীয়া জেলার একদল কংগ্রেসকর্ম্মী এবং নেতা পর্য্যন্ত বেঁকে বসলেন। এক প্রবীণ কংগ্রেসভক্ত কিনা বেফাঁস বলে দিলেন: "দেশসেবা করতে হলে জমিদারীর মাত্র এক বৎসরের আয় ১ লক্ষ টাকা দিয়ে কৃষ্ণনগরে একটা মাতৃসদন খুলে নারীদের মঙ্গল করুন, দেশবাসীর বিশ্বাস অর্জ্জন করুন। পার্লামেণ্ট তো দেশসেবার একমাত্র স্থান নয়।" কী লজ্জা, কী ঘেন্নার কথা! ওসব কাজ যাঁরা করেন, যাঁরা করতে ভালোবাসেন, তাঁরা এ যুগে আর কংগ্রেসে আসবেন কোন্ দুঃখে, বলুন তো!" —স্বাধীনতা।

বাঙালী আঁতকে ওঠে

"ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে আমরা অনেকেই জানি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়াও কিন্তু তাঁহার সুর পাল্টায় নাই। সংস্কৃতই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত—এ দিনেও তিনি একথা সাহস করিয়াই বলিতেছেন। বাঙ্গালী ইংরাজ-নবীশেরা অনেকেই কিন্তু সংস্কৃত দেখিলেই ভয় পায়। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিতেছে। বাঙ্গালীর পিঠে সব ভারই সহ্য হয়, শুধু সংস্কৃত ভাষা দেখিলেই আঁতকাইয়া ওঠে।" —পল্লীবাসী (কালনা)।

ভারত সরকারের মর্য্যাদাহানি

"আজাদ হিন্দ সরকারের বহু আলোচিত ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে 'হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্' হিসাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এক লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি গত ২৩শে অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবৃতি পাঠ করিলে আজাদ হিন্দ সরকারের ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিত না—কিন্তু ঠিক তাহার দুই দিন পরেই ২৬শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদেবনাথ দাশ পাল্টা এক বিবৃতি দিয়া এমন সব জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং ভারত সরকারের আচরণের উপর এমন গভীর সন্দেহের আরোপ করিয়াছেন, যাহা ভারত সরকারের পক্ষে অবিলম্বেই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। শ্রীদেবনাথ দাশ এই ফাণ্ডের 'কারচুপি' অনুসন্ধানের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের আহ্বান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কমিশনের সম্মুখেই তিনি বহু তথ্য সম্বলিত নজির উপস্থাপিত করিবেন যাহা হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ কর্ত্তৃক প্রচারিত তথ্যকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবে। শ্রীদাশ তাঁহার বিবৃতিতে ভারত সরকারের পেটোয়া 'রামমূর্ত্তি' নামধেয় জনৈক ব্যক্তির উপর এই পবিত্র অর্থ আত্মসাতেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন। অভিযোগ সত্য হইলে মারাত্মক ব্যাপার এবং বর্ত্তমানে এই অভিযোগ আনয়নের পর ইহা পরোক্ষ ভাবে ভারত সরকারের মর্য্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করিতেছে।" —বীরভূমের ডাক।

লক্ষ্ণৌয়ের শিক্ষা

"লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্রেরা দ্বিতীয় বার প্রমাণ করিয়াছে যে যুবশক্তি জাগিতেছে। কলিকাতায় জুলাই মাসে যাহা ঘটিয়াছিল, লক্ষ্ণৌয়ে অক্টোবরে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এখনও বিশ্বাস করেন যে পুলিশ ও মিলিটারী দিয়া তাঁহারা জনমত দাবাইয়া রাখিতে পারিবেন। আধুনিক যুগে এবং ৩৬ কোটি লোকের দেশে ইহা যে সম্ভব নয় একথা তাঁহারা যত দেরীতে বুঝিবেন দেশে অনাবশ্যক অশান্তি ততই স্থায়ী হইবে। ভারতবর্ষে ছাত্র এবং শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষ একমত হইতে পারে না ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা! কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশী মনোভাব অবলম্বন করিলে ছাত্রেরা বিক্ষুব্ধ হইতেই পারে। জহরলাল ধমক দিয়াছেন ছাত্রেরা কথা না শুনিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহা হিটলারী মনোভাব। হিটলারের পরিণতি ইহারও পরিণতি। ইহা গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান মন্ত্রীর কথা নয়। ছাত্রেরা কথা শোনে না ইহাতে ছাত্রদের যতটা দোষ তার চেয়ে বেশী লজ্জা অধ্যাপক ও শিক্ষানিয়ামকদের।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

কোন্ সুখে?

"ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবার পর ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশ সমূহের পুনর্ব্বিন্যাসের জন্য ভারত সরকার এই বৎসরের মধ্যে এক বাউণ্ডারী কমিশন নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পরই সিংভূম হইতে উড়িয়া ও বাংলা ভাষা উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর বিহার সরকার হঠাৎ জনদরদী হইয়া উঠিয়াছেন। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে বিহার সরকারের ভাষা সম্পর্কীয় যে সকল অনাচারের ফলে বিহার সরকার সিংভূমবাসীর আস্থা হারাইয়াছেন তাঁহারা তাহার উপর চুণকাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ধলভূমে বাঙলা ভাষা ও সদর ও সরাইকেলা খরসোঁয়ায় উড়িয়া ভাষা বজায় রাখিবার জন্য কত সদিচ্ছা প্রকাশ করা হইতেছে! অন্য দিকে আবার বিহারের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল এবং বর্ত্তমানে বিহার এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীবলদেও সহায় সিংভূম, মানভূমে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে উড়িষ্যা বা বাঙলার দাবীর যথার্থতা নাই। পাটনার সংবাদপত্রগুলি সানাইএর পোঁ ধরিয়াছে। এক চোখে অনুনয় ও অন্য চোখে ধমক দেওয়া হইতেছে। এমতাবস্থায় সিংভূমের সরকারী কর্ম্মচারিগণ সিংভূমবাসীর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বরবাদ করিবার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুড়ঙ্গ-পথে এ জেলায় হিন্দির ঘাঁটী স্থাপন করিয়া এই এলাকাকে হিন্দিভাষী প্রমাণ করিবার সাধু কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। পটকা থানার হলুদপুকুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের ইনসপেকশন নোট-বুকে গত ২২-৫-৫৩ তারিখে পঞ্চায়েত সুপারভাইসার মহাশয় নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:—

"Most of the books of the Panchayats are written in Bengali language and Bengali scripts.

Minute book of the executive committee is written like their inspite of the S. D. O's instruction and my instruction last time. Account book too have been maintained like this. But in future from to-morrow every book must be maintained in Rastra Bhasa, i. e. in Hindi in Devnagri script, otherwise the department will be moved to take disciplinery action for breach of discipline.

Sd/—J. N. Mishra
Subdivisional Supervisor
Gram Panchayat, Ghatshila

আমরা ইনস্পেক্টর মহোদয়ের ইংরাজী জ্ঞানের বহরের কথা উল্লেখ করিব না। কিন্তু পঞ্চায়েত জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত জনহিতার্থে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। তাহার কাজকর্ম্ম জনসাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই যে পরিচালিত হওয়া উচিত ইহা সামান্য বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কেহ বলিতে পারে। ইহা ছাড়া পঞ্চায়েত আইনে এ কথা কোথাও নাই যে পঞ্চায়েতের খাতাপত্র হিন্দিতেই রাখিতে হইবে। তৎসত্ত্বেও সিংভূমস্থ বিহার সরকারের কর্ম্মচারীদের এই জবরদস্তীর কি কারণ থাকিতে পারে? গণতান্ত্রিক সরকার জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়। সিংভূমের ১৪ লক্ষ অধিবাসীকে হিন্দি শিখাইবার জন্য এত কষ্টে এতদিনে তাহারা যেটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা ভুলাইয়া তাহাদের মূর্খ করিবার চেষ্টা করা কি জনমতের অভিব্যক্তি?" —নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

বেস্ কমাণ্ডারও ঘুষ নেয়?

"মিলিটারী সীমানায় কতিপয় গোয়ালা গরু-মহিষ লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বসবাস করিতেছে। তাহার ফলে রাত্রে প্রায়ই ধানের জমির ক্ষতি হইতেছে। বেস্ কমাণ্ডারকে দরখাস্ত দেওয়ায় (শালডাঙ্গা হইতে) কোন ফল হয় নাই অথচ বেস্ কমাণ্ডার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের সে-স্থান হইতে হটাইয়া দিতে পারেন। গোয়ালারা কতিপয় চাষীকে বলিয়াছে যে, "আমরা বেস্ কমাণ্ডারকে দুধ দিই, এমন কি মহিষ পর্য্যন্ত দিয়াছি। সে আমাদের কোন কথা বলিতে পারে না।" এখন মনে হইতেছে, সত্যই গোয়ালারা ঠিক বলিয়াছে নচেৎ প্রজাগণের রেজেষ্টারী দরখাস্তখানির কোন জবাব বা তাহাদের সেস্থান ত্যাগ সম্বন্ধে কিছুই হইল না কেন? আরও গোয়ালারা মিলিটারী ঘাসারী ডাক করার পর অত্যাচারের সীমা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়টি লক্ষ্য করিলে ভাল হয়।"

—দৃষ্টি (বর্দ্ধমান)।

ভূমি ও পশ্চিমবঙ্গ

"পশ্চিমবঙ্গে প্রতি এক হাজার ৫৭২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা ৩৬৪টি পরিবারের কেবল বসতবাটীর জমিটুকু রহিয়াছে এবং ইহারা মোট জমির মাত্র ১.৮ অংশ ভোগ করিতেছে। কিন্তু অপর দিকে ১৪.৩ জন শতকরা ৬৩৪ জমি দখল করিয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৪২ লক্ষ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ১ কোটি ২১ লক্ষ একর। এই ভয়াবহ সমস্যা ও বৈষম্যের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল মধ্যস্বত্ব লোপ করিয়া খাসমহল চালুর ব্যবস্থা করিতেছেন। জোতদারদের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, কেবল মধ্যস্বত্বের লোপ করিয়া মধ্যস্বত্বের খাস জমিটুকু দখল করিতেছেন। এ ফাঁকি কত দিন চলিবে?" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

রিহার্সাল দিন

"পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলা হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, সেখানকার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের গণসংযোগের কার্যক্রম অনুসারে আপন আপন জেলায় সফর করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই উপলক্ষে তাঁহারা জেলার শ্রমিক আন্দোলন, শিল্পের অবস্থা, অন্যান্য রাজনৈতিক দল-সমূহের শক্তি ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, বেকার সমস্যা, অস্পৃশ্যতা তথা সাম্প্রদায়িকতা ও সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এবং আমরা যত দূর অবগত আছি তাহার সভাপতি, সম্পাদক মহাশয়ও যথারীতি আছেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষ হইতে এইরূপ জেলা সফরের কোন সংবাদ অন্ততঃ আমরা অবগত নহি। ইহা হইতে কী এইরূপ ধরিয়া লইব যে আমাদের এই জেলায় উপরিউক্ত কোন সমস্যাই নাই, তাঁহারা না মনে করেন যে তাঁহারা যেরূপ সুদক্ষ অভিনেতা তাহাতে জনসেবার কথা না ধরিয়াও অন্ততঃ নির্বাচনী-মঞ্চে নামিবার পূর্বে তাঁহাদের রিহার্সালেরও কোন প্রয়োজনই নাই।" —ভারতী (মুর্শিদাবাদ)

করবৃদ্ধিতে বিক্ষোভ

"রামনগর: ৯নং কালীগঞ্জ থানার অধীন পলাশী ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দরিদ্র চাষী ও মধ্যবিত্ত মহল এই ব্যাপারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি এড়িয়াডাঙ্গা গ্রামে এই করবৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি সভা হইয়া গিয়াছে এবং একটি গণসহি-সম্বলিত দরখাস্ত অচিরে বর্দ্ধিত কর-হ্রাসের নিমিত্ত ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

সরকারের প্রচার বিভাগ সমীপে

"সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে Education and welfare services মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার না হওয়ায় চাকুরী-প্রার্থিগণ কোথায় এবং কিরূপে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে তজ্জন্য এখানে-ওখানে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। আশা করি, প্রচার বিভাগ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।" —রাঢ়দীপিকা।

ম্যালেরিয়াকে প্রতিরোধ কর

"পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক বাস করেন ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে। ম্যালেরিয়ার দুরন্ত প্রকোপে পড়িয়া দেশের শতকরা বেশীর ভাগই যখন মৃত্যুপথযাত্রী হয়, তখন ইহার প্রতিকারের বিশেষ প্রয়োজন

হইয়া পড়িয়াছিল, এই ব্যাপক ম্যালেরিয়া নিবারণ জন্য সরকার পূর্ব্ব হইতেই এক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী ভারত সরকার এবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৭৫টি ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মধ্যে ১৬টি বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সংস্থাগুলির প্রতিটি ৩ হইতে ৫ এলাকায় বিভক্ত থাকিবে এবং এক মেডিক্যাল অফিসারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। এলাকাগুলির উপর থাকিবেন এক জন করিয়া ম্যালেরিয়া তত্ত্বাবধায়ক এবং তাঁহার অধীনে ২ হইতে ৪ জন ম্যালেরিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন। পরিদর্শকগণের উপর ২০৩টি দলের ভার অর্পিত হইবে। আবার এই দলগুলি ৬ জন কর্ম্মী ও এক জন মেট লইয়া গঠিত হইবে। এই পরিকল্পনায় বর্ত্তমান বৎসর পশ্চিমবঙ্গের ২১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে এবং ভারত-মার্কিণ তহবিল হইতে এই সময়ে ৪৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া যাইবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ত্তমানে তাহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়। আমাদের এই কাঁথি সহর অঞ্চলে গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়া-নাশক পাম্প হস্তে নবনিযুক্ত সরকারী লোকজন গৃহ-বিশোধন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। দেশের ভীষণাকৃতি ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বিতাড়নে সরকারের এই বিরাট অভিযান কত দূর ফলপ্রসূ হয়, তাহাই দেখিবার বিষয়।"

—নীহার (কাঁথি)।

স্বাধীন ভারতে পুলিশের গুলী হত্যার খতিয়ান

"স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসী শাসকের পুলিশের গুলীতে ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত কত জন নিহত ও কত জন আহত হইয়াছে ও কত জন কারারুদ্ধ হইয়াছে তাহার নিম্নলিখিত খতিয়ান স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গুলী বর্ষিত হইয়াছে—১৯৮২ বার, নিহত হইয়াছে—৩৭৮৪ জন, আহত হইয়াছে—১০,০০০ জন, কারারুদ্ধ হইয়াছে—৫০,০০০ জন। ১৯৫০ সালের পরের হিসাব এখনও জানা যায় নাই।"

—বীরভূমবাণী।

পণ্ডিতজীর কথার মূল্য কাণাকড়ি

পণ্ডিতজীর শাসনাধীনে ভারত আজ সাত বৎসর—তাঁহার কতই আশার বুলি শুনিয়াই আসিয়াছে. দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার সাধারণ নির্ব্বাচনী যজ্ঞের আয়োজনে যখন ভোট প্রাপ্তির আশায় প্রতিশ্রুতির কল্পতরু সাজিয়া কংগ্রেস সভাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যে যে সঙ্কল্প এই প্রকার সভা-সমিতিতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সেই সঙ্কল্পের কতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা দেশবাসিগণকে দিলে তবে লোকে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ তিনিও যেমন বাতাসে খুশি করিবার বুলি সভা-সমিতিতে বিকিরণ করিয়া থাকেন, লোকেও তাহার পরিবর্ত্তে "নেহেরুজী কি জয়! নেহেরুজী জিন্দাবাদ!" প্রভৃতি বাতাসে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া খুশি করিয়া থাকে। তবে তাঁহার শাসনাধীনের এক এক প্রদেশে বেকার সমস্যা যে আংশিক অনেক দীন বেকারের দিন ফিরাইয়া সুদিনের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবিভক্ত ভারতের মন্ত্রী-সংখ্যা কর্ম্মচারী-সংখ্যার সহিত তুলনায় বর্ত্তমান খণ্ডিত ভারতের আমলা-সংখ্যা ও তাহাদের জন্য গৌরীসেনের অর্থব্যয়ের বহর দেখিলে মনে হয়, এই হারে যদি শাসকবর্গের আর তাহাদের পোঁ-ধরাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায় তবে দেশে বেকার সমস্যা সমাধান হইবেই। সত্যিকার বেকার দল অন্নাভাবে দেহত্যাগ করিলে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা না কমিয়া যাইবে কোথায়? পণ্ডিতজীর সভাপতিত্বের আওতায় বর্দ্ধিত কংগ্রেসের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রাজ প্রদেশের ১০ জন বিধান সভার সদস্য কর্ত্তৃক আনীত প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্রষ্টব্য) তাহা চোখ-রাঙানি বা বাক্যের তুবড়ীতে সমাধান হওয়া অসম্ভব। দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেস ও সরকারী আমলা লইয়া খেলা অপেক্ষা কাণাকড়ি লইয়া খেলা ঢের আশাপ্রদ। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হইলে সে সঙ্কল্পের মূল্যও কাণাকড়ির মতই। —জঙ্গীপুর সংবাদ।

ক'লকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌ ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা এমন এক মারাত্মক পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে সরকারকে সারা সহরে কারফু জারী করে জনবিক্ষোভের হাত থেকে শাসন রক্ষার জন্য ব্যূহ রচনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এরূপ হাঙ্গামা ও বিক্ষোভের জন্য কংগ্রেসী মহল থেকে বাংলা দেশের উপর এযাবৎ দোষারোপ করা হ'ত। বাংলা দেশ বোমা-পিস্তলের ঐতিহ্য এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং মনোভাব এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই যখনই কোন ঘটনা ঘটে তখনই মাথা-গরম বাংলা বিক্ষোভ ও হিংসার আশ্রয় নিয়ে এক অরাজকতার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও বাংলায় যে পর-পর বহু জনবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং বহু ব্যক্তিকে পুলিসের গুলীতে জীবন দিতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝেই যে বাংলা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভের আন্দোলন লেগে আছে তার জন্য কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষ এত দিন পর্য্যন্ত বাঙালীর উত্তেজনাকর ও আবেগশীল মানসিকতা এবং সন্ত্রাসবাদী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে দায়ী করে এ কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই অরাজক বিক্ষোভের ব্যাধি এখন শুধু বাংলা দেশের এবং বিশেষ করে কলকাতায় সীমাবদ্ধ সমস্যা মাত্র। কিন্তু আজ লক্ষ্ণৌর ঘটনা কলকাতার ট্রাম আন্দোলনের কার্য্যকলাপকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কলকাতায় যা ঘটেনি লক্ষ্ণৌতে তাই ঘটেছে। লক্ষ্ণৌর ঘটনা বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লবের ঘটনাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি কলকাতার আগুনই লক্ষ্ণৌতে গিয়ে থাকে—তা' হলে সে আগুন ইন্ধন পেলো কোথায়? ত্রিবান্দ্রমেও আজ লক্ষ্ণৌর প্রতিধ্বনি ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সব ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি সাধারণ ছাত্র আন্দোলন বা এমনিতর কোন সাময়িক ও সীমাবদ্ধ আন্দোলনেই কেন্দ্রীবদ্ধ?

—জনমত (কলিকাতা)।

খড়ো খড়ো

"রাজপুতানা নহে—জয়পুর সাহিত্য সম্মেলন। কত লোক জড়ো হইয়াছিল। আরামবাগে—যেখানে একটি বিদ্যার্থিনী কিশোরীর কৌমার্য্য-মহিমা লুণ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে জনপ্রাণীও উঁকি মারে

নাই। কল্যাণীতে হট্টগোল করিবার জন্য অনেক নিধিরাম সর্দ্দার কোমর বাঁধিতেছে। রুজ-পাউডার,-ভ্যানিটি-ব্যাগের গর্ত্ত হইতে বহু অকল্যাণ-কথা উচ্চারিত হইবে—নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার দাও অধিকার। আশ্চর্য্যের বিষয়, বলাৎকার-বিপর্য্যস্তা তরুণীর ভাগ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশ্বপণ্ডিত, রাষ্ট্রপণ্ডিত, জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, তরুণ, সবুজ, অতি আধুনিকা, গোদা, পালের গোদা কাহাকেও একটি কড়ে আঙুল তুলিতেও দেখা যায় নাই। রাজস্থানে সাহিত্য সঙ্কট! তদপেক্ষা রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবার পতন নাটকের অভিনয় হইলে ভাল হইত। সত্যবতীর সেই গান:—সেই মানের চরণে প্রাণ বলিদান।—মথিয়া অমর মরণ সিন্ধু! গোবিন্দসিংহের সেই বজ্রোক্তি: যুদ্ধই শুধু জানি, সন্ধি ত জানি না মহারাণা! সন্ধি-সম্মূঢ় দেশে সাহিত্য ত একটা বিলাস! নারীর আপন ভাগ্য জয় কারবার কেহ নাহি দিবে অধিকার বলিয়া রমণীকে খ্যাপাইয়া তোলা হইল, কিন্তু সেই নারীর দেহ লইয়া শ্মশান-কুক্কুরেরা যখন ছেঁড়াছেঁড়ি করে, তখন একটা ঝেঁটার কাঠি হাতে করিয়াও কেহ আগাইয়া যায় না! বর্ত্তমান সাহিত্য—ক্লীবতার কল-কাকলী। কামুকতার কদর্য্যকাতরতা! কল্যাণী কংগ্রেসের কল্পনা করিতেছি। যাহাদের ভাগ্য লইয়া পিশাচের উপ-সন্তানেরা মর্দ্দন-মন্থন করিতেছে, তাহাদেরই কতকগুলি কবরী হিল্লোলিত করিয়া কত প্রস্তাবই উত্থাপন করিবে? কুমারীরা ধর্ষিতা বা লুণ্ঠিতা যাহাই হউক, ধেড়ে-ধেড়ে কুমারীরা দেশের জননায়ক! কিন্তু সেবার দীপ্তি! কোথায় তুমি সত্যবতী! আজ একবার আমাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া বল:

দিব সমরে জীবন ডালি!
জয় মা ভারত! জয় মা কালী!!!"

—আর্য্য (বর্দ্ধমান)

কুতুব মিনার—আত্মহত্যা-কেন্দ্র

"কুতুব মিনার যেন ক্রমেই আত্মহত্যার মিনার হ'য়ে উঠছে। সম্প্রতি সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ঘটেছে সাত জন পুরুষ ও পাঁচ জন নারীর! জানি না, কোন্ দুঃখে তাদের এই অধঃপতন! শুধু জানি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন যে মুসলমান সাধুর স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছিলেন আজ সেটা এই সব অসাধুর স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

সরকার, ব্যবস্থা করিবেন কি?

"গত ২৫শে ভাদ্র তারিখের 'যুগশক্তি'তে জনৈক পত্রলেখক করিমগঞ্জ স্কুলবোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত চেয়ারম্যান তাঁহার কোন বক্তব্য প্রকাশ করেন নাই, সরকারও তাহার তদন্ত করিয়া কিছু করিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। স্কুলবোর্ডের ন্যায় একটা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তার বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাহা বাস্তবিকই কলঙ্কজনক। সরকার অবিলম্বে সম্যক্ তদন্ত করিয়া এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না কি?

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

সরকার কি বধির?

"লেভী প্রথা ও জেলা কর্ডনিং রদ হইয়াছে। এখন স্বভাবতই লোকের ধারণা যে, অবাধে ধান-চাল এবার বেচা-কেনা চলিতে পারে, মজুদদারীতে বিঘ্ন নাই, একমাত্র রেশন এলাকা বা কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সর্ব্বত্রই লোকে ধান-চাল লইতে বা পাঠাইতে পারিবে, তজ্জন্য আর কোন পারমিট বা লাইসেন্স দরকার হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার নীরব। অথচ ট্রেনে ২।১ সের চাল লইয়া গেলে ধরা হয়, মহকুমা শাখা নিয়ামকগণ আবার লাইসেন্সীদের স্ব স্ব এলাকা হইতে ধান খরিদ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে দেশবাসীদের মনে একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত সন্দিগ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। সুতরাং এ সব বিষয়ে সরকারের নীতি অবিলম্বে সুস্পষ্ট ও ঘোষিত হওয়া আবশ্যক।"

—প্রদীপ (তমলুক)।

জহরলাল—দি সেকেণ্ড

"পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সব কিছুরই "বিশ্বের পটভূমিকায়" এবং "আন্তর্জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে" বিচার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আর একটি আন্তর্জাতীয়তাবাদীর কংগ্রেসে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইনি হইতেছেন এত দিনের কংগ্রেসবিরোধী এবং বর্ত্তমানে মন্ত্রিত্বের কাঙাল ডাঃ রাধাবিনোদ পাল। যে কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘৃণ্যতম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই কংগ্রেস-নেতৃত্ব ডাঃ পালকে হাত করিয়া দেশবাসীর নিকট নিজেদের কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার সাহস নাই। তাই সামান্য অজুহাতে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে জাপানে চলিয়া গিয়াছেন। জাপান যাত্রার পূর্ব্বে 'সারমন্' দিয়া গিয়াছেন—আজকাল সমস্ত কিছুই আন্তর্জাতীয়তার পটভূমিকায় বিচার করিতে হয়—এমন কি তাঁহার নির্ব্বাচনে জয়-পরাজয়ের পর্য্যন্ত একটা আন্তর্জাতিক মূল্য আছে ইত্যাদি। আমরা আশা করি, নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেও পণ্ডিত নেহরু রতন চিনিতে বিলম্ব করিবেন না—ডাঃ পাল মন্ত্রী না হইলেও রাষ্ট্রদূতের পদ তাঁহার আর আটকায় কে?"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)।

বনিয়াদী শিক্ষায় শ্রীনেহেরু

"পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, শুধু মহাত্মা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত বনিয়াদী শিক্ষাই দেশে প্রচলিত হউক—উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলি যখন এত অশান্তি ও উৎপাতের সম্ভাবনাগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে সব একেবারে বন্ধ করিয়াই বরং দেওয়া হউক। তাঁহার বক্তব্য মনে হয় ইহাই যে, বনীয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়া বালক-বালিকাদের চরিত্রের একটা দৃঢ় ভিত্তিপাত করা সম্ভবপর হইবে ও সেই ভিত্তির উপর পরে আরও শুদ্ধতর ও সুন্দরতর করিয়া উচ্চ শিক্ষার সৌধ পুনঃ রচনা করা যাইতে পারিবে। পণ্ডিতজীর কথার মর্ম্ম যদি আমরা ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে আমরা বলিব—আমরা তাঁহার সহিত প্রথমাংশে একমত। দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব আমরা নেতিমূলক প্রস্তাব বলিয়াই তাহার সমর্থন করিতে না পারিলেও ভারতের বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষা-পদ্ধতির যে ত্রুটিগুলি দেখা যাইতেছে, তাহা শোধন ও পূরণ করার প্রস্তাবই উত্থাপন করিব। আর এই দিক্ দিয়া আমাদের বক্তব্য

ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগও যখনই পাইব, গ্রহণ করিব।"

—নবসঙ্ঘ (চন্দননগর)।

নান্যঃ পন্থা

"বর্ধমান আরামবাগ রোডের দামোদরের দক্ষিণ তীর হইতে বাবরকপুর পর্যন্ত যে বহু-আলোচিত সিমেন্ট-জমানো স্লাব দিয়া বহু অর্থ জলে দিয়া রাস্তা করা হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। বৎসর বৎসর তাহাতে আবার বালি দিয়া বহু অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। এইরূপ ছেলেখেলা না করিয়া যদি কয়েক ফুট নীচু হইতে ভাল ইটের গাঁথনী করা হইত, তাহা হইলে বিষয়টি মজবুত ও নিরাপদ হইত। কিন্তু তাহা হইবে কেন? এইরূপ বালি গোঁজা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে হরির লুঠের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া অনুগত পোষণ করা হইবে? পূর্ত্ত বিভাগ কি এখনো সংযত হইবেন না? আর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড হইতে সদরঘাট পর্যন্ত অংশটি মেরামত করিবার সরকারী প্রতিশ্রুতির কি হইল?"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

সঙ্গীত-সাধক শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

গত ১২ই কার্ত্তিক সন্ধ্যায় ৪৩।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের ৪২তম জন্মদিন উপলক্ষে এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান

অতিথির আসন গ্রহণ করেন। জয়কৃষ্ণকে সাংবাদিক বন্ধুগণের পক্ষ হইতে শ্রীজীবনব্রত মুখোপাধ্যায় মাল্যভূষিত করেন। সভায় বহু গুণী গায়ক, সুধীজন ও বন্ধুগণ মাল্য, পুষ্পস্তবক প্রভৃতি উপহার দেন। যুগান্তরবার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, দুর্গাদাস ঘোষ (আইনজীবী) প্রভৃতি বহু বক্তা ও সঙ্গীতজ্ঞগণ জয়কৃষ্ণের সঙ্গীত-প্রতিভা ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ মনোরম বক্তৃতা দান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শেষে বিখ্যাত গায়ক এবং বাদক দ্বারা একটি উচ্চাঙ্গের গানের আসর বসে এবং অধিক রাত্রে অনুষ্ঠানটি ভঙ্গ হয়।

শোক-সংবাদ

অবসর-প্রাপ্ত হাকিম শ্রীবীরেন্দ্রলাল গুপ্ত, গত ২৮শে অক্টোবর, বুধবার বেলা ১১-২০ মিঃ সময় ১১-এ জাষ্টিস চন্দ্রমাধব রোড-এ, তাঁহার নিজ ভবনে ৭০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ৺রাজেন্দ্রলাল গুপ্তের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীরেন্দ্রলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। শিশুর ন্যায় সরল মানুষটিকে সকল বয়সের মানুষই শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যা, বহু নাতি-নাতনী এবং অগণিত আত্মীয়-বন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে ভগবান শান্তি দিন, তাঁহার শুদ্ধ আত্মা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করুক!

* * * *

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতা ডাঃ সুনীলকুমার বসু তাঁহার সর্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে গত ১৬ই নভেম্বর সোমবার রাত্রি ১-৪৪ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। ডাঃ সুনীল বসু এক জন খ্যাতনামা হৃদযন্ত্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর পঞ্চম পুত্র। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

* * * *

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বোম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্ণাল ও তৎসংশ্লিষ্ট পত্রিকাসমূহের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী এস, সদানন্দ গত ১১ই নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা ৬টার সময় মিলাপুর ইসাবেল হাসপাতালে ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯১৭ সালে শ্রীসদানন্দ সাংবাদিকস্বরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পর তিনি এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ায় যোগদান করেন। ১৯২১ সালে তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি "ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শ্রীসদানন্দ এক জন কৃতী সাংবাদিক এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমরা পরলোক-গতের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড ২য় সংখ্যা
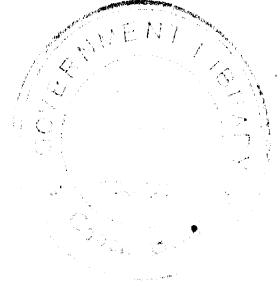
অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ (স্থাপিত ১৩২১) ৩২শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটি রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। আমি সব ভাবই কিছু কিছু দিন কর্ত্তাম তবে শান্তি হতো। আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি আবার বেদান্ত-বাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান লাভ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে লোকশিক্ষা কি ক'রে হবে? বিজ্ঞানী স্বার্থপর নয় যে আপনার হ'লেই হলো। সে আম সব্বাইকে দিয়ে খায়, আপনি খেয়ে মুখ পুঁছে থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রথমে চাই। ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়, তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং ক'রে শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দ্যাখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। আমি ঠাকুরের বাড়ীতে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের কচ্ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঋষিরা ভয়তরাসে! তাদের ভাব কি জান? আমি যো-সো ক'রে মুক্ত হয়ে যাই, আবার কে আসে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। ওদের জ্ঞান উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো। কখন দেখতাম, জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ; কখন চারি দিকে যেন পারার হ্রদ, ঝক ঝক কচ্ছে। আবার কখন রূপা-গলার মত দেখতাম। কখন দেখতাম রংমশালের আলো যেন জলছে।

প্রথম জাতীয় পতাকা

শ্রীসুকুমার মিত্র

১৯০৫ সালে বাঙ্গলার দান

১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসিগণ দেখিল যে তাহাদের সহস্র সহস্র প্রতিবাদ-সভা এবং বহু নিবেদন সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর প্রতিবাদে বিচলিত হইল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ় হইয়া রহিল। বাঙ্গালী মুক্তি চায় এবং অন্যান্য প্রদেশে সেই মুক্তির কথা প্রচার করিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। সেই বাঙ্গালীর শক্তি খর্ব্ব করা প্রয়োজন বুঝিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিল। বাঙ্গালী প্রতিকারের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। প্রতিবাদ-সভা করিয়া দেশবাসীর মনোভাব গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিবার প্রথা বহুকাল হইতে ইংলণ্ডে প্রচলিত। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ এই প্রথা অনুসারে এ দেশে ঐ ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, যাহা ইংলণ্ডে চলে ইংরাজ-শাসিত দেশেও তাহা চলিবে। তথাপি বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে বাঙ্গালীর চক্ষু খুলিল।

যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কথা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিল সেই সময়ে (১৩ই জুলাই, ইং ১৯০৫) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে, "বাঙ্গালী আর ইংরাজ শাসকদিগের সহিত সহযোগিতা করিবে না, সকল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ত্যাগ করিবে, শাসকদের আর সম্বর্দ্ধনা করিবে না ও তাহাদের সংস্পর্শে যাইবে না। বাঙ্গালী ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটিবে, তাঁত চালাইয়া নিজেদের পরিধেয় প্রস্তুত করিবে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র বর্জ্জন করিবে, বিলাতী নুণ, চিনি না খাইয়া করকচ ও গুড় খাইবে। সকল বাঙ্গালী বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিবে এবং অধিক মূল্য সত্ত্বেও দেশী মোটা কাপড় পরিবে।" 'সঞ্জীবনী'তে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পরে বাঙ্গালী দেখিতে পাইল তাহারা নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রতিকারের পথ আছে, প্রতিশোধ দিবার উপায় পাইয়াছে। দ্রুতগতিতে জনমত গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালী যুবকগণ উৎসাহের সহিত বয়কট-যজ্ঞে আহুতি দিতে আরম্ভ করিল। সে কি উন্মাদনা-উত্তেজনা!

১৯০৫ সালের ৭ই অগষ্ট তারিখে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়। দ্বিতলে স্থান না হওয়ায় একতলায় আর একটি এবং তথায়ও স্থান না হওয়ায় সম্মুখের ময়দানে সভা হয়। প্রত্যেক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিয়া ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব আনেন এবং উপস্থিত সকলকে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলেন।

ঘোর সবুজ
ঘোর হরিদ্রা
ঘোর লাল

দ্বিতলের প্রধান সভায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি হইয়াছিলেন। অপর দুই সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। মনে হইল ১৫০ বৎসর পরে নিরস্ত্র জাতি যেন প্রতিরোধের অস্ত্র পাইল। এই বয়কট প্রস্তাব অনেকে সমর্থন করিলেন কিন্তু ডাঃ নীলরতন সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করিবার কালে ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি ইংরাজী পোষাক পরিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল তিনি বৃটিশ দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব করিতেছেন অথচ তিনি পরিধান করিয়া আছেন বৃটিশ বস্ত্র! তিনি বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে আসিয়া দেখিতেছি আমি নিজেই বৃটিশ বস্ত্র পরিয়া আছি। আমি ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি গলার টাই ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। উহা আটকাইয়া গেল, মুখ লাল হইয়া উঠিল। জোর করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পরে কলার ধরিয়া টানাটানি, কিছুতেই তাহা খোলে না, অতি কষ্টে গলদঘর্ম্ম হইয়া তিনি যখন সভার মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলেন, তখন সভাস্থ সকলের মনে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ব্রিটিশ দ্রব্য-বর্জ্জন সংগ্রাম

ইহার পর হইতে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে বাঙ্গালী যুবকগণ পিকেট করিতে লাগিল। কাহাকেও আদেশ করিয়া পাঠাইতে হইত না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালী যুবকগণ কলিকাতার বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং ক্রেতাদিগকে বৃটিশ দ্রব্য ক্রয় করিতে বিনয়ের সহিত নিষেধ করিত। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ইহাদিগকে "স্বদেশের চৌকিদার" বলিয়া অভিহিত করে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বৃটিশ দ্রব্য বয়কটের জন্য সভা হইতে লাগিল। বাঙ্গলার নেতাগণ অতি ক্ষুদ্রতম পল্লীতে যাইয়াও বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। নেতাদের পল্লীতে গমন ও বক্তৃতা দিয়া রাজনীতিতে গ্রামবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করা এই প্রথম আরম্ভ হইল। বাঙ্গলা দেশে অতি কম গ্রাম ছিল যথায় নেতাগণ যান নাই বা বক্তৃতা করেন নাই।

ক্রমে সমগ্র বাঙ্গলায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে তৎকালীন "বোমাপন্থী" 'যুগান্তর' পত্রিকা লিখিলেন, "আমরা এই নুণ-চিনির বয়কটে বিশ্বাস করি না ও ইহাতে সন্তুষ্টও নহি"। পরে বয়কট আন্দোলন ক্রমে নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল। আজ সংবাদ আসে মাদারিপুরে বিলাতী কাপড়ের গাঁটে কে এসিড ঢালিয়া নষ্ট করিয়াছে, কাল খবর আসিল চট্টগ্রামের রেলের গুদামে অবস্থিত বিলাতী কাপড়ের গাঁটে কোন কোন লোক আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যুবকগণ
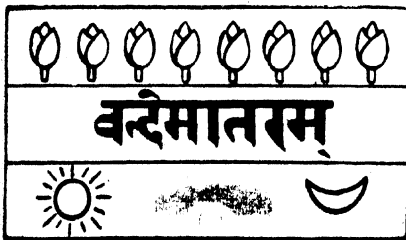
প্রতি বাড়ীতে যাইয়া বিলাতী কাপড় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে আগুন লাগাইয়া দিতে লাগিল। ইহাতে জনসাধারণের ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল কারণে পুলিশের সহিত মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইত। এদিকে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একদিন "কাবুলী দাওয়াই" শিরোনামায় উত্তেজনাপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাহার কিছুদিন পরে আর এক প্রবন্ধে "কালী মাইকি বোমা" নামে আর এক দুঃসাহসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গলায় উত্তেজনা ও স্বদেশসেবার বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, ছাত্রগণ ক্রমে অধিক সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়া নেতাদের সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার ফলে ছাত্র-দলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কর্তৃক ছাত্রদলন-বিরোধী এক সভা স্থাপিত হয়। উহার নাম ছিল "এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি।" ৪ নং কলেজ স্কোয়ারে ইহার কার্য্যালয় ছিল। এই সমিতিতে বহু কর্ম্মী যোগদান করে। ইহাদের উপর নেতাগণ নির্ভর করিতে পারিতেন। ইহার সেক্রেটারী ছিলেন বিখ্যাত ছাত্র-বাগ্মী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। বয়কট আন্দোলনে যোগদান করায় তিনি আত্মীয়গণ কর্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন। সভা-সমিতির অধিবেশন করিতে, কলিকাতা সহরে মিছিল বাহির করিতে, নেতাগণ এই "এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র সাহায্য লইতেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন বর্ত্তমান লেখক।

আন্দোলন দিন দিন বিপুল আকার ধারণ করিতে লাগিল। সকল স্থানে ইহা আর অহিংস রহিল না। যদিও সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন, there is ample latitude of work within the bounds of law অর্থাৎ "আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও কার্য্য করিবার প্রচুর স্থান আছে।" পুলিশের নিকট বাধা পাইয়া, কোথাও প্রহার খাইয়া নানা স্থানে যুবকগণ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল। লেখকও বৌবাজার ষ্ট্রীটে পুলিশের হস্তে মার খাইয়াছে।

এখানে "এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অক্লান্তকর্ম্মী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বক্তৃতা, সংগঠন প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। "এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র কোন্ কার্য্য কখন হইবে, কি ভাবে হইবে, সভার স্থান কোথায় হইবে, কে কে বক্তৃতা করিবেন ইত্যাদি নানা কার্য্যের ভার ছিল লেখকের উপর।

এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির কর্ম্মিগণ দেশী মোটা কাপড় মাথায় করিয়া কয়েক মাস বাড়ী-বাড়ী ফিরি করিয়া বিক্রয় করিবার পরে নেতাদের চেষ্টায় উক্ত সোসাইটির গৃহে দেশী মিলের কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। তথায় দেশী কাপড় বিনালাভে বিক্রয় করা হইত। একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে, যখনই পুলিশ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন বন্ধ করিতে নির্য্যাতন করিত, তাহার পরেই উক্ত দোকানে দেশী কাপড় বিক্রয় বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে মাসে এক লক্ষ টাকারও কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। বরিশাল হইতে কর্ম্মিগণ যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া প্রত্যাগমন করেন এবং শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মিছিল করিয়া কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইবার কালে রাস্তায় নিম্নলিখিত সঙ্গীত করিতে করিতে আসিতে থাকেন তখন অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সঞ্চার হয়:

মা গো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে,
যায় যেন জীবন চলে।

* * * *

বরিশালের ঘটনার পরে দেশী কাপড় বিক্রয় বাড়িয়া যায়। ১৯০৬ সালের জুন মাস আসিয়া পড়িল। লেখক একদিন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে বলিলেন "৭ই আগষ্ট বয়কট প্রচারের এক বৎসর হইবে। আপনি সুরেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে ঐ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসব করিতে অনুরোধ করুন। বাকী সব আমি করিয়া দিব।" শচীন্দ্রপ্রসাদ তখন কলুটোলা ষ্ট্রীটের 'বেঙ্গলী' অফিসে যাইয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট এই প্রস্তাব করিবা মাত্র তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। একজন যুবকের নিকট হইতে এই প্রস্তাব আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যুবকদিগকে সকল কার্য্যে উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়েও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। কোন প্রস্তাব যুবকের নিকট হইতে আসিলে তিনি আহ্লাদিত হইতেন এই জন্য যে, যুবকগণ নেতাদের চিন্তাধারা ব্যতীত স্বকীয় চিন্তা করিতে শিখিতেছে। সকল প্রকার স্বাধীনতা মানুষ লাভ করুক ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা।

সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভা গৃহে এক সভা করিয়া নেতাদের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং বয়কট সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান করিয়া এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিবার প্রয়োজন সকলকে বুঝাইলেন। সভায় উপস্থিত সকলে এই সাম্বৎসরিক উৎসব করার প্রয়োজন বুঝিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। "এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল।

জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা

জুলাই মাসে ফরাসী দেশ ও আমেরিকায় স্বাধীনতা দিবস। ঐ দিন তাহারা জাতীয় পতাকা উড়াইয়া আড়ম্বরের সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করিয়া থাকে। কলিকাতায়ও এই দেশদ্বয়ের স্বাধীনতা উৎসব হইল। লেখকের প্রথম প্রস্তাব, দেশ-নেতা সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায়, পুনরায় লেখক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নিকট একটি জাতীয় পতাকা তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব করেন। লেখক কলিকাতার "টিভোলি গার্ডেন" হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন সবগুলিতেই কংগ্রেস মণ্ডপ বৃটিশ পতাকার দ্বারা সজ্জিত হইতে দেখিয়াছেন। কংগ্রেসের সভায় আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য সকলে "হিপ হিপ হুররে" বলিয়া ধ্বনি করিত। সেই জন্য লেখক জাতীয় পতাকার প্রয়োজন বোধ করিয়া শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে এ সম্বন্ধে রাজী করেন। অপরকে রাজী

করাইবার শক্তি শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলে গভর্ণমেণ্ট বীতরাগ হইবেন বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে না-ও রাজী হইতে পারেন, সে জন্য সুরেন্দ্রনাথ যাঁহার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন, তাঁহাকে লেখক এই কঠিন কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু তাহাতে সম্মত হইলেন। লেখকের প্রস্তাবানুসারে শচীন্দ্রপ্রসাদ একদিন সাহসে ভর করিয়া লেখক সহ 'বেঙ্গলী' অফিসে সুরেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিলেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু বলিলেন, সকল দেশের জাতীয় পতাকা আছে, আমাদের দেশের নাই। আমাদের সভায় ও মিছিলে জাতীয় পতাকা না থাকায় অসুবিধা হইতেছে। বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা সকল উৎসবে ব্যবহৃত হয়। ইহা আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই। সুতরাং ৭ই আগষ্ট শুভ বয়কট সাম্বৎসরিক দিবসে এক জাতীয় পতাকা তৈয়ারী করিয়া উত্তোলন করা উচিত। • বিস্ময়, উৎসাহ, আনন্দ ও আগ্রহের সহিত সুরেন্দ্রনাথ পতাকা তৈয়ারী করিতেও রাজী হইলেন। তিনি বলিলেন, "এই পতাকা দেশের জাতীয় পতাকা হইবে সে জন্য কেবল আমার ইচ্ছানুসারে পতাকার রূপ (design) স্থির করা অথবা ইহা উত্তোলন করা ঠিক হইবে না। বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলার নেতাদের আমন্ত্রণ করিয়া এবং কলিকাতার নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পতাকার (design) রূপ স্থির করিতে হইবে এবং ইহা উত্তোলন করা সমীচীন কিনা তাহাও স্থির করিতে হইবে।" সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নিজের কল্পনা অনুসারে একটি পতাকা তৈয়ারী করিয়া আনিতে বলেন।

ইহার কিছু দিন পরে কলিকাতার ভারত-সভা গৃহে এই পতাকা সম্বন্ধে এক সভা হয়। উক্ত সভায় দেখাইবার জন্য নিজের কল্পনা অনুসারে লেখক কর্ত্তৃক একটি বিভিন্ন রঙ্গের পতাকা তৈয়ারী করা হইল। ইহা লেখকের ভগিনী স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু সিলাই করিয়া দেন। এদিকে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু লেখকের নির্দ্দেশ অনুসারে অনুরূপ বর্ণ দিয়া আর একটি পতাকা তৈয়ারী করেন। চটের উপর রং দিয়া এই পতাকা তৈয়ারী হইয়াছিল। লেখক তাঁহাকে বলিলেন যে ভারী চটের উপর ভারী রং দিয়া তৈয়ারী এই পতাকা উড়িতে পারে না। যেই বলা তখনই শত শত বক্তৃতা-মঞ্চের তরুণ বাগ্মী বক্তৃতার তুবড়ী ছাড়িয়া চট যে হাওয়ায় উড়িবে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন। "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"র সভ্যগণ অসম্ভব ব্যাপারে বক্তৃতার হিল্লোল দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছিল। কিছুতেই শচীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা থামে না। লেখক যখন তাঁহাকে বলিলেন, "যদি ঐ চট উড়ে, তবে তোমার এই বক্তৃতার ঝড়ে উড়িবে"। চতুর্দ্দিকে হাস্যরোল উঠিল। শচীন্দ্র বাবু চটের পতাকা রাখিয়া দিলেন। উহা একই designএ তৈয়ারী হইয়াছিল। সভার কয়েক দিন পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথকে লেখক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পতাকা দেখান হয়।

অতঃপর ভারত-সভা গৃহে সভা হইল। এই সভায় দেশের জাতীয় পতাকার কি "রূপ" (design) হইবে, উহাতে কোন কোন রং ব্যবহৃত হইবে তাহা স্থির করা হইবে। বাঙ্গলা দেশের সকল জেলার দিক্‌পালগণ আসিয়াছেন তাঁহাদের পরামর্শ ও অভিমত জানাইতে। কলিকাতার নেতাগণ ব্যতীত সভায় চট্টগ্রাম হইতে তথাকার নেতা যাত্রামোহন সেন, ঢাকা হইতে আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুর হইতে অম্বিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহ হইতে অনাথবন্ধু গুহ, যশোহর হইতে যদুনাথ মজুমদার, রাজসাহী হইতে কিশোরীমোহন চৌধুরী, জলপাইগুড়ি হইতে তারিণীনাথ রায়, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি সকল জিলার নেতাগণ আসিয়াছেন। লেখকের পতাকা সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। স্যার আশুতোষ চৌধুরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ইহাকে আবার (tricolour) ত্রিবর্ণ করিয়াছ"? সার আবদুল হালিম গজনভী উক্ত পতাকার বর্ণবিন্যাস দেখিয়া বলিলেন, "বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পতাকা হইয়াছে।" বহুক্ষণ বাদানুবাদের পরে পতাকাটির কি রূপ হইবে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল এবং ৭ই অগষ্ট এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস বলিয়া স্বীকৃত হইল। নমুনা পতাকায় যে যে বর্ণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা রাখিয়া কেবল বিন্যাস পরিবর্ত্তন করিয়া এবং আটটি শ্বেত পদ্মকোরক এবং "বন্দে মাতরম্" ও চন্দ্র সূর্য্য বসাইয়া পতাকা অনুমোদিত হইল। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, এই প্রথম জাতীয় পতাকার পশ্চাতে তৎকালীন জাতীয় অনুমোদন ছিল।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

এই সম্পর্কে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর জীবনী হইতে উদ্ধৃত হইল :—

—"শচীন্দ্রপ্রসাদ সার সুরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে একদিন তাঁহার বন্ধুর পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিলেন যে আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই। সুরেন্দ্রনাথ শিষ্যের অনুরোধে রাজী হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা জাতীয় পতাকা তৈয়ারী কর ও পতাকা আনিয়া দেখাও। শচীন্দ্রপ্রসাদ ও তদীয় বন্ধু পরমোৎসাহে গৃহে ফিরিয়া এক পতাকা তৈয়ারী করিলেন। পতাকার রূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত—সবুজ, পীত ও লাল। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে সার আশুতোষ চৌধুরী, সার আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতি যোগ দেন। তাঁহারা স্থির করেন যে এই ত্রিবর্ণের উপর আবার মানচিত্রের সংস্থান অনুসারে ভারতবর্ষের ৮টি প্রদেশের জন্য ৮টি পদ্মকুঁড়ি শোভিত থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ পরম আগ্রহে, পরম স্নেহে পতাকার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে জাতীয় পতাকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করাইয়া লইলেন। ১৯০৬ সালের ৭ই অগষ্ট বয়কট দিবসে এই পতাকা গ্রিয়ার পার্কে উড্ডীন করা হয়। * নরেন্দ্রনাথ সেন পতাকার জন্য প্রার্থনা করেন † ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহা সুরেন্দ্রনাথের হস্তে দেন ও তিনি তাহা ১০১টি বোমার ধ্বনির মধ্যে উড্ডীন করেন। ১৯০৬ সালে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তখন সেই পতাকা সভা-মণ্ডপের

* নরেন্দ্রনাথ সেন অন্যতম নেতা ও 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সম্পাদক।

† ভূপেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম নেতা, কংগ্রেস সভাপতি, আইন সভার সদস্য ও এটর্ণি।

শীর্ষে উড্ডীন করা হয়। ডেলিগেটদের ব্যাজেও এই ত্রিবর্ণ ছিল। এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাই কংগ্রেসের প্রথম পতাকা। কালক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত পতাকার একটি নমুনা জীর্ণ অবস্থায় আজিও স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে।"

(৩২—৩৩ পৃঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু) (১৯৪১ মার্চ্চ।)

নিম্নে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হইতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

—"অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে বেলা ২টা না বাজিতেই দলে দলে লোক "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সোসাইটির গৃহ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। * * * একটি বৃহৎ দণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছিল। ঠিক সাড়ে চারিটার সময়ে এই বিরাট বাহিনী সভাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে একজন প্রতিষ্ঠ যুবক জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন।"—

—'সঞ্জীবনী,'—২৪এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩১৩ বিলাতী পণ্যের বর্জ্জনোৎসব—"স্কোয়ারে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকে বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহোপরি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় উৎসব দেখিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি শুনা যাইতেছিল এবং বোমার আওয়াজ হইতেছিল। সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে নরেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র বাবু সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে আকুল কণ্ঠে একটি প্রার্থনা করিলেন। পূর্ণিমার জলোচ্ছাসের সময় মহাজলধি যেমন শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে তেমনি সেই বিশাল জনসমুদ্র পক্বকেশ বৃদ্ধের কণ্ঠে প্রার্থনা শুনিয়া মহানিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। জলদগম্ভীর কণ্ঠের সেই প্রার্থনা শুনিয়া সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন, "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, হে বিশ্বপতি ভগবান! আজ তোমার কৃপায় আমরা এখানে একত্র হইয়াছি—তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং আমাদিগের জন্মভূমির কল্যাণ সাধন কর। আমাদিগের মধ্যে যে আত্মনির্ভর এবং স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে তজ্জন্য হে ভগবান, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। আমাদিগের চারিদিকে যে নব-জাগরণের সাড়া পাইতেছি তাহার মধ্যে তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইতেছি। তুমিই এই নব প্রেরণা আমাদিগের মধ্যে দিয়াছ এবং তুমিই তাহা রক্ষা কর। তুমি রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে সদিচ্ছা এবং সাধু প্রবৃত্তি সকল জাগ্রত করিয়া দাও এবং তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থান এমন ভাবে স্পর্শ কর যেন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইয়া যায়। আমাদিগের যুবকগণকে অন্যায় এবং অসাধুতার হস্ত হইতে রক্ষা কর এবং তাহাদিগকে চরিত্রবান করিয়া গঠন কর, যেন তাহারা জীবনে-মরণে তোমার সেবা এবং তোমার জয়গান করিতে পারে।" নরেন্দ্র বাবু আসন গ্রহণ করিলে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মিঃ আবদুল হালিম গজনবি সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে নবনির্ম্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন। সবুজ, পীত ও লাল রঙের জমির উপর প্রথম লাইনে আটটি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংস্কৃত অক্ষরে বন্দে মাতরম্ এবং শেষ লাইনে সূর্য্য ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিই জাতীয় পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং গগনবিদারী বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

তৎপরে সুরেন্দ্র বাবু বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের পবিত্র মন্ত্র গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া একস্বরে সেই মহা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। আবার বোমার আওয়াজ হইল।"

উপরে ৭ই অগষ্ট তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সংবাদ-পত্রের অংশ উদ্ধৃত হইল। ৭ই অগষ্ট তারিখে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে (তখন বাঙ্গালা দেশ সমগ্র ভারত লইয়া চিন্তা করিত) এই উৎসাহে ছোট মাপের বহু পতাকা তৈয়ারী হইল। ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পর হইতে দলে দলে যুবকগণ "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"র সম্মুখে জড় হইলেন। কঞ্চির হাতল দেওয়া বহুসংখ্যক পতাকা যুবকদের মধ্যে বিতরিত হইল। তাঁহারা সারিবদ্ধ হইয়া পতাকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের পুরোভাগে এলাহাবাদের শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু অশ্বপৃষ্ঠে এক বৃহৎ পতাকা লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ঘোড়া হোঁচট খাইয়া পড়ে। তাহাতে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় এক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়। এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট বা গরম দলের পত্রিকাগুলি জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে উপহাস করিয়াছিল। তৎকালীন বিপ্লবপন্থী 'যুগান্তর' পত্রিকা এই পতাকা সম্বন্ধে লেখেন, "জাতীয় বৈপ্লবিক পতাকারূপে ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি।" নরম দল ও বৈপ্লবিক দলের মধ্যে অলক্ষ্য গ্রন্থি ছিল। কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট দিয়া যাইয়া মিছিল সার্কুলার রোডে পড়িল। রাস্তায় জনসমাগম, গৃহের জানালায় মিছিল দেখিবার জন্য বহু নর-নারী উপস্থিত ছিল। জনমতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া বাঙ্গলা বিভক্ত হওয়ায় জনসাধারণ গভর্ণমেন্টের সক্রিয় বিরুদ্ধতা করিতেছে, বাঙ্গলা দেশে তথা ভারতে ইহা অভিনব ব্যাপার! "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির" কর্ম্মিগণ দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া গাহিতে গাহিতে সভাস্থলের দিকে যাইতে লাগিল।

আমরা যা বল্‌ছি তা বল্‌বই বল্‌বো
আমরা যা করছি তা করবই করবো
থাক্ না কেন কাঁটা তরু গিরি-গহ্বর গহন মরু
যে পথে চলেছি মোরা চল্‌বই চল্‌বো।
ছিন্ন কর ভিন্ন কর সাত কোটি প্রাণ হবই জড়
ঝঞ্ঝা তুফান সবই মোরা সইবই সইবো।

* * * *

প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের মাঠের প্রতি সকলে একবার চাহিয়া দেখিল। ঐ স্থান পুলিশে ভর্ত্তি। এই স্থানে ৭ই অগষ্টের সভা হইবার কথা ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সভার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পুলিশ আদেশ জারী করিয়া এখানে সভা করিতে নিষেধ করে। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রিয়ার পার্কে (বর্ত্তমানে লেডিজ পার্ক) সভা করা স্থির করিলেন। মিছিল তথায়

প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমা গর্জ্জিয়া উঠিল। মোট ১০১টি বোমা ছাড়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন, "আমরা এই পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তোমরা সকলে এই পতাকাকে অভিবাদন কর।" সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া পতাকাকে অভিবাদন করিল। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বার বার সমবেত জনমণ্ডলীকে পতাকা অভিবাদন করিতে বলিয়াছিলেন। আরও কয়েক জনের বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হয়।

এই পতাকা ত্রিবর্ণের ছিল কিন্তু ফরাসীদের পতাকার ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের অংশ লম্বমান ছিল না। জাতীয় পতাকার বিভিন্ন বর্ণ সমান্তরাল ভাবে ছিল। এই রচনার প্রথম পৃষ্ঠায় উহার একটি মোটামুটি চিত্র দেওয়া হইল।

পতাকার উপরের অংশে ঘোর সবুজ বর্ণের কাপড়, তাহাতে ভারতের ৮টি প্রদেশের প্রতীকস্বরূপে ৮টি শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি বসান হয়। ঘোর হরিদ্রা বর্ণের অংশে সাদা নাগরী অক্ষরে বন্দে মাতরম্ লেখা ছিল এবং তাহার নীচে ঘোর লাল অংশে সাদা রঙ্গে সূর্য্য ও চন্দ্র ছিল।

দেখিতে পাই যে আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ১৮৮৮ সালে "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তকে "পদ্ম" ফুলই যে ভারতের জাতীয় প্রতীক তাহা প্রকাশ করেন এবং উক্ত পুস্তকে জাতীয় পতাকার এক পরিকল্পনা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করেন। পতাকার প্রয়োজন-বোধের সময় এই বিষয়টি লেখকের জানা ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত জাতীয় পতাকার উত্তোলনের পর হইতে প্রতিদিন প্রাতে "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"র কার্য্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইত ও সন্ধ্যায় নামাইয়া লওয়া হইত। পরে বহু স্থান হইতে জাতীয় পতাকার জন্য লোক আসিত। কিন্তু পদ্ম ফুল, বন্দে মাতরম্ অক্ষর ও চন্দ্র সূর্য্য কাটার জন্য যে সময় লাগিত ও অনভ্যস্ত হস্তে বিশ্রী হইত তাহাতে বেশী পতাকা তৈয়ারী হইত না। সুতরাং লেখকের ব্যবস্থা অনুসারে কেবল ৮টি পদ্ম ও তিন বর্ণের কাপড় দিয়াই পতাকা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করা হয় এবং "এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"ও ঐরূপ পতাকা বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে কাজের সুবিধা হয়, হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না এবং শিল্পীর প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সভা-সমিতিতে কিম্বা গৃহ ও মণ্ডপের শীর্ষে নেতাদের দ্বারা গৃহীত পতাকার রূপ-সমন্বিত জাতীয় পতাকাই উড্ডীন করা হইত। এই পতাকা ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে ও ১৯১২ সালে বিষণনারায়ণ দরের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহার মণ্ডপের শীর্ষদেশে ও প্রবেশ-তোরণের উপর স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভার অধিবেশন বহরমপুরে হইয়াছিল, তথায়ও এই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। কলিকাতার পথে মিছিলে এই পতাকা ব্যবহৃত হইত। ৩০এ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ দিবসের সভা ও ৭ই আগষ্টের সভাগুলিতে প্রতি বৎসর এই পতাকা ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩০এ আশ্বিনের রাখীবন্ধন উৎসব—প্রভাতের মিছিলে এই পতাকা লইয়া গঙ্গার ঘাটে সকলে স্নান করিতে যাইত। বৈকালের সভায় এই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হইত। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হয়। তাহার পর হইতে এই পতাকা ক্রমে অন্তরালে চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে পতাকায় সাধারণত উক্ত তিনটি বর্ণ ও ৮টি শ্বেত পদ্ম দ্বারাই শোভিত হইত। পূর্ব্বকথিত কারণে প্রায় সকলেই অক্ষর লেখার হাঙ্গামা হইতে রেহাই পাইবার জন্য জাতীয় পতাকার বর্ণটিই পতাকায় রক্ষা করিতেন। বিদেশেও এরূপ হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার এই জাতীয় পতাকা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাওয়ার পরে, অসহযোগী কংগ্রেস এক পতাকার পরিকল্পনা করেন। তাহাও এই পতাকার ন্যায় ত্রিবর্ণের ছিল কিন্তু হরিদ্রা বর্ণটি বর্জ্জিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বর্ণবিন্যাসও ভিন্ন রকমের ছিল। কিন্তু পূর্ব্বের পতাকার ন্যায় বর্ণগুলি সহ পতাকা সমান্তরাল ছিল। বিবর্ত্তনের ফলে সেই সমান্তরাল ভাবে বর্ণ রাখিয়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা পরিকল্পিত হইয়াছে। যদিও এক সবুজ বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য দুইটি বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে ১৯০৬ সালে যে জাতীয় পতাকা তৈয়ারী হইয়াছিল আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তাহা স্বীকার করিতে না চাহিলেও বর্ত্তমান পতাকায় ত্রিবর্ণ ও সমান্তরাল ভাবে বর্ণের বিন্যাসে বাঙ্গলার পতাকাই যে ইহার পরিকল্পনার পশ্চাতে ছিল তাহা বুঝা যায়। "বাঙ্গালী বিপ্লবে" পরিকল্পিত এই জাতীয় পতাকা বাঙ্গলারই দান।

বিদেশে জাতীয় পতাকা

কোন উৎসাহী বাঙ্গালী যুবক এই পতাকা সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন। ম্যাডাম কামা নাম্নী এক ধনী পার্শি মহিলা 'তলোয়ার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। উক্ত পত্রিকার বহির্দ্দিকের প্রথম পৃষ্ঠায় কলিকাতায় গৃহীত পদ্ম, বন্দে মাতরম্, চন্দ্র-সূর্য্য-সম্বলিত এক পতাকার চিত্র প্রতি সংখ্যায় অঙ্কিত থাকিত। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ও ম্যাডাম কামা ভারতের জাতীয়তা-বোধ ও বৈপ্লবিক মনোভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার লণ্ডনস্থ "ইণ্ডিয়া হাউস" গৃহে এই পতাকা উড়িত। ম্যাডাম কামা যখনই যেখানে বক্তৃতা করিতে যাইতেন তখন সেই স্থানে এই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতেন। সোসালিষ্ট-জগতে বিখ্যাত ১৯০৭ সালের জার্ম্মাণীর ষ্টুটগার্ট কনফারেন্সে ম্যাডাম কামা এই পতাকা উড্ডীন করেন। বাঙ্গলার এই পতাকাই প্যারিসের ভারতীয় বৈপ্লবিকদের পতাকা-রূপে গৃহীত হয়। ম্যাডাম কামা তাঁহার সমস্ত ধন ও শক্তি দ্বারা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে য়ুরোপে জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সকল দিক দিয়া সাহায্য করিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি প্যারিসে দেহরক্ষা করেন।

আবার বার্লিনে ভারতের বৈপ্লবিকগণের মধ্যে এই পতাকা দেখা যায়। বার্লিনের বৈপ্লবিক কমিটি ইহাকে ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া ব্যবহার করেন। উক্ত কমিটির গৃহে ভূতপূর্ব্ব 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গমন করিলে কেবল মাত্র ত্রিবর্ণচিহ্নিত এক পতাকা দেখেন। উহাতে চন্দ্র-সূর্য্য

প্রভৃতি ছিল না।* বাঙ্গালীর সকল বিষয় লইয়া ঈর্ষা। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বার্লিনে পতাকার এই অবস্থা দেখিয়া যখন সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বন্দে মাতরম্ ও চন্দ্র সূর্য্য পতাকায় না থাকায় প্রশ্ন করেন, তখন তিনি নিজের কৃতিত্ব দাবী করিয়া উত্তর দেন, "যেহেতু এই পতাকা ম্যাডাম কামার সৃষ্ট তজ্জন্য আমরা উহা উঠাইয়া দিয়াছি।" ১৯১৫ সালে ভূপেন্দ্র বাবু যখন বার্লিনে উপস্থিত হন তখন বাঙ্গলা দেশে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী কালে পতাকা নির্ম্মাণের সুবিধার জন্য কেবল পতাকার বর্ণগুলি ও শ্বেতপদ্ম ৮টি রাখিয়া পতাকা উত্তোলনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষ হইতে পতাকা তৈয়ারী হইত। সম্ভবতঃ এই পতাকার একটি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পৌছিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশে যখন প্রথম জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয় সেই পতাকা লণ্ডন ও প্যারিসে উড্ডীন করা হইয়াছিল। আবার সুবিধার জন্য "এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি" ও পরে জনসাধারণ কয়েকটি সূক্ষ্ম কার্য্য বর্জ্জন করিয়া যে পতাকা ব্যবহার করিত তাহা বার্লিন যাইয়া পৌছিয়াছিল।

বার্লিনে প্রকাশ্যে এই পতাকা উড্ডীন হইতে দেখা যায় নাই। ভিনসেণ্ট ক্রাফ্‌ট্ নামে একজন জার্ম্মাণ সৈনিককে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য জাভার ব্যাটেভিয়া সহরে বার্লিন বৈপ্লবিক কমিটি পাঠাইয়াছিলেন। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটির এক ভোজসভায় তিনি উক্তি করেন, "এই পতাকার জন্য অনেকে মরিয়াছেন আরও অনেকে মারা যাইবেন।"

আজকাল পশ্চিম-ভারত দাবী করিয়া থাকে তাহারাই জাতীয় পতাকা পরিকল্পনা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "এই কথাই মনে হয়; হায় দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশ! রাজনীতিতে তাহার সমস্ত কর্ম্ম, অপরের মৌলিক কৃতিত্ব বলিয়া ক্রমাগত জাহির করা হইতেছে এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে তাহার সমস্ত অবদান মুছিয়া ফেলা হইতেছে।"

* দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ২২০-২২৮ পৃঃ।

কলকাতায় প্রথম ধারাযন্ত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত

কালীপ্রসন্ন সিংহ সমাজসেবা এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধু খ্যাতিলাভ করেননি, বহু জনহিতকর কার্য্যের জন্য সমগ্র কলকাতাবাসীর তিনি উপকারী বন্ধু ছিলেন। কলকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয়নি তখন তিনি বিলাত থেকে চারটি ধারাযন্ত্র আনিয়ে কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ধারাযন্ত্রগুলির জন্য কালীপ্রসন্ন ব্যয় ক'রেছিলেন সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৫।৵০ টাকা। ধারাযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ায় তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৫ই জুন ১৮৬৮ তারিখে লিখছেন:—

"We understand that the Chairman of the Justices has determined to put up the four fountains presented by Baboo Kaliprossunno Singh to the Town at the following places :—

1. At Junction of Dalhousie Square and Clive Street.
1. At Junction of Strand Road and Durmahatta Street.
1. At Junction of Esplanade Row and Government Place East.
1. At Junction of Raja Guru Doss' Street and Beadon Street.

The first site is very appropriate....A fountain at the new Square in the Native Town will be both useful and ornamental. But we are of opinion that one ought to be put up near the residence of the munificent donor in Baranussy Ghose's Street.

পত্রিকাটির নির্দ্দেশে কাজ হয়েছিল। একটি রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট ও বিডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ও একটি ধারাযন্ত্র কালীপ্রসন্নের আবাস-স্থলের নিকটে স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ বাকী দুটি স্থাপিত হয়নি।

আইসেনহাওয়ার

উইলসন

পিটারসন্

ফ্লেমিং

রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা যদি থাকে

তা হ'লে আমেরিকা কি করবে না করবে তারই ফিরিস্তি নিম্নের উক্তিসমূহ। আইসেনহাওয়ার, উইলসন, পিটারসন্ ও ফ্লেমিং যথাক্রমে আমেরিকার সভাপতি, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, সেনেটের রিপাব্লিকান সদস্য ও পেনিসিলিনের আবিষ্কারক—এই ব্যক্তিচতুষ্টয়ের মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁদের মতামত সমগ্র পৃথিবীতে গ্রাহ্য হচ্ছে।—স]

রুশিয়ার কি হাইড্রোজেন বোমা আছে ?

"বর্ত্তমান বৎসর আগষ্ট মাসে সোভিয়েটে এক প্রকার আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-কার্য্য চালান হইয়াছে। এই বিস্ফোরণ হাইড্রোজেন বোমার শক্তির ন্যায়। প্রচলিত বোমাসমূহ অপেক্ষা ইহা খুব বেশী শক্তিশালী।" —আইসেনহাওয়ার।

"বাস্তব দিক হইতে আমি মনে করি, রুশদের যে থার্ম্মোনিউক্লিয়ার আণবিক বোমা আছে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তবে ইহা কেবল সম্ভাব্য ব্যাপার।" —উইলসন।

"আমি মনে করি, এখনো কেহ হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে পারেনি। একটি কৌশল আবিষ্কার করা আর বহনযোগ্য ও ক্ষেপণীয় বোমা তৈরী করা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।" —পিটারসন।

"রুশিয়ার থার্ম্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র আছে—আণবিক বোমা নাই—আমার অপর বিবৃতির বক্তব্য ইহাই ছিল।" —ফ্লেমিং।

রুশিয়া কি হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করতে পারে ?

"আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, সোভিয়েট এক্ষণে আমাদের উপর আণবিক আক্রমণ চালাতে সমর্থ এবং যত দিন যাবে তার এই সামর্থ্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।" —আইসেনহাওয়ার।

"তারা এক্ষণে এই সামর্থ্য অর্জ্জন করেছে, এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। আমার মনে হয়, তারা আমাদের চেয়ে তিন-চার বছর পিছিয়ে আছে।" —উইলসন।

"এখনো নয়। দেশরক্ষার ব্যবস্থা যাঁরা করবেন, তাঁরা হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কিছু সময় পাবেন।" —পিটারসন।

"সোভিয়েট রুশিয়া অকস্মাৎ এবং সতর্ক না করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত লক্ষ্যবস্তু সমূহের উপর এরূপ ধ্বংসকারী অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে যা কেউ কল্পনা করতে পারে না।" —ফ্লেমিং।

আমাদের আক্রমণ করা কত সহজ ?

"আমাদের স্বগৃহে এখনও যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা দেখা যায়নি বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, দূর পাল্লার বোমারু বিমান ও একটি মাত্র বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তি এই ভৌগোলিক নিরাপত্তার অবসান ঘটিয়েছে।" —আইসেনহাওয়ার।

"আমাদের দেশবাসীর এ বিষয়ে এত উত্তেজিত হবার কারণ এই যে, কোন শত্রু যে আমাদের কিছু করতে পারে, এ কথা আমরা কখনো ভাবিনি। আমাদের এত শঙ্কিত হবার কারণ নেই। আমাদের সামরিক ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী এবং আমরা প্রস্তুতও আছি।" —উইলসন।

"আণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বোমা, রোগবাহী বীজাণু, ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ এবং বাষ্প দ্বারা সম্ভাবিত ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।" —পিটারসন।

"লক্ষ লক্ষ লোকের জীবননাশ ও অত্যাবশ্যক দেশরক্ষা শিল্প ধ্বংস করতে মাত্র কয়েকটি নূতন ও ভীষণ বোমার দরকার। আমাদের সহরগুলিকে আক্রমণ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব।" —ফ্লেমিং।

আমরা কি করবো ?

"দৃঢ়, সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি স্থাপন—আক্রমণ থেকে আমাদের নিরাপদ করতে পারবে এমন একটি সামরিক শক্তি বজায় ও তার ব্যয়বহন।" আইসেনহাওয়ার।

"শেষ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করা যাবে না—শত্রুপক্ষের এই উপলব্ধি যুদ্ধের বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। ম্যাজিনো লাইন দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ করা যায় না। দেশরক্ষার যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৫০ কোটি ডলার।" —উইলসন।

"মাটির তলায় আশ্রয় গ্রহণ—" —পিটারসন।

"এক জায়গায় জমায়েৎ কমানো এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলিকে আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা···গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহ দ্রুত উৎপাদনের জন্য অগ্রিম প্রস্তুতি······ঘন বসতি এলাকা থেকে নূতন সংস্থাগুলি সরিয়ে ঘন বসতি এলাকাগুলির উপর আক্রমণ-সম্ভাবনা কমান যাবে না।" —ফ্লেমিং।

অটোগ্রাফ

(অপ্রকাশিত)

[এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গদ্যপঙ্‌ক্তি ও কাব্যখণ্ডসমূহ কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনা নয়। মাত্র কয়েকটি কথা, সামান্য কাব্যগন্ধ ও সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই আদিম মৈত্রীবন্ধন—যাদের মিলন খুঁজে পাওয়া যায় অটোগ্রাফের খাতায়। বহু স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীর এইরূপ সংগ্রহগুচ্ছ প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের কাছে প্রায়ই আসে, যেগুলিকে সামান্য জ্ঞানে এ যাবৎ মুদ্রণ করা হয়নি। পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রচনাসমূহ কবি শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতার পাতা থেকে নকল ক'রে দেওয়া হয়েছে। স্বাক্ষরকারিগণের পরিচয়দান নিষ্প্রয়োজন। —স]

মেঘের পরে চন্দ্র বিভা
আমার ঘরে আনে নিভা
একে হাসে আরে কাঁদে
এ কথার মানে কিবা ?

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড় কথা লিখে দোবার আমার সময় গেছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভাবচো বুঝি আছি আমি !
বহু দিনই নাই
ভালোবাসার মধ্যে শুধু
বেঁচে আছি ভাই।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ও মুখের পদ্ম হাসি যেন চির ফুটে।'

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী।

সুন্দর তব ধ্যানের কমল ফুটিবে যবে
তোমার নয়নে সেদিন আমার প্রকাশ হবে।
লীলা-চঞ্চল প্রাণ মম রবে স্তব্ধ হয়ে
মৌনী তোমার ধেয়ানের নীড়ে আকুল স্তবে।

নজরুল ইসলাম।

অবেলাতে ভাবছি বসে মনে মনে—
শেষের পাতায় কি লিখব এই শেষের ক্ষণে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অচেনারে চেনা হোলো চেনারে অচেনা
এইরূপে পাওনার মেটে শুধু দেনা।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিসি আপনার ক্রন্দন গাহিলে,
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী।

ঝুমকা রাণী

দুধ পাথরে তোমার নিখুঁৎ মূর্ত্তি গড়ি নির্জ্জনে।
আঙুর মিঠে অধর পুটে পিয়াস মিটাই তন্মনে।
জনম জনম এমনি করে লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে।
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া আমার স্মৃতির দর্পণে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আজীবন চেষ্টা করেছি একটি গান লিখতে।
অসংখ্য গান লিখেছি,—কিন্তু সেই একটি গান
আজ পর্য্যন্ত লিখতে পারলুম না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

। দাম্যত । দত্ত । দয়ধবম ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

যারে তুমি ভাঙ্গ গড় আপনার করে
জগতের ভাঙ্গা গড়া সে তো নাহি করে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কবির খাতার সাদা পাতাখানি
সব চেয়ে মোর ভাল লাগে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মানুষ চিরদিন বাঁচে না বলেই তার বাঁচার সাধ এত বেশি।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

এত লেখাতেও যদি বলা নাহি হয়ে থাকে, তবে
আর দুটো কথা লিখে সে কথা কেমনে বলা হবে ?

বুদ্ধদেব বসু।

একটুখানি শিশির, তাতেই ছায়া পড়ে আমার আকাশের।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

দ্বন্দ্ব-দ্বেষ বিপাকে ভরা জগৎ মরুভূমি
ইহার মাঝে চির শ্যামল হইয়া থেকো তুমি।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ঐ

যে সময়ে দানের অভাব ছিল না তখন বাংলাদেশের গ্রামে জলের অভাব ছিল না। সেই সময়ে ভুবনডাঙার জলাশয়ের সৃষ্টি। এই জলাশয়ের উপর চারিদিকের পাঁচখানি গ্রামের তৃষ্ণা নিবারণ ও ফসলক্ষেত্রে জলসেচন নির্ভর করে। ক্রমশই এর জল এসেছে শুকিয়ে, জলাশয়ের গভীরতা এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে, অসহায় গ্রামের লোকের দুঃখের অন্ত নেই। পঙ্কোদ্ধার করে এই জলাশয়কে যথাসম্ভব ব্যবহারযোগ্য করবার চেষ্টায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা বহুক্লেশে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের পক্ষে এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে সাহায্য করবার জন্যে আমরা সকলকে আহ্বান করি। একথাও স্মরণ করা কর্তব্য দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে প্রত্যহ তিনশত লোক এই কর্ম উপলক্ষ্যে অন্ন উপার্জন করতে পারছে, এমন অবস্থায় অতি সামান্য দানও মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আবেদন-পত্রের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি)

[শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভুবনডাঙা। সেখানকার গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করার উদ্দেশে বহু পুরোনো বাঁধটি নূতন ক'রে সমবায়-প্রচেষ্টাতে খনিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের কাছে লোকসেবার এই কাজে অর্থসাহায্যের জন্ম আবেদন জানান। এ সম্পর্কে ১৩৫৭ সালের ফাল্গুনের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত "প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।]

লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

মহৎ হৃদয়েরই এই কামনা—সিঁড়ির মতো হয়ে জীবনটা লোকের কাজে লাগুক। গুরুর মতো দূরের'থেকে উপদেশ না দিয়ে, নেতার মতো উপর থেকে হুকুম না চালিয়ে, অনেকে লোকসেবা জিনিসটা পছন্দ করেন লোকের প্রয়োজনে লেগে,—সে-রকম প্রয়োজনে, যে-প্রয়োজন লোকে নিজের থেকে বোধ করেছে,—বোধ করিয়ে দিতে হয়নি,—অর্থাৎ যে-প্রয়োজন-বোধ বাইরে থেকে চাপানো হয়নি। এমনি ধরনের কাজেই তাঁরা জীবন কাটিয়ে যান।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংবর্ধনা বা স্মরণোপলক্ষ্যে দেশশুদ্ধ সাড়া পড়ে যায়। সব সময় যে স্মরণীয়দের প্রতি অনুরাগবশত এ-সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে তা নয়, অনুষ্ঠাতাদের নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের পথে এই অনুষ্ঠানগুলিকে উপায় স্বরূপও ব্যবহার করা হয়। তা হোক, তবু দেখা যেতে পারে, কোন্ লোকের মধ্যে কতদিক দিয়ে অন্যের কাজে লাগবার এমন উপযোগিতা কতটা আছে। তাই দিয়েও তাঁদের মূল্য দাঁড়ায়।

পঁচিশে বৈশাখে দেখা দেয় দেশব্যাপী রবীন্দ্রোৎসব। রবীন্দ্রনাথ কখনো যদি কোথাও অন্যের অন্য উদ্দেশ্যসাধনেরও কাজে লেগে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সূর্যের আলো ভালোমন্দ নানা লোকের ভালোমন্দ নানা কাজ এগিয়ে দিচ্ছে, তার নিজের তাতে ক্ষয়বৃদ্ধি কিছুই ঘটবার নেই। সার্বজনীন ব্যাপ্তিই সৌর আলোকের সহজ কাজ।

লোকসেবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মূল কথাটি হচ্ছে—লোকের একটুকু কাজে-আসা, যাতে তারা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থকে নিজেদের

স্বাধীন বুদ্ধিবিচার ও চেষ্টার দ্বারা নিজেরা একদিন বুঝে উঠতে পারে। কাউকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাব নিয়ে তিনি অগ্রসর হননি। বড়ো জোর কথনোসথনো একটু পরামর্শ জুগিয়েছেন। যখন দেখেছেন অন্য কথায় লোকে ব্যস্ত, তিনি গোলযোগ না বাড়িয়ে লেগেছেন এসে নিজের কাজে। যেখানে আপন মনে নিজে কিছু করে তুলছেন,—সেখানে ডেকেছেন আদরের সঙ্গে সকলকেই তাঁর সব-কিছু কাজ দেখে যেতে। তা ছাড়া যখন লোকে ডেকেছে, গিয়েছেন ;—সকলের কাজ দেখেছেন এবং সুহৃদের মতো ভালোমন্দ দু'চার কথা প্রয়োজন মতো বলেওছেন। সে বলার মধ্যে খুশির তাগিদ ছিল, আবার কর্তব্যবোধও ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কথা নানাদিক দিয়েই আমাদের কাজে লাগবার মতো। তা যেমন গুরুর উপদেশের গুরুত্ব বহন করে, তেমনি নেতার দৃঢ় নির্দেশেরও শক্তি রাখে ; যখন যেভাবে যাদের কাছে তা খেটে যায় তারাই সেভাবে সে-সব ক্ষেত্রে তার মর্ম বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি-যে সকল ক্ষেত্রেই লোকের ভিতর থেকে আত্মবিকাশের সাধনাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন,—এইটি আমরা লক্ষ্য করতে পারব, তাঁর স্বদেশী যুগের লেখা থেকে শুরু ক'রে শেষদিনকার ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' অবধি সব-কিছুতে।

তিনি বলেছেন—"আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন, রাষ্ট্র ব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উলটো পথ দিয়ে এমনতরো বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।" সে সঙ্গে তিনি আরও বলছেন, "আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সে উৎস কখনও শুষ্ক হয় না। পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে।···যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টি-কাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি। আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে।"

তিনি যে বরাবরই লোককে কী শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে এসেছেন, এবং লোককে উপরে ওঠবার সিঁড়ির মতো ব্যবহার না

[বর্ধমান বিভাগীয় সমবায়-কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন- ভাষণের প্রথম খসড়ার পাণ্ডুলিপি। দ্রঃ "প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ," 'মাসিক বসুমতী' ১৩৫৭, ফাল্গুন]

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এই খানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

সেই আসন আজ [illegible] প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের বক্ষপুটে। শ্রীকে তাঁহার স্বক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা ইতঃপূর্বে ভুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ অনাচার লোকালয়ের জীবনকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই; শ্রীহীন অবসন্ন দেশে যমরাজের শাসন দিনে দিনে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লিভূমির নিঃস্ব বুকে পুনঃ সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাহার নিরানন্দ অন্তরের ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; জ্ঞানের দ্বারা, স্বাস্থ্যের দ্বারা, সেবাদ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা

ক'', তাদের ভিতরকার মহৎ সত্তাকে কিরূপ সত্য ক'রে উপলব্ধি করেছেন, তাদেরও আত্মোপলব্ধি ঘটাবার জন্যে কোথায় কতটুকু কী কাজের পত্তন করেছেন,—এ একটি তাঁর বিশেষ পরিচয়। এরূপ কাজের ক্ষেত্র ছিল তাঁর শ্রীনিকেতন। তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একখানি পত্রে লেখেন, "এটা খুব করে বুঝেচি আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোট আকারে তারি নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত। যাই হোক কিছু মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্চি দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে—তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেচে। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩০ (চিঠিপত্র ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫)। কোনো এক সময়ে সেখানকার বার্ষিক উৎসবে তিনি বলেন,—"প্রজারা যা চায়, প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের হয়ে ওঠে।"

লোকের এই আবিষ্কার করে নেবার পথে সহায়তার জন্যই কবি খুঁজেছেন,—লোকে কী চায়। শিক্ষার অভাব আছে, অন্ন ও স্বাস্থ্যের অভাব তো প্রত্যক্ষই, তার সঙ্গে যে গ্রামের মধ্যে গান বাজনা, কীর্তন, শাস্ত্রপাঠও দরকার, সেটাও যে এ দেশের চিরন্তন চাওয়া,—তার মধ্যে দিয়েই যে লোকের প্রাণ মিলেছে,—সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আলো প্রকাশ পেয়েছে,—এ বিষয়টি কবির চোখ এড়ায়নি।

কোনো বিশেষ মত প্রচারের উদ্দেশ্যে সভাসম্মেলন, বক্তৃতা, ইস্তাহারবিলি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণে ছায়াছবি দেখানো, প্রদর্শনী, কুচকাওয়াজ, মিছিল,—এগুলি আধুনিক উপায়। বিদ্যালয়-পরিচালনা আরো কিছুটা স্থায়ী ধরনের চেষ্টা। কবির কাজের ক্ষেত্রে এ সকলের সাহায্যগ্রহণ বর্জিত না হলেও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়নি। তিনি ঠিক যা বলেছেন, ও যা করতে চেয়েছেন—তার মধ্যেকার মনোভঙ্গিটুকু নিয়েই আমাদের কথা। সেটা ডিক্‌টেটরি নয়, সংবেদনশীলতায় তার মূল নিহিত। এ দেশে ভিখিরিও গান গায়, তারা বোবা হয়ে ভিখ মাগে না। কবি, কীর্তন, যাত্রা, একটা কিছু না হলে বারোয়ারি জমে না। ছড়া কেটে গালও যেমন চলে, আদর করাও হয় তাতেই।—রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসেবায় আগে লোকের সঙ্গে মন মিলিয়েছেন। তাদের সুখদুঃখসমস্যা বুঝতে গিয়ে তাদের সুকুমার শিল্প ও আনন্দের আসরগুলিকে উপেক্ষা করেননি, সেখানে তাদের সঙ্গে বসে তাদের আনন্দ জোগাবার প্রয়োজন যে অনুভব করেছেন, এইটুকুই তাঁর মনোভাব ও কর্মের বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলেছেন,—"আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা ব'লে মনে করিনি। আমরা জানি, গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় উঠেছিল। তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ উৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। * * * আমি * * বলি, * * জ্ঞানবিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে সর্ব-সাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে, * * মানুষের শক্তি নানাদিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনো একটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।"

শুধু খাওয়া-পরার সমস্যাটাকেই একান্ত করে দেখলে, সাধারণ লোকদের নেহাত দরিদ্রের স্তরে নামিয়েই দেখা হত, সেটা হত তাদের প্রকারান্তরে অপমান করা। মানুষের খেয়ে-প'রে বেঁচে-থাকাটা হচ্ছে পৃথিবীতে তার চরিত্র ও জ্ঞানধর্মশিল্প সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য। সাধারণের পক্ষেও সেই সংস্কৃতির দিকটার প্রাধান্য স্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাদের যে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন সেটুকু বুঝতে আশা করি আমাদের ভুল হবে না। তিনি চেয়েছেন, তাঁর কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক না হয় দুঃখ নেই, কিন্তু ঘনিষ্ঠতায় যেন বাধা না ঘটে। কেন না, তাঁর কাছে সেইটিই সার্থকতার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। উত্তুঙ্গ চূড়ায় বসে থাকলে সে সার্থকতা ঘটবে না। ভালো করবার জন্যে ভালোবাসা নয়,—ভালোবাসাটাই চাই আগে। গ্রামবাসীদের উপরে সেই ভালোবাসা অনুভব করেছেন ব'লেই, গ্রামের লোকের যা প্রাণের জিনিস তাও কবির ভালোবাসা লাভ করেছে। তিনি তাঁর কর্মীদের ডেকে বলেছেন—"সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গানবাজনা, কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি ক'রে দাও। আমি বলব, এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তাহলেই প্রকৃত ভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।" এই ভাষণের মধ্যে "যেমনটি ছিল" এই কথাতে লোকের অতীত সমৃদ্ধিতে কবি যেমন আনন্দ জানিয়েছেন, তার বৈশিষ্ট্যকেও তেমনি তিনি শ্রদ্ধা দিয়েছেন।

তাদের মধ্যে কোথাও যদি কিছু অশ্রদ্ধেয় থাকে, তাতে আহত হয়ে দূরে সরে না গিয়ে, তাদের গানের আসরে বসে মন মিলিয়ে আনন্দ জোগাতে পারলে, তাদের মন স্বভাবতই একদিন আকর্ষিত হবে। এবং তখন,—নিজের মধ্যে তাদের সম্বন্ধে ভালো করবার যদি কিছু প্রেরণা ও উপায় থাকে,—আপনি তা সহজে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ুর মতো যখন লোকে যাবতীয় শিক্ষা ও অনুষ্ঠানকে অনুভব করবে, তার গ্রহণবর্জনের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভ্যাস হবে,—তখনই মাত্র রবীন্দ্রনাথের লোকসেবার এই আদর্শ হতে পারে সার্থক।

লোকসেবার ক্ষেত্রে "ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে উপর থেকে" এই মনোভাবের বর্জন চাই। কবি বলেছেন,—"গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষা করা চাই।"

জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এরূপভাবে সকলের মধ্যে গিয়ে মিশতে পারেননি। কিন্তু তাঁর 'গুরু' বা 'অচলায়তন' নাটকের "দাদাঠাকুর" কতকটা তা পেরেছিল।

আজ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও দিনে দিনে যখন সর্বত্র তাঁর স্মরণঅনুষ্ঠানের প্রসার ঘটছে, তখন স্বভাবতই মনে হয় কায়িকভাবে তিনি বর্তমান না থাকুন, তিনি বেঁচে আছেন তাঁর সহজ সার্বজনীন এমন সব উপযোগিতায়, যার সাহায্য ও সাযুজ্য অবলম্বন না করলে কারো চলে না, এমনকি

তাঁর বিরুদ্ধ-কিছু করতে হলেও হয়তো তাঁকেই সামনে খাড়া রেখে তা করতে হয়। এতই তিনি সকলের।

এই কবিই একস্থলে বলেছেন: "সুশাসন এবং ভালো আইন মানুষের চরম লাভ নহে; মানুষ মানুষকে চায়, মানুষ হৃদয়কে চায়; তাহা যদি সে না পায় সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড পৃ ৬১৩) রবীন্দ্রনাথ যা বহুকাল আগে সেই স্বদেশীযুগে বলেছিলেন, তা যে কত সত্য, আজ প্রত্যক্ষ ঘটনা-সকল দেখে আমরা তা বুঝতে পারি। সেদিন যে অতৃপ্তির ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন, আইন এবং শৃঙ্খলার শত জালে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেও সুসভ্য ইংরেজের সুকঠিন শাসনচক্র ভারতবর্ষের সেই ঘনীভূত অতৃপ্তির "ভারত ছাড়ো"-নামক আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারল না, ইংরেজ শেষ পর্যন্ত সরেই গেল। যাদের নিয়ে কাজ, তাদের প্রতি অনাত্মীয়তার দূরত্ব রেখে চললে,—যেখানে স্বভাবত আছে যোগ, সেখানেও বিয়োগের ব্যর্থতাই একদিন মানুষকে পীড়িত করে;—কবি এ কথা জানতেন ব'লে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের গোড়াতেই তিনি বলেছিলেন,—"যাই হোক একদিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্র লোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি"—('স্মৃতি গ্রন্থ, পৃ: ৭১)। অন্তরের মধ্যে নিজেকে অনাবিল রেখে বাইরে মানুষের সঙ্গে সরল মেলামেশায় অন্তরঙ্গতা লাভ করা এবং প্রজাপতির দানকে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে হতে আবিষ্কাররূপে পাইয়ে দেওয়া—এই সহজের সাধনা যে কত কঠিন, কত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি যে এতে আবশ্যক হয়, তা উপদেশ-নির্দেশের সাধারণ মনোবৃত্তি নিয়ে বোঝা সহজ নয়। লোকসেবার নানা ধরন আছে; এই ধরনটি এই গুণেই বিশিষ্ট।

'অচলায়তনে'র' দাদাঠাকুর দর্ভকদলের মধ্যে মিশে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে তাঁর মানের স্তরে মেলে না, কিন্তু প্রাণের ভালোবাসার দ্বারা তিনি তাদেরই এক জন হয়ে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে কোথাও তাদের বাধে না। অলক্ষিত সহজ প্রভাবে তিনি তাদের দীন পরিবেশকে নোংরামির হাত থেকে রক্ষা ক'রে চলেছেন। তারা নাম-গান ধরেছে, নানাদিকেই তাদের আচার ও রুচি পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ভিতর থেকে, ক্রমে ক্রমে আপনাকেই তারা খুঁজে পাচ্ছে দাদাঠাকুরের মঙ্গলপ্রেরণার মধ্যে। এজন্য দাদাঠাকুরের নির্দেশ উপদেশের দরকার হচ্ছে না, তিনি ওদের-দেওয়া মাষকলাই আর ভাত, ওদের দেওয়া পিঠে খেয়ে ওদের সুখদুঃখের খবরাখবর রেখে চলেছেন, এটুকুই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এতেই কাজ হচ্ছে। বাইরে থেকে 'পঞ্চকে'র কাছে পর্যন্ত সেটা আশ্চর্যের বিষয় হয়েছে:—

"দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

পঞ্চক। এ কী। এ যে দাদাঠাকুর। গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে। তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।　[প্রস্থান।

*　　*　　*　　*

পঞ্চক। * * * এখন, আমি ভাবছি তোমাকে [দাদাঠাকুরকে] ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিলিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।"

যেদিন দরকার হল, অবস্থা ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, দাদাঠাকুর যোদ্ধৃবেশে যেখানে অভিযান করেছেন অন্যায় রীতিনীতির অচলত্ব ভাঙতে, সেখানে দর্ভক যূনক দলের মধ্যেও সংগ্রামের সম্মুখীন হতে সহজভাবেই টান পড়েছে ভিতর থেকে। বিন্দুমাত্র ভয়ভাবনা নেই। কিন্তু আবার সংগ্রামের পালায় তাদের কাজটি সারা হতেই যথাস্থানে গিয়ে তারা নূতন জীবন গড়ার কাজে লাগল। দাদাঠাকুরের মন্ত্র নেই তন্ত্র নেই,—অথচ জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দেবার মতো সবটাই কেমন অবলীলায় ঘটে চলেছে।—এই জাদুই রবীন্দ্রনাথের লোকসেবারীতির প্রভাব। "অচলায়তনে"র দাদাঠাকুরের মধ্যে যার ঝলক দেখি, "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর জীবনেও সেই প্রেরণার আলো ও কার্যরীতিই বিচ্ছুরিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঐ প্রেরণার আলোকেই দেশের যথার্থ মুক্তি দেখেছিলেন, ব্রতী হয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ লোকসেবায়, গিয়েছিলেন গ্রামের লোকের কাছে,—একেবারে তাদের গ্রাম্য পরিবেশের মাঝখানে করেছিলেন তাঁর নিখিল মানবের সেবার আয়োজন।

"সংস্কার হচ্ছে অজ্ঞতার গর্ভজাত শিশু।"
— হ্যাজলিট

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ভারত নট।—কিন্তু সেই আভিধানিক উদ্ধত ভাবটির সুস্থিরতা ঘটল,—আর্য্যপূর্ব মহাদেবের এই একটি মাত্র মহাবাক্যে।—অর্থাৎ যদি থাকতে চাও, তবে থাকো, কিন্তু আমাদের স্থিতি-ধর্মের সঙ্গে বিমিশ্রিত হ'য়ে থাকতে হবে। তোমারটিও আমি নেব, আমারটিও তুমি নাও।—এই পদ্ধতি। নয়তো, তফাৎ যাও।

স্বীকার করে নিয়েছিলেন দ্রুহী ব্রহ্মা।

সেই মিলনের অনিন্দ্য সমন্বয়ের,
সমন্বয়ের মহোৎসবে,
উৎসবের আমন্ত্রিত অভিনয়ে,
লক্ষ লক্ষ চরণে বেজে উঠল
মৈত্রীর নূপুর।

সেই নূপুররণনতার ইঙ্গিত আভাসে তোমাদের দিলুম। এখানে উঠল না কোনো রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন, বা মীমাংসার অর্থনৈতিক সমারম্ভ। অসম্ভব সোহাগে এখানে ফুটে উঠল,—কঠিনা সংস্কৃতি এবং নিগূঢ়া রসোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রপুষ্প। সেই সুরভি-ভার-স্নিগ্ধ ক্ষেত্রপুষ্পই ভারতবর্ষের শালীনতা। আদিম ভারতবর্ষ, ভালো বলেই, মহান্ আদরে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল ঐ আভিধানিক দ্রুহী বিরূপতাকে। সমান-সমাদরে শুদ্ধ ঔদ্ধত্যের মধ্যে তাই প্রবেশ করল অনুদ্ধত শালীনতা। তারি নামকরণ করেছেন মহাদেব,—"চিত্র"।

ভারতবর্ষ এই বিচিত্র "চিত্র";—পুঞ্জিত "মহা-চিত্র"। এর মধ্যে আছে, মানুষকে সত্য-মানুষ বলে গ্রহণের অঙ্গীকার। তাই, এই অঙ্গীকরণ—এই "করণ"; তাই এই অঙ্গহরণ—এই "অঙ্গ-হার"। যুদ্ধ-প্রমোদিত বীর সেনার এটি অবদান নয়,—এটি মহামানবদের মৈত্রীর নিঃসীম দান।

* * * *

মহাদেবের মহাবাণীতে বিহ্বল হয়ে গেলেন দ্রুহী ব্রহ্মা। তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন। তাঁর কাছে মহাদেব এখন—"সুর"।

"প্রয়োগং অঙ্গহারাণাম্ আচক্ষ্ব সুর-সত্তম।
ততস্তণ্ডুং সমাহুয় প্রোক্তবান্ ভুবনেশ্বরঃ।" (Sl. 17)

অনুবাদ:—"সুর-সৎ-তম, এই অঙ্গহারগুলির প্রয়োগ আমাদের বলুন। বাণী শুনে, তণ্ডুকে আহ্বান করলেন মহাদেব। বল্লেন—ভুবনেশ্বর।"

* * * *

ভারত নট।—অকস্মাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে,—"করণ" বলতে মহাশয় কী বোঝেন? তার উত্তরে সরাসরি বলব,—নর্ত্তনের যেটি সাধক সেইটিই "করণ"। সেই প্রসাধিত সাধনাগুলিই যদি তোমরা সুষ্ঠ এবং অবহিত চেতনা নিয়ে অভ্যাস কর, তাহলেই ঘটবে নৃত্ত-ক্রিয়ার নিষ্পত্তি। কেমন করে এগুলি অভ্যাস করতে হয়, শ্রীভরতমুনিই ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবেন তোমাদের। কিন্তু,—সেইগুলিই তিনি বোঝাবেন, যেগুলি প্রসিদ্ধ "করণ"। আরো অনেক রয়েছে "করণ"। তৈরী করতেও পারা যায়। যেমন ঘটেছে দ্রাবিড়ের কথাকলি-ক্ষেত্রে। অনেক ঘরোয়ানি ঠাট গড়ে উঠেছে "করণের।" বাধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে নৃত্ত সৃষ্টি-পদ্ধতির প্রসিদ্ধ "করণ"গুলি যদি ভেঙে ফেল, তাহলে ক্ষুণ্ণ হবে ভারতীয় শিল্প-নীতিনৈপুণ্য। যদি সামর্থ্য থাকে, বিরচন কোরো নব নব "করণ"-কিন্তু দেখো, যেন অ-ভারতীয় না হয়। এই শ্রীভরতনাট্য-শাস্ত্রে সেটির লাগ হবে না।

ভিন্নমার্গে মনুষ্য যখন ধায়, তখন প্রতিবন্ধক হ'তে বাসনা করেন না কোনো শিল্পী। শ্রীভরতও বাসনা করেন না। তোমরা গড়ে তুলতে যদি পার, গড়ে তোলো। বিপুলতর এবং মহত্তর গঠনের তোমরা হবে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু মনে রাখা উচিত, ধ্বংস হয় না সৌন্দর্য্য! শাশ্বতী তার শোভা।

তার পরেই প্রশ্ন উঠবে;—"অঙ্গহার" বলতে কী বোঝায়। অমরকোষ এক কথায় এর মধু-ব্যাখ্যা দিয়েছেন "অঙ্গবিক্ষেপ"। বোঝা শক্ত, কথাটি এতই সহজ নয়। কিন্তু নৃত্যক্ষেত্রে এইটিই অঙ্গবিক্ষেপের মধুব্যাখ্যা। নব রস এবং হাব ও ভাবের সমন্বয় করে যখন একটি অঙ্গ বিবিধ চঞ্চলতার মাধ্যমে অঙ্গ-অঙ্গে স্থানান্তরলাভ করে, নখ থেকে কেশ পর্য্যন্ত যা কিছু রয়েছে দেহের,—অঙ্গুলি-বিন্যাস থেকে দৈহিক সমগ্রতা পর্য্যন্ত নর্ত্তন-বিধানে যখন লাভ করে পরিপুষ্টি, তখনই ঘটে যায় "অঙ্গহার"। প্রাচীনেরা তাই বলেন। বহুতর নায়ক এবং নায়িকাদের মিলিত-নর্ত্তনের প্রয়োজনার মধ্যে এই "অঙ্গহার" প্রযোজ্য।

* * * *

মহাবাক্যের সমুচ্চারণ ক'রে ভুবনেশ্বর মহাদেব তখন প্রীতির প্রমুদিতায় মত্ত হয়ে, আহ্বান করলেন তণ্ডুকে। (অনেকে বলেন তণ্ডুই "নন্দী",—বিচার্য্য!)।

আদেশ দিলেন তণ্ডুকে—

"ভরত-কে অঙ্গহারগুলির প্রয়োগ-বিধান বুঝিয়ে দাও। এমন ক'রে বুঝিয়ে দাও, যাতে সে দেখতে পায়।"

* * * *

"ততো যে তণ্ডুনা প্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারা মহাত্মনা
নানাকরণসংযুক্তান্ ব্যাখ্যাস্যামি সরেচকান্।"
(Sl. ১৮)।

ভারতনট। শ্রীভরতমুনির কাছে তখন তণ্ডু হ'য়ে গেলেন, মহাত্মন্। তণ্ডুর আত্মা অতি মহৎ। পূজার নৈবেদ্যের মত তিনি তখন সর্বসমক্ষে ধরে দিলেন, প্রকাশ করে দিলেন তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য,—

বিনাদ্বিধায়! তাঁর মাধ্যমেই আর্য্য-নৃত্যে প্রবেশ করল এই নবীন নৃত্যালঙ্কার—"অঙ্গহার"। তাঁর পরিভাষাতেই আমি এখন ব্যাখ্যান করব "করণ"-সংযুক্ত, "রেচক"-সনাথ অঙ্গহারগুলি।

দাঁড়াও বন্ধু। নূতন একটি কূট-কথার আবির্ভাব হয়েছে। "রেচক"। এটি আবার কি? এখানে সুশ্রুতের ব্যাখ্যা অবিধেয়। নৃত্যের মধ্যে আবার রেচক কি? হাস্য-জনক ব্যাপার।

তাই নৃত্য-শিক্ষার পূর্বাহ্নেই আমাকে থামতে হোলো। বলতে চাই—এর অর্থ। এই "রেচক" বা "রেচিত" থেকেই নৃত্যকলার প্রারম্ভ। "করণ" এবং "রেচক" এই দুইটিই, অঙ্গহার-সংগঠনের প্রধান উপায় এবং আত্মা।

"রেচিতা বিধুতা ভ্রান্তা ভাবে মথন-নৃত্তয়োঃ।"

(ভঃ নাঃ শাঃ ৮,১৭৩)

আশ্চর্য্য! এই চরণটিরও আবার পাঠান্তর পাওয়া যায়।

দুটি পাঠান্তর :—

(১) "রেচিতা বিধুতা ভ্রান্তা ভাবোম্মথননৃত্তয়োঃ।"

এবং (২) "রেচিতা বিধুতা ভ্রান্তা ভাব-কথন-নৃত্তয়োঃ।"

শ্রীভরতমুনি আরও বলেছেন—

"রেচিতৌ চাপি বিজ্ঞেয়ৌ হংসপক্ষৌ দ্রুতভ্রমৌ
প্রসারিতোত্তানতলৌ রেচিতাবিতি সংজ্ঞিতৌ।"

(ভঃ নাঃ শাঃ। ৯,১৯৩)

যখনকার যে ভাব, সেই ভাবটি প্রকাশের উপযোগী ক'রে সম্পাদনা করতে হবে নৃত্যকলা। সেই নৃত্যের আচরণের সময়ে মণ্ডিত হতে থাকবে গাত্র—প্রসারিত হবে দ্রুতভ্রমী হস্তদ্বয়;— যেমন হংসদম্পতি আনন্দিত মিলনের অবকাশে কাঁপাতে থাকে তাদের বিস্তারিত শুভ্র পক্ষ। উত্তানিত (চিৎ-করণ) হয়ে থাকবে করতল দুটি। এই হচ্ছে "রেচিত"।

"মথন" এবং "কথন" এই দুটি শব্দের পাঠ-ভেদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে ভারতবর্ষের দ্বয়ী নৃত্য-পদ্ধতি। "কথা-কলি" নৃত্যের জন্মদাতা হয়ে রয়েছেন এই "কথন" শব্দটি। শ্লোকের ছন্দ ও ধ্বনির মধ্যে আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, "মথন-নৃত্তয়োঃ;"—শব্দটিই শুদ্ধ মহাদৈবিক। নাচ নিজেই কথা বলবে, কথা যদি নৃত্যকে বোঝায়, সে নৃত্য নৃত্যই নয়। প্রয়োগনৈপুণ্যের হানি ঘটে।

* * * *

তণ্ডু-কথিত প্রসিদ্ধ অঙ্গহারের নামগুলি নিম্নে সংখ্যিত হোলো। যথা :—

প্রসিদ্ধ অঙ্গহার

১।	স্থিরহস্ত	২।	পর্য্যস্তক
৩।	সূচীবিদ্ধ	৪।	অপবিদ্ধ
৫।	আক্ষিপ্তক	৬।	উদ্ঘট্টিত
৭।	বিষ্কম্ভ	৮।	অপরাজিতা
৯।	বিষ্কম্ভাপসৃত	১০।	মত্তাক্রীড়'
১১।	স্বস্তিকরেচিত	১২।	পার্শ্বস্বস্তিক
১৩।	বৃশ্চিক	১৪।	ভ্রমর
১৫।	মত্তস্খলিত	১৬।	মদাদ্বিলসিত
১৭।	গতিমণ্ডল	১৮।	পরিচ্ছিন্ন
১৯।	পরিবৃত্তিরেচিত	২০।	বৈশাখ-রচিত
২১।	পরাবৃত্ত	২২।	অলাতক
২৩।	পার্শ্বচ্ছেদ	২৪।	বিদ্যুৎ-ভ্রান্ত
২৫।	উরুদ্বৃত্ত	২৬।	আলীঢ়
২৭।	রেচিত	২৮।	আচ্ছুরিত
২৯।	আক্ষিপ্তরেচিত	৩০।	সম্ভ্রান্ত
৩১।	অপসর্প	৩২।	অর্দ্ধনিকুট্টক।

(Sl-১৯-২৭)

* * * *

শ্রীভরত।—

"এতেষাং তু প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং করণাশ্রয়ম্
হস্তপাদপ্রচারশ্চ যথা যোজ্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ। (Sl ২৮)
অঙ্গহারেষু বক্ষ্যামি করণেষু চ বৈ দ্বিজাঃ
সর্বেষাং অঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করণৈঃ যতঃ। (Sl ২৯)
তান্যতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি নামতঃ কর্মতস্তথা
হস্তপাদসমাযোগো নৃত্যস্য করণং ভবেৎ।" (Sl ৩০)

অনুবাদ—

[এই যে অঙ্গহারগুলির কথা বলা হোলো, সেই অঙ্গহারগুলির প্রয়োগ কিন্তু "করণ"-গুলির আশ্রয় নিয়ে। প্রযোক্তারা (Directors) যেমন যখন অভিলাষ করবেন তেমনি প্রয়োজন মত তাতে যুক্ত করে নেবেন "করণ"। কোথায় হাত রাখতে হবে, কোথায় ফেলতে হবে চরণ, তাঁরাই নির্দ্দেশ দেবেন তার প্রচার সম্বন্ধে। হে দ্বিজগণ, কিন্তু একটি বাণী স্মরণে রাখবেন, "করণ"গুলিই— সাধন করে সমস্ত অঙ্গহারের নিষ্পত্তি। নামতঃ এবং কর্ম্মতঃ এই দুটির ব্যাখ্যান করব আমি।"]

শ্রীভরতমুনি বললেন—

"দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা—
দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ চতুর্ভিঃ বাপ্যঙ্গহারস্তু মাতৃভিঃ।

(Sl. 31)

ত্রিভিঃ কলাপকং চৈব চতুর্ভিঃ মণ্ডকং ভবেৎ।
পঞ্চৈব করণানি স্যুঃ সংঘাতক ইতি স্মৃতঃ।

(Sl. 32)

ষড় ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্নবভিস্তথা
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

(Sl. 33)

[অনুবাদ]

"দুটি নৃত্য-'করণ' সৃষ্ট হলে, সৃষ্টি হয় "নৃত্য-মাতৃকার"। দুই, তিন বা চার মাতৃকা নিয়ে সৃষ্টি হয় অঙ্গহার।

তিনটি মাতৃকা নিয়ে যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলে "কলাপক"; চারটি মাতৃকা নিয়ে যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলে "মণ্ডক"। পাঁচটির নাম "সংঘাতক"। এইটুকুই সকলে মনে রাখেন স্মৃতির সাহায্যে। ষট্ বা সপ্তম বা অষ্টম বা নবম, যেগুলি রয়েছে—সেইগুলিকে নিয়েও প্রকীর্ত্তিত হয় "অঙ্গহার"।

* * * *

ভারতনট।—

১ নৃত্য-সৌন্দর্য্যের প্রথম প্রবেশ হয় এই 'মাতৃকা'র "করণ"-বিলাসে।

"অঙ্গহারের" প্রয়োগ-বিধি যখন বিচারিত হবে তখন তোমরা "কলাপক", "মণ্ডক", "সংঘাতক" শব্দগুলির নিষ্ঠা এবং অর্থ জানতে পারবে। এখন নয়। প্রয়োগশৈলিত্বের অধিকার না পেলে কেমন করে করবে তোমরা প্রয়োগ? আদিম ভারতবর্ষের সকলেই বিদিত ছিলেন এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য। আর্যেরা ছিলেন না। তাই উপরার্ধ উদ্ধৃতি করলুম। (Symphony of the Ninth)।

কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জাগছে। এই "নৃত্য-মাতৃকারা" কাঁরা? হঠাৎ কোথা থেকে হোলো এঁদের আবির্ভাব? সংসারে যিনি মাতৃস্থানীয়া, ধাত্রীস্থানীয়া,—গুহা-স্থানীয়া,—তাঁকে, সব সময়েই বিস্মৃত হয় নতুন-ফোটা ছেলে। যেমন সংসারে, তেমনি নৃত্তে। ব্যতিক্রম ঘটাননি বিধাতা।

যেই নট ও নটী নাচ আরম্ভ করল, তখনই প্রেক্ষকের চোখে ধরা পড়ে গেল,—"এঁদের কে নাচায়?"

খুঁজতে লাগলুম আমিও। খুঁজে পেলুম,...আমার "নৃত্য-মাতৃকাটিকে"। তিনিই প্রাধানিক-বৈশিষ্ট্যে রচনা করেন অঙ্গহার। একটা মুক্তো দিয়ে কি হার গাঁথা যায়? না। তাই নৃত্যের প্রতি-গঠনটিকে—বিনিসুতোয় গাঁথছেন নিজে। তাই সম্ভব হয়েছিল এই নৃত্য-মুক্তা-লহরের সৃষ্টি। গ্রীবার মধ্য দিয়ে অষ্টনাড়িকার প্রবাহধ্বনি যেমন বইছে, তেমনি নৃত্যের মধ্যেও বইছেন এই "নৃত্য-মাতৃকা"। (সুশ্রুত)।

শ্রীভরতমুনি "করণ" সম্বন্ধে মহাদেবের কাছ থেকে যা জেনেছিলেন সেইগুলিকে নিম্নলিখিত তালিকায় নাম-বদ্ধ করেছেন। যথা :—

১।	তলপুষ্পপুট করণ।	২।	বর্ত্তিত করণ।
৩।	বলিতোরু করণ।	৪।	অপবিদ্ধ করণ।
৫।	সমনখ করণ।	৬।	লীন করণ।
৭।	স্বস্তিক-রেচিত করণ।	৮।	মণ্ডল-স্বস্তিক-করণ
৯।	নিকুট্টক করণ	১০।	অর্দ্ধ-নিকুট্ট-করণ।
১১।	কটি-ছিন্ন করণ।	১২।	অর্ধ-রেচিতক করণ।
১৩।	বক্ষঃ-স্বস্তিক-করণ।	১৪।	উন্মত্ত-করণ।
১৫।	স্বস্তিক করণ।	১৬।	পৃষ্ঠস্বস্তিক করণ।
১৭।	দিক্ স্বস্তিক্ করণ।	১৮।	অলাত-করণ।
১৯।	কটি-সম-করণ।	২০।	আক্ষিপ্ত-রেচিত-করণ।
২১।	বিক্ষিপ্ত-আক্ষিপ্তক করণ।	২২।	অর্ধ-স্বস্তিক-করণ
২৩।	অঞ্চিত-করণ।	২৪।	ভুজঙ্গ-ত্রাসিত করণ।
২৫।	উর্দ্ধ-জানু-করণ।	২৬।	নিকুঞ্চিত-করণ।
২৭।	মত্তল্লি-করণ।	২৮।	অর্ধ-মত্তল্লি করণ।
২৯।	রেচক-নিকুট্ট করণ।	৩০।	পাদপ-বিদ্ধক করণ।
৩১।	বলিত করণ।	৩২।	ঘূর্ণিত করণ।
৩৩।	ললিত করণ।	৩৪।	দণ্ড-পক্ষ করণ।
৩৫।	ভুজঙ্গত্রস্ত-রেচিত করণ।	৩৬।	নূপুর-করণ
৩৭।	বৈশাখ-রেচিত করণ।	৩৮।	ভ্রমর-করণ।
৩৯।	চতুর-করণ।	৪০।	ভুজঙ্গাঞ্চিত-করণ
৪১।	দণ্ড-রেচিতক-করণ	৪২।	বৃশ্চিক-কুট্টন-করণ।
৪৩।	কটি-ভ্রান্ত করণ।	৪৪।	লতা-বৃশ্চিক করণ।
৪৫।	ছিন্ন-করণ।	৪৬।	বৃশ্চিক-রেচিত করণ।
৪৭।	বৃশ্চিক করণ।	৪৮।	ব্যংশীত-করণ।
৪৯।	পার্শ্ব-নিকুট্টক-করণ।	৫০।	ললাট-তিলক করণ।
৫১।	ক্রান্ত-করণ।	৫২।	কুঞ্চিত-করণ।
৫৩।	চক্র-মণ্ডল-করণ।	৫৪।	উরো-মণ্ডল-করণ।
৫৫।	আক্ষিপ্ত-করণ	৫৬।	তল-বিলাসিত করণ
৫৭।	অর্গল-করণ।	৫৮।	বিক্ষিপ্ত করণ
৫৯।	আবৃত্ত-করণ।	৬০।	দোলা-পাদক-করণ।
৬১।	বিবৃত্ত-করণ।	৬২।	বিনিবৃত্ত-করণ।
৬৩।	পার্শ্বক্রান্ত-করণ।	৬৪।	নিশুম্ভিত-করণ।
৬৫।	বিদ্যুৎ-ভ্রান্ত করণ।	৬৬।	অতিক্রান্ত করণ।
৬৭।	বিবর্ত্তিত করণ	৬৮।	গজ-ক্রীড়িতক করণ
৬৯।	তল-সংস্ফোটিত করণ।	৭০।	গরুড় প্লুতক-করণ।
৭১।	গণ্ড-সূচীকরণ।	৭২।	পরিবৃত্ত করণ।
৭৩।	পার্শ্বজানু করণ।	৭৪।	গৃধ্রাবলীনক-করণ।
৭৫।	সন্নত করণ।	৭৬।	সূচী-করণ।
৭৭।	অর্ধসূচী-করণ।	৭৮।	সূচীবিদ্ধ করণ।
৭৯।	অপক্রান্ত-করণ।	৮০।	ময়ূর-ললিত করণ।
৮১।	সর্পিত-করণ।	৮২।	দণ্ডপাদ করণ।
৮৩।	হরিণপ্লুত-করণ।	৮৪।	প্রেঙ্খোলিত-করণ।
৮৫।	নিতম্ব-করণ।	৮৬।	স্খলিত-করণ।
৮৭।	করিহস্তক-করণ।	৮৮।	প্রসর্পিতক-করণ।
৮৯।	সিংহ-বিক্রীড়িত-করণ।	৯০।	সিংহাকর্ষিত করণ।
৯১।	উদ্বৃত্ত-করণ।	৯২।	উপসৃত-করণ।
৯৩।	তলসংঘট্টিতক-করণ।	৯৪।	জনিত-করণ।
৯৫।	অবহিথক-করণ।	৯৬।	নিবেশ-করণ।
৯৭।	এলকা ক্রীড়া-করণ।	৯৮।	উরুদ্বৃত্ত-করণ।
৯৯।	মদস্খলিত-করণ।	১০০।	বিষ্ণুক্রান্ত-করণ।
১০১।	সম্ভ্রম-করণ।	১০২।	বিষ্কম্ভ-করণ।
১০৩।	উদ্ঘট্টিত-করণ।	১০৪।	বৃষভ-ক্রীড়িত-করণ।
১০৫।	লোলিত-করণ।	১০৬।	নাগাপসর্পিত-করণ।
১০৭।	শকট-করণ।	১০৮।	গঙ্গাবতরণ-করণ।

(Sl. ৩৮-৫৪)

* * * *

ভারতনট।—শ্রীভরতমুনির কাছ থেকে এই এতগুলো নাম-করণ পেয়ে ঘাবড়িয়ে যাবে সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমি জানি, যাঁরা নর্ত্তক, তাঁরা ঘাবড়াবেন না। তার কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এই "করণ"গুলিই নটনশৈলী। নামাঙ্কিত ১০৮ প্রসিদ্ধ করণগুলির, একটি একটি করে, পরে ব্যাখ্যা চলবে। সেগুলি যদি শিখে নিতে পারা যায়, তাহলে পারদর্শী হওয়া যায় নৃত্তে।

* * * *

শ্রীভরতমুনি।—

"নৃত্তে যুদ্ধে নিযুদ্ধে চ তথা গতি-পরিক্রমে
গতিচারে প্রবক্ষ্যামি যুদ্ধ-চারীবিকল্পনম্।" (Sl. 56)
"যত্র তত্রাপি সংযোজ্যমাচার্যেন নাট্যশক্তিতঃ" (Sl. 57)

অনুবাদ। নৃত্ত-শাস্ত্রে, যুদ্ধ-শাস্ত্রে বা মল্ল-ক্ষেত্রে, অথবা গতি-পরিক্রমা বা গতিচারে, এই করণগুলির যুদ্ধচারী হিসাবে বৈবহার‍্যও দেখা যায়। সে কথা পরে বলব। নাট্যের শক্তির দিকে দৃষ্টি রেখে নাট্যশক্তি অনুধাবন ক'রে, আচার্য হ'ন যেখানে যেটির প্রয়োজন—সেই মত, এই করণগুলির সংযোজনা করতে পারেন।

* * * *

ভারতনট। শ্রীঅভিনব গুপ্ত এখানে একটি 'কিন্তু' বলছেন; আর বিশেষ ভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে সেই 'কিন্তুটি।' যদিও অভিনয়ে বস্তুত: এই ১০৮টি করণের প্রয়োগ চলে, অন্য ক্ষেত্রে সবগুলি উপযোগী নয়। কী লাভ হবে আমাদের, যদি আমরা যুদ্ধ, মল্ল ইত্যাদির কথা চিন্তা করি। তাতেও গতিচার পরিক্রমা আছে, কিন্তু আপাততঃ এই নৃত্ত-শাস্ত্রে সেগুলির পৃষ্ঠস্থান নেই। অতএব, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যদি কিছু বলে থাকেন শ্রীভরতমুনি, তখন সেটিকে বিচার করা যাবে। এখন আমরা এগিয়ে যেতে চাই নৃত্তে, নৃত্যের অভিনয়ে। আপাততঃ আমরা ১০৮টি "করণ" পেলুম। সহজ কথা নয়। হজম করা শক্ত, ঘুঙুরের বোল দিয়ে বাজানো আরো কঠিন। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি শ্রীভরতমুনির দ্রুত অগ্রসর-পদ্ধতি। বলছেন :—

"প্রায়েণ করণে কার্যো বামোবক্ষঃস্থিতঃ করঃ।
চরণস্যানুগশ্চাপি দক্ষিণস্তু ভবেৎ করঃ।"

(Sl. 57)

"হস্তপাদপ্রচারস্তু কটিপার্শ্বোরুসংযুতম্।
উরঃ পৃষ্ঠোদরোপেতং বক্ষ্যমাণং নিবোধত।"

(Sl. 58)

অনুবাদ।—"করণে"র প্রকাশকালে বাম-করখানিকে বক্ষঃস্থিত করতে হবে। এটি কার্য্য। কিন্তু চরণের অনুগামী হবে দক্ষিণ কর। হস্ত এবং পদের প্রচার, কিন্তু কটিপার্শ্ব এবং উরু সংযুত হয়ে যাবে। উরস্ এবং পৃষ্ঠের বিপুলতা থেকে উদরের উপর যা নিকটে পড়বে এসে বাম বা দক্ষিণ কর। এইটুকুন জেনে রেখো।

* * * *

"যানি স্থানানি যাশ্চার্যো নৃত্তহস্তাস্তথৈব চ।
সা মাতৃকেতি বিজ্ঞেয়া তৎযোগাৎ করণং ভবেৎ।

(Sl. 59)

অনুবাদ। অঙ্গের স্থানগুলিকে, গতির প্রচারটিকে, এবং নৃত্তহস্তের ভঙ্গিমার প্রচারটিকেও,—"মাতৃকা" বলে জেনো। সেইগুলির সংযোগেই "করণ" লাভ করে অস্তিত্ব।

* * * *

ভারতনট। শ্রীঅভিনব গুপ্তের টীকা আরো দুর্বোধ্য। ভালো লাগলো;—যখন তিনি এই ব্যাখ্যার মধ্যে দেখতে পেলেন, "স্থানকের" উপযোগিতা, গতিতে চরণ-কৌশল (চার্য্যঃ), পূর্বকায়ে ঝুঁকে পড়ছে নৃত্তহস্ত, স্থির-স্থিতিতে পতাকার বিলাস।

এসব কথা আমরা আপাততঃ গ্রহণ করব না। আমরা এগিয়ে চলবো শ্রীভরত মুনির বাক্যমর্য্যাদার সঙ্গে। টিপ্পনিতে টিকি কেটে লাভ কি?

* * * *

শ্রীভরত।—কটী কর্ণসমা যত্র কৌর্পরাংসশিরস্তথা।
সমুন্নতম্ উরশ্চৈব সৌষ্ঠবং নাম তদ্ভবেৎ।

(Sl. 60)

অনুবাদ।—যখন কটিদুটি, কনুই দুটি (কৌর্পর, elbows), স্কন্ধ, শিরোভাগ এবং বক্ষের বিশালতা কর্ণসম সমুন্নত থাকবে, তাকে বলবে "সৌষ্ঠব"।

* * * *

ভারতনট। এইটিই নৃত্যের প্রাথমিক ভঙ্গি। এর পরেই আসবে, আসল "করণের" সমুন্নতায়। তখন তোমরা আশা করি মুগ্ধ হবে।

এতটা হয়ে গেল শাস্ত্রালোচনা। এর পরে ঘুঙুরের শৃঙ্গার।

[ক্রমশঃ।

উত্তম ফলার

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাক ভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই।
নিখুঁতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা।
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে
উত্তম ফলার তাকে কই।

—রামনারায়ণ তর্করত্ন
(১৮২২—১৮৮৬)

মা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভুবনকে তুমি ক্ষুদ্র ভবন করি'
ঈশ্বরী, হয়েছিলে সারদেশ্বরী।
তুচ্ছ ক্ষুদ্র গৃহকাজে যেত দিন,
হৃদয় জগন্মঙ্গল ব্রতে লীন।
তুমি মহীয়সী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী—
মানবী হইয়াছিলে, দুখ-সুখ সহি'।
মহিমা তোমার ঢাকিয়া রাখিত বেশ,
পল্লীর বধূ বলিয়া জানিত দেশ।
অতি দুর্লভ, সুলভ হইয়া থাকে,
মহাকাল দেন পরে চিনাইয়া তাকে।
গৃহ-অঙ্গনে তোমার আসন পাতা
চিনিতে দাওনি তুমি যে জগন্মাতা।
বিশ্ব জুড়িয়া উঠিছে জয়ধ্বনি,
বিশ্ব-জননী তুমি গো সারদামণি!

যে মহাপুরুষের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উপায় আজ সমগ্র পৃথিবীতে আদৃত—যাঁহার প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ জড়বাদ-জর্জ্জরিত ইহকালসর্ব্বস্ব সভ্যতায় মোহান্ধ প্রতীচীকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিয়াছিলেন, সেই রামকৃষ্ণের ভক্তপরিবারের জননী—সারদামণি দেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে।

১২৬০ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জিলায় জয়রামবাটী গ্রামে দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারে সারদামণির জন্ম হয়। সে পরিবারে ধর্ম্মের প্রভাব ছিল—

"ধর্ম্মের যেমন বাস দরিদ্রের ঘরে,
তেমন কি হয় কভু ধনীর অন্তরে?"

সারদামণি তাঁহার পিতৃগৃহবাসের কথায় বলিয়াছিলেন :—

(১) "ছেলেবেলায় গলাসমান জলে নেমে গরুর জন্য ঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।"

(২) "ভাইদের নিয়া গঙ্গায় নাইতে যেতুম। আমোদর নদীই ছিল যেন আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের বাড়ী আনতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল।"

পাঁচ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণের সহিত সারদামণির বিবাহ হয়। উভয়ের বয়সে অনেক পার্থক্য ছিল।

অরবিন্দ রামকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন, ভগবানের অভিপ্রেত কি, তাহা তিনিই জানেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় অশিক্ষিত, পল্লীগ্রামে ইংরেজী প্রভাবে অস্পৃষ্ট, সরল বালককে—বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে পুরোহিতের কাজে আনিয়াছিলেন।

তেমনই তিনিই তাঁহার যন্ত্র রামকৃষ্ণের জন্য তাঁহারই উপযুক্ত পত্নী দিয়াছিলেন। সরলা, ত্যাগধর্ম্মশীলা, পতিগতপ্রাণা—সারদামণি হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারবশে স্বামীকেই দেবতারূপে সেবা ও পূজা করিতেন। আর স্বামীর অলৌকিক আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাই তিনি স্বামীর এক জন ভক্তের "তুমি কেমন মা?"—এই জিজ্ঞাসায় অনায়াসে বলিয়াছিলেন—তিনি আসল মা।

স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ নূতন দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সারদামণির আদেশ চাহিতেন—আশীর্ব্বাদ লইতেন।

গৃহে মা যেমন সংসারের কেন্দ্র—রামকৃষ্ণভক্ত-পরিবারে তিনি তেমনই মা ছিলেন এবং সেই জন্য তিনি "শ্রীশ্রীমা" বলিয়া অভিহিতা হইতেন।

তাঁহার স্নেহ যেমন অবারিত ছিল—পবিত্রতা তেমনই অগ্নির মত যাহাকে স্পর্শ করিত তাহাকেই কালিমাশূন্য পবিত্র করিত।

রামকৃষ্ণ স্ত্রীকে ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন—কাহারও যেন কখন কোনরূপ বিকার সঞ্চার না হয়। উভয়েই সমভাবে বিকারমুক্ত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগী। সারদামণি ছিলেন স্নেহযোগী। তিনি যে স্নেহের উৎসের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার পাবনী ধারা সকলকেই সমভাবে পূত করিত। স্বামীর মত তিনিও জিজ্ঞাসুদিগের সমস্যার সমাধান অতি সহজ ও সরল ভাবে করিয়া দিতেন—সে ক্ষমতা তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল।

এক জন ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সাধুর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভাল?" তিনি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন—"মন যদি এক স্থানে শান্তিতে থাকে, তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?"

এ যেন রামপ্রসাদের সেই কথা—

"কাজ কি আমার কাশী?—
মায়ের চরণ-তলে পড়ে আছে—
গয়া, গঙ্গা বারাণসী।"

আর এক দিন এক জন ভক্তে "আসন" অভ্যাস করিতেছেন বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "শরীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে শরীর খারাপ হয়, এই বুঝে করবে।"

তিনি ভোগ-বাসনা সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছিলেন। এক দিন রামকৃষ্ণের এক ভক্ত মাড়বারী রামকৃষ্ণকে দশ হাজার টাকা প্রণামী দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হইয়া স্ত্রীর সাধনায় সিদ্ধির স্তর বুঝিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার নামে দিতে চাহিতেছে; তুমি উহা লও না কেন? কি বল?" তাহাতে সারদামণি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, "তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না—আমি লইলে এ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না, সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে।"

সারদামণি স্নেহের উৎস ছিলেন বলিয়াই রামকৃষ্ণের ভক্তদিগের মত যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার মাতৃত্বের মাহাত্ম্যে অভিভূত ও ধন্য হইতেন।

তিনি স্বামীর মতই ধর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন এবং তাঁহারই মত যোগস্থ হইয়া সঙ্গত্যক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেন। ছুৎমার্গ তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংস দেব দেহরক্ষা করেন। দীর্ঘকাল সারদামণি অজ্ঞাতভাবে অসীম শ্রদ্ধা সহকারে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর বয়সে সারদামণির লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়। এই দীর্ঘ কাল তিনি সর্ব্বদা ধ্যানে, ধর্ম্মকার্য্যে, লোকের কল্যাণ সাধনে ব্যয় করিয়াছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি এক স্ত্রী ভক্তকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ; কেউ পর নয়; মা; জগৎ তোমার।"

তিনি এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন—সমস্ত জীবনের কাজে তাহাকেই মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন।

তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার মাতৃস্নেহে ধন্য হইয়াছিলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত—'বসুমতী' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী তাঁহাদিগের মধ্যে গণনীয়।

এই শত বার্ষিকীতে "শ্রীশ্রীমা"র পুণ্য আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করিলে জগতের কল্যাণ হইবে।

শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর জন্ম-কুণ্ডলী

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য
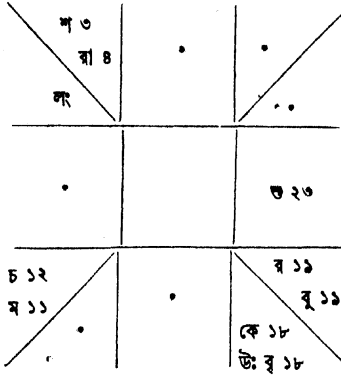
জন্ম শকাব্দা: ১৭৭৪।৮।৭।২৮।৩০

জন্ম লগ্নই পৃথ্বী বা দেহ, চন্দ্র মন এবং রবি আত্মা। শ্রীশ্রীমায়ের রাশি সিংহ; তাঁহার জন্মকালে চন্দ্র সিংহ রাশিতে এবং রবি ধনু রাশিতে ছিল। চন্দ্র, শুক্র ও বুধ—স্ত্রীজ্ঞাপক বা স্ত্রীস্বভাব এই গ্রহ তিনটির মধ্যে চন্দ্রই প্রধান। সুতরাং নারীজাতকের রাশির গুরুত্ব রহিয়াছে। সিংহ রাশির প্রকৃতি উদার ও সংহত; কর্কট জলরাশি তাহাকে সংহত করিয়া সৃষ্টির কাজে লাগায় সিংহ।

সিংহের প্রকৃতি স্থির; ভাদ্র মাস সিংহ লগ্নের মাস; শরতের বিকাশ এই ভাদ্রে। ভাদ্রের নৈসর্গিক ভাব অনুধাবনে সিংহের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। মহিমময়ী মাতৃভাবের উদারতা প্রসন্ন হাস্যে ভাদ্রে দেখা দেয়; এক রহস্যময়ী কলালক্ষ্মী ললিত মহিমায় ভাদ্রের প্রকৃতিতে সমাসীনা। সুতরাং সিংহ রাশির মধ্যে উদার, স্থির মহিমময় ঔদার্য্য সহজাত; অবশ্য দ্বাদশভাবে অন্যান্য গ্রহের বলাবল অনুসারেই তাহার তারতম্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শক্তিহস্ত কুমার গ্রহ এই মঙ্গল। আলোচ্য জন্মকুণ্ডলীর তৃতীয় স্থানে বা পরাক্রম স্থানে চন্দ্রের সঙ্গে এই মঙ্গলের মিলন হইয়াছে; সুতরাং চন্দ্র ও মঙ্গলের মিলন রবির ক্ষেত্রে সিংহে হইয়াছে। মিথুন লগ্ন দ্বি-স্বভাব রাশি; তাহার এক দিকে উচ্ছলতা অপর দিকে স্থিরতা; নিজেকে সময় সময় বিলাইয়া দিতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে আবার আকস্মিক ভাবে নিজকে সংহত করিয়া স্থিরতায় নিশ্চল হইয়া পড়ে। বালকস্বভাব বুধ ইহার অধিপতি,—মিথুনের ভাবই বালকের ভাব; বালকের উদারতা কিংবা স্বার্থপরতার প্রকৃত পক্ষে কোন অর্থই নাই; জলের মত নির্ম্মল তাহার প্রকৃতি। শ্রীশ্রীমায়ের লগ্নভাব এবং চতুর্থভাবের (বিদ্যা ও সুখ প্রভৃতি) অধিপতি এই বুধ। বুধ রহিয়াছে রবির সঙ্গে সপ্তম স্থানে (স্বামীস্থানে)।

রবির সঙ্গে লগ্নপতি বুধের ধনুরাশিতে সপ্তম বা স্বামীস্থানে মিলন হওয়ার ফল বিচার করিতে হইলে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে যে জাতিকার লগ্নভাব রবি-দ্যুতিতে আত্মসমাহিত; রবি ও বুধ এই স্থান হইতে তাঁহার লগ্ন ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; বুধ তাহার সত্তা রবিকে দান করিয়াছে; জ্যোতির্ম্ময় রবি তাঁহার জীবনে মহাজ্যোতির আলোক আনিয়াছে'; শনির বলয় ছিন্ন হইয়া গার্হস্থ্য-জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। জ্যোতিষের সাধারণ সূত্র অনুসারে সপ্তমভাব পাপ-পীড়িত, সপ্তমপতি দুঃস্থানগত পাপযুক্ত এবং পাপদৃষ্ট; মিলনের কারক শুক্র অষ্টমস্থ। সুতরাং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও দাম্পত্য-জীবন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে পারে না; বৈধব্যযোগও ইহাতে সূচিত হয়। দ্বাদশস্থ শনি-রাহু এবং ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি কেতু এই যোগকে আরও প্রভাবান্বিত করিয়াছে বিশেষতঃ, শেষোক্ত এই যোগ সন্ন্যাস-জীবনের সহায়তা করিয়াছে। শনি জাতিকার অষ্টম (নিধন) ভাব ও ভাগ্য (ধর্ম্ম) ভাবের অধিপতি; শনির ধর্ম্ম স্থূল দেহকে লইয়া; অর্থাৎ রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য শনি সংযমের গণ্ডী বা বলয় সৃষ্টি করে; তাই শনির ধর্ম্মী জাতক কৃচ্ছ্রব্রতের সাধক হইয়া থাকে; শুক্র শনির সহায়ক; পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতির লালসায় প্রবুদ্ধ করায় শুক্র; সেই হেতু এক অর্থে শুক্র শনির সহায়ক। শুক্র জাতিকার পঞ্চম (বুদ্ধি, মতি ও অপত্য) ভাব ও দ্বাদশ (ব্যয়) ভাবের অধিপতি। মিথুন লগ্নে জাত নর-নারীর পক্ষে শুক্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে; কারণ শুক্রই তাঁহার মতিগতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া সংসার-সুখ উপভোগের ক্ষমতা দেয়। বুধ ও শুক্র সমধর্ম্মী মিত্র-গ্রহ; শনি মিত্র হইলেও তিনি মৃত্যুভাবের অধিপতি হওয়ায় মিথুনের উপর কতকটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। এই শুক্র আলোচ্য কুণ্ডলীতে অষ্টমে শনির ক্ষেত্রে রহিয়াছেন; এবং শনি রহিয়াছেন শুক্রের ক্ষেত্র দ্বাদশে; জ্যোতিষে ইহাকে ক্ষেত্র-বিনিময় যোগ বলা হয়।

আবার শনি ব্যয় স্থানে পরম মিত্র রাহুকে আশ্রয় করিয়া জীবনের স্থূল ভাবের ব্যয় ঘটাইয়াছে। রাহুর উদগ্র ক্ষুধা শনির দুঃখবাদিতার আশ্রয় করিয়া যে প্রচণ্ডতা লাভ করিয়াছে তাহা ব্যয় স্থানে থাকিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা আনিয়াছে প্রবল সন্ন্যাস যোগ। তাহার উপর পড়িয়াছে বৃহস্পতির দৃষ্টি। বৃহস্পতির সঙ্গে আছে কেতু; নির্ব্বিকার জ্ঞানময় স্বর্ণদ্যুতি দেবগুরু বৃহস্পতি কেতুর সক্রিয় শক্তিতে ক্রিয়াশীল হইয়া অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে শনি ও রাহুর উপর। স্বামীস্থানের অধিপতি বৃহস্পতি এইরূপে ষষ্ঠে থাকিয়া জাতিকার ধর্ম্মভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকুণ্ডলীতে সপ্তম স্থান বা পত্নী-স্থানের অধিপতি রবি লগ্নে বুধ ও চন্দ্রের সঙ্গে রহিয়াছে; অর্থাৎ পত্নীভাব তাঁহারই আশ্রয়ে অভিমন্ত্রিত হইয়াছে। বৃহস্পতির কারকতা সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁহাকে সত্ত্বগুণের আধার, অমৃতের ও প্রজ্ঞার কারক বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মানসিক অনুভূতির ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞালোক; তাহা হইতেই আসে অনুপ্রেরণা। সেই জ্ঞানই মানুষকে অমৃতের মন্ত্র দান করে; অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতির সঙ্গে একাত্মবোধ জন্মায়; তাহাতেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। সেই বৃহস্পতি নিতান্ত দেহবাদী শনিকে ভোগের ক্ষেত্র অনড়-অটল অহংভাবের ক্ষেত্র বৃষরাশিতে অমৃত মন্ত্র দান করিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এইরূপেই সার্থক হইয়াছে। চন্দ্র ও মঙ্গল সক্রিয় সাধনায় মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে তাঁহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাকে প্রণাম।

স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবীকে লেখা কেশবচন্দ্র সেনের পত্রাবলী

এডেন ;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ

প্রিয় জগন্মোহিনী,

সিংহল পৌঁছিবামাত্র, তারে খবর পাইয়া আনন্দিত হইলাম। জাহাজ হইতে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা এতদিনে পাইয়া থাকিবে। গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবার সিংহল পরিত্যাগ করিয়া, অদ্য আরব সাগরে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে ইংলণ্ড প্রায় ১৪ দিনের পথ। আমরা কি প্রকারে দিন কাটাইতেছি, তাহা জানিবার জন্য, বোধ করি, আগ্রহ হইয়াছে। আমাদের যেরূপ বড় দল, তাহাতে দেশ ছাড়িবার কথা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছি ; যখন সকলে মিলিয়া গল্প করি, তখন যেন দেশে আছি, বোধ হয়। আমরা খুব ভোরে, প্রায় ৫টা ৫৷টার সময় উঠি, প্রায় ৭৷০টার মধ্যে স্নান উপাসনা শেষ হয়। এক এক দিন স্নানের ঘরের দ্বারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, সাহেবেরাও দাঁড়াইয়া থাকেন ; এক জন এক জন করিয়া ঐ ঘরে স্নান করিতে হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে কত বার খাই, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে।

১। ভোরে চা খাই।

২। ৮৷টার সময় ভাত, আলু ভাজা, তরকারি।

৩। ১২টার সময় রুটি কলা।

৪। ৪টার সময় প্রকৃত ভোজন, ভাত ব্যঞ্জন বাদাম লেবু তরমুজ।

৫। ৭টার সময় চা ও দুধের সহিত রুটি।

এত বার খাই বটে, কিন্তু অধিক খাইতে পারি না, তেমন তৃপ্তিও হয় না। বাটীতে যে সকল উৎকৃষ্ট তরকারী হইত, সে সকল এখানে পাইলে কত ভাল খাওয়া যাইত। যাহা পাওয়া যাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। তুমি কি ভাবিতে পার, আমি এখনো পান খাইতেছি। আমরা অনেকগুলি পান মান্দ্রাজে এক বন্ধুর নিকটে পাইয়াছিলাম। সেইগুলি এত দিন আমরা ব্যবহার করিলাম। তুমি যে মসলা দিয়াছিলে, তাহা এখনো আমরা খাইতেছি। ভোজনের পূর্ব্বে ভেঁপু বাজানো হয়, উহার ধ্বনি শুনিয়া সকলে প্রস্তুত হয়। রেলের গাড়ীতে যেমন ভেঁপু বাজে, ঠিক সেইরূপ। জাহাজে আমরা যে জল পান করি, ইহা পশ্চিমের জলের ন্যায় অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট। সমুদ্রের বায়ু যে কেমন নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। কলিকাতা সহরে ? টাকা দিলেও এমন অমূল্য বায়ু পাওয়া যায় না। গত রবিবার সন্ধ্যার সময় সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। অনেক সাহেব বিবি উপস্থিত ছিলেন। আমি ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করিলাম। সময় কাটাইবার জন্য সাহেবেরা কত আমোদ করে। গত মঙ্গলবারে একটি নাটক হইয়াছিল, নাটকের পর কতকগুলি গান হইল। আশ্চর্য্য ! অন্ধকার রজনীতে সাগর-বক্ষে এমন সুন্দর নাটক, এত আমোদ-প্রমোদ ! আমরা যে জাহাজে আছি, তাহা অনেক সময় মনে থাকে না, ঠিক যেন কোন মহানগরে রহিয়াছি। আমাদের এখানকার তো সব সংবাদ লিখিলাম। তোমাদের সংবাদ কি ? সন্তানেরা কেমন আছে ? প্রিয় রাজলক্ষ্মী ? কি করিতেছে ? সুখ, পুঁটী, ছোট পুঁটী কেমন আছে ? রাজলক্ষ্মী পত্র লিখিলে ভাল হয়। কলিকাতায় কি উত্তাপ আরম্ভ হইয়াছে ? মিস পিগট্ কি তোমাকে ছবি করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যান নাই ? ছবি হইয়া থাকিলে, তাহা ইংলণ্ডে শীঘ্র পাঠাইবে। দয়াময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করুন, তোমার হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন। আবার অনুরোধ করি, প্রতি সপ্তাহে এক একখানি পত্র আমাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবে। পত্র লিখিয়া বন্ধ করিয়া দিও, যেন খোলা না থাকে।

তোমারি কেশব।

সুয়েজ,
১০ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত শুক্রবারে এডেন ছাড়িয়া, লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া, অদ্য সুয়েজে উপস্থিত হইলাম। এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানে যোগ হইয়াছে, তাহার নাম সুয়েজ। এখানে জাহাজ ছাড়িয়া রেলরোডে যাইতে হইবে। কেবল এক রাত্রি রেলরোড গাড়িতে চলিতে হইবে। পরে আবার অন্য একখানি জাহাজে চড়িয়া, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ভূমধ্য সাগর পার হইয়া, ইউরোপে যাইতে হইবে। আমাদের গাড়িতে আর, বোধ করি, দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যে পথ দিয়া আমরা যাইতেছি, তাহা "ম্যাপে" ভাল করিয়া দেখিবে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। গত কল্য রজনীতে সাহেবেরা এক রকম তামাসা করিয়াছিল। তাহার নাম "মুরগীর লড়াই।" অর্থাৎ কতকগুলি লোক মুরগী হয় ও তাহাদের হাত-পা বন্ধ করিয়া দেয়, দুই জন পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া পা বাড়াইয়া ঠেলাঠেলি করে ; যে ব্যক্তি ঠেলিয়া উল্টাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার জয় হয়। যাহারা জয়ী হয়, তাহারা আবার এইরূপ লড়াই করে। অবশেষে একজনের জয় হয়। এক সাহেব, বিবির কাপড় পরিয়া, বিবি সাজিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলা শেষ হইলে তিনি দাঁড়াইয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং একখানি ভাঙ্গা প্লেট ঐ জয়ী ব্যক্তিকে দান করিলেন। জাহাজে অনেক দিন

থাকিবার যে কষ্ট, তাহা সাহেবেরা এইরূপে দূর করেন। এরূপ আমোদ-প্রমোদ না করিলে, দিন কাটানো ভার। আমাদের জাহাজে অনেকগুলি ছেলে আছে, তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিলে অনেক তৃপ্তিলাভ হয়; কিন্তু এক একটা ছেলে বড় কাঁদে। এ সময়ে সমুদ্র অত্যন্ত স্থির, তুফানের ভয় নাই। আর ২।৩ দিন পরে বোধ করি, শীত হইবে; আমরা উত্তাপের সীমা, অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রবণ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছি এবং ক্রমে শীতপ্রবণ দেশে অগ্রসর হইতেছি। এখন যত উত্তরে যাইব, ততই শীত।

আমার একখানি চিঠি কি পাইয়াছ? যেখানে সুযোগ পাইতেছি, সেইখান হইতে পত্র লিখিতেছি। যদি কখন পত্র পাইতে বিলম্ব হয়, তাহাতে ভাবিত হইও না। কেন না জাহাজ না লাগিলে, আমরা পত্র দিতে পারি না এবং সেই পত্র লিখিবার অনেক দিন পরে তোমরা পাইবে। প্রথম প্রথম শীঘ্র শীঘ্র পত্র পাইয়াছ, এখন বোধ করি, ১৪ দিন পরে পত্র পাইবে। ইংলণ্ড পঁহুছিলে সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র পাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার মঙ্গল-সমাচার হইতে বঞ্চিত করিও না। আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। যখন যাহা হয়, বিস্তার করিয়া লিখিবে। আমি যেন সমুদায় জানিতে পারি। কাগজের অভাব নাই, যত ইচ্ছা, তত লিখিবে। স্কুলের পড়া কেমন হইতেছে? তোমার খরচ কেমন চলিতেছে? আমি যে এক শত টাকা রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা তুমি পাইয়াছ কি না, বিশেষ করিয়া লিখিবে। উহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে, যখন যাহা বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্ব্বাহ করিবে। মাসে মাসে যে খরচের টাকা পাইয়া থাক, তাহা স্বতন্ত্র, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত পাইবে। যদি কোন কিছু অভাব বোধ হয়, তখন আমাকে লিখিবে। ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত যাওয়া হয় তো? এ বিষয়ে যেন অবহেলা না হয়। তোমার মনে অধিক কষ্ট হইয়াছে, জানি; কিন্তু কি করিব, বল। এই কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। দয়াময় পিতা আশা ভরসা, তিনি তোমার হৃদয়কে শীতল করুন। তোমারি কেশব।

মাকে প্রণাম জানাইবে। তিনি যে ডালগুলি সঙ্গে দিয়াছিলেন তাহা জাহাজে রাঁধিবার সুবিধা হয় নাই। সেগুলি সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি, সেখানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এখনি আমরা রেলগাড়ীতে যাইতেছি।

মারসেলিস,
১১শে মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ,

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলেকজেন্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া, অদ্য ইউরোপে পঁহুছিলাম। এখান হইতে রেলগাড়ীতে ২ দিনে ইংলণ্ড যাইবার সম্ভাবনা। এ স্থানের নাম মারসেলিস, ইহা ফ্রান্স রাজ্যের অন্তর্গত। পথে দুই দিন জাহাজ অত্যন্ত দুলিয়াছিল, এজন্য আমাদের প্রায় সকলের কিছু অসুখ হইয়াছিল, গা বমি-বমি করিত; কিন্তু সমুদ্র স্থির না হইতে হইতে সকল অসুখ দূর হইল। সাহেবদের মধ্যেও অনেকের কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহা কোন বিশেষ রোগ নহে, জাহাজ একটু দুলিলেই গা কেমন করে; অনেকে নৌকাতে চড়িলেও এরূপ হয়। আমরা কোন দিন তুফান পাই নাই। কেবল বায়ু বিপক্ষ হওয়াতেই জাহাজ দুলিয়াছিল। যাহা হউক, ঈশ্বর-প্রসাদে সমুদ্রের পথ প্রায় অতিক্রম করা হইল, এক মাসের অধিক পথে কাটাইতে হইল। জাহাজের খাওয়া ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, প্রতিদিন আলুপোড়া, ঝালের তরকারি আর ভাল লাগে না। অদ্য "ব্রাহ্মণের" সঙ্গে, অর্থাৎ সাহেব ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ভাল রন্ধন করা হইয়াছে। মা সঙ্গে যে মুগের ডাল দিয়াছিলেন, সেই ডাল রান্না হইল; আহার করিয়া আজ যে কত তৃপ্তি পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। দেশের খাওয়া অনেক দিন খাওয়া হয় নাই, অদ্য ডাল খাইয়া দেশের ভাব মনে হইল। ইংলণ্ডে পঁহুছিয়া ভাল খাবার আয়োজন করিতে হইবে। তোমার হস্তের একখানিও পত্র এখনো পাই নাই, ইংলণ্ডে গিয়া পাইব, এই আশা করিতেছি। গত বৃহস্পতিবারে সমুদ্রের দুই তীরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিলাম। এক দিকে ইটালী ও অপর দিকে সিসিলি দ্বীপ। দুই দিকেই পর্ব্বতমালা এবং ঐ পর্ব্বততলে সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নগর ও গ্রাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আহা, দেখিতে কেমন মনোহর! যেমন একখানি সুন্দর ছবি। ঐ স্থানের লোকেরা কেমন সুখী। উহাদের এক দিকে সমুদ্র, এক দিকে পর্ব্বত, সর্ব্বদাই বোধ করি, নির্ম্মল বায়ু সম্ভোগ করিতেছে। যদি সপরিবারে সকলে ঐরূপ স্থানে বাস করা যায়, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? তোমার মত কি? দেখিলে তুমি একেবারে মোহিত হইবে, সন্দেহ নাই; ওখানে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হইবেই হইবে। যাহা হউক, অসম্ভব ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিলে কি হইবে?

অদ্য শনিবার। বোধ করি, আগামী মঙ্গলবারে ইংলণ্ডে পঁহুছিব। তথায় উপস্থিত হইয়া মঙ্গল-সংবাদ লিখিতে চেষ্টা করিব। প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া তুমি আমার মনের ভাবনা দূর করিবে।

মাকে আমার প্রণাম জানাইবে, বালীতে প্রণাম পাঠাইবে। ভগিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবে। প্রিয় সন্তানগুলি আমাকে ছাড়িয়া কেমন আছে? তাহাদের মস্তকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার মা, বোধ করি, এতদিনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

তোমার কেশব।

লণ্ডন,
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ,

প্রিয় জগন্মোহিনী,

ঈশ্বরপ্রসাদে গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা নিরাপদে ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছি। তিনি কৃপা করিয়া পথে রক্ষা করিলেন, তিনিই এখানে আনিলেন। তাঁহার প্রতি যেন আমরা কৃতজ্ঞ হইতে পারি। রেলগাড়ী হইতে নামিবা মাত্র আলুর (স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত) সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহার সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঢাকাস্থ একজন ছাত্র কৃষ্ণগোবিন্দের (স্বর্গীয় কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত) বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া তোমার হস্তের একখানি লেখা পত্র বহুকালের পর পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তোমার খেদোক্তি পাঠ করিয়া, হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু তোমরা ভাল আছ

শুনিয়া, মনের দুঃখ দূর করিলাম। তোমাকে ও সন্তানদিগকে ছাড়িয়া কত দূর আসিয়াছি, তোমরা কত কষ্ট পাইতেছ, আবার কত দিনের পর তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমার জন্য তুমি যে শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতেছি। সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ঈশ্বরের কার্য্য সফল হউক। তুমি লিখিয়াছ যে, "আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।" আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি, যখন কলিকাতায় ছিলাম, তখন হইতে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমার হৃদয়ের সঙ্গে তিনিই আমাকে গ্রথিত করিয়াছেন; তোমার সম্বন্ধে মঙ্গল, তোমার সুখে আমার সুখ, এরূপ গূঢ় যোগ তিনিই সংস্থাপন করিয়াছেন। তোমার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। তোমাকে যদি অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহা হইলে তোমার কথা তাঁহাকে না বলিয়া কি থাকিতে পারি? প্রতিদিন প্রাতঃকালে যখন তাঁহার পূজা করি এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করি, তখন এই ভাবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাই যে, "হে দয়াময়, আমার দুঃখিনী স্ত্রীকে তোমার চরণে স্থান দেও!" তুমি সময়ে সময়ে আমার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও। তিনি আমাদের উভয়ের মনকে তাঁহার প্রেমরজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করুন।

এখানে আসিয়া অবধি, নূতন নূতন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতেছি। লণ্ডন সহর খুবই প্রকাণ্ড। দিবারাত্রি গোলমাল। গাড়ী ঘোড়াতে রাস্তা সকল পরিপূর্ণ। দোকানের সংখ্যা নাই। এক এক স্থানে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ী চলিতেছে; মনে কর, তাহা হইলে সমস্ত দিনের মধ্যে কত বার ঐ গাড়ী চলে। অনেকগুলি রেলগাড়ী মাটির নীচে চলে, উপর হইতে কিছুই দেখা যায় না। গত কল্য সন্ধ্যার সময় মিস কবের বাটী হইতে আসিবার সময় ঐ গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম। উহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে বড় সাহেব ছিলেন এবং যাঁহার সঙ্গে আমার খুব ভাব, সেই লর্ড লরেন্স সাহেবের বাটীতে সেদিন দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী অনেক স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তাহার পরদিন তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! এত বড় লোক হইয়া তিনি আমাদের সামান্য বাসগৃহে উপস্থিত! এখানে বড় লোকদের চাল আমাদের দেশের ন্যায় নহে, তাঁহাদের সমধিক বিনয় আছে। লরেন্স সাহেবের কন্যা আমাদের কলিকাতার বাটীতে সেদিন (মিস পিগটের সঙ্গে) আসিয়াছিলেন, এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি আমাদিগকে বলিলেন। তাঁহার কন্যা তাঁহাকে সে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন।

এখানে দোকানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক দোকানে কেবল ফল আর তরকারি বিক্রয় হইতেছে, কমলালেবু কপি আঙ্গুর কেমন সাজান রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই সাহেব। সাহেব রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, সাহেব জুতা বুরুস করিতেছে, সাহেব দুগ্ধওয়ালা প্রাতঃকালে Milk-উ: [দুগ্ধ চাই] বলিয়া আমাদের বাসার নিকটে দুগ্ধ বিক্রয় করে; গতকল্য সাহেব নাপিতের কাছে দাড়ি কামাইলাম, সাহেব কোচম্যান আমাদের গাড়ী হাঁকায়, সাহেব দরজি আমাদের কাপড় সেলাই করে। আমাদের বাসার প্রায় সকল কার্য্য একজন বিবি চাকরাণী সম্পন্ন করে। এখানকার চাকরাণীরা দেশের স্নুকোর ঝির ন্যায় নহে; ইহারা এত পরিশ্রম করে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিবি ব্রাহ্মণী আমাদের ভাত রাঁধে। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রতিদিন দুই বেলা ডাল ভাত ভাজা ও অপরাপর সামগ্রী আহার করিতেছি। এখানে ডাল খাইয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমরা "ভেতো বাঙ্গালী", ডাল ভাত প্রতিদিন হাপুশ হুপুশ করিয়া খাইতেছি। দুগ্ধ আমার অতি প্রিয়, তাহা তুমি জান, তাহা এখানে অধিক পাওয়া যায়। এখানে বড় শীত। যদিও শীতকাল প্রায় শেষ হইল, তথাপি এক এক সময়ে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়, স্নান করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়। খুব বেড়াইলে শীত কম লাগে। এত শীত বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ অসুস্থ হয় না।

এখানকার সংবাদ ভাল, তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবে।

তোমারি কেশব।

শরৎচন্দ্র বসুর পত্র

[মার্কারায় (কূর্গ) আটক থাকিবার সময় শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতায় প্রবীণতম সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেছিলেন।]

মার্কারা (কূর্গ)
১৬ই নভেম্বর ১৯৪২, সোমবার

প্রিয় হেমেন্দ্র বাবু,

এর পূর্ব্বে আপনাকে পত্র না দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমার হাজার বার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু আপনি তো জানেন আমার উপর কত বিধি-নিষেধ, সুতরাং তজ্জন্য আপনি যে আমায় ক্ষমা করিবেন, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জানি।

আপনার গত ১২ই ফেব্রুয়ারীর স্নেহপূর্ণ ও উৎসাহমূলক পত্র ত্রিচিনপল্লী জেলে আমার কাছে পৌঁছে। আমি বারংবার সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। যত বার আমি পত্রখানি পড়িয়াছি তত বারই আমার মনে হইয়াছে যে, এই পত্র এমন এক জনের নিকট হইতে আসিয়াছে যিনি তাঁহার হৃদয়ে আমাকে স্থান দিয়াছেন এবং স্বভাবতঃই আমাকে সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে অল্প কয়েক জন আমাকে ও আমার কাজকে ভালবাসেন, আপনি তাঁহাদের এক জন। এ বিষয়ে আমার মনে কখনও যে কোন সন্দেহ ছিল তাহা নহে; তবুও এ কথা মনে করিয়া আমি আনন্দ পাই যে, অন্ততঃ এমন কয়েক জন আছেন যাহাদের সম্বন্ধে কবির এই কথাগুলি খাটে না—

"Just for a handfull of silver he left us
Just for a riband to stick in his coat."

যাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার চারদিকে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রবার্ট ব্রাউনিংএর নির্ম্মম সমালোচনার কথা চিন্তা করিলে ভাল করিবেন। আমি আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। তাঁহারা তাঁহাদের পথে চলুন, আমি আমার পথেই চলিব।

আপনার ১১শে অক্টোবরের পত্রে আপনি আমায় বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি আমার শ্যালক অজিতকে আপনাকে আমার বিজয়ার

প্রণাম জানাইতে বলিয়াছিলাম এবং সে আমাকে জানাইয়াছে যে সে তাহা করিয়াছে।

আমি ৪ঠা তারিখের পত্রে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে (সতীশ) অনুরোধ করিয়াছি যে, গত কয়েক মাসে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলানা আক্রাম খাঁন আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যেন তিনি পাঠ করেন এবং তাহা যদি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের যোগ্য হয়, তাহা হইলে তিনি যেন আমার পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে কুৎসা রটনার মামলা দায়ের করেন। ফরিদপুরে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ ইউসুফ আলী চৌধুরীর এক সাম্প্রতিক উক্তি সম্বন্ধেও আমি অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়াছি। আপত্তিজনক বিষয় প্রকাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাকে যে কয়খানি সংবাদপত্র দেওয়া হয়, 'বসুমতী' তাহাদের অন্যতম, এবং আমি বরাবরই আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করি।

'বসুমতী'তে আমাদের প্রিয়বন্ধু পরিষদ-সদস্য কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর কলিকাতায় পীড়িত হওয়ার সংবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সময় ও তৎপরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে যে অতিরিক্ত শ্রম করিতে হইয়াছে, তাহাই তাঁহার পীড়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। আশা করি, তাঁহার পীড়া উদ্বেগজনক নয় এবং তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবেন।

আজ প্রাতে আমার কনিষ্ঠা কন্যার (পুতুল) ১ই তারিখের চিঠি পাইলাম এবং শুনিয়া সুখী হইলাম যে, শিশিরের অবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং অন্যেরা সকলে ভাল আছে। আমার স্ত্রীর ১৩ই তারিখের টেলিগ্রাম আজ সকালে মার্কারায় পৌঁছে এবং চীফ কমিশনার আজ বেলা প্রায় ১টার সময় উহা আমার নিকট প্রেরণ করেন। অমিয়র সম্বন্ধে ভাল খবর পাইয়া সুখী হইলাম।

আমার জ্বর এখনও ছাড়িতেছে না। আপনি হয়ত শুনিয়া থাকিবেন, গত ১৬ই এপ্রিল জ্বর আরম্ভ হয় এবং এখনও ছাড়িবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নিম্নে জ্বর উঠা নামার একটা তালিকা দিলাম:

১৫ই—সকাল ৮টা—৯৭.৪; বেলা ১২-৩০ মিঃ—৯৯.৪; অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিঃ—৯৭.৮; রাত্রি ৮-৩০ মিঃ—৯৮.৮; রাত্রি ১১-৩০মিঃ—৯৭.৮

১৬ই—সকাল ৮টা—৯৭.৪; বেলা ১২-৩০ মিঃ—৯৯.৫

আজ প্রাতে সিভিল সার্জ্জন আমার ওজন গ্রহণ করেন এবং তাহা ১৬৮ পাউণ্ড দেখা যায়। আগামী কল্য মূত্র পরীক্ষা করা হইবে। কয়েক দিন আগে পরীক্ষা করিয়া মূত্রে শতকরা ৩ ভাগ শর্করা পাওয়া গিয়েছিল। আমার সাধারণ স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না।

আপনার নিকট হইতে কয়েকখানি ভাল বাংলা বই পাইলে সুখী হইব। সেন্সর ও পাশ করার জন্য নয়া দিল্লীর গোয়েন্দা বিভাগের নিকট বইগুলি প্রেরণ করিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস, আপনার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই আছে। এ কথা সত্য যে, জীবনের সন্ধ্যার ছায়া আপনার উপর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি এবং প্রার্থনা করি, আপনি যেন আরও অনেক বছর বাঁচিয়া থাকেন। ঈশ্বর আপনাকে ও আপনার বাড়ীর সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমি পুনরায় আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইয়া এই পত্র শেষ করিতেছি।

অকপটে আপনার

এস, সি, বসু (শরৎচন্দ্র বসু)

পুঃ—এই পত্রখানি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্ত্রীকে দেখাইবার অনুরোধ করিতে পারি কি? আমার সলিসিটর নৃপেনের নিকট ইহা প্রেরণ করাই আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়।—এস, সি, বি।

আপনি কি জানেন?

১। ভারতবর্ষে তিনটি বিখ্যাত নগর আছে, যারা ইংরাজীতে The City of Palaces, The City of Gardens. এবং The City of Temples নামে বিখ্যাত হয়ে আছে আজও, তাদের অবস্থিতি কোথায়?

২। বাঙালী জাতির প্রাতঃস্মরণীয় এক মহাপুরুষ, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, যিনি একাধারে স্যর ও রাজা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে নিজের মৃত্যুর দিন সামান্য দুগ্ধপানের পর স্বীয় ভৃত্য নবীনকে ডেকে বলেছিলেন, "আজ আমার শেষ দিন। আমার দাহকার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য পুরোহিত মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমিও শুনিয়া রাখ। মৃত্যুর পর আমার দেহকে স্নান করাইয়া নববস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধ চন্দনে লেপিত করতঃ যমুনার কূলে লইয়া যাইবে। তথায় চন্দন কাষ্ঠ ও আমার পূর্ব্বসংগৃহীত তুলসী-কাষ্ঠে চিতাসজ্জা করিয়া তদুপরি একটি চন্দ্রাতপ দিবে। পরে আমি জীবিতকালে যেভাবে বসিতাম চিতার উপর সেই ভাবে বসাইয়া দেহ ভস্মীভূত করিবে এবং দেহাবশেষের এক সের আন্দাজ থাকিতে তাহাকে তিন অংশ করিয়া একাংশ কচ্ছপগণকে খাওয়াইবে, একাংশ যমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে এবং অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিবে।" এই বাঙালী মহাপুরুষ কে?

৩। পুণ্যভূমি কাশীধামের বিখ্যাত "দুর্গাবাড়ী" ও "দুর্গাকুণ্ড" এবং তৎসংলগ্ন "কুরুক্ষেত্রতলা" নামে যে জলাশয় আছে, সেগুলি একজন সুলক্ষণবতী বাঙালী জমিদার-পত্নীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, কে সেই মহিয়সী বাঙালী মহিলা?

৪। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মবারক উদ্দৌলার অধীনে ভূতপূর্ব্ব বাঙালী কর্ম্মচারী, যাঁর কার্য্যদক্ষতা ও নানা সদনুষ্ঠানের জন্য প্রীত হয়ে হেষ্টিংস দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ জহান্দর সাহের নিকট থেকে সনন্দ আনিয়ে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে যাঁকে ভূষিত করেন, তিনি মাত্র পনেরো বছর বয়সে একযোগে সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দী, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। এই বাঙালী-প্রতিভার নাম স্মরণ করতে পারেন?

[উত্তর ৩৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

চারজন

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানার কর্ণধার)

দু'শো বছরের বৃটিশ শাসন ও শোষণে জর্জ্জরিত ভারতবাসী আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। নব ভারতে নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা চলছে অক্লান্ত ভাবে। ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডে—বাঙ্গালা ও বিহারের সীমান্তে। এই ইঞ্জিন কারখানার যিনি কর্ণধার তিনি হচ্ছেন বাঙ্গালা মায়েরই কৃতী সন্তান শ্রীপি, সি, মুখোপাধ্যায়। তাঁরই অক্লান্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, উৎসাহ ও উদ্যমে গড়ে উঠেছে এই কারখানা ও ছোট্ট সহর চিত্তরঞ্জন। এক দিন দেশের জন্যে নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য দান করে যিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশের ও জাতির কাজে, সেই মহাপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম এ কারখানার সঙ্গে বিজড়িত। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এ কারখানার বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীমুখোপাধ্যায় নিরাসক্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন। ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়েছে এই কারখানা। স্বাধীন ভারতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাম তাতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করবে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এই কৃতী বাঙ্গালী সন্তানের জীবনের দু'-একটি বিষয় জানবার আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হলুম এক দিন তাঁর কাছে। এই নিরহঙ্কার, অমায়িক লোকটি নিজের প্রচার কোন দিনই চাননি, আজও তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি জানতে দিতে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু সাংবাদিক বলেই কিনা জানিনে, আমার অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। কিন্তু তার পরেই তিনি সোজা আমাকে দেখিয়ে দিলেন আমাদের বন্ধু পূর্ব্বাঞ্চল রেলের গণ-সংযোগ অফিসার শ্রীপি গুহ ঠাকুরতাকে। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাই কয়েকটি কথায় 'বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাদের জানাচ্ছি এই কৃতী লোকটির জীবন সম্পর্কে।

শ্রীপ্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

বললেন—"তাঁর কাছ থেকেই আমার সম্পর্কে যদি কিছু জানবার থাকে জেনে নিতে পারেন। ছেলেবেলায় 'আঁকতে 'আমি পছন্দ করতুম, তাই আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ভেবেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আমার উৎসাহ আছে। ১০ বছর বয়স থেকে কাঠের কাজ নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাটি করতুম। পরবর্ত্তী জীবনে সেই ভাবধারা মূর্ত্ত হয়ে উঠলো আমার জীবনে—আমাকে হ'তে হ'লো পুরোদস্তুর একজন ইঞ্জিনিয়ার।" আমার প্রশ্নের উত্তরে সামান্য এই কথা কয়টির মধ্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর শৈশব-জীবনের স্মৃতি তুলে ধরলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় এখানেই থামলেন না। বললেন—"১৯০৪ সালে ক'লকাতায় বালীগঞ্জে আমার জন্ম। আমার পিতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। সাত বছর বয়সের সময় আমার পিতা-মাতা আমাকে বিলাতে নিয়ে যান। দেড় বৎসর বিলাতে অবস্থান করার পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং ১৯১৩ সালে কৃষ্ণনগর জেলা-স্কুলে ভর্তি হই। সেখান থেকে পরে হেষ্টিংস হাউস স্কুলে সুরু হয় আমার পড়াশুনা। সিনিয়র কেম্ব্রিজে উত্তীর্ণ হ'য়ে ১৬ বছর বয়সে আমি ইংলণ্ডে যাই। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করে ফিরে এলুম স্বদেশে ১৯২৫ সালে।"

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমুখোপাধ্যায়কে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই তৎকালীন ই, আই, রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে। যুদ্ধের সময় অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ দপ্তরে তাঁর কর্ম্মকুশলতার জন্যে তাঁকে চেয়ে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল (ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে অধিষ্ঠিত হন। বিভিন্ন উচ্চ দায়িত্বশীল পদে সফলতার সঙ্গে কাজ) করে ফিরে আসেন তিনি আবার রেল বিভাগে ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসেই তৎকালীন বেঙ্গল নাগপুর রেলের জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হ'লো। এর পূর্ব্বে কোন ভারতীয়ের পক্ষে এ পদ অধিকার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৯ সালে চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা যখন স্থাপিত হ'লো তখনও ভারতীয়দের মধ্যে তাঁকেই বেছে নেওয়া হ'লো সে কারখানার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে। সেই থেকে আজ অবধি সুষ্ঠুভাবে তিনি সেখানকার জেনারেল ম্যানেজারের কঠোর দায়িত্ব নির্ব্বাহ করে চলেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ যে আরও সম্ভাবনাময়, এ বিশ্বাস আমরা অনায়াসেই রাখতে পারি।

শ্রীজ্যোতি বসু

(সাম্যবাদী নেতা; পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ-সদস্য)

—"আমার এ সামান্য জীবনে কি-ই বা করেছি যে আমার বিষয় কোন মাসিক পত্রে লেখা চলবে ?" এ সরলতাপূর্ণ ছোট্ট উক্তিটি যাঁর মুখে থেকে বেরিয়ে আসে, তিনি বাঙ্গালার উদীয়মান নেতা ও সুবক্তা শ্রীজ্যোতি বসু বার-এট-ল। বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠাবান নেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহু কাল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বাল্য-জীবন থেকে শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি পর্য্যন্ত বলতে গেলে রাজনীতির সঙ্গে এ লোকটির কোন সম্পর্কই ছিল না। রাজনীতিতে যোগ না দিলে তার পক্ষে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হওয়াই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল।

শ্রীজ্যোতি বসু

শ্রীবসুর রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্যবাদী হওয়ার প্রসঙ্গটাও একটা ইতিহাসের বিষয়।

তিনি নিজেই বলছেন—"ইংলণ্ডে যখন আমি পড়াশুনো করছি, তখনই আমি বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করি এবং কমিউনিষ্ট মতবাদে আকৃষ্ট হই। ১৯৪০ সালে ভারতে ফিরে আমি পুরোপুরি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করি। বিলেত-যাত্রার পূর্ব্বে দেশে যখন ছাত্র ছিলুম, তখন আমার কোন রাজনৈতিক ঝোঁক ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডেই আমার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত।"

১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই শ্রীবসুর জন্ম হয় কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম ডাঃ নিশিকান্ত বসু। ৬ বৎসর বয়সে তিনি লরেটো বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভান্তে ১৯৩৫ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলেন সত্যি, কিন্তু আইন ব্যবসার দিকে না যেয়ে রাজনীতিটাকেই তার পর থেকে আঁকড়ে ধরলেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বহু বার কারাবরণ ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়। ১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে সময় শ্রীবসু নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে তিন মাস কাল আটক থাকেন। মুক্তির পর আবারও যখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়, তখন কিছু দিন তাকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়েছিল।

এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও শ্রীবসু পুরোধা-স্থানীয়। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গে আইন সভা নির্ব্বাচনে রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থেকে ইনি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের গত সাধারণ নির্ব্বাচনে বরাহনগর সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে তৎকালীন শিক্ষা-সচিব শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীকে পরাজিত করে বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হ'য়ে আসেন। ইনি বর্ত্তমানে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক জন বিশিষ্ট সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কমিউনিষ্ট দলের নেতা।

শ্রীনীরদ চৌধুরী

(Autobiography of An Unknown Indian এর লেখক ও আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী)

ঠিকানা জানতাম না। শুধু জানতাম শ্রীনীরদ চৌধুরী থাকেন কাশ্মীরী গেটের কাছে কোথাও। যে কোন উপায়ে খুঁজে বার করতে পারবোই এই আশা নিয়ে নয়া দিল্লীতে আমার বাসস্থল থেকে এক দিন চড়ে বসলাম বাসে। সত্যি কথা বলতে কি, কাশ্মীরী গেটে নেমে আমাকে খুঁজতে হয়নি মোটেই। সামনেই পেলাম একজন বাঙ্গালীকে। বললাম—'শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী মশায়ের বাড়ী আমি যেতে চাই, পারেন বাতলাতে রাস্তা?' 'নিশ্চয়ই, এদিকে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে বাড়ীটা। ঐ যে হলদে বাড়ীটা দেখছেন ওর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে…।'

একতলা, দোতালা পেরিয়ে তিনতলায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। দেখা মিললো তাঁর। বহু কথা শুনেছিলাম যে মানুষটির সম্বন্ধে, বহু ভাবে যে মানুষটির কথা ভেবেছিলাম ন'শো মাইল দূর কলকাতায় বসে, দিল্লী এসে মানুষটির একেবারে সামনাসামনি বসে আছি ভাবতেও কেমন আশ্চর্য্য লাগছে। সমস্ত বসবার ঘরের প্রায় ঘরটাই জুড়ে রয়েছে শুধু বই আর বই। এক দিকে ভ্যান গঁগ থেকে দা ভিঞ্চি আসর জুড়ে আছেন। বেহালাটা অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে, ষ্ট্যাণ্ডে রাখা বিলাতী বাজনার স্বরলিপির বই, পাশে ঘর-জোড়া মস্ত বড় পিয়ানো। এরই মধ্যে ছোট্ট মানুষটিকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

নদী-নালার দেশের মানুষ উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'এক যুগ আগে বাংলা দেশকে ছেড়ে চলে এসেছি। আর যাবো না এই ইচ্ছে। কী বাংলাই দেখেছি আর এখন গিয়ে কি বাংলাই দেখবো!'

পূর্ব্ব-বাংলার ক্ষুদ্র শহর কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম। দেশের মাটীকে তিনি ভালবেসেছেন। সেখানকার নদী-নালা, খাল-বিল, স্কুল-পাঠশালা, হাট-বাজার তাঁর স্মৃতিপথে আজও পরিপূর্ণ মহিমায় জাগ্রত হয়ে আছে। নিজের বইয়েতে তিনি সেই কথাই বলছেন।

স্কুল-কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আপনি মানুষটিকে পাবেন না। এম-এ পরীক্ষা তিনি দেননি। কখনও বিদেশে যাননি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তো বলেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস যা আজ স্কুল-কলেজে পড়ছি তা অধিকাংশই ভ্রান্ত।'

—'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়েছে। আমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজের লেখায় আর ভারতবাসীর লেখায় যা আছে অধিকাংশই

পড়েছি। সংস্কৃত সাহিত্য আমাকে প্রাচীন ভারতবর্ষের সঠিক সংবাদ দিয়েছে। তার কিছু কিছু আমি পড়েছি, তাই ও-কথা এত জোর-গলায় বলতে পারছি। ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় আমার আত্মজীবনী যেভাবে পড়া হয়েছে, ভারতবর্ষে তা হয়নি। নিন্দা-প্রশংসার কথা বলছি নে, কারণ, বিলেতের বড় কাগজেও আমার বই-এর নিন্দা হয়েছে, তবে বিলেতে ও আমেরিকার সমালোচকরা আমার বইএ বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনের যে ছবি আছে তার কথাই বেশী আলোচনা করেছে। এখানে মতামত নিয়েই বেশী গালি খেতে হয়েছে।'

—'কিন্তু আপনি তো বই ছাপিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে আর আমেরিকাতেই।'

—'ঠিকই করেছি। আমার বই ছাপতে খরচ অনেকটা পড়েছে। ভারতবর্ষে কোন Publisher-ই অত টাকা খরচা করে বই ছাপাবার দায়িত্ব নিত না। কারণ, আমি নতুন লেখক। তবে এ কথা আপনাকে বলছি যে, আমার প্রকাশকের লোকসান হয়নি।'

শ্রীনীরদ চৌধুরী

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বইয়ে আপনি ভারতবর্ষ এবং ক্রমশঃ প্রায় সমস্ত পৃথিবীই আমেরিকার আধিপত্য গ্রহণ করবে বলেছেন?'

—'হ্যাঁ, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধাই নেই।'

বাংলা দেশের সাহিত্য, সাময়িক পত্রপত্রিকাদি সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলাম।

—'গত বারো বছরের মধ্যে বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক আমার খুবই কম। দিল্লীতে এসে বাসা নিয়েছি আজ থেকে বারো বছর আগে সুতরাং…'

এবার তিনিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাছ থেকে সব শুনতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কোন কাগজ আজকাল কত বিক্রী হয়। 'মাসিক বসুমতী' অনেক বেশী বিক্রী হয় জেনে খুবই আনন্দপ্রকাশ করলেন। তাঁর গৃহিণীর কিন্তু 'মাসিক বসুমতী' না পড়লে দিন কাটে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুসলমানদের তাহলে উল্লেখযোগ্য কোন কাগজই এখন নেই কলকাতায়?'

একদা তিনি ছিলেন সাংবাদিক। আজও সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ যায়নি বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন কোন কোন কাগজে আজও কাজ করছেন কে কে?

সাধারণ ভাবে লেখা ও পড়াশুনা নিয়েই তিনি অধিকাংশ সময় কাটান। সবচেয়ে তার প্রিয় ঢোল গান আর ছবি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার সঙ্গে যে-সব বড় মানুষদের সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে interesting যদি কিছু থাকে তো বলুন?'

বললেন, 'বড় মানুষদের চিরকালই এড়িয়ে এসেছি। তবে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৺শরৎচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে কাজ করেছি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। দেশের এই মানুষটির আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, সঙ্ঘশক্তি, চরিত্রবল আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই জেনেও এক দিনের জন্যও আমাকে এমন কিছু বলেননি যাতে আমি ক্ষুব্ধ হতে পারি।' প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, সুভাষচন্দ্রের উপর তিনি অনেক রচনা লিখছেন. একটি রচনা আগামী ডিসেম্বর মাস নাগাদ আমেরিকার Pacific Affairs এ প্রকাশিত হচ্ছে।

কথায় কথায় রাত হয়ে উঠলো অনেক। আমাকে ফিরতে হবে অনেক দূর। সিঁড়ির কাছ অবধি সঙ্গে সঙ্গে এলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। জানালেন নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে বাইরে পা দিলাম। কাশ্মিরী গেটের বড় টাওয়ার ক্লকটায় তখন ঢং ঢং করে ন'টা বাজছে।

"সেতারী" রবিশঙ্কর

পর পর বেশ কয়েক রাত জাগার একটা ছাপ রয়েছে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে। কোথায় গেছলেন, ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে সোজা এসে ঢুকলেন ঘরে। বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত· আপনাকে অনেকক্ষণ বসতে হোল।' বলতে বলতেই পাশের খাটটায় পড়লেন শুয়ে। তার পর আমার দিকে ফি বললেন, 'এইবার শুরু করুন আপনার কথা।' ঢোলা-পায়জামার ওপর সাদাসিধে লঙক্লথের পাঞ্জাবী, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, সাদা ধবধবে রঙ, মাঝারী গড়ন, লম্বায় সাড়ে চার ফুটের বেশী কিছুতেই নয়—মানুষটিকে জড়িয়ে কেমন যেন একটু রহস্য এনে দিয়েছে। এক নজরেই বলে দেওয়া যায় যেন, ইনি শিল্পী এবং জাত-শিল্পীর দলেরই কেউ।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি খুব ক্লান্ত?'

বললেন, 'আরে না, না, ভাই, গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষরা একটু গড়াতে ভালবাসে।'

পরিষ্কার বাংলা বলছেন। জন্ম বেনারসে। ১১২০ সালে। জন্মস্থান, তারিখ ইত্যাদি বলতে বলতে হঠাৎ রহস্য করে বলে উঠলেন, 'কই, আপনার খাতা পেনসিল কই?' বেশ গম্ভীর ভাবে বসে পেন্সিল ঠুকে নোট না করলে তো আপনাদের ঠিক সংবাদপত্র অফিসের লোক বলে মনে হয় না।'

কাজের কথায় এলাম। বললাম, 'ব্যারিষ্টারের বাড়ীর ছেলে হয়েও আপনি আইনের দরজায় কলা দেখিয়ে গান-বাজনা নিয়ে মাতলেন কি করে?'

—'দরজা আগেই পরিষ্কার করে রেখেছিল দাদা উদয়শঙ্কর। তবে গান-বাজনার উপর খুব তেমন চাড় আমার কোন দিনই ছিল না। মোটামুটি অবশ্য ভালই লাগতো। তবে আমার মা ভীষণ গান-বাজনা ভালবাসতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইচ্ছে আর দাদার সঙ্গে বিদেশে-বিদেশে ঘুরে নানা গানের জলসায় যেতে যেতেই ও-জিনিষটা আমার মধ্যে এসেছে। ঠিক কি ভাবে কখন কোথায় আমার বাজনা শেখবার ইচ্ছে হোল, যদি জানতাম কখনো দরকারে লাগবে

রবিশঙ্কর

তো না হয় মনে করে রাখতাম।' বলেই জোর-গলায় হাসতে লাগলেন।

—'আচ্ছা, 'আই, পি, টি, এ'তে আপনি কোন জিনিষটা মোটামুটি প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং সেইটে বা তা পারলেন না?'

—নৃত্যনাট্যের মধ্যে মিউজিকের scope দেশে তখন অত্যন্ত কম। অবশ্য এখনও যে যথেষ্ট রয়েছে তা নয়। পিপ্‌লস থিয়েটারের মধ্যে প্রথমেই আমি তাই মিউজিক নিয়ে পড়লাম। দাদার সঙ্গে আমার প্রভেদ খানিকটা এখানেও আছে। দাদা সাধারণতঃ সেট, সিন ইত্যাদির পক্ষপাতী। আমার কিন্তু মনে হয়, আবহাওয়া জমাতে মিউজিকের চেয়ে কেউ ভাল পারে না। আজকালকার সব দেখুন না! কাশ্মীরে কি হায়দ্রাবাদে দাঙ্গা হোল, নাটকে তাকেই ফোটাতে হবে—মন আপনার তাতে সায় দিক আর নাই দিক। যে-ই তাকে ভালো বলুক, আমি তো বাবা পারবো না। মনই যদি না রইলো তো অভিনয় হবে কোথা থেকে? আই, পি, টি, ছেড়ে দেওয়ার কারণও অনেকটা তাই। অবশ্য সব কিছুরই ওপরে ভাবতে হবে টাকার কথা। এই যে আজ দাদার মত লোককেও কোথায় বীরভূম, কোথাও বাঁকুড়াতে দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, এ শুধু টাকার জন্যেই তো? তাহলে নাচের উন্নতি হবে কোথা থেকে, বলুন? আর নাচের উন্নতির কথাই বা কি বলি! খানিকটা কথক, খানিকটা মণিপুরী মিশিয়ে জগাখিচুড়ী করে অখাদ্য সব পরিবেশনের দিকেই তো আজকাল রেওয়াজ।'

বয়স অত্যন্ত অল্প। মাত্র তেত্রিশ বছর। এরই মধ্যে সারা ভারতজোড়া এর সেতার বাজনার খ্যাতি। সেতারে যখন বসেন, মনের কথা তারের মধ্যে কি করে এসে ধরা দেয় তা নিজেই তিনি বলতে পারলেন না। স্বল্প জীবনের বেশী সময় কেটেছে মাইহারে। তাঁর পিতার ব্যবসা ছিল আইন। দেশীয় রাজার আইন-উপদেষ্টা হিসাবে বহু বার তিনি বিদেশে গেছেন বহু কাজে।

বর্তমানে রবিশঙ্কর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'মাসিক বসুমতী'র এক জন উৎসাহী গ্রাহক।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী ও আশীষ বসু সংগৃহীত।]

তিনি সেফ্‌টি-পিন আবিস্কার করেছিলেন

এখন থেকে ভবিষ্যতে যদি কোন দিন আপনার 'সেফ্‌টি-পিন্' ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়, তা হ'লে অন্ততঃ একবার—অন্ততঃ একটি বারের জন্য আপনি স্মরণ করবেন ওয়ালটার হাণ্টকে,—কেন না তিনিই এই সামান্য বস্তুটির আবিষ্কারক। দারিদ্র্যের কশাঘাতে যখনই ঘা খেয়েছেন হাণ্ট, তখনই তিনি একটা না একটা কিছু আবিষ্কার ক'রেছেন। ইচ্ছা থাকলে যেমন উপায় হয়, দারিদ্র্য থাকলে তেমনি বোধ হয় উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। হাণ্ট প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন ছুরি-ধারাণো-যন্ত্র, শিশের স্বয়ংক্রিয় দোয়াত-দান (যেটি কলম ডোবানোর পর তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়), পথ-পরিষ্কারের ঘূর্ণায়মান ক্রস্ এবং কংক্রীটের গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি। হাণ্ট যে সকল আবিষ্কারেই কৃতকার্য্য হয়েছিলেন, সে-কথা সত্যি নয়। কত প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি, ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু হাণ্ট তো একা ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী আর পাঁচটি সন্তান-সন্ততি। তাদের অনাহারে রাখা যায় না। ইং ১৮৩২ অব্দে হাণ্ট এমন একটি যন্ত্র তৈরী করলেন—যেটি সেলাই-কলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। এই যন্ত্রটি বাল্টিমোরের প্রদর্শনীতে দেখানো হয় এবং দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করে। খাড়া-দেওয়ালে ওঠার জন্য হাণ্ট এক ধরণের জুতোও আবিষ্কার করেন। এই জুতোর প্রচলন হয় না; কারণ এখনকার মত তখনকার মানুষ কথায় কথায় 'আরোহণ' করতো না। কয়েকটি ঔষধও তিনি আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর মানুষ যাতে সেই সেই ওষুধ তৈয়ারী ক'রে অর্থোপার্জ্জন করতে পারে, সে জন্য তিনি ঐ সব ওষুধ 'পেটেণ্ট' করেননি।

সেফটি-পিনের 'মডেল' তিনি বিক্রী ক'রে দিয়েছিলেন কেবল মাত্র অভাবের তাড়নায়, ৪০০ ষ্টার্লিঙে। ঋণগ্রস্ত হাণ্ট, বন্ধুদের নিকট থেকে পাওনা টাকার তাগাদায় অসহ্য হয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে সেফটি-পিন্‌কে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, ছিন্ন পোষাক আর রোগীর ক্ষত বন্ধনের সেবায়।

হাণ্ট জাতে আমেরিকান। ইং ১৮২৫ অব্দে নিউ ইয়র্কে বাসা বাঁধেন। মৃত্যু হয় ইং ১৮৫১ অব্দে।

পাড়ি
—মদন বোস

হংসেশ্বরী

—পান্না সেন

মুখচন্দ্র
—শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

প্রতিযোগিতা

বিষয়

ফুল ও পাতা

(পৌষ সংখ্যা)

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ১৫ই পৌষ

মাঘ সংখ্যার

প্রতিযোগিতা

বিষয়

শীতের সকাল

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ১৫ই মাঘ

জ্যামিতিক
—অবনী মতিলাল

হলওয়েল বর্ণিত ভারতের কথা

অনুবাদক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৫
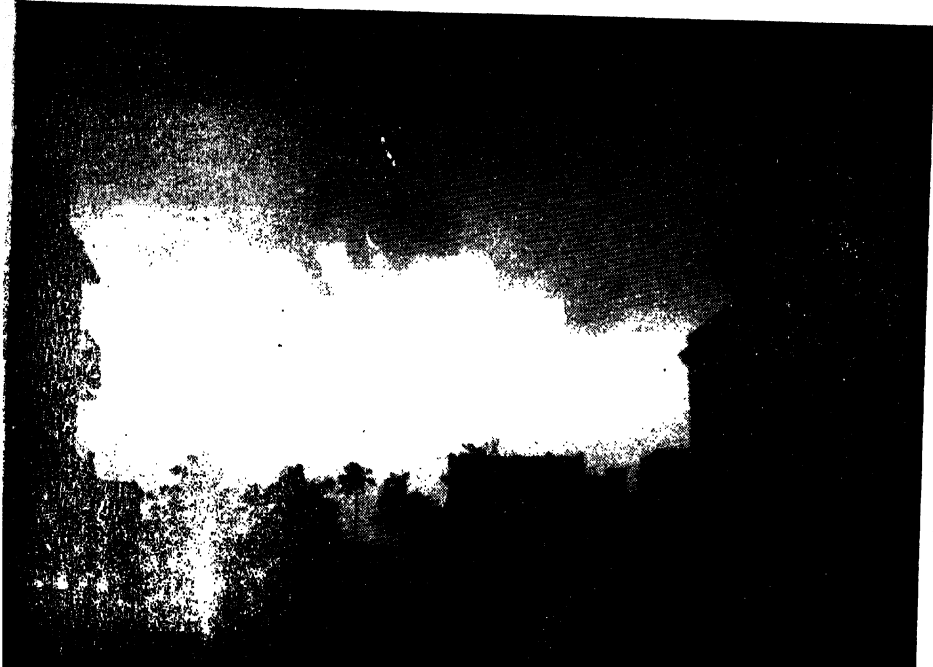
এই যাত্রাদলের সম্রাটগিরি করতে করতে তাঁর বিরক্তি ধরে গেল। যে নাগপাশে তিনি বদ্ধ হ'য়ে আছেন তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। নিজাম উল্ মুলুককে রাজ্যচ্যুত ক'রে তাঁর গদিতে বসবার জন্যে হোসেন আলি খাঁ তখন দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করেছেন। সেই যাত্রাপথেই হোসেন আলি খাঁ-কে এবং দিল্লীতে আবদাল্লা খাঁ-কে একই সময়ে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র পাকা করা হ'ল।

এই রকম একটি জটিল চক্রান্তে ব্যাপক ভাবে অনেকের সাহায্য না নিলে চলে না। সুতরাং কার্য্যনির্বাহের জন্য তিনি প্রধান ভাবে নির্ভর করলেন দু'-জন ওমরাহের উপর—একজন খন্দরান খাঁ (Khandoran Khan)*, অন্য জন মীর জুমলা (Mhir Jumla)। শক্তিমান সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় মাত্র এই দু-জন ওমরাহকেই অবজ্ঞাবশতই দলে টানেননি। ষড়যন্ত্রের সূত্রপাতেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যে এ সম্বন্ধে সবই জানতে পেরেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কে তাঁদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছিলেন তা নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না তবে খন্দরানই আবদাল্লা খাঁ-কে জানিয়েছিলেন ব'লে সন্দেহ করা হয়। যাই হোক, জানতে পারা মাত্র সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় স্থির করলেন—সর্বাগ্রে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে উজির রাজদরবারে আসা-যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। দূতের পর দূত পাঠিয়ে ভাইকে ডাকালেন এবং স্বীয় পদাধিকারে যে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তাদের সবাইকে একত্র করলেন।

ফরুখশায়ার যখন বুঝতে পারলেন যে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁর ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছেন তখন তিনি ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁর মাকে উজিরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ষড়যন্ত্রের যে সব কথা উজির শুনেছেন সে সব যে সর্বৈব মিথ্যা সেটা প্রমাণ করবার জন্য পবিত্র শপথ গ্রহণ করলেন পর্যন্ত। প্রচুর পরিমাণে প্রীতি ও বন্ধুত্ব জ্ঞাপন ক'রে এ কথাও বললেন যে তিনি যেন শীঘ্রই রাজদরবারে ফিরে আসেন এবং ইতিমধ্যে যদি কোনো সংবাদ ভাইকে পাঠিয়ে থাকেন তাও যেন প্রত্যাহার করেন।

সম্রাটের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আর কোনো সংশয়েরই অবকাশ নেই—এটা উজির বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন। তিনি সম্রাটকে লিখে পাঠালেন যে, সম্রাট তাঁর কথার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য স্বকীয় রক্ষী দল ও পার্শ্বচর দলকে বরখাস্ত করে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক নিযুক্ত রক্ষী দলকে গ্রহণ করুন। এই কুপরামর্শ ও কঠিন নির্দেশও যখন সম্রাট মেনে নিলেন তখন উজির আপন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে ভ্রাতার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই এই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

এদিকে ভাইএর চিঠি পাওয়া মাত্র সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ এক দল দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিরে এলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি দিল্লীতে পৌঁছলেন। উজির, অজিত সিং (মহারাজা—সম্রাটের শ্বশুর*) এবং কয়েক জন বড় বড় ওমরাহদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ করবার পরে সকলেই সেলিমগড়ের দুর্গে আওরঙ্গজেবের কন্যার মহলের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সেখানে দাবী করলেন যে বাহাদুর শা'র তৃতীয় পুত্র রফিল্ অল্ কাদেরের সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র রফিল অল্ দির্জাতকে মুক্ত করা হোক এবং হিন্দুস্থানের সম্রাট ব'লে ঘোষণা করা হোক। এই মর্মে তাঁরা শপথও গ্রহণ করলেন।

সেখান থেকে তাঁরা নূতন সম্রাটকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন। সেখানে ফরুখশায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক ব'লে ভৎর্সনা করতে আরম্ভ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ কালের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন ব'লে অজিত সিংও তাঁদের ভৎর্সনা করতে লাগলেন। এ সবের পর তাঁর হাত থেকে রাজ-তরবারি ও অন্যান্য রাজচিহ্নগুলি কেড়ে নেওয়া হ'ল এবং তাঁকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন যে রফিল দির্জাতকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। এমন কি তাঁকে নূতন সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করতে পর্যন্ত বাধ্য করা হ'ল। সর্বশেষে প্রাসাদের চূড়ায় এক কারাগৃহে তাঁকে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবার পরদিনই নিষ্ঠুর ভাবে ফরুখশায়ারের চক্ষু অন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় দিনে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি বিষপান করলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হ'ল না। তৃতীয় দিনে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলবার জন্যে কয়েকটি জল্লাদ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গলদেশে রজ্জু-বন্ধনী অনুভব করলেন (তখনও প্রাণের জন্য এমনই মায়া) সেই মুহূর্তে হাত ঢুকিয়ে জোর ক'রে সেই বন্ধনী ছিঁড়ে ফেললেন। আরেকটি দিন কোনো মতে এই যন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহিত হবার পর অর্থাৎ কিছু বেশি চার বছর রাজত্ব করবার পর ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলা হ'ল। মিষ্টার ফ্রেজারের মতে ফরুখশায়ার চার বছরের কিছু বেশি রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেন না তাঁর নিজের হিসাব অনুসারেই আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র শা'আলম ছ'বছর রাজত্ব করেছিলেন অর্থাৎ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের সুরু পর্যন্ত। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের সুরুতেই ফরুখশায়ার নিহত হলেন। তাঁর সিংহাসনারোহণ-পর্ব যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ত তা হ'লেও তাঁর রাজত্বকাল ছ'বছরের বেশি হ'ত না। কিন্তু কাকা মৌজুদ্দিন জাহান্দার শার আঠার মাসের রাজত্ব

---

* Khan Dauran.

* যোধপুরের ভূতপূর্ব মহারাজা যশোবন্ত সিং-এর পুত্র অজিত সিং—যে নাবালক পুত্রকে ঔরঙ্গজেবের কবল থেকে সেনাপতি দুর্গাদাস উদ্ধার করেছিলেন।

ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং ফরুখশায়ারের রাজ্যকাল চার বছরের বেশি হতে পারে না।*

সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলেন যে নবীন সম্রাট দির্জাত সম্বন্ধে তাঁরা ভ্রান্ত হয়েছেন। অল্প বয়সের ছেলে সহজেই

---

*ফরুখশায়ার যে অল্প কয়েক দিন রাজত্ব করেছিলেন তার মধ্যে তিনি এত হত্যা এবং নিষ্ঠুর কাজ করেছিলেন যা বোধ হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালেও ক'রে উঠতে পারেননি। সিংহাসনে ব'সেই তিনি ভূতপূর্ব সম্রাটের প্রধান কর্মচারীদের একে একে হত্যা করতে আরম্ভ করলেন। গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে মেরে হত্যা করাই তাঁর সময়ে সবচেয়ে প্রশস্ত ব'লে গৃহীত হ'য়েছিল। প্রধান কর্মচারীরা দরবারে যাবার আগে বাড়ী থেকে আত্মীয়-পরিজনদের কাছে প্রতিদিনই শেষ বিদায় নিয়ে যেতেন——কি জানি সেদিন আর বাড়ী ফেরা সম্ভব হবে কি না! এই কার্যে তাঁর সর্বপ্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন মীর জুমলা এবং সে সময়কার পাদিশা বেগম অর্থাৎ কিনা ঔরঙ্গজেবের কন্যা। এই সব হত্যাকাণ্ড শেষ হবার পরেই তার সঙ্গে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের খিটিমিটি সুরু হ'ল। পাছে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তৈমুর-বংশের অন্য কোনো রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসান, এই ভয়ে ফরুখশায়ার প্রাসাদের বন্দীশালা থেকে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি তারিখে জাহান্দার শা'র বড় ছেলে আজউদ্দিন, আজম শা'র ছেলে ওয়ালা তাবর, এবং তাঁর নিজের ছোট ভাই হুমায়ুন বক্তাকে (সে বেচারির তখন দশ কি বার বছর) বার ক'রে নিয়ে ত্রিপোলিয়ার দরজার ওপরে বন্দীগৃহে আবদ্ধ করলেন। অন্ধ রাজকুমার রাজত্ব পায় না——এই জন্য এই তিন হতভাগ্য রাজকুমারের চক্ষু অন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া ফরুখশায়ারের অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর কার্যের লম্বা তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে খিটিমিটি ঝগড়া হ'তে হ'তে শেষকালে আগুন জ্বলে উঠল। ফরুখশায়ার সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করবার চক্রান্ত করতে লাগলেন। কিন্তু বারে বারেই তাঁর সেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল। শেষকালে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় স্থির করলেন যে, ফরুখশায়ারকে রাজ্যচ্যুত ক'রে অন্য কোনো রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাবেন। সংবাদটা ফরুখশায়ারের কানে পৌঁছতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। ফরুখশায়ার অবিলম্বে প্রাসাদের অন্তঃপুরে হারেমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এদিকে এঁরা পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে, আলমগীরের প্রপৌত্র বিদারবক্তের পুত্র বিদার দিল্‌কেই সিংহাসনে বসানো হবে। কারণ তাঁদের মতে বিদার দিল্ খুবই সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। যাই হোক, যখন এঁদের দল বিদার দিলের বাড়ীতে পৌঁছল (সেখানে রাজপুত্র রফি-উস্-শানের ছেলেরাও ছিল) তখন সেখানকার হারেমের মহিলারা ভাবলেন যে, ফরুখশায়ার রাজবংশ নির্বংশ করবার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। এই কথা মনে ক'রে তাঁরা সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে রাজপুত্র বিদার দিল্‌কে একটা আলমারির মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। বাইরের লোকেরা চীৎকার করতে লাগল, আমরা রাজপুত্র বিদার দিল্‌কে নিতে এসেছি কারণ তাঁকে সিংহাসনে বসানো হবে——কিন্তু কে কার কথা শোনে! মেয়েরা চীৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দিলে। উপর থেকে তাদের ওপর বড় বড় ইট-পাটকেল পড়তে লাগল, শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে তারা দরজা ভেঙে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু রাজপুত্র বিদার দিল্‌কে খুঁজে পাওয়া যায় না, আতিপাতি ক'রে খুঁজে যখন তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তখন হতাশ হ'য়ে লোকেরা রফি-উস্-শানের ছেলে রফি-উস্-দর্জাতকে ধ'রে নিয়ে চলল সম্রাট ক'রে দেবার জন্যে। সে বেচারি অতি সামান্য পোষাকই পরেছিল। না ছিল রাজোচিত পরিচ্ছদ, না ছিল রাজোচিত অলঙ্কার। উজির সাহেব তাঁকে দেখে নিজের গলা থেকে এক ছড়া মুক্তামালা নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন, তার পরে তাঁর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানের সিংহাসন তক্ত-এ-তাউসে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরে চারশ' আফগান পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল প্রাসাদের অন্তঃপুরে——সিংহাসনচ্যুত ফরুখশায়ারকে ধ'রে আনবার জন্যে।

হারেমে এই সব আফগান সৈন্যেরা প্রবেশ করা মাত্র ফরুখশায়ারের রক্ষী-ক্রীতদাসীর দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অনেকে হত হ'ল, অনেকে আহতও হ'ল। সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরিকারা চীৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দিলেন। শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে ফরুখশায়ার এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আর তাকে ঘিরে রইল তার মা, তার স্ত্রী, তার কন্যা এবং প্রাসাদের অন্যান্য মহিলারা। কিন্তু আক্রমণকারী সৈন্যেরা মহিলাদের মারধোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে ফরুখশায়ারকে ধ'রে ফেললে। হ্যাঁচড়া-হেঁচড়িতে তার পাগড়ি উড়ে গেল, জুতো খসে গেল। তারা হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে দু'-দিন আগেকার সম্রাটকে লাথি-ঘুষো মারতে মারতে ও অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে টেনে নিয়ে চলল——দেওয়ান্-ই-খাসে উজিরের কাছে। বাবর-বংশীয় সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, বলশালী ও শক্তিমান পুরুষকে এই ভাবে খালি মাথায় খালি পায়ে কিল-চড় লাথি-ঘুষি মারতে মারতে আর গালাগালি দিতে দিতে দেওয়ান্-ই-খাসে কুতুব-উল্-মুলকের সামনে নিয়ে যাওয়াটা মোগল সম্রাটদের ইতিহাসের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব শোচনীয় ঘটনা! উজিরের সামনে দেওয়ান্-ই-খাসে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া মাত্রই তিনি তার দুই চক্ষু অন্ধ ক'রে দেবার হুকুম দিলেন। তখুনি ফরুখশায়ারকে পেড়ে ফেলা হ'ল কিন্তু কি দিয়ে অন্ধ করা যায়! উজিরের হাতবাক্স খুঁজে তাঁর চোখে সুর্মা লাগাবার একটা কাটি পাওয়া গেল। সেই কাঠি তাঁর দুই চোখে বিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। এদিকে ফরুখশায়ারের অন্তঃপুরে ও তোষাখানায় যত মূল্যবান জিনিষ ছিল——নগদ টাকা, পরিচ্ছদ, সোনা-রূপো তামা-পেতলের বাসন, এমন কি অন্তঃপুরিকাদের ব্যক্তিগত গয়নাগাঁটি ও রত্নাদি, শেষকালে তাঁর ক্রীতদাসী ও উপপত্নীদের পর্যন্ত লুণ্ঠন করে যে যার ভাগ ক'রে নিল।

ফরুখশায়ারকে অন্ধ ক'রে তাকে কেল্লার যে প্রধান দরজা ত্রিপোলিয়া তারই একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হল। এই ঘরেই সাত বছর আগে জাহান্দার শাকে বন্দী করা হয়েছিল। ঘরখানাকে একটা অন্ধকার গর্ত বললেই হয়। সামান্য একটু খাবার ও মুখ ধোবার জল ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। ইতিহাস বলে ফরুখশায়ারের এই বন্দী অবস্থা অত্যন্ত নির্যাতনের মধ্যে কেটেছিল।

বশ্যতা স্বীকার করবে—এই ভেবেই তাঁরা বড় ভাইকে লবাতি করে ছোট ভাইকে সম্রাট করেছিলেন। দির্জাতের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া মাত্র তাঁকে বিষপ্রয়োগে সরিয়ে ফেলা হ'ল। *—তিন মাসের রাজত্বের অবসান এই ভাবেই হ'য়ে গেল।

নূতন সম্রাট রফি-উস্-দর্জাত সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুদিন পরে ফরুখশায়ারের খবর নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন, ফরুখশায়ার নাকি তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে বলে পাঠিয়েছিলেন—"ওরে বুল্‌বুল্, মালির ছলনায় ভুলো না, তোমার পূর্বে এই বাগানে আমারও বাসা ছিল।" একেক বার এমনও হয়েছে যে চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত তিনি মুখ ধোবার জল পর্যন্ত পাননি, কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ-হাত-পা পরিষ্কার করেছেন। অখাদ্য খেয়ে খেয়ে তাঁর উদরাময় হ'য়ে গেল। এই অবস্থায় তিনি দিন-রাত চীৎকার ক'রে কোরাণ আবৃত্তি করতেন, কিন্তু অশুচি অবস্থায় বাস করছেন বলে কোরাণ আবৃত্তি করাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। লোকে বলে, তাঁর চোখ ফুঁড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি চোখে দেখতে পেতেন। সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে হত্যা করবার জন্যে লোক খুঁজতে লাগলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনেকেই তাঁকে হত্যা করতে রাজী হ'ল না। শেষকালে তাঁকে মারবার জন্যে জল্লাদ ডাকতে হ'ল। কেউ কেউ বলেন—ফরুখশায়ার দেওয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করেছিলেন। যাই হোক, ২৯শে এপ্রিল ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পরের দিনই তাঁর মৃতদেহ কেল্লার মধ্যে এক জায়গায় রেখে দেওয়া হ'ল যাতে লোকে ভূতপূর্ব সম্রাট বলে তাঁকে চিনতে পারে। মৃতদেহের মুখ হ'য়ে গিয়েছিল কুচকুচে কাল, তাতেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর দেহে অনেক ছোরা ও আঘাতের চিহ্নও ছিল। ফরুখশায়ারকে হুমায়ুনের সমাধি-প্রাঙ্গণে কবর দেওয়া হয়েছিল।

* রফি-উস্-দর্জাতকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে হয়নি, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। তাঁকে যখন ধ'রে এনে সিংহাসনে চাপানো হ'ল তখন তাড়াতাড়ি ও সেই হট্টগোলের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন সিংহাসন ভোগ করার পরেই টের পাওয়া গেল যে তিনি নিদারুণ যক্ষ্মারোগে ভুগছেন এবং রোগ এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। ওর উপরে তিনি আবার আফিং টানতেন। সিংহাসনে বসার পরেই তিনি দিনে দিনে দুর্বল হ'য়ে পড়তে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারা গেল যে, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে পেরে রফি-উস্‌দর্জাত সৈয়দভ্রাতাদের ডেকে বললেন যে, তাঁর বড় ভাই রফি-উস্-দৌল্লাকে যদি হিন্দুস্থানের সিংহাসন দেওয়া হয় তাহ'লে তিনি খুশি মনে মরতে পারেন। তাঁর ইচ্ছামত ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে রফি-উস্-দর্জাতকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁকে হারেমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। দু'দিন পরে অর্থাৎ ৬ই জুন তারিখে রফি-উস্-দৌল্লাকে সিংহাসনে বসানো হ'ল।

এর কয়েক দিন পরেই অর্থাৎ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখে রফি-উস্-দর্জাতের মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুকালে তাঁর কুড়ি বৎসর বয়স হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, ষোলো কিংবা সতেরো বৎসর বয়সে রফি-উস্-দর্জাতের মৃত্যু হয়।

এবার তাঁর বড় ভাইকে সম্রাট করা হ'ল। তিনি শা'জাহান অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর এই উপাধি গ্রহণ করলেন।

এই ভাবে সৈয়দভ্রাতৃযুগল শক্তিমদে মত্ত হ'য়ে নানান অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন। ফলে অচিরেই তাঁরা রাজ্যশুদ্ধ সকলের শত্রু হ'য়ে উঠলেন। উপর্যুপরি হত্যাকাণ্ডের ফলে তাঁরা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন। প্রধান প্রধান রাজা ও ওমরাহেরা তাঁদের ঈর্ষা করতেন; কারণ সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের যে এতখানি শক্তি ও প্রভুত্ব গ্রাস করবেন এটা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না—কেন না, তাঁরা মনে করতেন যে ঐ শক্তি ও প্রভুত্বের খানিকটা তাঁদেরও প্রাপ্য। শীগ্‌গিরই এক শক্তিসম্পন্ন দল সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল। যাঁরা এই দলের মাথা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সবেজী ফীত সিং (Savejee feet Singh) যিনি রাজা ফৈজ সিং নামে অধিকতর পরিচিত ছিলেন, গোপাল সিং বৌদ্রি (Gopaul Singh Bowderee) এবং শিবলরাম রায় (Chivalram Roy)—প্রত্যেকেই এক-একটি প্রতাপশালী রাজা।

[ক্রমশঃ।

আত্ম-পরিচয়

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উছিলার পাণি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়ীতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

* * *

দুরিতে দারিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ॥
মনসাদেবীরে বন্দি করি করযোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব শিব বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥

* * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে গীতা রামায়ণ গায়॥

* * *

সুলোচনী মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥

—মহিলা কবি চন্দ্রাবতী (১৬শ শতাব্দী)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

নরেন বাবু দলবল সহ থানায় ফিরে সেখানকার পরিবেশের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখলেন। চতুর্দ্দিকে থমথমে নিঝুম নিস্তব্ধ ভাব; চলনের গতি পর্য্যন্ত যেন স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। থানায় উপস্থিত কেউ সাহস করে নরেন বাবুর মুখের দিকেও তাকাতে পারে না। তবুও একজন অফসার সাহস করে এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে বললে, 'আপনাকে আমি একটা দুঃসংবাদ দেবো, স্যার! আপনার স্ত্রী একটু আগে হার্ট ফেইল করে মারা গেলেন। পাশের ডাক্তারখানা থেকে বর্ম্মণ ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেননি। বহুবাজারে আপনার শ্বশুর-বাড়ীতে খবর দেওয়া মাত্র তাঁরা সকলেই এসে গিয়েছেন, আপনার ছেলেটিকেও তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তাঁকে দেখাবার জন্যে, কিন্তু তার আগেই এখানকার সব শেষ হয়ে গেলো যে।'

নরেন বাবু চতুর্দ্দিকে যেন একটা অন্ধকার দেখলেন। দুই হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে টলতে টলতে নিজের আফিস-ঘরে এসে বসে পড়লেন। এই দুঃসংবাদে প্রণব বাবুও কম বিস্মিত হননি। নরেন বাবু স্ত্রীর অসুখ শুনেছিলেন, কিন্তু সেই অসুখ এতো বেশী তা তিনি জানতেন না। সব জেনে-শুনে নরেন বাবু কি করে আজকার অভিযানে বার হয়েছিলেন তা প্রণব বাবুর ধারণার বাইরে। প্রণব বাবুর মনে পড়ে গেল, এই দিনের অভিযানে 'বার হবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার একটি ঘটনার কথা। অভিযানের জন্যে সিপাহী-শান্ত্রী জড় করতে করতে নরেন বাবু স্মারক-লিপির বাকি অংশটুকু লিখে ফেলছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ীর বুড়া ঝি এসে খবর দিলে, 'মা-মণির অসুখ একটু বেশী মনে হচ্ছে, তেনা আপনাকে একবার উপরে ডাকতেছে।' প্রত্যুত্তরে বিরক্তির স্বরে নরেন বাবুকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, 'এখোন আমি ডাইরী লিখছি, বিরক্ত করো না আমাকে। একটু পরেই মামাবাবু এসে যাবে, যা হয় সেই করবে আখুন। আমার আবার এখুনি একটা জরুরী কাযেও বার হয়ে যেতে হবে। সরকারী কায ফেলে এখোন উঠি কি করে? যাও এখোন তুমি।' নরেন বাবুর এই দিনকার প্রতিটি উক্তি তাঁর স্মরণপথে উদিত হলেও প্রণব বাবু তাঁর উপর আজ আর রাগ করতে পারলেন না। কিন্তু তবুও প্রণব বাবুর একবার মনে হলো এই দিন অভিযানে বার হবার পূর্ব্বে ঐ ঝি এসেছিল ঈশ্বর-প্রেরিত দূতরূপে নরেন বাবুকে সতর্ক করে দিতে মাত্র। ধীরে ধীরে প্রণব বাবু নরেন বাবুর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন, 'একবার উপরে যাবেন, স্যার?'

'কি? কি বললে? ওপরে?' নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'না, ওপরে যাবো না; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি না একটু আগে বলেছিলে যে একটা ছোট অপরাধ দ্বারা একটা বড়ো অপকর্ম্ম চাপা যায় না। এ কথা তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করেছিলে? তুমি কি বলতে চাও যে আমার স্ত্রীর মৃত্যু আমার অযৌক্তিকর এবং অত্যধিক কর্ম্মতৎপরতার শাস্তিরূপে এলো? কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা'হলে আমার শিশুপুত্র কি অপরাধে আজ মাতৃহারা হলো? জানি না, ঈশ্বর বলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু আছেন কিনা, যদি আমার কাযের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া তাঁর অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তা'হলে এই সকল দস্যুদমনের জন্য এতো বড়ো ক্ষতি স্বীকারেও আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমার অবোধ শিশুপুত্র কার কাছে কি অপরাধ করেছিল? না প্রণব, আমি কোনও অন্যায় করিনি, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তো তোমাদের ঈশ্বরই তা করেছেন।'

প্রণব বাবুর সতর্কবাণী যে এমন করে এতো শীঘ্র কার্য্যকরী হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। কোনরূপ ভেবে-চিন্তেও এরূপ কোনও উক্তি এই দিন তিনি করেননি। লজ্জিত ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্ন তাঁর গত্যন্তর ছিল না। অবাক হয়ে প্রণব বাবু শুনলেন—নরেন বাবু, রহমান সাহেব, শৈলেন বাবু এবং অন্যান্য অফসারদের কাছে ডেকে আফিসের বাকি কাজকর্ম্ম তাঁর নিকট হতে বুঝে নিতে বলছেন। প্রত্যেকটি কাজ এই এই ভাবে শেষ করে ফেলতে হবে, কোথাও যেন ভুল না হয়, ইত্যাদি বলে নরেন বাবু তাদের বললেন, 'প্রণব বাবুকে নিয়ে আমাকে এখোন শ্মশানে যেতে হবে। ফিরে এসে তোমাদের কাজগুলো কিন্তু আমি চেক্ করে দেখবো।'

সম্মুখের এই শক্তিমান পুরুষটির দিকে অনিমেষ নয়নে প্রণব বাবু বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন। মানুষের স্নায়ুর শক্তি যে এতো বেশী হতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে। অতি কষ্টে বাক্যস্ফুরণ করে প্রণব বাবু নরেন বাবুকে অনুরোধ করলেন, 'এইবার একবার উপরে চলুন, স্যার।' কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে নরেন বাবু উত্তর করলেন, এ্যাঁ, উপরে, কেন? না, ওপরে যাবো না। তুমি বরং ওপরে গিয়ে আমার শ্যালককে একটু সাহায্য করো। আমি কিন্তু সোজা শ্মশান-ঘাটে চলে যাচ্ছি। সেখানে আমি তোমাদের সঙ্গে মিট্ করবো।'

সহরতলীর উত্তর দিকে অবস্থিত খালের ধারে বিস্তীর্ণ বস্তী-গ্রামের পিছনে সমুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বিরাট বাগানবাড়ী, কিন্তু এই সুবিশাল অর্দ্ধভগ্ন দ্বিতল বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আজ আর সুদৃশ্য উদ্যান দেখা যায় না। কয়েকটি মূল্যবান বৃক্ষ এর পূর্ব্ব-গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ আজও সেইখানে দণ্ডায়মান থাকলেও তাদের

বেষ্টন করে প্রায় সর্ব্বত্রই দুর্ভেদ্য মসীঘন ঝোপঝাড় ও আগাছা বিরাজমান। এই আগাছা ও ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে একটি আঁকাবাঁকা স্বল্পপরিসর পথ অর্দ্ধভগ্ন চূণবালী-খসা বৃহৎ অট্টালিকার প্রধান দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে থেমে গিয়েছে।

এই সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্দেশে ভগ্নাবস্থা দেখা গেলেও এর অভ্যন্তরের দুটি হল-ঘর সমেত দশ-বারোটি কক্ষ সুন্দররূপে মেরামত করা আছে। এমন কি ওদের ভিতর-দেওয়ালের ওপর অতি সুন্দর পদ্মের কাজও দেখা যায়। এছাড়া বহু রকমের যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রে এই ঘরগুলি সুসজ্জিত। দূরের নাতিবৃহৎ কক্ষে একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী ডায়ানামো যন্ত্রও রক্ষিত আছে। এই ডায়ানামো যন্ত্র হতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দ্বারা এই বাটীতে অবস্থিত বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা এবং বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি বৈদ্যুতিক উনান প্রয়োজন মত কার্য্যকরী করা হয়ে থাকে। এই সুরক্ষিত আড্ডাঘরটি হচ্ছে ভিখিরী সংগঠনের বড়ো সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবুর প্রধান ঘাঁটি। কলিকাতার এই প্রধান ঘাঁটিটি হতে বোম্বাই এলাহাবাদ বেনারস ও মাদ্রাজ প্রভৃতি উপ-ঘাঁটিগুলিতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভিখারী সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন স্থান হতে বালক-বালিকা এবং শিশুদের ভুলিয়ে বা চুরি করে এখানে এনে তাদের বিকলাঙ্গ এবং অন্ধ করে তাদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন উপ-সর্দ্দারদের অধীনে ভিক্ষাবৃত্তি করানোর জন্যে চালান করে দেওয়া হয়ে থাকে। কলকাতা হতে সংগৃহীত বালক-বালিকাদের বোম্বাই এবং বোম্বাই হতে সংগৃহীত হতভাগা-হতভাগিনীদের মাদ্রাজে চালান দেওয়া নিয়ম, তাই বড়ো সর্দ্দারকে বিভিন্ন শহরের আড্ডাগুলি ফার্ষ্ট ক্লাশ রিজার্ভ ট্রেণে চড়ে পরিদর্শন করতে যেতে হয়ে থাকে। প্রায় প্রতি শহরেই বসবাসের জন্য তাঁর নিজস্ব সুবৃহৎ বসতবাটী আছে, এছাড়া কলকাতা এবং বোম্বাই শহরে ব্যবহারের জন্য তাঁর একটি মূল্যবান রোল্স এবং একটি মিনার্ভা মোটরযানও মোতায়েন আছে।

এলাহাবাদ শহরের উপ-ঘাঁটি পরিদর্শন করে বড় সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবু এইদিন কলকাতার প্রধান ঘাঁটিতে এসে এখানকার কার্য্যাবলী পরিদর্শন করছিলেন। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখের একটি রিভলভিং চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে য়ুরোপীয় পোষাক-পরিহিত বড় সর্দ্দার উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিলেন। মূল্যবান গালিচার উপর রাখা কয়েকটি কৌচ-চেয়ারে বসে আছেন তাঁর প্রিয়বন্ধু মেছুয়া অঞ্চলের বিহারীলাল বাবু, এবং তাঁর তাঁবেদার কয়েক জন উপ-সর্দ্দার। এমন সময় দেখা গেল, একটি মূক বালকের কাঁধে ভর করে একজন বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তি অতিকষ্টে বড় সর্দ্দারের সেই খাসকামরায় ঢুকছে। নিকটে এসে অভিবাদন করে বালকটি হাঁ করে বো-বো করে কি যেন বলতে চেষ্টা করলো। বড় সর্দ্দার খুশী হয়ে মুখটা নীচু করে দেখলেন বালকের মুখের ভিতর জিহ্বার স্থলে মাত্র একটি স্থূল মাংসের পিণ্ড দেখা যায়। এর পর তিনি কুব্জদেহী বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, তার উভয় চক্ষুর মণি উপর দিকে উঠানো, চেষ্টা করেও সেখানে চক্ষুর শ্বেত অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর পর আদিষ্ট হওয়া মাত্র কুব্জদেহী বৃদ্ধ তার চক্ষুমণি উপরের দিক হতে নীচে নামিয়ে চক্ষের মধ্যস্থলে এনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বালকটি তার কুণ্ডলীকৃত জিহ্বা লম্বা করে কথা কইতে সুরু করে দিলে।

বড় সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ভেল্কীবাজ বালক এবং বৃদ্ধের প্রতি চোখ বুলিয়ে নিয়ে এইখানকার প্রধান ঘাঁটির কর্ম্মকর্ত্তা সুখর্জী সাউকে বললেন, 'বা, বা, চমৎকার তৈরী করেছো তো এদের! মাত্র এই কয় দিনের অভ্যাস দ্বারা এরা এই ভাবে জিহ্বা ভেতরে গুটতে এবং চোখের মণি উপরে তুলতে সমর্থ হয়েছে? এখানকার কারখানার কাজকর্ম্ম তা'হলে দেখছি ভালোই চলছে। এই রকম দুটি ভালো পেয়ার আমাদের বোম্বাই-এর ঘাঁটিতে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাঠাতে চাই, এদের প্রত্যেককেই আমি প্রাপ্য কমিশন বা উপরি ছাড়া মাসিক এক শত টাকা মাইনেও দেবো। আচ্ছা, এরা তা'হলে পরীক্ষায় পাশ। এখোন এখান হতে এরা যেতে পারে। হাঁ, আরও একটা কথা বলবার আছে তোমাকে, এদের পঞ্চাশ টাকা করে এখুনি বখশীষ দিয়ে দাও, খরচ লিখিয়ে রাখবে আমার নিজের নামে, বুঝলে?'

পরীক্ষায় প্রশংসনীয়রূপে পাশ করে অলীক মূক ও অন্ধ জীব দুটি কক্ষ ত্যাগ করা মাত্র সেখানে সাধুর বেশধারী এক ব্যক্তি একটি এগার বৎসরের ফুটফুটে ক্রন্দনরতা সুন্দরী মেয়েকে টেনে এনে বড় সর্দ্দারের নিকট হাজির করে দিলে। এই নকল সাধুটি ছিল ভিখারী অপদলের একজন প্রধান সংগ্রাহক বা আড়কাঠি। এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে বড় সর্দ্দার প্রথমে খুশী হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এই সময় সহসা তাঁর নজর পড়লো মেয়েটির একটি চক্ষুর দিকে। তার বাম চক্ষুটি লোহিত বর্ণ ধারণ করেছে এবং তার একটি কোণ হতে ঝরে পড়ছে রক্ত। তার ছোট্ট নরম হাতটি আহত চক্ষের উপর রেখে মেয়েটি থেকে থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল।'

'কি হয়েছে খুকী, কেউ মেরেছে তোমাকে?' বড় সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবু আদর করে মেয়েটিকে কাছে এনে বললেন, 'কিছু ভয় নেই তোমার, বলো আমাকে সব কথা। এক্ষুণি আমি তোমার চোখে ওষুধ দেবার ব্যাবস্থা করে দিচ্ছি।' 'আজ্ঞে আজ্ঞে, এঁ্যা এঁ্যা, আমাকে, আমাকে,' কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বললে, 'এই লোকটা আমাকে খেলনা দেবে বলে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এলো, আমি বাড়ীর সামনে খেলা করছিলাম। মা বারণ করেছিল আমাকে যেন আমি দূরে কোথায়ও না যাই। আমি তো মার কথার একটুকুও অবাধ্য হইনি, আমি বাড়ীর গেটের কাছেই তো নিতুদার সঙ্গে খেলা করছিলাম। আমি এই জঙ্গলের মধ্যে ভয়ে ঢুকতে চাইছিলাম না, তাই ও আমার চোখে ধাঁই করে একটি কীল আর একটি চড় বসিয়ে দিলে, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে যে আমার, উঃ বাবা রে! আমার চোখটা বোধ হয় এক্কেবারে কানা করে দিলে। আমি মার কাছে বাবার কাছে যাবো, ও মা মা, মা, বাবা-আ-ও!'

বড় সর্দ্দার মেয়েটির বাম চোখটি হাত দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা খুকী, দেখতে পাও কিছু?' উত্তরে খুকী বললো, 'আজ্ঞে হাঁ, দেখতে পাই।' 'আচ্ছা বেশ,' বলে বড় সর্দ্দার মেয়েটির ডান চোখে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'এইবার কি দেখতে পাচ্ছো কিছু?' 'না না, কিচ্ছু না', কেঁদে ফেলে মেয়েটি উত্তর করলো, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' 'সোইন ষ্টুপিড' বলে সাধুটিকে গাল দিতে দিতে বড় সর্দ্দার বললো, 'এঁ্যা, এ কি করেছো তুমি,

ছিঃ ছিঃ, এমন সুন্দর একটা মেয়ে ; একটা চোখ এর এমনিই কানা করে দিলে। এখানে কানা করবার যন্ত্রপাতি কম আছে ? এ ভাবে অঙ্গহানি না করলে একে দুই-এক বছর পরে বড় বড় কাপ্তেনদের কাছে দশ হাজার টাকায় বিক্রী করতে পারতাম। বাবু প্রাণধন মল্লিককে কতো দিন আগে কথা দিয়েছি এই রকম একটা ভালো জিনিস তাঁকে জোগাড় করে দেবো, এতো দিন পরে একটা মনের মত মেয়ে পাওয়া গেল, কিন্তু তা কিনা কোনও কাযে লাগলো না ! এতো অসাবধানী হলে কি চলে, এক্কেবারে এক-কালীন দশ হাজার টাকা বরবাদ, ছিঃ ছিঃ ! যাক, যা হয়ে গেছে তার তো আর কোনও চারা নেই, এখোন একে চেরাই-ঘরে নিয়ে ওর ডান চোখটাও কানা করিয়ে নিয়ে এসো। দিন পনেরো পরে একটু সুস্থ হলেই একে রাত্রের ট্রেণে সোজা বোম্বাই পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে ? কলকাতার মেয়েকে দিয়ে কলকাতায় ব্যবসায় না লাগানোই ভালো।'

মেয়েটিকে ভোলাবার জন্য তার হাতে একটা মিঠাই দিয়ে উপস্থিত একজন উপ-সর্দ্দার তাকে নিয়ে ভিতর মহলে অন্তর্ধান হয়ে গেলে বড় সর্দ্দার প্রধান আড্ডার কর্ম্মকর্ত্তা সুখাই বাবুকে বললেন, 'যাক, এখানকার যা কিছু ব্যাপার তা তো বুঝে নিলাম, এখোন বলো বিহারী বাবুর ফরমাজী কাযের কতো দূর করতে পেরেছো। খুকুরাণীর অবস্থা এখোন কেমন, একটুও কায়দা করতে পারলে তাকে ? কয়েদ-ঘরে তার মতন আর কাউকে এনে রেখেছো নাকি।' বিহারী বাবুর প্রতি একটু সপ্রতিভ দৃষ্টি হেনে খুস-মেজাজে প্রধান আড্ডার কর্ম্মকর্ত্তা সুখই বাবু উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে, অগ্রিম টাকা নিয়ে ওঁর ফরমাজী কাযে এলাকাড়ী দেবো, এমন বেইমান আমরা নই। প্রথমে মনে করেছিলাম ওকে দিয়ে প্রণব দারোগাকে ট্র্যাপ করে এখানে আনিয়ে নেবো ; কিন্তু এখনও ওর সেই প্রণব বাবুর উপর অন্তরের টান, তা ছাড়া বড়ো ধড়িবাজ মেয়ে সে, হাঁ করলেই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে নেয়। অগত্যা ক্লোরোফর্ম করে একেবারে অন্ধ করে দিয়ে তাকে বাগ মানাবো ঠিক করলাম। এ দিকে আমরা বাবুরাম সর্দ্দারের স্ত্রী চন্দ্রা রাণীকেও পুলিশের খপ্পর হ'তে উদ্ধার করে এখানে এনে আশ্রয় দিয়েছি। খুকুরাণীর রূপ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্রা রাণী বললে, ওকে বরং রাজা প্রাণধন বাবুর নিকট বিক্রী করে দাও। এমন নিটোল সুন্দরী মেয়ে হাজারের মধ্যে কদাচ একটা মেলে, বয়সটা সামান্য একটু যা বেশী হয়ে গেছে, এই যা। একদিন হুজুর প্রাণধন বাবুকে গোপনে এখানে এনে মেয়েটাকে তাঁকে দেখিয়েও দিলাম। প্রাণধন বাবু তো তাকে দেখে আনন্দে আটখানা, কিন্তু খুকুরাণী আমাদের সর্ত্তে রাজী হলো কৈ ? চন্দ্রা রাণী কিন্তু খুকুরাণী সম্পর্কে একটু মাত্রও আশা ছাড়েনি, তেনা প্রস্তাব করলেন যে, জন্মের মত ওকে অন্ধ না করে তিন মাসের জন্য ওকে অন্ধ করে দিলে একদিন উনি বাগে আসবেই। তাই চন্দ্রা বৌদির পরামর্শ মত তাকে চেরাই-ঘরে এনে অন্ধ না করে তাকে আমরা বিদ্যুত-ঘরে এনে বৈদ্যুতিক শক্ দ্বারা তার চোখের স্নায়ু ঝলসে দিই। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তিন মাস পর তার স্নায়ু পুনর্গঠিত হলে সে তার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পাবে ; কিন্তু কালকে আমাদের বেতনভোগী নরেন ডাক্তার এসে বলে গেল, বৈদ্যুতিক শক্কার তেজ একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় তার চক্ষুর স্নায়ু বিদগ্ধ হয়ে গিয়েছে, খুকুরাণী তার দৃষ্টিশক্তি আর কোনও দিনই ফিরে পাবে না। মেয়েটা হুজুর দেখতে কিন্তু ভারী চমৎকার ছিল, হুজুর তাকে দেখলে নিশ্চয়ই পছন্দ করে ফেলতেন।'

'যাক বাঁচা গেল, চোখ দুটো তা'হলে তার গেছে,' খুশী হয়ে বিহারী বাবু বললেন, 'তা তোমাদের চন্দ্রা বৌদিরই বা তার উপর এতো দরদ কেন ? বজ্জাত মেয়েটা আমার মান-ইজ্জত সব খুইয়ে দিয়ে তবে না ম'লো ! শহরের বড়ো হাকিম, নগর-কোটাল, উপ-নগরপাল প্রভৃতি কতো মান্যগণ্য লোকই না আমাকে খাতির করেছে, আজ তারা আর কেউ আমাকে দেখালে চিনতে পর্য্যন্ত পারে না। হতভাগিনী থানার দারোগা বাবুদের শুড়ুক-সন্ধান দিয়ে সাহায্য না করলে তাদের সাধ্য কি আমাকে এমনি করে কায়দা করে ? তোমাদের চন্দ্রা বৌদির সঙ্গে আগে-ভাগে খুকুরাণীর আলাপ ছিল না তো ? দেখো বাপু, আমার মত তোমরাও না আবার বিপদে পড়ো।'

'আজ্ঞে আপনি কি-ই যে বলেন,' প্রত্যুত্তরে সুখুই বাবু বললে, 'উনি হচ্ছেন আমাদের বাবুরাম সর্দ্দারের স্ত্রী। বাবুরাম বাবুর মত একজন কর্ম্মী আমাদের দলে আর একজনও আছে ? ওঁরা দু'জনাই বহু দিন যাবৎ আমাদের দলের সঙ্গে এক্কেবারে মিশে গিয়েছেন, আমাদের দলের কোন খবরটাই বা ওঁরা না জানেন, তাই এখোন বলুন তো ? ওঁদের যা কিছু রাগ তা ঐ রাজা প্রাণধন বাবুর উপর, কিন্তু আমাদের নিকট আশ্বাস পেয়ে তো ওঁরা চুপ করেই আছেন। আরও কয়েক হাজার টাকা রাজা সাহেবের কাছ হতে আদায় করে আমরা সকলে মিলে ওঁর উপর প্রতিশোধ নেবো। রাজা প্রাণধন বাবু আমাদের আড্ডায় এলে ওঁরা দু'জনাই যে লুকিয়ে পড়েন তা কি আমাদেরই মান রাখবার জন্যে নয় ? ওঁদের সম্বন্ধে এই রকম কথা আর যেন আপনার মুখে আমাদের না শুনতে হয়। আপনার সঙ্গেও তো আবার রাজা সাহেবের খুউব দহরম-মহরম, দেখবেন সব কথা ফাঁস করে দেবেন না যেন।'

'না না, ওসব তোমাদের বাজে সন্দেহ, বিহারী বাবুর সম্বন্ধে এইরূপ কথা কখনো বলবে না,' প্রত্যুত্তরে বড় সর্দ্দার বললেন, 'রাজা প্রাণধন বাবু ওঁর বেশী আপনার, না আমরা ওঁর বেশী আপনার ? আমাদের ক্ষতিকর কোনও কার্য্য উনি নিশ্চয়ই করবেন না। খুকুরাণী সম্পর্কে আমরা যা কিছু করলাম তা তো ওঁর জন্যেই। এখোন চলো দেখি তোমাদের খুকুরাণীর চেহারাটা তো দেখে আসি। খুউব রূপের মেয়ে হলে ওর চোখ দু'টার চিকিৎসা করানো যাবে আখুন।' 'আজ্ঞে, সে তো এখোন এখানে নেই', ভিখিরীদের কর্ম্মকর্ত্তা সুখুই বাবু উত্তর করলেন, 'চন্দ্রা বৌদির উপদেশে সে ভিক্ষে করতে রাজী হওয়ায় তাকে আমরা বেলভিউ রোডের একটা নাইট ক্লাবের সামনে বসিয়ে দিয়ে এসেছি, এ বিষয়ে একটু তালিম দিয়ে তাকে আমরা এলাহাবাদ পাঠিয়ে দেবো। সত্যি চন্দ্রা বৌদির আমাদের বুদ্ধি কতো, এবার হতে বুঝোনোর ব্যাপারে আমরা তাঁরই সাহায্য গ্রহণ করবো।'

'খুকুরাণীকে এতো সুযোগ-সুবিধে না দেওয়াই ভালো ছিল,' সন্দিগ্ধ ভাবে বিহারী বাবু বললেন, 'ওকে হাওড়ার বাদশা মিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হতো, আমার মতে ওকে কোলকাতায়

আর একটা দিনও রাখা উচিত হবে না, কারণ প্রণব বাবুর নেতৃত্বে পুলিশ এখোন মাত্র ওকেই খোঁজাখুঁজি করছে। বোধ হয় আমাদের বিরুদ্ধে মামলায় ওকে প্রধান সাক্ষী করা হবে। এখোন যদি আমরা নরেন দারোগার একমাত্র পুত্রকে এখানে এনে ফেলতে পারি, তা'হলে পুলিশী তদন্তের যা কিছু জোর, তা এখুনি স্তব্ধ হয়ে যায়।' 'অতো ব্যস্ত হচ্চেন কেন?' প্রত্যুত্তরে কর্ম্মকর্ত্তা সুখুইরাম বাবু বললেন, 'সে বন্দোবস্ত ইতিপূর্ব্বেই করা হয়েছে। এই কাজের জন্য লোকও পূর্ব্বে পাঠানো হয়েছে। এতোক্ষণে তাকে তারা কারখানার ল্যাবোরেটারীতে এনেও ফেলেছে, এমন কি ইতিমধ্যে হয়তো তার মুখ-চোখ ইলেকট্রিক ফার্ণেসে চড়িয়ে দিয়ে বিকৃতও করে দেওয়া হয়েছে। আপনার ফরমাজ মতো দুটো কাজই তো আমরা করে দিলাম, তবুও আপনি বৃথা আমাদের প্রতি অভিযোগ করছেন? আসুন তা'হলে আপনারা, কারখানার দিকে অগ্রসর হই।'

সকলে মিলে এইবার পর্য্যবেক্ষণের জন্য বাটীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করলেন। বাটীটি ছিল প্রকাণ্ড একটি চক-মিলানো দালান-বাড়ী। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের উপর কয়েকটি মানুষ-টানা ভিখারীদের গাড়ী সারিবন্দি ভাবে রক্ষিত দেখা যায়। এখানে-ওখানে কয়েকটি সদ্যনির্ম্মিত হাল্কা ধরণের ছাউনি। আশে-পাশে কুষ্ঠ, খঞ্জ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ বহু ভিখিরী ঘোরাঘুরি করছে। শহরে ভিখিরীদের উপর পুলিশের হামলা সুরু হওয়ায় এদের কয়েক জনকে এখানে এনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটা উন্মুক্ত চালার তলায় উনানের উপর বড়ো বড়ো হাঁড়ি রেখে চার-পাঁচ জন পাচক তাদের জন্য খাদ্য-রন্ধনে ব্যাপৃত।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে বড় সর্দ্দার তাঁর সাকরেদ-দ্বয় সহ প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের মহল হতে ভেসে আসছিল শিশু-কণ্ঠের এক চাপা কান্নার স্বর। কান খাড়া করে শিশু-কণ্ঠের সকাতর কাতবানি শুনে বড় সর্দ্দার এবং বিহারী বাবু সামান্য ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হয়তো এতে তাঁদিকে কিছুটা বিচলিতও করে থাকবে; কিন্তু তা সামান্য ক্ষণের জন্য মাত্র, কারণ, এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে বিচলিত হওয়া তাঁদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। নিমিষে আত্মসংবরণ করে তাঁরা এই বাটীর উত্তর দিকের মহলে প্রবেশ করলেন। এই মহলের গেট হতে একটি ছাদ-ঢাকা গলির পথ আড্ডাখানার বৈদ্যুতিক লেবোরেটারী পর্য্যন্ত প্রসারিত। এর দু'ধারে অবস্থিত গরাদেওয়ালা গারদ-ঘরের মধ্যে প্রায় জন ত্রিশ অসহায় বিকলাঙ্গ শিশু এবং বালক-বালিকা গড়াগড়ি করে ছেঁড়া কম্বলের উপর শুয়ে আছে।

বৈদ্যুতিক ল্যাবোরেটারীর নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র কাপড়ের মুখোসে মুখ-চোখ-ঢাকা, সাদা মেডিকেল গাউন পরিহিত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে সকলকে অভিবাদন করে নিবেদন করলো, 'আজ্ঞে, ছেলেটাকে এখানে আনা মাত্র আমি আপনাদের নির্দ্দেশ মত সব কাজ ফতে করে দিয়েছি, এমন ভাবে ছেলেটার মুখ-চোখ ব্যাটারী দিয়ে ঝলসে দিয়েছি যে, ওর নিজের বাবা এলেও এখোন আর তাকে চিনতে পারবে না।' বিহারী বাবুর মুখের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রেখে বড় সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবু বললেন, 'তা'হলে তো বিহারী বাবুর আর কোনও ক্ষোভের কারণ নেই, নরেন দারোগার উপর এর চেয়ে অধিক প্রতিশোধ উনি আর কি নিতে পারতেন? যতো বড়োই নির্দ্দয় এবং হৃদয়হীন তিনি হোন না কেন, একমাত্র পুত্রের বিরহে নিশ্চয়ই তিনি ভেঙ্গে পড়বেন। এই ভাবে ওঁদের মনকে ভেঙে দিয়ে সহজে আমরা ওঁদের দেহের ওপর আঘাত দিতে সমর্থ হবো। যাক, এতো দিনে তা'হলে আমরা সকলেই নিষ্কণ্টক হতে পারলাম, হাওড়ার বাদশা মিয়াকেও এই সুসংবাদটি যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দিও। কিন্তু এতো শীঘ্রি তোমরা দারোগা বাবুর ছেলেটাকে মোওকা মত বাগাতে পারলে কি করে?'

একজন দাড়ীওয়ালা লোক এতোক্ষণে এক মুঠি উড়ন্ত ফানুষের সুতী হাতে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এইবার সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার মূলোর মতন মিশে-ধরা সাদা দাঁতগুলো বার করে এগিয়ে এসে উত্তর করলে, 'আজ্ঞে, ও কাজটার ভার কর্তারা আমাকেই দিয়েছিলেন। প্রতি সন্ধ্যাতে নরেন বাবুর একমাত্র পোলা গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় বেড়াতে আসে। এই দিন সন্ধ্যায় সে খেলতে খেলতে মাঠের ওধারের নিরালা রাস্তা পর্য্যন্ত এসে পড়েছিল, তার সাথের দেশবালী দরোয়ানকে অনেক পিছুতে ফেলে রেখে এতো দূর পর্য্যন্ত সে এগিয়ে এসেছে: এই সুযোগে আমি তার মুখটি গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে আমাদেরই মোটরকারে তুলে তাকে এখানে এনে ফেলেছি। এখোন হুজুর, বকসিশটা আমায় একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

বিহারী বাবু এতোক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে এই দলের আড়কাটী বিভাগের লোকটির কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এইবার আনন্দে অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন, 'এঁ্যা, তাই নাকি! বলছো কি তুমি। হা হা হা হা: এতো দিনে আমার কলজে ঠাণ্ডা হলো। বড্ড বাড় বেড়েছিল এই নরেন বাবুর, তা' না হলে আমারও একটি মাত্র পুত্র আছে, সে নরেন বাবু ছেলের সমবয়সী ও সহপাঠীও বটে, একই স্কুলে ওরা লেখাপড়াও করছিল। এতো কথা নরেন দারোগা না জানলেও আমি তা জানি। আমি নিজেও একটি মাত্র সন্তানের জনক তাই ছেলের মূল্য কি তা আমিও বুঝি। এখোন বুঝুন তাহলে যে কতো দুঃখে আমি এইরূপ জঘন্য কাযে হাত দিয়েছি। কিন্তু, এরা ভুল করে অন্য কাউকে এখানে নিয়ে আসেনি তো?'

বিহারী বাবুর শেষ কথাটি শেষ হবা মাত্র একটি অগ্নিদগ্ধ অচৈতন্য শিশুকে কোলে করে এই দলের এক্তমালী বৌদি চন্দ্রা রাণী পাশের একটি কক্ষ হতে ঝড়ের মত বার হয়ে এসে উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ও হতবাক করে বলে উঠলো, 'আপনার অনুমান মিথ্যে নয়, বিহারী বাবু! সত্যই এরা ভুল করেছে, চিনতে পাচ্ছেন একে? এমন ভাবে একে পুড়িয়ে দিয়েছে যে এর বাপও আজ একে চিনতে পারবে না। কোকেন ইনজেকসন দিয়ে একে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, তা না হলে এর কান্নার স্বরে একে আপনি চিনতে পারতেন। বহু বার আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার বাড়ীতে আমি বেড়াতে গিয়েছি, একে অনেক বার আমি কোলে-পিঠেও করেছি, এই অবস্থায় একে আপনি হয়তো চিনতে না'ও পারেন, কিন্তু আমি যে মায়ের জাত, আমি কি করে একে ভুলবো? আমি

এর কান্না শুনে যখন নরকের এই অংশে এসে পৌঁছুলাম তখন যা' কিছু কাজ আপনাদের নির্দ্দেশ মতই এরা শেষ করে ফেলেছে। এই জড় মাংসপিণ্ডটি নরেন বাবুর ছেলে নয়, এ হচ্ছে আপনারই প্রাণের ধন একমাত্র পোলা। এরা আপনার ছেলেকেই নরেন বাবুর ছেলে বলে ভুল করে এখানে এনে তার এই দশা করেছে। এই দিন সন্ধ্যায় স্কুলের ফেরত এরা দুই বন্ধুতে এক মাঠেই খেলতে এসেছিল। এখোন মিন থানাদারদের উপর প্রতিশোধ! ধর্ম্মের কল আজও পর্য্যন্ত বোধ হয় বাতাসে নড়ে, বিহারী বাবু! এখোন বাকী রইলেন রাজা প্রাণধন আর আমাদের এই বড়ো সর্দ্দার, আজকে আর আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না; ওদিকে খুকুরাণীও বোধ হয় এতোক্ষণ আপনাদের নাগালের বাইরে চলে গেলো, তাকে বাইরে ভিক্ষে করতে আমি বিনা উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। এখোন দিন এইবার আপনারা আমার মুখটাও পুড়িয়ে ছাই করে, আমি এই সম্পর্কে আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছি, বুঝলেন? তবে আমি যে এখুনি মরবো না এ কথা ঠিক, ধর্ম্মের কল আরও কতো দূর যায় তা দেখে তবে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো।'

'এ্যাঁ, এ তুমি কি বলছো, চন্দ্রা!' হতভম্ব হয়ে রূপচাঁদ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যে আমার বিশ্বস্ত সর্দ্দার বাবুরাম বাবুর স্ত্রী। বিপদে-আপদে বাবুরামের উপর আমি কতো নির্ভরশীল তা কি তুমি জানো না? তুমি এমন কাজ কেন করলে চন্দ্রা রাণী? খুকুরাণী পালাতে পারলে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। আমাদের গোপন আড্ডা চক্ষুষ্মান্ লোকেরা না দেখাতে পারলেও অন্ধ মানুষ তা সহজে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু সে তার ভিক্ষাস্থান হতে পালাবেই বা কি করে, সেখানে তো আমাদের পাহারা থাকবার কথা! প্রথমে তো কাউকে একা ছেড়ে দেবার রীতি নেই।' 'ও কথা ভুলে যাও, বড়ো সর্দ্দার।' ধীর ভাবে চন্দ্রা রাণী উত্তর করলে, আপনারা আমাকে যতোই নজরবন্দী রাখুন না কেন, আপনাদের সকল প্রচেষ্টা আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি। এই আড্ডা-বাড়ীর বিশ্বস্ত পাচকের সাহায্যে একটি পত্র বহু পূর্ব্বে মেছুয়া থানার দারোগা প্রণব বাবুকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। এতোক্ষণে বোধ হয় তিনি খুকুরাণীকে উদ্ধার করেছেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদের পাহারাদারদেরও গ্রেপ্তার করেছেন। ধর্ম্মের কল এমন যে, পাপের ভার পূরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সংগঠনে ফাটল ধরে গিয়েছে। আপনাদের এই বিরাট সৌধটি ভেঙে পড়তে আর দেরী নেই। প্রকৃতির এমনিই নিয়ম যে সৌধের একটি ইট খসে পড়লে বাকীগুলিও এমনিই খসে পড়ে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই হয়েছে। অতি দুঃসময়ে আপনারা আমাদের আপনাদের এই দলে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাই অন্ততঃ আপনার কোনও ক্ষতি আমি করতে চাই না, খুকুরাণীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে অযথা বিপদ বরণ করতে আপনাকে আমি মানা করছি।'

'যেদিন একজন নারীকে আমাদের এই প্রধান আড্ডায় স্থান দেওয়া হয়েছে, সেই দিন আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, আমাদের সর্ব্বনাশ আসন্ন! বিষণ্ণ মনে বড় সর্দ্দার রূপচাঁদ বাবু বললেন, 'কিন্তু কেন চন্দ্রা রাণী, তুমি আমাদের এমন সর্ব্বনাশ করলে, তোমাদের ইচ্ছামত রাজা প্রাণধন বাবুর বিরুদ্ধে কোনও আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিনি বলে? কিন্তু এ কথা আগে বলোনি কেন, সে তো আমাদের নিকট পুঁটি মাছ মাত্র। তার কাছ হতে কিছু অর্থ প্রথমে বাগিয়ে নিতে চেয়েছিলাম এই যা। তুমি বললে এখুনি তাকে এই একই নরককুণ্ডে ফেলে দিতে পারি।'

'আজ্ঞে, তার আর কোনও দরকার হবে না', চোখের ভিতর হতে আগুন ঠিকরোতে ঠিকরোতে চন্দ্রা রাণী উত্তর করলে, 'ধর্ম্মের কল ইতিমধ্যেই বাতাসে নড়তে সুরু করেছে, মানুষের সাহায্যের আমার আর কোনও প্রয়োজনই নেই। আপনি বরং এখান হতে পালিয়ে সাধুর বেশে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে বিকৃত ও গলিতদেহ মানুষ এবং অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে পাপ স্খালন করতে থাকুন। এখানে আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠোলে আপনার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ঐ দেখুন, দুই হাতে দুই চক্ষু আবৃত করে আর্ত্তনাদ করতে করতে বিহারী বাবু আপনাদের আড্ডা-বাড়ীর গেটের বাইরে বিলীন হয়ে গেলেন। উনি কিন্তু এখান হতে বেরিয়ে তার নিজ বাড়ীতে নিশ্চয়ই ফিরবেন না, কোথায়ও যদি তিনি এখন যান তো সোজা থানাতেই তিনি যাবেন। পালান, পালান, সর্দ্দার, পালিয়ে যান!'

[ক্রমশঃ।

দুরন্ত প্রার্থনা

প্রভাকর মাঝি

আমার চলার পথ কণ্টকিত হোক পদে পদে
সহস্র বাধার বেশে জাগুক উত্তুঙ্গ হিমালয়।
বেদনার পঙ্ক-কুণ্ডে পঙ্কজের দুশ্চর সাধনা,
যান্ত্রিক জন্মের কাছে মানিব না ব্যর্থ পরাজয়।

প্রাত্যহিক পৃথিবীর পুঞ্জীভূত অপমান জ্বালা
লবণাক্ত অশ্রু দিয়ে সিক্ত করিবে না আঁখি-কোল।
উন্মুখর হয়ে উঠে প্রাণে প্রাণে সূর্য্যের শপথ—
ধমনীর রক্ত-রোলে শুনিলাম সমুদ্র-কল্লোল।

আরাম-শয্যায় শুয়ে নিত্য ভোগ-প্রাচুর্য্যের মাঝে
কোথায় গৌরব-দীপ্ত সূর্য্য-বীজ প্রাণ বহ্নিমান?
একটু রোমাঞ্চ নাই, একটু সংগ্রাম কোন'খানে,
ও-জীবন কাম্য নয়, ও-জীবন মৃত্যুর সমান।

আমার চলার পথ হে ঈশ্বর, কণ্টকিত করো,
আমার প্রতিজ্ঞা হোক, আরো তীব্র, আরো তীব্রতর।

শিকার কাহিনী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

ফেলে-আসা মোর হারানো দিনের সব কথা মনে নাই ;
যেটুকু র'য়েছে স্মরণে আজিও—সে কথা বলিতে চাই।
গ্রাম হ'তে দূরে মাইল সাতেক—তলাও মনিকচাঁদ—
চারি ধারে তার পাথরের সার—যতনে সাজানো বাঁধ
সিঁড়ি হ'য়ে ক্রমে নামিয়াছে সেই পুকুরের তলদেশে—
কভু দেখা যায় জলের উপরে কুমীর উঠেছে ভেসে।
ঘন জঙ্গল বাহু বেষ্টনে ঘিরিয়া রেখেছে তায়—
দিন দুপুরেও সেথা যেতে তবু কেহ আর নাহি চায় !

শীতের দুপুরে নিদ্রা তেয়াগি' ডাকিয়া বন্ধুজন,
'রুটীন' মাফিক আমারো সেথায় শিকারের আয়োজন।
বন্দুক নিয়ে মোটরে করিয়া প্রত্যহ যাওয়া চাই—
ঝোঁক পড়ে যায়—সব ছেড়ে দিয়ে কুমীর শিকারটাই
যেন লাগে ভাল। ফিরিবার পথে নিত্য সন্ধ্যাকালে,
মোটর-আলোকে দেখা যেত, বহু খরগোষ পালে পালে
ছুটিত সামনে—শিকার করিতে লাগিত বড়ই সুখ,—
কে জানিত হায়, একদা সেথায় প্রকাণ্ড দুর্ম্মুখ
দাঁতাল শূয়োর—দাঁড়াবে আসিয়া মোটরের ধার ঘেঁসে ;
হঠাৎ মাথায় জোগাল' বুদ্ধি,—তাই নিয়ে অবশেষে,
এক নম্বর সট্ ভরা সেই বন্দুক হাতে তুলি'
মোটর হইতে শূকরের প্রতি ছাড়িনু দুইটি গুলী।
টাল খেয়ে সেই বন্য বরাহ জঙ্গলে নেমে যায়—
সোফারে বলিনু মোটর পিছাতে—তর্জ্জনী ইসারায়।
কি হল হঠাৎ, দেখিনু পা' দুটো উঠেছে আকাশমুখে,
মস্তক হায় লুকাতে যে চায়—সে কোন্ পাতালে ঢুকে ?
পাশের গর্ত্তে পড়েছে মোটর—কিন্তু ভাগ্যে, এসে,
একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেকিয়া মোটর থামিল শেষে।
আমরা ক'জন মিলিয়া সবাই অনেক চেষ্টা করি'
হইনু বিফল, নিরুপায় হ'য়ে গ্রামের রাস্তা ধরি।
সন্ধ্যা নেমেছে, কুটীরে কুটীরে কৃষক বন্ধু সব—
হাত-মুখ ধুয়ে, বসেছে আহারে—উঠে তারি কলরব।—
আমাদের দেখি প্রশ্ন করিয়া ঘটনা লইল জানি'—
তাড়াতাড়ি এসে দড়ি-বাঁশ এনে তুলিল মোটরখানি
রাস্তার পরে।—হেন কালে দেখি সাঁওতাল সর্দ্দার
রয়েছে দাঁড়ায়ে মহা কুতুহলে দলবল নিয়ে তার।
কহিনু তাহারে—"দাঁতাল শূয়োর খেয়েছে আমার গুলী—
এই দেখ তার রক্তে রঙীন হয়েছে পথের ধূলি।
খোঁজ করে যদি এনে দিতে পার, পাইবে পুরস্কার—"
সেলাম করিয়া বুক ঠুকে কয় সাঁওতাল সর্দ্দার—
"মশাল জ্বালিয়া করিব বাহির এই রাতে, জঙ্গলে,—
কাল সকালেই করিব হাজির হুজুরের পদতলে।"

ফিরিয়া আসিনু আপন আলয়ে, দেখিনু আমার ঘরে
জমিয়া উঠেছে তাসের আসর দাবা পাশা থরে থরে।
আরো যেন কত হরবোলা যত রয়েছে সভার মাঝে,
সবাই আপন ভাবেতে বিভোর, যে আছে যাহার কাজে।
মুক্তকচ্ছ কবিরাজ ফেলি' "পোয়া-বারো" দানে পাশা,
কড়ি-বাঁধা হুঁকো মারিলেন টান, কদলী দেখায়ে খাসা!
গালে-হাত-রাখা বৃদ্ধ যে এক হাঁকিল অকস্মাৎ,
"নাও বাছাধন, সামলাও দেখি গজের কিস্তি মাৎ'।"
নোট্রাম্প্ ডাকি কেহ চীৎকারে ফরাসে ঠুকিয়া তাল,
অর্গানে বসি' কেহ গায় 'ছি ছি এত্তা কি জঞ্জাল'।
তালে তালে কেহ চক্ষু নাচায়ে বাজিয়ে চলেছে ডুঁড়ি,
বকের মতন কণ্ঠ দুলিয়ে হস্তে বাজায় তুড়ি।
এমন সময় কারা আসে যেন শুনিনু কলধ্বনি,—
দাঁড়াল সামনে গণেশ মলয়, আশার অতীত গণি।
বঙ্কিম ঠামে, কহিল গণেশ মেলি' বত্রিশ পাটি
"ওরে ভাই, আমি এসেছি শিকারে বাঘ তো মারিব খাঁটি—
এই যে সামনে দেখিছ বাবুরে, ইনি মারিবেন পাখী—
ব্যাং টিকটিকি ফড়িং মারাটা—কিস্যু না, সব ফাঁকি।
গিন্নীর সাথে এসেছি দু'জনে—। কি আর বলিব, ভাই—
ওনাদের ছেড়ে আমাদের নাকি দুনিয়ায় গতি নাই।"

চাহিয়া দেখিনু গণেশ বাবুর রাইফেল হাতে রাখা,
পিস্তল আছে কোমরে ঝোলানো,—ব্যাঘ্র-শিকারী পাকা!
মলয় বাবুর পিঠে বাঁধা আছে 'ডবল-ব্যারেল গান্'—
এমন সময় পর্দ্দা সরায়ে ছুঁড়িয়া দৃষ্টিবাণ,
কে যেন দাঁড়ালো—কহিল গণেশ, "এসো এসো এইখানে,
তোমরা এখন স্বাধীন জেনানা সে কথা কেবা না জানে।"
চেয়ে দেখি দুটি কাঁচা-পাকা মুখ—বিপুলা, তন্বী নাম—
বিপুলা হলেও বড় কৃশকায়া—তন্বী সে অবিরাম
স্থূল দেহ নিয়ে বিব্রত ভারী—তবুও তাদের মাঝে
গণেশ মলয় ভার-সাম্যের সন্ধান খুঁজিয়াছে।

ঠিক হল আগে পাখী শিকারেই যাওয়া যাবে পদ্মায়—
নৌকা ভাসায়ে ;—আজকাল নাকি বহু পাখী পাওয়া যায়।
যাত্রা করিব—আমরা সকলে প্রত্যূষে পরদিন ;—
মহা উৎসাহে মলয় বাবুর বচন—বিরামহীন।
বিপুলা তন্বী পাকশালে গিয়ে গণেশ মলয় সাথে,
শিলনোড়া দিয়ে মশলা বাঁটিতে বসিল তখনি রাতে।
রিণি ঝিনি মিঠে চূড়ীর আওয়াজে, আহ্লাদে আটখান্
গণেশ মলয় ঝুঁকে প'ড়ে দেখে—চোখে যেন করে পান—
সহধর্ম্মিণী রঙ্গ-মধুর রক্তিম মুখ-ছবি—
জবা কুসুমের লাল ছোপ দেওয়া যেন সে তরুণ রবি
আবীর গুলায়ে ঢালিয়াছে মুখে, দেখিতে লাগিল বেশ
গণেশ মলয় আপনা হারায়ে চাহিল নির্নিমেষ।

পরদিন প্রাতে শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়ানু বারান্দায়—
গণেশ বাবুর বিরাট নাসিকা-গর্জ্জন শোনা যায়!
ডাক দিতে ওঠে বিপুলা, তন্বী, গণেশ মলয় তবে—
শিকারের লাগি পোষাক করিয়া প্রস্তুত হল সবে—
জিনিষপত্র, বন্দুক-টোটা—কিছু না রহিল বাকী—
মশলা-ভরা সে কৌটাগুলিও। তন্বী কহিল ডাকি',
মলয়ে তখন, শুনেছ কি তবে করেছি নিমন্ত্রণ,
পাখীর মাংস খাওয়াব সবারে;—নহিলে কি অকারণ
মশলা পিষিয়া করেছি "সাইত"—হয়তো বলিবে শেষে
শাস্ত্রের কথা: মেয়েদের নিয়ে আসাটা সর্ব্বনেশে।

এমন সময় সাঁওতাল দল সমুখে দাঁড়ালো এসে
বন্য বরাহে বহিয়া এনেছে। রাখি মোর পদদেশে,
কুর্নিশ করি', কহিল তখন সাঁওতাল সর্দার,
"যে কথা সে কাজ, দেখুন হুজুর, বখশিস্ এইবার।
এই নিন্ আরো শূয়োরের দাঁত—" সহসা গণেশ বাবু
খপ করে তুলে, কহেন, "তন্বী, মাঝে মাঝে বড় কাবু
হও তুমি, তাই শূকরের দাঁত ধারণ করিলে তবে
মাজার ব্যথাটা ভাল হ'য়ে যাবে।" সহসা সগৌরবে
সাঁওতাল কয় বায়ান্নবাগ জঙ্গলে আছে বাঘ—
করিয়াছে "মারি"—সন্ধ্যার কালে করিতে হইবে 'তাক্'।
হঠাৎ গণেশ বাবুর কণ্ঠ শুষ্ক হইল ভারী—
"বা-হা-ন্ন-বা-ঘ—থাক্ তবে থাক্—তার চেয়ে চল বাড়ী।"
কহিনু তাহারে, "আরে শোন' শোন'—বাহান্ন বাঘ নয়,—
আমবাগানের জঙ্গল সেটা—জানিও সুনিশ্চয়।"
দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল গণেশ—"আজিকে সন্ধ্যাগমে,
চূর্ণ করিব ব্যাঘ্র-দর্প—আমারি পরাক্রমে।"

শীতের প্রভাত পদ্মার বুকে কুয়াসা দিয়েছে দেখা—
নূতন সূর্য্য ফেলেছে সেথায় আবছা আলোর রেখা,
এল মাঘ মাস—শীতের বাতাস—সহসা লাগিলে গায়,
হি-হি কাঁপে দাঁত—মনে হয় যেন প্রাণ বুঝি বাহিরায়।
চলিয়াছি মোরা ক'জন মিলিয়া—দাঁড়ী-মাঝি নৌকায়
ভোর হ'তে সবে রহে প্রস্তুত মোদের প্রতীক্ষায়।
এক নৌকায় গণেশ মলয়—আমিও তাদের সাথে,
অপরখানিতে তন্বী বিপুলা—ব্যস্ত চড় ই ভাতে।
শীতল হাওয়ায় গণেশ বাবুর কবিত্ব জমে যায়—
পদ্মা তাহার কানে কানে যেন কি কথা বলিতে চায়!
কল-কল্লোলে কত না বিরহ,—কত না মিলন-গান—
সহসা এধার হইতে ওধারে গণেশ ছুটিয়া যান।
আকাশের কোণে কৃষ্ণ মেঘের টুক্‌রো দিয়েছে দেখা—
ইঙ্গিত করি' মাতাল হাওয়ায় বিরাট প্রলয়-রেখা।
কাতর কণ্ঠে কহিল গণেশ, "সাঁতার জানি নে ভাই"
মুখ নীচু করি কহিল মলয়, "আমারো ব্যাপার তাই।"
দু'জনে তখন করে গোলমাল—"মেয়েদের কি যে হ'বে—
—ওরে বাবা, এ যে ভীষণ দুলিছে! নৌকা ভিড়াও তবে—
লাগে না কি ভয়?" দু'হাতে জড়ায়ে মলয় আমারে কয়—
কহিনু তাহারে, "ভয়কেই শুধু চিরদিন করি ভয়।
পদ্মার বুকে তুফান উঠিলে যদি এত সোরগোল,
থাকিলেই হ'ত আপনার ঘরে জুড়িয়া মায়ের কোল?
ভাল লাগে নাকি ঝঞ্ঝার মহাসঙ্গীত আয়োজন—
ধ্বনিয়া উঠিছে জীবনের পরে মৃত্যুর গরজন।"
স্পন্দিত বুকে মলয় তখন কহিল, "স্বীকার করি—
ভিটামিন্-ভরা উপদেশ তবু, এবার করুণা করি'—
হউন ক্ষান্ত, বড়ই শ্রান্ত—মাথা ঘোরে বন্ বন্—
কি জানি কখন ডুবে যাবে তরী—এলো কি মৃত্যুক্ষণ?"
শুনিয়া কাতর মলয়-বিলাপ, কহিনু তাহারে "ভাই—
"হিম্মৎ রাখ, তুফানের মাঝে ভয় যে করিতে নাই।"
"আর হিম্মতে কাজ নাই, বাপু," গণেশ তখন কয়—
এবারের মত ভিড়াও নৌকা, পেয়েছি বড়ই ভয়।
ওই যে ওপারে ওদের নৌকা যেথায় লেগেছে চরে,
নিয়ে চল সেথা—না জানি অবলা ভয় পেয়ে কি যে করে!"
কহিনু হাসিয়া, "ভ্যালো ভাই মোর, হোয়ো না আত্মহারা—
কোরো নাক ভয়, জেনো নিশ্চয় বিধবা হবে না তারা!
আর নয়, চুপ,—ঐ এক ঝাঁক বুনো হাঁস যায় উড়ে
খুব নীচু দিয়ে,—দেখেছো,—মলয়? আর যে নহে কো দূরে।"
খুব চট্‌পট, ভ'রে দু'টি সট—মলয় ছাড়িল গুলী—
চম্পট দিল পক্ষীর দল নিক্ষেপি' চোখে ধূলি।
গুলী দুটি করে মঙ্গলগ্রহে নির্ভীক অভিযান—
নৌকা তখন বেসামাল ভারী, মলয় টলায়মান—
হুমড়ী খাইয়া পদ্মাবক্ষে ঝপাৎ করিয়া পড়ে;
তিন জন দাঁড়ী ঝাঁপায়ে তখনি তাহারে রক্ষা করে।
টানাটানি করে নৌকার 'পরে তুলিল মলয়ে যদি
গণেশ বাবুর টিপ্পনী-স্রোতে ভরিল পদ্মা নদী।
লাভের অঙ্কে দেখা গেল শুধু ডাক্ গান্ মলয়ের
জলের মধ্যে লভেছে সমাধি;—উপায় নাহিক এর
উদ্ধার লাগি' কোনই চেষ্টা সম্ভব নহে আর—
অসহায় মুখে মলয় শুধুই চেয়ে দেখে চারিধার।
টাল খেয়ে চলে নৌকা মোদের নদীর অপর তীরে—
যেথায় বিপুলা, তন্বী সভয়ে চাহিতেছে ফিরে ফিরে—
চিন্তা-কাতর দু'টি নারী সেথা পরম ভক্তিভরে,
দেবতার দোরে মাগিছে মানত স্বামী-দেবতার তরে।
মোদের নৌকা ভিড়িতে সেথায়, তন্বী ঝাঁপিয়ে আসে;
উল্টে পাল্টে দেখিল মলয়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাসে
কহিল গণেশ, "বীরপুঙ্গব কতখানি খেল' জল—
জিজ্ঞাসি, মোরে কহ ত তন্বী",—হেসে ওঠে খল খল
বিপুলা দেবীও। কহিল মলয়, রক্তিম আঁখি তার—
কি দেখিছ সং, যাও না বরং, নিয়ে এসো এইবার
জামা ও কাপড় বদলাতে হবে—হয়েছে পদ্মাস্নান—"
কহিল গণেশ, "দেখিলে বিপুলা, হল কি কাণ্ডখান—
পাখী টিক্‌টিকি শিকার করিতে এত কি ভাগ্যে লেখা—
ভাব ত—কি হত,—মোর মত, যদি বাঘের মিলিত দেখা?"

এত বলি তার আস্তিন খুলি—দেখাল মাংসপেশী—
কহিল বিপুলা, "তোমার কাছে ত সে নহে এমন বেশী।"

এমন সময় পদ্মার চরে বন্য হাঁসের ঝাঁক—
কহিনু মলয়ে, "দেখো হে, আবার কোরো না চিচিং ফাঁক।"
মলয় তখন চলেছে আমারি বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে
খুব সাবধানে ;—কভু শুয়ে পড়ে—কভু হামাগুড়ি দিয়ে।
রহিনু চাহিয়া, ভাবি মনে মনে, "পক্ষী-শিকারী বটে !
কিছু না হলেও হবে অর্দ্ধেক, যে কথা বাহিরে রটে !"
"ফড়িং শিকারে যাও ওহে বীর, জয়যাত্রায় যাও—"
হাঁকিল গণেশ, "আহা বেশ, বেশ, চড়ই মারিয়া খাও।"
গণেশ বাবুর বিরাট ভুঁড়িটি সহসা উঠিল দুলি'—
গঙ্গার বুকে 'বয়ার' মতন ক্ষীণ তরঙ্গ তুলি।
এবারও ব্যর্থ হইয়া মলয় নৌকায় ফিরে আসে—
তম্বী দেবীর বিরস বদন—কহিল হতাশ্বাসে,
"এ পোড়া পেটের কী যে গতি হবে, ভাবিতে পারি না ছাই
চিরদিন বলি, তোমার সঙ্গে শিকারে আসিতে নাই।
শুধুই গতর খেটে যে মলাম—কি আর তোমারে বলি—
বাপ-আমলের বন্দুকটাও দিয়েছ জলাঞ্জলি !"
কহিনু মলয়ে, "কিবা খেদ, গেছে পৈতৃক বন্দুক—"
পৈতৃক প্রাণ রাখি' ভগবান্ রেখেছে আমার মুখ।
আজকের মত মোর 'ডাক্ গান্'—এ কাজ হবে নিশ্চয়—
এর পরে আমি দিব উপহার—রেখো নাক' সংশয়।"
মলয় বাবুর মুখে মেঘ কেটে রৌদ্র দিল যে দেখা—
তম্বী দেবীরও ম্লান চোখে যেন পড়িল তাহারি লেখা।
ফিরিবার পথে শান্ত হয়েছে নদীর স্রোতের জল,
তম্বী বিনয়ে কহিল আমারে আঁখি দুটি ছলছল্—
"পাখীর মাংস খাওয়াতে নারিনু—পেয়েছি বড়ই লাজ—"
কহিল মলয়, "ক্ষমা কর ভাই, ক্ষমা কর মোরে আজ।
যদি বেঁচে থাকি দেখো নিশ্চয়—শিকার করিব পাখী
আজ নাহি হয়—কাল হবে জয়—এই আশা মনে রাখি।"
"এ কালে না হয় হবে পরকালে" হাসিয়া কহিনু আমি—
"ওই আশা নিয়ে রহিব বাঁচিয়া, কাটাব দিবস-যামী।"

এ পারে আসিয়া ভিড়িল নৌকা। দু'খানা মোটর কারে—
দু'জন সোফার রয়েছে বসিয়া—আমাদেরে বহিবারে।
মলয় তম্বী বিপুলা উঠিল একটি গাড়ীর মাঝে,
অন্য গাড়ীতে আমি ও গণেশ বসিলাম রণসাজে।
মোটরে উঠিয়া কহিল তম্বী—"বাঘের চর্ব্বি চাই।"
সহসা হাসিয়া উঠিল বিপুলা, "কিবা প্রয়োজন, ভাই,
দেহেই তোমার চর্ব্বি অনেক কেন মিছে ফরমাস— ?"
মস্তক নাড়ি কহিল গণেশ, "আহা—হা—সর্ব্বনাশ !
বাঘের চর্ব্বি করিব হাজির, তোমারে দিলাম কথা—
ঘুচাব এবার দুঃখ তোমার, নিতম্বে যত ব্যথা।"

দুটো রাইফেল, টোটা-ভরা ব্যাগ লইনু সঙ্গে করি
বায়াম্নবাগের বাঘ শিকারের চলিনু রাস্তা ধরি।
আর সব গেল গৃহে ফিরে তারা—বিপুলা কহিতে চায়
"আজ আমাদের যেমন বরাত, কী হবে বলা না যায়—!
মাথার দিব্যি রহিল আমার, সঁপিনু আমার এঁকে
আপনার হাতে,—দয়া করে শুধু চলিবেন পাশে রেখে।"
শন্ শন্ শন্ চলিছে মোটর আমাদের বুকে নিয়ে—
মাইল সাতেক পথ যেতে হবে—গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে—।
যত চলি পথ, গণেশ বাবুর উৎসাহ নিবে যায়—
বিরাম-বিহীন বক্তৃতা যেন সমাধি লভিতে চায়।
অবশেষে আর হুঁ,-'হাঁ' রব ছাড়া শুনিতে পাই না কথা ;
যতই তাহারে উস্‌কিয়ে তুলি—ভাঙ্গে না যে নীরবতা।

বহু লোক-জন জমিয়াছে সেথা—আর যত সাঁওতাল—
কহিল গণেশ, "নিয়ে এস মই—ক'রো নাক' গোলমাল—
বৃদ্ধ বয়সে পদস্খলন হয় যদি একবার,
হইব নষ্ট, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ;—দেখিতে হবে না আর।
মই দিয়ে সেই গাছের উপরে গণেশ বাবুরে তুলি'
ডালের সঙ্গে বাঁধি ভাল করে। বন্দুকে ভরি গুলী
প্রস্তুত হয়ে রহিল গণেশ। আমিও অন্য গাছে
উঠিলাম তবে ; দুজনাই মোরা রহিনু "মারির" কাছে।
কহিনু "সিদ্ধিদাতা হে গণেশ, সিদ্ধি হওয়া যে চাই,"
গণেশের ভাব—করেছি শিকার—বাকী বাঘ দেখাটাই—।
সূর্য্য তখন নামে পাটে তার—হয়নি আঁধার তবু—
হঠাৎ শুনিনু—খস্ খস্ খস্—দেখিনু বিরাট প্রভু—
ব্যাঘ্র মশাই, বঙ্কিম গ্রীবা, গর্ব্বিত আঁখিপাতে,
চারিধারে চাহি দেখিয়া লইল—মহা বিক্রম সাথে।
'মারি'রে ঘিরিয়া মদালস গতি—ঘুরিল একটি বার
তার পর দূরে বসিয়া পড়িল—বিকট ভঙ্গী তার।
গণেশ বাবুর দিকে চাহিলাম—তাঁর সট্ প্রথমেই
কারণ তিনি যে অতিথি আমার। প্রথম ইঙ্গিতেই
গণেশ বাবুর রাইফেল মিছে উঠিল গরজি', হায়—
লক্ষ্যভ্রষ্ট, ঘন-গর্জ্জনে ব্যাঘ্র ছুটিয়া যায়
আমার গাছের পাশ দিয়ে যবে,—আমিও করিনু 'সট্'—
খালি বন্দুক—কি হবে আবার, হইল শব্দ—'খট্' !—
ভুল করে আমি ভরি নাই গুলী—আমার সে রাইফেলে ;
গণেশ বাবুর শিকার বলিয়া ; আমি হেথা অবহেলে
হারানু হাতের এমন শিকার—নেহাৎ ভাগ্যহীন !
ভুলিতে পারি না—মনের গভীরে আজো সে বিফল দিন !
সম্মুখে দেখি গণেশ বাবুর দেহটি দোলায়মান—
রাইফেল তাঁর ধরণীর বুকে—লভিল কি নির্ব্বাণ ?

এলো দলবল, কৈ বাঘ কৈ—গণেশে দেখায়ে দিয়ে,—
আমি তাড়াতাড়ি বলিনু সবারে—"চলো আগে মই নিয়ে
গণেশ বাবুরে নামাও মাটিতে—বুঝি বা ছেড়েছে নাড়ী
আর কাজ নাই—ব্যাঘ্র মশাই—গিয়েছে শ্বশুরবাড়ী !"

ফিরিলাম যবে, সবাই আসিয়া করে মহা হৈ-চৈ—
কহিল তন্বী, "কৈ গো, আমার বাঘের চর্ব্বি কৈ ?"
গণেশ নীরব,—বলিনু তখন সত্য ঘটনা যাহা
শুনিয়া সবাই করিতে লাগিল বাহবা-বাহবা-আহা !
তির্য্যক্ দিঠি হানিয়া গণেশে, মলয় তখন কয়,—
"আমারি বেলায় যত কিছু দোষ এখন কি মহাশয় ?
কথার দাপটে বাঘ মেরে খাও জানি তুমি মহাবীর—
শুধুই উদর বৃদ্ধি করেছ বাটি বাটি গিলে ক্ষীর।
আর চর্ব্বিতে কাজ নাই বাপু, মিটেছে মনের সাধ—
গোবর গণেশ, ঘুঘু দেখিয়াছ, দেখ নাই আজো ফাঁদ।"
মহা উৎসাহে গদ্যে পদ্যে টিপ্পনী হ'ল সুরু
গণেশ বাবুর মুখে কথা নাই—চামড়া এমনি পুরু
কোনো বিদ্রূপ গায়ে লাগে নাকো—কহিল উচ্চ রবে—
"ওরে আন্ দেখি পঞ্জিকাখানা, কোন্ তিথি আজ হবে—
যাত্রা অশুভ, নাহি সংশয়, নহিলে চালাকি নাকি—
আমার লক্ষ্য হইল ব্যর্থ লজ্জা কোথায় রাখি ?
তাই তো তাই তো—এ যে মঘা ভাই—কেমনে এড়াবে ক'থা
বিপুলা, তন্বী, আমি ও মলয়, তুমিও বলেছো অঘা।"
ঝঙ্কার দিয়ে কহিল বিপুলা—"এবার ক্ষ্যামাটি দাও—
সবাই জেনেছে ব্যাঘ্র শিকারে, তুমি যে কেমন তা'ও !
বাপের ভাগ্যি ফিরে এলে ঘরে নইলে কি হত, হায় !
বাঁচিয়া থাকিতে কখনো দেব না তোমার খেয়ালে সায়,—
বাপের তেমন মেয়ে নই আমি। ফের যদি কভু যাও—
গলে দড়ি দিয়ে মরিব এবার কথা শোন, মাথা খাও !
নিঃশ্বাসে আর বিশ্বাস নেই পেয়েছি বড়ই ত্রাস,
অঘটন কিছু ঘটে গেলে হ'ত আমারি সর্ব্বনাশ !"
সজল চক্ষে অঞ্চল গলে করিলা নমস্কার—
হাসি-কান্নার গঙ্গা-যমুনা ঝরিল নয়নে তার !

—দেখছি, অন্ধকারটা ঘুচোচ্ছে কিনা !

কন্যাকুমারিকা

ইলা মজুমদার
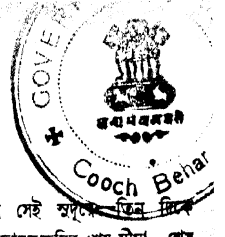
দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অতি প্রাচীন কাল থেকে ঘরছাড়া করেছে। আজকের সভ্য মানুষের মধ্যে তার আদিম পূর্ব্বপুরুষদের অনেক প্রবৃত্তি অবলুপ্ত হয়েছে, অনেক অভ্যাস রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু মনে হয়, আদিম যাযাবর বৃত্তিটা আমাদের রক্তের মধ্যে আজও রয়ে গেছে।

তীর্থভ্রমণ ও শিল্পকলার রসাস্বাদন এ দুই উদ্দেশ্য একসঙ্গে সাধিত হবার উত্তম সুযোগ দক্ষিণ-ভারতে। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে সারা দক্ষিণ-ভারতে যার বেশী ভাগই আবার প্রসিদ্ধ মন্দির ও তীর্থস্থান-সংলগ্ন। এবারে দক্ষিণ-ভারত বেড়াবার সুযোগ হয়ে যাওয়াতে আমাদের উৎসাহের আর অন্ত ছিল না। মাদ্রাজ ও মহাবলীপুরম্, শ্রবণবেলগোলায় গোমতেশ্বর ও বেলুড়ে কেশব মন্দির দেখে তিরুগিরপল্লী (ত্রিচিনপল্লী) হয়ে যখন রামেশ্বরম্-এ এলাম, তখন কন্যাকুমারিকা দেখা হবে বলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারণ তখন মাদুরা এবং কন্যাকুমারিকা যাওয়ার মত পাথেয় হাতে ছিল এবং উৎসাহেও বিশেষ ভাটা পড়ে আসেনি। রামেশ্বরম্-এ মন্দির দর্শন এবং পূজা দেওয়া প্রভৃতি সমাধা করে আমরা মাদুরার ট্রেণ ধরলাম। রামেশ্বরম্ থেকে মাদুরা কয়েক ঘণ্টার পথ। মাদুরায় এক রাত থেকে বিখ্যাত মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দেখে ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরে পরদিন বিকালে ত্রিবান্দ্রাম্ অভিমুখে রওনা হলাম। কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত রেল-লাইন নেই। বাসে যে দুই পথে যাওয়া যায় তার মধ্যে ত্রিবান্দ্রামের পথই শ্রেয়ঃ মনে করলাম, কারণ তাহলে ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যের রাজধানীও দেখা হয়ে যায়।

ত্রিবান্দ্রামের গাড়ীতে বসে ভাবছিলাম, কন্যাকুমারিকা দেখতে যাচ্ছি বলে মনে এত আনন্দ কেন? তীর্থস্থান ও মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গত এক মাসে এত দেখেছি যে, এখন একটু ক্লান্তি লাগছে। তা ছাড়া কন্যাকুমারিকার মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এমন কিছু প্রসিদ্ধি নেই। ছোটবেলায় ভূগোলে কুমারিকা অন্তরীপের কথা পড়ার সময় মনে হত, আমি যদি পাখী হতাম তা হলে দিগন্তে পাখা বিস্তার করে এই মুহূর্ত্তে চলে যেতাম সেই সুদূরে—তিন দিকে জলরাশি-বেষ্টিত স্বল্পপরিসর ভূভাগ—যা ভারতভূমির শেষ সীমা, শেষ বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, আর যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। আজ আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে, এ কথা মনে ভেবে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। কিন্তু কন্যাকুমারিকার এই ভৌগোলিক অবস্থানই তার একমাত্র আকর্ষণ কি? মনে পড়ল আমাদের সঙ্গে এর আরও গভীর যোগাযোগ আছে। এই স্থান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের পদরেণুধারক পুণ্যভূমি। এখানে বসেই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মর্ম্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন, যে কাহিনী এখন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ট্রেন থামার ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙতেই দেখি ত্রিবান্দ্রাম সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছে গেছি। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্টেশনের বাইরে এসে এক রাত্রের জন্য আস্তানার খোঁজ করা হ'ল। কাছেই একটি হোটেল পাওয়া গেল, বেশ পরিষ্কার এবং জলের অভাব নেই। আর দ্বিরুক্তি না করে দুটি ঘর ঠিক করে মালপত্র নামান গেল। তাড়াতাড়ি স্নান ও প্রাতরাশ সেরে আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

ষ্টেশনের কাছ থেকেই কুমারিকার বাস ছাড়ে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রথম বাস চলে গেছে, দ্বিতীয় বাস যেতে দেরী আছে। কাছেই অনেক ট্যাক্সি ছিল, ট্যাক্সিওয়ালারা ডাকাডাকি করতে লাগল। যাতায়াতে চল্লিশ টাকা চাওয়ায় আমরা একটু দ্বিধা করছিলাম, সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেল আরও দু'জন সহযাত্রী জুটে যাওয়াতে। আমরা চার জন ছিলাম, এক ট্যাক্সিতে ছ'জন অনায়াসে যাওয়া যায়। তা ছাড়া ট্যাক্সিতে যাবার সুবিধা এই যে, কুমারিকাতে ইচ্ছামত দেরী করা যাবে এবং পথে যে দু'-একটা মন্দির পড়ে সেগুলি দেখা যাবে, যা বাসে গেলে সম্ভবপর হ'ত না। এই সব লাভ-লোকসানের হিসাব তাড়াতাড়ি করে ফেলে

কন্যাকুমারিকায় স্নানের ঘাট

বিবেকানন্দ রক—কন্যাকুমারিকা

আমরা একটি ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। প্রথমে যাওয়া হ'ল সহরের পদ্মনাভ মন্দিরে।

ত্রিবান্দ্রাম নামটি এসেছে "তিরু অনন্তপুরম্" (অর্থাৎ অনন্তের পবিত্র সহর) কথাটি থেকে। শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ স্বামীর বিখ্যাত মন্দিরের নাম থেকেই সহরের নাম। এই মন্দিরে অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসে সারা দেশ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এই সহর গড়ে উঠেছে। অনন্ত পদ্মনাভ হলেন বিষ্ণু। সারা দক্ষিণ-ভারতে যত মন্দির আছে প্রায় সবই বিষ্ণু কিম্বা শিবের মন্দির। রামানুজাচার্য ও শঙ্করাচার্য এই দুই মহাপুরুষের প্রভাবেই প্রধানতঃ এটা হয়েছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন এই পদ্মনাভ মন্দির। কাছেই একটি বাঁধান জলাশয় আছে। দেখলাম, মন্দিরের নূতন গোপুরম্ বা প্রবেশদ্বার তৈরী হচ্ছে। বিজয় নগরীয় গোপুরম-এর তুলনায় এটি অনেক ছোট, কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যে ভবিষ্যতে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করবে মনে হয়। মন্দিরে প্রবেশকালে পুরুষদের খালি গায়ে ধুতি-অথবা লুঙ্গী পরে যেতে হয়। জামা, জুতা, গেঞ্জী প্রভৃতি প্রহরীর কাছে জমা দিয়ে যেতে হয়। এ রাজ্যের অন্য মন্দিরেও পুরুষদের উর্দ্ধাঙ্গের বসন ত্যাগ করে প্রবেশ করার নিয়ম। এই নিয়মের কারণ ঠিক বুঝলাম না, দেবতার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য, না কৌশলে জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্য দর্শনার্থী ব্রাহ্মণ কি না।

মন্দিরের পরিকল্পনা দ্রাবিড়ী রীতি অনুযায়ী গোপুরম্, মণ্ডপম্ প্রাকার ও বিমান নিয়ে গঠিত। মণ্ডপম্ বা মন্দিরের চত্বর বিরাট, প্রাকার বা করিডর খুব লম্বা (রামেশ্বরম্ মন্দিরের করিডরের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী)। প্রাকারের পরেই পূর্ব্ব দিকে গোপুরমের সামনে ধ্বজস্তম্ভ। প্রধান মণ্ডপম্ কুলশেখর মণ্ডপম্ বলে পরিচিত। এর পিলার ও প্রাচীর-গাত্রে বহু ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে। সারি সারি অসংখ্য অপ্সরার মূর্তি রয়েছে, এঁদের প্রত্যেকেই দুই কর জোড় করে একটি প্রদীপ ধারণ করে আছেন। রাত্রে আরতির সময় এই প্রদীপগুলি নারিকেল তেল দিয়ে প্রজ্বলিত করা হয়। শুধু এই মূর্তিগুলি নয়, মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রাচীর-গাত্র, ছাদের কার্ণিস, এমন কি ধ্বজস্তম্ভ পর্যন্ত দীপাধারে কণ্টকিত। শুনলাম সর্ব্বসমেত কয়েক হাজার প্রদীপ আছে, বিশেষ তিথিতে সবগুলি নারিকেল তেল দিয়ে জ্বালান হয়। নারিকেলের দেশ, নারিকেলই এখানকার প্রতীক স্বরূপ, সুতরাং রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান আরাধ্যের মন্দিরে নারিকেল তেলের অকৃপণ ব্যবহার অযৌক্তিক নয়। বিমান বা গর্ভগৃহ মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক ধাপ উঁচুতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চোখে পড়ে একটি বড় ঘর পর-পর তিনটি দুয়ারবিশিষ্ট। সমস্ত ঘর জুড়ে অনন্ত-শয্যায় বিষ্ণুর পদ্মনাভমূর্তি। বাম দিকের দরজা দিয়ে দেখা যায় বিষ্ণুর শিরোদেশ এক বাহুতে ন্যস্ত, ঐ হস্তটি প্রসারিত ও করতল মহেশ্বরের মস্তক স্পর্শ করে আছে; মাঝের দরজা দিয়ে দেখা যায় বিষ্ণুর দেহ, নাভিপদ্মে ব্রহ্মা সমাসীন; ডান পাশের দরজা দিয়ে বিষ্ণুর চরণারবিন্দ দর্শন করা যায়। দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুর যত মূর্তি দেখেছি সবই প্রায় শেষশায়ী বা অনন্তশয্যার মূর্তি, কিন্তু এত বিরাট মূর্তি দেখিনি। মাঝের দরজার সামনের দিকে একটি ছোট সুসজ্জিত উৎসব-মূর্তি রক্ষিত আছে। পরম পুরুষের যোগনিদ্রার ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত রূপ সহজেই মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গড় হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, নানা দিক থেকে পুরোহিতরা এসে বারণ করলেন। ভাঙ্গা হিন্দীতে বুঝিয়ে দিলেন যে, এখানে গড় হয়ে প্রণাম করার নিয়ম নেই, নিচের প্রাঙ্গণ থেকে প্রণাম করা যেতে পারে। আমরা বাঙ্গালা দেশের মন্দিরে ওই ভাবেই প্রণাম করি, এখানে না জেনে কোন অপরাধ করে ফেলেছি ভেবে লজ্জিত হলাম। পরে শুনেছিলাম, ওখানে প্রণাম করার অধিকার মহারাজা ব্যতীত আর কারও নেই।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমরা মন্দির থেকে গাড়ীতে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি কুমারিকার পথে গাড়ী চালাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। ত্রিবান্দ্রাম থেকে কুমারিকা অন্তরীপ প্রায় ৫৪ মাইল কংক্রীটের রাস্তা। গাড়ীতে বসে ঝাঁকুনি লাগে না, গাড়ীও খুব জোরে চলে। রাস্তা চড়াই-উৎরাইতে ভর্ত্তি, কখনও বা পাহাড়ের গা ঘেঁসে রাস্তা চলে গেছে। দূরে পশ্চিমঘাটের উচ্চ পর্ব্বতমালা দেখা যায়, পূর্ব্ব দিকেও পাহাড়ের শ্রেণী চলেছে দিগন্ত জুড়ে। আর দেখা যায় তাল গাছ ও নারিকেল গাছের সারি, —মাঠে, উপত্যকায়, পাহাড়ের গায়ে, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। এত নারিকেলের গাছ একসঙ্গে কেউ দেখেনি, যে ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন এসেছে সে ছাড়া। নারিকেল গাছকে সম্পদ বৃক্ষ (Tree of Wealth) বলা হয়। মনে হয়, খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা দেশের এই অংশে মুক্তহস্তে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। এই জন্য বোধ হয়

ত্রিবান্দ্রাম হইতে কন্যাকুমারিকার পথে শুচীন্দ্রম মন্দির
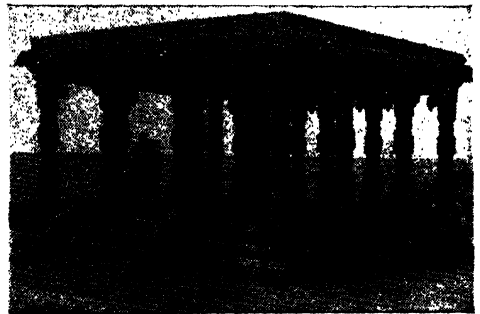
কন্যাকুমারিকার স্নানের ঘাটের মণ্ডপম্

মালাবার দেশের লোক স্বাস্থ্যবান ও স্বভাব-শিল্পী। আমাদের রাস্তায় মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে, দূরে পাহাড়ের চূড়ায় দেখি সকালের রোদ চক্‌চক্ করছে। কখনও আবার দেখছি পাহাড়ের চূড়া সাদা মেঘে ঢাকা পড়েছে, পাহাড় যেন তুষারাবৃত বলে মনে হচ্ছে। কখন আবার পাহাড়ের উপর বৃষ্টি হচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়াটে নীলাভায় দিগন্ত ছেয়ে গেছে। এমন নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই কেউ কেউ এ জায়গাটিকে বলেন "দক্ষিণের কাশ্মীর"।

আমরা নাগের-কয়েলে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা হয়ে গেছে। নাগের-কয়েল এই রাস্তায় একমাত্র বড় সহর। এখানকার নাগের মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু মন্দির দেখলাম বিশেষত্ব-বর্জিত। এই মন্দিরেও পুরুষদের খালি গায়ে প্রবেশ করতে হয়। এখান থেকে অল্প দূরেই বিখ্যাত শুচীন্দ্রম্ মন্দির। মন্দিরের পথে প্রথমেই চোখে পড়ে মন্দির-সংলগ্ন জলাশয়, যার মধ্যস্থলে একটি ছোট মণ্ডপম্ আছে। এখানে উৎসবের দিন মন্দিরের বিগ্রহের প্রতিমূর্তি নৌকা করে আনা হয়। মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথে একটি উচ্চ গোপুরম্ আছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত শক্তির পূজা হয়। কথিত আছে, ইন্দ্র এইখানে তপস্যা করে শুচি হয়ে গৌতম মুনির শাপমুক্ত হয়েছিলেন। সেই জন্য এই মন্দিরের নাম শুচীন্দ্রম্। স্থানটি খুব পুরাতন সন্দেহ নাই, স্থানীয় লোকের মতে মহর্ষি অত্রি এই মন্দিরের স্থাপনা করেন। কিন্তু মন্দিরটি খুব প্রাচীন বলে মনে হ'ল না। খণ্ডপথের স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্তিগুলি খুবই সুন্দর। খণ্ডপথের এক কোণে একটি বিশাল হনুমান-মূর্তি আছে। এখানে যথারীতি পূজার ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে কুমারিকা আট মাইল। আমরা তাড়াতাড়ি সেদিকে রওনা হ'লাম।

কুমারিকায় পৌঁছে শুনলাম মন্দিরের ভোগ হয়ে গেছে, শীঘ্রই মন্দির এ-বেলার মত বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা ট্যাক্সিতে জুতা, এবং পুরুষরা জামা-জুতা ছেড়ে রেখে মন্দির অভিমুখে ছুটলাম। মন্দিরে যেতে বালিয়াড়ি ভেঙে কিছু নিচে নামতে হয়। পাথরের প্রাচীর-বেষ্টিত মন্দির দুয়ারের দু'ধারে দুটি টাটকা কলা গাছ দেখলাম, রোজই আস্ত কলা গাছ রাখার বোধ হয় ব্যবস্থা আছে। দরজার কাছেই সিন্দুর, নারিকেল ইত্যাদি পূজার উপকরণ কিনতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ মন্দির সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকায় সেখানে পুরীর মন্দিরের মত পাণ্ডাদের অত্যাচার নেই। এই সব মন্দিরে পূজা দিতে হলে একটি করে টিকিট কিনতে হয়; টিকিটের হার চার আনা থেকে দু'শ টাকাও হতে পারে। ক্ষমতা অনুযায়ী লোকে টিকিট কিনে পূজার ডালির সঙ্গে পুরোহিতকে দিলেই পূজার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কন্যাকুমারিকার মন্দিরেও এই ব্যবস্থা আছে।

আমরা টিকিট কিনে একজন পুরোহিতের সঙ্গে ভিতরে গেলাম। অন্ধকার প্রাকার অতিক্রম করে দেবীর গৃহের সম্মুখে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহ আলোকে সজ্জিত, মাঝখানে দেবী দণ্ডায়মানা। কাল পাথরের মূর্তি শ্বেত চন্দনে অনুলেপন করা হয়েছে। বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা দেবী-প্রতিমার এত মানবীয় কান্তি কোন দেব-দেবীর মূর্তিতে কখনও দেখিনি। শুনলাম রোজই চন্দন ধুয়ে ফেলে নূতন করে সজ্জিত করা হয়। মন্দিরের পুরোহিতদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়। সুসজ্জিতা দেবীমূর্তির ললাটে ও বক্ষদেশে দুটি হীরকখণ্ড থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেবীর আস্য stylised বা রীতি অনুযায়ী না হলেও প্রশান্ত বরাভয়দায়িনী রূপ ধারণ করেছে। আয়ত চোখের দৃষ্টি দিগন্তে হারিয়ে গেছে। এই দেবীমূর্তির কল্পনায় একটি কাহিনী জড়িত আছে। পুরাকালে দুটি অসুরের উপদ্রবে দেবগণ উত্যক্ত হয়ে কাশীর বিশ্বনাথের কাছে তাঁদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানান। বিশ্বনাথ তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করে একটি কুমারীর সৃষ্টি করেন। কুমারীকে এই অন্তরীপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে ভারত মহাসাগর তাঁর পাদবন্দনা করেন। অচিরেই অসুরদ্বয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু শুচীন্দ্রমের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কুমারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেন। দেবগণ এতে বিচলিত হয়ে পড়েন, কেন না কুমারীর কৌমার্য রক্ষা করা দরকার। নারদ তখন এক ফন্দি করে বিবাহ ভণ্ডুল করে দেন। বিবাহের রাত্রে বরবেশী দেবতা অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে নারদ মোরগের ধ্বনি করে নিশার অবসান ঘোষণা করলেন। বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে গেছে মনে করে বর বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেলেন। ওদিকে বিবাহের সাজে সজ্জিতা কুমারী অপেক্ষায় রইলেন। সেই থেকে যুগ যুগ ধরে তিনি বিবাহের সাজে প্রতীক্ষমানা—ক্লান্তি নেই, বিষাদ নেই, স্থির সমাহিত ভাব! তাঁর কৌমার্য কোন দিন ভঙ্গ হবে না, দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। দেবীর গাত্রধৌত চন্দন সংগ্রহ করে আমরা বেরিয়ে এলাম।

সারা ভারত পর্যটন করে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন বিদেশ যাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে। এখানে এসেই তাঁর ভাবান্তর ঘটেছিল। প্রথমে মন্দিরে এসে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন, তার পর মন্দির থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে পড়ল সমুদ্রের মধ্যে একটি শিলাখণ্ড—ভারতবর্ষের সর্ব্বনিম্ন ভূভাগ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন। এখান থেকে নাকি ভারতের গঠনাকৃতি বেশ বোঝা যায়। স্বামীজি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে উঠলেন। সেই শিলাখণ্ডটির উপর বসে, ভারতভূমির দিকে তাকিয়ে তাঁর যে গভীর আত্মোপলব্ধি হয়েছিল সে কথা তিনি তাঁর এক পত্রে বলে গেছেন। এইখানে বসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর দেশবাসীর দুর্দশা, জেনেছিলেন যে তামসিকতা দূর করতে হলে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা মোচন করতে হবে। এইখানেই তাঁর দেশবাসীর ক্লিষ্ট আত্মার মধ্যে পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। দেশের জনসাধারণের সেবার মধ্যেই ঈশ্বর-সেবার নির্দেশ পেয়েছিলেন।

কন্যাকুমারিকার সাধারণ দৃশ্য

আমরাও মন্দির থেকে বেরিয়ে সমুদ্রমধ্যে শিলাখণ্ডটি দেখতে গেলাম। এইটির নামকরণ হয়েছে Vivekananda Rock. বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা-বেষ্টিত এই শিলাখণ্ডটি চিরকাল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর স্মৃতি বহন করবে। এক দিকে অসুরের প্রতিরোধকারিণী মাতৃমূর্ত্তি, অপর দিকে জনসাধারণের মঙ্গলব্রতী মহাতপস্বী স্বামীজির স্মৃতি—কন্যাকুমারিকা সত্যই মহাতীর্থ। আমরা 'বিবেকানন্দ রকটি'কে প্রণাম জানিয়ে স্নানের ঘাটে এলাম। স্নানের ঘাটটি স্থির শান্ত পুকুরের মত। স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য উপলখণ্ড দিয়ে ঘাটটিকে এমন ভাবে ঘেরা হয়েছে যে, এখানে কোন ঢেউএর দাপাদাপি নেই। এখানে দাঁড়ালে সম্মুখে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর ও বামে বঙ্গোপসাগর দেখা যায়—এ জন্য এ স্থানটিকে বলে তিনটি সমুদ্রের সঙ্গম-স্থল। অবশ্য এ তিনটি সমুদ্রের মধ্যে পৃথক্ ভাবে কিছুই চোখে পড়ে না; শুধু তিন দিক অনন্ত জলরাশি-বেষ্টিত দেখা যায়। মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য এরূপ ভাবে কাল্পনিক সীমারেখা টেনেছে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের শোভা দেখার জন্য অনেকে এখানে রাত্রিযাপন করেন। এখানে একটি হোটেল ও একটি রেষ্ট-হাউস আছে। আমরা বিকেলেই ত্রিবান্দ্রামে ফিরে গেলাম। সন্ধ্যা বেলা ত্রিবান্দ্রাম সহর দেখে বেড়ালাম। সমুদ্রের ধারে Aquariumটি দেখে এলাম কিন্তু চিত্রশালাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেখা হ'ল না; এখানে বিখ্যাত শিল্পী রবি বর্মার অনেক আসল ছবি আছে শুনেছি। সহরের রাস্তাগুলি উঁচু-নীচু। বাড়ীগুলির একটু বিশেষত্ব আছে, অনেকটা কাঠের বাড়ীর মত, ছাদ টিনের। অতিরিক্ত বারিপাতের জন্য বোধ হয় এই ব্যবস্থা। সহরের মধ্য দিয়ে একটি সরু খাল চলে গেছে, তাতে নৌকা-বোঝাই নারিকেলের ছোবড়া চলেছে। এই ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ, ম্যাটিং প্রভৃতি তৈরী হবে। হাতীর দাঁতের জিনিষও এখানে প্রচুর তৈরী হয়; দু'-একটি নিদর্শন সংগ্রহ করা গেল। কিন্তু এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প কথাকলি নৃত্য দেখার সুযোগ হ'ল না।

পরদিন সকালে আমরা কলকাতায় ফেরার পথে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হ'লাম।*

* এতৎসহ চিত্রসমূহ শৈলেন্দ্র মজুমদার গৃহীত।

রাত্রির প্রতি

পি, বি, শেলী

ক্ষিপ্রতর ঊর্মিরথে প্রতীচ্যের লহরী বাহিয়া
রজনীর ঐ মসীছায়া,—

প্রাচ্যের কুজ্মটিকা-পূর্ণ গুহা ছাড়ি'
এসো চলি'—নিঃসঙ্গ, একাকী
দিবসের আলো যেথা লইয়াছে রাজ্য তব কাড়ি'।
বুনিতেছ শত স্বপ্ন,—
কত ভয়, কত বা সুখের,
প্রিয় তোমা' কয় বহু লোকে, বিভীষিকা তুমি অপরের;
ক্ষিপ্র তুমি, সূক্ষ্ম তব কায়া।

আবরিয়া দেহখানি ধূম্র-আবরণে
তারকা-বিম্বিত;
ঘনকৃষ্ণ কেশপাশে দিবসের চক্ষু দিয়ে ঢাকি',
আতৃপ্তি চুম্বন করো তারে, যদবধি শ্রান্তি আনে ডাকি;
ভূধর, সাগর, পুর,—একে একে সব দাও পাড়ি,
পরশ সকলি—ঐ তব যাদুকরী ছড়ি
যাহা চায়;
এসো চলি' চির-অভীপ্সিত।

শয্যাপ্রান্তে জেগে দেখি, এসেছে প্রভাত,
তোমা' লাগি' ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস;
দীর্ঘতর হয় দিন, তৃণশীর্ষে শিশির শুকায়,
মধ্যাহ্নের খরতাপ লাগে ফুলে, গাছের শাখায়;
পশ্চিম-শিয়রে এসে তবু ক্লান্ত দিনমান দিগন্ত রাঙায়,
যেন কোন অতিথির অবাঞ্ছিত, অসহ-উৎপাত,
মোর বাড়ে দীর্ঘশ্বাস।

মৃত্যু আসি' ব'লে গেল ডেকে,—
—মোরে তুমি বরিতে কি চাও?
নিদ্রা এলো কচি-আধো শিশু, জ্যোতিহীন চক্ষু দুটি তার
মধ্যাহ্নের অলি-সম,—নিদ্রাবেশ গুঞ্জনেতে তার;
ব'লে গেল—পার্শ্বে তব রহিতে কি পারি?
চাহিবে কি মোরে?
উত্তরেতে বলিলাম তারে—না, না, চাহি না তোমায়।

নিদ্রা, মৃত্যু, সকলি আসিবে,
আগে নয়, তুমি গেলে পরে,
প্রেয়সি রজনি! ক্ষিপ্র তব ক'রে দাও গতি
এসো চলি' আরও ত্বরা ক'রে।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৩

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে কাজ-কর্ম শুরু হল। তখন লরি ভাবলেন যে চার্লস একজন দেশত্যাগী অভিজাত—তার স্ত্রী-কন্যাকে ব্যাঙ্কের আশ্রয়ে রেখে ব্যাঙ্ককে বিপদগ্রস্ত করা কোন মতেই সমীচীন হবে না। সে অধিকারও নেই তাঁর। লুসি ও তার মেয়ের জন্য তিনি নিজের নিরাপত্তা, ধনসম্পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে একটুও দ্বিধা বোধ করবেন না কিন্তু যে বিরাট দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত, সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করার চিন্তা অসম্ভব। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দুর্বলতা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না।

প্রথমেই মদের দোকানের মালিক ডিফর্জের কথা তাঁর মনে পড়ল। তার মদের দোকানটি খুঁজে বের করতে পারলে হত। তার পর তার সাহায্যে একটি নিরাপদ বন্দর। কিন্তু তখনি মনে পড়ল সে দোকান ত এখন বিপ্লবের ঘাঁটি। হয়ত এই বিপ্লবের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত ডিফর্জ।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ডাক্তারের দেখা নেই। লুসির সঙ্গে কথাবার্তায় লরি জানতে পারলেন যে, ডাক্তার ম্যানেটও ব্যাঙ্কের কাছাকাছি কয়েক দিনের জন্য একটা বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলেছিলেন। লরির কাছে কথাটা ভাল লাগল। তিনি তখনই বেরিয়ে একটা নিভৃত নিরাপদ আস্তানার খোঁজ করতে লাগলেন—পেয়েও গেলেন সুবিধা মত একটি। এ পাড়াটি নির্জন, পরিত্যক্ত। বহু লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে সে-মহল্লা থেকে।

লুসি, তার মেয়ে ও মিস্ প্রসকে তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ীতে পাচার করলেন লরি। বিশ্বস্ত জেরীকে রেখে এলেন তাদের পাহারায়।

সারা দিনের কাজ-কর্মের মধ্যে নানা চিন্তা-আশঙ্কার ক্লান্তিতে এক সময় বেলা গড়িয়ে গেল। ব্যাঙ্ক বন্ধ হল। একাকী নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন লরি। কত কি ভাবতে ভাবতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দে চকিত হয়ে উঠলেন লরি। সঙ্গে সঙ্গেই একটি মনুষ্য-মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে লোকটি তাঁকে নাম ধরে ডাকল।

—'আপনি আমাকে চেনেন?'

লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ। বলিষ্ঠ গড়ন। মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল।

—'আপনি আমাকে চেনেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক।

—'কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।'

—'হয়ত আমার মদের দোকানে।'

—'আপনি কি ডাক্তার ম্যানেটের কাছ থেকে আসছেন?' লরি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

—'হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই আসছি।'

—'তিনি কি কিছু বলেছেন?'

ডিফর্জ লরির কম্পিত হস্তে এক টুকরো কাগজ দিলেন। ডাক্তারের নিজের হাতে লেখা চিঠি পড়তে লাগলেন লরি।

—'চার্লস নিরাপদে আছে। আমি এখনও এ স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। লুসির জন্য চার্লসের লেখা দু'-এক লাইন পাঠাচ্ছি। পত্রবাহককে লুসির সঙ্গে দেখা করতে দিও।'

লা ফোর্স জেল থেকে লেখা।

চিঠি পড়ে লরি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল বুক থেকে।

—'তাঁর স্ত্রী যেখানে আছেন সেখানে আমায় নিয়ে চলুন।'

—'চলুন।'

ডিফর্জের কথাবার্তা বিরস-রূঢ় লাগল লরির কানে। তবু টুপি পরে তাকে নিয়ে উঠোনে এলেন লরি। দেখলেন উঠোনে দু'জন স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে একজনের হাতে বোনার কাঠি। দেখেই মনে পড়ল লরির।

—'মাদাম ডিফর্জ নিশ্চয়?' সতের বছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন আজও ঠিক সেই একই মূর্তিতে দেখতে পেলেন মাদামকে।

—'উনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

—'হ্যাঁ। পরে দেখলে তাঁদের যাতে চিনতে পারে। তাঁদের নিরাপত্তার পক্ষেই এটা প্রয়োজন?'

লরিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

নানা অলিগলি অতিক্রম করে তাঁরা লুসির বাসায় এসে পড়লেন। লুসি একা বসে কাঁদছিল। স্বামীর খবর পাওয়া গেছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লরির হাত জড়িয়ে ধরল লুসি। তার পর কম্পিত বুকে শতবার পড়লে সেই চিঠি:

—'প্রিয়তম,

সাহস হারিয়ো না। আমি ভালই আছি। এখানকার লোক-জনদের উপর তোমার বাবার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। চিঠির উত্তর দিতে হবে না। খুকুকে চুমু দিও।'

চিঠি পড়ে মাদামের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় বিগলিত হল। মাদামের দুটি হাত নিয়ে গভীর প্রীতিতে চুম্বন করলে অশ্রু-সজল লুসি। কিন্তু মাদাম ঝাপট দিয়ে হাত সরিয়ে নিতেই ভয়ার্ত চোখ তুলে লুসি তাকাল তার দিকে। দুটি মর্মভেদী দৃষ্টির শীতলতা সূচীবিদ্ধ করতে লাগল লুসিকে।

এই বিশ্রী পরিস্থিতিকে একটু হাল্কা করার জন্য লরি আশ্বাস দিয়ে বললেন—'ভয় কি লুসি? পথে-ঘাটে এখন নির্বিচারে ভয়ানক খুন-জখম চলেছে। মাদামের যাঁরা প্রিয়জন তাদের তিনি ভাল করে চিনে রাখতে চান। আমি ঠিক বলিনি মঁসিয়ে ডিফর্জ?'

বলতে বলতে লরি নিজেই মাঝপথে হোঁচট খেয়ে থেমে গেলেন। ঐ তিন জনের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই যেন সাহস হল না।

ডিফর্জ মুখ আঁধার করে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

লরি আবার বললেন—'তোমার মেয়েকে নিয়ে এস লুসি। মিস্ প্রসকেও আসতে বল। সবার পরিচয় করিয়ে দাও। উনি আবার ফ্রেঞ্চ জানেন না।'

লুসির কচি মেয়েকে নিয়ে মিস্ প্রস আসতেই মাদাম ডিফর্জ সেলাই বন্ধ করে এই প্রথম লুসির সঙ্গে কথা বললেন—'এই বুঝি

মেয়ে?' সেলাই-কাঠিটি মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দেখালে মাদাম—যেন নিয়তির তর্জনী নির্দেশ করলে।

—'হ্যাঁ, আমাদের এই একটিই।' বলতে কান্নায় গলা বুজে এল লুসির। অজানা আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে লুসি নীচু হয়ে মেয়েকে বুকে চেপে আড়াল করে ধরল।

—'যথেষ্ট হয়েছে'—স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে মাদাম: 'দেখা হল—এবার চল।'

মাদাম চলে যাবার উপক্রম করতেই লুসি মাদামের পোষাক চেপে ধরে মিনতির সুরে বললে—'কথা দিন, আমার স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না। কথা দিন, তার কোন অনিষ্ট করবেন না। আবার যেন তার দেখা পাই।'

মাদাম তাকে থামিয়ে দিয়ে কটু কণ্ঠে বললে—'তোমার স্বামীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য এখানে আনিনি আমরা। ডাঃ ম্যানেটের মেয়েকে দেখার জন্যেই এসেছিলাম।'

—'তবে আমার মুখ চেয়ে আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন। তাঁর সন্তানের মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচান। এই আমার মেয়ে হাত জোড় করে তার বাপের হয়ে মিনতি করছে। আপনাকেই আমাদের ভয়—অন্য কাউকে নয়।'

—'তোমার স্বামী কি যেন লিখেছেন চিঠিতে? তোমার বাবার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তিনিই তাকে বাঁচাবেন, তাই না?'

এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল লুসি—'দয়া করুন আপনি। প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। দয়া করুন আমায়। আপনিও নারী—আপনি আমার ব্যথা বুঝতে পারবেন।'

কিন্তু বেদনা-বিদ্ধ রমণীর কাতরতার প্রত্যুত্তরে মাদাম অবিচলিত শুষ্ক কণ্ঠে সঙ্গিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—'মা বৌ আমরাও কম দেখিনি, যাদের স্বামীরা বহু কাল ধরে জেলে পচেছে। যারা দুঃখ-দারিদ্র্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যাচারে-অপমানে নির্যাতিত হয়েছে দিনের পর দিন, যাদের কপালে চিরদিন মিলেছে শুধু বঞ্চিতের অবহেলা, অনাহার, অসম্মান।'

লুসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—'তুমিই বিচার করে বল না। এত জনের বদলে এক জনের দুঃখে অত বিচলিত হলে কি আমাদের চলে?'

তিন জনে নিঃশব্দে ঘর থেকে বিদায় নিলে লরি হাত ধরে তুলে নিলেন লুসিকে। বললেন—'ধৈর্য্য ধর লুসি। এখন চাই শুধু সাহস। অনেকের তুলনায় ভাগ্য এখনও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এখন ভয়ে মুষড়ে পড়লে চলবে না।'

৪

ডাক্তার ফিরে এলেন পুরো চার দিন পরে। এ ক'দিনে এগারোশ' বন্দী নারী-পুরুষ হত হয়েছে বিপ্লবী জনতার বিচারে। দিন-রাত্রি অবিরাম চলেছে এ মরণ-তাণ্ডব, দেখে এলেন ডাক্তার। কিন্তু সে সব কথা লুসির কাছে কিছুমাত্র ভাঙলেন না তিনি। লুসি শুধু জানলে যে বন্দি-হত্যা হচ্ছে বটে কিন্তু তার ডার্নে আজও অক্ষত আছে।

লরিকে শুধু গোপনে বললেন সে কথা। ডফার্জ বিপ্লবীদের বিচার-সভায় তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আঠার বছর তিনি নিজে রাজ-কারাগারে কাটিয়েছেন সে কথা জেনে বিপ্লবীরা তাঁকে অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করেছে নিজেদের দলে। সেই জোরে তিনি চার্লস ডার্নেকে প্রায় মুক্ত করেছিলেন কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে, আজও যার রহস্য পরিষ্কার হয়নি তাঁর কাছে, তাকে সদ্য মুক্ত করা সম্ভব হোল না বিচার-সভার রায়ে। তবে এটুকু আশ্বাস তিনি আদায় করে তবে জেল থেকে এসেছেন যে যত দিন না মুক্তি পাবে তত দিন ডার্নে জেলেই থাকবে। তার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখবে বিপ্লবী আদালত।

যে বীভৎস দৃশ্য সব দেখে এলেন ডাক্তার, তার ফলে আর একবার যদি তাঁর স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, এই ভয়ে লরি অন্তরে অন্তরে পীড়িত হচ্ছিলেন। ডাক্তারের চোখেও বোধ হয় তা ধরা পড়ল। বললেন—'ভয় করবেন না লরি। দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ঈশ্বর আমায় যে শক্তি দিয়েছেন, কোন কারাগারের লৌহ-গরাদ তা আটকাতে পারবে না। একদিন মেয়ে আমায় বুকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছিল, আজ তার স্বামীকে সর্বনাশের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তার হাতে দিয়ে বলব, এই নাও মা, তোমার বুড়ো ছেলের প্রতিদান। ঈশ্বরের কৃপায় আমি তা করতে পারবই লরি।'

ডাক্তারের শান্ত মুখ, দৃঢ় ভঙ্গী আর উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে লরি দেখলেন, দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ শক্তি যেন ডাক্তারের বৃদ্ধদেহে নব যৌবনের জোয়ার এনেছে। আর অবিশ্বাসের কারণ রইল না লরির।

বৃদ্ধ বয়সে ম্যানেট আবার প্যারিসে ডাক্তারী করতে সুরু করলেন। ধনী-নির্ধন, বিপ্লবী, রাষ্ট্রদ্রোহী, মুক্ত বন্দী—সমস্ত আহত রোগগ্রস্ত নর-নারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। তাঁর ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় অল্প দিনের মধ্যেই সারা প্যারিসে ডাক্তার ম্যানেটের নামে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। তিনটি জেলখানারই ডাক্তার হলেন তিনি—বিশেষ করে লা ফোর্স কারাগারে যেখানে তাঁর জামাই ডার্নে বন্দী। সেখানে তাঁর গতিবিধি হয়ে উঠল অবাধ অবারিত। ডার্নের নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করে ডাক্তার তাঁর কর্তব্য করতে লাগলেন। মেয়েকে তিনি দিনের পর দিন অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা দিতে পারলেন যে তার ডার্নে ভালই আছে। এক দিন সে মুক্তি পেয়ে তার স্ত্রী-কন্যার কাছে ফিরে আসবেই।

কিন্তু এত চেষ্টা তাঁর সার্থক হল না। বিপ্লবীদের বন্ধু ও প্রচণ্ড হিতকামী হয়েও এই পরম প্রিয়জনের মুক্তির কোন উপায় করতে পারলেন না ডাক্তার। বিপ্লবের দুর্বার বন্যায় বার বার তাঁর চেষ্টা ভেসে যেতে লাগল।

বিপ্লবের আর এক নবযুগ এল। রাজার বিচার করলে প্রজারা। গিলোটিনে রাজ্ঞীর মাথা কাটা পড়ল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু—এই ঘোষণা নিয়ে গণতন্ত্র সদম্ভে প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। নতরদামের উন্নত শীর্ষে দিন-রাত্রি উড়তে লাগল কৃষ্ণ পতাকা। মাটির কাছাকাছি থেকে তিন লক্ষ মানুষ যেন একসঙ্গে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘকাল ধরে এক দল লোক যে অন্যায়ের বীজ বপন করেছিল ফ্রান্সের দিকে দিকে—ছড়িয়েছিল পাহাড়ে অরণ্যে কোমল জমিতে, কঙ্করিত মাটিতে—দক্ষিণের উজ্জ্বল আকাশের নীচে—উত্তরের মেঘল ছায়াবৃত মৃত্তিকায়—তারা সব রক্তবীজের মত অঙ্কুরিত হল পত্রে পল্লবে শাখায় বিশাল হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ এক দিন এল

বন্যা। এল সর্বনাশের ঢল। আকাশ থেকে নামল না—উঠল মাটি বিদীর্ণ করে। আর সেই দুর্যোগময় দিন-রাত্রিতে পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল স্বর্গ।

শান্তি রইল না—ক্ষান্তি রইল না। করুণা-মমতার অবকাশ রইল না। ঝড়ের অন্ধকারে দিন-রাত্রি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। হিসেব রইল না কালের। এক দিন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা গোটা জাতি দেখলে তার রাজার মুণ্ডচ্ছেদ হল। আট মাস কারাগারে থেকে, নিরাভরণ বিধবার বেশে এক দিন তার সুন্দরী রাণীও জনতার পৈশাচিক মত্ততার ভূমিকায় লুণ্ঠিত-শির হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

এক দিন পবিত্র ক্রশ থাকত বুকে-বুকে। কিন্তু ক্রশ যা দিতে পারেনি—গিলোটিনের ধারাল লোহা তাই পারলে। তাই ক্রশ ফেলে লোকে সাগ্রহে সানন্দে গিলোটিনের প্রতীক বইতে লাগল আদর করে। গিলোটিন শুধু প্রতীক নয়—গিলোটিনই হল দেবতা!

এই আতঙ্কের রাজ্যে শুধু এক জন মানুষ নিষ্কম্প চিত্তে কাজ করতে লাগলেন। আপন শক্তিতে অসীম বিশ্বাসী মানুষটি যেন সকলের মধ্যে থেকেও রইলেন একাকী। যেন বিষাক্ত ঘূর্ণীর মধ্যে একটি মাত্র অমৃত-বিন্দু। তাঁর কাছে সবাই আপন। তাঁর কাছে সব দুয়ার অবারিত। এমনি করে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আড়াল করে রাখলেন তিনি ডার্ণেকে পনেরো মাস।

এত মৃত্যু, এত হত্যা! চতুর্দিকের এই নরকলীলার মধ্যে তবু বিশ্বাস আঁকড়ে রইলেন ডাক্তার। মেয়েকে তিনি যে কথা দিয়েছেন তা তিনি রাখবেনই। ফিরিয়ে এনে দেবেন ডার্ণেকে। লুসির মুখে আর একবার হাসি ফোটাবেন।

এমনি করে ডিসেম্বর এল। দক্ষিণের নদীতে মৃতের স্তূপ জমে পচতে লাগল। সারি-বাঁধা বন্দীদের গুলী করে হত্যা করতে লাগল বিপ্লবীরা। গিলোটিনের লোহার ওঠা-পড়ার বিরাম রইল না। নিরবধি রক্তস্নান করতে লাগল মেদিনী। আর দেশ জুড়ে ছিন্নশির অভিজাতদের দেহের উপর উন্মাদের মত নৃত্য করতে লাগল জনতা।

৫

দেখতে দেখতে এক বছর তিন মাস গড়িয়ে গেল। লুসি রোজই ভাবে আগামী কাল নিশ্চিত গিলোটিনে স্বামীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। শাণ-বাঁধান পথ প্রতিদিন মৃত্যু-পথযাত্রী বন্দীদের পায়ের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কত সুন্দরী কিশোরী, কত সুকেশা সুনয়না তরুণী, কত যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ—কেউ বড় ঘরের, কেউ বা পর্ণকুটীরের। কিন্তু সবাই এক পথের যাত্রী। গিলোটিনের ধারাল লোহার তলায় সবাই এক। বিপ্লব জানে শুধু দুটি পথ—এক সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আর এক মৃত্যু। মৃত্যুর সহজ পথের মুখেই এই গিলোটিন।

এ সর্বনাশা বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হলেও একটি দিনের জন্যও লুসি অন্য সবার মত উপায়হীন নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল না। এ ক'দিন একটি দীর্ঘকাল বন্দী পলিতকেশ বৃদ্ধের সকল দায়িত্ব নিজের ছোট বুক পেতে নিয়েছিল সে—আজ নিজের দুর্দিনেও তাঁকে তেমনি সযত্নে সবলে আঁকড়ে রইল লুসি। সকল বিপদ-আপদে একনিষ্ঠ সেবা করতে লাগল তাঁকে।

আবার সংসার গুছিয়ে বসল লুসি। স্বামী নেই, এ-বাড়ীর কোথাও তেমন চিহ্ন রাখলে না। তার জন্যে ঘর সাজালে। যেখানকার যেটি ঠিক তেমনটি করে সাজিয়ে রাখলে তার পুরোনো বাড়ীর মত। সে ত জানে বাবার কথা মিথ্যা হবে না। স্বামীকে সে ফিরে পাবেই। প্রতিদিন ঘুমের আগে বহু বন্দীর মধ্যে এক জন বিশেষ বন্দীর মুক্তি-কামনায় সে আকুল প্রার্থনা জানায় বিশ্বপতির কাছে।

এ পনেরো মাসে চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি লুসির। শুধু সোনালী রঙের জৌলুস হয়তো বা একটু ফিকে হয়েছে। দুর্যোগের যে মেঘস্তূপ তার মনের আকাশকে নিরন্তর অন্ধকার করে রাখে, কোন কোন রাত্রে বাবার পায়ের কাছে বসে সে-রুদ্ধ বেদনা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। তিনি তখন মেয়েকে সান্ত্বনা দেন।

—'ভয় কি মা? আমার অজান্তে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। তাকে আমি বাঁচাবই।'

বাবার প্রবল আশ্বাসে মনে বড় শান্তি পায় লুসি।

এমনি এক দিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ী ফিরে এসে বললেন—'জেলখানার উঁচু দিকে একটা জানলায় আমাদের চার্লসকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে দেয় ওরা। এই বিকেল তিনটে নাগাদ। অবশ্য সব দিনই যে দাঁড়াবে তা নয়। সেই সময় তুমি যদি মা রাস্তায় কোন বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক সে তোমায় চোখের দেখা দেখতে পারে। কিন্তু তুমি হয়ত তাকে দেখতে পাবে না। আর দেখতে পেলেও চেনার যেন কোন সংকেত কোরো না—করলে তার মহা বিপদ হবে।'

—'কোথায় সে জায়গা বাবা, দেখিয়ে দাও আমায়। আমি রোজ যাব সেখানে।'

পরদিন থেকে লুসি রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঘড়ির কাঁটাতে দুটো বাজলেই লুসি ছুটে যায়। চারটে বাজার আগে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় না। আবহাওয়া ভাল থাকলে মেয়েকেও নিয়ে যায়, নয় ত একাই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এইখানে আঁকা-বাঁকা পথের শেষে অপরিচ্ছন্ন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার একটা ছুতোরের দোকান। এই লোকটাই এক সময় রাস্তা মেরামতীর কাজ করত।

তৃতীয় দিন একই ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে লুসি ছুতোরের নজরে পড়ল। পরের দিন আবার আসতেই সে জিজ্ঞেস করলে—'আবার এসেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'সঙ্গে আবার একটি খুকু রয়েছে। তোমার নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা থাক। বেশ বেশ। আমার কাজ কাঠ কাটা। ঐ যে করাত দেখতে পাচ্ছ ওই দিয়ে গিলোটিন করা যায়।'

লোকটির কথার ধরন দেখে লুসি ভয়ে কাঁপতে লাগল। এখানে এলে ওর চোখে পড়বে না এ হতেই পারে না কিছুতেই। এর পর থেকে লোকটির শুভেচ্ছা পাবার উদ্দেশ্যে লুসিই আগে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। মাঝে মাঝে মদের পয়সাও দিত। লোকটিও তা হাত পেতে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখাত না।

অত্যন্ত কৌতূহল প্রকৃতির লোকটি। লুসি যখন জেলের ছোট্ট জানলার দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকে লোকটিও লুসির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায় জেলের দিকে। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে কি দেখে সে।

শীতের তুষার-কুচি, বসন্তের ঝড়ো হাওয়া, গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ আর হেমন্তের বাদল ধারায়—সকল ঋতুতেই লুসি প্রতিদিন দুটো ঘণ্টা কাটায় ওখানে দাঁড়িয়ে। যাবার বেলা জেলখানার দেয়ালে বার বার চুমু খায়। বাবা বলেছেন চার্লস জানতে পেরেছে যে লুসি সেখানে আসে। স্বামী মাঝে মাঝে দেখতে পায় তাকে। রোজ দেখা না পেলেও মাঝে মাঝে যে দেখতে পায় তাতেই খুশী সে।

এমনি করে ডিসেম্বর এল। চারি দিকের বিভীষিকা উন্মত্ততার রাজ্যে একটি মানুষ শুধু অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। বন্দী, প্রহরী, বিপ্লবী, দেশদ্রোহী বিচার করছেন না। তিনি ডাক্তার ম্যানেট।

এমনি এক তুষার-ঝরা দিনে লুসি যথাসময়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হয়েছে। সেটি এক শুভ আনন্দ-উৎসবের দিন। আসার সময় লুসি লক্ষ্য করেছে গৃহে গৃহে পতাকা উড়ছে—পতাকায় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী।

ছুতোরের দোকানটি আজ বন্ধ। দেখে খুশী হল লুসি। যাক্, অন্ততঃ একটি দিন ত সে একলা কাটাতে পারবে।

হঠাৎ লুসি শুনতে পেল, বহু কণ্ঠের জয়োল্লাস আর উদ্দাম পদশব্দ। এক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেল এক বিরাট মিছিল জেলের দিকে এগিয়ে আসছে। বিপুল জনতার কণ্ঠে বিপ্লবের গান। পদক্ষেপে জন-জাগরণের বলিষ্ঠ পৌরুষ। নৃত্যছন্দে সন্ত্রাস-জাগানো বেপরোয়া উদ্দামতা।

একাকী এই জনতার মুখোমুখী হয়ে ভয়ে-ত্রাসে অভিভূত লুসি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কাঁপছিল থর-থর করে। পালকের মত শাদা তুষার পড়ছে নিঃশব্দে। শাদা আর নরম। লুসি ভয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। মিছিল সরে যেতেই চোখ তুলে দেখলে বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

—'বড়ো ভয় করছিল বাবা!'

—'ভয় কি মা! ওরা কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।'

—'আমি নিজের জন্য ভয় করি না বাবা! কিন্তু যখন ভাবি এদের কৃপার উপরই তাঁর জীবন—'

—'এদের কৃপার বাইরে শীগ্‌গিরই সরিয়ে আনব মা চার্লসকে। ও আজ জানলায় দাঁড়িয়েছিল। সেই কথাই বলতে এলাম তোমায়। আজ তোমার উপর নজর রাখতে কেউ নেই এখানে। ঐ উঁচু জানলাটার দিকে চেয়ে তুমি তোমার ভালবাসা জানাতে পার।'

—'তাই রোজ জানাই বাবা!'

—'চার্লসকে এক দিনও দেখতে পাও না নিশ্চয়?'

—'না বাবা'—অঝোরে কাঁদতে লাগল লুসি। তুষারে কার পায়ের শব্দ হতেই দু'জনে চকিত হয়ে দাঁড়াল।

মাদাম ডিফার্জ।

নমস্কার জানালেন ডাক্তার।

প্রতি-নমস্কার করল মাদাম। এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল। নিষ্কলঙ্ক তুষার-জমা রাস্তার উপর দিয়ে একটা অশুভ কালো ছায়া হেঁটে চলে গেল।

—'আগামী কাল চার্লসের বিচার হবে।'

—'আগামী কাল?'

—'বৃথা সময় নষ্ট করার সময় কোথায়? আমিও প্রস্তুত। আরো সতর্ক থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির করা হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। এখনও নোটিশ পায়নি সে। আমি ভিতর থেকে জেনে এসেছি। তোমার ভয় করছে না তো মা?'

লুসি এ কথার সঠিক উত্তর দিতে পারলে না :—'তোমার মুখের কথাই আমার প্রাণ বাবা।'

—'আস্থা হারালে চলবে না মা! ভাবনার কাল শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে মুক্ত করে এনে তোমার হাতে সঁপে দেব। তাকে বাঁচানোর জন্য সব কিছুই করেছি। এখন একবার লরির সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

ডাক্তার ম্যানেট হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। ভারী চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ তাঁরা ভাল করেই জানেন।

—'লরির সঙ্গে দেখা করতে হবে।' পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার। টেলসন ব্যাঙ্কের প্রাচীন কর্মচারী ঐ লরির প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁদের আজও একটুও টলেনি। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্তরের সঙ্গে টাকা-জহরত বার বার দাবী করছে বিপ্লবীরা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে দিনের পর দিন। তবু তিনি চেষ্টা করতে কসুর করছেন না। যে যা বিশ্বাস করে রেখে গেছে, তা রক্ষা করতে প্রাণপণ করছেন।

আকাশে অমঙ্গলের পিঙ্গল আভা! কুয়াশা উঠছে সেইন নদী থেকে। আসন্ন রাত্রির সঙ্কেত। ব্যাঙ্কে যখন পৌঁছলেন ম্যানেট রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। ম'সিয়ের প্রাসাদ শূন্য—পরিত্যক্ত পড়ে আছে।

বাড়ীর উঠোনে ছড়ানো ধূলো আর ছাইয়ের গাদার উপরে বড় বড় হরফে লেখা—জাতীয় সম্পত্তি। এক অখণ্ড গণতন্ত্র। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—নয় মৃত্যু।

লরির ঘরের ভিতর চেয়ারে ঐ অদৃশ্য মানুষটি কে? দরজার বাইরে এসে আবার মুখ ঘুরিয়ে বললেন তিনি—'কাল বিচার হবার জন্যে চালান দেবে।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

"ধর্ম হচ্ছে মানুষের কাছে আফিমের মত।"

—কার্ল মার্ক্স

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

দ্বিতীয় পর্ব

তাজ্জব দেখুন। পিকিন-হোটেলে গান্ধি-জয়ন্তী। রাত আছে তখনো—প্রখর শীত। কলে গরম জল আসে নি। তা হোক—ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকলে হবে না। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরই মধ্যে নেয়ে ধুয়ে নিচে ছুটেছি।

গুটি কয়েক মানুষ—আয়োজন নগণ্য! গান্ধিজীর ছোট ছবি—দরিদ্র অর্ধনগ্ন ভারতের কঠিন ত্যাগ আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প চিত্রায়িত নরমূর্তিতে। সত্তর বছরের ক্ষীণদেহ নগ্নপাদ খদ্দরধারী রবিশঙ্কর মহারাজ গোটাচারেক বাক্যে করজোড়ে তাঁর কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করলেন। সাইত্রিশটা দেশের তিন শো আটাত্তর জন প্রতিনিধি ও দর্শক আজ থেকে একঘরে একটা ছাতের নিচে শান্তি-সম্মেলনে বসবেন—এক শো যাট কোটি মানুষের মুখপাত্র তাঁরা। তাবৎ ভুবন নিঃশব্দ বাক্যে বুঝি আকুতি জানাচ্ছে—দেখো তোমরা, মানুষের রক্ত আর যেন না ঝরে আমার বুকে, কলঙ্কের পাঁক গায়ে আর মাখতে না হয়!

মিনিট দশেকেই অনুষ্ঠান শেষ। আন্তর্জাতিক বিরাট সম্মেলন—তারই এই অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা। কিন্তু ক্ষুদ্র বলেই সামান্য নয়। নতুন পৃথিবীতে গান্ধিজীর মতো জীবন দিয়ে কে লড়েছেন শান্তির জন্য? ছবির একদিকে চতুর্নারায়ণ মালবীয়—ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান, ইদানীং পার্লামেন্টের এক কংগ্রেসি মেম্বার। অন্য দিকে গোপালন—ইনিও পার্লামেন্টের মেম্বার—কম্যুনিষ্ট দলের নেতা। পার্লামেন্টে মুখোমুখি মুখ উঁচিয়ে থাকেন, বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়েন না। আজকে দেখুন, নিস্তব্ধ পরম শান্ত তাঁরা—অতি-মধুর এক প্রত্যাশা অনুরণিত তাঁদের এবং সকলের মনে মনে।

ঘরে ফিরে দেখি, শান্তি-সম্মেলনের কাগজপত্র এসে পড়েছে। সবুজ ফাইল—তন্মধ্যে টাইপ-করা হরেক রকম বস্তু, সোনালি কপোত-আঁকা চমৎকার পকেট-বই, প্যাড-পেন্সিল এবং অভ্রের খাপের ভিতর নম্বর-সমম্বিত ডেলিগেট-কার্ড। স্বদেশে ছোট-বড় বিস্তর সভাসমিতি দেখা আছে, কিন্তু এর সঙ্গে কোন-কিছুর তুলনা চলে না। আয়োজনের নমুনা দেখে ইতিমধ্যেই মেজাজ চড়ে উঠছে। নিখিল বিশ্বভুবনের মালিক যেন আমরা···উঁহু, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত আর মেনে নেওয়া হবে না, আমরা পৌনে চারশ' বিচারক এজলাসে গিয়ে বসছি এবার, ক'দিন ধরে সাক্ষিসাবুদ নিয়ে রণদৈত্যের নির্বাসন-দণ্ড বিধান করব মর্তলোক থেকে।

সম্মেলন বসবে বিকাল তিনটায়। ইয়ং ও তার চেলাচামুণ্ডারা তাড়িয়ে-তুড়িয়ে সকলকে লনে এনে জড় করেছে। গজরাচ্ছে সারবন্দি বাস—মানুষগুলো উদরস্থ হলেই দেবে ছুট। কার্তিককে ভোলেন নি নিশ্চয়—বিড়বিড় করে বকতে বকতে সে দ্রুত পাদচারণা করছে গঙ্গাস্নান অন্তে বুড়োমানুষের স্তোত্র পড়তে পড়তে পথ চলার মতো।

ব্যাপার কি হে?

নম্বরটা রপ্ত করে নিচ্ছি। ডেলিগেট-কার্ড ধরুন খোওয়া গেল। নম্বর ঠিক থাকলে তবু অনেকখানি সুরাহা। নইলে যা শোনা যাচ্ছে—সে তো এক সমুদ্রবিশেষ।

কনফারেন্স-হল। পরশু এইখানে সরকারি ভোজ হয়েছিল। ভোল বদলে ফেলেছে একটা দিনের মধ্যে। প্লাটফরমের পিছনে শিল্পী পিকাসোর বিরাট পারাবত, পারাবতের দু-পাশে সাইত্রিশটা দেশের পতাকা—এ সব সেদিন ছিল, আজও আছে। আজকে
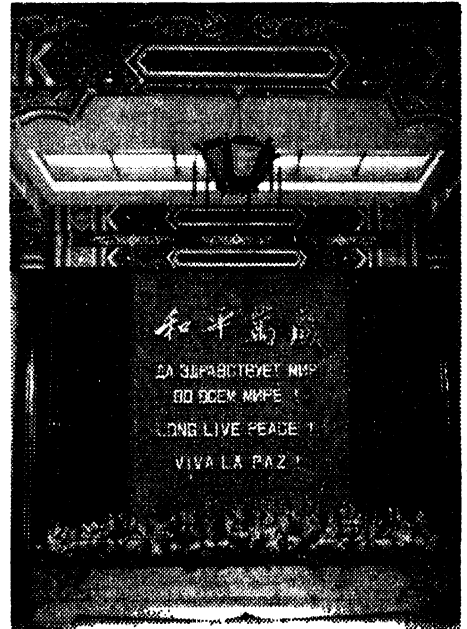
শান্তি-সম্মেলনের প্রবেশ-দ্বারের মর্মর ফলক

প্লাটফরমের উপর তিন-সারি চেয়ার পড়েছে সভাপতি মশায়দের। একটি দু'টি নন, গুনতিতে তেষট্টি হলেন তাঁরা। কোনও দেশ বড় বাদ নেই। পয়লা দিনের কাজকর্মের জন্ম পাঁচ জন বাছাই হলেন—সান-ইয়াৎ-সেনের বিধবা মাদাম সুং-চিং-লিং, ডক্টর কিচলু, পাকিস্তানের মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, জাপানের হিরোসি মিনামি আর কোষ্টারিকার এডুয়ার্ডো মোরা ভালভার্দে।

আসন নিলেন সভাপতিরা। টবে সাজানো অজস্র গুল্ম—তারই ফাঁকে ফাঁকে বসেছেন। আর, ফুল—ফুলে ফুলে কি অপরূপ সাজিয়েছে! হঠাৎ মনে হবে, কুসুমোদ্যানে আরামসে ওঁরা জমিয়ে বসে আছেন।

বক্তৃতার জায়গাটা কিছু এগিয়ে। চারটে মাইক এদিকে-ওদিকে। সিকিখানা শব্দও হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। বক্তার ডান দিকে কাচের কুজোয় জল ও গেলাস। দুই কোণে সিনেমেটোগ্রাফ-যন্ত্র উদ্যত—যেন বৃহৎ দুটো কামান পেতে রেখেছে। রঙিন সিনেমা-ছবি তোলার বন্দোবস্ত। সেই কামানের মুখ মাঝে-মাঝে ঘুরছে আসরের দিকে—দপ করে জোরালো আলোগুলো জলে উঠছে, আমাদের ইতরজনদেরও অর্ধেক হাত ইঞ্চি-দুয়েক মুখ কর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে ছবিতে।

আসরেরও একটু বর্ণনা দিই। আগামী বারে ছবি দেবো তাতে আন্দাজ পাবেন। ভোজের সময়কার সেই টানা-টানা টেবিল নেই। তার বদলে প্রতি জনের আলাদা চেয়ার-টেবিল। এক এক দেশের মানুষ এক এক জায়গায়। ভারতীয় আমরা দলে ভারী সকলের চেয়ে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উনষাট জন। মাঝখানে পাঁচ-ছয়টা সারি নিয়ে আমাদের জায়গা। অশোক-চক্রলাঞ্ছিত পতাকা সাঁটা রয়েছে সেখানে—রোমান হরপে 'ইণ্ডিয়া' লেখা। দলের মধ্যে যে যত্রতত্র বসে পড়বেন, তার জো নেই—ডেলিগেট-নম্বর ওয়ারি জায়গার ব্যবস্থা। চলাচলের পথ এক দিকে—কার্তিক এবং অন্য এক মহাশয় দেখলাম, উসখুস করছেন ঐ পথের কিনারে বসবার জন্য, জায়গা বদলাবদলির বিশেষ তদ্বির করছেন। ব্যাপার বুঝলেন? ছবি উঠবে ভাল, ফাঁকার মধ্যে ওঁদের আলাদা ভাবে চেনা যাবে। দেশে ফিরে যেই সব ছবি দেখিয়ে পশার জমাবেন, আমরা কি দরের মানুষ বোঝ! আর কিছুতে তো জাঁক করবার নেই!

কার্তিক এবং সেই ব্যক্তি—ফোটো তোলার ব্যাপারে আশ্চর্য প্রতিভা ওঁদের। কেমন যেন গন্ধ শুঁকে টের পান, কখন কোন দিকে ক্যামেরার মুখ ঘুরবে। সেইখানে ঠিক জেঁকে বসে আছেন। কনফারেন্স-হলের পিছন দিককার মাঠেও বিরাম সময়ে ইনি-উনি ছবি তুলতেন। ছবি তোলবার সময়টা ঠাহর পান নি কিন্তু ছবি হয়ে গেলে ঠিক দেখতে পাবেন, সকলের মাঝখানে সর্বপ্রধান জায়গা নিয়ে ওঁরা দাঁড়িয়ে। বিক্রির জন্ম এইরকম অনেক ছবি থাকত হোটেলের নিচের তলায়; এ-দোকানে ও-দোকানে পথের ধারে টাঙিয়ে রেখেছে, তা-ও দেখা যেত। ওঁরা দু-জনে আঙুল দিয়ে দেখাতেন, এই যে আমি,—ঐ যে আমি··· । কিচলু দলপতি—কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় চাপা পড়ে থাকতেন ওঁদের দাপটে।

যাক গে, সেই পয়লা দিনের কথায় আসি আবার। সভাপতি মশায়রা তো জেঁকে বসলেন প্লাটফরমের কুঞ্জবনে। বাজনা বেজে উঠল—কোন অলক্ষ্য লোক থেকে সুগম্ভীর মন্দ্র। পিছন-দরজা গেল খুলে। উল্লাসের কলধ্বনি—জোয়ারের ঢেউ এসে পড়ল যেন ঘরের মধ্যে। ফুলের তোড়া দিতে যাচ্ছে তরুণ আর তরুণীরা। চলেছে প্লাটফরমের দিকে। স্বাস্থ্য আর হাসিতে ঝলমল, সেই হাস্যোল্লাস ছিটকে দিয়ে যাচ্ছে গতির বীর্যভঙ্গিমায়। চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উঠল প্লাটফরমের উপর—এক এক জনে তোড়া দিল এক এক সভাপতিকে! তারপরে সেকহ্যাণ্ড। আরে আরে—কি কাণ্ড, কোণের ঐ টাকমাথা প্রবীণ মানুষটি আনন্দ-আবেগে আলিঙ্গন করছেন তাঁর নাতনির বয়সি মেয়েটাকে! অজানা অচেনা কত সমুদ্রের পারবর্তী বুড়ো থুথুড়ে এক জন আর নতুন কালের আনকোরা আধুনিকা—এতগুলো মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু বিকার নেই কারো মনে কিম্বা মুখে। সে হল অন্ধকার কোণচরদের রীতি—এই আলোর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনের ঘৃণ্য বীভৎস কীটগুলো। তারপরে হাততালি—ঘর ফেটে যায় বুঝি বা! সভাপতি মশায়রা প্রায় সবাই তো বয়স্ক মানুষ—তাঁরা ঘেমে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছি, আনন্দোন্মাদ জোয়ান ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—এমনিতরো অবস্থা। করুণ চোখে ওদের দিকে চেয়ে কোন গতিকে তাল ঠেকিয়ে যাচ্ছেন। হাততালি বন্ধ হল শেষ পর্যন্ত—নাচুনে ছেলে-মেয়েগুলো নেমে চলেছে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতো। পথের পাশের লোকের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করে যাচ্ছে তীরগতিতে—সেকেণ্ডে থান পাঁচ-সাত হাতের সঙ্গে। অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। বাজনা বন্ধ।

কাজ শুরু এবারে। চুপ করুন। কলম-পেন্সিল বাগিয়ে বসেছি। অধোদেশে আমাদের ছবি দেখে নেবেন নাকি একবার? শিবের মাথায় সাপ পেঁচিয়ে থাকে, সেই গোছের এক এক হেডফোন শিরে ধারণ করে আছি। টেবিলের গায়ে সুইচ-বোর্ড—আটটা ফুটো সেই বোর্ডে। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্প্যানিশ এবং বক্তৃতার মূলভাষা—তা ছাড়া আর তিনটে ফাউ। ঐ চারটে ভাষার একটা অন্তত আপনার জানা উচিত—তবে আর কোন অসুবিধে নেই। বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, চোখের সামনে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন—আর যে ভাষা আপনার পছন্দ, সেই ছিদ্রে প্ল্যাগ ঢুকিয়ে মহানন্দে কথা শুনে যান। আদি-অকৃত্রিম বক্তৃতা শুনবেন তো তারও ব্যবস্থা রয়েছে—ঐ মূলভাষার ছিদ্র। এইগুলো ছাড়া অন্য ভাষায় যদি প্রচার-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তারই জন্য বাড়তি ফুটো তিনটে।—আপাতত নিঃশব্দ এগুলো।

কায়দাটা বুঝলেন? যা মুখে এলো তা-ই বলা নয়—আগে থেকে তৈরী-করা প্রত্যেকটি বক্তৃতা। একটা কপি পূর্বাহ্নে জমা দিতে হয়। ওঁরা চারটে ভাষায় অনুবাদ করে রেখেছেন—মূল বক্তৃতার সঙ্গে একই সময়ে একই তালে ছাড়ছেন। নিখুঁৎ ব্যবস্থা—ধরা মুশকিল বক্তার আসল ভাষা কোনটা?

শ্রোতৃবর্গ পরম গম্ভীর—ব্যস্তসমস্ত হয়ে টোকাটুকি করছেন। কি অত লেখেন, আমি কিন্তু ভেবে পাইনে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা

চলছে—টাইপ করা কপি এসে যাচ্ছে অনতিপরেই। পরের দিন দশটা না বাজতেই চারটে ভাষায় পরিচ্ছন্ন সচিত্র মুদ্রণে তাবৎ বৃত্তান্ত ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। সমস্ত দায় ওঁরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমাদের কাজ তো দেখছি—পা ছড়িয়ে বসে বসে বক্তৃতা শোনা, বিরাম-সময়ে ঘুরে ঘুরে আলাপ জমানো আর যথাভীষ্ট পানাহারে ওঁদের অনুগৃহীত করা।

ঢুকে যাচ্ছি আমিও বটে! বক্তৃতার এক বর্ণ নয়—চতুর্দিকে যা কিছু দেখছি, তারই বর্ণনা। জুত মতো টেবিল-চেয়ার পেয়ে সুবিধা হয়েছে। স্মৃতি হাতড়ে যে লেখা বেরোয়, জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শুকনো বিবরণের বাণ্ডিল—প্রাতঃকালের সংবাদপত্র। সবজান্তা হওয়া যায়, কিন্তু মনের মধ্যে ঢেউ তোলে না। যাক গে, যাক গে—কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গেল ঐ যে!

পয়লা বক্তৃতা সুং-চিং-লিঙের। ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের ছবি তো যত্রতত্র, ছবির মুখে কথা পাইনে—কথার আগুন এই শুনতে পাচ্ছি তাঁর স্ত্রীর মুখে। মাঞ্চু-রাজার গ্রাস থেকে মহাচীনকে ছিনিয়ে এনেছিলেন—ওঁরাই স্বামী আর স্ত্রী, সেই থেকে গণরাজার রাজত্ব বহাল। তার পরে চল্লিশ বছর কেটে গেল, কত ছেলেমানুষ বুড়ো-থুপ্‌ড়ে হয়ে গেল, মাদামের কিন্তু বয়স বাড়ল না। একটি চুল পাকেনি—মুখে একটি কুঞ্চনরেখা নেই, নব তারুণ্যের ঝলকিত হাসি খেলে বেড়াচ্ছে তথায়। কথা যে ক'টি বললেন—বৈদগ্ধ্যে বিচিত্র নয়, কিন্তু আশায় সমুজ্জ্বল।

'শান্তি যারা চায়, তাদের শক্তি অসীম হয়ে উঠছে-দিনকে দিন। হতেই হবে। লড়াই বন্ধ হোক পৃথিবীতে—ঝগড়া-বিবাদের আপোষ-নিষ্পত্তি। মারণাস্ত্র তৈরি আর চলবে না—ওটা মহা অপরাধ বলে ঘোষিত হোক। অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্য চলবে সকল দেশের মধ্যে, সাংস্কৃতিক বন্ধনে এক হবে নানান জাতের মানুষ।...'

সভা চালাচ্ছেন এখন ডক্টর কিচলু। মাও-সে-তুং অভিনন্দন জানিয়েছেন, সম্মেলনের সাফল্য চেয়েছেন। পড়া হল সেটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে সকলে—কতক্ষণ কেটে গেল, উল্লাস থামবার লক্ষণ দেখিনে। বাণী পাঠিয়েছেন—জোলিও কুরি, ইকুওয়াকা, পাবলো নেরুদা, পল রবসন—এমনি সব জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ।

তার পরে বিরাম। ঘণ্টা দেড়েক ধরে বিস্তর ধকল গেল—খানাপিনা হোক পিছনদিককার চার-পাঁচটা ঘরে, প্রকাণ্ড উঠানে চরে-ফিরে বেড়ান, আলাপ-পরিচয় গল্প-গুজব করুন। ঘণ্টা বাজলে আবার এসে বসবেন।

ঘণ্টা বাজল। মিঞা ইফতিকারউদ্দিন এবারের সভাপতি। হাসিখুশির মানুষ—কথায় কথায় রঙ্গ-রসিকতা। দুরন্ত প্রাণাবেগ—একটি জায়গায় বসে থাকা বড় শক্ত মানুষটির পক্ষে। কংগ্রেসের সত্যযুগীয় আমলে ইনিও এক চাঁই ছিলেন। তখন নাম শোনা ছিল, পিকিনে এসে কাছাকাছি পরিচয় হল।

বক্তৃতার স্রোত চলল অতঃপর। একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছেন। গেব্রিয়েল-দ্য-অরকুশিয়ের—বিশ্বশান্তি-পরিষদের এক কর্মকর্তা। জাপানের অধ্যাপক হিরোশি মিনামি। আমাদের ডক্টর কিচলু। পাকিস্তানের দলপতি পীর মানকি-শরিফ। ব্রেজিলের আবেল চেরমঁ। ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ানস-এর ই, থর্নটন। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানন মেনার্ড। বৃটিশ লেবার পার্টির জন বার্নস।

নানা রকম হিতবাক্য, নিজ নিজ দেশের সমস্যা, তাবৎ বিশ্ববাসী সম্পর্কে ক্ষোভ-বেদনা ও প্রত্যাশার বাণী। অধিবেশন শেষ হতে সন্ধ্যা। পয়লা দিন, এর বেশি আর নয়। দশ দিন ধরে চলবে এই রকম—কত কি শুনতে পাবেন, তাড়া কিসের!

বলে কি, অধিবেশন নাকি দশ-দশটা দিন ধরে! এত কথা বলবার আছে, এত ভাবনা ভাববার আছে, এত সঙ্কল্প ঘোষণার রয়েছে? তাই! দশ দিনে শেষ করা গেল বটে, কিন্তু শেষাশেষি প্রতিদিন দুটো-তিনটে করে অধিবেশন চালাতে হয়েছে। শেষ অধিবেশন হল রাত্রি এগারোটা থেকে তিনটে। এর উপরে কমিশনের মীটিং আছে—তন্দ্রায় ঢুলছেন সকলে, রাত কাবার হয়ে যাবার দাখিল, তবু ছাড়ান নেই। বড় কঠিন কাজ—হুকুম-হাকাম দিয়ে সৈনিকদের লড়াইয়ে পাঠানো নয়, লড়াইবাজদের ধূলিশায়ী করা। যাতে আবার উঠে বসে তারা দল জোটাতে না পারে।

বাঘা শীত—ভোরে ওঠা অতিশয় কঠিন। কায়ক্লেশে উঠে তবু বেরিয়ে পড়লাম, উষালোকে পিকিনের চেহারা দেখব। তামাম শহর ঝকঝক তকতক করে—সে ব্যবস্থা হয়ে যায় মানুষের ঘুম থেকে উঠবার আগে। আগের দিন গান্ধি-জয়ন্তীতে উঠে ব্যাপারটার আন্দাজ পেয়েছি, তাই আজকে আরও সকাল-সকাল উঠে পড়েছি। ছেলেবেলায় যাত্রার সাজ-ঘরে উঁকি দিতাম—বিড়িখোর ছোঁড়াটা কি করে হঠাৎ রাজকন্যা হয়ে যায়, দেখবার দুরন্ত লোভ। এ-ও প্রায় তাই। কি করে এত বড় শহর এমন ফিটফাট রাখে?

পথে-পার্কে বিস্তর মানুষ। দস্তুরমতো ভিড় জায়গায় জায়গায়। দোকানপাট বেলায় খোলে—তার আগে এখন চতুর্দিক পরিমার্জনা হচ্ছে। আমার স্বদেশেও হয়ে থাকে, কিন্তু এমন পরিপাটি শৃঙ্খলা চোখে পড়ে না। রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, জল দিয়ে ধোয়াধুয়ি হচ্ছে, নর্দমার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে সযত্নে বীজাণুমুক্ত করছে। ময়লা ফেলার পাত্রগুলো সাফ-সাফাই। নতুন দিনে জেগে উঠে পথে বেরিয়ে সর্বত্র দেখতে পাবেন নির্মল প্রসন্নতা। মানুষগুলোর নাকে-মুখে কাপড়ের পটি, চোখ দুটো শুধু খোলা। বীজাণুরা তাড়া খেয়ে ঐ সব ছিদ্রপথে দেহ-মধ্যে ঢুকে না পড়ে—তারই ব্যবস্থা। এই কাপড়ের পটি খুব চলছে—ফেরিওয়ালারা দু-পয়সা চার পয়সায় বিক্রি করে, লোকে দেদার কেনে আর পরে। যারা বাইরে বাইরে ঘোরে, পরতেই হবে তাদের। রাস্তার ধারে দোকান দিয়ে বসেছে, তারা সব নাক-মুখ ঢেকে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে আছে। ইস্কুলের ছুটির সময়, দেখতে পাচ্ছি, ঐ বস্তুতে নাক-মুখ ঢেকে ছেলেমেয়েরা সারবন্দি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মোটর-ড্রাইভারের আবার নাক-মুখ ঢাকা শুধু নয়, দু-হাতে দস্তানা—ষ্টিয়ারিং-চাকার ময়লা যাতে হাতে না লাগে।

নজর কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে দিন। এক সঙ্গে, দেখুন দেখুন, কত মানুষ ব্যায়াম করছে! রেডিওয়, এই এত ভোরে, ব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে এখন বাজনা বাজাচ্ছে। আর, এরা সব হাত-পা খেলাচ্ছে সেই বাজনার তালে তালে। এ পার্কে ঐ মাঠে এমন কি ফুটপাথের যেখানটা বেশি রকম চওড়া সেখানেও দেখতে পাবেন, একই ধরনের শারীর-চর্চা। গ্রামে গ্রামেও নাকি এমনি সময়ে

ঠিক এই ব্যাপার—সেটা চোখে দেখতে পারিনি। ছেলে-বুড়ো চাষী-মজুর ছাত্র-মাষ্টার সবাই একই সঙ্গে হাত নাড়ে, পা তোলে, ঘাড় বাঁকায়। মানুষে মানুষে অজান্তে এক হয়ে যাচ্ছে—অযুতলক্ষ নরনারী, সকলে তারা এক।

আর ঐ এক মজা আছে—যা-কিছু করবে, তাই নিয়ে এক একটা আন্দোলন গড়ে তোলা। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকবে—সেই বাবদেও অভিযান। চার সাফাই—পাঁচ মার! সাফাই রাখো খাবার ও রান্নাঘর; সাফাই রাখো গোয়াল ও পায়খানা; সাফাই রাখো কাপড় ও বিছানা; সাফাই রাখো রাস্তা ও ঘরবাড়ি। মারো মাছি; মারো মশা; মারো পোকামাকড়; মারো জোঁক; মারো ইঁদুর। এ ছাড়া আর যত প্রাণী রোগবীজাণু ছড়ায়, মেরে মেরে তাদের শেষ করে ফেল।

কেমন এক এক আন্দোলনের ফুলকি ছেড়ে দেয়, আর দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। 'মাকড় মারলে ধোকড় হবে—তুমিও যেমন!' অতি-বুদ্ধিমন্তেরা তুড়ি মেরে সমস্ত-কিছু উড়িয়ে দেবার সাহস পায় না। প্রতিটি চেষ্টার দ্রুত সাফল্য দেখে আত্মবিশ্বাস এসে গেছে সকলের মনে। চেষ্টা করলে ঠিক হবে। যে মতলবটা উঠল, অচিরে তা হাসিল হবেই—তাবৎ লোকজন সে জন্য মরীয়া হয়ে লেগে যায়। এক গ্রামে গিয়েছিলাম—গ্রাম-প্রধান নানা গৌরব-প্রচেষ্টার মধ্যে পরিচয় দিচ্ছেন, কত হাজার মাছি মারা হয়েছে এতাবৎ। এখানে শুধুমাত্র মাছিমারা কেরাণী নয়, মাছিমারা সর্বজন। সরু জালে মাছি মেরে মেরে গোণাগুণতি করে রাখে। বেশি মারতে পারলে মুনাফাও আছে, উত্তম পুরস্কার।

দেহ আপনারই বটে কিন্তু সেটা পরিপাটি করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ রাখার পুরোপুরি দায়িত্ব রাষ্ট্র কাঁধে নিয়েছে। মানুষ নিয়েই সব—মানুষকে মজবুত করবার তাই দেশব্যাপ্ত আয়োজন। ডাক্তারকে ফী দিতে হবে না, অষুধের দাম লাগবে না, রোগ-চিকিৎসা একেবারে মুফতে; সিকি পয়সা সে বাবদে ডাক্তার-নার্সের প্রাপ্তি নেই। তাই রোগ যাতে কারো না হয়, ডাক্তারেরও চেষ্টা—হলে মুনাফা নেই, উপরন্তু হাঙ্গামা। নিশ্বাস ফেলে ওরা দুঃখ করছিল, ইচ্ছে আমাদের তাই বটে! কিন্তু তিন তিনটে বছর চলে গেল, সকলের জন্য ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। ডাক্তার কোথায় পাচ্ছি অত?

তবু যা হয়েছে, দেখেশুনে তাজ্জব মানি। ১৯৫১ সনে শ্রমিক-বীমা আইন হল। বীমা করতেই হবে সকলকে। খনি ও ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, চিকিৎসা বাবদে তাদের এখন এক পয়সাও লাগছে না এই বীমার কল্যাণে। ন্যাশনাল মাইনরিটি যত আছে, তাদের বীমার ব্যাপার নেই—তবুও বিনামূল্যে চিকিৎসা। গবর্নমেণ্ট তরফের যত লোক—তাদের সম্পর্কেও এই। এবারে পাঠকবর্গ মুখ বাঁকাচ্ছেন বুঝতে পারছি। সে তো হবেই—সরকারি লোক, তারা আবার পয়সা দিতে যাবে নাকি? তাদেরটা সকলের আগে চাই। আজ্ঞে না, গবর্নমেণ্ট মানে জনসাধারণ থেকে পৃথক্ তকমা-আঁটা রকমারি হিস্তার কর্তৃত্বভোগী এক দাম্ভিক গোষ্ঠী নয়—ঐ রাষ্ট্রধারণা মুছে ফেলতে হবে আপনাদের মন থেকে। মস্তিষ্ক ধুয়ে সাফসাফাই করতে হবে—যাকে ওরা বলে থাকে ব্রেইন-ওয়াশিং (brain washing)। এদের রাষ্ট্র গাঁয়ে গাঁয়ে; রাষ্ট্র-শক্তি ছড়িয়ে আছে যাবতীয় জনসংস্থার মধ্যে। চাষীদের সমিতি আছে; তাদেরও এমনি বেখরচায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা তাদের সমিতিগুলোর মাধ্যমে।

তবুও বাকি থেকে যায় কতক লোক। তাদের পয়সা খরচ করতে হয়। সেই হেতু নতুন-চীন হা-হুতাশ করে। তিনটে বছরেও সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা হল না—কি হল তবে আর বলুন! অতএব দ্রুত ডাক্তার বানিয়ে তোল ছেলেমেয়েদের, গড়ো ল্যাবরেটারি, চালাও গবেষণা, তৈরি করো নানাবিধ অষুধপত্তোর।

দলে দলে মেডিকেল কলেজে ঢুকছে। স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল চেহারা দেশ জুড়ে। তেজি ঘোড়া দাঁড়িয়ে থেকেও পা দাপায়—এরাও তেমনি যেন স্থির থাকতে পারে না—লাফায় দুমদুম করে। বিশ-বাইশ বছরের মেয়ের দল—সাংহাই মেডিকেল কলেজের ছাত্রী—লাফিয়ে লাফিয়ে সেকহ্যাণ্ড করছে, মাটি থেকে দুই পা উঠে যাচ্ছে ইঞ্চি ছয়েক—প্রাণের এমন উচ্ছাস চোখে না দেখলে ভাবতে পারতাম না।

রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ কিসে না হয়, সেই চেষ্টা। মশামাছির সঙ্গে লড়াই সেই জন্য। অবস্থা ছিল একেবারে আমাদের মতো। ডাক্তারের সংখ্যা অতি কম—শতকরা নব্বই তার মধ্যে শহরে। গ্রামাঞ্চলে যে দু-দশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তথায় না ডাক্তার না ওষুধপত্তোর—অব্যবস্থার চরম। আজকে হিসেব পেলাম, যত গ্রাম আছে তার শতকরা একানব্বইটা নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছে—স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করে তারা, রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করে।

আগে ছিল, প্রতি তিন বছরে একবার করে কলেরার প্রকোপ। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম, কলেরা তেমনি যথানিয়মে আসবেই। সারা চীনে এখন কলেরা বন্ধ হয়ে গেছে। তিন বছরের মধ্যে একটা মানুষকেও কলেরায় ধরেনি। আর কখনো কারো কলেরা হবে না—ওরা জোর করে বলে। খাবার জল ফুটিয়ে খায় বারো মাস তিরিশ দিন—অবিরত প্রচারের ফলে কাঁচা জল বিষের সমতুল্য ভাবতে শিখেছে। ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে দেশব্যাপী সংগ্রাম-ঘোষণা। তার উপরে নির্বিচারে কলেরা-টাইফয়েডের ইনজেকসন—বিশেষ করে বন্দর জায়গা এবং চীনে ঢুকবার ঘাঁটিগুলোয়। জগৎবেড় জাল পেতে আছে যেন—একটি মানুষ বাইরের রোগ নিয়ে ঢুকে পড়বে, কিছুতে তা হবার জো নেই।

বসন্তের ব্যাপারেও এমনি যুদ্ধং দেহি ভাব। দেশ জুড়ে পায়তারা চলছে। ঠিক করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে মা-শীতলাকে পুরোপুরি এলাকাচ্যুত করবে। বড় বড় শহরগুলোয় ১৯৫১ সনে শতকরা আশি জনে টিকে নিয়েছে। পাঁচ বছরের তিনটে পার হয়ে গেছে। আর দুটো বছর।

কি দুরন্ত বেগে স্বাস্থ্যোন্নতি চলেছে! মানুষ কিলবিল করছে—তবু বলে, কেউ মরবে না অকালে, রোগা-ডিগডিগে হয়ে থাকবে না—বাঁচার মতন করে সকলে বাঁচবে। রোগ খেদাও, রোগের জড় মারো, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াক মানুষ। মানুষ বাড়ুক আরও—মানুষ বোঝা নয়, মানুষই লক্ষ্মী।

কাজের মানুষ তৈরি করবে, সেই জন্য আরো বেশি মানুষ চাই। মৃত্যুর হার কমেছে, জন্ম বাড়ছে। বিশেষ করে ন্যাশন্যাল মাইনরিটিদের মধ্যে—দিনে-দিনে যারা নিশ্চিহ্ন হবার দাখিল হয়েছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সন্ন্যাস

নিউ ইয়র্কে নিবেদিতা থামলেন না। বন্ধুরা তাঁর জন্য বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা তাঁকে ট্রেনরীজের গাড়িতে তুলে দিলেন। ওখানে স্বামীজি মিসেস্ লিগেটের (মিস্ ম্যাক্লয়েডের বড় বোন) অতিথি হয়ে আছেন।

মিসেস্ লিগেটের বাড়ির নাম রিজ্‌লী ম্যানর, সেকেলে ধাঁচে তৈরী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কাছেই হাডসন নদী মন্থর গতিতে শতধারায় বিভক্ত হয়ে চলেছে। কোথাও বা বালুর চর কোথাও বা সবুজের ঝাড়ি—স্রোতের বাহুপাশে বাঁধা পড়েছে। বাড়ির চারদিকেই প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড 'লন', তার বুক চিরে রাস্তা চলে গেছে এদিক-ওদিক, দু'-পাশে কত কালের পুরানো ওকবীথি। বাড়ির সামনে দু'সার করে ওক থাকায় একটা গম্ভীর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

মিসেস্ লিগেটকে বন্ধুরা ডাকতেন 'লেডি বেটি' বলে। মার্জিত-রুচি বুদ্ধিমতী মহিলা—বহু বন্ধু-বান্ধবকে খাতির করবার আশ্চর্য নৈপুণ্য তাঁর। বাড়িতে একটা হৃদ্যতার পরিবেশ রচনা করতেন, এতে অতিথিরা দেহে-মনে স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন, নতুন-নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করারও সুযোগ মিলত। শিল্পী, চিত্রকর, লেখক, কবি—এ ধরণের লোকেরা অনেকটা সময় কাটাতেন তাঁর বাড়িতে, তিনিও তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে চমৎকার একটা ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন এই মজলিসে। এবারের শরৎকালে তিনি বোনের বন্ধুদের মহাসমারোহে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজি, মিসেস্ বুল আর নিবেদিতাকে তাঁর বাড়িতে পেয়ে তাঁর আনন্দ আর ধরে না! এমনি করে স্বামীজিকে ঘিরে আলমোড়ার ছোট্ট দলটি, আবার একত্র হল। লেডি বেটির অতিথিদের কাছে সারা বুল আরেকটি আগ্রহের বস্তু, কারণ সারা ওস্তাদ পিয়ানো-বাজিয়ে, 'গ্রীগের' সুরের লীলায় অমরাবতীর সৃষ্টি করেন। বাগানের মাঝখানে এক শিকার-কুঠি—সারা আর তাঁর মেয়ে ওলিয়া সেইখানে আস্তানা নিয়েছেন। ক্রিষ্টিন গ্রীনষ্টিডেল আর লেডি বেটির নিজের জনকয়েক বন্ধু এসেছেন কয়েক দিনের জন্য।

প্রথম ক'টা দিন স্বামীজির বিশ্রামে কাটল। তাঁকে ঘিরে জিজ্ঞাসুরা দল বাঁধতেন, কিন্তু অসুস্থতার দরুন সময়-সময় স্বামীজি সবার কাছ থেকে সরে থাকতে বাধ্য হতেন। তখন তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছেন। ছাত্রাবস্থাতেই এ-রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, উনচল্লিশ বছর বয়সে ঐ রোগেই চলে যান। তখনও ইনসুলিনের আবিষ্কার হয়নি। একটু ভাল হওয়ার লক্ষণ দেখলেই কিন্তু স্বামীজি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতেন না। প্রাতরাশের সময়ই হ'ক, ড্রয়িং রুমে বা জঙ্গলে হ'ক, যেখানেই থাকুন না কেন তিনি তখন সবার। বন্ধুরা এই সব শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকতেন, কখন তিনি গহন হতে উৎসারিত ভাবের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে দিব্য জীবনের ছবি আঁকবেন, শ্রোতার হৃদয় গলবে তাঁর প্রসন্ন-গম্ভীর বাণীতে। এরই মাঝে তাঁর গুরুশক্তির রহস্য। এই সব উপলক্ষ্যে লেডি বেটি একটা স্তব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করতেন স্বামীজির চারদিকে, কোনও কারণেই তাকে বিক্ষুব্ধ করা হত না। সারা দিনের যত পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হত, খাওয়ার সময় বদলে যেত। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অমূল্য, কারণ হয়তো আলোচনার মাঝখানে কাসির ধমক সামলাতে না পেরে স্বামীজি হঠাৎ উঠে চলে যাবেন। কখনও বা তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে যেত, অনেক চেষ্টায় তবে কথা বলতে পারতেন। তারপর হয়তো অন্তরের মণিকোঠায় ডুব দিয়ে সারা দিনটা চুপ করেই কাটিয়ে দিলেন, আশে-পাশে কি চলছে খেয়ালই রইল না।

রিজ্‌লী ম্যানরের এই ক'টা দিন নিবেদিতার পক্ষে যেন যুদ্ধের আগে বিরতির মত। একটু ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁকে তা তিনি জানেন, গুরুর বাণী প্রচার করতে যাবেন, তার আগে নিঃশেষে নিজের সকল বাঁধন খসিয়ে ভিতরের সব-কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। দিনগুলো তো উড়ে যাচ্ছে। চিকাগো আর বোষ্টনের বিদগ্ধ সমাজ স্বামীজিকে অনুকূল চিত্তে গ্রহণ করেছিল, ফলে রিজ্‌লী ম্যানরে চিঠি-পত্র আসত অগুণতি। পশ্চিমের একটি মেয়ে ভারতীয় জীবন যাপন করে কি পেল তা শোনবার ঔৎসুক্য অনেকেরই।

স্বামীজি নিবেদিতাকে খুব লক্ষ্য করতেন। নিবেদিতার বর্তমান অবস্থা তাঁর কাজের অপরিহার্য ভূমিকা। জাহাজে থাকতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মার্গট, পশ্চিম থেকে যে টাকাটা যোগাড় করতে চাইছ, সেটা করতে পারবে বলে মনে হয়?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্বামীজি!'

'আমার আশা, পারবে। মরবার আগে দুটো জিনিস দেখে যেতে চাই। একটা হয়েছে, বাকী আছে এইটা।' (২১শে জুলাই ১৮৯৯এর চিঠি।)

অথচ এ-সব আয়োজনে একটুও সাহায্য করেন না তিনি। তিনি যেন দিন গুণছেন। কিন্তু নিবেদিতা যখন এসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুর, একটা গভীর শান্তিতে সব তলিয়ে যেতে চাইছে, কি পাব জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস টুটবে না। এবার সময় হয়েছে,'···স্বামীজির চোখে জল এল। শুধু বললেন, 'শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। আমার শান্তি তোমার মাঝে। তাকে সার্থক কর।'

সেদিন সন্ধ্যায় মিস্ ম্যাকলয়েডের সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরে আসতেই স্বামীজি নিবেদিতার হাতে একখানা কাগজ দিলেন, তাতে লেখা

'এই শান্তি, এই তোমায় দিলাম। আমার দিনও আজ কাটল এই শান্তির মাধুরীতে। এই নাও আমার আশীর্বাদ।' তার পরেই একটি কবিতা :

'ঐ দেখ, প্রমত্ত বেগে আসছে সে···সে শক্তি, তবুও সে শক্তি নয়···আঁধারের বুকে সে আলো ; আবার চোখ-ধাঁধানো আলোতে কালোর ছায়া।

'সে যেন নির্বাক্ সুখ, বোধের অতীত গভীর দুঃখ যেন সে···প্রাণের চাঞ্চল্যহীন অমৃত জীবন সে, সে যেন শাশ্বত অশোক, মরণ।

'সে সুখ নয় দুঃখ নয়, অথচ দুয়ের মাঝখানে ; সে রাতের আঁধার নয়, ভোরের আলোও নয়, অথচ দুয়ের সেতু।

'সঙ্গীতের সুরেলা বিরাম সে, দেবশিল্পের তুলির টানে যতির ছন্দ···কোলাহল আর বাসনার প্রমত্ততার মাঝে সে গভীর মৌন, হৃদয়ের নীরব প্রশান্তি।

'মাধুরী সে, কিন্তু কেউ তাকে ভালবাসেনি ; সে প্রেম, কিন্তু চলার পথে সঙ্গহীন। সে যেন না-গাওয়া গান একখানি, যেন সকল জানার বাইরে জানা।

'দুটি জীবনের মাঝখানে সে মরণ যেন, দুটি নির্ঝরের ছন্দদোলায় বিরতি···সে যেন পরম শূন্যতা, যার হৃদয় হতে সৃষ্টির উদয়, আবার যার হৃদয়েই তার লয়।

'এক ফোঁটা চোখের জল চলেছে তারই সন্ধানে···একটুখানি হাসির আভা বিছিয়ে দেবে বলে···এই তো জীবনের শেষ বন্দর··· এই শান্তিই তো তার আপন ঘর।'

তারপর সারা মাসটা ধরে রিজ্‌লী ম্যানরে খুব গুরুগম্ভীর আলোচনা চলল। স্বামীজি যা-কিছু উপদেশ দিতেন নিবেদিতাকে লক্ষ্য করেই, তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বামীজির সব ভাবনা ঘুরছে।* নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এটা মেনে নিলেন। এমন কি সন্ধ্যায় যখন আগুনের কুণ্ড ঘিরে ড্রয়িং রুমে অতিথিরা একত্র হন তখনও নিবেদিতাই থাকেন মুখ্য শ্রোতা। আগুনের আভা প'ড়ে স্বামীজির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কুশনের উপর স্বদেশী কায়দায় আসন করে বসেন, অকুণ্ঠে সকলের প্রশ্নের জবাব দেন, কিন্তু তারই মধ্যে সব সময় নিবেদিতার ভাবনাগুলোকে ছুঁয়ে যান। একদিন বললেন, 'দেখ ভালবাসা এক জিনিস, আর সাযুজ্য হল আরেক জিনিস। সাযুজ্য ভালবাসার চেয়ে বড়। যা নিয়ে জীবনপাত করলাম, অন্তরের সিদ্ধি রূপ ধরেছে যার মধ্যে, সে-জিনিসকে "ভালবাসি" বললেই সব বলা হয় না। এই অর্থে আমি ধর্মকে ভালবাসি না। ও-জিনিস আমার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, ওই আমার সর্বস্ব। যাকে ভালবাসি তাকে ঠিক আত্মসাৎ করতে পারি না···ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে এই তফাৎ, আর এই জন্য ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।'

গুরুর কথা শুনতে-শুনতে নিবেদিতা ভাবেন, 'আমি তো মুক্ত, আমার সঙ্কল্প নাই, বাসনা নাই···' সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের শিহরণ খেলে যায় শিরায়-শিরায় 'একলা এগিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে কি ?'

একমাত্র ভাই মৃত্যুশয্যায়—সংবাদ পেয়ে মিস্ ম্যাকলয়েড তখন ক্যালিফর্ণিয়ায়। তাঁকে লেখা নিবেদিতার একখানা চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সময় স্বামীজি তাঁর মধ্যে কি ভাবে শক্তি সঞ্চার করছিলেন। প্রত্যেকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন নিবেদিতা। 'সকালে নীচে নেমে এলাম। স্বামীজি ঘণ্টা দেড়েক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে তথাকথিত ভদ্রতা সম্বন্ধে আমায় সতর্ক করে দিতে লাগলেন। "কী মিষ্টি, কী সুন্দর" এ সব বাঁধি গৎ চলবে না, আর অনবরত এই বাইরের দিকে নজর! "ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে, তখন আকাশ হতে বজ্রের মত ভেঙে পড়বে দুনিয়ার উপরে। যারা বলে 'আমার কথা কি কেউ শুনবে' তাদের উপর আমার কোনও আস্থা নাই। কিছু বলবার মত পুঁজি যার আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এ-পর্যন্ত পারেনি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ করতে পারবে? পারবে তুমি? যদি না পার তো হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস।" তার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে চললেন, তার শেষে চর্পটপঞ্জরিকার। শেষকালে সব সময়ই ধুয়া: "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!" কখনও বা তাকে পাল্টে করেন, "মার্গট, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!"

'সমাজ-সংসারের এই সব তুচ্ছ ডোর ছিঁড়তে হবে, অবিরাম ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের বিরুদ্ধে আত্মভাবনাকে অটল রাখতে হবে, ভোজন-বিলাস বা আ'রাম-শয্যার মত শারদ-শ্রীর উল্লাসও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আয়োজন মাত্র এই জানতে হবে, মানুষের অর্থহীন নিন্দা-স্তুতিকে উপেক্ষা করবে—এই হল আদর্শ···'

এখনও যে-সব দুঃস্বপ্ন হানা দেয় মনে, তাদের হাত এড়াবার জন্য নিবেদিতা ধ্যান যোগকে আঁকড়ে ধরতে চান। এটা লক্ষ্য করে স্বামীজি কঠোর তিরস্কার করেন, এখন এ-সব কসরৎ করবার সময় নয়, সহজ অন্তরাবৃত্তির সাধনা ছাড়া আর-কিছুরই ঠাঁই রেখো না জীবনে।'

গুরু চাইছেন সরাসরি নিবেদিতাকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিতে। শক্তির কোন স্ফুলিঙ্গটিকে আজ উস্‌কে দিতে হবে? চোখের সামনে দেখেছেন, দেহে-মনে যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন স্বামীজি, তা অবর্ণনীয়। বেলুড়ের দারিদ্র্য আর লণ্ডনের শিষ্যদের ঝগড়ার খবরে যা অনিষ্ট হবার তা হয়েছে। 'মনে কর ভগবানও ওঁর বিরুদ্ধে, আর তখন ওঁর পাশে এসে দাঁড়ানোর যে কী আনন্দ সেটাও কল্পনা করে দেখ।' (১৭ই আগষ্ট ১৮৯৯এর চিঠি)

মিসেস্ বুল স্বামীজির হয়ে সব গোল মিটিয়ে দিতে চান। কিন্তু স্বামীজি যেন একগুঁয়ে ছেলের মত খেপে রয়েছেন, মিসেস্ বুলকে বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি কে? আমি তো গোত্রহীন পথের সন্ন্যাসী···'

নিবেদিতা লেখেন, 'ভারতবর্ষে যখন আসি ব্যক্তিগত ভাবে স্বামীজির উপর আমার সামান্যই নির্ভর ছিল, বলতে গেলে কিছুই ছিল না। আলমোড়ার সেই সঙ্কট সময়টাতে যখন মনে হয়েছিল

---

* এই অধ্যায়ের সমস্ত কথাবার্তার সার সংগ্রহ করা হয়েছে নিবেদিতার পত্রাবলী হতে (৩রা আগষ্ট, ৯ই, ১৮ই, ২৭শে অক্টোবর, ৪ঠা, ১১ই নবেম্বর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৯) মিসেস্ বুলকে লেখা স্বামীজির একখানা চিঠির (১৫ই নবেম্বর ১৮৯৯) কিছুটাও নেওয়া হয়েছে।

উনি বুঝি অবজ্ঞাভরে নিজের জীবন থেকে আমায় ছেঁটে ফেলেছেন—তখনও মনের ধারণার খুব বেশী ইতর-বিশেষ হয়নি। কিন্তু এখন ভালই হক বা মন্দই হক তাঁর জন্যই এ-জীবন ; ভালবাসার ব্যাপারে দিন-দিন ব্যক্তির পূজারী হয়ে উঠছি। এ ভাব কমা দূরে থাক, ক্রমে যেন বেড়েই চলেছে—কোথায় যে শেষ তাও জানি না। ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় তাঁর একটা খামখেয়ালও এখন আমার পক্ষে সর্বস্ব। তাঁর কথা ভাবতেই যেন হৃদয় স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। এমন করে যে ভালবাসতে পেরেছি, এ ভগবানেরই দয়া।' (১৫ই জুলাই ১৮৯৯এর চিঠি)

সম্প্রতি সেই শিকার-কুঠিতে নিবেদিতা আস্তানা নিয়েছেন। ১৮ই অক্টোবর সেখান থেকে লিখলেন, 'এই চিঠির পর দীর্ঘদিন আমার কাছ থেকে স্বামীজির কোনও খবর পাবে না। Kali the Motherটা শেষ করতে হবে, তা ছাড়া আরও কাজ আছে। এদিকে নিঃসঙ্গ হবার জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু সে-পথে আচার্যদেব আমার মস্ত বাধা। অতএব ধীরামাতা আর ওঁকে কৌশলে জানিয়েছি যে সবাইকে যেন বলে দেওয়া হয় আমি এখন দিন পনেরো একলা থাকব…'

বিবেকানন্দের তাতে আপত্তি নাই, বরং উৎসাহই আছে। শেষের সন্ধ্যাটি অপরূপ শান্তিতে কাটল। মেয়েদের সম্বন্ধে লোপেনহাওয়ারের লেখা খানিকটা পড়া হল, তারপর ওঁরা দু'জন ম্যানর থেকে শিকার-কুঠিতে চললেন। আকাশে তারা ঝলমল করছে। নিবেদিতা আর স্বামীজি পাশাপাশি হাঁটছেন। 'ফিস ফিস করে বললাম, এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে পায়ের শব্দটুকুও যেন কানে বাজে। জ্যোৎস্নায় ফিনকি ফুটছে, দু'ধারে গাছের সার, আমরা নিঃশব্দে চলেছি, এতটুকু আওয়াজেও যেন তাল কেটে যাবে। তিনি বললেন, "ও-দেশে জঙ্গলে বাঘ যখন শিকারের পিছু নেয়, তখন যদি থাবা কি লেজের একটু শব্দ হয় তা হলে তাকে কামড়ে রক্ত বার করে ফেলে। বাতাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে ওরা চলে…' একটা চৌমাথার মোড়ে দু'জনে এসে পড়লেন, সামনে অর্ধবৃত্তের আকারে অনেকখানি খোলা জয়গা—স্বামীজি থামলেন। মিষ্টি হেসে বললেন, 'এখান থেকেই তোমার একলা চলা শুরু হ'ক। শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু। সমস্ত কামনা যখন বিশীর্ণ হয় হৃদয়গ্রন্থি বিকীর্ণ হয়, "অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।'

এই মৌনব্রতের সময়টায় নিবেদিতার দারুণ পরীক্ষা চলল। কাজে ডুবে গেলেন, কেমন করে মাকে ডাকেন, ভাবেন—তারই ছবি ফোটাতে ছোট-ছোট অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। কিন্তু লিখতে গিয়ে কথাগুলো আড়ষ্ট-আড়ষ্ট মনে হয়। কেমন-একটা কৃত্রিমতার সুর লেখায়, মনের ভাবটা যেন আবছা হয়ে থাকে। হতাশ হয়ে লেখা ছেড়ে দেন। এই সঙ্কটকালে মা তাঁকে ছেড়ে গেলেন ? স্পর্শভীরু একখানি গানের সুরের মতো কত যে ভাব মনে ওঠে পড়ে, ধরতে গেলেই মিলিয়ে যায়। আর্ত হয়ে নিবেদিতা বলে ওঠেন, কোথায় গেল মনের শান্তি ?

উত্তরে নিজের মনেই ওঠে সান্ত্বনার বাণী, 'আমার খুশিতে এ-দুনিয়ায় এসেছ মনে থাকে না কেন ? যখন আঁধার ঘনিয়ে আসবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, সেই খুশিতেই তোমায় নিয়ে যাব আমার অন্তের গহনে…মনে রেখো, প্রশ্ন আমিই তুলি, জবাবের ইশারাও আমিই দি'…(Kali the Mother, পৃঃ ৮৫, ৮৭)

'সন্তদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যেন চড়ায় ঠেকে গেলাম। আজ রাত্রে রামপ্রসাদের শেষ অধ্যায়ে এসেছি, ওটা শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখব…কিন্তু পারলাম না। কয়েক পাতা বাজে লেখা লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় নকল করতে লাগলাম…

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।'

শ্লোকটি নিবেদিতার কণ্ঠস্থ ছিল, একটা পাতার মাঝখানে ওটি লিখতেই যেন দপ করে চোখের সামনে আলো জ্বলে উঠল। নিবেদিতা নিজের ভুল বুঝলেন। এখনও তিনি প্রার্থী, শক্তি ভিক্ষা করছেন মায়ের কাছে। অথচ মা সব জানেন, সেই মায়ের পায়ে আত্মশক্তি অর্ঘ্য দেবার কথা তাঁর। দুটি দিন কাটল। শ্রান্তিতে নিবেদিতা অবসন্ন। মায়ের সঙ্গে যে আলাপ চলে তার খসড়া রাখেন, 'মা গো, যাঁকে ভালবাসি, তিনি আজ অনেক দূরে, কত দুঃখ তাঁর মনে। আমার হৃদয়ের পানে উন্মুখ হয়ে আছে তাঁর হৃদয়…আমি তাঁর সহায় হব। বলি তো তাঁকে ভালবাসি, কিন্তু তাঁর দুঃখ ঘোচাতে পারি না। কেন এমন হয় ?'

'এই দুর্বার ভালবাসা রুখতে হবে। তোমার মনটি আমার, আমি তার নিয়ন্ত্রী। বিশ্বের আনন্দ-বেদনায় তোমার ভাগ নাই, শুধু সাক্ষীর মত চেয়ে দেখ। তা হলেই আর কিছুতে জড়িয়ে পড়বে না। তবেই শান্তি পাবে।'

'মা গো, আমার শান্তি আমি চাইব কেন ? তাঁকে শান্তি দাও। তাঁর জন্য যেন শান্তি আহরণ করতে পারি, এই বর দাও। কিন্তু তোমার প্রসাদ পেতেও তো তাঁর প্রয়োজনের দাবিকে বা নিঃসঙ্গতার বেদনাকে উপেক্ষা করতে পারব না মা !'

'বোকা মেয়ে ! তার স্নেহের বিনিময়ে তুমি তাকে যে-ভালবাসা দিচ্ছ তার প্রতিটি কণিকা লোহার শিকল হয়ে বাঁধছে তাকে, যন্ত্রণাময় জীবন তার দীর্ঘায়িত করছে। আয় বাছা আমার বুকে আয়…তবেই তাকে তৃপ্তি দিতে পারবি। নিজেকে সরিয়ে নিতে পারিস যদি, তা হলেই শান্তি দিবি তাকে।'

'হার মেনেছি মা ! আমায় তোমার বুকে তুলে নাও। পেছন ফিরে তাকাতে দিও না। চোখের জলে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে আসছে, তবু তুমি যদি ডাক দাও, তোমার বুকে পথ খুঁজে পাব আমি… নিশ্চয়ই পাব…'

'কী বোকা তুই ! আমার করুণা ঘিরে আছে তোকে, পাখীর মত ছোট্ট তোর ডানা দুখানি মিছেই ঝাপটে মরছিস ভীরু ! চোখ মেলে চেয়ে দেখ, হাসি ফুটুক তোর মুখে ! মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল কালো আকাশে। বৈরাগ্যের সাধনা এনেছে জয়শ্রী, আনন্দে উদ্বেল হ'ক তোদের হৃদয়।' (Kali the Mother, পৃঃ ১০১-৪)

পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যায়, অনেকটা রাত হবার পর, স্বামীজি এসে নিবেদিতার ঘরের কড়া নাড়লেন। কি ঘটেছে তা তিনি আন্দাজ করেছিলেন। নিবেদিতা লিখছেন, 'ঘরে ঢুকে আমায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ছিলেন। বলতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ক রকম দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক অবতারই প্রকাণ্ডে

বা গোপনে উপাসনা করেন। "না হলে তাঁরা শক্তি পাবেন কোথায়?" শিব আর কালী তাঁদের আরাধ্য দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতেন, তাঁর ভিতর থেকে লম্বা সাদা একটা সুতো বেরিয়ে আসছে—সুতোটার এক প্রান্তে একটা জ্যোতির পিণ্ড। তারপর এই পিণ্ডটা ফেটে গেল, ঠাকুর দেখলেন তার মধ্যে মা বীণাপাণি। মা বীণা বাজান, আর সেই সুর পশু পাখী জীব-জগতের রূপ ধরে··· থরে-থরে সব গুছিয়ে ওঠে। মা যখন আর বাজান না, সব মিলিয়ে যায়। তারপর আলোটা গুটোতে-গুটোতে আবার জ্যোতির্পিণ্ডে রূপ নেয়, সেই সুতোটা ছোট হতে-হতে তাঁর মধ্যে এসে মিলিয়ে যায়···'

বিদায় নেবার আগে স্বামীজি গম্ভীর কণ্ঠে সতর্কবাণী শুনিয়ে যান, 'এখন বুঝেছ শিব পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি যোগ শিক্ষা দেন, অজ্ঞান ধ্বংস করেন। তাঁকেই সব কর্ম সমর্পণ করতে হবে, নইলে সুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা হতেও কর্মের সৃষ্টি হয়। নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব, জগতের হলাহল পান করেন বলে তিনি নীলকণ্ঠ··· অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই··· জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কী যে কঠিন! বৃদ্ধ বয়সে আত্ম-ত্যাগ করতে আসে যারা তারা নিজেদের মুক্তির পথ সাফ করে বটে; কিন্তু অন্যের গুরু হতে পারে না। যৌবন-মধ্যাহ্নে যে নিজের জীবন ডালি দিতে পারে সেই তো ধন্য ও সেই সদ্‌গুরু।'

দু'দিন পরে নিবেদিতার নির্জনবাসের মেয়াদ শেষ করে দিলেন স্বামীজি। 'যে-শান্তি পেয়েছ তাতেই মহিমময়ী হয়ে ওঠ। এবার কাজের সময় এসেছে। শক্তিস্বরূপিণী মা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন। তাঁকে জাগিয়ে তোল, তাঁকে ডাক, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা মা দশভুজা মূর্তিতে দুর্জয় প্রহরণ ধরে দানব দলন করবেন। তোমায় শক্তি দেবেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা যে পথের শেষে পৌঁছেছেন সে কথা আর স্বামীজি গোপন করলেন না। শ্রোতাদের কল্পনার পাখায় নিয়ে গেলেন হিমাচলবাহিনী গঙ্গার তীরে, সাধুরা সেখানে লতাপাতা দিয়ে যে যার কুঁড়ে বেঁধে থাকেন। তাঁর বর্ণনার গুণে ছবির মত ফুটে ওঠে আঁধার রাত্রি। সমুখে ধুনী জ্বালিয়ে কুশাসনে বসে উপনিষদ আবৃত্তি করছেন মন্দ্রকণ্ঠে। চারদিক শান্ত, সুনিবিড়, সবাই জানেন সত্য কি, সেই সত্য উপলব্ধির জন্যই তাঁদের জীবন। ধীরে-ধীরে গানের সুরে শ্লোকের ঝঙ্কার ওঠে, ক্রমে সব থেমে যায়। দেহ অচল অটল হয়ে যায়···দৃষ্টি অন্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে কি দেখে, কাকে দেখে!

স্বামীজি অপরূপ একটি গান ধরেন, প্রাণের গভীর আকুতি মেশান তাতে, 'সত্ত্বশুদ্ধির সাধনার শেষ নাই···এ বস্তু এত সুকুমার, সদ্য-ফোটা কুমুদের রেশমী পাপড়ির মত, প্রভাতের সদ্য-ঝরা-শিশিরের মত···এ দেওয়া চলে।' নিবেদিতা কেমন যেন শিউরে উঠতেই স্বামীজি থেমে গেলেন। উদ্যত আবেগ ঠোঁটের 'পরেই যেন মিলিয়ে গেল। তারপর কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই বলতে লাগলেন '···ব্রহ্মচর্য আর সত্ত্বশুদ্ধি একই কথা। সত্ত্বশুদ্ধি দিব্যতেজ হয়ে শিরায়-শিরায় আগুন ধরিয়ে দেবে···'

শরৎ শেষ হয়ে এল। রিজলি ম্যানরের অতিথিরা একে-একে চলে যেতে লাগলেন। ভালই হল, পাহাড়ের উপরে উন্মত্ত সাগর যেমন করে আছড়ে পড়ে তেমনি উদ্দাম বেগে স্বামীজির অন্তরে তখন তীব্র রহস্যানুভূতির আলোড়ন চলছিল। কখনও মনে হয় তাঁর সমস্ত প্রয়াস পণ্ডশ্রম হয়েছে, নিদারুণ নৈরাশ্যে তখন ভেঙে পড়েন। একটা কথা তাঁকে পেয়ে বসেছে, তাঁর যা-কিছু আছে সময় থাকতে-থাকতে সব দিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষ তাঁকে ডাকছে। সে-ডাক না শুনে কি তিনি পারেন? কেবল বলেন, 'এ আমি কোথায় রয়েছি? এখানে এখনও কেন আছি? হে রামকৃষ্ণ, তুমি আমায় নাও। তোমার পাদপদ্মই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়···এ-শরীর ভেঙে পড়েছে, কঠিন তপস্যায় এর পতন হ'ক'। দিনে দশ হাজার বার প্রণব জপ করব, হিমালয়ের বুকে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন করে বলব "হর হর ব্যোম ব্যোম!" নামটা বদলে ফেলব, কেউ আমায় চিনতে পারবে না। আবার সন্ন্যাস নেব, লোকালয়ে আর ফিরব না···যে-দিন থেকে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেদিনটাকে শতবার অভিসম্পাত করি।'

রোগের যন্ত্রণায় মুখখানা কেমন শীর্ণ শুকনো হয়ে গেছে। ভাবতে কেমন লাগে, তবুও মুখ দেখলে বোঝা যায় ধ্যান করবার সামর্থ্যও তাঁর যেন নাই। একদিন বললেন, 'স্নেহের দল, আমার সব তোদের জন্য থুইয়েছি। আমার আর কিছুই নাই।' দিন-দিন যেন অস্থির হয়ে উঠছেন। একদিন সকালে প্রাতরাশের পর সবার সামনে নিবেদিতাকে বললেন, 'আর কতদিন এখানে মাটি কামড়ে থাকবে বল দেখি? কবে যাবে, কাজে হাত দেবে কবে?' এই আচমকা আক্রমণে অবাক হলেও শান্ত স্বরে নিবেদিতা উত্তর দেন, 'আপনার স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েই এখানে আছি। যখনই বলবেন তখনই যাব।'

ওলিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি পরশু শিকাগো যাচ্ছি, আপনি সঙ্গে যাবেন?' নিবেদিতা তখনই যাওয়া ঠিক করে ফেললেন দেখে স্বামীজি খুশী হলেন। 'আমার যদি তোমার মত স্বাস্থ্য আর শক্তি থাকত আমি দুনিয়া জয় করতাম! তুমি ক্ষত্রিয়াণী। জান, আমরা এক গোত্রের লোক? তুমি ব্রাহ্মণ নও। কৃচ্ছ্রসাধন তোমার নয়। কাজ কর, লড়ে যাও···আর যে-কোনও অবস্থায় মনে রাখবে তুমি স্বাধীন। তোমায় সব রকম—সব রকম স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। অন্তরের প্রেরণাকে গভীর ভাবে অনুভব কর, তারপর আর-কিছুরই তোয়াক্কা রেখো না। মনে রেখ তুমি শুধু মায়ের দাসী। তিনি যদি তোমায় কিছুই না দেন, কৃতার্থ হয়ে ভেব, তোমায় তিনি কী মুক্তিই দিয়েছেন! আমায় যদি অমনি মুক্তি দিতেন তিনি!'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ঐ দিন স্বামীজিও মিসেস্ বুলের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক যাবেন। এখন বাকী রইল মালপত্র বাঁধাছাঁদা। নিরীহ ভাবে স্বামীজি শুধোন, 'নিবেদিতা, আমার সব গুছিয়ে দেবে? এ-সব কি করে করতে হয় কিছুই যে জানি না।' নিবেদিতা রাজী হন। উনি বইপত্র, কাগজ ইত্যাদি গুছিয়ে তুলছেন, স্বামীজি তার মধ্যে থেকে কতকগুলো স্কার্ফ আলাদা করে রাখলেন। ওগুলো দিয়ে পাগড়ি বাঁধতেন, এখন লেডি বেটির মেয়েদের দিয়ে যাবেন। তারপর গেরুয়া রঙের ঢিলেঢালা দুটি সুতী পোষাক বার করলেন। নিবেদিতাকে ইশারায় ডেকে জানতে চাইলেন মিসেস্ বুল কোথায়। 'বোধ হয় আমার ঘরে, চিঠি লিখছে।' 'এস দেখি'।

নিবেদিতার আগেভাগেই সে-ঘরের দিকে উনি তাড়াতাড়ি পা চালান; নিবেদিতা ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দেন।

মেয়েরা হতবাক্ হয়ে এ ওর দিকে তাকান। স্বামীজির প্রশান্ত মূর্তি আনন্দে ঝলমল করছে, দুটি বাহু প্রসারিত করে বললেন, 'আমার সন্তান তোমরা, আমি এসেছি, এই যে আমি···'

কি যে হতে চলেছে নিবেদিতা তা একটুও আঁচ করতে পারেননি। মিস্ ম্যাকলয়েডকে লেখা একখানা চিঠিতে আগাগোড়া দৃশ্যটি বর্ণনা করে বলছেন, 'সুতী পোষাকটা আলখাল্লা আর উড়ানির মত করে ধীরামাতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন—আজ থেকে তুমি সন্ন্যাসিনী।' তারপর আমাদের দুজনের মাথায় হাত রেখে বলেন, 'পরমহংসদেব আমায় যা-কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা তোমাদের দিলাম—দিলাম নারীকেই। এ নিয়ে যা পার কর। নিজেকে আর বিশ্বাস করি না। কাল যে কি করব ঠিক নাই আমার, হয়তো সব ভণ্ডুল করে দেব। মা নারী, তাঁর কাছ থেকে যে-শক্তির উত্তরাধিকার পেয়েছি নারীরাই তা ধারণ করবার যোগ্য। মা কে বা কি, তা আমি জানি না। তাঁকে দেখিনি কখনও, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেছেন, এমনি করে ছুঁয়েছেন তাঁকে (আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখান)। কে জানে হয়তো তিনি বিদেহিনী মহাশক্তি। যাই হ'ক, আমার বোঝা আজ তোমাদের কাঁধে চাপালাম। আমি শান্তিতে থাকতে চাই। আজই সকালে মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাব। দুপুরের খাওয়ার আগে শুতে গিয়ে কেবলই ভেবেছি। তারপর এই বুদ্ধি মাথায় এল, এত মনটা খুশী হল তাতে! যেন মুক্তি পেয়ে গেলাম। এতদিন যে বোঝা বয়েছি আজ তা নামাতে পারলাম···'

'ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন কি? মনে তো হয়। যত দূর মনে আছে, তখন তিনটার কাছাকাছি কি আর-একটু পরে হবে, দিনের আলো আছে তখনও···আমাদের দুজনেরই তখন তোমার কথা মনে পড়েছে। ম্যুম, এমনি করে একটা অপরূপ কিছু ঘটে গেল জীবনে। সন্ন্যাসিনী সারা আর আমার জীবন পালটে গেল সেই মুহূর্তে।' (১)

---

(১) ১১ই নবেম্বর ১৮৯৯এ লেখা চিঠি। বেলুড় মঠের অধুনা-প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নিবেদিতার এ-সন্ন্যাস আনুষ্ঠানিক নয়। কিন্তু স্বামীজি ইতিপূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি মেয়ে ও দুটি ছেলেকে এই ভাবে সন্ন্যাস দিয়েছেন—অভয়ানন্দ কৃপানন্দ আর যোগানন্দ স্বামীকে। বেলুড় মঠের প্রথম আমলের সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এ-রকম বৈধ অনুষ্ঠানহীন সন্ন্যাস পাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। দু'বছর পরে ভারতে ফিরে নিবেদিতা শুনলেন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ নিয়ে কথা উঠেছে। তিনি ব্রহ্মচারিণী বলে আত্মপরিচয় দেওয়াই স্থির করলেন। তবে দু'-তিন বার জনসভায় তিনি গেরুয়া পরে ভাষণ দিয়েছেন আর জীবনের শেষের দিকে বাড়িতে গেরুয়া পরেই থাকতেন।

গুরুকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এই পরম মুহূর্তে নিবেদিতা নিজের গভীরে অনুভব করছিলেন সর্বব্যাপ্ত সর্বগ্রাসী একটা শক্তির স্পন্দন। মনে হচ্ছিল তাঁর দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত কিছুই নাই। মাথার উপরে সন্ন্যাসীর উষ্ণ স্পর্শ, ভারী হাতখানা হতে যেন শক্তির প্রপাত নামছে। জীবনের চরম ব্রত গ্রহণ করলেন নিবেদিতা তার দায়িত্বের সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েই।

নিবেদিতার চোখের সামনে ছবির মত ফুটে ওঠে—মুক্তাত্মা আর বদ্ধজীব, বাঁধা ডিঙ্গি আর সূর্যালোকে ঝলমল নদীর বুকে চলন্ত নৌকা, বাসনা-জড়িত স্থাণু জীবন আর বিরাটের পায়ে উৎসর্গ-করা স্বাধীন জীবন। এত সত্য এ-অনুভব, সত্তার গভীরে এমনই সহজ। প্রায় জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, 'আমি মুক্ত, এ কি সত্যি? আমি নিত্য-মুক্তই ছিলাম? তাই হবে। শুধু জানতাম না, মুক্তির আনন্দের এই রূপ।'

রিজলী ম্যানর ছাড়বার আগে দুটি প্রিয়-শিষ্যার কাছে বিদায় নিতে হবে। তাদের নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে স্বামীজি কেবলই জপেন, 'শিব, শিব।' ও-নাম লেখা মেঘের গায়ে, ধরার সিক্ত বুকে ঝরা পাতার গায়ে ওই নাম, নদীর আবর্তে ও-নামের উচ্ছলন যেন। বালকের মত নিশ্চিন্ত খুশিতে ভরা মন, হাঁটেন জোরে-জোরে পা ফেলে। বললেন, 'আবার আমি শুকদেব হয়েছি। সেই কোন্ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ আমায় ঐ নাম দিয়েছিলেন, মায়ের পায়ে আমায় সঁপে দেবার আগে। শুক চিরকালের দস্যি ছেলে, জগৎকে দেখে হাসেন কেবল। অথচ তিনি মায়ের ভক্ত। আমিও তাঁর মত মায়ের আনন্দ-কাননে খেলা করে বেড়াচ্ছি···'।

নিবেদিতা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করেন, অন্তরে কিন্তু একটা দারুণ যন্ত্রণা। লেখেন, 'ওঁর অন্তরের কথাটি নিজের কাছে চাপতে গিয়েও চাপতে পারি না। স্বামীজিকে সর্বস্ব দিয়ে তাঁর গুরু দেড় বৎসর মাত্র জগতে ছিলেন, স্বামীজিও আর বেশী দিন থাকবেন না। জীবন তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, শুধু আমাদের জন্য এ-যন্ত্রণা তিনি সয়ে চলুন এ আমিও চাই না! কিন্তু ভাই য়ুম, ঈশ্বরের কাছে তোমার প্রার্থনার কোনও জোর থাকে যদি, তাহলে প্রার্থনা করো এ দিন ক'টা যেন তাঁর হেসে খেলে বিজয়ী বীরের মত কাটে। যে ক'টা দিন আমাদের সঙ্গে আছেন, তার মধ্যে যদি গুটি কয় জয়ের মালা ওঁর পায়ের তলায় দিতে পারতাম, তার জন্য আমি যে হাজারো নরকের আগুনে হাজার বার পুড়ে মরতে রাজী ছিলাম। দেবতার কাছে এ আমার প্রার্থনা নয়, এ আমার দাবি। মায়ের হৃদয় যদি থেকে থাকে পরম পুরুষের, আমাদের এ-প্রার্থনা পূরণ না করে তিনি পারবেন না। তুমিও এ প্রার্থনা করো, করবে না কি? সন্ন্যাসিনী সারা করে, আমি জানি। লড়াইয়ের সবটা ধাক্কা সামলাবার দায় যদি একজনের উপর পড়ে, মস্ত বড় ভাগ্যের কথা—কিন্তু একজন তো নয়, সবাই লড়ব আমরা। যে যেখানে আছি, সেইখান থেকে শুধু তাঁর সেবাই করে যাব···'

যাওয়ার দিন সকালে লেডি বেটির এক বান্ধবী স্বামীজির সঙ্গে আর একবার সাক্ষাতের জন্য ধরে বসলেন। স্বামীজি কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে যেন ছিনিয়ে নিলেন তাঁর হাত থেকে। 'আমার কোনও বাণী নাই। ভাবতাম বুঝি আছে, এখন জেনেছি আমার দুনিয়াকে দেবার কিছুই নাই। "আপনাতে মন আপনি থাক"। স্বপ্নের ঘোর আমাকে ভাঙতেই হবে।'

বিনাওয়াটার ষ্টেশনে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হল। শেষ মুহূর্তেও স্বামীজি নিবেদিতার ভ্রমণ-পর্বের সব খুঁটি-নাটির খবর নিলেন। কিছু ভুলে যাওনি তো? পরবার মত কিছু নিয়েছ? কম্বল? রাস্তার জন্য গরম শরবত? আর কি করতে পারি তোমার জন্য?' বিদায় কালে বললেন, 'কোনও কাজ আরম্ভ করবার আগে বা কোথাও যেতে হলে সব সময় "দুর্গা" "দুর্গা" বলবে মার্গট। তা হলে সব বিপদ কেটে যাবে।' বলে হাত জোড় করে নিজেই বলেন, 'দুর্গা দুর্গা!'

এই শেষ কথাটিতে এমন কিছু ছিল যা একান্তই মানুষের প্রতি মানুষের দরদ—ওতে মন দুলে ওঠে। এ যেন পিতার হৃদয়-উজাড় করা সন্তান-বাৎসল্য।

স্বামীজির মাঝে গুরু আর নাই, তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেছেন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

যুবতীদের অলঙ্কার বর্ণনা

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সিঁথি অতি শোভাকর।
কানবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে।
মনোহর মুক্তালচ্ছা তাহাতে দিয়েছে।
মুক্তায় মুণ্ডিত নত নাসায় দুলিছে।
মঞ্জনে মার্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে।
মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি।
হীরা-পান্না ধুকধুকি আছে শোভা করি।

বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও।
পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও।
ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে।
নবরত্ন অঙ্গুরীয় শোভা করে তাতে।
হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত।
কটিতে কনক চন্দ্রহার মনোনীত।
চাবিশিক্লি তাহে পুন দিয়াছে ঝুলায়ে।
পদাঙ্গুলে আছে চুটকি ছাল্লাতে মিশায়ে।

সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়।

—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাং ১১৯৪-১২৫৪)

নবীনচন্দ্র বসু

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় রঙ্গালয়ের প্রথম পর্ব্বে পণ্ডিত রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটকে কুলাচার্য্য সাজিতেন। তখন তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর। বাঙ্গালার রঙ্গালয় যত দিন সখের ছিল, তত দিন তিনি তাহার সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের সপ্তম পর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সান্ন্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারি থিয়েটার খুলিলেন। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত। আমরা relire করিলাম।"

১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত "পুরাতন প্রসঙ্গে" তাঁহার উক্তি :—

"আমাদের সেই 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে একটি বার শ্যামবাজারে থিয়েটার হইয়াছিল। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একজন ধনকুবের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন।"

এই "ধনকুবের"—নবীনচন্দ্র বসু। ইনি দাওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপালের ষষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে বৃন্দাবনে বসু পরিবারের "কুঞ্জে" (কালাবাবুর কুঞ্জ) তিনি পরলোকগত হ'ন। যখন কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পরে সপ্তাহ কাল মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপালের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্র অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি বাঙ্গালায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল হ'ন এবং 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তিনিই বাঙ্গালায় রঙ্গালয় প্রবর্ত্তনের গৌরবের অধিকারী।

দাওয়ান কৃষ্ণরামের পৈত্রিক বাস হুগলী জিলায় তাড়া গ্রামে। পারিবারিক কারণে তাঁহার পিতা কলিকাতার পথে কিছু দিন বালী গ্রামে অবস্থিতি করিয়া পরে কলিকাতায় আসেন। কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন বাঙ্গালী বিশ্বাস করিত—"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ।" কিন্তু তখনই চাকরী তাহাকে আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "লুঠের আমলে" চাকরীতে বহু অর্থার্জ্জনের উপায় ছিল। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জনের পরে কৃষ্ণরাম মাসিক ২ হাজার টাকা বেতনে হুগলীতে কোম্পানীর দাওয়ান নিযুক্ত হ'ন এবং কয় বৎসর চাকরী করিয়া কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজার পল্লীতে বাস করিয়া নানা স্থানে ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে থাকেন। মাহেশে জগন্নাথের মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তথায় রথযাত্রা প্রবর্ত্তিত করেন।

নবীনচন্দ্রের বাঙ্গালা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় চেষ্টার উদ্ভব কিসে, তাহা জানা যায় না। তবে তখন কলিকাতায় ইংরেজ অধিবাসীরা যে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাটকাভিনয় করিতেন, তাহা হইতেই হয়ত তিনি বাঙ্গালা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ সময়ে তিনি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হ'ন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্যামবাজারস্থ গৃহে চারি বা পাঁচখানি নাটক অভিনীত হয়। ঐ বৎসরই তথায় বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়। অন্যান্য নাটকের বিষয় অবগত হওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পূর্ব্বে যে সকল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সে সকল তত প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্যতা লাভ করে নাই।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় যে তৎকালীন সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা রামবাগানের দত্ত পরিবার বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পরিবারের কুমারী তরু দত্ত অল্প বয়সে ইংরেজী গদ্যপদ্যে যে সকল রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পরিবারের কয় জনের কবিতা ইংলণ্ডে 'The Dutt Family Album' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পরিবারের শশীচন্দ্র দত্তের ইংরেজী পুস্তকগুলি দশ খণ্ডে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র দত্তও এই পরিবারের। অনেকে আজ ভুলিয়া গিয়াছেন, এই পরিবারের গোবিন্দ দত্তের সাহায্যে অধ্যাপক কাওয়েল কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ইংরেজী অনুবাদ (পদ্যে) আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দত্ত পরিবারের রসময় দত্তের পুত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখ হইতে পাক্ষিক সংবাদপত্র 'হিন্দু পাইওনিয়ার' প্রকাশ করেন। তাহাতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল (২২শে অক্টোবর, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ) এবং তাহাই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'এশিয়াটিক জার্ণাল' পত্রের—"এশিয়াটিক ইন্‌টেলিজেন্স সেক্‌সানে"—অর্থাৎ এশিয়ার সংবাদ বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্র যে শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—

(১) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর 'ইংলিশম্যান' মন্তব্য করেন—

"হিন্দু পাইওনিয়ার' নামক নূতন পাক্ষিক পত্রের প্রথম সংখ্যা যখন সম্পাদকের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছিলাম, তখন অনভিপ্রেত ভাবে আমরা তাহার উল্লেখ করি নাই।"

(২) 'ক্যালকাটা মন্থলী জার্ণালের' মন্তব্য—

"দেখিতে 'লিটারেরী গেজেটের' মত 'হিন্দু পাইওনিয়ার' নামক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যা ২১শে আগষ্ট প্রকাশিত হয় এবং মোটের উপর ইহার জন্য লেখকদিগকে ও সম্পাদককে প্রশংসা করিতে হয়।"

'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রে "ভারতীয় থিয়েটার" শিরোনামায় লিখিত হয় :—

"প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর পৃষ্ঠপোষিত। ইহা শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠাতার গৃহে অবস্থিত। ইহাতে বৎসরে চারি বা পাঁচখানি নাটক অভিনীত হয়। এই সকল নাটক—ইংরেজী প্রথার অনুকরণে, হিন্দুদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের মাতৃভাষায় অভিনীত হয়। আমাদিগের

আনন্দের কারণ, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন—স্ত্রীলোকের অংশ প্রায় সবই হিন্দু স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হয়। ইহাতে ভারতের উন্নতিকামী সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা।

"গত পূর্ণিমার দিন আমরা এক দিন সন্ধ্যায় একখানি নাটকের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম। আমরা স্বীকার করিব যে, অভিনয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। হিন্দু, মুসলমান কয় জন য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী—মোট সহস্রাধিক দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল এবং সকলেই আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। রাত্রি ১২টার কিছু পূর্ব্বে অভিনয় আরম্ভ হয় ও পরদিন প্রাতে সাড়ে ৬টা পর্য্যন্ত চলে। আমরা অভিনয়ের আরম্ভ হইতে—কেবল শেষ দুইটি দৃশ্য ব্যতীত সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলাম। নাটকের বিষয় বিদ্যাসুন্দর। ইহা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে বেদনার ও হাস্যরসের সমাবেশ আছে। যাঁহাদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁহারাই রচনার বিষয়বস্তু অবগত আছেন। তথাপি আমাদিগের ইংরেজ পাঠকদিগের জন্য আমরা বলি—ইহা কতকটা সেক্সপীয়রের "রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট" নাটকের মত।

"প্রথমে ঐক্যতান বাদন হয়; তাহা সুমধুর। সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় বহু প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাদকরা সকলেই হিন্দু—প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। বাবু ব্রজনাথ গোস্বামীর বেহালাবাদন প্রশংসনীয়; কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তী শ্রোতৃগণের নিকট হইতে বার বার প্রশংসাব্যঞ্জক ধ্বনি লাভ করিলেও সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী বাদ্য সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পায়েন নাই। হিন্দু প্রথানুসারে যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাগীত গীত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে সূত্রধার কর্ত্তৃক দৃশ্যের বিষয় বিবৃত হয়। দৃশ্যপটগুলির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ—চিত্র, মেঘ, জল এ সকল যথাযথ ভাবে দেখান হয় নাই। সে সকলে রুচির ত্রুটিও লক্ষিত হইয়াছিল—একটির উপর একটি রক্ষিত হইয়াছিল—সুস্পষ্ট হয় নাই। যদিও দৃশ্যপটগুলি দেশীয় চিত্রকরদিগের দ্বারা চিত্রিত, তথাপি যাঁহারা সযত্নে চিত্র করেন (অর্থাৎ যোগ্য) তাঁহাদিগের দ্বারা এগুলি চিত্রিত হইলে ভাল হইত। তবে রাজা বীরসিংহের গৃহ ও তাঁহার কন্যার (বিদ্যা) কক্ষ মন্দ হয় নাই।

"নায়ক সুন্দরের অংশ বরাহনগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তরুণের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। তিনি প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অংশের অভিনয় উপযুক্ত ভাবে করিতে পারেন নাই। ঐ চরিত্রের অভিনয়ে নটপ্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ আছে; কারণ, ইহাতে নির্ব্বাক্‌ভাবে বার বার ভাব পরিবর্ত্তনের সুযোগ যেমন পাওয়া যায়, তেমনই নায়িকার পিতা যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রেম ধরিতে না পারেন, সে জন্য কৌশলও অবলম্বন করা হইয়াছে। তরুণ শ্যামাচরণ সময়-সময় তাঁহার ভাব প্রকাশের জন্য বৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও কাজ স্বাভাবিকতাদ্যোতক হয় নাই। রাজার ও অন্যান্য লোকের অভিনয়ে দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ নারীদিগের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের দুহিতা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার অংশ ষোড়শী রাধামণি (মণি নামে সচরাচর পরিচিত) অভিনয় করিয়াছিল। তাহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে হইয়াছিল। তাহার লাবণ্যময় অঙ্গসঞ্চালন,

শ্রীনবিনচন্দ্র সং।

মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং সুন্দরের সহিত তাহার প্রেমচাতুরী দর্শকদিগকে পরিতুষ্ট ও আনন্দিত করিয়াছিল। সে যতক্ষণ রঙ্গমঞ্চে ছিল, তাহার মধ্যে কখনও কোন ত্রুটি দেখায় নাই। আনন্দের সময় ও বিলাপকালে তাহার মুখভাবের ত্বরিৎ পরিবর্ত্তন, সুন্দর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ বাণী ও বিষাদপূর্ণ ভাব প্রকৃত অবস্থাব্যঞ্জক হইয়াছিল। সুন্দর ধৃত হইয়া তাহার পিতৃসকাশে নীত হইতেছে সেই সংবাদে তাহার ভাব তাহার ও রঙ্গালয়ের লোকদিগের পক্ষে প্রশংসনীয়। যখন সে সুন্দরের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ শ্রবণ করে, তখন তাহার সখীদিগের তাহাকে সান্ত্বনা দানের সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হয় এবং সখীদিগের শুশ্রূষায় জ্ঞান লাভ করিলে আবার মূর্চ্ছাভিভূতা হয়। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাহার মত অশিক্ষিতা ও বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ একজন তরুণী যে ঐরূপ দুষ্কর অংশ সন্তোষজনক ভাবে অভিনয় করিতে পারিবে এবং পুনঃ পুনঃ দর্শকদিগের প্রশংসা পাইবে—ইহা আশা করা যায় না। অন্যান্য স্ত্রীর অংশের অভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে আমরা রাজা বীরসিংহের রাণীর ও মালিনীর অংশ যাহারা অভিনয় করিয়াছিল, তাহাদিগের উল্লেখ না করিয়া পারি না। এই দুইটি চরিত্রই প্রৌঢ়া জয়দুর্গার দ্বারা

অভিনীত হইয়াছিল—উভয় চরিত্রেরই অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। সে অন্য সকলের মধ্যে তাহার অভিনয়ের ও মধুর সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল। রাজু নামে পরিচিত রাজকুমারী যে দাসীর অংশ অভিনয় করিয়াছিল তাহা জয়দুর্গার অভিনয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট না হইলেও সমান। অজ্ঞতার মধ্যে যে এইরূপ দৃষ্টান্ত লাভ করা যাইতেছে, ইহা আমরা বিশেষ আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি—কারণ, ইহা আশাতীত।"

'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রের নিরপেক্ষ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি—'ইংলিশম্যান' তখন কলিকাতায় ইংরেজ সমাজের মুখপত্র। এই পত্রে 'হিন্দু পাইওনিয়ারের' সমালোচনার এই বলিয়া নিন্দা করা হয় যে, ইহাতে অভিনেত্রী বারাঙ্গনাদিগের প্রশংসা করা হইয়াছে। তখন কলিকাতার ইংরেজরা একাধিক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ সেই সকল হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সে সকল রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনাদিগের দ্বারা অভিনয় হইত না। কিন্তু ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে তখন ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করান সম্ভব ছিল না। ইংলণ্ডেও সেক্সপীয়রের সময়ে যে নারীর অংশ পুরুষের দ্বারা অভিনীত হইত, তাহা 'হ্যামলেট' নাটক পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের রাজা। সেই সময়ই সার উইলিয়াম ডেভিনান্টের দ্বারা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আবার বহু দিন পরে বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে সম্ভব হইয়াছিল—নানা আপত্তির ও নানা বাধার পরে।

নবীনচন্দ্রের বাঙ্গালা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ আমরা কৈলাসচন্দ্র দত্তের আলোচনায় পাই, তাহাতে লক্ষ্য করিবার—

(১) তখনও দৃশ্যপটের প্রশংসনীয় উন্নতি হয় নাই। চিত্রপটগুলি বাঙ্গালী চিত্রকরদিগের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। বহু দিন পরে যখন মতিলাল শীলের বংশধর গোপাললাল শীল "ষ্টার থিয়েটার" ক্রয় করিয়া "এমারেল্ড থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনি বহু ব্যয়ে ইটালীয়ান চিত্রকর গিলার্ডির দ্বারা যবনিকা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। নবীন বাবুর ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখান হইত।

(২) তখনই বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে ঐক্যতান বাদনের প্রথা প্রচলিত হয়।

(৩) বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে তখনই প্রথম নারীর অংশ নারী কর্তৃক অভিনীত হয়।

(৪) পুরুষদিগের তুলনায় অভিনেত্রীরা অধিক অভিনয়নৈপুণ্য দেখাইয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; অথচ অভিনেত্রীরা অশিক্ষিতা—বাঙ্গালা ভাষার সহিতও সুপরিচিতা নহেন।

ইংরেজদিগের রঙ্গমঞ্চের তুলনায় সমালোচনা করিয়া লেখক—বাঙ্গালা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা উন্নতিদ্যোতক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং নারীর অংশ অভিনেত্রীদিগের দ্বারা অভিনীত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরেজীতে সুশিক্ষিত সমালোচক মহাশয়ের সমালোচনায় সে সময়ের শিক্ষিত সমাজের এক শ্রেণীর মনোভাব সপ্রকাশ।

নবীনচন্দ্রের জীবনকথা আজ আর বিস্তৃতভাবে জানিবার উপায় নাই। কাহাদিগের সাহায্য লইয়া তিনি রঙ্গালয়ে অভিনয়ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কাহারা নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কে বা কাহারা সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতে সুরসংযোগ করিয়াছিলেন, কিরূপে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল, কাহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ সব জানা যায় না।

পুরোহিত-নিয়োগ পত্র
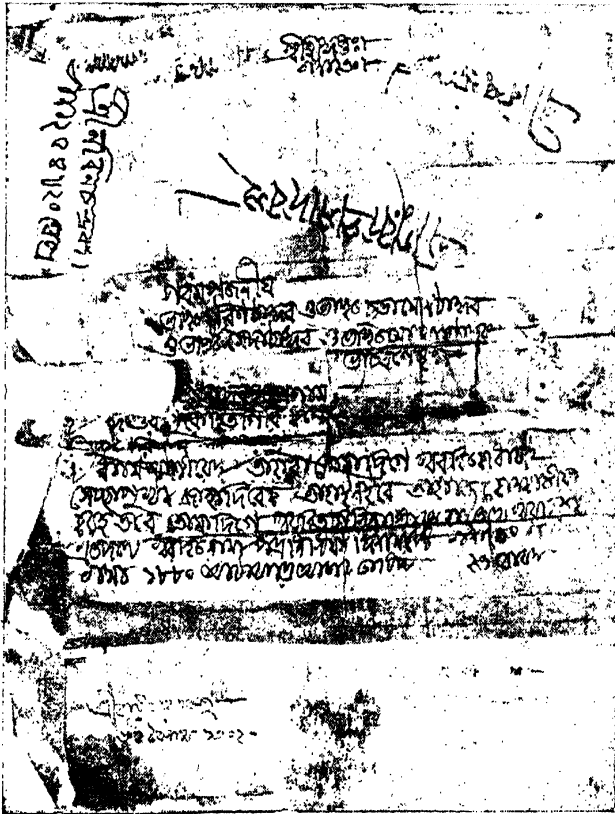
জানিতে না পারার অন্যতম কারণ, কিছু দিন পরে নবীনচন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার পরিবারের কুঞ্জে যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং তথায় তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

বৃন্দাবনে এই কুঞ্জ কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃষ্ণরামের কি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদের—সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কৃষ্ণরামের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই নবীনচন্দ্রের পিতা—কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপালের মৃত্যু হয়। ১২৩০ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ তারিখে বৃন্দাবনে পুরোহিত নিয়োগপত্রে বংশের অনেকেরই স্বাক্ষর আছে—নবীনচন্দ্রেরও আছে। তাহাতে কৃষ্ণরামের বা মদনমোহনের স্বাক্ষর নাই—গুরুপ্রসাদ বসুর স্বাক্ষর আছে।

লোকনাথ ঘোষ যখন এ দেশের সামন্ত, নৃপতি, জমীদার প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন—"The Modern History of the Indian Cheifs, Rajas, Zamindars etc."—তখন তিনি তাহাতে কৃষ্ণরাম বসুর ও তাঁহার বংশীয়দিগের নাতিবিস্তৃত বিবরণ লিখেন। তাহাতে কৃষ্ণরামের প্রথম পুত্র মদনগোপালের বংশধরদিগের বিষয় উপেক্ষিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—

"The descendants of Madan Gopal Bose, though numerous, are now scattered over different parts of Bengal, and not wellknown to us."

অথচ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অন্ততঃ নবীনচন্দ্রের দান স্মরণীয়। গ্রন্থকার কেন যে তাঁহার বিষয়ও লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়!

বৃন্দাবনে কুঞ্জ যদি কৃষ্ণরামের প্রতিষ্ঠিত না হইত, তবে নবীনচন্দ্র তাহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতেন কি না, সন্দেহ। 'বৃন্দাবনের কুঞ্জ ব্যতীত বসু পরিবার শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে যে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিয়োগপত্র এখন জীর্ণ ও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়াছে। কে পুরোহিত নিয়োগ করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। ঐ নিয়োগপত্রের পাঠোদ্ধার যথাসম্ভব করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :— শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

সন ১২৩০

পরম পুজনীয়,

শ্রীযুত পুরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত চূড়ামোন ঠাকুর ও শ্রীযুত সেদা ঠাকুর ও শ্রীযুত মোক্ষদা ঠাকুর। শ্রীচরণেষু :।—
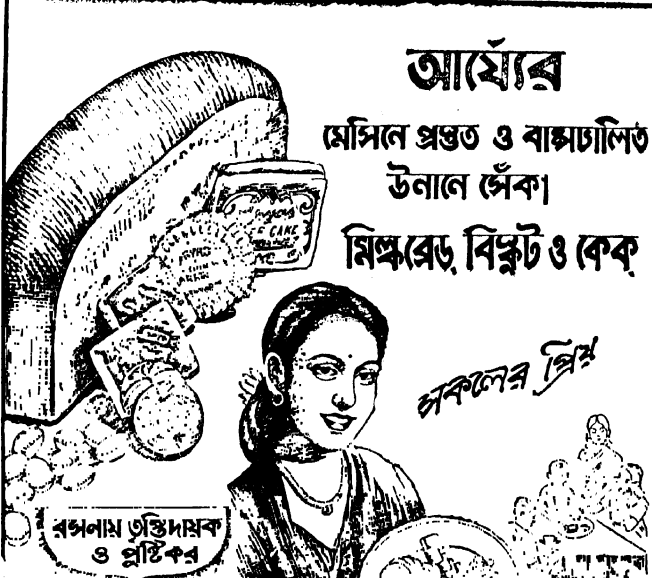
······প্রসাদ বহব প্রণাম

৺কুণ্ডের পুরোহিতগিরি কর্ম্মে তোমাদিগে···নিয়োগ করিলাম।·········

৺ধামে আসিবেন—তাঁহারা তোমাদিগে পুরোহিত করিবে সেচ্ছা পুর্ব্বক জাহা দিবে তাহাই লইবে তাহাতে কোন কাজিয়া করহ তবে তোমাদিগে পুরহিতগিরি রাখিবেক নাই অন্ন পুঁরহিত করিবে।

এতদর্থে পুরহিতনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩০··· সক ১৮৮০ আঠার শত আশী তারিখ—২৩ শ্রাবণ।

বৃন্দাবনের কুঞ্জও হয়ত সেই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। পুলিনবিহারী দত্ত তাঁহার "বৃন্দাবন-কথা" পুস্তকে ইহার প্রতিষ্ঠা-কালের উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বে যে পুরোহিত নিয়োগপত্রের

উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে নবীনচন্দ্রের স্বাক্ষর দেখা যায়—(১২৫৪ বঙ্গাব্দ ২০শে শ্রাবণ)।

নবীনচন্দ্র কিরূপ বিলাসী ছিলেন, তাহা তাঁহার লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় করানতেই বুঝিতে পারা যায়। শুনা যায়, তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণ ৪ ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতায় রাস্তায় বাহির হইতেন; সেজন্য অর্থদণ্ড দিতেন, তবুও অনুমতি গ্রহণ করিতেন না।

নবীনচন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনরব, অমিতব্যয়ী নবীনচন্দ্র তৎকাল-প্রচলিত "প্রেমারা" জুয়া খেলিয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বৃন্দাবনবাসী হয়েন। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

এক সময়ে বাঙ্গালায় "প্রেমারা" জুয়াখেলা অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে—যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ কলিকাতায় আসিলে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে পরিবারের মহিলাদিগকে দিয়া সম্বর্দ্ধনা করাইলে হেমচন্দ্র যে "বাজিমাৎ" লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ খেলার বিষয় দেখা যায়:—

"বেঁচে থাকো মুখুর্য্যে পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোব্রোরে শালুক ফোটে।
'ফ্রিক্রে' দানে, এক 'তাড়াতে' কল্লে বাজি মাৎ।
'মাছ' 'কাতুরে' 'ডেকো' হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।"

১২৮১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' "জাল প্রতাপচাঁদ" প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন:—

"(বর্দ্ধমানের) তেজচন্দ্র বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাইতেন। শালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া 'প্রেমারা' খেলিতেন। এক দিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে 'মাছ' জুটিল, তখন, রাধামোহন বাবুর হাতে 'কাতুর' ছিল। দুই প্রধান 'দান'; সুতরাং দুই জনেই 'ডাকাডাকি' চলিল। ক্রমে দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত 'ডাক' উঠিল। রাধামোহন বাবু দেড় লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ 'মাছ' দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।"

এই খেলায় অসাধারণ উত্তেজনা ছিল। সঞ্জীব বাবু লিখিয়াছিলেন—"প্রেমারা খেলায় উন্মত্ত করে, দিন রাত্রি কখন আসে, কখন যায়, তাহা খেলোয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রেমারা খেলা নাই, তাই এখনকার লোক মদ খায়। এ কালে মদে যে অভাব পূর্ণ হয়, সে কালে প্রেমারায় সেই অভাব পূর্ণ হইত।"

তখন এই খেলার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল।

সুতরাং প্রেমারা খেলিয়া বহু অর্থনাশের ফলে নবীনচন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন অসম্ভব বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে—এক জন শোভাবাজার জমীদার পরিবারে বিবাহিতা; অপরের স্বামী—রাজেন্দ্রনাথ সেন। এই সময় বহু অর্থনাশে নবীনচন্দ্রের মনে সংসারের অনিত্যতা প্রতিভাত হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তিনি বৃন্দাবনে পরিবারের "কুঞ্জে" যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া কতকটা অতর্কিত ভাবেই কলিকাতা ত্যাগ করেন—সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট ছিল, সে সম্বন্ধেও কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। সঙ্গে "লক্ষ্মীনারায়ণ" শিলা আর পুত্র শ্রীনারায়ণ সপরিবারে। শ্রীনারায়ণের জন্ম ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে—মৃত্যু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীনারায়ণ ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত আগ্রায় যাইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন। তথায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত নবীনচন্দ্র "লক্ষ্মীনারায়ণ" শিলা ও পৌত্র ৫ জনকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কুলদেবতা ও পৌত্রদিগকে কন্যা-জামাতাকে (রাজেন্দ্রনাথ সেন) দিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। তিনি আর কলিকাতায় আসেন নাই: পঞ্চদশ বর্ষ কাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া তথায় দেহরক্ষা করেন।

বৃন্দাবনে তিনি কি ভাবে কালযাপন করিতেন, তাহাও জানা যায় না। বৃন্দাবনেই রাধাকান্ত দেব ও কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ("লালাবাবু") দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নবীনচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। রাধাকান্ত—নবকৃষ্ণের ও কৃষ্ণচন্দ্র দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র; নবীনচন্দ্র দাওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র। রাধাকান্ত যশ-সমুজ্জ্বল জীবনের অপরাহ্নে সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় কাল অতিবাহিত করিবার জন্য বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ ভোগসুখের মধ্যে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র ভোগের মধ্যে বিলাসকেন্দ্র ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। এক এক জন—এক এক দিকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের পৌত্রদিগের মধ্যে হরিনারায়ণ চিত্রবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন এবং সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগ যেমন অতর্কিত—শ্রীনারায়ণের আগ্রায় মৃত্যু তেমনই অপ্রত্যাশিত। শ্রীনারায়ণের পুত্রগণ পিতার বা পিতামহের কোন কাগজ পায়েন নাই। এদিকে গুরুপ্রসাদের বংশীয়গণও যে মদনগোপালের বংশধরদিগের সম্বন্ধে সংবাদ সংরক্ষণে অবহিত হয়েন নাই, তাহা লোকনাথ ঘোষের সঙ্কলিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সে বিবরণ তিনি নিশ্চয়ই গুরুপ্রসাদের বংশধর-দিগের নিকট পাইয়াছিলেন। মাহেশে রথ ও মন্দির প্রভৃতির সকল ভারই গুরুপ্রসাদের বংশধরগণ গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সে সকলে কোনরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবহিত হয়েন নাই।

বাঙ্গলায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা নবীনচন্দ্রের বিরাট কীর্ত্তি। বাঙ্গালী দিকে দিকে তাহার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। যে সকল প্রতিভাবান বাঙ্গালী স্রষ্টার গৌরব লাভ করিতে পারেন, নবীনচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। *

---

* নবীনচন্দ্রের অন্যতম প্রপৌত্র শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসু প্রপিতামহের বিলুপ্তপ্রায় তৈলচিত্র হইতে তাঁহার প্রতিকৃতি উদ্ধার করিয়া এবং শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে বংশের পুরোহিত-নিয়োগপত্রের ফটোগ্রাফ আনিয়া আমাদিগকে এই প্রবন্ধ রচনায় যে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।—লেখক

ডি. এচ. লরেন্স

সান্ত্বনা পেলেন মিসেস মোরেল, ছেলের মা হবার সান্ত্বনা। তাঁর হৃদয় দুলে দুলে উঠতে লাগল।। ছেলের দিকে চেয়ে দেখলেন—নীল দুটি চোখ, একরাশ সুন্দর চুল, আর দিব্যি মোটাসোটা। সব কিছু ভুলে গিয়ে তিনি এই নবাগত শিশুটিকে ভালবেসে ফেললেন। মনে মনে অনুভব করতে লাগলেন অনুরাগের উষ্ণতা। নিজের পাশে এনে শোয়ালেন তাকে, নিজের শয্যায়।

মোরেল ক্লান্ত পায়ে বাগানের পথ ধরে উঠে আসছিল। বিশেষ কিছু ভাবনা তার ছিল না, কিন্তু মনটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। ছাতাটা বন্ধ করে সেটাকে নর্দমার পাশে রাখলে, তার পর ভারী বুট-জোড়া টেনে টেনে এসে হাজির হ'ল রান্নাঘরে। ভিতরের বারান্দায় মিসেস বাওয়ারকে দেখা গেল।

'এই যে'। মিসেস বাওয়ার বললে, 'গিন্নীর শরীর তো বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছে। একটি ছেলে হয়েছে।'

মোরেল একটি অস্ফুট শব্দ করলে। খালি ব্যাগ আর টিনের বোতলটা রান্নাঘরের টেবিলের উপর রেখে সে পাশের ঘরে গিয়ে কোটটা খুলে রাখলে। তার পর আবার এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। বললে, 'বলি তোমাদের কাছে কিছু পানীয় পাওয়া যাবে কি ?'

মিসেস বাওয়ার ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে শোনা গেল একটা বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ। একটা পাত্রে 'বীয়ার' ভরতি করে এনে সে যেন একটু অপ্রসন্নভাবে টেবিলটার উপর রাখলে। মোরেল এক ঢোকে সেটা খেয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিলে, তার পর তার পশমী আলোয়ান দিয়ে বড় গোঁফ-জোড়া মুছলে একবার—আবার একটু মদ খেয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে লম্বা হয়ে চেয়ারের উপর শুয়ে পড়ল। তার কাছে কিছু বলা নিরর্থক বলেই মিসেস বাওয়ার আর কোন কথাই তাকে বললে না। টেবিলের উপর তার রাত্রির খাবার সাজিয়ে রেখে সে উঠে গেল উপরে, মিসেস মোরেল যেখানে শুয়ে ছিলেন সেইখানে।

'কে ? তোমার মনিব না ?' মিসেস মোরেল প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ওঁর খাবার যথাস্থানে রেখে এসেছি।' জবাব পেলেন মিসেস বাওয়ারের কাছ থেকে।

এদিকে মোরেল উঠে বসল। টেবিলের উপর হাত দুটি রেখে সে খাওয়া শুরু করলে। মনে মনে বিরক্ত হ'ল সে—কেন মিসেস বাওয়ার টেবিলের উপর কাপড় বিছিয়ে রেখে যায়নি, কেন সে ছোট একটা প্লেটে খাবার রেখে গেছে ? অন্য সব চিন্তা—আর স্ত্রীর অসুস্থতার কথা, কিম্বা তার যে আর একটি ছেলে হয়েছে সে কথা—এখন সে সব তার কাছে বাহুল্য মাত্র। বড় ক্লান্ত সে, রাত্রের খাবারটা ঠিক মত পেলেই সে বেঁচে যায়। টেবিলের উপর হাত দুটি ছড়িয়ে বেশ আরাম করে খাওয়া যাবে—মিসেস বাওয়ার এদিকে নেই, তা' ভালোই বলতে হবে। আর ঘরে যে আগুনটা জ্বলছে, তা' মোটেই জোরালো নয়, এতেও সে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারল না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সে আরো কুড়ি মিনিট চুপচাপ বসে রইল। তার পর উঠে গিয়ে একটা বড় আগুন জ্বালিয়ে তুললে। এবার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে উপরে উঠে যেতে হ'ল। শুধু মোজা পায়েই সে উপরে উঠে গেল। আজ এই মুহূর্তে দেহ আর মনের এই ক্লান্তি নিয়ে, স্ত্রীর মুখোমুখি হওয়া তার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। তার মুখ ঝুলমাখা, ঘামে-ভেজা। পরনের জামা একবার ভিজে আবার গায়েই শুকিয়েছে, সারা দিনের ময়লা জমেছে ওর মধ্যে। পশমের যে গলাবন্ধটা গলায় জড়ানো সেটাও কালি-মাখা। এই অবস্থায় স্ত্রীর বিছানার কাছে, তাঁর পায়ের দিকে গিয়ে সে দাঁড়াল।

—'কি গো, কেমন আছ ?'

—'ভালো হয়ে যাব।' স্ত্রী উত্তর দিলেন।

—'হুঁ।'

এর পর আর কি বলবে সে ভেবে পেল না। ক্লান্তিতে তার দেহ যেন ভেঙে পড়েছে, এখন এই ঝঞ্ঝাট কার ভালো লাগে ! কি সে বলছে তাও যেন সে বুঝতে পারছে না। শুধু আমতা আমতা করে বললে, 'ওরা বলছিল, ছেলে।'

মিসেস মোরেল চাদরটা একটু উঠিয়ে নিয়ে ছেলেটিকে দেখালেন।

মোরেল অস্ফুট শব্দ করলে, 'ঈশ্বরের দয়া।'

শুনে মিসেস মোরেলের হাসি পেল। মোরেল যেন মুখস্থের মত কথাটাকে আবৃত্তি ক'রে গেল, এ শুধু তার পিতৃস্নেহের ভাণ—এই মুহূর্তে তার অন্তরে যে এক ফোঁটাও স্নেহ সঞ্চিত হয়ে ওঠেনি, সে কথা টের পেতে মিসেস মোরেলের দেরি হ'ল না। তিনি বললেন, 'হয়েছে, এখন শোও গে।'

মোরেল যেন বাঁচল। বললে, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

যেত যেতে অবশ্য তার ইচ্ছে হ'ল স্ত্রীর গালে একটি চুমু দিয়ে যায় কিন্তু সাহসে তা' কুলিয়ে উঠল না। মিসেস মোরেলের মনেও অস্পষ্ট ইচ্ছে জাগছিল একটি চুম্বন পাবার জন্যে, কিন্তু বাইরের হাবভাবে সে ইচ্ছে প্রকাশ হতে দেননি তিনি। স্বামী যখন বাইরে চলে গেল, পিছনে রেখে গেল খনির ময়লার ভ্যাপসা দুর্গন্ধ

মিসেস মোরেল এতক্ষণ প্রাণ খুলে নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলেন না যেন। স্বামী চলে যাবার পর তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

গির্জ্জের যাজক ভদ্রলোক রোজই মিসেস মোরেলকে দেখতে আসতেন। মিঃ হীটনের বয়স কম, অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থার লোক তিনি। তাঁর স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম হবার সময়েই মারা গেছেন, কাজেই গির্জ্জের পাশে তাঁর বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু অত্যন্ত মুখচোরা ধরণের লোক—লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। মিসেস মোরেলের ভাল লাগত লোকটিকে, আর তিনিও মিসেস মোরেলের উপর নির্ভর করে স্বস্তি বোধ করতেন। যখন মিসেস মোরেলের শরীর সুস্থ ছিল, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনে গল্প করেছেন। তিনিই নতুন ছেলেটির 'ধর্ম্মপিতা' হলেন।

কোন কোন দিন চা খাবার সময় পর্য্যন্ত তিনি মিসেস মোরেলের বাড়িতেই থাকতেন। সেদিন মিসেস মোরেল একটু তাড়াতাড়িই টেবিলের চাদরটা বিছিয়ে দিতেন টেবিলে, সবুজ ধারওয়ালা ভালো কাপগুলো বের করে দিতেন এবং মনে মনে আশা করতেন, যেন মোরেল আজ শীগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে না আসে। এমন কি, মোরেল যদি আজ এক পাঁইট মদ খাবার জন্যেও বাইরে থাকে তা'হলেও অন্তত: আজকের দিনে কিছুই তাঁর মনে হবে না, কিছুই মনে করবেন না তিনি।···

মিসেস মোরেলকে রোজই দুপুরে দু'বার রান্না করতে হ'ত। ছেলেমেয়েরা দিনের পুরো খাবারটা দুপুর বেলাই খাবে—কিন্তু মোরেল এসে খাবে সেই বিকেল পাঁচটায়। কাজেই মিঃ হীটনকে সাহায্য করতে হ'ত। মিসেস মোরেল হয়ত ময়দা মাখতেন কিম্বা আলু কুটতে বসতেন, মিঃ হীটন তাঁর বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসে তাঁর চলাফেরা লক্ষ্য করতেন, এবং এর পরদিন গির্জ্জেতে কি বক্তৃতা দিবেন সেই নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের ধারণাগুলো ছিল নিতান্ত অসংযত এবং অদ্ভুত। মিসেস মোরেল কল্পনার রাজ্য থেকে তাঁকে নামিয়ে আনতেন মাটিতে।

একদিন যীশুখৃষ্টের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে তাঁদের আলাপ হচ্ছিল। মিঃ হীটন বললেন, 'এই যে প্রভু জলকে পরিণত করলেন মদে, এর তাৎপর্য কী? এর অর্থ এই যে বিবাহিত স্বামি-স্ত্রীর সাধারণ জীবনে, এমন কি তাদের রক্তে অবধি কোন পরম প্রেরণা নেই। সে যেন অতি সাধারণ, যেন জল। প্রভু তাকে পরিণত করলেন মদে। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে যখন প্রেম আসে, তখন পবিত্র আত্মার প্রভাবে তার সমস্ত চরিত্রে দেখা দেয় গভীর পরিবর্ত্তন। বাইরে থেকে দেখতে গেলেও তাকে আর তখন ঠিক আগের মানুষটি বলে মনে হয় না।'

মিসেস মোরেল মনে মনে ভাবলেন, 'আহা, বেচারি! ওর স্ত্রী মারা গেছে, তাই। সেই জন্যেই ভালবাসাকে ও পরিণত করেছে আত্মার পবিত্রতায়!'···

সেদিন চায়ের প্রথম পেয়ালাটিতে তাঁরা সবে অর্দ্ধেক চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় বাইরে বুট জুতোর টেনে টেনে চলবার আওয়াজ শোনা গেল

মিসেস মোরেল নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলেন, 'সর্ব্বনাশ!'

মিঃ হীটনও একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ঘরে ঢুকল মোরেল। সে যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে কাউকে আঘাত করবার জন্যে। মিঃ হীটন এগিয়ে গেলেন হাত বাড়িয়ে, মোরেল শুধু মাথা নেড়ে কুশল প্রশ্ন করলে মাত্র, হাত দেখিয়ে বললে, 'না। চেয়ে দেখুন হাতের অবস্থা! এই তো কাটা-ছেঁড়া, ময়লা-মাখা হাত, আপনার হাত ধরার যোগ্য নয়, কী বলুন?'

মিঃ হীটন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠল। আবার চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। মিসেস মোরেল উঠে গিয়ে গরম সসপ্যানটা নাবিয়ে নিলেন। মোরেল তার কোটটা খুলে রেখে বসবার লম্বা চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে আনল—এনে ধপ্ করে বসে পড়ল তাতে।

যাজকটি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি খুব পরিশ্রান্ত?'

'পরিশ্রান্ত! কেন নয় বলুন? আমার মত পরিশ্রম না করলে আপনি বুঝতেও পারবেন না পরিশ্রান্ত হওয়া কাকে বলে! আপনার তো পরিশ্রম করা অভ্যেসই নেই।'

—'তা ঠিক।' মিঃ হীটন উত্তর দিলেন।

'আর দেখুন,' মোরেল তার কাঁধের কাছটা দেখিয়ে বললে, 'এখন তো তবু একটু শুকিয়েছে, কিন্তু এখনো এই জায়গাটা কেমন ভেজা—দেখুন, ধরে দেখুন।'

এদিক থেকে মিসেস মোরেল হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আঃ, কী করছ! তোমার ঐ ময়লা জামা কি মিঃ হীটন ছোঁবেন নাকি?'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাজক ভদ্রলোক তাঁর হাত বাড়িয়ে জামাটি স্পর্শ করলেন।

'তা ঠিক, তা ঠিক,' মোরেল বললে, 'কিন্তু কথাটা কি জানো, উনি আমার জামা ছোঁন বা নাই ছোঁন, এই ময়লা সব আমার দেহ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। আর রোজ···প্রতিদিন···আমার জামা এমনি ভিজেই ওঠে। আর তোমাকেও বলি, এই যে একটা লোক সারাদিন খনিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এলো, তার জন্যে কি একটু কিছু পানীয় পদার্থও রাখতে নেই?'

মিসেস মোরেল চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'কেন, তুমি তো সবটুকু বীয়ার শেষ করে রেখে গেছ!'

—'ও, তা'হলে বুঝি আর তৈরি করা বারণ?' যাজকটির দিকে চেয়ে সে বলতে লাগল, 'শুনুন, একটা লোক সারাদিন কয়লার খাদে কাজ ক'রে এলো, ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে গেছে তার গলা—বলুন তো, বাড়ি ফিরে এলে তার কিছু পানীয় প্রয়োজন হয় কিনা?'

—'নিশ্চয়ই, প্রয়োজন হয় বৈ কি।' যাজক জবাব দিলেন।

—'কিন্তু তাও পাওয়া আপনার সৌভাগ্য—দশ দিনে একদিন পাবেন কিনা সন্দেহ!'

মিসেস মোরেল উত্তর দিলেন, 'কেন! জল রয়েছে—চা আছে।'···

—'জল! জলে কখনো গলা সাফ হয়!'

পিরিচে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে, সেটাকে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিলে সে—তার পর বড় গোঁফ-জোড়ার ফাঁক দিয়ে চুমুক দিলে। আবার পিরিচে চা ঢেলে নিয়ে, পেয়ালাটাকে রাখলে টেবিলের চাদরটার উপর।

—'ও কি, আমার চাদরটা নষ্ট করছ!' ছুটে এসে মিসেস মারেল পেয়ালাটাকে বসালেন একটা প্লেটের উপর।

মোরেল জবাব দিলে। বললে, 'কাপড় নিয়ে আবার মাথা ঘামানো। আমার মত সারাদিন খাটলে আর কাপড় নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ত না।'

—'আহা, বেচারি!' মিসেস মোরেল বিদ্রূপ ক'রে বললেন।

সারা ঘর জুড়ে মাংস, সব্জী আর খনির ময়লা কাপড়-জামার দুর্গন্ধ। মোরেল যাজকটির দিকে সরে এলো। তার গোঁফ-গোড়া ফুলে উঠেছে, কালি-মাখা মুখে তার মুখের গর্ত্তটিকে দেখাচ্ছে অতিরিক্ত লাল। বললে, 'দেখুন মিঃ হীটন, একটা লোক যে সারাদিন ওই অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে খাদের কয়লা কেটে এসেছে, তাকে দেখে মানুষের তো দয়াও জাগে—একটু করুণাও তো হয় তার উপর!'

—'কিন্তু তাই নিয়ে ন্যাকামো করবার কোন মানে হয় না।' মিসেস মোরেল বলে বসলেন। ভারী খারাপ লাগত তাঁর, মোরেলের এই অতি-হীনতার ভাণ—তার এই ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা, মানুষের কাছ থেকে একটু সমবেদনা লাভ করবার এই হাস্যকর স্পৃহা। উইলিয়মও তার বাবাকে দেখতে পারত না—ছোট ভাইটিকে নিয়ে খেলা করতে করতে সে দেখছিল তার বাবার এই গলে-পড়া ভাব। মায়ের সঙ্গে বাবা যে হৃদয়হীন ব্যবহার করেন, তাও তার ভাল লাগত না। আর অ্যানি—সে তো কোন দিনই তার বাবার উপর সন্তুষ্ট নয়। সে বরং তার বাবার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে পারলেই ভাল থাকত।

মিঃ হাটন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর মিসেস মোরেল তাঁর টেবিলের চাদরটা ভাল করে দেখতে এলেন। বললেন, 'আহা, কী চমৎকার!'

মোরেল এবার গর্জ্জন করে উঠল, 'কেন নয়? তুমি ভেবেছ তুমি একজন ধর্ম্মযাজককে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছ বলে আমি সুবোধ বালকের মত হাত ঝুলিয়ে বসে থাকব?'

দু'জনেরই মেজাজ চড়ে উঠল, কিন্তু মিসেস মোরেল আর কিছু বললেন না। এদিকে ছোট ছেলেটির কান্না, ওদিকে মিসেস মোরেল তাড়াতাড়িতে সসপ্যানটা ওঠাতে গিয়ে, অ্যানির কপালে লাগিয়ে দিয়েছেন, সে জন্যে অ্যানিও সুর করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। মোরেল বিরক্ত হয়ে ধমকাচ্ছে তাকে। চারিদিকে যেন এক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ উইলিয়মের চোখ পড়ল তাদের আগুনের চিমনির উপর, বড় বড় অক্ষরে যে লেখাটা রয়েছে তার উপর, সে জোরে জোরে পড়ল:

—'আমাদের গৃহে ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক।'

মিসেস মোরেল ছোট বাচ্চাটাকে ঠাণ্ডা করছিলেন, কথাটা শুনে তিনি তেড়ে গিয়ে উইলিয়মের কান মুলে দিলেন। বললেন, 'তুমি কী? কী মনে করেছ তুমি?' ব'লে বসে প'ড়ে হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। উইলিয়ম তার বসবার টুলটাকে লাথি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মোরেল চীৎকার করে বললে, 'এতো হাসবার কি আছে? আমি তো হাসবার মত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

একদিন সন্ধ্যাবেলা মিঃ হীটন এসে বেড়িয়ে চলে যাবার পর স্বামীর মেজাজ সহ্য করতে না পেরে মিসেস মোরেল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে অ্যানি আর ছোট শিশুটি। আজ মোরেল উইলিয়মকে লাথি মেরেছে—মা হয়ে কী করে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন?

নদীর পুল পার হয়ে মাঠের কিনারা বেয়ে তিনি এগিয়ে চললেন ক্রিকেট খেলার মাঠের দিকে। সারা মাঠে গোধূলির পাকা সোনার রঙ ধরেছে, দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে জলস্রোতে পরিচালিত কলের শব্দ—যেন সেই দূর প্রান্তে মাঠে আর কলে কানাকানি চলেছে। ক্রিকেট খেলার মাঠে অলডার গাছগুলোর নিচে একটা আসনে গিয়ে তিনি বসলেন। সামনের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন গোধূলির শোভা। সবুজ মাঠটা যেন আলোক-সমুদ্রের শান্ত তলদেশ, মসৃণ এবং কঠিন। মাঠের আচ্ছাদনের নিচে নীলাভ আলোকে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে অনেক উঁচু দিয়ে ফিরে আসছে নিজেদের নীড়ে। আকাশ যেন নরম পশম দিয়ে বোনা একটি চাঁদোয়া। চিলগুলো হঠাৎ ডুব দিয়ে নিচের আলোক-সমুদ্রের আভার মধ্যে নেমে আসছে। এক-সাথে জড়ো হয়ে তারা চেঁচাচ্ছে। ঘূর্ণির মুখে যেমন জলের কণাকে কালো দেখা যায়, তেমনি ওরাও যেন এই আলোকের আবর্ত্তে এক একটি কণা। মাঠের মাঝখানে একটা গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাঠে কয়েকটি ভদ্রলোক ক্রিকেট খেলা অভ্যেস করছিলেন। বলের ঠুক-ঠাক আওয়াজ, মাঝে মাঝে খেলোয়াড়দের জোরে জোরে কথা বলা—এ সবই তাঁর কানে আসছিল। সবুজ মাঠের উপর দিয়ে শাদা পোষাক-পরা মানুষের মূর্ত্তিগুলো নিঃশব্দে বিচরণ করছে। এখুনি সন্ধ্যার প্রথম ছায়া নেমে এসেছে মাঠে। দূরে গোলাবাড়ির মাঠে শস্যের স্তূপ—তার এক ধারে পড়েছে আলো, অন্য ধারটা নীলাভ-ধূসর। আকাশের সোনালী রঙ ক্রমশঃ যেন মুছে যাচ্ছে—তার ভেতর দিয়ে আবছা চোখে পড়ে শস্য-বোঝাই একটি গাড়ি দুলে দুলে চলেছে।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চারিধারের পাহাড় জুড়ে রক্তিম সূর্য্যাস্তের উজ্জ্বল শোভা। মিসেস মোরেল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন—আকাশের বুক থেকে সূর্য্য কেমন ডুবে যাচ্ছে, পশ্চিম দিক রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে। মাথার উপর হাল্কা নীল রঙের আকাশ, যেন আকাশের সমস্ত আলো পশ্চিম দিকে ঝরে পড়ছে আর উপরে রেখে গেছে নির্ম্মল নীলের ছোপ। মাঠের ওপাশে ঝোপের মধ্যের লাল ফলগুলো তাদের কালো পাতার আড়াল থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝকমক করে উঠল। খোলা মাঠের এক কোণে কয়েক মুঠো শস্য যেন হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়াল—যেন তারা প্রাণবান, যেন তারা মাথা নীচু করে কাকে প্রণাম জানাচ্ছে। হয়ত তাঁকেই—হয়ত তাঁর ছেলেও একদিন হবে জোসেফের মত। পশ্চিমের এই রক্তিম সূর্য্যাস্তের প্রতিফলন হয়েছে পুব-আকাশেও—সেখানেও আবছা লাল রঙ যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের উপর যে শস্যের স্তূপগুলো এতক্ষণ এই আলোকধারার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তারাও এখন শীতার্ত্ত।

মিসেস মোরেলের মনে এই মুহূর্ত্তটি তার প্রভাব এঁকে দিয়ে গেল। কখনো কখনো এই ধরণের নীরব মুহূর্ত্তে মানুষ তার ছোটখাট অশান্তি ভুলে যায়—বাস্তবের অনাবিল সৌন্দর্য্যে তার

মন ভরে যায়। মিসেস মোরেলও যেন আজ নিজের মধ্যে ডুবে যাবার মত শান্তি আর শক্তি ফিরে পেলেন। বার বার একটা চড়ুই পাখী এসে তাঁর গা-ঘেঁষে উড়ে যেতে লাগল। কখনো কখনো অ্যানি অলডার গাছের ফলগুলো এনে তাঁকে দেখিয়ে যেতে লাগল। কোলের শিশুটিও অস্থির হয়ে উঠল, দু'হাত মেলে যেন আলোর উপর ভর দিয়েই সে উঠে দাঁড়াতে চায়।

মিসেস মোরেল ওর দিকেই চেয়ে রইলেন। জন্মের আগে এই শিশুটিই ছিল তাঁর আতঙ্কের কারণ, স্বামীর প্রতি তাঁর মনোভাবই ছিল এই আতঙ্কের হেতু। কিন্তু তার পর ওর দিকে চেয়ে কী এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে তাঁর হৃদয় ছেয়ে যেত। ছেলেটিকে দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে উঠত—যেন ও রুগ্ন কিম্বা বিকলাঙ্গ। কিন্তু বাস্তবিকই তা' নয়। ওর চেহারাতে তেমন কোন খুঁত নেই। তবু কেমন কুঁচকানো ওর ভ্রূ দুটি—চোখ দুটিতে কেমন যেন বিষণ্নতা, দুঃখ বলে কোন পদার্থকে সে যেন ভাল করে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। ওর চোখের কালো, চিন্তাভারগ্রস্ত তারা দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে মিসেস মোরেলের নিজের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

'ও যে কত কিছু ভাবছে।' মিসেস কার্ক বলতেন, 'ওর দিকে চাইলে মনে হয় যেন ওর মনে কত দুঃখ।'

আজ হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে থেকে থেকে মায়ের ভারাক্রান্ত মন বিগলিত হয়ে এলো অসহ্য ব্যথায়—ওর মাথার উপর ঝুঁকে পড়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললেন তিনি, যেন তাঁর হৃদয় নিংড়ে দরদর করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। শিশুটি তার ছোট আঙুলগুলো তুলে ধরল।

কান্না-ভরা গলায় মা চুপি চুপি বললেন, 'বাছা আমার!'

আত্মার গহনে কোথায় যেন তার অকস্মাৎ উপলব্ধি হ'ল, এই জন্যে তিনি এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই অপরাধী।

শিশুটি মায়ের দিকে চেয়েছিল। ওর চোখ দুটি ঠিক তাঁর নিজের মত নীল, কিন্তু দৃষ্টি বিষণ্ন, গভীর—যেন কোনো দুর্ব্বোধ্য রহস্যের ভার বইতে না পেরে ওর অন্তরাত্মা সহসা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। নরম, তুলতুলে ছোট্ট শরীরটি রয়েছে তাঁর দুটি বাহুর উপর। গভীর নীল চোখ মেলে অপলকে চেয়ে আছে তাঁরই দিকে। ওর চোখ দুটি যেন তাঁর নিজের মনের নিভৃততম কক্ষের আগল খুলে দিল—চিন্তাগুলো একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল বাইরে। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসার অবসান ঘটেছে, এই শিশুটির আগমনের জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা ছিল না—তবু এই তো সে শুয়ে আছে তাঁর বাহুর উপর, তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দুর টান রয়েছে ওরই দিকে। যেন জন্মের আগে যে নাভিসূত্র দিয়ে শিশুর ছোট্ট দেহটি সংলগ্ন ছিল তাঁর দেহের সঙ্গে, এখনও তার ছেদ ঘটেনি। শিশুটির প্রতি তাঁর অনুরাগ যেন উষ্ণ উচ্ছ্বাসের মত সঞ্চারিত হতে লাগল। ওকে তুলে ধরলেন নিজের মুখের কাছে, বুকের মাঝখানে। জন্মের আগে একে তিনি ভালবাসতে পারবেন বলে মনে হয়নি। এবার বুঝি তার ক্ষতিপূরণ—সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে একে ভালবাসা। ভাল তিনি বাসবেন—একবার যখন ওর আবির্ভাব হয়েছে তাঁর জীবনে, তখন ভালবাসা দিয়েই ওকে বড়ো করে তুলবেন। ওর চোখ-জোড়া কি স্বচ্ছ, যেন অন্তরের সব কথা ও বুঝে নিতে জানে। দুঃখ হ'ল তাঁর, ভয়ও হ'ল। ও কি সব জানে, তাঁর সব মনের কথা? যখন তাঁর জাগ্রত হৃৎপিণ্ডের নিচে ছিল ওর স্থান, তখন সেই হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দন কি ওর জানা হয়ে গেছে? ওর দৃষ্টিতে কি ভর্ৎসনার ভাব? দুঃখে এবং আতঙ্কে তাঁর দেহের অস্থি-মজ্জা যেন চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

সামনের পাহাড়ের কিনারায় সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু তখনও মুছে যায়নি। হঠাৎ কী মনে ক'রে শিশুটিকে তিনি তুলে ধরলেন। বললেন, 'দেখো, সোনা, দেখো।'

টকটকে লাল সূর্য্য—যেন কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেবে যাচ্ছে। শিশুটিকে সামনের দিকে তুলে ধরে তাঁর মনের মেঘ যেন কিছুটা কেটে গেল। ওর দিকে চেয়ে দেখলেন, ছোট্ট মুঠিটা তুলে সে দৃশ্যটুকু উপভোগ করছে। কিন্তু আবার কেমন তাঁর ভয় হ'ল। শিশুটিকে আবার এনে রাখলেন বুকের মাঝখানটিতে, যেন মনের ভুলে ওকে তিনি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন ও যে দেশ থেকে নেমে এসেছে সেই দেশে—নিজের এই বিহ্বলতার জন্যে তাঁর নিজেরই লজ্জা হতে লাগল। মনে মনে ভাবলেন, 'যদি ও দীর্ঘায়ু নিয়ে জন্মে থাকে, তা'হলে বড় হয়ে ও কি হবে?' তাঁর অন্তরে শুধু ওর জন্যে ব্যাকুলতা আর উদ্বেগ।

'আমি ওর নাম রাখলাম পল্।' মনে মনে বললেন তিনি। কিন্তু কেন, তা' তিনি নিজেও বুঝে উঠতে পারলেন না।

আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। ···সবুজ মাঠের উপর ঘন ছায়ার আস্তরণ···অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, কেউ নেই। এ তিনি আগেই ভেবে রেখেছিলেন। মোরেল যখন ফিরল, তখন রাত দশটা। সেদিন বাকী সময়টুকু শান্তিতেই কেটে গেল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

হে খৃষ্ট

হে খৃষ্ট যিশু মুকতিদ।
পাপির পাপ কারাগার হে খৃষ্ট যিশু।
হেদে খৃষ্ট যিশু মুকতিদ।
যিশু খৃষ্ট মুক্তি দাতা হে।
হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্য।
সেই সেই জগৎ করতা হে খৃষ্ট যিশু।

—রামরাম বসু (১১৫৭-১৮১৩)

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চোদ্দ

কিরীটি হাত বাড়িয়ে থানা-অফিসার রসময় ঘোষালের প্রসারিত হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল।

আমিও কৌতূহল দমন না করতে পেরে পশ্চাৎ দিক হ'তে ঝুঁকে কিরীটির হস্তধৃত খোলা চিঠিটায় দৃষ্টিপাত করলাম।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। হরবিলাস ঘোষ লিখছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষালকে সম্বোধন করে।

থানা-ইনচার্জ শ্রীরসময় ঘোষাল সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন দারোগা বাবু! আপনাকে জানান কর্তব্য বলিয়াই জানাইতেছি—গত কাল রাত্রে 'নিরালায়' চোর আসিয়াছিল এবং চোর কিছু চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে কি না বলিতে পারি না। তবে দ্বিতলের ষ্টুডিও-ঘরের ও শতদলের ঘরের তালা দু'টি ভগ্ন অবস্থায় দরজার কড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে দেখিতে পাই এবং উক্ত ঘরের দরজাই খোলা ছিল। শতদলের ঘর হইতে কোন মূল্যবান কিছু চুরী গিয়াছে কি না বলিতে পারি না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তার ঘরে আমি কখনো প্রবেশ করি নাই এবং সে ঘরে তাহার কোন মূল্যবান কিছু ছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ ব্যাপারে কোন কিছু করণীয় থাকিলে করিতে পারেন। আর একটা কথা এই সপ্তাহের শেষেই আমি ও আমার স্ত্রী এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাই। নমস্কার—

ইতি: হরবিলাস ঘোষ।

কিরীটি চিঠিটা একবার মাত্র পড়ে রসময় ঘোষালের হাতে প্রত্যর্পণ করল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রসময় কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'যাবেন নাকি একবার নিরালায়?'

'হাঁ, যেতে হবে বৈ কি! চলুন এখুনি না হয় একবার ঘুরে আসা যাক।—'

'এখুনি যাবেন?—'

'হাঁ—না, আর একটু দেরী করাই ভাল।—'

রাণুও এতক্ষণ আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবারে মন্থর পায়ে উপরের সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

আমরা ত প্রস্তুত হয়েই ছিলাম সকলে 'নিরালা'য় যাবার জন্য। রাস্তায় নেমে সমুদ্র-কিনারের পথ ধরে পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করলাম। রসময় ঘোষালের সঙ্গে যে লাল পাগড়ী এসেছিল সেও আমাদের অনুসরণ করে। শীতের রোদ আরামদায়ক হলেও এখন বেশ কনকনে কষ্টকর মনে হয়। বেলা প্রায় পৌণে এগারটা হবে।

এখনো সমুদ্রে স্নানার্থীদের ভীড় কমেনি। বহু পুরুষ নারী বালক-বালিকা যুবক যুবতী হৈ চৈ করে সমুদ্রের জলে লাফালাফি ঝাপাঝাপি করছে। তাদের উল্লাস কানে আসে। নিঃশব্দে কিরীটি ও রসময় পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ওদের পশ্চাতে আমি। 'নিরালা'য় ষ্টুডিও-ঘরে বা শতদলের ঘরে এমন কি ছিল যার জন্য কাল রাত্রে চোরের আবির্ভাব হলো! শতদলের ঘরে তবু কিছু থাকতে পারে কিন্তু ষ্টুডিও-ঘরে কেবল কতকগুলো ছবি আর টাচু! খেয়ালী ধনী আর্টিষ্টের বাড়ী। ষ্টুডিও-ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত কক্ষ বা আলমারী বা চোরা জায়গা ছিল না ত! ছিল না ত তার মধ্যে এমন কোন মূল্যবান বস্তু যার জন্য চোরের উপদ্রব হয়েছিল গত রাত্রে। ইতিপূর্বেও রাত্রে 'নিরালা'য় যার আবির্ভাব ঘটেছিল একবার সে শতদলের প্রাণ হরণের চেষ্টা করেছিল এবং দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্যটা ঠিক পরিস্ফুট না হলেও সীতার কুকুরটাকে জখম করে গিয়েছিল।

হঠাৎ আবার সীতার কথা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সীতা!

মনে হয় সে বুঝি মরেনি। নিষ্ঠুর ভাবে কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের বুলেটে নিহত হয়নি। সে যেন এখনো মনে হয় 'নিরালা'তেই আছে। এই যাচ্ছি। গেলেই দেখা হবে। শ্যামাঙ্গী অপরাজিতার মত ঢলঢল মেয়েটি। স্মৃতির পাতাগুলো যেন জল-জল করছে।

মরে গিয়েছে। চোখের সামনে তার রক্তাক্ত মৃতদেহটা অসাড় অসহায় ঘরের মেঝের 'পরে কার্পেটে আমরা সকলেই পড়ে থাকতে দেখেছি। মৃতদেহের ময়না তদন্তও হয়েছে। মৃতদেহের ভিতর থেকে রিভলভারের বুলেটও পাওয়া গিয়েছে। তবু যেন মনে হচ্ছে মরেনি সে। এখনো বেঁচে আছে।

কেন এমন হয়?

কিন্তু কে অমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলে মেয়েটিকে, আর কি উদ্দেশ্যেই বা হত্যা করলে! সীতার কুকুর টাইগার যে রাত্রে জখম হয় সে রাত্রেও কি আততায়ী সীতাকেই হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল? আচমকা কুকুরটা সামনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত তাকেই জখম করে পালিয়ে যায়। হঠাৎ রসময়ের কথা কানে এলো, রসময় কিরীটিকে প্রশ্ন করছেন: সকাল বেলাতেই কোথায় গিয়েছিলেন মিঃ রায়?

'শরৎ বাবু উকিলের বাসায় তার মেয়ে কবিতা গুহের সঙ্গে দেখা করতে।'

'হঠাৎ ?'

'নার্সিং-হোমে ফুল সন্দেশ তারই পরামর্শ মত শতদল বাবুকে রাণু দেবী পাঠিয়েছিলেন—'

'তার মানে ?'—বিস্মিত রসময় কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

'তার মানে ঐটাই সব ও শেষ নয়। ওটা ত প্রদীপের আলো। আলো জ্বালাবার ইতিহাস আরো পশ্চাতে। সে আর এক ভগ্নদূত সংবাদ!—' কিরীটি মৃদু হাস্য সহকারে জবাব দেয়।

"ভগ্নদূত সংবাদটি আবার কি ?'

'কে এক খোঁড়া দূত শতদল বাবুর পরিচিত কবিতা দেবীকে এসে জানায়, শতদল বাবু নাকি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন তাকে যেন কিছু লাল গোলাপ নার্সিং-হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণেই হোক, কবিতা দেবী নিজে ফুলটা না পাঠিয়ে ফুলগুলো রাণু দেবীকে পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানায়। রাণু দেবী সেই ফুলই শুধু নয় ঐ সঙ্গে মিষ্টি যোগ করে দেন অর্থাৎ কিছু কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে আসেন।'

'ঐ হোটেলের বেয়ারাদের মধ্যেই তাহ'লে কেউ একজন সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল ?'

'হাঁ। কিন্তু ঘোষাল সাহেব, জল সেখানেও গভীর। অনুসন্ধানে জেনেছি রামকানাই নামে এক বেয়ারাই সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল। এবং রাণু দেবী স্বয়ং গিয়ে সন্দেশ ও ফুল নার্সিং-হোমে পৌঁছে দিয়ে আসেন।'

'রাণু দেবীকে আপনি ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন নি ?'

'সুব্রতই গত রাত্রে করছিল। দু'-একটা আমিও করেছি কিন্তু যে মৎসটি গভীর জল থেকে লেজের ঝাপটা মেরেছেন সে ত রাণু দেবী নন। রাণু দেবীর বুদ্ধি ও চিন্তারও অগোচরে। কিন্তু তিনি যত গভীরেই থাকুন তার ল্যাজের আঁস আমার চোখে পড়েছে।'

'বলেন কি ? কাউকে সন্দেহ—'

'হাঁ। অন্ধকারে আলো দেখতে পাওয়া গিয়েছে ঘোষাল সাহেব! কিন্তু মাত্র একটি জায়গায় সূত্র একটা এসে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে পারলেই সব বোঝা যাবে।'

কিরীটির কথায় বিস্মিত আমিও কম হইনি। কিরীটি তাহলে সমাধানে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে। 'নিরালা'-রহস্য মীমাংসার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

বলতে বলতে কিরীটি থেমে গিয়েছিল। যতটুকু কিরীটি এইমাত্র বললে তার চাইতে একটি কথাও বেশী এখন আর সে বলবে না, এ-ও আমার জানা। কিন্তু তাই সে ঐ পর্যন্ত বলে থেমে গেল। কিন্তু কিরীটির চরিত্রের সঙ্গে রসময় ঘোষালের সম্যক্ পরিচয় নেই। তাই তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন: 'লোকটি কে ?'

'দু'-এক দিনের মধ্যেই জানতে পারবেন,— 'গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটির সংক্ষিপ্ত জবাব শোনা গেল।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থান 'নিরালা'র গেটে পৌঁছে

গিয়েছিলাম। সেই দিকেই কিরীটি রসময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে: চলুন, দেখা যাক 'নিরালা' কি বলে ?

দরজা বন্ধ ছিল।

বন্ধ দরজার এক পাশে ঝুলন্ত, দরজা খোলাবার জন্ম ভিতরে সাংকেতিক ঘণ্টার সঙ্গে সংযুক্ত দড়িটার প্রান্ত ধরে কিরীটি বার দুই টান দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে হরবিলাস।

'আসুন !'—হরবিলাস আমাদের আহ্বান জানালেন।

হরবিলাস এগিয়ে চললেন, পশ্চাতে রসময় ঘোষাল, আমি ও কিরীটি। সর্বশেষে সঙ্গের সেই কনেষ্টবলটি।

সীতার মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ দিন পরে নিরালায় এসে আমরা প্রবেশ করলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল হরবিলাস যেন ডান পাটা একটু টেনে টেনে চলেছেন মন্থর ভাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটির কণ্ঠস্বর শুনলাম।

'ডান পায়ে আপনার কি হলো হরবিলাস বাবু ?'

চলতে চলতেই হরবিলাস জবাব দিলেন : 'কয়েক দিন আগে বাগানে কাজ করবার সময় পায়ে একটা কাঁটা ফুটে-ছিল। সেটাই পেকে গিয়ে—নচেৎ নিজেই আপনাদের কাছে যেতাম।'

'কাঁটা ফুটেছিল ?'—কিরীটি পাল্টা প্রশ্ন করে।

কিরীটির প্রশ্নের জবাবে হরবিলাস কি জবাব দিতেন জানি না। কিন্তু জবাব দেবার পূর্বেই কথা বললেন রসময় ঘোষাল।

'কয় দিন বাড়ি থেকে তাহ'লে বের হননি বলুন ?'

'না। মেয়েটা বুকটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে !'—অশ্রু-রুদ্ধ হ'য়ে এলো হরবিলাসের কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু আপনি মিথ্যা কথা বলছেন হরবিলাস বাবু !'—কঠিন কণ্ঠে বললেন এবারে রসময় ঘোষাল কথাগুলো।

'মিথ্যা কথা বলছি ?'—প্রশ্নটা যেন পাল্টা উচ্চারণ করে ঘুরে দাঁড়ালেন হরবিলাস রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চোখ দুটো তার অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে ঝক্-ঝক্ করছে কিসের এক প্রত্যাশায়।

আমরাও নির্বাক্।

'হাঁ। মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি ; কারণ, পরশু সকালে বাজারে একটা ঔষধের দোকানের সামনে আপনাকে আমি দেখেছি —দোকান থেকে আপনি বের হ'য়ে আসছেন, হাতে আপনার একটা প্যাকেট ছিল !'

ক্ষণপূর্বে যে বিস্ময় ও চাপা একটা ক্রোধ হরবিলাসের মুখখানার 'পরে থমথমে হ'য়ে উঠেছিল মুহূর্তে যেন সেটা মেঘমুক্ত চাঁদের মত নির্মল হাস্য-দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠলো।

স্মিত কণ্ঠে হরবিলাস এবারে বললেন : 'ভুল দেখেছেন দারোগা সাহেব। আমি নয়। এই পাঁচ দিন বাড়ী থেকে এক পাও আমি বের হইনি কোথায়ও।'

'স্পষ্ট দিনের আলোয়—স্পষ্টই দেখেছি হরবিলাস বাবু ! ভুল হ'তে পারে না।'

'পারে বৈ কি ! ভুল ত আমরা কত সময়েই করি। বিশেষ করে দেখার ভুল—দেখবার ভুল।'

হরবিলাসের শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যেন কোন একটি শিশুকে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কিছু বোঝাচ্ছেন। কিরীটির দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু সে-দৃষ্টি যেন পাষাণে কুঁদে তোলা। কোথায়ও এতটুকু উত্তেজনা বা দীপ্তি মাত্রও নেই। এতটুকু উৎসাহ বা এতটুকু আগ্রহের চিহ্ন পর্যন্তও যেন ওর মুখের ভাবে বা চোখের দৃষ্টিতে নেই।

'দেখবার ভুল ? আপনি বলছেন দেখবার ভুল ?'—রসময় ঘোষালের স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে যেন এবারে একটা পুলিশী কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

'তা ছাড়া আর কি বলি বলুন। চার দিন পায়ের যন্ত্রণায় পায়ের পাতা ফেলতে পারিনি। নিজে বসে বসে হট কোমেন্টেসন দিয়েছি। আজই সবে মাত্র একটু যা হাঁটা-চলা শুরু করেছি। আর আপনি কিনা দেখলেন আমায় বাজারে !'

'হরবিলাস বাবু, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার মিথ্যে চেষ্টা করছেন। পনের বছর এই পুলিশ লাইনে চাকরী করছি। অত সহজে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয় না ! আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গত কাল হঠাৎ নার্সিং-হোমে শতদল বাবু কড়াপাকের সন্দেশ খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন—'

মুহূর্তে যেন রসময় ঘোষালের কথাটা শুনে হরবিলাসের কৌতুকোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখখানা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। হরবিলাসের মুখের চেহারার হঠাৎ পরিবর্তন আমার দৃষ্টিকেও এড়ায় না। কিন্তু হরবিলাস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মৃদু উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : 'তাই নাকি ! সন্দেশ খেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল কেন ?'

'কারণ, সে সন্দেশের মধ্যে বিষ ছিল।'

'বিষ !'—একটা আর্ত শব্দের মতই হরবিলাসের কণ্ঠ হ'তে কথাটা উচ্চারিত হলো।

'হাঁ বিষ। মরফিন !'

হরবিলাস স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ঘোষালের মুখের দিকে।

রসময় ঘোষালের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিও হরবিলাসের দুটি চোখের প্রতি অপলক হ'য়ে আছে। চার জোড়া চোখের দৃষ্টি যেন পরস্পর পরস্পরকে লেহন করছে।

'আপনি কি বলতে চান ঘোষাল সাহেব ?'

'শতদল বাবুকে নার্সিং-হোমে লাল গোলাপ ও কড়াপাকের সন্দেশ পাঠাতে হবে আপনিই কবিতা দেবীকে অনুরোধটা জানিয়ে এসে-ছিলেন গত পরশু কোন এক সময়, তাই নয় কি ?'

একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের 'পরে অভিযোগ। একেবারে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান।

আবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কঠিন স্তব্ধতা।

'ওঃ, আপনি এতক্ষণ ধরে তাহ'লে এই কথাটাই আমাকে বলতে চাইছিলেন ঘোষাল সাহেব ?'—হরবিলাসের শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অস্পষ্ট ব্যঙ্গের হুল উদ্যত হ'য়ে ওঠে।

রসময় কোন জবাব দেন না। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'আপনার অনুমান তাহ'লে আমিই শতদলকে সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলাম ?'—হরবিলাসই দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ। যতক্ষণ না বলছেন কেন আপনি গত পরশু সকালে বাজারে গিয়েছিলেন এবং ঔষধের দোকানে ঢুকেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমি সন্দেহ করবো।—'

'কিন্তু শতদলকে মেরে আমার লাভ কি ঘোষাল সাহেব ?—'

'মারবার কথা ত এর মধ্যে উঠছে না হরবিলাস বাবু—' এতক্ষণে কিরীটি কথা বলে: আপনার ঐ সময়ে সেদিন বাজারে উপস্থিতিটাই ওর মনে সন্দেহ আনছে কতকগুলো ব্যাপারে।'

'কিন্তু সেইটাই ত মিথ্যা !—'

'মিথ্যা নয় !—' কিরীটির কণ্ঠস্বরটা যেন বজ্রের মত ধ্বনিত হলো: 'উনি ঠিকই বলছেন।'

'তার মানে ?—' মিনমিনে গলায় হরবিলাস কথাটা বললেন।

'আপনার ডান হাতের আংটির প্রবাল পাথরটা কই ?—'

'প্রবাল পাথর ?—' বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হরবিলাস।

'হাঁ। প্রবালটা। কোথায় সেটা ?—দেখুন ত হাতের আংগুলের আংটিটা আপনার ?—'

'তাই ত! পাথরটা!' চোখের সামনে ডান হাতটা তুলে আংটিটার দিকে তাকালেন হরবিলাস।

সত্যি। হরবিলাসের হাতের আংগুলের আংটিটার পাথরটি নেই।

'লক্ষ্যও করেননি হরবিলাস বাবু যে আংটির পাথরটি আপনি ইতিমধ্যে হারিয়েছেন। যাক্। এই নিন পাথরটা—' বলতে বলতে কিরীটি জামার পকেটে হাত চালিয়ে একটি বড় মটরের দানার মত প্রবাল পাথর বের করে, হাতের পাতায় পাথরটা নিয়ে এগিয়ে ধরলে হরবিলাসের সামনে—'দেখুন, এটাই আপনার অজ্ঞাতে হারানো প্রবাল। দেখুন, ঠিক আংটিটায় বসে যাবে।'

সত্যি! হরবিলাসেরই আংটির পাথর সেটা।

সকলেই আমরা বিস্মিত ও নির্বাক্! অকস্মাৎ অন্ধকার কক্ষের মধ্যে যেন রৌদ্রালোক এসে পড়েছে। কিরীটি আবার বলে: 'পাথরটা আজই সকালে শরৎ বাবু উকিলের বাসার বৈঠকখানায় কুড়িয়ে পেয়েছি হরবিলাস বাবু! একটু আগে রসময় বাবু যখন আপনাকে গত পরশু সকালে বাজারে দেখেছেন বলে জেরা করছিলেন হঠাৎ আপনার হাতের আংগুলে আংটিটার প্রতি আমার নজর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায়, এই পাথরটিই ইতিপূর্বে আপনার আংগুলের আংটিতে বসান আমি দেখেছি। একেবারে সাধারণ যোগ; দু'য়ে দু'য়ে চার। এখন আর নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না হরবিলাস বাবু যে, আপনি এতক্ষণ যা বলছিলেন তা সত্য নয়।

হরবিলাস একেবারে নির্বাক্। স্তব্ধ নিশ্চল। প্রাণহীন পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

'এবারে বলতে বাধা নেই নিশ্চয়ই হরবিলাস বাবু, কেন গত পরশু সকালে আপনি বাজারে গিয়েছিলেন আর কেনই বা কবিতা দেবীর বাড়ীতে গিয়ে শতদলকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাবার জন্য বলে এসেছিলেন ?' খাঁঝিয়ে উঠলেন ব্যঙ্গে রসময় ঘোষাল।

কিন্তু নির্বাক্ হরবিলাস। টু শব্দটি বের হয় না মুখ দিয়ে।

'কি, চুপ করে কেন ? জবাব দিন ?—'

'আমার কিছুই বলবার নেই দারোগা সাহেব! আপনার যা খুসী করতে পারেন।—'

'আমার প্রশ্নের আপনি জবাব দেবেন না ?—'

'না !—'

'বেশ। তাহ'লে শতদল বাবুকে সন্দেশের মধ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করবার প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে আমি arrest করতে বাধ্য হচ্ছি। কাম্বু সিং—'

'বেশ। আপনার যেমন অভিরুচি !—' বললেন শান্ত ভাবে হরবিলাস।

কাম্বু সিং এগিয়ে এলো জুতোর মচমচ শব্দ তুলে।

'বাবুকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজত-ঘরে রাখ।—' রসময় বললেন।

'দাঁড়ান !—'

নারী-কণ্ঠ শুনে সকলেই আমরা একসঙ্গে ফিরে তাকালাম।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় নিঃশব্দে আমাদের পশ্চাতে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ইনভ্যালিড্ চেয়ার চালিয়ে নিয়ে এসেছেন তা টেরও পাইনি।

'আমার স্বামীকে arrest করবার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিরীটি বাবু !—' হিরণ্ময়ী দেবী শান্ত কণ্ঠে বললেন।

[ক্রমশঃ।

ঘূর্ণাবর্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

মায়ের আশা ইলা অপূর্ণ রাখেনি। অপিস ও সংসারের ছোটখাট খুঁটিনাটি কাজ করেও যে সময়টুকু তার হাতে থাকে, সে সময়টা সে উদ্বাস্তুদের সেবায় ব্যয় করে। বিশেষ করে মেয়েদের দুর্গতির কথা আজ আর উড়িয়ে দেবার মত নয়। সন্ধ্যার এক আবছা অন্ধকারে মালতীদির যে ছবি দেখেছিল তাতে নিজে ও ঠিক থাকতে পারে না। দিনের পর দিন নব-ভিটা কলোনীর প্রতিটি ঘরে খুঁজে ফেরে মালতীদিকে, যদি দৈবাৎ মালতীদির দেখা পায়, তবে তাকে ঐ পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে টেনে আনবে—এই আশায় ইলা নব-ভিটা কলোনীর বস্তির মধ্যেই তার কর্ম্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। সে আজ একা নয়। অণিমা, রমা, সুতপা এবং আরও অনেকে আছে ওর সঙ্গে। এত বড় একটা কলোনীর মেয়েদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় বলেই ইলা বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছে মহিলা-সঙ্ঘ। পেটের দায়ে মেয়েদের যেন সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে অধঃপাতের পথে এগিয়ে যেতে না হয়, সেদিকে ওরা সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ করে। যারা আজ সব-কিছু বিকিয়ে তলিয়ে গেছে অতলস্পর্শী অন্ধকারে তাদের তুলে আনা কি একেবারেই অসম্ভব? ইলা প্রতিটি মেয়েকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। দিনের পর দিন নানা রকমের অভাব, অভিযোগ ও অনুযোগের ভিতর থেকেও তারা যেন তাদের সত্তা হারিয়ে নীচে নেমে না যায়। মালতীদের প্রতিচ্ছবি আর যেন চোখের সামনে না ফুটে উঠতে পারে।

অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইলা কাজ ক'রে চলে। এক-এক দিন কাজের চাপে অফিস যাওয়া বন্ধ করতে হয়। সুবিমল মাঝে মাঝে ওর আন্তরিকতা থেকে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। তার জীবনের আদর্শ ইলার ভিতর পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে দেখে, মন আনন্দে ভরে ওঠে। তবুও মাঝে মাঝে না বলে পারে না—"এত পরিশ্রমে শেষে যে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে!"

সুবিমলের স্নিগ্ধ হাসি ইলাকে যেমন অদম্য উৎসাহ এনে দেয়, তেমনি নিরস্তও করে। সামনের পথে এগিয়ে যাবার সবটুকু প্রেরণা নিমেষে জট পাকিয়ে যায়। শান্তির নীড় রচনা করবার দুর্ব্বার নেশা তাকে পেয়ে বসে। ঘর বাঁধবার নেশায় আকুল চিরন্তনী নারী ওর বুকের ভিতর মাথা তুলে জেগে উঠতে চায়। নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে ইলা বলে—"না না, আপনি বাধা দেবেন না। মেয়েদের দুর্গতি কত দূর চরম সীমায় পৌঁছেচে, সেটা আমায় দেখতে দিন। মালতীদির কথা আপনার মনে নেই?"—আরও কি বলতে গিয়ে ইলা বলতে পারে না। ওর গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

এক একটি দুর্গত মেয়ের সঙ্গে ওর মনের মুখোমুখি পরিচয় হয়, ইলার সারা সত্তা যেন প্রচণ্ড আলোড়নে ভেঙ্গে পড়ে।

সেদিন শনিবার। দেড়টায় অফিস ছুটীর পরেই ইলা চলে এসেছিল তার কর্ম্মক্ষেত্রে। শনিবার—আর রবিবার—এ দুটো দিনই সে কলোনীর মেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে কাটিয়ে দেয়।

এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে নানা অবস্থার মেয়েরা। বাইশ বছরের মেয়ে নিরুপমা। এগার দিন লুণ্ঠনকারীর বাড়ীতে রাত্রি-বাস করার পর ওর বাপ রসিকলাল তাকে পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেও সংসারে আশ্রয় দিতে পারেনি। শ্যামলালের বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মী। দাঙ্গার সময় স্বামীকে হারিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সে এখানে এসে কোন মতে আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়াও আছে পদ্ম, রাধা, কদম, আরও অনেকে, যারা আজ রিক্ত, নিঃস্ব। নিজেরাই ভুলে গেছে যে তারাও একদিন ছিল চাষী-গৃহস্থ ঘরের মেয়ে না হয় বৌ। আজ কেউ মুড়ী ভাজে, কেউ ঝিয়ের কাজ করে, কেউ বা অন্য কিছু।

ইলা যত দিন ধরে কলোনীতে যাওয়া-আসা করে, তত দিনের ভিতর নিরুপমাকে কখনও স্বাভাবিক দেখেনি। তাকে দেখে বার বার শুধু ওর এই কথাই মনে হয়েছে যে, জীবনের উৎস নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে, শুধু বাইরের খোলসটা তার বেঁচে আছে! ইলা তাকে অনেক দিন বুঝিয়ে বলেছে যে, প্রতিরোধ করবার শক্তিকে ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে যে বিপদ পাষাণের মত ঘাড়ে চেপে বসে, তার জন্যে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। কিন্তু নিরুপমার মন তাতে স্বচ্ছ হয় না।

নাইট স্কুল ও শিল্পায়তনের কাজকর্ম্ম যখন সারা হলো তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কলোনীর ছেলেমেয়ে এবং অল্প কিছু লেখাপড়া যারা জানে, তাদের আরও খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়ে যদি নার্সিং বা অন্য কোন কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—এই উদ্দেশ্য নিয়েই ইলারা নব-ভিটার এই নাইট স্কুলটি খুলেছে। শুধু নাইট স্কুল কেন, শিল্পায়তনের কাজও কম নয়। হাতের কাজে যাদের পারদর্শিতা আছে তাদের দিয়ে ব্লাউজ বা পেটিকোটের লেস্ বুনিয়ে, না-হয় সোয়েটার, উলের নানা রকম গরম জামা, মাফলার প্রভৃতি তৈরী করিয়ে নিয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের দরজায় দরজায় হাঁটাহাঁটি করে সেগুলোর বিক্রীর ব্যবস্থা ইলাদেরই করতে হয়। মেয়েরা যাতে কতকটা স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেদিকে দৃষ্টি না দিলে বর্ত্তমান সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধান সম্ভব নয়।

বাইরে সুবিমলের সাড়া পেয়ে ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছেলেমেয়েরাও আসে পিছু-পিছু। সবার কাছে বিদায় নিয়ে ইলা যখন সুবিমলের গাড়ীর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় বস্তির ভিতর থেকে হঠাৎ কোলাহল ও কান্নার শব্দে সে চমকে উঠলো।

পশ্চিম দিকের বস্তীর ভিতর কারা যেন কাঁদে! শুনেই সুবিমল সেদিকে এগিয়ে যায়। যন্ত্রপুত্তলিকার মত ইলাও তার পিছু-পিছু চললো।

রসিকলালের স্ত্রী কাঁদে। কান্নার শব্দে আরও অনেকে এসে জমা হয়েছে ওদের বাড়ীর সামনে। ইলা ও সুবিমল থমকে দাঁড়ায়। রসিকলালের স্ত্রী কাঁদে আর মাথায় করাঘাত করে—"কেন এ কাজ করলি মা? কে এনে দিলে তোকে আফিং?" শুনে ইলা চমকে ওঠে—"আফিং?" হাঁ আফিং। আফিং খেয়েছে রসিকলালের মেয়ে নিরুপমা।

নিরুপমা আফিং খেয়েছে! কিন্তু কেন? এমন কি হলো হঠাৎ? ইলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন রকমে লোকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ইলা তাড়াতাড়ি নিরুপমার পাশে গিয়ে বসে, মুখে ফেনা ভাঙছে! সংজ্ঞা তখনও লুপ্ত হয়নি। ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গিয়েছে। হতভাগীর জীবনে এই কি ছিল শেষ পরিণতি? ইলা বার বার নিজেকে প্রশ্ন করে। রসিকের স্ত্রী তখন চীৎকার ক'রে মাথা ঠুকছে ইলার পাশে।

নিরুপমার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ইলা ডাকে। বার বার ডাকার পর নিরুপমা একবার চোখ মেলে চায়। "না—না। বাঁচতে চাই না—বাঁচতে চাই না আমি।" জড়িয়ে জড়িয়ে বলে। "কেন এমন কাজ করলে নিরুপমা ?"—ইলার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

উত্তরে নিরুপমা আরও কি বলতে চায়, কিন্তু পারে না। ঠোঁট দুটো কান্নায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। দেখতে দেখতে সারা মুখ নীল হয়ে আসে।

ইলা সুবিমলের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলে ওঠে—"এম্বুলেন্সে একটা খবর দিলে হতো না! এখনও হয়তো সময় আছে।" "এম্বুলেন্সে! দেখি কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন আছে কি না।" সুবিমল দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেলো।

*   *   *   *

নিরুপমার মৃত্যুর পর ময়না-তদন্তে ডাক্তার যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন, তা শুনে ইলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিরুপমার মত মেয়ের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয়েছিল এমন অঘটন ঘটানো ইলা তা ভেবে উঠতে পারে না। পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় জানা গেছে যে, নিরুপমা ছিল তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

হয়তো ভুল! মুহূর্ত্তের ভুলে নিরুপমা বিচ্যুত হয়েছিল তার নারী-জীবনের আদর্শ থেকে। না-হয়, অবস্থার বিপাক তাকে ঠেলে নিয়ে গেল অধঃপতনের পথে।

আজ আর ইলার বুঝতে অসুবিধা হলো না, কেন নিরুপমার মুখের হাসি নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হতো, যেন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে জীবন-পথের একটি পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাই বলতো না কারো সঙ্গে। অনেক দিন ইলা তাকে প্রশ্ন ক'রেছে, কিন্তু সে জবাব দেয়নি। অসহায় দৃষ্টিতে ইলার মুখ পানে চেয়ে হয়তো একটু হাসবার চেষ্টা করেছে; নিতান্ত ফিকে একটু হাসি ঠোঁটের কোণে জেগেই আবার মিলিয়ে গেছে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

একা নিরুপমা নয়। অমনি কত অসহায় মেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পীড়নে অতলস্পর্শ অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কেউ ঝড়ের ঝাপটায় নীড়-হারা পাখীর মত ছিন্নপক্ষ হয়ে উড়ে পড়লো ক্লেদাক্ত নরকের পঙ্কিল আবর্ত্তে, কেউ হলো গণিকা, কেউ বা ঘর ছেড়ে পথে নামলো নারীর সব মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে। ঝড়ের রাতে যাদের জীবনের জীর্ণ নৌকা বন্দর খুঁজে পেয়েছে, তারা কোন রকমে হয়তো প্রাণে বেঁচে আছে, দু'বেলা দু'মুঠো মোটা ভাত আর মাথা গুঁজবার একখানা কুঁড়ে ঘর খুঁজে নিয়ে। যারা তা পারেনি, তারা না খেতে পেয়ে তিল তিল ক'রে ধুঁকে মরেছে। যক্ষ্মা না-হয় কুৎসিত ব্যাধি আশ্রয় করেছে তাদের সর্ব্বাঙ্গে।

সুবিমলের মুখে নিরুপমার খবরটা শুনে ইলা যেন হতবাক্ হয়ে তার মুখপানে চেয়েছিল। ইলার অবস্থাটা বুঝতে সুবিমলের দেরী হয়নি।

সর্ব্বেশ্বর আচার্য্যের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা যে কত দূর আত্ম-বিস্তার করেছে, তা জেনে ইলা শিউরে ওঠে। উৎসুক দৃষ্টিতে সুবিমলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—"পুলিশ কোন ষ্টেপ নেবে না, এর?"

ছোট একটু হাসির সঙ্গে সুবিমল বলে—"হয়তো নেবে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের মত ধুরন্ধরকে শায়েস্তা করা সহজ নয়।"

*   *   *

বাইরের জগতের সঙ্গে ইলা যত মুখোমুখি দাঁড়ায়, বাস্তবতার নির্মম সংঘাতে ওর অন্তর তত ক্ষত-বিক্ষত হয়। নিরুপমার আত্মহত্যার কথা ও যেন কোন রকমেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। নিরুপমা মরে বেঁচে গেল। কিন্তু বেঁচে থেকে যারা তিল তিল ক'রে মৃত্যুকে হজম ক'রে চলেছে, তাদের কথা ভাবতে আরও ভয় করে। বাপ-মাও বাধ্য হয় সন্তানকে নরকের পথে এগিয়ে দিতে। বাঁচবার জন্য মৃত্যুর কি তাণ্ডব উৎসব সুরু হয় মানুষের জীবনে! সমাজের কাঠামো জীর্ণ কংকালের মত খুলে পড়ে। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বজ্রকীটের দংশনে ঘুণ ধরে যায়। তবুও জীবনকে তারা পারে না অস্বীকার করতে, যূপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে দিয়ে রক্ত-মাংস নিয়ে বেঁচে থাকবার মূল্য দেয়। দুঃস্বপ্নের মত রাতারাতি বদলে গেল একটা জাতির জীবন-পট! ভাবতে মাথার ভিতর ঝিম্-ঝিম্ ক'রে ওঠে।

সেদিন ধর্ম্মতলার মোড়ে ইলা নিজের চোখে দেখেছে দুটি বাঙ্গালী মহিলাকে। প্রিয়া নয়, মায়ের মূর্ত্তি। তবুও যেন কোথায় তাদের বেদনা। মনে হয়, উই পোকায় বুকের ভিতরটা ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে। হয়তো দুই বোন। চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল একদিন। কিন্তু গালে মেছেতা পড়ে মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরে প্রবেশ করেছে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশী নয়।

ইলা দেখে চম্‌কে উঠলো। এক জনের সঙ্গে একটি ছেলে, আর এক জন একটি মেয়ের হাত ধরে ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে এলো। ঠিক ইলার সামনাসামনি ফুটপাতে এসে দাঁড়ালো ওরা। ছেলেমেয়ে দুটির গায়ের রং কালো, পুরু ঠোঁট সামনের দিকে উল্টানো; মাথায় একরাশ কর্কশ কোঁকড়া চুল ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। দেহের গঠন বাঙ্গালীর নয়। যেন নিখুঁত ক'রে গড়ানো নিগ্রো শিশু। ইলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পথচারীদের দৃষ্টিও শিশু দুটির দিকে। ভদ্রমহিলাদের চোখে-মুখে কোথাও বিজাতীয় গঠনের ছাপ নাই। কিন্তু ছেলেমেয়ে! বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ের পেটে নিগ্রো শিশু কেমন করে এলো ইলা ভেবে উঠতে পারে না। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে দুজন তরুণ হন্-হন্ ক'রে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের কাছাকাছি এসে তিলার্দ্ধ কাল থমকে দাঁড়িয়ে বলে গেল—"ওয়ার প্রডাক্টস্। বোধ হয় ফ্রন্‌টিয়ারে চাকরি নিয়ে গিয়েছিল।"

ভদ্রমহিলাদের মুখের ওপর দিয়ে নিমেষে কালো ছায়া খেলে গেল। হয়তো সত্যি তাই। প্রতিবাদ করবার মত বোধ হয় কিছুই ছিল না তাদের।

ইলার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শির-শির ক'রে উঠলো। বুকের ভিতর তীব্র প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু মুখে কোন কথা জোগায় না। ইলা ভাবে। সারা দেহ-মনে নেমে আসে অবসাদ। এই তো সেদিনের কথা। যুদ্ধের আগে যে-বাংলা দেশকে সে নিজের চোখে দেখেছে। বয়েস তখন যত কমই থাক, সে-বাংলার [illegible]

ছবি আজও ওর মনে আঁকা আছে, ও দেখেছে বাংলা দেশের বধূর রূপ, দেখেছে মায়ের মূর্ত্তি। আজ ভাবলে মনে হয়, সে মূর্ত্তি ছিল সমাজ-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর! নির্ম্মল হাস্যময় মুখ। পর্য্যাপ্ত স্নেহে আপ্লুত অন্তর! দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল জাতির সেই জীবন-ধারা? গ্রামের বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে মা যখন ঘরে এসে শাঁখ বাজাতেন, ইলা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকতো মায়ের মুখপানে। সে কথা আজও মনে জ্বল্-জ্বল্ করে।

*   *   *   *

অফিসের আবহাওয়ায় ইলার মন ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে ওঠে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার জন্যে অর্থের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে অস্বীকার করে না। তবু যেন মনে হয়, এ জায়গা ওদের জন্যে নয়। বাইরের জগতে, সমাজে আরও অনেক কাজ আছে যাতে ক'রে জীবন-যুদ্ধের রসদ যোগান যায়।

দাস সাহেব এত দিন জানতেন যে, ইলার চাকরি না করলেও চলে। তাই তাঁর ব্যবহারে অনেকখানি শালীনতা ছিল। কিন্তু ক্রমেই যখন বুঝলেন যে, ইলার চাকরি সখের নয়, প্রয়োজনের তাগিদে, তখন থেকেই যেন তাঁর ব্যবহার আস্তে আস্তে বদলে গেল। ইলার দিক থেকেও যে কোন পরিবর্ত্তন হলো না, তা নয়। প্রথমে যে উৎসাহ তার ছিল, সে উৎসাহও যেন ক্রমেই শিথিল হয়ে এসেছে। ঘানির বলদের মত এই একঘেয়ে জীবনের গতি তার আর ভাল লাগে না। মন তিক্ত হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্যহীন জীবনে দাসত্বের গ্লানি জমে উঠতে দেরী লাগে না।

মনের সঙ্গে সঙ্গে ইলার দেহও অবসন্ন হয়ে এলো। এক দিকে সংসারের টানাটানি আর এক দিকে মায়ের অসুখ! অফিসে চাকরি, রোগ-শয্যায় মায়ের শুশ্রূষা, ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে দৈনন্দিন নিঃস্ব জীবনের করুণ কাহিনী শোনা আর সেই সঙ্গে ভাই-বোনদের মানুষ ক'রে তোলা—সব কিছু একসঙ্গে জোয়ালের মত ইলার ঘাড়ে চেপে বসেছে। না পারে সইতে, না পারে বইতে।

ইলাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখে ইন্দিরা দেবীর হতাশা আরও বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু ইলা আর পারে না। সান্ত্বনায় মনের উৎসাহ ফিরে এলেও দেহের উৎসাহ ফেরে না। মনে হয়, শরীরের সবটুকু শক্তি বুঝি ফুরিয়ে গেল।

মায়ের অসুখ কমে না। ধীরে ধীরে তিনি যেন চিরবিশ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে চান। এত বড় সংসারের ভার ইলার উপর দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলেও, দুশ্চিন্তা বেড়ে ওঠে চতুর্গুণ।

চার দিন ইলা অফিসে যায়নি। নব-ভিটা ও সেবা-সঙ্ঘের কাজেও যেতে পারে না। রাত-দিন মায়ের শয্যা-পাশে ব'সে থাকে। নিজের শরীরও হয়ে উঠেছে অচল। দীনেশ বাবুর মনে এত দিন যে সুস্থতাটুকু ছিল, এখন তাও লুপ্ত হতে বসেছে।

ইন্দিরা দেবী মাঝে মাঝে উতলা হয়ে ওঠেন ইলার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে, চাকরি, টিউসানি—অনেক কিছু করে আজ ইলা সংসার ধরে রেখেছে সত্যি, আত্মীয়-স্বজনের দরজায় হাত পেতে জীবন ধারণ করার চেয়ে অনেক ভাল। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতম দিনে মেয়েরা দলে দলে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে। ইন্দিরা দেবী তাদের এই বলিষ্ঠতাকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাঁর মন হতাশ হয়ে পড়ে এদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে। বয়েস যখন যৌবনের সীমা অতিক্রম ক'রে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা বাড়াবে, তখন এরা দাঁড়াবে কোথায়? দু'মুঠো পেটে খেয়ে, দু'খানা রঙীন শাড়ি প'রে নগরের পথে আকালী সৈনিকের মত যুদ্ধজয় ক'রে ফেরাই কি জীবনের সব? নারীত্বের বিকাশ যে সংসার—সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়, তার স্বাদ পাবে না কোন দিন? যুদ্ধজয়ের ঝোঁক যেদিন কেটে আসবে, ওরা খুঁজে মরবে শান্তির নীড়। কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না জীবনকে নতুন রূপ দেবার। ইলার সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ ইন্দিরা দেবীর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত ভেসে ওঠে। চোখ দুটো জলে ভ'রে ওঠে।

ইলা হয়তো এগিয়ে যায় মায়ের একান্ত কাছে। গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কাঁদছো কেন, মা? যন্ত্রণা কি বেড়েছে?"

শীর্ণ হাতখানি ইলার কোলের উপর রেখে মা বলেন—"যন্ত্রণা নয় মা! ভাবছি, কেমন ক'রে সংসারের চাপ থেকে তোকে রেহাই দেবো। দিন চলবেই, পড়ে থাকবে না। যা থাকবে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার কোন পথই আর থাকবে না সেদিন।"

মায়ের কথার পুরোপুরি তাৎপর্য্য ইলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। নিঃশব্দে মুখপানে চেয়ে থাকে। মনে হয়, মায়ের মনে কোথায় যেন ব্যথা! সে ব্যথা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দু'চোখ বয়ে জল ঝরে। কিন্তু কেন? কিসের ব্যথায় মা আজ এমন আকুল হয়ে উঠলেন?

হঠাৎ মনে হলো বাইরে সুবিমলের কণ্ঠস্বর। ইলা কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। হয়তো সুবিমল চার দিন ধরে তার কোন খবর না পেয়ে ছুটে এসেছে ওদের বাড়ীতে।···সর্ব্বেশ্বর আচার্য্যকে পুলিশ গ্রেফ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। কলোনীতে তাই নিয়ে সুরু হয়েছে গোলযোগ। ওরা দু'দলে বিভক্ত হয়েছে। অবস্থা জটিল হয়ে উঠতে কতক্ষণ! সুবিমলের উপর সর্ব্বেশ্বরের আক্রোশ কম নয়। লোকটা সব পারে। হয়তো মামলায় জড়িয়ে দেবে। নিরুপমার আফিং খাওয়ার ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে বেশ দল পাকিয়ে উঠেছে।

ইলার মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। ক'দিন খবর না পেয়ে হয়তো তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁর? বাবা চাকরি মেনে নিলেও মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের অবাধ মেলামেশা আদৌ পছন্দ করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য আজও তাঁর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর মন-মেজাজ হয়ে আছে বিভ্রান্ত। যদি বাবা কিছু বলেন!

যদি নয়, ইলা যা ভেবেছিল, তাই। বাইরের দরজায় বাবার গলা শোনা যায়—"যান্, যান্ এখান থেকে। মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে না। এখনও আমার সমাজ আছে। ইজ্জৎ সবারই সমান।"

ইলার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর-থর করে কেঁপে উঠলো। 'ঠিক তাই, কোন ভুল নেই।'—ইলা আর বসে থাকতে পারে না। তার মুখ-চোখের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ইন্দিরা দেবী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—"ও কি! অমন করছিস্ কেন মা? কি হলো?"

"কিছু না।"—ধীরে ধীরে ইলার মাথাটা লুয়ে পড়লো মায়ের বুকের ওপর।

চোখের জলে মায়ের বুক ভিজে ওঠে। ইলা কান্নায় ফুলে-ফুলে ওঠে। ইন্দিরা দেবী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন—"কাঁদিস্ না মা! বুকটাকে পাথর কর। নইলে সংসারে বাঁচতে পারবি না।"

ইলার জীবনে কোথায় কোন্ পথে ঝড় বয়ে গেল, ইন্দিরা দেবী তা বুঝতেও পারলেন না।

নিরুপমার মৃত্যুর কালো ছায়া রাহুর মত গ্রাস ক'রে বসলো নব-ভিটা কলোনীর সবটুকু জীবনীশক্তি। সারা পল্লী যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়লো এই অপমৃত্যুর বিভীষিকায়।

পুলিস তদন্তের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, তাতে সর্ব্বেশ্বর আচার্যও যে জড়িয়ে পড়লো না, তা নয়। তবে সর্ব্বেশ্বর ধুরন্ধর। সে ভাল ভাবেই জানে আত্মরক্ষার কৌশল। তাই কিছু টাকা ব্যয় ক'রে স্বচ্ছন্দে সে বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। উপরন্তু, বেশ একটা সুযোগ আপনা থেকেই এসে পড়লো সর্ব্বেশ্বরের হাতে। কলোনীর অধিবাসীদের মধ্যে বেধে গেল দ্বন্দ্ব। ছিদামের পক্ষ অবলম্বন ক'রে যারা পূর্ব্বেই সর্ব্বেশ্বরের বিরোধী হয়ে উঠেছিল, নিরুপমার অপমৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে তারাই সর্ব্বেশ্বরকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিল সব চেয়ে বেশী। এবার সর্ব্বেশ্বর তাদের ফেললো বেড়াজালে। দায়মুক্ত হয়ে সে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল জমিদারের কাছে। জমিদার এত দিন উচ্ছেদের যে পরিকল্পনা ক'রেও সফলকাম হ'তে পারেনি, সর্ব্বেশ্বর নিজেই তার পথ দেখিয়ে দিল। জমিদারের সঙ্গে সর্ব্বেশ্বরের হলো গোপনে আপোষ-রফা।

নব-ভিটার প্রায় অর্দ্ধেক জমি সর্ব্বেশ্বর আচার্য জমিদারের হাতে প্রত্যর্পণ করে অবশিষ্ট জমির জন্যে আবার কিছু টাকা সেলামি দিয়ে তার পূর্ব-বন্দোবস্ত আবার কায়েমী ক'রে নিল। কলোনীর প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীর নামে জমিদার দায়ের করলেন মামলা। যারা সেখানে জমি বেআইনী-দখল ক'রে বাড়ী-ঘর তুলে বসেছে, তাদের উচ্ছেদ করবার জন্য জমিদার প্রার্থনা করলেন সরকারী সাহায্য।

সুবিমল যত দিন কলোনীতে যাতায়াত করতো, তত দিন অধিবাসীদের মনে ছিল সাহস, কিন্তু হঠাৎ সুবিমল ও তার সেবাসঙ্ঘের লোকেরা যাওয়া-আসা বন্ধ করলো দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো। বিশেষ ক'রে ছিদাম হয়ে পড়লো সব চেয়ে বেশী বিব্রত। সর্ব্বেশ্বর যখন তাকে ভিটে-ছাড়া করবার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে এনেছিল, তখন একমাত্র সুবিমল ও তার দলবল দেখেই সে ঘাবড়ে গিয়েছিল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু আড়ালে ছিদামকে ডেকে ক্ষুব্ধ আক্রোশে বলেছিল—"এক মাঘে শীত যায় না, ছিদাম, সুদে-আসলে আদায় দিতে হবে। ভুলে যেও না যে, সর্ব্বেশ্বর জাতিসাপের বাচ্চা। সুযোগ আবার তার আসবেই।"

সুযোগ সত্যি এলো। ছিদামের পক্ষ অবলম্বন ক'রে তখন যারা সর্ব্বেশ্বর আচার্যকে বিব্রত ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছিল, এখন তারাই উল্টে পড়লো সর্ব্বেশ্বরের খপ্পরে। জমিদারকে হাত ক'রে আচার্য মশায় উচ্ছেদের মামলা বেশ জট পাকিয়ে তুললেন। সালিয়ানা দেড়শো টাকা খাজনা স্বীকার ক'রে, তিনি যে জায়গা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন জমিদারের কাছে, এবার আপোষ-রফা ক'রে স্বেচ্ছায় তার অর্দ্ধেক ইস্তফা দিলেন। এই ইস্তফা দেওয়া জমির চৌহদ্দি এমন ভাবে নির্ণয় করে দিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের বাড়ীগুলো প্রায় সবই পড়লো সেই সীমানায়। একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসে যারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে ভিটে তৈরি করেছিল, আবার ভূমিকম্প সুরু হলো তাদের বাস্তু-ভিটার কাঁচা মাটিতে।

* * * *

কলোনীর সান্ধ্য বিদ্যালয় ও শিল্পায়তন প্রায় মাসখানেক থেকে বন্ধ! ইলা আর আসে না। মাঝে অণিমা কয়েক দিন এসে ফিরে গেছে। কলোনীর যে সব ছেলেমেয়ে তাদের ঘিরে দু'দিন আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল, তারা আবার ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। শুধু কলোনীর ছেলেমেয়েরাই যে ম্রিয়মান হলো, তাই নয়—অল্প দিনের ভিতরেই সুবিমলের সান্নিধ্য আর নিরন্ন উদ্বাস্তু-পল্লীর মায়া যেন ইলার মনকে এক নূতন রাজত্বে টেনে নিয়েছিল। নারী-জীবনের অনভ্যস্ত অধ্যায়—সরকারি অফিসের চাকরি তার মনে যেটুকু গ্লানি আর অবসাদ সঞ্চিত ক'রে তুলতো তার অনেকখানি যেন ধুয়ে-মুছে যেত সেবাসঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে। ইলা যখন অক্লান্ত উদ্যম নিয়ে আপন মনে কাজ ক'রে যেত, সুবিমল তার মুখপানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। বঞ্চিত মানুষের প্রতি ইলার পর্য্যাপ্ত মমতা যেন চোখে-মুখে উথলে উঠতো।

ইলার চোখে চোখ পড়তে সুবিমল কত দিন অপ্রস্তুত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইলার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। জীবনে যে আনন্দের স্বাদ ছিল শুধু মাত্র কল্পনায়, সে আনন্দের শিহরণ ইলা অনুভব করেছে তার মনের প্রত্যেকটি কন্দরে। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর থেকে তিল তিল ক'রে যে রিক্ততা সারা অন্তর জুড়ে বসেছিল, সে রিক্ততা যেন নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল সেবাসঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে।

ইলা ভাবতে পারে না, সুবিমলের কাছে আর সে কেমন ক'রে মুখ দেখাবে। কোন অপরাধ, কোন অন্যায় তো তিনি করেননি। ইলা স্বেচ্ছায় যতটুকু অধিকার দিয়েছিল, তার বেশী তিনি দাবী করেননি কোন দিন। সেদিন হঠাৎ যে ভাবে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে এগিয়ে এসেছিলেন ইলার বাড়ীর পথে, সেটাকে অন্যে যা-ই ভাবুক, ইলা ভাবে তার জীবনের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। কিন্তু এ কি হলো? আচম্বিতে বাবা সুবিমলকে যে অপমান ক'রে বসলেন, সুবিমল হয়তো সারা জীবনে তা ভুলতে পারবে না। কথাটা ইলা যখনই ভাববার চেষ্টা করে তার মগজের মধ্যে চিন্তাগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। নিজের কানে না শুনলে, ইলা হয়তো এ কথা বিশ্বাস ক'রতেও পারতো না কোন দিন।

রোগ-শয্যায় শুয়ে ইন্দিরা দেবী সবই লক্ষ্য করেছিলেন। ইলার মুখপানে চেয়ে তাঁর বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি যে, ওর মনের সবটুকু আশা ও আনন্দ যেন হঠাৎ নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। একমাত্র অফিস যাওয়া-আসা ছাড়া ইলা আর বাড়ীর বাইরে যায় না। সংসারে টাকা-পয়সার প্রয়োজন দিন দিন বেড়ে চলেছিল, তাই চাকরিটা সে ছাড়তে পারেনি। টিউসানিটা না ছাড়লেও কিছু দিন থেকে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করেছে।

বলবার ইচ্ছা থাকলেও ইন্দিরা দেবী সংকোচে ইলাকে কিছু

বলতে পারেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, খেয়ালের ঝোঁকে স্বামী হঠাৎ সুবিমলের প্রতি যে ব্যবহার করে বসেছেন, তার গ্লানি সহজে মুছে ফেলা যাবে না। অথচ ইলার অন্তরের সবগুলি তার যেন একসঙ্গে বেসুরো হয়ে উঠেছে, সেটা ইলা কোন সময়ের জন্যে মুখ ফুটে না বললেও, মায়ের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজের শরীর দিন দিন অচল হয়ে আসে। অর্থাভাব, দুশ্চিন্তা ও সর্ব্বস্ব হারানোর রিক্ততায় স্বামী পাগল হয়ে উঠেছেন। সময় থাকতে তিনি যদি প্রলেপ না দেন, ইলা হয়তো অভিমানভরে দূরে স'রে যাবে, না-হয় তার বাবাকে ভুল বুঝে তাঁর প্রতি করবে অবিচার।

ইন্দিরা দেবী ভেবে উঠতে পারন না, কেমন ক'রে স্বামীকে বুঝিয়ে বলবেন সব কথা। তিনি জানতেন যে, দীনেশ বাবু একবার যা ভাল মনে ক'রে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, তা থেকে সহজে তাঁকে টলানো যায় না। তবে তিনি নিতান্ত অবুঝ নন। সংরক্ষণশীল হলেও দীনেশ বাবু উগ্রপন্থী ছিলেন না। মনের ভিতর যে আভিজাত্য তাঁর সারা জীবন মাথা উঁচু করে ছিল, সে আভিজাত্যটুকু হয়তো তিনি শত ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়েও রক্ষা ক'রে চলেছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে সামাজিক জীবনে যে প্রগতি যুগধর্ম্মে আত্মবিস্তার ক'রেছিল, তাকে মেনে নিতে তিনি কোন দিনই পিছিয়ে যাননি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশের যে সভ্যতার সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনে পরিচয় হয়েছিল, সে সভ্যতার পট শতাব্দীর মাঝখানে এসে যেন থমকে দাঁড়ালো। দেশের পরিস্থিতি গেল বদলে; সেই সঙ্গে সভ্যতার পালে লাগলো উল্টো হাওয়া। দেশের সভ্যতা যতখানি বদলে গেল, দীনেশ বাবুর পারিবারিক জীবনে ততখানি পরিবর্তন না দেখা দিলেও, যেটুকু স্বাভাবিক সেটুকু ঘটলো। মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে নূতনত্ব এলো, তার প্রথম সোপান হলো ইলা। তাঁদের বিরাট পরিবারের ভিতর ইলাই প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় ডিগ্রি পেয়ে সকলের চোখে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো। দীনেশ বাবু ইলার অবাধ চলা ফেরাতে বাধা দেন নি কোন দিন। ইলাও অবশ্য কোন দিন এমন কিছু ক'রে বসেনি, যাতে দীনেশ বাবুর অন্তরে আঘাত লেগে তাঁর মৌলিক আদর্শবাদ ভেঙে যায়। কিন্তু এত কাল পরে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বিষম সংঘাতে দীনেশ বাবু যেন হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন।

[ক্রমশঃ।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

ঊনত্রিংশ

নিকটেই মুক্তাদের বাড়ী। দিবাকরের ইচ্ছা হল একটু ঘুরে দেখে যাবে, কেমন আছে ও। অনেক দিন তো কোন খবরাখবর নেই। কে সংবাদ নেবে? দিবাকর? সম্পূর্ণ অসম্ভব। এত যে ঝড়-তুফান যাচ্ছে তাকি ও টের পায় না? জানে সবই থাকে শুধু চুপ করে। প্রাণের টান বড় জিনিষ। সে টান তো ওর নেই। আছে শুধু বচন-বিন্যাস। তাতে ফল হয় কি? দিবাকরের উচিত নয় এমন অনাহুতের মত যাওয়া। তবু একবার যাবে কাছে যখন এসেছে। দেখে যাবে শুধু চোখের দেখা। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন করবে, গয়নার জোগাড় হল কি? এত যে সোনা-দানা পছন্দ করে, তার গয়না কি থাকতে পারে অপরের জিম্বায়? কি কথার গাঁথুনি, একেবারে সাপকে নেউল বুঝিয়ে দেয়, জলকে দুধ। যাক গে, তবু যখন পথের পাশে তখন একটা মাত্র খোঁজ নিয়ে যাবে দিবাকর।

মন্দ লাগছে না ভোরের হাওয়া। তিলে তিলে ছন্দ জাগে। পরিশ্রমের ওপর এত যে পরিশ্রম তবু ভাল লাগে বৈঠা মারতে। জল এখানে বেশী। তাই লগি চলে না। বৈঠার চাল্লিতেই এগিয়ে চলে ছোট টালাইখান।

এত বড় একটা গুরু সমস্যায় এমন আকস্মিক সমাধান সে আশাই করতে পারেনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করে। ভাল লাগে একটু হালকা হল্লায় আজকার দিনটা অন্ততঃ ব্যয় করতে। তাই মুক্তাকে প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি প্রগল্‌ভা নারীর সংগ। ওর অংগে অংগে যেন আনন্দ। নাচে দেহের একটুখানি হিল্লোলে। ও হয়ত বোঝে না, কিন্তু দোলে অঙ্গের মর্ম। এমন একটা প্রয়োজন কি, তবু আজ দিবাকর কামনা করে গয়না লোভা সেই পড়শীর মেয়ে মুক্তামালার সান্নিধ্য।

চির অবোধ্য টানে নৌকাখানা এগিয়ে চলে নেচে।

কতখানি অগভীর জায়গা। কোন দাম জংগল নেই দশ-বিশ বিঘার মধ্যে। কেবল মাঝে মাঝে শাদা ফুল—ঢলক খেলছে হাওয়ায় দুলে দুলে। দু'-একটি ছোট-বড় পদ্ম পাতা—কয়েকটি অনামা ঘাস। তার ভিতর বুনো হাঁস ঝাঁক বেঁধে বসে রয়েছে। ছবির মত সুন্দর অথচ নীরব। হঠাৎ উড়ে গেল দিবাকরকে দেখে।

কিছু দূরেই একখানা ডোঙা। তার ওপর এক জন শিকারী। দু'পাশে দু'জন বৈঠাধারী বাইছা। শিকারীটি বাঙালী বাবু নয়, সাহেব। বন্দুক নামিয়ে ডাকল দিবাকরকে।

'তুমি যে শিকার উড়িয়ে দিলে রাসকেল?'

'আমি!'

'হ্যাঁ তুমি।' সাহেব বন্দুকের নলটা তুলে বলল, 'চলো ঐ বোটের কাছে।'

'বোট!' দিবাকর জিজ্ঞাসা করল, 'কার বোট? কই বোট?'

'ঐ যে দেখছ না, তোমার বাবার—দেব নগরের হাকিমের।'

সংগের বাইছারা শংকিত হয়ে ওঠে। তারা তো চেনে এই দিবাকরকে। অথচ সাহেবকেও হুঁশিয়ার করে দেওয়ার মত তাদের

সাহস নেই। সত্ত এসেছে কলকাতা থেকে। আবার দিদিমণির নাকি বন্ধু। ওরা ঠাওরা-ঠাওরি করেছে প্রথম শুনে।

দিবাকর বুঝতেই পারে না যে সাহেবটির মাথায় ছিট আছে নাকি। নইলে সুস্থ মানুষ এমন বা-তা বলতে পারে। অন্য সময় হলে কি যে কাণ্ড হত বলা কঠিন। আজ কিন্তু দিবাকর এ সব উক্তি গায় মাখল না। বলল, 'আমার সময় কম আইজ, আর একদিন যামু হাকিমের কাছে।' সে যথারীতি আরম্ভ করল বৈঠা চালাতে।

সাহেব একেবারে ফেটে পড়ল। 'পাকড়াও, পাকড়াও আসামী।'

বাইছা দু'জন বলে, 'গোঁসাই, চল না একবার বড় নায়ের কাছে। হুজুর নেই, আছেন দিদিমণি। তুমি না গেলে আমাদের মাথা থাকবে না।'

'দিদিমণি!' বৈঠা থামাল দিবাকর। 'কার কথা কইলা?'

'হুজুরের কন্যা, আইছেন জল-কেলি করতে।' একটি বাইছা জবাব দেয়। 'বোঝলা মা?'

'বোঝলাম তো—সেই সভাস্থ ঠারইন! কি কও?' এবার বোটের দিকে সরসর করে নিজেই এগিয়ে চলল দিবাকর।

'কুন্তলা, This devil has murdered the game…'

'Please shut up Mr. Dut. ওঁকে তো চেনেন না, উনি এই মৌজার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। নাম দিবাকর। ও কি, আসুন এই নায়ে।'

'পেন্নাম দেবী!'

'নমস্কার জন-গণ-মন-অধিনায়ক হে। দূর থেকে আলাপ না করে নাও ভিড়ান। ও কি, বাইছারা সিঁড়িটা এগিয়ে নাও।

'না, সিঁড়ির দরকার নাই।' দিবাকর অবলীলাক্রমে নীচু নাও থেকে উঁচু নায়ে লাফিয়ে ওঠে। উঠেই সিঁড়িখানা এগিয়ে দেয় মিষ্টার ডাটের দিকে। 'দৈবের ইচ্ছা দেবতাও রোধ করতে পারে না—হঠাৎ দেখা হইয়া গেল!'

মিষ্টার ডাট লক্ষ্য করল, দুজনার মুখে-চোখেই একটা বিদ্যুৎ ঝলকে গেল পলকে। এ তো বড় অদ্ভুত!

কুন্তলা বলল, 'আকস্মিকই বটে! আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে সেবার দেখা ইস্কুলে, আজ আবার এই বিলে। আমরা ঈশ্বরকে মানি না, কিন্তু এমন এক-একটা ষ্ট্রেঞ্জ ইনসিডেণ্টও ঘটে। তখন সে বেচারীকে ধন্যবাদ না জানালেও যেন মন ভরে না। কি বলেন মিষ্টার ডাট?'

মিষ্টার ডাট এতটা খুশি হওয়ার কারণ ঠিক বুঝতে না পারলেও নিজেদের উঁচু স্তরের প্রথানুযায়ী একটু একটু হাসতে বাধ্য হয়। অনুমোদন করে যায় বিরস নাটকের সংলাপ।

দিবাকর তার ছোট নাওখানা 'পারা' দেয় প্রকাণ্ড সাদা বোটের সংগে। শক্ত হাত-পা ধোয় চট করে বালতি ডুবিয়ে জল তুলে।

'আপনি বসুন, ও কি, ওরাই তুলে দেবে জল।'

'ক্যান?'

'আপনি অতিথি।'

'তাও ভাল। আমি ভাবছিলাম অপনে বুঝি ঠাহর করছেন আমার হইছে ভীমরতি।' হো-হো করে হাসে দিবাকর। একটা ছেঁড়া আধময়লা গামছা দিয়ে মুখ মোছে—যা সে সর্বদা সংগে নিয়ে চলে। এখন রাখল কাঁধের ওপর ফেলে।

'ওখানা রেখে আসুন—এসে ভিতরে বসুন।'

'যদি ভুইল্যা যাই, বেশী সময় তো বসুম না।'

কোথায় যাবে, এত ব্যস্ত কেন? অব্যক্ত একটা বেদনা জন্মে কুন্তলার মনে। একবার যে কেউ তার সংগ পেয়েছে, তাকে তো এত সহজে ছেড়ে যেতে চায়নি। এ মানুষটি কেমন—সাধারণের চাইতে একেবারে পৃথক্, অথচ অতি সাধারণ এর চাল-চলন। ভেরি সিম্পল, বাট ভেরি প্রমিনেণ্ট!

ভিতরের কামরায় সুন্দর একখানা দামী কার্পেট বিছান। তার ওপর তিন-চারখানা হাল্কা সৌখিন বেতের চেয়ার। মাঝখানে একটি পিতলের নক্সি টেবিল। ছোট ছোট টিপয় আছে গুটি তিনেক। ফুলদানীতে ফুল রয়েছে একগুচ্ছ।

দিবাকর উঁকি-ঝুঁকি মারে। সাহস হয় না ভিতরে পা বাড়াতে। কি সুন্দর রঙিন কোঠাটি। কেমন সব নক্সা। একবার দেখলে আর চোখ ফেরান যায় না। মনে হয় যেন গল্প-লোকের স্বপ্ন জড়ান আছে ঐ ঘরে। পাতাল থেকে এই এখনই উঠল যেন নাওখানা। যে রূপসী তাকে ডাকছে, সে কি তবে পাতাল-কন্যা? দিবাকরের কাছে যেন দিনের আলোতে গল্পের লাবণ্য এবং ভ্রম ছড়িয়ে যায়।

আবার অনুরোধ জানাল কুন্তলা। দিবাকর তবু ইতস্তত করতে লাগল। 'আমাগো উপযোগ্য নয় ঠারইন—লোকে নিন্দা করবে—তার চাইতে বসি বাইরে।' সে একটা জলচৌকি টেনে আনল।

এ বিদ্রূপ না উপেক্ষা অথবা কোন বিশেষ ইংগিত ঠিক বুঝতে পারল না কুন্তলা। সে কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। দিবাকরের এত পার্থক্য বোধ করার হেতু কি? এবার নিয়ে দু'-দু'বার দেখা—এখনও কি সে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হৃদয়টা দেখতে পেল না? তার বাইরের যত সমারোহই কি ঘটাল এ বিড়ম্বনা? মিষ্টার ডাট একটা তির্যক প্রশ্নের মত সুমুখে দাঁড়িয়ে—এর চাইতে বেশী একটা আগ্রহ দেখান নিতান্ত অশোভন—কুন্তলা বলল, 'অতিথি তো আপনিও, আপনাদের মর্জি বোঝা দায়—থাকবেন নাকি বন্দুক হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে। যান পোষাকটা বদলে আসুন।'

'না, না…' একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মিষ্টার ডাট। সে ত্বরায় ভিতরে চলে গেল পোষাক বদলাতে।

বড় কোঠার সংলগ্নই ছোট দুটি কোঠা। একটিতে যখন মিষ্টার ডাট প্রবেশ করল অপরটিতে গিয়ে ঢুকল কুন্তলা। দরজা দুটো—ভিতরে যে পার্টিশন রয়েছে তা জানে না দিবাকর। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে উঠল। নিজেকে নিজে সে প্রশ্ন করতে লাগল—কেন সে এখানে এসেছে? এমন একটা প্রয়োজন ছিল কি? কোন কিছু না ভেবে-চিন্তে সে সরসর করে নাও চালিয়ে এসেছে। এসে রয়েছে একা একা বসে। দিবাকর উঠে দাঁড়াল।

মুক্তা, কত স্পষ্ট কত প্রাঞ্জল মুক্ত। কোন প্রকোষ্ঠের অন্তরালে গিয়ে সে কোন দিন তাকে অপেক্ষমান করে রাখেনি। বাড়ায়নি কখনও তার ব্যগ্র আকুলতা। অন্দরে-বাইরে তার একই দ্যুতি—

সমান শুভ্রতা। বকের পাখনার মতই হালকা মন। শুধু একটু আছে প্রগলভতা। তা থাক, ঐ তো তার শোভা—তাই তো সে মনলোভা দিবাকরের কাছে।

দিবাকর 'পারা' (বাঁধন) খুলল তার টালাইখানার।

'কোথায় যাচ্ছেন? এ কি ভদ্রতা? পালাচ্ছেন না বলে?' কুন্তল-আকুল মাথাটি নাড়িয়ে, ছড়িয়ে একরাশ উগ্র বকুল গন্ধ, কুন্তলা বেরিয়ে এসে বলল, 'ডাকব নাকি মাঝি-মাল্লাদের, পাকড়াতে বলব নাকি আসামী?' কুন্তলার হাতে যেমন অপরিচিত নানা প্রকার খাবার পরনেও তেমনি নানাবিধ অজ্ঞাত বেশভূষা।

লজ্জিত দিবাকর ফিরে এলো। সজ্জিতা কুন্তলার সঙ্গে প্রতিবাদ করা দায়। সে এবার এসে ভিতরে বসল যবু-থবু হয়ে।

মিষ্টার ডাটও এলো—সাজ-গোছ তার একদিকে রওনা দেওয়ার মত। সে বলল, 'আমার মনে ছিল না, একটা জরুরী মিটিং আছে আগামী কাল ছাত্রদের নিয়ে, আমি বিদায় চাই কুন্তলা। আমাকে অবশ্যই দেড়টার ষ্টীমার ধরিয়ে দিতে হবে।'

'আপনি এখান থেকেই বিদায় চান, বাবা কি বলবেন?'

'তাঁর সংগে আবার কবে দেখা হবে, এর মধ্যে আমার অক্ষমতার অপরাধ নিশ্চয় ভুলে যাবেন।' ডাট খেতে বসল।

'এঁর সংগে এখন একটু ভাল করে পরিচয় করিয়ে দেই।'

'দাও দাও, সে তো উত্তম।' খেতে খেতে ডাট একটু মাথা নোয়াল।

'ইনিই হচ্ছেন বিলগাঁর বিপ্লবী জন-নায়ক।'

'তাড়াতাড়ি যেতে হলে তো ডোঙা ছাড়া উপায় নেই?···হ্যাঁ হ্যাঁ···তারপর তারপর? বলো, বলো, কিছু মনে করো না।'

'উনি তেমন কোন লেখাপড়া জানেন না।'

'জানলেই তো হত বিপদ···এই যেমন···। মাঝিরা কি প্রস্তুত হচ্ছে?' মিষ্টার ডাট আহারে ত্রুটি করছে না। রাস্তা-ঘাটে আবার কি দুর্ভোগ ঘটে। 'কিছু মনে করবেন না মিঃ দিবাকর—Forget and forgive আমার একটু তাড়াতাড়ি কিনা।'

'কিন্তু ঐ ডোঙায় তো পাড়ি দেওয়া যাইবে না ধইন্যাখালির বাঁক। তুফান হয় বেসামাল।'

'What? তুফান? আমি তো ভাল সাঁতার জানি নে।'

'জানলেই তো বিপদ—মরে যত দুঃসাহসী সাহেব-সুধা ডুইব্যা! সেবার এক পুলিশ সাহেব···'

'Excuse me. আপনি কি কখনও···?'

'আমি কখনও মরি নাই···অশু হইছে, পড়ি নাই তুফানে—পাড়ি দিছি সময় বুইঝ্যা।'

মিষ্টার ডাটের যাওয়ায় যে বিঘ্ন ঘটল তার জন্য একটু যেন খুশিই হল কুন্তলা। 'ইনি কোনও 'ইজমে'র ধার ধারেন না। আশ্চর্য্য, এর উপলব্ধি স্বতোৎসারিত। এমন মানুষ ক'টা আছে বাঙলা দেশে?'

আজ যাওয়া হল না। আগামী কাল ছাড়া উপায় নেই। ঝাড়া চব্বিশ ঘণ্টা যদি এই ব্যাখ্যা শুনতে হয়, এবং প্রতিবার সহাস্য বদনে মাথা নাড়াতে হয় তবে হয়েছে আর কি! কেন এসেছিল ডাট এখানে মরতে। তার মুখখানা রীতিমত ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

কুন্তলা তার ধ্যান ধারণা অনুপ্রেরণা—যা কিছু দিবাকরের ওপর প্রয়োগ করবার ইচ্ছুক, সকলই রয়ে গেল।

সমঝদার ডাট সবই সয়ে বসে রইল। সে ভাবল আসামী স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে কী মুস্কিলই ঘটাল!

অবশেষে কুন্তলা থামল। সে দেখল যে, কোন খাদ্যেই হাত দেয়নি দিবাকর! 'ও কি, আপনি যে কিছু খেলেন না?'

'তুফার না হইলে ক্ষিধা পায় না—এ সময় তো খাওয়ার অভ্যাস নেই আমাগো।'

অনেক পীড়াপীড়ির পর কিছু ফল-মূল আহার করল দিবাকর। তাও যেন বহু বাছ-বিচার করে।

'এবার তা হলে আপনি না হয় স্নান করে আসুন, আমাদের রান্না প্রায় হয়ে গেছে।'

ডাট অনুমোদন করল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভাল—তাই ভাল।' সে উঠে দাঁড়াল।

কুন্তলা বলল, 'আমিও একটু সাঁতার কাটব। মিষ্টার ডাট ধড়াচূড়া খুলে রেডি হয়ে আসুন।' কুন্তলা নিজের হাতেই একটা জবাকুসুমের শিশি দিবাকরের কাছে এগিয়ে দিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল। ডাট ঢুকল পাশের কামরায় দরজা ঠেলে।

তারা দু'জনে সুইমিং কষ্টিউম পরে বেরিয়ে এসে দেখল যে দিবাকর তখনও তেল মাখেনি। কি জন্য তার মাথা যেন নীচু। তারা গিয়ে জলে নামল। কুন্তলা বলে গেল, যেন একটুও দেরী করে না দিবাকর। সে আজ আর আনন্দ সামলাতে পারছে না।

জবাবে দিবাকর নিঃশব্দে তার ছোট নৌকার বাঁধন খুলল বড় নায়ের পাশ থেকে। লগিটার এক ঠেলায় চলে গেল আড়াই রশি দূরে। কুন্তলা ডাকল, কিন্তু কোন জবাব দিল না তার এই গ্রাম্য জন-নায়ক।

কিছু দূরে এগিয়ে দিবাকর ভাবল বাঁচা গেল। ওঃ, এমন কুহকেও সে পড়েছিল! কেন সে যে এগিয়ে গিয়েছিল ইচ্ছা করেই ঐ মায়াবিনীর নায়ে! তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ভাল লাগছে মুক্ত হাওয়া, রৌদ্রে ভরা মুক্ত দিগন্ত। একটানা বিল—সে একা যাত্রী। বাইরের পৃথিবী যেন তাকে আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে ইচ্ছা মত নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার। এখানে এখন আর ভেলকি বা ভোজবাজীর ভয় নেই। তবু সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। মিষ্টার ডাট, মিস্ কুন্তলা, মিষ্টার দিবাকর—এ সব কি কথা, কোন দেশী ভাষা? ছিঃ ছিঃ, ওরা আবার কোন দেশী সজ্জা পরে নামল জলে? সে তো জীবনে এ সব দেখেনি। তার আশেপাশে যে কেউ দেখেছে, তাও তো সে শোনেনি। তবে কি ওরা ওদের মত মানুষ নয়? বিদেশী?

একটা দুঃখ হয় দিবাকরের। সত্য সত্যই তো কুন্তলা আর কুহকিনী নয়। সরল আন্তরিক ওর ব্যবহার। মধুক্ষরা ওর কণ্ঠ। দেহে ও মুখে লাবণ্য বাঙালীর। কি যেন চির পরিচিত আনন্দ রয়েছে ওর ভিতর লুকিয়ে। ও সুন্দর, তবু তফাৎ কেন? বিধাতার এ কি সৃষ্টি?···

দিবাকর বারম্বার শুনতে পায় কে যেন ডাকছে—'কমরেড, কমরেড।' এ সম্বোধনের তাৎপর্য কি?···

সে বৈঠা বন্ধ করে চুপ করে রইল, কান খাড়া করে শুনল···

ভুল, ভুল, সবই তার ভুল। তেল কখনও মিশ খাওয়াতে পারে না আপনাকে জলের সংগে। এ সব চেষ্টা হয় বৃথা।

দিবাকর এগিয়ে চলল সজোরে বৈঠা হেনে।

ত্রিশ

মুক্তা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। অভ্যর্থনা বা আপ্যায়নের জন্য নয়—কোন দিকে যেন রওনা দেওয়ার জন্য। আজ তার গা-ভরা গয়না, ঠোঁট দু'খানা পানের রসে রাঙা, পরনে দিব্যি শাড়ী।

শাশুড়ী বলল, তাদের বৌর নাকি আজকাল মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নাকি প্রায় প্রত্যহ অমনি সেজে-গুজে বসে থাকে। 'আর বাছা কমু কি ব্রজটা গেছে জেলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।' সে ঘৃণা ও লজ্জায় মুখ ফেরায়। 'এমন অসময় ও হইল কিনা সাজুন্না পাগল!'

'জেল হইল ক্যান?'

'আসল ব্রজ চুরি কইর‍্যাই সইর‍্যা পড়ছে—নকল ব্রজ তখন যায় কই। ধরা পড়ছে হাটের পঞ্চাইতের হাতে। না হইলে কি আমার বাছার হয় জেল! চিরটা কাল বাবা আমার সাইর‍্যা-সামলাইয়া শ্যাষকালে বরাতে ফেরে খাইল ঠোকর।' সব দোষই নাকি ঐ বৌর। ও সেদিন অত গয়না-গয়না করে ঝগড়া না করলে, আদায় করে না রাখলে অতগুলো যত্নে তোলা অলংকার—ব্রজর এমন ধারা ভুল-ভ্রান্তি হত না। অতঃপর ব্রজর মা গোটা কয়েক কড়া কড়া অভিসম্পাৎ দেয় বৌকে।

এবার দিবাকর চেয়ে দেখল যে শাশুড়ীর কথা মিথ্যা নয়। নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে মুক্তার মাথা। নইলে সে কিছুতেই এতগুলো শক্ত অভিশাপ অনায়াসে সয়ে মুখ টিপে-টিপে হাসতে পারত না। এ হাসি যে উন্মাদের লক্ষণ।

দিবাকর উঠে মুক্তার কাছে গেল।

'গোঁসাই, খাওয়া-দাওয়া কর। সব জোগাড়, আমি তোমার সংগেই যামু।'

কথাটা শুনেই দিবাকর কেমন জানি বিব্রত হয়ে পড়ল। সে যেন এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। না-ই বা রইল—মুক্তার এ প্রস্তাব ন্যায়সংগত বা বিধি-বহির্ভূত তা আর বিচার করার অধিকার নেই দিবাকরের। তাকে আজ যে কোন মূল্যে মেনে নিতেই হবে নীরবে। সে সেদিনের গন্ধর্ব বিবাহ ছেলে-খেলা বলে উড়িয়ে দিতে চায় না—অস্বীকৃতির কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না, কিন্তু তা বলে সবই এত তাড়াতাড়ি কেন?

দিবাকরের খেতে খেতে সন্ধ্যা ঠেকল। আহার্যে তার অভিরুচি ছিল না কিন্তু কেবলই তার দেরী হতে লাগল। কেন যে সে এখানে এসেছিল!

'অত যে চুপ-চাপ গোঁসাই?' মুক্তা জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু জানি ক্যান ভাল লাগে না।'

শাশুড়ী এসে জবাব দিল, 'ভাল লাগবে কি কইর‍্যা? ও তো আইজ-কাইল রান্ধে না, খালি কোন্দল করে। তুমি দেশী মানুষ, আইছ যখন ওরে বাছা লইয়া যাও, আমার হাড় দু'খানা এট্ জুড়াউক।' তারপর দিবাকরের কানের কাছে এসে বলল, ও কেবল ধমকি দেখায়—নিত্য কয় বাইর হইয়া যামু। যদি যায়ই যাউক তোমাগো লাগে গিয়া। কলংক দিবে ক্যান আমার ব্রজর কুলে? ব্রজ আমার গংগা-স্রোত-কুলের ছাওয়াল।'

মুক্তার ওপর দিবাকরের যে মন-ভাবই জন্মে থাক, সে এখানে একটা কঠিন মন্তব্য না করে থাকতে পারল না। 'মাঐ, এমন কুলীন-বংশের পোলার (ছেলের) জেল হইল যে?'

'তোমারও তো বাছা হাজত হইছিল, তুমি কি চোর? ইজ্জতের দায় কত লোক যে চক্ষু-কর্ণ বুইজ্যা বেইজ্জত হয় তা কি জান না?'

দিবাকর সবই জানে, অতএব নীরব রইল।

সংবাদ পেয়ে গ্রামের পাঁচ জন এসে ছেঁকে ধরল দিবাকরকে। এরপর কর্তব্য কি? এ মাছে আর ক'দিন যাবে। বিলের জল তো দিন দিন কমছে, কলসী-হাঁড়ির চালও তো দিন দিন ফুরাচ্ছে। তারা শুনছে যে পুলিশ আসবে, এমন কি গোরা সৈন্যও নাকি আসা অসম্ভব নয় বন্দুকে সংগিন চড়িয়ে। স্ত্রী-পুত্রের জন্য অনেকের ভাবনা হয়েছে বটে, কিন্তু যা কিছু অনিবার্য তার জন্য সবাই প্রস্তুত। শক্তি হয়ত তাদের জাবদা হিসাবে কম, কিন্তু সংহতি তাদের অদ্ভুত। মরবে তবু শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে।

আজ এই হতশ্রী লোকগুলির কাছে দিবাকর কেন জানি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা এত দুর্দান্ত হইলা ক্যান? ছিলা তো শান্ত শিষ্ট।'

প্যাকাটির মত রুগ্ন একটা বুড়ো মানুষ এগিয়ে এসে বলে যে প্রায় বিশ-বাইশ বছর পূর্বে যখন প্রথম ব্রাহ্মণ এ সম্পত্তি কবলা করে তখন ওরা সর্বস্বান্ত হয় সেই ব্রাহ্মণের পিছনে হেঁটে। সে ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে দিল ব্রাহ্মণ ওদের না জানিয়ে নিলামে তুলে, ফলে এলো জলকর জরীপ। 'গোঁসাই, জ্বালায় জ্বালায় মানুষ ক্ষ্যাপে—এক খোঁচার ঘা না শুকাইতে শুকাইতে, যদি কেও দেয় আর এক খোঁচা।'

স্পষ্ট কোন চিহ্ন নেই বাইরে, অথচ ক্ষত রয়েছে ভিতরে, অহোরাত্রি রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে এই বিরাট জনসমাজের। দিবাকরের ইচ্ছা করে সে মুহূর্তে মহাবৈদ্য ধন্বন্তরি গুণ লাভ করুক, নিমিষে নিরাময় করে দিক ওদের কলিজার ক্ষতগুলো। সে ভুলে যায় কুন্তলার কথা, ভুলে যায় মুক্তার কথা—শুধু একটা ব্যথায় তাকে মুহ্যমান করে রাখে।

'ভাইরা, তোমরা সব বইস।'···অনেকক্ষণ আর কিছু বলে না দিবাকর। কেবল ওদের উত্তপ্ত সান্নিধ্য কত যেন তৃপ্তিতে অনুভব করে। বার বার কান পেতে শোনে এই বোবা মনগুলির গুমরে ওঠা ভাষা। তারপর বলে অনেক কথা, দেয় বহু সান্ত্বনা। কি যে সঠিক কর্তব্য দিবাকর জানে না। তবে এই পরিস্থিতিতে যেমন

করে হক বাঁচাতে হবে ওদের, আর লড়তে হবে সিদ্ধি লাভ না করা পর্যন্ত। 'ভাইরা, সাধ মিটাইয়া তামুক খাও, আর আমার মুখের দিকে চাও, ভুল পথে যাইও না জানি কোন দালালের দালালিতে। হুঁশিয়ার, ওরা মহা ফেরব্বাজ (ফন্দিবাজ)।'

রাত্রি ক্রমে গভীর হতে থাকে। দিবাকরের সম্বিৎ ফেরে মুক্তার ডাকে, তবু সে ওদের ছাড়তে চায় না। তখন অগত্যা মুক্তা বেরিয়ে এসে সবাইকে হুঁশ করিয়ে দেয় যে সন্ধ্যা বেলা ভাল মত আহার করতে পারেনি গোঁসাই।

'ও, তা হইলে এখন আমরা যাই।' তাদেরও বাড়ীতে তো অপেক্ষায় বসে রয়েছে বৌ-ঝিরা।

খেতে বসে দিবাকর প্রশ্ন করে, 'তবে কি যাবাই যাবা?'

মুক্তা কুপিত হয়ে জবাব দেয়, 'না, সাজ-গোজ করছি এটু মসকরা করতে।'...এর পর সে জনান্তিকে বলে, 'তয় এ সব গয়না-পত্তর হাত করলাম ক্যান?'...

কেবল গয়নার হিসাব, চিন্তা অর্থের। এত স্বার্থ-বোধ কি করে জন্মাল অমন রূপসীর মনে? ওর সংগে এতটুকু বেহিসাবী হয়ে চলা যাবে না একটি দিন। দিবাকর প্রমাদ গণে।

নৌকা ছোট হলেও দু'জন যাত্রীর স্থান সংকুলন হয়। একখান হোগলা দিয়ে, কয়েকটা বাঁশের কঞ্চির চাক পরিয়ে বেশ একটা অস্থায়ী ছই প্রস্তুত করা হয় জুতসই।

মুক্তা বলে, 'দিব্যি হইছে। এক গুণ না থাকলে সাধে লোকে পাগল হয়!'

আবার বিলান পথ। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিন্তু অবর্ণনীয় দ্যুতি। সহস্র কোটি হীরার মালা ছিল যেন কোন বিলাসিনী বণিকার—ছিঁড়ে ছিটকে গেছে এদিকে-ওদিকে। সামঞ্জস্য নেই, তবু রোশনাইতে ঝিল-মিল করছে আদিগন্ত বিলটা এবং গাঢ় নীল আকাশটা।

দিবাকর ধীরে ধীরে নাও বাইছে, মুক্তা নিকটে এসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

'গোঁসাই, স্যাবনগর গেছিলা ক্যান?'

'ক্যান, সে কথা কে না জানে? সভা করতে।'

'সভ্যা ছিল নাকি এক ঠারইনে—অল্প বয়স, মনলভ্যা গড়ন।' মুক্তা একটি একটি করে কথা উচ্চারণ করে।

তা থাকতে পারে, কিন্তু সেদিকে কি দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ হয়েছে দিবাকরের? কই কিছুই তো মনে পড়ে না। সে চুপ করে থাকে।

'একটা মানুষ, চাখতে ইচ্ছা করে কয় জনারে?'

এ তো ভীষণ অভিযোগ! দিবাকর গেল সভা করতে—কথা উঠল চাখা-চাখির! হায় ভগবান! একে নিয়ে সে কি করে দিন গুজরাণ করবে? প্রতি মুহূর্তে একটা কাজের অর্থ করবে অন্য আর একটা। আর, এত খোঁজও মুক্তা রাখে! আবার গত কল্যের কথাটা না বলে ফেলে খনার মত! দিবাকর এতটুকু হয়ে থাকে।

নৌকার গতি মন্থর হয়ে আসে। মুক্তাও কেন জানি অনেকক্ষণ আর কোনও প্রশ্ন করে না। দু'-একটা পোকা-মাকড় এক ছোপা ঘাসের বুক থেকে অন্য ছোপায় লাফিয়ে যায়। ভয় পায় না নিস্তব্ধ মানুষ দুটিকে দেখে। রাত্রি গাড়িয়ে চলে নিয়ম মত—নিরালায়। শুধু প্রহর ঘোষণা করে দূর বাড়িয়ালের (বাগান সহ বাড়ীর) আশ-পাশের নিশাচর শেয়ালগুলো।

'মুক্তা, আমি তো কায়-মন-বাক্যে আর কেওরে চাই নাই। ট্যাপাপোনার (এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ) মত সারা জীবনটাই তো ভাইস্যা বেড়াইলাম সোঁতের সাথে—কই কোনও লতা-পাতার জালে তো জড়াই নাই। ভাল অনেক কিছুই অনেকের লাগে—আমারও তা লাগতে পারে, কিন্তু তা বইল্যা তো সকলডিরে ভালবাসি নাই।' দিবাকর থামে, ধীরে ধীরে হাতের বৈঠায় গোটা দুয়েক ঘুরানি দেয়, অবশেষে বলে, 'যে পথে পা দিছি, ক্যান যে দিছি তা জানি না, সে পথের চলনদারেরা অবকাশ পায় না সাধারণের মত এক জনারে ভালবাসার। তারা বহুকে বাহু বেইড়্যা বুকে লইতে চায়। এ বহু তার চাইর পাশের ভাঙা-চুরা মানুষ-গুলো। তুই মিছামিছি কর অন্য স্ত্রীলোকের ভয়।'

এত দিন বাদে সত্য কথা বলল দিবাকর—দিল সাফ জবানবন্দী—যখন মুক্তা এলো ঘর ছেড়ে বাইরে। আগে কুন্তলার ওপর যে প্রচ্ছন্ন বহ্নি জ্বলতেছিল তা নিবে গেল—এলো জন-সাধারণের ওপর হিংসা। সংগে সংগে এলো ছোট একটি শিশুসুলভ ক্ষোভ—যে এইমাত্র হেরে গেছে বড়র সংগে প্রতিযোগিতায়।

মুক্তা ফাঁপরে পড়ল। তবে কি সে ফিরে যাবে?

কিন্তু কোথায়, কার কাছে ফিরে যাবে? নদীর এক কূল ভাঙে, অন্য কূল ভরে। তার জীবনে যে ভাঙন এলো দু'কূল ধরে! তার ইচ্ছা করে ডুকরে কাঁদতে।

কাঁদাও তো যায় না। সইতেও তো সে পারছে না। তবে কি করে সে বইবে বুকের জ্বালা? দিবাকর, তার আশৈশব ধ্যান জ্ঞান তপস্যার 'গোঁসাই' শেষ পর্যন্ত বলল কি!

ছায়া-পথের কোন পরিবর্তন হয়নি, একটি তারাও হয়নি স্থান-চ্যুত—নৌকা চলেছে ধীরে ধীরে গা ঢেলে নিঃশব্দে এগিয়ে। সবই ঠিক আছে, শুধু এই কিছুক্ষণ হয় মুক্তা টের পেল যে তার সারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে নিষ্ফল।

সারা রাত্রির পরিশ্রমের পর একটা সুদীর্ঘ দিন গেছে, তারপর আবার এসেছে রাত—দিবাকরের ঘুম পাচ্ছে। নৌকাটাও কেমন করে যেন বিপথে এসে এক 'বাঁওড়ে' পড়েছে। ধাঁধার মত বাঁওড়। মনে হয় যেন পথ আছে, খানিকটা এগুলেই মস্ত মস্ত দল দামের পচা স্তর, অনেকটা কূলের মতই কঠিন। দিবাকর বিরক্ত হয়ে লগি পুঁতল।

'মুক্তা, বড় ঘুম পাইছে।'

মুখে কিছু বলল না মুক্তা। সংগে যা কিছু কাঁথা চাদর ছিল তা দিয়ে নীরবে শয্যা রচনা করে দিয়ে এক পাশে সরে বসল নিতান্ত আলগা হয়ে।

'ও কি, তুই শুবি না, স্বাথপরের মত আমি শুই কি কইর‍্যা একলা?'

'আমার ঘুম পায় নাই, আর জায়গাই বা কই? তুমি শুইয়া পড়ো আর কথা না কইয়্যা।'

দিবাকর শুয়ে পড়ে। বাইরে নৈশ পোকা মাকড়ের ঐক্যতান চলতে থাকে। মাঝে মাঝে জ্বলতে থাকে আর নিবতে থাকে আলেয়ার আলো। কখন বা উড়ে যায় রাত্রিচর পাখী, কখনও আসে বন্যজলার গন্ধ। দূরে একটা ডাহুক ডাকছে মর্মান্তিক স্বরে। প্রবাদ আছে, ওর গলা বেয়ে যে রক্ত উঠবে তা দিয়ে নাকি ফোটাবে শাবকের চোখ। ডাকছে তাই অবিরাম।...

ব্যথা, ব্যথা, বড় ব্যথা। কোনও ব্যথা ছাড়া কি বৃহৎ কিছু জন্মে না? মুক্তা আজ থেকে সব লিপ্সাই ত্যাগ করবে। যত ব্যথাই তার বুকে বাজুক না কেন বৃহৎ কিছুকে সে তার মনের মাটিতে জন্ম দেবে। তা শাল্মলী নয় ত দেওদারু। সে ভাঙা-চুরা মানুষগুলোকে ভালবাসবে। চলবে 'গোঁসাই'র পায়-পায়—ছায়া যেমন করে কায়ার সংগে সংগে এগিয়ে যায়। কি যে করতে হবে সে তা জানে না, কিন্তু এটুকুও কি দিবাকর তাকে বলে-কয়ে শিখিয়ে দেবে না? এখন তো সে আর দিবাকরকে চায় না—চায় তার প্রিয়জনকে সেবা করতে। ঐ হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা শীর্ণ সামন্তকে, ভিটা-মাটি ছাড়া জগন্নাথকে, পীড়িত স্বামীর জন্য খয়রাত করে যে আসমানী তাকে। সে গহনা বেচবে, প্রয়োজন হলে গেরুয়া পরবে। তবু কি দিবাকর কিছু বুঝবে না!···

'মুক্তা, বড় অস্বস্তি ঠেকে।'

'তুমি এখনও ঘুমাও নাই?'

'তুই আইস্যা শো পাশে, না হইলে ঘুম আসবে না! জায়গায় কুলাইবে—এই আমি সইর‍্যা শুইলাম ছৈর কিনারে। দেখ কত ফয়লা (ফাঁক)।'

মুক্তা আসে না। দিবাকর বার বার অনুরোধ জানায়। অবশেষে হাত ধরে টেনে আনে। মুক্তা পাশের জায়গায় না শুয়ে একেবারে এলিয়ে পড়ে দিবাকরের বুকের ওপর। সে চোখের জলে ভাসি'য় দিচ্ছে সব।

'এ কি?'

'আমি গেরুয়া পরুম গোঁসাই।'

'হঠাৎ এ কথা ক্যান? হইছে কী?'

কিছু বলে না মুক্তা, কেবল অঝোরে কাঁদে।

তাকে উত্তপ্ত বুকে জড়িয়ে ধরে দিবাকর। চোখ-মুখ মোছায় বহু যত্নে। তবু যেন সামলাতে পারে না মুক্তা নিজেকে। দিবাকর বোঝে যে পুরুষের কাছে সব প্রিয়তমের বাড়া যে প্রিয়তমা নারী সে আজ এইমাত্র ধরা দিয়েছে। অভিমান তার ঘোচাতেই হবে—তার প্রকোষ্ঠ বিধাতাই করে দিয়েছে আলাদা। সে যে অতুলনীয়া। তার সম্মানে তাই অপমানিত হয় না সত্য যারা আপন জন।

পরদিন ভোর বেলা হাসতে হাসতে দু'জন গিয়ে বাড়ী ওঠে।

এত হাসি কেন? ছুটে আসে কনক। সে সদ্য-স্নাতা মুক্তাকে দেখে অনুমানে সব ধরে ফেলে! তারও আনন্দ হয় প্রচুর। সে মুক্তাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যায় একান্তে রান্নাঘরে। জিজ্ঞাসা করে প্রতিটি মুহূর্তের বিস্ময়কর রহস্য-ঘন বার্তা। মুক্তা জবাব দেয় আর ক্ষণে ক্ষণে তার মুখে-চোখে রঙের পিচকারী খেলে যায়।

জীবন দূরে বসে মুখ টিপে টিপে হাসে। সে হিসাব করে, কনক এলো, তারপর গোঁসাই, তারপর এলেম, অবশেষে মুক্তা। সে নিজে তো আছেই। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।···

যে যার ভাগ্যে খায়, ও শুধু একটু বাড়তি খাটুনি খাটবে বই তো নয়। জীবন ওদের দিকে চেয়ে আবার হাসে।

[ক্রমশঃ।

দুরভিলাষ
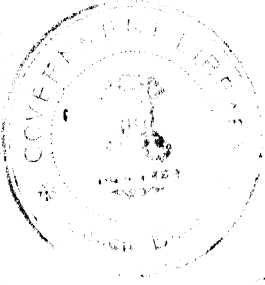
সোমেন্দ্রনাথ রায়

ড্রইং-রুমে পা দিতে গিয়ে পা আটকে গেল সুমিতার। মেঝেয় বিছানো মূল্যবান কাশ্মীরী কার্পেট, আনকোরা ঝকঝকে। ধুলো-মাখা স্ট্র্যাপ দেওয়া কম দামী স্যাণ্ডেলটা বাইরে খুলে রাখতে যাচ্ছিল, বাধা দিল অবিনাশ, "ও কি বৌদি? না না, জুতো খুলতে হবে না। চলে আসুন ভেতরে।"

তবু ইতস্তত: করছিল সুমিতা। মহিম হেসে বলল, "বলছে যখন জুতো সমেত ঘরে ঢুকতে, তখন অনর্থক খুলে লাভ কি? নষ্ট হলে ওর দামী কার্পেটটাই হবে। তোমার তালি-মারা স্যাণ্ডেলের আর কি ক্ষতি হবে?"

একটু হেসে সঙ্কুচিত হয়ে ঘরে ঢুকল সুমিতা। বড় অস্বস্তিকর লাগে এমন সব দামী আসবাবপত্রে সাজানো ছবির মত ঘরে ঢুকতে। পরিবেশের তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। দেওয়ালের ফিকে নীল পেণ্টিং থেকে কাচের বুক-কেসের মরক্কো-বাঁধানো বইগুলোতে পর্য্যন্ত সর্বত্র একটি অলক্ষ্য নিষেধের তর্জনী উদ্যত হয়ে আছে। আটপৌরে সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিপাতে মর্য্যাদাহীন হয়ে যাবে।

জড়সড় হয়ে সোফার এক কোণে বসতে না বসতেই অবিনাশ বলল, "চলুন ভেতরে নিয়ে যাই আপনাকে। মা, বউ এদের সঙ্গে আলাপ করবেন।"

মহিমের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ভেতরে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল না সুমিতার। তবু একবার মনে হল, ভেতরে হয়ত এই কড়া এটিকেটের শাসন শিথিলতর। ড্রইং-রুমের পর্দা সরিয়ে দুধের মত মার্বেলের হলে পা দিল সুমিতা। স্ফটিকস্বচ্ছ মেঝেয় প্রতিফলিত হল তার চেহারা। তালি-মারা জুতো শুদ্ধ নোংরা পাথানাকে সেই মার্বেলের মেঝেয় টেনে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসাধ্য।

পড়ন্ত বিকেলের সোনা রঙের রোদ্দুর কাচের ঝিলিমিলির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র আলপনা এঁকে দিয়েছে মেঝেয়। কাছের পার্ক থেকে ভেসে আসছে শিশুদের কোলাহল। বাতাস এ-বাড়িতে অবারিত। আশ্চর্য্য প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল সুমিতার মন। সপ্তাহের ছ'টা দিন কাটে অফিস-ঘরের বদ্ধ আবহাওয়ায় কৃত্রিম আলোয় অপরিস্ফুট টাইপরাইটারের চাবিতে দ্রুত আঙুল চালানোর একঘেয়েমিতে। রবিবারের ছুটি অপরিসর ভাড়াটে বাসায় সামান্য সংসারের খুঁটিনাটিতে মন দিতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। তারই ফাঁকে একটু আলো একটু হাওয়ার সন্ধানে কোন পার্কে যে যাবে, তেমন পার্কই বা কোথায় কাছাকাছি? সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করছিল সুমিতা এ-বাড়ির আলো-বাতাসের প্রাচুর্য্য।

"আসুন বৌদি, পরিচয় করিয়ে দিই। এই হচ্ছে আমার বউ।"

চমকে উঠল সুমিতা। ঘুমের মত কোমল অনুভূতির মাঝখানে হঠাৎ নাড়া খেয়ে ফিরে তাকাল। সুন্দরী একটি বউ, রূপ অর্থ আভিজাত্যের ছাপ সর্বাঙ্গে, অবকাশ আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে লাবণ্যময় চেহারা। অবিনাশ বলল, "ইনি আমার আটিষ্ট বন্ধু মহিমের স্ত্রী। তোমার মত শুয়ে-বসে দিন কাটান না। দস্তুর মত চাকরি করেন দশটা পাঁচটা।"

বেঁকে উঠল বউটির ঠোঁট মৃদু হাসিতে। হাত দুটি লীলায়িত করে ঈষৎ ভঙ্গী করল নমস্কারের। লজ্জিত হয়ে হাত জোড় করল সুমিতা।

"তাহলে বসুন বৌদি, আমি ও-ঘরে মহিমের সঙ্গে জরুরী কয়েকটা কথা সেরে নিই। মা আসবেন এখুনি, আলাপ করবেন, কেমন?"

অবিনাশ চলে যেতে এগিয়ে এল বউটি। বলল, "এসো ভাই, তোমার কথা ওঁর কাছে অনেক শুনেছি। কি নাম ভাই তোমার?"

কথার ভিতরে আত্মম্ভরিতা আর পিঠ-চাপড়ানির সুর অত্যন্ত স্পষ্ট, তবু অবাক হল না সুমিতা। এঁরা বনেদি পরিবারের বউ, তার মত সাধারণ মেয়েকে যে ভাই বলে ডাকছেন, তাই হয়ত যথেষ্ট অনুকম্পা করে। সামলে নিয়ে বলল, "আমার নাম সুমিতা। আপনার?"

একটু হাসল বউটি। বলল, "নাম ধরে তো আর কেউ ডাকে

না, ভুলে যেতেই বসেছি নাম। ইস্কুলে নাম দেওয়া হয়েছিল মাধবী। এখানে সকলে ডাকে বৌরাণী বলে। ঘরে বসবে চল।"

"আবার ঘরে কেন, এখানেই বেশ হাওয়া দিচ্ছে।"

হেসে বৌরাণী বললেন, "ঘরেও হাওয়া আছে। আর না থাকলে ফ্যান তো আছেই। এখানে বসতে চাও, এখানেই বস।" হলের শেষ প্রান্তে ঝুলোনো অর্কিডের চারায় জল দিচ্ছিল একটি ছেলে, তাকে ডেকে বললেন, "নন্দ, ক্ষীরিকে একখানা গালচে পেতে দিয়ে যেতে বল।"

মাঝবয়সী একজন ঝি এসে বলল, 'ডাকছিলেন বৌরাণী ?"

"হ্যাঁ, একখানা গালচে পেতে দিয়ে যা এখানে। আর মাকে বলে আয়, সেই ছবিওলা মহিম বাবুর বৌ এসেছে বেড়াতে।"

মনে মনে একটু হাসল সুমিতা। বন্ধুত্বের খাতিরে অর্ধেক দামে দু'খানা অয়েল পেণ্টিং করিয়ে নিয়েছেন অবিনাশ বাবু মহিমকে দিয়ে, তাও সব টাকা দেননি এখনও। যে মহিমকে নিয়ে গত একজিবিশনের পরে কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত স্তুতির বন্যা জেগেছিল, তারই স্ত্রী হয়ে সে এঁদের কাছে ছবিওলার বউ। তবু একটুও রাগ হল না এই কথা ভেবে যে, মানুষের প্রতিভাকে সম্মান করার মত শিক্ষা তো এদের নেই।"

ঝি এসে মূল্যবান গালচে পেতে দিয়ে গেল। জুতো খুলে পা বাইরে রেখে সন্তর্পণে এক ধারে বসল সুমিতা। ঘর থেকে রূপোর ডিবে নিয়ে এসে মাঝখানে জাঁকিয়ে বসলেন বৌরাণী। পান আর সুগন্ধি জর্দা মুখে দিয়ে লালা-ভর্তি মুখে প্রশ্ন করলেন, "কোন্ আপিসে কাজ কর ?"

গা ঘিন-ঘিন করতে থাকলেও উত্তর দিতে হল সুমিতাকে, "একটা ওষুধের কারখানায় কাজ করি।"

"ও মা, তাই নাকি ? আমার দাদারও যে ওষুধের কারবার। ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটারি। নাম শুনেছ ?"

মাথা নেড়ে জবাব দিতে যাচ্ছিল সুমিতা। মুখ উঁচু করে ডাকলেন বৌরাণী, "ক্ষীরি !" মুখ থেকে চলকে একটু পানের পিক পড়ল গালচেতে। ক্ষীরি এলে ইসারায় তাকে পিক ফেলবার ডাবর দিয়ে যেতে বললেন। প্রকাণ্ড একটা পিতলের ডাবর এনে এক পাশে রাখল ঝি। পিক্ ফেলে ধীরে-সুস্থে বৌরাণী বললেন, "সেখানেও অনেক মেয়ে কাজ করে। ইনজেক্সনের এম্পুল বন্ধ করা, ওষুধ ভরা, আর সব কি কি কাজ। মাইনে পাও কত ?"

অসহনীয় বিরক্তি দমন করে হাসিমুখে বলল সুমিতা, "সামান্যই।"

"আমার দাদার ওখানে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজকার করে এক-একটা মেয়ে। তোমার কত মাইনে, পঞ্চাশ ?"

"ওই রকমই।"

"তা এই বাজারে পঞ্চাশটা টাকাই বা কে দেয়। এই তো ওঁর মুখে প্রায়ই শুনি, এত মন্দার বাজার চলছে, কারবার না গুটোতে হয়।"

মাইনে পায় সুমিতা একশ' টাকা এবং মাসের পয়লাতেই। তবে মালিক চন্দ্রশেখর সিংহ প্রায়ই বলে থাকেন, "যে মন্দার বাজার চলেছে, কারবার না গুটোতে হয়।" সেই বিলেত-ফেরৎ পাকা ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই স্বল্প-শিক্ষিতা বৌরাণীর চিন্তাধারায় আশ্চর্য্য মিল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুমিতা।

"কে এসেছে বৌমা ?" ও-পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি বিধবা। সুমিতা নিঃসংশয়ে বুঝল, অবিনাশের মা উনি। মেদবহুল বিপুল চেহারা, মাজা রং, চুলে পাক ধরেছে; চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, পরনে উজ্জ্বল গরদ। প্রণাম করা দস্তুর কিনা ভাবছিল সুমিতা।

"সেই যে মহিম বাবু, আপনার আর বাবার ছবি এঁকে দিয়েছে, তারই বৌ।"

"অ! মহিমের বউ তুমি ? আমার অবিনাশের সঙ্গে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়ত মহিম। ছেলেবেলা থেকেই শুনতুম ওর আঁকায় হাত বেশ পাকা। বেশ এঁকেছে ছবি দু'খানা, না বৌমা ?"

"মন্দ না। দাদা বলছিল সেই পয়সা খরচ করেই যখন ছবি করান হল, তখন সায়েব-বাড়ির আর্টিষ্টকে দিয়ে আঁকালেই হত।"

"তা হোক। আমরা বাপু সেকেলে মানুষ। ও সায়েব-ঝাপেবাক দিয়ে আঁকাতে পারি না। তোমরা আজকাল থাক কোথায়?"

"শ্যামবাজারের কাছে।"

"অ! মহিম আজ-কাল রোজকারপাতি কেমন করছে?"

মাথা নিচু করে সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল সুমিতার। "কেমন আর কি, ছবি বিক্রি করা আজকাল বড় শক্ত।"

"তাই নাকি? তা অন্য কোন চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে না কেন মহিম?"

একটু হাসল সুমিতা। বলল, "কে চাকরি দেবে বলুন না? ব্যবসা-পত্তরের যে রকম অবস্থা, তাতে বড় বড় ব্যবসায়ীরাই কারবার গুটিয়ে ফেলতে চাইছে।"

ভ্রূ কোঁচকালেন বৌরাণী। বললেন, "একটু আগে এই কথাই ওকে বলছিলাম, মা!"

মা একটু হেসে বললেন, "তুমি তো বলবেই বৌমা, তোমার দাদার হল গিয়ে চার পুরুষের ব্যবসা, আবার শ্বশুরের দিকেও তাই।" তার পর সুমিতার দিকে ফিরে বললেন, "ছেলেপুলে ক'টি তোমার?"

মাথা নিচু করে উত্তর দিতে গিয়ে এবার সত্যিই বেদনা পেল সুমিতা। বলল, "হয়নি কিছু।"

"হয়নি? ক' বছর বিয়ে হয়েছে তোমার?"

একটু ভেবে উত্তর দিল সুমিতা, "এই বছর চারেক।"

"ও মা, এত দিন বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হয়নি? ডাক্তার দেখিয়েছিলে?"

অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সুমিতা এই প্রসঙ্গে। মাথা নিচু করে রইল সে। ডাবরে পানের পিক ফেলে বৌরাণী বললেন, "তা বাপু ভালই, তোমাকে তো আবার চাকরি করতে হয়। ছেলেপুলে হলে অসুবিধে হত।

কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন অবিনাশের মা। "সে কি? চাকরি কর নাকি তুমি? আজকাল দেখি এই এক ফ্যাশান হয়েছে লেখাপড়া-জানা মেয়েদের। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, গেরস্থ ঘরের বউ, বাড়ির বাইরে গিয়ে পরপুরুষের মাঝখানে চাকরি কর, মহিম কিছু বলে না?"

এঁদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতেই হবে, কখন মহিমের কথা শেষ হবে কে জানে। তাই সব সঙ্কোচ বিসর্জন দেওয়াই ভাল, ভাবল সুমিতা, বলল, "বাঁচ থাকতে হবে তো। ওঁর রোজকার যখন সুবিধের নয়, আর লেখাপড়া যখন শিখেছি আমি, তখন চাকরি করা অন্যায় কেন বলুন?"

একটু চুপ করে রইলেন বৃদ্ধা। তার পর ঘাড় নেড়ে বললেন, "না বাপু, ও-সব পছন্দ করি না আমি। বৌমানুষ, ঘরে থাকবে, সংসারটিকে গুছিয়ে রাখবে, ছেলেপুলে কোলে-পিঠে করে মানুষ করবে, তা না তো কি ছট্‌-ছট্ করে বাইরে রোজকার করতে যাবে? মহিমকে বলে দিও, এ সব আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।"

মজা লাগল সুমিতার বৃদ্ধার এই গায়ে-পড়া শুভাকাঙ্ক্ষা দেখে। ওঁর ধারণা, যেহেতু দু'খানা ছবি করিয়েছেন মহিমকে দিয়ে, তাও অর্থেক দামে, সেই জন্যে ওঁর পছন্দ-অপছন্দের মর্য্যাদা দিতে বউকে চাকরি ছাড়িয়ে সপরিবারে উপোষ দিয়ে মরাই মহিমের পক্ষে কর্ত্তব্য। হাসি এল তার।

উঠে পড়লেন বৃদ্ধা। বললেন, "একটু বস বাছা! আসছি আমি এখুনি।"

বৌরাণী একটু হেসে বললেন, "শাশুড়ি আমার ওই রকমই, একটু সেকেলে। আর হবেই বা না কেন? কত বড় বংশের মেয়ে উনি।"

অতি দুঃখেও হাসি এল সুমিতার। দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন তার এই বড় বংশের বড়লোকদের আওতায় একটুখানি থেকেই। তার শ্যামবাজারের ভাড়াটে বাসায় আলো-হাওয়া নেই বটে, তবে স্বাধীনতা আছে।

কালো মত একটি আয়া পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে এসে ভেতর থেকে কোলে তুলে ফুটফুটে একটি বাচ্ছাকে নামিয়ে দিল মেঝেয়। বছর খানেক বয়েস হবে বোধ হয়, গোলগাল চেহারা। পরনে পাতলা অর্গাণ্ডির জামা। পাতলা একরাশ সোনালী চুল মাথায়। হলে নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই তড়বড় করে ছুটে এল বাচ্ছাটি এদিকে হামাগুড়ি দিয়ে। অকস্মাৎ সুমিতার সর্ব শরীরে কি একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি ছড়িয়ে গেল, টন-টন করে উঠল বুক, গলার কাছে কি একটা ঠেলে উঠে বন্ধ হয়ে গেল স্বর। বাচ্ছাটিকে একবার বুকে চেপে ধরার বাসনায় সর্বাঙ্গ অস্থির হয়ে উঠল।

উজ্জ্বল হাসি-মাখা চোখে সেদিকে তাকিয়ে বৌরাণী বললেন, "এই এলেন, রাজ্য জয় করে ফিরলেন। এইটুকু দেখতে বটে। কিন্তু ওর দুষ্টুমীতে বাড়িশুদ্ধ লোক পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। শাশুড়ি তো ওকে কোলছাড়া করেন না বলতে গেলে।"

ঝাঁপিয়ে মায়ের কোলে এসে উঠল শিশুটি। মোটা শরীরে একটু বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লেন বৌরাণী। বললেন, "হয়েছে হয়েছে, তোমার জ্বালায় আর পারি না। ওই দেখ, কে এসেছে দেখ।"

শিশুর তখন খেয়াল নেই কোন দিকে। মায়ের স্তনে মুখ গুঁজে দেবার চেষ্টায় আকুল হয়ে উঠেছে সে। "এই যে সোনা, দুষ্টু, ছি, অমন করে না" বলে তাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন বৌরাণী। বললেন, "উনি আবার ছেলেকে মাই দেওয়া পছন্দ করেন না। এদিকে মাই না দিলে শাশুড়ি রাগ করেন। আমার হয়েছে এক জ্বালা ভাই!"

ঝিয়ের হাতে খাবারের প্লেট আর জল দিয়ে থপ-থপ করে আবার এলেন অবিনাশের মা। বললেন, "একটু জল খেয়ে নাও বাছা!"

ঠাকুরমায়ের গলা পেয়ে মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে তাকাল শিশুটি। এক গাল হেসে কাছে এগিয়ে এলেন ঠাকুমা। "অ মা, দাদু আমার বেড়ু করে ফিরে এসেছ? আহা, ওকে একটু মাই দাও বৌমা! দেখ দিকি, কোলে ছেলে না থাকলে বৌমানুষকে কি মানা[illegible]

ঝি এসে সুমিতার সামনে প্লেট আর জল রাখল। [illegible]বললেন, "একটু খেয়ে নাও, মুখ শুকিয়ে গেছে।" [illegible] বউ,

"এত দিলেন কেন?" প্রতিবাদ করল সুমিতা। [illegible] আমি খেতে পারব না।"

"এত আবার কোথায় গা?" রাগ করলেন বৃদ্ধা, "ওটুকু খেয়ে নাও। ফেলবার মত কিছু দিইনি।"

অন্তমনে বৌরাণীর কোলে শিশুটির দিকে তাকিয়েছিল সুমিতা। দুষ্টু ছেলেটা মায়ের স্তনে মুখ গুঁজে দিয়ে পরম সুবোধের মত তাকাচ্ছে তার দিকে। যেন কিছু জানে না। মাথা গরম হয়ে উঠল, ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল কান দুটো। ওই একরত্তি মাংসের ডেলাটাকে বুকে পিষে ফেলবার অদম্য বাসনা প্রাণপণে বুকে চাপার চেষ্টায় সারা হয়ে যেতে থাকল সে।

"ও কি, হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন? নাও মুখে দাও।"

বৃদ্ধার কথায় আত্মস্থ হল সুমিতা। ছি ছি! পরের সন্তানের প্রতি কেন তার এই অবৈধ লোভ? মহিম ছেলে চায় না। বলে, এই অভাবের সংসারে যুদ্ধ করতে করতে যদিও বা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে সে এখন, ছেলেপুলে হলে ছবি আঁকা তো দূরের কথা, সপরিবারে উপোষ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সুমিতা নিজেই কি এই অবস্থায় সন্তান কামনা করতে পারে?

গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে আলগোছে একটা সন্দেশ ভেঙে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল সুমিতা। মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে জুলজুল করে তাকাচ্ছে খোকা তার দিকে। পাতলা দুটি রাঙা ঠোঁট টুকটুক করছে। গভীর দুটি কালো চোখ। ভ্রু-রেখা এখনও ফোটেনি ভাল করে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে সুমিতা যেন ওই শিশুর গায়ের গন্ধ অনুভব করতে লাগল।

দুষ্টু ছেলে তড়বড় তড়বড় করে নেমে এল মায়ের কোল থেকে, তার দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। তার পর আবার পিছন ফিরে খিল-খিল করে হাসতে হাসতে হামাগুড়ি দিয়ে ঠাকুরমায়ের কোলে গিয়ে উঠল। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছিল সুমিতা শিশুর চাপল্য, গলা দিয়ে নামছিল না সন্দেশ।

ড্রইং-রুমের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল অবিনাশ। বলল, "মহিমকে আর গোটাকয়েক সন্দেশ দিয়ে যেতে বল মা!"

বাপের গলার সাড়া পেয়ে ঠাকুরমায়ের কোল থেকে নেমে এল খোকা। তাকে দেখে অবিনাশ বলল, "ছেলেকে দেখলেন বৌদি? বেটা খুদে শয়তান। সারা দিন দুষ্টুমীর আর কামাই নেই।"

অনিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল সুমিতা নাড়ুগোপালের ভঙ্গীতে বসে থাকা খোকার দিকে। বৌরাণী হাত এগিয়ে দিয়ে ডাকলেন "আয়।" অমনি মাথা নেড়ে খিলখিল করে হেসে ছুটল খোকা অন্য দিকে। মসৃণ মার্বেলের মেঝেয় হামাগুড়ি দিচ্ছে খোকা। তবু সুমিতার মনে হচ্ছিল বোধ হয় লাগছে ওর।

রেকাবি করে সন্দেশ এনে ঝিয়ের হাতে দিলেন অবিনাশের মা। অবিনাশের পিছু-পিছু চলে গেল সে বসবার ঘরের দিকে। সুমিতার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, "কই, তুমি যে বাছা কিছুই খেলে না?"

অনেক কষ্টে কথা বলল সুমিতা। অনুনয় করে বলল, "আর খেতে পারছি না মা! ছুটির দিনে আজ অনেক বেলায় ভাত খেয়েছি।"

"তবু ওটুকু খেতে পারতে খুব।" অসন্তুষ্ট হলেন বৃদ্ধা। তবে আর অনুরোধ করে বোধ হয় ছোট হতে চাইলেন না। গ্লাসের জলে হাত ডুবিয়ে হাত ধুয়ে নিল সুমিতা।

আরও আধ ঘণ্টা পরে বাসে যেতে যেতে প্রশ্ন করল মহিম, "কেমন লাগল অবিনাশের মা বৌকে?"

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল সুমিতা খোকার পাতলা চুল আর রাঙা ঠোঁটের কথা। অকারণে চোখে জল এসে যাচ্ছিল তার। স্বামীর প্রশ্নে কোন রকমে জবাব দিল, "কেমন আবার? বড় বংশের বড় লোকের শাশুড়ি বউ যেমন হয়, তেমনি।"

বিস্মিত হয়ে মহিম বলল, "খুব দেমাক দেখাল বুঝি? কি বলছিল?"

বলছিল অনেক কিছুই, ভাবল সুমিতা। কিন্তু সে সব তো স্বামীকে বলা যায় না। দিনের পর দিন দশটা-পাঁচটা উঞ্ছবৃত্তি করে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে যদি সে চায়, বৌমানুষ ঘরে থাকবে, গুছিয়ে রাখবে সংসারটিকে, ছেলেপুলে কোলে-পিঠে করে মানুষ করবে,—ছেলেপুলে, ওই খোকার মত টুকটুকে ফুটফুটে একরত্তি দুষ্টু ছেলে,—তবে সে চাওয়া কি তার অন্যায় হবে না?

তাই কিছুই বলতে পারল না সুমিতা। বাসের জানলা দিয়ে অপসৃয়মান পথের আলোকমালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর একবার ওই বড়লোকদের বাড়ির দমবন্ধ-করা আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক দখিণা বাতাসের মত সুন্দর ফুটফুটে শিশুটির কথা ভাবতে লাগল।

যাত্রা হল শুরু

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সকাল-বেলা সুপ্রিয় তার বাংলোর ড্রয়িংরুমে ব'সে চিঠি লিখছিল। খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। জানলার বাইরে গাছের মাথায় পাখীর কলকাকলি।

ঘরের কোলে প্রশস্ত বারান্দার প্রান্তে ব'সে আছে রামলাল। নতুন মনিবের খিদ্‌মদ্‌গার সে। সর্ব্ব সময় হাজির আছে। চিঠি ডাকে দেওয়া, লোকজনদের তলব করা, মনিবের ঘর পরিষ্কার রাখা এবং আরও কত টুকিটাকি কাজ রামলালের।

নতুন মনিবকে ভারী সমীহ করে সে। হয়ত ভয়ও করে। তাই সে সাধ্যপক্ষে তাঁর সামনে হাজির থাকে না। ঘরের বাইরে নীরবে ব'সে থাকে হুকুমের প্রতীক্ষায়।

—এই যে রামলাল! সাহেব আছেন তো?

স্লিপারের চটাপট্ শব্দ করতে করতে বারান্দায় উঠে এলো সুমিতা। তারপর 'আসতে পারি?' বলে ঘরের দরজায় থম্‌কে দাঁড়াল।

কলম নামিয়ে রেখে হাসিমুখে সুপ্রিয় বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সুমিতা বললে—কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

তেমনি হাসিমুখে সুপ্রিয় জবাব দিলে—ঘটলেই বা ব্যাঘাত। তাতে দুঃখিত বোধ করছি না মোটেই। বসুন।

টেবিলের সামনে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে সুমিতা বসল। ঘরের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে—এক রকম মন্দ হয়নি সাজানো-গোছানো। কি বলেন?

—মন্দ? চমৎকার হোয়েছে। যোগেশ বাবুর কাছে শুনলাম, আপনি নিজে দাঁড়িয়ে সব তদারক করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

সুপ্রিয়র কথায় খুসীতে উজ্জ্বল হল সুমিতা, বললে—আপনি আমাদের অতিথি। দেখাশোনা করা তো আমাদের কর্ত্তব্য। কিছু অসুবিধা বোধ করছেন না তো? ঠাকুরটা রান্নাবান্না করছে কেমন কে জানে!

—ভালই করছে। কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মনে মনে দমে গেছে সুপ্রিয়। এই ভাবে কথার পর কথার জাল যদি রচিত হতে থাকে তাহলে তার চিঠি-লেখার দফা গয়া।

সুমিতা বললে—কোন কিছু অসুবিধা হলে বা প্রয়োজন হলে বলতে সঙ্কোচ করবেন না। এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, আমরা থাকতে একথা যেন আপনাকে মনে করতে না হয়।

বাক্যের বাঁধুনি প্রশংসা পাবার যোগ্য। সুপ্রিয় বললে—অশেষ ধন্যবাদ। মনে রাখবো আপনার কথা।

সুমিতা বললে—আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে চা খাবেন।

—আজ সন্ধ্যায়! ব্যস্ত হল সুপ্রিয়—কিন্তু আজ তো বোধ হয় সম্ভব হবে না।

—কেন? ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুমিতা।

সুপ্রিয় বললে—আজ বিকেলে আমার বোম্বাই-এর সহকারী মিঃ পারেখ কলকাতা থেকে এখানে এসে পৌঁছোবে। কাজেই তার বাসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপারে বোধ হয় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, তাহলে কাল।

হাসলে সুপ্রিয়—কালও নয়। অন্য দিন। আমি নিজে বলব। কেমন?

ঘাড় নেড়ে সুমিতা বললে—আচ্ছা তাই। বলবেন তো?

—নিশ্চয় বলব।

কী মুস্কিলেই পড়েছে সুপ্রিয়। হঠাৎ ডাক দিলে—রামলাল।

—হুজুর। বলে ঘাড় নীচু করে রামলাল এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

—চায়ের জল দেওয়া হয়েছে?

—জী।

—আচ্ছা।

রামলাল চলে গেল।

সুমিতা বললে—কাল বিকেল-বেলা এই দিকে আসছিলাম। রামলালের মুখে শুনলাম, প্রমীলাদির বাড়ী গেছেন। ওঁদের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল বুঝি?

চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে সুপ্রিয় বললে—ছিল। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল ওঁদের বাসা। ভবতারণ বাবুর সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

—ও, তাই। উঠে দাঁড়াল সুমিতা—আজ যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।

—আসুন।

—সময় পেলে আসবেন আমাদের ওদিকে।

—নিশ্চয় আসবো।

—কথার ঠিক থাকবে তো? হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াল সুমিতা।

হা ভগবান! এমন বিপাকেও মানুষকে ফেলতে পারো তুমি!

সবেগে সুপ্রিয় বললে—নিশ্চয় ঠিক থাকবে।

চলে গেল সুমিতা। প্রকাণ্ড এক হাঁফ ছেড়ে সুপ্রিয় ডাকল—রামলাল!

রামলালকে পূর্ব্ববৎ দরজার গোড়ায় দেখা গেল।

অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে রামলালকেও এখন ভাল লাগছে সুপ্রিয়র। এই বৃদ্ধ বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে খুসী লাগছে তার। সত্যিই মায়া হয় লোকটাকে দেখলে। আর কী অনুগত। ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে যতক্ষণ না সে নিদ্রা যায় ততক্ষণ ঠায় হাজির থাকে রামলাল।

সুপ্রিয় বললে—রামলাল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে! তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব। তোমার কাজে খুসী হয়েছি।

বিড়-বিড় ক'রে রামলাল জবাব দিলে—হুজুরের মেহেরবাণী।

সুপ্রিয় জিগেস করলে—কতদিন এই কোম্পানীতে কাজ করছ রামলাল?

ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে রামলাল বললে—আজ্ঞে, এই ছ'মাস হবে।

—মাত্র ছ'মাস! আমি মনে করেছিলাম, দশ-বিশ বছর হবে। আচ্ছা রামলাল, তোমার দেশ কোথায়?

রামলালের ঘাড় আরও ঝুঁকে পড়ল, বললে—বিহার সরিফের এক গ্রামে। অজ পাড়াগাঁ হুজুর!

—সেখানে কে আছে তোমার?

—আছে? সবাই আছে হুজুর। রামলাল বলতে লাগল—জরু মরেছে। আছে ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ। ঘর-ভরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সুখের সংসার আমার।

ভাঙা-হিন্দি ভাঙা-বাংলায় মেশানো বুলি রামলালের কণ্ঠে ভারী অদ্ভুত শোনায়। অনেকদিন সে ঘর-ছাড়া, বাংলা দেশেই কেটেছে জীবনের বেশি সময়, তাই তার ভাষা অমন বিচিত্র।

সুপ্রিয় বললে—আমি চান করতে যাচ্ছি, রামলাল। হিতেন বাবু এলে বসতে বলবে।

রামলাল ঘাড় নাড়লে। সুপ্রিয় ভিতরের দিকে চলে গেল।

কাঁধের তোয়ালেখানা হাতে নিলে রামলাল। ঘরের আসবাব-পত্র ঝাড়-মোছ করতে লাগল। মনিব যখন থাকে না তখন সে এই সব কাজে মন দেয়। মিনিট পনেরো ধ'রে সে পাশাপাশি দু'খানি ঘরের দরজা-জানলা আসবাব-পত্রের সংস্কার সাধন করলে। তারপর এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়র টেবিলের সামনে। পরম যত্নে চেয়ারখানিকে মুছলে। টেবিলের ওপর ছোট-ফ্রেমে-আঁটা সুপ্রিয়র মায়ের ফটোখানি বসানো। সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল। পলক পড়ছে না চোখে। ঠায় সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলছে।

ঘরে ঢুকলো হিতেন। রামলাল তন্ময়। জানতে পারলে না। হিতেন তাড়া দিয়ে উঠল—এই উল্লু, সাবকো মেজ পর কেয়া করতা?

চমকে উঠল রামলাল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ঘাড় নীচু করে সরে যেতে লাগল দরজার দিকে। হিতেন খেঁকিয়ে উঠল—চোট্টা কাঁহাকা! কি নিয়েছিস টেবিল থেকে?

—কিছু নিইনি হুজুর!

—আলবৎ নিয়েছিস। সাহেবের মনিব্যাগে হাত দিয়েছিস।

—না, হুজুর! রামলাল কাঁপছে ভয়ে।

—না? গর্জ্জে উঠল হিতেন—হাম নেহি দেখা, ক্যা?

মারে আর কি!

চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এলো সুপ্রিয়। তখনো তার চুল আঁচড়ানো শেষ হয়নি।

—ব্যাপার কি হিতেন বাবু?

হিতেন বললে—দেখুন না কাণ্ড! বুড়ো ব্যাটা আপনার টেবিলের জিনিষ-পত্রে হাত দিচ্ছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে! দেখুন তো আপনার পার্স্‌টা খুলে। টাকাকড়িগুলো ঠিক আছে কি না।

মনিব্যাগ টেবিলের উপরেই রেখে গিয়েছিল সুপ্রিয়। কিন্তু সেদিকে সে মনোযোগ দিলে না। রামলালের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। রামলালের সর্ব্বদেহ কাঁপছে। মুখখানা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। কী করুণ আর অসহায় মূর্ত্তি!

নরম গলায় সুপ্রিয় বললে—রামলাল, তুমি বাইরে গিয়ে বোসো গে। তোমার কোন ভয় নেই।

সুপ্রিয়র কথা শুনে ঈষৎ সোজা হ'য়ে দাঁড়াল রামলাল। হাত-পায়ের কাঁপুনি থামল। যেন প্রাণ ফিরে পেল সে। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যস্ত হয়ে হিতেন বললে—টাকাগুলো একবার মিলিয়ে···

—টাকা ঠিকই আছে হিতেন বাবু! রামলাল চোর নয়! এখন শুনুন। গোটা দুই কাজের কথা আছে।

—বলুন!

ক্ষণেকের জন্যে অন্যমনস্ক হল সুপ্রিয়। তারপর বললে—আজ বিকেলে পারেখ আসছে। উপস্থিত গেষ্ট-হাউসে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—আজ্ঞে, সে তো ঠিক করাই আছে।

—আর, আপনি নিজে একটু তার দেখাশোনা করবেন! আমার মতো সে-ও আপনাদের অতিথি।

ঘাড় নেড়ে হিতেন বললে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমার ওপর যে-কাজের ভার দিলেন তাতে ত্রুটি ঘটবে না।

—ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। বললে সুপ্রিয়—আর একটা কথা, কাল থেকে আমি কাজে লাগতে চাই। রীতিমতো আপিসে বসব। আপনি সবাইকে বলে দেবেন। যোগেশ বাবুকে একবার দেখা করতে বলবেন। হিসাবপত্রের ব্যাপারটা চটপট চুকিয়ে ফেলবো মনস্থ করেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমায়।

হিতেন বললে—মাস তিনেক থাকবেন তো শুনেছি।

সুপ্রিয় আবার অন্যমনস্ক হয়েছে। হিতেনের কথার উত্তরে কতকটা আপনমনেই বললে—তিন মাস! সে যে অনেক দিন।

* * * *

সন্ধ্যার সময় প্রমীলা নিজের ঘরে শুয়েছিল। এলোমেলো চিন্তা। বিপর্য্যস্ত মন। কাল রাতে ঘুমের সঙ্গে ঘটেছে বিরোধ। আজ সারাদিন আহারের সঙ্গে। ক্লান্ত শরীর আর অবসন্ন মন নিয়ে প্রমীলা নিরতিশয় বিমূঢ় আর অসহায় বোধ করছে।

—ভিতরে আসবো, প্রমীলাদি!

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে উৎফুল্ল হল প্রমীলা। উঠে ব'সে বললে—আয়, শোভা, আয়। বাঁচালি আমায়!

অসংলগ্ন কথা। শোভা ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর হাসিমুখে বললে—তোমায় বাঁচালাম? সে আবার কি কথা হল! তোমায় বাঁচাবার লোক তো আমি নই। তবে তিনি আছেন কাছেই। ডেকে আনবো?

প্রমীলার বুঝতে দেরী হল না শোভা কার কথা বলছে। যোগেশের বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত হতে দেরী হয়নি সুমিতার মারফৎ! ম্লানমুখে ঈষৎ হেসে বললে—তোকে কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই ডেকে নিতে পারবো। কিন্তু তুই একা যে! সুমিতারা কই?

বিছানার এক প্রান্তে ব'সে শোভা বললে—তাদের আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে সুমিতার। সে হারিয়ে গেছে।

—তাই নাকি! কবে থেকে?

—বোম্বাই থেকে নতুন অতিথি যবে এসেছেন তবে থেকে! শোভা উত্তেজিত হল—ঢের ঢের হ্যাংলা মেয়ে দেখেছি প্রমীলাদি, কিন্তু সুমিতা সবাইকে টেক্কা দিয়েছে! ছি ছি!

—এত রাগ! প্রমীলা হেসে ফেললে!

—হবে না! শোভার রাগ বাড়ছে, বললে—আমাদের সবাইকার প্রেস্টিজ ডোবালে ও। সকাল নেই, বিকেল নেই, সন্ধ্যে নেই, সব সময়েই সুপ্রিয় বাবুর বাড়ী দৌড়োচ্ছে। ভদ্রলোক কী ভাবছেন, কে জানে?

—হয়ত ভালই ভাবছেন। বললে প্রমীলা।

—কে জানে। হতেও পারে। শোভা বললে—সকাল-বেলায় দেখা হল, হন্ হন্ করে চলেছে, বললে, ওঁকে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি! কি গদগদ ভাব, যদি দেখতে। লজ্জা নেই, বললে কি না, আমাকেই ভাই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া, সমস্ত।

শোভা থামল। প্রমীলা হাসছে। বেশ প্রাণ খুলেই হাসছে। শোভা বললে—হাসছ কি! কোন দিন হয়ত শুনবো, সাহেবের বাড়ীতে বসে সুমিতা বাটনা বাটছে!

কৌতুক সহকারে প্রমীলা বললে—কিন্তু তোর এত রাগ কেন? প্রতিযোগিতায় নেমে হেরে গেছিস নাকি?

রেগে হেসে ফেললে শোভা। বললে—আমার অমন পোড়া-কপাল নয়। আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো, আমার সব খবর। সুতরাং ও বদনাম দিতে পারবে না।

প্রমীলাও হাসতে লাগল, বললে—তা বটে। ভুলে গিছলাম যে তোর মনের মানুষ বাঁধা আছে মনের ঘরে। চিঠিপত্র আসছে?

—আসছে বৈ কি! আজই তো পেয়েছি। মস্ত বড় চিঠি।

শোভার সঙ্গে ভাব হয়েছিল যে-ছেলেটির, তাকে পছন্দ করেনি তার দাদা হিতেন। শোভার জেদ কিন্তু নুয়ে পড়েনি। সে পণ ক'রে ব'সে আছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না। বিনয় ছেলেটি ভাল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। পত্রালাপ আছে নিয়মিত। বিনয় শোভাকে জানিয়েছে যে প্রথম সুযোগেই সে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। প্রমীলাকে প্রথম থেকেই শোভার ভাল লেগেছিল। তাই তার গোপন কথা প্রমীলার কাছে প্রকাশ করে সে আনন্দ বোধ করেছে।

শোভার কথা শুনে প্রমীলা প্রশ্ন করলে—কি লিখেছে? বল্ না, শুনি!

—চিঠি সঙ্গেই আছে। কিন্তু পড়তে লজ্জা বোধ হচ্ছে যে!

—বলিস কি রে! চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস! প্রমীলার কণ্ঠস্বরে কৌতুক ঝরে পড়ল।

শোভা জবাব দিলে—ওই তো সম্বল। রক্ষা-কবচও বলতে পারো!

শোভার কথা শুনে অন্যমনস্ক ভাবে প্রমীলা বললে—খুব সাবধানে রাখিস। হারিয়ে না যায়।

ব্লাউজের ভিতর থেকে বার হল নীলাভ খাম। ব্রীড়ায় শোভায় অপরূপ দেখাচ্ছে শোভাকে। নিস্পলক নেত্রে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে প্রমীলা।

—সবটা পড়ব না কিন্তু। খানিকটা প'ড়ে শোনাই। বললে শোভা।

প্রমীলা প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করলে; হেসে বললে—ক্ষীরটুকু বাদ দিয়ে নীরটুকু? তাই পড়। শুনে কানে আঙুল দিতে হয় এমন ক্ষীরাংশই বুঝি বেশী?

—আঃ! কী যে বল। মুখে আটকায় না কিছুই। শোন।

শোভা পড়তে লাগল,—

"অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তোমাকে আর আমাকে। আমাদের জন্যে স্বর্গ-খেলনা নয়—এই বাণীটি সব সময় মনে রেখো। অনুশাসন আর বাধা-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পার হতে হবে তোমায়। পথের ধারে তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছি আমি, এই কথাটি মনে করে সাহস এনো অন্তরে। তোমার আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জয় অবধারিত। তোমার আত্মীয়রা যে অনুশাসন দিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাইছেন তার মধ্যে যুক্তি হয়ত আছে কিন্তু তোমার জীবনের চেয়ে সে যুক্তি বড় নয়। তোমার আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা ক্ষণকালের নয়, শুধু এ জীবনের নয়, তা অনাদিকালের, বহু জীবনের।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হোতে।

মন দিয়ে আমাকে যদি সত্যিকারের গ্রহণ করে থাকো, তাহলে কোন দ্বিধা যেন তোমাকে দুর্ব্বল না করে, কোন সংশয় যেন পীড়া না দেয়, গুরুজনের অনুশাসন যেন তোমাকে সত্য পথ থেকে বিচলিত না করে, আমাকে বরণ করে তুমি হয়ত তোমার গুরুজনের মনে দুঃখ দেবে, কিন্তু তোমার আমার জীবনের চিরকালের কল্যাণের
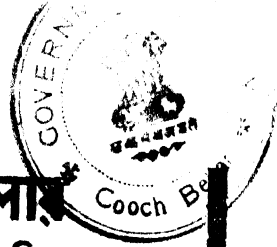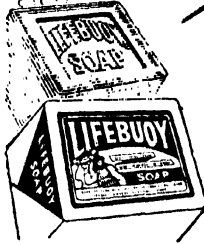
চেয়ে সে-দুঃখ বড় নয়. তাকে স্বীকার ক'রে জীবনের সার্থকতাকে অস্বীকার করবার মধ্যে ত্যাগের মহিমা খুঁজে পাবে না, অচিরকালেই বুঝবে, সে-ত্যাগের দ্বারা তুমি আর একজনের প্রতি চরম অবিচার করেছো।"

শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে গেল প্রমীলা। সহসা শোভার দু'হাত চেপে ধ'রে বলে উঠল—শোভা!

—কি প্রমীলাদি!

—না, কিছু না। পড়্।

—আর নেই। এখানেই শেষ।

প্রমীলা ঘাড় নাড়লে—আর-কিছু থাকতেও পারে না। তোরা ধন্ত। তোদের আশীর্ব্বাদ করি।

চিঠিখানি সযত্নে যথাস্থানে রেখে দিয়ে শোভা বললে—এখানে তুমিই আমার একমাত্র হিতৈষী, তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি প্রমীলাদি। তাই আমাদের যাত্রা যেদিন শুরু হবে সেদিন অন্ত কাউকে হয়ত কাছে পাবো না, কিন্তু তুমি যেখানেই থাকো, তোমাকে আনবো ডেকে। সব কাজের ভার নিতে হবে তোমায়।

—আমাকে! আর্ত্ত শোনাল প্রমীলার কণ্ঠস্বর—আমাকে কোন মঙ্গল-কাজে ডাকিস নে, শোভা, আমাকে ডাকিস নে।

আশ্চর্য্য হল শোভা। বললে—সে কি। সুমিতার মুখে সব শুনেছি। আগামী মাসেই তোমাদের বিয়ে হবে। সুমিতা বললে, যোগেশদা' অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন। কি হল! প্রমীলাদি!

—কিছু না। বড্ড মাথা ধরেছে। শোভা একটা গান কর। অনেক দিন তোর গান শুনি নি।

প্রমীলার কথায় মাথা দুলিয়ে শোভা বললে—বা রে, আমি আজ এসেছিলাম তোমার গান শুনতে। কতদিন সাধ্য-সাধনা করেছি। আজ না শুনে ছাড়বো না।

—আমার গান! সহজ কণ্ঠে প্রমীলা বললে—সে তো পুরনো যুগের কাহিনী। এখন অচল। এখন তোদের পালা। আমাদের দিন গেছে। তোদের হল শুরু, আমার হল সারা।

শোভা প্রতিবাদ করলে সজোরে—কী যে বল! তোমার কাছে আমরা! তোমার গানের কাছে আমাদের গান! সভা-সমিতি-জলসাতে তোমার পাশে থাকি আমরা, কিন্তু আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না!

—দূর! পোড়ারমুখী!

ঘাড় দুলিয়ে শোভা বললে—সত্যি! আমার কি মনে হয় জান প্রমীলাদি!

—কি মনে হয়?

—তুমি নিজেকে ঠিক মতো জান না। এখনো হয়ত নিজেকে চিনতে পারোনি। তোমার চোখের দৃষ্টি থাকে একদিকে, মনের দৃষ্টি অন্তদিকে! তোমাকে কল্পনা করেই হয়ত কবি লিখে গেছেন!—

তুমি অনন্যা

তুমি আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা!

তোমায় দেখে মাঝে মাঝে আমার ধাঁধা লাগে। যেমন এখন লাগছে।

—আঃ! তোর কথার জ্বালায় আমি গেলাম।

প্রমীলা রীতিমতো অসহিষ্ণু হোয়ে উঠল—বন্ধ কর্ তোর বচন-বিন্যাস।

—বন্ধ করলাম।

—গান ধর্।

—ধরলাম।

শোভা গাইতে লাগল:

"বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।"

কান পেতে শুনতে লাগল প্রমীলা। অনুভব করলে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

"ছিল তিথি অনুকূল
শুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার
সে-জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।"

গান শেষ হল। প্রমীলার মুখে কথা নেই। বহুক্ষণ কাটল নীরবে। তারপর শোভা বললে—আমার আবার গান! তুমি একটা গান শোনাও, লক্ষ্মীটি, প্রমীলাদি।

—আমি! প্রমীলা যেন ঘুম থেকে উঠল। বললে—কোন গানই যে মনে আসছে না শোভা!

শোভা বললে—রেকর্ডে যে-গান গেয়ে বহুজনের চিত্তহরণ করেছো, সেই গানটি তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তোর ডেঁপোমির আর অন্ত নেই! হাসলে প্রমীলা—রেকর্ডে তো শুনেছিস সে-গান কতবার।

—মন ভরেনি। সামনে ব'সে গাইবে, আমি একা শুনবো। স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে সে-অভিজ্ঞতা আর আনন্দ।

বাক্‌পটুতায় শোভা কম নয়। শেষ পর্য্যন্ত গাইতে হল প্রমীলাকে।—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

মৃদু-কম্প্র-কণ্ঠস্বর প্রাণের স্পর্শ পেয়ে ক্রমে সজীব হল। সুরের সঙ্গে মিশল আবেগ। অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ঘরের বাতাস হল মন্থর।

"সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন ক'রে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিও।"

ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে করুণ সুর-ঝঙ্কার পরিব্যাপ্ত হল দূর-দিগন্তে। পল্লীর অপর প্রান্তের মৃদু-আলোকিত আর-একটি ঘরে ঠিক সেই ক্ষণে সেই গানেরই সুর অনুরণিত হচ্ছিল।

নিজের ঘরে বসে সুপ্রিয় তার গ্রামোফোন খুলেছে। রেকর্ডে সেই গানখানিই বাজছে।

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়।"

তন্ময়-চিত্তে প্রমীলা গাইতে লাগল:

"হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে
ধরবো তারে ভরবো তারে রাখবো তারে সাথে,
একলা পথে চলা আমার করবো রমণীয়।"

এ-ঘরে ব'সে গাইছে প্রমীলা। ও-ঘরে বাজছে তার রেকর্ড। মধ্যে ছোট একটি প্রান্তর। কিন্তু সেই ছোট ব্যবধান আজ দিক্-বিহীন।

স্মৃতির সমুদ্র মন্থিত হল বুঝি! মনে পড়ল প্রমীলার একদিন এই গান সে শুনিয়েছিল সুপ্রিয়কে। তার নিজের হাতে রচনা-করা ফুলের বাগানে ব'সে সে গেয়েছিল এই গান, আর তার অদূরে ব'সে তার মুখের পানে তাকিয়ে সুপ্রিয় শুনেছিল এই গান।

গানের প্রথম লাইনের একটি কথা একটুখানি বদল ক'রে গেয়েছিল প্রমীলা :

"শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, সুপ্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

সুপ্রিয়র মনের পটে একই সময়ে সেই একই ছবি ভেসে উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পুষ্পভারানত সহকার-শাখার সেই সলজ্জ অভিসার-সজ্জা, আজন্ম-সাধনা-লব্ধ প্রিয়-বান্ধবীর সেই লাজ-নম্র মধুর অভিব্যক্তি, গানের একটি শব্দ বদল ক'রে গাইবার সময় তার দু'চোখের সেই মধুর আবেশ :

"শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, সুপ্রিয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

গান শেষ হল। শোভা হঠাৎ প্রমীলার পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। ব্যস্ত হয়ে তার দু'হাত ধ'রে ফেলে প্রমীলা বললে—এ কী কাণ্ড! হঠাৎ প্রণাম কেন?

মৃদু হেসে শোভা জবাব দিলে—তোমাকে দিদি বলে মানি। প্রণাম করতে দোষ কি?

প্রমীলা অপ্রস্তুত হল—তাই বলে সময় অসময় নেই?

শোভা উত্তর দিলে—কেন জানি মনে হল, তোমাকে প্রণাম করবার এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নেই।

* * * *

একাধিক কারণে যোগেশ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন এবং উদ্ভ্রান্ত বোধ করছে।

জগুয়াকে নিভৃতে ডেকে বলেছে, দুঃসময় আসছে খনি-শ্রমিকদের জীবনে, সে লড়বে তাদের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত, জগুয়া যেন তার পাশে থাকে।

উত্তরে জগুয়া জানিয়েছে, সে হুজুরের গোলাম। প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। প্রাণ নিতেও।

কিন্তু মহিম বাবুকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। চল্লিশ হাজারের হিসাবটার সমাধান এখনো হয়নি। মহিম স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন করে খাতা তৈরী করা বা অন্যায়-ভাবে কোন হিসাব খাড়া করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, হাজার কেন, দশ হাজার, একশো হাজার টাকার বিনিময়েও নয়।

মহিম বাবুর কথা শুনে মনে মনে জ্বলে উঠেছে যোগেশ। মুখে শান্তকণ্ঠে বলেছে, তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই যেন করেন।

সারাদিন তার কেটেছে নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে। সন্ধ্যাবেলা সে প্রমীলার বাড়ী হাজির হল, এবং সোজা পিসিমার ঘরে উঠে গেল।

দোতলায় দুখানি ছোট ঘর। তার একখানি পিসিমার। যোগেশ যখন পিসিমার সঙ্গে নানা সাংসারিক ও বৈষয়িক বিষয়ে আলোচনা বা তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে তখন ইচ্ছা করেই প্রমীলা সেখানে থাকে না।

—কেমন আছেন পিসিমা? বলে যোগেশ ঘরে ঢুকতেই পিসিমা বললেন—তিন চার দিন দেখা পাইনি কেন বাবা? শরীর ভাল আছে তো?

পিসিমা শয্যার ওপর উঠে বসলেন। যোগেশ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে বললে—শরীরের গোলমাল নেই। কাজের গোলমাল চলছে। তাও শীগগিরই মিটে যাবে। সেই ঝঞ্ঝাটের জন্যেই আসতে পারিনি।

—মিলির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রান্নাঘরে রয়েছে দেখলাম।

পিসিমা বললেন—হ্যাঁ, ঠাকুরটা আজ আবার আসেনি। ছুটি নিয়ে গেছে নাকি?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে যোগেশ বললে—বোম্বাই থেকে নতুন কর্ত্তা যিনি এসেছেন, তিনি গোল পাকাচ্ছেন। ঝক্কি তো সব আমারই কি না।

পিসিমা মন্তব্য করলেন—গোল পাকালে চলবে কেন? তুমি সব ঠিক ক'রে দাও না। নতুন মানুষ, তাই বোধ হয় কাজে হদিস পাচ্ছে না।

ঘাড় নেড়ে যোগেশ বললে—তাই বোধ হয় হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ চেনা ছিল, তাঁর বাবা আর কাকাবাবু নাকি খুব বন্ধু ছিলেন, কলকাতায় থাকতেন কাছাকাছি।

পিসিমা অনুসন্ধিৎসু হলেন, প্রশ্ন করলেন—নাম কি বল তো তার, আর তার বাপের?

—ভদ্রলোকের নাম সুপ্রিয় মুখুজ্যে, বাপের নাম প্রিয়নাথ মুখুজ্যে। চেনেন নাকি?

ভাইএর কাছে সমস্তই শুনেছিলেন তিনি। জেনেছিলেন সব খবর। যোগেশের কথা শুনে ভীষণ চমক লাগল তাঁর। মাথা নেড়ে বললেন—আমি চিনি নে, তবে নাম শুনেছি দাদার মুখে।

যোগেশ বললে—প্রমীলার সঙ্গেও ভদ্রলোকের আলাপ আছে। একদিন তো এসেছিলেন এখানে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

আবার চমক লাগল। উত্তরে বললেন পিসিমা—না। বোধ হয় আমার শরীর খারাপ ছিল বলে প্রমীলা আমার কাছে আনেনি।

ক্ষণকাল কাটল চুপচাপ। তারপর যোগেশ বললে—একটা কথা বলতে এসেছিলাম পিসিমা।

—বল বাবা।

যোগেশ একটু ইতস্ততঃ করে বললে—পুরুত মশায় দিন তো একটা স্থির করেছেন সামনের মাসে। দেরী আছে তার। আমি বলছিলাম কি, ইতিমধ্যে আশীর্ব্বাদটা সেরে রাখলে হয় না? অবিশ্যি আপনি যা ভাল বুঝবেন!

মাথা নেড়ে পিসিমা বললেন—ভাল কথাই বলেছো। আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি বাবা পুরুত মশাইকে একটা দিন দেখতে বল, যত তাড়াতাড়ি হয়।

—বলব, এবং তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—দিও। হ্যাঁ, আর শোনো বাবা, প্রিয় মুখুজ্যের ছেলেকে

বোলো যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে সময়মতো। দাদার সঙ্গে তাদের অনেক দিনের পরিচয় ছিল, তাই একটু আলাপ করব, এই আর কি!

—ব'লে দেব পিসিমা। আজ তাহলে উঠি।

—এসো বাবা।

নীচে নেমে প্রমীলার সঙ্গে দু'চারটে সাধারণ আলাপ শেষ ক'রে যোগেশ চলে গেল।

যোগেশের মুখে খবরটা শুনে পর্য্যন্ত পিসিমা ফুলছিলেন। এক সময়ে প্রমীলা ঘরে এলে বললেন—হ্যাঁ রে, একটা কথা জিগেস করি!

—কি কথা পিসিমা?

ভিতরের অগ্ন্যুৎপাত বাইরে ধরা পড়ল না, যথাসম্ভব নরম-গলায় তিনি বললেন—তোদের কলকাতার পড়শি প্রিয় মুখুজ্যের ছেলে সুপ্রিয়ই নাকি যোগেশদের কর্ত্তা হোয়ে এখানে এসেছে?

পিসিমা খবরটা পেয়েছেন তাহলে! প্রমীলা বললে—হ্যাঁ, তাই তো শুনছি!

—সুপ্রিয় নাকি এক দিন আমাদের বাড়ী এসে তোর সঙ্গে দেখা করে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কই, বলিসনি তো আমায়!

মুহূর্ত্ত কাল নীরব থেকে প্রমীলা জবাব দিলে—এমন কোন জরুরী বা গুরুতর ঘটনা নয়, তাই তোমায় বলতে খেয়াল ছিল না।

পিসিমা বললেন—দাদার সঙ্গে তাদের খুবই আলাপ ছিল। শুনেছি তো সবই। এসেছে জানলে আমিও একটু আলাপ করতাম। এবার এলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিস!

মনে মনে যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হয়ে মুখে বললে প্রমীলা—দেব।

[ক্রমশঃ।

নরহরি বাবুর চোখের জল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গায়ের রঙ কালো। মুখে বসন্তের দাগ। শরীরটা ঈষৎ স্থূলের দিকে ঝুঁকেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলের সংখ্যাই অনেক বেশি। চোখে নিকেলের ফ্রেমে মোটা লেন্স বাঁধানো পুরু চশমা। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। গলায় খদ্দরের চাদর। সদাপ্রসন্ন মুখ। বগলে ছাতা:—মোটামুটি এই হলেন নরহরি বাবু। গত ঊনত্রিশ বছর ধরে জাতীয়তাবাদী একটি বিখ্যাত দৈনিক কাগজের ক্যাসিয়ারের চাকরিতে তিনি বহাল আছেন। এতো দিন কাজ করতে-করতে সেই পত্রিকার আপিসের টেবিল—চেয়ার—মেসিন—বাড়ির মতোই তিনিও অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে আছেন। যাঁরাই এই কাগজের আপিস সম্বন্ধে কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁরাই নরহরি বাবুকে চেনেন। কল্পনাই করা যায় না এমন একদিন ছিলো যখন নরহরি বাবু এই কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এমন একদিন আসবে যেদিন নরহরি বাবুকে বাদ দিয়েও এই কাগজের আপিস চলবে!

গত ঊনত্রিশ বছরের মধ্যে ক'দিন নরহরি বাবু আপিস কামাই করেছেন আঙুল গুণে বলে দেওয়া যায়। জল হোক, ঝড় হোক, দাঙ্গা হোক, ষ্ট্রাইক হোক নির্বিকার ঘড়ির কাঁটার মতো নরহরি বাবু দশটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে পান চিবুতে-চিবুতে এক হাতে ছাতা অন্য হাতে খদ্দরের ধুতির কোঁচা ধরে খবরের কাগজের আপিসে ঢোকেন। গত ঊনত্রিশ বছর ধরে এই নিয়মের বড় একটা অন্যথা হয়নি।

তাই পর-পর দু'দিন তিনি যখন আপিস কামাই করলেন এবং তৃতীয় দিনে যখন ছত্রহীন অবস্থায় লাল-লাল চোখ, উস্কো-খুস্কো চুল, একমুখ খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর খদ্দরের আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আপিসে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে নিঃশব্দে গিয়ে বসলেন তখন আর সবাই কৌতূহল প্রকাশ না করে পারলো না। তাঁর চার দিকে পরিচিত মুখগুলি ভিড় করে এলো।

কী হয়েছে নরহরি বাবুর? আপিসে আসেননি কেন দু'দিন? চোখ দুটো লাল কেন? দাড়ি কামাতে কি ভুলে গেছেন? চুল আঁচড়াবার কথা কি মনে নেই? ছাতাটা কোথায়? চাদরটা কি হারিয়েছে? বৌদির সঙ্গে কি ঝগড়া চলছে? এ-রকম শুকনো-শুকনো চেহারা কেন?—নানা ধরণের প্রশ্ন—কখনো আন্তরিক, কখনো ভদ্রতা ও সৌজন্যমণ্ডিত, কখনো ঈষৎ কৌতুক-মিশ্রিত,—বর্ষিত হতে লাগলো।

গত ঊনত্রিশ বছর ধরে নরহরি বাবু আপিসের চেয়ারে বসে শাদা কাগজে লাল কালিতে দশ বার 'মা কালীর' নাম লিখে তার পর কথা বলেন। আজ তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর চারি দিকের পরিচিত মুখগুলির উপর চোখ বোলালেন সত্যি, কিন্তু মনে হোলো তাঁর দৃষ্টি সেই মুখগুলি অতিক্রম করে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। তার পর হঠাৎ যেন তাঁর চেতনা ফিরে এলো। টেবিলের উপর মুখটা ঝুঁকিয়ে কারুর দিকে না-চেয়েই তিনি মৃদু ধরা-ধরা গলায় বললেন, গত পরশু দিন হাসপাতালে তাঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তার পর একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং কাগজটার উপর শুধু কতকগুলো গোল-গোল শূন্য লিখে চললেন। শূন্যর পিঠে শূন্য তার পিঠে শূন্য—অসংখ্য শূন্য—যা যোগ করলেও শূন্য, বিয়োগ করলেও শূন্য, গুণ করলেও শূন্য, ভাগ করলেও শূন্য। গত ঊনত্রিশ বছর ধরে হিসেব করতে-করতে ঝানু হয়েও আজ যেন তিনি নিজের জীবনের ক্ষতির পরিমাণটা হিসেব করে উঠতে পারলেন না।

এতো দিন একসঙ্গে কাজ করতে-করতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা সবাই যেন একই পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক বিরাট পরিবার। প্রত্যেকের বাড়ির খুঁটিনাটি খবর প্রত্যেকে জানে। একের বিপর্যয়ে অন্যরা শোক পায়, অন্যের উৎসবে প্রত্যেকে আনন্দ প্রকাশ করে। মাঝে মাঝে খুঁটিনাটি কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও হয়, ছোটো-খাটো ঈর্ষাও আছে অনেকের মধ্যে। কিন্তু শোকের কারণ যেখানে বিরাট সেখানে সবাই অভিভূত না হয়ে পারে না। তাই নরহরি বাবুর পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে মুহূর্তের মধ্যে সবাই যেন কথা হারিয়ে ফেললো। তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল, বার্দ্ধক্যের একমাত্র ভরসা সেই ছেলে। কে কী বলবে?

খবরটা সমস্ত আপিসময় ছড়িয়ে পড়লো। একে-একে অনেকেই এলো নরহরি বাবুর ঘরে। ভিড় বাড়তে লাগলো।

কী হয়েছিলো নরহরি বাবুর ছেলের?

অখিলের প্রশ্নের উত্তরে নরহরি বাবু ধরা-ধরা গলায় যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করে যা বললেন তা এই :

সবাই জানে তাঁর ছেলে সদাগরি আপিসে কাজ করে। খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম আছে। পরশুর আগের দিন আপিস থেকে বাড়ি ফিরে ভিজে গামছা দিয়ে গা-হাত-পা মুছে সামান্য জলযোগ করে তিনি কাছের পার্কে কয়েক পাক ঘুরে আসার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন তখন এক ভদ্রলোক খবর দিয়ে যান খেলার মাঠে আঘাত পেয়ে তাঁর ছেলে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। কয়েক জন ট্যাক্সি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আঘাত গুরুতর বলে সন্দেহ হচ্ছে। নরহরি বাবু যখন হাসপাতাল পৌঁছন তখনও তাঁর ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এক কোণে রক্ত-মাখা তার নিস্পন্দ শরীরটা পড়ে ছিলো। তার পর অনেক দৌড়-ঝাঁপ করে অনেক কাকুতি-মিনতি অনেক হাতে-পায়ে ধরে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়, ভর্তির দু'ঘণ্টা পরে অকস্মাৎ তাঁকে বলা হয় দেহে সঞ্চালনের জন্য তাজা রক্ত জোগাড় করতে। কোনো দাতাকে জোগাড় করতে না-পেরে তিনি নিজেই সাড়ে তিন শ' সি· সি· রক্ত দেন এবং এই সব হাঙ্গামা করে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে নিজের রক্ত শিশিতে ভরে তিনি যখন হাসপাতালে পৌঁছন তখন আর রক্তের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। খানিক আগেই তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি বললেন, "হাসপাতালের এক ছোকরা ডাক্তারের কাছে পরে শুনলাম, তিন ঘণ্টা আগে রক্ত দেওয়া হলে নিশ্চয়ই সে বাঁচতো।"

হাসপাতালের অব্যবস্থা, সেখানকার কর্মচারীদের হৃদয়হীনতা—এ-সব কথা বলতে-বলতে গত উনত্রিশ বছর ধরে যা কেউ দেখেনি, দেখবে বলে কল্পনাও করেনি, তাই দেখলো সবাই : ব্লটিং কাগজের উপর মুখ রেখে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে নরহরি বাবু কাঁদতে লাগলেন! অভূতপূর্ব দৃশ্য, সন্দেহ নেই। তবে অস্বাভাবিক নয়। দরিদ্র কেরাণীর পক্ষে অসহায় ভাবে কাঁদা ছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আর কী পথ খোলা থাকতে পারে?

কিন্তু না, অন্য পথও আছে বৈ কি? পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কানে ক্রমশ কথাটা গেলো। তিনি নিজে নরহরি বাবুর ঘরে এলেন। হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের খাস-কামরায়। নিজ হাতে জল গড়িয়ে নরহরি বাবুকে পান করতে অনুরোধ করলেন, তার পর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "জানবেন নরহরি বাবু, এই সব অন্যায়, অবিচার, অনাচার,—আমাদের দেশের এই সব পাপের প্রতিবাদ না করে আমাদের পত্রিকা কখনোই চুপ করে থাকবে না। দেশ কী, দেশ কাকে বলে? আপনাকে আমাকে বাদ দিয়ে তো দেশ নয়। আজ আপনার সংসারে যা ঘটলো, কাল আমার সংসারেও তাই ঘটতে পারে। দৈনিক কত অসংখ্য এই রকম অনাচার ঘটছে কে বলতে পারে! আমি এখনি সম্পাদককে ডেকে পাঠাচ্ছি, চীফ রিপোর্টারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। এঁদের সামনে আপনার পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনা আপনি আবার করুন। চীফ রিপোর্টার হেমেন তার পর যাবে হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের এ-বিষয়ে কী বক্তব্য আছে শুনে আসুক। তার পর কালকের কাগজেই দেখবেন সবিস্তারে এই খবর আমরা বার করবো। জোরালো সম্পাদকীয় ছাপাবো। হাসপাতালের অব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ না করে আমরা শান্ত হব না। জানবেন, আপনি একলা নন, আপনার পিছনে আমরা সবাই আছি। আমাদের কাগজ আছে। আর হ্যাঁ, আপনার ছেলের একটা ভালো ফটো দরকার—"

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায় অভিভূত না হয়ে নরহরি বাবু পারলেন না। আবার চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়তে লাগলো। ময়লা কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে এবার তাঁর বুকের ভিতরকার জমাট ভারটাকে অনেকটা হালকা বলে মনে হোলো।

পরের দিন বাস্তবিকই সেই জাতীয়তাবাদী কাগজে সাড়ম্বরে ছবি সহ নরহরি বাবুর পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ এবং জোরালো সম্পাদকীয় ছাপা হোলো। আমাদের দেশের হাসপাতালে-হাসপাতালে এ-ধরনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করে অবিলম্বে তদন্ত কমিশন বসাবার উপদেশ ছিলো সেই সম্পাদকীয়তে। এই স্বাধীন দেশে এ-ধরনের অনাচার অবিলম্বে যাতে বন্ধ হয় তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জোরালো আবেগময়ী ভাষায় আবেদন এবং হুমকি কিছুই বাদ যায়নি।

সমস্ত রাত নিজের শোকের বাড়ির গুমট আবহাওয়ায় একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে নরহরি বাবুর রাত কেটেছিলো। ভালো ঘুম হয়নি। সকালে উঠেই তিনি অন্য সব খবর বাদ দিয়ে নিজের ছেলের খবর আর সে-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি অসংখ্য বার পড়লেন। পড়তে-পড়তে প্রায় মুখস্থ হয়ে এলো। শোকের পরিবর্তে একটু যেন গর্বই হতে লাগলো নরহরি বাবুর। তাঁর নাম ছাপা হয়েছে কাগজে, ছাপা হয়েছে তাঁর ছেলের নাম। তিনি একা নন। সহকর্মীরা সবাই রয়েছে তাঁর পিছনে। তাঁর পিছনে রয়েছে সমস্ত খবরের কাগজের আপিস। এতোক্ষণে বাড়িতে-বাড়িতে বিলি হয়েছে এই কাগজ, রেল গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছে এই কাগজ সহর থেকে সহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। হাজার হাজার লোক এতোক্ষণে নিশ্চয়ই পড়ছে এই খবর। সমস্ত দেশময় একটা হুলুস্থুল লেগে গেলো বলে! তাঁদের কাগজ লিখেছে : "নরহরি বাবুর পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া সরকারী মহলের যদি আজ টনক নড়ে, আমাদের দেশের হাসপাতালগুলির ভিতরকার এতো দিনকার পুঞ্জীভূত পাপ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার যদি আজ মূলোচ্ছেদ হয় তাহা হইলে সমস্ত দেশবাসী নিশ্চয়ই আমাদের সহিত একমত হইয়া বলিবেন—এই শোচনীয় মৃত্যু একেবারে নিরর্থক হয় নাই। তাহা হইলে বুঝিব, নরহরি বাবুর পুত্র নিজের জীবন দিয়া ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ জীবনকে বাঁচাইলেন এবং তাহা হইলেই এই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ শান্তি পাইবেন।"

নরহরি বাবু বার বার পড়ে চললেন। পড়ে-পড়ে যেন তাঁর আর তৃপ্তি হয় না। শেষে একটি কাঁচি বার করে সযত্নে তিনি খবর ও সম্পাদকীয়টি কেটে মানিব্যাগের ভিতর রাখলেন।

আপিস যাবার সময় মোড়ের হকারের কাছ থেকে আর এক কপি কাগজ কিনে তিনি ট্রামে উঠলেন। যার হাতেই খবরের কাগজ দেখেন কী যেন আশা করে নরহরি বাবু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। ভিড়ের মধ্যে কে কী বলছে, শোনবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে তাঁর কান। ট্রাম চলতে থাকে। আপিসগামী যাত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ ভিড়ের কথা উল্লেখ করে সরকারের মুণ্ডপাত করে। মোহনবাগান গতকাল একটা বাজে

দলের কাছে হেরে যাওয়ায় এক জন অসন্তোষ প্রকাশ করে। এলিজাবেথের করোনেশনের জন্ম কত লক্ষ পাউণ্ড খরচ হচ্ছে—এক দিকে তাঁর জল্পনা-কল্পনা চলে। পাশের ভদ্রলোক নরহরি বাবুর কাছ থেকে কাগজটি ধার নিয়ে দ্রুত শেয়ার-বাজারের দরের উপর চোখ বুলিয়ে আবার ফেরৎ দেন। ক্রমশঃ কী রকম যেন হতাশ হয়ে পড়েন নরহরি বাবু। অবশেষে তাঁর আপিসের কয়েক ষ্টপ আগে এক ভদ্রলোক আজকের কাগজে হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং ডাক্তারদের হৃদয়হীনতার কথা পাড়েন।

উত্তরে আর এক ভদ্রলোক বলেন, "আর বলবেন না মশাই। যে-সব কাণ্ড আমাদের দেশে ঘটছে—"

আবার চাপা পড়ে যায় এই প্রসঙ্গ। আপিসের সামনে নরহরি বাবু নেমে পড়ে মাথা নীচু করে হাঁটতে সুরু করেন।

আজ আর বলবার কথা তাঁর কিছু নেই। তাঁর কথা তো খবরের কাগজেই বেরিয়েছে। সহকর্মীরা অনেকেই তাঁর কাছে আসে। নরহরি বাবুর শোকের উল্লেখ করে নিজেদের নানা প্রাচীন শোকের কাহিনীর কথা তারা বলে। তাদের জীবনের শোকের গল্প চটকদার করার জন্ম কেউ-কেউ আবার রঙ চড়ায়। শুনতে ইচ্ছে করে না নরহরি বাবুর। তবু, শুনতে হয়। সমবেদনা জানাতে হয়। ভালো লাগে না তাঁর। কেবলি তাঁর ইচ্ছে করে নিজের মৃত পুত্রের কথা সবিস্তারে তাদের বলতে। তাঁর ছেলে যে কত ভালো ছিলো, তার উপর কতটা যে তিনি ভরসা করছিলেন, তার নাতি-নাতনিদের যে কী হবে, পুত্রবধূর কী হবে, কয়েক বছর পরে অবসর নিলে তাঁর সংসার কি ভাবে যে চলবে—এই সব কথা আজ তিনি সবাইকে শোনাতে চান, পেতে চান সবাইকার সহানুভূতি। কিন্তু আজ যেন তাঁর কথা শোনবার উৎসাহ কারুর নেই। তাঁকে কেন্দ্র করে আজ তো খবর ছাপা হয়েছে, অমন জোরালো সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। তাঁদের কাগজ তো নরহরি বাবুর প্রতি কর্তব্য সেরেছে। প্রতিদানে অন্তত আজ নরহরি বাবু অন্তদের শোকের, দুঃখের, অভাবের অনটনের কথা শুনুন। সবাইকার জন্ম আজ তিনি জানান সমবেদনা।—তাঁর সহকর্মীদের এই ভাবখানা নরহরি বাবুর ভালো লাগে না। শেষ কালে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই অমন মর্মন্তুদ ঘটনার কথা, অমন জোরালো সম্পাদকীয়র কথা সবাই বেমালুম ভুলে গেলো। রাতে ভালো ঘুম হয় না নরহরি বাবুর। ভোর হতে না হতেই খবরের কাগজের জন্ম ...র গিয়ে তিনি দাঁড়ান। তার পর আদ্যোপান্ত সমস্ত কাগজ পাঠ করে স্বভাব-স্বল্পবাক্ নরহরি বাবু যেন আরো গম্ভীর হয়ে যান। ভুলে যাচ্ছে সবাই তাঁর ছেলেকে, ভুলে যাচ্ছে তার শোচনীয় মৃত্যুকে। কোরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে, রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে, আইসেনহাওয়ার আর রিটা হেওয়ার্থকে নিয়ে, ইউ, এন্, ও, ও কাশ্মীর নিয়ে, রায়েলেশিমার বন্যা নিয়ে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চুরি-জুয়াচুরি নিয়ে কাগজে-কাগজে খবর ও সম্পাদকীয় বেরুচ্ছে। সেই রক্ত-মাখা দেহ আর হাসপাতালের অব্যবস্থার কথা সবাই ভুলে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে নরহরি বাবুর সাড়ে তিন শ' সি, সি, রক্ত দেবার কথাও মনে নেই কারুর। মাসে-মাসে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে তিনি বুক-পকেট থেকে পুরনো মানি-ব্যাগটা বার করে খবরের কাগজের সেই টুকরো দুটি বার করেন, মনে-মনে পড়েন। আবার তুলে রাখেন। বাড়িতে কেউ এলেই তিনি সেই টুকরোগুলো বার করে পড়ে শোনাতে যান। ভালো করে কেউ আর আজ-কাল শোনে না। ও-খবর তো পুরনো হয়ে গেছে, ও-খবর তো তারা অনেক দিন আগে পড়েছে, সদানন্দর স্ত্রীকে নিয়েও হাসপাতালে তো আবার এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটেছে—নরহরি বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজের টুকরোগুলি ব্যাগে ভরে রাখেন। কত লোককে কত বার নিজের শোকের কাহিনী গোড়া থেকে শোনাতে তাঁর ইচ্ছে হয়। পৃথিবীতে আজ সে-রকম কেউই নেই নাকি?

সময়ে স্নান নেই, আহার নেই, রাতে ভালো ঘুম নেই। দ্রুত খারাপ হয়ে চলেছে নরহরি বাবুর শরীর। তাঁর চামড়ার সেই চকচকে ঔজ্জ্বল্য আর নেই। চামড়াগুলো কী রকম ঢিলে আর ম্যাড়মেড়ে দেখায়—অনেক দিন ব্যবহার-করা পালিশহীন জুতোর মতো।

সেদিন রাত্রে নানা রকম আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে বসতে হয় বলেই নরহরি বাবু খেতে বসেছেন। এমন সময় বাড়ির বেড়ালটার ক্রমাগত মিউ-মিউ শব্দে বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

ছোটো নাতনি বললো, "জানো দাদু, মহেশটা কী বজ্জাত। পুষির বাচ্চাটাকে আজ সে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। সমস্ত দিন পুষিটা বাচ্চাটাকে খুঁজে-খুঁজে কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে।"

নরহরি বাবুর খাওয়া হোলো না। তিনি উঠে পড়লেন। মহেশ নামে ছোকরা, চাকরটাকে ডেকে গালাগালি করে তখনই জবাব দিলেন। তার পর শোবার ঘরে এলেন। পুত্রবধূ তাঁর জন্ম এক বাটি দুধ মাথার কাছে রেখে গেল। রাত্রে যদি ক্ষিদে পায়—

মশারি ফেলে শুয়ে পড়লেন নরহরি বাবু। দরজাটা বন্ধ করে তিনি শোন। সমস্ত শহর ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। বড় রাস্তা থেকে বাস আর ট্রামের শব্দও ক্ষীণতর হয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে ক্রমশ। কিন্তু নরহরি বাবুর ঘুম আর আসে না। অন্ধকার ঘরে জেগে থাকতে-থাকতে বেড়ালটার মিউ-মিউ তিনি শুনতে লাগলেন।

এক সময় মনে হোলো নখ দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের বন্ধ দরজাটা কে যেন আঁচড়াচ্ছে।

উঠে পড়লেন নরহরি বাবু। চোখে চশমা আঁটলেন। আলো জ্বালালেন। দরজাটা খুললেন। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো করে বেড়ালটা ঘরে ঢুকলো। নরহরি বাবুর দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই তীর-বেগে খাটের তলায় ঢুকলো, কোণের জলচৌকির নীচে সেঁদুলো, পাকানো মাদুরটাকে নখে করে আঁচড়াতে লাগলো। তার পর নতান্ত অসহায় হয়ে নরহরি বাবুর পায়ে নিজের গা ঘষতে-ঘষতে মিউ-মিউ করতে লাগলো।

নরহরি বাবু দুধের বাটিটা নামিয়ে তার মুখের কাছে রাখলেন। বেড়ালটা চুক-চুক করে খেতে লাগলো। কী মনে হওয়ায় তিনি আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বার করলেন। তার পর সন্তর্পণে সেই কাগজের টুকরোগুলোর ভাঁজ খুলে নাকের উপর চশমা টেনে পড়তে লাগলেন।

অনেক দিন পরে নিজের দুঃখের কাহিনী কোনো প্রাণীকে শোনাতে পেরে তাঁর মনটা হাল্কা হয়ে আসতে লাগলো। চোখ দিয়ে টপ-টপ করে বড়-বড় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগলো।
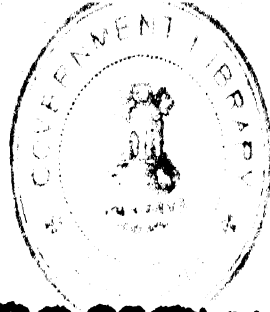
শীতকালের কাশি!
চাপা দিয়ে রাখা ভালো নয়—
সিরোলিন খেয়ে নির্মূল করুন
শীতকালের কাশি মানেই বিপদ। কাশি হলেই বুঝতে হবে, গলায় ও ফুসফুসে প্রদাহ হয়েছে, শ্লেষ্মা জমেছে। তাই কাশি চাপা দিয়ে রাখা ভালো নয়, একেবারে সারিয়ে ফেলা উচিত। সিরোলিন 'রচি' একেবারে কাশির গোড়ায় গিয়ে ঘা দেয়। এর জীবাণুনাশক ক্রিয়াতে কাশির জীবাণু বিনষ্ট হয়, প্রদাহ কমে; তাছাড়া এতে শ্লেষ্মা উঠে যায়। সিরোলিন কাশির কারণগুলোকে ক্রমে ক্রমে একেবারে নির্মূল করে। এতে কোন মাদকদ্রব্য নেই, তাছাড়া সিরোলিন-এ এফিড্রিন ও থাকে না।
ক্ষয়িত অবয়বের পুনর্গঠন করে
সিরোলিন শরীর সবল রাখে, ক্ষিদে আর হজমের ক্ষমতা বাড়ায়, ছোঁয়াচে রোগ হতে দেয় না। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক সিরোলিন খেয়ে উপকার পেয়েছেন — কাশি নির্মূল করার সুপরীক্ষিত পারিবারিক ওষুধ সিরোলিন সব সময়ে এক শিশি ঘরে রাখবেন।
SIROLIN
ROCHE
সিরোলিন
'রচি'
VB 6933

দেবব্রত ভৌমিক

মানুষে অনেক সময় এমন অনেক কাজ করে বসে, যার মূল খুঁজতে গেলে সঙ্গত কোন কারণই পাওয়া যায় না। হয়তো পাওয়া যেতে পারে মাত্র সামান্য একটু কৌতূহল। অথচ বহু ক্ষেত্রে এরই জের টেনে চলতে হয় অনেক দূর, বহু অনুশোচনার পথ বেয়ে যেতে হয়, পুড়তে হয় মনস্তাপে।

ন্যায়রত্ন দাদুর সঙ্গে আলাপটা আমার ঠিক এই ধরণের ব্যাপার।

সে প্রায় মাস ছ'শেক আগের কথা, দাদুকে প্রথম যেদিন দেখলাম ঠিক বেথুন কলেজের সামনে, ফুটপাথের উপর। জন কয়েক উড়ে আর খোট্টা জ্যোতিষীর মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী। সামনে খড়ি দিয়ে কতকগুলো নক্সা আঁকা, পাশে খানদু'য়েক মোটা-মোটা জীর্ণ পুঁথি, মাথার উপর ছোট্ট একটা বোর্ডে মোটা হরফে লেখা 'ভাগ্যগণনা'।

জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নেই, কৌতূহলও নেই। কাজেই আকর্ষণের কারণটা ওখানে নয়, কারণ স্বয়ং জ্যোতিষী—তার চেহারা। দূর থেকে দেখলে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়। ছোট-ছেলেদের পাঠ্য বইয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, ঠিক তেমনি। তেমনি তপ্তকাঞ্চননিভ বর্ণ, তেমনি সাদা দাড়ি, টিকালো নাক, প্রশস্ত ললাট, সৌম্য শান্ত মুখশ্রী। অবশ্য দারিদ্রের ছাপটাও সারা দেহেই প্রকট—পরনের কাপড়টা মলিন, গায়ের উড়্‌নিটা শতছিদ্র।

হাতে কাজ ছিল না, মনের অবস্থাটাও ছিল ভালো। আর সবার উপরে এই রকম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অতি বেমানান এই এই মানুষটি সম্বন্ধে কৌতূহলও বোধ করছিলাম বেশ একটু। কাজেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম।

সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলেন। স্মিত মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আসুন।'

রীতি মাফিক আমি পথের উপরেই উবু হ'য়ে বসতে যাচ্ছিলাম, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, একটা কাগজ পেতে দিই।'

তারপর তার পুঁথি-পত্তরের তলা থেকে পুরোন খবরের কাগজের একটা পাতা বের ক'রে সযত্নে সামনে পাতলেন। বললেন, 'এইবার বসুন।'

জাঁকিয়ে বসতেই আবার প্রশ্ন করলেন, 'হাত দেখাতে চান?'

হাত-দেখানর আমার প্রয়োজন ছিল না। তবুও ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো চাই-ই। দেখুন দেখি নিমতলার দেরী কত।'

উনি একটু হাসলেন, উত্তর দিলেন না। তারপর খানিকক্ষণ ধ'রে হাতটা উল্টে পাল্টে এপাশ-ওপাশ ভালো ক'রে দেখে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। বললেন, 'দেখুন, হাত দেখছি বটে, কিন্তু একটা কথা আগেই বলে নিই। জ্যোতিষে আমার খুব বেশী ভালো দখল নেই, কাজেই গণনা নিখুঁত নাও হ'তে পারে।'

হাল্‌কা স্বরে উত্তর দিলাম, 'না-হয় নাই হবে, আপনি দেখুন তো।'

'আচ্ছা, আপনার জন্মের সময়টা জানেন?'

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'না, জন্মেছি যে শুধু এইটুকুই বলতে পারি।'

মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে হাতটা দেখলেন উনি। খড়ি পেতে নানা আঁকজোক করলেন। তারপর বলতে লাগলেন এক এক ক'রে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে বহু কিছু। কিছু ঠিক মত খাটল, কিছু খাটল না। সব শেষে আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে বললেন, 'আপনি নিজের আর্থিক ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারে, অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে একটু উদাসীন প্রকৃতির। অনেক কাজ আপনি বোঝেন যে করা উচিত, আর তাতে আপনার অনিচ্ছাও নেই, অথচ শুধু একটু উৎসাহের অভাবে আপনি তা' করেন না। অবশ্য এ জন্য পরে অনুশোচনাও করতে হয় যথেষ্ট।'

মনে হলো, কথাটা অতি মামুলী। যে-কোন সাধারণ বাঙ্গালী সম্বন্ধেই খাটে এ-কথা। আমরা ঝোঁকের মাথায় অকারণেই যেমন বহু কিছু করি, তেমনি কারণ থাকা সত্ত্বেও শুধু উৎসাহের অভাবেই অনেক কাজ করি না। প্রতিবেশীর বাড়ীতে আগুন লাগলে আমরা ঘরে বসে-বসেই আন্তরিক ভাবে দুঃখ করি, কিন্তু এক বালতি জল নিয়ে এগোই না। এটা আমাদের জাতিগত ক্যালাস্‌নেস্।

যাই হোক, হাত দেখার পাট তো চুকলো। এবার আমি সরাসরিই প্রশ্ন ক'রে বসলাম, 'আচ্ছা, আপনি জ্যোতিষীর ব্যবসাই যদি করতে চান, তা'হলে এখানে এসে বসলেন কেন?'

উনি একটু অবাক হ'য়েই আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'কেন, এখানে বসতে কোন আপত্তি আছে নাকি?'

বললাম, 'না, তা' নয়। আমি ব্যবসার দিক থেকে বলছি। এখানে আরো অনেকে বসেছে। আর, ওরা যে ভাবে লোক ডাকাডাকি করছে, তাতে আপনি এখানে কিছু সুবিধা ক'রে উঠতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া, হাত-দেখার আগেই আপনি নিখুঁত দেখতে পারবো না বললে, ওদের অভ্রান্ত গণনা ছেড়ে লোকে আপনার কাছে আসবে কেন?'

উনি একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু কি আর করা যাবে, কোথায়ই বা যাবো! এখানে বরং তবু ওদের ডাকাডাকিতে দু'-চার জন লোক আসে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, আসে। কিন্তু সে ওদেরই কাছে, আপনার কাছে তো নয়।'

আবার হাসলেন উনি, হেসে-হেসেই বললেন, 'না, ওদের হাত থেকে ছিটকে দু'-এক জন আমার হাতেও চলে আসে বৈ কি।'

'কিন্তু সে কি টেকে? নিখুঁত গণনা হবে না শোনার পরও?'

এবার আর উনি কোনও উত্তর দিলেন না। অগত্যা আমাকেই কথা থামাতে হলো।

উঠে আসার সময় হাত দেখার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কিছু জিজ্ঞেস না করেই দু'টো টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু উনি একটা নিয়ে আর একটা আমার উদ্যত হাতেই ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি এক টাকাই নিই।'

উদার স্বরেই বললাম, 'তা' হোক না। দু'টোই নিন, আমি দিচ্ছি যখন।'

'না, আমার ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী তো নিতে পারি না।'—দৃঢ় স্বরেই উনি উত্তর দিলেন।

'প্রাপ্য হিসাবে না নিন, এমনিই নিন।'—টাকাটা ওঁকে দেবার জন্য আমার কেমন যেন একটা জেদ চেপে যায়।

উনি আবার হাসলেন। বললেন, 'না, তা' নিতে পারবো না। আপনি কিছু মনে করবেন না। দান-পরিগ্রহে আমার নিষেধ আছে—আমাদের কুলদেবতা গোবিন্দের নিষেধ।'

জেদ বজায় রাখতে না-পেরে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সে-ভাবটা কেটে গেল। উনি তখনো হাসছেন। আর, সে-হাসি এখন অদ্ভুত যে তার দিকে তাকিয়ে মনে রাগ পুষে রাখা যায় না। বড়ো স্নিগ্ধ, মিষ্ট হাসি, যেন সমস্ত ব্যথা-বেদনা-ক্ষোভের উপর দিয়ে স্নেহশীতল সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে নিয়ে যায়।

সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম। অবশ্য আসবার আগে নামটা জেনে নিতে ভুললাম না। নাম তাঁর: শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন।

দিন কয়েক পরেই আবার দেখা হলো।

ঠিক মাণিকতলা বাজারের সামনে। এপাশে-ওপাশে দু'টো কাপড়ের দোকান, মাঝখানে একফালি বারান্দা। তারই এক কোণে একগাদা গামছা, গেঞ্জি, ইজের, আর ফ্রগ সামনে বিছিয়ে বসে আছেন ন্যায়রত্ন মশায়।

স্মৃতিশক্তি আমার খুব বেশী দুর্বল নয়, আর এ-চেহারাও এতো সহজে ভুলবার নয়। তবুও চিনতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো।

তারপর এগিয়ে গেলাম। পায়ে-পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নমস্কার ক'রে বললাম, 'চিনতে পারছেন?'

ন্যায়রত্ন মশায় মুখ তুলে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন, বুঝতে পারলাম চিনতে পারেননি।

বললাম, 'সেই যে সেদিন হেদোর সামনে আপনাকে হাত দেখালাম।······মনে পড়ছে না?'

'ও···ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'—বৃদ্ধ হাসলেন।

বৃদ্ধ হাসলেন। আর, তাঁর মুখ-ভরা হাসির দিকে তাকিয়ে এতোক্ষণে আমার মনস্তাত্ত্বিক মন যেন দিশা পেলো। নিমেষেই বুঝতে পারলাম, যেন ওঁকে চিনতে আমার দেরী হচ্ছিল। সেই চেহারা, সেই পোষাক-আশাক, সবই সেই; অথচ কোথায় যেন একটা মস্তো পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। যে-চেহারা সেদিন সম্ভ্রম জাগিয়েছিল, তা' আজ কৃপার উদ্রেক করছে মাত্র। যে-হাসি সেদিন সান্ত্বনা দিয়েছিল, তা' নিজেই যেন আজ সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজছে। বৃদ্ধের চোখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, দু'চোখে সেদিনের সেই দীপ্তি নেই, নেই আত্মোপলব্ধির ব্যক্তিত্বময় দৃঢ়তা। তা' আজ বড়ো ম্লান, ম্রিয়মাণ—দু'চোখে যেন কেমন একটা অসহায় অবোধ দৃষ্টি।

কেন জানি বড়ো মায়া লাগলো। বললাম, 'আপনি এখানে? জ্যোতিষীর কাজ ছেড়ে দিলেন?'

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, সেই মুখ-ভরা অবোধ হাসি। বললেন, 'হ্যাঁ, ছেড়েই দিলাম। ওতে কিছু করতে পারলাম না তো, তাই।'

'কিন্তু এতেও কি কিছু করতে পারবেন?'—দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে বললাম।

'কি জানি, দেখি। সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।'—চিন্তা-ভাবনাহীন উত্তর।

হিতোপদেশ দেবার মতো ঘনিষ্ঠতা নেই। কাজেই ও-প্রসঙ্গ ছাড়তে হ'লো। বললাম, 'আপনি কলকাতায় নতুন এসেছেন নাকি?'

উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, এই তো মাত্র মাস ছয়েক হলো।'

'ওঃ, ইষ্টবেঙ্গল থেকে আসছেন নিশ্চয়ই?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন না, সম্মতিসূচক ভাবে হাসলেন।

'দেশ কোথায় আপনার?'

'যশোর।'

'যশোর? কোথায়? যশোরে তো আমাদেরও বাড়ী—কোটাকোল।'

'তাই নাকি!'—আনন্দিত স্বরে বললেন বৃদ্ধ, 'আমার বাড়ী তো ওর পাশের গ্রামেই—দীঘলিয়া। কিন্তু আপনাকে তো কখনো···'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি দেশে কখনো যাই-টাই নি—ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায়।'

'ওঃ। তা' মহাশয়ের পিতার নাম?'

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।'

'জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী!'—বৃদ্ধকে একটু বিস্মিত দেখাল।—'কোটাকোলের জ্ঞান চক্কোত্তী—মানে, আমাদের জ্ঞানের ছেলে আপনি!'

'বাবাকে আপনি চিনতেন নাকি?'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, জ্ঞানকে চিনবো না! জ্ঞান যে আমাকে খুড়ো বলতো। তা' ছাড়া, ছেলেবেলায় আমার টোলেও তো ও পড়েছে বহু দিন।···বলতে হয়, জ্ঞানের ছেলে আপনি?'

'দোহাই, দাদু!'—তাড়াতাড়ি হাত জোড় ক'রে বললাম, 'আপনি যখন বাবার খুড়ো হন, তখন সম্পর্কে আমার দাদু—আমাকে আর 'আপনি' বলতে পাবেন না।'

'বেশ, বেশ।'—বৃদ্ধকে খুশী দেখাল।—'আমাদের জ্ঞানের ছেলে, তুমি তো আমার নাতির সমান।'

একটু ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দাদু আবার বললেন, 'সময় আছে—না কি খুব ব্যস্ত?'

মাথা নেড়ে জানালাম, সময়ের অভাব নেই।

দাদু বললেন, 'তা' হলে চলো। বাজারের পিছনেই আমার বাসা—একটু বসবে।'

বললাম, 'চলুন।'

দাদু পাশের দোকানের একটি ছেলের উপর জিনিষ-পত্রের ভার সঁপে দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

যেতে-যেতে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানলেন আমাদের সংসারের সব কথা। আমি ব্যবসা করছি শুনে উৎসাহ দিলেন। বললেন, 'বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস—আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক।'

বাবা মারা গেছেন শুনে দুঃখ করলেন। বললেন, 'জ্ঞান বড়ো ভালো ছেলে ছিল—সৎ, নম্র, পরোপকারী। সে ছিল পুণ্যাত্মা, তাই এতো তাড়াতাড়ি সংসারের মোহ-মায়া কাটিয়ে তার সাধনোচিত ধামে গেছে। দুঃখ ক'রো না—বাবার মতো হ'য়ো।'

দাদু বলেছিলেন, বাজারের পিছনেই। কিন্তু ঠিক পিছনে নয়। দু'টো রাস্তা পেরিয়ে, একটা বাঁক নিয়ে—পথের মোড়েই নোংরা গলিটা। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটা যায় না, এমনি গলি। মুখ জুড়ে ডাষ্টবিন, ইঁদুর-পচা দুর্গন্ধে ভারি বাতাস।

নাকে রুমাল চাপা দিলাম।

কিন্তু দাদু এ কোথায় চলেছেন? চারি দিকেই বস্তি, ভদ্রলোকের বাসযোগ্য কোন বাড়ী তো চোখে পড়ে না।

'এই যে, এসে গেছি।'

বস্তিরই একটা দরজার সামনে এসে থামলেন দাদু। একবার পিছন ফিরে আমাকে বললেন, 'এসো, ভাই!'

পিছন-পিছন বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। চারি পাশে সারি-সারি ঘর, মাঝখানে ছোট্ট একটু উঠোন। এক দঙ্গল উলঙ্গ ছেলেমেয়ে মারামারি ক'রে খেলা করছে। একটা আবার মাঝখানেই বাহ্যে করতে বসে গেছে। এক পাশে ছেঁড়া চটের পর্দা দেওয়া পায়খানা, আর এক পাশে কলে বস্তির অধিবাসিনীদের অশ্লীল হুড়োহুড়ি। জলে-কাদায়-ময়লায়-মলে একাকার। গা ঘিন-ঘিন ক'রে ওঠে।

'এই যে, এসো কমল, ঘরে এসো।'—দাদু ডাকলেন।

ঘরে এসো—হ্যাঁ, আহ্বান ক'রে আনবার মতো ঘরই বটে! মনে-মনে অতি দুঃখে একটু হাসি পেলো। ছোট্ট একটুখানি ঘর, চালটা নীচু, জানলা-টানলার কোন বালাই নেই। ঘর না তো পায়রার খোপ, কি তারো চেয়ে সরেশ! শরতের এই পরিষ্কার সকালেও ভিতরে জমাট অন্ধকার। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত তো কিছু দেখতেই পেলাম না। তারপর অন্ধকারটা আস্তে-আস্তে চোখে স'য়ে এলো।

চারি পাশে তাকাতে চোখে পড়ল, ময়লা এক গাদা বিছানা, আর এক পাশে জড়ো করা কতকগুলো বাক্স-পেটরা—ঘরের মাঝে এ-ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। দেখলাম, বাক্সে-বিছানায়, ঘরের সমস্ত কিছুতে দৈন্যের মলিন হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

দাদু বিছানার উপরেই বসতে বললেন। কিন্তু আমি বসলাম না, বসলাম বিছানাটা সরিয়ে নীচের মাদুরের উপর।

'বড়ো বৌ! বড়ো বৌ! দেখে যাও কে এসেছে!'—দাদু চেঁচিয়ে ডাকলেন।

মিনিট খানেক পরেই ঘরে ঢুকলেন এক জন প্রৌঢ়া মহিলা। আমি দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিলাম। কাজেই ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখে পড়ল। শুধু একটু ধীর-পায়ে হেঁটে আসা, তার মধ্যে যে এতোখানি অপরিসীম ক্লান্তি ফুটে উঠতে পারে, তা' আমি এর আগে কখনো ভাবিনি। মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। মানুষের মুখ যে হতাশা এমন ক'রে পাথর ক'রে দিতে পারে, তা'ও আমি কখনো অনুভব করিনি।

চোখ নামিয়ে নিলাম, মুখ নত করলাম—মাথা আপনা থেকে নুইয়ে এলো।

দাদু পরিচয় দিলেন, 'বড়ো বৌ, এই আমাদের জ্ঞানের ছেলে। জ্ঞানকে মনে আছে তো তোমার?'

দিদিমা কথা বললেন না, কেবল নীরবে মাথা নাড়লেন।

আমি উঠে প্রণাম করতেই অস্ফুট স্বরে আশীর্বাদ করলেন, 'বেঁচে থাকো, সুখে থাকো—শতায়ু হও।'

দাদু আবার চিৎকার ক'রে ডাকলেন, 'মালু! একবার শুনে যা, দিদি।'

বাইরে থেকে মিষ্টি গলায় উত্তর এলো, 'যাই, দাদু।'

তারপরেই একরাশ হাল্কা খুশীর মতো লঘু-পায়ে একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। বয়স তার বছর সতেরো-আটেরো হবে। ভারি চমৎকার চেহারা, দাদুর সঙ্গে সাদৃশ্যটা খুব বেশী। তবে, একটু উচ্ছল, একটু বেশী হাসি-খুশী—এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেন একটু বেমানান।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে বললে, 'কি, দাদু, ডাকছো কেন?'

দাদু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইটি আমার নাতনী, বুঝেছো ভাই কমল। নাম রেখেছি কালিদাস থেকে চুরি ক'রে—মালবিকা। আমি স্বয়ং মহারাজ অগ্নিমিত্র তো আছিই, আর উনি আমার···বুঝতেই তো পারছো···'

মেয়েটির মুখ আরক্তিম হ'য়ে উঠলো। ভ্রূভঙ্গী ক'রে কুপিত স্বরে বলল, 'আঃ দাদু!'

'কেন, ভাই, সত্যি কথাই বলছি। তোমার সঙ্গে আমার একটু ইয়ে···মানে প্রণয়···'

'আমি চললাম।'—সত্যিই চলে যেতে উদ্যত হয় মেয়েটি।

'আরে যেও না, যেও না। শোন।'—দাদু বাধা দিলেন।

'কি, বলো।'—দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই বললে ও।

'শোন। আমার অতিথিকে একটু চা খাওয়াও।'

'আচ্ছা।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ও চলে গেল।

মিনিট কয়েক পরেই এসে হাজির হলো চা। আর, সুরু হলো ছেলেমানুষের মতো দাদুর অনর্গল বকুনি।

দাদু বিরামবিহীন ভাবে কথা বলতে লাগলেন। নিজের অভাব-অভিযোগ-দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে-বিষয়ে একটি কথাও তুললেন না। বললেন গ্রামের কথা, জ্যোতিষের কথা, আমার বাবার কথা আর সবার চেয়ে বেশী ক'রে তাঁর কুলদেবতা গোবিন্দের কথা। গোবিন্দ নাকি দাদুর পিতামহকে স্বপ্নে নিষেধ দিয়েছিলেন যে, এ-বংশে কেউ যেন কখনো নীচ কাজ, হীন কাজ না করে, মিথ্যা কথা না বলে, দান-পরিগ্রহ না করে, তা'হলে তিনি চিরকাল এদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবেন, আজীবন রক্ষা করবেন।

আমার মনস্তাত্ত্বিক মন এই সময়ে একটু মাথা ঘামালো। কিন্তু

ঠিক বুঝতে পারলো না, দাদুর দান-পরিগ্রহ না-করার মূলে কতোটুকু গোবিন্দের সঙ্গ-লালসা আর কতোটুকু আত্মাভিমান।

যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে একথা-সেকথা হবার পর সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে এলাম।

যতোক্ষণ ছিলাম, দিদিমা একটিও কথা বলেননি। প্রণাম ক'রে চলে আসার সময় শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আবার এসো, ভাই! কেউ তো আসে না।'

চলে এলাম বটে। কিন্তু ভুলতে পারলাম না। আত্মাভিমানী দাদু, নির্বাক্ দিদিমা, উচ্ছলিতা কিশোরী মালবিকা—যতোই আমি এদের মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করলাম, ততোই এরা বেশী করে জুড়ে বসতে লাগল। এই অদ্ভুত পরিবারটি আমার কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ভাবনায়, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভূতের মতো তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগল।

প্রথম দিন এই তাড়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নিজের মনকে জোর ধমক দিলাম: 'তোমার কি খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই, পরের ব্যাপারে নাক না-গলালেই চলে না?'

দ্বিতীয় দিন নরম সুরে বোঝালাম: 'কৌতূহল তো মিটেছে, তবে আবার কেন?'

তৃতীয় দিন নিরুপায় গলায় অনুনয় করলাম: 'কেন ছেলেমানুষী করছো?'

তারপর চতুর্থ দিন বিকেল বেলায় আবার দাদুদের বস্তির দরজায় যেয়ে হাজির হলাম।

দাদু বাড়ী ছিলেন না। অভ্যর্থনা করলেন দিদিমা।

'এসো ভাই, এসো। বসো।'

সেদিন দিদিমা একটিও কথা বলেননি—আজ বললেন। অনেক কথাই বললেন। আমার কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন হ'লো না, কোন কথায় সায় দেবার দরকার হ'লো না—দিদিমা আপনা থেকেই দম্-দেওয়া পুতুলের মতো একটানা বলে যেতে লাগলেন। এমন ভাবে গড়-গড় ক'রে বলতে লাগলেন যে আমার মনে হলো, কথাগুলো বোধ হয় তিনি বহু দিন ধরে সাজিয়ে-গুছিয়ে মনে-মনে মুখস্থ করেছেন।

দাদু নিজেদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি, দিদিমা কেবল নিজেদের কথাই বললেন। একবারও না-থেমে, একবারও দম্ না-নিয়ে। স্বামীর কথা, নাতনীর কথা, একমাত্র মৃত পুত্র-পুত্রবধূর কথা, সংসারের অভাব-অনটনের কথা, আর সবার উপরে আত্মীয়-স্বজন-পরিচিতের নির্মম হৃদয়হীনতার কথা—কেবলই অভিযোগ, বিধাতার কাছে, স্বার্থময় মানুষের উদাসীন হৃদয়ের কাছে।

শুনতে-শুনতে শুধু একবার আমি মন্তব্য করলাম। বললাম, 'দাদু পণ্ডিত মানুষ—এই গামছার ব্যবসা, এ কি ওঁকে মানায়!'

বলতে-বলতে দিদিমা থামলেন। তারপর হঠাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

'দেখো, ভাই, দেখো, ও-মানুষটার আমি কি দশা করেছি!'—কাঁদতে-কাঁদতে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন।—'সাধক-পণ্ডিত মানুষ, চিরটা কাল লেখা-পড়া পুজো-আর্চা নিয়ে থেকেছে, সংসারের সাতে-পাঁচে জড়ায়নি—সেই মানুষকে আমি গামছার ব্যবসা ধরিয়েছি। ছেলেটা মরে গেল, দেশে থাকা গেল না, জোর ক'রে এখানে নিয়ে এলাম। তা'ও এসে হাত-দেখার কাজ করছিল—ভালো। কিন্তু এদিকে যে পোড়া পেট শোনে না। তাই আবার জোর করেই ও-কাজ ছাড়ালাম, ধরালাম এই গামছার ব্যবসা! তুমিই বলো, ভাই, এ কি ওকে মানায়, না ও পারে! কিন্তু কিই বা করবো—ও তো কারো কাছে কিছু চাইবে না, কারো দানও নেবে না। এক যদি কেউ সংসারের মধ্যে এসে আপন জন হয়ে সাহায্য করে।'

দিদিমা কাঁদতে লাগলেন, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন, আমার দু'হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। আমি একটুও নড়লাম না, একটিও কথা বললাম না, সান্ত্বনা দিলাম না।

বহুক্ষণ পরে যখন মালবিকা ঘরে ঢুকলো, দিদিমা আমার হাত ছেড়ে দিলেন, ছেঁড়া আঁচলে ঘষে-ঘষে চোখ মুছলেন। তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

সেদিন আমি যতোক্ষণ ওখানে ছিলাম, দিদিমা আর একটি বারও আমার দিকে ফিরে তাকাননি।

সেদিন দাদু খুলে দিয়েছিলেন বাড়ীর দরজা, আজ দিদিমা উন্মুক্ত করে দিলেন এ-পরিবারের মনের দরজা। কাজেই এর পর এই দুঃখী পরিবারটির সাথে আমার নিছক পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হতে বেশী দেরী হল না। যাওয়া-আসার সংখ্যাও দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলে। কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই একবার এখান থেকে ঘুরে যাই।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আর কেউ ওখানে যায় না। না-কোন আত্মীয়-স্বজন, না-কেউ পরিচিত। হয়তো ওরা অত্যন্ত দরিদ্র বলেই সকলে সযত্নে ওদের এড়িয়ে চলতো। আর, এই জন্যেই বোধ হয়, ওরা আমাকে অতো তাড়াতাড়ি অতো আপন করে নিতে পেরেছিল।

মালবিকার সাথেও এর মধ্যে আলাপ হয়েছে। এক জাতের মানুষ আছে যারা অপরকে দেখা মাত্রই কাছে টেনে নেয়, মালবিকা সেই জাতের মেয়ে! আমাকে আপন ক'রে নিতেও ওর কষ্ট হয় না। লক্ষ্য করেছি, বয়সের তুলনায় ও একটু বেশী ছেলেমানুষ, মানসিক গঠন ওর একটু বেশী কাঁচা। এটা হয়তো ওর আজন্ম পল্লীবাসের ফল। ওর বয়সী শহুরে মেয়েরা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় যে-দূরত্ব বজায় রেখে চলে, ও সেটাকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না। হয়তো সে-সম্বন্ধে ও ছিল সম্পূর্ণই অজ্ঞ। আমার সঙ্গে ওর মেলামেশাটা ছিল বাধাবন্ধহীন। সমস্ত শহুরে ভব্যতা-বর্জিত।

আমি যখনই গেছি, ও যেখানেই থাক ছুটে এসেছে। যতোক্ষণ ওখানে বসেছি সমস্ত ক্ষণ ধ'রে বকর-বকর করেছে, আর কারণে-অকারণে খিল-খিল ক'রে হেসেছে। ছোট্ট মেয়ের মতোই ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আর তার পরক্ষণেই এসে আবার আব্দার সুরু করেছে।

এই হাসি-কথা আর ছেলেমানুষীর মাঝেও কখনো-কখনো দেখেছি, ও কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছে। আর সেই সব বিষণ্ণ মুহূর্তে ও আমাকে এসে বলেছে, 'আচ্ছা, কমলদা, তোমাদের বাড়ী খুব বড়ো—খুব খোলা, না?'

ঘাড় নেড়ে উত্তর দিয়েছি, 'হ্যাঁ।'

ও তার পরেই দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলেছে, 'আচ্ছা, কমলদা, আমাকে···আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে ?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছি আমি। বলেছি, 'বেশ তো, নিয়ে যাবো।'

ও আমার হাসির দিকে চোখ রেখে বলেছে, 'না, হাসি না, সত্যি সত্যি।'

তার পরেই অনুনয় করেছে, 'লক্ষ্মীটি, চলো না নিয়ে, কমলদা। আমি ঝিয়ের মতো থাকবো, তোমাদের সব কাজ ক'রে দেবো।'

জিজ্ঞেস করেছি, 'কেন, হ'লো কি আজ ?'

ও ছলো-ছলো চোখে তাকিয়ে বলেছে, 'না, এখানে আর আমি থাকতে পারবো না। আমার দম্ বন্ধ হ'য়ে আসে—এখানে থাকলে আমি মরে যাবো !'

একটু থেমে আবার বলেছে, 'তুমি যদি না নিয়ে যাও, দেখো, ঠিক একদিন আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো।'

ছেলেমানুষদের দুষ্টুমি দেখে জ্ঞানবৃদ্ধেরা যেমন হাসেন, অর্ধ-নিমিলিত চোখে ঠিক তেমনি একটু হেসেছি। সান্ত্বনার স্বরে বলেছি, 'পাড়াগাঁ থেকে এসেছো কিনা, খোলা-মেলায় থাকা অভ্যেস—তাই বন্ধ জায়গায় ও-রকম লাগছে। ও কিছু নয়, দু'দিনেই সেরে যাবে।'

ও কোন উত্তর দেয়নি। শুধু এক মুহূর্ত নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তার পর ছুটে পালিয়ে গেছে সামনে থেকে।

আমার সাথে পরিচয়ের পর এই ক'দিনে দিদিমার মধ্যেও কিছু-কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তাঁর মুখের পাথরের মতো কঠিন ভাবটা গলে কোমল হ'য়ে গেছে, দু'চোখের গাঢ় বিষণ্ণতা ফিকে হ'য়ে এসেছে। এমন কি, মালবিকা যখন আমার সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় মাতামাতি করেছে, দেখেছি, দিদিমার ঠোঁট দু'খানায় যেন কেমন একটু হাসির ছোঁয়াচও লেগেছে।

দিদিমা স্বল্পভাষী, আর দাদু তো নিজের অভাব-অনটনের কথা মরে গেলেও মুখ ফুটে কাউকে বলবেন না। তবুও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ওদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ আরো খারাপ হ'য়ে উঠছে। সমস্ত পরিবারটা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। আর, ওদের নিজেদের শক্তিতে একে কাটিয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনাই নেই। একমাত্র অপর কোন শক্তিই এ-যাত্রা ওদের বাঁচাতে পারে।

এটুকু বোঝার সাথে-সাথেই আমার দ্বৈত মানসিক শক্তির মাঝে ছোটখাটো একটা বিবাদ লেগে যায়। সেণ্টিমেণ্টাল মন বলে, 'দাদুদের এ-অবস্থায় তোমার কিছু করা উচিত।' হিসাব-পক্ক সাংসারিক মন উত্তর দেয়, 'তুমি কিই বা করতে পারো—ওঁরা তো কারো দান নেবেন না।' সেণ্টিমেণ্টাল মন আবার বলে, 'দান কেন, কাউকে সাহায্য করতে গেলেই যে অপমান করতে হবে তার কি মানে আছে ? দান না ক'রে কি সাহায্য করা যায় না ? তা'ছাড়া, দেখনি কি তোমার প্রথম দিনের দেখা দাদু আর দ্বিতীয় দিনের দেখা দাদুর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ ? তুমি এতো বুদ্ধিমান, কিন্তু এটুকু বোঝ নাকি যে মানুষের জীবন-কেন্দ্র থেকে তাকে সরিয়ে নিলে সে কি ভীষণ অসহায় হ'য়ে পড়ে, আত্মাভিমানের মুখোসের আড়ালে কি রকম ভাবে আশ্রয়ের জন্য লোলুপ হ'য়ে ওঠে ? আর, পথের ইঙ্গিতও তো পেয়েছ দিদিমার হাসির আভাসে। তবে সব বুঝেও না-বোঝার ভাণ করছো কেন ? আর্থিক স্বার্থহানির আশঙ্কায় ?' সাংসারিক মন বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিয়েছে, 'বুঝি নে বাপু অতো-শতো ! তোমার মতো অতো সূক্ষ্মবুদ্ধি আমার নেই। তবে এই বলে রাখলাম, অতো দুর্বল-মনা হ'লে জীবনে কখনো উন্নতি করতে পারবে না।'

এদিকে বাড়ীতে আর এক ব্যাপার। গল্পের ছলে একদিন মাকে বলেছিলাম দাদুদের কথা। তার পর থেকে মা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছেন, 'হ্যাঁ রে, সেই মেয়েটিকে দেখতে কেমন রে ?'

বুঝতে দেরী হয় না। কার কথা। তবুও বলি, 'কোন্ মেয়েটি ?'

'কেন, সেই যে তোর দাদুর নাতনী। কি যেন নাম···'

'কার কথা বলছো—মালবিকার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মালবিকাই বটে। বেশ নামটি। তা' তা'কে দেখতে কেমন রে ?'

'বেশ।'

'বেশ, মানে ? সুন্দরী ?'

ঘাড় নাড়ি। বলি, 'হ্যাঁ।'

মার কৌতূহল তবুও মেটে না। বলেন, 'কেমন—আমাদের মেজ বৌমার চেয়েও ভালো ?'

মেজ বৌমা, অর্থাৎ খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী কমলা। আমাদের সংসারে সেই-ই সব চেয়ে সুন্দরী। বলি, 'হ্যাঁ, মালবিকা দেখতে কমলা বৌদির চেয়েও ভালো।'

এতোখানি জানার পর মার কথাবার্তা ইঙ্গিতময় হ'য়ে ওঠে। বলেন, 'আচ্ছা, তুই তো রোজই ওদের ওখানে যাস, না ?'

ইঙ্গিতটা এড়িয়ে উত্তর দিই, 'না, রোজ নয়—মাঝে-সাঝে।'

মার মুখ দেখে বুঝতে পারি, কথাটা বিশ্বাস করেননি। বলেন, 'ওরাও তো ব্রাহ্মণ, আমাদের পালটি ঘর, না ?'

এবার আর উত্তর দিই না, যেন শুনতে পাইনি এমনি ভঙ্গীতে চুপ ক'রে থাকি। মাও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করেন না।

এমনি ভাবেই কাটছিল দিনের পর দিন।

আমার মনস্তাত্ত্বিক মন সব কিছু বিশ্লেষণ করছে, আর অবিরত ব্যবসায়ী মনকে সাবধান করছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে হাওয়ার গতি। কিন্তু তবুও আমি থামতে পারছি না। আমার যেন নেশা লেগে গেছে, অনেক রাত জেগে তাস খেললে যেমন নেশা লাগে, তেমনি। কেবলই নিজের চারি পাশ ঘিরে মাকড়শার জাল বুনে চলেছি। খেলা চলছেই—চলছেই।

এমনি সময়, নাটক যখন চতুর্থ অঙ্কে পড়ো-পড়ো, বিয়োগান্ত নভেলের মতো একটা ঘটনা ঘটলো। না, মঞ্চে অন্য কোন নায়িকার আবির্ভাব হয়নি, শুধু অফিসে গিয়ে একদিন আমার সিনিয়ার পার্টনারের এক টেলিগ্রাম পেলাম। আমাদের মাদ্রাজের অফিস থেকে তিনি লিখেছেন, আমার এক্ষুনি ওখানে যাওয়া প্রয়োজন। ওখানকার কাজে ভীষণ গোলমাল সুরু হয়েছে, আমি না গেলে বহু টাকা ক্ষতি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।

অগত্যা সেই দিনই আমাকে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে ন'টা চল্লিশের মাদ্রাজ মেল ধরতে হ'লো।

ভেবেছিলাম, যাবার আগে মালবিকাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো। কিন্তু তার আর সময় হ'লো না। ট্রেনে যেতে-যেতে ভাবলাম, ওখানে যেয়ে চিঠি দেবো। তারও সুযোগ হলো না। ওখানে যেয়ে এতো বেশী ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হ'লো যে, স্নানাহারেরও ঠিক রইল না।

শুধু কাজ আর কাজ, ব্যবসা—ছ'মাসের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোন কথা আমার মাথায়ই আসতে পারলো না।

অবশেষে যখন ধাক্কাটা সামলে উঠলাম, লোকসানের ভয় আর রইল না, তখন আমি অন্য মানুষ। নিজের স্বার্থচিন্তার এই ছ'মাস জোড়া প্রবল স্রোতের মুখে আমার সমস্ত পরার্থচিন্তা খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে গেছে।

কলকাতায় ফিরে এলাম বটে, মালবিকাদের কথা মনেও হলো, কিন্তু কেন জানি না, ওদের বাড়ী যাবার আর উৎসাহ বোধ করলাম না। নেশার ঘোরটা মনে হলো কেটে গেছে, আমার হিসেবী সাংসারিক মন আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। নেশা-কেটে-যাওয়া দুর্বল সেন্টিমেন্টাল মনটা তখনও একটু-একটু খোঁচা দিচ্ছিল। কিন্তু তাকে বোঝালাম, কি আর হবে ওখানে গিয়ে। ওদের তো তুমি কোন সাহায্যই করতে পারবে না, ওরা তো তোমার দান নেবে না। তবে আর কেন মিছিমিছি নিজেকে জড়াবে।

যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করার মতো জোর আর সেন্টিমেন্টাল মনের ছিল না। অভিমান ভরে সে মুখ ফিরিয়ে রইল।

গল্পের আমার এইখানেই ইতি ঘটতে পারতো, আর সেইটাই হয়তো শিল্পকলা-সম্মত হ'তো। কিন্তু বাস্তব শিল্পের কলাকৌশলের ধার ধারে না। তাই বছর তিনেক পরে এক দিন দাদুর সঙ্গে আবার আমার দেখা হ'য়ে গেল।

অফিস থেকে বাড়ী ফিরছিলাম। মনের অবস্থাটা ভালো ছিল না, আর হাতেও কোন কাজ ছিল না। তাই ভাবলাম, সোজাসুজি বাড়ী না ফিরে পার্কে যেয়ে নিরালায় একটু বসি।

বসেছিলাম অনেকক্ষণ। বেশ লাগছিল। আস্তে-আস্তে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো, তার পর সন্ধ্যেও ওৎরালো—চারি দিক আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে নেমে এলো রাতের অন্ধকার। পার্কে যারা বেড়াচ্ছিল, যে-সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল, তারা এক-এক ক'রে সবাই চলে গেল। তবুও আমি উঠলাম না। বসে রইলাম চুপটি ক'রে।

মাথার উপরে আকাশে একটা-একটা ক'রে তারা ফুটলো, চাঁদ উঠল। অবশ্য মেঘের দলও চুপ ক'রে ছিল না। তারাও ভেসে-ভেসে চাঁদটাকে এক-এক বার সম্পূর্ণ ঢেকে দিচ্ছিল, আবার একটুক্ষণ পরে সরিয়ে নিচ্ছিল তার আবরণ। অন্যমনস্ক হ'য়ে দেখছিলাম এই লুকোচুরি খেলা।

এমন সময় পাশে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। চাঁদটা লুকিয়ে পড়েছিল, তাই দেখা গেল না কিছু।

শঙ্কিত কাঁপা-গলায় কেউ পাশ থেকে ডাকলো, 'বাবু!'

গলাটা যেন কেমন চেনা-চেনা লাগলো। ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কি?'

'বাবু, এক জাগায় যাবেন?'

কৌতূহল হ'লো। বললাম, 'কোথায়? কেন?'

'এই কাছেই, বাবু। বেশী দূর না।'—গলা নামিয়ে ফিস্-ফিস্ ক'রে আবার বললে, 'সুন্দরী মেয়ে আছে, কাঁচা যুবতী!'

চমকে উঠলাম।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তখনো বলছে, 'রাজরাণীর মতো রূপ, বাবু। একবার গেলে খুশী হবেন। যাবেন?'

মেঘ সরে যাচ্ছে। চাঁদের আবরণ ঘুচছে।

'আমার নিজের নাতনী, বাবু। ব্রাহ্মণের কন্যা; কাঁচা বয়েস—যাবেন, বাবু?'

চাঁদ মুক্ত হ'লো। আলো ফুটলো।

'যাবেন, বাবু। সুন্দরী যুবতী। বেশী লাগবে না।'

চাবুক-খাওয়া ঘেঁয়ো কুকুরের মতো ছুটে পালিয়ে এলাম। মনের এ-কোণ-ও-কোণ জ্বালিয়ে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ দিয়ে গেল শুধু একটা প্রশ্ন: 'দারিদ্র্য আর হৃদয়হীনতার অশুভ শক্তি, সে কি বিধাতার চেয়েও বড়ো?'

ব্ল্যাক্ প্রিন্স

শ্রীবারি দেবী

নতুন বৌ সুনেত্রা! বিয়ের ছ'মাস পরে প্রথম চলেছে শ্বশুরালয়ে। কলকাতার বাড়ীতে অবিশ্যি কয়েক বার যাতায়াত করেছে; তবে অত'দূর দেশ—বিলাসপুরে মেয়েকে পাঠাতে সুমোহন বাবু রাজী হননি প্রথমে; কিন্তু শ্বশ্রূমাতা গঙ্গামণি দেবী এবারে তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করলেন—

—সেখানে আমার রাজ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ খাঁ-খাঁ করছে; ছেলে-বৌ নিয়ে এবারে কিছু কাল সেখানেই বসবাস করবো স্থির করেছি,—এতে আর আপনার আপত্তির কি আছে বেয়াই মশাই? কলকাতার এ-বাড়ীটা কি একটা বাড়ী? বৌমা দেখবে না তার শ্বশুরের ঐশ্বর্য্য? সাতপুরুষের ভিটে? সেখানে প্রজারাও তো আশা করে আছে বৌ দেখবার।

অগত্যা কি করা যায়?—তবুও সুমোহন বাবু আমতা-আমতা করেন—পল্লীগ্রামে কখনো তো যায়নি! সেখানে ইলেক্ট্রিক আলো বা কলের জল নেই; ম্যালেরিয়া ধরাও বিচিত্র নয়।

—সেই দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রের হাতেই তো আপনার মেয়েকে দিয়েছেন বেয়াই মশাই। আমার তো দিন ফুরিয়ে এলো, এখন থেকে সেখানকার বারো মাসের তের পার্ব্বণ বৌমাকেই তো বজায় রাখতে হবে!

ষ্টেশনে নেমে রূপোর পাত-মোড়া পাল্কি চড়ে সুনেত্রা এলো জমিদার-ভবনে। কি সাংঘাতিক লোকের ভিড়! বাপ রে, এত লোকও কি ছিলো এ দেশে?

ঝন্-ঝন্ শব্দে টাকা পড়ে নতুন বৌ-এর নজরানা। সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে, অনেক কাল পরে জমিদার-গৃহিণী এসেছেন পুত্র ও নববধূ নিয়ে।

বাড়ী দেখে অবাক হয়ে যায় সুনেত্রা! এ কি ময়দানবের পুরী? কি বিরাট এক-একখানি ঘর! কলকাতায় স্বল্প পরিসরের মাঝে ছিমছাম সাজানো বাড়ীটা তাদের; ক্ষুদ্র সীমার বাইরে একটা বিরাট পরিস্থিতির মাঝে এসে সুনেত্রা নিজেকে যেন ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলো না।

ঘরের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড আয়না দিয়ে ঘরের দেওয়ালগুলো যেন মোড়া রয়েছে! দামী-দামী গালচে পাতা, সোনালী কাজের ফ্রেমে বাঁধানো পূর্ব্বপুরুষদের বড় বড় অয়েলপেণ্টিং ছবিগুলো দেখলে যেন কেমন গা-ছমছম করে। শাশুড়ী প্রত্যেক ফটোর সামনে প্রণাম করিয়েছেন ওকে।

তারপর···চণ্ডীতলা, লক্ষ্মীনারাণের মন্দির, বুড়ো শিবতলা, মা মনসার থান, বুড়ো ঠাকুরাণীর ভিটে,—আরো যে কত আছে।···

রাশীকৃত সোনা-হীরে-মুক্তোয় আপাদমস্তক ঢেকে ঝক্‌মকে জরির কাপড় পরে, অবিরাম সুনেত্রা চলেছে গঙ্গামণির সঙ্গে একপাল অজানা আত্মীয়া-পরিবেষ্টিতা হয়ে পূজো দিতে! বংশরক্ষার জন্য, বংশের কল্যাণ কামনায়, গঙ্গামণি সব ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান পুত্র চন্দ্রনাথ ও বধূ সুনেত্রাকে···নিজেও মাথা খোঁড়েন নানা দেবতার স্থানে।

রাত্রে জ্বলে ওঠে বড় বড় বেলোয়ারী কাচের ঝাড়ের বাতিগুলো! গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে, এত দিনে বাড়ীটা মানালো। কর্ত্তারা সব অসময়ে চলে গেলেন, নাবালক ছেলেটুকু নিয়ে ছোট মা গঙ্গামণি চলে গেলেন কলকাতার বাড়ীতে। মাঝে মাঝে আসেন পাল-পার্ব্বণে, এত সমারোহ হয় না।

আজ আবার জমিদার-বাড়ী গম্‌-গম্ করতে থাকে,···সকলের অবারিত দ্বার। গঙ্গামণি অন্নপূর্ণার মত দু'হাতে সকলকে অন্ন বিতরণ করেন।

গভীর রাত্রে বাড়ীর কলরব থামে! সুনেত্রা যায় স্বামীর ঘরে। সারা দিনের গোলমালে সে হাঁপিয়ে ওঠে। ক্লান্তি ও তন্দ্রার ভারে দেহ-মন অবসন্ন। চন্দ্রনাথ থাকে বেশ সজীব প্রফুল্ল। সাতপুরুষে জমিদারী-রক্ত বইছে ধমনীতে তার; সে জন্য জমকালো পরিবেশের মাঝে এসে তার অন্তর্নিহিত সব সত্তাগুলো যেন রসসিক্ত ও প্রাণময় হয়ে উঠেছে।—সে সুনেত্রাকে এক ঝাঁকুনী দিয়ে বলে—এ কি? জমিদার-বাড়ীর বৌএর কি এর মধ্যে ঘুমোতে আছে? কত দায়-দায়িত্ব তার? তারপর—হেসে বলে—কেমন লাগছে সু? আমাদের দেশটা? বাড়ীখানা দেখলে তো?—এই বাড়ী কর্ত্তাদের আমলে একদিন কি জম-জমাট ছিল! নবৎখানায় নবৎ বাজতো। বারো মাস যাত্রা, গান, কবির লড়াই, বাঈনাচ, আরো কত মজা ছিলো! অতিথশালার ছিলো অবারিত দ্বার।—দেশ-বিদেশ থেকে আসতেন কত জ্ঞানী-গুণী জন; ধনী-দরিদ্র সবাকার জন্যই ছিলো প্রচুর আপ্যায়নের ব্যবস্থা! এর মাঝে আসতো বিখ্যাত লেঠেলদের দল; ঐ সামনের মাঠে তাদের কসরৎ দেখাতো—মাঝে মাঝে কর্ত্তারাও নামতেন ওদের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ আর কুস্তির প্যাঁচ লড়তে!—আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে, তখন আমার ন'-দশ বছর বয়স হবে। তারপর··· কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো, বাবা কাকা সবাই মারা গেলেন!

চন্দ্রনাথের গলা ভারি হয়ে আসে!

সুনেত্রার চমক ভাঙে। সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা করে···তারপর? আনমনা ভাবে জবাব দেয় চন্দ্রনাথ—তারপর মার সঙ্গে আমি গেলাম কলকাতার বাড়ীতে মামাদের তত্ত্বাবধানে। এখানকার সব ভোগ করতে লাগলো দরোয়ান, চাকর, আমলা-গোমস্তারা। মাঝে মাঝে পূজো-পার্ব্বণে আসতাম দু'-চার দিনের জন্য।···মা বলেন,—এ বড়ীটা নাকি অভিশপ্ত! অনেক খুন-জখম হয়েছে;—ঐ ঝিলের পাঁকে পোঁতা আছে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিগুলো!

সুনেত্রা সোজা হয়ে উঠে বসে,—ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—সে কি?

চন্দ্রনাথ ওর অবস্থা দেখে হা-হা করে হেসে ওঠে!—হাসতে হাসতে বলে,—এতে অবাক হবার আর কি আছে? সব জমিদারদের ঘরেই তো এ ব্যাপার ঘটে থাকে!—সুনেত্রার বুক কাঁপতে থাকে!

হঠাৎ এক ঝলক হিমেল বাতাস ঘরে এসে ফ্লাওয়ার-ভাসে রক্ষিত গোলাপের সুরভি সারা ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

—কিসের গন্ধ?—সুনেত্রা এদিক-ওদিক চায়।

চন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে নিয়ে আসে একগোছা লাল গোলাপ। সুনেত্রার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে;—এরই গন্ধ পাচ্ছ। আমাদের বাগানে ফুটেছে—ব্ল্যাক্ প্রিন্স!

সুনেত্রার হাতে যেন লাগে অগ্নি-পরশ!—ব্ল্যাক্ প্রিন্স? কবে ফুটলো?

অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে ফুলগুলোকে! ওদের রক্তের মত গাঢ় লাল রং যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয় ওর স্নায়ুগুলীতে। গন্ধটা মাথার ভেতর পাক্ খেয়ে ঘুরতে থাকে! কিসের আকর্ষণ?—কে যেন আকর্ষণ করছে।

কলকাতা মহানগরীর দক্ষিণ প্রান্তে ওল্ড বালিগঞ্জে বাড়ী ওদের।···তারই কিছুটা দূরে ছোট বাগানটি ফুলে-ফুলে ছাওয়া।··· বাগান-সংলগ্ন ছোট একটি একতলা বাড়ী।···প্রায় বছর দুয়েক আগে ঐ বাড়ীতে এলো নতুন ভাড়াটে—অজয়, আর তার মা।

ক'দিন পরেই সুনেত্রার নজরে পড়ে, আগাছায় ভরা ছোট বাগানটা একেবারে সাফ হয়ে গেছে; তার ভেতর চৌখুপি করে সাজিয়ে বসানো হয়েছে নানা রকমের গাছের চারা। একটি শ্যামবর্ণ যুবক সারা দিনটাই খুরপি, জলের ঝারি হাতে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে লেগে থাকে উদ্যান রচনার কাজে। অরণ্য-শিশুগুলোর প্রতি মনে হয় ওর সদাই সজাগ দৃষ্টি—যেমন সতর্ক, সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে মা রক্ষা করেন শিশুকে!

আরো কয়েক মাস পরে,—সুনেত্রা কলেজ থেকে ফিরছিলো ঐ বাড়ীটার পাশে দিয়ে। কি একটা মিঠে গন্ধ! থমকে দাঁড়ায় সুনেত্রা।

সামনেই তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট বাগানটা—সেদিনের ক্ষুদ্র চারাগুলো আজ মাথাচাড়া দিয়েছে। সবুজ পাতায় সজ্জিত হয়ে, লাল, নীল, পীত বর্ণের পুষ্পসম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—বাঃ, কি সুন্দর! কখন গেটটা খুলে সুনেত্রা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাগানের ভেতর। বিমুগ্ধ দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হোল কয়েকটি গোলাপের দিকে। শাদা আর হলদে রং-এর কতগুলো গোলাপ ফুটেছে গাছে—তার মিষ্টি গন্ধে বাতাসে কাঁপন লেগেছে। সুনেত্রা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় একটি গোলাপ···

—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

—কে? কে বললে এ কথা?—চমকে ওঠে সুনেত্রা, হাত থেকে ফুলটা পড়ে যায়!

পাশেই একটি অশোক ফুলের ঝোপের আড়াল থেকে উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়ায় অজয়; হাতে একটি খাতা ও পেন্সিল! মুখে একটু হাসি!

সুনেত্রা ওর দিকে চেয়ে প্রস্তুত করে নেয় নিজেকে—পরে বিজ্ঞজনের মত বলে—না বলিয়া পরের পুষ্প সর্ব্বদাই লওয়া উচিত। যে না লয় তাহাকে লোকে অরসিক কহিয়া থাকে।

অজয় এগিয়ে এসে বলে—দাঁড়ান। কয়েকটা গোলাপ তুলে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলে,—সৌন্দর্য্য-পিপাসিতকে পুষ্পবারি দান করা সুধীজনের সদাই কর্ত্তব্য! অতএব হে সৌন্দর্য্য-অনুরাগিণি…

এবারে সুনেত্রা খিল-খিল করে হেসে ওঠে। ফুলগুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে, নিশ্বাস টেনে গ্রহণ করে তার সুরভি।

অজয় বলে—যদি দয়া করে এলেন, আমার ছোট্ট বাগানটা একটু ঘুরে দেখে যদি যান, আপনিও আনন্দ পাবেন, আমারও পরিশ্রমটা সার্থক হয়।

সুনেত্রা তো তাই চাইছিলো। ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায় নানা রং-বেরঙের ফুলে ভরা গাছগুলো। খুসিতে যেন উছলে ওঠে ওর মন!

—এটা কি গাছ? এ ফুলটার নাম কি? বাঃ, কি চমৎকার! এইটুকু জায়গা—ফুলে-ফুলে, যে নন্দন কানন বানিয়েছেন দেখছি! —তার পর সখেদে বলে—জানেন, আমাদের দু-দুটো মালী রয়েছে, কিন্তু বাগানে ফুল একেবারে হয় না। কেন বলুন তো? আমার এমন রাগ ধরে ওদের ওপর। আচ্ছা, আপনি কি কোনো মন্তোর জানেন? একটু শিখিয়ে দিন না—আমিও চেষ্টা করি, এই রকম বাগান তৈরি করতে।

অজয় মাথা নেড়ে বলে,—বেশ তো, গুরুগিরিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তবে তার দক্ষিণাও তো কিছু চাই!—এই রোজ একটু করে আমার সঙ্গে বাগানের কাজ করবেন, এতে আমারও উপকার হবে, আর আপনারও শেখা হবে।

তাই হোলো! সুনেত্রা রোজ সময় করে একবার আসে, দু'জনে মিলে বাগানের কাজ করে।…স্তব্ধ হয়ে যায়, গাছগুলোর প্রতি অজয়ের অপরিসীম মমতা আর ভালোবাসা দেখে। আরো বিস্মিত করলো তাকে, অজয় ঐ গাছ আর ফুলগুলোর উদ্দেশ্যে লেখা কয়েকটি সুন্দর ছন্দে-ভরা কবিতা দেখিয়ে।

হঠাৎ সুনেত্রার মনে পড়ে…সেদিন "কাব্যলোক" মাসিক পত্রিকায় চমৎকার একটি কবিতা তার চোখে পড়ে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে লেখকের নামটা! অজয় মিত্র। অজয়কে স্বীকার করতে হয় "কাব্যলোকে"র সেই অভাগাই—এই অভাজন!

অজয়ের মায়ের স্নেহ-নীড়টিও দখল করেছে সুনেত্রা। তাঁর নিজ হাতের তৈরী খাবার ওকে না খাওয়ালে তিনি আজ-কাল বড় অতৃপ্তি বোধ করেন। কন্যা ছিলো না তাঁর, সে অভাব পুরণ করেছে সুনেত্রা। স্বামী কয়েক বছর হল মারা গেছেন, ছেলেটি এম-এ পাশ করলো বটে, তবে বড় খেয়ালী প্রকৃতির! কোনো কাজে মন নেই; দিন-রাত্তির ঐ বাগান আর কি সব ছাইভস্ম লেখা! ওর বাবা অবশ্য যা রেখে গেছেন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবার কথা নয়।…তবুও…

সেদিন অজয়ের মায়ের রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে সুনেত্রা কদ্‌বেলের আচার খাচ্ছিলো বেশ রসিয়ে-রসিয়ে। অজয় ঝড়ের মত ছুটে এসে ওর হাত ধরে এক হেঁচকা টান মারে; আচারটা ছিটকে পড়ে যায় হাত থেকে। মা চেঁচিয়ে ওঠেন, ওরে, করিস্ কি? করিস্ কি? মেয়েটাকে মেরে ফেলবি না কি?

অজয় ততক্ষণে ওকে টেনে নিয়ে গেছে বাগানে;—কি ব্যাপার? রক্তের মত গাঢ় লাল রংএর একটা গোলাপ চেপে ধরে ওর নাকের ওপর। আনন্দোজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলে,—শুঁকে দেখো, বল তো এটার নাম কি?

সুনেত্রা ওর হাত থেকে ফুলটা নিয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলে,—কি অপরূপ! কোথায় পেলে? কি নাম এর?

ব্ল্যাক্ প্রিন্স!

একেবারে গোলাপের রাজা! ঠিক আমার গায়ের মত কালো, আর আমার বুকের রক্তের মত লাল রং মেশানো ওর রংটা। ঐ যে ক'টা চারা গাছ এনেছি, ঐ গাছে ফুটবে এই ফুল! আর গাছগুলো বসাবো তুমি আর আমি দু'জনে…

মহা উল্লাসের মাঝে গাছ বসানো হ'ল!

সুনেত্রা চুপি চুপি বলে,…প্রথম যে ফুলটি ফুটবে, সেটি কিন্তু আমার। আর কাউকে দিতে পারবে না কিন্তু।

অজয় ওর হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে জবাব দেয়—সেদিন তুমি থাকবে তো আমার পাশে? ফুলটা দেখে চোখের জল ফেলাই সার হবে না তো?

না, না। এ ফুল শুধু আমারই জন্যে। আমার খোঁপায় তুমি পরিয়ে দেবে।

তারপর…কি হল যেন কয়েক মাস পরেই! জমিদার-গৃহিণী গঙ্গামণি প্রস্তাব করে পাঠালেন সুমোহন বাবুর কাছে—আপনার মেয়েটিকে আমি চাই!

গঙ্গাস্নান সেরে কবে নিজের গাড়ীতে বাড়ী ফিরছিলেন, পথে সুনেত্রাকে দেখে গাড়ী থামিয়ে ফেলেন। তারপর অনুসরণ আর অনুসন্ধানে জেনেছেন, তাঁদেরই পালটি ঘর…অতএব—

নাম-করা জমিদার-বংশ, পাত্রটিও শিক্ষিত, চেহারাখানাও বনেদি ছাপ-মারা; আপত্তি করার কি আছে…বিয়ে হয়ে গেলো।

বিয়ের পর সুনেত্রা আর যেতে পারেনি অজয়ের বাড়ীতে। মায়ের নিষেধ,…জমিদার-বাড়ীর বৌ…যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়া সঙ্গত হবে না। এখন অনেক কিছু বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হবে তাকে।

নতুন জীবন,—ঐশ্বর্য্যময় পরিবেশ! জীবনে খানিকটা বৈচিত্র্য আনলো বৈ কি? কিন্তু মনের গহন অরণ্যে কোন্ অশান্ত ঝড়ের চাপা-কান্না গুমরে ওঠে—সে শুনতে পায়, নিঝুম রাতে, যখন ঘুম ভেঙে যায়…কান পেতে সে শোনে! না, না, ও কিছু নয়, মনের সাময়িক দুর্ব্বলতা মাত্র!—সুনেত্রা জোর করে মনের গতি ফেরাবার চেষ্টা করে।…

ব্ল্যাক প্রিন্স!…

ও আজ এলো কেন তার কাছে? প্রতি স্নায়ুতে যে জাগিয়ে
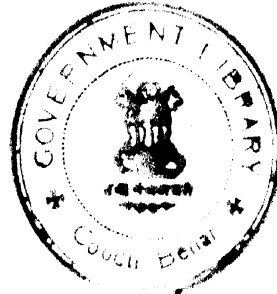
সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

তুলেছে স্মৃতির প্রবল আলোড়ন !···কোথায় যেন ফুটেছে ঐ রক্তমাখা ফুলগুলো ?—তারা ডাকছে ?···হ্যাঁ। তারা ডাকছে তাকে, এসো ! এসো ! তোমার হাতের প্রথম পরশ যে আমাদের পাবার কথা ছিল !···

অস্তরবির শেষ রশ্মি জলছিলো রক্তলাল স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কুঁড়িগুলোর ওপর ! ওদের পানে চেয়ে অজয়ও ভাবছিলো ঐ কথাটি !

ব্ল্যাক্ প্রিন্সের প্রথম কুঁড়িতে লেগেছে রক্তের ছোপ। রূপে-গন্ধে এবারে হবে ওদের পূর্ণ বিকাশ ! কিন্তু কোথায় সে শিথিল কবরী ? যেথায় নির্দ্দিষ্ট ছিল ওদের স্থান ?

"তোমায় দেবার কথা ছিল প্রথম গোলাপ ফুল
আমার হৃদয়-রক্তে রাঙা প্রথম গোলাপ ফুল।"

দরদ ভরা মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে অজয়,···

রক্ত-গোলাপের ঝাড় সুনেত্রার হাত থেকে খসে পড়ে ! প্রবল কম্পনে থর-থর করে কাঁপে সুনেত্রা ! চন্দ্রনাথ মহা উদ্বেগের সঙ্গে বলে—কি হোল ? অত কাঁপছো কেন ? ম্যালেরিয়া ধরলো নাকি ?—কপালে হাত দিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে,—হ্যাঁ, তাই তো ! গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে !

পরদিন···সহর থেকে বড় ডাক্তার আসে ; রক্ত নিয়ে যায় পরীক্ষার জন্য।

প্রবল জ্বরে অচেতন সুনেত্রা। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। মাঝে-মাঝে চমকে ওঠে। বড় বড় চোখ দুটো মেলে কাকে যেন খোঁজে। অস্ফুট স্বরে বলে···কে ? কে ডাকছে আমায় ?

গঙ্গামণি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। ও মা—এ কি হোল ? কত কাল পরে এলাম কত আশা নিয়ে ; এ যে আমার হরিষে বিষাদ হোল ! বাড়ীখানাও বহু দিন শূন্য পড়েছিলো, আর খুন-খারাপির লাশ চারি ধারে তো পোঁতা রয়েছে ! কি হতে কি হোল, কে জানে ?

ডাক্তাররা হালে পাণি পান না। রক্ত নির্দ্দোষ—তবে আর কি হতে পারে ?

তবে কি হবে ? পল্লীগ্রামে বউকে রাখতে তাঁর আর ভরসা হয় না ! টেলিগ্রাম করলেন বৈবাহিককে···তাঁর কন্যার অবস্থার কথা জানিয়ে। তিনি জবাবে জানালেন—আজই তাঁর কন্যাকে কলকাতায় রওনা করা হোক্।

ডাক্তার, ওষুধ, আর সুনেত্রাকে শায়িত অবস্থায় নিয়ে, মায়ের আদেশে—মোটরে সেই দিনই কলকাতায় রওনা হয় চন্দ্রনাথ।

ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়ীতে ;···পালঙ্কের ওপর শুভ্র শয্যায় শায়িতা সুনেত্রা। দু'দিন পরে আজ জ্বরের গতি নিম্নগামী হয়েছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ ফেরেনি। আচ্ছন্ন ভাব। মাথায় আইস্ব্যাগ চলেছে অবিরাম ভাবে ! বুকে কিসের ব্যথা—মাঝে মাঝে চম্কে ওঠে—কে ? কে ডাকছে ?

বিষণ্ণ ছায়া বাড়ীর সবার চোখে-মুখে ঘনায়মান !

রাত্রি বারোটা বেজে গেল, জ্বর বেশ কম—টেম্পারেচার ৯৯ ডিগ্রিতে নেমেছে। ডাক্তারের মুখে আশ্বাসের ইঙ্গিত,—আইসব্যাগ নামানো হয়েছে। রোগিণীর মুখের ভাব শান্ত, ক্লান্তিভরা নিদ্রায় মগ্ন সে।

সুনেত্রার মা ও বাবা, এ দু'দিন রাত্রি জাগরণ ও মহা উদ্বেগের পর আজ পেয়েছেন কন্যাকে ফিরে পাওয়ার আশ্বাস !—সুমোহন বাবু নিজের ঘরে গেলেন বিশ্রামের জন্য ; জামাতাকে অনেক আগেই পাঠিয়েছেন তার নির্দ্দিষ্ট ঘরে।

মা সুনেত্রার বিছানায় বসেছিলেন, ঘুমে যেন চোখ দুটো জড়িয়ে ধরছে। উদ্বেগ কমে গেছে, এসেছে নিদারুণ ক্লান্তি। কন্যার পাশেই শুয়ে পড়েন একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। নিঝুম রাত। চারটে বেজে গেলো। সারা বাড়ী নিদ্রাচ্ছন্ন !

সুনেত্রা চমকে ওঠে, কে ?—এদিক-ওদিক চায় ! একটু আগেই স্বপ্ন দেখছিলো তার নিজের হাতে রোপণ-করা গাছে ফুটেছে একরাশ রক্তরং-এর ব্ল্যাক প্রিন্স। কি মিষ্টি গন্ধ ! যেন নেশা ধরিয়ে দেয় !—নিশীথ-সমীরের হিমেল্ পরশে ওরা কাঁপছে ! দুলে দুলে ওরা ডাকছে···ডাকছে ওকে ! আর তারি পাশে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে অজয়···যেন কি বলছে !

—হ্যাঁ, বলছিলো অজয়। কৈ সুনেত্রা, তুমি তো এলে না···ফুল-গুলোর যে ঝরবার সময় হল, কৈ, তোমাকে তো দেওয়া হল না !

ঘুম কেন যে চোখে আসছে না···টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে, শাদা পাতার বুকে লাল কালিতে রক্তের রেখা ফুটিয়ে লিখে যায় অজয়···

তোমার আসার পথে জাগে রক্ত-রাঙা ফুল
স্মৃতির রঙিন্ প্রদীপ জ্বালে রক্তরাঙা ফুল।
অনাদরে, যায় যে ঝরে, রক্তরাঙা ফুল
অশ্রুধারায় রক্ত ঝরায় রক্তরাঙা ফুল।

জানলার পাশেই বাগান ! কার যেন পদশব্দ ! চমকে ওঠে অজয়।

জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সুনেত্রা ! দরজা খুলে চঞ্চল পায়ে নেমে আসে বাগানে।

ব্ল্যাক্ প্রিন্স গোলাপ ঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে সুনেত্রা। চোখে তার উদ্‌ভ্রান্তের চাউনি !

অজয় ছুটে যায় ওর কাছে ! ব্যাকুল ভাবে বলে,—এমন সময় কোথা থেকে এলে সুনেত্রা ? এ কি ! তুমি কি অসুস্থ ?

জড়িত স্বরে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে সুনেত্রা—তুমি···তুমি কি আমাকে ডেকেছ অজয় ?···কই ?···কই আমার—ব্ল্যাক্প্রিন্স ?

আর কথা বলতে পারে না, কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে যায় গাছের পাশে।

অজয় ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে, অস্ফুট চীৎকার করে দৌড়ে এসে সুনেত্রাকে তুলে ধরতে যায় ; কিন্তু পারে না,—তখন ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত সুনেত্রার নাক-মুখ দিয়ে উছলে প'ড়ে রাশি রাশি ব্ল্যাক্ প্রিন্স ফুটিয়ে চলেছে !

পুব-গগনের দিগন্ত সীমায় তখন মহামিলন লগ্ন সমাগত, উষার কপালে অরুণদেব এঁকে দিচ্ছেন রক্তিম সিঁদুর-রেখা !

সুনেত্রার মাথা সযত্নে কোলে তুলে নেয় অজয়। চরম বেদনায়, পরম বিস্ময়ে, বিস্ফারিত নেত্রে, দেখছিলো অজয়—

সুনেত্রার সর্ব্বাঙ্গে ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ছে ব্ল্যাক্ প্রিন্সের ঝরা পাপড়িগুলো !

তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল
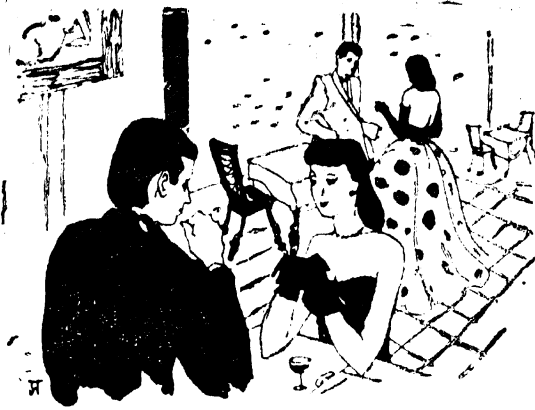
অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মা স টা র পী স !

"বেশ, তাই দেব ওকে !"

মোদরুল্লো হাতের আস্তিন গুটিয়ে বদ্ধমুষ্টি সামনে প্রসারিত করলো, তারপর সেই বিশাল ক্যানভাসের ওপর তাই আঁকতে লাগল, যেন ছায়াছবির বিরাট 'ক্লোজ আপ।' এই বদ্ধমুষ্টি ক্রমে অদ্ভুত সজীবতা লাভ করলো এই অলৌকিক দৃষ্টিকোণে—মনে হয় যেন পেশাদারী মডেলের একটা শারীরিক দেহাংশ মাত্র নয়, শক্তি ও তেজের অপরূপ প্রতিচ্ছবি ক্যানভাসে বিচ্ছুরিত। পরদিন বাহু, তারপর পদযুগল, তারপর হাঁটু, এইভাবে সেই বিস্ময়কর সিরিজ সে এঁকে চললো। উত্তরকালে ছবির বেপারীরা এই ছবির দর নিয়ে মারামারি করলেও সেই সময় কিন্তু রাগে ফেটে পড়েছিল আফতালিয়েন।

"শুয়োর ! এক টিউব পেন্টের দাম আট ফ্রাঁ, এখন আর ব্রাসে পেন্ট লাগাবার সময় হয়না তোমার, তোমাকে ত' আর পয়সা দিয়ে কিনতে হয়না ? দেখ দিকিনি ! —ক্যান্‌ভাসের ওপর যেন স্রোতের মত রঙ ঢেলেছে ! যখন সেগোনজাক্ হবে, প্রচুর টাকা রোজকার করবে, তখন এই রকম লাভাস্রোতের মত ক্যানভাসে রঙ ঢালতে পারবে। তবে উপস্থিত—"

কথা আর শেষ হলোনা, মোদরুল্লো আফতালিয়েনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। ছবিওলাও প্রত্যাঘাত করে। সারা নীচের তলা জুড়ে এই ভাবে লড়াই চলে, তারপর টেবলের তলায়, টেবল উলটিয়ে যায়, অবশেষে মোদরু আফতালিয়েনকে সশরীরে তুলে নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোকান-ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ছবিওলা একটিও কথা বলেনা। রাগে জ্বলছে সে, এই সংঘর্ষের ফলে একটা পুরাতন ফুলদানী ভেঙে গিছল, তার দাম চায় আফতালিয়েন—সেই বাবদ শেষের ছবিটার দাম দিলনা। শেষের ছবিটা একটা বিরাট বুড়া আঙুলের—ক্যানভাসের ঠিক ওপরেই টিউব টিপে ধরে আছে—আঙুল ছাপিয়ে রঙ ঝরে পড়ছে ক্যানভাসের ওপর এক বিরাট ও মনোহর সরোবর সৃষ্টি হয়েছে।

সাত

সেই দিন সন্ধ্যায় খালি হাতে বাড়ী ফিরল মোদরুল্লো, টাকা পেল না। ৎবরোর বাড়িতেও অবস্থা তেমন সুবিধে নয়—একটা সসপ্যান কিনতে হবে, কিছু ওষুধ কেনাও প্রয়োজন। 'লা রোতন্দে'তে গিয়ে একপাত্র কফি ক্রীম পান করার মত অর্থ সংগৃহীত হল।

লীজার, উৎরো ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে একটা টেবলে বসে কিছুকাল গল্প করার পর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিসলিং এসে হাজির হয়েই হায়দারী হাঁক দেয়—

"সবাই উঠে পড়ো,—আমি তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব—"

"কোথায় ?"

"বলা হবে না,—চমকে দিতে চাই।"

"না"—বললো মোদরুল্লো।

এই সব কাণ্ড তার ভালো জানা আছে। একরাত্রে এক শুভ্রকেশ মার্সেনেস এখানে উপস্থিত সব কটি মডেলকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই সঙ্গে ডাকলেন আরো কয়েকজনকে, তারপর তাদের তাঁর এ্যাভিন্যুস্থ বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে সারারাত্র ধরে চললো পানোৎসব। কিংবা ভাউজিরারের পিছনে থাকে হয়ত কোনো দরিদ্র দানব, একপাত্র করে মদ নিয়ে সবাই তার বাড়ি চলল—তারপর রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে চলল তর্ক-বিতর্ক—ভোরের দিকে বাতির আলোয় সবাই বাড়ি ফেরে। তার চেয়ে আরো বিশ্রী রু জ্যাকবের কোনো ইংরাজ কবির বাড়ি ছোটে—হয় অসকার ওয়াইলডের উপন্যাসের নায়ক নয় বিয়ার্ডসলের ব্যঙ্গচিত্র। গলায় তিনপাটা রুমাল,—যেন ভুতুড়ে বাড়ীর অশরীরী আত্মা। গ্যাসের আলোয় বারান্দা আলোকিত—বাইরে টিউলিপ ফুল সাজানো কিংবা ধূসর প্রজাপতি—একেবারে হুইসলারের পুনরাবির্ভাব।

কিন্তু কিসলিং ছাড়বার পাত্র নয়, নিঃসন্দেহে আগেই সব কথা হারিকট রুজকে সে বলেছিল,—কারণ তার জ্বলন্ত চোখের নীরব অনুরোধ মোদরুল্লোকে পরাভূত করল।

কিসলিঙ একটা ট্যাক্সি ডাকে—সবাই গিয়ে ভেতরে ঢোকে,

তারপর পারীর এ্যাভিন্যু দ্য মেদিনের পরিষ্কার পথে ট্যাক্‌সি ছুটে চলে,—পার্ক মনকোর সামনে গিয়ে ট্যাক্‌সি থামে।

"এ যে দেখছি দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। একেবারে অভিজাত পাড়া—নয়? এর পিছনটাও তেমন 'না-পসন্দ' নয়।"

যে বসত-বাড়িতে কিসৃলিঙ ওদের নিয়ে গেল, সে বাড়িটি আগাগোড়া শাদা পাথরের তৈরী, তিনটি প্রশস্ত সিঁড়ি ওপরে উঠে এক চাতালে গিয়ে মিশেছে। তিনজন উর্দিপরা চাপরাশি অপেক্ষা করছিল,—তাড়াতাড়ি কিসৃলিঙের টুপীটা আর সেই সঙ্গে আর সকলের তৈলাক্ত টুপীগুলি সযত্নে তুলে গুছিয়ে রাখল।

লাল, স্বুবর্ণগৈরিক আর নীল রঙের উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত কয়েকটা বড় বড় ঘর পার হয়ে প্রায়ান্ধকার এক বিরাট ঘরে গিয়ে ওরা পৌছয়, কালো কার্পেটের পাশে নানা রঙের কাগজের কিউবে মোড়া আলো। দীর্ঘায়ত চন্দ্রাতপের শীর্ণ সোনালি শিখায় সরু মোমবাতি বা 'মশাল ঝুলছে। যেভাবে সুগন্ধি ধূপে ঘরটি সুরভিত ভাব-সমাধি ঘটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গেই পাষণ্ড হাঁচি ওদের আক্রমণ করে। চোখ কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—দেয়ালগাত্রে আবছা পরদা দেখা যায়, একটি মঞ্চের ওপর আরাম কেদারা, ও অন্যান্য ধরণের কাউচ কেদারা সাজানো। জায়গাটি খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির নয়, মার্কিণী ফিল্মের ষ্টুডিয়ো নয়। ডিভানে শায়িত নর-নারীর দেহাংশ দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে সিগারেটের আগুন এবং রত্নালঙ্কারের দ্যুতি।

সেই দেহাংশগুলির একটি বাষ্পীয় মূর্তির মত এগিয়ে এসে ক্রমে নারীদেহের আকৃতি লাভ করলো, মসৃলিনে ঢাকা রমণীয় তনু—তাঁর কাছে গম্ভীরভাবে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেয় কিসৃলিঙ:—

"ইসাডোরা, এই সেই মোদরুল্লো।"

"মঁসিয়ে, আপনার এই আগমন আমার কাছে শুধু আনন্দ নয়, আমার পরম গৌরবের বস্তু,—আজ সকাল থেকে আপনারই আঁকা একটি ছবির আমি অধিকারিণী হয়েছি, এ আমার গৌরব।"

আফতালিয়েনের সেই নীচের তলার ঘরে আঁকা হারিকট রুজের দেয়ালগাত্রস্থিত ছবির দিকে আঙুল দেখালেন ইসাডোরা। ছবিটি এখন মূল্যবান সোনালি ফ্রেমে মণ্ডিত।—মোদরু হারিকট রুজের পরিচয় দেয়:

"এই আমার ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

শিল্পীর মলিন বেশ বাস, গেঞ্জী নেই, সার্টের কলার নেই, এমন কি গলাবাঁধও নেই, নর্তকী তবু মনোহর ভংগীতে শিল্পীর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, কিন্তু এই লালমুখো মেয়েটা যেন এই মাত্র চাষের মাঠ থেকে উঠে এসেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল এক রকম জোর করেই, অতি কষ্টে তাকে অভিবাদন জানালেন।

ইসাডোরা দলটিকে মঞ্চস্থ ডিভানে নিয়ে চললেন, সেখানে ডিনার কোট আর ধোপদোরস্ত সার্ট পরে গড়াচ্ছেন, অসংখ্য সাংবাদিক, রঙ্গমঞ্চের পরিচালকবৃন্দ, অভিনেতা আর সমালোচকবৃন্দ। মোদরুদের দলটির দিকে গাত্রোত্থান না করেই তাঁরা নীরবে তাকিয়ে রইলেন। মোদরুল্লো পকেটে হাত রাখলো—

তার সঙ্গীরাও তাই করলো। হ্রস্ব ঝুলওলা স্কার্ট আর অনেকখানি বুক-খোলা জামা পরা একদল মেয়ের সামনে ওদের নিয়ে যাওয়া হ'ল,—তাঁদের বক্ষোদেশ পাউডার-চর্চিত করে শুভ্র করা হয়েছে, বহুবর্ণের মোজার ভিতর থেকে সূক্ষ্ম পায়ের গোড়ালি দেখা যাচ্ছে, আর সেই সব পায়ে অতি ছোট সব জুতা পরা, সোনা-রূপা এমন কি মূল্যবান মণি-খচিত জুতোগুলি চক্ চক্ করছে।

গির্জাঘরের চেয়ারের মত একটি বিরাট চেয়ারে একজন মহিলা বসেছিলেন, তিনি তাঁর লম্বা হাতলযুক্ত চশমার ভিতর দিয়ে শিল্পীদের একবার দেখে নিলেন। তাঁর কপালের ওপর একটি মরকত জ্বলছে আর মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে উটপাখির পালক। নাকটি টিকালো, চোখ দুটি উত্তেজক, তার সেই ছোটখাটো দেহের এই বহুমূল্য এবং সোচ্চার অলংকরণ যেন তাঁর বিকশিত দন্তবিন্যাসের পাদপীঠ।

শিল্পীদের একে একে নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন: "মজার ব্যাপার!"

কথাটা মানিয়ে নেওয়ার জন্যই যেন ইসাডোরা বলে উঠলেন:

"ইনি হলেন 'Comedie'র সেই লা কারাল্লা।"

মোদরু এই বিচিত্র প্রাণীটির প্রতি তার সেই ভয়ংকর দৃষ্টিদানে উদ্যত, এমন সময় নর্তকী ইসাডোরা তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পরিচয় দেন: "মাদাম লা প্রিন্সেস্ দ্য লরেন্স।"

এই মহিলাটি লম্বা,—তাঁর মাথার চুলে তিনটি বিভিন্ন ধরণের ছাপ,—তার ফলে তাঁর অপ্রশস্ত ললাটে একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। মহিলাটির চোখ দুটি ধূসর, চমৎকার সূক্ষ্ম নাক, মুখটি ছোট, কিন্তু ঠোঁট দুটিতে পূর্ণতা আছে। মহিলাটির সমগ্র দেহটিতে আশ্চর্যজনক নমনীয়তা—অনাড়ম্বর সাধারণ পোষাকের ভিতর থেকে দুটি সুটোল হাত প্রকাশিত,—মোদরুল্লোর দিকে করমর্দনের জন্য যখন হাতটি এগিয়ে দিলেন, মনে হ'ল যেন তা তরঙ্গায়িত হ'ল।

তিনি বললেন: "মঁসিয়ে, আপনি মাদামের যে ছবিটি এঁকেছেন তা দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। আপনার ঐ একখানি ছবিই দেখলাম, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো অনেক দেখতে পাবো।"

তাঁর দেহ যেমন তরঙ্গায়িত, কণ্ঠস্বরও তেমনই ছন্দিত। কথা কওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হাতটি মোদরুল্লোর হাতে বন্দী ছিল,—বাল্যকালে হাতের মুঠিতে পাখির ছানা ধরে রেখে মোদরুল্লোর মনে যে আকুলতা জেগেছিল, আজও তার প্রাণে সেই আকুলতা ফুটে উঠল। মহিলাটি হাতটি তুলে নেওয়ার পর এক নিদারুণ শূন্যতায় তা'র মন ভরে গেল।

কমেডির ঐ মেয়েটির মত এই মহিলা মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে কথা বলেননি। ভাগ্যবানরা যে ভাবে দুর্গতদের দিকে তাকায়, সে দৃষ্টি ওঁর চোখে নেই; একবারও এই মহিলাটির নজর ওর পোষাকের ওপর পড়লো না।

ওর চোখের দিকেই উনি সমানে চেয়ে রইলেন। তবু তাঁর
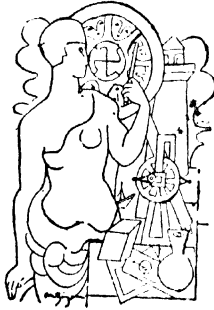
বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য তিনি বজায় রেখেছেন, জানেন যে শিল্পীর সঙ্গে এক স্তরে নেমে আসার প্রয়োজন নেই।

অন্য শিল্পীরা লক্ষ্য করলেন না শ্রোতাদের দু'চারজন বাউণ্ডুলে এই গৃহকোণের এক বিরাট ডিভানে এসে জমেছে।

পরিপূর্ণ অন্ধকার নেমে এল। মোদক দাঁড়িয়েই রইল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই নর্তকীর সব কিছু গতিবিধি ও লক্ষ্য করবে, নিশ্চয়ই চিত্রশিল্পীদের কাছে ছবি যেমন প্রিয়, নাচও ওঁর কাছে তাই, যাই হোক, উনিই ত' বলেছেন:

"নৃত্য আর্টের এক মহত্তর অভিব্যক্তি; কারণ, এর ভিতর সবই রয়েছে। যা কিছু মহৎ তাই নৃত্য: একটি সুন্দর কবিতাও একটি নৃত্যভঙ্গী, একটি বিকাশোন্মুখ ফুলও তাই,—এথেন্সের মন্দিরের ভাস্কর্যও তাই···"

কালো কার্নিসের এক অংশে দুটি লাল আলো পড়েছে, সেই খান থেকে সহসা একটা মূর্তি উঠে আসে,—একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি, তাঁর চারপাশে ভাসছে ধূসর রঙের ওড়না,—মাঝে মাঝে এই কুয়াশা ভেদ করে মধুর হাসি বা একটি কমনীয় হাত ভেসে আসছে। তারপর চমৎকার মধুর স্বরে সেই দ্যুতিময়ী ছায়াকৃতি নারী কথা বলে,—ছবি সম্পর্কে কোনো কোনো শিল্পী যেমন বলে থাকেন, তেমনই তিনিও ব্যাখ্যা সুরু করলেন। তার পর তিনি তিনটি মেয়েকে এনে হাজির করলেন,—গ্রীসিয় আত্মা,—আর চমৎকার হেলভেশীয় দেহ সত্বেও তাদের বটিচেল্লীর আঁকা তরল ছবির ভূমিকায় নামানো হবে।

"এক মুহূর্তের মধ্যে ওরা তিনজনে বসন্ত কালের তিনজন রমণীয় রমণী হয়ে উঠবে,—পরস্পর হাত ধরা থাকবে, আর ওড়না মিশে যাবে।

"তাদের দেহভঙ্গীর সুর-মূর্চ্ছনা আমাদের স্যুমানের সঙ্গীতও ভুলিয়ে দেবে···"

ইসাডোরা সুদীর্ঘ পিয়ানোর দিকে আঙুল দেখায়,—তিনটি মোমবাতির নীচে অন্ধকারের ছায়া,—তার সামনে একজন রসজ্ঞ কলাবিদ্ বসে আছেন।

"এইবার আপনারা আমার মেয়েদের নাচ দেখতে পাবেন। ওদের পা আছে—হাত আছে, কিন্তু ওরা নাচবে শুধু এই নিয়ে···"

দক্ষিণ দিকের বাহুতে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে নর্তকী তাঁর বাম দিকের ওড়নার একটি প্রান্ত উন্মোচন করলেন। শরীরের বেপথুমান একটা অংশ অনাবৃত হল,—দা ভিঞ্চির আঁকা ব্যাপটিষ্ট যে ভঙ্গীতে ক্রসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, এই আঙুলেও যেন সেই ছন্দ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

"হৃ দ য় আ মা র না চে রে—"

ছায়াঘেরা অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল তিনটি তরুণী নারী-মূর্তি। তাদের ভেতর একজনের মাথাটি ছোট, কাঁধ দুটি সংকীর্ণ, আর উদরটি যেন উদার-ফুলদানি। দ্বিতীয়ার সলজ্জ ও বিস্তীর্ণ ভ্রূযুগের নীচে গভীর টলটলে চোখ, আর কিছুই তার দেখা যায় না। তৃতীয়া যেন বাষ্প মাত্র, সব কিছু ছাপিয়ে ঝরে পড়ছে মোহন মাধুরী, খুব কাছে এসে যখন দাঁড়ালো, তখনও তার দেহের প্রান্তরেখা লক্ষ্য করা কঠিন।

আলোর বন্যা ঝরে পড়ছে মেয়েটির কাঁধ থেকে তার ছোট্ট

নিতম্বে, মনোহর পৃষ্ঠদেশে, কিন্তু কিছুতেই যেন তার সেই সূক্ষ্মদেহকে স্পর্শ করতে পারছে না, একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুতীব্র আলোর জোয়ারে যখন তার পা দুখানি ভাসিয়ে দেওয়া হল, তখন মনে হল যেন মর্মর গিরিবক্ষে ঝরণার শুভ্রধারা ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু সুরুতেই প্রথম ভঙ্গিমা থেকেই যেন ওরা এক সূত্রে বাঁধা পড়ে গেল। চোখ যেমনটি দেখবে আশা করেছিল, অভিজ্ঞ রূপদক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেমনটি চায়, প্রতিটি পদক্ষেপে তাই ফুটে উঠলো। বিরাট মঞ্চে উপবিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর কণ্ঠে প্রশংসার সেই প্রত্যাশিত কথাগুলিই ধ্বনিত হ'ল:

"অনবদ্য! বিস্ময়কর! স্বর্গীয়!"

উৎরো বলে উঠলো—"নতুন কোনো মানে নেই, এ সেই প্রাক্-র‍্যাফেলবাদী ব্যাপার। ফোটোগ্রাফের ওপর কোমল স্পর্শ। আহা! এখন বুঝছি কেন এই বসন্তের রাণীকে ব্যালে রুসেতে সব আহাম্মক-গুলো শীষ দিয়ে উঠেছিলো। এই ছন্দসুষমা, এই ভঙ্গিমা ঐ গাধাদের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে কি সয়? কি মধুর! কি ভাবগাঢ়!—এদিকে আবার আমাদের সঙ্গে মিতালির খাতিরে কিউবও রেখেছে। পিকাসো আর তার সমতল আঙ্গিক,—আসল রঙে আঁকা লিজারের ছবি এ সব মুছে দেবে। জাদকিন আমাদের নতুন ছন্দ শেখাও।"

এদিকে কমেডির সেই বৃদ্ধা নটী-অষ্ট্রিচ পাখির পাখনা দুলিয়ে বলে ওঠে—

"কি চমৎকার! হৃদয় আমার আকুল হয়ে উঠেছে।"

এক কোণে বসে মোদরু সব দেখছে আর শুনছে।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই রাজকুমারীর তরঙ্গায়িত তনু ওর চোখের ওপর ভাসছে, নর্তকীর দেহে যেন সেই রূপলাবণ্যময়ীরই আবির্ভাব ঘটেছে। দুটি হাত দিয়ে মাথাটা ধরে রইল মোদরু হাতের তালু যখন কপাল স্পর্শ করলো তখন ওর গাত্রচর্ম যে কর্কশ তা অনুভূত হ'ল,—অথচ মেয়েরা এই চর্মকেই নরম ও মোলায়েম বলেছে কতবার। যে কণ্ঠস্বর ক্ষণকাল আগে সে শুনেছে তার কাছে এই নৃত্যতালের সঙ্গীত অতি স্থূল। আর সেই নির্মল, দীপ্ত ও প্রশংসাভরা চোখ তার চোখের ওপর ভাসছে, নাচই দেখুক আর চোখ বুজিয়ে রাখুক, ঐ একই অবস্থা; তারপর ঐ সূক্ষ্ম দেহরেখা,—আহা! এখন মনে পড়েছে কোথায় আগে দেখেছে এই পরম রমনীয় নারী দেহ।

সীয়েনার পোড়া-সোনার দেয়ালগাত্রে এই দেহ রেখায়িত করে রেখেছেন সীম মারতিনি। সমগ্র অনুভূতি দমন করে মোদরু মনে মনে চিত্রশিল্প সম্পর্কে আত্ম-আলোচনায় মগ্ন হল:

"আজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে এদিনে লীজার হয়ত ঠিক—কিন্তু আগামীকাল হয়ত সে বাসি হয়ে যাবে এই ইমপ্রেসনিষ্ট ইসাডোরা ডানকানের মত—একদিন মলিন হয়ে যাবে ওর হাতের কাজ।

মানুষ চিরদিনই ভাববাদীদের ভুল বোঝে। অতীত ও ভবিষ্যতের ভিতর চিরদিনই রয়েছে এদিনের জীবন। মানুষ যে আগ্রহে অপরূপ বৃক্ষের ফলের আস্বাদ নেয় তেমনই আগ্রহে কি এই জীবনকে সজোরে কামড়ে ধরতে হ'বেনা? ব্যক্তিগত বিচার ও রুচি অনুসারে মানুষ ভালোবাসবে মুলকে, মাটিকে; কেউ আবার ভালোবাসবে বসন্তের গরিমাদীপ্ত মুলকে, কিন্তু কি হবে রঙে রসেভরা সুমধুর ফলের?"

উনি চলে গেলেন।

মোদরু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর সেই লঘু পদক্ষেপ যেন কার্পেট স্পর্শই করলো না—যেন হাওয়ার মত ভেসে গেলেন।

"এই মোদরু..."

নৃত্য শেষ হ'ল—ওরা সবাই গিয়ে ঢুকলো আর একটি বিরাট ঘরে। কালো পাথরের চারটি ছোট্ট টেবলে সাজানো রয়েছে ফলের পাহাড়, নানাবিধ মিষ্টান্ন আর মাংস। প্রতিটি পাহাড় মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আটটি নিগ্রো মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রোম্যান ফ্যাসানে একটি কাউচে শুয়ে আছেন ইসাডোরা, যে কেউ পান-পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে, তিনি তাকে মণি-খচিত রোমক সুরাপাত্র এ্যমফোরা থেকে শ্যামপেন ঢেলে দিচ্ছেন।

মাথার এলোচুল লুটিয়ে পড়েছে, ওড়না খসেছে, তিনি সবাইকে অনুরোধ করছেন 'মা ম নু স র'। আমার পথ ধরো।

"সবাই যেখানে নগ্ন, সেখানে পোষাক পরাটাই হ'ল অসভ্যতা, যেমন সবাই যেখানে পান করছে সেখানে চুপ করে থাকাই চরম অভব্যতা। কেমন—তাই না—লর্ড জ্যারুট?"

সেই মোসাহেবটা! পরনের ট্রাউজার অতি ছোট, তেমনই বড় ডিনার কোট, দুটো দু'রকম কাপড়ের। মাথায় আবার ফুলের মুকুট—দু'হাতে দুটি পানপাত্র ধরে আছে।

লা রোতন্দের এই বাউণ্ডুলেগুলোকে এই উৎসবের জন্য ঐ সংগ্রহ করে এনেছে, তাদের সবাইকে স্বহস্তে বোতল পরিবেশন করেছে।

আমন্ত্রণ জানিয়ে নর্তকী বললেন—"মোদরুল্লো! মোদরুল্লো! এইসব শিল্পীদের সঙ্গে এক পাত্র হোক্—"

মোদরুল্লো বলে উঠলো..."মাফ করুন মাদাম,—এরা যদি আর্টিষ্ট হন, তাহলে আমাদের সাধারণ শ্রমিক বলেই মনে করতে দিন,—এই অনুরোধ। আচ্ছা বিদায়—গুড নাইট।"

কিন্তু ইতিমধ্যেই কোনো কূটনীতিবিদ বা অভিনেতার হস্ত প্রসারিত ওয়েষ্টার মিশ্রিত হ্যামের পাত্রের জন্য ইসাডোরা অন্যদিকে হাত বাড়িয়েছেন।

জাজব্যাণ্ডের কলরব সুরু হ'ল, মোদরুল্লো সহচরদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে বেরিয়ে কিসলিঙ বলে ওঠে "মোদরু, তুমি ঠিকই করেছ, কিন্তু দেখো ভাই, ঐ সব বাউণ্ডুলের দল, সাংবাদিকরা ওদেরই কিউবিষ্ট বলে ভুল করে, ওরাই গরম খানা খাবে। যাক তাতে কিছুই এসে যায় না। আমরা ঠিকই করেছি। আর আমার কাছে টাকা আছে, পোলাণ্ড থেকে পঁচিশ হাজার রুবল সবে পেয়েছি, প্রথম হোটেলের কাছে পৌঁছলেই আমি তোমাদের শ্বেত মদ্য, শূকরের মুণ্ড আর সার্ডিন মাছ খাওয়াব—নিজেরাই নিজেদের খাওয়াব, কোনো নর্তকী বা রাজকন্যার পয়সায় নয়—"

হারিকট রুজের হাতটি মোদরু বেশ জোরে চেপে ধরলো।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য

লেখক-মঞ্জুষা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রামানন্দ ন্যায়বাগীশ—পণ্ডিত। জন্ম—ফরিদপুরে জপসা গ্রামে। কর্ম—কথকতা। গ্রন্থ—গরুড়ের দর্পচূর্ণ, সত্যভামা।

রামানন্দ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দুলালী, ভুলের ফুল, রসায়ন, মঞ্জরী (স্বরলিপি)।

রামানন্দ বসু—বৈষ্ণব ভক্ত। নামান্তর—রায় রামানন্দ। পিতা—ভবানন্দ রায়। মৃত্যু ১৫৩৪ খৃঃ। ইনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ও বিদ্যানগরের শাসনকর্তা ছিলেন। ইঁহার ভক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া চৈতন্যদেব ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থ—জগন্নাথবল্লভ (নাটক), পদাবলী।

রামানুজ স্বামী—দার্শনিক ও টীকাকার। জন্ম—১০১৭ খৃঃ ভূতপুরী বা শ্রীপেরেম্বুদুরে। মৃত্যু—১১৩৭ খৃঃ—পিতা আসুরি কেশবভট্ট। মাতা—কান্তিমতী। যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন। কয়েক বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীরঙ্গমে অবস্থান ও দীক্ষালাভ। ইঁহার জীবন ঘটনাবহুল। বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—ভগবদ্গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, শরণাগতি গদ্যত্রয়, ভগবদারাধনক্রম, বেদার্থসংগ্রহ, শ্রীভাষ্য।

রামানন্দ ঘোষ—কবি। নামান্তর—বুদ্ধদেব। ইনি নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ—রামায়ণ (কাব্য)।

রামানন্দ সরস্বতী—অদ্বৈতবাদী। জন্ম—১৭শ শতাব্দী। ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দের শিষ্য। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। গ্রন্থ—ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী (ব্রহ্মসূত্রের টীকা)।

রামাচার্য, ব্যাস—মধ্বমতাবলম্বী। জন্ম—১৭শ শতাব্দী গোদাবরী তীরে অন্ধপুরীতে। পিতা—বিশ্বনাথ। গুরু—ব্যাসরাজ। গ্রন্থ—তরঙ্গিণী (ন্যায়ামৃতের টীকা)।

রামাবতার সাহিত্যাচার্য্য—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—মিত্রগোষ্ঠী পত্রিকা (১৮২৭ শক—১৮২৮ শক)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ ৫ই ভাদ্র মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায়। মৃত্যু—১৩২৬ বঙ্গ। পিতা—গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। শিক্ষা—গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা (কান্দি ইংরেজি স্কুল, প্রথম স্থান, ১৮৮১), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ২য় স্থান, ১৮৮৩), বি-এ (ঐ, প্রথম স্থান, ১৮৮৫), এম-এ (১ম স্থান, ১৮৮৭), পি-আর-এস (১৮৮৮)। কর্ম—অধ্যাপক, রিপন কলেজ (১৮৯৫), পরে অধ্যক্ষ (১৯০৪), বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় সরল ভাবে বুঝাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৩০১, ১৩১১—১৩১৮)। গ্রন্থ—প্রকৃতি (১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), শব্দকথা, কর্মকথা, চরিতকথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞকথা, নানাকথা, জগৎকথা, ধর্মের জয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ব্রতকথা, মায়াপুরী। সম্পাদক—সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, ১৩০৬—১০)।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে মেদিনীপুর জেলায় অযোধ্যাবাড় গ্রামে। মৃত্যু—১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে। পিতা—লক্ষ্মণ চক্রবর্তী। মাতা—রূপবতী দেবী। কর্ম—মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড় রাজ্যের সভাকবি। গ্রন্থ—শিবায়ণ কাব্য (১৭১০—১১ খৃঃ), সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

রায়নারায়ণ বিশ্বাস পরামাণিক—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা। গ্রন্থ—মহাভারতের প্রকৃত দর্পণ (১৮৭১)।

রায়শেখর—পদকর্তা। জন্ম—বর্ধমান জেলার পড়ানগ্রাম। ইনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং বহু বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। গ্রন্থ—পদাবলী।

রাসবিহারী ঘোষ—প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও বাগ্মী। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ বর্ধমান জেলায় তেরকোনা গ্রামে। মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ। পিতা—জগবন্ধু ঘোষ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বাঁকুড়া হাই স্কুল, ১৮৬০), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৬২), বি-এ (ঐ, ১৮৬৪), এম-এ (১৮৬৬), বি-এল (১৮৬৭), ডি-এল (১৮৮৪)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট (১৮৬৭), অনার্স অফ ল পরীক্ষা (১৮৭২), ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৮৭১)। ভারতীয় জাতীয় সভার সভাপতি (মাদ্রাজ, ১৯০৮)। ইয়োরোপ ভ্রমণ। শিল্পের ও শিক্ষার উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান। সি-আই-ই (১৮৯৬), সি-এস-আই (১৯০৯), স্যর (১৯১৫) উপাধি লাভ। গ্রন্থ—The Law of Mortgage in India (১৮৭৬), Hindu and Muhamadan Law of Mortgage.

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১২৩২ বঙ্গ ঢাকা জেলার তারপাশা গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৪ বঙ্গ ২৮এ চৈত্র। তিন বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় খুল্লতাত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পালিত হন। ইনি স্বভাবকবি ছিলেন। তারকচন্দ্র গোঁড়া কুলীন ও বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন—এবং অপরিণত বয়সেই ইঁহাকে ১৪টি বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে পিতৃব্যের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া ময়মনসিংহের আঠারবাড়ীর তহসিলদার নিযুক্ত হন। কিছু দিন কর্মের পরে সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া কুলীন ও কুলাচার্যগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কৌলিন্য-প্রথার বিরুদ্ধে বহু গান রচনা করেন। গ্রন্থ—বল্লালী সংশোধনী, কুলীনকীর্তন, রমণীরমণ কাব্য, বিষাবিধি, শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা, সীতার বনবাস।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—দার্শনিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৪ খৃঃ উত্তরপাড়া বিখ্যাত জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ। পিতামহ—বিখ্যাত জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। বৌদ্ধ-দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন। গ্রন্থ—পতঞ্জলি যোগদর্শন (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৯৫), Philosophical Dialogues and Fragments (লণ্ডন, ১৮৮৯)।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা (১২৭৫)।

রাসবিহারী রায়—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১২ বঙ্গ মেদিনীপুরে 'রায় মহাশয়' বংশে। এম-এ। বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ লেখক। স্কুলপাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা। সম্পাদক—মেদিনীবাণী (মাসিক), ওরিয়েন্টাল সেমিনারী পত্রিকা, যুগ্ম-সম্পাদক—মেদিনীপুর পত্রিকা (সাপ্তাহিক)।

রাসসুন্দরী—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। ইনি কিশোরীলাল সরকারের মাতা। গ্রন্থ—আমার জীবন (১৮৭৬)।

রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—আর্য-প্রদীপ (মাসিক, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, ১২৮৫), কৌমুদী (মৈমনসিংহ, মাসিক, ১২৮৫), আর্যপ্রভা (ঐ, মাসিক, ১২৮৭)।

রুজ, জি, এইচ (G. H. Rouse)—খৃষ্টান পাদরী। সম্পাদক—খৃষ্টীয় বান্ধব (মাসিক, ১২৮৬)।

রুদ্র, রাজা—সাহিত্যানুরাগী। পিতা—রাঘব (কৃষ্ণনগরের রাজা)। সিংহাসনারোহণ (১৬৬৯)। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ। সম্রাটের নিকট 'মহারাজ' উপাধি লাভ। 'রাঘবেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যোৎসাহী। গ্রন্থ—পুরাণসার (সঙ্কলন গ্রন্থ—১৬৬৯ আনু)।

রুদ্ররাম তর্কবাগীশ—পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র। গ্রন্থ—কারকাত্থার্থ-নির্ণয় টিপ্পনী, বৈশেষিক পদার্থ-নির্ণয়, অধিকরণচন্দ্রিকাকারকব্যূহ (মীমাংসা), বাদ-পরিচ্ছেদ, চিত্ররূপ-পদার্থ।

রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। পিতা—বিদ্যানিবাস। বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি ভাষ্য রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। ঐগুলি 'রৌদ্রী' বলিয়া বিখ্যাত। গ্রন্থ—ভ্রমরদূত (খণ্ডকাব্য), টীকা—ভাবপ্রকাশিকা, মণিদীধিতি-ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর ভাষ্য।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শারীরতত্ত্ব (১৩৫০), হর্মোন, বাঙালীর খাদ্য।

রুবেন রায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—আরক্তিম, স্পন্দন, জাগ্রত জীবন।

রূপ গোস্বামী—বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি। জন্ম—১৪৮৯ খৃঃ কর্ণাটক সর্বজ্ঞের বংশে বাক্লা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নগরে। মৃত্যু—১৫৫৮ খৃঃ। পিতা—কুমার। বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ। গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের উজীরের কর্ম এবং পরে প্রধান অমাত্য। মহাপ্রভুর শিষ্য ও পার্ষদ। বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ৮৪টি লুপ্ত বনতীর্থের উদ্ধার সাধন। বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—উজ্জ্বল নীলমণি। উদ্ধবদূত, উপদেশামৃত, গঙ্গাষ্টক, গোবিন্দ বিরুদাবলী, চৈতন্যাষ্টক, দানকেলি-কৌমুদী, নাটক চন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, পরমার্থ-সন্দর্ভ, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু (সনাতন সহ), মথুরা-মহিমা, যমুনাষ্টক-রসামৃত, ললিত-মাধব নাটক, ব্রজবিলাস স্তব, সাধন-পদ্ধতি, স্তবমালা, হংসদূতকাব্য, হরিনামামৃত-ব্যাকরণ, শ্রীরূপচিন্তামণি, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, বিদগ্ধমাধব, উৎকলিকাবল্লরী, কারিকা (বাংলা ভাষায়), পদ্যাবলী নাটক লক্ষণ, লঘু ভাগবত, ব্রজবিলাস বর্ণন, কড়চা, রিপুদমন বিষয়ে রাগময়কোণ (বাংলা ভাষায়)।

রূপনারায়ণ—পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিয়ালকোটে। মৃত্যু—১৭৪০ খৃঃ। পিতা—হরিরাম ক্ষত্রী। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও ব্রজধামে বাস। গ্রন্থ—মখজন অল্ ইর্ফান (ব্রজ মাহাত্ম্য ফার্সী ভাষায়, ১১২৯ হিঃ)।

রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—একটি ফুল (১৩০৮)।

রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়—কবি ও ভূস্বামী। জন্ম—১২৮৮ বঙ্গ, ঢাকা জেলার ব্রজযোগিনী গ্রামে। পিতা—কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা গৃহে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজি ও পণ্ডিতের নিকট বাংলা অধ্যয়ন। ইনি স্বদেশী যুগের নির্যাতিত ভূস্বামী ও পল্লীকবি এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—মা (১৩০৫), লেখা (১৩০৭), আশীর্বাদ (১৩১৮) বর্ষা নারী, শুভযোগ (১৩১৯), শিশুপাঠ্য কৃত্তিবাস (১৩২০), কুলবধূ (১৩২১), ভক্তের ভগবান (১৩২১) লঘিমা (১৩৩০), করুণা (১৩৩১), ভোগের ঘর (১৩৩২), তোমাদের রামায়ণ (১৩৩৮)। আকাশের কথা (১৩৪০), উপন্যাস—পাথর পড়া (১৩৪২), বিপত্নীক, তৃতীয় পক্ষ (১৩৪৫)।

রেবতীমোহন রায় মৌলিক—কবি। গ্রন্থ—প্রকৃতি (কাব্য ১২৯৩)।

রেবতীমোহন সেন—দেশসেবক ও ভক্ত কীর্তনীয়া। জন্ম—১২৭৩ বঙ্গ ১৮ই কার্তিক বিক্রমপুরের অন্তর্গত মূলার গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৭ বঙ্গ ৫ই অগ্রহায়ণ। পিতা—রামকুমার সেন (দেওয়ান)। শিক্ষা—এন্ট্রান্স (ঢাকা পাগোজ স্কুল)। কর্ম—শিক্ষকতা—খুলনা জেলা নলধা স্কুল, বরিশালে সেটেলমেন্ট অফিসে চাকুরী। এই সময় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, পরে বরিশাল হইতে মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট যোগদীক্ষা (১২৯৬) লইয়া ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ও নাম-কীর্তনে আত্মনিয়োগ। বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা। গ্রন্থ—ঠাকুর হরিদাস (১৩২৭), দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্য (১৩২৪), বালক শ্রীকৃষ্ণ (১৩২০), হাসান হোসেন, 'বালক রামায়ণ, কীর্তনমঙ্গল, নলদময়ন্তী, সাবিত্রী।

রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মুন্সী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যরচনা ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ। গ্রন্থ—গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ, ২ ভাগ, কৃষকবন্ধু, জোবেদা খাতুন রোজ-নামচা, আমীর জানের ঘরকন্না, বিলাতি মুসলমান, হক নদি হক্, উপদেশ রত্নাবলী। সম্পাদক—ইসলাম প্রচারক (মাসিক), সুধাকর (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), সোলতান।

রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মৌলবী, শেখ—মুসলমান গ্রন্থকার। জন্ম—রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত তুষভাণ্ডার দলগ্রামে। গ্রন্থ—সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস, ৩ খণ্ড, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস (অনুবাদ), জীবহত্যা ও গো-কোরবাণী, মহাত্মা স্তর সৈয়দের সুবৃহৎ জীবনী।

রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশ্‌হাদি—মুসলমান সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—ময়মনসিংহের অন্তর্গত রতনগঞ্জের অন্তর্গত চারাণ গ্রামে। ছদ্মনাম—ফকির আবদুল্লা। দিলদুয়ার জমিদার বাড়ীতে

অবস্থান। গ্রন্থ—প্রবন্ধ-কৌমুদী, অগ্নিকুক্কুট, সমাজ ও সংস্কারক (১২১৬), সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা (প্রকাশক, ১৩০৮)।

লঙ, রেভা: জেমস—খৃষ্টান মিশনারী ও বিদ্যোৎসাহী। জন্ম—১৮১৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ ২৭এ মার্চ। বাল্যে কিছুদিন রুষিয়ায় বাস। মিশনারীরূপে ভারতে আগমন (১৮৪৬)। কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থান ইহার কার্যক্ষেত্র। বাঙলার অধিবাসীদিগের বহু ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা। 'নীলদর্পণে'র অনুবাদের তত্ত্বাবধায়ক (১৮৬১)। নীলকর কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক দণ্ডিত অর্থ প্রদত্ত। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন (১৮৭২)। বাঙালীদিগের দরদী বন্ধুরূপে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ—The Banks of Bhagirathi (কলি, ১৮৮৬), Descriptive Catalogue of Vernacular Books and pamplets (কলি, ১৮৬৭), Eastern Problems and Emblems illustrating old Truths (লণ্ডন, ১৮৮১), The Eastern Questions in its Anglo-Eastern Aspects (লণ্ডন, ১৮৭৭), Five hundred questions on the social condition of the Natives of India (লণ্ডন, ১৮৬৫), The Indigenous Plants of Bengal (কলি, ১৮৭০), Notes on a Tour from Calcutta to Delhi (কলি, ১৮৫৩), On Russian Proverbs as illustrating Russians Manners & Customs (লণ্ডন, ১৮৭৬), Oriental Proverbs and the rises in sociology, ethnology, philology & education (১৮৬৫), Oriental proverbs in their relations to folklore, history & sociology (লণ্ডন, ১৮৭৫), Returns relating to Publication in the Bengali Language in 1857 (কলি, ১৮৫১), Russian Proverbs (কলি, ১৮৬৮), Russian Trade with India (কলি, ১৮৭০), Scripture Truth in Oriental Dress (কলি, ১৮৭১), Selections from unpublished records etc (কলি, ১৭৬৭), Adams Report on Vernacular education in Bengal and Bihar (১৮৬৮)।

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩২৮ বঙ্গ ১০ই আশ্বিন ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত লক্ষ্মণদীয়া গ্রামে। পিতা—গোপালচন্দ্র বিশ্বাস। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ১১৩১), আই-এস-সি (বঙ্গবাসী কলেজ)। কর্ম—শিক্ষকতা, ফরিদপুর মাচপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ১১৪৫-১১৪১; নিজ গ্রামে পাঠশালা স্থাপন (১১৪০); ব্যবসায় পরে চিত্র জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট (১১৫০)। 'কাব্যশ্রী' উপাধি লাভ (১১৪৫)। গ্রন্থ—পাঠশালার মাষ্টার (উপ, ১১৪১)। সম্পাদক—মিলন (ফরিদপুর, ১৩৫০), মর্মবাণী (মাসিক, ১৩৫১ কলিকাতা)।

লক্ষ্মণচন্দ্র রক্ষিত—কবি। গ্রন্থ—শ্রীবিশ্বকর্মা।

লক্ষ্মণাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১০শ শতাব্দীতে বারেন্দ্রবংশে। পিতা—কৃষ্ণবিজয় আচার্য। গুরু—উৎপলাচার্য (কাশ্মীরবাসী)। গ্রন্থ—সারদাতিলক (সংকলন), তারাপ্রদীপ।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা। গ্রন্থ—অপূর্বজ্ঞানযোগ।

লক্ষ্মীধর—স্মার্ত গ্রন্থকার। জন্ম—১১-১২ শতাব্দী। পিতা—হৃদয়ধর। কর্ম—কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী। গ্রন্থ—দানকল্পতরু, রাজধর্মকল্পতরু, ব্যবহার-কল্পতরু, কৃত্যকল্পতরু।

লক্ষ্মী দেবী—টীকাকর্ত্রী। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। স্বামী—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে। পুত্র—বালম্ভট্ট। টীকাগ্রন্থ—কালনির্ণয়, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া—সাহিত্যসেবী। জন্ম—অসমপ্রদেশ। ইনি কলিকাতা ঠাকুর বংশে বিবাহ করেন। চটুল রস রচনায় সিদ্ধ। সম্পাদক—বাঁহী (কলিকাতা, মাসিক, ১৯০৯)।

লক্ষ্মীনাথ শর্মা—অসমিয়া সাহিত্যিক। সম্পাদক—বিজুলী (নবপর্যায়, ১৯০২)।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী—কবি। কাব্যগ্রন্থ—ভীষণ ঝঞ্ঝা (১২৭১), সন্ন্যাসী (১৮৬৪), শকদুহিতা বা দুর্গোদ্ধার (উপ, ১৩০৬)।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—স্মার্ত পণ্ডিত। পিতা—গদাধর তর্কবাগীশ। কর্ম—সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (১৮২৪-১৮৩১), জজ পণ্ডিত, পূর্ণিয়া জেলা আদালত। গ্রন্থ—দায়াধিকারক্রমসঙ্গ্রহ-কৌমুদী (বঙ্গানুবাদ, ১৮২২), মিতাক্ষরাদর্পণ (১৮২৪), দায়তত্ত্ব (ঐ), ব্যবহারতত্ত্ব (১৮২৮), দায়ভাগ (১৮২৯), মিতাক্ষরা (১৮২৯), হিতোপদেশ (১২৩৭), ব্যবস্থা-রত্নমালা (১৮৩০), কবিকল্পদ্রুম (১৮৩০), কবিরহস্য (১৮৩০), ব্যবহার-বিচার শব্দাভিধান (১৮৩৮)। 'শাস্ত্র-প্রকাশ' (সাপ্তাহিক পত্র) প্রকাশক (১৮৩০ জুন), ইহাতে কেবলমাত্র শাস্ত্রালোচনা থাকিত)।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—নবদ্বীপের কাচকুলি গ্রামে। ছদ্মনাম—আমোদর শর্মা। এম-এ। অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। বিখ্যাত হাস্যরসিক ও লেখক। হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানলাভ। 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ (১৩২২)। গ্রন্থ—প্রেমের কথা, সাত নদী, ফোয়ারা, পাগলা ঝোরা, কাব্যসুধা, কপালকুণ্ডলা, ব্যাকরণ-বিভীষিকা, বানান-সমস্যা, সখী, অনুপ্রাস, ককারের অহঙ্কার (১৩২২), রসকরা, সাহারা, সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা, ছড়া ও গল্প (শিশু), আহ্লাদে আটখানা (শিশু)।

ললিতকৃষ্ণ ঘোষ—গ্রন্থকার। ১২৮৭ বঙ্গ ২৭এ ভাদ্র ময়মনসিংহ জেলায় বালীগাঁও কিশোরগঞ্জে। পিতা—কালীকৃষ্ণ ঘোষ। সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—পরিণয় (কবিতা), সাগরিকা (ঐ), মজা।

ললিতমোহন অধিকারী—অনুবাদক। গ্রন্থ—হ্যামলেট।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

ললিতমোহন কর—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। এম-এ, বি-এল। কাব্যতীর্থ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—অশোক অনুশাসন (অনুবাদ, চারুচন্দ্র বসু সহ)।

ললিতমোহন গুপ্ত—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—হিন্দুস্থান (দৈনিক, ১৩২৬-১৩৩০)।

[ক্রমশঃ।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

৫৩

আই-বি পুলিশের সঙ্গে জেল-পুলিশের তফাৎ অনেক। আই-বি পুলিশ প্রচ্ছন্ন, রহস্যময়, তাই অনেক সময় দুর্জ্ঞেয়, আর জেল-পুলিশ যেন সর্ব্বদাই দুপুরের রোদের মতো স্পষ্ট, অত্যন্ত বেশী প্রকট, তাই স্থূল। শত্রুপক্ষের দুর্গজয়ের সংকল্প নিয়ে আই-বি এগিয়ে আসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে, পেছনের দেয়ালে গিয়ে গুপ্তদ্বারের বোতাম খুঁজতে থাকে আর জেল-পুলিশের লরী আসে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ীর মতো ঘণ্টা বাজিয়ে, পথ কাঁপিয়ে, বুক কাঁপিয়ে, সিংহদ্বারের সমুখে এসে রুখে দাঁড়ায় সিংহের মতো। আই-বি অনেক সময় কিল চুরী করে কিল ফিরিয়ে দেবার জন্যই, কিন্তু জেলের ইতিহাসে এক পা পেছিয়ে যাবার অবমাননা নেই। জলের নীচে নীচে এসে আই-বি যখন হাঙ্গরের মতো টুক্ করে পা কেটে নিয়ে সরে পড়ে, মাথার ওপর তখন জেলের পুলিশ বজ্র হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। আই-বির গুপ্তচরেরা যখন মাটির নীচে নেমে চোরাবালি রচনা করে, জেলের অক্ষৌহিণী তখন পথের বাঁকে বাঁকে কাঁটা তারের বেড়া দেয়। আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখে আই-বি সাদা পোষাকের নীচে আর জেল-পুলিশের কাঁধে শোভা পায় মিলিটারী রাইফেল। ইঙ্গিতের মতোই আই-বি অস্পষ্ট, ভবিষ্যতের মতোই অজানা। আর জেলের পুলিশ নির্লজ্জ বন্য শূকরের মতো, লোহার শিকে শিকে তার পালিশহীন বুদ্ধির স্থূলতা!

অনেক বুদ্ধি ব্যয় করে আই-বি যখন পরামর্শ দিয়ে গেল আমায় সহ-আসামীদের থেকে পৃথক রাখতে, জেল-পুলিশের ভ্যানিটিতে তখন ঘা লাগলো। জেল-সুপার লিওনার্ড সাহেব তখন হোম-এ চলে গেছেন দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে, সুপার হয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট এস, এল, পাটনী। আর জেলার সুধীর মুখার্জ্জী। সে যুগে এই পাঞ্জাবী সুপারটি বেশ সুনাম কিনেছিলেন যেমন বৃটিশ প্রভুর কাছে, তেমনি বিপ্লবী কয়েদী ও রাজবন্দীদের কাছেও। জেলের কোনো বিধি লঙ্ঘন যেমন বরদাস্ত করতেন না তিনি, তেমনি নেপালী দারোয়ানের মতোও প্রভুভক্ত ছিলেন না। আমার সুবিধে হলো সেইখানেই।

রঙ্গলালের সঙ্গে তখন বার কয়েক পত্রের আদান-প্রদান হয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আদালতে যথাসময়ে ইঙ্গিত করলেই কালাচাঁদ ও সে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেবে। লেবং মামলায় দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুশীল চক্রবর্ত্তীও ছিল তখন চল্লিশ ডিগ্রীতে। তাকেও সংবাদ পাঠিয়েছি মৈনুদ্দীন মারফৎ; সেও সংবাদ পাঠিয়েছে, আমায় পর্য্যন্ত মামলায় জড়িয়ে ফেলায় আত্মগ্লানিতে রঙ্গলাল ও কালাচাঁদ মর্ম্মাহত। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে উন্মুখ তারা।

এমন সময় একদিন পাটনীকে নিবেদন করলাম যুক্তি দিয়ে যে, আমাদের মামলা যখন একই, তখন সব আসামীকেই এক জায়গায় রাখা উচিত। কারণ মামলা পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দরকার, কোথায় টাকা, কম টাকায় কোথায় পাওয়া যাবে ভালো আইনজীবী, রাজনৈতিক মামলায় কার অভিজ্ঞতা বেশী—এমনি আরও কত প্রশ্নের মীমাংসা করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাটনী বললেন, যুক্তি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ, মামলা এখনও সুরু হয়নি; দ্বিতীয়তঃ আই-বির হুকুম নেই।

চট্ করে প্রশ্ন করলাম: আই-বির হুকুম নেই, মানে? জেল-সুপার কি আই-বির হুকুমে ওঠে-বসে? জেলের মধ্যেও কি আই-বির রাজত্ব? এখানেও গ্র্যাসবি—

এবার পাঞ্জাবীর পৌরুষে ঘা পড়লো। বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও প্রভুভক্তিতে যিনি প্রায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ফেলেছেন, বাংলার কারা-সমূহের ইনস্‌পেক্টার-জেনারেলের গদীতে উপবেশনের জন্য যাঁর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে, একটি জেলার আই-বিদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করবার কাজ করতে হবে তাঁকে বোবা যন্ত্রের মতো? বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে, যেখানকার হিটলার তিনি!···ল্যাজে ঘা খেয়ে পৌরুষ তার অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করে উঠছিল অজগরের মতো, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, লোকটা যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদী মানেই কতকটা মাটির মানুষ, সজ্জন, অথচ দ্বিধাগ্রস্ত! তাই বাধা দিয়ে বললেন: না, না, জেলের মধ্যে গ্র্যাসবির হুকুম অচল। তোমার কথাও খুব যুক্তিপূর্ণ বটে। Let me see what can be done......

বেরিয়ে গেলেন পাটনী সদলবলে। কিন্তু হুজুরের মনোভাব আন্দাজেই আঁচ করে নিয়ে একদিন আদালতে নিয়ে যাবার সময় জেল-অফিসে আমাদের সবাইকেই এক জায়গায় জড়ো করা হলো এবং আশ্চর্য্য যে, একই কয়েদী গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হলো অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। এ নিয়ে-যাওয়া ও নিয়ে-আসা কিন্তু একেবারেই নিয়ম পালন ও আইন-রক্ষা। আমাদের গ্রেপ্তারের মূলে রয়েছে আই-বি। দুজনের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীনগর থানায়। এবার আইন মাফিক মামলা সাজানোর ভার থানার ওপর।

কিন্তু আমাদের এই মামলা সাজানো বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রায় দেড় বছর পূর্ব্বেকার ঘটনা। ফরিয়াদী, অর্থাৎ দেলভোগ হাটের গরুর ব্যাপারীরা থানায় ডায়েরী করিয়েছিল যে, জনকতক লুঙ্গি-পরা মুসলমান তাদের আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কাউকেও চিনতে পারেনি তারা। অকুস্থলে পুলিশ তদন্তে পাওয়া গিয়েছিল একখানা গরু চরাবার পাচনবাড়ি আর একখানা সবুজ রংয়ের পেষ্ট-বোর্ডে তৈরী ছোরার খাপ। থানার মালখানায় তা-ই যথারীতি জমা হয়ে গেল এবং ছ'মাস পর কোনো কিনারা করতে না পারায় অবশেষে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে যথারীতি সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শ্রীনগর থানার বড় বাবু দেলভোগের গণিকা-পাড়ায় সে রাত্রে যে এক দল বিদেশী এসে চম্পকরাণীর গৃহ আহারে, পানে, সংগীতে ও নৃত্যে সরগরম করে তুলেছিল, তাদেরকে হাজতে পুরে ও মাস দুয়েক পর ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করে ফেলেছিলেন। দেড় বছর পর শুধু দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে এক হাত দেখিয়ে দেবার জন্যই আই-বি কবর খুঁড়ে এই কংকাল বার করেছে। এবার তাতে মাংস দিয়ে, শিরা-উপশিরা মস্তিষ্ক দিয়ে, তার নিশ্চিহ্ন হৃদপিণ্ডে ধকধকানি জুড়ে দিয়ে মিশরের মমীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।···

অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, মিঃ জেঙ্কিন্‌স্। খাস বিলিতি সাহেব। হোম থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন বাংলা দেশের চপলমতি বালক-বালিকাদের সায়েস্তা করবার জন্ম। বালক-বালিকারা অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে অভদ্র বলে এবং যখন-তখন নেকড়ে বাঘের মতো শিকারীর স্কন্ধে লাফিয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় শক্ত লোহার জাল দিয়ে ঘেরা তাঁর এজলাস, ঘেরা আসামীর কাঠগড়া এবং সাক্ষীরও।

হুড়হুড় করে আমাদের দশ-বারো জনকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আসামীর খাঁচায়। আর উলটো দিকে সাক্ষীর জন্ম নির্দ্দিষ্ট কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। মামলা হবে না, তাই কক্ষে উকিল-মোক্তারের ভিড় নেই, আমাদের জন্ম কোনো উকিলও তখন দেয়া হয়নি। বাংলা দেশে এমনি রাজনৈতিক মামলা হামেসাই হয়ে থাকে, তাই আমাদের জন্ম বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও একে-একে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু কোথায় আমাদের প্রতিপক্ষ, শ্রীনগর থানার দারোগা খগেন রায়? খাঁচায় আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম এক পাল মেষের মতো, যেন পুরোহিত খগেন্দ্র রায় দেব-শর্ম্মা ফুল-বেলপাতা নিয়ে এসেই আমাদের স্কন্ধে রেখা এঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করে উৎসর্গ করে দেবেন বৃটিশ-মা কালীর পায়ে!...

জেঙ্কিন্‌স্ বার বার চাইছেন কোর্ট-ইনসপেক্টারের পানে, ইনসপেক্টার চাইছেন অবিনাশ দারোগার পানে আর অবিনাশ বার বার বারান্দায় এসে দৃষ্টিক্ষেপ করছেন পথের পানে—কোথায় শ্রীখগেন রায়?...আমরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। পূর্ব্ব-ব্যবস্থা মত রঙ্গলাল আমার পানে চাইলো, আমি ইসারায় বারণ করে দিলাম অর্থাৎ ওদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবার সময় এখনো আসেনি।

বেশ একটু পর ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন বহু প্রত্যাশিত খগেন রায়। বগলের কাগজপত্র ও ফাইলগুলো ঝপ করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে দু'খানা ঝপাৎ করে মেঝেয় পড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে চাইবার তাঁর অবসর কোথায়? এবার চাণক্যের সম্মুখে হাজির করা হয়েছে বৃটিশরাজের শ্যালক বাচাল খগেন রায়কে। স্তার স্তার করে তোতলাতে-তোতলাতে কম্পিত কলেবরে তিনি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর যা নিবেদন করলেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, প্রায় শেষ করে এনেছেন তদন্ত, আর দু'-তিন সপ্তাহ সময় পেলেই তিনি অভিযোগ-পত্র পেশ করবেন চুরি, ডাকাতি, ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা সংক্রান্ত বাছা-বাছা ধারা অনুযায়ী। অতএব—

অকস্মাৎ আমি সহাস্তে নিবেদন করলাম ম্যাজিষ্ট্রেটকে: জামিন অবশ্য আমরা চাই না, কারণ জেলের মধ্যে ভালই আছি। আই-বি টিকটিকিদের উৎপাত নেই। কিন্তু শ্রীনগরের মতো বিখ্যাত থানার ভারপ্রাপ্ত ততোধিক বিখ্যাত দারোগা খগেন রায় কি জানেন না যে, আদালতে আসতে হলে মাথার টুপীটাও সোজা করে পরে আসতে হয়, নইলে হয় আদালতের অবমাননা—

খগেন রায় ঝটিতি টুপীটা ঘুরিয়ে পরে ফেললেন, সহ-আসামীরা সবাই হেসে উঠলো, অবিনাশ দারোগা হাসি চাপতে না পেরে বারান্দায় পালিয়ে গেলেন, স্বয়ং বিচারক জেঙ্কিন্‌সের মুখমণ্ডলের প্রস্তর-ফলকে হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

কয়েদী-গাড়ীতে জেলে ফিরে আসবার সময় হলো আলোচনা। মনোমালিন্ম সুরু হয় রঙ্গলালের সঙ্গে ছোট কোনের। আমি মেদিনীপুর চলে যাবার পর সর্ব্বকার্য্যের নেতৃত্ব থাকবে কার হাতে, তাই নিয়ে হলো মতভেদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিপ্লবী দলে প্রস্তাব পাশ করে নেতার নির্ব্বাচন হয় না। মনোনয়নের সুযোগ নেই সেখানে। সুকঠিন কাজের মধ্য দিয়ে সেখানে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, নেতা সৃষ্টি হয়। এরা ছেলেমানুষ। তাই ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ক্রমে ক্রমে তা এমনি তীব্র হয়ে দাঁড়ালো যে, একে অপরকে যে কোনো প্রকারে জব্দ করবার ফিকির খুঁজতে লাগলো। এক দলের নেতা রঙ্গলাল, আর এক দলের মুখপাত্র ছোট কোনে অর্থাৎ বিপদভঞ্জন। দলে ভারী বিপদভঞ্জনের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে রঙ্গলাল ঢাকায় এসে দেখা করলো আই-বি ইনসপেক্টার বিভূতি সাহার সঙ্গে। পাইথন যেমন করে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ছাগশিশুকে, তেমনি করে বিভূতি সাহা লুফে নিল রঙ্গলালকে ও ক্রমে ক্রমে একেবারে গ্রাস করে ফেললো তাকে। কালাচাঁদ এসে রঙ্গলালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নেহাৎ পুলিশের মারের চোটে আর গ্র্যাসবি সাহেব প্রদত্ত আর্থিক প্রতিশ্রুতির লোভে।

উল্টো-পাল্টা অনেক কথাই বলেছে ওরা দু'জন। তাই গ্রেপ্তারও হয়েছে জন দশ-বারো। তার মধ্যে সুবোধ চক্রবর্ত্তীও আছে, নেপালও আছে, মনীন্দ্রও আছে, আর আছে আমাদের গ্রামের ক'জন।

কিন্তু দু'জনের কেউ ভাবতেই পারেনি যে, আই-বি আমাকেও ফিরিয়ে এনে এদের দলে ভিড়িয়ে দেবে এবং শুধু ভিড়িয়ে দেবে নয়, পুরোভাগে এগিয়ে দেবে। আমি আসাতেই এদের টনক নড়ে গেছে। আমায় জেল থেকে রক্ষা করবার জন্ম এরা এখন যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বলে সবাই একবাক্যে ঘোষণা করলো।

আমাদের প্রত্যেকের পরিবারে সাড়া পড়ে গেছে। জেলে গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে রয়েছি আমরা, আর জেলের বাহিরে থেকে তাঁদের নিদ্রা নেই, আহার নেই। দুশ্চিন্তায় তাঁরা যে একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছেন!...

একদিন ফুলদা এসে দেখা করে জানিয়ে গেলেন যে, উকিল রজনী দাস আমাদের পক্ষে দাঁড়াবেন আর যদি ঢাকাতেই মামলা সুরু হয়, তাহলে স্বয়ং শ্রীশ চাটার্জ্জীকে পাওয়া যাবে। মুন্সীগঞ্জে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। রজনী দাস আমার সঙ্গে একদিন দেখা করে গেলেন। আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আই-বি উপস্থিত থাকবার নিয়ম নেই। রাজসাক্ষী দুজনই যে তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবে, এই সুসংবাদ শুনে বললেন: আপনি যদি তাই করে দিতে পারেন দ্বিজেন বাবু, তাহলে মামলা আমি তচনচ করে দোবই।

প্রশ্ন করলাম: ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি কি আইনতঃ প্রত্যাহার করা যায়?

জবাব দিলেন রজনী দাস: দ্বিজেন বাবু, সারা জীবন আইনের বই ঘেঁটে-ঘেঁটে হাতে কড়া পড়ে গেছে। দেশবন্ধুর তামাক সাজা কি বৃথাই যাবে?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম তামাক অবশ্য উনি সেজে দেননি, তথাপি তাঁর জুনিয়র হিসেবে অনেকগুলো রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেছেন রজনী দাস। চেহারা একেবারেই বিশ্রি। যেমন কালো রং, তেমনি বেঁটে ও রোগা। কিন্তু চশমার ওপর দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়েই সাপের মতো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকান সাক্ষীর চোখের পানে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠের যুক্তিপূর্ণ সওয়াল আদালত-কক্ষের দেয়ালে ঘা খেয়ে-খেয়ে বিচারকের মনেও প্রতিধ্বনি তোলে। ঢাকা শহরের নামজাদা উকিল রজনী দাস।

সুবিধে হলো। পাটনীকে আবার একদিন ধরে বসলাম: স্যার, আমাদের মামলা পরিচালনার জন্ম উকিল নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সবাই এক জায়গায় বসে পরামর্শ না করে নিলে সাফাইয়ের যুক্তি খাড়া করা যাবে কী ভাবে? আমাদের আইনগত অধিকার—

এবার পাটনী জল হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকে পাগলা গারদের একটি বৃহৎ কক্ষে একসঙ্গে রাখবার হুকুম দিয়ে গেলেন।

৪০ ডিগ্রি থেকে দূরে সরে এলাম বটে, কিন্তু পেলাম সবাই একসঙ্গে থাকবার সুযোগ। তখন শীতকাল। বোধ হয় ডিসেম্বর মাস। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চমৎকার ওলকপির ক্ষেত, দূরে আলুর। এতে জল দেবার ব্যবস্থাটি ভারী সুন্দর। গাছের সারির পাশ দিয়ে-দিয়ে এমনি ভাবে নালি কাটা আছে যে, জল কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে না, ঐ নালি দিয়ে বয়ে চলে। একটি সারি জলসিক্ত হয়ে যাবার পর তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে অপরটির খুলে দেয়া হয়। বিরাটাকার ওলকপি। অথচ তা কয়েদীদের খাবার জন্ম তোলা হয় না, তোলা হয় বাইরের বাজারে বিক্রয়ের জন্ম।

ভালোই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল; ভবিষ্যৎ একেবারে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ছেলেদের বৈপ্লবিক নীতি শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট জেঙ্কিন্সের আদালতে আর একদিনের ঘটনা বলছি।—

সেদিনও দু'দিকের খাঁচায় আমাদের ঢুকিয়ে দেয়া হলো। অবিনাশ দারোগা সহাস্যে এগিয়ে এসে মিঠে সুরে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যথারীতি খগেন রায় দেরীতে এসে প্রবেশ করলেন হন্তদন্ত হয়ে, সবিনয়ে জানালেন যে, এবার স্যার তদন্ত শেষ করে ফেলেছি। শুধু মামলাটা যাতে মুন্সীগঞ্জে হয়, তার অনুমতির জন্ম লেখা হয়েছে সরকারকে। সেটা এসে গেলেই স্যার—নইলে মামলা আমার রেডি স্যার···

জেঙ্কিন্স্ ভ্রূকুঞ্চিত করে মন্তব্য করলেন: But it is more than three months—

হাঁ স্যার, হাঁ স্যার, তা স্যার, তা স্যার করে যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে

ছাগশিশুর মতো চিঁ চিঁ করে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন খগেন রায়: আর স্যার এক উইক, তার মধ্যেই আমি স্যার—

এমন সময় রঙ্গলাল আমার দিকে চাইতেই আমি ইসারায় জানিয়ে দিলাম যে, এখনো প্রত্যাহারের সময় আসেনি। কিন্তু রঙ্গলাল নিশ্চয়ই ভুল বুঝে ফেললো। একটু পর সে অকস্মাৎ জেঙ্কিন্‌স্‌কে বললো যে, তার কিছু বলবার আছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন জেঙ্কিন্‌স্: Yes!

রঙ্গলাল বললো: I want to speak in your chamber.

Gladly!—বলে জেঙ্কিন্‌স্ উঠে পড়লেন। আমিও প্রাণপণে ইসারা করে জানাতে চেষ্টা করলাম, এখনও নয়, এখনও নয়। দেখলাম, রঙ্গলাল বুঝতে পেরেছে এবং মৃদু হাস্যে অভয় দিচ্ছে। নিশ্চিন্ত হলাম। রঙ্গলালকে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস-কামরায় নিয়ে গেল, আমাদের নিয়ে এল বারান্দায়।

বাইরে এসেই একেবারে মা'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। হ্যাঁ মা, স্বয়ং মা, আমার মা, আমার দুঃখিনী মা! আমাদের সবার মা!

একে একে সবাই দু'হাতে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরলেন মা জাপ টে একেবারে বুকের সঙ্গে, ব্যথা-জর্জ্জর পঞ্জরের সঙ্গে···তার পর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আজও স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে তাঁর সেই শোকাকুল অন্তরাত্মার আর্ত্তনাদ। একে একে জড়িয়ে ধরছেন সবাইকে আর ক্রন্দন-ভাঙ্গা স্বরে বলছেন: কত বার বারণ করেছি তোদের, কত বার সাবধান করে দিয়েছি এসব কাজে যাসনি, যাসনি। শুনিস্‌নি আমার কথা, শুনিস্‌নি মা-বাবার কথা। এখন কী করবো বলতে পারিস? বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো কি? কিন্তু তবুও তো বাঁচানো যাবে না তোদের!

নেপাল আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট ও পাড়ার সবার চাইতে বড়লোক পিতার কনিষ্ঠ ও আদুরে পুত্র। তাকে বুকে টেনে নিয়ে মা বলে উঠলেন: এতটুকু ছেলে, সেদিনও তোকে প্যাণ্ট পরে থাকতে দেখেছি রে, তুইও এই দলে মিশেছিস্?

বিপদভঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন: বল্ তো, কী বলে প্রবোধ দোব তোর মাকে? কী বলে বোঝাবো? আমি ফিরে গেলেই তো সব মায়েরা এসে জিজ্ঞেস করবেন, কেমন দেখলেন ওদের, দিদি! কী বলবো তাঁদের? কী জবাব দোব!—ইস্, কী কালো হয়ে গেছিল! কতখানি শুকিয়ে গেছিস্!—কেন রে, দুনিয়ায় আর কি ছেলে ছিল না?

এগিয়ে এলাম আমি। মা আবার আমায় জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে বললেন: এই হারাম-জাদাই যত অনিষ্টের গোড়া। তুই-ই নষ্ট করেছিস্ সবাইকে—

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলাম প্রাণপণে: জানো না মা, জেলের মধ্যে খুব ভালো আছি আমরা। একসঙ্গে খাই, একই ঘরে গদী-আঁটা খাটে শুই; রীতিমত ভালো খাওয়া, রোজ মাছ আর মাঝে মাঝে মাংস। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, খালি বই পড়ি আর গান করি। সবার মাকেই বলে দিও তুমি যে, আমরা ভালো আছি, বেশ ভালো। ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মামলার কথা যা বললে না, তাহলে শোন—

কিন্তু আর শোনানো হলো না। ঠিক এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস্-কামরা থেকে বেরিয়ে এল রঙ্গলাল আর কালাচাঁদ। অভিভূত মা যেন এদের দু'জনকে ভুলেই ছিলেন এতক্ষণ। এবার ছুটে এগিয়ে গেলেন এবং ওদেরকে ধরে প্রথমেই অত্যন্ত বেয়াড়া একটা প্রশ্ন করে বসলেন: তোরা দু'জন আবার আলাদা কেন রে?

দেখলাম, লজ্জায় ও ঘৃণায় রঙ্গলালের ফর্সা মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠেছে। অসহ্য আবেগে কাঁপছে তার নিশ্চুপ অধর, চোখ তুলে মা'র পানে চাইতে পারছে না সে।···আবার এগিয়ে গেলাম আমি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, বললাম: ওরা দু'জন ভুল করে ফেলেছিল, পুলিশকে বলে দিয়েছিল কিছু কথা। কিন্তু মা, সে জন্য ভেবো না তুমি, ওরা কথা প্রত্যাহার করবে বলে কথা দিয়েছে—

রাজসাক্ষীদের দু'জনকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। মাকে ঘিরে ছেলেরা সব দাঁড়িয়েছিলাম, অকস্মাৎ শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ যাঁকে একেবারেই লক্ষ্য করিনি, লক্ষ্য করবার ফুরসৎই পাওয়া যায়নি, তিনি হচ্ছেন আমার দূর-সম্পর্কীয় কাকা মণিমোহন চক্রবর্তী। সেই সুহাসিনীর বাবা মণিমোহন কাকা। ঢাকা শহরের স্বনামধন্য মোক্তার এম, চক্রবর্ত্তী। আইনের অনেকগুলো দুর্ব্বোধ্য ধারা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে ঘড়্-ঘড় করে তিনি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই যে, আই-বির দুয়ারে একবার ধর্ণা দিয়ে যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন তিনি মাকে নিয়ে সোজা এসে হাজির হলেন একেবারে জেঙ্কিন্‌স্ সাহেবের আদালতে। এখানে ইণ্টারভিউ এ্যালাউ করার কর্ত্তা আই-বি নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট। অমুক ধারার অমুক উপধারার খ অধ্যায়ে বর্ণিত আইনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলাম, মণিমোহন কাকা একটা বীরত্বের কাজ করে ফেলেছেন। আইনের জ্ঞান তাঁর কত গভীর, সে ধারণা আমার পূর্ব্বেও তেমন ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু তাঁর ছেদ ও যতিহীন অনর্গল বক্তৃতার মধ্য দিয়ে একটি স্বচ্ছ দরদী অন্তরের পরিচয় পেলাম। কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে।···

তার পর এলো বিদায়ের পালা। বারান্দার অপর প্রান্তে অবিনাশ দারোগার পুনরাবির্ভাব হওয়ায় বোঝা গেল আমাদের সময় উত্তীর্ণ। অতএব—

অতএব মণিমোহন কাকার পশ্চাতে মা চলে গেলেন। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো আমরাও এসে উঠলাম ঢাকা, অন্ধকার কয়েদী-গাড়ীতে। পাশাপাশি বসলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালা পড়লো। মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, গাড়ী চলছে।

চলছে তো, চলছেই। পটুয়াটুলী, বাবুর বাজার, ইসলামপুর অতিক্রম করে চক-বাজারের কাছাকাছি আসতেই ঝাঁকুনি লাগছে। রাস্তা খারাপ। একটু পরই তো জেলের ফটক। এতখানি পথ অতিক্রম করে এলাম একেবারে নীরবে। অনেক কথা বলেছি অন্য দিন, অনেক হেসেছি। আজ আর কেউ কথা কইলো না। কইতে পারলো না বুঝি। গলা বেয়ে কী যেন একটা ঠেলে ওপরে উঠছিল, বার বার চোখের কোণটা ভিজে-ভিজে উঠছিল···

—জেলের ফটক খুলে গেল। এবার নামতে হবে।

[ক্রমশঃ।
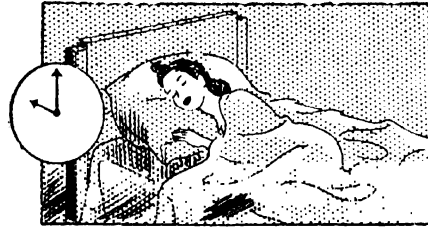
ইংরেজী
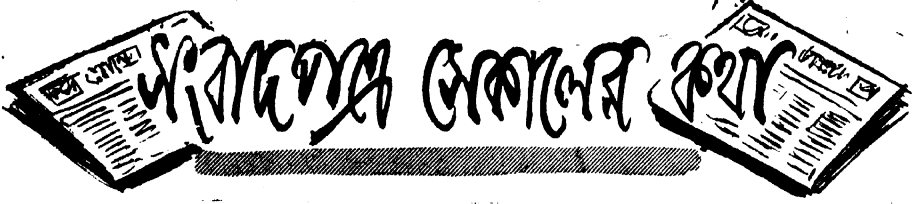
সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

সরকারী দপ্তরে দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ

সিভিল ফাইন্যান্স কমিটি গভর্ণমেন্টের কয়েকটি বিভাগে দেশীয় কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করায় কলকাতার কোন কোন মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অল্প দিন পূর্বে এঁরাই সরকারী কার্যে দেশীয় কর্মচারী নিয়োগের নীতিকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রচার করেছেন। এখন তাঁরা আবার প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন যে, সরকারী দপ্তরে দেশীয় কর্মচারী গ্রহণ করা অনুচিত এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবের পরিচায়ক।

'বেঙ্গল ক্রনিক্‌ল' কাগজে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত চাকুরীগুলির জন্য ভারতীয়দের যোগ্যতা নেই; এবং নতুন নীতি প্রবর্তিত হলে মিথ্যা মিতব্যয়িতার নামে উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিসর্জন দেওয়া হবে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ থেকে দেখা যাবে যে, এক জাতীয় লেখকরা কোনো বিষয়ের দু'দিকই সমান ভাবে সমর্থন করতে পারেন।

"য়ুরোপীয় কর্মচারীর স্থলে দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত করলে টাকা বাঁচবে, এ ধারণা ভুল। ভারতীয় কর্মচারীদের মাইনের হার কম হলেও শেষ পর্যন্ত লাভ হবে না; কারণ, তাদের দীর্ঘসূত্রতা কর্তব্য-সম্পাদনে বিলম্ব ঘটাবে। য়ুরোপীয় কর্মীদের যে দৈহিক শক্তি ও উদ্যম আছে, ভারতীয়দের তা নেই। এটা শুধু তাদের প্রকৃতিগত আলস্যের জন্যই নয়, নৈতিক দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতাও এর কারণ। সকলের কাছ থেকেই এ-দেশীয় কর্মীদের ঢিলে স্বভাব সম্বন্ধে অভিযোগ শোনা যায়। তা ছাড়া পাপ স্কালনের এমন সহজ উপায় হিন্দুধর্মে রয়েছে যে, নগদ লাভের প্রলোভন দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং বিধি-নিষেধ তুলে দিলে এদের সহজাত প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠবে এবং কম বেতন দিয়ে যে সামান্য টাকা বাঁচবে তা দুর্নীতির বন্যায় ভেসে যাবে। দেশীয় কর্মচারীরা অধীনস্থ সহায়কারী হিসেবে ভালো কাজ করতে পারে। সিপাহীরা য়ুরোপীয় অফিসারদের নির্দেশ ব্যতীত যেমন শৌর্য প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি দেশীয় কর্মীরা অ্যাকাউন্টস্‌ বিভাগ স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করতে পারবে না। নিয়ম-কানুন জানে না ব'লে এরা হিসেব-পত্র এমন এলোমেলো করে রাখে যে তা পুনঃ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

"সওদাগরী আপিসের লক্ষ্য থাকে সবচেয়ে অল্প বেতনে কর্মী নিয়োগ করা। অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ চলা চাই। ভারতীয় কর্মীদের বেতন কম; সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, তাদের নিযুক্ত করলে টাকা বাঁচবে। কিন্তু দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে টাকা বাঁচে য়ুরোপীয়ান অফিসার থাকলে। সরকারী দপ্তরেও যে সব বিভাগে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক য়ুরোপীয়ান আছে, তাদের দক্ষতা বেশী এবং মোট ব্যয়ও কম। কিন্তু যেখানে দেশীয় কর্মীদের প্রাধান্য, সেখানে কাজ হয় অল্প এবং তাদের মোট বেতনের সঙ্গে তুলনায় কাজের পরিমাণ আশানুরূপ নয়।

"টাকা-পয়সার লেন-দেন একমাত্র ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে দেওয়া বিপজ্জনক। তহবিল তছরুপের ঘটনা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সকল ক্ষেত্রেই দেশীয় লোকদের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে; এদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তেমন দৃষ্টান্ত এতই বিরল যে, তা খুঁজে বের করতে কষ্টসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন।

"লবণ বিভাগের তহবিল তছরুপের দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণ হয় কি পরিমাণ বিশ্বাস এদের করা যায়। নিদ্রায় ও জাগরণে এদের একমাত্র ধ্যান হলো অর্থ উপার্জন এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি করা। মানুষ তার সকল শক্তি একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করলে প্রার্থিত বস্তু লাভের প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা পায়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষুদ্রতম সুযোগও তারা ত্যাগ করে না।"

—এশিয়াটিক জার্ণাল।

মানহানির দায়ে 'বেঙ্গল হেরাল্ড'

গত ১৫ই অগাষ্ট 'বেঙ্গল হেরাল্ডের' স্বত্বাধিকারী রবার্ট মণ্টগোমেরি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, এবং নীলরতন হালদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার বিচার হয়েছে। "কুক বনাম প্যাটল" মোকদ্দমার প্রসিকিউটরের চরিত্র সম্পর্কে 'বেঙ্গল হেরাল্ডে' সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। বিচার আরম্ভ হবার পূর্বে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও নীলরতন হালদার নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রথমে নির্দোষ বলে যে আর্জি পেশ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহারের প্রার্থনা জানান। আদালত তা মঞ্জুর করেন। বিচারে মিঃ মার্টিনকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অন্যান্য আসামীদের এক টাকা করে জরিমানা হয়েছে।"

—এশিয়াটিক জার্ণাল।

সংবাদপত্রের মাশুল

সংবাদপত্রের মাশুল শীগগিরই পরিবর্তিত হবে, এবং এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে। এখন দূরত্ব কম-বেশীর উপর মাশুলের হার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু এর পর থেকে তিন সিক্কা তোলা ওজনের পত্রিকার জন্য দুটি নির্দিষ্ট হার থাকবে,—চার আনা ও দু'আনা। যে সব কাগজের ওজন তিন তোলার অধিক, তাদেরও সস্তা মাশুলের সুযোগ পাওয়া উচিত। —কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট গেজেট, ৫ই অক্টোবর।

দুর্গা পূজা

দেবী দুর্গার পৃথিবীতে আগমন উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, তা গত বৃহস্পতিবার সমাপ্ত হয়েছে। দুর্গা যে কে তা সঠিকরূপে বলা অসম্ভব। বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিতা এবং তাঁর কর্তব্যও নানা প্রকারের। তিনি শিবের স্ত্রী। তাঁর দশ হাত এবং প্রত্যেকটি হাতে নানা প্রকার অস্ত্র। তাঁর এক পাশে লক্ষ্মী, অন্য পাশে সরস্বতী। এবং তাঁর ময়ূরবাহন পুত্র কার্তিক ও গণেশও দু'পাশে রয়েছেন। দুর্গার পায়ের তলায় গাঢ় নীল রঙের এক দস্যুর মূর্তি। আর আছে তাঁর বাহন সিংহ।

দেশীয় লোকরা যতই জ্ঞান লাভ করছে অথবা যত দরিদ্র হচ্ছে, ততই দুর্গা পূজার জাঁকজমক হ্রাস পাচ্ছে। লক্ষ টাকার অঙ্কটা নেমেছে হাজার টাকায়; হিন্দুর ধর্ম অথবা অর্থসম্বল হিমাঙ্কে এসে পৌঁছেছে। মল্লিকদের বাড়ী সোনার দুর্গা পূজা করা হয়। মল্লিক-পরিবারের কর্তাদের মধ্যে বত্রিশ বছর পর পূজার পালা পড়ে। সুতরাং যাদের বার্ষিক পূজা করতে হয়, তাদের চেয়ে মল্লিক-বাড়ীর পূজায় অনেক বেশি জাঁকজমক হয়। এক বছর কি দু'বছর আগে গুরুচরণ মল্লিক পূজায় লাখ টাকার উপরে ব্যয় করেছিলেন। এই টাকার অধিকাংশই ব্যয় করা হয়েছে ব্রাহ্মণ-ভোজনে এবং ব্রাহ্মণদের ধুতি ও শাল দান করতে। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধনীরা সাধারণতঃ প্রতি বৎসর পূজার জন্য দশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করে না। য়ুরোপীয়ানরা প্রধানত গোপীমোহন দেব, রাজকিষেণ সিং, রাজা শিবকিষেণ এবং রাজা রাজনারায়ণের বাড়ী পূজা দেখতে যায়। সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় শোভাবাজারে গোপীমোহন বাবুর বাড়ীতে। তাঁর পুত্র বাবু রাধাকান্ত দেব সুশিক্ষিত ও খুব ভদ্র। বাবু রাজকিষেণ সর্বক্ষণ অতিথিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন; এবং তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় নবীনকিষেণ ও শ্রীকিষেণ সিং ও বারো-তেরো বছরের চৌকস পুত্র মহেশচন্দ্র পরিবারের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সর্বদাই অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। এঁদের ব্যবহারে ভারতীয় সৌজন্য এবং য়ুরোপীয় আচার-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। পরিবারের তরুণরা সুশিক্ষিত এবং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। তারা অতিথির সন্তোষবিধানে ব্যগ্র।

—ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট, ১১ই অক্টোবর।

২

বড়লাট বাহাদুর এবং প্রধান সেনাপতি পূজা দেখতে যাবেন বলে মহারাজা শিবকিষেণ ও কালিকিষেণ বাহাদুরের এবং বাবু গোপীমোহন দেবের সুদৃশ্য প্রাসাদ গত বুধবার রাত্রিতে চমৎকাররূপে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাজা শিবকিষেণ, কালিকিষেণ এবং অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের অনুচরবর্গ সহ লর্ড কম্বারমীয়ারকে অভ্যর্থনা করবার গৌরব লাভ করেন। একটু পরে অনুচর সহ এলেন লর্ড ও লেডী বেণ্টিঙ্ক; তাঁরা আসতেই 'গড সেভ দি কিং' সংগীত শুরু হলো: নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে সোনার সোফায় লাট বাহাদুর এবং তদীয় পত্নী আসন গ্রহণ করলেন। বড়লাট যে অনুকম্পা পূর্বক তাঁর বাড়ী পদার্পণ করেছেন, এ জন্য রাজা কালিকিষেণের আনন্দের সীমা ছিল না। নাচ দেখে বড়লাট ও লাটপত্নী বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। এমন আনন্দদায়ক ও জমকালো দৃশ্য পূর্বে দেখা যায়নি। পূর্বে কেউ ভাবতে পারেনি যে, দেশের শাসকরা দয়া করে এ সব উৎসবে উপস্থিত হয়ে উৎসাহ দেবেন। বড়লাট ও তাঁর সহধর্মিণীর সহানুভূতির জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা গান শুনে এবং অসি খেলা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তার পর কৌতূহলের সঙ্গে দেখলেন দেবীর প্রতিমা। এক ঘণ্টা থাকবার পর সদলবলে লাট বাহাদুর গেলেন বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়ী। সেখানেও সর্বপ্রথম দুর্গা প্রতিমা দর্শন করবার পর বাবু রাধাকান্ত দেব সকলকে উপর-তলায় নিয়ে সসম্মানে আপ্যায়ন করলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে সম্মানিত অতিথিরা বিদায় গ্রহণ করেন।

—বেঙ্গল হরকরু, ১২ই অক্টোবর।

৩

দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর যে নাচের আসর বসে, তাতে য়ুরোপীয়ান এবং খৃষ্টানদের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে প্রায়ই আলোচনা শোনা যায়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজের ইচ্ছা ও মত অনুসারে যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু সাধারণ মত এই যে, শুধু দর্শক হিসেবে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই। আবার কেউ কেউ এই সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, নাচের আসরে না যাওয়াই ভালো। কারণটা ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। —গভর্ণমেণ্ট গেজেট, ৫ই অক্টোবর।

৪

প্রায়ই শোনা যায় যে, দুর্গা পূজায় উৎসাহ এবং আড়ম্বর প্রতি বৎসরই ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। পূর্বের মতো য়ুরোপীয়ানরাও আজকাল অধিক সংখ্যায় পূজায় যোগ দেয় না। আমাদের গত চার-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, উপরোক্ত মন্তব্য সত্য; দুর্গা দেবীর সুদিন আর নেই। সম্ভবতঃ এদেশের ভদ্রলোকেরা বুঝতে পেরেছেন যে, মিথ্যা আড়ম্বরে টাকা ওড়ানো মূর্খামি ছাড়া কিছু নয়। আবার অনেকেরই হয়তো পূর্বে থাকলেও এখন আর ওড়াবার মতো টাকা নেই। আর এ কথা স্বীকার করতে হবে যে নাচের আসর সম্বন্ধে দুর্নামও রটেছে। গত কয়েক বছর ধরে এ সব জায়গায় অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার ঘটেছে; দর্শকরা সকলেই ভদ্র নয়, এবং এরা মজলিসের উপযুক্ত ধীরতার পরিচয় দিতে পারেনি। এই সব কারণে নাচের সঙ্গে দুর্নাম যুক্ত হয়েছে। এবারকার পূজার কথা সংবাদপত্রে হয়তো একেবারেই আলোচিত হতো না যদি লর্ড ও লেডী বেণ্টিঙ্ক এবং লর্ড কম্বারমীয়ার পূজা দেখতে না যেতেন। সমাজের এই শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মহারাজা শিবকিষেণ এবং গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে নাচের আসরে উপস্থিত হয়ে ভারতীয়

সমাজের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, পূর্বে তা কখনো হয়নি। চিনসুরার হালদার-পরিবার বরাবরের মতোই জাঁকজমকপূর্ণ নাচের আয়োজন করেছিল। এই পরিবারের এক জন জালিয়াতির অপরাধে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, এক রাত্রিতে সুপ্রীম কোর্টের তিন জন বিচারপতি সেখানে সস্ত্রীক নাচ দেখতে গিয়েছিলেন।

—ক্যালকাটা জন বুল, ১৩ই অক্টোবর।

এক আনা ডাকঘর

গত ১৫ই জুন কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে এক আনা ডাকঘরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই ডাকঘরের উদ্ভাবক এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ ডি, ক্লার্ক তাঁর পরিকল্পনা ও নিয়মাবলী প্রকাশ করেছেন।

রবিবার ব্যতীত সহরের সীমানার মধ্যে ডাক বিলি ও গ্রহণ করা হবে দিনে তিন বার:—সকাল ন'টা, বারোটা এবং অপরাহ্ন তিনটায়। সহরের বাইরে নিম্নলিখিত স্থানে সকালে দশটা এবং অপরাহ্ন চারটায় দু'বার ডাক বিলি ও ডাকের জন্য চিঠিপত্র গ্রহণ করা হবে: কাশীপুর; চৌৎপুর; মির্জাপুর; বেলিয়াঘাটা; ইণ্টালী; বালিগঞ্জ; ভবানীপুর; টালিগঞ্জ; ফোর্ট উইলিয়াম; কুলি বাজার; আলিপুর; খিদিরপুর; গার্ডেন রীচ; বিভার; হাওড়া ও সালকিয়া।

ডাক-পিয়ন তার নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করে ঘণ্টা-ধ্বনি দ্বারা নিজের আগমন বার্তা জানিয়ে দেবে এবং আধ ঘণ্টা যাবৎ এরূপ ঘণ্টা বাজাতে থাকবে। এই সময়ের মধ্যে ডাক বিলি করা এবং ডাকের জন্য চিঠি সংগ্রহ করা শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

আপিস কিংবা পিয়ন মাশুল ছাড়া চিঠিপত্র কিংবা পার্শ্বেল গ্রহণ করবে না।

তিন সিক্কার অধিক ওজনের পার্শ্বেলের মাশুল দিতে হবে দু' আনা, অর্থাৎ সাধারণ মাশুলের দ্বিগুণ। ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক হারে মাশুল বৃদ্ধি পাবে।

নগদ টাকা, সোনা, রূপা অথবা অন্য কোন মূল্যবান জিনিস চিঠির সঙ্গে দিলে আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কিংবা পিয়নকে তা জানিয়ে দিতে হবে। ডাক মারফৎ প্রেরিত কোন জিনিস হারালে ডাকঘর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

কেউ যাতে অসদুদ্দেশ্যে ডাকঘর থেকে চিঠি নিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য কোন কারণেই একবার ডাকে দেওয়া চিঠি ফিরিয়ে না দিতে পিয়নদের উপর কঠোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাপক চিঠি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে প্রেরকের নিকট বিনা মাশুলে চিঠি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পত্র-লেখকের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করতে না পারলে কলকাতার কোন একটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। লেখক বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি ফেরৎ চাইলে মাশুল নিয়ে চিঠি দিয়ে দেওয়া হবে। এই মাশুল নেওয়া হবে বিজ্ঞাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

পিয়নদের মধ্যে দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য প্রত্যেক চিঠির উপরে ডাকঘরের মোহর দেওয়া হবে। কেউ যদি মোহর ছাড়া চিঠি পান, তাহ'লে দয়া করে স্বত্বাধিকারীকে জানাবেন।

—এশিয়াটিক জার্ণাল।

দুর্নীতির অভিযোগ

একটি চরমপন্থী কাগজে "অনুসন্ধানী পল" ছদ্মনামধারী এক লেখকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় চিঠি কোন দেশীয় ব্যক্তির লেখা। এই চিঠিতে একজন রেভিনিউ কমিশনারের বিরুদ্ধে জোর করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ এই যে, সরকার বার্ষিক ছ'হাজার টাকা ভ্রমণ-ভাতা দেওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কমিশনার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে ভ্রমণের ব্যয় আদায় করেন। পত্র-লেখক প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করেছেন: কমিশনারের সফরের জন্য একটি পানসির প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কোন এক রাজার নিকট পানসি চেয়ে পাঠান। এই রাজা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, গভর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ষাট হাজার টাকা কর দেন। রাজা সৌজন্য সহকারে পানসি দিতে অক্ষমতা জানান। পানসির জন্য কমিশনারের কাছ থেকে দ্বিতীয় বার তাগিদ এল। রাজা বর্ষাকালে পানসিতে থাকেন, সুতরাং পানসি দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কমিশনারের ইচ্ছা পূরণ না করলে তাঁর ক্রোধভাজন হতে হয়, এ কথা সর্বজন-বিদিত। সুতরাং দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যানের পরিণাম মঙ্গলজনক হবে না এই আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানসি দিতে হলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; কমিশনার দাবী করলেন রাজাকে নিজ ব্যয়ে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এবারও রাজা পরিণামের আশঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হলেন না।

উপরোক্ত বিবরণ নিজামত আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোর্ট আদালতের রেজিষ্ট্রারকে সম্পাদকের নিকট হতে পত্রলেখকের নাম, ধাম ও সংশ্লিষ্ট কমিশনারের পরিচয় জানবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বিবরণ সংগৃহীত হলে কোর্ট এ বিষয়ে তদন্ত করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, কমিশনার দোষী বলে প্রমাণিত হলে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। যদি তা সত্য না হয়, তাহ'লে পত্র-লেখক এবং সম্পাদককে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য তেমনি কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই আমাদের নিকট অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। কারণ সংবাদপত্রটি (বেঙ্গল হরকরু) ভুল সংবাদ পরিবেশনের জন্য কুখ্যাত।

—এশিয়াটিক জার্ণাল।

স্ত্রী-শিক্ষা

কলকাতার ব্যাপ্‌টিষ্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটির অষ্টম বার্ষিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সোসাইটির কমিটি এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার দু'-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা থেকে দেখা যাবে যে, স্ত্রী-শিক্ষার কাজ প্রকৃতই অগ্রসর হয়েছে। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন ব্যাপারটা এত নতুন মনে হয়েছিল এবং জনসাধারণের মন এর প্রতি এতটা বিরূপ ছিল যে, মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করবার জন্য লোক পাওয়া সহজ ছিল না। যাঁরা সুনাম ও যশের কথা ভাবতেন, তাঁরা স্ত্রী-শিক্ষালয়ে পড়াবার জন্য কি করে সম্মত হবেন? এই মনোভাব আজকাল অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে। এখন মফঃস্বলের অনেক ছোট-ছোট স্কুলে কয়েক জন সম্মানিত ব্রাহ্মণকেও শিক্ষকতা করতে

দেখা যায়। এদিক থেকে স্ত্রী-শিক্ষা যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক বৎসরই অভিভাবকদের মন থেকে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে কুসংস্কারটা ক্রমশঃ দূর হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আজকাল কলকাতায় ছাত্রী পাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। অবশ্য কয়েক বছরের রিপোর্ট থেকে ছাত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে না। এর দ্বারা উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করা হচ্ছে না। ছাত্রী-সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না হবার কারণ সুষ্ঠ পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানের অভাব।

এদেশের লোকের স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি মনোভাব যে পরিবর্তিত হয়েছে, তার প্রমাণ অন্য একটি বিষয় থেকেও বোঝা যায়। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারে এখন মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়ীতেই করা হয়েছে। অল্প কিছু দিন আগে স্কুলের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেয়েদের পড়াবার জন্য বাড়ীতে শিক্ষক পাঠাবার আবেদন কয়েক জন বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট থেকে পেয়েছেন।

এ সব দৃষ্টান্তগুলি সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে, এবং আশা করা যায়, স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ব্যাপক ভাবে শীঘ্‌গিরই ঘটবে।

—ক্যালকাটা গভর্ণমেণ্ট গেজেট, ২৫শে জুন।

(এ পর্যন্ত জানুয়ারী—এপ্রিল (১৮৩০) খণ্ডের এশিয়াটিক জার্ণাল থেকে উদ্ধৃত)।

সরকারী চাকুরীর মোহ

এদেশের লোকের মধ্যে সরকারী চাকুরী লাভের জন্য যে ব্যগ্রতা দেখা যায়, সে অনুপাতে বেতন খুবই সামান্য। যে চাকুরীর বেতন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার জন্যও সম্ভ্রান্ত ও ধনী-পরিবারের প্রার্থীদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং তা লাভ করবার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। সরকারী চাকুরীর সাহায্যে সমাজে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, এই জন্যই সরকারী চাকুরীর প্রতি এত লোভ। তা ছাড়া সরকারী চাকুরীতে থাকলে গৌণ ভাবে আরো অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা পাবার আশা আছে। বিচার, রাজস্ব অথবা সওদাগরী বিভাগে কেউ একটি ভালো চাকুরী সংগ্রহ করতে পারলে ধরে নেওয়া হয় যে, সমগ্র পরিবারের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারণ, একজন চাকুরী পেলে তার ক্ষমতার মধ্যে যত পদ আছে সবগুলিতে নিজের লোক নিযুক্ত করবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। এক দল ক্ষুধার্ত, অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে,—চাকুরী খালি হলেই যেন তারা ঢুকতে পারে। আপিসের কর্তা য়ুরোপীয়ান, লোক নিয়োগের অধিকার তাঁর; তথাপি শূন্য পদটা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর অধীনস্থ কোনো দেশীয় কর্মচারীর আত্মীয়ই পাবে। কেন না, সেই কর্মচারী সুকৌশলে সাহেবের কাছে নিজেকে অত্যাবশ্যকরূপে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। য়ুরোপীয়ান প্রভুকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রভাবান্বিত করবার উদ্দেশ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশীয় কর্মচারীরা অবিরাম সাধনা করে। এবং এক দিন-না-এক দিন তাদের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবেই। অধস্তন ও পশ্চাদ্‌বর্তী হয়েও প্রকৃতপক্ষে এরাই আপিসে নেতৃত্ব করে। এটা সত্যি কৌতুকজনক, যখন দেখি যে সৎ ও দৃঢ়চেতা য়ুরোপীয়ান কর্তা ভারতীয় কর্মচারীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না বলে গর্ব করেন, তিনিও কার্যকালে প্রভাবশালী দেশীয় কর্মচারীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন। যে কর্মচারী প্রভুর আস্থাভাজন হতে পারে সে নিজের চাকুরীর বেতন ও পদমর্যাদা ব্যতীত তার বিভাগের নিম্নতর সকল পদগুলির সুযোগও পায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, সরকারী চাকুরীর সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের প্রভাব জড়িত আছে। গ্রামাঞ্চলে এই প্রভাব আরো বেশী। ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে প্রাচীন বংশের প্রভূত সম্পত্তিশালী কোন ভদ্রলোকের সম্মান সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা অনেক অধিক। এই চাটুকারিতা ও দাসভাবসুলভ দেশে সাধারণতঃ এর উল্টোটাই দেখা যায়। দেশের অনেক অংশেই ধনী জমিদার অপেক্ষা আদালত অথবা কালেকটরেটের সামান্য কর্মচারীও বেশী সম্মান পায়। তার মতামতের মূল্য অধিক; তার দৃষ্টান্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা অনুসরণ করে; এবং জনসাধারণের মতামত ও রীতি-নীতির উপর তার প্রভাব নিশ্চিতরূপে বেশী। এই কারণেই বিশ-ত্রিশ টাকা বেতনের সরকারী চাকুরীর জন্য সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যগ্রতা দেখা যায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১৯শে নভেম্বর, ১৮৩৫।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

গত ১১ই জুলাই বারাকপুরে লেফটেন্যাণ্ট লো এবং ব্রডরিপের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের ফলে লেফটেন্যাণ্ট ব্রডরিপের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। অনুসন্ধান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট গেজেট বলছেন যে, লেফটেন্যাণ্ট লো প্রতিপক্ষের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়।

এশিয়াটিক জার্ণাল, জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৮৩০

উত্তর

১। কলিকাতা, এলাহাবাদ ও কাশী।

২। স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব।

৩। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী রাণী ভবানী।

৪। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

দিল্লী ও আগ্রা—(২)

সুন্দর ঝকঝকে দোকানপত্তরের জন্তও ইয়োরোপীয় নগরের সৌন্দর্য বাড়ে। দিল্লীতে সেরকম কোন দোকানপাতি নেই। যদিও দিল্লী শহর মোগল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ রাজধানী এবং নানারকমের মূল্যবান জিনিসপত্তরেরও আমদানি হয় সেখানে, তাহলেও দিল্লী শহরের মধ্যে আমাদের এখানকার শহরের মতন পথঘাট নেই, এমন কি সারা এশিয়া মহাদেশেই নেই বলা চলে। মূল্যবান পণ্যদ্রব্য সাধারণত সেখানে গুদামজাত ক'রে রাখা হয় এবং দোকানপাতি কখনও সাজানো হয় না। দোকান-সাজানো ব্যাপারেই যেন দিল্লীর ব্যবসায়ীরা অভ্যস্ত নয়। কদাচিৎ এক-আধটি দোকান এরকম দেখা যায় যেখানে ভাল ভাল দামী রেশমী বস্ত্র, সোনারুপার জরির কাজ করা নানারকমের ঝালর, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরকম একটি দোকানের বদলে পঁচিশটি দোকান দেখা যায় যেখানে কিছুই সাজানো থাকে না দেখবার মতন। মাটির পাত্রভরা তেল, ঘি, মাখন, বস্তা বস্তা চাল গম ছোলা ডাল ইত্যাদি নানারকমের খাদ্য মজুত করা থাকে স্তূপাকারে। এ-সব অধিকাংশই হ'ল হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণীর খাদ্য, যাঁরা মাংস খান না বেশী। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরাও অবশ্য তাই খায় এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই খাদ্য খেতে হয়।(১)

এছাড়া একটি ফলের বাজার আছে, যা বাস্তবিকই দেখবার মতন। ফলের বাজারে দোকানের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং গ্রীষ্মকালে এই সব দোকান নানারকমের ফলে ভর্তি হয়ে যায়। নানাদেশ থেকে ফলের আমদানি হয় দিল্লীর বাজারে। পারস্য থেকে, বল্খ বোখারা সমরকন্দ থেকে ফলের আমদানি হব ঝুড়ি-ঝুড়ি। কতরকমের ফল তার ঠিক নেই—পেস্তা, বাদাম, আখরোট, খুবানী ইত্যাদি। এসব গ্রীষ্মকালে আমদানি হয়। শীতকালে আসে চমৎকার আঙুর-ফল, সাদা-কালো রঙের। ঐ সব একই দেশ থেকে আসে, সযত্নে তুলোয় ঢাকা। তিনচার রকমের আপেল, ডালিম-বেদানাও আসে প্রচুর। আর আসে তরমুজ, সারা শীতকাল থাকে, নষ্ট হয় না। অত্যন্ত দামী ফল এই তরমুজ, এক-একটির দাম প্রায় দেড় ক্রাউন ক'রে। এর চেয়ে নাকি অভিজাত ফল আর কিছু নেই। আমীর-ওমরাহদের তরমুজ-খরমুজ না হ'লে চলে না। এই ফলের জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করেন। ফল-মূল এমনিতেও অবশ্য তাঁরা যথেষ্ট খান। আমার কর্তা যিনি ছিলেন তিনিই প্রায় দৈনিক বিশ ক্রাউন ক'রে নিজের ফলের জন্য খরচ করতেন।

গ্রীষ্মকালে তরমুজের দাম সস্তা হয়, কিন্তু তখন খুব ভাল-জাতের তরমুজ পাওয়া যায় না। ভাল তরমুজ সংগ্রহ করাও খুব কষ্টকর। পারস্য থেকে বীজ আনিয়ে অত্যন্ত যত্ন ক'রে মাটি তৈরী ক'রে তাতে সেই বীজ বুনে দিতে হয়। সাধারণত অভিজাত-শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্যেরা তরমুজের চাষ করতে পারে না। ভাল তরমুজ পাওয়া সেই জন্য খুব শক্ত ; কারণ, যে-কোন মাটিতে তরমুজ হয় না এবং মাটি খুব ভাল না হ'লে একবছরেই তরমুজের বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

আম্রফল(২) বা আম গ্রীষ্মকালে মাস দু'ই খুব সস্তা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। কিন্তু দিল্লী অঞ্চলে বিশেষ ভাল আম তেমন পাওয়া যায় না। ভাল ভাল উৎকৃষ্ট আম আসে বাংলাদেশ থেকে, আর গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে। অদ্ভুত সুস্বাদু ফল এই আম। আমের চেয়ে বোধ হয় কোন মিষ্টান্নও সুস্বাদু নয়। তরমুজ সারা বছর ধ'রে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু দিল্লী অঞ্চলের তরমুজের রঙ বা মিষ্টতা নেই। ভাল তরমুজ সাধারণত ধনীলোকদের গৃহেই দেখা যায়, কারণ তাঁরা বাইরে থেকে বীজ আনিয়ে রীতিমত খরচ ক'রে, যত্ন নিয়ে তার চাষ করেন।

ময়রার দোকান দিল্লী শহরে অনেক আছে, কিন্তু মিষ্টান্নের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, রুচি বা আস্বাদ কোনদিক থেকেই নেই। মিষ্টান্ন খারাপ তো বটেই, তা ছাড়া মাছি ও ধূলোতে ভর্তি—আহারের যোগ্য নয়। রুটিওয়ালাও শহরে অনেক আছে, কিন্তু তাদের চুল্লী আর আমাদের এদেশের রুটিওয়ালাদের চুল্লী এক নয়। চুল্লী ঠিক মতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী নয়। সেইজন্য রুটি ভাল ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয় না এবং সেঁকাও হয় না। প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে যে রুটি তৈরী হয়, সেগুলো অনেকটা ভাল। আমীর-ওমরাহরা

---

(১) বার্নিয়ের এখানে বোধ হয় মুদির দোকান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দোকানের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হ'ল যে, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির সাজানো বাহারে দোকান দিল্লীতে বেশী ছিল না,—মুদির দোকান ও খাদ্যের দোকানই বেশী ছিল।

(২) 'আম' ও 'আম্র' উত্তরভারতের প্রচলিত শব্দ। আমের তামিল নাম হ'ল "মানকে"। এই 'মানকে' থেকে পর্তুগীজরা করেন "মঙ্গ" এবং তাকে ইংরেজী করা হয় "ম্যাঙ্গো"।

সাধারণত নিজেরা ঘরেই রুটি তৈরী ক'রে নেন, বাইরের রুটিওয়ালাদের রুটি খান না। রুটি তৈরী করবার সময় টাট্‌কা মাখন, দুধ বা ডিম দিতে তারা কোন কার্পণ্য করে না, কিন্তু এত করা সত্ত্বেও রুটির আস্বাদ কিরকম যেন পোড়া-পোড়া মনে হয়, খেতে তেমন ভাল হয় না। ঠিক রুটির যে স্বাদ তা যেন হয় না, কতকটা কেকের মতন হয়। আমাদের এখানকার রুটির সঙ্গে তার কোন তুলনাই করা চলে না।

বাজারে অনেক দোকান আছে, যেখানে নানারকমের রান্না মাংস বিক্রী হয়। কিন্তু সেই সব বাজারের রান্না মাংস বিশ্বাস ক'রে খাওয়া যায় না; কারণ কিসের মাংস যে রান্না করা থাকে, তা অনেক সময় বলা মুশকিল। ঘোড়ার মাংস, উটের মাংস, এমন কি ব্যাধিগ্রস্ত মৃত ষাঁড়ের মাংসও রান্না ক'রে বাজারের দোকানে বিক্রী করা হয়। সুতরাং বাজারের খাদ্যের উপর নির্ভর করাই যায় না। বাড়ীতে রান্না করা ছাড়া তৃপ্তি ক'রে কোন খাদ্য খাওয়ার উপায় নেই।

শহরের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে মাংস বিক্রী হয়, কিন্তু পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস পাঁঠা ব'লে বেশী চালানো হয়ে থাকে। সেইজন্য মাংস কেনার সময় খুব হুঁসিয়ার হয়ে মাংস কিনতে হয়, কারণ গরু ও ভেড়ার মাংসের উত্তাপ বেশী এবং সহজপাচ্য নয়।(৩) সাধারণত কচি পাঁঠার মাংসই ভাল, কিন্তু তার জন্য জ্যান্ত পাঁঠা কেনা দরকার। জ্যান্ত একটা গোটা পাঁঠা কেনা মুশকিল, কারণ পাঁঠার মাংস বেশীক্ষণ রেখে খাওয়া যায় না, তেমন সুগন্ধও নেই। ছাগমাংস যা বাজারে বেশী বিক্রী হয় তা ছাগীর মাংস, অত্যন্ত শক্ত ও ছিবড়ে।(৪)

কিন্তু আমার দিক থেকে এই ভাবে অভিযোগ করা বোধ হয় অন্যায় হবে; কারণ হিন্দুস্থানের লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে আমি মিশেছি এবং তাদের আচার-ব্যবহারে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমি যে রুটি ও মাংস খেতে পেয়েছি, তার মধ্যে অভিযোগ করার মতন কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি। সাধারণত ভাল খাদ্যই আমি খেতে পেতাম। আমার ভৃত্যকে পাঠিয়ে দুর্গের ভিতর থেকে আমি খাবার কিনে আনতাম। তারাও ভাল খাদ্য দিত, কারণ খাদ্য তৈরীর খরচ তাদের বিশেষ লাগত না, অথচ আমি যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনতাম। রাজদুর্গের ভিতর থেকে এইভাবে খাবার কিনে খাই শুনে আমার মনিব হাসতেন। বুদ্ধি খাটিয়ে এই উপায় উদ্ভাবন না করলে, সামান্য দেড়শ' ক্রাউন আমি যে মাসিক বেতন পেতাম, তাতে আমার উপোস থাকতে হ'ত। অথচ ফ্রান্সে আমি যদি আট আনা খরচ করি খাদ্যের জন্য, তাহলে রাজার খাদ্য যে মাংস তাও বোধ হয় আমি নিয়মিত খেতে পারি।

ভাল জাতের খাসী মোরগ তেমন পাওয়া যায় না, এক রকম দুর্লভই বলা চলে। ওদেশের মানুষের জীবজন্তুর প্রতি দয়াটা যেন একটু বেশী মনে হয়। মোরগ বেগমখানার জন্যই প্রধানতঃ বরাদ্দ থাকে। বাজারে সাধারণ মুর্গী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, বেশ ভাল মুর্গী এবং সস্তাও। নানাজাতের মুর্গী পাওয়া যায়, তার মধ্যে একরকমের আছে খুব ছোট ছোট, কচি ও নরম। আমি তার নাম দিয়েছি 'ইথিওপিয়ান' মুর্গী বা হাব্‌সী মুর্গী, কারণ তার গায়ের চামড়াটা রীতিমত কালো।(৫) পায়রাও বাজারে বিক্রী হয়, কিন্তু ছোট পায়রা নয়, কারণ বাচ্চা পায়রার উপর ভারতীয়দের মমতা খুব বেশী। একরকমের ছোট ছোট পাখীও বাজারে বিক্রী হয়। জাল ফেলে ধরা হয় পাখীগুলো এবং অনেক দূর থেকে বাজারে আনা হয়। পাখীর মাংস মুর্গীর মতন খেতে সুস্বাদু নয়।

দিল্লী অঞ্চলের লোকরা সেরকম ভাল মৎস্যশিকারী নয়। মাছ ধরতে ভাল জানে না। মধ্যে মধ্যে ভাল মাছ বাজারে আমদানি হয়, কিন্তু তার অধিকাংশই সিঙ্গী ও রুইমাছ। আমাদের এদেশের এক জাতীয় মাছের সঙ্গে তার তুলনা হয়। ঠাণ্ডা পড়লে লোকে আর মাছ খেতে চায় না, কারণ শীত বা ঠাণ্ডাকে তারা ভয়ানক ভয় করে, ইয়োরোপীয়রা গরমকে যা ভয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং, শীতকালে যদি কোন মাছ বাজারে আসে, তক্ষণই খোজারা তা কিনে নেয়। খোজারা বিশেষ ক'রে মাছ খুব বেশী ভালবাসে, কেন বাসে জানি না। আমীর-ওমরাহরা 'কড়া' বা চাবুকের ভয় দেখিয়ে জেলেদের মাছ ধরতে পাঠায়। লম্বা লম্বা চাবুক তাঁদের দরজার সামনে সব সময় ঝোলে।

মোটামুটি যে বিবরণটুকু দিলাম তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, 'প্যারিস ছেড়ে দিল্লী শহরে একবার বেড়াতে যাওয়া উচিত কি না। বড় বড় ধনী লোক যাঁরা তাঁরা অবশ্য বেশ আরামে ও আনন্দেই থাকেন; কারণ তাঁদের হুকুম তামিল করার জন্য চাকরবাকরের অভাব থাকে না। টাকার জোরে তো বটেই, চাবুকের জোরেও তাঁরা লোকজনকে দিয়ে নানারকমের কাজ করিয়ে নেন।

দিল্লী শহরে কোন মধ্যবর্তী স্তরের বা অবস্থার অস্তিত্ব নেই। দুই শ্রেণীর লোক দিল্লীতে সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। হয় উচ্চশ্রেণীর ধনী লোক, আর না হয় নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোক। মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবর্তী স্তর বলতে কিছু নেই।(৬)

---

(৩) বার্নিয়েরের এই মন্তব্য এখন অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। ছাগলের মাংস যে ভেড়ার মাংসের চেয়ে উপাদেয়, একথা এখন আর কেউ মনে করেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু এক সময় করতেন বলে মনে হয়।

(৪) বার্নিয়েরের কথা আজও যে কত সত্য, তা মাংসাশী মাত্রই জানেন। খাদ্যের প্রতি, এমন কি মাংসের প্রতিও বার্নিয়েরের সজাগ দৃষ্টি পড়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক আগে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের কচি পাঁঠার তারিফ ক'রে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বাজারে যে পাঁঠার চেয়ে ছাগীর মাংস বেশী বিক্রী হয়, সেকথাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

(৫) বার্নিয়েরের সজাগ দৃষ্টির এটি আর একটি দৃষ্টান্ত। অন্যান্য পর্যটকরা মাংস কালো রঙের বলেছেন, কিন্তু বার্নিয়ের বলেছেন যে, গায়ের চামড়াটাই কালো। সামান্য মুর্গীর ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অন্যান্য কোন সমসাময়িক পর্যটকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

(৬) (ভারতীয় সমাজের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "মধ্যবিত্তশ্রেণী"

আমি নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করি এবং খরচ করতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় এমন অবস্থা হয় যে আমার অদৃষ্টে কোন খাদ্য জোটে না। বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না অধিকাংশ দিন এবং যাওবা পাওয়া যায় তা ধনিকদের ভুক্তাবশেষ বা উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু নয়। ভোজনপর্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে মদ, তাও দিল্লীর একটিমাত্র দোকানে পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ মদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে, কারণ দেশী আঙুর থেকে হিন্দুস্থানে বেশ উত্তম মদ তৈরী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ বাইরের দোকানে বিক্রী হয় না, কারণ হিন্দুদের শাস্ত্র ও মুসলমানদের শরিয়তে মদ্যপান নিষিদ্ধ। যৎকিঞ্চিৎ মদ্য আমি মধ্যে মধ্যে আমেদাবাদ ও গোলকুণ্ডায় পান করেছিলাম, তাও ডাচ ও ইংরেজদের গৃহে অতিথি হয়ে, কিন্তু সে-মদের আস্বাদ তেমন ভাল নয়।(৭) মোগল রাজ্যের মধ্যে মদ যা পাওয়া যায় তা সাধারণত দু'রকমের—শিরাজ ও ক্যানারী। 'শিরাজ' পারস্যদেশ থেকে আমদানি হয়। পারস্য থেকে বন্দর আব্বাসি হয়ে সুরাটে এসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে দিল্লীতে আসে ৪৬ দিনে। 'ক্যানারি' মদ ডাচরা নিয়ে আসে সুরাটে। কিন্তু এই দু'রকমের মদেরই দাম এত বেশী যে, তার আস্বাদ দামের জন্যই নষ্ট হয়ে যায়।(৮) অর্থাৎ অত দেশী দাম দিয়ে মদ খেতে হ'লে তা খেতে ভাল লাগে না। প্যারিসে যে মদের পাঁইট বিক্রী হয়, সেইরকম তিন পাঁইট মদের দাম দিল্লীতে ছয়-সাত ক্রাউন। এক রকমের দেশী মদ চিনি বা গুড় থেকে চোলা'ই ক'রে ওদেশে তৈরী হয়। তাও প্রকাশ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। লুকিয়ে-চুরিয়ে লোকে খায়, খৃষ্টানরা প্রকাশ্যেই খায়। দেশী আরক-জাতীয় মদ পোল্যাণ্ডের ধেনো মদের চেয়ে অত্যন্ত কড়া, খাবার সময় রীতিমত গলা থেকে বুক পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়। বেশী খেলে নানারকমের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। বিচক্ষণ ও মিতাচারী ব্যক্তি যাঁরা তাঁরা বিশুদ্ধ জল পান করেন অথবা সোডা-লেমনেড জাতীয় কিছু পানীয়। দামেও সস্তা, দেহেও সহ্য হয়, সুতরাং যত খুশী প্রাণভরে পান করতে কোন বাধা নেই।(৯) সত্য কথা বলতে কি, খুব কম লোকই ভারতবর্ষে মদ্যপান করে। মদের প্রতি সেরকম কোন বিশেষ আসক্তি ভারতবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। এদিক থেকে তাদের মিতাচারী ও সংযমী বলা যায়। ওদেশের আবহাওয়ার গুণে লোকে হাঁপানি রোগে ভোগে খুব বেশী। কিন্তু বাত, পেটের অসুখ, ষ্টোন ইত্যাদি ব্যাধির বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই জাতীয় ব্যাধি নিয়ে যদি কেউ বাইরে থেকে আসে, তা'হলে তার সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'তেও বেশী সময় লাগে না। আমার নিজের এই ব্যাধি ছিল এবং আমি কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠেছিলাম। এমনকি উপদংশ রোগেরও (Veneral disease) হিন্দুস্থানে বেশ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তেমন মারাত্মক আকারে দেখা যায় না এবং অন্যান্য দেশের মতন তার ফলাফলও খুব ভয়াবহ নয়।(১০) সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভালই বলা চলে, কিন্তু তাহলেও শীতপ্রধান দেশের লোকের মতন তারা কর্মঠ ও পরিশ্রমী নয়। বোধ হয়, অত্যধিক গরমের জন্য দেহ ও মনের জড়তা তাদের বেশী, কাজেকর্মে তেমন উদ্‌যোগ ও উৎসাহ নেই। শৈথিল্য ও অবসাদই তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। অবসাদের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই হিন্দুস্থানে। নির্বিচারে সকলশ্রেণীর লোককে এই জড়তা ও অবসাদ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। এমনকি, বিদেশী ইয়োরোপবাসীরাও এর হাত থেকে মুক্তি পান না। বিশেষ ক'রে, গ্রীষ্মের পরিবেশে যাঁরা তেমন অভ্যস্ত হ'তে পারেননি, তাঁদের তো কথাই নেই।

দিল্লীতে সুদক্ষ কারিগরদের ভাল কারখানা বেশী নেই। অন্ততঃ সেদিক থেকে গর্ব করার মতন বিশেষ কিছু নেই দিল্লীর। তার মানে, ভাল ভাল কারিগর যে ভারতবর্ষে নেই তা নয়। সুদক্ষ কারিগর ভারতের প্রায় সর্বত্রই আছে এবং যথেষ্ট আছে। উঁচুদরের কারুশিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়, যা কারিগররা যন্ত্রপাতি বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও, এবং কোন গুরুর কাছ থেকে কোন রকম শিক্ষা না পেয়েও, তৈরী করে।(১১) এক-এক সময় বিদেশী ইয়োরোপীয় শিল্পদ্রব্য তারা এমন নিখুঁতভাবে নকল করে যে আসল কি নকল

বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিকাশ হয়েছে আধুনিক শিল্পযুগে। মধ্যযুগে 'মধ্যশ্রেণী' ব'লে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কোন সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না।

(৭) ভোজনবিলাসী বার্নিয়েরের এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, এক কালে দেশী মদ বোধ হয় বিলেতী মদের চেয়েও ভাল ছিল।

(৮) ফ্রায়ার (Fryer) লিখেছেন: "বোম্বাই ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, কিন্তু পর্তুগীজরা ও দেশীয় লোকেরা বেশ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দীর্ঘজীবী। তার কারণ তারা অত্যন্ত সংযমী এবং মদ্য পান করে না। ইংরেজরা খুব বেশী মদ্যপান করে বলে অকালে মারা যায়। বরং বৃদ্ধবয়সে কিছু কিছু মদ্যপান করা উচিত, কিন্তু অল্প বয়সে নয়।" (A New Account of East India and Persia: Hakluyt Soc. Vol. 1, 180)

(৯) ভারতীয় পানীয়ের মধ্যে "সরবৎ" অন্যতম। সরবতের প্রচলন হিন্দুযুগেও ছিল, কিন্তু তার বৈচিত্র্য তেমন ছিল না। লেবুর রস ও ফলের সরবৎ ইত্যাদি নানারকমের সরবতের প্রচলন হয় মুসলমানযুগে। অতিথিকে সরবৎ পান করতে দেওয়া (চা বা মদ্য নয়) ভারতীয় সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য রীতি।

(১০) ভারতীয় ব্যাধি সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বার্নিয়ের বলেছেন যে হাঁপানি রোগই ভারতবর্ষে বেশী দেখা যায় এবং গ্রীষ্মজনিত চারিত্রিক অবসাদ ও জড়তাকেও তিনি ব্যাধি ব'লে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাত বা পেটের পীড়া ভারতবর্ষে নেই বললেই হয়—বার্নিয়েরের এই মন্তব্যে আজকাল রীতিমত বিস্মিত হবার কথা। উপদংশ-রোগ সম্বন্ধে মন্তব্যও কৌতূহল উদ্রেক করে।

(১১) বার্নিয়েরের কারিগরদের সম্বন্ধে এই উক্তি থেকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। কারিগরদের 'গিল্ড' বা শ্রেণী ও সংঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তার বৈশিষ্ট্য হ'ল বংশানুক্রমে কারিগরি-বিদ্যায় দীক্ষা দেওয়া। কারিগরদের অনেকের যন্ত্রপাতি নেই বলতে তিনি নিঃস্ব দরিদ্র কারিগরদের কথাই বলতে চেয়েছেন মনে হয়।

তা সহজে ধরা যায় না।(১২) ভারতীয় কারিগররা বেশ চমৎকার বন্দুক বানাতে পারে। সোনার নানারকমের অলঙ্কার এত সুন্দর তারা তৈরী করে যে, তার কারুকাজ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ইয়োরোপের স্বর্ণকাররা এইদিক থেকে কারিগরিতে ভারতীয় স্বর্ণকারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় চিত্রকরদের ছবির প্রশংসা আমি অনেকবার করেছি। ছোট ছোট চিত্রের বিশেষ ক'রে নৈপুণ্য ও কলাকুশলতার তুলনাই হয় না। একটি চিত্রিত ঢাল দেখেছিলাম একবার, আকবর বাদশাহের আমলের।(১৩) তখনকার দিনের বিখ্যাত কোন চিত্রকর সাত বছর ধ'রে ঐ ঢালের চিত্রগুলি এঁকেছিলেন। চিত্রায়নের সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বিস্ময়কর। এরকম বিচিত্র কলাকুশলতা সচরাচর দেখা যায় না। ভারতীয় চিত্রকরদের আমার মনে হয়, চিত্রের সামঞ্জস্যবোধ বা প্রমাণবোধ (Sense of proportion) তেমন সজাগ নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ ক'রে মুখের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সব ক্রটি-বিচ্যুতি সহজেই শুধরানো যেতে পারে, কোন গুরুর কাছে শিক্ষা পেলে। শিল্পকলার পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার দরকার এবং তার জন্য দরকার শিক্ষার। ভারতীয় শিল্পীদের এই শিক্ষার অভাব আছে ব'লে মনে হয়।(১৪)

সুতরাং কেবল প্রতিভার অভাবের জন্যই যে দিল্লী শহরে ভাল শিল্পকলার নিদর্শন তেমন দেখা যায় না, তা নয়। শিল্পীরা যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উৎসাহ পেতেন, তাহ'লে ভারতবর্ষে শিল্পকলার আশ্চর্য বিকাশ হ'ত। কিন্তু কোন উৎসাহই ভারতীয় শিল্পীরা পান না। সাধারণত শিল্পীরা অবজ্ঞার পাত্র এবং তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেহনতের জন্য তাঁরা উপযুক্ত মজুরিও পান না। ধনী লোক যাঁরা, তাঁরা সস্তায় জিনিস কিনতে চান, অর্থব্যয় করতে চান না। কোন আমীর বা মনসবদার যদি কোন কারিগরকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চান, তাহ'লে তাকে বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে ধ'রে নিয়ে আসেন। অনেক সময় জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে ধ'রে আনেন এবং হুমকি দিয়ে তাকে কাজে নিযুক্ত করেন। কাজটি যখন শেষ হয়ে যায় তখন প্রভু তাকে যা মজুরি দেন তা তার মেহনৎ অনুপাতে নয়। দয়া ক'রে যা দেন, তাই তাকে ঘাড় হেঁট ক'রে নিতে হয়। কোনরকম বাদ-প্রতিবাদ করার অধিকার নেই তার। কারণ তাহ'লে দয়ার দানের সঙ্গে আমীর বেত্রাঘাত দক্ষিণা দিতেও দ্বিধা করবেন না। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের কাজ করতে হয়। সুতরাং কোথা থেকে তাঁরা কাজের প্রেরণা পাবেন? কি জন্য তাঁরা শিল্পোন্নতির চেষ্টা করবেন? যশ, খ্যাতি, সম্মান, এসবের প্রতি কোন আকর্ষণই তাঁদের থাকে না। খেয়ালী ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য কোনরকমে কাজের নামে তাঁরা দায় উদ্ধার করতে চান। তা না হ'লে খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকাই তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই একটুকরো রুটির জন্য তাঁরা আমীর-ওমরাহদের হুকুম তামিল করেন। এই হ'ল সাধারণ শিল্পীদের অবস্থা। যে সব শিল্পীর প্রতিষ্ঠা আছে বা মর্যাদা আছে, তাঁরা সাধারণত রাজা-বাদশাহের অনুগ্রহজীবী, অথবা বড় বড় আমীর-ওমরাহ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা একটু ভাল খেতে-পরতে পান ও আরামে থাকেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠা হয়। তা না হ'লে, অর্থাৎ রাজা-বাদশাহের মতন পৃষ্ঠপোষক না থাকলে, শিল্পীর কোন কদর নেই হিন্দুস্থানে।(১৫)

[ক্রমশঃ ।

(১২) ভারতীয় শিল্পকলায়, বিশেষ ক'রে কারুশিল্পে, ইয়োরোপীয় প্রভাব মোগলযুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বার্নিয়েরের এই উক্তি তার প্রমাণ।

(১৩) এইরকম একটি চিত্রিত ঢালের বিবরণ ১৮৯১ সালের ২০শে মার্চ তারিখের বিলেতী 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঢালটির নাম "রামায়ণ ঢাল"। জয়পুরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী গঙ্গা বক্স এই ঢালটিতে রামায়ণের কাহিনী সম্পূর্ণ চিত্রায়িত করেন, জয়পুর মিউজিয়মের অধ্যক্ষ মেজর হেণ্ডলের তত্ত্বাবধানে। রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী ফলকাকারে ঢালের উপর রূপায়িত করা হয়। আকবর বাদশাহের আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের অনুকরণে গঙ্গা বক্স এই ঢাল চিত্রায়িত করেন। পরে নাকি হেণ্ডলে সাহেব এইরকম একটি মহাভারতের কাহিনী-চিত্রিত ঢালও তৈরী করান। জয়পুরের মিউজিয়মে এই ঢালগুলি এখনও রক্ষিত থাকবার কথা।

(১৪) ভারতের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার নিখুঁত বর্ণনায় বার্নিয়ের তাঁর সমসাময়িক পর্যটকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। কিন্তু এখানে ভারতীয় শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা হয়ত সাধারণশ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু সর্বশ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। বোঝা যায়, অন্যান্য বিষয়ে বার্নিয়ের অসাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিলেও, শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না। বিশেষ ক'রে, ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য, পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় অজ্ঞ ছিলেন বলা চলে। থাকাও স্বাভাবিক। তখনকার দিনের একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার মতন সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়।

(১৫) ভারতীয় শিল্পকলার গুণাগুণ সম্বন্ধে বার্নিয়েরের মন্তব্যের মধ্যে ক্রটি থাকলেও, শিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য বলা চলে।

"ভাগ্য সাহসীদেরই জয়ী করে।"

—ভার্জিল

ট্রেন
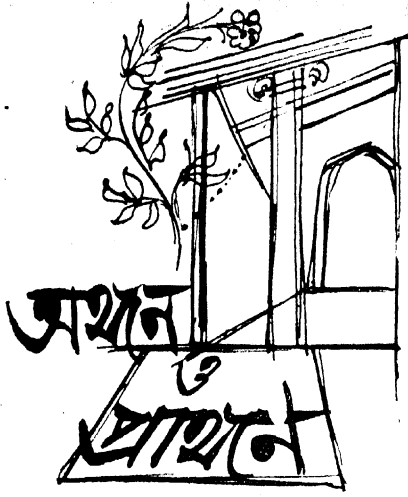
ভেরা পানোভা

পশ্চিম থেকে পূবে

লেনা—

ক্লান্তিহীন কাজের স্রোতে একটানা ভেসে চলেছে লেনা। আহত সৈন্যদের একঘেয়ে রুগ্ন পরিবেশে আনে উচ্ছলতা আনন্দ। কখনও কামরাগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছে, কখনও কারো ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে, কখনও ময়লা কাপড় ছাড়িয়ে কাউকে পরিয়ে দিচ্ছে সুন্দর পাটভাঙ্গা কাপড়। আবার দেখা যায়, কোনো রোগীকে খাইয়ে দিচ্ছে। আবার কারো বা মাথার কাছটিতে বসে কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। অচেনা নগরের নামগুলো-অনভ্যস্ত উচ্চারণে মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছে।

একটানা অবসাদের মাঝখানে ক্ষণিক মুক্তি···লেনা। বৃদ্ধেরা স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ডাকেন 'মা' বলে, নরম চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলাতে বুলাতে। আর তরুণ সৈন্যেরা ভাবে—'কি স্বপ্ন-নীড়ই না রচনা করা যায়, একে নিয়ে'—

কিন্তু লেনা যখন পরিজের বাটীটা মুখের কাছে ধরে, তখন কিন্তু ধৈর্য্য থাকে না ওদের, পরিজ দেখলেই রেগে জ্বলে ওঠে ওরা—আর লেনা—

—"সত্যি অবাক কাণ্ড, কি ছেলেমানুষী করছো তোমরা বলো তো? জানো, সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য এটা। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি খাদ্য-পরিচালিকাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বলবো এতে কত 'ক্যালোরী' আছে—"

—"গোল্লায় যাও তোমার খাদ্য-পরিচালিকাকে নিয়ে—" ওরা গজরাতে থাকে,—"সৃষ্টি-শুদ্ধ ক্যালোরী তাকেই খেতে বলো, আমাদের আর ছাই ওটা দেবার দরকার নেই—ও আমাদের কি ভেবেছে কি—ঘোড়া?"

কিন্তু যখন বিদায়ের মুহূর্ত্তটি আসে,—লেনার হাতটি ধরে যেন ছাড়তে চায় না, কোমল স্বরে বলে,—"সিষ্টার, তোমাকে কোন দিন ভুলতে পারবো না, তোমার ঠিকানা দাও, আমি চিঠি লিখবো তোমাকে—"

—"ঠিকানা? না, না, ঠিকানা নেবার কোনো দরকার নেই। চিঠি-পত্তর লেখবারই বা কি প্রয়োজন? লিখলেও উত্তর তো পাবে না—আমার যে একটুও ভালো লাগে না চিঠি লিখতে—"

একটুও ভালো লাগে না চিঠি লিখতে শুধু···শুধু একটি বিশেষ ঠিকানায় ছাড়া। যুদ্ধক্ষেত্রের সেই বিশেষ পোষ্ট-অফিসটিতে চিঠির পর চিঠি পাঠাতে একটুও ক্লান্তি লাগে না—একটুও না।

চিঠির পর চিঠি, কিন্তু কোন কূপের অতলে ফেলা হচ্ছে, যেখান থেকে আসছে না কোনো সাড়া···উঠছে না কোনো প্রতিধ্বনি? তিন-চার মাস পর ট্রেনটা থামলো এক জায়গায়—সেখানে এলো ডাক—কত চিঠি, খামে ভরা, পোষ্টকার্ড, প্যাকেট, পার্শ্বেল, তাছাড়া মিলিটারী কাগজ-পত্র নানা রকম।

···প্রার্থিত চিঠিখানিও এলো। অন্তরের আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো লেনার মুখে—পাওয়ার খুসী ছড়িয়ে গেলো ওর দেহে-মনে! এ কি শুধু কালির আঁচড়ে পাওয়া? ওর কানে বাজছে না দান্যার গভীর কণ্ঠস্বর—কোমল মাধুর্য্যের ছোঁয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা···?

···গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিন। কালো ধুলার রাশ উড়ছে শুকনো হাওয়ায়। জানলার সাদা পর্দা থেকে সুরু ক'রে আহতদের বিছানা, ব্যাণ্ডেজ অবধি ধুলোয় ভরে যাচ্ছে। নার্সদের কাজ বাড়লো দ্বিগুণ ক'রে। বার বার বদলাতে হচ্ছে আসবাব-পত্র, মুছতে হচ্ছে কামরার মেঝে। সবে মাত্র ট্রেনটা ভর্ত্তি করা হোয়েছে আহত সৈন্যদের নিয়ে; এখন চলেছে তাই পূব থেকে পশ্চিমে—উরালে। লেনা যেখানে কাজ করছে, সেখানে আছে কুড়ি'জন লোক। উঃ, কি খেয়ালী এই দলটা—ওরা সব সময় চাইবে সিগারেট খেতে, কিছুতেই ফুটানো জল খাবে না···ওদের চাই টাটকা জল বরফের টুকরো ভাসানো। কিন্তু সতেরো নম্বর রোগী—যাঁর হাঁটু থেকে বাঁ পা-টা কেটে বাদ দেওয়া হোয়েছে—সে চায় না কিছুই···সিগারেটও খায় না। কিন্তু তাহলে হবে কি, সেই তো হোলো সবচেয়ে বিপদ। সৈন্যটি খায়ও না, ঘুমোয়ও না। রোদে-পোড়া তাম্রাভ মুখখানা সাদা বালিসের কোলে স্থির হোয়ে জেগে থাকে। দু'টি চোখে শুধু জেগে থাকে তীব্র বিতৃষ্ণা ভরা দৃষ্টি। অল্গা ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে মায়ের মত স্নেহভরা সুরে বলে:

—"কেন খাচ্ছ না? খেতে ইচ্ছে নেই, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না? খাবার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?"

—"খাবার ভালই দেওয়া হচ্ছে, ধন্যবাদ"—দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দেয় সতেরো নম্বর।

—"তুমি অন্য কিছু খেতে চাও? ডিম? কেক্? বল কি খাবে, তাই তৈরী করে দেবো।"

—"ধন্যবাদ। আমার কিছুই চাই না—"

শুধু তো সতেরো নম্বর নয়, একশো ন'জন রোগী—গুরুতর আহত রোগী অপেক্ষা করে আছে অল্গার জন্যে। তাঁদের একশো ন'রকম সমস্যা। তার একশো রকম কাজ, একশো রকম অভিযোগ,' আর বায়না—গরমের জন্যে, পরিজ খাওয়া নিয়ে, টাট্কা জল খেতে চাইলেও নার্সরা দিচ্ছে না তাই নিয়ে—আবার এই রোগীদের বিরুদ্ধে নার্সদের একশো রকম অভিযোগ—ওরা ঝগড়া করে, অষুধ খেতে চায় না, আরও কত কি।

অল্‌গা সতেরো নম্বরের পরিচয়-পত্রটার দিকে এক-নজর তাকিয়ে নিয়ে বলে—"তুমি না এক জন নৌ-সেনা, কমরেড গ্লাসকভ, তোমার এমন ভেঙ্গে পড়া চলে ?"

—"নৌ-সেনা ? হ্যাঁ, ছিলাম বটে তাই—"

চকিতে লেনার দৃষ্টি পড়ে ওর উপর। মসৃণ শুভ্র কপালের নীচে রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, আর গভীর কালো চোখ···কোথায় যেন মিল আছে না 'দাস্তার' সঙ্গে ?

—"লেনা, লেফটানেন্টের বালিসটা সোজা করে দাও"—অল্‌গা বল্‌তে বলতে এগিয়ে চলে পাশের রোগীর কাছে। লেনা ঝুঁকে বালিসটা ঠিক করতে যায়, ওর চোখে পড়ে এক জোড়া কালো চোখের আহত, ক্ষুব্ধ দৃষ্টি।

—"তোমার নাম লেনা"—প্রশ্ন করে গ্লাসকভ।

—"হ্যাঁ"।

চোখ-জোড়ার দৃষ্টি কোমল হোয়ে আসে।—"আমার বোনের নাম ছিলো লেনা"—কাটা-কাটা কথা বলে—"অমনি ছোটো বোঁচা নাক।" ব্যস একেবারে চুপ, তারপর লেনা এগিয়ে যায় অন্য রোগীর কাছে। জোর করে খাওয়ায় ফোটান জল, ধুলো ঝেড়ে বিছানা ঠিক করে দেয়। আবার ট্রেন থামলে ওদের অনুরোধে ছুটে গিয়ে কিনে আনে ছোটো টুক্‌রীভরা রাস্‌পবেরী। প্লাষ্টার অফ প্যারিস করা এক জন হাসি-খুসী ক্যাপ্টেন ভাগ করতে বসে ফলগুলো। লেনার ভাগে পড়ে এক-ঠোঙা ভর্ত্তি ফল।

খাবার সময় লেনা আবার আসে গ্লাসকভের কাছে।

—"একটু কিছু খাও, এই ছাখো তোমার জন্যে আলাদা করে করা টমাটো দিয়ে রান্না মাংস, ও-বেলা কেক দোবো। একটু খাও, খেতেই হবে. কিছুতেই শুনবো না—"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, খাবো। হোলো তো ?"—এক টুক্‌রো টমাটো মুখে ফেলে অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠে গ্লাসকভ—"কিন্তু তুমি একটু থাকো এখানে. চলে যাবে না বলো—তুমি খালি পালিয়ে যাও। যদি তুমি এখানে থাকো তাহলে খাবো—"

—"আচ্ছা, এই তো বস্‌ছি আমি"—লেনা পাশে বসে পড়ে। একটু পরে বলে ওঠে,—"কই, কিছু খাচ্ছো না তো ? কেবল খাওয়ার ভান করা হোচ্ছে ? বল্‌ছি শোনো···খেতেই হবে তোমাকে।"

—"অর্থাৎ বাঁচতেই হবে আমাকে ? তাই না ?"

—"নিশ্চয়ই, বাঁচতেই হবে তো।"

—"মিথ্যে বলেছিলাম বোনের কথা—" গ্লাসকভ বলে ওঠে—"সে আমার বোন নয়। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম—দু'জনে মিলে ঘর বাঁধবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আজ···ঘর সে বাঁধবে, কিন্তু আর আমাকে নিয়ে নয়···আমাদের দু'জনকার সেই স্বপ্ন-নীড়ে আমার আর ঠাঁই হবে না···চুলোয় যাক্ সে সব···হ্যাঁ, কি বলছিলে···টমাটো দিয়ে মাংস ?···ইচ্ছে করে তুমি খাও। আমার দরকার নেই কিছু—"

—"কি করে এখনি তুমি জানছো যে সে আর কাউকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে ?" লেনা বলে।

—"বাঁধুক আর নাই বাঁধুক, আমার কাছে সবাই সমান। আমি আর ফিরে যাচ্ছি না।"—দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে—"একটা বিকলাঙ্গ, কুৎসিত···খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোবে···উঃ ভাবতে পারি না আমি। না, আমি মার কাছে যাবো—দু'জনে মিলে অন্য কোথাও চলে যাবো। মায়েরাই শুধু পারে···"

—"কুৎসিত, কখনই না"—লেনা স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে আর বলে—"আমি তো ভাবতেই পারি না যে কুৎসিত লাগবে। মার কাছেই হোক আর যারই কাছে হোক তুমি ঠিক আগের মতই প্রিয় থাকবে। আর যদি সত্যিই জানতে চাও তো বলি, যতটা খারাপ তুমি নিজেকে ভাবছো, ততটা খারাপ কিছু হয়নি। এখনও তুমি কাজ-কর্ম্মও করতে পারবে, শিখতে পারবে, বিয়েও করতে পারো—সারা জীবন তো তোমার সামনে পড়ে রয়েছে। খোঁড়াই বা হবে কেন ? আজকাল তো চমৎকার নকল পা তৈরী হয়—তার উপর বুট পরলে কিছু বোঝা যাবে ভাবছো ?···কিছুই বোঝা যাবে না···"

গ্লাসকভ চোখ দু'টি বুজিয়ে চুপ-চাপ পড়ে থাকে। লেনা উঠে পড়ে চলে যায় একেবারে কামরার শেষ দিকে। না গিয়ে যে উপায় নেই···হঠাৎ কেন ওর মনে হোলো গ্লাসকভের মাথাটিতে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে.—এক খানি নরম হাতের ছোঁয়া দিতে ওর কপালে···তামাটে মুখের উপর ঠিক দাস্তার মতই শুভ্র মসৃণ কপাল···দাস্তা···।

প্রচণ্ড গরমে জ্বলে জ্বলে শেষ হোয়ে এলো দিনটা। শেষ হোয়ে এলো সারা দিনের কাজ—খাওয়ানো, অষুধ দেওয়া, রাতের বিছানা ঠিক করে দেওয়া। শেষ বারের মত অল্‌গা সব কিছু দেখে গেলো। যাবার আগে সব আলো নিবিয়ে দিলে—শুধু রাতের নার্সটির টেবিলে জ্বলতে লাগলো একটি শুধু ম্লান আলো···সেই আলোয় নিঃশব্দে যাতায়াত করতে লাগলো লেনা। বেশ বড় আর আরামের এই কামরাটা, যদি ঐ উপরে ঝোলানো দ্বিতীয় থাকের বিছানাগুলো এদিকে দশটা ওদিকে দশটা, ওপরে পাঁচটা নীচে পাঁচটা করে না থাকতো, তবে তো সাধারণ হাসপাতালের ওয়ার্ডের সঙ্গে কোনোই তফাৎ থাকতো না। নীল আলোর ম্লান আলো এসে পড়ে ঘুমন্ত সৈন্যদের মুখে—বালিসের কোলে শ্রান্ত মাথাগুলি এলানো, গভীর ঘুমে চোখ-দুটির সঙ্গে ঠোঁট দুটিও বোজা। শুধু ঘুম নেই গ্লাসকভের চোখে···যত বার লেনা ওর পাশ দিয়ে গেছে দেখেছে ম্লান আলোয় জ্বলছে এক জোড়া চোখ···

ইচ্ছে হোলো লেনার—কথা বলে ওর সঙ্গে, কিন্তু কেন আসে অকারণ আশঙ্কা ? কেন এত ইচ্ছে করে ঐ তামাটে মুখের শুভ্র কপালটিতে আলতো ভাবে ছোঁয়া দিতে নরম একখানি হাতের ?

—"না, না, ওর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়"—আপন মনে বলে লেনা—"আমি শুধু ছোটো বোনটির মতই ওকে সান্ত্বনা দিতে চাই···ও-যে···ও-যে দাস্তার মত দেখতে···

—"আমি যাবো ওর কাছে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো···একবারটি শুধু···কী-ই বা এমন হবে তাতে···শুধু একটু···যাই হোক্ না কেন, আমি তো আর ওকে ভালোবাসছি না। একটুও না—কালই যদি ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাতেই বা আমার কী এমন এসে গেলো···"

সে কথা সত্যিই।

—"আমি যাবো, যাবো ওর কাছে। কী কালো চোখ ওর···

কত শান্ত সুরে কথা বলে। আমি বন্ধুর মত কোমল ভাবে মিশবো ওর সঙ্গে—আহা, তা'হলে হয়ত ও নিজেও বন্ধুর মত আমার কাছে জানাতে পারবে ওর দুঃখ-বেদনা। এখনি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবো, কথায়-কথায় ওর মনকে ভুলিয়ে রাখবো যত সব দুশ্চিন্তা থেকে···আর···আর ওর কপালে যদি হাতখানা রাখি তাতেই বা ক্ষতি কি···ঠিক ছোটো বোনটির মতো···"

এগিয়ে যায় গ্লাসকভের কাছে। কিন্তু গ্লাসকভ তখন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখের উপর গভীর বেদনার ছাপ—শিশুর মত শান্ত মৃদু নিঃশ্বাস।

লেনা দাঁড়িয়ে থাকে, জোর করে মনে করে—'ভালোই হোয়েছে, ঘুমিয়ে পড়াতে', কিন্তু মনের গভীরে একটা আঘাত একটা বেদনার অনুভূতি তবু জেগে থাকে।

হঠাৎ ফোঁপানোর শব্দ—গ্লাসকভ ফোঁপাচ্ছে, হয়তো ঘুমের আগে কাঁদছিলো। ওর সেই কান্না লেনার চোখে পড়েনি।•

গ্রীষ্মের ছোটো রাত শেষ হোয়ে আসে—ভোরের আলো এসে পড়ে।

—"না, না—না, আমি কাউকে দেখাবো না এতটুকু কোমলতা, দেবো না একটুও দরদী মনের ছোঁয়া···শুধু এক জন ছাড়া—সারা দুনিয়ায় সেই একটিকে ছাড়া···সে দাস্কা, সে আমার স্বামী, আমার কাছে বিদায় নিয়ে সে যুদ্ধে গেছে···রেখে গেছে তার বুকভরা ভালোবাসা আমারি কাছে···দাস্কা, একটুও ভেব না, এমনি করেই তুমি বিশ্বাস রেখো তোমার লেনার উপর···দাস্কা, প্রিয় আমার, সারা দুনিয়ার আমার সব চাওয়া গিয়ে মিলেছে তোমাতে। ওখানে যে শুয়ে আছে সে তো আমারি একটি ভাই···আমার হাজার হাজার ভায়েরা আজ এমনি করে জীবন পণ করে লড়ছে···কিন্তু দাস্কা, বলো তো কেন এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত আঘাত কেন··· কেন এই সব—জীবন যখন এমন সুন্দর, মধুর স্বপ্নভরা···"

—"মিষ্টার"—দূর থেকে ডাক এলো।

—"এই যে এখনি আসছি"—দ্রুত লঘু ছন্দে এগিয়ে গেল লেনা।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

'দীঘা'য় সাত দিন

শ্রীঅপর্ণা বিশ্বাস

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠিক সাড়ে আটটা। বাবা তো কখন থেকেই তাড়া দিচ্ছেন।—"তোরা এক্ষুণি রওনা হ', তা না হলে মুস্কিলে পড়বি। 'বাচ্চা' যাক্ তোদের নিয়ে।"

মাসতুতো ভাই বাচ্চাদার সঙ্গে আমরা হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম। হাতে ছোট টুকিটাকি স্যুটকেশ, ব্যাগ। প্ল্যাটফরম্-এ এসে দেখি মামীমাও এসে পৌচেছেন। যাক্, এতক্ষণে তবে দলটা সম্পূর্ণ হলো—জনা কুড়ি লোক আর মোটঘাট নিয়ে আরও কুড়িটা।

তিনটি কামরায় ভাগাভাগি করে তো উঠে পড়লাম। সমস্ত জিনিষপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে মামীমা ব্যস্ত হয়ে হাণ্ডব্যাগটা খুলে দেখে নিলেন খাম-পোষ্টকার্ডগুলো ঠিক আছে কি না। ননদের দিকে ফিরে বললেন,—"বুঝলে ভাই মেজদি, বাবা বার বার করে বলে দিয়েছেন পৌছেই চিঠি দিতে।"

—"হ্যা গো, তোমায় আবার চিঠি দিতে হবে না কি ?" মামীমা দুষ্টামী ভরা হাসি হেসে চাইলেন মামার দিকে।

হায় রে! তখন কে জানতো—এমন এক জায়গায় তিনি চলেছেন যেখানে পোষ্টবাক্সের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

যাক্, পুরী প্যাসেঞ্জার তো ছাড়লো।

তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ মোছেনি···মাসিমণি হঠাৎ ডেকে বললে, "বাবুল, শুনছিস্ কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে? দেখ তো আমরা কোন ষ্টেশনে?"

কান পেতে শুনি কে যেন ভারী মিষ্টি সুর ধরেছে বাঁশিতে— "জাগরণে যার বিভাবরী, আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি।"

জানালাটা খুলেই দেখি, বাবা!

—"পরের ষ্টেশনেই আমরা নামবো। ঠিক হয়ে নে। বেশীক্ষণ কিন্তু ট্রেণ থামছে না।" আবার বাঁশিতে সুর ধরে তিনি ফিরে চললেন রাণী-পিসীমাদের কাছে। তাদের কাছেও তো এই খবর দিতে হবে।

তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে যখন আমরা কণ্টাই রোডে এসে পা দিলাম। ৩৬ মাইল বাসে এলাম কাঁথিতে। ডাক-বাংলোতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বাস ধরলাম। বেলা দশটা নাগাদ এসে পৌছলাম দীঘায়—কাঁথি থেকে ২২ মাইল দূরে। ফরেষ্ট-ডাক-বাংলোতে উঠবার বন্দোবস্ত ঠিক করা ছিল। অপূর্ব্ব সুন্দর ছোট্ট একটি ডাক-বাংলো ঝাউ আর কাজু বাদামের নিবিড় বনের মাঝে। মনে আছে, এক দিন যখন আকাশ ছেয়ে আসা প্রথম বর্ষার জলভরা কালো মেঘের পটভূমিকায় ঐ ডাক-বাংলোটিকে দেখে বাচ্চাদা আনন্দের সঙ্গে বলে উঠেছিল—"ঠিক মনে হয় a house of ivory!"

Byron-এর একটি কবিতার চারটি পংক্তি; যাদের মনে পড়েছে বারে বারে, শত-সহস্র কাজে আর হাসি-গল্পের মাঝে। আর প্রত্যেক বারই মনে জাগিয়ে তুলেছে অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ ঐ জায়গাটাকে ঘিরে।

"There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is a society where none intrudes,
By the deep sea and music in its roar."

চমৎকার সাজানো ঘর তিনখানি। রান্না-ঘর অবশ্য একটু দূরে। কোন কিছুরই অসুবিধা নেই। দিনে সূর্য্যের আর রাতে চাঁদের আলোয় আর সমুদ্রের পাগল-করা বাতাসে দিন কেটে গেছে আনন্দে—শান্তিতে।

খাওয়া-দাওয়া? যাকে বলে রাজসিক! মাছ নানা রকমের; মুরগী, শাক-সব্জী, দুধ অপর্য্যাপ্ত ভাবে পাওয়া যায়, আর কি সস্তা! মা তো হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তবে জোগাড় করা খুবই মুস্কিল— বহু দূরের এদিক-ওদিক গ্রাম থেকে সংগ্রহ করতে হতো।

সকালে চা'র পর্ব্ব শেষ হতে না হতেই আমাদের স্নানযাত্রা হতো সুরু। ঝাউ বনের মাঝ দিয়ে, বালুর পাহাড় পার হয়ে এসে পৌছাতাম সমুদ্রে। নির্জ্জন তীর—যত দূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র আর আকাশ। দূরে—বহু দূরে সমুদ্র আর আকাশ

একাকার হয়ে মিশে গেছে। তীরের কাছাকাছি অশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাসের যেন সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটার পর একটা ঢেউ উঠছে আর সগর্জ্জনে আছড়ে পড়ছে সোনালী বালুর উপর। ছড়িয়ে পড়ছে ফেনার রাশি—যত দূর চোখ যায় তীর ঘেঁষে—শুধু ভেঙ্গে পড়া ঢেউএর ফেনায় ফেনায় সে তীরের কিনারা সাদা। জল আবার পরমুহূর্ত্তেই যাচ্ছে সরে—বালির বুকে ছড়িয়ে পড়া ঝিনুক তুলতে এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে ছোট ভাই-বোনগুলো।

ঢেউএর উপর গা ভাসিয়ে সাঁতার দিত বাবা আর বাচ্চাদা। আমরা হাত-ধরাধরি করে ঢেউএর দোলা খেতে নামতাম। আর সেই সঙ্গে সুরু হতো নানা রকমের গল্প। শ্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণ পরেই তীরে এসে পড়তাম শুয়ে বালুর উপর—সামনের চঞ্চল সমুদ্র আর উদার শান্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হতো বুঝি এই দিনগুলো সত্যিই সোনায় মোড়া। মাঝে-মাঝে বড় বড় ঢেউ এসে আমাদের দিত ভিজিয়ে—কখনও বা তার ধাক্কায় গড়াতে গড়াতে রওনা দিতে হতো সমুদ্রের বুকে। এক দিন তো কমলার একটু হলে হয়েছিল আর কি! ঢেউএর টানে বেশ কিছু দূর গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে তলিয়ে গেল—আমরা তো ভয়ে দিশেহারা। শেষকালে যখন কোনও রকমে উদ্ধার করা হলো তখন দেখি—বালির ঘষায় পা দু'টো ক্ষত-বিক্ষত।

ঘণ্টা তিনেক পর ভিজে শাড়ী নিংড়ে নিয়ে, মাথার উপর ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে দল বেঁধে ফিরে চল্‌তাম বাড়ীর দিকে। এক দিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ প্রথম বর্ষায় ফোটা কেয়া ফুলের তীব্র মিষ্টি মন-মাতানো গন্ধে থমকে দাঁড়ালাম। কে জানে কোথায় সে ফুটেছে? অনেক খোঁজা-খুঁজির পর তো দেখতে পেলাম দুটো কেয়া ফুল ফুটেছে কাঁটা ঝোঁপের মাথায়। কি করে তোলা যায়? অনেক আলোচনা অনেক বুদ্ধির লড়াই-এর পর একটা ঝড়ঝড়ে রোদে পোড়া, জলে ভেজা মই তো নিয়ে আসা হলো। রাণুও এদিকে বঁটি নিয়ে প্রস্তুত। আমরা দল বেঁধে উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষারতা। এক পা, দুই পা করে বাবা তো ধীরে ধীরে উঠেছেন একেবারে ফুলের কাছাকাছি—এমন সময় মট মট মটাস্‌! মইটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো ভেঙ্গে। আর বাবা? একেবারে সেই কাঁটা বনের ভিতরে। শুনেছিলাম কেয়া-বনগুলো নাকি বিষাক্ত সাপের আড্ডাখানা। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম অসংখ্য সাপ বাবার পা জড়িয়ে আছে। অবশ্য পরে অনেক কষ্টে ফুল দু'টো পাড়া সম্ভব হয়েছিল।

···বাড়ী ফিরে এসে আবার তো করতে হতো স্নান। তাস খেলতে যেতাম সামনের ঐ টিলাটার উপর। নিবিড় ঝাউ বনের মাঝে। গাছের পাতা অবিরাম ঝরে-ঝরে নরম করে তুলেছে নীচের মাটিটাকে। ডালের ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়তো সূর্য্যের আলো আমাদের উপর। সামনেই উদার বিস্তৃত অশান্ত জলরাশি, ঢেউএর মাতামাতি, নীল সমুদ্রের সোনালী বালুর তীর—যেন কোন সুন্দরীর শাড়ীর আঁচল। বেবিদি তো তার কবিতা রচনার যথার্থ স্থান খুঁজে পেলো! অবশ্য শুধু সে একা নয়—মামীমা, মেজ-পিসীমা আর বাপ্পিও বাদ যেতো না। শুধু এবার অবাক হলাম মাসতুতো বোন কমলাকে দেখে। এক দিনও বসেনি কিছু লিখতে—বোধ হয় আই-এর ফলাফলের দিন খুব সামনে বলেই।

······শুক্ল পক্ষ থাকাতে আমরা প্রায় সন্ধ্যায় যেতাম জনহীন সমুদ্রতীরে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে। হু-হু করে বইছে হাওয়া—শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ভেঙ্গে-পড়া সমুদ্রের ঢেউএর মাঝে পা ভিজিয়ে ভিজিয়ে চলতাম, অন্ধকার নামতো নির্জ্জন সমুদ্র-তীর ঘিরে। মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ কখন উঠতো চাঁদ—আকাশ ছেয়ে পড়তো তার আলো সমুদ্রের বুকে—বালুর তীরে। দূরের ঢেউগুলো জ্যোৎস্নায় ঝলমলিয়ে উঠতো। এই আনন্দ-পূর্ণিমার রাতগুলো যেন পৃথিবীর বুকেই নামিয়ে আনতো স্বপ্নের রাজ্য—রূপকথার ঘুমের দেশ!

স্নেথ, সাহেবের বাড়ী তীর থেকে একটু দূরে। বাড়ী না প্রাসাদ! বহু দিন মনে হয়েছে বুঝি পথ-চলতি এক টুকরো সাদা মেঘ ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ঐ ঝাউ বনের মাঝে। বেড়াতে গিয়ে দেখি, চমৎকার সাজানো ঘর-দুয়ার। টলমল করছে পুকুরের জল আর তাতে পদ্ম ফুল। শুনেছি, সাহেব নাকি মাঝে-সাঁঝে এরোপ্লেনে এসে নামেন এই সমুদ্র-তীরে। থাকেন দুই-চার দিন—আবার ফিরে যান কর্ম্মক্ষেত্রে। বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে।

বাড়ী ফিরে বসতো তাসের আড্ডা। অনেক রাতে ভূতের অলৌকিক রহস্যময় গল্প উঠতো জমে। ছোট্ট বারান্দায় সব গা ঘেঁষে বসতাম—কে জানে কখন প্রেতের স্পর্শ পেতে হয়! ছমছম্ করে উঠতো গা—বাইরের নিবিড় ঐ ঝাউ বনটার দিকে তাকিয়ে। ঝাউ বনের মাথায় তখন চাঁদ। পাগল-করা সমুদ্রের বাতাসে বনের ভেতর থেকে কেমন যেন শোঁ-শোঁ শব্দ পেতাম শুনতে। দূরের সমুদ্র আর বালুর পাহাড় ঝক্‌ঝক্ করে উঠতো চাঁদের আলোয়। হঠাৎ কখন যেন কথা যেতো থেমে—দূর হতে বাতাসে ভেসে আসা অস্পষ্ট সমুদ্রের কল-কল্লোল ধ্বনির সুর আর ঐ শান্ত-স্নিগ্ধ মন-ভরানো নিবিড় রহস্যময় আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে হতো, এমন সব রাত জীবনে আর ক'বার আসবে ফিরে?

বারে বারে মনে হয়, 'দীঘা'য় যাওয়া আমাদের সত্যিই সার্থক হয়েছে। বাঁধা-ধরা ক'লকাতার নাগরিক-জীবনের গণ্ডী ছাড়িয়ে খুসীর আমেজে নিজেদের ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম। মহানগরী থেকে মোটে শ'দেড়েক মাইল, কিন্তু মনে হয় বুঝি বা বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পেছনে। পৃথিবীর কত বিস্ময়কর ঘটনাই না ঘটে গেল এই সাত দিনে! তেনসিং-হিলারীর এভারেষ্ট বিজয়—রাণী এলিজাবেথের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন পরিচ্ছেদের সুরু—অথচ আমরা পারলাম না কিছুই জানতে। না আছে খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিফোন—না আছে পোষ্ট অফিস, থানা। সমুদ্র আর আকাশ—এই দুই বিরাট পট-ভূমিকার মধ্যে মনকে করে তুলেছিল পরিব্যাপ্ত—কল্পনাতে লেগেছিল প্রাণবন্ত সৃষ্টির উন্মাদনা। অলৌকিক কিছু ঘটা, উত্তেজক কিছু ঘটনা, তার চমকপ্রদ বর্ণনা—সে তো নেহাতই স্থূল; তার চমক, সে তো কেবল সৃষ্টি করে মোহ। কিন্তু এই আকাশ, এই বাতাস, এই ফুল, ফল, মাটি যখন তার অন্তরের রহস্যটুকু উদ্‌ঘাটন করে আমাদের চেতনায়—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে এনে দেয় সতেজ নবীনতা, কল্পনার সুমহান্ প্রকাশের পথ করে দেয় প্রশস্ত—সেটাই হয়ে ওঠে চরম পাওয়া। জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আসে দৃঢ়তা।

জননী সারদামণি

শ্রীসংযুক্তা কর

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মাতৃ রূপটি বড় মধুর। সুদূর অতীতে কবে কোন দেশ হতে, কোন সমাজ হতে মাতৃ-প্রধান সমাজের আলো এ দেশে প্রথম এসেছিল সে প্রশ্ন গবেষণাগারের জন্য তোলা থাক্। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের সব জটিলতাকে ছাপিয়ে যেটি আজ আমাদের হৃদয়-মন হরণ করে সেটি ভারতের মাতৃ-সাধনার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। আমরা দেশকে জননী বলে ভালবেসেছি, প্রকৃতিকে মাতৃরূপে জড়িয়ে ধরেছি। নারীত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছি মাতৃত্বে। যুগে যুগে কত সাধকের অশ্রুজল মাতৃ-নামে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। কত আকুল নিঃশ্বাস মিশে আছে ভক্তির বাতাসে। এই মাতৃ-মহিমার এক দিকে আছে প্রেম, অন্য দিকে সেবা; এক দিকে ধৈর্য্য, অন্য দিকে সহিষ্ণুতা; এক দিকে ত্যাগ, অন্য দিকে ক্ষমা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী শ্রীসারদামণি দেবীর জবীনে এই পরিপূর্ণ মাতৃ-রূপটির প্রকাশ আমাদের চোখে পড়ে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীব ঘরণীকে ছাপিয়ে তাঁর যে রূপ আপন গৌরবে বিকশিত হয়ে উঠেছে সেটি তাঁর মাতৃত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত তাঁর পরিচয় এক দিকে না থাকলেও তাঁর স্বতন্ত্র গৌরব নিশ্চয়ই আছে। দূরের সূর্য্য অনেক বড়—চোখ ধাঁধান তার তেজ। সাধারণ চোখ তাকে সহ্য করতে পারে না। ছোট্ট জলের আধারে বন্দী করে আমরা তাকে কাছে পাই। বড় চরিত্রকে দেবতা বলে তুলে ধরলে পূজার আসনে তাকে বসিয়ে ফুল-চন্দন দিতে পারি বটে, কিন্তু সখা বলে দু'হাত ধরি নে। পারিও নে। তাই আমাদেরই সাধারণ মানবীয় ভূমিতে তাকে বিচার করলে তাঁর মহত্ত্বটুকু আমাদের সাধারণ হৃদয়ের জালে ছেঁকে তুলতে পারি।

যে অরুণের উদয়-রাগে ফুল জাগে না, গন্ধ ছোটে না, পাখী গান করে না, তৃণে-তৃণে শিশির ঝলমল্ করে না, তাকে অরুণোদয় না বলাই ভাল। সেটা তার আভাস মাত্র। কাক-জ্যোৎস্নাও হতে পারে। জীবনের প্রথম প্রভাতেই মহান্ চরিত্র তার মহান্ পটভূমিকা রচনা করে। তার স্নিগ্ধ প্রভায় চার দিক আলোকিত করে। যে পটভূমিকাতে শ্রীসারদামণি দেবীর জীবন-গাথা তার প্রথম যবনিকা তুলে ধরেছিল—সেটি অখ্যাত এক পল্লীর আঙিনা। অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অন্ধতাই যার প্রধান পরিচয়। কিন্তু অন্ধকার থাকে বলেই ত রাত্রির তপস্যাকে সার্থক করে আসে আলোর প্রসাদ।

শুনেছি, শিশুকালে গ্রামের এক ভক্ত ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী পূজার দিন প্রতিমার পাশে বসা তন্ময়-চিত্ত সারদামণির মুখে দেবীর সাদৃশ্য দেখে আকুল হয়ে পড়েছিলেন। বিস্ময়ে তাঁর চিত্ত সেদিন বাঁধ মানেনি। বাইরের রূপের বিচারে যিনি রূপসী ছিলেন না, কোন্ অরূপের রূপে তিনি রূপসী ছিলেন কে জানে? তাঁর ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে কোন্ বিশ্বজননী আপন স্থান নিয়েছিলেন? কেন? এর মীমাংসাই বা কে করেছে? পৌষ-লক্ষ্মী পূজার দিন কোন্ বিশ্বলক্ষ্মী এসে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বন্ধন গ্রহণ করেছিলেন—ভক্তিশাস্ত্রে তার নজীর মিলবে। আধুনিক যুগের সন্দেহী আমরা। জ্ঞানমার্গের বিচারই আমাদের কাছে লোভনীয়। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানের বিচারের ভূমিকাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ঘরণী সারদামণি দেবীর যে জীবন-কাব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার 'রেণাশাঁ' বা পুনরুজ্জীবন যুগ বলা যায়। এই যুগে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-সংস্কার এই তিন ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ বিপ্লব এসেছে। এর সঙ্গে নারীর আত্ম-জাগৃতির বিপ্লব কাহিনীও বিশেষ ভাবে জড়িত। তথাপি এ কথা বলতে দ্বিধা নেই—তখনকার প্রগতিশীল নারী-সমাজের প্রত্যহের আটপৌরে জীবনের সঙ্গে এ দেশের—ভারতের চিরকালের বাঞ্ছিত যে মাতৃ-রূপ সেটির কোনো আত্মিক যোগ ছিল না। নারীর স্বাধিকার বিপ্লবের যাঁরা ছিলেন পুরোধা তাঁরা যেন অন্য ধাঁচে গড়া—অন্য সুরে সাধা। তাই ভারতের চিরন্তন নারীরূপটি যিনি আপন জীবনের মাঝে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ গৌরবে তুলে ধরলেন—তিনি শ্রীসারদামণি। তথাকথিত 'কালচার' বা শিক্ষার জৌলুস তাঁর ছিল না। কিন্তু সব জাতি, দেশ ও সংস্কারের ঊর্দ্ধে তাঁর জীবনের অপরূপ ধারা কুসুমিত হয়েছিল। তাই তাঁর কন্যা-রূপের ও জায়া-রূপের পরিচয়কে ছাপিয়ে জননী-রূপের পরিচয় বহু ঊর্দ্ধে উঠেছিল। তাঁর জীবনের এই যে বৈপ্লবিক রূপ—এটি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, কিন্তু অতি সত্য।

পাখী ডাকা, ছায়ায় ঘেরা গ্রাম জয়রামবাটি। শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ। ঘোমটার আড়ালে পথ দেখে বধূরা জল আনে, পালে-পার্ব্বণে যাত্রা বসে হয়ত, মুখর হয় শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যার তুলসী-মঞ্চ। অসুখে-বিসুখে তারা মানত করে, মাদুলী পরে। মাঠে-মাঠে চাষ করে তারা, ধান ঝেড়ে তোলে মড়াই-এ! বর্ণ ও শ্রেণীর বিচারে উদ্যত তাদের তর্জ্জনী। এই ত পরিবেশ! এরই মধ্যে বাস করতেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখুয্যে। আর তাঁর কন্যা সারদা। সকলের মধ্যে থেকেও স্বাতন্ত্র্য তাঁদের ছিল। কিন্তু ইতিহাস এখানে নীরব। কে-ই বা লক্ষ্য করেছে—দৈনন্দিন কাহিনীর মাধুর্য্য লিখেই বা রেখেছে কে? তবু সেই মুছে যাওয়া দিনগুলির মধ্য হ'তেও যে দু' একটি অক্ষর ভেসে আসে তার তাৎপর্য্য অতি গভীর।

দেশে অজন্মা হ'ল সেবার। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া পড়ল দ্বারে-দ্বারে। গরীব চাষীর দেশ, হাহাকারে ভরে গেল চারি দিক। বৌ ছেলে মেয়ের হাত ধরে পথে পথে তাঁরা কেঁদে ফিরতে লাগল। রামচন্দ্র মুখুয্যে তাঁর দরজা খুলে দিলেন। হাঁড়ি ভর্ত্তি খিচুড়ি বিলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। ফুটন্ত সেই খিচুড়ির সামনে ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণের দল বসে গেল আকুল আগ্রহে। কোথা হ'তে ছুটে এলেন সারদামণি। হাতে তার পাখা। দু'হাতে ধরে সজোরে বাতাস করতে থাকেন। আহা! গরমে হাত পুড়ে যাবে! ক্ষুধিতের দল অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে রইল। কে এই করুণাময়ী জননী! অথচ তখন কতই বা তাঁর বয়স—বড় জোর চার কি পাঁচ!

প্রথম বার স্বামী-সন্দর্শনে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে যাবার সময় সেই ডাকাত বাগদী ও বাগদিনীর গল্প আজ সর্ব্বজন-সুবিদিত।—সেই সূর্য্য-ডোবা আঁধারে কুখ্যাত তেলেভেলোর প্রান্তর, সেই পথ-শ্রান্ত সারদামণির নিশুতি রাত্রে পথ হারিয়ে যাওয়া, সেই অন্তরের নিভৃত

পরশমণির স্পর্শে ডাকাত-দম্পতীর নবজন্ম লাভ। শুনেছি, প্রেমে পাষাণ গলে। কিন্তু পাষাণের চাইতেও কঠিন বুঝি মানুষের হৃদয়—যে হৃদয় হত্যায় নিষ্ঠুর, লোভে নির্মম। সে রাতে সারদামণির নিঃসঙ্কোচ স্নেহ-ঝরা আবেদনে ডাকাত-দম্পতীর হৃদয় যেন হাহাকার করে উঠেছিল। কত দিন পরে যেন প্রিয়জনের আকুল সম্ভাষণে অশ্রুর জোয়ার উথলে উঠেছিল তাদের বুকে। বুকে জড়িয়ে সারদামণিকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল তারা। পরদিন বহু দূর পর্য্যন্ত তারা তাঁকে এগিয়ে দিল। পথের পাশের মটর ক্ষেত হতে কড়াইশুঁটি তুলে আঁচলে বেঁধে দিল তাঁর। বিদায়ের মুহূর্ত্তে কান্নায় তারা ভেঙে পড়েছিল। সব চাইতে আশ্চর্য্যের কথা, সে রাতের পর দস্যু-বৃত্তিই তারা ছেড়ে দিয়েছিল। সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকায় এ ঘটনাটি শুধু চমকপ্রদ নয়, বৈপ্লবিক। সারদামণির অন্তরের কোন্ বিশ্বজননীর স্পর্শে পাষাণ গলে ঝরেছিল পবিত্র স্বচ্ছ ফল্গুধারা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পর সারদামণি দেবী সংঘ-জননী হয়েছিলেন। কিন্তু কিসের অধিকারে? শুধুই কি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নীত্বের দাবী? শিশুকাল হ'তে যে অন্তরবাসিনী জননী তাঁর জীবনে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াতল সৃজন করেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তারই পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখেছি তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে। এরই অধিকার তাঁকে দিয়েছে শত শত গৃহী ও সন্ন্যাসীর মাতৃ-পদের গৌরব। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যে-বার পাশ্চাত্য দেশে যান, শুভার্থী বন্ধু, অনুরাগী ভক্তের শত অনুরোধেও মন সম্পূর্ণরূপে স্থির করতে পারেননি। কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর আশীর্ব্বাদী চিঠিখানা পেয়েই চিত্তের সব দ্বিধা, সব সংশয় তিনি নিঃশেষে মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু শুধু স্নেহের সন্তানের প্রতিই নয়, অবজ্ঞাত সমাজের ঘৃণিত সন্তানের প্রতিও তাঁর মাতৃপ্রেম নিত্য উৎসারিত হত। জয়রামবাটির পাশের গ্রামে এক দল মুসলমানের বাস ছিল। পূর্ব্বে নীল চাষের আমলে তারা ছিল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত। সমাজ তাদের বিশ্বাস করত না—সমাদর ত দূরের কথা। ঘরামির কাজ ছিল তাদের জীবিকা। নিতান্তই হীনবৃত্তির অন্ত্যজ শ্রেণী। তথাপি শ্রীসারদাদেবীর উপর তাদের অগাধ দাবী—অসীম নিষ্কপট তাদের দরদ। সন্তান-স্নেহে শ্রীসারদামণির হৃদয়ও নিত্যমুক্ত। শঙ্কিত হতেন সারদাদেবীর পরিজন। হোক না শান্ত, হোক্ না গরীব ঘরামি—তবুও ওদের রক্তে ডাকাতের নির্মম হিংসার বীজ লুকিয়ে আছে কি না কে জানে? কর্ণপাত করতেন না সারদাদেবী। অন্যের অবিশ্বাসে ও ঘৃণায় তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য যেন আরো উথলে উঠত—উদ্বেল হ'ত। পরম আদরে তিনি নিমন্ত্রণ করতেন তাদের। একটি ঘটনা বলি—ক্ষুদ্র জলবিন্দু, কিন্তু জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের প্রকাশ তাতে। সেই মুসলমান এক চাষীকে নিমন্ত্রণ করেছেন সারদাদেবী। লৌকিক প্রথা মত উঠানে পাতা পেতে পরিবেশন করছেন তাঁর এক আত্মীয়া। তবু অশুচি অস্পৃশ্যের ছোঁয়া বাঁচান চাই। তাই দূর হতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাতায় তরকারি দিচ্ছেন আত্মীয়াটি। সারদাদেবী দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এলেন। পরিবেশনকারিণীর হাত হতে থালা নিয়ে পরম যত্নভরে পরিবেশন করতে লাগলেন। আত্মীয়াটি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—করছ কি গো? ও যে মুসলমান! আর তুমি হিন্দু-বিধবা! প্রতিবাদ করলেন সারদাদেবী—হলেই বা। শরৎ আমার যে আমজাদও আমার সে। এক দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান, অন্য দিকে অখ্যাত, ঘৃণিত মুসলমান চাষী! কিন্তু মাতৃ হৃদয়ের বিচারে দুই-ই সমান।

এরই পাশাপাশি আরো একটি ঘটনা আমাদের মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য দেশ হ'তে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে কয়েক জন বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যাও এসেছিলেন। সকলের দুর্ভাবনা—এই শিষ্যারা কোথায় থাকবেন। সমাদৃতা হবেন কি না? স্বামীজি কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে সারদাদেবীর কাছে সঁপে দিয়ে এলেন তাঁদের। পরম সমাদরে তাদের গ্রহণ করলেন সারদাদেবী। প্রত্যেকের সাথে আলাপ করলেন। এক পংক্তিতে বসে তাদের মাঝে আহার করলেন। অনেকে বিস্মিত হলেন এতে। ওরা ম্লেচ্ছ যে! হাসলেন সারদাদেবী—হলেই বা! ওরা যে নরেনের সন্তান। নানা 'বাদ'পূর্ণ বর্ত্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা দু'টিকে অসাধারণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু সারদাদেবীর যুগে অতি নিষ্ঠাবতী, ব্রাহ্মণী, শুদ্ধাচারিণী, গুরুপদবৃতা রমণীর পক্ষে এ ঘটনা শুধু অলোকসাধারণ নয়। চূড়ান্ত বৈপ্লবিক।

অদ্ভুত তপস্বিনী অথচ প্রচ্ছন্না, জ্ঞানগৌরবে দীপ্তা অথচ কত সাধারণ, ত্যাগপূত চরিত্রা অথচ নিরহঙ্কারা সর্ব্বদেশকালজয়ী মানব-প্রেমে ধন্যা—এই হচ্ছেন সারদাদেবী। কত অগণিত তাপিত ভক্ত আকুল হৃদয়ে ছুটে এসেছেন। কত পথহারা হৃদয় তাদের পেয়েছে শান্তির আশ্রয়। পেয়েছে অভয় বাণী। শত-শত আপাত-তুচ্ছ ঘটনায়, দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খোলা পথে, সামান্যের প্রাঙ্গণে তাঁর অসামান্য জীবন-বাণী অপূর্ব্ব সৌরভ বিকীরণ করে গেছে। যাঁকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করেছিলেন, যাঁর পায়ে সর্ব্বকর্মফল বিসর্জন দিয়ে আপন সাধনার ইতি করেছিলেন তিনি, সেই মহাশক্তিস্বরূপিণী সারদাদেবী সংসারের শত তুচ্ছতার মাঝে আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ ভাবে কালযাপন করে গেছেন। সবার সাথে পান সেজে, তরকারি কুটে রান্না-ঘরের ব্যবস্থাপনায় তাঁর কল্যাণ-হস্ত দু'টি সদা ব্যস্ত থাকত। প্রত্যেকেরই জন্য তাঁর অন্তরের মঙ্গল-প্রদীপটি থাকত সদা জাগ্রত। বিশাল তাঁর মাতৃ-হৃদয় অসীম ক্ষমায় ছিল ধন্য। শেষ নিঃশ্বাসের সাথে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন শান্তির বীজমন্ত্র।—"যদি শান্তি চাও কারো দোষ দেখ না।" প্রতিটি ভক্তের খবর নিতেন তিনি। প্রতি সন্ন্যাসী-সন্তানের নিত্য সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি। প্রত্যেকের অমঙ্গলে শঙ্কিত হতেন। গভীর উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন হতেন। আবার তাদের সুখে তৃপ্ত হতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-লগ্নে তাঁর জন্ম। এ শতাব্দী পুনর্জাগরণের কাল। স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগ। এ অধ্যায়ে নারী-জগতের শিক্ষা-প্রগতি ও সামাজিক গৌরবের পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন চলেছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। কোথায় যেন বেসুর বীণার ছন্দপতন ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তখনই আবার নিভৃতে নীরবে অদৃশ্য ফল্গুর মত চলেছে অপর একটি ধারা। এই স্রোতস্বিনীর প্রাণশক্তি সারদাদেবী। এ সলিলে অবগাহন করে যে মাতৃরূপটি সমাজের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটিই ভারতের চিরন্তন আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষিত নারী-রূপ। এটি কন্যা নয়, জায়া নয়, সখী নয়। এটি সকল গণ্ডীর ঊর্দ্ধে চির সমুজ্জ্বল মাতৃত্ব!

সতী
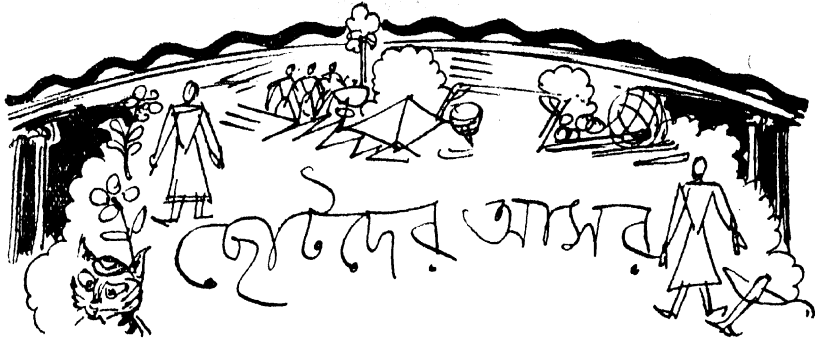
ইন্দিরা দেবী

অলকদের বাড়ীর সতী ঝি'কে কে না চেনে বলো!

ওমা! তোমরা নিশ্চয় চোখ বড় করে ভাবতে সুরু করে দিয়েছ—ঝি'টা তাহলে নিশ্চয়ই খুব দজ্জাল!

কিন্তু তা মোটেই না, বরং এত ভালো মানুষ যে, মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। তবে?

তবে কি, যাকে বলে বোকা, শুধু বোকা নয় 'রাম-বোকা'।

অলকের মা আগে তার বোকামীর কাজ-কর্ম্ম দেখে হাসতেন। বাড়ীর অন্য লোকেদের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে বলতেন: হোক, হোক, একটু বোকা-সোকা ভালো, কোলকাতার জল পেটে পড়লে চালাক হ'তে দেরী হবে না। যত দিন ভালো মানুষ আছে—ভালো করে কাজ করুক, কাজ তো কিছু আটকাচ্ছে না।

অলকদের ভাই-বোনের দল মায়ের আড়ালে সতীর কথা নিয়ে হাসাহাসি করে।

সতী সত্যিই ভালো মানুষ। বয়স হয়েছে—মাথায় গায়ে বেশ করে কাপড় টেনে সে চলা-ফেরা করে। মনে হয়, প্রথম সে সহরে এসেছে। বারান্দা দিয়ে অগণিত নানা প্রকারের যান-বাহন দেখে এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—হ্যাঁ মা, এত সব গাড়ী কোথায় যায়?

হাসি চেপে মা বললেন: যে যার কাজে যায়—আর কোথায় যাবে। যাও তো ও-ঘরে দাদাবাবুরা পড়ছে—এই দু'কাপ দুধ দিয়ে এসো।

কাপ দু'টো নামিয়ে দিল সতী—যেখানে অলক আর বুলু তারস্বরে স্কুলের পড়া মুখস্থ করছে।

—মা বলেছে দুধ খেয়ে কাঁপ খালি করে দাও—সতী বললে।

—কাঁপ কি? বুলু হাঁ করে সতীর দিকে তাকায়।

এতো দুধ এনেছি যাতে করে ঐ—ওর নাম কাঁপ। আচ্ছা দিদিমণি, ওটা কি বন্দুক?—দেয়ালে বুলুর সেতারটা গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছিল—সেটাকে দেখিয়ে সতী প্রশ্ন করলে।

ওরা ভাই-বোনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যখন হাসি চাপবার মতলব করছে, তখন সতী আপন মনে বলেই চলেছে—আমাদের দেশে জমিদার বাবুদের একটা বন্দুক আছে এই রকম, সেটা দিয়ে একটা চিতাবাঘ মেরেছিল—মরা বাঘ দেখতে গাঁয়ের সবাই গেল।

—বন্দুকটা কি বাঘের গায়ে ছিল? দাঁত চেপে অলক বললে।

—কি জানি দাদাবাবু, আমি কি দেখেছি—সে দেখতে যে গঞ্জে যেতে হবে—মেয়ে-লোকদের তো যেতে দেবে না। তা দাদাবাবু, তুমি আজ একখানা চিঠি লিখে দেবে আমার দেশে নাতনীর কাছে?

—হ্যাঁ, তা হবে এখন—ঐ দিদিমণিকে বলো না—ও তো পারবে।—অলক বললে বুলুকে দেখিয়ে।

বুলু সতীর আড়ালে অলককে কলা দেখিয়ে উঠে চলে গেল। সতী গম্ভীর হয়ে বললে: না দাদাবাবু, তুমিই দাও লিখে। আমি এসেই একখানা চিঠি ঐ পাশের বাড়ীর বৌদিকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম—কিন্তু ও যে মেয়ে-ছাওয়াল, ওরা লিখতে জানে না—তাই তো চিঠির উত্তর এলনি—তুমি এবার দাও দাদাবাবু, দিদিমণির লিখতে হবে না।

—মেয়ে-ছাওয়াল লিখেছে বলে তোমার চিঠি যায়নি? ঠোঁট কামড়ে অলক জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ দাদাবাবু, তুমি আমার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড এনো। কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি না—কত দাম?

—তিন পয়সা লাগবে তোমার কার্ড—অলক বললে।

—তুমি একটু বলে-টলে দর কমিয়ে দু'পয়সা কি এক পয়সা দিয়ে একখানা এনো। তুমি বললে কম দামে দেবে—এ কথা বলেই সতী আঁচল থেকে একটা দু'আনা বার করে অলককে দিতে গেল।

অলকের মেজাজ তখন অন্য পথ নিয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে: ওটা নিয়ে কি করবো? পোষ্টকার্ড তুমি হরিকে দিয়ে আনিও—যখন বাজার যাবে।

—ও বাজারে পাওয়া যায়—কিন্তু তাহলে কি হবে দাদাবাবু, আমি একা বাজার যেতে পারিনে—একদিন গিয়ে ভয়ে মরি!

—ও সতী এদিকে এসো—মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নিঃশব্দে সতী সরে গেল। সতী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুলু ঢুকলো ঘরে আর দু'জনেই গড়াগড়ি মেঝেতে।

মা ঢুকলেন: ব্যাপার কি? গড়াগড়ি খাচ্ছিস্ কেন দু'টোতে?

—আর মা, তোমার ঝি'কে নিয়ে পারা যাবে না।

—ওঃ, তাই বল, তা হোক গে বাপু, বোকা-সোকাই ভাল।

জল খাবার খেতে খেতে অলক চীৎকার করলো: ওমা, মা গো, দেখ ঘুগনীতে পোকা!

—সে কি রে? মা ছুটে এলেন—সত্যিই তো!

মা হাঁকলেন—সতী ! ও সতী !

নিঃশব্দে ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়ালো সতী।

রেগে মা বললেন : যাচ্ছি বলে সাড়া দিতে পারো না? ঘুগনী চড়াতে বলেছিলাম—দেখোনি মটরে পোকা ছিল ?

—হ্যাঁ, দেখেছিলাম। তুমি তো আমায় ওসব বলনি—বলেছ যে, মশলার জল ফুটছে তাতে দিয়ে দিতে—জল মরে গেলে নামাতে। ঠাণ্ডা-গলায় সতী জবাব দিলে।

মার কণ্ঠস্বর এবারে চড়েছে। তা বলে কি দিচ্ছ দেখবে না, যা থাকবে সব ঢেলে দেবে? আশ্চর্য্যি মানুষ !

কিন্তু ওসবে সতীর এসে-যায় না।

নিরুপদ্রবে নির্ব্বিঘ্নে সতীর দিন কাটছিল।

বোকা হলেও সতী যে নিতান্ত ভাল মানুষ, সে কথা তার শত্রুও বলবে।

টেবিল পরিষ্কার করে ফুলদানীর শুকনো ফুলগুচ্ছ সতীর হাতে দিয়ে মা বললেন : ধুয়ে আনো—ফুলগুলো ঐ ফুল গাছের টবের কাছে দাও—বাথরুমে ফেলো না যেন।

—আচ্ছা ! বলে সতী ফুলদানী ধুয়ে এনে মার হাতে দিল।

একটু পরেই বুলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : বাথরুমে ফুলের কাঁড়ি কেন? মা, ও মা।

মা মুখ কাল করে সতীর দিকে তাকালেন।

সতী নির্ব্বিকার !

অলকের জ্বর হয়েছে।

মা, বুলু, অলকের ভালো মানুষ দাদাটি পর্য্যন্ত তটস্থ। কখন যে কি হয়। অল্প জ্বরেই অলক অস্থির হয়।

মা তো সব ফেলে বসে রইলেন কাছে—সতীর উপর বাড়ীর খাবার-দাবারের ভার বেশ কিছুটা পড়লো।

রোজই চেঁচামেচি শোনা যায়—খেতে বসে বলুর কণ্ঠ উচ্চে ওঠে : এটা কি জিনিস—এক বাটি জলের মধ্যে মাছ কেন?

সতীর শান্ত কণ্ঠও শোনা যায়—ওমা। দিদিমণি কি বলে—ওটা তো মাছের ঝোল।

তার পরেই ভালো মানুষ দাদাটি ঘরে ঢুকে বলে : দশ মিনিট ধরে কড়া নাড়ছি দরজা খোল না খোলো—'যাচ্ছি' বলে সাড়া দিতে পারো তো!

বুলু বললে : হ্যাঁ, ও নাকি সাড়া দেবে—বললে বলে 'লজ্জা করে'।

—ওর লজ্জার জন্য আধ ঘণ্টা ধরে কড়া নেড়ে চলো আর কে! বিরক্ত মুখে ভালো মানুষ দাদাটি বলে : মায়ের পছন্দের ঝি।

নীপুকা'কে মা বললেন : দেখ, সতীকে ভালো করে বুঝিয়ে বলে এসো, ভালো করে যেন আগুন রাখে—অলকের সুপ গরম হবে।

—আমি বাবা পারবো না, তোমার ঝিকে তুমি বুঝিয়ে বলো—নীপুকা' উত্তর দিলো।

সতীকে ডেকে মা বললেন : দেখ, বললেও বুঝতে পারো না—যত দিন বলেছি উনানে আগুন রাখবে—কোনো দিন রাখনি—নিবিয়ে ফেলে বলেছ—রেখেছিলুম তো, এখন নেই কি করবো। কিন্তু আজ যেন তা করো না—আজ বেশ গনগনে আগুন রাখবে—বুঝেছ?

সতী ঘাড় নাড়লো!

মা বললেন : কি বুঝেছ বল তো?

সতী বেশ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল : গনগনে।

মা ভাবলেন বুঝেছে তাহলে সতী—বললেন : হ্যাঁ, গনগনে আগুন রাখবে—যাও, ভুলে যেও না। আর দিদিমণি চেঁচায় কেন খেতে বসে?

সতী বললে, ঝোলকে দিদিমণি জল বলে চেঁচাচ্ছে—কি করবো!

হাসি চেপে মা বললেন : রান্না-টান্নাগুলো ভালো করে করো, যেন খেতে পারে—বুঝলে? আচ্ছা যাও।

আবার বুলুর চীৎকার! ও নীপুকা এসে দেখ কি হচ্ছে। সতী উনানের উপর ফুটন্ত ডেক্‌চির জলে এক মুঠো চা ছেড়ে দিয়ে ফোটাচ্ছে আর নিজে সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বুলুর চীৎকারে বা নীপুকা'র আগমনে তার কোনো পরিবর্ত্তন হলো না।

—ও কি হচ্ছে সতী? নীপুকা' জিজ্ঞাসা করলো।

—তুমি তো চা চাইলে—তাই।

—ও ফোটাচ্ছ কেন?

—বাঃ, ভাত, ডাল, তরকারী সবই একটু ভালো না ফুটলে স্বাদ হয় নাকি—চা'টা ফুটলে ভাল হবে খেতে।

—এর আগে তুমি কোনো দিন চা করনি?

বুলু ঝংকার দিয়ে উঠলো—থাম তুমি, আমি চা করছি, ফেলে দাও ও-সব।

মায়ের ডাকে নীপুকা' ঘুরে এসে বললেন: বুলু, যাহ'ক করে মা চালিয়ে নিতে বলছে—চেঁচামেচি করো না।

মুখ বেঁকিয়ে বুলু বললে: আহা! মায়ের সখের ঝি!

সতী নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত প্রায় ন'টা। মা ডাকলেন, সতী, এদিকে এসো।

শান্ত ভাবে সতী এলো—কোনো শব্দ নেই।

মা বললেন: দাদা-দিদি নীপুকা'দের খেতে দাও—খাবার আগে ওদের সব গরম করে দিও—আর অলকের সুপটা ভালো করে গরম করে কাচের বাটীতে ঢেলে নিয়ে এসো।

অলক তাড়া দিলো: খুব তাড়াতাড়ি আনো, ঢিলে-ঢিলে কাজ করো না।

—হাঁ, তাড়াতাড়ি আনো, ক্ষিদে পেয়েছে বেচারীর—মা বললে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর বুলুর দাপাদাপি সুরু হলো: ওমা! তুমি ছেলে নিয়ে বসে থাকলে আর ছেলের খাওয়া হবে না। দেখ তোমার আদরে ঝি'র কাণ্ড!

মা দৌড়ে এলেন—কি হয়েছে? কেবল চেঁচামেচি। একটুও চালিয়ে নিতে পারো না?

—ঐ নাও তোমার আদরের ঝি গনগনে আগুন রেখেছে অলকের সুপ গরম হবে যে!

মা উনানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ছাই-পড়া উনানের পাশে নিশ্চিন্ত মনে সতী দাঁড়িয়ে আছে—পাশে থালা-বাটি ছড়ানো। মা একবার চোখ তুলে তাকালেন। শান্ত সতী বললে: রেখেছিলাম মা, কখন নিবে গেছে, আমি কি করবো!

সে রাতে অলকের সুপ খাওয়া হয়েছিল কিনা সে-খবর আমরা জানিনে। তবে তার অসুখ সেরে গেছে, রীতিমত স্কুলে যাচ্ছে সে-খবর আমরা জানি। ওদের বাড়ীর আশেপাশে কোথাও সতীর চেহারা দেখা যায় না, বুলুর চীৎকারও আর শোনা যায় না।

বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

সে এক যুগ—

এগিয়ে আসছে ফ্রাঙ্কেষ্টাইন, মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মত। পৃথিবীর বুকে পড়েছে তার ছায়া। ছায়া কালো-কালো। এ যেন যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুর ফ্রাঙ্কেষ্টাইন। মাত্র পাঁচটি বছর, কিন্তু এ স্বল্প সময়েই হ'ল সূচনা এক নোতুন যুগের।

অবিস্মরণীয় সেই যুগ, সেই পাঁচটি বছর—১৯৪৩ হতে '৪৭। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এ যেন কয়েকটি উত্তেজনাকর, বিস্ময়কর দৃশ্যপট। এ যুগ তাই ভোলবার নয়। কোটি কোটি মানুষের আশা-নিরাশা, সংগ্রাম-পরাজয় ঘেরা এই পাঁচটি বছর।

সেদিনের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই যুগ; শুধু অবাস্তব কল্পনার গজদন্তমিনার নয় কাব্য বা সাহিত্য। জীবনের পরিস্ফুটনাই সাহিত্য। ধ্বনিত হল এই সুর এক তরুণ বিপ্লবী কবির কবিতায়। দুঃসাহসী বিপ্লবী সেই তরুণ কবি। 'ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ, জলের মত কালো কালি'র কলম যিনি নিলেন না, নিলেন কলম,—তলোয়ারের মত শাণিত আর ক্ষুরধার, কালি যা'র রক্ত।

নোতুন যুগের সার্থক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। কতই বা বয়স তাঁর—যখন প্রথম সুরু হল তাঁর কবিতা-রচনা। বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্র···কুঁড়ির মত সবুজ আর কোমল তাঁর মন। ভাবতেও বিস্ময় জাগে, এত অল্প বয়সে এমন বিদ্রোহী কবিতা লেখা সম্ভব হ'ল কি করে? সুকান্তের কল্পনায় কবিতার পেলব কমনীয়তা নেই, আছে রূঢ় বাস্তবের কঠোরতা। 'পূর্ণিমা চাঁদ' 'গদ্যময় পৃথিবীর ক্ষুধার রাজ্যে' তাই মনে হয় 'যেন ঝলসানো রুটি।' সুকান্ত কবি। কবিতা তাঁর আবেগোজ্জ্বল অবাস্তব ভাববিলাস নয়, তা নিপীড়িত মানুষের জীবন-বেদ। পাথর আকারে মূঢ়, ম্লান, মূক মুখের অকওয়া-কথার তল রূপায়ন। জনতার কথাই ফুটে উঠল তাঁর ভাষায়। সুকান্তের কবিতায় তাই অনুভূত হয় গণ-মানসের সুর।

কবি নিজেকে শোষিত মানবগোষ্ঠীর অন্যতম বলে স্বীকার করেছেন। 'চারা গাছ' কবিতায় বিরাট প্রাসাদের কার্ণিশের ধারে ছোট্ট একটি অশ্বত্থ চারা কবিকে স্মরণ করিয়ে দেয় আগামী দিনের ইতিহাসটুকু। শোষক—অত্যাচারী প্রাসাদ একদিন হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ এই সব নিপীড়িত অশ্বত্থ চারার বিদ্রোহে।

কবি তাই বলেন,—

"তাই তো অবাক আমি দেখি যতো অশ্বত্থ চারায়
গোপন বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ;
প্রাসাদ বিদীর্ণ করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।"

গণ-শক্তিতে তিনি বিশ্বাসী···। জীবন-সংগ্রামে আজকের পরাজিত মানুষই আগামী দিনে মাথা তুলে দাঁড়াবে। কবি কল্পনা করেন নিজেকে ছোট একটি দেশলাই কাঠির সংগে। যার বুকে আছে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের বারুদ। জ্বলে ওঠার তাই এত তাঁর তীব্র আবেগ।

"মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেধেছিল?
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞা-ভরে না-নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায়!"

মায়াকভস্কির মতই সুকান্ত বলতে পারতেন, 40 crores speak through these lips of mine. মেসফিল্ড ও হুইটম্যানের মতই তিনি জনতার কবি। পথে-প্রান্তরে, খামারে কাস্তে-হাতে কৃষক, কলকারখানার ধর্মঘটী শ্রমিক, দুর্ভিক্ষ, বন্যায় আর যুদ্ধে তিলে-তিলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়-থাকা মানুষ,—এরাই জুগিয়েছে তাঁর কাব্যের খোরাক।

'রানার' কবিতার তুলনা কোথায়? গভীর গহন রাতে দিগন্ত থেকে দিগন্তে যে শুধুই খবরের বোঝা বয়ে বেড়ায়, যার নেই

ক্ষুধা-ক্লান্তি। ওঁর জীবন বুঝি অপরের জীবনের বোঝা টানার জন্যেই সৃষ্টি। কবির কণ্ঠে তাই ফুটে ওঠে একটি বেদনাহত জিজ্ঞাসা:

"রানার! রানার! ভোর তো হ'য়েছে—আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?"

এমন গভীর আন্তরিকতা সত্যই দুর্লভ। 'আঠারো বছর বয়েস' কবিতায় কবির বিপ্লবী জীবন-দর্শন হয়েছে উদ্‌ঘাটিত।

"এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মত চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।"

বিপ্লবী তরুণ, তাজা প্রাণের স্বাক্ষর এই 'আঠারো বছর বয়েস'।

সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ কথাই বলেছেন সুকান্ত। তাঁর আত্মপরিচয় আছে 'ঠিকানা' কবিতায়—

"পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাক পথ,
তাই তো পথের নুড়িতে গড়বো
মজবুত ইমারত।"

নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে অল্প বয়সেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু সাহিত্যের যে 'ইমারত' তিনি গড়ে রেখে গেলেন—স্বর্ণাক্ষরে তার কথা লেখা থাকবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

সার্কাসী পালোয়ান

ডিগবাজী খায় আস্ত গাধা দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে
গান গেয়ে তার বোম্বা সুরে লম্বা দু'কান নাড়িয়ে।
চুরুট মুখে নাচে বাঁদর, চাঁদপানা তার চেহারা;
ছাগলছানা পাল্‌কী চড়ে, ভেড়ারা তার বেহারা।
চশমা চোখে কাস্‌ছে বসে দু'চোখ-কানা ঘোড়া যে,
তারি তলায় দাঁড়িয়ে হাসে দুলিয়ে মাথা ঘোড়া যে।
পিট্‌ছে জোরে ক্যানেস্তারা উর্দ্দীপরা বাজনদার,
বুরুশ দিয়ে সেই তালেই দন্ত মাজে মাজনদার।
অনেক উঁচু দোল্‌না দোলে আপন মনে একা রে!
বল্‌ছে যেন "কোথায় গেলি? নেই কেন তোর দেখা রে!"
খুঁড়িয়ে হেঁটে হাজির হলো ল্যাকপেকে এক পালোয়ান
গায়ে চাপানো আড়াই হাজার তালি খাওয়া আলোয়ান।
মুখখানা তার কাচুমাচু, পাৎলা গোঁফে তা দিয়ে,
বল্‌লে গলা হাঁকড়ে নিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে:
"বল্‌তে গেলে কুস্তি আমি বড়ো একটা লড়ি নে,
ধার ধারি নে হাতাহাতির, ঘুষোঘুষিও করি নে।
হাতী কিম্বা ঘোড়ায় বুকে নিতে কি আর না পারি?
জাহাজ নিয়ে মিথ্যে কেন মাত্‌বো আদার ব্যাপারী?
পারি নে কি ওজন তুলে সব ব্যাটাকে হারাতে?
কিন্তু ও-সব কর্‌তে গেলেই ভোজন হবে বাড়াতে।
এম্‌নিতেই খেতে যা চাই শক্ত যে হয় তা মেলা,
যাই নেকো তাই হাঙ্গামাতে, বাড়াই নাকো ঝামেলা।"

গুড় ঢাকার গান

ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়, ঢাক্ গুড় ঢাক্ গুড়
গুড় ঢাক্, গুড় ঢাক্, ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ গুড়।
ঢাক্ গুড়, গুড় ঢাক্, গুড় গুড় ঢাক্ ঢাক্
গুড় গুড় গুড় ঢাক্, ঢাক্ গুড় গুড় গুড়।
গুড় গুড় গুড় গুড় ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্
গুড় ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় গুড় ঢাক্ গুড়।
গুড় গুড় গুড় ঢাক্ গুড় গুড় গুড় ঢাক্
গুড় গুড় গুড় ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় গুড়।
ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্
গুড় গুড় গুড় গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়।
ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় গুড় গুড় ঢাক
গুড় গুড় গুড় ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ গুড়।
কেন গুড় ঢাক্‌বো? খুলে খুলে রাখবো,
যত খুশী চাখ্‌বো, মুড়ি দিয়ে মাখবো,
গলা ছেড়ে হাঁক্‌বো, সবাইকে ডাক্‌বো:
"আয় আয় আয় রে তোরা কে কোথায় রে?
বেলা বয়ে যায় রে ডাইনে ও বাঁয় রে!
কে না গুড় খায় রে কাঁকে যদি পায় রে?
হাত দুটি হায় রে করে গুড় গুড় গুড়।
ঢাক্ গুড় গুড় ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় গুড়।

এক ভগ্নমূর্ত্তির সত্যি গল্প

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বনাশ!—কি অলুক্ষুণে কথা,—এ কি কাণ্ড!—কর্ত্তাদের কানে কথাটা গেলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াবে ভেবেছ!—এমনি সব কথাবার্ত্তা চলছে মন্দির-মহলে। আজ সমস্ত মন্দিরের মধ্যেই একটা কি রকম বিষণ্ণতার ছায়া—আতঙ্কের চিহ্ন—হতাশার সুর—ব্যাপার আজ যা ঘটে গেছে মন্দিরে তা সাংঘাতিক—

শয়নারতি দেবার সময় পূজারীর হাত থেকে পড়ে গোপীকান্তের বিগ্রহ ভেঙ্গে গেছে। আমরা হিন্দু, পৌত্তলিক, মূর্ত্তিপূজায় আস্থাবান, সাকার উপাসনার উপাসক। আমাদের কাছে ওই পাথরের ঢ্যালাগুলিই সব—আমাদের যা-কিছু বাহ্যিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, নৈবেদ্য সব কিছুই উজাড় করে ঢেলে দিই ওই ঢেলাগুলির কাছেই। বিগ্রহ ভেঙ্গে যাওয়া আমাদের শাস্ত্রে অতি এবং আশু অমঙ্গলের চিহ্ন বলেই আবহমান কাল ধরে পরিগণিত হয়ে আসছে। কাজে কাজেই সেদিন ঐ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা ওই বিগ্রহ ভেঙ্গে যাওয়া মন্দিরের মধ্যে কি রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

. কর্তাদের কানে কথাটা তুলতে সাহসীই হয় না কেউ। কে বলবে?—কার ঘাড়ে ক'টা গর্দান আছে? কারণ এ যে ভয়াবহ ব্যাপার—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ—চুরী, ডাকাতি, রাহাজানি, এমন কি নরহত্যার দোষকে কর্তারা যদি বা ক্ষমা করেন, কিন্তু পুরোহিতের ক্ষণিকের একটু অসাবধানতার জন্তে যে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল—এ অপরাধ নিশ্চয়ই তাঁরা ক্ষমা করবেন না।

যাই হোক্, তবু উপরে কথাটা জানাতে হয়। খবর শুনে তাঁরাও বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। হবারই কথা, তাঁরাও তো হিন্দু, হিন্দুধর্মের প্রত্যেকটি অনুশাসন মেনে চলেন, কি করবেন তাঁরা তো ভেবেই পেলেন না—তাঁরা হতভম্ব! শেষে তাঁরা ঠিক করলেন যে, সমস্ত স্বনামধন্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আহ্বান করে এনে তাঁদের অভিমত জানা হোক এবং পরে সেই মত অনুসারে ভবিষ্যতে যা করবার করা যাবে।

সভা হোল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রমুখ বড় বড় ব্রাহ্মণ-মহল্লার বিগ-বিগ সংস্কৃত উপাধিধারী ব্রাহ্মণের দল এসে হাজির হ'লেন। অভিমতও দিলেন। তাঁদের মতে ঠিক হোল যে, ওই বিগ্রহচূর্ণ টিকে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দেওয়াই সমীচীন এবং তা ছাড়া—তা ছাড়া—'নাঙ্ঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অন্ত পথ নেই।

সবাই মেনে নিল সেই পথ—কিন্তু মনে-প্রাণে মানতে পারলেন না মন্দিরের আসল সেবাইত রাণী··· ' তিনি ঠিক করলেন যে, একবার ছোট ভট্চাজের মত নেওয়া যাক।

* * * *

—তা'হলে কি করা যায়, ঠাকুর! ওদের মতই মেনে নেব?—সংশয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করেন রাণী।

তোমার কি মাথা খারাপ হোল না কি? ঠাকুর ভাসিয়ে দেবে কি? আচ্ছা, ওই ঠাকুর না ভেঙ্গে যদি তোমার নিজের ছেলেমেয়ের কারুর হাত-পা ভাঙ্গত, তা হলে কি তাদের সভা করে জলে ভাসিয়ে দিতে, না তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে?—জিজ্ঞাসা করেন ছোট ভট্চাজ।

—ঠিক বলেছ ঠাকুর, তাই তো, চিকিৎসাই তো করাতুম। —রাণী বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেন যে, চিকিৎসা করান হবে এবং সে চিকিৎসার চিকিৎসক হবে স্বয়ং ছোট ভট্চাজ।

রাণী ছোট ভট্চাজের মত মেনে নিয়েছেন শুনে ব্রাহ্মণেরা তো মহাখাপ্পা—আরে! চাল নেই, চুলো নেই, কোথাকার একটা পাগলা বামুন সে কি বোঝে, কতটুকু জানে সে, আমাদের আর্য সনাতন ধর্মের রীতি-নীতি বিধানের সে কতটা খবর রাখে?

রাণী কিন্তু অবিচল—নির্বিকার। ছোট ভটচাজের কথাই তিনি রাখবেন—তাতে যে যত খুশী বাধা দিক্। কারণ ছোট ভট্চাজকে সর্বসাধারণ যে রকম ভাবে অর্থাৎ ক্ষ্যাপা-পাগলরূপে দেখে, রাণী কিন্তু তাকে ঠিক সে চোখে দেখেন না। তিনি সেই পাগলামীর মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন আলোর শাশ্বত আভাস, জ্ঞানের দিব্য রূপ—জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ। ছোট ভট্চার্যের মধ্যে দিয়েই তিনি অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন আলোক, মাটির ভিতর খুঁজে পেয়েছেন সোনা, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কার করেছেন সুসভ্য নতুন দেশ।

* * * *

চিকিৎসা হোল, ছোট ভট্চাজই করলে। বিগ্রহ-চূর্ণ দু'টিকে জুড়ে আগেকার মতই এক করে দিলে, বিশ্বকর্মার সৃজনী-শক্তির চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। নতুন শিল্পের জন্ম দিলে যে ব্যক্তি—সে ব্যক্তি কোন দিনই তুলি ধরেনি। আজও দক্ষিণেশ্বরে গোপীকান্তের সেই প্রাচীন বিগ্রহটি রাধাকৃষ্ণের পাশের ঘরেই বিরাজমান। আজও তাঁর চাল-কলা দিয়ে পুজো হয়। ছোট ভট্চাজ যত দিন বেঁচে ছিল, তত দিন বিগ্রহটির আসন যথাস্থানেই ছিল। তার পর ছোট ভট্চাজের পরবর্তী যুগে ওই বিগ্রহটিকে পাশের ঘরে সরিয়ে তাঁর স্থলে নতুন বিগ্রহের স্থাপনা হয়।

সমস্ত কাহিনীটি তো পড়লে, এখন ধরতে পারলে কিছু—কে এই ছোট ভট্চাজ? এই ছোট ভট্চাজ আজ অমর হয়ে রয়েছেন, রাণীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সার্থক হয়েছে, আজ আর তাঁকে কেউ ক্ষ্যাপা-পাগলা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। আজ শুধু বাংলা দেশ নয়—এশিয়া নয়—সারা বিশ্ব তাঁর পায়ে অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁর গৌরবে আজ বাঙালী গৌরবান্বিত—তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—নটগুরু গিরিশচন্দ্র—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র—'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—"বি-কে-পাল"এর বটকৃষ্ণ পাল প্রমুখ দেশের সন্তানগণ উত্তর-জীবনে ধন্য হয়েছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর যে প্রচার বিশ্বজুড়ে করতে আরম্ভ করে গেছেন—আজও সেই পূত পবিত্র স্মৃতির প্রচার অব্যাহত গতিতে চলছে—দিকে দিকে তাঁর পবিত্র নাম বহন করছে একটি মিশন। কোলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানও বাগবাজারের একটি স্বল্পপরিসর ছোট্ট গলির নাম তাঁর নামানুসারে রেখেছেন (যদিও আরও বহু বড় বড় বা ভাল ভাল রাস্তা তাঁর নামে এখনও রাখা যায়)।

আজ বিশ্বের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের পিচ্ছিলময় পথ চলার পাথেয় হোক যুগমানব পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শান্তির পথে—সত্যের পথে পৌঁছোবার পথ-নির্দেশ। তাঁর অনুপ্রেরণায়, তাঁর আশীর্বাদে পথহারা বাঙালী আবার পথের সন্ধান পাক, পথের দাবী নিয়ে আবার তারা দিক্‌পাল হোক, ফিরিয়ে আসুক তাদের লুপ্ত শক্তি, প্রাণ দিক সেই শক্তিকে, ভাষা দিক, বীর্য দিক, মন্ত্র দিক সেই বিরাট শক্তির মধ্যে।

'শেষের কবিতা' শেষ।

প্রদীপ শ্রোতাকুসলের পক্ষ থেকে পরিচালক মধু বসু কবিগুরুর 'শেষের কবিতা' চিত্রায়িত করেছেন। কাহিনী গতানুগতিক নয়, কথাটি সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেই অসাধারণ 'কাহিনী' চিত্রে রূপান্তরিত করায় যে কতটা অসাধারণত্বের প্রয়োজন, পরিচালক বোধ করি সে-কথাটি ভেবে দেখেননি। মামুলী কাহিনী যেমন বর্ত্তমানে বহু ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তেমনি অসাধারণ 'কাহিনী'ও অধুনা অনেক ছবিতে প্রচলিত হচ্ছে, কেন না কেবল মাত্র অসাধারণ 'কাহিনী'ই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে বহু ছবির প্রধান আকর্ষণ। রবীন্দ্র-সাহিত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এ ছবিতে। ভাগ্যিস, কবিগুরু এখন পরলোকে! কিন্তু 'বিশ্বভারতী' ও 'শান্তিনিকেতন' যে এখনও বর্ত্তমান আছে। তাদের কি চোখ এবং কান দুই-ই দিল্লীতে বাঁধা রেখেছেন! আড়ষ্ট গতিও অস্পষ্টবাক অমিত রায়, রবীন্দ্র-সংস্কৃতিজ্ঞানহীনা লাবণ্য, পিতামহীর বয়েসী কেটি মিত্তির যদি থাকে শেষের কবিতায়, তাহ'লে সে-ছবি কি দাঁড়াতে পারে—তারই নমুনা মধু বসুর এই ছবিটি। 'প্যানোরামিক' দৃশ্য দেখাতে হ'লে অভিনেতাদের অঙ্গ-বৈকল্য থাকলে চলে না, তাও কি জানেন না মধু বসু? উৎপল দত্তর কর্ণমূলের অতিরিক্ত অঙ্গটুকু (যেটি মাইকেলের নাতিদীর্ঘ কেশে ঢাকা ছিল) 'প্যানোরামিক' দৃশ্যে যে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে, তাও কি চোখে পড়লো না মধু বসুর? 'শেষের কবিতা'য় শিল্প-নির্দ্দেশনার কোন বালাই-ই নেই। যা আছে তা যাচ্ছেতাই। অমিতের পোষাক-বর্ণনাটাও বোধ করি পরিচালকের বোধগম্য হয়নি। কেবল অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন চন্দ্রাবতী দেবী যোগমায়ারূপে। প্রীতি মজুমদার ও সময় রায় উল্লেখযোগ্য। নীলিমা দাস শেষের কবিতার পক্ষে অশান্ত। ছবিটির আদ্যোপান্ত অতি কষ্টে দেখে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, শেষের কবিতা কবিগুরুর কবিতা হয়নি, রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় গদ্য-কবিতাকে স্বেচ্ছায় শেষ করা হয়েছে এবং এটাকে অপঘাতে মৃত্যুই বলবো।

সবচেয়ে ভাল হয়েছে প্রচার-পরিকল্পনা। ঠিক ছবির উপযোগীই হয়েছে। বাঙলা বিজ্ঞাপন-শিল্পের কি দুর্দ্দশা!

'হিন্দুস্থানী' শিক্ষা

দক্ষিণ-কলকাতা সম্পর্কে এত কাল পরে বহু লোকের ধারণা পালটে গেল। এতকাল জানতাম,—মারামারি, এ্যাসিড বম্ব নিক্ষেপ, কাচের বোতল নিয়ে লোফালুফি, যথেচ্ছা ইট ও পাটকেল ব্যবহার একচেটিয়া ছিল শুধু উত্তর ও মধ্য-কলকাতার। দক্ষিণ-কলকাতাও বাদ থাকলো না। দত্তবাড়ীর ছেলেরা কলকাতাবাসীকে হকচকিয়ে দেওয়ার জন্তে যে ব্যবস্থা করেছিলেন একান্ত বালখিল্যের মত, তারই সমুচিত জবাব দিয়েছে দক্ষিণী-বাসিন্দাগণ। কতকগুলো তারকাকে একত্র করে স্ফূর্ত্তি ও টাকা লুঠতে চাওয়ার আমেজ আর আনন্দকে 'হিন্দুস্থানী'রা এমন মাঠে মেরে দেবে, কে জানতো? দত্তজগণ কি এত দিনেও বুঝলেন না, ব্যবসায় যেমন ভাগীদার ভাগ বসাতে চায়, প্রমোদ-বিহারেও তেমনি বিহারীরা জুটতে পারে?

এই গ্লানি, অপমান, অসম্মান আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত যত দোষ পড়লো কেবল মাত্র বাঙ্গালীর স্কন্ধে। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করুন, শুধু বাঙালী নয়, আরও অনেক প্রদেশের লোক ছিল এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। আমরা আশা করি, এখন থেকে ভবিষ্যতে যাঁরা এ ধরণের তারকাদের এক করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রমোদ-বিহারীদের আগেভাগে স্মরণ করবেন। কারণ, শুধু পাটকেল খেলে কোন খেলই জমে না। হাসপাতালের শূন্ত বেডই শুধু পূর্ণ হয়।

● লেডী ভিভিয়ান লে গত এক বছরের মধ্যে কোন ছায়াছবিতে কাজই করেননি, অথচ তাঁর স্বামী স্যর অলিভিয়ার লরেন্স একটির পর একটি ছবি পরিচালনা ও ছবিতে অভিনয় করে চলেছেন। ভিভিয়ানের অনুপস্থিতির কারণ শারীরিক অসুস্থতা। উদর সংক্রান্ত কী এক অসুখে ভুগলেন তিনি। নিরাময় হওয়ার পর ভিভিয়ানকে চিত্রামোদীদের পক্ষ থেকে সম্মান-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্দ্ধনার ফুলের তোড়া হাতে তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে এই চিত্রে।

লেডী ভিভিয়ান লে

অশোককুমারকে কে পথ দেখাবে ?

শ্রীদেবকী বসু—"অশোককুমার খ্যাতি, যশঃ, অর্থ প্রচুর করেছেন এবং হিন্দী চিত্র নির্ম্মাণে তিনি তা নিয়োগও করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য তাঁর কিছু করা উচিত।"

শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম কিছু করতে আমি আগ্রহশীল—কিন্তু আমাকে পথ দেখানো দরকার।"

একখানা 'ক্যালকাটা গাইড' কেউ যদি কিনে দেন অশোককুমারকে! অনায়াসে তিনি বাঙলা ষ্টুডিওর পথ দেখতে পান। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, সে-পথ কি এতই দুর্গম আর পিচ্ছিল? অন্ততঃ বোম্বাইবাসী অশোককুমারের পথ দেখতে চাওয়াটা অন্যায়। পথের পথিক পথের কাঁটা দেখে কি ডরায়?

টকির টুকিটাকি

নবতম প্রতিষ্ঠান বাদল পিকচার্সে'র প্রথম চিত্র পরিচালনা করছেন শ্রীসুশীল মজুমদার, ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে। কাহিনী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর। * আর্টিষ্ট লিমিটেডের প্রথমতম চিত্র 'রাজধানী' পরিচালনা করছেন কাহিনীকার শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে। * আর্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার পরবর্ত্তী 'এ্যাটম বম্' চিত্রের কার্য্যারম্ভ হয়েছে শ্রীতরু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। অভিনয়াংশে রবীন মজুমদার, সুচিত্রা সেন, দীপ্তি রায়, সাবিত্রী চট্টোঃ ও ভানু বন্দ্যোঃ। সন্ধ্যা মুখোঃ ও আলপনা বন্দ্যোর কণ্ঠস্বর থাকবে এই ছবিতে। * তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক কাহিনী "না" নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সে'র ৫ম চিত্র। পরিচালক শ্রীতারাশঙ্কর। অভিনয়ে আছেন সন্ধ্যা, বিকাশ, রবীন, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, মলিনা দেবী ও সুস্মিতা সিংহ প্রভৃতি। * পরিচালক শ্রীহেমচন্দ্র ও শ্রীসৌরেন সেনের যুগ্ম-পরিচালনায় ও শ্রীইন্দ্র সেনরায়ের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে 'চিত্রাঙ্গদা' চিত্র প্রায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। কাহিনী শ্রীমন্মথ রায়ের ও সুর সংযোজন করেছেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। নমিতা সেনগুপ্তা ও চট্টোপাধ্যায়, মালা সিন্‌হা এবং সমীরকুমার আছেন অভিনয়ে। * 'এরা খুনীর চেয়ে অপরাধী' একটি শিক্ষামূলক ছবি, যাতে দেখানো হয়েছে ভেজাল ওষুধের চোরা-কারবারের রহস্য। পুলিশের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য পুলিশী কর্ম্মীরা অভিনয় করছেন। মলিনা দেবীও আছেন। পরিচালক শ্রীপ্রবোধ সরকার। কাহিনী রচনা করেছেন কলিকাতার ডেপুটি কমিশনার সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। * মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীদেবব্রত সরকারের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অভিনয়ে আছেন—তুলসী লাহিড়ী, জীবেন বসু, রাজলক্ষ্মী, অমিতা, জহর, হরিধন, নৃপতি ও নিভাননী প্রভৃতি। চিত্রটির প্রযোজক শ্রীমন্ট ঘোষ।

যে-ছবি মুক্তি-প্রতীক্ষায়

প্রফুল্ল

মুভি টেক্‌নিক সোসাইটির নবতম নিবেদন। রচনা: মহাকবি গিরিশচন্দ্র, পরিচালনা: চিত্ত বসু, সুরশিল্পী: কালীপদ সেন, চিত্রশিল্পী: ধীরেন দে, শব্দধারণ: নৃপেন পাল। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—উমাসুন্দরী (মা): সুপ্রভা মুখার্জি, প্রফুল্ল: সন্ধ্যারাণী, জ্ঞানদা: শোভা সেন, জগমণি: রাণীবালা, যোগেশ: ছবি বিশ্বাস, রমেশ: বিকাশ রায়, সুরেশ: শুভেন্দু মুখার্জি, ভজহরি: কমল মিত্র, কাঙালীচরণ: হরিধন মুখার্জি, মদন: তুলসী চক্র, যাদব: মাষ্টার বিষ্ণু।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের এই প্রখ্যাত নাটকটির পরিচয় নতুন করে দেবার নয়। অর্দ্ধ শতাব্দীরও বহু আগে থেকে এর অতি করুণ আখ্যায়িকা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত জয় করে রেখেছে। বাঙলার মাটি-জল-হাওয়ায় পরিপুষ্ট তৎকালীন হিন্দু বাঙালী সমাজের অতি বাস্তব চিত্রটিকে সকলে সকরুণ আনন্দে পুরুষানুক্রমে উপভোগ করে আসছেন। আজও যে আমাদের ঘরে 'প্রফুল্ল'র কোনো কোনো চরিত্রের দেখা না পাওয়া যায় এমন নয়, তাই হয়তো চির নতুন মনে হয় মহাকবির নাট্য-রচনাটিকে। এই নাটক কতো ভাবেই না মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, হচ্ছে এবং অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতে হবে তার লেখা-জোকা থাকবে না; কতো অভিনেতা-অভিনেত্রী একনিষ্ঠ সাধনায় কবি-কল্পনাকে রূপায়িত করেছেন এবং কচ্ছেন। সুবিধা হলে প্রায়শঃই তাই সম্মিলিত শিল্পী-সম্প্রদায় কিংবা বিভিন্ন পেশাদার অ-পেশাদার মঞ্চ অভিনয় কচ্ছেন বেদনাবিধুর 'প্রফুল্ল' পালাটি।

উদার-হৃদয় ব্যবসাদার যোগেশকে কি করে তাঁর মধ্যম সহোদর রমেশ সর্বস্বান্ত করে পথে বসালো, শেষে পাগল করে দিলো, তারই হৃদয়-বিদারক বিভিন্ন দৃশ্যে শেষ হয়েছে প্রফুল্ল নাটক। শুধু তাই নয়, রমেশ স্বীয় অনুজ সুরেশকে মিথ্যে দোষ দিয়ে জেলে দিলো এবং সোনার সংসারকে শ্মশান করে তুললো—সেই চিত্র এঁকে গেছেন গিরিশচন্দ্র নির্ম্মম ভাবে। অভিনয়ের যবনিকা পতনের বহু পরেও তাই যোগেশের খেদোক্তি

প্রফুল্ল ও রমেশের ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়

কানে বাজে; 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'!—এতো দুঃখের মাঝে যে চরিত্রটি দর্শকের মন ভরিয়ে তোলে—সে হোলো 'প্রফুল্ল'। অতো বড়ো শয়তানের কি করে এমন স্ত্রী হয়, ভেবে পাওয়া যায় না। রমেশের নৃশংসতার মূল্য দিতেই বুঝি নাট্যকার সৃষ্টি করেছিলেন এই মহীয়সী নারীটিকে।

চরিত্রগুলির যথাযথ বণ্টন হয়েছে—এ কথা অনায়াসে বলা যায়। যোগেশ-জননীরূপিণী সুপ্রভা মুখার্জি ও প্রফুল্ল-ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ে ষ্টুডিয়োর সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ্মীর চুব্‌ড়ি গড়িয়ে দিতে দিতে পাগলিনী উমাসুন্দরীর কথাগুলি এখনো শুনতে পাচ্ছি। শাশুড়ী ঠাকুরুণের অস্বাভাবিক এই মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে কুসুম-কোমলা প্রফুল্ল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, দেখতে দেখতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। অনতিবিলম্বে 'প্রফুল্ল' দর্শকজনকে অভিবাদন জানাবে।

ভক্ত বিল্বমংগল

প্রযোজনা: আজ প্রোডাকশন, চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, পরিচালনা: পিনাকী মুখোপাধ্যায়, সংগীত: রাজেন সরকার, চিত্রগ্রহণ: সন্তোষ গুহরায়, শব্দ-ধারণ: শিশির চ্যাটার্জি, শিল্প-নির্দেশক: বটু সেন। প্রধান অংশে নীতিশ মুখোপাধ্যায় (বিল্বমংগল) ও মঞ্জু দে (চিন্তামণি)। এ ছাড়া আছেন, বিপিন মুখার্জি, শিশির বটব্যাল, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, জহর রায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, রেবা বোস, তপতি ঘোষ, মালা সিন্‌হা, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি।

বিল্বমংগল চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় শ্রীমতী মালা সিন্‌হা

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'—বিদ্যাপতির এই অমর উক্তি বিল্বমংগলের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিলো। কবি বিল্বমংগল রূপের পূজায় হয়ে উঠলো উন্মাদ! এ পৃথিবীর যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মনোহর—তারি পিছনে ছুটে চলে পাগল হয়ে সকল বাধা-বাঁধন ছিন্ন করে। দেহোপজীবিনী চিন্তামণির অপরিসীম বিস্ময়, মানুষকে মানুষ এতো ভালোবাসতে পারে? চোখের জলে ক্রমে সে-ও নিবেদন করে নিজেকে ওই রূপোন্মাদ ঠাকুর বিল্বমংগলকে। কিন্তু সে যে পতিতা, নিজেকে দেবতার সেবায় উৎসর্গ করার অধিকার তার তো নেই। না না, উচ্ছিষ্ট ফুল আর কি কখনো ভগবানের পায়ে নিবেদিত হতে পারে! দেহ তার মলিন হলেও অন্তরে এর আগে কারো ঠাঁই ছিলো না। কাজেই বিল্বমংগলের মূর্তি সেখানেই প্রতিষ্ঠা করে চিন্তামণি। কিন্তু সামান্য একটি কুলটার জন্যে বিল্বমংগল কেন নিঃশেষিত হবে, তার ওই সর্বজয়ী প্রেম ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হলে দেবতা নিশ্চয়ই প্রীত প্রসন্ন হবেন, ভক্তকে দেবেন দরশন। বিল্বমংগল সে-কথা চিন্তামণির মুখে শুনে আত্মস্থ হোলো, দীর্ঘ দিন পরে পথ খুঁজে পেল এই পাগল-ঝোরা! এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে প্রেমিক বিল্বমংগল ভক্ত বিল্বমংগলে রূপান্তরিত হয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলো।

'ভক্তমাল' গ্রন্থের এই অপূর্ব কাহিনীটি পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি যুগোপযোগী সামান্য পরিবর্জন পরিবর্ধন করে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। অবিশ্যি মূল কাহিনী এই রূপারোপে বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি। প্রতিটি চরিত্র সু-অভিনীত হয়েছে—শোনা গেল। বর্তমানে ছবিটি সম্পাদনাগারে।

গল্প চাই

শ্রীরমেন চৌধুরী

সংকটের যেন epidemic লেগেছে—সর্বত্র সব কিছুতেই তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে এই বাঙলা দেশে। খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি সাত-সতেরো জিনিষের মতোই ছায়া-ছবির নানান্ বিষয়েও লেগেছে সংকটের মহামারী। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, গোটা বছরে এখানে যতোগুলো ছবি হয়, তার চার ভাগের তিন ভাগই কপালে বিফলতার রাজ-টিকা এঁকে মুখ বুজে সরে যায় কোন্ অতল গহ্বরে! শুধু ছবিই যায় না, যায় সেই সংগে তার জনক অর্থাৎ যার অর্থে ছবি নির্মিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলো সেই ভাগ্যহত প্রযোজক। হয়তো সকল জনকই এতো দুর্বল না হতে পারেন, কেউ কেউ হয়তো বা গোঁ ধরেন সাফল্য অর্জন না-করা পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন চিত্র-প্রস্তুতি—কিন্তু সেটা ডুমুরের ফুলের মতো দুর্লভ বস্তু। অধিকাংশেরই ২।১টি ছবি নির্মাণের পরই তহবিলে টান পড়ে, আর তার ফলে হয় ঢাকিশুদ্ধু বিসর্জন! সে সব নির্মাতারা আর ওঠেন না, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে সূর্য অস্তাচলে পাড়ি দেয়।

কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, সুতরাং ছায়াচিত্রের এই সংকটের হেতু অবশ্যই একটা থাকবে। সেটা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, এখানকার দু'-একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রায় সব প্রযোজকই কোনো পূর্ব-কল্পিত প্ল্যান মাফিক চলেন না, যা হোক করে যে কোনো একটা ছবি তৈরি করাই হোলো তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন ছবি তৈরি করার আগে প্রথম যেটায় নজর দিতে হবে সেটা হোল তার কাহিনী। ভিৎ যদি না সুদৃঢ় হয়, তার ওপর ইমারৎ উঠতে পারে না। জোর করে বাড়ী তুলতে গেলে তাসের ঘরের মতো সব কিছু নিয়ে ভেঙে পড়তে বাধ্য। আজকের ছায়াছবির অসাফল্যের মূল কথা হোলো এই-ই—গল্প-পদবাচ্য গল্প না থাকার জন্যে ছবির ফানুস এখানে চুপসে যাচ্ছে একের পর একটি। আমরা কিছুতেই ভাবি না যে, বইয়ের পাতায় গল্প লেখা আর সেলুলয়েডের ফিতেয় গল্প রূপায়িত করা—এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অবিশ্যি এটা খুবই শক্ত কাজ। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি'র নাম সর্বপ্রথম এ পর্যায়ে অবলীলায় করা চলে। এ ছাড়া প্রকৃত সিনেমার গল্প খুব বেশি দেখা যায়নি এতাবৎ। কেউ পারেন না, এ কথা বলতে চাই না, তবে তাঁরা যে করেননি, এটায় কোনো ভুল নেই। শরৎচন্দ্রের গল্পের তো সিনারিয়ো হয়েই আছে পুঁথির পাতায়; তাকে যে কেউ যেভাবে হোক ছবির মাধ্যমে বললেই ল্যাঠা চুকে যায়। কেন না, শরৎচন্দ্র কথাশিল্পী। ছবি এঁকেছেন আর কথা বলিয়েছেন পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে। তাই তো শরচ্চন্দ্রের একই রচনা একাধিক বার চিত্রায়িত হচ্ছে এবং প্রযোজকদের মধ্যে চলেছে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি।

সে যাই হোক, আজ ছবির গল্পের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে গোটা পৃথিবীতে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাগর-পারের প্রযোজকরাও অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তা আমরা সবাই জানি। সেখানেও আমাদের মত "ক্ল্যাশিক" ছায়াছবিতে দেখানোর হিড়িক পড়েছে। কিন্তু বোম্বাই এবং বাঙলা সেই সংগে মাদ্রাজও ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। অন্য প্রদেশের জন্যে আমাদের চিন্তার প্রয়োজন দেখি না, এখন ঘরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার চরম মুহূর্ত উপস্থিত। সেই জন্যে একান্ত অনুরোধ: এখনও সময় আছে, ছবির উপযোগী গল্প সাহিত্যিকরা লিখুন, প্রযোজক পরিচালকেরা লেখান। 'আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মায়া-মমতা ত্যাগ করে প্রকৃত ব্যবসায়ীর দৃষ্টি নিয়ে ব্যবসায় অগ্রসর হোন, তাহলে বাঙলা ছবির অকাল-মৃত্যু চিরতরে দূর হবে।

'শ্যামলী' নাটকে দুই বোন সাবিত্রী ও শেফালী

'শ্যামলী' নাটকে মামা ও ভাগনে জহর ও উত্তমকুমার

ছন্নছাড়ার গান

শ্রীশান্তি পাল

খোল দ্বার খোল দ্বার
যুগের আগল ভাঙি',
মুক্তির পাগল আমি
আসিয়াছি অসত্যেরে হানিতে কুঠার,
জীবনের নব মন্ত্রে ঘুচাইতে মৃত্যুর আঁধার।

কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষ
দৈন্যের গরল পিয়ে নিয়ত বেহুঁস,
আমি তারি একজন, দাঁড়াইয়া তাই
উদার আকাশতলে আমি কবি
ঘোষিবারে চাই—

জেগে ওঠো জেগে ওঠো ভাই
প্রাসাদ-কুটীরে সত্য কোন ভেদ নাই।
কৃপণের কাছে
যে অমৃত আছে,
এস পৃথিবীর যত ছন্নছাড়া ছুটে—
ভাগ ক'রে খাই লুঠেপুটে।
অসির ঝন্‌ঝনে
জাগে যে আতঙ্ক প্রাণে
বন্ধহারা বাঁশরীর তানে,
হাসির ফুটাই ফুল তারি মাঝখানে।

প্রত্যভিবাদন

মাসিক বসুমতীর "সাহিত্য-পরিচয়" বিভাগ আলোচনাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকা ও বহু পরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে অসংখ্য অভিনন্দন-পত্র পাওয়ায় আমরা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছি। 'পরিচয়' যাতে সাহিত্যিক হয় এবং দলাদলি নির্বিশেষে যাতে প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়, আমাদের দৃষ্টি শুধু সেদিকে। বিভাগটির জন্ম পাঠক-পাঠিকা ব্যতীত সহযোগিতা চাই সাহিত্যিক, গ্রন্থ-লেখক ও প্রকাশকদের। তাঁদেরও অনেকেই ইতিমধ্যে সহযোগিতার আভাষ দেখিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, বিভাগটি উত্তরোত্তর আরও আকর্ষণীয় ও তাতব্যপূর্ণ হবে এবং সৎসাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হবে।

মাসিক বসুমতীর আবেদনে সাড়া

মাসিক বসুমতীর আবেদনে কি কাজ হয়েছে? গত সংখ্যায় দুঃস্থ সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আবেদন করেছিলাম। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গেল যে, ভারত সরকার জগদীশ গুপ্তকে মাসিক দেড়শো টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন। বাঙলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় ডাঃ রায় স্বয়ং দৃষ্টিপাত করছেন দেখে আমরা প্রীত হয়েছি। বাঙলার বর্ত্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে ডাঃ রায়ের পুরাপুরি জ্ঞান না থাকাই সম্ভব—তিনি যেন আসল-নকল চিনতে পারেন—এইটাই আমাদের প্রার্থনা।

সাহিত্য ও বেতার জগৎ

বেতার ভাষণের জন্য কণ্ঠস্বর থাক বা না থাক, কৃতী এবং গুণী হ'লেই চলবে অন্ততঃ মাইক্রোফোনের সামনে—এই চিরাচরিত প্রথাকে পালটে দেওয়া হয়েছে প্রায় সকল সভ্য দেশে। যাঁর কণ্ঠে স্বর নেই, তাঁর রচনা অন্যে পড়ে শোনাবে। যাঁর আছে তাঁর তো কথাই নেই! ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিক সমারসেট মমকে। চমৎকার বাচনভঙ্গী না কি মমের। মম বেতারে রচনা পড়ছেন। আর লেখক ষ্টেইনবেক, বেতার-ভাষণ পাঠ করতে করতে পাণ্ডুলিপি সংস্কার করছেন। ষ্টেইনবেকের কণ্ঠ নাকি খুবই গুরুগম্ভীর।

মাসিক বসুমতীর সাহিত্য-পরিচয়ে, কলকাতা আকাশ-বাণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোচনা থাকবে আগামী সংখ্যা থেকে।

বিদায়, সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রাদেশিকতার মেকী ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের হর্ত্তা-কর্ত্তা কেশকর যা নয় তাই করছেন। বাঙলার স্কন্ধে যত অজ্ঞ, অপটু, অযোগ্য ও অপদার্থকে চাপিয়ে বাঙলার যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করছেন—আশা করি, আমাদের এই স্বীকারোক্তি মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র অস্বীকার করবেন না। আকাশ-বাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে শুরু ক'রে ডাঃ রায়ের প্রচার বিভাগকে কেশকর কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, তার প্রমাণ পদে পদে মিলছে এবং ডাঃ রায়ও বোধ করি উপলব্ধি করছেন। পাঠক-পাঠিকাই বিবেচনা করুন, একজন পাঞ্জাবী ও একজন মাদ্রাজী—বাঙলা ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও এমন কি বাঙলা দেশের মানচিত্র যাদের কাছে গ্রীক ভাষা ও দেশের মতই, সেই লুথরে আর মাথুর যদি হয় আমাদের আকাশবাণীর মাথা আর সরকারী প্রচারকর্ত্তা, তা হ'লে ডাঃ রায় যে এমন অসহায়ের মত সাহিত্যিক আর সাংবাদিকদের ডাকবেন তাতে আশ্চর্য্যের কিছু আছে?

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে একজন বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ এসেছিলেন, যিনি উড়িয়া ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর

ষ্টেইনবেক
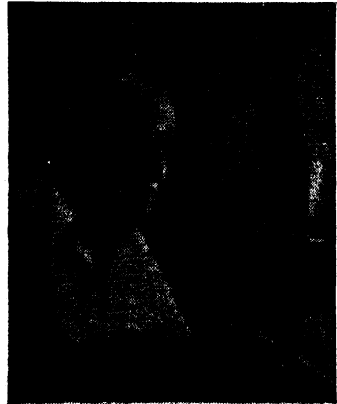
সমারসেট মম

পনেরোটা ভাষা জানেন, সেই ডক্টর মুজতবা আলীকে কেশকর কটকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কি কারণে কেউ জানে না। ডক্টর আলী বলছেন যে,—"ওড়িয়া ভাষা না শিখলে কাজ চালাতে পারবো না। ওড়িয়া শিখতে আমার সাত দিন সময় যাবে।"

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত ডক্টর আলীর অসমাপ্ত উপন্যাস "নর্ত্তকী" শেষ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি নিজেই। কিছু কাল অতীত হ'লেও প্রকাশিত অংশ পুনরায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করবে মাসিক বসুমতী।

গোপাল হালদারের বাঙলা সাহিত্যালোচনা

বাঙলার সাম্যবাদী সাহিত্যিক গোপাল হালদার এত কাল বিক্ষিপ্ত রচনা লিখছিলেন বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রে, সম্প্রতি তিনি এক গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রকাশক এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মনোনীত করেছেন গোপাল হালদারকে। বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা—যা এত কাল বিভিন্ন জন লিখেছেন নিজ নিজ দল বা উপদলের গুণকীর্ত্তন সহ, সেই সমালোচনা যাতে নির্দ্দোষ ও পক্ষপাতশূন্য হয় তৎপ্রতি নাকি লেখক ও প্রকাশক উভয়েই বিশেষ দৃষ্টিপাত করছেন। এই আলোচনা-গ্রন্থ বর্ত্তমানে ছাপাখানায়।

ফরষ্টারের সর্ব্বাধুনিক গ্রন্থ "দেবীর গিরি"

"The Hill of Devi" নামে একটি গ্রন্থ—যাতে আছে শুধু চিঠি আর চিঠি, ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্পর্কে বিভিন্ন চিঠিপত্র—লিখেছেন বিখ্যাত বিদেশী লেখক মিঃ ই, এম, ফরষ্টার। মধ্যভারতের দেওয়া রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজপুত্র টুকোজী রাওএর (তৃতীয়) সঙ্গে লেখক একদা পরিচিত ছিলেন এবং রাজপুত্রের অধীনে ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ ক'রেছিলেন। তখন ১৯২১ অব্দ। তার পর মধ্য-ভারতের দেওয়া রাজ্য সর্দ্দার প্যাটেলের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় এই সেদিনে। ফরষ্টারের চিঠিতে পূর্ব্বের এবং বর্ত্তমানের দেওয়া রাজ্যের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায়, বৈদেশিকের চোখে করদ রাজ্যের রাজপুত্র এবং তাঁর রাজত্বের বহুবিধ রূপাবলী। ফরষ্টারের দৃষ্টিতে ভারত এবং ভারতবাসীও বেশ পরিস্ফুট হয়েছে 'দেবীর গিরি' নামক গ্রন্থটিতে। প্রকাশক এডওয়ার্ড আর্ণল্ড।

এলিশের 'সাইকোলজি অব্ সেক্স'এর বঙ্গানুবাদ

বিশ্ববিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ্ হ্যাভলক এলিশের বই না পড়েই এত কাল অনেকে এলিশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে। প্রত্যেক সভ্য মানব-মানবীর যৌনতত্ত্ব শিক্ষার প্রয়োজন, বর্ত্তমান জগতে আর অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় বিশ্বাসযোগ্য ও সুখপাঠ্য বই নেই বললেই হয়। ভারতীয় বইয়ের মধ্যে বাৎস্যায়নের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক তর্জ্জমা করেছিলেন। প্রথম, মহেশচন্দ্র পাল এবং দ্বিতীয়, পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন। কিন্তু উক্ত দুটি অনুবাদ-গ্রন্থ বহু দিন ছাপা নেই। সঠিক অনুবাদের অভাবে বাৎস্যায়নের নামে বাজারে যে সকল পুস্তকাদির প্রচলন আছে, সেগুলিতে শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা অর্জ্জন হয় অধিক মাত্রায়।

হ্যাভলক এলিশের "সাইকোলজি অব সেক্স" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাঙলায় তর্জ্জমা ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। অনুবাদ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডটি শীঘ্র বাজারে প্রকাশ হচ্ছে। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় অনুবাদ-গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য পাঠক-পাঠিকাকে পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে এই খণ্ডগুলি তাঁদেরই বিক্রয় করা হবে, যাঁরা বিবাহিত এবং বয়স্ক অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের। "সাইকোলজি অব সেক্স" নামক এলিশের বিরাট গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের অধিকার এবং স্বত্ব লাভ করেছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

সাহিত্য-সংবাদ সম্পর্কে পুস্তিকা

সাহিত্য-সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশের এতটা হিড়িক কখনও দেখা যায়নি বাঙলা সাহিত্যে। সম্প্রতি কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলের কয়েক জন প্রকাশক এই বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন। সাহিত্য-সংবাদ বা সংবাদ-সাহিত্য প্রচারের জন্য কেউ কেউ কয়েক পৃষ্ঠার 'বুকলেট' বিনামূল্যে প্রচার করছেন। কেউ আবার বাঙলায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক পুস্তকাবলীর তালিকা সাঁটে প্রকাশ করছেন। লেখকদের আগে-পিছুতে যার যা-খুশী বিশেষণ প্রয়োগ করছেন। প্রকাশিত বই সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক বাক্য ব্যবহার করছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রকাশিত বইয়ের ঢালাও বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। যাই হোক, প্রকাশক কর্ত্তৃক পুস্তিকা প্রকাশের এই প্রচেষ্টায় প্রকাশকদের ইচ্ছাই প্রবল হোক। কিন্তু মাত্রা ছাড়ালেই গেল! তখন বিনামূল্যে বিতরণ করেও লাভ হবে না। এই শুভ প্রচেষ্টায় আরেক কাজ হচ্ছে—সাম্প্রতিক প্রকাশিত পুস্তকের 'লিষ্ট' ছেপে প্রকাশক প্রচুর অর্ডার পাচ্ছেন, যা অন্য কেউ পাচ্ছে না।

সাহিত্য-সংবাদ সম্পর্কে প্রয়োজন হয়েছে একটি নির্ভেজাল পুস্তিকার—যেটি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশক সমিতিই প্রকাশ করতে পারেন। এই ধরণের প্রচেষ্টায় প্রকাশকের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিতে হয়। এ পুস্তিকায় সাহিত্য এবং শিল্পকে এক করতে হয়।

ডক্টর বসাক অনূদিত রামচরিত

সংস্কৃত থেকে বাঙলায় তর্জ্জমা হয়েছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাক্কালে। বহু পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ক্ল্যাসিক-সাহিত্যিক এই তর্জ্জমার কাজে তখন আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কেন না বর্ত্তমানের মত অতীতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ লেখক কেউ ছিলেন না বললেই হয়। অতীতের বাঙলা সাহিত্যসেবীগণ বাঙলা ভাষায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি সংস্কৃত, ইংরাজী এবং এমন কি ফার্সী ভাষায় পর্য্যন্ত কারও কারও দখল ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক শিক্ষক-জীবন শেষ ক'রেও অনুরাগী ছাত্রের মতই পরিশ্রম-সাপেক্ষ তর্জ্জমা-কার্য্য ক'রে চলেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দুই খণ্ডে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র বঙ্গানুবাদ করেছেন। সম্প্রতি ডক্টর বসাক-

অনূদিত "রামচরিত" বাজারে বেরিয়েছে। সংস্কৃতে বিচক্ষণ হয়েও তর্জমায় ভাষা যে কত সহজবোধ্য করতে পারা যায়—"রামচরিত" পাঠ করলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বইটির ছাপা বাঁধাই চমৎকার।

মাসিক বসুমতীর ধারাবাহিক লেখা

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রায় অধিকাংশ ধারাবাহিক লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেই হাজার হাজার বিক্রী হয় সে-কথাটি হয়তো আমাদের পাঠক-পাঠিকার অজানা নেই। গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত রচনা 'দৃষ্টিপাত', 'শীতে উপেক্ষিতা', 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'আমার দেখা রাশিয়া', 'রাত্রির তপস্যা', 'রক্তনদীর ধারা', 'মনের ময়ূর', 'আকাশ-পাতাল' (১ম) এবং আরও অনেক লেখা বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রচুর সংখ্যক বিক্রয় হয়েছে। সদ্য-প্রকাশিত রচনার মধ্যে 'দেশে-দেশে', 'চীন দেখে এলাম' বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করলেন। 'ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করছেন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ।

প্রকাশিত রচনার মধ্যে 'নিরক্ষর' ও 'রাত্রির তপস্যা' ছায়া-চিত্রাকারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 'মনের ময়ূর'ও বাদ গেল না। বাঙলার বিশিষ্ট প্রকাশক ও চিত্র-প্রযোজকদের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি আছে মাসিক বসুমতীর ধারাবাহিক লেখায়—অনুমানেই তা বোঝা যায়।

বইয়ের গতর ও দাম

সম্প্রতি বইয়ের গতর ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে মোটা করা ও দাম বাড়ানোর দিকে সাহিত্যিক ও প্রকাশক উভয়েরই বেশ একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও যে ক্ষেত্রে গল্প উপন্যাসের দাম দু'-তিন টাকার বেশী দেখা যেত না, সে ক্ষেত্রে ক্রমশঃ দু'-তিন থেকে চার-পাঁচ এবং চার-পাঁচ থেকে সম্প্রতি আবার বইয়ের দাম ছ'-সাত-আটের ধাক্কায় এসে পৌঁচেছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং প্রয়োজনে বড় উপন্যাসও যে লেখা হবে না তা বলছি না, কিন্তু বর্ত্তমানে বাড়্‌তি দামের এমন কতকগুলি উপন্যাস দেখা গিয়েছে, যেগুলির দাম একটু হিসাব করলে অহেতুক বাড়ান হয়েছে ব'লে মনে হয়। এর জন্য লেখক ও প্রকাশক উভয়েই সমান দায়ী। কারণ, যে ক্ষেত্রে স্মল পাইকা টাইপে ছেপে একখানি বইয়ের দাম চার টাকায় দাঁড় করান যায়, সে ক্ষেত্রে লেখক বেশী রয়েলটি পাবার লোভে বইয়ের দাম যদি ছ' টাকা করার পক্ষপাতী হন, এবং এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রকাশক যদি সেই পাঁচ টাকার বইকে পাইকায় ছেপে, পাতায় বেশী জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছ' টাকায় দাঁড় করান, তা'হলে উভয়কেই দোষী করা ছাড়া উপায় কি?

বিদেশে এই ধরণের বড় টাইপে দাম বেশী ক'রে গল্প উপন্যাস ছাপার রেওয়াজ থাকলেও, ওদের অধিকাংশ মূল্যবান গ্রন্থেরই চীপ এডিসন পাওয়া যায়, তা'ছাড়া আমাদের দেশের তুলনায় ওদের পাঠক-সংখ্যাও যেমন বেশী, বই কেনার ক্ষমতাও তেমনি বেশী। কাজেই আমাদের এই গরীব দেশের বই-পড়ুয়াদের কথা স্মরণ করে লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই বইয়ের দাম কম করার অনুকূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

হাল-ফিল

বুদ্ধদেব বসু বর্ত্তমানে আমেরিকায় বসে মধ্যে মধ্যে যে কেবল এখানে-ওখানে দু'-একখানা কবিতা ছাড়ছেন তা নয়, তিনি দীর্ঘ এক ভ্রমণ-কাহিনীও লিখছেন এবং 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে একখানি কাব্য-সঙ্কলনও সম্পাদনা করছেন। প্রবীণদের সঙ্গে বহু নবীন কবিদের দেখা যাবে এই কবিতা-সংগ্রহের মধ্যে। কলকাতার এক বিশিষ্ট প্রকাশক শীগ গিরই বইটি প্রকাশ করছেন।

* * * *

পর্দ্দা ও মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য্য এবার নামছেন সাহিত্যের আসরে। তিনি নট হিসাবে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে পুলিশ জীবনের যে মহড়া দিয়েছিলেন, তারই উত্তেজনামূলক ঘটনাবহুল কাহিনী দিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ 'আমার পুলিশ-জীবন' নামে তাঁর এই রচনাটি কোন একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিছু দিনের মধ্যেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। পাব্লিশার্স'ও ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে, কাজেই খবরটা শুনে অন্যদের হাঁকু-পাঁকু করে লাভ নেই।

* * * *

একখানি বই লিখে খ্যাত দীপক চৌধুরী নামক এক বেনামী ব্যক্তি সম্প্রতি খ্যাতির ঠ্যালায় থাকতে না পেরে নিজেই নিজের নাম ফাঁস করে দিয়েছেন। তাঁর আসল নাম নাকি নীহার ঘোষাল। আর একবার সাহিত্যের আসরে 'নিষাদ বাসু' নাম নিয়ে তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাজার থেকে নাকি বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছেন এবং সেগুলিকে পুস্তকাকারে বার করার জন্য প্রকাশকদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। মরণদশা প্রকাশকদের! বহুরূপী এই ভদ্রলোক কবিতার বইয়ে আবার কি নাম নেবেন কে জানে!

কাজীর চিকিৎসা

কাজীর বিচার নয়,—আমরা কাজীর চিকিৎসার কথা বলছি। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সম্প্রতি লণ্ডন থেকে আবার ভিয়েনায় পাঠান হয়েছে সেখানকার বিখ্যাত চিকিৎসকদের পরামর্শের জন্য। গত জুন মাস থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত বিলেতে যেভাবে তাঁর মাথা নিয়ে বিখ্যাত চিকিৎসকদের গবেষণা হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে মতদ্বৈধ দেখা গেল, তাতে তাঁকে আর ভিয়েনায় না রেখে কোন রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, সেইটেই আনন্দের কথা।

আন্তর্জ্জাতিক গল্প-প্রতিযোগিতা

কিছু দিন পূর্ব্বে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আন্তর্জ্জাতিক গল্প-প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ চারটি গল্পের জন্য মোট হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে সেই প্রতিযোগিতার গল্পগুলির

বিচারক হিসাবে মাত্র তিন জন সাহিত্যিকের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন জনের মধ্যে আছেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সাহিত্যিক হিসাবে এঁদের যশ খ্যাতি বা সমালোচক হিসাবে বিচারশক্তি কত দূর, সে সম্বন্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা শুধু এইটুকুই ভাবছি যে, সাহিত্যে আজকাল যে পলিটিক্সের প্রভাব দেখা দিয়েছে তাতে প্রমথ বিশী ও তারাশঙ্কর এক দিকে পড়লে আর এক দিকের ভারসাম্য নন্দগোপাল কি করে রক্ষা করবেন।

পুরস্কৃত লেখক

খ্যাতনামা প্রবীণ কবি ও লেখক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। ভুবনমোহিনী স্মৃতিপদক পেয়েছেন এবার শ্রীমতী সুষমা দেবী। এর কীর্ত্তিকাহিনী ও পরিচয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অবগত নই।

* * * *

বিখ্যাত বৃটিশ গ্রন্থকার ও জীববিদ্যা-বিশারদ ডক্টর জুলিয়ান হাক্সলেকে এবার তাঁর বিশেষ বৈজ্ঞানিক রচনা সমূহের জন্য প্যারিসে ১০০০ পাউণ্ডের 'কলিঙ্গ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কার প্রতি বছরেই একজন-না-একজন বৈজ্ঞানিক বা কারিগরী বিদ্যায় বিশেষ গবেষণামূলক কাজ করেছেন এমন ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। এই পুরস্কার মিঃ এস, পট্টনায়ক নামক একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

* * * *

সাহিত্যের জন্য এবার ভিনিসে প্রথম ইণ্টারন্যাশানাল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ নরউইজান লেখক ত্রাজি ভেসাস্‌কে তাঁর ছোট গল্পের বই 'Vindane'-এর জন্য। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সাত-আটটি দেশ থেকে অসংখ্য গ্রন্থকার তাঁদের বই পাঠিয়েছিলেন। ত্রাজি নরওয়ের একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রায় ২৫খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার বেশীর ভাগই উপন্যাস। ১৯৪৭ সালে নরউইজান পার্লামেণ্ট থেকে তাঁকে বার্ষিক সম্মান-বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

ছোটো গল্পের পাঠক ও প্রকাশক

দীর্ঘকাল ধরে অনুযোগ শুনে আসছি—ছোটো গল্পের চাহিদা নেই। পাঠকের আগ্রহ না থাকায় প্রকাশকরা স্বভাবতই ছোটো গল্পের বই ছাপতে চান না। ছোটো গল্পের বই ছাপাতে প্রকাশকদের রাজী করতে হলে ঘুষ হিসাবে উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ দিতে হয়, এ সব হ'ল নেপথ্যের সংবাদ। ওদিকে ছোটো গল্প না থাকলে পত্র-পত্রিকা চলে না,—সেখানে পাঠক দু'-চারটি গল্প থাকলে খুসী হ'ন, প্রবন্ধগুলো না থাকলেও আপত্তি ছিল না, আরো গল্প চাই। সম্পাদকদের আগ্রহে এবং সাহিত্য-সৃষ্টির তাগিদে লেখক যে গল্প রচনা করেন প্রকাশকের আগ্রহের অভাবে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ হ'তে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। বাংলা দেশের অসংখ্য পাঠাগার আর তার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই তেমন গৌরবের কথা নয়, অথচ বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে গর্ব্বের

বস্তু তার ছোটো গল্প। বিশ্ব-সাহিত্যের হাটে সমান আসনে বসতে পারে শুধু বাংলা ছোটো গল্প, এ কথা অত্যুক্তি নয়, বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই তা জানেন। সম্প্রতি তাই দেখা যাচ্ছে, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'সেরা গল্প' ইত্যাদি নামকরণ করে কিছু গল্প-গ্রন্থ বাজারে চালানো হচ্ছে। অবশ্য এই প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, কিন্তু এই সূত্রে এমনও দেখা যাচ্ছে, যে বাজারে যাঁর একটিও গল্প-গ্রন্থ নেই তাঁরও শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। এটা নিছক পাঠক ঠকানোর কৌশল মাত্র। আমাদের মতে বর্ত্তমান কালে যে সব উৎসাহী প্রকাশক সৎসাহিত্যের প্রসারে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের উচিত বিজ্ঞাপন ও অন্তবিধ প্রচার-কার্যের দ্বারা পাঠকদের কাছে ছোটো গল্পের জনপ্রিয়তা বর্ধনের জন্ম সচেষ্ট হওয়া। এদিনের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় পাঠককে সচেতন করার দায়িত্ব তাঁদেরই বেশী।

অনুবাদ সাহিত্য

ইদানীং অনুবাদ সাহিত্যের দিকে সাহিত্যিক ও প্রকাশকগণের যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠেছে—"এত অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে কেন?" প্রকাশকরা জবাবে জানান—সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদি সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাঁরা গড়ে বছরে একখানি হয়তো উপন্যাস লেখেন, তাও প্রতিযোগিতার ফলে কোন প্রকাশক পাবেন তার ঠিক নেই, তাই তাঁরা সহজ পথ বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ খ্যাতনামা লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করছেন। অনুবাদ-কার্য আমাদের দেশে দীর্ঘ দিন অবহেলার বস্তু ছিল, অনুবাদক ছিলেন অপাংক্তেয়। যদিচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, সজনীকান্ত দাস, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি কৃতী সাহিত্যিকরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, তবু সেদিন পর্যন্ত অনুবাদ-সাহিত্য সাহিত্য-জগতে 'হরিজন' হিসাবেই গৃহীত হয়েছে। এখনও যে সে অবস্থা কেটেছে তা নয়, তবে ক্রমে এ বিষয়ে শিক্ষিত পাঠকসাধারণেরও আগ্রহ বাড়ছে। বিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থের স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ পাঠক মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন এমনও দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে অক্ষম অনুবাদকের শৈথিল্য ও অবহেলায় অনেক সদ্‌গ্রন্থের মূল সুর ব্যাহত হতে দেখেছি—সেদিকে লেখক ও প্রকাশকের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অনুবাদ কার্য সহজ নয় বরং অতিশয় পরিশ্রমসাপেক্ষ, এই কথাটাই সকলের জানা উচিত। আর একটি কথা, এলো মেলো ভাবে যা খুসী অনুবাদ করাও ঠিক নয়, যে গ্রন্থের অনুবাদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে সেই গ্রন্থের অনুবাদ করাই যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক গ্রন্থের নূতন সংস্করণ

বাংলা সাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদের পুনর্মুদ্রণ না হওয়ায় তা ক্রমশঃই পাঠক-সমাজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ, কালও যে লেখকের জনপ্রিয়তা ঈর্ষ্যার বস্তু ছিল আজ আর তাঁকে স্মরণ করি না। তাই প্রয়োজন—পুরাতন জনপ্রিয় গ্রন্থের নূতন প্রচার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগের দিনে একখানি গ্রন্থের এক হাজারের বেশী ছাপা হয়নি, সে ক্ষেত্রে তার নূতন সংস্করণের চাহিদা হওয়াই স্বাভাবিক। সম্প্রতি বসুমতী সাহিত্য মন্দির কয়েক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। চারু বন্দ্যো, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি খ্যাতনামাদের কয়েকখানি জনপ্রিয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণও ছাপা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ অতি শুভ লক্ষণ। প্রকাশকদের এ বিষয়ে আরো তৎপর হওয়া উচিত।

বইএর মলাট

যুদ্ধপূর্ব কালে বাংলা বইগুলির মলাট প্রায় বিলাতী গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল। উপহার গ্রন্থের মলাটও দর্শনীয় বস্তু ছিল। এখন আর সেদিন নেই, বইএর দামও সেদিনের তুলনায় অনেক বেড়েছে। যুদ্ধের সময় যে কাগজের মলাট উদ্ভাবিত হয়েছিল, অবস্থা দেখে মনে হয়, তা বুঝি স্থায়ী আসন লাভ করল। অথচ ডাইরী বা পাঠ্য-পুস্তকের মলাট কাপড়ে বা রেক্সিনে বাঁধা চলে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'চেনা মহল' নামক গ্রন্থটির মলাট এই কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশকের কৃতিত্বের প্রশংসা করা যায়। আমাদের মনে হয়, এই প্রকাশক প্রদর্শিত পন্থা অন্যান্য প্রকাশকদের গ্রহণ করা উচিত। একখানি গ্রন্থ চার বা ততোধিক টাকায় কিনে পাঠককে যদি দু'-চার দিনেই আবার বাঁধানোর বন্দোবস্ত করতে হয়, তার মত বিড়ম্বনা আর নেই। মলাটের ছবি ভালো হলেই চলে না, সেটি মজবুত হওয়াও প্রয়োজন।

সমসাময়িক বঙ্গ-সাহিত্য সমাবেশ

সংবাদপত্রে প্রকাশ, দেশের সাহিত্যিকদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্বে এবং সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রতি বৎসর বাংলা দেশে একাধিক সাহিত্য সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করা হবে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে সম্প্রতি এই সমিতির দু'টি প্রারম্ভিক আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ মহাশয় বলেছেন—"সাহিত্যের স্বার্থই সাহিত্যিকের স্বার্থ, সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর জনচিত্তের সংযোজন চাই।" সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সূত্রে একটি চমৎকার কথা বলেছেন—"সাহিত্যকে কদাপি দলীয় রাজনীতির বাহন হইতে দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃত সাহিত্য জীবনতত্ত্বের বাহক, উহা রাজনীতি অপেক্ষা অনেক মহৎ বস্তু এবং সাহিত্য রাজনীতির সাময়িকতাকে অতিক্রম করিয়াও ভবিষ্যতের জীবনকে প্রতিফলিত করিতে পারে।"

সাহিত্য সমাবেশের সঙ্কল্প সাধু, বর্তমানে বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছেন, মত যাই থাকুক পথটা যখন এক, তখন তুচ্ছ বিভেদ ভুলে সৎসাহিত্যের প্রসারে ভাষা-জননীর সেবা করাই সৎসাহিত্যিকের কর্তব্য।

সাহিত্যিকের মৃত্যু

সাহিত্যিকদের আজ ঘোরতর দুর্দিন। কোনো একটি শক্তিশালী দলের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সাহিত্যিকেরও মৃত্যু-সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, এই অবস্থাও দেখা গেল। ৮৩ বছর বয়সে প্যারীতে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন আইভান বুনিন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক অভিজাত-পরিবারে রাশিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। সাহিত্য-কর্মের জন্ম রাশিয়ার পুসকিন একাডেমি তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার

দিকে সম্মানিত করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান আইভান বুনিন। ১৯২৩-এ লেখা তাঁর "নেভার এনডিং স্প্রীং" গল্পটি অবিস্মরণীয়। এর দু'বছর আগে তিনি রাশিয়া ছেড়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশের জন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে ধন্তবাদ।

*   *   *   *

আর একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক ইউজিন ও'নীলের বোষ্টনে নিউমোনিয়া রোগে সম্প্রতি মৃত্যু ঘটেছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রচিত "বিয়ণ্ড দি হরাইজেন" নামক নাটকটির জন্ত তিনি পলিটজার পুরস্কার পান। প্রথম জীবনে তিনি সিঙ্গার সিউইং মেশিন কোম্পানীর কমচারী ছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'এ্যানা ক্রিষ্টি', 'ষ্ট্রেঞ্জ ইনটারলুড' অতিশয় খ্যাতিসম্পন্ন এবং আরো দু'বার তিনি এই নাটকটির জন্ত পুরস্কার পান। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। আইভান বুনিন বা ইউজিন ও'নীলের কোনো গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়নি।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্পর্কে গ্রন্থ

(অসম্পূর্ণ তালিকা)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)—স্বামী অরূপানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা (শ্রীশ্রীমায়ের কথা গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত)—স্বামী অরূপানন্দ। শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ (মায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ)। শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্ত। Sri Sarada Devi and the Holy Mother—Swami Ghanananda. A Short Life of the Holy Mother. A Glimpse of the Holy Mother (Centenery Memorial Volume)—Chandra Kumari Handoo. সারদা-সঙ্গীত—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদামণি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীমা সারদামণি—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ।

॥ প্রাপ্তি-স্বীকার ॥

নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিঃ—স্বামী জগদানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

কৈলাস ও মানস তীর্থ—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য আড়াই টাকা।

যাঁরা নারী মহীয়সী—স্বামী অসিতানন্দ। চিত্র মন্দির, ৩, খেলাৎ বাবু লেন, কলিকাতা-২। মূল্য দেড় টাকা।

অরবিন্দ দর্শনের উপাদান—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী ও শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী। ভারতবাণী প্রকাশনী, ৫৪।৪বি, হাজরা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

নেতাজীর জীবনবাদ—শ্রীঅনিল রায়। অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ৪৭।এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

চোরকাঁটা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপনী, ২৩৫, বি, টি, রোড। মূল্য দুই টাকা।

কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ—জিম করবেট। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য তিন টাকা।

সংবর্ত্ত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য দু টাকা।

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার—বিষ্ণু দে। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য আড়াই টাকা।

এলিঅটের কবিতা—বিষ্ণু দে অনূদিত। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য দু টাকা।

পারাপার—অমিয় চক্রবর্ত্তী। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য আড়াই টাকা।

পদিপিসীর বর্মি বাক্স—লীলা মজুমদার। সিগনেট প্রেস, ১৫।২, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য দু টাকা।

কুরুক্ষেত্র—স্বামী সমুদ্ধানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার, বোম্বাই-১। মূল্য এক টাকা।

রাজনগর—শ্রীননীমাধব চৌধুরী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বাংলার ইতিহাস সাধনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

চলতি পথে—শ্রীমৃণালকান্তি বসু। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ভাব-রূপা—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৯৫।১বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দু টাকা।

ক্ষয়রোগ কথা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। নিউ গাইড, ১২, রূপরাম বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'মিত্রা' রচনা দুটির কিস্তী পাইতে বিলম্ব হওয়ায় জন্ত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশ সম্ভব হইল না।

লবকুমার বসু

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিদেশাগত কমনওয়েলথ দলটির বিষয় আগেই কিছু বলা হয়েছে ; সে সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাক।

তাঁদের ষষ্ঠ খেলাটি অমৃতসরে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। প্রথম ব্যাট করতে নেমে জুবিলী দল মাত্র পাঁচ উইকেটে ৩১৬ রাণ করলে অধিনায়ক বার্ণেট ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেঞ্চুরী করেন ওরেল (১১০ রাণ)। এ সফরে এটি তাঁর তৃতীয় শতাধিক রাণ। ওরেল ছাড়া সিম্পসন (৮০), সুব্বা রাও (৭২) এবং এড্রিচও (৬৪) ব্যাটিংএ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উত্তরাঞ্চল ২৭৮ রাণ তোলে। তার মধ্যে গাওকারী করেন ৭৮ রাণ। এ খেলায় বেশ উল্লেখযোগ্যই হয়েছিল তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিং। জুবিলী দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে মাত্র ১৪৮ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে। গাওকারী ৩৭টি মাত্র রাণ দিয়ে ছটি উইকেট লাভ করেন। এর পর স্থানীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে সাত উইকেট হারিয়ে ১০১ রাণ করে এবং খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

জুবিলী দলটিকে সফরের দ্বিতীয় পরাজয় বরণ করতে হয় দিল্লীতে, ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট খেলায়। নতুন অধিনায়ক উম্রীগড় ভারতীয় দলটিকে পরিচালনা করেন। তাঁর এই প্রথম নেতৃত্বে ভারতীয় দলের সাফল্য খুবই প্রশংসার্হ। অপর দিকে জুবিলী দলের পরাজয় সকলকে খুবই নিরাশ করেছে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত চার উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৪৮ রাণ করে। মঞ্জরেকার ৮৬ রাণ করে আউট হয়ে যান। তার পর ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক উম্রীগড় ও রামচাঁদ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে পঞ্চম উইকেটে ১০১ রাণ তোলেন। উম্রীগড় ৪৭ রাণ করে আউট হ'লে রামচাঁদ বারোটি 'চার' ও দুটি 'ছয়' মেরে ১১৯ রাণ করেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৮৭ রাণে। এর পর জুবিলী দল ব্যাট করতে নামলে প্রথম উইকেটের জুটিতে সিম্পসন ও মার্শাল ৯০ রাণ তোলেন। কিন্তু ভাল ভাবে গোড়াপত্তন করলেও গুপ্তে ও গুলাম আমেদের স্পিন বলের বিরুদ্ধে তাঁদের বিপর্যস্ত হতে হয়। ভারতের স্পিন বোলারদ্বয় অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বল করে তাঁদের সকল উইকেটের পতন ঘটান মাত্র ১৯৮ রাণে। 'ফলোঅন' হতে বাধ্য হয়ে জুবিলী দল দ্বিতীয় বার খেলতে নামলেও সেই স্পিন বলের সম্মুখীন হয়ে পুনরায় তাঁদের বিপর্যয় ঘটে। খেলার চতুর্থ দিনে মাত্র ১৭৪ রাণে তাঁদের সকল খেলোয়াড়ই আউট হয়ে যান। গুপ্তে ও গুলাম আমেদ এই ম্যাচে যথাক্রমে ১৭৩ ও ১৩২টি রাণ দিয়ে ১২টি ও ৮টি উইকেট লাভ করেন। এই প্রথম টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ১৫ রাণে জয়লাভ করে। ফলাফল :—

ভারত—৩৮৭ (রামচাঁদ ১১৯, মঞ্জরেকার ৮৬, বেরী ৯০ রাণে ৫টি, ওরেল ৬৫ রাণে ৪টি)

জুবিলী দল—১৯৮ (সিম্পসন ৫৭ ; গুপ্তে ৯১ রাণে ৮টি) এবং ১৭৪ (সিম্পসন ৫৯, ওরেল ৫৪ ; গুলাম আমেদ ৫২ রাণে ৬টি, গুপ্তে ৮২ রাণে ৪টি)

রাজস্থানের রাজপ্রমুখ একাদশের বিরুদ্ধে জুবিলী দলের সঙ্গে পরবর্ত্তী খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরে। রাজপ্রমুখ দলের অধিনায়কত্ব করেন ডুঙ্গারপুরের মহারাজা। খেলাটির শেষ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয়নি।

এর পর বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে খেলাটিও অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। ভারতের প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় সোহনীর নেতৃত্বে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত বোম্বাই দল বিদেশাগত দলের বিপক্ষে খুবই প্রশংসনীয় ভাবে খেলে। প্রথম ইনিংসে বোম্বাইর উদীয়মান খেলোয়াড় কেনী শতাধিক রাণ (১৪৩) করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন এবং ইরাণীর সহযোগিতায় পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১৭০ রাণ করেন। মার্শাল ও লোডার এই খেলায় বোলিংএ যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেন। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৩৩৮ রাণে শেষ হলে জুবিলী দল সাত উইকেটে ৫১০ রাণ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। লক্সটন ও বার্ণেটের শতাধিক রাণ এবং সপ্তম উইকেটের জুটিতে ২০২ রাণ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এমেট, মার্শাল এবং সিম্পসনও ব্যাটিংএ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খেলার শেষ দিনে বোম্বাই দল দ্বিতীয় ইনিংসে সাত উইকেটে ১৩২ রাণ করলে খেলাটি 'ড্র' হয়।

জুবিলী দল প্রথম টেষ্টের ব্যর্থতার গ্লানি অনেক পরিমাণে মোচন করে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেষ্টে। এ খেলাটিও অবশ্য শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবেই। প্রথম ইনিংসে সিম্পসন, ব্যারিক, মার্শাল, মিউলিম্যান, লক্সটন প্রভৃতির সাফল্যমণ্ডিত ব্যাটিংএর জন্যে জুবিলী দল মাত্র ছয় উইকেটে ৫০৪ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে দেয়। সিম্পসন ও ব্যারিক উভয়েই শতাধিক রাণ তোলেন। ভারতের পক্ষে তিন জন স্পিন বোলার মানকড়, গুপ্তে ও জাসু প্যাটেলকে নেওয়া হয়েছিল! কিন্তু দিল্লীর উইকেটে যে স্পিন বোলাররা বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের বিপর্যস্ত করেছিলেন, বোম্বাইর নিষ্প্রাণ উইকেটে তাঁদের অকৃতকার্য্যতাই পরিলক্ষিত হয়। অথচ এরূপ উইকেটে সবচেয়ে যাঁদের কার্য্যকারিতা বেশী, ভারতীয় দলে সেই ফাষ্ট বোলারদের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'জন—রামচাঁদ ও সুন্দরাম ; যদিও তাদের কাউকেই প্রকৃত ফাষ্ট বোলারের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। অপর দিকে জুবিলী দলের লোডার, লক্সটন এবং ওরেলের মত ফাষ্ট বোলারের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যাট করতে হয় এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই ভারতীয় দলকে প্রথম ইনিংসে বিপর্যয়েরও সম্মুখীন হতে হয়। মাত্র ১৫৩ রাণে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে সকলে আউট হয়ে যান। মানকড়, তামানে, মঞ্জরেকার ও গাওকারীর উইকেটের পতন হয়েছিল মাত্র ২৬ রাণে। কেবল মাত্র অধিনায়ক উম্রীগড় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৮৩ রাণ করতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় ইনিংসেও মাত্র ৬২ রাণে উম্রীগড় ও মঞ্জরেকারের উইকেটের পতন হয়। অবশেষে মানকড় ও হাজারে জুটী এবং পরে গাওকারী ও গোপীনাথ জুটী ভারতকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। মানকড় অসামান্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়ে ১৫৪

রাণ করেন এবং তৃতীয় উইকেটের জুটীতে হাজারের সহযোগিতায় ১৮২ রাণ তোলেন। অতঃপর তরুণ খেলোয়াড় গাডকারী শতাধিক রাণ করতে সমর্থ হন। গাডকারী ও গোপীনাথ উভয়েই অপরাজিত থেকে ষষ্ঠ উইকেটের জুটীতে ১৪৪ রাণ করেন এবং ভারতের পরাজয়ের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। ফলাফল :—

জুবিলী দল—ছয় উইকেটে ৫০৪ ও ডিঃ (সিম্পসন ১২১, ব্যারিক নট আউট ১০২, মার্শাল ৯০, লক্সটন ৫৫, মিউলিম্যান ৫০, মানকড় ১১০ রাণে ৩টি)

ভারত—১৫৩ (উম্রীগড় ৮৩, লোডার ৫৩ রাণে ৪টি, ওরেল ৩২ রাণে ৩টি, লক্সটন ৪২ রাণে ৩টি) এবং পাঁচ উইকেটে ৪৪৭ (মানকড় ১৫৪, হাজারে ৬১, গাডকারী নট আউট ১০২, গোপীনাথ নট আউট ৬৭ ; লোডার ৪৩ রাণে ৩টি)

* * * *

কলকাতায় সি, এ, বি, পরিচালিত ক্রিকেট লীগের খেলা পুর্ণোদ্যমে চলেছে। প্রতি শনিবার ও রবিবারে কলকাতার ক্রিকেট-দর্শকদের এটি হ'ল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। লীগ জয়ের জন্য শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কতকগুলি ক্লাব বাহিরে থেকে কয়েক জন টেষ্ট খেলোয়াড় এনেছে এবং অন্যান্য দলও স্থানীয় নামকরা খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথম ডিভিশনে এখন কেবল মাত্র মোহনবাগান ও রাজস্থান দলের কোন পয়েণ্ট নষ্ট হয়নি। এই ক্লাব দুটি ছাড়া লীগ পাবার জন্যে কালীঘাট, ভবানীপুর, ইষ্টবেঙ্গল ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে আজ যে খবরটি লোকের মুখে বেশী শোনা যাচ্ছে, সেটি সফরকারী রজত জয়ন্তী দলের কলকাতায় টেষ্ট ম্যাচ খেলার বিষয়। প্রতিবারেই সফরকারী কোন দল কলকাতায় এলে ইডেন গার্ডেনেই তাদের খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সি, এ, বি, তার পরিচালনা করে।

এ বছরে কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছে। ন্যাশান্যাল ক্রিকেট ক্লাব স্থির করে বসেছিল যে, এবার তারা নিজেরাই সফরকারী দলের খেলার পরিচালনা করবে। অন্যান্য বছর বাঙ্গালা দেশের ক্রিকেট খেলার সর্বময় কর্ত্তা হিসাবেই সি, এ, বি, এগুলির পরিচালনা করত এবং এন, সি, সি-র মেম্বরদের জন্যে কিছু আসন সংরক্ষিত হ'ত। বরাবর এই ভাবেই চলছিল। তাই সি, এ, বি, স্থির করে যে, তারাই খেলাগুলির পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে ইডেন গার্ডেনের পরিবর্ত্তে অন্য কোন মাঠে খেলার ব্যবস্থা করা হবে। এই সব মতদ্বৈততার কারণে এন, সি, সি-র সভাপতি শ্রীজে, সি, মুখার্জ্জি সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে আবার আর এক সমস্যাও দেখা দিয়েছে। ইডেন গার্ডেনের খেলার মাঠ, ষ্টেডিয়াম প্রভৃতি জায়গা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি। তাই কিছু দিন হ'ল সরকার এন, সি, সিকে ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইডেন গার্ডেন পরিত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যাই হোক, সি, এ, বি, এবং এন, সি, সি-র মধ্যে একটা মিটমাট হয়েছে। সি' এ, বিই টেষ্ট খেলাগুলি পরিচালনা করবে। তবে সরকারের নির্দ্দেশ সম্পর্কে আর কোন খবর এটি লেখার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। উদগ্রীব হয়েই আমরা অপেক্ষা করব এর একটি সুব্যবস্থার জন্যে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বারমুডা সম্মেলনের ফলশ্রুতি—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইনসেনহাওয়ার এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ লেনিয়েলের মধ্যে বারমুডায় যে সম্মেলন গত ৪ঠা ডিসেম্বর আরম্ভ হয়, তাহা ৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) শেষ হইয়াছে। ঐ দিনই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার বারমুডা হইতে বিমানযোগে সরাসরি নিউ ইয়র্ক যাইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে পরমাণু যুগের আতঙ্কজনক অবস্থা দূরীভূত করিবার উপায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বারমুডা সম্মেলন শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি কেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এই বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বারমুডা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই বক্তৃতা যদিও বারমুডা সম্মেলনের রিপোর্টের অন্তর্গত নয়, তথাপি তাঁহার এই বক্তৃতা স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং মঃ লেনিয়েলের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বক্তৃতা যে বারমুডা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বিশেষতঃ, মার্কিণ পরমাণু উপদেষ্টা এডমিরাল ষ্ট্রাস এবং স্যার উইনষ্টনের পরমাণু উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েল বারমুডায় প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতার মুসাবিদা রচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বারমুডায় যাওয়ার উহাই ছিল উদ্দেশ্য, এই সংবাদটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বারমুডা সম্মেলনের আলোচনা বিশেষ সতর্কতার সহিত গোপন রাখা হইয়াছে। কাজেই, এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই জানিবার উপায় নাই। চারি দিনব্যাপী আলোচনার শেষে এই সম্মেলনের ফলাফল বর্ণনা করিয়া যে-ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে কোন কথাই প্রকাশ করা হয় নাই। উহাকে বারমুডা সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। উহা যেমন তথ্যহীন তেমনি নীরস। বার্লিনে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তেরই কোন বিবরণ এই ইস্তাহারে নাই। অবশ্য সম্মেলনে আলোচনার গতি কি ভাবে চলিয়াছিল, আলোচনার যথার্থ স্বরূপ কি, সে-সম্পর্কে গোপন ইঙ্গিত এই ইস্তাহার বিশ্লেষণ করিলে একেবারেই পাওয়া যায় না তাহাও নয়। কিন্তু এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রকৃত পরিচয় শুধু ভাবী আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই পাওয়া সম্ভব হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেন এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও প্রকাশিত ইস্তাহারের যবনিকা ভেদ করিয়া কিছু-না-কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে মাসিক বসুমতীর কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরালোচনা করার স্থানাভাব। এখানে বোধ হয় শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেন এবং ফ্রান্সের যে-সকল মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেগুলি দূর করিয়া ঐক্যমত গঠনই ছিল এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য। এই মতভেদটা মৌলিক তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সম্মেলন প্রথম আহূত হইয়া স্থগিত থাকিবার পর এই মতভেদও বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়া যায়। তথাপি কোরিয়া শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে পশ্চিমী ত্রিশক্তির মধ্যে পুরাপুরি মতৈক্য হওয়া প্রয়োজন। রাশিয়ার সহিত আলোচনা সম্পর্কেও কোনরূপ মতভেদ বা ভ্রান্ত ধারণা থাকাও সঙ্গত নয়। বারমুডা সম্মেলনে যে এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, প্রকাশিত ইস্তাহার হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বারমুডা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের তীব্রতা হ্রাস করিবে, না বৃদ্ধি করিবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

বারমুডা সম্মেলনের ফলাফল ঘোষণা করিয়া প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান উত্তেজনা লাঘব করিবার কোন সুযোগ তাঁহারা হারাইবেন না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বারমুডা সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের তীব্রতা হ্রাসের জন্য কি ভাবে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে। ইস্তাহার হইতে দেখা যায়, বৃহৎ তিনটি দেশের সম্মিলিত শক্তিই যে শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষা-কবচ, এ সম্পর্কে পশ্চিমী তিন প্রধান একমত হইয়াছেন। তাঁহারা আরও একমত হইয়াছেন যে, চৌদ্দটি দেশ লইয়া গঠিত আটলাণ্টিক চুক্তি প্রতিষ্ঠান বৃহৎ ত্রিশক্তির সাধারণ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে। তাঁহারা পুনরায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলিকে দেশরক্ষায় সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের জন্য পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা উত্তেজনার প্রকৃত কারণগুলিকেই সুদৃঢ় করিবার জন্য একমত হইয়াছেন। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি এবং ইউরোপীয় দেশরক্ষা ব্যবস্থাই আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। লুগানোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের যে-উত্তর রাশিয়া দেয়, তাহাতে রাশিয়া

স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দেয় যে, ইউরোপীয় বাহিনী চুক্তি এবং বনচুক্তি কার্য্যকরী করা হইলে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন হওয়ার কোন সার্থকতা নাই। অতঃপর বারমুডা সম্মেলনের প্রক্কালে গত ২৬শে নবেম্বর (১৯৫৩) বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদানে রাজী হইয়া রাশিয়া পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়কে যে-পত্র দেয় তাহাতে সকলেই বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। এই পত্রকে কেহ কেহ রাশিয়ার কূটনৈতিক পরাজয় বলিয়া অভিহিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এই পত্রে রাশিয়া তাহার ৯ই নবেম্বরের (১৯৫৩) পত্রে উল্লিখিত সমস্ত দাবীই পুনরায় উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু এইগুলিকে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদানের সর্ত্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয় নাই। এই জন্য বারমুডা সম্মেলনে রাশিয়ার প্রস্তাব অনুসারে বার্লিনে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের অনুষ্ঠানে একমত হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাশিয়াকে পত্রও দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম-বার্লিনে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৫৪) এই সম্মেলন আরম্ভ হইবে। রাশিয়া পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী হইয়াছে বলিয়াই, ইউরোপীয় বাহিনী সম্পর্কে তাহার আশঙ্কা দূর হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ২৬শে নবেম্বরের পত্রেও ইউরোপীয় বাহিনী সম্পর্কে রাশিয়া কঠোর সমালোচনা করিয়াছে।

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় তাঁহাদের ইস্তাহারে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য বলপ্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হইবে না, তাঁহারা জাতি-সঙ্ঘের নিয়মানুযায়ী সর্ব্বত্রই আক্রমণ প্রতিহত করিবেন। তাঁহাদের এই আশ্বাসের মূল্য কি, তাহা কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মধ্যে পাওয়া যায়। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সাম্রাজ্য রক্ষায় সাহায্য করিতেছে। রাশিয়া ভাবী আক্রমণকারী, ইহা কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহারা উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি করিয়াছেন, ইউরোপীয় দেশরক্ষা বাহিনী গঠনের আয়োজন চলিতেছে। রাশিয়ার চারি দিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আরও ঘাঁটি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই যেখানে অবস্থা, সেখানে আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা লাঘব করিবার শুভ ইচ্ছা সাধারণ মানুষের কাছে ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই মনে হইবে না। আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধির আর একটি কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে তাহার ন্যায্য আসন হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা। ইহার মূলে যে বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ফরমোসায় চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশে অবস্থিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে সশস্ত্র করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্ষা করা হইতেছে চীন দেশ হইতে কম্যুনিষ্ট-শাসন উচ্ছেদ করার জন্যই, এ কথা কাহারও অজানা নাই। সিংম্যান রী এবং চিয়াং কাইশেক এশিয়ায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের যে আহ্বান জানাইয়াছেন (২৮শে নবেম্বর ১৯৫৩) তাহার প্রকৃত লক্ষ্য কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর-কোরিয়া। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটে আশ্রয় না পাইলে এত দিন যাহাদের অস্তিত্বই থাকিত না, কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনে এশিয়াবাসীকে আহ্বান করার দুঃসাহস তাহারা কোথায় পাইল? এই প্রসঙ্গে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিণ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট

মিঃ নিক্সন তাঁহার সুদূর-প্রাচ্য ভ্রমণের সময় গত ৯ই নবেম্বর (১৯৫৩) ফরমোসায় চীনা জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট এবং জাতীয়তাবাদী এসেম্বলীর সদস্যদের সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমেরিকা চীনা জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্টকেই, চীনের গবর্ণমেণ্ট এবং জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্টকেই চীনা-জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে।" চাইনিজ পিপলস্ গবর্ণমেণ্টের পতন অবশ্যম্ভাবী, এই ভবিষ্যদ্বাণীও এই বক্তৃতায় তিনি করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেকের বাহিনী চীন আক্রমণ করিয়া কম্যুনিষ্ট-শাসনের উচ্ছেদ পূর্ব্বক চীন দখল করিবে, আমেরিকা-বাসীরা এই আশাই পোষণ করিতেছে। এই জন্যই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার করিতে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাকে তাহার প্রাপ্য আসন দিতে রাজী নয়। বারমুডা সম্মেলনে সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার সময় কম্যুনিষ্ট চীনের কথা আলোচিত হয় নাই, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রকাশিত ইস্তাহারে সে-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ইস্তাহারে শুধু এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে, সুদূর-প্রাচ্যের প্রশ্ন সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া যাওয়াই তাহাদের বর্ত্তমান নীতি। কিন্তু বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা-কার্য্য সম্পর্কে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে এবং রাজনৈতিক সম্মেলন-সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাতেই যে অচল অবস্থার পর অচল অবস্থা চলিতেছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহারা করেন নাই, ইহা কি স্বীকার করা সম্ভব? অথচ ইস্তাহারে এ সম্পর্কে উল্লেখ মাত্র করা হয় নাই।

বারমুডা সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে প্রকাশিত ইস্তাহার হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, বার্লিনে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিত্রয় একমত হইয়াছেন। রাশিয়া সম্পর্কে যে সামান্য মতভেদ ছিল তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। সুদূর-প্রাচ্যের প্রধান সমস্যা কোরিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কেও তাঁহাদের সমস্ত মতভেদের অবসান হইয়াছে। এক কথায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মার্কিণ নীতির সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের যে মতভেদ ছিল, তাহার অবসান হইয়া মার্কিণ-নীতিতেই তাহারা সায় দিয়াছে। মার্কিণ-নীতিরই জয় হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মূলতঃ মার্কিণ-নীতির সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতির সত্যিকার কোন বিরোধ নাই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-রক্ষা করাই তাহাদের সকলেরই একমাত্র নীতি। তবু তাহাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে বৃটেন ও ফ্রান্সের মনে গভীর আশঙ্কাও আছে, জার্ম্মাণ জঙ্গীবাদের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কায় ফ্রান্সও কম ভীত নয়। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সকে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিণ অতি-সাম্রাজ্যবাদের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাই বারমুডা সম্মেলনের মূল ফলশ্রুতি।

পরমাণুশক্তির বিভীষিকা ও আইসেনহাওয়ার

বারমুডা সম্মেলন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সরাসরি নিউ ইয়র্ক যাইয়া পরমাণু শক্তি সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দেওয়া তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করা চলে না। অবশ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশোল্ডের আমন্ত্রণেই তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার বারমুডা সম্মেলনে যোগদানের পরই তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মনে করিলেন কেন, তাহাও কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার এই বক্তৃতাটি কখন এবং কোথায় রচিত হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। বারমুডা সম্মেলন আরম্ভ হয় ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫৩) শুক্রবার। ঐ দিনই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের আমন্ত্রণ প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট পৌঁছে। রবিবারের আলোচনা সম্পর্কে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে, ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিবেন। একটি সংবাদে বলা হয় যে, তিনি বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স এই তিন গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের প্রতিনিধিরূপে এই বক্তৃতা দিবেন না, বক্তৃতা দিবেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে। একটি সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন এজেন্সীর কতিপয় কর্ম্মচারী এবং হোয়াইট হলেরও কতিপয় কর্ম্মচারী মিলিয়া পাঁচ মাস যাবৎ প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের জন্য পরমাণু শক্তি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা রচনা করিতেছিলেন। এই বক্তৃতার নাম দেওয়া হইয়াছিল "Operation Candour." আর একটি বিবরণে প্রকাশ যে, মার্কিণ পরমাণু উপদেষ্টা এডমিরাল ষ্ট্রাস এবং স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের পরমাণু উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েল মিলিত ভাবে প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের এই বক্তৃতার মুসাবিদা তৈয়ার করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বারমুডায় গিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাটির মুসাবিদা পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল এবং বারমুডা সম্মেলনকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণ পরিষদে এই বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সেক্রেটারী জেনারেল কর্ত্তৃক আমন্ত্রণের ব্যবস্থাও পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের এই বক্তৃতা যে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণের রাশিয়ার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহেই অনুমান করিতে পারা যায়। বারমুডা সম্মেলনের পরেই এই বক্তৃতা দেওয়ার তাৎপর্য্য বোধ হয় ইহাই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিরাট শক্তি-শালী হইয়াই পরমাণু শক্তি সম্পর্কে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু শক্তিতে কিরূপ শক্তিশালী হইয়াছে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতায় তাহার আতঙ্কজনক বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-পরিমাণ পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত করিয়াছে এবং এখনও উৎপাদন করিতেছে সেগুলির ধ্বংসকারী শক্তির পরিমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত বোমা ও গোলাবারুদের শক্তির মোট পরিমাণকে বহু গুণে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যে-কোন বিমান ঘাঁটি কিম্বা যে-কোন বিমানবাহী জাহাজ হইতে আজ যে-কোন একটি বিমানবাহিনী তাহাদের নাগালের মধ্যে অবস্থিত যে-কোন লক্ষ্যস্থলে এত পরমাণু বোমা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, যাহার ধ্বংস-শক্তি দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধে বৃটেনের উপর বর্ষিত সমুদয় বোমা অপেক্ষা অধিক।" হাইড্রোজেন বোমার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা ও ঐ জাতীয় অস্ত্রাদির বিস্ফোরণ ক্ষমতা পরমাণু অস্ত্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক।" এক সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তির একচেটিয়া অধিকার থাকিলেও কয়েক বৎসর হইল রাশিয়াও যে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিয়াছে, এই বাস্তব সত্যকে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার পাশ কাটাইয়া যান নাই। কিন্তু পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে কি ভীষণ ধ্বংস-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "আমি যদি বলি যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আক্রমণকারীর ভীষণ ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ, আমি যদি বলি যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারীর দেশটিকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে সমর্থ, তবে হয়ত সত্য কথাই বলা হইবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিকার উদ্দেশ্য ও আশা তাহা নহে।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে রাশিয়াই ভাবী আক্রমণকারী। কম্যুনিষ্ট চীনের সম্প্রসারণের অভিপ্রায়ও মার্কিণ কল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার বক্তৃতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনকে সমঝাইয়া দেওয়া যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহাদের দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে পারে। স্বাধীন বিশ্বের কাছে অর্থাৎ যাহারা সোভিয়েট ব্লকে যোগদান করে নাই, তাহাদের নিকটেও তাঁহার এই বিভীষিকা প্রদর্শন তাৎপর্যাহীন নয়। যাহারা এখনও মনে-প্রাণে মার্কিণ তাঁবেদার হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে নাই, তাহারাও এই বিভীষিকা দেখিয়া 'প্রণম্য শিরসা' বলিবে "ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।" আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল তাঁবেদার রাশিয়ার পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার ভয়ে ভীত হইয়াছে, তাহারাও এই বক্তৃতা হইতে অভয় পাইবে। কিন্তু ধ্বংস করাই যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং আশা না হয়, তবে কি জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এত অধিক পরিমাণে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতেছে, তাহার কোন উত্তর প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যায় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিপুল পরমাণু শক্তিকে ধ্বংস-শক্তিতে পরিণত না করিয়া জন-কল্যাণের কাজে কেন নিয়োজিত করে নাই, তাহারও উত্তর এই বক্তৃতায় নাই।

বিশ্ববাসীর মনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি সম্পর্কে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মন হইতে পরমাণু শক্তির আতঙ্ক দূর করিবার জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ায়ের অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এই আতঙ্ক দূর করিবার জন্য তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মজুত ইউরেনিয়ম ও অন্যান্য বিস্ফোরণযোগ্য আণবিক উপাদান হইতে কতক অংশ এই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সীর হাতে অর্পণ করিবে এবং এইগুলির মজুত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব উক্ত এজেন্সীর হাতেই ন্যস্ত থাকিবে। কি ভাবে ঐ সকল দ্রব্য মানব-সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইবে তাহাও স্থির করিবে এই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী। মানব জাতির কল্যাণের জন্য পরমাণু শক্তি

নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের এই প্রস্তাব যে শ্রুতি-মধুর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে বিশ্ববাসীর মন হইতে পরমাণু শক্তির বিভীষিকা দূর হইবে কিরূপে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। তবে তাঁহার প্রস্তাবের আরও যে চারিটি অঙ্গ আছে তাহাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, এই সকল পরমাণু শক্তির উপাদানাদির শান্তিকালীন প্রয়োগ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি ভাবে হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল দেশেই তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ তদন্তের পর প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্ম উপযুক্ত পরিমাণ উপকরণাদি রাখিয়া বিভিন্ন দেশে সঞ্চিত পরমাণু শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের কাজ আরম্ভ করা হইবে। তাঁহার প্রস্তাবের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গটি উচ্চাদর্শবাদী কল্পনার লীলা-বৈচিত্র্য মাত্র। সমর উপকরণ প্রস্তুত করা অপেক্ষা মানুষের উচ্চাভিলাষ সাধনের আগ্রহকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবার আগ্রহ প্রদর্শনের সুযোগ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে দিতে হইবে এবং সমস্ত কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্ম শান্তিপূর্ণ আলোচনার একটা নূতন পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাব বারুচ পরিকল্পনার কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুচ পরিকল্পনার উপর তিনি একটা জন-কল্যাণের চাকচিক্যময় আবরণ দিয়াছেন এবং তাবার কূটনৈতিক মাধুর্য্য দ্বারা বারুচ পরিকল্পনার তীব্রতার তীক্ষ্ণতাকে যথাসম্ভব সরস করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বারুচ পরিকল্পনার উপরেও তিনি এক কাঠি গিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী প্রকৃতপক্ষে হইবে প্রত্যেক দেশের পরমাণু শক্তির উপাদানগুলির কতক অংশ আমানত রখিবার ব্যাঙ্ক-বিশেষ। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, এই আমানতী উপাদানগুলি জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা আবশ্যক, ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের উপর আমানত-কারীদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, উহার নিয়োগ সম্পর্কে কোন কথা বলিবারও অধিকার তাহাদের নাই। সর্ব্বোপরি ইউনাইটেড নেশানস্ বর্ত্তমানে ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এ পরিণত হইয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে উহার এই স্বরূপটি সুস্পষ্ট ভাবেই উদ্ঘাটিত দেখা যায়। আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে থাকিবে। কাজেই অন্যান্য দেশের যে-পরিমাণ পরমাণু শক্তির উপাদান এই এজেন্সীর নিকট আমানত রাখা হইবে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। পরমাণু শক্তির উপাদান কোন দেশই অপর দেশকে সহজে দিতে চায় না। পরমাণু শক্তির বিভীষিকা দূর করা এবং জন-কল্যাণের ধাপ্পা দিয়া বিভিন্ন দেশের পরমাণু শক্তির উপাদান সমূহের কতক অংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী যে অপূর্ব্ব কৌশল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি সম্পর্কে একচেটিয়া অধিকার যেটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী দ্বারা তাহার কিছুটা যে অন্ততঃ পূরণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় পরমাণুযুদ্ধ নিষিদ্ধ করিবার কোন প্রস্তাব করা হয় নাই, কিম্বা বিশ্ববাসীর পরমাণু শক্তির আতঙ্ক দূর করিবার জন্ম তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন প্রস্তাবও তাঁহার বক্তৃতায় আমরা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতা সম্পর্কে রুশ গবর্ণমেন্টের মনোভাব জানিতে পারা যায় নাই। এ সম্পর্কে তাঁহারা গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

সুদানের সাধারণ নির্ব্বাচন—

সুদানের ভবিষ্যত নির্দ্ধারণের জন্ম গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে যে-চুক্তি হয় তদনুযায়ী সুদানে সম্প্রতি সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। গত ২রা নবেম্বর (১৯৫৩) এই নির্ব্বাচন আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ৫ই ডিসেম্বর। এই নির্ব্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নেশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টিই একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া জয়লাভ করিয়াছে। সুদানের এই রাজনৈতিক দলটি মিশরের সহিত সুদানকে সংযুক্ত করিবার পক্ষপাতী। সুদান আইন সভার নিম্নতম পরিষদ বা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৯৭ জন এবং উচ্চতন পরিষদ বা সিনেটের সদস্য-সংখ্যা ৫০ জনের মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৩০ জন। একটি সংবাদে (২১শে নবেম্বর, ১৯৫৩) প্রকাশ, নেশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি প্রতিনিধি পরিষদের মোট ৯৭টি আসনের মধ্যে ৫১টি আসন দখল করিয়াছে। ১০ই ডিসেম্বরের (১৯৫৩) এক সংবাদে প্রকাশ, নেশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি প্রতিনিধি পরিষদের ৪৪টি, উম্মা পার্টি ২০টি, সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান দল ৪টি, সাউদার্ণ পার্টি বা দক্ষিণী দল ৯টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১৪টি আসন দখল করিয়াছে। ছয়টি আসনের নির্ব্বাচন ফল এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিনেটের নির্ব্বাচিত ৩০টি আসনের মধ্যে নেশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি ২১টি, উম্মা পার্টি ৪টি, দক্ষিণী পার্টি ৩টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী ২টি আসন দখল করিয়াছে।

এই নির্ব্বাচনের সময় বৃটিশ এবং উম্মা পার্টির দিক হইতে নির্ব্বাচনে মিশরের হস্তক্ষেপের অভিযোগ করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মিশরের দিক হইতে বৃটিশের উপর অনুরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। এমন কি, মিশর এক সময় নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিবার অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। মিশরের মন্ত্রী মেজর সালেম গত ১৩ই নবেম্বর সুদানের নির্ব্বাচনে বৃটিশের হস্তক্ষেপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার সুদানী, কার্য্যতঃ এক লক্ষ সুদানী মিশরের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মিশরের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করিতেছে। তিনি বলেন, "ভাগ্য নির্দ্ধারণের মুহূর্ত্তে এই সকল সুদানীদের অনেকে যদি সুদানে যাইতে চায় তাহা হইলে মিশর গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে বাধা দিবেন বলিয়াই কি মিঃ ইডেন মনে করেন?" এই সকল সুদানী ভোট দিবার জন্ম সুদানে যায় নাই তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। নেশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি জয়লাভ করায় মিশরের সহিত সুদানের যোগদানের সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়াছে। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি অনুযায়ী সুদান আইন সভা খুব তাড়াতাড়ি সুদানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবে না।

যেখানেই তাঁরা মিলিত হন..
কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালকেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশতৈল ক্যাষ্টরলএর কথা আলোচনা করেন। নারী-সৌন্দর্য্যের যে দুর্ণিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যে জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।
ক্যাষ্টরল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন করে।
CASTROL
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

দ্বাদশ তরঙ্গ
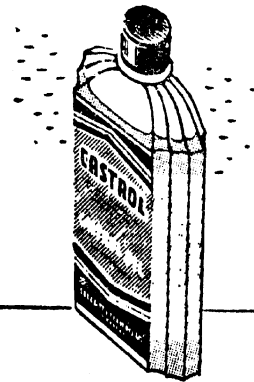
রাজদ্বারে

মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে আমার "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" নামক উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বাহির হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল। ভূদেব-রাজনারায়ণের স্বদেশ-স্বধর্মমূলক প্রবন্ধ পুস্তকাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-বক্তৃতা-পত্রাবলী, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-রচিত ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনেতিহাস, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ, অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি বাংলা দেশের তৎকালীন যুবসম্প্রদায়কে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ ও আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া কতকটা চরিত্রবল অর্জন করিতেছিল। এইভাবে বাংলা দেশের "ভদ্রলোক"-সম্প্রদায়ের যুবকেরা যে শক্তি অর্জন করিয়াছিল, রাউলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে তাহার পরিচয় আছে। তাহার পর বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বপ্রেমের ধাক্কায় বাঙালীর পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়া তাহাকে কতখানি পরমুখাপেক্ষী ও উচ্ছৃঙ্খল করিল সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তাহারও পরিচয় মিলিবে। বহু-বহু শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উনবিংশ শতকের বনস্পতিতুল্য সাধকদের সুবিপুল সাধনার উপর বাঙালীর ভবিষ্যতের যে ভিত্তি রচিত হইতেছিল আকস্মিক বিশ্বসঙ্কটে তাহা নড়িয়া গেল এবং ঝড়ের ঝাপটায় বিদেশ হইতে উড়িয়া আসা কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের উপরে বাঙালী-তারুণ্যের পুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তাহার খুব স্পষ্ট প্রকট সাক্ষ্য নাই। সাহিত্যে ছাপাখানার দীর্ঘস্থায়ী কালিতে সে-সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে এবং ইহারই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম।

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি; গৌরবময় ঐতিহ্য ও সাধনালব্ধ চরিত্রবলের সহিত যুক্ত হইয়া এই ভাব-প্রবণতা যে অঘটন ঘটাইতে পারে স্বদেশী আন্দোলন তাহার প্রমাণ। কিন্তু সর্বনাশা মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ইউরোপে স্বভাবত উদ্ভূত উচ্ছৃঙ্খলতার সৌখীন নকল করিতে গিয়া সমাজে ও সাহিত্যে আমাদের ভাবপ্রবণতা যে দুর্বলতার সঞ্চার করিল আমরা তাহা আজও সামলাইতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে আমি পরে লিখিয়াছিলাম:

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার মাটির প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়া ছিল সভাপর্বের বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমির রাত্রে ভেঙেছে আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়-বিয়োগের ব্যথা,
ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের বেডে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হ'ল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, "হে বন্ধু, আমি আছি!"
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যারা খেলে সুতরাং—
আমরা তাহারা নহি—সেই কথা এ যুগের কবি স্মরণে কি রাখিয়াছে,
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত সমস্যাভারে!

আমরা তাহারা নহি!
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে মোদের গায়ে,
ড্রইং-রুমের টেবিলে মোদের চা'র পেয়ালায় তরঙ্গ তুলিয়াছে:
চুমুকে চুমুকে কথায় কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয়;
পারে নি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল বিরাট ঘুমন্ত রথ চলে নাই এক তিল।

আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিসনের কোটিং যদিও পড়েছে তাহার গায়ে—
কোটিং উঠিতে লাগে বা কতক্ষণ!
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের সত্য রূপ।
অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান!
মোদের মুক্তি? আধখানা তার পীরদরগার এখনো সিন্নি মাঝে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে;
বাকি আধখানা গ্যাস্রোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দড়ি-টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়!

অন্তি-বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে-সংস্কারে মধুর সমন্বয় !

—"এই যুগ", 'মানস-সরোবর'

ভাবপ্রবণ বাঙালীর চরিত্রগত এই সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দৈবের দোহাই পাড়িয়া একদল লোক ব্যবসায় আরম্ভ করিল ; ভূয়া গণৎকার ও ভূয়া ধর্মাশ্রমে দেশ ছাইয়া গেল। সাহিত্যে তথাকথিত তারুণ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও জীবনে আসিল কর্মশক্তি ও পুরুষাকারের প্রতি বিমুখতা ও অনাস্থা, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সস্তায় কিস্তি মারিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ। গণৎকারের গণনা পয়সা দিয়া খরিদ করিয়া লোকে রেস খেলিতে যায়, ইহা বুঝি। এখানে দৈবের সহিত দৈবেরই কোলাকুলি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবনের সর্বঘটে তথাকথিত গুরু ও গণৎকারের প্রাধান্যের মধ্যে যে সাধারণ মানুষের কতখানি অসহায়তা ও পলায়নী মনোভাব লুকাইয়া আছে, কতখানি দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা ঘটিলে এই ঠক-নির্ভরশীলতা জাতিকে পাইয়া বসে তাহা প্রণিধান করিয়া আমি আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিশ-সাহেব প্রভৃতি উচ্চ সরকারী পদস্থেরাও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আকর্ষণে এই দুর্বলতার কবলে পড়িয়াছিলেন। যেদিকে তাকাই সেদিকেই আশ্রম গজাইয়া উঠিতে দেখি। শিষ্যের পক্ষে ভক্তির আতিশয্য ঘটিলেই যে পরমার্থ লাভ হয় তাহা নহে, শিষ্যকে তাহার যাবতীয় আর্থিক উপার্জন, মায় স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত গুরুর চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবে মুক্তি। চোখের সামনে অনেক সংসারকে ভাঙিতে দেখিলাম, পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক পুত্র পাগল হইল, অনেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়া দিলেন গুরু। আজ সিনেমা-ব্যবসায় সহজলভ্য অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাইয়া গৃহস্থের স্ত্রী পুত্র কন্যাকে যেরূপ প্রলুব্ধ করিতেছে সে দিন দেখিয়াছিলাম, এই ভূয়া আশ্রমগুলি সেইরূপ করিতেছে। এইরূপ দুই-চারটি আশ্রমের গুরুদের এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মাইল যে তাঁহাদের কয় স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে সেক্রেটারির নিকট সে হিসাব লইতে বলিতেন। অনুযোগ করিলে বলিতেন, আমাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ইঁহারা যদি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসেন তো আমি কি করিব। বাংলা দেশে এই কালে "কাঁধে বাড়ি বলরাম"দের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই এই নকল গুরুদের "তুমি রাধা আমি শ্যাম" কাল্টের (cult) ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল।

আমি এইরূপ একটি আশ্রমের টাইপ কল্পনা করিয়া "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" লিখিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুর প্রতীক হইলেন নকুড় ঠাকুর এবং শিষ্য শিষ্যাদের প্রতীক হইলেন সরমা। এই মোহগ্রস্ত মানুষদের কল্পনা করিয়া লিখিলাম :

পতঙ্গভুক্ বৃক্ষ যেমন করিয়া আপনার শিকারকে লালাসিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতে থাকে, প্রথমটা একটু হাত-পা ছোঁড়া, মূক-বধির অরণ্যভূমিতে কিঞ্চিৎ আর্তনাদ, কিছু ছট্‌ফটানি—তার পর সেই অসহায় প্রাণী যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার পুষ্টি-সাধন করে এবং তাহার উপর স্বজাতীয়কে গ্রাস করিবার জন্য বৃক্ষের প্রাণ জীয়াইয়া রাখে এ যেন তেমনই। কিন্তু সরমা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে ? প্রসারিত পত্রদল মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে অতি ধীরে—কিন্তু সে-যে মৃত্যুপাশ চৈতন্যহীন প্রাণীকে তাহা কে বলিয়া দিবে ? দৃষ্টি আছে, চৈতন্য নাই। নিজের অপূর্ব রূপান্তর, সে হয়তো দেখিতেছে কিন্তু অনুভব করিবার শক্তি হারাইয়াছে।

ভাদ্র মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এবং 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে নানা বিপর্যয় আরম্ভ হইল। প্রথম বিপর্যয় সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পর্ক ছাড়িলেও তিনি দলছাড়া হইলেন না, এই যা ভরসা। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন। আমাকে পরবর্তী আশ্বিন মাস হইতে এই প্রথম 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে হইল। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক—তিনই এক আধারে বর্তাইল।

মোহিতলাল মজুমদার ঠিক এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। সহায় তিনি রহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সহিত নিত্য পরামর্শের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

যাঁহাদের ব্যবসায়ে ঘা লাগিল তাঁহারা বন্ধু ও শত্রু দুই ভাবেই আসিয়া আমাকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। উৎকোচ অস্বীকার করাতে বিপরীত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল। সন্ধ্যার পর পথে ঘাটে বাহির হওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। রাত্রে বাড়িতেও লোষ্ট্র-বৃষ্টি চলিতে লাগিল। কুৎসিত বেনামী পত্র আসিতে লাগিল।

নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি আরও উগ্র হইয়া উঠিলাম। আশ্বিন সংখ্যায় পতঙ্গভুক্ বৃক্ষের পতঙ্গ-জীর্ণকারী পদ্ধতির বাস্তব বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিলাম। এইটুকু বিশ্বাস এখনও আছে—জনসাধারণের নির্জীব জড়ত্বকে বিচলিত করিবার জন্য শান্ত-দান্ত-মধুর-ভদ্র রুচিকে লঙ্ঘন করিলেও আইনবিগর্হিত বর্ণনা করি নাই। কিন্তু তখন নানা কারণে নানা দিকে নানা শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গে প্রধানেরাও বিরূপ হইয়াছিলেন। সকলের সমবেত শক্তি অকস্মাৎ একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা হইতে পুলিশের বেশে প্রবাসী প্রেসে আসিয়া দর্শন দিল। আশ্বিন সংখ্যায় "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র কিস্তিতে শ্লীলতা-ভঙ্গের অপরাধে আমি ধৃত হইয়া ব্যক্তিগত মুচলেকায় জামিনে মুক্ত হইলাম। আমার বিরুদ্ধে শুধু তথাকথিত ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবই কাজ করে নাই, আমাদের শরাহত সাহিত্য-সমাজের রুই-কাৎলা হইতে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তৎপর হইয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে শ্রীবিষ্ণু দে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি কৌতুককর ছেলেমানুষি পত্র লিখিয়াছিলেন, বস্তুত তিনি তখন লেখা ছাপিতে আরম্ভ করিলেও কাঁচা ছেলেমানুষই ছিলেন।

আমি কিন্তু ইহাতেও দমিলাম না। "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিকভাবে চলিতে লাগিল। ১৯২৮ সালের অক্টোবরে অপরাধমূলক অংশটি বাহির হইয়াছিল। ১৯২৯ সালের গোড়ায় ধৃত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই আরও একটি মামলায় ধৃত হইয়া রাজদ্বারে নীত হইয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল, ইহা কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল আমি তাহাতে স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। দীর্ঘ আট বৎসর পরে কলিকাতায় এই সাধারণ অধিবেশন। এমন বিপুল সমারোহের সহিত কংগ্রেসের অনুষ্ঠান ইহার পূর্বে আর হয় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি, ও, সি, বা অধিনায়ক। তাঁহার প্রতি বিরূপতা বশতই এই বিপুল যজ্ঞে শুধু দর্শকই ছিলাম, কোনও অংশ গ্রহণ করি নাই। প্রবাসী অফিস হইতে একটি বইয়ের ষ্টল কংগ্রেস-সংলগ্ন প্রদর্শনীতে খোলা হইয়াছিল, নিয়মিত প্রত্যহ সেখানে গিয়া 'শনিবারের চিঠি'র হাসি ও ব্যঙ্গের খোরাক সংগ্রহ করিতাম। এই বিপরীত দর্শনের ফলেই আমার "অভিনয়" কবিতা ও G. O. C. বা "গক" ছবির জন্ম। পরবর্তী কালে "গক" সুভাষচন্দ্র সত্যসত্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র হইয়া আমাদের ব্যঙ্গকে বাতিল ও উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আজ আমরা সকলেই গৌরবান্বিত, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমাদের পূর্ব লজ্জাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমার "অভিনয়" কবিতার ব্যঙ্গ ব্যর্থ হইলেও এখনও সতর্ক হইতে বাধা নাই। ঠিক পঁচিশ বৎসর পরে আবার বাংলা দেশের অনির্মিত কল্যাণী নগরীতে আয়তনে ও সমারোহে আরও বিপুলতর আকারে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিতেছে, আশা করি তাহা "অভিনয়ে" পর্যবসিত হইবে না। তবু পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার "অভিনয়" স্মরণ করিতেছি:

হ'ল চল্লিশ পার।
বরষে বরষে একই অভিনয় হয়ে গেছে বার বার।
তিন দিন ধ'রে মারমুখো হয়ে মিলিবে বীরেরা মহা হৈ-চৈ-এ,
অ্যামেণ্ডমেণ্ট ও প্রস্তাব লয়ে লেগে যাবে মহামার।
গম্ভীর মুখে বসিবে সকলে ভীষণ খাঁটি ও বেজায় নকলে,
কোন্ ভাষা কত আছয়ে দখলে হবে পরীক্ষা তার।
গোড়ায় হইবে কথা কাটাকাটি, তাতে না শানালে হবে লাঠালাঠি,
লাল হবে চোখ, লাল হবে মাটি, মিলন চমৎকার!
অনুষ্ঠানের নাই কোনো ত্রুটি, কেহ খায় খানা, কেহ ডালরুটি,
দশদিক হতে দশ জন জুটি বচন করিবে সার।
হ'ল চল্লিশ পার।

শেষ স্তবকটির দুইটি মাত্র শব্দ বদল করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা আজিকার আক্ষেপোক্তিও হইতে পারে—

শীর্ণা ভারতমাতা,
উঠিছে শিহরি ভক্তেরা যত গাহিছে বিজয়গাথা।
চোখে অবিরাম ঝরে বারিধার, পারে না বহিতে বুঝি দেহভার,
খ'সে খ'সে ওই পড়ে বারবার মলিন ছিন্ন কাঁথা।
আকাশ-কুসুম করিতে রচন রাম শ্যামে করে বাক্-বরিষণ,
থেকে থেকে ন'ড়ে ওঠে ঘনেঘন ক্যাপ-সুশোভিত মাথা;
জননী নীরবে বসি একধারে শীর্ণ হস্ত ললাটে প্রহারে,
শরীর বিকল তবুও তাঁহারে শিখিতে হইবে তাঁত।

দেশের অর্থে আপনার নাম করিছে জাহির শুধু রাম শ্যাম,
কংগ্রেস ক্রমে হতেছে স্থঠাম বুকের রক্তে গাঁথা।
শীর্ণা ভারতমাতা! —'বঙ্গরণভূমে'

জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি জওহরলালকে এই পার্কসার্কাসী কংগ্রেসেই সর্বপ্রথম পিতার স্নেহচ্ছায়া ভেদ করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখি; স্বাধীনতা-প্রস্তাব এখানেই প্রথম গৃহীত হয়। আমার রামদাদা-সিরিজের গল্প "আবার উটরাম সাহেবের টুপি"তে ব্যঙ্গচ্ছলে এই কংগ্রেসের একটা প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছি। 'মধু ও হুলে' তাহা স্থান পাইয়াছে।

যাহা হউক, একদিন মধ্যরাত্রে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ দেখিয়া সামরিক ভাবে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত মগজ লইয়া বাসে পার্কসার্কাস হইতে ফিরিতে-ছিলাম, সঙ্গে বন্ধুবর গোপাল হালদার। বাসে মানুষের ঠাসাঠাসি, কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া ঝুলিয়া আসিতে আসিতে মেজাজ আরও চড়িয়াছিল। আপার সার্কুলার রোড-মাণিকতলা রোডের কাছে বাস থামাইবার জন্য ঘণ্টা দিলাম। বাস থামিল না। আরও গরম হইয়া চালককে গালি দিলাম। সেও পাল্টা একটা খারাপ গালি দিল। মাণিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি থামিতেই আমি ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া ড্রাইভারের আসনে উঠিয়া তাহাকে দুই-এক ঘা দিতেই তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া দুই জন পুলিশ দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল; পিছনে চাহিয়া দেখি বাসটি জনমানবহীন, গোপাল শুধু বিপন্ন বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতে একা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পুলিশ বাসসহ আমাদের প্রথমে বড়তলা থানায় এবং পরে জুরিসডিকশন মানিয়া আমহার্স্ট ষ্ট্রীট থানায় লইয়া গেল। গোপাল জামিন হইল। পরদিন বেলা দশটায় বাঁকশাল কোর্টে গিয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া সগর্বে ফিরিয়া আসিলাম। ইহাও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছিল বলিয়াই সাহস করিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। পরের সপ্তাহেই শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'বাতায়ন' সাপ্তাহিকে আমার একটি দীর্ঘ প্রশস্তি-কবিতা বাহির হইল। দুইটি পংক্তি মনে আছে—

বাস-কণ্ডাক্টারে মারিয়া যে দেয় ফাইন,
তাহার কালচার এবং শিক্ষা স্নুপারফাইন।

এই গেল দ্বিতীয়। তৃতীয় রাজদ্বার দর্শন অচিরাৎ ঘটিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও সম্পূর্ণ পুস্তকের প্রকাশ বিষয়ে আমার প্রকাশ্য সহযোগিতা ঘোষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' (বিশ্বভারতী সংস্করণ) এবং পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠি খেলা ও অসি শিক্ষা'র কথা বলিয়াছি। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিক শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি তৎসঙ্কলিত 'বীরভূম বিবরণ' ৩য় খণ্ডের (শ্রাবণ ১৩৩৪) বোলপুর "শান্তিনিকেতন-কথা" অধ্যায়টি লিখিয়া দিই। তিনি সস্নেহে ইহা তাঁহার গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাকে সম্মানিত করেন। ১৯২৮ সালে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সঙ্কলিত 'বনে জঙ্গলে' নামক বহুল-প্রচারিত পুস্তকের 'সন্দেশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত রচনাগুলি বাদে যাবতীয় নামহীন প্রবন্ধ আমিই রচনা করি। তিনি সর্বপ্রথম শতাধিক টাকা দক্ষিণা দিয়া আমাকে সম্মানিত করেন, বই লিখিয়া রোজগার এই প্রথম। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মানবপ্রেমিক মনীষী বৃদ্ধ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তকের প্রকাশক হইবার গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটে। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ দেখিতে দেখিতে চার মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। পরবর্তী এপ্রিল (১৯২৯) মাসের শেষে দ্বিতীয় সংস্করণ হইবামাত্র গবর্ণমেণ্টের টনক নড়ে। তাহার পর কি ঘটে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতা পুলিশ প্রবাসী কার্য্যালয় ও প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া ডাঃ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রণীত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' নামক পুস্তকের চুয়াল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা জুন এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল; কিন্তু মোকদ্দমা তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ১২ই জুন পর্য্যন্ত সময় লওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ আবার ৬ই জুন তারিখে রাজদ্রোহ অপরাধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই মামলা ও পূর্ব্বেকার মামলার শুনানী এক তারিখেই হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী এই গ্রেপ্তারের কথা জানিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার অভিমত ৬ই জুন তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই মামলা লইয়া কলিকাতা শহর তোলপাড় হইয়া যায়। সরকার পক্ষের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট-জেনারাল সার্-

এন, এন, সরকার ব্যতীত হাইকোর্টের প্রায় যাবতীয় প্রখ্যাতনামা উকীল-ব্যারিষ্টার, বি, সি, চ্যাটার্জি, এন, সি, সেন, আই, বি, সেন, কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে ৮ই মে হইতে জোড়াবাগানে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এন, আহমদের কোর্টে 'শনিবারের চিঠি'র মামলাও আরম্ভ হয়। সেখানেও সাহিত্যিক অ্যাডভোকেট শ্রীকেশব গুপ্ত আমার পক্ষ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক উকীলেরা সহযোগিতা করেন।

দুইটি মামলা প্রায় চার মাসকাল চলে। বাঁকশাল ও জোড়াবাগান ছোটা-ছুটিতে আমার হয়রানির অন্ত ছিল না। জোড়াবাগানে শ্রীকেশব গুপ্ত সৎসাহিত্য হইতে হাজারো দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া সর্বসমক্ষে একরূপ প্রমাণই করিয়া দিলেন যে, সদুদ্দেশ্যে পাঠকের জুগুপ্সা উৎপাদনের জন্য নৈষ্ঠিক শ্লীলতা লঙ্ঘন সেক্সপীয়র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিককেই অল্প-বিস্তর করিতে হইয়াছে। তারকনাথ সাধু সরকারপক্ষে এই যুক্তির বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বিশেষ জুৎ করিতে পারেন নাই। তথাপি আমাকে শাস্তিস্বরূপ শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে স্বর্গীয় সাধু মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তখন আমি তাঁহাকে স্পষ্টতই প্রশ্ন করি, এই মামলার পিছনে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনা ছিল কি না। তিনি স্পষ্ট নাম করেন নাই, ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন, তোমাকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য এমন লোক আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রই বাংলা দেশে সব কিছু হইতে পারিত। মোকদ্দমাশেষে জজ নসীরউদ্দীন সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, ইয়ং ম্যান, আমার হাত পা বাঁধা, যেখানে তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত ছিল সেখানে তোমাকে শাস্তি দিতে হইল।

অন্য মামলায় বিচারপতি রক্সবার্গের হুকুমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ও আমার প্রত্যেকের এক হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইল। প্রবাসী আফিস দিবে হাজার টাকা এবং প্রেসকে দিতে হইবে হাজার টাকা। আমি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলাম। চীফ জাষ্টিস ও অন্য একজন জজ শেষ পর্যন্ত আপীল ডিসমিস করিয়া দিলেন। জের মিটিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। জরিমানা দিয়া মুক্ত হইলাম।

উপর্যুপরি রাজদ্বারে উপনীত হইয়া ১০+৫০+১০০০৲ মোট ১০৬০ টাকা সেলামী দিলাম। এখন পর্যন্ত রাজার ঋণ আমার নিকট ইহা অপেক্ষা বেশি আর জমে নাই। তবে পরবর্তীকালে আরও তেইশবার ভারতে ইংরেজের স্বৈরাচারী শাসনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা ও চিত্র প্রকাশ করিয়া খানাতল্লাসীর হাঙ্গামায় পড়িয়াছিলাম, হাঙ্গামা জেল বা জরিমানা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ঠিক এই সময়ে ঢাকায় মোহিতলালের অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর অধ্যক্ষ পদে স্থায়িত্ব লাভ আমাদের আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

'শৃঙ্খলিত ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিলে কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইহা চিরকাল রামানন্দ-চরিত্রের সততা ও দৃঢ়তার একটি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। পুলিশ যেদিন প্রথম প্রবাসী আপিসে খানাতল্লাসী করে, সেদিন ৪৪খানি বাঁধা পুস্তক লইয়া যায়। আবাঁধা পুস্তক সমস্তই দপ্তরীর বাড়ীতে ছিল। মামলা চলিবার কালে অতি দ্রুত বিক্রীত হইয়াও বাজেয়াপ্তির হুকুমের দিনে মোটামুটি ৪৫০খানা বাঁধা-আবাঁধা বই থাকিয়া যায়। প্রতিখানির মূল্য পাঁচ টাকা কিন্তু তখনই প্রায় ডবল দামে বাহিরে বইটি বিক্রয় হইতেছিল। জরিমানার দুই হাজার টাকা তো ডাহা লোকসান, এই অবশিষ্ট বইগুলি ন্যায্য মূল্যে বেচিলেও সে লোকসান উঠিয়া আসিত। একজন পুস্তক-বিক্রেতা মূল্য লইয়া উপস্থিতও হইয়াছিলেন কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কড়া হুকুম দিলেন, এক কপি বইও বাহিরে যাইবে না। অফিস-ঘরের ঠিক মাঝখানে বইগুলিকে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখা হইল; পুলিশ আসিয়া ভ্যানে করিয়া সেগুলি লইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চোখের একটু ইঙ্গিত করিলেই নিমেষ মধ্যে বইগুলি নগদ টাকায় রূপান্তরিত হইয়া সিন্দুকে জমা হইতে পারিত।

এদিকে এত হাঙ্গামার মধ্যে "মকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলিয়া সমাপ্ত হইল। কোনও দিক দিয়া আমাদের সাহিত্য-হুল্লোড়ের কিছুমাত্র কমতি পড়ে নাই। আমাদের যেন তখন খুন চাপিয়া গিয়াছে,

প্রমথ চৌধুরীর পর একে একে আরও মহারথী নিপাতের উদ্দেশ্যে অবিশ্রাম শরাঘাত করিয়া চলিয়াছি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত —আমি একাই পর পর এই তিন জনকে লক্ষ্য করিয়া মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; "অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ হনি, ঢাক," "দীনেশ-নামা" ও "নরেশ-নিকষ" আমারই রচনা। দা'ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মহাশয় আমার নাম দিলেন "নিপাতনে সিদ্ধ"। চারিদিকে কলরব উঠিল। চারুচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন, কিন্তু নরেশচন্দ্র পারিলেন না। তিনি স্বয়ং ব্যবহারজীবী, আইনের ঘোঁৎঘাঁৎ তাঁহার নখাগ্রে, তিনি 'শনিবারের চিঠি'র মুদ্রাকর, প্রকাশক বা সম্পাদককে না ধরিয়া একেবারে প্রবাসী প্রেসের মালিককে ধরিয়া টান দিলেন। অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উকীলের চিঠি দিলেন। তিনি যদি কৃপাপরবশ হইয়া একটু উর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির না করিতেন তাহা হইলে নির্ঘাৎ আমাকেই আবার রাজদ্বারে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার লক্ষ্য একটু বেশি উর্ধ্বে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফস্কাইয়া গিয়াছিল।

শুধু পরহিংসা-ব্যসনে ও রাজদ্বারেই যে এই কালটা কাটিয়াছিল তাহা নয়, কাব্যলক্ষ্মীর পূজা-উৎসবও কম করি নাই। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই আমার 'অজয়', ও 'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল' সম্পূর্ণ এবং 'মনোদর্পণ' ও 'বঙ্গরণভূমে'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। বাল্যকালে খুব মনোযোগ দিয়া ভূগোল পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম বিচিত্র মানুষদের প্রকৃতিগত পরিচয় কিছু কিছু জানা ছিল। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সভ্যতাসম্পর্কহীন স্বাভাবিক ভালবাসার কাব্য রচনা করিলাম—'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল'। আমি মনে মনে জানিতাম, আপাতত অসি-চর্ম ধারণ করিলেও এই আমার আসল কাজ। সমরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে নিভৃত নিরালায় নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া যখন বসিতাম তখন ভয় হইত। সাহিত্যের পথ বাছিয়া লইয়াছি কিন্তু এই পথে যিনি আমার একমাত্র আরাধ্য সেই রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করিয়াছি, তাঁর বরাভয়-কর আর দেখিতে পাই না, শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ, প্রমথ-দীনেশ-জলধর-চারুচন্দ্র সকল প্রধানেরাই মদান্ধের অস্ত্রাঘাতে লাঞ্ছিত, কিন্তু তখনও শনিগোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে নাই বলিয়া নিজেও ভাঙিয়া পড়ি নাই। নকল মণিমুক্তার আহরণে ভালমন্দ মাসিক পত্রিকাগুলির উপর শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশীথ শান্তিকে যখন বিঘ্নিত করিতাম তখন অরণ্যপ্রান্তর-পথের ঘাসের ফুলেরা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত, আমার কবি-মনের যিনি প্রেয়সী তখন তিনি সভয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিতেন; আমার সামরিক মোহভঙ্গ হইত, ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতাম:

তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু ব'য়ে যাক ঝরণা,
ডাকছে পাহাড় বন ডাকছে এ দেহ-মন ফেলে দিয়ে এস ঘর করণা।
দুজনে বসব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে লতাকুঞ্জে,
দেখ্‌ব মুখানি তব রহি-রহি চমকানো চঞ্চল খদ্যোৎ-পুঞ্জে।
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জ্যোৎস্না ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব অধর দুটি ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর মিষ্টি।
এস এস এস সখি, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরণার কুলু কুলু ছন্দে
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা ঘন তিমিরের বাহুবন্ধে।
পূর্ণিমা চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধবধবে পথ-ঘাট জ্যোছনায়।
আমার নয়নে সখি, আঁধার শ্রাবণ রাতি, এস এস জ্বেলে দাও রোশনাই।

দ্বিতীয় প্রবাহ সমাপ্ত।
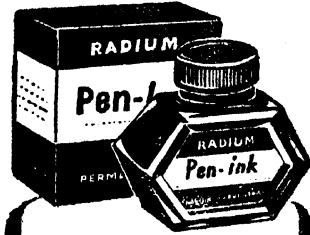
সাময়িক প্রসঙ্গ

অভিমন্যুর দশা

"মুক্ত ভারতের সামরিক শক্তি অর্জনে এত বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে যে, এখন এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির সহিত যৌথ আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মন দিতে হইবে। চক্ষের উপর দেখা গেল, সেদিনের জার-নিপীড়িত রুশিয়া ও আফিংখোর চীন দেখিতে দেখিতে সামরিক শক্তি-চর্চ্চার ফলে দুর্জ্জয় প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্য্যায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ ইন্দোচীন ঘুণদষ্ট ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া এশিয়ায় তৃতীয় শক্তিরূপে উঠিতেছে। এখনও কি ভারত জঙ্গীবাদী এশিয়ায় প্রভুত্বলোভী ইঙ্গ-মার্কিণের মুখ চাহিয়া তাহাদের ঠেলা খাইয়া পথ দেখিয়া চলিবে? নেহেরুজীর মুখে কথায় কথায় ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার গর্ব্বের কথা শুনিতে হয়। হিন্দু-ভারত, বৌদ্ধ-ভারত সমৃদ্ধি, বল ও উদারতার কি উত্তুঙ্গ শীর্ষে উঠে নাই? ভারত কি কখনও পররাজ্য আক্রমণকারী ছিল? ভারতের নিরপেক্ষ নির্বীর্য্য পররাষ্ট্র-নীতির আগে ঘটিয়াছে কূটনৈতিক পরাজয়, তাহার পর আসিতেছে পাক-মার্কিণ চক্রান্তে সামরিক অবরোধ ও সম্ভাব্য পরাজয়। আজই সমগ্র এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যকে লইয়া নূতন আন্তর্জাতিক ভারসাম্য গড়িয়া লইতে হইবে এবং দ্রুত অস্ত্রবল বাড়াইতে হইবে। ভারতের উপকূলে পর্ত্তুগীজ গোয়া অবধি অস্ত্র ও সেনা ঘাঁটী বাড়াইতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনার ধূম্রজালের আড়ালে যাহা সাজিতেছে, তাহার উহাই সুস্পষ্ট লক্ষণ। অহিংস নিরপেক্ষ ভারত আজ সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর দশা লাভ করিয়াছে।" —দৈনিক বসুমতী।

অপরাধীর শাস্তি চাই

"গৌহাটি উদ্বাস্তু মহিলা শিবিরের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী ঊষা দাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেওয়ার দায়িত্ব এ স্থলে আসাম সরকারের কর্মচারিগণের উপরই গিয়া পড়ে। কেননা উদ্বাস্তু মহিলাগণকে আশ্রয় ও সাহায্য দানের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিগণ যদি সময় থাকিতে সতর্ক হইতেন, ছোটখাটো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিতেন, তাহা হইলে অপরাধপ্রবণ গুণ্ডা দলেরও দুর্মতি, ক্ষিপ্রতা ও পাশবিকতা এতখানি বেপরোয়া হইতে কদাচ সাহসী হইত না, ইহা অতি পরিষ্কার। একান্ত অসহায়া আশ্রয়প্রার্থী মহিলাদের উপর এরূপ জঘন্য অত্যাচারে যাহারা অগ্রসর হয়, বুঝিতে হইবে যে, তাহারা মানুষের স্তর ছাড়াইয়া পশুর স্তরে, এমন কি পশুরও নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আদালতের বিচারে কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের গৌহাটী অফিসের সংবাদে দেখিতেছি, একটু বিলম্বে হইলেও গৌহাটীর সরকারী কর্মচারিগণ এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। পুলিশ সক্রিয় হইয়া ঘটনা সম্পর্কে দশ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহা ছাড়া উলুবাড়ী আশ্রয় শিবিরস্থ উদ্বাস্তু মহিলাদিগকে নিরাপদ স্থানে, নবনির্মিত উদ্বাস্তু বাজারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু এখানেই সরকারী কর্তব্য সমাপ্ত করিলে চলিবে না। গোড়াতেই বলিয়াছি, অপরাধীর আদর্শ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

পণ্ডিত নেহরুর লজ্জাবোধ?

"শীতের দিনে কলিকাতার আসর জমে। শাসকগণ হইতে রাজনৈতিক প্রধানদের আগমনে, সভা-সমিতি ও সম্মেলনে আলাপ-আলোচনায় সরগরম হইয়া উঠে। এবারেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বয়ং আসিয়া বণিক সঙ্ঘে বক্তৃতা করিয়াছেন, জনসভায় ভাষণ দিয়াছেন, মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্বোধন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থ-সচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ আসিয়াছেন, যানবাহন-সচিব শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী আসিয়াছেন, সেই সঙ্গে পরিচিত অপরিচিত আরও অনেকে কলিকাতার বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তাতাইয়া তুলিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু এবার ময়দানে প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, শুনা গেল যে, সে সভার আয়োজন অন্যান্য বারের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে নাই, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নাকি এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবারে তাঁহার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের কোন সমস্যার বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই, উহা অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনক। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আলোচনান্তেই তিনি দেশবাসীর চিত্ত আলোড়িত করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু অন্যান্য বারে যখনই আসিয়াছেন, তখনই সাংবাদিকদের সঙ্গে কিংবা বিশেষ নির্বাচিত কয়েক জন বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এবারকার কর্ম-তালিকায় সেরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। ময়দানে পুলিশী মারপিট-ঘটিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পর সাংবাদিকদের নিকট মুখ দেখাইতে একটু লজ্জাবোধ করিবারই কথা।" —যুগান্তর।

পাশপোর্ট নয় "পাশ"

"লিখিত বা অলিখিত 'পাসে' (প্রমোদকর বর্জিত?) সপরিবারে সিনেমা দেখা এক শ্রেণীর সরকারী ও আধা-সরকারী কর্ম্মচারিগণের একরূপ স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। অস্থায়ী সিনেমাগুলির উপর আবার তাহাদের স্নেহের (!) অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশী।

কারণ এগুলির আয়ুষ্কাল নাকি ইঁহাদের মর্জ্জির উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ও প্রমোদকর (Entertainment Tax) ইত্যাদি ঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এই শ্রেণীকে বিভিন্ন প্রকারে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সিনেমার কর্তৃপক্ষকে যেরূপ অশোভনীয় ঔদার্য্যের সহিত ঢালাও আয়োজন করিতে দেখা যায়, তাহাতে জনচিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় যদি কোন দুর্ম্মুখ এ মন্তব্য করিয়া বসেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণের এই আচরণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণেরই নামান্তর মাত্র (illegal gratification), তাহা হইলেও বোধ হয় খুব অতিরঞ্জিত হইবে না। দেবতাকে যোড়শোপচারে পূজা করিলে যদি দেবতা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তবে কুতঃ মানবাঃ।"

—ভারতী (মুর্শিদাবাদ)।

পুলিশের শাস্তি হয় কি ?

"মাল পোষ্ট অফিসের কোন কর্ম্মচারীর বাসায় এক দিন চুরি হয়। নগদ ৬০৲ টাকা ও তাহার স্ত্রীর গলার হার লইয়া যায়। ভদ্রলোক থানায় এজাহার দিতে গিয়া কাহাকেও পায় না, বাধ্য হইয়া পোষ্ট-মাষ্টারের বরাবর এজাহার থানায় পাঠাইয়া দেন। থানার দারোগা সাহেব ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি এজাহারের ৪।৫ দিন পরে তদন্ত করিতে যান। থানা হইতে উক্ত ভদ্রলোকটির বাড়ী খুব বেশী হইলেও দুই ফার্লং; তদন্তে গিয়াই উক্ত ভদ্রলোক ৬০ টাকা কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন। উক্ত প্রশ্নে ভদ্রলোক একটু হতবাক হইয়া পড়েন এবং বুঝিতে পারিলেন, চুরির এজাহার দিতে হইলে কোথা হইতে টাকা সংগ্রহ হইল, স্ত্রীর গহনা কোথা হইতে পাওয়া গেল, এই সব হিসাব দেওয়া দরকার। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, পুলিশ জনসাধারণের সেবক। সেবার নমুনা এই হইলে বিপদের কথা! পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া আইনতঃ দণ্ডনীয়। কিন্তু সাধারণের সম্মানহানি হইলে পুলিশের শাস্তি হয় কি ?"

—আমাদের কথা (জলপাইগুড়ি)

দীঘায় যাওয়ার অসুবিধা

"দীঘা সমুদ্রোপকূলে ভ্রমণের জন্য প্রত্যহ বহু ভ্রমণকারী আগমন করেন, কিন্তু বাস ছাড়ার সময়ের অব্যবস্থায় অনেকে বহু হায়রান ভোগ করেন; কারণ, দীঘায় যদি বা থাকিবার যায়গা পাওয়া যায় কিন্তু খাবার ভাল ব্যবস্থা নাই। অনেক ভ্রমণকারীর ইচ্ছা যে, সকালে গিয়া সারা দিন দীঘায় কাটাইয়া সন্ধ্যায় কাঁথি ফিরিয়া আসেন। বর্ত্তমান ১১টায় দীঘার গাড়ী ছাড়ে ও দীঘায় প্রায় ১-১।০টা নাগাৎ পৌঁছে এবং দীঘায় ৩।০-৪টায় ছাড়িয়া কাঁথি আসে; এই অল্প সময় বেড়াইয়া ভ্রমণকারীরা আনন্দ পান না। যদি ১১টার পরিবর্ত্তে গাড়ী ভোর ৫-৬টায় যায় ও দীঘায় ৫টায় ছাড়ে, তাহাতে ভ্রমণকারীদের খুবই সুবিধা হয়। বাস কোং ও উৰ্দ্ধতন জেলা পরিবহন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।" —নারায়ণ (কাঁথি)

হাসপাতাল সরানো চলবে না

"সিউড়ী সদর হাসপাতাল বেশী দিনের নির্ম্মিত নয়, উহার পরমায়ু এখনও অনেক দিন আছে। এই হাসপাতাল ভাঙ্গিয়া বা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র হাসপাতাল নির্ম্মাণ শুধু সহরবাসীর নানা অসুবিধার কারণই হইবে না, প্রচুর অর্থেরও অপব্যয় করা হইবে। সদর হাসপাতালের দক্ষিণ ও পশ্চিমে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী প্রচুর জায়গা পড়িয়া আছে; সুতরাং হাসপাতাল সংলগ্ন স্থানে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান হাসপাতালের সম্প্রসারণ করা হউক। গরীব দেশের জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের এক পয়সাও অপব্যয় করা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধজনক। নাই বা হইল আপটুডেট প্যাটার্ণ রোগ-নিরাময়-গৃহ! সদর হাসপাতালের গৃহগুলি সমেত লইলে বহু টাকা বাঁচিয়া যাইবে মনে হয়। ১০০ বেডের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে না, অন্যান্য সরঞ্জাম যাহা নাই তাহাও হইবে এবং লোকচক্ষুর সম্মুখে সুপরিদর্শনে কাজ হইলে বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। সিউড়ীর অধিকাংশ লোক হাসপাতাল স্থানান্তরের বিরোধী।" —বীরভূম বাণী।

হাসা কাঁদা

"ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।" জমিদারী যাইতেছে; জোতদারগণ বড়ই নিশ্চিন্তে ছিলেন। জোতদারগণ সেদিনের "লেভী অর্ডারের" বিরুদ্ধে কতই না আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দল এই "লেভীর" অযৌক্তিকতার কথা বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া চমক লাগাইয়াছিলেন। আজ কংগ্রেস, প্রজা-সমাজতন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লক সকলে মিলিয়া জোতদারগণের ধ্বংস সাধন করিলেন। জমিদারগণ পথে বসিলেন। বিভিন্ন বর্ণের নিজ হস্তে চাষ-কার্য্যে অক্ষম কৃষিকুল সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সুতরাং এই

দুই শ্রেণীর মধ্যে হাসা কাঁদা বোধ হয় কিছু থাকিল না। কিন্তু কলিকাতাকে এই ধ্বংস হইতে রেহাই দেওয়ায় আমরা যতদূর শুনিতেছি—এই দুই পথ-হারানো পথিক দল—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিয়াই চলিয়াছেন—"হাসা কাঁদা করো না ঠাকুর"।

—রাঢ়দীপিকা (রামপুরহাট)

ডাঃ রায়ের অবগতির জন্য

"গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস সরকার পশ্চিম-বাংলায় আর কিছু করুন আর নাই করুন, কয়েকটি সুন্দর পাকা সড়ক নির্ম্মাণের দ্বারা গমনাগমনের সুরাহা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সীমান্তবর্ত্তী জিলা মুর্শিদাবাদে যে কয়টি রাস্তা হইয়াছে, তাহাতে জেলাবাসীর যথেষ্ট সুবিধা যে হইয়াছে, সে কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আরও পথ নির্ম্মাণ চলিতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার যে আরও উন্নতি হইবে, তাহা আশা করা যাইতে পারে। শুনিয়াছি, উত্তর-কলিকাতা বিজলী সরবরাহ স্কীম অনুসারে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই এতদঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কংগ্রেস সরকারের এই প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। তবে সস্তা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি যাহাতে জনসাধারণ সরকারের নিকট হইতে পায়, তাহার ব্যবস্থা প্রথমেই হওয়া উচিত; এ বিষয়ে কংগ্রেস সরকার অবহিত হইলে লোকে আরও বিজলী শক্তি ব্যবহার করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার

অপরাধ—জমিদার কুলবধূ

"লোকসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর ব্যক্তিগত নিন্দাবাদ প্রচার সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। আমরা শুনিয়া ব্যথিত হইলাম, প্রজাসমাজতন্ত্রী নেত্রী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীও কংগ্রেসপ্রার্থী সম্পর্কে ব্যক্তিগত কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুক্তা ইলা পাল-চৌধুরীর অপরাধ তিনি জমিদার কুলবধূ। আমাদের সংগ্রাম জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত ভাবে কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে নয় এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন বর্ত্তমানে বিধান সভার আলোচ্য। গান্ধীজী শিখাইয়াছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন বৃটিশের বিরুদ্ধে নয়। কোন ব্যক্তি যদি কোন জমিদার-পরিবার বা ধনী-বংশের সন্তান বা বধূ হইলে অস্পৃশ্য হইয়া যান, তাহা হইলে বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দের বংশ-পরিচয় খুঁজিতে হয় এবং খুঁজিলে দেখা যাইবে, অনেকেই জমিদার ও ধনী-বংশজাত হইয়াও বামপন্থী ও বিপ্লবী।" —নদীয়ার কথা।

বিভ্রান্ত সাংবাদিকতা—'য়্যাও হয় অও হয়'

"কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি ক্রমশঃ এতই দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে যে, দেখিলে খুবই দুঃখ হয়। আশঙ্কা হয় যে, সম্পাদকেরা বোধ হয় জন-মঙ্গলের জন্য নির্ভীক ভাবে কিছুই লিখিতে পান না। এ অনুমান ঠিক না হইলে বলিতে হইবে, কলিকাতার উদ্‌ভ্রান্ত সাংবাদিকগণ জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়াই তুলিতেছেন। জনমতকে গড়িয়া তুলিবার যাঁহাদের পবিত্র দায়িত্ব, নিষ্করুণ ভাবে তাঁহারা অবহেলাই করিতেছেন। সব কথা গুছাইয়া লেখার স্থানাভাব; সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিধান সভায় যে জমিদারী বিল উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ 'যুগান্তর' পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য দারুণ কুজ্ঝটিকাই সৃষ্টি করিয়াছে। দুই দিক রাখা-কথায় যে জনমত দানা বাঁধিয়া উঠিতে পায় না, তাঁহারা তাহা খুবই জানেন সন্দেহ নাই। 'যুগান্তরে' যেদিন বাহির হইল—ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি দরদ, তার পরের দিনই বাহির হইল মধ্যস্বত্বভোগিগণকে টিকাইয়া রাখিবার উক্তি—যুক্তি। সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে 'যুগান্তর' সম্পাদক ঠিক কি বুঝাইতে চান? রামের কথা শ্যামের কথা তুলিয়া কলম কলম লেখা লিখিয়াও লেখকের অন্তরাত্মা খাঁচার ভিতরই বদ্ধ হইয়া রহিল। বিভ্রান্ত জনতা কি বুঝিল? কলিকাতার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগিবে না বলিয়া নির্ভয়ে যথেচ্ছ লেখনী চালনা করিলেও মফঃস্বলের লোকগুলা যে কেহই কিছু বুঝে না—এ রকম মনে করা কখনই সুরুচিসঙ্গত নয়। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, মফঃস্বলের লোকেরা তাঁহাদের মন্তব্যের পানে চাহিয়া থাকে—অনেক সময় চালিতও হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি "য়্যাও হয় অও হয়" বলিয়া হেঁয়ালী সৃষ্টি করিতে থাকেন, তবে ক্রমেই তাঁহাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইবে—অন্ততঃ মফঃস্বলে। বন্ধু ভাবেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

এ্যাডভোকেট জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি

"রাষ্ট্রের দিক্‌পালগণের অবগতির জন্য কয়েকটি সদিচ্ছা সমৃদ্ধ সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বর্দ্ধমান, ২৪শে নভেম্বর: শ্রীমতী
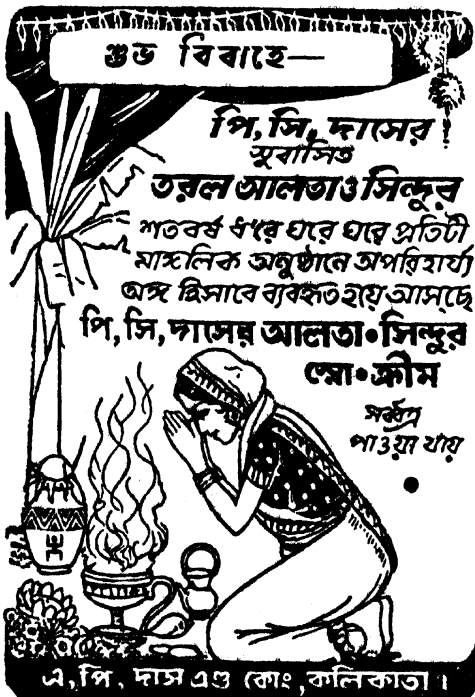
পারুলবালা দেবী সদর থানায় এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছে, বেলকাশ ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক মুসলমান শিক্ষক পারুলবালাকে ধর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। অন্যটি, শ্রীমতী নন্দী দাসীর অভিযোগে প্রকাশ, নন্দী সন্ধ্যার সময় জল লইবার সময় শেখ পটল তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া······অন্য সংবাদটি 'বীরভূম বাণী' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 'রাঢ় দীপিকায়' প্রকাশ, গত ৫।১১।৫৩ তারিখে নীলজা মালিনী তাহার স্বামীসহ নওয়াপাড়া হইতে সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে ৭।৮ জন মুসলমানের মধ্যে ৪।৫ জন নীলজা মালিনীকে জোর পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। উপনির্ব্বাচনে নদীয়ায় কংগ্রেসের জয় হইয়াছে। নির্ব্বাচিতা যিনি, তিনি একজন খ্যাতনামা জমিদারের পুত্রবধূ। একদিন নদীয়া জেলায় বিপ্রদাস-নফর পাল চৌধুরীর নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাইত। আল্লারামিয়ারা যেন কমলের মা। রুচির বালাই মাত্র নাই। জমিদারী উচ্ছেদও করে, জমিদার-গিন্নিকে পূজাও করে। ওদিকে কলিকাতায় কমিউনিষ্টরা জয়ী হইয়াছে। ইহা কমিউনিষ্টদের জয় নহে, সতীনের বাটীতে অমেধ্য গুলিয়া গলাধঃকরণ করা। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ও অন্যান্য কারণে কংগ্রেসের উপর লোকের যে বিতৃষ্ণা, তাহাই ঐ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রভাবশালী, বহু প্রচারিত এবং দল-নিরপেক্ষ সংবাদপত্রগুলিকে বিজ্ঞাপন না দিয়া কেবল মাত্র দলীয় ও নিলাম ইস্তাহারগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া বর্ত্তমান কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বহুবিধ কেলেঙ্কারীর মধ্যে অন্যতম কেলেঙ্কারী। দেশ খণ্ডনের অবিচার কার্য্য যাহারা করিয়াছে, তাহারা কি না করিতে পারে, তাহাই ভাবিতেছি! বিষয়টির প্রতি এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত।" —আর্য্য (বর্দ্ধমান)

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

"গত বৎসর চায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় কেন্দ্রীয় চা-বোর্ডের সহায়তায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ চা-কর ও কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের সদস্য শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৯৫৩ সালের উৎপাদন স্বেচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে সহরের চা প্রস্তুতের ফ্যাক্টরীগুলি অবিলম্বে পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি। ভারতীয় চায়ের সুনাম ও সুযশ রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার কম নয়। এই সকল ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় চায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইবেন। যেখানে ভাল চা প্রস্তুত বহু চেষ্টায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সেখানে অখাদ্য ও কু-খাদ্য দ্রব্য চায়ের নামে বাজারে যাহাতে না চলে তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা আমরা তাঁহাকেই করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই নিয়ন্ত্রণের বাজারে আরও এক শ্রেণীর দ্রব্য তাঁহাকে আমরা উপহার দিতে পারি। ইহার নামও বাজারে চা বলিয়া চলিতেছে। এই দ্রব্যটি কেবল চায়ের পাতার ডাষ্ট। কালো রংয়ের এই ডাষ্টিতে এক কণাও পাতার লেশ নাই। ভাল চায়ের সহিত মিশাইবার জন্য এই ডাষ্টগুলি বিরাট উদ্যমে প্রস্তুত হইতেছে। কেবল এই ডাষ্টগুলির দরও বাজারে ॥০ আনা হইতে ॥৶০ আনা পাউণ্ড। অবস্থা যে কিরূপ সাংঘাতিক, তাহা চিন্তা করিতে আমরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। ভাল চায়ের সুনাম নষ্টের এই যে ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা চলিতেছে, ইহার ফলে প্রকৃত লাভবান হইতেছে কাহারা এবং মরিতেছে কাহারা? সার্কুলার দিয়া লাল ডাষ্ট বিক্রয় বন্ধ করা সম্ভবপর নয় এবং কেমিক্যালের প্রস্তুতের নামেও উহা ঘুরিয়া-ফিরিয়া আবার যে বাজারে আসে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। চা-উৎপাদনকারিগণ যদি ভাল চা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ নীতি মানিয়া চলে তবে লাল ডাষ্ট ও নিকৃষ্ট চা বাজারে না দেওয়ার নীতি মানিয়া চলা উচিত। সকলে না হইলেও যদি সামান্য কয়েক উৎপাদনকারী লাল ডাষ্ট ও নিকৃষ্ট চা বাজারে ছাড়িয়া দে, তথাপিও তাহা সর্ব্বনাশের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা বিষয়টির গুরুত্ব বীরেন বাবুকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেশের সরকার সহজে ইহা করিতে পারিতেন; কারণ, প্রধানতঃ, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলাতেই অর্থাৎ চা-উৎপাদনকারী জেলাতেই অন্যত্র হইতে এই ব্যবসায়িগণ শিকড় গাড়িয়া পরম নিশ্চিন্তে এই কারবার চালাইতেছে। সরকার তাহা করিবেন না। তাহা ছাড়া, সৎ-কর্ম্মচারী ও সবল আইন দ্বারা ইহা নিরোধ করার সামর্থ্যও সরকারের নাই। সুতরাং ব্যবসার সুনাম ও সুযশ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় চা-বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চা-কর শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে অবিলম্বে সমগ্র বিষয়টি গ্রহণ করিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।" —ত্রিস্রোত (জলপাইগুড়ি)

চন্দননগরবাসীর দাবী

"(১) ভারত পার্লামেন্টের এখনই আইন করিয়া চন্দননগরের জনসাধারণকে ভারতীয় নাগরিকের মর্য্যাদা দিতে হইবে। (২) প্রাপ্তবয়স্কের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি কাউন্সিল এখানে থাকিবে। (৩) এই কাউন্সিলের একটি কার্য্যকরী সংস্থা থাকিবে। (৪) কার্য্যকরী সংস্থার সভ্যরা বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবেন, বাজেট নির্ধারণ ও "গ্রান্ট এবং ট্যাক্স ইত্যাদি সম্পর্কে অর্থনৈতিক নীতি স্থির করিবেন। (৫) আইন, শৃংখলা ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর থাকিবে না। (৬) পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি এখানে থাকিবেন—যিনি কাউন্সিল ও পশ্চিমবংগ সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর কাজ করিবেন এবং আইন, শৃংখলা ও বিচার বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিবেন। (৭) রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভায় চন্দননগরের প্রতিনিধি থাকিবে। (৮) পশ্চিমবংগ সরকার তাহার বর্ত্তমান আইন বা নতুন আইন, (যেগুলি চন্দননগরের জনসাধারণের স্বার্থের উপযোগী হইবে না সেগুলি) এখানে চালাইবার পূর্ব্বে কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ করিবেন। (৯) আইন, শৃংখলা ও বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যবস্থার দায়িত্ব পশ্চিমবংগ সরকারকে লইতে হইবে। (১০) যেহেতু অতীতে ভারত সরকার সমগ্র ফরাসী ভারতের জন্য কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দান করিতেন এবং তাহা হইতে চন্দননগরও তাহার অংশ পাইত, সেই হেতু চন্দননগরের বর্ত্তমান উন্নত ব্যবস্থা বজায় রাখা ও জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বর্ধনের জন্য ভারত সরকারকে প্রয়োজনের সময় আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে। (১১) চন্দননগরের বাজেটে ঘাটতি পড়িলে অসুবিধা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সরকারকে যথাযথ সাহায্য করিতে হইবে।" —প্রগতি (চন্দননগর)।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ১১৩৩ হইতে ১১৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুসারে ১১৪৫ সালে তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে পৌর-সভার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি হুগলী জেলা-বোর্ডের সদস্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, উত্তরপাড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ইত্যাদি বহু জনহিতকর সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

শোক-সংবাদ

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজ বরাহনগরস্থ পাঠবাড়ী আশ্রমে গত ৪ঠা ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি ২-৪০ মিনিটের সময় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। পরলোকগত বাবাজী মহারাজ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের লোকান্তর গমনে বৈষ্ণব-সমাজের এক জন পরম ভক্ত ও প্রেমিক শিরোমণির মরদেহের অবসান ঘটিল।

• • • •

ভারতীয় রাজনীতিবিদ স্যার বেনেগল নরসিং রাও গত ৩০শে নভেম্বর জুরিখে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্যার বেনেগল নরসিং রাও একজন বিশিষ্ট আইন-বিশারদ এবং ভারতের শাসনতন্ত্র রচনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে মিঃ রাও হেগস্থিত আন্তর্জ্জাতিক আদালতের বিচারপতি ছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে তিনি বহু জটিল সমস্যার সমাধানে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

• • • •

লোকসভার সদস্য ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী গত ১২ই ডিসেম্বর নাগপুরে এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-দপ্তরের পরিচালক সংস্থার সদস্য ও আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সহঃ সভাপতি ছিলেন।

• • • •

রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন গত ৫ই ডিসেম্বর শনিবার রাত্রে তাঁহার দক্ষিণ-কলিকাতা একডালিয়া রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অবিভক্ত বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

• • • •

ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ গত ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েসানের সংগঠন-সম্পাদক ও সমাজ কল্যাণ সমিতির সদস্য এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব প্রচার-অধিকর্ত্তা ছিলেন।

• • • •

পণ্ডিত শ্রীশ্রীনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার কলিকাতাস্থ আরপুলি লেনের গৃহে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও উপাধি লাভ করেন। শ্রীনাথ একজন সুকবি ছিলেন।

আমরা এই সকল মৃতের পরিবার ও আত্মীয়বর্গকে তাঁহাদের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।
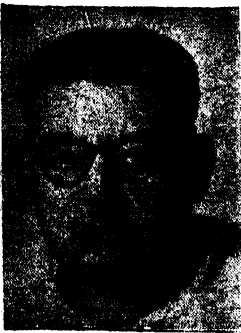
সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় খণ্ড

৩য় সংখ্যা

পৌষ, ১৩৬০ (স্থাপিত ১৩২১) ৩২শ বর্ষ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীশ্রীমা। ঠাকুর, ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, 'দেখছ তো মানুষের দেহ কি,—এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ, কত জ্বালা পায়। এ দেহের আবার পয়দা করা কেন? এক ভগবানই নিত্য, সত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভাল। দেহ ধরলেই নানা উপসর্গ।

শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের কোন বিষয়ই ভগবান ছাড়া ছিল না। আমাকে যে সব জিনিষ দিয়ে ষোড়শী পূজা করেছিলেন, সেই সব শাঁখা সাড়ী ইত্যাদি—আমার তো গুরু-মা ছিলেন, কি করবো—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ভেবে বললেন, 'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পার।' তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। ঠাকুর বললেন,—'কিন্তু দেখো, তাঁকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না, সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে দেবে।' তাই করলুম, এমনি তাঁর শিক্ষা ছিল।

শ্রীশ্রীমা। আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন। একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেননি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেননি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার* রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে ক'রে তিনি বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।' আমি বললুম, 'আচ্ছা।' আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কে, তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম—লক্ষ্মী, কিছু মনে করো নি।' আমি বললুম 'তা বললেই বা।' কখন আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন।

শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের দেহ রাখার পর তাঁর সব ভাল ভাল জিনিষ-পত্র—বনাত, আলোয়ান, জামা কারা নেবে এই কথা নিয়ে গোল বাধে। তা ও-সব হ'ল ভক্তদের ধন, তারা ও-সব চিরকাল যত্ন ক'রে রাখবে। তারাই শেষে ঐ সব গুছিয়ে নিয়ে বাক্সে পুরে বলরামের বৈঠকখানায় এনে রাখলে। কিন্তু মা ঠাকুরের কি ইচ্ছা—সেখান থেকে চাকরদের কে চাবি দিয়ে খুলে তার অনেকগুলি চুরি করে নিয়ে বিক্রী করে ফেললে—কি, কি করলে। তা ও-সব কি বৈঠকখানায় রাখতে হয়? বাড়ীর ভিতরে নিয়ে রাখলেই পারতো। তাঁর ব্যবহারের জিনিষ-পত্র আর জামা-কাপড় যা বাকী ছিল তা এখন বেলুড় মঠে আছে।

* সেদিন সরুচাকলি পিঠে ও আর সুজির পায়স ক'রে, অন্য লোক নেই দেখে শ্রীশ্রীমা নিজেই সন্ধ্যার পর ঐ সব ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো চার

'আরেক দিন দেখাবে ?' বালকের মতন জিগগেস করলেন ঠাকুর। নয়নে সানন্দ-কৌতূহল।

'বেশ তো যাবেন যে দিন খুশি। দেখে আসবেন।'

'কিন্তু কিছু নিতে হবে।'

কি নেব ? টিকিটের দাম ? ঠাকুর পয়সা পাবেন কোত্থেকে ? কৃপা করে যে আসছেন সেই কি অনেক নিচ্ছি না ?

না, ঠাকুর পিড়াপিড়ি করছেন, নিতে হবে কিছু। কিছু না দিয়ে তিনিই বা দেখবেন কেন ?

গ্যালারির সিট আট আনা। গিরিশ হেসে বললে, 'বেশ, আপনি আট আনা দেবেন।'

'বা, আমি গ্যালারিতে বসতে পারব না। সে বড় র‍্যাজলা—'

'না, না, আপনি গ্যালারিতে বসবেন কেন। সে দিন যেখানে বসেছিলেন সেই বক্সেই বসবেন।'

'কিন্তু মোটে আট আনা ?' গূঢ় রহস্যভরা হাসি হাসলেন ঠাকুর।

'তা—' গিরিশ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

'আট আনা নয়, ষোল আনা দেব।'

ষোল আনা দেব। ফাঁক রাখব না, ছিদ্র রাখব না, নিরবকাশ করে দেব। ভরে দেব সম্পূর্ণ করে। ষোল কলা একত্র করে দেব তোমাকে পূর্ণচন্দ্র। করুণার পূর্ণচন্দ্র। প্রসাদের পূর্ণঘট।

কিন্তু তুমিই শুধু দেবে, আর আমি নেব হাত পেতে ? আমার এ দারিদ্র্য এ কার্পণ্য আর সহ্য হয় না। শুষ্ক পিপাসা দিয়ে গড়েছি যে শূন্য পেয়ালা তা এবার ভেঙে ফেলব। আমি নিজেকে বুঝেছি এবার মহীয়ান রূপে, ঐশ্বর্যবান দাতারূপে। এবার আমি দেব, তুমি নেবে। তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে প্রার্থী হয়ে আর আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব।

বলো তো, কী দেব ? নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের চন্দন, কণ্ঠের ফুলমালা।

না, আংশিক নয়, তোমাকেও আমি দেব ষোল আনা। আমার আমি-কে দিয়ে দেব তোমার হাতে। ঢেলে দেব, বিকিয়ে দেব, বিলিয়ে দেব। কিছু রাখব না আপনার বলে। তখন আমিই তোমার আপনার।

তোমার দান, আমার সমর্পণ। তোমার দয়া, আমার উৎসর্গ।

জানি না দাতা হিসাবে কে বড় ? তুমি না আমি ?

প্রথমবার যখন যান থিয়েটারে, লোকজন আলো দেখে ঠাকুর বালকের মতন খুশি। বক্সে বসে বলছেন মাষ্টার মশাইকে, 'বাঃ, এখানে এসে বেশ হলো। অনেক লোক এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছে। অতিথি চোখ বুজে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করছে, নিমাই ছুটে এসে তাই খেয়ে নিচ্ছে পলকে। গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসে পুজো করছে ব্রাহ্মণেরা, নিমাই এসে কেড়ে খাচ্ছে নৈবেদ্য। বিষ্ণু পূজার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস, সর্বনাশ হবে তোর—এক ব্রাহ্মণ তেড়ে গেল নিমাইকে। পালিয়ে গেল নিমাই। মেয়েরা ভালোবাসে ছেলেটাকে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ডাকতে লাগল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই, ফিরে আয়। নিমাই ফিরল না।

আমি জানি কি করে ফেরাতে হয় নিমাইকে। আমি জানি সেই মহামন্ত্র। বললে একজন উটকো লোক। বলেই সে বলতে লাগল, হরিবোল, হরিবোল।

হরিবোল বলতে-বলতে ফিরে এল নিমাই। ফিরে এল নাচতে-নাচতে।

ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুখে বললেন, আহা, আর নয়নে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্রু।

বাবুরামও সঙ্গে ছিল। তাকে আর মাষ্টার মশাইকে বললেন, 'দেখ আমার যদি ভাব কি সমাধি হয়, গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং বলবে।'

বহুবার, নাটকের বহু জায়গায় ঠাকুরের সমাধি হল, কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ঘর-ভরা দর্শকের দল হায়-হায় করে উঠলেও ঠাকুর বিচলিত হলেন না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই ঝড়ে-ছেঁড়া বৃক্ষশাখার দিকে।

অভিনয়ের পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, একজন এসে জিগগেস করলে, কেমন দেখলেন?

প্রসন্ন স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

মহেন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি হয়ে গাড়ি চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর গান ধরেছেন:

'গৌর-নিতাই তোমরা দু ভাই,
পরমদয়াল হে প্রভু—
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই,
ব্রজে ছিলে কানাই-বলাই, নদে হলে গৌর-নিতাই।
ব্রজের খেলা ছিল, দৌড়োদৌড়ি,
এখন নদের খেলা ধূলায় পড়াগড়ি।
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চ রোল,
আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল॥
ওহে পরম করুণ, ও কাঙালের ঠাকুর—'

মাষ্টার মশাইও পাইছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মহেন্দ্র মুখুজ্জে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে। বললেন, একবারটি তীর্থে যাব।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু প্রেমের অঙ্কুরটি হতে না হতেই তাকে শুকিয়ে মারবে? কিন্তু যাও যদি, শিগগির এস, দেরি কোরো না।'

তীর্থ কোথায়? তীর্থ তোমার এই অন্তরের নির্জনতায়। সেইখানেই গহন গিরিগুহা, শিহরময় শৈলশিখর, সেইখানেই সঙ্গবিহীন সমুদ্র-তীর! তোমার বাইরের তীর্থ জীর্ণ হয়, পুরোনো হয়, কিন্তু এই অন্তরের দেবালয় রোজ তুমি নিজের হাতে নিত্যনবীন ভাবরসে নির্মিত করো। ধৌত করো অশ্রুজলে। জ্বালো একটি অনাকাঙ্ক্ষার ঘৃতপ্রদীপ। বাইরের তীর্থে কত বিক্ষোভ কত মালিন্য কিন্তু অন্তরতীর্থে অনাহত প্রশান্তি। এই অন্তরতীর্থে আশ্রয় নাও। অন্তরতমকে দেখ। তার সামনে দাঁড়াও করজোড়ে।

গিরিশ ঠাকুরকে একটি ফুল দিল।

নিয়ে তখুনি আবার ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমায় ফুল দিচ্ছ কেন? ফুল দিয়ে আমি কী করব? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার?'

'দুজনের। এক দেবতার, আর ফুল-বাবুর।'

সকলে হাসতে লাগল।

থিয়েটারে কনসার্টের সময় আরেক কামরায় বসালো ঠাকুরকে। কথায়-কথায় ঠাকুরের ভাবসমাধি হল। মনের আড় যায়নি এখনো গিরিশের। ঠিক ঢং না ভাবলেও ভাবল বোধ হয় বাড়াবাড়ি। যে মুহূর্তে সংশয় ছায়া ফেলল, ঠাকুর চোখ চাইলেন। কুয়াসা কাটিয়ে দেবার জন্যে উদয় হল দিবাকরের।

'মনে তোমার বাঁক আছে।' বললেন ঠাকুর।

শুধু একটা? অসংখ্য। কত কুটিল আবর্ত। অন্ধ ঘূর্ণিবাত। কত অসরল পন্থা, অস্বচ্ছ লক্ষ্য। বক্রতা আর শীর্ণতা। মালিন্য আর আবিল্য। শুধু বিবৃদ্ধ বাসনা।

'এ বাঁক যায় কিসে?' গিরিশের কণ্ঠে লাগল বুঝি কান্নার রঙ।

'শুধু বিশ্বাসে।'

বিশ্বাসে কী না হতে পারে? যার ঠিক, তার সবতাতে বিশ্বাস। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের বড় আর জিনিস নেই।

বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একজনের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলে। বললে, সমুদ্রের ওপারে যাবে তো, ভয় নেই, দিব্যি জলের উপর দিয়ে চলে যাও। বিশ্বাস করে চলে যাও। কিন্তু অবিশ্বাস করেছ কি, পড়েছ জলের তলে। বিশ্বাস করে সোজা চলে যাচ্ছে সে লোক, ঢেউয়ের উপর দিয়ে, চোখ সামনে রেখে, ঘাড় খাড়া করে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল, কাপড়ের খুঁটে কী বাঁধা আছে একবার দেখি। খুলে দেখে, আর কিছু নয়, শুধু একটি রাম নাম লেখা। এই? শুধু একটি রাম নাম? যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল, ঢেউ এসে গ্রাস করলে!

সেই কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। একবার ঈশ্বরের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি! অনাময় নির্মল হয়ে গিয়েছি আমি।

আর আমাকে কে টলায়! বিশ্বাস করে বসেছি।

আকাশ নিজে জানেন। তার ব্যাপ্তি কতদূর তেমনি আমি নিজে জানি না আমার এ অনুভূতির সীমা কোথায়! কিসের ব্যাপ্তি, কিসের অনুভূতি? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, শুধু তুমি আছ। তোমার প্রকাশেই আর সকলে অনুভাত। তুমিই রথেশ্বর আত্মা। সর্বলোকচক্ষু সূর্য। বিশ্বাস করে ফেলেছি। আর আমাকে কে ফেলে! এবার জলে পড়লেও জলে ডুবব না। আগুনে পুড়লেও পুড়বে না কপাল। ভবমরুপরিখিন্ন হয়ে পথ চলছিলাম, এবার নেমে পড়েছি এক মনোহর সরোবরে। যত ক্লান্তি আর ক্লেদ, যত সন্তাপ আর অতৃপ্তি সব শান্ত হল অবগাহনে। আর কে আমাকে তোলে সেই সরোবর থেকে? সেই আমার তাপতৃষাহর হরিসরোবর।

দেখ, দেখ, তাঁর অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁর করতল ও পদতল পদ্ম হয়ে ফুটে আছে, তাঁর চক্ষু হচ্ছে মীন আর তাঁর বাহুর আন্দোলন হচ্ছে তরঙ্গলীলা। শুধু শান্তি আর শান্তি। অগাধ ভবজলধি ভেবেছিলাম এখন দেখি সরল-স্বচ্ছ শীতল সরোবর।

তোমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। তুমি কত সহজ! আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, তৃণের মত সহজ। আমার নিশ্বাসের মত সহজ।

তুমি যে আমার নিশ্বাস, এইটিই বিশ্বাস করেছি আজ।

'ও দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এল।' বলছেন ঠাকুর, 'মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবাই বললাম, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। আবার বললাম, হনুমান। আচ্ছা, সব যে বললাম, এর মানে কি? কি জানো, ঐ যখন চাকর বা ঝি বাজারের পয়সা নেয় প্রথমটা আলাদা-আলাদা করে নেয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের, এ কটা মাছের। সব থাক-থাক হিসেব করে নিয়ে তারপর দে মিশিয়ে।'

একই অনেক হয়ে মিশেছে। অনেক আবার মিশেছে সেই একে। চাই সেই বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে জুজু, তা ঠিক জেনে আছে ওখানে জুজু ছাড়া কেউ নেই। মা বলেছে ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।

চোখওয়ালা বিশ্বাস নয়, চোখ বন্ধকরা অন্ধ বিশ্বাস। বিচারের পরেও আবার বিচার চলে, কথার পরে আরো কথা। কিন্তু বিশ্বাসের পরে আর কিছু নেই। স্তব্ধতার পরে আবার স্তব্ধতা কি!

ভক্তদের জন্যে মার কাছে কাঁদছেন ঠাকুর। 'মা, যারা যারা তোর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস মা। সব ত্যাগ করাসনি! কী নিয়ে থাকবে, খুব কষ্ট হবে যে! সংসারে যদি রাখিস, এক-এক বার দেখা দিস! এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ পাবে কি করে? শেষে যা হয় করিস, একেবারে বিমুখ করিস নে।'

রাম দত্তের বাড়িতে আরেকবার দেখা পেয়েছে ঠাকুরের। জিগগেস করছে আকুল হয়ে, 'বলুন, আমার মনের বাঁক যাবে তো?'

থিয়েটারে এসে সেদিন একটা চিরকুট পেল গিরিশ। কে দিয়েছে? কেউ বলতে পারলে না। লেখা কি? লেখা, আজ রাম দত্তের বাড়ি পরমহংসদেব আসবেন। তাতে গিরিশের কি? জোয়ারের জলে কাছিতে হঠাৎ টান পড়ল, গিরিশ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অনাথ বাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে থামল গিরিশ। ওই কি নেমন্তন্নের চিঠি? অচেনা লোকের বাড়ি ওই চিরকুটের নেমন্তন্নে যাব? রাম বাবুর সঙ্গে আলাপ নেই, তাঁর নেমন্তন্ন কি এমনি উপেক্ষার চেহারা নেবে? দরকার নেই আমার রবাহূতের দল বাড়িয়ে।

কিন্তু ফেরে এমন সাধ্য নেই। তবে ও কার নেমন্তন্ন? চিরকুটটা কি উপেক্ষা? না, কি অন্তিকতম আন্তরিকতার ডাক?

রাম বাবু খোল বাজাচ্ছে আর ঠাকুর নাচছেন। ছন্দের দৃঢ়তার উপর দাঁড়িয়ে ভাবকোমল নৃত্য। সঙ্গে গান হচ্ছে: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কাকে বলে প্রেম আর কাকে বলে প্রেমের হিল্লোল সমস্ত প্রাণকে দুই চক্ষুর মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখল গিরিশ। আর কাকে বলে টলমল-করা দেখল একবার অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের তারা আর মর্তের মুহূর্ত নাচছে হাত ধরাধরি করে। আর শ্যাম হয়েও গৌরকে, মনে কি এখনো বাঁক আছে? বাঁকাকে দেখে বাঁক কি এখনো সিধে হয়নি?

নাচতে-নাচতে ঠাকুর একবার গিরিশের কাছে এসে পড়েছেন। আর সেইখানেই সমাধিস্থ। মাথাকে

নত করে দিল, গিরিশ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কীর্তনান্তে ঠাকুর যখন পুরোপুরি নামলেন দেহভূমিতে, গিরিশ জিগগেস করল, আমার মনের বাঁক যাবে ?

ঠাকুর বললেন, 'যাবে।'

যেন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা যায় না, এমনি দ্বিধান্বিতভাবে আবার জিগগেস করল গিরিশ, 'সত্যি, যাবে ?'

'যাবে।'

তবু, বার-বার তিনবার।

'ঠিক বলছেন, যাবে আমার মনের বাঁক ?'

'সত্যি বলছি, যাবে, যাবে, যাবে।'

মনোমোহন মিত্তির বসেছিল পাশে। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বললেন, 'এক কথা একশোবার জিগগেস করছেন কেন ? উনি বলছেন, যাবে, তবু বার-বার ত্যক্ত করা।'

কি আস্পর্ধা লোকটার, মুখের উপর সমালোচনা করে! গর্জে উঠতে যাচ্ছিল, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল গিরিশ। অনুভব করল তার মনের বাঁক কেটে গেছে। ক্রোধের বদলে দীনতা এসেছে। রূঢ়তার বদলে স্নৈগ্ধ্য। কলহ না করে দেখলেন আত্মদোষ। সত্যিই তো, ঠাকুরের এক কথাই একশো সত্যের সমান। তবে কেন অসহিষ্ণু হয়েছিলাম ? ঠাকুরকে কেন বসাতে পারিনি এক কথার একাসনে।'

পর দিন থিয়েটার যাবার পথে বেজ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা।

'ও মশায়, কাল আপনার জন্যে একটি চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন ?'

'তুমি কোথায় পেলে ?'

'কোথায় আবার পাব! থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতে লিখলুম চিরকুট।'

'কিন্তু আপনাকে সংবাদ কে দিলে ?'

'কিসের সংবাদ ?'

বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠবার প্রশ্ন এই। কিন্তু অদ্ভুত নম্র থেকে গিরিশ বললে, 'রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেবের আসার সংবাদ!'

'আর কে দেবে! স্বয়ং প্রভু। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দিও।'

'আমাকে কেন খবর দিতে বললেন বলতে পারেন ?'

'তার আমি কি জানি!' বেজ মিত্তির দু'হাতে শূন্যায়িত ভঙ্গি করলে: 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে, এই কৈফিয়ৎ আমার জানা নেই।'

তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ এ কি আসেনি আমার কর্ণকুহরে ? আমার অন্তরতিমিরে জ্বলেনি কি তোমার ডাকের দীপশিখা ? হৃদয়ের শুষ্ক মঞ্জরীর মর্মদেশে লাগেনি কি ডাকের লাবণ্যবর্ণ ? বিভাবরী ভোর হল, তোমার ডাকটি এল আজ তপস্বিনী উষসীর মূর্তিতে। তোমার ডাক শুনে জাগি আজ অম্লান-নির্মল নেত্রে, শ্যামায়মান প্রাণের সমারোহে। বলবান বিশ্বাসের দুর্বারতায়। নিমেষের কুশাঙ্কুরকে পায়ে দলে চলব নবতর প্রভাতের আবিষ্কারে। মৃত্যুর উদার তীর্থে। সেই পরমা নির্বৃতির শেষ প্রান্তে।

ভবনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'আসবে হে আসবে! আমি চেয়েছিলুম ষোল আনা, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিলে। না দিয়ে যাবে কোথা ? আলো যখন উপচে পড়বে, তখন যাবে কোথা, দিতেই হবে। প্রেম যখন উপচে পড়বে তখন ধরবে কি আর প্রাণপাত্রে ? যাবে কোথায়, ঢালতেই হবে সে মধু-প্লাবন!'

সে দানের ক্ষয় নেই। সে গানের শেষ নেই। আর সে প্রাণ অপরিচ্ছেদ্য।

[ক্রমশঃ

দেখ মা, পুরুষ-জাতকে কখনও বিশ্বাস কোরো না—অন্য পরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।

—শ্রীশ্রীমা
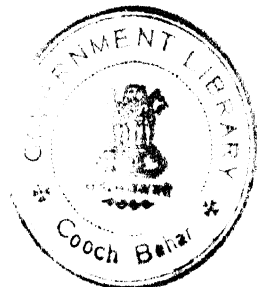
অটোগ্রাফ্

(অপ্রকাশিত)

[গত সংখ্যায় মাত্র এক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সুধী ব্যক্তির 'অটোগ্রাফ' মুদ্রণের জন্য অনেকেই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং অনেকে তাঁদের 'সংগ্রহ' প্রকাশের জন্য খাতা দাখিল করেছেন। পাঠক-পাঠিকার উৎসাহ ও উদ্দীপনা যখন এত অধিক তখন স্থির করা হয়েছে যে, এই ধরণের স্বাক্ষর-সংগ্রহ মাঝে-মিশেলে ছাপা হবে। এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উক্তি ও কাব্যকণা শ্রীমতী মালশ্রী ও শ্যামশ্রী ঘোষালের সংগ্রহ। —স]

খাতার পাতায় কালির আঁচড়
এর নাই কোন মূল্য নাই কোন দর।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নামটি আমার লিখে তোমাদের ঐ খাতায়
—আমি হলাম ধন্য
তোমাদের দুজনারে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য।

—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

একে একে সব জিনিষই যাচ্ছে আমায় ছেড়ে,
কলমটিও চিত্রগুপ্ত নিয়েছে মোর কেড়ে।

—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপের তীর্থে তীর্থ পথিক যুগে যুগে আমি আসি,
ওগো সুন্দর! বাজাইয়া যাই তোমার নামের বাঁশী।

—নজরুল ইসলাম

অত বোঝা পড়ায় কাজ নেই ভাই,
বোঝ সোজা, চল সোজা।

—জলধর সেন

সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বাংলাকে ও ভারতকে অখণ্ড ভারতে রূপান্তর কর। সেই পূর্ণতিই ভারতই ভাবী সত্যালোকদীপ্ত জগৎ গড়িয়া তুলিবে—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী যাহার যুগ প্রবর্ত্তক।

—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি
বিধি মিলাইবে পুরস্কার।

—শ্রীমেঘনাদ সাহা

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি
ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে,
লাজুক মেয়ে উঠল নেয়ে
চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মিথ্যা মায়ায় সাজাইতে তারে
নাহি কোন প্রয়োজন;
সকলের চেয়ে সত্য সে মোর
যাহারে সঁপেছি মন।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে ব্যক্তি নিশ্চয় চলতে জানে সে নিশ্চিত
সঙ্গী খুঁজে পায়।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

নীলিমার চারি ধারে ছোটে মোর মনোরথ,
স্বপনের মাঝে খুঁজি জীবনের ছায়াপথ।
জীবন আমার যেন আকাশ গঙ্গার ধারা
আঁধারের বুকে চাই চাঁদিমার হাসি ঝারা।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

যেমন শোভে কমল হাতে
তেমনি শোভে বাজ।
বাঙ্গলা দেশের মেয়ে ওগো
দেখাও সবে আজ॥

—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষণ মুখর সাঁজে, যে সুর অন্তরে বাজে
ছন্দে সে কি ধরে রাখা যায়?

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

নিজেকে জানাই হলো ভগবানকে জানার পথ।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বহু যুগান্তে গগন প্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি?

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবে বঞ্চিত করিয়া রাখে যারা
দ্বার রুদ্ধ করে,
ভাণ্ডার মিথ্যায় ভরে, তারা সর্ব্বহারা
ভিখারী সংসারে।

—প্রভাদেবী সরস্বতী

খড়দের সঙ্গে নাম লিখিয়ে নিয়ে আমাকেই বড় করে দিলে। ইতি

—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

আকাশ পরে মেঘের লেখা
যাচাই কেবা করে?
মোদের আঁচড় টানার সাথেই
হৃদয় কাঁপে ডরে।

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

খাতার পাতায় যা তা দিলুম লিখে
যতন করে রেখো খাতা য'দিন থাকে টিকে।

—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পত্র

শ্রীনিকুঞ্জ দেবীকে (মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে) লেখা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা

২৪ শ্রাবণ

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বিশেষ পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। মা তোমাকে পত্র লিখিতে পাই না। সেজন্ম কিছু মনে করিও না। আমার জ্বর হইয়াছিল। এখনও পথ্য হয় নাই বোধ হয় কাল পথ্য হইবে এইরূপ বাসনা আছে ও কুইনাইন খাইয়া ভাল আছি।

মা আমি তোমাকে খুব ভালবাসি তুমি আবার এখানে আসিবে। ভয় কি···অনেক জিনিষপত্র পাইয়াছি এবং নিমকি ও গজা উত্তমরূপ হয়েছিল। আর ঠাকুরকে খাওয়াইয়াছিলাম আর তোমার বাই শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল কি করিবে মা একটু ধৈর্য্য করিয়া থাক ৺ভগবানের কৃপায় ভাল হইবে। মাষ্টার মহাশয়কে বেশ যত্ন করিবে ও ছেলেদিগকে বেশ করিয়া খাওয়াবে।

আর মাষ্টার মহাশয় যে কুইনাইন পাঠাইয়াছিলেন তাহা মধ্যে মধ্যে খাইয়া থাকি এখানকার কাইক মঙ্গল তোমাদের মঙ্গল সর্ব্বদা লিখিবেন আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন ও মাষ্টার মহাশয়কে আমার আশীর্ব্বাদ দিইবেন। ইতি—

তোমার মা

মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব :
সহায়

চির জীবেষু—'

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন

পরে বাবাজীবন তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আর কৃষ্ণকুমারী দরুন পাঁচ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি ও পুস্তক আপনি পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রাপ্ত হইলাম। পরে আমার ৺বিজয়া দশমীর আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আর তোমার চিঠি ত্রয়োদশীর দিন প্রাপ্ত হইলাম। আর আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ বৌউ মাতাকে এবং বালক বালিকাদিগকে জানাইবেন। এক্ষণে শারিরীক আমি ভাল আছি। এখানকার কায়িক মঙ্গল তোমাদের মঙ্গলাদি লিখিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতা ঠাকুরাণী

Oct 7th 1903.
Postal Date

মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

চিরজীবেষু, ৬ই ভাদ্র ১৩০১ সাল।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আর আমার যাইবার কথা লিখিয়াছেন কিন্তু আমি এখন যাইতে পারিলাম না কারণ মা গর্ভধারিণী শ্যামা দেবী এখনও পর্য্যন্ত সারিতে পারেন নাই অন্ন পথ্য করিয়াছেন এখন বেশ বল পান নাই।

আর অক্ষয় মাষ্টার (সেন, পুঁথির কবি) ডাক্তার আনিয়া আমাকে আরোগ্য করিয়াছেন। এখনও টনিক খাইতেছি। আমি বেশ ভাল হইয়াছি। আমার জন্ম কোনও চিন্তা করিবেন না আর দশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন পাইয়াছি। আপনার দীর্ঘায়ু হউক যেন। আপনার ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও মন থাক আমার এই ইচ্ছা। আর বৌমা কেমন থাকে সংবাদ লিখিবে ও তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিইবে আমি তাহাকে ভালবাসি ও ছেলেরা কেমন আছে লিখিবেন আর তোমার শাশুড়ী কেমন আছে ও কৃষ্ণকুমারীকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

এখানকার কাইক মঙ্গল তোমাদের মঙ্গল লিখিবেন।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতা

নিকুঞ্জ দেবীকে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে তোমার এই পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে মা আমাকে ভুলিয়াছেন। কিন্তু আমি ভুলি না। আর এখানে ছেলেরা প্রায় আসা যাওয়া করে। উহাদের মুখে তোমাদের সংবাদ পাই। সেই জন্ম তোমাদের পত্র লিখি না। তাহাতে দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে মনের সহিত খুব ভালবাসি ও বিশেষ ভালবাসি। আর তুমি প্রাণত্যাগ করিব বলিয়াছ। ওকথা মুখে এন না। বলিলে মহাপাপ হয়। কি করিবে? একটুক সহ্য করিয়া থাক। আমাদের দেশে আসিয়া নদীর তটে বেড়াইবে। আমি তোমাকে রোজ মনে করি এবং মনের সহিত খুব ভালবাসি। আর মাষ্টার মহাশয় যে দুই খানি কাপড় দিয়াছিলেন আমি পরিতেছি। এই কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলিবেন। আমার আশীর্ব্বাদ মাষ্টার মহাশয়কে জ্ঞাত

করিবেন ও তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও ছেলেদিগকে ও তোমার মাকে আমার আশীর্ব্বাদ ও কৃষ্ণকুমারীকে (নিকুঞ্জ দেবীর ভগ্নী) আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। যেহেতু তুমি ভগবানের শরণাগত••• আমার একই আছে। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে চিঠি দিও। মা আমি তোমাকে খুব ভালবাসি ও খুব মনে-রাখি। এখানকার কায়িক মঙ্গল। তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। ইতি—

২রা আষাঢ় তোমার মা

Post Date 17-7-94

মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীকালী

চিরজীবেষু

পরে বাবাজীবন অদ্য তোমার প্রেরিত আট টাকা পাইলাম আর আপনি নন্দর.ভ্রাতষ্পুত্র জন্য অত্যন্ত ভাবনাদি করিবে নাই কারণ আপনি সুশিক্ষিত সকলি ঈশ্বর ইচ্ছার। শুনিলাম আপনি সামান্য রুটী ইত্যাদি আহার করেন ইহাতে আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইবেক। আমার কথায় পুর্ব্ববৎ আহারাদি করিবেন আমি কলিকাতা যাইয়া কাহার নিকট দাড়াইব তোমরা আমার একমাত্র। আর চারুর অসুখ শুনিয়া মনকষ্টে রহিলাম, চারুর সুস্থ সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। এখানকার কুশল তোমাদের কুশল লিখিবেন।

আশীর্ব্বাদিকা
মাতাঠাকুরাণী

Postal Date
19. 7. 1907

মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম

জয়রামবাটী
৭ই বৈশাখ ১৩১৬

পরম কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। শ্রীমান চারুর (মাষ্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র) অসুখের সংবাদে চিন্তিত রহিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শ্রীমান সত্বর আরোগ্য হয় ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমানকে ভাল রকম চিকিৎসা করাইতেছ ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য ৺পুরীধামে পাঠাইয়াছ জানিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। ভগবান করুন শ্রীমান এখন আরোগ্য লাভ করে। শ্রীশ্রীকথামৃত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথা, তুমি উহা প্রকাশ করিয়া মানবের অশেষ উপকার করিয়াছ। এক্ষনে ঐ পুস্তকের বন্দোবস্ত (ঠাকুরের নামে আয় উৎসর্গ ?) করিবার যে সংকল্প করিয়াছ তাহা অতি উত্তম। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সৎ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। এখানকার মঙ্গল। ভরসা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি

১

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত হইয়াছিল।

Glen Eden I
Darjeeling, 8. 11. 16.

যাহা অজ্ঞাত তাহাই বিভীষিকাময়, সেই জন্যই আমরা মরণকে মিথ্যারূপে দেখি। আমার নিকট ত সমস্ত জগতই জীবন্ত।

আর এক কথা—যাহা অনিবার্য্য তাহাকে বরণ করিতেই হইবে, পৌরুষ সহকারে অথবা ভীত চিত্তে।

যদি মাতৃপ্রেম বিধাতার প্রদত্ত হয়, তবে তাঁহার স্নেহ এবং করুণা মানুষের মমতা হইতে গভীরতর। আর শিশু যদি মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারে, তবে মরণ-নিদ্রাতে ভয় কি ?

এই জীবন একটা মহাক্রীড়া স্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারি না ?—হয় জয় কিম্বা পরাজয়। আপনি জীবনকে আনন্দময় দেখিতে চান। কিন্তু ঝটিকা ও অগ্ন্যুৎপাতেও এক মহাসঙ্গীত আছে।

আমরা এখানে শান্তি ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আছি। কিন্তু অদূরেই লক্ষ লক্ষ লোক নিজেকে যন্ত্রণাময় মরণে আহুতি দিতেছে। ইহাদের নিরানন্দে হয়ত ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে।

আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ, সুখ কি দুঃখ, ইহাতে কি আসে যায় ?

আসল কথা পূর্ণতা বা অপূর্ণতা লইয়া, ইহার মধ্যে আমরা কোন্‌টা গ্রহণ করিব ?

জগদীশচন্দ্র বসু

২

১৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২৫ জুলাই, ১৯১৬

যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নয়। সর্ব্বদা ভুল দেখি, ভুল ভাবি ও ভুল শুনি। আমরা ক্ষুদ্র সৃষ্ট বস্তু হইয়াও যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে স্নেহ মমতার চক্ষে দেখি তবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার মমতা আমাদের অপেক্ষা কত বেশী।

আমাদের বুদ্ধির অতীত বিষয়ে মন ক্লিষ্ট না করিয়া আমাদের করিবার অনেক আছে। হয়ত আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার হস্ত। আমাদের হস্ত আড়ষ্ট হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য আড়ষ্ট হইবে।

জগদীশচন্দ্র বসু

স্ত্রীকে লেখা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

(দ্বিতীয় অংশ)

লণ্ডন,
১লা এপ্রিল, ১৮৭০

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সপ্তাহে তোমার হস্তের কোন পত্র না পাওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি। আমি বার বার তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রতি সপ্তাহে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিও। দূর-দেশে পড়িয়া রহিয়াছি, তোমাদিগকে দেখিতে পাই না; এ অবস্থাতে তোমার

পত্র যে আমার পক্ষে কত আদরণীয় ও সুখপ্রদ, তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। যদি অধিক লিখিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা সময় না থাকে, দুই-পাঁচটি কথা লিখিবে, তাহাতেও আমার অনেক তৃপ্তি হইবে। বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, প্রতি সপ্তাহে একখানি পত্র পাঠাইবে, আমি অনেক আশা করিয়া প্রতীক্ষা করি। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি। অত্যন্ত শীত, স্নানের সময় যেন শরীর অসাড় হয়, হস্ত-পদ জ্বালা করে, রাস্তায় ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস, সর্ব্বদা সূর্য্যোদয় হয় না, প্রায় সর্ব্বদা চারিদিক অন্ধকার থাকে। কিন্তু এত শীত হওয়াতেও শরীর অসুস্থ হয় না। সিমলা পাহাড়ে যেমন শীত, তাহা অপেক্ষা এখানে বেশী শীত। সর্ব্বদা গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়। আমরা······কাপড় পরি যে দিনের মধ্যে, কাপড় ছাড়িতে পরিতে অনেক সময় যায়। আমরা প্রতিদিন ডাল ভাত খাইতেছি, বাটী হইতে যে মুগের ডাল আনিয়াছিলাম, তাহা এখনও চলিতেছে। ভাতের সঙ্গে আলু ভাতে······এবং দুগ্ধও প্রতিদিন পান করি। অনেক বড় বড় সাহেবদের ও বিবির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে; প্রায় সকলেই অত্যন্ত সমাদর ও স্নেহ করিতেছেন। লরেন্স সাহেব আবার সেদিন আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া অনেক স্থান দেখাইলেন এবং অনেকের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। তিনি যে কত স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নদীর ধারে এই নূতন বাসাতে আসিয়াছি। আমাদের সম্মুখে টেমস নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ পাঁচ মিনিট দশ মিনিট অন্তর চলিতেছে। তুমি অনেক সময় বলিতে, নদীর ধারে বাটীতে থাকিতে বড় ইচ্ছা হয়; এখানে সঙ্গে থাকিলে, বোধ করি, অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে এবং অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সুখী হইতে। যে বাটীতে আমরা বাস করিতেছি, ইহা এখানকার সাহেবেরা আমার সম্মানার্থ আমাকে দিয়াছেন, ইহার ভাড়া এক মাসের জন্ত (১২০৲ টাকা)। তাঁহারা দিবেন। এখানে ধর্ম্মবিষয়ে অনেকের মত আমাদের স্থায়। তাঁহারা যদিও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। তাঁহারা আমার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির এখানে স্থাপিত হইলে কত আনন্দ হইবে। পিতা তোমাকে তাঁহার পবিত্র চরণতলে স্থান দান করুন।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,
৮ই এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সপ্তাহে তোমার পত্র না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, এ সপ্তাহে তোমার কোমল হস্তের অক্ষর পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখান হইতে তোমার তাপিত অন্তরকে কি প্রকারে শান্ত করিব? আমি তোমার দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ; আমাকে তুমি এত ভালবাস, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কত সময় দূরে ভ্রমণ করি। কি করি? ঈশ্বরের কার্য্যে আসিয়াছি, তাঁহার হস্তে আমাদের মঙ্গলের ভার। তিনি তোমাকে শান্তি বিধান করিবেন। সুখোর পত্র দেখিয়া আমরা সকলে কত হাসিলাম। ছেলেরা কেমন আছে? তুমি লিখিয়াছ, তারা খেলনা চায়। আমি কিছু কিছু খেলনা ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু কত দিন পরে সেগুলি লইয়া যাইব! নির্ম্মল কি কথা কহিতে শিখিয়াছে? সে দিবস এক সাহেবের বাটীতে গিয়াছিলাম, তাঁহার একটি ছোট ছেলে দেখিলাম, একজন বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ছোট বালকটির বয়স কত? তাঁহারা নির্ম্মলের কথা পূর্ব্বেই জানিতেন। নির্ম্মল একজন······লোক। বড়'পুঁটী কি গিন্নি হইয়াছে? বিবির আছে কি এখন পড়ে? বিন সমস্ত দিন কি করিয়া বেড়ায়? তোমার দাদার কি কোন কাজ হইয়াছে? তোমার মা কেমন আছেন? গত সপ্তাহে এখানে অনেক নূতন নূতন স্থান দেখিলাম। ক্রিষ্টাল্ প্যালেস্ নামে এখান হইতে কিছু দূর একটি বৃহৎ কাচের ঘর আছে। বোধ করি, উহার ছবি আমাদের বাটীর ভিতরের ঘরে আছে। সেখানে কত দোকান, কত প্রকার আশ্চর্য্য বিক্রয়ের বস্তু, কত ছবি, কেমন সুন্দর উদ্যান দেখিলাম। বোধ করি, এমন স্থান আর জগতে নাই। সঙ্গীত এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য একটি স্থান আছে, সেখানে বোধ করি, দশ হাজার লোক বসিতে পারে। কেবল লোহা ও কাচ দ্বারা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত স্থান হইতে কতকগুলি খেলনা ও অন্য অন্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। ইচ্ছা হয়, সমুদায় ক্রয় করিয়া লইয়া যাই, এমনি সুন্দর সামগ্রী। তুমি যদি হাজার টাকা লইয়া তথায় যাও, বোধ করি, একটি পয়সাও অবশিষ্ট থাকিবে না। গত বুধবার নৌকার লড়াই দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে যেমন বাচ খেলান আছে, এখানে সেইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার দেখিলাম। লোকের ভিড় ভয়ানক, কত সাহের কত বিবি, রেলগাড়ী পরিপূর্ণ, নৌকা কত প্রকার, তাহার সংখ্যা নাই। দুইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দুই পক্ষ, তাহাদের দুইখানি সুন্দর নৌকা বেগে দৌড়িতে লাগিল, প্রায় দুই ক্রোশ চলিতে হইয়াছিল; নদীর দুই দিকে হাজার হাজার লোক করতালি দিতে লাগিল, যাহাদের জয় হইল, তাহাদের নাম সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। আগামী মঙ্গলবারে এখানকার সাহেবেরা আমার সম্মানার্থ একটি সভা করিবে। সেখানে আমায় বক্তৃতা করিতে হইবে। আগামী রবিবারে সাহেবদের উপাসনা-মন্দিরে একটি উপদেশ দিতে হইবে। অনেকের উৎসাহ দেখিতেছি, দয়াময়ের নাম সকল স্থানে প্রচারিত হউক। পিতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমারি চিরদিন
'কেশব।

মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিও, দেখ, যেন ভুল হয় না। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। প্রসন্ন, গোপাল সকলে ভাল আছেন। রাজলক্ষ্মীকে সংবাদ দিবে।

লণ্ডন,
১৫ই এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আবার এ সপ্তাহে পত্র হইতে কেন বঞ্চিত করিলে? কত আগ্রহের সহিত তোমাদের সংবাদ প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, একখানিও পত্র এবার পাই নাই। অনেক আশার

পর, আশা পূর্ণ না হইলে, কত কষ্ট হয় তাহা সহজেই অনুভব করিতে পার। কতকগুলি বন্ধু, তাঁহারা কি কেহ একখানি পত্র লিখিতে পারিলেন না? তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আবার অনুরোধ করি, প্রতি সপ্তাহে সংবাদ লিখিয়া মনের কষ্ট দূর করিও। গত রবিবারে এখানকার উপাসনা-মন্দিরে একটি উপদেশ দিয়াছিলাম। প্রায় ৫০০ লোক, সাহেব বিবি, উপস্থিত ছিলেন। বোধ করি, কল্যই উপাসনা ছাপা হইবে। গত মঙ্গলবারে আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি মহাসভা হইয়াছিল, প্রায় ১০০০ এক সহস্র লোক একত্র হইয়াছিলেন। সাহেবেরা কতকগুলি বক্তৃতা করিলেন, এবং কলিকাতার যিনি বড় সাহেব ছিলেন, অর্থাৎ লরেন্স সাহেব, তিনিও এক বক্তৃতা করিয়া আমার পরিচয় দিলেন। অবশেষে আমি এক বক্তৃতা করিলাম। সাহেবেরা আমাকে যে প্রকার সমাদর করিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি। এখানে অনেক বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে; প্রায় প্রতিদিন নিমন্ত্রণ হইতেছে। পত্রও অনেক লিখিতে হয়। সমস্ত দিন প্রায় হস্তে কার্য্য থাকে, চুপ করিয়া থাকা যায় না। অনেকে বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করিতেছে, আগামী রবিবারে আর একটি উপসনা-মন্দিরে উপদেশ দিতে হইবে। আমাদের দেশে যেমন দরিদ্র ব্যক্তিরা রাস্তায় সঙ্গীত করিয়া ভিক্ষা করে, এখানেও সময়ে সময়ে সেইরূপ দেখা যায়; আমাদের বাটীর নিকটে থাকিলে, আমরা কখন কখন ইংরাজী পয়সা দান করিয়া থাকি। রাস্তায় স্থানে স্থানে ছোট লোকের মাগীরা কমলা লেবু বিক্রয় করে এবং অন্যান্য সামগ্রীও বিক্রয় করে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখানে শীত কম হইয়াছে এবং সাহেবদের বড় আনন্দ হইতেছে। তোমাদের কলিকাতায় এখন কি হইতেছে, বিস্তার করিয়া লিখিবে। সকল সংবাদ জানিতে চাই। এখানকার সকলে ভাল আছেন। তোমারি কেশব।

লণ্ডন,
২২শে এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ

প্রিয় জগন্মোহিনী,

যে চিঠি ও তোমাকে ছবি যিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমার নমস্কার জানাইয়াছি। গতকল্য এক বিবির বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেখানে আরও কয়েক জন বিবি ছিলেন, তাঁহারা ছেলেদের জন্য খেলনা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বড় ছেলে কিরূপ খেলনা ভালবাসে। ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মিকা বলিলে বলা যাইতে পারে। গত রবিবারে যে উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেখানে অনেক সাহেব বিবি আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় অনেকে আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন; কেহ কেহ নিকটে আসিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। এই মন্দিরে শুনিলাম, মহর্ষি রামমোহন রায় সর্ব্বদা উপাসনা করিতে আসিতেন। তিনি যেখানে বসিতেন, প্রসন্ন সেদিন সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায়। আগামী দুই রবিবার অন্যান্য স্থানে উপদেশ দিতে হইবে, ধার্য্য হইয়াছে। এখানে তত শীত আর নাই, দুই পাঁচ দিন হইতে উত্তাপ হইতেছে। আমরা যদিও গরম দেশের লোক, তথাপি এরূপ উত্তাপে কিছু কষ্ট বোধ হয়। বিশেষতঃ যেরূপ গরম কাপড় পরিতে হয়, তাহাতে উত্তাপ ভাল লাগে না। এদেশে একটু একটু শীত ভাল লাগে। অধিক শীত আবার ভাল নহে। আমরা আবার বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এ স্থান যদিও নদীর ধারে নয়, তথাপি অতি পরিষ্কার ও রমণীয়। আমাদের ঘরের সম্মুখে একটি অতি ক্ষুদ্র উদ্যানে বৃক্ষগুলি দেখিলে চক্ষুর্দ্বয় তৃপ্ত হয়।

প্রসন্ন এক পত্র দ্বারা সংবাদ পাইয়াছেন যে, কৃষ্ণবিহারীর শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে; যদি সত্য হয়, বড় দুঃখের বিষয়, ছোট বৌকে আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মাকে আমার প্রণাম দিবে। সুকো, বিন, বড় পুঁটী, ভোলা সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। তুমি সমস্ত দিন কি করিয়া থাক? এখনো কি মিস পিগটকে তোমার ছবির কথা বল নাই? সে ছবি শীঘ্র চাই, একখানিতে কেবল তুমি, আর একখানিতে ছেলেরা; এই দুইখানি ছবি কোন ভাল সাহেবের দোকানে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে। মিস পিগটকে বলিবে, তিনি সাহায্য করিবেন। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। প্রসন্নের প্রণাম গ্রহণ করিবে।

তোমারি কেশব।

রমেশচন্দ্র দত্ত

স্বদেশনিষ্ঠ, স্বদেশবাসীর প্রিয় রমেশচন্দ্র—বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী রমেশচন্দ্র, কংগ্রেস-যজ্ঞের অন্যতম অধ্বর্য্যু, বাগ্মী রমেশচন্দ্র,—দীন বঙ্গসাহিত্যের ভক্ত উপাসক, ঔপন্যাসিক, ঋগ্বেদের অনুবাদক রমেশচন্দ্র,—ইংরাজী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, নানা ইংরাজী গ্রন্থের প্রণেতা রমেশচন্দ্র, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থায় পারদর্শী, সুতার্কিক, কর্জ্জন-বিজয়ী রমেশচন্দ্র,—রাজা ও প্রজার বন্ধু, বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রমেশচন্দ্র, গায়কবাড়ের অমাত্য, বারোদার দেওয়ান রমেশচন্দ্র,—ভারতের সকল শুভানুষ্ঠানের হিতকামী কর্ম্মবীর! ভারতের কল্যাণ-কামনায় চিরজীবন যাপন করিয়া, তুমি কর্ম্ম-মন্দিরেই চির-বিশ্রাম করিলে! সাহিত্য ও শিক্ষা, রাজনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা, চিন্তার সাম্রাজ্যের কোন্ বিভাগে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় মুদ্রিত নাই? তোমার অভাবে বঙ্গদেশ দরিদ্র হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিন্তাশীল মনীষী হারাইয়া অশ্রুজলে তোমার স্মৃতির পূজা করিতেছে। ভারতের, বাঙ্গালার, এ শোক কি ভুলিবার? তোমার অভাব কি সুদূর ভবিষ্যতেও দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে?

—১৯০৯ অব্দে রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ:
'বসুমতী'তে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক লিখিত।

পরমা প্রকৃতি

শ্রীশ্রীসারদামণি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?' পায়ে বাত ধরে গেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, তবু সারদা দরমার বেড়ার সেই ছিদ্র থেকে চোখটি সরিয়ে নেয় না। বড়-বড় থামের আড়াল পড়ে যায়, দেখা যায় না সেই নয়ন-মনোহরকে, তবু এই নিয়ত কাকুতি, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস—

যেন কত অযোগ্য, কত অভাজন, কত দীনহীন—এমনি এক আত্যন্তীন কাতরতা। এ কি তাই? যে অশেষ ঐশ্বর্যে সমারূঢ়া, জগদ্ব্যাপিকা আনন্দরূপা, বিশ্বেশসিংহাসনা—এ তার দুঃখনিবেদন? যেন কত নির্যাতিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত—তাই কি শোনাচ্ছে? তবে যিনি উপেক্ষা করছেন তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা কেন? এ কখনো শুনেছে কেউ? যে অন্যায়চারী, সেই আকর্ষণ করবে? আকাঙ্ক্ষনীয় হয়ে থাকবে? তারই জন্যে নয়নে ভরে থাকবে দর্শনের পিপাসা? যে বনবাসে রেখেছে তারই জন্যে অনুরাগ?

আসলে, এ কি কান্না? এ কি নালিশ? যে মেরুকিরীটভারা সমুদ্রকাঞ্চী পৃথিবী, তার আবার খেদ কিসের? সে তো মূর্তিমতী মৌন।

আসলে, এ একটি যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ। তপস্যার হোমশিখা।

পার্বতী যখন মহাদেবের ধ্যান ভাঙতে চাইলেন, পঞ্চশরের শরণাপন্ন হলেন। পঞ্চশর ভস্ম হয়ে গেল। পার্বতী তখন অপর্ণা সাজলেন। প্রাপ্তির মধ্যে বৃহত্ত্ব আনতে হলে পদ্ধতির মধ্যেও মহত্ত্ব আনতে হবে। দুঃসাধ্য মূল্য দিয়ে তাকে পেতে হবে বলেই তো সে দুর্লভ। যদি অল্পমূল্যে পাওয়া যায় সে অল্পজীবী হয়ে থাকে। যে আমার না-পাওয়ার ধন তাকে চিরন্তন চাওয়ার মধ্যেই যে আমার পরম পাওয়া সেটিই অনির্বাণ দীপবহ্নি করে রাখলুম জ্বালিয়ে। এইটিই আমার যোগ-সাধন।

সারদা অপর্ণা সাজল।

জ্বালিয়ে রাখল একটি প্রেমের দীপভাণ্ড। শিখাটি প্রতীক্ষার। নিষ্কম্প, নির্ধূম। যে জ্যোতিটি বিকিরিত হচ্ছে সেটি পরমানন্দের আভাতি।

তাই কান্না নয়, বিলাপ নয়, নবযুগের বেদসূক্ত।

'হ্যাঁ গা, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?' মাঝে-মাঝে এসে জিগগেস করেন ঠাকুর।

যেন একটি গভীর পরিপূর্ণতা কথা কইছে, তেমনি সুরে সারদা বললে, 'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।'

কি খেয়াল হল, খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর সে দিন নবতে এসে হাজির। ব্যাপার কি? বেটুয়ায় মশলা নেই। সারদার আনন্দ তখন দেখে কে। প্রত্যক্ষ সেবার একটু সুযোগ পেল। দুটি যোয়ান-মৌরি খেতে দিল ঠাকুরকে। এ খাওয়া তো এখুনি ফুরিয়ে যাবে—লোভ হল, রাত্রেও যেন দুটি খান, খাবার সময় সারদার কথা যেন একটু মনে করেন। কাগজে মুড়ে আরো দুটি মশলা ঠাকুরের হাতে দিল সারদা। বললে, নিয়ে যাও। পরে খেও।

বৃষ্টি ফুরিয়ে গেছে, তবু গাছের পাতার কাঁপনে ফোঁটা-ফোঁটা কতগুলো জল প'ড়ে বৃষ্টিকে আবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া।

মশলার পুঁটলি নিয়ে ঠাকুর চললেন তাঁর নিজের ঘরে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর রাস্তা ভুল হয়ে গেল। ঘরে না গিয়ে সোজা গঙ্গার ধারের পোস্তার দিকে চলে গেলেন। যেন বেহুঁস, ঠাহর হচ্ছে না দিশপাশ। 'মা, ডুবি' 'মা, ডুবি' বলতে বলতে প্রায় গঙ্গায় নেমে পড়েন আর কি! বন্দিনী সারদা ছটফট করতে লাগল, কাকে ডাকি, কাকে দেখাই। কি ভাগ্যি, মা-কালীর একটি বামুন যাচ্ছে এ দিক দিয়ে, তাকে সারদা বললে, 'শিগগির হৃদয়কে ডাকুন।'

হৃদয় খাচ্ছিল, এঁটো হাতেই ছুটে এল খাওয়া ফেলে। সবলে ধরে ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এল জল থেকে।

পাড়ে উঠে ঠাকুর ভাবলেন, এমনটি হল কেন? কেন পথ ভুললুম?

মুহূর্তে উত্তর প্রতিভাত হল। ও, সঞ্চয় করেছি যে। পরের বেলার কথা ভেবে মশলা নিয়েছি পুঁটলি বেঁধে।

আর দ্বিধা করলেন না। মশলার পুঁটলি ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। সারদার চোখের সামনে তার দেওয়া মশলা পড়ে রইল মাটিতে।

তবু মনের মধ্যে অহরহ সেই সন্তোষবাণী: 'মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?'

এই যে বসে আছি আমি, আমি কি পথ হারিয়েছি?

একটি মেয়ে মাকে একবার লিখলে, মা, আমি কি পথ হারিয়েছি? উত্তরে মা লিখলেন, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।

এক ভক্ত ঝুড়িতে করে কতগুলো পদ্মফুল নিয়ে আসছে। দূর হতে পরিচিত একজনকে দেখে ফুলশুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলে। মা দেখতে পেয়েছেন। বললেন, 'ও ফুল দিয়ে আর ঠাকুরের পুজো হবে না। ওগুলো ফেলে দাও।'

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে লোভালু চোখে নৈবেদ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনো ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়নি, শুধু থালা সাজানো হচ্ছে, এখুনি লোভদৃষ্টি! মা সে নৈবেদ্য দিলেন না পুজোয়। কিন্তু এ ভাবটি রইল না বেশি দিন। পরে আবার যখন নৈবেদ্যের থালায় অমনি লুব্ধ চোখের ছায়া ফেলেছে ঐ ছেলে, মা সানন্দে থালা থেকে খাবার তুলে তাকে খেতে দিচ্ছেন। ও কি, এখনো যে নিবেদন করা হয়নি ঠাকুরকে! তা হোক। মা বললেন, 'ওর মধ্যেই ঠাকুর আছেন।' বলে সেই নৈবেদ্যের থালাই ধরে দিলেন পুজোয়।

একটি মেয়ে এসেছে কিন্তু তার শোবার বালিশ নেই। মা তাঁর মাথার বালিশটি স্বচ্ছন্দে তার ঘাড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। না মা, বালিশ লাগবে না। 'লাগবে, শান্তিতে ঘুমোও', মা বললেন, 'তোমার মধ্যেই ঠাকুর আছেন।'

'ও মা,' নন্দরানী, অন্ধজনে দয়া করো মা'—দুয়ারে এক ভিখিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

গোলাপ-মা বললে, 'ওরে, সঙ্গে-সঙ্গে একবার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর। গৃহস্থেরও কানে যাক, তোরও নাম করা হোক। তা নয়, অন্ধ-অন্ধ করেই গেলি—'

পর দিন আবার এসেছে ভিখিরি। বলছে, 'রাধা-গোবিন্দ, ওমা নন্দরানী, অন্ধজনে দয়া করো মা—' সঙ্গে-সঙ্গে কাপড় আর পয়সা।

সে দিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতে নিচের ভক্তরা তাড়া দিয়ে উঠল: 'যা, এখন দিক করিস নে।'

মার কানে গেছে। বলছেন, 'দেখেছ? দিলে ভিখিরিকে তাড়িয়ে! ঐ যে একটু উঠে এসে ভিক্ষে দিতে হবে এটুকু আর পারলে না। এক মুঠো তো ভিক্ষে, ওর প্রাপ্য, তা ওকে দিলে না। যার যা প্রাপ্য তার থেকে তাকে কি বঞ্চিত করা উচিত? এই যে তরকারির খোসা, এ গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।'

'কারু কাছে কিছু চেয়ো না।' মেয়ে-ভক্তদের বলছেন মা, 'বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। যে চায় সে পায় না। যে চায় না সে পায়।'

কোনো দিন চাননি কিছু মা। তাই সব তাঁর অঢেল। সব তাঁর ভরা-ভাণ্ডার।

দুঃস্থদের জন্যে সেবাশ্রম হয়েছে, কিন্তু তাতে বড়লোকের ভিড়। বিনা ব্যয়ে ওষুধ নেবার কারসাজি। দেখে-শুনে রাখাল খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এসেছে মার কাছে। বলছে, 'যারা অনায়াসে নিজের খরচে চিকিৎসা করাতে পারে তারা এখানে আসবে কেন? এ তো শুধু গরিবদের জন্যে। মা, আপনি বলুন, 'বড়লোকদের কি ওষুধ দেব, করব চিকিৎসা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, সব করবে। আমাদের সব সমান, গরিবই বা কি, বড়লোকই বা কি। তা ছাড়া বাবা, যে চায় সেই তো গরিব।'

একটি লোক এসেছে মশুর কলাই বিক্রি করতে। 'মা, আমি আট আনার নেব।' একটি ভক্ত-মেয়ে এসেছিল মার কাছে, সে বললে।

ভক্ত-মেয়েটির স্বামী সঙ্গে ছিল। সে টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'মার কাছে কি চাইতে এসে কি চাইছে! মশুর কলাই চাইছে।'

মা বলে উঠলেন, 'বাবা, মেয়েমানুষ ওরা, ওদের সংসার করতে হবে। সব রকম ওদের চাই। নীলবড়ি থেকে শশা বিচি—মায় সমুদ্রের ফেনা। সব জোগাড় করে রাখতে হবে আগে থেকে। ওদের সংসার করতে হবে।'

এই সংসারটি কি করে পরিপাটিরূপে করা যায় সেটুকু দেখাবার জন্যেই তো মা সংসারী হয়েছেন। জগন্মাতা সারদা হয়েছেন। সন্ন্যাস তো আর কিছুই নয়, ভগবানে সম্যক্‌রূপে ন্যাস করা, মানে, অর্পণ করা, নিক্ষেপ করা। সংসারের সমস্ত কাজ নিখুঁত ভাবে করো কিন্তু মনটি ভগবানে দিয়ে রাখো, লাগিয়ে রাখো—একেই বলে সংসারে সন্ন্যাসীর মতো থাকা। ঠাকুরের ভাষায়, নর্তকীর মতো থাকা। মাথায় ঘড়া নিয়ে নেচে যাচ্ছে নর্তকী, ঘাঘরা ঘুরিয়ে, কিন্তু মাথার ঘড়া স্খলিত হচ্ছে না। তেমনি সংসারের যাবতীয় কর্তব্য হাসিমুখে সম্পন্ন করো, কিন্তু খবরদার, যিনি শিরোধার্য, সেই পূর্ণঘট যেন নির্বিচল থাকে। নৃত্যের আনন্দে যেন সেই ঘটকে না মাটিতে ফেল। ঘটই যদি পড়ে যায় তা হলে আর নৃত্য কি।

এই নিস্পৃহ অথচ নির্দ্বন্দ্ব নৃত্যটি দেখাবার জন্যই সারদা। জগজ্জননী মহামায়া হয়ে সংসারে আবার শুধু-মায়া।

রাধুকে নিয়ে মা মহাব্যস্ত। আবার পরনের কাপড়খানি কোথায় একটু ছিঁড়ে গিয়েছে বলে গোলাপ-মাকে বলছেন সেলাই করে দিতে।

কাশী থেকে কজন স্ত্রীলোক এসেছে দেখা করতে। একজন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।'

অস্ফুটরেখায় মা হাসলেন। বললেন, 'কি করব মা, আমি যে নিজেই মায়া।'*

---

* লেখকের শীঘ্র-প্রকাশিতব্য গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ

দেখো, যেন আমায় ডুবিও না

দেখ মা, আমি যাকে-তাকে মন্ত্র দিই না, তবে তুমি ভাল, তাই দিলুম। দেখো, যেন আমায় ডুবিও না। শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়। সব সময় ঘড়ীর কাঁটার মত ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।—শ্রীশ্রীমা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তৃতীয় প্রবাহ

প্রথম তরঙ্গ

রঞ্জন প্রকাশালয়

"পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন, ১৩৩৫) অপরূপ চিত্রসজ্জায় বাহির হইয়াছিল; শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়। পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় চিত্রগুলি বাদ দেওয়াতে বইখানির আকর্ষণ ও মর্যাদা অনেকখানি খণ্ডিত হইয়াছে। মনে আছে, চিত্রসম্বলিত টুকরা কবিতাগুলি কলহ-বিবাদে বিরূপ বহু সাহিত্যরসিককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—হাবলদা, আমাকে তিন দিন সস্নেহে আইসক্রীম খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথেরও কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আমার কবি-জীবনের সর্বাধিক আনন্দ এই প্রসঙ্গে পাইয়াছিলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, ভবানীপুর বেলতলার এক গলিতে। ওই অঞ্চলে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের কোনও কাজ ছিল, তাঁহার গাড়িতে আমিও ছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, গ্যাসের বাতি জ্বালা হইয়াছে। ক্ষুদ্দা গাড়িতে আমাকে একেলা রাখিয়া কাজে গিয়াছেন। সহসা লক্ষ্য করিলাম, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া দুই জন যুবক বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও অতিশয় নিবিষ্ট চিত্তে 'শনিবারের চিঠি' পড়িতেছে, উৎকর্ণ হইলাম এবং স্বেদপুলককম্পসহ শুনিতে লাগিলাম—

জাগো সখি জাগো রে, বল্‌টিক্‌-সাগরে
উঠ্‌ল সূর্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখি জাগো রে হিমজল-সাগরে
গোলরুটি সূর্য সেঁকা তার দু পিঠই।
স্লেজ-টানা হরিণেরা দাঁড়িয়েছে বাইরে,
জাগো জাগো প্রিয় সখি, রাত আর নাই রে।
যেতে হবে বহু দূর ঝলকায় রোদ্দুর,
চোখ যেন ঝলসায় বাধা পেয়ে তুন্দ্রায়।
যেতে হবে বহু দূর বরফে হানিয়া খুর
হরিণেরা ডাকে, জাগো, থেকো নাকো তন্দ্রায়।•••

কবিতা তাহার পর অনেক লিখিয়াছি, প্রশংসাও পাইয়াছি কিন্তু এমন ঘাসের ফুলের মত পথের প্রসন্ন হাসিতে আর সম্বর্ধিত হই নাই।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় আশ্বিনেই "প্রটেষ্ট" জানাইয়াছিলেন—

সব দেশ ঘুরে এলে
বিবাহিতা পত্নীটিকে ফেলে,
কিন্তু গেলে না কো চীনে,
জাপানী গেইশাগণও তব প্রেম বিনে
মরে খেয়ে খাবি।••••••

সুতরাং কার্তিকে চীন-জাপান যাইতে হইল। চীনা উপদেষ্টা মিলিল না, কিন্তু 'জাপান'-বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সযত্নে সাহায্য করাতে জাপান অচিরাৎ অধিগত হইল। সমুদ্রতীর হইতে ফজিশানকে প্রণাম জানাইয়া কুরুমা-(রিক্‌শা)য় চাপিয়া তোকিও এবং সেখান হইতে শহরের উপান্তে এক তাড়িখানায় উপস্থিত হইয়া মাতালদের সঙ্গে গান ধরিলাম—

জোঁসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে*,
সাকে † দে সাকে দে সাকে দে দে রে।
তোকোনোমায় ‡ আছে বোতল তোলা,
ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিছে খোলা,
(কিছু) বেগ নী কি ফুলুরি, ভাজা ছোলা
আনিয়ে নে এই বেলা আনিয়ে নে নে রে।

হোটেলে যাবে কে দর যা বেশি,
চুষবে রেস্ত সবি শেষাশেষি!
গেইশা দু-চারটাকে আন না ধ'রে,
চুমকে হবে কি? টান্ না জোরে,
হাস্‌ছে কেন ওরা দাঁড়িয়ে দোরে—
(কিছু) আছে বাকি? ওদের দে দে দে দে রে।

বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষা সুরেশচন্দ্রের শিক্ষা। সেখান হইতে সাংঘাই, গৃহনির্মাণরত ছুতার-মিস্ত্রীর দলে—

কে যাবি রে সাংঘায়ে
আরাখা নে রাণ্ডারে,
ঠক্‌ঠকাঠক্‌ ঠোক্‌ হাতুড়ি,
তোল্ কড়ি আর বর্গা তোল্,
হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস মিছা গণ্ডগোল।•••

---

* মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে।
† মদ ‡ কুলুঙ্গি

বস্তুত, গুরুতর তপ্তগরম লড়াইয়ের মধ্যে এই হালকা নিছক কাব্যের প্রয়োজন ছিল—আমার চিত্তকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য ; ক্ষুতুদা এই সময়ে কবিতায় আমার সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়াছিলেন। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' আমি প্রেয়সীকে এই নিবেদন জানাইয়া শেষ করিয়াছিলাম—

তোমার লাগিয়া সখি, গিয়েছিনু বহুদূর পার হয়ে নদী-গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি' গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুলমধুবিন্দু।
বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল হয়ে ফুটছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা কুটছে।
যেথানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
কচিৎ আলোকরেখা ভয়ে-ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ করি ছিন্ন···
যেথানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ রৌদ্রে,
আঁখিতে আঁখিতে প্রেম প্রকাশের ভাষা আজো পায় নাই
পদ্যে কি গদ্যে।
সেই ফুল, সেই ভাষা, সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা, কানে-কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি বাহুবন্ধে।
এ-শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখি, ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

ক্ষুতুদা আমার এই প্রেয়সী-চর্চাকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন—

সখি রে, আকাশ কালো, আসে দেখ সন্ধ্যা,
ভয় কি লো, কাছে আয়, তুই যে গো বন্ধ্যা।
তোর সনে প্রেম সই, হয় বিনা মূল্যে,
এমন দিনে কি চলে সে কথাটি ভুললে !
এসো সখি, কাছে এসো, চুমু দাও আস্তে,
সন্ধ্যায় বন্ধ্যারা জানে ভালোবাসতে।

আমাদের ছয় বৎসরের পুরাতন বিবাহ তখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই, সুতরাং আঘাতটা বাজিয়াছিল। ক্ষুতুদার কবিতাটি লজ্জায় ছাপাইতে পারি নাই কিন্তু রাখিয়া দিয়াছি। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির দুর্বোধ্য লীলা যে এই কবিতা লিখিবার কালেই ক্ষুতুদাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল তাহা কে জানিত !

ইহার পরেই ধরপাকড়ের মামলামকদ্দমার পালা চলিল কয়েক মাস। জুলাই মাসে (১৯২৯) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শব্দভেদী বাণ বৃথা গেল ; এক মাস যাইতে না যাইতে আগষ্ট মাসের ২৮ তারিখে মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি সলিসিটার্স-এর চিঠি পাইলাম, সরাসরি সম্পাদক 'শনিবারের চিঠি' অর্থাৎ আমার নামে প্রেরিত। অপরাধ, পুরাতন 'ভারতী' হইতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ-সরস্বতী' পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি "কলিকাতা, ৩৬নং মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের মৃত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একমাত্র বিধবা শ্রীমতী কনকলতা দত্তে"র পক্ষে অনেক টাকার খেসারৎ দাবি করিয়াছিলেন। অপরাধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, চক্ষে সরিষাফুল দেখিলাম। পরম্পরায় খবর পাইলাম, এই হঠাৎ আক্রমণের পিছনেও দুই-চারিজন সাহিত্যিক মহতের প্ররোচনা আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ভায়রা-ভাই অর্থাৎ কনকলতা দেবীর ভগিনীপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শেলীর "দি ক্লাউডে"র কাব্যানুবাদের জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া একদিন 'প্রবাসী' অফিসেই আমাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। সময় বুঝিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলাম। তিনি সানন্দে শরণাগতকে উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে তাঁহার সহিত অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" ছাপিয়া আবার তাঁহার স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তিনি নিজের মূল্যবান সংগ্রহ হইতে দুই-চারিখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও সরবরাহ করিয়াছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে জড়াইয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নরেশচন্দ্র যে হুমকি-পত্র দিয়াছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত তাহার জবাবটিতে তাঁহার দৃঢ় ও মহৎ চরিত্রের পরিচয় আছে। সেই কারণে আজ বাতিল কাগজের সামিল হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্‌ধৃত করিতেছি।—

The Modern Review

91 Upper Circular Road, Calcutta
Dated July 24, 1929

Dear Dr. Sen Gupta,

* * * *

I do not wish, nor am I competent, to discuss the legal aspect of what you say has appeared in Sanibarer Chithi about your books and yourself. I write this letter assuming that everything you state in your letter is correct. Even on that assumption I find it difficult to do what you suggest I should. My apology would mean that another party had done something for which he is criminally and civilly liable. It would not be honourable for me to save myself by implicating some one else, nor would it be in accord with business etiquette. Had I alone

been accused by you of having done something wrong, it would have been comparatively easier for me to apologise on being satisfied that I was wrong.

* * * *

I have not written anything about the legal aspect of the matter. But should you, in view of my inability to apologise, decide to proceed against me according to law, I would, on receiving invitation to that effect, ask some lawyer or other to advise me in the matter.

Yours Sinecrely
Ramananda Chatterjee

কনকলতা দত্ত মহোদয়ার সলিসিটার্স-এর চিঠিতেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। লেখকের কপিরাইট বজায় থাকা কালে অর্থাৎ মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্র হইতে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত পুরাতন লেখা পুনর্মুদ্রিত করাও যে দোষের—এই জ্ঞান সকলের নাই। আজকালও এইরূপ বেওয়ারিশ উদ্ধৃতি প্রায়শই দেখিতে পাই। সকলের অবগতির জন্য উক্ত পত্রটির শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই দাবি-পত্রের সমস্ত দাবিই আইনসঙ্গত বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইত :

Mitra & Mukherji 10, Hastings Street
Solicitors Calcutta 28th August, 1929

* * * *

We are accordingly instructed to call upon you which we hereby do, forthwith to stop the sale of the said issue of 'Sanibarer Chithi' and to give to our client an undertaking in writing not to repeat such infringement and to make over to our client all unsold copies of the said book and to render an account of the profits made by you by the sale thereof and to pay our client the sum of Rs 500 as damages. Please note that in default of compliance with the above requisitions within three days from date our client will institute proceedings against you, civil, criminal or both, without any further reference or delay.

দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার পর পঁচিশ বৎসর হইতে চলিল, "ছন্দ-সরস্বতী" আজও পুস্তকাকারে বাহির হইল না; 'শনিবারের চিঠি' যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী ১৯২৯ সনকে আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া মনে করি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরের প্রথমার্ধে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হন। তিনি কলেজ-জীবনে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহপাঠী ও মির্জাপুর ষ্ট্রীটের এক মেসে সহবাসী ছিলেন। তৎপূর্বে 'প্রবাসী'তে তাঁহার গল্প বাহির হইয়াছে এবং কয়েকটি ছোটগল্পের জন্য তাঁহার যথেষ্ট নামও হইয়াছে। 'বিচিত্রা'তেও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'পথের পাঁচালী' নামক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ১৯২৯ সনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৎসরের প্রথমার্ধেই শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা। মোহিতলাল পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তখন কলিকাতায় থাকিলেও আমার পক্ষে না থাকারই মত, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি' অপেক্ষা 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিয়ু'র দিকে বেশি ঝুঁকিয়াছেন, শ্রীগোপাল হালদার 'ওয়েলফেয়ার' লইয়া ব্যস্ত, ছিলাম ক্ষুদুদা ও আমি। সেই ক্ষুদুদাও দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। জুলাই-আগষ্ট মাসে আমি যখন সর্বাধিক বিপন্ন, তিনি তখন জেনিভায় বসিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডের হ্রদ-পর্বতের সৌন্দর্যে মস্গুল। সাত দিক হইতে সপ্তরথীর ধাক্কা আমাকে একা সামলাইতে হইতেছে।

এই বৎসরের মে মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" সংক্রান্ত মামলা এবং জুন মাসে 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'-এর মামলায় পড়ি; প্রথম মামলা আগষ্ট মাসে গিয়া শেষ হয়, দ্বিতীয় মামলার জের ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বৎসরেরই মাঝামাঝি কালে "নরেশ-নিকষ" ও "ছন্দ-সরস্বতী"র হাঙ্গামা ঘটে।

এই বৎসরেই 'শনিবারের চিঠি'কে বধ করিবার জন্য শত্রুপক্ষ সমবেত ভাবে দুইটি পাশুপত অস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগ করেন—'মহাকাল' ও 'রবিবারের লাঠি'।

১৯২৯ এপ্রিল মাসে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহযোগিতায় শেষ বৎসরের (১৩৩৫) জেলেপাড়ার

সং রচনা করি। অমৃতলাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের গোড়াতেই দেহরক্ষা করেন।

১৯২৯-এর জুন মাসে প্রবাসী প্রেস এবং প্রবাসী কার্যালয় হইতে 'শনিবারের চিঠি'র ছাপাখানা ও আপিস স্থানান্তরিত করার জরুরি নির্দেশ প্রাপ্ত হই এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করি। ১৩৩৬এর আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইয়া শ্রাবণ (জুলাই, ১৯২৯) হইতে ৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হয় এবং ১লা আগষ্ট হইতে আপিস ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীমানী বাজারের দ্বিতলে রুম নং ১৬।১-এ স্থানান্তরিত হয়।

নূতন ঠিকানাতেই ৯ই ভাদ্র (২৫ আগষ্ট, রবিবার) আমার ২৯শ তম জন্মদিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঞ্জন প্রকাশালয়ের পত্তন হয়। আমার প্রথম মুদ্রিত বই 'অজয়ে'র মুদ্রণ অবশ্য ৮ দিন পূর্বে ১লা ভাদ্র (১৭. ৮. ২৯) সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

৭ জুলাই (২৩ আষাঢ়, রবিবার) আমার প্রথম সন্তান রঞ্জনের জন্ম হয়।

অক্টোবর ১৯২৯ মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ১৩৩৬এর কার্তিক পর্যন্ত পুরা দুই বৎসর তিন মাস কাল একটানা চলিয়া নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি' আর অগ্রসর হইতে পারে না। অগ্রহায়ণ সংখ্যা কয়েক ফর্মা ছাপা হইয়াছিল, উহা বাহির হয় নাই।

এই বৎসরের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রবাসী প্রেস ও কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে ওই রাস্তারই ১২০।২ নম্বরে। কার্তিকের 'প্রবাসী' পুরাতন ঠিকানা হইতেই ৩১ আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) বাহির হয়। ১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ঠিকানা বদল হয়।

মামলা প্রসঙ্গ গতবারে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ও রঞ্জন প্রকাশালয় স্থাপন একই প্রসঙ্গের অন্তর্গত, কারণ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াই আমি প্রকাশক হইয়া পড়ি। কোনও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলে আমি পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ে ব্রতী হই নাই; ঘটনাচক্রে, হৃদয়াবেগবশতও বলিতে পারি, আমাকে এই কার্য করিতে হইয়াছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্যান্য ঘটনার বিবৃতি মুলতুবি রাখিয়া আমি এইবার বিভূতিভূষণ ও রঞ্জন প্রকাশালয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে পল্লী-আশ্রিত কান্তমধুর ভাবের জন্য হঠাৎ চমকের সৃষ্টি করে নাই। তখন সবে ইউরোপ হইতে আমদানি কারি-পাউডারের উগ্র ঝাঁঝে বঙ্গ-সাহিত্যের পাকশালা সরগরম; বেপরোয়া নগ্ন বীভৎসতার একটা মত্ত মাদকতা ইউরোপের ভদ্র-সংস্কার-ঐতিহ্যনাশী সমরাঙ্গণ হইতে উড়িয়া আসিয়া বাংলার রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র-বিমুগ্ধ নগর-পল্লী-সমাজে জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছে। তরুণেরা মত্ত বিভ্রান্ত, প্রবীণেরা ভীত সন্ত্রস্ত বিচলিত। 'সবুজ পত্র' মৃতপ্রায় হইলেও "নবীন" ও "কাঁচা"রা 'সবুজ পত্রে'র ছায়ানিরপেক্ষ ভাবেই পুচ্ছ তুলিয়া নাচিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ফ্রয়েড্—বাঁর্গস আসিয়া গিয়াছেন; ইউরোপের আত্মঘাতী আবহাওয়ায় এলিয়ট-লরেন্স-জয়েসের ন্যায্য বিদ্রোহ বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজকে অকারণে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের (১৯২২, ১৪ জানুয়ারি) 'প্রবাসী'তে গল্প-লেখকরূপে বিভূতিভূষণের প্রথম আত্মপ্রকাশ লক্ষ্যের বিষয় হওয়ার কথা নহে। যদিও তাঁহার প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা"য় তাঁহার বৈশিষ্ট্যের সকল পরিচয়ই ছিল তথাপি তাহা উপেক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্তী "উমারাণী" (শ্রাবণ, ১৩২৯), "মৌরীফুল" (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), "অভিশপ্ত" (আষাঢ়, ১৩৩১), "নাস্তিক" (পৌষ, ১৩৩১) এবং "পুঁইমাচা" (মাঘ, ১৩৩১) 'প্রবাসী'র কয়েকজন পাঠককে আকৃষ্ট করিলেও বিভূতিভূষণকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। ইহার পরেই 'কল্লোল'-দলের পটল-ডাঙার পাঁচালী ভাবী 'পথের পাঁচালী'র কবি বিভূতিভূষণকে মিঠা গল্পের আসর জমাইতে দেয় নাই, তিনি উত্তর ভাগলপুরের ইসমাইলপুরের কাছারিতে অরণ্যবাস বরণ করিয়াছেন। প্রবাসে এই মনুষ্য-সমাগমহীন নিবিড় আরণ্য নির্জনতায় তিনি সুদূর যশোহরের স্বগ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের (বারাকপুর) তাঁহার শৈশবস্মৃতি-মণ্ডিত কাহিনী 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। সূত্রপাতের তারিখ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল—১৭ই বৈশাখ, ১৩৩২। ওই তারিখের দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন—

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে।··· সাহিত্যিকদের কাজ হচ্চে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া, তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্ত্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেচে···এই কাজ তাদের কর্ত্তে হবেই,···তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা···

ভাগলপুরেই লেখা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ২০ নবেম্বর (১৯২৫) তিনি দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলচে···লেখার ['পথের পাঁচালী'র] পাতাগুলো ছড়ানো আছে···ফুলদানটাতে ক্রিসেন্থিমাম, কলাফুল···এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়ত ৫১ বৎসর পরে আমার কোনো চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়ত থেকে যাবে।··· হয়ত কত লোকের মনে আশা, সান্ত্বনা দেবে···হয়ত ৫০০ বছর পরে যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত, প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীন কালের এক লেখক হয়ে যাবো।···আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না··· তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব পড়া চলবে···অনাগত ভবিষ্যতের সে সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেলে তেল খরচ ক'রে আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক,. যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তবুও দেবো, দিতেই হবে, মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব কর্চ্ছি···তার পরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক···আমি আর দেখতে আসবো না, আমার ফুলদানীর এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর ক্রিসেন্থিমাম ফুল আর বছর এ সময় কোথায় থাক্‌বে? ৮০ বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?

দীর্ঘ তিন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার শেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে (১২ বৈশাখ, ১৩৩৫) 'পথের পাঁচালী' সম্পূর্ণ হয়। ২৬. ৪. ২৮ তারিখের দিনলিপিতে পাইতেছি—

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এই জন্যে যে আজ আমি আমার তিন বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েচি।

পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৫) অর্থাৎ 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে শেষ হয়; মোট ১৫ সংখ্যায়; কোনও কারণে কার্তিক ১৩৩৫এর বিচিত্রায় 'পথের পাঁচালী'র কিস্তি বাহির হয় নাই।

নীরদচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণ যেদিন আমাদের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেদিন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কেহই বিশেষ উৎসাহী ছিলাম না। 'পথের পাঁচালী' দুই-একটা খুচরা সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় মাত্র চোখ বুলাইয়া দেখিয়াছিলাম, নিবিষ্ট চিত্তে পড়ি নাই। উহার স্বাভাবিক মাধুর্যে আবিষ্ট হই নাই। তাহা ছাড়া উহা 'বিচিত্রা'য় তখনও চলিতেছিল, শেষ হয় নাই।

কথায় কথায় নীরদচন্দ্র বলিলেন, 'পথের পাঁচালী'র মত উপন্যাসের একজন ভদ্র প্রকাশক জুটিল না, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা। নীরদ-চন্দ্রের কথার ঠিক তাৎপর্য আমি সেদিন উপলব্ধি করি নাই, কারণ 'পথের পাঁচালী'র বিশেষত্ব তখন পর্যন্ত আয়ত্ত হয় নাই। প্রথম দিনের আড্ডার শেষে বিভূতিভূষণ বিদায় লইলেন। আমি 'বিচিত্রা'র ফাইল সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশিত অংশ পাঠ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে। শেষ রাত্রিটা উত্তেজনায় প্রায় বিনিদ্র কাটিল। পরদিন ঠিক দশটার সময় আপিসে উপস্থিত হইয়া নীরদচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলাম, 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক পাওয়া যায় নাই, এই কথাটার অর্থ কি? তিনি তৎকালে প্রখ্যাত দুই জন প্রকাশকের নাম করিলেন, এক জন মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনিতে চাহিয়াছেন, এক জন বই ছাপিয়া বিক্রয় হইলে কিঞ্চিৎ রয়াল্‌টি দিতে পারেন বলিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম, যদি বিভূতিবাবু রাজী হন আমিই 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক হইব। নীরদ-চন্দ্র অবাক। আমার বেতন তখন মাত্র মাসিক দেড় শত টাকা, কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সংসার পাতিয়াছি। কোথাও হইতে অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তিরও কোনই সম্ভাবনা নাই। নীরদচন্দ্র এই সকলই জানিতেন। তিনি বলিলেন, যদি সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন আমি মির্জাপুরের মেসে গিয়া বিভূতিবাবুকে লইয়া আসিতেছি। উঁহার সহিত কি ভাবে লেখাপড়া হইবে আপনি স্থির করিয়া রাখুন। নীরদচন্দ্র চলিয়া গেলেন, আমি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সহিত পরামর্শ করিয়া লইলাম। গোপালের বাবা তখন নোয়াখালি জেলার ফেনি মহকুমার কোনও সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম-সচিব। গোপাল আশ্বাস দিলেন তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজন মত অর্থ ধার পাওয়া যাইবে। গোপাল ও আমি উভয়ে মিলিয়া পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায় ফাঁদিব

গোড়ায় তাহাই স্থির হইল। উভয়ের পরামর্শে নির্ধারিত হইল 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণের জন্য বিভূতিভূষণকে আমরা তিন শত টাকা সম্মান-দক্ষিণা দিব। ইহাও আজ বলিতে বাধা নাই যে, আরও মাত্র দুই শত টাকা দক্ষিণা বাড়াইয়া দিলে আমরা 'পথের পাঁচালী'র কপিরাইট খরিদ করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থকারদের রক্ষা করিবার প্রেরণাই যাহাদের প্রকাশক হইবার মূলে তাহারা এইরূপ প্রস্তাব সে যুগে সঙ্গত হইলেও করিতে পারিত না।

বিভূতিভূষণ আসিলেন। আমাদের প্রস্তাব তাঁহার নিকট পেশ করিলাম। তাঁহার মধ্যে যে চিরন্তন শিশুটি বরাবর ছিল, সে বলিল, একটু দরাদরি না হইলে ব্যবসা হয় না, সুতরাং তিনি দরাদরি করিয়া 'পথের পাঁচালী' প্রথম সংস্করণ ১১০০ কপির জন্য তিন শত পঁচিশ টাকা দাবি করিলেন। আমরা সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। বিভূতিভূষণ ও আমার মধ্যে লেখাপড়া হইবে, সাক্ষী থাকিবেন নীরদচন্দ্র ও গোপাল—এইরূপই স্থির হইল। কিন্তু প্রকাশালয়ের নাম একটা দরকার, নহিলে দলিল হয় না। গৃহিণী তখন আসন্নপ্রসবা। আমার বরাবরই ধারণা ছিল, প্রথমটি পুত্র-সন্তান হইবে। সেই দিন সেই মুহূর্তে দলিল প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার নাম রঞ্জন রাখা স্থির করিলাম এবং তাহার নামে আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানটির নাম "রঞ্জন প্রকাশালয়" রাখা হইল এবং 'রঞ্জন প্রকাশালয়ের' পক্ষে আমি দলিলে সহি করিলাম। গোপাল অন্তরালে রহিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালেই রহিয়া গেলেন।

৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে প্রবাসী আপিসের অন্তর্গত 'শনিবারের চিঠি'র ক্ষুদ্র কক্ষে মতিবাবুর দোকানের ডিম মাংস পাঁউরুটি পুডিং এবং কয়েক প্যাকেট ট্যাট্লার সিগারেট ধ্বংস করিয়া সেদিন "রঞ্জন প্রকাশালয়ে"র গোড়াপত্তন হইল। গোপাল সেই রাত্রেই পিতার নিকট অর্থ সংগ্রহার্থে ফেনি রওয়ানা হইলেন, বিভূতিভূষণকে পঁচিশ টাকা মাত্র বায়না দিলাম।

স্থির হইল পরদিন বৈকাল হইতে আমাদের আড্ডায় প্রত্যহ 'পথের পাঁচালী' পাঠ হইবে, বিভূতিভূষণ সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। ইহার পরের কথা তাঁহার দিনলিপি হইতেই তুলিয়া দিতেছি। একটা কথা এখানে যোগ করা আবশ্যক, ২৩শে জুলাই শ্রীমান রঞ্জন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের প্রকাশালয়ের নামটা কায়েম করিয়া দিল।

২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার। আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েছে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে।

২৮শে জুলাই, ১৯২৯, রবিবার। কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন; আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ কর্লেন। এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন। দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে। আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর্লে বোঝা যায় বেশী।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, শনিবার। আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি, কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্ত্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এই মাত্র প্রবাসী আফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দু মাস লাগলো ছাপতে।

ঘন বর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিম গাছের দিকের ঘরটাতে ব'সে বনাত-মোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্ত্তিক, সাবোর ষ্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়ীটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ' মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে। জীবনে কখনও বোধ হয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটিয়েচি, মাথা ঘুরে উঠেচে তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়া ঝোপে ব'সে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাল ফুল ফোটা ঝিলটার ধারে ব'সে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকালে ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত বইএর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক ক'রে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা হাত পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কি না জানি না, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরোনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষ দিকটাতে পার্কার

ফাউন্টেনপেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

২রা অক্টোবর, ১৯২৯. ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৬, বুধবার, মহালয়া। আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আপিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিন, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করাবার জন্যে, তাই যদি কর্ত্তে পারি। তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জ্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্ত্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হ'তে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল-ফোটা, ছায়া-ভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন ক'রে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙিন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ তিরু কাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুসি হোত তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

বিভূতিভূষণ আজ বাঁচিয়া থাকিলে রঞ্জন প্রকাশালয়ের উদ্বোধন-কাহিনী তাঁহারই লিখিবার কথা। তিনি অসময়ে বিদায় লইয়া সেই দিনকার সেই আনন্দ-কাহিনী আমাদিগকে অশ্রু-অভিষিক্ত করিয়া লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন।

'পথের পাঁচালী' দিয়া সূত্রপাত হইলেও উহা রঞ্জন প্রকাশালয়ের সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক নয়। দ্বিতীয়ও নয়। তৃতীয় পুস্তক। প্রথম পুস্তক আমার 'অজয়' আকারে ছোট বলিয়া উহার ছাপা পরে আরম্ভ হইলেও আগেই শেষ হইয়া যায়, ১লা ভাদ্র ১৩৩৬ (১৭ই আগষ্ট, ১৯২৯) উহা প্রকাশিত হয়। 'অজয়ে'র কিছু কাগজ বাঁচিয়াছিল মাত্র চার ফর্মার 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'ও ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখে বাহির হয়। 'পথের পাঁচালী' বাহির হয় ২রা অক্টোবর, মহালয়ার দিন। আমি সেইদিন "অপুকে" 'অজয়' দিয়া নাম সহি করি "অজয়" এবং বিভূতিভূষণ "অজয়কে" 'পথের পাঁচালী' দিয়া নাম সহি করেন "অপু"। এই মহামূল্যবান প্রথম কপিখানি আজও আমার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সহস্র কথা আমার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আছে। যথাসময়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। এইখানে শুধু একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া রাখি যাহা আমরা অর্থাৎ তাঁহার সমসাময়িকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যেন মানস-সরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাললাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নব শুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘবিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

চারজনে

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আমাদের মধ্যেই এমন ক'জন আছেন যাঁরা সাধারণ হয়েও একটি স্থলে অসাধারণ—যাঁরা গড্ডলিকা নন পরন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে যাঁরা বিচারশীল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সে শ্রেণীরই একজন—যাঁকে শ্রদ্ধাভরে ভারতের আইনষ্টাইন বলা হয়। বৈজ্ঞানিক হিসেবেই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, একাধারে তিনি শিক্ষক, সাহিত্যানুরাগী, বহু ভাষাবিদ্, সুরসিক ও গবেষক পণ্ডিত। শুধু বিজ্ঞান-গবেষণাগারের মধ্যেই তাঁর শিল্পী মন কখনও আবদ্ধ থাকেনি, আজও পর্য্যন্ত সে খুঁজে পেতে চাইছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, আত্মবিকাশের নব নব পন্থা। তাঁর ন্যায় নিরহঙ্কার, অমায়িক, সদালাপী মানুষ আজকালকার সমাজে বিরল।

অধ্যাপক বসুর ছাত্র-জীবন আরম্ভ হয় এ কলকাতাতেই নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে। তারপর হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেন তিনি ১৯০৯ সালে। তখনও তিনি ঠিক ঠিক জানতেন না যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হ'তে চলেছেন; এ উপলব্ধি না হওয়ার কারণও ছিল। তাঁর নিজের কথায়—"সে সময় এ দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা ছিল না। তবে অঙ্কের বিষয়ে আমার প্রথম থেকেই একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল।" পরে কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি স্থির করেন যে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকবেন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে চলবেন। "এ ছিল আমার জীবনের সঙ্কল্প, তা না থাকলে হয় তো ল' পাশ করে আমি উকিল হতে পারতুম।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জীবন সংগঠনে যাঁদের প্রভাব বিশেষ ভাবে কাজ করেছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অধ্যাপক বসু নিজেই বলছেন—"সার জগদীশচন্দ্র ও সার প্রফুল্লচন্দ্র এঁরা দু'জনেই ছিলেন আমার শিক্ষক। তাঁদের ধ্যান, ধারণা ও উৎসাহ আমার জীবনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁদের দু'জনার কাছেই আমি ঋণী।"

অধ্যাপক বসুর কলেজ-জীবন প্রেসিডেন্সী কলেজেই অতিবাহিত হয়। এ কলেজ থেকেই গণিতশাস্ত্রে বি, এ, অনার্স ও এম, এ'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও দেশসেবী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

ছাত্র-জীবন শেষে সত্যেন্দ্রনাথের আহ্বান এলো সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে। এর কিছু কাল পূর্ব্বে মাত্র কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপিত হয়। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় তিনি প্রবেশ করলেন এই জ্ঞান-মন্দিরে এবং ক্রমে গড়ে তুললেন নিজের সাধনা দিয়ে দরদ দিয়ে এর পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ। মাঝে কিছু কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করলেও নিজের সৃষ্টির মমতায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগটিকে তিনি বিস্মৃত হননি। তাই দেখা গেল, সুযোগ পাওয়া মাত্র এই সাধক পুরুষ ছুটে এলেন এখানে এবং করে তুললেন একে আবার নিজের সাধনার পীঠস্থান। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ বলতে তাঁকেই বোঝায়। তাঁর পরিচালনাধীনেই এখানে যা-কিছু হ'য়ে থাকে।

বিজ্ঞান-গবেষকের জীবন ছাড়াও অধ্যাপক বসুর আর একটা দিক আছে যেখানে তিনি সাধারণের একজন। বাল্যকালে তাঁর সেতার বাজাবার অভ্যাস ছিল। এখনও দর্শন, সাহিত্য, চারুশিল্প ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম নয়। আর একটি অভ্যাস তাঁর এখনও রয়েছে—সেটি হচ্ছে পাশা খেলা। এই পাশা খেলাটা তাঁর একটা 'হবি' বলা চলে। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়—প্রথম অবস্থায় তিনি অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। তার পর দেশসেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন অজ্ঞ ভাবে। বর্ত্তমানে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদের রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৮—৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের ন্যাসনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের চেয়ারম্যান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অধিবেশনে যোগদানার্থ ১৯৫১ সালে তিনি প্যারিস যান। বাঙ্গালার বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রচার ও প্রসারের জন্য গঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের তিনি বর্ত্তমানে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

অধ্যাপক বসুর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ও গৌরবোদ্দীপ্ত অধ্যায়—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের সঙ্গে পরিচয়। "বোস-আইনষ্টাইন রিলেটিভিটি থিওরী" যা আজ পৃথিবী-বিখ্যাত, আইনষ্টাইনের বিজ্ঞান সাধনায় বাঙ্গালী মনীষার এ শ্রেষ্ঠ দান। বস্তুতঃ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন গণিতের যত নয়া ফর্ম্মুলা বের করেছেন, তার
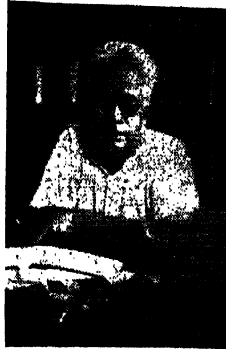
মূলে আছে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা। সেই জন্তেই আলোচ্য ফর্ম্মুলাটি বসু-আইনষ্টাইন ফর্ম্মুলা নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—এ আইনষ্টাইনের জীবনের যেমন সত্যেন্দ্রনাথের জীবনেরও তেমনি একটি অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

বাঙ্গালার মনীষী সন্তান সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সাধনা আজও অব্যাহত ভাবে চলেছে। দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁর এই সাধনা চরম সিদ্ধি বহন করে আনবে—আগামী দিনের নতুন পৃথিবীতে বিজ্ঞান-সাধক ও জীবন-শিল্পীদের নিকট তাঁর নাম হবে মস্ত বড় প্রেরণার বস্তু, এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

(অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ)

কলেজের প্রশস্ত একটি ঘরে হাজারো ছেলের নানা রকমের কাজ, দায়িত্ব নিয়ে যে মানুষটিকে অবিরত হিমসিম খেতে হচ্ছে, আজ অমুক ধর্মঘট, কাল তমুক ছাত্রসভা নিয়ে যিনি সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাঁকে যদি বাড়ীতে বাগানের ধারে একটি নিভৃত স্থানে বসে এক-মনে আপনি সেতারে কোন একটি পরিচিত বা অপরিচিত রাগ বাজাতে শোনেন, তাহলে একটু আশ্চর্য্য হবেন কি? 'মোটামুটি লেখাপড়া নিয়েই বেশী সময় কাটাই, এক কালে খেলাধূলা নিয়ে খুব মেতেছি। সব চেয়ে প্রিয় খেলা ছিল টেনিস আর···আর একটা শখ এখনও ছাড়তে পারিনি সেটা হল সেতার বাজানো, যাক গে, বলেই ফেললাম আপনাকে।'

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

'লেখাপড়া শুরু করেছি বঙ্গবাসী স্কুলে। তার পর বঙ্গবাসী কলেজ থেকেই বি. এ পাশ করলাম। এম. এ পাশ করি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে। সঙ্গে সঙ্গে আইন। হাটকোর্ট যে একেবারেই মাড়াই নি তা নয়। কিছু দিন বাদেই ১৯৩১ সালই হবে মনে হচ্ছে, চলে গেলাম অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরাজী Language and Literature নিয়ে B. A. পাশ করবার জন্তে। পরীক্ষায় সেখানে বরাবরই খুব High Certificate পেয়েছি।'

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে দু'-তিন বছর পরেই ১৯৩৪ সালে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে জীবনে তিনি বিশেষ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৪০ সালে All Bengal College Teachersদের Conferenceএ তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে বার্ণপুরে অধিবেশনে উক্ত সমিতির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের তিনি অন্যতম সদস্য। তথায় আর্ট-বোর্ড ও ল'-বোর্ডেও তিনি সদস্য। বাংলার বাইরেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত। গৌহাটী বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে B. Com পরীক্ষার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। তা ছাড়া সব চেয়ে সম্মানের কথা এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁকে আসামের সমস্ত কলেজ পরিদর্শন করতে অনুরোধ করেন। তিনি কলেজগুলি পরিদর্শন করে ৫০ পৃষ্ঠার মত শিক্ষার নানা গলদ নিয়ে আলোচনা সহ এক রিপোর্ট দেন এবং সকলেই সে রিপোর্টের অসামান্ত প্রশংসা করেন।

বাংলায় Text Book কমিটি, বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন ইত্যাদি বহু শিক্ষামূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। এ ছাড়াও তাঁর স্কুল-কলেজের জন্ম লেখা কয়েকখানি মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক রয়েছে।

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসুর বহু ধ্যান-ধারণার তিনি উত্তরাধিকারী। জীবনে বহু ভাবে তিনি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিতে যোগদান করা তিনি পছন্দ করেন না। নিজেই বললেন, 'শিক্ষাদান ও রাজনীতি একই ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।'

শিক্ষাদানকে তিনি জীবনের ব্রত বলে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেই জানালেন, এ কাজেই তিনি সর্বাধিক আনন্দ পান। মাসিক বসুমতী তাঁর ভাল লাগে এ কথা নিজেই বললেন। জানালেন, 'শিক্ষাব্রতীদের কাছে কত ভাল ভাল বস্তু যে কাগজ মারফৎ আপনারা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন এ জন্ম ধন্যবাদ।' মাসিক বসুমতীর তিনি একজন উৎসাহী নিয়মিত পাঠক।

আবুল কাসেম

(সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হগ মার্কেট)

কত অনাঘ্রাত কুসুম মধুগন্ধ নিয়ে লুকিয়ে থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে, ক'জনই বা তার সন্ধান পায়? হয়তো গন্ধ তার গন্ধবহ বহন ক'রে নিয়ে আসে, কিন্তু উৎস কোথায়—সে খবর জানবার আগ্রহ রয়েছে অতি অল্প লোকেরই। পথিক আমি; আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই রকম কয়েকটি কুসুমের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গন্ধ নেবার।

সেদিন হগ মার্কেটের তত্ত্বাবধায়ক মৌলভি আবুল কাসেমের কক্ষে বসে আছি। তাঁর সৌজন্তে ও আতিথেয়তায় অভিভূত হ'য়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সেদিন বললুম—"আপনার বিষয় কিছু লেখা দরকার। মাসিক বসুমতীর মত কোন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার মারফতে আপনার জীবনের একটু-আধটু পরিচয় দিতে চাই জন-সমাজকে।"

তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন,—একটু লজ্জা-চকল হ'য়ে উঠলেন,—"বলেন কি! আমি কি এমন উপযুক্ত যে আমার বিষয় আবার লিখবেন?"

আভিজাত্যে এবং কর্ম্মপ্রেরণায় কাসেম যে তাঁর উর্দ্ধতন পিতৃ-পুরুষের মুখ উজ্জ্বল করবেন তা তাঁর চোখের দীপ্তিতেই স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর পিতা ছিলেন বহরমপুর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত উকিল স্বর্গত মৌলভি মহম্মদ আবদুস সামাদ—মুর্শিদাবাদের প্রথিতযশা জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা। ইনি বহু দিন প্রাক্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ও আমরণ মুর্শিদাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ৺পণ্ডিত মালব্য ও ৺শরৎচন্দ্র বসুর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভয়ে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সকল রকমের সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে জাতীয়তা-নাশক ও প্রগতির পরিপন্থী কার্য্যের বিরোধিতা ক'রে গেছেন সারা জীবন।

আবুল কাসেম

পিতার কথা বলতে বলতে কাসেমের চোখ দুটো উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল। বললেন, "বাবার সম্বন্ধে কিছু বলার পর আমার জ্যাঠা মশাই-এর সম্বন্ধে কিছু না ব'লে থাকতে পারছি না। আমার জ্যাঠামশাই, মৌলভি মহম্মদ ইয়াসিনও ছিলেন অক্লান্ত কংগ্রেসকর্ম্মী। ইনি স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আজকের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তখনকার স্বরাজ্য পার্টির পতাকা-তলে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একেবারে নিরামিষাশী ছিলেন। কলকাতায় এলে ৺নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে উঠতেন। আমার জ্যাঠতুত ভাই মৌলভি রেজাউল করিম এম-এ বি-এল, এখন বহরমপুর গার্লস্ কলেজের প্রফেসর। ইনিও আজীবন কংগ্রেসের নিঃস্বার্থ সেবায় ব্রতী। কাসেম চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ হ'য়ে গেছে।

—"বলুন এবার আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু।"

কাসেম চমকে উঠলেন, ঈষৎ লজ্জিতও হলেন,—"নিজের সম্বন্ধে আমার কি বলব?"

আমি বললুম—"না, তা বলছি না;—বলছি আপনার দেশের কাজে নিজস্ব দানের কথা একটু বলুন।"

কাসেম গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন—"বাপ-খুড়োর নাম রাখতে পারলুম কই! আমি একটা অখাদ্য। তবে একটা কথা,—আমিও তো তাঁদেরই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। বীজ আছে, ক্ষেত্র তৈরী নেই; তাই সেবাধর্ম্ম ফলে-ফুলে বাড়তে পারল না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর জাতীয়তাবাদের আর প্রগতির পরিপোষক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করে গেছি।"

—"তাই একটু-আধটু বলুন না, তাই শুনতেই ও এলুম।

—"১৯২০ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি-এ পড়ছি; দেশময় অসহযোগ আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেল মহাত্মা গান্ধীর আকুল আহ্বানে। পড়াশুনো মাথায় রেখে বেরিয়ে পড়লুম। বিদেশী কাপড়, সিগারেট ইত্যাদি বর্জ্জনের নীতি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে বহরমপুরে গিয়ে স্বদেশী কাপড়, পরে বিড়ির ব্যবসা লাগিয়ে দিলুম। অনেকগুলি স্বদেশী ব্যবসাই করলুম দু'বছর ধরে। গ্রামে গ্রামে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী জিনিষের পরিপোষণের জন্তে প্রচারও করতে হতো যথেষ্ট; কিন্তু থাক্ সে সব কথা। তার পরে কোন্ ভাগ্য-বিধাতার তাড়নায় ফিরে এসে আবার পড়ায় মন দিতে হ'ল। ১৯২৭ সালে বি-এ পাশ করে বিলেত গেলুম। সেখান থেকে ফিরলুম ব্যারিষ্টার হ'য়ে ১৯৩১ সালে। বিলাতে থেকে পড়ার খরচ অনেকখানি বহন করেছিলেন মহাপ্রাণ ৺মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী আর ৺মহারাজা লালগোলা। কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ-লাভ করলুম, দু'বছর প্র্যাক্‌টিসও করেছিলুম। মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জ্জির জুনিয়র হ'য়ে ছিলুম,—ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের স্নেহানুগ্রহও যথেষ্ট পেয়েছিলুম। কিন্তু কি জানি, আদালতের পরিবেশ কিংবা আয়ের প্রাচুর্য্য আমাকে বাঁধতে পারল না; মনে হ'ল, এ আমি কি করছি—

আমার কাজ অন্যত্র,—আমার কাজ জনসেবা; জনসেবাই আমার পৈতৃক বৃত্তিস্বরূপ। আদালতের মোহ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনে হল কলকাতা করপোরেশনে ঢুকতে পারলে লোকসেবা করতে পারবো; তারই চেষ্টা চলল। আমাদের পরিবারের নিঃস্বার্থ দেশ-সেবায় আকৃষ্ট হ'য়ে নেতাজী সুভাষ, শরৎচন্দ্র বসু আর বর্ত্তমান বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় কলকাতা করপোরেশনের ভেতর দিয়ে জনসেবার জন্তে আমাকে আহ্বান করেন। হগ মার্কেটের রেভিনিউ অফিসারের পদ খালি হতে তাঁরা বললেন আমাকেই ঐ পদটা দেওয়া দরকার, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, যিনি হবেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সূত্র, সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিবিবর্জ্জিত। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলুম। তার পর ১৯৪২ সালে হগ মার্কেটের প্রথম স্থায়ী তত্ত্বাবধায়কের পদে বহাল হয়েছি। দেখছেন তো আজও সেই কাজ করছি। কাজে কোন দিন অবশ্য গাফিলতি করিনি—সেইটুকুই আমার আনন্দ। মার্কেটের বাজেট অনুপাতে আয় ক্রমান্বয়ে বেড়েই গেছে আমার আমলে। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও গত বছর ১৪৫০০০০৲ টাকা আদায় হয়েছে। তবে কাজটা বড় Strennous."

—"শুনলুম, কলকাতার দাঙ্গার সময় আপনি খুব কাজ করেছিলেন?"

—"সে এক পর্ব্ব। জিন্নার direet action day. যেটুকু করতে পেরেছি, শ্রীখেমকা, শ্রীরায় চৌধুরী প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত Public Utilities and Markets Committee-র '৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভার মন্তব্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। এইখানেই আছে, আপনাকে দিচ্ছি। পড়লুম মন দিয়ে। দেখলুম কেমন করে তিনি মার্কেটের লোকজন ও পণ্য লীগপন্থী সহস্র সহস্র মুসলমানের কলুষ-হস্তের নাগালের বাইরে রেখেছিলেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে চারশ' হিন্দুর প্রাণরক্ষা করেছিলেন তিনি বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে।

হঠাৎ তিনি যেন কিছু উত্তেজিত হ'য়েই বলে উঠলেন—"চাকরী আর ভাল লাগছে না। আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জনগণের সংস্পর্শে আসতে চাই। তাই দাঁড়িয়েছিলুম গত ইলেক্‌শনে কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে। হার হ'ল অতি অল্প ভোটেই; কিন্তু জানতে পারা গেল, মুর্শিদাবাদ আর বর্দ্ধমানের বহু লোক আজও আমাকে স্নেহ করেন।"

আমি বললুম,—"তাতে কি হ'য়েছে।"

—"আপনার সৌজন্য।"

—"আচ্ছা, এই ভারত-বিভাগে আপনি দুঃখিত—?"

—"অত্যন্ত দুঃখিত। এ যেন দুটি সন্তান মাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ভাগ ক'রে নিয়েছে। জানেন,—একদিন কোন লোক—নাম করব না—আমাকে পাকিস্থানী বলেছিলেন। খুব দুঃখিত হয়েছিলুম। তাঁকে বললুম,—"ভারতে আমার জন্ম, ভারতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করব জানবেন। এখনও কয়েক জন হিন্দু মহিলাকে "মা" বলে ডাকি। ৺বিজয়ার পর আমার পিতৃবন্ধুদের আমি প্রণাম করি।

ডাঃ শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য

(ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপিকা)

আর্ত্তের সেবার মাধ্যমে জন-সমাজের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন, এমন নিষ্ঠাবান লোকের সংখ্যা আজও বিরল। অথচ এটা ঠিক যাঁরা এ ভাবে আপনাদের বিলিয়ে দিয়েছেন কি দিচ্ছেন, তাঁরাই প্রকৃত মানুষ—তাঁদের জন্মই সার্থক। এমনি একজন সার্থক-জীবন মহিলা আমাদের মধ্যেই রয়েছেন—যাঁর নাম ও পরিচয় সাধারণের মধ্যে তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। প্রচার-বিমুখ নিরলস কর্ম্মী ইনি, আর্ত্ত মানবতার সেবায় রাত-দিন উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন। যাঁর কথা বলছি তিনি হচ্ছেন ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী ডাঃ বিমলা ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা দেশেরই একটি সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য। নারী হয়ে এ দেশের দুর্গত নারী-সমাজের সেবা করবার জন্য তাঁর প্রাণে ব্যাকুলতা জাগে প্রথম বয়সেই। এ লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেন জীবনপথে—সুরু করেন একনিষ্ঠ ভাবে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, বি, ডি, টি, এম্ পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করে চলে যান তিনি বিলেতে আরও উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্, আর, সি ও জি (ধাত্রীবিদ্যা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসেন তিনি বঙ্গভূমিতে। সেবার সঙ্কল্প তখনও তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি পরন্ত তা সক্রিয়রূপে গ্রহণ করবার জন্যে হয়ে উঠলো উদগ্র। তার পরেই আমরা তাঁকে দেখতে পেলুম বিভিন্ন হাসপাতালে একজন সুদক্ষা নারী-চিকিৎসকরূপে।

শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের ডাক্তার হওয়ার মূলে রয়েছে ছোট্ট একটি ইতিহাস। তাঁর কথায়ই বলি—"আমি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। সেই সময় আমার মায়ের হয় গুরুতর অসুখ। একদিন রাতে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হ'য়ে উঠে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও একজন চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। এতে আমার তরুণ প্রাণে সহসা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাই এবং তখনই ঠিক করে নিলুম যে চিকিৎসক হ'য়ে আমার জীবন আর্ত্ত মানব-সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করবো। বিশেষ করে দেশের অসহায় নারী-সমাজের কল্যাণ সাধন করবো, এ কামনা আমার প্রাণে তখনই জাগে।"

ডাঃ ভট্টাচার্য্য প্রথমে কাজ গ্রহণ করেন ডাফরিন হাসপাতালে। এখানে কিছু কাল কাজ করার পরেই তাঁর আহ্বান এলো ভারতের সর্ব্ববৃহৎ কলেজ ও হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের ইডেন হাসপাতাল থেকে। বলা বাহুল্য, এ হাসপাতালটি একমাত্র মহিলাদের জন্যই পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট। সেখানে তিনি রেসিডেণ্ট সার্জ্জনের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন।

সঙ্কল্পিত সেবার সুযোগ এসে গেল, তাঁর কাছে অপূর্ব্ব। তাই সে সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি এতটুকু ইতস্ততঃ করলেন না। দিন-রাত্রি অবিরাম তিনি দেখা-শুনো করে চলেন প্রসূতি ও অন্যান্য আর্ত্ত নারী-দের। এ কাজের জন্যে তাঁকে হাসপাতালেই থাকতে হতো। এমন কি, মা-বাপ ভাই-বন্ধুদের গিয়ে দেখবার জন্যেও তাঁর অবসর ছিল না। প্রায় চার বছরের অধিক কাল তিনি এ ভাবে নিঃসঙ্কোচে অতিবাহিত করেন। আশ্চর্য্য, এর ভিতর একদিনের তরেও তাঁর মুখের হাসি ম্লান হয়নি—তাঁকে কখনও এতটুকু শ্রমকাতর দেখা যায়নি।

বর্ত্তমানে শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রী-বিদ্যার অধ্যাপিকা। বাঙ্গালার কোন চিকিৎসা-বিদ্যালয়েই ইতিপূর্ব্বে আর কোন মহিলা এ মর্য্যাদার আসন পাননি, এ পদে থেকেও সক্রিয় ভাবে রুগ্না নারীজাতির সেবার কথা ভুলে যাননি ইনি, সেটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। ক্যাম্বেল হাসপাতালেরই প্রসূতি বিভাগের তত্ত্বাবধানের কাজও ডাঃ ভট্টাচার্য্য নিরলস ভাবে করে চলেছেন।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য শুধু একজন বিশিষ্ট ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনীই নন, তাঁর ভিতরে রয়েছে একটি সাহিত্যিক মন। বাল্য ও কৈশোরে তিনি বহু গল্প ও কবিতা লিখেছেন এবং তাহা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। চিকিৎসকের কঠোর দায়িত্বের মধ্যেও তিনি এখনও মাঝে মাঝে গল্প লিখে থাকেন। একটু ফাঁক পেলেই ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তকাদি পড়বার এখনও তাঁর সখ আছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাও তিনি পড়তে ভালবাসেন। মাসিক বসুমতীর তিনি একজন নিয়মিত পাঠিকা, কথা বলতে গিয়ে জানলুম এই মাসিক পত্রিকাটি তাঁর বিশেষ প্রিয়।

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, নির্ম্মল মিত্র ও আশীষ বসু সংগৃহীত)
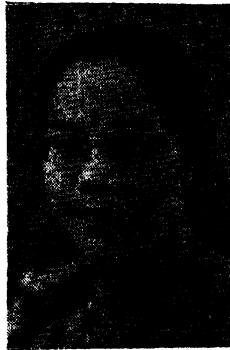
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তলপুষ্পপুট-করণ

শ্রীভরত।—

"বামে পুষ্পপুটঃ পার্শ্বে পাদোঽগ্রতলসঞ্চরঃ
তথা সন্নতং পার্শ্বং তলপুষ্পপুটং ভবেৎ।" (Sl. 61)

অনুবাদ :—বামে 'পুষ্পপুট' মুদ্রা করতে হবে; পার্শ্বদেশে একটি চরণের হবে "অগ্রতলসঞ্চার" মুদ্রা; তার পরে "সন্নত" হবে পার্শ্বদেশ। একেই বলে "তলপুষ্পপুট"।

* * * *

ভারতনট।—যেমনটি জেনেছিলেন শ্রীভরত মুনি, ঠিক তেমনি করেই তিনি লিখে চলেছেন। কিন্তু আমাদের আরম্ভ হয়ে গেছে বিপদ, ঐ মুদ্রাগুলির অর্থগুণ নিয়ে। এর সমাধান খুব যে বেশী কঠিন তা নয়, কিন্তু আয়াস-সাধ্য।

সূত্রধর বা সূত্রধারিণী নাটকের আরম্ভেই প্রবেশ করেন। এ আমরা সকলেই জানি। এই "করণ"টি তাঁর। তিনি সর্বসমক্ষে নিবেদন করতে আসছেন তাঁর প্রযোজনা। কিন্তু কেমন করে, কোন রীতিতে তিনি প্রথম অবতীর্ণ হবেন রঙ্গমঞ্চে? সেই নিবেদনের প্রকাশভঙ্গিটি ব্যক্ত হয়েছে এই করণে।

এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—পূর্বাহ্নেই শব্দার্থগুলিকে সরল করে নেওয়া। অতএব,—

(১) "পুষ্পপুট" শব্দের অর্থ :—

"যস্তু সর্পশিরাঃ প্রোক্তস্তস্যাঙ্গুলিনিরন্তরঃ।
দ্বিতীয়পার্শ্বসংশ্লিষ্টঃ স তু পুষ্পপুটঃ স্মৃতঃ॥ (ভঃ নাঃ শাঃ ৯. ১৫০)
ধান্তফলপুষ্পসদৃশাঞ্জনেন নানাবিধানি যুক্তানি
গ্রাহ্যান্যুপনেয়ানি চ তোয়ানয়নাপয়নে চ॥" (ভঃ নাঃ শাঃ ৯. ১৫১)

অর্থাৎ—"সর্পশির"মুদ্রায় যে হস্ত রচনা করা হয়, তার অঙ্গুলিগুলি জোড়া থাকবে। দুটি কর-ই পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট করে দিলে বিরচিত হবে "পুষ্পপুট" করবন্ধ। বহিরাবরণের শ্রীটি তাহলেই ফুটে উঠবে পুষ্পকোরকের মত। এই মুদ্রার অভিনয়ে প্রকাশ পাবে, যেন কেউ কর-তল-পাত্রে পূর্ণ ক'রে নিয়ে আসছে নানাবিধ ধান্তফলপুষ্পাদির উপহার। জল নিয়ে আসা বা জল ফেলে দেওয়ার অভিনয়েও এই পুষ্পপুট প্রয়োগ করা সমীচীন। সর্পশির মুদ্রার ব্যাখ্যা পরে যথাস্থানে করব।

সঙ্গীতরত্নাকর (৭·৫৭৭) বলেছেন—পুষ্পাঞ্জলিক্ষেপ ও লজ্জার অভিনয়ে এই পুষ্পপুট প্রযোজ্য।

শ্রীনান্দীকেশ্বর তাঁর অভিনয়দর্পণে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন গণ্ডী। বলেছেন ;—

নীরাজনবিধিতে (আরতি বা শারদীয় সমরোৎসবে) বারি-ফল-গ্রহণ, সন্ধ্যোপাসনা, অর্ঘ্যদান, ও পুষ্পকে মন্ত্রশোধন করার অভিনয়ে এই পুষ্পপুটের বিনিয়োগ হয়। (অভিঃ দঃ ১৮৩)

(২) "অগ্রতলসঞ্চর" শব্দটির অর্থ :—

"উৎক্ষিপ্তা তু ভবেৎ পার্ষ্ণিঃ প্রসৃতোঽঙ্গুষ্ঠকস্তথা।
অঙ্গুল্যশ্চাঞ্চিতাঃ সর্বাঃ পাদোঽগ্রতলসঞ্চরে।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯-২৭৩)

তোদননিকুট্টনে স্থিতনিশুম্ভনে ভূমিতাড়নে ভ্রমণে
বিক্ষেপ-বিবিধরেচক-পার্ষ্ণিকৃতাগমনম্ এতেন॥"
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯-২৭৪)।

অর্থাৎ—উৎক্ষিপ্ত করতে হবে পার্ষ্ণি (heel); পাতা পায়ের বুড়ো আঙ্গুল প্রসৃত হবে অর্থাৎ এগিয়ে থাকবে; অন্য আঙ্গুলগুলোও থাকবে ছড়িয়ে। শ্রীঅভিনবগুপ্ত (৯-২৭৬) শ্লোকের টীকায় "অঞ্চিতা ইতি প্রসৃতাঃ" বলেছেন। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে (৯·২৭৩) শ্লোকে একসঙ্গে 'প্রসৃত' ও "অঞ্চিত" শব্দ ব্যবহার করতেন না। এই কথাই মনে জাগে।

তোদন—(প্রেরণ, driving, instigating, exciting)

নিকুট্টন—(act of pounding, crushing down)
(ভালো ক'রে কোটা)

স্থিত—(স্থানকাদি, যথা—(১) বৈষ্ণব, (২) সমপাদ, (৩) বৈশাখ, (৪) মণ্ডল, (৫) প্রত্যালীঢ়, এবং (৬) আলীঢ়)

নিশুম্ভন —(পীড়ন, traning down)

ভূমিতাড়ন—(ভূমি-হনন)

বিক্ষেপ—(ভূতাপসরণ বা মনের ভ্রান্তক perlexity)

বিবিধ-রেচক, ভ্রমণ

পার্ষ্ণি কৃত—আগমন ;—

এইগুলির ভৌম-চারী অভিনয়ে এই অগ্রতলসঞ্চরটি প্রযোজ্য।

(৩) "সন্নত"—শব্দের অর্থ :—

"কটী ভবেত্তু ব্যাভুগ্না পার্শ্বমাভুগ্নমেব চ
তথৈবাপসৃতাংসা চ কিঞ্চিৎ পার্শ্বং নতং স্মৃতম্"।
(ভঃ নঃ শাঃ ৯, ২৩৫)

অর্থাৎ—কটি-টুটি বিশেষ বক্রীকৃত হবে, ঝুঁকে পড়বে নীচের দিকে এবং উত্তানিত হবে শ্রোণীদেশ (ব্যাভুগ্ন);

দক্ষিণ দিক্ থেকে গ্রীবাটি বাম দিকে সরে সরে যাবে; পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ শিথিল ও স্বল্প-বক্র হ'তে হ'তে নত হয়ে আসবে।

এই ভঙ্গিটির মধ্যে যখন একীভাবের মহিমা প্রবেশ করবে তখন সিদ্ধ হল 'সন্নত'-শব্দের অর্থ।

"সমিত্যেকীভাবম্" (নিরুক্ত ১, ১)।

এই পর্য্যন্ত গেল শব্দার্থ। শ্রীঅভিনবগুপ্ত কিন্তু এই স্থলে আরো কিছু সংযোগ করেছেন। সংযোজনাটি সুন্দর। তিনি এর

মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্ব স্ব পার্শ্বদেশে হস্ত দুটির আবেষ্টনক্রিয়া, এবং সৌষ্ঠবের সমারোহে দেহটিকে আবর্তিত ক'রে বাম স্তনক্ষেত্রে পুষ্পপুট-হস্তবন্ধের অবস্থান। অতএব এখন আমাদের এই করণটি সম্বন্ধে শেষ বোঝাটি বুঝে নিতে হবে। প্রয়োগ করাটাই ত আসল।—

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল সূত্রধার বা সূত্রধারিণী, নট বা নটী। যখন এল, তখন আমি দেখতে পাচ্ছি,—তার পদতল এবং হস্তদ্বয় সমান সহজভাবেই গাত্রসংলগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু ঐ দেখ, সে হঠাৎ তার দক্ষিণ চরণখানিকে তালযোগে নিষ্ক্রান্ত করে দিয়েছে। চরণাঙ্গুলির কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছে ঝঙ্কৃত নূপুর। দু' পায়েরই দুটি গোড়ালি মাটি ছেড়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। পাতা পায়ের আঙুলগুলো এলিয়ে গেছে, আর এগিয়ে গেছে বুড়ো আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে, কি আশ্চর্য্য, নট তার করযুগলকে দক্ষিণ পার্শ্বে নিয়েছে! তার পরেই অকস্মাৎ এ কি হোলো?

সৌষ্ঠব-সহকারে সে পরিবর্ত্তিত কোরে বামপার্শ্বে নিয়ে এসেছে তার যুগল কর; বাম স্তনক্ষেত্রে কর-দুটিকে ন্যস্ত করেছে পুষ্পপুটহস্তবন্ধে। সর্পশীর্ষমুদ্রায় সংলগ্ন রয়েছে করাঙ্গুলি। ঐ জোড়াহাত দেখছি আর আমার মনে হচ্ছে—বহিরাবরণের শ্রীতে ফুটে উঠেছে পুষ্পকোরকের বিলাস।

এই করণের মধ্যে কেবল তোমাদের চোখে পড়বে ফুল-ছড়ানোর অভিনীতি। রঙ্গমঞ্চরূপ পাদপ যখন শাখা মেলে উত্থিত হয়েছে, তখন প্রথমেই কি তাতে বিকশিত হয়ে উঠবে না পুষ্পাঙ্কুর?

এই করণটিতে নট এলেন—
হাতে নিয়ে নমস্কারের মুকুল;

সর্পশীর্ষ

পুষ্পপুট

অবসানে বিদায় নিলেন—
ছড়িয়ে দিয়ে ফুল।

বর্তিত-করণ

শ্রীভরত।—"কুঞ্চিতৌ মণিবন্ধে তু ব্যাবৃত্তে পরিবর্তিতৌ।
হস্তৌ নিপতিতৌ চোর্বো বর্তিতং করণং তু তৎ।"
(sl. 62)

অনুবাদ:—

মণিবন্ধ (wrist) দুটিকে কুঞ্চিত করণের পর "ব্যাবৃত্ত" ও "পরিবর্তিত" মুদ্রা অভিনয় করতে হবে। তারপরে উরু দুটির উপরে নিপতিত হয়ে পড়বে হস্তদ্বয়। একেই বলে বর্তিত-করণ।

* * * *

ভারতনট।—শ্রীঅভিনবগুপ্তের ভাষ্যমুখেই বলছি:—

বক্ষঃক্ষেত্রে উন্মুখ ক'রে, সমরেখায় স্থাপন কর্বো তোমার দুটি কর (palms turned outward)। করদুটিকে এমন ভাবে অশ্লিষ্ট অর্থাৎ অসংলগ্ন আলগা করে রাখো, যাতে সে দুটিকে দেখতে হয় স্বস্তিকের মত। মণিবন্ধ দুটিকে কুঞ্চিত কর, অর্থাৎ ঈষৎ সঙ্কোচ করে বাঁকাও। তারপরে হস্ত দুটিকে বক্ষঃক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে বিবিধ ভাবে এবং চতুর্দ্দিকে লীলাভরে আবর্তন করতে করতে, সমকালে রূঢ়ভাবে ফেলে দাও তোমার দুটি উরুর উপরে। করতল দুটি তখন যেন উত্তানিত থাকে।

এখন কথা হচ্ছে,—হস্ত, মণিবন্ধ, বক্ষ: ও উরুর লীলা তো দেখা গেল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরূপণ হ'ল কই? হয়েছে। শ্রীভরত সেটির ব্যবস্থা করে রেখেছেন—ঐ "ব্যাবৃত্ত-পরিবর্তিতৌ" বাক্যটির মধ্যে। মণিবন্ধের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাদেশটি বিবিধ ভাবে অভিমুখিন্ ক'রে আবর্তন করতে হবে। প্রতিপৎ

"তলপুষ্পপুট"

চন্দ্রের মত সহজ মাধুর্য্যে ঘোরাতে হবে। দক্ষিণ হ'তে বামে, এবং বাম থেকে দক্ষিণে।

ধাতুগত অর্থ ধরতে গেলে,—

ব্যাবৃত্ত— বি (অনেক ভাবে) + আ (আভিমুখ্যে) + বৃত— to turn round, to turn, revolve, roll।

পরি-বর্তিত— পরি (সর্বদিকে) + বৃত etc।

নাচের কাঠামোটা একরকম দেখতে পেলুম। কিন্তু কোথায় প্রয়োগ হবে এই করণ? কার ভাষা ফুটে উঠবে এই করণটির নৃত্তগাত্রে? উত্তরে বল্‌ব—

যারা প্রেম-সংশয়ী,

যারা জার—শঙ্কিত,

তাদের অভিনয়ে—

প্রতিদ্বন্দ্বিমূলক ঈর্ষ্যায় ও অসূয়ায়,

স-মাৎসর্য্য পরশ্রীকাতরতায়,

যোষবাক্যের অভিনয়ে,—

কোরো এই করণটির ব্যবহার। রুদ্র, শৃঙ্গার ও বীররসের ক্ষেত্রে এই করণের হয় পুষ্টি।

এই কারণ বশতঃই শ্রীভরত অঙ্গস্থান-নিরূপণের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে গেছেন, তিনি যেন বল্‌ছেন,—যেমন প্রয়োজন, তেমনি কোরো আয়োজন। স্বস্তিক-হস্ত তোমায় করতেই হবে, কোরো; আবার যদি প্রয়োজন বোধ করো, তাহলে কটকমুখ, শুকতুণ্ডাদি হস্তবন্ধ রচনা করতে দ্বিধা কোরো না।

পায়ের ভঙ্গিটি তাহলে কেমন-ধারা হবে? এই বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন,—'অগ্রতল সঞ্চর' হবে চরণের ভঙ্গি। কিন্তু নৃত্যাচার্যেরা বলেছেন,—শ্রীভরত যখন বিধান দেন নি, তখন পাদযোগ হবে ঔচিত্য অনুসারে।

বর্তিত-করণ

শ্রীশার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে (৭, ৫৮০।৫৮১) একটি নতুন কথা বলেছেন। তিনি শ্রীভরতের ভক্ত। তাই উদ্ধৃতি :—

"পতাকা রচনা ক'রে যদি করদুটিকে পাতিত করা হয় তাহলে হবে অসূয়ার প্রকাশ; এবং অধোমুখনিযুক্ত ক'রে পাতিত করা হলে সূচিত হবে ক্রোধ।"

বলিতোরুক-করণ

শ্রীভরত।—

"শুকতুণ্ডৌ যদা হস্তৌ ব্যাবৃত্তপরিবর্তিতৌ।

উরূ চ বলিতৌ যস্মিন্ বলিতোরুকমুচ্যতে"। (sl. 63)

অনুবাদ :—হস্ত দুটি যখন 'শুকতুণ্ড' অবস্থানে বিরাজ কোরে ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং উরু দুটি "বলিত" হ'বে, তখনই নিষ্পন্ন হবে "বলিতোরুক"-করণ।

* * * *

ভারতনট।—এই শ্লোকটির মর্মার্থ গ্রহণ করতে হলে আমাদের জানতে হবে—'শুকতুণ্ড' ও 'বলিত' এই দুটি শব্দের অর্থ। ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত সম্বন্ধে ৬২ শ্লোকে বলেছি। দেখে নিও।

শুকতুণ্ডের লক্ষণ। যথা :—

"অরালস্য যদা বক্রানামিকা ত্বঙ্গুলির্ভবেৎ।

শুকতুণ্ডস্তু স করঃ কর্ম চাস্য নিবোধত।

এতেন ত্বভিনেয়ং নাহং ন ত্বং ন কৃত্যমিতি চার্থে

আবাহনে বিসর্গে ধিগিতি বচনে চ সাবজ্ঞম্।

(ভঃ নাঃ শাঃ ৯০ ৫৩।৫৪)

বলিতোরুক-করণ

তাহলে এই দাঁড়ালো :—

'অরাল' করের অনামিকা অঙ্গুলিটি যখন বাঁকিয়ে রাখা হয়, তখনই নিষ্পন্ন হোলো 'শুকতুণ্ড' কর-মুদ্রা। শুকপাখীর মাথা বা ঠোঁটের মত দেখতে হয় এই করের ভঙ্গি। ঈর্ষ্যা বা প্রেমের কলহের অভিনয়ে,—"আমি নয়, আমি নয়', 'তুমি নয়, তুমি নয়," "এ আমার কাজ নয়, নয়, নয়,"—এই রকমের কোনো ভাবের ইঙ্গিত যখন ব্যক্ত করতে হয়, তখন প্রয়োগ করতে হয় এই শুকতুণ্ড কর। আবার যদি কাউকে আহ্বান করতে হয়, বা বিসর্জন দিতে হয়, বা অবজ্ঞা ভরে ধিক্‌বাক্য উচ্চারণ করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ধরণের কোনো ভাবের বিধান করতে হয় অভিনয়ে, তাহলে তখন বহাল করতে হয় এই শুক-তুণ্ড করের প্রয়োগ।

শ্রীভরত ও শ্রীঅভিনবগুপ্তের তরফে এই হয়ে গেল শুকতুণ্ড লক্ষণ-বিচার।

কিন্তু শ্রীশার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে (৭. ১৪১) উল্টে কিছু পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাশার দান ফেলা হচ্ছে—এই বোঝাতেও 'শুকতুণ্ডে'র ব্যবহার করতে হয়। আঙুলগুলিও বাইরে এবং ভিতরে যথাক্রমে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলবে।

কিন্তু নান্দীকেশ্বরের অভিনয়দর্পণে (১১৪।১১৫) অনেক তফাৎ। তিনি বলেছেন,—

"বাণ প্রয়োগে অথবা কুন্তাস্ত্র (বর্শা, ভল্ল) প্রয়োগের নিমিত্ত, অথবা নিজ গৃহের স্মরণে, মর্মোক্তিতে ও উগ্রভাবে শুকতুণ্ড প্রযুক্ত হয়।"

মতান্তর নিয়ে আমাদের মাতামাতির প্রয়োজন দেখছি না। শ্রীভরত ও শ্রীঅভিনবগুপ্তের জয়ধ্বনি তুলেই ভিন্নমার্গ থেকে পা সরিয়ে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। কারণ এই technical ব্যাপারের মধ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবসানে আমাদের রোদন করতে হবে অরণ্যে। এক এক গুণীর এক এক পথ। সকল পথে যুগপৎ চলতে গেলে পথিক হারায় তার লক্ষ্য।

শুকতুণ্ডটি বোঝালুম বটে, কিন্তু "অরাল" করটি না বোঝাবার দরুণ, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপত্তি উঠছে ঘন ঘন। অতএব, 'অরাল'-করের ব্যাখ্যা :—

"আদ্যা ধনুর্নতা কার্যা কুঞ্চিতোঽঙ্গুষ্ঠকস্তথা—
শেষো ভিন্নোর্ধ্ব বলিতা হ্যরালেঽঙ্গুলয়ঃ করে।"
(ভ: না: শা: ৯-৪৬)

"অরাল" শব্দের অর্থ হচ্ছে—বক্রকুটিল। করের পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে কেবলমাত্র তর্জনীটিই ধনুকের মত বক্রনত হয়ে থাকবে। বুড়ো আঙুলটি বাঁকা হয়ে সেঁটে থাকবে তর্জনীমূলে আর মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা বেঁকাক দাঁড়িয়ে থাকবে খাড়া। এই হোলো "অরাল-কর"।

এই অরালকরের প্রয়োগস্থলের অন্ত নেই। লম্বা একটা তালিকা পাই শ্রীভরতে। বলে যাই :—

এতেন—

"সত্ত্বশৌণ্ডীর্য-বীর্যকান্তি ধৃতিদিব্যগাম্ভীর্যম্
আশীর্বাদাশ্চ তথা ভাবা হিতসংজ্ঞকা কার্যাঃ।
এতেন পুনঃ স্ত্রীণাং কেশানাং সংগ্রহস্তথোৎকর্ষঃ
সর্বাঙ্গিকং তথৈব চ নির্বর্ণনমাত্মনঃ কার্যম্।
(ভ: না: শা: ৯. ৪৭।৪৮)

অর্থাৎ,—ধৈর্য, গর্ব, উৎসাহ, শোভা, ধারণা, দিব্যগাম্ভীর্য, স্বস্তি ভদ্রাদি আশীর্বাদ, তথা মঙ্গলসুখের ভাবগুলির অভিনয়ে;
স্ত্রীলোকের কেশবন্ধন বা এলায়িত-করণের অভিনয়ে;
নিজের সর্বাঙ্গ দর্শনের অভিনয়ে;
এই অরাল-করের ব্যবহার কর্তব্য।

অতএব শুকতুণ্ড আর অরাল করবন্ধ—এই দুটির মধ্যে যে পার্থক্যটি রয়েছে, সেটি এখন আমাদের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রয়োগনৈপুণ্যে দৃশ্যতঃ মুদ্রার প্রভেদ অতি-সামান্য। অরাল-করে তর্জনীটি ধনুকের মত বাঁকা থাকে, এবং তাতে যদি অনামিকাটিও বাঁকিয়ে নত করে দেওয়া হয়, তাহলেই 'অরাল' গ্রহণ করবে শুকতুণ্ড-রূপ। অবশ্য, অঙ্গুলিগুলিরও অতিসামান্য বক্রতা ঘটবে শুকতুণ্ডে এটি স্বাভাবিক। পেশীর টান যাবে কোথায়?

এখন "বলিত"—শব্দের অর্থভেদ প্রয়োজন।

শ্রীভরত বলেছেন :—

"গচ্ছেদভ্যন্তরং জানু যত্র তদ্বলনং স্মৃতম্"। (ভ: না শা: ১, ২৫২)

পাঁচ রকমের হয় উরুকর্ম। যথা :—কম্পন, বলন, স্তম্ভন, উদ্বর্তন এবং বিবর্তন। 'বলন' বা 'বলিত' এদের মধ্যে অন্যতম। জানু যখন উরুর অভ্যন্তরে অর্থাৎ উল্টোপিঠে স্থান লাভ করে, তখনই হয় বলনের সৃষ্টি। জঘনদেশ ও উরুর সঞ্চালন দায়িত্ব গ্রহণ করে এই বলিতের। অন্য চারটি উরুকর্মের কথা যথাস্থানে পরে বলব।

এই পর্যন্ত তো একরকম বোঝা গেল। কিন্তু করণটির সফল রূপদান করতে হলে নটীর বা আমাদের কী কর্তব্য? যথাযোগ্য

"শুকতুণ্ড"   "অরাল"

নৃত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নৃত্য ও তো পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—
আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আকর্ষণ।
সোনা মেঘ ওই করছে সোনা বৃষ্টি,
চৌদিকে তার ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি,
রূপ চাহিছে অরূপকে যে করতে আলিঙ্গন।
ভাবের অভিব্যক্তি শুধু নয়,
সুন্দরের যে পূজা ওতেই হয়,
সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমাস্পদে করছে নিমন্ত্রণ।

স্বর্ণগিরির অঙ্গ বেয়ে ঝরছে যে নির্ঝর,
উঠছে ফুটে হাজার নাগেশ্বর।
মানস সরের তুলছে কমল দল
সুবর্ণ-রাজহংসী কাঁপায় জল,
কাশ্মীরী জাফ্রাণের ক্ষেতে লাগছে মৃদু ঝড়।
শিল্পী ছবি আঁকছে অজন্তায়,
বসায় মণি তাজ-মহলের গায়,
যক্ষ-বধূর নিশ্বাসে মেঘ-মেদুর অম্বর।

করছে চারু চঞ্চলতা সৃষ্টি কাব্যলোক,
ফুটছে শিরীষ কর্ণিকার অশোক।
ইন্দ্রবজ্রা, মন্দাক্রান্তা সাথ,
মিলছে এসে ভুজঙ্গ-প্রয়াত,
ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে তার সঙ্গীত এবং শ্লোক।
দেব ও দানব মানব পশু পাখী
নৃত্যে তাদের চিহ্ন গেছে রাখি',
সর্ব্ব যুগের কৃষ্টি সাথে আছে ইহার যোগ।

নৃত্যে রাজে শিল্পী মনের গভীর সংবেদন—
ও রৌদ্রে রয় জল-ভরা শ্রাবণ।
রূপ যে তাহার সোনালী বিদ্যুৎ—
দিক্-দিগন্তে পাঠায় করে দূত,
হস্তে তাদের অভিজ্ঞান আর প্রেমের নিদর্শন।
অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত পিয়াসা,
আলোর পাখী খুঁজছে যেন বাসা,
গ্রহ-তারায় লাগছে লঘু পাখার আন্দোলন।

গীতবাদ্য অনুসরণ কোরে এবং রূপকের মর্মার্থ-টি প্রণিধান কোরে এখন তোমাদের সম্পাদন করতে হবে সেই করণীয়টি। নেচে ওঠ। দুটি বক্ষ:-ক্ষেত্রে আনো। তোমার দুটি হস্ত। নূপুরের শিঞ্জার সঙ্গে, আসারিত তালের অনুবর্ত্তন কোরে সমকালে বিবিধভাবে আবর্তন করতে থাকো দুটি হস্ত। পাদচারী নৃত্যে সমতালে লীলাধ্বনিতে বাজুক তোমার ঘুঙুর। এই পাদচারীতে ক্রমলগ্ন হতে থাকুক তোমার দুটি জানু দুটি উরুর অভ্যন্তরে, যথাক্রমে। আবর্তনশীল হস্ত দুটিকে উরুর অভিমুখে পাতিত করতে করতে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে এস বক্ষ:-প্রদেশে। হাত দুটির এই ফিরিয়ে-আনাটিও সম্পন্ন হোক্ চতুর্দ্দিকে হাত-ঘোরানোর মধ্য দিয়ে। তারপরে সহসা হস্তদ্বয়ের করযুগে শুকতুণ্ডের অধোমুখী ভঙ্গি যোজনা কোরে নৃত্যমাধুর্য্যে সমাপ্তিতে নিয়ে এস এই বলিতোরুক-করণ।

এই করণটির একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। মুগ্ধা নায়িকাকেই ঘিরে ক্রীড়া করে এই করণ। গৃহকর্মরতা পতিব্রতা স্ত্রীদের মধ্যে মুগ্ধা অন্যতমা। ভেবে নাও সেই রমণীয়াকে ;—

যার বরাঙ্গে প্রথম নেমেছে যৌবন, যার প্রথম ফুটেছে কামনার ফুল। সে যেন নূতন মনোরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে পেয়েছে হঠাৎ পরিচিত এক কন্দর্পকে। রতি বিষয়ে সে বামা—চোখে চোখ রাখলেই সে নামিয়ে নেয় চোখ ; কাঁপতে থাকে, বুকে জড়িয়ে নিলে ; প্রশ্নের উত্তর আটকা থেকে যায় ঠোঁটে। মানাভিমানে সে মৃদু, সমধিকলজ্জাবতী।

এই রকমের নবোঢ়া প্রিয়াকেই অবলম্বন কোরে, তার হাবভাব-শৃঙ্গার চাতুর্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করতে পারা যায় এই করণের অভিনয়ের মৌন-মাধ্যমে। [ক্রমশ:।

(চন্দ্রমল্লিকা) —কল্যাণী দত্ত

ফুল ও পাতা

(চন্দ্রমল্লিকা)

—ক্ষুদিরাম মাইতি

(গোলাপ)

—অজিতকুমার মিত্র

(সূর্য্যমুখী)
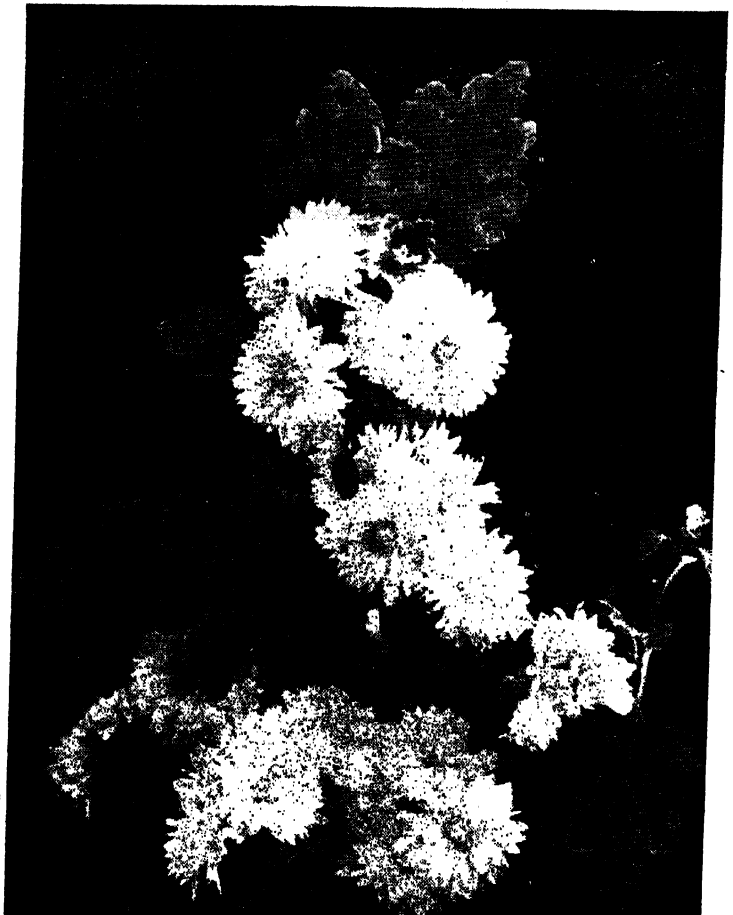
—সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়

ফুল ও পাতা

—মোহন ঘোষাল

(প্রথম পুরস্কার)

প্রতিযোগিতা

বিষয়

শীতের সকাল

(মাঘ সংখ্যা)

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২০শে মাঘ

ফাল্গুন সংখ্যার

প্রতিযোগিতা

বিষয়

বনভোজন

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২০শে ফাল্গুন

(কসমিয়া) —ইন্দিরা দে
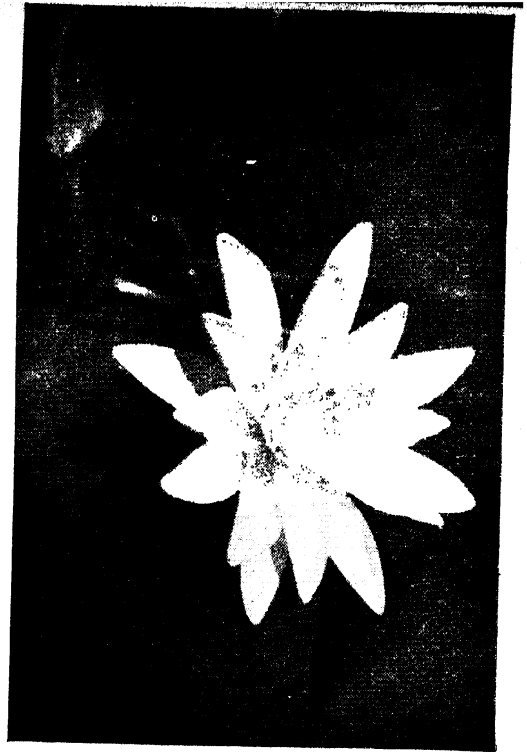
(শালুক) —দেবকুমার সরকার

(ডালিয়া —অশোক বসু

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

দ্বিতীয় পুরস্কার

ফুল
ও
পাতা

(চন্দ্রমল্লিকা)

ফুলের তোড়া

—বিশ্বনাথ দাশ

জয়নারায়ণ ঘোষাল

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অনন্য-সাধারণ বিষয়-বুদ্ধিবলে যিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ খিদিরপুরে গঙ্গার সান্নিধ্যে পরিখা-বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে স্নিগ্ধনীলপরিসর সরোবর, বহু দেবমন্দির ও প্রাসাদ রচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বারাণসী ধামে গমন করিয়া তথায় সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় বহু ধর্মগ্রন্থ রচনা, "গুরুধাম" প্রতিষ্ঠা ও যাহাতে দেশের শিক্ষার্থীরা বিনা-ব্যয়ে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, হিন্দী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে সেই জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই জয়নারায়ণ ঘোষাল কলিকাতায় (গড় গোবিন্দপুরে) ১১৫৯ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামত্রয় একত্রিত করিয়া কলিকাতা রচিত হয় নাই। তাঁহার পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল গোবিন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। ইংরেজ দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর অধিকার করায় ঘোষাল-পরিবার প্রথমে গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাকসাড়ায় কিছুদিন বাস করিয়া গড়িয়ায় ও বেহালায় অল্প দিন অবস্থিতির পরে ১১৬১ বঙ্গাব্দে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন।

জয়নারায়ণ মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন এবং মীরজাফরের—বুবু বেগমের গর্ভজাত পুত্র—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব-নাজিম মোবারকদ্দৌলার দরবারে চাকরী গ্রহণ করেন (বোধ হয় ১১৭২ বঙ্গাব্দ)। তখনও ইংরেজ মুর্শিদাবাদের নবাবকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রদেশ শাসন ও শোষণ করিতে রত—নবাব মোবারকদ্দৌলার বিমাতা মুন্নী বেগম ইংরেজের সহায়।

মাত্র তিন বৎসর চাকরী করিয়া জয়নারায়ণ খিদিরপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

অনুমিত হয়, মুর্শিদাবাদে অবস্থিতিকালে কুশাগ্রবুদ্ধি জয়নারায়ণ দেশের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমান শাসনের নিঃশেষ অনিবার্য ও আসন্ন এবং ইংরেজ বণিক সামান্য বণিক থাকিবে না—তাহাদিগের "রাজ্য রাজ্য ব্যবসায়" হইবে। সেই জন্য কলিকাতায় আসিয়া তিনি ইংরেজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করেন ও সফলকাম হয়েন। তখন ইংরেজরাও এ দেশের লোকের সাহায্য ব্যতীত আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বুঝিয়া প্রতিভাবান ও দক্ষ ভারতীয়দিগের সন্ধান করিতেছিলেন। সেই জন্যই তখন নানা কার্য্যে বহু বাঙ্গালী বিপুল অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—"কথিত আছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানি করিয়া আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন নবকৃষ্ণ অল্পদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা মাতৃশ্রাদ্ধে খ করিয়াছিলেন।"

কোন সূত্রে জয়নারায়ণের সহিত পরিচিত হইয়া জন সেক তাঁহার গুণগ্রাহী হয়েন। সেক্সপীয়র তখন কলিকাতায় পু ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভার পাইয়াছিলেন। সেই কার্য্যে জয়না- তাঁহার সহকারী হয়েন। ঐ কার্য্যের পরে সেক্সপীয়র প্রথমে যশোহরের রাজার ব্যবস্থা করিবার ভার লাভ করেন এবং তাহার পরে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঢাকায় কাউন্সিলের অধ্যক্ষ হইয়া যায়েন। উভয় স্থানেই জয়নারায়ণকে তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সাহায্য করিতে হইয়াছিল। ১১৮৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় কাজ করিবার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু জয়নারায়ণ খিদিরপুরে ফিরিয়া আইসেন। ইহারই মধ্যে কোন সময়ে তিনি কিছুদিন সন্দ্বীপে (নোয়াখালী) কানুনগোর কাজ করিয়াছিলেন।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য—জয়নারায়ণের পিতৃব্য গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাঙ্গালার গভর্ণর ভেরেলেষ্টের দাওয়ান ছিলেন ও বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার মৃত্যুতে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ধনসম্পত্তি তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ লাভ করেন। কিন্তু জয়নারায়ণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বয়ং অর্থার্জন করেন ও অর্থের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি লবণের ও স্বর্ণের ব্যবসা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার

পরেও জয়নারায়ণ নানা কার্য্যে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে সাহায্য প্রদান করেন, কিন্তু সে জন্ম পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সাহায্য এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম দিল্লীর বাদশাহ জাহান্দার শাহের নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্ম "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি ও ৩ হাজার (বাকল্যাণ্ড বলেন, সাড়ে ৩ হাজার) অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার (মনসবদারী) আনাইয়া দেন।

তিনি বিনা-পারিশ্রমিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম যে সকল কাজ করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) বিষ্ণুপুরের রাজার জমিদারীর বন্দোবস্ত করায় সাহায্য।

(২) ১১৯৩ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণার জরিপ ও বন্দোবস্তে রাজস্ব-বৃদ্ধিতে তৎকালীন কালেক্টারকে সাহায্য।

(৩) ১২০৩ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব বাবর জং-এর সম্পত্তি প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপনে টমাশ প্যাটোলকে সাহায্য।

এই সময়ে তিনি নানাস্থানে সম্পত্তি ক্রয় ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্ষিদিরপুরে নিম্নভূমিখণ্ড পরিখা-বেষ্টিত ও তাহাতে শিবগঙ্গা নামক বিস্তৃত জলাশয় খনন করাইয়া তথায় "ভূকৈলাস" স্থাপিত করেন। পরিখা ও দীর্ঘিকা খননের মৃত্তিকায় জমি "ভরাট" করা হইয়াছিল।

এই স্থানে তিনি কেবল বাস জন্ম বৃহৎ গৃহই নির্ম্মাণ করান নাই, পরন্তু স্থানটিকে প্রকৃত ভূকৈলাস নাম সার্থক করিবার জন্ম বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সকলের মধ্যে পিতা কৃষ্ণচন্দ্র স্মরণে প্রতিষ্ঠিত বিরাট কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর শিব, মাতা রক্তকমলের স্মরণে কমলেশ্বর শিব ও পত্নী রাজরাজেশ্বরী স্মরণে রাজেশ্বর শিব যেমন উল্লেখযোগ্য—পঞ্চানন, পতিতপাবনী (ধাতুমূর্ত্তি), গণপতি, গঙ্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি তেমনই নানা মতের সমন্বয়ের নিদর্শন। এই সমন্বয়ের পরিচায়ক—কাশীধামে "গুরুধামে" প্রতিষ্ঠিত শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত যুগলমূর্ত্তি—রাধাকৃষ্ণ—"করুণানিধান"। ...সমর্পণের নিদর্শন মূর্ত্তির জন্মই ইহা

...ষ্ঠা। বাঙ্গালী হিন্দু ...ন্দ্র) শক্তি— ...রিণী, তিনি -সিংহও ...ন্তি। ...র্গ।

হিন্দু, তিনি ধর্ম্মমতের উদারতার বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এ সেই—

> "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

বারাণসীতে জয়নারায়ণের মূল মন্দির—দ্বাদশ শিব-মন্দির-পরিবেষ্টিত।

জন্মস্থান বঙ্গদেশে জয়নারায়ণ কর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে যে ধর্ম্ম-জীবনের সম্মেলন করিয়াছিলেন—বারাণসীতে তাহাই সর্ব্বতোভাবে স্ফুরিত হয়, যেন অরুণকিরণপাতে প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্ম মধ্যাহ্ন-রবিকরে শতদল বিকশিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া জয়নারায়ণ বারাণসীতে গমন করেন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি "ভূকৈলাস" প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কমলেশ্বরের মন্দিরের লিপিতে দেখা যায়, উহা ১৭০২ শকাব্দের ২৯শে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভূকৈলাসের কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর শিবের মত বিরাট শিবলিঙ্গ কলিকাতায় আর আছে কি না, বলা যায় না। সেরূপ শিবলিঙ্গ বাঙ্গালায় বিরল। উহা অন্য কোন প্রদেশে—যে স্থানে কষ্টিপাতর পাওয়া যায় এমন স্থানে প্রস্তুত করাইয়া ভূকৈলাসে নীত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। হয়ত পাতর আনিয়া ভূকৈলাসে ভাস্করের দ্বারা উহা প্রস্তুত করান হইয়াছিল। পতিতপাবনীর ধাতুমূর্ত্তি কোথায় করা হইয়াছিল, তাহা জানিতেও কৌতূহল অনিবার্য্য।

বারাণসীতে যাইয়া জয়নারায়ণ কেবল "গুরুধাম" প্রতিষ্ঠা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি তথায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন :—

সংস্কৃত

(১) শঙ্করী-সঙ্গীত—ভগবতীর একাম্রকাননলীলা

(২) ব্রাহ্মণার্চ্চনচন্দ্রিকা—বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত ব্রাহ্মণার্চ্চন-বিধি

(৩) জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম—কৃষ্ণলীলা।

বাঙ্গালা

(১) করুণানিধান-বিলাস—কৃষ্ণলীলা

(২) কাশীখণ্ড।

কাশীখণ্ডে কাশীর বিবরণ বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। অনুবাদ তাঁহার প্ররোচনায় ও ব্যবস্থায় বংশবাটীর নৃসিংহ দেব রায় ও তাঁহার সহগামী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত। পুস্তকের পরিশিষ্টে পদ্যে তৎকালীন কাশীর বর্ণনায় জয়নারায়ণের কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রকট।

মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> "মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
> আমার সহায় হয় কাহারে না দেখি।
> মিত্রশত চৌদ্দ শকে পৌষমাস যবে।
> আমার মানস মত যোগ হইল তবে।
> শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাসী।
> শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী।
> তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
> প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা।

তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া।
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া।

* * * *

পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার।"

১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুস্তক রচনা আরম্ভ ও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শেষ হয়।

এই নৃসিংহ দেব রায় বংশবাটীর রাজা গোবিন্দ দেব রায়ের পুত্র। দেব রায় পরিবার পাটুলী হইতে আসিয়া বংশবাটীতে বাস করেন। নৃসিংহ দেব লিখিয়াছেন :—

"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ দেব রায়ের কাল হয় সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকের জমিদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হালদা পরগণা কিসমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখন হয় নাই।"

গঙ্গার পূর্ব্ব পারের সম্পত্তি কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও পশ্চিম পারের সম্পত্তি বর্দ্ধমানের মহারাজা অন্যায়রূপে অধিকার করায় নৃসিংহ দেব রায় হৃতসম্পত্তি হইয়া যখন কি করিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন সেই সময় ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনেতাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে—ইংরেজ প্রভুত্ব করিতেছে। নৃসিংহ দেব কোন সূত্রে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে ২৪-পরগণায় তাঁহার যে পৈত্রিক সম্পত্তি পূর্ব্বে ছিল, তাহা ফিরাইয়া দিলেন; কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছু করিতে অক্ষমতা জানাইলেন। পরে গভর্ণর হইয়া আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস নৃসিংহ দেব রায়কে তাঁহার সম্পত্তির জন্য ইংলণ্ডে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারসে দরখাস্ত করিতে বলিলে নৃসিংহ দেব ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া তজ্জন্য আবশ্যক অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কাশীতে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় জয়নারায়ণের সহিত পরিচয়ে, তাঁহার প্রভাবে, নৃসিংহ দেব কেবল যে জয়নারায়ণের সাহিত্যিক কার্য্যে সহযোগী হইলেন তাহাই নহে—ধর্ম্মকার্য্যে ও যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কর্ম্মচারী ছয় বৎসর পরে যখন সংবাদ দিলেন, আবশ্যক অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তখন আর সম্পত্তি উদ্ধারে নৃসিংহ দেবের আগ্রহ নাই—তিনি পারলৌকিক কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি সঞ্চিত অর্থে তন্ত্রানুমোদিত ষট্‌চক্রভেদের প্রতীক মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া বারাণসী হইতে উপকরণ প্রস্তর ও শিল্পী পাঠাইয়া স্বয়ং বংশবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় হংসেশ্বরী (কুণ্ডলিনী শক্তি) দেবীর মন্দির সেই পরিকল্পনানুসারে নির্ম্মিত হয়।

ইহাতে জয়নারায়ণের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—ভূকৈলাসে ও বারাণসীতে বহু মন্দিরে দেবমূর্ত্তি বা প্রতীক প্রতিষ্ঠা তাহার প্রমাণ—মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগও তাহার পরিচায়ক। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ উদারতা ছিল।

শিক্ষাবিস্তারে জয়নারায়ণের আগ্রহ তাঁহার দূরদর্শিতার ও জ্ঞানপিপাসার পরিচয় প্রদান করে। আমরা প্রথমে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার-চেষ্টার কথা বলিব।

হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।"

তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনরী রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়।"

তখন বাঙ্গালায় ইংরেজী শিক্ষাপ্রদান জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সে বিষয় সুপ্রিম কোর্টের জজ সার জন হাইড ঈষ্টের গোচর করিলে সার জন ও হেয়ার উদ্যোগী হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে এক সভায় আমন্ত্রণ করিয়া ঐ প্রস্তাবের আলোচনা করেন। কিন্তু যে কারণেই কেন হউক না, সে সভায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কিছুদিন আলোচনার পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরে হিন্দু কলেজে পরিণত হয় এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গভর্ণর আমহার্ষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় উহার গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া সপার্ষদ বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্র লিখেন। সেই জন্য অনেকে রামমোহনকে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম প্রচেষ্টাকারী বলিয়া থাকেন। রামমোহনের কার্য্যের গৌরব কোনরূপ ক্ষুণ্ণ না করিয়া বলিতে হয়—তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্র লিখিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে—যখন হাইড ঈষ্ট প্রভৃতি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছিলেন, তখনই বাঙ্গালী জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহাদিগের পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া কাশীতে যে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী ও ফারসী—পাঁচটি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্য বিষয়—পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও পুলিস আইন। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী শিক্ষাপ্রদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব যাঁহাদিগের প্রাপ্য জয়নারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম।

জয়নারায়ণের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সৈয়দ মামুদ তাঁহার ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"হিন্দুরা কেবল যে কলিকাতায় ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, এমন নহে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বড়লাট যখন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন, তখন বারাণসী-বাসী জয়নারায়ণ ঘোষাল ঐ নগরের সান্নিধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া আবেদন করেন। তিনি লিখেন, তিনি সরকারের নিকট ২০ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তাহার আয় ও তিনি যে সকল সম্পত্তি দিবেন সে সকলের আয় ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহে প্রযুক্ত হইবে। বড়লাট প্রস্তাবে সম্মত হইয়া জয়নারায়ণকে তাহা জানাইয়া দেন। এই ব্যবস্থানুসারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মযাজক ডি. কোরীকে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দেন এবং তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়কে ন্যাসরক্ষক করেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা পড়ান হইত এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতার পুত্র আরও ২০ হাজার টাকা দিয়া ন্যস্ত অর্থ বর্দ্ধিত করেন।"

বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল—১৮১৪ খৃষ্টাব্দ। জয়নারায়ণ তখন গরুড়েশ্বর মহল্যায় নিজ বাড়ীতে উহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিবরণ জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক লণ্ডন চার্চ মিশন সোসাইটীকে লিখিত পত্রে পাওয়া যায়। জয়নারায়ণ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কাশীতে গমন করেন। তিনি উল্লেখিত পত্রে যাহা লিখেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া তিনি যখন কাশীতে গমন করেন, তখন হিন্দুদিগের মতে ও য়ুরোপীয় মতে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভে অক্ষম হয়েন। সেই সময় এক হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাকে বলেন, তিনি জি, হুইটলী নামক এক জন ইংরেজ ব্যবসায়ীর চিকিৎসায় নিরাময় হইয়াছেন। শুনিয়া জয়নারায়ণ হুইটলীর সহিত পরিচিত হয়েন। এই হুইটলী চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ও দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা করিতেন। হুইটলী ঔষধের ব্যবস্থা করেন ও সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দেন যে, রোগীকে ঈশ্বরের নিকট নিয়মমত এই প্রার্থনা করিতে হইবে যে, তিনি যেন তাঁহাকে সত্যের পথে রাখেন ও শারীরিক ব্যাধিমুক্ত করেন। হুইটলী জয়নারায়ণকে একখানি "নিউ টেষ্টামেণ্ট" উপহার দেন ও তিনি তাঁহার নিকট হইতে একখানি "কমন প্রেয়ার" পুস্তক ক্রয় করেন। হুইটলী খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে জয়নারায়ণের সহিত অনেক আলোচনা করিতেন। আরোগ্য লাভ করিয়া জয়নারায়ণ যখন হুইটলীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ঈশ্বরের নামে কি করিতে পারেন, তখন হুইটলী তাঁহাকে দেশবাসীর উপকার করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে জয়নারায়ণ বাঙ্গালা, ইংরেজী, ফারসী ও হিন্দী শিক্ষা প্রদান জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় হুইটলী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি জয়নারায়ণকে বলিতেন—প্রার্থনায় যোগদানে বা খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে জাতিনাশের আশঙ্কা নাই; বরং তাহাতে ধর্ম্মপরায়ণতা বর্দ্ধিত হয়। পত্রে লিখিত হয়—

"ইহার অল্পকাল পরেই হুইটলীর মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে আমি বিদ্যালয়টি লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রা যখন এই অঞ্চলে আগমন করেন, তখন জন সেক্সপীয়র নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলাম। বড় লাট আমার প্রচেষ্টার অনুমোদন করিয়া কাশীর এজেণ্ট ব্রুককে কার্য্যভার দেন। ব্রুক বলেন, আমি যে সকল সম্পত্তি বিদ্যালয়ে দান করিতে চাহি, সে সকল সম্বন্ধীয় গোল মিটিলে তিনি বড় লাটকে আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। গোল এখনও মিটে নাই। বিদ্যালয়টির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি চিন্তাকুল হইয়াছি। আমি যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন হইয়াছেন; ছাত্ররা তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষায় উপকৃত হইতেছে না। আমি মিষ্টার হুইটলীর নিকট ধর্ম্মপ্রচারক কোরীর বিষয় শুনিয়াছি এবং তাঁহার মারফতে বৃটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটীকে ১৮০ টাকা পাঠাইয়াছিলাম। আমি প্রায়ই প্রার্থনা করিতাম, তিনি যেন বারাণসীতে আগমন করেন। শেষে তিনি বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর সংবাদ লইয়া ও তাহার একখানি কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া আমি মনস্থ করিয়াছি, ঐ সোসাইটীর কলিকাতার শাখাকেই অছি নিযুক্ত করিব। আমি সোসাইটীকে ইহার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। বিদ্যালয় ও সম্পত্তি তাঁহাদিগকে প্রদান সম্বন্ধে আইনজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ চলিতেছে। বাঙ্গালীটোলায় যে গৃহ আমি ৪৮ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহা বিদ্যালয়ের জন্য দান করা হইয়াছে।

"কিন্তু যাহাতে আমার দেশীয়দিগের মন শীঘ্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, তাহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা আমার অভিপ্রেত। সেই জন্য আমি বারাণসীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়াছি। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইবে এবং অন্যান্য বিষয়ক পুস্তকও মুদ্রিত হইয়া দেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারিবে। মুদ্রাযন্ত্র ব্যতীত জ্ঞানের বিস্তার মন্থরগতি হয়—তাহাতে হিন্দু আরও বহু দিন অবনতাবস্থ থাকিবে। উদার-হৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা একান্ত বেদনাদায়ক। সেই জন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটী কাশীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রেরণে প্রচেষ্ট হউন—সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য পরিচালনজন্য এক কি দুই জন যোগ্য ধর্ম্মপ্রচারকও যেন পাঠান হয়। ইঁহাদিগের সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এই প্রাচীন নগরীর পণ্ডিতদিগের বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে হইবে। শ্রীরামপুরের ধর্ম্মযাজকদিগের ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর প্রচেষ্টা যেরূপ অভিনন্দিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় কাশীতেও অনুরূপ চেষ্টা সমর্থিত হইবে। চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটী মানব জাতির কল্যাণকল্পে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্য কাশীবাসীদিগেরও উপকার সাধন করিবে। কাজেই কাশীতে যে সকল জনহিতকর কার্য্য চলিতেছে, সে সকলকে সাহায্য দিতে পশ্চাৎপদ হওয়া সোসাইটীর পক্ষে সমীচীন নহে।"

রামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ('প্রবাসী', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়—"মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অবৈতনিক স্কুল"; তখন "দরিদ্র ছাত্রগণ এখানে বিনা বেতনে পড়িতেন। দরিদ্র ছাত্রগণকে আহার ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত; ছাত্রের

অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে স্কুল ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেন। প্রথমে পঞ্চাশ জন ছাত্র স্কুলে প্রবিষ্ট হন।"

শেরিং তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে ৪৭৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। জয়নারায়ণ কাশীর কি অভাব দূর করিয়াছিলেন, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়।

রামচরণ বাবু উল্লেখিত প্রসঙ্গে হিসাব দিয়াছেন :—

"মহারাজা জয়নারায়ণ যতদিন জীবিত ছিলেন, স্কুল কমিটীর হস্তে মাসিক ২০০ টাকা প্রদান করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীর নিকটস্থ শিবপুর ও শিকরোল গ্রামস্থিত বসতবাটী—যাহাদের মাসিক আয় ৩৫০ টাকা ছিল—তিনি স্কুলে দান করিয়া যান। চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটী শিবপুর গ্রামস্থ সম্পত্তি ১৮৫৬ খৃঃ মিঃ এলিস নামক ইংরেজকে ৮,০০০ টাকায় এবং শিকরোল গ্রামস্থিত সম্পত্তি ১৮৫৯ খৃঃ মিঃ টেলর নামক ইংরেজ ভদ্রলোককে ৮,৫০০ টাকায় বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন। এইরূপেই স্কুলের এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের সূত্রপাত হয়। এই ভাণ্ডার বহু বিদ্যোৎসাহী মহানুভবের অনুগ্রহে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৬৮ খৃঃ ৪৫,২০০ টাকায় পরিণত হয়। এই ভাণ্ডার বর্ত্তমান সময়ে চার্চ্চ মিশনরী ট্রাষ্ট এসোসিয়েশনের হস্তে ন্যস্ত আছে। ১৯১৬-১৭ খৃঃ স্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকালে এই ভাণ্ডার হইতে ১৫০০০ টাকা লওয়া হয়। এক্ষণে এই ভাণ্ডারে ২৭,০০০ টাকা সঞ্চিত আছে এবং ইহা হইতে স্কুলের বাৎসরিক আয় ১,০০০ টাকা।

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রধান পথি-প্রদর্শক জয়নারায়ণ দীর্ঘকাল কাশীবাসের পরে ৬১ বৎসর বয়সে ১১২৮ বঙ্গাব্দে (১৮২১ খৃঃ) ২৫শে কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া জয়নারায়ণ বারাণসীতে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট পত্র লিখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উদারপ্রকৃতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—যে মৃত্যু হিন্দুর কাম্য তাঁহার সেই মৃত্যুই হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুকালে বারাণসীর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য মণিকর্ণিকার ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। এইরূপে জনকল্যাণরত জয়নারায়ণের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়।

বলা অসঙ্গত নহে—

"Nothing in his life
Became him like the leaving it…"

জয়নারায়ণ সন ১১৮৮ সালে যে দলিল করিয়া "শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঠাকুরপুত্র মহাশয় * * তথা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য ঠাকুরপুত্র মহাশয়কে" দেবসেবায় ও দেবসেবায় উৎসৃষ্ট সম্পত্তির সকল ভার অর্পণ করেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের হিসাব পাইবার অধিকারমাত্র ছিল। দেবসেবা, মন্দির-সংস্কার প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া যে অর্থ থাকিবে তাহা "অন্ধ, আতুর, অঙ্গহীন, দুঃখী, অক্ষম এমন যে কেহ ভূকৈলাসে উপস্থিত হইবেক তাহাদের ভরণপোষণার্থ" দিবার ব্যবস্থাও ছিল। এমনও লিখিত ছিল—"যে দেবোত্তর ভূমী ও বাটি ও বাগান ও নগদ তঙ্কা দিলাম আমি জীবিতমান থাকিতে আমার এবং পরে আমার ওয়ারিষাণের কোন এলাকা ও দাবি নাই।"

এই দলিল অর্পণনামা কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। পরে ১২২৮ সালের ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে সম্পাদিত আর এক দলিল ও ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ তারিখে কাশীতে সম্পাদিত কাশীস্থ "গুরুধামের" ন্যাসপত্রও দেখা যায়। সে সকলে দেখা যায়, তিনি ঐ সকল সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন নাই।

ভূকৈলাসে ও বারাণসীতে এই অসামান্য বাঙ্গালীর কীর্ত্তি যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশমত রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও যুক্তপ্রদেশের সরকারের এবং জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

ছন্দোব্রহ্ম

শ্রীকালিদাস রায়

ছন্দে উঠে ডুবে রবি তার কাছে ছন্দ লভি'
ছয় সর্গ কাব্য রচে প্রতি বর্ষে কাল।
গিরি হতে নদ-নদী ছন্দে ছুটে নিরবধি
ছন্দে ছন্দে প্রেমানন্দে সিন্ধু দেয় তাল।
ছন্দে গাহে বনপাখী, নানা ছন্দে লতা শাখী
জন্ম দেয় নানা স্বাদ বর্ণে ফুল ফল।
মেঘে ছন্দ মন্দ্রে বাজে ব্যোমে ছন্দ চন্দ্রে রাজে,
পঞ্চদশী পদ্যে তার গাই ছন্দ ভুল।
ছন্দে চলে সৃষ্টিধারা ছন্দে গলে বৃষ্টিধারা
কিছু নাই ছন্দহারা অলস জল্পনা।
ছন্দোময় হেরি সবি মনে হয় মহাকবি
করেছেন এ বিশ্বের যে জন কল্পনা।
মহাকবি কি যে চান কর তবে অনুমান,
তিনি চান এই মহাকাব্যের পাঠক।

এই বিশ্বকাব্যখানি না করিয়া ছন্দোহানি
যে পাঠ করিতে পারে সেই ত সাধক।
হ'য়ে অনুবর্ত্তী তাঁর লভি ছন্দে অধিকার
ছন্দো রচনারই নাম তাঁরি উপাসনা।
কোন বাক্য ছন্দ বিনা কর্ণে তাঁর পৌঁছে কিনা,
এ সংশয় দেয় মোর মনেরে সান্ত্বনা।
যোগী ঋষি মুনি জ্ঞানী তাপস জাপক ধ্যানী
সবাই তাঁহারে জানে চিদানন্দময়।
পড়ি বিশ্বকাব্যখানি আমি আজ তাঁরে জানি
মধুচ্ছন্দা সুরব্রহ্ম তিনি ছন্দোময়।
ছন্দ রচি আকৈশোর জীবন কাটিল মোর,
তপজপ দানধ্যান করিনি ক' হায়।
আজি তাই মনে হয়,— ছন্দ রচা ব্যর্থ নয়
কবিত্ব নাই বা হ'লো পূজেছি ত তাঁয়।

অস্পৃশ্যতাবর্জন

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

অস্পৃশ্য ও বর্জন এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের সমাস হইয়া অস্পৃশ্যতাবর্জন এই যুক্ত পদটি গঠিত। ইহার অর্থ বড় জটিল, এক কথায় ইহার অর্থ হয় না। ধাতুগত অর্থ হইল অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ স্পর্শের অযোগ্যতা পরিহার করা, কিন্তু এই ধাতুগত অর্থকে ব্যবহারিক অবস্থায় আনিলে ধাতুগত অর্থের বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গার্থ প্রভৃতি শাব্দবোধের জটিলতার পথে চলিতে চলিতে মূল কথাটাই দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে, আর সেই কারণে ইহার অর্থ পরম অনর্থের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই অনর্থকে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রয়াস হয়ত স্পর্দ্ধার নামান্তর; তথাপি এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া মনের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাকে ভাষায় রূপ দিয়া যোগ্যতর আলোচকের বিচারের সম্মুখে উপস্থিত করার চেষ্টায় দোষ নাই মনে করিয়াই অস্পৃশ্যতাবর্জনের মত জটিল ও দুরূহ প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অস্পৃশ্যতার অতি সাধারণ অর্থ লইয়াই আলোচনার আরম্ভ, সুতরাং অস্পৃশ্যতার অর্থ 'ছোঁয়াচ' বলিলে অসঙ্গত হইবে না। মানুষ প্রাণিজগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরের জীব বলিয়া মানুষের ধারণা; সুতরাং মনুষ্যেতর প্রাণীর আলোচনা অবান্তর। কিন্তু দেখা যায়, সংসারে যে ব্যক্তি অসঙ্কোচে কুকুরকে সাদরে আলিঙ্গন করে, সেই ব্যক্তিই আবার অবস্থা-বিশেষে বিশিষ্ট মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। এমনও দেখা যায়, কোন মানুষ বিশিষ্ট অবস্থায় যাহার স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য বোধ করিয়া থাকে, অবস্থান্তরে তাহার স্পর্শই বিষস্পর্শের মত পরিহার করিতেছে। আজ যাহার "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ কাঁদে" কাল হয়ত তাহার সান্নিধ্যেই আমার দুঃসহ জ্বালা অনুভূত হইবে। মানুষের মনের এই চির চঞ্চল অবস্থাই যদি অস্পৃশ্যতার মূল কারণ হয়, তাহা হইলে ইহা মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

ইহা যদি মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তাহা হইলে ইহার উপর দোষারোপ করিতে হইলে ইহাকে রিপুর পর্য্যায়ে ফেলিতে হইবে এবং ষড়রিপুর প্রতি দোষ আরোপ করিয়া কাম-ক্রোধাদি পরিহারের উপদেশ যেমন সদ্‌গ্রন্থের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনই অস্পৃশ্যতা পরিহারের উপদেশ-সম্বলিত সাময়িক পত্র ও সদ্‌গ্রন্থ নমস্য হইয়া থাকিবে। তবে ইহা যদি মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি না হইয়া দুষ্ট মানুষের স্বার্থসাধনের অপচেষ্টা হয়, তাহা হইলে মহামানব ও মহামনীষীর উপদেশ এবং তাঁহাদের অনুকারিগণের চেষ্টা সফলতার পথ ধরিতেছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করায় আপত্তি থাকিতে পারে না। এখন এই অস্পৃশ্যতা মানুষের স্বার্থবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন পর-পীড়নের নিকৃষ্ট আত্মপ্রকাশ মনে করিয়া 'অন্ধ জনে দেহ আলো'র অনুসরণে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া লোকহিতের পুণ্য ব্রত গ্রহণ করিলে কত দূর কি করা যায় তাহা দেখা যাক।

স্বভাবতই মানুষ আপনাকে খুব বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, ফলে, দেব-ভাষায় উক্ত হইয়াছে 'সোঽহম্'। ইহারই রূপান্তর কবি-কথায় শুনিতে পাওয়া যায় "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ইহাকে মানুষের দম্ভোক্তি বলিলে প্রতিবাদ হয়ত উঠিবে, কিন্তু তাহাতে সত্য মিথ্যা হইবে না। মানুষের এই অহংকার গগনস্পর্শী হইয়া দেশান্তরের কবির কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে "Its better to reign in hell, than to serve in heaven". আবার সকল দেশেই অপ্রত্যক্ষ এক ঈশ্বর কল্পিত হইয়া সব কিছু তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই চেষ্টাই বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুসারিগণের বিনয়-মাহাত্ম্যে অবস্থা-বিশেষে 'তৃণাদপি সুনীচেন'র মত দীনতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আবার এই পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির সমন্বয় সাধনের সাধকেরও অভাব হয় নাই। পুনরুক্তি, প্রতিবাদ ও সমন্বয়ের একক ও সম্মিলিত চেষ্টাতেও মানবাত্মা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। মানব-মন নানা শিক্ষা ও বহুবিধ সংস্কৃতির বক-যন্ত্রে সুপক্ক হইয়াও স্বাভাবিক দোষ-গুণের আসব হইয়াই রহিয়াছে—বিবর্ত্তনবাদের সুপ্রতিষ্ঠা মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, চতুষ্পদ দ্বিপদ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিপদ প্রাণীর পদ ও লাঙ্গুল লুপ্ত হইলেও মনে সে চতুষ্পদের স্তর অতিক্রম করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মানুষ নাকি আসঙ্গ-প্রিয় আর এই আসঙ্গ-প্রীতিই নাকি তাহাকে সমাজবদ্ধ করিয়াছে। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে, তবে সেই কারণ যাহাই কেন না হউক, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও মানুষ পূর্ব্বেরই মত হিংস্র, পূর্ব্বেরই মত লোভী, স্বার্থপর ও রিপুর অধীনই রহিয়া গিয়াছে। আবার এই অবস্থাটাকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া, একটু রমণীয় করিয়া বলার চেষ্টার ফলে মানুষ দাঁড়াইয়াছে rational animal. কোন কৃচ্ছ্রসাধনের ফলেই মানুষের animality তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। পূর্ব্বে যাহা স্বভাববশতঃ প্রকাশ্য ছিল মানুষের চেষ্টায় তাহার নগ্ন রূপ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে মানুষ rational হইয়া animality গোপন করিবার চেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে মাত্র। তাই মানুষ আসঙ্গ-প্রিয় হইয়াও ভাই-ভাই হইতে না পারিয়া ঠাঁই-ঠাঁই হইয়াই রহিয়া গিয়াছে এবং মনীষিগণের মনীষার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিতে পারা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতেও ইহার বিপরীত হইবার আশা নাই।

মানুষ প্রাণী, সুতরাং প্রাণিসুলভ স্বাভাবিক বৃত্তি তাহার থাকিবেই। স্বার্থপরতা এই প্রাণিসুলভ বৃত্তির অন্যতম। এই বৃত্তির প্রেরণাতেই সে সমাজ গড়িয়াছে, কিন্তু পরস্পর সমান সে হয় নাই। কারণ এক হওয়ার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলেও সমান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মানব-সমাজে দেখা দেয় নাই। ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় দেহে ও মনে মানুষ অসমান বলিয়াই সমাজেও সে অসমানই রহিয়া গিয়াছে। মানুষের দেহ ও মনের অসমানতা প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই এই স্বাভাবিক তারতম্য অপেক্ষাকৃত বলবানকে শিখাইয়াছে দুর্বলতরকে ঘৃণা করিতে। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে 'সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা' জীবন যাপন হয়ত সম্ভব, কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানী নয়, তাহার পক্ষে লাভে ও ক্ষতিতে, জয়ে ও পরাজয়ে চঞ্চল না হইয়া উপায় কি? 'ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ' যতীর ভূষণ হইলেও মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে যতী হইয়া উঠা সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞান বণিক-দ্রব্যও নয় যে বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে। জগতে ব্রহ্মজ্ঞানের চোরাকারবার না থাকায় কোটীশ্বরের ভাণ্ডারেও তাহার সন্ধান

মিলে না। সৃষ্টির প্রথম হইতে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালেও মানুষের ভিতরটা অন্ধকারই রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে আলোকিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ অবধি অবতার ও অবতারকল্প মহামানবের কর্ম্ম ও বাণী মানুষের মনের এই অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। সমাজের স্তরে-স্তরে বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে এই তমিস্রা সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষ সমান হইতে পারে না বলিয়াই উচ্চ ও নীচ ভেদ অপরিহার্য্য। অপেক্ষাকৃত সবল, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের প্রতি সমদর্শী হইতে পারে না। দুর্ব্বলতরকে কৃপা করা সম্ভব হইলেও সবল তাহাকে কিছুতেই সমান ভাবিতে পারে না। সুতরাং অস্পৃশ্যতা মানুষের প্রকৃতিগত, আর কোন না কোন আকারে ইহা তাহার কার্য্যে প্রকাশ পাইবেই। দুর্ব্বলতরের প্রতি আচরণে ঘৃণার পরিমাণ অপেক্ষ সমধর্মীর প্রতি অবজ্ঞার পরিমাণ সমধিক। দুর্ব্বলকে হয়ত সহা যায়, হয়ত তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু সমধর্মী হইয়া উঠে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাকে সহ্য করা যায় না। মানুষের যে মনোবৃত্তির প্রেরণায় এক জন মানুষ আর এক জনকে সহিতে পারে না তাহার প্রচলিত নাম ঘৃণা—আর এই ঘৃণা হইতেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব।

মানুষকে আমরা সমাজবদ্ধ দেখিতে পাই, প্রকৃতির বিধানেই সে এক দিন ঘর বাঁধিয়াছিল; প্রয়োজনের খাতিরেই সে সমাজবদ্ধ হইয়াছিল, আর এই প্রয়োজনের খাতিরেই বাঁধা ঘরের জীর্ণ সংস্কার করিতে করিতে সে যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়াছে। ঘর সে বাঁধিয়াছে প্রকৃতির প্রেরণায়, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াছে বলিয়াই সে পরমহংস হইয়া উঠে নাই; কারণ পরমহংসত্ব প্রকৃতির ব্যবস্থা নহে—কাজেই তাহার মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা যেমন আছে অবসাদ আর বৈরাগ্য তেমনই রহিয়াছে। অনুরাগে যেমন আকর্ষণ করে, বিরাগে তেমনি নিকটকেও দূরে সরাইয়া দেয়।

পুরুষে ও নারীতে মিলিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রকৃতিরই নির্দ্দেশে ঘর বাঁধিয়াছে। সভা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা এক হয় নাই। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ঘর বাঁধার ব্যাপারে দুইটি বিপরীত অবস্থার মিলন হইয়াছে, ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই স্বভাব—বাকি যাহা সমাজে দেখা যায় তাহা এই মিলনের আনুসঙ্গিক আবশ্যকের অনুরোধে আসিয়া জুটিয়াছে, প্রকৃতির প্রেরণায় হইলেও সমস্তটাই প্রকৃতির নির্দ্দেশ নয়। মানুষ মিলিল কিন্তু সেই মিলনের মধ্যে ক্রমে গরমিল দেখা গেল এবং এই গরমিলের সমাধানের জন্য মনুষ্যকৃত বিধি-বিধান রচিত হইল এবং সেই বিধি-বিধান রক্ষার জন্য গড়িয়া উঠিল রাষ্ট্র। এখানেও সবল দুর্ব্বলের উপরে গেল; রাষ্ট্র-পরিচালকের সহিত সাধারণের সম্বন্ধ হইল শাসক ও শাসিতের, প্রভু ও ভৃত্যের। এমনই করিয়া কালপ্রবাহের এক তরঙ্গে হিন্দুস্থানে আর্য্য-সভ্যতা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারই উত্তমাঙ্গ হইল বর্ণাশ্রম। কালপ্রবাহ বহিয়াই চলিয়াছে, সুতরাং বর্ণাশ্রম তাহারই সঙ্ঘাতে রূপান্তরিত হইতে হইতে জাতিভেদ নাম লইয়া সমাজের বুকে স্বাভাবিক হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। এই অবস্থা সকল দেশের সমাজেই সমভাবে বিদ্যমান; তবে এই দেশে যাহা জাতিভেদ, দেশান্তরে তাহা হয়ত স্তরভেদে রূপান্তরিত; মূলের কথা এক। সমে সমে মিল হয় না, মিল হয় সমে ও বিষমে। কঠোরে কঠোরে মিলের চেষ্টা হইলে তাহার অনিবার্য্য পরিণাম ঠোকাঠুকি—কোমলে কোমলে মিলের ফল যাহা হয় তাহা অপ্রত্যক্ষ। ফলে মিল হয় সমে ও বিষমে, মিল হয় সবলে ও দুর্ব্বলে—আবশ্যকের খাতিরে, প্রকৃতির প্রেরণায় ইহার মধ্যে গোঁজামিলের স্থান নাই। বিনা কারণে মিলন ঘটে না—প্রকৃতির রাজ্যে অনাবশ্যকের স্থান নাই, সুতরাং নিষ্ফল মিলনের চেষ্টা স্বভাববিরুদ্ধ। সেই জন্য এক জন দিবে আর এক জন নিবে—যখন পাওয়ার দাবী থাকিবে না, তখন দুই পক্ষই হইবে উদাসীন—উদাসীনতা ঘৃণারই অন্যতম অভিব্যক্তি।

আগের বলা বাঁধা ঘরের সমষ্টি লইয়াই সমাজ এবং সমাজের প্রতি ঘরেই সাধারণ অবস্থায় একই বিষয়ের অনুকার বা পুনরাবৃত্তি, সুতরাং অবশিষ্ট অবস্থায় ও সাধারণ পরিবেশে একটি গৃহের কর্ম্মপদ্ধতি বা ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বুঝা যাইবে, তাহাই জাতি ও জাতি সমূহের উপর আরোপিত হইলে সমগ্র মানবসমাজের অবস্থা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরুষ ও একটি নারী মিলনেপ্সু হইয়া পরস্পরের আকর্ষণে মিলিত হইল, এই স্বাভাবিক মিলনপর্ব্বকে ইতর প্রাণীর মত গ্রহণ করা মানুষের রুচিকর না হওয়ায় তাহাকে ঘিরিয়া একটা শ্লীল ও সুরুচিসঙ্গত আবরণ বা পরিবেশের সৃষ্টি হইল। স্বভাবের বিরুদ্ধ না হইলে মানুষের বুদ্ধি প্রকৃতির পরিচর্য্যা যে ভাবেই করুক না কেন তাহা বিফল হয় না। আসিল সন্তান—নারী ও পুরুষের দায়িত্ব বাড়িয়া গেল—উপযুক্ত পরিবেশ ও জীবনোপায় গড়িয়া উঠিল। মানুষের জীবনোপায় সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রেরণার ফলেই পরস্পর কর্ম্মসমবায় ও কর্ম্মব্যতিহারের উৎপত্তি হইল। প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসিল প্রতিবেশী, জুটিল অনুজীবী ও সহজীবী—এই সকলের গৃহেও একই কর্ম্মপদ্ধতির গতানুগতিকতা। প্রয়োজনের অনুরোধেই কালক্রমে দাস-দাসী ও অনুজীবী-উপজীবীর জন্ম হইল—এই সকলের ঘরেও সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশের সনাতন সত্যই অভিব্যক্ত হইল। ফলে সকলের কর্ম্মসমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ ও তাহার সংরক্ষণ ও সুপরিচালনার প্রয়োজনে মানুষই গড়িয়া তুলিল রাষ্ট্র ও তাহার আনুসঙ্গিক। যুগে যুগে মানুষের গড়া এই ব্যবস্থার হয়ত সংস্কার বা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু মানবসমাজের মূল ভিত্তি যাহা প্রকৃতির প্রেরণায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

দুইটি মানুষ সমশক্তি নহে, অথচ প্রত্যেকের মধ্যেই প্রধান হইবার দুরভিলাষ বর্ত্তমান; ফলে রূপ পাইয়াছে উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা—আর এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়াই শক্তিমান শক্তিহীনের উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় তাহাকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। দৈহিক বলের প্রাধান্যের যুগে মানুষের মন যে পর্য্যায়ে ছিল আজ সমবায় শক্তির অভিব্যক্তির যুগেও মানব-মনের সেই একই অবস্থা। এই শক্তির প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষে দ্বন্দ্ব, নারীতে নারীতে দ্বন্দ্ব এবং পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেরও আবার দুইটি রূপ; একটি প্রকাশ্য ও আর একটি গোপন। মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অসংখ্য হইলেও সাধারণ ও অসাধারণ এই দুইটি স্তরই সর্ব্বদা চোখে পড়ে। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণের ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে না—হিংসা দ্বেষ ঘৃণা অবজ্ঞা প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ এই

স্তরেই আদিম যুগের রূপ লইয়াই সমভাবে অবস্থিত। মানব-প্রকৃতির এই আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাহার ফলে দ্বন্দ্ব সঞ্জাত অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই ইহার বিষয়ে কেহ ভাবিয়া দেখে না। মানুষ যে মানুষকে ঘৃণা করে, এবং এই ঘৃণার ফলে একে অপরকে মনে মনে অস্পৃশ্য করিয়া রাখে—ইহা এত স্বাভাবিক যে তাহাকে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কেহই কোন দিন ভাবিতেও পারে না। আমি উত্তম পুরুষ, সুতরাং সকলের বড়, এই বিশ্বাস মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; আর সেই কারণে শিক্ষিত অশিক্ষিতকে, ধনী নির্ধনকে, উদ্ধতন অধস্তনকে, বর্ষীয়ান কনীয়ানকে, পুরুষ নারীকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, এই ব্যবস্থা সনাতন এবং ইহাই স্বাভাবিক অস্পৃশ্যতা।

মানব-মনের এই স্বাভাবিক অস্পৃশ্যতা-বোধের কথা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। অতিমানব ও মহামানব সকলেই এ দেশের জাতিভেদকে লইয়া আলোচনা করিয়াছেন শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে। এই তাগিদের প্রেরণায় কেহ কেহ ধর্ম্মের, কেহ নীতির, আবার কেহ বা প্রতি মানবের অধিকারবোধের দোহাই দিয়া যাহা নাই তাহারই সৃষ্টি করিয়া, এই ভেদবুদ্ধির স্বাভাবিকতাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের জাতিভেদকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন বৌদ্ধযুগ হইতে এ দেশে চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূল ভিত্তিও ভেদবুদ্ধির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইহা অবাস্তব।

মানব-সমাজের সুচিন্তিত ব্যবস্থা যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শের অবাস্তবতা অনস্বীকার্য্য। আদর্শ হইল "নাল্পে সুখমস্তি।" এই অত্যুচ্চ আদর্শকে তুঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত ভ্রষ্টাচার করিতেছে। প্রথমেই নারী ও পুরুষের অনুরাগ-বিরাগের কথা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বত্র কোন না কোন আকারে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অবিবাহিক মিলনও জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যেই মানব-সমাজে বিদ্যমান —প্রকাশ্যে যাহার ছোঁয়া জলটুকুও অপবিত্র গোপনে তাহাকে সশরীরে গ্রহণ করিতে দ্বিধা নাই; আবার যে ব্যক্তি এই ভাবে অস্পৃশ্যার সান্নিধ্যে ধন্য, সেই ব্যক্তিরই কাছে নিজের দুরভিসন্ধির অন্তরায় বোধে সন্তানবতী পত্নীও অস্পৃশ্যা এবং সেই কারণে পরিত্যক্তা। তথাকথিত পতিতা নারী সকল দিক হইতে স্পর্শের অযোগ্যা হইয়াও স্পৃশ্যার অধিক হইয়া মানব-সমাজের সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বোধ মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি।

আবশ্যকতা বা প্রয়োজনই উদ্ভাবনীর প্রসূতি। প্রয়োজন বোধেই মানুষের কাছে এক জন স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য। প্রয়োজন বোধেই স্পৃশ্য অস্পৃশ্যে আর অস্পৃশ্য স্পৃশ্যে পরিণত হয়। কর্ম্মই প্রয়োজনের পরিচায়ক। যাহাকে দিয়া যেমন কাজ করাইব, যাহাকে আমার যতটুকু প্রয়োজন সে আমার কাছে সেই পরিমাণ স্পৃশ্য। যে আমার কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না, সে আমার কাছে চিরদিনই অস্পৃশ্য। এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা পারিবারিক, পরিবারের প্রয়োজন মিটাইতে যাহাদের উপস্থিতি তাহারাই কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ততখানি স্পৃশ্য; যে ঘরের কাজ করে সে ঘরে আসিতে পারে, তাহাকে স্পর্শ করায় আপত্তি নাই। তবে যে বাহিরের কাজ করে তাহার পক্ষে কর্ম্মের অনুরোধে বাহিরেই থাকিতে হইবে। নিকটতর হইবার সুযোগের অভাবেই সে থাকে দূরে—ফলে সে হইয়া উঠে অস্পৃশ্য। যাহাকে যাহার যেমন ভাবে প্রয়োজন, সে তাহার সেই পরিমাণ নিকট বা দূর। এই ভাবে উপযোগের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মবিভাগের ফলে যে অস্পৃশ্যত্ব আসিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ অসম্ভব।

আর একটা কথা বলিয়াই আলোচনা শেষ করিতে চাহি। অস্পৃশ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, আর তাহা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যাহাই কেন না হউক, তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। ভারতের অতীত গৌরবের দিনে এই জাতিভেদ উগ্র থাকিয়াও তাহাতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় নাই; ক্ষতি হইয়াছে মানুষের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্বোধনে। ধর্ম্মীয়, সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক অবস্থাকেই বিপক্ষের প্রতি আরোপিত অপচেষ্টার মূল বলিয়া প্রচার করিয়া দলপুষ্টির চেষ্টার ফলেই আজ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জল-আচরণীয় বা জল-অনাচরণীয় প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা আজ অস্পৃশ্যতা নাম ধরিয়া দেশীয় জনগণকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থাকে ভুল বুঝিয়া ও ভুল বুঝাইয়া মানুষের ব্যক্তিগত অহংকারই বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা যেখানে থাকিবার সেখানে স্বভাবতই থাকিবে, তাহা মানুষকে কোন দিনই ত্যাগ করিবে না। ইহা পরিহার করার কথা বলিলে সাধুবাদ আছে কিন্তু পুরস্কার নাই। সুতরাং অস্পৃশ্যতা পরিহারের চেষ্টা না করিয়া অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনকে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

শেষের কবিতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

প্রতীক্ষার শেষ রাত্রি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেস হ'য়ে আসে।
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ সারা রাত্রি শুধু তোমাকেই ডেকে

এবার নিস্তব্ধ হলো। শিথিল গাছের হাত থেকে
ধূলায় লুটাল ফুল, কেঁদে মরে সৌরভ বাতাসে।
আকাশের আঙিনায় ভেঙে যায় তারার আসর।
জোনাকির দীপ নেবে। থেমে আসে ঝিঁঝিঁর নূপুর
রাত্রির নটীর পায়ে। তন্বী চাঁদ বিবশ বিধুর।
নীরব নদীর বীণা কোলে নিয়ে মূর্চ্ছিত প্রান্তর।

এখনো এলে না তুমি, জাগালে না বিরহী হৃদয়
জীবনের নৃত্যে গানে, তবে কেন ভালবেসেছিলে?
স্মৃতির আগুন কেন জ্বেলে দাও মাধবী নিশায়?
বিফল রজনী শুধু রেখে গেল ব্যথার সঞ্চয়
ঝরা ফুলে, ভিজে ঘাসে, অসমাপ্ত কাব্য লিখে দিলে
বিদায়ী চাঁদের বুকে, সঙ্গিহীন প্রভাতী তারায়।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

খগেন রায়ের এক উইক শেষ হতেই আবার আমাদের আনা হলো জেলের বাইরে। আদালতে সোজা না নিয়ে রাখা হলো হাজতে। আদালত-প্রাঙ্গণের এক পাশে এমনি এক সারি মাঝারী আকারের হাজত-কক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষের সমুখেই ছোট একটি বারান্দা, বারান্দাও ছাদহীন কক্ষের মতো, তার সমুখে কাঠের দরজা।

আমাদের পাশের কক্ষেই রাখা হয়েছে রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। সেদিন জেঙ্কিন্‌সকে কী বলেছেন রঙ্গলাল, জানতে পারা যায়নি। জানা দরকার। স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা পূর্ব্বাহ্নেই বেফাঁস হয়ে গেলে আই-বি সতর্ক হয়ে পড়বে যে!

মাঝে মাঝে খাঁকি পোষাক-পরা স্মার্ট সহ-দারোগারা এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। দু'-একটা গালগল্পও করছেন। প্রবোধ দিচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সরজমিন তদন্তে কোথায় গেছেন, এলেই আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে। বেশীক্ষণ আর হাজতভোগ করতে হবে না। আর একবার এসে বললেন যে, মণি চাটার্জ্জী নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন আমাদের বিপদভঞ্জন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ইণ্টারভিউ-এর পারমিশন—

অকস্মাৎ অনুরোধ জানালাম: একটা সিগারেট দেবেন দারোগা বাবু? অনেকক্ষণ খাইনি কিনা, গলাটা—

বিলক্ষণ!—বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি: কিন্তু দ্বিজেন বাবু, সিগারেট তো আমি খাই নে।—আচ্ছা, আপনাকে কিনে দিচ্ছি।

বললাম: থাক্, থাক্, আর কিনতে হবে না। তার চাইতে এক কাজ করুন না, ঐ যে মণি চাটার্জ্জীর নাম করলেন না, ওকে বলুন, ও দুটো সিগারেট কিনে দেবে'খন। কেমন?

স্মার্ট দারোগা বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কারণ সবাই নিশ্চিত ভাবে জানে, সিগারেট আমি খাই নে। বিপদভঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: সে কি দাদা, সিগারেট?

Nothing is unfair in war!—বলে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

দারোগা ফিরে এলেন দুটো সিগারেট নিয়ে। দেশলাই ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। বেরিয়ে যেতেই আমার প্ল্যান ব্যাখ্যা করলাম। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে পেন্সিল দিয়ে খগেন লিখলো:

জেঙ্কিন্‌সকে কী বলেছ জানিও। প্রত্যাহারের কথা আই-বি যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। ওদের তাল দিয়ে যাবে আর কালাচাঁদকে সর্ব্বদা রেডি রাখবে। মামলা হবে মুন্সীগঞ্জে। সেখানে ঠিক কোন্ সময় প্রত্যাহার করতে হবে আমি ইসারায় জানিয়ে দোব।

কাগজখানা সাবধানে মুড়ে ফেলা হলো। তার পর দ্বিতীয় সিগারেটটি থেকে সাবধানে কিছু তামাক পাতা বার করে নিয়ে কাগজটি তার মধ্যে পুরে দিয়ে আবার পাতা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো। খানিকক্ষণ পর স্মার্ট দারোগা ফিরে আসতেই অনুরোধ জানালাম: দেখুন দারোগা বাবু, একটা অনুরোধ জানাবো, রাগ করবেন না যেন। ওধারে যে দু'জন আছে, জানেনই তো ওরাও একই মামলার আসামী। ওর মধ্যে রঙ্গলাল বাবু সিগারেট খান। আমি খাচ্ছি আর ওই ভদ্রলোক পাচ্ছেন না, এটা যেন ভারী খারাপ দেখাচ্ছে। আমায় যখন দিয়েছেন খেতে, তখন ওঁকেও একটা দিলে আমরা খুশী হই। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে এই সিগারেটটাই না-হয়—কেন আবার মিছেমিছি কিনতে যাবেন।

স্মার্ট দারোগা খুব স্মার্ট ভাবে কাঁদে পা দিয়ে বসলেন। রঙ্গলাল যে আমার ভাই, তা এদের জানবার কোন কারণ নেই। তাই আমার হাত থেকে সিগারেটটি নিয়ে নির্ব্বিবাদে দিয়ে এলেন রঙ্গলালকে, বলে এলেন যে, ওধারের দ্বিজেন বাবু ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রমাদ গুনলো রঙ্গলাল। দাদা পাঠিয়েছেন সিগারেট?…কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই আসল ব্যাপারটি বুঝে ফেলতে দেরী হলো না তার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে দারোগা বেরিয়ে যেতেই সে সিগারেটটি ছিঁড়ে ফেললো।

১১৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সদলবলে এলাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমা জেলে। জেনানা ফাটকে রাখা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। একবার এসেছিলাম আইনভঙ্গের অপরাধে। সে অভিযোগ ছিল সামান্য। এবার এসেছি বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীরূপে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের সতর্কতার সীমা নেই।

কামাখ্যা মৈত্র বদলী হয়ে গেছেন কিংবা রিটায়ার করেছেন। তাঁর স্থানে মহকুমা হাকিম হয়ে এসেছেন রায় বাহাদুর ভবেশ-চন্দ্র রায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে আমাদের বিচার করবেন ইনি। মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা মাত্র দুই বা বড় জোর তিন বৎসর কারাদণ্ড, আর স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে ইনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ড দিতে পারবেন।

মামলার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি। বাইরের আত্মীয়-স্বজনেরা একত্র হয়ে পাকাপাকি ভাবে নিয়োগ করেছেন ঢাকার রজনী দাসকে আর তাঁর জুনিয়ররূপে কাজ করবার জন্য মুন্সীগঞ্জের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তীকে। শ্রীশ চাটার্জ্জী ঢাকা ছেড়ে আসতে পারবেন না। শেষ পর্য্যন্ত খগেন রায় অভিযোগপত্র পেশ করতে পেরেছেন মাত্র আমাদের ছ'জনের বিরুদ্ধে—রঙ্গলাল, কালাচাঁদ, খগেন, অনাথ, বিপদভঞ্জন ও আমি। অবশিষ্ট সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আই-বির যথাকর্ত্তব্য তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করছে? তারা রটিয়ে দিয়েছে যে, এরা মারাত্মক আসামী। গভীর রাত্রে জেলের দেয়ালের বাইরে থেকে এদের লোক এসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কয় এদের সঙ্গে। সুতরাং বারো জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনার একটি স্কোয়াড ঢাকা থেকে এসে পড়লো এখানে। জেলের কাছেই পড়লো তাদের তাঁবু। চব্বিশ ঘণ্টা তারা জেলের দেয়াল পাহারা দিতে লাগলো বন্দুক কাঁধে। শুধু তাই নয়। আমাদের সাকরেদরা কখন এসে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর গুলী চালিয়ে দেবে কে জানে! তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভবেশ রায়ের একজন সিভিলড্রেসধারী দেহরক্ষী নিযুক্ত হলো। অর্থাৎ আই-বিরা আবহাওয়া এমনি উত্তপ্ত করে তুললো যে, অবধারিত ভাবেই সবাই বুঝে নিলেন, দ্বিজেন গাঙ্গুলী এবার সত্যিই তাহলে পরাজিত হলেন।…

মামলা আরম্ভের দিনটিতে আদালতে যে নাটকাভিনয় হয় আজও তা বেশ মনে আছে।

অফিসের বাবুর মতো তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলাম আমরা। জেল-গেটের বাইরে এসে দেখি বারো জন গাড়োয়ালী সেনা আমাদের নিয়ে যাবার জন্ম অপেক্ষা করছে। শ্লোপ আর্ম করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। অর্ডার দিলাম :

ফল্ ইন
আইজ ফ্রন্ট
রাইট টার্ণ
কুইক মার্চ

এগিয়ে চললো আমার সেনাবাহিনী গাড়োয়ালীদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। একেবারে নিখুঁত মার্চ! হাই স্কুলের পেছন দিয়ে এসে খালের ওপরকার বৃহৎ কাঠের সেতু পার হয়ে আদালত-প্রাঙ্গণে পড়লাম। সেনাবাহিনী থামবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দিলাম : হল্ট।

আদালত কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো, প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র একজন সেনা। আই-বির অনুমতি-পত্র ব্যতীত সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কক্ষ লোকে লোকারণ্য। উকিল-মোক্তারে একেবারে ঠাসা, তাছাড়া কিছু দর্শক আর এসেছেন ফুলদা, অনাথের দাদা, মণি এবং আরো ক'জন। কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার শক্ত ক্রিজওয়ালা ট্রাউজার পরে এসেছেন, রিভলভারের খাকি বেল্ট বার্নিশ করা, পিতলের চাকতিগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। এক পাঁজা ফাইল ও কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন খগেন রায় জুনিয়র কাউন্সিলের মতো। আমাদের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তী উসখুস করছেন, রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌছোননি। অতি সাধারণ দর্শকের মতো সাদা পোষাকে প্রথম বেঞ্চির এক পার্শ্বে ভালো মানুষটির মতো বসে আছেন অবিনাশ দারোগা—বোধ হয় প্র্যাসবি সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে।

মোটা কাচে ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন। ওপারে বসে আছেন গাম্ভীর্য্যের খোলস পরে রায় বাহাদুর ভবেশ রায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে প্রত্যেক দিনের শুনানীর জন্ম পাবেন ২০০৲ টাকা করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হিসেবে।

মামলা সুরু করবার জন্ম আদেশ উচ্চারণ করতেই জিতেন চক্রবর্ত্তী আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, আসামী পক্ষের প্রধান উকিল রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌছুতে পারেননি, তাই আধ ঘণ্টা সময় আজ্ঞা হোক।

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। রঙ্গলাল কাচের ওপার থেকে আমার পানে চাইলো, আমি মৃদু হাস্য করলাম মাত্র। সেও হাসলো। এই হাসি কিন্তু অবিনাশ দারোগা দেখে ফেললো এবং আমার দিকে তাকিয়ে এমনি ভাবে মুখ বিকৃত করলেন যেন বোঝাতে চাইলেন, তোমার হাসিতে আর ফল হবে না বন্ধু, রোগ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে!···

আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে যেতেই ইন্‌স্‌পেক্টর আবার আবেদন জানালেন, জিতেন চক্রবর্ত্তীও পাল্টা আবেদনে আরও আধ ঘণ্টা সময় চাইলেন। কিন্তু এবার হাকিম হুকুম দিলেন : মামলা সুরু হোক।

রঙ্গলাল কালাচাঁদকে একেবারে হাকিমের পাশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। রঙ্গলাল আর একবার চাইলো আমার পানে। এবার ভেল্‌কি দেখাতে আর ভুল করলাম না। ইসারায় জানিয়ে দিলাম : This is the time—

অবিনাশ দারোগা আবারও লক্ষ্য করেছেন আমায়। কিন্তু অবজ্ঞার চাপা হাসিতে মুখমণ্ডল তাঁর বিকৃত মনে হলো।···কিন্তু কতক্ষণ, কতক্ষণ তোমার এই আত্মম্ভরিতা, এই অবজ্ঞা?

যেই ইন্‌স্‌পেক্টার আসামীদের তালিকা পাঠের পর রাজসাক্ষী দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন, অমনি রঙ্গলাল ইংরেজীতে বললো : I have something to say, Sir!

বেশ, বল।—ভবেশ রায় জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

আমি যা বলেছি, পুলিশের শিখিয়ে দেয়া কথা বলেছি। সুতরাং আমার বিবৃতি আমি withdraw করছি।—বলেই সে বার বার চিমটি কাটলো কালাচাঁদের হাতে।

সে কিন্তু রঙ্গলালের কথায় সায় দিল না পূর্ব্ব-ব্যবস্থা মত। কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভবেশ রায় জিজ্ঞেস করলেন : তুমি withdraw করছো কি?

নির্লজ্জ কালাচাঁদ মৃদু স্বরে জবাব দিল : না।

ভবেশ রায় হুকুম দিলেন : Then it is evident that Rangalall Ganguly is not a witness, but an accused. He may be led to the accused box!

বেরিয়ে এল রঙ্গলাল গট্‌গট্ করে। আমাদের কাঠগড়ায় উঠে আসতেই সর্ব্বাগ্রে বিপদভঞ্জনই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাকে, পিঠ চাপড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো : সাবাস্ রঙ্গুদা, সাবাস্!

তাকিয়ে দেখলাম, কালাচাঁদ তেমনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে দলের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, রঙ্গলালের সঙ্গে, ঢাকা জেলের আমাদের শুভানুধ্যায়ী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। কী শাস্তি এই দেশদ্রোহীদের?···

তাকিয়ে দেখি, এবার ল্যাজ গুটিয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো অবিনাশ দারোগা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ যে কল্পনাও করতে পারেনি ও-ব্যাটা।

কিন্তু এমন সময় ভেজানো দ্বার সটান মেলে দিয়ে উকিল-মোক্তার-দর্শকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গুটি-গুটি পা ফেলে এসে হাজির হলেন খর্ব্বকায় স্বয়ং রজনী দাস। একেবারে পোষাক এঁটে এসেছেন রণং দেহি মূর্ত্তিতে। এসেই নাটকীয় ভঙ্গীতে চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন : I see—the principal Approver is already led to the accused box, but a remnant remains—a weakling as the last ray of hope of the Intelligence Branch. Well, my dear boy—বলে ছুটো প্রশ্ন করলেন কালাচাঁদকে সমুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে : তুমি বুঝি রাজসাক্ষী?

কালাচাঁদের মুখে কথা ফুটলো না।

লজ্জা কি? নাচতেই যখন নেমেছ, তখন আর ঘোমটার বালাই কেন?

তার পরই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করলেন রজনী

দাস। প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করলেন অনিবার্য্য বিলম্বের জন্ত। ষ্টীমার লেট্ ছিল। তার পর জানালেন অভিযোগ, গুরুতর অভিযোগ: এ কাজির বিচার নয় যে, খাস-কামরায় বসে খুশী মত কাজি শিরশ্ছেদের হুকুম দেবেন। এ প্রকাশ্য আদালত, জনসাধারণের আইনগত অধিকার আছে to be present and to watch the proceedings। আই-বি এখানকার মালিক নন যে, তাঁরা খুশী মত দরজা বন্ধ করে রাখবেন। This is a serious encroachment upon the jurisdiction of the Court and privileges of the public. I appeal to your honour—

কিন্তু এ্যাপিল আর করতে হলো না। এ যে রজনী দাস, ঢাকার বিখ্যাত উকিল রজনী দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাক্তন সহকারী। রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায় ধুরন্ধর রজনী দাস। সুতরাং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেবার হুকুম হলো, অনুমতি-পত্রের বাধা বাতিল করে দেয়া হলো। সাধারণ দর্শকেরা দলে দলে এসে প্রবেশ করলেন। মামলা সুরু হয়ে গেল।

এক দিন এক-দিন করে পুরো বাইশটি দিন হলো মামলার শুনানী। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা। প্রতিদিনকার শুনানীর বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগলো 'ষ্টেটসম্যান' প্রমুখ বাংলার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। বেছে বেছে সাক্ষী জোগাড় করেছে খগেন রায়। আমাদের গ্রামের গাঁজাখোর বদমায়েস বিশু চক্রবর্ত্তী, তমিজদ্দী চৌকিদার, তারই জনকয়েক সাকরেদ, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার জমির কারিগর আর হাঁসাড়া প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির স্বনামধন্য সম্পাদক সেই মৃণাল সোম। ঠিক তেমনি খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ী, ময়লা খদ্দরের সার্ট, ময়লা ধুতি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। গ্যাটা-পারচার ফ্রেমের ওপর দিয়ে কুৎ কুৎ করে তাকিয়ে সত্য কথা বলবার প্রতিজ্ঞা করে অবলীলাক্রমে ডাহা মিথ্যে বলে গেলেন যে, ঢাকা থেকে বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত, বিভূতি চৌধুরী প্রভৃতি বি ভি'র অফিসাররা হাঁসাড়ায় সামরিক ড্রিল শেখাতে এসে রাত্রি যাপন করতো কেয়টখালীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। কেয়টখালীর দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে এই দলের সভ্য এবং এই সব আসামী তাঁরই রিক্রুট, সবাই জানে তা। কথায়-কথায় মারধর করা, ছোরা-ছুরি চালানো এবং রিভলভার নিয়ে ঘোরাফেরা এদেরই কাজ। হাঁসাড়া, কেয়টখালী ও আশে-পাশে গ্রামের সবাই তাই এদের ভয় করে।

কংগ্রেসের কাজে কোন দিনই আমরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াইনি, কংগ্রেসও কোনো দিন এমনি প্রকাশ্য ভাবে শত্রুপক্ষে যোগদান করে বিরুদ্ধাচরণ করেনি আমাদের। কংগ্রেসী কুলকলঙ্ক মৃণাল সোম একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলো।

তার চাইতেও বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং বিজয় সেন। আমার আবাল্য সুহৃদ, সহকর্মী, শহীদ বিনয় বোসের প্রাক্তন রুম-মেট ও সহপাঠী গোপাল সেনের দাদা বিজয় সেন। সেই বিজয় সেন, গলায় সেই তুলসীর মালা, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের প্রতীক! বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না, যখন দেখলাম সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো বিজয় বাবু গড়্-গড়্ করে বলে চললেন: হ্যাঁ, অনাথ চক্রবর্ত্তীর হাতের ক্ষত চিকিৎসা করেছি আমি। ঢাকা শহর থেকে আনা হয় কেলেতুলা। প্রতি-দিন রঙ্গলালদের বাড়ীতে গিয়ে আমি অনাথের ক্ষত ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে আসতাম।

রজনী দাসের প্রশ্ন: কীসের জন্য ক্ষত হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

কী বললেন দ্বিজেন বাবু?

দ্বিজেন বাবু নয়, রঙ্গলাল। সে বললো, তা দিয়ে আপনার দরকার কি?

এতে আপনার কোনো সন্দেহ হয়নি?

হ্যাঁ, হয়েছিল। কারণ তার দু'দিন আগেই ডাকাতির ঘটনা শুনেছিলাম।

সন্দেহের কথা বলেছিলেন কাউকে? এরাই যে ডাকাতি করতে পারে, তা মনে হয়েছিল কি?

মনে হলেও বলতে ভয় করেছে, কারণ—

কারণ আমি জানি।—সহাস্যে জুড়ে দিলেন রজনী দাস: কারণ কথায়-কথায় ছোরা-ছুরি চালানো আর মারধর এদের কাজ।—The same sentence quoted by His Highness the Secretary of the Hashara Congress Committee—তোতা পাখীর বুলি!

রাজসাক্ষী কালাচাঁদকে জেরা চললো চার দিন। সে বললো যে, সে বি-ভি দলের সভ্য। বিপদভঞ্জন তাকে দলে টেনে নিয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা ও ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহই এই দলের কাজ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পূর্ব্বে বহু বার ডাকাতি ও হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে। নানা কারণে তা কার্য্যকরী হয়ে ওঠেনি। দোলভোগের ডাকাতিতে সে অংশ গ্রহণ করেছিল। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর এক হাতে ছিল একটি ছোট লাঠী, আর এক হাতে সবুজ খাপে ভরা একখানা ছোরা। কোমরে ছিল রিভলভার জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

রজনী দাসের অবিশ্রাম প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠলো কালাচাঁদ। অসতর্ক মুহূর্ত্তে আই-বির শেখানো অনেক কথাই বেরিয়ে এল, অসংলগ্ন জবাবকে শোধরাতে গিয়ে তা আরও জটিল করে ফেললো, উকিলের প্রত্যেকটি অভিমতকেই সোজা অস্বীকার করতে গিয়ে সহজ সত্যকেও শোচনীয় ভাবে বিকৃত করে ফেললো। কিছুই মনে পড়ছে না' বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টাকে রজনী দাস নির্ম্মম হাতে চূর্ণ করে দিলেন, প্রশ্ন করলেন: কী-কী দিয়ে দুপুরে আজ খেয়ে এসেছ, মনে পড়ছে তা?

মূর্খ কালাচাঁদ বলে বসলো: না।

কেন, আই-বি তা শিখিয়ে দেয়নি? বলেনি, ভাত খেলে বলবে, খাইনি; মাছ খেলে বলবে, ডাল খেয়েছি, ডাল খেলে বলবে, তরকারি?—আমি বলছি, তুমি একটি মিথ্যেবাদী—a downright liar……

তার পর সুরু হলো সওয়াল। সাক্ষীদের নিরপেক্ষ বিবৃতি উল্লেখ করে বলতে লাগলেন কোর্ট-ইনস্পেক্টার: সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা সবাই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক গুপ্ত

বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য এবং দ্বিজেন গাঙুলী এদের নেতা। বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে হিংসাত্মক উপায়ে উৎখাত করাই এদের লক্ষ্য। গ্রামের লোকেরাও এদের জানতো, কিন্তু কথায়-কথায় এরা মারধর করে, ছুরি চালায় বলে ভয়ে সে কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করতো না। দোলভোগে যে সব বেপারীদের ওপর ডাকাতি হয়েছে, তারা সরল, অনভিজ্ঞ মুসলমান চাষী। টাকা প্রথমটা দিতে না চাওয়ায় এরা ছুরির ফলা ওদের কাঁধে খানিকটে বসিয়ে দেয়। টাকা না দিলে হয়তো হত্যাই করতো ওদের। দ্বিজেন গাঙুলীই হচ্ছে এই দলের প্রধান পাণ্ডা। তারই প্ররোচনায়, ব্যবস্থাপনায় এই ডাকাত দল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের চেষ্টা করে, সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে, ডাকাতির পরিকল্পনা করে। দ্বিজেনই এদের—

রজনী দাসের সওয়াল চললো চার দিন। বহু উকিল-মোক্তার এসে শুনতে লাগলেন স্মরণীয় সেই বক্তৃতা। এমনি যুক্তিপূর্ণ তাঁর ভাবণ যে, তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন আই-বি-র ব্যর্থতার কথা। টুকরো কথা কানেও ভেসে এল: এদের আটকাতে পারবেন না হাকিম। আমরাও আশান্বিত হয়ে উঠলাম যে, হয়তো বা তাই হবে।

কিন্তু আমাদের সকল আশা, শ্রোতাদের সকল ধারণা, আত্মীয়-জনের সমস্ত কল্পনা কাচের বাসনের মতো চূর্ণ করে দিয়ে রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫১৫ ধারা অনুযায়ী হত্যার চেষ্টা সহ ডাকাতি এবং ১২০খ ধারা অনুযায়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে যে দীর্ঘ রায় পাঠ করলেন, দেখা গেল, তাতে ব্যবহার করা হয়েছে হুবহু সেই কোর্ট-ইন্‌সপেক্টারেরই প্রাঞ্জল ভাষা, তার প্রত্যেকটি বাক্য ও ইডিয়ম!…এ নইলে বৃটিশ আমলে ন্যায়-বিচার হবে কেন?

গম্ভীর মুখে তিনি দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন:

দ্বিজেন গাঙুলী—৭ বৎসর

রঙ্গলাল গাঙুলী
খগেন চাটার্জ্জী
অনাথ চক্রবর্ত্তী } প্রত্যেকে ৫ বৎসর

বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী—২ বৎসর

কালাচাঁদ দাস—সম্রাটের অনুকম্পায় খালাস

স্পেশ্যাল ক্ষমতার একেবারে পুরোটাই ব্যবহার করবেন আমার বেলায় এতটা অবিনাশ দারোগাও কল্পনা করতে পারেননি। দণ্ডাদেশ শোনাবার পর পুলিশ অফিসে আনবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই বললেন অবিনাশ বাবু: জেল হয়ে যাবে, তা জানতাম দ্বিজেন বাবু, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতটা হবে এটা আশাই করতে পারিনি। কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টারও সায় দিলেন: We could not even dream—

আমি হেসে জবাব দিলাম: There are many things in the world Horatis. which are not dreamt of… ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি স্বপ্নেও না ভাবতে পারলেও ভবেশ রায় স্বপ্ন দেখছেন স্যার হতে পারেন কিনা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে।…

তখনই সবাইকে রওনা করে দেয়া হলো মুন্সীগঞ্জ থেকে। ঢাকা জেলে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। সংবাদ বোধ হয় পূর্ব্বেই পাঠানো হয়েছিল। দেখলাম, রেজ্জাক সাহেব বসে আছেন প্রতীক্ষায়। অকস্মাৎ খুব গম্ভীর মনে হলো। সদালাপী, সদা হাস্যময় রেজ্জাক সাহেব এমনি নীরব কেন? আবহাওয়া লঘু করে দেবার জন্য দু'-এক টুকরো হাসির কথাও বললাম। হাসলেন না, এমন কি, সে কথায় যোগদানও করলেন না।

শুধু বললেন: ডিভিশন পেয়েছেন কিনা, কাগজ-পত্র থেকে তা বুঝতে পারছি না। আজ সিভিল ইয়ার্ডেই থাকুন, কাল যা হয় হবে।

চলেই যাচ্ছিলেন, ডাকলাম: রেজ্জাক সাহেব!

ফিরে দাঁড়ালেন মুখ নীচু করে। বললাম: এবার আর ডেটিনিউ নয়, কয়েদী। সাত বৎসরের মেয়াদী কয়েদী। কিন্তু একেবারে যে চিনতেই পারছেন না আমায়, ব্যাপার কি?

কিছুই বললেন না তিনি। অকস্মাৎ পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বার করতে-করতে ত্রস্তপদে গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গেট বন্ধ হয়ে গেল।

সিভিল ইয়ার্ডে এসে দেখি সেই কক্ষ, যেখানে ক'মাস পূর্ব্বেও আমি রাজবন্দী হিসেবে রাজত্ব করে গেছি। কিন্তু রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙুলীর মৃত্যু হয়েছে, এবার জন্মলাভ করেছে কয়েদী দ্বিজেন!

গোটা তিনেক ঘোড়ার কম্বল ফেলে দিয়ে গেল সিপাই। যেমন ময়লা, তেমনি এর দুর্গন্ধ। লোহার খাটে গদী পাতা বটে, কিন্তু চাদরও নেই, বালিশও নেই, মশারিও নেই। তবু শীতকালে পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেসি শুতে ভালই লাগলো।…

সবাই চুপ, একেবারে চুপ। যেন কথা সব ফুরিয়ে গেছে। নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, কেউ ঘুমোয়নি ওরা। চোখের পাতায় আগুনের হল্‌কা!…

বহুক্ষণ পর অকস্মাৎ বলে উঠলো বিপদভঞ্জন: দাদা, তাহলে সত্যিই কি শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হলাম আমরা আই-বির কাছে?

কণ্ঠে প্রচুর ভাবাবেগ ঢেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম: বিপ্লবীকে সরিয়ে ফেললেও বিপ্লবকে হত্যা করা যায় না, ভাই! তা যদি হতো, তাহলে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর সঙ্গেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের হতো যবনিকা পতন। তা হয় না, হতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলাম এক দিন, আমার ভূমিকা শেষ হয়ে গেল, তাই প্রস্থান করলাম। কিন্তু নাটক কি তাতে শেষ হয়ে যায়? এই রক্তের হোলি-খেলা চলবে তত দিন, যত দিন না আমার মায়ের শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে!…

বিপদভঞ্জন আর কথা কইলো না, আমিও চুপ করে গেলাম। জেলের গেটে ঘণ্টা বাজলো—এক, দুই, তিন!

[ক্রমশঃ।

দুর্গাপূজার গান

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-রত্নাকর

আদি যুগ থেকে হিন্দু-সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ সঙ্গীতকে কেবলমাত্র আনন্দ পরিবেশনের বস্তু না ভেবে তাকে ভগবৎ সাধনার প্রধান সহায়-রূপে ধার্য্য করে গেছেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ কালে স্বরের উত্থান ও পতন সপ্ত স্বর সৃষ্টির মূল। স্বরের পূর্ণ বিকাশের পর সুরের বিকাশ। সুর অর্থাৎ রাগরাগিণীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কাব্য ও সঙ্গীতের মিলন হল। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইহা এক চরম উৎকর্ষ। সেই আদিকাল থেকে সুর সংযোগে মন্ত্র উচ্চারণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসছে। চিত্তবিকার হতে মানব-মনকে মুক্ত করে একাগ্রতা আনয়নে সঙ্গীত অদ্বিতীয়। তাই পারমার্থিক চিন্তায়, পূজা-অর্চ্চনায়, সুরকে আশ্রয় করতে হয়। বাঙ্গালা দেশে ভাগবত পাঠ, কথকতা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিতে ভাবোপযোগী ও সময়োপযোগী সুর সংযোজিত হয়।

দুর্গাপূজা ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত। রামায়ণে বর্ণিত 'শারদীয় পূজাই' সর্ব্বাধিক সমারোহে ও বিচিত্র ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার সাধক ভক্তগণ দুর্গামাতাকে মাতৃরূপে ও কন্যারূপে পরিকল্পনা করে গেছেন। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ 'আগমনী' গানে এই ভাবই ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগ ও তৎপরবর্ত্তী কালে বহু গীতিকার-রচিত আগমনী গান, বাঙ্গলার সঙ্গীত-সম্পদ সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বহু দুর্গাস্তব মধুর সুরে গীত হয়। অধুনা দুর্গাপূজায় এরূপ সঙ্গীত অতি অল্পই শোনা যায়। এককালে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ পরিবারে দুর্গোৎসবে এইরূপ গান যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুর-তালযোগে যে কয়েকটি স্তব অধিক গীত হ'ত তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হল। এই স্তবগুলি ভৈরব, শ্রী এবং মালকোশ রাগে এবং ধ্রুপদের তালে গীত হ'ত।

১

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদবন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে!
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে। ইত্যাদি

আর একটি সংস্কৃত গান বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল এবং ইহা অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত। এই গানটি 'নারায়ণী' সুরে গীত হ'ত। এই গানটিও নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

"নমামি মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মহিষ-মস্তক-নটন বেদ বিনোদিনী
মোদিনি মালিনি মানিনি
প্রণত জন সৌভাগ্য জননী।
শঙ্খ চক্র শূলাঙ্কুশ পাণি
শক্তি সেন মধুর বাণি
পঙ্কজনয়নি, পন্নগবেণি পালিত গুরুগুহ পুরাণি।
শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণি সমস্ত দৈবত-রূপিণি
কঙ্কনালঙ্কৃত জননি কাত্যায়নি নারায়ণি॥

এই গানটির বিশেষত্ব ইহার সুর-বৈচিত্র্য। 'নারায়ণী' সুর অপ্রচলিত রাগের পর্য্যায়ে পড়ে। এই সুরের গান অতি অল্প সংখ্যক। এই গানটি মদীয় পিতৃদেব মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাঠাগারে এক পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থে সুর সমেত প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই গানটি বাঙ্গলায় এক সময় জনপ্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সেকালে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ পরিবারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান পূজার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের গৃহে দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ক্ষণে পূজার অন্যান্য প্রচলিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাম্বুরা ও মৃদঙ্গ-যোগে ধ্রুপদ সঙ্গীত গীত হ'ত। বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়কগণ এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হ'য়ে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় রচিত দুর্গাস্তব গাহিয়া সমবেত ভক্তজনচিত্তে অপার আনন্দ দান করে গেছেন। এইরূপ পূজা অনুষ্ঠানে ভক্ত-কবি তুলসীদাস রচিত একটি বিখ্যাত দুর্গাস্তব প্রায় গীত হ'ত। সেই গানটিরও কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি :—

দুসহ দোখে দুখ দলনি' কর, দেবি দয়া।
বিশ্ব মূলাহসি জন সানুকূলাসি,
কর শূল ধারিণি মহামূল মায়া।
চণ্ড ভূজ দণ্ড খণ্ডনি বিহণ্ডনি মুণ্ড
মহিষ মধ ভঙ্গ করি অঙ্গ তোরে।
শুম্ভ নিশুম্ভ কুম্ভীশ রণ কেশরিন
ক্রোধ বারিধি বৈরী বৃন্দ বোরে।
নিগম আগম অগম গুর্ব্বি তব গুণ কথন
উর্ব্বিধর ভণত দোহে সহস জিহ্বা।

গানটির ভাবার্থ "দুঃসহ দোষ এবং দুঃখদমনকারী হে দেবি! তুমি আমায় কৃপা কর। এই সংসারে তুমিই আদি, ভক্তকে তুমি দয়া কর। দুষ্টের দলনের জন্য তুমি ত্রিশূল ধারণ করেছ এবং তুমিই মায়া উৎপন্নকারী পরাপ্রকৃতি। চণ্ড দৈত্য, মুণ্ড রাক্ষস এবং মহিষাসুরের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে তাদের বধ করেছ। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তুমি রণসিংহিনীর বিক্রমে নিধন করেছ এবং তোমার ক্রোধরূপী সমুদ্রে শত্রুর দলকে ডুবিয়েছ। বেদশাস্ত্র এবং সহস্র জিহ্বাযুক্ত শেষ নাগ তোমার গুণগান ক'রেও তোমার অন্ত পায় না।"

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান ব্যতীত চণ্ডীর গান কিংবা রামায়ণ গান দুর্গাপূজার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল।

বাঙ্গলার আগমনী গান ভাবের বন্যায় ভরপুর। ভারতীয় সঙ্গীতে যে নব ভাব ও নব প্রেরণা এসেছে, সেটা প্রধানত বাঙ্গলারই অবদান। এই গানগুলির কথা, ভাব ও সুর সমাবেশ দেখলে মনে হয় যে, সঙ্গীত-ক্ষেত্রে তাদের তুলনা মেলে না। বাঙ্গলা গানে যে ভাবের প্রাধান্য পাওয়া যায় তা' অন্য কোন ভাষায় বিরল। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ রচিত ভক্তি-রসাত্মক গান বাঙ্গলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই আগমনী গান দিয়ে আমাদের দেশে পূজা আরম্ভ হয়। বাঙ্গলার অনেক পল্লীতে এখনও ধ্রুপদাঙ্গের আগমনী গান মৃদঙ্গযোগে গায়ক দল কর্ত্তৃক গীত হয়। এই দল গান গেয়ে সমস্ত পল্লী

পরিভ্রমণ করে নির্দ্দিষ্ট পূজামণ্ডপে উপস্থিত হন। 'পঞ্চমী' দিনের ইহা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। আগমনী গান সাধারণতঃ 'প্রভাতী' সুরে রচিত। আগমনী গানে 'বিভাস' রাগ সংযোজনা সনাতনী প্রথা। অন্যান্য প্রভাতী রাগের মধ্যে 'কালেংড়া,' 'ভৈরবী' এবং রাত্রের সুরের মধ্যে সিন্ধু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট প্রভৃতিতে আগমনী গান রচিত হয়। বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত বিভাস রাগ, আগমনী গানের বিশেষ উপযোগী। তার সুর-লহরী মাতার আগমনের মঙ্গল-বার্ত্তা বহন করে। অন্য কোন রাগে এইরূপ ভাব পাওয়া যায় না। কথা ও সুরের অপূর্ব্ব মিলন বাঙ্গলা দেশে ও বাঙ্গলার গানে বিদ্যমান। গানের বাণী ও ভাবের সঙ্গে যথাযথ রাগের সমাবেশ বাঙ্গালীর শিল্পানুভূতির এক অপরূপ পরিচয়। কীর্ত্তনের করুণ রসাত্মক ও বাউলের উদাস সুর এই বাঙ্গলা দেশেই সৃষ্টি। আগমনী গানও বাঙ্গলা সঙ্গীতের এক বিশেষ পর্যায়ভুক্ত। এ সকল ভক্তি-রসাত্মক গান এখন প্রায় লুপ্ত হ'তে চলেছে। সাহিত্য ও সঙ্গীত-পূজারীদের কর্ত্তব্য, এই সকল লুপ্ত সঙ্গীতকে পুনরুদ্ধার করা এবং মহিমান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠা করা। উপসংহারে কয়েকটি 'আগমনী' গানের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম। এই গানগুলি এখন প্রায় লুপ্ত কিন্তু এককালে এই সকল গান শোনার জন্য অসংখ্য শ্রোতা উৎসুক হয়ে থাকতেন।

কমলাকান্ত রচিত আগমনী গান—

'রাণি এই লাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবন ধন।
অনেক মিনতি করি তুষিয়া ত্রিশূলধারী,
উমা-ধনে আনিলাম নিজ পুরে।"

* * * *

"অসংখ্য তপের ফলে কপটতা মায়া ছলে
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
কমলাকান্তের বাণী ধন্যা ধন্যা গিরিরাণি
তব পুণ্য কে কহিতে পারে।"

ভক্তকবি তারাচাঁদের একটি বিখ্যাত আগমনী গান—

"করী অরি পরে আনিলে হে কারে
কৈ গিরি মম নন্দিনী।
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা
এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী।

* * * *

আবার রসিক রায় গেয়েছেন—

"ভিখারী হরের ঘরে কি সুখে থাক শঙ্করি
শুনেছি সে পাগল ভোলা আছে গঙ্গা শিরে করি।"

আর একটি দুর্গা-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গান দরবারী-কানড়া রাগে প্রচলিত ছিল—

"দুর্গা নাম মহামন্ত্র মুক্তির কারণ।
এই মন্ত্র জপ মন মুক্ত হবে ভব-বন্ধন।
অপার মহিমা যাঁর দেবাদি না জানে।
কি কব মানব আমি মূঢ়মতি অভাজন।"

এ সব কি হে? আন্ কাট্‌লেট্, মানে না মানা চপ, অনন্তা ডেভিল;
শাড়ী ব্লাউজ থেকে এখন বুঝি চপ-কাটলেটে ঢুকেছে!

শ্রীমতী লিজেল্‌ রেমঁ

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের কাজ

'মনে রেখ তুমি শুধু মায়ের দাসী। লোকের কাছে সাহায্যের দাবী করবে—নিজেকে বিকিয়ে দেবে না তাই বলে।' যুক্তরাষ্ট্রে অর্থভিক্ষা করা যে কত কঠিন তা না ভেবে নিবেদিতা শুধু গুরুর হুকুমটাই মনে-মনে বার-বার আওড়াতে থাকেন।

যে কয় দিন ওলিয়া শিকাগোতে ছিল, সে কয় দিনেই তার উপর নিবেদিতার একটা মায়া পড়ে গেল। হোটেলে কোনও তরুণীর সঙ্গে একত্রে থাকাটা সহজ নয়। ওলিয়ার বয়স সবে কুড়ি, মনের কোনও স্থিরতা নাই বলে কোন রকম সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না। মায়ের সন্তর্পণ মমতার হাত থেকে ছাড়া পেয়েই প্রবল প্রবৃত্তির রাশ আলগা করে দিয়েছে, তার ফলে কী জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব যে হতে পারে সেদিকে কোনও খেয়াল নাই। সম্প্রতি নিবেদিতাকে পেয়ে তার মনটা অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্য দিকে ঝুঁকল। নিবেদিতাকে শহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো তার একটা মস্ত কাজ। শিকাগো তার ভাল রকমই চেনা। মায়ের বন্ধুদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিতে তার কী উৎসাহ!

দু'জনে মিলে গেলেন হাল্‌-হাউসে। প্রকাণ্ড বাড়ি, ওখানে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার মত তালিম পায় বিদেশীরা। তারা হাজারে-হাজারে আসে, কিছু দিন ওখানে থাকে। কর্নেল পার্কারের সাহায্যে জেন অ্যাডামস্‌ এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়া-পত্তন করেন। বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া, বিশেষ করে নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানো ইত্যাদি নানা রকম কাজের ব্যবস্থাই আছে। শ্রীমতী জেনের তখনও বয়স অল্প, কিন্তু নানা রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে। নিবেদিতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সংখ্যা বা আয়-ব্যয়ের খতিয়ান নিয়ে তাঁর কোনও কথা হল না। বিবর্তনের পথে মানুষের মাঝে কোন্‌ বৈশিষ্ট্য ফুটছে এই নিয়েই আলোচনা চলল। জেন অ্যাডামস্‌ রাশিয়াতে কি ভাবে দিন কাটিয়েছেন সে-গল্পও করলেন। ইয়াস নেইয়া পোলিয়ানায় মুজিকদের সঙ্গে কিছু দিন কাটিয়েছেন, সে সময় টলষ্টয়ের সংশ্রবে এসেছিলেন—সে কথা ওঠে। তখনই হাল্‌-হাউস্‌ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পান। উর্বর দেশ, তবু রাশিয়ান কৃষকের এক টুকরা রুটি জোটে না এ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তাই বিদেশীর শাসনে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হিন্দুর সম্পর্কে নিবেদিতার কি বলবার আছে তা তিনি সহজেই বুঝলেন। মানুষ তৈরী করবার সঙ্কল্প নিয়ে স্বামীজি যে কাজের পত্তন করেছেন তার সম্বন্ধেও জেনের অপরিসীম আগ্রহ। নিবেদিতা যাদের মুখপাত্রী তাদের সম্পর্কে এবং নিবেদিতার নিজের সম্পর্কেও আরও ভাল করে জানবার জন্য তিনি তাঁকে পর-পর কতকগুলো ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথম বৈঠকেই নিবেদিতা সবার অন্তর স্পর্শ করলেন। বিভিন্ন জাতির—বিভিন্ন ধর্মের—দেশ ছাড়া এই সব মানুষ, এদের মধ্যে অনেকেই ভয়াবহ দারিদ্র্য আর নির্যাতনে পিষ্ট হয়েছে,—নিবেদিতা তাদের কাছে বললেন শান্তির বার্তা। আত্মমুক্তির পিপাসায় মানুষ যখন শুরু করে উত্তরায়ণের অভিযান, এক আশ্চর্য আশ্বাস জাগে তার অন্তরে। মনে হয়, এই তো আমার মাঝেই সব, সাধনা বল, সিদ্ধি বল, আত্মদানের আনন্দ বল, এমন কি চরম সত্যের সেই দীপ্তিও—এই যে আমারই বুকের মাঝে। নিবেদিতার বাণীতে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ে, এতটা তিনি ভাবতেই পারেননি। শ্রোতাদের অসীম আগ্রহ, তারা আরও জানতে চায়, জিজ্ঞাসা করে—'কেমন করে পথ চলব?' প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করে নিবেদিতাকে। উত্তরে নিবেদিতা শোনান হিন্দুদের মরমীয়া ভাবের রহস্য, সবার সহজবোধ্য ভাষায় বলে যান কেমন করে প্রতি কাজে প্রতি কথায় আত্ম আবিষ্কারের অবিশ্রান্ত সাধনা করে যেতে হয়। শেষ বৈঠকে একটি বাক্সে করে তারা পনেরোটি ডলার এনে দিল, নিজেদের মধ্যে খুদ-কুঁড়ো কুড়িয়ে-কুড়িয়ে এই যোগাড় হয়েছে, হিন্দু ভাইদের জন্য এই তাদের সেবার অর্ঘ্য।

কিন্তু শিকাগোর ভদ্র সমাজ থেকে নিবেদিতা তেমন সাগ্রহ অভ্যর্থনা পেলেন না। ভাষণের জন্য কোন রকম টাকা-পয়সা নিতে স্রেফ অস্বীকার করায় এবং নিজেকে স্বামীজির নামের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলায় জনসাধারণ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে রইল। স্বামীজির শত্রু-মিত্র দুই-ই ওখানে আছে কি না। তাছাড়া ইংরেজ সাংবাদিকের মত ভারতের মজাদার বর্ণনা দেবেন তিনি এই আশাই করছিল সবাই। সে-জায়গায় নিবেদিতা বলেন দার্শনিক ভারতের কথা, তার মরমী অনুভবের কথা,—কেন তিনি হিন্দু হলেন তার চমক লাগানো কাহিনী। ব্রহ্মচারিণীর শুভ্র বেশে নিতান্ত অনাড়ম্বর ভাবে লোকের সামনে বার হওয়া—এটাও সবার কাছে বিসদৃশ ঠেকল। ফলে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কিন্তু মায়ের দাসী কোথাও হটে যাবার মেয়ে নয়। এত যে বাধা, এ তো খেলারই একটা অংশ, শেষ পর্যন্ত ও-খেলায় নিবেদিতা জয়ী হবেনই।

ক্রমে কয়েকটা সেলুন, আর ক্লাবে নিবেদিতার প্রবেশাধিকার মিলল। ভারতবর্ষের নারী সমাজ, কুটীর-শিল্প বা কলা-বিদ্যা নিয়ে উনি বক্তৃতা দিতেন। স্কুলের ছাত্রেরা দিলখোলা, তারা তাঁকে ভাষণ দিতে ডাকত। উনি তাদের কাছে প্রস্তাব করলেন, ছেলেরা 'পারস্পরিক সাহায্য সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান যদি গড়ে তো কেমন হয়। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেব-দেবী আর ঐতিহাসিক বীরদের গল্পও ওদের শোনালেন।

ওলিয়া শিকাগো ছেড়ে যাবার পর নিবেদিতা একখানা ঘর ভাড়া করলেন। ওখানে মেরী হলের নেতৃত্বে স্বামীজির বহু

বন্ধু-বান্ধব নিবেদিতার কাছে আসতেন, সবাই মিলে ভারতীয় ভাবনার ফল্গু-ধারায় অবগাহন করতেন। কিন্তু এইটুকু ছাড়া সাধারণ্যে কথা বলবার সুযোগ ক্রমেই কমতে লাগল, নিবেদিতা অখ্যাত অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন। খবরের কাগজওয়ালারা তাঁকে পাত্তা দেয় না। ভারতের খবরের জন্ম এক চিলতে জায়গা মাত্র রাখে তারা। সব রকমে যেন পর্বত প্রমাণ বাধার সামনে পড়লেন নিবেদিতা।

এই অবস্থায় কালিফোর্ণিয়া যাবার পথে গুরু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শিকাগোতে একদিন মাত্র ছিলেন। তিনি কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত, মায়ের ইচ্ছার কাছে সব সঁপে দিয়েছেন, কণ্ঠে বিজয়-গাথার একটি কলি। দুই সন্ন্যাসীর পথ দু'দিকে চলে গেছে। একসঙ্গে ধ্যান করতে বসলেও নিজের যত সমস্যার কথা নিবেদিতা নিজের মনেই রাখলেন। এ সব ক্লান্তিকর আলোচনা তুলতে ইচ্ছা হয় না। আর সমস্যা কি তাঁর, মায়ের না? বিজয়িনীর এ-ও তো এক লীলা। মনে পড়ে গুরুর হুঁশিয়ারি, 'জগতে যারা আদর্শ প্রচার করতে আসে মার্গট, নিজের পথ তাদের নিজেদেরই করে নিতে হয়। মানুষ তাদের কথা শুনবে এমন আশা করতে নাই।' নিবেদিতা ভাবেন, এটার পুরোপুরি অভিজ্ঞতা হওয়া চাই,—একেবারে একা যুঝে।

মেরী হল তাঁকে মেয়েদের একটা ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। 'সারা জগতে অ্যাংলো-স্যাকসন সংস্কৃতি বিস্তারে আমেরিকার দায়িত্ব কতখানি'—এই নিয়ে বক্তৃতা হচ্ছিল। বক্তারা পর-পর বলে চলেছেন। এর মধ্যে কয়েকটা ঝাঁঝালো কথায় নিবেদিতার কান খাড়া হয়ে উঠল। সভাপতি যখন সাধারণ বিতর্কের সুযোগ দিলেন, সকলের আগে উঠে নিবেদিতা গেলেন মঞ্চে। মাত্র মিনিট পনেরো বললেন, কিন্তু ফল হল অত্যাশ্চর্য। সমস্ত হল প্রশংসনীয় মুখর হয়ে উঠল। আইরিশ মেয়ে আবার ফিরে পেয়েছে তার প্রাণোচ্ছলতা, দিতে পেরেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন জনতার বশীকরণ মন্ত্র। সেদিন বিকালে সাংবাদিকরা তাঁর ঘরে ধাওয়া করল। কাগজে-কাগজে তাঁর নাম। শিকাগো তার নগরলক্ষ্মীকে আবিষ্কার করেছে।

নিবেদিতা যে কৌতূহল উসকে তুললেন তার ফলে নাছোড়বান্দা অধীর জনতার দাবি মেটাতে তাঁকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হল বেশ কিছু দিন। সাত মাস ধরে অবিশ্রাম ঘোরাঘুরি, এর মধ্যে যে আমন্ত্রণ করেছে তার ডাকই শুনেছেন, কাউকে ফেরাননি। ডেট্রয়েট, অ্যান্‌ আরবর্‌, ক্যানসাস্‌ সিটি আর মিনীয়াপোলিসে ঘোরবার পর বিবেকানন্দের কাছ থেকে অভিনন্দন আসে, 'তোমার সাফল্যে কী যে খুশী হয়েছি! লেগে থাকতে পারলে বরাত ফিরবেই—আমরা একটা বিষয়ে একাগ্র চিত্তের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে তাতে জড়িয়ে পড়ি, আরেকটা দিকে নজরই দিই না। কিন্তু সেটাও কম শক্ত কাজ নয়—এই মুহূর্তে নিজেকে সব-কিছু থেকে একেবারে বিবিক্ত করা। আসক্তি আর অনাসক্তি, দুটোরই অনুশীলন নিখুঁত হলে তবে মানুষ বড় হয়, জীবনে সুখী হয়। শেষ কালে সবই গুছিয়ে আসে। বীজ মরলে তবে না গাছ!……' (অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত পত্রাবলী পৃঃ ৪০৫)।

নিবেদিতা এসেছেন একটা বাণী নিয়ে। যেখানেই যান, তা সে গির্জার বেদিই হ'ক বা ঘরোয়া বৈঠক কি সাধারণ সভাই হ'ক, আপন বক্তব্যের অনুকূল একটি পরিবেশ প্রথমেই সৃষ্টি করে তোলেন। ভারত সম্পর্কে প্রশ্ন করবার জন্ম তাঁর চার পাশে লোকে ভিড় করত না, তারা চাইত নিবেদিতার বিদ্যুৎবাহিনী এই যে প্রশান্তি ওরই একটুখানি। স্বামীজির শিষ্যেরা তাঁর কাছে গুরুর কথা শুনতে চাইতেন। এমন মিষ্টি করে সহজ করে তিনি বলতেন। 'আমার নিজের কোনও বাণী নাই, প্রচার করবারও কিছু নাই, অহং ছাড়বার জন্ম কত যে ভুগেছি সেই অতীত অভিজ্ঞতাটুকুই আছে……সে-শিক্ষার তুলনা নাই।' ওদেশে সমাজ-জীবনের লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠা আর সমৃদ্ধি! ওখানকার সমাজ স্বভাবতই অনুদার, অথচ ইচ্ছা করলে তাক লাগানো জনকল্যাণকর নিষ্কাম কর্মের সামর্থ্য তার আছে। এ হেন সমাজের সামনে নিবেদিতা নিষ্কাম কর্মের একটা বিশুদ্ধ আদর্শ উপস্থাপিত করে জ্বলন্ত উৎসাহের স্রোত বইয়ে দিলেন।

বহু বছর দেশ ছেড়েছে এমনি-সব প্রাচ্যবাসীরা নিবেদিতা এসেছেন জানলেই দলে-দলে তাঁর কাছে হাজির হ'ত। তাঁর কোনও কাজে যদি তারা লাগে! অনেকে এমন যাচ্ছেতাই ইংরেজী বলে যে ভাব-বিনিময় অসম্ভব হয়; কিন্তু যে-দরদ নিয়ে নিবেদিতা তাদের অধ্যাত্ম সমস্যার আলোচনা করেন, তাতে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশই ভয়ানক গরীব, কিন্তু সবাই তাদের সাধ্যমত ভারতের জন্ম অকপটে কিছু-না-কিছু দান করেছে। একদিন একটি বৌদ্ধ নিবেদিতার সামনে ছোট্ট এক প্যাকেট চা রেখে শ্রদ্ধাভরে হাত দুটি একবার জড়ো করল, তার পর একটি কথাও না বলে চলে গেল।

একদিন ভাষণ শেষ হলে লোকে তাঁকে ঘিরে অভিনন্দন জানাচ্ছে, এমন সময় নিবেদিতার পরিষ্কার কণ্ঠ রণিত হয়ে উঠল, 'একবার বলুন, আপনারা কি করছেন আমার জন্ম?' সবাই অবাক। নিবেদিতা কাঙালিনীর মত ভিক্ষা চান, 'বছরে একটি করে ডলার দিন, অন্তত দশটি বছর।' সবাই হেসে উঠল, 'এই সামান্য টাকায় কি হবে?' 'ভবিষ্যতের গোড়া-পত্তন হবে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই, ভারতের নারী আর শিশুর জন্ম স্থায়ী সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হ'ক এদেশে এই চাই। সেইটাই আসল কথা; আপনাদের আদত কাজও হল এই।' এর পর 'পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতি'তে দলে-দলে লোক নিয়মিত চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিতে লাগল। মিঃ লেগেট্‌ সভাপতি হতে রাজী হলেন; মিস্‌ ম্যাকলয়েড, মিসেস্‌ বুল এবং তাঁদের বন্ধুরা হলেন পৃষ্ঠপোষক।

নিবেদিতা প্রচার-পুস্তিকা লিখে দু'হাতে ছড়িয়ে দিলেন ওদেশে। তাতে তাঁর সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হল, তাঁর কাজটাকে পাদ্রীগিরির সঙ্গে যেন গুলিয়ে ফেলা না হয়। আমেরিকান মেয়েদের জন্ম আমেরিকান স্কুল আছে, নিবেদিতা চান হিন্দু মেয়ের জন্ম তেমনি হিন্দু আদর্শে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনাটা সবাই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কেবল যে টাকাই সংগৃহীত হল তাই নয়, অনেক মেয়ে তাঁকে সাহায্য করতে চাইল, এমন কি কেউ-কেউ নিবেদিতার সঙ্গে ভারতে আসতেও প্রস্তুত। নিবেদিতার জয়ের ভরা পূর্ণ হল।

কিন্তু শিকাগোতে ফিরে দেখেন—সেখানে সবাই তাঁকে ভুলে গেছে। এমন কি মেরী হলেরও মাথায় নতুন খেয়াল চেপেছে।

এখানে যদি থাকতে হয় নিবেদিতাকে আবার 'কেঁচে গণ্ডূষ' করতে হবে। পরে তিনি বলতেন, 'সব-কিছু নির্ভর করে সংগঠন-শক্তি আর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির 'পরে। এখন ঠিক স্বামীজির মত আমার সব কাজের দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে নিতে পারি। জনতার স্তুতি আর ঔদাসীন্য দুয়ের পরীক্ষাতেই উতরে গেছি। ক্রমেই বুঝতে পারছি যে, কারও ব্যর্থতা বা সার্থকতার জন্য যে নিজে পুরোপুরি দায়ী নয়। যারা সহযোগিতা করবে তাদের সামর্থ্যের উপরেও অনেক-কিছু নির্ভর করে।' একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল, এখন একবার সব খতিয়ে দেখতে হবে। 'এই যে কাজ করছি এর মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা কতখানি ঢুকেছে? ভারতের মেয়েদের জন্য যে ভিক্ষা করছি তা কি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবেই করছি? মা গো! শুধু সেবা করবার আনন্দেই যেন যুগের পর যুগ সেবা করে যেতে পারি।' তখন এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। (২০শে এপ্রিল ১৯০০ ও ১৮ই জানুয়ারী ১৯০০র চিঠি থেকে)

দীর্ঘ দিন পথে-পথে কাটানোর ফলে শরীরের যে ধকল আর অবসাদ তার কাছে নিবেদিতাকে হার মানতে হল। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এটা অনুমান করে স্বামীজি লিখলেন, 'আদরিণী নিবেদিতা, প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করছি তোমায়। কোন মতেই মুষড়ে পড় না। শ্রী ওয়াহ্ গুরু! শ্রী ওয়াহ্ গুরু! তোমার শিরায় ক্ষত্রিয়ের রক্ত। আমাদের এই গেরুয়া হল কুরুক্ষেত্রে মরণের সাজ। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপাত, সাফল্য অর্জন নয়। শ্রী ওয়াহ্ গুরু! শিব বলেছেন, "আমিই ধাতা। আমি হাত তুলি, সব মিলিয়ে যায়। আমি ভয়েরও ভয়—আতঙ্কেরও আতঙ্ক। আমি অভয়, এক, অদ্বিতীয়। আমি নিয়তির নিয়ন্তা মহাকাল! শ্রী ওয়াহ গুরু! বৎসে, অবিচল থেক, সোনা দিয়ে বা কিছু দিয়ে কেউ যেন তোমায় কিনতে না পারে···।'

নিবেদিতা মৃদু গুঞ্জনে বললেন, 'শিব! শিব! মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি কর্মের শক্তি, ব্যক্তের মধ্যে সুব্যক্তির আকৃতি। যখন সব শেষ হবে, তখন শিবের প্রসাদে জানব সেই একক···অব্যক্ত নির্বিশেষ অখণ্ডকে···কিন্তু কাজ যে এখনও শুরুই হল না···'

নিবেদিতা জুনের আগে নিউইয়র্কে ফিরতে পারলেন না। লেগেটদের ওখানে মিস্ ম্যাকলয়েড আর মিসেস্ বুল ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক হল। নিবেদিতা ভেবেছিলেন সটান ভারতে ফিরে যাবেন, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা স্বামীজির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য রকম স্থির করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব, দলের সবাই প্যারিসে চলেছে, নিবেদিতাও চলুন, ওখানে কয়েক মাস কাজ করবেন। প্যাট্রিক গেড্ডেস ওঁর সহযোগিতা চাইছেন। এতে নিবেদিতার নানান রকম সুযোগ-সুবিধা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

রিজলী ম্যানরে প্যাট্রিক-দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়। এই জীববিৎ পণ্ডিত তাঁর 'রূপান্তরবাদ' সম্বন্ধে নিবেদিতার কৌতূহল জাগিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সবিস্তারে ভারতবর্ষের নানা কথা বলেছেন নিবেদিতা। তাঁর সহযোগিতা করলে তিনি কি ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তা নিবেদিতা জানতে পারবেন; তাঁর কাছে ইওরোপীয় ইতিহাসের নাড়ীর খবর মিলবে এবং শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে। নিবেদিতা প্যারিস যেতে রাজী হলেন। আরেকটা আনন্দের কথা, প্যারিসে থাকলে জগদীশ বোসের সঙ্গে দেখা হবে। তিনি তখন ইওরোপ আসছেন। মিসেস্ বুক ইংল্যাণ্ডে আর আমেরিকায় অনেক চেষ্টা করে তাঁকে একটা বৃত্তি জোগাড় করে দিয়েছেন, ওটা অনেক দিন চলবে।

নিবেদিতাকে তখনই রওনা হতে হয়। 'প্র্যাট ইনষ্টিটিউশনে' 'হিন্দু নারীর আদর্শ' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েই যাত্রা করবেন এই ঠিক হল। স্বামীজিও সেদিন নিউইয়র্কে এসেছেন। এই প্রথম ওদেশে নিবেদিতাকে ভারতের কথা বলতে শুনলেন, এই শোনাই শেষ। অনাড়ম্বর অথচ দৃপ্ত ভঙ্গী নিবেদিতার, হিন্দুর চেয়েও খাঁটি হিন্দু, দেখলেই মনে দোলা লাগে। তাঁর অধ্যাত্ম-মাতৃভূমির কথা বলছিলেন, যেন আলো ঠিকরে পড়েছিল সারা অঙ্গ হতে।

কৃতার্থতার আনন্দে আচার্যের চোখে জল এল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ফ্রান্সে

প্যাট্রিক গেড্ডেসের সঙ্গে কাজ করবার জন্য নিবেদিতা প্যারিসে এসে গুছিয়ে বসলেন। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে একত্রে দু'জন কাজ করলেন মাত্র তিন সপ্তাহ। একটা বিষয়েও ওঁরা একমত হতে পারেন না। আসলে কাজটার ধরন কি হবে তা' নিয়েই দু'জনের প্রকৃতিগত বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা নীরস ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত সব কিছুর অবসান ঘটল।

উনিশ শতকের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে এক জন সংগঠকের কাজ করবার জন্য প্যাট্রিক গেড্ডেসকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিষয়গুলো দৈনন্দিন ভাষণের সাহায্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করা ছিল তাঁর দায়। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে, সমাজ-বিজ্ঞানে, এবং যাকে তিনি Geotechnics বলতেন বিজ্ঞানের সেই বিশেষ বিভাগে কাজ করে গেড্ডেস সুনাম অর্জন করেছিলেন, বিজ্ঞান-জগতে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। জরুরী কাগজপত্র হাতের কাছে যুগিয়ে দেওয়া, তাঁর ভাষণগুলোর সংক্ষিপ্তসার তৈরী করা আর মাস তিনেকের মধ্যে কাজের উপযোগী একটা গ্রন্থাগার গড়ে তোলা—এই সব ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার গেড্ডেস নিবেদিতার উপর ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। নিবেদিতাকে বেছে নেওয়াটা সুবিবেচনার কাজই হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে এ সব কাজে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিলে আরও ভাল হত। তার বদলে গেড্ডেস তাঁকে গ্রহণ করলেন নির্ভরযোগ্য এক জন সেক্রেটারী হিসাবে শুধু। এ অবস্থায় দু'জনের মধ্যে খাঁটি সহযোগিতার ভাবটি আসতে পারে না।

দিন-দিন গোলযোগ বেড়েই চলে। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত নিবেদিতা আর গেড্ডেস একসঙ্গে কাজ করেন। গেড্ডেস কেবলই ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'এটা নিশ্চয়ই করতে পারবে, পারবে না?' ওদিকে নিবেদিতা মনে-মনে বোঝেন ভাল রকমের একটা মুসাবিদা করবার বা চুম্বক লেখবার যোগ্যতা তাঁর মোটেই নাই। মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখলেন, 'আমি যেন জেরবার হয়ে গেলাম। উনি চাইছেন ওঁর চিন্তাকে ওঁরই মত করে ভাষায় রূপ দেবে এমন এক জনকে। কিন্তু আমি যা খাড়া করছি তাকে বলা যেতে পারে কথার "মোজেয়িক"—ঝকঝকে কথার

টুকরোগুলো ওঁর, আমি কেবল ব্যাকরণ মাফিক বাক্য রচনার ধূসর সিমেণ্টে সেগুলো বসিয়ে চলেছি। বুঝতেই পারছ এ হেন রচনা কী রকম পঙ্গু!' (১লা জুলাই ১৯০০ সালের চিঠি)

আরেকটা মূলগত প্রভেদ ছিল দু'জনের যুক্তিধারায়—যা আরও মারাত্মক। জীবতত্ত্ববিশারদ হিসাবে গেড্ডেস বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই চরম সত্য বলে জানতেন। তার ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে মাপতেন তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্কের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে। প্যাট্রিক গেড্ডেসকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন নিবেদিতা; তাঁর বন্ধুত্বের দামও কম দিতেন না। তবুও ব্যবহারের ওপারে পরমার্থই যে চরম সত্য এ কথা নিবেদিতার অনুভবে একান্ত স্বচ্ছ। এইখানে গেড্ডেসের সঙ্গে তাঁর ধাতুগত প্রভেদ।

তবুও হাল ছাড়েন না নিবেদিতা। সারা দিন প্রদর্শনী-হলে ছুটোছুটি করে অনেক রাত পর্যন্ত লেখার খসড়া তৈরী করেন। এমনি করে ব্যর্থতার পর্বটা কাটিয়ে ওঠা—সেও তো তাঁর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

জুলাই-এর প্রথমে বোসেরা প্যারিসে পৌঁছলেন। প্রথমেই ওঁরা দেখা করলেন গেড্ডেসের সঙ্গে। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে দুই বৈজ্ঞানিকের আলাপ হল, অন্ততঃ বাইরে থেকে মনে হল তাই। সবে মাত্র জগদীশ বোস বিজ্ঞান-কংগ্রেসের দরবারে তাঁর আবিষ্কার পেশ করেছেন—'জড়ের উপর বিদ্যুৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া।' গাছপালার মাঝেও যে চেতনার অস্তিত্ব আছে এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তিনি সহজ ভঙ্গিতে গেড্ডেসকে বুঝিয়ে বলেন। বলেন 'পুরাদস্তুর প্রাণ-বস্তু জীব ওরা, তবে ওদের নাড়ীতন্ত্র খুব সূক্ষ্ম ধরনের। আচার্য বসু অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী, গেড্ডেসের ঠিক তার বিপরীত। বোসের মতে দেশের গণ্ডিতে বাঁধা থেকেও বস্তুর বিচিত্র সমাহারে দুর্জ্ঞেয় এক তত্ত্বের আভাস ফুটে উঠতে পারে। বিশ্ব জুড়ে অনন্ত প্রকাশস্বরূপের বিভূতিজালকে অন্তরে অনুভব করেন বোস। ঋষিরা তাঁকেই দেখেছিলেন কবির দৃষ্টিতে। জীবসত্ত্বকে সীমিত বলতেন না তাঁরা, বলতেন 'জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ' —জ্যোতির ধারা বয়ে চলেছে আধারে-আধারে, বুদ্ধিই তার গ্রহীতা।'

দু'দিন না যেতেই রাজধানীর সমাজ-আবর্তে বোসের পাক খেতে লাগলেন। লেডি বেটি সে সময় প্যারিসে ছিলেন, তিনিই বিদগ্ধ গোষ্ঠীর আনুকূল্য করতেন। যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে তাঁর সেলুন—নামজাদা সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ্, শাসন পরিষদের সদস্য আর মঞ্চাভিনেতাদের শ্রীক্ষেত্র।

আসবা মাত্র স্বামীজিও এই রসিক সমাজের খপ্পরে পড়লেন। কিন্তু নিজেকে তিনি ক্রমেই গুটিয়ে নিচ্ছিলেন—তাঁর মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা, আবার ভারতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মিসেস্ লিগেট তাঁর বাড়িতে গিয়ে নিরিবিলি থাকবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু স্বামীজি তাঁর ফ্রেঞ্চ শিষ্য জুল বোয়ার কাছেই রয়ে গেলেন। ভদ্রলোক ছোট একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন।

মিসেস্ বুল গরমের কালটা ব্রিটানীতে কাটাচ্ছিলেন। বেলুড়ের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য স্বামীজির সঙ্গে তিনি দেখা করতে এলেন। স্বামীজি সব ভার তাঁকেই ছেড়ে দিলেন। এ নিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করা, চাঁদা আদায়ের নতুন-নতুন পরিকল্পনা করা—মিসেস্ বুলই ওসব করবেন। চার দিকের অসংখ্য সমস্যায় স্বামীজি যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন।

মাস কয়েক আগে করুণ ভাবে মিসেস্ বুলকে লিখেছিলেন, 'তুমি নিশ্চয় আমায় ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; যাবে না?' নিজেকে একেবারে ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে—বলেছিলেন, 'দিশারী হিসাবে নিজের চেয়ে তোমার 'পরে বেশী ভরসা আমার···তোমার ভিতর দিয়েই মা আমায় এখন পথ দেখাচ্ছেন···আমি যে তাঁর অবোধ ছেলে। আমায় যা-ই করতে হ'ক না কেন, আমার সব শক্তি যে তোমায় দিয়ে দিয়েছি, এটা স্পষ্টই অনুভব করি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু বলা আর আমার আসবে না···তাতে আমি খুশী। এখন ছুটি চাই। ক্লান্ত হয়েছি যে তা নয়, কিন্তু এবারে আর কথা নয়—একটু ছোঁয়াতেই কাজ হবে মন্ত্রের মত। শ্রীরামকৃষ্ণের মত। কথা বলার দায় তোমার, আর ছেলেদের ভার দিয়েছি মার্গটকে। ওসবের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নাই। আমি খুশী, ছুটি নিলাম স্বেচ্ছায়। কেবল এখান থেকে সরিয়ে ভারতে নাও আমাকে, নেবে না কি? মা তোমাকে দিয়ে নেওয়াবেনই জানি···।' (১৭ই জানুয়ারী আর ৪ঠা মার্চ ১৯০০র চিঠি থেকে)

প্যারিসে মিস্ ম্যাকলয়েডের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতেন স্বামীজি। উনি তাঁর দিশারী। আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভার কার্যকলাপ বোঝবার জন্য স্বামীজি ফ্রেঞ্চ শিখতে শুরু করলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের আলোচনায় বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগ। প্যারিস আর ফ্রান্সের উদারতা তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করে। অপরা বিদ্যার কী সমৃদ্ধি এখানে! কিন্তু এ নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে যেন একটু বিব্রত ভাবে উত্তর করেন, 'আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও তোমরা? আমার ভাবনা আর ভাষায় রূপ ধরে না, দৃষ্টির মোড় ফিরেছে ভিতর পানে। এখন আছি নতুন এক ভূমিতে।'

মিসেস্ লিগেটের বাড়িতে গান-বাজনার সান্ধ্য আসর বসে। কখনও কখনও বিবেকানন্দ ওখানে যান। এমা কালভে সে-যুগের জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁর গান শুনে স্বামীজি আনন্দ পেতেন। এর আগে আমেরিকার সব বক্তৃতা-সভাতেই এমাকে দেখেছেন। এক সন্ধ্যায় বললেন, 'যে ভূমিকায় তুমি সব চেয়ে আনন্দ পাও, সেই ভূমিকায় তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে। কি সে ভূমিকা বল তো?'

এমার মুখ-চোখ আগুন-রাঙা হয়ে ওঠে। বলেন, 'যখন কার্মেন সাজি, তখন মনে হয় ঘর-ছাড়া বাঁধন-ছেঁড়া যাযাবর তরুণী আমি। কিছু মনে করবেন না, স্বামীজি—প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসরে আমার অজানতে আমি অমনি হয়ে পড়ি।' 'আমি গিয়ে শুনব'—স্বামীজি বলেন। বাধা দিয়ে নিবেদিতা বলে ওঠেন, 'কিন্তু সে যে অসম্ভব স্বামীজি। থিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না, দারুণ সমালোচনা সইতে হবে তা হলে।' অবাক হয়ে নিবেদিতার পানে তাকান স্বামীজি। নিরুত্তরে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় মিঃ লিগেটের সঙ্গে নাট্যমঞ্চে গেলেন স্বামীজি। বিরতির সময় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শিল্পীর নেপথ্য-গৃহে। স্বামীজিকে দেখে কোরাস গায়িকারা বলাবলি করে 'বীর গম্ভীর সৌম্যদর্শন ইনি কে? আমাদের এমার সম্বন্ধে ওঁর এত ঔৎসুক্য?' এমা বিব্রত ভাবে ওঁকে অভ্যর্থনা জানান।

'তোমার কারমেন দেখতে এসেছিলাম এমা', স্বামীজি বলেন। 'তাকে খারাপ ভেবো না। সেও সত্য। সে তো মিথ্যা বলে না ···তার উদ্দামতায় আত্মস্বরূপকেই অনাবৃত করে সে। যে মহীয়সী নারীরা প্রার্থনার শেষে ম্যাডোনাকে বলেন, "মা গো, আমার কথায় কান দিও না তুমি, আমি যে কামনার আগুনে পুড়ে মরতে চাই মা"···তাদেরই জাত সে।'

পরদিন লিগেটের বাড়িতে স্বামীজি অনুরোধ করেন, 'অনুষ্ঠানের শেষে সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুললে যে-গানে, আমায় সেটি গেয়ে শোনাবে, এমা? ওটি আমি শিখতে চাই।'

'দি মার্সেইল্যাজ? কিন্তু ও যে সমর-সঙ্গীত স্বামীজি, কামান গর্জে উঠছে, সৈন্তরা হুঙ্কার ছাড়ছে···'

'হ্যাঁ, ঐ গানটিই। ও-গানে নির্ভয়ের আগুন জ্বলে তোমাদের অন্তরে, দেশকে ভাল বেসে তার জন্ত প্রাণ দেবার প্রেরণা পাও তোমরা, তাই না? কল্পনায় দেখতে পাও, কিছু-না ভেবেই নাগরিকরা কোন্ অদৃশ্য শক্তির আহ্বানে মাথা তুলে দাঁড়াল। আমার ছেলেদের এ-গান শেখাব।'*

স্বামীজির ধরন-ধারনে নিবেদিতা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। দেখা দু'জনের কমই হয়···হলেও সেটা সুখের হয় না। তাঁদের মধ্যে যে-স্বচ্ছতা ছিল তা যেন আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিবেদিতাকে স্বামীজি বলেন, 'আমি এখন স্বাধীন, স্বাধীন···জন্মসূত্রে এ-স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন যা-কিছু করছি তার কোনটারই কোনও ভার নাই। আবার যেন শিশু হয়ে গেছি।' যুক্তরাষ্ট্রে নিবেদিতার অভিযানের ফল কি হল কান দিয়ে তা প্রায় শুনলেনই না, প্যাট্রিক গেডেস্‌সের ব্যাপারে নিবেদিতাকে কোনও পরামর্শ দিতে নারাজ হলেন। এক ভারতে ফিরে যাওয়ার কল্পনাতেই তাঁর যা কিছু আগ্রহ।

স্বামীজির কয়েক জন বন্ধু মতলব করছিলেন ওঁর সঙ্গে মিশর পর্যন্ত যাবেন। সেখান থেকেই উনি ভারতে পাড়ি জমাবেন। মিস্ ম্যাকলয়েড আর এমা কাল্‌ভে নিকট-প্রাচ্য দিয়ে ধীরে-সুস্থে সফর করবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন—নিবেদিতাও সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু প্যারিসের গুপ্তবিদ্যা সম্প্রদায়ের নামজাদা জনকয়েক পাণ্ডা এঁদের সঙ্গে যাবেন শুনেই নিবেদিতা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। স্বামীজি কিন্তু কোনও আপত্তি তুললেন না। তাঁর কাছে সব কিছুই যেন বাস্তব ঘটনাচক্রের বাইরে একটা অদ্বৈত ভূমিতে কেন্দ্রিত হচ্ছে—সেখানে তো কোনও দ্বন্দ্ব নাই।

নিবেদিতা যখন বললেন, এমন পাঁচমিশেলী দলে তিনি থাকলে তাঁর দুর্নাম হবে। স্বামীজি জবাব দিলেন, 'ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। কি হয়েছে তাতে? তোমাদের মধ্যযুগীয় গির্জার তোরণের পানে নজর করে দেখনি কখনও? আগে-আগে চলেছেন মহামানব, পরমপিতার ইচ্ছায় আপনাকে তিনি সঁপে দিয়েছেন। তাঁর ঠিক পিছনে দেখবে সব সময় একটা শয়তান লেগে আছে। পায়ের তলায় যে-ফুল ফুটেছে তাদের কুড়িয়ে নিতে শেখ, ভাল চোখে দেখ সব-কিছুকেই, কাদার ছিটে যদি গায়ে লাগে—তবুও। অখণ্ড মণ্ডলাকারে জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন তিনি—সকল-কিছুর-ভাল মন্দ বিচার করা কি আমাদের কাজ? অনেক দিন আগে হিমালয়ে মায়ের একটা মন্দির দেখেছিলাম—ভাঙাচোরা, মুসলমানেরা ধ্বংস করেছে; অহঙ্কার নিয়ে ভাবলাম, "সে সময়ে যদি থাকতাম মা, তোমায় রক্ষা করতাম, এর চেয়েও বড় মন্দির তৈরী করে দিতাম তোমায়।" কিন্তু ভাবনায় বাধা দিলেন মা নিজেই, শুনতে পেলাম বলছেন, "এই ভাঙা মন্দিরেই থাকা আমার খুশি তা জানিস্। নইলে এখানে কি সাততলা সোনার মন্দির গড়তে পারতাম না আমি? তুই আমাকে রক্ষা করিস না আমি তোকে রক্ষা করি?"

এত দিন দু'জনের মধ্যে চাপা পড়া যে কলহটা শুধু ধোঁয়াচ্ছিল হঠাৎ তা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। নিবেদিতা রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এই তেজের জন্যই তাঁকে স্নেহ করতেন স্বামীজি, তা বলে রেয়াৎ করতেন না তাঁর ধৃষ্টতাকে। 'তুমি যেমন জেদী তেমনি একরোখা—ঠিক আমি যেমনটি ছিলাম। তোমার চালচলনে এখনও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রয়েছে। মায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দাও। কি ভাল আর কি মন্দ তা বেছে নেওয়ার অভিমান এখনও তোমার রয়েছে। সুযোগ পেলেই নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাক। ভেদবুদ্ধি যাতে ছাড়তে পার নিজের অন্তরে সেই শক্তি অর্জন কর। কেমন করে তা করবে আমি জানি না। অন্তরের অন্তঃস্থলে ডুবে যাও, সংস্কারের সকল ছাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে—তবেই-না কূল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর। তখনই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে। যে-পাঁকের ছোঁওয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়েই গড়বে প্রতিমা, তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না; তুমি শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল।'

কিছু না বুঝে নিবেদিতা মন্ত্রের মত আউড়ে যান, 'সৃষ্টি···শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল।' যেন দেখতে পান, তাকে ঘিরে পুতুল-নাচের পুতুলের মত জনতা পাগল হয়ে নাচানাচি করছে—সেই ভিড়ের ঠেলায় গুরু তাঁর কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। কিন্তু কেন?

'······যে প্রীতির সঙ্গে তাঁর মানুষ-ভাবকে মেনে নেওয়া উচিত তা আমার আসে না, বা সে যোগ্যতাও আমার নাই।' মিস্ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা লেখেন, 'স্বামীজি যে-আঘাতে আমায় ছিটকে দিয়েছেন তা আমার পাওনা বটে···ও এক রকম ভালই হয়েছে। ভাবী যুগের হিন্দু নারীর স্বপ্ন দেখছেন তিনি—তাদের জন্য আর তাঁর জন্যই আমায় বেঁচে থাকতে হবে, এ ছাড়া আর কোনও অবলম্বন আমার নাই। এ কথা আজ যেমন সত্য হয়ে উঠেছে এর আগে এমনটি আর কখনও হয়নি। খুব আশ্চর্য, না? অথচ তাঁর কাছে কোনও চিঠি বা কোন খবর পাঠাতে হলে কিংবা তাঁর সাথে ব্যবহারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে তাঁকে এক রকম 'গতজীবন' বলেই ধরে নিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও ভাব মনে আসছে না।' (২৬শে আগষ্ট ১৯০০ সালের চিঠি)

নিজের মনের সঙ্গে নিবেদিতাকে ভয়ানক যুঝতে হয়। সে সময় স্বামীজির ঐ কথাগুলোর মানে হাতড়াতে থাকেন, 'জীবন্ত সৃষ্টির তপস্যা করে যাবে তুমি।' দেওয়ার অধিকার হতে যদি বঞ্চিত হই এ জীবনে আর কোনও আনন্দ কি অবশিষ্ট থাকতে পারে? ভাবতে থাকেন নিবেদিতা,···শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝতে পারেন, যখন কেউ কিছু দেয় তখনও তার মাঝে মমত্বের দাবি থাকে, আত্মোৎসর্গের

---

* বহু বৎসর পরে এমা ভারতে এলে বেলুড় মঠ দেখতে যান, তখন যে-সাধুরা স্বামীজির কণ্ঠে 'লা মার্সেইল্যাজ' শুনেছেন, তাঁরা এমাকে ওটি গাইতে অনুরোধ করেন।

মাঝেও খুব সূক্ষ্ম হয়ে ঐ বোধটাই জেগে থাকে। নিবেদিতা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এ-আবিষ্কারে! ধীরে-ধীরে একটা নির্বাক্ স্তব্ধতায় অন্তর অভিভূত হয়ে এল। তার পর হঠাৎ নিজের ভুলটা দেখতে পেলেন। সন্ন্যাস নিয়েছেন যে-মুহূর্তে তখন থেকেই এ-ভুলটাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন তিনি—মায়ের কাছে চেয়েছেন নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি বর, গুরুকে যেন সাফল্যের একখানি জয়মাল্য উপহার দিতে পারেন। যাকে তিনি ভেবেছেন অনাসক্তি, আসলে সে সুগুপ্ত আসক্তি শুধু। নিবেদিতা কাজ করেছেন গুরুরই মুখ চেয়ে, মহাশক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্য সৃষ্টির তপস্যায় ডুবে যান নি তো। তাই আমেরিকার অপ্রত্যাশিত সাফল্য বা প্যাট্রিক গেডেসের সহযোগিতায় তাঁর ব্যর্থতা, এর কিছুই স্বামীজি গ্রহণ করেননি! মুক্তহস্ত যাঁর, তিনি নেনও না, দেনও না।

'তুমি কেবল সৃষ্টিই করে যাবে'—শতবার এক কথা আউড়ে যান নিবেদিতা। 'গোধূলির ম্লান আলোয় কাঁটাবনে যেন এসে পড়েছি আমরা—বেরোবার কোনও পথ নাই। সেই পথহারা মরুকান্তারে সব চাইতে মজার হল এই মায়া-মরীচিকা যে অন্যকে সাহায্য করবার স্বপ্ন দেখি আমরা, আশার চোরাগলিতে হাবুডুবু খাওয়ায় ঐ স্বপ্নগুলোই······নিতে চাই না আমরা, কিন্তু দেওয়ার স্বপ্ন সহজে যায় না। যাক, দুঃখ সয়ে তো যেতে পারি!······ আমাদের গর্ব, অকারণ কর্মব্যস্ততা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, অহঙ্কার, অন্যের সম্বন্ধে অবজ্ঞা আর অধৈর্য এ-সব কখনও যাবার নয়! আয়েসী হওয়ার চেয়ে এগুলো ভালো বটে······কিন্তু এগুলিকে উৎখাত করা ওর চেয়ে হাজার গুণে শক্ত······' (মিসেস্ বুলকে লেখা ১৩ই আগষ্ট ১৯০০র চিঠি)

মিসেস্ বুলকে লেখেন, 'মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হল জ্ঞান লাভ করা। জানতে চাই। বৃহৎ কেউ আছেন। শক্তিহীন আর আশাহীন হলেও ভালবাসতে যে চাই কাউকে সে-বিষয়ে আমরা সচেতন। এমন কারও সন্ধান চাই যিনি সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁর খবর জানি না এ খুবই ঠিক কথা। স্বামীজি অলৌকিক উপায়ে সে-জ্ঞান যদি আমাতে সঞ্চারিত না করেন তা হলে নিজে থেকে তার নাগাল পাব এমন আশাও রাখি না। এখন এইখানে এসে ঠেকেছি। শুধু বাইরের দুনিয়া আর তিনি, আর সব-কিছু তিক্ত-চিত্তে সয়ে যাওয়া। যা চাই তা কি দেবেন উনি? দেবেন কি? হায় রে······আজ চুপি চুপি বলি তোমায়, দিতে উনি পারবেন না। এর আগে ওঁকে চেষ্টা করতে দেখেছি আমি। পারলে এর মাঝেই উনি আমায় দিতেন। সত্যকে লাভ করেছেন তিনি, দেওয়ার শক্তিও রাখেন। কিন্তু আমার নিজেরও কিছু করবার আছে—অথচ সে-সাধ্য আমার নাই, সত্যিই নাই। এমন চাওয়া কি জেগেছে যার জন্য হেন জিনিষ নাই যা ছাড়া না যায়? নিজের মন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনা-লালসা এ কি কেউ ছাড়তে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ আর উনি কি কি ছেড়েছেন? কি তাঁরা ছাড়েন নি তাই বল।'

এই ব্যাকুল আর্তনাদের উত্তরে মিসেস্ বুল লেখেন, 'বৃটানিতে চলে এসো, আমার কাছে। সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার মনের ভার হাল্কা হয়ে যাবে।' বৃটানির মানুষের মুখে-চোখে নিয়মানুবর্তিতার ছাপ, বৃদ্ধাদের মুখে স্নিগ্ধ শান্তি, আকাশে-বাতাসে আলো আর রূপের ছড়াছড়ি—নিবেদিতা এর কিছু কি দেখেছিলেন? ও-দেশের সাগর-পাড়ি-দেওয়া ভিখারীদের দেখলে মনে হয় সন্ন্যাসী। কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে ওরা ফিরছে বেদনার এক তীর্থ হতে আর এক তীর্থে। ঝড়ে-জলে, রোদে-বাতাসে ক্রুশগুলি ক্ষয়ে এসেছে, তাতে বিদ্ধ মহামানবের পায়ের তলায় কি প্রার্থনা জানায় ওরা? ঘরের জন্য প্রাণ কাঁদছে ওদের—নিবেদিতা কান পেতে শোনেন ওদের আবেদন, ওদের ব্যাগপাইপের গান। চড়া রোদে চোখ ঝলসে যায়। এমনি করে কত দিন একঘেয়ে কেটে গেল, ওঁর মনে একটি প্রশ্নেরই তোলাপাড়া। 'তাঁকে জানতে হলে এমনই তীব্র সংবেগ চাই ইচ্ছার যে—তাঁর তরে সব কিছু ত্যাগ করতে তুমি প্রস্তুত। আমি প্রস্তুত কি? রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ কী ত্যাগ করেছিলেন—কিংবা কী তাঁরা ত্যাগ করেন নি? আমি কি তাঁদের পথে চলবার জন্য তৈরী হয়েছি? স্বামীজি বলেছিলেন, সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন জ্বরের মত—যেখানে যে-ভাবেই থাকুন না কেন তার জন্য প্রাণপাত না করে তাঁর সোয়াস্তি নাই। একমনে অষ্ট প্রহর বসে থেকেছেন একটুও নাড়াচাড়া না করে। এমন করে চাইতে পেরেছে কে?

এ-প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নিবেদিতা গুরুকে লিখতে যান। কিন্তু চিঠিখানা এলোমেলো হয়ে গেল। তাঁর মনে যে-বেদনা এবং যা নিয়ে তাঁদের মতদ্বৈধ তারই কথা বড় হয়ে উঠল তার মধ্যে।

স্বামীজি উত্তর দেন মর্মস্পর্শী দীনতা নিয়ে—'এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম···আমি এখন স্বাধীন, কোনও কাজে আমার কোনও অধিকার নেতৃত্ব বা ক্ষমতা আমি রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষপদও ত্যাগ করেছি।

'সব বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায় কী যে খুশী হয়েছি। এখন সত্যিই আমি সুখী···আর আমি কারও প্রতিনিধি নই, কারও কাছে কোনও দায়ও আমার নাই। বন্ধুদের সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ববোধ ছিল, সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। বেশ ভেবে দেখেছি, আমি কারও কোনও ধারও ধারি না। যদি ঋণ কোথাও থেকে থাকে, তার বদলে মরণ পণ করে আমার যা কিছু ঐশ্বর্য তা বিলিয়ে দিয়েছি, বিনিময়ে পেয়েছি কেবল শাসানি, কেবল বজ্জাতি আর আমাকে জ্বালিয়ে-খাওয়া।

'তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়, আমি তোমার নতুন বন্ধুদের ঈর্ষার চোখে দেখি। এই শেষবারের মত বলছি, আমার যা দোষই থাক, আমি হিংসুটে নই, লোভী নই বা কারও উপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছাও রাখি না। ছোটবেলা হতেই এগুলো আমার মাঝে ছিল না।

'এর আগেও তোমায় কখনও চালনা করিনি; আর এখন যখন কাজের বাইরে চলে গেছি, তোমায় কোনও নির্দেশ আমার দেবার নাই। শুধু এই জানি, যত দিন প্রাণ ঢেলে মায়ের কাজ করবে তিনিই তোমায় চালিয়ে নেবেন।

'যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও না কেন তাতে আমার ঈর্ষা হবার কিছুই নাই। আমার গুরুভাইরা যার সঙ্গেই মেলা-মেশা করুক না কেন আমি কখনও তাদের কিছু বলি না। কেবল একটা কথা ঠিক জানি, পশ্চিমের লোকের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে—তাদের নিজেদের কাছে যা ভাল সেটা পরের ঘাড়েও জোর করে চাপাতে চেষ্টা করে, মনে থাকে না যে তাদের কাছে যা ভাল অন্যের কাছে

তা ভাল না-ও হতে পারে। সেই জন্যই ভয় হয়, নতুন বন্ধুর সংস্পর্শে এসে তোমার মন যখন যেদিকে ঝুঁকবে, অন্যদেরও তুমি সেই দিকে জোর করে টানতে চাইবে। শুধু এই জন্যই কখনও-কখনও বিশেষ ধরণের কোনও প্রভাব বিস্তারে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি, আর কিছু নয়।

'তুমি স্বাধীন, তোমার পছন্দ-অপছন্দ তোমার নিজের, আমার কাজও তাই·········শত্রু হ'ক বা মিত্র হ'ক—সকলেই মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র, তাদের দিয়েই মা সুখে-দুঃখে আমাদের কর্মক্ষয় করান। এমনি করেই মায়ের করুণা ঝরে পড়ে সবার 'পরে।

আমার স্নেহাশিষ। বিবেকানন্দ।'

(২৫শে আগষ্ট, ১৯০০র চিঠি)

নিজের উপর ধিক্কারে নিবেদিতার চোখের জল ঝরে। পর-পর যে সব ঘটনায় গুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটছে, তার বেদনায় অন্তর যেন রক্তাপ্লুত হয়ে ওঠে। মনে-মনে বলেন, নির্বোধ, যে-আগাছার জঞ্জালে দম আটকে আসছে তা উপড়ে ফেলতে পার না?···মাঠে-মাঠে হু-হু হাওয়ায় বেদিশা ঘুরে বেড়ান, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ফিরে আসেন ঘরে। 'স্বামীজি আমার মনে যে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন তার শেষ কণাটিকে নিবিয়ে না ফেলা পর্য্যন্ত আমি ইউরোপে থেকেই কাজ করব। ওঁর স্মৃতি যত দিন না সরে যায়, ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার যত দিন না ঘোচে তত দিন এই পণ। কোথায় যাব আমি? মাগো? যে-ব্রতে আমায় ব্রতী করতে চাও তুমি, তা কি আমাকেই বেছে নিতে হবে? আমার সব বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার পায়েই সঁপে দিলাম মা!'

নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মিস্ ম্যাকলয়েডকে চিঠি লেখেন, বলেন, 'বছরের পর বছর স্বামীজির পার্শ্বে তুমি থাকবে দেখতে পাচ্ছি······কোনও দিন হয়তো আমিও এসে তোমার চরণ ছুঁয়ে যাব। তোমার মত আমিও তাঁকে ভালবাসি, বিচ্ছেদ-বেদনায় আর তোমার মধ্য দিয়ে সেকথা বুঝতে শিখেছি। বড় আশ্চর্য্য, না?' (১৯শে আগষ্ট ১৯০০র চিঠি)।

দূরের দিগন্ত স্পষ্ট হল যখন মিসেস্ বুল এবার শীতকালে নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে যাবার আমন্ত্রণ পাঠালেন।* বোসেরাও যাবেন।

যাওয়ার কয়েক দিন আগে মিস্ ম্যাকলয়েডের আসার খবর পাওয়া গেল। স্বামীজি আসার কয়েক ঘণ্টা আগে উনি এলেন। শান্তির বার্ত্তা নিয়ে স্বামীজি এলেন পেরোগিরেক্-এ।

নিবেদিতাকে স্বামীজি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। অজানা রাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা নিবেদিতার, তাঁর ভাগ্যে কি আছে কিছুই জানেন না। বাইরে স্বামীজি অবিচল। কিন্তু নিবেদিতা লক্ষ্য করেন, ওঁর মনেও এই ভাবনার ছায়া পড়েছে যে বিদেশে আনুকূল্য পেতে হলে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিপজ্জনক। এত লোককে বিশ্বাসভঙ্গ করতে দেখেছেন স্বামীজি যে নতুন আরেকটা দল ছাড়ার সংবাদ পেতে তিনি যেন সদাই প্রস্তুত। 'আমার এটা সঙ্কট মুহূর্ত্ত, তিনিও তা বুঝতে পেরেছেন।' (মাই মাষ্টার অ্যাজ আই সি হিম, পৃঃ ২৬৩)

ডুবুরী যখন সমুদ্রে নামে, তার মনটা যেমন হয় নিবেদিতার মনের ভাব ঠিক সেই রকম। মুক্তো তুলে আনতে পারব কি? পারব কি গায়ে জড়িয়ে যাওয়া শেওলার জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলতে, যে দুর্বার স্রোত কেবলই উপর পানে টেনে নিতে চায় তার বাধা কাটিয়ে উঠতে পারব তো? কোথায় সে শুভ্র-শুচি অজানা রত্নের ঝলক। মুক্তো যদি খুঁজে পাই, নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে, মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দেব।'

যাওয়ার আগের দিন, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর স্বামীজি ওঁকে বাগানে ডাকলেন। আশীর্বাদ করবেন, তাই! 'শক্তিধর পুরুষ যখন কর্মী তৈরী করে দূরে সরে যান, এই নিয়ম। কারণ, তিনি কাছে থাকলে এরা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারবে না। আমি এখন তোমার কেউ নই। আমার যা শক্তি ছিল তা তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধু সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর মুসলমান আছে তারা নাকি এমন ধর্মান্ধ যে শিশু জন্মাতেই তারা তাকে বাইরে ফেলে রেখে বলে, "ভগবান যদি বানিয়ে থাকেন তো মর্, আর আমি যদি তোকে প্রাণ দিয়ে থাকেন তো বাঁচ।" নব জাতককে তারা যা বলে, আমিও আজ রাত্রে তোমায় তাই বলছি—অবশ্য উলটো করে। যাও জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি, তুমি টিঁকবে না, আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন অমৃতা হয়ো।' (১৯০২ সালের ২৪শে জুলাইর একখানি চিঠি ও 'মাই মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্', পৃঃ ২৬৩ হতে)।

'আমি চললাম। গুরু আমার! রাজা আমার! পিতা আমার! তোমার জয় হোক। তোমার করুণার তোমার মহিমার পারাপার দেখি না দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে হাত রেখেছেন আমার মাথায়।'

পরদিন সকালে নিবেদিতা চেপে বসলেন এক চাষীর গাড়িতে। তাঁকে ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুয়ারে গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। সারা গ্রাম তখনও ঘুমের কোলে, হাওয়া কনকনে, ভোরের আলো ঝলমল করছে। ভঁরর-ভঁরর নিশ্বাস ছেড়ে ঘোড়া চলল খটখটিয়ে। রাস্তা যেখানে বনের মধ্যে ঢুকেছে সেখানে এসে পিছন ফিরে তাকালেন নিবেদিতা। দেখলেন, আরক্ত উষালোকে পথের পাশে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ! দু'টি হাত মাথার উপরে তোলা। নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করছেন।

•

দু'বছর পরে মিসেস্ বুলকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'মনে আছে বোধ হয়, বৃটানির সেই শেষ দিনের সুন্দর সন্ধ্যায় স্বামীজি আমায় মুক্তি দিয়েছিলেন—সব কিছু আগে থেকে দেখবার পড়বার মুক্তি, বলেছিলেন, "এও তো মা।"

'ভাবি, যদি মরে যাই, তুমি যেন খোকাকে* নিয়ে সেই বাগানখানি দেখিও, যেখানে স্বামীজি তাঁর চরম ও পরম আশীর্বাদ দিয়েছিলেন আমাকে—দিয়েছিলেন তাঁর ঋষি-ব্রতের উত্তরাধিকার।' (ধীরা মাতাকে লেখা, ১২ই জানুয়ারী ১৯০৬) [ক্রমশ

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

---

* ১৯০০ সালের ১২ই মার্চ্চ স্বামীজি মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখেছিলেন, 'আমি নিবেদিতাকে তোমার হাতে দিলাম, জানি তুমি ওকে দেখবে।'

* জগদীশ বোসকে নিবেদিতা এই নামে ডাকতেন।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৬

জেলের ভিতর নিত্য ট্রাইবুন্যাল বসছে। বিপ্লবদ্রোহীদের বিচার চলছে অবিরাম। আগামী কাল যাদের বিচার হবে তাদের নামের তালিকা বের হয় আগের দিন সন্ধ্যায়। জেলাররা বন্দীদের পড়ে শোনায় সে নামের তালিকা। বলে—'শোন বন্ধুরা, খবরের কাগজে তোমাদের নাম বেরিয়েছে।'

নাম পড়েছে আগামী কালের বিচার-সভায়। যে তালিকায় ডার্নের নাম তাতে সব শুদ্ধ তেইশ জনের নাম পড়েছে। তাদের মধ্যে পাত্তা পাওয়া গেল সব শুদ্ধ কুড়ি জনের। এক জন বন্দী ইতিমধ্যেই মরে বেঁচেছে আর দু'জনের বিচারের আগেই ফাঁসী হয়ে গেছে। লোকের স্মৃতিপট থেকেও মুছে গেছে তাদের নাম।

পরদিন পনের জনের বিচারের শেষে চার্লস ডার্নের ডাক পড়ল। আগের পনের জনের বিচারে সাক্ষীদের ভিড় ছিল না। বিচার হয়ে রায় দিতে সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক। রায় হল গিলোটিনে মাথা দিয়ে মৃত্যু।

পালকের টুপি মাথায় বিচারকেরা নিজেদের আসনে সমাসীন। জুরীরা বসে আছেন আর রয়েছে দর্শকবৃন্দ। এত দিন যারা ছিল সমাজের নীচুতলার বাসিন্দা, অবর, অধঃপতিত, অনাহারী, আজ তারা জুরীর সামনে বসেছে। বসেছে বিচারকের আসনে। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ সশস্ত্র। মেয়েদেরও কারুর কারুর হাতে কোমরে ছুরী-ছোরা ঝুলছে। দর্শকদের প্রথম সারি অলঙ্কৃত করে বসে আছে ডিফার্জ। সীমান্ত অতিক্রম করার পর এই প্রথম তাকে দেখল ডার্নে। ডিফার্জের পাশেই মাদাম। মাদাম দু'-এক বার ফিস্‌ফিস্ করে কি বললে ডিফার্জের কানের কাছে মুখ নিয়ে। আর প্রেসিডেন্টের আসনের নীচেই বসে আছেন শান্ত সমাহিত ডাক্তার ম্যানেট। তাঁর পাশে মিঃ লরি। বিপ্লবীদের দলে এঁরাই দু'জন বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

বিপ্লবীদের উকিল ডার্নেকে প্রথমেই দেশত্যাগের অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। আইনের বিধানে দেশত্যাগীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার যোগ্য। ফ্রান্সের সীমানায় ধৃত হয়েছে আসামী। মৃত্যুই তার শাস্তি।

—'রাষ্ট্রের শত্রুর মাথা চাই। গিলোটিন, গিলোটিন'—করে চীৎকার করে উঠল সশস্ত্র জনতা। হত্যার নেশায় উন্মত্ত জনতার মুখে ঐ আওয়াজ যেন লেগেই আছে। জনতাকে শান্ত করার জন্য হাতুড়ী পেটালেন প্রেসিডেন্ট। আবার জিজ্ঞেস করলেন বন্দীকে—দেশত্যাগ করে ইংলণ্ডে বহু দিন বাস করছে, এ সত্য অস্বীকার করে কি আসামী ?

ডার্নে অস্বীকার করতে পারলে না সে-কথা।

আসামী নিজেই দেশত্যাগের কথা স্বীকার করেছে। আর কিছু বলবার আছে তার ?

আছে বই কি। আইনের বিধানে একে দেশত্যাগী বলে না। কেন নয় ?

—'কারণ স্বেচ্ছায় আমি রাজ-উপাধি ত্যাগ করেছি—ত্যাগ করেছি অপ্রীতিকর আভিজাত্যের অধিকার। দেশত্যাগ করে ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম স্বাধীন জীবিকার খোঁজে। বিলাসী ধনীদের মত অত্যাচারিত নিরীহ ফরাসী প্রজাদের শ্রমার্জিত অন্নে লোভের ভাগ বসাইনি।'

—'আসামীর উক্তির কি প্রমাণ আছে ?'

—'ডাঃ ম্যানেট ও নায়েব গ্যাবলকে আমি সাক্ষী মানছি।'

—'কিন্তু আসামী ত বিয়ে করেছে ইংলণ্ডে।'

—'বিয়ে করেছি সত্যি, কিন্তু কোন ইংরেজ মহিলাকে নয়।'

—'আসামীর স্ত্রী কি ফরাসী নাগরিক ?'

—'হ্যাঁ। প্রিয় ফ্রান্স তার জন্মভূমি।'

—'আসামী স্ত্রীর নাম ও বংশ-পরিচয় দিক।'

ডাক্তার ম্যানেটের কন্যা—লুসি ম্যানেট আসামীর বিবাহিতা পত্নী। ডাক্তার ম্যানেট এখানে উপস্থিত আছেন। মহান্ আদালত তাঁকে জেরা করতে পারেন।

এই উত্তরে ক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত শান্ত হল। মহান্ ডাক্তারের জয়ধ্বনিতে বিচার-সভা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট আবার প্রশ্ন করলেন—'কেন সে এত দিন বিদেশে বসবাস করছে—এই ক্রান্তিকালে কেন বিনা অনুমতিতে ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করতে এসেছিল ?'

এত দিন সে ফিরে আসেনি তার কারণ স্পষ্ট। ফ্রান্সে যে সম্পত্তির ভোগ-অধিকার স্বেচ্ছায় সে ত্যাগ করে গিয়েছিল তা ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের আর কোন উপায় ছিল না তার এখানে। ইংলণ্ডে সে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকতা করে নিজের ও পরিবারের অন্ন উপার্জন করে। বর্তমানে সে এসেছে এক ফরাসী নাগরিকের কাতর আবেদনে—তার অনুপস্থিতিতে লোকটির নাকি প্রাণ-সংশয় ঘটেছে। সেই হতভাগ্য নাগরিককে রক্ষা করার জন্যই নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে ফিরে এসেছে ফ্রান্সে। রাষ্ট্রের চোখে তার এই উদারতা কি অপরাধ বলে গণ্য হবে ?

জনতা সমস্বরে রায় দিল—না।

আবার প্রেসিডেন্টের হাতুড়ী বেজে উঠল জনতাকে শান্ত করার জন্য। কিন্তু শান্ত হল না জনতা—ক্রমান্বয়ে জিগীর তুলতে লাগল —'না—না। আসামী নিরপরাধ।'

—'যার প্রাণ বাঁচাতে এসেছিল আসামী, তার নাম ?'

সে আসামীর দ্বিতীয় সাক্ষী। নাগরিক গ্যাবেল।

যে চিঠিখানি লিখেছিল গ্যাবেল সীমান্তরক্ষীরা সেটি আসামীর অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, হয়ত প্রেসিডেন্টের সম্মুখে রাখা দলিলপত্রের মধ্যেই সেটি পাওয়া যাবে।

চিঠিখানি যাতে থাকে তার জন্যে পূর্বেই ব্যবস্থা করেছিলেন ডাক্তার। চিঠিখানি আদালতে পড়া হল। চিঠির সত্যতা প্রমাণের জন্য গ্যাবেলকেও প্রেসিডেন্টের সম্মুখে হাজির করা হল।

সওয়াল জবাবে সাক্ষী জানাল, এ্যাবয় জেলে সে এত দিন বন্দী ছিল। মাত্র তিন দিন আগে তাকে ট্রাইবুন্যালের সমক্ষে হাজির করা হয়েছিল। চার্লস ডার্নে ধরা পড়ায় তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিচারে মুক্তি পেয়েছে সে।

এবার ডাক্তার ম্যানেটের জেরা সুরু হল। ডাক্তারের প্রভূত

জনপ্রিয়তা ও বক্তব্যের স্পষ্টতায় প্রভাবান্বিত হলেন বিচারকেরা। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন তিনি মুক্তি পেলেন তার পর থেকেই বন্দী তাঁর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর কন্যার প্রতিও কর্তব্যপরায়ণ সে। বন্দী ফ্রান্সের অভিজাত শাসনতন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে ইংলণ্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতের জীবন যাপন করছে। সেখানেও ইংলণ্ডের অভিজাত সরকার কর্তৃক সে দেশের শত্রু ও যুক্তরাজ্যের বন্ধু হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিল। ইংরেজ ভদ্রলোক মিঃ লরি, যিনি এখানে বিচার-সভায় উপস্থিত আছেন সেই বিচারের তিনি এক জন প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ডাঃ ম্যানেটের বক্তব্য শ্রবণের পর জুরীরা সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে বন্দীকে নির্দোষ বলে রায় দিলেন। মুক্তি পেল বন্দী। ট্রাইবুন্যালের রায়ে জনতার সন্তোষের অবধি রইল না। যে জনতা এখুনি হত্যার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, তারাই এই অভিজাত শত্রু বিপ্লবী বন্ধুকে সাগ্রহে তুলে নিলে। বন্দীর মুক্তি-বার্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের বাইরে আনন্দের রোল উঠল।

ডার্ণেকে একটি বড় চেয়ারে বসিয়ে রক্তপতাকা উড়িয়ে জনতা তাকে কাঁধে করে বহন করে নিয়ে চলল তুষার-ঢাকা পথ দিয়ে। ডাঃ ম্যানেট আগেই বাড়ী ফিরে এসেছিলেন লুসিকে খবরটি দিতে। ডার্ণে এসে যখন তার সামনে দাঁড়াল আবেগের আতিশয্যে বিবশ হয়ে তার কোলে ঢলে পড়ল লুসি।

লরিও এলেন হাঁফাতে-হাঁফাতে। চিরবিশ্বস্ত মিস্ প্রসও এল। ডার্ণে সকলকেই তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল বারে বারে।

দু'জনে একান্ত হলে লুসি বললে—'রোজ আমি ভগবানকে ডেকেছি। প্রতিদিন তাঁর কাছে তোমার মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাতুম।

—'তোমার বাবা আমার জন্যে যা করেছেন আজকের ফ্রান্সে তা আর কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। কী অমানুষিক—'

এক দিন তিনি যেমন মেয়ের কোলে মাথা রেখেছিলেন আজ ছোট্ট মেয়ের মত পরম নির্ভয়ে বাবার বুকের উপর তেমনি মাথা রাখল লুসি। মেয়েকে যে তিনি সুখী করতে পারলেন, এই তাঁর পরম গৌরব।

—'অমন করে কাঁপছিস কেন মা? ঐ দেখ না তোর চার্লসকে আমি নিয়ে এসেছি। কাঁদছিস কেন মা লুসি?'

৭

তবু কেন যেন লুসির ভয় ঘোচে না। কি এক নামহীন আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

চারি দিকের পরিবেশ কেমন যেন চাপা ছমছমে। মৃত্যু নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে সারা দেশটা। হত্যা হয়েছে নেশা। হিংস্র হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষ। অহেতুক সন্দেহের বশে বা হীন প্রতিহিংসার জন্যে কত নিরীহ লোকের প্রাণ যাচ্ছে গিলোটিনের শাণিত কোপে। এ কথা কেমন করে ভুলে থাকবে লুসি যে তার স্বামীর মতই কত নিরপরাধ নির্দোষ লোক জনতার কোপে জীবন হারালে। তারাও ত কোন কন্যা-জননী-জায়ার আদরের ধন—পরম প্রিয়জন। তবু ভাগ্যবতী সে, কেন না সে-নিষ্ঠুর নিয়তির বজ্রমুষ্টি থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছেন বাবা। এ সব যখন ভাবে লুসি, কান্না ঠেলে আসে চোখের দু'তট ছাপিয়ে। শীত-সন্ধ্যার কালো পক্ষছায়ায় ঢেকে যায় চারি দিক। নিষ্প্রদীপ পথে শব-শকটগুলির ভয়াবহ ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ কানে আসতেই লুসি স্বামীর কাছে আরো ঘন হয়ে বসে। কাঁপুনি বাড়তে থাকে বুকের।

বাবা তাকে অভয় দেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন—রক্ষা করেছেন মেয়ের স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। এক দিন তিনি ছিলেন প্রায় উন্মাদ—স্মৃতিভ্রংশ দুর্বল। আজ বিরাট বনস্পতির মত তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে সবাই—এ তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।

চারি দিকের এই ভীতি ও অবিশ্বাসের রাজ্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনই যেন বানচাল হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জিনিষ-পত্তর কেনাকাটি করা হয় প্রতি সন্ধ্যায়—তাও স্বল্প পরিমাণে নানা ছোট-ছোট দোকান থেকে যাতে না সন্দেহের সৃষ্টি হয়। গুজব ও ঈর্ষার কারণগুলি থেকে শত হাত দূরে থাকাই এখন প্রয়োজন। যত দিন না এ দেশ ত্যাগ করে তাঁরা নিরাপদে যেতে পারছেন ইংলণ্ডে।

আগুনের ধারে ঘন হয়ে বসে লুসি আর তার স্বামী; তার বাবা ও মেয়েটি। লরিও শীগগির ব্যাঙ্ক থেকে এসে পড়বেন। মিস্ প্রস আলো জ্বেলে দিয়ে যায় ঘরে। ঠাকুর্দার হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে নাতনী পরীর গল্প শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। চারি দিক নীরব নিঝুম।

—'ও কিসের শব্দ'—হঠাৎ আঁতকে উঠল যেন লুসি।

ডাক্তার ম্যানেট গল্প বলা থামিয়ে বললেন—'মা, তুমি বড্ড ভয়কাতুরে হয়ে পড়েছ আজকাল। একটুকুতেই অত ঘাবড়ে যাও কেন? সাহসিনী হও মা।'

ধরা-গলায় ফ্যাকাশে মুখে বললে লুসি—'আমার মনে হল, সিঁড়িতে যেন কাদের পায়ের শব্দ পেলাম।'

—'সিঁড়ি ত মৃত্যুর মত নিঃসাড় পড়ে আছে মা।'

কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় করাঘাত হল।

—'ঐ যে বাবা। তুমি লুকিয়ে পড়। বাবা, বাঁচাও ওকে।'

—'কেন উতলা হচ্ছ মা। তোমার চার্লসকে আমি বাঁচিয়ে এনেছি। বাঁচিয়েছি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ছিঃ, এ কি দুর্বলতা তোমার! আমি দেখছি কে।'

ডাক্তার ম্যানেট বাতী হাতে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দ করে মাথায় লাল টুপি, হাতে পিস্তল, কোমরে ছোরা, রুক্ষ চেহারা চার জন লোক ঘরে প্রবেশ করল।

—'চার্লস ডার্ণে আছেন'—বললে প্রথম জন।

—'কে খোঁজ করছে তার?' প্রশ্ন করল ডার্ণে।

—'আমি। আমরা। আপনাকে চিনি আমরা—আজকের ট্রাইবুন্যালের বিচারের সময় দেখেছি। চার্লস ডার্ণেকে রাষ্ট্রের বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

লুসি আর মেয়ে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। তবু ডার্ণেকে চার জনে ঘিরে ফেলল।

—'কেন আবার আমাকে বন্দী করা হচ্ছে জানতে পারি কি?'

—'এক্ষুণি আবার জেলে ফিরে যেতে হবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি। আগামী কাল সব জানতে পারবেন। আগামী কালই বিচার হবে।'

ডাক্তার ম্যানেট এতক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বক্তার হাত চেপে ধরে বললেন—'ওকে চেনেন বললেন। আমায় চেনেন কি?'

—'চিনি বই কি!'

—'আপনি আমাদের সকলেরই পরিচিত ডাক্তার। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন।'

তাদের মুখের দিকে নীরব দৃষ্টি মেলে নীচু-গলায় বললেন ডাক্তার—'এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও, কেন ওকে আবার বন্দী করার হুকুম হল। কি ওর অপরাধ?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম লোকটি বলল—Saint Antoineএর দল কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়েছেন উনি। এই লোকটি সেখান থেকেই আসছে'—দ্বিতীয় লোকটিকে দেখিয়ে দিল প্রথম।

'কি অভিযোগে?'

—'এর বেশী আর জানতে চাইবেন না ডাক্তার! রাষ্ট্র আমাদের কাছে যা দাবী করছে বিপ্লবী হিসেবে তা হাসিমুখে স্বীকার করতেই হবে আমাদের। রাষ্ট্রের দাবী প্রথম। জনতার দাবী দুর্লঙ্ঘ্য।'

—'আর একটি কথা'—ডাক্তার প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন—'অভিযোগকারী কারা তাদের নাম জানতে পারি কি?'

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে অবশেষে নীচু-গলায় বললে—এ প্রশ্ন বে-আইনী। তবে আপনি যখন জানতে চাইছেন বলছি। অভিযোগকারীদের নাম—মঁসিয়ে ও মাদাম ডিফর্জ। আরো এক জন আছেন।'

—'কে সে?'

এবার এক অদ্ভুত দৃষ্টি মুখে এনে বলল লোকটি—'এ প্রশ্নের উত্তর আজ নয়। আগামী কাল আদালতে সব জানতে পারবেন। কিন্তু আর নয়। চলুন চার্লস ডার্ণে!'

তৃতীয় পর্যায়

৮

মুক্তির দু'ঘণ্টার মধ্যেই চার্লস ডার্নে যে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হয়েছে এ সংবাদ মিস প্রস আর তার সঙ্গী কেউই জানতে পারেনি। তারা তখন প্যারিসের পথে সংসারের সওদা করতে ব্যস্ত। মুদীর দোকানের খুঁটিনাটি কেনার পর বাড়ী ফেরার পথে হঠাৎ প্রসের মনে পড়ল মদের কথা। ভাল মদের আশায় দু'জনে ন্যাশান্যাল প্যালেসের কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়ে উঠল।

পথের কলরব আর থমথমে আবহাওয়ার পর এই দোকানটির নির্জ্জন শান্তিতে এসে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রস। ইংগিতে দেখিয়ে দিল দোকানীকে কোন মদ কতখানি তার দরকার।

একটি লোক একখানি কাগজ থেকে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছিল লাল টুপী-পরা সঙ্গীদের। সেই শব্দ ভিন্ন সব স্তিমিত এখানে। উত্তাল উন্মত্ত নগরীর তরঙ্গোচ্ছাসের মধ্যে এটি যেন একটি নিভৃত শান্ত দ্বীপ। এখানে বিপ্লবীদের মাথার টুপীর রঙও যেন ফিকে লাল মনে হল এই সন্ত্রস্ত বিদেশী খরিদ্দারদের চোখে। দোকানের এক কোণে দু'জন লোক ফিসফিস করে কথা কইছিল। এক জন উঠে চলে যাবার সময় তার মুখোমুখী হতেই প্রস বিস্ময়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল।

চকিতে সমস্ত দলটি ঘুরে দাঁড়াল তাদের দিকে। আজকাল এ-রকম হঠাৎ আর্ত্ত চীৎকার ওঠার মানেই খুন হওয়া। কে খুন হল দেখতে মুখ ফেরাতেই তাদের চোখে পড়ল দু'টি আতঙ্ক-স্তব্ধ বিস্মিত নরনারীর মুখ।

দু'-জনে মুখোমুখী। এক জনের সর্বাঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সাজ আর একজন ইংরেজ। প্রসের অবাক চোখের চাউনিতে এক জন্মের সমস্ত বাক্য-প্রবাহ যেন নিরুদ্ধ স্তব্ধ। আর তার সঙ্গী ক্রানচারের চোখেও বিহ্বল বিমূঢ়তার অবধি নেই।

নীচু রূঢ় গলায় ইংরেজীতে বললে লোকটি—'কি চাও তোমরা এখানে?'

দু'টি হাত সশব্দে জড়ো করে নিয়ে কণ্ঠে মমতা বাড়িয়ে বললে প্রস—'সলোমন—আমার সলোমন। এত দিন পরে এমনি করে তোর দেখা পেলাম ভাই।'

—'ও নামে খবরদার ডাকবে না আমায়'—ভয়ার্ত্ত চঞ্চল চোখে চারি দিকে তাকিয়ে বললে লোকটি—'খবরদার ডাকবে না। খুন করাবে নাকি আমায়।'

—'কেন অমন নিষ্ঠুরের মত কথা কইছিস ভাই? কি আমি করেছি তোর?'

—'কথা কইতে চাও ত চুপচাপ জিনিষ নিয়ে বাইরে চলে এস। সঙ্গের ও লোকটা কে?'

—'ও ত ক্রানচার।'

—'ওকেও চলে আসতে বল। আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন? আমি কি ভূত নাকি?'

প্রস দাম মিটিয়ে দিলে মদের। সেই অবসরে লোকটা তার সঙ্গীদের ফরাসী ভাষায় কি সব বুঝিয়ে দিতেই তারা নিঃশব্দে যে যার আসনে ফিরে গেল। আবার সব ঝিমিয়ে পড়ল দোকানের ভিতরে।

বাইরে নিরিবিলি গা-ঢাকা আঁধারে দাঁড়িয়ে সলোমন বললে—'কি চাও বল?'

'একটা মিষ্টি কথা বল ভাই। কেন অমন শুকনো-গলায় কথা কইছিস?' নিতান্ত দায় গোছের করে বোনের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালে সলোমন—'হোল ত?'

ঘাড় দুলিয়ে সাড়া দিল প্রস। তেমনি নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

—'তোমরা আমায় অবাক করতে পারোনি। শুধু তোমরা কেন—ইংলণ্ড থেকে এখানে যারা আসে কেউ-ই আমার নজর এড়ায় না। কিন্তু আর নয়—এবার আমায় নিষ্কৃতি দাও। আমি এদের অফিসার, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে গেলে আমার নিজের প্রাণ-সংশয়।'

'বলিস কি ভাই'—প্রসের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না—'ওখানে থাকতে তোর কত ভরসা আমরা করতাম। তুই ছিলি দেশের ভবিষ্যৎ। আর এখানে বলিস কি তুই—তুই হলি বিপ্লবীদের অফিসার? এর চেয়ে যে—'

—'ঠিক জানি'—বোনের কথায় থাবা দিয়ে বললে সলোমন—'ঠিকই বুঝেছি—তুমি আমার মরণই চাও। তারই ব্যবস্থা করতে এসেছ এত দূর।'

আচম্বিতে লোকটির কাঁধে হাত দিয়ে জেরী বললে—'একটা কথা। আপনার নাম জন সলোমন না সলোমন জন?'

—'তার মানে?'

—'আপনার বোন বলছে সলোমন। আমি জানি জন। কি নাম ছিল আপনার সমুদ্দুরের ওপারে?'

—'তাতে কি দরকার?'

—'দরকার আছে বই কি। তুমি হলে গিয়ে বেলী জেলের গোয়েন্দা। তোমার নামটার দরকার আছে বই কি। জানা নামটা পেটে আসছে মুখে আসছে না।'

—'ওর নাম বরসাদ'—বলতে বলতে সকলকে অবাক করে দিয়ে উপস্থিত হলেন সিডনী কার্টন। বললেন—'ভয় পেয়ো না মিস্ প্রস। কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছি মিঃ লরির ওখানে। তিনিও কম অবাক হননি আমায় দেখে। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমার ঐ করিৎকর্মা ভাইটির সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার। এখানকার জেলের টিকটিকি—'

ফ্যাকাশে মুখে বরসাদ প্রতিবাদ করার উপক্রম করতেই সিডনী কার্টন তাকে থামালেন—'চুপ কর জেলের টিকটিকি। আজ বিকেলে জেলের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তোমায় প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ঐ মুখ। ঐ মুখ কি মানুষ সহজে ভুলতে পারে? কিন্তু ঐ মুখ আর আমার তোমার ঐ সব বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে চাল-চলন দেখেই একটা মতলব এসেছে আমার মাথায়। তোমাকে নিয়েই তা সিদ্ধ হবে—তোমাকে দিয়েই ঠিক হবে। সেই তখন থেকে তোমার পিছু ছাড়তে পারিনি দেখছ না—'

—'কি মতলব আপনার?'

—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে চাও ত বলতে পারি। কিন্তু সে তোমার পক্ষে হবে সাংঘাতিক। তার চেয়ে চল না কেন টেলসন ব্যাঙ্কের নিরিবিলিতে—'

—'আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?'

—'ভয়ের কথা আমি বলেছি?'

—'তবে টেলসনেই বা যেতে বলছেন কেন?'

—'সে কথা নাই শুনলে বারসাদ?'

—'অর্থাৎ আপনি কারণ বলবেন না?'

—'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই।' বললেন কার্টন।

সিডনী কার্টনের মুখ-চোখের বেপরোয়া ঔদাসীন্য দেখে বরসাদের বুঝতে বাকী রইল না যে এ মানুষটির সঙ্গে তার কোন ফাঁকিই চলবে না। বিষাক্ত হিংস্র সাপ মুহূর্তে বশ হল। তবু বোনের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললে বরসাদ—'আমার যদি কোন ক্ষতি হয় বুঝব যে তোমার জন্তেই তা হোল।'

—'থাক থাক—খুব হয়েছে'—ধমক দিয়ে উঠলেন কার্টন—'অকৃতজ্ঞ অমানুষের মত কথা বলো না। তোমার দিদিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাই, নইলে সামান্ত ব্যাপারের জন্তে তোমার সঙ্গে এমন ভদ্রতা আমার না করলেও চলত। তুমি আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবে কি না?'

—'চলুন যাচ্ছি।'

—'কিন্তু তার আগে তোমার দিদিকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে। আসুন মিস্ প্রস, আমার হাত ধরুন। এই সময় এমন অরক্ষিত অবস্থায় পথে বেরোনো আপনাদের ঠিক হয়নি। চল বরসাদ, এগোও।'

ভাই তার যত অন্যায়ই করুক, তবু স্নেহময়ী প্রস তার কোন ক্ষতির কথা ভাবতে পারে না। সিডনী কার্টনের আশ্চর্য আচরণের অর্থ না বুঝে তার দিকে মিনতিভরা চোখে তাকাল প্রস। দেখলে সেই মানুষটির প্রসন্ন চোখে কি এক অবোধ্য উজ্জ্বল দীপ্তি। সেই দীপ্তিতে মনের কুয়াশা কেটে গেল প্রসের—অজানিত আশঙ্কা দূর হল।

প্রস ও তার সঙ্গীকে পথের বাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এগিয়ে গেলেন কার্টন টেলসন ব্যাঙ্কের দিকে। জন বরসাদ ওরফে সলোমন প্রস তার সঙ্গী হল।

সান্ধ্য আহার সেরে গনগনে আগুনের মুখোমুখী বসেছিলেন লরি। কার্টনের সঙ্গে অপরিচিত লোকটিকে দেখে সবিস্ময়ে তাকালেন তাদের দিকে।

—'মিস্ প্রসের ভাই—বরসাদ।'

পরিচয় শুনেই লরি সামান্ত বিচলিত হলেন, বললেন—'নামটার সঙ্গে যেন পরিচয় হয়েছিল কোন সময়ে। মুখ দেখেও চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।'

—'বোসো বরসাদ'—বলে সিডনী কার্টন নিজেও আসন নিলেন। তার'পর সেই পরিচয় স্পষ্ট করে দেবার জন্তে বললেন—'চেনা বৈ কি। ও-মুখ কেউ ভুলতে পারে না সেই কথাই বলছিলাম এতক্ষণ ওকে। বেলী জেলের বিচারে রাজসাক্ষী বরসাদকে মনে পড়বে আপনার।'

আগন্তুকের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছেন লরি। দেখে কার্টন বললেন—'তবু ভাল যে বরসাদ মিস্ প্রসের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর দুঃসংবাদ আছে মিঃ লরি। ডার্নে আবার গ্রেপ্তার হয়েছে।'

—'বলেন কি?'—অতর্কিত ধাক্কায় অভিভূত হয়ে পড়েন লরি—'বলেন কি মিঃ কার্টন!' এই যে ঘণ্টা দুই হোল ওকে নিরাপদে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে এলাম। এখুনি একবার ওদের খবর নেবও ভেবেছিলাম। কিন্তু কি হোল কিছুই ত বুঝতে পারছি না।'

—'আমিও বুঝতে পারছি না। এই বরসাদ সব খবর জানে। ওর মুখেই আমি খবরটা প্রথম শুনলাম। আশ্চর্য হবেন না মিঃ লরি। মদ খেতে খেতে আর এক টিকটিকিকে জানাচ্ছিল বরসাদ খবরটা। আমি তা শুনে ফেলি। তাকে নিরাপদে জেলেও পৌঁছে দিয়েছে এতক্ষণে ওরা। কি, আমি ঠিক বলিনি বরসাদ?'

লরির সপ্রশ্ন চোখের দিকে চেয়ে কার্টন বললেন—'কাল আবার ওকে বিচার-সভায় হাজির হতে হবে তাই বলছিলে না তুমি বরসাদ? হয়ত এবারও ডাক্তার ম্যানেটের আত্মীয়তা তাকে মুক্ত করতে পারবে। কিন্তু কি জানি কেন এবার আমি বড়ো নার্ভাস

হয়ে পড়ছি মিঃ লরি। ডাক্তার ম্যানেটের প্রতিপত্তি মনে রাখলে ডার্নের পুনর্বিচারের কথাটা কেমন যেন অসংলগ্ন বোধ হয়—'

—'কিন্তু ডাক্তার হয়ত আগে জানতেই পারেননি।'

—'জানা-না-জানার প্রশ্ন নয় মিঃ লরি। বিপ্লবীরা ত জানে যে ডার্নে তাদের ডাক্তারের প্রাণের প্রাণ। তবে?'

এ কথার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না লরি। এই অকল্পনীয় বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত বিচলিত ভাবে বসে রইলেন বক্তার মুখের দিকে চেয়ে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন সিডনী কার্টন—'এ বড় ছন্নছাড়া সময় মিঃ লরি! জীবন-মৃত্যুর এই বেহিসেবী জুয়োখেলার পণের পরোয়া রাখলে চলবে না। দান ফেলতেই হবে—কেউ জিতবে, কেউ সর্বস্ব খোয়াবে। ডাক্তার জিতুন, আমি হারার দান ধরছি। আজ আর প্রাণের দাম নেই। নইলে এখুনি যাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম—কাল হয়ত তাকে হারাতে হবে। না মিঃ লরি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই জুয়ো আমি ধরব। ভগবান না করুন, যদি হারার খুঁটি পড়ে আমাদের, এই বরসাদ তাকে বাঁচাবে।'

—'ভাল তাস আছে ত হাতে?'

বরসাদের কণ্ঠে চকিত হয়ে তাকালেন সিডনী কার্টন। বললেন—'দেখা যাক, কি তাস ওঠে হাতে। মিঃ লরি, আমি একটু গলাটা ভিজিয়ে নেবো।'

—'সানন্দে'—বললে, লরি, তাঁর দিকে পানপাত্র এগিয়ে দিলেন।

গলা ভিজিয়ে নিয়ে একবার আরামের নিশ্বাস ফেললেন কার্টন। তার পর বরসাদকে লক্ষ্য কার বললেন,···'ভয় কি? তাস যা পেয়েছি হাতে মোক্ষম জিনিষ। জাতে ইংরেজ—নাম ভাঁড়িয়ে ফরাসী। আগে ছিলে ফরাসী রাষ্ট্রের শত্রু ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের চর—এখন ডিগবাজি খেয়ে ফরাসী বিপ্লবের গোয়েন্দা টিকটিকি। এ কি সোজা তাস ভাবছ বরসাদ! এখনো ত মাইনে খাচ্ছ ইংরেজ রাজার—কি বল?'

—'আমি টেক্কা মারছি বরসাদ, তুমি তাস ফেলো। এই ত কাছেই বিপ্লবীদের আড্ডা, গিয়ে তোমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি চলো। তাড়াতাড়ি করো না, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই—ভেবে বল।'

বরসাদের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সিডনী কার্টন আর এক পাত্র মদ নিজে ঢেলে নিলেন। তার দিকেও এগিয়ে দিলেন এক গ্লাস, তার পর শান্ত কণ্ঠে বললেন—'ভাল করে ভেবে তাস ফেলবে বরসাদ। আমি তোমায় সময় দিচ্ছি।'

তার জালিয়াতীর কথা বেফাঁস হলে বিপ্লবীদের হাতে কি চরম শাস্তি সে পাবে, সে কথা ভেবে বরসাদ অন্তরে অন্তরে শিহরিত হল। এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব তার পক্ষে। গিলোটিনের ধারাল লোহা সমস্ত দেশ জুড়ে তার আতঙ্কিত ছায়া বিস্তার করে রেখেছে—তার থেকে পরিত্রাণ নেই কোন বিশ্বাসহন্তার।

রক্তহীন মুখে কার্টনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বরসাদ অনেকক্ষণ। তার পর লরির দিকে ফিরে বললে—'আপনিও ত জ্ঞানী লোক—বয়োবৃদ্ধ। আপনিই বলুন ত, ওঁর মত ভদ্রলোকের পক্ষে এই ধরণের হীন কাজে নেমে আসা কি উচিত, না ওঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে মানায়? আমি ত গোয়েন্দা—চর—টিকটিকি—আমি ত অন্নের জন্যেই এই ইতরামি করছি, কিন্তু তাই বলে উনিও যদি সেই নোংরামির মধ্যে—আপনিই বলুন—'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কার্টন যেন আপন মনেই বললেন—'বৃথা বাক্যব্যয় কোরো না বরসাদ। আমার হাতে সময় বেশী নেই—আমি তাস ফেলেছি, তোমার যা করবার করো।'

—'আমার দিদিকে আপনি শ্রদ্ধা করেন শুনেছি—সে ক্ষেত্রে আপনার পক্ষে—'

—'তোমার মত ভায়ের হাত থেকে আমি তাকে মুক্তি দিতে চাই বরসাদ। তোমার বক্তব্য তুমি বলে ফেল—আমার হাতে সময় বড় কম।'

তবু তাকে বশ করতে পারছেন না দেখে অধৈর্য কণ্ঠে কার্টন বললেন—'শুধু তাই নয়। আমার হাতে রঙের বারো তাস আছে বরসাদ। যে টিকটিকির সঙ্গে তুমি কথা কইছিলে, তার নাম কি, কি জাত তার?'

—'ফরাসী—'

—'মিথ্যে কথা। ইংরেজ। তার ফরাসী আলাপে স্পষ্ট বিদেশী টান আমি শুনেছি। তুমি আমায় ধাপ্পা দিতে পারবে না বরসাদ—সে-চেষ্টাও তুমি করো না। সে হোল ক্লাই। পুরোনো বেলী জেলের সেও এক দাগাবাজ গোয়েন্দা টিকটিকি। যতই ছদ্মবেশ ধরো, আমার চোখকে তোমরা ফাঁকি দিতে পারবে না।'

—'আপনি এইবার ভুল করলেন স্যার। ক্লাই ত কবে মরে গেছে। তাকে আমরা লণ্ডনে কবর দিয়েছিলাম। লোকটাকে কেউ দেখতে পারত না, তাই ভয়ে তার শবযাত্রায় আমি যোগ দিতে পারিনি, কিন্তু তার মৃতদেহ আমি নিজে হাতে কফিনে দিয়েছিলাম যে! এই দেখুন না তার সার্টিফিকেট আমার কাছে রয়েছে। দেখুন হাতে করে—এ ত আর জাল নয়।'

—'নিজের হাতে কফিনে দিয়েছিলে, না?'

কাঁধের উপর লৌহ-মুষ্টির চাপ পড়তেই চমকে ফিরে তাকাল বরসাদ। তার পর হঠাৎ সামনে জেরীকে দেখে আমতা আমতা করে বললে—'হ্যা—'

—'তাকে বের করে নিয়েছিল কে?'

—'তার মানে?'

—'তার মানে সব জিনিষটাই বানানো-সাজানো। কফিনের ভেতরে মাটী-পাথর দিয়ে তোমরা ভেবেছিলে খুব লোক ঠকিয়েছ। কিন্তু আমি জানি আর আমার দুই বন্ধু তারা জানে—'

—'তুমি কেমন করে জানলে—'

—'তাতে তোমার কি বিশ্বাসঘাতক! তোমার মত লোককে খুন করলেও গায়ের জ্বালা জুড়োয় না। দেশে-বিদেশে কত নিরীহ লোককে তুমি ফাঁসীতে, গিলোটিনে পাঠালে—'

উত্তেজিত জেরীকে হাত ধরে শান্ত করলেন কার্টন। বললেন—'তোমার কত রহস্য আমরা জানি দেখছ ত বরসাদ! তোমায় গিলোটিনে পাঠাবার তুরুপের টেক্কা এই আমার হাতে ধরা—কি বলতে চাও বল?'

—'আমায় দয়া করুন।' কাতর কণ্ঠে বললে বরসাদ—'আমার অপরাধ এই আমি কবুল করছি। কি করব ইংলণ্ডে থাকলে ওরা আমায় নিশ্চয় প্রাণে মারত। তাই প্রাণভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। আর ক্লাইকে এমন করে না মৃত্যুর অভিনয় করলে সবাই মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলত সেদিন, ' কিন্তু এই লোকটা—এই লোকটা—এই লোকটা কি করে জানতে পারলে—,আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এতক্ষণে নির্বিষ নির্বীর্য বরসাদ আত্মসমর্পণ করলে কার্টনের কাছে। বললে—আমার ডিউটির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কী প্রস্তাব ছিল আপনার বলুন। সাধ্য মত আমি তাতে রাজী হব। আমার মাথা এখন আপনার হাতে—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার আর দাম কি? বলুন আপনি।'

সিডনী কার্টন স্পষ্ট প্রশ্ন করলেন—'জেলে তোমার অবাধ গতিবিধি শুনেছি; এ কথা কি সত্যি?'

—'খানিকটা সত্যি বটে।'

—'যখন-তখন আসতে-যেতে পার। স্পষ্ট জবাব দাও।'

—'পারি।'

শুনে সিডনী কার্টন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্তার সাক্ষী রইলেন এরা দু'জন। এস এবার আমরা পাশের ঘরে যাই। সেখানে আমার শেষ কথা তোমায় নিভৃতে বলব।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

মরু-প্রান্তর

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এ মরু-প্রান্তরে কামনা-কঙ্কাল
ফিরেছি হাতে নিয়ে বাঁধিনি ঘর তবু
ব্যথা ও কান্নার ঝরানো অশ্রুর মরূদ্যান
গড়েছি কত বার ভেঙেছে বার বার
বোশেখী উত্তাল মাতাল ঝড় তবু
ধূসর দুরাশার ধূধূ এ বালুচরে
দগ্ধ জীবনের গেয়েছি গান!
গানের সুরে সুরে এ মরু-প্রান্তরে
পিরামিডের মতো জেগেছে হতাশার পাথারে ঢেউ,
জেগেছে জিজ্ঞাসা চরণচিহ্নের
নীরব মিছিলের আমি কি কেউ?
হয়তো কোনো দিন অরুণ প্রভাতীর
আলোর বন্যায় উদার শান্তির
ছিলকি ফুটেছিল কুসুমহার
প্রিয়ার হাতে ছিল সুরবাহার!
বর্গী এলো দেশে নগ্ন হাতে হাতে ছিঁড়তে ফুল
হায় রে ধর্ষিতা শ্যামলী যৌবন আত্মহত্যায় বাঁচালো কুল!

জীবন ধিকি ধিকি জ্বলছে হায়
মুক্তারেণু যেন মরুতে এই,
আকাশে রামধনু তবু পাঠায়
নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন সেই!
রৌদ্রে ঝলসানো নয়নে তাই
সরষে ফুলে জাগে সবুজ দেশ,
সেখানে জীবনের মৃত্যু নাই—
কেবল গান আর প্রাণ অশেষ!
তাই কি মনে হয় ডাকছে ফের
মেঘের চোখ মেলে প্রিয়া আমার
স্বপ্নজয়ী গানে যৌবনের
এ মরু-প্রান্তর সীমানা পার!—

এ যদি এ জীবনে চরম সত্যের ইশারা হয় তবে
মরুর দাবানলে জ্বলেও জ্বলবো না কঠিন পণ,
দস্যু বেদুইন ফলকে গেঁথে নেবে
তবুও কিছুতেই কিছুতে মানবো না কাল মরণ!

হোক সে কামনার এ কঙ্কাল তবু
পেরিয়ে মরীচিকা বালুর ঢেউ ভেঙে
চালাবো অনুখন এ অভিযান,
কামনা-কঙ্কাল মৃত্যু জয় করে
আবার দেহ পাবে, দোলাবে বিশ্বকে
ফোটাবে ফুল আর জাগাবে গান।

ক্লান্ত জীবনের ধৈর্য্যহারা তীরে অজেয় শক্তির খুলবো খিল,
হতেই হবে পার এ মরু-প্রান্তর, হবে না এ জীবন মৃত্যুনীল!

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের অতিপ্রিয় মাতৃভাষা দুই দিক থেকে আজ গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন।' রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের দ্বারা বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব-পরিধি যেমন স্পষ্টতঃই অনেকখানি সংকুচিত হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি বাংলা ভাষার অগ্রগতির পক্ষে প্রচণ্ড আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত উভয় বঙ্গে বাংলা ভাষা চালু রয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে রকম বিধিবদ্ধ ভাবে পূর্ব-পাকিস্থানে উর্দুভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং পাকিস্থানী রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তাদের যে রকম মনোভাব, তাতে পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষা আর কত দিন বাহাল-তবিয়তে টিঁকে থাকবে সে বিষয়ে সঙ্গত ভাবেই সংশয় প্রকাশ করা চলে। আর টিঁকে থাকলেও তাকে বাংলা ভাষা বলে চেনা যাবে কি না তাও একটি প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গের কোন কোন মহলে বাংলাকে উর্দুবিমিশ্র করবার যে পরিকল্পিত আন্দোলন কিছু কাল যাবৎ চলছে আজ হয়তো তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের তীব্রতা আংশিক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তবে এই সাফল্য সব সময়ের জন্য প্রতিরোধকারীদের করায়ত্ত থাকবে কি না সন্দেহ। ধর্ম-মোহ আর সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সে রাষ্ট্রের একাংশে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যতই প্রবল হোক, সে অনুরাগ যে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

সুতরাং কথাটা অপ্রিয় হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের পক্ষে আজ পশ্চিম-বঙ্গই প্রধান নির্ভর। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ আজ কত ভাবেই না বিপর্যস্ত। সকলের চাইতে বড়ো বিপর্যয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়, আর এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের উপর গিয়ে পড়েছে। প্রাণশক্তির অভাবে আজ পশ্চিম-বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের সাহিত্যপ্রয়াস স্ফূর্তিহীন। সাহিত্যের যে একটি অর্থকরী বা ব্যবসায়গত দিক আছে, সেটি পাকিস্থান স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। বাংলা বইয়ের একটা মোটা পরিমাণ সংখ্যার ক্রেতা ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়, সেই হিন্দু সম্প্রদায় আজ সাহিত্যের আনুকূল্য করা দূরে থাক, বিড়ম্বিতভাগ্য উদ্বাস্তুরূপে নিজেরাই সর্বপ্রকার আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রায় পদে পদে অনৈশ্চিত্য নিয়ে সাহিত্যের পোষকতা করা চলে না। এদিকে পাকিস্থানের অভ্যন্তরে বাংলা বই প্রচারিত হবার পথেও ব্যবহারিক বাধা বহু। ফলে বাঙালী লেখক এবং প্রকাশক উভয়কেই আজ কর্তিত-অঙ্গ, ক্ষীণ-পরিসর পশ্চিম-বাংলার সীমাবদ্ধ পাঠক-সংখ্যাকে নিয়েই মুখ্যতঃ সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

বিপদের উপর বিপদ। বঙ্গ বিভক্ত হতে না হতেই দেখা দিল রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর সমস্যা। ভারতীয় সংবিধানে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর মাত্র পনেরো বৎসরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কর্ম সম্পাদনের ভাষা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে হিন্দী ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত হবে। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দীর প্রতি ন্যস্ত এই গুরুত্ব হিন্দীর যথাযথ ভাবে প্রাপ্য কি না জানি না, তবে এ কথা ঠিক, ভারতীয় সংবিধানকারদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দীর গুরুত্ব বহু গুণ বেড়ে গেছে। ইতোমধ্যেই পশ্চিম-বাংলায় হিন্দী শিক্ষার হিড়িক পড়ে গেছে। বাঙালী ছেলে-মেয়েরা দলে দলে হিন্দী শিখতে উঠে-পড়ে লেগেছে। বহু প্রবীণের মধ্যেও এই নূতন নেশা সঞ্চারিত হয়েছে। কেউ-কেউ আবার হিন্দীর অনুকূলে প্রচার-প্রবন্ধও লিখছেন দেখতে পাই।

যাঁরা বলেন বাঙালীর এই নবার্জিত হিন্দীমনস্কতার দরুণ বাঙলা ভাষার সম্পর্কে ভয় পাবার কিছু নাই তাঁরা যথার্থ বলেন কি না সন্দেহ। এ ক্ষেত্রে ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা করা ভুল হবে, কেন না ইংরেজীর অবস্থা আর হিন্দীর অবস্থা এক নয়। ইংরেজী একটি ঐশ্বর্যময় ভাষা, তার ঐশ্বর্যের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। এই ভাষার সহিত সংস্পর্শের ফলে বাংলার তো ক্ষতি হয়ই নাই, বরং নানা দিক দিয়ে তার সম্পদ বেড়েছে। ইংরেজীর খাতবাহিত বিচিত্র ভাবস্রোতের দ্বারা বাংলা ভাষার বারিধি পুষ্ট ও পরিস্ফীত হয়েছে। বাঙালীর মনোভবনের অনেকগুলি রুদ্ধ বাতায়ন ইংরেজী ভাষার কর-স্পর্শেই প্রথম উন্মুক্ত হল। ইংরেজী ভাষার প্রসাদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ হয়েছে তা প্রাক্-ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের পার্থক্যের পরিমাপ নিলেই হৃদয়ঙ্গম হবে। ["ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল।" ("পত্র-সূচনা," 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্র।]

ইংরেজীর এই ঐশ্বর্য হিন্দী ভাষার নেই, কাজেই হিন্দী ভাষার চর্চার দ্বারা বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ হওয়ার আশা অল্প। বড়ো জোর হিন্দী থেকে নূতন নূতন শব্দ আহরণ করে আমরা বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়াতে পারি, কিন্তু ভাবের দিক থেকে হিন্দীর বিশেষ কিছু দেবার আছে বলে মনে হয় না। কথাটার মধ্যে হয়তো স্বীয় মাতৃভাষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার মনোভাব প্রকাশ পেল, তবে সাফাই এই যে, এইটুকু আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করবার মতো অবস্থা আজ সুনিশ্চিতরূপেই বাংলা ভাষার করায়ত্ত। সকলের দ্বারা অবিসম্বাদী ভাবে স্বীকৃত যে গৌরব, সেই গৌরবের বোধে উদ্দীপিত হওয়ায় দোষ নেই।

বরং ব্যাপক হিন্দী চর্চার ফলে বাংলার মর্যাদাহানির আশঙ্কা আছে। নানা বাস্তব কার্য্য-কারণের যোগে এমনিতেই বাংলা ভাষা আজ হৃতস্ফূর্তি, ম্রিয়মাণ, তার উপর যদি আমাদের সাংস্কৃতিক উদ্যমের একাংশ হিন্দী শিক্ষায় বিশেষ ভাবে ব্যয়িত হয়, সে ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ভেবে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হতে হয় বই কি। কারণ এ তো শুধু হিন্দী শিক্ষার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে অ্যাটিচ্যুড অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নও জড়িত আছে। হিন্দী কেন্দ্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে হারে বাঙালী ছেলেমেয়েরা হিন্দী শিখতে উঠে-পড়ে লেগেছে, তাতে উৎসাহের পরিবর্তে মনে বরং নৈরাশ্যই জাগ্রত হয় বেশী। বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় যে ইতোমধ্যে এতখানি বৈষয়িক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এ ধারণা আমাদের ছিল না। হিন্দী শিক্ষার অন্তরালবর্তী মূল প্রেরণা যে বৈষয়িক সে কথা আশা করি কাউকে বলে দিতে হবে না। উদ্দেশ্য দ্রুত হিন্দী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ঐ ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন এবং তদ্দারা কেন্দ্রীয়

তথা আন্তঃপ্রাদেশিক স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ। সরকারী চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে না থাকার মনোভাবও উক্ত ভাষাশিক্ষাগত তৎপরতার মূলে বহুলাংশে সক্রিয়।

এ সকল উদ্দেশ্য অসাধু তা বলি না, বরং জাগতিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে অপরিহার্য জ্ঞানে মান্য, কিন্তু কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই যদি দলে দলে লোক নতুন ভাষা শিখতে আদা-জল খেয়ে লাগে, সে ক্ষেত্রে আপত্তি না জানিয়ে পারা যায় না। কারণ, এতে মাতৃভাষার প্রতি এক ধরনের অবহেলা সূচিত হয়—যে অবহেলা হিন্দী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কই, দশ বৎসর আগে অন্ততঃ দশ জন লোককেও তো হিন্দী শিক্ষায় আগ্রহশীল হতে দেখা যায়নি !

প্রথম যখন বাঙালী ইংরাজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, সে প্রধানতঃ বৈষয়িক প্রয়োজনেই এই দিকে ঝুঁকেছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ইংরেজী শিক্ষাই বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে অযুত শুভ ফলের কারক হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনের উপর ইংরাজী শিক্ষার কুফল একেবারেই যে কিছু না হয়েছে তা বলি না, তবে এই কুফলের কাঁটা ধন্য করেই অজস্র সুন্দর ফুল ফুটে উঠেছে জাতীয় মনোতরুতে। ইংরাজী শিক্ষার সামান্য ক্ষতির পিঠে বাঙালী-মানস সমৃদ্ধ হয়েছে নানা ভাবে। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তৎকালীন বাঙালী লেখকদের লেখনীমুখে যে নূতন ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল তার কোনো পূর্ব-ঐতিহ্য এ দেশে ছিল না।

তা ছাড়া, এখনকার অবস্থার সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলের অবস্থার তুলনা হয় না। তখন বাংলা ভাষা, বিশেষ বাংলা গদ্য ছিল নিতান্ত দরিদ্র; এখন আর সে কথা বলা যায় না। আজ বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের বিচারে যে কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের অনেকানেক কুশলী গদ্যলেখকদের মিলিত সাধনায় বাংলা গদ্য বর্তমানে যেখানে এসে উপনীত হয়েছে, সেখানে উন্নীত হতে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার আরও কিছু দিন সময় লাগবে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষার নাম করে হিন্দী নিয়ে হৈচৈ করার একমাত্র যে অর্থই হয়—সে অর্থ, বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অচেতনতা, মাতৃভাষার প্রতি সম্যক্ প্রীতির অভাব, এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক চিত্ত-দৈন্য। বাংলার সব চাইতে গৌরবের বস্তু তার ভাষা ও সাহিত্য, সেই গৌরবের কাঞ্চনখণ্ড ত্যাগ করে আঁচলে কাচ বাঁধবার প্রয়াসকে কোন ব্যক্তিই প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না, বিশেষ তিনি যদি সংস্কৃতিনিষ্ঠ হন।

বাংলা ভাষার তুলনায় হিন্দী ভাষার ঐশ্বর্যাপকর্ষই যে হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে ভয়ের একমাত্র কারণ সৃষ্টি করেছে তা নয়। ভয়ের আরও কারণ আছে। ইংরাজীর বেলায় আমরা দেখেছি, ইংরেজ সরকারী কর্তাদের দৌলতে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এক সময়ে এ দেশে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। এ-দেশীয় শিক্ষার ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যথার্থ পণ্ডিত হয়েও অবহেলিত হয়েছেন, এদিকে নাম মাত্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৃতিত্বকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অযথা বড়ো করে তোলা হয়েছে। মাতৃভাষার অনুশীলনকারীরা যোগ্যতার অধিকারী হয়েও তদানীন্তন সরকারের নিকট কল্কে পাননি, এদিকে কেবল মাত্র 'ড্রাফট' রচনার তথাকথিত কৃতিত্বের সুবাদে বা ইংরাজী কথন-নৈপুণ্যে পল্লবগ্রাহী ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি একটা কেষ্ট-বিষ্টু রূপে সমাজে অভিনন্দিত হয়েছেন। ইংরাজী ভাষার বহুতর উৎকর্ষ আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, কেবল মাত্র ইংরাজী জ্ঞানের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই—যদি না সেই জ্ঞানের দ্বারা স্বজাতির ও স্বসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মানুষের কৃতিত্ব ভাষাকুশলতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ঐশ্বর্যে, তার প্রজ্ঞায়। ইংরাজী না জেনেও একজন ব্যক্তি প্রাজ্ঞ হতে পারেন যদি তাঁর এদেশীয় শিক্ষার উদার, মানবতাবাদী ধারাটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিচয় থাকে। তেমন ব্যক্তি যে একজন বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত পল্লবগ্রাহী শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু গুণে মান্য, সেটি যুক্তি-তর্কের দ্বারা বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। তবু দুর্ভাগ্য এই যে, এমন প্রত্যক্ষ সত্যের ক্ষেত্রেও যুক্তি দিতে হয়। শুধু তা-ই নয়, আমরা এ ক্ষেত্রে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলি, বিদেশী ভাষায় হাজার শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তির জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ নেই তাঁর ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত এবং অসার্থক। সমাজ-জীবনের বৃক্ষে তিনি পরগাছার মতো ঝুলে থাকেন। তাঁর পরকীয় ভাষাজ্ঞানের দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় না, তিনিও দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ স্থাপন করতে পারেন না। জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রহীন হয়ে তিনি চিরটা কাল দেশের অভ্যন্তরে থেকেও বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেন।

অথচ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই ইংরেজ শাসনের আমলে সকলের চাইতে সুবিধা-সুযোগ লাভ করে আত্মাভিমানপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এঁদের দ্বারা সরকারী সেবার কাজটি ভালো ভাবেই সাধিত হয়েছে, এ বাদে আর কিছু হয়নি। বাংলা দেশ তথা বাংলা ভাষার স্বার্থ এঁদের দৃষ্টিসীমার বাইরে বরাবর অবজ্ঞাত অবস্থায়ই পড়ে ছিল। অথচ সরকারী আনুকূল্য-মহিমার প্রসাদে কী দাপটই না এঁদের ছিল। যাঁরা সমাজসেবা ও মাতৃভাষার সেবাকে জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতি এঁদের তাচ্ছিল্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাঁরা যে এঁদের চাইতে ইংরাজী কিছু কম জানতেন তা-ই নয়, বরং বেশীই জানতেন। মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়দের অপরাধ এই যে, তাঁদের জ্ঞানের সীমা কিঞ্চিৎ অধিক সম্প্রসারিত ছিল। তাঁরা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেই তৃপ্ত থাকেননি, সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন মাতৃভাষাটাকেও ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন। বিদেশী ভাষা অপরের ক্ষেত্রে যেখানে শুধু বৈষয়িক স্বার্থ সংসাধনের এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় বিধানের ভাষা হয়ে উঠেছিল, এঁদের বেলায় তা হয়ে উঠে মাতৃভাষা তথা জাতীয়

জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার সুস্পষ্ট হাতিয়ার। বিদেশী ভাষাভিমানী, ভিতর-কাঁপা সরকারী চাকুরিয়ার দল ইংরাজী ভাষাকে মনে করেছিলেন জর্দন নদীর জল, গায়ে ছিটোলেই কৌলীন্যের অধিকারী হলেন; আর আমাদের পূজনীয় পূর্বাচার্য সাহিত্যরথীরা ছিলেন সাহিত্যিক ভগীরথ, যাঁদের চোখে ইংরাজী সাহিত্য ছিল ভাবগঙ্গাবৎ। সেই ভাবগঙ্গাকে তাঁরা বহু আয়াসে বাংলার মৃত্তিকায় বয়ে এনে তাকে নানা ভাবে ফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন। বাংলার সাহিত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষাভিমানী পরগাছাদের কোন তুলনা হ'তে পারে না।

আমাদের ভয় হয়, হিন্দী ভাষা যখন বাংলা দেশে তার পদাধিকারের সুযোগে যথেষ্ট পরিমাণে আসর জাঁকিয়ে বসবে, তখন গত যুগের ঠিক ইংরাজী শিক্ষাভিমানী বাঙালী সম্প্রদায়ের মতোই হিন্দীকে কেন্দ্র করে এক নূতন পরগাছা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। পরগাছা, কেন না কেন্দ্রীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই হবে এই সম্প্রদায়ের প্রধান নির্ভর, আর সেই সূত্রে অনাদৃতা মাতৃভাষা এঁদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। যদি কেউ বলেন এমনতরো আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কোন ভিত্তি নেই, তা হলে পুনরায় তাঁকে গত যুগের ইংরাজী ভাষাভিমানী সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে। চোখ-কান খোলা রেখে যাঁরাই পথ হাঁটেন তাঁরাই জানেন, সরকারী প্রসাদপুষ্ট ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞম্মন্যদের দাপটে বাংলা ভাষা বহু দিন কী রকম স্ফূর্তিহীন, ম্লান অবস্থায়ই না ছিল। হ্যাটকোটধারীদের সামনে ধুতি-চাদর যেমন ম্লান হয়ে থাকে সে জাতীয় ম্লানতা গোটা ইংরাজ-শাসনের কাল জুড়ে বাংলা ভাষাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যদিও সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন, ধুতি-চাদরের তুলনায় হ্যাটকোটকে সহজাত ভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করবার কোন কারণ নেই। হিন্দী ভাষাকে অবলম্বন করে মাতৃভাষার সেই ম্রিয়মাণতার অধ্যায় যদি পুনরাবৃত্ত হয়, সে কি খুব আশ্চর্যের বিষয় হবে? এ প্রসঙ্গে যে কথাটা সব চাইতে বেশী মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে, হিন্দীর পিছনে সরকারী সমর্থনের জোর আছে, বাংলা ভাষার পিছনে তেমন কোন জোর নেই। এটা যে কতো বড়ো তফাৎ তা বলে বোঝাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। সরকারী সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অর্থই হল বৈষয়িক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হওয়া। হিন্দী ভাষার বেলায় যখন সেই সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আর মাতৃভাষা বাংলার বেলায় তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তখন সাধ করে কে আর হিন্দীকে পিছনে ফেলে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসবে? আমরা মুখে সংস্কৃতি-প্রীতির যতোই বড়াই করি না কেন, আসলে আমাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সংখ্যাই বেশী। সকল বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও মাতৃভাষার অনুশীলনকে পরম কর্তব্য জ্ঞানে আঁকড়ে থাকবার মতো স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি খুব বেশী খুঁজে যাওয়া যাবে না। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান নিশ্চয় করা যেতে পারে যে, বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির টানেই বহু লোক হিন্দীকে কুলীন জ্ঞান করবে এবং তদনুপাতে মাতৃভাষাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবে। সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মানসিক ধর্মই হচ্ছে, যা তাঁদের সুবিধা-সুযোগের কারক, তাকে মহামূল্য জ্ঞান করা এবং যে বস্তুর পশ্চাতে সুবিধা-সুযোগের প্রতিশ্রুতি নেই তাকে অবজ্ঞা করা। এই প্রতিতুলনার বোধ অজ্ঞতা থেকে আসে এমন মনে করা ঠিক হবে না, কারণ অনেক সময় নিতান্ত সচেতন ভাবেই সুবিধা-সুযোগের কারণ-বর্জিত বস্তুকে হেয় জ্ঞান করা হয়। মনের ভিতর হয়তো প্রচ্ছন্ন এই অনুভূতি থাকে যে, যাকে হেয় জ্ঞান করা হচ্ছে তা আসলে হেয় নয়, কিন্তু যে হেতু তা থেকে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিতান্ত কম থাকে বা একেবারেই থাকে না, সেই হেতু জেনে-শুনেই তাকে পাশ কাটিয়ে সুবিধা-সুযোগের হেতুভূত বস্তুর উপর মনের সবটুকু প্রীতি ঢেলে দেওয়া হয়। নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থেই প্রচারের ঢক্কা-নিনাদ দ্বারা শেষোক্ত বস্তুকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করে তোলা হয়, এবং তদ্ধাবদে দশের নিকট আত্মশ্লাঘা প্রচারের সুযোগ লওয়া হয়। হিন্দী বনাম মাতৃভাষা বাংলার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এমনতরো অবাঞ্ছিত অবস্থার যে সৃষ্টি হবে না, সে কথা জোর করে কেউ বলতে পারে না। এমনিতেই আমাদের মাতৃভাষার পিছনে সংগঠন-বল কম, তার উপর বাংলা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের জোর আরও কমে গিয়েছে, এমন অবস্থায় হিন্দী উড়ে-এসে জুড়ে-বসে আমাদের মনোযোগের একটা মোটা অংশ যদি গ্রাস করে বসে, তা হলে অচিরকালের মধ্যে অবস্থা কী দাঁড়াবে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

সম্প্রতি রাঁচীতে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য-সম্মেলনে বাংলার কোন এক সুপরিচিত অধ্যাপক-সাহিত্যিক এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, এখন থেকে বাঙালী সাহিত্যিকদের হিন্দী এবং বাংলা এই দুই ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করতে চেষ্টিত হওয়া উচিত। উক্ত সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের অভিপ্রায় সাধু হলেও সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে দুই ভাষার আশ্রয় নেওয়ার যে কতকগুলি বিপদ আছে তা তাঁকে স্মরণ করতে বলি। মানুষের সময় সীমাবদ্ধ, উদ্যম ততোধিক। মাতৃভাষা ভালো করে আয়ত্ত করতেই এক-এক জন লেখকের গোটা জীবন কেটে যাবার দাখিল হয়, তার উপর যদি আবার তাঁকে ভাষান্তর আশ্রয় করে সাহিত্য-চর্চা করতে বলা হয়, তা হলে তাঁর উপর নিতান্তই জুলুম করা হয়। হিন্দীকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের ভাষারূপে প্রয়োগের অর্থ বুঝি, এমন কি পাশাপাশি অঞ্চলের ভাষা হিসাবে হিন্দী সাহিত্যের প্রয়োজনানুরূপ খোঁজ-খবর রাখার যুক্তিটাও অবোধ্য নয়। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে কেউ যদি আবার বলে, বাংলা ভাষার পাশে পাশে হিন্দীকেও সাহিত্য চর্চার ভাষা করতে হবে, তা হলে বাঙালী লেখকদের উপর বড়ো বেশী দাবী করা হয়। প্রথমতঃ, লেখকদের শক্তি ও উদ্যম সীমাবদ্ধ বলেই তাঁদের পক্ষে এ দাবী যথাযথ ভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের একাংশ যেই অনুপাতে হিন্দী-চর্চার দিকে ঝুঁকবে, সেই অনুপাতে বাংলা ভাষা দুর্বলতর হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে কথা একটু আগে একবার বলা হয়েছে, সে কথা পুনরায় বলি। আমাদের লেখকদের মধ্যে সকলেই কিছু আদর্শনিষ্ঠ লেখক নন। অধিকাংশেরই মানসিক গঠনের ভিতর বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। একবার এঁরা হিন্দী সাহিত্য চর্চার দ্বারা বৈষয়িক সমুন্নতির স্বাদ পেয়ে বসলে মাতৃভাষার জন্যই মাতৃভাষার চর্চা আর কেউ করবেন এমন মনে হয় না। তা হলে বাংলা ভাষার অবস্থাটা কী হবে? আমাদের চোখের উপরই হয়তো আমরা দেখব, একে একে
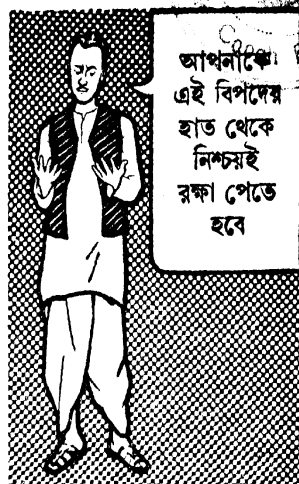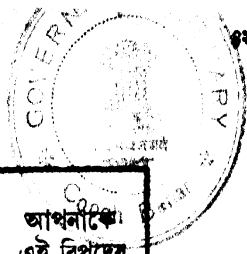
প্রতিদিনই ময়লার বীজা-ণুর ছোঁয়াচে আপনার লাগতে পারে
আপনাকে এই বিপদের হাত থেকে নিশ্চয়ই রক্ষা পেতে হবে
লাইফ্‌বয় সাবান মেখে ময়লার বীজাণু ধুয়ে সাফ্‌ কোরে ফেলুন
লাইফ্‌বয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা কোরবে
লাইফ্‌বয় সাবান
প্রতিদিনের ময়লার বীজাণুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচায়
LIFEBUOY SOAP
SOAP
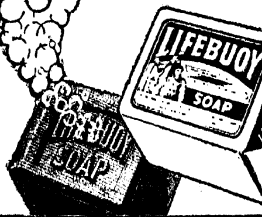
বাংলার লেখকগণ সকলে মাতৃভাষার চর্চা ত্যাগ করে হিন্দী ভাষার আশ্রয়ী হয়েছেন এবং হিন্দী সাহিত্যের চর্চার দ্বারা হিন্দী সাহিত্যকে সুস্পষ্ট ভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

না, বাংলা সাহিত্যের পাশে পাশে হিন্দী সাহিত্য চর্চার যুক্তিটা কোনক্রমেই প্রণিধানযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের উপরই আমরা প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ দিতে পারি না, তার উপর আবার হিন্দী! কে যথাযথ ভাবে বাংলা ভাষার চর্চা করেন তার ঠিক নেই, এদিকে আবার হিন্দীকে আসনের একাংশ ছেড়ে দেবার যুক্তি দেখানো হচ্ছে। বাংলা ভাষার অবস্থা এমন সুরক্ষিত নয় যে, তার ভাগ্য নিয়ে হেলাফেলার বিলাস আমরা করতে পারি। অবশ্য এ কথা মানব যে, ভাষান্তরের চর্চার দ্বারা প্রকারান্তরে স্বভাষারই উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু এই উন্নতির পিঠে অন্য দিক দিয়ে আমাদের কতখানি ক্ষতি সইতে হতে পারে সে হিসাবও এ প্রসঙ্গে করণীয়। বাংলা ভাষা বর্তমানে পূর্বকথিত দ্বিবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই অবস্থায় বাংলা ভাষাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমাদের সবটুকু মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। হিন্দী ভাষার প্রতি নবার্জিত অনুরাগ বশে আমরা যদি সে মনোযোগের একটা মোটা অংশ উক্ত নূতন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে ব্যয় করতে আরম্ভ করি, তা হলে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত অধোগমন রোধ করা কঠিন হবে। একাধিক ভাষা-সাহিত্যে নৈপুণ্য অর্জন শ্রেয়: আদর্শ তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু বাংলা ভাষার উপর উক্ত এক্‌স্‌পেরিমেন্টের ভর সওয়াবার সময় এটা নয়, এইটেই শুধু বলবার। রাষ্ট্রীয় গরজে হিন্দীকে বড়ো জোর আমরা ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভাষা করে তুলতে পারি, কিন্তু তাই বলে অপ্রয়োজনের ভাষা, অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষাও হিন্দী হোক, এ দাবী গ্রাহ্য নয়। এ দাবী অংশত: মেনে নিলেও বর্তমান অবস্থায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে তা আত্মঘাতী হবে।

জানি এ প্রসঙ্গে ইংরাজী ও বাংলা ভাষা পাশাপাশি চর্চার নজীর অনেকেই তুলবেন। ইংরাজী ও মাতৃভাষা যুগপৎ চর্চা করছেন এমন দু'চার জন লেখক আজকের বাংলা দেশে পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ, উনিশ শতকে এ রেওয়াজ কতকটা ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল বলা যায়। কিন্তু সেখানেও দেখতে পাই, ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা কখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। বাংলা সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টির দানে যাঁরা নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলে অখণ্ড অভিনিবেশের সহিত কেবল মাত্র বাংলা ভাষারই চর্চা করেছেন। অবশ্য শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকে ইংরাজী রচনার প্রতি ঝুঁকেছিলেন, তবে তাঁদের এই ইংরাজী-মনস্কতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নি। ইংরাজী সাহিত্যানুশীলনের উপর ন্যস্ত তাঁদের প্রারম্ভিক কালের আগ্রহ শেষ জীবন অবধি অক্ষুণ্ণ থাকলে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তার ফল খুব সুখকর হ'ত বলে মনে হয় না। এদিকে রবীন্দ্রনাথেরও ইংরাজী-পরাঙ্মুখতা সুবিদিত। কবির ইংরাজী রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম না হলেও বাংলার তুলনায় যৎসামান্য। মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ সুবিশাল। সেই দিক থেকে কবিকে সর্বাংশে না হলেও মুখ্যত: মাতৃভাষামনস্ক লেখক বললে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না। প্রমথ চৌধুরী ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইংরাজীতে রচনার সংখ্যা অঙ্গুল্যগ্র-গণনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর শরৎচন্দ্র তো মনে-প্রাণে আগাগোড়াই ছিলেন বাংলাভাষী লেখক।

ভাষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত মনোযোগের অসুবিধা তো আছেই, এ ছাড়া হিন্দীর বেলায় আরও অসুবিধা আছে। পূর্বে যে কথা একবার বলেছি, সে কথা পুনরায় বলি: ইংরাজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা হয় না। হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে বলেই এখন থেকে সবাইকে কোমরের কসি সজোরে বেঁধে হিন্দী সাহিত্য-চর্চায় লেগে যেতে হবে, হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে এমন বীরপূজার মনোভাব না থাকাই ভালো। অন্তত:, বাঙালীর এ মনোভাব শোভা পায় না।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, ভাষা শিক্ষা আর সাহিত্যানুশীলন এক বস্তু নয়। সাহিত্যে কুশলতা অর্জনের জন্য গোটা জীবনের প্রস্তুতি দরকার, ভাষা শিক্ষার বেলায় তা না হলেও চলে। ব্যবহারিক এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাঙালী হিন্দী শিক্ষা করতে হয় করুন, কিন্তু দোহাই, সে ভাষাকে অনুপাত-অতিরিক্ত মর্যাদা দেবেন না। তা হলে বাংলা সাহিত্যের বিপদ হবে। হিন্দী ভাষা-চর্চাকে তার যথাযোগ্য স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় সবটুকু উত্তম আরোপ করাই হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান করণীয়। বাংলা সাহিত্যের আত্মরক্ষার এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

জড় ও জড়ের গুণ

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ দুই প্রকার; সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থবিদ্যা।

—অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬)

গান্ধী টুপী

(ছোট গল্প)

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

বীরু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে!

খবরটা চমকে দেয় বৈ কি! আমি রইলাম সেই স্কুল-মাষ্টার আর বীরু! সে কি'না ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট! কী হৃদয়-বিদারক কথা!

ইচ্ছে করলেই যে আমিও ওরকম একটা কিছু হতে পারতাম না, বা কতো বার কতো কিছু হবার সম্পূর্ণ সুযোগকেও মাত্র বুদ্ধি ও হৃদয়-বল প্রসাদাৎ দুর্য্যোগ বলে পরিত্যাগ করে ধন্য হয়ে আছি—এ জাতীয় চিন্তা মনে আসতো হয়তো! কিন্তু বীরুর খবরটা শুনে আসেনি।

বীরু—যার চরিত্র, যার রুচি, যার মনোবৃত্তি, শিক্ষা মনে পড়লেই মন কুঁকড়ে যায় সেই বীরু এই কংগ্রেস সরকারের দৌলতে সেই পদমর্য্যাদা পেলো, ইংরেজও যা দিতে রাজী হয়নি!

দেখতে হচ্ছে বীরুকে!

এবার ছুটিতে যখন কাশী গেলাম, গেলাম বীরুর বাড়ী।

বীরুর বাড়ী;—বলতে ভুল করেছি। বীরুর বাড়ী বলতে মনে পড়ে কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলির ভেতরে বিরাট একটা বাড়ী; তাতে ঠাসা দশ-বারো ঘর পরিবার। সারা বাড়ীটা সর্বদাই স্যাঁৎস্তেতে, ধোঁয়ায় সর্বদা অন্ধকার, রোগে এবং ভোগে জরাজীর্ণ। তারই মধ্যে দু'খানা ঘর, সামনে একফালি বারান্দা মতো। থাকে বীরু আর তার বিধবা মা। বীরুর বাড়ী তো তাই।

কিন্তু এ কি বাড়ী বীরুর! ভেলুপুরার ওপর চমৎকার বাগান-বাড়ী। সামনে মোটর দাঁড়িয়ে। একখানা নয়; ক'খানা! কারা এসেছে হয়তো। আর্দালি কার্ড চায়।···ও-সবের বালাই নেই। ভাবছি ফিরে যাই। হঠাৎ পান্নুদা বেরিয়ে এসে হাঁক পাড়লেন, "আরে, মাষ্টার যে!···ঢুকতে দিচ্ছে না বুঝি? তা আর ওর দোষ কি বলো! চেনে না তো তোমায়। এসো, এসো, কবে এলে?···হ্যাঁ, এইটে হোলো বসবার ঘর। বীরুর ঘরে দু'জন লোক এসেছে। সহরের ব্যবসায়ী···চেনো তো তুমি···কই বিড়ি আছে নাকি একটা? ছাড়ো তো!···ওঃ, ছেড়ে দিয়েছো বুঝি? আচ্ছা, মদ্না দেবে; দে তো···" আশ্চর্য্য! আর্দালিটা বিড়ি দিলো, এবং পান্নুদা তা হাত পেতে নিলেন, ধরালেন, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলে চললেন,—"চেনো তো ওদের তুমি! ছেলে পড়াতে ওদের বাড়ী। চন্দুমল্ গুলজারিমল্—ওরাই এসেছে। বীরু তো নামকে ওয়াস্তে ডিষ্টি-সাব ···আসলে তো চিনি আর লোহা—" মুখ বাঁকিয়ে বিশ্রী ভাবে চোখ মটকে হাসলেন পান্নুদা। হঠাৎ অত্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,—"পারো তো ব'লে-ক'য়ে দু'টো পারমিট তুমিও বাগাও না। লাল হয়ে যাবে হে, লাল! সিমেন্ট কি লোহা···ব্যস্ ব্যস্। পারমিটটা নাও তার পর টাকা। টাকার কি আর অভাব হয় হে? কত চাও টাকা? নাও নাও, লেগে পড়ো···কি করবে কতকগুলো ছাগল চরিয়ে?···একটু চট্‌পটে হও; আমাদের বীরু যেখানে—"

"খুব যে বীরুর কথা জমিয়েছেন পান্নুদা!"

একেবারে স্বয়ং শ্রীবীরু!

পরনে খদ্দর, ধবধবে শাদা, গায়ে খদ্দরের মেরজাই বাঁধা, মাথায় তেরছা করে সুভাষবোসী ষ্টাইলে মুর্শীকাটের গান্ধীটুপী। পায়ে ম্যাচ করে পরা সাদা শ্যামরের কাবলী চপ্পল। আঙুলে টেপা সোনালী ব্যাণ্ড-পরা চুরুট। চোখে লাইব্রেরি-ফ্রেমে বাঁধানো হাল্কা নীল রংয়ের চশমা। Ashes of Roses-এর গন্ধ চুরুটকে ছাপিয়ে উঠেছে।

এক ঝলক দেখবার আগেই বীরু চেঁচিয়ে উঠলো,—"What a surprise! তুমি হঠাৎ গরীবের বাড়ী!"

বললাম, "অনেক দিন খোঁজ নিইনি; কি দরকার-টরকার জানতে এলাম।"

রসিকতা মনে করে পান্নুদা হাসিতে এমন ফেটে পড়লেন যে, মোমেণ্টাম্ রক্ষা করার দায়ে বীরুর পকেট থেকে পানের ডিবাটি বার করে দুটো পান মুখে ভরে দিয়ে থামলেন।

কিন্তু বীরু অতটা রসিকতা পায়নি কথায়; তাই অতটা হাসেনি।

পূর্বকথা তো সে জানতো কিনা; তাই।

ও-জাতীয় খোঁজ-খবর সত্যিই এককালে নিতে আসতাম ওদের বাড়ী; এ সত্যটা তো ও আর হেসে ওড়াতে পারে না!

"চলো চলো, ভেতরে চলো"; বলে ও যখন আমায় ভেতরে নিয়ে চললো, তখন পান্নুদার পানে ঈষৎ বাঁকা চোখে চেয়ে বললো,—"তুমি বরং আর্দালি বাজারের ব্যাপারটা সাঙ্গ করেই এসো পান্নুদা!"

লোকটির অন্তর্দ্ধানে যে আমি নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম, বুঝি বা বীরু তা লক্ষ্য করেছিল; বললো, "হ্যাঁ, নৈলে যেতো না; Cad!"

বীরু বুঝিয়ে-বুঝিয়ে তার কাহিনী বলতে লাগলো। ডিগ্রীটা ওর ভাল ক্লাসের ছিল—তখন ইংরেজের যুগ, চাকরি পাবার পরীক্ষাও পার হোলো, কিন্তু চাকরি পেলো না। সরকারী তদ্বিরে ওর ব্যক্তিগত জীবনের ইংরেজ-বিদ্বেষ নাকি ওকে সেই মহামান্য পদ লাভে বঞ্চিত করেছিলো। এবং সেই উগ্র ইংরেজ-বিদ্বেষই যে আজ ওকে খদ্দরি-সরকারের দরবারের দরবারী করায় সাহায্য করেছে, এই সুকঠিন তত্ত্বটাই ও সাধ্যমত আমার কর্ণকুহরে ঢালছিলো।

কিন্তু হায়, সে তত্ত্ব যে আমার জানা ছিলো।

নুন তৈরী করার দলে ও, আমি আরও প্রায় জন পঞ্চাশ ধরা পড়ি। জেলখানা তখন ঠাসা। কোন অছিলায় তখন ছাড়ান দিতে পারলেই সরকার বাঁচে আমরা বয়েসে ছোটো। ক্ষমা চাওয়ার অজুহাতেই অনেকে ছাড়ান পাই। অনেকে ক্ষমা চাইনি। কিন্তু এক রাতের সেই হাজতবাসের পর ওকে আর চিন্তে পারা যায় না। কেঁদে-কেঁদে ওর চোখ-মুখ লাল। সাহেব কলেক্টর দেখেও ধমকে দিয়ে বললে,—"লে যাও! কভি মৎ করনা! How miserably stupid!" ও অবশ্য পরে বলেছিল—"Tact রে Tact; কান্না কান্না কেবল কারসাজি। আমার যেন্নায় থাকতে হোলো না।" আমরাও তা এক রকম মেনে নিয়েছিলাম এমনি অস্বস্তিই ওর ছিল বটে! অতঃপর ও চার আনার মেম্বর। এবং তার ফলে, অন্ত—ডেপুটি।

আমার দুর্বুদ্ধি—ক্ষমা চাইনি। কলেজ থেকে নাম খারিজ হোলো।—শ্রীঘর বাসও হোলো,—আরও অনেক কিছু হোলো বা আজও বলা যায় না। কেবল ভাল কাজ একটি করেছিলাম, চার আনার মেম্বর হইনি, এবং খদ্দর পরা তার পরেই ছেড়েছিলাম।

ও চার আনা দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে, ইংরেজ যাবার পরেই সরু

ওর গুণপনা বিস্তর বেড়ে গেল। চার আনা, এক দিনের হাজত, খদ্দর এবং এক কালের পাস-করা কীর্ত্তি ওর আভিজাত্য বাড়িয়ে দিলে। ওকে সেই হারানো পি, সি, এসের পদ এসে গ্রাস করলো।

কিন্তু বীরুর খাসা চাল, খুকুড়ির ভেতর থাকলে কি হয়। রাশনিং আর সিভিল সাপ্লায়ের ভাগ্যবিধাতা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর কেরামতি খদ্দরি-শাসনকেও তাক্ লাগিয়ে দিলে। ফলে, স্বাধীনতা-ভোজের চর্ব্য, চোষ্য, পেয় যাদের চোয়াল বেয়ে গড়াচ্ছে, বীরু তাদের অন্যতম। বীরু,—যে বীরু পরে খদ্দর, জাতে ভদ্দর, মাথায় গান্ধীটুপী ও নগদ ষোলো পয়সার ভোটাধিকারী!

ও বোঝাচ্ছিল ওর সাধ্য মত। প্রতিপত্তি ও প্রতাপের কথা। মাঝে-মাঝে কত জনার "গতি" করে দিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতেও ভুলছিল না। "মনে আছে তোর, সেই দাশুর কথা? পাঁড়ে ঘাটের দাশু, যার মা'র মুড়ির দোকান ছিল। আমাদের সঙ্গে পড়তো?"

বললাম,—"হ্যাঁ, সতী তার বোন্; তোর সঙ্গে তার…"

বাধা দিয়ে বললে,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর মনে আছে দেখছি। তার তো এখন মস্ত বাড়ী কবীরচৌরায়।"

"কি করে? তোমার দয়ায় নাকি?"

পাষণ্ড ফস্ করে ভক্ত ব'নে গেল। বক কোথাকার!…দয়া তাঁর! নৈলে লোহা আর চিনি তো উপলক্ষ্য মাত্র।"

"তার বোন্—সতী?"

বর্মা চুরুটের ছাইটা শাদা হয়ে ঝুলছিল। জ্র তুলে সেটা রূপার ছাইদানে ভেঙ্গে রেখে সিগারটার জ্বলন্ত মুখটা বার বার ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। একটু লজ্জা করছিল বোধ হয়। বলল,—"বিয়ে দিয়ে দিয়েছি সময় মতো এক শালার সঙ্গে।… ফাঁসিয়েছিলো নৈলে!…" বলেই একটা উচ্চ হাসি। "হাঃ হাঃ,… কাশী হে কাশী! জুটে যায়, সব মাল।"

গম্ভীর হয়ে বললাম,—"তাই দেখছি।"

হঠাৎ একটি বছর পনর-ষোলোর ছেলে এসে বলল—"মা বলে পাঠালেন, আজ দ্বাদশী। আপনি না খেয়ে নিলে তিনি খাবেন না।"

"হচ্ছে হচ্ছে। দ্বাদশী তো কি? আমার কাজ তো ভাসিয়ে দিতে পারি না। মাকে বলো গে, এ সব না করলে দ্বাদশীর পারণ জুটবে কোত্থেকে?"

খুব সামলে নিলাম নিজেকে। "থাক্ ভাই! বিধবা মানুষ, কাজের কথা তো কিছু নেই। আমি নয় আবার আসবো। তুমি যাও।"

"আরে না-না। বুড়ীদের কথায় কান দিও না। এসেছো, বোসো। ভেতরেই নিয়ে যেতাম। কিন্তু আজ নয়। গেলেই মাকে তো জানো, সব পুরোনো কথার বাণ্ডিল খুলে বসবেন। আর আমার স্ত্রীর সামনে…"

"ওঃ আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। তা বেশ তো, আজ উঠি।"

"শোনো। একটা কথা বলছি। অবশ্য সম্পূর্ণ ভালবাসি ব'লে all for auld long syne—'বিগত দিনের স্মৃতি মাধুরী স্মরিয়া মনে'—ম্যাট্রোরি আর কত দিন হ্যাঁচড়াবে? ছাড়ো ও-সব। লেগে পড়ো। দু'টো পারমিট নাও। বাকী সব পানু করবে। আমার সামান্য পার্সেণ্টেজ হয় দিও নয় তো নাই-ই—auld long syne—ছেড়েই দেবো।…দেখবে ছ'মাসে লাল হয়ে যাবে। এই সময়। লেগে পড়ো"…পরক্ষণেই দরজার পানে লক্ষ্য করে ছেলেটিকে দেখে বললো, "যাও, যাও, মাকে গিয়ে বলো যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে থাকা কেন? আড়িপাতা! বাপের স্বভাব যাবে কেন? ক্যাবলা কমনেকার!"

কিন্তু সত্যি কথা এই যে, ও দাঁড়িয়ে ছিল না। আমায় নিরীক্ষণ করে দেখছিল; সেটা আমি বুঝতেই পারছিলাম। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম না। ছেলেটি চলে যেতেই বললাম—"কে বলো তো? ছলো-ছলো চোখ—চিনি যেন?"

"তা আর চিনবে না? স্বনামধন্য বংশের চারা ও। জানকী স্যাকরা, মনে নেই? গড়েনহাটার জানকী। খুব ওস্তাদ ছেলে। তার দাদা ফটিক ছিল, ঢ্যাঙ্গা ফটিক—আমরা যাকে হাবিলদার বলতাম?"

"ওঃ, ঢ্যাঙ্গা ফটিক—হাবিলদার ফটিক-টিক—যাকে টিক্‌টিকি বলতাম—প্রথম যুদ্ধের ফেরৎ—"

"হ্যাঁ, সেই ফটিক মারা গেছে তো।…তার ছেলে।—ওই বরদা ভট্টাচার্য্যি মশায়ের কথায় প'ড়ে চাকরি দিয়েছি। বাড়ীতে চাপরাসী বলে আছে। মাইনে সরকারী। যা হোক হিল্লে তো একটা।"

সেই ফটিক হাবিলদারের ছেলে সরোজ!

আমি যখন বেরুচ্ছিলাম কোত্থেকে সরোজ এসে গেটের ধারে আমার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করলো, ধুলো নিল। বললে, "বীরু কাকা চাকরি দিয়েছেন তাই খেতে পাচ্ছি, নৈলে মারা যেতাম কাকা! ভিক্ষে করতে হোতো।"

কোনও মতে দায়-সারা গোছের বলতে বলতে বেরিয়ে এলাম, "বাঃ, বেশ করছো, বেশ তো! মন দিয়ে কাজ করো। বীরুর কাছে যখন আছো ভাবনা কি?"

মনে পড়লো এই জানকী স্যাকরাকে, তার দাদা ফটিক হাবিলদারকে।

বীরু আজ খদ্দরি-অভিজাত। আর ফটিক হাবিলদার টিকটিকি। তার সোনার ডেলা সরোজ টিকটিকির পো গিরগিটি।

মনে পড়ে ফটিক হাবিলদারকে। জন্মাবধি, জ্ঞানাবধি হাবিলদারকে এক পোষাকে, এক ঢংয়ে, এক বয়সে, এক ভাবে দেখেছি। কাশীর পুঁটের মন্দির আর জ্ঞান-বাপীর রাঙা ষাঁড়ের যেমন বরাবর একই চেহারা, এবং তারা যেমন কাশীর কাশীত্বকে ধরে-বেঁধে রেখেছে আপনার অস্তিত্ব গৌরবে, তেমনি এই ফটিক হাবিলদারের চেহারা চিরকাল এক ধরণের, আর তার অস্তিত্ব কাশীর অস্তিত্বের, কাশীত্বের, একটা অবিনশ্বর অংশ।

কবে যে ও সত্যি যুদ্ধে গিয়েছিল কেউ জানে না। বরং ১৯১৯ সালে ও যখন হঠাৎ অনেক দিন অদর্শনের পর কাশীতে উদয় হোলো তখন ওর মতিগতির অনেকটা রকমফের হয়েছে। লম্বা লিকলিকে চেহারা। সাধারণ মানুষের মধ্যে চলাফেরা করলে মনে হয় যেন চাঁদা মাছের ঝাঁকায় বান মাছ। লম্বা, শুকনো। চলতো, যেন রণপা দিয়ে চলছে। চোমরানো গোঁফ। কাইজারি গোঁফ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ফেরতা সেপাইদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল। মাথায় বোতাম-দেওয়া ভাঁজকরা খাকী টুপী; মুখে টোপা লণ্ঠনমার্কা সিগারেট; পরে সেটা বিড়ি হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতো যখন মনে হোতো ওর গলায় এক টুকরো কার্পেট আটকে আছে।

যে কালে যুদ্ধের ফেরতা, যুদ্ধ জয় করেই ফিরেছে। ইংরেজ সরকারের পায়া জমিয়ে রাখার তদ্বির ও যেন অনেকখানিই করেছে এমনি একটা ভাব বরাবর বজায় রেখে চলতো—মুড়িউলি, ও ফুলুরিউলি, বিরজু বেহারা আর মাণিক পানওলার কাছে। তারা ওকে ততটাই সমীহ করতো, আমরা যতটা করতাম কালেক্টরকে, আর কালেক্টর গবর্ণরকে।

কিন্তু ও করতো কি? পেন্সন হয়তো পেতো, হয়তো পেতো না, জানতাম না। পেলেও সামান্য। তবে ওর চলতো কি করে? ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা মনে করতে পারবেন, এই শ্রেণীর লোকেরা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে খবর চোলাই করে বেড়াতো। দুর্জনে বলতো টিকটিকি।

তখন চলেছে জোর স্বদেশীয়ানার যুগ। এই সব টিকটিকিরা সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। কাশীর গলিগুলোয় বাছা-বাছা বাঙালী তরুণ ছিল যারা বাপের খেয়ে মাথা ঘামাতো কি করে ইংরেজকে সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যায়। গলির মধ্যে এ-জাতীয় আড্ডা প্রায়ই দুটো-একটা ছিল। ব্যাঙের ছাতা অনেক হোলেও চন্দন গাছও ছিল। সত্যিকার সন্ত্রাসবাদী দলও ছিল। সুতরাং টিকটিকিরা সক্রিয় ছিল। তাদের মধ্যেও সব থেকে ঘৃণা করতাম এই ফটিক হাবিলদারকে। সাধারণ ভদ্রসমাজে ফটিক হাবিলদারকে সকলে ক্রিমির মতো পরিহার করে চলতো, ও তা হাড়ে-হাড়ে বুঝতো।

লাহোর-ফেরৎ ডাক্তার সেন এসে যেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী বাৎলালেন সেদিন যেন সারা বাঙ্গালীটোলায় কে আগুন জ্বালিয়ে দিল! পরদিন সকালে বিষ্টুর চায়ের দোকানে খুব ভোরে ফটিকের গলা শুনলাম। বলছে যেন কা'কে,—"করবে না? রাজার রাজত্বে ও-সব সহ্য হয় না। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবার ন্যাকাপোনা। ইংরেজ রাজত্ব ওড়াবে মীটিং করে! আর কিছু নয়? জর্মাণী পারলে না, আর এই 'গেঁধে' আর 'নেরু'! এখন বুঝুন সব ইংরেজ কী মাল!"

স্নান করতে যাবো বলে তেল মাখছিলাম। বেরিয়ে এসে বললাম,—ইংরেজের এঁটো হাড় খেয়ে কুকুরেও লেজ নাড়ে বিষ্টু! মানুষের লেজ নেই কিনা, তাই জিভ নাড়ে—বুঝলি?"

যখন স্নান সেরে ফিরছি তখন বিষ্টু বললে,—"করলে কি দাদা! ও ফটিক হাবিলদার। কখন গিয়ে শালা বাঁড়ুয্যেকে লাগাবে! তোমার আর কি? বুড়ো বাপ-মা মরবে হাপুস নয়নে কেঁদে।"

গোয়েন্দার সর্দার বাঁড়ুয্যেকে ভয় খায় না তেমন অল্প ছেলেই ছিল সেকালে। মুখে বললাম, "ফটিক অমর নয় বিষ্টু।"

কিন্তু অনেক দিন পরে কানাইদার ঘরে ফটিককে দেখে আমি অবাক্। তখন এলাহাবাদে থাকি; কাশীতে যাতায়াত করছি। কানাইদা আমাদের বোমা-দলের চাঁই। কানাইদার কথা আরেক দিন বলবো। কিন্তু ইচ্ছে করে না। স্বাধীনতা পাবার পর থেকে দরজন্-দরজন্ কানাইদার গল্প পড়ি, আর ভাবি এঁরা সব ছিলেন কোথায় এত দিন! আজকালকার কাহিনীর স্রোতে কানাইদার ইতিবৃত্তও হয়তো কাহিনী হয়েই হারিয়ে যাবে।

বললাম, "সে কি কানাইদা? ফটিক হাবিলদার আবার তোমার সাঙাত হোলো কবে থেকে?"

কানাইদা বললেন,—"কেন রে? জগাই-মাধাই, অহল্যা, এ সব কি গল্প?"

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বললাম, "সাপ, কানাইদা, সাপ! বৃন্দাবনকে ধরিয়ে দিয়েছিল ও। বৃন্দাবনের মৃত্যু আসন্ন, জানো তো? জেলের খবর শুনেছো?"

রাত-দিন কি লেখেন কানাইদা। বললেন,—"জানি। তুই এই ছ'খানা চিঠি নিয়ে যাবি বিন্ধ্যাচলে। সেখানে ঘোড়-ফড়েকে পাবি, যেমন করে হোক্, তাকে দিতেই হবে। পারবি তো?"

"এখনই দেবে? নিয়ে যাই।"

সরোষ তিরস্কারের ভঙ্গীতে চেয়ে বললেন,"তা নৈলে বাইরে ঐ যে ভজু পানওলার দোকানে বসে পান খাওয়ার ভাণ করছে তার খপ্পরে পড়বে কি করে?"

হেসে বললাম, "ও তো পরেশ মাতাল। বেহেডের একশেষ।"

"আপাততঃ তোমার মাতলামী ও বেহেটপনা থামাও। কাল এলাহাবাদের গাড়ীতে যখন চাপবে তখন যদি কেউ কাশীর প্যায়রা বেচতে আসে, এক টুকরি প্যায়রা কিনো এবং টুকরিটা বেশ করে কাগজ দিয়ে প্যাক করে দিতে বোলো। কেমন? বুঝেছ তো চিঠি কোথায় পাবে?"

একগাল হেসে বললাম,—"বুঝেছি। কিন্তু ফটিককে তুমি বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না করলে আজ এই চিঠিও পাঠাতাম না, এবং ঘোড়-ফড়ের খবরও পেতাম না।"

ও যখন ইংরেজ-দপ্তরে টিকটিকি থেকে প্রায় কুমীর হবার মতো হোলো তখন যেন ওর কি হোলো। সেই থেকে দপ্তরের কাজ সম্পূর্ণ বহাল রেখে ও আমাদের দপ্তরে দরকারি খবরগুলো পাচার করতে লেগে গেল। ফলে আমাদের যে লাভ হচ্ছিল তার দাম কোন মতেই আজ নির্দ্ধারণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা চরমে উঠলো ১৯৪২এর বিদ্রোহে। শোনপুর ষ্টেশন তখনকার দিনে ইংরেজ কোম্পানী বি এণ্ড এন্ ডব্লু রেলওয়ের বড় আড্ডা। অনেক সাহেব থাকে।—সারণ আর বালিয়ায় অনেক রক্ত ঝরেছে।—শোনপুরে সাহেব-মেম প্রায় জন-ত্রিশেক বন্দী। মারা হবে তাদের; ক্ষমা নেই। আবার সেই কানপুর ১৮৫৭এর।

খবরটি এসেছে। গণেশ মহল্লার আড্ডায় বসে খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে। হঠাৎ ফটিক এলো।—জানালো সৈন্যভর্ত্তি একটি লরি যাচ্ছে ভদৌনি থেকে শোনপুর। তার ভেতরে ইংরেজ-পরিবারও আছে।

ক'দিন ধরেই ফটিক পলাতক ইংরাজদের খবর দিয়ে যাচ্ছিল। এ খবরটা দামী, কেন না সৈন্যবোঝাই গাড়ী।

বলা বাহুল্য, ভদৌনী থেকে খানিক এগিয়ে রাস্তার ওপর দিয়ে যে ব্রীজটা গেছে চরম মুহূর্ত্তে সেটা ভেঙ্গে যায় এবং লরী-শুদ্ধ সব খানায় পড়ে ভীষণ ভাবে হতাহত হয়।

কিন্তু কি করে সেই থেকে ফটিক হাবিলদার সরকারের বিষ-নজরে পড়ে যায়।

ক'দিন পরে; ১৯৪২এর অক্টোবর। মেদিনীপুরের বন্যার ব্যাপার নিয়ে রক্ত গরম। রাত্রে কানাইদার আড্ডায় জোর তাস

চলছে। চলছিল বটে তাস, কিন্তু কানাইদা যেন কিসের অপেক্ষা করছিলেন। একটু শব্দেই চমকে উঠছেন।

গভীর রাতে কি একটা শব্দে লাফিয়ে উঠলেন কানাইদা। দেয়াল-আলমারীটা ঘুরে গেল। মস্ত বড় ফাঁক দিয়ে সোজা গহ্বর বেয়ে গঙ্গার তীর দেখা যায়। ফাঁকটার বাইরে কানাইদা লাফিয়ে পড়ে যাকে ভেতরে টেনে নিলেন সে ফটিক হাবিলদার। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা, যেন সন্ত গঙ্গাস্নান করে ফিরছে। অথচ পরনে সেই খাকী হাফপ্যান্ট, খাকী শার্ট আর খাকী কোট। তা দিয়ে টপ-টপ করে জল ঝরছে। মরেছে সে। গায়ে দুটো গুলী।

বললে, "শালারা ধরে ফেলেছে হে! সেদিনকার ভদৌনীর ব্যাপারের পরেই বাঁড়ুয্যে আমায় শাসিয়ে রেখেছিল। গেরাহ্যি করিনি। সেই স্মিথ সাহেব, মারা গেল কি না। তার ভাই তো পাটনা পুলিশে। তদ্বিরে এসেছিল। আজ বেটা, হ্যাঁ, সে ছাড়া কেউ নয়, লাঞ্চ থেকে পটাপট গুলী মারলে। হ্যাঁ, লাঞ্চ থেকে। পারো তো কেস কোরো। প্রায় পার হয়ে এসেছিলাম,—"

কানাইদা' বললেন,—"খবর? খবর এনেছো?"

"হ্যাঁ, পাবে। কোটের লাইনিং ছিঁড়লে পাবে। অভ্র দিয়ে মোড়া লম্বা কাঠীর মতো জিনিষ। সাবধানে খুলো।"

বুঝলাম ফটিকের সারা গা ভিজে কেন, জামা-কাপড় সপসপে ভিজে। সাঁতরে গঙ্গা পার হয়েছে। রামনগর থেকে খবর আনছিল। কিন্তু ফটিক তখন মরছে।

বললো,—"আমার ছেলেটা রইলো কানাই।"

মরে গেল ফটিক হাবিলদার, টিকটিকি হাবিলদার।

সেই রাত্রেই ওর লাশ জলে ডুবিয়ে দিলাম আমরা।

ফটিক হাবিলদার "লা-পতা" হয়ে রইল, অর্থাৎ নিরুদ্দেশ।

ছেলেটা ছিল তো। কানাইদাও ছিলেন। তাঁর বাপ বরদা পণ্ডিত মশায় বীরুকে বলেছিলেন হাবিলদারের ছেলে সরোজের কথা। বীরু তো এখন গণ্যমান্য, যদি ওর একটা চাকরি।

বীরু অবশ্য বলেছিল, "ফটিক হাবিলদারের ছেলে! তার আবার চাকরি কি হবে? দেশের জন্য কোনও দিন কিছু যারা করেনি তাদের এখন চাকরির খোঁজে কি দরকার?"

বরদা পণ্ডিত মশায়ের চোখ নাকি জ্বলে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, "হাবিলদার কিছুই করেনি বীরু? তুমি বলবে?"

হাস্যভরা মুখে বীরু বলেছিল, "সন্ত্রাসবাদী আর গান্ধীবাদীর গোত্র আলাদা পণ্ডিত মশায়…সে জন্য নয়, আপনি নেহাৎ বলছেন তাই আপনার জন্যে…" ইত্যাদি।

তাই সরোজ আজ বীরুর পিয়ন। স্বদেশী সরকার বদান্য।

আর বীরু!

বীরু আজ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

যাত্রা হল শুরু

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পারেখ এসেছে। এবং এসেই কাজে লেগেছে। কোন্ দিকে কোন্ কাজে সে লেগে থাকবে তার নির্দ্দেশ নিয়ে এসেছে খোদ কর্ত্তার কাছ থেকে। আপিসের ভিতরে কোন কাজ নয়। তার কাজ বাইরে। তার কাজ লক্ষ্য রাখা। সংবাদ রাখা কোন্ শ্রমিক কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত, কে কার বিরুদ্ধে, কে কার অনুগত। লক্ষ্য করেছে জগুয়ার বেপরোয়া চলা-ফেরা, লক্ষ্য করেছে যোগেশের প্রতি তার আনুগত্য। লক্ষ্য করেছে যোগেশের গতিবিধি।

শ্রমিকদের মধ্যে দুটো দল আছে। এক দলের নেতা জগুয়া। অন্য দল মান্য করে বুড়ো রামলালকে। ইতিপূর্ব্বে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল জগুয়া। রামলাল এসে জগুয়ার রাজত্বে ভাগ বসিয়েছে সে জন্যে রামলালের প্রতি জগুয়ার বিদ্বেষ। পারেখ এ তথ্যও কতক জেনেছে এবং কতক বুঝে নিয়েছে।

আজ ক'দিন হ'ল নতুন কয়েকটা নির্দ্দেশ মুখার্জ্জী সাহেব জারী করেছেন, সেই আদেশগুলি ঠিক মতো প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে পারেখ দেখলে, একমাত্র জগুয়া ছাড়া অন্য সকলেই আদেশগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে।

• • • •

সুপ্রিয় এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে চায় যত শীগগির পারে। ফিরে যাবে সে বোম্বাই। আজই যদি যেতে পারতো!

পারেখের কাছে সে নিয়মিত সব সংবাদই পাচ্ছে। বুঝেছে, যত সহজে সব কাজ সম্পন্ন হবার আশা করেছিল, তত সহজে তা হবে না।

যোগেশের কথায়-বার্ত্তায় আচরণে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে সুপ্রিয়। হেসেছে মনে-মনে। কঠিনও হয়েছে সেই সঙ্গে। কোন কারণেই কোন অবস্থাতেই সে শেঠজির দেওয়া গুরু দায়িত্ব সম্পাদনে শিথিল হবে না।

আপিসে ব'সে যোগেশকে তলব করলে সুপ্রিয়। যোগেশ এসে দাঁড়াল। সুপ্রিয় বললে—এইবার তাহলে হিসেবটা বুঝিয়ে দিন। পরশুর মধ্যে একটা ট্রায়াল ব্যালান্স তৈরী ক'রে ফেলতে চাই।

অন্তরে কাঁপন ধরল যোগেশের। মুখে শান্ত ভাবে বললে—সে-হিসেব মহিম বাবু আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

মাথা নাড়লে সুপ্রিয়, বললে—আপনার কাছ থেকেই আমি সব বুঝে নেব। সেই রকমই নির্দ্দেশ আছে।

কিছুক্ষণ নীরব রইল সুপ্রিয়, তার পর নম্র কণ্ঠে বললে—যে-সব নতুন আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন করেছি সেগুলো যেন সবাই মানে, তার প্রতিও নজর দেবেন আপনি।

—নজর দেব। তবে মানা-না-মানা তাদের ইচ্ছে। তাদের ওপর আমার জোর খাটবে কেন?
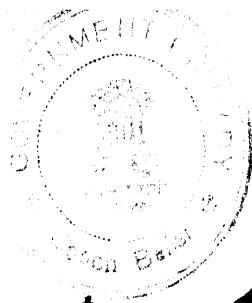
যোগেশের কথায় হাসল সুপ্রিয়, বললো—এত দিন তাদের ওপর

কর্তৃত্ব ক'রে তাদের বাধ্য করতে পারচেন না, এটা তো আনন্দের কথা নয়।

তর্ক করবার ঝোঁক চেপেছে যোগেশের, বিরস মুখে বললে—আমার বাধ্য তারা চিরদিনই।

—তবে কেন মানবে না আপনার কথা?

—আমার কথা নিশ্চয় মানবে। কিন্তু অন্যের কথা মানবে কি না তা আমি কেমন ক'রে জানবো?

ভ্রূ কুঞ্চিত হল সুপ্রিয়র, বললে—ও! আপনি বলছেন আমার কথা তারা মানবে না।

যোগেশ চুপ ক'রে রইল।

সুপ্রিয় বললে—তারা হয়তো জানে না, কিন্তু আপনি তো জানেন, এখানে কাজ করতে হলে আমার কথা মানা দরকার।

—চেষ্টা করব।

—ধন্যবাদ। তাহলে কাল দশটায় মহিম বাবুকে নিয়ে আপনি আসবেন। কেমন? আচ্ছা।

যোগেশ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে পারেখ এলো।

—এসো পারেখ। বোসো। ভগ্নদূতের মতো আজ কি সংবাদ এনেছো বল?

পারেখ বললে—আপনি হাসছেন। কিন্তু আমি হাসতে পারছি না।

—তাই নাকি! হাসতে লাগল সুপ্রিয়—তাহলে তো ভাবনার কথা।

—ভাবনার কথাই তো! রীতিমতো ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। পারেখ বলতে লাগল—প্রথম দিনেই আপনাকে বলেছিলাম, সোজা আঙুলে ঘী উঠবে না। বোধ হয় বুঝেছেন আমার কথা বেঠিক নয়। পুলিশ-অফিসারকে কিন্তু আমি আভাস দিয়ে রেখেছি।

একটু ভেবে সুপ্রিয় বললে—হয়ত ভালই করেছো। কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে তারা যেন ইন্টারফিয়ার না করে।

—তা করবে না।

সুপ্রিয় একখানা খাতার ওপর চোখ রেখে বললে—খাতাপত্রগুলো একটু সাবধানে রাখতে হবে। ভাউচারের ফাইলগুলো। এ দায়িত্ব রইল তোমার।

—সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি।

—বটে! তারিফ করে বললে সুপ্রিয়—আমার চেয়েও খর বুদ্ধি তোমার। তাতে সংশয় নেই। নতুন নিয়মগুলো জারী হয়েছে। সকলকে জানিয়ে দিও।

পারেখ বললে—লিখিত আদেশ সবাইকে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ফল কি লক্ষ্য করেছো?

—ফল, জগুয়া।

—অর্থাৎ?

—তাদের দলের লোকদের সে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, এ-সব নতুন নিয়ম অত্যাচারের নামান্তর। জগুয়াকে যথেষ্ট টাকা আর বুদ্ধির যোগান দেওয়া হচ্ছে।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুপ্রিয়। অনর্থক এ বৈরিতা কেন? সে তো এখানে থাকতে আসেনি, আসেনি কারুর কোন সুখের অন্তরায় হোতে। কিন্তু কর্তব্যে তো ত্রুটি ঘটতে দেওয়া চলবে না। সেদিক থেকে সে যে নিরুপায়।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যায় যোগেশকে দেখা গেল শহরের এক নোংরা বস্তির মধ্যে এক নীচজাতীয়া গণিকার ঘরে যোগেশ বসে আছে। নাচ-গান চলছিল বোধ হয়। থেমেছে। দু'জন সঙ্গী নিয়ে জগুয়া বসেছে পাশে। সলা-পরামর্শ চলছে।

* * * *

পরদিন সকাল দশটায় সুপ্রিয় আপিসে গিয়ে বসল। সকলেই যথাসময়ে হাজির হয়েছে, মহিম বাবু ছাড়া।

খাতাপত্র পারেখের জিম্মায়। মহিম বাবু এলেই কাজ আরম্ভ হবে, কিন্তু তাঁর দেখা নেই। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করেও যখন তিনি এলেন না, তখন সুপ্রিয় তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে বেহারা পাঠালে।

কিছুক্ষণ পরে বেহারা এসে যে সংবাদ দিলে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। কাল রাত থেকে মহিম বাবুর দর্শন পায়নি তাঁর চাকর। আহারাদির পর এক জন লোক এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ীর বাইরে। তার পর থেকে তাঁর আর কোন সন্ধান নেই। তাঁর চাকরটা চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

পারেখ দ্রুত বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ এলো।

যোগেশ মন্তব্য করলে—হয়ত কোন খবর পেয়ে তিনি দেশে চলে গেছেন।

—তাঁর দেশ কোথায়?

—সে তো অনেক দূর। শান্তিপুর।

প্রাথমিক তদন্ত শেষ ক'রে পুলিশ-অফিসার চলে গেল। যাবার আগে নিভৃতে সুপ্রিয়কে জানিয়ে গেল, সাবধানতা অবলম্বন করবার সময় এসেছে।

সুপ্রিয় কোন কথা বললে না। খাতা-পত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

যে যার কাজে চলে গেল। এক জন ছোকরা সহকারীকে ডেকে সুপ্রিয় খাতাগুলো নিয়ে পড়ল। কাটলো সারা দিন।

পারেখ ব্যাপৃত রইল তার নিত্যকার পর্য্যবেক্ষণ কাজে।

* * * *

সকাল বেলায় সুপ্রিয়র বাংলোয় উপস্থিত হ'ল যোগেশ। ড্রয়িং-রুমে বসেছিল সুপ্রিয়। কিছু চিন্তামগ্ন। যোগেশকে দেখে বললে—আসুন।

—আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ। বসুন।

বসল যোগেশ। মিনিট দুই কাটল। তার পর সুপ্রিয় বললে—মহিম বাবু হয়ত দেশেই চলে গেছেন। হয়ত ফিরতে দেরী হবে। না-ও ফিরতে পারেন। কিন্তু কাজ আটকে থাকলে তো চলবে না। হিসেবের ব্যাপারটা তাহলে আপনার কাছ থেকেই বুঝে নিতে হবে আমায়।

যোগেশ বোধ করি প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। বললে—আমার দ্বারা কি সম্ভব হবে?

—কেন হবে না ?

—খাতা লেখার কাজ তো করিনি।

—কিন্তু টাকা-কড়ির লেন-দেন হয়েছে আপনার হাত দিয়ে। সুপ্রিয় বললে—কাল কতকগুলো জিনিষ আমার নজরে পড়েছে। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা আপনার নামে রয়েছে যার হিসেব নেই।

আর কোন উপায় নেই। উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যোগেশের এত দিনের বেপরোয়া অনাচার। কিন্তু উপায় কি নেই? ইজ্জত আর প্রতিপত্তি যদি যায়, তার প্রতিশোধ নেবে না সে ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইল যোগেশ। তার পর শান্ত ভাবে বললে—আমি মহিম বাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু খাতা-পত্র তো সে কথা বলছে না।

—আমি নাচার।

—কিন্তু খাতা-পত্র যে সব সই করা রয়েছে আপনার। প্রত্যেক দিনের হিসেবে আপনার টিক দেওয়া রয়েছে। ডেবিট্ ভাউচারে সইও আছে। অতএব ও টাকাটা তো আপনাকেই দিতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, তার জন্যে জবাবদিহিও করতে হয়।

খুব নরম গলায় সুপ্রিয় বলতে লাগল—কোম্পানীর কাজ দেখতে এসেছি। সুতরাং আমার অবস্থাটাও আপনাকে বুঝতে হবে। দেখে-শুনে চুপ করে থাকা তো সম্ভব নয়।

চোখ তুলে যোগেশ বললে—চুপ ক'রে থাকা কি একেবারেই অসম্ভব ?

ক্ষীণ হাসি দেখা দিল সুপ্রিয়র ওষ্ঠপ্রান্তে; গম্ভীর গলায় বললে—ও প্রশ্নটা না করলেই পারতেন।

শেষ চেষ্টা করলে যোগেশ; নীচু গলায় বললে—আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। আমার মান-ইজ্জত গেলে আপনার কোন লাভ নেই। তার চেয়ে রফা করা যাক না কেন? দশ হাজার টাকা আপনাকে দেব। মিটিয়ে নিন না ব্যাপারটা। ইচ্ছে করলে, খুব সহজেই পারবেন।

দুঃখ লাগল সুপ্রিয়র। হাসিও পেল। মাথা নেড়ে বললে—এক দিন সময় দিলাম। পরশু হেড আপিসে রিপোর্ট পাঠাবো। তার আগেই টাকাটা আপনাকে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে পদত্যাগ-পত্র……

মাথার খুলির ওপর কে যেন সজোরে হাতুড়ি মারলে। কানের মধ্যে ঝিমঝিম্ শব্দ! কিন্তু দমবার পাত্র নয় যোগেশ। বলে উঠল—দুটোই অসম্ভব।

একান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে সুপ্রিয় বললে—পরশু সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

যোগেশ ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আচ্ছা, তাহলে চললাম। একটা কথা বলবার ছিল।

—বলুন।

—মিস্ চক্রবর্ত্তী, মানে প্রমীলার পিসিমা আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

অবাক্ হ'ল সুপ্রিয়।

—তাঁর সঙ্গে তো জানা-শোনা নেই। তিনি হঠাৎ…। আচ্ছা, যাব সুবিধে মতো।

যোগেশ চলে গেল। সুপ্রিয় বসল চিঠি লিখতে। মিনিট পনেরো পরে দরজার কাছে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। মুখ তুলে সুপ্রিয় দেখলে, জগুয়া এসে দাঁড়িয়েছে। এক মিনিটে লক্ষ্য ক'রে নিলে তাকে। উদ্ধত তার ভঙ্গী। কঠিন তার মুখের ভাব।

—আমাকে তলব করেছেন ?

—হ্যাঁ। ভেতরে এসো।

জগুয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

কলমটি যথাস্থানে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে সুপ্রিয় বললে—জগুয়া, কাজ করে দিন গুজরান করতে গেলে যেখানে কাজ করতে হবে সেখানকার নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলাই দরকার। তা না করলে যে কর্ত্তারা অসন্তুষ্ট হবে, আর তা হলে তো জীবনে উন্নতি করা যাবে না।

জগুয়া চুপ ক'রে রইল। ক্ষণকাল নীরব থেকে জগুয়া বললে—আপনার নয়া নিয়মগুলো আমাদের লোকসান করবে। আপনি আমাদের আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ ক'রে দিতে চান। বেশি ক'রে খাটাতে চান। আমাদের অনেকের চাকরি থাকবে না শুনছি। এ-সব বরদাস্ত হচ্ছে না আমাদের।

সুস্পষ্ট বিদ্রোহের সূচনা।

—এ সব নিয়ম বন্ধ করতে হবে আপনাকে।

—বল কি তুমি? অসহ্য বিস্ময়ে সুপ্রিয় সোজা হয়ে বসল। মনের ক্রোধ দমন ক'রে বললে—আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।

বীরদর্পে জগুয়া বেরিয়ে গেল।

রামলাল আসছিল ডাক নিয়ে। জগুয়া দেখতে পেলে তাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ক'রে উঠল—বুড়ো বেইমান!

রামলালের প্রতি জগুয়ার মন কোন দিনই প্রসন্ন ছিল না। তাই এখন তাকে সামনা-সামনি দেখে সে বারুদের মতো জ্বলে উঠল।

রামলাল কাছে আসতেই জগুয়া বললে—বেইমান কুত্তা কাঁহাকা। সাহেবের পা চাটতে যাচ্ছিস্!

জগুয়ার মনের খবর রামলালের অজানা ছিল না, হেসে বললে—তাঁর পা চাটাতেও পুণ্য আছে রে জগুয়া!

—বেইমান কুত্তা তোম্।

—বারে বারে গাল দিচ্ছিস্ কেন ?

—আলবৎ দেগা। বলে জগুয়া তার দিকে ধেয়ে গেল এবং অশ্লীল ভাষায় পুনরায় তাকে গালাগাল দিলে।

—খবরদার জগুয়া। ঠক-ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল রামলাল।

জগুয়ার মাথায় তখন যেন খুন চেপেছে……।

* * * *

শোভা এল প্রমীলার কাছে।

তার হাত ধরে প্রমীলা তাকে ঘরে এনে বসালো। বললে—দেখিনি যে দু'-তিন দিন? ত্যাগ করলি নাকি আমাকে সবাই মিলে? অমন বিষণ্ণ লাগছে কেন? প্রমীলা প্রশ্ন করলে—ঝগড়া হয়েছে কারুর সঙ্গে?

মাথা নেড়ে শোভা বললে—হয়েছে। তবে আমার সঙ্গে নয়। দাদার আপিসে। সুপ্রিয় বাবুর সঙ্গে যোগেশ বাবুর।

—সে আবার কি? উৎকর্ণ হ'ল প্রমীলা। কী খবর বল্ দেখি?

—খবর ভাল নয়। দাদার মুখে আজ সব শুনছিলাম। তাঁদের

আপিসে খুব ডামাডোল বেধেছে! কি সব হিসেবের গোলযোগের জন্তে। যোগেশ বাবু নাকি দায়ী। তাঁর সঙ্গে জুটেছে গুণ্ডার সর্দার জগুয়া। তারা সুপ্রিয় বাবুকে অপদস্থ করবার জন্তে ভীষণ ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি দাদা বললেন যে, তারা সুপ্রিয় বাবুকে মারতেও পিছ-পা হবে না।

কম্পিত কণ্ঠে প্রমীলা বললে—বলিস্ কি রে? এত কাণ্ড! কিছুই তো জানি নে!

—তুমি আর জানবে কি ক'রে! শোভা বলতে লাগল—পরশু রবিবার জগুয়ার দল মিটিং করবে। যোগেশ বাবুই এই মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। এই মিটিংএ যোগেশ বাবু প্রকাশ্যে সুপ্রিয় বাবুর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের কাছে বলবেন, তিনি নাকি শ্রমিকদের সর্ব্বনাশ করবার জন্তেই এসেছেন। আর জগুয়ার দল সেই মিটিং-এ সুপ্রিয় বাবুকে এখান থেকে চলে যাবার দাবী জানাবে। দাদা বলছিলেন, মিটিং-এ খুব গোলমাল হবে। সুপ্রিয় বাবু যদি সেই মিটিংএ যান তাহলে তাঁর ভীষণ বিপদ ঘটবে।

—সে কি! কেঁপে উঠল প্রমীলা।

—হ্যাঁ দিদি! দাদা খুব ভয় পেয়েছেন। সুপ্রিয় বাবু নাকি বলেছেন, সভায় তিনি যাবেনই।

—শোভা! ব্যাকুল কণ্ঠ প্রমীলার।

প্রমীলার ব্যাকুলতা দেখে শোভা ঈষৎ বিস্মিত হল। বললে—বল।

—সভায় যেতে নিষেধ ক'রে দেওয়া হোক না কেন?

—কাকে? সুপ্রিয় বাবুকে? শোভা বললে—কিন্তু কার নিষেধ তিনি শুনবেন? দাদার মুখে এই সব কথা শুনে পর্য্যন্ত মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে প্রমীলাদি! কোন উপায় করা যায় না?

বিহ্বলের মতো প্রমীলা বললে—উপায়! কিসের উপায়?

—সুপ্রিয় বাবু যাতে সভায় না যান।

হঠাৎ কি ভেবে শোভা বললে—তুমি বারণ করতে পারো না? তোমার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে। হয়ত তোমার কথা তিনি শুনবেন।

নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইল প্রমীলা। অস্ফুটে বললে—শুনবেন কি?

শোভা জোর দিয়ে বললে—নিশ্চয় শুনবেন। আজ সন্ধ্যে হোয়ে গেছে। আজ আর দরকার নেই। তুমি কাল সকালেই তার সঙ্গে দেখা কোরো। তাতে কোন লজ্জা নেই।

আপন মনে প্রমীলা বললে—আমি যাব তাঁর কাছে? গিয়ে বলব?

—হ্যাঁ, বলবে। তাতে কোন দোষ নেই। কোন লজ্জা নেই। কোন অপরাধ নেই। এ-কাজ যদি করতে পারো তাহলে অক্ষয় পুণ্য লাভ করবে তুমি।

শোভা তো জানে না, কাকে কি বলছে? কী ঝড় যে উঠেছে প্রমীলার মনের আকাশে সে-বার্ত্তা শোভা পাবে কেমন করে? আরও খানিকক্ষণ প্রমীলার কাছে অতিবাহিত ক'রে সে চলে গেল।

বাইরে এসে দাঁড়ালো প্রমীলা। আধো-অন্ধকার বারান্দাটা যেন গিলতে আসছে।

বারান্দার অপর প্রান্তে জুতোর শব্দ! ও কে? ভীষণ চমকে উঠল প্রমীলা। সুপ্রিয় এসেছে।

তাকে দেখে সুপ্রিয় এগিয়ে এলো। বললে—এই যে তুমি রয়েছো। যোগেশ বাবুর কাছে শুনলাম তোমার পিসিমা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। কেন বল ত?

সুপ্রিয়কে দেখে প্রমীলার বিহ্বলতা যেন আরও বেড়ে গেছে। তার কথা শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না তার। পিসিমা ডেকেছেন তাকে! সে তো কিছু জানে না!

মৃদু কণ্ঠে বললে—তা তো জানি না!

—জানো না? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। তোমার পিসিমাকে গিয়ে বল আমি এসেছি দেখা করতে।

কি বলতে গেল প্রমীলা। বলা হল না।

সুপ্রিয় বললে—আমার একটু তাড়া আছে কিন্তু। অনেক কাজ ফেলে রেখে এসেছি।

মৃদু আলোর নীচে মুহূর্ত্তের জন্তে চোখোচোখি হল। তার পর প্রমীলা ক্ষীণ স্বরে বললে—আমি জিগেস ক'রে আসি।

ভিতরে চলে গেল প্রমীলা। স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়। ক্লিষ্ট দুই নয়নের অন্তরালে কী সে ভাষা প্রকাশের পথ খুঁজছিল? দোলা লাগল মনে।

প্রমীলা উপরে গিয়ে শ্লথ পদে নীচে নেমে আসে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল সুপ্রিয়। টের পেল না। কাছে গিয়ে প্রমীলা বললে—পিসিমা ডাকছেন।

সুপ্রিয়কে নিয়ে প্রমীলা ওপরে উঠল। তাকে দেখে পিসিমা বললেন—এসো বাবা, এসো। বসো এই চেয়ারটায়। প্রমীলা, তুই নীচে যা।

এক মুহূর্ত্ত কী ভাবলে প্রমীলা। তার পর নীচে নেমে গেল।

সুপ্রিয় আড়ষ্ট। হঠাৎ এ কী সম্বর্দ্ধনা! পিসিমা বলতে লাগলেন, বাপ-বেটায় মিলে আমাদের সর্ব্বনাশ করেও আশ মেটেনি! আবার এসেছো জ্বালাতে। কিন্তু এবার সুবিধে হবে না। আবার যদি কখনো আমার বাড়ীতে আসো বা আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা কর, তাহলে পুলিশে দেব তোমায়।

আরও অনেক কথা অনেকক্ষণ ধ'রে শুনিয়ে যখন ক্ষান্ত হলেন পিসিমা, তখন সুপ্রিয় বললে—তাহলে কি যেতে পারি?

পিসিমা বললেন—যাবে না তো কি! এখানে ব'সে থাকবে?

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে সিঁড়িটা ঠাহর করতে পারছিল না। হাতড়ে হাতড়ে নেমে এলো।

বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল প্রমীলা। কী বলবে মনে-মনে তারই জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিল। সুপ্রিয়কে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে একান্ত সন্নিকটে।

—কি বললেন পিসিমা?

হাসলে সুপ্রিয়। বিকৃত করুণ হাসি। বললে—সে অনেক কথা। পেট ভরে গেছে।

অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠল প্রমীলা। বাড়ীতে ডেকে এনে পিসিমা তাঁকে অপমান করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এগিয়ে গিয়ে বললে—কথা ছিল যে।

ফিরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে—পিসিমার বাকী কথা বুঝি তুমি শেষ করবে? বল শুনি।

প্রমীলা বললে—আপিসের কাজে নাকি খুব গোলমাল? অনেকে নাকি বিরুদ্ধে লেগেছে? এ-সব গোলমালের মধ্যে না থাকাই তো ভাল।

সুপ্রিয় বললে—হ্যাঁ, শুনছি, খুব গোলমাল হবে। সেই জন্যে তো আরও বেশি করে যেতে হবে আমায়।

—কী দরকার যাবার! যদি গুরুতর কোন কাণ্ড ঘটে! বিপদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো কেন?

সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা, চললাম।

চ'লে যেতে দিলে প্রমীলা? পথ আটকাতে পারলে না? বলতে পারলে না কিছুই? এ কী করলে তুমি!

* * * *

রবিবার অপরাহ্ণ। মাঠের ওপর থেকে ক্রম-বর্দ্ধমান কোলাহল ভেসে আসছে। দলে দলে শ্রমিকরা চলেছে সভায়। কণ্ঠে বিক্ষোভের বাণী—নয়া সুপরিন্‌টেন্‌ডেন্ট মুর্দ্দাবাদ। ইন্‌ কিলাব জিন্দাবাদ।

প্রমীলা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সারা দিন তার যে কী করে কেটেছে তা জানেন অন্তর্য্যামী।

ঘরের ভিতরে গিয়ে বসল। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে কৈ? ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে।

—কে? দাঁড়িয়ে উঠল প্রমীলা। না, কেউ তো নয়! বাতাসে দরজাটা নড়ে উঠল।

—মাইজি!

—কে রে?

—আমি হরিয়া।

রামলালের অনুগত অনুচর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। মুখে-চোখে নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া।

প্রমীলা কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে হরিয়া?

—মা, সর্ব্বনাশ হবে এখুনি। সর্দ্দার আমায় আপনার কাছে পাঠালে।

—রামলাল কোথায় হরিয়া?

হরিয়া বললে—সর্দ্দার বাড়িতে শুয়ে আছে। আজ দু'দিন সে উঠতে পারছে না। খুব জ্বর আর গায়ে-বুকে বড্ড বেদনা। সেদিন জগুয়া তাকে বড্ড মেরেছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। মা! বড্ড লেগেছে সর্দ্দারের। কিন্তু সে-কথা নয়। সর্দ্দার আমায় আপনাকে মিটিং-এ নিয়ে যেতে বলেছে। মুখার্জ্জি সাহেবের আজ বড় বিপদ। আপনি গিয়ে তাঁকে মিটিং থেকে ফিরিয়ে আনুন। জগুয়া আজ তাঁকে খুন করবে বলেছে। সর্দ্দার বলেছে, সাহেব তোমার কথা শুনবেন। তুমি শীগগির যাও মা। মিটিং শুরু হবে এখুনি।

রামলাল বলেছে এই কথা! রামলালের মুখ দিয়ে ভগবান কি তাঁর শেষ নির্দ্দেশ পাঠালেন প্রমীলাকে?

—তুমি যাবে না মা?

—যাব।

হরিয়া ব্যস্ত হল—তাহলে আমি সর্দ্দারকে বলি গে।

—হ্যাঁ, যাও। আমি যাচ্ছি। একাই যেতে পারবো।

ছুটে চলে গেল হরিয়া।

প্রবল ভূমিকম্পে চারিদিক ধ্বসে পড়েছে। সেই ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে নিতে হবে প্রমীলাকে। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে প্রমীলা বারান্দা থেকে নামল। থমকে দাঁড়াল বারেক। দু'হাত তুলে প্রণাম করলে পথের দেবতাকে। শক্তি দাও, শক্তি দাও, ভগবান, এই পথটুকু পার হোতে প্রমীলাকে শক্তি দাও।

* * * *

সভায় উত্তেজনা আর হট্টগোলের অবধি নেই। হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে যোগেশ বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বক্তৃতা যেমন উত্তেজক, তেমনি হিংসায় পঙ্কিল।

—শ্রমিকদের সর্বনাশ করবার জন্যে বোম্বাই থেকে যারা এসেছে তাদের জুলুমবাজী শ্রমিকরা কি নত-মস্তকে মেনে নেবে?

'না', 'না', শব্দ উঠল চারিদিক থেকে। মুর্দ্দাবাদ আর জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর হল সভাস্থল।

যোগেশ বলতে লাগল—সব রকমে শ্রমিকদের শুষে নিতে, তাদের জীবনের আনন্দকে হরণ করতে যারা আজ এসেছে তারা ফিরে যাক, নইলে…

কথা অসমাপ্ত রইল। ক্রুর হিংস্র দৃষ্টিতে যোগেশ তাকালো সুপ্রিয়র দিকে। অদূরে একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের ওপর ব'সে আছে সুপ্রিয়—স্থির, নিষ্কম্প।

ভীড়ের পিছনে দাঁড়িয়েছিল জগুয়া। ধীরে ধীরে সে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে ভীড় ঠেলে। তার ডান হাতখানা রয়েছে কোমরে যেখানে লুকানো আছে বিষাক্ত শাণিত ছুরিকা।

আবার চীৎকার উঠল চারি দিকে—জুলুমবাজী চলবে না। নয়া সাহেবলোক মুর্দ্দাবাদ।

বক্তৃতা শেষ ক'রে সুপ্রিয়র দিকে ফিরে উদ্ধত বিজয়ীর মতো যোগেশ বললে—বলুন, এবার কি বলবেন।

হঠাৎ চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠল। ভীড়ের পাশ দিয়ে ও কে আসছে? প্রমীলা? হ্যাঁ, প্রমীলাই তো?

মঞ্চের ওপর উঠে এলো প্রমীলা। দাঁড়ালো এসে সুপ্রিয়র সামনে। রুদ্ধশ্বাসে বললে—চলে এসো এখান থেকে। এসো।

জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিস্ময় সুপ্রিয়কে বিহ্বল করলে ক্ষণকালের জন্যে। বললে—তুমি এখানে কেন?

উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়।

—আসতেই হল আমায়। চাপা ত্রস্ত কণ্ঠে প্রমীলা বললে—এ সভা ছেড়ে চলে এসো এখুনি।

—কি বলছ তুমি? যাও, যোগেশ বাবুর পাশে গিয়ে বোসো গে।

আজ আর প্রমীলার কথা হারিয়ে যাচ্ছে না। বললে—ভর্ৎসনায় সময় অনেক পাবে পরে। চল এখান থেকে।

—অনর্থক তুমি এসেছো। দৃঢ় কণ্ঠে সুপ্রিয় বললে—আমি যাব না।—না, আমার কথা না বলে আমি যাব না। আমি ভীরু নই।

এই বলে সুপ্রিয় এগিয়ে গেল মঞ্চের সামনে। প্রমীলার গতি

আজ আর রুদ্ধ হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে সেও গিয়ে দাঁড়াল সুপ্রিয়র পাশে।

সেই অভিনব দৃশ্যের সামনে হতভম্ব হোয়ে গেছে যোগেশ। অবাক হোয়ে চেয়ে আছে শ্রমিকরা।

সুপ্রিয় বলতে লাগল—ভাই সব, তোমরা মনে কোরো না, ভয় পেয়ে আমি তোমাদের কাছে কোন আবেদন জানাতে এসেছি। আমি বলতে এসেছি যে, তোমরা ভুল পথে চলেছো; স্বার্থলোভী সয়তানের ষড়যন্ত্রে প'ড়ে তোমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছো।

জগুয়া এগিয়ে আসছে। হিংস্র জন্তু শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যে ভঙ্গীতে এগিয়ে আসে তেমনি ভঙ্গী জগুয়ার। যোগেশের সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'ল। যোগেশ কি ইসারা করলে। মাথা নেড়ে উত্তর দিলে জগুয়া।

—মার, মার!

হঠাৎ মার মার শব্দ উঠল চারিদিকে!

—খবরদার! খবরদার!

পিছন থেকে টলতে-টলতে সামনে এসে দাঁড়াল রামলাল। দাঁড়াল প্রমীলা আর সুপ্রিয়কে আড়াল ক'রে। ভাঙা গলায় জনতাকে উদ্দেশ ক'রে বলে উঠল—খবরদার!

রামলালকে দেখে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠল জগুয়া! তার মাথার শির যেন ছিঁড়ে গেল। কোমর থেকে তীক্ষ্ণধার ছুরি টেনে বার করলে, তার পর সজোরে অব্যর্থ সন্ধানে নিক্ষেপ করলে সেই মারণাস্ত্র।

বায়ুস্তরের বুক চিরে বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো দ্রুত ধাবমান সেই ছুরিকার ফলা গিয়ে বিঁধলো রামলালের গলার নীচে বুকের মধ্যে! অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে রামলাল লুটিয়ে পড়ল।

—খুন হো গিয়া, খুন! বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল চারিদিকে।

সেই মুহূর্ত্তে সভায় ঢুকলো পারেখ। সঙ্গে চার জন সাদা পোষাক-পরা সশস্ত্র পুলিশ। পাঁচ মিনিট আগেও যদি আসতে পারতো পারেখ। গ্রেপ্তার হল জগুয়া আর তার দুই সঙ্গী। গ্রেপ্তার হল যোগেশ।

—রামলাল! এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রমীলা। রামলালের পাশে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলে।

ক্লান্ত দুই চোখ মেলে একবার তাকালো রামলাল। জড়িত স্বরে বললে—প্রমীলা, মা! আঃ!

চেতনা লুপ্ত হল রামলালের। সারা বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিমীলিত দুই চোখে অশ্রুর আভাস।

—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ধর ওকে।

লোকজন ছুটে এলো। ধরাধরি করে তুললো। তার পর তার সংজ্ঞাহীন দেহ নিকটস্থ হাসপাতালে প্রেরিত হল। হিতেন চলল সঙ্গে।

হেঁকে বললে সুপ্রিয়—কোন চেষ্টার ত্রুটি যেন না হয় হিতেন। আমি এখনি যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিটে প্রলয় শেষ হয়ে প্রকৃতি আবার শান্ত হল। ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে পুলিশ চলে গেল। পারেখ গেল সঙ্গে। লোকজন যে-যার ঘরের দিকে ছুটল। জনশূন্য সভাস্থলে আবার দু'জনে দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—আমার জন্যে প্রাণ দিলে রামলাল! গাঢ় স্বর সুপ্রিয়র। সুপ্রিয় বললে—আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। যাবে আমার সঙ্গে?

—যাব বৈ কি!

—চল।

* * * *

হাসপাতালের বড় ডাক্তার নিজে চিকিৎসায় লেগেছেন। ক্ষত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ইনজেক্সনের পর ইনজেক্সন দিয়েছেন। স্বতন্ত্র কামরায় শুভ্র শয্যার ওপর রামলাল শুয়ে আছে, অচেতন নিস্পন্দ।

মাথার শিয়রে গিয়ে বসল প্রমীলা। দুই চোখে তার জলের ধারা। রামলালের শেষ কথাগুলি তার কানে বাজছে।

ঘণ্টা দুই পরে দু'জনে হাসপাতাল থেকে বেরুলো। ডাক্তার কোন আশা দিতে পারলেন না। বললেন, দু'-তিন দিন যদি কাটে তাহলে হয়ত জীবনের আশা ফিরে আসতে পারে।

নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তর পার হোয়ে দু'জনকে পথ অতিক্রম করতে লাগল। গভীর বিষাদে দু'জনেরই অন্তর আচ্ছন্ন, গতি মন্থর।

সুপ্রিয় বললে—তাহলে শেষ মুহূর্ত্তে রামলালই তোমায় বলে পাঠিয়েছিল সভায় যেতে? কেমন ক'রে সে বুঝলে যে তুমি কোন বাধা মানবে না, দুর্য্যোগ মাথায় করে সভায় যাবে, তা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগছে!

প্রমীলার মুখে কথা নেই। নানা ভাবের প্রতিক্রিয়ায় সে যেন মুহ্যমান হোয়ে পড়েছে।

সুপ্রিয় আবার বললে—রামলাল শুধু যে আমাকে বাঁচালো, তাই নয়, তোমাকে ফিরিয়ে দিল আমার কাছে।

প্রমীলা তথাপি নীরব। সুপ্রিয় প্রমীলাকে রেখে চলে গেল হাসপাতালে। যাবার সময় বললে—কাল যদি হাসপাতালে এসো দেখা হবে।

সুপ্রিয় সকাল হ'তে না হ'তেই হাসপাতালে গিয়েছিল। গিয়ে দেখলে প্রমীলা তার আগেই এসেছে।

ডাক্তার দাঁড়িয়েছিলেন সামনে, প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছে এ বেলা?

মাথা নেড়ে ডাক্তার বললেন—আর কোন আশা নেই। ডিলিরিয়ম শুরু হয়েছে।

ঘরে ঢুকলো প্রমীলা। তাকে দেখে নার্স ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রলাপ বকছে রামলাল। প্রমীলা মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল সে। এ সব কি বলছে রামলাল!

—ছেড়ে দাও, কালিনাথ, আমায় ছেড়ে দাও। তুমি সয়তান, তুমি সয়তান।

সর্ব্ব দেহ হিম হোয়ে গেল প্রমীলার! এ কার কণ্ঠস্বর সে শুনছে!

করুণ কণ্ঠের প্রলাপ শোনা যেতে লাগল—প্রমীলা, ওকে যেতে দিস্ নে মা! ধ'রে রাখ, ওকে ধ'রে রাখ! ভুল করেছি মা, কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই? তোরা ছেড়ে গেলি আমায়! ভাসিয়ে দিয়ে গেলি। সয়তানের কবলে ফেলে গেলি?

কাঁপতে কাঁপতে রুগীর মাথার কাছে বসে পড়ল প্রমীলা। এ কী বিস্ময়! এ কী উদ্‌ঘাটন! এ কী মর্ম্মান্তিক বেদনা!

অস্ফুটে প্রমীলা ডাকলে—জ্যেঠা মশায়! এ কী হল! এ কী করলেন? জ্যেঠা মশায়!

কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে কে? দীপ নিবে আসছে। ক্ষীণ কণ্ঠের শেষ প্রলাপ শোনা গেল—আমায় তোরা শোধরাবার সুযোগ দিলি নে, সময় দিলি নে। শুধু আমার স্খলন আর ত্রুটিই তোদের চোখে পড়ল? ছেড়ে গেলি আমায়? আমি কি শুধুই পাপিষ্ঠ? আমার মধ্যে ভাল কি কিছুই ছিল না? কে? কে? কালিনাথ! দূর হও তুমি! আঃ! ছেড়ে দাও আমায়!

—জ্যেঠা মশায়!

কঠিন হল সর্ব্বশরীর। দুই চোখ হল বিস্ফারিত মুহূর্ত্তের জন্যে। তার পর ধীরে ধীরে মুদে এলো। নীথর হ'ল দেহ। স্তব্ধ হ'ল হৃদ্‌স্পন্দন।

—ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! কেঁদে উঠল প্রমীলা।

সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকলো সুপ্রিয়। বললে—কি হ'ল?

প্রমীলা লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। প্রমীলার অধীর ব্যাকুলতার আতিশয্যে হয়ত একটু বিস্মিত হ'ল সুপ্রিয়।

শেষ

বাড়ী বদল

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সদর রাস্তার উপর পাশাপাশি দু'খানি বাড়ী—মাঝে একটি অপ্রশস্ত গলি মাত্র ব্যবধান। ও-বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লে এ-বাড়ীতে কেউ ডাকছে বলে ভ্রম হয়; এ-বাড়ীতে কারুর জোরে নাক ডাকলে ও-বাড়ীর লোকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে—এমনি অবস্থা। এত কাছাকাছি এবং মাখামাখি ভাবে বাস করলেও দুই বাড়ীর মধ্যে সম্বন্ধটা তেমন ঘনিষ্ঠ ও মধুর নয়।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাড়ী দু'টিতে যাঁরা যাঁরা বাস করেন বা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আগে কিছু আলাপ-পরিচয় করতে হয়।

মাষ্টার মন্মথনাথ মিত্র, প্রায় বিশ বৎসরের কাছাকাছি—ঐ পশ্চিম দিকের বাড়ীটায় বাস করে আসছেন। মাষ্টার বলতে সাধারণতঃ নির্ব্বিবাদী নিরীহ দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারই বুঝায়, যাঁরা সারা জীবন ধরে ছেলে পড়িয়ে মানুষ করতে ও একটা জাতিকে গড়ে তুলবার পিছনে নিজেদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি নিঃশেষ করে ফেলে শেষ জীবনে নিজেরাই আর মানুষের মধ্যে ধর্ত্তব্য থাকেন না। কিন্তু মন্মথ মিত্রের 'মাষ্টার' খেতাবটা ঠিক তাই বলে ধরে নিলে একটু ভুল করা হবে। তাঁর নিজের মুখেই ওটার ব্যাখ্যা এই ভাবে শোনা যায়, "গান্ধীজীকে মহাত্মা বলে, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-কবি বলে, সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে যেমন উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয়, মাষ্টারটি আমারও ঐ ধরণের সম্মানসূচক পদবী; এবং বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, ওটি কে দিয়েছিলেন জানো? স্যার আশুতোষ—স্বয়ং!"

কেউ কি আর নিজের সম্বন্ধে অমন অযথা বাড়িয়ে বলে! সুতরাং বিশ্বাস না করে চলে না; কিন্তু, কি কারণে এবং কবে যে স্যার আশুতোষ এত মাথা ঘামিয়ে এমন পদবীটি দিয়ে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন, পরিষ্কার খুলে না বললেও—তাঁর অন্যান্য পরিচয় কিছু কিছু পেলেই, সে কথা জানতে আর বিশেষ ক্লেশ পেতে হবে না।

তিনি নিজেই বলেন যে, সাত-ঘাটের জল খাওয়া মানুষ,—জীবনে অনেক কিছুই দেখেছেন। শ্রীঅরবিন্দ-রবীন্দ্র থেকে উদয়শঙ্কর, শিশির ভাদুড়ী পর্য্যন্ত, আবার মহাত্মা গান্ধী-নেহরু প্যাটেল থেকে মোহনবাগান ইষ্ট বেঙ্গলের ব্যানার্জ্জি-চ্যাটার্জ্জি পর্য্যন্ত, সকলের সঙ্গেই সমান সম্বন্ধ পরিচয় দাবী করেন। ভারতের এমন কোন স্থান নেই যেখানে তিনি ভ্রমণ করেননি—এমন কোন জাতি নেই যাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেননি—এমন কোন ভাষা নেই যা তাঁর অল্প-বিস্তর জানা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আকাশের তারার সংখ্যা নির্ণয় করা বোধ করি তত কঠিন নয়—যত কঠিন, চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা। মাথায় চুল,—ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গাছের পাতার বর্ণ-পরিবর্ত্তনের মত—মাসে দু'মাসে রঙ বদল করে। কখনো ঘন-কালো কখনো বা ধূপ-ছায়া, কিছু দিন ফ্যাকাশে লালচে ধরণের, তার পর কিছু দিন তুষারধবল এবং পুনরায় ঘন-কৃষ্ণ। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর লোকে এই দেখে আসছে।

দিন ও রাত্রি যেমন প্রকৃতির দুটি অবস্থার প্রকাশ, তেমনি তাহার মুখাকৃতিরও দুটি ভাবের বিকাশ সাধারণতঃ লোকের চোখে পড়ে। নিন্দুকেরা তাকে 'আলো-ছায়া' ভাব বলে। আলো—অর্থাৎ মুখখানি যখন বেশ পুরন্ত, গাল দুটি স্বাভাবিক রকম ফোলা, মুখের কোন স্থান তোবড়ানো বা কুঁচকানো থাকে না, হাসলে সুন্দর সুসমৃদ্ধ শুভ্র দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে ওঠে—তখন আলো-ভাব বলা হয়। আবার যখন গাল দুটি চুপসে যায়, মুখের নানা স্থানে খাঁজ পড়ে, হাসলে দন্তবিহীন মাড়ি বার হয়ে পড়ে তখন বলা হয় ছায়া-ভাব। চেষ্টা করলে সারা দিনে আলো-ছায়ার এ নিত্য খেলা কয়েক বারই দেখতে পাওয়া যায়।

'লোকের বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় নিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, সে চেষ্টা না করাই সুবিবেচনার কাজ। কর্মই লোকের প্রকৃত পরিচয়।' এ কথা তিনিই বলেন। কথাগুলি মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং কি যে তাঁর পেশা, কি যে তিনি করেন এবং কি যে না করেন, সহজে তা জানবার বা বুঝবার কোন উপায় নেই। তবে ডাক্তারী, মোক্তারী, ঠিকেদারী, ব্যবসাদারী এবং সর্ব্বোপরি মাষ্টারী প্রভৃতি সবেতেই তাঁর সমান দখল ও ব্যুৎপত্তি দেখা যায় এবং হাত-যশও যথেষ্ট আছে। সকল শাস্ত্রেই যে তিনি সমান পারদর্শী ও অভিজ্ঞ—তাতে সন্দেহ করবার কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

মন্মথ মিত্রের এত দিন ধরে এ-বাড়ীতে অবস্থান কালে ও-বাড়ী—অর্থাৎ পূর্ব দিকের বাড়ীতে বোধ করি বার আষ্টেক ভাড়াটের ফের-বদল হয়েছে। চোখ-কান একেবারে বন্ধ করে থেকেও, দু'বৎসরের বেশী কেউই প্রায় টিঁকতে পারেননি।

প্রতিবারই নতুন কোন ভাড়াটে এলে প্রথম কিছু দিন দুই বাড়ীতে বেশ ভাব জমে ওঠে, আসা-যাওয়া, জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদান বেশ চলতে থাকে। কিন্তু এ মিষ্ট-সম্বন্ধ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তুচ্ছ কোন কারণে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়!

এ-বাড়ীর পোষা টিয়া পাখী খাঁচা খোলা পেয়ে উড়ে ও-বাড়ীতে গিয়ে বসলে যদি ও-বাড়ীর পোষা বিড়াল তাকে সাদর অভ্যর্থনা না জানায়, কিম্বা দুই বাড়ীর পোষা কুকুর বেশ কিছু দিন ধরে একত্রে বাস করবার এবং প্রতিদিনই কত-শত বার পরস্পরে দেখা হয়ে গা-শুঁকাশুঁকি করে ভাব করবার সুযোগ পেয়েও যদি সাক্ষাৎ মাত্রেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, মুখব্যাদান করে সামনের বাহু-যুগল বিস্তার করে এ-ওর গলা জড়িয়ে সশব্দে আদর ও চুম্বন করতে থাকে,—তাতে কারুরই বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু যদি এ-বাড়ীর কোন চিঠি ভুলক্রমে ও-বাড়ীতে গিয়ে পড়ে এ-বাড়ীতে ফিরে আসবার পথ আর খুঁজে না পায়, অথবা ও-বাড়ীর দোতলার জানালা খুললে এ-বাড়ীর অঙ্গন বেপর্দা হয়ে পড়তে থাকে, তখনই বুঝতে হয়, উদ্যোগ-পর্ব আরম্ভ-প্রায়। ক্রমে ছেলে-মেয়েদের ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে বড়দের মধ্যে মন-কষাকষি, ঝী-চাকর নিয়ে রেশা-রেশি, পুরুষদের হুংকার আস্ফালন, মেয়েদের কোন্দল-কোলাহল বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত আইন-আদালতের আশ্রয় নেবার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে মাষ্টার মন্মথর মাষ্টারী চালে ভাড়াটেকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। কূটনীতি বলুন আর রাজনীতিই বলুন,—সকল নীতি-বিশারদ মন্মথনাথের জয় অব্যর্থ!

একবার এক বিহারী-পরিবার এসে চুরী হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে চলে যায়, এক মুসলমান ভাড়াটের প্রতিদিন ক্রমাগত হাঁস ও মুর্গী কমে যেতে থাকে, একবার এক ধর্মভীরু মাড়োয়ারী ঘি-এর কারবার করতে আসেন। ঘৃতে চর্বি সংমিশ্রণের সময় চর্বির মধ্যে প্রায়ই মাছের কাঁটা, পাঁঠার হাড়, ডিমের খোলা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হতে থাকায় সভয়ে দশরথ-নন্দনকে স্মরণ করতে করতে, এখান থেকে কারবার গুটিয়ে অন্যত্র গিয়ে কাঁদেন।

একবার এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে কিছু বেশী দিন বাস করেছিলেন ননীলাল বসু—হাই স্কুলের মাষ্টার।

মন্মথ মিত্রের স্ত্রীর সে সময় বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে,—এখন-তখন অবস্থা! খবর পেয়ে ননী বাবু সস্ত্রীক ও-বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যান। স্ত্রীকে অন্দরে পাঠিয়ে নিজে বাইরের ঘরে মন্মথ বাবুর সঙ্গে গল্প-গাছা করতে থাকেন।

মন্মথনাথ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে বললেন, "বড়ই খুশী হ'লুম মাষ্টার মশাই—আমার এ বিপদের সময় দয়া করে আপনারা খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। আজকাল কে কার খোঁজ রাখে বলুন? সভ্যতার যুগে এ-সব ভদ্রতা, সামাজিক নিয়ম একেবারে উঠে গেছে বললেও চলে। সহরে গিয়ে দেখুন, যেখানে চলতে-ফিরতে, পথে-ঘাটে সভ্যতার ছড়াছড়ি, নীচের তলায় হয়ত কেউ মরেছে, মড়া-কান্না কাঁদছে, ওপরের তলায় দেখবেন দিব্যি স্ফূর্ত্তির হুড়োহুড়ি, বাইজীর নাচ-গান চলেছে;—হায় রে দেশের অবস্থা! নকল সভ্যতায় চারিদিক ছেয়ে গেল।"

ননী বাবু ঘন ঘন সায় দিয়ে বললে, "যথার্থ বলেছেন—অতি সত্য কথা।"

মন্মথ বাবু সেই ভাবেই বলতে লাগলেন, "অথচ এমন এক দিন ছিল—আমাদের চোখে দেখা,—যখন কারুর বিপদ-আপদে পাড়া-প্রতিবেশী বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আপন-পর জ্ঞান থাকত না।" সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, "কার্য্যোপলক্ষে, মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে একবার কিছু দিন থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল,—তাঁর এই গুণটি আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছিল; কারুর দুঃখ-বিপদে একেবারে আপন জন হয়ে দাঁড়াতেন, যেন ঈশ্বর এসে সহায় হয়ে দাঁড়ালেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কথা শোনেনি এমন লোক নেই; কিন্তু এঁকে যে আমার স্বচক্ষে দেখা! আহা! স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।" বলে যুক্ত-কর কপালে ঠেকালেন।

ননী বাবু ভাবাবেশে ঘন-ঘন দুলতে লাগলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন, "যথার্থ বলেছেন, ওঁরা মানুষ ছিলেন না—শাপভ্রষ্ট দেবতা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্মথ বললেন, "তাই বলছিলুম, মাষ্টার মশাই, কি দিন ছিল আর কি এল!"

"ঠিক কথা" মাথা নেড়ে ননী বাবু বললেন। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কাটবার পর ননী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন? ডাক্তারেরা কি বলছেন?"

হতাশ ভাবে মন্মথনাথ বললেন, "ওর আর থাকাথাকি বলাবলির কি-ই বা আছে বলুন,—যে ক'টা দিন কাটবার কোন প্রকারে কেটে যাচ্ছে,—এই।" একটু থেমে বলতে লাগলেন, "ও কি আর আজ থেকে ভুগছে মশাই, দুঃখের কথা কত আর বলি,—কয়েকটি বছর এই নিয়ে হিম্-সিম্ খাচ্ছি, ধনে-প্রাণে মরতে বসেছি! চিকিৎসার কিছু কি আর বাকী আছে? হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবরাজী, হাকিমী ইত্যাদির পিছনে কোথায় না ছুটোছুটি করেছি—কোলকাতা, মিহিজাম, দিল্লী, বোম্বাই সারা দেশ চষে ফেলেছি; কিসৃসু না। সার নীলরতন বলুন, ডাক্তার রায়ই বলুন, কাউকে বাদ দিইনি। কত ক্রোড়-ক্রোড় পেনিসিলিন আরও কি সব মাইসিন-ফাইসিন কত কি ফোঁড়া হল তার আর আদি-অন্ত নেই। হালে পানিই পাওয়া গেল না।···আধুনিক চিকিৎসার কি বলিহারি ব্যবস্থা! ভীষ্মের শরশয্যা বললেও খাটো করে বলা হয়।··· অবশেষে ফিরিয়ে এনে নিজেরই চিকিৎসায় কিছু দিন রাখি, রোগও কমের দিকে এলো, বেশ খানিকটা সামলেও উঠলো,—তবে মেয়েদের ব্যাপার জানেনই ত—একটু ক্ষমতা পেয়েছে কি অনিয়ম-অত্যাচার করতে থাকবে। হ'লও তাই—আবার ঘুরে পড়ল। এবার 'ফরেনে' কোথাও নিয়ে যাবো ভাবছি, দু'-চার জায়গা খোরাও আছে—তবে বহু দিন হয়েও গেল·· তাই।"

ননী বাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, "যথার্থ, তাই করা উচিত। আজকালকার চিকিৎসা-বিধানকে আসুরিক চিকিৎসা বলা চলে,

এর চেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরা বোধ করি কম কষ্টকর!···আচ্ছা আজ উঠি, আবার আসব।" বলে নমস্কার করলেন।

"আসবেন বৈ কি" প্রতি-নমস্কার করে মাষ্টার মন্মথ বললেন, "প্রতিবেশী,—আপনারাই ত বিপদে ভরসা।"

ওদিকে মন্মথ বাবুর স্ত্রী ননী বাবুর স্ত্রীকে আসতে দেখে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়েই একটু পাশ ফিরবার চেষ্টা করে, ম্লান হাসি হেসে রুগ্ন-ক্ষীণ কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "এসো ভাই বসো,—ও-বাড়ীতে বুঝি তোমরা এসেছ, বেশ, বেশ—বসো। আমিই কোথায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করব, পোড়া কপাল দেখ না, ওঠবার-নড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই।" বলতে বলতে কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল, এবং চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ননী বাবুর স্ত্রী সহানুভূতির স্বরে বললেন, "ভাল হয়ে উঠুন, যাবেন বৈ কি, আপনাদের ভরসাতেই ত এ-বাড়ীতে আসা।"

করুণ কণ্ঠে মন্মথর স্ত্রী বললেন,—"আমার আর যাওয়া,—আমার আবার ভরসা,—আমি ত গিয়েই আছি।" আঁচলে চোখ মুছে বললেন, "তোমার ছেলে-মেয়েদের ত কাউকে দেখছিনে,—সঙ্গে আনোনি বুঝি? ক'টি ছেলে-মেয়ে ভাই?"

ননী বাবুর স্ত্রী বললেন—"একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। মেয়েটি বড়, এবার আই-এ পরীক্ষা দেবে, বাড়ীতেই পড়া-শোনা করে। বড় ছেলে আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে, ছোটটি সাত বছরের, ইস্কুলেই পড়ে। পরীক্ষা কাছে বলে মেয়ে পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত রয়েছে, কোথাও বিশেষ বেরোয় না। বড় ছেলে বোধ হয় বল-টল্ খেলতে গেছে, ছোটটি ভারী চঞ্চল, অসুখের বাড়ীতে এসে ছুটোপুটি দুরন্তপণা করবে বলে সঙ্গে আর আনিনি।"

ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে মন্মথর স্ত্রী বললেন, "তাতে আর কি হয়েছে,—ছোট ছেলে-মেয়েদের একটু হাত-পা চন্‌মনে হয়েই থাকে। এক দিন আমার কাছে সবাইকে পাঠিয়ে দিও,—আমি দেখব।"

ননী বাবুর স্ত্রী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। মন্মথর স্ত্রী বললেন, "আমাকেও ভগবান দুটি দিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না—কেনই বা দিলেন···" বলতে বলতে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন।

ননী বাবুর স্ত্রী সযত্নে তাঁর বাঁ হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "অসুখ শরীরে আর কান্নাকাটি করবেন না, কষ্ট বেড়ে যাবে,—মন শান্ত করুন। তাঁর দেওয়া দুঃখ সহ্য করবার শক্তি তিনিই দেবেন। ভাল হ'য়ে উঠুন, ভগবান মুখ তুলে চাইলে সব শোক-দুঃখ দূর হয়ে যাবে।"

সজল চক্ষে মন্মথর স্ত্রী বললেন, "আর ভাল হওয়া! এ রোগেরও শেষ নেই, ভোগেরও শেষ নেই—আর আয়ুরও শেষ নেই।" একটু থেমে বললেন, "সব কথা বলবার নয় বোন্—বলাও যায় না,—হয়ত বলবার সময়ও আর হবে না। আর একটি প্রাণও আমার আগে এই ভাবেই নিঃশেষ হয়ে গেছে,—সতী-সাধ্বী স্বর্গে গেছেন। পরেও আবার কার অদৃষ্টে এ দুর্ভোগ লেখা আছে কে জানে! লোকে অনেক কথাই শোনে, তোমরাও হয়ত শুনবে!" চক্ষে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা-বাপও নেই,—তিন কুলেও আর কেউ কোথাও নেই যে দু'দিন গিয়ে জুড়োই—ছেলে-পুলেও নেই যে তাদের মুখ চেয়েও প্রাণ ঠাণ্ডা করি—উঃ"—আর বলতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পরে ননী বাবুর স্ত্রী সুবিধে মত আবার আসবেন জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

ননী বাবু ও তাঁর স্ত্রী পরস্পরের কথাবার্তা শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এ ওর মুখের পানে চেয়ে রইলেন, কিছুক্ষণ দু'জনের মুখে আর কথা সরল না।

কয়েক দিন পরে মন্মথ বাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ এক দিন স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন।

ননী বাবুর স্ত্রী শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, "ও মা, আমাদেরও একটু জানালেন না! যাবার আগে একবার দেখাও হল না! কে জানে আর ফিরবেন কি না—শরীরের যা অবস্থা হয়েছে,—আহা!"

ননী বাবু সায় দিয়ে বললেন, "যথার্থ বলেছ,—ভদ্রমহিলা বাঁচবেন বলে আর আশা হয় না। কিন্তু মাষ্টার যাবার আগে আমাদেরও একবার জানালেন না কেন কে জানে! রোগে-রোগে ভাবনায়-চিন্তায় ভদ্রলোকের মাথার কি আর ঠিক আছে? হয়ত এমন সময় যাবার ঠিক হয়েছে, কাউকে জানাবার সুবিধেই হয়নি।"

মাস দুই পরে হঠাৎ এক দিন মাষ্টার মন্মথনাথকে একলা ফিরতে, এবং তাঁর চেহারা ও হাব-ভাব দেখে কারুর আর বুঝতে বাকী রইল না যে তাঁর রুগ্না স্ত্রী আর ইহজগতে নেই। মাথায় তৈল-বিহীন তাঁবাটে রঙের বড় বড় চুল, কাঁচা-পাকা ঘন দাড়ি-গোঁফে মুখের সেই আলো-ছায়া ভাব লুপ্ত হয়ে গেছে,—ঘন-ঘন সিগারেট চলেছে। বোধ করি শোকের আতিশয্যে—ননী বাবু 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পড়লেন। আরাম-চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে বসে সিগারেটের শেষটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—"হরিদ্বারেই সব শেষ হয়ে গেল। মনে-মনে সবই বুঝতে পেরেছিলেন আর কি,—তাই পুরী বারাণসী বৈদ্যনাথ হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে যাবার এত ঝোঁক চাপল। হলও প্রায় সব দেখা, কিন্তু তাহলে কি হবে, প্রাণটা এইখানেই পড়েছিল,—তোমাদেরই কাছে। গৌরীর মায়ের নাম ত মুখে লেগেই ছিল, কেবলই বলেন, আর বোধ হয়, দেখা হবে না; হলও তাই, ওঁর কথা কইতে কইতেই শেষ পর্য্যন্ত প্রাণটা বেরুলো। উঃ—ভারী দুঃখের ব্যাপার!" বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—"এই ত সংসারের মায়া!" বলে উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

দুঃখে দোলায়মান ননী বাবু বললেন, "যথার্থ বলেছেন, এ সব বড়ই দুঃখের ব্যাপার! মায়া নয়? সংসারে সুখ-দুঃখ সবই ত মায়ার খেলা—অতি সত্য কথা।"

কিছুক্ষণ পরে দু' হাতের চেটো দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে মন্মথনাথ বললেন, "চললুম,—একেবারে একলা,—কিছুই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের বিরক্ত না করলে হয়ত টিঁকতেই পারব না,—পাগল হয়ে যাবো!" বলে ননী বাবুকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

কোন একটা গভীর শোক বা বড় আঘাত মানুষের মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে যেন একটু বেশী রকম নাড়া দিয়ে যায়, মনের দৃঢ়তা কমে গিয়ে কোন একটা অবলম্বন খুঁজতে থাকে। সে সময়টা,—অন্যমনস্ক হবার অভিপ্রায়ে কারুর ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাসের আতিশয্য দেখা যায়—কারুর বা সংসারে বৈরাগ্য জন্মায়। কেউ বা সঙ্গীতপ্রেমে মগ্ন হয়ে পড়েন, কেউ বা কাব্য-রসে ডুবে

যেতে চেষ্টা করেন। কেউ বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চান, আবার কেউ বা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করেন। মন্মথনাথ ঠিক কি চান পরিষ্কার বুঝা না গেলেও দেখা গেল—ননী বাবুর বাড়ীতে তার যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল।

মাঝে হঠাৎ দিন দশ-বারো কোথায় ডুব মেরে এক দিন সকালের গাড়ীতে মন্মথনাথ সোজা এ-বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। ননী বাবু তখন সবে মাত্র সকালের চা পান শেষ করে পরীক্ষার খাতাগুলি নিয়ে বসেছেন। রবিবার, বিশেষ তাড়াহুড়া নেই,—ধীরে-সুস্থে কাজ করছেন, হঠাৎ ঝড়ের মত মন্মথনাথ প্রবেশ করলেন।

"আসুন আসুন" বলে ননী বাবু ব্যস্ত ভাবে খাতাপত্র বন্ধ করতে লাগলেন। চৌকির এক পাশে ততক্ষণে শক্ত হয়ে বসে পড়ে মন্মথনাথ বললেন, "হুঁ—তা যাক্, তোমার চা খাওয়া হয়েছে মাষ্টার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই মাত্র" ননী বাবু বললেন, "আপনাকে এক পেয়ালা দিতে বলি?"

"না হলেও ক্ষতি ছিল না," শুষ্ক স্বরে মন্মথ বললেন, "নেহাৎ সারা রাত্রি ঘুমতে পারিনি,—বিশেষ ক্লান্ত;—এখন আবার নিজে আয়োজন করে খাওয়া ত!—আচ্ছা দিতে বলো।"

ননী বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আপনি বরং ঐ চেয়ারটায় আরাম করে বসুন,—আমি খবরটা দিয়ে আসি" বলে যেতে উদ্যত হতেই ফোঁস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মন্মথনাথ বলে উঠলেন,—"আরাম-বিরাম সব আমার জীবন থেকে একেবারে ঘুচে গেছে মশাই,—যাক্ সে কথা। মনটা একটু হালকা হবে ভেবে দু'দিনের জন্যে বাড়ী গেলুম,—উঃ কী ভুলই করেছিলুম! বাড়ীশুদ্ধ, দেশশুদ্ধ লোক আমাকে প্রায় ক্ষেপিয়ে ফেলে আর কি! এ এক রকম বলে ত ও এক রকম, সে নানা মতের মধ্যে পড়ে আমি একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কাল সারা রাত্রি এই নিয়ে তর্কাতর্কি বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে,—শেষে উত্যক্ত হ'য়ে শেষ রাত্রের গাড়ীতে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচি। নেমেই ছুটে আসছি—তোমাদের কাছে।"

ননী বাবু অনেকটা সেই ধরণের লোক, যাঁরা কারুর সঙ্গেই কোন প্রকার মতভেদ রাখতে চান না, কোন বিষয়েই কোনরূপ গণ্ডগোল পছন্দ করেন না। শান্তিপ্রিয় স্কুল-মাষ্টারটি কারুর সাতে-পাঁচে থাকতে চান না বলেই বোধ করি সকলের তাঁকেই বেশী প্রয়োজন হয়। বললেন, "যথার্থ অন্যায়,—আপনার মনের বর্ত্তমান অবস্থায়—এ ভাবে—"

"থাক্ থাক্, সে পরে হবে, সে সব অনেক কথা।" বাধা দিয়ে মন্মথনাথ বললেন, "আগে চায়ের ব্যবস্থাটা করো দেখি!"

নিঃশব্দে চা ও ধূমপান চলতে থাকে। "আঃ, শরীরটা একটু

ধাতস্থ হল,—মনটাও,—" মন্মথনাথ বললেন, "বুঝেছ মাষ্টার, তোমাদের কাছে এলে মনে বড়ই শান্তি পাই, কি জানি কেন,—এমনই আর, যাক্" একটু হেসে বললেন, "কিন্তু তুমি এখনও আমাকে 'আপনি' 'মশাই' করো, আমার কেমন যেন ভাল লাগে না। তুমি আসল মাষ্টার, আমি না হয় নকল,—এই ত প্রভেদ!"

খাতাপত্রের দিকে চোখ রেখে ননী বাবু বললেন, "আপনাকে দেখে মনে কেমন একটা সম্ভ্রম জাগে,—'তুমি'টা কেমন বাধো-বাধো ঠেকে—যথার্থ বলতে কি—"

সোজা হয়ে বসে মন্মথনাথ বললেন, "ঠিক তাই, কারুর কারুর ব্যক্তিত্বে এমনই একটা প্রভাব থাকে বৈ কি!" পরে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, "সে বার বর্মায় সুভাষ বাবুর সঙ্গে দেখা, লড়াই নিয়ে তখন খুবই ব্যস্ত, মরবার ফুরসৎ নেই,—তবু জোর করে দেখা করলুম। বয়সে হয়ত আমার চেয়ে ছোটই হবেন, কিন্তু তাঁকে দেখেই তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় মন এমন ভরে গেল যে, তাঁর বার বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই মুখ দিয়ে 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' বেরুলো না। সবিনয়ে বললেন, "আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধার পাত্র,—আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বললে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হব।" কিন্তু বললে কি হবে, কিছুতেই পারলুম না। শেষে হতাশ হয়ে বললেন, 'স্বাধীন ভারতে দেশের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ-সম্বোধন গড়ে তুলব জনসাধারণের যেটা হবে সকলেরই খুব প্রিয় ও মধুর। ঈশ্বর ত সকলেরই প্রণম্য, পূজনীয়; কিন্তু তাঁকে কেউ 'আপনি' বলে ডাকে কি? শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। সত্যিই একটা মানুষ বটে; সারা দেশের কেন সারা বিশ্বের নেতা হবার যোগ্য! ধন্য নেতাজী!" বলে যুক্তকরে তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "বহু দিন আগে একবার 'বিচিত্রায়' এই 'আপনি-তুমি' নিয়ে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম বটে, কিন্তু আমাদের কথা কে আর পোঁছে বলুন? এ ত আর নেতাজী নয় যে লোকে মাথা পেতে মেনে নেবে। শেষ পর্য্যন্ত ধামা-চাপা পড়ে গেল।"

ননী বাবু বললেন, "যথার্থ,—খুবই ন্যায্য কথা, এ নিয়ে রীতিমত আন্দোলন চালানো প্রয়োজন।"

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল এই ভাবে মন্মথনাথ বললেন, "জানো মাষ্টার, আবার বিয়ে করবার জন্যে আমার ওপর কি রকম পীড়াপীড়ি ও অত্যাচার চলেছে। শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আরে, আর সকলে পারলেও আমি কি এত শীগগির ভুলতে পারি,—তুমিই বল?"

—ননী বাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বললেন, "যথার্থ তাই কি কেউ পারে? মানে আপনি—"

"শোনই না বলি" মন্মথনাথ বলতে লাগলেন, "চিঠি-পত্রের জ্বালায় ত অস্থির হয়ে উঠলুম—ক্রমাগত উপদেশ ও ডাকাডাকি! শেষ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাম এল;—যেতেই হ'ল। গেলুম বটে, কিন্তু মনে-মনে একেবারে স্থির করে নিলুম, এবার কারুর কোন কথায় কর্ণপাতও করব না, সে বড়-ছোট যেই হোক্ না কেন। কি বল? একটা জীবন নিয়ে বার বার ছেলেখেলা! আরে, ঈশ্বরই যে স্বয়ং বিরূপ; দু'-দু'বার তা দেখেও কি লোকের চোখ খোলে না! যা হবার নয় তাই করতে যাওয়া। তা ছাড়া সব জিনিষেরই একটা সময়-অসময় আছে।" একটু পরে চাপা স্বরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "অবাক্ কাণ্ড! গিয়ে দেখি পাত্রী পর্য্যন্ত প্রস্তুত! বোঝ একবার!" বলে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। পরে বললেন, "দ্বিতীয় কথাটি আর না বলে, ধুলো পায়ে বাড়ী থেকে বিদেয় নিলুম। দাদা এসে হাত ধরলেন, বললেন, 'মনো, আমি কথা দিয়েছি।' তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললুম, "মন আমার এখন বড়ই চঞ্চল হয়ে পড়েছে, —আমায় ক্ষমা করুন। সোজা সেবাগ্রামে চলে গেলুম। শান্ত পরিবেশে সত্য ও অহিংসার পূজারী, শান্তির প্রতিমূর্ত্তিকে দেখে মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনের আবেগ খুলে পায়ে ঢেলে দিলুম। মুখে স্নিগ্ধ ক্ষমা-সুন্দর হাসি হেসে বললেন, 'বিবাহই সংসার-বন্ধনের একমাত্র সার্থকতা নয়; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মহৎ, মানুষ নিজের স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে মন পবিত্র করে, নিঃস্বার্থ ভাবে বিবেচনা করে দেখলে সত্যের সন্ধান পাওয়া শক্ত হয় না। এই ভাবে চিন্তা করে দেখো, সহজে পথের সন্ধান পাবে।' কী সুন্দর কথাগুলি! উত্তপ্ত প্রাণে যেন শীতল চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। অমনিই কি আর জগৎপূজ্য মহাত্মা হতে পেরেছেন? মানুষ নন্—অবতার!" বলে ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে স্পর্শ করলেন।

ভক্তি-গদগদ চিত্তে ননী বাবু বললেন, "যথার্থ বলেছেন, ওঁর আর তুলনা হয় না"—বলে ঘন-ঘন দুলতে লাগলেন।

ক'দিন পরে স্কুলের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর ব্রজেশ্বর রায় এক দিন ননী বাবুকে ডেকে, স্কুল সম্বন্ধে দু'-চার কথা কইবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্মথ বাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?"

ননী বাবু বললেন, "এই ত ক'মাসের মাত্র, যবে থেকে তাঁর বাসার পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছি। নামটা জানতুম বটে, তার আগে আলাপ-পরিচয় বিশেষ ছিল না।"

রায় বাহাদুর গম্ভীর ভাবে বললেন, "সেই ভাল ছিল।" একটু থেমে বললেন, "স্কুল সম্বন্ধে যদি কোন কথা-বার্ত্তার প্রয়োজন হয়, সোজাসুজি আমার সঙ্গেই কইবেন।"

ননী বাবু থাবড়ে গিয়ে রায় বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালেন, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না।

রায় বাহাদুর সেই ভাবেই বলতে লাগলেন, "হেড-মাষ্টারের বিরুদ্ধে মন্মথ বাবুর সঙ্গে আর কোন আলোচনা করবেন না, আর আপনার যদি কোন দাবী থাকে, তা আমাকে জানালেই ভাল হয় নাকি?"

ননী বাবু প্রায় কেঁদে ফেলবার মত হয়ে বললেন, "যথার্থ বলেছেন, কিন্তু আমি ত এ সব কথার কোন মানেই বুঝতে পারছি না; মানে মন্মথ বাবুর সঙ্গে আমার ত এ বিষয়ে কোন কথাই হয়নি।"

"তাই নাকি?" রায় বাহাদুর সবিস্ময়ে বললেন, "তাহলে দেখছি হেড-মাষ্টার মশাই ঠিকই বলেছেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'আমি বাবুকে যদি ননী এ সব কথা বলতে নিজের

কানেও শুনি, তবুও বিশ্বাস করব না, অন্য লোকের কথা ছেড়েই দিন।" বেশ কথা। আচ্ছা, আপনার মেয়েটির বয়স কত হবে?"

ননী বাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার রায় বাহাদুরের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে বললেন, "আঠারো, —কিন্তু—যথার্থ এ সব কথার মানে—"

বাধা দিয়ে রায় বাহাদুর হেসে বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, বলছি; কিন্তু আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি অন্য কোন বাড়ী পান, কিছু অসুবিধে হলেও, ও-বাড়ীটা ছাড়তে কোন আপত্তি আছে কি?"

"তা ত' নেই, কিন্তু সুবিধে মত,—মানে আপনি কি বলতে চাইছেন,—যথার্থ আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না" ননী বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন।

রায় বাহাদুর বললেন, "আপত্তি যখন নেই তখন কোন চিন্তা না করে যত শীঘ্র পারেন বাড়ীটা বদলে ফেলুন। আমার বাগান-বাড়ীর পাশের ছোট বাড়ীটা খালি রয়েছে। কালবিলম্ব না করে চলে আসুন, জায়গাটাও ভাল, ভাড়াও কম লাগবে, বুঝলেন?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ননী বাবু উঠে দাঁড়াতেই হেসে উঠে রায় বাহাদুর বললেন, "চললেন? অন্ততঃ কারণটাও ত শুনে যান! হেড-মাষ্টারকে সরিয়ে সে পদটি আপনাকে দেওয়াবার জন্যে আপনি মন্মথ বাবুকে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করে তুলেছেন, এমন কি সে জন্যে তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবার জন্যে আপনি অযথা তাঁকে বিশেষ পীড়াপীড়ি সুরু করেছেন; সে ক্ষেত্রে আপনাকে অবিলম্বে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমরা সুবিবেচনার কাজ মনে করি, অতএব"—হো-হো করে হেসে উঠলেন, কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

ননী বাবু হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে না পেয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

বলা বাহুল্য, ননী বাবুর স্ত্রী সব শুনে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে সম্মত হলেন না, দৃঢ় স্বরে স্বামীকে বললেন, "তুমি এখনই যাবার ব্যবস্থা করো আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি,—এ পোড়া বাড়ীতে আমি আর জলগ্রহণ করছি না।"

পূর্ব-কথা আপাততঃ এইখানেই বন্ধ রেখে, আসল কাহিনীতে আসা যাক্।

ডাক্তার দেবব্রত দত্তকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই মন্মথ মিত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, "এত দিনে একটা মানুষের মত মানুষ এল বটে; যত সব মিন্‌মিনে মাড়োয়ারী আর মেয়েমুখো স্কুল-মাষ্টারের দল—না আছে মনুষ্যত্ব, না জানে ভদ্রতা।" নিজে থেকেই ডাক্তারকে আপ্যায়িত করে আলাপ জমিয়ে বললেন, "পাশ করেই প্র্যাক্টিস করবার ইচ্ছে বুঝি? বেশ বেশ—চাকরী-বাকরীতে আজকাল আর কিস্সু নেই—ও অনেক করে দেখেছি। হ্যাঁ, তবে একটু ধৈর্য্য চাই—সাহস করে কপাল ঠুকে ঝুলে পড়তে হবে—একবার জমাতে পারলে পয়সা তখন পিছনে পিছনে ছুটবে।"

দেবব্রত মৃদু হেসে কথায় সায় দিলেন।

বয়েসের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও অবিবাহিত ডাক্তার দেবব্রত ও বিপত্নীক মাষ্টার মন্মথর মধ্যে একটা মনের সূক্ষ্ম মিল, হৃদয়ের ভাবৈক্য ও আন্তরিক ভালবাসা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। কি যেন একই বস্তু দু'জনকে সমান ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল, দু'জনের লক্ষ্যও যেন এক।

দেবব্রতর গান-বাজনার সখ ছিল, সম্প্রতি বেহালা শেখবার ঝোঁক চেপেছে। কণ্ঠ-সঙ্গীত বলুন আর যন্ত্র-সঙ্গীতই বলুন, তার সাধন-পর্বটা অন্যের কাছে তেমন শ্রুতিমধুর হয় না। কিন্তু সাধক সাধনার তীব্রতায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে তার পিছনে এমনই আড়ে-হাতে লেগে পড়েন যে আশ-পাশের কাহারো অস্তিত্ব, শান্তি, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যান। শোনা যায়, এমন একাগ্রতা না হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজে হয় না।

দেবব্রতর নিয়মিত এবং অনিয়মিত বেহালা শিক্ষা প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করার পর এক দিন মন্মথনাথ সাধ্যমত বিরক্তি দমন করে বললেন, "শান্তিনিকেতনে থাকতে আমারও একবার এমনই ঝোঁক চাপে; দিন কয়েক পরে আশ্রমের সকলে কবিগুরুকে কি বোঝালেন জানি না, এক দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে শ্যামলীতে ডেকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মত তাদের যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা-পদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার; সম্ভবতঃ তোমার তা জানা নেই, ওরা বাঁধা ঘাটে চলে না—কিঞ্চিৎ উগ্র-ভাবাপন্ন কিনা! তাই প্রথম প্রথম গভীর রাত্রে লোকালয় পরিত্যাগ করে, দূরে বহু দূরে কোন নির্জ্জন স্থানে একাগ্রচিত্ত হয়ে চেষ্টা করো, সুরের সন্ধান মিলবে।

দিনের কোলাহলে একটু বেসুর বলতে থাকে। তোমার সুর-জ্ঞান প্রশংসনীয়,—চেষ্টা ও সাধনার সফলতা কামনা করি'। মুগ্ধ হয়ে কবিকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে দিনের বেলার যন্ত্র কি,—যা "লোকালয়ে নির্ব্বিবাদে শেখা চলতে পারে'। কবি সহাস্যে বললেন,—'বীণা, সেতার, সুরবাহার—এই জাতীয় যন্ত্রগুলি। যার স্নিগ্ধ মধুর ঝংকার ও রেশ বাতাসে মৃদু হিল্লোল জাগায় মাত্র।' 'সার্থক উপদেশ' মন্মথনাথ বলতে লাগলেন "জীবনে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। সে বড় মজার ব্যাপার,—গ্রামে যাত্রা হচ্ছে, অধিকারী মশায়ের কী বেহালায় হাত, লোক ভেঙ্গে পড়ল! হঠাৎ এক দিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলে কান্নাকাটি পড়ে গেল, মহারাজ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, মহারাণী গান গাইবেন কি করে, ভেবে না পেয়ে খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিলেন। শম গানের 'সীন'টা—যেখানে পুত্রশোকে গান গাইতে গাইতে মহারাণী যখন মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বেন,—তখন বেহালার সে করুণ ক্রন্দন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে কাঁদিয়ে,—কে শোনাবে? হায় হায়, সমস্ত পালাটাই মাটি হয়ে যাবে! বললে ভাববে বাড়িয়ে বলছি, সে রাত্তির ত কোন রকমে সামনে দিলুম, কিন্তু পরের দিন হল আরও বিপদ, অধিকারী মশাই একেবারে নাছোড়বান্দা, 'আপনার সামনে আমি আর বেহালায় হাতই দিতে পারি না।' সেও এক-একটা দিন গেছে।"

দেবব্রত প্রাণ-খোলা হাসি হেসে বললেন, "তাহলে যাত্রার দলও বাদ পড়েনি, বলুন?"

"না না" ঘন-ঘন মাথা নেড়ে মন্মথ বললেন, "অতটা পেরে উঠিনি। তবে পাবলিক ষ্টেজে বার কয়েক নামতে হয়েছে বটে; প্রথম বার 'সীতায়' রাবণের অভিনয় দেখে শিশির ভাদুড়ী মশাই পর্য্যন্ত রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েন। যাক্ গে,—কোন কথার আলোচনায় কোথায় এসে পড়া গেল। তাই বলছিলুম,—লোকালয়-বর্জ্জিত নির্জ্জন স্থানই বা এখানে কোথায় পাবে, ও-সব কবির কল্পনা, তার চেয়ে গভীর রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা সব বেশ ভাল করে চেপে বন্ধ করে লেগে যাও।"

কিন্তু কবির কল্পনাও এখানে হার মানল। দেবব্রতের কাঁচা হাতের বেহালার তীব্র ধ্বনি বন্ধ দরজা জানালা ছাদ স্কাই লাইট প্রভৃতি ভেদ করে, মন্মথনাথকে সুরের টানে প্রায় ঘর ছাড়া করবার উপক্রম করে তুলল। এর উপর তাঁরই কথামত দেবব্রত দিনের বেলাও সেতার ও এস্রাজ সাধতে সুরু করে দিলেন।

অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে মন্মথনাথ এক দিন দেবব্রতকে হাত জোড় করে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, দোহাই ভাই,—শুধু আমারই নয়, কবিরও বোধ করি ভুল হয়েছিল,—তুমি বরং দিনের বেলাই বেহালা এবং রাত্রে সেতার বাজাও—নইলে এত দিন পরে আমাকেই এবার অন্য বাড়ীর চেষ্টা দেখতে হবে।"

ননী বাবুদের ব্যাপারটা দেবব্রতও কানাঘুষা কিছু কিছু শুনেছিলেন। কথায় কথায় এক দিন মন্মথনাথকে বলে বসলেন, "হ্যাঁ দাদা, ননী বাবু ত আপনাকে আচ্ছা পাকড়াও করেছিলেন শুনলুম। তা আপনি অমন অমত করে বসলেন কেন? মন্দ আর কি হত?"

দেবব্রতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে মাষ্টার মন্মথ বললেন, "পাগল হয়েছ? পাকড়াও অমনি করলেই হল? অত সহজে হয় না হে,—তোমাদের মত অতটা না হলেও, এখনও আমাদের কিছু মূল্য আছে হে, একেবারে অতটা সস্তা হয়ে পড়িনি!" গলাটা একটু ঝেড়ে বললেন, "অমন কত-শত ননী-ছানা-মাখন নিত্যিই পাকড়াও করে থাকে, কে কার খোঁজ রাখে! কত জজ-ব্যারিষ্টার তলিয়ে যায় ত তিন পয়সার ইস্কুল-মাষ্টার!" বলে ঠোঁট উল্টে বললেন, "আর করবই যদি ত ঐ মেয়ে—" বিরক্তির চোটে কথাটা যেন শেষ করতে পারলেন না।

দিন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল,—সহসা পূর্ব্ব-দিগন্তে মেঘের সঞ্চার দেখা দিল।

পরীক্ষার ক'দিন আগে ননী বাবুর কন্যা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এবং ডাক্তার দেবব্রতরও তাকে নিয়ে ক'দিন একটু ব্যস্ত ভাবেই কাটল।

মাষ্টার মন্মথ শুনে বললেন, "অত বেশী পড়লে অসুখে পড়বে না? ও ঠিক ফেল্ করবে, তুমি দেখে নিও।"

"তাই মনে হয়" বলে দেবব্রত মৃদু হাসলেন।

পরীক্ষার পর দেখা গেল, দেবব্রত গৌরীকে নিয়ে আরও কিছু দিন আরও বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এমন কি বেহালা-সেতারও ক'দিন বন্ধ রয়ে গেল।

পরে দেবব্রত যেদিন গৌরীকে সঙ্গে করে এ-বাড়ীতে নিয়ে এলেন সেদিন থেকে পশ্চিম দিকের বাড়ীর পুব-মুখো দরজা-জানালাগুলো প্রায় বন্ধই থাকে দেখা গেল। তা' দেখে গৌরী এক দিন বললে, "এ-বাড়ীটা ছেড়ে দিলে হয় না?"

"কেন? আর ভয় কিসের?" দেবব্রত হেসে বললেন, "বরং তুমিই হয়ত এবার ওঁকে বাড়ীছাড়া করবে।"

গৌরী হাসি চেপে বললে, "তা কেন,—তুমি আর একবার পুরো দমে সেতার-বেহালা বাজাতে আরম্ভ করলেই আর কিছ প্রয়োজন হবে না।"

দেবব্রত হেসে গড়িয়ে পড়েন আর কি!

দেবব্রত এক দিন মাষ্টার মন্মথকে চেপে ধরে বললেন, "দাদা, কি ব্যাপার বলুন ত? আমাদের একটু আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করা দূরের কথা,—মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন, অপরাধটা কার,—গৌরীর না আমার?"

বাধা দিয়ে ডাক্তারের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখে জল ও মুখে হাসি এনে মাষ্টার মন্মথ বললেন, "ছিঃ ছিঃ, এ সব কি কথা ভাই! গুরুদেব এসেছিলেন, ঈশ্বর-চিন্তা, যোগ-যাগ, পূজা-পাঠ এই সব নিয়ে ক'দিন একটু ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। অদ্ভুত সব পদ্ধতি, কঠিন ব্যাপার; দিন কতক পণ্ডিচেরীতে গিয়ে থাকব ভাবছি, গুরুদেবও সেই কথাই বললেন,—" পরে ডান হাত দিয়ে দেবব্রতর পিঠ চাপড়ে বললেন,—"ঈশ্বরের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ তোমাদের মাথায় অবিশ্রাম ঝরতে থাকুক, কায়মনে এই প্রার্থনা জানাই। অপরাধ? তোমাদের? কেন? না, না, সব অপরাধ আমার অদৃষ্টের!" বলে ডুক্‌রে ডুক্‌রে হাসতে লাগলেন!

ক'দিন পরে সত্য সত্যই তিনি বাড়ীটা ছেড়ে দিলেন।

একটি চাষীর মেয়ে*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

এক গাঁয়ের এক ঘরের কোণা থেকে এসেছে আরেক গাঁয়ের আরেক ঘরের কোণায়—একটু বর্দ্ধিষ্ণু গাঁয়ের একটু সম্পন্ন চাষী মামার বাড়ী।

তাতেই আমাদের রেবতীর কত যেন বেড়ে গেছে ছড়িয়ে গেছে সামাজিকতার দায়!

অচেনা অজানা মানুষগুলিকে সামলানো প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় জন্ম থেকে কুঁড়ের কোণে কুণো করা রেবতীর পক্ষে।

সব বয়সের হরেক রকম মানুষ আসে। দেখতে আসে চাষীর ঘরের সে কেমন মেয়ে, কাগজে যার নাম ছড়ায়।

মেয়েছেলেই অবশ্য আসে বেশীর ভাগ। ঠাকুমা-দিদিমা থেকে মাসী-পিসীরা সম্পর্ক পাতাতে—দিদি আর বৌদি হতে—সমবয়সী সই পাতাতে।

তাদের পরিমাণ সংখ্যার মাপে ধারণা করার সাধ্য রেবতীর নেই।

তার গণনায় মেয়ে-ছেলেরা 'এক পাল'।

পুরুষও আসে পনের-বিশ জন।

অধিকাংশ বয়স্ক পুরুষ মানুষ—বৃদ্ধই বলা যায়। কেবল ষাট-সত্তর বছর বয়সের বুড়োই নয়, ও বয়স আর ক'জনের হয় আজকাল। মধ্য যৌবনে প্রৌঢ় বয়সে যারা রোগে, শোকে অনাহারে বাহাত্তুরে বুড়োর অবস্থায় পৌঁছেচে তারাই অধিকাংশ। যাদের বাপ খুড়ো জেঠার মত গোবর্দ্ধনের অন্দরে ঢুকে তার বয়স্কা যুবতীর মত বাড়ন্ত বালিকা ভাগ্নীটাকে সামনে ডেকে কথা বলার, স্নেহ জানাবার, তিরস্কার করার অধিকার আছে।

রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় পুরুষও আসে দু'-চার জন।

নামকরা চাষীর মেয়ের মানিয়ে চলার দায়। ওখানে ছিল বেশীর ভাগ আশে-পাশের কম-বেশী জানা-চেনা লোক, এখানে প্রায় সকলেই অজানা।

তাকে জ্বালাতন করতে আসে না। নিছক কৌতূহল মেটাতে আসে না।

প্রাণের তাগিদেই আসে।

খাঁটি চাষীর মেয়েই আছে—অথচ তাকে নিয়ে সভা হয়েছে, খবরের কাগজে নাম ছড়িয়েছে। এ কেমন মেয়ে?

যোয়ানও আসে দু'-এক জন—যাদের অন্দরে আসা, জাঁকিয়ে বসা, মেয়ে বৌদের সাথে আলাপ করা অনীতি নয়, নতুন নয়।

যোয়ান থেকে প্রৌঢ় বয়সী কয়েক জন পুরুষের কামাতুর নজর কি আর নজরে পড়ে না রেবতীর!

সে তাই আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে একজনও তার সঙ্গে বাড়তি খাতির জমাবার চেষ্টা করতে আসে না। চেষ্টা করার সুযোগ পর্য্যন্ত খোঁজে না।

রেবতী জানে না তার কত সম্মান বেড়েছে। সবাই জেনে গেছে সামাজিক ভাবে সাংসারিক মেলামেশার স্বীকৃত নিয়ম মেনে রেবতীর কাছে ঘেঁষা কঠিন নয়—কিন্তু তার সাথে বাড়তি খাতির জমানো কঠিন ব্যাপার বড় বেশী রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে!

রেবতীর সঙ্গে দু'দিন একটু খাস্তা পীরিতের সস্তা মজা লুটতে চাইলে অনেক দিন ধরে অনেক রকম ছল-চাতুরী কলা-কৌশলের অভিযান চালাতে হবে। একনিষ্ঠ ভাবে দিনের পর দিন আসা-যাওয়া বজায় রেখে আত্মীয়তা জমাতে হবে রেবতীর পাঁচ জন আপন জনের সাথে—রেবতীর সাথে এমন ভাবে মিলতে মিশতে কথাবার্তা বলতে হবে যেন সে তুচ্ছ, তার জন্য আসা-যাওয়া নয়। ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাতে হবে সকলের যে সকলের আপন হতেই তার আসা যাওয়া, সকলের জন্য তার প্রাণের টানটাই আসল।

তার পর, তার পর তাকে তাকে থাকলে মাঝে মাঝে জুটবে রেবতীর সঙ্গে একা কথা বলার, মন ভুলিয়ে তাকে বশে আনার চেষ্টা করার কিছু কিছু সুযোগ।

রীতিমত তপস্যার ব্যাপার!

কী দরকার এত দাম দিয়ে?

সত্যিকারের বাহাত্তুরে বুড়ো বোধ হয় আসে দু'জন।

এক জন চরণদাস বাবাজী, আরেক জন যোগীরাজ সাধু।

সত্তর পেরিয়েও বেশ আছে দুজনের স্বাস্থ্য। এক দিনে দু'জনে এসে উপস্থিত অন্য সাত আট জনের সঙ্গে।

একই গ্রামের দু'প্রান্তে ডেরা বেঁধে বসে আজ প্রায় তিন যুগ ধরে চলেছে তাদের শিষ্য বাগানোর লড়াই আর শত্রুতা।

ঠিক শিষ্য বাগানো নয়, কাউকে শিষ্য করার জন্মগত অধিকার যে তাদের একজনেরও নেই অজ্ঞ মূর্খ চাষা-ভুসো মানুষদেরও তা ভাল করেই জানা আছে।

ভক্ত বাগানোর প্রতিযোগিতা।

রেবতীকে দেখতে এসে একটা খড়ের ঘরে আরও অনেকের মধ্যে দু'জনে একেবারে মুখোমুখি সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় আধ ঘণ্টা গুম খেয়ে থেকে মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে নিয়েই তারা কাটিয়ে দেয়।

আরেক দিন আসবে ঠিক করে দু'জনের একজনেরও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই—তার মানেই দাঁড়াবে হার মানা।

মাথা নীচু করে বসে আছে রেবতী।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে বুড়োর দল।

মাথা না তুলে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে রেবতী জবাব দিয়ে চলেছে।

গাঁট থেকে শুকনো কিছুটা পাতা নিয়ে এক সময় সাধু মুখে গুঁজে দিয়ে চিবোতে থাকে।

চরণদাস ব্যাপার বুঝে ঝোলা থেকে সিগারের মত মোটা একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে প্রাণপণে একটা টান দেয়।

কিছুক্ষণ পরেই তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে।

চরণদাস প্রথম কথা বলে, মেয়েটাকে তো নিকেশ করলে দাদা? চরণদাস উঠে এসে সাধুর পাশে বসে। বলে, এবার খেদাতে হয় সবাইকে। তোমার দাদা গলা আছে, একটা হুঙ্কার ছাড়ো বুঝিয়ে বললে কেউ বুঝবে না, শুনবে না।

---

* লেখকের নিবেদন: শুনলাম তরুণ সম্পাদককে অনেকে অনুযোগ দিয়েছেন—ধারাবাহিক উপন্যাসের ধারা কেন শুকিয়ে যায়! সম্পাদকের দোষ নেই, তাগিদের কসুর করেন নি। লেখক দেহধারী—দেহের অসুখ-বিসুখ হয়। দোষটা দেহের—কিন্তু দেহটা আমার! পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি তাই ক্ষমাপ্রার্থী।

এক মুহূর্ত ভাববারও সময় নেয় না সাধু, হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, মেয়াটাকে তোমরা মারবে নাকি? তাড়াবে নাকি মামাবাড়ী থেকে? এবার সবাই রেহাই দাও ওকে।

ঘাট পেরোনো বুড়ো নদেরচাঁদ খসে পড়া কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়াতে জড়াতে সকলের আগে উঠে দাঁড়ায়।

বলে, যা বলেছ দাদা। ভেবেছিলাম, নষ্ট মেয়ে গাঁয়ে এয়েছে গাঁয়ের মেয়ে নষ্ট করতে। আহা, কি মিষ্টি কথা, কি জগদ্ধাত্রীর মত রূপ!

মাথা ন্যাড়া, কঙ্কালের মত চেহারা, যেন তাতে স্পষ্টতর কঙ্কালত্ব পেয়েছে।

পিতল-ওঠা প্লেট-করা ফ্রেমে দুটো মোটা কাচের চশমা চোখে দিয়েও সে ঝাপসা ত্যাখে। চোখ নষ্ট হয় নি—নজর এলিয়ে গুলিয়ে গেছে। লাগসই চশমা পেলে সে তিন হাত তফাতে বসা রেবতীকে মোটামুটি দেখতে পারত, ক্ষীণদৃষ্টি চোখ আর হাতুড়ের চশমার কাচের যোগাযোগে রেবতী কখনোই তার কাছে ঝাপসা আলো ঝলসানো জগদ্ধাত্রীর জীয়ন্ত মূর্ত্তি হয়ে উঠত না।

গলায় কাপড় দিয়ে সে রেবতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

কয়েক জন হাঁ হাঁ করে ওঠে, কয়েক জন হাসে।

গোবর্দ্ধন ঝেঁঝে উঠে বলে, কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ খুড়ো? একটা কচি কাঁচা মেয়ে, 'তোমার যে পায়ের ধূলো নেবে, তাকে প্রণাম করছ?

গোবর্দ্ধন টের পায়, একটা বিভ্রাট ঘটে গেছে!

কিন্তু আর তো পিছোবার উপায় নেই।

না বুঝে যদি তাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেবে এমন একটা কচি-কাঁচা মেয়েকে প্রণাম করে ফেলেই থাকে —সে প্রণাম ফিরিয়ে নিয়ে ভুল স্বীকার করে অপদস্থ হওয়া যায় না সবার কাছে! নদেরচাঁদ হাসে না থ্যাঁক থ্যাঁক করে খেঁকিয়ে ওঠে ঠিক বোঝা যায় না।

: তুই সত্যি গোবর্দ্ধন—তোর মাথায় গোবর আছে—সেটাই তোর জ্ঞান বুদ্ধির ধন। কচি-কাঁচা হবে না তো কি জগদ্ধাত্রীর রূপ ফুটবে তোর খুড়ীর মত বুড়ী হাবড়ীতে?

কেউ হাসে না।

নদেরচাঁদের বৌ ফুলের মার চেহারাটা সত্যাই বিকট। বেখাপ্পা গড়ন, বাঁ কাঁধটা নীচের দিকে ঢলে নামানো, বাঁ হাতটা খর্ব্ব আর পঙ্গু—ডান দিকের কাঁধটা আর হাতটা কুস্তিগির পুরুষের মত। মাথাটা একটু লম্বাটে আর বাঁকা, মুখটা তাই ফ্যাদালে মনে হয়—সেই মুখে দু'পাটি বড় বড় দাঁত!

পঞ্চাশ বছর সে ঘর করছে নদেরচাঁদের।

পুকুরে যাওয়া ছাড়া, গরুটাকে মাঠে খুঁটি বেঁধে চরতে দিতে যাওয়া ছাড়া, তিথি আর পূজা-পার্ব্বণে স্থায়ী শিবমন্দির আর অস্থায়ী পূজা-মণ্ডপে গিয়ে প্রণাম পূজা জানিয়ে আসতে ছাড়া, সে ঘর ছেড়ে বার হয় না, কারো বাড়ী যায় না, কারো তোয়াক্কা রাখে না। বিশেষ রকম বিপদে পড়লে বরং গাঁয়ের মেয়ে-বৌরাই তার কাছে লুকিয়ে যায়।

ফুলের মা নির্ব্বিকার ভাবে বলে, না গো, আমি জানি নে কোন পিতিকার! আমি তো একটা গরু বাছা। মোর কাছে এয়েছিস পিতিকার চাইতে। খাটি-খুটি খাই-দাই-ঘুমোই—জানিও নে বুঝিও নে তোদের ব্যাপার-স্যাপার।

গোপন প্রতিকার চেয়ে বিপন্ন যারা যায় তারা চুপ করে থাকে। মুখখানা কাঁদ' কাঁদ' করে থাকে। কেউ কেউ কেঁদেও ফেলে।

ফুলের মা এক হাতে বুড়ো আম গাছের কাটা গুঁড়িটায় গা থেকে কুড়োল দিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে চলকা কাঠের ছিলতে তুলতে তুলতে মুখ না ফিরিয়েই বলে, কাঁদিস নে বাছা, ঘরে যা! দেখি কি করা যায়। ফুলকে দিয়ে ডেকে পাঠালে সময় বুঝে সুযোগ বুঝে আসিস।

কত কুমারী আর বিধবাকে সে যে কত কাল ধরে বাঁচিয়ে দিয়ে আসছে সামাজিক সন্ত্রাসবাদের বিপদ থেকে!

নদেরচাঁদের সঙ্গেই প্রায় সকলে চলে যায়।

সাধু আর চরণদাস গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জাঁকিয়ে বসে।

কিন্তু হায় রে তাদের হিসাব-নিকাশ!

অন্য সকলে চলে যেতেই রেবতীও উঠে দাঁড়ায়—অন্দরে চলে যাবার জন্য।

সাধু হেঁড়ে গলায় হুকুমের সুরে বলে, একটু বোসো। ক'টা কথা শুধোব তোমায়।

রেবতী কানেও তোলে না, ফিরেও তাকায় না, ধীরপদে তাদেরই পাশ কাটিয়ে দুয়ার দিয়ে রোয়াক পেরিয়ে মাট জমিতে নেমে পাশের হোগলার 'বেড়ার কাঁকে বসানো বাঁক দিয়ে অন্দরে চলে যায়।

রক্তের সম্পর্কে যারা নিকট আত্মীয়, তাদেরই কেবল বিনা ঝনঝাটে বা সামান্য ঝনঝাটে রেবতীর নাগাল ধরা সম্ভব।

মাসীর ছেলে মাস্তুতো ভাই প্রাণেশ্বর তাই দুপুর বেলা নির্বিবাদে সটান অন্দরে অর্থাৎ তিন ভিটায় খড়ো ঘরের সামনের ছোট অঙ্গনে ঢুকে বাঘা নামধারী আদ্দেক লোম-ওঠা কুকুরটা ঘেঁউ—করে উঠতেই; তাকে ঘরের লোকের মত এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে, চার-পাঁচ বছর ধরে শূন্য এবং জীর্ণশীর্ণ গোয়াল ঘরটার সামনে কুড়িয়ে অথবা চুরি করে আনা একটা হাত দেড়েক চৌকো ইঁট সিমেন্টের চাকতিটায় গালে হাত দিয়ে বসা রেবতীকে অনায়াসে বলে, আমায় তুই চিনতে পারবি না রেবতী। কখনো দেখিসনি তো। আমি তোর বড় মাসীর ছোট ছেলে, প্রাণেশ্বর।

রেবতী এলোচুলে বসেছিল। রোদে নয়, বাতাসে শুকাচ্ছিল তার তেলের অভাবে আধ রুক্ষ রাশিকৃত চুল। দেহটা তার নড়ে-চড়ে না, শুধু মুখ তুলে চেয়ে শান্ত মিষ্টি সুরে বলে, বড় মাসীমা মেসো মশায় ভাল আছেন পেরাণদা? তোমায় দেখেই আমি চিনেছি। মনে নেই, ছেলেবেলা রথের মেলায় চলে গিয়েছিলে, দু'-দিনের জন্য গিয়ে দেড় মাস দু'মাস একটানা জ্বরে ভুগে কাটিয়ে এসেছিলে, মোদের প্রায় পাগল করে দিয়েছিলে?

: কিছু মনে নেই। কী জ্বরে কত কাল ভুগছিলাম এতদিন পরে মনে থাকে!

: মনে নেই? ওমা, এই তো সেদিনের কথা! আর বছরের আর বছর।

: জ্বর আসার পর মাথা বিগড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলাম। চাষীর ছেলে, বোকা-হাবা, কী ভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে কী কাণ্ড যে

করেছিল, তোকে বলতে পারব না। সব যেন কালীপূজায় রাতের বাজী ফুটানো, বোম ফুটানো ব্যাপার।

: আবোল-তাবোল কথা কেন আমায় শোনাচ্ছ পেরাণদা?

: প্রাণেশ্বর চটে বলে, আমায় প্রাণেশ্বরদা বলবি, পেরাণ কথাটা আমি পছন্দ করি না।

: ইস্কুল-কলেজে পড়েছ বুঝি? তাই এমন কথা! পেরাণদা, মোকে ইস্কুলে-কলেজে একটু পড়াও না গো? একটুখানি জানাও মা গো বিনা কষ্টে কিসে মোর পেরাণটা খসে!

মাস্তুতো ভাই! তবু প্রাণেশ্বর চলে গেলে রেবতীকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তাকে সে যেন বেশী প্রশ্রয় না দেয়।

: একদম বিগড়ে গেছে ছোঁড়াটা, চূড়ান্ত রকম বদ হয়ে গেছে। ও ছোঁড়া সব পারে—ওর অসাধ্য দুষ্কর্ম নেই।

রেবতী তার পোড়া কপালের কথা ভাবে। এমনি কড়া পাহারা যে, ভাল মানুষ, কাজের মানুষ, দামী মানুষ তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টাও করবে না। পঙ্গু, অকেজো আর পাজী মানুষরাই শুধু আসবে তার কাছে, আসার অধিকার খাটিয়ে! কোন অপরাধে তার নির্ব্বাসন হল দোষে-গুণে আস্ত শক্ত কাজের মানুষের জগত থেকে?

এক চাষাড়ে অন্দর থেকে সে যে প্রায় একই রকম আরেক চাষাড়ে অন্দরে এসেছে এবং এই অন্দরই তার জগৎ, এটা খেয়ালও হয় না রেবতীর।

খেয়াল হয় না যে ইতিমধ্যে কতগুলি বিশেষ ঘটনার বিশেষ অভিজ্ঞতা জুটে না গিয়ে থাকলে মামা-বাড়ী এসে নির্ব্বাসিতা বন্দিনীর অনুভূতি জাগা তার হৃদয়-মনে একেবারেই সম্ভব হত না!

নিভৃত, নির্জন গোয়ালঘরের উঠান নয়। খড় ঘাসের পচা চালের বাঁশের বেড়ায় এই ঘরগুলি এমন নয় যে সপরিবারে সবাই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে পারবে দুপুর বেলা—প্রকৃতপক্ষে বাড়ীটা নির্জন হয়ে থাকবে।

বাড়ীতে মানুষ এগারোটা। মোটে পাঁচ জন গেছে মাঠে—বাকী মানুষ ঘরেই আছে।

৪

মামার বাড়ীর আদর!

রেবতী ভাবে, হায় রে! সে কালের লেটেল-রাজা ডাকাত আজ পুলিশ-পোষা চোর হয়েছে, সেই চোরের ভয়ে ছ্যাঁচড়ার মত পালিয়ে আসতে হয়েছে মামা-বাড়ী, তবু প্রাণটা মামা-বাড়ীর আদর চায়—খাঁটি আদর।

আদর না ছাই। শুধু অনাদর নেই, দূর-ছাই করা নেই।

তার বাপ-ভাই তাকে পুষবার খরচ দিচ্ছে তাই নেই।

কিন্তু শাসন আছে, গঞ্জনা আছে।

এলোকেশীর সঙ্গে ভাব হয়েছে তাড়াতাড়ি। ভাগ-চাষী বর্ণির অল্পবয়সী বৌ এলোকেশী কচি দুটো ছেলেমেয়ের মা।

বড় গরীব।

যেন কাঙালেরও বাড়া। কে বলবে তারা চাষী, ভাগে হলেও চাষ করে!

ওদের বাঁধা পড়া ভিটের ভাঙা কুড়েয় সন্ধ্যাতক্ কাটিয়ে আসায় কি রাগ মামা-মামীর! রাগের ঝাল মেরে-ধরে গালাগালি দিয়ে ঝাড়তে না পেরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কত কটূক্তি দু'জনের, মামার কি আপশোষ, মামীর বার বার কি ভাবে নিজের কপাল চাপড়ানো।

'কেন, দোষটা কি হল গো? অমন করছ কেন, চ্যাঁচাচ্ছ কেন? এই তো লাগাও ঘরে ছিলাম, বৌটার সাথে দু'দণ্ড কথা কয়ে এলাম? দোষটা হল কি?'

'গাঁয়ে আর বৌ নেই, গল্প করার লোক পেলি না? ওই বজ্জাতটার সাথে কেন তোর এত মাখামাখি? রাত দুকুরে পুলিশ এসে মেরে-ধরে সব তচনচ করে দিয়ে গেলে মজা লাগবে, না?

তবু আগে পরে ধরে পূজার কয়েকটা দিন বেশ কাটল রেবতীর। গোলোক দুর্গাপূজা করে।

আগে গাঁয়ে একটাই দুর্গাপূজা ছিল, গোলোকের তিন মহল বাড়ীর সদর পূজামণ্ডপে—মহাপূজা ছাড়াও সারা বছর ছোট-বড় নানা পূজার জন্য তৈরী সম্মুখ খোলা প্রকাণ্ড তিন দেয়ালী সরু পাতলা ইটে গাঁথা সুপ্রাচীন ঘর দালান।

আশে পাশের কয়েকটা গাঁয়ের লোকেরা চাঁদা তুলে আরেকটা সার্বজনীন পূজা চালু করেছে বছর কয়েক আগে।

এবং কয়েকটা গাঁয়ের লোক চাঁদা দিয়ে থাকলেও সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গোলোকের পূজা মণ্ডপের সঙ্গে কেবল একটা পাড়ার ফারাক রেখে এই গাঁয়েই পূজা হয়ে আসছে।

দুই পূজায় চলেছে ঘোরতর কম্পিটিশন।

গোলোকের সেকেলে পূজামণ্ডপে সেকেলে প্রতিমার সেকেলে পূজার চেয়ে সার্বজনীন পূজার বাঁশ হোগলা চট ত্রিপলের পূজা-মণ্ডপে ভিড় হচ্ছে বেশী।

চাঁদা আর প্রণামীতে শুধু পূজার খরচ উঠে যাচ্ছে না—দেড়শো-দুশো টাকা বাড়তি থাকছে! গোড়ায় বছর দুই সকলকে হিসাব অবশ্য দেওয়া হয়েছিল বাড়তিটা বাদ দিয়ে দশ-বিশ টাকা লোকসান দেখিয়ে। লাভটা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল কয়েক জন মাতব্বরের মধ্যে।

পরের বছর কয়েক জন বয়স্ক ব্যক্তিকে সামনে খাড়া রেখে ছেলের দল সোরগোল তুলেছিল। মাতব্বরি একেবারে বাতিল হয়নি, প্রসাদ ইত্যাদি কয়েক জনের বাড়ীতে আজও বেশী পরিমাণে যায়, তবে চাঁদা আর খরচের হিসাবপত্র নিয়ে আর ছ্যাঁচড়ামি চলে না।

পূজার ব্যাপার—মা দুর্গাই হয় তো চটে যাবেন, গোলোক তাই সকলের স্পর্দ্ধাটা সয়ে যায়। অন্য ব্যাপার হলে দু'-চার জনের মাথা যে ফাটত, দু'-একটা ঘরের চালায় যে আগুন লাগত, তাতে সন্দেহ নেই।

রেশারেশির পূজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে সবাই যেন কয়েকটা দিনের জন্য রেবতীকে রেহাই দেয়। গোবিন্দ আসে সপ্তমীর দিন, শেষ বেলায়।

আজ হবে সারা রাত যাত্রা।

রাত ভোর যাত্রা দেখার প্রস্তুতি চলছিল ভিতরে, বাইরে দাওয়ায় বসে বার বার কাসতে কাসতে খেলো হুঁকোয় দা-কাটা গুড়-মাখা তামাক টানছিল গোবর্দ্ধন।

গোবিন্দ এসে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে, গোবর্দ্ধন হুঁকোটা এগিয়ে

দিলে ডান হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে নল তৈরী করে, হুঁকোর ছেঁদায় লাগিয়ে কয়েক বার টানে এবং যথারীতি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাসে। তারপর বলে, রেবতীর মা-বাপের চোখে ক'রাত নিদ নেই—হাড়মাস কালি হয়ে গেছে ক'দিনে। আমাকে তাই উপায় করতে পাঠাল।

নিয়ে যাবে?

সার্বজনীন পুজামণ্ডপ চাতালে কিন্তু আলো ছড়িয়েছে বুড়ো বট গাছটার ডগার দিকের শাখায় পাতায়। সেদিকে তাকিয়ে উন্নাসিক প্রশ্নটা উচ্চারণ করে গোবর্দ্ধন।

গোবিন্দ হাত গুটিয়ে নিয়ে হুঁকোর ছেঁদায় মুখ দিয়ে জোরে টেনে কাসতে কাসতে প্রায় বেদম হয়েও হাসে।

: মাথা খারাপ, আমি নিয়ে যাব কি রকম? নিয়ে যেতে আসিনি। কেমন আছে ওর মুখ থেকে জেনে বুঝে যাব—গিয়ে মা-বাপের মনটা ঠাণ্ডা করব।

গোবর্দ্ধন বলে, অ!

ভিতরে গিয়ে রেবতীকে জিজ্ঞাসা করে, চিনিস তো মানুষটাকে?

রেবতী বলে, ওমা, বাচ্চা বয়েস থেকে ওকে চিনি না?

গোবর্দ্ধন মস্ত একটা হাই তুলে উদাসীনের মত বলে, যা তবে, কথা বলগে যা। ছোট কল্কে নিয়ে ঘাটে গিয়ে বসছি—কথা শুনতে পাব না। বাড়াবাড়ি করিস না কিন্তু—মেরে ফেলব, কেটে ফেলব।

ছোট কলকি মানে—গাঁজা। ঘাটে বসে গাঁজার কলকের টান দিতে দিতে সে চোখ মেলে শুধু দেখতে পারবে তাদের কাণ্ড-কারখানা—তাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না।

গেঁয়ো গাঁজাখোর গুরুজনের কি আশ্চর্য্য উদারতা!

প্রায় আধুনিকতা বলা যায়!

একটানা কত কথাই যে গোবিন্দ বলে যায়। অনেক বার নিশ্বাস টেনেই অবশ্য বলে, এক নিশ্বাসে নয়। অত কথা এক নিশ্বাসে বলতে গেলে শুরুতেই দম আটকে যাবার কথা।

রেবতী চুপচাপ শোনে, মাঝে মাঝে শুধু চোখ তুলে গোবিন্দের মুখের দিকে তাকায়—গায়ে তার কাঁটা দেয়।

কত সুযোগ ছিল তাকে এ সব কথা শোনাবার, কিছুই তখন গোবিন্দ বলে নি। আজ অবেলায় ভিন গায়ে ছুটে এসেছে তাকে কথা শুনিয়ে তার রোমাঞ্চ জাগাতে, তার মাথা গুলিয়ে দিতে।

গোবিন্দ নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করে বলে, আগে কিছু টের পাই নি রেবতী, তুমি গাঁয়ে থাকতে একদম টের পাই নি। তুমিও চলে এলে, আমিও আশ্চয্যি বনে গেলাম। প্রাণটা এমন পোড়ায় কেন রে, কার জন্তে পোড়ায়? রেবতীর জন্ম নাকি?

আবার গায়ে কাঁটা দেয় রেবতীর!

আরও কতক্ষণ ধরে আরও কত কথা গোবিন্দ শোনাত কে জানে, ওদিকে গোবর্দ্ধনের ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি। উঠে এসে বলে, রাত ভোর কথা চলবে নাকি তুমাদের, এ্যাঁ?
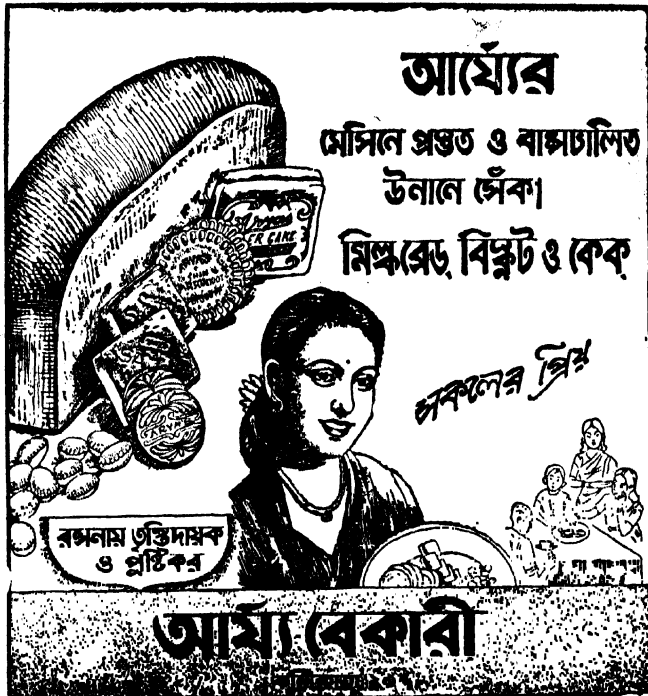
রাত্রে রেবতীর ঘুম আসে না।

গিরি বলে, ঘুমো না বাবা? হাড় জুড়োক! বুড়ী-বুড়ী মাগীদের বাপ-মা বিয়ে দেবে না, মামা-বাড়ী এসে ছটফট করবে রাত ভোর।

এক মামী গত হয়েছে অনেক আগে। দু'নম্বর এই মামীর এখন মাঝ-বয়স। সে থাকে বাপের বাড়ী। সে নাকি শেষ বিদায় নিয়েছিল এই বলে: সোয়ামীর ঘর করতে করতে বড়জনার মত সোয়ামীর হাতে খুন হয়ে নরকে যাব—কাজ নেই বাবা। বাপের বাড়ী লাথি-ঝাঁটা খাব, দিবারাত্তির খাটব—সে ঢের ভাল।

দেহগত নড়াচড়ার কাজ করতে, নড়তে চড়তে ঘাটে বাগানে যেতে, নাতি নাতনিকে ধরতে—এমন কি খেতে বসে ভাগের অল্পটুকু কচুর ঘণ্ট কলমী শাক দিয়ে মেখে মুখে তোলার সময়, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেবার সময়,—গোবর্দ্ধনের হাত-পা থর থর করে কাঁপে!

বার্দ্ধক্যের মৃত্যু-ভারাক্রান্ত বিনিদ্র রাত্রি—ঝিমোতে ঝিমোতেও জীবনের একটু স্বাদের জন্য সে যুবতী গিরিকে পাশে ডাকে! একটু আদর তো করতে পারবে যুবতী বৌটাকে, শুধু একটু আদর।

আদর করার ছোঁয়াছুঁয়িতেই তো জ্যান্ত জীবনের দু'-এক ঝলক ছোঁয়াছুঁয়ি বয়ে যাবে দেহে-মনে, মৃত যৌবনের স্মৃতির মত।

গিরি যে কি করে এমন নির্ব্বিকার থাকে, ভাবলেও ঘেন্নায় রেবতীর গা ঘিন-ঘিন করে।

বিয়ে হয়েছে, উপায় নেই, সইতে হবে। সে আলাদা কথা। দুখ ব্যাজার করতে কি কেউ বারণ করেছে গিরিকে—মাঝে মাঝে কপাল চাপড়ে একটু কেঁদে কপালকে গালমন্দ দিতে?

গিরি যে দু'বেলা শুধু আধপেটা শাক-ভাত খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গোবর্দ্ধনের তিন নম্বর বৌ হতে খুসীর সঙ্গে রাজী হয়েছিল—সে হিসাব তো রেবতী ধরে নি।

মামা-বাড়ী এসে প্রথম দু'-এক দিনের সামান্য আদরের পরে সেও খাচ্ছে আধপেটা শাক পাতা কচু—তবু সে গিরির দুঃখ বা আপশোষের এমন অভাব কেন ধরতে পারে না।

সবে শিখছে নিজের হিসাব করতে। সেও যে মানুষ এই হিসাবটা করতে।

দুটো সকরুণ মিষ্টি কথা বলে তাকে শাক পাতা কচু আধপেটা খাইয়ে মামা-মামীরা যে তার "মর্য্যাদা" রাখছে—চাষীর মেয়ে রেবতী হঠাৎ এটা বুঝে উঠতে পারে না।

ওদের তুলনায় কত কম বয়স তিন নম্বর মামী গিরির, কত সে ছেলেমানুষ!

বিয়ে অবশ্য হয়েছে বছর কয়েক কিন্তু ভরা যৌবন এখন থৈ-থৈ করছে সর্ব্বাঙ্গে। বিয়ের সময় তো ছিল রেবতীর চেয়েও কচি।

অথচ সে যেন হেসে খেলে মনের আনন্দে ঘর করছে বুড়ো আর জ্বর-জ্বালার কাতর অশক্ত সোয়ামীর।

এই বয়সে এ রকম সোয়ামীর ঘর করাই যেন মজার ব্যাপার!

রেবতীর সঙ্গেই শোয়। তবে অনেক দিন বেশী রাতে ঘুম ভাঙ্গলে পাশ হাতড়ে গিরিকে সে খুঁজে পায় না।

রেবতী এসেছে তার মামা-বাড়ী।

গিরি করছে সোয়ামীর ঘর।

সারা দিন বড় তার খাটতে হয়।

শোয়ার পর কথা কইতে কইতে কত তাড়াতাড়িই না তার কথা জড়িয়ে আসে, দু'-চার বার ছেদ পড়তে পড়তে কথা একেবারে থেমে যায় গাঢ় ঘুমে।

রেবতীর ঘুম আসে না।

গোবর্দ্ধন এসে দুর্ব্বল হাতে ঝাঁকানি দিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে, কাণে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে গিরির ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যায়—ঘুমের ভাণ করে রেবতী মরার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকে।

কাক ডাকা ভোর থেকে দিন-ভোর খাটার পর বিভোর হয়ে ঘুমালেও সে ঘুম ভাঙ্গালে গিরি রাগ করে না, চাপা সুরে শুধু বলে, বাবা রে বাবা! যাচ্ছি চল।

রেবতী বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে সে গিরিকে একই কথা জিজ্ঞাসা করে: অনেক বছর হয়ে গেছে, এখন মানিয়ে নিয়েছ। মনটা বুড়িয়ে থুরথুরে হয়ে গেছে। বিয়ের সময় মনে কষ্ট হয় নি? বিয়ের পর কষ্ট হয় নি?

: কিসের কষ্ট রে?

: বুড়ো বর হল বলে?

: আ মরণ, ছুঁড়ির কি কথা! এত ঢং শিখলি কোথা বল দিকি নি? ঘর আছে, জমি আছে, গাই বলদ পুকুর আছে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, আদরে-সোহাগে রাখবে, বুড়ো হয়েছে তো হয়েছে কি? কত জোয়ান মদ্দ বৌ নিয়ে উপোস দিচ্ছে দেখতে পাস না?

: কিছু বুঝি নে মামী। মাথা ঘুরে যায়।

: বোকা তাই বুঝিস নে! বুঝিস নে তাই মাথা ঘুরে যায়। কানু দাস তো যোয়ান মদ্দ, ওর বৌটা কেন গলায় দড়ি দিলে? চারটে ছেলে-মেয়ে ফেলে গলায় দড়ি দিলে? বড় ছেলেটা মরলে কানু শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছিল, মেয়ে দুটোকে কেন মাটিতে গর্ত্ত করে পুঁতে দিলে?

: তাই নাকি গো!

: তবে কি? তিন দিন আগে পরে মরল মেয়ে দুটো—নিজে কোদাল নিয়ে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতেছে। পতিত জমিটা করিম মিঞার, সে শুধিয়েছিল—মাটি নিচ্ছ? মাটি কি হবে? কানু কি বলেছিল জানিস? বলেছিল, মাটি নিচ্ছি না, তোমার পোড়ো জমিতে সার দিচ্ছি।

কানু দাসের শোচনীয় কাহিনী অবশ্য ঠিক ভাবে শোনাতে পারে না গিরি—কী করে পারবে।

শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবার সাধ্য হারিয়েছে বলে ঘরের পাশের ডাল-কলাই ফলাবার পক্ষে অদ্ভুত উপযোগী আগাছা ভরা মানবিক ময়লা ভরা পতিত জমিতে গর্ত্ত খুঁড়ে মেয়েটাকে কেন কানুর পুঁততে হল—সে কাহিনীকে রোমাঞ্চকর না করে কত সহজ আর সস্তাই যে করে দেয় গিরি।

বাড়ায় না, ফেনায় না। চাপা গলায় কথা সুরু করেছিল, গলা চড়ে যায়।

: বেচারা কি করবে বল্? ওদিকে আরেকটা মেয়ে মর-মর। বেটা মরেছে সেটাকে তাড়াতাড়ি মাটির গর্ত্তে পুঁতে মেয়েটার দিকে তাকাবার তো?

গিরির চোখে জল আসতে চায় কিন্তু প্রাণটা এমন জ্বালা করে যে সেই তাপেই বুঝি জল শুকিয়ে যায় ভিতরেই—চোখটা সজলও হয় না।

শুধু জ্বালা করে।

অকালের বর্ষা নামল মহাষ্টমীর সন্ধ্যায়।

আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে খানিক বৃষ্টিপাতও হয়।

বৃষ্টিটা গৌণ।

ঝড়-বৃষ্টি বলে যে একটা কথার কথা আছে শুধু সেটার মর্য্যাদা রাখার জন্যই যেন আকাশ থেকে কিছু জল ঝরা, ঝড়ের বাতাসে ফেনা হয়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

এবার ঝড় এল না, শুধু বৃষ্টি।

একটানা বৃষ্টি, অঘোরে মুষল-ধারে।

সমানে দু'রাত্রি, দু'দিন ধরে।

প্রতিবার মহাসমারোহে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় আধ ক্রোশ দূরের বর্ষা-পুষ্ট শান্ত জীবন্ত নদীতে। এবার নদীই যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমা গ্রহণ করতে এগিয়ে এল গাঁয়ের ভিতরে।

এমন বন্যা ক'বছর হয় নি ?

ছ'বছর না সাত বছর ?

অসময়ের এমন বন্যা ? এক হাত উঁচু মাটির ভিটে। ছ'-সাত বছরের গোবর-মাটি লেপায় দু'-এক-ইঞ্চি কি উঁচু হয় নি আরও ? সেই ভিটের উপর আধ হাত উঁচু জলের বন্যা থই-থই করছে। ধীরে ধীরে জল বেড়ে বন্যা এলে এমন সর্বনাশ হত না।

[ক্রমশঃ।

নতুন চাকরি

প্রভাত দেবসরকার

নতুন চাকরি হ'য়েছে মাধুরীর। যেন নতুন মানুষ হ'য়ে গেছে সে তারক বাবুর সংসারে। নিজেকেও তার কেমন নতুন লাগে।

কিন্তু মার যেন কি, না কিছুতেই তাকে নতুন করে দেখবেন, না তার চাকরির মর্যাদা দেবেন। মাধুরী আজো তাঁর হাতের দোসর, সব কিছুর মুখাপেক্ষী !

খেতে বসে তারক বাবু বললেন, কি মুসকিল ! ও যাবে কখন ? অফিস তো ওর-ও আছে !

মনোরমা স্বামীর কথায় উত্তর না দিয়ে মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, এক গেলাস জল আনতে দোল ফুরিয়ে গেল যে ! পোড়া কপাল, ঐ গতরে মেয়ে আমার রোজগার করবেন !

এক তরফা। তারক বাবু ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে চাইলেন। মাধুরী দু'টো জলের গ্লাস দু'হাতে আঁকড়ে ধরে গুটি-গুটি পাতের কাছে এগিয়ে এল। মায়ের অভিযোগে খুব যে বিচলিত তাকে দেখে মনে হয় না—মুখটা এখনো হাসি-হাসি।

তারক বাবু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত থেকে একটা গ্লাস ধরতে যেতেই মনোরমা হা-হা করে উঠলেন, জাত-জন্ম আর রইল না, সব একশা করে ছাড়লে ! সকড়ি হাতে গেলাসটা নিয়ে কি আদিখ্যেতা হচ্ছে শুনি ? মেয়েও তেমনি—নেকী, কেমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ ! গেলাসটা নামিয়ে দিতে পারছো না ? সকড়ি হ'লো যে। গতরে তোমার কি হ'য়েছে ?

মাধুরী ন যযৌ, ন তস্থৌ। তার বাঁ হাতের গ্লাসটা ততক্ষণে তারক বাবু টেনে নিয়ে মুখে তুলেছেন।

মনোরমা বললেন, আর দাঁড়িয়ে কেন ? বসে পড়, দয়া করে খেয়ে অফিস যাও। ছাতা দিয়ে আমাদের মাথা রক্ষে কর ! রোজগেরে মেয়ে তুমি, তোমার আবার এড়া-সকড়ি ! এ সংসারের দাসী-বাঁদী আছি আর ভাবনা কি !

বাড়া-ভাত পাতের কাছে ডান হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মাধুরী পিছন ফিরে কলতলার দিকে এগোয়। হাতটা ধোওয়ার কথা তার মনে আছে !

তারক বাবু মেয়েকে ডাকলেন, তুই বস। এইখানেই হাতে জল দিচ্ছে ! আজ বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে !

মাধুরী দাঁড়াল না। দালান পেরিয়ে কলতলায়। মনোরমা কিন্তু ছাড়েন না : দশটা ঝি-চাকর রেখেছো তোমাদের হুকুম তালিম করবে ? রোজগার করে খাওয়াস, আর কি !

তারক বাবু উত্তর দিলেন না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

মনোরমা তাঁর শূন্য পাতকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আজ-কাল ভাতটা পর্য্যন্ত বেড়ে নিতে পারেন না, সব এই বাঁদীকে করতে হবে ! যেহেতু উনি রোজগার করবেন ! মেয়ের মাথাটা উনিই খাচ্ছেন ; দশ দিন চাকরি হ'য়েছে কি হয়নি, নবাবী কত মেয়ের !

মাধুরী আধ কথা বলে না। চুপ-চাপ বসে কোন রকমে মাথা গুঁজে খেয়ে উঠে পড়ে। কোন দিন বা বাপের সঙ্গে, কোন দিন বা একলাই বেরিয়ে পড়ে। পিছন থেকে মায়ের গলা তখনো শোনা যায় ; আবার তেজ আছে ! ভাত ফেলে উঠে যাওয়া হ'লো ! খাওয়ার ছিরি দেখ না, যেন হাঁস-মুরগীতে খেয়েছে !

তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে কোন দিন মাধুরী মায়ের কথায় মনে মনে খুব হাসে, কোন দিন খুব গম্ভীর হ'য়ে ভাবে—কেন মা এমন করেন ? অযথা তাঁর এ রাগের কি মানে হয় ? অবুঝ এ আক্রোশের হেতুই বা কি তাঁর ?

প্রায় রোজই। মা যেন মুখিয়ে থাকেন। একটু কিছু পেয়েছেন কি···

অথচ তাদের ভাই-বোনের কারো না কারো চাকরি না হ'লে তারক বাবুর পক্ষে চালান ক্রমেই অসম্ভব হ'য়ে পড়ছিল।

দু'জনেই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। দরখাস্তটা প্রায়ই দু' ভাই-বোনে পরামর্শ করে করতো।

চাকরির খবরাখবর বেশির ভাগ সুবোধই আনতো। কখনো একটু চিরকুট, কখন বা চেয়ে-আনা খবরের কাগজের পাতা একখানা। কখন বা মৌখিক।

আবার সুবোধেরই আগ্রহ বেশী। মাধুরী যদি বলতো, এটাতে

একলা তুই দরখাস্ত কর, আমি করবো না। আর একটা বরং খবর আনিস। সুবোধ বোনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইতো। ঠিক এখন কথাটা যেন উভয়ের মধ্যে কোন কালে হয়নি। এক জন করছে বলে আর এক জন করবে না এর মানে কি?

সুবোধ বললে, কেন?

মাধুরী ভাইকে নিরস্ত ক'রতে বলে, আমার হ'বে না মনে হচ্ছে।

সুবোধ জেদ ধরে, করেই দেখ না। বলা কি যায় কার কখন কিসে হয়! আমার মনে হয় তোরই হ'বে।

ভাইএর দিকে চেয়ে মাধুরী হাসে। তারও বোধ হয় তাই মনে হয়—এ পদের প্রার্থী হ'লে তাকেই ডাকবে নিয়োগ-কর্তারা নির্ঘাৎ। কিন্তু মুখে বলে, না, মিছিমিছি দরখাস্ত করে লাভ নেই, তুই কর।

হঠাৎ সুবোধ বলে বসে, তার মানে তুই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চাস না। যদি আমায় না ডেকে তোকে ডাকে, এই ভয়?

মাধুরী হেসে উড়িয়ে দেয়: ডাকলেই বা তাতে কি? এখন আমাদের যার 'হোক চাকরি হওয়া নিয়ে কথা। মনে করাকরির কি আছে।

সুবোধ ছাড়ে না, বলে, তা হ'লে তুইও কর—দু'জনের এক জনের লেগে যেতে পারে। লটারী যখন, করে দে!

তবু মাধুরী মাঝে মাঝে সরে দাঁড়ায়—সুবোধ যেখানে দরখাস্ত ক'রে পারতপক্ষে সেখানে সে আবেদন করে না। সুবোধের কিন্তু কোন বাচ-বিচার নেই। খালি পদ পূর্ণ করবার জন্তে সে সব সময় প্রস্তুত। চাকরির ব্যাপারে দিদির মত সে অত কিন্তু-কিন্তু নয়। যেন চাকরি দেবার জন্তে বিজ্ঞাপনদাতারা হাত ধুয়ে বসে আছেন—ভাইকে দেবেন, কি বোনকে দেবেন, ভেবে তাঁদের ঘুম হচ্ছে না।

এমনি ক'রতে ক'রতে হঠাৎ একদিন এক জায়গা থেকে তাদের দু' ভাই-বোনের নামেই 'ইণ্টারভিউ' এসেছিল। মাধুরী কিছুতে যেতে রাজী হয়নি। সুবোধ বোনকে বলে যখন পারেনি, তখন তারক বাবু মেয়েকে বলেছিলেন। যাতে মাধুরী রাজী হয়—'ইণ্টারভিউ'-এ যায়। কিন্তু মাধুরীর এক কথা, ও তার হবে না। মিছিমিছি 'ইণ্টারভিউ' দিয়ে লাভ নেই। বাজে যত সব!

তারক বাবু মেয়েকে আর পেড়াপিড়ি করেননি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাকরিটা সুবোধেরও হয়নি।

ফিরে এসে সুবোধ বোনকে বললে, শুনলি না, ওরা ফিমেল ক্যাণ্ডিডেট্ নিলে! তুই গেলে নিশ্চয়ই তোর হ'তো!

নিরুৎসুক কণ্ঠে মাধুরী বললে, তোর তো হ'তো না!

সুবোধ বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে যায়, তার মানে? যার হোক এক জনের হওয়া নিয়ে কথা! দিদিটার যদি কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে!

ছেলের মুখে মনোরমা শুনে মেয়েকে বললেন, কেন গেলি না তুই? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি? বড্ড তেজ তোর!

মাধুরী বললে, ও চাকরি ভাল নয়। না গেছি ভালই হয়েছে। হ'লে তখন ছাড়তে পারতুম না।

মনোরমা বুঝতে পারেননি মেয়ের কথা। কঠিন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে? হবার জন্তে এত চেষ্টা তাহ'লে কেন?

মাধুরী উত্তর দেয়নি আর।

যে-মাছটা পালিয়ে যায় তার ওজন বেশী। তার পর অনেক দিন মেয়েকে শুনিয়ে শুনিয়ে মনোরমা বলেছিলেন, তা হবে কেন, চাকরি করলে যে সংসারের সুবিধে হবে! বুড়োটা খেটে-খেটে মরুক! উনি বিবি হ'য়ে বসে থাকুন! ঢং-এর কথা শিখেছেন—চাকরি হ'লে ছাড়বো কি করে!

অন্ততঃ মায়ের ও-মুখটা বন্ধ হবে মাধুরী ভেবেছিল চাকরি পেয়ে। তিনি খুসী হবেন সংসার কিছুটা সচ্ছল হ'লে, কিন্তু কৈ, মুখ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, মুখ তাঁর খুলছে দিন দিন। এমনি করে বোধ হয় আর চাকরি করা চলবে না মাধুরীর—নতুন আনন্দ-উত্তেজনায় সবটুকু অনুভূতি কেমন যেন ভোঁতা হ'য়ে যায় বার বার। রোজগারও করবে আবার মুখও শুনবে অকারণে, কেন? মা কি ভেবেছেন!

মুখোমুখি কোন কথা মাধুরী বলে না মনোরমাকে। যতটা পারে গায়ে মেখে নেয়।

ইচ্ছে করে কিনা কে জানে, সেদিন মাধুরী অফিসের পর বাড়ী ফিরলো অনেক রাত্রে। তখন কেবল তারক বাবুর ঘরে আলো জ্বলছিল, আর দুটো ঘর আছে কি নেই দূর থেকে ঠাহরই হয় না। পাড়াটাও যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ঘরে ফেরার কথা মাধুরীর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল নতুন করে—থমকে দাঁড়াল সে সদর রাস্তার ওপর—ও-ফুট থেকে এ-ফুটে আসবার জন্তে শাড়ি সামলে নিজেকে প্রস্তুত ক'রলে খানিকক্ষণ, সামনে যেন পারাবার দুস্তর!

গুটি-গুটি এগিয়ে এসে নিজের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াল মাধুরী। ঘরের মধ্যে গাদাগাদি জিনিষগুলো অপচ্ছায়ার মত। তাই কি এক ডাকে উঠবে সুমু! উঃ-আঁ ক'রতে ক'রতে যে জন্তে ভয়—মা ঠিক উঠে আসবেন। তার পর—যত মাধুরী ভাবে এত ভয় পাবার তার কোন কারণ নেই, ততই যেন ভয়ে সে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। আজ দেরীতে বাড়ী ফেরার তার যথেষ্ট কারণ আছে। মা যদি জিজ্ঞেস করেন, মুখের ওপর বলবে সে। ভয়ের কি আছে? তা বলে এক দিন-আধ দিন দেরী হ'বে না বাড়ী ফিরতে—এখনো কি ঘড়ির কাঁটার গণ্ডি পেরুতে পারবে না সে! কেন?

পাশের জানালায় এসে সুবোধকে ডাকলে মাধুরী। নিজের গলা নিজেই শুনতে পেল না, এত ক্ষীণ আর অস্পষ্ট। সুবোধের ঘুমও তেমনি বেড়েছে আজ-কাল! কি করে যে অত ঘুমোয়, চোখ পোচে যায় না ছোঁড়ার!

খানিক হাত-পা হারিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাধুরী। হঠাৎ তার মনে হয়, এ-বাড়ির কেউ তাকে আর চায় না। যেমনি এসেছে তেমনি সে ফিরে যাক! যেখানে খুসী!

বাড়ীর সামনে গ্যাসের আলোটার অন্তিম দশা—এক চোখে ভ্রূকুটি করছে। সারা রাতই বোধ হয় অমনি করবে।

বেশ সংযত করে নিল নিজেকে মাধুরী—ভ্যানিটি ব্যাগটা চেপে ধরে দৃঢ়-ঋজু কণ্ঠে হাঁক দিলে, সুবোধ! ও সুবোধ! সুবোধ!

গ্যাস-পিদিমের আলোটা যেন আরো কমে এল—ছায়াচ্ছন্ন একাগ্রতায় নৈশ ভয় পাড়াটাকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

তারক বাবুর ঘরের দরজা খুলে মনোরমা দেবী বেরিয়ে এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়ালেন। মুহূর্ত্তের জন্যে মাধুরী চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলে, তার পর মাথা হেঁট করে এসে ঘরে ঢুকলো। মনোরমা তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন থ' হ'য়ে—মেয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করলে না তো? একচোখো গ্যাস আলোটার ভ্রূকুটি যেন বেড়েছে আবার।

মাধুরীও কম অবাক হয়নি মা'র এমনি চুপচাপ ব্যবহারে। তিনি আজ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না! মাধুরীর ওপর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব যেন তিনি তুলে নিয়েছেন। সাবালক মেয়ের স্বাধীন চলা-ফেরায় মত দিয়েছেন!

আজ দুটোই মাধুরীর খুব আশ্চর্য লাগে—দেরী করে বাড়ী ফেরা, আবার ফিরে কোন বকুনী না খাওয়া মা'র কাছে। কত কৈফিয়ৎ সে ভেবে রেখেছিল মনে মনে, শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগল না।—নিজের কাছে চোর হওয়া শুধু।

কেমন সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায় মাধুরীর। মা'র এই বিপরীত ব্যবহারে নিজেকে হঠাৎ যেন সে চিনে উঠতে পারে না—কালকের অফিস-ফেরা মাধুরীর সঙ্গে আজকের এই মুহূর্ত্তের মাধুরীর অনেক তফাৎ হয়ে গেছে!

আর পারলেন না বলে কি মা সরে দাঁড়ালেন? না, ভেবে দেখলেন, বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো দিয়ে কোন লাভ নেই। বরং সংসারে যে ক'দিন যে ক'টা টাকা আসে নির্বিবাদে তাই লাভ।

মা রাগ করেছেন? করাই তাঁর উচিত। দেরী করেছিল করেছিল, মা যখন দরজা খুলে দিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ স্বীকার ক'রে বললে না কেন আজ অফিসে এক জনের ফেয়ারওয়েল পার্টি ছিল তাই—

তা নয়, অমন 'অগ্রাহ্যির' ভাব করে চলে আসা মাধুরীর উচিত হয়নি। তিনি মা তো! তার ভালর জন্যেই তিনি যা কিছু বলেন।

সত্যিই নিজেকে মাধুরীর বড় অপরাধী মনে হয়। চাকরি করছে বলে কি সবার মাথা কিনে রেখেছে সে, তার ন্যায়-অন্যায়ে কেউ কিছু বলতে পারবে না? এ অনুচিত!

ক'মাসের মধ্যে নিজেকে আবার যেন কেমন সহজ মনে হয় মাধুরীর—তেমনি সম সুখদুঃখভাগিনী, ছোট্ট মেয়েটি এ সংসারের সবার স্নেহ-ভালবাসার প্রার্থী!

মা'র ওপর আর কোন ক্ষোভ নেই মাধুরীর। তার জন্যে আর অহেতুক কষ্ট ভোগের কথা ভেবে মাধুরী বিশেষ লজ্জা বোধ করে।

তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে দালানে বেরিয়ে আসে মাধুরী। মা ভাত বেড়ে দেবার আগেই সে নিজে থেকে ভাত বেড়ে নিয়ে বসতে যায়। রাত দুপুরে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে জ্বালাতন করতে চায় না! মা বুঝবেন, নিজের ব্যবহারে মেয়ে কুণ্ঠিত!

কিন্তু হায়, সবই বোধ হয় তার কল্পনা। দালানে তখনো আলো জ্বললে কি হবে, মনোরমা নিজের ঘর থেকে আর বেরিয়ে আসেননি। তাঁর ঘরের আলোও নিবে গেছে কখন।

দালানের এক ধারে মাধুরীর খাবার ঢাকা আছে। এক গ্লাশ জলও এক পাশে রাখা। এখনো আলো-ছায়ায় যেটুকু খেলা তা কেবল যেন এই জলের গেলাশটার মুখে।

"নবাব-নন্দিনী আজকাল এক গেলাশ জলও গড়িয়ে নিয়ে বসতে পারেন না!"

মাধুরীর হয়তো কোন দিন ভুল হয়ে থাকবে, মা এখনো ভুলতে পারেননি। তাকে কিছুতেই আর সে-ভুল শোধরাতে দেবেন না। অন্ততঃ আজ স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে সে-সুযোগ দিতে পারতেন।

রাগ না করলে কেউ এমন পরিপাটি করে মেয়ের জন্যে ব্যবস্থা করে রাখেন না। এ ঢেপ দিয়ে রাগ।

আজ সারা রাত উপোস করে দেখবে মাধুরী মা আর কত তার ওপর রাগ করতে পারেন? কি এমন অপরাধ সে করেছে, তার বোঝাপড়া হবে! এমন করে রোজ রোজ অকারণে অশান্তিই বা হবে কেন? মা স্পষ্ট করে বলুন—কি তিনি চান মেয়ের কাছ থেকে, কি অন্যায় মাধুরী করছে! চাকরি ছাড়া আর তো কিছু সে করছে না, দশটা হাত-পাও তার বেরোয়নি যে মা সব সময় হা-হা করবেন—তার সব ব্যবহারে খুঁত ধরবেন। কেন?

তবু কি ভেবে সুবোধ শান্ত মেয়েটির মত মাধুরী ঢাকা খুলে কোন রকমে ভাতগুলো গিলে ফেললো। আর ভাবা যায় না, আজ না খেলে কালি হয়তো মা'র মুখের আর শেষ হবে না। মাঝখান থেকে বাবাকেও তিনি যাচ্ছেতাই করবেন। তার চেয়ে—

কিন্তু অত সহজে মনোরমা ভোলবার নন। সেই অফিস যাবার সময় মাধুরীর রাত করে বাড়ি ফেরার কথা তুললেন।

মাথা নীচু করে ভাত মাখতে মাখতে মাধুরী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠলো। তারক বাবু সাড়া করলেন না।

মনোরমা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, জানি, কথাটা তোমার ভাল লাগবে না। লজ্জা করে না মেয়ের রোজগার খাচ্ছ!

অভাবিত অভিযোগে তারক বাবু বিভ্রত বোধ করেন। মাধুরী থালার সঙ্গে মিশে যায়।

বিরক্ত হ'য়ে তারক বাবু বললেন, তার মানে! কি বলছো তুমি?

মনোরমা বললেন, ঠিকই বলছি। মেয়ের রোজগার খুব মিষ্টি লাগছে তোমার, মাথায় যাবে কি করে!

তারক বাবু রাগ করেন, বেশ করছি! মেয়ের রোজগার, মেয়ের রোজগার, যেন একটা মস্ত অপরাধ করছি।

আজ মাত্রাটা একটু যেন ছাড়িয়ে যায়, মনোরমা সমানে উত্তর দেন, অপরাধই তো! না হ'লে রাত দুপুরে সমত্ত মেয়ে বাড়ি ফিরলে আর তোমার চোখে লাগে না! এইবার আমি শুদ্ধ রোজগার করবো, চার হাত দিয়ে গিলবে! মুরোদ থাকলে তো বলবার সাহস হ'বে!

তারক বাবু অর্দ্ধভুক্ত অবস্থাতেই পাত ছেড়ে উঠে পড়েন,—কটু হ'লেও মনোরমার কথাগুলো সত্যি বলে তাঁর মনে হয় কিনা কে জানে! তিনি তো তখন জেগেছিলেন, মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি কেন? তিনি তো বাপ, অভিভাবক!

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীও ওঠে, কিন্তু বাপের মত অতটা রাগ সে প্রকাশ করে না। কোন রকমে পাতের ভাতগুলো গিলে উঠে পড়ে। পিছন থেকে মনোরমা বললেন, আদিখ্যেতা! বাপ উঠলেন তো মেয়েও উঠলেন! চাকরির গরম!

এক সময় বাপ-মেয়ে এসে ট্রাম-রাস্তায় দাঁড়ালো। যেন দু'টি অপরিচিত পথচারী। তারক বাবু মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারেন না, মাধুরীও বাপের মুখের দিকে চাইতে পারে না। উভয়ের দৃষ্টির শূন্যতায় একটা অকারণ লজ্জা পিতা-পুত্রীর সহজ সম্বন্ধে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করে।

পর-পর অনেকগুলো ট্রাম চলে গেল। ছড়ান সময়ের অনেকগুলো খুঁটে নিলে।

মাধুরী এদিক ওদিকে চেয়ে ধরা-গলায় বললে, বাবা, দেরী হ'য়ে গেল—

তারক বাবুর যেন খেয়াল হ'লো, বললেন, এইটেতে উঠি আয়। আজ ভিড়ও তেমনি হয়েছে!

মাধুরী বাপের পিছু-পিছু ট্রামে উঠলে। এত খালি ট্রামে সে আর কোন দিন অফিস যায়নি! বাবা ভীড় কোথায় দেখলেন কে জানে!

তারক বাবু প্রথমটা মেয়ের কথা বুঝতে পারলেন না। খানিক মেয়ের দিকে নিরুত্তরে চেয়ে রইলেন। মনে মনে তিনিও কম তিতিবিরক্ত হননি, কিন্তু তা বলে যে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে মাধুরীকে, তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। তাঁর ধারণা ছিল, মনোরমা আর যাই বলুন, মেয়েকে চাকরি ছেড়ে দিতে কখনো বলবেন না।

তারক বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেন, তোমার মা কিছু বলেছেন?

মাধুরী মাথা নিচু করে রইল, মা'র কথা সে তো বলতে আসেনি। নিজের কথাই সে বলতে পারে শুধু।

ইতস্ততঃ করে তারক বাবু বললেন, আমি আর কি বলবো! যা ভাল বোঝ করবে, তবে আজকালকার দিনে চাকরি—

ছেলেমানুষের মত মাধুরী ফুঁপিয়ে বললে, আমি কি করবো তা হলে?

মেয়েকে প্রকৃত সান্ত্বনা দেবার কথা হয়তো তারক বাবুর জানা আছে, এ অবস্থায় চাকরি ছাড়া অনূঢ়া মেয়েরা আর কি করতে পারে তাও বাপ হ'য়ে তারক বাবুর না জানবার কথা নয়। তবু তিনি উত্তর দিতে পারেন না। কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়েন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে।

কম্পিত কণ্ঠে তারক বাবু বললেন, না, তোর আর চাকরি করে কাজ নেই। উনি যখন চান না তখন কেন—

কথাটা তারক বাবু শেষ করতে পারলেন না, দোর-গোড়ায় মনোরমা এসে দাঁড়ালেন। শ্লেষ করে বললেন, থামলে কেন, শেষ করে ফেল। আমিই তো সবার বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছি! আমার জন্যে মেয়ে তোমার চাকরি করতে পারছেন না, বল বল, আর কত কি বলবে!

ব্যথিত স্বরে তারক বাবু বললেন, তুই যা যা, পরে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

পথটা মনোরমাই আটকালেন, পরে কেন, এখনি তোমাদের ঠিক ক'রতে হবে—কি সুখ হ'য়েছে জানতে তো আর বাকি নেই! কেনাকেলে বাঁদীকে আর কত খোয়ার ক'রতে হ'বে? যত পার মেয়েকে পটের বিবি করে রাখ, কার কি! দয়া করে আমাকে রেহাই দাও—

তারক বাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, কি আরম্ভ ক'রছো দিন দিন ইতরোমী, ছিঃ! সখ করে কেউ চাকরি করে?

মনোরমা অবুঝ, সখ করে করবে কেন, সখী সাজবার জন্তে করে। একবার চৌকাঠটা পেরুতে পারলে হ'লো, আর কি! সংসার পুড়ে যাক, হেজে যাক, বয়ে গেছে! সব বুঝি!

তারক বাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, বললেন, বুঝলে কেউ তোমার মত ছোট-লোকমি করতো না। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতো না। হাত জোড় করছি, একটু শান্তিতে থাকতে দাও দয়া করে।

মনোরমা আরো খানিকটা অকথ্য চেঁচামেচি ক'রলেন। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করলেন। মেয়ের চাকরি নিয়ে তিনি যে জ্বলে-পুড়ে মরছেন ত'ও বললেন উচ্চ স্বরে।

তারক বাবুর মেয়েকে বোঝাবার আর কিছু রইল না। এ কি নির্বোধ আক্রোশ মনোরমার!

পরের দিন মনোরমা যথারীতি স্বামীর সঙ্গে আসন করে চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন, কই গো, নবাব-নন্দিনীর হলো! আজ অফিস-কাছারী নেই নাকি?

তারক বাবু চুপ করে খেতে লাগলেন।

মনোরমা ক্রমেই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলেন, শেষে স্বামীকেই ছোবল দিলেন। কানের মাথা খেয়ে রেখেছো, শুনতে পাচ্ছ না?

শুনতে পেলেও তারক বাবুর বলবার কিছু নেই। আর বলেও কোন লাভ নেই। মাধুরী ঠিকই করেছে।

শেষটা মনোরমা নিজেই অপ্রস্তুত বোধ করেন। স্বামীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল, সত্যিই তো মাধুরী এলো না—তা হ'লে কি—

মনোরমা বিদ্রূপের মত জিজ্ঞেস করলেন, মানে, ও কি অফিস যাবে না? কেন?

তারক বাবু চুপ। কোন উত্তরই দেন না।

চুল-ছেঁড়া র'গে মনোরমা চেঁচিয়ে ওঠেন, কি! কি! উত্তর দিচ্ছো না কেন?

তারক বাবু জলের গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, মাধু আর চাকরি করবে না!

কেন? মনোরমা তেমনি চীৎকার করে ওঠেন।

মেয়ের চাকরির চেয়ে সংসারের শান্তি বড়—সামান্ত ক'টা টাকার জন্তে রোজ রোজ— তারক বাবু থেমে যান।

হঠাৎ মনোরমা যেন কেঁদে ফেলেন, আমি অশান্তি করি? ভগবান বিচার করবেন, তিনি অন্তর্যামী!

তা হ'লে? তারক বাবু একটু বিচলিত বোধ করেন।

কেমন জড়ভরত হ'য়ে গেছেন মনোরমা দেবী। হয়তো নিজের অযৌক্তিক মনোভাবের জন্তে মনে মনে দগ্ধ হন। তাঁরই জন্তে মাধুরী চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে! সংসারের দুঃখু বাড়ছে।

সত্যি তিনি কি শান্তি চান না? মাধুরী চাকরি ক'রলে তাঁরও সুখ হয় না?

মেয়ের শূন্য আসন লক্ষ্য করে মনোরমা বলতে লাগলেন, তা বলবে বই কি! মেয়েকে অত বড়টা করলে কে? এখন তার ভাল-মন্দ বলতে যাওয়া তো দোষের, জানি! আমি তো তার এখন শত্তুর হবোই!

হঠাৎ থেমে মনোরমা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, আজ তোমাকে বলছি, এ আদিখ্যেতা তোমার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না! মেয়ে তোমার একার নয়।

তারক বাবু কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না। মেয়েমানুষটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি! আবোল-তাবোল যা-তা বকছে!

মনোরমা এক রকম কান্নার সুরে বললেন, আজ যদি আমার সুবোধের চাকরি হ'তো, তা হ'লে কি এমনি ঘরে-বাইরে চোর সেজে থাকতে হ'তো, না লোকের এমনি কথা শুনতে হয়? হা, ভগবান! কার বদলে তুমি কাকে চাকরি দিলে!

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তারক বাবু থমকে যান। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে যায়। মেয়ের চাকরি তিনি যে চান না, তা নয়; কিন্তু তার আগে সুবোধের চাকরি তাঁর পরম অভিপ্রেত—আর সেই জন্তেই তাঁর এই মানসিক বিকার, মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া।

সব ভুলে গিয়ে মনোরমা বলতে থাকেন, আজ যদি সুবোধের চাকরি হ'তো, কেউ আমাকে এমনি অপমান ক'রতে সাহস করতো, না, কারো কথার আমি ধার ধারতুম? পেটের শত্তুর জানি তো! মেয়ের রোজগারে আমার লোভ নেই—যার আছে সে খোসামোদ করবে! ঢের সুখ হ'য়েছে—

তারক বাবু চুপিসাড়ে পাত ছেড়ে উঠে পড়েন। আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি!

আকস্মিক

সুনীলকুমার ধর

এই মুহূর্তের ঘটনাটি একান্তই আকস্মিক।

প্রায়শই অনেক ঘটনা এবং দুর্ঘটনা আকস্মিকই ঘটে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আকস্মিক ঘটে ব'লেই অনেক ঘটনা শেষ পর্য্যন্ত দুর্ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সে আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্ত স্তম্ভিত হলেও মানুষের মনে কোন অস্বস্তির চাপ বাঁতা দিয়ে বসে না। কারণ ঘটনা এবং দুর্ঘটনার আকস্মিকতা মানুষের জীবনে নতুনও নয় অকল্পিতও নয়। প্রথম ধাক্কায় স্তম্ভিত হওয়ার সঙ্গে বাড়তি যা ঘটে তা হ'ল খানিকটা এলোমেলো ভাবনা। তাই দুর্ঘটনার জন্ত বেদনার্ত্ত হয়ে ওঠে বলেই মানব-চিত্ত বোধ করি এমন ভাবে তৈরী যে, আকস্মিকতার জন্ত যেন আগে থেকে ভিতরে ভিতরে অনেকখানি তৈরী হয়েই থাকে। বেদনা-বোধ যা কিছু ঘটনার মধ্যেই আপ্লুত হ'য়ে গিয়ে আকস্মিকতার কথা ভুলিয়ে দেয়। আকস্মিকতা তখন ইতিহাসের ভূমিকা হয় মাত্র।

কিন্তু এই ঘটনাটিই একান্ত আকস্মিক।

এমনই আকস্মিক যে অনঙ্গমোহনের চোখ বড় হ'য়ে উঠেছে। অথচ এতটুকু বেদনা বোধ নেই অনঙ্গমোহনের মনে, সর্ব্বনাশ ব'লতে যা বুঝায় ঘটনাটির সঙ্গে তারও কোন সংস্রব নেই—তবুও, অনঙ্গমোহনের চোখ কেবল বড় নয়, কপালে ওঠার মত অবস্থা।

তার সামনে পঁচিশ হাজার টাকার একটা প্যাকেট। আর এই প্যাকেটটি যে লোকটি পকেট থেকে বের করে দিল, সে তার সামনের চেয়ারে বসে।

পঁচিশ হাজার টাকা এই টেবিলে আগেও অনেক বার এসেছে, গেছে। ঘটনাটি পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে নয়। ঘটনা সামনে বসে আছে। ঐ লোকটি।

গত কাল রাত্রে যে লোক মাত্র দু'টি টাকা চেয়ে নিয়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের উপবাস থেকে বাঁচাবার জন্ত, সেই লোকটি আজ নির্ব্বিবাদে পঁচিশ হাজার টাকা পকেট থেকে বের ক'রে দিল কি ক'রে!

গত রাত্রেই ঐ লোকটি সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে না কি? কিন্তু সোনার খনি পেলেও ত' এত তাড়াতাড়ি এত টাকা আসা সম্ভব নয়! তবে কারো পকেট মেরে নিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই! কিন্তু কই, এর আগে এ বিষয়ে লোকটির কোন দক্ষতার কথা ত' জানা যায় নি। তবে নিশ্চয়ই কোথা থেকে চুরি করে এনেছে। তাই সম্ভব। কিন্তু ঘরে গেলেই পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে এমন লোকের সঙ্গে তার আত্মীয়তা বা পরিচয় আছে—সে-কথাও ত' শোনা যায় নি এর আগে! তা হ'লে কি রাস্তায় কুড়িয়ে পেল টাকাটা? অসম্ভব নয়। ক'লকাতা সহরের রাস্তায় টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে, হয়ত দাঁও মাফিক ওর কব্জায় এসে গেছে।

অনঙ্গমোহনের চোখ কপালে উঠেছে পঁচিশ হাজার টাকা দেখে নয়! এই পঁচিশ হাজার টাকার পিছনের ইতিহাসটুকু সে কিছুতেই কল্পনার আয়ত্তে আনতে পারছে না ব'লেই অসহনীয় অস্বস্তি এবং তারই তাপে ওর কপালে এই শীতের দিনেও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। মানুষের চিন্তাধারা যতই এলোমেলো হোক, বল্গাহীন হোক, তারও একটা শেষ আছে, সীমা আছে। যতই উদ্দাম হোক যে-কোন চিন্তা বা কল্পনাকে এক জায়গায় গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত থামতেই হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে কিছুতেই বিচার-বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্তে আনতে পারছে না অনঙ্গমোহন।

—'টাকাটা তোমাকে দিলাম।' বেশ সহজ করেই এই কথাগুলি ব'ললে ঐ লোকটি। সুরে কোথায়ও এতটুকু আত্মম্ভরিতার স্পর্শ নেই বরং কেমন যেন একটা কৃতজ্ঞতার সুর রয়েছে কথাগুলিকে জড়িয়ে। যেন টাকাটা দিতে পেরে অনেকখানি কৃতার্থ হয়েছে, এমন ভাব!

কিন্তু অনঙ্গমোহনের ছেঁড়া-ছেঁড়া বিস্রস্ত চিন্তার তন্তুতে-তন্তুতে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে গেল এ-কথায়। লোকটি বলে কি! পাগল না কি?

অস্বস্তির বোঝা আর বইতে পারছে না অনঙ্গমোহন। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ এ ভাবে কাটলে সে হয়ত দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ধারা বেশ কিছুক্ষণ থেকেই স্বাভাবিক গতি-পথ ছেড়ে হোঁচট খেয়ে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে। অনঙ্গমোহন আর পারে না। কিন্তু কি করবে, কি করা উচিত, তাও ত' ঠিক করতে পারছে না অনঙ্গমোহন। একবার খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠবে না কি অনঙ্গমোহন, না প্যাকেটটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে টেবিলের উপর থেকে—না, লোকটির গলা টিপে ধরবে দু'হাতে যত জোরে পারে। কিন্তু কই, এই অসংলগ্ন চিন্তার ঢেউয়ে মনের অস্বস্তির চাপ ত' কমলো না একটুও! তাহ'লে কি শেষ পর্য্যন্ত বোবা যন্ত্রণায় এমনি তিলে-তিলে নীরবে মরবে অনঙ্গমোহন?

—'চুরি করা নয়। টাকাটা চুরি করে আনি নি!' অনঙ্গমোহনের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বললে লোকটি। অস্বস্তির উত্তেজনা চরমে উঠেছে এবার। মনে হচ্ছে, অনঙ্গমোহনের চোখ দুটি বুঝি এবার ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনঙ্গমোহনের বিবশ চিন্তার অতল তলে যেন একটু অস্পষ্ট আশার শিহরণ খেলে গেল। যেন, অকূলে একটা কূল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কোথায়ও। অল্প একটু নড়ে বসলো অনঙ্গমোহন। অস্বস্তির তরঙ্গে দোলা লেগেছে। বড় টলটলায়মান অবস্থা এখন।

—'আমার এমন কোন দূর বা নিকট ধনী আত্মীয়-বন্ধু নেই যিনি আমায় এ টাকাটা দিয়েছেন। উইল করে রেখে যাবার মতও কেউ ছিলেন না।'

অনঙ্গমোহন এবার সোজা হয়ে বসলো। ভিতরে ঝড় উঠেছে। এই সোজা-হয়ে-বসা নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াসের প্রকাশ। ঝড় যখন উঠেছে, তখন থামবেই এক সময়। সান্ত্বনা ঐটুকু। কিন্তু কি তছনছ করে যাবে এই ঝড় কে জানে! যাই হোক, টিকে থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে এই হ'ল যে-কোন অবস্থায় আক্রান্ত মানুষের একমাত্র চেষ্টা। ডুবন্ত মানুষ খড়-কুটোও আঁকড়ে ধরে। অনঙ্গমোহন দাঁতে দাঁত চেপে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত করল।

—'লটারি বা ক্রস্‌-ওয়ার্ডেও এ টাকা পাই নি।'

অনঙ্গমোহনের অবশ অনুভূতির বেলাভূমিতে জোয়ারের স্রোত এসে আঘাত করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু আর একটু—আরও একটু

ধৈর্য্য ধরতে হবে অনঙ্গমোহনকে। জোয়ারের বড় ঢেউটা এসে পৌঁছল বলে।

—'স্বপ্নে—স্বপ্নে এই টাকা পেয়েছি আমি'···

কথা শেষ হবার আগেই ও-ও করে গুমরে উঠলো অনঙ্গমোহন। ভিতরের অবরুদ্ধ আবেগের স্তূপ যেন বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে এল ঐ শব্দটুকুকে অবলম্বন করে। বেশ বুঝা গেল, অনঙ্গমোহনের চিন্তাধারা এতক্ষণে একটা চলার পথ পেল। এতক্ষণ অস্বস্তির চাপে অবশ হয়েছিল। তর্ক ও বিচারে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়াক না কেন, আপাততঃ গুমোট কাটলো ত'। মানসিক এমনি গুমোট অবস্থায় নাকি মানুষের সব চেতনা পঙ্গু হয়ে যায়, হারিয়ে যায় পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধের ইতিহাসের সব স্মৃতি। মানুষের মন যখন কোনখানেই দাঁড়াবার অবলম্বন পায় না অর্থাৎ মানুষ যখন অবস্থাবিশেষে তার বুদ্ধি এবং ধারণা-শক্তি দিয়ে কোন মীমাংসায়ই গিয়ে পৌঁছতে পারে না, কোন অবলম্বন পায় না, সান্ত্বনা পায় না, এমন কি অবস্থা-বিশেষে ভগবানের ঠিকানাও পায় না—সেই অবস্থায় আকস্মিকতার চাপে অনেকের স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে যায় কিংবা হয়ত ভগবানও নির্দ্দয় হন এদের প্রতি।

—'স্বপ্নে বিশ্বাস করো?'

কোন জবাব না দিয়ে অনঙ্গমোহন লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। এমন ভাব, আমি কি বিশ্বাস করি আর না করি সে কথা এখন থাক। তুমি কি বলতে চাও ব'লে যাও। কিন্তু কি বিপদ, লোকটি সেদিক দিয়ে গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলে: 'স্বপ্নে বিশ্বাস করো না?'

মাথা নেড়ে জবাব দিল অনঙ্গমোহন—'না।'

—'দুঃস্বপ্নে বিশ্বাস করো?'

কোন জবাব না দিয়ে নীরব রইল অনঙ্গমোহন।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলে: 'দুঃস্বপ্নে বিশ্বাস করো না?'

—'না।' এবার স্পষ্ট ভাবে জবাব দিল অনঙ্গমোহন।

—'এ তোমার মিথ্যা কথা।'

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাকাল অনঙ্গমোহন লোকটির দিকে। লোকটি এতটুকু বিচলিত হ'ল না। বেশ জোর দিয়ে বললে: 'তোমাদের বিজ্ঞান বলে, মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তার মূলে হ'ল অপূর্ণ সাধ মেটাবার আকাঙ্ক্ষা, আর দুঃস্বপ্ন হ'ল তার কৃত অপরাধ আর অন্যায়ের জন্ত নিজেকে শাস্তি দেবার প্রচেষ্টা—ক্ষেত্র-বিশেষে reflection of guilty eonseience. কিংবা অনেকে বলেন, দুষ্পাচ্য-ভুক্তের প্রতিক্রিয়া হ'ল এই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু premonition বলে একটা ঘটনার কোন ব্যাখ্যা যেমন আজও পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানী দিতে পারেন নি, তেমনি স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁদের সব কথা বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বলছি, বিজ্ঞানীদের কাঁধে চড়ে তুমি মিথ্যা কথা বললে।'

এবার আরো সোজা হয়ে বসলে অনঙ্গমোহন।

'—স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন দুইয়ে তুমি বিশ্বাস কর। ভাল স্বপ্ন দেখলে তুমি মনে মনে খুশি হ'য়ে থাকো এবং নিভৃত চিত্তে আশাও কর যে তারা সত্যে রূপান্তরিত হোক, কিন্তু অনেক সময় তোমার ভীরু মন অতখানি আশাকে ধারণ করতে সাহস পায় না বলেই বেশীর ভাগ সময়ই তুমি স্বপ্ন ভুলে যাও এবং সময় সময় তোমার সামাজিক

সংগঠন তোমাকে তা মুখে প্রকাশ করতে বাধা দেয়। সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হ'ল, এই বিজ্ঞান-ধর্ষিত যুগে সভ্য এবং শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হ'য়ে স্বপ্নে বিশ্বাস করা একটা মস্ত বড় প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। তাদের মতে আজকের দিনেও স্বপ্নে বিশ্বাস করে একমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিশেষ করে অলস প্রকৃতির লোকেরা। বিজ্ঞানীদের মতে স্বপ্ন দেখা একটা মনোবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যতই কেন দম্ভ করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হোক না, স্বপ্ন দেখে প্রায় সকলেই এবং প্রতিটি স্বপ্নের ব্যাখ্যার যখন একটা বাস্তব পটভূমিকা আছে, তখন সেটা যে কখনও বাস্তব সত্যে পরিণত হবে না, এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানীই জোর করে বলেন নি। দুঃস্বপ্ন দেখে তুমি ঘুমের মধ্যে আঁতকে ওঠ না—চিৎকার করে ওঠ না? জীবিত প্রিয়জনের মৃত্যু-দৃশ্য স্বপ্নে দেখে পরের দিন তোমার মন ভার হয়ে ওঠে নি কোন দিন? দুঃস্বপ্নে আঘাত পেয়ে বেদনা-বোধ করো নি, বলো?'

অনঙ্গমোহন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে এতক্ষণে; বললো: 'সামনে প্যাকেটটা দেখে আর তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। কিন্তু এ টাকা তুমি আমায় দিচ্ছ কেন?'

এইবার কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে উঠলো লোকটি। ধীরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে: 'তুমি আমার দুর্দ্দিনের একমাত্র বন্ধু! তুমি যা করেছ তার প্রতিদান কোন দিনই টাকা দিয়ে সম্ভব নয়, এ কথা আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি। এমন দুঃসাহসও যেন কোন দিন আমার না হয়। কিন্তু তবুও মনে মনে আমি যেন কোথায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছি—এই প্রীতি, দয়া এবং ঋণের বোঝায়। আমি সর্বক্ষণ ভেবেছি কি ভাবে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো, কেমন ক'রে আবার তোমার দাতব্যের সরাইখানার ভিড় ঠেলে তোমার সত্যকার বন্ধু হ'য়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবো। আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসেবে প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ আমার দুঃসময়ে তোমার যে সাহায্য করবার উদারতা, তার মধ্য থেকে প্রীতির উত্তাপটুকু যেন শেষ পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকতার গতানুগতিকতায় হারিয়ে গিয়ে বিরক্তিকর দায় পালনে পর্য্যবসিত না হয়, এই ছিল আমার একান্ত ভয়। আজ তুমিও দুর্দ্দিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, তাই আমার সাধ্যমত তোমাকে কি ভাবে এই দুর্য্যোগ থেকে বাঁচাতে পারি, সেই চিন্তা গত কিছু দিন ধরে আমাকে এমনি উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল যে, সে কথা তোমাকে মুখে ব'লে ঠিক বুঝানো সম্ভব নয়, আর তা ছাড়া তুমি সবটাই যে বিশ্বাস করবে এতখানি ভাববার সাহসও আমার নেই। অনেক ভেবেছি, যখনই এতটুকু অবসর এসেছে তখনই মনে হয়েছে ঐ এক কথা। কি ক'রে খুব তাড়াতাড়ি অনেক টাকা পাওয়া যায় যাতে ক'রে তোমার, আমার এবং আমাদের চার পাশের বন্ধু-বান্ধবদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে। সাধারণ লোকেরা এ কথা শুনে হাসবে, হয় ত' বলবে, লোকটার পাগল হবার আর বেশী দেরী নেই, কিন্তু বিশ্বাস করো, শেষ পর্য্যন্ত কাল রাত্রে স্বপ্নে…' বক্তব্য শেষ না করেই লোকটি একান্ত কুণ্ঠিত ভাবে সুর পাল্টে জিজ্ঞাসা ক'রলে: 'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো আমি তোমায় পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি?'

এইবার ভীষণ বিপদে পড়লো অনঙ্গমোহন। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। টেবিলের উপরকার প্যাকেটটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সোজা তাকাল লোকটির দিকে। তার পর ধীরে ধীরে বললে: 'ঐ প্যাকেটটির মধ্যে যদি ছেঁড়া কাগজের টুকরো থাকে, তবুও আমি একান্তমনে বিশ্বাস করি যে, তুমি আমাকে পঁচিশ হাজার কেন, সম্ভব হ'লে আরো অনেক বেশী টাকা দিতে পার এবং দেবে।'

লোকটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে আবেগভরে অনঙ্গমোহনের একখানা হাত চেপে ধ'রে উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে: 'স্বপ্নের বিবরণটা শুনবে?'

স্নিগ্ধ উদ্বেলিত কণ্ঠে অনঙ্গমোহন ব'ললে: 'না, বন্ধু!'

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

একত্রিশ

মুক্তার বাপ-মা কেউ জীবিত ছিল না। এক দূর সম্পর্কের বুড়া ভোগ করত ওদের ভদ্রাসন। খুড়ী ছিল অত্যন্ত মুখরা। তবু বিয়ের পর মাঝে মাঝে মুক্তা আসত কেবল মাত্র বাপের বাড়ীর টানে। কিন্তু এবার আর সে ওদিকে পা বাড়াবে না তা স্থির করে এসেছিল নায়েই বসে।

তবে সে কাউর গলগ্রহ হয়েও থাকবে না। থাকবে স্বাধীন ভাবে, জেলের ঝি জলে জলে। সাজাবে একখানা ছোট্ট টালাই, ছিপ এবং লতা-বঁড়শি দিয়ে। মাছ ধরবে গাঙে গাঙে, কিম্বা বিলান জলে—নয় ত বঁড়শি ফেলবে লম্বা জলো ঘাসের কোলে। জিয়াল সে গাঁথতে জানে শামুক ভেঙ্গে। ফড়িং ধরেও সে পাততে জানে ফাঁদ। মুক্তার হাসি পায়। মাছ ধরা ফাঁদ তো সহজ বিষয়—আকাশের চাঁদ ধরা ফাঁদও তার কাছে কঠিন নয়। শেষ পর্য্যন্ত সে সেই ফাঁদই পাতবে। কিন্তু এ যে চাঁদ নয়—সূর্য। হক গে, মুক্তা সূর্যই ধরবে—করবে একটা নতুন কিছু।

মাছ বেচে হাট থেকে যখন মুক্তা ফিরে এসে টালাই নায়ের ঘরে সাঁজবাতি জ্বালবে, তখন কি কেউ আসবে না? প্রলুব্ধ হবে না রাতটুকু তার সংগে কাটাতে?

মুক্তা ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে, দিবাকর অন্য দশ জনার মত শুধু তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে পারবে না—সে একার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি, এসেছে অনেকের জন্য। তাকে যদি মুক্তা একটু যত্ন করতে পারে, দিতে পারে একটু আনন্দ তবেই সে ধন্য।

গোঁসাইকে সে বরাবরই ভালবাসে, ক্রমে কেন জানি তার মনে ভক্তি আসছে, তাই সে করতে চায় সেবা। দেওয়ার মত তার আর কি-ই বা আছে—কেবল একটু রূপ আর যৌবন তো!

তবু মুক্তার মনের পর্দায় রঙিন ভবিষ্যৎ কত আশা নিয়ে যে ঝিলমিল করে! টালাই নাও, সাঁঝবাতি, উত্তপ্ত শয্যা···শেষ পর্যন্ত সন্তান।

দূর, দূর···জলচর পাখীর আবার নীড়, তার আবার শাবক··· এ সব কি কেউ দেখেছে কখনও?

গাঁয়ের ভিতর থেকে একখানা ভাঙা নাও নিয়ে আসে দিবাকর চেয়ে। সে নিজের হাতে মেরামত করে সাজিয়ে দেবে।

মুক্তা জিজ্ঞাসা করে, 'কত দাম?'

'এক পয়সাও না।'

'না, না, আমি কেওরডা মাগনা নিমু না।' অন্য সময় হলে মুক্তা হয়ত সানন্দে রাজি হত, কিন্তু এ যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার নাও। নবীন স্বপ্নে ভরা নব জীবনের নীড়।

দিবাকর আগ্রহ করেই নায়ের সরঞ্জাম গড়ে। যেন বাজু পরাবে বিয়ের কন্যাকে। বাঁশ বাখারী চাঁছে, আনে নতুন এবং নরম দেখে চাঁচ, যা দিয়ে দেবে ঘোমটা, মানে ছই। একটা তুর্পিন ও হাতুড়ী একটা ঘরেই আছে, চেয়ে আনল পাশের বাড়ী থেকে করাত একখানা। তক্তা কেটে তালি দিতে হবে নায়ের দু'পাঁজরে। গলুই-খানাও বদলাতে হবে কাঁঠালের পোক্ত ডাল কেটে। রঙ হবে হলদে পাখীর মত। চলনও হবে তেমনি উড়ন্ত।

দুটো দিন খাটল দিবাকর প্রাণপণে।

মাঝে মাঝে মুক্তা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেছে একাগ্রতা। এর পিছনে কি কোনও প্রেম নেই, কোনও কামনা? নিছক কি পরোপকারেরই প্রেরণা? মুক্তা জবাবের আশায় বহুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করেছে। দিবাকর হয়ত ঘর্ম-সিক্ত কপালটা একটু মুছে ঈষৎ হেসেছে। অমনি মুক্তার মন যেন গেছে তৃপ্তিতে ভরে।

নাও সাজান হল, দাঁড় বৈঠাও জোগাড় হল। বিহংগিনীর নীড় প্রস্তুত। এখন চাই আহার্য সংগ্রহের আসবাব। সরু শনের দড়ি এলো তিনশ' হাত। তাতে কনক ও মুক্তা ঝুলিয়ে দিল পঁয়ত্রিশ গণ্ডা ছোট বড় মাঝারি মাপের ধনেখালির গালা কাটা বঁড়শি। হ্যাঁ, এখন যে মাছই আসুক ফিরে যাবে না। ছিপও দিল দিবাকর তল্লা বাঁশের ঝাড় থেকে এনে তিন-চারটা।

যে দু'দিন ধরে এ সব সংগ্রহ চলছিল, কাটছিল এক উত্তেজনায়। বিদায়ের বেলা কেমন জানি সকলে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল।

এমন যে জীবন সে এসেই প্রথম বলল, 'জায়গা কি ছিল না আমাগো ঘরে? এতগুলা লোকের উপর একজনের কি দুইডা চাউল জোটত না? কি যে সব বেবস্থা গোঁসাইর, মুখ্য আমরা বুঝি না। বঁড়শি বাইবে ঘরের মাইয়া লোক!'

কনকও গোপনে গোপনে চোখের জল মুছল কি যেন ভেবে।

দিবাকর শুধু গেল আবডালে চলে।

মুক্তা বলল, 'এই তো ভাল রে জীবন! নিত্য আসুম, নিত্য আইস্যা তোগো ঘাটে নাও বান্ধুম—আমি তো তোগো ছাইড়া যামু না। ক্যাবল থাকুম একটু আলগা আলগা।'

'থাকো, তুমি তো চিরকালের শিং-ভাঙা (স্বাধীন-চেতা)।'

মুক্তা হাসে। মনে মনে বলে—'ওরে জীবন, ও কনক, আমি কি আলগা থাইক্যাও এ-বাড়ীর বন্ধন 'থিকা মুক্তি পামু? তোরা ভাবিস ক্যান?'

ঠিক হল, আর কিছু সময় বাদে খেয়ে-দেয়ে মুক্তা নায়ে উঠবে। রাত বেশি করবে না, আজই বৌনি করবে বঁড়শি। জীবন পাকা জেলে। সে তার সাধ্যমত উপদেশ দিয়ে গেল, নির্দেশও দিল কিছু-কিছু। ভয়-ভীত কোথায় কোথায় আছে তাও বলে গেল— বাঘা-চক্কোরে দিক-রাত্তিরে যত ঘাউ শোনা যায় তা নাকি মাছের নয়, খুব হুঁশিয়ার! মোল্লার তালে আছে নাকি সহস্র পরীর বাসা।

'পৈরীর ভয় সুপুরুষের, তাতে আমার কি? তোগো গোঁসাইরে সামলাইয়া রাখিস, বুঝলি জীবন। রাইত-বিরাতে যাইতে দিস না একলা একলা।'

মুক্তা ঘাটের দিকে এগিয়ে নৌকায় গিয়ে ওঠে। সকলের কাছে যথারীতি বিদায় নিয়ে নাও খুলে যায় সন্ধ্যার একটু পরই। মুক্তাকে বিদায় দিয়ে সকলে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী এসে বসে থাকে। জীবন অনেক বার অনুযোগ করে। না গেলে কি চলত না একটা মানুষের খরচ? কেউ কিছু জবাব দেয় না দেখে সে নিজের মনেই কড়া-কড়া কথা শোনায় অনুপস্থিত মুক্তাকে। 'যত স্বাধীন-ধর্মি মাইয়া লোক!'

মাঝ রাত্রে হঠাৎ বাইরে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। আগুন, আগুন! কে কার ঘরে আগুন দিল? এ শত্রুতা শোধ, না ডাকাত পড়ল? অন্ধকার আকাশটা একেবারে উজ্জ্বল হয়ে গেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে—সময়তে স্ফুলিংগ উঠছে ওপরে ঠেলে। শব্দও হচ্ছে বাঁশ কপাট ফাটার।

শোঁ-শোঁ করছে পশ্চিম দিকটা। বাড়িয়াল ও বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবু সকলে অনুমান করল যে কেষ্টর বাড়ী এ কাণ্ড।

এই কিছুক্ষণ হয় আলাম এসেছে, মুক্তা রওনা দিয়ে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে।

'গোঁসাই কই?' জিজ্ঞাসা করল আলাম।

দিবাকরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই যেতে চাইল আগুন নিবাতে। আলাম নিষেধ করল।

কেন বারণ করছে আলাম?

'খুনী মরে খুনে—সাপুড়্যা সাপের বিষে—এ কে না জানে? ওরা মরবে নিজের আগুনে। তুমি-আমি যাইয়া করুম কি? ও আগুন সহজ আগুন নয়। কিন্তু গোঁসাই গেল কই···?'

সকলে ঠিক অনুমোদন না করতে পারলেও, খণ্ডন করতে পারে না আলামের যুক্তি। সবাই তাই তো, তাই তো করতে থাকে।

যদি আগুন নেবাতে না-ই যাওয়া হয় তবে একেবারে চুপ করে বসে থাকা মুস্কিল। জীবন জিজ্ঞাসা করে, 'এবার কি কইরা আইলা?'

আলাম বহু দিন চেষ্টার পর এবার যা করে এসেছে তা একটা আশ্চর্য সংবাদ। 'গোঁসাই গেল বলি কার কাছে?'

'কেন আমরা রইছি যে।' কনকও এগিয়ে এসে বসল জীবনের কাছে। 'কও এখন ভাইজান।'

ওদের পাড়ার চৌকিদার হাকিম মোল্লা এবং বিটের দফাদার সুলতান এত দিন পরে রাজি হয়েছে জোটে যোগ দিতে। প্রথম

হারু মাঝিকে হাত করেছে আলাম সদুপদেশ দিয়ে। কিন্তু সুলতান ও হাকিম সহজে রাজি হয়নি। তারা একটার পর একটা যুক্তি দেখিয়েছে, সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছে রাজভক্তির। তারা পুরুষানুক্রমিক যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তাও বলেছে। 'এখন বল দেখি আলাম ক্যামনে ছাড়ি মহারাণীর চাপরাস?'

আলাম যুক্তির পর যুক্তির বাণ হেনে কেটে ফেলেছে ওদের স্বকীয় লাভ ও মোহের বর্ম। তার পর জুড়েছে গান—খঞ্জরীর তালে তালে সে ফেরতা দিয়ে গেয়ে শুনিয়েছে জনগণের মর্মস্পর্শী রাগিণী। হাকিম ও সুলতান অবাক হয়ে রয়েছে।

'কি গান গাইলা ভাইজান।'

আলাম বলে, 'তর খঞ্জরীটা দাও।'

সে গান আরম্ভ করে—

আগুন, আগুন, আগুন দেখ না ভাই
মা মাসীর তোর কাপড় পোড়ে, তোর কি সরম নাই?
ওরে আগুন জ্বালায় কে?
ইংরাজে, ইংরাজে, ইংরাজে।
তার নুন খাইয়া, গুণ গাইয়া, করো জাশের বেইমানী
জানি জানি আমরা তোর তলব তকমার দাম জানি।
এখনও যে মুখে তোদের দুধের গন্ধ পাই—
(সেই) মা মাসীর কাপড় পোড়ে, তোর কি সরম নাই?
ওরে আগুন জ্বালায় কে?
ইংরাজে, ইংরাজে, ইংরাজে।

আলাম থামে। কিন্তু তার জ্বালাময়ী ইংগিত ছড়িয়ে যায় ঘর বাড়ী বিল ছাপিয়ে দূর-দিগন্তে। এমন গান শুনলে চাপরাস কেন, তার চেয়েও অনেক লোভনীয় সামগ্রী মানুষ ত্যাগ করতে পারে। জীবন ও কনক বসে থাকে বিহ্বল হয়ে।

বত্রিশ

ভোর না হতেই কেষ্ট গিয়ে দেবনগর হাজির হল।

দীনেশ সেন খবর পাওয়া মাত্র শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এলো। মুখ-চোখও তার ভাল করে ধোয়া হল না।

এ সংবাদ কুন্তলারও কানে গেল। সেও তাড়াতাড়ি একটু চুল ও শাড়ী গুছিয়ে বেরিয়ে এসে বাপের কাছে বসল।

কেষ্ট সবিনয়ে নমস্কার করে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বলে গেল। 'হুজুর এখন করা কি?'

কুন্তলা কেন জানি এই ক'দিনের মধ্যে বেশ খানিকটা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। কেষ্টর অভিযোগ শুনে আরো গেল পাংশু হয়ে। জীবনে এসব কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায়ই পড়েছে।' কিন্তু এবার শুনল বলতে গেলে মুখোমুখি বসে। সব শুনেও কুন্তলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, হৃদয় যে তার কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না এ অভিযোগ। সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'দিবাকরই কি আগুন দিয়েছে?'

দীনেশ সেন জবাব দিল, 'হ্যাঁ মা, এতক্ষণ বসে শুনলে কি? কেষ্ট স্বচক্ষে তাকে পালিয়ে যেতে দেখেছে।'

কুন্তলা উত্তেজিত হয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'সত্য নাকি?'

কেষ্ট অতি বিনীত ভাবে একটু মাথা নোয়াল শুধু।

কুন্তলা অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল চেয়ারে।

অবস্থা দেখে দীনেশ সেন বলল, 'তোমার এ সব সইবে না মা, তুমি ভিতরে যাও।'

কুন্তলা বাপের সুমুখে আর জোর করে বসে থাকতে সাহস পেল না। কিন্তু মনটা তার পড়ে রইল এই পরামর্শ-সভায়।

দীনেশ সেন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, থানার দারোগা তার তুলনায় অনেক নগণ্য। অথচ শাসন সংরক্ষণের ব্যাপারে এক জন দারোগার ক্ষমতা অপরিসীম। দীনেশ সেনের যাওয়া উচিত নয়, তবু সে ঠিক করল একবার থানায় যাবে কেষ্টর সঙ্গে। নইলে হয়ত এমন একটা গুরুতর ব্যাপার আমলেই আনবে না থানা-অফিসারেরা।

অল্প সময়ের মধ্যেই কোষ নৌকা খোলা হল। থানা আর বেশি দূর নয়—মাত্র বিলাসী নদীর দু'বাঁক।

দীনেশ সেনকে দেখা মাত্র দারোগা মথরানাথ উপলব্ধি করতে পারল সব। বিষয়টা যতটা জটিল তার চেয়ে বহু গুণ জটিলতর করে নিল মথুরানাথ। সে পাকা পুরান দারোগা। ওপরওয়ালার মন যোগাতে ওস্তাদ।

মথরানাথ এজাহার নিতে নিতে প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখলে কি ভাবে?'

'দেখলাম...দেখলাম...বাইরে আইস্যা।'

'আহা তা নয়, তা নয় মূর্খ। এত বড় একটা অগ্নিকাণ্ড কি দেখতে আসা লাগে বাইরে? ঘরে বসেই আগুনের ঝিলিক দেখেছ, তার পর দোর খুলে বের হলে—কি বল?'

'হ্যাঁ তাই। তার পর তখন কি জ্ঞান ছিল।'

'এই আবার মাটি করেছে। সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে যা না বলবে তা এজাহারই নয়। দেখলে তো তোমাকে পাকা ঘুঘু বলে মনে হয়, তবে আবার ভুল করছ কেন বার বার?'

'বাবু, আমি আপনার পায়ের যোগ্য নই।'

'আসল ঘটনাটা আমি প্রাঞ্জল দেখতে পাচ্ছি, এখন সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে।'

'আপনারে আর কমু কি, আমরা মুখ্যো চাষাভুষা—আপনে হইলেন অন্তরযামী।'

মথরানাথ কলমটা একটু থামাল। কি জানি চিন্তা করল মিনিট তিনেক। একটা চৌকিদার এসে দূরে দাঁড়িয়ে রইল সভয়ে। থানার পাহারাওয়ালা তেজসিং খৈনী টিপতে টিপতে পেণ্ডুলামের মত টহল দিতে লাগল বারান্দায়। একটা হাতকড়ি আছে দেওয়ালে টাঙান, সেই দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কেষ্ট।

মথরানাথ বলল, 'আগুন যে স্বহস্তে দিয়েছে দিবাকর, এটা প্রমাণ করাতেই হবে। কিন্তু তুমি যে বলছ কেষ্ট, খড়ের গাদায় এবং বাইরের ছনের ঘরে আগুন দিয়েছে শুধু, এতে মামলাটা নিতান্ত হালকা হয়ে যাবে। আর তেমন কোন শক্ত ধারাও পড়বে না।'

'তা হলে কি করতে চান?' দীনেশ সেন প্রশ্ন করল।

সুমুখে এক জন হাকিম। এরা এজলাসে বসলে দারোগা পুলিশের যমস্বরূপ। মথরানাথ কাঁচু-মাচু করতে থাকে।

'ভয় নেই আপনার মথুরা বাবু। আপনিও সরকারী কর্মচারী আমিও তাই। এ কেসের সংগে সরকারের স্বার্থ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আমি চাই, অর্থাৎ সরকার চায়—কনভিকসন (সাজা)।'

মথুরানাথ জোর পেল। সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন রাজনীতি। কেষ্টকে যে কোন উপায়ে বাঁচাতেই হবে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে। মামলা মানেই আর সত্য কথা নয়। সত্য হলে, সত্য বললে—আজ নিরানব্বইটা কেসেরই কাঠামো যেত ভেঙে।' মথুরানাথ হাসতে থাকে মহা গৌরবে। 'এখন ডেকয়িটি এ্যাটেম্পট উইথ মারডার এমনি ভাবে কেসটা সাজাতে হবে।'

'বলেন কি!' একটু যেন বিচলিত হয়ে পড়েছিল দীনেশ হাকিম। পর-মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'বাস্তবিকই পুলিশের ওপর আমরা খাপ্পা বটে, কিন্তু পুলিশ না থাকলে ইংলণ্ডে বসে আর রাজত্ব বাঁচান যেত না। ধন্যবাদ মথুর বাবু আপনার পাকা মাথাটাকে।'

তার পর প্রথম এতলা লেখা হল শক্ত করে। একেবারে নতুন ধাঁচে খাড়া করা হল সব। যা কখনও ঘটেনি, তাও বজ্র আঁটুনী দিয়ে গাঁথা হল ওর সংগে। কেষ্ট সই দিল পাঠ শুনে। দীনেশ সেন চলে গেল দেবনগর। কেষ্ট থানায় রইল, মথুরানাথের সংগে বাড়ী যাবে, এই ইচ্ছা।

মথুরানাথ বলল, 'আমি তদন্তে যাব সরেজমিনে শেষ বেলা নাগাত। তার আগে তুমি বাড়ী যাও। বসত ঘরের চৌকাঠের সংগে কতগুলো কাঁথা কাপড় কেরোসিনে ভিজিয়ে ঝুলিয়ে রেখ। যাও শীগগির।'

কেষ্ট প্রণাম করে রওনা দিল।

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, রাত্রের ঘটনা—বেশি সাক্ষী-সাবুদ লাগবে না। গুটি তিনেক চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখ।'

'যে আজ্ঞে, তেমন লোকের অভাব হইবে না।'

এবার কেষ্ট মোক্ষম চাল চেলেছে দারোগা পুলিশ হাকিম হুজুর সব তার করতলগত। সে এখন আর ডরায় না সামান্য দিবাকরকে। কী স্পর্দ্ধা, খুন করতে এসেছিল তাকে! নিজের কষ্টার্জিত অর্থে সে সম্পত্তি খরিদ করেছে, ধর্ম বজায় রেখে সে বহু কাল ধরে ধীরে ধীরে এ অর্থ সঞ্চয় করেছে—অথচ তা বিনিয়োগ করতে দেবে না কতগুলি পংগু ভাগ্যহীন নির্বুদ্ধি হিংসুক। কেন, ওরা সঞ্চয় করতে পারে না? কেষ্ট কি ওদের পথে বাধা হতে যায়? আসল কথা সুযোগ বুঝে বিনিয়োগ করার বুদ্ধিই ওদের নেই। আছে কেবল খাই-খাই।

কেষ্ট একটা বিড়ি ধরায়।

মূলধন বিনিয়োগের যাদু জানা চাই—জটিল বেণীর মত জড়িয়ে জড়িয়ে। শুধু যাদু···!

ওদের মত অসাধু নয় কেষ্ট।

পংগু ভাঙাচুরা লোকগুলোর মুখগুলি মনে পড়ে কেষ্টর একটা ঘৃণার উদ্রেক হয়। ওদের আবার একতা!···বিড়িটা নিঃশেষ হয়ে যায়।

তেত্রিশ

সাক্ষীর অভাব হয় না কেষ্টর। পুলিশ আসা মাত্র পাখীর মত মুখস্থ বলে যায় দোকানের কর্মচারী ও বাড়ীর চাকর। নসু পাঁচ বছর বয়স থেকে এখানে আছে, এখন তার কমসে-কম পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। ঘর-সংসারও হয়েছে, যেমন পাঁচ জনের হয়। সে ভোর বেলা আসে আর রাত বারটায় বাড়ী ফেরে।

মনাইর মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে গেছে এ বাড়ীর হাল বয়ে, মাছ ধরে, সত্য-মিথ্যা বহু দলিলপত্রের সাক্ষী দিয়ে। ওরা অকৃতজ্ঞ নয়, বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াল বন্ধুর মত কোমর বেঁধে।

মথুরানাথ খুশি হয়ে বলল, 'বেশ, বেশ···এই তো চাই।'

দুটি বেশ পাকা সাক্ষী হয়েছে, আর একটি পেলে খুবই ভাল হয়।

'কেষ্ট তোমার পাঁচ-সাত বছরের ছেলে-মেয়ে আছে?'

'আজ্ঞে অভাব কি! প্রভুর ইচ্ছায় বছর ফেরে না ফেলীর মা'র। ও ফেলী, আন্নি, আন্না শোন।'

কেষ্টর ডাকে তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়াল—যেন এক একটি পেত্নীর বাচ্চা।

মথুরানাথ এক জনাকে ডেকে নিয়ে ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করল যে কি ভাবে মুঁয়ে মুঁয়ে দিবাকর মশাল নিয়ে ঢুকেছে, দিয়েছে আগুন। এইটি হচ্ছে মারাত্মক সাক্ষী—অবিশ্বাস করবার আর জো-টি থাকবে না। অবুঝ বালিকা তো!

এর পর তদন্তের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল। দারোগা চলল দিবাকরের বাড়ীর দিকে। দিবাকরকে পাওয়া গেল না। ধরা পড়ল আলাম ও জীবন। ধান চাল তেমন কিছু মজুত ছিল না ঘরে। কিন্তু ঘর-দোর সব ফাড়া-ফাড়া করা হল কেষ্টর বৌর সোনার দানার খোঁজে। এ দানা অবশ্য কোন দিনই ফেলীর মার জন্য তৈরী করেনি কেষ্ট, কেবল কেসের কাঠামো শক্ত করতে গত কাল এজাহারের পাতায় কালি দিয়ে গড়ে তুলেছে মথুরানাথ দারোগা।

ফেলীর মা সব শুনে মন্তব্য করেছিল, 'ও আমার পোড়া কপাল লো!'

কনকের গলায় ছিল এক ছড়া দানা। তাই টেনে ছিঁড়ে নেওয়াল হুকুম দিয়ে মথুরানাথ। কনক দাঁড়িয়ে থাকে শাবকহারা বাঘিনীর মত। গোটা দুয়েক অশ্লীল বাক্য ছাড়ে অল্পবয়সী জমাদার হরি সিং তেওয়ারী।

'দিবাকর কোথায়?'

আলামও জানে না, জীবনও জানে না—অতএব ওরা নীরব থাকে!

মোটা কাঠের রোলারের বাড়ি পড়ে পাঁচ-সাত ঘা করে।

কনক কেঁদে ওঠে।

আবার কটূক্তি করে তেওয়ারী।

দারোগা পুলিশ অত্যাচার সখে করে না। মানুষের সহজ সরল অনুভূতির কেন্দ্রগুলি বিষিয়ে তুলে তারা আসল অপরাধীকে পরোক্ষে আত্মসমর্পণ করতে বলে। তারা ঠিক বোঝে কোথায় কার দরদ।

কিন্তু দিবাকর হাজির হয় না। অবশেষে ওরা হয়রাণ হয়ে চলে যায়। হয়রাণ হওয়ার একটা সংগত কারণ আছে। ওরা মাহিনার চাকর, সকলের আর পদোন্নতি কিম্বা সার্টিফিকেট পাওয়ার আশা নেই, তাই অযথা শক্তির অপচয় করতে সবাই চাইবে কেন? করে মামুলী অত্যাচার। সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সামলান দায়।

চৌত্রিশ

আলাম বলে, 'এই তো সবে সুরু হইল, জীবন ভাই, অধীর হইও না।' তার পাঁজর দুটো খুবই টাটাচ্ছে, তবু জল এনে নেকড়া চেয়ে খেতলান-প্রায় জীবনের আংগুলটা বেঁধে দেয় সর্বাগ্রে।

জীবন অক্ষম আক্রোশে মাথা নত করে থাকে। জল-জল করে কনকের চোখ দুটো।

খানিক বাদে জীবন আপশোষ করে, 'এমন সময় ঠাকুর গোঁসাই কি না ডুব দিল!'

'ইচ্ছায়ই দিউক, আর অনিচ্ছায়ই দিউক ডুব—চিন্তা কইর‍্যা দেখ কামডা ভালই হইছে। আমরা ভাগে ভাগে যে গুঁতা সইতে পারি না, তা সইত উনি একা।'

কনকও দুঃখিত হয়েছিল খুবই, কিন্তু আলামের বুদ্ধি-দীপ্ত উক্তিতে তার সমস্ত দুঃখ-জ্বালা কেটে গেল।

'ঠাকুর গোঁসাই এর জানে কি!' আলাম মন্তব্য করে।

কনক ও জীবন সমস্বরে প্রশ্ন করে, 'তবে আগুন দিল কে ভাইজান?' ভাইজানই বটে ঐ লম্বা দোহারা মানুষটি। জানে একেবারে কলিজার খবর।

'কই, কইতে আছি—আগে এক লোটা পানি দাও বুইন দিদি।'

তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসে কনক। এসে দেখে যে আলাম সংজ্ঞাশূন্য। জীবন ও কনক ত্রস্ত তাকে ধরে দাওয়ায় তোলে। শুয়িয়ে দেয় জীবনের সেই নরম হোগলাখানায়। কনক ছুটে গিয়ে পাখা আনে।

তার পর দুরু-দুরু বক্ষে বাতাস করতে থাকে। জলের ঝাপটা দেয় জীবন।

একটু পরেই আলাম জল খায়। কনক মা'র মত ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। 'কোথায় দরদ লাগছে ভাইজান? তেল মালিস কইর‍্যা দিমু পাঁজরায়?'

ঈষৎ হেসে আলাম জবাব দেয়, 'তা লাগবে না। তোমাগো আলাম অত সহজে মরবে না এই জল জমিন ভগ্নাসন খুইয়া!'

কনক বলে, 'ঘরে এট্টু দুধ আছে ছাগলের, গরম কইর‍্যা আনি—তুমি আর কথা কইও না এট্টু, সুস্থ না হইয়া।'

আলাম দূরদর্শী। চুপ করে থাকে। সুস্থ হওয়ার এখনও যে ঢের দেরী। তবে তার সুস্থ হবেই হবে, এবং অফুরন্ত স্বাস্থ্য ও পরমায়ু নিয়ে বাঁচবেই বাঁচবে। আলামের জাত কখনও মরতে পারে না।

নিত্যকার মত সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কনক ক্ষিপ্র হাতে দুধ জ্বাল দিয়ে এগিয়ে দিয়ে গেল। তছনছ করা জিনিষ-পত্তরগুলো যত দূর সম্ভব গুছিয়ে রাখল এক স্থানে স্তূপ করে। ঘরে উঠে জ্বালল প্রদীপ।

অন্ধকারে বসে জীবন গোছাতে লাগল তার নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য সংগ্রহের সরঞ্জাম। নিঃশব্দে সে তার কাজ করতে লাগল, পাছে কেউ টের পায়। তার পর সে কাউকে কিছু না বলে এক সময় নেমে গেল দাওয়া ছেড়ে।

পিঁপড়ার মত একটি একটি করে লোক আসতে লাগল। এলো গৌতম মাঝি দক্ষিণ পাড়ার প্রভাতকে নিয়ে। উত্তর পাড়া থেকে এলো শিবু শানদার ও মবেত্ত মাতব্বর। ক্রমে ক্রমে জড়ো হল পিঁপড়ের দল। শক্তি যা-ই থাক সংহতি অপূর্ব! ওরা রেণু রেণু করে খুঁড়ে ধ্বসিয়ে দেবে ঔদ্ধত্যের হিমাচল।

সকলের মুখে একই প্রশ্ন, একই নিঃস্বার্থ জিজ্ঞাসা। কে ফ্যাসাদে ফেলল তাদের গোঁসাইকে? দিবাকর আর কিছুতেই যায়নি আগুন দিতে। তারা চোখে দেখলেও এ কথা কখনই বিশ্বাস করতে পারে না।

আলাম জবাব দেবে ভাবছে, এমন সময় উত্তর দিল আর এক জন এসে। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল তাকে দেখে।

'দেখি বুইন ঠারইন, এট্টু বাত্তিডা ধর দেখি।'

আলাম ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল বিছানায়।

কনক লম্প নিয়ে এলো। সভায় একটা আহ্লাদের বন্যা বয়ে গেল। ঈশ্বরের এ কি লীলা!

নসাই ও মনাই হাসছে। তাদের আপাদ-মস্তক গায়ের কাপড়ে ঢাকা। শীতের জন্য নয়, পথে আবার কেষ্ট না দেখে ফেলে। ওর দৃষ্টি তো শ্যেনের মত সতর্ক।

জবাব দিয়েছিল নসাই। 'আগুন দেছে ভূতে!'

'ভূতটা কে?'

'আর কে—তোমাদের কেষ্ট মহাজন নিজে।'

'কেষ্টা নিজে!' গুমরে ওঠে বুড়ো শানদার। তার মুখের কুঞ্চনগুলো আরও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাগে। 'এত কারসাজি,—আমি বাঁচুম কয় দিন আর!' ঠিক সামঞ্জস্য হল না দুটো বাক্যে অথচ একটা গভীর অর্থ ফুটে উঠল সকলের কাছে।

নসাই ও মনাই বলল যে চাকরী ওরা বহু কাল ধরেই করছে, কিন্তু আছে সেই গোলামের মতই। কেষ্ট দিন দিন যে পরিমাণে ফাঁপছে ফুলছে, ওরা প্রতিনিয়ত সেই পরিমাণে শুকিয়ে যাচ্ছে। কেষ্টকে হাড়ে হাড়ে চিনতে ওদের বাকী নেই। তাই ওরা আর মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে পরকালের পথটা নষ্ট করতে চায় না। চায় না ছাড়তে গরীব দুঃখী জাতি-গোষ্ঠীর দল। ওদের যেটুকু জল জায়গা আছে, তাতেও তো কবুলিয়ৎ দিয়েছে কেষ্ট। এখন নাকি বলছে, নরালিপত্তন নিতে কোর্ফা স্বত্বে। ওদের চোখ খুলে দিয়েছে গোঁসাই—ওরা হলফ করছে, কিছুতেই আর বিভীষণের মত নাম লেখাবে না ভিন্ন দলের খাতায়।

'আলাম ভাই, আমাগো পর ভাইব্যো না।' কৃশ নসাইর চোখে জল আসে। 'কত তোমাগো মাপে কম দিছি রাইত-বিরাইতে ওর ইসারায়—সে সব কথা মনে পড়লে পরাণডা এখন চির খাইয়া যায়।'

মনাই বলে, 'কত আমি মিথ্যা সাক্ষী দিছি, পরের জমির আইল ঠেইলা ওর জমিনের লগু করছি—আর লয়।' মনাই কাঁদে না। কিন্তু খাদে নেমে যায় তার গলাটা অনেকখানি।

আলাম সস্নেহে দু'জনকে কাছে টেনে আনে হাত ধরে। 'নসাই মনাই, তোমরা আমাগো ভাই। সময় থাকতে নাওর 'পারা' (বন্ধন) যখন খোলছ বজ্জাতের ঘাট থিক্যা, তখন ক্যান কর আর আপশোষ? এখন নাও সামলে পাড়ি দাও।'

ওরা নীরবে সম্মতি জানায়। এবার ওরা আপন বহর (নৌকার সমষ্টি) চিনেছে, তাই তো এসেছে ছুটে।

এর পর সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করে যে গোঁসাই কোথায়? হয়ত নিকটেই আত্মগোপন করে আছে, বেরিয়ে আসবে এখনই।

আলাম প্রথম জবাব দেয়, 'জানি না।' পর-মুহূর্তেই সে ভাবে যে ওদের মনবল হয়ত ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তাই ফের একটু হেসে বলে, 'জানই তো এ সময়টা কেমন?'

'জানি, জানি, থাউক, থাউক, লাগবে না বাইর হওন। কিন্তু··· আমরা এট্টু চৌক্ষের দেখা দেখতাম ক্যাবল—কইতাম না কেউরডে।' মনাই বলে, 'নসাইরে যুগ্য যখন হবি, তখন আপনে দেখা পাবি—চল, চল, আইজ জুলুম করে না অকারণ।'

ওরা চলে যায়। কেবল একটি লোক কোনও ভাল-মন্দ কিছু বলে না—সে হচ্ছে বুড়ো শানদার। কেষ্টর বাড়ীর পাশের লোক। তাকে নানা ভাবে ঝালাপালা করেছে অনেক কেষ্ট। বুড়োর মনে কেবলই খোঁচা মারে সেই সব অত্যাচারের কাহিনী।

লগি ঠেলতে ঠেলতে শানদার এবার মুখ খোলে, 'ব্যাপারডি সহজ নয়। নিজের ঘরে আগুন দিয়া যে আসামী করে অন্যেরে, জাইন্সো ভূ-ভারতে অসাধ্য তার কাম নাই।'

'বোঝলাম তো—' মবেত্ত বলে, 'তুমি এখনই তার কি করবা? টাটকা বিচার আছে নাকি আর ইংরাজ আমলে?'

'আছে, আছে, গাঁও পঞ্চাইতের বিচার—তুমি আমি তার সভ্য! লওনা আইজ রাত্তিরে ওরে ধইর্যা আনি।'

'কে রে?' একটা টর্চের আলো এসে পড়ে অন্ধকার বিলের বুক চিরে। ডোঙাগুলির ওপর ঘুরতে থাকে আলোটা।

ওরা কণ্ঠস্বর শুনে বোঝে, পুলিশের নৌকা—পেট্রল বোট।

'কোথায় গেছিলি তোরা?'

'সেলাম হুজুর—বাবুগঞ্জ হাটে।' নৌকা ক'খানা এদিক-ওদিক চলে যায়।

'চোর-ডাকাত তো নয়?'

'ভাল কইছেন—এই সাঁজ রাইতে!' ওরা হেসে ওঠে।

বুড়ো শানদার পেট্রোল বোটের গা ঘেঁসে এসে নাও ভিড়ায়। হুজুরদের সংগে—অর্থাৎ কনেষ্টবলদের সংগে আলাপ জমিয়ে বিড়ি চেয়ে নেয়।

'কেষ্ট মহাজনের বাড়ী কত দূর?'

'ঐ তো আমার বাড়ীর কোলে—আসেন আমার সংগে। মাত্তর রশি ছয়েক পথ।'

কেষ্টর যাতে কেউ ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য পাহারাওয়ালা দু'জন নাকি চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন থাকবে ওর বাড়ীতে—আরও নানা কথা বলে পুলিশেরা। জানায় ঘরের সংবাদ পর্যন্ত। হাজার হলেও ওরা গ্রাম দেশের মানুষ তো। দায় ঠেকে চাকরী করলেও আছে সাধারণের সংগে প্রাণ খুলে মেশার একটা দুরন্ত নেশা।

[ক্রমশঃ।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সস্ত্রীক—সদার, সপত্নীক, সভার্য্য।
সহকার—আনুকূল্য, সাহায্য, সহায়তা।
সহকারী—সহায়, সাহায্যকারী, সঙ্গী।
সহক্রীড়—বয়স্য, সখা, খেলাড়ুভাই।
সহগামী—সহগামিনী, সতী, চিতারূঢ়া।
সহগমন—মৃত পতির সহিত চিতারোহণ, সহমরণ।
সহচর—অনুগত, সঙ্গী, সাথী, সহবর্ত্তী।
সহজ—স্বাভাবিক, সামান্য, কোমল।
সহধর্ম্মিণী—বিবাহিতা স্ত্রী, সধর্ম্মিণী।
সহন—দুঃখভোগ করণ, ভার বহন।
সহনশীল—সহিষ্ণু, সহনে ক্ষম, সহকারী।
সহনীয়—সহ্য, সহনযোগ্য, বহনীয়।
সহবাস—একত্র বাস, সংসর্গ, একত্র থাকা।
সহমান—সৌজন্য, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, সহিষ্ণু।
সহমৃতা—পতির সহিত চিতারূঢ়া।
সহসা—হঠাৎ, অকস্মাৎ, আশু, ঝটিতি।
সহস্র—দশ শত, ১০০০।
সহযোগে—সঙ্গে, একেবারে, একযোগে।
সহায়—সহকারী, অনুকূল, উপকারক।
সহায়তা—সহকারিতা, উপকার, সাহায্য।
সহিত—সঙ্গে, মিলিত, সাথে, সমেত, সহ।
সহিষ্ণু—সহনশীল, ক্ষমাবান, ধৈর্য্যশীল।
সহিষ্ণুতা—ধৈর্য্য, সহতা, ক্ষমাশীলতা।
সহোদর—একমাতৃজাত, সগর্ভ, ভ্রাতা।
সহ্য—সহনীয়, সহন, যোগ্য, বহনীয়।
সাইঙ্গ—ভারা, ভার বহনের দণ্ড।
সাংসারিক—সংসার সম্পর্কে, বিষয়ী।
সাঁকো—সংক্রম, সেতু, পুল, জাঙ্গাল।
সাঁচি—নবীন, টাটকা, সদ্যোজাত, সাঁজো।
সাঁজড়ন—সাজান, যোটান, সাজলাগান।
সাঁজোয়া—কবচ, তনুত্র, সজ্জা, বর্ম্ম।
সাঁঝ—সন্ধ্যাকাল, সায়ং, প্রদোষ।
সাঁটন—লুণ্ঠন, ভরণ, বৃদ্ধি, পাওন, আঁটন।
সাঁড়াশী—সন্দংশ, জাঁতী, চিমটা, মোচনা।
সাঁতলান—তৈল দ্বারা মৎস্যাদি ভাজন।
সাঁতার—সন্তার, ভাসা, নদী পার হওন।
সাঁধান—প্রবেশ করণ, ঢুকন, ঘুষণ।
সাঁধি—সন্ধি, ফাঁক, ছিদ্র, অস্থিসন্ধি।
সাকল্য—সমুদায়, তাবৎ, সকলের ঐক্য।
সাকার—আকারবিশিষ্ট, অবয়ববিশিষ্ট।
সাক্ষাৎ—দর্শন, গোচর, সমক্ষ, প্রত্যক্ষ।
সাক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী, জ্ঞাতা, প্রমাণকারী।
সাক্ষ্য—প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রমাণ, সাব্যস্ত।
সাঙ্গ—সমাপ্তি, শেষ, অঙ্গের সহিত।
সাঙাৎ—(বন্ধু দেখ)
সাঙ্গোপাঙ্গ—সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গযুক্ত, সমুদায়।
সাঙ্ঘাতিক—প্রাণনাশক, বধিক, মারাত্মক।
সাচিব্য—মন্ত্রিত্ব, আনুকূল, সুসার।
সাজ—বেশ, সজ্জা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
সাজন—বেশ ধারণ, শোভন, ভূষিত হওন।
সাড়—চৈতন্য, জ্ঞান, বোধ, সম্বিৎ।
সাড়া—শব্দ, উত্তর, চিহ্ন, ধার, সঙ্কেত।
সাড়ে—সার্দ্ধ, অর্দ্ধেকের সহিত।
সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণাবলম্বী, সাধু, ধার্ম্মিক।
সাদৃশ্য—সমতা, দৃষ্টান্ত, উপমা, তুলনা।
সাধ—বাসনা, অভিলাষ, কামনা, বাঞ্ছা।
সাধক—নিষ্পাদক, ভক্ত, উপাসক।
সাধন—নিষ্পাদন, পরমার্থের অনুষ্ঠান।
সাধনা—আরাধনা, ভজনা, প্রার্থনা।
সাধারণ—সামান্য, অবিভক্ত, সকলের।
সাধিত—নিষ্পন্ন, সিদ্ধ, সুশিক্ষিত।
সাধু—সদ্ব্যবহারবান, উত্তমর্ণ, মহাজন।
সাধ্য—নিষ্পাদ্য, উপাস্য, ক্ষমতা, শক্তি।
সাধ্যক্রমে—যথাশক্তি, সাধ্যানুসারে।
সাধ্যসিদ্ধি—অভীষ্টসিদ্ধি, বাঞ্ছিতপ্রাপ্তি।
সাধ্বী—পতিব্রতা, সতী, সুচরিত্রা।
সানায়ী—মুখবাদ্যযন্ত্র, বাঁশী, সানাই।
সানু—পর্ব্বতের সমস্থান, প্রস্থ, শৈলশৃঙ্গ।
সান্ত্বনা—আশ্বাস, প্রবোধ, শান্তি, দমন।
সান্দ্র—নিবিড়, ঘন, গাঢ়, অভেদ্য, ঘোর।
সান্নিধ্য—নৈকট্য, সামীপ্য, অন্তিকতা।
সাপ—(সর্প দেখ)
সাপত্য—পুত্রবত্তা, পুত্রবিশিষ্টতা।
সাপরাধ—অপরাধী, দোষী, কৃতাপরাধ।
সাপুড়িয়া—ওঝা, ব্যালগ্রাহী, অহিতুণ্ডিক।
সাপেক্ষ—অপেক্ষাকারী, পরাধীন।
সাবকাশ—নিষ্কর্ম্মা, প্রাপ্তাবসর।
সাবধান—সমাহিতান্তঃকরণ, মনোযোগী।
সাবন—সৌর মাস, ত্রিশ দিবসকাল।

[ক্রমশঃ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

জয়ন্তী বিয়ে-বাড়ী গেল বিয়ের দিন। এ নেমন্তন্নে যাবার কথা বলতে এবার আর কেউ মিত্রার কাছে এগুলো না। ঝুমার মুন্নীর কথাটাও বলেন স্বর্ণময়ী বেশ রয়ে-সয়ে। আর ওদের বিষয় আপত্তি না জানানোতেই হলেন মহা খুসী। মিত্রার বাড়ীতে একা থাকবার প্রশ্নের সমাধান হলো, শমিত নেমন্তন-বাড়ী যাবার আগে ওকে পৌঁছে দেবে ওর মামা-বাড়ী।

বাচ্চাদের জামা পরায়, মাথায় রিবন বাঁধে, থুতনী উঁচু করে ধরে পাউডার দেয় আর হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে মিত্রার শমিতের সঙ্গে আসন্ন নির্জন সাক্ষাতের কথা ভেবে। আজ আর নিজ শক্তির উপর ওর এত জোর নেই—শমিতের সামনে নিজেকে নিয়ে দাঁড় করাবার। সবাই রওনা হয়ে যাওয়া মাত্র একটা ঠাণ্ডা রক্ত-স্রোত বয়ে গেল মিত্রার শরীরের ভেতর দিয়ে—এবার খালি বাড়ীতে শমিত আর ও। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকল সে স্নানের ঘরে। একেবারে তৈরী হয়ে শমিতকে ডেকে গাড়ীতে উঠে বসবে।

স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোণের ড্রেসিং-টেবিলটার কাছে গিয়ে চটপট হাতে-গায়ে পাউডার ঢাললো, চুল আঁচড়ালো, প্রসাধন করল, টাইট বডিজ, ব্লাউজ আর শাড়ী পরলো। যেন ওকে পেছন থেকে ভূতে তাড়া করছে। তার পর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে কৌচে-বসা শমিতকে দেখে এমন চমকানো চমকে উঠলো যে হাত থেকে ব্যাগটাই গেল মেঝেতে পড়ে।

সেটা তুলে খাটের উপর একটু ছুঁড়ে দেওয়া ভাবে রেখে দিল শমিত। বললো—'প্রথমেই তোমাকে জানান দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাতে আরো বেশী লজ্জায় পড়ে যেতে। সে যাক্, এ এমন কিছু ভাবিত হবার মতো বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু এতো পড়ি-মরি করে তৈরী হবার কারণটা কি জিজ্ঞাসা করি?'

—'বাঃ, যেতে হবে না?' যেন চোখ তুলে সঙ্কোচে শমিতের চোখের দিকে তাকাতে পারে না মিত্রা।

—'কোথায়?'

—'আমি যাব মামা-বাড়ী। তুমি নেমন্তন্নে।'

—'দুটোই এমন জরুরী যে, ছুটোছুটি করে হার্ট-ফেল করার অবস্থা করেছ। এ ভাবে আমাকে এড়িয়ে চলা কেন মিত্রা? বেশ তো, একেবারে কেটে ফেলার ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত করে ফেলি। চলো আমার ঘরে।'

মিত্রা একটু হেসে বললো—'এখানে কথা বলতে অসুবিধা কি?'

—'যে কোন সময় কেউ এসে পড়তে পারে।' উঠে শমিত মিত্রার কাছে এসে দাঁড়ালো।

দু'পা পিছিয়ে গেল মিত্রা। বললো—'আজ থাক।'

—'প্লিজ'—হাত জোড় করল শমিত।

শমিতের চোখের দৃষ্টি কাঁপিয়ে তুললো মিত্রাকে। এই নির্জন পরিবেশে আষাঢ়ের গাঢ় সন্ধ্যার আঁধারে একবার শমিতের কাছে গেলে আর সে কখনই নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। অদ্ভুত এক জীবন-বঞ্চনার 'ঠিক থাকার' মাতৃ-মাতামহীর রক্তধারা মিত্রার ধমনীতেও তো বইছে। অবসন্নপ্রায় হাত দু'টো তুলে সেও করজোড়ে বললো—'মাপ করো। এর পরও যদি অনুরোধ কর—আসব। কিন্তু দুর্বলের উপর শক্তির পরিচয় দিতে নেই। সত্যি আমি এ চাচ্ছি না। ক্ষেত্র অনুপযোগী জায়গায় কাউকে টেনে নিলে আনন্দ মেলে না—ভার বাড়ে।'

আর একটি কথাও না বলে শমিত চলে গেল ঘর ছেড়ে। আর প্রায় তক্ষুণি ফিরে এলো গায়ে একটা পাঞ্জাবী চাপিয়ে। বললো—'চলো।'

মিত্রা কৌচে বসে পড়েছিল। শমিতের দিকে তাকিয়ে বললো—'এ কেমনতর তৈরী হয়ে এলে? নেমন্তন্নে যাচ্ছ না?'

—'তোমায় পৌঁছে দিয়ে এসে ঠিক করব।'

—'মানে তুমি যাচ্ছ না।'

এবার অধৈর্য্য কণ্ঠে বলে উঠল শমিত—'দোহাই—নেমন্তন্ন-বাড়ীর আমার খাবার ডিসটার কথা তোমার না ভাবলেও চলবে।'

—'চলবে না। এ বাড়ীতে আজ রান্নার পাট নেই। খাবে কি?'

স্থিরদৃষ্টিতে একটু সময় তাকিয়ে রইল শমিত মিত্রার দিকে। তার পর বললো—'ধরা মাছ বঁড়শিতে গাঁথা খেলা অতি নিষ্ঠুর খেলা। নিশ্চয়ই তোমার প্রবৃত্তি সে স্তরের নয়।' পকেটে হাত দিয়ে একটা চাবি বের করে টেবিলের উপর রেখে বললো—'এই আমার গাড়ীর চাবি। নীচে যদি পৌঁছে দেবার মতো কাউকে না পাও, আমায় ডেকো।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শমিত।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মিত্রা। হয়ত অনেকক্ষণ আগে থেকেই হবে, ও টের পায়নি—বাইরের শান্ত আষাঢ় আকাশ কালো করে অলস-বৃষ্টি নেমেছে। গতিতে কোন গর্জে বর্ষে ত্বরায় শেষ হয়ে যাবার ঝমঝমানি নেই—যেন সাত দিনের অতিথি। উঠে দাঁড়ালো মিত্রা। বাঞ্ছিত জনের আহ্বান অস্বীকার করতে পারে না বলেই না নারী চির-অভিসারিকা।

বাতি না জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। তবু আলো জ্বাললো না ও। একটা অস্বাভাবিক দ্রুত-তালে চলা ধক্‌ধকানো বুক নিয়ে উঠে এলো উপরে। ঘরের ভেজানো দরজা সন্তর্পণে ঠেলে ভেতরে ঢুকে একবার বাতিটা জ্বালবার জন্য হাত বাড়ালো, পরক্ষণেই আনলো হাত নামিয়ে। দূরের বড় বাড়ীর যে আলোর রশ্মিটুকু জানালা দিয়ে এসে ঘরে পড়েছে তাতে দেখলো, শমিত ওর দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে ওর কেদারাটার কাছ ঘেঁসে মেঝের কার্পেটের উপর বসে পড়ল মিত্রা।

শুভ্রবসনা মিত্রাকে আবছা আলোয় শমিতের মনে হলো যেন বদ্ধ ঝিনুকের মুখ খুলে একটি তাজা মুক্তো খসে পড়ল তার কাছে।

আরো একটু এগিয়ে শমিতের হাটুতে শরীরের ভার রেখে ওর দিকে মুখ তুলে বললো মিত্রা—'কি, এমন জমে বসে রইলে যে?'

গাঢ় কণ্ঠে জবাব দিল শমিত—'সমুদ্রের ঢেউকে ধরতে গেলে যেমন তার কিছুই হাতে আসে না—কতগুলো আনন্দ আছে ঠিক তেমনি, ঢেউএর মতো বয়ে যেতে দিয়ে শুধু অনুভব করতে হয়।'

দশটা পর্য্যন্ত তো সময়, সে আর কতটুকু! তিনটা ঘণ্টা কেটে গেল যেন তিনটা মিনিটের মতো। তার পর আবার কোথায় মিত্রা—কোথায় সে। মাঝখানে যেন মহা সমুদ্রের ব্যবধান। জয়ন্তীর অনুপস্থিতিটাই মস্ত ভেবে রেখেছিল, কিন্তু যাদের কথা ধরার ভেতর আনেনি সেই ঝি-চাকর-দারোয়ানগুলো পর্য্যন্ত যে মস্ত মস্ত এক এক জন কেউ!

পুরো কয়েকটা দিন আর মিত্রার সঙ্গে দিনে-রাতে একবারের জন্যও নির্জন সাক্ষাতের সুবিধা না পেয়ে এক দিন গভীর রাতে মিত্রার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো শমিত। দরজা খুলতে হলো, কিন্তু মন বসল মিত্রার বেঁকে। তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছিঃ ছিঃ করে উঠলো—শমিতের এই চোরের মতো [illegible] শব্দে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ানো, এ-দরজা সে-জানালা [illegible] কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিত্রা। শমিত কাছে আসতেই দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল—'এ রকম নীচ আসা আমি সহ্য করতে পারব না। বড্ড ছোট লাগছে নিজেকে।'

এ-ভাবে তুমি কোন দিনও এসো না—এক দিনও না।'—উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চাপল মিত্রা।

ওর মরাল গ্রীবায় মুখ চেপে কাতর মিনতি জানালো শমিত—'পাঁচ মিনিট।' আর এই মিনিট পাঁচেক পরই হয়ত হবে উঠে দাঁড়াতে গেলে ওর একমাথা চুল শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে রইল মিত্রা।

—'কি, যাবো না?'

—'না—না, যাবে না।' যেন বিকারগ্রস্ত মিত্রা।

—'বেশ যাবো না।' ওকে শান্ত করতে শমিত ওর মাথায় হাত বুলোয়। বলে—'এত অশান্ত হয়ে উঠবে, এত কষ্ট হবে তোমার এ জানলে আমি কখনই আসতাম না। মনকে অত উঁচু সুরে বেঁধে চললে পদে পদে দুঃখ পাওয়া যে তোমার অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। গলা মিলিয়ে সুর বাঁধবার মতো, [illegible] মেলানো মন তৈরী করতে হয়। আমাদের তো এ ভাবে মিলিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই মিত্রা!'

মিত্রার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে উঠে। বলে—'অসম্ভব। মর্য্যাদা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে হবে এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা তার নয়।'

শমিত হাসে। 'রাক্ষসই হোক, আর মানুষই হোক—ক্ষুধার চেহারা এক। শুধু রাক্ষসের [illegible] আইটেমগুলো প্রয়োজন হয় না মানুষের। কিন্তু একেবারে না হলে চলে না কখনই। প্রবৃত্তির নামটা যখন ক্ষুধা তখন তার নিবৃত্তির কথাটাও ভাবতে হবে বৈ কী।'

কিন্তু মিত্রার মন মানে না। শমিতের সদম্ভ অবহেলায় সকলকে এড়িয়ে চলা স্বভাবে [illegible] কি শঙ্কিত পদক্ষেপ! সামান্য শব্দে আত্মগোপনের কি তীক্ষ্ণ চেষ্টা! শমিতের সমগ্র বড়ত্বটাকে টেনে খাটো করে ফেলে ওর চোখে। যাকে সে অত বড় করে দেখতে চায়, তাকে এতখানি ছোট করে পাওয়ার সার্থকতা কোথায়? মনস্থির করে ফেলে মিত্রা। দু'জনার এ লাঞ্ছনাকে আত্মাবমাননাকে সে বাড়তে দেবে না। কিন্তু দিনের আলোর দৃঢ় সঙ্কল্প রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ছিঃ ছিঃর পিছু হাঁটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যে তাকে দুর্নিবার টানে টেনে শমিতের দিকে ঠেলে দেয়, সেও তো তুচ্ছ করবার মতো নয়। ধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা কড়া নেশা যেন সমান আকর্ষণে ওকে জড়িয়ে ধরেছে! মুক্তির পথ খুঁজে পায় না মিত্রা।

শমিত বোঝে ওর মনোভাব। বলে—'কেন, কি অন্যায়টা করছি শুনি? যার জন্য এমন ধিক্কৃত করতে হবে নিজেদের? শুধু এই গোপনতাটুকু বর্জন করে, ওরা এই সত্যকে যদি দশের চোখের সামনে তুলে ধরবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারে—তবে আর ধিক্কার দেবার কি থাকে!'

—'কিন্তু তারই যে কোন উপায় নেই।'

—'আছে, বিয়ে করব তোমায়।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল মিত্রা—'সে হয় না।'

'—কেন হয় না? প্রধান কারণ তো বলবে তোমার ছেলে-মেয়ে?—'

—'এ তো উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ কারণ নয়!'

—'উড়িয়ে দেবার মতো না হলেও পাথর ওজনেরও নয়।' তর্কের মীমাংসা হয় না—কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়ায় সন্দেহের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। শৈলনন্দিনীর চোখের দৃষ্টি অস্বস্তি আনে মিত্রার মনে। জয়ন্তী ফিরে এসে দু'-চার দিন বাদেই এক গাল হেসে মন্তব্য করল—'তুমি তো তবে আর এখন এখান থেকে যাচ্ছ না!'

সদম্ভে উত্তর দিল মিত্রা—'না, আজই যাচ্ছি।' সে দিনই চলে এলো সে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বালিগঞ্জে। শমিতের সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করে এলো না।

বিস্মিত হয়ে উঠল শমিত খবর শুনে। হাতের বইটা নামিয়ে রেখে, দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কখন গেল!'

ভ্রাতার বিস্ময় ভাব বৃদ্ধা ভগিনীর দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিতে সমর্থ হলো না। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'এই কত ক্ষণ হবে। কিন্তু আমি তোমায় সে খবর দিতে আসিনি।'

আবার গা ছেড়ে বসে পড়ল শমিত, বললো—'যা বলতে এসেছ, তবে তাই বল। নিশ্চয়ই অনেক কথা হবে। বলে নেও।'

দিদি বসতে বসতে বললেন—'ওঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে দিতে কত ঝামেলা আমার করতে হয়েছে—তা ভোলনি নিশ্চয়ই?'

মাথা নেড়ে শমিত জানাল, 'না, সে ভোলেনি।'

—'আর মায়ের মৃত্যুর পর বুকে করে এনে, আপন দুধ খাইয়ে দুঃখ-কষ্টের আঁচটুকু গায় লাগতে না দিয়ে, দু'হাতে আগলে বেড়িয়েছি—তাও ভোলনি নিশ্চয়?'

'—আমার সবই তুমি করেছ। এ আর একটা-একটা করে বলে লাভ কি দিদি? জীবনভর তোমার যে স্নেহে বড় হলাম, তা কি আজ শুনে বুঝতে হবে আমায়?'

দিদির চোখে জল দেখা দিতে চায়। তিনি তা সামলে নিয়ে বলেন—'এবার আমি তোমাকে বিয়ে দিতে চাই—মানে দেবোই। সেই যে তোমায় ফটো দেখিয়ে ছিলাম দু'বোনের—তাদের এক জনের এখন বিয়ে হয়নি। আমি সেখানে লোক পাঠিয়েছি। তা ছাড়াও

দু'-এক জায়গায় খোঁজ আছে। আর আমি অপেক্ষা করব না —কিছুতেই না।

শমিত দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'কি, জবাব দিচ্ছ না যে ?'

সামান্য হাসলো শমিত—'জবাব চাইলে কোথায় ? তুমি তোমার স্থির করা কথা বলছ তো ?'

—'আমার একার স্থির করায় তো আর বিয়ে হবে না। তোমার মত বলো ?'

'অমত হবার তো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি বিষয়-সম্পত্তিই দেও আর যত ভালোই বাস, বিয়ের পর বৌর সঙ্গে যে দু'দিনও বনবে না সে তো ঠিকই। তখন ?'

শমিত এত সহজে মত দেওয়ায় খুসী হয়ে উঠলেন দিদি। বললেন—'আমি তোর বৌ নিয়ে সংসার করবার জন্য আর থাকব নাকি। এবার আমরা দু'জন ঠিক করেছি কাশীবাসী হবো। তোদের সুখ-শান্তি দেখলেই আমাদের সুখ।'

—'আমার সুখ দেখতে'চাও—কই, এতক্ষণ তো সে কথা বলোনি।'

টান হলেন শৈলনন্দিনী—'বিয়ে কি তবে করতে বলছি আমার সুখের জন্য ?'

—'আমি তো তাই ভেবে মত দিয়েছি।'

—'তাই ভেবে মত দিয়েছ! তোমার বৌ রান্না করে খাওয়াবে, সেবা-যত্ন করবে আমার ?'

—'করবে না। আমার ইচ্ছে নেই—তোমারও প্রয়োজনে আসবে না—তবে বিয়েটা কার জন্য ?'

—'তোমার ইচ্ছে নেই কেন ?'

—'এসেই প্রথমে যে কথাটা বললে—বিষয়-সম্পত্তি সব তোমার। তাই চাকরী না করে আমি বিয়ে করতে পারি নে। আমায় যদি একবার শোনাতে পার বৌকে নিশ্চয়ই দশ বার শোনাবে।' দিদির দেওয়া অস্ত্রে দিদিকে জখম করল শমিত।

বিব্রত বোধ করলেন শৈলনন্দিনী। সেটা ঢাকবার জন্য রাগত স্বরে চরম আদেশ দিয়ে উঠে গেলেন—'বাজে কথা রাখো, বিয়ে এবার তোমায় করতেই হবে।'

দিদি চলে গেলে ভেতরের উদ্বেগে শমিত উঠে দাঁড়ায়। চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে পায়চারী করে—মিত্রার হঠাৎ চলে যাওয়া আর দিদির তাকে বিয়ে দেওয়ার জেদ চাপার সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। অসম্মানিত হয়েছে কি মিত্রা! এঁরা বুঝতে পেরেছে! নিশ্চয়ই পেরেছে। আনন্দ-শান্তি, দুঃখ-বেদনা অনুভূতিগুলোর ভেতর যেন একটা নীরব ঢেউ আছে। হৃদয় থেকে—হৃদয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। আর তার সেই নীরব স্পর্শেই কোন কথা না জেনে-শুনে দেখে-শুনেও মানুষ অনেক কিছু বুঝে নেয়। বুঝতে পারে কোথায় দুঃখ আঘাত দিয়েছে, বেদনা উঠেছে অন্তর মথিত করে, আনন্দ ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে অসীমে। তাই যে বার্তা বাতাস আপন বুকে নিয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে গোপন করবে তারা কি উপায়ে। ফুলকে লুকোনা যায়—কিন্তু ফুলের গন্ধকে তো লুকানো যায় না ?

জয়ন্তী এসে ঢুকলো ঘরে। 'কি বিয়েতে নাকি খুসী হয়ে মত দিয়েছ ? জ্যাঠাইমা তো পারলে এক্ষুণি মেয়ে দেখতে বেরিয়ে পড়েন। সত্যি তো ?'

শমিত বুঝল এবার দিদির মরণ-কামড়। মুখে হাসি টেনে এনে বললো—'সত্যি। কি প্রেজেন্ট দিচ্ছ শুনি ?'

—'আহা, তুমি যেন আমার প্রেজেন্টের লোভেই বিয়ে করছ।'

—'শুধু তোমারটা হবে কেন। অনেকেরটার লোভে। বিয়ের ব্যাপারে প্রেজেন্টের লোভটা তুচ্ছ নয়। বর্তমান যুগে নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণের পাটগুলো যে এখনও টিকে আছে তা ঐ প্রেজেন্টগুলো বুকে আঁকড়ে। বল, কি দিচ্ছ ?'

—'নেও, ফাজলামো রাখো। আমি কিন্তু ভাবতে পারি নে তুমি বিয়েতে রাজী হবে!'

—'পারনি ?'

—'না।'

—[illegible] না পারারই কথা।'

—'তবে রাজী হলে কেন ?' চেপে রাখা কথাটা আর ধরে রাখতে পারল না জয়ন্তী। রসালো জিব গড়িয়ে জল-পড়ার মতো টুপ করে [illegible]লো—'মিত্রা কিন্তু আঘাত পাবে।'

বিস্ময়ে [illegible] শমিত—'বল কি! আঘাত পাবে মিত্রা, [illegible]'

হকচকিয়ে গেছে [illegible] জান না!'

—'না, জানি নে [illegible] নিতে হয়। মেয়েদের চোখ তো এ সব ব্যাপারে [illegible] না। ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেল, মন্দিরকে ঘর বানাও, [illegible] খুশী কর কিন্তু কারু মনে দুঃখ দিও না। আগেকার [illegible] ভয়ে পালাচ্ছি—ঐ শেষ কথাটায় প্রবল বিশ্বাস বলেই [illegible] আমি দিতে পারি না।'

—উঠে দাঁড়ালো জয়ন্তী [illegible] না পেরে। যেতে যেতে বলল—'যতই বাজে বক, জ্যাঠাইমা এবার ছাড়ছেন না। লিষ্ট তৈরী হয়ে গেছে কাল কটি মেয়ে দেখা [illegible]।'

সমানে কয়েকটা দিন ধরে শৈলনন্দিনী জয়ন্তী আর স্বর্ণময়ীকে নিয়ে শহর চষে ফিরলেন [illegible]। কেমন একটা শঙ্কায় যেন তাঁর বুক হিম হয়ে আসছিল। [illegible] হলে এক দিনও বুঝি আর তিনি দেরী করতেন না। কিন্তু তেমন একটি উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যাবে তবে তো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন—মনোমত ঘরে সুন্দরী মেয়ে পেয়ে। একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলেন বিনা দ্বিধায়, শমিতের একবার দেখা বা [illegible] নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র না করে। বিয়ে শমিতের দিতেই হবে। স্বর্ণময়ী নির্বোধ, তিনি তো নির্বোধ নন।

আর খবরগুলোর ব্যাপ্ত বর্ণনা জয়ন্তী নিজে গিয়ে দিয়ে এলো মিত্রাকে।

জয়ন্তী চলে গেলে সৌমী বললো—'খবর দিয়ে যাওয়াটা উদ্দেশ্য-মূলক নাকি ?'

—'মনে হয়।' হাসলো মিত্রা।

দু'-তিন দিন ক্রমাগত মিত্রা মনকে বুঝিয়ে তৈরী করল—এ পথের আনন্দ—পথের সন্ধান দেয় না, মনকে শুক্ত করে—ভরিয়ে তোলে না। আত্মার [illegible] সাধনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম [illegible]। সেই আনন্দের সন্ধান

তো সে খেয়ে গেছে। তার সাধনা-পথ থেকে সে চ্যুত হবে কেন? শিল্পি-মন ওর হাত গুটিয়ে যে কল্পনা-বিলাসে মজে থাকতে চাইছে—তাকে কিছুতেই ও প্রশ্রয় দেবে না। বসল গিয়ে মিত্রা আঁকার সরঞ্জাম বের করে। অসুখের পর প্রথম ধুলো ঝেড়ে ইজেল খাটালো সে। কিন্তু খানিক বাদেই আবোল-তাবোল লাইন টেনে গিয়ে পড়ল বিছানায় শুয়ে। তার পর ওর দু'চোখ কানায়-কানায় ভরে যা উপচে পড়তে লাগলো, তা বিদ্রূপ নয়, পরিহাস নয়, শক্ত কাঠিন্য নয়, বুদ্ধিদীপ্ত জবাব নয়—টলটলে জল। কোন দিকে কূল দেখতে না পেলে মানুষ যে ভাবে কাঁদে।

তার পর বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিল না মিত্রার। হঠাৎ রেডিওটা বন্ধ হয়ে ঘরটা স্তব্ধ হয়ে যেতেই চমকে উঠল সে। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে শমিত। ঠিক পনের-বিশ দিন পরে দেখা ওদের। বসতে বসতে শমিত বললো—'এমন স্তব্ধ হয়ে বসে কি ভাবছিলে শুনি?'

পিঠ-ছড়ানো চুল হাতে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে মিত্রা বললো—'রেডিও শুনছিলাম।'

—'গান না মাছ চাষের আলোচনা হচ্ছিল?'

হেসে ফেললো মিত্রা। বললো—'গান মাছে আধুনিক তো? ও দুই-ই সমান।'

—'তা হলেও অসময়ে কাজে আসে। এই কেমন রেডিও শোনবার মত করে বসে আমার বিয়ের কথা ভাবছিলে।'

—'তা ভাবছিলাম।'

—'কান্না পাচ্ছিল তো?'

'ভীষণ!' বলে একটু থেমে [illegible] মিত্রা—'ঠাট্টা করছি নে। এই 'ভীষণ' শব্দটা যেমন [illegible] সত্য; তেমনি সত্য—তোমায় আমি আমার সঙ্গে জড়িয়ে একটা অস্বাভাবিক জীবনে টেনে আনতে চাই না। নিজেও চাই না এমন লুকোচুরি আর শঙ্কার ভেতর থাকতে। বড় [illegible] হয় নিজেকে। তাই'—একটু হেসে বললো—'অনুমতি দিলাম অনায়াসে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বর হয়ে বসতে পার।'

—'অনায়াসে না হোক, আয়াস করে হলেও বর এবার আমি হবোই হবো। বাদ শেষ না বলছি।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বের করল শমিত, বের করল একটা কলম। তার পর কাগজটা মিত্রার সামনে মেলে ধরে, হাতে কলম গুঁজে দিয়ে বললো—'সই করো।'

কম্পিত গলায় মিত্রা বললো—'কি এটা?'

—'আইনের কাজে [illegible] স্থান নেই। সব কলমের ব্যাপার। বিয়ের আবেদন পেশ করতে দু'জনের যুক্ত-সই দরকার হয়।'

গুটিয়ে গেল মিত্রা। [illegible]—'বলেছি তো এ হয় না।'

—'হতেই হবে।' [illegible] যেন বাড়ী থেকে মহড়া দিয়ে মুখস্থ করে আসা [illegible] গড়গড়িয়ে বলে চললো শমিত—'ঐ এক কথা [illegible] না কারণ—ছেলে-মেয়ে। কিন্তু কি হয়েছে [illegible] ছেলে-মেয়ে ছিল। কই তারা তো প্রতিবন্ধক [illegible] তার বিয়েতে।' মিত্রা কি যেন বলবার জন্য মুখ [illegible] থামিয়ে দিল শমিত: 'থাক, কি বলবে জানা আছে। যা বলে আসা হচ্ছে। বহু বার তুমি আমায় যা বলেছ—বিয়ে হলে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সবাই যা বলবে, সে কথাগুলোই তো? নূতন যদি কিছু বলবার মতো থাকে বলো। নইলে দোহাই তোমার, আমার কথায় বাধা দিও না। চলতিগুলো সব আমার জানা।' একটু নড়ে-চড়ে বসে বললো—'বলবে—পুরুষ পারে। এই তো? তাই যদি হয় তবে মেয়েরাই বা পারবে না কেন? আচ্ছা, স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েরা সন্তান নিয়ে যে [illegible] ভেতর পড়ে, দোর থেকে দোরে যে ভাবে ঘোরে আশ্রয়ের জন্য, [illegible] করে ভাই, ভাসুর, দেওরের আশ্রয়ে—স্ত্রীর মৃত্যুতে [illegible] কি এ সব বিপদের একটায়ও পড়তে হয়? কি জবাব নেই তো? তবু তাদের স্ত্রী চাই। তারা বিয়ে করে [illegible] চোখের উপর প্রথমার সন্তানকে অত্যাচারিত হতে দেখে নিষ্ঠুর ভাবে। উইল করে বিমাতাকে দিয়ে যায় দেওয়ার মতো কিছু থাকলে। যেমন আমার বাবা দিয়ে গিয়েছে এবং বহু জনের বাবা যায়। বেঁচে থেকে অত্যাচার অবিচার করতে বা দেখতে পুরুষের কোমল হৃদয় চূর্ণ হয় না—বুক ফেটে যায় বুঝি তাদের পরলোকে বসে সন্তানের কথা ভেবে! তাই তার মৃত্যুর পর স্ত্রী সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য বিয়ে করতে পারবে না। তোমার বাধাটাও একমাত্র তাই—মা বিয়ে করলে সন্তানের কি গতি হবে। অন্তত: পুরুষ যে হাল করে তার চাইতে খারাপ কিছু হবে না। কারণ—মা মা-ই। আমাকে বিশ্বাস করতে না পারলেও আপত্তি নেই—যদিও পারা-উচিত।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল—কথা বৃথাই গেল। না, কিছু বোঝাতে সমর্থ হয়েছি।'

—'কণা মাত্র নয়।' ম্লান হাসলো মিত্রা।

—'কণা মাত্রও নয়—তা কি করে পারব বলো? যত বুদ্ধিই থাক সংস্কারের পায় বলি হতে সব মেয়েই মাথা বাড়িয়ে থাকে সমান। এত বোকা না হলে কি আর এত কাল ধরে আমরা পারছি সব ঝোল নিজেদের দিকে টানতে।'

কিন্তু প্রতিদিন একবার করে পকেট থেকে কাগজখানা বের করা আবার ফের চার ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে ফিরে যাওয়া—এই সে করে চলে কিন্তু রাজী করাতে পারে না মিত্রাকে। সেদিন শমিতকে তার কথা আরম্ভ করতে না দিয়ে মিত্রা বললো—'তোমার বিয়ের নাকি প্রায় ঠিক?'

—'একেবারে ঠিক। শোন—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনি!
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি, হে গরবিনি!
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে,
দাঁড়ায় পাশে, হায়—
হেসে চলে যায় জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা—
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি, হে গরবিনি!
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণি!

বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্য চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়-পথের চরণ ফেলা দিন-যামিনী,
হে গরবিনি।
জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা—
করো না হেলা হে গরবিনি—যাও, সই করো।'

অসহায় দৃষ্টিতে শমিতের দিকে তাকালো মিত্রা। 'আচ্ছা, তোমার ত্যক্ত লাগছে না?'

—'একটুও না। তবে কি আর গান আসত!'

—'আমার কিন্তু লাগছে।'

—'তবে ত্যক্ত হয়েই কাগজখানার নীচে নামটা লিখে ফেল।'

—'ক্ষেপে উঠে যদি ছিঁড়ে ফেলি?'

—'লাভ কি। আর একটা লিখে আনব। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না আমার।'

—'ততক্ষণে কমলার নেমন্তন্ন রাখতে আমি জলন্ধরে পৌঁছে।'

—'মানে?' এবার গম্ভীর হয়ে উঠল শমিত। একটু ঝুঁকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো মিত্রার দিকে। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'এতটা করবার দরকার ছিল না। তোমার কোথাও পা বাড়াতে একটা মাসি পিসি ননদ জাতীয় কিছুর প্রয়োজন হয়। পৃথিবী সামনে করে বেরিয়ে পড়ার জন্য আমার প্রয়োজন শুধু মনে করার।' দরজা পর্য্যন্ত চলে গিয়ে আবার ঘুরে এসে বললো—'জীবন নাটকের ছকটা যা কেটেছে মিত্রা তা অতীব সস্তা দরের। বটতলার সংস্করণেও আজকাল অচল। নায়কের নিরুদ্দেশ যাত্রা, বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টিতে কনের মুখের উপর প্রিয়ার জল-ভরা মুখ দেখা, বধূর বাসর-শয্যায় একা কাটানো আর ওদিকে নায়িকার জানালার শিকধরা দাঁড়ানো দীর্ঘশ্বাসিত হৃদয়ে টুকরো চাঁদের ব্যথা হয়ে ঝরে পড়া—রাবিশ—রাবিশ! আচ্ছা, নমস্কার।' হঠাৎ হাত তুলে অপ্রত্যাশিত এক নমস্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শমিত।

এ নমস্কারের অর্থ অতি সহজ। একটা অদম্য কান্নার বেগে বুকটা ভেঙ্গে আসতে চাইল মিত্রার। ডাকবে শমিতকে। জানালার কাছে দু'পা এগুতে গিয়েও থমকে দাড়ালো সে। না থাক। কি বলবে ডেকে। বলাবলির আর কিছু বাকী নেই। হয় রাজী হতে হয়, নয় তো এই ভালো। লম্বা কৌচটায় বসে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মিত্রা। সন্ধ্যা গড়িয়ে যে রাত হয়েছে—টের পেল সে বাচ্চারা এসে তাদের বরাদ্দ গল্পের জন্য ঘিরে দাঁড়ালে। রোজ না হোক, প্রায়ই সে এ সময়টায় ওদের গল্প শোনায়। উঠে বসল মিত্রা।

সৌমী এসে ঢুকল দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললো—'এমন এক মজার গল্প তোমাদের কাছে বলবার জন্য দিদিমা বসে আছেন, শুনে আমিই লাফিয়ে উঠেছিলাম। শীগগির যাও। দেরী করলে ভুলতে কত-খন। জান তো কি ভুলো মন তার।'

—'তোমারটা কিন্তু তবে কাল শুনব মা!' বলতে বলতে সবাই দৌড়োলো দিদিমার ঘরের উদ্দেশ্যে।

সৌমী মিত্রার হাতে চায়ের কাপটা ধরে দিতে দিতে বললো—'বিকেলে এসে দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছ। আর ডাকিনি। মাথা ধরেছিল?'

—'না তো। ডাকলে না কেন। মামারা খোঁজ করেছিলেন নিশ্চয়ই?'

—'করেছিলেন। বলেছি মাথা ধরেছে।'

—'মা?'

—'তিনি জানতে চাননি।'

নীরবে দু'জনে চায়ে চুমুক দিয়ে চলে। মিত্রা হেসে উঠে বলে—'বা, কেমন চুপচাপ দু'জনে চা খেয়ে চলেছি। এমনি চুপ করেই থাকবে নাকি?'

—'চুপ করে থাকব কেন? এক্ষুনি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতাম—যে জন্য এসেছি।'

—'কি জিজ্ঞেস করবে?'

—'আমার বুদ্ধির উপর বিশ্বাস কি তোমার আর নেই?'

—'কেন বল তো?'

—'নইলে যে বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে প্রথম ছুটে এসেছিলে, এখন তার প্রয়োজনবোধ করছ না কেন?'

—'ও,'—হাসল মিত্রা। বললো—'বুঝছ তো সব।'

এমন সময় চাকর এসে একখানা চিঠি দিল মিত্রার হাতে—'বাবু দিলেন।' [illegible] লেখার উপর চোখ বুলিয়ে মিত্রা বললো—'রাণীর চিঠি অনেক দিন বাদে এলো। দাঁড়াও পড়ে নেই। তার পর তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।'

এনভেলাপ ছিঁড়ে [illegible] করল সে।

"মিত্রা,

একটা গল্প বলি শোন। একটি মেয়ে,—নাম জিজ্ঞাসা করছ? কেন, এক যে ছিল রাজার মতো, একটি মেয়ে বলে গল্প চালিয়ে গেলে অসুবিধাটা কি? নাম না হলে ভালো লাগে না? ভাবিয়ে তুললে।...না, নিজের নাম ছাড়া কোন নামই আমার এখন যুতসই লাগছে না। তাই ধর রাণীই তার নাম। ভাবছ বুঝি আমার গল্প? তবে থাক—একটি মেয়েই বলেই লিখব। তার পর কি বলছিলাম—ও, মনে পড়েছে। মেয়েটি বহু দিন পর ভাই বোন মার কাছে আসতে পেরে বেশ আনন্দেই আছে। হঠাৎ এসে উপস্থিত স্বামী। অভাবিত স্বামী দর্শনে মেয়েটির খুসী হওয়া উচিত—উচিত কাজ নিজের উপর মমতা না করেই করে আসছে সে চিরকাল। সেদিনও করল। খুসী হল।

ব্যস্ত হয়ে উঠল বাড়ীর সবাই। গরীবের ঘরে ধনী জামাই—ধন্য হয়ে গেছে তারা। নির্জন সাক্ষাতে স্বামীকে শ্বশুর-ঘরের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি। গম্ভীর মুখে সংক্ষিপ্ত জবাবে যদিও স্বামী কুশলই বললেন, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল মেয়েটি। ফের জিজ্ঞাসা করতেই এবার বাঁকা হাসলেন স্বামী। বললেন—পুত্র বর্ত্তমান এখানে। বর্ত্তমানে তিনিও সশরীরে উপস্থিত—তবে শ্বশুর-ঘরের কার মঙ্গল সংবাদের জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে? বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্য নয় নিশ্চয়ই।

মেয়েটি তো হতবাক্।

হঠাৎ তাকে আরো বাক্শূন্য করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন—'না গো, এতক্ষণ লুকোচ্ছিলাম। দিন তিন চার আগে সন্ধ্যার দিকে মোটর একসিডেন্ট করে গুরুতর জখম হয়ে—ঐ তো, আবার নাম-সমস্যায় ফেললে। আর পারি না। ধর মিতই—হাসপাতালে আছে।

আর্ত কণ্ঠে শব্দ করে কেঁপে উঠল মেয়েটি। প্রায়
ঝাঁপিয়ে পড়া ভাবে বলে উঠল—'এ কি বলছ তুমি?'

—'যা ঘটেছে তাই বলছি।'

—'এতক্ষণ বলনি কেন—জীবনের ভয় নেই তো?'

—'বলা যায় না।'

এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সেই মেয়ে।
দু'টো মুখ তখন পাশাপাশি দুলছে—একটি ... তার মেঘে
রক্তাক্ত মুখ, অপরখানা অশ্রু-ভেজা মিত্রা। ... শমিতের

—'তুমিও যে বাঁচবে না দেখছি।' স্বামীর ...
উঠল সে। দু'চোখ ... উঠল ... এবার চমকে
চলা প্রবৃত্তি তৈরী ... সেই মাটি ওঁকে
বিশদ-বর্ণনায় যাবার ... শুনে রাখো।
অথগুনায় যুক্তিতে প্রমাণ ... কাছ থেকে সংগৃহীত
বেরিয়ে যেত লুকিয়ে শামিতে... হীনতা। সে প্রায়ই
তার উপর আছে টাকা পাওয়া ... দিনে, কি রাতে।
দাঁড়ালেন—'এর পর যেন ... রায় দিয়ে উঠে
চরিত্রা স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার ... বাচ্চেই যায়। অসৎ-
তার নয়। গিয়েই শমি... পেটের ছেলেও
ইত্যাদি।' বোন আর ... বেন তিনি ইত্যাদি
ডিস হাতে, জামাই তখন ... চা আর জল-খাবারের
এসে দাঁড়ালো ভীরু ... রর দরজায় ভীড় করে
ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ... মুখ। শঙ্কিতা মা
গেল কেন? কার চরিত্র ... হয়েছে রাণী, জামাই চলে

মেয়েটি ডাকলো—ধর...
ছিলেন, তাঁর নিজ সন্তানকে ...। কিন্তু ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে-
তাঁর সামান্যতম মমতা নেই। ...। অপরের সন্তানের প্রতি

ধরণী দ্বিধা হলো না—...
করতে পারল না। কিন্তু তা... ...জনোচিত ভাবে মৃত্যু বরণ
মিত্রা যে তবে শিষ্যাকে ক্ষমা ... ছিল না কিন্তু বান্ধবী

সৌমার হাতে চিঠিটা দিবে না।'
ভাবলো মিত্রা। তার পর ... দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কি যেন
কাগজ-কলম নিয়ে খস্‌... ঘড়ির দিকে চাইল। দেখল আটটা।
আসবে।' চাকরের হাতে ... শমিতকে লিখল—'এক্ষুনি একবার
সৌমার পাশে। ... পাঠিয়ে তার পর এসে বসল আবার

পড়া শেষ করে সৌমী...
মানুষ!' ... বলল—'তোমার ভাসুরটি কি সাংঘাতিক

—মানুষ!

—'কিন্তু এর কা...
এই তো অবস্থা মেয়েদের ... আবার আসতে হবে, ঘর করতে হবে,

—'কেন আসতে হবে?

—'তবে কোথায় যা...?' ... কণ্ঠে বলল মিত্রা।

আসন ছেড়ে উঠে ...
আবার ফিরে এলো ... পায়ে একবার দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে
পিষছে কথাটাকে সে। ... কোথায় যাবে?' যেন দাঁতে

—'তুমি কা'কে চিঠি ...

—'শমিতকে।'

—'কেন?'

—'এক্ষুনি আসতে। তাকে এ চিঠি দেখানো দরকার'

সৌমী আর কিছু বললো না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে গেল ছোটদের খাবার ব্যবস্থা করতে। মিত্রা অস্থির চাঞ্চল্য নিয়ে বসে রইল শমিতের প্রতীক্ষায়।

গাড়ী থামার শব্দ হলো। শমিত উঠে এলো উপরে। আশ্চর্য্য ভাবে জানতে চাইল—'ব্যাপার কি?'

রাণীর চিঠিটা শমিতের দিকে বাড়িয়ে ধরল মিত্রা।

—'পড়তে হবে?'

মাথা নেড়েই জবাব সারল মিত্রা।

চিঠি পড়ে শমিতও একটু সময় চুপ করেই রইল। তার পর বললো—'বড় সুন্দর ঝরঝরে চিঠিখানা। শুধু শেষ লাইনটিতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।'

—'মানে?'

—'সমাপ্তিতে ভেবেছিলাম, পাতাল প্রবেশটা যখন সম্ভব হলো না, জহরব্রত-ট্রত জাতীয় একটা কিছু থাকবে।'

—'এটা কি পরিহাসের বিষয়বস্তু হলো তোমার?'

—'কি করব মিত্রা, নিতান্তই জালে জড়িয়ে গেছি—নইলে হেসে উঠতাম তোমাদের আধুনিকাদের অগ্রগতির দৌড় দেখে।'

—'তুমি রাণী হলে কি করতে?'

—'আমি? গান গেয়ে উঠতাম—'কি অ...বী... অনেক দূরে, কি চরম মুক্তি বলে।'

—'আর এমনি চিঠি তোমার কাছে কেউ ...ননগর। সম্পাদক— জবাব দিতে তুমি?'

হেসে ফেলল শমিত। বললো—'সে যদি ...আন্দোলনে কারারুদ্ধ। লিখত, তখন তার জবাব ভাবতাম।'

...২১৯ বঙ্গ খুলনা

—'আমার জন্যে ভাবো।'

—'আমি বলব—তবে তুমি লিখবে।'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার জীবনে আমার ইচ্ছা আগ্রহ সম্মান পেল না। অন্যের কাছে পাবে কেন?' একটু সময় চুপ করে থেকে বললো—'এ সন্দেহ যে কি মিথ্যা তা প্রমাণ করাটা তো তোমার হাতেই মিত্রা!'

টেবিলের উপর কনুই রেখে, চোখের কোণ আঙুল দিয়ে টিপে ধরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মিত্রা। তার পর তেমনি অবস্থায় হাত বাড়িয়ে দিল শমিতের দিকে—'দেও, কলম দেও।'

মিত্রার অপ্রত্যাশিত সম্মতিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল শমিত। টান দিয়ে পকেট থেকে কলমটা তুলে মুখটা খুলতে খুলতে বললে—'ঐ তো একটু, সই, চোখ বুজেই করে ফেলতে পারবে।' বলেই কিন্তু হঠাৎ আবার থমকে গেল—'বান্ধবীকে রক্ষার জন্য রাজী হলে কি?'

—'আমার ভাগ্যকে হিংসে করতে পারো। নিজের জন্যে যা করলাম, বান্ধবীর নামে তা চালিয়ে দিতে পারব। দেও কলম।'

সইটি হয়ে যাওয়া মাত্র কলমশুদ্ধ হাতটা মিত্রার মুঠো করে ধরে গাঢ় স্বরে বলে উঠল শমিত—'এ জন্য তোমায় কোন দিন দুঃখ করতে হবে না মিত্রা!'

(ক্রমশঃ)।

সাহিত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ললিতমোহন গোস্বামী—বৈষ্ণব সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (১৩০৬)।

ললিতমোহন ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অচলবাসিনী (১৮৭৫)।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার। সরকারী কর্ম, দিল্লী। নাট্যগ্রন্থ—সহরলীলা, আক্কেল সেলামী, শ্মশান, অনিলা, চপলা।

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—শ্রীগৌরাঙ্গসেবক (১৩১৮-১৫)।

ললিতমোহন রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হারানিধি (উপ, ১৩২২)।

ললিতমোহন সিংহরায়—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলার চকদীঘি জমিদার বংশে। 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—আত্মদর্শন, স্বপ্নদর্শন, গীতাবলী।

ললিতমোহন সেনগুপ্ত—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—বরিশাল হিতৈষী (বরিশাল)।

... ঘোষ—গ্রন্থ। জন্ম—নদীয়া জেলার মায়াপুরে। বটতলার সংস্করে ... ও ধর্ম।

যাত্রা, বিয়ের রা... দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্রহ্মকায়স্থ, বঙ্গে জল-ভরা মুখ দেখা ... ওদিকে নায়িকার ...কার। নিবাস—১০ম শতাব্দীতে লাটদেশে। হৃদয়ে টুকরো চাঁদের ...। গ্রন্থ—ধীবৃদ্ধিদ বা শিষ্যধীবৃদ্ধিদমহাতন্ত্র, আচ্ছা, নমস্কার।' ...ধ, গোলাধ্যায়। জানিয়ে ঘুর ...

...লাল—কবি। জন্ম—গুজরাতী ব্রাহ্মণ-বংশে। ফোর্ট উলিয়াম কলেজের ব্রজভাষার মুন্সি। গ্রন্থ—সভাবিলাস (১৮১৪)।

লসন, রেভাঃ জন—খৃষ্টান মিশনারী। জন্ম—১৭৮৭ খৃঃ ২৪এ জুলাই। মৃত্যু—১৮২৫ খৃঃ ২২এ অক্টোবর। কলিকাতায় মিশনারীরূপে আগমন (১৮১২), শ্রীরামপুরে অবস্থান ও চীনা ও বাঙলা অক্ষর প্রস্তুতকরণের শিক্ষাদান। ভারতীয় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ। গ্রন্থ—Orient Harping। যুগ্ম-সম্পাদক—পশ্বাবলী (মাসিক, ১৮২২, ফেব্রুয়ারী)।

লাটদেব, আচার্য—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। ৫ম শক-শতকে বর্তমান। আর্যভট্টের শিষ্য। গ্রন্থ—পুলিশসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা, রোমকসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা, সূর্যসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা, পিতামহসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা।

লাবণ্যকুমার চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অন্ধের বাঁশী। বাগিচার কুলি।

লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার)—বিদুষী মহিলা। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ। পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু। স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী। স্বামী—হেমচন্দ্র সরকার, ডি, ডি (১৯০৭)। গ্রন্থ—আনন্দমোহন বসুর ...নিক জীবনী ১ম (১৮৯৯), ২য় (১৯০১), নীতিকথা, গৃহের ...কবি ও কাব্যের কথা, পৌরাণিক কাহিনী, ২ ভাগ।

...রণ (১৩১১), মাতা ও পুত্র। সম্পাদিকা—মুকুল ... চৈত্র—১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ)।

(১৩২...) ...লতা মল্লিক—বিদুষী মহিলা। বি-এ, বি-টি। লাব... ...র (মাসিক, ১১৪৪)।

...দাস বাবাজী—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

... ফকির—ধর্মসংস্কারক ও কবি। জন্ম—১৭৭৫ খৃঃ নদীয়ার ছেঁউরিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯০ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর (আয়ু ... ১৬ বৎসর বয়সে)। বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী ও পদকর্তা।

গ্রন্থ—বৈষ্ণব ... ...লালবিহারী ...—বঙ্গীয় খৃষ্টীয় যাজক। জন্ম—... খৃঃ। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৮২৬ খৃঃ। ...পাদরী ডাফ কর্তৃক (১৮৪৩), খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ... এবং অবসরগ্রহণ (১৮৫৭)। খৃষ্টযাজকরূপে অধ্যাপক, নিযুক্ত (১৮৫৫) ... বেলঘর ও ...চন্দ্র সেন প্রবর্তিত ধর্মের হুগলী কলেজ। ইং... গ্রন্থ—Reminiscences of বিরুদ্ধে লেখনীধারণ। Bengal Peasant Life (Govinda Dr. Duff (১৮৭৯), Folk Tales of Bengal। সম্পাদক—Samanta), F... (প্রথম সচিত্র পাক্ষিক পত্র, Bengal Magazine, ...টির মুখপত্র, শ্রীরামপুর)

১৮৪৩ খৃঃ, খৃষ্টিয়ান ...। গ্রন্থ—জীবন-সংগ্রাম (১৩২২)।

লালবিহারী বল্লভ—গ্রন্থ—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সম্পাদক—সত্য-

লালমাধব মুখোপা... ১৮৯৫, জুলাই, জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী (ত্রৈমাসিক ... সমাজ হইতে প্রকাশিত)। জন্ম—১৮৪৯ খৃঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে।

লালমোহন ঘোষ—বাগ্মী ...মপুরে। মৃত্যু—১৯০৯ খৃঃ ১৮ই পূর্বনিবাস—ঢাকা জেলার ...ন ঘোষ। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী সেপ্টেম্বর। পিতা—রামলোচন। আইন ব্যবসায়, ইংলণ্ডে গমন মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রা... ইংলণ্ডের কাছে উপস্থিত করেন। ও ভারতের দাবী নির্ভীকভাবে ... ia Arjune (কলি, ১৯০১)। গ্রন্থ—Thesis on Termina... অধ্যাপক। গ্রন্থ—The

লালমোহন দাস—শিক্ষাব্রতী alluvion & fishery Law of Riparian Rights (কলি, ১৮৯৪)।

... পণ্ডিত। জন্ম—১২৫১

লালমোহন বিদ্যানিধি—শিক্ষাব্রতী। মৃত্যু—১৩২৩ বঙ্গ ১২ই বঙ্গ চৈত্র নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ... ভট্টাচার্য। শিক্ষা—আশ্বিন শান্তিপুরে। পিতা—...রমে, 'বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ চতুষ্পাঠী (দিগম্বরপুর ও মহেশপুর অধ্যাপক (কটন কলেজ, (সংস্কৃত কলেজ, ১৮৬৮)। কর্ম—...। (১৮৭০-১৮৮৮)। ১৮৬৮), স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর (১৮৮৮-১৯০১)। গ্রন্থ—হেড পণ্ডিত (হুগলী নর্মাল স্কুল, ...নির্ণয় (১৮৭৫ নবেম্বর), কাব্যনির্ণয় (১৮৬২, নভেম্বর), ...(১৮৯১, জুন), মেঘদূতম্ ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা ...: (১৯২৩ সংবত), (সটীক, ১৮৯৪), স্কুলপাঠ্য—...(১৯০৩), চারুপ্রবন্ধ পত্র-প্রবন্ধ (১৮৭৬), শিক্ষা-সোপান The Meghadutam (১৯১০)। সম্পাদিত গ্রন্থ (১৯০১)।

...১৮৬৩ খৃঃ। জোড়াসাঁকো

লীলা দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—... মার্চ। পিতা—ঠাকুর পরিবারে। মৃত্যু—১৯... খৃঃ ... ইনি কবি ও ...রেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামী—...

সুলেখিকা। গ্রন্থ—নবঘন ২ ভাগ, বরার ঝর্ণা, রূপহীনার রূপ (উপ), কিশলয়, সিঞ্চন, ধ্রুবা (উপ)।

লীলাবতী আদিত্য—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—লীলার দপ্তর (১৩২২)

লীলাবতী নাগ (রায়)—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—ঢাকা। এম-এ। সম্পাদিকা—জয়শ্রী (মাসিকপত্র, ঢাকা, ১৩৩৮, ১৩৪৫-১৩৫৮)।

লীলাবতী মিত্র—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—অন্তঃপুর (মাসিক, ১৩১১)।

লীলাময় দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কবিতার জন্মদিন, অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা, অভিযান (ক)।

লুৎফ রহমন, মুন্সি—কবি। জন্ম—নদীয়া জেলার মুন্সীগঞ্জে। গ্রন্থ—প্রকাশ (কাব্য)।

লোকনাথ দত্ত—কবি। গ্রন্থ—মায়ের মন্দির (কাব্য), বীর ছেলে, সাঁওতাল কাহিনী, শান্তসতী, আনন্দ-কুটির।

লোকাচার্য—টীকাকার। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—তত্ত্বত্রয় (বিষ্ণুপুরাণের টীকা), অষ্টাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যা, লোকাচার্যসিদ্ধান্ত।

লোচনদাস—বৈষ্ণব কবি। পূর্ণ নাম—ত্রিলোচন দাস। জন্ম—১৫২৩ খৃঃ বর্ধমান জেলায় গুস্করা ষ্টেশনের অদূরবর্তী গ্রামে বৈদ্যবংশে। পিতা—কমলাকান্ত। মাতা—সদানন্দা। বহু পদ রচনা। গ্রন্থ—চৈতন্যমঙ্গল (১৫৩৭), দুর্লভসার।

লোচনদাস—টীকাকার। গ্রন্থ—কলাপব্যাকরণের টীকা।

লোহারাম শিরোরত্ন—পণ্ডিত। জন্ম—১৭৪৭ শকে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। গ্রন্থ—মালতীমাধব, মুগ্ধবোধসার, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শিশুবোধ ব্যাকরণ, নীতিপুষ্পাঞ্জলি।

লৌগাক্ষি ভাস্কর—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১০শ শতাব্দী। পিতা—মুদ্গল ভট্ট। গ্রন্থ—অর্থসংগ্রহ, তর্ককৌমুদী, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রকাশ।

শকুন্তলা দেবী—মহিলা সম্পাদিকা। সম্পাদিকা—মুকুল (মাসিক, ১৩৩৫—১৩৩৬)।

শকুন্তলা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—বঙ্গশ্রী (ঢাকা, মাসিকপত্র, ১৩৩১)।

শঙ্কর তর্কবাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী নদীয়া। প্রকৃত নাম—রামশঙ্কর। পিতা—যদুনাথ সার্বভৌম। গ্রন্থ—তিথিতত্ত্ব।

শঙ্কর দেব—অসমীয়া বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারক। জন্ম—১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আসামের বরদোয়া নামক স্থানে বারভূঞা অংশে। মৃত্যু—১৫৬৮ খৃঃ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ধর্মপ্রচারক (১৯ বৎসর বয়সে)। তীর্থে গমন, শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ শ্রীক্ষেত্রে। তীর্থপর্যটন সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন ও ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত। ইনি ২৭খানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—কীর্তনঘোষা।

শঙ্করনাথ পণ্ডিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সংস্কার বিধি, আর্যাভিনয়, সত্যার্থ প্রকাশ, আস্তিকাদর্শ, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা, ঋষীন্দ্র-জীবন।

শঙ্কর মিশ্র—দ্বৈতবাদী পণ্ডিত। ১৬শ শতাব্দীতে দ্বারভাঙ্গায়। পিতা—ভবনাথ মিশ্র। শিক্ষা পিতার নিকট। গ্রন্থ—তত্ত্বচিন্তামণিময়ূখ, পণ্ডিতবিজয়, অভেদধিক্কার, উপস্কার (বৈশেষিক সূত্রের টীকা)।

শঙ্করাচার্য, আচার্য বা আচার্যপাদ—দার্শনিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। জন্ম—৭৮৮ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশে। মৃত্যু—৮২০ খৃঃ। তার্কিক ও মেধাবী পণ্ডিত। পিতা—শিবগুরু। মাতা—সতীদেবী। ইঁহার মতবাদ বেদান্তানুগ। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অভিভব হইতে দেখিয়া হিন্দুধর্ম প্রচার। মঠ স্থাপনা—মহীশূরে শৃঙ্গ গিরির মঠ, উৎকলে গোবর্ধন মঠ, গুর্জরে দ্বারকা মঠ ও বিষ্ণুপ্রয়াগে জ্যোতির্মঠ। গ্রন্থ—শারীরক ভাষ্য। উপনিষদ ভাষ্য, গীতা ভাষ্য, মোহমুদ্গর।

শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী—ঐতিহাসিক ও সন্ন্যাসী। পূর্বনাম—উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, জীবের সাধ্য ও সাধনা, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, মানুষ ও গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্দর্শন, A brief history of the Bengal Brahmin, The Grandeur of the Vedas.

শচীনন্দন পাল—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—সমাজশক্তি (১৩৩০-৩১)।

শচীন্দ্রনাথ দত্ত—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৪ খৃঃ চট্টগ্রামে। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। বাঙলার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। সহ-সম্পাদক—যুগধর্ম।

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত—নাট্যকার। কর্ম—সম্পাদকীয় বিভাগ, ষ্টেটস্‌ম্যান, নিউ দিল্লী। নাট্য-গ্রন্থ—এই পৃথিবীর অনেক দূরে, সোনালী শহর।

শচীন্দ্রনাথ মোদক—সাহিত্যিক। জন্ম—চন্দননগর। সম্পাদক—জয় হিন্দ।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—গ্রন্থকার। জাতীয় আন্দোলনে কারারুদ্ধ। গ্রন্থ—বন্দীজীবন, ২য় খণ্ড।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—নাট্যকার। জন্ম—১২৯৯ বঙ্গ খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে। শিক্ষা—রংপুরে। ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ও বিদ্যালয় ত্যাগ। প্রবেশিকা (জাতীয় বিদ্যালয়), বি-এ পর্যন্ত পাঠ। অধ্যাপক, জাতীয় কলেজ। প্রথম নাট্য রচনা 'রক্তকমল'। গ্রন্থ—গৈরিক পতাকা, রক্তকমল, ঝড়ের রাতে, সতীতীর্থ। সম্পাদক—হিতবাদী (সাপ্তাহিক), বিজলী (ঐ), আত্মশক্তি (ঐ)। সহ-সম্পাদক—দৈনিক 'কৃষক', ভারত (দৈনিক)।

শচীন্দ্রপ্রসাদ বাগচী—সাহিত্যিক। যুগ্ম-সম্পাদক—হসন্তিকা (১৩৩৫)।

শচীন্দ্রমোহন সরকার—কবি। জন্ম—পাবনা জেলার আকড়া গ্রামে। শিক্ষা—বি-এ, বি-এল। আইন ব্যবসায় ও শিক্ষকতা। গ্রন্থ—ফুলঝুরি, মঞ্জুষা।

শচীন্দ্রলাল ঘোষ—সাংবাদিক। জন্ম—১৩১২ বঙ্গ ৭ই মাঘ নড়াইলে। পিতা—হীরালাল ঘোষ। মাতা—সরলাবালা ঘোষ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (খুলনা জেলা স্কুল, ১৯২২), আই-এ (দৌলতপুর কলেজ, ১৯২৪), বি-এ (ঐ, ১৯২৬), এম-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮)। কর্ম—সাংবাদিকতা। গ্রন্থ—মৃত্যুবিলাসী (জয়ন্ত উপাধ্যায় ছদ্মনামে, ১৯৩৬), Urban Morals in Ancient India (১৯৪৫),

Holocoust (১৯৪৬), Gandhiji's Do or Die Mission (১৯৪৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ—Karl Marx's Capital (L. G. Adnilicas ছদ্মনামে, মূল ও সংক্ষিপ্ত সং, ১৯৪৪), The Soviet East (১৯৪৫), Kamasutra (ইংরেজি অনুবাদ, ১৯৪৩)। সহ-সম্পাদক—স্বাধীনতা (১৯২৮), বঙ্গবাণী (১৯৩০), Liberty (১৯৩১), Advance (১৯৩৩), Amrita Bazar Patrika (১৯৩৮), Hindusthan Standard (নিউ দিল্লী ১৯৫২)। সম্পাদক—Tide (১৯৪৯)।

শচীন্দ্রলাল রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০৩ বঙ্গ পাবনা। পিতা—উপেন্দ্রলাল রায়। কর্ম—রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার, বর্তমানে মহিষাদল রাজ এষ্টেটের চীফ ম্যানেজার। গ্রন্থ—দাবী-দাওয়া, গেঁয়ো, নেশার ঘোরে, রক্তের সম্বন্ধ, জহর ও অমৃত।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ ২৪-পরগনায় নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায়। পিতা—শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৮৬), এফ-এ (১৮৮৮)। কর্ম—সব-রেজিষ্ট্রার (১৮৯১, নভেম্বর), স্পেশাল সব-রেজিষ্ট্রার (১৯১৪)। মধ্যবয়স হইতে ইনি সাহিত্য-সাধনা শুরু করেন। গ্রন্থ—বীরপূজা (১৩১২), রাণী ব্রজসুন্দরী, বারিবাহিনী, রাজা গণেশ, বাঙ্গালীর বল, বেলমতিয়া, অমরনাথ, প্রণবকুমার, সনাতন গোস্বামী, বঙ্কিম জীবনী, কুঞ্জের ঝঙ্কার, বঙ্গসংসার (১৩১৪), নীরদা (১৩১৫), পূজার মালা (স্ত্রীর রচিত কয়েকটি গল্প ও স্বরচিত প্রবন্ধ সমন্বিত)।

শতদলবাসিনী বিশ্বাস—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১৮৮৩ খৃঃ ফরিদপুরে। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ। গ্রন্থ—বেহুলা, বাঙ্গালার ব্রতকথা, বিজনবাসিনী (উপ), বিধবা বঙ্গললনা (উপ, ১২৯১)।

শম্ভুচন্দ্র দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The Bansberia Raj (কলিকাতা, ১৯০৮)।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মৃত্যু—১৮৪২ খৃঃ আগষ্ট। কর্ম—ন্যায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, বেদান্তের অধ্যাপক (১৮২৬), সংস্কৃত কলেজ, উইলসন সাহেবের পণ্ডিত। গ্রন্থ—বেদান্তসার (সটীক, ১৮২৯)।

শম্ভুচন্দ্র মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সংবাদ দিনমণি (সাপ্তাহিক, ১৮৪৮, অক্টোবর)।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রাজনীতিজ্ঞ ও সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—১৮৩৯ খৃঃ ৮ই মে। মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি। পিতা—মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। কর্ম—মুর্শিদাবাদের নাজিমের দেওয়ান (১৮৬৪), কাশীপুররাজ শিউরাজসিংহের (১৮৬৮) ও রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী (১৮৬৯)। ত্রিপুরারাজার মন্ত্রী (১৮৭৭)। 'ডক্টর' উপাধিলাভ (আমেরিকা), ইংরেজি-সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তিলাভ। সম্পাদক—তালুকদার অ্যাসোসিয়েশন (লক্ষ্ণৌ), প্রতিষ্ঠাতা—Indian League। ফেলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। পরিচালনা—Mookherjee's Magazine (মাসিক, ১৮৭২-৭৬)। গ্রন্থ—Mr. Wilson, Lord Canning and Income Tax (কলি, ১৮৬৮), On the Causes of Mutiny (১৮৫৭), The Careers of an Indian Princes (১৮৬৯), The Princes in India & to India (১৮৭২), The Empire is Peace & the Baroda coup d'Etat (১৮৭৫), Travels in Bengal. সহ-সম্পাদক—হিন্দু পেট্রিয়ট (১৮৫৮)। সম্পাদক—সমাচার হিন্দুস্থান (১৮৮২), Rais and Rayyet (১৮৮২-৯৪)।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—আইনজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২০ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৬৭ খৃঃ ৬ই জুন। পিতা—শিবনাথ (সদাশিব ?)। আদি নিবাস—কাশ্মীর। শিক্ষা—গৌরমোহন আঢ্য স্কুল। কর্ম—সদর দেওয়ানি আদালতে কেরাণী, ডিক্রিজারীর মোহরার, ওকালতি, সরকারী জুনিয়ার ও পরে সিনিয়ার উকীল (১৮৬১), অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিচারপতি, হাইকোর্ট (১২৬৯—ইনি এ-দেশীয় প্রথম বিচারপতি, ১৮৬৩-৬৭)। প্রবন্ধ রচনা, হিন্দু পেট্রিয়ট। ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। গ্রন্থ—ডিক্রিজারী।

শবর স্বামী—মীমাংসা-টীকাকার। জন্ম—২-১ খৃঃ পূর্ব শতাব্দী। পূর্ব নাম—আদিত্যদেব। বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদপূর্বক সনাতন ধর্মের প্রচারকার্যে ব্রতী হন। গ্রন্থ—মীমাংসাবৃত্তি (উপবর্ষ এবং কাত্যায়ন রচিত)।

শরৎকুমার রায়, কুমার—প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—রাজশাহী জেলার দয়ারামপুরে প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে। এম-এ। প্রতিষ্ঠাতা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। গ্রন্থ—বুদ্ধের জীবন ও বাণী, বৌদ্ধভারত, শিবাজী ও মারাঠা জাতি, বঙ্গগৌরব গুরুদাস, পঞ্চকন্যা, শিখগুরু ও শিখজাতি, ভারতীয় সাধক, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, মোহনলাল।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী—মহিলা লেখিকা। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ১৫ই জুলাই। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ ১১ই এপ্রিল। পিতা—শশিভূষণ বসু (চোরবাগান-নিবাসী)। স্বামী—সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (আন্দুল)। ইহার শৈশব কাটে লাহোরে। পুরাতন সাময়িক পত্রে বহু রচনা প্রকাশ। প্রথম রচনা—'কলিকাতা স্ত্রী-সমাজ' (ভারতী, ১২৮৮ বঙ্গ ভাদ্র ও কার্ত্তিক)। গ্রন্থ—শুভ বিবাহ (১৯০৬), মনের কথা (?)।

শরৎকুমারী দেবী—মহিলা কবি। শিবচন্দ্র দেবের পুত্রবধূ। কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্তা। ছদ্মনাম—পদ্মাবতী দেবী। কাব্যগ্রন্থ—শান্তিকানন (১৩১০)।

শরৎকুমারী দেবী—মহিলা লেখিকা। গ্রন্থ—উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান।

শরৎচন্দ্র ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অবসর (১৩২২—২৩)।

শরৎচন্দ্র ঘোষাল—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। 'সরস্বতী', 'কাব্যতীর্থ', 'বিদ্যাভূষণ', 'ভারতী' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—দবব সংগহ (১৯১৭), বেদান্ত পরিভাষা, বারুণী (গল্প)।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত। গ্রন্থ—সাধু নাগ মহাশয়, স্বামী-শিষ্য সংবাদ।

[ক্রমশঃ ।
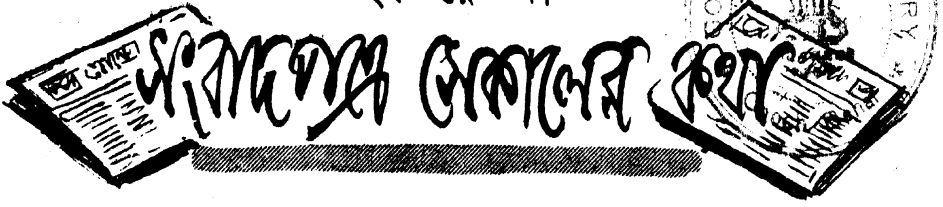
সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

[ইংরেজরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সরকারী ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এর পক্ষে ছিল তাদের নানাবিধ বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হতে হতো। এ দেশে বসবাস শুরু করলে উপার্জিত অর্থের একটা অংশ এখানেই থেকে যাবে। প্রধানতঃ এই কারণে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনী পছন্দ করত না যে তাদের কর্মচারীরা ভারতে বাড়ী-ঘর করে স্থায়ী ভাবে থাকে। কয়েক জন ইংরেজ ভারতে জমিদারি কিনে যখন নীলের চাষ আরম্ভ করে, তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা সু-নজরে দেখতে পারেনি। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ দেশে ব্যবসা করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল, অন্য কেউ এখানে ব্যবসার সূত্রপাত করবে, সেটা তাদের ইচ্ছা নয়। কলকাতায় গুজব উঠল যে, ইংরেজরা ভারতে যাতে জমি-জমা অবাধে কিনতে না পারে তার জন্য কোম্পানী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই গুজব শুনে কলকাতার ১১৫ জন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় নাগরিক শেরিফের নিকট একটি সাধারণ সভা আহ্বান করবার জন্য আবেদন জানান। ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে মিঃ জন পামারের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ হতে পার্লামেণ্টে একটি আবেদনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করাই ছিল সভার উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত আবেদনে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করা হবে যে, চীন ও ভারতের সঙ্গে বৃটেনের বাণিজ্য যেন সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করা হয়; এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বর্তমান সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর ভারতের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বৃটেনের মূলধন, দক্ষতা ও কর্মকৌশল যাতে অবাধে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। ঐ সভায় প্রস্তাবের সমর্থন করে অনেক বক্তৃতা হয়। দু'জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের বক্তৃতা উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হলো।]

ইংরেজদের জন্য অবাধ সুযোগের আবেদন

য়ুরোপীয়ানদের ভারতে বাস করা সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আছে তা দূর করবার জন্য প্রস্তাব উপাপন করে দ্বারকানাথ ঠাকুর বললেন, আজকের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে পারি। মফঃস্বল অঞ্চলে আমার কতকগুলি জমিদারি মহাল আছে। আমি দেখেছি যে নীলের চাষ এবং য়ুরোপীয়ানদের বাস দেশের ও সমাজের প্রভূত উন্নতি করেছে। জমিদার ধনী ও সমৃদ্ধিশালী হবার সুযোগ পেয়েছে; রায়তদেরও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে; আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় যে স্বাচ্ছন্দ্য আছে তার চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নীল চাষ ও নীল প্রস্তুত যে সব অঞ্চলে হয় সেখানকার লোকেরা। নীল-কুঠীর পার্শ্ববর্তী জমির দাম বেশ বেড়ে গেছে এবং চাষাবাদেরও দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। লোকের মুখে শুনে আমি এ সব কথা বলছি না; আমি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কয়েক বার ঘুরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। নীলকরদের স্বভাব-চরিত্র আমার ভালো করেই জানা আছে। সাধারণতঃ নীলকরেরা মন্দ আচরণ করে না; অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও খুব বিরল এবং গুরুত্বও সামান্য। আমার উক্তির সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে যখন নীলের চাষ এতটা প্রচলিত হয়নি তখন আমার একটি মহাল থেকে যে আয় হতো তা দিয়ে সরকারী খাজনাও শোধ করা যেত না। নীলের চাষ আরম্ভ করবার কয়েক বছরের মধ্যেই এখন সেই মহালে এক বিঘা জমিও পতিত নেই; এখন মহাল থেকে বেশ মোটা লাভ হয়। আমি আমার আত্মীয় এবং বন্ধুদের কথাও জানি; নীলের চাষ দ্বারা তাঁদের সম্পত্তিরও উন্নতি হয়েছে, এবং তাঁরা মহাল থেকে প্রচুর লাভ করছেন। য়ুরোপীয়দের দক্ষতার গুণে একমাত্র নীল থেকেই যদি এত উপকার পাওয়া যায় তাহ'লে বৃটিশের কার্যদক্ষতা, মূলধন ও অধ্যবসায়ের অবাধ প্রয়োগ কি না করতে পারে?

রামমোহন রায় প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার প্রতীতি হয়েছে যে, য়ুরোপীয় ভদ্রসমাজের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যত ঘনিষ্ঠ হবে, সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ততই আমরা উন্নতি লাভ করব। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করা যায় যারা য়ুরোপীয় সমাজে চলাফেরা করেছেন এবং যারা সে সুযোগ পাননি তাদের অবস্থার তুলনা করে। য়ুরোপীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ যে কল্যাণপ্রদ হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমি শপথ করে ঘোষণা করতে পারি। বাংলা ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে আমি ভ্রমণ করেছি; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, নীল-কুঠীর সন্নিকটবর্তী অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আর্থিক অবস্থা স্পষ্টই অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা ভালো। নীল-কুঠীর মালিকরা হয়তো কিছু ক্ষতি করেছে; সব দিক বিচার করে দেখা যাবে যে, এ দেশের সাধারণ লোকেরা নীল চাষের দ্বারা যতটা উপকৃত হয়েছে কোনো শ্রেণীর য়ুরোপীয়র দ্বারা ততটা উপকার পায়নি। —এশিয়াটিক জার্ণাল, জুন, ১৯৩০।

মহিলার অপমান

আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, গত শনিবার রাত্রিতে দু'জন ভদ্রমহিলা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন তালতলা বাজার ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে অবস্থিত এক বাবুর বাড়ী হতে কয়েক জন লোক বেরিয়ে এসে এঁদের প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করে; ঐ আক্রমণকারীরা

মহিলাদের জোর করে পাল্‌কি থেকে বের করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। মহিলা দু'জন এবং তাঁদের সহচর ভদ্রলোকরা গুণ্ডাদের কার্যে বাধা দেন; এবং ধস্তাধস্তিতে পাল্‌কির এক অংশ ভেঙে যায়। যে বাড়ী থেকে মহিলারা এইমাত্র এসেছেন সে বাড়ী নিকটেই ছিল। সেখান থেকে লোক আসতে দেখে গুণ্ডারা ক্ষান্ত হয়। শোনা যায় যে, ঐ বাবু এ রকম গুণ্ডামী প্রায়ই করে থাকে এবং রাস্তা থেকে নিজের বাড়ীতে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতে সক্ষমও হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে তার নামে পুলিশের নিকট অভিযোগ করা হয়েছে; সুতরাং আশা করা যায় যে, এবার সে দুষ্কৃতির শাস্তি পাবে। —ইণ্ডিয়া গেজেট, ১২ই নভেম্বর ১৮২৯; এশিয়াটিক জার্ণাল, মে ১৮৩০ সংখ্যায় উদ্ধৃত।

ভারতীয়দের অধিকার

টাউন-মেজরের নিকট হতে পাশ ব্যতীত কোনো ভারতীয়কে গাড়ী, পাল্‌কি অথবা ঘোড়ায় চড়ে ফোর্ট এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। গভর্ণর জেনারেল এই বিরক্তিকর বিধি প্রত্যাহার করেছেন। আমরা ভারতীয় সমাজকে এ জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতীয়দের সম্পর্কে যে উন্নত নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এটি তার একটি প্রমাণ।

—হরকরা হতে এশিয়াটিক জার্ণালে (জুলাই, ১৮৩০) উদ্ধৃত।

আধুনিক হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়

কলকাতার হিন্দুরা কয়েকটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত। অনুমান সহজেই করা যায় যে, গোঁড়া হিন্দুরাই দলে ভারী এবং সঙ্গতিপন্ন। 'চন্দ্রিকা', 'প্রভাকর', 'রত্নাকর' প্রভৃতি বাঙলা সাময়িকপত্র এই দলের মুখপত্র। এ পর্যন্ত এদের ইংরেজী ভাষায় কোনো মুখপত্র নেই; কিন্তু আমরা শুনেছি যে, পৌত্তলিকতা সমর্থন করবার জন্য গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় একজন খৃষ্টানকে নিযুক্ত করবে! হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি সমর্থন দ্বারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে চিরস্থায়ী করবার সহায়তা করলে প্রস্তাবিত খৃষ্টান লেখকের নাম প্রকাশ করে দেওয়া হবে বলে 'এনকোয়ারার' পত্রিকার সম্পাদক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। আমাদের বিশ্বাস, এই সাবধান-বাণী কার্যকরী হয়েছে, সেই খৃষ্টান লেখক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বহু দেবতার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের জন্য কলম ধরবার সুযোগ পাননি।

রামমোহন রায় অন্য একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, তাঁকে বরং সম্প্রদায়ের নেতা বলা যেতে পারে। রামমোহনের মতবাদ যে কি, তা তাঁর বন্ধু কিংবা শত্রু কেউ ঠিক বুঝতে পারে না। তাঁর মত কি তা বলা কঠিন; কি নয়, তা বরং বোঝা সহজ। হয়তো সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। রামমোহন বেদ, কোরাণ ও বাইবেল সমান ভাবে শ্রদ্ধা করেন এবং এদের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা গ্রহণ করেছেন এবং মন্দকে ত্যাগ করেছেন। তাঁকে কখনো খৃষ্টান এবং কখনো বা হিন্দু একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতে দেখা গেছে। কিন্তু তিনি হিন্দু অথবা খৃষ্টান প্রার্থনার রীতি পছন্দ করেন তা বলা কঠিন। ব্রাহ্মণদের যে ভাবে প্রণাম করা হয়, লোকে রামমোহনকে সে ভাবে প্রণাম করে এবং তিনি ব্রাহ্মণোচিত আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন। এখন যেরূপে ব্রাহ্ম সভার কার্য পরিচালিত হয় তা রামমোহনের দ্বারা অনুমোদিত হলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অনুচরবর্গ গোঁড়া হিন্দুদের ন্যায় ব্রাহ্মণদের বিশেষরূপে সম্মান করেন। তিনি হিন্দুদের মতোই জীবন যাপন করেন, শুধু শীত কালে কখনো কখনো সামান্য মদ্য পান করেন। তিনি য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে খানার টেবিলে বসেছেন; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তিনি সেই খাদ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর অনুচরদের (অন্ততঃ কয়েক জনের) আচরণে অসঙ্গতি দেখা যায়। রামমোহনের নামের আড়ালে সর্বপ্রকার স্বৈরাচারে এরা প্রবৃত্ত হয়; বিশেষ করে অশাস্ত্রীয় মাংস ও পানীয়ের প্রতি এদের আকর্ষণ প্রকাশ পায়। এরা মুখে বলে যে হিন্দু ধর্মে আস্থা নেই, অথচ বাড়ীতে পূজা-আচ্চার অবহেলা করে না এবং ব্রাহ্মণদেরও দক্ষিণা দেয় রীতিমতো। 'এনকোয়ারার'-এর সম্পাদক এদের আধা-উদারপন্থী বলে অভিহিত করেছেন, এবং এ নামটি ঠিকই হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের ইংরেজী মুখপত্রের নাম 'রিফর্মার,' এবং বাঙলা ভাষায় আছে 'বঙ্গদূত' ও 'কৌমুদী' নামে দু'টি মুখপত্র।

সকলের শেষে যে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করব সেটি ক্ষুদ্রতম, কিন্তু আমাদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নানাবিধ গুণসম্পন্ন! হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন ভদ্র যুবক এই দল গঠন করেছেন; কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করাই এদের উদ্দেশ্য; প্রয়োজন হলে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। 'এনকোয়ারার' পত্রিকার সম্পাদক এবং বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক এই দলের অন্তর্গত। এঁদের মতামত যা-ই হোক, কপটতা যে নেই সে কথা জোর করেই বলা যায়। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে আপোষ করবার ভাণ দেখিয়ে সত্যকে ফাঁকি দেবার অপচেষ্টা নেই। এদের ভুল দেখিয়ে দিলে ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে সত্যকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে; কারণ দলের নেতাদের মনে গোঁড়ামি নেই, নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত। প্রধানতঃ নির্ভীক সততার জন্য দলের পরিচালকরা প্রশংসার যোগ্য। সমাজ তাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন; বিপদের আশঙ্কা এবং অত্যাচারের ভয় থাকা সত্ত্বেও শত্রু-মিত্রের নিকট সত্য মত প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। যা সত্য বলে জানে তাকে কার্যে পরিণত করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না।

— ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান, অক্টোবর, ১৮৩১ হতে এশিয়াটিক জার্ণালে উদ্ধৃত।

কর্তাভজা সম্প্রদায়

ডিসেম্বর মাসের 'ক্রিশ্চিয়ান ইনটেলিজেনসার' পত্রিকায় একজন সংবাদদাতা নতুন একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পরলোকগত জয়নারায়ণ ঘোষাল এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; পূর্বে তাঁর নিবাস ছিল খিদিরপুর; সম্প্রতি থাকতেন বারাণসী। এই দলের সভ্য-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বলে শোনা যায়। এদের বলা হয় কর্তাভজা অথবা সৃষ্টিকর্তার পূজারী। ব্রাহ্মণদের তারা দেবতা বলে মানে না, মূর্তি পূজায় তাদের আস্থা নেই, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে না, অথবা মূর্তিপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন অনুষ্ঠানই পালন করে না। সুতরাং এরা একেশ্বরবাদী; ভগবানের চিন্তাই তাদের পূজা। বেদান্তেও এই ধর্মের কথাই বলা হয়েছে। প্রতিবেশীরা কর্তাভজাদের শ্রমবিমুখ এবং পরিবারের প্রতি উদাসীন বলে অভিযোগ করে।

এরা চুল, দাড়ি কামায় না; নখও কাটে না। গোঁড়া হিন্দুরা কর্তাভজাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং সুযোগ পেলেই অত্যাচার করে। —বেঙ্গল হেরাল্ড, ৩রা জানুয়ারী, ১৮৩৫ থেকে এশিয়াটিক জার্ণালে উদ্ধৃত।

২

কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরো সংবাদ সংগ্রহ করবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। জয়নারায়ণ ঘোষাল যে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নয়, সে বিষয়ে আমাদের আর সন্দেহ নেই; পূর্বে ভুল ধারণা ছিল। অবশ্য এ কথা সম্ভবতঃ সত্য যে, জয়নারায়ণ ঘোষাল যোগ দেবার পর এই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। শ্রীরামপুরে এমন কয়েক জন দেশীয় খৃষ্টান আছে যারা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে (খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত না হতে) কর্তাভজা দলের সহিত যুক্ত ছিল। অনেক যুবক আছে যাদের মাতাপিতা ছিল কর্তাভজা। আমাদের খৃষ্টান বন্ধুদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের জন্মস্থানের অধিবাসী পণ্ডিতদের বিবরণের সঙ্গে মিলে গেছে।

হুগলী নদীর অপর তীরবর্তী ঘোষপাড়া গ্রামের অধিবাসী সদ্‌গোপ রামচরণ ঘোষ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এখনো রামচরণের পুত্র কর্তাভজাদের গুরু বলে স্বীকৃতি পান। যদিও বর্তমানে কর্মবিমুখতা ও লাম্পট্যই এই সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তথাপি আমাদের মনে হয়, প্রথমে এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু শুভ উদ্দেশ্য ছিল। মূর্তিপূজা ও ব্রাহ্মণদের অহমিকার বিরুদ্ধে হয়তো তারা বিদ্রোহ করেছিল; একমাত্র পরমেশ্বরকেই তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, যশোহরে যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা আগে থাকতেই ঘোষপাড়ার নতুন ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের নামে এদের মধ্যে যে ঘৃণিত আচরণ চলছে তা অন্তর ব্যথিত করে। কর্তাভজারা প্রত্যেকে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পায় এই হলো একটা প্রধান দাবী। কর্তাভজা হবার পূর্বে যে যে-দেবতাকে পূজা করত সেই একটি দেবতাকেই নব মতবাদে দীক্ষা নেবার পরও পূজা করতে পারে। ওদের এই দাবী কি করে স্বীকৃত হলো তার বিভিন্ন বিবরণ পেয়েছি। বিভিন্ন বিবরণ থেকে এটুকু ঠিক জানা যায় যে, আরাধ্য দেবতার মূর্তি দেখাবার জন্য একটি অন্ধকার ঘর বেছে নেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন যে, কৌশলের সাহায্যে আরাধ্য দেবতার মূর্তি এনে উপস্থিত করা হয়। আবার আর একটি মত এই যে, ভক্ত উজ্জ্বল আলোর দিকে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্ধকারে চোখ ফেরালে সামনে কতকগুলি ছায়ামূর্তি ভেসে ওঠে। আরাধ্য দেবতার মূর্তি মনে মনে চিন্তা করতে থাকলে এই ছায়াগুলি দেবতার রূপ লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের আর একটি নিয়ম—কোনোরূপ ঔষধ ব্যবহার না করা। অসুখ হলে তারা তুকতাকের সাহায্য নেয়। গল্প আছে যে, কর্তাভজাদের প্রতিষ্ঠাতা গুরুর কোনো এক মহাপুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। সেই মহাপুরুষ তাঁকে এমন এক কলসী জল উপহার দেন, যে জল যে কোনো লোক পান করলে যে কোনো রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে। সেই পবিত্র জল এখন নিঃশেষিত হয়ে গেছে; জলের পরিবর্তে এখন কি গ্রহণ করা হয় তা আমাদের জানা নেই।

যশোহর জেলার কর্তাভজা দলের অনুচরবৃন্দ দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। এদের অনেকেই দলের সঙ্গে সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। যারা গোপন করে না তাদের অবশ্য জাতিচ্যুত হবার ভয় নেই। কারণ কর্তাভজাদের এমন কোনো অনুষ্ঠান পালন করতে হয় না যা জাতির বিরুদ্ধে যেতে পারে। হিন্দু, মুসলমান, পর্তুগীজ নির্বিশেষে সকলে মিলে আহার্য গ্রহণ করতে বাধা নেই। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মমত এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। ঘোষপাড়ার মূল গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিষ্যরা মুখে মুখে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মমতকে প্রচার করে। —ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১৪ই জানুয়ারী ১৮৩৫।

ব্যাপক জালিয়াতি

সম্প্রতি জানা গেছে যে, কলকাতায় কিছু কাল যাবৎ ব্যাপক ভাবে জালিয়াতির ব্যবসা চলছে। যে সব সংবাদ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, এই জালিয়াতি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত করা হয়; এমন সব দলিলপত্র জাল করা হয় যা সহজে ধরা যায় না। জালিয়াতরা ধরা না পড়ায় তাদের সাহস বেড়ে যায়; ক্রমশঃ তারা দুঃসাহসিক হয়ে ওঠে। হুণ্ডি, নোট, প্রভৃতি যে সকল দলিলের সাহায্যে টাকার লেন-দেন হয়, এবং বিশেষ করে কোম্পানীর কাগজগুলি প্রধানতঃ জাল করা হয়। জালিয়াতির সংবাদে সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে; গত কাল খাজাঞ্চিখানায় বহু লোকের জনতা তাদের নিকট যে সব নোট আছে সেগুলি আসল কিংবা নকল জানবার জন্য ভিড় করেছিল। যদিও বহু লোক জাল নোটের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে তথাপি ক্ষতির পরিমাণ যে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে তা বিশ্বাস করবার কারণ আছে বলে আমরা মনে করি।

জাল নোটগুলির স্বাক্ষর দেখে আসল থেকে কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু অক্ষর ও অন্যান্য চিহ্ন দেখে সহজেই নকল নোট চেনা যায়।

এই সুপরিকল্পিত জালিয়াতি প্রচেষ্টার প্রধান কর্তা রাজকিশোর দত্ত এবং তার জামাতা দ্বারকানাথ মিত্র। রাজকিশোর কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার। এরা দু'জনেই আত্মগোপন করেছে। এদের গ্রেপ্তার করবার জন্য যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও আড়াই হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। রাজকিশোর ও দ্বারকানাথের পলায়নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ সংবাদ জানতে পেরে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়বেই।

রাজকিশোর দত্ত বিরাট সম্পত্তির মালিক বলে শোনা যায়। যারা জালিয়াতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা রাজকিশোরের সম্পত্তি থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে বলে আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ জাল করা কি উপায়ে বন্ধ করা যায়, সে সম্বন্ধে পথ নির্দেশ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে এক জন প্রতিভাবান শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই শিল্পীর খোদাই করা প্লেট অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হবে। যারা প্লেট দেখেছে তারাই এর প্রশংসা করছে। আমাদের বিশ্বাস যে, এই প্লেটের সাহায্যে নোট ছাপানো হলে ভবিষ্যতে জাল করা সম্ভব হবে না।

—ক্যালকাটা গেজেট, ৩০শে জুলাই, ১৮২৯

ডি. এচ. লরেন্স

সম্প্রতি ওয়াল্টার মোরেলের মেজাজ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত খিটখিটে। সারা দিনের পরিশ্রমে যেন সে নির্জীব হয়ে পড়ত বাড়ি ফিরে এসে কারু সঙ্গে ভালো-মুখে কথা বলত না। খাবার-দাবার নিয়েও তার খুঁৎখুঁৎ লেগেই থাকত। ছেলে-মেয়েরা যদি একটু গোলমাল করত, তবে সে এমন ধমক দিত তাদের যে, তাদের মায়ের রক্ত পর্য্যন্ত গরম হয়ে উঠত আর তাদেরও মনে জন্মাত অশ্রদ্ধা আর বিরাগ।

শুক্রবার রাত্রে এগারোটা পর্য্যন্তও মোরেল বাড়ি ফিরে এলো না। ছোট ছেলেটির শরীর ভালো নয়, সারাক্ষণ ছটফট করছে, শুইয়ে দিতে গেলেই কেঁদে কেঁদে উঠছে। মিসেস মোরেল সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, শরীরও এখনও অবধি সেরে ওঠেনি। তাঁর মেজাজও খুব ভাল ছিল না। নিজের মনে মনেই বিরক্ত হয়ে তিনি বলছিলেন, 'সে আপদটাও কই এখনো তো এলো না।'

কিছুক্ষণ পরে শিশুটি তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে তুলে নিয়ে দোলনায় শুইয়ে দেবার মত শক্তিও তাঁর ছিল না। মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন: আজ আর কোন কথাই নয়—যত রাত করেই আসুক না কেন! ব'লে তো শুধু নিজেরই মেজাজ খারাপ করা—আজ আর কোন কথাই বলব না। আবার ভাবলেন: কিন্তু আমার রক্ত যে গরম হয়ে ওঠে—যদি সে কিছু করে, তবে আমি তা বরদাস্ত করতে পারব না।

মোরেলের আসার শব্দ শোনা গেল। অসহ্য! মিসেস মোরেল জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। প্রায় মাতাল হয়েই বাড়ি ফিরল মোরেল। তাকে ঢুকতে দেখে, মিসেস মোরেল কোলের শিশুটির উপর ঝুঁকে পড়লেন, যেন তার দিকে চাইতেও তাঁর ইচ্ছে নেই। কিন্তু যখন চলতে চলতে সে রান্নাঘরের টেবিলটার সঙ্গে ধাক্কা খেল এবং সে আঘাতে টিনগুলো খট্‌খট্ করে উঠল—এবং তার টাল সামলাতে গিয়ে সে যখন হাতলটাকে জোরে চেপে ধরল, তখন তাঁর সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে গেল। মোরেল তার টুপি আর কোট যথাস্থানে রেখে আবার এদিকে ফিরে এলো। এসে দূর থেকেই তাঁর দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল।

মিসেস মোরেল শিশুটিকে কোলে নিয়ে মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। মোরেল জিজ্ঞেস করলে, 'কী, বাড়িতে কিছু গেলবার নেই নাকি?' তার গলার স্বর রুক্ষ এবং উদ্ধত, যেন সে কোন চাকরাণীর সঙ্গে কথা বলছে। কোন কোন সময় মাতাল হয়ে সে এমনি সংক্ষিপ্ত ও কাঠখোট্টা ধরণের (শহরে যেমন শোনা যায়) কথা বলত। মিসেস মোরেল তাকে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন সেই সময়টাতে।

—'তুমি জানো বাড়িতে কি আছে?' প্রাণহীন জবাব এলো মিসেস মোরেলের কাছ থেকে—যেন কে কাকে কথা বলছে।

মোরেল এক পাও নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে নিজের চোখ দুটোকে আরও বিস্ফারিত এবং দৃষ্টিকে আরও উজ্জ্বলতর করে তুললে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'আমি ভদ্র ভাবে প্রশ্ন করেছিলাম এবং উত্তরটাও আশা করেছিলাম ভদ্র ভাবেই।'

—'উত্তর তুমি পেয়েছ, হ্যাঁ।' মিসেস মোরেল বেপরোয়া ভাবেই জবাব দিলেন।

মোরেল টলতে টলতে এগিয়ে এল সামনের দিকে। টেবিলের উপর এক হাত দিয়ে ভর রেখে, অন্য হাতে রুটি কাটবার ছুরি বের করবার জন্যে টেবিলের দেরাজ ধরে টানতে গেল। কিন্তু মদের ঝোঁকে পাশের দিকে টানতে দেরাজটা আটকে গেল আরও শক্ত হয়ে। রাগ করে সে খুব জোরে দেরাজ ধরে টান দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দেরাজসুদ্ধ সমস্ত চামচ, কাঁটা, ছুরি ঝনঝনাৎ করে পাকা মেঝের উপর ছিটকে পড়ল। ছোট শিশুটি চমকে উঠল ঘুমের মধ্যে। ওর মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও কি হচ্ছে, বেহুঁস মাতাল আর জংলী হয়ে উঠেছ যে!'

—'তা'হলে কেন...কেন তুমি জিনিসপত্রগুলো নিজে বের করে রাখো না?...তোমায় উঠে দাঁড়াতে হবে। অন্য মেয়েরা যেমন করে, তোমারও তেমনি দাসীপণা করতে হবে।'

—'দাসীপণা করব? তোমার দাসীপণা?' মিসেস মোরেল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, 'ওঃ, বুঝতে পারছি নিজের অবস্থাটা।'

—'হ্যাঁ, আর কী করে তা করতে হয় তাও তোমাকে শেখাব। করতেই হবে, আমার খিদমৎ তোমায় খাটতেই হবে।'

—'কক্ষনো না। বরং বাইরের একটা কুকুরের খিদমৎ খাটব, তোমার নয়।'

—'কী? কী বললে?'

মোরেল দেরাজটাকে ঠিক জায়গায় রাখবার চেষ্টা করছিল। স্ত্রীর শেষ কথায় সে ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখ টকটকে লাল, চোখ জবা ফুলের মত রক্তবর্ণ। এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে সে তাকিয়ে রইল সেই জ্বলন্ত চোখে।

—'ইস!' অবজ্ঞা দেখাতে গিয়ে মিসেস মোরেল উচ্চারণ করলেন। উত্তেজনার চোটে মোরেল দেরাজ ধরে টানতে সুরু করলে। দেরাজটা খুলে এসে পড়ল তার পায়ের উপর। তার পা ছড়ে গেল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল সে, কি করছে বুঝতে না পেরেই দেরাজটা ছুঁড়ে মারল মিসেস মোরেল-এর দিকে।

দেরাজটা মিসেস মোরেলের কপালে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়ল চিমনির মধ্যে। দেরাজের একটা কোণ লেগে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, তার মনে হ'ল মূর্চ্ছিত হয়ে এখুনি তিনি মাটিতে

পড়ে যাবেন। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ মুক্তির কামনায় মাথা কুটে মরতে লাগল—শিশুটিকে সজোরে তিনি আঁকড়ে ধরলেন নিজের বুকে। কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে গেল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি স্থির করলেন নিজেকে। কোলের ছেলেটি করুণ সুরে কাঁদতে সুরু করেছে। তাঁর বাঁ চোখের জ্র উপর থেকে রক্তবিন্দু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে—মাথা ঘরছে ভীষণ ভাবে। একবার তিনি শিশুটিকে ভাল করে দেখতে গেলেন, তাঁর কপালের রক্তে ওর গায়ের শাদা কাপড়টি ভিজে যেতে লাগল। তবু ভাগ্য ভাল, ওর দেহে কোন আঘাত লাগে নি। স্থির ভাবে থাকবার জন্যে তিনি নিজের মাথাটাকে সোজা করে রাখলেন—রক্তের ধারা তাঁর চোখে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মোরেল যেমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। এক হাতে টেবিলের উপর ভর রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল এদিকে। যখন নিজের দেহের ভার বহন করবার ক্ষমতা আবার ফিরে পেল সে, তখন টলতে টলতে স্ত্রীর কাছে এসে তাঁর চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াল। সামনের দিকে নুয়ে কাঁপা-গলায় সে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার লেগেছে?' তার কথায় বিহ্বলতা আর উদ্বেগ।

আবার সে টলতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন টাল সামলাতে না পেরে সে শিশুটির উপরেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

মিসেস মোরেল হৃদয়ের স্থৈর্য্য বজায় রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। শুধু বললেন, 'সরে যাও তুমি।'

মোরেলের গলা আটকে গেল। ঢোঁক গিলে সে বললে, 'দেখি—দেখি কি হ'ল?'

—'সরে যাও বলছি।' মিসেস মোরেল চীৎকার করে বললেন।

—'আহা, দেখি না কেন কী হয়েছে?'

তার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। তার হাতের জোর টানে মনে হতে লাগল যেন চেয়ারসুদ্ধ তিনি গড়িয়ে পড়ে যাবেন। আবার চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'যাও—যাও তুমি।' দুর্ব্বল হাতে তিনি ঠেলতে লাগলেন তাকে।

মোরেল কোন রকমে নিজের টাল সামলে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস মোরেল উঠে দাঁড়ালেন, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। হেঁটে যেতে তাঁর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। তবু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করে তিনি যেন নিশিতে-পাওয়া লোকের মত ঘুমের ঘোরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। পাশের ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে ভেজাতে লাগলেন এক মিনিট ধরে। কিন্তু আবার তাঁর মাথা বেজায় ঘুরতে লাগল। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন ভেবে তাড়াতাড়ি তিনি আবার আগের সেই চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। তাঁর দেহের প্রতিটি স্নায়ু তখন কাঁপছে। নিতান্ত অভ্যাসের বশেই শিশুটিকে তখনো তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছেন।

মোরেল উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। দেরাজটাকে গর্ত্তের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রেখে, হাঁটু গেড়ে বসে সে তার অবশ হাত দুটো দিয়ে চামচগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলছিল।

মিসেস মোরেলের রক্ত তখনো বন্ধ হয়নি। একটু পরে মোরেল উঠে এসে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'দেখি গো, কোথায় লেগেছে তোমার।' অত্যন্ত বিপন্নের মত তার ভাব, অতি মোলায়েম তার গলা।

—'কোথায় লেগেছে তা তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

মোরেল কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। তার বড়ো বড়ো গোঁফে-ভরা মুখের সান্নিধ্য থেকে নিজের মুখ যত দূর সম্ভব সরিয়ে নেবার জন্যে মিসেস মোরেল একটু পিছিয়ে গেলেন। পাথরের মত নিশ্চল তাঁর মুখাবয়ব, তাতে কোন ভাবের প্রতিফলন নেই, ঠোঁট দুটি চাপা—দেখে মোরেলের কেমন যেন নিজেকে অসহায় বলে মনে হতে লাগল, তীব্র অবসাদ আর নৈরাশ্যে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। বিষণ্ণ ম'নে সে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল, এক ফোঁটা রক্ত···তাঁর পাশ-ফেরানো মুখ থেকে ঝরে পড়ল ছোট ছেলেটির নরম সোনালী চুলের উপর। যেন মেঘের কোলে একটি বৃষ্টি-বিন্দু, মোরেল মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল, সেই মাকড়সার জালের মত চলগুলো কেমন করে নুয়ে পড়ছে ওই রক্তবিন্দুটির ভারে। আবার এক ফোঁটা রক্ত টুপ করে পড়ল। শিশুটির মাথায় শুকিয়ে যাবে এই রক্ত। মোরেল তবু শুধু দেখতেই লাগল, মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে সে কল্পনা করতে লাগল কী করে রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকবে শিশুটির চুলে লেগে। অবশেষে হঠাৎ এক সময় তার সমস্ত দৃপ্ত পৌরুষ যেন ভেঙে পড়ল।

তার স্ত্রী শুধু বলেছিলেন, 'ছেলেটির দিকে চেয়ে চেয়ে কী দেখছ অমন ক'রে?' কিন্তু কী যে এক তীক্ষ্ণতা ছিল তাঁর মৃদু কণ্ঠে, মোরেলের মাথা হঠাৎ নুয়ে পড়ল। মিসেস মোরেলও নরম হয়ে গিয়ে বললেন, 'একটা কাজ কর তো'—মাঝখানকার দেরাজ থেকে আমাকে একটু তুলো বার করে দাও দিকি।'

নিতান্ত অনুগত ভক্তের মত মোরেল আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, ফিরে এলো একটু তুলো হাতে নিয়ে। তুলোটাকে আগুনে গরম করে নিয়ে, মিসেস মোরেল নিজের কপালে লাগিয়ে দিলেন, তার পর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন।

—'ওগো শুনছ, ওই পরিষ্কার ন্যাকড়ার ফালিটুকু নিয়ে এসো দেখি।' আবার মোরেল গিয়ে দেরাজ হাতড়াতে হাতড়াতে ন্যাকড়ার ফালিটা ধরলেন, তারপর মাথার চার দিকে ঘুরিয়ে ওটা বাঁধবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন—তাঁর আঙুলগুলো তখনো কাঁপছে।

—'দাও, আমি বেঁধে দিই।' মোরেল যেন অনুগ্রহ প্রার্থনা করল।

—'এ আমি নিজেই পারব।' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন। স্থাকড়াটা বেঁধে তিনি উপরে চলে গেলেন। মোরেলকে বলে গেলেন, আগুনটা ভালো ক'রে জ্বালিয়ে দরজায় তালা দিতে।

পর দিন সকালে মিসেস মোরেল সবাইকে বললেন, 'কাল রাত্রে আলো নিবে গিয়েছিল, অন্ধকারে গিয়েছিলুম কয়লাতলায়, কয়লা-তলার ছিটকিনিটার সঙ্গে লেগে গিয়ে এই দুর্দশা।'

ছোট ছেলে-মেয়ে দুটি ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে মাথার দিকে তাকাল। তারা মুখে কিছু বলল না, তবু মনে হ'ল এর বেদনা তাদের শিশু-মনকেও স্পর্শ করেছে। হাঁ করে তারা শুধু চেয়ে রইল কি এক অনির্দেশ অশুভের আভাস পেয়ে।

দুপুর অবধি মোরেল বিছানা ছেড়ে উঠল না। সে যে গত রাত্রির কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছিল তা নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে সে কিছুই ভাবছিল না। বিশেষ করে গত রাত্রির ঘটনাকে মনে স্থান দেবার ইচ্ছেও তার ছিল না। আহত পশুর মত সে শুধু মনে মনে আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করছিল। নিজেকেই সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল সে। তার আঘাত সবচেয়ে বেশী গুরুতর হয়ে উঠেছিল শুধু এই কারণেই, যে অনুতাপ করবার কিম্বা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে দুটো কথা বলবার পাত্র সে ছিল না। জোর করে কোন রকমে এর হাত থেকে পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্যেই সে বেশী ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মনে মনে সে ভেবে রেখেছিল সমস্ত দোষই তার স্ত্রীর। তার বিবেক যে ভিতরে ভিতরে তাকে দংশন করেছিল, তার সমস্ত সত্তা যে সে দংশনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, সেটা বন্ধ করবার মত কোন উপায়ই তার জানা ছিল না, শুধু মদ ছাড়া। একমাত্র মদ দিয়েই এই তীব্র জ্বালাকে সে দমিয়ে রাখতে পারত।

তার মনে হতে লাগল যেন উঠে দাঁড়াবার সমস্ত ইচ্ছা এবং শক্তি তার লোপ পেয়েছে। মুখ খুলে একটা কথা বলতেও যেন তার ইচ্ছে হচ্ছে না। নির্জীব পদার্থের মত শুধু শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন গতিই যেন নেই তার। তাছাড়া মাথার মধ্যেও কেমন তীব্র যন্ত্রণা। সে দিনটা শনিবার। দুপুরের দিকে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে রুটি কেটে নিলে নিজের জন্যে, মাথা না উঠিয়েই কোন রকমে সেটাকে গলাধঃকরণ করলে, তারপর জুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরল বেলা তিনটায়। তখন তার বেশ একটু নেশা হয়েছে এবং মনের ভার অনেকটা কেটে গেছে। বাড়িতে ফিরেই সে সোজাসুজি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যা ছ'টায় উঠে, চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল আবার।

পর দিন রবিবার। সে দিনও একই রকম। দুপুর পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকা, আড়াইটে অবধি মদের দোকান, তারপর দুপুর বেলার খাওয়া সেরে আবার শয্যার আশ্রয়। মুখে কথাটি নেই, একেবারে চুপচাপ। চারটের সময় যখন মিসেস মোরেল রবিবারের প্রার্থনার পোষাক পরবার জন্যে উপরে উঠলেন, তখনও সে অঘোরে ঘুমচ্ছে। যদি সে শুধু একটিবার বলত, 'ওগো, আমি অনুতপ্ত', তা'হলে তিনিও তার দুঃখে দুঃখিত হতে পারতেন।

কিন্তু তা তো হবার নয়। তার বদ্ধমূল ধারণা, সমস্ত দোষ তার স্ত্রীর। কাজেই, এক দিকে যেমন সে নিজেকে নিপীড়িত ক'রে তুলল, অন্য দিকে তিনিও তাকে দূরে ঠেলে রাখলেন। তাঁদের মনের রাজ্যে যেন দুঃসাধ্য সঙ্কট এসে উপস্থিত হ'ল—আর দু'জনের মধ্যে তুলনা করে দেখলে মিসেস মোরেলের মনের জোরই বেশী।

মা আর ছেলেমেয়েরা মিলে চা খেতে সুরু করলেন। এ বাড়িতে শুধু রবিবারেই সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করা চলত।

—'বাবা কি আজ আর ঘুম থেকে উঠবে না?' উইলিয়ম হঠাৎ বলে উঠল।

—'থাক না ও শুয়ে।' মায়ের কাছ থেকে জবাব পেল সে। সারা বাড়ীতে কেমন একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে শ্বাস নিয়ে নিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটিও কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। কিছু তাদের ভাল লাগে না—না কাজ, না খেলা।

ঘুম ভেঙে যেতেই মোরেল সটান বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এ তার সারা জীবনের অভ্যেস। কাজের নেশা তার রক্তে। দু'দিন যে বিনা কাজে শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছে এতে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিল।

সে যখন নীচে নেবে এল তখন ছ'টা প্রায় বাজে। আজ সে নিঃসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে পড়ল। এ দু'দিন যে লজ্জা, যে সঙ্কোচ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছিল তা দূর হয়ে তার মন আজ আবার কঠিন হয়ে উঠেছে। বাড়ির লোক তাকে নিয়ে কি ভাবছে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই তার আর নেই।

টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। উইলিয়ম ছোটদের একটি গল্পের বই 'The Child's Own' থেকে গল্প পড়ছিল, অ্যানি তাই শুনছিল আর বার বার 'কেন, কেন?' বলে প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করে তুলছিল। বাইরে বাবার মোজা-পরা পায়ের শব্দ শুনে দু'জনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। মোরেলকে ঢুকতে দেখে দু'জনেই কেমন যেন গুটিসুটি হয়ে বসল। অথচ ওদের দিকে মোরেলের আদরের অভাব সাধারণতঃ কখনোই দেখা যেত না।

মোরেল নিজের খাবার নিজেই গুছিয়ে নিলে। সে যেন বন্য পশুর মত একাকী হিংস্র জীবনযাপন করছে। অনাবশ্যক শব্দ করে মোরেল তার পানাহার সমাপ্ত করলে। তার সঙ্গে কথা বললে না কেউ। যেন পারিবারিক জীবন তার দিক থেকে সরে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছে—তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক জীবনের কলরবের যেন অবসান ঘটেছে। কিন্তু মোরেলের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই—পরিবার থেকে সে যে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তার জন্যে কোন উদ্বেগই নেই তার।

চা-পান শেষ করেই সে বেরিয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার এই হন্তদন্ত ভাব, বাইরে চলে যাবার জন্যে এই অশোভন ব্যগ্রতা দেখে মিসেস মোরেলের মন ঘৃণায় রী-রী করে উঠল। ঝপ করে সে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এল, তার পর চিরুণী দিয়ে ভেজা চুল আঁচড়াবার শব্দ পাওয়া গেল—শুনে মিসেস মোরেল গভীর বিরক্তিতে চোখ বন্ধ করে রইলেন। জুতোর ফিতে বাঁধবার সময় সে এমন বিশ্রী রকমের ব্যস্ততা দেখাতে লাগল যে, এ বাড়ির অন্যান্য লোকের ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাকে

নিতান্ত হাল্কা ধরণের লোক বলে মনে হতে লাগল। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলেই সে পিছু হটে যেত, পালিয়ে যেত। সে যতক্ষণ প্রস্তুত হচ্ছিল, ততক্ষণ ছেলে-মেয়েরা নীরবে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখছিল। সে বাইরে চলে যেতে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সেও দরজা বন্ধ করে বাইরে এসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, এমন দিনে দোকানে বসে মদ খেতে আরও বেশী আরাম। আশায় উল্লসিত হয়ে সে চলল তাড়াতাড়ি পা ফেলে। চারিদিকের বাড়িগুলোতে কালো শ্লেটের ছাদ জলে ভিজে চকচক করছে। এ-দিককার রাস্তাগুলোতে সর্ব্বদাই কয়লার গুঁড়ো জমে থাকে, এবার বৃষ্টিতে সেগুলো কালো কাদায় পরিণত হয়েছে। জোরে জোরে হাঁটতে লাগল সে। দোকানের জানালাগুলোতে জলের ছাট—ঢুকবার পথে ভেজা-পায়ের দাগ। কিন্তু ভিতরের বাতাসে উষ্ণতার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তার মধ্যে দুর্গন্ধের অভাব নেই। চারিদিকের হাসি গল্পে, বীয়ার আর সিগারেটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মোরেল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কে এক জন চীৎকার করে উঠল, 'কী হে মোরেল, তুমি কী মনে করে?'

—'কে ও, বাবা জিম্, তুমি আবার উদয় হলে কোত্থেকে?'

তারা মোরেলের জন্যে জায়গা করে দিলে, বিপুল অভ্যর্থনা করে তাকে নিয়ে বসালে নিজেদের পাশে। মোরেল খুশি হয়ে উঠল। তার মনের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত দায়িত্ববোধ, সমস্ত লজ্জা এবং জ্বালা যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উবে গেল। আজ রাত্রের সমস্তটুকু মজা লুটে নেবার জন্যে সে প্রস্তুত করে আনল নিজেকে।

এর পরের বুধবারে মোরেলের হাতে এক পেনিও অবশিষ্ট ছিল না। স্ত্রীর কথা ভেবে মনে মনে সে ভয় পাচ্ছিল। তাঁকে আঘাত দিয়ে সে তাঁকে ঘৃণা করতেও সুরু করেছিল। সন্ধ্যাবেলা হাতে কোন কাজ নেই, মদের দোকানে যাবার মত পয়সাও নেই, এর মধ্যেই অনেকবার ধার নিতে হয়েছে—মোরেল অধীর হয়ে উঠেছিল। কাজেই মিসেস মোরেল যখন শিশুটিকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন, তখন চুপিচুপি গিয়ে সে রান্নাঘরের টেবিলের উপরের দেরাজ হাতড়াতে লাগল। হাতড়াতে হাতড়াতে মিসেস মোরেলের টাকার ব্যাগ পেল; সে জানত মিসেস মোরেল ওখানেই টাকা পয়সা রাখেন। খুলে দেখলে ভিতরে একটা আধ-ক্রাউন, দু'টো আধ-পেনি আর একটা ছ'পেনি। মোরেল ছ'পেনিটা উঠিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে ব্যাগটাকে ঠিক জায়গায় রেখে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন শব্জীওয়ালাকে পয়সা দিতে গিয়ে ব্যাগ খুলেই মিসেস মোরেল চমকে উঠলেন। ছ'পেনিটা নেই···কী সর্ব্বনাশ! তারপর বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন, 'সত্যিই ছ'পেনি একটা কি ছিল? খরচ করে ফেলি নি তো? অন্য জায়গায় রাখি নি তো ভুলে?'

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তাঁর। তন্নতন্ন করে খুঁজলেন সারা বাড়ি। খুঁজতে গিয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীরই এই কাজ। ব্যাগে যা ছিল সে-টুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল। সে-টুকুও সে চোরের মত চুপিচুপি নিয়ে যাবে, এ তো সহ্য করা যায় না। আরও দু'বার এ রকম ঘটনা ঘটেছে। প্রথমবার তিনি বুঝতে পারেন নি যে এটা তাঁর স্বামীর কাজ, সেবার সপ্তাহের মাইনে পেয়ে মিসেস মোরেল বুঝতে পেরেছিলেন সমস্ত ব্যাপার। কিন্তু দ্বিতীয়বার পয়সা নিয়ে সে আর ফেরত দেয় নি।

এবার তাঁর আর সহ্য হ'ল না। সেদিন রাত্রে মোরেল তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল, বাড়ি ফিরে সে সবে খাওয়াদাওয়া সেরেছে, এমন সময় মিসেস মোরেল গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কাল রাত্রে আমার ব্যাগ থেকে ছ'পেনি নিয়েছ?'

—'আমি!' মোরেল অভিমানের ভাণ করে বললে, 'আমি নেব! তোমার টাকার ব্যাগ আমি চোখেও দেখি নি।'

সে যে মিথ্যে বানিয়ে বলছে মিসেস মোরেলের তা বুঝতে দেরি হ'ল না। আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'ওঃ, কিন্তু তুমি জানো যে তুমিই এ কাজ করেছ?'

মোরেল চীৎকার করে উঠল, 'বলছি—না, না, না। তুমি আবার আমার পেছনে লেগেছ···আবার! আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, আর আমার সহ্য হয় না!'

—'তা'হলে আমি যখন কাপড় আনতে গিয়েছিলাম, তখন তুমি আমার ব্যাগ থেকে ছ' পেনি তুলে নিয়েছিলে, এই তো?'

মোরেল বুঝতে পারলে, আর কোন আশা নেই। চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'দেখো এর শাস্তি তোমায় ভুগতে হবে।' ব'লে তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে সে জোরে জোরে পা ফেলে উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে সাজগোজ করে একটা বড় নীল রুমালের বিশাল পুঁটুলি হাতে নিয়ে সে নেমে এল নীচে। এসে বললে, 'আর শোন, এই তোমার-আমার শেষ দেখা।'

—'অমন দেখা আর আমি চাই না।' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন। মোরেল তাঁর কথা শুনে, পুঁটুলি নিয়ে বাড়ি থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ল।···উত্তেজনায় কাঁপন ধরতে লাগল মিসেস মোরেলের দেহে, কিন্তু তাঁর মনে শুধু ঘৃণা, শুধু অবজ্ঞা। তিনি ভাবতে লাগলেন —যদি সে অন্য খাদে গিয়ে কাজ নেয়, অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে ঘর পাতে—তবে? মনে মনে তিনি জানতেন সে এ সব কিছুই করতে পারবে না। তার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট এবং নিশ্চিত। তবু কোথায় যেন খটকা খচখচ করতে লাগল, মনের অতলে কে যেন দংশন করতে লাগল তাঁকে।

উইলিয়ম স্কুল থেকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কোথায় আজ?'

মা জবাব দিলেন, 'সে বলে গেছে, কোথায় চলে যাবে।'

—'ও মা, কোথায়?'

—'জানি না। নীল রুমালটাতে এক বিরাট পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে গেছে। বলে গেছে আর ফিরবে না।'

শুনেই উইলিয়ম কেঁদে ফেলল, 'ও মা, তবে আমরা কোথায় যাব?'

—'আঃ, কেন জ্বালাস, ও কি আর দূরে যাবে নাকি?'

জবাব দিলে অ্যানি। কাঁদতে কাঁদতে সে বললে, 'কিন্তু···যদি বাবা ফিরে না আসে?'

তারপর উইলিয়ম আর অ্যানি দু'জনেই বড় সোফাটায় উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মিসেস মোরেল বসে বসে শুধু হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কী বোকা যে তোরা, তোরা দু'জনেই সমান বোকা। দেখ, আজ রাত শেষ হবার আগেই সে ফিরে আসবে।'

কিন্তু ওয়া যার সে কথা শুনছে তো। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো। মিসেস মোরেল বসে থাকতে থাকতে নিছক একঘেয়েমির বশেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের এক দিক বলতে লাগল, যদি আপদ বিদেয় হয়ে থাকে তো বেঁচে যাই। আর এক দিক ছেলে-মেয়েদের ঝঞ্ঝাট পোয়াবার জ্বালায় বিরক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এখনও তাকে ছেড়ে তাঁর চলবে না। আর অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল, এমন ভাবে চলে যেতে সে পারে না।

বাগানের শেষ মাথায় কয়লা রাখবার জায়গা। সেখানে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর কেমন মনে হ'ল দরজাটার পেছনে কি যেন একটা রয়েছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি ভাল করে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন, সেই বড় নীল রুমালের পুঁটুলিটা অন্ধকারে পড়ে আছে। সেখানেই খানিকটা কয়লার উপর বসে পড়ে মিসেস মোরেল হাসিতে ফেটে পড়লেন। এত বড় পুঁটুলিটা, অথচ একেবারেই তুচ্ছ বস্তুর মত পড়ে আছে, অন্ধকারে যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে আত্মগোপন করে, ভেবে তাঁর আরও হাসি পেতে লাগল। তাঁর মন অনেকটা হালকা হয়ে উঠল।

বসে বসে ক্রমশঃ মিসেস মোরেল অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। লোকটা গেল কোথায়? তার হাতে এক কপর্দকও নেই, কাজেই যদি সে কোথাও আড্ডা দিতে বসে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই ধার বাড়ছে, তার বিল এসে উপস্থিত হবে। মরণও হয় না তাঁর—এমন বিরক্তি ধরে যায় কখনো কখনো যে মনে মনে মরণকেই তিনি কামনা করেন।···কিন্তু কী আশ্চর্য্য, লোকটার এতটুকুও সাহস নেই যে কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে বাড়ির বাইরে যায়; উঠোনের এক কোণেই সেটাকে ফেলে রেখে গেছে!

বসে ভাবতে ভাবতে রাত ন'টা বাজল। এমন সময় দরজা খুলে মোরেল এসে ঢুকল। তার মাথা নীচু, তার মুখে অসন্তুষ্টির ভাব। মিসেস মোরেল একটি কথাও বললেন না। মোরেল কোটটা খুলে রেখে জড়োসড়ো হয়ে বড়ো চেয়ারটায় বসে পড়ল বসে জুতোগুলো খুলতে সুরু করল।

এবার মিসেস মোরেল কথা বললেন। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন, 'জুতোগুলো খুলবার আগে কাপড়ের পোঁটলাটা নিয়ে এলেই তো ভাল হয়।'

মোরেল মাথাটা নীচু রেখেই চোখ তুলে চাইলে। গরজাতে গরজাতে বললে, 'তোমার ভাগ্যি ভাল, তাই আজ রাত্রে আবার আমি ফিরে এসেছি।' নাটকীয় ভঙ্গীতে সে কথাটা শেষ করলে।

—'কেন, কোথায় জায়গা পড়ে রয়েছে তোমার শুনি?' মিসেস মোরেল বললেন, 'তোমার দৌড় তো ওই উঠোনের কোণ পর্য্যন্ত, তার বেশী কাপড়ের পোঁটলাটা নিয়ে যাবার সাহসও তোমার নেই।'

মিসেস মোরেল একটুও রাগ করেন নি। মোরেলকে আজ এমন নিরীহ গোবেচারার মত দেখা যাচ্ছিল, তার উপর রাগ করা অসম্ভব। সে জুতোগুলো খুলে শুয়ে পড়বার আয়োজন করছিল।

—'তোমার রুমালে কি আছে আমি জানি নি।' মিসেস মোরেল আবার বললেন, 'তবে তুমি যদি না আনো, সকালবেলা ছেলে-মেয়েরাই ওটা কুড়িয়ে নিয়ে আসবে।'

এবার মোরেলের টনক নড়ল। বেরিয়ে গিয়ে রুমালের পুঁটুলিটা নিয়ে এলো সে। তারপর স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি উঠে গেল দোতলায়। তার অবস্থা দেখে মিসেস মোরেল আর হাসি সামলাতে পারলেন না। রুমালের পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে সে যখন সুড়-সুড় করে উপরে উঠে গেল, তখন হাসি চেপে রাখা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হ'ল। তবু অন্তরে গভীর বেদনার সৃষ্টি হ'ল তাঁর—কেন না, এক সময়ে এই মানুষকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সাড়া

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা আকাশের যত ফাঁক গলে গলে
সূর্য্যের রঙ পৃথিবীর বুকে পড়ে
আঁচল বিছান নীল সাগরের কোলে
আবির মাখানো আশিন সকাল ঝরে।

ধানের গাছেরা মাঠে মাঠে শুধু দোলে,
সবুজের সাথে কথা বলা হয় শেষ;
শেফালিকা বুঝি ধীরে ধীরে চোখ খোলে—
আকাশের নীলে কি জানি কিসের রেশ।

পাহাড়ের বুকে দেওদার বনে বনে,
বাতাসেরা বুঝি খবর বিলায়ে যায়—
সে খবর এসে মানুষের ভাঙা মনে
কি যেন কিসের আশ্বাস আঁকে হায়।

দোয়েল-পাপিয়া গাছেদের ডালে ডালে,
একমনে বসে রচে যায় কলতান—
আমার এ মন সোনালী মাঠের আলে
বারে বারে হায় শোনে যেন কার গান।

চুপ করে ওগো আর তো যায় না থাকা,
আকাশে-সাগরে কথা বলা হোলো সুরু;
মনেরে আমার যায় না তো বেঁধে রাখা—
মেঘে মেঘে বুঝি ডাক ওঠে গুরু গুরু।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

স্বামী হিসেবে সত্যিই আমি ভাগ্যবান কারণ আমার স্ত্রী আমার কাপড়-চোপড়ের বিশেষ যত্ন নেন—সানলাইট সাবানের সাহায্যে। সানলাইট সাবানের দ্রুত-উৎপাদিত ফেনা কাপড়ের সব ময়লা বার করে দেয়, **কাপড় আছড়াবার দরকার হয় না**। তার মানে আমার পয়সা বাঁচে, কারণ আমার কাপড়-চোপড় টেঁকে বেশী দিন।

সানলাইট সাবান দিয়ে সহজে ও তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে আপনার আমোদ প্রমোদের অবসর বাড়ান। সানলাইট সাবানের কার্যকরী ফেনা কাপড়ের ময়লাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেয়, আর রঙীন্ কাপড়কে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে করে তোলে।

S. 220-X52 BG

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

দিল্লী ও আগ্রা—(৩)

রাজদুর্গের মধ্যে বেগমমহল ও অন্যান্য রাজকীয় ভবন আছে। কিন্তু 'লুভের' বা 'এস্‌কিউরিয়ালের' অট্টালিকাদির মতন নয়। (১) ইয়োরোপীয় ঘরবাড়ীর গঠনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই। থাকা উচিতও নয়। কেন নয় তা আমি আগেই বলেছি। ফরাসী বা স্পেনীয় স্থাপত্যের সঙ্গে তার তুলনা করা উচিত নয়। যদি পরিবেশোপযোগী নিজস্ব আভিজাত্য তার থাকে, তা হলেই যথেষ্ট।

দুর্গের প্রবেশদ্বারের এমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। দু'টি বড় বড় পাথরের হাতি আছে দু'দিকে। একটি হাতির উপর চিতোরের রাজা জয়মলের প্রস্তর প্রতিমূর্তি, অন্যটির উপর তাঁর ভাইয়ের। এই দু'জন দুঃসাহসী বীর ও তাঁদের বীর জননী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, কারণ আকবর বাদশাহ যখন চিতোর অবরোধ করেছিলেন তখন তাঁরা অমিতবিক্রমে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা অতুলনীয়। (২) সেই প্রতিরোধ যখন চূর্ণ হয়ে গেল, যখন দেশরক্ষার আর কোন উপায় রইল না, তখন তাঁরা তাঁদের জননীসহ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তবু তাঁরা উদ্ধত শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। মাথা উঁচু ক'রেই তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। তাঁদের এই অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই তাঁদের শত্রুরা এই মর্মরমূর্তি তৈরী করেছিল। যখনই আমি এই দু'টি হাতির পিঠে এই দুই বীরের মর্মরমূর্তির দিকে চেয়ে দেখি, তখন আমার এক অনুভূতি জাগে মনে, যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

এই প্রবেশদ্বার দিয়ে নগরদুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে একটি সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায় সামনে। রাস্তাটির (দিল্লীর প্রাচীন 'চান্‌নি চক্' নামে রাস্তাটি) মাঝখান দিয়ে একটি জলের খাল ব'য়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে লম্বা উঁচু বাঁধ, প্রায় পাঁচছয় ফুট উঁচু এবং চার ফুট চওড়া। বাঁধের পাশেই সারিবদ্ধ তোরণ রাস্তা বরাবর চলে গেছে। এই বাঁধের উপরেই বাজারের রাজকর্মচারীরা তাঁদের খাজনা ট্যাক্স শুল্ক ইত্যাদি আদায় করেন এবং রাস্তার উপর দিয়ে ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি চলাচল করে। মনসবদাররা ও নিম্নপদস্থ ওমরাহরা বাঁধের উপর ঘোড়ায় চ'ড়ে পাহারা দেন। খালের জল বেগমমহলের অন্দরে পর্যন্ত চলে গেছে। নানা জায়গার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়ে খালের জল দুর্গের বাইরের পরিখায় গিয়ে পড়েছে। খালটি দিল্লীর প্রায় পাঁচছয় লীগ দূর থেকে যমুনা নদী থেকে, বিশেষ যত্ন ও মেহনৎ ক'রে, কেটে আনা হয়েছে। অনেক মাঠের উপর দিয়ে, পাথরে মাটির বুক চিরে এসেছে খালটি। (৩)

অন্য দুর্গদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলে আরও একটি লম্বাচওড়া রাস্তা দেখা যায়। তারও দু'দিকে বেশ উঁচু ও প্রশস্ত বাঁধ দেওয়া আছে। কেবল বাঁধের পাশে সারবন্দী তোরণের বদলে আছে দোকান।

---

(১) ফার্গুসন সাহেব তাঁর "The History of Indian Architecture" গ্রন্থের মধ্যে (১৮৭৬ সং) বলেছেন: "দিল্লীর রাজপ্রাসাদ প্রাচীর সমস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, এমন কি, সারা পৃথিবীর রাজপ্রাসাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এমন সুন্দর স্থাপত্যের পরিকল্পনা রাজপ্রাসাদ নির্মাণে আর অন্য কোথাও দেখা যায় না।" মোগল সম্রাটের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে হারেম, বেগমমহল ও অন্যান্য গোপন বিভাগাদির যে আয়তন ছিল এবং যতটা স্থান জুড়ে ছিল, ইয়োরোপের সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদেরও ততটা বিস্তৃতি ছিল না! আকারে, আয়তনে, বৈচিত্র্যে, ঐশ্বর্যে ও পরিকল্পনায় দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য ছিল।

(২) আকবর চিতোর অবরোধ ক'রে অধিকার করেছিলেন ১৫৬৮ সালে। এই মর্মরমূর্তি দু'টির বিস্তৃত বিবরণ ও ইতিবৃত্ত কৌতূহলী পাঠকরা H. G. Keene-এর A Handbook for Visitors to Delhi and its Neighbourhood (৪র্থ সং) গ্রন্থের মধ্যে (Appendix 'A') পাবেন। মর্মরমূর্তি দু'টি এখন দিল্লীর মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে এবং হাতি দু'টির একটি সাধারণ উদ্যানে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় হাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৮৬৩ সালে হস্তিসহ এই মর্মরমূর্তি দু'টি দুর্গের মধ্যস্থ আবর্জনাস্তূপের তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয়।

(৩) দিল্লীর এই বিখ্যাত "কেন্সাল" বা খালটি আলি মর্দান খাঁ কাটিয়েছিলেন। আলি মর্দান খাঁ সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন এবং দক্ষতার জন্য তিনি কাবুল ও কাশ্মীরের গবর্ণর হয়েছিলেন। জনকল্যাণকর কাজে (Public Works) তাঁর মতন উদ্যোগী শাসক তখন খুব অল্পই ছিলেন। অনেক কীর্তি তাঁর আছে, তার মধ্যে দিল্লীর এই খালটি একটি। ১৬৫৭ সালে তিনি মারা যান।

রাস্তাটি আসলে একটি বাজারই বলা চলে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, কারণ রাস্তাটির উপরে ছাদ আছে। আলোবাতাসের অভাব নেই। ছাদের মধ্যে যথেষ্ট বড় বড় ফাঁক আছে আলোবাতাস ঢোকার জন্ম।

এই দু'টি প্রধান রাস্তা ছাড়াও, নগরদুর্গের মধ্যে, ডাইনে-বামে, আরও অনেক ছোট ছোট রাস্তা আছে। সেই সব রাস্তা দিয়ে ওমরাহদের বাসাঞ্চলে যাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা ক'রে ওমরাহরা প্রত্যেকে সেখানে পাহারা দেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পালা পড়ে প্রত্যেকের। যেখানে ওমরাহরা এইভাবে পাহারা দেন, সেই স্থানগুলি সত্যিই খুব মনোরম। নিজেরা খরচ ক'রে তাঁরা সেই স্থান সাজান। প্রশস্ত উঁচু বাঁধ বা ঘরের মতন জায়গা, চারিদিকে তার ফুলবাগান, ছোট ছোট জলের খাল, ঝরণা ইত্যাদি। যাঁরা গার্ড দেন অর্থাৎ পাহারাদার ওমরাহরা সম্রাটের কাছ থেকে খাদ্য পান। যথাসময়ে রাজপ্রাসাদ থেকে খাদ্য আসে এবং যথারীতি আদবকায়দা সহকারে ওমরাহরা সেই খাদ্য ভোজনের জন্ম গ্রহণ করেন। খাদ্যের থালার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে তাঁরা তিনবার সেলাম করেন এবং কুর্ণিশের ভঙ্গীতে ওঠানামা ক'রে খাদ্যের পাত্রটি হাত পেতে গ্রহণ করেন। (৪)

এই রকম আরও অনেক বড় বড় উঁচু বাঁধ ও তাঁবু আছে নগরের মধ্যে। সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের লেনদেন ও আফিসের কাজকর্মের স্থান হিসেবে সেগুলি ব্যবহার করা হয়।

বড় বড় হলঘর অনেক জায়গায় দেখা যায়। তাকে 'কারখানা' (৫) বলে। কারিগরদের ওয়ার্কশপের নাম কারখানা। কোন হলঘরে দেখা যায় সূচিশিল্পের কাজ হচ্ছে, মাষ্টার তদারক করছেন। কোন হলঘরে স্বর্ণকাররা কাজ করছে, কোথাও চিত্রকররা। কোথাও বার্ণিশ, পালিশ ও লাক্ষার কাজ হচ্ছে। কোথাও চর্মকার, দরজী ও সূত্রধররা কাজ করছে। কোথাও কাজ করছে রেশম-ব্রকেডের কারিগররা, কোথাও সূক্ষ্ম মসলিন ইত্যাদি কাপড় তৈরী হচ্ছে। তাই দিয়ে শিরোপা, কোমরবন্ধ, কামিজ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে কোথাও, সোণালি ফুলের ঝালর দেওয়া ও বিচিত্র কারুকাজ করা। মেয়েদের পোশাক তৈরী হচ্ছে কোথাও, এত সূক্ষ্ম যে একরাত্রির বেশী হয়ত ব্যবহার করা চলে না। এই ধরনের একরাত্রির পোশাক, কয়েকঘণ্টার পোশাক, সূক্ষ্ম সূচের কারুকার্যের জন্ম হয়ত দশবারো ক্রাউন পর্যন্ত দামে বিক্রী হতে পারে।

কারিগররা প্রতিদিন সকালে উঠে কারখানায় যায় এবং সারাদিন কারখানায় খেটে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আসে। এইভাবে কারখানার নির্জন হলঘরের কোণে সকলের অগোচরে একাগ্রচিত্তে মেহনৎ ক'রে, তাদের জীবনের দিনগুলি কেটে যায়। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব'লে কারও কোন কিছু থাকে না এবং নিজেদের জীবনযাত্রার কোনরকম উন্নতির জন্মও কেউ সচেষ্ট হয় না। যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তারা জন্মায়, সেই অবস্থার মধ্যেই তারা সারাজীবন একভাবে থাকে। সূচিশিল্পী যে সে তার পুত্রকেও সূচিশিল্পে শিক্ষা দেয়, স্বর্ণকার যে সে তার পুত্রকে করে স্বর্ণকার এবং শহরের বৈদ্য যে সে তার পুত্রকেও বৈদ্য করতে চায়। সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যেই সকলে বিবাহাদি করে। এই সামাজিক বিধি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কারিগররা কঠোরভাবে পালন করে। এর কোনরকম ব্যতিক্রম আইনের চোখে পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সামাজিক বিধানের ফলে অনেক সুন্দরী মেয়েদেরও আজীবন হয়ত অবিবাহিত কুমারী জীবন যাপন করতে হয়, কারণ সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময় ভাল পাত্র পাওয়া যায় না এবং সেক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী উচ্চ-বা-নিম্নস্তরের কোন কারিগরগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহও সম্ভবপর নয়। (৬)

'আমখাসের' কথা বলি। আমখাসের (যে দরবারগৃহে সম্রাট প্রজাদের দর্শন দেন) কথা সত্যই ভোলা যায় না। এই সব রাস্তাঘাট, বাঁধ তোরণ ইত্যাদি পার হয়ে অবশেষে আমখাসে এসে পৌঁছতে হয়। সুন্দর গঠন এই আমখাসের, স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চমৎকার। বিশাল চতুষ্কোণ কোর্ট একটি, অনেকটা আমাদের 'প্লেস রয়ালের' মতন, চারিদিকে তার তোরণ দিয়ে ঘেরা। তোরণের উপরে কোন ঘরবাড়ী কিছু নেই। তোরণের মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করার জন্ম দরজা আছে। কোর্টের একদিকে মাঝখানে একটি খোলা উঁচু জায়গা আছে, তার উপর 'নাকাড়াখানা'। যেখান থেকে বাদ্যকাররা নাকাড়া বাজায় তাকে 'নাকাড়াখানা' বলে। নাকাড়াখানায় কাড়া-নাকাড়া দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্য থাকে এবং বাদ্যকাররা দিন-রাত্রির নির্দিষ্ট ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানারকম সঙ্কেতধ্বনির জন্ম সেগুলি

(৪) মনসব, জায়গীর, খিলাৎ, হাতি ঘোড়া ইত্যাদি উপহার, যা কিছু হোক, সম্রাটের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময় তিন বার সেলাম করাই হ'ল প্রথা (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকওবরী'—১ম খণ্ড, ১৫৮)।

(৫) মোগলযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানতে হ'লে এই 'কারখানাগুলি' সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বার্নিয়েরের মতন বিচক্ষণ পর্যটক স্বচক্ষে এই সব কারখানার কাজকর্ম-প্রণালী দেখেছিলেন এবং তাঁর বিবরণও অত্যন্ত মূল্যবান। বার্নিয়ের ছাড়া তাভার্নিয়েই (Tavernier), মানুচ্চি (Manucci) প্রমুখ পর্যটকরাও তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে এইসব কারখানার বিবরণ দিয়ে গেছেন। 'আইন-ই-আকবরীতেও' এইসব কারখানার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ২৬টি প্রধান কারখানার স্বতন্ত্র বিবরণ ছাড়াও আরও ১০টি কারখানার উল্লেখ আছে—অর্থাৎ মোট ৩৬টি কারখানার কথা আছে। অন্যান্য অনেক মূলগ্রন্থেও পাণ্ডুলিপি থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে মোগলযুগের 'কারখানা' সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর "Mughal Administration' গ্রন্থের মধ্যে (৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৫-১৭৫)।

(৬) কারিগররা বিভিন্ন 'গিল্ডে' বিভক্ত ছিল পেশানুযায়ী। 'গিল্ডের' সামাজিক বিধিনিষেধ কতকটা আদিম 'ক্ল্যানের' (Clan) মতন ছিল—অর্থাৎ আধুনিক যুগে আমরা যেমন 'স্বজাতি' বা 'গোত্র' বলি তার মতন। মধ্যযুগীয় সমাজের এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বত্র।

বাজায়। বিদেশী ইয়োরোপবাসীর কাছে নাকাড়াখানার বাদ্যকারদের এই বাজনা বিচিত্র ব'লে মনে হয়, কারণ বিশপঁচিশ জনের একত্রে এই বাজনা শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। বড় বড় শানাই, কাড়া-নাকাড়া ও মন্দিরা যখন একত্রে বাজতে থাকে তখন বাস্তবিকই অদ্ভুত শোনায়। শানাইয়ের আকার কি? একটি শানাই দেখেছি, নাম তার 'কর্ণ', বিশাল লম্বা এবং নীচের চাবিকাঠিগুলি প্রায় একফুট জুড়ে রয়েছে। কাঁসা ও লোহার মন্দিরাগুলি খুব বড় বড়। আওয়াজ তার কিরকম হ'তে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায় এবং নাকাড়াখানা থেকে এই সব বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত শব্দ যে কতখানি জোরালো হ'তে পারে, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমি প্রথম দিন এই বাজনা শুনে রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার কাণ এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এই কাড়া-নাকাড়া শানাই-মন্দিরার ঐকবাদন আমার কাছে অপূর্ব শ্রুতিমধুর ব'লে মনে হয়। রাত্রে বিশেষ ক'রে যখন দূরে কোন অট্টালিকা-শীর্ষের শয়ন-কক্ষে আমি শুয়ে থাকি, তখন দূর-থেকে-ভেসে-আসা নাকাড়াখানার এই ঐকবাদন আমার কাছে সুন্দর, সুগম্ভীর ও সুরৈশ্বর্যময় ব'লে মনে হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই অবশ্য। কারণ বাদ্যকাররা সকলেই প্রায় বাল্যকাল থেকে বাদ্যচর্চা ও সুরচর্চা করে, সুরের তালতান, মীড়-মূর্ছনায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে। সেইজন্য এই সব বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র শব্দধ্বনি ও সুরের মিশ্রণে তারা চমৎকার শ্রুতিমধুর ঐকতান রচনা করতে পারে এবং দূর থেকে তা শুনতে এত ভাল লাগে যে বলা যায় না। নাকাড়াখানা সম্রাটের প্রাসাদ থেকে দূরে তৈরী করা হয় এবং উঁচু মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সম্রাট বাজনার সুর শুনতে পান, অথচ তার তীব্রতা বা কটুতা (কাছে থাকার জন্য) তাঁর কাণে না পৌঁছয়।

সিংহদরজার উল্টো দিকে, কোর্ট পার হয়ে, সামনে বিরাট একটি হলঘর। হলঘরের মধ্যে সারবন্দী স্তম্ভ এবং ছাদ ও স্তম্ভ দুইই সুন্দরভাবে চিত্রিত, সোনার কাজ করা। অপূর্ব দেখতে। জমি থেকে বেশ উঁচুতে হলঘরটি তৈরী, প্রচুর আলোবাতাস খেলে। তিনদিক খোলা, বাইরের চত্বরটির দিকে। মধ্যে একটি প্রাচীর, তার ওপাশে বেগমমহল। প্রাচীরের মধ্যস্থলের কাছাকাছি মানুষের চেয়েও উঁচু একটি বেদীমঞ্চ এবং সেখানে জানালার মতন একটি বড় গবাক্ষ আছে। সেইখানে সম্রাটের সিংহাসন। প্রতিদিন প্রায় মধ্যাহ্নকালে সম্রাট সেই সিংহাসনে এসে একবার করে বসেন, দক্ষিণে ও বামে রাজকুমাররা ব'সে থাকেন। খোজারা পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরের পাখা ও চামর দিয়ে হাওয়া করে। কেউ কেউ বিনম্র ভঙ্গীতে দাসানুদাসের মতন সব সময় তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করে, কখন কি আদেশ হয় সেই জন্য। রাজসিংহাসনের ঠিক নীচে একটি স্থান আলাদা রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকে, পদস্থ আমীর-ওমরাহ দেশীয় রাজা ও বিদেশী রাজদূতদের জন্য। তাঁরা সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, নীচের দিকে চোখ নামিয়ে, ঘাড় হেঁট ক'রে, হাত দু'খানি সামনের দিকে ক্রস্ ক'রে। আরও একটু দূরে মনসবদাররা ও সাধারণ ওমরাহরা দাঁড়িয়ে থাকেন, ঠিক ঐ একই ভঙ্গীতে, নতশিরে। বাকি জায়গায়, হলঘরে ও চত্বরে সবরকমের লোক থাকে, নানা স্তরের ও নানাশ্রেণীর লোক,—পদস্থ ও সাধারণ, ধনী ও নির্ধন। সকলেরই সেখানে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ এই হলঘরেই মোগল সম্রাট প্রতিদিন একবার করে সকলকে দর্শন দেন, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নির্বিশেষে। সেইজন্যই এই হলঘরের নাম "আমখাস", অর্থাৎ সর্বসাধারণের রাজদর্শন-গৃহ।

রাজদর্শনের অনুষ্ঠানটি প্রায় দেড়ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা ধ'রে চলতে থাকে। অশ্বশালার ভাল ভাল ঘোড়াগুলিকে সিংহাসনের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কারণ সম্রাট স্বচক্ষে দেখতে চান, তাদের কি অবস্থায় কেমন যত্নে রাখা হয়েছে না-হয়েছে। অশ্বশালার ঘোড়ার পর পিলখানার হাতিরা মন্থরগতিতে চ'লে যায় সিংহাসনের সামনে দিয়ে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব হাতি, কালো কুচকুচে রঙ করা, কপাল থেকে শুঁড়ের ডগা পর্য্যন্ত দু'টি লাল রঙের রেখা অঙ্কিত। সুন্দর সব কারুকাজকরা নানারঙের কাপড়চোপড় দিয়ে হাতিগুলি সাজানো। দু'টি বড় বড় রূপোর ঘণ্টা পিঠের দু'পাশে রূপোর শিকল দিয়ে ঝুলানো থাকে এবং কাণের দু'পাশ দিয়ে তিব্বতী গরুর সাজা লেজ লম্বাকারে বাঁধা থাকে গুম্ফের মতন। হাতিগুলি এক অপূর্ব দৃশ্য রচনা করে। দু'টি ছোট ছোট হাতি তার মধ্যে সবচেয়ে জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে অন্য সব বড় বড় হাতির সামনে এমনভাবে ন'ড়েচ'ড়ে বেড়ায় যে দেখলে মনে হয় যেন তারা বড় হাতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, প্রভুদের হুকুমের অপেক্ষা করছে। পোশাক-পরিচ্ছদ হাতিরই সবচেয়ে জমকালো এবং মনে হয় সে সম্বন্ধে যেন তারা বেশ সচেতন। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়েই যেন তারা নিজেদের জামাকে হেলেদুলে হোমরাচোমরাদের মতন চলতে থাকে। চলতে চলতে যেমন একে-একে তারা সম্রাটের সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ায়, অমনি মাহুত ডাঙ্গুশের একটি ঘা মেরে, পিঠের উপর শুয়ে পড়ে কাণে কাণে কি যেন তাদের ব'লে দেয় মনে হয়। চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একটি জানু বাঁকিয়ে নত হ'য়ে, কপালের দিকে শুঁড় উঁচুতে তুলে, গর্জন ক'রে ওঠে হাতি। অর্থাৎ সম্রাটকে হাতিও সশ্রদ্ধ সেলাম জানায়।

হাতির পর অন্যান্য জন্তুদের পালা। পোষা হরিণের দল যায়, হরিণের লড়াই দেখার জন্য সম্রাট অনেক রকমের হরিণ পোষেন। নীলগাই, গণ্ডার যায়। বাংলাদেশের বড় বড় মহিষ যায়, লম্বা লম্বা পাকানো তাদের শিঙ। এই শিঙ দিয়ে তারা বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করে, সম্রাট দেখে আনন্দ পান। পোষা প্যান্থার ও চিতাবাঘ যায়, হরিণ শীকারের জন্য যত্ন ক'রে পোষা। উজবেকিস্থানের সব ভাল ভাল খেলোয়াড় শীকারী কুত্তা যায়, প্রত্যেকটি কুত্তার পায়ে একটি ক'রে লালরঙের কোর্তা জড়ানো। সবার শেষে নানারকমের শীকারী পাখী ও বাজপাখী যায়, শুধু পাখী খরগোস ইত্যাদি শীকারেই যে তারা অভ্যস্ত তা নয়, হরিণ পর্যন্ত শীকারেও নাকি ওস্তাদ। বন্য হরিণের ঘাড়ের উপর বিদ্যুৎবেগে ছোঁ দিয়ে প'ড়ে এবং হরিণের মাথাটি ঠুকরে ঠুকরে ঘায়েল ক'রে দেয়। বড় বড় ডানা ঝাপটে তাদের দিশাহারা ক'রে দিয়ে ধারালো থাবায় আঁচড়ে ধরাশায়ী করে।(৭)

---

(৭) নানারকম শীকারের, শীকারী-জন্তুর ও শীকারী-পক্ষীর চমৎকার বিবরণ আছে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে। কৌতূহলী পাঠকরা 'আইন-ই-আকবরীর' (ব্লকম্যান অনূদিত ও Phillot

জন্তু জানোয়ারের এই বিচিত্র শোভাযাত্রা ছাড়াও, দু'চারজন ওমরাহের অশ্বারোহী সেনারাও সামনে দিয়ে যায়। অশ্বারোহী সৈন্তরা ভাল ভাল পোশাক প'রে থাকে, এবং সেদিন ঘোড়াগুলিকে নানারঙের রঙিন সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

আর একটি দৃশ্য দেখতে সম্রাট ভালবাসেন, তলোয়ার দিয়ে মৃত মেষ কাটার দৃশ্য। মৃত মেষটির নাড়ীভুঁড়ি ছাড়িয়ে, চারপা বেঁধে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসা হয়। তরুণ ওমরাহ, মনসবদার ও গুর্জ-বরদাররা নিজেদের কারদানি ও শক্তি দেখাবার জন্ত মেষটিকে এককোপে এফোঁড়-ওফোঁড় করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এত সব বিচিত্র অনুষ্ঠান-পর্ব গৌণ ব্যাপার মাত্র। আসল কাজ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের নিজে একবার দেখেন তো নিশ্চয়; গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকে তিনি প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতেও চান। নিজে সব স্বচক্ষে তদারক করেন এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কারও তনখা ও পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেন, কারও বা কমিয়ে দেন, কাউকে আবার নোকরি থেকে বরখাস্তও করেন। আমখাসে সমবেত প্রজাদের মধ্য থেকে যেসব আর্জি-আবেদনপত্র পেশ করা হয়, সেগুলি সম্রাটের কাছে এনে, তাঁর সামনেই পড়া হয়, যাতে তিনি শুনতে পান। তারপর আবেদনকারীদের প্রত্যেককে একে-একে সম্রাটের সামনে ডাকা হয়, তিনি নিজে স্বচক্ষে তাদের দেখেন এবং সামনা-সামনি অনেক সময় অধিকাংশ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেন। অন্যায়ের জন্য অপরাধীদের দণ্ডও দেন। সপ্তাহে একদিন নিভৃতে ব'সে তিনি সাধারণ প্রজাদের ভিতর থেকে দশজনের আবেদনপত্র নিজে বিচার করেন। আদালতখানাতেও সপ্তাহে একদিন ক'রে যান এবং সেখানে সাধারণত: দু'জন কাজীর সঙ্গে ব'সে আবেদন-অভিযোগের বিচার করেন। সম্রাটের এই কাজগুলি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এশিয়ার সম্রাটদের বর্বরতা ও অবিচার সম্বন্ধে আমাদের মতন বিদেশীদের যে ধারণা, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমখাসের অনুষ্ঠানাদির যে বিবরণ দিলাম তা নিন্দনীয় নিশ্চয় নয়। তার মধ্যে যুক্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ব্যাপার আমার কাছে অতি জঘন্য ও অসহ্য ব'লে মনে হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। সেটা হ'ল, মোসাহেবি, স্তোকবাক্য ও প্রশস্তি। সম্রাটের মুখ দিয়ে যখনই কোন একটি কথা বেরোয়, তা সে যেকথা বা যত নগণ্য কথাই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোকসভায় তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হ'তে থাকে। প্রধান ওমরাহরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আশমানের দিকে হাত বাড়িয়ে, দেবতার আশীষপ্রার্থীর মতন, কাতরকণ্ঠে "কেরামৎ, কেরামৎ" ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। অর্থাৎ প্রভু কি কথাই বললেন, কেউ আর কোনদিন এমন কথা বলেননি, বলবেনও না কোনদিন! কি আশ্চর্য কথা! কি সুবিচার! কি দূরদৃষ্টি! পারস্যভাষায় একটি লোকপ্রবাদ আছে, তার অর্থ

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের "শীকার" ও "আমোদ-প্রমোদ" সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি পড়তে পারেন (পৃ: ২৯২-২৯৬, এবং পৃ: ৩০৮-৩১৩)।

হ'ল: "শাহ্ যদি বলেন দিনটাকে রাত, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা বলবেন, আহা! কি সুন্দরই না চাঁদ উঠেছে আকাশে, কি চমৎকার তারার ঝলমলানি!" মোগল দরবারেও ঠিক তাই হয়।

স্তাবকতা ও মোসাহেবি যেন অস্থিমজ্জায় সকলের মিশে রয়েছে, সর্বস্তরের লোকের মধ্যে। যদি কোন মোগলের আমার কাছে কোন কাজ থাকে, তাহ'লে তিনি আমার মতন ব্যক্তিকেও বলবেন—"আপনি? আপনার মতন লোক আর দেখা যায় না। আপনি আরিস্ততল, আপনি হিপোক্রেটিস্, আপনিই বর্তমান যুগের আবিসিন্না-উজ্-জমান্। প্রথম প্রথম আমি তো ঘাবড়েই যেতাম এবং আমার সহানুভূতি-প্রার্থীদের আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে, আমি কিছুই নই, সামান্য একজন লোক মাত্র; আমার এমন কিছু বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা নেই যে ঐ সব মহান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করা যেতে পারে। কিন্তু দেখলাম শেষ পর্যন্ত যে আমার অনুনয়-বিনয়ে কোন কাজ হয় না, বরং উল্টো ফল ফলে, এবং স্তাবকতা ক্রমে বাড়তেই থাকে। সুতরাং কাণটাকে ক্রমে অভ্যস্ত ক'রে নেওয়াই ঠিক করলাম এবং তাঁদের কোন স্তোক বাক্যেই আর আমার মনে এখন কিছুই হয় না। এখানে একটি ছোট কাহিনী উল্লেখ করব। বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ না ক'রে পারছি না। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আমি আমার আগা সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। আগা সাহেবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীরপুরুষদের সঙ্গে তুলনা ক'রে, নানারকমের সব আজগুবি চাটুবাক্য বর্ষণ ক'রে, পণ্ডিত মশায় শেষকালে বললেন তাঁকে: "আপনি যখন, আগা সাহেব, আপনার অশ্বারোহী সেনার আগে-আগে ঘোড়ার পিঠে জিনে পা' লাগিয়ে চলতে থাকেন, তখন মনে হয় যেন আপনার পায়ের তলায় মেদিনী পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। যে আটটি হাতির মাথার উপর মেদিনীটা অবস্থান করছে, তারা আর তখন আপনার ভার সইতে না পেরে মাথা নাড়তে থাকে এবং মেদিনী টলমল ক'রে ওঠে"। পণ্ডিতের এই চাটুবাক্যের বর্ষণ শেষ হবার পর শ্রোতাদের মনে কি তার প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তা বুঝতেই পারছেন। আমি তো হো হো ক'রে সজোরে হেসে উঠলাম। আগা সাহেবকে আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম: "আপনার উচিত আরও সাবধানে ঘোড়ায় চড়া, কারণ আপনার ঘোড়ায় চড়ার জন্যে যদি ভূমিকম্প হয়, তাহ'লে তো মারাত্মক ব্যাপার!" আগা সাহেব বুদ্ধিমান ও রসিক ব্যক্তি। আমার কথার উত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন: "তা তো বটেই! সেইজন্যই তো পারতপক্ষে আমি ঘোড়ায় চড়ি না, পাল্কিতে চ'ড়ে বেড়াই!"

আমখাসের বিশাল হলঘরের ভিতর দিয়ে আর একটি নিভৃত ঘরে যাওয়া যায়, তার নাম "গোসলখানা"।(৮) গোসলখানা হাতমুখ ধোওয়া ও স্নানাদি করার ঘরকে বলা হয়। গোসলখানায় অবশ্য সকলের প্রবেশ নিষেধ, এবং তার আয়তনও আমখাসের মতন

(৮) "গোসলখানা" স্নান-প্রক্ষালনাদির গৃহ হ'লেও, সম্রাটের গোপন সভাকক্ষও বটে। গোপনে ও নিভৃতে যেসব বিষয় রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, তা আমখাসের বদলে গোসলখানাতে বসেই করা হ'ত। মোগলযুগের প্রচলিত রীতি ছিল তাই।

বিশাল নয়। তা না হ'লেও ঘরটি বেশ বড়, হলঘরের মতন এবং চমৎকারভাবে রঙিন চিত্র ও নক্সায় সুশোভিত, দেখতে অতি সুন্দর ও মনোরম। চারপাঁচ ফুট উঁচু ভিতের উপর তৈরী, বড় প্ল্যাটফর্মের মতন। সাধারণতঃ, এই গোসলখানার নির্জন কক্ষে সম্রাট একটি চেয়ারে ব'সে, আমীর-ওমরাহ পরিবেষ্টিত হয়ে, সঙ্গোপনে রাজ্যের বিবরণাদি শোনেন, জরুরী আরজি-আবেদনপত্রাদির বিচার করেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সলাপরামর্শ করেন। সকালের দিকে আমখাসে যেমন ওমরাহরা উপস্থিত থাকেন, তেমনি সন্ধ্যার দিকে গোসলখানায় তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয়। দু'বেলা হাজিরা দিতে তাঁরা বাধ্য, তা না হ'লে তাঁদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রতিদিন দু'বেলা, আমখাসে ও গোসলখানায়, হাজিরা দেওয়া তাঁদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। একজন ব্যক্তি কেবল এই দৈনন্দিন বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রভু আগা সাহেব, দানেশমন্দ খাঁ। তাঁকে স্বাধীনতা দেবার কারণ হ'ল, সম্রাট তাঁকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী বিচক্ষণ ব্যক্তি ব'লে মনে করেন এবং সেইজন্য তাঁকে দৈনন্দিন দরবারী রীতিনীতি মানতে বাধ্য করেন না। সেইসময়টা তাঁকে অধ্যয়নাদির জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। সপ্তাহে একদিন মাত্র, প্রতি বুধবারে তাঁকে আমখাসে ও গোসলখানায় একবার হাজিরা দিতে হয় এবং ঐদিনই তাঁর উপর গার্ড দেওয়ার ভার পড়ে। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার ক'রে রাজসভাগৃহে হাজিরা দেবার এই প্রথা খুব প্রাচীন। কোন আমীর এই প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না, কারণ সম্রাট নিজেও দু'বেলা এই ভাবে নিয়মিত হাজিরা দেন এবং দেওয়া তাঁর অন্যতম কর্তব্য ব'লে মনে করেন।(১) বিশেষ গুরুতর কোন ব্যাপার না ঘটলে, অথবা অসুখবিসুখ না হ'লে, সম্রাট নিজে দু'বেলা যথারীতি আমখাসে ও গোসলখানায় তাঁর দৈনন্দিন রাজকার্যের জন্য উপস্থিত হন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব যখন সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হয়েছিলেন, তখনও তাঁকে প্রতিদিন অন্তঃপুর থেকে শায়িত অবস্থায় হয় আমখাসে, না হয় গোসলখানায়, যে কোন এক সভাগৃহে একবার ক'রে বহন ক'রে নিয়ে আসা হ'ত। তিনি নিজে এইভাবে অন্ততঃ দৈনিক একবার ক'রে বাইরের সকলের সামনে 'দর্শন' দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন। কারণ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন এমন ভয়াবহ ছিল যে একদিন তিনি দর্শন না দিলেই বাইরে তাঁর মৃত্যুর গুজব পর্যন্ত রটনা হ'তে পারত এবং গণবিদ্রোহ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত।

[ক্রমশঃ।

(১) প্রতিদিন দু'বার ক'রে সভাগৃহে সম্রাটের দর্শন দেবার এই রীতির কথা "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে, (আইন-ই-আকবরী—১ম খণ্ড, ১৫৭)।

কাশফুল

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন হঠাৎ ফুল নিয়ে এলো তপতী···
চাঁদ চুরি করা মেঘের মতন আলো
কে জানে কখন ছড়ালো যে চোখে-মুখে,
হুট্ করে এলো ঘরের ভেতরে ঢুকে,
টেবিলে লিখছি, সামনেতেই দাঁড়ালো।
এক গোছা ফুল হাতে ছল ছল করে,
কাশফুল এক গোছা,
মনে হ'ল ওরা এক্ষুনি কাঁদছিল,
এক্ষুনি চোখ মোছা···
বললে :-শুনেছি কথায় কথায় আগে,
কাশফুল নাকি আপনার ভালো লাগে ?—
দুর্গম পথে পাহাড়ী নদীর ধারে
দেখতে পেয়েছি, কুড়িয়ে এনেছি তাই,
এদের প্রণামে আপনার টেবিলেতে,
আজকে সকালে তপতীকে রেখে যাই···

সেই দিন থেকে তপতী রয়েছে কাছে,
এক ফোঁটা মেয়ে সবটা স্বপ্ন মাখা ;
কাশফুলগুলো ওরই মতন ঋজু,
উর্দ্ধে অসীম আকাশে মেলেছে পাখা—
ওরা যেন সব শেলীর পাখীর গান
উড়ে উড়ে যায়, আরো দূরে, আরো দূরে,
কাশফুল যেন ঐ তপতীর প্রাণ,
ধক্ ধক্ ধক্···কাঁপে অজানার সুরে—
তপতী, তুমি তো থার্ড ইয়ারেতে পড়ো,
শেলী পড়িয়েছি কাল তোমাদের ক্লাশে ?—
চোখ তুলে দেখি, তপতী গিয়েছে চলে,
মুখ নীচু করে ফুলগুলো সব হাসে···

"সময়ে সামান্য সতর্ক হ'লে সহজেই সংক্রমণ রোধ করা যায়"

রোগবাহী জীবাণুই রোগ-সংক্রমণের কারণ। জীবাণু এত ছোটো যে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। যে-বাতাস আপনি শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেন, যে কোনো জিনিসে আপনি হাত দেন, এমন কি আপনার গায়ের ত্বকেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে।

শরীরের কোথাও কেটে বা চামড়া উঠে গেলে সেই মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জীবাণু আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু পিনের খোঁচাকেও তুচ্ছ করবেন না, তা থেকেই সারা শরীর বিষাক্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অঙ্গহানি কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সুতরাং জীবাণুর হাত থেকে নিজে ও বাড়ীর সবাই নিরাপদে থাকতে চান তো 'ডেটল' ব্যবহার করুন — 'ডেটল' আধুনিক জীবাণুনাশক।
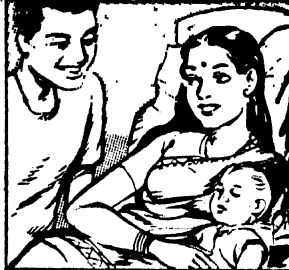
প্রসবপথের মুখে বা ভেতরে সামান্য একটু ক্ষত থাকলেও প্রসূতিজ্বর দেখা দিতে পারে, যা থেকে চিরতরে অকর্মণ্য বা বন্ধ্যা হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। ডাক্তাররা তাই জীবাণু-সংক্রমণের ভয় দূর করবার জন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে জীবাণুনাশক 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন।

ক্ষতস্থান যত ছোটোই হোক তা যেন বিষাক্ত হতে না পারে। কেটেকুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগাবেন। ডেটল জীবাণু নাশ করে, বিষাক্ত সংক্রমণের পথ রুদ্ধ করে এবং ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করুন—'ডেটল' স্নিগ্ধ, এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। 'ডেটল' লাগালে কাপড়ে বা গায়ে দাগ হয় না। শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। খরচ খুব কম, একটুতেই অনেকটা কাজ হয়।

"মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" নামক স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। চিঠি লিখুন:—এফ্, বি (বি-২) বিভাগ, পোঃ বক্স নং ৬৬৪ কলিকাতা—১।

দাড়ি কামানোর জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেবেন, তাতে ছোট-খাটো কাটাকুটি বা আঁচড় আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকবে না। বেশী জলে অল্প 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচো করলে গলায় আরাম ও উপকার পাবেন।

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ,
পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

AEL 3010 (R)

DBI-2

গৌরী-দান

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

দশ বছরের ছোট্ট রাণুর বিয়ে—

সানাইয়ের করুণ সুর বিয়ে-বাড়ীর আনন্দের মধ্যেও আসন্ন বিরহের বেদনা জাগাচ্ছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে বিয়ে-বাড়ীর উৎসবের আয়োজন।

রাণুর মার মন খারাপ, তার বড় আদরের রাণু চলে যাবে। গোপনে চোখের জল মোছেন বারে বারে। ভাবেন, কেমন করে থাকবেন রাণুকে ছেড়ে! এখনও মার হাতে নইলে তার খাওয়া হয় না। স্নানের সময়ও একটি পর্ব্ব। তার দুষ্টুমি শ্বশুর-বাড়ীতে কে সহ্য করবে?

হ্যাঁ, এই ছোট্ট রাণুর বিয়ে? খুব আশ্চর্য্য লাগছে তো? কিন্তু এ তো আজকের কথা নয়। কবেকার কথা। সে যুগে গৌরীদানের প্রথাই প্রচলিত ছিলো সমাজে। মার বুকে মুখ রেখে কেঁদে চলে যেতো ছোট্ট মেয়েরা। কত না কষ্ট পেতো ভাই-বোনেদের ছেড়ে যেতে। অন্য একটি সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে, কোথা থেকে একটি ছোট্ট জীবন এসে জুড়ে বসতো—ছোট্ট একটি ভীরু পাখীর মত। মনে ভয় হোতো তাদের,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভয়—কারণে-অকারণে বুক কেঁপে উঠতো ভয়ে। তবুও কত সুখ ছিলো তারি মধ্যে, নিজের অজান্তে নিজেই শান্ত হয়ে যেতো তারা। শ্বশুর-বাড়ী হয়ে যেতো একান্ত আপনার। একটি মুখের প্রতি তাকিয়ে তাদের মন প্লাবিত হয়ে যেতো ভরা জোয়ারের মত।

তাই রাণুর বিয়ের জন্য আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, ভাল ঘর-বর পেলে বিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মার দিক থেকে ইচ্ছাটা প্রবল না হলেও বাবার যুক্তি অকাট্য। তাঁর ইচ্ছাই পুরণ করেছেন।

সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সানাই বাজছে। সেই মিলনের বাঁশীতেই যেন বিচ্ছেদের সুর মিলিয়ে আছে। এই বিয়ে-বাড়ীর জমকালো উৎসব যাকে নিয়ে তার কোন দিকে খেয়াল নেই—বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে মার বিছানায়। কাজের ফাঁকে মা এসে দেখে যান রাণুকে—তার কত সাধের রাণু বাড়ী অন্ধকার করে চলে যাবে। কেমন করে থাকবেন তিনি রাণুকে ছেড়ে। মা এসে ঘরে ঢোকেন। রাণু শুয়ে আছে এক রাশ যুঁই ফুলের মত—বিছানার ওপরে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ঘুমিয়ে আছে। ভোরের আলোর প্রথম রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা গায়ে, কালো রেশমের মত থোকো-থোকো চুলগুলো কপালের ওপরে ছড়ানো। মেয়ের পানে তাকিয়ে মার চোখে জল ভরে আসে, তার মাথায় হাত রেখে তিনি ডাকেন, রাণু, ওঠো মা! মুখ-হাত ধোও বেলা যে অনেক হয়েছে। ঘুমের ঘোরেই রাণু বলে—না-না—এখন নয়, আরও একটু পরে। মাথার বালিশের মধ্যে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে রাণু—ঘুম আর ভাঙ্গে না। মার দাঁড়াবার সময় নেই, আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্ত্তি, কতটুকু সময় আছে তার মেয়ের কাছে বসবার?

কত কাজ যে আছে—মহাল থেকে বড় বড় রুই-কাতলা এনে ফেলেছে উঠানে—মাছ কোটবার জন্য জেলেরা তাগাদা দিচ্ছে, সে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। এধারে রাশীকৃত তরকারী পড়ে আছে বারান্দায়। এর মধ্যেই কয়েক জন আত্মীয়া প্রতিবেশী মিলে তরকারী কোটা শুরু করেছে। গোলাপি রং-ছোপানো শাড়ী, সোনার তাগা হাতে বুড়ী-ঝি, কাটা তরকারীগুলি পৃথক্ করে সাজাচ্ছে। ছোট মেয়ে-বৌয়েরা পান তৈয়ারী প্রভৃতি খুটিনাটি কাজগুলি করছে গিন্নিদের তদারকে। কাজের মধ্যে চলছে হাসি-গল্প—কেমন করে বরকে ঠকানো হবে তার পরিকল্পনাও চলেছে। রাণুর মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। কাকিমা বললেন—ও দিদি! এবার রাণুকে উঠিয়ে দিন, নান্দিমুখ করতে অনেক সময় লাগবে, কত বেলা হবে ঠিক নেই। একটু কিছু মুখে দিক—বাচ্ছা মেয়ে তো, উপোস করতে পারবে কেন? কাকিমা দুঃখ বোধ করেন রাণুর মার জন্য।

বৌদি বলেন—আমি যাচ্ছি কাকিমা, রাণুকে ডেকে আনি।

বৌদি এসে রাণুর চিবুক স্পর্শ করে ডাকেন—ওগো রাণু, ওঠো! আজ যে তোমার বিয়ে। মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে না। সেই অচিন দেশের রাজকুমার এসে ঘুম না ভাঙ্গালে বুঝি রাণুর ঘুম ভাঙ্গবে না? বৌদির মুখের পানে তাকায় রাণু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে। বলে, আমি কক্ষণো বিয়ে করবো না। তোমরা ভারী দুষ্টু— খালি বিয়ের কথা বলো, যাও—আমি উঠবো না।

বৌদি বলেন, বেশ মেয়ে যা হোক, আমরা খেটে-খেটে অস্থির হয়ে গেলাম আর উনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবেন, সে হবে না।

রাণুর ছোট বোন বেণু এসে ঘরে ঢোকে।—দিদি, একটা মজার জিনিষ এনেছি দেখবে এসো!

কৈ, দেখি! বলে রাণু এগিয়ে আসে তার ছোট বোনটির কাছে। সে ফ্রকের তলা থেকে ছোট্ট একটা রঙিন বাল্ব বের করে দেখালে।

রাণু বলে, কোথায় পেলি রে এটা? ঠিক গোলাপ ফুলের মত দেখতে।

বেণু—তোমার বরের জন্যে যে সিংহাসন সাজানো হচ্ছে তাইতে এ-রকম অনেক লাগাচ্ছে। একটা এনেছি তোমার জন্য।

রাণু।—চল আর একটা নিয়ে আসি। দু'জনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বৌদি আপন মনেই হাসেন—কবির এই কথাটি তার মনে হয়:

"ওগো বর ওগো বঁধু
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা,
এ তব বালিকা বধূ"

* * * *

উৎসবের অভিনব আয়োজন চলছে। বরের বসবার জায়গাটি বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে। কি ভাবে কোন রং মেলালে সুন্দর লাগবে, দেওয়ালের গায়ে কি নক্সা লাগাতে হবে, তারই জল্পনা-কল্পনা চলছে। ছোট ছেলের দল ঘিরে বসেছে—তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি সব কিছুই লক্ষ্য করছিলো, না জানি কি হবে আজ সন্ধ্যায়। ময়ূর-সিংহাসন তৈরী হচ্ছে দামী কাপড়ে মুড়ে শিল্প-চাতুর্য্যের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, দু'ধারে দু'টো ময়ূরের মুখ। ছোট ছোট আলোগুলি আস্তরণের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিলো। ছেলের দল চেয়ে থাকে সকৌতুকে, চারিধারে উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাদের ছোট মনের উপর দিয়ে অনেক কিছুই ভেসে চলে। এই রহস্য জনক আসনটির চারিধারে ভীড় করে থাকে তারা। রং মিলনের সামঞ্জস্য রেখে সাজাবার কায়দায় সাধারণ জিনিষগুলিও মনকে মুগ্ধ করছে। বড় আদরের রাণু, তার আজ বিয়ে, তাই তো এত ঘটা! বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা হাঁক-ডাক ক'রে কাজের আবহাওয়া জাগিয়ে রাখছেন। ভিয়েনকরেরা এসে নানা রকমের মিষ্টি তৈরী করছে। রানাঘাটের পান্তুয়া। কৃষ্ণনগরের সরভাজা প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টি এসেছে নানা দেশ থেকে।

কত সম্ভ্রান্ত লোক আসবেন নিমন্ত্রিত হয়ে—তাঁদের উপযুক্ত উদ্যোগ চলেছে। রাশি রাশি বেল-জুঁইয়ের মালা—তবক-দেওয়া পান রূপোর থালায় রাখা আছে। গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে—হাঁক-ডাকেই উৎসব সরগরম হতে লাগলো!

এধারেও রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। প্রসিদ্ধ রান্না-জানা বামুন এসেছে—সকল রকম রান্নায় ওস্তাদ তারা—আহার-বিলাসীদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য তারা রান্না সুরু করেছে পূর্ণ উদ্যমে। সুগন্ধে চারি দিক সুরভিত হয়ে উঠেছে। সকালের অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেকটা বেলা হয়ে গেলো। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো ক্রমশঃ—গোধূলির রাঙা আবির লাগলো প্রকৃতির গায়ে। কনে-স্নানের আয়োজন সুরু হোলো, রাণুকে ডাক পড়লো, কিন্তু কোথায় গেলো মেয়ে? শেষে রাণুকে পাওয়া গেলো তার খেলাঘরের সামনে। দুই বোনে বসে আছে সজল চক্ষে।

শিশু-চিত্তের লোভনীয় জিনিষ ছিলো এই পুতুলগুলি। কত যত্নে সেগুলি সঞ্চিত হোতো, মার খাটের তলায় সারা দিন ধরে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করাই ছিলো তার কাজ। সেই প্রিয় পুতুলগুলির জন্যই আজ রাণুর মন খারাপ।

বেণুকে তার সব পুতুলগুলি দিয়ে দিচ্ছে—তবুও ঘাগরাপরা "ডলি"টার পানে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবে বেণু বলেছে—দিদি এলে তারা দু'জনেই খেলবে—তাছাড়া খুব যত্নে রাখবে সে। এর আগে বেণুর সাহসই হোত না পুতুলে হাত দেবার, তাই দূরে থেকেই দেখতো, কিন্তু আজ!

দিদি তো তাকেই দিয়ে যাচ্ছে—সে তো শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, আর তো খেলবে না। মা এসে কখন দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে তারা জানতেও পারেনি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে আসে তার ভুলে-যাওয়া দিনের ব্যথা, সে কি আজকের কথা!

নতুন বৌ হয়ে এসেছিলেন বিদেশে থেকে—চেনা-পরিচয় ছিলো না কারো সঙ্গে, ননদ-জাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেন—তারাই ছিলো সুখ-দুঃখের সাথী। সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অনেক কিছুই সইতে হয়েছিলো তাঁকে। অবকাশ পেলেই ফাঁকা মনটা গুমরে উঠতো সেই অতিপ্রিয় গৃহটির জন্য। সে সব দিন তো অবাধেই জলের স্রোতের মত কেটে গেলো। সেই বন্দী-জীবনটাও বনেদি ভিটের অন্তরালে স্বপ্নের মত গেলো মিলিয়ে। যাক সে সব কথা। আজ রাত্রির উৎসব-আয়োজনের মধ্যে তার মর্ম্মবেদনার অবকাশ নেই। রাণুকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। বারাণ্ডার একধারে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে, তারি মাঝে আল্পনা-দেওয়া পিঁড়ি পাতা আছে, রাণু এসে দাঁড়ালো তারি উপর—হলুদ-তেল জল মাথায় লাগালে পাঁচ জন এয়ো মিলে। শুভ কর্ম্মের মাঙ্গলিক ক্রিয়া শেষ হলে পরে নাপতিনী আল্তা পরাতে বসলো, ক্ষিপ্র হাতের রেখার টানে রাণুর ছোট্ট সাদা-পা দু'খানা রাঙিয়ে দিলে।

রাণুর ছোট মাসীমা বসে আছেন প্রসাধনের বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কনে সাজাতে অদ্বিতীয়া তিনি—এখনকার চেয়ে যে কিছু কম জানতেন তা নয়। রুজ, পাউডার, পমেটম্ থেকে আরম্ভ করে গোলা-টিপ, সুরমা, কাজল, আলতা, সিঁদূর, সব কিছুই গুছিয়ে রেখেছেন তিনি আগে থেকেই। কনে-স্নানের পরই সুরু হোলো প্রসাধন। মাথা-জোড়া এলো খোঁপা বাঁধা হোলো—সোনার ফুল-কাঁটা চিরুণী দিয়ে সাজালেন। তার পরে চলে প্রসাধনের খুঁটিনাটি নানারূপ কারুকার্য্য। কপালে কনে-চন্দন লেপে দিয়ে ছোট্ট হাতিদাঁতের চিরুণী দিয়ে টেনে দিলেন তার ওপর ছোট্ট একটি টিপ। রাঙা সাড়ী, গা-ভরা গয়না পরে লক্ষ্মীর মতই দেখাচ্ছিলো রাণুকে। প্রথানুরূপ সোনা-বাঁধানো লোহা পরিয়ে দেওয়া হোলো রাঙা শাঁখার কোলে। রাণু তার সাদা মোরবাতির মত হাত দু'খানার পানে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে খুসী হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য। কারণ সাজগোজ করতে রাণু খুব ভালবাসে। বৌদি একটি ছোট আয়না তার হাতে দিয়ে বললেন—একবার মুখখানা দেখো কেমন ভাল দেখাচ্ছে।

বেণু বসে দেখছিলো—দিদির সাজ-গোজ, দিদির পানে তাকিয়ে চোখে জল এলো তার। আজ তো দিদি এখানে, আর কাল এমন সময় দিদি কোথায়! নাঃ, আর সে ভাবতে পারে না। কাকিমা দু'গাছা গড়ে-মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন—কনে-চন্দন পরে রাণুর কেমন শ্রী উঠেছে দেখো! রাণুকে বললেন—বর এলে যেন ছুটে দেখতে যেও না—বিয়ের আগে দেখতে নেই, শুভ লগ্নে দেখাব। রাণু গম্ভীর মুখে সম্মতি জানায়। দিন ও রাত্রির মিলনের শুভক্ষণেই রাণুর বিয়ের লগ্ন। সূর্য্যাস্তের সোনালী আলো তখনও মেলায়নি, ব্যাণ্ডের বাজনা উঠলো বেজে ঝম্ ঝম্ করে, বরের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিলে, তারি সঙ্গে সুর মিলিয়ে নহবতে ধরলে তান সাহানা সুরে। ছেলেমেয়েরা ছুটলো বর দেখতে। ছাদে বারাণ্ডায় জানালায় লোকে ভরে গেলো। বাজনার শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে এলো রাজপথ ধরে। খাস-গেলাসের আলোয় রাস্তা আলো করে বরের প্রসেসান এগিয়ে

এলো। প্রথমে এলো এক দল ঘোড়সোয়ার, তার পর কাগজের প্রকাণ্ড হাতি, ঘোড়া, মানুষ, ক্লাউন, ময়ূরপঙ্খি আরো কত কি, তার পরে এলো জরির তক্‌মা-আঁটা দ্বারবান, হাতে রূপোর আসাসোঁটা। সব শেষে বরকে নিয়ে এলো ফুলে ঢাকা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ী—তেজী দুটো জুড়ী ঘোড়া টগবগ করে এসে দাঁড়ালো আলো-ঝল্‌মলে বাড়ীটার সামনে। ওপর থেকে ফুল ছড়িয়ে দিলে ছেলেরা। শাঁখ উঠলো বেজে। কন্যাপক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বরকে নামিয়ে নিলেন। জামাই দেখে সকলেই খুসি। বর বেচারার অবস্থা শোচনীয়, সেকালের সুবোধ ছেলে—গুরুজনেরা যেমন সাজিয়েছেন তেমনি সেজেছে—তাই সাজের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। গলায় মালা টোপর-পরা বর এসে বসলো ময়ূর-সিংহাসনে। দুই বেয়ারা বরের দু'ধারে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলো। এধারে চলেছে বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন। রূপোর গড়গঁড়াতে অম্বুরি তামাক সেজে নিয়ে কুশিরাম বেয়ারা চলেছে তাঁদের খাতির করতে, লাল কার্পেটের উপর এনে বসিয়ে দিলে। রূপার আতরদান গোলাপপাস, পানদান আগে থেকেই রাখা আছে সেখানে, এ সব জিনিষের কারুকার্য্য দেখবার মত। ছোট ছেলেরা ঘিরে বসেছে বরকে—এর মধ্যেই বেশ আলাপ হয়ে গেছে। বর বেচারা হয়তো চম্পকবরণী কন্যার ধ্যানে মগ্ন ছিলো। হঠাৎ পুরুত মশাই জানালেন শুভ লগ্ন উপস্থিত। বরকে তুলে আনা হোলো স্ত্রী-আচারের জায়গায়। মা এগিয়ে এলেন বরণডালা হাতে নিয়ে—বরণ শুরু হোলো। শুভদৃষ্টির সময় রাণুকে পিঁড়িসমেত ওঠানো হোলো বরের সামনে। রাণুর বন্ধ চোখ দুটো খোলে না—ঘুমে না লজ্জায় কে জানে! ছোট মাসী বলেন, "দেখো রাণু, এ সময় ভালো করে দেখতে হয়।" রাণু একবার মাত্র চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। এত লোকের সামনে বরের পানে চাইবে 'কেমন করে? মালাবদল হোলো শাঁখের শব্দে পাড়া মুখরিত করে।

সম্প্রদানের জায়গায় তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো।

কত জিনিষ-পত্র সাজানো আছে,—কাঠের আসবাবপত্র, রূপোর ও শ্বেত-পাথরের বাসন, তাছাড়া আরও কত সৌখিন জিনিষ আছে ঘর জুড়ে। চিত্রিত পিঁড়িতে এসে বসে বর-কনে। পুরুত মশাই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সুরু করেন—মন্ত্রপাঠ হোলো, বরের বাবা এগিয়ে এসে বসেন পুরুতের কাছে। সব শেষে মেয়ের বাবা রাণুর কম্পিত দু'খানি হাত তুলে দিলেন বরের হাতে—মালার বন্ধনে বেঁধে দিলেন। ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠে। রাণু তার বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকে, চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে তার। বিয়ে শেষ হয়ে গেলো—বর-কনেকে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো ভেতরে। উৎসাহী মেয়েরা রাণুর সঙ্গে গেলো বাসর-ঘরে। উৎসবের শেষ রাগিণী বেজে ওঠে বাঁশীতে। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসবের জের চললো। রাত্রির ম্লান চাঁদ ক্রমশঃ মিলিয়ে এলো, পূর্ব্ব দিগন্তে দেখা দিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাষ—কতকগুলো পাখী কিচির-মিচির করে উঠলো ডেকে। গত রাত্রের বাসি মালাগুলো এধারে-ওধারে ছড়ানো, ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ীগুলোর বুকে তখনও মিষ্টি গন্ধ শেষ হয়ে যায়নি, উৎসবের চিহ্নটি বুকে ধরে আছে এই বাসি-বিয়ের সকালে। সকলের মন আজ ক্লান্তিতে ভরা। অবসাদের ছায়া পড়েছে বাড়ীতে। সানাইয়ের সুর ঝিমিয়ে পড়েছে। সে সুর আজ কান্নায় উচ্ছল।

আজ রাণু চলে যাবে,—আজ আর কোন উৎসাহ নেই: বাবার কাছে বসে আছে ম্লান মুখে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন—ছুটোছুটি কোর না—এখন বউ হয়েছ, ধীরে ধীরে কথা বলবে, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেঁদ না, ইত্যাদি। দাদা বলেন—পুতুল ভেঙ্গে গেলে ভ্যাঁ করে কেঁদ না—লোক নিন্দে করবে। এতগুলি উপদেশ শুনে মনে ভয় আসে তার, চোখ বড় করে তাকায় বাবার মুখের পানে। সব কিছুতেই মানা—শ্বশুরবাড়ী সে কেমন যায়গা? একা থাকতে হবে মা-বাবাকে ছেড়ে! কত দিন তা কে জানে?

ক্রমে রাণুর বিদায়ের লগ্ন উপস্থিত হয়ে আসে।

শ্বশুরবাড়ী থেকে বাক্স-ভরা গহনা-কাপড় নিয়ে ননদরা এসেছে বৌ সাজাতে। মা, ঠাকুরমাদের গয়না-কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাবে বৌকে, কত রকমের গহনা—মুক্তোর সাতনরি, হীরের ঝাপটা, কাণ, বাউটী, বাজুবন্দ, আরো কত কি। এই সাজিয়ে নিয়ে যাবার প্রথাটি অনেক জায়গায় নেই। কিন্তু রাণুর শ্বশুরবাড়ীতে এই প্রথাই চলে আসছে। রাণুর প্রসাধন সুরু হলো—সাজ-সজ্জা চললো কিছুক্ষণ ধরে।

কোন গহনাটি কোথায় পরালে মানাবে, ওড়নাটি কি ভাবে পরালে দেখতে ভালো লাগবে, কোন ছাঁদে খোঁপা বাঁধলে পাশমুখ থেকে সুন্দর লাগবে, তাই নিয়ে কল্পনা-জল্পনা চললো। গহনা-কাপড়ের প্রাচুর্য্যে আসল রাণুকে আর চেনা যায় না। পুরুত ঠাকুর মাঙ্গলিক জিনিষপত্র সাজিয়ে বসেছিলেন—জানালেন আর দেরী করবার সময় নেই। কান্নায় উদ্বেল রাণুকে নিয়ে এলো বৌদি; গহনার ভারে রাণু চলতে পারে না সহজ ভাবে। পিসিমা বলেন, ও বৌদি এসে দেখো তোমার রাণুকে কেমন মানিয়েছে, ঠিক রাজরাণীর মতই দেখতে লাগছে। রাণুর মা মিষ্টির থালা হাতে বেরিয়ে আসেন কুটুম্বদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার জন্য। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী থৈ-থৈ। আর সময় নেই, বিদায়ের শুভক্ষণ উপস্থিত। অল্প সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠানের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে, বর-কনেকে এগিয়ে দিতে গেলেন সকলে। রাণুর চন্দন-আঁকা ক্লান্ত মুখশ্রীর পানে তাকিয়ে মার মন ব্যথায় ভরে উঠলো। গুরুজনদের প্রণাম করে রাণু। বাবা মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন। দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে। রাণুর কান্না আসে। মাকে আর দেখতে নেই, তাই আগে থেকেই ঘরের ভেতর চলে গেছেন—চোখের জলে বুক ভেসে যায়। ভগবান! রাণুকে সুখী করুন। বৌদি গাড়ীতে উঠিয়ে দেন বর-কনেকে। আঁচলে আঁচল বাঁধা রাণু বরের পিছু-পিছু উঠে গেলো গাড়ীতে, পায়ে নূপুর বেজে উঠলো ঝম্ ঝুম্ ঝুম্। রাজপথ কাঁপিয়ে গাড়ী ছুটে চলে দূর হতে দূরান্তরে। চলেছে রাণু কোন্ অজানা ভাগ্যপথে—উৎসবকে নিঃশেষ করে দিয়ে! পড়ে রইলো তার খেলাঘরের স্মৃতি। পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে বর রাণুর পানে। কি সুন্দর লাবণ্যমাখা মুখখানা!

ট্রেন

ভেরা পানোভা

গ্লাসকভের উপরে আঁঠারো নম্বর বেড হোলো ক্রামিনের। ছোটোখাট দুর্বল মানুষটি, মাথায় চক্‌চক্ করছে টাক্। ধারালো অথচ কৌতুকমাখানো মুখখানি সর্বদাই উজ্জ্বল। গোল-গোল চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা—সত্যি বলতে কি অনেকটা প্যাঁচার মতনই দেখতে কিন্তু।

ওর শিরদাঁড়াতে আঘাত লেগেছে—পা দুটিও পক্ষাঘাতে গেছে—ভুগে-ভুগে বেচারা ছোটো একটা শিশুর মত হাল্কা হোয়ে গেছে। বাকী জীবনটা ওকে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হবে, মাঝে মাঝে কম্বলটা সরিয়ে নিজের কাঠির মত শুকনো হলদে পা দুটোর দিকে চেয়ে থাকে। যখন প্রথম আসে, তখনই ও একটি জিনিষ চেয়েছিলো— বই।

— যতগুলো বই সম্ভব"—বলেছিলো ও।

ট্রেনের ছোটো লাইব্রেরীতে যত-কিছু আছে লেনা সব এনে হাজির করেছিলো ওর কাছে। ইউজেন আনগিন, যোশশেঙ্কোর মজার গল্প, একটা ১৯৩১ সালের ম্যাগাজিন, আর একটা প্রথম আর শেষ পাতা-ছেঁড়া নামহীন বই—যা-কিছু ছিলো।

—"বাঃ, চমৎকার!"—খুশী হোয়ে ওঠেছিলো ক্রামিন।

প্রথম দিনেই বেচারার সব কটা বই পড়া শেষ হোয়ে গেলো। কি অসম্ভব শীগগির পড়তে পারে লোকটা! মনে হোতো ক্ষিদে পেলে মুরগীর ছানাগুলো যেমন চক্ষের নিমেষে দানাগুলো খুঁটে নেয়, তেমনি বই পেলে পাগলের মত গোগ্রাসে গিলতো ও প্রতিটি লাইন। নতুন রোগীর দল ট্রেনেতে না নেওয়া অবধি প্রত্যেক বিছানার ধারে একটা করে বই রাখা থাকতো টেবিলের উপর। ক্রামিনের তো যা-কিছু পড়বার ছিলো সব শেষ। ওর নামে গুজব রটলো ও নাকি এক ঘণ্টায় এমন মোটা বই শেষ করে যেটা অন্যদের সমস্ত ট্রেন-যাত্রাতেও ফুরাতো না! দানিলভ, ডাঃ বেলভ, নার্সেরা তাদের সব বই এনে দিতো ওকে। সব বইতেই ওর সমান আগ্রহ, সে সার্জারীর বই-ই হোক, কিম্বা ফাইনার দেওয়া Sources of Happinessই হোক।

যখন আর বই থাকতো না তখন চশমাটি খুলে মাথার পিছনে হাত দুটি জড়ো করে সবার সঙ্গে গল্পগুজবে যোগ দিতো। বেশী কথা বলতো না বটে, তবে মাঝে মাঝে খুব দু'-একটা সরস মন্তব্য করতো। ওর কাছে সবই চমৎকার!

—"চমৎকার পরিজ" বলে একেবারে খালি বাটিটা ফিরিয়ে দিতো লেনার হাতে—ওর ফ্যাকাশে চোখ দুটো হাসতে থাকতো। ফাইনার Sources of Happiness সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি—"চমৎকার বইটা।"

—"সত্যি?"—ফাইনা খুশী হয়ে উঠতো, এতক্ষণে একটা সমঝদার লোক পাওয়া গেলো—ট্রেন-শুদ্ধ লোক বইটা নিয়ে ওকে ঠাট্টা করে।

ক্রামিন আগে ছিলো লেনিনগ্রাদের একটা বড় ফ্যাক্টরীর আইন-উপদেষ্টা। সবাই জানতো বই পড়ায় আর অভিনয়ে ওর অসীম অনুরাগের কথা। ওর ঘরে ছিলো ওর অপরূপ সুন্দরী তরুণী বধূ। ওর বন্ধুরা তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চায়নি যখন প্রথমটা গুজব রটেছিলো যে ও অব্যাহতি পেতে অস্বীকার করে, জুনিয়ার লেফটানান্টের বিভাগে ভর্তি হয়েছে। শেষটায় অবশ্য বিশ্বাস করতে হোলো যখন একজন ওকে নেভস্কি ষ্টেশনে একেবারে ইউনিফর্ম-পরা অবস্থায় দেখলে।

ওই প্রথম বিভাগীয় শিক্ষা শেষ করে। তারপর একটা ছোটো সেনাদলের নেতৃত্ব পায়। করণীয় যা কিছু তাতে ওর কোনো ত্রুটিই ঘটতো না, কিন্তু ওর উঁচু অফিসাররা ওর উপর কেমন যেন বেশী নির্ভর করতে সাহস পেতেন না। আসলে ওর আমুদে চেহারাটাই হোলো ওর কাল।

লেনিনগ্রাদের বিভীষিকাময় দিনগুলির সুরু হোলো। জার্মানরা গাশিনা, পুশকিন, ক্রাশনায়া সেলো ইত্যাদি জায়গাগুলো অধিকার করলে—এই জায়গাগুলোতে ক্রামিন যেত গরমের দিনগুলি কাটাতে, আজ সেখানে সেনাদলের নেতৃত্ব নিয়ে যেতে হোলো। গরমের সময়েই ওর স্ত্রীকে লেনিনগ্রাদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

এক দিন ওদের সমগ্র সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার ওকে ডেকে পাঠালেন।

—"তোমাকে দলের নেতৃত্বভার এবার লেফটানান্ট নিকোলভকে বুঝিয়ে দিতে হবে—" ওর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আদেশ দিলেন।

—"কেন, আমি কি জানতে পারি?"

—"কারণ এবার তোমার দলটাকে দুব্রোভকাতে পাঠানো হবে, নেভা নদীর বাঁ দিকে এই দুব্রোভকা—এই দেড় কিলোমিটার লম্বা আর সাতশ' মিটার চওড়া জায়গাটা আমাদের সৈন্যরা জার্মানদের কবল থেকে অধিকার করে নিয়েছে, এখন এইটাকে আমাদের একটা শক্ত ঘাঁটী করে বাড়ানো হবে। এখন জার্মানরা এর ধারে-কাছে সর্বত্র সৈন্য-সমাবেশ করছে আর সমস্ত জায়গাটায় সারাক্ষণ বোমা ফেলছে—"

—"ভালো কথা"—ক্রামিন প্রশ্ন করে—"কিন্তু আমি কেন নিকোলভকে নেতৃত্বভার দেবো?"

—"রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের হুকুম তাই, আর তুমি দুব্রোভকার পক্ষে উপযুক্তও নও"—কমাণ্ডারের পরিচিত নীরস কথাগুলি থামে না—"এই সব ছোটোখাটো মস্করা, হাসি-তামাসা··· ···সামনে আমরা শক্ত-সমর্থ দক্ষ লোক চাই!"

ক্রামিনের মুখ ফ্যাকাশে হোয়ে যায়।

—"কমরেড ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার, তুমি অনুগ্রহ করে শোনো, আজ এক মাসের উপর আমি আমার দলকে শিখিয়ে আসছি যে আমাদের সকলকেই একসঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াতে হতে পারে। ভেবে দেখো কথাটা—'সকলকেই একসঙ্গে' বুঝেছো? আর এখন তারা হঠাৎ সব চলে যাবে আর আমি পড়ে থাকবো পিছনে! অসম্ভব—অসম্ভব—এ যেন প্যারেড করবার সময় গালে চড় খাওয়া—" গভীর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে ক্রামিনের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। কমাণ্ডার প্রকৃত সৈনিক। তাই সে বুঝলে।

—"ঠিক বলেছো তুমি। হাঁা, তুমি যাবে তোমার দল নিয়ে—"

এক নিবিড় অন্ধকার রাতে, প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে ক্রামিন তার দল নিয়ে নেভা নদী পার হোলো। পার হোতে গিয়ে উনিশ জন জার্মান গোলায় প্রাণ হারালো। ক্রামিনও প্লেটুন কমাণ্ডার হোয়ে ওপার থেকে আসছিলো, এপারে উঠলো একেবারে কোম্পানি

কমাণ্ডার হোয়ে। কারণ পথে আরও দু'জন প্লেটুন কমাণ্ডার নিহত হওয়াতে তাদের দল যোগ দিলে ক্রামিনের সঙ্গে।

ট্রেঞ্চগুলো মৃতদেহে পূর্ণ। ক্রামিন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চললো একেবারে শত্রু-অধিকৃত জায়গায়। চারদিকে গোলা আর মেশিন-গান—ডুব্রোভ্‌কাকে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ। সন্ধ্যার দিকে আদেশ এলো রাত্রিশেষে আক্রমণ করবার। ট্রেঞ্চ থেকে ট্রেঞ্চে এগিয়ে চললো ক্রামিন গুঁড়ি মেরে, বুকে হেঁটে তার দল নিয়ে। তখনো বৃষ্টি থামেনি। ডুব্রোভকার উপর চলেছে আগুন আর জলের তাণ্ডব। ঠিক সময় বুঝে আক্রমণ করলে। সাত জন বন্দীকে নিয়ে ফিরে আসার পথে ক্রামিনের মেরুদণ্ডে লাগলো আঘাত। ওর দলের দু'জন সৈন্য কোন রকমে একটা মৃতদেহপূর্ণ ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে ওকে নিয়ে চললো নদীর ধার অবধি। সেখান থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসে ওপারে যুদ্ধ-সীমান্তের সব চেয়ে কাছের হাসপাতালে। তারপর ওকে পাঠানো হয় লেনিনগ্রাদ। এইখানেই ওর সৈনিক-জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

লেনিনগ্রাদের হাসপাতালটার জানলাগুলোতে কাচ ছিলো না—অবিশ্রাম বোমাবর্ষণের ফলে। প্লাইউড দেওয়া থাকতো কাচের বদলে, ক্রামিনের হোতো বই পড়ার অসুবিধা। চুপ করে থাকতে পারতো না ও—বন্ধুদের ছোট্টো ছোট্টো চিঠি লিখতো। এক দিস্তে কাগজ আর একটি কলম চেয়ে নিয়ে ও লিখতে সুরু করে। স্ত্রীকে, বন্ধুদের সবাইকে লিখতো—বিদ্রূপাত্মক, দ্ব্যর্থক সব লেখা, কখনও রেডিওতে শোনা কবিতাগুলোর প্যারডি। বোমাবর্ষণের ফলে সবার মত ওর কিন্তু ভয় পেতো না। ডুব্রোভকার অভিজ্ঞতার পর এ-সবে ওর কিছুই মনে হোতো না। যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতাও ছিলো অসীম। তখন লেনিনগ্রাদে তীব্র শীত, আহতদের পশমের সোয়েটার, দস্তানা, টুপী ইত্যাদি পরিয়ে রাখা হোতো—ক্রামিন চাইতো শুধু সার্ট পরেই থাকতে—কিন্তু ওকে অনুমতি দেওয়া হোতো না। ক্রামিন জানতো চার পাশে লোক মরছে তখন অনাহারে, সেও চাইলো ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করতে, যেমন করে জয় করেছিল শিরদাঁড়ার অসহ্য যন্ত্রণা। দিনে দিনে শুকিয়ে আসতে লাগলো, ক্ষীণতর হোতে লাগলো ওর দেহ, আর ততই ভরে উঠতে লাগলো কাগজের সাদা পাতাগুলো কলমের আঁচড়ে।

কিন্তু ট্রেনেতে ওর লিখতে ইচ্ছে হোতো না, গল্প করে আর বই পড়ে সময় কাটাতেই চাইতো ও। ট্রেনের সবাই ওর সঙ্গে সুন্দর ভদ্র ব্যবহার করে। প্রত্যেকেই কেমন অমায়িক, নম্র—বিশেষ করে ভালো লাগে ঐ হাসিখুসী সরল মেয়েটি কোঁকড়ানো চুলওলা,—যখন তার দেওয়া Sources of Happiness বইটা পড়ে চমৎকার বলেছিলো, তখন ওর মিষ্টি মুখখানা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ক্রামিনের সব চেয়ে ভালো লাগে দেশ-ভ্রমণ করতে। কত দেশই না ও ঘুরেছে—একবার তো ঠিক করেছিলো আর্টিকে যাবে, তুষার রাজ্যে। কিন্তু সেই সময়ই জীবনে এলো প্রেম, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, তারপর—বিয়ে। বাতিল হোলো আর্টিক অভিযান। এখন অবশ্য চিরদিনের মতই শেষ হোয়ে গেল সব অভিযান। তাতে কি হোয়েছে!

এই তো ট্রেনে করে বেড়াচ্ছে—জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পরিচিত গ্রামগুলি, মাঠ, বন, পথ···এই তো চোখের আর মনের ক্ষুধা মেটাচ্ছে পুরানো বার বার পড়া বইগুলি। ভাগ্যের নির্দ্দেশ মত চলতে ও প্রস্তুত—কিই-বা এসে গেলো।

ট্রেনের নিয়ম নেই তার গতিপথ কাউকে জানানো—প্রথম বারের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এই নিয়ম করা হোয়েছে। যদি বলা হয়, ধরো মস্কোর ভিতর দিয়ে যাবে ট্রেনটা অমনি মস্কোর লোকেরা পাগল হোয়ে উঠবে তাদের সেখানেই নাবাবার জন্ম। ভারী মুস্কিল হয় তখন তাদের সামলানো—এমন সব কাণ্ড হয়!

কিন্তু ক্রামিনকে ঠকানো যায় না। রেলপথের গতি তার রীতিমত ভালো ভাবেই জানা। দানিলভকে ডেকে একদিন বলে, —"কমরেড কমিশার, আমরা ষ্টারদোনভস্কএর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না?"

—"কে বললে, মোটেই নয়, ভুল করছো তুমি—"

—"বেশ তো, আমার কিন্তু একটা অনুরোধ আছে। আমার স্ত্রী এখানেই থাকে—যদি তুমি একবার দয়া করে তাকে খবর দাও যে ট্রেনটা যাচ্ছে এখান দিয়ে। এই নাও ওর ঠিকানা। যদি খুবই অসুবিধা না হয় তবে পাঠিয়ে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

—"কিন্তু কমরেড, তুমি ভুল করছো, আমি বলছি"—যদিও বলতে বলতে দানিলভ ঠিকানাটাও নেয় আর যথাস্থানে একটা টেলিগ্রামও পাঠানো হয়।

কোল্‌কা হোলো এই কামরাটির আর একটি আহত সৈন্য। অবশ্য ওর একটা বড় গোছের নামও আছে—থাকলে কি হবে, কামরাশুদ্ধ লোক ওকে ডাকে 'কোল্‌কা' বলে। অথচ আসল নাম হোলো—নিকোলাই নিকোলিয়েভিচ।

আঠারো বছরের ছেলে, স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যায় একেবারে সীমান্তে। একবার আহত হয়ে ফিরে আসে—সেরে উঠে আবার যায় একেবারে 'অরিয়েল' সীমান্তে যুদ্ধ করতে। সেখানে আবার ভীষণ ভাবে আহত হোয়ে এখন ফিরে চলেছে হাসপাতালে—অনেক দিন চিকিৎসার প্রয়োজন এখন। ইতিমধ্যেই ছেলেটা দুটো কৃতিত্ব-চিহ্ন পেয়েছে। সারাক্ষণ সেই গল্প করে—ওর খুসীর সঙ্গে ঈষৎ গর্ব্বও মিশে থাকে বৈ কি।

—"ও কোল্‌কা, শুনছো ও কোল্‌কা"—প্লাষ্টার অব প্যারিস করা ক্যাপ্টেন চেঁচায়—"যুদ্ধের শেষে তুমি তো দেখছি সব রকম চিহ্নের নমুনাই একটা হোয়ে দাঁড়াবে হে! এই নাও, কটা রাস্‌পবেরী খেয়ে ফ্যালো এখন—"

কোল্‌কা রাস্‌পবেরীগুলো খেয়ে আঙুল চাটতে থাকে। ক্রামিন ওর নিজের চিনির ভাগ থেকে ওকে দেয়। প্রতিদিনের বরাদ্দ খাবারে কোল্‌কার খিদে মরে না।

ঠিক কি করে যে কোলকা কৃতিত্ব-চিহ্ন পেয়েছে সে কাহিনীগুলো কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারে না। দৌড়তে দৌড়তে গুলী ছুঁড়েছে, গুঁড়ি মেরে চলতে চলতে, কখনও বসে বসেই গুলী ছুঁড়েছে—এই সব কথার মধ্যে বোঝা যায় যুদ্ধের আসল কৌশল সম্বন্ধে ও কিছুই বোঝে না। শুধু যা করতে হোয়েছিলো ওকে সেইগুলো ভালো ভাবেই করেছে। ওর কাছে সব ঘটনাগুলো খুব মন দিয়ে শুনে ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলে,—"নিশ্চয়ই তুমি খুব ভালো কমাণ্ডারের অধীনে ছিলে, নাহলে এত দিনে কোথায় তলিয়ে যেতে।"

কোল্‌কা গ্রামের ছেলে। মোটে তিন বছর আগে ওর সাত বছরের স্কুলের পড়া শেষ হোয়েছে। এর আগে গ্রামের যৌথ খামারে যুবসঙ্ঘের নেতা ছিলো। ক্রামিন জিজ্ঞাসা করে ওকে যুদ্ধে যোগ দিতে ডাকার আগেই ও স্বেচ্ছায় কেন এগিয়ে এলো ?

—"ওরা যে যৌথ-খামার সব ভেঙে দিয়ে জমিগুলো জমিদারদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল—"

কোল্‌কার কথায় এতটুকু উত্তাপ বা উত্তেজনা নেই। এমন স্বাভাবিক আর শান্ত ভাবে বললে যেন কোথায় একটা ক্ষ্যাপা কুকুর কি করেছে তাই বলছে। কোলকার মতে জার্ম্মানরা এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়—ওদের সম্বন্ধে ভয় পাবার কিছুই নেই।

—"ওরা কিনা আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবে! আর কি দিয়ে? —না মোটর সাইকেল। তিনশ' না চারশ' মোটর সাইকেল ছুটলো রাস্তা দিয়ে—প্রচণ্ড গর্জ্জন, আর ধোঁয়া সোজা তাড়া করে চললো। নার্ভাস লোক হোলে কিম্বা ভীতু প্রকৃতির হলে অবশ্য মুস্কিল। কিন্তু মোটর সাইকেলে ভয় পাবার আছে কি?—যুদ্ধের আগে একটা মোটর সাইকেল কিনবো এই তো আমার স্বপ্ন ছিলো।"

—"আর এখন?—ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করে—"এখন চাও না একটা মোটর সাইকেল?"

—"এখন?"—কোল্‌কার দ্বিধাহীন জবাব—"এখন তো অমনি অমনিই পাবো একটা।"

ওর বালকসুলভ মুখখানিতে আজও ক্ষুরের ছোঁয়াটুকুও লাগেনি। স্বভাবটাও সেই সারা কামরার মধ্যে ওই শুধু ভারী লজ্জা পেতো মেয়েদের সামনে জামাকাপড় ছাড়তে—নিজের অসহায়ত্বের সঙ্কোচে মরমে মরে যেতো। চিন্তাগ্রস্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে শুধু লেনার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। ছেলেটার প্রকৃতি লাজুক, কিন্তু হলে হবে কি, নিজের কথা বলতে ভারী ভালবাসতো, বড়রা হাসবে জেনেও লোভ সামলাতে পারতো না।

—"সব চেয়ে বিশ্রী লেগেছিলো, যেবার প্রথম আহত হই—কোনো ধারণাই ছিল না, ভয় পেলাম পাছে মরে যাই—" কোল্‌কা বলে।

—"এঁ্যা, বল কি! তুমি মরতে ভয় পাও?"

—"ঈশ্! মোটেই না—" কোলকা তীব্র প্রতিবাদ জানায়—"আমি পাগল হোয়ে উঠতাম মরার চিন্তায়, আমার যে জীবনটাকে দেখাই হোলো না সেই জন্যে—কিছুই তো জানা হয়নি জীবনের—"

দম্‌দম্ বুলেটে ওর দুটি পা-ই আহত—পচ ধরেছিলো হাসপাতালেতেই। কিন্তু ওর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের গুণে আর ওষুধের ঠিক কাজ হওয়াতে, সেটা বাড়তে পারেনি—বরং সারার দিকেই। কোল্‌কার মতে সেরেই গেছে একেবারে। ড্রেস্ করাবার জন্যে নার্সকে ধরে ধরে ডিস্‌পেন্‌সারী অবধি যেতে পারে। মস্ত আরাম-কেদারাটায় হাঁটুর উপর হাত দু'খানি রেখে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে ওর—তখন যেন ওর সুগঠিত শরীরটা বলতে থাকে—'আমার উপর নির্ভর করতে পারো, কাজ আমি করেছি কিছু কিন্তু আরও অনেক কোরবো।'

ডাঃ বেলভের ভালো লাগতো এই এগারো নম্বর কামরাতে বসে বসে কোল্‌কার কথা শুনতে। নাঃ, ইগোরের সঙ্গে কোনোখানেই সাদৃশ্য আসে না ওর—মুখই বলো আর স্বভাবটাই বলো একেবারেই উল্টো। ইগোর হোলো সন্তর্পণে গাছ-ঘিরে রাখা ছোটো চারা আর কোল্‌কা যেন প্রাণরসে ভরা সহজ স্বচ্ছ একটা বন্য ফুল।—কিন্তু ইগোরও তো এরই মত বালক, বয়েসেও কাছাকাছি—তাই; তাই বোধ হয় ভালো লাগে ডাক্তারের কোল্‌কার দিকে চেয়ে অনুভব করতে আপন সন্তানকে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা: শান্তা বসু।

ভিখারিণী মা গো!

শ্রীরেবা সরকার

সারাটা দিনের ক্লান্ত যাত্রী সূর্য্য প'ড়েছে ঢলে
কালো রাত্রির কোলে,
কর্ম্মমুখর ক্লান্ত পৃথিবী হোল নিঝুম,
মা গো তোর চোখে তবুও এখনো নামেনি ঘুম;
স্নেহ-ঘেরা তোর ক্ষুদ্র গৃহের কোণে
এখনো ব্যস্ত শত কর্ম্মের শত-শত আয়োজনে।
বনে-বনে তোর আলো-আঁধারির খেলা,
মাঠে-মাঠে তোর সোনালী ধানের মেলা,
কোথা থেকে পেলি এত সমারোহ ভার,
খুলেছিস্ মা গো কোন্ কুবেরের দ্বার?
মা গো তোর ঘর চির আনন্দময়,
তোর ঘরে আছে সুখী জীবনের সহস্র সঞ্চয়।

আকাশে-বাতাসে অট্ট হাসিছে সর্বনাশা,
জীবনের ছকে মরণ খেলিছে কপট পাশা,
মা গো তোর ঘরে আগুন লেগেছে আকাশ ছোঁয়া
বাতাসে মিশেছে অনল তপ্ত কালো ধোঁয়া;
মাঠের সোনায় ভরা গোলা তোর গেল পুড়ে,
অন্নহীনের ভুখা মিছিল আজ দেশ জুড়ে—
অন্ন চায়,
অন্নপূর্ণা ভিখারিণী আজ নাই উপায়।
সন্তান আসে তোর কাছে মা গো ক্ষুধার জ্বালে,
বুক-জোড়া তোর হাড়ের মিছিল অট্টহাসে,
কেমন ধারা;
সব ছিল মা গো তবু কেন আজ সর্বহারা?

কবির খেয়াল

যতীন্দ্রনাথ পাল

অনেক দিন আগেকার কথা।

পারস্য দেশের একজন বেদুইন দলপতির তাঁবুতে বসে আছেন একজন কবি। নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন তিনি সেখানে। কবির বয়েস হয়েছে অনেক, সত্তরের কম তো নয়ই। পারস্যে যা-কিছু দেখবার-শোনবার সে সব দেখা-শোনা হয়ে গেছে তাঁর মোটামুটি। বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে এসে ঘোরাঘুরি করে তাঁর শরীর খুবই ক্লান্ত তখন। পারস্যে তাঁর বিপুল অভ্যর্থনা হয়েছে সর্বত্র। বেদুইন দলপতির তাঁবুতেও তিনি যে সংবর্ধনা পেলেন তা-ও তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। হঠাৎ কি মনে হল কবির, বললেন তিনি তাঁর বেদুইন নিমন্ত্রণ-কর্তাকে: আপনাদের আতিথেয়তায় পরম আপ্যায়িত হয়েছি আমি, কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে বেদুইন দস্যুতারও পরিচয় পেতে। ওটা না হলে তো আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হবে না?

হেসে উত্তর দিলেন বেদুইন দলপতি: দেখুন, ওটা হওয়া সম্ভব নয়, কেন না আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানী মানুষদের গায়ে হাত তোলে না। তারা তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। এই জন্যে যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে ব্যবসায়ীরা তখন অনেক সময় উটের ওপর চড়িয়ে তাদের কর্তা সাজিয়ে নিয়ে আসে বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে।

এ কথা শুনে বললেন কবি: চীনে ভ্রমণ করবার সময়েও চীনের ডাকাতের হাতে ধরা পড়বার সাধ হয়েছিল আমার, কিন্তু সেখানেও শুনেছিলাম বৃদ্ধ জ্ঞানী লোকদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে দস্যুরা। আপনাদের দস্যুদের ও চীনের দস্যুদের মনোভাব দেখছি একই রকম। অতএব বেদুইন দস্যুদের হাতে নাকাল হবার হাজার ইচ্ছে করলেও ওটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল আমার এই বয়েসটার জন্যে। আমার এই বয়েসটাও মারামারি কাটাকাটি করবার বয়েস নয়।

পারস্যে ও চীনে গিয়ে ডাকাতদের কবলে পড়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার ইচ্ছা হয়েছিল যে কবির, তাঁর নাম তোমরা জান কি? ইনি হলেন বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমতী ছবি গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট একটি ছেলে। বেশীর ভাগ সময়েই ছোট বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান ও শাসন করে ঝি-চাকররা। এই ছেলেটির বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এই ছেলেটি যেমন দুষ্ট তেমনি ডানপিটে। সারা বাড়ী খুঁজে সারা—ছেলেটি হয় বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে, নয় সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে। কখনও হয়ত ছুতারের হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে ব্যস্ত, কখনও হয়ত কারুর আফিংয়ের কৌটো চুরি করে তাকে বিষম ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আবার কখনও হয়ত সুন্দর মাছের টবে লাল রং গুলে, কখনও চুপিচুপি পাখীর খাঁচার কাছে গিয়ে খাঁচার পাখী উড়িয়ে দিয়ে—একেবারে চুপ। এমনি ধারা আরও কত দুষ্টুমি যে করেছে এই ছেলেটি, কিন্তু তাই বলে লেখাপড়ায় মন ছিল না যে তা নয়, বাড়ীতে রীতিমত পড়াশুনা করতে হয়েছে। এত বড়লোকের ছেলে হলেও বিলাসিতার নাম-গন্ধও ছিল না। অনাড়ম্বর ভাবেই কেটেছে আর অন্য ছেলেদের সাথে। এই দুষ্টু ডানপিটে ছেলেটি সাদা কাগজে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে নয় ত গাছের ফুল-পাতার রং নিংড়ে ছবি এঁকে যেতেন। এই ছেলেটির এমনি ধারা ঝোঁক দেখে অভিভাবকরা উৎসাহ দেন। কিছু পরে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ গিলার্ড সাহেব আর বিখ্যাত শিল্পী পামারের কাছে তিনি বিলেতী পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখেন। বাড়ীর গ্রন্থশালায় বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক দিন হঠাৎ এক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করার পর প্রতিভা বিকশিত হবার প্রকৃত সুযোগ এল। ঐ পুঁথিতে ছিল মোগল ও রাজপুত যুগের বহু ছবি। এই পুঁথি থেকেই ছবি আঁকবার, লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে আবার তুলে ধরবার সুযোগ পান। পরবর্তী সময়ে তাঁর সব ক'টা ছবিতেই ইতিহাসের বহু ঘটনা ও চরিত্রের অপূর্ব্ব রূপ দেখা যায়। তা ছাড়াও ছবিতে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল ও আরও পুরাণের বিষয়বস্তু। প্রতিটি ছবিই অপূর্ব্ব, সব চাইতে সাজাহানের মৃত্যু, শেষ বোঝা, অশোক-মহিষী, ভারতমাতা, কচ ও দেবযানী, বিরহী যক্ষ, ত্রয়ী, বুদ্ধ ও সুজাতা ও শ্রীচৈতন্যদেবের এই ছবিগুলির তুলনা কোন কালেই হবে না। বিশ্বের কলা-রসিকরা এই শিল্পীর শিল্পকলার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছু পরে যখন শিল্প-গুরুর আসন পেলেন তখনও দূর-দেশ থেকে বিদেশীরা এসেছে ভারতীয় শিল্প শিখতে। তাঁর আঁকা বহু ছবি বিদেশে প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে, নিজে সাগর পাড়ি দিয়ে যাননি বিদেশে। এই শিল্পীর সব চাইতে বড় ভক্ত ছিলেন সেই সময়কার বড়লাট লর্ড কারমাইকেল। ১৯১১ সালে তিনি দিল্লীর দরবার থেকে দুইখানা বিখ্যাত ছবির জন্য পুরস্কৃত হন। ১। সাজাহানের মৃত্যু, ২। তাজমহল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সাথে লর্ড হার্ডিঞ্জ পরিচয় করিয়ে দেন তাঁকে এই কলকাতায়, সম্রাট-দম্পতি ক'খানা ছবি নিয়ে যান। আজও বাকিংহামে সে ছবি রয়েছে, এই

শিল্পী পরে ১৯০৬ সালে কলকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন। আজও তাঁর বহু বিখ্যাত শিষ্য রয়েছেন এদিকে-ওদিকে। এই বিখ্যাত শিল্পী আর সেই দুষ্টু ডানপিটে ছেলেটি আর কেউ নন—আধুনিক ভারতীয় শিল্পের জনক (Father of Modern Indian Art) শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাইপো ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে। ভারতের দুই কীর্তিমান সন্তান—শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। শিল্প-গুরু, কবি-গুরু দু'জনকেই এস সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

কান্তি বাবুর শান্তি খুড়ো

কান্তি বাবুর শান্তি খুড়ো মাথায় দিয়ে বালিশ
ভোজন করে পেট ভরিয়ে
ধোলাই ধুতি গায় জড়িয়ে
দুপুর বেলা অঙ্ক কষেন "বিশ দু'গুণে চালিশ।"
দু'পায়ে তার 'পাম্প-শু' জুতো,
চেঁচিয়ে ডাকেন "ওরে ভুতো,
আয় নিয়ে আয় বুরুশ কালি, কর্ তো দেখি পালিশ।"
এম্নি ভুতো হতচ্ছাড়া,
হাজার ডাকেও দেয় না সাড়া,
তবুও খুড়ো চটেন নাকো, করেন নাকো নালিশ।
অঙ্ক কষার ফাঁকে ফাঁকে
হাত বুলিয়ে মাথার টাকে
বলেন "শুধু টাক-মারী তেল কর্‌তে হবে মালিশ।
আয় কে কোথায় আছিস্ টাকী?
এ নয় মিছে, এ নয় ফাঁকি,
টাকের দুখে দুই চোখে জল মিথ্যে কেন ঢালিস্?
আমায় যদি আনিস্ ডেকে,
অঙ্ক না হয় বন্ধ রেখে
সব ঝামেলা মিটিয়ে দেবো মান্‌লে আমায় সালিশ।"

অবাক্ কাণ্ড

বাবুই কাঁদে বাবলা গাছে, তাই দেখে যে বাঁদর হাঁচে।
সেই হাঁচিরই ঝট্‌কাতে আগুন ধরে পট্‌কাতে।
সেই আগুনে চট্ করে পটকা ফাটে পট্ করে।
সেই ফাটুনির গন্ধে ভাই, দুপুর হলো সন্ধ্যে ভাই।
সন্ধ্যে বেলার অন্ধকার কর্‌লে যেন বন্ধ দ্বার।
বন্ধ দ্বারে দেয় টোকা বাইরে থেকে কোন্ খোকা?
আয় রে খোকা আয় রে আয়, আদর করে ডাকছে মা'য়;
তাই তো খোকা সব ভোলে, অম্নি ছোটে মা'র কোলে।

কোন্ দেশে?

ঝাউ গাছে কোথা হায় লাউ ফল ফলে রে?
মাছেরা ডাঙায় থাকে, বাঘ থাকে জলে রে?
ময়রারা কোথা খায় নিজেদের মণ্ডা?
এক মণে কোথা হয় সাড়ে কুড়ি গণ্ডা?
ফুটো বল দিয়ে কোথা ফুটবল খেলা হয়?
লোকজন ছাড়া কোথা গাজনের মেলা হয়?
গাছ থেকে টুপটাপ কোথা ঝরে টুপি রে?
কোথা জলে পেট্রোলে কেরোসিন কুপি রে?
কোথায় পলাশ ফুলে গোলাপের গন্ধ?
কোন্ দেশে কবিতায় নেই কোনো ছন্দ?
ঝিঁঝিঁ পোকা কোথা ভাই ঝিঁঝিঁ ডাক জানে না?
হাঁচি আর টিক্‌টিকি কোথা কেউ মানে না?
ব্যাঙের কামড়ে আহা সাপ কোথা মারা যায়?
চুলো মাথা ন্যাড়া করে বেল্‌তলা কারা যায়?
কোন্ দেশে ফাঁদ পেতে চাঁদ চায় ধর্‌তে?
ছাত্রের কাছে আসে মাষ্টার পড়্‌তে?
চাই যাহা পাই তাহা, পাই যাহা চাই রে?
চল্ ভাই দল বেঁধে সেই দেশে যাই রে!

গাধার গাড়ী

গাধা-টানা গাড়ী ঐ চলে রে চলে।
এক চাঁদ বহু তারা জ্বলে রে জ্বলে
মাথার ওপরে ঐ গগন-তলে।
পেছনে কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ ঘেউ,
ছল ছল করে জলে ওঠে যেন ঢেউ,
গাড়ীর ভেতর থেকে শোনে কেউ কেউ।
ঝিঁঝিঁ ডাকে হর্‌দম বাঁশের ঝাড়ে
আন্‌মনে হোথা ঐ পুকুর পাড়ে।
জোনাকীর ঝিক্‌মিক্ বনের ধারে।
ঝিঁঝিঁ ডাক যায় নাক গাধার কানে?
মনে মনে কি যে ভাবে গাধাই জানে।
গাড়ী চলে ঘর্‌ঘর্ সমুখ পানে।
পথের দু'ধারে ঘেরে সাঁঝের আঁধার।
গলা করে সুড়্‌সুড় গাড়ীর গাধার—
ভাবে যে সময় হলো কণ্ঠ সাধার।
আকাশের চাঁদোয়ায় মুক্তা ঝলে,
গাধা করে গুন্-গুন্ গানের ছলে,
বাঁকা পথে সোজা গাড়ী চলে রে চলে।

অঙ্ক কষা

রাত দুপুরে জ্বালিয়ে বাতি
ছট্টুরামের ছোট্ট নাতি
শোবার ঘরে একলা বসে
আপন মনে অঙ্ক কষে
বলে "আমার চাই নে সাথী।
ঘুম তাড়িয়ে চোখের পাতায়
অঙ্ক কষে খাতায় খাতায়
একাই আমি জাগবো রাতি,
ফুলিয়ে বুকের ছোট্ট ছাতি"।

মা কেঁদে কয় "শোন রে যাদু।
তোর তরে যে কাঁদছে দাদু।
এমন করে রাত্রি জেগে
মরবি শেষে সর্দি লেগে,
তখন সবাই বল্‌বে হাদু।"
ছুট দাদুও ছুটে এসে
একটু কেঁদে একটু হেসে
বলেন "দাদু, অঙ্ক থামা।
গায় পরে নে গরম জামা,
নইলে শেষে মরবি কেশে।
অঙ্ক কষিস্ দিনের বেলা,
সময় তখন মিল্‌বে মেলা—
আয় রে এখন ঘুমের দেশে।"
ছোট্ট নাতি চেঁচিয়ে ওঠে :
"গোল কোরো না হেথায় মোটে।
অঙ্ক কষা নয় তো খেলা,
কর্‌লে পরে এমন হেলা
অঙ্ক যাবে বিষম চটে।"
এই না বলে ছোট্ট নাতি
ফুলিয়ে বুকের ছোট্ট ছাতি
জ্বালিয়ে বাতি রাত দুপুরে
নামতা পড়ে নানান্ সুরে
অঙ্ক কষে কাটায় রাতি।

কোহিনূর

অজয়কুমার গুপ্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "স্পর্শমণি" কবিতায় দেখতে পাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবন, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বর্দ্ধমান থেকে বৃন্দাবন ছুটে গেছে সনাতন গোস্বামীর কাছে ধনদৌলতের সন্ধান পাবে বলে। সন্ন্যাসী হেলাভরে বালুর নীচে রক্ষিত স্পর্শমণির সন্ধান বলে দেন। লুব্ধ, উত্তেজিত জীবন, স্পর্শমণি হাতে নিয়ে নির্লিপ্ত, পার্থিব ধনদৌলতে উদাসীন সনাতন গোস্বামীকে দেখে চৈতন্য লাভ করলে—অর্থই কি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য, শান্তি ও সুখের কারণ? অনুশোচনা অশ্রুজলে স্পর্শমণি নদীর জলে ছুড়ে ফেলে সাধুর চরণে লুটে পড়ল—

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান' না মণি
তাহার খানিক
মাগি আমি নতশিরে।"

* * * *

অর্থই অনর্থের মূল। এই দার্শনিক সত্যটুকু বিশেষ করে প্রমাণ করলে ভারতবর্ষেরই একটি বিশ্ববিখ্যাত মণি—"কোহিনূর"! এই অমূল্য রত্নটিকে ঘিরে কত রাজ্যের, কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত রাজা-বাদশার ভাগ্য-বিপর্য্যয়, কত লুঠতরাজ, ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলো—সে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাসের কাহিনী। নানা হাত বদল হয়ে, দেশ-দেশান্তর ঘুরে আজ সেই "কোহিনূর" সাত সমুদ্রপারে বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর মুকুটমণি হয়ে শোভা পাচ্ছে। কোহিনূর যে রাজার গলে দুলেছে, যে বাদশার মুকুটে জ্বলেছে, দেখা গেছে তাঁর ধনপ্রাণ, সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়েছে। তাই সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আদেশে কোহিনূর মণি ইংলণ্ডের রাণীর বা সম্রাজ্ঞীর মুকুটেই লাগান থাকবে।

কোহিনূর সর্বপ্রথম কার কাছে, কবে ছিল এবং কেমন করে এলো তার ইতিহাস অস্পষ্ট। অনুমান ৬ হাজার বৎসর আগে মহাভারতের যুগে কর্ণের কাছে এই মণি ছিল বলে অনেকে মনে করেন। কুরু পাণ্ডবগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না সে তর্ক এখানে অবান্তর। যাই হউক, এই রত্নটির অনেকটা স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ৫৬ সালে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে। তার পরবর্ত্তী ১৩শ বৎসরের ইতিহাস আবার রহস্যাবৃত। ১৩০৪ খৃঃ এই অমূল্য রত্নটির সন্ধান মেলে মালওয়ারের হিন্দু রাজার রাজভাণ্ডারে। ঐ বৎসরই মালওয়া রাজ্য দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিন মহম্মদ শাহের অধীন হয় এবং এই মণিটি তাঁর হস্তগত হয়।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তাইমুরলঙ্গ তাঁর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে উত্তর-ভারত আক্রমণ করলেন। তাইমুরলঙ্গ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বলেছেন—"Perhaps the greatest artist in destruction known in the savage annals of mankind" লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসের তাণ্ডব লীলার পর যখন তাইমুরলঙ্গ সমরকন্দে ফিরে গেলেন—বিপুল লুণ্ঠিত ধন-ঐশ্বর্য্য, নানা মণি-মাণিক্য নিয়ে, আশ্চর্য্যের বিষয় তার মধ্যে কোহিনূর ছিল না। সম্ভবত তদানীন্তন দিল্লীর বাদশা পালিয়ে যাবার সময় কোহিনূর সঙ্গে করে পালিয়েছিলেন।

তাইমুরলঙ্গ যে বিধ্বস্ত ভারত পিছনে ফেলে গেলেন, তারই ধ্বংসাবশেষের উপর লোদি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তার পতন হল ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে। ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত ও নিহত করে জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবুর—ইতিহাসে যিনি "Caesar of the East" বলে পরিচিত—ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। ইব্রাহিমের পরাজিত সৈন্য যখন আগ্রামুখী পলায়নে তৎপর, বাবুর তার পুত্র যুবরাজ হুমায়ুনকে সৈন্য দিয়ে পিছনে পাঠালেন। ইব্রাহিমের রাজদরবার দিল্লী থেকে উঠে গিয়ে আগ্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হুমায়ুন আগ্রা অবরোধ করলে, গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ হন। বিক্রমজিৎ তখন হুমায়ুনকে অনেক জহরৎ ধনদৌলত উপঢৌকন দেন। তার মধ্যে এই বিশ্ববিখ্যাত কোহিনূর মণিও ছিল। বাবুর তাঁর রোজনামচায় লিখছেন—"হুমায়ুনকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিক্রমজিৎ যে বিপুল ধনদৌলত উপহার দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই বিখ্যাত রত্নটি ছিল যাহা আলাউদ্দিন হস্তগত করেছিল। কথিত আছে, এই রত্নটির দাম প্রত্যেক জহুরী সমস্ত পৃথিবীর ২½ দিনের খাদ্যের মূল্যের হিসাব করেছে। ওজনে প্রায় আট Misqals ছিল। আগ্রায় পৌছলে, হুমায়ুন বাবুরকে রত্নটি দেন, বাবুর সেটি আবার হুমায়ুনকেই ফিরিয়ে দেন।" "(They made him a voluntary offering of a mass of jewels and valuables amongst which was the famous diamond which Ala-ud-din must have brought. Its reputation is that every appraiser

has estimated its value at two and a half day's food for the whole world. Apparently it weighs eight misqals. Humayun offered it to me when I arrived at Agra ; I just gave it back to him.")

লোদিদের হাত থেকে গোয়ালিয়রের রাজার কাছে কি করে এই রত্নটি এলো ইতিহাসে তার বিবরণ রহস্যাবৃত।

কিংবদন্তী আছে, হুমায়ুন যখন কঠিন রোগে শায়িত, অনেকে বাবুরকে তার সব চেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ্ দিয়ে পুত্রের প্রাণরক্ষা পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোহিনূর তখন হুমায়ুনের কাছে। বাবুর কোহিনূরের পরিবর্ত্তে নিজের প্রাণ দিতে রাজী ছিলেন। প্রার্থনা তাঁর মঞ্জুর হল, হুমায়ুন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন এবং তিন মাসের মধ্যে বাবুর প্রাণত্যাগ করলেন।

হুমায়ুনের প্রথম দশ বৎসরের রাজত্ব কাল পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টলমল। ১৫৪০ খৃঃ কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে প্রাণ নিয়ে ছুটতে হয়। দিল্লী, পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধুর মরুভূমির মধ্য দিয়ে সিংহাসনচ্যুত সম্রাট আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হতে ছিলেন। এই যাযাবর জীবনে হুমায়ুন এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সুন্দরী আরব মেয়ে—হমিদার সাক্ষাৎ লাভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পর বৎসর এই হামিদার গর্ভেই আকবর বাদশার জন্ম হয় সিন্ধু-মরুর প্রান্তে ছোট্ট একটি সহর—ওমরকোটে। হুমায়ুন তখনও কোহিনূর বহন করছেন। কে জানে, জীবনের দুর্গম দুর্য্যোগে তার একমাত্র জীবনসঙ্গী, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভাগী প্রেয়সী হামিদাকে কখনও সেই অমূল্য বস্তুটি দিয়ে সাজিয়েছিলেন কি না?

পলাতক বাদশা হুমায়ুন শেষ পর্য্যন্ত যখন পারস্যের শাহের দরবারে উপস্থিত হলেন তখনও কোহিনূর মণি তাঁর কাছে, কিন্তু তাঁর প্রিয় পত্নী হামিদা ও পুত্র আকবর সঙ্গে ছিল না। কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা কমরাণ, হুমায়ুনের ভাই, কান্দাহারে হুমায়ুনের স্ত্রী-পুত্রকে আটক করেন। ভারতবর্ষ হ'তে আনীত নানা মণিমুক্তার সঙ্গে কোহিনূর মণিও উপঢৌকন দিয়ে হুমায়ুন পারস্যের শাহের আতিথেয়তা ও আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। সুদীর্ঘ পলায়ন-পথে কত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও হুমায়ুন কোহিনূর বিক্রি করেননি। তিনি বলতেন—"এই মণি কেনা যায় না; হয় এ অস্ত্রবলে অধিকার করা যায়, নয় বিধির বিধানে লাভ করা যায়, অথবা রাজা-মহারাজার দাক্ষিণ্যে পাওয়া যায়।" ("Such a gem cannot be obtained by purchase ; either they fall to one by the arbitrament of the sword, an expression of the Divine Will, or else they come through the grace of great monarchs.")

হুমায়ুনের পারস্যের দরবারে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হবার সময় থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোহিনূরের ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন, পারস্যের শাহ আহমেদ নগরের বুরান নিজাম শাহকে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কোহিনূর পাঠিয়েছিলেন। এবং খুব সম্ভব আহমেদ নগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আকবর নিজাম শাহের রাজপ্রাসাদে যে সমস্ত মণিমুক্তা লাভ করেন সেই সঙ্গে কোহিনূর মণিও উদ্ধার করেন। আর এক দল ঐতিহাসিকের মতে হুমায়ুন পারস্যের শাহের এমন নেক্‌নজরেই পড়েছিলেন যে শাহ হুমায়ুনকে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে কাবুল ও কান্দাহার জয় করে স্ত্রী-পুত্র উদ্ধার করতেই শুধু সাহায্য করেননি, হিন্দুস্থানের হৃত সিংহাসন লাভের জন্যও সৈন্য-সামন্ত দিয়েছিলেন। হিন্দুস্থান অভিযানের সময় খুব সম্ভব দুই সম্রাটের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করবার মানসে শাহ কোহিনূর মণি হুমায়ুনকে প্রত্যর্পণ করেন। সে যাই হউক, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল ধনভাণ্ডারে এই কোহিনূরের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই থেকে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান্, ঔরঙ্গজেব এবং তার পরবর্ত্তী মোগল বাদ্‌শাহদের কাছে এই মণি গচ্ছিত ছিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মসনদে যখন মহম্মদ শাহ, তখন নিষ্ঠুর নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে রাজধানী দিল্লীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন। বিপুল হত্যাকাণ্ড, লুঠতরাজ, দাবাগ্নির যে তাণ্ডবলীলা নাদির শাহ দেখিয়ে গেলেন ইতিহাসে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন মহম্মদ শাহ অবশেষে নাদির শাহের কাছে শান্তি ভিক্ষা করলেন। ৩৪৮ বৎসরের মোগল বাদ্‌শাদের সঞ্চিত ধন-ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে হাতবদল হয়ে গেল। নাদির শাহ মোগল ধনভাণ্ডার ত নিঃশেষ করলেনই, ময়ূর-সিংহাসন এবং কোহিনূর তাঁর হস্তগত হল। মহম্মদ শাহ কোহিনূর মণি তার পাগড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। নাদির শাহ নিজের পাগড়ির সঙ্গে মহম্মদ শাহের পাগড়ির বিনিময় করে প্রীতির নিদর্শন রাখতে চাইলেন। অগত্যা মহম্মদ শাহকে বিশেষ অনিচ্ছায় পাগড়ি বদলাইতেই হয়। নাদির শাহ পাগড়ির ভাঁজ থেকে মণিটি বের করে উল্লাসে চীৎকার করে উঠেন—"কোহিনূর"! অর্থাৎ আলোর পাহাড় (Mountain of light)।

অনেকের মতে কোহিনূর মণি আসলে Great Mogul নামে একটি বড় মণির ভগ্নাবশেষ। "গ্রেট মোগল" মণিটি অখণ্ড অবস্থায় ৭৮৮ ক্রেট ওজনের ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় ভেনিসের জহুরী Hortensio Borgia ওটাকে ঘসে-মেজে, কেটে-ছেঁটে ২৮০ ক্রেটের করেন। ইংলণ্ডে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এটাকে আরও কেটে ১০৬ ক্রেটের করা হয়েছে। সে যাই হউক, মণিটির নাম নাদির শাই প্রথম "কোহিনূর" দেন। নাম সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ—১৭ শতাব্দীতে গুণটুরের কাছে কৃষ্ণা নদীর তীরে কোলার নামক জায়গায় এই রত্নটি প্রথম পাওয়া যায়। সেই জায়গার নামের অপভ্রংশ হতেই এই রত্নটির নাম কোহিনূর হয়েছে।

নাদির শাহ কোহিনূর মণি পারস্যে নিয়ে যান। কোহিনূর মণি দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষের বাইরে গেলো। সাত বৎসর পর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী নাদির শাকে এক আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল। পারস্যের সিংহাসনারোহীর অদল-বদলের সঙ্গে সঙ্গে কোহিনূরও হস্তান্তরিত হতে লাগল। শেষটায় অজ্ঞাত পথে কোহিনূর আফগান রাজা শাহসুজা দুরাণীর হাতে এলো।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে পেশাওয়ারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আফগানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সন্ধি-চুক্তি করে। সন্ধি-চুক্তির সময় The Hon. Mount Stuart Elphinstone শাহসুজার গলার ব্রেসলেটে কোহিনূর মণি দেখতে পান। এর কিছুকাল পরেই শাহসুজা কাবুলের সিংহাসনচ্যুত হয়ে প্রাণভয়ে সপরিবারে কোহিনূর সহ পাঞ্জাবে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিং সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুর মণি দাবী করলেন। শাহসুজা প্রথমটা দাবী অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু রণজিৎ সিং শাহসুজাকে সপরিবারে কয়েক দিন উপবাসে রেখে কোহিনুর ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলেন। আর হতভাগ্য শাহসুজা পালিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে এসে আশ্রয় নিলেন।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ব্রিটিশদের সঙ্গে শিখদের ২টি যুদ্ধ হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। কোহিনুর মণি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী লিখছেন যে, তিনি লাহোর থেকে কোহিনুর কোমরের বেল্টএর সঙ্গে সিলিয়ে থলির মধ্যে আনেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি কোহিনুর বোম্বের ট্রেজারীতে জমা দিয়েছেন দিবারাত্র এক মুহূর্তের জন্য কোহিনুর হাতছাড়া করেননি। ("I brought the Kohinoor from Lahore in a wallet sewn into a belt round my waist, and it never left me day or night till I got it into the Treasury at Bombay.") বোম্বে থেকে H. M. S. MEDEA জাহাজে ১৮৫০ সালে কোহিনুর ইংলণ্ডে পাঠান হয়।

*   *   *   *

Tower of Londonএর Wakefield Towerএ ৬ পেনস্ মূল্য দিয়ে প্রবেশ করলে বিরাট কাচের বাক্সের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজ-ভাণ্ডারের অন্যান্য ধন-দৌলতের সঙ্গে কোহিনুর মণিও দেখা যাবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোয় কোহিনুরের বিদ্যুচ্ছটায় তার ভাবী ইতিহাসের ধারার কি কোন হদিস্ মিলবে? কোহিনুর কি তার পথ চলার প্রান্তে এসে গেছে? গণপরিষদে আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য জননেতাগণ কোহিনুর মণি ফিরিয়ে আনবার যে প্রস্তাব করেছেন তা কি কোন দিন সফল হবে? ভবিষ্যৎই জানে!

শীত এলো

মীরা দেবী

ঐ দেখ শীত বুড়ি—কোথা যেন ছিল রে—
কুয়াসার কাঁথা গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি এল রে।
ধূসর আঁচল আড়ে,
হাড়-কনকনে জাড়ে,
নিয়ে এসে চুপিসাড়ে ছড়িয়ে সে দিল রে।

শীত এলো মাঠে পথে হিমে হাওয়া এলিয়ে।
হরিৎ বনের বুকে পীত রঙ বুলিয়ে।
যত ফুলে ডেকে ডেকে
কোথা সে যে রাখে ঢেকে;
ফুটিল দোপাটি গাঁদা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে।

শীত এলো, ভয়ে ম'ল আর্ত্ত ও আতুরে।
লেপের ভিতরে কাঁপে যত শীত-কাতুরে।
খোকনের মন ভার,
ফাট্ ধরে গালে তার;
হিম-ছোঁয়া পেয়ে বাতে কাঁদে বুড়ো বাতুরে।

শীত এলো, বনে বনে এলো ঝর-ঝরানি।
শীর্ণ আলের বুকে ব'সে ভাবে কুড়ানি,—
আজি হ'তে ঝুড়ি ভরা
ধান কুড়া হ'ল সারা
রিক্ত নিরালা মাঠে আর মিছে বেড়ানি।

ঝরা পাতা উড়ে যায় উত্তুরে হাওয়াতে।
খুকুরাণী বসে ভাবে রোদে-ছাওয়া দাওয়াতে—
বনানীর যত সাজ
শীত খুলে নিল আজ,
কেমনে সে ফিরে পাবে কার কাছে চাওয়াতে!

সৈনিক

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
জীবন-যুদ্ধে কিসের ভয়?
সৈনিক তুমি নির্ভীক চলো
শত সংঘাতে রে দুর্জ্জয়!
শক্ত করিয়া শিথিল মন
করো সংগ্রাম মৃত্যুপণ,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্রে তোমার
হউক জীবন পুণ্যময়,
জীবন-যুদ্ধে কিসের ভয়?

অঙ্গে লাগাও বীরের সজ্জা
কল্প-বর্ম্ম আচ্ছাদন,
ব্যাণ্ড-বাদ্যের তালে তাল দিতে
টলে নাক' যেন ঐ চরণ।
তোমার গতির দুর্ব্বারে
কাঁপিবে পৃথ্বী, ভয় কারে?
লড়াই তোমার জীবনের ব্রত,
শত ভীরুতায় মানবে ক্ষয়,
জীবন-যুদ্ধে কিসের ভয়?

তোমার চলার আড়ালে যেদিন
গড়বে তোমার ভবিষ্যৎ,
নূতন দিনের উষার আলোয়
দেখবে জীবন-স্বর্ণ-রথ।
অন্ধ নাশিবে, মন্দ লেশ
রূঢ় বাস্তবে যুদ্ধবেশ,
কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
হ'বে নিশ্চিত তোমার জয়,
জীবন-যুদ্ধে কিসের ভয়?

বাঙলা দেশে একদা যখন এক দল ধনীর দুলাল মদ আর মেয়েমানুষের জন্যে ফতুর হয়ে যেতে বসেছে কিংবা পায়রা আর ময়ূর সেজে বাগান-বাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকছে কিংবা জুয়া আর তিতিরের লড়াইয়ে লাখ লাখ টাকা ওড়াচ্ছে, তখন অন্য এক দল ধনী সম্প্রদায় 'সঙ্গীত-সমাজ' সৃষ্টি করছেন। তখন ছিল 'সঙ্গীত-সমাজ'। তারপর যদিও আমাদের কোন বিশেষ একটা 'সমাজ' ছিল না, কিন্তু এমন কয়েক জন বাঙালী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন একাধারে বিত্তশালী ও সঙ্গীতরসপিপাসু! মুঘল যুগের দরবারী গানের আজ্ঞাকে সামাজিক আসরে রূপান্তরিত করলেন তাঁরাই প্রথম! রাজা-বাদশাদের একচেটিয়া সম্পত্তিকে সাধারণের কাছে বিলিয়ে দেওয়ার প্রথম ব্যবস্থা করেছিলেন নাটোরের স্বর্গত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এবং পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। শীতকাল। 'সিনেট হল'এ রবীন্দ্রনাথ প্রথম নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পত্তন করেন। এই সম্মেলনের যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদের অনেকেই বিশেষ জ্ঞানী ও গুণী। এক কথায় সকলেই সঙ্গীত-রসিক এবং আজকে আর বলতে কোন বাধা নেই যে নাটোরের মহারাজা, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার এবং ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষই ছিলেন প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে প্রধানতম এবং আজও তাঁদেরই সুযোগ্য বংশধরগণ নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুরাপুরি বজায় রেখেছেন।
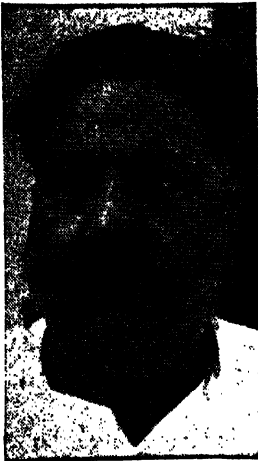
বড়ে গোলাম আলী খাঁ

* *

বেশ কয়েক বছর ধ'রে লক্ষ্য করছি, বাঙলা দেশের সঙ্গীত-সম্মেলনে জড় করা হচ্ছে যত মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতের ওস্তাদদের। এ-প্রদেশ সে-প্রদেশ থেকে আসছে, হাজার হাজার টাকা নিচ্ছে আর কালোয়াতী গানের শ্রাদ্ধ করে যাচ্ছে। আর বাঙালী সমঝদার, দর্শক ও গাইয়ে-বাজিয়ের দল, সেই সব ভিনদেশীদের পায়ের কাছাকাছি ব'সে সাকরেদী করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। ফলে লাভ হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমানে বাঙলা 'ক্ল্যাশিকাল গান'কে ক্ল্যাশিকাল গান বলতেও পেছপাও হচ্ছে এমন কি দিল্লীর নেহেরু সরকার। বাঙলা মার্গ-সঙ্গীতের একটা নামকরণ করিয়ে নেওয়া হয়েছে আধুনিক ভাষাবিদের নিকট থেকে। নাম দেওয়া হয়েছে 'বাঙলা রাগ-প্রধান গান'। নিজেদের গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর বাঙালীর গান 'রাগ-প্রধান'? কিন্তু এততেও বাঙলা ও বাঙালী যদি সামান্যতম 'রাগ' প্রকাশ করতো! বাঙালী গান না গেয়ে যদি শুধু রাগই দেখাতে বসতো, তা হ'লে কে প্রচার করতো ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলি, আলাউদ্দীন খান, বালা সরস্বতী, সম্রাট আল্লাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম, নাসির আলি খাঁ আর ওঙ্কারনাথের নাম?

* * * *

সম্মেলনটা হচ্ছে যখন বাঙলা দেশে, তখন বাঙলা দেশে অন্যান্য প্রদেশ কেন অন্যান্য উপদেশ, মহাদেশ থেকেও গুণীজনদের ধ'রে ধ'রে নিয়ে আসার বিরোধী আমরা আদপেই নই। কিন্তু আমরা যদি দাবী জানাই, বাঙলা দেশেরও কিছু কিছু গান আর বাজনাকে স্থান দেওয়া হোক এই সঙ্গে। কোন সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখলাম না কোথাও লেখা আছে যে, 'কখনও যেন না একটি ধারাও বদল করা হয়'! যে-ধারা চ'লে আসছে সেই ধারাই চলবে চিরকাল, এটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। পূর্ব্বের সেই উৎসাহী উদ্যোক্তাদের

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (সম্পাদক, নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন)

না হয় 'মার্গ-সঙ্গীত'কে স্থান দেওয়া ভিন্ন কোন গত্যন্তর ছিল না। কেন ছিল না পরে বলছি। তার আগে বাঙলা দেশে কি কি সঙ্গীত সুপ্রচলিত ছিল এবং এখনো সেগুলোর পুনরুদ্ভব সম্ভব—তাদেরই একটা ফিরিস্তি দিই যাঁরা সম্মেলন আর Conference-এর কর্ম্মকর্ত্তা তাঁদের জন্য। বাঙলা দেশে বর্ত্তমানে যেমন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে আছে সেই "সাড়ে-সাত-বছর-আগে-মরে-যাওয়া-কোন-আত্মীয়ার-প্রতি-হঠাৎ-জেগে-ওঠা-অহেতুক-কোন' বিরহ সঙ্গীত, তেমনি এখনও অর্দ্ধমৃত হয়ে বেঁচে আছে বৈষ্ণব কীর্ত্তন, আউল-বাউল-সহজিয়া, পাঁচালী, টপ্পা, ধ্রুপদ, খেয়াল, সুফীদের মর্সিয়া আর মারফতি গান; আছে যাত্রার গান, তরজা, কথকতা, ঝুমুর, ধামালি আর গম্ভীরা। আছে জারি, সারি, ভাটিয়ালী আর বেদে গান। আগমনী, নবমী আর বিয়ের গান। মৈমনসিংহ গণ-গীতিকার গান। রামপ্রসাদ, নিধু বাবু, কান্ত কবি, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্মেলনের অধিকাংশ কর্ম্মকর্ত্তারা এখনও গান বলতে বোঝেন শুধু মার্গ-সঙ্গীত, তারের যন্ত্র বলতে চেনেন তানপুরা এবং চামড়ার যন্ত্রের মধ্যে জানেন শুধু তবলাকে। পূর্ব্বে জেনেছিলেন যা, এখনও তাই তাঁদের জানা আছে।

* * * *

সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভিনদেশী গায়কদের সংখ্যা অধিক কেন? পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানেও এই আধিক্য? সামান্যতম জ্ঞানের অধিকারী মাত্রেই অনুধাবন করতে পারবেন কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য।

(১) সম্মেলন সমূহ কেবল মাত্র খ্যাতিমানদেরই প্রতি বছরে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন।

(২) খ্যাতিমানদের মধ্যে আবার এক জনও নেই, যিনি লোকশিল্পী অর্থাৎ গণ-শিল্প যাঁর আয়ত্তে।

(৩) সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি যা চ'লে আসছে তাই চলুক? নতুন কোন পরিকল্পনা নেই কেন?

(৪) সম্মেলনের প্রবেশ-পত্রের মূল্য যখন পঁচিশ থেকে হাজার টাকা তখন সম্মেলনটা অবশ্যই সাধারণদের জন্য নয়। অসাধারণদের

জন্য। এবং পুরাপুরি ব্যবসার জন্য।

(৫) সঙ্গীত সম্মেলন শুধু 'সঙ্গীতের জন্যে'। একে-তাকে ডেকে নাচানোর কি অর্থ? রূপবতী ললনাদের দেখিয়ে অর্থলাভ?

* * *

কিন্তু সম্মেলন আর কনফারেন্স হচ্ছে যেখানে, সে-স্থানটা দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ কিংবা দক্ষিণ-ভারত নয়! বাঙলা দেশেরই বিশিষ্টতম শহর, কলকাতা মহানগরী। দর্শকদের মধ্যে

সরস্বতী রাণে

অধিকাংশই বাঙালী। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সম্মেলনের পেছনে আছে বাঙলা ও বাঙালীর অর্থ। বাঙলা দেশের অর্থ, ভোগ করছে যত মার্গ-সঙ্গীতের ধামাধরা আর যত ভিনদেশী? বাঙলার স্বার্থকে পদদলিত ক'রে প্রতি বছরে বাঙলা দেশ থেকে যারা কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা লুটতে আসে যদিও তাদের দিন বেশী দিন নয়। এমন দিন এসেছে যখন নেহরু সরকারের মত কমনওয়েলথভুক্ত সরকারও লোকশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং বহু পরিকল্পনায় বহু টাকা লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই বাবদে। কত কে লুটছে!

লোকশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গীত সম্মেলনের যোগাযোগ নেই শুধু এই কারণে যে, যোগসাধন করতে হ'লে হয়তো সম্মান বজায় থাকে না। রাজা-বাদশাদের পোষা হাতীর মত পোষা গাইয়ে-বাজিয়েদের সঙ্গে যাদের দহরম-মহরম, তাঁরা কোথা থেকে জানবেন দেশের লোকশিল্পীদের ঠিকানা? যদিও তারা না জানলেও বর্ত্তমান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাবৎ লোকশিল্পীদের টিকির সন্ধান করা হচ্ছে। কেন করা হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। কেন না, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির প্রচারের কাজ এক-আধটা সম্মেলনের কাজ নয়, লোক-শিল্পীদের কাজ। আর কংগ্রেসের কাজ লোকশিল্পীদের দলে ভেড়ানো। আই, পি, টি, এ নামক প্রতিষ্ঠান যখন এ-কাজে প্রথম অগ্রসর হয় তখন যদিও বহু বিখ্যাত জনই হাত-পা ছুঁড়ে ও গলা ফাটিয়ে এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসকে তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেখে আমাদের হাসি এবং কান্না একই সঙ্গে পাচ্ছে।

* * * *

কলকাতার প্রথম অনুষ্ঠান নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের। এমন রুচিপূর্ণ ও ভদ্র আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেনি তানসেন কিংবা নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনও। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সকলেই সম্ভ্রান্ত বাঙালী এবং সেই কারণেই বোধ হয় 'নিখিল বঙ্গ' অভিজাত ভঙ্গীতে পরিচালিত হয়েছে। মার্গ-সঙ্গীতের প্রাধান্য অত্যধিক দিলেও ধ্রুপদ, উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও কীর্ত্তনকেও তাঁরা বাতিল করেননি এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকতর দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় তাঁরা দেবেন। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় প্রথমে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের। অন্যান্যদের মধ্যে মহারাজা শ্রী প্র বী রে ন্দ্র মো হ ন ঠাকুর, শ্রীসুধাংশু মিত্র, শ্রীরাসবিহারী মল্লিক প্রভৃতি। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্মেলনের দু'জন উদ্যোক্তা যা ব্যক্ত করে-ছিলেন, তার মধ্যে কোন বক্তব্যই ছিল না। সঙ্গীত-শিল্পের

গঙ্গু বাঈ হাঙ্গল

প্রসারই যদি লক্ষ্য হয় তবে লক্ষ্যটা শুধু কালোয়াতী গানের প্রতি কেন? তানসেন সম্মেলনের শিল্পী-সমাবেশও উল্লেখযোগ্য নয়। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন আরও এক ধাপ এগিয়েছে। রাঙতা, জরি, লাল-নীল কাগজের ফুলে সাজানো মঞ্চে হয়েছে অনুষ্ঠান। প্রথম ক'দিনের ভাঙা আসরের অবস্থা দেখে মনে হ'ল, সঙ্গীতরসপিপাসুরা কি কলকাতা ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন? প্রচার-মন্ত্রী কেশকর উদ্বোধন করলেন এই অনুষ্ঠানটির। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেই খাড়া বড়ি আর থোড়ের কথা উল্লেখ করলেন। যথা, 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচার চাই।' কিন্তু 'প্রচার' চাইলেই যে পাওয়া যায় না, ভারতের প্রচার-মন্ত্রী নিশ্চয়ই সে-কথা ভেবে দেখেননি। দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অভুক্ত দেশবাসীর কানে রাগ-সঙ্গীত কি মধু বর্ষণ করতে পারে কে জানে! উচ্চ জাতের কোন কিছু প্রচার করতে হ'লে দেশ ও দেশবাসীকে তৈরী করতে হবে, উপযুক্ত করতে হবে। চতুর্থ অনুষ্ঠান ডোভার লেনে। সেখানেও সেই তা না না না আর পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রব। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত! কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ডোভার লেনে বাঙালী শিল্পীদের প্রতি অবহেলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারাপদ চক্রবর্তীকে না খাইয়ে রাত তিনটে পর্য্যন্ত অহেতুক বসিয়ে রাখা শুধু অসৌজন্য নয়, অভদ্রতাও!

* * * *

কলকাতার অলিতে-গলিতে মাঠে-ময়দানে আর বাজারের প্রেক্ষাগৃহগুলোর যখন সম্মেলন আর কনফারেন্সের আসর জমে উঠেছে তখন কলকাতার সংবাদপত্র-জগৎ ভাগাড়ে মড়া পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি ধাবায় লালায়িত হয়ে উঠেছে। একেই 'কলম' পুরানো যায় না, 'আর্টিকেল' ছাপতে হয় ঘর থেকে টাকা খরচা করে। লাগাও কলম কলম ফেনানো আর জাবরকাটা কয়েকটা গালভরা সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় কথা! কয়েকটা সুরের নাম! আর ঠাট ও গমকের বর্ণনা লাইনের পর লাইন! শুধু গানের Report দিলে আবার চলবে না, মহিলা শিল্পীদের যৌবন গত হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশও করা চাই। শ্রীমতী কেশর বাঈয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' দুঃখ প্রকাশ করছেন: "তিনি এসে দাঁড়ালেন আসরে—তাঁর উপস্থিতি-ধন্য শ্রোতার দল করতালিতে তাঁকে অভিনন্দন জানালে। কণ্ঠের মাধুরীর সঙ্গে রূপের মাধুরীও তিনি পেয়েছেন, যদিও প্রৌঢ়ার বয়সের ভারে আজ তা স্তিমিতগতি। হাতীর দাঁতের মত হলদে হয়ে গেছে রূপ—" (১৪।১।৬০)। কেশর বাঈয়ের যৌবনটা যে বহু দিন আগেই গত হয়েছে।

কিষেণ মহারাজ

'প্রৌঢ়া', 'বয়সের ভার', 'হলদে হয়ে যাওয়া' কথাগুলো ব্যবহার না করলেই ভাল ছিল না কি? বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে বোধ করি 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীপঙ্কজ দত্ত তুলনায় অনেক ভাল Report করেছেন।

* * * *

কলকাতার সম্মেলনে অন্যান্য প্রদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাঙলা দেশকে ভালবাসেন সত্যিকার। কেন না, বাঙলা দেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বোধ হয় এত সম্মান, এত আপ্যায়ন ও এতটা সমাদর তাঁরা পান না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাত্রির পর রাত্রি, সুস্থির হয়ে গান শোনার মধ্যে সঙ্গীত-পিপাসা যেমন আছে তেমনি আছে বাঙলা দেশবাসীর ধৈর্য্য, ভদ্রতা আর সহযোগিতার পরিচয়। খোলা-মাঠে দাঁড়িয়ে একত্র হয়ে 'রামা হৈ রামা হৈ' নাম-সংকীর্ত্তনের সঙ্গে কলকাতার গানের জলসার আবহাওয়ার তুলনায় বাইরের শিল্পীরা কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন। বেয়াদপি করলে যেমন হিন্দুস্থান সম্মেলনের গতি হয় তেমনি আবার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মিষ্টি আসরও রাতের পর রাত বিনা বাধায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়—শুধু শহর কলকাতায়। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ কোথাও এমনটি নেই। সেখানে সম্মেলনও হয় না, জলসাও বসে না। তারকারাই যা করবার করে।

* * * *

কলকাতার সম্মেলনগুলিতে যেমন একই ব্যক্তি বা একই দল অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি দেখতে পেলাম একই শ্রোতা শুনতে গেছেন প্রায় অধিকাংশ আসরে। যেদিকে ফিরাই আঁখি 'সেই মুখখানি' দেখিতে পাই! এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কলকাতা এবং তার আশ-পাশ অঞ্চলে আছেন সত্যিকার এক জাতীয় সঙ্গীতরসপিপাসু—যাঁরা দলাদলির এত-শত বোঝেন না, বোঝেন না কোন্ গায়ক কোন্ দলের, কোন্ সম্মেলন কোন্ দলের। তাঁরা শুধু গান শুনতেই ভালবাসেন। ভাল গান শোনার জন্য অর্থব্যয়ে তাঁরা পেছপাও নন মোটেই। তবে কেবল মাত্র 'নিখিল ভারত' সঙ্গীত সম্মেলনের শ্রোতা দেখলাম ভিন্ন জাতের। বিরাট বিরাট গাড়ী—ক্যাস্, পাকার্ড, পন্টিয়া, কাইজার ফ্রেজার, সানবীম ট্যালবট। বিরাট বিরাট বপু—নারী ও পুরুষের। কে বা কারা যেন গায়ের জোরে তাঁদের টিকিট বিক্রী করেছে আর তাঁরা একান্ত অনিচ্ছায় নেহাৎ আসতে হয় বলেই এসেছিলেন। এ আসরে অধিকাংশ সময়ে বেশীর ভাগ আসন ছিল শূন্য। দামোদর দাস খান্না (লালাবাবু), যিনি এই সম্মেলনের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, তিনি জাতিতে বাঙালী না হ'লেও বাঙলা ও বাঙালীকে ভালবাসেন: কিন্তু তিনিও ক্ল্যাশিকাল গানের মতই এক জন 'ক্ল্যাশিকাল' ব্যক্তি। 'প্রগ্রেস' বা প্রগতির পুছ করেন না। ওঙ্কারনাথের মোহে যেমন আচ্ছন্ন তেমনি তাঁর সম্মেলনও ওঙ্কারনাথী। এই সম্মেলনে গুণী সমাবেশ যথেষ্ট

আহমদ্ জান থেরকুয়া

ছিল না ব'লেই কি বাউণ্ডুলে গাইয়ে-বাজিয়েদের ধ'রে ধ'রে কাজে লাগানো হয়েছে। কত সব নাম-না-জানা অপটু কুমারী ও কিশোরীকে জড় করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগলো, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ল স্কুলের মেয়েদের নাচ দেখে। রহস্যটা আবিষ্কার করতেই পারলাম না। বেথুন, ভিক্টোরিয়া, লরেটো ও ব্রাহ্ম গার্লস থাকতে হঠাৎ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের ধ'রে টানাটানি কেন?

নিখিল ভারতের এত হাঁক-ডাক সত্বেও সম্মেলনটায় বাগুতা আর লাল নীল কাগজের চেকনাই-ই বেশী। দামোদর খান্নার পুরাতাত্বিক মনোভাবের পরিবর্তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

* * * *

কলকাতার সম্মেলনে এ বছরে বাঙলা ও বাঙালীর সুনাম অক্ষয় রেখেছেন যাঁরা, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাধিকামোহন মৈত্র, শিশির-কুমার গুহ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর, মীরা চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, কল্যাণী রায়, বেলা অর্ণব, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, হেনা বর্দ্ধণ, উমা দে, শ্যামল বোস, সুচিত্রা মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অনুরাধা গুহ প্রভৃতি। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে মুর্শিদাবাদের কীর্ত্তন রসসাগরের কীর্ত্তন কিন্তু হতাশ করেছে আমাদের। কলকাতার সম্মেলনে খ্যাতিমান বাঙালী শিল্পীরা আসর মাৎ করেছিলেন অনেকেই। কয়েক জন নবাগত বাঙালী শিল্পীও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন।

বাঙলা দেশ যখন একসঙ্গে এতগুলি সম্মেলনের কেন্দ্রস্থল তখন বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গীত-প্রীতির কথার আলোচনা অনর্থক। বাঙলা ও বাঙালীর এই প্রীতি আরও নিবিড়তর হোক,—আমাদের এই কামনা সফল হবে, তার 'ইশারা' ১৩৬০ সালের সকল সম্মেলনেই পাওয়া গেছে।

* * * *

সম্মেলন বা Conference অর্থে কি বোঝায়? কতকগুলি খ্যাত ও অখ্যাত গায়ক ও বাদককে একত্র করে অত্যন্ত চড়া মূল্যে 'টিকিট' বিক্রয় ক'রে ক্রমাগত কয়েক দিনের প্রোগ্রাম আর ডিমনষ্ট্রেশনকেই কি সঙ্গীত 'সম্মেলন' বা 'মহাসম্মেলন' বলে? যাঁরা গান-বাজনার ধার-কাছে ঘেঁষেননি কোন পুরুষেই, তাঁরা হবেন সভাপতি, প্রধান অতিথি বা পুরোহিত। 'সা রে গা মা' কাকে বলে তা যিনি জানেন না তাঁকে শুধু স্বার্থ বা অর্থের খাতিরে সভায় 'পতিষ্ঠ' করতে ডাকলে কি হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হ'তে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন ভূপতি মজুমদার। তিনি 'নিখিল ভারত'এ লেকচার দিতে উঠে বলেছেন—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার'কে 'গীতসূত্রকার'। পিতাপুত্র আলাউদ্দীন খাঁ ও আলি আকবরকে মৃতদের মধ্যে গণনা করেছেন এবং বলেছেন 'স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সকল গানের সুরকার।' এই ভ্রমাত্মক উক্তির জন্য ভূপতি মজুমদার লজ্জিত কিনা জানি না, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতি লজ্জানুভব করেছে।

যে-কথা বলছিলাম সে-কথাই বলি। 'সম্মেলন'এ সাধারণত হয়ে থাকে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অনেক অজ্ঞাত তথ্য ও বহু ভ্রমাত্মক রীতি-নীতির যথাক্রমে আবিষ্কার ও নিষ্পত্তি। দর্শকদের বোকা ঠাউরে গায়ক বাদক যা-খুশী তাই গাইবেন আর বাজাবেন মানেই 'সম্মেলন' নয়। সম্মেলন নয়, 'আসর' বা 'আড্ডা' আখ্যা দেওয়া যায় এই ধরণের সম্মেলন নয় সম্মিলনকে। এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দেশের উক্তি "অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে শ্রীরবিশঙ্কর সেতারে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটি রাগ বাজিয়েছেন সেটি হ'ল 'রাগ-হিন্দোল-কেদার'। এখন কথা হ'ল এই, দুই রাগের মিশ্রণ কতখানি সম্ভব এবং সম্ভব হ'লেও এটিকে 'ইমন কল্যাণ', 'সিন্ধু খাম্বাজ' ও 'কাফিসিন্ধু' প্রভৃতি মিশ্র রূপের মত আলাদা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিনা।"

আখ্যা কি দেওয়া যেতে পারে আর কি পারে না তার জন্য শুধু রবিশঙ্করকে দায়ী করলেই চলবে না। এ প্রশ্ন আরও অনেককেই করতে পারি। কিন্তু সে-ধরণের সম্মেলন, সত্যিকার সম্মেলন কি হয় একটিও? যা হয় সেটা আসর, জলসা বা আড্ডা—যেখানে আলাপই চলে শুধু, আলাপের সঙ্গে আলোচনা চলে না। আমাদের সম্মেলনের নামটা ব্যবহার করাই অনুচিত। ব্যবহার না করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!

* * * *

আমাদের শেষ কথা, বাঙলা দেশেই খুব উঁচুদরের গুণী অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হয়ে আছেন। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এই অজানা প্রতিভাদের লোকালয়ে আনতে পারেন না?

সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে বর্ত্তমানে অজস্র হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের জন্য কণ্ঠের ও বাদ্যযন্ত্রের যথা ব্যবহারের জন্য একটি গবেষণাগার এখনও আমাদের সৃষ্টি হল না কেন?

বাঙলার সম্মেলনে বাঙালী শিল্পীদের এখনও যেন একঘরে ক'রে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত: ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনে তারাপদ চক্রবর্ত্তীর লাঞ্ছনা ও সম্মেলনের পরিচালকমণ্ডলীর অভদ্রতার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

বাঙলায় যে-সকল সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় দুর্মূল্য গ্রন্থসমূহ একদা প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল সেই সকল দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তরত্ন উদ্ধারের কে কি ব্যবস্থা করবেন? এমন কি ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিপুল রচনাভার পর্য্যন্ত থেকেও আমাদের নেই। ছাপা নেই।

যা নেই তার জন্যই আক্ষেপ। যা আছে তা যথেষ্ট হ'লেও বাঙালী জাতি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আত্মবিস্মৃত হবে কেন?

তুলি ও রঙ
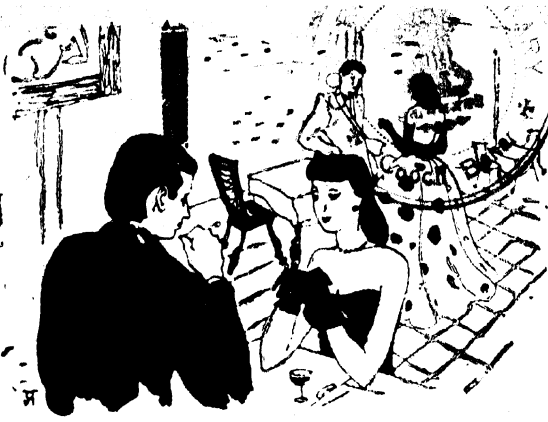
মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

আট

সেদিন মরার মতো ঘুমালো মোদক্লো। তার পর দিন কিন্তু কিছুতেই আর ক্যানভাসের ওপর কাঠকয়লার আঁচড় টান্তে পারে না। মানসপটে বার বার দু'টি প্রতিমূর্তি ভেসে আসে, একটিকে অবশ্য মন থেকে সরানোর চেষ্টা করে মোদক্লো। সেই রাজকুমারী আর ওর কল্পিত মডেলের সূক্ষ্ম আকৃতি মনে ভাসে। সেই পরমা-রমণীর হাতের উষ্ণ স্পর্শ যেন এখনও তার হাতে লেগে আছে, আজ এই সকালটিতে তাঁর রুমালে ব্যবহৃত গন্ধসারের মৃদু সুরভি যেন নাকে লেগে আছে। অথচ কাল যখন অত কাছে এসেছিলেন তখন মুহূর্তের জন্যও এই সুরভিত স্পর্শের সুগন্ধি-ছোঁয়াচ তাকে সচেতন করে নি।

তবু মোদক্লো জানে বনেদি বংশোচিত ভব্যতায় মহিলাটি তার ছবি সম্পর্কে অত সাধুবাদ করা সত্ত্বেও, তখনই তাঁর চিন্তার পরিধির বাইরে চলে গেছে মোদক্লো। কত বিখ্যাত কেচ্ছা-কাহিনী আছে; বড় ঘরের চমৎকার মহিলারা শিল্পীদের সঙ্গ লাভের আশায় আকুল হয়েছেন কতবার। এই সব সৌখীন মহিলারা অবশ্যই পোষা কুকুরের মত সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো চলে এমনই একটি জীব চান, বিশেষতঃ লক্ষ্য থাকে সেই প্রাণীটি যেন তেমন নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু এখানেও কি সেই প্রশ্ন? কল্পনা তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে! দেহে ও মনে যাঁর এতখানি বৈচিত্র্য ও সম্পূর্ণতা, বৈদগ্ধের জন্য যাঁকে এত অপূর্ব বলে মনে হয়েছে, তাঁকে দেখে যদি সে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারত, তাহ'লে তা অবশ্যই অদ্ভুত মনে হত। ওর দেহতন্ত্রী এমনই অনুভূতিপ্রবণ যে মন থেকে ভাবাবেগ সরিয়ে দিলেও তার রেশ স্নায়ু শিরায় অনুরণিত হয়।

মহিলাটি তার চঞ্চলতা বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু সে চঞ্চলতা স্পর্শ করেছে শিল্পী মোদক্লোকে, মানুষ মোদক্লোর কাছেও তিনি ঘেঁষতে পারেন নি! সহচরদের এতটুকু কষ্ট, এতটুকু অমর্যাদা সহ্য হ'ত না মোদক্লোর, বরং বন্ধুদের খাতিরে এই মহিলাটিকে সে নর্দমায় ফেলতেও দ্বিধাবোধ করত না। গত রজনীর স্বপ্নকে চিত্রে রূপায়িত করতে সে হারিকট রুজের মুখ এঁকে ফেলেছে, আর এখন মামুলী পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে সেই রাজকুমারীর মুখ।

"বহুৎ আচ্ছা। আমি পুরুষের ছবি আঁকব।"

মেঝের এক কোণে পালকের কয়েকটি ঝাঁটার ভেতর পড়েছিল একটি তরঙ্গায়িত আয়না। সেইটি তুলে নিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো মোদক্লো।

জুলাই মাসের এই সময়টা নীচের তলার এই ঘরটায় সাধারণতঃ বড় গরম, মোদক্লো সার্টের আস্তিন গুটিয়ে ছবি আঁকে। মাঝে মাঝে ঘর্মসিক্ত সার্টটাও খুলে ফেলে ইঞ্জিনের কয়লা যোগানদারের মত কাজ করে। এই ভঙ্গীতেই নিজের মস্তকহীন দেহকাণ্ড আঁকে মোদক্লো। ঘরে এখন সে একা। একাদেমীর যে কোনও মডেলের মত আবরণহীন হয়ে মোদক্লো নগ্ন দেহে ছবি আঁকে।

চমৎকার দেহের বাঁধুনী তার; শরীর কৃশ বটে, পেশীগুলি সুডৌল, কনুই কিংবা হাঁটু, হাত কিংবা পায়ের সরল রেখায় এতটুকু ভাঙন ধরায় নি। গায়ের রঙ অতি সুন্দর, যেন ইতালীর অপূর্ব-দর্শনা ব্রুনেট। প্রতিটি পেশীর মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছন্দ সক্রিয়তা। যে-রেখা গলায় গিয়ে পৌঁছেছে, কোথাও তার এতটুকু ছন্দ পতন ঘটে নি। হাত দু'টি অবশ্য পুরুষ মানুষের পক্ষে কিঞ্চিৎ রোগা। পা দু'টিতে রয়েছে মৃদু চালের চলা-ফেরার ইঙ্গিত।

সেই পরমা-রমণী

মার্কিণ শিল্পী
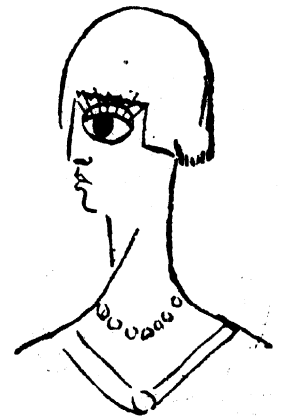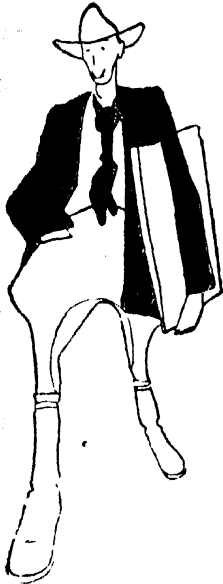
প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ছবি এঁকেছে মোদকল্লো। প্রাথমিক কাঠ-কয়লার ড্রয়িংটার ওপর এমন জীবন্ত ও বলিষ্ঠ রেখা চালিয়েছে যে, যে-সব সৌখীন চিত্র-শিল্পীরা আইনগত পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে অভ্যস্ত তাঁরা এই সব ছবি দেখলে রীতিমত চমকে উঠবেন।

খুষি সুখের উল্লাসে গুন-গুনিয়ে গান ধরেছে মোদকল্লো। সহসা সেই নীচের তলার ঘরে কার যেন উপস্থিতি অনুভূত হয়।

একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার—নারী-দেহের এক মনোরম অংশ অতি দ্রুত পদক্ষেপে ঘোরানো সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল, আর আফ তালিয়েনের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হচ্ছে মার্জনা ভিক্ষার করুণ সুর।

তখনই আবার নীচে নেমে এল ছবির বেপারী আফ তালিয়েন।

—"শুয়োর! এখনই হয়ত উনি পুলিস ডেকে আনবেন। চমৎকার মহিলা, আমি কোথায় বড় মুখ করে তোমাকে দেখাবো বলে নিয়ে এলাম—আর এই কাণ্ড!"

"আমাকে দেখাতে? কেন? আমি কি যাদুঘরের সামগ্রী?"

"উনি তোমাকে মেডটা দেখলেন। নিশ্চয়ই ওঁর পায়ের শব্দ পেয়ে ইচ্ছা করে এই কীর্তি করেছ, এর উপযুক্ত দামও তোমাকে দিতে হবে। উনি এক জন ভালো খদ্দের। লিপচিৎস্, ব্রাকস্ এমন কি উৎরিল্লোরও খান কয়েক ছবি উনি কিনেছেন। তুই আমার সর্বনাশ করবি। বেরো এখান থেকে, দূর হয়ে যা আমার দোকান থেকে। হতভাগা বাউণ্ডুলে—একেবারে পাকা গুণ্ডা।"

অতি ধীরে পোষাক পরে নেয় মোদকল্লো। তার পর পোষাক পরা শেষ হতেই বিনা বাক্যব্যয়ে ক্যানভাসটি বগলে নিয়ে বেরোবার উপক্রম করে।

ক্যানাডার দানবী

—"কি, আবার ক্যানভাস-টাও নিয়ে যাবার ইচ্ছে দেখছি যে! ওর দামটা কি আমি দিই নি? ষাট সেনটি-মিটারের ক্যামভাস্। আর রঙের দামও অন্ততঃ চল্লিশ ফ্রাঁ হবে।

দেয়ালের গায়ে ছবিটি রেখে দিয়ে আফতালিয়েনের কাছ ঘেঁষে এমন একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো মোদকল্লো যে ছবিওলা সে থে

ওপরের তলায় না পৌঁছানো পর্যন্ত চুপ করে গালাগাল বর্ষণে ক্ষান্ত রইল। তার পর সুরু হয়—

"আমি তোর পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেব। খুব ব্যবহারটা করলি আমার সঙ্গে। আমি তোর হিতৈষী, এক মাস আমার অন্ন ধ্বংস করে এই তোর কীর্তি! বেটা বাউণ্ডুলে—গুণ্ডা কোথাকার।"

আকাশে তখনও আলো রয়েছে, গ্রীষ্ম সন্ধ্যার সেই উজ্জ্বল নীল আকাশ। সীন নদীর ধার দিয়ে না গিয়ে বুলভার্দের পথ ধরে মোদকল্লো। পথে জনতার ভীড় ঠেলে সে পথ চলে, যেন কায়াহীন ছায়া শরীরের অপূর্ব মিছিল। যখন রু দ্য লা পেইক্সে গিয়ে পৌঁছেচে তখন গোলাপী রঙের বৈদ্যুতিক আলো সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এই প্রথম তার মনে হল যেন স্বপ্নলোকের এক পরীরাজ্যে এসে পড়েছে। লা অপেরা যেন যাদুমাখা একটা দুর্গ বিশেষ, পথের গোলাপী আলোয় সারা বুলভার্দ সজ্জিত, আলোর ছায়া গাছের পাতায় পড়ে এক অপরূপ মায়াজাল রচনা করেছে। রু দ্য লা পেইকস্ থেকে সুরু করে এখন যেখানে এসে ও দাঁড়িয়েছে, সেখানে অনাড়ম্বর হালকা রঙের পোষাক পরে অসংখ্য মেয়ের দল ভীড় করে রয়েছে, ওর দু'পাশ দিয়ে এমন ভাবে তারা চলা-ফেরা করছে যে মনে হচ্ছে যেন পাথরের মূর্তির ওপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

পায়ের গোছ, গায়ের রঙ, সিল্কের মসৃণতা, মাথার চুল, রিবণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে কোনো দিন সে সচেতন ছিল না। কলারে মণ্ডিত মরাল গ্রীবা, কিংবা সাটিন মণ্ডিত কণ্ঠ; মৃদুহাসি কিংবা কলহাস্য, আর জোনাকির মত জ্বলজ্বলে চোখ। এমন কায়দায় মুখে রুজ মাখানো যে এত কৃত্রিমতা সত্ত্বেও মোদকল্লোর চোখে তা ভালো লাগে। শ্বেত পাথরের দেয়াল-গাত্রে পেলব দেহলতার ছায়া পড়ে,—তার পর সেই মাথার চুল, কারো তরঙ্গায়িত, কারো নামানো, কেশবিন্যাসের কি অপরূপ পরিকল্পনা, উদ্ভাবন কৌশলের কৃতিত্ব আছে, তেমনই প্রশংসনীয় ওদের ভঙ্গী আর অঙ্গের সুগন্ধ সুরভি। কি চমৎকার মোটর গাড়ি, চকচকে ওপরকার সাজ, কাচগুলিতে আলো পড়ে ঝলমল করছে, কি তার বৈচিত্র্য!

এ্যাভিন্যুর পথ ধরে দৌড়য় মোদকল্লো। সীন অতিক্রম করে রু বারার বাসায় গিয়ে পৌঁছায়। হারিকট রুজকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে ৎবরৌসকিকে শোনাতে বসে আফ্‌তালিয়েনের দোকানের খবর।

ৎবরো বলে ওঠে—"কিন্তু ভায়া এইটুকুই ত সব নয়, এর জন্য তোমার তেমন মাথা-ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না, এহ বাহ্য, আগে কহ আর—"

কি আশ্চর্য! কি সেই বস্তু! মনে যদিও কিছু নেই তবু কি সেই স্ত্রীলোকটির চিন্তার ছাপ ওর মুখে ফুটে উঠেছে!

প্রতিদিনের মতো এই সন্ধ্যায় হারিকট রুজ হাতের কাজ প্রদর্শন করার পর সকলে নীরবে আহার শেষ করল।

হারিকট হঠাৎ বলে ওঠে—"তোমার যখন অনেক টাকা হবে মোদক, তখন এখানে বসে কাজ না করে কিংবা লুভরে গিয়ে কপি না করে আমি রু সেভরুয়েসের কোনো একটা লাইফ ক্লাসে সকালের দিকে চলে যাব। একটা চমৎকার জায়গা পেয়েছি, আজ সকালে সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম। ছোট্ট বাগানের ঠিক মাঝখানে শ্যাওলা-ঢাকা অনেকগুলি পুরাতন মূর্তি পড়ে আছে,—ওদিকে একটা বিরাট
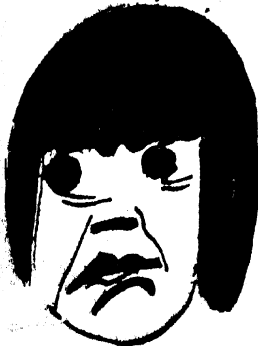
ষ্টুডিয়ো'র ভেতর মডেল সামনে রেখে সবাই নীরবে এঁকে চলেছে। তাদের মধ্যে সকল দেশের মেয়েরাই আছে। তবে প্রতিদিনের প্রবেশ মূল্য—পনেরো সো (Sou), রীতিমত বড় লোকের মেয়েদের ব্যাপার! পনেরো সো! আমাদের সকলের খাবার পাওয়া যায় ঐ টাকায়।"

নিজের গায়েই নখ বসায় মোদক্লো। হারিকট রুজের এই প্রথম প্রার্থনা পূরণের শক্তিও তার নেই। তিন দিনের মধ্যে দু'দিন উপবাস করলেও এই অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না। তা ছাড়া এখন আবার আক্‌তালিয়েনের দোকানের কাজ ওর নেই।

মাদাম ৎবরৌসকি উচ্ছিষ্ট প্লেটগুলি টেবল থেকে তুলে নিলেন। আর কোমল গলায় ৎবরো বলে—"লা রোতন্দে যাবে নাকি?"

সবায়ের সঙ্গে মোদক্লও চলল।

সেখানে তুমুল উত্তেজনা। আমেরিকানরা দিন-রাত ওপর তলার পিয়ানোটা অধিকার করে বসে থাকে, নিগ্রোদের গান গায়। আজ কিন্তু তারা পিয়ানোটা ছেড়ে চলে এসেছে।

আজ আমেরিকানরা রঙীন মোমবাতি জ্বালিয়েছে, আর টেবলের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে সর্প নৃত্য করছে। মোদক্লোর দলের কাছে এসে লাল চুলওলা এক বিরাটাকৃতি মার্কিণ সেই শোভাযাত্রা সমেত দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমেরিকান মাসিক পত্রিকা "Gargoyle"-এর তিনি একজন কবি।

তিনি বলে ওঠেন—"আরে এই যে, চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। ন্যু ইয়র্ক থেকে ক'জন মেয়ে এসেছে, তারা আমাদের একটা পার্টি দিচ্ছে। মঁ পারনাশের সব আমেরিকানরা আজ রাত্রে সেখানে যাবেন। আপনারও নিমন্ত্রণ রইলো মঁসিয়ে মোদক্লো। আপনার মুখে আজ এমনই বিষাদের মেঘ নেমেছে যে মনে হচ্ছে—লা রোতন্দের সব হুইস্‌কি খতম হয়ে গেছে। উঠুন—হেসে বলুন—তথাস্তু!"

সবাইকে অবাক করে মোদক্লো উঠে দাঁড়ায়। বলে ওঠে—"চলো হে—ব্যাপারটা দেখাই যাক।

হারিকট রুজের হাতটা জড়িয়ে ধরে মোদক্লো।

নয়

মঁ পারনাশের এই আমেরিকান কলোনীতে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় কুড়ি খানেক আমেরিকান চিত্র-শিল্পী থাকেন। এঁরা গরীব ঘরের মানুষ। দেশে হয়ত, ফিলমে আমরা ন্যু ইয়র্কের চিত্র-শিল্পীদের যে সব ব্যারাক বাড়ীর ছবি দেখি, সেই রকম বাড়ীতেই থাকে।

কাম্‌পেন প্রিমিয়েরে সেই ধরণেরই একটা ব্যারাক খুঁজে নিয়েছে ওরা, আশ্চর্য এখানেই একদা বার্ণ জোনস্ বা জেমস্ টিসট থাকতো। রু দ্য সেভরেস্থের ভেতর ওরা গাথা কাব্যের সন্ধান পেয়েছে, প্রোটেষ্টাণ্টদের লম্বা বোর্ডিং হাউসের পাশে ধর্ম-মন্দিরটা যেন খেলা-ঘরের বাড়ী মনে হয়, সত্যই যেন ছোট ছেলেদের খেলনায় তৈরী।

কাজের এই বৈচিত্র্যময় জীবন ওদের ভারি ভালো লেগেছে, এই নৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ লণ্ডন বা স্বাধীন মার্কিন মুলুকের কোনো শহরেই ওরা পায় নি। লা রোতন্দ, দ্যু ডোম, লা পারনাশ প্রভৃতির আন্তর্জাতিক বাৎসরিক মেলায় কি অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। যে কোনো সময়ে এমন কি রবিবারও এই সব জায়গায় এসে কাজ করো, মদ খাও, পিয়ানো বাজাও, অচেনা মেয়েকে নিয়ে নাচো—এক কথায় 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'।

অনেক মেয়ে কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে আমেরিকানদের দেখবে বলে সানন্দে এগিয়ে আসে, যেচে এসে অচেনা মেয়েরা আলাপ জমায়। এখানে সোনার সন্ধানে কেউ আসে না, বুভুক্ষু মেয়েরা সামান্য একটু দুধ পেলেই খুসী, আর মেজাজ খারাপের মাথায় দু'চার ফোঁটা মদ—যেন তাতল সৈকতের বারিবিন্দু!

এখানকার যাঁরা চাঁই তাঁদের মধ্যে ঐ লালচুলওলা কবি একজন। We Have no Black Monkey Faces, Yo, Yo, One Thousand Miles, এবং Hair in the Eye প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তারই রচনা। অপ্‌কার, শাদা কালোর ছবি আঁকতে যাঁর অসাধারণ পটুতা, বিরাট আকৃতি। জাজ সঙ্গীত রচয়িতা কেডী, তার প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়া দেখবার মত। মেয়েদের মধ্যে আছে লম্বা, শ্যামবর্ণা, চটুল, কৃশাঙ্গী, রোমশ মেয়েটি—স্বামীর সঙ্গে Gargoyle পত্রিকার সে সহযোগী পরিচালক। রোগা ঘাড়ের ওপর পাউডার পাফের মত কালো চুল। মহিলাটির স্বামী বেচারী লোক ভালো, কদাচিৎ কথা বলেন, ছায়ার সঙ্গে হাত নাড়াই তাঁর অভ্যাস।

বাঘিনীকে আক্রমণ

শাদা-কালোয় আর একজন শিল্পী হলেন নিনা হামেট। কাজের সময় মেকানিকের মত কর্ডুরয় ট্রাউজার আর ব্লু শার্ট পরতে ভালোবাসেন। এ ছাড়া ছুব চুলওলা, কিংবা কালো বা সাদা চুলওলা আরো অনেকগুলি মেয়ে আছে। এই সব আমেরিকানরা তাদের বলে—বুনো হাঁস।

আসবাবপত্রহীন বিরাট ষ্টুডিয়োতে ওরা বাস করে,—দেরাজের গায়েই মুখ ধোওয়ার পাত্র, পেরেকের গায়ে পোষাক ঝোলানো। মাঝে মাঝে হাতের রেস্ত ফুরালে এক জন এসে আর এক জনের ঘাড়ে চেপে বসে। আমেরিকা থেকে টাকার চেক না আসা পর্যন্ত এইভাবেই চলে। এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তাকে একটি মাদুর আর তোয়ালে দেওয়া হয়, আর সবুজ কড়াই-সুটির ভাগ বা ফল-মূলের ব্রেকফাষ্টের অংশ তাকে দেওয়া হয়।

মেয়েরা নিজেরাই পার্টিতে যাওয়ার পোষাক-পরিচ্ছদ কেচে নেয়, দুধের বালতী ভরে নিয়ে আসে, শাদা দস্তানা-পরা হাতে দুধের পাত্র আনে। মোটামুটি এই জীবনযাত্রায় তারা খুসী হয়েই আছে।

সবাই দল বেঁধে চললো বুলভার্দ দ্য বাটিগনলসের যে বাড়ীতে এই দু'জন নবাগত এসে ষ্টুডিয়ো বানিয়েছেন সেই বাড়ী। বিচ্ছিন্ন না হয়ে যে যার সে তার দলেই ভিড়ে রইল। মোদরু, হারিকট-রুজ আর কিসলিঙ প্রায় রাত সাড়ে দশটার সময় যখন সিঁড়িতে পৌঁছে দেশলাই জেলে পথ ঠিক করছে তখন সাত তলার ওপর থেকে গৃহকর্ত্রী অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন:

"হ্যালো—এই রাস্তা, আসুন—ইয়ু হু।"

অতিথিদের গালে, কাঁধে, হাতে হাত দিয়ে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। যখন কথা বলে তখন জিভ নাড়ায় যেন তাতে আঠা লাগানো আছে।

ওদের মধ্যে একজন আবার বানরীর মতো তামাটে রঙের। ফুলকাটা পোষাক-পরা আর একটি মেয়েকে কিঞ্চিৎ অসুস্থ দেখাচ্ছে।

"আসুন ভাই, ভেতরে আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও করুণায় ভরা কয়েকটি জলজলে চোখ নজরে পড়ে, ঘরের ভেতর অনেকগুলি মার্কিন মেয়ে রয়েছে।

ষ্টুডিয়োটা অবশ্য এই জাতীয় আমেরিকানদের পারীর আর যে কোনও ষ্টুডিয়োর মতই দেখতে; দেয়ালগাত্র নগ্ন,—ধূলিময় মেঝেতে কয়েকটা মাদুর ছাড়া আর কিছু নেই। সেই মাদুরের ওপর ঘোড়ার গায়ের কম্বল বিছানো হয়েছে। ঘরের কোণে একটা আলমারি, তার ওপর একটি প্রাচীন আলো। দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো,—দাসী-চাকরের ঘরের উপযুক্ত আয়না। ঘরের চার কোণে দড়ি খাটানো, তার ওপর পার্টির পোষাক, মোজা, ফার প্রভৃতি নানাবিধ পোষাক ঝোলানো রয়েছে। একটা পিয়ানোও আছে। স্কাইলাইটের (ওপরের জানালা) গায়ে একটা বিরাট মই লাগানো।

দু'-তিন জন আমেরিকান ইতিমধ্যেই এসে পড়েছেন। তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। চক্রাকারে দাঁড়িয়ে পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে, গান গাইতে গাইতে বোতল বগলে নিয়ে অপর দল এল।

"হ্যালো! হ্যালো!—এখানে নিগারদের স্থান নেই,—আসুন!"

"আর সব কোথায়?"

"নীচের তলায়।"

সবাই গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। নীচে পথের ধারে একটা দল দাঁড়িয়ে আছে, গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছে। ওপকার সেই বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে একটা বোতল তুলে নিয়ে ছ'তলার নীচে ফেলে দিয়ে চেঁচায়—

"মন মাতার।"

নীচে থেকে জবাব আসে—"হে!"

সবাই এবার ওপরে উঠে আসে,—এইটুকু উঠতে ওদের আধ ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

পারস্পরিক পরিচয়াদির পর প্রত্যেককে একটি করে পাত্র দেওয়া হল—অল্পক্ষণের মধ্যেই নীরবে, ধীরে ধীরে সবায়ের বেশ নেশা জমে ওঠে! মেয়েরা বোতলের ছিপি খুলে মদ্য পরিবেশন করছিল।

দেশে এই আমেরিকানরা চায়ের পেয়ালায় মদ্যপান করে—কারণ, সে-দেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ,—তাই ভাণ করে চা পানের। এখানেও সেই অভ্যাস বজায় রেখেছে।

লিকিয়োর পান করার আগেই নৃত্য সুরু হয়ে গেল।

লেডী নিগ্রোদের মত চীৎকার করে আর পিয়ানো বাজায়। সেই ছায়ার সঙ্গে লড়াইকরণেওলা লোকটা লম্বা মেয়েটার কাছ ছাড়ছে না, মেয়েটা ফ্লোরেন্স মিলসের অনুকরণ করছে,—কোমর বাঁকিয়ে অতি মধুর ভঙ্গীতে হাসে। আর সবাই জোড়াতাড়া দিয়ে জোড় মিলিয়েছে আর ঘুরছে, মাঝে মাঝে শুধু পূর্ণ বা শূন্য পাত্র রাখার জন্য থামছে। মেঝের মাঝখানে রাখা কাপগুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেরী, হুইস্কী, চমৎকার স্যাম্পেন, ক্যামেল সব এলোপাথাড়ি ভাবে মিশ্রিত হচ্ছে—কি ভুল!

মোদরুলো নাচতে ভালোবাসে। হারিকট-রুজের কোমরটা অতি সযত্নে ধরে নিজেই কোনো দিন যে নাচ শেখে নি সেই নাচের তাল বোঝাচ্ছে, না শিখলেও তাল ও মাত্রাজ্ঞানের সহজাত জ্ঞান থেকেই সে সব শিখেছে। বেয়াড়া ভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে জোর করেই হাসে।

আর সবায়ের মত গরম বোধ করলে হাত বাড়িয়ে যা হয় একটা কাপ তুলে নিয়ে ওরাও ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। তার পর পাত্রগুলি নামিয়ে রাখে, ওদের মত তলানিটুকু দেয়ালগাত্রে বা অন্য কোনো গ্লাসে ফেলে দেয় না। আর সকলের মত মোদরুও হাতকাটা জামা পরে আছে। এই সব আমেরিকানরা এদিকে কোট খুলে রেখে নাচে, কিন্তু অদ্ভুত লজ্জা! বেলট্ আঁটার সময় সস্পেনডার ঠিক করার জন্য বাথরুমে ঢোকে।

একটি দম্পতি ট্যাংগো নৃত্য সুরু করলো। মেয়েদের মধ্যে একজন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, একজন সঙ্গী তার মাথাটি ধরে কয়েক মিনিট একটু হাওয়া খাইয়ে নেয়, তার পর আবার নাচের মজলিসে ফিরে আসে, তার পর আবার যতক্ষণ না বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় ততক্ষণ কাপের পর কাপ শেষ করে। কোনও কথাবার্তা নেই, হাত এগিয়ে যায় হয়ত নৃত্যের তালে নয় ত আর এক কাপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রতি মিনিটেই নবাগত আসছে,—রাত একটা নাগাদ সকলেই

নেশায় চুর হয়ে গেছে, তবু ক্লান্ত হয় না,—এই উজ্জ্বল আনন্দ জাগিয়ে রাখার জন্ম সবাই সজাগ।

এই সব বিরাটাকৃতি প্রাণী সোজা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, তখনও হাতে বোতল আর মুখে হাসিটুকু রয়েছে—মাটিতে শুয়ে গান গাইছে।

সেই লম্বা আমেরিকান মেয়েটি তখনও নাচছে,—তার চটুলতা বেড়েই চলেছে। মোদক্ক আর হারিকট ক্রজ মাঝে মাঝে থেমে তার রকম-সকম লক্ষ্য করে। মেয়েটির দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনই হালকা মনে হয় যেন কারো সঙ্গেই কোনো অঙ্গের সংযোগ নেই। নৃত্যের প্রতিক্ষেপে কার কমলালেবু রঙের বিবর্ণওলা মাথা, গলা, বুক, কোমর, প্রভৃতি অপর দিকে যেন ভেসে চলেছে, আমেরিকান কবির ভাষায় "Caressed the air like a breeze of the Gulf stream—"। এক কথায় মার্কিণ মুলুকের উত্তপ্ত হাওয়ার সকল কাব্যই তার ভঙ্গিতে ছন্দিত। ফ্লোরিডা, টেকসাস প্রভৃতি অঞ্চলের কলা আর তুলা ক্ষেতের হাওয়া তার এই ভঙ্গিমায় রূপায়িত। বার কয়েক সে তার সুন্দর নগ্ন বাহু প্রসারিত করে মোদক্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে—কিন্তু বৃথা!

হারিকট-ক্রজ তাকে বলে—"তুমি চমৎকার মানুষ, শুধু আমার সঙ্গেই নাচো—

"আর কোনও দেহের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই না—আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।"

এই কথাগুলিতে গলার স্বর আটকে যায় মোদক্লোর। এইমাত্র অদূরে সেই ক্যানাডীয় রক্ষিতাকে সে দেখতে পেয়েছে—এর কাছ থেকেই একদিন সে পালিয়ে এসেছে, তার পর এই সাক্ষাৎ। স্ত্রীলোকটি নেশায় চুরচুরে হয়ে আছে, সেই ছায়াশরীরের সঙ্গে লড়নেওলা বেঁটে লোকটির ক্ষীণ বাহুর বাঁধনে তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, সেখান থেকেই মোদক্কর প্রতি সে অঙ্গভঙ্গী করছে।

এই বিশালাকার মহিলাটির দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না মোদক্ক। স্ত্রীলোকটিও সমানে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। মোদক্ক অপেক্ষা করে।

একজন মাতাল সেই মইটার সর্বোচ্চ ধাপে উঠে জনৈক মার্কিন বক্তার অনুকরণ করে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করে। মইটা ভীষণ নড়ছে। আর একজন ইলেকট্রিকের বালবগুলি কাপ ছুঁড়ে ভেঙে অতিশয় আমোদ বোধ করছে!

"আরে ভাই—হাসো, হেসে নাও দুদিন বই ত নয়!"

নিমন্ত্রণকর্ত্রী মোমবাতির কৌটা দিয়ে মেঝেটি চিত্রিত করছেন এবং এই ভাবে বহু অভ্যাগতের পায়ে ছেঁকা দিচ্ছেন!

"এসো নাচা যাক।"

"না!"

ক্যানাডীয়ান রমণীর বলিষ্ঠ বাহু অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে আসে, তার পর মোদক্লোর গালে এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দেয়। সে আবার বলে ওঠে :—

"এসো—নাচো বলছি।"

"না।"

এইবার কিন্তু হারিকট-ক্রজ মোদক্কর সামনে এগিয়ে এসে নিজেই চড় খায়। বলে : "এত বড় সাহস,—মোদক্কর গায়ে তুমি হাত দাও!"

বেচারী হারিকট দানবীর মুখে আঘাত করে, কানটা সজোরে টেনে ধরে। ছাড়াবার চেষ্টা করে ক্যানাডীয় রমণী—কিন্তু হারিকট-ক্রজ যেন বুলডগের বিক্রমে বাঘিনীকে আক্রমণ করেছে। ক্যানাডীয় স্ত্রীলোকটির পোষাক খসে পড়ে—তাইতে পা জড়িয়ে যায়,—দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ওদের চার পাশে চলেছে পানোল্লাস। সেই মইওলা ব্যক্তিটির অবশেষে পতন ও মূর্চ্ছা ঘটেছে, অনেকগুলি গ্লাসও সেই সঙ্গে ভেঙেছে। সেই ইলেকট্রিক বালবধ্বংসীর বালবের সংখ্যা কমে গেছে! মাতালরা গান গেয়ে ইতস্তত: ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুনো হাঁস-মার্কা মেয়ের দল বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকছে। মাটিতে শায়িত মেয়ের দল তখনও কাপের অবশিষ্ট সুধা-রসে নাক আর আঙুল ভিজিয়ে নিচ্ছে।

ক্যানাডীয়ান মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছে, প্রায় নগ্ন হয়ে পড়েছে, বিশাল পা দুটি টলটলায়মান—নিঃশ্বাসের তালে বুক কাঁপছে। জনৈক গাইয়ে মাতাল হারিকট-ক্রজের দোলান বেণীর দুটি প্রান্ত নিয়ে টানছে। ফলে একটা ভাঙা কাপের টুকরো গালে লেগে রক্ত বেরোচ্ছে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না হারিকট ক্রজ।

মোদক্লো সেইখানে যেন স্থাণুর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পর সেই ক্যানাডীয় রমণী তরুণী হারিকটের বক্ষোদেশ ধরে টানতে সুরু করে,—সেই নখর পয়োধরে নখ বসিয়ে ক্ষত করার চেষ্টা করে। ক্ষিপ্ত হারিকট শত্রুকে ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে চলে—মাথার যন্ত্রণাতে অতিশয় কাতর, তখনো সেই মাতালটা চুল ধরে টানছে, তবু হারিকট লড়ছে। এইবার সেই দানবীর বিরাট মাথাটা কায়দা করে সে দেয়ালে চেপে ধরে। দুটো কান সে সমগ্র শক্তিতে টেনে আছে। দেয়ালে মাথাটা প্রায় একশ বার ঠুকে দেওয়ার পর ক্যানাডীয় দানবী ওর বুক থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

এইবার উঠে হারিকট মোদক্লোকে টেনে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে,—সেই সিঁড়িতেও কয়েক জন পাগলের শায়িত দেহে হোঁচট লাগে—তারা নিগ্রো সঙ্গীত গেয়ে ওঠে।

পথে বেরিয়ে হারিকট মোদক্ককে বলে—"আমার মুখ থেকে রক্তটা মুছিয়ে দাও, যদি পুলিসে দেখতে পায় ত' মুসকিল হবে।"

"মাগীটাকে মেরে ফেল্লে নাকি?"

"না—তা বোধ হয় পারি নি।"

"তাহ'লে ও তোমার পিছনে লেগে রইল।"

"না,—মেয়ে মানুষেরা মেয়ে মানুষকে চেনে, ওরা পুরুষকে ভয় করে না, ভয় করে মেয়ে মানুষকে। কারণ মেয়েদের নাড়ী-নক্ষত্র ওদের জানা—তাই সুবিধে করতে পারে না মেয়েদের সঙ্গে, যেমনটা পারে পুরুষের সঙ্গে। আর কখনও আমাদের জ্বালাবে না, দেখো! এখন থেকে ও আমাকেই ভয় করবে।"

প্যারীর কেন্দ্রস্থলে ওরা চলেছে, পা দুটি খসে পড়ছে—মোদক্ক ভিজে সার্ট পরে কাঁপছে, আর হারিকটের মুখের সেই কাটা যায়গাটা জ্বালা করছে।

বুলভার্দে এসে ওরা এক মুহূর্ত বিশ্রামের আশায় পাশাপাশি বসে পড়ে বেঞ্চের ওপর।

সেইখানেই উভয়ে ঘুমিয়ে রইল সকাল পর্য্যন্ত। ক্রমশঃ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

১৯৫৪ সাল—

খৃষ্টীয় ১৯৫৩ সাল অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এই বৎসরের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া ১৯৫৪ সালে কি ভাবে দেখা দিবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৫৩ সাল একটু ভাল কাটিয়াছে ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম ১৯৫৩ সালে আরম্ভ হইবে না বলিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছিল ঘটনাবলীর গতিপথে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই বটে, কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি হওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা একটুও হ্রাস পায় নাই, বরং প্রস্তাবিত পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি ঠাণ্ডা যুদ্ধের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হওয়ার গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ১৯৫২ সালে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার যে গভীর আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, ১৯৫৩ সালে তাহা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-কামী জনগণের সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আশঙ্কার ভয়াবহ রূপের কাছে এই সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামের কিছুই মূল্য দেওয়া হয় না। বরং তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আপাত দূরবর্ত্তী হওয়ার সুযোগকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাহাদের অধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবার উপায়ে পরিণত করিয়াছে। যে সকল দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল সেগুলির উপর পুনরায় তাঁহাদের প্রভাব সুদৃঢ় করিবার আয়োজন চলিতেছে। ১৯৫৩ সালে বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। তাই বলিয়া এই বৎসরে পৃথিবী শান্তির পথে অগ্রসর হইবে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন বিপুল ভাবেই চলিতেছে। এশিয়ায় চলিতেছে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লড়াইয়ে নিযুক্ত করিবার আয়োজন। এই আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে কিনা তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

মিঃ আইসেনহাওয়ার ২০শে জানুয়ারী (১৯৫৩) মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের নবেম্বর মাসেই তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এক নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "If there is a war, let Asians fight Asians." অর্থাৎ 'যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এশিয়াবাসীর সহিত এশিয়াবাসীকেই যুদ্ধ করিতে হইবে।' এই নীতিতে তিনি কি ভাবে কার্য্য করিতে চান তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমশঃ এই নীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার দুই মাস পূর্ণ না হইতেই ৫ই মার্চ (১৯৫৩) মঃ ষ্টালিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে কম্যুনিষ্ট-শিবিরে ভাঙ্গন ধরিবে এই সম্ভাবনা যে জাগে নাই তাহা নয়। এই আশা পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতিতে একটা পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। মঃ ষ্টালিনের মৃত্যুতে রাশিয়ার দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইতিমধ্যে কোরিয়া যুদ্ধে যে অচল অবস্থা চলিতেছিল তাহার অবসান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় জুন মাসে—যখন বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর জুলাই মাসের শেষভাগে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু অনিচ্ছুক বন্দী বিনিময় ব্যাপারে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সীংম্যান রী ২৬ হাজার বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়া যে আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করা সম্ভব হইলেও, তিনি মাঝে মাঝে হুমকী দিতে ছাড়িতেছেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-কোরিয়ার মধ্যে একটা নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। অনিচ্ছুক বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা-কার্য্যের মেয়াদ যদি বর্দ্ধিত করা না হয় এবং ২৩শে জানুয়ারী যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোরিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। যদি কোরিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন আদৌ অনুষ্ঠিত না হয়, কিম্বা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে কোরিয়ায় আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে কিনা তাহা অনুমান করা সহজ নয়। কোরিয়া যুদ্ধ আবার বাধিয়া উঠে ইহাই সীংম্যান রীর ইচ্ছা। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে উত্তর-কোরিয়া জয় করিয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র ভরসা। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ আবার বাধিয়া উঠিলে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। চিয়াং কাইশেক তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামই চাহিতেছেন। তাঁহার আশা, তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে চীন দেশ জয় করিয়া দিবে। কিন্তু এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লড়াইয়ে নিযুক্ত করিতে না পারা পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

আন্তর্জ্জাতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধে এক পক্ষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর এক পক্ষ রাশিয়া। বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিলেও মিঃ চার্চিল রাশিয়ার সহিত আলোচনার জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহারই ফলে ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৩) বারমুডায় বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের নায়কদের সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের প্রাক্কালে বৃহৎ পররাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী হইয়া রাশিয়া

বৃহৎ শক্তিত্রয়কে পত্র দেয়। বারমুডা সম্মেলনে রাশিয়ার প্রস্তাব অনুসারে বার্লিনে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়া রাশিয়াকে পত্র দেওয়া হয়। বারমুডা সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সরাসরি নিউইয়র্ক যাইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এক বক্তৃতায় একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মজুত ইউরেনিয়ম এবং অন্যান্য বিস্ফোরণযোগ্য আণবিক উপাদান হইতে কতক অংশ এই এজেন্সীর হাতে অর্পণ করিবেন এবং এজেন্সী উহাকে নিয়োজিত করিবেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। রাশিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বে-সরকারী ভাবে বা কূটনৈতিক পন্থায় আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছে। পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণও রাশিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তবে রাশিয়া ৪ঠা জানুয়ারীর (১৯৫৪) পরিবর্ত্তে ২৫শে জানুয়ারী কিম্বা তাহার পরে এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছে। ইহাতে অনেকের মনেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস হওয়া সম্পর্কে আশা জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন ব্যর্থ করিতে ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির যে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না, ইতিমধ্যে তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। ১৯৫৪ সালে পরমাণু শক্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া ও জার্ম্মাণী গঠনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কাজেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইবে, ইহাও আশা করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ এডেনার জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সের বিরোধিতার জন্য ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের কাজে কোন অগ্রগতিই সম্ভব হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিণ অদূরদর্শিতা-প্রসূত প্রস্তাবের ফলে ত্রিয়েস্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালেই স্পেন-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় বাহিনী গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম-ইউরোপ শক্তিশালী হইবে না। এশিয়ায় এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়িবার মত এশিয়াবাসীর সৈন্যবাহিনী এখনও গঠিত হয় নাই। চিয়াং কাইশেককে সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করা চলে না। জাপানের পুনরায় সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইতে বিলম্ব আছে। দক্ষিণ-কোরিয়ায় এবং ভিয়েৎনামে দেশীয় সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহাতেও পর্য্যাপ্ত সৈন্যবল পাওয়া যাইবে না। যাহা পাওয়া যাইবে তাহার উপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। এই জন্যই যে পাকিস্তানের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তির আয়োজন চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চুক্তি সম্পাদিত হইলেও এশিয়াবাসীর সহিত লড়াই করিবার মত পর্য্যাপ্ত এশিয়াবাসী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে। হয়ত যে-পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে সে-পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় একটা সামরিক অচল অবস্থাই পছন্দ করিবে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ১৯৫৪ সালে বিশ্ব-সংগ্রাম না-ও বাধিতে পারে। তবে এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাহাদের অধীন দেশগুলিকে আরও কঠোর ভাবে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিবে।

মধ্য-প্রাচী

মধ্য-প্রাচীর অবস্থা ১৯৫৩ সালে একেবারেই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এ কথা বলা চলে না। ইরাণে ডাঃ মোসাদ্দেকের পতন বৃটিশ ও মার্কিণ কূটনীতির জয়ই সূচনা করিতেছে। ইরাণের সহিত বৃটেনের আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। তৈল সম্পর্কেও হয়ত একটা মীমাংসাও হইবে। সুয়েজ খাল সম্পর্কে মিশরের সহিত বৃটেনের কোন মীমাংসা হয় নাই বটে, কিন্তু সুদান সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে সুদানে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেই সুদানের সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত ইজরাইল রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া এখনও বহু দূরবর্ত্তী। ইতিমধ্যে জর্ডানের সহিত ইজরাইলের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিলেও গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই। রাজা ইবন্ সাউদের মৃত্যুতে মধ্য-প্রাচীতে গুরুতর কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। মরক্কো ও টিউনিসিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন জয়লাভ করিতে পারে নাই। ফ্রান্স কর্ত্তৃক মরক্কোর সুলতানের অপসারণ ফ্রান্সেরই জয়লাভ সূচনা করিতেছে বটে, কিন্তু অশান্তির তীব্রতা হ্রাস পায় নাই।

কেনিয়ায় দমন নীতি

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেনিয়াকে দ্বিতীয় মালয়ে পরিণত করিয়াছেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক-সচিব গত ৯ই ডিসেম্বর কমন্স সভায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১লা জানুয়ারী হইতে ২৮শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মাউ মাউ দমনের অভিযানে কেনিয়ায় ২৮২২ জন আফ্রিকানকে হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তি হইতে বৃটিশ অত্যাচারের সামান্য পরিচয়ও পাওয়া যায় না। আবেরডারেসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অজস্র বোমা বর্ষণ করিয়া হাজার হাজার কিকুয়ুদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু মাউণ্ট কেনিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের কিকুয়ুদিগকে দমন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। তা ছাড়া নৈরবীতেও মাউ মাউদের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। কে যে মাউ মাউ আর কে যে মাউ মাউ নয় তাহাও বলা কঠিন। যে-সকল আফ্রিকান একান্ত বৃটিশ-ভক্ত তাহাদের জীবনও বৃটিশ সৈন্য ও হোমগার্ডের হাতে নিরাপদ নয়। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই যে-কোন আফ্রিকান নিকট ঘুষ দাবী করা হয় এবং দিতে না পারিলেই মাউ মাউ সন্দেহে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে। হাজার হাজার আফ্রিকানকে তো হত্যা করা হইয়াছেই, তা ছাড়া ৫৫ হাজার আফ্রিকানকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের অনেকেরই বিচার হয় নাই, অনেকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ মাত্রও নাই।

গত জুন মাসে (১৯৫৩) ব্রেন গান দ্বারা দুই জন আফ্রিকানকে হত্যা করার অভিযোগে কেনিয়ার জনৈক বৃটিশ ক্যাপ্টেন ডি. এস. এল. গ্রিফিথসের নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে সামরিক আদালতে বিচার হয়। বিচারে সে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিচারের সময় মাউ মাউদিগকে দমনের জন্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর রোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে। মাউ মাউ আন্দোলন দমনের জন্য যে-সকল পন্থা গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন আফ্রিকানকে মাউ মাউ বলিয়া সন্দেহ হইলেই তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা অন্যতম। প্রত্যেক সন্দেহভাজন আফ্রিকানকে হত্যা করিবার জন্য পাঁচ শিলিং হইতে দশ শিলিং পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। বৃটিশ সৈন্যের প্রত্যেক কোম্পানীতে মাউ মাউ হত্যার একটা তালিকা বা Score-board রাখা হয়। যে অধিক সংখ্যক মাউ মাউকে হত্যা করিতে পারিবে তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। কোন আফ্রিকান মাউ মাউ কিনা তাহা বুঝিবারও সহজ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই যদি দাঁড়াইয়া সেলাম না করিয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করে তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তিই মাউ মাউ। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। একজন অফিসার কিকুয়ুদের উপর অত্যাচার করিবার ২১টি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া দোষ স্বীকার করে। তাহার তিন মাস কারাদণ্ড এবং ১০০ পাউণ্ড জরিমানার আদেশ হয়। কেনিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই লোকটিকে অস্থায়ী ভাবে জেলা-শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুরতার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। সে সন্দেহভাজনকে গলায় চামড়ার দড়ী বাঁধিয়া জ্বলন্ত সিগারেট দিয়া তাহার কর্ণপটহ দগ্ধ করিত। কেনিয়াতে দোষী-নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে এই ভাবেই চরম নিষ্ঠুর অত্যাচার চলিতেছে এবং শাসকবর্গই এই অত্যাচারের নায়ক।

গত ৬ই অক্টোবর (১৯৫৩) বৃটিশ গিয়ানায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জনগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটে নির্ব্বাচিত আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত ডাঃ জগান গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করিয়া শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা হইয়াছে। বৃটিশ গিয়ানার পর গত ৩০শে নবেম্বর (১৯৫৩) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুগাণ্ডার কাবাকা অর্থাৎ রাজা দ্বিতীয় মুতেসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। অর্থাৎ বুগাণ্ডার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। আফ্রিকানদের প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ-রোডেসিয়া এবং ন্যায়েসাল্যাণ্ডকে লইয়া ফেডারেশন গঠন করা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই এই ফেডারেশনের সৃষ্টি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ডাঃ মলান নির্ব্বাচনে জয় লাভ করিয়া নূতন উদ্যমে বর্ণ-বিভেদ প্রথা কার্য্যকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার দেশ হইলেও, নামে স্বাধীন দেশ হইলেও কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ মাত্র। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৩) উহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে কুইরিনোর পরাজয় এবং সেনর ম্যাগসেসের জয়লাভের একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, কুইরিনো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ম্যাগসেস পাইয়াছিলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন। বিপুল নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক অভিযান সত্ত্বেও মালয়ে বর্ত্তমানে একরূপ অচল অবস্থাই চলিতেছে। মালয়ের নিরাপত্তা বাহিনী বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তিন ডিভিসন সৈন্য, বিপুল সংখ্যক পুলিশ তো আছেই, তা ছাড়া হোমগার্ড আছে দুই লক্ষের অধিক। প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদীর জন্য ৬৫ জন সশস্ত্র লোক নিয়োজিত করা হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদিগকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ৫ লক্ষ লোককে তাহাদের বাসভূমি হইতে অপসারিত

করিয়া অন্যত্র স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি হইয়াছে এ কথা বলা চলে না। বরং গত দুই বৎসরে সশস্ত্র গরিলার সংখ্যা বাড়িয়া ৬ হাজার ৮০ জনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গরিলাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান নিরাপত্তা বাহিনীর কৃতিত্ব নয়, উহা কম্যুনিষ্টদের নীতি পরিবর্ত্তনের ফল। গত ডিসেম্বর মাসে গরিলাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। গরিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম মালয়ের অধিবাসীরা নিজেদের সংগ্রাম বলিয়া মনে করে না।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহীদের অবস্থা কি তাহা কিছুই প্রকাশ করা হয় না। শুধু মাঝে মাঝে তাহাদের দুই-একটি বিক্ষিপ্ত কার্য্যকলাপের সংবাদ প্রকাশ করা হয় মাত্র। ব্রহ্মদেশের আর এক সমস্যা কুয়োমিণ্টাং সৈন্য দল। ইহাদের সংখ্যা ১২ হাজার। তন্মধ্যে মাত্র দুই হাজারকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু সাকল্যে ১২ শতের অধিক কুয়োমিণ্টাং সৈন্যকেও অপসারিত করা হয় নাই। উহাদের মধ্যে অনেক অসামরিক লোক আছে বলিয়া প্রকাশ। যাহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়াও শোনা যায়।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থাও স্থিতি লাভ করে নাই। মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা-গড়া ইন্দোনেশিয়ার এক প্রধান ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্য্যন্ত সাধারণ নির্ব্বাচন হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপের কথা আর শোনা যায় না বটে, কিন্তু মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্য-কলাপ পূর্ব্বোদ্যমেই চলিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-সুমাত্রার আচীন জেলায় এক বিদ্রোহ হয় এবং বিদ্রোহীরা ইন্দোনেশিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ আর জানা যায় নাই।

ইন্দোচীনে বড়দিনের প্রাক্কালে ভিয়েটমিন বাহিনী পুনরায় লাওস অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ভিয়েটমিনরা দাবী করিতেছে যে, যাহারা অভিযান চালাইতেছে তাহারা লাওসের অধিবাসী। ১৯৫০ সালে স্বাধীন লাওটিয়া গবর্ণমেণ্টেও গঠিত হইয়াছে। গত বসন্ত কালে লাওস অভিযানের সময় দখল-করা সাম নেউয়া অঞ্চলে স্বাধীন লাওটিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভিয়েটনামেও সংগ্রামের অবস্থা ফ্রান্সের পক্ষে বড় সুবিধাজনক নয়। এদিকে ইন্দোচীনে শান্তির যে একটা কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভিয়েটমিনের সরকারী রেডিও 'ভয়েস অব ভিয়েটনাম' গত ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) ডাঃ হো চি মিনের যে-বাণী ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতির জন্য ফ্রান্স যদি আলোচনা চালাইতে চায়, তাহা হইলে তিনি এই আলোচনায় যোগদান করিতে রাজী আছেন। পক্ষকাল পূর্ব্বেও আর একবার তিনি অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ও হো চি মিনের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব এই নূতন নয়। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে (১৯৫৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মঃ সুম্যান বলিয়াছিলেন যে, ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের জন্য ডাঃ হো চি মিনের সহিত আলোচনা চালাইতে ফ্রান্স প্রস্তুত আছে। কম্যুনিষ্টরা পিকিং রেডিও এবং পিয়ং গিয়াং রেডিও হইতে যে শান্তির কথা উল্লেখ করেন, তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই মঃ সুম্যান আলোচনার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার ঐ বক্তৃতার দুই দিন পূর্ব্বে ডাঃ হো সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঃ সুম্যানের এই বক্তৃতার পক্ষকাল পরে ইন্দোচীনের ফরাসী কমিশনার জেনারেল ১৫ই অক্টোবর (১৯৫৩) বলেন যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির আলোচনা হওয়ার কোন সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পান না। তিনি বলেন, "What is taking place now, especially in North Viet Nam is hard fighting, not talking." ইন্দোচীনের ফরাসী কমিশনার জেনারেলের এই উক্তির প্রায় পক্ষকাল পর স্বয়ং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ লেনিয়েল বলেন যে, ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আলোচনা চালাইতে রাজী আছেন। এমন কি, এ জন্য চীনের সহিত আলোচনা চালাইতেও তাঁহার আপত্তি নাই। বাও দাই ভিয়েটনাম নেশন্যাল এসেম্বলী আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, এই এসেম্বলীর অধিবেশন মাত্র দুই দিন হইবে। কিন্তু এসেম্বলীর সদস্যরা দাবী করিয়া বসিলেন যে, এই এসেম্বলীকেই গণ-পরিষদে রূপান্তরিত করিতে এবং একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে হইবে। তাঁহারা আরও দাবী করেন যে, ভিয়েটনাম চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, তাঁহারা ফ্রান্স ইউনিয়নের সদস্য থাকিতে চান না। বাও দাই অবশ্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ভিয়েটনাম ফরাসী ইউনিয়নের সদস্যই থাকিবে।

অতঃপর গত ৩০শে নবেম্বর ডাঃ হো চি মিন একখানি সুইডিস পত্রিকার মারফৎ শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এই ধরণের উড়ো প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি চান, যথাযোগ্য পন্থায় প্রস্তাব উত্থাপিত হউক। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর ডাঃ হো শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেন। এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের প্রশ্ন লইয়া বাও দাইয়ের সহিত তাঁহার মন্ত্রিসভার মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ফলে তাঁহাকে এবং তাঁহার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। যে-সর্ত্তেই শান্তি আলোচনা আরম্ভ হউক না কেন, সাধারণ নির্ব্বাচনে বাও দাইয়ের জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ভিয়েটনাম রিপাবলিকে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ডাঃ হো শতকরা ৯৮টি ভোট পাইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালের ১২ই জুলাই লণ্ডনের 'অবজারভার' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, 'যদি স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে ডাঃ হো চি মিন-ই অধিক সংখ্যক ভোট পাইবেন বলিয়া ফরাসী অফিসারগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থার এখনও কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তা ছাড়া ইন্দোচীনের প্রশ্নটা ফ্রান্স ও বাও দাইয়ের প্রশ্ন নয়। ইন্দোচীনের যুদ্ধ এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও যুদ্ধ। মার্কিণ-দৃষ্টিতে ইন্দোচীন স্বাধীন বিশ্বের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি।

নিরপেক্ষ কমিশনের রিপোর্ট—

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে না হইলেও হয়ত সমসময়েই সেই গুরুত্বপূর্ণ দিবস ২৩শে

জানুয়ারী (১৯৫৪) আসিয়া উপস্থিত হইবে। উত্তর-কোরীয় এবং চীনা যুদ্ধ-বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা কার্য্যের মেয়াদ গত ২৩শে ডিসেম্বর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ২২শে জানুয়ারীর মধ্য-রাত্রের পূর্ব্বেই যে ২২ হাজারেরও অধিক বন্দী মুক্তিলাভ করে নাই তাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, এই প্রশ্নের গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম্যাণ্ড এবং কম্যুনিষ্ট কম্যাণ্ড একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। অবশ্য কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে এই সম্মেলন হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য উভয় পক্ষে যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৩) তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য আবার আলোচনা আরম্ভ হইবে কি না এবং হইলেও রাজনৈতিক সম্মেলন আদৌ কোন দিন আরম্ভ হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে যাহাতে কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন আরম্ভ না হইতে পারে তাহার জন্যই যে উহার আলোচনা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ব্যাখ্যা-কার্য্যের পরেও যে-সকল যুদ্ধ-বন্দী মুক্ত হইবে না, তাহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে রাজনৈতিক সম্মেলন। উত্তর-কোরীয় ও চীনা যুদ্ধ-বন্দীদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে না দেওয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ-কোরিয়ার অভিপ্রায়। যদি রাজনৈতিক সম্মেলনই আরম্ভ না হয় তবে বন্দীদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কেহ থাকিবে না, তাহাদিগকে তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর হেফাজত হইতে মুক্তি দিতে হইবে। এই জন্যই যে রাজনৈতিক সম্মেলনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা-কার্য্য করিবার জন্য ৯০ দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র দশ দিন ব্যাখ্যা-কার্য্য করা সম্ভব হইয়াছে এবং ২২ হাজারের অধিক বন্দী মুক্তি লাভ করিতে বাকী রহিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, সে সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদও সিদ্ধান্ত করিতে পারে। কিন্তু ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্র রাজী হইলে প্রেসিডেন্টকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্রই ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়া চাহেন না। কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামেই যুদ্ধ চালান হইয়াছে। যুদ্ধ-বন্দী সংক্রান্ত এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দূরে থাকিতে চাহে কেন, তাহাও খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়। যে-ভাবে বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা-কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে-ভাবে রাজনৈতিক সম্মেলন হওয়ার পথে বিপুল অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার সহিত ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন না হওয়ার একটা বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার মূলে যে একটা বিশেষ অভিসন্ধি রহিয়াছে সে-সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ কমিশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী রিপোর্টের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক।

বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ কমিশনের রিপোর্ট সর্ব্বসম্মত হয় নাই। নিরপেক্ষ কমিশনের ভারত, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সদস্যত্রয় যে রিপোর্ট রচনা করেন সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনের সদস্যদ্বয় তাহা অনুমোদন না করিয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষ কমিশনের একটি সংখ্যা-গরিষ্ঠ রিপোর্ট এবং একটি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং কম্যুনিষ্ট উভয় কমাণ্ডের নিকট পেশ করা হইয়াছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সংখ্যা-গরিষ্ঠ রিপোর্টকেই নিরপেক্ষ কমিশনের রিপোর্ট বলিয়া গণ্য করা উচিত। নিরপেক্ষ কমিশনের রিপোর্টের সহিত সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রিপোর্টের পার্থক্যটাও বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুইজারল্যাণ্ড এবং সুইডেনের সদস্যদ্বয় মনে করেন যে, ব্যাখ্যা-কার্য্যে বাধার জন্য দায়িত্ব কাহার তাহা নির্দ্ধারণ করা রিপোর্টের উদ্দেশ্য নয়। যত দিন ব্যাখ্যা চলে তত দিনের কাজের পর্য্যালোচনা করাই রিপোর্টের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই যুক্তির মধ্যে গোড়াতেই গলদ রহিয়া গিয়াছে। এই গলদ যে ইচ্ছাকৃত, এইরূপ সন্দেহও না হইয়া পারে না। উত্তর-কোরীয় ও চীনা যুদ্ধ-বন্দীরা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, মার্কিণ সমর-নায়কদের এই দাবী সন্দেহজনক এবং অবিশ্বাস্য বলিয়াই নিরপেক্ষ কমিশনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। নতুবা নিরপেক্ষ কমিশনের কোনই প্রয়োজন হইত না। যদি দেখা যায় যে, নিরপেক্ষ কমিশনের উপস্থিতিতেও নানা ভাবে বন্দীদিগকে বুঝাইয়া বলিবার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে তাহা হইলে মার্কিণ সমর-নায়কদের দাবী যে সত্য নয় তাহা সহজেই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই ব্যাখ্যা কার্য্যে বাধা প্রদানের দায়িত্ব কাহার তাহা রিপোর্টে উল্লেখ করিতে সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনের সদস্যদ্বয়ের আপত্তি।

নিরপেক্ষ কমিশনের সংখ্যা-গরিষ্ঠ রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-কোরিয়ার বন্দী-নিবাসে আটক উত্তর-কোরীয় ও চীনা যুদ্ধ-বন্দীরা তাহাদের পূর্ব্বের আটককারী পক্ষের (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কম্যাণ্ড) এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া গণতন্ত্র কর্ত্তৃপক্ষের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন না। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-কোরীয় কর্ত্তৃপক্ষের আনাগোনায় কমিশনের পক্ষে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "The Commission also became aware of the fact that the prisoners delivered by the U. N. Command were well organized. The main object of such organization was to resist repatriation and prevent such prisoners as desired repatriation from exercising their right. In pursuance of this objective, force was being resorted to by one set of prisoners against another with the result that any prisoner who desired repatriation had to do so clandestinely and in fear of his

life.* অর্থাৎ 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কম্যাণ্ড যে সকল বন্দীকে অর্পণ করিয়াছেন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ বলিয়া কমিশন জানিতে পারিয়াছেন। প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দান এবং প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক বন্দীদিগকে তাহাদের অধিকার প্রয়োগ করিতে বাধা দান এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক দল বন্দী আর এক দল বন্দীর উপর বলপ্রয়োগ করিতেছে। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যদি কোন বন্দী প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক হয় তবে তাহাকে গোপনে এবং প্রাণ হারাইবার ভয় লইয়া এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়।' কমিশন তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখানে শুধু একটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিবার স্থান পাইব। গত ১লা নভেম্বর কমিশনের অধস্তন কর্ম্মচারীদের সম্মুখেই দুই জন বন্দীকে গুরুতর প্রহার করিতে থাকে। তাহাদের অপরাধ তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তত্ত্বাবধায়কবাহিনী বহু কষ্টে তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ অবস্থায় কত জন বন্দীকে প্রত্যাবর্ত্তনের অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হইয়াছে তাহা কমিশনের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যাহারা প্রত্যাবর্ত্তনে অনিচ্ছুক তাহারা সকলেই স্বাধীন ভাবে ও স্বেচ্ছায় এই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে—দীর্ঘদিন ধরিয়া ভয় প্রদর্শনের ফলে এই অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই—তাহাও কমিশনের পক্ষে বলা অসম্ভব।

কমিশনের সংখ্যা-গরিষ্ঠ রিপোর্ট পাঠ করিলে এই ধারণাই জন্মিয়া থাকে যে, স্পষ্টবাদিতা সত্ত্বেও তাঁহারা খোলাখুলি সব কথা বলেন নাই, অনেক তথ্য চাপিয়া গিয়াছেন। যে-সকল চীনা ও উত্তর-কোরীয় বন্দী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তাহারা যে-সকল তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহা সত্যই চমকপ্রদ। এখানে সেগুলি উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। গত ৩রা অক্টোবর (১৯৫৩) টংজাংনি শিবিরে চীনা-বন্দী •চ্যাং টু লাংকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। তাহার অপরাধ সে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী হত্যাকারীকে ধৃত করিয়াছে। তাহাদের বিচারের জন্য বিশেষ ভাবে একটি সামরিক আদালত গঠিত হইয়াছে। মার্কিণ-পক্ষ হত্যাকারীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এটর্ণি পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা আইন-সঙ্গত তো নয়ই, অধিকন্তু এই ব্যাপারে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যমও সন্দেহ সৃষ্টি না করিয়া পারে না।

যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিরপেক্ষ কমিশনের হেফাজাতে প্রেরণের পর আটককারী পক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত থাকিবে, নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের এই সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে। ফলে ৯০ দিনের মধ্যে মাত্র ১০ দিন বন্দীদিগকে বুঝাইয়া বলিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর ২২শে জানুয়ারী মধ্য-রাত্রে বন্দীদিগকে যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে নিরপেক্ষ কমিশন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এ কথা বলা চলিবে না। বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার দায়িত্ব হইবে ভারতের। ভারত কি ভাবে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিবে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। ভারত বন্দী-শিবির হইতে পাহারা সরাইয়া লইয়া বন্দীদিগকে ইচ্ছামত উত্তর-কোরিয়ায় বা দক্ষিণ-কোরিয়ায় চলিয়া যাইতে দিতে পারে। অথবা উভয় পক্ষের কম্যাণ্ডারকে আহ্বান করিয়া তাহাদের বিশেষ বন্দীদিগকে লইয়া যাইবার অনুরোধও করিতে পারে। কি হইবে, তাহা এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময়েই বুঝা যাইবে।

বেরিয়ায় মৃত্যুদণ্ড—

গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) মঃ লাভরেন্তি বেরিয়া এবং তাঁহার ছয় জন সহযোগীকে গুলী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহার এই মৃত্যুদণ্ড স্বতঃই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ-দম্পতীর মৃত্যুদণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বেরিয়ার এই মৃত্যুদণ্ড একদিকে যেমন জিনোভিয়েব, কামেনেভ, বুখারিন প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর একদিকে বেরিয়া নিজেও যে কত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণদণ্ডের জন্য দায়ী তাহাও মনে না পড়িয়া পারে না। তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি দেশের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী মূলধনের স্বার্থে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ মান্ত্রদপ্তরকে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা এবং ঐ মন্ত্রিদপ্তরকে পার্টি এবং গবর্ণমেণ্টের উর্দ্ধে রাখিয়া ক্ষমতা দখল করা এবং সোভিয়েট ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া ধনতন্ত্র ও বুর্জ্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে তিনি যে-সকল রাষ্ট্রদ্রোহিতার কার্য্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার গ্রেফতার পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী কালেও তিনি যে বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই অভিযোগও করা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই অপরাধ স্বীকার করেন।

বিচার হইয়াছে গোপনে। কি কি প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাও জানিবার উপায় নাই। এই বিচারের আপীলও নাই। বিচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম চিরদিন মসীলিপ্ত হইয়া থাকিবে। শোনা যাইতেছে, বেরিয়ার যে জীবনী লিখিত হইয়াছে তাহাও ধ্বংস করা হইবে। হয়ত নূতন করিয়া তাহার জীবনী লেখা হইবে। বেরিয়া-পর্ব্ব শেষ হইল। অতঃপর আর কাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা বলা কঠিন। বাকী রহিল ভরোশিলভ এবং মলোটভ।

বেরিয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে ক্ষমতা লইয়া ম্যালেনকভ এবং বেরিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। লাল ফৌজের অধিনায়কগণ ম্যালেনকভের পক্ষ লওয়ায় বেরিয়া পরাজিত হন। যদি বেরিয়া জয়লাভ করিতেন তবে ম্যালেনকভের বিরুদ্ধেই ঐ সকল অভিযোগ উপস্থিত হইত এবং এইরূপ বিচারে এই ভাবেই তাঁহাকেও হত্যা করা হইত।

—প্রচ্ছদপট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে বৃন্দাবনস্থিত গীতা মন্দিরের দেওয়াল-গাত্রের একাংশের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল। এই চিত্রে মহাভারতের যুদ্ধ-পর্ব্বের যুধ্যমান অর্জ্জুন ও সারথি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্যণীয়। চিত্রটি অজিতকুমার ঘোষ গৃহীত।

'নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘে'র স্বরূপ কি ?

বাঙলা দেশে সাময়িকপত্র আজ পর্য্যন্ত যত বেশী প্রকাশিত হয়েছে তত আর অন্য কোন প্রদেশে নয়। তবুও বাঙলা বর্ত্তমানে দ্বিধাবিভক্ত। কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বর্ত্তমানে যতগুলি চালু কাগজ আছে তাও নেই অন্য প্রদেশে। কলকাতা থেকে প্রচারিত সাময়িক পত্র যেমন অসংখ্য দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাও অসংখ্য দেখা যায়। বাঙলা দেশের এই সব পত্র-পত্রিকার কি কোন 'সঙ্ঘ' আছে? সংবাদপত্র সঙ্ঘ বা সাংবাদিক সঙ্ঘের মত কোন মিলন-কেন্দ্র? আমরা জানি, ভাঙা-বাঙলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির চোখ-বাঁধা পাঠক-গোষ্ঠী বলবেন, 'হ্যাঁ, আছে। কেন, 'নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ' যখন রয়েছে তখন আর এই প্রশ্ন অনর্থক কেন?'

তবুও আমরা বলব, তথাকথিত সঙ্ঘ মানেই যেমন সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে, 'নিখিল বঙ্গ সাময়িক-পত্র সঙ্ঘে'র নামটা শুনলেই তেমনি সাঙ্ঘাতিক এক দলকে আমরা দেখতে পাই চোখের সমুখে। সঙ্ঘের রূপ পূর্ব্বে এমন ছিল না, বর্ত্তমানে যেমন ধারণ করেছে। এই সঙ্ঘের জন্মের একটা ইতিহাস আছে, যার সঙ্গে বর্ত্তমান সঙ্ঘের কোন সম্পর্কই নেই। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় সরকার যখন কাগজ নিয়ন্ত্রণের আইনে তাবৎ সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হ্রাস করলেন, তখন পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করবার জন্য এই 'সঙ্ঘ'টির সৃষ্টি হ'ল সাময়িক।

যুদ্ধ কবে থেমে গেছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়িও ততটা নেই বর্ত্তমানে। কিন্তু সঙ্ঘটিকে জিইয়ে রাখলেন কয়েক জন ফন্দীবাজ ও কুখ্যাত ব্যক্তি এবং দু'-একটি তথাকথিত মাসিক পত্রের সম্পাদক। সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে এই সঙ্ঘ মারফৎই কত কি লাভ করা যায় তার হদিশ দিতে পারেন দু'জন; যথা—সুরেন নিয়োগী (অতিখ্যাত জ্ঞানাঞ্জনের সহোদর) এবং ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেসী এম, এল, এ)।

'নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ' সম্পর্কে আমরা জনসাধারণকে সাবধান করতে চাই। এই মেকী ও স্বার্থপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব আমরা স্বীকারই করি না, কেন না সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে প্রভাবশালী কোন পত্র-পত্রিকারই প্রতিনিধিদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। যাদের পাওয়া যায় তারা এক জনও সত্যিকার লেখক বা সম্পাদক নয়, তারা সাহিত্যের ধ্বজাধারী কাগজ-কলমে এবং আসলে ঐ জ্ঞানাঞ্জনেরই সমগোত্রীয়।

জাতীয়তাবাদী কাগজ আর প্রেস কমিশনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও কোন ফল হবে না। যাদের চোখই নেই তাদের চোখে চশমা পরিয়ে কি লাভ?

কবি এলিয়টের রসিকতার নিদর্শন

কবি টি. এস. এলিয়টের বর্ত্তমানে বয়স কত? ষাটের ওপর, পঁয়ষট্টি। এলিয়ট ভীষণ লাজুক প্রকৃতির। প্রচার আদপেই চান না। বলেন, "যত দিন আমি জীবিত আছি তত দিন আমি খ্যাতি চাই না, বিখ্যাত হ'তে চাই না।" কবি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাবলম্বী, প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিক এবং রাজভক্ত রাজনীতিক। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও কবির পরিবর্ত্তন হয়নি। এখনও তিনি পূর্ব্বের মতই রসিক। ডাকঘরের পিওনদের সঙ্গে কবির যত রসিকতা। এলিয়ট কাকেও পত্র লিখলে সেই লেফাফায় ঠিকানা লেখেন কবিতায়। এখানে একটি নিদর্শন উদ্‌ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কবি জনৈকার ঠিকানা লিখেছেন নিম্নরূপ:—

Postman, propel thy feet, and take this note
to greet

The Mrs, Hutchinson
Who lives in Charlotte Street.

'ফীট', 'গ্রীট' ও 'ষ্ট্রীট' মিলিয়েছেন কবি।

'না বলিয়া লইলে' কি হয়?

ইদানীং পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, বিদেশী গল্পের নায়ক-নায়িকাকে ধুতি আর শাড়ি পরিয়ে বাঙালী পাঠকের সামনে হাজির করা হয়, অথচ কোথাও কোনো স্বীকৃতি নেই, যেন মৌলিক রচনা। পূজা-সংখ্যা 'সচিত্র ভারতে' কোনও বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিকের মূল রচনা হিসাবে প্রকাশিত "রোমাঞ্চকর" গল্পটির সঙ্গে P, G. Woodehouse-এর "Crime Wave at Blandings" গল্পটি মিলিয়ে দেখুন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু চমক দিয়েছেন দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ২৭শে পৌষ তারিখে 'নব' কমলাকান্তের সার্ল'ক হোমস্ সংক্রান্ত গবেষণা। উক্ত প্রবন্ধটির সঙ্গে ৩রা জানুয়ারী তারিখের 'ইলসট্রেটেড উইকলী'তে প্রকাশিত সার্ল'ক হোমস প্রবন্ধটিও পঠিতব্য! হুবহু প্রায় 'না বলিয়া লওয়া'। লেখক নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন এবং জি, বি, এসের বঙ্গজ সংস্করণ!

দেখে-শুনে কিন্তু স্বর্গত মোহিতলালের সেই বিখ্যাত উক্তিটাই মনে পড়ে।

২৫শে তারিখের 'আনন্দবাজারে'র সাহিত্য-জগতের "এক বছরের বিদেশী সাহিত্য" প্রবন্ধটির সঙ্গে আমেরিকার 'Time' পত্রিকার ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের সংখ্যাটি পড়ুন!

বিচিত্র পাণ্ডিত্য বটে!

কুট্টনীমতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার এত বিশাল যে বর্তমানে অতি অল্পসংখ্যক দেশের প্রচলিত সাহিত্য তার সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা রাখে। মধ্যযুগের একটি কাব্য, 'কুট্টনীমত কাব্য' প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। কাব্যকারের নাম ভট্ট দামোদর গুপ্ত। ইং ১৮৮৩ অব্দে ডাঃ পিটার্স'ন ক্যাম্বের শান্তিনাথ মন্দিরের পুঁথিশালা থেকে 'কুট্টনীমতের' একটি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। ইং ১৮৯৭ অব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই কাব্যের এক সম্পূর্ণ পুঁথি উদ্ধার করেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত এমন প্রাচীনতর পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

'কুট্টনীমত' বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সমগোত্রীয় হ'লেও পতিতাদিগের সম্বন্ধেই অধিক কথা এই গ্রন্থে আছে। এই কাব্যের অনুবাদ কয়েক বছর পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে হ'তে বিশেষ কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করলেন। 'কুট্টনীমত' গ্রন্থটি বসুমতী কেবল মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের বিক্রয় করছেন। অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। মূল্য চার টাকা।

নারী-চরিত্রের বৈচিত্র্য

Reader's Digest-এর নভেম্বর সংখ্যায় Kinsey Report-এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ-জীবনে Kinsey Report-এর গুরুত্বের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ডাঃ আলফ্রেড সি, কিন্‌সের রিপোর্ট "Sexual Behaviour in Human Female" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১২০০০ গোপনীয় সাক্ষাৎকারের ও ইণ্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি ও ন্যাশানাল রিসার্চ কাউনসিল এবং রকফেলর ফাউনডেশন ফণ্ডের সহযোগিতায় এই বিরাট গবেষণা সম্ভব হয়েছে। ডাঃ কিন্‌সে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সতীত্ব ও অবাধ প্রেম সম্পর্কে হাভলক এলিস, বার্ণার্ড শ, মার্গারেট মীড, বেন লিণ্ডসে প্রভৃতি এত দিন যা বলে এসেছেন, কিন্‌সের এই রিপোর্ট তার ওপর এক মূল্যবান সংযোজন। নারী-চরিত্র ও তার যৌন-জীবনের যে রহস্যময় রাজ্য মানব-সমাজের কাছে এত কাল অজানা ছিল তা এত দিনে উদ্ঘাটিত হ'ল। কিন্‌সের এই রিপোর্ট ভারতীয় সমাজ-জীবনেও নতুন আলোর সন্ধান দেবে।

ভারত সম্পর্কে সদ্য-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

সাগর-পারের প্রকাশকদের মধ্যে আরও কেউ কেউ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ একেবারে হাল আমলে প্রকাশ করলেন। পেঙ্গুইন বুকস লিঃ ছাপলেন বেঞ্জামিন রোল্যাণ্ডের লেখা The Art and Architecture of India অর্থাৎ, 'ভারতের শিল্প এবং গৃহনির্ম্মাণশিল্প'। হডার এণ্ড ষ্টাউগটন বের করলেন স্যর জন হাণ্টের রচনা 'The Ascent of Everest' অর্থাৎ এভারেষ্ট আরোহণ (সচিত্র)। হাণ্টের এই রচনার আলোচনায় Times Literary Supplement বলেছেন: Sir John Hunt's book combines two qualities which do not always go together. It tells an epic story in a form which will be read with the deepest interest by a public far beyond the narrow circle of the Alpine and mountain clubs of this and other countries; and, with its appendics, it provides a text book on how a great Himalayan expedition should be prepared and conducted." প্রকাশক জোনাথন কেপ ছাপলেন মরিস্ হেরজগ লিখিত "Annapurna", যার বঙ্গার্থ 'অন্নপূর্ণা'। এটিও এভারেষ্ট আরোহণ সম্পর্কেই। বইয়ের নামকরণটি ভাল হয়েছে। ভারতীয় নাম বজায় রাখা হয়েছে। প্রকাশক এলেন এণ্ড আনুইন প্রকাশ করলেন একসঙ্গে দু'খানি বই। যথা, স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের রচনা "The Principal 'Upanisads", অর্থাৎ 'প্রধান উপনিষদ সমূহ'; এবং কে. এম. পানিকরের লেখা 'Asia and Western Dominance' অর্থাৎ 'এশিয়া ও পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহ।' পানিকরের রচনাটি ব্যাপকতর। শুধু ভারত নেই তাঁর লেখায়, সমগ্র এশিয়াই আছে।

বেশী বই চাই না, চাই বইয়ের মত বই

১৩৫০ সালের পর কিংবা মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে নাম করবার মত বই বেরিয়েছে মাত্র কয়েকটি। কয়েকটি রম্য-রচনার সংগ্রহ, খান কয়েক সমালোচনা-সাহিত্য,

গোটা তিনেক উপন্যাস, ডজন খানেক কবিতা-সঙ্কলন এবং এক-আধখানা জীবন-চরিত ব্যতীত খুব বেশী উল্লেখযোগ্য বই আত্মপ্রকাশ কেন করেনি তা একমাত্র মা সরস্বতী জানেন! অন্যান্য হাজার হাজার বই যে না বেরিয়েছে তেমনও নয়। গত দশ বছরে বাঙলা ভাষায় পাঠ্য এবং অপাঠ্য বই বেরিয়েছে সংখ্যাতীত। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এতটা আধিক্য পূর্ব্বে কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য তার কারণও একটা আছে। যুদ্ধকালীন প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের ক্রেতা ছিল তৎকালীন জঙ্গী-সরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদানকারী বাঙালী পাঠকদের কাছে তখন জঙ্গী সরকার হরিলুটের বাতাসার মত বই লুটিয়ে দিয়েছিল। কার লেখা, কি বৃত্তান্ত তা জানবার প্রয়োজনও ছিল না। শুধু বই হ'লেই চলেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত ও শশধর দত্তর মধ্যে কে শক্তিশালী, তার বাচবিচার ছিল না। শুধু বই হ'লেই চলেছিল। তারাশঙ্কর ও শ্রীতারাশঙ্করের বিক্রীর কোন ফারাক ছিল না, শুধু বইয়ের নামে বই হ'লেই চলেছিল।

দুর্ভিক্ষ আমাদের ইহজন্মে হয়তো ঘুচবে না। কিন্তু পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কবে কোন কালে বিদায় নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, তৃতীয়র ব্যবস্থাও পাকা হ'তে চলেছে। তেমন একটা গরম-যুদ্ধ না চললেও ঠাণ্ডা-যুদ্ধের ঠেলায় মানুষের আধ হাত জিব বেরিয়ে পড়ছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল কত লোকের। আসল কথা, যুদ্ধের সময়ের পকেট এবং সৈনিক-পাঠক, দুইয়েরই অভাব ঘটেছে এবং তার ফলে বর্ত্তমানে, বই শুধু বই হ'লেই চলছে না। এমন কি সোনায় জলে ছেপে, ঝকমকে প্রচ্ছদে ঢেকে প্রকাশ করলেও চলছে না। বইয়ের মত বই না হ'লে চলছেই না। কেন না, পাঠকের আর্থিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তির মাত্রা বেড়ে চ'লেছে। যত কমছে তত বিচার করছে। দেখে দেখে ভাল জিনিষটি কিনছে। যেটি না কিনলে নয় কেবল মাত্র সেটিকেই কিনছে। অর্থাৎ, বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে বইয়ের মত বই প্রকাশিত হচ্ছে হাজারে একটি। এবং সেই একটি বই-ই হাজার হাজার বিক্রী হচ্ছে। সুতরাং, সাহিত্য-জীবিকায় বাঁচতে হ'লে বইয়ের মত বই না লিখলে গত্যন্তর নেই। অন্ততঃ বাঙলা সাহিত্যে যখন বর্ত্তমানে এতটা বাচ-বিচার দেখা দিয়েছে।

আকাশ-বাণী, কলিকাতা-কেন্দ্র—বাঙলা ও বাঙালী

মাঝে মাঝে, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যেন ভুলেই যাই যে, আমরা বাঙালী। এই ভাবটা মনের মধ্যে চেগে ওঠে বেশী, যখন আকাশ-বাণীর কলকাঠি নাড়াচাড়া করতে বসি। বেতার-যন্ত্রটির কান ধ'রে প্রথম পাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কান ধ'রে পাক দেওয়ার প্রতিশোধ নেয় বেতার-যন্ত্র। সমগ্র বাঙালী জাতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত, ও অর্ব্বাচীন। তাই বেতার-যন্ত্র সাত-সকালে বেত হাতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। মূর্খ বাঙালী জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে লাগতে হবে। শ্রেফ বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করবেন গুরুমশাই। সমগ্র বাঙালী জাতির গুরুমশাই ভুবনেশ্বর ঝা।

যতই হোক বাঙালী। আত্ম-বিস্মৃত জাতগুলোর মধ্যে আমরা 'ফার্ষ্ট'। বাঙালী যে বাঙালী সে-কথাটা ভুলে যাওয়া তেমন কিছু বিচিত্র নয়। তবুও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত বেতার-ওয়ালাই জাতির কখনও আমাদের কর্ণকুহরে নুন-তেল বর্ষণ করতে চায় —যখন কলকাতার আকাশ-বাণী থেকে শুনতে পাওয়া যায় ন'মাসে ছ'মাসে বাঙলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোন কোন আলোচনা।

হেড-অফিসের গণ্ডগোল বা আব্দার-বায়নার কারণেই সকল অনুশাসন ও নির্দ্দেশই পালন করতে হয় শাখা-অফিসকে। তা সত্ত্বেও, আকাশ-বাণীর কলকাতা-কেন্দ্র গত কয়েক মাসের মধ্যে বাঙলা ও বাঙালী জাতির বিশেষ উপকারী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন। যথা, 'ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বাঙলা' বাঙলার অলঙ্কার ও দারুশিল্প, অলঙ্কারশিল্প, বস্ত্রশিল্প। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙলার লুপ্ত নগর, বাঙলা গদ্যরীতি, বহির্বঙ্গে বাঙালী, সাহিত্যে দেশপ্রেম, মহানগরীর পথে প্রভৃতি কথামালা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠও হয়েছে। মাসিক বসুমতীতে একদা প্রকাশিত যাযাবরের 'জনান্তিক' নাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

কলকাতার আকাশ-বাণীর প্রতি মাসিক বসুমতীর এই প্রথম দৃষ্টিপাত। সুতরাং প্রথমেই 'প্রোগ্রাম' ধ'রে ধ'রে সমালোচনা করলেম না, ক্ষান্ত থাকলেম। বাঙলা দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কলকাতা-কেন্দ্রের সময়োপযোগী ও সজাগ দৃষ্টিপাতের জন্য প্রথমে আমরা উৎসাহ প্রদর্শন করছি। অতঃপর বিস্তারিত।

দৈনিক সংবাদপত্রের বিশেষ পৃষ্ঠা

দৈনিক সংবাদপত্র এত কাল সংবাদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর তোয়াক্কা করতো না। অন্য দেশের কথা বলছি না। বিদেশে মামুলি সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ের সংবাদপত্রই প্রকাশ ক'রে থাকে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়ে বলছি, বাঙলা দেশের কয়েকটি পত্রিকা সম্প্রতি সংবাদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের অভাব বা সংবাদের অভাব কিনা জানি না, 'কলম' পূরণ করতে এই সকল কাগজ প্রায় প্রত্যহই আড়াই 'কলম'-ব্যাপী প্রবন্ধ ছাপছেন। পাঠক পাঠিকা অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে, খবরের কাগজে খবর না ছাপিয়ে ম্যাগাজিনের লেখা ছাপছে কেন?

যাই হোক, যাঁদের কাগজ তাঁরা যা-খুশী করুন। কিন্তু সাহিত্য-পরিচয়ের নামে দু'টি বিশিষ্ট কাগজ বিশেষ পৃষ্ঠা বা বিশেষ রচনা প্রকাশ করছেন। এই প্রচেষ্টায় একটি কাগজের নিজস্ব কয়েক জন লেখকের বা সেই কাগজের সম্পর্কে দুর্ব্বল আলোচনার নামে আত্ম-প্রশংসা ছাপা হচ্ছে এবং অন্য কাগজে যে-সব বইয়ের আলোচনা প্রকাশ হচ্ছে সে-সকল বই সাধারণ বাঙালী কদাপি পড়বে না।

কাগজের বিশেষত্ব হোক, কাগজ ভাল হোক, কে না চায়! কিন্তু বিশেষ লেখায় যদি কোন বিশেষত্ব না থাকে তা হ'লে বিশেষ কোন কাজই হয় না। যা কাজে লাগে না তাকে জোর ক'রে কাজে লাগানোর চেষ্টাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি?

বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক

অতিশয়োক্তি, অতিরিক্ত বিশেষণ, উচ্ছ্বাস এবং তৎসহ কিঞ্চিৎ মিথ্যা কথার চাটনী সহকারে বিজ্ঞাপন দেওয়াটাই আমাদের দেশে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদ্দারা বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব থাকে না,

যাঁদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, তাঁরা সহজেই আসল অবস্থা বুঝে ফেলেন আর বিজ্ঞাপিত দ্রব্য মার খায়। সম্প্রতি বইয়ের বাজারের বিজ্ঞাপনে এমন সব উক্তি চোখে পড়ে যা নীরবে হজম করা কঠিন। যেমন কোনও একটি উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অবহেলায় ও আলস্যে টেকচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর কেউ ও-কাজে হাত দেননি—এত দিনে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন সত্যিকারের জাত-উপন্যাস-লেখক ইত্যাদি। আর এক জন নিজের ছবি বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে তার তলায় লিখেছেন—'জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্য রচনা করেন বলেই তাঁর সাহিত্য আজকের দিনে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে'—ইত্যাদি। আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার মাপকাঠি যে কি তা আজো কেউ বলতে পারেন না। যেমন মহুয়ার ধারণা ছিল সে সুন্দরী। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনেই আরো দু'টি কথা লেখা আছে—"পৃথিবীর ছ'টি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে,—দ্বিতীয় মুদ্রণ ছাপা হচ্ছে।" এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে বিগত শারদীয়ায়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদান-প্রথার শৈশব অবস্থা অনেক দিন কেটে গেছে, এখন অনেক প্রতিষ্ঠান সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই জাতীয় বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতার সাফল্য সেইখানে, যেখানে সকলেই তাঁর প্রচারণার সততা অনায়াসে উপলব্ধি করেন এবং প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করেন। আমরা সবিনয়ে এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উপন্যাসের ক্রমাবনতি

John o' London's Weekly নামক বিখ্যাত পত্রিকায় John Rowland লিখেছেন—"১৯৩৫ থেকে ১৯৫০-এর ভেতর উনিশটা নভেল লিখেছি কিন্তু ১৯৫০ থেকে আজ পর্যন্ত লিখেছি একখানি, আর একটি আত্মজীবনী, ধর্মসংক্রান্ত একটি পুস্তিকা, দু'খানি বিজ্ঞানের বই, আর ছোটদের জন্য একটি কাহিনী। কিন্তু নভেল লিখিনি, আমার বন্ধুদেরও সেই দশা। এক জন বন্ধু বললেন—উপন্যাস এখন আর্ট হিসাবে মৃতকল্প হয়ে পড়েছে। কথাটি কি সত্য?"

মিঃ রোলাণ্ড এক জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসাবলী সর্বত্র সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর বর্তমান বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। তাঁর সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধটি সমগ্র অংশ অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করলাম—কারণ বাংলা দেশের উপন্যাস-সাহিত্যেও এই মড়ক লেগেছে। এ দেশের সাহিত্যিকরা যাঁরা—আজ চল্লিশের ওপর তাঁদের লেখনী বন্ধ্যা না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে থেমে আছে। যাঁরা সাহিত্যের সর্বোচ্চ আসনে তাঁরা গত দু'-তিন বছরে একাধিক উপন্যাস রচনা করেননি, যা করেছেন তারও সাহিত্যিক মূল্য গৃহ-চূড়া থেকে ঘোষণা করার মত নয়। সমারোহ সহকারে প্রচার না করে অনেক সাহিত্যিক এক রকম অবসর গ্রহণ করেছেন, কদাচিৎ চুটকি রচনা লিখছেন বা সাহিত্যের অন্য বিভাগে মন দিয়েছেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ (অর্থাৎ ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভিতর), তাঁদের

রচনায় চমকপ্রদ কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি? কল্লোলোত্তর সাহিত্যিকদের উপন্যাস বা গল্পে নতুন তত্ত্ব কি আছে? পুরাতন বস্তুই কি নতুন পোষাকে পরিবেশিত হচ্ছে না? রোমান্স-বিমুখতা এ দিনের ধর্ম। বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়-বস্তুর দিকে অনেকের আগ্রহ আছে, কিন্তু বাঙালীর বর্তমান সমাজ-জীবনে যে অভিশাপ আজ স্পর্শ করেছে তার কাহিনী কে রচনা করবে? উপন্যাস আজ মৃতকল্প।

মিঃ রোলাণ্ড প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই ক'টি কথা বলে—"the book of the future seems to me to be the biography, the book of interpreted fact, rather than the book of fiction. I may be wrong; but all the same I should like to know what others feel about it...."

এ দেশে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি আত্মজীবনী ও জীবনীর সাফল্য দেখে এবং রম্য-রচনার প্রতি পাঠকদের আগ্রহ দেখে মিঃ রোলাণ্ডের কথাটি খাঁটি বলে মনে করার হেতু আছে।

সমারসেট মম্ কর্তৃক বোট-হাউস দান

এক বায়রণ ব্যতীত পৃথিবীর কোন লেখকই রাতারাতি বিখ্যাত হননি। অনেককেই অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে সাহিত্যিক যশঃ পুরাপুরি অর্জন করতে। খ্যাতিলাভের পর কেউ মনে রাখেন পূর্ব্বের স্মৃতি, কেউ রাখেন না। সমারসেট মম্ কিন্তু তেমন অকৃতজ্ঞ নন। যে-বিদ্যালয়ে তিনি পড়েছিলেন ছাত্রাবস্থায়, ক্যাণ্টারবেরির সেই কিংস্ স্কুলকে তিনি এখনও ভোলেননি। বিদ্যালয়টির ঐতিহ্য ১,৩০০ বছরের। এই স্কুলের পাঠাগারে মম্ দান ক'রেছেন তাঁর দু'টি বিশিষ্ট উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, যথা—'লিজা অব ল্যাম্বেথ' এবং 'ক্যাটালিনা'। এই বিদ্যালয়ে কৃতী-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই পড়েছিলেন, যেমন, নাট্যকার ক্রীষ্টোফার মার্লো, রচনাকার ওয়াল্টার প্যাটার এবং ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল। কিছু দিন আগে এই বিদ্যালয়টির বহু উৎসাহিত বাচখেলার সুবিধার জন্য একটি বোট-হাউস (Boat-House) ক্রয়ের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন সমারসেট মম্।

কাজী নজরুল 'যুগান্তর' ছিঁড়ছেন

সম্প্রতি কলকাতা শহরের একটি বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একখানি আলোকচিত্র মুদ্রণ করা হয়েছে। চিত্রটি যেমন মর্ম্মান্তিক তেমনি দুঃখের। বাঙলার বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা আজ কে না জানেন? কিন্তু মাথা খারাপ হওয়ার পর কবি যদি অস্বাভাবিক কোন কাজ করেন, সেই ঘটনাকে ফলিয়ে, ফাবি ক'রে জাহির করার মধ্যে কি সত্যিকার সাংবাদিকতা প্রকাশ পায়! মন আর মস্তিষ্কে যাঁর বিকার দেখা দিয়েছে তাঁর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সাধারণ্যে প্রকাশ করার পদ্ধতি কোন সভ্য দেশেই নেই। তদুপরি কাজী যখন কাজী নজরুল ইসলাম;

দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কিনা জানি না, 'যুগান্তর' মধ্যে মধ্যে কাজীর সম্পর্কে কাতর-সংবাদ প্রকাশ করে থাকেন। কবি বর্তমানে সুস্থ-মনে কিছু পড়তে পারেন না এবং কাগজ-পত্র ছিঁড়ে ফেলেন—তার ছবিও বাদ গেল না 'যুগান্তরে'র ক্যামেরায়। কি অসহ্য ও পীড়াদায়ক দৃশ্য! কবির অদূরে প'ড়ে আছে ছেঁড়া 'যুগান্তর'। দোহাই কর্তৃপক্ষ, একটি কথা যেন তাঁরা ভুলে না যান যে, কবির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা থাক এইটেই সকলের প্রার্থনা; কবির প্রতি সাধারণের করুণা বর্ষিত হোক—কোন সভ্য মানুষই তা চায় না। এমন বিচার-বিবেচনা বিহীন আত্ম-প্রচারের মোহ ত্যাগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষকে।

সাহিত্যে বিভ্রান্তকারী নামের কারসাজি

সম্প্রতি একটি স্কুলপাঠ্য বই সম্বন্ধে একটি মজার অথচ বিভ্রান্তকারী সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। এ বইখানি স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য, নাম "ছোটদের পরমপুরুষ"। বইখানি প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী আরতি দেবী, ৮ নেবুবাগান লেন, কলিকাতা-৩ হইতে। লেখক হচ্ছেন অনিন্দ্যকুমার সেনগুপ্ত। এই শ্রী-বর্জ্জিত অনিন্দ্যকুমার সেনগুপ্ত নামের সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নামের সঙ্গে লোকের মনে ভ্রান্তি উদ্রেকের কারণ হিসাবে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। তা ছাড়া এই ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি, কয়েকটি স্কুলে এই বইটি পাঠ্য হিসাবেও 'বুক-লিষ্টে' উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে, অর্থাৎ বুক-লিষ্টের মধ্যে গ্রন্থের লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অথচ 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের খ্যাতিমান গ্রন্থকার অচিন্ত্যকুমারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, তিনি এরূপ কোন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেননি। এখন যাঁরা সুজন তাঁরা এই রহস্যের সন্ধান করুন।

আত্মচরিত রচনার প্রাবল্য

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে আত্মচরিত রচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিলেতেও Books in Britain নামক Pat Murphy-র একটি রচনা থেকে জানা যায় যে, গত বৎসর ও-দেশেও জীবনী ও আত্মজীবনী অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের চেয়েও বিক্রীত হয়েছে বেশী। আত্মজীবনী, আত্মস্মৃতি বা আত্মচরিত রচনার সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু সাধারণের জন্য তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে, তার মধ্যে সকলের উপভোগ্য কি খোরাক আছে, এবং উক্ত জীবনীর মধ্যে সাধারণ মানুষের গতানুগতিক জীবন অপেক্ষাও কিছু ঘটনা-স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

বর্তমান কালের আত্মচরিত রচনাকারদের মধ্যে হামবড়িয়া অহংসর্বস্ব ভাবই প্রকট সর্বত্র। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে আমরা যে সকল উচ্চাঙ্গের আত্মচরিত-রচয়িতাদের সন্ধান পাই তাঁদের তুলনা হয় না। ব্যক্তিকে উপলক্ষ ক'রে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যের যে চিত্র রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ও রাসসুন্দরী এঁকেছেন, যে রস পরিবেশন করেছেন, তা এগুলি পাঠ না করলে সম্যক

উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এগুলি পাঠ করলে মনের মধ্যে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, বহু বৈচিত্র্যের যে বিস্ময় ঘটে ও তাঁদের সত্য ভাষণ সম্বন্ধে যে প্রত্যয় জন্মায়, বর্ত্তমান আত্মচরিত-রচয়িতাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার অভাবই যে পরিলক্ষিত হয় এটা খুবই হতাশার কথা।

ভারত সরকারের সাহিত্যাভিযান

আমেরিকা ও রাশিয়ার মত বিদেশে নয় এবং একের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে নয়,—স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উন্নয়নকল্পে ভারত গভর্ণমেণ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় শিশু, কিশোর ও পরিণতদের জন্য তাঁরা নানা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। এর জন্য সর্ব্ব-ভারত থেকে সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটী গঠিত হয়েছে। বাংলা দেশ থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, 'মৌচাক' ও 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক'-এর সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমতঃ বাংলা, হিন্দী, তেলেগু, তামিল, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় এবং ইংরেজী, ফরাসী বা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কিশোর ও পরিণতদের জন্য লিখিত বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থও লিখিত হবে বহু, এবং এই সকল কার্য্যের জন্য কখনো প্রতিযোগিতার সাহায্যে পারিতোষিক ঘোষণার দ্বারা, আবার কখনো বা স্বতন্ত্র ভাবে সাহিত্যিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এই সাফল্য অর্জ্জনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হুমায়ুন কবির বর্ত্তমানে সমস্ত বিষয়টি কমিটীর সদস্যদের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করছেন। আমরা আশা করি, ভারত গভর্ণমেণ্টের এই সাধু প্রচেষ্টায় দেশের সাহিত্য উন্নত হবে এবং সাহিত্যিকরা উপকৃত হবেন।

নূতন সাপ্তাহিক প্রকাশের আয়োজন

কলিকাতার কোন একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করছেন। এই উপলক্ষে কয়েক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত ক'রে তাঁরা প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা সুসম্পন্ন করেছেন। সম্ভবতঃ আগামী বাংলা নববর্ষের প্রারম্ভেই এই পত্রিকাখানি বাজারে আত্মপ্রকাশ করে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে।

অচিন্ত্যকুমারের স্বামী বিবেকানন্দ

ছেলেমেয়েদের রাজ্যে অচিন্ত্যকুমার বহু কাল পরে আবার এক নূতন অধ্যায় সূচনা করলেন। শিশুদের একটি মাসিক পত্রিকায় আগামী ফাল্গুন মাস থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখবেন স্থির করেছেন। লেখাটি বিবেকানন্দের ডাক-নামে বেরুবে।

ঐতিহাসিক সংবাদপত্র

জার্মাণীর ফ্রাঙ্কফুরটের আলফ্রেড উইলহেলম "News-paper of World History"র সম্পাদক। আধুনিক দৈনিকপত্রের আঙ্গিকে তিনি অতীতের সংবাদ পরিবেশন করেন। প্রথম সংস্করণে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সংবাদ হানিবল কর্তৃক রোমানদের পরাজয়-কাহিনী 'ব্যানার হেডলাইন' দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বছরে চার বার এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে। প্রথমেই প্রচার সংখ্যা ২০,০০০-এ পৌঁছিবে। ইতিহাস শেখানোর অভিনব প্রচেষ্টা।

দামোদর ভ্রমণ

বাংলা দেশের কিছু সাহিত্যিক সাংবাদিক ও পুস্তক-প্রকাশক সরকারী খরচায় দামোদর ভ্রমণ করে এসেছেন। হয়ত এইবার সাহিত্যে দামোদরের বান ডাকবে। ইতিমধ্যেই দু'-একটি নমুনা পাওয়া গিয়েছে। বাংলা সরকার এত দিনে সাহিত্যিকদের পংক্তি-ভোজনের আসরে ডেকেছেন—সুসংবাদ সন্দেহ নেই।

॥ প্রাপ্তি-স্বীকার ॥

কামশাস্ত্রম্

কুট্টনীমতম্—দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিতং। মূল, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসহ, অনুবাদক—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

উপন্যাস

মনোলীনা—শ্রীপ্রতিভা বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

এ জন্মের ইতিহাস—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ষ্টার লাইট পাবলিকেশনস্, ১১এ, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা-২০। মূল্য পাঁচ টাকা।

আইন-পুস্তক

দেশের জ্ঞাতব্য আইন (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীএস্, এন্, ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। ২১৫, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য চার টাকা আট আনা।

ছোট গল্প

অক্রুরসম্ভ—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

কবিতা

পাগলা গারদের কবিতা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য আড়াই টাকা।

যে শিশু আনিল মুক্তি—মালী বুড়ো, শ্রীসুধীরকুমার মল্লিক। ২২, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা-১১। মূল্য বারো আনা।

যাত্রী—শ্রীচিত্ত সিংহ। সৃজনী, ৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য চার আনা।

মহাবসন্ত—শ্রীচিত্ত সিংহ। সৃজনী, ৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য চার আনা।

ধর্ম্ম-পুস্তক

অরূপের রূপলীলা—শ্রীভৈরবানন্দ, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীবিমলানন্দময়ী কালিকা আশ্রম, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। মূল্য দু টাকা।

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ছয় টাকা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

স্ত্রীর মৃতদেহের দাহ-কার্য্য শেষ করে নরেন বাবু প্রণব বাবুর সঙ্গে যখন থানায় ফিরে এলেন, সূর্য্যদেব তখন দিক্‌চক্রবালের পরপারে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। থানা-বাড়ীর গেটে এসে তারা দেখলেন, রেকাবের উপর কয়েকটি নিম-পাতা রাখা রয়েছে। উভয়ে একটি করে নিম পাতা খুঁটে নিয়ে দেশাচার মত উহা মুখে দিয়েছেন মাত্র, এমন সময় নরেন বাবু প্রণব বাবুকে বললেন, নন্দ গুণ্ডার মামলাটা নিজে দেখবেন, লোকটা যেন ছাড়া না পেয়ে যায়!

স্তম্ভিত হয়ে প্রণব বাবু নরেন বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাত্র; মুখ দিয়ে তাঁর একটি বাক্য পর্য্যন্ত বার হলো না। নরেন বাবুর এবংবিধ উক্তিতে সত্য সত্যই তিনি বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই রকম নিষ্ঠুর কাজ-পাগলা মানুষও পৃথিবীতে আছে! থানা-বাড়ীর কাজকর্ম্ম যেন তাঁর পৈতৃক জমিদারীর কাজ! আপন সম্পত্তির মতন করে সরকারী কাজ করে যেতে ইতিপূর্ব্বে প্রণব বাবু কাহাকেও দেখেননি।

নরেন বাবু ধীর পদ-বিক্ষেপে তাঁর আফিস-ঘরে এসে একটা ইজিচেয়ার পেতে নির্ব্বিবাদে শুয়ে পড়লেন। নরেন বাবুকে এই ভাবে অফিস-ঘরেই শুয়ে পড়তে দেখে প্রণব বাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'চলুন স্যার, ওপরে চলুন।' 'এঁ্যা' বলে প্রণব বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখে নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'না প্রণব বাবু, আমি আর ওপরে যাবো না। এই চেয়ারটায় শুয়েই বাকি রাতটুকু আমি কাটিয়ে দেবো। খাওয়া-দাওয়াও ঐ ছোট টেবিলটায় আমি সেরে নেবো আখুন। তুমি বরং ওপরে উঠে একটু জিরিয়ে নাও গে, তোমার তো আবার ভোর রাত্রে এলাকায় রাউণ্ড আছে।'

নরেন বাবুর কথায় প্রণব বাবু বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে পৌছুলেন। তাহলে আজকেও তাকে রাত্রে রাউণ্ডে যেতে হবে! অন্য অফসাররা ভাবলেন সারা-রাত্র নীচে থেকে ইনি সকলকে জ্বালাবেন। তবুও প্রণব বাবুর মন নরেন বাবুকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, কিন্তু কি ভাষায় তিনি তাঁকে শান্ত করবেন। প্রণব বাবু ভাবছিলেন কিরূপ ভাষা তিনি এখোন প্রয়োগ করবেন, এমন সময় উপস্থিত সকলকে সচকিত করে আর্ত্তনাদ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বিহারী বাবু। সহসা বিহারী বাবুকে থানায় দেখে নরেন বাবু এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রণব বাবু ছুটে এসে পিছন দিক হতে সজোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু বিহারী বাবু এই দিন স্বেচ্ছায় থানায় ধরা দিতে এসেছিলেন। তিনি নির্ব্বিবাদে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি ধরা দিতেই এসেছি, প্রণব বাবু! এখুনি আমার এই হাত দু'টোয় লৌহ-বলয় পরিয়ে দিন। আজ আমি এখানে এসেছি, সকল অপরাধ কবুল করে যেখানে যতো বদমায়েস আছে তাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে!'

'বটে বটে তাই নাকি?' নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এতো দরদ কেন তাই আগে বলুন। সহজে যে এতো বৈরাগ্য আপনার এসেছে তা তো মনে হয় না। তবে আপনি নিজে ধরা না দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না, আমরাই আপনাকে দুই-এক দিনের মধ্যে এখানে ধরে আনতাম। এখোন বলুন, দেখি, আপনি সেধে ধরা দিলেন কেন?' 'বলবো বলবো, সব কথা বলবো, বলবো বলেই এখানে এসেছি', বিগলিত চিত্তে বিহারী বাবু উত্তর করলেন, 'নরেন বাবু, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে তাই—শুধু তাই জন্যে। বসুন আপনারা, খুলেই বলবো—'

স্তম্ভিত হয়ে প্রণব ও নরেন বাবু বিহারী বাবুর মুখ হতে সকল কথা শুনে গেলেন। প্রত্যুত্তরে তাকে শুনাবার মত কোনও ভাষা তারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর নরেন বাবু কি ভেবে দরজার সিপাহীকে ডেকে বিহারী বাবুকে এক গেলাস জল এনে দেবার হুকুম দিলেন মাত্র। ঢক ঢক করে নিঃশেষে সবটুকু জল গলাধঃকরণ করে বিহারী বাবু বললেন, 'তা'হলে আর একটুও দেরী করবেন না। এক্ষুনি না গেলে তারা সকলেই পালিয়ে যাবে ওখান থেকে।' বিহারী বাবুর কথায় সম্মতি জানিয়ে নরেন বাবু হেড-কোয়ার্টারে ফোন করে দিলেন, এক গাড়ী সশস্ত্র সিপাহী পাঠানোর জন্যে। এবং তার পর সশস্ত্র সান্ত্রীদের অপেক্ষায় বাহিরে দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন। জরুরী তাগিদে এক গাড়ী সশস্ত্র সিপাহী সেখানে এসে পৌছুনো মাত্র নরেন বাবু, প্রণব ও বিহারী বাবুর সহিত গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ীর ড্রাইভার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র উদ্দাম গতিতে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে শহরতলীর দিকে।

গাড়ী উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে, কয়েক মিনিটের ব্যবধান মাত্র। সকলে বড় সর্দ্দারের বাগান-বাড়ীতে এসে পৌছুলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁরা ধীরে বনানী ভেদ করে এগিয়ে চলছিলেন, এমন সময় অতর্কিতে দূরের পুরানো বাড়ী হতে বিকট শব্দে সাইরেন বেজে উঠলো। সান্ত্রী দলের সকলে বুঝলো তাদের আগমন-বার্ত্তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সহসা তাঁরা লক্ষ্য করলেন একটি সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক সম্মুখের অপরিসর পথ দিয়ে ছুটতে সুরু করে দিয়েছেন এবং তাঁর পিছন পিছন ছুটে আসছে আলুথালু বেশে এক নারী। তাদের দূর হতে দেখে অস্ফুট স্বরে বিহারী বাবু বলে উঠলেন, 'বড়ো সর্দ্দার, আর ঐ চন্দ্রা—'

বড়ো সর্দ্দার একবার পলায়ন করলে তাকে পুনরায় পাকড়াও করা যে কতো শক্ত তা নরেন বাবুর জানা ছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল বার করবা মাত্র তিনিও দেখলেন বড়ো সর্দ্দারও

একটা দূর-পাল্লার পিস্তল বার করেছে। উভয়েই একসঙ্গে আগ্নেয় অস্ত্র হতে গুলী-বিনিময় করলেন। চতুর্দিক বিকম্পিত করে আওয়াজ হলো দুড়-দম্-দুম্। নরেন বাবুর অব্যর্থ সন্ধান বড়ো সর্দারের উরুদেশ ভেদ করে দিলে, অপর দিকে বড়ো সর্দারের গুলীও বোধ হয় সান্ত্রীদের এক জনের বক্ষ এতোক্ষণে বিদীর্ণ করে দিত; কিন্তু ততোক্ষণে চন্দ্রারাণী ছুটে এসে পিছন হতে তাকে ঝাপটে ধরে তার দুই চক্ষুতে তার তীক্ষ্ণ নখযুক্ত অঙ্গুলী পুরে দিয়েছে। বড়ো সর্দারের পিস্তলের নিক্ষিপ্ত গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি বৃক্ষকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে মাটির উপর গড়িয়ে পড়লো। নরেন বাবু সদলবলে এগিয়ে এসে দেখলেন বাঘিনীর মত চন্দ্রারাণী বড়ো সর্দারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দুইটি চক্ষুমণিই উপড়ে বার করে এনেছে। কিন্তু এতো সত্বেও চক্ষুহারা আহত বড়ো সর্দার বনানীর আড়ালে কোথায় যে অন্তর্ধান হয়ে গেল তাহা উপস্থিত কেহ উপলব্ধি করতেও সক্ষম হলো না।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। পালাবে ও কোথায়?' উদাত্ত স্বরে নরেন বাবু বললেন, 'এধারকার যা-কিছু আমিই করবো। তুমি প্রণব আর একটুও এখানে অপেক্ষা করো না। খুকুরাণীকে শহরের সেই নাম-করা নাইট ক্লাবের তলায় এরা ভিক্ষা করাবার জন্যে বসিয়ে রেখে এসেছে। তুমি চন্দ্রারাণীকে নিয়ে এক্ষুণি সেখানে চলে যাও, তা না হলে তার আরও বিপদ হতে পারে। আমার সঙ্গে বিহারী বাবু থাকলেই যথেষ্ট হবে আখুন। যাও যাও, আর একটুও দেরী করো না—'

'যাবো যাবো, নিশ্চয়ই যাবো' রক্ত-মাখা হাত দু'টো তুলে ধরে চন্দ্রারাণী উত্তর করলো, 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে, ধর্ম্মের কল নড়েছে বাতাসে, কাউকে আর আমি একটুও ভয় করি না, আসুন প্রণব বাবু, ও-দিকটাও তাহ'লে দেখে আসি।'

'রেখে দাও তোমার ধর্ম্মের কল' ধমকে উঠে নরেন বাবু বললেন, 'ধর্ম্মের কল তো দেখছি এই আমার আর বিহারী বাবুর জন্যে তৈরী হলো, ওদিকে রাজা রামধন বাবু তো এখনও বেশ সভ্য সমাজে ঘোরাফিরা করছে। তার তো দেখছি কেশও কোনও ধর্ম্ম স্পর্শ করতে পারলো না। যাও যাও, বাজে না বকে যা বললাম তা কর গে যাও।'

বিহারী বাবু এতোক্ষণ তাঁর ব্যথা-কাতর চোখ দুটো বুজিয়ে চন্দ্রারাণী এবং নরেন বাবুর বক্তব্যটুকু শুনছিলেন। দূরের প্রাচীর-ঘেরা অট্টালিকার প্রতি সকরুণ চক্ষে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন, 'সবুর করুন নরেন বাবু, সবুর করুন। এতো দিন আমিও বলতাম, কৈ, ধর্ম্মের কল তো নড়ে না, কিন্তু আমার সে ভুল আজ ভেঙে গিয়েছে। ওকে হয়তো মানুষ দিয়ে না মারিয়ে ভগবান নিজে ওকে মারবেন।'

প্রণব বাবু ও চন্দ্রারাণী দূরে চলে গেলে নরেন বাবু বিহারী বাবুকে সঙ্গে করে ধীর পদবিক্ষেপে দূরের পুরাতন অট্টালিকাটি লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বিহারী বাবু আর একটু মাত্রও এগুতে চাইলেন না। তাঁকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নরেন বাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না বিহারী বাবু! আমিও একজন কম বড়ো গুণ্ডা নই। শাস্তি যা হবার তা তো আমার হয়েইছে, তাহ'লে আর মিছিমিছি ভয় করি কেন?'

'না না না, না নরেন বাবু!' ঘা-খাওয়া হিংস্র জীবের মত পিছিয়ে এসে বিহারী বাবু বললেন, 'ওখানে আমাকে আর নিয়ে যাবেন না। আমার শাস্তি কি আরও বাকী আছে? পারেন তো ঐ বাড়ীটা কামান দিয়ে ভেঙে দিয়ে ওকে কবর-স্তূপে পরিণত করুন।'

রাত্রি তিন ঘটিকা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। রাজপথে সমুজ্জ্বল আলোক ব্যতীত ঘরে-বাহিরে আর কোনও আলোক দেখা যায় না। কয়েকটি ট্যাক্সী এবং রিক্সা বৃথা এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা করছে মাত্র, রাত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কয়েকটি সোডা ওয়াটারের দোকান ব্যতীত আর কোনও বিপণি উন্মুক্ত দেখা যায় না। চারি দিককার বাড়ীগুলি নিঝুম ও নিস্তব্ধ হয়ে গেলেও মধ্যবর্ত্তী একটি বাটীর সমগ্র দ্বিতলের ঘরে ঘরে তখনও পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল আলোক দেখা যায়। ঐ সকল কক্ষের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি রাজপথের উপরও এসে পড়ছে। এ ছাড়া এই বাড়ীটিতে রঙ-বেরঙের মোটর গাড়ীর বিরামহীন আনাগোনা ও উহাদের হুস-হাস শব্দও তাদের পক্ষে কম বিরক্তিকর নয়।

এই অত্যদ্ভুত স্থানটির নাম নাইট ক্লাব বা নৈশ আড্ডা। পুরানো শেয়ানাদের জন্যে যেমন আণ্ডার ওয়ার্ল্ড বা পাতাল-পুরী আছে, তেমনি এক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তিদের জন্য এক প্রকার আপার ওয়ার্ল্ড বা উর্দ্ধতন পৃথিবীও আছে। আধুনিক শহরের এই নৈশ আড্ডা-ঘর বা তথাকথিত নাইট ক্লাব হচ্ছে এই দুর্ব্বোধ্য পৃথিবীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং গুণী ও জ্ঞানী নাগরিকদের এই উর্দ্ধতন পৃথিবী সর্ব্বদাই নাগালের বাইরে।

নাইট ক্লাব-বাড়ীর মাঝের হল-ঘরটি এই দিন বিশেষরূপে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এখানে-ওখানে একটি করে গোল টেবিল এবং উহার চারিদিক ঘিরে কয়েকটি কাষ্ঠাসন সাজানো। কাচের পেয়ালার টুনটান শব্দ, মধ্যে মধ্যে বোতল ভাঙার আওয়াজ এবং তার সঙ্গে ভদ্র নর-নারীর মিশ্র হাসি ও কলরোলে সারা হল-ঘরটি ভরপুর। মিঃ ডট, মিস্ ঘোউস, মিসেস্ বেনা অনুরূপ নামধারী নর-নারী অকারণে এক টেবিল হতে অপর টেবিলে এসে পরস্পরের গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে পুনরায় স্ব স্ব আসনে ফিরে আসছিলেন। পুরুষদের বাটারফ্লাই গোঁফ এবং নারীর ঠোঁটের আলতা এইখানকার এক আকর্ষণীয় বস্তু। পানোন্মত্ত নর-নারী অসাবধানতা বশত এ ওর ক্রোড়ে ঢলে বা বসে পড়ছে, কিন্তু পরক্ষণেই তারা এই জন্ম ত্রুটি স্বীকার করে সসম্ভ্রমে সরেও বসছে। থ্যাঙ্ক ইউ, নো নো, ওতে কি, ঠিক আছে? ইত্যাদি ভদ্রতাসূচক বাণীও কেউ কেউ বলে ফেলেন কিন্তু এই জন্যে সেখান হতে অপ্রস্তুত হয়ে কেউ চলে গেলেন না। ঢলাঢলি গলাগলি ঘেঁসাঘেঁসি করে চলা-ফেরা এখানে একটুও দোষণীয় নয়। বরং উহা তাদের উপভোগ্য বিষয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এমন কি কোনও ফাঁকে দুই-এক জন নরনারী জোড় বেঁধে কক্ষান্তরে সরে গেলেও কারও তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি জানাবার মত মনের বা শরীরের অবস্থাও কারও এখানে থাকে না, কারণ, তারা এখানে এসে শুধু মদই খায় না, উপরন্তু মদেও তাদের খেয়ে থাকে। উপস্থিত নারীদের দেখলে মনে হবে খান কতক অস্থি-কঙ্কাল মূল্যবান শাড়ী দিয়ে জড়ানো আছে মাত্র। এই সকল ক্ষীণাঙ্গী মহিলাদের দেহের ওজন বুঝি বা দেড়পো আড়াইপোরও কম। পুরুষদের চাহনি নিষ্প্রভ ও চক্ষুমণি কোটরগত। দেহের ভিতরটাও হয়তো এতো দিনে তাদের ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

সহসা একটা ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আ-আ, উ-উ, ই-ই এবং হিহি টিঁটিঁ প্রভৃতি শব্দে লাফাতে লাফাতে পার্শ্বের কক্ষগুলি হতে প্রায় অধিকাংশ নর-নারী ক্লাব-বাড়ীর হলঘরে এসে সমবেত হলো। এরা সকলে ঢলাঢলি করে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করা মাত্র হলঘরের শেষ সীমানায় অবস্থিত ষ্টেজের উপরকার পুরু পর্দ্দা দুই পাশে ত্বরিত গতিতে সরে গেল। সম্মুখের আবরণ উন্মোচন হওয়া মাত্র ঐক্যতান বাজনার তালে তালে পা ফেলে সেখানে আবির্ভূত হলেন সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সবিতারাণী। তাঁকে দেখা মাত্র উপস্থিত ভদ্র পুরুষেরা চীৎকার করে বলে উঠলো, ডিয়ারী ডিয়ারী ডা এবং নারীগণ প্রত্যুত্তরে হাসির কলরোল উঠিয়ে তাতে তাদের সম্মতি জানালো। এদের কেহ কেহ আবার হেঁট হয়ে দুই হাতে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে উঠলো, বিউটিফুল!

কলরোল থামা মাত্র কালো রঙের অতিসূক্ষ্ম কটিবাস-পরিহিতা সবিতারাণী বারেক নমস্কারের ভঙ্গিতে করজোড় করে ঘুরপাক খেয়ে নিমেষের মধ্যে উদ্দাম নৃত্য সুরু করে দিলে ঐক্যতানের তালে তালে। সমাগত নর-নারীরা কেউ নাড়তে সুরু করলো মাথা, কেউ বা ঠুকতে থাকলো পা, কেউ কেউ কুনুয়ের গুঁতা দিয়ে বা পা দিয়ে পা চেপে নিদ্রালুদের জাগিয়ে তুলতে থাকে। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে এখানে যেন সকলেই একাত্মা, পৃথক্ সত্তা যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। কোনও কোনও নারীর গৃহে ফেলে-আসা শিশুপুত্রের কথা যে মনে না আসছে তাও নয়। কিন্তু তখুনি তারা সিগরেটের ধূমে বা পানীয়ের আমেজে নিজেদের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা পরিহারও করে ফেলছে। পৃথিবীর নিচের এবং উপরের তলার গুণগত প্রভেদ কি তাহাই এখোন বিবেচ্য। কিন্তু সেই বিবেচনা আজকার পৃথিবীতে কে কবে কোথায় বসেই বা করবে?

হীরার আঙটি ও দামী পোষাক-পরিহিত কয়েক জন ধনী নাগরিক এইখানকার এই পকেট রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে গদি-আঁটা চেয়ার কয়টিতে বসে মুগ্ধ নয়নে মাথা নাড়তে নাড়তে সবিতারাণীর নৃত্য এই রাত্রে উপভোগ করছিল। এই সকল ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিক রাজা প্রাণধন মল্লিক। সবিতারাণীর নৃত্য-কৌশলে খুশী হয়ে রাজা সাহেব তাঁর অঙ্গুলী হতে হীরক-অঙ্গুরী খুলে, তাকে হস্ত লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। অন্য দিকে সবিতারাণীও যে অপ্রস্তুত ছিলেন না তাও নয়। ক্ষণিকের মধ্যে উহা তিনি লুফে ধরে নৃত্যের ভঙ্গিতে এবং গানের সুরে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু রাজপ্রাসাদে ও প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এমন অপমান তাঁকে কেউ কোনও দিনই করেনি। কারণ, তাঁর দশ অঙ্গুলীতে সেখানকার লোকে দশটি হীরক পরিয়ে দিয়েছে; কোলকাতায় এসে রাজা সাহেবের নিকট তাঁর মর্ত নারীর কি না এতো অপমান সইতে হলো! এবং এর পর তিনি নাচতে নাচতে গানের সুরে আরও মনের বেদনা জানিয়ে রাজা সাহেবের হস্ত লক্ষ্য করে অঙ্গুরীটি ছুঁড়ে দিয়ে তা তাঁকে প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দিলে। পানোন্মত্ত রাজা প্রাণধন বাবু কিন্তু প্রকাশ্যে এইরূপ অপমান সহ্য করবার মানুষই ছিলেন না। ক্ষেপে উঠে মুখ বেঁকিয়ে তিনি তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন মোসাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কি-ই, এতো বড়ো অপমান, এ্যাঁ? এখুনি গিয়ে হীরাচাঁদ জহুরীর দোকান খুলিয়ে দশটি দামী হীরক-অঙ্গুরী কিনে আনো। এই আমি কেটে দিলাম দশ হাজার টাকার চেক।'

মোসাহেব ভদ্রলোক এইরূপ একটি ঘটনার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। সে তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করে উঠে পড়ছিল হীরক-অঙ্গুরী কয়টি ক্রয় করে আনবার জন্যে, কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানে অভাবনীয় ভাবে অপর একটি অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। এই সকল পানোন্মত্ত ধনীর দুলালদের মধ্যে একজন পানবিমুখ অবাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত নাগরিকও এই দিন এখানে উপস্থিত ছিলেন। এখানে কিন্তু তিনি কোনও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হতে আসেননি। তিনি একজন আর্টিষ্ট বিধায় এখানে এসেছিলেন চিত্রাঙ্কনের জন্য একজন পছন্দসই মডেলের সন্ধানে। রাজা প্রাণধন মল্লিকের পাগলামীতে বিরক্ত হয়ে একটি অর্দ্ধদগ্ধ দেশলাই কাঠির বিদগ্ধ মুখ দিয়ে তিনি টেবিলের উপরই আনমনে একটি নারীমূর্ত্তি আঁকছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্যরতা নারীটির প্রতিও চেয়ে দেখছিলেন। সহসা তার হাতের অঙ্কনরেখা অতর্কিতে ফুটিয়ে তুললো একটি অপরূপ সুন্দর মুখ এবং সেই সঙ্গে অস্ফুট স্বরে আচম্বিতে আর্টিষ্ট ভদ্রলোকের মুখ হতে বার হয়ে এলো, 'আরে কে? এ্যাঁ, বীণা?'

[ক্রমশঃ।

উনপঞ্চাশী All Star Tragedy

ডোঙ্গরের বালামৃত দেখেছেন কখনও? নিশ্চয়ই দেখেছেন। কলকাতায় চিৎপুর রোড ধ'রে যেতে যেতে কিংবা কোন তীর্থক্ষেত্র দর্শন করতে নেমে কোন-না-কোন ষ্টেশনে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ডোঙ্গরের বালামৃতের বিজ্ঞাপনের লম্বা সাইনবোর্ড—যাতে আছে সেই সে সেই অল্প ঘোমটা-টানা করুণ-চোখ মা, বুকে হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে ধ'রে আকাশ পানে থাকিয়ে আছেন, সেই মা ও ছেলেকে আবার দেখলাম না কি মা ও ছেলের বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, হোর্ডিং-এ?

জোড়া বিয়ে, জোড়া প্রেম, জোড়া মা, জোড়া শ্বশুর থেকে ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র ৪৩ জনের সমাবেশ, কি আছে আর কি যে নেই এক কথায় বলা যায় না। এ ধরণের ছবিকে ইংরাজীতে All Star Tragedy বলে। কলকাতার বুকেই বিভিন্ন চিত্রগৃহে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হয়েছে, যাদের মধ্যে 'Grand Hotel'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। 'অল ষ্টার ট্রাজেডি' তুলতে হ'লে প্রযোজক, পরিচালক, লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে চমৎকার এক সমাবেশের প্রয়োজন হয়। শুধু ৪৩ জন *কে একত্র করলেই ছবি হয় না। একটি জামা সকল শিল্পীর অঙ্গে পরাতে দেখে ছবির পুঁজি ও দৌড় ধরা যায়।

মা ও ছেলে যখন এমন নয়-ছয়-মার্কা ছবি হয়েছে তখন ৪৩-এর সঙ্গে আর ৬ যোগ ক'রে ৪৯ সংখ্যার সমাবেশই ছিল ভাল। 'মা ও ছেলের' বদলে ছবির নামটিও হ'তো সমীচীন—উনপঞ্চাশ।

অমুক বলেন—

এক কাপ চা, দু'খানা কেক বা প্যাষ্ট্রি এবং সেই সঙ্গে দু'-চারখানা ফ্রি পাশ আর সামান্য কিছু নগদ টাকা খরচা করতে পারলে যে কোন পচা, রদ্দি আর রাবিশ ছবিরও অপূর্ব্ব সমালোচনা কলকাতার 'এ ক্লাশ' পত্র-পত্রিকায় ছাপানো যায়, তার নজীর কলকাতার কাগজওলারা নিজেরাই নিজেদের বুকে ছাপিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। চা, কেক এবং বিজ্ঞাপন বাবদ আরও কিছু নগদানগদি টাকা খাওয়ার পর চোখ-কান বন্ধ ক'রে লিখেছেন ছবির সমালোচনা নয়, প্রশস্তি!

শুধু কাগজের মতামতে যখন কাজ হয় না তখন চিত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কতকগুলো তথাকথিত সম্পাদক ও সাহিত্যিককে পাকড়াও করার ব্যবস্থাবলম্বন হচ্ছে। কোথা দিয়ে কি হয় কে জানে, এঁরাও সেই অকপটে মন্তব্য কাটছেন—"এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব ছবি আমরা সাতপুরুষে কখনও দেখি নাই।"

ধ্বংসমূলক বা অযৌক্তিক সমালোচনার পক্ষপাতী আমরাও নই। কিন্তু যে ছবি দেখে সমগ্র বাঙালী জাতি একমুখে ছি ছি করলো, সেই ছবি সম্পর্কে মাথামুণ্ডহীন সমালোচনার নামে প্রশংসা ছাপানোর অর্থ সাধারণকে বঞ্চিত করা নয় কি? সম্প্রতি কতকগুলি সর্ব্বজনীন সত্যকে অস্বীকার করতে দেখা গেল কলকাতার কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

বাঙলা সংবাদপত্র পরিচালকদের অধিকাংশই এখনও সেই ইনকাম আর ইনকাম-ট্যাক্সের দিকে নজর রাখতেই ব্যস্ত। কাগজের মান এবং সম্মান কার জন্য বা কিসে ক্ষুণ্ণ হয় তৎপ্রতি তাঁদের দৃষ্টিই নেই, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়!

আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজ

আলাউদ্দীন খাঁ বাঙলার এক শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, যিনি শুধু সুর ও যন্ত্রের সাধক নন, যিনি একাধারে সুরস্রষ্টা ও শিক্ষাগুরু। খাঁ সাহেবের জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিতে নামাঙ্কিত আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গীত-সমাজ। এই সমাজের উদ্দেশ্য সাধু। খাঁ সাহেবের পদ্ধতি ও উপদেশকে মূল ক'রে সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রসার, প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা, সঙ্গীত বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশ প্রভৃতি এই সমাজের উদ্দেশ্য। খাঁ সাহেবের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক, ছাত্র-ছাত্রী ও আত্মীয়-বন্ধু প্রতিষ্ঠা করেছেন এই সমাজ। সম্প্রতি কলকাতায় এই সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওস্তাদ আলি আহাম্মদ খাঁন, খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র এবং জামাতা যথাক্রমে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁন, পণ্ডিত রবীন্দ্রশঙ্কর, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মন্মথনাথ ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রথম বার্ষিক সম্মেলন কলকাতায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠান চার দিন চলে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ একটি অপূর্ব্ব ভাষণ দেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা-মাধুর্য্য তিনি নিজে দর্শন করেছেন, এ কথাও ব্যক্ত করেন। সম্মেলনের পক্ষ থেকে খাঁ সাহেবকে মাল্যদান করা হয়। 'মাসিক বসুমতী' সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক সম্মান-দক্ষিণা হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে এক শত এক টাকা খাঁ সাহেবকে প্রদান করেন। এই অর্থ খাঁ সাহেব তাঁর গুরুর বংশধর ওস্তাদ দবীরুদ্দীন খাঁকে দেন এবং তিনি এই অর্থ খুশী-মনে আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজকে দান করেন। আমরা আশা করি, বাঙালী জাতির ঐশ্বর্য্যস্বরূপ আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যেক বাঙালীই অগ্রসর হবেন।

"কলকাতার আসরে বাজিয়ে আমি যেমন আনন্দ পাই তেমন আর অন্যত্র কোথাও পাই না।"

—ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

টকির টুকিটাকি

চিত্র নির্মাণে উদ্যোক্তা মণিলাল শ্রীবাস্তব 'শেষের কবিতা' রূপদানের পর অনুরূপা দেবীর 'গরীবের মেয়ে' চিত্রায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পরিচালনা করছেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। এই চিত্রের সঙ্গে জড়িত আছেন আলোক-চিত্রশিল্পী জি, কে, মেহতা, লোকেন বসু, শিল্পনির্দ্দেশক কার্ত্তিক বসু, ব্যবস্থাপনায় কল্যাণ গুপ্ত ও চিত্রনাট্য-রচনা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায়—চন্দ্রা, দীপ্তি, অনুভা, ছায়া, পদ্মা, বনানী, শোভা এবং ছবি, কমল, নির্ম্মলকুমার, উৎপল ও সমর রায় প্রভৃতি। বোসার্ট ফিল্মসের শ্রীসুখেন্দু বোস দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর 'সতী তুলসী' চিত্রনির্মাণে তৎপর হয়েছেন। গত ১৫ই ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরে চিত্রটির শুভ মহরৎ হয়। শিল্পী-নির্ব্বাচন চলছে। এ, আর, প্রোডাকসন্সের "দীপশিখা" চিত্রগ্রহণ চলেছে ত্রিদূতের পরিচালনায়। কাহিনী প্রেমলতা দেবীর। প্রযোজক রমেন ঘোষ। অভিনয়ে জহর গঙ্গো, বিকাশ, ভানু, অজয়কুমার, অনুভা, সাবিত্রী, মণিকুন্তলা প্রভৃতি। সুরযোজক রণজিৎকুমার। এমার প্রডাকসন্সের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র পরবর্ত্তী চিত্র নরেশচন্দ্র মিত্রই পরিচালনা করছেন। ছবির নাম 'অতিথি'। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরকাঁটা'-র চিত্র-গ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে। একটি নবগঠিত সম্প্রদায় এর পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে। নিউ থিয়েটার্সে'র দোভাষী 'বকুল' বাণীচিত্রটির কাজ অর্দ্ধপথ অতিক্রম করেছে। পরিচালক ভোলানাথ মিত্র ছবিটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করছেন। 'বকুলে'র কাহিনীকার হচ্ছেন মনোজ বসু। শীঘ্র মুক্তিলাভ করছে কল্পনা মুভীজ পরিবেশিত তারাশঙ্করের কাহিনী 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ'। পরিচালক ও প্রযোজক নির্ম্মল দে। উত্তমকুমার, কানু, প্রেমাংশু, তুলসী চক্র, অনুভা, সাবিত্রী, কবিতা প্রভৃতি অভিনীত। 'অন্নপূর্ণার মন্দির,' 'শ্যামলী' ও 'বিরাজ বৌ' চিত্রগুলিরও পরিবেশন ভার পেয়েছেন কল্পনা মুভীজ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', যার মুক্তিপূর্ব্ব সমালোচনা মাসিক বসুমতীতে পূর্ব্বে প্রকাশ হয়েছে, সেই চিত্রটি পরিবেশন করছেন 'চিত্রপরিবেশক'। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালিত 'মরণের পরে' চিত্রটি পরিবেশন করছেন 'অঞ্জন ফিল্মস্'। ফিল্ম গিল্ডের বাস্তবধর্মী চিত্র 'নাগরিক'-এর দু'-একটি দৃশ্যের পুনর্গ্রহণ শুধু বাকী আছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক, ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে স্বর্গতা প্রভা দেবী, শোভা সেন, অজিত ব্যানার্জ্জি, বুলবুল ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে।

যে-ছবি মুক্তি-প্রতীক্ষায়

য়্যারিষ্টোক্রেসী

রাধা ফিল্মসের মুক্তি অপেক্ষারত দোভাষী চিত্রার্ঘ্য। প্রযোজনা: কানাইলাল ঘোষাল; কাহিনী নিত্যহরি ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য:

অ্যারিষ্টোক্রেসী চিত্রে জহর ও অনুভা

তরু মুখোপাধ্যায়, শীতল সেন ; সুর : রবীন রায় ; রবীন্দ্র-সংগীত : অনাদি দস্তিদার ; চিত্রশিল্পী : ধীরেন দে ; প্রধান শব্দযন্ত্রী ; নৃপেন পাল ; শব্দধারণ : শচীন চক্রবর্তী ; সম্পাদনা : নানা বোস ; রাসায়নাগারিক : ধীরেন দে (কবি) ; পরিচালনা : দিলীপ মুখার্জ্জি ; চরিত্রায়নে আছেন : অনুভা গুপ্তা, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী।

সেদিন রাত্তিরের শো-তে বায়োস্কোপ দেখতে গিয়েছিলো ধনীর দুলালী শীলা দেবী। বর্ষার দিন হলেও গোড়াতে আকাশের হাব-ভাব বেশ সজ্জনোচিত ছিলো। তাই ছবি দেখার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি, ছবি ভাঙলে গৃহাভিমুখী হতে গিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলো শ্রীমতী শীলা। ইস্, এ কী হয়েছে! অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরে চলেছে যে! লাইট হাউসের আশপাশ সর্বত্র জলে জলময়! কিছু দূরে 'পার্ক' করা গাড়িতে পৌঁছুতে পারা যাবে কি করে—সেই চিন্তায় কিছুক্ষণ ব্যয়িত করে শেষে কার্নিশের নীচ দিয়ে দিয়ে তো কোনো রকমে হাজির

অ্যারিষ্টোক্রেসী চিত্রে অনুভা

হোলো অপেক্ষমান সংগিহীন গাড়িটিতে। যাক, বাঁচা গেল! একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে এক্সিলেটরে চাপ দিলো সে। ঘুমন্ত ইঞ্জিন মুহূর্তে নিয়ন্ত্রীর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে গাড়ি-দেহটিকে নিয়ে ছুটতে শুরু করে দিলো। বেশ খানিকটা পথ পেছনে ফেলে আসা গেছে নিরুপদ্রবে, পথঘাট মধ্যরাত্রি সেই সংগে বর্ষণের কল্যাণে—স্তব্ধ গম্ভীর, হঠাৎ কে যেন কি বলে উঠলো!—

ষ্টিয়ারিংটা ঘুরে যেতে যেতে রয়ে গেল, শ্রীমতী সবিস্ময়ে দেখলো একজন পুরুষকে, তারই পেছনের সীটে বসে কথা কইছে।

কে তুমি? এতো রাত্রে এ গাড়িতে কি করছিলে?

মেয়েটির প্রশ্নের জবাব দেয় লোকটি, কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে সোজা চালিয়ে নিয়ে যায় গাড়ি মেয়েটি।

আর্তকণ্ঠে লোকটি বলে: দোহাই আপনার, ফিরিয়ে নিয়ে চলুন গাড়ি যেখানে আপনি রেখেছিলেন। এ গাড়ি আপনার নয় আমার মনিবের। যদি তিনি আমায় খুঁজে না পান, তাহলে চাকরিতে আমায় ইস্তফা দিয়ে দেবেন। ইত্যাদি।

মেয়েটিরও কেমন যেন সন্দেহ হয়, সত্যিই বোধ হয় তার ভুল হয়েছে। আর বাক্যব্যয় না করে ফিরে আসে লাইট হাউসের সামনে। দেখে আর একটি একই model-এর গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে।

লোকটি ড্রাইভার। খুঁজে-পেতে দেখে মনিব তার আছে কিনা। কিন্তু অনুসন্ধান বৃথা, কেউ সেই মধ্যরাত্রে অপেক্ষায় নেই। কান্না-করুণ কণ্ঠে শোফার জানায় হয়তো এই কারণে তার চাকরি খতম্ হয়ে যাবে। আর তা যদি সত্যিই যায় তাহলে স্রেফ উপবাসে দিন কাটবে। দেশের এই পরিস্থিতিতে একটা চাকরি জোটানো সোজা কথা তো নয়!

শ্রীমতী শীলা আশ্বাস দেয়, সত্যিই যদি চাকরি খোয়া যায় তাহলে তাকে যেন খবর দেয়। সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।•••

দীপক সত্যিই কি ড্রাইভার? আচার-ব্যবহার কেমন কেমন যেন! সে অনুভূতি জাগে না মেয়েটির। খোঁজ-খবর নিয়ে সত্যি সে বিপদগ্রস্ত জেনে তার গাড়ি চালাবার জন্তে নিয়োগ করে। জ্বালা শুরু হয় এখান থেকেই। প্রতি পদে ত্রুটি দেখা দেয় ড্রাইভারের কথায়-বার্তায় কাজে-কর্মে। একে নিয়ে শীলার জীবন দুর্বিষহ!

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা মধুর পরিণতির দিকে ক্রমে এগিয়ে চলে ছবির কাহিনী। সকলেই খুশি হয়ে ওঠেন গল্পের মোড় এই ভাবে ফেরায়—অবিশ্যি এমনটা যে হবে এ যেন কতকটা জানা কথা।

সে যাই হোক, গল্পের মধ্যে সহজ সরল একটা গতি আছে, চলচ্চিত্রায়ণে সেটি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে তৃপ্তি লাভ করেছি আমরা। ছবি সেন্সার হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু পর্দায় প্রতিফলিত হওয়া। কিন্তু সেন্সার বোর্ডের নির্দেশ এসেছে ছবির নাম পরিবর্তনের নতুবা ছবির ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না। সরকারের খেয়াল-খুশিতে প্রযোজকবর্গ কি ভাবে বিব্রত হন, বিন্দুর ছেলের পর এ আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন!

ওরা থাকে ওধারে

নির্মাতা : এস, এম, প্রোডাকসনস্ ; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান : প্রেমেন্দ্র মিত্র ;প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত; প্রধান

যন্ত্রশিল্পী : সরোজ মিত্র : চিত্রশিল্পী : বন্ধু রায় ; শব্দযন্ত্রী : সমর বসু ; শিল্প-নির্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী ; রসায়নাগারাধ্যক্ষ : উমা মল্লিক ; সুরস্রষ্টা : কালীপদ সেন ; সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র। ভূমিকায় : মলিনা দেবী, সুচিত্রা সেন, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, বিজয় বসু, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

একটি ফ্ল্যাট বাড়ি আর তার বাসিন্দাদের কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'ওরা থাকে ওধারে' বাণীচিত্রের আখ্যান ভাগ। নানু, নেপাল, রিনি, মিলু, শিবদাস, হরিমোহন বাবু—অর্থাৎ ছবির প্রতিটি চরিত্রের সংগে আপনার আমার পরিচয় আছে প্রাত্যহিক জীবনে। এদের কেউই উদ্ভট কল্পনার আজব সৃষ্টি নয়। একবার দেখলেই মনে হবে আমাদের সমগোত্রীয় বলে। অভাব-অনটন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, নুন জোটে তো মরিচ জোটে না এমন অবস্থা। কিন্তু তাতে কি হয়, ওরি মাঝে চোখে মায়া-কাজলের প্রলেপ পড়ে, দুঃখের ভাত সুখের করে খেতে চায় আমাদেরই মতো।

ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা! এ-ফ্ল্যাটের সংগে ও-ফ্ল্যাটের হৃদ্যতা কেন, পরিচয়ই ছিলো না কখনো! সে হোলো স্মরণাতীত কালের কথা। বর্তমানে আত্মীয়তার আতিশয্যে বান ডেকেছে! এ-বাড়ির নানু ও ও-বাড়ির রিনি, ও-বাড়ির কার্তিক এ-বাড়ির মিলুর বন্ধুত্বে যথেষ্ট অন্তরের টান দেখতে পাওয়া যায়! কর্তাদের মধ্যেও আছে অন্তরংগতা। কিন্তু পাশাপাশি থাকলে মাটির বাসনে-বাসনেও ঠোকাঠুকি লাগে, তা এ তো জলজ্যান্ত মানুষ—তাতে পর যাকে বলে পাড়া-প্রতিবেশী। দুই ফ্ল্যাটের মানুষদের মাঝে যখন ভিন্ন ভাবের ঘূর্ণি ফেনিয়ে ওঠে, তখনই হয় মুস্কিল! মুহূর্তে স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়িত হয়ে ওঠে। চায়ের পেয়ালায় তুফান জাগতে যেমন দেরি হয় না, আবার উদ্যত নাগের ফণায় ধূলো-পড়া পড়তেও সময় লাগে খুব কম। এই অবস্থায় এ-বাড়ি ও-বাড়ির লোকজনদের আচার-ব্যবহার দেখলে বাইরের লোক অবাক হতে বাধ্য। অতো যে আত্মীয়তা, চোখের নিমেষে তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না কারুরই মনে। ঘোরতর শত্রুর মতো হয়ে ওঠে সকলের আচরণ। শিবদাস বাবু শ্যালক নেপালকে নিয়ে হানা দেন ও-বাড়ি থেকে তাঁর ইলেকট্রিক ইস্ত্রিটা কেড়ে নিয়ে যেতে। অবিশ্যি ও-বাড়ির সেলায়ের কলটা ফেরৎ আনতে ভোলেন না। শুধু কল বা ইস্ত্রিই নয়, সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্তে কতো জিনিসই তো প্রয়োজন হয়, সব জিনিসই একটা বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের মনে তাই অষ্টপ্রহর এটা-ওটা-সেটা দু-ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া-আসা হচ্ছেই। ভেবে দেখুন না নিজের কেন, এ তো আমার আপনার ঘরেরই কথা—এই অতি বাস্তব ঘটনাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

পূর্ববংগের শিবদাস বাবু আর পশ্চিম-বংগের হরিমোহন বাবু—এই দুই পরিবারের দুঃখ-সুখের মাঝে অলক্ষ্যে একটা সেতু গড়ে উঠতে থাকে। হাজার ঝগড়াঝাটি, লক্ষ কথা-কাটাকাটিতে অন্তরের টান যেন দানা বেঁধে ওঠে।

'ওরা থাকে ওধারে'র একটি স্মরণীয় দৃশ্য

চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা প্রভৃতি কাজগুলি সারা হয়ে গেছে, 'ওরা থাকে ওধারে' যে কোনো মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাবে রূপালি পর্দায়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

৫

চিত্রনায়ক শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর পুণ্য জন্মদিবস। এ-দিনটিই বেছে নিলুম আমি ছায়া-শিল্পের আচার্য্য অহীন্দ্র বাবুর কাছে যাওয়ার। বেলা তখন প্রায় ১টা। আমার গাড়ী গিয়ে থামলো গোপাল নগর রোডে (আলীপুর) তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি। সামনেই দেখলুম দারোয়ান দাঁড়িয়ে। তার হাত দিয়ে আমার ভিজিটিং কার্ডটি পাঠিয়ে দিতেই আমায় নিয়ে বসান হ'লো তাঁর ড্রয়িং-রুমে। কি সুসজ্জিত কক্ষ! চারিদিকে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকলার নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত। তাঁর শিল্পী-মন ও রুচির পরিচয় এখান থেকে আমার পাওয়া সুরু হ'লো। ড্রয়িং-রুম থেকে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো অহীন্দ্র বাবুর নিজস্ব ষ্টাডি-রুমে। দেখে মনে হলো এটিও বুঝি শিল্পসাধনার এক মনোরম পীঠভূমি। সুশোভিত আলমারিগুলিতে সারি সারি গ্রন্থ রয়েছে সাজান। তারই একটি কোণ ঘেঁষে রয়েছে অহীন্দ্র বাবুর পড়বার ও লিখবার সব আয়োজন। এই পরিবেশের ভেতর অহীন্দ্র বাবুকে যখন দেখলুম তখন একটা বিস্ময় লাগলো। নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের পোষাক-পরিহিত তাঁকে দেখলুম শান্ত গম্ভীর ভাবে বসে রয়েছেন আপন আসনে। আমাকে দেখেই স্মিত হাস্যে জানতে চাইলেন আমার প্রয়োজনের কথা। তার পরেই চললো আমার প্রশ্নের উপর তাঁর উত্তর, তাঁর উত্তরের পর আমার আবার প্রশ্ন।

আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অহীন্দ্র বাবু ধীর ভাবে বললেন—"Soul of a Slave" (সোল অব এ শ্লেভ) নির্বাক

ছবিতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ—সে ১৯২০ সালের কথা। এই ছবিখানি মুক্তি লাভ করে ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম যখন সবাক ছবি তোলা হলো তখন ছবির জন্ত কোন নাটকাকারে কাহিনীর ব্যবস্থা ছিল না। নির্ব্বাচিত দৃশ্তে তখন আমি অভিনয় করেছি।

কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে বেশী আনন্দ পাওয়া গেছে জিজ্ঞেস করলুম আমি। পরিষ্কার উত্তর এলো, পেশাদার অভিনেতা যাঁরা, তাঁরা যখনই যে ছবিতে অভিনয় করেন এবং যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হন প্রতি ক্ষেত্রেই আনন্দ পেয়ে থাকেন। যদি কোন অভিনেতা এ আনন্দ না পান, তবে বুঝতে হবে তাঁর অভিনয় সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত হয়নি। আমার কথা বলতে পারি, আমি যখন যে ভূমিকায়ই অভিনয় করে আসছি তাতেই আমার প্রচুর আনন্দ হয়েছে। তবে এতগুলো ছবিতে অভিনয় করেছি, সঠিক নির্ণয় ক'রে বলা শক্ত কোন ছবিতে কিম্বা কোন্ ভূমিকায় সব চাইতে বেশী আনন্দ পেয়েছি।

তার পর প্রশ্ন রইল আমার—চলচ্চিত্রে যোগদানে কখনো আপনার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি ছিল কি ? গম্ভীর ভাবে অহীন্দ্র বাবু বললেন, ব্যক্তিগত আপত্তি বলতে আমার কিছুই ছিল না। তবে এ-শিল্পের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রতে হয়েছে, সামাজিক বাধার চেয়েও প্রচণ্ড বাধা অনুভব করেছি আর্থিক ক্ষেত্রে। সে সব একটা বিরাট ইতিহাস। অর্থের অভাব, স্থানের অভাব, প্রতিটি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। ম্যাডান কোম্পানী ছাড়া এ দেশে সে যুগে কোন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানই ছিল না। এত সব সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও এ লাইনে আসতে আপত্তি তো ছিলই না, পরন্তু আগ্রহ ও আনন্দ বোধ ছিল যথেষ্ট এবং সে ছিল ব'লেই বোধ করি এতটা এগুতে পেরেছি। প্রসঙ্গত তিনি বলে চলেন, সামাজিক দিক থেকে সে যুগটা ছিল রক্ষণশীল যুগ। সমাজের বাধা বা অনুশাসন আমাদের উপরও যে এসে থাকবে, সে তো জানা কথা, কিন্তু আবারও বলবো বাধা-বিপত্তি কোন কিছুই আমরা গ্রাহ্য করিনি। আমাদের জীবন ছিল এ বিষয়ে অত্যন্ত বিদ্রোহী। কে নিন্দা করলে, কে দুটো বিরুদ্ধ কথা বললে, সেদিকে আমাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আজ পর্য্যন্তও আমরা প্রায় অসামাজিকই হ'য়ে আছি। সমাজ কি অসমাজ এ নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথা নেই। পূর্ব্বেই বললুম, ১৯২০ সাল থেকে আমি চলচ্চিত্রে যোগদান করেছি। পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি নিয়ে আমার সাংসারিক জীবন কাটছে। এদিক থেকে সাধারণ সামাজিক মানুষের চেয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নই।

অভিজাত-পরিবারের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান সম্পর্কে আমার নিজস্ব অভিমত যদি জিজ্ঞেস করেন, অহীন্দ্র বাবু বলে চলেন, তবে আমি বলবো অভিজাত ও ভদ্র গৃহস্থঘরের ছেলেরাই এ লাইনে এসে থাকেন। মেয়েদের সম্পর্কেও ব'লতে পারি, আজকাল যে ক্ষেত্রে মেয়েরা কেরাণী, টাইপিষ্ট প্রভৃতির সব কাজই করছেন, সে ক্ষেত্রে তারাও এ শিল্পে আসুন, এতে আমার অমত নেই। আমরা রক্ষণশীল—আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা চাকরি করেন, সাধারণ অবস্থায় এ আমি চাইনে স্বীকার করবো, কিন্তু এইমাত্র বললুম যখন তাঁরা অন্তত্র কাজ করছেন তখন তাঁদের চলচ্চিত্রে যোগদানেও কোন বাধা থাকতে পারে না।

অপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৌধুরী বলতে থাকেন—দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী বলতে আমার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য কিছু নেই। সংসারের কাজ ক'রেই সাধারণত: আমার দিন কাটে। অপর দশ জন গৃহস্থ ভদ্রলোকের যা কাজ সে ভাবে আমিও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তবে আমি কখনও ছবি দেখতে যাইনে। পয়সা দিয়ে ডাকলে যাই, কর্ত্তব্য করে আসি—এ পর্য্যন্ত। "Hobby" (খেয়াল)'র কথা যা জিজ্ঞেস করছেন, 'হবি' সব মানুষেরই একটা না একটা থাকে। আমারও ধরুন বাগান করবার, বই পড়ার সথ আছে—আর সথ আছে সুবিধে হ'লে বেড়ান। খেলাধূলো বলতে এককালে ফুটবল খেলা ভাল লাগতো। এখন কোন খেলাই আমার প্রায় ভাল লাগে না। ফুটবল খেলা কেন ভাল লাগতো, সে আজ অতীতের অন্ধকারে। মনে পড়ে, এক-কোমর জল ভেঙেও ময়দানে খেলা দেখেছি। কিন্তু কেন, সে আজ বলতে পারবো না।

অহীন্দ্র বাবু বলে চললেন, পুঁথি-পুস্তক পত্র-পত্রিকা পড়াশুনো সম্পর্কে আমি ব'লতে পারি, যে-কোন পত্রিকা হাতে আসে তাই আমি পড়ি। স্বীকার করবো কোন পত্রিকা আমি কিনে পড়িনে, কেউ পাঠালে তবেই পড়ি। সে জন্য বুঝতে পারছেন পত্র-পত্রিকা পাঠের প্রতি আমার বিশেষ একটা আগ্রহ নেই। অবশ্য একটা পত্রিকা পড়বার জন্যে আমার সর্ব্বদাই ঝোঁক আছে সেটা হচ্ছে "শনিবারের চিঠি।" বাঙ্গালা দেশে এত পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে যে পয়সা দিয়ে পড়তে হলে দেউলিয়ে হয়ে যেতে হবে। আগে 'মাসিক বসুমতী'ও পড়তুম। কিনতে হয় বলে এখন আর পড়া হয় না। অপর দিকে আমি পুঁথি-পুস্তক পড়তে সব সময়েই ভালবাসি। অবশ্য গল্পের বই নয়—প্রবন্ধের বই, টেক্‌নিক্যাল বই, ইতিহাস প্রভৃতি। ভাল গল্পের বই যদি কখনও হাতে পড়ে, তবে হয়তো পড়লুম। ইংরেজী গ্রন্থকারদের মধ্যে ডিকেন্সএর বই আমার বেশ ভাল লাগে। সেক্সপিয়ারের সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না, কাজেই তাঁকে বাদ দিয়েই বললুম। গল্প ও কবিতা লেখার অভ্যাস আমার নেই। লিখতে হলেই গায়ে যেন জ্বর আসে।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমার মতামত যা জানতে চাইলেন, শ্রীচৌধুরী বলে চললেন, তাতে আমি বলবো,—খাঁটী বাঙ্গালীর পোষাক-পরিচ্ছদ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ ধুতি চাদর ও পাঞ্জাবী—সে-ই আমিও ভালবাসি ও প'রে থাকি। হাফ সার্ট ও প্যাণ্ট দেখলেই আমার কেন জানি মেজাজ উষ্ণ হয়ে উঠে। কাজের জন্ত অনেকের এ পড়তে হয় স্বীকার করি, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে এ যাঁরা পরে যান তাঁদের দেখে কেবলই আমার মনে হয় দেশটা কোন সর্বনাশের দিকেই না চলেছে।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি গুণ না থাকলে নয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অহীন্দ্র বাবু বলেন—সু-চেহারা প্রথমেই প্রয়োজন। সুচেহারা বলতে "well proportion" এবং "photogenic" চেহারার কথাই বলা হচ্ছে। এমন অনেক চেহারা আছে, যা দেখতে ভাল কিন্তু ফটোতে আসে না। সে ধরণের চেহারা চলচ্চিত্রের উপযোগী নয়। যে চেহারা ফটোতে আসে তাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অভিনয়-কুশলতাও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন সন্দেহ নেই, তবে এ গুণটা অভ্যাসে হয়তো বাড়িয়ে নেওয়া চলে ; কিন্তু আবার বলবো, "ফটোজিনিক" চেহারা যাদের থাকে তাদেরই অগ্রগতির পথ পরিষ্কার।

"ভাল ছবির জন্ত যে কয়টি উপাদান অপরিহার্য্য তার মধ্যে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের, সে বল্‌তে হয় না। প্রযোজকগণ যাঁরা ছবি তৈরী ক'রবেন তাঁদের ভাল ছবির জন্তে ব্যাকুলতা থাকা চাই। তার পর তাঁদের থাক্‌তে হ'বে নিজস্ব ষ্টুডিও। ভাড়া করা ষ্টুডিওতে কাজ করা কঠিন ও অসুবিধে হয়। সমস্ত ব্যবস্থার সমন্বয় ও সুপরিকল্পনা ভাল ছবি তৈরীর জন্ত অত্যাবশ্যক। ছবি নির্ম্মাণের কাজ একটা প্রধান শিল্প। সমন্বয় বা সুপরিকল্পনা না থাক্‌লে কাজ সফল হ'বার নয়।"

এ প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে অহীন্দ্র বাবু বলেন, ছবির পরিচালক যাঁরা হ'বেন, তাঁদের আবার কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার। ছবির পরিচালকই বল্‌তে গেলে ছবির সব। তিনি হচ্ছেন ছবির স্রষ্টা এবং তার পরেই আস্‌ছেন ক্যামেরা-ম্যান। পরিচালকের ক্ষেত্রে সাহিত্য, নাটক, চিত্র-শিল্প, আলোক-শিল্প—সব রকমের জ্ঞান থাকার দরকার। সর্ব্ববিভাগীয় জ্ঞান ছাড়াও সব চাইতে বড় গুণের প্রয়োজন পরিচালকের শালীনতা বোধ।

"অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সফলতার জন্তে প্রচুর কল্পনা বা imagination থাকা দরকার। শিল্পীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর রাখা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় তাদের বাইরের খাবার খেয়ে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে—অকালে বুঁড়ো হয়ে যায়। এ অবস্থা ও ব্যবস্থা না পাল্টালে চল্‌বে না।"

অহীন্দ্র বাবুর আয় সম্পর্কে জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন, ইনকাম ট্যাক্সের জবাবদীহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, সুতরাং ও-সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভাল। কোন ছবিতে সব চাইতে বেশী বা কম টাকা পেয়েছি তা-ও বলবার প্রয়োজন নেই। আমার ব্যক্তিগত হিসেবে কম-বেশী কোন পার্থক্য করি নে। প্রথম জীবনে বিনে পয়সায়ও হয়তো অভিনয় করেছি, প্রতি ছবিতে হয়তো আড়াইশো টাকায়ও কাজ করেছি। সে কথা এখন ছেড়ে দিন। নির্ব্বাক্ যুগে একখানা ছবিতে তিনশো হ'লে যথেষ্ট পাওয়া হতো।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানাতে গিয়ে অহীন্দ্র বাবু বলেন, দেশে যে সকল "মাসরুম" কোম্পানী গড়ে উঠে, তাঁদের ছবি তৈরী করতে যতটা না দেওয়া হয় ততই মঙ্গল। সরকারকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। ভাল ছবি যাতে তৈরী হতে পারে তা লক্ষ্য রাখবার একটা কমিটি বা প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। আজকের দিনে এ শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। এ লাইনে অনেক লোক এসেই ভীড় জমায়। অনুপযুক্ত যাঁরা, তাঁদের বাদ দিয়ে যাঁরা কুশলী, তাঁদেরই যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবেই হবে এ শিল্পের উন্নতি ও সাফল্য।

কথা বল্‌তে বল্‌তে অহীন্দ্র বাবুর প্রাণে একটা আবেগ উঠেছে লক্ষ্য করা গেল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আছে—এটাই সবচেয়ে বড় প্রমোদ-শিল্প। আবার বল্‌বো, এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প—এর ভবিষ্যৎ আছেই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনেহরুর লজ্জাবোধ

"নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে যাইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নাকি লজ্জাবোধ হইয়াছিল ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাজের বাঁধ তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে নাই। তিনি সম্মেলন উদ্বোধন করিয়াছেন এবং লজ্জাকেও লজ্জা দিয়া বলিয়াছেন, "আপনাদের সম্মুখে অভিভাষণ দিবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলাম। এখানে আসিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছিল। কারণ, আপনাদের দুঃখের কোন সমাধান আমার হাতে নাই।" প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ-কষ্টের সমাধান তাঁহার হাতে নাই, এ কথা বলিতে নেহরুজীর লজ্জাবোধ হইল না কেন? সমাধান যদি তাঁহার হাতে না-ই থাকে, তবে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সম্মুখে আসিতে নেহরুজীর লজ্জিত হইবার তো কোন কারণই থাকিতে পারে না। তবে সম্মেলনে আসিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইয়াছিল কেন? প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার ক্ষমতা নেহরুজীর হাতে নাই, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে কি? তিনি শিক্ষক-দিগকে জাতি গঠনের কাজে লাগিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন, অথচ ইহাও জানাইয়াছেন যে, দেশের সমস্ত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পথে অন্তরায় অর্থের অভাব। বৃটিশ শাসকের আমলেও আমরা শুনিয়াছি যে, শিক্ষার জন্য অর্থাভাব। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী শাসকবর্গের মুখেও সেই কথাই আমরা শুনিতেছি। কিন্তু অপব্যয়ের জন্য কখনও সরকারী কোষাগারে অর্থের অভাব তো হয় না। প্রকৃত অর্থাভাব দেশের লোকের। রত্নগিরির এক সংবাদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অনেক অভিভাবক এত দরিদ্র যে, ছেলে-মেয়েদিগকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুলে পাঠাইতে পারেন না। এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যে জরিমানা হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অভিভাবকদের দারিদ্র্যের জন্য নিজেদের পকেট হইতে সেই জরিমানা দিয়াছেন।" —দৈনিক বসুমতী।

ডাঃ রায়ের আবেদনে সাড়া

"কলিকাতার অদূরে হরিণঘাটায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দুগ্ধ-পল্লীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সতর লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোশালা এবং দুগ্ধ-বিক্রেতাদের আবাসস্থল নির্মিত হইবে। আপাততঃ বার শত গাভী রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। ডাঃ রায়ের এই জনকল্যাণকর উদ্যমের আমরা সাফল্য কামনা করিতেছি। কলিকাতা সহরে খাটালগুলি অপসারণের পরিকল্পনা এত দিনে কার্যকরী হইতে চলিল। এগুলি কেবল সহরবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষেই হানিকর নহে, দুগ্ধবতী গো-মহিষাদির দুগ্ধও নানাভাবে কলুষিত হয়। নয়া ব্যবস্থায় কলিকাতা সহরের পরিচ্ছন্নতা বাড়িবে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধও সহরে সরবরাহ করা হইবে। বোম্বাই সহরে কর্তৃপক্ষ দুগ্ধ-পল্লী স্থাপন করায় সেখানে সুলভে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙলা সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টার সহিত সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া ডাঃ রায় বলিয়াছেন,—"কলিকাতার খাটালসমূহে যে ত্রিশ হাজার দুগ্ধবতী গাভী আছে সেগুলি দুগ্ধ-পল্লীতে স্থানান্তরিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহার জন্য আট শত একর জমির প্রয়োজন হইবে। আমি আশা করি, যাঁহাদের জমি আছে এবং গরুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা সরকারকে জমি সংগ্রহ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।" ডাঃ রায়ের এই আবেদনে সাড়া দিবার মত হৃদয়বান লোকের অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

পূর্ব্ববঙ্গে আসন্ন নির্ব্বাচন

"পূর্ববঙ্গের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলি যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে সেই জন্য অনুরোধ জানাইয়া পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা শ্রীসতীন সেন এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এক বিরাট বিপ্লবের শুভ সূচনা সম্মুখে দেখা যাইতেছে। প্রগতিশীল ও মুস্লিম লীগ-বিরোধী মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই সর্বপ্রথম নির্বাচন এক সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিতেছে। ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে পূর্ববঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায়ের প্রবর্তন করিবে। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সমস্ত মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রগতিশীল দলগুলির একতা দরকার। অপর পক্ষে নির্বাচনে পরাজয় ঘটিলে, তাহার ফলে এক মহাবিপর্যয় ঘটিবে। শ্রীযুক্ত সতীন সেনের এই আবেদন মুসলমান অ-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গের জনগণের মঙ্গল সাধনের আন্তরিক ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। জাতিবর্ণনির্বিশেষে দেশ-হিতকামী সকল প্রগতিশীল দল ও প্রতিষ্ঠানেরই ইহাতে সাড়া দেওয়া উচিত। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দলগত স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত মুস্লিম লীগের হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকিলে মুসলমান জনসাধারণের উন্নতির পথ যে রুদ্ধ থাকিবে, ইহা লীগের বাহিরে অবস্থিত মুসলমান জননেতারাও খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে মুস্লিম লীগ নেতারা মোল্লা-মৌলবী নিযুক্ত করিয়া ধর্মের নামে মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় আছেন। এক দিকে প্রগতিশীল জননেতাগণের আবেদন অপর দিকে ধর্মান্ধ

মোল্লা-মৌলবীদের অপপ্রচার, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কোনটির দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়, তাহা দেখিবার বিষয়।" —যুগান্তর।

খোলাবাজারের খেলা

"কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট মানুষের পাকস্থলীগুলি যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ারকীর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র নয় মাস আগে খোলাবাজারে চাউলের 'বিশেষ' ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ৩১শে ডিসেম্বর হইতে সরকার সে ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া বসিলেন। আমরা অবশ্য রেশন এলাকায় খোলাবাজারে "বিশেষ" ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। একদিকে রেশন আর একদিকে খোলা-বাজারের সরকারী "বিশেষ" ব্যবস্থা শুধু নীতির দিক হইতে পরস্পর-বিরোধী নয় কার্যতঃ ইহা অভিসন্ধিমূলক—কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশনের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার চতুর প্রস্তুতি। কিন্তু আপাততঃ সে কথা থাক্‌। উপায়ান্তর না দেখিয়া ইতিমধ্যেই প্রায় দশ লক্ষ লোক এই "খোলাবাজারের" দ্বারস্থ হয় এবং প্রায় এক হাজার খোলা-বাজারের দোকান গড়িয়া ওঠে। আজ আবার সেই দশ লক্ষ কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীকে "অ-খাদ্য" মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের দাঁতভাঙ্গা নাড়ীকাটা চাউলের লাইনে দাঁড়াইতে হইবে এবং বহু টাকা-পয়সা খরচা করিয়া যাহারা ওই সব দোকানগুলি খুলিয়াছিলেন তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবেন। এই দোকানগুলির মালিকদের বিপদ কেবল ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাওয়ার মধ্যেই নয়, সরকার ৩১শে ডিসেম্বর এই সব দোকানের সমস্ত মজুত চাউল নিজেদের কনট্রোল দর ১৪।০ আনায় দখল করিয়া লইবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের হাতে ১৪।০র বেশী দরে কেনা চাউল থাকিলে সরকারী দখলের সময় উহার দর ১৪।০ আনাই থাকিবে। এমন না হইলে খাদ্য বিভাগের মূলে কেরামতী সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝিবে কি করিয়া! সাধারণ চাউল ব্যবসায়ীদের মাঝ-দরিয়ায় না ডুবাইলে সরকারী গুদামের দুই হাজার টন পচা আতপ পাচার হইবে কি করিয়া? এই সব ব্যবসায়ীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন—তোমরা ভারতের বাহির হইতে চাউল আমাইয়া "খোলাবাজার" চালু রাখিতে পার। অর্থাৎ সরকার "খোলাবাজারে" বাইরের নিকৃষ্ট ধরণের চাউলকে আরও চড়া দরে চালু রাখিবার নীতিকে অস্বীকার করিতেছে না; কলিকাতার বাহিরে পশ্চিমবাংলার জেলাগুলিতে যে এত বিভিন্ন ধরণের ভাল চাউল পাওয়া যায়, সে কথা খোলা বাজারগুলিতে ফাঁস হইয়া যাউক—তাহা সরকারী খাদ্যনীতি সহ্য করিবে না! এই সব চাউল ব্যবসায়ীদের ভাতে মারিয়া বিলাতী শ'ওয়ালেস কোম্পানীর হাতে পশ্চিমবাংলার জেলাগুলি হইতে চাউল সংগ্রহের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।" —মধ্যবিত্ত (কলিকাতা)।

কেবল হিন্দুদের জাত মারিবার জন্য

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কাটজু লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন—অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য করিয়া একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিবেন। সংবাদটি পড়িয়া হাসিতে-হাসিতে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অন্তকার

জগতে আন্তর্জাতিক মানব বলিয়া যিনি খ্যাতিমান হইয়াছেন, তাঁহার দুলালী কন্তা আমাদের ঘুঁটে-কুড়নি মেয়ে খ্যান্তকালীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া যদি পান্তাভাত খাইতে অসম্মত হন, তাহা হইলে সেই কাঞ্চন-কৌলীন্ত-পুষ্টিত অস্পৃশ্যতাবোধ কি দণ্ডযোগ্য হইবে? ডাঃ কাটজু বা রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার কি আমাদের সহিত ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া উপনিষৎ আলোচনা করিবেন? কেবল হিন্দুদের জাত মারিবার জন্তই কি এই বিলের উদ্ভব?" —আর্য্য (বর্দ্ধমান)।

রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত চলুক

"কলিকাতা পুলিশের বেলতলার সোনার খনিতে নূতন পুলিশ কমিশনার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহাতে আমরা খুসী হইয়াছি। যোগ্য লোককেই এখন সেখানে পাঠানো হইয়াছে। মোটর ভেহিকেল বিভাগে শুধু যে টাকা আছে তাহা নয়, এখানে সহরের পথচারীদের প্রাণও বাঁধা আছে। নূতন ডেপুটি কমিশনার রাস্তায় অতর্কিতে লরী ধরিয়া তাহাদের গবর্ণরগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে ইহাদের বেপরোয়া দৌড় সংযত হইবে, বহু নিরীহ পথচারীর প্রাণ রক্ষা হইবে। ৩ বি বাসটি খুসী মত চলে, খুসী মত ভাড়া আদায় করে। ন্তাশনাল লাইব্রেরীর পাঠকদের পক্ষে এই বাসটি একান্ত প্রয়োজনীয়। এটি যাহাতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত চলে তার ব্যবস্থা নূতন ডেপুটি কমিশনার করিতে পারিলে শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক ধন্তবাদের পাত্র হইবেন।" —যুগবাণী।

প্রধান শিক্ষক কে ও কি?

"প্রধান শিক্ষক মহাশয়, যিনি পুরাদস্তুর ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ও স্বৈরাচারী, যাঁহার ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের প্রতিই আচরণ অত্যন্ত অশোভনীয় ও কঠিন, তাঁহার কয়েক জন প্রিয়পাত্র ছাড়া আর কাহারও প্রতি যিনি সৎ ব্যবহার করেন না, যিনি স্বজনপ্রীতি, মানসিক অবনতি, অকর্ম্মণ্যতা এবং আর যাহা কিছু নিন্দনীয় আছে তেমন সকল দোষে দোষী, সেইরূপ এক ব্যক্তিকে বর্দ্ধমান টাউন স্কুলের মত মর্য্যাদাযুক্ত ও ঐতিহ্যসম্পন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করা হউক এবং অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন, কারণ যিনি নিজে শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়িয়া তোলার স্থান পবিত্র বিদ্যায়তনগুলি পরিচালনায় স্পর্দ্ধা রাখেন।" —বর্দ্ধমান।

উচিত নয়

"পাকিস্তানের শ্রীহট্ট সহরে কয়েক দিন পূর্ব্বে সুলতান খাঁ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে। যে স্থানে ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায় পুলিশ তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পরিবারের লোক। তাহাদের মধ্যে নারী-পুরুষ ত আছেনই, শিশুও রহিয়াছে। ঘটনা এখনও তদন্তাধীনে। কাজেই এই সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না। প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া উপযুক্ত দণ্ডবিধান

করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্ব্বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে গ্রেপ্তার করার কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। পাকিস্তানের পুলিশের আচরণে মনে হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন চালাইতেছে।"

—জনশক্তি (শিলচর)।

সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন সম্বন্ধে বিহার পার্লামেন্ট-সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য

পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশনের ১০ই ডিসেম্বরের' এক সংবাদে প্রকাশ যে—বিহারের পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যদের এক মিলিত সভায়—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু, বিহারের সেরাইকেলা ও খরসেঁয়ার উড়িষ্যার সহিত এবং মানভূম সিংভূম ও ধলভূমের পশ্চিমবাংলার সহিত যুক্ত হইবার প্রশ্ন যে কমিশনের বিচারের বিষয়ীভূত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তাঁহারা মনে করেন যে—ইহাতে আন্দোলনকারীদের ও অনিষ্টকারীদের সুবিধা হইবে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক তিক্ত হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে—কমিশন গঠিত হইবার পর কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা বিচার করিবেন তাহা তাঁহারাই ঠিক করিবেন। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর পূর্ব্বাহ্নেই এরূপ কিছু ঘোষণা করা ঠিক হয় নাই। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি ডেপুটেশন পাঠাইয়া বিহারের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইঁহাদের এরূপ উদ্বেগের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন। কারণ ইঁহারা তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন যে—মানভূম সিংভূম প্রভৃতি হিন্দীভাষী। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে চিন্তা কেন? আসল ব্যাপার এই যে—এই সব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের মাতৃভাষা যে বাংলা এ সম্বন্ধে তাহাদের কলুষিত বিবেক শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যায় ভাবে লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদের ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে রাখিবার ষড়যন্ত্র বিফল হইবে বলিয়া ইঁহারা এই প্রশ্ন কোন নিরপেক্ষ কমিশনের কাছেও তুলিতে ভয় পাইতেছেন। মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলকে বিহারে রাখিবার পশ্চাতে যে কিরূপ অসৎ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান তাহা ইঁহাদের চাঞ্চল্য দেখিয়াই বুঝা যায়।"

—মুক্তি (পুরুলিয়া)

কৃষকের সঙ্কট

"ধান্যই এ দেশবাসীর একমাত্র প্রধান ফসল এবং ধান্য-মূল্যের উপরেই এ দেশবাসীর যা-কিছু খরচপত্র চলিয়া থাকে। মুষ্টিমেয় লোকে চাকরী আদি করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করে। কিন্তু পনের আনা লোককে একমাত্র ধানের উপর করিতে হয়। ধান চাউলের দাম কমিয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য ও কৃষি মজুরীর মূল্যের অনুপাতে কমিয়া গেলে কৃষকের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর. বিশেষতঃ এই পৌষ মাসে। এই মাসে কৃষকগণকে তাহার যাবতীয় ঋণ, সরকারী লোন, জমিদারের খাজনা, ছেলেমেয়েদের নূতন বই ক্রয়, স্কুল-কলেজের ফি এবং দোকানদারের পাওনা আদি মিটাইতে হয়। তা ছাড়া সংসার খরচ ত আছেই। ধান্য-মূল্য কমার সঙ্গে সঙ্গে যদি সোনা-রূপা হইতে ডাল, তেল, মসলা, চিনি, কাপড় প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমিত, তবে বিশেষ অসুবিধা ঘটিত না। কাজেই কৃষকগণের পক্ষ হইতে আর্ত্তনাদ উঠা স্বাভাবিক। একমাত্র ধান্য বিক্রী ছাড়া কৃষকদের অন্য কোন উপায় নাই। এ সময় ধান্যের দাম কমিয়া যাওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে নির্দ্দিষ্ট সরকারী ধান্য-মূল্যের কমে যেন লোকে ধান বিক্রী করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েন। অথচ এতদঞ্চলের ধান্য-সংগ্রাহক ডি, পি, এজেণ্টগণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের ধান্য সংগ্রহ ব্যাপারে তেমন তোড়জোড় দেখা যাইতেছে না।"

—নীহার (কাঁথি)

মার্কিণ আমেরিকাতে অপরাধের হিসাব-নিকাশ

"মার্কিণ গোয়েন্দা বিভাগের কর্ত্তা এডগার হুভার জানাইয়াছেন যে, '১৯৫৩ সালের প্রথম ছয় মাসেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৪.১ মিনিটে একটি করিয়া মোট ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৯০টি বড় রকমের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি ৪০.৩ মিনিটে একটি করিয়া নরহত্যা ও অসতর্কতাজনিত হত্যা; প্রতি ২১.৪ মিনিটে একটি করিয়া নারীধর্ষণ; প্রতি ৮.৮ মিনিটে একটি ডাকাতি; প্রতি ৫.৭১ মিনিটে একটি মারপিট; ১.১২ মিনিটে একটি সিঁধেল চুরি; প্রতি ২৫.৬ সেকেণ্ডে একটি চুরি; প্রতি ২.৩১ মিনিটে একটি মোটরগাড়ি চুরি হইতেছে। হত্যা, ধর্ষণ, মারপিট, ইত্যাদি অপরাধ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৭.২ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া এই বিবরণীতে জানানো হইয়াছে।"

—মজদুর (আসাম)।

চোরাকারবারের দায়ে অভিযুক্ত পূর্ব্বস্থলীর কংগ্রেস নেতা পুলিশ কর্ত্তৃক মামলা সাজাইবার পর সাক্ষ্যে পরিবর্ত্তিত

"পূর্ব্বস্থলী, ১৪ই ডিসেম্বর—গত সপ্তাহের নূতন পত্রিকায় "সাত পোতা বাঁধের সিমেন্ট চোরাবাজারে চালানের মামলা দায়েরের" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মামলায় যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থানার ডায়েরী করা হইয়াছিল, পুলিশ মামলাটি এমন ভাবে সাজাইয়াছে যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনিয়া তাঁহাকে সাক্ষ্য হিসাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বস্থলী থানা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সাত পোতা বাঁধের কণ্ট্রাক্টর শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে উক্ত সিমেণ্ট চোরাবাজারে পাচার করার অভিযোগ করিয়া থানায় ডায়েরী করা হইয়াছিল বলিয়া ইতিপূর্ব্বে নূতন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সিমেণ্ট ক্রয় করেন, তিনি বামাল সমেত ধরা পড়িলে, উক্ত কংগ্রেস নেতার নিকট হইতে সিমেণ্ট ক্রয় করেন বলিয়া তিনি থানায় এজাহার দেন। প্রাপ্ত সিমেণ্টের বস্তাগুলিতে ইংরাজীতে "এস, সি, রায়, পূর্ব্বস্থলী" লেখা ছিল।"

—নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মোরগের লড়াই

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা
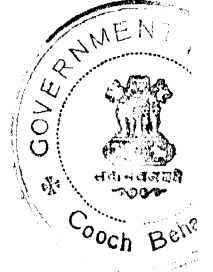
মাঘ, ১৩৬০ (স্থাপিত ১৩২১) ৩২শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাজ দিয়ে রান্না ভাত হ'লো, খানিক খেলাম। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলাম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না এলো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান কচ্চি, দ্যাখালে—প্রথম দ্যাখালে অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে; তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দোফরাশ, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শানকি, তাতে ভাত রয়েছে। শানকিতে করে ভাত নিয়ে সাম্‌নে এলো। সেই শানকির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গ্যাল। সেই শানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গ্যাল। আমিও একটু আস্বাদ কল্লাম। মা দেখালেন,—এক বই দুই নাই! সেই সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধ'রে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান লাভ করে চুপ করে থাক্‌লে লোকশিক্ষা কি করে হবে? বিজ্ঞান স্বার্থপর নয় যে আপনার হলেই হলো। সে আম সব্বাইকে দিয়ে খায়, আপনি খেয়ে মুখ পুঁছে বসে থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ 'অস্তি' মাত্র বোধ হয়—আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দ্যাখা দ্যান না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়ো, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে কিন্তু তাঁকে পারবে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন আকাশের জল ছাদ হতে, বাঘের মুখ দিয়ে বেরোয়, তারই কথা এই খোলটার ভিতর দিয়ে বেরুচ্ছে।
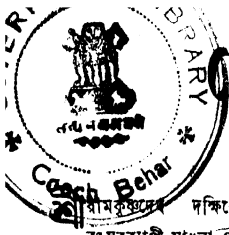
দেবী সারদামণি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁহার দ্বাদশ বৎসরব্যাপী সাধনা শেষ করিয়া নিজের ভাবে একান্ত বাস করিতেছিলেন—প্রাণের ভিতর একটি অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা উঁকি দেয় ভগবৎ-প্রেমিক সাধু-সজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপের জন্য—একটি অনির্ণেয় প্রতীক্ষা ইসারা করে ভবিষ্যতের কি এক জীবন-ব্রতের জন্য। স্পষ্ট কিছু বুঝেন না, তাই অপেক্ষা করিয়া থাকেন জগদম্বার ইঙ্গিতের। এইরূপ অবস্থায় বেলঘরিয়া বাগানে এক দিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত দেখা। উভয়েই জহুরী, উভয়েই মণি। উভয়েই উভয়ের মূল্য বুঝিতে পারেন। কলিকাতার কাগজে 'পরমহংসে'র কথা বাহির হইতে থাকে। দীনতার প্রতিমূর্তি ঠাকুর অভিমান করিয়া বলেন, কেশব এ সব কি? খপরের কাগজে লেখা 'এগুলো' আবার কেন? কিন্তু সে প্রতিবাদের সাধ্য কি কাল-গতি নিবারণ করা। জনতার সমাগম চলে দিনের পর দিন। প্রতিবাদক বুঝেন—'যোগমায়ার আকর্ষণ'। মাতিয়া উঠেন, নাচেন, গান, অবিশ্রান্ত ভাগবত-গঙ্গা বহাইয়া দেন কাম-কাঞ্চন-মত্ত কলিকাতার কঠিন রাজপথে, অলিতে-গলিতে। কাহারও কাছে চাপিয়া যান, কাহারও কাছে গোপনে জীবন-সত্য ঘোষণা করেন—'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং······'। সে সত্য চাপা থাকে না—এক হইতে দুয়ের কাছে, দুই হইতে চার, ক্রমান্বয়ে বহুর মর্মে আঘাত করে। বাউলের সঙ্গীতে এক দিন দেশ-দেশান্তর ধ্বনিয়া উঠে—'জগতে পড়েছে সাড়া রামকৃষ্ণ ভগবান'।

কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে আরও একটি সঙ্গীতের আয়োজন চলিতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূলদেহে যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন তত দিন উহা তেমন আত্মপ্রকাশ করে নাই, করিবার ক্ষেত্রও বোধ করি আসে নাই। তিনি কিন্তু জানিতেন ঐ ভবিষ্যৎ সঙ্গীতের—শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-সঙ্গীতের সুদূরপ্লাবী প্রভাব। তিনি নিজেই তো ছিলেন উহার প্রধান উদ্যোক্তা, শিক্ষক—আবার উৎসাহী শ্রোতা। উহার অপূর্ব সুরলহরীর মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার কানও তিনি কিছু-কিছু তৈরী করিয়া গিয়াছিলেন—সতর্ক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছিলেন বিশ্বস্ত পার্শ্বচরগণকে, দেখিয়ো এ সুর যেন বিজন কান্তারে অশ্রুত, অবজ্ঞাত, অননুপ্রযুক্ত হইয়া মহাশূন্যে বৃথাই মিলাইয়া না যায়।

না, মিলাইয়া যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও শিক্ষার সহিত পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া দেবী সারদামণির জীবন-সঙ্গীত কী সুললিত, বলিষ্ঠ তানই উত্তর-কালীনদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, শতসহস্রকে মুগ্ধ, সঞ্জীবিত করিয়াছিল! এই শেষের গীতিটি যেন প্রথম গীতির পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী—হিন্দু ঐতিহ্যের পুরুষ ও শক্তি—বর্তমান যুগের একটি অখণ্ড উদ্‌গীথ-ধ্বনি। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি তাঁহার সর্বপ্লাবী ঈশ্বর-পরায়ণতা, বিস্ময়কর ত্যাগ, গভীর সত্যদৃষ্টি এবং অনুপম উদার মানব-প্রেমে জগৎবাসীর নিকট দেবতার সম্মান পাইয়া থাকেন, তো শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী মাতা সারদামণির প্রতি দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র নরনারীর দেবী-বুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারও একলক্ষ্য ভগবৎ-লীনতা, অদ্ভুত অনাসক্তি ও পবিত্রতা, ভাস্বর তত্ত্বজ্ঞান এবং অপূর্ব হৃদয়স্পর্শী করুণা ও বিশ্বাবগাহী মাতৃত্বেরই মহিমায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পুরুষের ও নারীর; মা সারদাদেবীকে বলা যাইতে পারে নারীর ও পুরুষের—নারীর জীবনাদর্শ, পুরুষের নারী-মহিমা-খ্যাপয়িত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ পুরুষের জগতে—অন্তঃপুরবাসিনী জননী সারদেশ্বরীকে দেখিতে পাই বিশেষ ভাবে সকল স্তরের নারীর মধ্যে থাকিয়া, মিশিয়া, আপনার করিয়া লইয়া নারীশক্তির উদ্বোধন ও জাগৃতিতে জীবনপাত করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বহির্মুখ ধন-কুল-বিদ্যা-দাম্ভিক বিষয়ভোগোন্মত্ত পুরুষকে অন্তর্মুখীনতা, জীবনের পরম লক্ষ্যের অনুসন্ধান শিখাইয়াছিলেন—দেবী সারদামণি অবহেলিতা আদর্শ-সংঘর্ষ-বিক্ষুব্ধা নারীর নিকট আনিলেন তাহার ভুলিয়া-যাওয়া আত্মবিশ্বাস, প্রাচীন ও নবীন আদর্শের সুসমঞ্জস সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আকাশ হইতে অকস্মাৎ নামিয়া আসেন নাই; এই মাটির ধূলা হইতেই ধীরে ধীরে উঠিয়া, পৃথিবীর সব ধাপ মাড়াইয়া পৃথিবীর ঊর্ধ্বে পৌছিয়াছিলেন। দেবী সারদামণিরও আবির্ভাব ও পরিচিতি আকস্মিক নয়। কেহ দেখে নাই, জানে নাই, বুঝিতেও পারে নাই নেপথ্যে কত কৃচ্ছ্রতা, কত তপস্যা, কত আত্মত্যাগ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কত ব্যাকুল বিরহের অশ্রুজল তাঁহার নয়নদ্বয়কে সিক্ত করিয়াছিল, কত সহিষ্ণুতা, ক্ষমা তাঁহাকে সাধিতে হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে একান্ত বালিকা-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন।

তাহার পর হইতে সুদীর্ঘ ৬৭ বৎসরের মর্ত্যজীবন হইতে শেষ বিদায় লইবার দিন পর্যন্ত একটুও অবসর মিলে নাই—ছিল অতন্দ্রিত কর্মব্যাপৃতি—বিশ্ব-কর্ম—যে কর্মের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'কুটো বাঁধা' হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন জয়রামবাটি গ্রামে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। গড়িয়া উঠিলেন সুকন্যারূপে—শুধু রামচন্দ্র-শ্যামাসুন্দরীর নয় সমস্ত পল্লীর। এমন কন্যা কে কোথায় দেখিয়াছিল? পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান—গৃহের সমস্ত দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছেন—পল্লী-সংসারের ছোট-বড় কত প্রকারের কাজ—সুখের দিনে, আবার দুঃখের দিনে। পিতার চোখে চমক লাগে—কে? কে? এ কন্যা কে? এত বুকভরা স্নেহ—এত সমবেদনা—এত প্রশান্ত মাধুর্য—এত অনলস কর্মক্ষমতা!

কন্যা সারদা ধীরে ধীরে দেখা দেন ভগিনী সারদা মূর্তিতে। চার জন অনুজের দিদি—চার জনের মধ্য দিয়া আরও কত ভ্রাতা-ভগিনীর দিদি। তাঁহার এই দিদির ভূমিকা অতি অদ্ভুত। পরবর্তী কালে বৈষয়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভ্রাতারা কত কষ্ট দিয়াছে—তিনি কিন্তু তাঁহার করুণা সঙ্কুচিত করেন নাই। সারা জীবন ভ্রাতাদের অত্যাচার সহিয়াছেন, আবদার রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের সংসারের ভার বহিয়াছেন। মনকে পরিবর্তিত করিতে না পারিলেও ভ্রাতাদের প্রাণে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা অব্যর্থ প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিল। তাই শ্রীশ্রীমা-র দেহত্যাগের বহু পরে তাঁহার জন্মস্থানে নির্মিত মন্দিরের দরজায় বৃদ্ধ মধ্যম ভ্রাতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়কে সজল

নয়নে নিত্য প্রণাম করিবার সময় গদগদ কণ্ঠে বলিতে শোনা যাইত—'মা রাজরাজেশ্বরী দিদি গো'। উচ্চাবচ সহস্রের যিনি মা, অলৌকিক অতুল ঐশ্বর্যের যিনি অধীশ্বরী তিনিই অখ্যাত পল্লীর অশিক্ষিত, অসংস্কৃত, বিষয়-মলিন দরিদ্র ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের আজীবন-থাকিয়া-যাওয়া দিদি!

দিদির পর স্ত্রী—দিব্যোন্মাদ সাধকের সুধীরা অতি-শান্তা সেবা-প্রতীক্ষমানা সহধর্মিণী—সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের সাধ্বী সহচরী—ভগবৎ-মহিমাপ্রাপ্ত যুগাবতারের মহাশক্তিময়ী লীলা-সঙ্গিনী। সারদাদেবীর মধ্য-জীবনের ঘটনাবলী অনুসরণ করিলে তাঁহার ভিতরকার যে কল্যাণময়ী পত্নী-মূর্তি মানস-চোখে ভাসিয়া উঠে তাহার তুলনা নাই। এমন একনিষ্ঠ পতিপরায়ণতা, এমন আত্মত্যাগ, এমন সেবা সত্যই ভবিষ্যৎ স্ত্রীজাতির নিকট অপূর্ব চরিত্রাদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছিলেন, লৌকিক কোন সন্তান না থাকিলেও কালে এত লোক তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে যে তাঁহাকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে। আজ তাঁহার পুণ্যাবির্ভাবের শতবর্ষ পরে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেই পাইতেছি ঠাকুরের এই উক্তি কত সত্য। সারদাদেবীর জীবনের সামান্য ভূমিকাকে ছাপাইয়া এই মাতৃ-পরিচয়ই আজ তাঁহার একমাত্র পরিচয়—সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি মা। অতি সহজ, অতি নির্ভয়, অতি নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক-সূত্র ধরিয়া বিশ্বের কত লোক আজ তাঁহার এবং তাঁহার মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-মর্মে প্রবেশ করিতেছে—সত্য ও শান্তির সন্ধান পাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, ঘোষণা করিয়াছেন।

নারীর মাতৃত্বই তাঁহার শক্তির মহত্তম অভিব্যক্তি। সনাতন ভারতবর্ষ নারীকে এই মহাশক্তির প্রতীক বলিয়াই আবহমান কাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছে। ভারত-সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি আজ বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে ভারতবাসীর নিজের পক্ষে, আবার ভারতের বাহিরে অন্যান্য মানব-সাধারণের পক্ষেও। নানা ভাবে পৃথিবীতে আজ নারীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী মলিন হইয়া পড়িয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর শোধন না হইলে মানব জাতির কল্যাণ নাই। সারদাদেবীর অনাবিল ত্যাগ-ভাস্বর, সেবা-মধুর, প্রশান্ত উদার মাতৃজীবন বিশ্বজনকে এই কার্যে নূতন চক্ষু দিবে। সেই চক্ষু দিয়া সে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে নারীর চির-জ্যোতির্ময় মহিমা—যাহা রূপ-বিদ্যা-ঐশ্বর্য বিবিধ পটুতা, অগ্রগতি—এ সব কিছুরই পুরোগামী—যাহা অম্লান থাকিলেই এ সকলের সার্থকতা—যাহা ক্ষীণ হইলে এ সব-কিছুই নিষ্প্রভ, মূল্যহীন।

লাল তারা

[২৮শে জানুয়ারী সেনেট হলে অনুষ্ঠিত কবি-সম্মেলনে পঠিত]

কৃষ্ণ ধর
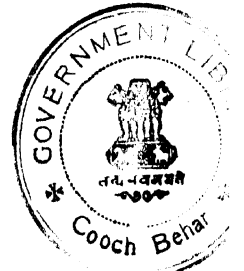
প্রমত্ত ঝড়ের পর উঠেছিল লাল তারা এক।
আকাশের উজ্জ্বল ললাটে নিঃসঙ্গ, নির্ভীক লাল তারা ॥

মানুষের প্রাণের প্রার্থনা সে তারাকে জানাল স্বাগত;
হৃদয়ের প্রেরণার গানে ডানা মেলে দিল বিহঙ্গেরা।
আকাশের নির্মেঘ ললাটে উঠেছে নির্ভীক লাল তারা ॥

প্রতীক্ষায় কেটে গেল কাল এ রাত্রিকে মেলাবো সকাল;
উদ্বেলিত হৃদয় বন্যায় ভেসে গেল সঞ্চিত কান্নারা।
আকাশের মুগ্ধ ললাটে উঠেছে উজ্জ্বল লাল তারা ॥

শস্যের সম্ভারে এল গান সমুদ্রকল্লোলে কল তান;
কান্নার মাটিতে এত গান এত প্রাণ নিয়ে এল কা'রা!
আকাশের প্রসন্ন ললাটে উঠেছে নির্ভীক লাল তারা ॥

ডনের জলেতে তার ছায়া চীনের তুষারে তার ছায়া;
বর্ষণের স্বপ্ন দেখে মেঘে তৃষাতুর প্রাণের সাহারা।
মানুষের দেশে দেশে গান উঠেছে উজ্জ্বল লাল তারা ॥

এ তারায় শিশুর কথা ফোটে কচিডগা ধানেরা ফুলে ওঠে;
এ তারার উদ্দাম হাওয়ায় যৌবনের উত্তরীয় ওড়ে!
নিরন্নের উন্মুখ শস্যেরে এ তারা এনেছে প্রতি ঘরে।

এ তারায় পাখিরা সুর তোলে মায়েরা নতুন ছড়া বলে;
এ তারায় কান্নার হীরারা বধূর নোলক হয়ে দোলে।
এ তারায় বসন্তসেনার হৃদয়-হরণ প্রেম জ্বলে ॥

(কোরাস্)

আকাশে উঠেছে লাল তারা হৃদয়ে মুখর বন্যারা।
নদীরা উচ্ছল গতিবেগে ভাষা দিল মৌন পৃথিবীকে।
মানুষের দেশে দেশে গান: উঠেছে উজ্জ্বল লাল তারা ॥

কাস্তেরা খরশাণ ঝলকে কিষাণ তৈয়ার এক পলকে।
মৃত্যুকে ফিরে যেতে হবে এ আশাই এনেছে বিপ্লবে ॥
এশিয়ার দেশে দেশে গান উঠেছে নির্ভীক লাল তারা ॥

বাঙলা দেশেই একটা যুগ গেছে, যখন লোকের ধারণা ছিল, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে, গান শিখলে বাঈজী হবে আর নাচ শিখলেই ঐ ধরণের একটা কিছু না কিছু হবেই। এ হেন ই বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে গানের জোয়ার বইতে দেখলে আর পাড়ায় পাড়ায় নাচের স্কুলের সাইনবোর্ড দেখলে আপনি বিস্মিত হন না? আপনার গৃহের শিশুরা যখন হিন্দী গানের হুবহু অনুকরণ ক'রে গেয়ে দেখিয়ে আপনারই আত্মীয়ের নিকট থেকে বাহবা পায় তখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন না, গান শিখলেই পুরুষ দুশ্চরিত্র ও নারী বাঈজীতে পরিণত হয়ে যেতে পারে! রেডিও এবং রেকর্ডের গাইয়ে-বাজিয়েরা প্রত্যেকেই যে দুর্দান্ত লম্পট নয়, তাও আপনি স্বীকার করবেন। তবুও কেন যে বাঙালী জাতি সে-যুগে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল?

*　　*　　*　　*

ওস্তাদ দবীর খাঁ

নবাবী আমল থেকেই বলা যায়, গান-বাজনা বস্তুগুলোর প্রচলন

হয়েছিল রমণীদের কেন্দ্র ক'রেই। রূপসী বিবিরা গাইতেন বাঈরা নাচতেন এবং নাচাতেন। এই বিবি এবং বাঈদের প্রভাবে শুধু যে মুসলমান নবাবরাই আচ্ছন্ন ছিলেন তা নয়, কত হিন্দু রাজা কত কোটি কোটি টাকা কত বিবিদের পায়ে লুটিয়ে দিয়েছেন। দরবারে আসরে বিবিদের দল যখন সঙ্গীত-সুধা পান করাচ্ছে, তখন ঘরের বিবির কাছে অপটু কণ্ঠের গান কে আর শুনতে চায়? নাচে-গানে বিবিরা যা করে, সুতরাং নাচলে বা গাইলেই হয় বিবি না হয় বাঈজী হবে, এই ধারণাটি পাকা হয়েছিল বাঙালী জাতির। শুধু এই কারণেই সঙ্গীত ও নৃত্য বাঙালী জাতির কাছে দস্তুরমত ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তার পর যে-যুগটা এলো, সে-যুগে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চার সামান্য প্রসার হ'লেও গৃহস্থ মেয়েদের গান গাইতে দেওয়া হ'ত না, নাচতে দেওয়া দূরের কথা। কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না। নাচ-গানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা স্বর্গে হাসাহাসি করলেন। বাঙলা দেশের লোভজনক পাত্ররা আর তাদের বাপ-মা একসঙ্গে বেঁকে বসলো। কেবল নগদ পণ দিয়েই খালাস পাওয়া যাবে না। বৌটি গান-বাজনা-জানা না হ'লে চলবেই না।

বাঙালী অভিভাবক। মেয়ে তেরোয় পড়তে না পড়তে তাঁদের দিনের খাওয়া এবং রাতের নিদ্রা ঘুচে যায়। মেয়েকে পার করবার জন্য হেন চেষ্টা নেই যে করেন না। দু'টো গান শেখাতে পারলে যখন মেয়েটার বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে যায় তখন একটু-আধটু গান-টান শিখলে দোষ কি? যদি একজন বয়স্ক শিক্ষক পাওয়া যায়?

* * * *

আমরা বেশ বুঝতে পারছি, অনেকেই মনে মনে ভাবছেন, তবে কি বাঙলা দেশের সঙ্গীত-চর্চ্চা ম'রে গিয়েছিল? ওস্তাদ আর বিবিরা ছাড়া আর গায়ক ছিল না? ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা কি গাইতো না কেউ? যাত্রার গান শুনতো না মানুষ? বৈষ্ণবরা কি ম'রে গিয়েছিল? রামপ্রসাদ আর নিধুবাবুর গান তবে কোথা থেকে এলো? কে বা কারা গাইলো?

ছিল, সবই ছিল। গানও ছিল বাজনাও ছিল। তেমন তেমন গাইয়ে-বাজিয়েও ছিল। পাত্র-পাত্রী সবই ছিল, ছিল না শুধু ভদ্রলোকের ঘরে গান-বাজনা ও নাচের কোন স্থান। বৈঠকখানায় গান-বাজনা চলতো, মাঠে-ঘাটে যাত্রা-তরজা হ'ত, মন্দিরে-মণ্ডপে ধর্ম্মসঙ্গীত গাওয়া হ'ত, মাঠের চাষা আর নৌকার মাঝিরা ভাটিয়ালী গাইতো, বাউলরা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তন করতো, ভিখারী ফকিরে মিলে পথে পথে রামপ্রসাদের গান ও মর্সিয়া মারফতি গেয়ে ভিক্ষা চাইতে বেরুতো।

তখন নাচা-গাওয়া বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দরে প্রবেশ করে নি। গৃহস্থের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গান ও নাচের প্রতি দৃক্‌পাতই করেন নি।

* * * *

রেডিও রেকর্ড সিঁদ কাটলো প্রথম। কোথা দিয়ে যে প্রবেশ করলো তারা গৃহস্থের অন্দরে! কল চালিয়ে দিলেই যখন ঘরের মধ্যে গান-বাজনার জলসা বসানো যায়, অথচ চরিত্রটা খারাপ হওয়ার কোন রকম ভয় থাকে না, তখন রেডিও আর রেকর্ড বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়ে পড়লো। বিলেতী কোম্পানীরা রেডিও ও রেকর্ডের ব্যবসা চালাতে শুরু করলেন কলকাতায়। বিলেতীর অনেক পরে দেশীরাও অবতীর্ণ হলেন মা-লক্ষ্মীর নাম করে। রেডিও আর রেকর্ড শুনে শুনে বাঙালী

কিষেণ মহারাজ, রবিশঙ্কর ও আলি আকবর

ওস্তাদ আলি আহম্মদ খাঁ

কেরামতুল্লা

ও

পটবর্দ্ধন
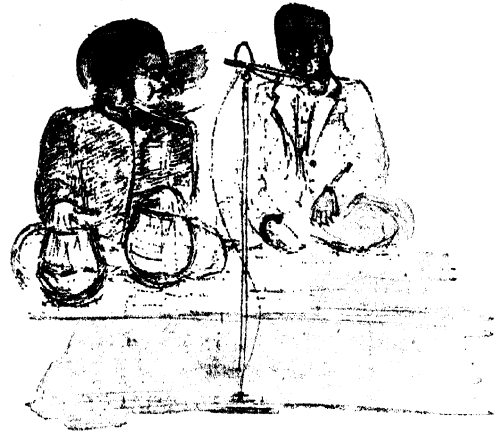
শান্তাপ্রসাদ

ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ীরা গুন-গুন গান ধরলো। তাঁদের মধ্যে যাঁদের গানের গলা আছে, বাজনার হাত আছে তাঁরা গান-বাজনার চর্চ্চা করতে লাগলেন।

রেডিও আর রেকর্ডের দোকানেই শুধু শহরের পথ-ঘাট পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো না, অলি-গলিতে সঙ্গীতযন্ত্রের দোকান বসে গেল। ক্রমে হারমনিয়ম চালু হয়ে গেল। মিস্ ইন্দুবালা ও আঙ্গুরবালাদের কৃপায় বাঙালী আবার গান ধরলো। আবার গানের জোয়ার বইলো সমগ্র বাঙলার ঘরে ঘরে।

* * * *

তার পর এলো বাইসকোপ। প্রথমে মুখে কথা ছিল না ছবির, হাত-পা নাড়া, হাসা-কাঁদা, ওঠা-বসা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ এক দিন বিজ্ঞানলক্ষ্মী কৃপা করে বসলেন। ছবির মানুষ কথা কইতে লাগলো। আগে শুধু নাচানাচি করতো, এখন ছবির মানুষের কণ্ঠে গানও শোনা গেল। দেশবাসী সাগ্রহে গ্রহণ করলো টকী ছবিকে।

টকীর দৌলতেই আধুনিক বাঙলা গানের সৃষ্টি। প্রথম যুগের আধুনিক গানের অধিকাংশ ছিল অর্থহীন। চাঁদ, জ্যোছনা বিরহ, মিলন, প্রিয় ও প্রিয়াদের জগাখিচুড়ী ছিল। ছবির মালিকরা শেষে অর্থহীন গান বুঝতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি, নজরুল ইসলাম, অজয়

ভট্টাচার্য্যদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। আসল গীতিকারদের স্থান দেওয়া হ'ল।

গান-বাজনার অধিষ্ঠাত্রীরা প্রথমে হাসাহাসি করেছিলেন, এখন তাঁরাও প্রসন্ন হলেন। বাঙলা গান প্রচলিত হ'ল, বাঙলা সুরের সৃষ্টি হ'ল, বাঙলার নৃত্যকলাও পরিপুষ্ট হ'তে লাগলো। বাঙালী গান-বাজনার প্রতি যেই দৃষ্টি দিলো, তৎক্ষণাৎ রেডিও রেকর্ড ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসাদারগণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। আগে যে-পাড়ায় একটা দোকান ছিল, এখন সেখানে একাধিক দোকান। আগে গান-বাজনা শেখানোর উপায় ছিল না, এখন শুধু কলকাতায় সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের সংখ্যাই হাজার হাজার। আগে গাইয়ে বাজিয়েরা অনাহারে ম'রতো, এখন তাঁরাও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করছেন, সুখের কথা। অধিকন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতকে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করায় আরও সুবিধা হ'ল।

* * * * *

তাই ভাবছিলাম, যে বাঙলা দেশে যখন এত সঙ্গীত-পিপাসুর আধিক্য হয়েছে, তখন মাসিক বসুমতীতে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী নাচ-গান-বাজনার সচিত্র বিভাগ উন্মুক্ত হ'লে কেমন হয়? পাঠক-পাঠিকা কি বলেন? আপনাদের অভিমত কি?

—চিত্র-পরিচিতি—

এতৎসহ স্কেচগুলির প্রত্যেকটি চিত্র আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গীত-সমাজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অঙ্কিত হয় এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও অন্যান্য শিল্পিগণ চিত্রে স্বাক্ষর করেন। আলাউদ্দীন খাঁয়ের চিত্রটি পিছন থেকে আঁকা। অন্যান্য চিত্রসমূহ শিল্পীদের অনুষ্ঠানের সময়ে অঙ্কিত হয়। ১০ সেকেণ্ড থেকে এক মিনিট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ছবি আঁকতে হয়েছে। শান্তাপ্রসাদ স্বাক্ষরের পরে নিজেই নিজের মাথার ওপর 'ওঁ' শব্দটি বসিয়ে দেন। কিষেণ মহারাজ, রবিশঙ্কর, আলি আকবরের চিত্রটি অঙ্কনের সময় প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং চিত্রটি সেই সময়েই আঁকতে হয়। কেবল মাত্র আলি আকবর স্বাক্ষর করেন চিত্রে। অন্য দু'জন অনুষ্ঠান-শেষেই বিদায় গ্রহণ করেন। চিত্রসমূহ প্রাণতোষ ঘটক অঙ্কিত।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ
(চেয়ারের পেছনে স্বাক্ষর)

বিপ্লবী নায়ক বিপিনদা'

অমর মুখোপাধ্যায়

আজকের এই স্বাধীন ভারতবর্ষ সেদিন বিদেশী শাসনের নাগপাশে জর্জরিত। ভারতের আকাশে-বাতাসে 'ইউনিয়ন জ্যাক্' ইংরাজ শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করে চলেছে। সহর-নগরের বুক বৃটিশ গোরার পদভারে কম্পিত। হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষ সেদিন জড়, মৃতপ্রায়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হ'য়ে সেদিন গর্বিত, স্ফীত। ঝিমিয়ে পড়েছে দেশের মানুষগুলি। এমনই দিনে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নির্ভীক আত্মার দারুণ আবির্ভাব। বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবার সঙ্কল্প তাদের মনে—তাদের প্রাণে জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ—অন্তরে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। সেই দলেরই একজন শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—আমাদের বাংলার তথা ভারতের বিপিনদা'। ভূগোলে লেখা ছিল—বাঙ্গালী নিরীহ জাতি। কিশোর বিপিনবিহারীর মনে যেন বেত্রাঘাত হ'ল। নিরীহ! মানে—গরু, ভেড়া, ছাগলের মত! অসহ্য! ভূগোলের পাতাটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল।···সুরু হ'ল ব্যায়াম অনুশীলন। মুষ্টিযুদ্ধ, ছুরি, লাঠির কসরৎ সুরু হ'ল পূর্ণোদ্যমে।

স্কুলের পড়া শেষ হ'ল। দরজা খুলল কলেজের। সঙ্গে সঙ্গে এল পড়ার সুযোগ ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডিকে। সঙ্গলাভ হ'ল অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীসতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তাবীরদের। প্রতিষ্ঠিত হল আত্মোন্নতি সমিতি। বিপিনবিহারী তার একজন উদ্যোক্তা। কয়েক দিনের মধ্যে লাগল লড়াই সাদা-কালোয়। আজকে যেখানে 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার', সেদিন সেখানে কালো চামড়ার মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিপিনবিহারীর দল প্রতিবাদ করল। ফলে, সেদিন কত সাদা মুখ লাল হয়ে ফুলে উঠল বিপিনবিহারীর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে। পরদিন কলকাতার দৈনিক কাগজগুলির অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন 'নেটিভ'দের ঐ ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে।

পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহে' জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দুনারীর মর্য্যাদা বিপন্ন হল। বিপিনবিহারী সদলবলে হাজির হলেন সেখানে। দাঙ্গার চাকা ঘুরে গেল। ফিরে এল শান্তি। আসল লড়াই তখনও বাকি। ইংরাজ অস্ত্রে বলীয়ান্। খালি হাতে লড়াই চলে না। হাতিয়ার চাই। লুঠ হ'ল রডা কোম্পানির পঞ্চাশটি মশার পিস্তল আর ছেচল্লিশ হাজার রাউণ্ড বুলেট্। বিপিন গাঙ্গুলীর দল সেদিন সারা ভারতবর্ষকে চমকে দিল। বৃটিশসিংহের লেজে আঘাত পড়ল। সরকার সন্ত্রস্ত হ'ল।

প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এই ত' সুযোগ! ভারতের বিপ্লবী মাথাগুলি একজোট হয়ে আপন আপন দায়িত্ব ভাগ করে নিলেন। বিপিন গাঙ্গুলী নিলেন মানবেন্দ্র রায়ের সহায়তায় কলকাতার আশপাশের অস্ত্রাগারগুলি লুঠ করে 'ফোর্ট-উইলিয়ম্' দখল করার দায়িত্ব। কিন্তু ভারতের ভাগ্যাকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকা। তাই ষড়যন্ত্র গেল ফেঁসে। বিপ্লবী নেতারা অনেকেই ধরা পড়লেন। অনেকেই দেশ-দেশান্তরে আত্মগোপন করলেন।

এমনই একদিন বারাকপুর মহকুমায় আগড়পাড়ার অন্তর্গত এক গ্রামে দিনের বেলা হৈ-হৈ পড়ে গেল—ডাকাত্, ডাকাত্! গ্রামের লোকের সহায়তায় টেগার্ড সাহেবের দল সেদিন বিপিন গাঙ্গুলীকে ধরে ফেলল। মিলিটারি পোষাক-পরা ডাকাতটির পরিচয় যখন গ্রামের লোক জানতে পারলেন তখন আর অনুতাপের সময় নেই। অসহনীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে কাটল পাঁচ বৎসর দিল্লীর জেলে। তারপর কংগ্রেসের কাজ সুরু হল ১৯২১ সাল থেকে। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে। কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলির মধ্যে বাংলা দেশে বিপিন গাঙ্গুলীর অবদান অনেকখানি। চট্টগ্রামে জ্বলল আগুন মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে। এ সময় চট্টগ্রামের বীরদের শ্রদ্ধেয় বিপিনদা' কি চুপ করে থাকতে পারেন? মধ্য-কলকাতার বুকের ওপর হঠাৎ গজিয়ে উঠল এক দর্জির দোকান। যুদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র সেখান থেকেই জুলু সেন মারফৎ সরবরাহ করা হল চট্টগ্রামে। বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীর বুকের আগুন সেদিন চট্টগ্রামের আকাশকেও রাঙা করে তুলল। কিছু দিন পরেই রাজসাহীতে নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি বিপিনদা' গ্রেপ্তার হলেন। বিয়াল্লিশ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে বিপিন গাঙ্গুলীকে দেখা গেল আবার সক্রিয় অংশ নিতে।

এই ভাবে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পঞ্চাশটি বৎসর কাটল। পঁচিশ বৎসরের ওপর কেটে গেল মান্দালে, রেঙ্গুন, দিল্লী, আলিপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সী জেলের অন্ধকারে। আত্মগোপন ক'রে কাটাল দিনগুলি কত গ্রামের পথে পথে, কত রোমাঞ্চকর ছাপ রেখে গেছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর পথের দাবীর সব্যসাচীকে কল্পনা করেছিলেন তাঁর বিপিন মামাকে দেখেই অনেকখানি। একদিন তাই শরৎচন্দ্রের মুখেই প্রকাশ্য সভায় বাংলা দেশ শুনেছিল—বাঙ্গালী হ'য়ে বিপিন গাঙ্গুলীর নাম না জানা শুধু অপরাধ নয়, মহাপাপ।

'গত ১৫ই জানুয়ারী' '৫৪ তারিখে কর্মযোগের মূর্ত্ত প্রতীক বিপিনদা'র চিতাগ্নির শেষ সোনালী শিখাটুকু অস্তরাঙা সূর্য্যের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু বিপিনদা'র স্মৃতি চিরকাল অন্তহীন। অম্লান থেকে দেশের যৌবনকে আত্মত্যাগের সাধনার পথে হাতছানি দিয়ে তাঁরই ভাষায় বলবে—'মানুষ বাক্যে বড় হয় না, কর্মে বড় হয়। কাজ কর, করে মর।'

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
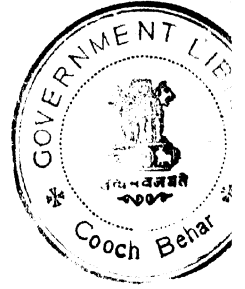
একশো পাঁচ

গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। আর গড়িমসি নয় একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসে আছেন ঠাকুর। সামনে আরেকখানি কম্বলে ভবনাথ ব'সে।

'এসেছিস? আমি জানি তুই আসবি। জিগগেস কর একে,' ভবনাথের দিকে ইসারা করলেন ঠাকুর, 'তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। বোস, পাশে এসে বোস।'

পায়ের কাছে বসে পড়ল গিরিশ। বললে, 'আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী। আমি যেখানে বসি সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।'

'তাই নাকি?' অভয়মালা হাসি হাসলেন ভুবনসুন্দর। বললেন, 'তুই এত পাপী যে পতিত-পাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম—তাই না?'

'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি?' ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন আবার। বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা ব'লে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

অকূলে যেন কূল পেল গিরিশ। যেন আর সে ভেসে যাবে না, তলিয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না। বললে, 'এখন থেকে আমি কী করব?'

'যা করছিস তাই কর।'

কী করছি? বই লিখছি। ধারণা নেই, লিখে চলেছি অভ্যাসবশে। লোকে বলে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে অমন জিনিস বেরোয় না কলমে। বিশ্বাসের জোর তো ভারি, কখানি নাটক লেখাচ্ছে। লোকশিক্ষা হচ্ছে নাকি। মস্ত পণ্ডিত আমি, লোকশিক্ষা দেবার আর লোক নেই দুনিয়ায়!

ঠাকুরের পদাশ্রয়ে এসে এখনো বই লেখা! তুচ্ছ পুঁথির পুঁতির মালা তৈরি করা।

'হ্যাঁ, বই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবে কি করে? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল।

সেই দিনানুদৈনিক কাজ, সেই বই লেখা, সেই থিয়েটার করা—এখনো ঠাকুরের এই ব্যবস্থা?

হ্যাঁ, এই। কর্মে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে যখন তোর ঘর্ম ঝরে পড়বে তখনই তোর আসল ধর্ম।

তবে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওটিই হচ্ছে যুক্ত হবার সেতু। লেগে থাকবার আঠা।

'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল্।' বললেন ঠাকুর, 'তার পর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে,' ঠাকুরের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল: 'সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবি নে?'

মুষড়ে পড়ল গিরিশ। এ আবার কী বাঁধাবাঁধি! সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও! স্মরণ-মননের সময় কই! শেষকালে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি আর কি!

কিন্তু কত সামান্য কথা। এটুকুও গিরিশ রাখতে পারবে না? কোনো কঠিন ব্রত-নিয়ম করতে বলছেন না, নয় কোনো আসন-প্রাণায়াম, নিশান্তে ও দিনান্তে একটু শুধু মনে করে ঈশ্বরকে বাধিত করা! এটুকুতেও গিরিশ অসমর্থ! লোকে বলবে কি!

কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। সরলতার ঠাকুর, তাঁর সামনে কেন ধরব ছদ্মবেশ? মুখে যাই বলি মনের কথা তিনি ঠিক নখমুকুরে দেখে নেবেন।

'বহু দিনই সকালের সঙ্গে দেখা হয় না, ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর। আর বিকেল?' গিরিশ

কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'বিকেল যেখানে কাটে সেখানে আরেক রকম মোহনিদ্রা!'

'বেশ, খাবার আগে?' ঠাকুরের কত দায় এমনি ভাবে বলছেন কাতর হয়ে: 'না খেয়ে তো আর থাকিস না? বেশ তো, খেতে বসে একটু নাম করিস মনে-মনে।'

সত্যি, রোজ খাই তো? এমন এক-এক দিন গেছে কাজে-কর্মে খাওয়াই হয়নি। খেতে বসেছি, কিন্তু এত দুশ্চিন্তা, খাচ্ছি বলে হুঁস নেই। কোনো দিন দশটায়, কোনো দিন বা বিকেল তিনটেয়। কোনো দিন কতগুলি শিঙাড়া-কচুরি খেয়ে দিন কেটেছে থিয়েটারে। আমার আবার খাওয়া! আসন নেই, বাসন নেই, ফরাসে বসে ঠোঙায় করেই খেয়ে নিলাম। আমার আবার স্থির হয়ে বসে নাম করা!

'ও পারব না।' মাথা চুলকোতে লাগল গিরিশ: 'খাওয়ার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া খিদের সময় খাবার পেলে আর কিছু তখন মনে থাকে না।'

যেন কত বাহাদুরের মত কথা বলছে। সামান্য একটা অনুরোধ, অত্যন্ত সোজা অত্যন্ত হালকা, তবুও সে অপারগ! সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে!

কিন্তু ঠাকুর দেখুন তার গহন মনের গোপন মুখচ্ছবি। যা সে পারবে না তা সে বলবে করব? অসত্যের চেয়ে অক্ষমতা অনেক নির্দোষ।

তবু নিরস্ত হন না ঠাকুর। বললেন, কণ্ঠস্বরে সেই মমতাময় মিনতি; 'বেশ তো, শোবার আগে? শুতে না শুতেই তো ঘুম আসে না! অন্ততঃ এক-আধ মিনিট তো অপেক্ষা করতে হয়! তখন, সেই এক-আধ মিনিট সময়টুকুর মধ্যে একটু নাম করিস!'

ভালো সময়ই বের করেছ বটে! আমার কি ওটা ঘুম? আমার ওটা বিস্মরণ। কিংবা বিস্মরণের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন। একটি শুচিস্নিগ্ধ শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা নয়, জ্বালা-নিবারণের ওষুধ। আর শুই কোথায়? কোন বিছানায়? কার বিছানায়?

মাথা হেঁট করল গিরিশ। বললে, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে নামও আসে না।'

ছি ছি, এমন করে কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে ঠাকুরকে! গন্ধমাদন আনতে বলেন নি, গাণ্ডীব তুলতে বলেন নি, চান নি দধীচির অস্থি। বলেন নি, গুহায় যাও পর্বতে গিয়ে ওঠো বা অরণ্যে প্রবেশ করো। শুধু একটি চিহ্নিত সময়ে মনের নির্জনে একটু ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এত সংখ্যা জপ করতে হবে, তাও না। কোনো ধরা-বাঁধা মন্ত্র নয় যে মুখস্থ লাগবে বা উচ্চারণে ভুল হবে। একেবারে বেকড়ার, একেবারে বেকসুর। চোখ পর্যন্ত বুজতে হবে না। একটু শুধু ভাবা। মনে দাগ রাখতে হবে বা স্থান দিতে হবে মনের কোণে এমনও কোনো কথা নেই। শুধু সময়ের উড়ন্ত বাতাসে একটি চপল মুহূর্তের ঘ্রাণ নেওয়া। এটুকুও করতে পারবে না, দিতে পারবে না গিরিশ? ছি ছি, তবে সে জন্মেছিল কেন মানুষ হয়ে?

কিন্তু বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। গিরিশ নিজেকে তো জানে। কেমন সে বাউণ্ডুলে কেমন সে ছন্নমতি! শেষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে! আসলে ভগবানের যে নাম করব তাঁর কৃপা না হলে হবে কি করে? এই যন্ত্রে যে তিনি ঝঙ্কার তুলবেন যন্ত্র নিজের হাতে তো তাঁকে বেঁধে নিতে হবে! বাঁধবার সময় ব্যথা লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ব্যথাই তো কৃপা।

কিন্তু, এ কি, এ কৃপা যে ব্যথাহীন। এ কৃপা যে অহেতুক!

'বেশ, তোকে কিছুই করতে হবে না।' ঠাকুর বললেন প্রসন্নাস্যে; 'আমাকে তুই বকলমা দে।'

তার মানে?

তার মানে, তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে! তোর হয়ে আমিই নাম করব। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে।

আর কি চাই! আমার একেবারে ছুটি, আমি নেচে-গেয়ে আনন্দ করে বেড়াব। যা করবার প্রভু করবেন। আমি নন্দের গোপাল হামা দিয়ে বেড়াব। তিনিই ধুলো মুছে কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু এ কি গিরিশ ছুটি পেল, না, বাঁধা পড়ল দ্বিগুণ শৃঙ্খলে?

বাঁধা পড়ল। গিরিশের আর আমি রইল না। ঠাকুর যখন ভার নিয়েছেন তখন নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব তাঁর ইচ্ছাধীন। আমার হয়ে তিনি সত্যি নাম করছেন কিনা এটুকু প্রশ্ন করবারও আর অধিকার নেই। সব তাঁর খুশি, তাঁর এক্তিয়ার। ভার নেওয়া কঠিন হতে পারে, ভার দেওয়াও কম কঠিন নয়। ভার দেওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, ভার দেওয়া মানে কোলের উপর বসা, কাঁধের উপর

চড়া। নইলে, ভার যে দিলাম চাপিয়ে, বোঝাব কি করে?

আমার হয়ে সত্যি নাম করছেন কিনা—মাঝে-মাঝে এ চিন্তা আসে। এমনি হলে একবার নাম হত, এ চিন্তায় দু বার করে হচ্ছে। প্রথমত, নাম হচ্ছে কিনা,—নামই রাম—আর দ্বিতীয়ত, ঠাকুর করছেন কিনা। নামের সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরের মূর্তি মনে ভাসছে। একের জায়গায় দুই হচ্ছে।

এ যে অছি বসিয়ে দেওয়া। আর 'আছি' নয়, এবার অছি। আর 'আমি' নয়, এবার তুমি। আমার বলে আর কিছু নেই সংসারে। আমার কলম তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। পা-টি ফেলছি এ আমার জোরে নয়, তোমার জোরে। নিশ্বাসটি ফেলছি এ আমার কেরামতি নয়, তোমার করুণা।

'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত! সময় করে নাম করা যেত তার একটা অন্ত থাকত। এ যে একেবারে অনন্তের মধ্যে এসে পড়লুম।' গিরিশ বলছে তদ্গত হয়ে: 'কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বক্‌লস লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া!'

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। পুত্র মারা গেল।

উপায় নেই, বকলমা দিয়ে দিয়েছ। মনকে প্রবোধ দেয় গিরিশ: 'তুমি কী জানো কিসে তোমার মঙ্গল, ঠাকুর জানেন। তুমি তাঁর উপর তোমার ভার দিয়েছ তিনিও নিয়েছেন সে-ভার। এখন তো আর বিচার চলবে না, সমালোচনা চলবে না। দলিলে এমন কোনো লেখাপড়া নেই কোন পথ দিয়ে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তোমার জীবনস্বত্ব দান করে দিয়েছ ঈশ্বরকে। এখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যা খুশি করুন, মারুন-কাটুন, ফেলুন-ভাঙুন, তোমার কিছু বলবার নেই। তাঁর কুলালচক্রে তুমি এখন এক তাল নরম কাদা হয়ে যাও।'

তাই হোক। তাই হোক।

আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। আমার বাক্যকে। নিযুক্ত করো তোমার গুণকথনে, কর্ণকে নিযুক্ত করো তোমার রসশ্রবণে, হস্তকে নিযুক্ত করো তোমার মঙ্গলকর্মে। মন থাক তোমার পদযুগে, মাথা থাক তোমার জগৎপ্রণামে আর দৃষ্টি থাক দিকে দিকে তোমারই মূর্তিদর্শনে।

'যার যা মনের পাপ আছে, অকপটে জানাও ঈশ্বরকে।' বলছেন ঠাকুর বরদমূর্তিতে: 'যিনি বিন্দুকে সিন্ধু করতে পারেন তিনি পারেন পাপকে মার্জনার পারাবারে ডুবিয়ে দিতে।'

'কি করে জানাব!' গিরিশ কেঁদে পড়ল, 'আমি যে দুর্বল।'

'তা কি ঠাকুর জানেন না? খুব জানেন। তাই, একবার তাঁর শরণাগত হও, সব সমাধান হয়ে যাবে। শরণাগতকে শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না। দীনের ত্রাণকর্তা তিনি, নিশ্চয়ই তোমাকে ত্রাণ করবেন।'

'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি তোমাকে।' গিরিশ জোড় হাত করল: 'তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি নিয়েছ আমার ভার! তুমিই আমার ভারহরণ—'

একশো ছয়

কেদার চাটুজ্জেরও সেই কথা।

গোড়ায় ব্রাহ্ম ছিল এখন ভক্তিতে সাকারবাদী হয়েছে। এত দৃষ্টিময় স্বাদময় হয়েছে যে বলছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না, এখানে পেট-ভরা পেলুম।'

'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার।' কেদারকে বলছেন ঠাকুর, 'সাধুই ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কেদার বললে, 'যেমন রেলের এঞ্জিন। পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। কিংবা যেমন নদী। কত লোকের পিপাসা মেটায়। তেমনি সব মহাপুরুষ। তেমনি আপনি।'

ঈশ্বরের কথায় চোখ জলে ভেসে যায় কেদারের। সংসারে রুচি নেই। মন যেন পাদপদ্মলোভী মধুকর।

কালীঘরে মাকে প্রণাম করে এসেছেন, চাতালে বেরিয়ে এসে ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। চেয়ে দেখলেন সামনে কেদার, রাম, মাষ্টার আর তারক।

তারক মানে বেলঘরের তারক মুখুজ্জে।

প্রথম যখন এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে, চার বছর আগের কথা, তখন তার বয়স মোটে কুড়ি। বিয়ে করেছে। বাপ-মা আসতে দেয় না ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঠাকুর যে বাপ-মার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

সঙ্গে সেবার একটি বন্ধু নিয়ে এসেছে। নাস্তিবাদী বন্ধু। নাকের ডগায় সব সময়ে একটু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, ছোট খাটটিতে বসে আছেন

ঠাকুর। তারককে দেখে শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গের ওই ল্যাজটি কোত্থেকে জুটিয়ে আনল ?

বন্ধুটিকে ঠাকুর বললেন, 'একবার মন্দির সব দেখে এস না।'

বন্ধু উপেক্ষার একটা ভঙ্গি করল। বললে, 'ও সব ঢের দেখা আছে।'

'শোন্,' তারককে কাছে ডাকলেন ঠাকুর, 'বিশালাক্ষীর দ, মেয়েমানুষের মায়াতে যেন ডুবিসনি। যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। তোর অনেক শক্তি, তুই পড়বি কেন ? দেখি, তোর হাত দেখি।'

ঠাকুর তারকের হাতের ওজন নিচ্ছেন। বললেন, 'একটু আড় যে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু, আমি বলছি ওটুকু যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি আর মাঝে-মাঝে আসবি এখানে।'

তারক মাথা নোয়ালো। বললে, 'বাবা-মা আসতে দেয় না।'

'জোর করে আসবি। বাপ-মা শিরোধার্য, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়ে কম।'

'এটা কি বললেন মশাই ?' সেই বন্ধু ফোড়ন দিল : 'যদি কারু মা দিব্যি দিয়ে বলে ছেলেকে, যাসনি দক্ষিণেশ্বরে, সে যাবে ? মার অবাধ্য হবে ?'

'যে মা ওকথা বলে সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মা'র অবাধ্য হলে কোনো দোষ হয় না।' বললেন ঠাকুর : 'ঈশ্বরের জন্যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে, কিন্তু মনে রাখিস, শুধু ঈশ্বরের জন্যে। তা ছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শুনতে হবে বাপ-মার। নির্বিবাদে, তর্ক-বিচার না করে।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন শাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে ?' বন্ধু আবার চিপটেন কাটলো।

'বহু। ভরত রামের জন্যে শোনেনি কৈকেয়ীর কথা। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি হিরণ্যকশিপুর শাসন। বলি শোনেনি গুরু শুক্রাচার্যের কথা, জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। আর গোপীরা ? কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি পতিদের নিষেধ। কি বাপু, মিলছে শাস্ত্রের সঙ্গে ?'

ওরা চলে গেলে পর ঠাকুর শুয়েছেন ছোট খাটটিতে, আর বলছেন মাষ্টারকে, 'বলতে পারো, ওর জন্যে আমি এত ব্যাকুল কেন ? সঙ্গে ওটাকে আবার কেন নিয়ে এল ?'

'বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী।' বললে মাষ্টার, 'অনেকটা পথ তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।'

যদি সঙ্গী কেউ না জোটে ঈশ্বরই তোর সঙ্গী। ঐ নির্জনতাই তোর নিবিড়তা। কেউ সঙ্গে নেই বলেই তো সে চলেছে তোর পাশে-পাশে।

কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ফের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। তারকের চিবুক ধরে আদর করলেন। 'নরেন রাঙাচক্ষু রুই, কিন্তু তুই হচ্ছিস মৃগেল।'

ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘরের মেঝেতে বসেছেন ঠাকুর। পা দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত। রাম আর কেদার নানা জাতের ফুল দিয়ে সেই পা দুখানি বন্দনা করছেন।

ঠাকুরের দু পায়ের দুই বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে কেদার। বিশ্বাস, স্পর্শে শক্তি সঞ্চার হবে। কিন্তু তাইতেই কি হয় ? যিনি দেবার তিনি যদি না দেন শুধু তাঁর আঙুল ধরলে কিছু হবে না।

'মা, ও আমার আঙুল ধরে কি করতে পারবে ?' ঠাকুর বলছেন অর্ধবাহ্যদশায়।

কেদার তো অপ্রস্তুত। মনের কথা কি করে টের পেয়েছেন অন্তর্যামী। তাড়াতাড়ি আঙুল ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করলে।

মনের আরো কথা যেন টের পেয়েছেন। গোপনীয় নিগূঢ় কথা। প্রকাশ্যেই তাই বলছেন ঠাকুর, 'মুখে বললে কি হবে যে মন নেই, কামকাঞ্চনে এখনো তোমার মন টানে। আমি বলি কি এগিয়ে পড়ো। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে। চন্দন গাছের বনের পর আরো আছে, রূপার খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। এখুনি থামলে চলবে কেন ?'

কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে কেদারের। রামের দিকে চেয়ে বলছে ভয়ে-ভয়ে, 'ঠাকুর এ কি বলছেন !'

ঠিকই বলছেন। এমনি তো মনের মুখোমুখি হবে না, খালি পাশ কাটিয়ে যাবে। ঠাকুর মনের সঙ্গে সম্মুখ-সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। এখন দেখ একবার নিজের নির্ভেজাল রূপটুকু, আর আত্মতৃপ্তির আবরণ টেনে রেখো না। দেখ এখনো কত বিকৃতি, কত বৈচিত্র্য। কৃপা পেয়েছ বলেই তো পেলে এই আত্মদর্শনের সুবিধে। দর্পণ আবার মার্জন করো। ক্ষালন করো ক্ষতক্লেদ।

'এই কামকাঞ্চনই আবরণ। এত বড়-বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওতেই রয়েছ জুজু হয়ে। বলো, ঠিক বলছি কিনা, মনে-মনে দেখ বিবেচনা করে—'

কেদার চুপ করে আছে। ঠিক বলছেন।

'যাকে ভূতে পায় সে জানতে পায় না তাকে ভূতে পেয়েছে। যারা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে তারা বুঝতে পারে।'

এক দিন কেদারের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ঠাকুরের, পারলেন না। বললেন, 'ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঢুকতে পারলাম না। বললাম তো, আসক্তি থাকলে হবে না। তাই তো ছোকরাদের অত ভালো-বাসি। ওদের ভিতর এখনো বিষয়বুদ্ধি ঢোকেনি। অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই টান ঈশ্বরের দিকে। যেন বনের মধ্যে ফোয়ারা বেরিয়ে পড়েছে। জল একেবারে বেরুচ্ছে কলকল করে।'

সেদিন আপিস যাবার পথে কেদার এসে হাজির। সরকারী একাউণ্টেণ্টের কাজ করে, থাকে হালিসহরে। সেখান থেকে কলকাতায় আসে। আসবার পথে কি মনে করে ঢুকেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। আপিসের পোষাক পরনে, চাপকান মায় ঘড়ি আর ঘড়ির চেন। হঠাৎ মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে, দেখে যাই একবার ঠাকুরকে। যেই মনে হওয়া, অমনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সটান দক্ষিণেশ্বর।

তাকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ও রাধিকার ভাবে গেয়ে উঠলেন গদগদ হয়ে: 'সখি, সে বন কতদূর! যেথায় আমার শ্যামসুন্দর! আর যে চলিতে নারি।'

ঠাকুর দেখলেন কেদারের অন্তরে গোপীর ভাব। তার সেই ব্যাকুলতাটিই কৃষ্ণান্বেষিণী গোপবালা।

ব্রজবন থেকে কৃষ্ণ যখন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন তখন গোপীদের কী দশা? বন হতে বনান্তরে খুঁজতে লাগল পাগলের মত। অশ্বত্থ আর অশোক, কিংশুক আর চম্পক, হে পরার্থজীবিত বৃক্ষ, আমাদের প্রিয়তম কোন পথ দিয়ে চলে গেল তা কি তোমরা দেখেছ? হে তুলসী, যার বুকে থেকেও যার পদযুগল ধ্যান করো, তুমি কি দেখেছ কোথায় পড়েছে তার পদধূলি? মালতী আর যূথিকা, করস্পর্শে তোমাদের শিহরিত করে তিনি কি গেছেন এই পথ দিয়ে? সখীগণ দেখ দেখ, এই ব্রততী শরীরে পুলক ধারণ করে বিরাজ করছে, তবে কি তিনি একে নখাঘাত করে চলে গেছেন? হে তৃণাঙ্কিত পৃথিবী, কোন পুরুষভূষণের আলিঙ্গনে তোমার এই নবীন রোমাঞ্চ? কৃষ্ণবিরহে আমরা বিগতপ্রাণা, আমাদের পথ বলে দাও। পতি-পুত্র দ্বারা বারিতা হয়েও আমরা নিবৃত্ত হইনি। লোলায়িতকুণ্ডলকর্ণে ছুটে এসেছি এখানে। কেউ গোদোহন ফেলে এসেছি, কেউ বা দুগ্ধাবর্তন; কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলাম, কেউ বা করছিলাম অন্নপরিবেশন কেউ বা অঙ্গরাগলেপন—যার যা হাতের কাজ সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটে এসেছি তার বাঁশি শুনে। সেই অরবিন্দনেত্র এতক্ষণ তো ছিলেন আমাদের সামনে, তিনি কোথায় গেলেন? কেন অদৃশ্য হলেন?

এই ব্যাকুলতাটিই বাস করছে কেদারের বুকের মধ্যে। এই ব্যাকুলতাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বিধি-বন্ধনের কাঁটাবেড়া।

অধর সেন বললে, 'শিবনাথ বাবু সাকার মানেন না।'

'সেটা হয়তো তাঁর বোঝবার ভুল।' বললে বিজয় গোস্বামী। ঠাকুরের দিকে ইসারা করলে: 'ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখনো এ রং কখনো সে রং। যার গাছতলায় বাসা সে ঠিক খবর রাখে। আমি ধ্যান করতে-করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, কত কি। আমি বললাম, আমি অত-শত বুঝি না, আমি তাঁর কাছে যাব, তবে বুঝব।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ঠিক-ঠিক দেখা হয়েছে।'

কেদারের মধ্যে তন্ময়তা এল। বললে, 'ভক্তের জন্যে সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন শ্রীহরিকে দর্শন করল. বললে, কুণ্ডল কেন দুলছে না? শ্রীহরি বললেন, তুমি দোলালেই দোলে।'

'সব মানতে হয় গো সব মানতে হয়—নিরাকার সাকার সব। কালীঘরে ধ্যান করতে-করতে দেখলুম, রমণী। বললুম, মা, তুই এরূপেও আছিস? কোন রূপে কার সামনে কখন এসে দাঁড়াবেন কেউ জানে না।'

'যাঁর অনন্ত শক্তি,' বললে বিজয়, 'তিনি অনন্তরূপে দেখা দিতে পারেন।'

'সেই যে গো চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল।' বললেন ঠাকুর, 'এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে

গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব। তেমনি একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বা বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে আমি সব বুঝে ফেলেছি।'

নবগোপাল ঘোষ একবার তিন বছর আগে এসেছিল। তার পর ভুলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কথা। কিন্তু ঠাকুর ভোলেননি। কি জানি কেন, তিন বছর বাদে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন।

নবগোপাল তো অবাক। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি অথচ তুমি আমাকে ভোলোনি। কিংবা এত দিন ভুলিয়ে রেখে শুভক্ষণ দেখে ডেকে পাঠিয়েছ। নবগোপাল পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'কামকাঞ্চনে ডুবে আছি, কি করে আমার ত্রাণ হবে!'

'কোনো চিন্তা নেই।' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধাননে, 'দিনে শুধু একবারটি আমায় মনে করো। শুধু একবার।'

গুরু-শিষ্য বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ ধরে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয় তখন গুরু এসে শিষ্যকে বলেন তুইই গুরু তুইই ইষ্ট। যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'তাই তো বলে গুরুর মাথা শিষ্যের পা।'

'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল, 'শিষ্যের মাথাটা গুরুর, আর গুরুর পা শিষ্যের।'

'না, ও মানে নয়।' বললে গিরিশ, 'বাপের ঘাড়ে ছেলে চড়েছে। শিষ্যের পা এসে ঠেকেছে গুরুর মাথায়।'

'তবে তেমনি কাঁচ ছেলে হতে হয়।' বললে নবগোপাল, 'কচি ছেলে হলেই তবে বাপ তুলবে কাঁধের উপর।'

হতে হবে সরলশুভ্র। হতে হবে লঘুমূত্থ। হতে হবে মানহীন ভারহীন সহায়সম্বলহীন। মা তখন ছেলেকে ধুলো থেকে কোলে, কোল থেকে কাঁধে তুলে নেবেন। চুমু খাবেন পদাম্বুজে।

বেলঘরের তারক মুখুজ্জে অমনি এক খাঁটি ছেলে, কচি ছেলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে চলেছে তারকের পিছু-পিছু। তারক অসহায়, তারক আশ্রিত, অর্পিতসর্বস্ব। তাই তাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তার সঙ্গ নেন, হাত ধরেন, পথ দেখান, শ্রান্ত হলে নেন তাকে কাঁধে করে।

কয়েক দিন পর আবার এসেছে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তারকের বুকের উপর পা তুলে দিলেন। তারক আর কি চায়! যমভয়লয়কারী পরম পদ। কারুণ্য-কল্পদ্রুমের ধ্রুবচ্ছায়া! এ পদের বাইরে আর কী সম্পদ চাইবার আছে!

'খুব উঁচু ঘর তারকের। তবে শরীর ধারণ করলেই যত গোল। স্খলন হল তো সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই দেহধারণ।' বললেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'যাঁরা অবতার তাঁদেরও কি বাসনা থাকে?'

সরল ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'কে জানে! তবে আমার দেখছি সব বাসনা যায়নি। এক সাধুর আলোয়ান দেখে ইচ্ছে হয়েছিল অমনি পরি একখানি। সেই ইচ্ছে এখনো আছে। জানি না আবার আসতে হবে কি না—'

বলরাম বসেছিল পাশে। হেসে উঠল শিশুর মত। বললে, 'আপনার জন্ম হবে কি ঐ আলোয়ানের জন্যে?'

'কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে। হয়তো গেল না শ্রীক্ষেত্র। তা হলে জগন্নাথ ভাবতে-ভাবতে শরীর যাবে।'

ঘরের মধ্যে একজন গেরুয়াধারী লোক ঢুকল। ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

চিরকাল ঠাকুরকে ভণ্ড বলে এসেছে। তবু প্রণাম করবার ঘটা দেখ।

বলরাম হাসছে। ঠাকুর বলছেন, 'বলুক গে ভণ্ড। হাসিসনি। কে জানে ভেক ধরেই হয়তো ওর ভিক্ষে মিলবে। ভেকেরও আদর করতে হয়। ভেক দেখলেও উদ্দীপন হয় সত্যবস্তুর।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তৃতীয় প্রবাহ

দ্বিতীয় তরঙ্গ

"মদন ভস্মের পর"

১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই তথাকথিত "অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান আশ্রয়গুলির অধিকাংশই কাহিল হইতে হইতে একে একে মরিয়া গেল। কলিকাতায় 'কল্লোল' স্তব্ধ হইল, 'কালি-কলমে'র কালি ফুরাইল, সদ্যোজাত 'ধূপছায়া' অন্ধকারে মিলাইয়া গেল; ঢাকায় 'প্রগতি' গতিহীন হইল, 'বীণা'র তার ছিঁড়িয়া গেল। 'হসন্তিকা'র বুড়া তরুণদের বাঁধানো দন্তবিকাশও মাত্র চার সংখ্যায় নিঃশেষ হইল, দৈনিক 'ফরওয়ার্ড'-আশ্রিত 'আত্মশক্তি' ভোল পাল্টাইল। যে দুইজন সত্যকার সৃষ্টিধর্মী শক্তিমান সাহিত্যিক 'কল্লোল'কে প্রতিষ্ঠিত ও নূতন সাহিত্যকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র সর্বপ্রথম দল ভাঙিয়া চতুর্থ বৎসরে (১৩৩৩) 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন "সংবাদ-সাহিত্যে"র ভাষায় "গড দি ফাদার ও গড দি সন্ রূপে গড্ দি হোলি গোষ্ট্ শ্রীমুরলীধর বসু"র সহিত মিলিত হইয়া উৎসাহের সঙ্গে এক বৎসর 'কালি-কলম' চালনা করিয়াছিলেন, তাহারও দ্বিতীয় বৎসরে (১৩৩৪) গড দি সন্ এবং তৃতীয় বৎসরে (১৩৩৫) গড্ দি ফাদার সরিয়া পড়িয়াছিলেন। একা মুরলীধর আরও এক বৎসর 'কালি-কলম' লইয়া যুঝিয়াছিলেন, কিন্তু "বরদা" বিরূপ হওয়াতে তিনিও ক্ষান্ত হইলেন।

'কল্লোল'-দলে অনেক আগেই ভাঙন ধরিয়াছিল, যাঁহারা নিয়মিত লিখিতেন ও আড্ডা দিতেন তাঁহাদিগকেই দল বলিতেছি। সে দল ভাঙিয়াছিল গঙ্গাধরবৎ 'কল্লোল'-ধর গোকুল নাগের অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। আসলে তিনিই ছিলেন 'কল্লোলে'র প্রাণ। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ মুখের মিষ্টতায় ধ্বনি জোগাইতেন, এইটুকুই তাঁহার বড় কৃতিত্ব। তিনিও আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী মানুষ ছিলেন কিন্তু সকলকে ধরিয়া রাখিবার মত ধৃতি তাঁহার ছিল না, চাতুর্য ছিল কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবন' প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১) 'কল্লোলে'র আড্ডার একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি:

> এই সময়েই আমি ঢুকলাম।
>
> শৈলজা দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন—আরে, তারাশঙ্কর বাবু—আসুন, আসুন। দীনেশ! তারাশঙ্কর বাবু। ইনি দীনেশ বাবু, উনি পবিত্র।
>
> পবিত্র তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি উঠছি, আপনি এলেন। তা বেশ, হবে এর পর আলাপ। কেমন?
>
> চলে গেলেন। দীনেশ বাবু বললেন, বসুন, বসুন।*
>
> বসলাম। তার পর সব চুপ। আমিও চুপ। তাঁরাও চুপ। ভাবছি কেমন করে জমানো যায়! কি বলি! কড়িকাঠের দিকে চাইলাম, মেঝের দিকে চাইলাম, হঠাৎ একটা কথা খুঁজে পেলাম, ভাবলাম বলি, আমার ভাইয়ের বিয়ে, চলুন না আমাদের দেশে। কথাটা আমাদের গ্রাম্য সমাজ অনুযায়ী চমৎকার। এই সূত্র ধরে অনেক কথা বলা যেতে পারবে। অন্তত: আমি বলবার সুযোগ পাব আমাদের গ্রামের অনেক কথা। মুখ তুললাম বলবার জন্য, তুলেই একটু অপ্রস্তুত হলাম, দেখলাম—দীনেশ বাবু মুখ টিপে ও চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দের দিকে চেয়ে না-এর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়ছেন। মুখ আপনিই চকিতে ফিরল শৈলজার দিকে। দেখলাম—শৈলজা দীনেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন—দু হাতের দশটি আঙুল মেলে দেখাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন। তার পরই হাত জোড় করলেন।
>
> দীনেশ বাবুকে চতুর লোক মনে হল। চতুর মানে ধূর্ত বলছি না আমি। আমি বলছি, নাগরিক যে হিসাবে গ্রামীনের কাছে চতুর সেই হিসাবে চতুর তিনি। মুহূর্তে তিনি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। বললেন, তার পর তারাশঙ্কর বাবু, আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে—না? ছিপে ধরা যায়?

সুতরাং মানী তারাশঙ্করের 'কল্লোল'-শ্রবণস্পৃহা এই প্রথম দিনেই নিবৃত্ত হয় এবং অনুরূপ কারণে ধীরে ধীরে দল ভাঙিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 'কল্লোল' স্তব্ধ হয়।

দগ্ধ হইবার পর ছাই উড়িবার পালা; উড়িতেও লাগিল। ছাইয়ের সঙ্গে প্রতিহিংসা-তুষের কিঞ্চিৎ আগুন মিশ্রিত ছিল, ছাই উড়িয়া নূতন যাহাদের উদ্ভব হইল 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে তাহারা বেড়া-আগুনের মূর্তি ধরিতে চাহিল, চারিদিকে বেড়িয়া পুড়াইয়া মারাই লক্ষ্য। প্রথম উদ্ভব হইল

'মহাকালে'র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কালো মলাটের উপর লাল কালির আগুন-অক্ষরে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল তিনটি শব্দ "শনিবারের চিঠির অশনি।" অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

এ সময়ে······'মহাকাল' নামে এক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যুক্তি। 'শনিবারের চিঠি' যেমন বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয়দের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো ক'জন শ্রদ্ধাভাজনদের—যাদের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা। 'মহাকালে'র সঙ্গে আমি, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 'মহাকাল' অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে মানুষের জীবনের ইতিহাস লেখে, কিন্তু এ 'মহাকাল' যে কিছুকাল পরেই নিজের ইতিহাসটুকু নিয়ে কালের কালিমায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এ একটা মহাশান্তি। —১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৮৭-৮৮

অচিন্ত্যকুমার বলিতে ভুলিয়াছেন যে তাঁহারা যে কারণেই হউক "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমের"ও "ব্রিফ" লইয়াছিলেন, হইতে পারে তাহা শেক্সপীয়র-প্রোক্ত নিছক সঙ্কটের বন্ধুত্ব। ক্রোধের বশে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর মত রুচিবাগীশ "সৃষ্টিকর্ত্তা" সাহিত্যিকেরা কতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন প্রথম সংখ্যা (১৩৩৬ বৈশাখ) 'মহাকাল' হইতে তাহার কিছু নমুনা দিতেছি :—

রামানন্দ বাবুর দাড়ির বহরটা দেখেছেন চোখ মেলে? একটা গোটা কম্বল বোনা যেতে পারে—ইয়ারকি নয়!···রামানন্দ বাবু খাইয়ে-দাইয়ে গোণা এক ডজন খেঁকি কুকুর পুষেছেন জানো? লেলিয়ে দিলে টেরটা পাবে বাছাধন। ঋষির সঙ্গে চালাকি নয়! নিরাকার ব্রহ্মের যদি হাত থাকতো তা হলে প্রার্থনা করতুম—হে ভূমা, তুমি এদের মাথায় গুণে গুণে তিনশ পঁয়ষট্টিটি গাঁট্টা মেরো। —পৃঃ ৩০-৩১

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র ব্রাহ্ম রাসবিহারী নাকি বাস্তবে বর্ত্তমান। তিনি অবশ্য জমিদারির ম্যানেজার নন, তিনি ম্যানেজার সাহিত্যের। আমাদের কাছে খাস রাসবিহারীর ছবি আছে 'দত্তা'র রাসবিহারীর কি দাড়ি ছিল? —পৃঃ ৩৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মির্জ্জাফর লুকিয়ে আছেন, আপনারা বোধ হয় জানেন না। এই লোকটির একটু পরিচয় নিচে দিলাম।

ইনি প্রথমে ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরী নেন। তার পর আশু বাবুর বাড়ীতে বছর খানেক ধন্না দেবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরী পান। চতুর লোক!—রমাপ্রসাদ মুখুয্যে এবং প্রমথ বাঁড়ুয্যের হাতে-পায়ে ধরে একটু একটু করে আশুতোষের নেকনজরে পড়বার সুযোগ করে নেন। তার পর স্যার আশুতোষ, রমাপ্রসাদ ও প্রমথ বাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি আদায় করে বিলাত যাত্রা করেন, এবং সেখান থেকে ফিরে স্যার আশুতোষের কৃপায় এবং রমাপ্রসাদ বাবু প্রমথ বাবু প্রভৃতির চেষ্টায় দিব্যি হোমরা-চোমরা একজন হ'য়ে ওঠেন। তখন আর পায় কে?···রমাপ্রসাদ বাবু এবং প্রমথ বাবুর চাকরি খাবার জন্তে এই মহানুভবটি যে কি প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তা দিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা হতে পারে। মহাকবি বাল্মীকি আজ বেঁচে থাকলে এই অপূর্ব জীবটিকেও বোধ হয় অমর করে রেখে দিয়ে যেতেন। তবে ভরসা এইটুকু যে, রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং হয়ত বা শেষ বয়সে একটা মহাকাব্য রচনা করে দয়া করে এই বিনীত সুনীতিরত মহাত্মাটিকে অমর করে রেখে দিয়ে যাবেন। —পৃ ৩৭-৩৮

বশিষ্ঠ-প্রিয়া অরুন্ধতী কি আছেন ঘরে?
গালি দাও তবে মহিলাজনেরে তৃপ্তি ভরে!
সীতা নেই ঘরে! কমলাও নেই! দিতেছ গালি
অন্যের ঘরে!—Scandal তবু ঘুরিয়া মরে!
জীবনের আধা কাটিল! বাজারে পাত্র কি নেই?
কাটলই যদি বিয়ে হল নাক' কেন সুধীরেই?
চাল্‌শেই যদি আসূল তবে এ আজি বা কালি
দাস হতে হবে? হ'লেই তা হ'ত ত শান্তিতেই।
—পৃ ১১

ইহা অপেক্ষাও বীভৎস খিস্তি-কথামৃত সেদিন ভবিষ্যৎ 'পরম-পুরুষ'কারের লেখনী-মুখে নির্গত হইয়াছিল যাহা আজ ছাপা চলে না। "সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে"র এই স্রোত রুদ্ধ করিয়া সনাতন মহাকাল যে বাংলা দেশের কি ক্ষতি সাধন করিতেছেন বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। মহাকালের প্রবাহে 'মহাকাল' তিন মাসের অধিক চলে নাই। আষাঢ় বা শেষ সংখ্যায় পণ্ডিচেরী-ফেরত বোমারু বারীন্দ্রকুমার, অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'মহাকাল'কে চতুরানন করা সত্ত্বেও 'মহাকালে'র কাল হইল। বারীনদা আষাঢ় সংখ্যায় "রাহু-ভারত" নামক এক মহাকাব্য সুরু করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহা আর শেষ হয় নাই। উপরের উদ্‌ধৃতিগুলি এবং "রাহু-ভারত" হইতে উদ্‌ধৃতি শুধু এই কারণেই "আত্ম-স্মৃতি"-ভুক্ত করিতেছি যে, 'মহাকালে'র এই সকল মহারত্ন এইভাবে ধরিয়া না রাখিলে বাংলা সাহিত্যের ভাবী উত্তরাধিকারীদের সেগুলি আর চোখে দেখারও সুযোগ মিলবে না, সম্ভবতঃ আমার কাছ ছাড়া 'মহাকাল'গুলি আর অন্য কুত্রাপি নাই। বারীনদার মহাকাব্যটি আমার, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এবং 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকথা লইয়া রচিত হইতেছিল। পয়ারে রচিত প্রস্তাবনার মর্ম এই—

বঙ্গদেশে নারী-অভ্যুদয় দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র আদি স্বর্গের দেবতারা একদা হতভম্ব, উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা প্রভৃতি রাগে হাঁড়িমুখ হইয়া আছেন এমন সময়

সিংহদ্বারে কোলাহল উঠিল, মুক্তকচ্ছ বৃদ্ধ নারদ কাহাদের যেন গালি পাড়িতে পাড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলেন, একপাল দেবশিশু ছেঁড়া জুতা লইয়া "নারদ নারদ" করিতে করিতে তাঁহাকে ক্ষ্যাপাইতেছিল—

মুক্তকচ্ছদশা মুনি মহাক্রোধ ভরে
শাপান্ত করেন যত দেব-বালকেরে,—
"যেমন করিলি মোরে হেথা মুখখিস্তি
মানুষ হইয়া পাও এই মত শাস্তি।
কবি হ'য়ে জন্মি সবে লেখ কামায়ন,
এক গাছি কেশ মোর করি উৎপাটন
পাঠাব বাঙলা দেশে মানুষ করিয়া
ঠেঙায়ে তোদের ভূত দিবে ছাড়াইয়া।
রাহু-মণ্ডলের সেই হবে সম্পাদক
আত্মা তারে দিবে এক লড়ায়ে মোরগ।
তীক্ষ্ণ দন্ত চার পাটি দিবে যত খেঁকী
গুঁতাবার বল দিবে সে ষণ্ড পিনাকী।
শত পদী-পিসী আর মেছনি ছানিয়া
গড়িব তাহাকে সেই জিহ্বামৃত নিয়া,
জগতে হইবে মহা রাহু-জয়-জয়
কুঁদুলে চণ্ডীর নাম বঙ্গেতে অক্ষয়।"
অশোক সজনী নাম তৃতীয় পর্ব্ব
সেই উৎপাটিত কেশ মহা ভয়ঙ্কর
সূর্য্যলোক ভেদি চলে মর্ত্ত্যলোক পর।...
হাঁ হাঁ করি দেবসভা আকুলিয়া ওঠে,
কাটিতে ভীষণ কেশ বিষ্ণুচক্র ছোটে
দ্বিখণ্ড করিয়া তারে চক্র ফিরি যায়,
কার সাধ্য তবু মুনি-শাপেরে খণ্ডায়?...
হাসিয়া বিষ্ণুর প্রতি কহিলা নারদ,
"ভালই করিলে প্রভু কাটিয়া আপদ।...
বিষ্ণু-চক্রে কাটি দেব, করিয়াছ ভাল,
দ্বৈত তেজ হ'য়ে উভে জ্বালিবে যে আলো,—
সে জ্ঞানে ব্রহ্মের কুল হইবে উল্লাস,
উভে মিলি রাহু-পত্র করিবে প্রকাশ।
দুই জনে হবে অতি মেধাবী বালক
সজনী প্রবন্ধ আর লিখিবে শোলক,
তাড়নায় চলিবে সে অশোক-চট্টের,
লভিবে অমর যশ দুর্ম্মুখ-ভট্টের।...
রাহু-ভারতের কথা অমৃত সমান
শাপান্তে হইবে ওরে কেশ-অন্তর্ধান।
হৃতশক্তি সে সজনী তবু তারোপর
বাহির করিয়া দন্ত রবে নিরুত্তর।
—'মহাকাল', আষাঢ়, ১৩৩৬ পৃষ্ঠা ১০-১৫

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের গূঢ় কারণও অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবেরা এই সংখ্যার ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় জাহির করিলেন—

কিছুকাল বাদে খেঁটুর পয়সায় এক পত্রিকা বাহির হইল—নাম হইল 'লড়ায়ে মোরগ'। বছর খানেক ধরিয়া, জনকয়েক ছোকরা সাহিত্যিক এমন ভালো লিখিতে সুরু করিয়াছিল যে, অবিলম্বে তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদের ভাত মারিয়া দিবে, এমন আশঙ্কাও হইল। কারণ, তাহাদের কারবার ফাঁকির নয়, ধাপ্পা মারিয়া তাহারা ব্যবসা বজায় রাখে না। মহা মুস্কিল! এই সব কচুকে ছোঁড়াদের অকাল-পক্বতা অসহ্য!

তাই 'লড়ায়ে মোরগে'র আবির্ভাব!

সম্পাদক হইল সজিনা নামক 'বিদেশী'র বোকা ছাপাখানার ভূতটা।

'শনিবারের চিঠি' দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন হইতে আজিও বাঁচিয়া আছে বলিয়া তাহার গায়ে নিন্দা-কটূক্তির যে ছাপ লাগিয়াছিল তাহা এখনও উঠে নাই; কিন্তু 'কল্লোল'-ওয়ালারা বার বার মরিয়া বার বার জন্ম পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদের কলঙ্ক-কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে; এখন তাঁহারা অতীতের নিষ্কলুষ শুচিতারও বড়াই করিতে লজ্জা পাইতেছেন না। অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগে' এই মিথ্যা দম্ভের বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের প্রথম তিন মাসের ইতিহাস যদি অচিন্ত্যকুমার 'মহাকাল যুগ' নাম দিয়া বাহির করিতেন তাহা হইলে 'কল্লোল যুগে'র মর্যাদা আরও বাড়িত। কিন্তু 'মহাকাল যুগে'ই এই ইতিহাসের সমাপ্তি নয়। এই বৎসরের শেষ তিন মাস অর্থাৎ মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্রকে 'রবিবারের লাঠি'র যুগ বলিতে হইবে এবং এইখানেই 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে জেহাদের শেষ। এই 'রবিবারের লাঠি' আরও নিকৃষ্ট, আরও কর্দমাক্ত রূপ লইয়া মাঘ মাসে (১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। ইহার মলাটে ছিল ভূমণ্ডলের উপর উপবিষ্ট এক সকঞ্চি বংশদণ্ড-ধৃত তরুণ, দণ্ডের প্রান্তভাগে একটি মোরগ গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝোলানো। 'শনিবারের চিঠি'র সহিত নাম-সামঞ্জস্যে এই বর্ণগন্ধস্বাদহীন কাগজটার নামই লোকে মনে রাখিয়াছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 'মহাকালে'র কথা আর কাহারও স্মরণে নাই। 'রবিবারের লাঠি'র কোন লেখাই উদ্ধারের যোগ্য নয়।

'কল্লোলে'র এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বেই খাস কল্লোলীরা এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩৩৫এর শেষে অচিন্ত্যকুমার 'বিচিত্রা'র চাকুরি লইলেন—"আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর।" স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ চলচ্চিত্রের

কারখানাতে দৃশ্য-সজ্জার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্বপলাতক শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্রের মধ্যে প্রেমেন্দ্র দৈনিক 'বাংলার কথা'র নিশি-সম্পাদকের দলে ভর্তি হইয়াছিলেন; পরম্পরায় শুনিতাম তিনি সেখানে সুখী ছিলেন না। কিছুকাল এদিক ওদিক ভ্রাম্যমান শৈলজানন্দ শেষ পর্যন্ত বিপরীতের আকর্ষণে আমাদের সমীপবর্তী হইলেন। পরে আসিলেন, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র প্রবোধও আসিলেন, কিন্তু অন্যভাবে।

শৈলজানন্দ আমার দেশের অর্থাৎ বীরভূমের লোক। তাঁহার প্রতি দেশোয়ালী প্রীতি আমার বরাবরই ছিল। তাহা ছাড়া আমরা একই বাংলা সালের (১৩০৭) ফল হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আমার অগ্রজ—শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন 'প্রবাসী'তে তাঁহার কয়লা-কুঠীর গল্পগুলি বাহির হইতেছিল। সেই গল্পগুলি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, শরৎ-উত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতনের অগ্রদূত যদি কাহাকেও বলিতে হয় সে এই শৈলজানন্দকেই বলা চলে। কয়লাখাদের কুলী, কামিন, অতি নগণ্য বাবু-চাকুরেদের লইয়া যে মর্মস্পর্শী কাহিনী রচনা করা যায় তাহা তিনিই প্রথম দেখাইলেন। শুরু হইতেই তাঁহার ভাষার অপরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল। ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ, সব কথা না বলিয়াও সকল কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার ভঙ্গি শৈলজানন্দের স্বভাবতই আয়ত্ত ছিল। অথচ তাঁহার মধ্যে কোথায়ও অস্পষ্টতা ছিল না। পরিচয় হইলে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলাম, ভাষার মত তাঁহার অক্ষর-গ্রন্থনও চমৎকার। শৈলজানন্দের এই লিখন-ভঙ্গি অনুসরণ করিতে গিয়া তরুণ প্রবোধকুমার নানা দিক দিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানি।

শৈলজানন্দ চাকুরির সন্ধানে 'প্রবাসী'তে আসিলেন। অবস্থা এমন যে-কোনও সামান্য চাকুরি হইলেই চলিবে। চাকুরি তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পদমর্যাদা ঠিক কি হইয়াছিল আজ স্মরণ নাই। সম্ভবত প্রুফ দেখার কাজেই তিনি বহাল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ খাস আমারই ডিপার্টমেণ্টে। পূর্বরাগ ছিলই, তিনি আসিবামাত্রই আমরা "একপ্রাণ, একটিকিট" হইয়া গেলাম। তুচ্ছ আর গম্ভীর গল্প বলিয়া এমন আসর জমাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভূতের গল্প, সাপুড়ের গল্প, খুনের গল্প—তাঁহার অফুরন্ত ষ্টক ছিল; তিনি জীবনকে নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়াছিলেনও। 'প্রবাসী'র ছাপাখানার প্রুফ-রীডারের চেয়ারে অমন একটা মানুষ বেশিদিন টিকিতে পারেন না। শৈলজানন্দ অচিরাৎ সরিয়া পড়িলেন কিন্তু সৌহার্দ্যের যে রেশটুকু আমার মনে রাখিয়া গেলেন তাহা আজও অম্লান হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, উহার পরে নানাভাবে তাঁহার সম্পর্কে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। সে সব কথা পরে বলিব। শৈলজানন্দ এই সময় হইতেই চলচ্চিত্র লইয়া মাথা ঘামাইতেন, ইহা স্মরণ আছে।

পলাতক শৈলজানন্দের পরিত্যক্ত আসনে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া বসিলেন। 'প্রবাসী'তে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র আখড়ায় আসিতে শৈলজানন্দের সঙ্কোচ ছিল না, কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত 'কল্লোলে'র পবিত্রকে নিশ্চয়ই আমল দিবেন না। তাই তিনি কাহাকে যেন সুপারিশ স্বরূপ ধরিয়া আনিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, সাহিত্যিকেরা যখন কলম চালায় তখনই তাহাদের দল থাকে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহারা বন্ধু ও সগোত্র। অপরিচয়ের আড় ভাঙিতে একদিন মাত্র লাগিয়াছিল। পরের দিন হইতেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্রদা হইলেন। সেই সম্পর্ক আজও বজায় আছে। তাঁহার চলমান জীবন তাঁহাকে ভিন্ন পথে লইয়া গেলেও তিনিই যে একদা অতি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নজরুল ইসলামকে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেই প্রথম সন্দর্শন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল এ কথা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

'কল্লোলে'র অন্তরঙ্গ দল বলিতে যাহা বুঝায় নজরুল ইসলাম ও প্রবোধকুমার সান্যাল কখনই তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা স্বভাব-যাযাবর, মানস-সরোবর-বিহারী হংসের মত ঋতুবিশেষে আসিয়া জুটিয়াছেন, আবার উড়িয়া গিয়াছেন। কলগুঞ্জনে নিকট পরিবেশকে মুগ্ধ—অভিভূত করিবার ভগবদ্দত্ত শক্তি ছিল নজরুলের—ঝাঁকে মিশিয়া আত্মহারা তিনি কখনই হন নাই। এই কারণে 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া গেলেও এই দুই জনের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে নাই!

[ক্রমশঃ।

৪

অপবিদ্ধ-করণ

শ্রীভরত—"আবর্ত্য শুকতুণ্ডাখ্যমূরুপৃষ্ঠে নিপাতয়েৎ।
বামহস্তশ্চ বক্ষঃস্থোঽপ্যপবিদ্ধং তু তদ্ভবেৎ"। (Sl. 64)

অনুবাদ :—শুকতুণ্ডাখ্য-হস্তমুদ্রান্বিত দক্ষিণহস্তটিকে উরু-পৃষ্ঠে নিপাতিত করে থামাতে হবে ; এবং বামহস্তটি বক্ষঃস্থ হয়ে থাকবে। একেই বলে "অপবিদ্ধ-করণ"।

* * * *

ভারতনট।—একবার চোখ বুলোলেই দেখতে পাওয়া যায়,—শ্রীভরতের এই শ্লোকটি অত্যন্ত সহজ। কেমন ক'রে শুকতুণ্ড-হস্ত করতে হয়, তা পূর্ব্বেই ৬৩ শ্লোকে (ভঃ নাঃ শাঃ) বলা হয়ে গেছে। উরুপৃষ্ঠে সেই হস্তটিকে নিপাতিত করাও অতি সহজ এবং বক্ষঃস্থানে বাম হাতখানিকে স্থাপন করার ব্যাপারটি এমন কিছু গুরুতর নয়। এর একটি রেখা-চিত্র দ্রুত আঁকতে তুলিকা দেবীকেও কিছু কষ্ট ওঠাতে হবে না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সবই সহজ, সবই ভাল ; কিন্তু কেমন যেন মন ভরে উঠছে না। কেন উঠছে না ?

তার কারণ—ঐ "অপবিদ্ধ" সংজ্ঞাটি। এই করণের সংজ্ঞাটি সত্যিই গুরুগম্ভীর। মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ স্বামী নাইডু এই সংজ্ঞাটির ইংরাজী রূপান্তর করেছেন "Violent Shaking off"। তাই খুঁজতে বসে গেলুম।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

এই "অপবিদ্ধ" শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে—অপ + ব্যধ + ক্ত।

ব্যধ ধাতুর অর্থ হচ্ছে…"তাড়না করা" ;—to pierce, transfix, hit, strike, wound (ঋগ্বেদে) ; to shake, to wave (মহাভারত যুগে)।

"অপ"—এই উপসর্গটির অর্থ হচ্ছে "সম্ ইতি একীভাবম্।"

সমনখ-করণ

"বি-অপ ইতি-এতস্য প্রাতিলোম্যম্।" (নিঃ ১.১) অতএব একীভাবের প্রাতিলোম্য। অনেক ভাব, বা বিবিধ ভাব।

অতএব এই "অপবিদ্ধ"—সংজ্ঞাটির অর্থ আমরা নিরাপদে করতে পারি—অনেক বা বিবিধ ভাবে তাড়িত ইত্যাদি। হেমচন্দ্রও এই অর্থ করেছেন; যথা:—"নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত।" উইলসন্ প্রমুখ বহু আভিধানিক বহু অর্থ করেছেন এই অপবিদ্ধ সংজ্ঞাটির। যথা:—"ত্যক্ত", "বিচূর্ণিত" "ক্ষিপ্ত" ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি কথা-মাত্রে আমাদের গ্রহণীয় হতে পারে না।

সুতরাং এখন ধাত্বর্থের ডমরু-ধ্বনির বাইরে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি:—টীকাকার শ্রীঅভিনবগুপ্ত যে অর্থ টি গ্রহণ ক'রে শ্রীভরতের এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন, সেইটি—সিদ্ধ।

তাঁরই মতাবলম্বী হয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়াই এখন কর্তব্য। তাই করছি। এই পথে না চললে আমরা রসের পথে চলতুম না, রসাভাসের পথেই আস্বাদ পেতুম দুর্গতির।

শ্রীঅভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যাটি অনুধাবনযোগ্য। তার মূলে রয়েছে নৃত্যের 'করণ' প্রয়োগের সঠিক সমাধান। করণগুলি Static। এখানেই ওর শেষ। কিন্তু করণগুলি যে পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে আলঙ্কারিক সমাপ্তিতে এসে পৌঁছয়, তার কোথাও ইঙ্গিত নেই নাট্যশাস্ত্রে। মিলনের পূর্ব্বে যেমন পূর্বরাগ থাকে তেমনি করণগুলির সমাধানের পূর্ব্বেও থাকে আনুষ্ঠানিক সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাই তিনি ব্যক্ত ক'রে যেন বলেছেন:—

যে-রসের সুধারা তুমি প্রকাশ করবার প্রয়াস করছ—তার অতীতেও কিছু প্রয়োগ-নৈপুণ্য ছিল। এই 'অপবিদ্ধ'-করণের সেই অতীত তোমরা শোনো। নৃত্তের বিলাসের মধ্যে যখন এই করণটির হঠাৎ-প্রয়োগের প্রয়োজন ঘটবে তখন প্রথমতঃ,—চতুরস্রে রেখো তোমার অভিনয়-হস্তবিন্যাস।

ঐ দেখো। 'চতুরস্র' আবার কি? অতএব,—আসতেই হোলো ব্যাখ্যার।

চতুরস্র:—

বক্ষসোঽষ্টাঙ্গুলস্থৌ তু প্রাঙ্মুখৌ খটকামুখৌ।
সমানকূর্পরাংসৌ তু চতুরস্রৌ প্রকীর্তিতৌ"।
(ভঃ নাঃ শাঃ ১০ ১৮৪০)।

অর্থাৎ—"স্তন-শীর্ষের আট আঙুল দূরে তোমার দুটি অভিনয়হস্ত। দর্শকদের দিকে অভিমুখিন ক'রে রাখো, দুটি হস্তই থাকবে 'খটকামুখ' মুদ্রায়। কূর্পর (কনুই) এবং অংস (কাঁধ) দাঁড়ি-পাল্লার মত, দুদিকে দুলতে থাকবে সমান-ওজনে। তাহলেই হবে "চতুরস্র"।

এখন—'খটকামুখ'—এই শব্দটি আবার গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। সমাধান করতেই হবে। কিন্তু "খটকামুখ" জানতে হ'লে "মুষ্টিহস্ত", শিখরহস্ত, এবং কপিত্থহস্ত আগে জানতে হবে এবং তার পরে কটকহস্ত!—কাজে কাজেই সব কটি সম্বন্ধেই চিত্রের দর্শনিকা দিয়ে বলছি:—

মুষ্টিহস্ত:—

অঙ্গুল্যোর্যস্য হস্তস্য তলমধ্যেঽগ্রসংস্থিতা।
তাসামুপরি চাঙ্গুষ্ঠঃ স মুষ্টিরিতি সংজ্ঞিতঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ৫৫)

এষ প্রহারে ব্যায়ামে নির্গমে পীড়নে তথা।
সংবাহনেঽসিযষ্টীনাং দণ্ডকুন্তগ্রহে তথা।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ৫৬)।

অর্থাৎ:—দুই করের, বুড়ো আঙুল দুটি বাদে, যে আটটি আঙুল থাকে সেই আঙুলগুলির অগ্রভাগ করের তলদেশে স-জোরে স্থাপিত ও বদ্ধ করো। এবং এই আঙুলগুলির উপরে দুটি করের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন রাখো। তাহলেই "মুষ্টি-হস্ত" সম্পন্ন হোলো।
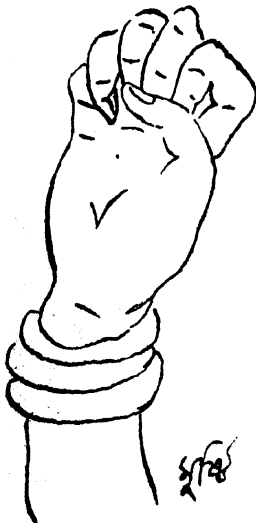
নিম্ন-গ্রথিত স্থলবিশেষে মুষ্টিহস্তের প্রয়োগ হয়। যথা :—

(১) প্রহারে ; এটির স্বয়ং জ্ঞান সকলেরই আছে।

(২) ব্যায়ামে ; প্রতিমল্লের প্রকোষ্ঠ গ্রহণ এবং খড়্গযুদ্ধের ব্যায়ামে।

(৩) নির্গমে ;—অর্থাৎ আর্দ্রক-সুরাদির রস নিষ্কাশনের অভিনয়ে।

(৫) পীড়নে ;—অর্থাৎ স্তনপীড়ন, মহিষাদি দোহনের অভিনয়ে।

(৬) সংবাহনে ;—অর্থাৎ মাটি-ঠাসা (মৃৎপীড়ন) বা গা-দাবানোর অভিনয়ে ; অসি ছুরিকা বা লাঠিখেলার অভিনয়ে।

(৭) দণ্ড, বা কুন্তাদি অস্ত্রের গ্রহণের অভিনয়ে।

শ্রীনান্দীকেশ্বর অভিনয়দর্পণের ১১৬-১১৭ নং শ্লোকে বলেছেন—"স্থিরভাব, কেশগ্রহণ, দৃঢ়তা, বস্তু প্রভৃতির ধারণ ও মল্লগণের যুদ্ধভাব বুঝাইতে মুষ্টিহস্তের প্রয়োজন।"

শ্রীশার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে (৭,১৩০,১৩১) একই কথা বলেছেন ; কেবল একটি দফা বাড়িয়েছেন। সেটি—

(৮) "ধাবনে" ; অর্থাৎ দৌড়ানোর অভিনয়ে (Racing) বা কাপড় কাচার অভিনয়ে। (Washing)।

এগুলি আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রহণ করায় কিছু অসমীচীনতা দেখতে পাচ্ছি না।

"শিখরহস্ত" :—

অস্যৈব চ যদা মুষ্টেরূর্দ্ধোঽঙ্গুষ্ঠঃ প্রযুজ্যতে।
হস্তঃ স শিখরো নাম তদা জ্ঞেয়ঃ প্রযোক্তৃভিঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ৫৭)

রশ্মিকুশাঙ্কুশধনুষাং তোমরশক্তিপ্রমোক্ষণে চৈব।
অধরোষ্ঠপাদরঞ্জনমলকস্যোৎক্ষেপণে চৈব।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯, ৫৮)

অর্থাৎ :—মুষ্টিহস্তের উর্দ্ধে, যখন বুড়ো আঙুলটিকে খুলে নিয়ে সেটিকে বহিঃপ্রসারী করে, উন্নত কোরে দেওয়া হয় তখন সেই মুদ্রাটিকে বলা হয় "শিখর-হস্ত"।

করাঙ্গুলির আপনা হতেই এই রকম সংগঠন হয়ে যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে। যথা :—

(১) রশ্মি ;—লাগাম ধরার অভিনয়ে।

(২) কুশ, অঙ্কুশ, ধনুক, তোমর, শক্তি ইত্যাদির গ্রহণ বা মোচনের অভিনয়ে।

(৩) অধর, ওষ্ঠ, এবং চরণতলের রঞ্জনের অভিনয়ে।

(৪) গণ্ড-প্রহারী অলকগুলিকে সরিয়ে দেবার অভিনয়ে।

শ্রীশার্ঙ্গদেব একই কথা বলেছেন তাঁর (৭, ২৩২।২৩৩ শ্লোকে)।

শ্রীনান্দীকেশ্বর অনেক কিছু বাড়িয়েছেন।

"মদনে কার্ম্মুকে স্তম্ভে নিশ্চয়ে পিতৃকর্মণি।
ওষ্ঠে প্রবিষ্টরূপে চ রদনে প্রশ্নভাবনে।
লিঙ্গে নাস্তীতি বচনে স্মরণেঽভিনয়ান্তিকে।
কটিবন্ধাকর্ষণে চ পরিরম্ভবিধিক্রমে।
ঘণ্টানিনাদে শিখরো যুজ্যতে ভরতাদিভিঃ।"
(অভিঃ দঃ ১১৯, ১২০)

শিখর হস্ত.

শ্রীনান্দীকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দিচ্ছি, তার অনুবাদগুলি কিন্তু আমার নয়। সেগুলি করেছেন শ্রদ্ধেয় ৺অশোকনাথ শাস্ত্রী। নিঃসঙ্কোচে এবং তাঁর ব্রাহ্মণোচিত বদান্যতায় স্নেহদানরূপে আমি সেগুলিকে গ্রহণ করেছি।

অনুবাদ :—"কামভাব (অথবা মদনদেব), ধনু, স্তম্ভ, নিশ্চয়, পিতৃতর্পণ (বা শ্রাদ্ধ), ওষ্ঠ (রঞ্জন), প্রবিষ্ট (বস্তুর) রূপ, দন্ত, প্রশ্নভাবনা, (শিব)-লিঙ্গ, 'না'—বলা, স্মরণ, অভিনয়, সামীপ্য, কটিবন্ধের আকর্ষণ, আলিঙ্গন-বিধির উপন্যাস, ঘণ্টানিনাদ প্রভৃতি বুঝাইতে ভরত প্রভৃতি (নাট্যশাস্ত্রকারগণ) কর্তৃক শিখর প্রযুক্ত হয়।"

"কপিত্থ-হস্ত" :—

"অস্যৈব শিখরাখ্যস্য হ্যঙ্গুষ্ঠকনিপীড়িতা।
যদা প্রদেশিনী বক্রা স কপিত্থস্তদা স্মৃতঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯. ৫৯.)

অসিচাপচক্রতোমরকুন্তগদাশক্তিবজ্রবর্গানি।
শস্ত্রাণ্যভিনেয়ানি তু কার্য্যং পথ্যং চ সত্যং চ।"
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯. ৬০.)।

অর্থাৎ :—'শিখর-হস্তে'র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ডগায় তর্জ্জনীটিকে (প্রদেশিনী) সজোরে বাঁকিয়ে রাখো। অন্য অঙ্গুলিগুলি করতলেই লগ্ন থাকবে। করযুগের এই রচনাই 'কপিত্থ-হস্ত'।

অসি, ধনুক, চক্র, তোমর, কুন্ত, গদা, শক্তি, বজ্র ইত্যাদি পর্য্যায়ের যত শস্ত্র আছে, তাদের প্রয়োগ-শৈলীর যদি অভিনয় করতে হয়, তাহলে প্রয়োজন হয় "কপিত্থ-হস্তে"র। ছোটিকা-প্রয়োগের (অর্থাৎ তুড়ি-মারা) (Snapping of the thumb & the forefinger) অভিনয় করেও বীররসের প্রকাশ করা যেতে পারে কপিত্থ-হস্তে। এই ক্রিয়াই রসের পথ্য এবং সত্য।

শ্রীশার্ঙ্গদেব (অভিঃ দঃ ৭. ১৩৪।১৩৫) শ্লোকে একই মত পোষণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন,—শরাকর্ষণাদির অভিনয়ে এই "কপিত্থ-হস্তের" ব্যবহার সমীচীন।

কিন্তু শ্রীনান্দীকেশ্বর (অভিঃ দঃ ১২২।১২৩) যা বলেছেন, তা একেবারেই বিপরীত। শ্রীভরতে পাই যুদ্ধ-ক্রিয়া, কিন্তু শ্রীনান্দীকেশ্বরে পাই ললিত-ক্রিয়া। যথা :—

"লক্ষ্ম্যাশ্চৈব সরস্বত্যাং নটানাং তালধারণে।
গোদোহনেঽপ্যঞ্জনে চ লীলাকুসুমধারণে।
চেলাঞ্চলাদিগ্রহণে পটস্যৈবাবগুণ্ঠনে।
ধূপদীপার্চ্চনে চাপি কপিত্থঃ সম্প্রযুজ্যতে।"

অর্থাৎ :—"লক্ষ্মী ও সরস্বতী (দেবীর প্রতিমাতে) নটগণের তালধারণ, গোদোহ, অঞ্জন, লীলাকুসুম-ধারণ, বস্ত্রাঞ্চল ধারণ, বস্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন ও ধূপদীপ দ্বারা (দেবতার) অর্চ্চনা প্রভৃতি বুঝাইতে কপিত্থ-হস্ত প্রযুক্ত হয়।" (শ্রী-অঃ-শাস্ত্রী)

কিন্তু আমাদের পক্ষে ভরত-মতই গ্রহণ করা যুক্তিসংগত। এতটা প্রভেদ যে, সাধারণ্যে না জানালে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারতুম না।

"খটকামুখহস্ত" :—

"উৎক্ষিপ্ত-বক্রা তু যদানামিকা সকনীয়সী।
অস্যৈব তু কপিত্থস্য তদাসৌ খটকামুখঃ।
হোত্রং হব্যং ছত্রং প্রগ্রহপরিকর্ষণং ব্যজনকং চ।
আদর্শ-ধারণং খণ্ডনং তথা পেষণং চৈব।
আয়তদণ্ডগ্রহণং মুক্তাপ্রালম্বসংগ্রহং চৈব।
স্রগ্‌দামপুষ্পমালাবস্ত্রান্তালম্বনং চৈব।
মন্থনশরাবকর্ষণপুষ্পাবচয়প্রতোদকার্য্যাণি।
অঙ্কুশরজ্জ্বাকর্ষস্ত্রীদর্শনমেব কার্য্যং চ।"
(ভঃ নাঃ শাঃ ১৬০—৬৩)

অর্থাৎ :—কপিত্থ-করের অনামিকা অঙ্গুলিটি যখন কনিষ্ঠাটিকে সঙ্গে নিয়ে, করের তলদেশ ত্যাগ ক'রে, উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে বক্র এবং বিরল অবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই কপিত্থ-করের নব ভঙ্গিটিকে "খটকামুখ" বলা হয়।

নিম্নবর্ণিত ব্যাপারের অভিনয়ে খটকামুখের প্রয়োগ বিধেয়। যথা :—

(১) হোত্র ;—হোমের স্রুক্‌, চমস ইত্যাদির গ্রহণ,
(২) হব্য ;—হোমের ঘৃতপুরোডাশাদির দান বা গ্রহণ,
(৩) ছত্র-ধারণ,
(৪) গতিরোধের উদ্দেশ্যে বল্গা টেনে ধরা,
(৫) ব্যজনক ;—অর্থাৎ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা,
(৬) দর্পণ-ধারণ,
(৭) খণ্ডন ;—অর্থাৎ তালবৃন্ত দিয়ে বাতাস করা,
(৮) কুঙ্কুম-মৃগমদাদির পেষণ,
(৯) আয়তদণ্ড-গ্রহণ,
(১০) বুকের মধ্যে মুক্তামালার নহরগুলিকে ধরা,
(১১) বিবাহাদিতে, বধূদের প্রণয়কোপে বা পথানুসরণে ফুলের মালা বা মেয়েদের আঁচল ধরা,
(১২) মন্থন, শরাবকর্ষণ, পুষ্পাবচয়ন, জলতোলা,
(১৩) অঙ্কুশ বা রজ্জু দিয়ে আকর্ষণ বা লীলাভরে কেশাকর্ষণ, এবং (১৪) স্ত্রীদর্শন।

সঙ্গীতরত্নাকরের (৭. ১৩৬-১৩৯) শ্লোকে এবং অভিনয়-দর্পণের (১২৫, ১২৬) শ্লোকে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পৃথকতা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই, তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা পরিহার করলুম। তাঁরা—

(১) "নাগবল্লী"-(তাম্বূল) দান ও
(২) চামর-গ্রহণ, মাত্র এই দুটি দফা বাড়িয়েছেন।

আমার বন্ধুবর হঠাৎ একদা প্রশ্ন তুললেন—"ওহে, দু'রকমেরই ত পাঠ দেখতে পাই। ওটা 'কটকামুখ' হবে, না 'খটকামুখ' হবে?"

সন্দেহ নিরসন ক'রে দেখলুম, শ্রীভরত যে 'খটকামুখ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেইটিই এতাবৎকাল গ্রাহ্য হয়েছে ভারতবর্ষে। 'অমরকোষ, এবং "পুরাণসর্বস্ব"—ঐ শব্দটিই গ্রহণ করেছেন। এমন কি নবতন মনিয়র উইলিয়মসও এ ক্ষেত্রে দ্বিধা করেন নি। শব্দকল্পদ্রুম ইত্যাদি এ শব্দ-বিষয়ে নিঃশব্দ। শ্রীঅভিনবগুপ্ত এই শব্দটিকে আবার ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছেন। যথা :—

"খট কাঙ্ক্ষায়াম্‌। ইত্যস্য ক্ষুৎ-তৃট্‌ পিপাসার্ত্তয়োরিতি বুন্‌।
খটকো বিটভোগ্রধুঃ (?) তস্য আমুখে যতোঽয়ং বক্ষ্যতে
অতঃ খটকামুখঃ।"

পদ-পাঠের গোলমালের জন্য এই ব্যাখ্যাটি বুঝে ওঠা দুরূহ।

কিন্তু অন্যত্র পাচ্ছি—'খটক' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবাহ ব্যাপারে লিপ্ত 'ঘটক'; এবং 'আমুখ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'to the face'।

সব কিছু তর্কের জঞ্জাল স্লেট থেকে মুছে ফেললেও একটি কথা জেগে থাকে। সেটি হচ্ছে এই,—

—যে আকাঙ্ক্ষা করে, সে যদি তোমার সম্মুখে নব-রসের মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করতে চায়, তাহলে তাকে ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হবে এই "খটকামুখ"—হস্তমুদ্রায়।

যাক্. "অপবিদ্ধ"-করণের ব্যাখ্যা করতে করতে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা। এসেছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে কাজ গুছিয়ে ফেলেছি অনেকটা। চারটি হস্তমুদ্রার কথা প্রসঙ্গতঃই তো বলা হয়ে গেল; পরে আর প্রয়োজন হবে না ব্যাখ্যাড়ম্বরের।

হাঁ, একটা কথা। হাতের কাজের কথা বলেছি, পায়ের কাজের কথা বলিনি।

"কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য আক্ষিপ্য স্বস্তিকং ন্যসেৎ।
জঙ্ঘাস্বস্তিকসংযুক্তা চাক্ষিপ্তা নাম সা স্মৃতা।"
(ভাঃ নাঃ সাঃ ১০, ৩৭)

অর্থাৎ :—আকাশচারী এই নৃত্যে, মাটি ছাড়িয়ে উপর দিকে তোলো তোমার গোড়ালী, মাটির দিকে ঝুঁকে থাকবে তোমার পদাঙ্গুলিগুলি। একটু বেঁকে থাকবে কোমর।

উৎক্ষিপ্তা যস্য পার্ষ্ণিঃ স্যাদ্ অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতা স্তথা।
তথাকুঞ্চিতমধ্যশ্চ স পাদঃ কুঞ্চিতঃ স্মৃতঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ১০.২১৮ also see ১, ২৭১)

ত্রিতল উল্লম্ফনের পর নীচে যখন জঙ্ঘা দুটিকে প্রসারিত ক'রে নামবে তখন স্বস্তিক রচনা কোরো তোমার চরণের চতুর অবস্থানে। একেই বলে "আক্ষিপ্তা" চারী। ষোড়শ আকাশিকী চারী-নৃত্যের মধ্যে ইনি অন্যতম।

এই গেল "অপবিদ্ধ"-করণের পায়ের কাজ।

এখন, হে ভবিষ্যনটী, টীকার সংহিতা ভুলে যাও। মনে রেখো, অভিনয় করতে করতে নৃত্যের মধ্য দিয়ে তোমাকে প্রকাশ করতে হবে একটি বিশেষ ভাব। ধরো, তোমার মূক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করবার জন্যে মনোনীত করে নিয়েছে এই 'অপবিদ্ধ'-করণ। তখন তুমি কি করবে?

অতএব বাজাও তোমার নূপুর। নাচতে নাচতে হঠাৎ স্তনক্ষেত্রের আট আঙুল দূর "খটকামুখ" মুদ্রায় রাখো তোমার দুটি হস্ত। কর দুটি দর্শকদের দিকে অভিমুখী করে রাখবে। ধীরে ধীরে দুলতে থাকবে দু'দিকের কনুই এবং কাঁধ,—দাঁড়িপাল্লার মত, সমান-ওজনে। তার পরে তালের ও সঙ্গীতের অনুসরণ কোরে দক্ষিণ হস্তখানিকে আবর্তিত করতে করতে, নিষ্ক্রান্ত কোরে দাও সেটিকে। দিয়েই, সমকালে পা-দুটিকে "আক্ষিপ্তা" আকাশিকী চারী-নৃত্য করে নাচতে থাকো। এই পায়ের কাজ সাধতে সাধতে ঐ দক্ষিণ হস্তখানিকে "শুকতুণ্ড" কর। তার পরে সবেগে দক্ষিণ চরণ পাতনের সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ উরুপৃষ্ঠে নিপাতিত করো দক্ষিণ কর। বামহস্তখানি কিন্তু প্রথম থেকেই স্তনক্ষেত্রের আট আঙুল দূরে যেমন 'খটকামুখ' মুদ্রায় অবস্থিত ছিল, তেমনিই অচঞ্চল থাকবে শেষ পর্য্যন্ত। "অপবিদ্ধ" নাম থেকেই বুঝতে পারছ, এই করণে সূচিত হয়েছে নৃত্য-বর্তনার চাতুর্য্য।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণে রেখো। অসূয়া বা কোপ-বাক্যের মূকাভিনয়েও এই 'অপবিদ্ধ-করণ'টিকে আহ্বান করা হয়। সাফল্য পাবে।

৫

সমনখ-করণ

শ্রীভরত। "শ্লিষ্টৌ সমনখৌ পাদৌ করৌ চাপি প্রলম্বিতৌ।
দেহঃ স্বাভাবিকো যত্র ভবেৎ সমনখং তু তৎ।" (Sl. 65)

অনুবাদ :—পা-দুটি সেঁটে থাকবে। প্রলম্বিত কর দুটিও তাই। হস্ত এবং পদ হবে "সম-নখ"। দেহের অবস্থান হবে স্বাভাবিক। একেই বলে 'সমনখ'-করণ।

* * * * * * *

ভারতনট। এই করণটি অতি সুষ্ঠু। এর Symmetry অসাধারণ। ঐটিই এর বৈশিষ্ট্য। এর হস্ত-বিরচনের শৈলীটিকে বলা হয় "লতাহস্ত", বা "প্রলম্বিত-কর"। প্রাশস্ত্যে দীর্ঘ-কর। বিশেষ কিছু বলবার নেই।

তাই "লতাহস্ত" ও "পতাক-হস্ত" সম্বন্ধে এখানে বলব।

লতাহস্ত। "তির্য্যক্ প্রসারিতৌ চৈব পার্শ্বসংস্থৌ তথৈব চ।
লতাখ্যৌ চ করৌ জ্ঞেয়ৌ নৃত্যাভিনয়নং প্রতি।"
(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ১১৮)।

অর্থাৎ :—এই হস্তের কর দু'খানি যখন "পতাক"-মুদ্রায় তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হ'য়ে পার্শ্ব-সংস্থ হয় তখন তাকে বলা হয় "লতা-কর"। নৃত্যটিকে অভিনয়ন করতে এটি বিশেষ উপকারী। এই কর যেন পথ-প্রদর্শক।

শ্রীঅভিনবগুপ্ত এখানে ত্রিপতাক-মুদ্রার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবং অনেকে বলেছেন, কর-দুটির সংস্থা হবে পল্লবের মত। মানলুম।

তাঁরা যাই কিছু বলে থাকুন না কেন, আমরা এইখানে "পতাক"-মুদ্রার নাড়ীনক্ষত্র একবার বিচার করে দর্শন করে নেব। দূরের জিনিষকে নিকটে-দেখার মধ্যেই রয়েছে মনুষ্যের চিরন্তন লোভ।

"প্রসারিতাঃ সমাঃ সর্বাঃ যস্যাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি।
কুঞ্চিতশ্চ তথাঙ্গুষ্ঠঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ।
এষঃ প্রহারপাতে প্রতাপনে নোদনে প্রহর্ষে চ।
গবোহংপ্যহমিতি তজ্জ্ঞৈঃ ললাটদেশোত্থিতঃ কার্য্যঃ।
এষোহগ্নিবর্ষধারানিরূপণে পুষ্পবৃষ্টিপতনে চ।
সংযুতকরণঃ কার্য্যঃ প্রবিরলচলিতাঙ্গুলঃ হস্তঃ।
স্বস্তিকবিচ্যুতিকরণাৎ পল্লবপুষ্পোপহারশষ্পাণি।
বিরচিতমুর্বীসংস্থং যদ্দ্রব্যং তচ্চ নির্দেশ্যম্।
স্বস্তিকবিচ্যুতিকরণাৎ পুনরেবাধোমুখেন কর্তব্যম্।
সংবৃতবিবৃতং পাল্যং চ্ছন্নং নিবিড়ং চ গোপ্যং চ।
অস্যৈব চাঙ্গুলিভিস্ত্বধোমুখপ্রস্থিতোত্থিতচলাভিঃ।
বায়ুর্মিবেগবেলাক্ষোভস্রোতশ্চ কর্তব্যঃ।
উৎসাহনং বহু তথা মহাজনপ্রাংশুপুষ্করপ্রহতিম্।
পক্ষোৎক্ষেপাভিনয়ং রেচককরণেন কুর্বীত।
পরিঘৃষ্ট তলস্থেন তু ধৌতং মৃদিতং প্রমৃষ্টপিষ্টে চ।
পুনরেব শৈলধারণমুদ্‌ঘাটনমের চাভিনয়েৎ।
দশাখ্যাশ্চ শতাখ্যাশ্চ সংপ্রাখ্যা স্তথৈব চ।
পতাকাভ্যাং তু হস্তাভ্যাম্ অভিনেয়ঃ প্রযোক্তৃভিঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ১৮-২৬)

এবমেষ প্রযোক্তব্যঃ স্ত্রী-পুংসাভিনয়ে করঃ।
(ভঃ নাঃ শাঃ ১, ২৭)

অর্থাৎ :—যখন করের অঙ্গুলিগুলি সমানভাবে বেঁকাক সটান প্রসারিত থাকে এবং বুড়ো আঙুলটি কুঞ্চিত হয়ে তর্জনীমূলে লগ্ন থাকে, তাকেই ধরে নেওয়া হয় "পতাক" ব'লে।

এর কার্য্যস্থল হচ্ছে :—

(১) প্রহার পাতের অভিনয়,

(২) রাজার প্রতাপ বোঝাতে, বা শীত নিবারণার্থ অবিস্পর্শ গ্রহণের অভিনয়,

(৩) নোদন (driving away, removing),

(৪) রোমাঞ্চিত হৃষ্টতার অভিনয়,

(৫) "আমিও চলছি" (গবধাতু, vedic. to go), এই কথাটি যেন জানান দিয়ে ললাট স্পর্শের অভিনয়।

এইগুলিতে দেখানো হয়ে গেল অসংযুত (একক) পতাক হস্তের লীলাভঙ্গি।

নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে সংযুত, অর্থাৎ (যুগল) হস্তের ক্রীড়াস্থলী। এই সংযুত হস্তের করাঙ্গুলিগুলি বেঁকাক্ (অবিরল ; "প্রবিরল" দুষ্টপাঠ) অবস্থায় নড়তে থাকবে।

(১) অগ্নি-বর্ষণ, ধারানিরূপণ, পুষ্পবৃষ্টিপতন, বোঝাতে হলে দুটি হস্তের "পতাক মুদ্রা"ই ব্যবহার করতে হয়।

করদুটিকে 'পতাক'মুদ্রায় রেখে, মণিবন্ধের ভূমিতে হস্তদুটি ন্যস্ত ক'রে রচনা করো স্বস্তিক। তার পরে বাহুদুটিকে পরিভ্রমণ করিয়ে, ঐ মণি-বন্ধ-ন্যস্ত স-'পতাক' হস্তদুটির যুক্তি ও বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে অভিনয় করে দেখাতে হয় :—

(১) স্বচ্ছোদক সরোবর,

(২) পুষ্পোপহার,

(৩) স্বল্প তৃণস্থান

(৪) মাটিতে ছড়ানো দ্রব্যগুলির অবস্থান।

এই স্বস্তিকবিচ্যুতির পরে যদি অধোমুখী করা হয় "পতাক-কর", তাহলে বুঝতে হবে,—

(১) কোনো পদার্থকে আধখানা ঢাকা হচ্ছে, বা আধখানা খোলা হচ্ছে ;

(২) যে জিনিষটি পড়ে যাচ্ছে, সেটিকে স্বস্তিকরচনা ক'রে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে ;

(৩) কোনো পদার্থকে আচ্ছাদিত করা হচ্ছে বা লুকোনো হচ্ছে ;

(৪) কোনো কিছু ঘনিয়ে আনা হচ্ছে বা হচ্ছে না ;

(৫) "আমাকে দেখতে দেব না"—এই জানিয়ে যেন নিজেকে আড়াল করা হচ্ছে ; বা হচ্ছে না।

এই স্বস্তিকবিচ্যুতির পরে যদি অধোমুখী "পতাক-করের" অবিরল অঙ্গুলিগুলিকে উঠিং-পড়িং করা হয়, তাহলে দেখবে সেই ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে :—

(১) বায়ু বা তরঙ্গের বেগ ;

(২) অট্টালিকার উত্তোল-ঋজুতা,

(৩) প্রবাহিণীর উচ্ছল স্রোত।

এই ভঙ্গিটির সঙ্গে যদি একটু "রেচক" মিশিয়ে দাও, তাহলে দেখবে সেই ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে,

(১) মহান্ ব্যক্তিরা যেন বহু উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কমলের মৃণাল দিয়ে প্রহার করছেন ;

(২) ডানা মেলে উড়ে যাওয়া।

(৩) ধোয়া, মাজা, ঘসা।

(৪) শৈল ধারণ বা শৈল-শিলার উৎপাটন।

[এইখানে শ্রীঅভিনবগুপ্ত "অভিনয়"-শব্দের একটি বিচিত্র অর্থ করেছেন। জেনে রাখা ভালো। যথা :—

"অভি-শব্দেন আভিমুখ্যং, ন-শব্দেন নিষেধঃ, য-শব্দেন যদর্থো লক্ষ্যতে"

শ্রীভরত নিজে কিন্তু অন্য রকম ব্যাখ্যা করেছেন—

"অভিপূর্ব্বস্তু ণীঞ্ ধাতুঃ
আভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি
তস্মাৎ অভিনয় স্মৃতঃ"।
(ভঃ নাঃ শাঃ ৮-৭)]

পতাক-যুক্ত হস্তদুটি (সংযুত) দিয়ে দশ, একশো, হাজার, রকমের অভিনয় চলতে পারে। স্ত্রী, পুরুষ, সকলেরই অভিনয়ে এর প্রয়োজনা চলবে।

সঙ্গীতরত্নাকরের (৭০।—১০৪-১১০), এবং শ্রীনান্দীকেশ্বরের (অভিঃ দঃ ৯৪-৯৯),—শ্লোকগুলিতে তালিকা আরো বাড়ানো হয়েছে বটে, তবে নূতনত্বের কিছু আভাস পেলুম না। থোড় বড়ি খাড়া। তাই এই প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করতে মন চাইছে না। অধিক-জিজ্ঞাসুদের জন্যে খোলা রইল পথ।

'পতাক'-মুদ্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয়েছে। এর মধ্যেই আমি অনুভব করছি আমার ভবিষ্যনটীরা বিচলিতা হয়ে উঠেছেন। হাতের আঙুল-ফেরতাও যে দু-এক জন না করেছেন, তা নয়। তাহলে, তোমরা এবার প্রযোজনা কর 'সমনখ-করণটি'। শ্রীঅভিনবগুপ্ত বলেছেন,—নৃত্তে, প্রথম প্রবেশে এই করণটিকে দেখা যায়। আরও বলেছেন,—কেউ কেউ জয়মঙ্গলাদি বিষয়ে এর প্রয়োগ সমীচীন মনে করে থাকেন।

"সম"—এই অব্যয়টি থেকে আমরা even, smooth, flat, plain, level, parallel আদি অর্থের দ্যোতনা পাই।

"সমনখ"—করতে হলে, তাহলে তুমি কি করবে?—চতুরস্র মুদ্রা থেকে (See. sl. 64, notes) মুক্তিলাভ করে শ্লিষ্ট হবার পর যখন হাত বা পায়ের নখগুলি সমান ভাবে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকবে তখনই হবে "সমনখ"। স্থান বুঝে কোরো পতাক-হস্তের ব্যবহার।

এই করণটিতে কোনো গোলোযোগ নেই। যে কোনো রসেই এটি লাগতে পারে।

• • • •

[ক্রমশঃ।

—প্রতিযোগিতা—

ফাল্গুন মাসের প্রতিযোগিতা

বিষয়

বনভোজন

২২শে ফাল্গুন ছবি পাঠানোর শেষ দিন

চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতা

বিষয়

প্রবাসী বাঙালী

২২শে চৈত্র ছবি পাঠানোর শেষ দিন
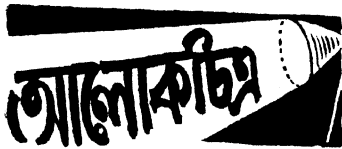
গড়ের মাঠে —এ, সি, ঘোষ

(প্রথম পুরস্কার)

শীতের সকাল

—[illegible] সেনগুপ্ত (দ্বিতীয় পুরস্কার)
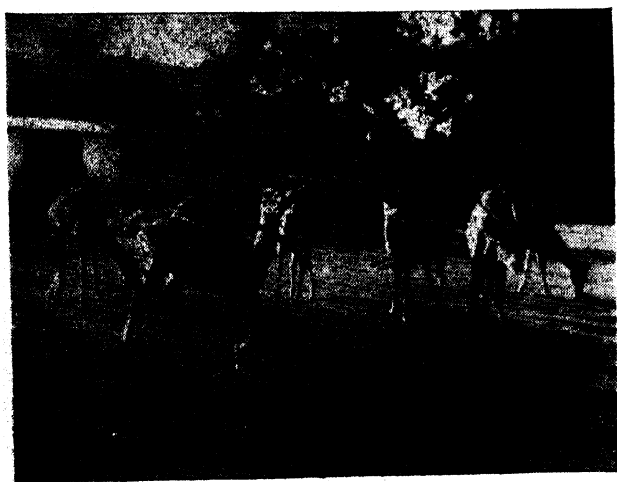
শীতের সকাল

চিড়িয়াখানায় সকাল —বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য

—রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেওয়াল-গাত্রে ভারতীয় ফৌজ। ভারতের গভর্ণর জেনারেল (১৯০৫—১০) আর্ল অব মিণ্টোর মূর্ত্তির নীচের এই ব্রোঞ্জ প্যানেলটি মিণ্টো-পত্নী কর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ট্রাষ্টিদের প্রদত্ত। স্যর গসকম্ব জন, আর, এ, এই শিল্পকার্য্যটির স্রষ্টা।

জাহাজ-ঘাটে সূর্য্যোদয়

—এ, মুখোপাধ্যায়

সকালের নাচ —অবনী মতিলাল

অগ্নিসেবা —শি, সু, বসু

শী
তে
র

স
কা
ল

গড়ের মাঠে
—জি, পেরেরা

কমেটে লণ্ডন থেকে কলকাতা
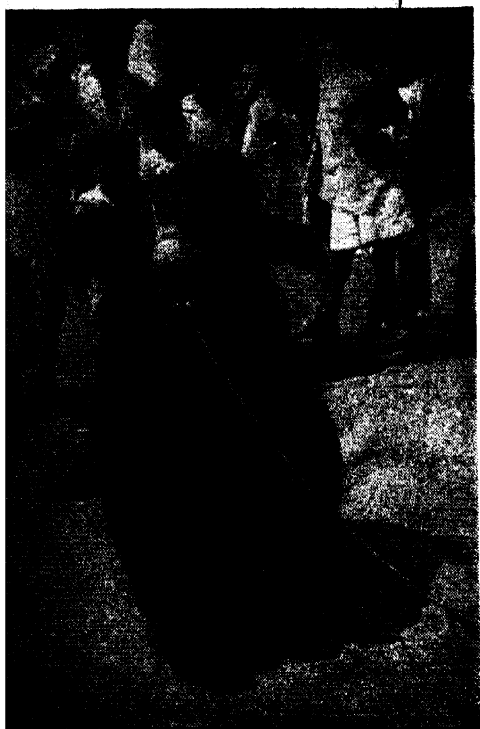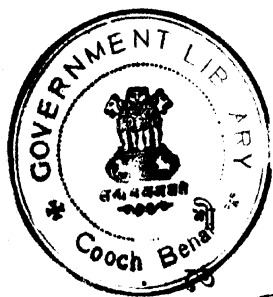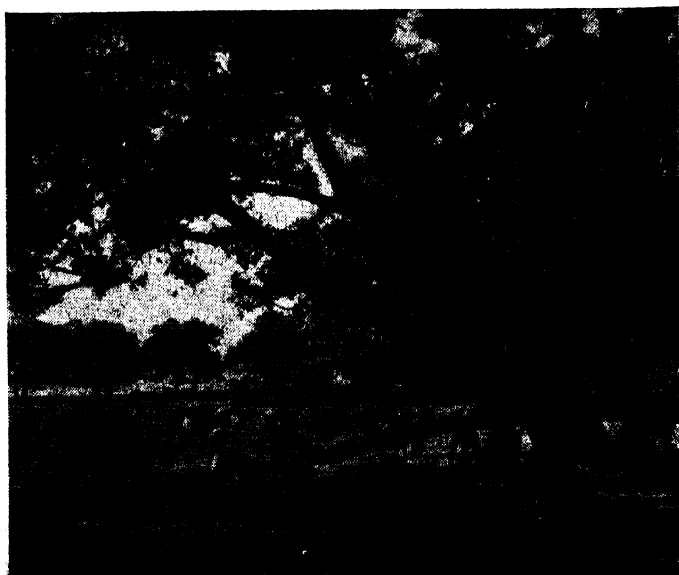
জিওফ্রী উইলিয়ামস্
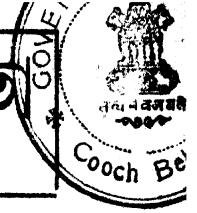
'যাই হোক না কেন', আমার স্ত্রী পরিষ্কার জবাব দিলেন, 'এমনি বিপদসঙ্কুল, ভয়াবহ আর বিদ্‌ঘুটে দেশ-ভ্রমণে তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।'

'কিন্তু', আমি আপত্তি করলাম, 'এতে কোন বিপদই নেই। একেবারেই…।' বাকী কথাটা আর শেষ করতে হোল না, আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। সেটা ছিল জুন মাস, আমরা বাগানে বসেছিলাম আর জুন মাসেই আমার এই রকম জ্বর হবার সময়।

'উড়োজাহাজ মানেই বিপদ, আর তুমি কি বলতে চাও যে তোমার জেট-প্লেনে করে দশ দিন ঘোরবার খেসারৎ আমাকে বইতে হবে সারা জীবন? বিধবা হয়ে আর বিশেষ করে দুটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে, তাদের মানুষ করার দিকটাও ভাবতে হবে।'—আমার স্ত্রী নাছোড়বান্দা।

'কিন্তু আমাদের রাণীও তো সে দিন জেটে করে ঘুরে এলেন।'

যাই বলি না কেন, আমার স্ত্রী রইলো অবিচলিত। আমার মৃত্যুর পর ইন্‌সিওরেন্সের মোটা মোটা টাকাগুলো তার পক্ষে যথেষ্ট হবে কি না সে কথা একবারও ভাবলো না। না ভাবলে তো বয়ে গেল! দূরের ডাক আমার কানে এসেছে। কমেটে করে আবার সেই কলকাতায়, সিঙ্গাপুরে। সেই নীল আকাশ দিগন্তবিস্তৃত, রঙ-বেরঙের শাড়ী, পায়ে পায়ে জড়ানো পদক্ষেপে চলা ভারতীয় মেয়ে, আকাশে রঙ-বেরঙের ফানুস আর ঘুড়ি। মাউণ্ট ল্যাভিনিয়ার উত্তপ্ত উত্তান, কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের ব্যাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে দেশে ফিরে আসার জন্ম সামরিক অফিসারদের সে কি আকুতি! সব একে-একে আমার চোখে আবার ভেসে এল।

আমি পুলকে রোমাঞ্চিত হলাম।

'আবার শুরু হল। সেই জ্বরটা…।' আমি স্ত্রীর দিকে কথাটা এগিয়ে দিলেম।

কোন কথা নেই। কি ভাবছে কে জানে? হয়তো ভাবছে কেন ফেলে-যাওয়া এই ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল, জামরুলগুলো সবে গাছে-গাছে পেকে উঠছে। এই গরমে কেন কষ্ট পেতে ভারতবর্ষে যাওয়া। আবার সে-যাওয়া যখন মাত্র দশ দিনের জন্ম। তেইশ হাজার মাইল দশ দিনে, পাগল আর কি!

আমি আবার কেঁপে উঠলাম।

'এই বিদ্‌ঘুটে জ্বরের জন্ম তোমার এখন থেকেই কিছু করা উচিত।' আমার স্ত্রী যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন।

অন্ত সময় হলে ওই কথাটাতে আমি বেশ লম্বা-চওড়া জবাব শুনিয়ে দিতে পারতাম। এই জ্বরের জন্ম আমি কি করিনি! টীকে নিয়েছি, বাড়ী থেকে বেরোইনি, ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, ওষুধের পর ওষুধ খেয়েছি কিন্তু সেরেছে কি? কিন্তু হ্যাঁ, একবার আমার এই প্লেগ-জ্বরটা হয়নি, সেই এক বছরই মাত্র যে বছরটা আমি—

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আর সেই কারণেই আমার একবার ভারতবর্ষে যাওয়া উচিত। তুমি তো জান, সেখানে যে বছরে ছিলাম, সে বছর এই জ্বরটা মোটেই হয়নি।'

'ওঃ', আমার স্ত্রী দ্বিতীয় কথাটি বললেন না।

আমি বুঝলাম, আমি জিতেছি। এমনি সময়ে আমাদের এক বন্ধুকে বাগানে আমরা যেদিকে বসে আছি সেখানে আসতে দেখা গেল। আমার স্ত্রী তাকে খাতির করে বসিয়ে এক কাপ চা দিতে দিতে বললে, 'জান, তোমার বন্ধুটি যে কমেটে করে চললো ভারতবর্ষে। সোমবারেই তো যাচ্ছ, না?'

অদ্ভুত স্ত্রী-চরিত্র! আমার বিদেশ যাবার কথাটা সে যে ভাবে ভণিতা করে বললো তাতে তো স্পষ্টই মনে হল, সে এতে আনন্দিতই হয়েছে।

হ্যাঁ ঠিকই! এ জয় আমার নয়, এ জয় হোল আমার প্লেগ-জ্বরের।

• • • •

লণ্ডন এয়ারপোর্টে বিরাটকায় কমেটখানা দাঁড়িয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখলাম গায়ে লেখা G—ALYS; আর কোন কিছুতেই বিশেষত্ব নেই। জনত্রিশেক লোক, হাতে চিরাচরিত হাণ্ডব্যাগ নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অফিস-ঘরের পুরোনো ছবিগুলো দেখছে।

আমাদের ডাক পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠে আমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসলাম। ষ্টুয়ার্ডেস তার বহুবার বলা উপদেশাবলী আরও একবার আমাদের শোনালে। প্লেনের দরজা বন্ধ হল, ইলেকট্রিক মোটর আওয়াজ করে উঠল, প্লেন নড়ে উঠল, আমাদের যাত্রা শুরু হল। সত্যি কথা বলতে কি, প্লেগ-জ্বর আমার তখন থেকেই ছাড়তে আরম্ভ করল।

এর আগেও একবার কমেটে চড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সাড়ে সাত মাইল উপর দিয়ে যাচ্ছি ভাবতেই কেমন লাগছে! আমার ঘড়ির মাত্র ন' মিনিটের মধ্যে আমরা ইংলিশ চ্যানেলের ধারে এসে পড়লাম। এত উঁচু থেকে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। চ্যানেলে ঢেউ নেই, জাহাজগুলোকে দেখাচ্ছে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের মত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফ্রান্সের মাথায় এলাম। ফ্রান্সকে প্লেন থেকে সুন্দর একখানা কাজ-করা কার্পেটের মত দেখাচ্ছে।

আমি হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম এতক্ষণে। আধ ঘণ্টা আগে ছিলাম লণ্ডনে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পড়ব রোমে। তার পর রাতটা কাটাবো বিরুটে। মন্দ নয়! অন্তত অফিসে বসে থাকার চেয়ে ভাল, এমন কি জুন মাসের লণ্ডনের চেয়েও!

কমেটে আমার পাশের সিটটি অধিকার করে যে ব্যক্তিটি বসেছিলেন তিনি জে. জি। জেট বিমান পরিচালনায় একজন শিক্ষার্থী। এইবার তিনি আমার দিকে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জেট বিমান কি করে চলছে কিছু জানেন কি?'

আমি কিছুই জানি না, সুতরাং ঘাড় নাড়লাম।

'যদি কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে তো অনায়াসে করতে পারেন, আমি যতদূর জানি উত্তর দেবো।'—জে. জি আমাকে

ভরসা দিয়ে বললেন। বলেই শুরু করলেন তাঁর ব্যাখ্যা, 'ওই যে তারা-আঁকা পাখা দেখছেন না, ওইটিই সব। মনে করুন, আপনি চরেশো মাইল ঘণ্টায় কোনও একটি বেড়ালকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, বেড়ালটার মধ্যে কিছু বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হবে। এরোপ্লেনের বেলাতেও তাই, এমন কি একটা সিল্কের সার্টের বেলাতেও তাই।'

আমরা এখন ছত্রিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছি। নীচে দক্ষিণ-ফ্রান্স। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা ভূমধ্যসাগরে এসে পড়লাম। আরও আধ ঘণ্টার মধ্যে রোমে আমাদের প্লেন নামলো।

সামান্য অপেক্ষা করে যন্ত্রপাতি দেখে নিয়ে প্লেন আবার উড়লো। ঘণ্টা তিনেকের একটানা চলার পর আমরা বিরুটে এলাম। এরোড্রামেই আমাদের নাকে এলো মধ্য-পূর্ব এশিয়ার মাটির পরিচিত সেই সোঁদা গন্ধ।

বিরুটে রাত্রিবাস। রাত্রে হোটেলের ঘরে শুয়ে শুয়ে স্ত্রীকে একখানা চিঠি পাঠালাম :—

'তুমি বিপদের কথা বলেছিলে, কিন্তু বিপদের কণামাত্রও এখনও আমি দেখতে পাইনি। কমেটটিকে যদি দেখতে তো বুঝতে এটি একটি নিরীহ ভারবাহী পশুর মত অসহায়, আর ভেতরটা ঘরে থাকার চেয়েও আরামের নিঃসন্দেহে। বিরুটের একটা হোটেলে রয়েছি। চারদিকে শুধু পাহাড়ে ঢাকা। কাল সকালে আমরা করাচী যাত্রা করবো।

পুঃ— প্লেগ-জ্বর এখনও রয়েছে। নাক বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আশা হচ্ছে শীগগিরই সামলে উঠবো।'

সকাল সাড়ে ৬ টায় এরোড্রাম থেকে টেলিফোনে আমার ডাক আসার কথা। সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের জানলা খুলে দিয়ে সূর্য্যোদয় দেখলাম। দূরে-কাছে কালো কালো পাহাড় আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা। তার মধ্য দিয়ে সূর্য্য উঠলো। ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে সাড়ে ছ'টা বাজলো, কিন্তু টেলিফোন এল না। আমার স্থির ধারণা হোল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। নিশ্চয়ই কমেট আমাকে একা এখানে ফেলে রেখে চলে গেল। মধ্য-পূর্বের এই বিদেশী হোটেলে দিনের পর দিন বাস করতে হবে অনেকটা কয়েদীর মত ভাবতে ভাবতেই আমি ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে হাঁক দিলাম।

সব শুনে-টুনে সে বললে, 'আজ প্লেন ছাড়ছে না। মেসিনের কিছু গোলমাল আছে।'

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেলের লনে বসে বসে আমাদের এই বিষয়েই আলোচনা হতে লাগলো। কেউ বললেন, করাচীতে না থেমে আমরা সোজা কলকাতায় যাবো। কেউ বললেন, সিঙ্গাপুরে হয়তো আমাদের যাওয়া না হতেও পারে। কেউ বললেন, মধ্যরাত্রেই প্লেন ছাড়বে। কেউ বললেন, কাল সকালের আগে কিছুতেই না। এর মধ্যে জে· জি এসে খবর দিলে একটা হাইড্রোলিক পাম্প কম পড়ে গেছে। সেটা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পরের কনষ্টেলেশনে করে এসে পড়ছে। সুতরাং রাত ন'টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো বলে আশা করছি।

প্লেগ-জ্বর প্রায় ছেড়ে গেছে ইতিমধ্যে। সব-কিছুই ভাল লাগছে, শুধু ভাল লাগছে না বিয়ারের দামটা। এরোড্রামের কাফেতে এক বোতল বিয়ারের দাম প্রায় দু' লেবানীজ পাউণ্ড। লেবানীজ পাউণ্ড যদিও ইংল্যাণ্ডের পাউণ্ডের চেয়ে অনেক সস্তা, তবুও পাউণ্ড পাউণ্ডই আর তা খরচ করতে গেলে গায়ে লাগেই।

বিরুটের এরোড্রামে ইউনাইটেড নেসনের কনসুলার সার্ভিসের প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা স্পষ্টই। ইস্রায়েল আর লেবাননের প্রান্তসীমা হল এই বিরুট, আর ওদের গোলমালটাও চির পরিচিত।

প্লেনের লোকেরা জানে কোথায় কি সস্তা। বোম্বাই থেকে তোয়ালে, সিঙ্গাপুর থেকে সার্টের কাপড়, ব্যাঙ্কক থেকে কুমীরের চামড়ার ব্যাগ সব-কিছুই তাদের জানা। 'এখান থেকে যদি কিছু কিনতে চান তো জীন, এক বোতলের দাম তেরো শিলিং মাত্র।'

ঠিক রাত সাড়ে আটটায় আমরা আমাদের হোটেলের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কমেট ছাড়লো ন'টায়। ঠিক আগের মতই সব। তবে তফাৎ এই যে এবার যাত্রা রাত্রে। কমেট এক ছুটে এগিয়ে গেল সবুজ বাতি-দেওয়া রানওয়ের সীমান্ত অবধি, তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে উড়লো আকাশে।

রাতে কমেটে আমি এর আগে কখনো চড়িনি। সমস্ত আকাশটা তারায়-তারায় ভরা। কোনটা আমার উপরে, আবার কোনটা বা নীচে, আবার কোনটাকে এত কাছে মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়াতে ইচ্ছে হয়।

এইবার আমার পাশে বসেছেন একজন 'এডিশনাল' পাইলট। বিরুট থেকে তিনজন অতিরিক্ত পাইলট আমাদের সঙ্গে চলেছেন। এঁরা পূর্ব-এশিয়ায় কমেট চালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন।

'চার নম্বরের ইঞ্জিনটা একটু বেশী গরম হয়ে গিয়ে গোলমাল ঘটিয়েছিল আর কী। কিন্তু এখন সেটা ঠিক হয়ে গেছে আবার। বাহেরিণ পৌঁছে অবশ্যি আমরা আরও একবার ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করব।'—তিনিই শুরু করলেন।

'কিন্তু খুবই আশ্চর্য্যের নয় কি যে হাওয়া কেটে যাবার সময় পেছনের ধাক্কাতেই প্লেনটা সামনে চলছে?'—এবার আমার জিজ্ঞাসা।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। নিউটনের বিখ্যাত সূত্র প্রত্যেক আঘাতেরই একটা প্রত্যাঘাত আছে জানেন নিশ্চয়ই? কমেট চলে এই নিয়মের ফলেই।' বলতে বলতে শুরু হল জেট প্রপেলারের ব্যাখ্যা। আমার অবৈজ্ঞানিক মন তা' গ্রহণ করতে পারলো না কিছুতেই। এর মধ্যে সকালের আলো একটু-একটু করে চারদিক ছেয়ে ফেললো। আমাদের প্লেন এসে নামল বাহেরিণে।

বাহেরিণ মানেই তেল, আর তেল মানেই বাহেরিণ। সকাল বেলায় দিকটা তত গরম না হলেও বেশ বুঝছিলাম যে শীগগিরই খুব গরম পড়তে শুরু হবে। ছোট দ্বীপ হলে কি হবে, বাহেরিণ একদিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয় স্থান। এটি একটি বিশিষ্ট এয়ার-পোর্ট। তাই এখানকার লোকেরাও একটু বিশিষ্ট। ছুটি পড়লেই তারা কাশ্মীর, কি সিলোন, কি নাইরোবি যাবার টিকিট কাটে।

ঠিক দু'ঘণ্টা পরে আমাদের প্লেন ছাড়লো। এবার একেবারে টানা পাড়ি কলকাতায়। ম্যাজিক কার্পেটের কথা স্বভাবতই এবার আমার মনে হচ্ছে। যেন ম্যাজিক কার্পেটে বসেই আমরা চলেছি। মনে পড়ছে, যুদ্ধের ভীড়ে আরও একবার বোম্বাই থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাওয়ার কথা। সেই ভীড়, সেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিচিত্র মানুষের উঠা-নামা। ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী পাল্টিয়ে রেষ্টুরেণ্ট কারে গিয়ে ডিনার খেয়ে আসা, কয়লার গুঁড়ো থেকে বাঁচার জন্ম কাচের শার্সি তুলে দেওয়া, যতক্ষণ না দেখা গেল মাথা উঁচু করা ঢেউ খেলানো হাওড়ার পুল।

নীচে সিন্ধুর মরুভূমি দেখা যাচ্ছে। কলকাতা দূর অস্ত—এক হাজার তিনশো একষট্টি মাইল। এখনও প্রায় চার ঘণ্টা লাগবে। পাশে জে· জি নাক ডাকাচ্ছেন। আমি উঠে গিয়ে উইং কমাণ্ডারের পাশের খালি সিটটায় বসলাম।

'খুব সোজা উপায়ে বাতলান, জেট প্লেন কি ভাবে চলছে ?—আমার জিজ্ঞাসা।

'আপনার মুখের মধ্যে একটা বেলুন—নিউটনের থার্ড ল' জানেন তো—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'ওসব শোনা হয়ে গেছে, সহজ কোন উপায় থাকে তো বোঝান। নাহলে—।'

ধৈর্য্য ধরে তিনি শুরু করলেন, 'অয়েল-ষ্টোভে যেমন করে তেল আসে তেমনি করে ট্যাঙ্ক থেকে এতেও তেল আসছে। ঠিক তেমনি করেই তেল থেকে হচ্ছে গ্যাস। গ্যাস ঘোরাচ্ছে টারবাইন। সেইটিই পেছনে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরী করছে আবার সেই ভ্যাকুয়াম ভর্ত্তি করবার জন্ম গ্যাস ছুটে আসছে, তাতেই যে বিপরীতমুখী গতি তৈরী হচ্ছে, নিউটনের থার্ড ল' বুঝলেন ? তাতেই কমেট চলছে আর সেই গতিই কাজ করবে যতক্ষণ না আমরা আবার লণ্ডনের এরোড্রামে ফিরে যাই। বুঝলেন কিছু ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। কিছুই বুঝিনি। তিনি আবার নতুন করে ভাঁজবেন এমন সময় কমেট হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিল। উনি উঠে গেলেন।

দমদম এয়ারপোর্ট। কমেটের মত ভারী প্লেন ওঠা-নামার পক্ষে খুব যে সুবিধের তা ঠিক নয়। উইং কমাণ্ডার বললেন, যদিও কমেট আস্তে আস্তেই নামে তবে অন্ততঃ ছ'হাজার ফুট রানওয়ে না থাকলে চলবে না কিছুতেই। এ তো গেল উইং কমাণ্ডারদের কথা, যাত্রীদেরও অসুবিধা আছে বিভিন্ন, যেমন—দমদম থেকে কলকাতায় যাওয়া। দমদম থেকে কলকাতায় যেতে আপনাকে যে রাস্তাটি দিয়ে যেতে হবে সেটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। কলকাতা পূর্ব-গোলার্ধের সবচেয়ে বড় সহর। এখানে আপনি পাবেন মাইলের পর মাইল লম্বা রাস্তা। অসংখ্য লোক তাতে অবিরাম গতিতে চলছে তো চলছেই। পেট-মোটা ছেলে রাস্তার ধারে খালি গায়ে খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, খঞ্জ বা কুঁজো, অতিব্যস্ত কোন লোক, অভিভাবকহীন গরু, মান্ধাতার আমলের বাস বা মোটর সবসময়েই আপনার পথ জুড়ে দাঁড়াবে। এত চেঁচামেচি আর হট্টগোল যে আপনার স্বতঃই মনে হবে প্লেনে বসে বসে এ আওয়াজ আপনার কাণে পৌঁছল না কেন ?

অবশ্য এক বছর আমি এখানে বাস করে গেছি এবং এ সবে আমি অভ্যস্ত, কিন্তু বিলেত থেকে হালফিল আসা কারোর চোখে দমদম থেকে চৌরঙ্গীর পথের দু'ধারের দৃশ্য বিসদৃশও লাগতে পারে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে বসে বাড়ীতে পাঠালাম আমার দ্বিতীয় চিঠি :—"সাধারণ ভাবে দূর থেকে যা শোনা যায় কাছে গেলে তার যে ঠিক উলটোই হয় কলকাতাই তার প্রমাণ। লোকেরা আজ-কাল আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করছে। খুবই ভালো এদের বলতে হবে, কারণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল হল এরা এখনও উড়িয়ে দেয়নি। বেশ গরম পড়ছে। সুতরাং প্লেগ-জ্বর আর নেই। কাল রাত কাটবে সিঙ্গাপুরে।"

পরের দিন সকালে আমরা কলকাতা ছাড়লাম। এবার ফেরার মুখে শুধু একটু সিঙ্গাপুর ছুঁয়ে আসতে হবে। ঠিক সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের বাড়ী ফেরার পালা। সেখান থেকে উত্তর দিকে ফিরে করাচী। করাচী থেকে লণ্ডন।

সিঙ্গাপুরে যাবার পথে কমেট একবার রেঙ্গুনে নেমেছিল। সিঙ্গাপুরে গিয়ে মনের আর এমন অবস্থা ছিল না যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সহর দেখি।

কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার কমেট চলতে শুরু করল। এবার সোজা করাচী। মধ্যে শুধু ঘণ্টা খানেকের মত বিশ্রাম দিল্লীতে পানাহারের প্রয়োজনে।

'এখানকার শুধু ভাল লাগে শীতকালটা। আমার ইচ্ছা হয় সারা গ্রীষ্মকালটা কাটাই লণ্ডনে আর শীতকালটা এই দিল্লীতে।'—বললেন জনৈক দিল্লীর বাসিন্দা ইংরেজ, 'আপনার নিশ্চয় এ জায়গা ভাল লাগবে না।'

'মরুভূমির মধ্যে বাস করতে কারই বা ভাল লাগে বলুন ?'

'না, না, মোটেই মরুভূমি নয়। মাটী মোটামুটি উর্বরাই। ক্যানা আর গোলাপ একটু চেষ্টাতেই অজস্র ফোটে।'

করাচীতে দেখলাম, খুবই গরম। যে হোটেলে গিয়ে উঠলাম সেখানে সেদিন কি একটা বিশেষ উৎসব ছিল। লাল-নীল বেলুন দিয়ে চারদিক সাজানো। হরেক রকমের শাড়ী পরা, বোরখা ঢাকা মেয়ে ইতস্তত ধাবমান।

তারপর আবার সেই বাহেরিণ, বিরুট, রোম। আবার দেখা যেতে লাগলো লণ্ডনের এয়ারপোর্ট ইংলিশ চ্যানেল পার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। পথে ফেলে এলাম একখণ্ড লাইনোলিয়মে ফুল-পাতা আঁকা দেশ ফ্রান্স। লণ্ডনের এরোড্রামের মাথায় যখন কমেট চক্কোর দিচ্ছে তখন পাইলট আমাদের সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'পনেরো সেকেণ্ড লেট। এবং সে জন্ম আমি দুঃখিত।'

'বিশ হাজার মাইল পথ চলতে পনেরো সেকেণ্ড লেট! তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ! না, না, কোন প্রয়োজন নেই'—আমরা সকলে একবাক্যে বলে উঠি।

কমেট আস্তে আস্তে নেমে রানওয়ের ওপর দাঁড়াল।

অনুবাদক—আশীষ বসু।
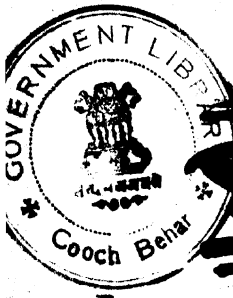
[রূপকথার রাজা হ্যান্স এণ্ডারসেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রূপকথা-শিল্পী হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছেন। জন্ম তাঁর ডেনমার্কে। তাঁর লেখা রূপকথার অনুবাদ হয়নি পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই। বাঙালী শিশুরাও তাঁর "এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড" এবং অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত। জন্ম ১৮০৫ সালে আর মৃত্যু ১৮৭৫ সালে। পুরো নাম হচ্ছে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন। তাঁর বই মূলত শিশুদের জন্য লেখা হলেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছেই সমান লোভনীয় বস্তু। তাঁর 'আত্মকাহিনী' (Story of my life) রূপকথার মতই উপভোগ্য।

চিঠিগুলি এণ্ডারসেন লিখেছেন, লিভিংষ্টোনের কন্যাকে। এ যাবৎ এই পত্রসমূহ অপ্রকাশিত ছিল এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। চিঠিগুলিও রূপকথার সুরে পরিপূর্ণ।]

হ্যান্স এণ্ডারসেন ও লিভিংষ্টোন-কন্যার পত্রাবলী

[কোপেনহাগেনের জাতীয় গ্রন্থাগারে—রয়াল লাইব্রেরীতে হ্যান্স এণ্ডারসেনকে লেখা অসংখ্য চিঠি সংগৃহীত আছে। এগুলো তিনি পেয়েছিলেন দেশ-বিদেশে ছড়ানো তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে। তাদের অনেকেই ছিল অল্পবয়সী। এই দিনেমার লেখকের রূপকথা পড়ে তাদের এত ভালো লেগেছিল যে, সে ভালো লাগা কথাটা না জানিয়ে তাদের উপায় ছিল না। লণ্ডন থেকে একটা মেয়ে একবার লিখেছিল, "হ্যান্স এণ্ডারসেন সাহেব, একটা ছোট মেয়ে তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছে। তোমার রূপকথাগুলো তার খুব ভাল লাগে।"

এ রকম অভিনন্দন-বাণী পেয়ে তিনি খুব খুশি হতেন। কোনো কোনো শিশু আবার লম্বা চিঠি লিখে তাঁকে জানাতো তাঁর কোন্ কোন্ গল্প তাদের খুব ভাল লাগে, কেউ তাঁর স্বাক্ষর চেয়ে পাঠাতো; কেউ কেউ আবার কোন্ কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কি বেরিয়েছে জানতে চাইত। একটা মার্কিণ ছেলে লিখেছিল: "আমরা মার্কিণরা তোমাকে খুব ভালবাসি···"। আর একজন তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পাবার আশা জানিয়েছিল, "শুধু দু-চারটে কথা লিখলেই হবে। আমি যখন বড় হব আর ছোট ছেলে-মেয়েরা আমার কাছে তোমার লেখা গল্প শুনতে বসবে তখন তাদের সামনে তোমার লেখা চিঠিটা ধরে বলব, 'তোমরা যার গল্প শুনবে সেই হ্যান্স এণ্ডারসেন আমাকে এই চিঠি লিখেছিলেন। তখন আমি খুব ছোট।"···

ছেলেরা যে তাঁর গল্প ভালবাসত আর ঐ গল্পগুলোর জন্যে তাঁকেও ভালোবাসত তার প্রচুর পরিচয় হ্যান্স এণ্ডারসেন পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি চিঠির উত্তর দিতেন—বেশীর ভাগই পড়ে থাকত।

একটি স্কচ বালিকার সঙ্গে তার যে সব চিঠির লেন-দেন হয়েছিল তাঁর সবগুলোই পাওয়া গেছে। মোট পাঁচ বছর ধরে এই চিঠি লেখালেখি চলেছিল,—সবশুদ্ধ তেরোখানা চিঠি। স্কচ মেয়েটার নাম ছিল—আনা মেরি লিভিংষ্টোন্। ডাঃ লিভিংষ্টোনের ছোট মেয়ে। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ তখন অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার ভিতরে অভিযান চালাচ্ছেন।]

"উলভা কটেজ, হ্যামিলটন্, স্কটলণ্ড,
১লা জানুয়ারী, ১৮৬১

প্রিয় হ্যান্স এণ্ডারসেন,

তোমার রূপকথাগুলো আমার এত ভাল লাগে যে, ইচ্ছে করে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি, কিন্তু তা তো পারি না। তাই তোমাকে চিঠি লিখছি। বাবা আফ্রিকা থেকে ফিরে এলে তাঁকে বলব আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে। তোমার একখানা বইয়ের "সৌভাগ্যের জুতো" 'বরফের রাণী' আর আরও কয়েকটা গল্প আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমার বাবার নাম ডাঃ লিভিংষ্টোন্। আমি তোমাকে আমার কার্ড আর বাবার স্বাক্ষর পাঠাচ্ছি। এখন বিদায়, তুমি আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা জেনো।

তোমার স্নেহমুগ্ধ শিশু-বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন্।

পুনশ্চ :—

আমাকে চিঠি দিও। শীগ্‌গির ক'রে। চিঠির প্রথম পাতায় আমার ঠিকানা দেখে নিও। আমাকে তোমার কার্ড পাঠিও।"

নামের উপর ঠিকানা দেওয়া ছিল: "হ্যান্স এণ্ডারসেন, ডেন্‌মার্ক"। ব্যস্‌, আর কিছু না। এণ্ডারসেন সে চিঠি পেয়েই উত্তর দেন। তাঁর উত্তর লেখা হয়েছিল দিনেমার ভাষায়—চিঠির অপর পাতায় নিজের হাতেই তিনি এর একটা ইংরেজি অনুবাদও করে দেন।

কোপেনহাগেন
১১শে জানুয়ারী, ১৮৭১

"ছোট্ট বন্ধু আনা মেরি লিভিংষ্টোন্,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার দেখা করার কার্ড আর তোমার বাবার স্বাক্ষরও পেয়েছি। ধন্যবাদ। এটা আমি যত্ন করে রেখে দেব, তাহ'লে আমার ছোট্ট বন্ধুটির কথা মনে থাকবে। আমাকে আনন্দ দেওয়ার উপায়টা ঠাহর করেছিলে বেশ।

আমরা সবাই ডাঃ লিভিংষ্টোনের নাম জানি। তাঁকে জানি। তিনি মারা গিয়েছেন শুনে আমরা সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, তার পর যখন জানলাম তিনি বেঁচে আছেন তখন আমরা খুব খুশি হলাম। এখন তো আনা মেরির সঙ্গে এইচ সি এণ্ডারসেনের পরিচয় হয়েছে, আর ভাবনা কি? নিশ্চয়ই আমার দরদী হৃদয়ের প্রীতি সম্ভাষণ তার বাবার কাছে পৌঁছে যাবে।

এই চিঠির সঙ্গে আমার কার্ড পাবে। ছোট্ট আনা মেরি হয়তো আমি কি লিখেছি বুঝতে পারবে না এই ভয়ে চিঠির উল্টো পাতায় একটা ইংরিজি অনুবাদও পাঠালাম।

বাবা কবে বাড়ী ফিরবেন, মাঝে মাঝে জানিও। তোমার মা, ভাই-বোন্, উল্ভা কটেজের সকলেরই খবর জানিও। ভগবান্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, সুখে রাখুন। বাড়ীর সকলকে আমার প্রীতি জানিও। ইতি

তোমার বন্ধু
হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন।"

ন'মাস পরে আনা মেরির চিঠি এল:

"উল্ভা কুটীর, হ্যামিলটন, স্কটলণ্ড
২০শে অক্টোবর, ১৮৭১

প্রিয় হান্স সি এণ্ডারসেন,

অনেক দিন হল তোমাকে চিঠি দিইনি; এখন দিচ্ছি, তাতেই হবে কি বলো? তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। তার পর যখন তোমার কার্ড দেখলাম, তখন ভাবলাম একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—একে আমার খুব ভাল লাগবে নিশ্চয়। অনুবাদটা পাঠিয়ে ভালই করেছিলে, নইলে তোমার চিঠি বুঝতে পারতাম না। যখন আর তোমার প্রশ্নগুলোর জবাবও দেওয়া যেত না। দু'বার বাবার খোঁজ পাই আমরা কিন্তু ওগুলো বাজে খবর। গত শুক্রবার আমাদের এখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার—আমাদের তিনি চেনেন—আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ ছিল। তাতে খবর ছিল—ভাল খবর। উঃ, আমরা কত খুশিই না হয়েছিলাম। 'ভাঙ্গনো আর য়াঙ্গনো' বলে গল্পটা দেখলাম, খুব ভাল গল্প। অমনি গল্প আরও কয়েকটা তুমি লিখবে আশা করি। প্রথম পড়ি 'মাথা' বা 'কড়ে আঙুল' বলে গল্পটা। আমার দুই দাদা টমাস্ আর অস্ওয়েল, আর আমার দিদি, আগনেস বেশ ভাল আছে। মা তো মারা গিয়েছেন। আমার দুই পিসি জ্যানেট আর আগ্‌নেশ লিভিংষ্টোন আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের বাড়ীটা খুব ভাল। আমাদের একজন ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি এখন মারা গিয়েছেন। আচ্ছা, তুমি সুইডিস্ ভাষা জানো? জানলে আমায় পরে চিঠিতে জানিও। তোমরা বাড়ীসুদ্ধ সকলে আমার ভালোবাসা জানবে।

তোমার একান্ত স্নেহমুগ্ধা ছোট্ট বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন।"

এর পর আঠারো মাস, চুপ।

১৮৭১ অব্দের বসন্ত কাল। হান্স এণ্ডারসেন তখন কোপেনহাগেনে এক বন্ধুর বাড়ীতে আছেন। একদিন চারটি ইংরেজ মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আনা মেরির দিদি আগনেস্ তাঁর দুই বন্ধু আর আনা মেরির এক পিসিমা। আনা মেরি তাঁদের মারফৎ খবর পাঠিয়েছে। এখন তার বয়স তেরো বছর, কিন্তু ডেন্‌মার্কের বন্ধুটির কথা সে ভোলেনি। এণ্ডারসেন খুব খুশি হলেন। তাঁদের হাত দিয়ে আনা মেরির জন্যে পাঠালেন তাঁর নতুন একখানা রূপকথার বই। নিজের হাতে উৎসর্গ লিখে দিলেন। বইটা পেয়েই আনা মেরি লিখল:

"উল্ভা কুটীর, হ্যামিলটন, স্কটলণ্ড
২১শে এপ্রিল, ১৮৭১

প্রিয় হান্স এণ্ডারসেন,

আমার দিদি আগ্নেস্ মারফৎ যে চমৎকার বইটা পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ। এ তোমার দয়া; বইখানা খুবই চিত্তাকর্ষক। 'সহযাত্রী' আর ঐ সেই 'ভাগ্যের জুতো' গল্প আমার খুব ভাল লেগেছে—ঐ জুতো পরলে লোকের কী সব দশা হয়!

আমার সর্দি লেগেছিল—এখন অনেকটা ভাল আছি। এখানে এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে মনে হচ্ছে আবার বুঝি শীত এল।

গ্লাস্‌গোর থিয়েটারে 'নাবিক সিন্ধবাদ' দেখতে গিয়েছিলাম। মূক অভিনয় এটা। খুব আমোদ পেয়েছিলাম। এই প্রথম মূক অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ভাঁড়টা দেখতে পেল একটা লোক—জানলে, লোকটা পুলিশ—ষ্টেজের বাঁ হাতে সাইড বক্সের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ও করল কি—উনোন্ থেকে পাঁউরুটি তোলার জন্যে দোকানে যেমন লম্বা কাঠি ব্যবহার করে তাই দিয়ে, না, ঐ পুলিসকে মারতে গেল। ওকে না লেগে, সেটা গিয়ে লাগল প্যান্টেলুনের গায়ে—ও ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ভুল করে হোক্, ভুলের ভাণ করে হোক্—লাগল প্যান্টেলুনের গায়ে। আমি আর মুখ বুজে থাকতে পারলাম না—হি-হি করে হেসে ফেললাম। এমন মজার। অনেক কিছু দেখে আমি কেবল হাসলাম। জানলে, এমন অভিনয় এর আগে কখনো দেখিনি—এমন মজার।

আমার দিদি আগ্নেস এখন ইংলণ্ডের কেণ্টে আছে।

এখন বসন্তের মত দেখাচ্ছে সব। তুমি যদি এখন স্কটলণ্ডে আসতে। এত চমৎকার!

বাবার দেশে ফিরতে এখনো অনেক দেরী। যদি এসে যেত, আমি তোমাকে দেখতে যেতাম। কেমন মজা হত তাহলে।

প্রত্যেক বছর আমি সমুদ্র তীরে যাই। দু'বছর আর্গাইল জেলায় করিস্‌ডেলে গিয়েছি। এবার টরিসডেলে যাবার কথা হচ্ছে—এ জায়গাটা করিস্‌ডেল থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে; চার

মাইল হয়তো। কবে জুন মাস আসবে তাই ভাবছি। ঐ মাসেই আমরা সমুদ্র-তীরে যাই কি না।

আমেরিকা থেকে আমার এক পিসি আর পিসতুত ভাই এসেছে। তারা এখন কাকার সঙ্গে ষ্টালিংশেয়রে ব্রিজ অব আলানে গিয়েছে। এখন আসি। ইতি—

তোমার স্নেহমুগ্ধ ছোট্ট বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন।

পুনশ্চঃ—যদি সময় করতে পারো, চিঠি পেলে ভারি খুশি হব। আমি তোমাকে কত ভালবাসি, সে-কথা জানাবার জন্তে তোমাকে স্কটলণ্ডের একটা ছোট ফুল পাঠালাম। বিদায়!"

চিঠিটা হান্স এণ্ডারসেন পেলেন নিউজীলণ্ডে থাকতে। তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন:

"রাম্‌নীস্, স্থিয়েলকয়ের কাছে।
২৫শে মে, ১৮৭১
(দেনমার্ক)

ছোট্ট বন্ধুটি,

সেদিন যে চিঠি লিখেছ তার জন্তে ধন্তবাদ! থিয়েটারে মূক অভিনয় দেখার কথা যা বলেছ তার জন্তে ধন্তবাদ। সে রাত্রিটা খুব আনন্দে কেটেছিল নিশ্চয়। আমি সিন্ধবাদের গল্পটা জানি। 'হাজার এক রাত্রি' বলে বইখানাতে এ গল্পটা আছে, বইখানা নিশ্চয় পোড়ো।

তোমার দিদি আমার কাছ থেকে যে গল্পগুলো তোমার জন্তে নিয়ে গিয়েছিল, তার পরের গল্পগুলো শীঘ্রি পাঠাচ্ছি তোমাকে। নতুন বইথানায় অনেক গল্প থাকবে যা তুমি জানো না। তোমার দিদি আর তাঁর বন্ধুরা যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন আমি কোপেনহাগেনের কাছে এক গ্রামে ছিলাম। তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দিলেন ছোট্ট মেরির ভালবাসা। এটা হল তাঁর মৈত্রী ও সুবিবেচনার পরিচয়। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে যে বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন তাঁকেও আমার প্রীতি জানিও। দেনমার্কে আমরা প্রায়ই তোমার বাবার কথা—তাঁর আফ্রিকা বেড়ানোর কথা বলাবলি করি। সেদিন একটা খবরের কাগজে দেখলাম, তিনি দেশে ফেরার জন্তে বেরিয়ে পড়েছেন। জয় হোক্! কী চমৎকার! যাঁরা ভগবানে আস্থা রাখেন, ভাল ভাল কাজ করেন, ভগবান তাঁদিকে কখনো ত্যাগ করেন না। তোমার বাবা কর্মিৎকর্মা লোক—তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরে আসবেন, বাড়ীতে কী হৈ-চৈ পড়ে যাবে; দেশময় কী উৎসব সুরু হবে! আমরা সবাই তাঁর মর্য্যাদা বুঝি, তাঁকে সম্মান করি। তিনি এসে যখন ছোট্ট মেরিকে অনেক বার চুমা খাওয়া শেষ করবেন, তার সঙ্গে গল্প করা, খবর দেওয়া শেষ করবেন, তখন তাঁকে আমার প্রীতি জানাতে ভুলো না—ভগবান তাঁকে আমাদের আনন্দ ও শিক্ষার জন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। তোমার পিসিমাতার আর বাড়ীর আর আর যাঁরা মেরির বন্ধু হান্স ক্রিশ্চিয়ান্ এণ্ডারসনকে ভালবাসেন তাঁদের কাছে আমার নাম করে বোলো।

এখন একটা গ্রামে আছি সাগরের কাছে। একটা প্রাচীন জমিদার-বাড়ীতে—বাড়ীর উপর উঠেছে লম্বা-লম্বা চূড়ো—বাগানটা এগিয়ে গিয়েছে সাগর-সৈকত আর বীচ বনের দিকে। বীচ বনটা এখন চমৎকার সতেজ আর সবুজ। মাটীর উপর যেন ভায়োলেট আর এনিমোন্ ফুলের গালিচা বিছানো হয়েছে। ঘুঘু ডাকছে, কোকিলগুলো কী-সব খবর বলছে। এখানে হয়তো একটা নতুন গল্প লিখব, আমার ছোট্ট বন্ধুটি পরে সেটা পড়বে। ছুটীর পর আমি সহরে ফিরে যাব—সেখানে গিয়ে আমার বন্ধু মেলচিয়রদের বাড়ীতে থাকব। বাড়ীটা সুন্দর দেখতে। তোমার দিদি আগনেস ঐ বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বাবা ফিরলে তাঁর প্রিয় কন্তা মেরির কাছ থেকে একটু খবর পাব আশা করছি। এখন তাহলে আসি। দেনমার্কে যে বন্ধু আছে তাকে ভুলো না যেন।

হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন"

আবার এক বছরের উপর চিঠি-পত্র বন্ধ। ষ্টান্‌লি যখন আফ্রিকা থেকে ডাঃ লিভিংষ্টোনের সংবাদ আনলেন, তখন আনা মেরি হান্স এণ্ডারসেনকে লিখলো:

"উলভা কুটীর,
হ্যামিল্টন
৮ই আগষ্ট, ১৮৭২

প্রিয়তম হান্স এণ্ডারসেন,

বাবার খবর পেলেই তোমাকে লিখে পাঠাব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এখন খবর এসেছে। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসি হয়েছিলাম; উত্তর দেবার আগে বাবার কোনো সংবাদ পাই কি না দেখছিলাম।

এ-বছর গরম কালের হাওয়া বদলানোটা চমৎকার হয়েছে। এতো মজা আর কখনও পেয়েছি কি না সন্দেহ। আমরা গিয়েছিলাম আইওনা, হেব্রাইডিস্ দ্বীপপুঞ্জের একটা। ওখানে একটা ক্যাথিড্রাল গির্জা আছে, রাণী মার্গারেটের আমলে ওটা তৈরী। কত কাল হয়ে গেল—যখন নতুন ছিল নিশ্চয়ই খুব জাঁকালো ছিল। এটার থিলেন্ আর থামগুলো, গোথিক ঢং-এ তৈরী থিলেন-বালা দরজাগুলো—সব কিছুর উপর সেই অনেক কাল আগেকার মহত্ত্বের ছাপ রয়েছে। সব-কিছু যত্ন করে খোদাই করা হয়েছিল, এখন কাল আর জল-হাওয়ার গুণে ক্ষয়ে গিয়েছে, অনেক জায়গা মুছেই গিয়েছে।

তার পর দেখেছি সেন্ট ওরানের ছোট গির্জাটা—তার ছাদ নাই—ভেঙে পড়েছে। এর বিখ্যাত তিন-থিলেনও আর নাই—তার উপর সুন্দর খোদাই-এর কাজ। এই গির্জাটায় কয়েকটা সমাধি-প্রস্তর রয়েছে। ছোট গির্জাটার চার দিকে কবর-স্থান, সেখানে স্কচ, আইরিশ আর ফরাসী রাজারা নাইট আর বিশপদের পাশে বেশ শান্তিতে শুয়ে আছেন। আর একটা ধ্বংস-স্তূপ আছে—সেটা ছিল সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম, চূণ-পাথরের একটা সুন্দর ঢিপি। চমৎকার লাল-রঙা গ্রানাইট্ পাথর চার দিকে ছড়ানো সেখানে।

সেণ্ট কোলম্বো যেখানে প্রথম নৌকা থেকে নামেন সেটাকে বলে পোর্ট না কুলহিক। তাঁর নৌকা ছিল বেতের তৈরী—৬০ ফুট লম্বা। প্রবাদ আছে, তিনি নৌকাটাকে টেনে ঘাসের উপর তুলে ঘাস আর পাথর দিয়ে সেটাকে ঢেকে ফেলেন। ও-জায়গাটায় একটা ৬০ ফুট লম্বা ঢিপি আছে—ঐটাই নাকি সেই নৌকা। এখানকার সাগর-ধারে সবুজ পাথর পাওয়া যায়—আর কোথাও পাওয়া যায় না। এর এক টুকরো পালিশ না করিয়েই তোমাকে পাঠালাম। আরও পাঠাতাম কিন্তু তাহলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। (লোকে বলে, এই পাথরের একটা টুকরো পকেটে থাকলে তুমি কখনো নৌকাডুবিতে পড়বে না।) পরে যখন চিঠি দেব তখন আইওনা থেকে আনা একটা স্বচ্ছ পাথরকুচি তোমায় পাঠাব—সেটা সেণ্ট কোলম্বার ঘাট থেকে কুড়ানো।

কোলম্বোর আর একটা দেখবার মত জিনিষ হচ্ছে—উদ্গারী গুহা। দ্বীপটার আটলাণ্টিকের দিকে পাহাড়ে যে ফাটাল রয়েছে তারই দরুণ এই জলোদ্গার হয়। পাহাড়ের নীচেটা ফাঁপা। ফাটাল বেয়ে প্রবল বেগে বড় বড় ঢেউ এসে যখন ঢোকে,—ফাটালের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সময় বেরুবার পথ না পেয়ে ফাটালের মুখ দিয়ে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত ছিটকে ওঠে। লোকে বলল, শীতকালে নাকি জল ৫০ ফুট পর্য্যন্ত ওঠে। রৌদ্রে খুব চমৎকার দেখতে হয় এটা। ঝক্‌ঝকে ফোয়ারার জলে রৌদ্র পড়ে রামধনু সৃষ্টি হয়।

আইওনা থেকে ষ্টাফা হল আট মাইল, আমার তো মনে হয়, এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে বিস্ময়কর দ্বীপ আর হয় না। এ জায়গাটা দেখবার আগে এমনটা ভাবতে পারিনি।

আমার তো মনে হয়, মিষ্টি আইওনার মত আর কোনো জায়গাকেও আমি ভালবাসি না। এটা যেন সুন্দর এক টুকরো রত্ন। আইওনা থেকে ফেরার পরদিনই বাবার চিঠি এল—আমরা ভারি খুশি হলাম।

আগেকার মতই তোমার গল্পগুলো আমার খুব ভাল লাগে। আমি ফিরে ফিরে ওগুলো পড়ি।

তোমার যদি সময় হয়, তোমার চিঠি পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। কী চমৎকার তোমার সব চিঠি।

এই সামুদ্রিক উদ্ভিদটাও আইওনা থেকে এনেছিলাম।

সব খবর বলা বোধ করি শেষ হল। এখন আসি।

তোমার স্নেহের বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন।"

হ্যান্স এণ্ডারসেন এ চিঠি পেলেন ১১ই অগষ্ট তারিখে। তাঁর ডায়েরী থেকে জানা যায়, চিঠি খোলার সময় সবুজ পাথরটা পড়ে যায়; তিনি সেটা খুঁজে পাননি। তিন দিন পরে তিনি লিখলেন:

"কোপেনহাগেন
১৪ই অগষ্ট, ১৮৭২

প্রিয় বন্ধু,

তোমার সুন্দর চিঠিটা পেয়ে আর তোমার হেব্রাইডিস ভ্রমণের কাহিনী শুনে খুব আনন্দ পেলাম। তুমি যে রকম জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করেছ তাতে মনে হচ্ছিল আমি যেন সেখানে পৌঁছে গেছি। চিঠি খুলবার সময় সবুজ পাথরটা খাম থেকে বাগানের পাথরকুচির মধ্যে কোথায় যে পড়ে গেল, আর পেলাম না। তাই লিখছি, তোমার পরের চিঠিতে আর এক টুকরো পাঠিয়ে দিও, আমি সেটা যত্ন করে রেখে দেব। তাতে সমুদ্রে বিপদ হতে তো বাঁচবই; আমার ছোট বন্ধুটির কথাও মনে করিয়ে দেবে সেটা। কিছু দিন ধরে আমার এবং দেনমার্কের আরও অনেকের মন তোমার মহামহিম বাবার কথায় ভরে আছে। তিনি বেঁচে আছেন, তাঁকে পাওয়া গিয়েছে জেনে আমরা সকলেই আনন্দিত। তাঁর সঙ্গে মিঃ ষ্ট্যানেলির সাক্ষাতের সংবাদ পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসেছিল, আমার কেবলই ইচ্ছা হচ্ছিল মিঃ বেনেটকে তাঁর কথাগুলোর জন্যে গিয়ে আলিঙ্গন করি—"যত টাকা লাগে লাগুক, লিভিংষ্টোন্‌কে খুঁজে বার করা চাই।"

আমার ছোট বন্ধুটি তার প্রথম দিকের একখানা চিঠিতে লিখেছিল, বাবা দেশে ফিরলে মিস্ মেরি তাকে নিয়ে দেনমার্কে আসবে। সে হয়তো সে কথা ভোলেনি—আমার আশা হয়তো পূর্ণ হবে। সকলের হৃদয়, সকলের বাড়ীই তোমাদের কাছে খোলা থাকবে, বিশেষ করে মেলচিয়রদের। তাদের বাড়ীতে আমি গ্রীষ্মকালটায় থাকি। কুটীরটা সুন্দর, সাগরের সুমুখেই, কোপেনহাগেনের কাছে। তোমার দিদি একবার সে-বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তোমার বাবা যদি একবার আমাদের এই উত্তর-দেশে বেড়াতে আসেন, আমাদের সকলেরই কী আনন্দ যে হবে! দেনমার্ক হচ্ছে ইংলণ্ডের বড় একটা বাগানের মত; নরওয়ে সুইডেন্ স্কটলণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভাগ্যবতী মেরি! লিভিংষ্টোনের মত বাবা পেয়েছ। সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস রেখে, মানব জাতির মঙ্গলের জন্যে যে-দেশে তিনি বহু অবসাদ ভরা দিন ও রাত্রি যাপন করেছেন, সে-দেশের বুকের উপর যখন রেলপথ খুলবে সেই সুদূর ভবিষ্যতেও লোকে তাঁকে স্মরণ করবে।

ভাগ্যবতী মেরি! ভগবান করুন্, তোমার এবং তোমার প্রিয়জনদের সঙ্গে স্কটলণ্ডের ভূমিতে তোমার বাবার মিলন হোক্। তাঁর বলবার মত কত কাহিনীই না থাকবে। তাঁর দুঃসাহসিক জীবনে তিনি যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার তুলনায় আমার গল্পগুলো কোথায় লাগে? তুমি যখন তোমার বাবাকে জড়িয়ে ধরবে তখন তাঁকে আমার নাম করে বলতে ভুলো না। তোমার পিসিমাকেও আমার নাম করে বোলো; তিনি তোমাদের মায়ের মত বুকে করে রেখেছেন—লিভিংষ্টোনের সন্তানদের জন্যে জীবনধারণ করে আছেন।

আবার তোমার চিঠি পাব, এই আশা করছি। মিস্ মেরি লিভিংষ্টোন, ইতি—

তোমার সত্যিকার অকপট বন্ধু
হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান্ এণ্ডারসেন।"

[ক্রমশঃ।

ছড়ার চিঠি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এ কী দেখি ? হঠাৎ এ কী ? পেলাম চিঠি ক্বচিৎ হেন ?
লিখতে পার খুব সহজেই 'মুড' আসে না লিখতে কেন ?
বহুদিনের পরে, জানো ? ফুরসত আজ মিলল আমার
তাই ধরলাম ছড়ার চিঠি—থামব এলে সময় থামার।
দূর বিদেশে চরকি বাজীর সাঙ্গ হ'ল বুঝি পালা,
দেহের যখন থামে গতি কলমকে দিই তখন মালা।
ঘোরা, লেখা একসঙ্গে খাপ খায় না জানো না কি ?
পেশী যখন সতেজ থাকে মন ঘুম যায়, জানো তা কি ?
আমেরিকায় যেতেই ছোঁয়াচ লাগলো ওদের ঘূর্ণিপাকের
কাঠবিড়ালীর নাম শুনেছ ? ওরা আজো তারি থাকের।
তাই সেখানে চুটিয়ে, ও ভাই, করলাম গান, বক্তৃতাও
আলোচনা অন্তহীনা—নাচল অফুর ইন্দিরাও।
ফ্রান্সিস্কো, লসেঞ্জেলেস্, কারমেল, বিগস্যুর আরো ভাই
কত নগর ঘুরলাম যে—কত লিখি সময় যে নাই !
এই ফুরসত আজ আছে—কাল যাব উধাও আরেক দিকে
হোক, তবু যা পারি তোমায় খুস খেয়ালে যাবই লিখে।
আমেরিকায় কতোগুলি আসর আমরা জমিয়েছি তা
আন্দাজ কি করতে পারো ? কথকতাও জানো কি তা ?
চল্লিশটি জলসা গানের আমেরিকায়—নৃত্য সাথে
কখনো বা সকাল-সাঁঝে, কখনো বা গভীর রাতে।
কখনো রামকৃষ্ণ-পীঠে, কখনো বা প্রেক্ষাগৃহে,
কখনো ইউনিভার্সিটি, ড্রয়িংরুমে—জানো কি হে ?
এমন শঙ্কর কেউ করেনি সে-মান্ধাতার আমল থেকে
বোঝে না যার ভাষা কি সুর, স্বাদলো ওরা চেখে চেখে।
হাততালিও কম পড়েনি, পেলা কভু—মিথ্যে এ নয়,
টিকিট করা হ'লেও ওরা কিনতে টিকিট পেল না ভয়।
নামডাক খুব হল—ওরা মানল সবাই—শুধু ভাবি
কাজ কতটুকু হল ? হায় এ প্রবলেমটির কোথায় চাবি ?
না, না, দিগ্বিজয়ের পরে, পেসিমিস্‌ম্ বেসুর লাগে
ভগবানের নাম করেছি, গান করেছি অনুরাগে।
সৎ-কথারও বসিয়েছি পাঠ, বলেছি সজ্জনের কথা
আনন্দেরি বইয়েছি ভাই আমরা জোয়ার দিইনি ব্যথা
কারো প্রাণে, চাইনি কিছুই সহজ সখ্য মৈত্রী বিনা
করিনি তো আস্ফালনের প্রদর্শনী অন্তহীনা।
গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী, মানী, ভাবুক, রসিক নানাবিধ
সবাই কিছু সুখ পেয়েছে, বলেছে : "বাঃ ! জানিনি তো
ভারতীয় নৃত্যগীতের ভাব রস রূপ এমন রঙিন
তাই তোমাদের দিই সাধুবাদ—ও তরুণী এবং প্রবীণ !"
(বুদ্ধ ওরা বলেনি ভাই সাতাত্তোরেও আমায় কভু,
হয় তো মনে ভাবল, কিন্তু বলেনি কো মুখে তবু।)
'কার্নেগী'র কি নাম শুনেছ ? অঢেল দাতা, কোটি কোটি
বিলিয়ে ডলার নাম কিনেছে—ভাবতে অবাক, পিছু হটি।
সেই সমিতির শান্তিগৃহেও নৃত্যগীতের বসিয়ে আসর
পেয়েছি যে নিউইয়র্কে আমরা দু'জন কত আদর।
দেখতে যদি চোখে তবে বলতে খুশি হ'য়ে দেখে :
"ঢাল তরোয়াল বিনা এ কোন্ সর্দার এলো কোথা থেকে ?"
একটি শুধু হারমোনিয়ম্—সঙ্গিনীও একটি বিনা
দুটিও নয়—তবু এদের মন যেন গায়—'ভয় জানি না।'
তারপর এলাম উড়ে পৌঁছে—ইন্দিরা আর দিলীপকুমার
আমেরিকা থেকে সোজা লণ্ডনে—আনন্দে অপার।
সেখানে এক মস্ত হলে ফের বসালাম নৃত্যগীতের
আমরা আসর—কবি কাজীর লণ্ডনে আজ তাঁর খরচের
সুরাহা ভাই হয় তো হল—আশা করি এ বিলিতি
ডাক্তারেরা সারিয়ে দিলে ফের পাব তার দরাজ প্রীতি।
তারপর ? সে বলব বা কি ? সাক্ষাত লর্ড রাসেল-গৃহে
গান গাইলাম ইন্দিরার সুনৃত্য সাথে জানো কি হে ?
সেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল—যিনি আজ পেয়েছেন 'লর্ড' এ খেতাব
কী সাধুবাদ দিলেন যে—তাঁর চোখের মুখের সে যে কী ভাব।
নৃত্যগীতের পরে—না থাক্, বেশি বলা নয় কো ভালো।
আলো যখন যায় বিছিয়ে বলতে কি হয়—'বা রে আলো।'
সেখান থেকে আমরা গেলাম গটিংগেলের নিমন্ত্রণে
জার্মণির এক প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে খুশি মনে।
সেখানে কী সমারোহ বলতে তো চাই পঞ্চমুখে
কেবল বাসি ভয়—যদি বা অমিত্রদল ওঠে রুখে !
যদি বলে—কিন্তু না না, সত্য কথা যাই তো ব'লে
যে যা বলে বলুক, ভাবে ভাবুক—যাব সোজা পথে চ'লে
লক্ষ্যমুখে,—শঙ্কা কেন ? মিথ্যা যখন নয় কাহিনী
"বাজ"—ওরা বলুক না, আমরা দেখি সোনার সৌদামিনী।
গটিংগেলে সুধী, মানী, বিদ্বান্ ও ঐতিহাসিক
অধ্যাপকের ব্যূহের মাঝে কী যে আদর পেল পথিক।
ইন্দিরা যে নাচল কী নাচ—শুনে ওদের জয়ধ্বনি !
থামবে না কিছুতেই, ঘোষে : "ছড়াও আরো নৃত্যমণি !"
কাণ্ড তুমুল, কী করা যায় ? নাচতে হবেই একটি নাচ আর
অমনি এল নীরবতা সূচীভেদ্য পরম বিথার !
শিবনৃত্য গানের সাথের ইন্দিরা চমক জাগালো
তার পর অধ্যাপক-সুজন বলল কথা ভালো ভালো !
বলল, "এদের নৃত্যগীতে উঠলো জেগে আচম্বিতে
কৃষ্ণ, মীরা, শিব ভাবের রস আমাদের গহন চিতে।"
বললেন এক ঐতিহাসিক : "বাঁধলে সেতু তোমরা গুণী
জর্মণি-ভারতের মাঝে—ইন্দ্রজালের এ-সুর বুনি।"
কত যে জর্মণ প্রফেসর, কত ছাত্রছাত্রী এল
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, নৃত্যগীতে কে কি পেল।
তারপরদিন করল ওরা নিমন্ত্রণ এক শোভন হলে
গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের পাঠচক্রে দলে দলে •

কত যে সন্ধানী এল শুনতে ভাষণ মহাধ্যানীর
যাঁর ধ্যানে এ-যুগে এলো নব আশা আলোক-বাণীর।
ইন্দিরা আর আমি সেথায় বললাম যে কথা কত
নয় লেখা তো সম্ভব আর—করছে কলম ইতস্ততঃ।
বলছে থামার পালা এলে থামা শোভন—মিষ্টি কথন
সব চেয়ে ভাই বাস্তি ঢাকের জানোই জানো তোমরা সুজন।
তারপর ওরা চড়িয়ে দিল ট্রেণে, সোজা এলাম হেথায়
সুইজর্ল ণ্ড-রাজধানীতে রূপের মেলা অফুর যেথায়।
শৈলমালা, কূল-বনানী হ্রদ হর্ম্যরাজির শোভা
সবার উপর শান্তিসখী বাসন্তিকা মনোলোভা।
ছ মাস ধ'রে ঘুরে ঘুরে কর্মঢেউএর ঘূর্ণিপাকে
এতদিনে একটু জিরুই—স্বপ্নের ঢেউ প্রাণে লাগে।
তাই তো ছড়ার নাচের পালা এল কাজের পালার পরে
ছন্দমিলে যা বলা যায় সহজেই যে মনে ধরে।
তোমরা পাবে চিঠি যখন করব যে কী আমরা তখন
ঠিক করিনি—তবে বোধ হয় রইব স্বপ্নসুখেই মগন।

রবি শশী তারা মেঘের বসায় সভা উর্ধ্বে গগন
নিচে শুধু শ্যামল শোভা—অতৃপ্ত যে আজো নয়ন।
বিশ্বজগত নয় তো কুরূপ, মানুষ শুধু পায়নি চাবি
রূপকে আপন করতে আজো—কেন যে তাই খালি ভাবি।
নন্ ভগবান আলেয়া তো—দেন্ তো আজো চাইলে তিনি
তবে কেন হিংসাদ্বেষের আমরা করি বিকিকিনি।
সব দেশেতেই আজো কেন মানুষ উধাও লক্ষ্য বিনা
হৃদয় যখন জানে—কেন মন হাঁকে: "না না জানি না"।
প্রশ্ন থাকুক—শান্তিঢেউএ গা ভাসিয়ে যাক না চলা
অনেক কিছু বলা হল, অনেক কিছু থাক না-বলা।
ভালোবাসা নিও দোঁহে চিঠি লিখো ফিরতি ডাকে
তুরথ্ যদি লেখো জবাব লিখো সহজ অনুরাগে—
যা তোমাদের কাছে সহজ তাই তোমাদের আশিস-পরশ
দেন গুরুদেব—আমরা পাঠাই প্রীতির বাণী, রঙিন সরস।
(জুরিখ—৩. ৭. ৫৩)

(শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়-কে লিখিত।)

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
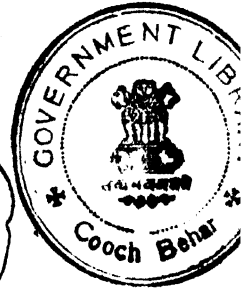
দেবানন্দপুর—শরৎচন্দ্রের পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী

[শরৎচন্দ্রের পিতামহী (মতিলালের মাতা) ও
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (শরৎচন্দ্রের মাতামহ)]

মতিলালের মাতা। জানেন বেয়াই মশাই, আজ কর্ত্তা নেই। তিনি থাকলে আজ আপনাকে কত আদর-যত্ন করতেন।

কেদারনাথ। আপনিই বা আদর-যত্ন কি কম করলেন! কত রকম করে রেঁধে খাওয়ালেন।

মতিলালের মাতা। কর্ত্তা বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই গাঁয়ের জমিদারের এত দাপট যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। তিনি সেই জমিদারের কথাই রাখেন নি। তিনি যা ভাল বুঝতেন তা কিছুতেই ছাড়তেন না। তার ফলও তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হ'ল। তা নইলে আমি আজ মতিকে নিয়ে পথে বসব কেন বলুন?

কেদারনাথ। কি রকম?

মতিলালের মাতা। একবার একটা প্রজা-উচ্ছেদের মামলায় জমিদার তাঁকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলে। তিনি ছিলেন ধর্ম্মভীরু লোক। মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজি হলেন না। স্পষ্টই বলে দিলেন—মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারব না। বড়লোকে কখনও মুখের ওপর অপ্রিয় কথা সহ্য করতে পারে না। তাঁর ওপর অত্যাচারের পর অত্যাচার সুরু হ'ল। তারপর সেই ঝগড়া এতদূর পৌঁছল যে তিনি এই গাঁ ছাড়তে বাধ্য হলেন।

কেদারনাথ। বলেন কি বেয়ান? বৈকুণ্ঠ বাবুর ওপর এত অত্যাচার হয়েছে?

মতিলালের মাতা। শুনুন না। এইখানেই শেষ নয়। তিনি গাঁ ছাড়লেন বটে, তবে মধ্যে-মাঝে অনেক রাতে এসে আমাদের দেখে-শুনে যেতেন। আর ভোর হবার আগেই চলে যেতেন। তখন মতির বয়েস ছ'-সাত বছর। তারপর একদিন গভীর রাতে তিনি বাড়ী এসেছেন। মতি বিছানায় ঘুমুচ্ছিল। তাকে একটু আদর করলেন। তারপর আমায় বললেন—আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। কিছু খেতে দিতে পার? আমি জানতাম পাঁচ-সাত দিন অন্তর তিনি আসবেন। আমি আন্দাজ করে দুটি ভাত হাঁড়িতে রেখে দিতাম। এমন কতদিন ভাত ফেলাও যেত। সেদিনও ভাত ছিল। পিঁড়ি পেতে জায়গা করে ভাত বেড়ে দিলাম। তিনি খেতে বসেছেন এমন সময় বাইরে থেকে ডাক পড়ল—"অমুক বাবু, বাড়ী আছেন?" তিনি রাতে এক-আধ দিন বাড়ী আসেন—এই খবর হয়ত জমিদারের কানে উঠেছিল। তিনি লোক লাগিয়ে রেখেছিলেন। তারাই এসে ডাকাডাকি সুরু করল। মুখের অন্ন—বাড়া ভাত—সেইখানেই পড়ে রইল। আমি হাত ধরে বললাম—মুখের ভাত ফেলে যেও না। তিনি শুনলেন না, দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন।

কেদারনাথ। তারপর কি হ'ল?

মতিলালের মাতা। আমি দূরে শুধু একটা বীভৎস প্রাণফাটা চীৎকার শুনতে পেলাম। সেই চীৎকার লক্ষ্য করে যেতে গিয়ে দেখি, উঠোনে ধানের মরাইয়ে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চালাটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ফট্-ফট্ করে ধান পুড়ছে। মৃতদেহ আমি দেখতে পেলাম না। যমদূতের মত লোকগুলো আমায় দেখে ছুটে পালাল। এই সব কাণ্ড দেখে আমি সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আগুন দেখে অনেক লোক এসেছিল তারাই আমাকে ঘরের ভেতর এনে মুখে-চোখে জল দিতে আমার জ্ঞান হ'ল। চোখ খুলে আমি শুধু বললাম—তাঁর কি হ'ল?

পাড়ার লোকে আমাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিল।

কেদারনাথ। বলেন কি? জমিদারের এত অত্যাচার?

মতিলালের মাতা। পরদিন সেই মৃতদেহ সরস্বতী নদীর স্নানের ঘাটে পড়ে ছিল।

কেদারনাথ। তারপর কি করলেন?

মতিলালের মাতা। কি আর করব বেয়াই মশাই! আমি একে গরীব, তায় বিধবা। একেবারে অসহায় যাকে বলে। গাঁয়ের লোকও বললে—কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস করা চলে? তোমার সে ক্ষমতা কোথায়?

কেদারনাথ। তা সত্যি।

মতিলালের মাতা। আমার সে কি দিনই গিয়েছে বেয়াই! সহায় নেই, সম্বল নেই। ঐ শিবরাত্রের সলতেটুকু নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। অতি কষ্টে মতিকে এই গ্রামে যেটুকু লেখাপড়া শেখা যায় ততটুকু পড়িয়েছি। আর আপনি যখন দয়া করে আপনার মেয়েটি দিলেন, তখন আমি ওকে আপনার হাতেই সঁপে দিচ্ছি। আপনি ওকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখান। এই অসহায় বিধবার সন্তানটি যাতে মানুষ হয়ে ওঠে। এখন তো ও আর শুধু আমার নয়, আপনারও তো বটে।

কেদারনাথ। আচ্ছা, তাই হবে বেয়ান! আমি মতিকে ভাগলপুরে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু মতিকে নিয়ে গেলে এই গ্রামে একলা থাকতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

মতিলালের মাতা। অসুবিধে আর কি হবে বেয়াই! পাড়ার লোক আমাকে খুব দেখে-শোনে। তাদের জন্তেই এই গাঁয়ে খেয়ে-পরে রয়েছি। মতি চলে গেলে আমি এই কথাটা ভেবে নিশ্চিন্ত হব যে মতি আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে।

কেদারনাথ। আচ্ছা, তাই হোক্। মতি আমার সঙ্গে চলুক। ওর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মতিলালের মাতা। আজ আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত হ'লাম বেয়াই। ও একটু লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে আমি শান্তিতে চোখ বুঁজতে পারি। আর ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি যে আমার বংশে কেউ যেন জমিদারের অত্যাচারের কথা না ভোলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৮৮৬ সাল। দেবানন্দপুর

[একটি আম-বাগানে বসিয়া শরৎচন্দ্র ছিপ তৈরী করিতেছেন। অরু নামে একটি দশ বৎসরের বালিকার প্রবেশ।]

শরৎচন্দ্র। অরু, তুই কেন এলি রে? পারু এল না?

অরু। শরৎদা, তুমি আমায় ডাকছিলে?

শরৎচন্দ্র। না ত! তোকে ত ডাকি নি। পারুকে ডাকছিলাম। তোকে ডাকছিলাম কে বললে?

অরু। পারুই বললে। তাই ত আমি এলাম।

শরৎচন্দ্র। তোকে ত ডাকিনি। পারু ত ভারি দুষ্টু। নিজে না এসে তোকে পাঠিয়ে দিল।

অরু। তুমি ভারি একচোখো। তুমি আর কাউকে দেখতে পার না। কেবল পারু আর পারু।

শরৎচন্দ্র। না রে না। তোকেও খুব দেখতে পারি।

অরু। ছাই পার।

শরৎচন্দ্র। সত্যি বলচি। তুই পারুকে একবার ডেকে দে ত—আমার ছিপটা ধরবে।

অরু। আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আমি ছিপটা ধরলে কি তোমার ছিপটা খারাপ হয়ে যেত?

[আম গাছের পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পারু—
তার বয়স আট বৎসর।]

—এই পারু, এদিকে আয় না। আবার উঁকি মারা হচ্চে। শরৎদা তো তোকেই ডাকছিল। দুষ্টুমি করে আমাকে ডেকে দেওয়া হল। এবার ডাকলেও আর আসব না।

শরৎচন্দ্র। না, আসবি নে। পেয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় যেতে হবে না? পড়া না পারলে তখন দেখিস। মাথায় এইসা গাঁট্টা দেব যে মাথা ফুলে উঠবে।

অরু। না ভাই, মেরো না ভাই। আমাদের বাগান থেকে তোমাকে দুটো পেয়ারা এনে দেব। সেদিন আমার মাথায় গাঁট্টা মেরেছিলে, আমার মাথা ক'দিন ফুলে ছিল। সেদিন মা চুল বেঁধে দিতে দিতে ফুলোটা দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ কি হয়েছে রে? আমি বললাম—পাঠশালা থেকে আসতে পড়ে গিয়ে লেগেছে।

শরৎচন্দ্র। আচ্ছা যা, এখন পেয়ারা নিয়ে আয় দেখি।

[অরুর প্রস্থান।

—পারু, এ দিকে আয়। তোকে ডাকলাম—আর তুই অরুকে ডেকে দিলি কেন রে?

পারু। আমিও তো তক্ষুনি এসেছি। আমি গাছের পেছনে লুকিয়ে দেখছিলাম তুমি কি কর।

শরৎচন্দ্র। না এলি বয়েই গেল। ছিপটা ধর দিকি, আমি টপ করে চেঁচে ফেলি।

[পারু ছিপ ধরিল।]

—তুই এতক্ষণ এলে আমার ছিপ কখন হয়ে যেত। আজই বিকেলে এই ছিপ দিয়ে রায়েদের পুকুরে মাছ ধরব।

পারু। আর রায়েরা যদি বকে?

শরৎচন্দ্র। আমাকে বকবে না। আর যদি বকে, রাতারাতি পুকুরপাড়ের কলমের আম গাছের চারাগাছগুলো সব শেষ করে দেব। আমাকে চেনে, আমায় কিছু বলবে না।

পারু। আমি মাছ ধরব শরৎদা।

শরৎচন্দ্র। তুই কি মাছ ধরতে পারিস? তুই আমার কাছে বসে থাকবি. আর যোগাড় দিবি। ছিপটা হয়ে গেলে, কেঁচো খুঁড়ে আনব। তুই একটা নারকোলের মালায় দুটি মাটি নিয়ে আমার সঙ্গে যাবি। আমি কেঁচো তুলে তুলে তোর মালায় দেব। তুই সেগুলো মাটি চাপা দিয়ে রাখবি। দেখিস, যেন পালায় না। বোলতার ডিম কোথায় পাই বল ত পারু?

পারু। আমি জানি নে। আমি কিছু পারব না। কাল তুমি আমায় মারলে কেন?

শরৎচন্দ্র। বলেছি না—বৈঁচির মালা একটু বড় করে গাঁথবি। কাল যে মালাটা করেছিলি, সেটা ছোট হয়েছিল—গলা দিয়ে কোন গতিকে গলে। এই নাই পর্য্যন্ত লম্বা মালা করবি কাল, বুঝলি? নইলে—

পারু। নইলে কি?

শরৎচন্দ্র। এইসা মার মারব যে—

পারু। তবে এই আমি চললাম।

শরৎচন্দ্র। আচ্ছা, আচ্ছা, মারব না, আয়। এখানে বোস।

পারু। (বসিয়া) আচ্ছা নেড়াদা, বড় হয়ে আমাকে তোমার মনে থাকবে?

শরৎচন্দ্র। খু-উ-ব।

পারু। তুমি হয়ত তখন আমাকে চিনতেই পারবে না।

শরৎচন্দ্র। খুব পারব দেখিস্। এখন চল।

[প্রস্থান।

শ' ও চার্চ্চিল-সংবাদ

শ'য়ের একটি নাটকের প্রথম রজনীতে অভিনয় দেখার জন্য দু'খানি টিকিট পাঠিয়ে দিলেন উইনষ্টন চার্চ্চিলকে। লিখলেন, "এই সঙ্গে দু'খানি টিকিট। আমার নাটকের প্রথম রজনীতে যদি আসেন। অন্যটি আপনার কোন বন্ধুর জন্যে, অবশ্য বন্ধু যদি আপনার কেউ থাকে।" চার্চ্চিল পত্রোত্তরে লিখলেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, প্রথম রজনীতে যোগ দিতে পারলাম না। আমি এবং আমার বন্ধু দ্বিতীয় রজনীতে যেতে চাই, যদি অবশ্য নাটকটা বন্ধ হয়ে না যায়।"
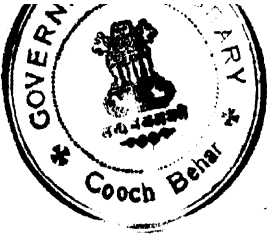
স্মরণে

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

হরিদ্বারে

ডেরাডুন থেকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা হরিদ্বার। পৌঁছলাম সেখানে বেলা চারটায়। ভাবের স্থান দেখে আনন্দ হলো। মনে পড়তে লাগলো মা, ভাই ও বৌদেরকে। কেন একা এলাম এত দূরে? প্রতিজ্ঞা করলাম বেঁচে থাকলে আনবো তাদেরকে অতি শীঘ্র।

পরের দিন বেড়াচ্ছি ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে, গঙ্গা তীব্রবেগে 'বয়ে' চলেছে। ঘাটে-ঘাটে বসে রয়েছেন পাঞ্জাবী কথকতার পণ্ডিত। দু'-চারশো করে পুরুষ-মেয়েতে আসন নিয়ে বসে। কাশীর চেয়েও নূতনত্ব দেখলাম। ঠাকুর গান ধরলেই সুর দেন মেয়েরাও।

বাঙালী তেমন বেশী নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো এক ভদ্রলোক নিজের কন্যা না হয় নাতনীকে নিয়ে যাচ্ছেন আগে আগে। তাঁর বন্ধুও একজন আছেন। আমি তাড়াহুড়ো ক'রে এগিয়ে গিয়ে ধরলাম বাবুকে।

"আপনার কন্যার কোন অসুবিধা হবে না ত?"

শুনেই থমকে দাঁড়ালেন মহিলাটি। চমকে উঠে বাবু বললেন, "উনি আমার স্ত্রী!"

তিনি বাসা নিয়েছেন ভোলা গিরির ধর্ম্মশালায়। আমাদের বাসা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরই একটা বাড়ীতে। সামনে বৃহৎ একটা গাছ। পাশেই সাধুদের আস্তানা। সব চেয়ে দেখার স্থান এইটাই। বাবু এসে খোঁজ নেন আমার। গল্প হয় আমাদের। মাছের কাঁটা গলায় বেধে আছে বুঝলাম বাবুর। আমার সঙ্গে বোঝাপড়া না হ'লে পারবেও না বুঝলাম।

বাবুই প্রথম কথা তুললেন, "আপনাকে বলচি শুনুন। আপনি বোধ হয় ভেবেচেন এই বুড়ো কী অসৎ জানোয়ার দেখ। নিজের নাতনী-বয়সী মেয়ের সঙ্গে বে করলো? ঠিক বলুন কি না? আপনি ত জিজ্ঞেসই করলেন আপনার কন্যার অসুবিধা হবে না ত? আপনি কী ক'রে জানবেন এতো বয়সে এতো বড় গর্হিত কাজ করে কী ক'রে!! আমার একটু কথা শুনতে হবে, তা হ'লে বুঝবেন অন্যায় করেচি কি না!"

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "আপনি আমাকে কৈফিয়ৎ দেবেন কেন? আমি কিছু ভেবে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। এমনি বলেছিলাম—"

"বাঃ! আপনাকে বলে আমি একটু হাল্কা হ'তে চাই। আপনি শুনুনই না।"

বুঝলাম—এ ক্ষোভ।

সুরু করলেন নিজের কাহিনী ব'লতে।

"আমার বয়স যখন তেষট্টি তখন স্ত্রী মারা গেলেন। এতো দিন ভাবতে পারিনি এতো বড় বিপর্য্যয় এ বয়সে আমার হবে। আমি ত সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। স্ত্রীই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা। একটু জলের দরকার হ'লে দেখি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাজেই আমাদের স্ত্রীই। যখন বাড়ীতেই রাত-দিন তখনই স্ত্রী নেই। স্ত্রী মারা যেতেই আমার পেনসেন হ'লো। তখন দেখলুম আমার দিন যায় না। আমার দুই পুত্র এক কন্যা—তাদের কাছে সাহায্য চাইলুম, তোমরা দু-এক মাস ক'রে থেকে আমার সাহায্য করো। ছেলেরা গভর্ণমেণ্টের চাকরী করে। বৌদেরকে পাঠালেন দু-এক মাস ক'রে। বুঝলুম, রাখলে তাদের সংসার অচল। নিজে থেকেই বলতে বাধ্য হলুম—তোমরা যাও বৌমা, ছেলেদের অসুবিধা হচ্ছে। বলতেই তাদের রাস্তা দেখে নিলো। কথা বলার লোক না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠি। গেলুম নিজের কন্যার কাছে। জামাই আমার বড়দরের কন্ট্রাকটার। কন্যারও দিনে-রাতে সময় নেই, লোকজনের চা-জলখাবার দেওয়া দেখা। সময় সময় দেখলুম, জামাই তার বৌকে নিয়ে বসে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ব্রিজ খেলছে। তা হলেও কোন গতিকে মেরে-কেটে আমার খোঁজ নেয়। বলে—বাবা, দুপুরে আপনার খাবার সময়ে আসতে পারিনি। আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে শুনি ও দেখি। জামাইদের সুখের সংসারে একটা কণ্টক হয়ে বসে রয়েছি এইটাই মনে হয় বার বার। আমার মনের অবস্থা বুঝছেন ত বাবু সাহেব! একটা অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট!"

আমি নির্ব্বাক্ শ্রোতা। তিনি বলেই চলেছেন, "আমি কন্যাকে বললুম, "মা, দিন কতক বাসা থেকে ঘুরে আসি, না হ'লে জিনিষ-পত্রগুলো খোওয়া যাবে।"

কন্যা বললে, "কেন বাবা! আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে? জিনিষ আমি আনিয়ে নেবো। আপনি থেকে যান।"

বিচার ক'রে দেখলুম, ঠিক সময় আহার আসে। বরং বাড়ীর চেয়ে ভাল খাদ্য। চাকর-বাকর হাজির সকল সময়। তবুও যেন কিসের অভাব। যা চাইছি সে দরদ পেলুম না। সকলেই নিজের তালে। আমাকে দেখবার নেই কেউ।

কন্যাকে ব'লে আমি নিজের আস্তানায় চলে এলুম। সেখানে আগের সেই নীরবতা। একটা ঝি যোগাড় ক'রে দিলো আমার বন্ধু। একটা মানুষ পেয়ে বাঁচলুম। সেই রেঁধে আমাকে খাওয়াতো। ভেবেছিল, বোধ হয় বিপত্নীকের শূন্য স্থানে জুড়ে বসবো। যখন দেখলো তা হবার নয়, তখন আরম্ভ করলো না-বলে আমার জিনিষ-পত্র নিয়ে যেতে। চোখে দেখতে পারলুম না। বললুম—আমি ডেকে না পাঠালে আর আসবে না তুমি। এই গেল এক অধ্যায়।

তার পর এলো এই অবস্থা—বন্ধু একজন বললেন, "রাখাল! তোকে ভাই বে করতে হবে।" আমি বললুম—"আমার সে ক্ষমতা কই?" তিনি বললেন—"ক্ষমতা আছে আমি জানি।" আমার হাসি পেলো, ক্ষমতা আছে কি না আমি জানি না, বন্ধু জানেন! শুনে হাসি আসে কি না বলুন ত?

বন্ধু আমার নাছোড়বান্দা; বললো, "রাখাল, তোকে মেয়ে দেখতে হবে।" আমি তখন আরও ভয় পেয়ে গেলুম। বললুম, "দেখতে হবে তা হ'লে নিশ্চয় সুন্দরী! কী বল? তার তা—র।"

"তুই পরিচয় ক'রেই দেখ না।"

সত্যই দুপুর বেলায় আমার হবু-বৌ এসে হাজির। আমি বললুম, "আমাকে বে ক'রে ত তুমি সুখ পাবে না?"

বেচারা মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো চুপটি ক'রে।

আমি বুঝলুম, বেচারা আমার কথা শুনতে চায়। কিছু বলতেও চায় হয়তো! ব'লে চললুম, "তোমার বোঝবার বয়স হয়েছে। আমি অকপটে তোমাকে বলছি পুরুষের সামর্থ্য হারিয়ে গেছে আমার। এখন বে করা হাসির ব্যাপার হবে। আমি নিজে অপরাধী হবো আমারই কাছে।"

ভিতরের সত্য শুনে মুখ নড়ে উঠলো মহিলার। বললেন "কেবল কামের সম্বন্ধ ছাড়া কি অন্য সম্বন্ধ থাকতে নেই? মা ভাবতে ভাবতে মারা গেছেন। কাকা জীবন্মৃত হয়ে আছেন আমাকে পার করবার জন্যে…" চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো মহিলার। আমার লজ্জা হলো নিজের কাছেই।

তারপর বে আমাদের হয়ে গেল এক মাসের ভেতরেই। পুত্র দু'জনেই জানিয়ে দিলেন খবর পেয়ে—"বাবা! আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ। মুখাগ্নির প্রত্যাশা করবেন না আমাদের।" অভিমানে এতদূর জানিয়ে গেলো।

চিঠি-পত্র সব দেখেন আমার স্ত্রী। দুঃখ করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "তাদের রাগ-দুঃখ হাওয়া স্বাভাবিক। কালে আপনি সয়ে যাবে।"

বুঝলুম তখুনিই—এ বাবা অল্প জলের মাছ নয়।

প্রথম প্রথম দু'-চার দিন পাগলামী করতে গেলেই শরীর গরম হয়ে উঠতো। কাজের সময় আসতো অবসাদ। বুঝতে পেরে বললেন স্ত্রী, "ছি! তুমি কী পাগল! তোমার শরীর থাকবে না যে!" আমি দু'মাস নিজেকে নিয়ে পর্য্যালোচনা করেছি। আমার অক্ষমতার দুঃখে আলো দেখতে পেলুম। মনে পড়লো মহাভারতের কথা। ভারতের অধীশ্বর নিজের রাজমহিষীকে সন্তান উৎপাদনের স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। মনে পড়লো আমার পূর্ব্ব স্ত্রী থাকতে আমি খুব ভাল ছেলে থাকলেও নিজেকে ত চিনতাম। ডুবে ডুবে কত জল খেয়েছি সে-সব মনে পড়তে লাগলো। বুঝতাম এ-সব একটা মনের বিলাস। ভাব-টাব এর ভেতর কিছুই নেই। তেমনি আমার এ স্ত্রী একটু এদিক-ওদিক করুক না। তার ছেলে হলেও মেনে নেব নিজের ছেলে বলেই। ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত বলতে গিয়ে আসল মূর্ত্তি দেখতে পেলাম স্ত্রীর। একটা ছত্রে বুঝিয়ে দিলেন, "ছি! আমরা যে মায়ের জাতি, ভুলে যাও কেন? আমাদের আসল ধর্ম্ম হচ্ছে সেবা।" যদি কোন দিন গ্রামোফোন এনে দিয়েছি, বলেছেন, "কী দরকার এ-সবে আমার!"

আমি বললুম "কী দরকার তবে তোমার?"

হেসে জবাব দেয়, "কেন, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার বেঁচে থাকা। তোমার সেবার ভার নেওয়া।"

—"রুগ্ন অক্ষম লোককে বাঁচিয়ে রাখায় কী সার্থকতা তোমার?"

হাসি থামতে চায় না স্ত্রীর—"এখনও আমাদের সমাজে শুনেছো কোন স্ত্রী, কোন মা, সাহেবদের মত মেরে ফেলেছে তাদের প্রিয় অসুস্থ অকর্ম্মণ্য কোন ঘোড়া কিংবা কুকুরের মত নিজের কোন আত্মীয়কে?"

"আপনাকে আমি সত্যি করেই বলছি, আপনার মত চৌকোশ চাকর-বাকর একজন থাকলে আমি কখখন বে'র কল্পনাও করতুম না। আমি অবাক হয়ে আপনার চাকরকে কাপড়-চোপড় পরান থেকে রান্না-বান্নার কাজ করতে দেখি আর ভাবি—কেন আমি সর্ব্বনাশ করলাম নিরীহ এক মহিলার! হাজার প্রায়শ্চিত্ত করলেও এ পাপ থেকে মুক্তির উপায় নাই। তারপর কিছু দিন পর কন্যার চিঠি পেলাম, তিনি লিখেছেন বাবা? মা মারা গেছেন তিন বছর আগে। এখন জানলাম বাবাও আমার নেই।"

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

ও ভাই চাষী বঙ্গবাসী
শোন্ রে পেতে কান,
আজকে শুধু হেথায় ব'সে
গাইব মাঠের গান।
ও ভাই, গাইব মাটির গান।
ওরে চাষাই যদি বল্-ভরসা
তবে, মোদের কেন এমন দশা?
আজ, অন্ন বিনে উপোস করি
হায়, কবুল ক'রে জান!
মোরা, ভুবন জুড়ে ধানের ক্ষেতে,
কত, 'আঁওন' 'আউস' ফলি হেঁ'তে,
এই, কপালের ঘাম পায়ে ফেলে রে,—
হায়, হই শেষে হয়রান!

রোজ, কাদায় পাঁকে চাঙড় ঘেঁটে
দেখ, পায়ের তলা গেছে ফেটে,
ভাই, তবু মোদের জুড়'ল না হায়,
এই, ভাঙা নসীবখান!
এই, ফাটা কপালখান।

আমরা চাষার দল।
লাঙ্'লা বলদ সাথের সাথী
মাটিই বুকের বল্!
আমরা মনে ক'রলে পরে
সোনা ফলাই মাঠের 'পরে,
হাত গুটিয়ে থাকলে ব'সে
মা লক্ষ্মী চঞ্চল!

আমরা এবার উঠ্ব ঠেলে
ভয়-ভাবনা ঘুচিয়ে ফেলে,
দূরের পাহাড় ধুয়ে রে দেখ্
আসছে নেমে ঢল্;
ছলের বলের ভাঙ্বে রে বাঁধ
ঢুকবে বেনো-জল!

•

ও ভাই চাষী ভারতবাসী
ডাক্ এসেছে চল।
তোরা যে ভাই আশার আলো
তোরাই জাতির বল্।
তোদের মুখের পানে চাইবে না রে কেউ,
তোদেরি ভাই আনতে হবে মরা-গাঙে ঢেউ;

তোর হালের ঘায়ে ভাগবে যত
চোর-ডাকাতের দল !
তোর কাঁদন-রোলে উঠছে ফুলে
সাত-সাগরের জল !

চাষী ভাই রে—
কাল-বোশেখী ঘনিয়ে এলো
ভাবিস্ কেন বল্
মাঠের মাঝে শুকন 'নাড়া'
ক'র্‌ছে রে ঝল্‌ঝল্ !
'বাউরী-বাতাস' পাখ্‌না মেলে
যাচ্ছে ধূলোর পালক ফেলে,
মাথার 'পরে রৌদ্র হেলে—
হায় হায়, দারুণ দাবানল !
'গোল্' খুলে নে' ঝুড়ি-ঝোড়া,
খোন্তা-খড়া, 'হেলে' জোড়া,
চল্ রে তুলি ঘাসের গোড়া,
ফেল্ চাযে লাঙল।

মাটির সেবা কর্ রে চাষী
ভাই রে, মাটির সেবা কর্ ।
'আঁচোট' ভেঙে 'আগাছ' মেরে
দাঁড়া পায়ের পর্ ।
'ওঁচলা-ছানি' পুড়িয়ে দে রে,
লাঙল ফেলে, বাঁওই মেরে,
নতুন ক'রে ফসল বুনে
ভাই রে, গোলায় এনে ভর্ ।
লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলে,
দেখ রে চেয়ে চক্ষু মেলে,—
খাস-খামারে কায়েম ক'রে
ভাই রে, তোল্ রে কোঠা-ঘর !

শাওন ধারা নামল মাঠে
চ' ভাই, ধান রুইতে যাই,
হাল্‌কা ক'রে রু'য়ে যা' রে—
বেশি রু'য়ো নাই।
দেখ্ রে এসে মাঠের 'পরে
'বীজ-তলা' তোর গেছে ভ'রে,
সবুজ শীষে সবুজ মিশে
ভাই রে, সবুজ সুরে ছাই ।
কুপিয়ে মাটি যা' 'নিড়িয়ে'
সমান ক'রে 'আঁচড়া' দিয়ে,
'ফুল্‌কো-বেগো-ময়না' ঘাসে—
ভাই রে, তামাম মারা চাই ।
পাক্‌লে ফসল আসিস্ আবার,
পহর দিতে ক্ষেত ও খামার,
নইলে শেষে প'ড়্‌বি গিয়ে

ভাই রে, ফাঁকের ঘরে ভাই ।
সহজ কথা ব'ল্‌ছি আমি
মাটির নামে হ' রে নামী,
মাটি-মা'কে আঁকড়ে ধ'রে
ভাই রে, দাঁড়া রে সবাই ।

মাঠের বুকে ঢল্ নেমেছে
বইছে জলের রেত,—
আয় রে হেঁকে দেখ্‌বি কে কে
সবুজ ধানের ক্ষেত ।
কাদায় ভরা ভিজল মাটি,
বুন্‌তে 'জেঠে' ডুবল পা-টি,
'শালি-সুনো'য় তুনোয় ঘিরে
কে করে সঙ্কেত ?
সব্‌জে রং-এর দোলাই প'রে
মাঠের হিয়ে উজল ক'রে,
দাঁড়িয়ে কে ওই ডাগর চোখে—
আহা, যেন ছাঁচি জালি-বেত !

ধান কাটার যে সময় হ'ল
মাঠে, চল্ ও ভাই চাষী ।
দাওয়ায় ব'সে 'বেওনা' ফুঁকে
ওরে, কাল্ করিস্ নে বাসি ।
'আগ্‌ড়াচিটে' বাছিস্ পরে,
'তড়্‌পা বেঁধে নে' আয় ঘরে,
কুচল মাটি সুচল হবে
তোর, ফুটবে মুখের হাসি !
সোনার ফসল দোলে হাওয়ায়,
মাঠে মাঠে ঢেউ খেলে যায় ;
বিহান বেলায় কোন্ দরদী
আহা, বাজায় ব্যাকুল বাঁশী !

ও ভিন্ গেরামের চাষী !—
ও বাংলা দেশের চাষী !—
ফসল কাটার সময় হ'ল
চল্ কাস্তে নিয়ে আসি ।
মাঠের ফসল বোঝাই ক'রে
নিয়ে চল্ ভাই আপন ঘরে,
ওরে, কেড়ে নিয়ে যাবে রে সব
কখন সর্ব্বগ্রাসী !
তোর গৃহ-লক্ষ্মী শূন্য হাতে,
সোনার পরশ নেইক' তাতে,
এই সোনা দেশের সোনা গেছে
হায়, লবণ-জলে ভাসি !
চক্ষু মেলে দেখ্, রে এবার
নেইক' ঘরে কিছুই দেবার ;
আছে শুধু চোখের কাঁদন
বুকের বেদনরাশি !

চল্ রে চাষী চল্—
ধান কাটি গে চল্,
মাথার 'পরে ঝরছে যে দেখ
শিশির ধোয়া জল ।
হিমেল হাওয়া লাগছে গায়ে,
থাকিস্ নে ভাই ঘরের ছায়ে,
কাছট ক'ষে আয় ছুটে আয়
আন্ রে মনে বল্ ।
কিষেণ-হাতে কাস্তে নাচে—
এবার দেখ্‌ব কা'রা মরে বাঁচে,
রইব না আর উপোস ক'রে
ভাঙ্‌ব বাঁতা-কল !

আম্‌রা পল্লীবাসী ভাগ্-চাষী ভাই
গতর খাটাই জীবন ভরি',
বাদ্‌লা-খরা মাথায় ক'রে
ফসল বুনি লাঙল ধরি' ।
সারা দিনই মর্‌ছি খেটে,
হাওড়-হাবড় গোবর ঘেঁটে,
সন্ধ্যে বেলায় সুতলি কাটি
হরি-সভায় লুটিয়ে পড়ি ।
ভাগের জমি চ'ষ্‌ব কত,
ভাগ্য আনে দুঃখ শত,
শীতে কাঁপি ছেঁড়া কাঁথায়
ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলে মরি ।
দুঃখের কথা কইব কা'রে,
কেউ তো ফিরে তাকায় না রে ;
কবে মোরা দেখ্‌তে পাব রে—
সুখের সড়ক নতুন করি ।

চাষী ভাই রে—
'ধান-কাড়া'-র যে সময় হ'ল
আলিস্ ছাড় ভাই ।
'খুটো'-য় পুঁতে 'হেলে'-য় জুতে
ভাই রে, ক'ষে দে 'মাড়াই' ।
এবার এলো লুটের পালা,
বাউটি বাজায় পল্লীবালা,—
'নিকিয়ে' খামার 'চেড়েন' দিয়ে
চল, 'পালা-ভেঙে' যাই।
'পোল-মেড়ে' নে 'ধান-ঝেড়ে'
ছানি-কুটোয় কুলোয় ঝেড়ে,
'চিটে'-য় ফেলে গোলায় ঢেলে
'ধান-সারা' চাই।
আয় এয়োরা পিদিম দেখা—
'উলু দে' সবাই

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সাবিত্রী—গায়ত্রী, বেদমাতা।
সাব্যস্ত—স্থিরীকৃত, সপ্রমাণ, নির্ণীত।
সাম—তৃতীয় বেদ, শান্ত করা, থাম।
সামগ্রী—দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ, প্রস্থ।
সামন্ত—সীমাস্থ, অধিকারস্থ প্রজা।
সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত।
সামর্থ্য—বল, শক্তি, ক্ষমতা।
সামাজিক—সমাজস্থ, সমাজবাসী, সভ্য।
সামাল—সাবধান, মনোযোগপূর্ব্বক রক্ষা।
সামিল—সম্বলিত, সহিত, অন্তর্গত, সংযুক্ত।
সামীপ্য—নৈকট্য, সান্নিধ্য, অন্তিকতা।
সামুদ্র—হস্তরেখাদি, সমুদ্র-সম্বন্ধীয়।
সামুদ্রক—করাদি রেখাবেত্তা, গণক।
সামুদ্রিক—সমুদ্রোদ্ভব, সাগর সম্পর্কে।
সাম্প্রদায়িক—সামাজিক, শিষ্ট, সভ্য।
সাম্বৎসরিক—বার্ষিক, বর্ষীয়, আব্দিক।
সাম্য—ঐক্য, সম ভাব, শান্তি, স্থৈর্য্য।
সাম্রাজ্য—রাজত্ব, অধিকার, প্রভুত্ব।
সায়—সম্মতি, স্বীকার, অনুমতি, অঙ্গীকার।
সায়ং—(সন্ধ্যা দেখ)
সায়ক—বাণ, তীর, শর, আশুগ, পতত্রী।
সার—উত্তমাংশ, মর্ম্ম, মজ্জা, বল, তেজ।
সারক—রেচক, ভেদজনক দ্রব্য।
সারঙ্গ—শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুক, চাতক, হরিণ।
সারথি—রথচালক, সূত, রথনিয়ন্তা।
সারা—শুদ্ধ করা, সমুদায়, হত্যা।
সারার্থ—স্থিরাংশ, স্থূলার্থ, বিশেষ অর্থ।
সারি—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, আবলী।
সার্থক—অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন, সফল।
সার্দ্ধ—দেড়, সাড়ে, অর্দ্ধেকের সহিত।
সার্দ্র—ভিজা, তিমিত, সজল।
সাশ্রয়—স্বমূল্যতা, সুলভ, শস্তা, আর্জা।
সাস্র—সকোণ, কোণবিশিষ্ট, কোণুয়া।
সাহচর্য্য—সাহিত্য, সহকারিতা, উপকার।
সাহিত্য—সঙ্গ, বন্ধুতা, সাহচর্য্য, প্রণয়।
সিংহ—মৃগেন্দ্র, পশুপতি, পঞ্চম রাশি।
সিংহদ্বার—প্রধান, মহাদ্বার।
সিংহাসন—রাজাসন, বিচারাসন।
সিঁড়ি—সোপান, নিঃশ্রেণী, পইঠা।
সিকতা—বালী, বালুকা, বালীময়, অশ্মরী।
সিত—শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, ধবল।
সিদ্ধ—পক্ব, কৃতকার্য্য, নিষ্পন্ন, প্রসিদ্ধ।
সিয়ন—বস্ত্রাদি সীবন, সূচীকর্ম্ম, সীবন।
সিসৃক্ষা—সৃজনের ইচ্ছা, সৃষ্টিবাসনা।
সীতা—সীমন্ত, কেশের বিভাগ করা।
সীমা—অন্ত, ধার, অঞ্চল, অবধি, পর্য্যন্ত।
সুকৃত—পুণ্য, সহজে কৃত, শ্রেয়ঃ, সৎকর্ম্ম।
সুখ—আনন্দ, হর্ষ, স্বর্গ, দুঃখাভাব।
সুখ্যাত—যশস্বী, প্রসিদ্ধ, খ্যাতাপন্ন।
সুগতিক—সুপ্রকরণ, সদুপায়, সদভিপ্রায়।
সুত—পুত্র, সন্তান, তনয়, আত্মজ।
সুদ্ধ—কেবল, তন্মাত্র, নিরবচ্ছিন্ন, সমেত, সুদ্ধ।
সুধা—অমৃত, পীযূষ।
সুধী—সুধীর, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পণ্ডিত।
সুনীতি—সুধারা, সদ্ব্যবহার, সদাচার।
সুন্দর—সুরূপ, সুদৃশ্য, সুশ্রী, বিলক্ষণ।
সুপথ—উত্তম বর্ত্ম, সদুপায়, সুরীতি।
সুপ্ত—নিদ্রিত, নিদ্রাগত, ঘুমান, শায়িত।
সুভিক্ষ—শস্যাদির বাহুল্য, অনাকাল।
সুমুখ—উত্তমাস্য, সুবদন, সুন্দর।
সুমেরু—দেবালয় পর্ব্বত, হেমাদ্রি।
সুর—স্বর, কণ্ঠরব, কণ্ঠধ্বনি।
সুরপুরী—সুরালয়, ইন্দ্রধাম, স্বর্গ।
সুরভি—সুগন্ধ, বসন্ত কাল, দেবধেনু।
সুরা—মদ্য, মদিরা, আসব, সীধু।
সুরাচার্য্য—সুরগুরু, বৃহস্পতি, গুরু।
সুরাপ—মদ্যপ, মদ্যপায়ী, পানাসক্ত।
সুশৃঙ্খল—সুনিয়ম, পরিপাটি, সানুক্রম।
সুষুপ্তি—ঘোর নিদ্রা, স্বপ্নহীন নিদ্রা।
সুসাধ—অনায়াসসাধ্য, সহজ, সুকর।
সুস্থ—রোগমুক্ত, অরোগী, সুস্থির, সুখী।
সুঁই—সূচি, সূচ, সীবনার্থ লৌহশলাকা।
সূক্ষ্ম—তনু, অস্থূল, ক্ষীণ, ইন্দ্রিয়াতীত।
সূক্ষ্মদর্শী—বিশেষজ্ঞ, প্রখর, প্রাজ্ঞ।
সূচক—জ্ঞাপক, বোধক, উপস্থাপক।
সূতা—সূত্র, সুতলী, তন্ত্র, তন্তু।
সূতক—জননাশৌচ, কালাশৌচ।
সূতিকা—নবপ্রসূতা, প্রসবকারিণী।
সূত্র—লক্ষণ, অনুষ্ঠান, বিধান।
সূত্রধর—ছুতার, জাতিবিশেষ।
সূপ—অন্নের উপকরণ, ডাইল, ব্যঞ্জন।
সূপকার—পাচক, রন্ধনকর্ত্তা, রান্ধনী।

অটোগ্রাফ্

(অপ্রকাশিত)

(কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত)

Grow old along with me,
The best is yet to be,
The last of life
for which the first is made.
—Sisir Kumar Bhaduri

মানুষের কর্মই তাহার ধর্ম।
—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"রাখিও বল জীবনে
রাখিও চির আশা
শোভন এই ভুবনে
রাখিও ভালবাসা।"
—রবীন্দ্রনাথ
—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ও

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালবেসে।"
—শ্রীকালিদাস নাগ

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
—শ্রীকালিদাস রায়

Life is like a rain-bow, rich in colours, desceptive & feelings.
—শ্রীমেঘনাদ সাহা

অটোগ্রাফের খাতা দেখে
শঙ্কা জাগে মনের মাঝে
লিখব যাহা, হয়তো তাহা
হয়ে যাবে নেহাৎ বাজে।
—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কালির আঁচড় সাদা পাতায়
জীবনের সই—ঠিক বুঝি তাই শূন্যতায়।
—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাঁকা কথা আর আঁকাবাঁকা সই
বৃথা এ খাতায় ধরিয়া রাখা
লেপে মুছে সব চলে নিত্যই
নিঠুর কালের রথের চাকা
তারি মাঝে শুধু বাঁচিবে মানুষ
মহৎ জীবন পায় যদি বা
ফিরো না কুড়ায়ে কথার ফানুষ
কাজ করে যাও রাত্রি দিবা।
—শ্রীসজনীকান্ত দাস

আকাশকে তখনই সুন্দর ও কবিতাময়
দেখি যখন আপন সত্তার মধ্যে অপরিসীম
আনন্দ ও সৌন্দর্যের উপলব্ধি হতে থাকে।
—প্রবোধকুমার সান্যাল

নিজের শক্তিতে যখন কোনও কাজ হবে না, তখন ভগবানের কাছে শক্তি প্রার্থনা কোর, শক্তিহীনের জন্তে তাঁর ভাণ্ডারে অনেক শক্তি জমা হয়ে আছে—আমি জানি।
—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চাই সই।
তাই সই।
—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কাহার লাগি আকাশে এত নীল
কাহার লাগি ভুবনে এত আলো
তাহারই তরে ব্যাকুল এ নিখিল
তারেই আমি বাসিতে চাহি ভাল।
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মরার পরেও ভুলব না এ বসুধারে
তারা হয়ে রইব চেয়ে আকাশ পারে।
—মনোজ বসু

যে কূল ধুইয়া যায় রে নদী সে কূল ভাইঙ্গা যায়
আবার আলসে ঘুমায়া পড়ে মৌন কূলের গায়
তাই ত তরী ভাসাই আমি ভাঙা কূলের ছায়
কূল-ভাঙা সেই বন্ধু যদি সেথান দিয়া যায়।
—জসীম উদ্দীন

ঝরাপাতার ঝরঝরানি
জানায় যাঁহার আগমনী
কালবোশেখীর রুদ্র তালে
ছন্দ যাহার বাজে
সুখে-দুঃখে তাহাই যেন
তোমার মাঝে বাজে
—ভবানী মুখোপাধ্যায়

সুখ হোক দুখ হোক প্রিয় বা অপ্রিয়
যা আসে অজের চিত্তে তাই তুলে নিও।
—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগসাধনায়
তারাপীঠ ভৈরব বামদেব

তারাপীঠ ভৈরব

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী বিধর্মীর অত্যাচার আর অনাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ধর্মগুরুরা জনসাধারণের আত্মরক্ষার জন্যে বীরাচারের প্রবর্তন করলেন। বাস্তব তথা মৌলিক এই আত্মরক্ষার দৈহিক ধর্মই প্রহার ও পীড়নের হাত থেকে জাতকে বাঁচিয়েছিল। "গৌড়েনোৎপাদিতা" এই বিদ্যা বাংলা আর মিথিলায় প্রবল হয়ে যবনাধিকৃত ভারতের নির্বীর্য্যতা থেকে বাংলার মেরুদণ্ড ঋজু করে রেখেছিল। বখতিয়ারের সময় থেকে নবাগত মুসলমানরা হিন্দুর ধর্ম ও নারীর উপর যে অকথ্য অত্যাচার সুরু করেছিল, তাতে বাংলার মাত্র নয়, সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় বাধা দিতে না পেরে হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণ প্রহার-বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল। এর একমাত্র প্রতিরোধ করেছিল ভারতের বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুরা। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, জাতিভেদ উঠিয়ে দিলেন, পতিতের সম্মান দিলেন, আর বীরাচারী অসীম শক্তিশালী গুরুরা লোককে বীরাচারী হয়ে শক্তির আশ্রয় নিয়ে অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের হাত থেকে কুল, ধর্ম, জাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্যে উত্তেজিত করলেন। বাংলার বীরাচারী রাজা গণেশ থেকে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদ-কেদার ও মারাঠা বীরাচারী শিবাজী মাত্র নয়, ইংরেজ আমলের বীরাচারী মহারাজা নন্দকুমার, রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত জাতকে বাঁচাবার প্রেরণা দিলেন। তান্ত্রিক ভূদেব সত্যই বলেছেন, 'তখন এই বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষদিগের অভাব ছিল না। কেনই বা থাকিবে? তখন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।'

এই বীরাচারের মহাকেন্দ্র রাঢ়ের দুর্গম অঞ্চলগুলোয়—আজকের বর্দ্ধমান বিভাগে ও মিথিলায়। পলাশী যুদ্ধের ৫ বছরের মধ্যে এই বীরাচারীরা দলে দলে বীরভূম থেকে বর্দ্ধমানের রাজা মিশ্রী খান, সুদর সিং এর সৈন্যদের সঙ্গে বর্দ্ধমান আর সঙ্গতগোলার কাছে ইংরেজকে বাধা দিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিল। এরা মারাঠাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজদের অস্থির করে তুলেছিল। পথাচারী মুসলমান ফকীররা এদের বাধা দিয়ে মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করতে থাকলেও পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে পঞ্চাশ বৎসর বরাবর জনসাধারণের প্রেরণা দিয়ে এসেছে, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এই বীরাচারী সন্ন্যাসীর দল। মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে নতুন ম্লেচ্ছ দলের নতুন সাম্রাজ্য পত্তনে বাধা দেবার জন্য সমগ্র বাংলা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের মাত্র ইন্ধনই জোগায় নাই, এই বীরাচারীরা নিজেরাই সহস্রে সহস্রে আরাকান সীমান্ত থেকে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধর্মভূমি ভারতের প্রাণ ও ধর্মরক্ষার জন্যে।

এঁদের কেন্দ্র ছিল অনেক। কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসী দল এঁদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। ১৭৭২-এ হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় অধিবেশনের পর অসংখ্য বীরাচারী সৈন্য ইংরেজের অধিকারের

● বামদেবের আরাধ্যা দেবী উগ্রতারা শ্রীশ্রীচণ্ডী ভগবতী, বশিষ্ঠারাধিতার যে মূর্ত্তি এখনও তারাপীঠে বর্ত্তমান।

অভিমুখে অভিযান করে। '৭৫ খৃষ্টাব্দের কুম্ভের প্রয়াগ অধিবেশনের পর চুনারের কাছে ইংরেজ ফৌজ এঁদের অগণিত সশস্ত্র দলকে বাধা দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যে তাদের প্রবেশ করতে দেয় না। উত্তর-বঙ্গের মহাস্থানে এদের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। আর এক কেন্দ্র বীরভূমের বক্রেশ্বর ও দ্বারকা নদীর তটে।

এর পর অর্দ্ধ শতাব্দী খৃষ্টানী অত্যাচার। জনসাধারণকে পদপিষ্ট করবার, তাদের ধর্ম্ম, রীতি, ভাষা, গৃহস্থালী পর্য্যন্ত ওলট-পালট করবার প্রচেষ্টা। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন মহামারীতে দেশ শ্মশান হতে লাগল, তারই সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা অগণিত দরিদ্রকে, অসংখ্য নর-নারীকে লুণ্ঠন করে বিধর্ম্মে দীক্ষিত করতে লাগল, কুল-ললনাদেরও লুণ্ঠন করে চা-বাগানে চালান দিতে লাগল।

নিত্য দৈহিক বেদনা, নিত্য পারিবারিক সর্ব্বনাশ, নিত্য কুলক্ষয়, নিত্য বাস্তহারা হওয়া, নিত্য পিশাচ-প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও জাতির শোণিত শোষণ, নিত্য ভারতের আত্মাপুরুষের কদর্য্য লাঞ্ছনা।' দেশ শ্মশান হয়ে পড়ল। আর্ত্তনাদে আর্ত্তনাদে সে শ্মশান মুখরিত হতে লাগল। সে আর্ত্তনাদ পৌঁছল জননীর পাদমূলে। রুদ্রাণী জননী সন্তানের দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

এ সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুদের আবির্ভাব হ'ল, আর তাঁদের প্রেরণায় মৃত্যুস্পর্দ্ধী বীর ভৈরবদের আবির্ভাব সূচিত করল।

আবির্ভূত হলেন তাঁরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে আর্ত্ত ও দুঃখী, অতি সাধারণ মানুষের পরিবেশে। পাণ্ডিত্য-বিলাসের অবসর নাই। অর্থসম্পদ, ভোগবিলাসেরও অবসর নাই। অসহ্য দুঃখ ও বেদনার ক্রন্দন কলরোলে তখন সারা মাতৃভূমি মুখরিত, মানুষের বাঁচবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে জাত তখন মাত্র মাকে ডাকছে। জাতির সেই আহ্বানে, সেই আকুতি মূর্ত্ত হয়ে জন্মালেন দুঃখীর কুটিরে।

কালীঘাটের মহাতান্ত্রিক গুরু আচার্য্য ভগবানচন্দ্র, আর কাশীতে স্বামী তৈলঙ্গধর ভারতের প্রাণ-পুরুষ সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিতে অনাগত জাতির কাছে ঘোষণা করলেন—"ধর্ম্ম বিদ্বেষ করো না। আহারাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না। ভগবান মানুষকে মনের মত তৈরী করে তাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সকল জীবের সেবা করেছেন। আজ সে শক্তির প্রয়োগ কর।"

যুগপৎ আবির্ভূত হলেন বারদীর ব্রহ্মচারী শ্রীলোকনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী শ্রীবামাচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবামাচরণ যেন নির্দ্ধারিত কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা এক দিকে যেমন জাতের অন্তর থেকে ম্লেচ্ছ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জাতিকে 'নিজ নিকেতনে' ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, তেমনি আশ্বাস দিলেন—দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্যে বাইরের দিকে তাকিও না—ডুব দাও নিজের অন্তরে—

"ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

পাশ্চাত্য প্রভাব-সমৃদ্ধ রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ম্মগুরুদের আবিষ্কার করলেন—শক্তি সঞ্চার করলেন। পাশ্চাত্য প্রহার-জর্জ্জরিত পল্লী-ভারতের শ্মশানে বসে শ্রীবামাচরণ দেশের আর্ত্ত পশু ও মানুষের বেদনার রূপ পরিগ্রহ করে শ্মশানবাসিনী জননীকে তারস্বরে আহ্বান করলেন—তারা তারা—তারা। লক্ষ কোটি মানুষের বাস্তব বেদনার এই আকুল রোদন-ধ্বনি মহামন্ত্রের রূপ নিয়ে মাতৃবোধন করল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে খুঁজে না পেয়ে হাহাকার করেছিলেন বামাচরণ পল্লীর শ্মশানে শ্মশানে সে মাকে খুঁজে পেলেন।

ভারতের গণশোণিত-শোষক নতুন ম্লেচ্ছ পিশাচদের বাধা দিবার জন্যে ও পুরাতন পশ্বাচারী যবনরাজ্যের গলিত শবের উপর জননীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে যে বীরাচারী মাতৃসাধক সন্ন্যাসীদের অভিযান হয়েছিল, তাই থেকেই বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মাতৃপীঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বিভিন্ন কেন্দ্রে মহারাজা রামকৃষ্ণ, মহারাজ নন্দকুমার, রামপ্রসাদ প্রভৃতি তান্ত্রিকদের আবির্ভাব যেমন দেখতে পাই, তেমনি জনসাধারণের শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ বর্দ্ধিত করবার জন্যে মহা সমারোহে বারোয়ারী শক্তিপূজার অনুষ্ঠানে দেশে আশার সঞ্চার হয়। শ্মশানে শ্মশানে খোল করতাল ও তারকব্রহ্ম নামের আর্ত্তনাদ স্তব্ধ করে দিয়ে জয়-ডঙ্কার গুরু-গুরু গর্জ্জনে শিশু-বাল-বৃদ্ধের নির্জ্জীব প্রাণ সজীব হতে দেখি। দেশময় যবনত্রাস ভবানী পাঠক, পণ্ডিতা, নয়না, বিশ্বনাথ প্রভৃতি বীরাচারীদের আবির্ভাব হ'তে দেখি। বাংলা, বিহার, আসামের গ্রামাঞ্চলের সেদিনের বিবরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, অতি দুরবস্থার মধ্যেও সেদিন যেন ভবিষ্য-ভারত-প্রতিষ্ঠার আনন্দ-পূর্ব্বাভাষ পরিস্ফুট। ধনীদের সেদিন গ্রাস করেছিল শ্বেতাঙ্গ যবন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎকোচ দিয়ে। যবন রীতি-নীতি আচার-সংস্কৃতির বিষে দেশকে পরিপূর্ণ ভাবে জর্জ্জরিত করে ভারতকে গ্রাস করবার জন্যে ইংরেজ সেদিন বাংলায় যে ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল, তারা জনতার দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করে, সে দুর্দ্দশার সুযোগে তথাকথিত "সংস্কৃতি" ও 'কৃষ্টির' প্রতিষ্ঠা করে বর্ত্তমান দুনিয়ায় সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ শ্রীবৃদ্ধির সাহায্যই করেছিল।

তাই প্রয়োজন হয়েছিল প্রতিরোধ-শক্তি জাগাবার। তাই প্রয়োজন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নতুন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে গণত্রাণের কার্য্যের জন্য নতুন বীরাচারীদের গঠন করবার। তাই প্রয়োজন হয়েছিল খৃষ্টানী সংস্কৃতির গ্রাস-সংস্করণকে সম্পূর্ণ ভাবে মোড় ফিরিয়ে 'মা' 'মা' এই অভী মন্ত্রে জনসাধারণকে আশ্বাস দেবার। ভারতের চিরন্তন রাজনীতিক বিপ্লবকেন্দ্র রাঢ় এই নবোত্তমের পীঠস্থান।

নতুন গণগুরু যাঁরা এলেন এই বিপ্লবের প্রাণশক্তিরূপে, তাঁরা জন্ম নিলেন দরিদ্র-কুটিরে, আর্ত্ত ও মূর্খদেরই প্রতিনিধিরূপে। আমুড়ের 'ছোট জাতের' প্রাণের দেবতা বিশালাক্ষীর ছোট্ট মন্দিরে বালক গদাধরের অন্তরে আবির্ভূতা হলেন 'মা'। দ্বারকা নদীর তটবর্ত্তী মহাশ্মশানে বালক বামাচরণের অন্তরও আকর্ষণ করলেন—'মা'! জননী এই দুই শক্তিধর সন্তান-প্রহরীকে স্থাপন করেছিলেন নব ভারতের প্রাণ ও ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে। দক্ষিণে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামে বামাচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধদের নিয়ে বিশ্ব-সংস্কৃতির দম্ভকে চূর্ণ করে মাতৃ-নির্দ্দেশে ভারতের সর্ব্ব সংস্কৃতি কেন্দ্রকে পুনঃ স্থাপন করলেন। বামাচরণের কাজ দেশের আর্ত্ত, অবহেলিত,

অস্পৃশ্য লাঞ্ছিত পশু ও মানুষগুলোকে নিয়ে। নদাই হাড়ির কুষ্ঠগ্রস্ত হাতের জল না খেলে বামাচরণের ভাল লাগত না। যারা বলত—'একে জাতে হাড়ি, তার পর হাতে কুষ্ঠ, ওর হাতে জল খাওয়া?' উত্তরে বলতেন বামাচরণ—'আমি ত জল খাই ওর হাতের, তো শালারা জল খাস ওর পায়ের।' বলতেন—'জাত-বেজাতে কাজ নেই বাবা। আমার কাছে সবাই তারা মায়ের জাত। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণের যা অধিকার, চণ্ডালেরও তাই।'

পাশ্চাত্য জাতিভেদে যখন ভারতকে ধনী ও নির্ধনে—ভদ্রলোক আর ছোটলোকে—ইংরেজী বুকনি আর সংবাদপত্রের ঝুটা তথ্য-সম্বল তথাকথিত শিক্ষিত আর স্বভাবসরল ও সদাচার-সম্বল অশিক্ষিতে ভাগ করে ফেলেছিল, তখন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে ভগবান যে সব নির্ব্বাচিত শক্তিধরদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন জনতার প্রাণ-পুরুষ। এই সব মুমূর্ষুর কাছে তাঁরা দাওয়াইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নি। তাই বামাচরণ দুঃখীদের মায়ের বুকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বাংলার শ্মশানকে তিনি আপনার সাধনা দিয়ে 'তারা'ময় করে তুলেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বুঝেছিলেন মাতৃহীন হবার জন্মেই, মাতৃ-অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবার জন্মেই দেশের এত দুর্গতি, কিন্তু মাকে তিনি খুঁজে পান নি। দেশের প্রতি চিত্তে, প্রতি গৃহে, প্রতি গিরি-সরিৎ-বনানীতে, প্রতি পশু-পক্ষীতে, মাতৃপ্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণে গদাধর, বামে বামাচরণ মহা তপস্যা করে অন্তর্হিতা জননীকে জাতির অন্তরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বামাচরণের সাধনায়, বামাচরণের মর্ম্মভেদী "তারা-তারা" এই প্রবল হুঙ্কারে মাত্র তারাপীঠেরই মহাশ্মশানের নয়, বাংলার মহাশ্মশানের প্রতি রেণু-পরমাণু শক্তিময়ী জননীর কৃপায় সজীব হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন—"মানুষের অভয় দেবার শক্তি নেই, অভয় দেবেন অভয়া।" তাই সব দুঃখীর দুঃখ তিনি মায়ের কাছে নিবেদন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বামাচরণ আর্ত্তকে, দুঃখের প্রতিকারের জন্য মাকে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—'দুঃখ নিজের চেষ্টায় ঘুচবার নয় রে, মাকে ডাক।' বলতেন আর্ত্তকে—"ওরে, এখনও কেন মরা-কান্না কাঁদিস, মন্দিরে গিয়ে তোর মায়ের কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাই গে যা।"

জনতার দুঃখ-হলাহল পান করে অনেক সময়ই বামাচরণ হয়ে পড়তেন জড়বৎ। অনেক সময় মিনতি করতেন—'বাবা, আর যেন কখন পাপ করিস নে।' অনেক সময় স্ববৈদ্যের মত তাদের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান পাপকে প্রহার করে শুদ্ধ করে দিতেন। অনেক সময়, সমাজে যাকে তোমরা পাপী বল, তার পক্ষ নিতেন।

আদালতে দাঁড়িয়ে সবাইকে ধমকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, —'ওরে কার টাকা কে চুরী করে। ওর অভাব, তাই নিয়েছে। বেশ করেছে। ওকে ছেড়ে দাও, তা নইলে আমি শালাদের সব ফট্ করে দেব।'

বামাচরণের অর্থনীতিক মতবাদ অদ্ভুত। শ্রীরামকৃষ্ণ ধনীদের বলতেন—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' ক্ষ্যাপা বামা তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলতেন—'টাকা বলে টং টং ঢং ঢং—তারা-তারা।'

বীরাচারী মহাপুরুষ দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে চৈতন্য-শক্তি জাগ্রত করবার জন্য মার কাছে আব্দার করেছিলেন। মাতৃ-নির্দ্দেশে তিনি বলেছিলেন—'শরীর ঠিক রাখ। নইলে শক্তি বাড়বে না। মায়া ত্যাগ করবি কি রে শালা। মায়াই ত মা। যার মায়া নেই সে রাক্ষস। মায়া ত্যাগ করলে সে পতিত।'

তিনি নতুন জাতকে উপদেশ দিলেন—'মায়া ত্যাগ? সে কি কথা? মায়া ত্যাগ মানে মা ত্যাগ। জয় কর্ মায়া। এক জন কষ্ট পাচ্ছে, দেখেও মায়া ত্যাগ করে চলে গেলি, তুই কি মানুষ? তার ভালর জন্যে চেষ্টা কর্, তার পর কপালে যা আছে তাই হবে।'

আর্ত্ত জাতির অসহ্য দুঃখে বামাচরণ তাদের প্রতিভূ হয়ে মহাশ্মশানে অধিষ্ঠিতা জননীর কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতেন—'খিদের সময় খেতে দাও না, তাই ত রোগা হয়ে যাচ্ছি, বলছো বামা, তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন? তুমি কি করছ? ছেলেদের জন্য মা-ই ত সব করে। যা করতে হয় করো।'

আর সে যুগের চাকরীসর্ব্বস্ব শিক্ষাভিমানী 'ভদ্দর লোকদের তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন—'বিদ্যে শিখে তোরা শুধু টাকাই রোজগার করিস, তাতে তোদের জড়শক্তি বেড়েই যাচ্ছে—চৈতন্য-শক্তির বিকাশ হচ্ছে না। দেহ ঠিক থাকছে না। দেহ ঠিক না রাখলে শক্তি বাড়ে না।'

[ক্রমশঃ।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় প্রজাতন্ত্র-দিবসের মিছিলে একেক প্রদেশের প্রতীক। পশ্চিম-বঙ্গ, উড়িষ্যা

মুজাফফর আমেদ

(সাম্যবাদী নেতা)

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীমুজাফফর আমেদ থাকেন কড়েয়া রোডের একটি 'কমিউনে'। কম্যুনিষ্টরা নিজেদের মেসকে বলে 'কমিউন'। ছোট্ট একটা কামরায় দু'জন বোর্ডার—মুজাফফর আমেদ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম নায়ক শ্রীগণেশ ঘোষ। যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন তিনি দুপুরের আহার শেষ করছিলেন। সেখানেই ডেকে পাঠালেন। আমার উদ্দেশ্য শুনে হেসে বললেন : "এইবারই বিপদে ফেললেন। বাঙলা দেশের অনেক মহান্ নেতার জীবনী আমার মুখস্থ কিন্তু নিজের কথা কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারি।"

৬২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মুজাফফর পার্টির প্রবীণতম সদস্য। রুগ্ন শরীর। মিহি সুরে টেনে টেনে কথা বলেন। দু'পাটি দাঁতই তাঁর বাঁধানো। কথা বলবার সময় নড়ে নড়ে যায়। তাঁর সমস্ত জীবনটাই সংগ্রামের কাহিনী। নোয়াখালীর এক দরিদ্র মোক্তারের দ্বিতীয় পত্নীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তিনি। ছেলেবেলায় পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে লাঙল ধরতে হয়েছিল। শেষে নিজের চেষ্টায় ২১ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসেন আই-এ পড়তে। ১২ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং ম্যাট্রিক পাশের আগেই তিনি একটি কন্যার পিতা।

কলকাতায় এসে প্রথমে হুগলী মহসীন কলেজ এবং পরে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু কলেজের পড়ায় মন ছিল না। তিনি মাতলেন সাহিত্যের হুজুগে। প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উৎসাহী সদস্য হলেন, পরে হলেন মুসলিম সাহিত্য সমিতির। শেষে বার করলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে এই সময় তাঁর পরিচয় হয় এবং নজরুলের বহু কবিতা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অবশেষে নজরুলের সঙ্গে একযোগে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা এবং পরে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা করতে থাকেন।

মুজাফফর আমেদ দু'বার সরকারী চাকরী করেছেন কিন্তু ছ' মাসের বেশী টিঁকতে পারেননি। তিনি হিন্দী, উর্দু, বাঙলা, ইংরাজী চারটি ভাষাতেই বক্তৃতা করতে পারেন। কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'নবযুগে' কাজ করার সময় শ্রমিক কৃষকদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রুশ-বিপ্লবের সাফল্যে সারা পৃথিবীময় এক বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই চাঞ্চল্য তিনি নিজের মধ্যেও অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানতেন না কম্যুনিজম কি বস্তু। আস্তে আস্তে বিদেশ থেকে লুকিয়ে আনা লেনিনের দুই-একখানা বই তাঁর হাতে আসে। প্রথম দিকে তার ভাষাই তিনি বুঝতে পারতেন না। যখন বুঝতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁর পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

জীবনে তিনি ১৪ বছর জেল খেটেছেন আর আত্মগোপন করে ছিলেন আড়াই বছর। শেষ বার জেল খেটেছেন কংগ্রেসী আমলে ১৯৪৮ সালে। তিনি কখনও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেননি কিন্তু কংগ্রেসে বহু দিন কাজ করেছেন। দেশবন্ধু থেকে নেতাজী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই তাঁর সৌহৃদ্য ছিল। নজরুল তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং তাঁকে দিয়েই তিনি কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের প্রথম বাঙলা অনুবাদ করিয়ে নেন। ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে তিনি সেসন আদালতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে আপীলে ছাড়া পান।

আজীবন পুলিশের তাড়া খাওয়া মুজাফফর আমেদ নিজেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলতে লজ্জা পান। বললেন : "ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যেমন মার্কসবাদের জন্ম, তেমনি ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।"

১৮৯২ সালে জন্ম মুজাফফরের। ১৯১৩ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন। তার পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে কখনও দাম্পত্য-জীবন যাপন করার অবকাশ পাননি। গত চল্লিশ বছরে মাত্র কয়েক বার স্ত্রীর সঙ্গে আকস্মিক ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। বললেন : "স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে থাকার অবস্থা কখনও হয়নি। জেলের বাইরে যখন থাকতাম তখন দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটানো যে কি কঠিন ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।" মুজাফফরের আযৌবন বিরহিনী পত্নী তাঁর ভাইদের সঙ্গে দেশেই বাস করেন। একমাত্র মেয়েও তাঁর সাহিত্যিক [illegible] থাকে।

১৯২৮ সালে মুষ্টিমেয় কয়েক জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও মুজাফফর খুশী নন। তিনি আশা রাখেন, তাঁর জীবিত কালেই এ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। ১৯২৪ সালে জেলখানায় যক্ষ্মার কবলে পড়ে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মুজাফফরের মনের জোর অসীম। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে তাঁর ভূমিকা ঠিক নেতার নয়, অভিভাবকের। সদস্যদের কাছে তিনি 'কাকা বাবু' নামে পরিচিত। ১৯৪০ সালে আত্মগোপন করার সময় ওই নামে তাঁকে ডাকা হ'ত। সেই থেকে নামটা চালু হয়ে গেছে।

মুজাফফরের সঙ্গে আলাপ হল ঘণ্টা দু'য়েক ধরে, কিন্তু যতটুকু বললেন তাঁর চেয়ে বেশী শুনলেন আমার কাছ থেকে। ওইটাই নাকি তার অভ্যাস। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করলেন। 'মাসিক বসুমতী'র তরুণতম সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের দল-মত-নিরপেক্ষ নীতিরও প্রশংসা করলেন। সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা দিয়ে জীবন সুরু করেছিলেন, তাই ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তিনি ভারতের কৃষি-সমস্যার উপর একখানি বইও লিখেছেন এবং অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের খোঁজ-খবরও রাখেন।

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

(পরিচালক, ইউ, পি, আই)

সোজা ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে বেহালার ট্রাম যেতে যেতে হঠাৎ যেখানে শেষ হয়ে গেছে, ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ী ঘুরলো সেখান থেকে ডান-হাতি। তার পর এ-গলি, সে-গলি করে যখন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে পৌছলাম তখন ঘড়িতে তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। টেলিফোন করে ঠিক করা ছিল যাবো দু'টোয়। দেরী হয়ে গেছে। যাই হোক, বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বিধুবাবু। নিয়ে গিয়ে বসালেন বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর বাড়ীতে ঢুকে যে কথাটি আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল, সেটি হোল, 'চমৎকার!' সুন্দর ভাবে তিনি সাজিয়েছেন তাঁর বাগানটিকে। দেশী-বিদেশী সহস্র রকমের মরশুমী ফুলে ভরে আছে চার দিক, তারই মধ্যে দু'খানা চেয়ার পেতে মাঝখানে একটা ছোট টেবিল রেখে মুখোমুখি বসলাম দু'জনে। কথা শুরু হোল।

কথা শুরু করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, তাঁর ছোট টেবিলে আর সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে একখানি 'মাসিক বসুমতী'ও রয়েছে। জানালেন 'মাসিক বসুমতী'র তিনি একজন নিয়মিত পাঠক। মাসিক বসুমতীর নতুন নতুন প্রচেষ্টার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, 'সাংবাদিক আমি। পয়ত্রিশ বৎসর কেটে গেল এই কাজে। সরকারী চাকরীর আকর্ষণ আমার ছিল না কোনও দিনই। পরীক্ষা পাশের পর দু'বার সে রকম যোগাযোগও হয়েছিল, কিন্তু সে চাকরী নিতে পারিনি—যেমন পুলিস বিভাগের একটি চাকরী। আজও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন কিছু করা হচ্ছে দেখলে স্বভাবতই আমি সেদিকে বিশেষ নজর দিই।'

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করবার সময়েই তাঁর মধ্যে সাংবাদিকতার আগ্রহ দেখা যায়। সে সময়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'বন্দেমাতরম্,' 'যুগান্তর' বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। ১৯০৮ সালে তিনি কলকাতায় আসেন ও সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের হাতেখড়ি ১৯১৮ সালে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়। কিন্তু সেখানে কাজের তেমন সুবিধা না হওয়ায় তিনি আসেন 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' কাগজে। পাঁচ বৎসর এই কাগজে কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেই স্বীকার করলেন, সব-কিছু শিখেছেন সাংবাদিকতার। এটি হোল একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ। কাগজের মালিক উইলিয়ম গ্রাহাম হঠাৎ এক দিন কাগজ বন্ধ করে দিলেন। প্রেস কিনে নিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেখান থেকে বেরুলো স্বরাজ্য পার্টির 'ফরোয়ার্ড'। এখানে কিন্তু চাকরীর কোন বন্দোবস্ত হল না পুরোনো কর্মী শ্রীযুত বিধুভূষণের। সমস্ত সংসার তখন রয়েছে তাঁর ওপর নির্ভর করে। খুবই কষ্টের সে সব দিন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কাগজ 'দি সারভেণ্ট' তখন তাঁকে ডাক দিল। কিন্তু সে কাগজের অবস্থাও এখন-তখন। স্বরাজ্য পার্টির 'ফরোয়ার্ডে'র দাপটে তার বিক্রী ক্রমশঃ কমছে। যাই হোক, বিধুভূষণের একাগ্র চেষ্টায় গান্ধীবাদী এই দৈনিকটির অবস্থার কিছু উন্নতি হলো। ঠিক এই অবস্থায় 'রয়টার'ও 'এসোসিয়েটেড প্রেস' 'দি সারভেণ্ট'কে সমস্ত প্রকার সংবাদাদি প্রদান বন্ধ করলো।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত

কিন্তু এই সময়ই সাংবাদিকতা-জগতের আর একটি নক্ষত্র সদানন্দ একটি ভারতীয় নিউজ সার্ভিস খোলবার মতলব ভাঁজছিলেন। 'সারভেন্টে'র সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত হল। প্রায় রাতারাতি খোলা হল দেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'ফ্রী প্রেস অফ ইণ্ডিয়া।' ক্রমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'বেঙ্গলী' ও 'বসুমতী' 'ফ্রী প্রেসের' সংবাদ ছাপতে শুরু করলো। এইবার বিধুবাবু নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে 'ফ্রী প্রেসের' সঙ্গে যুক্ত করলেন। তিনি হলেন কলকাতা অফিসের ম্যানেজার ও এডিটর। পরে একদা রাতারাতি 'ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নাম পালটিয়ে হল 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া।' ১৯৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'ইউ, পি, আই'র জন্ম। আর সেই থেকেই এই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি-অবনতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আছেন শ্রীযুত সেনগুপ্ত।

বয়স তার পয়ষট্টি। অক্লান্ত কর্মী তিনি আজও। ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের তিনি একজন কর্ণধার। নিজেই বললেন, 'বিউটি ইজ দি জয় অফ লাইফ'। তাই আছেন সহর থেকে দূরে গ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে। যেখানে আছেন সেখানকেই নিজের মত করে নিয়েছেন। বেহালাতে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, কলেজ ইত্যাদি তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। এ সব বাদ দিয়েও সদাই হাসিখুসী মানুষটিকে সত্যিই আপনার নিজের লোক বলে মনে হবে।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ

এক দিন, দু'দিন, তিন দিন ছোটাছুটি, টেলিফোন আর অভিযান সত্বেও কিছুতেই পাকড়াও করতে পারা গেল না ওস্তাদ আলী আকবর খানকে। 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক নির্দ্দেশ দিয়েছেন, "যে কোন উপায়ে হোক আলী আকবরের আত্ম-পরিচয় চাই-ই। কেন না দশ জনের মধ্যে নয়, 'চার জন' বাঙালীর মধ্যে আলী আকবর নিশ্চয়ই অন্যতম। আমাদের দেশে রাজনীতিক আর সাহিত্যিকরা ছাড়া কি মানুষ নেই?" সুতরাং—

সেদিন ছিল রবিবার।

কপাল ঠুকে যাত্রা করলাম সকালেই। কলকাতার ঠাণ্ডা এবারে কেন কে জানে হঠাৎ যেন চাগিয়ে উঠেছে। পথে চলতেও কাঁপুনি লাগছে। তবুও যখন কপাল ঠুকে বেরিয়েছি, তখন যতই ঠাণ্ডা হয়ে যাই না কেন, দেখা আমাকে করতেই হবে সুদূর মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁয়ের পুত্ররত্ন আলী আকবরের সঙ্গে।

কিছু কাল যাবৎ, চার জনের একেক জনকে খুঁজে বের করতে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করেছি প্রচুর। মানুষের মত মানুষও খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু চলতে-ফিরতে দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখতে দেখতে চোখ এবং মন দুই-ই হয়ে আছে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। এখানে বলা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ বলতে আমরা সাধারণ বাঙালীর কথাই বলতে চাইছি, অবাঙালীর কথা নয়। বেকার সমস্যা, অন্ন-দুর্দ্দশা, শিক্ষক-বিভ্রাট আর ছাঁটাইয়ের ঘায়ে আধ-মরা বাঙালী জাতের কথা।

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

আর কত দূর? কি প্রচণ্ড শীতার্ত্ত হাওয়া!

রবিবারের ছুটির সকাল। পথে তেমন ভিড় নেই। নেহাৎ দু'-চার জন। সাড়ে দশটা বেজে যাওয়ার আগে পৌঁছতে হবে। আর কালবিলম্ব নয়। দ্রুত পদক্ষেপ।

'ক্যাশেল' আছে কলকাতায়, না দেখলে অনেকে বিশ্বাস করবেন না। চৌরঙ্গীর ধারে-কাছে নয়, নেহাৎ বাঙালী পল্লীর মধ্যে architecture-এর এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন সত্যিই রোমাঞ্চকর! ধূসর রঙের 'ক্যাশেল,' আকাশ স্পর্শ করেছে যার শীর্ষ। আপাত-দৃষ্টিতে বিরাট এক দুর্গ বলেই ভ্রম হয়!

টেগোর ক্যাশেলের ঠিক বিপরীতে ক্যাশেলের অধিকর্ত্তা মহারাজা শ্রীপ্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'প্রাসাদ' আবাসগৃহ। এই রাজপ্রাসাদে এসে উঠেছিলেন (এ বছরে) আলী আকবর, যত দিন কলকাতায় ছিলেন।

—আছেন ওস্তাদ আলী আকবর? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম জনৈক অপেক্ষমান দ্বাররক্ষককে।

—হ্যাঁ।

বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গ নিলাম। কাঠের সুদীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে একতলা, দোতলা, তিনতলায় পৌঁছে ক্ষণেকের মধ্যে সাক্ষাৎ মিললো আলী আকবরের। একটি সুসজ্জিত ফরাস-বিছানো ঘরের কৌচে বসেছিলেন তিনি। সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে তাঁর সম্মুখের আসনে বসতে বললেন।

বেহালায় সুর ধরার আগে ভাবছিলাম, বেহালার ছড়িটা কি ভাবে ধরা যায়? অর্থাৎ কি প্রশ্ন, কোন্ প্রসঙ্গ প্রথমে তুলবো এবং কি ভাবে তুলবো এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম,—বাঙলা গানে রাগ মেশালে তা হয় রাগপ্রধান বাঙলা গান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলা হয় না কেন তাকে? আপনি কি বলতে চান যে, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন সম্ভব নয়?

আলী আকবর স্বল্পভাষ। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে

সিগারেটের ধূম্রকুণ্ডলী বিস্তার করতে লাগলেন। মনে হ'ল, বেশ এক গভীর চিন্তায় তিনি যেন মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখে কথা নেই দেখে মনে করলাম, প্রশ্নটা অবান্তর হয়নি তো? তিনিই হঠাৎ মুখ খুললেন। বললেন,—না, না, কখনও সে-কথা বলবো না। হিন্দীতে যদি হয়, বাঙলাতে কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। প্রথম কথা, চেষ্টার অভাব। দ্বিতীয়, সব জিনিষ বাঙলায় চলবে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে এ কথাটা সত্যি জানবেন, 'রাগ-প্রধান বাঙলা গান' কথাটা শুধু কথাই।

কথাগুলি শুনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম।

এমন সময় ঘরের দরজায় দু'জনের আবির্ভাব। 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক, সঙ্গে তাঁরই একজন ছায়াচিত্র-প্রযোজক ও সাহিত্যিক বন্ধু। যাঁর চোখে ধূলো দেবো ভেবেছিলাম, তিনি যে কোথা থেকে জানলেন আমার আগমন-সংবাদ, তা আজ পর্য্যন্ত আমিও জানি না। যাই হোক, আরও দুটো শূন্য সোফা পূর্ণ হ'ল। আলী আকবরের সঙ্গে সামান্য দু'-চার কথা শেষ ক'রেই আমার রিপোর্টের কাগজটি সম্পাদক দেখলেন। কি দেখলেন কে জানে! কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তিত থেকে সম্পাদকই আলি আকবরকে প্রশ্ন করলেন,—আপনার জন্ম কোন সালে? কোথায় জন্মভূমি?

—১৪ই এপ্রিল, ১৯২২ সালে। ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে।

—শিক্ষা কত দূর? কোথায় পড়েছিলেন?

—ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত। দেশের স্কুলে। সেখান থেকে চলে যাই মাইহারে, বাবার কাছে।

—বাদ্যযন্ত্রে হাত দিলেন প্রথম কবে?

—আমার বাবাই (আলাউদ্দীন খাঁ) আমাকে যা-কিছু শিখিয়েছেন। তখন আমার পাঁচ বছরও বয়স নয়, যখন প্রথম হাতে-খড়ি হ'ল। মুখের বিকার, হাত-পা চালনা ও অঙ্গভঙ্গী দেখানোর অভ্যাস যাতে না হয়, সে জন্যে সামনে আয়না রেখে শেখাতেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই শিক্ষাই চলতে থাকে। কথা বলতে বলতে থামলেন আলী আকবর। মুখে তাঁর হাসির স্বল্প রেখা ফুটে উঠলো। বললেন,—যখন শিক্ষা শুরু হয় বাজনার, তখন বাবা আমাকে কারও সঙ্গে বড় একটা মিশতে দিতেন না, কারও গান কিংবা বাজনাও শুনতে দিতেন না। কঠোর নিয়ম ছিল আমার জন্যে। এই নিষেধের কারণ, শৈশবে যদি অন্যের প্রভাব পড়ে তাতে শিক্ষার ক্ষতি হয়। বাবা বলতেন, আগে তৈরী হও, তার পর নিজেই বেছে নেবে কার ঘরে যাবে। আমি এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। বাবা আমাকে কোন আসরে বাজাতেও দিতেন না। ষোলো-সতেরো বছর বয়সে এলাহাবাদ কনফারেন্সে প্রথম বাজাই। সে-সময়ে লিলুয়াতে কোথাও যেন একবার বাজিয়েছিলাম।

মাইহারে থাকতে থাকতেই চাকুরী-জীবনের সূত্রপাত। প্রথমে ছিলাম উদয়শঙ্করের দলে। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ রেডিও ষ্টেশনে মিউজিক ডিরেক্টর। তার পর যোধপুর ষ্টেটের কোর্ট মিউজিসিয়ান।

তার পর আমাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন চললো,—বর্ত্তমানে আপনি ছায়াচিত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন না?

—হ্যাঁ, বম্বের নবকেতনে আছি।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন নবকেতনের 'আঁধিয়া' ছায়াচিত্রের সুরকার ছিলেন আলী আকবর।

—ফিল্ম লাইনে খুশী আছেন বেশ?

—এ লাইনে ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের লোকেরা বড় একটা আসতে চান না। সে জন্যে এখানে উন্নতিও তেমন হচ্ছে না। দেখি, যদি কিছু করতে পারি।

—উল্লেখযোগ্য বা নাম করবার মত শ্রোতা কাকে পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, তা অনেককেই পেয়েছি। বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গেছি, রবীন্দ্রনাথের সামনে ব'সে বাজিয়েছি। শিশুবেলায় কবিগুরুর কোলে বসবারও সৌভাগ্য হয়েছে।

—রবীন্দ্র-সঙ্গীত আপনার কেমন লাগে?

ঠোঁটের কোণে আবার অল্প হাসির রেখা। আবার সেই নীরবতা। সেই চিন্তামগ্ন মুখ। সিগারেটের ধূম্রজালরচনা।

—গান-বাজনার মধ্যে আমার ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলী খাঁর গান ভাল লাগে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও অপূর্ব্ব লাগে। রবিশঙ্করের সেতার শুনতেও ভালবাসি।

—গান বা বাজনার সময় হাত-পা নাড়া, মুখের বিকার দেখানো, অর্থাৎ অঙ্গ ও মুখভঙ্গী দেখানোর অর্থটা কি?

এতক্ষণ অল্প হাসির আভাষ ছিল আলী আকবরের ওষ্ঠে। এ কথায় হাসলেন সজোরে। হাসতে হাসতেই বললেন,—আগেই বলেছি, পাছে এই বদ্‌অভ্যাস হয় সে জন্যে বাবা আয়নার সামনে বসিয়ে বাজাতে শিখিয়েছিলেন। আমি পছন্দ করি না আদপেই, গান বা বাজনার সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন বা মুখের বিকৃতি। এ অভ্যাস থাকলে শ্রোতাদেরও শুনতে ব্যাঘাত হয়, মন দিয়ে শুনতে পারে না। অঙ্গচালনার কি প্রয়োজন? 'শো' দেখিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া শিল্পীরও মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়।

—এ বছরে কলকাতায় গানের জলশা হয়েছে খুব বেশী। এর কারণ কি? বাঙলা দেশে গান আর বাজনার কদর কি বেশী?

—সেটা বাঙলা দেশের আবহাওয়ার দোষ বা গুণ বলতে পারেন। সত্যিই, কলকাতায় জলসা এত বেশী কখনও হয়নি। কলকাতায় দেখলাম সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী। কলকাতার লোকসংখ্যাও বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। সেটাও একটা কারণ। তাছাড়া বাঙলা দেশে বোধ হয় শিল্পীরা সম্মান পান অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। তবে বলতে বাধা নেই, কলকাতার কনফারেন্সের রীতির কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। মুস্কিল হয় এই যে, শ্রোতাদের মধ্যে সকলেই যে সকল শিল্পীর প্রতি অনুরাগী তা ঠিক নয়। এর ফল হয় এই যে, আমার বাজনা যাঁর প্রিয় তিনি আমার বাজনাই শুনতে আসেন। অন্য প্রোগ্রামের সময় তাঁকে হয়তো দেখা যায় আসর ছেড়ে উঠে গেছেন। মাদ্রাজের কনফারেন্স হয় চমৎকার। সেখানে তিন জন আর্টিষ্টের একত্রে Demonstration হয়। এক জন এ্যামেচার, এক জন প্রফেসনাল এবং এক জন 'গেষ্ট'। কলকাতাতেও এমনটি হওয়া উচিত।

—সেদিন আপনার পিতা এক ভাষণে বললেন যে, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলা দেখেছেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন দিন তাঁর আলাপ হয়েছে?'

—বাবা তাঁর জীবনে অলৌকিক অনেক কিছুই দেখেছেন।

তার কিছু কিছু বলেছেন, আবার অনেক কিছুই আমার জানা নেই। তিনি বলেন না এ সকল কথা, প্রকাশ করেন না।

কথায় কথায় বেলা যে বেড়ে যায়।

যে যার হাতঘড়ির প্রতি দৃষ্টি দেন। কিন্তু আলী আকবরের মুখাকৃতিতে ক্লান্তি বা অবসন্নতার চিহ্ন ফোটে না। শেষ প্রশ্ন করা হ'ল। 'বসুমতী' দেখেন না কি ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখি বৈ কি। বাবা 'মাসিক বসুমতী' ছাড়া অন্য কোন কাগজ কখনও পড়তে দেননি। মাইহারে বাবার কাছে 'মাসিক বসুমতী'র সেট বাঁধানো থাকে। 'মাসিক বসুমতী' বর্ত্তমানে একখানি অপূর্ব্ব ও চমৎকার কাগজ হয়েছে।

বিদায় নিয়ে আমরা নেমে আসছি নীচে, এমন সময় সিঁড়ির মুখে বিরাট ও সুসজ্জিত এক হলের সমুখে দেখা হ'ল মহারাজা প্রবীরেন্দ্র-মোহনের সঙ্গে। সেদিনটি রবিবার, অবসরের দিন। মহারাজার পরনে ধোপদুরস্ত কোঁচানো ধুতি আর চমৎকার একটি গরম জামা। মুখে যেন প্রসন্নতা। তাঁকে আমরা নমস্কার জানালাম। তিনিও সহাস্যে প্রতি-নমস্কার জানালেন।

ডাঃ রমা চৌধুরী

(লেডি ব্রেবোন কলেজের অধ্যক্ষা)

আশ্চর্য্য এক পরিবেশের ভেতরে ডাঃ রমা চৌধুরীর জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক আনন্দ-মোহন বসুর পৌত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুধাংশুমোহন বসুর সুযোগ্যা কন্যা। তাঁর মাতামহ-পরিবারের সকলেই সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর তিনি দৌহিত্রী। অপর দিকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, সংস্কৃত ভাষা-বিশারদ্, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁর স্বামী। সুতরাং শ্রীমতী চৌধুরীর জ্ঞানলিপ্সা যে সহজাত এবং সমগ্র পরিবেশই যে তাঁর জ্ঞানচর্চ্চার অনুকূল ছিল বা রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

ডাঃ চৌধুরী ছেলে বেলাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে পড়েন, এ থেকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মে। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলেজ-জীবনে তিনি পড়াশুনো করেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতি পরীক্ষাতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং এম, এ পরীক্ষাতেও দর্শন-শাস্ত্রে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে মর্য্যাদায় ভূষিত হন। তার পর তিনি লালবিহারী মিত্র "স্কলারশিপ" পেয়ে চলে যান বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল উপাধি পেয়ে তিনি ১৯৩৭ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ শেষ হয় এখানে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেশে ফিরেই শ্রীমতী চৌধুরী স্থির করেন জাতির শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ ক'রবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন দর্শন-শাস্ত্রের লেকচারার হিসেবে। ১৯৩৬ সালে তিনি লেডী ব্রেবোন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। শিক্ষা-জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তিনি পরে ব্রেবোন কলেজেরই অধ্যক্ষা-পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এখনও কৃতিত্বের সহিত কাজ করে চলেছেন।

অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

শিক্ষাবিদ্ হিসেবে শ্রীমতী চৌধুরী গতানুগতিক বা নিয়মবাঁধা কতগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে চল্‌ছেন না। তিনি অধ্যক্ষার দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে বহু সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। দার্শনিক হয়েও তিনি বাস্তব ধর্ম্ম-বিবর্জিতা নন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি বাস্তবমুখী অবদানের কথা উল্লেখ না করলে নয়। ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি যাতে কলেজীয় নির্দ্দিষ্ট পুঁথি-পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকে তার জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে "পপুলার লেক্‌চারের" প্রবর্ত্তন করে-ছেন। সিলেবাসের বাইরে প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ছাত্রীদের সামনে এই বক্তৃতা হয়ে থাকে এবং এ বক্তৃতা করেন বাইরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ। তাঁর আর একটি মূল্যবান অবদান—কলেজের মহিলা হোষ্টেলের রান্নাবান্না আগে যেখানে বাইরের লোক দিয়ে করাতে হ'ত সেখানে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য তাদেরই এ কাজ করবার উৎসাহ যুগিয়েছেন। ছোট বেলাতেই শ্রীমতী চৌধুরীর পড়াশুনার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। তাঁরই কথায় "বিয়ের পরেও যে ছোট বেলার মত লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি, পাচ্ছি—এটাই ভাগ্যের কথা।" ছাত্রী-জীবনে দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করলেও সংস্কৃত, অঙ্কশাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। গীতা, উপনিষদ্, বেদান্ত এবং কালিদাস, ভবভূতি—এঁদের লেখা তিনি বরাবরই ভালবাসেন। সংস্কৃত নাটকেও রূপদান করেছেন তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে। সংস্কৃত প্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি তাঁর স্বামী ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে "প্রাচ্য বাণী" যুগ্ম সম্পাদনা করছেন। শ্রীমতী চৌধুরী এশিয়াটিক সোসাইটীর একমাত্র মহিলা ফেলো। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

দর্শনশাস্ত্রে শ্রীমতী চৌধুরীর অবদানও অসামান্য। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন যার জন্য সুধী সমাজ গর্ব্বিত। জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি ইউরোপের ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন।

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, সুনীল ঘোষ ও আশীষ বসু সংগৃহীত)

অভিসারিকা

—সুভো ঠাকুর অঙ্কিত

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

লণ্ডনে

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

অক্টোবরের শেষে এক সন্ধ্যায় নিবেদিতা বোসদের সঙ্গে লণ্ডনে পৌঁছলেন, এক-খানা ক্যাবে মালপত্রসুদ্ধ তিন জন ঠেসাঠেসি করে উঠেছেন। জানলার গায়ে মুখখানা চেপে নিবেদিতা দেখতে চেষ্টা করেন কোথায় চলেছেন। কিন্তু ঘন কুয়াসার বিষণ্ণ ছায়ায় চারদিক আবছা। বোসেরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল ওঁদের। নিবেদিতা শীতে কাঁপছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেন কে জানে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা চমৎকার একটি রূপক নিবেদিতার মনে পড়ে গেল। 'আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্রের উদয় হয়, যে-সব ঝিনুকের খোলে মুক্তো হবে তারা জলের উপর ভাসতে-ভাসতে খোলা দু'খানি ফাঁক করে রাখে। যতক্ষণ না এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে, ওরা ভাসতে থাকে—ফোঁটাটি পড়লেই টুপ করে তলিয়ে যায়। সেই জলের ফোঁটাটিই অবশেষে অপরূপ মুক্তো হয়ে ফলে।'

নিবেদিতা ভাবেন, 'এই কুয়াসা আর স্যাঁতা আবহাওয়াই হবে আমার এখানকার পরিবেশ। এ একটা পূর্ব-সূচনা। নিজেকে নিয়ে একা থাকতে হবে—শামুক কেমন খোলার আড়ালে শক্ত করে গুটিয়ে রাখে নিজেকে। স্বাতীনক্ষত্রের এক ফোঁটা প্রসাদ কাজ করুক আমার মাঝে, রূপান্তর ঘটাক আমার। আজ বুঝছি না, কিন্তু এক দিন সবই বুঝতে পারব।'

ভেবেছিলেন বোসদের মায়ের ওখানে আমন্ত্রণ করবেন, কিন্তু সে মতলব ছাড়তে হল। মেরি নোবল্ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন রিচমণ্ডও পুরাদস্তর সংসারী, ছেলেমেয়েদের উপর মায়ের আর নজর রাখবার প্রয়োজন নাই। তাই মেরি নিজেকে সংসারে ভাবেন অবান্তর! তাঁর জীবনযাত্রায় এতটুকু অদল-বদল হলেই অসীম শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েন। যে ডাচ দাসাটি দশ বছর তাঁর সঙ্গে ছিল, সেই 'বেটি'ও নিজের পথ দেখেছে।

নিবেদিতা দেখলেন ভাইটির মনেও বেশ আত্ম-প্রত্যয় এসেছে। অক্টোভিয়াস বিটির সঙ্গে মিলে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রিচমণ্ড, গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করতে পিছ-পা নন। হাজার-হাজার সৈন্য ফিরে আসছে কেপ-টাউন হতে—বুয়র যুদ্ধের খুঁটিনাটি খবর নিয়ে। বিভিন্ন রাজনীতিক দল সে-সব লুফে নিচ্ছে। এ নিয়ে সুস্পষ্ট মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। বুয়ররা কি এই নিরর্থক অসম যুদ্ধ চালিয়েই যাবে? পার্লামেণ্টে, সমাজে, বাড়িতে-বাড়িতে—সর্বত্র এই নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলেছে। রাস্তায় মিঠাইওয়ালারা চরম-পন্থীদের প্রচারপত্র নিয়ে ঘুরছে, পার্কগুলিতে বক্তারা চলন্ত মঞ্চের 'পরে টব তুলে দুদ্দাড় পেটাচ্ছেন, লোকে দারুণ ভীড় জমিয়েছে তার চার পাশে। রাস্তা আর পার্ক যেন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মত, সকলেরই ঠাঁই মেলে সেখানে।

লণ্ডনবাসীর জীবনের ঘূর্ণাবর্ত নিবেদিতার পক্ষে তীব্র রসায়নের কাজ করল। সব বন্ধুরাই নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দিলেন। সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই তাঁর দিন-সূচী কাজের তালিকায় ভরে উঠল। 'যত দূর আমার নাগাল পৌঁছয় তত দূর পর্যন্ত ভারতের জন্য যা-কিছু করবার করে যাচ্ছি,—আর যাঁদের বেশ প্রতিপত্তি আছে ক্রমেই তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি।' (২৫শে জানুয়ারী ১৯০১এর চিঠি) কিছু দিনের জন্য হলেও আরেকটা কর্তব্য নিবেদিতা পালন করলেন—ডাঃ বোসের পাশে মিসেস্ বুলের জায়গাটি দখল করলেন। বৈজ্ঞানিকের চার পাশে এমন একটি অক্ষুব্ধ শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যা তাঁর কাজের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। রয়াল সোসাইটিতে পেশ করবার জন্য ওঁর পরীক্ষিত বিষয়গুলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাজিয়ে-গুজিয়ে ঠিক করতে হবে। লণ্ডনে এর আগে যে ছ'মাস কাটিয়েছেন সে-দিনগুলোর কথা বোসের মনে পড়ে। বাইরের দুনিয়ার খেয়াল থাকত না ওঁর—তাই খবরাখবর, নাওয়া-খাওয়া-ঘুমানো, ছোট-বড় নানান ব্যাপারের তদারক সব মিলে তালগোল পাকিয়ে যেত যেন। ফলে কাজ করাই মুশকিল মনে হত। তত্ত্বদর্শীর মতই বৈজ্ঞানিকও ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। যেদিন বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যেত না পরীক্ষায় সেদিন তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ত, সব তাতেই কেবল খুঁতখুঁত করতেন। নিবেদিতা আর আচার্যের দুই সহকর্মীকে তখন তার ঝক্কি পুইয়ে ওঁর পাশে-পাশে থাকতে হত।

মিসেস্ বুল এসেই তাঁর এই পাতানো ছেলেটির আনুকূল্যের জন্য তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তির সবটুকু প্রয়োগ করলেন। এইটির দরকার ছিল। জাতিগত বিদ্বেষের প্ররোচনায় রয়াল সোসাইটির সভ্যরা সামনে যেন কাঁটা তারের বেড়া রচেছেন। তাঁদের বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করা আচার্য বসুর পক্ষে ভারী শক্ত। বোসের দাম যে অনেক এ কথা সোসাইটির সভ্যরা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এক জন হিন্দুর প্রতিভা তাঁরা মানতে রাজী নন, —বলেন, ওঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো কল্পনার এলাকায় পড়ে, বিজ্ঞানের নয়।

জামসেদজী টাটা লণ্ডনে এসে পৌঁছানতে গতিক আরও মন্দ হয়ে দাঁড়াল। বোম্বের এই ধনী পার্শীটির সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল। ভারতীয়দের জন্যে ভারতীয় মূলধনে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কেন সেটা ধামাচাপা রয়েছে সেই তদন্ত করতেই তাঁর লণ্ডনে আসা।

ভারতের শিক্ষা-সম্পর্কিত যা-কিছু ব্যাপার, স্যার জর্জ বার্ডউড ছিলেন তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। মিঃ টাটা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। মিসেস্ বুল তাঁর বাড়ির এক লাঞ্চ-পার্টিতে সে সুযোগ ঘটিয়ে

দিলেন। ধূসর পোষাকে নিবেদিতাকে ভারি সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল, তিনি পার্টির চতুর্থ অতিথি। আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল উঁচু পর্দায়।

জগদীশ বোস ভারতে ফিরে যাওয়ার পর যে পরিস্থিতি তাঁর জন্ত তৈরী হয়ে আছে, নিবেদিতা তা আগে-ভাগেই অনুমান করেছিলেন। তাই কৌশলে জানতে চাইলেন যে সরকারী ভাবে যখন শিক্ষাব্রতীদের নিয়োগ চলবে ভবিষ্যতে, আবেদনকারীদের বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতার হিসাবই শুধু নেওয়া হবে এমন কোনও আশা আছে কি না। স্যার জর্জ বললেন, 'সে অসম্ভব। একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হবে কাগজে-কাগজে। তারই ফলাফল অনুসারে আড়াল থেকে নিয়োগপত্রের তালিকা তৈরী হবে, ভারত-সচিবের আসল উদ্দেশ্য এই।'

'···আপনার মনে হয় না এ রকম ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ?'

'তা থাকতে পারে বটে, তা থাকতে পারে···তবে আমি কিন্তু মনে করি না যে এমন সম্ভাবনা আছে। ভারতবাসী কখনও আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে না। শাক-সব্জী খায়,—গো-বেচারী ওরা!'

'আমি ভাবছি ভারতের ক্ষতির কথা, আমাদের কথা নয়···'

'ওঃ, আমি কিন্তু তা ভাবিনি। তাই তো, কথাটা ভাববার মত বটে।'

মিঃ টাটা তাঁর নিজের কথা 'পাড়বার সুযোগ পেতে-না-পেতেই কফি পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। নিবেদিতা বেপরোয়া হয়ে আমন্ত্রণ চালালেন, 'মিঃ টাটা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করছেন। তাতে অধ্যাপকের পদে বিশেষ গুণী হিন্দুদের যাতে নিয়োগ হয় সে-ব্যবস্থা পাকা করবার জন্ত কি ধরণের বিধান প্রবর্তন হবে বলে প্রস্তাব করেন, স্যার জর্জ ?'

অতর্কিত আক্রমণ। মিঃ টাটার সুচতুর পরিকল্পনা ছিল সমান সংখ্যক পার্শী, মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টান অধ্যাপকদের নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-সংসদ গঠিত হবে। স্যার জর্জ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কিছুই প্রস্তাব করব না। এ-ধরণের কিছু করা হলে বিজ্ঞান-চর্চায় গোড়াতেই কুড়ুল মারা হবে···সমস্ত পৃথিবীর স্বার্থ এতে জড়িত, শুধু ভারতের তো নয়!'

এ একটা দু-মুখো মতবাদের সংঘাত। তাই কোনও আলোচনা হওয়া সম্ভব হল না। 'মিঃ টাটা, আপনি 'টাইমসে' আমায় খোলা চিঠি লিখবেন। আমি সরকারী ভাবে উত্তর দেব। এটুকু বলতে পারি যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা খুবই চিত্তাকর্ষক'—এই বলে স্যার জর্জ চালাকের মত নিজেকে আলগোছ করে নিলেন।

নিবেদিতা এরই মধ্যে মনে-মনে এ-সংঘাতের কোন্ পর্বে নিজে কি করবেন তা ঠিক করে রাখছিলেন, হাতের কাছে সুযোগ মিলবার ওয়াস্তা শুধু। 'স্যার জর্জ যা করতে চাইলেন না তা আমি করব। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের লক্ষ লোকের চেষ্টায় যে-ভারতের জন্ম হবে তার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।' সেই দিন সন্ধ্যাতেই তিনি যা ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোসেদের কাছে পাঠালেন। 'তোমরা দু'জন এক্ষুণি আমায় ভারতীয়দের মাঝের একটা তালিকা পাঠাও—যাঁরা সত্যিকার গুণী-জ্ঞানী, অথচ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহেলায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ভাষাতত্ত্ববিদ্ এঁদেরও নাম দাও, আমি সবাইর পক্ষ নেব। কি করতে পারব তাদের জন্ত তা এখনও জানি না, যা সাধ্য তার কিছুই বাদ দেব না।'

কিন্তু আপাতত ডাঃ বোস আর রয়াল সোসাইটির মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতেই নিবেদিতাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হল। ওদের বছর সুরু হওয়ার মুখে এটেই হল কার্যসূচীর প্রধান বিষয়। জগদীশ বোস অসুস্থ, একটা অপারেশন হবে তাঁর। এ-অবস্থায় প্রতিটি ভাষণ তাঁর পক্ষে প্রাণান্তিক পরিশ্রমের কাজ। কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক এমন মুষড়ে পড়তেন যে সে-সঙ্কট থেকে টেনে তোলা দায় হত। লিখলেন, 'আমার কাগজপত্র হয়তো সামনের সপ্তাহে এসে পড়বে, কিন্তু তাতেও খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছি। কেন না সম্প্রতি কতগুলো দরকারী পরীক্ষা আমি চলনসই ঘরোয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে করেছি, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পেলে সে-সব পরীক্ষা আরও নিখুঁত হত, ফল হত সুদূরপ্রসারী। আমি যদি আমার পদ্ধতির কথা প্রকাশ করি, আর নিজে কাজ না করি তা হলে অন্যেরা শীগগিরই আরও ভাল কাজ দেখাবে—আমার কাজগুলি তখন নেহাৎ আদ্যিকালের বলে মনে হবে।' (মিসেস বুলকে ১৬ই নবেম্বর ১৯০০তে লেখা চিঠি)

সব-কিছু ঠিকঠাক হয়ে যেতেই আচার্য বসু এক নার্সিং হোমে চলে গেলেন। তাঁর সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বড়দিনের এক পক্ষ আগে অপারেশন হল। তখন কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে।

নিবেদিতা আর বসু-পত্নী পালা করে রাতের পর রাত সেবা করতেন। এই সময়টা নিবেদিতা গভীর ভাবে চিন্তা করবার প্রচুর অবসর পেলেন। দেব-মানবের জন্মলগ্ন ঘোষণা করে গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। সেই ধ্বনিতে নিবেদিতার অন্তরে জাগে সব বিলিয়ে দেওয়ার অনির্বচনীয় আকৃতি। 'আমি কারুণ্য-প্রতিমা মেরীর পূজারিণী, মায়ের পাশে ঠাই পাওয়া ছাড়া আর কোনও সাধ আমার নাই। জীবনে এমন একটা সময় এখন এসেছে, মনে হয় আর চাইবারও কিছু নাই। গুরুর পায়ে শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোনও প্রার্থনা নিবেদন করবার নাই—এটা এখন কল্পনায় আনতে পারি। তাঁর কাছে যখন ফিরে যাব, এই ভাব নিয়েই যাব। তবে শিশুর মত অবুঝ মন নিয়ে যেদিন তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিনের মাধুর্য আর কোনও দিন ফিরে পাব না।' যার চোখে চোখ পড়ে তার চোখেই নিজের ছায়া দেখেন নিবেদিতা। নিজের চার পাশে নিশ্চিত আশ্বাসের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, —কিন্তু তখনও একটা বাধায় নিজেকে সে-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। 'এখনও জানি না কেমন করে অন্যের হৃদয়ের সুরে এ-হৃদয়ের সুর বেঁধে নেব, কেমন করে প্রতিক্ষণে সবার সাথে মিলনের ঐকতান বাজবে মনে। কেমন করে মানুষকে পূজা করতে হয় এখনও তা শিখিনি।' ত্রুটি স্বীকার করেন নিবেদিতা। 'ওগো মধুময়ী কুমারী জননী, আলো জেলে দাও সেবিকার অন্তরে।' (২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০০ সালের চিঠি)।

আচার্য বসু যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন সে জন্ত ওঁদের স্বামি-স্ত্রীকে নিবেদিতা তাঁর মায়ের ওখানে নিয়ে যান। মেরী

নোবল তখন দেশে গেছেন। বোসের 'পরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। নিবেদিতার সঙ্গে পড়া-শোনায় উনি অনেকটা সময় কাটান। ছেলেবেলায় এই বাড়িতেই গোঁড়া পিউরিটান আবহাওয়ায় দিন কেটেছে, আজ এখানেই নিবেদিতা হলেন ওঁর ছাত্রী। ব্রাহ্ম সমাজের দর্শন আর ঐতিহ্যের সবটুকু এইখানেই আয়ত্ত করলেন। ভাবলেন, এটা জানা নিতান্তই দরকার। মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখলেন, 'ওঁর দিক থেকে একটা প্রচণ্ড বাধা ঠেলতে হয়েছে। কারণ বোস মনে-মনে বুঝেছিলেন, নিষ্ঠায় আঘাত লাগবে বলে কখনই আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর মতবাদ শুনতে রাজী হব না। কিন্তু মনে হয় শেষ পর্যন্ত ওঁর চিন্তাধারাটা আমার আয়ত্তে এসেছে। দ্বিধাহীন চিত্তে মনের দুয়ার খুলে দিয়েছি, কেন না মনে হল শ্রীরামকৃষ্ণ যেন চাইছেন আমি এই করি। যদি তাই হয়, দেখিই না চেষ্টা করে ভগবানকে এই পথেই পাওয়া যায় কি না।' শ্রীরামকৃষ্ণ সকল পথেই সাধনা করেছেন। যীশু, মহম্মদ, কৃষ্ণ সবার মতেই চলেছেন, সত্য লাভও করেছেন। এখানে তারই ইঙ্গিত করছেন নিবেদিতা। 'তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে, প্রথমটায় শিব আর কালীকেও আমি ভালবাসতে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণও নিশ্চয় সব ধর্মকে সমান ভালবাসতে পারতেন না···সময়-সময় কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি, আমার যা-কিছু প্রয়াস তার প্রেরণা স্বয়ং ঠাকুর। আবার অন্য সময় স্বামীজির কথা মনে করে বুক কেঁপে ওঠে—উনি এ-সব বুঝবেন বা সায় দেবেন বলে মনে হয় না। আর তাঁর অননুমোদনের ভয় যে আজও আমার কাছে সর্বনাশা···যা নিয়ে এত দিন জীবন কেটেছে আজ যেন সে-সব ঝেড়ে ফেলতেই চাইছি, যে-সব অধিকার বজায় রাখাকেই স্বাতন্ত্র্য বলে জানতাম সে-সবই ছেড়েছি···' (১৯০১এর ৪ঠা জানুয়ারীর চিঠি)

এর পরে রবিবারে টান ব্রীজ ওয়েল্‌সের গির্জার বেদি থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে নিজের মনোভাবের ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন নিবেদিতা। ১৯০১ সালের ১১ই জানুয়ারীর এক চিঠিতে লিখছেন, '···ওখানে অদ্ভুত একটা জিনিষ পেলাম। দেখলাম, এ-যাবৎ স্বামীজি আমায় যা-কিছু দিয়েছেন তার সারটি আমি পেয়ে গেছি। তার পরই বিদ্যুতের ঝলকে মনে হল, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা তাতে এমনি একটা ডাক আমার শোনবারই তো কথা··· অথচ অন্য এক জন যদি ডেকে না শোনাত তো আমি কখনই ব্রাহ্মধর্মের আহ্বান শুনতাম না। এখন বুঝতে পারছি, আসলে দেব-দেবীর মূর্তি নাড়াচাড়া করে অদ্বৈতের সংস্কারকেই আমি চাপা দিতাম হয়তো, একমেবাদ্বিতীয়মের ধ্যান আমার আড়াল হয়ে যেত প্রতিমা পুজায়।···অদ্বৈত জ্ঞান পাকা না হওয়া পর্যন্ত সাকারের জগতে আর হয়তো আসতে পারব না। এই সত্যটা ধরতে পেরে কী যে শান্তি পেয়েছি বলতে পারি না। স্বামীজির শক্তি যে এমন দুর্বার, যে-পথেই যাই না কেন তাঁর প্রতি নিষ্ঠা যে রাখতেই হয় এতেই তো চমৎকার প্রমাণ হয় যে অদ্বৈতবাদ সত্য। তিনি এত বিরাট যে যতক্ষণ তুমি সত্যার্থী এবং আত্মসচেতন ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধতেই পারে না।'

এ সময় বোসও কাজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কুরী-দম্পতির নতুন আবিষ্কারে স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তনবাদের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে বোসের নিয়মিত পত্রালাপের যোগ স্থাপিত হল। টমাস হাক্সলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনিদ্রায় কাটিয়ে এক দিন সকালে বোস নিবেদিতাকে বললেন, 'দেখুন, মহাব্যোমই সব, চরাচর মহাব্যোমের টানা-পোড়েনে বোনা। প্রাণ মাত্রেই তা সে ফুলেরই হ'ক কীটেরই হ'ক বা আপনার-আমারই হ'ক—অনন্তের দুটি মেরুবিন্দুর সেতুস্বরূপ। আমাদের পিছনে অনন্তের সিন্ধুরূপ, আর সম্মুখে তার সাধ্যরূপ···ঠিক ম্যাগনেসিয়াম আর অন্য-সব ধাতুর বাঁকা রেখার মত, তাই না? এই জন্যই মানুষই পারে গভীরের অতল গহনকে ছুঁয়ে আসতে, পারে চেতনার তুঙ্গতম শিখরে কূটস্থ হতে, পথের বাধাকে কোথাও না মেনে। জীবনের অতীতে-ভবিষ্যতে এক অভিজ্ঞতা হতে আরেক অভিজ্ঞতায় অবাধে সঞ্চরণ করুক মানুষ, চলুক এগিয়ে, স্থাণু হলে তার চলবে না। এই তো মুক্তি।' (১৯০০ সালের ২২শে ও ২৯শে নবেম্বরের চিঠি)

'যেখানে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা অন্ধের মত ভুল পথে পা বাড়ান, সেখানে অদ্বৈতবাদের দৌলতে ডাঃ বোস কী ভাবে যে ভুলের হাত থেকে বেঁচে যান সে এক আশ্চর্য লাগে দেখতে···' নিবেদিতা লেখেন, 'উনি এখন যেন আকাশচারী সিদ্ধ চারণ। একটার পর একটা সত্য আবিষ্কার করছেন, যন্ত্রের পর যন্ত্র উদ্ভাবন করছেন, দীপ্ত সহজ বোধ রূপ ধরছে গণিতসিদ্ধ বাস্তবে। রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে দেখে যেতে হয় শুধু। ভুবনেশ্বরী তাঁর শক্তি এমন অন্তঃপ্রবাহে ঢেলে দিতে পারেন কেমন করে কে জানে?' (১১ই জানুয়ারী ১৯০১)

সন্ধ্যায় নিবেদিতা বোসকে একেবারে সুমেরু হতে নিয়ে আসেন কুমেরুতে। গোয়েন্দা-কাহিনী চেঁচিয়ে পড়ে শোনান। ওঁদের আরেকটা বড় আমোদ হল ফি-রবিবারে সারের 'বীচ' বনের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালানো। সে-বারের বসন্ত ঋতু সার্থক হল এমনি করে।

কিন্তু নিবেদিতা ভাবেন ভারতবর্ষের কথা। মিস্ ম্যাকলয়েড স্বামীজির কাছে গেছেন। প্রতি সপ্তাহেই তাঁর চিঠি আসে। মার্চের প্রথমে সারদা দেবী নিবেদিতাকে ডেকে পাঠালেন ফিরে আসতে। কোন্ জাহাজ ভারতমুখো ছাড়বে তার তালিকা জানতে যান নিবেদিতা। কিন্তু ঠিক লগ্নটি এসেছে কি? নিবেদিতার হাতে অনেক কাজ। স্কুলের তহবিলে টাকা যোগাড় করবার জন্য সপ্তাহে তিনটা করে ভাষণ দেন। ও-দিকে নামজাদা প্রকাশক 'স্টেড এ্যাণ্ড বিটি'রা তাদের পত্রিকায় নিবেদিতার লেখা চেয়েছে। প্রচুর লিখতে হয় তাঁকে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মিসেস্ বেসান্তকে যে-সব হাঙ্গামায় পড়তে হচ্ছে, নিবেদিতা তার খুঁটিয়ে খবর রাখেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে নিবেদিতাকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আবার আমন্ত্রণ জানান প্যাট্রিক গেডেস। ফেব্রুয়ারিতে উনি স্কটল্যাণ্ডে এক পক্ষকাল ভাষণ দিলেন। গেডেসের সঙ্গে দেখা করলেন, আর খৃষ্টান পাদ্রী সমাজের দারুণ ঈর্ষা জন্মিয়ে যোগাড় করলেন 'ব্যারোন্স' পাউণ্ডেরও বেশী। ওঁকে আমন্ত্রণ করে পাদ্রীরা দ্বন্দ্বে আহ্বান জানান। ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটের মারফতে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিবেদিতা ওঁদের আক্রমণের জবাব দেন। খৃষ্টধর্ম-প্রচারকরা কী পরিমাণ

পরধর্ম-অসহিষ্ণু, নিবেদিতার 'ল্যাম্বস্ অ্যামঙ উলভস্' প্রবন্ধটিতে তার বেদনাদায়ক বিবরণ ছিল। এ লড়াইয়ের ওই একটিই পর্ব,—এর পরই নিবেদিতা ব্যাপারটা চুকিয়ে দিলেন।

স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। ডাঃ বোসের বন্ধু ছিলেন রমেশ দত্ত। বহুমুখী তাঁর বৈদগ্ধ্য। পঁচিশ বৎসর সিভিল সার্ভিসে থেকে ভারতের কাজ করবার জন্ত লণ্ডনকেই তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র করে নিয়েছেন। দত্ত ছিলেন এক জন কবি। লণ্ডন বিশ্ববিত্যালয়ে ইতিহাস চর্চা করা ছাড়া ইংরেজীতে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পত্তানুবাদও বার করেছেন। নিবেদিতা অনুরোধ করেন, 'ছাত্রদের কাছে যে ভারতের কথা বলেন, আমাকেও বলুন না তার কথা। ভারতের অর্থনীতি আর আর্থিক জগতের গোড়ার কথা আমি শুনতে চাই। পুব আর পশ্চিম কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে সেই খবর দিন আমায়।'

বিত্তার্থীর অধ্যবসায় নিয়ে নিবেদিতা কাজে লেগে যান। রমেশ দত্তের জন দশেক কি আরও বেশী ভারতীয় ছাত্র নিবেদিতার কাছে পড়া-শোনা করতে আসেন। ওঁর পক্ষে তরুণ ভারতের অন্তরের খবর পাবার এই হল সহজ উপায়। নিবেদিতা তাঁদের উন্মাদ আশা আর নিদারুণ হতাশার কথা জেনে নেন একে-একে। সকলেরই প্রায় এক অবস্থা, নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত আত্মসচেতন। ও-দেশের ঠাণ্ডায় স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় ওরা লজ্জা পায়, দেশাচার পালন করতে গিয়ে অন্ত ছাত্রদের চোখে ছোট হয়ে পড়ে। ইংরেজ কি চোখে ভারতকে দেখে, কিপলিঙের বইয়ে তার বিবরণ আছে। এরা সুবোধ ছেলের মত সেই ভারতীয় চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায় যেন। নিবেদিতা ওদের কথা শোনেন, আলোচনা করেন ওদের সমস্যা নিয়ে, ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ করার কথা তোলেন।

প্রত্যেক মাসেই নিবেদিতার লণ্ডন ছাড়বার কথা ওঠে, যাওয়ার আয়োজন শুরু হয়। রমেশ দত্ত ভাবতেন, নিবেদিতার ইউরোপে থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে স্বামীজির 'পরে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল তাঁর, সেই সূত্রে তাঁকে লেখেন, 'ভারতের মঙ্গলের জন্তই নিবেদিতার ভারতে ফিরে যাওয়া আপনার স্থগিত রাখা উচিত।' এই সময় শ্রীযুত দত্তের নির্দেশে 'ভারতীয় জীবনের রহস্য' নামে নিবেদিতা একখানা বই লিখছিলেন। লিখতে গিয়ে প্যাট্রিক গেডেসের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। 'ইউরোপকে একটুখানি বুঝতে গিয়ে পরোক্ষ ভাবে এমন একটা শৈলীর সন্ধান পেয়ে গেলাম যার মাধ্যমে হিন্দু-জীবন-সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতাগুলি অন্তকে বুঝিয়ে বলতে পারি।' বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদগুলি দেখেই রমেশচন্দ্র ধরে বসলেন, এ-বই নিবেদিতাকে শেষ করতে হবে, ভাষণ দিতে গিয়ে যে-সব অপরূপ কাহিনী নিবেদিতা বলেছেন সেগুলোও এতে সঙ্কলিত করতে হবে।

কিন্তু প্রতি ডাকেই আরও জরুরী কাজের তাগাদা আসে। মিস্ ম্যাকলয়েড তখন জাপানে। নিবেদিতাকে আনুগত্যভঙ্গের অভিযোগ করে তিনি শাসাতে থাকেন।

নিজেকে নিবেদিতা প্রশ্ন করেন। ফিরে যাচ্ছেন এই সংবাদ দিয়ে সারদা দেবীকে চিঠি লেখেন, কিন্তু যাওয়ার দিন ঠিক করে উঠতে পারেন না। তখন মে মাস। নিবেদিতা চলে যেতে চান। হ্যাঁ, মরিয়া হয়ে পালাতে চান—কিন্তু ভারতে নয়। সঙ্কল্পকে রূপ দিতে মুক্ত বাতাস আর নির্জন অবসর চাই তাঁর। কিন্তু যাবেন কোথায়?

মিসেস্ বুল প্রস্তাব করলেন, নরওয়ে। সেখানে তাঁর স্বামী সমুদ্রতীরে সবুজ পাহাড়ের উপরে একখানি বিরাম-কুটির তৈরী করছিলেন। সমস্যার সমাধান মিলল। মে'র মাঝামাঝি নিবেদিতা একলা 'বের্গেন'-মুখো রওনা দিলেন। অন্য বন্ধুরা পরে এসে জুটবেন তাঁর সঙ্গে।

মাহেন্দ্র ক্ষণ এসেছে জীবনে। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়ে নিবেদিতা দেখতে চান, শুক্তির বুকে স্বাতীবিন্দুটুকু মুক্তো হয়ে ফলল কিনা!

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

সতর্ক নিরীক্ষা

নরওয়ের অরণ্যভূমিতে তিন সপ্তাহ নিবেদিতা একেবারে একা কাটালেন। একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে বই-লেখার কাজ করতেন। কখনও বা বনের মধ্যে চলে যেতেন, কুকুর দুটো ডাকতে-ডাকতে সঙ্গে চলত। পাইনের সারিতে ঝাপটা দিয়ে সমুদ্রের দমকা হাওয়া সন্‌সনিয়ে বইছে, নুয়ে পড়ছে ফুলন্ত 'হিদার'। বাড়ির চাকর দুটি এক অক্ষর ইংরেজী জানে না, ওরাই সন্ধ্যাবেলায় নিবেদিতার ঘরে কাঠকুটো দিয়ে খুব খানিকটা আগুন করে দেয়। তার পর কালো রুটি, মাখন আর এক বাটি সরসুদ্ধ খাবারের ট্রে এনে হাজির করে।

এই বনবাস-পর্বটা নিবেদিতার সতর্ক আত্ম-বিশ্লেষণের কাল। তাঁর চিঠিগুলো থেকে বোঝা যায়, এ সময়ের ভাবনা ও সঙ্কল্পের প্রভাবে তাঁর গোটা জীবনের ধারাটাই বদলে গেছে। সত্যি বলতে, বহু তপস্যায় অর্জিত স্বাতন্ত্র্যের আনন্দে এই সময়ই নিজের পায়ে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। পরস্পর স্বতঃবিরুদ্ধ নানা শক্তি যেন এত দিন তাঁকে বাধ্য করেছিল অবাঞ্ছনীয় নানা কাজে। কিন্তু নিজের কাছে তাঁর লক্ষ্য বরাবরই সুস্পষ্ট। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। এই নির্জন অবসরে তিনটি ভাবনাকে রূপ দিলেন, 'কেবল কাজ করে যেতে চাই, কেবল কাজ—আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই ভারতে ফিরে যাব না স্থির করেছি। গোপালের মা যে কুঁড়েটিতে থাকতেন নাম মাত্র ভাড়ায় সেইটি নেব—কঠোর দারিদ্র্যের ভয় ঘুচে দেহ-মনের শুদ্ধি ঘটবে এতে।'

১৯০১ এর ১০ই জুন মিসেস্ বুলকে নিবেদিতা লিখলেন, 'স্বাধীনতার একটা কদর আছে আমার কাছে। এমন অনেক-কিছুকে জীবনে মেনে নিয়েছি যা স্বামীজি বোধ হয় কখনও অঙ্গীকার করতে দিতেন না। কিন্তু তাঁরই জন্ত সে-সবকে মনে ঠাঁই দিয়েছি। আমার বিশ্বাস "সব ভাল যার শেষ ভাল।"' স্বামীজিও আগের মতই আমাকে তাঁর সন্তান বলেই গ্রহণ করবেন।...আমার সম্পর্ক এখন আমার কাজের সঙ্গে, আমি এখন ওদেশের মেয়েদের সম্পত্তি। আজ আমি ভাবনায় যতটা হিন্দু অতটা এর আগে কখনও ছিলাম না। কিন্তু সেই সঙ্গে ওদেশের রাষ্ট্র-চেতনার প্রয়োজনটা অত্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে। এই হল আমার মনের পরিষ্কার কথা—

নিজের কাছে আমায় খাঁটি থাকতেই হবে। নবজাগ্রত ভারত আর ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে, এ-বিশ্বাস আমার জন্মেছে। সেই "কিছু" করবার অধিকার কেমন করে পাব, সেটা ঠিক করবার ভার মায়ের, আমার নয়।

জুলাইএর প্রথমে এক পাল অতিথি সঙ্গে নিয়ে মিসেস বুল এসে পৌছলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে মিসেস্ সেভিয়ার এক জন। ইংলণ্ডে মাস কয়েক কাটিয়ে উনি ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। এঁরা আসাতেও নিবেদিতা আর রমেশ দত্তের কাজে বিঘ্ন হল না বিশেষ। শ্রীযুত দত্ত ওঁদের আগেই এসেছিলেন। ভারতবর্ষের ভাবনা এঁদের মাথায়—শুধু ভারতবর্ষ আর কিছু নয়। ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়েই নিবেদিতা আর রমেশচন্দ্রের যত আলোচনা চলে। নিবেদিতা শ্রীযুত দত্তকে বলতেন, 'আমার ধর্ম-বাপ'—নিবেদিতাকে তিনি ভবিষ্যতে কাজের জন্য ভাল করেই গড়ে-পিটে তুলেছিলেন। এক দিন বললেন, 'হয়তো জাতীয় মহাসভায় কিছু বলবার জন্য তোমার ডাক পড়তে পারে, তা হলে কি করবে?'

'ডাকলে নিশ্চয় যাব, কারণ আমারও কিছু বলবার থাকতে পারে।'

১৮৯৯এর ৪ঠা জানুয়ারী এক চিঠিতে নিবেদিতা মিসেস্ হ্যামণ্ডকে লিখেছিলেন, 'দু'দিন আগে হ'ক বা পরে হ'ক, আমার কাজকে সবাই খাঁটি রাজনীতি বলে ধরে নেবে।' এর মধ্যেই বহুবার নিজেকে জানান দিয়েছেন নিবেদিতা, কিন্তু একটা বেদনা ছিল তাঁর মনে। জানতেন ঠিক কোনখানে গুরুর মতের সঙ্গে তাঁর গরমিল, 'আবার যখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজির লেখা পড়ি তখন সে-ধর্মের বিপুল ঔদার্যে যেন পায়ের তলায় মাটি পাই না…এক পুরুষে ও-জিনিস ধারণা করা শক্ত। এর একটা কেন্দ্রবিন্দু স্থির করা চাই…যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য, একটা জাতির পক্ষেও তা-ই সত্য। শিশুকে চিত্র-বিদ্যা শেখাবার জন্য চিত্রকর রাখতে পার, তারা হয়তো খুকীর ছবিটি মেজে-ঘষে এমন করে দেবে যে মনে হবে চমৎকার হয়েছে। কিন্তু তার নিজের হাতে আঁকা যে হিজিবিজি তা অমন হাজারটা ছবির চাইতে দামী। যে-কোনও দেশের সম্বন্ধে ঐ কথা। আপনা হতে যে-ভাবে সে বড় হতে চায় তাই তার পক্ষে ভাল, আর তার জন্য চেষ্টা করে যা করা যায় তা নিতান্তই রঙচঙে দেখনাই শুধু।

'ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না। কেবল শিখে-পড়ে তৈরী হচ্ছি। দেখতে চাইছি কেমন করে শিশু চারাটি বেড়ে উঠবে। যখন সত্যি-সত্যি সেইটি বোঝা হয়ে যাবে, জানব আর-কিছু করবার নাই—শুধু ওটিকে রক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া। আমার তো এই ধারণা। ভারতবর্ষ তার স্বাধ্যায়-তপস্যায় ডুবে ছিল: এক দল দস্যু তার ঘরে হানা দিয়ে দেশটাকে ছারেখারে দিয়েছে। ভারতবর্ষের তপোভঙ্গ হয়েছে। দস্যুর দল আর-কিছু কি শেখাতে পারে? না। এখন ভারতের কর্তব্য হল এদের তাড়িয়ে দিয়ে আবার আপন স্বভাবে ফিরে যাওয়া। মনে হয় এই ধরণের একটা কিছুই ভারতের পক্ষে আদর্শ সাধনা। ইংল্যাণ্ডের রাজ্য-শাসনের পালা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু সর্বান্তঃকরণে কামনা করি—সেদিন আসুক যেদিন এ-পালা সাঙ্গ হবে। ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের কচি ছেলেরাও রংরুট হয়ে ম্যাট্‌সিনীর পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির বার্তা প্রচার করেছিল। ভারতবাসীরা স্বদেশের স্বাধীনতা যেদিন আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, সেদিন আমি যেন আবার নতুন জন্ম নিয়ে "তরুণ ভারতের" (Young India) জয়-গাথা উচ্চারণ করতে পারি—এই আমার প্রার্থনা।'

নিবেদিতার চিঠি পড়লে বোঝা যায়, একটা বিষয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে, 'ঐ বিদেশী খৃষ্টান পাদ্রী বা সরকারের দালালদের সঙ্গে মিলে আমার কিছুই করবার নাই। ভারতের পক্ষে যা-কিছু ভারতীয়, তা যতই অর্থহীন বা তুচ্ছ হ'ক না কেন, তা আমার নমস্য। এ ধরনের কিছু ছাড়া আর-সবই ভালো যত না করুক মন্দ করবে ঢের বেশী। আমারও ও-সব জিনিষের কোনও প্রয়োজন নাই।'

'হ্যাঁ, যে কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়েছি তাতেও কিছু ক্ষতি করবে, কিন্তু এতে গণ-দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। ভাল হ'ক বা মন্দ হ'ক, এটা তাদেরই নিজস্ব, আর কারও নয়—এ রকম ক্ষতিকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। এরও প্রয়োজন আছে। আমার স্বজাতিরা মর্মান্তিক ক্ষতি করল তোমার হে ভারত, কে তার পূরণ করবে? তোমার যে-সন্তানেরা সাহসে আর বুদ্ধিতে অতুলন, কোনও কিছুর কাছে যারা নুইতে জানে না, তাদের 'পরে প্রতিদিন তিক্ত অপমানের লক্ষ ধারা ঝরে পড়ছে—তার এতটুকু প্রতীকার করবে কে?

'এখন ভাবি, ইংল্যাণ্ডে ভারতের জন্য কিছু করবার চেষ্টাটা কী বোকামি! কী যে সময়ের অপব্যয় এতে তা বলতে পারব না! ক্ষুধার্ত নেকড়েকে কচি ছেলের মত নিরীহ করে ফেলা যায় ভাব কি? তোমার খুকুমণির মত শান্ত আর মিষ্টি স্বভাব হবে তাদের? ইংল্যাণ্ডে ভারতের জন্য কাজ করার অর্থ এই রকম অসাধ্য সাধন। সেখানেও কাজ করার প্রয়োজন আছে। কাজ করতে হবে, তা জানি। কিন্তু কি ধরনের সে-কাজ তা জান কি? স্বামীজি, ডাঃ বোস, মিঃ দত্তের মত মানুষের ইংল্যাণ্ডে আসা উচিত। তাঁরা এসে বুঝিয়ে দেবেন যে ভারতবর্ষ কী এবং কী সে হতে পারে। তাঁরা হাজারে হাজারে বন্ধু শিষ্য বা অনুরাগী যোগাড় করুন এদেশে। আজ থেকে কুড়ি বছর পরে * ভারতবর্ষ আঘাত হানবে যখন (আমি জানি সে আঘাত আসবেই) তখন হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে এক দল নরনারী সচেতন হয়ে উঠবে। এর আগে এভাবে নিজেদের বিচার তারা করেনি, কিন্তু সেদিন দল বেঁধে তারা বলে উঠবে, "তফাৎ যাও। এদেশ স্বাধীন হতে দাও।" কিন্তু এ হল ইংল্যাণ্ডের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা নয়। বুঝতে পারছ? আর আমি অন্ততঃ ঐ জন্য জন্মাইনি শুধু। আকুল প্রাণে চাইছি, স্বামীজি যদি বুঝতে পারতেন যে তিনি—কিন্তু তাঁর সাধনা সম্বন্ধেই বা কি জানি আমি? আমাদের বুদ্ধির অগোচর তা……

'ওঁম্! আমরা চাই—ভারতে…কিন্তু কী চাই আমরা? চাই ধরিত্রীর প্রতি ধূলিকণা আমাদের আকুল-বাণী বহন করুক। আমরা চাই প্রকৃতির মন্দাক্রান্তা রূপায়ণী-শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে। বৃক্ষরোপণ, শিশুশিক্ষা বা ভূমিবিভাগ—এই সব

---

* নিবেদিতার ভবিষ্যৎবাণীর ৪৬ বৎসর পরে ১৯৪৭এ ভারত স্বাধীন হয়েছে।

সমাজ-হিতকর কাজের কথা ভুলে গেছি তা মনে করো না। তাও চাই···কিন্তু সেই সঙ্গে চাই ব্যাকুল আহ্বান, জনতার উন্মাদনা, প্রাণ বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ-গুলো না হলে চলবে না। কী আমাদের চাই সে-কথা খতিয়ে দেখি যখন তখন হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন মনে হয় সময় হয়েছে,—আমি নয়, মহাশক্তি স্বয়ং নেমেছেন কাজে, তখন আবার সাহসে বুক বাঁধি।

'আমাদের কর্তব্য বলতে শুধু "স্রোতে গা ভাসান দেওয়া"—তা সে যেখানেই নিয়ে যাক না! যে কথা বলবার ভার পড়বে তা যেন সব বলতে পারি, লোহা গরম থাকতে-থাকতেই যেন দিতে পারি হাতুড়ির ঘা। ভরসা আছে, আমরা বিফল হব না। আমার কাজ হল চোখ মেলে দেখা, আর অন্যদের চোখ মেলে দেওয়া। বাকীটুকু, আপনিই হবে। স্বপ্ন দেখাটাই সব চাইতে শক্ত···'

'ভাই য়ুম্! আশা আছে, তোমার হৃদয় উদার,—সেখানে এ-সব ভাবনার ঠাঁই হবে···যদি মনে কর আমার সবই ভুল, সবই সর্বনেশে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় তোমার পা ছুঁয়ে আমার পথে আমি চলে যাব। আমার পাওয়া স্বপ্নকে আমায় রূপ দিতেই হবে।' (১১০১এর ২৬শে এপ্রিল, ১১শে জুলাইর চিঠি)।

নিবেদিতা তাঁর ভাবী কাজের একটুখানি আভাস দিলেন এ-চিঠিতে।

সেপ্টেম্বরের শেষে এক দিন সকাল বেলা নিবেদিতা বন্ধুদের বললেন, 'ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্ম আমি প্রস্তুত। পথ দেখতে পাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবার স্বামীজির সঙ্গে যোগ দিতে হবে।'

মিসেস্ বুল জাপানে মিস্ ম্যাকলয়েডের কাছে যাবার জন্ম তৈরী হচ্ছিলেন। নিবেদিতার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে তাঁর দীর্ঘ দিনের ইতস্তত ভাবটা কেটে গেলো। নিবেদিতারও ওখানে যাওয়ার কথা চলছিল;—কিন্তু আপাততঃ সে-কথাটা চাপা পড়ল। নিবেদিতা তাড়াতাড়ি রওনা দিলেন।

লণ্ডনে জাহাজের টিকেটের জন্ম অপেক্ষা করতে হবে। নিবেদিতা 'সিষ্টারস্ অব বেথানি'র এক স্ত্রী-মঠে গিয়ে উঠলেন। এরা প্রটেষ্টান্ট। মঠটি উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, বেশ শান্তিতে সবাই আছে। যাওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল শীগগিরই, সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার আগে ছুটো দিন আর নিবেদিতার কিছু করবার রইল না। বসে-বসে দেখতে লাগলেন, মঠবাড়ির মধ্যে সাদা শিরোবাস পরা সন্ন্যাসিনীরা কেমন নিঃশব্দে লঘু পায়ে ঘুরছে-ফিরছে। মেজে, জানালা, তৈজসপত্র সব ঝক্‌ঝক্ করছে। প্রত্যেক ঘরে ফুল সাজানো। সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় দিন চলে যায় এদের—সে-দিনচর্যায় উপাসনা আর কর্মের সমান মর্যাদা। 'সারদা দেবীকে ঘিরে যারা আছে এরা তাদের চেয়ে কম পূজা-পাঠ করে না। সেই সঙ্গে এমন একটি সংযত আত্ম-শাসনের ভাব আছে এদের মধ্যে যা আমার কাছে বড় সুন্দর ঠেকল।'

শেষ দিনটিতে মিস্ ম্যাকলয়েডকে আরেকখানা চিঠি লেখেন। ঘুরে-ফিরে গুরুর কথা তুলেছেন তাতে। 'আমার স্নেহময় পিতার মন্ত্র-বাণীর যে তুলনা নাই তা কি আমি জানি না মনে কর? তা আমি ভুলিনি কখনও, কিন্তু এ ছাড়া আর-কিছু বুঝতেও পারি না। এই শেষের বছরটি নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে কেটেছে। উনি আমায় যে-ধারা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, এ-সব তার এলাকায় একেবারে বাইরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন করে আঁকড়ে আছি যে কোথায়ও যদি হাজার ভুল হয়ে থাকে, সেটা আমি তাঁরই দোষ বলে ধরব—আমার নয়। অথচ তা সত্ত্বেও এ-ও সম্ভব যে ভবিষ্যতে এ সব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আনবে শুধু বিপদের সূচনা, আনবে দুঃখ। বলতে পারি না। বোঝবার দরকারও নাই। চাই কেবল অনুগত থাকতে। আমার যা করবার তা আমি করেছি।

'আমার কাছে এ-সব অভিজ্ঞতার একটা মূল্য হল এই যে, ভারতের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি খুলে গেছে আমার, এ না হলে কোন মতেই সে-দৃষ্টি আমি পেতাম না। যদিও কি করে যে আমার দর্শনকে লোকায়ত্ত করব তা এখনও আন্দাজ করতে পারিনি, অথবা সে-দর্শনের আদৌ কোনও মূল্য দাঁড়াবে কিনা কখনও, তা-ও জানি না। অথচ অনাস্বাদিতপূর্ব একটা প্রশান্তির কোলে ঢলে পড়ছি বলে মনে হচ্ছে আজ। এই কি প্রস্তুতির পূর্ব সূচনা? অথবা এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে আমার সামর্থ্য চরমে উঠে এবার অস্তাচলে হেলে পড়েছে। যদি তা হয় সে-ও মায়ের দোষ। আমি আমার সাধ্যের চরম করেছি। মায়ের যা ইচ্ছা তিনি নেবেন।' (১১০১এর ৩রা অক্টোবরের চিঠি)।

বন্ধুদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে নিবেদিতা রওনা হলেন। জাহাজে একা থাকবেন এই তাঁর ইচ্ছা। চেয়েছিলেন ভারতে গিয়ে একলাই দেখা করবেন সারদা দেবী আর তাঁর গুরুর সঙ্গে।

এইমাত্র খবর পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ভয়ানক অসুস্থ।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

এই অবমানিত দেশে

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "বিদ্যাসাগর-চরিত"।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

সেই গদীহীন খাটে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত খোড়ায় কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসেই জাঁকজমকের সঙ্গেই আমরা শেষ করলাম প্রাতরাশ। আত্মস্থ হয়ে উঠেছি আমরা ততক্ষণে। আগামী কয়েকটি বৎসর যে নিশ্চিত ভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কহীন অবস্থায় কারা-প্রাচীরের মধ্যেই কাটাতে হবে, সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছি।'

সবার চাইতে গম্ভীর দেখলাম রঙ্গলালকে। মগের চা এক চুমুকে শেষ করে সে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মনের কথা মন দিয়ে যেন শুনতে পেলাম আমি। এই মর্মান্তিক নাটকের সেই তো রচয়িতা। বিপদভঞ্জনের সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সূত্র ধরে ওকে জেলে পাঠিয়ে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতে গিয়ে অবশেষে যে অজানতে আমাকেও জড়িয়ে ফেলবে সে, মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেনি তা। অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ওর, দশটা বিভূতি সাহাকে সে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে, এ সত্য বিভূতি সাহা নিজেও জানতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে রঙ্গলাল বোধ হয় এই প্রথম ও আমি জানি, এই শেষ একটি মহাভ্রম করে ফেলেছে। সাহার মিষ্টি কথার হাসনুহানার ঝাড়ের নীচে যে আই বি-র কালসাপ আত্মগোপন করেছিল, রঙ্গলাল প্রথমটা বুঝতে পারেনি তা। বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বিভূতি সাহা যখন অকস্মাৎ ফণা তুলে ধরলেন, তখন আমি ঢাকা জেলে পৌঁছে গিয়েছি। আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটতে দেবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তার পর যখন দেখা গেল গৈরিক পোষাকের অন্তরালে তাঁর লুকোনো রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছুরি, রঙ্গলাল তখন প্রমাদ গুণলো। আমার পত্র পাওয়া মাত্র মনে-মনে সে শপথ গ্রহণ করলো যে-ভাবে হোক্ আমায় সে রক্ষা করবে। কালাচাঁদও তৎক্ষণাৎ তার হাতে হাত মিলাতে দ্বিধা করলো না। রঙ্গলাল বিভূতি সাহাকে যা বলেছিল, তার মধ্যেও ছিল তার শাণিত বুদ্ধির খেলা, নেহাৎ যতটুকু বললে বিপদভঞ্জনকে ও তার দলীয় ক'জনকে ফাঁদে ফেলা যায়, ঠিক ততটুকু ওজন করে তুলে দিয়েছিল সে সাহার হাতে। কিন্তু কালাচাঁদ শেষ পর্য্যন্ত সেজে বসলো পরম বৈষ্ণব। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের উন্মাদনায় সে একে একে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক কংকাল তুলে দিল আই বি-র হাতে। শুধু অসংকোচে নয়, উৎসাহের সঙ্গে। কারণ প্র্যাসবি ওকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের সাজা হয়ে মামলার যবনিকাপাত হয়ে যাবার পরই ওকে পাঠিয়ে দেবেন একেবারে দার্জ্জিলিংএ। সেখানে পুলিশের দপ্তরে তার চাকরি একেবারে স্থির হয়ে আছে। তাই এক দিকে সে যেমন সহাস্যে রঙ্গলালকে সমর্থন করলো, অপর দিকে সে সমস্ত গোপন তথ্য ও সর্ব্ব শেষ পরিণতি জানিয়ে দিল বিভূতি সাহাকে।

বিভূতি সাহা আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কৌশলে রঙ্গলালের হৃদয় জয় করতে অবশ্যই কোনো-কিছু প্রকাশ না করে। কিন্তু নিরাশ হয়ে যখন দেখলেন রোগ হকিমির বাইরে চলে গেছে, তখন 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অনুসরণ করে কালাচাঁদকে আগলে রইলেন যক্ষের মতো!...অবশেষে কালাচাঁদই তাঁদের মুখরক্ষা করেছে।

রঙ্গলাল কিন্তু অটল রইলো তার সংকল্পে। রাজসাক্ষী যেমন সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষে করলে বৃটিশ সম্রাট অকৃপণ হস্তে করুণা বিতরণ করে থাকেন, তেমনি স্বীকৃতি অকস্মাৎ প্রত্যাহার করে সব দোষ পুলিশের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তাদের কঠোর দণ্ড, তাদের ক্রোধ তৃণের মত দহন করবার জন্ম বিস্তার করে লোলজিহ্বা!...রঙ্গলাল তা জানতো এবং ভালো করেই জানতো যে, এতেও সে তার দাদাকে রক্ষা করতে পারবে না। তথাপি মুহূর্তের দুর্ব্বলতায় যে ভুল সে করে বসেছে, তারই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করবার শপথ গ্রহণ করলো সে। ধূপের মতো নিঃশেষে নিজকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবার জন্যই অধীর হয়ে উঠলো সে! তাই জেঙ্কিন্‌স্‌এর এজলাসে প্রতিদিনই সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো আমার সংকেতের প্রত্যাশায়। ভুল বুঝে এক দিন সে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় গিয়ে অবশেষে তাঁকে জেলের থাকা ও খাওয়ার কতকগুলো কাল্পনিক অসুবিধের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার চেয়েছিল।

তার পর মামলার প্রথম দিনেই নাটকীয় ভাবে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে আমাদের কাঠগড়ায় এসে ওঠবার পর বিপদভঞ্জন যখন উল্লাসে চীৎকার করে অভ্যর্থনা জানাল, ভাবাবেগে সে তখন বেশ কয়েক মিনিট রইলো মাথা নীচু করে। আত্মস্থ হতে একটু সময় লেগেছিল তার।

জানালার বাইরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও আমি জানি, মনে তার এতটুকু শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই। কী মারাত্মক পরিণতি হলো ব্যক্তিগত মন-কষাকষির! এ যে কল্পনাও করেনি সে! দাদা যে তার শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক এবং বিশেষ ক'রে তার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে বিক্রমপুরের কাজের যে অপরিমেয় ক্ষতি হবে, সেই আশঙ্কাতেই পাথর হয়ে বসেছিল রঙ্গলাল।

রায় বাহাদুর ভবেশ রায় আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে গণ্য করবার আদেশ দেবার কথা চিন্তা করে দেখবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁর রায় শোনাবার সময়, কিন্তু দেখা গেল, সেটা একেবারেই ভাঁওতা।

খানিক পরই গেলাম আমরা গুদামে। সেখানে নিজেদের ধুতি, সার্ট, জুতো ত্যাগ করে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর পোষাক পরলাম। একটি জাঙ্গিয়া, অনেকটা আধুনিক আণ্ডারউইয়ারের মতো, তবে কোমর থেকে যেমন হাঁটুর প্রায় আধ হাত ওপরে এসেই থেমে গেছে, তেমনি পা ঢোকাবার ফাঁকটুকুও বেশ ছোট। গায়ে দিলাম যা, তাকে বলা হয় কুর্‌তি। ধরুন একটি খাটো-ঝুল পাঞ্জাবী, পকেট নেই তায়। তার পর হাতা কেটে শর্ট স্লিভ করলেন একেবারে গেঞ্জির মতো। কলার তৈরী হলো এমনি যাকে প্রায় হাই-কলারের অপভ্রংশ আখ্যা দেয়া যায়। কোনো মাপ নিয়ে তৈরী করা হয় না বলেই বেশ ঢিলেঢালা। মাথায় পরলাম টুপী। অনেকটা মুসলমানদের কিস্তির টুপীর মতো। এক টুকরো কাপড় কুর্‌তির ওপর দিয়ে কোমরে জড়ালাম। তার পর তিনটে কম্বল, একখানা

এ্যালুমিনিয়ামের ধার-উঁচু মাঝারি আকারের থালা ও বেশ বড় সাইজের একটি এ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে এসে একেবারে সোজা হাজির হলাম ৪০ ডিগ্রিতে। সেখানে একা আমায় রেখে ওদের সবাইকে বিভিন্ন খাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। আই. বি নাকি পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সবাইকে পৃথক পৃথক রাখতে। Dangerous prisoners…

সম্বর্দ্ধনা জানালেন রাজনৈতিক বন্দীরা কলরব করে। কারণ তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো এবং তা দ্বিজেন গাঙুলীকে দিয়ে। লেবং মামলায় সুশীল বললো: জানতাম ওরা withdraw করলেও আপনাকে ছাড়বে না, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যে জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়ে গেছে। তা—কদ্দিন?

হেসে জবাব দিলাম: স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কলমের জোর যতখানি—

অ্যাঁ, বলেন কি, একেবারে সাত বৎসর!—বিস্ময় প্রকাশ করলেন ক'জন। আর এ্যাপ্রুভারদের?

বললাম। ঘটনা শুনে সুশীল বললো: তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার কালাচাঁদকে। অতটুকু ছেলে, কেমন যেন গম্ভীর, বেশী কথা কয় না—

কোথা থেকে এসে হাজির হলো মৈয়ুদ্দীন। থমকে দাঁড়ালো: এ কি, আপনি! ডিভিশনও দেয়নি শালারা? আপনি কি পারবেন বাবু এই খাওয়া খেতে?

হাসি পেল।

সশ্রম কারাদণ্ড। সুতরাং পরদিনই সকাল বেলা শ্রমের কাজ এসে পড়লো। এক মণ ডাল আর একটা ভারী যাঁতা, কুলো আর একখানা ছোট্ট ঝাঁটা। ঐ এক মণ ডাল ভাঙতে হবে, ঝাড়তে হবে, তার পর আবার বস্তাবন্দী করে জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। এমনি প্রতিদিন। কখনো কখনো একটি চালুনি ও একটা ডালাও দেয় পরিষ্কার ভাবে কাজ করবার জন্ত।

কিন্তু নিজে হাতে আর ডাল ভাঙতে হলো না আমার। সুশীল বললো: আপনার কিছু করতে হবে না দ্বিজেন দা।

দেখলাম সে বস্তা থেকে কয়েক সের ডাল ঢেলে নিয়ে ভেঙে, ঝেড়ে আবার তা বস্তায় ভরে দিয়ে বেশ টাইট করে বেঁধে রাখলো। জিজ্ঞেস করলাম: ও কী করলে?

বললো: জানেন না, এটাই আমাদের রীতি। এক মাস এমনি ডাল ভাঙাবার নিয়ম এঁদের। কিন্তু এমনি ভাবে গোঁজামিল দিই বলে দিন সাতেক পরই ওরা বদলে দেয় বিরক্ত হয়ে। তখন দেয় চৌকীদার-দফাদারের কোটে টাক দেবার কাজ। তাও-বা কে করে, তার পর আর দেয় না।

গোলমাল করে না এ জন্ত?

বহু গোলমাল হয়ে গেছে। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে সাজাও দিতে কসুর করেনি প্রথম-প্রথম। কিন্তু তার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বিকেলের দিকে ডালের বস্তা নিয়ে যাবার সময় মৈয়ুদ্দীন জিজ্ঞেস করলো: ভালো করে ভেঙেছেন তো বাবু?

জবাব দিল সুশীল: নিশ্চয়ই। বলে মুচকি হাসলো। মৈয়ুদ্দীনও হাসলো। অর্থাৎ সেও জানে।

এক দিন বিকেলে সারি দিয়ে খেতে বসেছি আমরা। কালো রংয়ের মটর ডাল, কিছু আস্তও আছে তাতে। এক দিকে ডাল, আর এক দিকে জল। দু'-চারটে পেঁয়াজের খোসা ভাসছে আর অকস্মাৎ তাতে কোনো-কোনো দিন দেখতে পাওয়া যায় এক-আধটি শুকনো লঙ্কা, ফোড়নের ভাজা কালো শুকনো লঙ্কা। জজের মুখে হাসির মতোই ক্বচিৎ! আর পেয়েছি কালো, মিশমিশে কালো তরকারি। তাতে কি ছিল, কি আছে জানি নে। সব কিছুই সেদ্ধ হয়ে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। অনেকটা ঘাসের ঘণ্টের মতো। আমি আবার ষ্টাইল করে নিয়েছি খান চারেক রুটি, যেমন পাতলা, তেমনি বৃহদাকার, পূর্ণিমার চাঁদের মতো। টুকরো রুটি সেই ডালে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ব্যঞ্জন সহযোগে গলাধঃকরণ করছি, এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল: সরকা—ঠ, প্লাম।

রেজাক সাহেব পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। ৪০ ডিগ্রির বাইরের লন্-এ বসেছিলাম আমরা। রেজাক আমায় দেখতে পেয়েই হাসপাতালের পথ ছেড়ে ফিরে এলেন। একেবারে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। হেসে বললাম: ভালো আছেন?

জবাব দিলেন না। ভারী ক্ষুণ্ণ হলাম, রাগও হলো। এই সেদিনও সিভিল ইয়ার্ডে রাজবন্দী দ্বিজেন বাবুর অসুখের জন্ত ব্যস্ততার সীমা ছিল না যাঁর, আজ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী দ্বিজেন গাঙুলীর সঙ্গে কথা বলতেই তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো? এতখানি দম্ভ সামান্ত এক ডেপুটি জেলারের!…কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ভুল ভাঙলো আমার তার পরক্ষণেই। দীর্ঘ পাঁচটি মিনিট পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার আহার্য্যের পানে, তার পর বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, একটি অবাধ্য দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপবার জন্ত তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।…

বিকেল চারটের মধ্যেই শেষ করতে হয় রাতের আহার। তার পর যখন পৃথক পৃথক সেলে তালা পড়ে, তখনো জেলের ওপরকার টুকরো আকাশ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লাল কিরণে আলোকিত মনে হয়। তাই তখন বসে যায় আমাদের দৈনিক নৈশ সভা বা বিচিত্রানুষ্ঠান। কেউ তোলেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা, কেউ কাঁদেন হারুণ-অল্-রশীদের গল্প, কেউ আবৃত্তি করেন, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর—' আবার কেউ একখানা বাগেশ্রী বা বেহাগে টান দেন। হল্লা হয় না আদৌ, পর-পর কাজগুলো শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকে, পরিচালনা করেন চট্টগ্রামের মণী সেন। রাজবন্দী ছিলেন সাভারে। এক দিন যাত্রা শোনবার জন্ত নাকি বেশ কয়েক মাইল দূরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন আর-এক গ্রামে; দারোগার সঙ্গে ছিল মনোমালিন্ত। তিনি সে রাতে ছিলেন মফঃস্বলে, তাই এই নৈশ অভিযান। কিন্তু রাত নাকি সেখানেই নামে, যেখানে ওৎ পেতে বসে আছে নেকড়ে বাঘ! দারোগা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে থানায় ফেরবার পথে সেই যাত্রা দেখতে গিয়ে হাজির।—ব্যস্, দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল একেবারে রণক্ষেত্রে! মণী বাবুর সাজা মাত্র তিন মাস। ডিভিশন পেয়েছেন। গদী-আঁটা খাটে শয়ন করেন।

আর আমাদের জন্ত বিছানো আছে পরিষ্কার মেঝে। পরিপাটি করে বিছিয়ে দিয়েছি একখানা কম্বল, তার ওপর পাতা হয়েছে সেই টুকরো কাপড়টি। একখানা কম্বল গুটিয়ে বালিশের মতো করে

নিয়েছি। আর একখানা যেন মুড়ি দেবার ইটালিয়ান রাগ। রাজনৈতিক বন্দীদের একটা সুবিধে আছে, ইচ্ছে করলে তাঁরা বাড়ী থেকে মশারি আনিয়ে নিতে পারেন। রাত্রে মলত্যাগের ব্যবস্থাটি চমৎকার। আমাদের শয্যা থেকে ফুট তিনেক দূরে একটি পাত্র, মোটা করে আলকাতরা লাগানো। তলায় খানিকটে ফিনাইল। ঢাকনি আছে। ঘরে আছে সেই থালা ও বাটি-ভরা জল, ঘরের এক কোণে একটুখানি মাটি, অথবা মণী সেনের কাছ থেকে আনা ক্ষুদ্র এক টুকরো সাবান। সুতরাং অসুবিধে কোথায়? পাটগৈন শিকের দরজায় কেউ কেউ একখানা কম্বল ঝুলিয়ে দেন; কেউ কেউ সেই সংকীর্ণতার স্তর থেকে আরও অনেক উর্ধে উঠে গেছেন। অনেকেই আরও অনেক উর্ধে উঠে গিয়ে প্রায় ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ ঐ পাত্রের ওপর বসে-বসেই তাঁরা বারান্দার সিপাইজীর সঙ্গে দু'-চারটে বাৎচিৎও চালান বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে।

পাকুড় রাজ-এষ্টেটের মামলার বিনয় পাণ্ডে ছিলেন আমার পাশের ঘরে। ছ'ফুট লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মিষ্টভাষী। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন, সিলেবাস-বহির্ভূত নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও প্রচুর। শুধু একেবারে অজ্ঞ রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে সে যুগের বিপ্লবীদের রাজনীতি। এক দিন নৈশ সভায় মন্তব্য করলেন তিনি: তাহলে তো মণী বাবু, ভারী সুবিধে রাজনৈতিক ডাকাতিতে। যেমন পাওয়া যায় এক কাঁড়ি টাকা, যেমনি মেলে দেশ-জোড়া খ্যাতি। টাকাকে টাকা, নামকে নাম—

মণী সেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: কিন্তু একবার ধরা পড়লে একেবারে দড়িকে দড়ি। সেখানে আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা নেই—

কক্ষে-কক্ষে হাসির রোল পড়ে গেল। বিনয় পাণ্ডে বলে উঠলেন: ওরে বাব্বা, আর দড়ির কথা বলবেন না মণী বাবু! এগারো মাস আলীপুরে ফাঁসীর সেল-এ থেকে সে দড়ির খেলা দেখেছি আমি। মনে হয় অন্তত: এগারো বার ফাঁসী হয়ে গেছে আমার।

ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল বিনয় পাণ্ডে আর তাঁর সহ-আসামী তারিণীর প্রতি। নামটি আজ আর মনে পড়ছে না, তারিণীও হতে পারে, হরিচরণও হতে পারে। তার পর এগারো মাস চলে হাইকোর্টের আপীলের শুনানী। এই এগারোটি মাসের মধ্যে একটি দিন, একটি রাত, একটি নিমেষের জন্যও ঘুমোতে পারেননি বিনয় পাণ্ডে। তারিণী তো পাগলই হয়ে গেল। তার পর বেরুলো হাইকোর্টের রায়—ওদের ফাঁসীর হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের মতলব ভাঁজছিলেন বিনয়, আমরাই বুঝিয়ে নিরস্ত করেছি। কে জানে সেখানে যদি আবার উলটে ফাঁসী হয়ে যায়?...

৬ ডিগ্রিতে মাত্র দু'জন বন্দী আছেন, লেবং মামলার আসামী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের অন্যতম। ভাওয়াল রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার যোগেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ফাঁসীর হুকুমই হয়েছিল, তার পর লাট্রী নর্থফিল্ড সাহেবের হস্তক্ষেপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। তাই সুপারের পরামর্শে আমি নানা অভিযোগ সুরু করলাম সুপারের কাছে। পাটনী তখন ফিরে গেছেন প্রেসিডেন্সী জেলে কারণ হোম থেকে ফিরে এসেছেন স্বনামধন্য লিওনার্ড। জেলর আছেন সেই সুধীর মুখার্জ্জীই। পর পর অভিযোগ জানাবার ফলে সহসা এক দিন আমায় বদলী করা হলো ৬ ডিগ্রিতে নয়, ৪ নং খাতার নীচের তলার কোণের ঘরে। সেখানে মাত্র পাঁচ জন রাজনৈতিক আসামী থাকেন আর পাঁচ জন সাধারণ কয়েদী। রবির ওখানে যেতে না পারলেও তবু তো এক-সঙ্গেই একই ঘরে থাকতে পারবো দশ জন! তাই উৎসাহের সঙ্গেই চলে এলাম।

কে কে ছিলাম, আজ আর মনে নেই। মনে আছে শুধু এক জনের কথা, বরিশালের শান্তিরঞ্জন মুখার্জ্জী। বয়স আমার চাইতে কয়েক বছর কমই হবে। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা। সতীন সেনের দলের ছেলে। বরিশালের রাস্তায় একটি মস্তার পিস্তল সহ গ্রেপ্তার হন। পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

৪ নং খাতাতেই দোতলায় একেবারে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে ময়মনসিংহের জনকতক রাজনৈতিক বন্দীকে। ১১০ ধারায় সাজা হয়েছে তাঁদের। বিচারাধীন আসামী থাকতে পাগলা গারদে এঁদেরই জনৈক সহ-আসামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১১০ ধারার আসামী রাজনৈতিক বন্দীর সুবিধে পেতে পারে না। আর কয়েদীর পোষাকটি এমনি যে, ওর অন্তরালে ব্যক্তিগত রূপটি একেবারে চাপা পড়ে যায়!

এক দিন অকস্মাৎ শুনতে পাওয়া গেল, ময়মনসিংহের এমনি এক জন দশ ধারার বন্দী ভূপেন সরকারকে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। তাঁর কম্বল তল্লাসী করে নাকি একখানা ক্ষুর পাওয়া গেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, একখানা সামান্য দেয়ালের ব্যবধান থাকলেও জেল একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জগৎ, এর ভেতরকার কোনো কথা যেমন বাইরে আসতে পারে না, তেমনি বাইরের শোভনতা বা সামান্যতম ভদ্রতার বালাই এর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। কোনো জমাদার, সিপাই বা কোনো কয়েদী মেটের সঙ্গে আপনার মন-কষাকষি হলেই জানবেন আপনি হয়ে পড়লেন তাদের টারগেট। কয়েদীদের তামাক-পাতা দিয়ে হাত করে এক দিন এমনি সন্তর্পণে আপনার কম্বলের নীচে একখানা ক্ষুর ঢুকিয়ে দেয়া হলো যে, টেরই পেলেন না আপনি। অকস্মাৎ সিপাই এসে তল্লাসী করে সেখানা উদ্ধার করে নিয়ে গেল হয়তো আপনার অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞানতেই। তার পর এক দিন কেস্-টেবিলে হাজির করা হলো আপনাকে। সেখানে অভিযোগ পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল বিচার ও দণ্ডাদেশ। পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রয়োজন হয় না, ডাকা হয় না কোনো সাক্ষীকেও। এমন কি, অভিযুক্তের কী বলবার আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা, সে প্রশ্নও করা হয় না তাকে। কাজীর আসনে বসে জেলর তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না কিছুই, শুধু দণ্ডের বিবরণ লেখা ও রবার ষ্ট্যাম্পমারা আপনার History Ticketএর নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি কলমের আঁচড় রেখে যান।

তার পরই দেখা গেল, হয়তো আপনার খাদ্যের জন্য এসেছে পেনাল ডায়েট, পরনের জন্য এসেছে চটের পোষাক, অলংকার হিসেবে এসেছে বেড়ি বা ডাণ্ডা-বেড়ি কিংবা এসেছে Night standing

handcuffএর হুকুম। চালগুলো চালনিতে চেলে ও কুলোতে ঝেড়ে নেবার পর যে খুদ পড়ে থাকে, কেন-মিশ্রিত সেই খাত্তকে বলা হয় পেনাল ডায়েট। সঙ্গে আর-কিছু নেই, না ডাল, না তরকারি, না কিছু। যে জাঙ্গিয়া জামা পরেছেন, সুতোর তৈরী সে-সব জিনিষের পরিবর্ত্তে আপনাকে পরিয়ে দিয়ে যাবে চটের পরিচ্ছদ, চটের টুপী। দু'পায়ের কব্জিতে দুটো লোহার বালা পরিয়ে কোমরের সামনের দিকে সুতো দিয়ে ঝোলালো আর-একটি অমনি বালার সঙ্গে তা জুড়ে দেয়া হয় দুটো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, একে বলা হয় বেড়ি। ডাণ্ডা-বেড়ি একটু কঠোরতর সাজা। দেড় ফুট একটি ডাণ্ডা দিয়ে এক পায়ের বালার সঙ্গে আর এক পায়ের বালা সংযুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে পা অন্ততঃ দেড় ফুট ফাঁক করে চলতে হয়। Standing handcuff আরও কঠিন শাস্তি। ছ'ফুট উঁচুতে দেয়ালের একটি হুকের সঙ্গে হাত-কড়া লাগানো হাত দু'খানা এঁটে দেয়া হলো। এমনি ভাবে থাকবে সারা রাত। অর্থাৎ সারাটি রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনাকে। হয়তো এমনি ভাবে সাতটি দীর্ঘ রাত্রি।

প্রতিদিনকার ফলাফল লেখা হয়ে যাবে আপনার History Ticketএ। অর্দ্ধ ফুলস্ক্যাপ সাইজের খুব শক্ত এক-একখানা রুল-করা কার্ড, তাতে লেখা হয় বন্দীর কারা-জীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনা—কবে এলেন, কোন্ খাতায় গেলেন, কবে কোন শ্রমের কাজ সুরু করলেন, কবে কোন্ অপরাধে কী সাজা পেলেন, কবে অসুখ হয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে গিয়ে পড়লেন, কবে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলেন আবার কবে এক বৎসর সুবোধ বালকের মতো থাকার ফলে এক মাসের মেয়াদ কমে গেল—প্রত্যেকটি কথা এতে লেখা থাকে।

ভূপেন সরকারের এমনি টিকেটে এমনি ভাবে এক দিন লেখা হয়ে গেল যে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের অভ্যন্তরে ন্যায়বিচারে তাঁর প্রতি ত্রিশ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। যে ক্ষুর তাঁর কম্বলের মধ্যে পাওয়া গেছে, তা দিয়ে নাকি মানুষের গলা কাটা যেতে পারে! সুতরাং—

সুতরাং এক দিন ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসের এক সকাল বেলায় আমাদেরই ব্যারাকের সমুখে একটি 'টিকটিকি' এনে খাড়া করা হলো। একে একখানা মই বলা চলে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার মতো ভূপেন সরকারের দুটি হাত প্রসারিত করে তার ওপর আটকে দেয়া হলো, তেমনি করে পা দুখানিও। তার পর জাঙ্গিয়ার বাঁধন আল্‌গা করে দিয়ে অনাবৃত করে দেয়া হলো তার নিতম্ব।

এবার বেত্রের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাত সুরু হবে সেই মাংসপিণ্ডের ওপর—একবার নয়, দু'বার নয়, দশ বার নয়, গুণে গুণে পুরো ত্রিশ বার!···

বৃটিশ ন্যায়বিচারের শাসন!······

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মৃত্যুসুখ

ডি. এইচ. লরেন্স

মৃত্যু
তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না,
জানি না—মৃত্যুর পর কী ঘটে।
সত্যি কথা বলতে কী, তোমার সম্বন্ধে
আমরা কিছুই জানি না।

তবু মৃত্যু,
বাস্তব ঘটনা বিরল যে তুচ্ছ জ্ঞান আমার ভেতর আছে
তাই দিয়েই
তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি।

মরণের যন্ত্রণাদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে
আমি পেয়েছি:
এক অব্যক্ত আনন্দ।
মৃত্যু মহা-রোমাঞ্চের মধ্যে আছে এক অজ্ঞাতপূর্ব আনন্দ
যেখানে টমাস কুক
আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

আমার সব সময়ের আকাঙ্ক্ষা: ফুল হবার—
যাদের জন্ম এবং মৃত্যু অব্যাহত।
আমি বিশ্বাস করি: মৃত্যুর পর আমি ফুলের জীবন পাব।
বাগানে ফোটা ফুলের মতন আমি ফুটবো
এবং
মরণ কুহেলীভেদী কিরণের মাঝে
নিজকে প্রোজ্জ্বল করবো,
পুষ্পিত কোরে তুলবো অনাঘ্রাত সুমিষ্ট সুরভিতে।

মানুষ একে অপরকে মানুষ হতে বাধা দেয়,
কিন্তু মৃত্যুর মাঝে যে অনন্ত পরিসর আছে
সেখানের বাতাস শুধুই মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে।

অনুবাদক: রাণা বসু

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

আমার কি বিপদ হল, শুনুন তবে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুখের কাছে অবিরত খাদ্য এনে ধরে, অভ্যাস বশে খেয়ে যাই। এবম্বিধ খাটনির দরুন পাকযন্ত্র একদা উষ্মা প্রকাশ করল। দেশে-ঘরে এমনি একটু-আধটু হামেশাই হয়ে থাকে, আমলে আনি না। এটা অনেক দূরের দেশ, আর শীতের দেশও বটে। রোগি হয়ে চোখ-কান বুজে শয্যায় পড়ে থাকতে মন্দ লাগে না। অসুখের চেয়ে কু-মতলবই অধিক ছিল (ফাঁস করে দেবেন না কিন্তু)। তারিখটা ৭ই অক্টোবর—পাঁচ দিন তৎপূর্বে কনফারেন্স হয়ে গেছে। পাঁচ পাঁচটা দিন একনাগাড় ডজন পাঁচেক বক্তৃতা শুনেছি—তাই ভাবলাম, ভাগ্য বশে শরীর যখন খারাপ লাগছে—সভার ঝামেলা আজকে নয়; চুপিসারে ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি।

তাই হতে দেবে নাকি? তক্কে তক্কে ঠিক চলে এসেছে সুইং। মেয়েটার চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরে ঘুরে ত্রিভুবন পাহারা দেয়। এখনো ওকে পুলিশের বড় কর্তা কেন বানায় নি, তাই ভাবি।

অসুখ করেছে আপনার?

না হে, এমন-কিছু নয়—

অসময়ে শুয়ে কেন তবে?

মুহূর্তকাল নজর করে দেখে সে বেরিয়ে গেল। হ্যাঙ্গামা চুকল, ভেবেছিলাম। তা কি হবার জো আছে? ফিরল অনতি পরেই।

হাতিয়ারপত্র সহ ত্রিমূর্তি সঙ্গে। ডাক্তার এবং এক জোড়া নার্স। সে কি কাণ্ড! শোয়ায় বসায় দাঁড় করায়; আধ হাত জিভ করে আছি, নিরিখ করে করে দেখে; খুন্তির মতো এক বস্তু গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে টর্চের আলো ফেলে। পেট টিপে দেখে। বুকে নল বসিয়ে দেখে। বিশ মিনিট ধরে নানা রকম প্রক্রিয়ার পর ডাক্তার কায়েমি ভাবে শুইয়ে দিয়ে গেল। পাছে উঠে বসি, একটা নার্স বসিয়ে রেখেছে শিয়রে!

তার পর অষুধপত্রের বোঝা এসে পড়ে। কোনটা খাওয়ার, কোনটা শোঁকার। আয়োজন দেখে আঁৎকে উঠি। রোগটা নিশ্চয় শক্ত। সত্যি বলুন, কি হয়েছে আমার?

মধুর হাস্যে নার্স ঘাড় নাড়ে।

কিছু নয়। ঘুমোন দিকি—আচ্ছা এক ঘুম দিন। জেগে উঠে দেখবেন, শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

বলেছে ভাল, চোখ বুজে থাকাই নিরাপদ। ডাক্তার এসে আবার যদি পরীক্ষা করতে চায়, কিছুতে চোখ খুলছি নে।

পাক্কা ছ-ঘণ্টা মড়ার মতো পড়ে থেকে সে যাত্রা রেহাই পেলাম।

আমার তো এই। আর এক অভাজন এসেছেন, তাঁর নাড়িতে সত্যি সত্যি দু-ডিগ্রি জ্বর পাওয়া গেল।

আর যাবে কোথা? মুহুর্মুহু ডাক্তারের আনাগোনা। শিয়রে ছোটখাট ডিস্পেনসারি। দশ মিনিট অন্তর নাড়ি টিপে চার্টে লিখছে, অষধ খাওয়াচ্ছে। এই এক মওকা পেয়ে গেছে যেন। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা চলল এইপ্রকার। ইতিমধ্যে জ্বর ছেড়েছে। তবু রেহাই নেই—শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। জ্বর আবার যদি আসে?

সকালবেলা একবার একটু ফাঁক পাওয়া গেছে; নার্স-ডাক্তার কেউ নেই। রোগি পিটটান দিয়েছেন অমনি। খোঁজ খোঁজ—কি সর্বনাশ! এ-ঘর ও-ঘর দেখা হচ্ছে—কোনখানে পাত্তা নেই। খোঁজ মিলল অবশেষে সাততলার খানাঘরে। এক গণ্ডা আণ্ডার রাক্ষুসে ওমলেট এবং কফির বাটি নিয়ে তিনি টেবিলে বসেছেন।

নাকে খৎ দিচ্ছি মশায়, কদাপি আর রোগে ধরবে না যত দিন এ দেশে আছি। বড় ভয়ে ভয়ে ছিলাম। রোগের চেয়ে বেশি ভয় নার্স-ডাক্তারের।
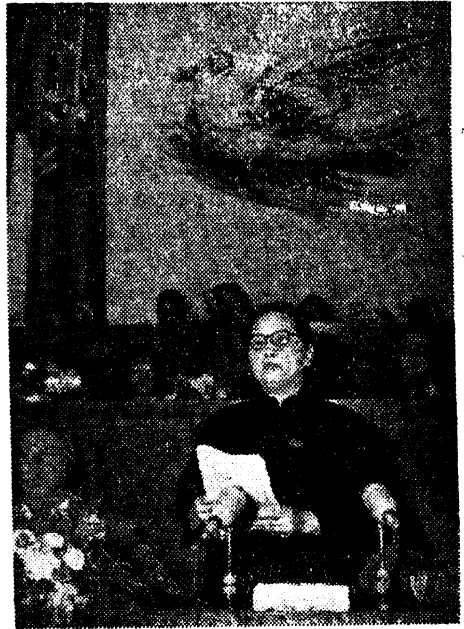
শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশনে মুন-চিং-লিং (সান-ইয়াৎ-সেনের স্ত্রী) বক্তৃতা করছেন।

সেক্রেটারিদের একজন খবর দিয়ে গেলেন, দুপুরবেলা জাপানিদের সঙ্গে খানাপিনা। চর্বচোষ্য ঠেসেই যে অমনি ঘরে ঢুকে শয্যা নেবেন, সেটা সভ্য রীতি নয়। অনেকক্ষণ বসে বসে উদ্গার তুলতে হয়। বচনে—এবং কখনো কখনো গানে। ভারতীয় দলের হয়ে আজকে আমি বলব। আর বলবেন উমাশঙ্কর যোশি। ব্যাপার ঘোরতর—দুই সাহিত্যিক জোড়ে আসরে নামছেন। দেশে থাকতে হিতার্থীরা বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিলেন, রা কাড়বে না মোটে ও-সব জায়গায়—চোখ মেলে শুধু দেখে আসবে। জবান যা-কিছু ছাড়তে হয়, স্বদেশের নিরাপদ সীমানার মধ্যে ফিরে এসে। সতর্ক বাক্যগুলো বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি। ভুল হয়ে যায় যে, ভিন্ন দেশে এসেছি—চতুষ্পার্শের এরা আমার আপন লোক নয়। ঘরের দুয়োর এঁটে বসে, দোহাই প্রাজ্ঞবর্গ, মানুষকে পর ভাববেন না। বিজ্ঞানের হাওয়ায় পথে বেরুনো আজকাল তো কঠিন নয়—দেখে আসুন, দেশ-বিদেশে কত আত্মীয়তা বিছানো আছে, মানুষ জন কত ভাল!

সকাল-বিকাল দু-বেলা আজ অধিবেশন। সভাপতি পুরোপুরি এক ডজন। কটমট নাম শুনে কি হবে, সভাপতি মশায়দের দেশগুলো কেবল জেনে রাখুন। অষ্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, ইরান, বর্মা আর কলম্বিয়া সকালে সভারোহণ করলেন। বিকালের জন্য আর ছ-জন—তুর্কি (নাজিম হিকমত), কোরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইণ্ডোনেশিয়া, কানাডা ও ইকুয়েডর। নানা জায়গার রিপোর্ট ও অভিনন্দন পড়া হল আজকে; পড়লেন চীনা-দলের ডেপুটি-লীডার কো-মো-জো; পাকিস্তানের এস. হাই; আমেরিকার হুয়েটন; অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টর জেমস; সম্মেলনের সেক্রেটারি-জেনারেল লুই নিঙ্গি; জাপানের টোগো কামেদা; আর কলম্বিয়ার দিগো মস্তানা কিউলার।

নতুন দেশে প্রথম আজ মুখ খুলছি। মওকা পেয়ে গেছি, ছাড়ব কেন? আচ্ছা করে স্বদেশের গুণ-কীর্তন করা গেল। আর সত্যি কথাই তো, দুর্গম ইতিহাসের সুদূর কাল অবধি বিচরণ করুন—হেন দৃষ্টান্ত একটি পাবেন না, পররাজ্য গিলবার জন্য ভারত হাঁ করেছে। হানা দিয়েছে বটে ভারতের মানুষ—সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নয়, সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা—কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র, শান্তি প্রীতি ও আনন্দের বাণী···

শেষ করে বসতে না বসতে উমাশঙ্কর যোশি আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। ঐ যে বললেন, 'পাহাড়-সমুদ্রের ওপার থেকে চিরকাল আমরা বাইরের ভুবনের দিকে প্রীতির হাত বাড়িয়েছি—' ভারি সুন্দর! কিন্তু সাহিত্যিক হয়ে অন্য সাহিত্যিকের প্রশংসা—এটা কি করে হল? ভিন্ন ভাষায় লেখেন বলেই হয়তো। বাংলা দেশে আমরা তো হেন ক্ষেত্রে কাষ্ঠহাসি হেসে চুপ করে থাকি। হেসে হেসেও কত কান্না কাঁদা যায়, বুদ্ধিমানে বুঝে নেন।

বক্তৃতায় আরও এক অহঙ্কার করেছিলাম। আর সেই সময়টা জওহরলালকে প্রাণ ভরে নমস্কার করেছি। বাইরের দশটা জাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তখনই বুঝতে পারি, কতখানি ইজ্জত হয়েছে আমাদের, কত শক্তি ধরি আমরা! বুক ঠুকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় বললাম, শোন হে জাপানি ভায়ারা, ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা সানফ্রান্সিসকো-চুক্তিতে সই মেরে বসলেন—ভারত কিন্তু নয়। ইংরেজ মাথায় চড়ে ছিল, এমনি অপমানের দশা আমাদেরও গিয়েছে এই সেদিন অবধি। দেশের মানুষ না-রাম না-গঙ্গা কিছু জানে না, অথচ বিশ্ববাসী জেনে বুঝে রইল, লড়নেওয়ালাদের মধ্যে ভারতও আছে। সে মনের দাগা এখনো মিলায় নি। ভিতরের ব্যাপার তাই মালুম হল। চুক্তিতে তোমরা রাজি হয়েছ বটে—সেটা খুশ মেজাজে নয়, কর্তার ইচ্ছা ক্রমে।

কেমন-কেমন চোখে তাকায় জাপানিরা। সমব্যথীর কথায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঠিক এই কথাগুলোই পরে আর এক মওকায় ছেড়েছিলাম। সেবারে নানান দেশের অনেকে সেখানে। আমাদেরই পড়শি এক ব্যক্তি মাথা চুলকান, 'সানফ্রান্সিসকো প্যাক্টে আমরা সই মেরেছি বটে—কিন্তু সে হল গবর্নমেণ্ট, পিপল্‌স্ নয়।' আর উপায় কি, দেশের গবর্নমেণ্টের কান মলে দশের আসরে কায়ক্লেশে মান বাঁচানো। আমাদের সে দায় ঠেকতে হল না। আমাদের জওহরলাল কাছেপিঠে হয়তো ঝাপসা দেখেন, কিন্তু দূরের নজর অতি পরিষ্কার।

এক বক্তৃতা ঝেড়েই কিঞ্চিৎ পশার জমে উঠল—পিছন-বেঞ্চি থেকে পয়লা সারিতে প্রমোশান। লোকটা তবে কলম-পেশা লেখক মাত্র নয়, গরজ মতো বচনও ছাড়তে পারে! আর গণতান্ত্রিক ভুবন তো তারই মুঠোয়, তূণ ভরা যাদের বাক্য-অস্ত্র।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ সেকহ্যাণ্ড করে বললেন, আপনাদের লেখকদের দিন এলো এবার। কি বলতে চাইলেন, ঠিক বুঝি না। কলমের খোঁচায় এ যুগে মানুষের পুরু চামড়া ভেদ করা শক্ত—তাই বুঝে জগতের লেখককুলও রসনায় শান দিচ্ছেন—এই নাকি? অমৃত রায় বললেন, আপনি এমন বলেন, তা তো টের পাইনি। যথারীতি আমি না-না করছি, অর্থাৎ বলুন না আরও-কিছু মনোরম বাক্য—আঙুর-আপেলের সঙ্গে চেখে চেখে স্বাদ নেওয়া যাবে। আর এক জন—উড়িষ্যার চিন্তামণি পাণিগ্রাহী—বয়স বেশি নয়, জাত-লেখক। যা-কিছু চোখে পড়ছে, টুকে বেড়াচ্ছেন আমারই মতো। অবসর পেলেই লেখাপড়ায় বসেন। ইংরেজি লেখেন বেশি, এক টাইপরাইটার অবধি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছেন সেই কটক থেকে। এঁর কথা বলতে হবে পরে বিশেষ করে। পাণিগ্রাহী উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন···উঁহু, কি বললেন তা আর লিখছি নে। আপনাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হচ্ছে, আন্দাজ পাচ্ছি। কি হে লেখক মশায়, সার্টিফিকেটের মালা গলায় ঝুলিয়ে শোভা বাড়ানোর লোভ হয়েছে এই বয়সে?

সবাই তারিফ করছেন, কেবল আমাদের সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুঁতখুঁতানি। বাংলায় বললেন না কেন? জাপানিরা তাদের ভাষায় বলল—জাপানি থেকে চীনায় তর্জমা—তার পরে ইংরেজি। আপনারও তেমনি হত। বাংলার সাহিত্যিক—বাংলা ভাষায় কথা শুনতে চাই আপনার কাছে।

ক্ষোভের কথাই বটে! আন্তর্জাতিক সমাবেশে সবাই প্রায় স্বভাষায় বলে, আমরা কেন তবে লালাসিক্ত ভাঙা ইংরেজি বর্ষণ করে বেড়াই? ইংরেজ অনেক দাগা দিয়েছে, তা মানি—মানুষগুলো দরিয়া পাড়ি দিল তো তাদের ভাষা জখম করে কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ নিচ্ছি। সেটা কিন্তু স্বদেশের চৌহদ্দির ভিতরেই মানায় ভালো—দেশবাসী খুশি হন, চতুর্দিকে পশার বাড়ে। বাইরের নিরীহদের উত্যক্ত করা নীতিসঙ্গত নয়।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এত বড় এই পিকিন শহরে, যত দূর

জানি, বাংলা-জানা আছেন এক জন মাত্র—এক বিদুষী রমণী, অধ্যাপক উ-শিয়াও-লিঙের স্ত্রী। শান্তিনিকেতনে স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন, ভাল বাংলা শিখেছেন, মহিলার ঐ সময় নাম হয়েছিল পার্বতী দেবী। সাহিত্যের উত্তম সমজদার, রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের তিনি চীনা তর্জমা করেছেন। অধ্যাপক উ-র সঙ্গে খানিকটা দহরম-মহরম হয়েছে; কিন্তু পার্বতী দেবীর ধরা পেলাম না। ফোনে উত্যক্ত করেছি, অনেককে বলেছি একটুখানি মোলাকাতের উপায় করে দেবার জন্য। শুনলাম, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তিনি—সকাল হতে তিলেক ফুরসৎ নেই। তাই কি—না, গুহ্যতর কিছু? সে যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিরকালের চীনা গুণীদের আসরে আদর করে নিয়ে বসিয়েছেন—সে কুটুম্বিতা কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার একটা বইয়ে নাম লিখে পাঠিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রোত্তর আর এক বাঙালি সাহিত্যিকের আগমন জাহির করে এলাম। সে বইয়ের পাঠোদ্ধারের দ্বিতীয় মনুষ্য যখন নেই—ভরসা করা যায়, উপহারটা তাঁর হাতে পৌঁচেছে।

অবস্থা তো এই। আর রইলেন আমাদেরই দলের গুটিকয়েক বঙ্গনন্দন—বাংলায় বচন ঝাড়লে অতএব ঠেলা সামলাবেন তাঁদেরই কেউ না কেউ। ইংরেজিতে তর্জমা না হওয়া অবধি শ্রোতৃবৃন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাবেন অথবা মৃদু মধুর আন্দাজি হাসি হাসবেন। অবোধ জনদের এমন করে খেলাতে মায়া লাগে। ঝক্কিটা তাই নিজের কাঁধে রাখা—আর কিছু না হোক, সময় বাঁচে অনেকটা।

কিন্তু সুবোধ বন্দ্যোর মনোভাবও মালুম হচ্ছে। এখানে যে যার নিজ ভাষায় বলছে, আমরাই বা কম হলাম কিসে? ঘাট মানলাম তাঁর কাছে। মূল শান্তি-সম্মেলনে আমায় যদি কিছু বলতে হয়, নিশ্চয় বাংলায় বলব। বলব বাংলায় আর যেখানে যখন সুবিধা পাবে।

গোটা পনের জায়গায় আমাকে বলতে হয়েছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না—ধীরে ধীরে আসছি। শেষটা যেন নেশায় পেয়ে গেল। বেপরোয়া জবান ছেড়েছি—মাথা-মুণ্ডু থাকত কিনা, সেটা সঠিক বলতে পারব না। তার মধ্যে দুটো বাংলায়—একটা ঐ শান্তি-সম্মেলনের কথা শুনলেন। আর একটা এক ভোজসভায় পাকিস্তানি ভায়াদের সম্বর্ধনার ব্যাপারে।

তবে শুনুন, অধমও ছেড়ে কথা কয়নি। অনেক পরের ব্যাপার। শান্তি-সম্মেলন চুকে-বুকে গেছে—পিকিন ছাড়ব-ছাড়ব করছি। খুচরো সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গেল, একেবেলা-ওবেলা মিলিয়ে অমন পাঁচটা-সাতটা। বক্তৃতাদি তেমন নয়, ঘরোয়া মেলামেশা—টেবিলে টেবিলে ভাগ হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা, এবং তৎসহ—। উঁহু, আমি কথা দিয়েছি খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে পাঠক-সজ্জনদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করব না। তবু বারম্বার তাই উঠে পড়ে। আজ্ঞে না, ধরে নিন কথাবার্তাই শুধু। আর যদি কিছু থাকে, আমার তা মনে নেই।

আমাদের টেবিলটা ছোট—সাকুল্যে জন আষ্টেক হবো। ভুবনের এপাড়া-ওপাড়ার কয়েকটি ব্যক্তি। মেক্সিকো আছেন, ইউ-এস-এ ও ইরান আছেন। ইন্দুরাসের ফরশা মোটা মেয়েটিও আছেন, অনুমান হচ্ছে। আর আছেন মাও-তুন—তাঁকে পাকড়াও করে এনে বসিয়েছি। যে সে ব্যক্তি নন, জাঁদরেল উপন্যাসকার—শুনলাম, আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের দোসর। আবার ওদিকে বড়-কর্তাদেরও একজন—সাংস্কৃতিক মন্ত্রী (Minister for Culture)। চেহারায় পোষাকে কিম্বা ভাবে-ভঙ্গিমায় অবশ্য টের পাবেন না। কথার তুবড়ি ছুটছে। মাও-তুন চীনা বলছেন, আমাদের কেউ ইংরেজি কেউ বা স্প্যানিশ। গোটা দুই-তিন দোভাষি ছেলেমেয়ে টপাটপ এভাষা-ওভাষায় তর্জমা করে এর ঠোঁটের কথা ওর কানে এনে জুড়ে দিচ্ছে। খাসা জমেছে।

তখন আচ্ছা করে বললাম মাও-তুনকে। এটা কেমন হল মশায়? রবীন্দ্রনাথ এলে খুব তাঁকে তোয়াজ করলেন, কলেজ অব আর্টসে তাঁর মস্ত বড় ছবি। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে আধুনিক ভারতীয় বই বলতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বইগুলো। তিনিও দেশে ফিরে চীনাভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে। আমাদের চিরকালের ভালবাসা তাঁকে দিয়েই ফের জমজমাট হল। আর এখানে সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার অনাদর! কলকাতা য়ুনিভার্সিটি চীনা ভাষা পড়াচ্ছে, আর ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যে বাংলা—

আর যাবে কোথায়! ডাইনের টেবিলে তাকিয়ে দেখিনি—রে-রে রব উঠল সেদিক থেকে। বাংলা-বাংলা করে তড়পাচ্ছেন, রাষ্ট্রভাষাটা বুঝি ফেলনা হয়ে গেল?

হিন্দি-ভাষী বন্ধুকে তাড়াতাড়ি নিরস্ত করি, ঠিক কথা! ভাষাই তো হল দুটো—বাংলা আর হিন্দি।

বাঁয়ের টেবিল অমনি ফোঁস করে ওঠেন, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলোর খোঁজ রাখেন? না জেনে-শুনে অমন আপ্তবাক্য ছাড়বেন না।

শান্তির সৈনিক হয়ে অশান্তির আলোড়ন তোলা চলে না তো! সেদিকে ফিরেও ঘাড় নাড়তে হয়, আজ্ঞে হ্যাঁ—ভারতীয় সমস্ত ভাষাই উত্তম।

এবং সকলে মিলে ও-পক্ষকে চেপে ধরা গেল, হিন্দির জন্য ঐ দেড়খানা অধ্যাপক রেখেই হয়ে গেল? আর কি করছেন বলুন? এবারে আমরা এলে নিজের ভাষায় কথা বলে যাবো। না বোঝেন তো বয়ে গেল।

ওঁরা দোষ কবুল করেন। ঝামেলা কত দিকে বিবেচনা করে দেখুন। অদূরে কোরিয়ার লড়াই। সকল দিককার তাল সামলাতে হচ্ছে, এদিকটায় তাই যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলা শেখাবার লোক কোথা পাওয়া যায়, সে-ও তো এক ভাবনা!

কত চাই? বদলাবদলি চলুক না—ওখান থেকে বাংলা শেখাবার লোক আসবেন, এদিক থেকে গিয়ে চীনা শেখাবেন। সেকালে যেমন শিক্ষক-ছাত্রের স্বচ্ছন্দ গতায়াত ছিল।

পণ্ডিত সুন্দরলালের কাছে সম্প্রতি অনুরোধ এসেছে, বাংলা উর্দু হিন্দি ইত্যাদ শেখাবার লোক পাঠাতে। আমাদের আলোচনার ফল ফলেছে, এমন কথা বলি নে। মতলব ঠিকই ছিল, ব্যবস্থা এতদিনে পুরোপুরি হয়ে উঠল···

কিন্তু দেখুন কাণ্ড! গড়াতে গড়াতে এ কোথায় এসে পড়েছি! গল্প জুড়ে বসলে তাল ঠিক থাকে না। ভোজের আসরে ওদিকে জাপানি বন্ধুরা। খানাপিনা এবং বক্তৃতাদি সারা হয়েছে, তবে আজে-বাজে কথা এখনো খানিক চলতে পারে।

ছাড়পত্র দেয় নি, এসে পৌঁছলে তোমরা কেমন করে ভাই? ডাঙা

হলে বুঝতাম, কোন গতিতে সীমানা পেরিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছ। এ যে জল—জাহাজ ছাড়া পাড়ি দেওয়া যায় না। একটি দু'টি নয়—এতজনে কি করে পার হলে উত্তুঙ্গ সমুদ্র ?

ওরা হাসে, বলবে না গুহ্য কথা। যা দিনকাল—কতবার হয়তো এমনি ধারা আসতে হবে। কার মনে কি আছে, ফাঁস করে দিয়ে শেষটা মুশকিলে পড়ে আর কি !

তা না বলল তো বয়ে গেল! ভারি এক ব্যাপার! আমাদেরও ঢের ঢের জানা আছে। দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে। রাসবিহারী বোস দিন দুপুরে চাঁদপাল-ঘাটে জাহাজে উঠলেন—সেই ঘাটেরই দেয়ালেই তাঁর ছাপানো ছবি, ছবির নিচে মাথার দাম ধরা আছে অনেক হাজার টাকা।··· নেতাজি নিশিরাত্রে এলগিন রোডে মোটরে চাপলেন। সিপাহি-সান্ত্রী ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক সময়টা। ঝিম-ঝিম করে রাত, নিঃসীম স্তব্ধতা। কে যায় ? যুগযুগান্ত ধরে আমরা চলি এমনি আগুন হাতে—আঁধারের মধ্যে আলো ছড়াই, পঙ্গুর পায়ে পাহাড় ডিঙোবার বল জোগান দিই। নিঃসহায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি-দুটি প্রাণী—কিন্তু ইতিহাসের আমরা মোড় ঘুরিয়ে দিই, ভাবীকাল উজ্জ্বল বাহু বাড়িয়ে সমাদরে মাথায় তুলে ধরে···

বিকালে শান্তি-সম্মেলন চলছে—তার মধ্যে এক ব্যাপার। ভারতীয়দের তরফ থেকে কোরিয়ানদের উপহার দেওয়া হল—কী আর এমন জিনিষ—জয়পুরী কাজ-করা কুঁজো, টেবিল-ঢাকা, আর ফুলের তোড়া কতকগুলো। বক্তৃতাদির ফাঁকে গম্ভীর বাজনা বেজে ওঠে—উৎসুক দৃষ্টিতে সকলে পিছন-দরজায় চেয়ে—দরজা খুলে গেল। পাঁচটি ভারতীয় মেয়ে ফুল আর জিনিষ ক'টি নিয়ে প্লাটফরমের দিকে চলেছেন—ডক্টর কিচলু অগ্রবর্তী। কোরিয়ানদের মধ্যে দুটি মেয়ে—উপহার তাদের হাতে দিতে সে কি হাততালি সমস্ত হল জুড়ে! আমাদের মেয়েদের তারা জড়িয়ে ধরল গভীর আলিঙ্গনে। ডুবন্ত মানুষের দিকে কারা যেন স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—সেই হাত যেমন করে জড়িয়ে ধরে, ঠিক তেমনি। কিছুতে ছাড়বে না। তারপর ছেড়ে দিল তো এ-মুখে ও-মুখে চুম্বন করছে বারম্বার। বাইরের দেশ থেকে ধ্বংস আর মৃত্যুই পাচ্ছে ওরা, তাই যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—ভালবাসা এই প্রথম পাচ্ছে। পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখ ভরে জল আসে—বিশাল হলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সকলে চোখ মুছছে।

সাত তলায় খানা-ঘর, সন্ধ্যার পর খেতে যাচ্ছি। লিফটে দেখা হল—কোরিয়ান ক'জন, তার মধ্যে সেই মেয়ে দুটিও। তাকাচ্ছে আমার দিকে। বললাম, ইণ্ডিয়ান। অমনি হাত বাড়িয়ে দিল সকলে। দোতলা থেকে সাত তলা—কতটুকু বা সময়! হাতগুলো ছোঁয়াই হয়ে ওঠে না। অনেক গেছে তাদের—ঘর-বাড়ি চুরমার হয়েছে, রক্তে দেশ ভাসছে। জীবাণু-বোমার বন্দোবস্তে কার কোথায় ভবলীলা সাঙ্গ হবে, লেখা-জোখা নেই। আজকে পৃথিবীর এক অতি-প্রাচীন পর দেশ তাদের প্রেম অমৃত পান করাল—সে নেশায় আবিষ্ট তারা এখনো। ওরা জেনে রেখেছিল, শক্তিমানের আছে কেবল মারণাস্ত্র-সম্ভার—এই টের পেল প্রীতি ও সমবেদনার ভাণ্ডারও জমা আছে দেশ-দেশান্তরে, নিরাশ হবার কিছু নেই।

খানা-ঘরে সব টেবিল ভরতি, জায়গা খুঁজে পাইনে। এক প্রান্তে দু-জন গুজরাটি আর জন তিনেক বিদেশি। কায়ক্লেশে আরও একটা জায়গা হতে পারে। বসলাম সেই টেবিলে। বিদেশিরা অষ্ট্রিয়া থেকে আসছেন—বাক্যের এক বর্ণও বুঝিনে। ঐ না বোঝা নিয়ে হাসাহাসি চলল খানিকক্ষণ। উঠে গেল তারা। সেই খালি চেয়ারে এসে বসলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী আর এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। পুরুষটির সঙ্গে আলাপ জমাই, ইংরেজি জানো তুমি ?

ঘাড় নাড়লেন। রক্ষে পেলাম, জানেন তিনি ইংরেজি। এই পিকিনেই আছেন অনেক কাল। কুয়োমিনটাঙের আমল থেকে।

তাজ্জব লাগে মশায়, যেদিকে তাকাই ঝকঝক-তকতক করছে। কলকাতায় বিস্তর চীনা আছেন, তাঁদের দেখে কিন্তু চীন সম্বন্ধে উল্টো ধারণা হয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, বিদেশে গিয়ে তাঁরা হয়তো অমনি হয়ে গেছেন। পরিচ্ছন্ন চিরকালই এ জাতটা। এই নতুন আমলে পরিচ্ছন্নতার যেন নেশায় ধরেছে।

মহিলাটি নিজ মনে আহারে রত ছিলেন। আমাদের কথার মধ্যে এক সময় মুখ তুলে ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ভারত থেকে আসছ ? আমি সুইডিশ, ফরাসি বলি। কিন্তু দেখছ তো, ইংরেজিও বলি একটু-আধটু—

খাওয়াটা ইতিপূর্বেই দ্রুত হাতে প্রায় সমাধা করে এনেছেন—তাঁকে এখন ঠেকায় কে ? গড়গড় করে একাই বলে চলেছেন—কমা সেমিকোলন নেই যে তার ভিতর অন্য কেউ একটা-দুটো কথার ফোড়ন দেবে। নাম-ধাম জাত-জন্মের নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন। আইনজীবী আন্তর্জাতিক সংঘের (International Association of Democratic Lawyers) বড় পাণ্ডা। তাই বলুন, কথা বিক্রিই পেশা। তবে আর এমন হবে না!

তিনটে দিন পরে এই মহিলার বক্তৃতা হল শান্তি-সম্মেলনে। জলের মতো প্রমাণ করে দিলেন, শান্তিকামী মানুষেরাই আসলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। যাদের কাজে শান্তি বিঘ্নিত হয়, ধরে ধরে তাদের কাঠগড়ায় তোলা উচিত; এবং বিচারান্তে কড়া শাস্তি। আমি এই যেমন দু-কথায় সেরে দিলাম, তেমনটি ভাববেন না। দেশ-বিদেশের পাহাড় প্রমাণ আইন-নজির জুটিয়ে অশেষবিধ তর্কবিতর্কের পর অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন।

বলছেন, তোমাদের দলেও তো আইনজীবী রয়েছেন। যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন, সকলের সঙ্গে আমি মোলাকাত করব। আমাদের ভিতর রীতিমতো বুঝসমঝ থাকা দরকার, যাতে কোনখানে বে-আইনি কিছু ঘটলে সারা দুনিয়ার টনক নড়ে যায়।

তার পরে আমাদের দিকে নয়ন তুলে পাইকারি প্রশ্ন, কি করো তোমরা ?

গুজরাটি ভদ্রলোক উমাকান্ত শেঠ আমার পরিচয় দিলেন, নানা বিশেষণ জুড়ে ওজন বাড়িয়েই বললেন।

লেখক ? বিগলিত কণ্ঠে মহিলা বললেন, নামটা কি বলো দিকি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঢের জানি, তোমার কত বই পড়েছি—

দেখুন, ডালডা বনস্পতি কিনলে কত দিক দিয়ে আপনার লাভ হবে

সর্বত্রই গৃহিনীরা বলেনঃ

"ডাল্‌ডা কিনুন- তাহোলে পয়সাও বাঁচবে ও আরও সুস্বাদু খাবারও রাঁধা হবে।"

কিছু দিন পরে
ডাল্‌ডা দিয়ে রাঁধা হোয়েছে যে!
বাঃ খেতে বেশ হয়েছে তো!
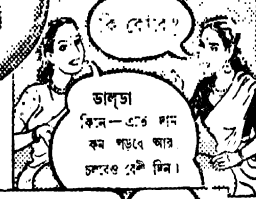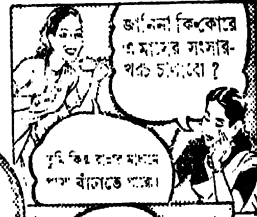
হিসেবী গৃহিনীরা প্রতিবারই ডাল্‌ডা কিনে থাকেন। আমাদের দৈনিক খাবারে যে রকম স্নেহপদার্থ দরকার হয় বলে ডাক্তাররা বলেন ডাল্‌ডায় ঠিক সেই জিনিসই আছে, আর ডাল্‌ডার দামও কম। ব্যবহার কোরে দেখুন একটিন ডাল্‌ডা কতদিন চলে আর কি চমৎকার খাবার এতে রান্না হয়! আজই একটিন ডাল্‌ডা কিনুন।

রান্নার ব্যাপারে কি কোরে খরচ বাঁচানো যায়?
বিনামূল্যে উপদেশের জন্যে আজই বা যে কোনো দিন লিখুনঃ-
দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্ পোঃ, আঃ, বক্স্ নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডালডা

১০, ৫, ২, ও ১ পাউন্ড্ টিনে পাওয়া যায়

HVM. 102-X52 BG

সবিনয়ে প্রতিবাদ করি, আজ্ঞে না। আপনার ভুল হচ্ছে—

নাছোড়বান্দা তিনি। কি ভাবো আমায়? আইনের বই ছাড়া আর বুঝি কিছু পড়িনে? জানি তোমার নাম—এক-আধটা নয়, বিস্তর বই পড়েছি তোমার। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি—ইংরেজিতে তোমার কি কি বই আছে, শুনি?

একটাও নয়—

কোন বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হয় নি?

গল্প পাঁচ-দশটার। গোটা বই একটারও নয়।

সে কি! বিস্তর শুনেছি যে তোমার নাম—বাসু···বাসু···

বাসু (বসু) অমন দশ-বিশ হাজার আছেন আমাদের দেশে। বিস্তর গুণীজ্ঞানীও আছেন, তাঁদেরই কারো নাম শুনে থাকবেন। আমি তাঁদের পদনখের যোগ্য নই।

আছে তোমার বই ইংরেজিতে—তুমি জানো না। আমি পড়েছি। য়্যাকগে—একটা বাণী দিতে হবে আমার দেশের সাহিত্যিকদের জন্য। তারা খুশি হবে। কাল আবার খানা-ঘরে দেখা হচ্ছে তো? সেই সময় চাই।

খানা-ঘরে সেই থেকে দেখে শুনে ঢুকতে হত। আবার তাঁর খপ্পরে গিয়ে না পড়ি!

পূর্ণিমা রাত—সে খবর কে জানত? জানিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যাপক চেন। তৈরি থাকবেন মশায়রা, খেয়ে দেয়েই শয্যা নেবেন না। চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে বেড়াবো।

রাত্রি ঠিক দশটা। সেই সময় এলেন তাঁরা। জোর-জবরদস্তি নেই, যাঁর যাঁর খুশি চলে আসুন। বেশি নয়, একটা মাত্র বাস বোঝাই হল। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, তার উপরেও চারিদিক আলোয় আলোয় সাজিয়েছে। বছরের একটা বড় পরব। পরবের নাম চীনা থেকে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'মধ্য-শারদ রাত্রির উৎসব।'

অধ্যাপক চেন মানে করে বোঝাচ্ছেন। আমুদে মানুষ—কথায় কথায় হাসিরহস্য। অথচ বিদ্যার বারিধি। তামাম জগৎ চষে বেড়িয়েছেন; ভারত ঘুরে গেছেন মাস কয়েক আগে; কলকাতায় অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সেটা অবশ্য বড় কিছু নয়। আমার সঙ্গে এই তো আজ সর্বপ্রথম দেখা—ঘনিষ্ঠ হতে মিনিটখানেক লাগল।

হোটেল থেকে ডাইনে ঘুরে নিষিদ্ধ-শহরের রঙিন পাঁচিলের পাশে পাশে বাস চলেছে। তার পর তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সময়। চলেছে, চলেছে···মাঠের প্রান্তে বাস থেমে দাঁড়াল। ফটক পার হয়ে ঢুকে পড়লাম।

পে-হাই পার্ক। পে-হাই কথার মানে হল উত্তর-সমুদ্র। মস্ত বড় লেক—লেকের তোলা-মাটিতে ছোট-বড় পাহাড় গড়ে উঠেছে। তা হলেও সমুদ্র নিশ্চয় নয়। সে গল্প আগে করেছি। রাজ-অন্তঃপুরিকারা বাইরের সমুদ্র চোখে তো দেখবে না—তা এই সমুদ্রই দেখে নাও নয়ন ভরে। আসল বস্তুটা আয়তনে খুব খানিকটা না হয় বড়ই হবে—আবার কি! পে-হাইয়ের মতো সমুদ্র আরও অনেক আছে নিষিদ্ধ শহরের ভিতর—দক্ষিণ-সমুদ্র, মধ্য-সমুদ্র। আর তোলা-মাটির পাহাড়ও রয়েছে সমুদ্রের পাশে পাশে—দূরদূরান্তর থেকে সত্যিকার পাথরের চাঁই এনে খাঁজে খাঁজে বসানো। তবে আর কি দরকার রইল চাল-চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে পাহাড়-সমুদ্র দেখতে বেরুবার?

এত রাত হয়েছে, তবু কত মানুষ! ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেকের উপর নৌকো বাইছে; আড্ডা দিচ্ছে এখানে-ওখানে বসে পড়ে। দলে দলে বেড়াচ্ছে কলেজি ছেলেমেয়ে। এমনটা রোজ হয় না—আজকে শুধু এই পরবের রাতে হস্টেলের দরজা অনেক রাত অবধি খোলা থাকবে। গান ধরেছে এক একটা দল—এদিক-ওদিক থেকে গান ভেসে আসছে। আর চকিত হাস্যধ্বনি।

মনে পড়ে গেল, আমার বাংলাদেশেও তো এমনি! কোজাগরী রাত্রি—লক্ষ্মীপূর্ণিমা। নাটমণ্ডপে পাশা চলছে—গ্রামের মানুষের জটলা। হুঙ্কার দিয়ে নির্জীব শুষ্ক অক্ষকে শুনিয়ে দিচ্ছে, কোন দান পড়তে হবে এইবার। দানটা পড়ল তো উল্লাসের ধাক্কায় ঘরবাড়ি কাঁপতে থাকে। হুঁকো ফিরছে হাতে হাতে। পাথরের খোরায় চিঁড়ে ভেজানো নারিকেল-জলে। আজকে ফলাহার এবং নিশি-জাগরণ চারিপ্রহর। এরই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে কর্তা উন্মনা হয়ে বাইরে তাকান। কে মেয়েটা ঐ, ধবধবে কাপড়-পরা? উঁহু, পোয়াল-গাদার পাশে জ্যোৎস্না পড়ে ঐ রকমটা দেখাচ্ছে। তা আসবেন তিনি ঠিক—এমনি শারদ পূর্ণিমা রাত্রে ফুটফুটে-রং হাস্যমুখী লক্ষ্মী ঠাকরুন মর্ত্যলোকে নেমে আসেন। গ্রামের সুঁড়ি-পথে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় জ্যোৎস্না পড়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। তারই উপর পদ্মফুলের মতো কোমল পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে তিনি এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ান। কে জেগে আছ গো? পায়ের ছোঁয়ায় সারা উঠান শুচি হয়ে যায়—এই তো, আর ক'দিন পরে মাঠের হৈমন্তী ধান উঠবে এসে এখানে। ঝি-বউ সকলে জেগে ছিল এতক্ষণ—পুজো-আচ্চার পরে গল্পগুজব করছিল কিম্বা বিস্তি খেলছিল। তা চোখ যদি ঝিমিয়েই পড়ে থাকে, তাদের জেলে-দেওয়া পূজার প্রদীপ রয়েছে। ও প্রদীপ নেভাবার নিয়ম নেই, সারারাত্রি এমনি জ্বলবে। মিটি-মিটি দীপের আলোয় লক্ষ্মী দেবীও আর এক কুমারী মেয়ে হয়ে ঘুমন্ত গ্রামকন্যাদের মধ্যে একটুখানি বসে পড়েন।

ছেলেবেলা এমনি ছবি গ্রামে দেখেছি। পে-হাই পার্কে ঘুরতে ঘুরতে তাই মনে পড়ল। পালপার্বনেও এত মিল দুটো দেশের মধ্যে!

কথা হল, নৌকোয় করে চলে যাবো লেকের শেষ প্রান্ত অবধি; পায়ে হেঁটে ফিরব। কম সময়ে বিস্তর জিনিষ দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু ঘাট হা-হা করছে, কোথায় নৌকো? বিস্তর খোঁজাখুঁজিতে শেষ অবধি একটা মিলল বটে কিন্তু মাঝি নেই। এত রাতে কে বসে রয়েছে আপনার নৌকো বেয়ে দেবার জন্যে?

পায়ে হাঁটা ছাড়া অতএব গতি নেই। রোহিনী ভাটেকে জিজ্ঞাসা করি, অনেকটা পথ কিন্তু। পারবেন?

ঘাড় দুলিয়ে তিনি বললেন, হাঁটতে আমি খুব পারি।

এই এক ডাহা মিথ্যা বলে বসলেন। স্বচক্ষে দেখেছি সেদিন মহাপ্রাচীরের উপর ওঠা। হাঁটেন না তো উনি। নাচুনে মেয়ে—চলেন যেন নাচের চালে। কিম্বা বাতাসে লঘুদেহের ভর রেখে আঁচল মেলে পাখীর পাখনার মতো।

লেকের গা বেয়ে বাঁধানো পথ। ঘাটের যত নৌকো কারা

সরিয়েছিল, এবারে ঠাহর হচ্ছে। ডাংপিটে যত কলেজি ছেলেমেয়ে। মাঝির তোয়াক্কা রাখে না, নিজেরাই বাইছে। নৌকোর পর নৌকো যাচ্ছে সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে। জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিচ্ছে। আর তার সঙ্গে দু-এক টুকরো হাসি, দু-এক কলি গান একটু বা বাজনা। আমাদের গাঙে পৌষ-সংক্রান্তির সেই বাইচ-খেলার মতো। অধ্যাপক চেন বললেন, রাতে বুঝতে পারছ না—এই লেকের জল অবিকল কাশীর গঙ্গার মতো। ভারত ঘুরে আসার পর, প্রতি কথায় তিনি ভারতবর্ষ এনে ফেলেন।

আর এই ডক্টর আলিম। ইতিহাস একেবারে গুলে খেয়ে আছেন। পা ফেলতে না ফেলতে জায়গাটার হাড়হদ্দ বিশ পুরুষের খবর। খৃষ্টীয় নয় শতকে এই রাজোদ্যান গড়তে হাত লাগানো হয়। তারপরে কাজ কখনো টগবগিয়ে চলেছে, কখনো ঢিমে-তেতালায়, কখনো বা একেবারেই বন্ধ। সামনে ঐ সকলের বড় পাহাড়টা। বানানো পাহাড় বলে নাক সিঁটকাবেন না, উঠে বুঝুন না গায়ে কত দূর শক্তি ধরেন। চড়াই-উৎরাই, গুহা, গাছ-পালা—চাই কি হোঁচট খাবার পাথরের চাঁই অবধি রয়েছে। রাজরাজড়ার গড়া জিনিষ—ঈশ্বরের চেয়ে তাঁরা বড় বেশি কম যান না। (ঝরণা দেখি নি, এই একটা ব্যাপারে ঈশ্বরের জিত।) চূড়ায় সমাধি-মন্দির। এক তিব্বতি লামা মারা যান; শবদেহ তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল—মন্দির রচিত হল তাঁর স্মৃতিতে। নিয়ম মাফিক এক ঝুটো সমাধিও রয়েছে মন্দিরের ভিতর।

সেইখানে আমরা উঠছি। হিমরাত্রি, কিন্তু গায়ে ঘাম দিল—পা যে আর চলে না! সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আনন্দ-মূর্তি ঐ ছেলে-মেয়ের দল ধুপধাপ করে উঠে যাচ্ছে। গান গাইছে, মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, নাচছেও কখনো কখনো। তখন নিজের উপর রাগ ধরে যায়। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, আমরা না হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলি—ফিরে গেলে বড্ড অপমান। আমাদের গ্রামের বিলে দেখেছি, অগুন্তি আলেয়ার মুখে দপ-দপ করে আগুন ওঠে। আলোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে পথিককে তারা তেপান্তরে নিয়ে ফেলে। এরাও এ-দিকে সে-দিকে তেমনি ছুটোছুটি দাপাদাপি করে আমাদের চূড়ায় নিয়ে তুলল।

আলো-ঝলমল রাতের পিকিন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কি জ্যোৎস্না! রাত দুপুরে দিনমান। মন্দির ও সমাধি দেখছি চারিপাশের বারাণ্ডায় ঘুরে ঘুরে। মন্দিরের গায়ে অগুন্তি বুদ্ধমূর্তি। নাকভাঙা—এই এক মজা দেখছি, হাজার হাজার মূর্তির মধ্যে একটিরও নাক আস্ত নেই। নাকের উপরই শুধু আক্রোশ, আর কিছু নয়। এক জনে—ছাত্রই হবে—বলল, জাপানিদের কীর্তি। ডক্টর আলিম তা মানেন না, ইতিহাস এমন কথা বলে না তো কোথাও।

এই উর্ধ্বলোকেও চা-কফি-সরবতের দোকান। লোকে খাচ্ছে আর গুলতানি করছে। এখানে-ওখানে বসেও আছে কত জন—জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ দেখছে। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের দিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসে—ছায়ামূর্তি ঐ যে কারা! ঘড়ি দেখে শিউরে উঠি—বারোটা বেজে গেছে। আর নয়, পালানো যাক এবার।

তা বলে এত সহজে? মোড় ঘুরে দেখি, পথ আটকেছে অনেক ছেলে। হাত বাড়িয়েছে, সেকহ্যাণ্ড করবে। আমরা এই ক-জন আর ওরা সবগুলো—পালা করে চলেছে। তা কি সহজে ছাড়বে—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাড়ের নড়া ছিঁড়ে না দেয়! কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র তারা। চেন আমাদের জনে জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জকার উঠছে, হোপিং ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। ক্ষমা দেও লক্ষ্মী ভাইরা, এবারে যাই—। শান্তি-সৈনিক—বুঝতে পারছ তো? বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকালে চোখ মুছেই আবার গিয়ে সম্মেলনে বসতে হবে।

পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে—একটা চীনা কথা বলুন, তবে ছুটি। বলে ফেলুন—

একটা কেন—অমন এক গণ্ডা কথা ইতিমধ্যে জমেছে ভাণ্ডারে। পরোয়া কিসের? লাগসই বুঝে ছেড়ে দিলাম—ছে-ছে অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এবারে তাদের চেপে ধরি, বাংলা বলো। টেগোরের ভাষা—বলতে হবে একটা বাংলা কথা।

বেবাক হার। বোবা হয়ে রইল। ছুও-ছুও—আসবে আর লাগতে? ছাড়ো পথ। কিন্তু হেরে গিয়েও ছেড়ে দেবে না। শিখিয়ে দিয়ে যাও বাংলা একটুখানি। শুনুন আবদার—রাত দুপুরে এখন টিলার উপরে ক্লাস করতে বসে যাই!

হাত ছাড়িয়ে পালাতে বড্ড দেরি হল। জোর পায়ে নামছি। একটা বড় জিনিষ দেখা বাকি রইল—সাত ড্রাগনের দেয়াল। নাম ঐ বটে, ড্রাগন গুণতিতে ডবল। এ-পিঠে সাত, ও-পিঠে সাত। চেন বললেন, বাকিই থাক মশায়। আবার একদিন আসতে হবে এই লোভে লোভে। দু-দিন কেন, দশ দিন এলেও ক্ষতি নেই এ হেন জায়গায়।

চওড়া রাস্তা—মাঝখানটা বাঁধানো, ঢালু হয়ে ক্রমশ নেমে গেছে। রোহিনী পাশের দিকে চলতে চলতে পা পিছলে যাচ্ছিলেন। চেন বলেন, পথ হাঁটবার সময় মাঝামাঝি যাবে সব সময়। বিপদ ঘটবে না।

আলিম বলেন, রাজনীতিতেও। মাঝ-রাস্তা ভাল সকলের চেয়ে।

খানিকটা দূরে আর এক মাঝারি পাহাড়, তার উপরে প্রাসাদ। জ্যোৎস্না বলেই নজরে আসছে। আজ এই উৎসব-নিশীথে সারা শহর আলোর মালা পরেছে—শুধু কেন্দ্রভূমে ঐ জায়গাটুকুই নিরন্ধ্র অন্ধকার। আলো জ্বালতে মানা, দুয়োর খুলতে মানা—অন্ধকার হয়ে থাকবে প্রাসাদ-কক্ষগুলো দিবারাত্রি। শেষ মুঙ-রাজা ওখানে আত্মহত্যা করেন। জানি না, বিলাসলাস্য-নিক্কণিত নিষিদ্ধ-নগরের সর্বময় প্রভু শক্তিধর সম্রাটের কি ছিল অন্তর বেদনা!

মার্বেল পাথরের মনোরম সেতু পার হয়ে বাসের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। দলের দু'টি লোকের সন্ধান নেই। জ্যোৎস্নালোকিত এই মায়াপুরীতে কোথায় তাঁরা পাগল হয়ে ঘুরছেন, সময়ের খেয়াল নেই। ডাকতে চলে গেলেন একজন। কি ব্যাপার, তিনিও যে ফৌত। তারপর আবার একজন। এখনও দলে দলে মানুষ এসে ঢুকছে। বাসের হর্ন টিপে এই বিপুল উল্লাসের তাল ভাঙা যায় না। কি করব, শীতার্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

[ক্রমশঃ।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৯

সিডনী কার্টন জেলের গোয়েন্দা বরসাদকে নিয়ে পাশের একটি নির্জন আঁধার কক্ষে একান্ত হলেন। দু'জনের নিম্ন-কণ্ঠ পরামর্শ লরীর সজাগ কানে পৌঁছল না। কতক্ষণ পরে দু'জনে বাইরে এলেন।

—'কথাবার্তা তাহলে ঐ ঠিক রইল বরসাদ। আমার দিক থেকে তুমি নিঃশঙ্ক থাকবে'—গোয়েন্দাকে বললেন কার্টন। তার পর তাকে বিদায় করে অগ্নিকুণ্ডের সামনে লরীর মুখোমুখি একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে কি কথা হোল জানতে চাইলেন লরী।

—'বিশেষ কিছু নয়।' বললেন কার্টন—'বন্দীর সঙ্গে একবার দেখা করার ব্যবস্থা পাকা করলাম।'

এ কথা শুনে লরীর মুখের আলো এক ফুৎকারে নিবে গেল।

—'এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। এর বেশী কিছু করতে হলে ঐ লোকটির মাথা গিলোটিনের নীচে ঠেলে দেওয়া হবে।'

—'কিন্তু ট্রাইব্যুন্যালের বিচারে মন্দ কিছু যদি ঘটে, শুধু দেখা করলেই ত তাকে বাঁচান যাবে না।'

—'সে কথা আমিও বলি না।'

লরী যে কত ভালবাসেন এই পরিবারটিকে তা জানেন কার্টন। ডার্নে দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার হওয়ায় নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্ভর দুশ্চিন্তায় মানুষটি যেন হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। কার্টন দেখলেন সামনের মানুষটির দু'টি চোখের তট উপচে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—'নিখাদ সোনার মত খাঁটি মানুষ আপনি। এদের অকৃত্রিম বন্ধু।• আমার কথায় যদি আঘাত পেয়ে থাকেন ক্ষমা করবেন আমায়'—কার্টনের গলার স্বরে নিবিড় মমতা মাখানো—'আমার বাবা যদি পাশে বসে এমনি নিরুপায়ের মত কাঁদতেন, আমি চোখে দেখতে পারতুম না।'

কার্টনের মুখে এই ধরনের কথার জন্য লরী একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। এই লোকটির সম্বন্ধে তার মনে কোন দিনই ভাল ধারণা ছিল না। কিন্তু এই বেদনার্ত সঙ্কটকালে তার স্নিগ্ধ ভাষণে পুলকিত হয়েই লরী হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। সাগ্রহে তার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন।

—'লুসির কথা ভাবছি আমি। তাকে এই ব্যবস্থার কথা জানানো চলবে না। ডার্নের সঙ্গে তার দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়। আর ভগবান না করুন, সত্যি যদি কোন অমঙ্গল ঘটে শেষ অবধি সে হতভাগিনী হয়ত ভাববে আগে থেকে আমরা তাকে খারাপটা সম্বন্ধেই জানান দিয়ে রেখেছিলাম।'

অতটা ভাবেননি লরী। তাই অবাক হয়ে তিনি কার্টনের মুখের দিকে তাকালেন। ভাবলেন, সত্যিই কি তবে কার্টনের মনে এত সব উদয় হয়েছে?

—'শুধু কি তাই। হয়ত আরো হাজারো ভাবনায় কণ্টকিত হবে সে। তাতে তার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। দয়া করে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না তাকে। আমি কি করতে পারি দেখি! তার চোখের আড়াল থেকেই আমি আমার যথাসাধ্য করব—এ শুধু আপনিই জেনে রইলেন। সংসারে আর কাউকে আমি জানাতে চাই না! আপনি এখন যাচ্ছেন ত তার কাছে? আজ রাত্রে ও নিশ্চয় একলা বোধ করবে।'

—'আমি এখুনি যাব সেখানে।'

—'সেই ভাল। আপনাকে বড়ো ভালবাসে, বিশ্বাস করে লুসি। কত দিন তাকে দেখিনি। এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে?'

—'উৎকণ্ঠায় কাতরা। মনে তার সুখ নেই। কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগে তাকে দেখতে।'

—'আহা!' বলে কার্টন আর কথা কইলেন না।

কিন্তু সে শুধু একটা শব্দ নয়। যেন একটা বুক-ফাটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস। যেন একটা চাপা কান্নার অস্ফুট আর্তনাদের মত শোনাল সে-শব্দ লরীর কানে। চমকিত হয়ে তিনি ফিরে তাকালেন কার্টনের দিকে।

দেখলেন আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছেন কার্টন। দেখলেন তাঁর মুখের উপর দিয়ে একটা কুয়াশা মুহূর্তে সরে গেল। দেখলেন যেন উজ্জ্বল ঝরঝরে দিনে পাহাড়ের উপর দিয়ে সঞ্চরমান একটা আলো-ছায়ার ঝিলিমিলি চঞ্চল পায়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। উদ্দীপ্ত আগুনের আভায় সেই সুন্দর মুখে ততোধিক সুন্দর করুণা।

মাথার বাদামী চুলগুলি অনেক দিন অমার্জিত। কানের দু'পাশ দিয়ে সেগুলি অবিন্যস্ত, দীর্ঘ। এত দিন পরে আজ প্রথম আবিষ্কার করলেন লরী যে সুন্দরই দেখতে সিডনী কার্টন। কিন্তু সে সৌন্দর্যে বড়ো নিষ্করুণ ঔদাস্য। অবহেলায় অনাদরে সে রূপ কত মলিন হয়ে পড়েছে। যেন আপনার মনের কারাগারে মানুষটি বন্দি-জীবন যাপন করছেন কত দিন। তারই ছাপ যেন ছায়া ফেলেছে সে-মুখে।

—'আপনার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ, যা করা সম্ভব শেষ করে এনেছি। এদের এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখে প্যারিস ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। যাবার পাসপোর্টও পেয়ে গেছি। যাবার জন্য আমি ত প্রস্তুতই হচ্ছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দু'জনেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। এক সময় কার্টন বললেন—'ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কত দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি পিছনে ফেলে রেখে এসেছেন।'

—'তা প্রায় আটাত্তর হবে।'

—'একটি সফল সুন্দর জীবন। সকলের ভালবাসা শ্রদ্ধা পেয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্ত কর্মে মুখর। আজ আটাত্তর বছরের শেষে সহজেই অনুমান করা যায় কোথায় আপনার স্থান। যখন আপনার অবর্তমানে এ পদ শূন্য থাকবে, কত লোক আপনার জন্যে ভাববে।'

—'আমি অকৃতদার একলা মানুষ। আমার জন্যে চোখের জল ফেলবে না কেউ।'

—'এ কথা কি করে বলছেন? লুসি কাঁদবে আপনার জন্য। কাঁদবে তার মেয়ে।'

—'তা ঠিক, তা ঠিক। হা ঈশ্বর! যা বললাম তা আমার মনের কথা নয়।'

—'আজ যদি এই নিরালা জীবনের শেষে বলতে পারেন যে কারুর ভালবাসা প্রেম পাইনি জীবনে, পাইনি কারুর শ্রদ্ধা-প্রীতি, কারুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে এতটুকু স্থান পাওয়ার মত কিছু করিনি, করিনি স্মরণযোগ্য কোন মঙ্গল কর্ম—তাহলে আপনার এই আটাত্তর বছর আটাত্তরটি অভিশাপের ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসতো জীবনে। সত্যি নয়, বলুন?'

—'সত্যি বই কি।'

কার্টন অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, কয়েক মিনিট নীরব বিরতির পর আবার বললেন—'শৈশবের দিনগুলির কথা কি মনে পড়ে না যখন মায়ের কোলে মাথা রেখে তাঁর আদর খেতেন? সে সব স্মৃতি কি সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে?'

লরীর মনও দ্রবীভূত হোল। স্নেহ-সজল নরম কণ্ঠে বললেন—'আজ থেকে কুড়ি বছর পেছিয়ে—না, না আরো অনেক কালের সেতু পেরিয়ে বহু মধুর স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। তারা সব ঘুমিয়ে আছে মনের পালঙ্কে। মনে পড়ছে মায়ের কথা—আরো অনেক সঙ্গী-সাথীর কথা যখন প্রবেশ করেনি সংসারের বিচিত্র রঙ্গভূমিতে। যখন আমার এত দোষও ধরা পড়েনি লোকের চোখে।'

—'কিন্তু দোষের তুলনায় আপনি অনেক ভাল ছিলেন।'

—'তা হয়ত ছিলাম।'

সর্বাঙ্গের অলসতা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আলাপের সূত্র ছিন্ন করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন কার্টন।

—'কিন্তু তোমার এখন যুবা বয়স'—লরী পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসতে চেষ্টা করলেন।

—'হ্যাঁ, এখনো আমি বুড়ো হয়ে পড়িনি। কিন্তু আমার তারুণ্যও আমার বয়সোচিত-নয়। বাঁচার স্পৃহা আমার মিটে গেছে।'

—'তুমি কি এখন বেরুবে?'

—'লুসিদের বাড়ী পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা আছে। জানেন ত আমার অস্থির স্বভাব। অনেক রাত পর্যন্ত যদি আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই ভয় পাবেন না যেন। আবার ঠিক দেখা হবে সকালে। কাল কোর্টে যাচ্ছেন ত?'

—'তা যেতে হবে বই কি। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।'

'আমিও থাকব সেখানে জনারণ্যে মিশে। আমার স্পাই আমার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে রাখবে। হাত ধরুন আমার।'

লরী কার্টনের হাত ধরলেন—তার পর দু'জনে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এলেন উঠোনে—উঠোন থেকে রাস্তায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন তারা। কার্টন লরীকে বাড়ীর দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়েই চলে এলেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলেন না। একটু গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—দরজা বন্ধ হলে আবার ফিরে এলেন—স্পর্শ করলেন দরজায় যেখানে লুসি হাত রেখেছিল। শুনেছে, লুসি রোজই জেলখানায় যায়। এই পথ দিয়েই ত তার নিত্য যাওয়া-আসা। 'তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমিও যাব এই পথ ধরে।'

রাত দশটার সময় কার্টন জেলখানার সামনে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে লুসি নিত্য এসে দাঁড়ায়। করাতী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দোর-গোড়ায় বসে পাইপ টানছিল। কার্টন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

কার্টন লোকটাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে খানিক দূরে একটি স্তিমিত আলোর নীচে থেমে একখণ্ড কাগজে কি যেন লিখলেন পেনসিল দিয়ে। পথ-ঘাট যেমন অন্ধকার তেমনি অপরিচ্ছন্ন। সেই ময়লা জমা আলোহীন পথের অনেকখানি ঘুরে কার্টন এক কেমিষ্টের দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দোকানী তখন নিজের হাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছিলেন।

কার্টন সেই চিরকুটটি দোকানীর সামনে খুলে ধরলেন।

—'আপনার নিজের জন্যে?'

—'হ্যাঁ'—

—'পুরিয়া দুটোকে আলাদা রাখবেন। মিশে গেলে কিন্তু মারাত্মক ফল দাঁড়াবে।'

—'খুব জানি।'

দোকানী দুটো ছোট পুরিয়া দিল কার্টনের হাতে। কার্টন পুরিয়া দুটো কোটের পকেটে চালান করে, দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকান ত্যাগ করলেন।

কালকের আগে আর কিছু করবার নেই। কিন্তু আজ আর চোখে কিছুতেই ঘুম আসবে না।

আকাশে মেঘের ভেলা ভাসছে। পৃথিবীর জনারণ্যে ঘুরে-ঘুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত তাঁর মন বার বার পথ হারিয়ে ফেলেছে। আবার ফিরে পেয়েছে পথের নিশানা। কিন্তু এত দিনে বুঝি জানতে পেরেছেন পথের শেষ কোথায়।

বহুদূর-কাল যৌবনের দিনগুলির মধুময় স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। সেদিন তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল কত উজ্জ্বল—বহু সম্ভাবনা-পূর্ণ। প্রতিভাশালী বলে খ্যাতি ছিল বন্ধু-মহলে। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। মা তার কয়েক বছর আগেই গতায়ু হয়েছিলেন। পিতার শেষ সৎকারের সময় পুরোহিত যে গুরু-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন আজো যেন তা স্পষ্ট কানে বাজছে। 'আমিই জীবন—আমিই মৃত্যু। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে সে অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।'

নীচে আলো-আঁধারির সতরঞ্চ পথ। উপরে আকাশে মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

উদ্যত কুঠারের নীচে প্রাণ-ভয়ে ভীত শহরের নির্জন পথে একাকী ঘুরতে ঘুরতে নিহত নিরীহ লোকগুলির জন্য এবং এখনও যারা অন্ধকার কারাকক্ষে পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে, তাদের কথা মনে হতেই কার্টনের হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে উঠল।

চারি দিকের এই মৃত্যু ও ভীতির রাজ্যে শুধু সাময়িক ছেদ পড়েছে।

মুহূর্তের জন্য লোকেরা সব ভুলে শান্তিময় নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। একটিও গাড়ী নেই পথে। চারি দিক নীরব নিঝুম। রাতের প্রহর গড়িয়ে চলেছে। এক সময় বিবর্ণ বিশীর্ণ মৃত চাঁদ আর তারাগুলি নিয়ে রাতও নিঃশেষ হল।

পূর্ব-গগনে নবীন সূর্য সহস্র রশ্মিতে ভাস্বর হয়ে উঠল। কার্টন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী থেকে বহু দূরে নদীর ধারে এসে পড়েছেন। এক সময় নদীর পাড়েই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে যখন বাড়ী ফিরলেন, দেখলেন লরী ততক্ষণে

বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় গেছেন তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হোল না কার্টনের। হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে তিনিও পা বাড়ালেন আদালতের দিকে।

আদালত-প্রাঙ্গণ বহু পূর্বেই জীবন-স্পন্দনে মুখরিত হয়ে উঠেছে। তারই এক কোণে আসন নিলেন কার্টন। দেখলেন, লরী ডাক্তার ম্যানেট বসে আছেন। লুসিও এসেছে—বসেছে তার বাবার পাশে।

কিছু পরেই বন্দীকে আনা হোল। সেই একই জুরী—একই বিচারকেরা।

আসামী চার্ল্‌স এভারমণ্ডী—ওরফে চার্ল্‌স ডার্নে। গত কাল মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু পুনরভিযুক্ত করা হয়েছে। অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণীর এক জন। প্রজাতন্ত্রের শত্রু।

প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞেসা করলেন—'গোপনে না প্রকাশ্যে—কি ভাবে আসামীর বিচার হবে?'

'প্রকাশ্যে'—দাবী জানাল জনতা।

অভিযোগকারীদের নাম?

আর্নেষ্ট ডিফর্জ। সেণ্ট আঁতোয়ানের মদওয়ালা।

আর কেউ?

তার স্ত্রী মাদাম ডিফর্জ।

আর?

ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ম্যানেট।

এ কথায় আদালতে তুমুল অট্টরোল উঠল। ডাক্তার ম্যানেট রক্তহীন পাংশুমুখে কাঁপতে লাগলেন। বললেন—'মহামান্য প্রেসিডেণ্টকে আমি জানাচ্ছি এ জঘন্য মিথ্যা—জালিয়াতি। আপনি জানেন আসামী আমার মেয়ের স্বামী। আমার মেয়ে এবং তার প্রিয়জনেরা আমার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার কাছে। আমি আমার মেয়ের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি এ কথা যে বলে সে মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারী কে? কোথায় সে?'

—'বিচলিত হবেন না ডাক্তার। রাষ্ট্র যদি আপনার সন্তানের বলিদান চায় হাসিমুখেই তা মেনে নিতে হবে ডাক্তার।'

প্রেসিডেণ্টের এই ভর্ৎসনায় জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডাক্তার ম্যানেট বসে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্তের মত তিনি তাকাতে লাগলেন চারি দিকে। লুসি বাবার আরো কাছে ঘেঁসে বসল।

প্রথমে ডিফর্জের জেরা সুরু হোল। তার নিজের কারাবাসের কাহিনী। ডাক্তারের অধীনে সে কাজ করত যখন তখন তার বালক বয়েস। তার পর সে ডাক্তারের মুক্তি-কাহিনী, তখন তাঁর মানসিক অবস্থার কথা একে একে বিবৃত করে যেতে লাগল।

—'ব্যাষ্টিল জয় করতে ত আপনি অমূল্য সাহায্য করেছিলেন?'

—'তা কিছুটা করেছিলাম।'

—'ব্যাষ্টিল অধিকারের পর কি কি দেখেছিলেন সেখানে?'

ডিফর্জ স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে সুরু করল তার কাহিনী:—

'বন্দী নর্থ টাওয়ারের একশ' পাঁচ নম্বর সেলে বন্দী ছিলেন। আমারই তত্ত্বাবধানে তিনি সেখানে জুতা সেলাই করতেন। ব্যাষ্টিল অধিকারের পর আমি সেই সেল পরীক্ষা করি। এক জন বন্দীর সাহায্যে আমি সেই সেলে প্রবেশ করি। মাননীয় জুরীদের এক জন সেদিন সেখানে বন্দী ছিলেন। পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানের পর চিমনীর একটি গর্ত্তে পাথর সরিয়ে একখানা দলিল খুঁজে পাই। এই সেই দলিল। ডাক্তার ম্যানেটের লেখা সেই দলিল। দলিলটি আমি মহামান্য প্রেসিডেণ্টের হাতে সমর্পণ করছি।'

'দলিল পড়া হোক'—আওয়াজ তুলল জনতা।

আদালত কক্ষে কবরের নিস্তব্ধতা। বন্দী মমতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। লুসি দিশেহারা চোখে চেয়ে আছে বাপের মুখের দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টি পাঠকের উপর স্থির নিবদ্ধ। জনতা উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। সুরু হোল দলিল পড়া।

১০

'ব্যাষ্টিল দুর্গের নির্জন কারাকক্ষে বন্দী আমি ডাক্তার ম্যানেট। এই দলিলটি লিখে রাখছি সবার অলক্ষ্যে। কেউ জানতে পারেনি—কেউ জানতে পারবে না এমন ভাবে একে আমি লুকিয়ে রাখব। এই ঘরের চিমনীর দেয়ালে একটি নিরাপদ গহ্বর তৈরী করেছি. তার মধ্যেই এটিকে আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখব। কোন দিন কোন দয়ালু লোক হয়ত এটিকে আবিষ্কার করবে। তখন লোকে জানতে পারবে আমার দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা, আমার অত্যাচার নির্যাতনের কথা। কিন্তু সেদিন হয়ত আমি থাকব না।

'চিমনীর ঝুলের সঙ্গে গায়ের রক্ত মিশিয়ে কালি তৈরী করেছি। মরচে-ধরা লোহার সূচীমুখ সেই রক্তমাখা কালিতে ডুবিয়ে আমি লিখছি আমার কথা। আমার আশাহীন আনন্দহীন বন্দি-জীবনের চরম অবমাননার কথা। শরীর আমার ভাল নেই। যে ভাবে চলেছে তাতে অধিক দিন আর আমার মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে না। কিন্তু আজ এই এখন যা লিখছি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অসংলগ্নতা নেই—মিথ্যা বানানো কিছু নেই। আমার এই সব কথা এক দিন দরবারে আমায় পেশ করতেই হবে—সে মানুষের আদালতেই হোক আর ভগবানের বিচার-সভাতেই হোক।

'সতেরশ' সাতান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে এক মেঘলা রাতে সেইন নদীর ধারে একলা বেড়াচ্ছিলাম। শীতে কুয়াশায় রাত নিঝুম।

'এমন সময় দুরন্ত বেগে একখানা গাড়ী আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। চাপা পড়ার ভয়ে আমি ত্রস্ত পায়ে সরে দাঁড়ালাম। আর সেই মুহূর্তে শুনলাম ছুটন্ত গাড়ীর জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন আরোহী গাড়োয়ানকে হুকুম দিলে গাড়ী রুখতে।

'গাড়ী থামতেই কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলে। সাড়া দিয়ে যেতে যেতে গাড়ীর আরোহীরা ততক্ষণে পথে নেমে পড়েছে। দুটি লোক আপাদমস্তক ভারী পোষাকে ঢেকে আমার দু'পাশে সম্ভ্রম ভরে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম দু'জনকে আশ্চর্য এক রকম দেখতে। দু'জনেই প্রায় আমার সমবয়সী।

—'আপনিই ডাক্তার ম্যানেট?'

'কি প্রয়োজন বলুন।'

—'আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি নদীর ধারে বেড়াতে এসেছেন, তাই সেই আশায় এত দূর অবধি গাড়ী ছুটিয়ে আসছি। দয়া করে গাড়ীতে উঠুন।'

'গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি। দুটি সবল যুবা আমার দু'পাশে। দু'জনেই সশস্ত্র। আমি অসহায় অস্ত্রহীন। শীতের রাত্রি নির্জন।

—'কিন্তু কি প্রয়োজন বলুন আগে। কী রোগ, রোগীর অবস্থা কেমন, সে-সব না জেনে আমার যাওয়ার অর্থ হয় না।'

—'দক্ষিণার জন্ম উদ্বিগ্ন হবেন না ডাক্তার! আপনার পারিশ্রমিক যথোচিত পাবেন। আর রোগী—সে আপনি স্বচক্ষে দেখেই যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আপনার মত খ্যাতনামা ডাক্তারকে রোগ সম্বন্ধে আমরা কি উপদেশ দেব। চলুন ডাক্তার—দেরী করবেন না।'

'নিরুপায় হয়ে আমি গাড়ীতে উঠলাম। উল্কা বেগে গাড়ী ছুটল। প্যারিসের সীমানা পেরিয়ে গ্রামপথে বাজতে লাগল চাকার ঘর্ঘর। কত পথ পার হোল গাড়ী, তা ঠাহর হোল না ঠিক। এক সময় নির্জ্জন পথের পাশে একটা বাগানবাড়ীর গেটে থামল আমাদের গাড়ী। আমার সঙ্গীরা নেমে সদরের ঘণ্টাধ্বনি করল। কিন্তু দরজা খুলতে দেরী হোল অনেক। যে লোকটা দরজা খুলে দাঁড়াল তার মুখে সবলে ঘুঁষি মারল এক জন প্রচণ্ডবেগে, তার পর আমায় নিয়ে দু'জনে বাগানবাড়ীর অন্দরে দাঁড়াল।

'আশ্চর্য হবার মত কিছু নয়। বাড়ীর লোকজনদের কুকুর-বেড়ালের মত মারধোর করাটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা এখানে। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগল এই দু'জনের চেহারা দেখে। এক রকম মুখ-চোখ সর্বাঙ্গ। এরা দুটি যমজ ভাই বলেই আমার সন্দেহ হোল।

'বাড়ীর ভিতর পা দেওয়া মাত্রই একটি আর্ত কান্না-মেশান গোঙানি আমার কানে এসেছিল। সিঁড়ি ভেঙে আমরা যত ওপরে উঠতে লাগলাম সে-আওয়াজ বেশী করে কানে বাজতে লাগল। গিয়ে দেখলাম প্রচণ্ড জ্বরের তাড়সে অস্থির একটি মেয়েকে!

'সদ্য-ফোটা যেন একটি ফুল। কুড়ি বছরও বয়স হয়নি বোধ হয়। দুটি হাত দু'পাশে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মাথার চুল বিপর্যস্ত ছিন্ন। রোগের পাণ্ডুরতায় সেই সুন্দর মুখে একটা অপার্থিব প্রভা থর-থর করে কাঁপছে।

'অস্থির আক্রোশে মেয়েটি বিছানার ধারে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছিল। আমি তাকে সযত্নে তুলে শোয়ালাম। তার পর তার বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে বসলাম।

'সারা মুখের মধ্যে দুটি চোখের দৃষ্টিতেই যেন প্রাণ ধক-ধক করে জ্বলছে। সে চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয়। উন্মত্ততার প্রান্তে মানুষের চোখে যে বিস্ফারিত বিভ্রান্তি দেখা যায়—সেই উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি সুন্দরী মেয়েটার চোখে দেখে আমি নিজেও কেমন যেন অবাক হলাম।

'এক-এক বার আর্ত চীৎকার করে উঠছে মেয়েটি—'বাবা—আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' এক-দুই করে বারো অবধি গুণছে আপন-মনে। তার পর চুপটি করে যেন কি শুনছে। সাড়া না পেয়ে আবার সেই কান্না-ভাঙা চীৎকার—'বাবা—আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' তার পর আবার সেই এক-দুই-তিন করে বারো অবধি বার বার গোনা। আবার সেই নিঃসাড়ে পড়ে কান পেতে শোনা। রোগীর পাশে বসে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে লাগলাম।

—'কখন থেকে এ রকম করছে?'

—'কাল রাত থেকে এই সময় বরাবর সুরু হয়েছে।'

—'মেয়েটির বাপ ভাই স্বামী—তারা সব এখানে আছে?''

—'না, একটি ভাই আছে শুধু।'

—'তার সঙ্গে কথা কইতে চাই আমি।'

'পরম ঘৃণা ভরে উত্তর দিল এক ভাই:—'সে হবে না।'

—'তা হোক। কিন্তু এক-দুই করে বারো অবধি গোণার অর্থ কি? বারোর রহস্যটা কি?'

—'বারো নয়—রাত বারোটা বলতে পারেন।'

'তাদের আগ্রহহীন প্রত্যুত্তরে আমি নিরাশ হলাম। বললাম—'দেখুন, এই ভাবে নিরুপায়ের মত এখানে বসে আমি রোগিণীর রোগের কোন উপশম করতে পারব না। আমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসিনি—এই নির্জন জায়গায় ওষুধপত্র পাওয়ারও কোন সুবিধা নেই। আমাকে ত একবার বাসায় ফিরতেই হবে।'

—'কোন অসুবিধা হবে না আপনার'—বলে বড় ভাই আলমারী থেকে একটি বড় ওষুধের বাক্স এনে রাখলে আমার সামনে—'প্রয়োজন মত ওষুধ আশা করি এরই মধ্যে পাবেন।'

'সেগুলি নিয়ে আমি ঘ্রাণে বর্ণে পরীক্ষা করছি দেখে ছোট দর্প-ভরে বললে—'আমাদের কি আপনি সন্দেহ করেন ডাক্তার ম্যানেট?'

—'কিছু মাত্র নয়'—বলে আমি নিজের পরীক্ষা শেষ করে রোগিণীর মুখে এক মাত্রা ওষুধ ঢেলে দিলাম। তার পর তার বুকে হাত রেখে তেমনি ভাবেই বসে রইলাম।

'রোগিণীর সেই আর্ত-কান্না আর শব্দের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক লয়ে ফিরে আসছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। গভীর আগ্রহে আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর সেই পাণ্ডুর মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে দেখে আমি নিজেও অনেকখানি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

'আধ ঘন্টা এমনি ভাবে তার শয্যা পার্শ্বে কাটল। দুই ভাই ঠায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। মেয়েটির কষ্টের কিছুটা আরাম হয়েছে দেখে বড় ভাই আমায় বললে—আরো একটি রোগী আপনাকে দেখতে হবে ডাক্তার!'

শুনে চমকিত হয়েছিলাম, এ স্বীকার করতে লজ্জা নেই। —'সেও কি জরুরী কেস নাকি?'

—'চলুন দেখবেন'—বলে আলো দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল সে।

'আরও একটি সিঁড়ি পার হয়ে বাড়ীর পিছন দিকে আস্তাবলের ওপরে একটি টালির ঘরে আমায় নিয়ে গেল সে। আজ দশ বছর এই জেলখানায় নির্জনে কাল কাটাচ্ছি। কিন্তু সে দৃশ্যের কোন সামান্য খুঁটিনাটি অবধি আমি ভুলিনি। ঘর-আসবাব-মানুষ কিছুরই বিস্মরণ হয়নি আমার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সে-ছবি এঁকে দিতে পারি আমার এই বর্ণনায়। খড়ের গাদার ওপর একটি বছর সতের বয়েস ফুটফুটে ছেলে দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাতে বুক ধরে মাথা উপরে বাঁকিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। দুটি চোখ তার জ্বল-জ্বল করছিল; তামসী রাতের এক জোড়া নক্ষত্রের মত।

'কোথায় তার ক্ষত দেখার জন্যে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম তার পাশে। তীক্ষ্ণ কোন অস্ত্রের আঘাতে সে মরতে বসেছে তা তার

চোখের স্থির তারকায় আর দৃঢ়বদ্ধ অধরোষ্ঠের চাপা কাতরতায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি।

—'ভয় কি। আমি ডাক্তার। আমায় দেখতে দাও তোমার ক্ষত।'

—'কোন দরকার নেই আমার ডাক্তারের।'

তবু আমি তাকে দেখলাম। অন্ততঃ বিশ ঘণ্টার বেশী এই ভাবে সে পড়ে আছে তীক্ষ্ণ তরবারিতে বিদ্ধ হয়ে। ক্ষতের মুখে শুধু হাত চাপা দিয়ে। তার সেই সুন্দর শরীর থেকে রক্তের সঙ্গে মাটীতে ঝরে পড়ছে প্রাণ-রস। জীবনের ধারা শুষ্ক শীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন শুধু মুকুল ঝরে পড়ার অপেক্ষা।

'সেই অবস্থায় তাকে দেখে আমার কেমন মনে হতে লাগল এ কোন মানুষ নয়। মানুষের সমাজের বাইরে এ বুঝি কোন জানোয়ারের রাজ্য। কোন গভীর অরণ্যে একটা আহত পশু কি পাখীকে বুঝি এর চেয়ে অসহায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় না।

—'কি হয়েছিল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমি তাকালাম বড় ভাইয়ের দিকে।

—'পথের নোংরা কুকুর আমার ভায়ের সঙ্গে বিবাদ করতে এসেছিল। তাই মুগুরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে।'

'সে উত্তরে আহত প্রাণীর প্রতি কোন করুণা মমতার লেশ নেই। এই ভাবে তাদের বাগান-বাড়ীতে মরবে এ জন্যে যেন কত বিরক্ত ভাব তার। পথের কুকুর পথেই মরবে। তাদের জ্বালাতে এসেছে মিছিমিছি, এমনই তাচ্ছিল্য তার কণ্ঠে।

'একবার চকিতে তার দিকে তাকিয়েই ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে ফিরে বললে—'ডাক্তার! ওরা জমিদার বড়লোক—বনেদী ঘর। ওদের দেমাকের অবধি নেই। আমরা পথের শেয়াল-কুকুর—আমাদের শরীরেও ভগবান রক্ত-মাংস দিয়েছেন। যত খুশী অত্যাচার অনাচার করুক ওরা—পিষে মেরে ফেলুক যত বার, তবু গরীবের গর্ব ওরা ভাঙতে পারবে না। সে গর্ব মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দেবেই—আমার দিদি—আমার দিদিকে আপনি দেখেছেন ডাক্তার বাবু?'

এতক্ষণে সেই আর্ত চীৎকার আর কান্না আমার মনে পড়ল। এখান থেকেও সেই চাপা আর্তনাদ কানে আসছিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, দেখেছি ভাই।'

—'ঐ ওরা ভাবে যে পৃথিবীতে সব মেয়েই বুঝি ওদের ভোগ্য। অনেক মেয়েও তেমনি পায় ওরা। কিন্তু সব মেয়ে সমান নয়—ডাক্তার! আমার দিদির মত ভাল মেয়েও সংসারে ছিল। ভাল একটি পাত্রে বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেও আমাদের মত ওদের প্রজা। ঐ দুই ভায়ের। কিন্তু ওরা—' কথা কইতে তার অমানুষিক কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথায় যেন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে ছেলেটি।

—'ঐ ওরা আমাদের শুষে নিচ্ছে কত কাল ধরে। খাজনা নিচ্ছে জোঁকের মত, মজুরী না দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে পশুর মত, মানুষের মত বাঁচা ভুলিয়ে দিচ্ছে। বাবা কি বলেন জানেন ডাক্তার বাবু?—বলেন আর নয়—আর যেন গরীবের ঘরে ছেলে-মেয়ে না জন্মায়। এ পৃথিবী গরীবের নয়। গরীবের বংশ সব নির্বংশ হয়ে যাক।'

'দিদির আমার বিয়ে হোল। কিন্তু কিছু দিন পরেই খুব শরীর খারাপ হোল আমার ভগ্নীপতির। এই সময় ঐ ছোট কর্তার কুনজর পড়ল আমার দিদির ওপর। কত ছলে-কৌশলে ছোট কর্তা তাকে বাগান-বাড়ীতে আনতে চাইলে। কিন্তু আমার দিদি বাঁ পায়ে সে সব ঠেলে ফেলে দিলে। তখন ঐ নারকী কি করলে জানেন? অত্যাচার করে করে মেরে ফেললে আমার ভগ্নীপতিকে। তার পর জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমার দিদিকে।

'বাড়ী ফেরার পথে দেখলাম দিদিকে নিয়ে পালাচ্ছে বড়লোক ভদ্রলোক ঐ জমিদার ডাকাত। বাবাকে খবর দিতে তিনি সেই যে বুক চাপড়ে চুপ করে গেলেন আর কথা কইতে পারলেন না। তখন আমার ছোট বোনটিকে নিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এ শয়তানের এলাকার বাইরে তাকে আমি লুকিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি।

'খুঁজে খুঁজে কাল রাতে আমি এই বাড়ীতে এসে ঢুকি। হাতে তরোয়াল নিয়ে জানলা টপকে আমি ভিতরে লাফিয়ে পড়ি। ছোট কর্তাকে আমি খুন করতে এসেছিলাম। ও আমার ফুলের মত নিষ্পাপ দিদিকে নষ্ট করে দিয়েছে—ওকে আমি খুন করতে এসেছিলাম। গরীবের অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি পারিনি ডাক্তার বাবু—এই আমার বুকে সে বিঁধিয়ে দিয়েছে ···কিন্তু সে কোথায়?'

'ইতস্ততঃ খুঁজে দেখলে ছেলেটি তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে। তার পর পরম ঘৃণাভরে বললে—'সহ্য করতে পারে না—ওরা আমাদের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। পথের কুকুরের ভ্রূকুটিতে ওদের কাপুরুষ আত্মা শিউরে ওঠে। তাই টাকা দিয়ে সব কিছুর মুখ বন্ধ করতে চায়। আমাদেরও চেয়েছিল। কিন্তু এই আমার বুকের রক্ত ক্রুশ করে দিচ্ছি ডাক্তার—এক দিন এই রক্তের শপথে ওদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এক দিন এই সব অনাচারের শাস্তি ওদের মাথায় বাজের মত ভেঙে পড়বে। সেদিন ওদের নিস্তার থাকবে না। সেদিন এলো বলে।'

'বুকে ঠেকিয়ে রক্তাক্ত আঙুলে শূন্যে দু'বার ক্রুশ করলে ছেলেটি। তার পর ক্লান্তিতে টলে পড়ল তার শরীর আমার দু'হাতের ওপর। টলে পড়ল—আর উঠল না।

'ক্লান্ত পা টেনে আবার সেই মেয়েটির শয্যাপার্শ্বে এসে বসলাম। সেই একই রকম ব্যবস্থা চলেছে তার। সেই এক কথা, সেই এক চীৎকার—একই রকম নিঃশব্দে কান পেতে শোনা। এ কষ্ট আরো অনেক প্রহর সহ্য করতে হবে মেয়েটিকে, তবে মাটীর নীচে গিয়ে শান্তি পাবে অভাগিনী!

আর একবার ওষুধ খাইয়ে প্রতীক্ষা করে বসে রইলাম। রাত গভীর হতে লাগল। এখানে প্রথম আসার পর ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার শুধু বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলাম আমি, নইলে সর্বক্ষণই আমার কাটল তার পাশে। ধীরে ধীরে তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়ে এল। গলার স্বর হোল স্তিমিত—সর্বাঙ্গ বিবশ। সেই বিলম্বিত বিভীষিকাময় যন্ত্রণার অবসানে শিথিল দেহ তার লুটিয়ে পড়ল শান্ত মূর্চ্ছায়। তখন আমার কাজ ফুরোল।

'ঘরের আর একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে সেই সংজ্ঞাহীন দেহ-লতা আমি সযত্নে শয্যায় শুইয়ে দিলাম। আর সেই প্রথম আমি জানলাম যে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

অলঙ্কারে
রুচি ও
সৌন্দর্য্যের
পরিচয়
এম.বি. সরকার এণ্ড সন্স
১৬৭ সি. ১৬৭ সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে ফোন-এভিনিউ ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ফোন:-

—'মরেছে ?'—রোগিণীর অবস্থা দেখে বড় ভাই আমায় প্রশ্ন করতে শান্ত কণ্ঠে বললাম—'এখনো মরেনি—তবে মরবে বটে।'

—'বোঝবার কি আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছে ভগবান এই সব ছোটলোকদের।'

'তার চোখের অগাধ বিস্ময় দেখে বললাম—'দুঃখে দুঃখে ওরা পাথর হয়ে যায় কিনা—তাই।'

'একবার চকিতে অবজ্ঞার হাসি ফুটল সেই মুখে। আবার তখনি সেই হাসি কুটিল ভ্রূকুটিতে বদলে গেল।

—'ভাই আমার নিতান্ত বিপদে পড়েছে বলেই আপনার শরণাপন্ন হতে হোল ডাক্তার। আপনি বয়সে তরুণ—আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে যে এ দু'দিনে যা দেখলেন শুনলেন, তা মনে মনে রাখলেই ভাল করবেন।'

'আমি সন্তর্পণে রোগিণীর লঘু নিঃশ্বাস পতন শোনার চেষ্টা করছি দেখে বিরক্ত কণ্ঠে সে বললে—'আমার কথাগুলো কি ডাক্তারের কানে গেল না ?'

—'মনে রাখবেন মঁসিয়ে আমি ডাক্তার। ডাক্তারের ইতি-কর্তব্য কতটুকু তা আমায় স্মরণ করিয়ে না দিলেও চলবে।'

'আরো সাত দিন জীবন-মৃত্যুর জোয়ার-ভাঁটায় জীবন-তরণী দোল খেল। তার পর মৃত্যুর সমুদ্রোচ্ছাসে এক অন্ধকার রাত্রে অজানা গভীরতায় হারিয়ে গেল হতভাগিনী।

'নীচু তলার ঘরে দুই ভাই অপেক্ষা করছিল। আমায় দেখে সাগ্রহে বললে—'মরেছে ?'

—'আর সন্দেহ নেই।'

ভায়ের দিকে তাকিয়ে বড় বললে—'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে ভাই এত দিনে।'

'এর আগেই দু'জনে আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল কিন্তু নেবো নেবো করে আমি ফেলে রেখেছিলাম। এখন আমার হাতে সোনা গুঁজে দিলে তারা। এই সবের পর আর টাকা নেবার ইচ্ছা ছিল না আমার। টেবিলের ওপর সেটি রেখে দিয়ে দুই ভাইকে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলাম সে রাত্রে।

'কী যে ক্লান্তি লাগছে লিখতে। বড়ো কষ্ট হচ্ছে মনের ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে সেই পুরোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু লিখে আমায় রেখে যেতেই হবে।

'পরের দিন ভোরে আমার দ্বারপ্রান্তে ছোট একটা বাক্সের মধ্যে সেই সোনা আমি পড়ে থাকতে দেখলাম। এই শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মুহূর্ত থেকেই আমার মধ্যে একটা তীব্র বাসনা জেগেছিল যে এই ক'দিনের ঘটনা আমি গোপনে মন্ত্রিদপ্তরে পেশ করব। রাজ-দরবারে অভিজাত জমিদারদের প্রতিপত্তির কথা জানতে আমার বাকী ছিল না—তাদের গায়ে যে রাজ-রোষ লাগবে না তা জেনেই আমি মন স্থির করেছিলাম। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই হত্যা ও মৃত্যুর কাহিনী নিবেদন করে আমি দায়মুক্ত হব ভেবে স্ত্রীর কাছে অবধি এ-সব কথা গোপন করেছিলাম। নিজের দিক থেকে কোন বিপদের ভাবনাই আমার ছিল না।

'পরের দিন আমার নানা জরুরী কাজে কাটল। ভোরের বেলা উঠে মন্ত্রিদপ্তরে উদ্দিষ্ট চিঠিখানা সবে লিখে শেষ করেছি এমন সময় একটি অপরূপ তরুণী আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হয়ে উপস্থিত হলেন।

'অত্যন্ত বিচলিত ভাবে এসেছেন দেখে সাগ্রহে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, তিনিই আত্ম-পরিচয় দিলেন। মারকুইস এভারমঁদির স্ত্রী। সর্বাঙ্গের আবরণে আভরণে জমিদার-বধূর সম্ভ্রম জাজ্বল্যমান।

'নামটি শুনেই চিনতে বিলম্ব হোল না আমার। বড় ভাই যেটি মহিলা তারই পত্নী। তাদের পারিবারিক সুনাম ও কল্যাণ বিঘ্নিত খণ্ডিত হচ্ছে দেখে এবং আমি ডাক্তার হিসাবে সে সব কথা জানি বলে নারীজাতির স্বভাবসুলভ মমতায় চাষী-বৌয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে ছুটে এসেছে জমিদার-বধূ। তার সঙ্গে আমার আলাপের সব খুঁটিনাটি আজ বিস্মরণ হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী ও দেবরের লুব্ধ দৃষ্টিতে পড়ে একটি নিষ্পাপ দরিদ্র বধূ যে অপরিসীম নির্যাতন ও লজ্জা ভোগ করেছে তার জন্যে তার চিত্তে শান্তি নেই। যে কোন ভাবে গোপনে এ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চায় সে—মুক্তি দিতে চায়। তা নইলে একটি হতভাগিনীর নিরুপায় অভিশাপে তার সুখের সংসারে আগুন লাগবে। একেই ত বহু কাল ধরে এই পরিবারের পাপের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে, তার উপর বিধাতার অভিশাপ লাগলে আর কি নিস্তার থাকবে ?

'ভারী স্নেহময়ী মিষ্টি মেয়েটি। কিন্তু কি বিধাতার লিখন, অমন মেয়েও বিবাহে সুখী হোল না ! হবে কি করে ? ভাই ভাতৃজায়াকে বিশ্বাস করে না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা-স্নেহ লেশমাত্র নেই। আপন সংসারে প্রতিষ্ঠা পায়নি বধূ। সকলকে ভয়ই করতে হয় তাকে।

সদর অবধি তাকে পৌঁছে দিতে এলাম। গাড়ীতে বছর দুই-তিনের একটি ছেলে বসেছিল। তাকে দেখিয়ে বললে সে—'এই এর জন্যে আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিতে চাই ডাক্তার বাবু ! তা যদি না করি ওর জীবনেও শান্তি-সুখ আসবে না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি আমরা না করে যাই, কি যেন আমার মায়ের মনে ভয় হয় যে এক দিন রুদ্র নিয়তি ওর কাছে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেবে, ওর জীবনে অভিশাপ লাগবে। যেমন করে হোক আপনি সেই অভাগিনীর বোনের খবর এনে দিন। তাকে সুখী করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'ছেলেটিকে আদর করে মা গদগদ কণ্ঠে বললে—'তোর জন্যে রে চার্লস ! তুই আমার ভাল ছেলে হবি ত বাবা ?'

—'হব মা'—সেই আধ-মিষ্টি কথা কি যে মধু বর্ষণ করল আমার কানে। মায়ের মুখও হাসিতে ভরে উঠল। ছেলেকে কোলে করে আদর করতে করতে দুই জনে চলে গেল।

'আর আমি তাকে কখনো দেখিনি।

'পাছে যথাস্থানে না পৌঁছয় এই ভয়ে আমি স্বহস্তে চিঠিখানি দিয়ে এলাম। দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

'সেই রাত্রে উপরের ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি, আজ তার কথা লিখতে চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে—আমার চাকর আর্নেস্ট এসে জানাল যে এক জন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'আর্নেস্টের পিছনে যে লোকটি এসে দাঁড়াল, সর্বাঙ্গ তার রাত্রির অন্ধকারের মত কালো পোষাকে ঢাকা। বললে—'বড় জরুরী কেস ডাক্তার বাবু। আপনার দেরী হবে না, সদরে গাড়ী এনেছি।'

'বাড়ী থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কে যেন মাফলার দিয়ে অতর্কিতে আমার মুখ বন্ধ করে দিলে। হাত বেঁধে ফেললে পিছনে। পথের অন্ধকার কোণে এতক্ষণ সেই দুই ভাই দাঁড়িয়েছিল। বেরিয়ে এসে হাতের ইংগিতে দেখিয়ে দিলে আমায়। তার পর আমার সেই চিঠিখানি বের করে আমায় দেখাল এক জন। দেশালাই জ্বালিয়ে সেই চিঠি পুড়িয়ে ঘৃণাভরে পা দিয়ে ছাই মাড়িয়ে আর এক অন্ধকারে সরে গেল।

'কোন কথা নয়—সাড়া নয়। নিঃশব্দে ওরা আমায় এইখানে এনে ফেললে। জীবন্ত মৃত্যুর গুহায় বন্দী করে রেখে দিয়ে গেল।

'শুধু একবার, শুধু একটি বারের জন্মে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সংবাদের জন্মে আকুলি-বিকুলি করে মরেছি। মাথা কুটেছি কারাগারের নির্জন পাথরের দেয়ালে। ভগবান আমায় না শাস্তি দিলেন, তার জন্মে তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু সেই অত্যাচারী দুই ভাইয়ের কথা ভাবি। তাদের ঘরেও ত স্ত্রী-পুত্র আছে। তবে দয়া-মায়া তাদের শরীরে নেই কেন? কেন আমার স্ত্রীর একটি খবর তারা আনতে দেয়নি? তবে কি সে অভাগিনী আর বেঁচে নেই!

'এ কষ্ট আর সহ্য হয় না ভগবান! তোমার পৃথিবীতে যারা গরীবের ওপর এত অত্যাচার করছে তুমি তাদের কসুর মাপ করো না ভগবান! তোমার রুদ্র অভিশাপে তাদের বংশে আগুন লাগুক। আমি ডাক্তার ম্যানেট—মানুষের কাছে—দেবতার কাছে এই প্রার্থনা রেখে গেলাম—এই রইল আমার মিনতি। চরম শাস্তিতে তাদের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।'

এ দলিল পাঠে আদালতে যেন অপ্রত্যাশিত বজ্রপাত হোল। যে গভীর মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ, তা শুনে সমবেত জনতার কণ্ঠে বাক্‌রোধ হয়ে এল। ডাক্তার ম্যানেট বিভ্রান্তের মত মুখে মুখে চেয়ে দেখতে লাগলেন। নিষ্ঠুর অফর্জ এই জন্ম বুঝি এত দিন গোপন করে রেখেছিল এই দলিল?

অবশেষে ডাক্তারকে সম্বোধন করে প্রেসিডেন্ট বললেন, জাতীয়তার পবিত্র বেদীমূলে ঐ জমিদার-নন্দনকে বলি দিয়ে মাতৃভূমির চরম সেবা করার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার নিজের জীবন ধন্য করুন, আপন কন্যার বৈধব্যের দুঃখ দেশপ্রেমের অগ্নিতে সহিষ্ণু হয়ে উঠুক ডাক্তারের মনে। শুনে জনতা সোল্লাসে গর্জন করে উঠল।

—এই বার ডাক্তার বাঁচান ঐ নরকের কীটকে। নিজের জামাইকে।' তিক্ত কণ্ঠে বললে মাদাম অফর্জ তার সঙ্গিনীর কানে।

এক জন জুরী উঠে মৃত্যুর রায় দিতেই সমগ্র আদালত পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে উঠল। তার পর মুহুর্মুহু সেই কলরোল তরঙ্গে তরঙ্গে বিদীর্ণ হতে লাগল।

মৃত্যু! জনতার রায়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার্লস ডার্নের শিরশ্ছেদ হবে গিলোটিনের তলায়।

প্রহরীরা তাকে টেনে নিয়ে গেল কারাগারে।

আগামী বারে সমাপ্য।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

বিশ্বজননী সারদামণি

শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবী

"কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি।
শক্তি দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

নারী শক্তিরূপিণী। মহাশক্তি জগদ্ধাত্রীর অংশে তাহার জন্ম। সে শক্তি নিত্য নব নব রূপে উৎসারিত হইয়া সুষ্ঠু সমাহারে স্রষ্টার সৃষ্টির বনিয়াদকে অক্ষত বিশ্বস্ততায় সুদৃঢ় করিতেছে। আত্ম-সমাহিত পুরুষ-শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া বাস্তবমুখীন সৃষ্টিতৎপরতায় সুবিন্যস্ত করিবার শক্তি নারীতেই বিদ্যমান। নারীরই স্বতঃস্বেচ্ছ আকূতিভরা প্রেরণাপ্রাচুর্য্যে পুরুষ-শক্তির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়। তাই নারী—নারী, যিনি উৎসারিত অমৃত আশীষে জীবন দান করেন—বৃদ্ধি পাওয়ান। তেমনি একজন জীবনদাত্রী জগদ্ধাত্রী নারীর পুণ্য চরিত আলোচনা করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব। তিনি হইলেন জননী সারদামণি।

অসুর-বিধ্বস্ত নিরুপায় দেবগণকে পরিত্রাণ মানসে শিবশক্তি জাগরিত করিবার জন্য যেমন উমার সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমনি প্রয়োজন হইয়াছিল বিংশ শতাব্দীর কলুষ-কলঙ্কিত মানব-হৃদয়ের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করিবার মানসে রামকৃষ্ণজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্য সারদা মাতার সাধনা। একটি প্রদীপ জ্বলার পশ্চাতে যেমন কত-শত নিরলস দ্বিপ্রহরের অক্লান্ত সলিতা পাকানোর ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে, তেমনি রামকৃষ্ণ-শক্তি স্ফুরণ হইবার পশ্চাতে সারদা দেবীর জীবনব্যাপী সাধনার হোমবহ্নিশিখায় আপনাকে তিল-তিল করিয়া উৎসর্গ করিবার ইতিহাস নিহিত আছে। এই ধূলার ধরণীতে নরদেহ ধারণ করিয়া প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন অতি উচ্চস্তরের সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন জননী সারদামণি এবং তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার স্বামিপ্রেমের অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে। স্বামী ছিলেন তাঁহার অস্তিত্ব। তাঁহার সহিত তিনি ছিলেন অভেদাত্মা। স্বামীর প্রতি সর্ব্বস্ব উজাড় করা একনিষ্ঠ প্রেমই তাঁহাকে করিয়াছিল অতখানি উন্নত ও কল্যাণপ্রসবিনী। কারণ, শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ ভক্তি ও ভালবাসা হইতে মানুষ যখন কর্ম্মপরায়ণ হইয়া ওঠে, তখনই তাহার মধ্যে সত্যিকারের উৎকর্ষতা জন্মে ও তাহার চরিত্রের সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বামীকে তিনি ভালবাসিতেন। তাই তাঁহাকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে অতখানি প্রবল ছিল, সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার চব্বিশ বৎসরের যুবক রামকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সুদীর্ঘ কাল তিনি পিতৃগৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী বধূর বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বামিসন্দর্শন ঘটিল কামারপুকুরে শ্বশুরবাড়ীতে। অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব মিলন! এমন মিলন কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ভারতভূমিরই দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। অন্য কোন দেশ কোন কালে তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। স্বামী দিলেন স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা আর স্ত্রী করিলেন তাহা নত মস্তকে গ্রহণ প্রীতিপ্রসন্ন অন্তরে। ছিলেন বধূ, ছিলেন পত্নী, হইলেন মনোবৃত্ত্যনুসারিণী সহধর্ম্মিণী। স্বামীর চরণে হইলেন সর্ব্ববৃত্তিনিবেদিতা, তাই আজ বিশ্ববন্দিতা।

জীবনের প্রভাত-বেলায় পতি-পত্নীর মিলিত সত্তা বিশ্রাম লাভ করিল মা জগদম্বার চরণকমলে। নিঃশঙ্ক চিত্তে ভগবৎ-পাগল স্বামী ফিরিয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে। আর পত্নী নিয়োজিত হইলেন তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-জীবনে প্রশান্ত অন্তরে।

কাটিল কিছু দিন। পতি সম্ভাষণ মানসে সতী হইলেন অধীরা। পিতৃ-সমীপে গঙ্গাস্নানের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। কন্যার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতা কন্যাকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন পদব্রজে। পথশ্রমে অনভ্যস্তা সারদা পথিমধ্যে পীড়িতা হইয়া মা জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। হৃদয় যেখানে মলিনতাশূন্য স্ফটিকশুভ্র, ভগবৎদর্শন সেখানেই সম্ভব।

বহু দিন পরে আপনার ঘরে সারদা প্রতিষ্ঠিত হইলেন স্বামীর পার্শ্বে। স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন সাদরে ও সমাদরে আপনার কক্ষে। অসুস্থা পত্নীর সেবার ভার পরম স্নেহময় পতি গ্রহণ করিলেন আপনার হস্তে। আশ্রয় মিলিল নারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত স্থানে—স্বামীর শয্যায়। উভয়ের মিলিত জীবনে আরম্ভ হইল কঠোরতম সাধনার অধ্যায়। সাধনমার্গে পত্নী বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী। সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে হইলে পত্নী অবশ্য ত্যাজ্যা, —এই হইল পূর্ব্ববর্ত্তীদের নিদর্শন। 'নারী নরকের দ্বার'। অথবা 'ব্যভিচার অন্য নাম রমণী তোমার', ইত্যাদি আর্ষপ্রয়োগ বহুজন-সমর্থিত। গার্গী মৈত্রেয়ীর দেশ এই ভারতভূমি এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিল নিশ্চয়ই নারীর চলনার কোন মর্ম্মান্তিক ছন্দপতনে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে থাকুক। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করিলেন নারী নরকের দ্বার তো নহেই, বরং স্বর্গের দ্বারের চাবিকাঠি নারীরই আঁচলে বাঁধা—কেবল ব্যবহার করিতে জানার অপেক্ষা।

পুরুষ যেখানে আপন সংজ্ঞায় আপনি সার্থক—পূরণপ্রবণ—স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, নারী সে সংস্পর্শে হয় বৈশিষ্ট্যপালিনী, মূর্ত্তিমতী কল্যাণী। তাই নারায়ণের পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং শিবের পার্শ্বে দুর্গা ভারতের চিরন্তন ধ্যানের ধারণা। আবার বিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বে শ্রীশ্রীসারদা দেবী।

পরম পুরুষের পার্শ্বে পরমা প্রকৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন, 'ও যদি অত ভাল না হইত, আমাকে যদি আক্রমণ করিত, হয়ত আমি সাধনার পথে চলিতে পারিতাম না'। তিনি সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টানিতে আসিয়াছ?' মাতা বলিয়াছিলেন, 'না, না, তা' কেন? আমি তোমাকে তোমার সাধনার পথে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।' রাতের পর রাত, মাসের পর মাস ক্রমান্বয়ে তিনি স্বামীর কক্ষে, স্বামীর শয্যায়, স্বামীর পার্শ্বে রাত্রি যাপন করিলেন, নিরাসক্ত, নির্বিকার, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির, স্নিগ্ধ অথচ চির-ভাস্বর। তাঁহার সংযমের সৌন্দর্য্যে স্বভাবের মাধুর্য্যে চরিত্রের ঔদার্য্যে স্বামীর সাধনার পথ হইয়া উঠিল সরল—মসৃণ। তিনি জন্মিয়াছিলেন মানবী আকারে, উত্তীর্ণা হইলেন দেবীর পর্য্যায়ে। স্বামী তাঁহাকে পূজা করিলেন দেবীর আসনে ষোড়শোপচারে মাতৃরূপে। মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ নারীত্বের আধার হইতে মাতৃত্বের অমৃত বারি উৎসারিত করিলেন। যুগস্রষ্টা পরম পুরুষ সৃষ্টি করিলেন নারীত্বের নব অধ্যায়, নূতন ইতিহাস। সারদা মাতা স্বয়ংপ্রভা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিলেন এবং করিবেন আবহমান কাল পর্য্যন্ত।

যত দিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বর্ত্তমান ছিলেন, মাতা ছিলেন, ভারতের চিরন্তনী লজ্জাশীলা বধূটি। স্বামীর পরিচর্য্যা, শাশুড়ীর শুশ্রূষা তাঁহার ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। সঙ্কীর্ণ নহবৎ-ঘরটি ছিল এই সরলা পল্লীবধূর জগৎ।

তাহার পর আরম্ভ হইল জননীর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। যে জীবন নারীত্বের সহজ অভিব্যক্তিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা হইল মাতৃত্বের মহিমার দ্যুতিতে পরিসমাপ্ত। যে মাতৃত্বের বীজ শিশু বয়স হইতেই তাঁহাতে নিহিত ছিল, উত্তর-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই জ্ঞান-ভক্তির আলো-বাতাসে পরিবর্দ্ধিত করিয়া মহীরুহে পরিণত করিলেন। আর তাহারই শীতল ছায়ায় কত-শত তৃষিত, তাপিত, বঞ্চিত হিয়া বিশ্রামলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। মাতৃত্বের যে অনুভূতি ক্ষুদ্র বালিকাকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধার্ত জনতার গরম খিঁচুড়িতে হাওয়া দিবার জন্য পাখা হস্তে ছুটিয়া আসিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তাহাই আবার উত্তর-জীবনে পুত্রশোকাতুরা জননীর শোকে হাহাকার আর্ত্তনাদে জননীর শোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া সান্ত্বনার কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়াছিল। তাঁহার মাতৃত্বের অনুভূতি পুত্রশোকাতুরা জননীর শোকানুভূতিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মাতৃত্বের শীতল ছায়ে পুত্রশোকাতুরা পুত্রশোক ভুলিত, পতিহারা বিস্মৃত হইত স্বামি-বিরহের দুঃসহ জ্বালা। তাই সর্বহারার তিনি ছিলেন পরমপ্রাপ্তি; পরম আশ্রয়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তিনি ছিলেন সকলের মাতা, সকলের জননী। তাই তাঁহার ক্ষুদ্র নহবৎ ঘরখানি ভরিয়া থাকিত গোপালমাদের দলে। আপন হস্তে তিনি উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেন আমাদের। মাতৃত্বের সহজ অনুভূতিতে তাঁহার কাছে শরৎও যা, আজমও তাই। আজ তাই তিনি বিশ্বজননী। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃমন্ত্র-সাধনার সিদ্ধিরূপে তিনি আজ পতিতপাবনী, সুরধুনীরূপে মৃতপ্রায় ভারত-সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর মাতাই হইয়াছিলেন সঙ্ঘ-জননী। তাঁহারই নির্দ্দেশে, তাঁহারই অনুপ্রেরণায় সঙ্ঘের কাজ বহুলাংশে পরিচালিত হইত। স্বামীর অসমাপ্ত কার্য্যভার তিনি আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া সুদক্ষ পরিচালনায় সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। পিতৃহীন তরুণসঙ্ঘ জননীর স্নেহাঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজিকার সুবৃহৎ কলেবর ধারণ করিয়াছে। তাঁহারই স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিদেশিনী মার্গারেট মায়ের "খুকী" হইয়া, মায়ের কোল আশ্রয় করিয়া ভারত নারীর মর্ম্মবাণী উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর তিরোধানের পর সুদীর্ঘ কাল তিনি স্বামীর আরব্ধ কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

সীতা-সাবিত্রীর দেশ এই ভারতভূমির মাতৃজাতি আজ ভুলিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের চিরন্তন আদর্শ। ভুলিতে বসিয়াছেন যে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য বাহিরের চাকচিক্যে নয়—অন্তরের ঐশ্বর্য্যে, স্বভাবের মাধুর্য্যে। পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবী করা তাঁহাদের সাজে না। কারণ অধিকার দাবী করিয়া পাওয়া যায় না, তাহা অর্জ্জন করিতে হয় আপনার উপযুক্ততায়। আর অধিকার তাঁহাদের আছেই, কারণ তাঁহারাই জাতির ধাত্রী। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারত-নারীর এই বোধ-বিপর্য্যয়ের দিনে নারী-জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য জননী সারদামণির আবির্ভাব এই ভারতের মাটিতে। তিনি দেখাইলেন অধ্যাত্ম সম্পদে গরীয়ান এই ভারতভূমিতে নারীজাতিকে কেবল মাত্র স্কুল-কলেজী শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। তাহাকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে সে আদর্শ কন্যা, আদর্শ বধূ ও আদর্শ মাতা হইতে পারে। আর তাহাতেই তাহার বৈশিষ্ট্যের সার্থকতা। পুরুষত্বে গরীয়ান সর্ব্ববিষয়ে উন্নত পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া নারীকে তৎ-মনোবৃত্ত্যনুসারিণী সহধর্ম্মিণীরূপে আপনার নারীত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ইহাই এ যুগে শ্রীশ্রীসারদা মাতার শিক্ষা। ঘরে-ঘরে মাতার পূজারতি তখনি সার্থক হইবে যখন প্রতি ঘরে নারীদের জীবনে মাতাকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে।

পৌরাণিক গল্পের জন্মকথা

শ্রীযূথিকা ঘোষ

আদিম মানবের নিকট জগতের দৈনন্দিন ঘটনাবলী রহস্যাবৃত বলে মনে হ'ত। শিশুসুলভ সরলতার সহিত সকল বস্তুকে সে করত নিরীক্ষণ। রাত্রির অন্ধকারে শিশু হয় ভীত, মেঘগর্জ্জনে শিশুর সর্বাঙ্গে দেখা দেয় শিহরণ, বর্ষার ঝমঝম বৃষ্টি দেখে সে হয় পুলকিত, আনন্দে সে তখন কোন ছড়া মনে করে গাইতে আরম্ভ করে। সকাল বেলা পূর্বগগনে সূর্য্যদেবকে উঠতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সূর্য্যিমামার ছড়া উচ্চারণ করতে থাকে সে। পথ চলতে চলতে কোথাও যদি ঝোপ-জঙ্গল দেখে তবে সেখানে কোন ভূত-প্রেত আছে মনে করে সে হয় আতঙ্কিত, দ্রুতবেগে আশ্রয় নেয় জননীর ক্রোড়ে, আবার রাত্রিকালে চন্দ্রের স্নিগ্ধ

জ্যোৎস্নায় শিশুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসি—এই যে ভাবে শিশু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকে জানায় তার মনের অভিনন্দন, ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে প্রথম যুগের মানুষ চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবীকে করেছে বন্দনা। আদিম মানুষ বনে বনে বিচরণ করেছে আহার সংগ্রহের জন্য, আবার প্রকৃতির ক্রোড়ে পর্ণকুটীর নির্মাণের জন্য হিংস্র পশুগণের সঙ্গে সে করেছে নিরন্তর সংগ্রাম, পিপাসার্ত্ত হয়ে নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছে পানীয় জলের আশায়। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও জীবিকা অর্জনের যে সহজাত প্রবৃত্তি তা মিটাবার জন্য আপন শক্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি মানব, কিন্তু জীবন ধারণের দৈনন্দিন কাজ সামাধা করার পর যেটুকু অবসর পেয়েছে সে, সে অবসরটুকুতে জাগত তার অসংস্কৃত মনের তলদেশে কল্পনার রঙীন নেশা, কল্পনা-পক্ষীর পাখায় ভর দিয়ে তার পরিচিত জগতের আশ-পাশে যতটুকু সম্ভব সে বিচরণ করত। কল্পনাদেবীর উপাসনায় কখনও তার মন পূর্ণ হ'ত অনির্বচনীয় আনন্দে, কখনও বা সে মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হ'ত। আদিম যুগের মানব বিরাট পৃথিবীর বুকে কোথায় কি ঘটছে তার খবর কিছুই সে জানত না, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য আহরণের স্পৃহা জাগেনি সে মনে, কেন না বিশাল পৃথিবীর কতটুকুই বা সে জানত, যেটুকু ভূমিখণ্ডের সহিত তার আবাল্য সংযোগ সেটুকুরই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হ'ত সে।

বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক উপকথার বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সকল দেশের প্রাচীন মানুষ প্রায় একই রকম কল্পনার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। পুরাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা এই পৌরাণিক গল্প অলীক অমূলক হলেও তদানীন্তন মানব জাতির সমাজগত, ধর্মগত তথ্য আবিষ্কারের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট মূল্য আছে বলে মনে করেন। এক দেশের পৌরাণিক গল্পের সহিত অপর দেশের অনুরূপ আখ্যানভাগের সাদৃশ্য থেকে তাঁরা সহজেই অনুমান করেন যে এইরূপ দুই জাতি পূর্বে একই স্থানে বসবাস করত অথবা কোন স্থান থেকে এক জাতির কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের আবাসভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। আর্য্যগণের মধ্য-এশিয়ায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক পারস্য, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সে জন্য ঋগ্বেদে উল্লিখিত কয়েক জন দেবতার কথা আমরা ইরাণীয় আবেস্তার মধ্যে পাই। হিন্দু ও গ্রীক পুরাতত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই দুই জাতির কয়েক জন দেব-দেবীর নাম ও কার্য্যের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। ইন্দ্রের সহিত Jupiter, চন্দ্রের সহিত Sunus, বিশ্বকর্মার সহিত Vulcan, দুর্গার সহিত Juno, উষার সহিত Aurora, শ্রীর সহিত Venus, কামের সহিত Eros, সূর্য্যের সহিত Solএর তুলনা করা যেতে পারে। ইজিপ্টবাসীদের আখ্যানভাগের সহিত হিন্দু পুরাণ-তত্ত্বের কিছু মিল আছে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সেখানে Osiris দেবতার কথা বলা হয়েছে। পদ্মযোনি ব্রহ্মার ন্যায় Horus নামক দেবতার অনুরূপ উৎপত্তির কথা ইজিপ্টের পৌরাণিক গল্পে বলা হয়েছে। দেশ-বিদেশের পৌরাণিক গল্পের এই সকল রূপটির বিশ্লেষণ পুরাতত্ত্ব আলোচনারত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করবে।

ভারতবর্ষের বিরাট পৌরাণিক সাহিত্য অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনায় সুসমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বহু অবাস্তব, অনৈসর্গিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পুরাণ-অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি যে শুধু 'পৌরাণিক গল্প' এই আখ্যা লাভ করবে তা নয়, পুরাণ-বহির্ভূত অনেক অতিপ্রাকৃত কাহিনী যা বেদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় সে সকলও এই নামেই বিশেষিত হবার যোগ্য। ভারতবর্ষের অতিপ্রাকৃত গল্পসমূহের আলোচনা করতে গেলে ঋগ্বেদের স্তোত্র সমূহের দিকে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হয়। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করে নিজেদের বাসভূমি সংগ্রহের জন্য প্রথমে তৎপর হন। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে আধিপত্য বিস্তারের পর তাদের মধ্যে জ্ঞান-পূজারী তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে বিস্ময়-বিমথিত চিত্তে তারা কল্পনা করেছেন অগণিত দেবতার এবং শত শত মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা কল্পিত দেবতার চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কালক্রমে বহু সূক্তে দেবতাদের এই প্রাকৃতিক রূপ-প্রকাশটি গৌণ হয়ে পড়েছে এবং তাদের শৌর্য্য-বীর্য্যকে আশ্রয় করে বহু পৌরাণিক গল্পের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, রুদ্র, পর্জ্জন্যদেবের স্তোত্র সমূহে তাদের শত্রু-বিজয়-গরিমা ও শক্তিমত্তা কীর্ত্তিত হয়েছে। এই কীর্ত্তনের প্রাধান্যে তাদের প্রত্যেকের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রকাশিত হয়নি। ঋগ্বেদের প্রায় ২৫০ স্তোত্র দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতির উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। ইন্দ্র-স্তোত্রে ইন্দ্রের সহিত বৃত্র নামক দৈত্যের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। ঝঞ্ঝার দেবতা ইন্দ্র বজ্রহস্তে বিপুল বিক্রমে নদীর গতিরোধে উদ্যত দৈত্যদের হনন করে পৃথিবীতে প্রচুর জলবর্ষণ করেন। শম্বর, রৌহিণ, অর্বুদ, বল প্রভৃতি দানবের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতেন দেবরাজ ইন্দ্র। সোমরস পান করে তিনি অর্জ্জন করতেন নব শক্তি, নূতন বীর্য্য; বিরাটকায় এই দেবতা তাঁর ভক্ত আর্য্যগণকে অনিষ্টকারী অনার্য্যদের সহিত সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। বিষ্ণু-সূক্তে বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের কথা বিশেষ ভাবে জানা যায়। পরবর্ত্তী যুগে বামন অবতারের গল্প এই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে লিখিত হয়েছে। শব্দতত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিপুণ ঊর্ণবাভ ঋষি সূর্য্যের উদয়, মধ্যগগনে স্থিতি ও অস্তগমনের ব্যাপার এই তিনটি পদবিক্ষেপের দ্বারা সূচিত হয় এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সূর্য্য ও বিষ্ণুর ঐক্য প্রতিপাদন করে তিনি এই ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। লাবণ্যময়ী রমণীরা রাত্রির অন্ধকার অপসারণরতা উষাদেবীর স্তোত্রগুলিতে রচয়িতাদের কল্পনার সুষ্ঠু বিকাশ দেখা যায়। বৈদিক স্তোত্র ব্যতীত মহাকবি ব্যাস ও বাল্মীকির রচিত মহাকাব্য দুইটির মধ্যেও আমরা বহু অলৌকিক কাহিনীর সন্ধান পাই। রামায়ণ মহাভারতে রামের কাহিনী ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ভিন্ন বহু অপ্রাসঙ্গিক গল্প সংযোজিত হয়েছে, সে সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে অতিরঞ্জিত শৌর্য্য-বীর্য্যের বর্ণনা ও অবাস্তব দিকগুলি পাঠকের চক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাভারতের মধ্যে আমরা নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ দেখি। দেবতাদের সম্বন্ধে অতিপ্রাকৃত ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আশ্রয়ে ভারতবর্ষের পুরাণ-অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি লিখিত হয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে
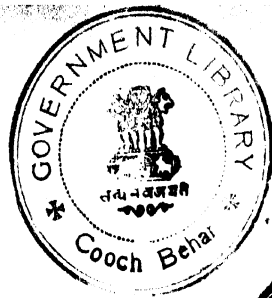
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে ঘোষিত হয়েছে। অনুগত ভক্তকে দেবতা আপন অপরিমিত শক্তিমত্তার দ্বারা সকল সময় সুরক্ষিত করেন এবং তার শত্রুকে অচিরে বিনাশ করতে দ্বিধা করেন না—এই সাধারণ বিশ্বাস প্রকটিত হয়েছে দেবতা সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পের মধ্যে। পুরাণ-বর্ণিত দেবতা অপেক্ষা বৈদিক দেবতা অত্যধিক মানবীয় গুণসম্পন্ন। অনার্য্যদের সহিত সর্বদা যুদ্ধরত থাকায় পরবর্ত্তী যুগের গল্প-রচয়িতাদের মত আর্য্যগণ তত দূর কল্পনাবিলাসে মগ্ন হতে পারেননি। দেবতা অলৌকিক শক্তির অধিকারী, সেই অপরিমিত শক্তির প্রভাবে দেবতা সকল বিপদ থেকে ভক্তকে মুক্ত করবেন এই বিশ্বাসে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনীর সংযোগে পুরাণ-লেখকেরা দেবতার স্তুতি করেছেন। পুরাণ পাঠ শুনে সাধারণ শ্রোতাগণ ইষ্টদেবতার অসীম বিক্রম প্রকাশের কথা জেনে নিরতিশয় আনন্দ বোধ করতেন। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য্য জাতির চিন্তাধারার প্রভাব বহু পরিমাণে এই সমস্ত গল্পের উপর পড়েছে।

উপনিষদ সমূহে সর্বব্যাপী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু উপনিষদের উচ্চ ভাবধারা, নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা সাধারণের সহজবোধ্য হতে পারে না বলে বহুবিধ মূর্ত্তিপূজা কালক্রমে প্রসার লাভ করে। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—সাধকের হিতের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপ কল্পনা করা হয়ে থাকে। এক-একটি দেবতার কল্পিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হয়। অগণিত দেবতার উপাসনার কথা শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্য দিয়ে আমরা বহু পৌরাণিক গল্পের সহিত পরিচিত হই। দেবতা ভিন্ন কিন্নর, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও অপ্সরাদের সম্বন্ধে বহু গল্প পাওয়া যায়। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহের স্তব পাঠে অনেক অশান্তি দূর হতে পারে এ সাধারণ বিশ্বাসে এদের সম্বন্ধেও অনেক অতিলৌকিক গল্প রচিত হয়েছে।

দার্শনিক চিন্তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না, তাই মৃত্যু সম্বন্ধে লোক-প্রচলিত গল্পের অভাব নেই। মৃত্যুর দেবতা হচ্ছেন যমরাজ, মানুষ জগতে যা পাপ-পুণ্য করেছে জীবিত অবস্থায়, সেই অনুযায়ী তাকে ফলভোগ করতে হবে, সে জন্য মৃত্যুর পর যমদূতরা আসে মৃত ব্যক্তিকে যমালয়ে নিয়ে যেতে। নরক হচ্ছে ভূত-প্রেতের তমসাবৃত বাসভূমি, পাপের শাস্তি সেখানে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে হয়। পুণ্যকর্মী স্বর্গলাভ করে অশেষ সুখ-শান্তি ভোগ করেন আর পাপী অন্ধকার নরকে বিচারানুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকে। মৃত ব্যক্তি যমালয়ে গেলে তার বিচার আরম্ভ হয়, চিত্রগুপ্ত প্রত্যেক মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব দাখিল করেন এবং যমরাজ সে সব শুনে দণ্ডদান করেন।

পৌরাণিক গল্পের মধ্যে জীবজন্তুও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণের করাল কবল হতে সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করে বানরগণ। পরবর্ত্তী কালে এ জন্য হনুমান-পূজার প্রচলন বহু স্থানে দেখা যায়। বানর-বধ উত্তর-ভারতে বহু স্থলে পাপকর্ম বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। গাভী তার দুগ্ধ দিয়ে মানুষের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তাই ভারতের সর্বত্র গো-পূজা প্রসার লাভ করেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের প্রাধান্য, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা এই যজ্ঞীয় অশ্বকে শুদ্ধ করা হত। দ্রাবিড়দের মধ্যে সর্প-পূজার প্রচলন ছিল আবার পৌরাণিক গল্পগুলিতে তক্ষক, বাসুকি, আস্তিক, অনন্ত প্রভৃতি নাগের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। দেবদেবীর বাহন হিসাবে অনেক জন্তু প্রাধান্য লাভ করেছে। দুর্গার বাহন সিংহ, সরস্বতীর বাহন হংস, শিবের বাহন বৃষভ, গণেশের বাহন ইন্দুর, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর—এই ভাবে এক একটি দেবতার সান্নিধ্যে কতকগুলি জন্তুও বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই সব দেবতা সম্বন্ধীয় গল্প-কথায় জন্তুগুলিও নিজেদের কার্য্যকলাপের দ্বারা গল্পের আয়তনকে করেছে বর্ধিত।

বৃক্ষ-পূজাও ভারতের বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করে অনেকে পুণ্যার্জ্জন করে থাকেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদমূলে শালগ্রামশিলার যথাবিধি অর্চ্চনা করতে অনেককে দেখা যায়। বৈদিক যুগে সোমলতার পূজা ও সোমরস পান সোমযাগের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হত। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষ-পত্র ভিন্ন দেবতার পূজা সুসম্পন্ন হয় না, তাই এই সমস্ত বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ-বধূ আজও প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলসী-তলায় সংসারের কল্যাণ কামনা করে প্রণাম করে থাকেন। এই সমস্ত বৃক্ষপূজাও বহু অলৌকিক কাহিনী রচনায় উৎসাহিত করেছে গল্প-লেখককে।

ট্রেন

ভেরা পানোভা

গ্লাসকভের বিছানার পাশটাতে বসে দানিলভ সেদিনের খবর শোনাচ্ছে। সবাই মিলে উৎসুক জানতে যুদ্ধের গতি। ওদের আলোচনা চলে ফ্যাসীবাদী শত্রু হিটলারকে নিয়ে—মস্কো, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদির যুদ্ধ নিয়ে। দানিলভ চায় গ্লাসকভও যোগ দিক এই সব আলোচনায়, ওর দিকে চায় আগ্রহের সঙ্গে। গ্লাসকভের চাপা ঠোঁট দুটি খোলে একবারের জন্য—ক্লান্ত স্বরে বলে, "হ্যাঁ ওরা লড়ছে বটে বীরের মত—"

ক্যাপ্টেন বলে—"হুঁঃ, জার্ম্মাণদের দিন হোয়ে এসেছে।"

ওপাশ থেকে এক জন ফ্যাকাশে অথচ সুন্দর চেহারার জর্জ্জিয়ান সৈন্য বলে উঠলো,—"আমি তো ভাবছি কবে ওদের তাড়াবো। ম্যাপের দিকে চেয়ে আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার চেষ্টা করি—ঠিক কোন জায়গাটা থেকে তাড়ানো শুরু করবো।"

—"উঁহুঁঃ, ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্যে ম্যাপ কোনো কাজে লাগবে না"—ক্যাপ্টেন বলে—"পেনজাতে আমি একটা গণৎকারের কথা শুনেছি—দারুণ ঠিক্ বলে—"

কামরা-শুদ্ধ লোক হো-হো করে হেসে ওঠে। দানিলভ উঠে পড়ে যাবার আগে গ্লাসকভের কাঁধে হাত রেখে বলে,—"এমন মনমরা হোয়ে থাকলে কি চলে? আমোদ কর একটু, তাছাড়া তোমাকে খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, বাঁচতে হবে—শুনছো?"

অদ্ভুত দৃষ্টিতে দানিলভের দিকে চেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে ওঠে গ্লাসকভ—"দুটো পা নিয়েই আমোদ করা চলে, বাঁচার মত বাঁচা চলে।"

—"হ্যাঁ, একটার চেয়ে দুটো ভালো এ-কথা মানছি, এ নিয়ে কেউ তর্ক করছে না—কিন্তু কমরেড, একবারটি ভাবো তো যেখান থেকে তুমি এসেছো সেখানে কত লোক প্রাণটাই হারিয়েছে। তাছাড়া আজকাল তো কৃত্রিম পা এত চমৎকার বেরিয়েছে যে তুমি একটুও অসুবিধা বোধ করবে না। তোমার তো ভাগ্য বলে মানা উচিত।"

—"একটা খোঁড়ার আবার দাম কি?" গ্লাসকভের সখেদ উক্তি শোনা যায়—"যত শীগ গির মরা যায় ততই ভালো।"

—"না, কখনই ভালো নয়"—শোনা যায় ক্রামিনের শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

চশমাটা খুলে লেন্সের কাচ দুটোতে হাই দিতে দিতে বলে। চুপ করে যায় সবাই—ক্রামিনের কথা শুনতে সবারই সমান আগ্রহ।

—"কমরেড কমিশারের কথাগুলি খুব সত্যি"—কাচ দুটো মুছতে মুছতে ক্রামিন বলে—"তোমার বরাত জোর আছে, মরতেই তো গিয়েছিলে···কিন্তু এখনও বেঁচে আছো, মানে এ তো একেবারে পুনর্জীবন পাওয়া যাকে বলে। ভাবতে পারো এর মত আর কোনো অমূল্য দান?"

আর কিছু বলে না ক্রামিন। তবু সবাই অপেক্ষা করে আরও কিছু শোনার আশায়। শেষে ক্যাপ্টেন বলে,—"আচ্ছা কমরেড, তোমার কথাগুলো একটু বিচার করে দেখতে দাও—বলো তো তোমার নিজেকেও কি খুব ভাগ্যবান বলে মনে হয়?"

—"নিঃসন্দেহে"—ক্রামিন উত্তর দেয়।

দানিলভ চলে গেছে। আর সবাই চুপ। মনে হয়, কথা বলে বলে সবাই ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে। হঠাৎ গ্লাসকভ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে,—"কোলকাকে তো জিজ্ঞাসা করছিলে যুদ্ধে ও নিজে এগিয়ে এসে যোগ দিলে কেন? কিন্তু আমি কি জানতে পারি তুমি কি জন্যে যোগ দিয়েছিলে?"

ক্রামিন উপরের বার্থ থেকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ওর দিকে চাইলে, —"কিছু মনে কোর না, বয়সটা তো তোমার নেহাৎ কম নয়, অন্ততঃ যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত তো নয়ই। গবেষণার কাজেই মানাতো ভালো। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কি করতে···স্রেফ লোক দেখাতে?"

—"হুম্? দেখো আমি হচ্ছি একজন মস্ত ধনী লোক"—স্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয় ক্রামিন—"আমি আমার সেই ধনসম্পত্তি বাঁচাবার জন্যই যুদ্ধে গিয়েছিলাম।"

গ্লাসকভের বিছানার ধার দিয়ে যেতে গিয়ে লেনা দেখে গ্লাসকভ কাঁদছে। সমস্ত শরীরটা ওর ফুলে-ফুলে উঠছে নিরুদ্ধ আবেগে। বাধা মানছে না—অসহায় ক্ষোভে অদম্য কান্নায় যেন ভেঙে পড়ছে।

—"এই, কি হোচ্ছে, সাশা, ওকি, ওকি?"—লেনা কোমল স্বরে ডাকে কাছে গিয়ে।

বালিসের ভিতর ও মাথাটা আরও গুঁজে দেয়। শুধু লজ্জা নয় তার সাথে মিশে থাকে আনন্দ—তবু তো কেউ কাছে এলো, সান্ত্বনা দিলে। লেনা ওর ছোটো-ছোটো করে ছাঁটা মাথাটাতে দুই হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগলো। "সাশা চুপ কর, কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি বলছি···"

চোখের জলে ভেজা মুখটা এবার লেনার দিকে ফিরিয়ে কান্না-ভজা গলায় বলে,—"ওদের ধারণা আমি ভীতু, কাপুরুষ···"

—"সাশেঙ্কা, তাই ভাবছো বুঝি? কেউ কেউ ভাবে না ও-কথা—এ সব তোমার নিজের কল্পনা, কেন অমন করছো বলো তো?···কিচ্ছু ভেব না···কেমন?···চুপ কর, লক্ষীটি চুপ কর। একটু জল খাও···ওসব কিছু ভেব না, সব বাজে কথা···"

গ্লাসকভ জলটা খেয়ে ফেলে,—"চুলোয় যাক্। উঃ, নার্ভের কি দশাই হোয়েছে!"

—"নার্ভ, আর নার্ভ···দেখো আবার তোমার শক্তি ফিরে আসবে—একটু বিশ্রাম পেলেই এ সব কেটে যাবে, ঠিক আগের সব ক্ষমতা ফিরে পাবে···"

কিন্তু অবাধ্য অশ্রু বাধা মানে না। মাথা অবধি কম্বলটা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে। কমিশার বলে প্রাণে বেঁচে গেছো এই ভাগ্য, একটা পা নেই তাতে কি ক্ষতি? ক্রামিন বলে পুনর্জীবন পেয়েছো ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। কিন্তু ওরা কেউ কি বুঝবে যে আর ও ফিরে যেতে পারবে না সেই নাবিক-জীবনে? দরিয়ার হাতছানিতে আর সাড়া দিতে পারবে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সীমাহীন জলরাশি—তার মেঘের মত কালো ঢেউয়ের মাথায় দুধের মত সাদা ফেনা। বিপুল প্রশান্তি···অসীম ব্যাপ্তিতে ভরে ওঠে মন···বুকের ভিতর কাঁপতে থাকে······

বাস্তবের ছোঁয়ায় চমকে ওঠে মন। কানে বাজে পরিচিত কণ্ঠস্বর, প্রাত্যহিক কাজের ধারা চলে···সেই ডাক্তার, নার্স, আহতদের গোঙানি···

দূর দিগন্তে নীলিমায় মিলে যায় সাগরের ঢেউ—দুলতে থাকে বাতাসে ঝিলমিলিয়ে ওঠে সোনালী রোদের আলোয়। মানুষে মানুষে হানাহানি আর এই চোখের জল ওদের কি পারে স্পর্শ করতে!

নিফোনভ। সার্জেণ্ট নিফোনভ।

বেশী কথা বলতো না, শুধু 'হ্যাঁ', 'না', কিম্বা একটু জল দাও এই রকম দু'-একটা ছাড়া। কিন্তু নতুন কোন আহত সৈনিক দেখলেই জিজ্ঞাসা কোরতো—"তুমি বোধ হয় চেন না বেরেজাকে—সিমন বেরেজা, মেশিন গান চালাতো? কিন্তু কেউই চেনে না—ডাক্তার, নার্স, কি সৈনিকরা কেউই কোনো দিন দেখেনি সিমন বেরেজাকে যে মেশিন গান চালায়। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করতো বেরেজাকে কেন খোঁজে, কি দরকার ওর···ব্যস্, আর কোনো উত্তর নেই। নিফোনভ চোখ বুঁজে ঘুমের ভান সুরু কোরে দিতো। কিন্তু বেরেজা বেঁচে আছে কি না জানলে কি ভালোই না হোতো! চমৎকার লোক। ঈশ, একবার যদি জানা যায় কোথায় সে এখন······

কিন্তু অনর্গল শুধু বক্‌বক্ করে জিভ ব্যথা করার জন্যে কথা বলার কোন মানে হয়? বিশেষ করে একটা নিতান্ত গুরুতর সমস্যা যতক্ষণ না সমাধান করা যাচ্ছে, ততক্ষণ আর অন্য কথা বলবার কী-ই বা আছে? আর সেই সমাধানের জন্যেই তো চাই বেরেজাকে।

বেরেজা···মাত্র দশ মিনিটের পরিচিত বেরেজা। কিন্তু নিফোনভের মনে হয়, সারা জীবনেও ওই দশ মিনিটের বন্ধুটির মত ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ওর মেলেনি।

যুদ্ধক্ষেত্র। গরম ধুলোর ঝড়ে গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। নিফোনভের পাশেই ছিলো অন্য রেজিমেণ্টের অচেনা একটি সৈন্য। মেশিন গান চালাচ্ছিল। শুধু পিছন থেকে ওর টুপী, কাঁধ আর টকটকে লাল কান দুটো দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ লোকটি মুহূর্তের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে নিফোনভের দিকে। কি উজ্জ্বল, নীল তীক্ষ্ণ চোখ দুটো······

—"অচেনা বন্ধু, একটু তামাক দিতে পারো?"

মুখটা কয়লার গুঁড়োতে ভরা। নিফোনভের কাছ থেকে এক চিমটি তামাক নিয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে দুই ঠোঁটে কঠিন ভাবে চেপে ধরলে। মুখটা যেন আরও দৃঢ়তাময়···অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ও যাবে না। নিফোনভ একটা সিগারেট মুখে নিয়ে চাইলে আগুন—অন্য জন তার জ্বলন্ত সিগারেট বাড়িয়ে দিলে··· নাম বিনিময়ও হোলো।

অদূরে একটা বোমা ফাটলো।

—"চুলোয় যাক্"—মৃদু স্বরে বললে বেরেজা।

ওর মুখটা এখন যেন মনে হচ্ছে পাথরের নয়, ইস্পাতের ছাঁচ, শক্ত···কঠিন। নিফোনভের মনে হোলো ঠিক এমনি সঙ্গীই যেন ও চায় ওর পাশে। এমনি বলিষ্ঠ কঠিন—নির্ভরযোগ্য। তার পর?···তার পর থেকে যেন কোন ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন, চিন্তা তার নাগাল পায় না···স্মৃতির কোঠায় হাতড়াতে থাকলে মনে পড়ে হাসপাতাল। শুয়ে আছে আচ্ছন্ন হোয়ে, কানে ভাসছে দু'জন ডাক্তারের তর্ক—দুটো হাত, দুটো পা-ই কেটে বাদ দিতে হবে না, শুধু বাঁ পাটা বাদ দিলেই চলবে। তর্ক চললো অনেকক্ষণ ধরে··· কিন্তু নিফোনভ যেন সম্পূর্ণ উদাসীন সে বিষয়ে। ওর মনে হোতে লাগলো সত্যি নিফোনভ যেন মরে গেছে, যে আছে সে যেন আর কেউ, তাকে ও চেনে না—তার দেহ নিয়ে ডাক্তাররা কাটা-ছেঁড়া যা খুসী করুক ওর কিছুই এসে যাবে না।

ডাক্তারদের গলার স্বরও ওর কানে ক্ষীণ হোয়ে এলো। বাতাস যেন বন্ধ হোয়ে আসছে···কিসের মৃদু গন্ধ···নিঃশ্বাস নিতে পারছে না···ঘুম ঘুম ঘুম···অতল ঘুম, গভীর ঘুম আর কিছুই নেই···

যখন চোখ মেললে, মনে হোলো কি একটা যন্ত্রণায় বুঝি, কিন্তু কোথায় ঠিক বুঝতে পারছিলো না। খুব সম্ভব বাঁ পাটা—হাড়টা তো গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো। অস্ফুট স্বরে ছোটো ছেলের মত গোঙাতে লাগলো নিফোনভ—দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

খাটের পাশে চশমা-পরা একটি বৃদ্ধা বসেছিলো, ওকে জাগতে দেখে বলে উঠলো,—"যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ, জ্ঞান ফিরেছে, কাঁদছে দেখি। কাঁদো বাছা কাঁদো, এতে ভালোই হবে।"

বৃদ্ধাটি চলে গেলো। আর একটি মেয়ে এলো, ওর ঠোঁট দুটো মুছিয়ে দিয়ে ছোটো বাচ্ছাদের মত মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। ডাক্তাররাও এলেন—আর তর্ক করছিলেন না তাঁরা, ফিস-ফিস করে কি সব যেন কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধাটি আবার ফিরে এলো, হাতে ইনজেকশনের ছুঁচ। নিফোনভকে একটা গ্লুকোস ইনজেকশন দিয়ে বললে,—"কোথায় কষ্ট হচ্ছে বাছা?"

—"আমার পায়।"

—"কোন পায়?"

—"বাঁ পায়ে।"

—"আহা-হা-হা।"

বাঁ পাটা যে একদম বাদ দেওয়া হোয়েছে এ কথা নিফোনভ তার পরদিন জেনেছিলো। হাসপাতালে সবাই খুসী যে ওর হাত দুটো আর ডান পাটা বাদ দিতে হয়নি। বৃদ্ধাটি বললে,—"ডাক্তার শেরেমিনৎ! লোকটা ভেল্কী জানে, কিছুতে ভয় নেই। শুধু কি তোমার প্রাণটার ঝুঁকিই নিলে? তার সঙ্গে নিজের মানটারও তো বটে। কিছুতেই হাত-পাগুলো নষ্ট করতে দেবে না। তা' যেমন জিদ করে দায় নিলে, শেষ পর্য্যন্ত জিতলোও বটে। অমন সাহসীদের ভগবান সহায় হ'ন। তুমি সেরে উঠবে বাছা, যখন যাবে তখন তো একেবারে সুন্দর সেরে যাবে—দেখো, ঠিক বিয়ের যুগ্যি হোয়ে···"

বৃদ্ধা চোখ নাচিয়ে মুচকি হাসে।

—"তোমার এই অপারেশনটা সমস্ত 'মেডিক্যাল' পত্রিকাগুলোতে বার করা হবে—"

কি এসে-গেলো তাতে নিফোনভের? ডাক্তার শেরেমনিস্কির সাফল্যে তার কি আসে-যায়? এই রুগ্ন, আহত বিকলাঙ্গ লোকটাই কি নিফোনভ? সে তো ছিলো বিখ্যাত দক্ষ কর্ম্মী একজন, তার দক্ষতার খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিলো—তাকে কি খোঁড়াতে খোঁড়াতে নার্সের উপর ভর দিয়ে চলতে হবে? এই যে অসহায় লোকটা বিছানায় পড়ে গোঙাচ্ছে—সব কাজের বার যে,—সে মরলেই বা কি, বাঁচলেই বা কি?

ঐ বৃদ্ধাটিই নিফোনভকে বলেছিলো যে ওকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে একজন কমরেড নিয়ে আসে। সেই সৈনিকটিও আহত হোয়েছিলো, তা সত্ত্বেও কিন্তু নিয়ে আসতে পেরেছিলো। নিফোনভ ভাবে এ আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই 'সিমন বেরেজা'। প্রশ্ন করেছিলো—"সৈনিকটি বেঁচে আছে?"

—"কি জানি বাছা, সে কথা তো আমি জানি না, কি করে বলবো বলো?"

এক দিন খবর এলো ওকে অন্য হাসপাতালে বদলী করা হবে। ষ্ট্রেচারে করে ওকে যখন বাইরে আনা হোলো, তখন বাইরের খোলা হাওয়ায় যেন ও নতুন করে স্বচ্ছন্দ ফিরে পেলো। এলোমেলো বাতাসে আর একটু হোলেই টুপীটা উড়ে যেতো—হাত বাড়িয়ে চট করে ও ধরে ফেললে।

—"সাবধান, সাবধান কমরেড, তোমার ব্যাণ্ডেজ?"—নার্স চেঁচিয়ে উঠলো।

নিফোনভ যেন বজ্রাহত। এ কী সম্ভব? ওর হাতটা নাড়াতে পারলো? আবার ফিরে এলো ওর হারানো ক্ষমতা? সত্যি? তাহলে ডাক্তাররা যে বলেছিলো ও আবার সব ক্ষমতা ফিরে পাবে, সে ওকে ভোলাতে নয়?

আঃ, কি মিষ্টি বাতাস! সত্যিই যেন পরম ক্লান্তিতে ভরে এলো দেহ। মন চাইছে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম···নিটোল ঘুম···

ট্রেনেতে এসে ঘুম ভাঙলো নিফোনভের। জেগে উঠলো পূর্ণভাবে—দেহে-মনে। এ যেন সেই আগের পুরানো নিফোনভ। ওর ব্যাণ্ডেজের আর প্লাষ্টারের তলায় যেন ফিরে এলো ওর হারানো শক্তি ক্ষমতা, প্রাণোচ্ছলতা।

চলার গতিতে দুলছিলো উপরের বার্থগুলো। বাচ্ছাদের

ঘুমপাড়ানী দোলনীর মত। কিন্তু নিফোনভের চক্ষে আর আসছে না ঘুমের আবেশ। পূর্ণ জাগ্রত পূর্ণ চেতনায়। কিন্তু কেন? কেন ফিরে এলো এই শক্তি, ও যে আজ অক্ষম। চলার শক্তিই তো নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফ্যাক্টরীর কর্ম্মচঞ্চল মুহূর্ত্তগুলো—ঝকঝক করছে কলকব্জা, আর যন্ত্রপাতি তার মধ্যে দ্রুত লঘুপায়ে ক্ষিপ্র ব্যস্ততায় দেখা যায় কাজের আনন্দে দীপ্ত, বলিষ্ঠ নিফোনভকে। খবরের কাজজের রিপোর্টাররা অবধি কত কৌতুক ভরা, সরস রচনা করতো নিফোনভের নামে। দিনে ক 'শ' মাইল ও হাঁটে ঐ কারখানাটুকুর ভিতরে।

প্রচুর পারিশ্রমিক আর বিপুল খ্যাতি—কি অভাব ছিলো ওর? ঐ কারখানায় কাজ করেছেন ওর বাবা, ঠাকুর্দা,—তাঁদের মৃত্যু হোয়েছে, আর ওর জন্ম হোয়েছে—ওই একই কারখানার গণ্ডীতে।

বিবাহ···? আছে বৈ কি, বন্ধুরা ঠাট্টা করেই বলে সেদিকেও বিধাতার কৃপাদৃষ্টি। ওই কারখানারই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হোলো ওর স্ত্রী। ওদের দু'জনার ভালোবাসার সঙ্গে মিশিয়ে ছিলো শ্রদ্ধাও। আরও ছিলো দুটি মেয়ে। তাদের দিন কাটতো, স্কুলে কিম্বা পায়োনীয়ারদের গ্রীষ্মাবাসে।

উঃ, সবাই কি ভীষণ আঘাত পাবে যখন শুনবে ওর একটা পা নেই। কারখানার বুড়ীর দল আসবে চোখ মুছতে মুছতে, ভাঙ্গা গলায় ওর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে···কিন্তু সে সব কিছু না—কিছু না। সব চেয়ে খারাপ, সব চেয়ে গ্লানিকর হোলো সুদক্ষ যন্ত্রী নিফোনভ আজ দাঁড়াবে কোথায়···কোন কাজে? তার চির পুরাতন কারখানার কোথায় রইবে তার প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? পারবে না দিতে মেয়েরা, পারবে না স্ত্রী, পারবে না কেউ-ই, তাকেই সমাধান করতে হবে এই সমস্যার।

পাশ দিয়ে গেল দানিলভ।

—"কমরেড কমিশার!"

কাছে এলো দানিলভ। কিছু বলবে বুঝি নিফোনভ।

—"কমরেড কমিশার, তোমার মনে থাকবার কথা নয় যদিও, তবুও তুমি কি দেখেছিলে—সিমন বেরেজা···মেশিন গান চালাতো—একজন আহত সৈনিক—দেখেছিলে কমরেড?"

—"নাঃ, মনে করতে পারছি না তো! তোমার কোনো আত্মীয় বুঝি?"

—"নাঃ, এমনিই একবার দেখেছিলাম লোকটিকে, তাই জানতে চাইছিলাম।" ওর মনে হোলো আজকের দিনে একমাত্র বেরেজাই পারতো ওর পথের সন্ধান দিতে। আসল সমস্যাটা ছিলো ওর একর্ডিয়ান। সেই পুরানো হাসি-গানভরা দিনগুলিতে নিফোনভের একটি পরম দুর্ব্বলতা ছিলো ওর এই বাজনাটি—অবশ্য এই দুর্ব্বলতার সঙ্কোচও বেচারার কম ছিল না। বিয়ের আগে আমোদ-উৎসবে, কোথাও জন্মদিনের কি বিয়ের উৎসবে ও নিয়মিত বাজাতো। কিন্তু এই সর্ব্বত্র বাজানোটা ওর স্ত্রী পছন্দ করতো না—শুধু নিজেদের ক্লাবের কোনো উৎসবে ছাড়া।

অবশ্য ক্রমেই ওর বাজানো বন্ধ হোয়েই এসেছিলো—চার দিকের কাজ, দায়িত্ব আর খ্যাতির সম্ভারে ও তো একজন বিশিষ্ট নাগরিক হয়ে উঠেছিলো। আর ওর স্ত্রীর পদমর্য্যাদাও কিছু কম ছিল না—এই রকম পরিবেশে বাজনা? না, ও ছেড়েই দিয়েছিলো···তবু বাড়ীতে কেউ না থাকলে ওই বাজনাটিই ছিলো ওর নিভৃত ক্ষণের সঙ্গী।

আজ ওর শুয়ে-শুয়ে মনে হোতে লাগলো—কি এমন ক্ষতি একর্ডিয়ান বাজালে? এ সবই হোলো অলগার সংস্কার। ও চেয়ারম্যান তাতে ভালোই তো—থাকুক না ওর কাজ নিয়ে—আমি থাকবো আমার বাজনা নিয়ে। তাতে ওর আপত্তি করাই অন্যায়। নিফোনভের চোখের সামনে ভেসে ওঠে···প্রকাণ্ড ষ্টেজ। ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলো, সবার চোখ ওর দিকে। একজন ছাত্র এসে দিয়ে যাবে ওর হাতে বাজনাটা। তার পর? সুরের মোহে ভরে উঠবে সব···কে জানে হয়ত এইটাই ওর আসল পেশা? তাহলে অলগা কি আর করবে বলো, একর্ডিয়ান বাদকের সঙ্গেই তোমায় দিন কাটাতে হবে। কিন্তু চল্লিশের পর—একটানা কর্ম্মবহুল অভ্যস্ত জীবনের পর হঠাৎ নতুন জীবন সুরু করা খুবই কঠিন নয় কি? তা হলে···? কে এমন সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যে এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারে? কার সঙ্গে আলোচনা করে মনের বোঝা হাল্কা করা যেতে পারে?

—"নার্স! একবার এদিকে শোনো, হয়তো তোমার মনে নেই, কিন্তু তবুও বলতে পারো সিমন বেরেজা, একটি আহত সৈনিক, মেশিন গান চালাতো—এই ট্রেনে কখনো ছিলো?"

একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণী এলো ট্রেনে। ডাক্তার বেলভের হাতে দিলে জুনিয়ার লেফটানাণ্ট ক্রামিনের নামে একটি কাগজ—তাতে নির্দ্দেশ আছে এখানের হাসপাতালে তাকে রেখে যাবার।

—"খুবই সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হোয়েছে?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—"আমি ওঁর স্ত্রী।"

বুঝলে কি না, ক্রাচ ছাড়া ও এক পাও চলতে পারবে না"—ডাক্তার বেলভ বলেন,—"কিন্তু মাথার কাজ ও অনায়াসেই করতে পারবে দেখো তুমি, আর কি অসাধারণ মনের জোর আর ভালো থাকার ক্ষমতা তোমার স্বামীর"—কথার মাঝে ফোটে সান্ত্বনার কোমল আভাস।

—"সত্যি?" মেয়েটি বলে—"তাহলে তো ভালোই।"

নাঃ ভেঙ্গে পড়েনি মেয়েটি। দীঘল দেহ আর দৃঢ় পদক্ষেপ তার সঙ্গে ধীর শান্ত কথাগুলি—কোথাও নুয়ে পড়েনি, এতটুকুও না। ফোটা ফুলের মত ঢলঢলে মুখখানিতে কি যেন আছে, মনে করিয়ে দেয় ক্রামিনকেই। ডাক্তার ভাবেন, ক্রামিনের অনেক দিনের শিক্ষা ওর আড়ালে আছে। সেই শিক্ষাই ওকে এমনি সহজ করে তুলেছে।

মেয়েটিকে নিয়ে এলেন এগারো নম্বর কামরাতে, ক্রামিনকে ষ্ট্রেচারে করে বার করা হোলো। মেয়েটি ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে ···তেমনি ঋজু, তেমনি স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে···। এগিয়ে এসে মেয়েটি ঝুঁকে পড়লো ষ্ট্রেচারের উপর।

—"সুপ্রভাত, সুপ্রভাত ইনোচকা" ক্রামিন···মেয়েটির বলিষ্ঠ সুকুমার হাতখানিতে চুমা খেয়ে বললে,—"দাঁড়াও, ডাঃ বেলভকে বিদায় সম্ভাষণ জানাই—"

প্লাটফর্ম্মের শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে ষ্ট্রেচারের পাশে পাশে মেয়েটি চলেছে, মাঝে-মাঝে নরম রেশমের মত চুলে ভরা মাথাটি ক্রামিনের দিকে ঝুঁকিয়ে কি যেন বলছে—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে ডাক্তার বেলভের মনে হোলো—ক্রামিন অনেক শিখিয়েছে ওকে···এখনও আরও অনেক শেখাবে—। [ক্রমশঃ।

অস্ত্রপূজা নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও অমলা এবং আরও অনেকে

কানাডার চোখে উদয়শঙ্কর

কুমারী স্মৃতি চক্রবর্তী

ট্রাম-লাইনের খুব কাছে—লাজ-নম্র নববধূর মতো সসংকোচে দাঁড়িয়ে আছে নন্দরাম সেন স্ট্রীট। কিন্তু নিরীহ বলেই কি রেহাই আছে তার? বাজারের হট্টগোল, পথচারীর কলরোল বার বার আছড়ে পড়ছে প্রায়ান্ধকার এই গলিটার ওপর। এর বাসিন্দাদের তা গা-সওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন—মার্চ মাসের এক আশ্চর্য সকালে—নন্দরাম সেন স্ট্রীটের কল-গুঞ্জন গান হয়ে বেজে উঠলো আমার জীবনে—পণ্য-বিকিকিনির এলাকায় এলো প্রাণের ছন্দ। নাচের প্রতি ছোটবেলা থেকেই অনুরাগ ছিল—এর আগে দু'-একটা নৃত্যানুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছি। তা বলে খোদ্ উদয়শঙ্করের সঙ্গে নৃত্যসঙ্গিনী হয়ে বিদেশ ভ্রমণে যাব তা কোন দিন ভাবিনি। কিন্তু তা-ই সত্যি হলো। লণ্ডন ঘুরে আমরা এলাম—প্রমোদ-নগরী নিউ ইয়র্কে—সে দিন ছিল ১৯৪৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর। নিউ ইয়র্ক ছিল আমাদের আমেরিকা সফরের হেড কোয়ার্টার। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নৃত্যানুষ্ঠানের কথা আমি পত্রান্তরে লিখেছি। এই প্রবন্ধে কানাডার কথা কিছু লিখব।

আজ আমাদের কানাডায় পথে পা বাড়াবার দিন—১৯৪৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে 'শো' দিয়ে মার্কিণ দর্শকের ধাত অনেকটা আমরা বুঝতে পেরেছি—তারা কি চায় আর কি তাদের পছন্দ হয় না। প্রাথমিক ভয় আর দ্বিধা তো কেটেই গেছে বরং ইংরাজীর অনুসরণে বলা যেতে পারে আমরা নাচতে-নাচতেই সোজা মার্কিণ দর্শকদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেছি—তাদের চিত্ত জয় করেছি। যে সম্মান, যে সম্বর্দ্ধনা উদয়শঙ্করকে দিয়েছে মার্কিণ সমাজ, সাম্প্রতিক কলা-শিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আজ ২৬শে জানুয়ারী। আজ ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো ১-৪৫ মিনিটের ট্রেন ধরতে হবে। এ ক'দিন একটানা 'শো'এর পর সবারই দেহ-মনে ক্লান্তির ছায়া। তবু নতুন জায়গায় যাব—নতুন দর্শকদের নৃত্য-পরিবেশন করব—এই আনন্দেই সব ক্লান্তি ভুলে গেলাম। বেলা আড়াইটার সময় আমাদের ট্রেন কুইবেকে পৌঁছলো। সঙ্গে-সঙ্গে রিপোর্টাররা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। আমরাও আনন্দে তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। ওঁরা সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ফটোও তুলে নিচ্ছিলেন। এই পর্ব শেষ করে আমরা সোজা চলে এলাম 'সেণ্ট লুই হোটেলে'। ক্যাফেটেরিয়ায় খাওয়ার পালা চুকিয়ে আমরা 'লেক্ ওণ্টেরিও'র ধারে বেড়াতে বেরুলাম। লেকটি আমাদের হোটেলের খুব কাছে। স্লেজ গাড়ী ঘণ্টায় ৪ ডলার ভাড়া চাইলো। আমরা তখন গাড়ী না নিয়ে হেঁটেই লেকে রওয়ানা হলাম। লেকের ধারে পৌঁছে আমরা ফটো তুললাম। কিন্তু দশ মিনিট পরেই হাত-পা বরফের মতো জমে যাবার জোগাড় হলো।

এখানে অনেক ছেলেমেয়েরা স্কী করছিল। ভেবেছিলাম ছেলেদের ফটো তুলবো। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। আমার পা দুটো অসাড় হয়ে আসার জোগাড় হলো। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে কোনমতে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু তখন দরজা খোলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই আমার। একজন মেম আমাকে ও সেজদিকে (প্রীতি চক্রবর্তী) ভেতরে নিয়ে গেলো। ওপরে গিয়ে দিদিদের (অমলাশঙ্কর) সব বললাম। দাদা (শঙ্কর) বললেন যে, তাঁর পুরনো পার্টির কোন মেয়ে নাকি ঠাণ্ডায় এই কানাডাতেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। দাদা আমাদের রাস্তায় বেরুতে বারণ করে দিলেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) আমরা চার জন—আমি, সেজদি (প্রীতি চক্রবর্তী), গীতু (গীতা নন্দী), দীপ্তিদি (দীপ্তি ঘোষ)। দিদি (অমলাশঙ্কর) এবং আনন্দ (উদয়শঙ্করের ছেলে) একসঙ্গে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরুলাম ও লেকের ধারে গিয়ে ২ ডলার দিয়ে আধ ঘণ্টার জন্য একটা স্লেজ ভাড়া করলাম। গাড়ীতে উঠতেই মোটা-মোটা লোমের কম্বল দিয়ে আমাদের সবাইকে ঢেকে দিল। আমরা শুধু চোখ বার করে সারা মুখ ঢেকে শহর দেখতে লাগলাম। সেখানে আমি সকলকে স্লেজ গাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে যেই ফটো তুলতে রাস্তা পার হতে গেছি, অমনি পা পিছলে বরফের ওপর পড়ে প্রায় দু'মিনিট উঠতে পারলাম না। মনে হলো, পায়ের হাড়গুলো যেন সব ভেঙে গেছে। তবু ফটো তুললাম। আর দেরী নয়। সন্ধ্যা ৬টায় মন্ট্রিলে পৌঁছে আমাদের 'শো' দিতে হবে।

ঠিক সময়েই 'শো' আরম্ভ হলো। 'নিরাশা', 'বিদায়', 'নৃত্যছন্দ', 'অস্ত্রপূজা' প্রভৃতি সমষ্টি-নৃত্য দর্শকদের এক অপরূপ স্বপ্নলোকে নিয়ে গেলো। বার বার দেখেও যেন দর্শকদের তৃষ্ণা মিটছে না। দাদার (শঙ্করের) 'ইন্দ্র', 'গান্ধর্ব'; দিদির (অমলাশঙ্করের) 'কৃষ্ণাণী', 'রাজপুত বধূ' একক নৃত্য দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনিতে অভিনন্দিত হলো। আমার 'উর্বশী' একক নৃত্যও বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। বিখ্যাত মার্কিণ কলা-সমালোচক জন মার্টিন 'হেরাল্ড ট্রিবিউনে' লিখলেন: 'Uravasi introduced the charming little dancer Smriti, in her first solo of the season. It deals with the curse by the heavenly nymph of Arjuna when he remains indifferent to her wiles and Smriti dances it exquisitely, from the admirable use of her hands to the dramatic colors that came from within.' ("উর্বশী" নৃত্যেই ছোট্ট মেয়ে লীলাময়ী স্মৃতির বর্তমান অনুষ্ঠানে প্রথম নৃত্যাবতরণ। অর্জুনকে তপঃভ্রষ্ট করবার জন্য অপ্সরা উর্বশীর সব ছলাকলাই যখন ব্যর্থ হলো, তখন সে অর্জুনকে অভিসম্পাত দিল। অভিসম্পাতের সেই অন্তর্গূঢ় ক্রোধ ও প্রত্যাখ্যানের বেদনাটি মুদ্রা-বিস্তারের আশ্চর্য কৌশল ও বর্ণাঢ্য রস-বিলাসে পরিবেশন করেছেন স্মৃতি।)

কানাডার প্রমোদ-পাত্রকে কানায়-কানায় পূর্ণ করে দিয়েছেন উদয়শঙ্কর। কানাডার চোখে লেগেছে অরূপের অঞ্জন—মনে এসেছে খুশির জোয়ার। জীবন-পাত্র থেকে উপচে পড়ছে উজ্জ্বল আনন্দ-রসের শতধারা। শঙ্করের নৃত্য-নিবেদনের এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু হতে পারে না। টাকা-আনা-পাই—ডলার—ষ্টার্লিং—সেন্টএর গণ্ডী পেরিয়ে যখনই বিদেশীর মন অপরূপের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠে তখনই বুঝতে হবে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কিছু দেবার স্পর্দ্ধা আছে যা পাশ্চাত্ত্য অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দৈনন্দিন প্রয়োজনের যা অতিরিক্ত তাই তো আমাদের জীবনের পরম সম্পদ। সুন্দরের অভিসারকে সাগ্রহে সম্বর্দ্ধনা জানানোর মধ্যেই তো নিহিত আছে একটা অর্দ্ধ-সচেতন জাতির বিশুদ্ধ শিল্প-রসানুগ্রহণের চরম পরীক্ষা। লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে, ক্লীভল্যাণ্ডে, চিকাগোতে, ডেনভারে, কুইবেকে, মনট্রিলে—সর্বত্রই দর্শক-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও প্রশস্তিতে শঙ্করের স্বীকৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশিষ্টতম কলা-সমালোচক থেকে শুরু করে সাধারণতম মানুষটি পর্যন্ত উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠানের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছিলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—আর সে-ধারাকে বেগবান ও বর্ণাঢ্য রীতিতে মার্কিণদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন উদয়শঙ্কর। নিউ ইয়র্ক থেকে মনট্রিল—সব জায়গাতেই দর্শকদের মুখ থেকে ছোট্ট বিস্ময়টুকুই উচ্চারিত হলো—"ওয়াণ্ডারফুল! শঙ্কর ইজ ওয়াণ্ডারফুল! শঙ্করের তুলনা নেই।"

এ বিস্ময়-নিবেদন তো ব্যক্তিগত ভাবে শঙ্করকে নয়, ভারতের শিল্পদূত উদয়শঙ্করের মারফতে এ শ্রদ্ধা-নিবেদন স্পর্শ করেছে ভারতের সাধারণজনকে—তার অগণিত নরনারীর মনকে।

স্মৃতি চক্রবর্তী

স্মৃতিপটে কুম্ভ

শশিশেখর বসু

বেণীঘাটে যেমন দল-বল নিয়ে পৌছলাম, অদূরে গুরুগম্ভীর প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র শুনতে পেলাম—

হর হর গঙ্গা পার্বতী
পাপ না রহে এক রতি !

মহাপাতকে নিমগ্ন কোন ব্যক্তিকে বেণীঘাটের ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুযায়ী ডুব দিয়ে ধৌত করা হচ্চে। এ দৃশ্য তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগের যোগ্য, যে দেখে তারও পাপ চলে যায়। পণ্ডিতের চীৎকার আসছে—"বুড়কি মারো! বুড়কি মারো!" [ডুব দাও! ডুব দাও!] এ ছাড়া দলবদ্ধ পাপ-নাশক-স্নান অহোরাত্র চলছে। বিশেষ দিনে নেহানও আছে।

পুরাণোক্ত সুধাপূর্ণ কুণ্ডা বা কুম্ভ এখানে ছিল, এক চুমুক খেলেই পাপ হ'তে মুক্তি, তাই পরমধাম লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ পাপী-পাপিনী বেণীঘাটে ছোটে, কুম্ভের অমৃত পান করতে।

প্রবাদ, অমৃতি এই কুণ্ডার অমৃত থেকে কুণ্ডলী রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাই পশ্চিমা বিধবাদের একাদশীর দিন অমৃতি খেলে পুণ্য হয়, পাপ হয় না। বাংলা দেশে এটা চলা উচিত। যুক্তিপূর্ণ প্রথা। বড় বড় অমৃতির দোকান থেকে চিৎকার আসছে "গি কে মাল! গি কে মাল!—তাজে তাজে গরমা গরম।" জিলিপিরও উৎপত্তি ঐ একখানির অমৃত থেকে।

"কুণ্ডা"ও অনেক রকম বিক্রি হচ্ছে, ঘয়লা, ঘড়া, কলসী, জালা। চার কোণ যুক্ত কুম্ভ বিক্রি হতো,—মাদ্রাজের এক সহরে নির্মিত [কুম্ভা কোনম্]। রাধিকার কোলে উঠে কুম্ভ পবিত্র হয়ে গেছে "ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে। তাঁর অধরসুধা ও নয়নজল 'অমৃতে হৈ।" হিন্দীতে বলে। "দেহি মুখ কমল মধু পান!" কৃষ্ণ বলতেন। নোনতার চেয়ে মিষ্টিটা বেশী পছন্দ করতেন।

•তাঁমা, লোহা, কপা, মাটির কলসী সকলই পবিত্র; বালতি চালু হবার আগে কুম্ভই প্রচলিত ছিল। জলপূর্ণ কুম্ভ শুভ যাত্রা জ্ঞাত করায়, শূন্যকুম্ভ যদি ভরতে যায় তা আবার পূর্ণকুম্ভর চেয়েও শুভ যাত্রার বেশী পরিচায়ক। পশ্চিমে রাজারা যখন উপাধি লাভ করে দেশে ফিরতেন ৫০ জন মেথরাণী মাথায় ভরা কুম্ভ নিয়ে গান গাইতো।

ঘট বোলে কলা কল
পানিয়া দল মল

এই অমৃতভরা কুম্ভের সঙ্গে সুমিষ্ট ফলের তুলনা করা হয়,— উড়িষ্যার বিখ্যাত পেঁপেকে "অমৃত ভাণ্ড" বলে। পশ্চিমে বড় জাতের কুমড়কে "কুণ্ডা" বলে। মুঙ্গেরের "মোটকী" বিখ্যাত ছিল।

কলসী বা কুম্ভ অমৃতের আধার বলে এটা ভাঙ্গা মহাপাপ। অন্ধ ভিখারী কলসী বাজিয়ে গান করে খায়। তবে কখন কলসী ভাঙতে পারেন,—যখন ভবলীলা শেষ, আর অমৃতের আবশ্যক নেই তখন। মড়া পোড়াবার পর কলসীতে জল এনে চিতা নিভান হলে পেছু দিকে না তাকিয়ে ফটাস করে ভেঙ্গে কলসী ফেলে আত্মীয়রা বাড়ি যান। ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়ে গেল। এখন কুম্ভ, কুম্ভমেলায় হরিনামের কোন আবশ্যক নেই, বাকি রইল গয়ায় পিণ্ডি চট্কান। কিন্তু সঙ্গমে একবার অস্থি ফেলতে আসতে পারেন, মলেও নিস্তার নেই ত্রিবেণী টানছে। ত্রিবেণীতে বিক্রয়ের জন্য কলসী স্তূপ ও কুম্ভমেলা তাই এত মহান্ দৃশ্য। এখন কলসী বিক্রি আর হয় না, নানা রকম খেলনা, লখনউয়ের তৈরি মাটির সাধু, ঠাকুর ইত্যাদি বিক্রি হয়, আর কাপড়-চোপড়। বড় বড় বেটপ আকারের পেতলের কুম্ভ করে ত্রিবেণীর জল "নেহানের" দিন ঠেলা গাড়ি করে সহরে বিক্রি হয়। যারা কুম্ভে যেতে অপারগ, তারা ঘরে চান করেন।

ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা, তাতে নানান দেব-দেবীর মূর্তি, তাঁদের সামনে চাল, লাড্ডু, ফলফুলরাশি ও রজত মুদ্রার সম্ভার। ধনাগম্ রূপয়া গিরতা! আপনার দক্ষিণা তাতে নিপতিত হলেই গদাধরের পাদপদ্ম আশীর্বাদ পাবেন, ও পুরোহিতের অর্ধচন্দ্র, কারণ তরঙ্গ প্রপীড়নে নৌকায় উল্টি (বমি) হতে পারে ও পুলিশ আপনাকে ক্যাম্প হাসপাতালে পাঠাবে। কলেরা রেজিষ্টারে নাম উঠবে। ১০ দিন কোয়ারেনটিনে বন্দি হবেন যদি ডাক্তার কুঁচকি টিপে বলে, "পিলেগ হৈ!"

গত কুম্ভ, অর্ধ কুম্ভ, মাঘ মেলার স্মৃতিচিহ্ন আধ-ভোলা মনকে বহু বৎসর পরে জাগিয়ে তুলছে।

কুম্ভমেলায় বিশেষ আনন্দ পেতাম বলে আবার সে চিত্রের অবতারণা করতে ইচ্ছা করছে।

লক্ষ লক্ষ পাপী-দেহ ধৌত ত্রিবেণী জল, মেলার কোলাহল, মেঘশূন্য নীল আকাশ, জোছনার মত নরম রোদ, শীতের কনকনে হাওয়া মন যেন অদূরেই উপলব্ধি করছে।

বহু বৎসর এলাহাবাদে বাস করেছি। বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুম্ভমেলায় ঘুরে বেড়াতাম। ভ্যাগাবণ্ডরা তীর্থযাত্রীর চেয়ে কুম্ভে বেশী আনন্দ পায়। আমাদের ঘুরে বেড়ান ছাড়া চব্য-চূষ্য লেহ্য-পেয় ছাড়া, তামাশা দেখা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবাৎ কোনও দিন নৌকাযোগে ঠিক সঙ্গমে পৌছে একটা ডুব দিয়েই মাছধরা পাখীর মত নৌকায় উঠে পড়তাম! অত ঠাণ্ডা জল কি সব বাঙ্গালীরা সহ্য করতে পারে?

মে জুনে জল কমলে এখানে রাত্রে ইংলিশ বোটে দল বেঁধে রো করতাম। হেথায় কোন বোধাতীত মোহ আছে। কালিদাস ও মেঘদূতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম উপমান করে দুইকেই নদী-প্রধানা করে গেছেন।

কলকাতা থেকে দুই যুবা পুরুষ "ওবান অপ" থেকে নামলেন। ষ্টেশনে তামাসা দেখছিলাম। শীতে কাঁপছেন। জিজ্ঞাসা করলেন "মশায় রোজ কি এখানে এই রকম শীত?" বললাম "রাত্রে আরো বেশী"। তাঁরা বললেন "করব কি? সহ্য হচ্ছে না। গাড়ি কখন?" বললাম "ঐ ডাউন মেল এল, যান ফিরে—পুণ্য ঠিক হয়েছে।" কষ্ট করলেই কেষ্ট।

শুধু যে বেণীঘাটে মেলা হচ্ছে তা নয়। সমস্ত সহরটাই কুম্ভ-মেলা হয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা বাড়ি পর্য্যন্ত ভাড়া হয়ে গেছে, বাঙালী

ভাড়াটে উঁকি মারছেন। অত বড় কপির দেশ, বাজারে একটি কপি নেই, বার লক্ষ পঙ্গপাল চাট্ পোট্ করে দিয়েছে।

কপালকুণ্ডলাতে আছে "তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটা বসিয়াও সেইরূপ হইতে পারে।" অনেক বৃদ্ধা কল্প-বাস করতে এসে ছেলেদের গান শুনে গৃহস্থের বাড়ীতেই থেকে যান :—

মাঘে প্রয়াগে বুড়ি কল্প-বাসে
মরণ নিশ্চয় পশ্চিম বাতাসে

আধুনিক বিলাতী ভূগোল-বিশারদ পণ্ডিতরা সরস্বতীর নদী গঙ্গা যমুনার সঙ্গে মিলনের কথায় বড় একটা কান দেন না। রয়াল জেগরফীক্যাল সোসাইটীর উপাধিকারী এক মহাবিজ্ঞান্ বন্ধু বলেন সরস্বতীর বিদ্যমানতার কোন চিহ্ন নেই। নাইনী রেল ষ্টেশন তা হলে কি অন্তঃসলিলা? এইখান থেকে সরস্বতী ছুটে সঙ্গমে পড়েছিল?

সরস্বতীর অস্তিত্ব না মানলেও আমরা যমুনা ব্রিজের মাঝামাঝি প্যারাপেট থেকে তিনটা বেণী দেখি। গঙ্গা এখানে বেঁকেছেন, এই বাঁকস্থলে যমুনা মিলেছে। গঙ্গার দুটা লাইন ও সোজা যমুনার একটা রেখা তিনটা বেণী গড়ে তুলেছে। এখানে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি। প্যারাপেটে দাঁড়িয়ে সঙ্গমের কাল-হলদে জলের রেখাকে জিজ্ঞাসা করুন হিন্দীতে :—"সরস্বতী নাহিনা?" আবার আওয়াজ প্রত্যাবর্তন করে হিন্দীতে পাঁচ বার উত্তর দিবে "নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা!" এই শব্দেই নাকি "নাইনী" ষ্টেশনের নামকরণ হয়েছিল। রামচন্দ্রের সময় থেকে গঙ্গাও এর "অপ এ" গতিবিধি বদলেছেন। পুরাণে যে ঘাট ও-পারে ছিল এখন এ-পারে, অথচ নিজের স্থানেতেই আছে। গঙ্গা মায়ী "ইধার সে উধার বহ গাওয়া"।

কলকাতায় এক বিখ্যাত পুরাণ-লেখকের কাছে বসে একদিন কুম্ভমেলার গল্প করতে করতে বললাম "সুরজকুণ্ড পুলে রেল গাড়ির ভীড় দেখছি—" তিনি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন "কি বললে? সুরজকুণ্ড! কোথা এই সুরজকুণ্ড খুঁজে খুঁজে আমি হায়রাণ! এলাহাবাদের ও-পারে?" বললাম "না, এখন এলাহাবাদের মধ্যে,—হয়তো একদিন ও-দিকে ছিল। মানিকতলা বাজারও বোধ হয় গঙ্গার ওপারে ছিল ভূমিকম্পে গঙ্গার চাল-চলনের সঙ্গে আমার সুবিধার জন্য এদিকে এসেছে!" গঙ্গার মাহাত্ম্য!

ত্রিবেণী ঘাট না বলে লোকে বেণীঘাট বলে কেন? তিনের উপর কিছু সন্দেহ আছে বোধ হয়। আর না হয়তো সুরজকুণ্ডের মতন এটা একটা পৃথক সহর ছিল এখন ত্রিবেণী বেণী এক হয়ে গেছে। অথবা একটা 'বেণীর' পাশে ঘাট বলে। আসল সঙ্গম একটু দূরে।

এই বেণী নামের উপর লোকের এত ভক্তি যে এলাহাবাদের বহু লোকের নাম বেণী বাবু। গিন্নিদেরও নাম বেণী রাণী, বেণী দাসী। এক "কুম্ভ ভোজে" আড়াই শ' বাঙ্গালী সহরে খেতে বসেছেন। দরওয়ান দৌড়ে বলল "বেণী বাবুকে ডেরা মে আগ লাগে হ্যায়!" অমনি অর্দ্ধেক লোক ভোজ ছেড়ে বাড়ি ছুটলেন। সকলেই বেণী বাবু, কার বাড়িতে বিপদ কে জানে!

স্বামী বিদেশ থেকে যখন পত্নী বেণী রাণীকে চিঠি লেখেন ডাকিয়া [পোষ্টম্যান] এই নামের চিঠি অন্য গিন্নির হাতে দিয়ে যায়। খুলে পড়েন গিন্নি "আমার বুকের ধন!" লজ্জিত হয়ে বলেন ওরে নেপলা পাশের সব বাড়ির বেণী রাণীদিকে দেখিয়ে দিয়ে আয় ঠিক বুকের ধন কে।

খোট্টাদের ভেতরও অনেক রকম বেণী আছে,—বেণীয়া, বেণী পরসাদ, বেণী দাস, বেণী মাহতো, বেণীরাম,—"সব বেণীয়ে বেণী হৈ!" তারা বলে। "বেণী মাধো" নামে ঠাকুর ও বায়গাও আছে।

পাপের বোঝা এখন বেড়েছে, তাই চার গুণ লোক কুম্ভে বেড়েছে। সকলেই যে চান করে পাপ ধোবে তার মানে নেই; নাফাখোর, দাগাবাজ, গাঁটকাটা, গদ্দিদার [হোর্ডার], ব্লাক-বাজারী, পলিটিসিয়নরা 'লেকচার' দিয়ে পাপমুক্ত হবেন। পূর্বে তীর্থে পলিটিকস্ ছিল না। একমাত্র ত্রিবেণীর পানি-ই পাপের বুকে ছুরি বসাত। "আব লিচড় হোগা!" [লেকচরের হিন্দী] অর্দ্ধেক যাত্রী ভিখারী,—অন্ধ, পংগু, বস্ত্রহীন। সমুদ্র-তরঙ্গের মতন পেছু-পেছু ছোটে। তাই লোকে থলে ভরে আধ পয়সা নিয়ে যেত, তাই ছড়াত। এত বেশী পঙ্গুর দল যে এক পয়সা দিতে হলে দাতা নিজেই ভিখারী হয়ে পড়বেন। অথচ দান না করলে পাপ ও মনের ব্যাধি ঘোচে না।

কুম্ভে যিনি দান করেন তিনি মহাপাপী—ঘোর পাপে নিমগ্ন, যন্ত্রণার উপশম করতে চান খরচ করে

যব শির লাগে ফাট্নে
খয়রাত লাগে বাঁটনে।

তীর্থযাত্রী খরচ করতে যেমন ব্যগ্র,—কুম্ভে অবৈধ রোজগারেও তেমনি উন্মত্ত। একটা ছেলে বললে "দেখবেন?" পেনসিল দিয়ে বেলে মাটি খুঁড়তে লাগল। কতকগুলা খোট্টা জিজ্ঞাসা করল "কোন্ চিজ ঢুঁড়ত হ্যায় বাঙ্গালী বাবু?" ছেলেটা বললে "একঠো গিনি খোয়া গিয়া!" খোট্টারা খুঁজতে আরম্ভ করলে; দেখতে দেখতে হাজার হাজার লোক মাটি খুঁড়তে লাগল "গিন্নি হৈ!" বলে। গিনি তখন চালু ছিল।

অন্যান্য ঘাটেও যথেষ্ট লোক-সমাগম, ভরদ্বাজ ঘাট, রাম ঘাট, বালুয়া ঘাট, গৌ-ঘাট, ইত্যাদি। তিনটা রেল-ষ্টেশনেও সমান ভীড়,—এলাহাবাদ জংসন, এলাহাবাদ সিটি, প্রয়াগ। ঘোড়ার গাড়ি, উটের গাড়ি, হাতী, পালকি, ডুলি, একা ধুলো উড়িয়ে অন্ধকারে "ট্রাফিক জাম" প্রস্তুত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ফোর্ট ট্রেন পাশ করলে "জাম" ভাংবে।

কুম্ভ বহ্বারম্ভ পুলিস আফিসকে ব্যস্ত করে তোলে। তখন থেকেই রেজিষ্টারের সব রকম 'কলম'-ই 'এনট্রি' প্রাপ্ত হচ্ছে:—পাকিট-মার, গালিগুফতা, দাগাবাজী, খুন, বহুচোরী, লেড়কি চোরী, সুইসাইড, রূপয়া লুট, 'জিনাহারাম' ইত্যাদি। লোকে পাপ ধুতে যায় কি পাপ করতে যায় সমস্যা সমাধান শক্ত। মেলার আগেই লোক জমে।

একটি ঝুলনী (নোলক)-পরা বাঁকা (রূপসী) মেয়ে বলছে "মেরি হাঁসুলী, ছুড়া কড়া, গহনা গুড়িয়া সব ছিল লিয়া বাবু:—গঙ্গাজী মে জান দে দুঙ্গি"।

"লষ্ট প্রপার্টি" আফিসে গহনার কি টাল লেগেছে! কুম্ভ প্রারম্ভ গহনা দান দেখেন, বাঙ্গালীর বউ গহনা হারাতে পটু। [গড়াতেও কোন্ কম?] অন্তর্জ্জানীয় ইচ্ছা সোনা [পুরীষের প্রতীক] ফেলে দিয়ে পাপ হ'তে উদ্ধার হই। একটি মেয়ের হারান কানের ফুল খুঁজতে গিয়েছিলাম। এক হাজার কানের ফুল প্রারম্ভতেই জমে গেছে,—যেন জুয়েলারী 'শপ'। ফিরে এলাম, পুরুষ নারীকেই চিনতে অপারগ, তার কানের ফুল-জোড়া মিলিয়েও চিনতে পারলাম না,—সে আমাকে জোড়াটা দিয়েছিল।

কে এই গহনা কুড়িয়ে আফিসে জমা দেয়? সে চুরি করে না কেন? তা হলে ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরও পৈরাগে আগমন হয়! না কি সে পাপী, পাপ মোচন করতে এসেছে, আর নূতন পাপ করবে না। ছেলেদের রূপার চুসিকাটি, যাকে পশ্চিমে জুজী বলে, কোমরবন্ধের সঙ্গে ফিতায় বাঁধা থাকে। ছেলে আঙুল চুসলেই মা বদ অভ্যাস ঘুচাবার জন্ম ছেলেকে জুজী কাটি চুসতে দেন। হারান জুজী পর্য্যন্ত আফিসে জমা হয়।

ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত। শরীরকে বৃথা কষ্ট দিলে যদি পাপ যায়, তবে আমাদের এই বৃহৎ "ভ্যাগা পার্টির" যথেষ্ট পুণ্য হয়েছিল, কল্পবাসীদের চেয়েও আমরা ১ মাসে বেশী রোগা হয়েছিলাম। চায়ের হোটেল নেই, ফ্লাস্ক ২টাতে কুলায় না। খাঁটি দুধের দোকান আছে, গরম গরম দেয় 'পরই' করে,—অর্থাৎ ভাঁড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্ম না থাকলে খেতে সাহস হয় না। যেন জোলাপ। "হাম্দি বে" "কালু" "গামা" পহলওয়ানদের ফটো দুধের দোকানে টাঙ্গান আছে। এই রকম গায়ে জোর থাকলে এই দুধ হজম হয়; "নেহি তো পেঁত লুন [খারাপ যায়ী" [বেগ সংবরণে অক্ষম]।

অনেক লোক রাত্রেও চান করে। একবার কনকনে শীতে বেণীঘাটে রাত্রে "ডাক মহারাজ"কে ঝাঁপ দিতে দেখলাম। গঙ্গাভক্ত বৃদ্ধ নারীবয়ান দেখতেন না; বলতেন "সড়ক কি আওরত না দেখনা চাহি, রাত মে আতেহেঁ, ইসকি কিমত মানুনে কি হমারি আদত পড় গয়ি হৈ। ঐসি হৈ পুরুষত কি মহিমা।" পুরুষের মনের বিকৃতি নিবারণ জন্ম তাহলে নারীর রাস্তা পরিত্যাগ বিধেয়।

"ডাক মহারাজ" নাম হ'ল কারণ লণ্ঠন হাতে হাঁক-ডাক্ ছাড়তে ছাড়তে আসতেন:—

হলা কল্ কলা
হলুয়ে কে লিয়ে কুম্ভ মেলা।

গঙ্গা-ভক্তিতে উন্মাদ হয়ে তার পর লণ্ঠন সমেত ঝাঁপ দিতেন। ইনি বলতেন লোকে হলুয়া জেলেবী খেতে আসে কুম্ভে, পুণ্য করতে নয়। [হলা কল্ কলা — ও লো কল্লোলিনী।]

আগ্রা কানপুর জব্বলপুর লখনৌ থেকে গাঁজার ছিলিম চালান আসতো। সেকালে ভারতে ৫২ লক্ষ সাধু ছিল। ৪, ৫ লাখ কুম্ভে আসত, ফেরত যেত, আবার ৫ লাখ আসতো "মেলা" স্পেসেলে চলে যেত। নিরঞ্জনী আখড়ায় সাধু সব অনাবৃত। ছাই কেবলমাত্র অঙ্গ-ভূষণ। সেদিকে স্ত্রীলোকদের যেতে বারণ। ঝুসিতে অনেক গুহাবাসী সাধু থাকে। তারা চটের থলের মধ্যে প্যাক হয়ে ঠেলা গাড়িতে আসতো। মেলাভূমিতে গুহা নেই বলে চটশুদ্ধ মাটিতে পড়ে থাকত। চটের থলে গুহার কাজ করে। চেলা এসে মাঝে মাঝে দুধ ও গাঁজা খাওয়াত। মেয়ের আলাদা স্থান। "সন্ন্যাসিনী" দিকে মাতাজী বলতো। পুরুষকে সেদিকে যেতে দিত না। এখনকার দিন হলে ভাবুতাম তাঁদের ক্লথ কুপন নেই তাই।

বাঙ্গালীর বউ যে পুলিশের পাশ নিয়ে নিরঞ্জনী আখড়ায় গিয়ে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করেন ও মন্ত্র বলেন "প্রজনঃ সর্বভূতানাম্ উপস্থ অধ্যাত্তম উচ্যতে" [আত্মা পরমাত্মার মধ্যে উপস্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছে] এ গল্প এলাহাবাদে শুনতাম। প্রমাণ পাই নাই। অকস্‌ফোর্ডও (মহাভারতের মতন) বলেন "ফ্যালস্ [উপস্থ] জন্মদাতা বলে পূজিত হ'ন।" তা তো সকলের জানা। কথা হচ্ছে মাঘে প্রয়াগে এ পূজা হয় কি না ?

খুব বড় বড় খাবারের দোকান। এত সুন্দর জিলাপি, মতিচুর, কচৌরি, পুরি, বরফী, কালাকন্দ, গুলাপজামুন, 'খজুর' খিওড়া, রাবড়ি, মালাই, দহি যে, সহরে বাঙ্গালীবাড়ি হাঁড়ি চড়া বন্ধ। ভীড়ে সমস্ত দোকান দুর্ভেদ্য, এঁটো বটপাতার ঠোঙ্গা নিবিড় ভাবে পড়ে আছে। সে দেশে শাল পাতা নেই। মেয়ে-পুরুষ ক্ষুধার পীড়নে গরম তরকারী ও কচৌরি, বুঁদিয়া, চিবুচ্ছেন একসঙ্গে বেঞ্চে বসে। পরমাসুন্দরী ভোজনলোলুপা হিন্দুস্থানী রমণী গালে এত বড় গরাস ঠুসেছেন যে শ্যামাঙ্গী বাঙ্গালী মেয়েরা হিংসায় চিবাতে চিবাতে বলাবলি করছে "বদন ব্যাদান দেখচো পুঁটি মাসী ?"

হালুয়ারীর হাউলাররা চেঁচাচ্ছে "জেলেবী ! জেলেবা ! জেলেবী কে বাপ জেলেবো ! ঘি কে মাল ! ঘি কে মাল !"

চার রকম রাবড়ি,—লচ্ছে-লচ্ছা, দানাদার, ঢোঁকে-ঢোঁকা, লুটুর-পুটুর। ব্যাখ্যার স্থানাভাব।

এক মালসায় চার রকম দৈ একসঙ্গে পাতা। কি একটা পাতা দিয়ে কমপার্টমেণ্ট করা আছে। খাট্টা, মিঠা, ফিকা, নোনগার।

আর সাধারণ দৈ টক বটে, কিন্তু কি চাপ! হাতের আঙুল থেকে ঘি ছাড়ে না। মতিচুর দিয়ে চটকে খান। কি স্বাদ! তিন আনা সের সে কালে, কোথাও কোথাও দু'আনা। জিলাপী ।৶০, কচৌরী পয়সায় দুটা। আটা টাকায় সাড়ে বার সের, ঘি ২ সের, অড়র দাল টাকায় ২৬ সের। গোল্ডস্মিথ কবি বটে :—

স্মৃতি ! তুমি প্রবঞ্চক
কি রঙ্গে মাতিয়া
মরমে বেদনা দাও
অতীতে ডাকিয়া।

আবার এক রকম দৈ আছে গ্রামে যা চেঙ্গারিতে পাতা হয়। আর একটা "ডাগরা" ময়দা দিয়ে এঁটে ঢেকে দেওয়া হয়। সবটা দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে পুকুরের পাঁকে পোঁতা হয়। ৮ দিন পরে বের করে খান যেন একটা প্রকাণ্ড "চিজ" কেক। মানুষকে ভগবান খেতেই জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু কুম্ভ মেলার লক্ষ লক্ষ ভিখারীর কোন গতি করেন না। দেখে জীবনে ধিক্‌কার দিতে ইচ্ছে হয়।

"হর হর গঙ্গা !" প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে। সকলে দেখলাম পাপীটা দিব্যি সুন্দর পুরুষ, আগে ভেবেছিলাম নানান ব্যাধিতে রুগ্ন পাপী বিকট দেখতে হবে রাক্ষসের মতন।

"আওর এক বুড়কি মারো ! এক রুপয়া আওর নিকাল।" ট্যাঁক থেকে পাপী টাকা দিল।

"হর হর গঙ্গা পার্বতী, পাপ না রহে এক রতি !" পণ্ডিত হুংকার ছাড়লেন "কেয়া পাপ কিয়া সবোন কো সামনে বোলো।" লজ্জার কথা।

পাপী বললে "আম চোরি জামুন, চোরি, চাচিকে খেত সে ধান চোরি, আওর আওরত দেখা সড়ক কি ; আওর ঝাঁকি ঝাঁকা—"

"হর হর গঙ্গা ! বুড়কি মারো, পাঁচ পাপকে পাঁচেই রুপয়া দেও, বেশী নেই মাংতা।"

পাপী টাকা দিয়ে চলে যেতে উদ্যত। পণ্ডিত বললেন "কুছ ছিপায়া ত নেহি ? সব পাপ বোলা ?"

"হাঁ পণ্ডুৎ জি !" বলে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে বললে "পণ্ডুৎ ! এক পাপ কি খিয়াল উতার গিয়া !"

"বোলো, বোলো !"

"হাম কলকাত্তাকে হামেদিয়া হোটল মে শিককাবাব ভোজন কিয়া !"

"এ পরমাত্মা ! এ সচ্চিদানন্দ ! ই পাপীকো নরক মে ভি স্থান নেই দেও !" পণ্ডুৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

পাপী ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল "পণ্ডুৎ জি বুড়কি মারে ফিন্ ?"

পণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন "কেতনা শিককাবাব খায়া থা ?"

"ছ হি ইঞ্চি (মাত্র ৬ ইঞ্চি।)

"এ সচ্চিদানন্দ ! ই পাপী কো আপ কেয়া হাল করেঙ্গে। হা কপাব্ ! হা কপাব্ !" বলে পণ্ডিত কপাল চাপড়াতে লাগলেন। যেন নিজেই পাপী। এতে পাপী সত্যই ভয় খেয়ে গেল, কারণ, বেণীঘাট থেকে নরক স্পষ্ট—দেখা যায়। হামেদিয়া হোটেল থেকে নয়।

পণ্ডিত বললেন "ছ হি রুপয়া দেও। বুড়কি মারো ! আওর এক বুড়কি,—ছ বুড়কি মারো।"

পাপী বললে "পানি বড়ি ঠাণ্ডি হৈ !" শীতে কাঁপচে।

"পাপ ভি ত গরমা গরম থা না ? হর হর গঙ্গা পার্ব্বতী,— পাপ না রহে এক রতি !"

পাপী এবার যাবে ; ট্যাঁকের সব খরচ হল, এক রতি এক তিলও পাপ মনে রইল না, পূর্ব শান্তির স্মৃতি প্রাণে ফিরে এল।

বলতে বলতে চলল "আওর পাপ নেই করেঙ্গে। সড়ক মে কৈ কলনীওয়ালী বাঁকা ছুকুরিয়া দেখেঙ্গে তো শুয়ার কি বাচছা কো হালাল কর দুংগা।"

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

উইলিয়াম কেরির আয়

১৮০১ সালের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (৯ই জুন, ১৮৩৪) ডাঃ উইলিয়াম কেরি মোট যে আয় করেছেন, নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হলো :

	সিক্কা টাকা
১৮০১ সালের মে মাস থেকে ১৮০৭ সালের জুন পর্যন্ত বাঙলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে ৭৪ মাস মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে মোট……	৩৭,০০০৲
১লা জুলাই, ১৮০৭, থেকে ৩১শে মে, ১৮৩০ পর্যন্ত উপরোক্ত ভাষা দুটির অধ্যাপক হিসাবে মাসিক ১০০০৲ টাকা করে মোট…	২,৭৫,০০০৲
১৮২৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৩০ সালের জুলাই পর্যন্ত সরকারী আইন অনুবাদের জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে মোট……	২৪,৬০০৲
১লা জুলাই, ১৮৩০, থেকে ১৮৩৪ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত মাসিক ৫০০৲ টাকা হিসাবে পেন্সন পেয়েছেন মোট……	২৩,৫০০৲
মোট সিক্কা টাকা	৩,৬০,১০০৲

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, ডাঃ কেরি চৌত্রিশ বছরে চার লক্ষেরও কম টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে তিনি যে চৌত্রিশ বছর পাঁচ মাস যুক্ত ছিলেন, সেই সময় গড়ে তাঁর মাসিক আয় ছিল ৮৭২৲ টাকা। এই টাকা থেকে ডাঃ কেরিকে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে হতো; তাঁর চার ছেলে, সুতরাং পরিবারের ব্যয় কম ছিল না। ১৮২২ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্সের মৃত্যুর পর থেকে বিধবা পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের যত দিন দরকার তত দিন ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; য়ুরোপবাসী আত্মীয়দেরও সাহায্য করতে হতো; তার উপর ছিল তাঁর বিশ বিঘার অধিক বিস্তৃত উদ্যানের ব্যয়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে এর চেয়ে বড় উদ্যান তখন ভারতবর্ষে আর কারো ছিল না। এ সব ব্যয় নির্বাহ করে যা-কিছু বাঁচত, তা ব্যয় করতেন যীশুর কাজে।

—আলেকজান্দার্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিন; ৯ম খণ্ড, ৫২ সংখ্যা, ১৮৩৫।

আদালতে পাদুকার মর্যাদা

সুপ্রীম কোর্টে একটি অসাধারণ আবেদন পেশ করা হয়েছিল। মিঃ টার্টন তাঁর মক্কেল সীতানাথ মল্লিকের পক্ষে আবেদন করেন যে, জেরার পূর্বে শপথ গ্রহণ করবার সময় যেন সীতানাথকে জুতা পরে থাকতে দেওয়া হয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভদ্রলোক শপথ গ্রহণ করতে এসে জুতা খুলতে অস্বীকার করায় শপথ না করিয়েই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে লোক তার বিবেকের নির্দেশ অনুসারে আদালতে সত্য কথা বলতে এসেছে, জুতা খুলতে অস্বীকার করায় সাক্ষী হিসাবে সে অযোগ্য প্রমাণিত হয় না। কিছুকাল পূর্বেও পথে ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখতে পেলে ভারতীয়দের গাড়ী কিংবা পালকি থেকে নেমে সম্মান প্রদর্শন করতে হতো; না নামলে শাস্তি পেত। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় মাষ্টারের সম্মুখে জুতা খোলবার ও পরবার ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার প্রয়োজন কি? জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী উঠেছে; য়ুরোপীয় সমাজে ভারতীয় রীতি গ্রহণে বাধা দেওয়া হবে কেন? হিন্দু আইনে সাক্ষীর উপর এরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। এক জোড়া পাদুকা হলো ব্রাহ্মণের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ পাদুকা পরে বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জুতা খোলবার দৃষ্টান্ত খৃষ্টান শাস্ত্রে একটির বেশী পাওয়া যায় না। কোর্ট এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সীতানাথকে জুতা পায়ে দিয়ে শপথ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, পূর্বে সীতানাথ মল্লিক সাধারণ জুতা পরে এসেছিল; আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সে বুট জুতা পরে আদালতে এসেছে!

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ৫ম খণ্ড, ২৬শ সংখ্যা, ১৮৩৩।

বাঙলা সংবাদপত্র

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর লোকের মনোভাব তারা যে সংবাদপত্র পড়ে ও সমর্থন করে তা থেকে জানা যায়। সভ্য জাতিগুলি সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয়ই সত্য; কিন্তু এ দেশের গোঁড়া ভারতীয়দের সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এরা সংবাদপত্র পড়তে উৎসুক নয়; যদিও তাদের পড়বার উপযোগী ধর্মবিষয়ক একটি মাত্র পত্রিকা আছে, তথাপি সে পত্রিকারও প্রচার খুব বেশী নয়। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হলো; এই থেকে বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারবে।

'জ্ঞানান্বেষণ' গত বারো মাস যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে, এবং এরই মধ্যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। এই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা খুব বেশী নয়; কিন্তু স্বত্বাধিকারী কিছু সংখ্যক পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করায় যাদের জন্য এই কাগজ, তারা উপকৃত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর করবার জন্য সর্বদা নিযুক্ত আছে।

'চন্দ্রিকা' সংরক্ষণশীল দলের পত্রিকা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মুখপত্র। ধর্মসভার সেক্রেটারী ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক; দেশের প্রচলিত কুসংস্কার নিয়ে লাভজনক খেলা করাই এই পত্রিকার ব্যবসা। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া 'চন্দ্রিকা' সর্বদাই জনসাধারণের ধর্মবিষয়ক ভ্রান্তি ও কুসংস্কার উদ্দীপ্ত করে তোলে। 'চন্দ্রিকা' একাধিক বার আমাদের দলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব আহ্বান করেছে; কিন্তু তার প্রকৃতি এমন যে ভদ্রতা রক্ষা করে যুদ্ধে যোগ দেওয়া যায় না। উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এর গালি ও অপবাদ ঠিক বাঙালী-প্রবৃত্তি-সুলভ। অভদ্রতা ও নীচতায় এর তুলনা পাওয়া ভার। 'চন্দ্রিকা' যে মিথ্যার বেসাতি করে থাকে তা অন্যান্য কাগজ কয়েক বার প্রমাণ করে দিয়েছে। এটা অবশ্য সম্পাদকের চোখে দোষের কথা নয়; যে হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে নেমেছে, তাকে যে শুধু অসত্য বলতে দেওয়া হয় তাই নয়, মিথ্যা বলবার জন্য উৎসাহিতও করা হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করবার পর আমাদের সহযোগীর ভাগ্য ফিরেছে; সতীদাহ নিষিদ্ধ করবার বিরুদ্ধে 'চন্দ্রিকা' এমন তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করল যে বহুসংখ্যক হিন্দু গ্রাহক-তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ল। কয়েক জন ধনী ব্যক্তির সহায়তায় 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ধর্মসভাকে দিয়ে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কার্যের বিরুদ্ধে আবেদন পাঠালেন। এত সব করা সত্ত্বেও হিন্দুরা কিন্তু 'চন্দ্রিকা' খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেনি।

'চন্দ্রিকা'র প্রভাব প্রতিরোধ করবার জন্য রামমোহন রায় 'কৌমুদী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কৌমুদী' উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করে। রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে 'চন্দ্রিকা' যে অপবাদ তাঁকে দেয়, তার প্রতিশোধ নিতে 'কৌমুদী' বড় জঘন্য ভাষা ব্যবহার করেছিল। রামমোহনের বন্ধুরা এ জন্য ব্যথিত হয়েছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁর কার্যকলাপ বন্ধুদের মনোবেদনা দূর করেছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা খুবই কম; শুধু কাগজ চালাবার মতো সামান্য সাহায্য পাওয়া যায়।

'সুধাকর' যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা সম্পাদকের পক্ষে গৌরবের কথা। লজ্জাজনক ভাষা ব্যবহার করে জনসাধারণের রুচিবোধে আঘাত দেবার রোগ এখনো একে স্পর্শ করেনি। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অথবা উদার দৃষ্টি দিয়ে কোনো বিষয়কে বিচার করা এই পত্রিকার রীতি নয়;—মধ্যপথ অবলম্বন করেই চলে। এ দেশের লোকদের মধ্যে এর পাঠক-সংখ্যা বেশ বিস্তৃত।

'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয় 'রিফর্মার প্রেস' থেকে। এর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী 'কৌমুদী'র অনুরূপ; 'বঙ্গদূত' সমাজ-প্রচলিত কুসংস্কারগুলির সরাসরি বিরোধিতাও করে না, আবার অন্ধভাবে বিশেষ সমর্থনও করে না।

'রিফর্মারে'র সম্পাদক 'অনুবাদিকা' বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। 'রিফর্মারে'র রচনাগুলি বাঙলায় অনুবাদ করে 'অনুবাদিকায়' প্রকাশিত হতো। কিন্তু এখন রিফর্মারই উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে না বলে 'অনুবাদিকা' বন্ধ হয়ে গেছে।

'তিমির নাশক' বৈশিষ্ট্যহীন ভাবে প্রকাশিত হয়; খুব কম লোকই পড়ে। এর উদ্দেশ্য রক্ষণশীল দলকে তুষ্ট করা; কিন্তু উদারপন্থীদের প্রতি কুৎসা ও অপবাদ বর্ষণ করেও কাগজের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

কিছু দিন পূর্বেও 'প্রভাকর' ও 'রত্নাকর' অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল; কিন্তু এখন তাদের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।

'জ্ঞানোদয়' একটি সাময়িক পুস্তিকা। বাঙলা দেশের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইংরেজী পাঠ্য-পুস্তক থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ 'জ্ঞানোদয়ে' প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত যতগুলি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথম খণ্ডটি সব চেয়ে ভালো।

'বিজ্ঞান সেবধি' 'জ্ঞানোদয়ে'র মতো আর একটি সাময়িক পত্র। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

আমরা এখনো 'সমাচার দর্পণে'র নাম উল্লেখ করিনি। কারণ, একে আমরা এ-দেশীয় কাগজ বলে গণ্য করবার যুক্তি দেখি না। 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক য়ুরোপীয়, এবং ইহা ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়।

বাঙলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রভাতে সংবাদপত্র পড়বার আগ্রহ এখনো হয়নি। 'চন্দ্রিকা' তাদের সব চেয়ে প্রিয় পত্রিকা, কিন্তু পাঠক খুব কম। ধর্ম-সভার সেক্রেটারী 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক হওয়ায় অনেকে গ্রাহক হয়েছে, কিন্তু পত্রিকা পড়বার কষ্টটুকু তারা করতে চায় না। জনসাধারণ যা চায় 'চন্দ্রিকা' তাই লেখে, এবং বাঙলা কাগজের ডাক মাশুল ইংরেজী পত্রিকার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও 'চন্দ্রিকা'র আরও বেশী প্রচার কেন হয়নি তা আশ্চর্যের বিষয়।

—'এনকোয়ারার' থেকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিনের
৫ম খণ্ড, ২১ সংখ্যায় (১৮৩৩) উদ্ধৃত।

বাঙালীর ছাপাখানা

১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারীরা কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১১ সালে বাবুরাম কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। বাবুরামই প্রথম হিন্দু যার ছাপাখানা থেকে দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য বাংলা বই ছাপা আরম্ভ হয়। এর পরে আরম্ভ করলেন শ্রীরামপুরের কর্মী গঙ্গাকিশোর। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বাঙলা বই মুদ্রণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি পুস্তক বিক্রয়ের জন্য প্রধান প্রধান শহর ও গ্রামে এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। লোকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর বই কিনত। ছ'বৎসর ব্যবসা চালাবার পর তিনি স্বগ্রামে চলে যান। ১৮২০ সালের শেষ ভাগে ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে অন্ততঃ চারটি ছাপাখানা ছিল এবং তারা সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকত। ছাপাখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে এখন কত দাঁড়িয়েছে তা আমাদের জানা নেই।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশনারীরা বাঙলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল এটি ছিল একমাত্র পত্রিকা। কিন্তু ১৮২৫ সালে প্রায় এক হাজার গ্রাহক সহ ছ'টি দেশীয় পত্রিকা ছিল। ১৮৩২ সালের মধ্যে অন্ততঃ আরো দশখানা কাগজ দেশীয় লোকদের পরিচালনায় কলকাতা থেকে

প্রকাশিত হয়েছে। 'সমাচার দর্পণে'র স্থান এখনো সকলের পুরোভাগে। সপ্তাহে দু'বার বের হয়; এবং এর জন্ত কম পরিশ্রম করতে হয় না, কারণ পাশাপাশি স্তম্ভে ইংরেজী ও বাঙলা থাকে। প্রত্যেকটি ইংরেজী লাইনের বাঙলা অনুবাদ পাশেই দিতে হয়। আজকাল শহরের পর শহরে 'সমাচার দর্পণ' ছড়িয়ে পড়েছে। এই পত্রিকা পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাতে সহায়তা করছে, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করছে এবং সংবাদের জন্ত সৃষ্টি করেছে আগ্রহের। ডাকঘরের মারফৎ 'সমাচার দর্পণ' বাঙলা হিন্দুস্থান, আসাম ও আরাকানে ছড়িয়ে পড়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল করে তুলতে সাহায্য করবে। এই পত্রিকার প্রায় এক শত ভারতীয় সংবাদদাতা আছে। ১৮৩২ সালের প্রথম তিন মাসে চারশ'র অধিক চিঠি পাওয়া গিয়েছিল।

ছাপাখানার সুযোগ পৌত্তলিকতার সাহায্যেও প্রয়োগ করা হয়েছে। ভারতীয় মালিকদের ছাপাখানা থেকে অসংখ্য বাজে বই প্রকাশিত হয়ে থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থও মুদ্রিত হয়। বহু যুগের জড়তা থেকে ভারতীয় মন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, এবং হিন্দুধর্মের অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। হিন্দুধর্ম এমনই অসঙ্গতির মিশ্রণ যে কোন কোন সংবাদপত্রের সমর্থন সত্ত্বেও এর প্রভাবের উপর মারাত্মক আঘাত না পড়ে উপায় নেই। বিশেষ করে অন্ত কোনো ভারতীয় পত্রিকা যদি ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দেয়, তাহ'লে তো কথাই নেই। দেশীয় ছাপাখানা এবং পত্রিকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, গোঁড়ামীকে নরম করে আনছে, এবং জনসাধারণকে প্রত্যেকটি বিষয় ভেবে দেখতে উৎসাহিত করছে।

—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ১ম খণ্ড, ৫৪ সংখ্যা, ১৮৩৫।

গঙ্গা নদীতে মৃতদেহ

কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গা নদীতে এত অধিক সংখ্যক মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায় যে, জাহাজী লোকদের পক্ষে এটা মস্ত বড় উৎপাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পূর্বেই এই অভিযোগের প্রতিকার করা উচিত ছিল। আমরা শুনেছি যে, মৃতদেহগুলি ডুবিয়ে দেবার জন্ত একটি নৌকা নিযুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু কাজ ঠিক হচ্ছে না। হয় নিযুক্ত লোকেরা কর্তব্যে অবহেলা করছে, কিংবা আরও লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। অতি অল্প ব্যয়েই তা হতে পারে। সম্প্রতি একটি জাহাজ থেকে সকাল বেলা সাতটি শব ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। জাহাজের অত্যন্ত নিকট দিয়ে যাওয়ায় মৃত মনুষ্য-দেহগুলি বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়েছিল। প্রায়ই দেখা যায় যে, শবগুলি জাহাজের দড়ি-কাছির সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে আটকে পড়ে; খালাসীরা এদের ছাড়িয়ে দিতে অনিচ্ছুক বলে জোয়ার না আসা পর্যন্ত মৃতদেহগুলি আটকে থাকে।

—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ৫ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা, ১৮৩৩।

সতী দাহ ও ব্রাহ্মসভা

গতকাল রাত্রিতে সতীদাহ প্রথার যাঁরা বিরোধী তাঁরা ব্রাহ্মসভা ভবনে মিলিত হন। সেই সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

(১) কলকাতার উদারপন্থী হিন্দুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সম্রাটকে সতীদাহ নিষিদ্ধ করবার জন্ত অভিনন্দন পত্র দেওয়া হবে।

(২) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ এ বিষয়ে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, সে জন্ত তাঁদের আর একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হোক।

(৩) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করেছেন, সে জন্ত তাঁকেও একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হোক্।

(৪) মানবতার জন্ত রাজা রামমোহন রায় যে অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, সে জন্ম উদারপন্থী দেশবাসীরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং তাঁকেও একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হোক। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত অভিনন্দনপত্র দুটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্তও রাজা রামমোহনকে অনুরোধ করা হোক্।

অতঃপর এই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হয়।

—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ৫ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা, ১৮৩৩।
'রিফর্মার' থেকে উদ্ধৃত।

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পনের
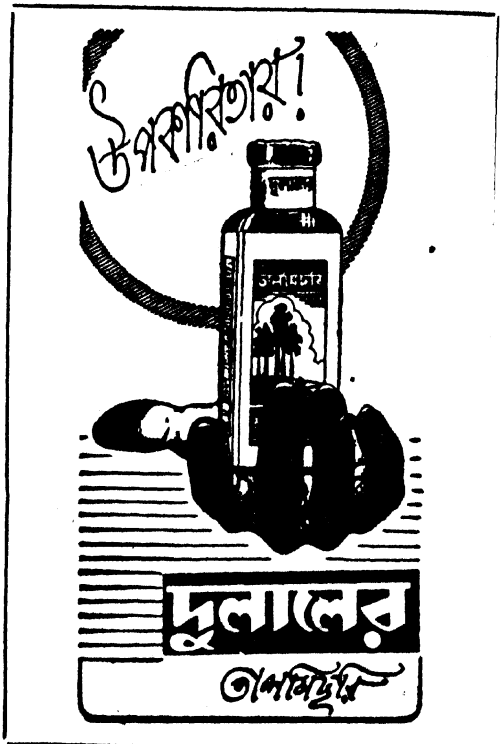
হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন মুহূর্তে একটা মোচড় দিয়ে আমাদের সকলের মনই তার দিকে আকর্ষণ করল। তাঁর দু' চোখের ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কিরীটির দু' চোখের 'পরে নিবদ্ধ! সমস্ত মুখে একটা গভীর উত্তেজনা যেন থম-থম করছে। দু'হাতের মুঠি যেন উপবিষ্ট ইনভ্যালিড চেয়ারটার হাতল দুটোর 'পরে লৌহ-কঠিন ভাবে চেপে বসে আছে।

কয়েকটা মুহূর্ত কারো কণ্ঠ হতেই কোন শব্দ বের হলো না। হরবিলাসকে কেন্দ্র করে ক্ষণপূর্বে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর আকস্মিক আবির্ভাব ও নাটকীয় উক্তি সেটাকে যেন আরো রহস্যঘন করে তুলল। একমাত্র কিরীটি ছাড়া আমরা উপস্থিত সেখানে সকলেই হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো কিরীটি। পকেট হ'তে সোনার সিগারেট-কেসটা বের করে একটা সিগারেট দুই ওষ্ঠের বন্ধনীতে চেপে ধরে, অগ্নিসংযোগ করবার জন্য ফস্ করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। এবং প্রজ্বলিত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ফেলে দিতে দিতে মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললে: 'আপনার কিছু বলবার থাকলে নিশ্চয়ই আমরা শুনবো হিরণ্ময়ী দেবী। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত কথা শোনা যাবে না। চলুন। আপনার ঘরে চলুন।'

আমরা সকলে অতঃপর কিরীটির আহ্বানেই যেন কতকটা হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সেই ঘর। ঠিক তেমনি ভাবে ঘরের সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ। ঘরের দেওয়ালে সেই পাশাপাশি দুটি নারীর অয়েল-পেনটিং দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দু'টি প্রতিকৃতি। যে ফটো দু'টি সম্পর্কে কয়েক দিন পূর্বে কিরীটি হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, কার ছবি তিনি জানেন না। এ কথাও মনে পড়লো তার উত্তরে কিরীটি পুনরায় প্রশ্ন করেছিল ওঁকে, শতদল বাবুর মা হিরণ্ময়ী দেবীর ভাইঝি কি না। জবাবে হিরণ্ময়ী দেবী বলেছিলেন: হাঁ।

'বলুন হিরণ্ময়ী দেবী! আপনার কি বলবার আছে!—' কিরীটিই বলে হিরণ্ময়ী দেবীকে।

'আপনাদের অনুমান ভুল। আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার কোন চেষ্টাই করেনি।'

'কিন্তু আপনার স্বামী যে গত পরশু সকালে বাজারে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কবিতা দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন, এ কথাও ঠিক!—' জবাবে বলে কিরীটি।

'গত পরশু উনি বাজারে গিয়েছিলেন সত্যি, তবে—'

হঠাৎ এমন সময় বাধা দিলেন হরবিলাস। এতক্ষণ তিনি চুপ করেই ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন: 'না। হিরণ, চুপ করো। কোন কথাই তোমার বলতে হবে না। মিঃ ঘোষাল! আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন। আমি প্রস্তুত।'

'তুমি থাম! আমাকে বলতে দাও!—' কতকটা যেন ধমকের সুরেই হিরণ্ময়ী তার স্বামীকে থামিয়ে দিলেন। কিন্তু আজ হরবিলাস যেন স্ত্রীর কর্তৃত্বে বাধা মানলেন না। জোর-গলায় বলে উঠলেন: 'কেন? কেন মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারী করছো হিরণ! যে গেছে সে ত ফিরবে না। চলুন না মিঃ ঘোষাল! কেন দেরী করছেন? চলুন না কোথায় নিয়ে যাবেন আমায়—'

'না। না—আমাকে বলতে দাও! পাষাণের মত গুরুভার হ'য়ে আমার বুকের মধ্যে চেপে বসেছে। এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না।—' উত্তেজনায় আবেগে হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

'হিরণ! হিরণ চুপ করো—ভুলে যাও। ভুলে যাও ওসব কথা!—' মিনতিতে করুণ হ'য়ে উঠে হরবিলাসের কণ্ঠস্বর।

'শুনুন মিঃ রায়! সীতাকে। আমি। হাঁ, মা হ'য়ে আমিই তাকে হত্যা করেছি!—'

'হিরণ! হিরণ—' চীৎকার করে ওঠেন হরবিলাস: 'কি বলছো তুমি পাগলের মত?'

হিরণ্ময়ী দেবীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে আমরা সকলেই নির্বাক্।

'হাঁ! আমি! আমিই সীতাকে হত্যা করেছি। আর। আর—যে আক্রোশের বশে সীতাকে আমি হত্যা করেছি সেই আক্রোশের বশেই শতদলকেও আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। এ্যারেষ্ট যদি করতে হয় কাউকেও, আমাকেই করুন। আমিই দোষী! সমস্ত দোষ আমারই—' কান্নায় গলার স্বর বুজে এলো হিরণ্ময়ী দেবীর।

'না। না—মিঃ রায়। হিরণ নির্দোষ। দোষী আমিই। সীতাকে আমিই হত্যা করেছি।—' বাধা দিলেন হরবিলাস।

'থাম ত তুমি! আমাকে বলতে দাও—' চিরাচরিত হিরণ্ময়ী যেন আবার জেগে উঠলেন। সেই আধিপত্যলোভী নারী! নিজস্ব স্বকীয়তায়, নিজস্ব অহমিকায়। স্ত্রীর তর্জনে হরবিলাস একেবারে ঝিমিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত আগেকার তাঁর

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
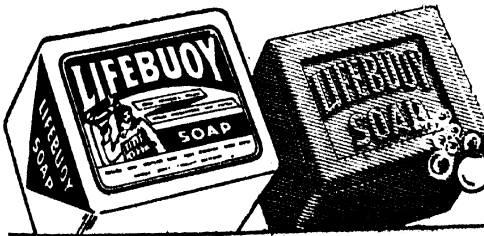
কষ্টার্জিত পৌরুষ যেন একটি মাত্র তর্জনে ভেঙ্গে চুপসে গেল। তবু শেষ বারের মত বুঝি স্ত্রীকে নিরস্ত করবার চেষ্টায় ক্ষীণ মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন: 'যা চুকে-বুকে গিয়েছে, সেই অতীতকে দিনের আলোয় টেনে এনে কি লাভ আর হিরণ !'

'না! আমাদের যদি শাস্তি পেতেই হয়, সব কথাই বলে যাবো। কারণ আমি জানি, এখানে এমন এক জন আছেন যাঁর দৃষ্টির সামনে সত্যকে একটা আবরণ দিয়ে কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না!—' বলতে বলতে হিরণ্ময়ী দেবী বারেকের জন্ত কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

আর কেউ ঘরের মধ্যে উপস্থিত হিরণ্ময়ী দেবীর শেষের কথাগুলোর তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পারলেও আমি পারলাম।

'কিরীটি বাবু! সব কথাই আমি বলব। কিন্তু বলবার আগে একমাত্র আপনি ও ইচ্ছা করলে সুব্রত বাবু ব্যতীত আর সকলকে, এমন কি আমার স্বামীকেও অনুগ্রহ করে এ-ঘর থেকে যেতে বলুন।—'

হিরণ্ময়ী দেবীর অনুরোধে কিরীটি চোখের ইংগীতে বাকী সকলকে ঘর ছেড়ে যেতে বলল। এবং সকলেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত রইলাম আমি, কিরীটি ও হিরণ্ময়ী দেবী।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করছে, আর সেই স্তব্ধতার বুক চিরে অদূরে টেবিলের 'পরে রক্ষিত টাইমপিসটা কেবল একটানা টিক্-টিক্ শব্দ করে চলেছে।

হিরণ্ময়ী দেবীর অনুরোধে সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেও কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত হিরণ্ময়ী কোন কথাই বলতে পারলেন না। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। স্তব্ধ অনড় পাষাণ প্রতিমার মত বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী ইনভ্যালিড চেয়ারটার 'পরে।

সামনেই দু'টি চেয়ারে আমি আর কিরীটি বসে।

হিরণ্ময়ী এক সময় মুখ তুলে কারো দিকে না তাকিয়েই বলতে শুরু করলেন। এবং বলবার সঙ্গে সঙ্গে কোলের উপর থেকে এতক্ষণ পরে উলের বুননটা তুলে নিয়ে দুই হাতে বুনে চললেন।

শিল্পী রণধীর চৌধুরী তাঁর পিতা লক্ষপতি শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর একমাত্র পুত্র-সন্তান ছিলেন। পূর্ববঙ্গে শুধু জমি-জমাই নয় ব্যাংকেও মজুত ছিল শশাঙ্ক চৌধুরীর লক্ষাধিক টাকা তিন-চার পুরুষ ধরে অর্জিত বিত্ত। শশাঙ্ক ছিলেন যেমনি হিসাবী তেমনি অর্থগৃধ্নু। আর তার একমাত্র ছেলে রণধীর হলো ঠিক উল্টো। যেমন খেয়ালী তেমনি দিলদরিয়া স্বভাবের। অল্প বয়েসেই শশাঙ্ক চৌধুরীর স্ত্রী জগত্তারিণীর মৃত্যু হয়। লৌকিক ভাবে তিনি আর দ্বিতীয় বার 'বিবাহ না করলেও তার এক বিধবা শালী জ্ঞানদা তার গৃহে ছিল। তাকে তিনি এনেছিলেন অসুস্থ স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করতে। কারণ মৃত্যুর আগে বৎসর চারেক জগত্তারিণী নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগে এক প্রকার শয্যাশায়িনী ছিলেন। সেই জ্ঞানদারই গর্ভে জন্ম হলো হিরণ্ময়ীর। লোকে হিরণ্ময়ীকে জগত্তারিণীরই সন্তান জানলেও আসলে তার জন্ম জ্ঞানদারই গর্ভে। রণধীর আর হিরণ্ময়ী মাত্র তিন বৎসরের ছোট-বড় ছিল এবং রণধীর বহু দিন পর্য্যন্ত জানতে পারেনি হিরণ্ময়ী তার মায়ের পেটের বোন নয়। জানতে পারলে তার পিতার মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে। কিন্তু সে কথা পরে। শশাঙ্ক জীবিত কালেই হিরণ্ময়ীর খুব অল্প বয়সেই হরবিলাসের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে যান। শশাঙ্কের মৃত্যুর সময় হিরণ্ময়ী কাছে ছিলেন না। তবে তাঁর মৃত্যুর মাস দুই পূর্বে পিতার লিখিত এক চিঠিতে হিরণ্ময়ী জানতে পেরে-ছিলেন, শশাঙ্ক তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমান দুই ভাগে রণধীর ও হিরণ্ময়ীকে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী যখন পিতৃগৃহে এলেন এবং কথায় কথায় এক দিন পিতার অর্ধেক সম্পত্তির কথা দাবী তুললেন, রণধীর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

'সম্পত্তি! সম্পত্তি কিসের। কি তুই বলছিস হিরু?—'

'ঠিকই বলছি। বাবার সম্পত্তিতে আমাদের দু'জনের সমান অধিকারই আছে, কারণ—'

'কারণটা বলেই ফেল তাহ'লে শুনি!—'

'কারণ তুমিও যেমন বাবার সন্তান, আমিও তেমনি তার সন্তান!—'

'সন্তান! হাঁ, তা বটে। তবে অবৈধ সন্তান!'

'দাদা!—' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠেন হিরণ্ময়ী দেবী।

'হাঁ! আইন বলে জারজ সন্তানের পিতৃ-সম্পত্তির 'পরে কোন অধিকার বা দাবীই থাকতে পারে না।'

'দাদা!—'

'হাঁ! ঠিকই বলছি। তোমার মা অর্থাৎ আমার বিধবা মাসী বাবার সঙ্গে তাঁর যা-ই সম্পর্ক থাক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্র বা আইন-সিদ্ধ ভাবে স্ত্রীর মর্যাদা বা অধিকার দেননি এবং তিনি এখনো জীবিত। তাঁকে ডেকে শুধালেই সমস্ত কিছু জানতে পারবে।—'

রাগে, ঘৃণা-লজ্জা ও অপমানে হিরণ্ময়ীর সর্বাঙ্গ তখন থর-থর করে কাঁপছে। চেঁচামেচি বা ঝগড়া করবারও উপায় নেই। স্বামী হরবিলাস তখন নীচে। হরবিলাস যদি সব কথা শুনতে পায় তার বিবাহিত জীবন সেখানেই শেষ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে মা। হাঁ, মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। পাশের ঘরে গেলেন হিরণ্ময়ী। জ্ঞানদা দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন। শুভ্র থান-পরিহিতা জ্ঞানদা দাঁড়িয়েছিলেন প্রস্তরমূর্ত্তির মত ঘরের জানালার সামনে। মেয়ে এসে ডাকলে: মাসী! চিরদিন যে ডাকে অভ্যস্ত সেই 'মাসী' ডাকেই।

জ্ঞানদার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশ্য হিরণ্ময়ীর বুঝতে বাকী ছিল না, পাশের ঘর হ'তে তার ও রণধীরের ক্ষণপূর্বের কথা-বার্তা সমস্তই তাঁর কানে এসেছে। সব কিছুই তিনি শুনেছেন।

'মাসী?—'

এবারে জ্ঞানদা মেয়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে নিঃশব্দ ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেই পাষাণের মত স্তব্ধ মূর্তি! সেই নিঃশব্দ অশ্রুধারা মুহূর্তে যেন একটা চরম হাহাকারে হিরণ্ময়ীর বুকের মধ্যে এসে আছড়ে পড়ল।

'হাঁ। হিরণ! সব—সব সত্যি! তুই এই অভাগিনীরই কলঙ্কের ফুল!—' বলতে বলতে জ্ঞানদা দুই হাতে বোধ করি নিজের দুঃসহ লজ্জাটাকে ঢাকবার জন্তই মুখ ঢাকলেন।

হিরণ্ময়ী নির্বাক!

জ্ঞানদা এগিয়ে আসছিলেন দুই হাতে মেয়েকে বুকে নেবার জন্ত কিন্তু পাগলের মত ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন হিরণ্ময়ী: না। না—তুমি আমায় ছুঁয়ো না। তুমি আমার কেউ নও। আমি তোমার কেউ নই।···কলঙ্কিনী। রাক্ষুসী!—বলতে বলতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে পা পিছলে গড়াতে গড়াতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

'সেই পড়ে গিয়ে পিঠের শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিন মাস শয্যায় পড়ে রইলাম। সুস্থ হলাম কিন্তু—'

'কিন্তু জন্মের মত আপনার শিরদাঁড়ার হাড় নষ্ট হয়ে গিয়ে একটা কুঁজের মত হ'য়ে গেল—' কথাটা বললে কিরীটি।

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'কারণ প্রথম দিন আপনার দুই পা ও কোমরের গঠন থেকেই বুঝেছিলাম আপনি যে বলেছিলেন paralysisয়ে আপনি ভুগছেন সেটা সত্য নয়। কোমরে বা পায়ে আপনার কোন রোগ নেই। ইনভ্যালিড চেয়ারের আপনি ভেক্ নিয়েছেন অন্ত কোন কারণে। এবং দ্বিতীয় দিনেই আমার দৃষ্টিতে আপনার পিঠের কুঁজটা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং বুঝেছিলাম ঐ কারণেই নিজের বিকল দেহটাকে ঢেকে রাখবার জন্ত আপনি সর্বদা ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে থাকেন।'

'ঠিক তাই! দীর্ঘ দিন ধরে ইনভ্যালিড চেয়ার ব্যবহার করে করে এখন এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা বলছিলাম!—'

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী আবার শুরু করলেন।

হিরণ্ময়ী কিন্তু তবু পিতৃ-সম্পত্তির লোভ দমন করতে পারলেন না। রণধীরের কাছে বাপের লেখা চিঠিটার কথা উল্লেখ করলেন।

'বাবার চিঠির দ্বারাই আমি প্রমাণ করবো বাবার সম্পত্তির অর্ধেক আমার।'

'তা করতে পার। তবে ঐ সময় এ কথাও আমি কোর্টে প্রকাশ করবো তোমার সত্যকার পরিচয়। তার চাইতে আমি যা বলি তাই করো।'

'কি?'

'বিশ হাজার টাকা তোমাকে আমি নগদ দেবো। আর আমার উইলে provision রেখে যাবো তোমার ও আমার সন্তান আমার সম্পত্তি সমান ভাগে পাবে।'

'কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি? যদি তুমি তোমার কথা না রাখো?'

'লিখে দিচ্ছি—'

'বেশ। তাহ'লে রাজী আছি।'

'কিন্তু চিঠির মধ্যে এই সর্তও থাকবে। কোনক্রমে ঐ চিঠি যদি আমার মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ পায় ত—ঐ condition নাকচ হ'য়ে যাবে। রাজী আছো তাতে?'

'রাজী।—'

সেই ভাবে রণধীর একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও চিঠি নিয়ে হিরণ্ময়ী ফিরে গেলেন স্বামীকে নিয়ে কলকাতায়। একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার চাইতে তবু কিছু পাওয়া গেল।

তার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর দু'জনে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তবে হিরণ্ময়ী শুনেছিলেন, রণধীর তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার দুই যমজ কন্যা বনলতা ও সোমলতাকে নিয়ে নিরালায় এসে বসবাস করছেন।

কিরীটি আবার এইখানে বাধা দিল: ঐ ছবি দুটি তাহলে তাদেরই।

'হাঁ।—বনলতা আর সোমলতা দুই বোন। দাদারই হাতে আঁকা ছবি।'

তবে যে আপনি সেদিনকার আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন বনলতা আর সোমলতা একে অন্ত হ'তে চার পাঁচ বছরের ছোট-বড়। মিথ্যা বলেছিলেন! বলুন?—'

'হাঁ।—'

[ক্রমশঃ।

বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগল-যুগের ভারত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

দিল্লী ও আগ্রা—(৪)

গোসলখানায় ব'সে সম্রাট যদিও এইসব কাজকর্ম করেন, তাহ'লেও আমখাসের মতন আদবকায়দা সেখানেও বজায় রাখা হয়। তবে দিনের শেষে কাজ শুরু হয় ব'লে এবং গোসলখানার সংলগ্ন কোন মুক্ত চত্বর না থাকার জন্য, ওমরাহদের অশ্বারোহী সেনার কোন কুচকাওয়াজ দেখানো সেখানে সম্ভব হয় না। গোসলখানার সান্ধ্য সভায় একটি উৎসব বিশেষভাবে পালন করা হয় দেখেছি। মনসবদার যাঁরা পাহারা থাকেন তাঁরা সম্রাটের সামনে দিয়ে একবার ক'রে সমারোহে 'সেলাম' ক'রে যান। তাঁদের হাতে নানারকমের 'প্রতীক' থাকে এবং দৃশ্যটি নানাদিক থেকে বিশেষ উপভোগ্য হয়। প্রতীকের মধ্যে অনেকগুলি রূপোর মূর্তি থাকে, রূপোর দণ্ডের উপর বসানো। তার মধ্যে দু'টি মূর্তি হ'ল বড় বড় মাছের মূর্তি; দু'টি হ'ল বৃহদাকার কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর মূর্তি, নাম 'আশদাহ'—একরকমের ড্রেগন বিশেষ। এছাড়া দু'টি সিংহের মূর্তি, দুটি হাতের পাঞ্জার মূর্তি, একজোড়া দাঁড়িপাল্লা এবং আরও অনেক কিছুর মূর্তি প্রতীকরূপে মনসবদাররা বহন ক'রে নিয়ে যান। এই সব প্রতীকের নাকি একটা গভীর তাৎপর্য আছে। মনসবদারদের সঙ্গে গুর্জবরদাররাও থাকে, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ সব। তাদের কাজ হ'ল, সভাকালীন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজাদেশ পালন করা এবং প্রয়োজন হ'লে সম্রাটের হুকুম বিদ্যুৎগতিতে তামিল করা।

হারেম-বর্ণনা

এইবার আপনাকে মোগল বাদশাহের হারেম বা জেনানা-মহলের সামান্য পরিচয় দেব। কিন্তু জেনানা-মহলের গৃহবিন্যাস বা স্থাপত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই, কোন পর্যটকেরই নেই। সম্রাটের সেই হারেমের অন্দরমহল দেখার সৌভাগ্য কারও হয়নি আজ পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে দিল্লী থেকে সম্রাট যখন চলে যেতেন বাইরে, তখন আমি দু'একবার অনেক চেষ্টা ক'রে জেনানা-মহলের মধ্যে ঢুকেছি এবং কিছুটা দেখেছি। একবার সম্রাট বেশ কিছুদিনের জন্য দিল্লী থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় জেনানা-মহলের কোন মহিলার কঠিন অসুখ হয়। বাইরে আসা, যেকোন কারণে, তাঁদের নিষেধ। পর্দাপ্রথা সনাতন প্রথা। সুতরাং চিকিৎসক হিসেবে আমাকেই অন্দরমহলে যেতে হ'ল। যেতে যখন বাধ্য হলাম তখন দু'চোখ খুলে দাওয়া সম্ভব হ'ল না। একটি বড় কাশ্মিরী শাল দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হ'ল। অতঃপর একজন খোজা এসে আমাকে হাত ধ'রে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। অন্ধের মতন আমি বেগমমহলে প্রবেশ করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু আমার পথপ্রদর্শক খোজার মুখে হারেমের কথা শুনে যা বুঝলাম, তাই আপনাকে বলছি।

খোজারা বলল,—জেনানা-মহলে সুন্দর সুন্দর সব কামরা আছে। বেশ বড় বড় কামরা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, এক কামরার সঙ্গে অন্য কামরার কোন যোগাযোগ নেই। কামরার বাহার ও বাইরের পরিপাটিও আছে যথেষ্ট। যেমন জেনানা, তেমনি তার কামরা। যিনি উচ্চপদস্থ, যাঁর রোজগার বেশী, তাঁর কামরাটিও তেমনি বাহারে। যিনি সেরকম নন, তাঁর কামরারও তেমন বাহার নেই। চারিদিকেই বাগান আছে জেনানা-মহলের, সুন্দর সাজানো বাগান ও বাগিচা। প্রত্যেক কামরার দরজার কাছে একটি ক'রে জলের ট্যাঙ্ক আছে। সুন্দর সুন্দর মনোরম রাস্তা, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন, ঝরণা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, উঁচু মঞ্চ ও তোরণ ইত্যাদিও আছে। এমনভাবে সব ব্যবস্থা করা আছে যে, জেনানা-মহলের সীমানার মধ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ কিছু বোঝা যায় না। সূর্যকে আড়াল ক'রে আনন্দ করার মতন আরামকুঞ্জ আছে, আবার উচ্চ মঞ্চের উপর শুয়েব'সে চাঁদের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করবার মতন ব্যবস্থাও আছে। নদীর সামনে একটি ছোট মিনারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুনেছি খোজাদের। মিনারটি নাকি সোণার পাত দিয়ে মোড়া, আগ্রার দুটি মিনারের মতন। তার কক্ষগুলিও স্বর্ণমণ্ডিত এবং নানারকম রঙীন চিত্রে সুশোভিত। বড় বড় আয়নাও আছে দেয়ালের গায়ে লাগানো (বার্নিয়ের 'খাসমহলের' কথা বলছেন)।

এবার রাজদুর্গ থেকে বিদায় নেবার আগে আর একবার আমখাসের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। মনে করিয়ে দেবার বিশেষ কারণ আছে। আমখাসে আমি কতকগুলি বাৎসরিক উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান দেখেছি। বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, সমারোহ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে তার তুলনা হয় না। আমি অন্ততঃ আর কখনও সেরকম অনুষ্ঠান দেখিনি।

আমখাসের উৎসব

আমখাসের হলঘরের প্রান্তে সিংহাসনের উপর সম্রাট রাজপোশাক প'রে উপবেশন করেন। সাদা ধবধবে সাটিনের

মের্জাই গায়ে, রেশম ও সোণার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তার উপর। শিরস্ত্রাণও স্বর্ণখচিত কাপড়ের তৈরী, মাথার গোড়ায় নানাকারের হীরে বসানো। মধ্যে একটি ওরিয়েণ্টাল 'পুষ্পরাগ' বা পোখরাজ, সূর্যের কিরণের মতন দ্যুতি বিস্ফারিত হয়ে আসে যার ভিতর থেকে। তুলনা হয় না তার সৌন্দর্যের। (১) গলায় একটি মুক্তার মালা, উদর পর্যন্ত লম্বা। হিন্দুস্থানের অন্যান্য ভদ্রলোকরাও এরকম মালা পরেন, প্রবালের মালা। সিংহাসনের দু'টি পায়া, একেবারে নীরেট সোণার, তার উপর হীরে, পান্না, চুণি তারার মতন ছড়ানো। কতরকমের মণিমুক্তারত্ন এবং তার মূল্যই বা কত, তা সঠিকভাবে আমি আপনাকে বলতে পারব না, কারণ আমি জহুরী নই এবং সবরকমের মণিরত্ন সকলের পক্ষে চেনাও মুশকিল। তবে আমার মনে হয়, সিংহাসনটির মূল্য অন্ততঃ চার কোটি টাকার কম নয়। একশ' হাজারে এক লক্ষ, এবং একশ' লক্ষেতে এক কোটি হয়। সুতরাং সিংহাসনের মূল্য প্রায় চারশ' লক্ষ টাকার সমান হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পিতা শাজাহান এই সিংহাসনটি তৈরী করিয়েছিলেন। প্রচুর মূল্যবান মণিরত্ন রাজকোষে মজুত হয়েছিল, দেশীয় নৃপতিদের ও পাঠান রাজাদের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা মণিরত্ন, বাৎসরিক নজর ও উপঢৌকনরূপে পাওয়া মণিরত্ন, আমীর-ওমরাহদের বিশেষ বিশেষ উৎসবে উপহার দেওয়া রত্ন। সম্রাট শাজাহান তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন এই সিংহাসনটি তৈরী ক'রে। সিংহাসনের নির্মাণকৌশল বা কারিগরি তার মণিরত্নের উপাদানের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হয় না। কেবল মণিমুক্তা খচিত ময়ূর দু'টি প্রশংসার যোগ্য। পরিকল্পনা ও কারিগরি দুইই ভাল। (২) একজন খুব ক্ষমতাশালী শিল্পী এই ময়ূর দু'টি তৈরী করেছিল, ফরাসী শিল্পী, নাম——। (৩) অদ্ভুত কৌশলে নকল মণিরত্ন দিয়ে ইয়োরোপের রাজাদের প্রতারণা ক'রে, তিনি শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পালিয়ে এসে হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাটের রাজদরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে কাজ ক'রে ফরাসী শিল্পীর ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল।

রাজসিংহাসনের পায়ের কাছে আমীর-ওমরাহরা একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর, জমকালো পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্ল্যাটফর্মটি একটি রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা, মাথার সোণার ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। হলঘরের স্তম্ভগুলিতে সোণার কাজ-করা দামী ব্রকেড ঝলানো থাকে। ফুলতোলা সাটিনের চাঁদোয়া আগাগোড়া টাঙানো, লাল রেশমী দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং সেই বাঁধনের কাছ থেকে বড় বড় রেশমের ও সোণার সব ট্যাসেল ঝুলানো। মেঝেটি সিল্কের কার্পেট দিয়ে মোড়া। এত বড় কার্পেট বা গালিচা দেখা যায় না। একটি প্রকাণ্ড তাঁবু বাইরে খাটানো থাকে, হলঘরের চাইতেও বড়। তাঁবুর সঙ্গে হলঘরের যোগও থাকে। প্রাঙ্গণের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে তাঁবু খাটানো হয়, চারিদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা, রূপোর পাত দিয়ে মোড়া। তাঁবুর ভার বহন করে মোটা মোটা থামের মতন পোষ্ট, কয়েকটা বেশ মোটা, বড় জাহাজের মাস্তুল-পোষ্টের মতন। অন্যগুলি ছোট। তাঁবুর উপরের দিকটা লাল রঙের, ভিতরের দিকটা চমৎকার মসলিপত্তনের কাপড় দিয়ে সাজানো। কাপড়টিতে বড় বড় ফুল তোলা। নানা রঙের ফুল। এত স্বাভাবিক দেখতে ফুলগুলি এবং এত উজ্জ্বল রং যে তাঁবুটি যেন সত্যিই ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা মনে হয়।

চারিদিকে যেসব গ্যালারী ও আর্কাদ আছে, সেগুলি ভাল ক'রে সাজাবার ভার পড়ে ওমরাহদের উপর। এক-একজন আমীর একটি ক'রে গ্যালারী সাজাবার দায়িত্ব নেন। তার জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন যাতে তাঁর নিজের গ্যালারীটি সবচেয়ে ভাল সাজানো হয় এবং সম্রাট দেখে সবচেয়ে বেশী খুশী হন ও বাহবা দেন। তার ফলে গ্যালারী সাজানো খুব চমৎকার হয়, এবং প্রত্যেক আর্কাদ ও গ্যালারী আগাগোড়া গালিচা ও ব্রকেড দিয়ে ঢাকা থাকে।

উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট এবং সম্রাটের পরে তাঁর আমীর-ওমরাহরা দাঁড়িপাল্লায় নিজেদের ওজন করান। দাঁড়িপাল্লা ও বাটকারা দুই নীরেট সোণার তৈরী। আমার বেশ মনে আছে, যে-বছরের কথা আমি বলছি, সেই বছরের উৎসবের সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের ওজন নিয়ে যখন দেখা গেল যে তার আগের বছরের তুলনায় দুই পাউণ্ড বেড়েছে, তখন সকলে তুমুল হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলো।

এইরকম উৎসব প্রত্যেক বৎসরেই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যে-বৎসরের কথা আমি বলছি বা যে অনুষ্ঠান আমি দেখেছি, সেরকম জাঁকজমক ও সমারোহ সাধারণত কোন বৎসর হয় না। শোনা যায়, উৎসবের এই সমারোহের বিশেষ একটা কারণ ছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ ক'রে রেশম, ব্রকেড ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের কেনাবেচা একরকম ছিলই না বলা চলে। সম্রাট ঔরঙ্গজীব এই উৎসবের মাধ্যমে কয়েক বছরের সঞ্চিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন বণিকদের। ওমরাহদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছিল এই উৎসবে, তা কল্পনাতীত। কিছুটা এই অর্থের অংশ সাধারণ সেপাইদের ভাগ্যেও জুটেছিল, কারণ

---

(১) এই রত্নটিই মনে হয় পর্যটক তাভার্নিয়েরকে (Tavernier) দেখানো হয়েছিল, ১৬৬৫ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে (Tavernier: Travels, vol I, 400)। তাভার্নিয়ের রত্নটির বর্ণনা করেছেন—"of very high colour, cut in eight panels"—ব'লে। রত্নটির ওজন 'ইংরেজী' ১৫২ ক্যারাটের কিছু সামান্য বেশী ব'লে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে গোয়া থেকে এটি মোগল বাদশাহের জন্য ১৮১,০০০৲ টাকায় কেনা হয়।

(২) পর্যটক তাভার্নিয়েরও এই সিংহাসনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে (Travels, vol I, 381-385)। তেহারণ ট্রেজারীতে পারস্যের শাহার দখলে এখন এই সিংহাসনটি রয়েছে। নাদীর শাহ যখন ১৭৩১ খৃঃ অব্দে দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন এই সিংহাসনটি পারস্যে নিয়ে যান।

(৩) বার্নিয়ের শিল্পীর নামটি প্রকাশ করেননি কেন জানা যায় না, কিন্তু বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীর ইষ্টার্ট সংস্করণে (কলিকাতা ১৮২৬) "La Grange" নামে একটি নাম পাওয়া যায়। নামটি সত্য কি মিথ্যা তা অবশ্য বলবার উপায় নেই।

ওমরাহরা তাদের মের্জা'ই তৈরী করার জন্তও ব্রকেড কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহুকালের একটি প্রাচীন প্রথাও পালন করা হয়ে থাকে। প্রথাটি ওমরাহদের কাছে খুব প্রীতিকর নয়। প্রথাটি হ'ল, বাৎসরিক উৎসবের সময় সম্রাটকে পদমর্যাদা ও তনখা অনুযায়ী প্রত্যেক ওমরাহের পক্ষ থেকে ভেট বা উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা। কেউ কেউ অবশ্য এই সুযোগে বেশ মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সম্রাটকে খুশী করার সুযোগও পান। অনেক কারণে তারা এই সুযোগ খোঁজেন। সরকারী কর্মচারী যিনি যা অপকর্ম, অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, যাতে সে সম্বন্ধে কোন তদন্ত না হয়, অথবা সম্রাট তার জন্ত কোন কৈফিয়ৎ না তলপ করেন, তার জন্তও কেউ কেউ অপ্রত্যাশিত ভাবে বহু মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে সম্রাটের কাছে হাজির হন। কেউ কেউ আবার ভাল সেলামী দেন নিজেদের পদোন্নতি বা তনখাবৃদ্ধির জন্ত। কেউ উপঢৌকন দেন বহু মূল্যবান মণিরত্ন—হীরে জহর পান্না চুণি ইত্যাদি; কেউ দেন সোণার পাত্র, রত্নখচিত; কেউ দেন সোণার মোহর। একবার এই উৎসবের সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীব জাফর খানের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর উজীর ব'লে নয়, আত্মীয় ব'লে। জাফর খাঁ তাঁকে এক লক্ষ ক্রাউন মূল্যের সোণার মোহর, সুন্দর সুন্দর মুক্তা, চুণি ইত্যাদি প্রায় চল্লিশ হাজার ক্রাউন মূল্যের রত্ন উপহার দিয়েছিলেন। অবশ্য সম্রাট শাজাহান নাকি এইসব রত্নের মূল্য আরও অনেক কম ব'লে ধার্য করেছিলেন, পাঁচশ' ক্রাউনেরও কম। তাতে অনেক বড় বড় সাচ্চা জহুরী পর্যন্ত বোকা ব'নে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁরাও তার সঠিক মূল্য যাচাই করতে পারেননি।(৪)

হারেমের মেলার বর্ণনা

এই উৎসবের সময় হারেমে বা জেনানা-মহলে একটি অদ্ভুত ধরনের মেলা হয়।(৫) মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নেন আমীর-ওমরাহদের পত্নীরা এবং সাধারণতঃ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী স্ত্রী যাঁরা তাঁরা। বড় বড় আমীর-ওমরাহ ও মনসবদারদের সুন্দরী ভার্যারাই হারেমের এই বিচিত্র মেলার পরিচালিকা। যে সমস্ত দ্রব্য মেলায় সাজানো হয়, তার মধ্যে জরীর ফুললতাপাতা-তোলা রেশমী কাপড়, ভাল ভাল সূচীশিল্প, সোণার কারুকাজ-করা শিরস্ত্রাণ, দামী মসলিন ও অন্তান্ত নানারকমের সব বিলাসের সামগ্রী। মেলার বিশেষত্ব হ'ল, সুন্দরী পরিচালিকারা (আমীর ও মনসবদারদের স্ত্রী) বিচিত্র বেশবিন্তাস ক'রে বেচাকেনার কাজ করেন। তাঁরাই বিক্রেতা সাজেন। ক্রেতা হলেন সম্রাট, তাঁর বেগমরা এবং হারেমের নামজাদা মহিলারা। যদি কোন আমীর-পত্নীর কোন বয়স্থা সুন্দরী কন্তা থাকে, তাহ'লে তিনি তাকেও সঙ্গে ক'রে সাজিয়ে-গুজিয়ে মেলায় নিয়ে যান, যাতে কন্তাটির দিকে সম্রাট ও তাঁর বেগমদের নজর পড়ে এবং তার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হন। মেলার প্রধান আকর্ষণ হ'ল, কেনাবেচার চমৎকার হাস্তকর অভিনয়টি। সম্রাট নিজে ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্তর দেখেন এবং সুন্দরী বিক্রেতা আমীর-মনসবদার-পত্নীদের সঙ্গে দরদস্তরও করেন। দরদস্তরের ভঙ্গিমাটি খুব মজার। অনেক সময় সামান্ত দু'চার পয়সা নিয়ে সম্রাট দর-কষাকষি করেন সুন্দরীদের সঙ্গে এবং এমন ভাব দেখান যে তিনি তার বেশী এক কড়িও বেশী মূল্য দিতে নারাজ। সম্রাট বলেন—"তোমরা বেশী দাম চাইছ, যেরকম জিনিস নয় তার চেয়ে বেশী। তাহ'লে রইল তোমাদের জিনিস, আমি চললাম অন্ত কারও কাছে, দেখি যদি ঐ দামে কেউ বিক্রী করে।" এইরকমের অনেক কেনাবেচার কথাবার্তা হয়। সুন্দরীরাও তখন সম্রাটকে নানাভঙ্গীতে জিনিস গছাবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে নিয়ে বেশ টানাটানি চলে। সম্রাটও সহজে ছাড়ার বান্দা নন। দুই পক্ষে যখন টানাটানি ও কষাকষির অভিনয় চলে তখন সম্রাট যদি কিছুতেই রাজী না হন, তাহ'লে সুন্দরী আমীর-পত্নী ও মনসবদার-পত্নীরাও মুখ ঘুরিয়ে বেশ জোর গলায় দু'চার কথা শোনাতে ছাড়েন না। তাঁরাও সম্রাটকে বলেন: "না নেবেন না নেবেন! আপনি এসব জিনিসের কদর বুঝবেন কি ক'রে? দেখেছেন কখন এমন জিনিস? বেশ, না নেন যদি তাহ'লে দেখুন অন্ত কোথাও সুবিধে পান কি না"—ইত্যাদি। এইভাবে কেনাবেচার একটা রঙ্গতামাসা চলতে থাকে মেলার মধ্যে। সম্রাটের বেগমরা সস্তায় কেনার আগ্রহ আরও যেন বেশী ক'রে দেখান এবং নানারকম অভিনয় করেন দর নিয়ে। মধ্যে মধ্যে আমীর-পত্নী ও মনসবদার-পত্নীদের সঙ্গে সম্রাট ও তাঁর বেগমদের দরাদরি ও তর্কবিতর্ক রীতিমত কলরবে পরিণত হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটি মিলে একটি চমৎকার কৌতুকনাট্যের অভিনয় করা হয় ব'লে মনে হয়। অবশেষে সুন্দরীরা অবশ্য জিনিস বিক্রী করতে রাজী হন সম্রাট ও বেগমদের কাছে। তখন সম্রাট ও তাঁর বেগমরা অনর্গল জিনিস কিনতে থাকেন মেলা থেকে, এবং অনর্গল টাকা দিতে থাকেন। তারই মধ্যে কাঁকে কাঁকে হয়ত সম্রাট দাম ছাড়াও দু'চারটে সোণার মোহর সুন্দরী বিক্রেতা অথবা তাঁদের রূপসী কন্তাদের বিতরণ করেন পুরস্কার স্বরূপ। 'সাধু ব্যবসায়ী' বলে তিনি পুরস্কার দেন। গোপনেই সকলে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এবং হাসিঠাট্টা রঙ্গতামাসার মধ্যে এইভাবে হারেমের মেলাটি শেষ হয়ে যায়।

---

(৪) তাভার্নিয়েরের বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্রাট ঔরঙ্গজীব একবার নাকি শাজাহানকে, একজন জহুরী মনে করে, এইসব মণিরত্নের যথার্থ মূল্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

(৫) "প্রতি মাসের উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট একটি করে সভা আহ্বান করেন, বিশ্বের সুন্দর সুন্দর সামগ্রীর বিষয় প্রশ্নাদি করার জন্ত। তখনকার বণিকরা তাতে যোগদান করতেন এবং পণ্যদ্রব্যের পসরা সাজাতেন। সম্রাটের হারেমের মহিলারা এবং অন্তান্ত মহিলারাও তাতে আমন্ত্রিত হতেন। একটা মেলার মতন সেখানে কেনাবেচা চলত। সাধারণতঃ এদিনেই সম্রাট তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন, নানা জিনিসের মূল্য ঠিক ক'রে দিতেন। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আহরণ করতেন। সারা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা, দেশের কারখানাদির ত্রুটিবিচ্যুতি-ইত্যাদি সব এই মেলায় ধরা পড়ত। এই মেলামেশা ও পণ্যবিনিময়ের দিনটিকে সম্রাট বলতেন—'খুশরোজ' —অর্থাৎ খুশীর দিন।" আইন-ই-আকবরী, ১ম, ২৭৬, ২৭৭)।

কাঞ্চনবালার কথা

সম্রাট শাজাহানের নারীর প্রতি অনুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং তিনিই নাকি এই সব উৎসবে এই জাতীয় মেলার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তার জন্ত ওমরাহরা নাকি বিশেষ খুশী হতেন না।(৬) শাজাহান তাঁর হারেমে বাইরের নাচওয়ালীদের প্রবেশাধিকার দিয়ে নিশ্চয় শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন বলতে হবে। তিনি তাঁর হারেমে বাইরের যে নর্ত্তকীদের নিয়ে আসতেন নাচগানের জন্ত, তাদের 'কাঞ্চন' বলত। কাঞ্চনবর্ণ রূপসী যুবতী মেয়ের দল। বাইরে থেকে হারেমের মধ্যে তাদের সম্রাট নিয়ে আসতেন এবং রাতভোর আটকে রেখে দিতেন। তারা কিন্তু বাজারের বারাঙ্গনা নয়। গৃহস্থ ও ভদ্রঘরের মেয়েই বেশী। আমীর-ওমরাহ ও মনসবদারদের বিবাহোৎসবে এরা নাচগান করার জন্ত আমন্ত্রিত হয়। অধিকাংশ কাঞ্চনবালা বেশ সুন্দর দেখতে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, এবং নৃত্যগীতকলায় রীতিমত পারদর্শী। যেমন নাচিয়ে, তেমনি গাইয়ে! দেহের গড়ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন নরম ও কোমল যে নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গিমা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন লীলায়িত হয়ে ওঠে। তাল ও মাত্রা জ্ঞানও চমৎকার। কণ্ঠের মিষ্টতাও অতুলনীয়। অথচ এই কাঞ্চনবালারা সাধারণ ঘরের মেয়ে। সম্রাট শাজাহান তাদের যে শুধু মেলাতেই নিয়ে আসতেন তা নয়। প্রতি বুধবারে আমখাসে তাদের হাজিরা দিতে হ'ত সম্রাটের সামনে। এটা নাকি অনেক-কালের প্রাচীন প্রথা। সম্রাট শাজাহান কেবল তাদের একবার চোখে দর্শন করেই মুক্তি দিতেন না। প্রায়ই তিনি সারা রাত তাদের আটকে রাখতেন এবং রাজকর্মের শেষে তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন, তাদের সঙ্গে মস্করা ক'রে সময় কাটাতেন। ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতার চেয়ে অনেক বেশী গোঁড়া ধর্মানুরাগী ও আত্ম-সংযত পুরুষ ছিলেন। তিনি কাঞ্চনবালাদের হারেমে প্রবেশ করতে দিতেন না। তবে বহুকালের প্রথানুযায়ী তাদের প্রতি বুধবারে একবার ক'রে আমখাসে আসবার হুকুম দিয়েছিলেন।

(৬) গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমানরা সাধারণতঃ এই ধরনের মেলার বিরোধী ছিলেন। বাদাউনি (Badaoni) ছিলেন আকবর বাদশাহের আমলের সবচেয়ে নির্ভীক ঐতিহাসিক (আঃ ১৫১৬ খৃঃ)। মেলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "আমাদের ইসলাম ধর্মের নীতিকে আঘাত করার জন্তই যেন মনে হয় যে বাদশাহ এই বাৎসরিক মেলায় (নববর্ষের সময়) বেগমদের, হারেমের মহিলাদের ও অন্যান্য বিবাহিত স্ত্রীলোকদের ইচ্ছানুযায়ী যোগদান করার ও পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করার আদেশ দিয়েছেন। এই ধরনের মেলায় বাদশাহ নিজেও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করেন। তাছাড়া হারেমের মহিলাদের অনেক গোপনীয় ব্যাপার, বিবাহাদির কথাবার্তা, যুবক-যুবতীদের প্রেমের সূত্রপাত, সবই এই মেলাতেই ঘটে থাকে।"

আমখাসে এসে বহুদূর থেকে তারা সম্রাটকে সেলাম ক'রে তৎক্ষণাৎ চলে যেত।

বার্নাড-কাহিনী

উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা, কাঞ্চনবালা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমার বিশেষ ক'রে 'বার্নাড' (Bernard) নামে একজন স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়ের কথা মনে পড়ছে। এখানে বার্নাড-সংক্রান্ত একটি ছোট্ট কাহিনীর উল্লেখ না ক'রে পারছি না। প্লুটার্ক (Plutarch) ঠিকই বলেছিলেন যে নগণ্য ঘটনা বা বিষয় কখন উপেক্ষা করা বা গোপন করা উচিত নয়, কারণ বাইরে থেকে যা সামান্য মনে হয়, ঐতিহাসিকের কাছে তার অসামান্য মূল্য থাকতে পারে। সামান্য ব্যাপারের মধ্যে অনেক সময় লোকচরিত্র ও লোকপ্রতিভার বিশেষত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, অসামান্য ঘটনার মধ্যে সাধারণতঃ তা পাওয়া যায় না। এইদিক থেকে বিচার করলে, আমার বার্নাড-কাহিনী, যদিও হাস্যকর, তাহ'লেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'তে পারে। বার্নাড সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে থাকতেন, তাঁর রাজত্বের শেষদিকে। ভাল চিকিৎসক ও সার্জেন ব'লে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল তখন। তিনি মোগল বাদশাহের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রায় সম্রাটের সঙ্গে এক টেবলে খানাপিনায় যোগদান করতেন।(৭) অনেক সময় তাঁরা দুজনেই খুব বেশী পরিমাণে সুরাপান করতেন শোনা যায়। দুজনেরই রুচি একই রকমের ছিল প্রায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর সর্বক্ষণ তাঁর নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বা দায়িত্ব যা কিছু তা সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। নুরজাহান বিদুষী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন এবং রাজকার্য এমন সুন্দর নিখুঁতভাবে তিনি করতেন যে কোনদিন কারও হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজন হ'ত না। তাঁর স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বার্নাডের দৈনিক তনখা ছিল দশ ক্রাউন ক'রে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী উপরি অর্থ তিনি রোজগার করতেন, নিয়মিত হারেমের মহিলাদের ও ওমরাহদের চিকিৎসা ক'রে। কঠিন অসুখ-বিসুখ সারিয়ে অনেক উপঢৌকনও তিনি পেতেন। হারেমের মহিলারা ও আমীর-ওমরাহরা পাল্লা দিয়ে ভাল ভাল উপহার দিয়ে তাঁকে খুশী করবার চেষ্টা করতেন। সুতরাং চিকিৎসক বার্নাড সাহেবের অর্থের অভাব ছিল না। উপহার পাবার আরও একটা কারণ হ'ল, সকলেই জানতেন যে তিনি সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই সকলে তাঁকেও ভেট দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বার্নাড সাহেবের অর্থের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল না। যা তিনি পেতেন, তার অধিকাংশই তিনি নিজে আবার বিলিয়ে দিতেন উপহার দিয়ে। তার জন্য সকলেই তাঁকে আরও ভালবাসত। বিশেষ ক'রে, নর্তকী কাঞ্চনবালাদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি, কারণ তাঁর অর্থের বেশীর ভাগ তিনি তাদের জন্যই ব্যয় করতেন। তাঁর গৃহে কাঞ্চনবালারা নিয়মিত আসত এবং নৃত্যগীত ক'রে তাঁকে খুশী করত। এইভাবে বার্নাডের দিন কেটে যায়। কিন্তু এর মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে গেল। বার্নাড একটি কাঞ্চনবালার প্রেমে প'ড়ে গেলেন। প্রচণ্ডভাবে প্রেমে পড়লেন। কাঞ্চনের নৃত্যভঙ্গিমায় বার্নাড বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বার্নাড সেই কাঞ্চনের পাণিপ্রার্থী হলেন। কিন্তু কাঞ্চনরা সাধারণতঃ কুমারীই থাকে, তাদের বাপ-মারা তাদের বিবাহ দিতে চান না, কারণ বিবাহ করলে তাদের রূপযৌবন বেশী দিন স্থায়ী হবে না এবং অর্থোপার্জনে বিঘ্ন ঘটবে, এই তাঁদের ধারণা। সুতরাং বার্নাড-প্রেয়সীর জননী যখন বুঝতে পারলেন যে বার্নাড সাহেব তাঁর কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তখন থেকে তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন তাঁর কন্যাটির উপর, যাতে কোনরকম অঘটন কিছু না ঘটে। বার্নাডের করুণ কাকুতি-মিনতি দিনের পর দিন কাঞ্চনবালা প্রত্যাখ্যান ক'রে ঘরে ফিরে যায়। বার্নাডের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ক্রমেই তিনি হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েন। এমন সময় একদিন হঠাৎ আমখাসে সকলের সামনে সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন যে বার্নাডের সুচিকিৎসার জন্য তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। হারেমে কোন মহিলার দুরারোগ্য ব্যাধির সার্থক চিকিৎসা ক'রেছিলেন ব'লে সম্রাট তাঁকে পুরস্কার দিতে চান। আমখাসে সকলের সামনে এই ঘোষণার পর বার্নাড উঠে বললেন: "সম্রাট! মার্জনা করবেন। আমি আপনার এই মূল্যবান উপহার গ্রহণ করতে অক্ষম। আমার বিনত নিবেদন, যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কোন উপহার দিতে ইচ্ছুক হন, তাহ'লে কাঞ্চনবালাদের দলের মধ্যে ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনাকে সেলাম করার জন্য, ওকে উপহার দিন আমাকে।" সভার সমস্ত লোকজন বার্নাড সাহেবের উক্তি শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। সম্রাটের উপহার প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা এবং খৃষ্টান হ'য়ে মুসলমানকন্যাকে উপহার চাওয়ার স্পর্ধা তাদের কাছে হাস্যকরই মনে হবার কথা। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোন দিনই ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না কিছু। বার্নাডের প্রস্তাব শুনে তিনি নিজেও অট্টহাসি হাসলেন এবং হেসে হুকুম দিলেন, কাঞ্চনকন্যাকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারসাহেবকে দান ক'রে দিতে। সম্রাট বললেন: "মেয়েটিকে দল থেকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে এসে ডাক্তারের কাঁধে এখনই বসিয়ে দাও এবং তাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে ডাক্তারকে চ'লে যেতে বলো।" যেমন বলা, তেমনি করা। বলা মাত্রই সভাসুদ্ধ লোক হৈ হৈ ক'রে মেয়েটিকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে এসে আমখাসের মধ্যেই ডাক্তার বার্নাডের স্কন্ধের উপর চাপিয়ে দিল এবং বার্নাড সাহেবও কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বিজয়ী বীরের মতন সগর্বে কাঞ্চনবালাকে কাঁধে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হাতির লড়াই

উৎসবের শেষে একরকমের ক্রীড়া হয় যা আমাদের দেশে ইয়োরোপে দেখা যায় না। ক্রীড়াটি হ'ল—হাতির লড়াই। নদীর তীরে বালুভূমির উপর সকলের সামনে এই হাতির লড়াই হয়।

---

(৭) কাত্রু (Catrou) জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে বলেছেন: "আগ্রার ফিরিঙ্গীদের সম্রাটের কাছে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আছে, কারও উপর কোন বিধিনিষেধ নেই। সম্রাট এই ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সারারাত মদ্যপান করেন। প্রধানতঃ মুসলমান পরবের দিনেই তাঁর এই রাত্রিব্যাপী মদ্যপান ও স্ফূর্তি চলতে থাকে।"

সম্রাট নিজে, রাজান্তঃপুরের মহিলারা, আমীর ও ওমরাহরা প্রত্যেকে যে যার স্বতন্ত্র গবাক্ষ থেকে এই হাতির লড়াই দেখেন ও উপভোগ করেন।

তিন-চার ফুট চওড়া এবং পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু একটি মাটির দেয়াল তৈরী করা হয়। দু'টি বৃহদাকার জন্তু (অর্থাৎ হাতি) দেয়ালের দু'দিক থেকে মন্থরগতিতে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেক হাতির পিঠে দু'জন ক'রে মাহুত থাকে। প্রথম মাহুতটি, যে কাঁধের উপর ব'সে লোহার ডাঙ্কুস নিয়ে হাতি চালায়, সে যদি কোনরকমে বেকায়দায় প'ড়ে যায় তাহ'লে যাতে পিছনের দ্বিতীয় মাহুতটি তৎক্ষণাৎ এসে তার স্থানটি দখল ক'রে কাজ চালিয়ে নিতে পারে, তার জন্য এই জোড়া মাহুতের ব্যবস্থা। মাহুতরা হয় আদর ক'রে মিষ্টিকথা ব'লে, অথবা নানারকম সাঙ্কেতিক ভাষায় গালাগাল দিয়ে, কাপুরুষ ইত্যাদি ব'লে, হাতিদের সম্মুখ সমরে প্ররোচিত করে। পা-দানিতে পা চেপেও তারা হাতিকে উৎসাহিত করে। অবশেষে ঐ মাটির দেয়ালের দু'দিকে দু'টি হাতি এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রথম আঘাতটি মারাত্মক। দেখলে অবাক হতে হয় ভেবে যে কি ক'রে তারা পরস্পরের গজদন্ত, মাথা ও শুঁড়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে থাকে। লড়াই একটানা চলে না, মধ্যে মধ্যে উভয়পক্ষই বিশ্রাম নেয়, আবার প্রচণ্ডভাবে পুনরাক্রমণ শুরু হয়। ক্রমে মাটির দেয়ালটি মাটিতে মিশিয়ে যায় এবং বেশী দুর্ধর্ষ হাতিটি অন্য হাতিটিকে তাড়া ক'রে নিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে শুঁড় বা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। এমন ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরে যে কোনভাবে আর দু'জনকে ছাড়াবার উপায় থাকে না। তখন নিরুপায় হয়ে চরকি জ্বালিয়ে, বাজী ফুটিয়ে তাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কারণ এই একটি মাত্র অস্ত্র যা হাতিরা যমের মতন ভয় করে। আগুন তারা সহ্য করতে পারে না, এবং পটকা বা বোমার আওয়াজ শুনলে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়। এইজন্য আগ্নেয়াস্ত্রের যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির ব্যবহার একেবারে অচল হয়ে গেছে। যুদ্ধে আর হাতির কোন কদর নেই। সিংহলের হাতি সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও সাহসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ট্রেনিং না দিয়ে আগে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। বছরের পর বছর কাণের কাছে বন্দুকের আওয়াজ ক'রে, এবং পায়ের কাছে পটকা বোমার শব্দ ক'রে, তাঁদের অভ্যস্ত করা হয়, ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হয়, তার আগে নয়।

এই হাতির লড়াই দেখতে হ'লে অনেক সময় খুব নিষ্ঠুরের মতন দেখতে হয়। কারণ, মাহুতরা কেউ কেউ মধ্যে মধ্যে হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে পদতলে দলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। হাতির লড়াইয়ে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দুই পক্ষের হাতিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতির পিঠ থেকে মাহুতকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে এবং তার জন্য অনেক সময় শুঁড় দিয়ে মাহুতকে জড়িয়ে ধরতে যায়। এ ভয় সবসময় থাকে। তাই হাতির লড়াইয়ের দিনে যে মাহুতদের উপর হাতিতে চড়ার পালা পড়ে তারা তাদের স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসে। যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, মৃত্যুর মঞ্চারোহণ করতে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। তাদের একমাত্র সান্ত্বনা হ'ল এই যে যদি তারা কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারে এবং যদি তাদের হাতির লড়াই দেখে সম্রাট খুশী হন, তাহ'লে তাদের মাসিক তনখা বৃদ্ধি হবে এবং তারা এক থলে পয়সা (পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আন্দাজ) পুরস্কার-স্বরূপ পাবে। হাতির পিঠ থেকে নামা মাত্রই তাদের ঐ পয়সার থলেটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।(৮) তাদের আরও একটা মস্তবড় সান্ত্বনা এই যে যদি তাদের মৃত্যু হয় তাহ'লে তাদের বিধবা পত্নীরা তাদের তনখা ভাতাস্বরূপ পাবে এবং তাদের যোগ্য পুত্র থাকলে সেই চাকরীতে বহাল হবে। কিন্তু হাতির লড়াইয়ের মর্মান্তিক মজার শেষ হয়নি এখনও। আরও কিছুটা বাকি আছে, বলা হয়নি। প্রায়ই দেখা যায়, হাতির লড়াইয়ের সময় মাহুতরাই যে মরে তা নয়, দর্শকদের মধ্যেও কেউ কেউ বেকসুর প্রাণটা হারায়। উন্মত্ত হাতি মধ্যে মধ্যে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ছুটে চ'লে এসে আতঙ্কের সঞ্চার করে। ঘোড়া, মানুষ, যে যেখানে থাকে ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে এবং কেউ হাতির পায়ের তলায় প'ড়ে, কেউ বা ভিড়ের চাপে প'ড়ে মারা যায়। এত প্রচণ্ডভাবে ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি আরম্ভ হয়, যে কারও কোন দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। দ্বিতীয়বার আমি যখন এই হাতির লড়াই দেখেছিলাম তখন আমিও কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম কেবল আমার দুরন্ত ঘোড়াটির জন্য এবং আমার অনুচর ভৃত্যটির প্রাণপণ চেষ্টার জন্য। [ক্রমশঃ।

(৮) পিলখানার প্রত্যেক হাতির একজন ক'রে নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, লড়াইয়ের জন্য। সম্রাটের হুকুম পেলেই তাদের লড়াইয়ের জন্য বাইরে আনা হয়। লড়াইয়ের সময় কৃতী মাহুতদের পুরস্কার দেবার থলে-ভর্তি পয়সা থাকে। প্রায় একহাজার 'দাম' বা পয়সার এক-একটি থলে ('দাম' ও পয়সা ঠিক এক নয় অবশ্য)। আনুমানিক পঁচিশটাকার বেশী পুরস্কারের মূল্য নয়।

শিকারী মশা

জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে অনেক সময় মানুষের মত আচরণ দেখা যায়। কীট-পতঙ্গের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মশাদের মধ্যে এটা খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। পুং-মশারা সাধারণতঃ একটু নিরীহ প্রকৃতির এবং তারা গাছের রস খেতেই বেশী ভালবাসে। কিন্তু স্ত্রী-মশাদের রক্ত নইলে চলে না এবং মানুষের রক্ত পেলে তো কথাই নেই। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, স্ত্রী-মশারা কিছুতেই খুসী হয় না এবং যার-তার রক্তও খায় না। আক্রমণের আগে তারা শিকারের পাত্র বা পাত্রীর গায়ের চামড়ার রং পছন্দ করে নেয় এবং সুবিধা অনুযায়ী তাদের ছুটি সূচের মত হুল ফুটিয়ে দেয়।

বাল্‌চানমা

নাগার্জ্জুন

[লেখক-পরিচিতি—নাগার্জ্জুন হিন্দি সাহিত্যের একজন প্রগতিশীল কবি, এবং ঔপন্যাসিক। নাগার্জ্জুন ছদ্ম নাম। প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথ মিশ্র। ১৯১০ খৃঃ অব্দে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার তারাউনী গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় আধুনিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হন। বাধ্য হইয়া অতি স্বল্প-ব্যয়ে বিহারের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। বিহারের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়েই তিনি বেনারসে সংস্কৃত-বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তথায় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসেন। বেনারসের 'দৈনিক আজ' পত্রিকা, স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশাল ভারত' এবং 'ত্যাগ ভূমি' নামক পত্রিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন। ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে সিংহলে থাকিবার সময়ে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও স্বামী সহজানন্দের সহিত পত্রের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ অব্দে বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়া নাগার্জ্জুন ঐতিহাসিক আমহারী কৃষক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া রাজরোষে পতিত হন। তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪২ খৃঃ অব্দে মুক্তি পাইয়া সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার প্রথম রচনা ১৯৩০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। মাতৃভাষা মৈথিলীতে রচিত হয়। প্রথম হিন্দি রচনা লাহোরের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মৈথিলী ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস "পারো" ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে মৈথিলী ভাষায় রচিত উপন্যাস "পারো" কবিতা সংগ্রহ "চিত্রা", হিন্দি ভাষায় রচিত উপন্যাস "রথিনাথকী চাচী" "নই পাধ" "বালচানমা", গুজরাটি ভাষা হইতে অনূদিত উপন্যাস "পৃথিবল্লভ", বাংলা ভাষা হইতে অনূদিত "চন্দ্রনাথ", "দেহাতী দুনিয়া" "পরিণীতা", সংস্কৃত হইতে অনূদিত "গীতগোবিন্দ" "মেঘদূত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগার্জ্জুন কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছেন। প্রতি পদে-পদে তাঁহাকে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। এই কারণেই তিনি বলেন যে, এই দেশের সৃজনী প্রতিভাশীল সাহিত্যিকের জীবন ভিক্ষুকের জীবনের তুল্য।

বক্ষমান অনুবাদের শিরোনামা সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। একটি উপন্যাসের নায়কের শৈশব জীবনের এক অধ্যায়। আমাদের দেশে সুধীরকে "সুধরে" নেপালকে "নেপলা" বলা হয়। তেমনি বালচাঁদকে "বালচানমা" বলা হয়।]

আমার বয়স যখন বারো তখন বাবার মৃত্যু হয়। আমাদের সংসারে ছিল ঠাকুরমা, মা আর আমার ছোট বোন রেবাণী। বাড়ী বলতে ছিল একখানা মাটির দো-চালা ঘর। দৈর্ঘ্যে ছিল নয় গজ আর প্রস্থে সাত গজ। সম্মুখে ছিল ছোট্ট একটি উঠান। বাঁ দিকে এক ফালি জমিও ছিল। এই জমিতে সারা বছর ধরে কিছু-না-কিছু গাছপালা লাগাতাম। পিছনে ছিল বাবুদের বাঁধানো কুয়ো। সামনের দিকে ছিল বাবুদের চাষের জমি। আর ডান দিকের কোণ ঘেঁষে ছিল পুকুর।

যে ছোট্ট জমির উপরে আমাদের বাড়ী ছিল সেটা যে বাবুদেরই জায়গা তা আর না বলাই ভাল। আমার জীবনের প্রথম ঘটনা আজ যা' আমি বলছি তা' সব মনে নাই।···আমার বাবাকে একটি ভাঙ্গা থামে ক'রে বাঁধা হয়। বাবার সর্বাঙ্গে ছিল কঞ্চির দাগ। কয়েক জায়গায় মারের চোটে চামড়া কেটে যায়। গালে, বুকে ও পেটের উপর চোখের জলের যে ধারা ব'য়ে গিয়েছিল সেটা শুকিয়ে গেলেও দাগটা স্পষ্ট ছিল।···ভয়ে বাবার মুখখানি কালো কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। ঠোঁট দু'খানিও শুকিয়ে গিয়েছিল। একটু দূরে একখানি টুলের উপরে যমরাজের মত বসে মেজ বাবু মোচে তা দিচ্ছিলেন।···তাঁর সেই ভয়ংকর লাল চোখ দুটো আজও আমার মনে পড়ে। ঠাকুরমা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেজ বাবুর পা জড়িয়ে ধ'রে কাতর স্বরে বার বার অনুনয় ক'রে বলতে লাগল: "লালুয়াকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও বাবু! বাছা আমার ম'রে যাবে। আর কখনও এমন কম্ম করবে না। ও বাবু—বাবু গো—দয়া কর।" রাস্তার ধারে ব'সে মা কাঁদছিল। আমিও কাঁদছিলাম। ছোট বোন রেবাণীও ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বাবুদের আম বাগান থেকে বাবা দুপুর বেলায় দুটি কিষাণভোগ আম পেড়েছিল। কাঁচা কিষাণভোগ আম খেতে বড় মিষ্টি। বাবাকে গাছ থেকে আম পাড়তে কেউ দেখে নেই কিন্তু ভাঙ্গা চালায় বসে বাবাকে আম খেতে দেখে অন্য কেউ এ কথাটা মেজ বাবুর কাণে গিয়ে তুলেছিল। তারপর ঘটল এই বীভৎস কাণ্ড।

বাবার মৃত্যু হ'লো। ঠাকুরমা জ্বরে পড়ল। বাবুদের কাছে আর পাড়ার অন্যান্য লোকের কাছে কিছু ধার-কর্জ্জ ক'রে বাবার শেষকৃত্য ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলাম। তারপর ঠাকুরমা ও মা উভয়েই পরামর্শ ক'রে বললে যে আমাকে বাবুদের বাড়ীতে রাখাল থাকতে হবে। প্রথম দিকে ঠাকুরমা এই প্রস্তাবে বাধা দিয়ে ব'লেছিল: "এখন সে ছোট ছেলে। খেলাধুলো করার বয়েস। একটু বড় হোক। এ বয়েসে খাটতে দিলে ওর আর বাড়-বাড়ন্ত হবে না।" মা বলল: "এখন থেকে কাজকম্ম না শিখলে বড় হয়ে কিছুই পারবে না।"

অবশেষে কিছু দিন পরে মেজ বাবুর বাড়ীতে একটি মোষ চরাবার কাজ পেলাম। আমাকে কাজে লাগানোর জন্যে মেজ গিন্নীমাকে মত করাতে আমার ঠাকুরমা ও মাকে কি বেগই না পেতে হয়েছিল। সে এক অতি কঠিন ব্যাপার। তাঁর বাড়ী গিয়ে কাজ দেবার কথা বলতেই তিনি হাত বের করে ঝাঁঝি মেরে বলে উঠলেন: "আরে সর্বনাশ! তোমার ছেলে ত' খেয়েই আমার গোলা ফাঁক করে দেবে। এক-এক বারেই ত' দেড় সের করে ভাত গিলবে। ওর কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত সবটাই যে পেট। কি ছুঁচের মত চেহারা বাবা!"

"যা সাংঘাতিক মাথা ধরেছে—আমাকে আজকের
সভা বাতিল করতেই হবে!"
(কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী সারিডন-এর কথা জানতেন)
আজকে সভায় যাওয়া আর হল না। যা সাংঘাতিক মাথা ধরেছে তাতে সেখানে কাজ চালানো অসম্ভব।
আমার কাছে সারিডন আছে, স্যর্। খেয়ে দেখুন না কেন?
এসব ব্যথা কমানোর ওষুধ আমি দেখতে পারি না। খেয়ে অস্বস্তি লাগে, তার ওপর ঘামতে থাকি।
সারিডন-এ তা হয়না, স্যর্! এ একেবারে অন্য ধরণের ওষুধ — এতে বরং আপনার শরীর সতেজ মনে হবে। এই নিন, জল দিয়ে ট্যাব্‌লেটটা খেয়ে ফেলুন দেখি···
কয়েক মিনিট পর
অদ্ভুত! মাথাটা একদম ছেড়ে গেছে···সব কাজই এখন করতে পারবো। 'সারিডন' —নামটা ভুলবো না। ভাগ্যিস তুমি বলেছিলে—ধন্যবাদ!
অ্যাস্‌পিরিন বা কোন মাদক পদার্থ নেই—
খাওয়ার পর একটুও অবসাদ আনবে না—
সারিডন ব্যথা দূর করে!
অস্বস্তিকর দিন কয়টিতে: সারিডন খেলে চট্‌ করে মেয়েদের মাথাধরা, পিঠব্যথা আর ক্লান্তিভাব দূর হয়।
সর্দি আর জ্বরে: সারিডন জ্বর কমায়, সর্দিকাসি দূর করে, বিরক্তিকর ঘাম বা পেটের গণ্ডগোল আনে না।
মৃদু উত্তেজক: সারিডন খেলে আপনি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন, সুস্থ ও সবল বোধ করবেন। খাওয়ার পর কখনো ঘুম-ঘুম ভাব বা অবসন্নতা আসবে না।
ব্যথায় কষ্ট পেলে—
সারিডন খান
১০টী ট্যাব্‌লেটের টিউব ১।৶০
10 Saridon
BRAND ANALGESIC TABLETS
'রচি'র অতুলনীয় ফরমূলা অনুসারে ভারতে প্রস্তুত
VB 9173
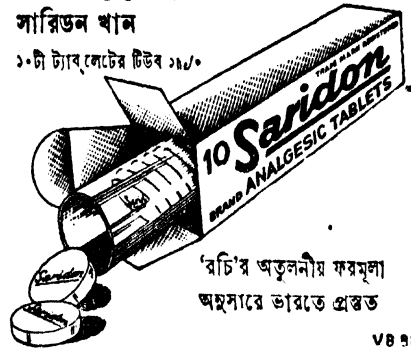
ঠাকুরমা সস্নেহে আমার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে: "রাণীমা, এমন কথা বলো না। আমার বালচানের গলা দিয়ে এক মুঠোর বেশী যায় না। চানা, যোয়ার, ভুট্টা, কোদো, মারুয়া যাইই রুটি দেবে তাই ও অমৃত ব'লে খেয়ে নেবে। বাছার আমার খাবার কোন জ্বালা নাই।"

আমার পরনে একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছিল। একে কটিবাসও বলা যায় না আবার ল্যাঙ্গটও বলা যায় না। ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কি বলব। মেজ গিন্নীমার এটার উপর চোখ পড়তেই বলে উঠলেন: "আমরা কাপড়-চোপড় কিন্তু দিতে পারব না।"

ঠাকুরমা এবারে হেসে ফেলল। হেসে উঠতেই ঠাকুরমায়ের মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আবার হাতজোড় করে বললে: "রাণীমা, তোমাদের কোন অভাবই নাই। তোমাদের ছিল্লে আমরা বাস করি। তা না হ'লে আঁতুড়-ঘরেই ছেলেগুলোকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতাম। তোমাদের ফেলে-দেওয়া' জিনিষগুলোই আমাদের সম্বল।······"

মেজ গিন্নীমা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মুখে হাসি দেখা গেল। ছোট্ট ফুলের কুঁড়ির মত তাঁর দাঁতগুলি বিকশিত হলো। রক্তিমাভ ঠোঁট দুখানি তাঁর দেখতে কি সুন্দর! ঠাকুরমাকে যেন চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ ক'রে তিনি উত্তর দিলেন: "খোরাক-পোষাক আবার তার ওপর মাসে দু'আনা ক'রে পয়সা! কে বাবু অত দেবে? একে ত' একটি আস্ত ভূত। সব কাজ শিখিয়ে নিতে হবে। কাজ শেখাতেই ত আমরা সব পাগল হ'য়ে যাবো।"

এই কথা বলতেই ঠাকুরমা তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বললে: "আজ থেকে তুমি এই অভাগার মা-বাপ হ'লে। তুমি যা' ফেলে দেবে তাই খেয়েই ও মানুষ হবে···।"

পরের দিন কাজে গেলাম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। কাজে লাগাবার সময় বলা হ'য়েছিল যে আমাকে শুধু একটা গাই মোষ চরাতে হবে, কিন্তু এ ছাড়াও ছেলে কোলে নেওয়া, জল তোলা, বৈঠকখানা ঝাঁট দেওয়া, মুদিখানা থেকে তেল, নুন ও মশলা কিনে আনা, গিন্নী মায়ের পা টেপা, এ সবই আমাকে করতে হ'তো।

এক কালে এই চৌধুরী-পরিবারটি ছিল সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল। আজ তাঁদের জমিদারীর অনেক কিছু নষ্ট হ'য়ে গেলেও আচারে-ব্যবহারে সেই পুরানো চালচলনটুকু কিন্তু এখনও ঠিক বজায় আছে। এখন এঁরা পৃথক্ হ'য়ে চারটি পরিবার হ'য়েছেন। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বাড়ী-ঘর হ'য়েছে। জমিদারীটিও পৃথক্ করা হ'য়েছে। অবশ্য বাগান, বাগিচা, বাঁশবন, পুকুর, গোচর এ সব এখনও এজমালিতে আছে। আম বাগানটির আয়তন প্রায় বিঘা কুড়ি। কলমের আম বাগানটিও বেশ বড়। বাঁশের বনটিও নেহাৎ ছোট নয়। সে'ও প্রায় বিঘা তিনেক ত' বটেই—তার কম নয়। তিনটি পুকুর ছিল। চারটি পরিবারের ঘর ছাওয়াবার মত প্রচুর খড়ের গাদাও তাঁদের ছিল। গোচর খুবই বড় বটে, কিন্তু তা'তে আর ঘাস হ'তো না। এ ছাড়াও তাদের একটা বনও ছিল। এই বনে হাজার হাজার তেঁতুল, জাম, শিরীষ, মহুয়া প্রভৃতি গাছ ছিল।

প্রথম দিন সকালে যখন চরাবার জন্যে গোয়াল থেকে মোষ খুলে দিই তখনও বেশ ভোর ছিল। ফর্সা হ'তে তখনও বাকী। আমার ত' খুব ভয় হ'চ্ছিল। ঠাকুরমা আমাকে প্রায়ই ভূতপ্রেতের গল্প শোনাতেন। তাই গাঁয়ের বাহিরে সব শিমূল বা বটগাছে ভূত আছে এই বিশ্বাস আমার হ'য়েছিল। মোষটি শান্তশিষ্ট ছিল। এর নাকের ভিতর দিয়ে একটা রশি পরানো ছিল। এই রশিটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে ওর পিঠের উপরে সটান শুয়ে পড়তাম। মোষও ঠিক সোজা নিজের মনে গাঁয়ের পুব দিকের মাঠে চ'লে যেত।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দুরন্ত গরম পড়েছে। এ বছরে গাছে আম আসে নাই। তাই রাখালেরা গরু-মোষ আম বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত আর নিজেরাও সকালের ঠাণ্ডায় মোষের পিঠে ঘুমিয়ে নিত। আগে এদের দেখে আমার ঈর্ষা হ'তো, কিন্তু এখন? এখন আমি নিজেই মজা ক'রে এ আনন্দ উপভোগ করছি।

মেজ বাবু কোন এক রাজা সাহেবের এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। কার্য্যস্থলে তিনি কখনও তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে যেতেন না। মেজ বাবুর স্ত্রী খুব বড়ঘরের মেয়ে ছিলেন। দুধ ও দই ছাড়া কোন কিছুই খেতে পারতেন না। তাই তিনি মেজ বাবুকে দিয়ে দু'শো টাকায় এই গুজরাটি মোষটি কিনিয়েছিলেন। যত্ন না থাকায় মোষটি রোগা হ'য়ে গিয়েছিল। বাচ্ছাটি ম'রে যাওয়ায় সে বেচারা মনের দুঃখে আরও রোগা হ'য়ে যায়। গায়ের হাড় আর শিরদাঁড়াটা বের হ'য়ে প'ড়েছিল। আগের রাখালটি কাটিহারে পাটকলে কাজ করতে পালিয়ে যায়। তারপর এক ছোকরাকে কাজে লাগান হয়। এই ছোক্‌রা রাখালটি একজন গোয়ালিনীর সাথে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়। বাবু এ কথা জানতে পারেন। অবশেষে একদিন হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যায়। মেজ বাবু ত' জুতো দিয়ে বেদম প্রহার করেন। মারের চোটে ঘণ্টা কয়েক সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকে। এর পর সে'ও পালিয়ে যায়।

এবার আমার পালা শুরু হ'লো। প্রথম দিন বাবুর বাগানে মোষটিকে চরালাম। পরের দিন থেকে মোষটির উপর আমার মায়া জন্মে গেল। ঠাকুরমা, মা আর ছোট বোন রেবাণীকেই নিজের লোক ব'লে জেনে এসেছি। আর জানতাম বাবাকে। বাবা ত' আর নাই। এই চারটি প্রাণী ছাড়াও এই মোষটির উষ্ণ নিঃশাস ও আর্দ্র চোখ আমায় ব্যথিত ক'রে তুলল। প্রতিদিন সকালে মাঠে তাকে চরাতে নিয়ে যেতাম। বেলা বেশ কিছুটা হলে মেজ গিন্নীমা আমায় খেতে দিতেন মহুয়ার লাল রুটি। নুন ও সরষের তেল মাখিয়ে খাবার পর ভার পড়ত তাঁর বাচ্ছা ছেলে কোলে নিয়ে বেড়াবার। বাচ্ছাটি শুধু কাঁদতেই জানত। এর কান্নার চোটে আমার মাথা ধ'রে উঠত। কান্না থামিয়ে শান্ত করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত। মেজ গিন্নীমা আমার তিরস্কার ক'রে বলতেন: "কাঁধের উপর শুইয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দে। তোর মা কি তোকে শুধু গিলতেই শিখিয়েছে। ফুলের মত হাল্কা ছেলে কোলে নিতে পারবে কেন? কুঠে কোথাকার!"

প্রথম দিন দুয়েক এই সমস্ত গালাগাল শুনে আমার বেজায় রাগ হ'তো, কিন্তু পরে এ সবে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলাম। গাধা, শুয়োরের বাচ্ছা, প্যাঁচা, কুকুর—যা মুখে আসত তাই বলতেন। শান্ত ছেলের মত সবই সহ্য ক'রতে শিখে গেলাম। একদিন মাঠে

থেকে ঘাস আনতে বেলা বিকাল উত্‌রে যায়। জ্যৈষ্ঠের দুরন্ত রোদে এক ঝুঁড়ি ঘাস কাটা এক ভীষণ ব্যাপার! ঠাণ্ডা ঘরে বাস করে মেজ গিন্নীমা এই সত্যটা বুঝবেন কি ক'রে? তিনি মনে করতেন যে, সারা দুনিয়াটাই তাঁর ঘরের মত ঠাণ্ডা আর সব জায়গাই কচি ঘাসে বোঝাই। তাই সেদিন ঘাস নিয়ে যেতে দেরী করতেই তিনি ত' ঝাঁঝি মেরে ব'লে উঠলেন: "এত লোক মরে তোর মরণ হয় না? এ্যা—নবাবের নাতি যেন কাজ করতে এসেছে। মাঠে তোর কোন্ বাবার সঙ্গে খেলা করছিলি? এই বার বল্—মাঠে ঘাস নাই—কাস্তের বাঁট খুলে গিয়েছিল—ধার ভোঁতা প'ড়ে গিয়েছে। এই ত? না, আর কিছু বলবি? ও-সব বাজে ওজর শুনতে চাই না। জানোয়ার কোথাকার?" এত ব'লেও রাগ পড়ল না। ঘর থেকে ঝাঁটা এনে আমার পিঠে ওসারে দিলেন। দমাদম পড়ল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলাম। মারের চোটে ব'সে পড়তে হ'লো।

মনটা খুসী থাকলে পচা খাবার, পচা আম, টকো দুধ, দুর্গন্ধ দই বা যা-তা তরকারীর ছিটে-ফোঁটা আমায় খেতে দিতেন। এই সব খেতে দিয়ে আবার বলতেন: "বাল্‌চানমা—খা। তোর চৌদ্দ পুরুষের মুখে এ সব জিনিষ কোন দিন ওঠে নাই রে। খা!"

মুনিবদের কোন কিছুরই অভাব ছিল না। মেজ বাবুর মাসে আড়াইশো টাকা বাড়তি আয় ছিল। গিন্নী মায়ের বাপের বাড়ী থেকেও মাসে দু'-এক বার ক'রে ভার-বোঝাই জিনিষপত্তর আসত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে 'উপহারের ভার পাঠান যা'-তা' ব্যাপার নয়। কাঁধে বাঁশের একটি বাঁক। বাঁকের দু'দিকে ঝোলান থাকে দু'গাছি শিকা। শিকার মধ্যে থাকত মাখন, চাল, কলা, মিষ্টি, ফলমূল, ধুতি, শাড়ী, গালার বালা, আরও কত জিনিষ। একে বলা হয় "ভার" আর এ সব যারা ব'য়ে নিয়ে যায় তারা হ'লো "ভারী"। মেজ গিন্নীমা এই সব জিনিষ আশে-পাশের গাঁয়ের ও নিজের গাঁয়ের ছোট-বড় অনেককেই ভেট্ দিতেন। অবশ্য চাল, শাড়ী—কাউকেই দিতেন না।

দই পচে দুর্গন্ধ বের হ'লে আমাকে খেতে দিতেন। কুকুরের মত গব-গব ক'রে আমি গিলে ফেলতাম সেই পচা দই। একবার এই দই এমন প'চে গিয়ে গন্ধ হ'য়েছিল যে, আমি খেতে পারি নাই। এই জন্যে গিন্নীমা আমায় শাস্তি দিলেন। পরের দিন আমার খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল।

অনুবাদক—ললিত হাজরা

পরীক্ষা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মায়ের হাসপাতাল যাওয়া সম্বন্ধে খোকনের ধারণা খুব স্পষ্ট। কাজেই সে যখন শুনল আজ বিকেলে তার মা যাচ্ছেন হাসপাতালে, তখন সে বলল—'মা, তুমি আবার আর একটা ভাই আনতে যাচ্ছ? এবার মা ভাই এনো না, একটা বোন নিয়ে এস!'

খোকনের কথা শুনে মা হেসে উঠলেন,—'পাগল ছেলের কথা শোনো! আমি ত বাবা আজই ফিরে আসব, সেই যে তোমার মাসিমা আছেন না, তাঁর অসুখ করেছে তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি দুষ্টুমি ক'র না কিন্তু—'

খোকন বিশ্বাস করে না মায়ের কথা। সে জানে, হাসপাতালে সবাই যায় ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আনতে—সেই যে একবার তার মা হাসপাতালে গেলেন তার পর যখন ফিরলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছোট ভাই এল। আর খোকন হয়ে গেল ছোট ভাই-এর দাদা। এখনও যদি কেউ খোকনকে নাম জিগ্যেস করে ত সে জবাব দেয়—'আমার নাম ছোট ভাইর দাদা। আর বাবুজি বলেন খোকন!' শুধু খোকনের মা কেন, পাশের বাড়ির কাকিমাকেও সে দেখেছে হাসপাতাল থেকে একটি 'বোন' আনতে। তাই সে আবদার ধরল—'না, না, তুমি একটা বোন আনবে বলো, নইলে আমি খুব দুষ্টুমি করব হ্যাঁ!'

"ছিঃ, দুষ্টুমি ক'র না বাবা, তাহলে আমি আর তোমায় ভালোবাসবো না।"

"তবে বোন আনবে বলো?"

"আমি ত মাসিমাকে দেখতে যাচ্ছি। ভাখো না এখুনি ঘুরে আসব।"

"তবে আমি যাবো তোমার সঙ্গে।"

"না বাবা, সেখানে ছোটদের যেতে নেই।"

"হ্যাঁ, আমি ত বড়ো হয়েছি—যাবো তোমার সঙ্গে।"

"রাগ করব কিন্তু!" ব'লে খোকনের মা মুখ ভার ক'রে ছেলের দিকে তাকালেন।

"আমি তাহলে কান্নাকাটি করব, ছোট ভাইকে মারব। মরে যাবো—"

অনেক যুক্তি-ভীতি দেখিয়েও খোকনকে বাড়িতে রেখে অনিমা হাসপাতালে যেতে পারল না। ওদিকে মিনতিকে না দেখতে গেলেও নয়, বেচারী বড় একা-একা পড়ে থাকে। উভয় সঙ্কটে পড়ে অনিমা শেষ পর্যন্ত বলল, "আচ্ছা চলো। কিন্তু হাসপাতালের ঘরে ঢুকতে পারবে না, মঞ্জু পিসীর সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"আচ্ছা বেশ! আমি কিন্তু হাসপাতালকে বলব, আমায় একটা বোন দাও।"

মিনতির মুখে হাসি ফুটে উঠল দিদিকে দেখে, বলল—"ইস্, এত দেরী করলি ছোটদি! আমি হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে পড়ে রয়েছি—ওদিকে আহ্লাদীর বর এল, পেঁচীর ভাওর এসে গেছে কখন। ও মা, তুই এত সেজে-গুজে বেরিয়েছিস ক্যানো ছোটদি—এখান থেকে বুঝি আর কোথাও যাবি?"

—"থাম, তোর যেমন কথা। সাজলাম কোথায়! সাত জন্মে ত বেরুতে পারি না, তোর অসুখ করল তাই না—তা এমন গুণনিধি ছেলে হয়েছেন ঝোঁক ধরে বসলেন আমিও যাবো, হাসপাতাল থেকে বোন আনবো!"

—"তোর আবার ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরুনো বাপ্‌, খোকনকে আনলেই পারতিস। ওকে যে কত দিন দেখিনি!"

—"বেশ কথা, তিন দিন আগেও ত গিয়েছিলি আমাদের ওখানে—কেবল এই পরশু আর কাল মিলেই অনেক দিন হল? তা এমন ধাঙড়ীর মতো রয়েছিস কি জন্মে, আয়া রয়েছে নার্স আছে কেউ কি তোর চুলটাও বেঁধে দিতে পারে না?"

—"ও-সব আর ভালো লাগে না, কি হবে সাজ-গোজ ক'রে?"

—"তাও বটে, এ জায়গাটা যা বিশ্রী নোংরা! হ্যাঁ রে, কেবিন কবে খালি হবে?"

—"ছোট্‌দি, তোরা সবাই কেবিন-কেবিন ক'রে হেদিয়ে মরছিস কি জন্মে বল্‌ তো? একা-একা দিন-রাত পড়ে-পড়ে কড়িকাঠ গুনতে খুব ভালো লাগে না আমার। এখানে কত রকমের ছবি দেখি, কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টেরও পাই নে।"

কথা বলতে বলতে মিনতি একবার ওয়ার্ডের বিরাট ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। অনিমাও সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে, অবশেষে মিনতির মুখের ওপর শান্ত শুভদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—"তোর ঘেন্না করে না? কেমন যেন নোংরা-নোংরা সব কিছু—হ্যাঁ রে মিনু!"

—"তা একটু কম পরিষ্কার ত হবেই, ফ্রি-বেড কি না!"

—"তোকে এখানে বড্ড বেমানান ভাখায়!"

—"যাই বলো ছোট্‌দি, এখানে খুব খাতির করে সবাই। আমার আয়াকে দিয়ে ওদের অনেক কাজও করিয়ে দিই। একটা ত মোটে নার্স এতগুলো পেসেণ্ট—তার জ্বর ভাখা, চার্ট বানানো থেকে সব-কিছু বোঝা একটা মানুষে পারবে ক্যানো সাম্‌লাতে! অনেক সময়ে আমার নার্সকেও পাঠিয়ে দিই ওদের দরকার পড়লে।" —বলতে বলতে মিনতি চকিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ ছোটদি, বাইরে মঞ্জু এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বলছে রে?"

—"খোকন এসেছে কি না!" অনিমা নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল।

—"বাঃ, তা ওকে বাইরে রেখে দিয়েছিস্‌—ডাক্‌ ডাক্‌!"

অনিমা বলল—"এ সব জায়গায় ওকে আনাই উচিত নয়, তাছাড়া তোর জামাই বাবু যদি শোনেন যে ওয়ার্ডে ঢুকেছিল ও, তাহলে খুব বকবেন।"

মিনতি অপ্রসন্ন মুখে উত্তর দিল—"জানি না ভাই, তোমাদের ছেলে তোমরা ওর ভালো-মন্দ বোঝো। কিন্তু এতটা বাতিক থাকাও ঠিক নয়; এই হাসপাতালেই ত ছেলে-মেয়ে হ'তে সবাই আসে, তার বেলা কিছু ক্ষতি হয় না যে—"

—"তখন উপায় থাকে না! তুই অবুঝের মতো রাগ করছিস্‌ মিনু।"

—"রাগ আমি করিনি। তবে, সবই ভাগ্য—"

মিনতির শেষের কটি কথা বড় বোনের বুকে যেন হাতুড়ির ঘা মারল। এক চমকে কয়েক বছরের ঘটনা-প্রবাহ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত অনিমার চোখের সামনে খেলে গেল। ছোট্ট মধ্যবিত্ত পরিবারের হাসিকান্না-জড়ানো জীবন-কাহিনী যেন শহরের বিকেলের আকাশের বর্ণবৈচিত্র্য মাখানো মেঘ, যে পথিক সে বিচিত্রবর্ণ মেঘ ভাখে সে লক্ষ্য না-ও করতে পারে, যদি বা লক্ষ্য করে তবে ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ হয়ে আবার মন থেকে মুছে ফ্যালে। শুধু দর্শকই নয়, যে আকাশে এই মেঘবৈচিত্র্য আঁকা হয় সেই আকাশই ভুলে যায় বর্ণরাশিকে। অনিমাদের পারিবারিক জীবনও কতকটা সেই ধরণের। একদা অনিমাকে ডিঙিয়ে ছোট বোন মিনতি নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করাতে ওদের পরিবারে অস্বাভাবিক আলোড়ন ভাখা দিয়েছিল। মিনতি যে কত দূর 'ওস্তাদ' মেয়ে তা সবাই বুঝে ফেলল—। তারপর অবশ্য তিন বছরও পেরোয়নি, মিনতির দৌত্যেই তার ছোট্‌দির বিয়ে হয়ে যায়। অনিমার বিয়ের ব্যাপারে মিনতির স্বামী শ্যামলের কৃতিত্ব এবং কর্তৃত্বই বেশি, তা-ও সবাই জানল।

মিনতি একদা নিজের জীবনের ভারটুকু বইবার দায়িত্ব দুনিয়ার সকলের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু আজকের এই হঠাৎ ভাগ্যের ওপর আত্মসমর্পণের পিছনে ব্যর্থতার ইতিহাস রয়েছে। মিনতির জীবনটা শুধুই যেন ফুলের মেলা, সেখানে ফলের গৌরব নেই। শুধুই বসন্তের রাণী হয়ে বেঁচে থাকার শখ আর নেই ওর। চোখের সামনে সবাই কেমন ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে। মিনতির বিয়ের ঢের পরে ত অনিমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু খোকন, মাণিককে নিয়ে অনিমা বেশ গিন্নী হয়ে উঠেছে। এই সব দেখে-শুনে মিনতি আজ ভাগ্যকে না স্বীকার করে পারে না।

অনিমা ম্লান হাসিয়া সান্ত্বনায় ছোট বোনকে আশ্বস্ত করে—"এই ত সবে এসেছিস ভাই এখানে। শ্যামলদা'র হাতে সব বড়-বড় ডাক্তার, নিশ্চয় ওরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে।"

কথাটা মিনতির মনে মোটেই রেখাপাত করে না, ও বলল—"যা হবে তা আমার বুঝতে বাকী নেই। তবে সবাই যখন বলছে, তখন ডাক্তারদের দৌড়টা একবার দেখে নিই। আমি জানি, যার হবার নয় তার কিছুতেই কিছু হয় না। যাক্‌ গে, এখন এই শাস্তিভোগটা চুকলে বাঁচি।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জু বলল—"ও বৌদি, তোমার ছেলেকে সাম্‌লে রাখা যাচ্ছে না। একবার ভাখো এসে—"

—"আর পারি নে বাবা!" ব'লে অনিমা উঠে বাইরে গেল।

মিনতি ঠোঁট কামড়ে কি যেন একটা বেদনাকে দমন করে দূরে তাকিয়ে কোনো কিছু আশ্রয় খুঁজতে লাগল। ওই ত সতেরো নম্বর বেড ভাখা যাচ্ছে। ওখানে আবার কে এল? চার-পাঁচটা মাথা—ব্যাপার কী? মিনতি উঠে বসল। ওই ত মেয়েটার বাবা এসেছে। আহা, বেচারীর মুখখানা কী করুণ! মিনতির ইচ্ছে করে একবার উঠে গিয়ে ওখানে দাঁড়াতে—দুটো সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারে ওকে একমাত্র মিনতিই। আর যারা ওখানে রয়েছে তারা সবাই তামাশার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে। যাবে না কি মিনতি? মেয়েটাকে আজ সারা দিন কিছু মুখে ঠেকাতে দেয়নি। কী কষ্ট মেয়েটার, আহা!

অনিমা ফিরে এসে টুলের ওপর বসতে বসতে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে রে, ওখানে অত ভিড় ক্যানো?"

মিনতি মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল—"মেয়ে জাতটাকে ওই জন্মেই ঘেন্না করি।"

—"কি জন্যে?"

এবার মিনতি মুখ ফেরালো, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ওর ফর্সা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে—"সেই যে ধনুষ্টঙ্কারে ভুগছে যে মেয়েটা তার কথা মণ্টু বলেনি কিছু?"

—"না, তোর জামাই বাবু বলছিলেন বটে! আহা, মেয়েটা ত রোগে ভুগছে, কিন্তু ওর মায়েরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। বেচারী ঘর-সংসার সব ফেলে মেয়ের মুখ চেয়ে নাকি তিন মাস হাসপাতালে পড়ে রয়েছে! উনি খুব প্রশংসা করছিলেন, মায়ের মন কি জিনিস—"

বাধা দিয়ে মিনতি বলল—"থাক থাক, আর বলিস না, আমার গা জ্বালা করে। কাল পর্যন্ত আমিই কি কম আদিখ্যেতা করেছি! তখন কে জানত যে সে পেত্নী এমন কাণ্ড করবে!"

—"কেন কি হ'ল রে, কি করেছে সে?"

—"পালিয়েছে।"

—"পালিয়েছে? তুই কি বলছিস্ মিনু!"

—"তার আগে মেয়েটার গলা টিপে মেরে রেখে গ্যালো না কেন—তাই ভাবছি!"

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মিনতির জীবনের সব আশাস্বপ্ন যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। শ্রান্ত ভাবে অনিমার দিকে তাকিয়ে ও বলল—"এমনি ক'রে ফেলে দিয়ে যাওয়া যে মেরে ফ্যালার চেয়েও সাংঘাতিক, সে কথা কি ভেবে দেখল না রাক্ষুসী!"

অনিমা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলল—"তুই বলছিস কী! কত বড় মেয়ে?"

—"যাও না দেখে এসো, আমাকে ওসব জিগ্যেস কর না, ভাবতেও কষ্ট হয়। আহা বেচারী বাপ!"

মিনতির আয়া এল, তার চোখে-মুখে যেন কথার ফুলঝুরি ফুটছে—"জানেন দিদিমণি, বাবা এয়েছে। এতক্ষণে মেয়েটা হাঁ করেছে। বলি হাজার হোক আপন-পর ত পশু-পাখীতেও চেনে, তা ও ত মানুষের বাচ্চা। সারাটা দিনমান আমরা হাল্লাক হয়ে গেলাম। দাঁত ফাঁক করল না—এখন কেমন এতখানি দুধ, এতটা পাঁউরুটি খেলে। ইস, কি ক্ষিদেই পেয়েছিল—হাঁ-হাঁ করতে-করতে খেলে। খাচ্ছে আর কাঁদছে, কাঁদছে আর খাচ্ছে। যেমন বা বাপের কান্না তেমন বা মেয়ের। আমি বলি কেঁদে কি হবে বাছা, এখন ভগবানকে ডাকো, একটা উপায় যদি ক'রে দ্যায় তিনি—যে মাগী মরতে গিয়েছে তার জন্যে মিথ্যে মায়া ক'রো না, সে মরুক। আহা, তাই কি মন মানে—!"

কথা ক'টা বলেই আয়া আবার চলে গেল।

অনিমা বলল—"তুই যেমন করে পারিস আজ-কালের মধ্যে কেবিনের ব্যবস্থা করিয়ে নে মিনু! এখানে থাকলে তোর শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে। আর কেবিন না পাস্ ত ফিরে চলে যা, দু-চার দিন পরে পরীক্ষা-পত্তর করালে কিছু ক্ষতি হবে না—এই সব ছোটলোকের কাণ্ডকারখানায় থাকবার কি দরকার তোর?"

—"ছোটলোক বড়লোক বলে কিছু আলাদা নেই ছোটদি—আমি ত দেখছি মেয়ে জাত পুরুষ জাতের ভাগ্যটাই বড়ো কথা।"
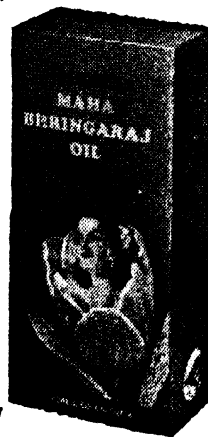
—"এতক্ষণ ধরে একটা ধাঁধার মধ্যে পাক খাচ্ছি মনে হচ্ছে—মেয়েদের জাত তুলে বার বার গালাগালি করছিস যে, তুই নিজে কী ?"

—"আমার কথাও জানি। তাই ত এত ঘেন্না। তোর কথাও আলাদা মনে করিস না। আমরা সবাই ওই।"

—"না, না, এ আমি মানতে রাজী নই।"

—"কাল রাত আটটা পর্যন্ত আমারও ঠিক তোর মতোই বিশ্বাস-ভরসা ছিল, কিন্তু তার পর সারা রাত ধরে, আজ সারা দিন ধরে নিজেকে ভেঙে-চুরে দেখেছি—এখন দেখছি সব কিছুই চুরমার হয়ে গেছে, আস্ত কিছু নেই।" কথা বলতে বলতে মিনতি যেন মনের গভীরে ডুবে গেল—"কাল রাত আটটায় হঠাৎ চাপা-চাপা কথাবার্তা উঠল, মায়ালতা কোথায় গেল? সেই রাক্ষুসীর নাম হ'ল মায়ালতা। মায়ালতার স্বামী মানে ওই পঙ্গু মেয়েটার বাপ এসেছে ওদের খাবার দিতে। হাসপাতালের দরওয়ান, বেয়ারা, ঝি, নার্স, ডাক্তার সবাই মায়ালতাকে চেনে। সবাই জানে, এমন মা আর হয় না। আর দেখেছেও ত তিন মাস ধরে। তা ছাড়া চোখে পড়বার মতো চেহারা, কালো রং হ'লে হবে কি—আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়েছিল, আমি নাম দিয়েছিলাম কৃষ্ণকলি। দরওয়ান বললে, উনি ত ভিজিটিং আওয়ারের পর-পরই বাইরে গেলেন, বললেন—একবার বাড়ি যাচ্ছি। স্বামী ত আকাশ থেকে পড়ল—'কই বাড়ি ত যায়নি ? তা ছাড়া বাড়ি ত আমাদের এখানে নয়, যাবেই বা কার সঙ্গে। বাড়ি গেলে ত আমার সঙ্গে দেখা হ'ত।' বাড়িও যায়নি, হাসপাতালেও নেই, তবে মায়ালতা কোথায় গেল? সবাই নানারকম প্রশ্ন শুরু করল, কিন্তু তার স্বামীর মুখে একটি কথাও নেই, ভদ্রলোক যেন বোবা-কালা হয়ে গেছে। এত কথা এত লোকে বলছে কিন্তু মায়ালতার স্বামী একেবারে চুপচাপ। মেয়েকে রাত্তির খাওয়া খাইয়ে চলে গেলেন। মেয়েটা শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল ক'রে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক যাবার সময় বলে গেলেন—'মায়া যদি ফেরে ত ভালো, নইলে কাল সকালে ত আমি আস্‌ছি তখন কেতুকে খাইয়ে আপিস যাবো।' ব্যস, মেয়েটা রইল পড়ে। মায়ালতা ফেরেনি। মেয়েটার দুর্গতির আর শেষ নেই ছোটদি!"

অনিমা একমনে মিনতির কথা শুনছিল, হঠাৎ চমকে উঠল কি দেখে—"সর্বনাশ!" ব'লে ব্যস্ত ভাবে চলে গেল। মিনতি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি, এমন ক'রে অনিমা কোথায় যাচ্ছে। ও কী, সতেরো নম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কেন অনিমা? মিনতিও যাবে না কি! নাঃ, কেতকীর বাবার মুখের দিকে চাওয়া যায় না, বেচারী এম্‌নিতেই মাটিতে মিশে রয়েছে—এর ওপর আর নতুন ক'রে কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না।

দিদির ওপর খুব রাগ হ'ল মিনতির। নিশ্চয় মজা দেখতে গিয়েছে দিদি। যে স্বামীর বৌ পালিয়েছে সেই মানুষটার মুখ-চোখের অবস্থা কেমন হয় সেটুকু দেখবার লোভ সাম্‌লাতে পারল না দিদি—ছি-ছি-ছি! পঙ্গু মেয়েটার কী ব্যবস্থা হবে, সে কথা কি একবারও ভেবেছে অনিমা? অথচ অনিমা নিজে ত দুই সন্তানের জননী!···সারা দিনের মধ্যে অন্ততঃ বিশ বার মিনতি উঠে গিয়ে কেতকীকে দেখে এসেছে—একটু কিছু যাতে খায় তার জন্য সাধ্য-সাধনাও বড় কম করেনি মিনতি। কিন্তু পারেনি, কেতকীর কুঁকড়ে-যাওয়া দেহটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে—দুটি চোখে নিথর পাথর চাহনী। দু'-ফোঁটা চোখের জলও ঝরতে দেখেনি মিনতি। মিনতি উদ্‌গ্রীব হয়ে সতেরো নম্বরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনিমা গিয়ে খোকনের হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে আস্‌ছে।

—"কি হ'লো?" দিদির মুখ-চোখ অপ্রসন্ন। আর খোকন বক্‌বক্ করছে। ওরা কাছাকাছি আস্‌তেই মিনতি শুন্‌তে পেল:

—"ওই বোন্‌টিকে ওর মা নিয়ে যাবে না?"

—"থামো, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না।"

—"ক্যানো? তুমি রাগ করলে ক্যানো? ভালো মাছিমাকে বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ!"

মিনতিকে দেখতে পেয়েই খোকন মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে এল—"ও মা, তাই বলি, তুমি এখেনে আছো ভালো মাছি?"

—"হ্যাঁ বাপী!"

—"ভালো মাছি, তুমি কোন বোনকে নিয়ে যাবে?"

অনিমার মুখের আঁধার যেন এই কথাতে কেটে গেল। বোনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—"ছাখ, এখন বোন্-টোন পায় কি না!"

খোকন প্রশ্ন করে—"ওই বোন্‌টাকে কে নিয়ে যাবে ভালো মাছি?"

—"কোন বোন্‌কে বাপী?"

—"ওই যে শুয়ে আছে, কাঁদছে? ওকে তুমি নেবে নাকি!"

দুই বোন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। চাপা নিশ্বাসের বাড়তিটুকু বার ক'রে দিয়ে মিনতি বললে—"ওর বাবা যে আমাকে দেবে না বাপী!"

—"ও! তা ওর মা কখন আসবে নিতে?"

—"এই আর একটু পরে।"

—"কোথায় গেছে ওর মা?"

সে কথার জবাব না দিয়ে মিনতি বলল—"খোকন, তুমি হাতী নেবে, না, ঘোড়া?"

ভালো মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে খোকন বলল—"আমি বোন নোবো। খুব সুন্দর,—তোমার মতো সুন্দর, এত্তোটুকু বোন—কাঁদবে না কিন্তু, আর—"

—"আর কী?"

অনিমা ধমক দিল—"থাম দেখি! আর মঞ্জুকেও বলিহারি যাই—বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে করছে কী?"

মিনতি মুচকি হেসে বলল—"ললিত এসেছে বোধ হয় আমাকে দেখতে!"

অনিমা প্রশ্ন করল—"তার মানে?"

—"মানে আবার কী, আমার দেওর আসে বৌদিকে দেখতে, আর তোর ননদও আসে—ওয়ার্ডে বড্ড ভিড়, তাই ওরা বাইরে একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকে।"

—"বলিস্ কি, ওইটুকু মেয়ে মঞ্জু—ওর পেটে-পেটে এত!"

অনিমার মুখের কথা শেষ হয়নি তখনও—মঞ্জু ঘরে ঢুকল ইতস্তত নজর ফেলতে ফেলতে। মিনতির বেড-এর সামনে এসে

খোকনকে দেখতে পেয়ে বলল—"দেখেছ কাণ্ড, ছাখ-না-ছাখ করতে করতে তুই ঢুকে পড়েছিস! চল্-চল্, বাইরে চল্—"

অনিমা বাধা দিল—"ওর আর কাজ নেই বাইরে গিয়ে।"

—"রাগ করছ কেন বৌদি! যা ছটফটে ছেলে—ওকে সাম্‌লায় কার সাধ্য!"

মিনতি হেসে উঠল, বলল—"ললিত বুঝি ভেতরে আসবে না, হ্যাঁ রে!"

ললিতের নাম শুনে মঞ্জু একটু বিস্মিত হ'ল—"ললিতদা' কোথায়? দেখিনি ত!"

—"আসেনি? আমি ভাবলাম বুঝি ও বাইরে তোর সঙ্গে কথা বলছে!"

—"তোমাদের সব কেমন-কেমন কথা।" বলে মঞ্জু মুখ ভার ক'রে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

খোকন এবার মঞ্জুর হাত ধরে টানতে লাগল—"চলো পিসিমণি, বাইরে চলো। এখানে ও বোন্‌টা বিচ্ছিরি—ভালো না।"

—"কোন্ বোন্ রে?"

—"উই যে শুয়ে আছে—যেখানে ওর বাবা দাঁড়িয়ে—দেখতে পাচ্ছ!" বলেই মঞ্জুকে টানতে-টান্‌তে নিয়ে চলল খোকন।

মিনতি বলল—"বাপী, যেয়ো না।"

খোকন ফিরল—"না যাবো না, ও বোন বিচ্ছিরি! যেয়ো না পিসিমণি!"

মঞ্জু ঘুরে এসে মিনতিকে বলল—"ও মেয়েটার মা নাকি পালিয়েছে মিনুদি?"

—"তুই জান্‌লি কি করে?"

—"ওই ত বাইরে এক জন কে এসেছে—সে নার্সের কাছে বলছিল সব।"

—"কি বলছিল?"

—"আমি সব শুনিনি, তবে মনে হ'ল, বাচ্ছাটাকে একটু দেখা-শুনো করবার জন্যে বলছিল। কিন্তু মা হয়ে পালালো কি ক'রে মিনুদি?"

অনিমা গম্ভীর ভাবে বলল—"সৎমা নিশ্চয়।"

—"না, না, আপন মা। দেখতে অবিশ্যি মায়াকে খুবই কচি-কচি, কিন্তু বয়স ওর অনেক। আমার কাছে কত কান্নাকাটি করত—কেতকীর পরে আরও দুটি হয়েছিল, তবে বাঁচেনি। এই একটিই টিকে আছে, তাও এই হাল হ'ল! বলে ধন্বুষ্টঙ্কার। ওকে এখন দেখলে কেউ ভাবতে পারে আট বছর বয়েস?"

ওয়ার্নিং বেল পড়ল। আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় রয়েছে। মিনতির কথাগুলো ঘন্টার শব্দে চাপা পড়ে গেল, সেই সঙ্গে বুঝি একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ডুবে গেল।

অনিমা প্রশ্ন করল—"শ্যামল এলেন না?"

—"না, আজ ও আসতে পারবে না, আপিসের মাইনে দেবার তারিখ কি না।"

খোকন ছটফট করছে, বলছে—"ভালো মাছি, তুমি হাসপাতাল-বালাকে বলো একটা বোন দিতে—আমরা বাড়ি যাবো। সবাই যাচ্ছে। সুন্দর বোন চাই। পিসিমণি, তুমি রাগ করলে বুঝি? না, না, রাগ করে না, বিসকুট দেবো তো বলছি—সত্যি বলছি।"

ওদিকে সতেরো নম্বরের ভিড় অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। মিনতির আয়াও ফিরছে এদিকে। আয়ার কালো মিশমিশে বার্ণিশ-করা চেহারা পেরিয়ে ও-পাশে দেখা যাচ্ছে কেতকীর বাবাকে। শীর্ণ বিষণ্ণ মুখের আদল—মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে কেতকীর শিয়রে। কি করছে লোকটা? ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে। হ্যাঁ, হাতজোড় ক'রে কি যেন মন্ত্র পড়ছে—ঠোঁট নড়ছে, দু'-চোখ বুজে একান্ত মনে ভগবানকে ডাকছে।

অনিমার কথায় মিনতির দৃষ্টি ব্যাহত হ'ল, অনিমা বলল—"আজকের মতো আসি ভাই!"

—"এস।"

—"তুই কেবিনে চলে যা মিনু, এখেনে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে।"

—"দেখি।"

আয়া এসে বলল—"আহা, বেচারী কাঁদতে পারছে না বলে খুব কষ্ট হচ্ছে।"

মঞ্জু প্রশ্ন করে—"কে?"

—"ওই বাপ গো, কেতুর বাপ।"

অনিমা বলল—"মেয়েটার খুব নাকাল।"

—"হবে না, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে, কই মাছের পেরাণ। প্রাণটুকু যে কি ক'রে আছে, আশ্চর্যি! এই তিন মাস হ'ল হাসপাতালে শুষছে। দেখেও কষ্ট হয়—এর চেয়ে যেন ওর মরণ ভালো ছিল।"

মিনতি ধমক দিল—"ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে এনো না—"

—"না দিদিমণি, ও আর বাঁচবে না, দেখে নিয়ো।"

—"তুমি সব জানো, কাল দুপুরেই ত মায়ালতা বলছিল ডাক্তারে আশা দিয়েছে এখন ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে—এ যাত্রা বেঁচে যাবে। তবে জীবনের মত বোবা হয়ে থাকবে, হয়ত হাত-পায়েও তেমন জোর পাবে না।"

আয়া বললে—"অমন বাঁচায় কাজ কী? আর যার মা বেঁচে থেকেও নেই তার কপালে শতেক খোয়ার!"

অনিমা খোকনের হাত ধরে বলল—"ভালো মাসিমাকে গুডবাই করো খোকন।"

—"ক্যানো, ভালো মাছি যাবে না বুঝি!"

—"যাবো বাপী, কালই চলে যাবো।"

—"না, না, তুমি চলো আমাদের সঙ্গে। ওই বিচ্ছিরি বোনটিকে তুমি ভালোবেসো না ভাল মাছি।"

অনিমা বলল—"ছিঃ, ওকথা বলতে নেই খোকন।"

সবাই চলে গেছে—যারা দেখতে এসেছিল কেউ আর নেই। গম্ভীর মুখে জুতার খুট-খুট শব্দ ক'রে নার্স ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিউটি দিচ্ছে—টেম্পারেচার নিচ্ছে, বালির ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ার গতি পরীক্ষা ক'রে চার্ট লিখছে নার্স। ওয়ার্ডটা হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মিনতি উঠে দাঁড়াল। এতগুলি মানুষ যেন প্রাণহীন—এরা কেউ বুঝি বেঁচে নেই মিনতির মনে হয়।

ও আপন মনে একবার বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক মিনিট পরে সোজা সতের নম্বর বেড-এর পাশে এসে দাঁড়াল। কেউ নেই। মেয়েটা বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে। স্থির, শূন্য-দৃষ্টি—মৃত্যুর চেয়েও জড় ঐ দু'-চোখের চাহনী। মিনতি ওর সামনে এসে দাঁড়াল। পলক পড়ল না তবু। মেয়েটা বেঁচে আছে ত? আছে, ওই ত ফ্যাকাশে গালের কোলে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ।

কেতকী তবে কাঁদতে পারে! কাঁদে ও।

মিনতির বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

শীর্ণ বিষণ্ণ মুখের আদল,—হাতজোড় ক'রে চোখ বুজে মন্ত্র উচ্চারণরত একটি মুখচ্ছবি এই শিয়রে যেন এখনও উপস্থিত। সেই মন্ত্র কি এখনও এখানে রয়েছে—সেই মন্ত্র এই মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারে! মিনতির ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে।

বিছানার ওপর বসে পড়ে কেতকীর গালে হাত বুলিয়ে দিল মিনতি। অমনি শূন্যদৃষ্টি চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

কতক্ষণ মিনতি এই ভাবে বসেছিল, সব কিছু ভুলে গিয়েছিল তা কে জানে! হয়ত এমনি ক'রে আরও থাকত—আয়া এসে ডাকল—"দিদিমণি, চলুন খাবার এসেছে।"

—"ও, যাই।" ব'লে মিনতি বসে রইল।

নার্স এসে দাঁড়াল—"কি মিসেস্ মজুমদার, আজ সন্ধ্যে থেকে এখানেই বসে রয়েছেন যে! আপনার ও বইখানা শেষ করেছি, আজ আর একখানা চাই কিন্তু।"

মিনতি একটু হাসল, প্রশ্ন করল—"কেতকী বাঁচবে ত?"

নার্স ইসারায় ডাকল মিনতিকে। একটু সরে গিয়ে নার্স ফিস-ফিস করে বলল—"ও কিন্তু সব বুঝতে পারে। ওর জ্ঞান আছে। কথা কইতে পারে না, কিন্তু—"

—"বাঁচবে কি না—"

—"বেঁচে থেকেই বা ওর কি লাভ বলুন?"

—"তবু বেঁচে থাকা ত—"

নার্স বলল—"আমি নিজে কিন্তু এমন ভাবে বেঁচে থাকা চাই না মিসেস্ মজুমদার। ওর বাবার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। বাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই ওকে দেখবার, মা ত নিজের রাস্তা বেছে নিল!"

আয়া ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। সে বলল—"এমন জন্মবোঝা বইতে কে চায় দিদিমণি! যাই বলো, মায়ালতার সঙ্গে ওর সোয়ামীকে মোটেই মানাত না। কিন্তু যে ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে সে একেবারে ছেলেমানুষ।"

মিনতি ভ্রূকুটি ক'রে বলল—"তুমি এত খবর কোথায় পেলে?"

—"ওমা, তুমি অবাক করলে যে, বলি, হাসপাতালে কে না জানে শুনি?"

এগারো নম্বরের রোগিণী এর মধ্যে উঠে এসেছে, সে বলল—"না জানার কি আছে, দু'-চোখ খোলা থাকলে সব পরিষ্কার। আমি কবে থেকেই দেখছি ওই বেটো—কেষ্টো ছোঁড়াটা আসে, বাইরে দাঁড়ায় আর মায়ামণি টুকুস ক'রে বেরিয়ে যায়। রইল পড়ে রোগা মেয়ে—দু'-তিন ঘণ্টা বাইরে কোথায় থাকে মা। আজ এক মাস ধরে দেখছি ত সবই। আবার আমাকে বলত কি—দিদি যেন বরকে দেখলে ঢ'লে পড়েন, আমার ভাই ও-সব নেই, স্বামীর সঙ্গে অত কিসের হাসাহাসি ঢলাঢলি। তা আমি মনে মনে বলেছি রোজ—আমার ত আর ইদিক-উদিক নেই, মরতে বাঁচতে নিজের সোয়ামী।"

মিনতির আর এক দণ্ডও এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে নেই। তবু নড়তে পারে না—ওকে যেন এরা তিন জনে জাপটে ধরে রেখেছে, ও নিরুপায় নিশ্চল!

আয়া বলল—"ইদিকে কি কান্নার ঘটা, দেখে মনে হ'ত সত্যি বুঝি মেয়ের জন্যে ভাবনায় মরে যাচ্ছে।"

নার্স বলল—"হাঁ, ভালো কথা, মিসেস্ মজুমদার, আপনার কেবিন যে খালি হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালেই ত চললেন আপনি?"

মিনতি জবাব দিল না।

এগারো নম্বর বলল—"আর কিছু না, সব ঢং। যেই শুনলো মেয়েটা বাঁচবে অমনি কেটে পড়ল।"

মিনতির ইচ্ছে করছিল প্রৌঢ়া এগারো নম্বরের গালে একটি চড় বসিয়ে দিতে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল মিনতি। ওর মনে হচ্ছে, পৃথিবী যেন অনেক নীচ হয়ে গেছে। নিজের বিছানায় এসে একেবারে শুয়ে পড়ল মিনতি।

আয়া ওর পিছু-পিছু এসে বলল—"ওমা, এ কি কাণ্ড, দাদা বাবু যে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

—"এতক্ষণ সে-কথা বলোনি কেন?"

—"বাঃ, আমি ত সে কথা বার বার বললুম।"

—"থাক, আর মিথ্যে সাফাই গাইতে হবে না। তোমরা কেবল পরের নিন্দে খুঁজে বেড়াও।"

বলতে বলতে মিনতি আঁচল সামলাতে সামলাতে বাইরে চলে গেল।

ওর চোখ মুখের চেহারা দেখে শ্যামল প্রশ্ন করে—"কি হয়েছে তোমার মিনু ?"

—"কই, কিছু না ত !"

—"বুঝেছি। তা আজ কোনো রকমে এখানে কাটিয়ে দাও। কাল সকালেই কেবিনে transfar করছি।"

—"কে বলেছে আমি কেবিনে যেতে চাই ?"

—"এ আবার বলতে হবে কেন ?"

—"আমি বেশ আছি।"

—"অত রাগ করে না মণি ! আমি ত নার্সিং-হোমেই থাকার কথা বলেছিলাম। তুমিই না ঝোঁক ধরলে, ছেলেমেয়ে হ'লে তখন পয়সাকড়ি অনেক দরকার,—পাগল !"

—"আমার কিছু দরকার নেই। কেবিনে যাবো না।"

—"কি হ'ল কী ?"

শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতি শান্ত মধুর চাহনী মেলে বলল—"সত্যি, রাগ করে বলিনি। আমাকে এখানে থাকতে হবে। খুব দরকার গো।"

—"কি দরকার শুনি ?"

—"সে তুমি বুঝবে না। পরে বলব। সব শুনো তখন—এখন জানতে চেয়ো না। বলতে পারব না—আর বললেও তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না—ব'লে বোঝানো যায় না কি না।"

—"কিন্তু কেবিন একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে পাওয়া খুব শক্ত।"

—"জানি। তার চেয়েও দুর্লভ জিনিস আছে ত।"

—"তোমার হেঁয়ালী বোঝা আমার কাজ নয়। যা ভালো বোঝো করো গিয়ে।"

শ্যামলের ডান হাতখানা দু'-হাতে জড়িয়ে মিনতি বলল—"জানি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমিও জানি না, কি ভাবে বোঝানো যায়। তবে এটুকু বলতে পারি, এতে আমার ক্ষতি নেই, তোমারও নয়—তা যদি এখানে থেকে এতটুকু উপকার করতে পারি !"

কেতকীর কথা বলল মিনতি। সব শুনে শ্যামল বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নেড়ে বলল—"এ সবের কোনো অর্থ হয় না মিনু ! তুমি বাজে সময় নষ্ট করছ। কাল তোমাকে ডাক্তারে examine করবে। নিজের কথাটা ভুলে যাচ্ছ যে, আমার কথা ?"

—"তার জন্যে ঢের সময় পাওয়া যাবে। মেয়েটা কেবল কাঁদে, ও ত সবই শুনেছে, বুঝতে পারে সব। ও আর কারও কাছে কিছু খায় না, এক ওর মা খাওয়াতে পারত—আর আমার কাছে খেয়েছে। আমি খাওয়াতে পারি ওকে—আর শুধু আজ ওর বাবার কাছে খেলো। তা তিনি ত সেই সকাল-বিকেল ছাড়া দেখতে পারেন না।"

একটা কথা মিনতির মনে পড়ল তবু বলল না, আজ সারা দিনের মধ্যে বার বার খাওয়াবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হওয়ার ইতিহাসটা ও যেন নিজের কাছেও গোপন রাখতে চায়।

শ্যামল মোটেই সমর্থন করে না মিনতির এই অকারণ করুণাকে। কিন্তু কিছু বলতেও ভরসা হ'ল না তার। এমন অনেক কিছুই ত নীরবে মেনে নিয়েছে শ্যামল। জেদটাই মিনতির সব চেয়ে বড় ব্যাধি, শ্যামল তা জানে। ডাক্তারেরা বলেছেন, সন্তান-সন্ততি হ'লে মিনতির এই ধরণের একগুঁয়ে মনোভাব কেটে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামল বলল—"ডাক্তার সেনকে বলা আছে কাল তিনি পরীক্ষা করবেন, তার কি হবে ?"

—"এখান থেকেও সেটা হতে পারে ত !"

—"অসুবিধে আছে তাতে।"

—"ও-সব জানি না, আমি এখানে থেকেই treatment করাতে চাই।"

—"দেখা যাক।"

—"নইলে আর এক কাজ করতে পারো। আমার কেবিনে কেতকীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেই হয়।"

—"বেশ তাই হবে।"

শ্যামল আর কোন কথা বলল না, মিনতিও চুপ ক'রে রইল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে মিনতি সতেরো নম্বর বেড-এর পাশে টুলের ওপর গিয়ে বসল।

মায়ালতার কথাই কেবল মনে পড়ছে ওর। বেচারী মায়ালতা, এমনি করেই ত এখানে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়েছে। কেতকী মূক, কেতকী জড়, কেতকীর কঙ্কালে জীবনের কোনো লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু বেঁচে রয়েছে। কী কষ্ট ওর তা কেউ ত বুঝতে পারে না। মিনতি বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠল—নাঃ, ভালো লাগে না, খুব অস্বস্তি হচ্ছে। ওপাশে ওয়ার্ডের মাঝখানে নার্সের চেয়ারটা শূন্য—কোথায় গেল নার্স, কে জানে !

সন্ধ্যার বিচিত্র আবেশে মিনতির মনে যে ভাবোচ্ছ্বাস জেগেছিল তার কোনো অবশেষই আর খুঁজে পাচ্ছে না মিনতি। এ যেন অন্য মানুষ। কেতকীর প্রতি কোনো মমতা আর নেই। সত্যিই মিনতি বিস্মিত হয়ে যায় নিজের এই ভাবান্তরে। এখন যেন মনে হচ্ছে কেতকীর বেঁচে থাকাটা বিড়ম্বনা ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বর কেন ওকে এত কষ্ট দিচ্ছেন ! কেন ওকে মুক্তি দিচ্ছেন না ?...পরক্ষণে মিনতি শিউরে উঠল। ছি, ছি, এ কী প্রার্থনা করছে ও। মেয়েটাকে একটু সেবা-শুশ্রূষা করবে ব'লে যেচে এসে এ কী অকল্যাণের কথা ভাবছে মিনতি। আত্মধিক্কারে মিনতি মরমে মরে যায়।

নার্স এসে ডাকল—"মিসেস্ মজুমদার, আপনি এখানে বসে রয়েছেন এখনো ! যান শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়েছে।"

—"যাচ্ছি ভাই !"

—"আপনি যান, ওকে আমি দেখব।"

মিনতি উঠে পড়ল। অযথা মৃত্যুকামনার জন্য বসে থাকা ত অপরাধ।

তবু বিছানায় শুয়ে মিনতি ঘুমোতে পারল না। বিকেলের ছবিগুলো ওর পাতাবোজা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোকনের আপত্তি, কচি কণ্ঠের দৃঢ় মন্তব্য: 'বিচ্ছিরি বোনকে তুমি ভালোবেসো না ভালো মাছি।' আর শীর্ণ-বিষণ্ণ মুখের আকুল—

হাতজোড় ক'রে মায়ালতার স্বামীর মন্ত্রপাঠ।···এক সময়ে মিনতি ঘুমিয়ে পড়ল এমনি করেই।

পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলাতে। প্রথম চোখ খুলেই মিনতি দেখল সতেরো নম্বরের চারি পাশ মশারি দিয়ে ঢাকা।

কি হ'লো?

আয়া খবর দিল, মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

মিনতি প্রশ্ন করল—"ওর বাবা আসেনি?"

—"হ্যাঁ দিদিমণি, বাপ এসে দুধ পাঁউরুটি মুখে দিচ্ছিল। বেশ খেল. সবটা খেয়ে নিল। তার পর কি যে হ'ল, বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

দীর্ঘশ্বাস পড়ল না মিনতির। কিন্তু পড়লেই যেন ভালো হ'ত। ও বললে—"ছাখো, আমার কেবিনটার কি বন্দোবস্ত হ'ল।"

নার্স এল—সব ঠিক হয়ে গেছে, আপনি চলুন। ডাক্তার সেন আসবেন এগারোটার সময়।

নিমেষের জন্য কেতকীর পাংশু মুখচ্ছবি এসে কি যেন বলতে চাইল, মায়ালতার টিপ-পরা টুলটুলে কালো মুখখানা তার পাশেই রয়েছে—ওরা দু'জনেই যেন প্রশ্ন করছে—এর পরও তুমি সন্তান কামনা করো?"

মিনতি বিরক্তিভরে আয়াকে বলল—"হাঁ করে দেখছ কী, এগারোটায় ডাক্তার আসবেন—তার আগে তৈরী হওয়া দরকার সে খেয়াল নেই!"

মিনতি সংহত ব্যক্তিত্ব দিয়ে যেন দুনিয়ার সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে প্রস্তুত, এমনই ভঙ্গীতে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঢাকা মশারির দিকে একবার ফিরেও তাকাল না—এ কি উপেক্ষা না ভয়!

একটি চাষীর মেয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

চরম অরাজকতার ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মত নদীর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা কত মানুষের সর্বস্ব যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

বাঁধ ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে তারা চকিত হয়ে উঠেছিল বটে!

কিন্তু কি করে তারা কল্পনা করবে তাদের এত ঝনঝাট ঝামেলা বেওয়ারিস খাটা আর এত লাখ টাকা ঢেলে গড়া বাঁধ এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়বে?

পুরানো আম কাঠের চৌকিটা বন্যার ঘোলা জলের স্রোতের উপর আঙুল চারেক পিঠ উঁচু করে আছে—স্রোতের জল মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে উছলে উঠে ছিটিয়ে পড়ে উপরটা ভিজিয়ে দেয়।

আর আছে ঘরের ভিতরে মানুষ সমান উঁচু মাচাটা। বাঁশের পুরানো নরম মাচা—গোবর্দ্ধনেরই এক বিঘা জমিতে আলু এবং আরেক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করায় নতুন পরীক্ষা বুক ঠুকে চালাবার সময় মাচাটা তৈরী করেছিল।

নীচে রাখলে ইঁদুর আলু খেয়ে সর্বনাশ করে দেয়।

দু'বছর চেষ্টা করেই গোবর্দ্ধন আর আলুর চাষ বন্ধ করেছিল—পোষায় না। এত দামে বীজ কিনে, এত মেহনত ঢেলে চাষ করে আলু হয় ডুমুর ফলের মত। জমির যৌবন ফুরিয়ে গেছে। পেঁয়াজও সে মোটে চার-পাঁচ কাঠা জমিতে বোনে।

আলুর চাষ বন্ধ হয়েছে। মাচাটা কিন্তু আছে। চৌকী আর মাচাটা আশ্রয় করে তারা বেঁচে গেছে। বন্যার জলে ডুবে মরেনি।

গরুটা ছিল বাঁধা। বাছুরটা ছাড়া।

বাছুরটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বন্যা কে জানে!

মরা মানুষের সঙ্গে দু'-একটা কুকুর-বেড়ালও ভেসে এসেছে ঘরের দাওয়ায়। বাঁশ দিয়ে ঠেলে দিতে কে জানে কোথায় কোন দিকে ভেসে গেছে।

বাঁধা গরুটা—সকলের আদরের কালোটা—খাটো দড়িতে বাঁধা ছিল বলে বন্যার জলে ডুবে মরেছে।

চৌকিতে বসে কেঁদে কেঁদে গোবর্দ্ধন বলে, একবার খেয়াল হল না গো কালোকে ছেড়ে দেই। কালো মা আমার দড়ির ফাঁসে বন্যায় ডুবে মরছে!

গিরিও কাঁদে।

বলে, আর গরু পুষব না। মা গো মা! দুরন্ত বলে দড়ি বেঁধে রেখে তোকে মুই মারলাম! গো-হত্যা পাতক হল মোর বেঁধে-ছেঁদে জোড়াতালি দিয়ে মাচানটাকে!

বাঁশের মাচায় গিরির পাঁচ বছরের পাঁকাটির মত রোগা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে মামামামীর হাহুতাশ কান্নাকাটি শুনতে শুনতে রেবতীর মনে হয় যেন প্রাণান্ত হচ্ছে।

সে রেগে উঠে ঝংকার দিয়ে বলে, কেন গো মামী? নিজেকে দোষী বানিয়ে ন্যাকা কান্না কাঁদছ কেন? গরু সবাই বেঁধে রাখে। এমন বন্যা আসবে তুমি জানতে না অন্যেরা জানত? কালো মরেছে, তোমার দোষটা কি? এ বন্যার দায়িক যারা গোহত্যার দায়টা তাদের। তোমার নয়।

গিরি কান্না থামিয়ে হতাশার সুরে বলে, তুই ছুঁড়ি বুঝবি নে লো, বুঝবি নে। ঘর-সংসার পেতে বসিস, ছেলে-পুলের সাথে গরু পুষিস, টের পাবি দু'-চারটে ছেলেপিলে পোষার চেয়ে কত হাঙ্গামা একটা গরু পোষায়।

রেবতী এতটুকু দমে না গিয়ে বলে, কি দরকার অমন ছেলে-পিলে পোষায়, গরু পোষায়! গাঙ কি নেই? গাঙে ভাসিয়ে দিলেই চুকে যায়!

যেখানে যত নৌকা আর ডিঙি ছিল সব দিবারাত্রি লেগে যায় প্রাণ বাঁচানো আর প্রাণে বেঁচে থাকার উপকরণ বাঁচানোয়

কাজে। নৌকাই ঘর-বাড়ী হয়েছে কত পরিবারের। বাঁশ আর ভক্তা খাটিয়ে কত পরিবার আশ্রয় নিয়েছে গাছের ডালে।

লক্ষকোটি মানুষের ঘাড় ভাঙ্গার অধিকার পাওয়া কিছু মানুষদের বিলাতী বিশেষজ্ঞ এনে অজস্র টাকা ঢেলে তৈরী করা বাঁধের হঠাৎ চুরমার হয়ে পড়ার বন্যা। সবাই জানত বিপদ আসছে। ভীষণ বিপদ। তাদের কপালে যে এত পরিকল্পনা করা বাঁধ ভাঙ্গার বিপদ এমন আকস্মিক বন্যার রূপ নিয়ে আসবে কে তা ভাবতে পেরেছিল!

জলে থৈ থৈ চারিদিক।

রেবতী ভাবে একটু কিছু যে করত কারও জন্য, তারও তো উপায় নেই!

চারিদিক জল থৈ থৈ।

গিরি শুধু কপাল চাপড়ে কাঁদে না, ক্রমে ক্রমে রেবতীর খেয়াল হয় মামীর যেন তার আরও কেমন একটা অদ্ভুত ভাব এসেছে। মাঝে মাঝে গুম খেয়ে থাকে, কেমন একটা বিদ্বেষভরা ভয়াতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবতীর মনে হয় গিরির প্রাণে যেন বিরাগ ভাবের বন্যা নেমেছে।

কেন? কেন তার দিকে এমন ভাবে তাকায় গিরি, অথচ রাগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে না?

এ সময় কথা কইলে এমন ভাবে মুখ বুজে থাকে যে মনের কথাটা আঁচ করার উপায় থাকে না। গা-বাঁচানো গঞ্জনা বন্ধ হয়েছে। বিরাগ কি তবে তারই উপর?

: এমন মুখ ভার করে থাকিসনে মামী। তোর মুখ দেখে সাধ হয়, উঠোনে নেমে ডুবে মরে স্রোতে ভেসে ঘরে তোর চৌকির পায়ার এসে ঠেকি। নয় তো সাঁতরে গিয়ে দেখে আসি বাপ-ভাই ডুবে মরেছে নাকি।

গিরি খনখনিয়ে ওঠে, তোদের ওগাঁয়ে জল নেমেছে নাকি? নদীর ওপারে না তোদের গাঁ? ঢল নামলে এপারেই নামে—ওপারে যায় না।

মাচা থেকে নেমে এসে চৌকিতে উবু হয়ে বসে রেবতী রেগে বলে, শোন বলি মামী—বয়েস সমান, মাঝে মাঝে তুই বলে কথা কই, সম্পর্কে তো গুরুজন! নে, পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করলাম তোকে। মন খুলে বল দিকি কেন এমন মুখভার? মোর সাথে কেন কথা কসনে ভাল-মন্দ?

তার এই আকস্মিক আক্রমণে মনের দুয়ার আর বন্ধ রাখতে পারে না বুড়ো চাষীর সরলা অল্পবয়সী বৌ। দেড় দিনেই দম আটকে আসছিল।

: তুই তো ঢল আনলি। একেবারে সব্বোনাশ করলি।

রেবতী গালে হাত দেয়।

: ওমা, মামী কি বলছিস তুই? বেশী বর্ষা নামল, নদী ফুলল, বন্যা হল, দায়িক হলাম মুই?

: পাপ করে এয়েছিস তো। দু'বছর ঢল নামেনি। পুড়ে-জ্বলে গেছে আদ্দেক ধান। তুই এলি আর ঢল নেমে শেষ করে দিল এবারের চাষ। তোর মামাই তো বললে, সব্বোনাশী হয়ে এসেছে, এমন ঢল বিশ বছরে নামেনি। এক মণ 'ধান উঠবে কিনা সন্দ' এবার।

বলতে বলতে কি যেন ঘটে যায় গিরির চেতনায়। জমা করা ভয়-ভাবনার সঙ্গে ভীষণ বন্যার ভয়ঙ্কর ভয়-ভাবনা মিশে ফেটে চুরমার হয়ে যায় তার ধৈর্য্যের ঘাঁটি, চুরমার হয়ে যায় তার সহ্যের বাঁধ।

নেমে আসে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতই বিকারের ঢল।

রকম দেখে রেবতীকে ভাবতে হয়, মাথা কি খারাপ হয়ে গেল গিরির? সে কি ভুলে গেল এইমাত্র তাকে গুরুজন বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল রেবতী?

আছড়ে পড়ে রেবতীর পা জড়িয়ে ধরে গিরি হাউ-হাউ করে কাঁদে, তার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলে, তুই ফিরে যা। সব্বোনাশী ফিরিয়ে নিয়ে যা সব্বোনাশ। মাঘ-ফাগুনে বাচ্চা বিয়োতে হবে—মাঠের ধান শেষ হয়ে গেল। কি খেয়ে বাঁচব মাঘ-ফাগুন তক?

রেবতীকে শুয়ে পড়তে হয়। নইলে পা আঁকড়ে ধরা গিরিকে বুকে আঁকড়ে ধরা যায় না। গিরির মাথাটা বুকে চেপে ধরে কানে মুখ লাগিয়ে বলে, কেন এত ভাবছিস মামী? ব্যাকুল হচ্ছিস? তুই মরলে আমি মরলে কার কি এসে যায়? মরলেই তো তুই-আমি বাঁচি! মরার ভয়ে মরে মরেই তো মোরা মলাম! তার বুকে মাথা গুঁজে গিরি ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে।

কাঁদে আর বলে যে পেট থেকে পড়া মাত্র তার মা-মাগী কেন তাকে নুন দিয়ে মেরে ফেলে নি—নুন তো সস্তা—কত সের আর লাগত আঁতুড়ে তাকে নুন দিয়ে মারতে? বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে যমঘরে পাঠাতে কম কি টাকা লেগেছে মার।

রেবতী বলে, কি ভাবছিস বুঝেছি মামী। সবাইকে ডুবিয়ে নিজে ডুবতে চাস্, মরতে চাস্? এ মরণ কি সুখের হবে তোর? মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে ঝাকড়া গাছে ঝুলে থাকবি আর মোদের ভয় দেখিয়ে মজা পাবি। কেন গো তোর মরে গিয়ে পেত্নী হওয়ার সাধ? যতক্ষণ বেঁচে আছি, বাঁচার জন্য লড়ব।

গিরি কথা কয় না। হাত দিয়ে পা দিয়ে তাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তার গালে ঘন ঘন চুমো খায়। চুম্বনে আলিঙ্গনে তাকে যেন পিষে ফেলতে চায়।

এখনো উন্মাদিনীর মত করতে থাকলেও তার ভাবান্তরে এতক্ষণে শান্ত হয় রেবতীর মন। সে টের পায়, তাকে মেরে আত্মহত্যার চিন্তাকে গিরি আর আঁকড়ে থাকবে না, পাগল হয়ে উঠবে না ওই চিন্তায়। গিরি তাকে আদর করছে।

গিরির পাগলামীর এ বিস্ফোরণ বিপজ্জনক নয়।

তৃতীয় দিন জল নেমে যায় দাওয়ার কয়েক আঙুল নীচে। এটুকু নামবে জানাই ছিল, ঢলের জল চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু থৈ-থৈ জল সরে গিয়ে উঠোনটার গা তুলতে এবার ক'দিন লাগবে কে জানে!

অতি কষ্টে একটা নৌকা যোগাড় করে আর পাঁচ জনের সঙ্গে গোবর্দ্ধন গিয়েছে জলমগ্ন ক্ষেতের দিকে। কারো কিছু করার নেই। তবু যদি কিছু করা যায়। সর্বনাশ যদি একটু ঠেকানো যায়।

ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে চেরা বাঁশের বৈঠা বেয়ে গোবিন্দ একেবারে দাওয়ায় এসে ঠেকে।

বেড়া ভেসে গেছে বন্যায়। লাউ মাচাটা ভেঙ্গে পড়ে ভেসে গেছে—শিকড়ের বাধনে আটক সাদা ফুল আর কচি কচি চারা লাউয়ে ভরপুর গাছটা বন্যায় জলে হাবুডুবু খেতে খেতে অঙ্গ খসিয়ে খসিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

কুমড়ো গাছটা তুলেছিল চালায়—পুরানো জীর্ণ খড়ের চালায়। গোড়া টেনে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছে হঠাৎ বন্যায় ঘোলা জলের স্রোত, পচা খড়ের চালায় কিন্তু হাসছে রাঙা ফুল, সবুজ চওড়া পাতা, মোটা সোটা সবুজ সতেজ ডাঁটা—কচি কচি কয়েক গণ্ডা কুমড়ো ফল।

গোবিন্দ বলে, বেঁচে আছ?—বাঁচলাম। ভাবতে পারিনি এসে জ্যান্ত দেখতে পাব। ফিরে যদি যেতে চাও—

গিরি চীৎকার করে ওঠে, ওকে তুমি নিয়ে যাও—দোহাই তোমার নিয়ে যাও। ওর জন্য এই ঢল নেমেছে—ওর জন্য মোদের এই সব্বোনাশ।

রেবতী রাগে না। আজে-বাজে কথা বলে আবোল-তাবোল মরা-বাঁচার জের টানে না।

সোজাসুজি প্রশ্ন করে, চাল-ডাল ঘাস-পাতা কিছু এনেছ নাকি?

: এনেছি বৈ কি।

: দাও।

গোবিন্দ এনেছে কিছু মোটা লাল চাল, দু' রকম ডাল, নুন, মশলা, কাতলা মাছের মস্ত একটা মাথা!

রেবতী বলে, মামী, দাওয়ায় একটা উনুন করে চালটা ফুটিয়ে দিচ্ছি, মাথাটা কেটে কুটে দিতে পারবে তো?

গিরি তার দিকে এক নজর তাকিয়েও ত্যাখে না, বিরাগভরা একটা আওয়াজ করে জানিয়েও দেয় না যে সে তার সব কথাই শুনেছে।

ছেঁড়া কাপড়ের ছেঁড়া আঁচলটা যতটা পারা যায় সামলে-সুমলে নিতে নিতে সে উঠে এসে বলে, ডিঙ্গা চেপে দাওয়ায় এসে, ডিঙ্গায় বসে ফিরে যাবে? এতই কি সস্তা হয়ে গেছি—মামীশাশুড়ী মুই!

ছেঁড়া আঁচলে বুকটাই সামলায় গিরি, কোমরের বাস যে খসে গেছে এটা তার খেয়ালও নেই। গোবিন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে তাল গাছটার মাথা অথবা আরও দূরের আকাশে থরে থরে সাজানো মেঘের দিকে, রেবতী লুটানো কাপড় তুলে মামীর কোমরে জড়িয়ে দেয়, খোঁচা দেওয়া রসিকতার সুরে বলে, মামী-শাউড়ী! ভাগ্নী রইল আইবুড়ো, উনি হলেন মামী-শাউড়ী!

গোবিন্দকে বলে, উঠে এসো না দাওয়ায়? দরদ জানাতে এসে ডিঙ্গায় গ্যাট হয়ে বসে থেকে বৈঠা মেরে মন ফাটিও না আপন জনের।

দাওয়ার খুটিতেই নৌকা বেঁধে গোবিন্দ কাদা-লেপা দাওয়ায় উঠতেই একেবারে যেন অন্য মেয়েমানুষ হয়ে যায় গিরি। কপালটা চাপড়ে দেয়।

: মুখে বলো আর না বলো, এবার জামাই হয়ে ঘরে উঠলে। কি দিয়ে কি করে জামায়ের মান রাখি!

রেবতী আর গোবিন্দের চোখে চোখ মেলে। দু'জনের চোখ যেন ঝলসে ওঠে।

মাথা কি সত্যি বিগড়ে গেছে গিরির?

গিরি কি জানে না তাকে জামাই বলা বিষম দোষ?

ডিঙ্গি নৌকায় চেপে রেবতী বেঁচে আছে না, বন্যায় ভেসে গেছে অথবা বন্যায় সব কিছু ভেসে যাওয়ায় না খেয়ে মরতে বসেছে জানতে এসে সে গিরির কাছে হয়ে গেল জামাই! বিয়ে যেন হয়ে গেছে তাদের!

চাল ডাল নিয়ে সত্যিকারের বুড়ী শাশুড়ীর মতই অনায়াসে কাপড় হাঁটুর উপরেও অনেকখানি তুলে উঠানের থৈ-থৈ জলে নামার আগে মুখ ফিরিয়ে গিরি বলে, না খেয়ে যদি যাও জামাই, আজকেই সম্পর্ক শেষ। তোমার চাল ডাল খড় কঞ্চি জ্বালিয়ে রাঁধছি—মাছের ঝাল পাবে। যেও না কিন্তু খপর্দ্দার!

রেবতীকে শাসিয়ে বলে, রসুই-ঘরে পা দিবি তো তোর মাথা ফাটিয়ে দোব, হাঁ। ঘরে যেয়ে গপ্পো কর দু'জনায়।

রসুই-ঘরের ভিটে নীচু—এখনো মেঝেয় পায়ের পাতা ডোবানো জল—উনানটা গলে গেছে না আছে কে জানে। রেবতী বলে, রসুই-ঘরে জল যে গো!

গিরি ঝংকার দিয়ে বলে, তোর তাতে কি লো আবাগীর বেটি?

আমি যে ভাবে পারি জামাইকে রেঁধে খাওয়াব—দায় তো তোর নয়!

বন্যার ভয়েই উঁচু করে ঘরের ভিত গাঁথা, দাওয়ার কয়েক আঙুল নীচে নামলেও উঠোনে জল কম গভীর নয়। আরও খানিকটা কাপড় উঠিয়ে বন্যার জল ঠেলে গিরি রসুই-ঘরে চলে যায়।

গোবিন্দ বলে, মাছ? মাছের ঝাল?

রেবতী বলে, কেন? বন্যা হলে দাওয়ায় বসে কঞ্চির ছিপে সারা দিন মাছ ধরার ব্যাপার তুমি জানো না?

বলতে বলতে রেবতী হাত বাড়িয়ে আচমকা কঞ্চির ছিপটায় হেঁচকা টান দিয়েই ঢিল দেয়।

: বড় মাছ। এ ছিপে তোলা যাবে না।

গোবিন্দ যেন বিদ্যুতের ছোঁয়াচ লেগে লাফিয়ে ওঠে।

: এক মিনিট শুধু ধরে রাখ মাছটাকে।

তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলে রেবতীর কাঁধে রেখেই গোবিন্দ বন্যার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—ছিপের সুতোটা ধরে মাছটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঘর আর বেড়ার কোণার দিকে।

সুতোটা শক্তই ছিল—জালের জন্য পাকানো নতুন সুতো—নইলে মাছটা ধরা যেত না।

বিশ্ব-সংসার ভুলে গিয়ে রেবতী চেঁচিয়ে বলে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও আসছি।

শুকনো শাড়ী নেই, মামার পরনের আট হাতি ছেঁড়া ধুতিটা সম্বল করেছিল—তাও ভুলে যায় রেবতী। জলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দু'হাতেই আলিঙ্গনে বুকে বেঁধে প্রকাণ্ড মাছটাকে সত্যই গোবিন্দ তুলে নিয়ে আসে।

মাছটা লেজ চাপড়ে চূর্ণ করে দিতে চায় বাঁধন—গামছা-পরা গোবিন্দ দু'হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকে মাছটা।

চাপে তার ছাতি ফেটে যাক—এত কষ্টে ধরা মাছটা সে ছাড়বে না।

আট হাতি ছেঁড়া ধুতি পরে রেবতী জলে নেমেছিল তাকে সাহায্য করতে।

ছেঁড়া হেটো মোটা ভিজা ধুতিটা রোয়াকে ছেড়ে শুকনো গামছাটা গায়ে জড়াবে বলে ঘরে যাওয়ার উপক্রম করতেই গোবিন্দ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাছটাকে যেমন ধরেছিল।

রেবতী চাপা গলায় বলে, মাথা খারাপ হয়েছে? মামী তাকিয়ে আছে না রসুই-ঘর থেকে?

এত বড় মাছটা টেনে তোলার উত্তেজনায় গিরির কথা মনেও ছিল না গোবিন্দের।

গিরিকেও আশ্চর্য্য মানুষ বলতে হবে, একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের জলে নেমে মাছটা তোলা চেয়ে দেখেছে, টুঁ শব্দটি করে নি।

এ রোয়াকে দু'জনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রসুই-ঘরের দুয়ারে দাঁড়ানো গিরি মুচকে হেসে বলে, মাছ তো তুললে, মাছ দিয়ে হবে কি জামাই? পারলে জিইয়ে রাখো, বিয়ের দিন ভোজ দিতে লাগবে। আর নয় তো সহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে যাও।

বন্যায় কি শুধু ভেসে যায় মেয়ে পুরুষ শিশুর প্রাণহীন দেহ? শুধুই কি প্রকাণ্ড মাছ আটকা পড়ে জল থৈ-থৈ করা ছোট উঠানের বাঁশের বেড়ার জেলখানায়?

ভেসে যায় কিশোর ফসলের আগামী ভবিষ্যৎ?

এই অনিয়মিত এলোমেলো বন্যার রকম-সকম ব্যাপার-স্যাপার আর মারাত্মক ফলাফলের কাণ্ড-কাহিনী যারা জানে—তারাই কেবল ধরতে পারে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ চাষীর মন কি ভাবে হতাশায় কুঁকড়ে যায় সাত দিন দশ দিনের বন্যায় সারা বছরের জীবনের হিসাব-নিকাশ তলিয়ে গিয়ে গুলিয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে!

সকলের ভাব সব দেখে নিজেকে এমন অসহায়া মনে হয় রেবতীর।

চিরদিন জানত—পুরুষতায় চরম ভরসা।

পুরুষরা ক্ষেতে খেটে কলে খেটে পয়সা কামায়—তাদের খাওয়ায়।

এবার বিশ্বাস ভেঙ্গে যায় পুরুষের উপর।

গোবিন্দ বলেছে, এই বন্যা নাকি ঠেকানো যায়—ফাঁকি না দিয়ে ঠিকমত বাঁধ গড়া হলে বন্যা এসে সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যেত না।

শুধু ঠেকাতে পারাই নাকি নয়! গরু-ছাগলকে বেঁধে পোষ মানিয়ে মানুষ যেমন দুধ আদায় করে খেয়ে বাঁচে আর পুষ্ট হয়, বন্যাকে বেঁধে পোষ মানিয়ে তেমনি নাকি মানুষ বাড়াতে পারে ধনসম্পদ।

কেন তবে বন্যাকে পোষ মানায় না পুরুষেরা? পুরুষ হয়ে নিজের এই অক্ষমতা আর উদাসীনতার জন্য নিজেকে একটি বারের জন্য ধিক্কার না দিয়ে গোবিন্দ কেন খুসী হয়ে বলে, সে যাই হোক তাই হোক এই বন্যার কল্যাণেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।

বন্যা যদি না হত, সে যদি খবর নিতে না আসত, প্রকাণ্ড মাছটা তোলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে রেবতীকে বুকে জড়িয়ে ধরা গিরির চোখে না পড়ত—তবে কি এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা হত?

এ কি বিচার-বিবেচনা পুরুষের?

এই বন্যায় বিয়ে?

তিন দিন পরে যে বিয়ের শুভ লগ্ন আছে সেই লগ্নে?

রেবতী আর গোবিন্দ দু'জনে মিলে মস্ত একটা রুই মাছ রোয়াকে তুলতে গিয়ে অর্দ্ধ নগ্ন হয়ে, মাছটা তুলে রোয়াকে রেখে পরস্পরের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে, একটা অদ্ভুত রহস্যময় অদম্য প্রেরণায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল বলেই এবং সেটা মামীর চোখে পড়েছিল বলেই তিন দিনের মধ্যে বিয়ে ঘটিয়ে দিতেই হবে তাদের! এই থৈ-থৈ বন্যায় পৃথিবী যখন ডুবে আছে?

মামী বলে, না বাছা। সব বুঝেছি—আর টাল-বায়না নয় বন্যা হোক ভূমিকম্প হোক আর দেরী করা নয়। ছিরিমন্ত ঠাকুর এসে মন্তরটা আউড়ে দিয়ে যাক, দু'-পাঁচ জনা পড়শী এসে দুটো মেঠাই-মণ্ডা খাক, তার পর যা খুশী কর তোমরা দু'জনায়।

রেবতীর বাপ-ভাই?

গোবিন্দ তাদের খবর দেবে।

মামা বলে, গোবিন্দ রাজী না হলে দা' দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে বেনো জলে ভাসিয়ে দিতাম!

রেবতী মনে মনে হাসে। গোবিন্দ রাজী না হলে! নগদ নগদ হাতে স্বর্গ পাবার জন্ম গোবিন্দ রাজী না হলে!

মামা-মামীকে একটু ভড়কে দেবার জন্ম সে জিজ্ঞাসা করে, ছেড়ে তো দিলে, আর যদি ফিরে না আসে?

মামী হেসে বলে, চুপ কর মুখপুড়ী ছুঁড়ি! খুসীতে গদ গদ হয়ে যায়নি তোর বাপ-ভাইকে খবর দিতে? কে জানে বাবা তুই কি-বজ্জাতি জানিস, কোথা থেকে কি বশীকরণ শিখেছিস! তোর মামা কথাটা তুলতেই বললে কি না, তাই তো আমি চাই, ধন্না দিয়ে আছি, হন্তে হয়ে আছি!

গালটা তার টিপে দেয় মামী।

: ধন্মি মেয়ে বাবা তুই!

: কি করলাম? কোন দিন হাত ধরতে দেইনি, জানো? মাছটা তুলতে বেসামাল হয়ে কেমন করে যেন—

মামী পোড়া তামাকের গুঁড়োয় মাজা কালো দাঁতে ত্'গাল হেসে বলে, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ। মিটেই তো যাচ্ছে ব্যাপারটা? এই ঘরে তোর বাসর করে দিয়ে বিয়ের রাতে মোরা ওই চালার নীচের মাচাটায় রাত কাটাব। মশায় পোকায় অতিষ্ঠ করবে—উপায় কি? তুই ছুঁড়ি যে পীরিতের জাল ছড়িয়েছিস্।

মামীর হাসি-খুসীর ভাব দেখে পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল রেবতী।

পীরিত করা তবে নিষিদ্ধ নয় তার মত গরীব ছোট লোক চাষীর মেয়ের পক্ষে। পীরিত করা লোকটার সঙ্গে বিয়েও অসম্ভব নয়—বন্তায় দেশ ভেসে গেলেও!

গোবিন্দ ফিরে আসে না।

কোন সংবাদও জানায় না।

মামা-মামী বিয়ে স্থির করল তৃতীয় দিনের শুভ লগ্নে।

দ্বিতীয় দিনটা কেটে গেল মামীর সনে হাত মিলিয়ে ভাত-ব্যঞ্জন রেঁধে, চিড়ে কুটে, বিচালি টুকরো করে কেটে।

পরদিন গোবিন্দ এসে নিশ্চয় জানিয়ে যাবে ব্যবস্থাটা কি রকম আর কি ভাবে করা হল।

বন্তায় ভাসা পৃথিবীতে শুধু মন্ত্র পড়ে সয়া হোক, বিয়ে তো তুচ্ছ ব্যাপার নয়!

সারা দিন প্রতীক্ষায় কাটে।

গোবিন্দ আসে না।

বন্তা থৈ-থৈ করছে অঙ্গনে।

দাওয়ায় বসে উঠোনে ছিপ ফেলে ছেলে-মেয়ে বৌরা ধরছে চারা রুই কাতলা মিরগেল আর পুঁটি মাছ।

দিন যায়।

কী রাঙা হয় দিনান্ত! বিয়ের দিনেও গোবিন্দ আসে না।

আসে অজানা এক জন যোয়ান মানুষ।

খবর দেয়, গোবিন্দকে বিনা বিচারের আইনে ধরে জেলে পোরা হয়েছে।

[ক্রমশঃ।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

পঁয়ত্রিশ

একটা রাত আগের কথা।

দিবাকর ব্যতীত ঘাটে এসেছে সবাই। মুক্তা ধীরে ধীরে নাও ঠেলে। অনিচ্ছায় নৌকাখানা এগিয়ে চলে। কিছুদূর যেতে না যেতে পিছন থেকে ডাক আসে, 'মুক্তা মুক্তা···নাও ভিড়াও।'

কে? কনক নাকি? এমনিতেই তো এ ওর অনিচ্ছার যাত্রা তাতে আবার পিছন থেকে বাধা!

নাও কূলের পাশ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে, মুক্তার হাতের বৈঠা টেনে নিয়ে গলুইতেই উঠল দিবাকর। 'তুই ভিতরে যা।'

'আহা না, না···'

'আর ঢং করে না—ভিতরে যা। সর, সর, জল ওঠে দেখ না গলুইর কোল বাইয়া।'

বৈঠা ছেড়ে মুক্তা ভিতরে চলে যায়।

'ক্যান আইল্যা গোঁসাই, কি ভাইব্যা?' মুক্তা প্রশ্ন করে।

'আইলাম তো তোর হাতে খড়ি দিতে। প্রথম প্রথম দুই একটা রাইত যদি না দেখাইয়া দি—হাজার হইলেও ঘরের বৌ, পারবি ক্যান 'আওড়-বাওড়' (জলের গতি) চিনতে?'

টালাইখানা এগিয়ে চলে নৈশ বিলের বুক চিরে নিঃশব্দে। মুক্তা তৎক্ষণাৎই কিছু জবাব দেয় না। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে।

মুক্তা হর্ষে আনন্দে অধীর হ'য়ে বাইরে চলে আসে ছুই ছেড়ে, জড়িয়ে ধরে দিবাকরকে। 'এখন আমারে কোলে তুইল্যা লও গোঁসাই, আমি তো আইছি তোমার কাছে—একেবারে বুকের কাছে।' পক্ষিণীর চঞ্চুপুট উদ্ঘাটিত।

দিবাকর হঠাৎ কিছু বুঝতে পারে না। সে বৈঠা ছেড়ে ওকে নিয়ে ভিতরে আসে। 'ওরে, জল ওঠে 'আবার গলুই বাইয়া।'

'জলে আমার ভয় নাই গোঁসাই, আমি জাইল্যার মাইয়া, ভয় আমার আকাশে, ভয় হালকা বাতাসে। জীয়ন্ত ইলশা কূলে উইঠ্যা কতক্ষণ আর বাঁচে?'

দিবাকর সঠিক কিছু না বুঝলেও জবাব না দিয়ে পারে না এ ক্ষেত্রে। 'তুই পাখীও না মাছও না—মানুষ। ওরে আমার সাধের সাগর-সেঁচা ধন। তুই মিছামিছি আবোল-তাবোল চিন্তা কর ক্যাবল।'

'পাইয়াও তো পাই না তাই তো ভাবি। জম্মিলাম এক গ্যাশে গেলাম চইল্যা কই···বুকে বড় বাজে, বুকে বড় বাজে!'

ওর চোখ মুছায় দিবাকর অন্ধকারে। তার পর বুকের সংগে সজোরে চেপে ধরে বলে, 'এখন তো পাইছ?'

'না, না গোঁসাই আরও কাছে আইস।'

'তুই যেন মিলতি দিলি পয়ারের।'

'বার বার তুমিই তো ছন্দ কাটো।'

'ওরে যা ভবিতব্য তা খণ্ডান যায় না। আইজ যে মিইল্যা গেছে, সেই মহা সৌভাগ্য।'

তার পর গভীর আনন্দে অপূর্ব বেদনায় কেটে যায় ত্রিযামা রজনীর শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। নয়ালি লতা বঁড়শি আনকোরা লতান থাকে বাঁশের পর্বের এক মাথায়।

দু'জনে চেয়ে চেয়ে দেখে, কুয়াশার কোল বেয়ে চলেছে ঝাঁক বেঁধে শীতের যাযাবর বুনো হাঁস, চখাচখী, শাদা বক বিনা সুতার মালার মত। •

একটু একটু করে কুয়াশা কেটে গেল। মানুষ নেই, পাখীরা চোখ পাকিয়ে চেয়ে দেখল, কি যেন বলাবলিও করল নিজেদের মধ্যে। প্রহর খানেক বেলা হয়েছে প্রায়। দূরে দল দাম ঘাসের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। মুক্তা শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে লজ্জায়।

সে স্নান করে। ঘরণী আজ নতুন ঘর করবে। অতএব তাকে কাটিয়ে উঠতেই হল আলস্যের অন্তরায়।

'গোঁসাই আজ আমাগো অজ্ঞাতবাস।'

কোনও জবাব না দিয়ে, দিবাকর মৃদু মৃদু হাসে।

'ও কি, হাস ক্যান?'

'তাতে আমার লাভ নাই, অংশীদার হইবে আরও চাইর জন।'

'তুমি যে কি কও!' মুক্তা দুঃখিত হয় যেন একটু। 'এক কথার অর্থ কর আর একটা।'

কনক সংগে কিছু চাল দিয়েছিল—মসলা-পাতিও ছিল নায়ে। মুক্তা রান্না চাপিয়ে দিল গলুই খোপে বসে। ভাতের পর কি যে রাঁধবে তার জোগাড় নেই, মসলা—বাটে প্রচুর।

একটা মাছ অনায়াসে ধরে দিবাকর বঁড়শি ফেলে। 'এই নে—ধর মাছটা।'

মুক্তা আশ্চর্য হয়ে যায়। কখন উঠল দিবাকর, কখনই বা পাছা খোপে বসে ফেলল ছিপ!

'একটু তাড়াতাড়ি কর।'

'এত ক্ষিদা লাগা তো উচিত নয়।' মুক্তা মিষ্টি গলায় রহস্য ঢেলে বলে, 'কোলের পোলাপানের (ছেলেমেয়ের) মত অত খাই-খাই করে না।'

দিবাকর বাঁকা কথা তলিয়ে বোঝে না, উত্তর দেয়, 'না রে, যামু বাড়ী।'

মুক্তা লজ্জার মাথা খেয়ে বলে, 'তুমি তো গোঁসাই একবার চাইয়াও দেখলা না আমার দিকে—সাজলে-গোজলে মনুষ্যে তো দাসী-বান্দির দিকেও চায়।'

তীব্র পিপাসা, আকণ্ঠ অতৃপ্তি রয়ে গেছে মুক্তার মনে। তার বুকটা টনটন করতে থাকে। পড়েনি, তার আগেই যে দিবাকর ভাঙতে চাইছে ঘর। সে এসেছে বটে, কিন্তু যাওয়ার জন্যই যেন ব্যাকুল।

'মুক্তা, আমি কি তোরে উপেক্ষা করছি যে ও-কথা কও? চিরদিনই তো তোরে প্রিতিমার মত দেখায় সাজ-সজ্জায়।'

চিরদিনের সংগে আজকার এই দিনটি যে কত পৃথক তা তো বোঝা উচিত ছিল দিবাকরের। পরিবেশটাও কি তার মনে কিছু রেখাপাত করছে না?

'যদি দেরী করি, কোন জরুরী ডাক পড়ে তা তো কওয়া যায় না···ওরা হয়ত···'

পথের দিকে চেয়ে আছে। ওদের ডাকে শুধু সাড়া দেবে। তাই দাও, তাই দাও। মুক্তার কণ্ঠ মিলিয়ে যাক এই নির্জন দিগন্তে। সে ডেকে ডেকে মরে যাক তৃষ্ণার্ত চকোরীর মত

'ইচ্ছা ছিল তোরে শিখাইয়া বুঝাইয়া দিমু। কিন্তু আইজ নয়, আর একদিন—সময় তো আছে ঢের।'

তারই তো চূড়ান্ত প্রমাণ আজ দেখাচ্ছে দিবাকর। বলুক, বলুক যা ওর চিত্তে আসে। মুক্তার মনের প্রদাহ ক্রমে বাড়তে থাকে। তাই কুটতে গিয়ে জীবন্ত মাছটা পিছলে চলে যায় জলে। মুক্তা একেবারে হাহাকার করে ওঠে।

'কি হইছে?···ভালই হইল—যাউক গিয়া—ভাত তো আছে।'

আজ মুক্তা আর ঝগড়া করে না। শুধু ভাতই বেড়ে দেয় বেলা দ্বিপ্রহরে কেবল একটা লংকা পোড়া দিয়ে। অবশেষে চেয়ে থাকে মুখ ফিরিয়ে রৌদ্র-দগ্ধ অসীম বিলের দিকে।

খাওয়া শেষ হয়, যাওয়ার সময় আসন্ন হয়ে আসে। অপরাহ্নের ম্লান আভা পড়ে দিগন্তে। দীর্ঘ হয় নিকটস্থ ছাড়া টিলার গাছ-পালার ছায়া।

'তুই খাবি না?'

'ব্যস্ত কি, আমি তো যামু না।'

তা বটে! দিবাকর বলে, 'গত রাত্তির তুই যখন ঘুমে তখন একটা আগুনের ঝলকা দেখছি বিলগাঁর দিকে। কার ঘরে কে আবার আগুন দিল· তাই মনডা আমার অস্থির।'

ও মিথ্যা, মিথ্যা অগ্নি-শিখা।···মুক্তা মনটাকে বলিষ্ঠ করে।

দিবাকর কেন জানি বলে, 'আইজ না হয় থাউক কাইলই যামু গ্যাশে।'

মুক্তা অতর্কিত আনন্দে ওর গোঁসাইর বুকে লুটিয়ে পড়ে।

পরদিন ফিরতে ফিরতে রাত শেষ হয়ে গেল দু'জনার।

এলেম বলল, 'গোঁসাই, ধীরে কথা কও।'

'ক্যান?'

উত্তরে সব ভাঙিয়ে বলল এলেম। বলল, কনকের গলার হার ছিনিয়ে নেওয়ার কথাও।

'তবে এখন আমি ধরা দি।'

'সর্বনাশ—এমন একটা হইছে কি? তুমি আটকা পড়লে ভাঙবে যে সকসডির মেরুদণ্ড।'

'তবে করতে কও কি?'

'ডুব দাও, সময় বুইঝ্যা আইষা মাঝে মাঝে। এখানে তো

ছাড়া ভিটা, জংলা চর আছে অনেক। বাইরে রইলাম আমরা, গোপনে রইলা তুমি। ফন্দিডা কেমন?'

'খুব পাকা—কাজ হইবে সব রকম।'

মুক্তার বুকটা টিব টিব করছিল এতক্ষণ। সে মনে মনে স্থির করল যে, নেবে গোঁসাইর তদ্বিরের ভার। বলল এলেমের কাছে, নিশ্চিন্ত হল সে।

'কিন্তু খুব হুঁশিয়ার গোঁসাই, পুলিশ সব্বত্র আছে ওতে ওতে—নায়ে থাইক্যো না বেশিক্ষণ।'

এ কটাক্ষ নয়—নিতান্তই উপদেশ। দিবাকর মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'জানি সবই এলেম। তবু সময় মত মনে করাইয়া দেওয়ার একটা মূল্য আছে। কি কও মুক্তা?'

দিবাকর তাড়াতাড়ি গিয়ে নায়ে ওঠে। ঘাটের কাছে নীরবে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কনক। কি কি আরব্ধ কাজ বাকি রয়েছে, কার কার সংগে করতে হবে সংযোগ স্থাপন, সমস্তই বলে যায় দিবাকর। এলেম ও জীবন মাথা নত করে শোনে, আর শোনে মুক্তা ও কনক।

এবার বাইছা মুক্তা। সে লগিতে ঠেলে দেয় সজোরে। নাও ছুটে চলে ঘাস দামের ওপর দিয়ে।

বিমর্ষ কণ্ঠে জীবন বলে, 'চলো কনক ঘরে।'

ভোর ভোর নাগাত মুক্তা দিবাকরকে তুলে দেয় একটা ঘন বৃক্ষবহুল জংলা চরে। চরের লগ্ন রয়েছে বিলের দক্ষিণ কূল, যেখান থেকে গা-ঢাকা দেওয়া যায় দেশান্তরে।

'কি কথাই সেদিন কইলা গোঁসাই যে ভবিতব্যের লেখা খণ্ডান যায় না—কথাডা পড়ল নিতান্ত অক্ষণে।'

মুক্তা তুই ভুল বোঝ—অক্ষণ আর সুক্ষণ নাই ও-কথায়। ও-কথা নিত্য সত্য।'

'হউক, আমি আর শোনতে চাই না?'

'তবু তোর আইজ শোনা লাগবে, আমার অনুরোধে বোঝা লাগবে মন দিয়া—সত্যের পিছে পিছে চিরদিন আসে 'সু' আর অসত্যের সংগে 'কু'। যা কিছু দেখ দুঃখ-কষ্ট ও-সবই শুভ লক্ষণ।'

মুক্তা মনে মনে অনুমোদন করতে পারে না দিবাকরের কথা, অথচ একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়েও দিতে পারে না তৎক্ষণাৎ।···

'অনেক ব্যথায় তোরা মা হও, অনেক শ্রমে ঘরে ওঠে ফসল—এ ফসলও ফলাইতে হইবে মাথার ঘামে বুক ভাসাইয়া। ওরে মুক্তা সহজ কিছু নয়।'

ওরা কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিবাকর জংগলের দিকে এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

মুক্তা বলে, খাড়াও—না, না যাও, আমারও ঢের কাম আছে। সে দ্রুত নৌকায় ফিরে আসে। এসে দেখে যে ভোর বেলাও সব যেন অন্ধকার। পাঁচ হাত দূরের জিনিষও চেনা দায় ঘোর কুয়াশায়।

সে আশায় আশায় বসে থাকে—কখন উঠবে সূর্য!

ছত্রিশ

সুখ-সুপ্ত ইংলণ্ডের অধীশ্বর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায়, তারই প্রতিনিধি মহামান্য গভর্ণর জেনারেল ব্যস্ত ভারতীয় ভূপতিগণের এক শৈল-ভোজসভায়, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মগ্ন যখন কুকুরের খেল নিয়ে তখন, তাদের তংখা ভোগী সামান্য এক কর্মচারী ব্যগ্র প্রজানুরঞ্জনে। দীনেশ সেন তার একটা চোখ মেলে চেয়ে আছে বিলগাঁর দিকে। এইবার ফর্ক চালাবার সময় এসেছে। নইলে রক্ষা পাবে না কেষ্টর মত অনুগত সজ্জন।

দেখতে দেখতে নায়েব নাজির এলো, পথে জুটল অনেকগুলো সংগিন পুলিশ। যাচ্ছে কোথায়? কতগুলো নিরস্ত্র ভাওচুরা মানুষকে বাগ মানাতে।

মুক্তা চেয়ে দেখল সূর্য উঠেছে, কেটে যাচ্ছে কুয়াশা।···

সে স্তব্ধ হয়েছিল অনেকক্ষণ। এবার উঠে একে একে খুলতে লাগল গয়না। ধুয়ে ফেলে দিল পায়ের আলতা, চোখের কাজল। গত রাত্রে তার প্রসাধনের মাত্রা একটু বেশি হয়েছিল—এখন ভাবল এ সব স্বাদহীন, একান্ত অকারণ। শুধু মুছল না সে এয়োতির চিহ্ন, সিঁথির সিঁদুর। অবশেষে মুক্তা সাধারণ একখানা শাড়ী পরে নায়ের বুকে দাঁড়ায়। চিরগর্বিতা মুক্তা আজ রিক্তা। মুক্তা ফসল তুলবে ঘরে, তাই নাও বেয়ে চলে সজোরে।

গাঁয়ের ভিতর এসে মুক্তা দেখে যে ছোট বড় পুলিশের নৌকা এসেছে অনেকগুলি। লাল পাগড়ি এবং বন্দুকে ছেয়ে গেছে চারদিক। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সেদিন এসে গেল পুলিশ, আজ আবার কি? এ সমারোহের একটা বিশেষ অর্থ আছে। তার গা ছমছম করতে লাগল। এগিয়ে যাবে, না ফিরবে এখান থেকে?

'কি মাগী, গেছিলি কোথায়?'

পুলিশের প্রশ্নে চমকে ওঠে মুক্তা—যেন অন্তস্থলটা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'তোর নাম কি?'

'মুক্তা।'

'এই চৌকিদার···' পুলিশটি বিশ্বাস করতে পারে না মুক্তার কথা। নতুন পদোন্নতি হয়েছে কিনা, ভারি পাকা লোক। 'বিটের চৌকিদার কে তোদের?'

'হারু মাঝি।'

হারুর অনেক খোঁজাখুঁজি হয়, কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। শোনা যায় সেও নাকি জোটে যোগ দিয়েছে। পুলিশটি মন্তব্য করে, 'শালা নেমকহারাম!'

এর পর মুক্তাকে নজরবন্দী করা হয়। সে যতক্ষণ না সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ বিশ্বাসযোগ্য আত্ম-পরিচয় দিতে পারবে, ততক্ষণ থাকবে পুলিশের সংগে সংগে। এ অবশ্য আইনের কথা নয়—কিন্তু নেমক এক্তারি আফিসারদের এমনি হাজার গণ্ডা আছে বে-আইনী ক্ষমতা। নইলে চোর ডাকু সায়েস্তা হবে কি করে!

মুক্তা পুলিশের নায়ের সংগে সংগেই বেয়ে চলল নিজের নৌকাখানা। একখানা টিলার কাছে সবগুলো নাও এসে ভিড়ল।

'হাজার গণ্ডা টিলা, প্রত্যেক খানার ওপর বিশ-পঞ্চাশ ঘর শয়তানের বাস, কোন দিক থেকে আরম্ভ করতে চান রমেন বাবু?' পুলিশ অফিসার অতুল দাস জিজ্ঞাসা করল।

নায়েব নাজির সহাস্য বদনে উত্তর দিল, 'মড়ক সব দিক দিয়েই লাগতে পারে, শাস্ত্রে এর কোনও বিধান নেই, আইনেও কোন ধারা নেই।'

নায়েব নাজির রমেন বাবুর চাকুরী হল প্রায় আটাশ বছর। পেন্সন নিকটবর্তী। তার যপে-তপে কাটে অনেক সময়। তার পর প্রাতরাশ তো রয়েছেই। নোংরা ঘাঁটতে হবে অনেক। তাই সে ডাক্তারের মত কখনও খালি পেটে বের হয় না। ভাল জামা-কাপড় পরে একখানা দামী আলোয়ান কাঁধে ঝুলিয়ে, জামাইর মত যখন উঠল রমেন বাবু, তখন বেলা প্রায় দশটা। অসহিষ্ণু হয় সমস্ত পুলিশের দল। রৌপ্যমণ্ডিত বেতের পাকা লাঠিখানায় ভর দিয়ে রমেনবাবু নায়ের সিঁড়িতে পা দিয়ে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলল, 'তারা, তারা, মা গো···দুর্গা হরি···দুর্গা শ্রীহরি···'

'যমের মুখে দেবদেবীর নাম অনেকটা যে ভূতের মুখে রামনামের মতই শোনাল রমেন বাবু!'

'উপায় নেই অতুল বাবু। নিস্পৃহ থেকে কোনও কিছু করতে গেলে ঐ নামই একমাত্র সম্বল। বয়েস হক তখন সব বুঝবেন। শালাদের যদি একটু মতি মতলব বদলাত।'

'তা হলে আমাদের আর চাকরী থাকত না।' একটু হেসে মন্তব্য করল পুলিশ অফিসার অতুল বাবু। 'প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত বন্দুক বেয়নেটের।'

'তারা, তারা কি যে বলেন আপনি! তা হলে কি বলতে চান আমরা চাই দেশের যত লোক বদমাশ হক, বিদ্রোহ করুক, আর আমরা বসে বসে ঘি-ভাত খাই তাদের শাসিয়ে? তারা, তারা।' রমেন বাবু আত্মহারা হয়ে আরও বার কয়েক মাকে ডাকল।

'আমরা কি চাই এবং আমাদের যারা চালায় তারা কি চায় সে সব আলোচনা আমাদের পক্ষে যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সিডিসাস—অতএব চলুন কাজে মন দেওয়া যাক। এই তেওয়ারী, দেখো শালী ভাগে মৎ।'

বেলা তিনটা অবধি লিষ্ট দেখে প্রায় পঁচিশ ঘর লোককে রমেন বাবু, নায়েব নাজির নিস্পৃহ ভাবে ঘর কেটে পথে নামিয়ে দেয়, যা কিছু খাদ্যসামগ্রী করা হয় তছনছ। গরু, বাছুর, হাঁস, মুরগী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশের দল। মায়ের কান্না, বৃদ্ধ কৃষাণ অথবা জেলের হা-হুতাশ—কিছুই স্পর্শ করে না নায়েব নাজিরের মর্ম।

নানা জাতির পুলিশ এসেছে—তারা বিরক্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আর্মড ফোর্স যারা। তাদের কি কতগুলো নিরীহ ছাগল তাড়াতে আনা হয়েছে এখানে? নেই প্রতিবন্ধক, নেই যুদ্ধ, আছে শুধু মর্মন্তুদ হাহাকার—এ ক্ষেত্রে যে সংগিন বন্দুক নিষ্ক্রিয়। এ কি অদ্ভুত! যত তারা ঘর কাটছে, ততই যেন মনে হচ্ছে হেরে যাচ্ছে ছাগল-ভেড়ার তীব্র হা-হুতাশের কাছে।

কে একজন যেন বলে, 'চিঁড়িয়া-ভি চিল্লাকে আঁখ রাঙাতা, কৌয়া ভি ঠোক্কর মারণে আতা, আর ই শালালোক···'

কোন বাধা দিচ্ছে না···

ওরা তো জানে না, ভবিষ্যৎ অন্তরীক্ষে বসে হাসছে···এই ছাগল ভেড়ার দলই দুর্বার হয়ে উঠবে, করবে এক দিন দিগ বিজয়।

বুটের তলায় সে সব মরমর করতে লাগল—সংগিনের খোঁচায় ছিঁড়ল নক্সি কাঁথা। বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ল সাড়ে তিন আনার বাড়ীর মালিক। কিন্তু একটি ছোট্ট ছেলে টেনে আনল ছেঁড়া কাঁথা। সে ধাক্কা খেল, তবু জিনিষটা অপটু হাতে গুছিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

মুক্তা সংগেই রয়েছে। তাকে বিদায় দেওয়া হয়নি বা সে পালাবার সুযোগ পায়নি। তাকে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে শুনতে হচ্ছে অশ্রাব্য কথা, সময়তে অশ্লীল উক্তি। সকাল কাটল, দুপুরও কাটল, এখন বেলা গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম সীমান্তে। শীতের সন্ধ্যা এলো বলে। রাত্রির অন্ধকারে এতগুলো কুকুর যদি একসংগে ধরে টানাটানি করে, হয়ে ওঠে হিংস্র, তবে সে কি করবে? দিনের খেলা খেলা তো নয়! সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তবু সে ভাবে, এ দৌরাত্ম্য যাবে সকল বাড়ী। কনককে যদি আগে-ভাগে ইংগিত করে সরিয়ে দেওয়া যেত! কিন্তু তাতেও তো এড়ান যাবে না। এই বিলগাঁয়ে, ঘরে ভাত না থাক আছে কনকের মত অনেক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী। কাকে রেখে কাকে সে সংবাদ দেবে? এ বিপদে উপায় হবে কি?

কূলে ভারি বুট মসমস করে···মুক্তা দেখছে চেপ্টে যাচ্ছে নরম মাটি। যেন দাগ পড়ে মুক্তার মনে—গভীর ক্ষত জন্মায় লৌহ-নালগুলি।···

অতুল দাসের পদোন্নতি হলেও এ সব বোধ হয় ভাল লাগে না। সে হঠাৎ অসুস্থতার ভাণ করে Personal diaryতে কি যেন লিখে বিলর্গা ত্যাগ করে।

যমের অনুচরের মতই কেষ্ট সব কিছু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে থাকে রমেন বাবুকে। কেষ্ট আজ কোঁটা তিলক কেটেছে যথেষ্ট—সে আজ এখনও অভুক্ত। সে-ই মুক্তার যত অপ্রিয় পরিচয় ঢালে রমেন বাবু ও পুলিশের কানে। সোৎসাহে দেখিয়ে দেয় নিকটেই দিবাকরের বাড়ী।···

রমেন বাবু বল্লেন, 'আজ আর নয়।'

কেষ্ট সংগে সংগেই জবাব দেয়, 'থাউক, কালই না হয় হইবে—এত ব্যস্তর কি!' কিন্তু তার ইচ্ছাটা স্পষ্টই ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

'তুমি যা চাও তা তো বুঝি মহাজন, কিন্তু পুলিশ অফিসার যিনি সংগে ছিলেন তিনিও পড়লেন সরে। নতুন একজন পদস্থ লোক না আসা পর্যন্ত এই চৌকিদার কনেষ্টবল নিয়ে···'

'আপনার কিছুতেই উচিত নয় সাপের গর্তে হাত দেওয়া—তা আমরা খুব বুঝি—তবে থাউক কাইলই হইবে। কিন্তু মুক্তা?'

'কোথায় যাবে?'

কেষ্ট বাড়ী ফিরে যায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষ্টচিত্তে।

মুক্তার মনে পড়ে, গোঁসাই তো তার সারা দিনমান অনাহারে রয়েছে। নায়ে নায়ে রান্না চড়ল, তারও তো উচিত উনান জ্বালা। সে একটু সরে গিয়ে হাঁড়ি চড়ায় আগুন জ্বেলে। ভাতের আশায় দিবাকর হয়ত সারাটা বেলা পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে।

পুলিশেরা পানাহারে মত্ত। মুক্তা সুযোগ বুঝে নাও ঠেলে প্রথম ধীরে ধীরে তার পর অত্যন্ত জোরে। পাখীর মত ছোট্ট টালাই চলে যায় একেবারে অন্ধকারে। একটুখানি মেঘের আভাস যেন দেখতে পায় মুক্তা ঝড়ো কোণে।

পরিচিত পথ—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মুক্তা এসে পৌঁছায় নির্দিষ্ট স্থানে। একখানা থালায় উত্তপ্ত ভাত বাড়ে। লংকাপোড়া ও নুন ব্যতীত আর কিছুই সংগ্রহ নেই। তবু আজ আর দুঃখ হয় না—মুক্তার বুক দুরু-দুরু করতে থাকে।

'মুক্তা নাকি?' অন্ধকারে এসে গায় হাত দেয় দিবাকর। তার কণ্ঠ বড় কাতর, কিন্তু মধুর।

হ্যাঁ অভাগিনী মুক্তাই তোমার—যার আশায় সমস্ত দিনটা কাটিয়েছ অভুক্ত।'

'এত দেরী যে?'

মুক্তার হৃদয় মথিত হয়ে যেতে থাকে। তবু কোনও জবাব জোগায় না মুখে। কত অপরাধের এ যেন পরিণাম।

'তোর মনডা এত ভারী ক্যান—কথা যে কও না!'

'সবই কমু. তুমি ভাত খাও, আগে এট্টু সুস্থ হইয়া নি।'

'নাও বাইতে তোর বড় কষ্ট হয়, না রে মুক্তা—কি যে করুম!' দিবাকর তারার আলোতে ভাতের সুমুখে বসে। 'এখুন আইজকার সংবাদ ক।' ক্ষুধার্ত দিবাকরের নাসিকায় তপ্ত ভাতের একটা সৌগন্ধ প্রবেশ করে তাকে ব্যাকুল করে তোলে। তবু সে তার ব্যাকুলতা দমন করে চেয়ে থাকে মুক্তার দিকে। 'কি রে, আইজকার সমাচার কি?'

'ভাল। তুমি আগে ভাত মুখে দাও।'

'না, না—তুই যে ক্যামন কইর‍্যা কও। ভাত আগে না জাইত আগে। আইজ ঘটছে নাকি নতুন কিছু?'

যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু সংঘটনের আশংকা আছে, তা যদি জানতে পারে দিবাকর, এখনই, ভাত তো দূরের কথা, তার চেয়েও প্রিয়তর সামগ্রী সে অবলীলাক্রমে তুচ্ছ করে উঠবে। মুক্তা তাই বার বার অনুরোধ করে পূর্বাহ্নে আহার সারতে।

দিবাকর ভাতের থালাটা ঠেলে দিয়ে দৃঢ় হয়ে থাকে। অগত্যা মুক্তা বলতে থাকে সব।

সব শুনে দিবাকর বলে, 'আমার হাতে বৈঠা দে।' সে এক প্রকার ছিনিয়ে নেয় মুক্তার নিকট থেকে বৈঠা।

'তুমি যাও কই পাগলের মত সুমুখের ভাত ফেইল্যা? গোঁসাই গো, তোমার পায়ে পড়ি আহার কর।'

'মুক্তামালা, ভাল যদি বাস আমারে ছাইড়্যা দে। ওরে ভাতের চাইতে জাইত যে বড়, তা যাইবে আমি বাইচ্যা থাকতে?' দিবাকরের চোখ দুটো অন্ধকারে চকচক করে ওঠে। সে আচমকা বৈঠায় থাবা মারে।

মুক্তা পায়ের ওপর উবুড় হয়ে থাকে।

'কে গোঁসাই নাকি? একটা কাষ্ঠ হাসি শোনা যায় প্রেতের।

দিবাকর চমকে উঠে অনুমানে বুঝতে পারে এ প্রেত নয়—পোড়া কাঠ কেষ্ট।

মথুরানাথ সংগে আছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি টর্চের আলোতে অন্ধকার বিলটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে দিবাকর। শীতের আকাশে ফালি ফালি কৃষ্ণ মেঘ জমাট বাঁধে। সংবাদটা তখনি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

সাঁইত্রিশ

অভাবনীয় কাণ্ড, আশাতিরিক্ত ফল লাভ—কার্য-সূচী একেবারে পালটে যায়।

মথুরানাথ দেবনগরের পাশ দিয়ে আসার সময় দীনেশ সেনও তার সংগে এসেছিল। এতক্ষণ সে ছিল রমেন বাবুর নৌকায়। খবর পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে সে মথুরানাথের পেট্রোল বোটে চলে আসে। দিবাকরকে সে আজ পর্যন্ত দেখেনি। অথচ এর সঙ্গেই স্নায়ু-যুদ্ধ চলেছে তার এই দীর্ঘকাল ধরে।

মেঘের আড়ালে ছিল বীর। এ তো মানুষ নয়—ইন্দ্রজিৎ। কেমন দেবতুল্য চেহারা। দীনেশ সেন সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটা চোখ মেলে। মনে হয় তার একটা চোখে এসেছে যেন নেমে দুটো অক্ষি তারকার শুভ্র দৃষ্টি।

কিন্তু কেন ক্রন্দন শোনা যায়? বন্দিনী সীতা কেন কাঁদছে বিল গাঁয়ের তট-প্রান্তর ছেয়ে?

কেন? কেন? অতিষ্ঠ হয়ে টর্চটা ঘুরিয়ে চেয়ে দেখে দীনেশ সেন—বাইরে দিবাকরের জুড়ে-গেঁথে দেওয়া সেই ছোট্ট টালাইখানায় একাকিনী মুক্তা। সুমুখে তার বাড়া ভাতের থালা। চোখে জল।

নিমেষে নিঃশেষ হয় ক্ষণিকে। দীনেশ সেনের চোখে পুনর্বার নেমে আসে একচোখো দৃষ্টি।

দলবল ভেঙে দিয়ে দীনেশ সেন রওনা দিল। পথে এসে দেখল যে কালো মেঘের ফালিগুলি ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। বিশ্রী অন্ধকার, তার ওপর আকাশটা করতে লাগল থমথম, এ যেন মহা দুর্যোগের পূর্বাভাস। নৌকা থামিয়ে পরামর্শ হল কে কোন দিকে যাবে। রমেন বাবু ও পুলিশেরা যাবে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দিকে। তারা এই মেঘলা রাতে আর এগোবে না বেশি দূর—খানিকটা গিয়ে নাও থামাবে; সকাল বেলা বুঝে-সুঝে যা হয় করবে।

কিন্তু সংগে আসামী নিয়ে মাঝ-পথে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না মথুরানাথ, একটু দেরী হলেই হবে বে-আইনী। সে এক্ষুনি রওনা দেবে পেট্রোল বোটে। একটা মাত্র গাঙ, তেমন বড়ও নয়, তবে আর ভয় কি এত?

দীনেশ সেন বলে, 'শীতের মেঘ, হয়ত কুয়াশা হয়েও কেটে যেতে পারে, ওর জন্য এমন একটা চিন্তার কারণ দেখি না আমি। কি বলো মাঝিরা?'

এব্রাহিম বলে, 'হয় হুজুর।' তার পর সে একটা ঢোক গেলে—গিলে বলে, 'এমন কিছু ডর করি না, কিন্তু অকালে ক্যান জানি ভর করছে কাল নাগিনী রাক্কুস্যা কোণায়।'

মাঝি এব্রাহিমের শেষ কথা ক'টি খুব আশ্বাসদায়ক নয়। সকলেরই একটা আতংক হয়। এক দিকে অন্ধকারে শত্রুর বিল, অন্য দিকে ছোট হলেও সুগভীর নদী। নামে ছোট বটে কিন্তু স্থানে অস্থানে আছে ঘোপ—যেখানে থেকে নদী বাঁক ঘোরে অথবা ভাঙে দুর্দান্ত বেগে বর্ষার মরসুমে।

রমেন বাবু ও পুলিশের দল চলে গেছে অনেক দূর, এখন তারা ডাকের বাইরে। মথুরানাথ নিজের নৌকা ছেড়ে তাড়াতাড়ি এসেছে একখানা ছোট পেট্রোল বোটে, সংগে মাত্র দু'জন কনেষ্টবল। জোটের মহলের জেলেরা এসে আবার ছিনিয়ে নিয়ে না যায় আসামী। এমন ঘটনা একেবারে বিরল নয়। সে তার নিজের রিভলবারে গুলী ভরে। কনেষ্টবল দু'জন প্রস্তুত রাখে দুটো বন্দুক।

বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে আকাশে।

মথুরানাথ বার বার সাবধান করে দেয় কনেষ্টবলদের ফিস-ফিস করে, কানের কাছে এসে।

দীনেশ সেন আলাপ জমাতে চেষ্টা করে হাতকড়ি পরা দিবাকরের সংগে।

'তুমি এ সব কর কেন?'

'কি সব?'

'এই দাংগা হ্যাংগামা রাহাজনী…'

'চুপ করেন।' শৃঙ্খলিত সিংহ যেমন করে মহা বিরক্ত হয়ে উৎসুক দর্শকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে তেমনি করে বসে রইল দিবাকর।

দীনেশ সেন একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। উচিত ছিল ভেবে-চিন্তে দিবাকরের সংগে কথা বলা।

একটা বাতাস ফুঁপিয়ে উঠল ঝড়ো-কোণ থেকে। নাওটা কলার খোলের মত কেঁপে উঠল আচমকা। হ্যারিকেনের শিখা দপদপ করল বার তিনেক। কনেষ্টবল দু'জন আগা-পাছায় বন্দুক নিয়ে বসল গিয়ে জুত হয়ে। মথুরানাথ হাতের রিভলবারটা ঘুরিয়ে দেখল ঠিক আছে কিনা।

দীনেশ সেনের ইতিমধ্যে অস্বস্তিটা কেটে গেল। সে পুনর্বার শক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'জান তুমি রাজদ্রোহী ?'

কোন উত্তর দিল না দিবাকর।

নিকটে কোনও বড় গাছ নেই, শুধু হাজার হাজার বিঘা জলো জমি। কোথায়ও বা আধ হাত কোথায়ও বা এক-লগি জল। হাজা-মজা চোরা চরেরও অভাব নেই। দূরে রূপসী নদী আজ যেন রাক্ষসীর মত ক্ষেপে উঠেছে। মাঝিরা গোটা তিনেক শক্ত লংগর ফেলল এক মাথায়। অন্য মাথা খোলা রইল বাতাসের তালে তালে ঘুরবে। নইলে নৌকা ওলটাবার আশংকা।

সব চাইতে পীড়াদায়ক আশংকা দলবদ্ধ জেলের জোটের আক্রমণ। মথুরানাথ বলল, 'হুঁশিয়ার মাঝিরা।' অর্থ হচ্ছে কনেষ্টবলেরা।

দমকা হাওয়া নরম হয়ে এসেছে একটু, কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে বার বার। মেঘ ছুটছে মত্ত হাতির মত অন্ধকারের বুক ভেঙে।

'জান দিবাকর, তুমি রাজদ্রোহী ?

সেই মুহূর্তে আবার একটা হাওয়া আসে। পেট্রোল বোটের ঢিলা ছিট্‌কানীর জানালা দু'-একটা সশব্দে খুলে যায়।

কোমরের দড়িটা একটানে সরিয়ে এনে দিবাকর হঠাৎ লণ্ঠনটা উলটে দেয়—দিয়েই লাফিয়ে পড়ে জানালা গলে জলে। যাওয়ার সময় উত্তর দিয়ে যায়, 'জানি হুজুর সবই, কিন্তু আমি জাতি-শত্রুর নই।'

মথুরানাথ এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'গেল গেল, আসামী ভাগল।'

তৎক্ষণাৎ দুটো বন্দুকের ঘোড়া লাফিয়ে পড়ল অগ্নিগর্ভ বুলেটের ক্যাপে।

ঝড় এলো হু-হু শব্দে।

যত বজ্র-আঁটুনি ততই ফসকা গিরে—হাতকড়ি হাতে পালিয়ে গেল দিবাকর। সে ওস্তাদ সাঁতারু। হাতে গামছা বেঁধে অনেক বার পাড়ি দিয়েছে নাম-করা শাওলা বিলের এপার-ওপার। এ সব ছিল তার কৈশোরের খেলা। এখন বিদ্যুতের আলোতে অবহেলায় চলল এক সীমানা আন্দাজে লক্ষ্য করে।

নাও ডুবল দুর্দান্ত ঝড়ে।··· [ক্রমশঃ।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে দীনেশ বাবু যখন রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়ান, ইন্দিরা দেবী নির্ব্বাক্ ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তাঁর মুখপানে। স্বামীর চোখে-মুখে দিন দিন হতাশার ছায়া যেন ঘনিয়ে আসে। অত সাহস, অত তেজস্বিতা, সব নিঃশেষে মুছে গেছে। চোখ দুটো যেন অসহায় দৃষ্টিতে কি খুঁজে বেড়ায়!

সেদিন কি ভেবে, দীনেশ বাবু হঠাৎ ব'সে পড়লেন ইন্দিরা দেবীর মাথার কাছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন—"তোমার রোগটা সেরে গেলে, আবার ফিরে যেতাম দেশের বাড়িতে। এমনি ক'রে তিলে তিলে মরার চেয়ে, একসঙ্গে সবাই মিলে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল ছিল।"

ইন্দিরা দেবী চমকে উঠলেন। স্বামীর জীবনে হয়তো এই প্রথম পরাজয়। ইন্দিরা দেবী কিছুক্ষণ মনের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে বলেন—"এ রোগ আর সারবে না। কিন্তু তুমিও যদি এমন ক'রে ভেঙে পড়, কে ওদের মুখপানে চাইবে? ছেলেরা ছোট। কবে মানুষ হবে ভগবান জানেন! মেয়েটা রাতদিন ভূতের মতন খাটে। ওই তোমার পাশে দাঁড়াবে বড় ছেলের মত। তুমি—"

দীনেশ বাবু এক নজর পত্নীর মুখপানে চেয়ে থাকে, কি ভেবে নিয়ে বললেন—"সবই জানি, সবই বুঝি। তবে দিনে দিনে দেশ-কালের অবস্থা যা হয়ে উঠলো, তাতে ভরসা আর করতে পারি না কারো ওপর। দু'শো বছরের পরাধীনতায় যে পরিবর্ত্তন এদেশে হয়নি, মাত্র ক' বছরের যুদ্ধে তার চরম পরিণতি হ'লো। তার পর এলো মারামারি কাটাকাটি। প্রতিবেশীর বুকে প্রতিবেশী ছোরা মেরে বিশ্বাসের মূল আলগা ক'রে দিয়ে গেল। সমাজে মেয়েদের জীবনে যেটুকু হতে বাকী ছিল, সেটুকুর পূর্ণাহুতি হলো বাংলা ভাগাভাগি হয়ে।···ভাবতে পারি না, কেমন ক'রে সম্ভব হলো!··· সম্ভব, সবই সম্ভব এখন।"

ইন্দিরা দেবী চমকে ওঠেন। শীর্ণ হাতখানা স্বামীর হাঁটুর ওপর রেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হলো? হঠাৎ এমন অস্থির হয়ে উঠলে কেন?"

দীনেশ বাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন—"বিপিন বাবুকে তোমার মনে আছে? রহমৎপুরের বাগচি মশায়! ···গ্লোকোমা হয়ে যাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল?"

ইন্দিরা দেবী একটু ইতস্ততঃ করে বলেন—"কেন? কি হয়েছে তাঁর?"

"হবে আর কি! কালের ধর্মে যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। সমাজের হাড়ের ভিতর ঘুণ ধরেছে, আর কিছুই থাকবে না। অসহায় ভদ্রলোক, বিপত্নীক। সংসারে ছিল দুই মেয়ে, মিলি আর লিলি। বাপ-মা-মরা ভাগ্নেটাকে তিনি বুকে করে মানুষ করে-ছিলেন। কিন্তু, করলে কি হয়! জীবনের আদর্শ যে জাত হারিয়ে ফেলেছে, তাদের কাছে ভালো-মন্দ সবই সমান।"

খানিকক্ষণ স্বামীর পায়ে হাত বুলিয়ে ইন্দিরা দেবী ধীর স্বরে বলেন—"পরের ভাবনায় মন খারাপ ক'রে আর লাভ কি বলো? এখন নিজেরা কেমন ক'রে রক্ষে পাবো, তাই ভাবি।"

"আমিও তাই ভাবি, ইন্দিরা! পরের অবস্থা দেখে নিজের ভাবনা বেড়ে যায়। বাগচি মশায়ের ভাগনে সেই অনিল মৈত্র চিরদিন ওঁরই অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, ওঁরই বুকে ছুরি মেরেছে। আমরা হিন্দু-মুসলমানের ছুরি মারামারি দেখে শিউরে উঠেছিলাম, কিন্তু এ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর!"

"ছুরি মেরেছে!"—ইন্দিরা দেবী চমকে ওঠেন। একটুখানি

থেমে বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করেন—"ওঁরা পাকিস্থানেই ছিলেন বুঝি ?"

"না, ওঁরা ছিলেন বেলেঘাটায় একটা টালি-খোলার বাড়ী ভাড়া করে ; বাগচি মশায়ের হাতে টাকা-পয়সা যা ছিল, ভাগনেটাকে দিয়েছিলেন ব্যবসা করতে। ব্যবসা সে ভালই করেছে। ছোট মেয়েটাকে ফুসলিয়ে টালিগঞ্জে নিয়ে গিয়ে কোন এক বিদেশীকে বিক্রি করেছে চার হাজার টাকায়, আর বড়টাকে টেনে নিয়ে গেছে উচ্ছন্নের পথে। হতভাগাটা পালিয়েছে। মেয়েটা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। আমি—আমি হলে—" দীনেশ বাবুর হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে ঠোঁট দুখানা থর-থর ক'রে কাঁপে।

স্বামীর অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে, ইন্দিরা দেবী ভয় পেয়ে গেলেন। মনে হয়, বুঝি বা কোন অনর্থ ঘটবে। সেদিন ঝোঁকের মাথায় সুবিমলের সঙ্গে যে ব্যবহার দীনেশ বাবু করেছিলেন, সেটা ভাবতে আজও ইন্দিরা দেবী লজ্জা পান। অমন তো উনি ছিলেন না। তা হ'লে কি অবস্থার বিপাকে প'ড়ে মাথাটা বিগড়ে গেল ? চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে ওঠে। নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে বলেন—"সাত-পাঁচ ভেবে অমন অধীর হয়ো না তুমি। কপালে যা আছে, তা হবেই। এতই যখন সইল, তখন সব সইবে। তুমি ঠিক থাকলে, কোন কিছুকে ভয় করি না। নইলে, ওরা কার মুখপানে চেয়ে বাঁচবে বলো ?"

ইন্দিরা দেবীর কথায় দীনেশ বাবু শুধু একটু হাসেন। হাসি নয়, বেদনারই রূপান্তর। মাথা নেড়ে বিড়-বিড় ক'রে বলেন—"কে কার মুখ চেয়ে বাঁচে ইন্দিরা ! তুমি যা ভাবছো, সেদিন আর নেই। এত বড় একটা জাতি দশ বছরের ভিতর পঙ্গু হয়ে গেল ! আদর্শের জন্যে যারা এক দিন হাসিমুখে মরণের সামনে দাঁড়িয়েছে, আজ তারা তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে না পারে এ-হেন কাজ নাই। মিলি তার বাবাকে কি বলেছে জানো ? না : আর জেনে কাজ নাই !—উচ্ছন্নে যাবে সব।"

আপন মনে গজ-গজ ক'রে বকতে বকতে দীনেশ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইন্দিরা দেবী হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন : এর পরেও অদৃষ্টে আর কি আছে, কে জানে ! উনি তো এমন ছিলেন না। হাল-চাল দেখে-শুনে অন্তরটা বিষিয়ে উঠেছে। কিন্তু কে রুখবে এই কালের স্রোত ! ভাবতে ইন্দিরা দেবীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে। কি হবে তাহ'লে, স্বামীর মনের যে অবস্থা, তাতে সহজে তাঁর মত ফেরানো যাবে ব'লে মনে হয় না। ইলার জীবনে যে বিপর্যয় এসে পড়বে, তার গুরুত্ব হয়তো দীনেশ বাবু কোন দিনই বুঝবেন না। আর ইলা ! ইলাকে তিনি ভাল ভাবেই জানেন। শুধু ইলা তাঁর গর্ভজাত সন্তান ব'লে নয়, তাঁর নিভৃত মনের সবটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ইলাকে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজেরই প্রতিচ্ছবি। বুক ভেঙে গেলেও সে কোন দিন তার দাবী জোর ক'রে বাপ-মায়ের ওপর চাপাবে না।

* * * *

এক দিন যে চাকরি হয়ে উঠেছিল ইলার জীবনে চরম কাম্য, আজ সেই চাকরি যেন জাঁতা-কলের মত তার বুকে চেপে বসেছে। ঘড়ির কাঁটার মাপে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর যন্ত্রপুত্তলিকার নিঃশব্দ চলা। ঘানির বলদের চেয়েও কেরাণী-জীবন যেন আরও একঘেয়ে। কোন বৈচিত্র্য নাই, আশার আনন্দ নাই। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে জীবিকা-তরণীর গুণ টেনে চলা। সাফল্যে ধন্যবাদ নেই, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে চোখ-রাঙানির অভাব হয় না। এমনি করে কেটে চলেছিল দিনের পর দিন। ইলা হাঁপিয়ে ওঠে।

ক'দিন থেকেই মনটা থমথমে হয়েছিল। তার পর হঠাৎ সেদিন দাস সাহেব সামান্য ত্রুটির জন্যে এমন আচরণ করে বসলেন যে, ইলার মেজাজ গেল বিগড়ে। কাজ করতে গেলেই ভুল হয়তো হয়। কিন্তু তাই নিয়ে যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, ইলা তা ভাবতে পারেনি। সামান্য একটা ভুল। অন্যমনস্কতার অবকাশে কেমন ক'রে টাকা আনার যোগ-বিয়োগে ইলা ছয়কে নয় ক'রে বসেছে। ফাইলটা সই করতে পাঠাবার কিছুক্ষণ পরেই ইলার কানে এলো দাস সাহেবের চেঁচামেচি। চাপরাশিকে ধমক দিয়ে বলছেন—"যার ফাইল তাকে আসতে বলবে। কে দিয়েছে তোমার হাতে ? ডাকো তাকে—"

কথাগুলো সুস্পষ্ট ভাবে ইলার কানে এসে পৌছলো। তার বুঝতে বিলম্ব হ'লো না যে, ফাইলটা সে-ই পাঠিয়েছে সই করতে। কিন্তু দাস সাহেবের এমন মেজাজ তো দেখেনি কোন দিন ! এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছে সে, ইলা ভেবে উঠতে পারে না। নিজে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে হয়তো এতখানি চেঁচামেচি হ'তো না। কিন্তু······চিন্তাটা সিদ্ধান্তে পৌছবার আগেই চাপরাশি এসে হাজির হলো—"সাহেব সেলাম দিয়েছেন।"

"সেলামই বটে !"—ইলা উদ্বিগ্ন মনে চেয়ার ছেড়ে উঠলো। লাঞ্ছনার জন্যে সেলাম না দিয়ে হুকুম দেওয়াই ভালো। দাস সাহেবের ঘরে গিয়ে যখন সে শঙ্কিত চিত্তে উপস্থিত হলো, তখন চেঁচামেচি থেমে গেছে। পকেট থেকে রুমালখানা বের ক'রে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তিনি বললেন—"বসো।"—

ছোট্ট একটি কথার ভিতর দিয়েও পদ-মর্য্যাদার ঝাঁজ-গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু আশ্চর্য্য ! এক মিনিট আগে যাঁর রুক্ষ কথার স্পন্দন কাঠের পার্টিশান ভেদ ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে পর্য্যাপ্ত স্নিগ্ধতা !

ইলা দাঁড়িয়েই রইল। দাস সাহেব টেবিলের অপর পাশ থেকে চায়ের পেয়ালাটা টান দিয়ে কোলের কাছে নিয়ে চুমুক দিলেন। মিষ্টি একটু হেসে ইলার মুখপানে চেয়ে বললেন—"দাঁড়িয়ে রইলে যে ? ব'সো।"

"আমায় কিছু বলবেন ?"—ইলা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। "হাঁ। ছ'আনার জায়গায় ন'আনা করে বসে আছ। এর পর হয়তো কোন দিন হাজারের ঘরে হবে অঙ্কের ভুল ! মনটা তোমার কোথায় থাকে আজকাল ?"—দাস সাহেব ঠোঁট দু'খানা একটু বাঁকিয়ে মুচকি হাসির সঙ্গে ইলার মুখপানে চাইলেন।

সে দৃষ্টিতে যেন মুহূর্তে ইলার মগজের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। নীচেকার ঠোঁটটা শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে সে বলে—'তার মানে ?' কথা বলতে ইলার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপে। কিন্তু দাস সাহেব চায়ের পেয়ালায় আর একবার চুমুক দিয়ে হালকা হাসির সঙ্গে বলেন—"মানে, ভাগ্যবানটি কে ? যাঁর কথা ভাবছিলে ?"

"মিষ্টার দাস! চাকরি করতে এসেছি বলে যা-খুসী তাই বলতে আপনাদের মুখে বাধে না! আমাদের কি ভাবেন আপনারা বুঝতে পারি না। হ'তে পারেন আপনি উপরওয়ালা। কিন্তু আমাদেরও একটা সামাজিক মর্য্যাদা আছে। সেটা ভুলে যাবেন না।"

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে দাস সাহেব চুপ করে যান। কিন্তু ক্ষুব্ধ অপমানে তাঁর পদ-মর্য্যাদা গুমরে ওঠে। সংযত শান্ত স্বরে জবাব দিলেন—"আই'ম সরি। একস্‌কিউজ মি।—আচ্ছা যান।"

ইলা এসেছিল মন্থর পদে, কিন্তু গেল ঝড়ের মত। ও যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলো, সহকর্মীরা উদগ্রীব দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর মুখপানে।

পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে ফাইলটা সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এলো ইলার টেবিলে। সামান্য ভুলের জন্য চাওয়া হয়েছে লিখিত কৈফিয়ৎ। দেখে ইলা মোটেও আশ্চর্য্যান্বিত হলো না। অল্প দিনের হলেও চাকরি সম্পর্কে তার যে সুস্থ ধারণা হয়েছে, তাতে হয়তো কৈফিয়ৎ না চাইলেই অবাক হতো বেশী। বার বার মনে হলো মাধবীর কথা। মাধবী বলেছিল যে, উপরওয়ালার মন যোগাতে পারেনি ব'লে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিজনেস্‌ শুরু করেছে।

ইলা আর ভাবতে পারে না। মগজের শিরাগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে। এই দাস সাহেবই অনেক দিন তাকে শুনিয়েছেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা বেশীর ভাগই কালচার্ড। আশ্চর্য্য!

পাঁচটার পর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ইলা অফিস থেকে বাইরের জগতে গিয়ে দাঁড়ালো। মনটা ঘৃণায় ভরে ওঠে। ওর মনে হয়, এর চেয়ে ষাট টাকার স্কুল-মাষ্টারিও ছিল অনেক ভাল। তাই করবে সে। পরক্ষণেই মনে হয় অণিমার কথা। মনটা নিমেষে তিক্ত হয়ে ওঠে। আজ আর ইলা ট্রামের জন্য দাঁড়ায় না। ফুটপাথের এক পাশ ধরে এগিয়ে যায় ময়দানের দিকে।

কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে ও যখন বিড়লা ক্লাবের দিকে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সুবিমল আর শেফালির দিকে চোখ পড়তে। ওরা বেহালার ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। শেফালি কি যেন অনর্গল বকে চলেছে। সুবিমল নিরপেক্ষ শ্রোতার মত শুনে যায়, নিজে কিছু বলে না। ইলার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত নিমেষে অবসন্ন হয়ে আসে। পা দুটো যেন আর চলে না।

বেহালার একটা ট্রাম আসতেই ওরা দু'জনে চলে গেল: হয়তো কোন উদ্বাস্তু-শিবিরে, কিংবা ওদের সেবাসঙ্ঘের কাজে। ইলার চোখের জলটুকু পর্য্যন্ত তখন শুকিয়ে উঠেছে।

*   *   *   *

অফিস থেকে ইলা এক মাসের ছুটি নিয়েছে। আগে প্রতিদিন যেটুকু অবসরও ছিল বাইরের উন্মুক্ত আকাশতলে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার, এখন যেন সেটুকুও লুপ্ত হয়ে গেল। মায়ের অসুখ দিন দিন বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠে আর্থিক অসঙ্গতি, মানসিক উদ্বেগ আর দৈহিক ক্লান্তি।

চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন শুনে মা শুধু একটু হেসেছেন; নিতান্ত নিষ্প্রভ ফিকে হাসি। অস্ত্রোপচারে বাধা দিয়ে স্বামীর মনে ব্যথা দিতে তিনি চান না। চিকিৎসা যখন এত অভাবের ভিতর দিয়েও হ'লো, তখন আর বাধা দিয়ে সে রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গহানি করবার ইচ্ছা তাঁর নেই। মা চাইলেন হাসপাতালে যেতে। মামারা অবস্থাপন্ন। হাসপাতালে পাঠাবার সংবাদে তাঁরা এগিয়ে এলেন। অপারেশান বাড়ীতেই হ'লো ডাক্তারকে কয়েক হাজার টাকা ফি দিয়ে। ইলা ছোট ভাইবোনগুলোকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ব'সে থাকে মায়ের শয্যাপার্শ্বে।

এত দিন দীনেশ বাবু যেন ইলার কাছ থেকে কেমন একটু তফাতে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর কাছে এগিয়ে না এসে পারলেন না। দীনেশ বাবু অনেক দিন ভেবেছেন, ইলাকে খুলে বলবেন তাঁর সাময়িক উত্তেজনার কথা। তাঁর ভুলের কথা। কিন্তু পারেননি। সংকোচে তাঁর কথা হারিয়ে যায়। জীবনের কাছে পরাজয় তিনি কোন দিন মানেননি। কিন্তু এবার বুঝি সে মেরুদণ্ড ভেঙে পড়লো। ইন্দিরা দেবীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দীনেশ বাবু নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন: যেন পাথরের মানুষ।···

"সেবা-সংঘের কাজে আর কি তুই যাস্ না, মা?···বড় দুঃখী ওরা। ওদের সেবা ক'রে জীবন সার্থক হয়।"—দীনেশ বাবু ইলার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

ইলার মাথাটা নুয়ে পড়ে। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না। অপ্রত্যাশিত স্নেহস্পর্শে চোখের জল উপচে পড়ে। ঠোঁট দু'খানা কাঁপে।

"ইলা!"

"বাবা!"

"আমায় ভুল বুঝিস্ না মা! তোদের অমঙ্গল কোন দিন চাইনি। যদি কোন ভুল ক'রে বসি, সে ভুল—"

ইলার চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ে মায়ের শীর্ণ পা দু'খানির উপর। ইন্দিরা দেবী চমকে ওঠেন—"কাঁদছিস মা?··· ভয় কি? রোগ আমার সেরে যাবে।"

মনের আবেগ চেপে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টায় দীনেশ বাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইলা একবার মায়ের মুখপানে, আর একবার বাবার মুখপানে চেয়ে যন্ত্রপুত্তলিকার মত ব'সে ছিল মায়ের পদতলে।···"ভয় কি! সেরে যাবে!"

ইন্দিরা দেবী আবার চোখ বন্ধ করলেন। চাপা দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বুকখানা কেঁপে ওঠে।

* * * *

অণিমার চিঠিখানা পেয়ে ইলা যেন বিমূঢ়ের মত নির্বাক্ ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবে। অণিমা বিয়ে করেছে। তার স্বামী এঞ্জিন-ড্রাইভার হলেও একজন পরিপূর্ণ মানুষ। দিনের পর দিন অণিমা যখন মা আর শিশু ভাইবোন দু'টিকে নিয়ে উপোস করেছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে পায়নি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি; ওই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যুগিয়েছেন তাদের ক্ষুধার অন্ন। নিজের দিকে না চেয়ে চেয়েছেন ওদের মুখপানে। রাত্রি-দিন 'বেগ-বরো-ষ্টীলে'র অসহ্য লাঞ্ছনা সয়ে মানুষ কত দিন পারে অনশনের সঙ্গে লড়াই করতে! কর্মপ্রার্থী হয়ে সে যেখানেই হাত পেতেছে, সেখানেই বিপন্ন হয়েছে তার মর্য্যাদা। আত্ম-মর্য্যাদার চোরা-কারবার করার চেয়ে, নিজেকে সসম্মানে কারো হতে তুলে দেওয়া অনেক ভাল।

আর রতনদা'! অণিমার উপর ইলার তবুও অশ্রদ্ধা হয় না। হয় দুঃখ, সহানুভূতিতে ওর মন ভরে ওঠে। কিন্তু রতনদা'র উপর হয় ঘৃণা। অপদার্থ পুরুষ তার খেয়াল-খুসীতে ভেঙে চুরমার করে নারীর অন্তরের সুকুমার প্রবৃত্তি। সামনের পথে হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত হয়, তবু পিছন পানে ফিরে চাইবার তাগিদ কোন দিন তাকে চঞ্চল করে না। পাগলের মত রতনদা' যেদিন ছুটে এসেছিল অণিমার কাছে, সেদিন অণিমার জীবনে সে ছিল অপ্রত্যাশিত। কিন্তু রতনদা'র জীবনে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে হয়ে উঠেছিল তার প্রয়োজন। নিজে সে ভুল করে রতনদা হয়েছিল গ্লানিতে জর্জ্জরিত, সে ভুল থেকে অণিমাকে সে করেছিল সাবধান। তাই অণিমা আর ভুল করেনি। বাঁচবার তাগিদে শুধু প্রাণ ধারণের আশ্রয় ছাড়া আর কোন কাম্য সে খুঁজে পায়নি, হয়তো চায়ওনি আর কোন কিছু।

অণিমার চিঠিখানা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে আজ ইলার মনের ভিতর যেন চৈতালি ঘূর্ণীর ঝড় তুলে দিয়ে গেল। ও ভাবতে পারে না, তবু ভাবে। মনকে সান্ত্বনা দেবার কিছুই নেই তার, তবুও বার বার সান্ত্বনা দেয়।···ভুল অণিমা করেনি। একটা জীবনের বাকী ক'টা দিন! তার বেশী তো নয় কিছু!

* * * *

সেদিন সকাল থেকেই চলেছিল ক্রাইসিস্। তার উপর ড্রেস করতে এসে ডাক্তার বাবুর মুখখানা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। আজ আর কম্পাউণ্ডারের হাতে ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না।—পেনিসিলিন রেসপণ্ড করছে না দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। রোগীকে ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রে ইনজেক্শান ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার যখন চলে গেলেন, তখন বেলা প্রায় বারোটা। চিকিৎসকের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লেও ইন্দিরা দেবী বেশ প্রসন্নই ছিলেন। ইলাকে কাছে ডেকে ধীর স্বরে বললেন—"অনিয়ম করিস্ না, মা! ওদের খাইয়ে, সকাল সকাল নিজেও এক মুঠো খেয়ে নিস্। রোগ তো এক দিনের নয়, এক দিনে কমবেই বা কেমন করে?"

"তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে মা?—" ইলা ভীরু কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

ইন্দিরা দেবী হেসে বলেন—"কষ্ট কি! মরা-বাঁচা ভগবানের হাত।···কি পাইনি, তা জানি না। তবু যা পেয়েছি, তাতেই বুক ভরে আছে। তোদের রেখে যেতে পারলে, যা পাইনি তার জন্যে কোন দুঃখ আর থাকবে না, মা! এ কি কম ভাগ্য!"—ইন্দিরা দেবীর চোখ দুটো ছল-ছল করে ওঠে।

ইলা আঁচল দিয়ে মা'র চোখ দুটো মুছিয়ে দেয়। মৃদু একটি দীর্ঘশ্বাসে ইন্দিরা দেবীর বুকের সব বোঝা যেন নেমে যায়।

বেলা তিনটার কিছু আগে দীনেশ বাবু ফিরলেন আশ্রম থেকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী পুষ্প নিয়ে। ইন্দিরা দেবী মুখে কিছু না বললেও,

দিনে দিনে আরও
নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার
জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।
রোজ রেক্সোনা সাবান
ব্যবহার করুন। এর
ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপ-
নার গায়ের চামড়াকে দিনে
দিনে আরও কোমল,
আরও নির্ম্মল কোরে
তুলবে।
রেক্সোনা
ক্যাডিল্*যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।
RP. 109-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

এতক্ষণ যেন তাঁর প্রত্যাশাতেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কোন্ সকালে বেরিয়েছেন স্নান ক'রে একটু মিছরির জল মুখে দিয়ে। না খেয়ে এই দুপুর রৌদ্রে কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছেন, সেই চিন্তাই ইন্দিরা দেবী করছিলেন বিছানায় পড়ে।

দীনেশ বাবু বাড়ী ফিরতেই ইন্দিরা দেবী ইলাকে ডেকে বললেন—"ভাতগুলো ঢেকে রেখেছিস্ তো মা? খালি পেটে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে হয়তো পিত্তি পড়ে গেল।"

"তুমি ভেবো না, মা!"—ইলা ওঠে। বাপকে অভুক্ত রেখে সে নিজেও খায়নি। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে যায়।

"না ভাববো না। আর দু'দিন পর আর কিছুই ভাবতে আসবো না, মা!"—ইন্দিরা দেবী চোখ বন্ধ ক'রে কি ভাববার চেষ্টা করেন।

যে যন্ত্রণার জন্যে হ'লো লিভারে অস্ত্রোপচার, সেই যন্ত্রণাই আবার সুরু হ'লো বিকেল থেকে। সেই সঙ্গে দেখা দিল জ্বর। রাত্রি যত ঘনিয়ে আসে, টেম্পারেচার তত বাড়ে। ডাক্তার যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা ভেবে ইলার মন ভেঙে পড়ে, দীনেশ বাবু বিভ্রান্ত হয়ে ওঠেন।

তুলসীতলায় সন্ধ্যার প্রদীপ দেখিয়ে, ইলা এক হাতে ধুনোচি আর এক হাতে প্রদীপ নিয়ে ঢুকলো ঘরে। বালিশ থেকে মাথা একটু তুলবার চেষ্টা ক'রে, ইন্দিরা দেবী হাত দু'খানা কপালে ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন তাঁর আরাধ্য দেবতাকে।

ধুনোচি-প্রদীপ নামিয়ে রেখে ইলা মায়ের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালো। এত দিন যেটুকু আশা মনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আজ যেন হঠাৎ আবার সেটুকু কর্পূরের মত উবে গেল। কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ইলা মায়ের মুখের কাছে মুখখানা নামিয়ে ডাকে—"মা!"

ইন্দিরা দেবী চোখ তুলে চাইলেন—ভয় করিস না, মা! মরণ যেদিন সত্যি আসে, সেদিন কি কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে ইলা!...হিন্দু মেয়ের এর চেয়ে আর বড় সৌভাগ্য কি থাকতে পারে মা? স্বামী—সন্তান—"

"ইলা!"

হঠাৎ ইলা চমকে উঠলো। "এ কি! শেফালি!"

"হাঁ, আমি। আমি এলাম তোমায় খবর দিতে।"—শেফালি যেন কথা বলতে হাঁপিয়ে ওঠে।

"কি খবর শেফালি?"—ইলার বুকের ভিতরটা ধড়াস্-ধড়াস্ করে।

"ব'সো। বলছি।"—শেফালি টুলটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

"ব'সো তুমি। কি খবর তাই বলো আগে।"—খাটের বাজুটা শক্ত ক'রে ধ'রে ইলা উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে শেফালির মুখপানে চায়।

শেফালি ইতস্তত করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, থেমে থেমে বলে—"সর্বেশ্বর আচার্য্যিরা মামলায় জিতেছে। জমিদারের সঙ্গে জোট ক'রে কলোনীর অর্দ্ধেক বাসিন্দার ঘর দিয়েছে ভেঙে। আদালতের হুকুমে ওরা পুলিশের সাহায্য পেয়েছে।...ডক্টর সেন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছিলেন বাধা দিতে। পুলিশ ব্যাটন চার্জ্জ করেছে। সেই সঙ্গে সর্বেশ্বরের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা চালিয়েছে লাঠি।—সুবিমল বাবু—মাথায় আঘাত পেয়েছেন।...গুরুতর আঘাত—"

"শেফালি!"—ইলা আঁৎকে ওঠে।..."কোথায়—কোথায় আছেন তিনি?"

"হাসপাতালে।...তিন ঘণ্টা পরে একবার জ্ঞান ফিরে এসেছিলো।...চারি দিক চেয়ে শুধু তোমায় খুঁজেছেন।"

"আমায় খুঁজছেন!...শেফালি, থামলে কেন? বলো—" ইলা অস্থির হয়ে ওঠে, নিমেষে ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা কম্পন বয়ে যায়।

ইন্দিরা দেবী এতক্ষণ নির্বাক্ হয়ে শুনছিলেন সব কথা। এবার তিনিও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইলাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"যা মা, আর দেরী করিস্ না।"

"কিন্তু কেমন করে—"

"কেমন ক'রে আমায় ফেলে যাবি, তাই ভাবছিস্? তুই সেখানে গেলেই আমি বেশী শান্তি পাবো ইলা! মা হলেও আমি নারী! যা—যা মা, দেরী করিস না। নদীর এপার যখন ভাঙ্গে, ওপারের মায়া মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, দু'দিক হারাস্ নে মা!"—কথা বলতে ইন্দিরা দেবী হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

ইলা নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল। ওর দু'চোখে নেমেছে তখন অশ্রুবন্যা!

ইলার চিবুক স্পর্শ করে ইন্দিরা দেবী আবার বলেন—"যা মা, দেরী করিস না। মায়ের আশীর্ব্বাদ হবে তোর জীবনের পাথেয়। সুবিমল বেঁচে উঠবে! ইলা...ইলা..."

ইলার মনে হলো, মায়ের হাতখানা যেন ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো সেই কম্পন। ইন্দিরা দেবী স্থির থাকতে পারেন না। অসহ্য কম্পনে তাঁর শরীর যেন ছিটকে পড়তে চায়।

বিহ্বল হ'য়ে ইলা ঝুঁকে পড়লো মায়ের বুকের উপর। শেফালি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। ...এপার ভাঙ্গে, ওপারে উঠেছে ঝড়।

* * * *

ইলার জীবনে মায়ের আশীর্ব্বাদই হলো পাথেয়। ওই প্রবহমান জনস্রোতে মিশে ইলা অতিক্রম করে পৃথিবীর কঙ্করময় পথ।

শেষ

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

"মানুষ ইচ্ছা করে, ভগবান বাধ সাধেন।"

—টমাস এ কেমপিস (১৩৮০—১৪৭১)

রাধাকান্ত দেব

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রভূত ঐশ্বর্য্য, সমাজে সম্মান, স্বদেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত যশঃ—ভোগের সকল উপকরণের মধ্যে যিনি জরার স্পর্শ অনুভব করিয়া ত্যাগের পথে শ্রেয়ঃ কি তাহা বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বিনা বৃন্দাবনে বাসং শ্রেয়ঃ ক্বচিৎ ন পশ্যামি" এবং বৃন্দাবনে যাইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি যদ্ বৃন্দাবনমাগতঃ।
অত্র দেহপতনেন পূর্ণকামো ভবাম্যহম্।"

সেই রাধাকান্ত দেব ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ (১লা চৈত্র) কলিকাতা সিমলা পল্লীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

যখন রাষ্ট্রবিপ্লব বা শাসক-পরিবর্ত্তন হয়, তখন যেমন এক সম্প্রদায়ের পতন ও আর এক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, তেমনই কতকগুলি লোকের অবস্থার অবনতি ও কতকগুলি লোকের ভাগ্যোদয় হয়। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনে ও পরোক্ষ ভাবে ইংরেজের অভ্যুত্থানে যে সকল বাঙ্গালীর ভাগ্যোদয় হইয়াছিল—যাঁহারা সমাজে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অবস্থা হইতে অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের ও ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, ক্লাইবের মুন্সী নবকৃষ্ণ দে তাঁহাদিগের অন্যতম ও প্রধানদিগের এক জন। সিরাজদ্দৌলার পতনে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব করিয়া ক্লাইব সত্যই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। তিনি কেবল যে নির্লজ্জ ভাবে আপনার জালিয়াতী প্রভৃতির সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু যে অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আপনার সংযমের প্রশংসা আপনি করিয়াছিলেন—"I stand astonished at my own moderation." মেকলে লিখিয়াছেন, ব্রাউন নামক যে ব্যক্তিকে ক্লাইব ইংলণ্ডে তাঁহার প্রাসাদের ভূমি সুসজ্জিত করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি প্রাসাদে একটি বৃহৎ সিন্দুক দেখিয়া জানিয়াছিলেন, তাহাতে মুর্শিদাবাদের নবাবের তোষাখানা হইতে লুণ্ঠিত স্বর্ণস্তূপ আনীত হইয়াছিল এবং মনে করিয়াছিলেন, পাপের ঐ সাক্ষ্য শয়নকক্ষের নিকটে রাখিয়া কি ক্লাইবের সুনিদ্রা-সম্ভোগ সম্ভব হয়? শেষে যে ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝায়, তিনি বিবেকের বৃশ্চিকদংশনের অস্থিরতা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। কথায় বলে "নাড়ু নাড়িলে গুঁড়া পড়ে।" সেই জন্য ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদে গমনকারী মুন্সী নবকৃষ্ণেরও লাভ অল্প হয় নাই। ক্লাইব প্রভৃতি সিরাজদ্দৌলার যে ধনাগার হইতে ২ কোটি টাকার স্বর্ণাদি অংশ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরে একটি ধনাগার ছিল। তাহার বিষয় ইংরেজরা জানিতে পারে নাই। সেই ধনাগার হইতে নাকি মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, ইংরেজদিগের দাওয়ান রামচাঁদ রায় ও মুন্সী নবকৃষ্ণ ৮ কোটি টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি আত্মসাৎ করেন।

জুন মাসে পলাশীর যুদ্ধ হয়—তাহার পরেই নবকৃষ্ণ তাঁহার কলিকাতার ভবনে "দালান" নির্ম্মাণ করাইয়া কয় মাস পরে তাহাতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন,—পক্ষকাল উৎসব চলিয়াছিল।

নবকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীর সংখ্যা সাত ছিল। কিন্তু বহু দিন তাঁহাদিগের কাহারও পুত্র না হওয়ায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাহার পরে তাঁহার এক স্ত্রী এক পুত্র (রাজকৃষ্ণ) প্রসব করেন। রাধাকান্ত গোপীমোহনের পুত্র।

বিষয়ী চতুর নবকৃষ্ণের যে সকল দোষত্রুটি ছিল, সে সকল রাধাকান্তকে স্পর্শ করে নাই।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নবকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি রাজকৃষ্ণ ও গোপীমোহন উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়।

বাল্যকালাবধি জ্ঞানার্জ্জনে রাধাকান্তের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষিত হইত। তিনি অল্প বয়সেই বাঙ্গালা ব্যতীত আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফিরিঙ্গী সরবোরণের বিদ্যালয়ে যাঁহারা ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক জন—বোড়াল গ্রামবাসী কৃষ্ণমোহন বসু রাধাকান্তের ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণমোহন যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন মোতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন।" নহিলে ধনী ছাত্রের সম্ভ্রম রক্ষা হইত না।

রাধাকান্ত দেব

বাঙ্গালা ব্যতীত তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

পাঠদশাতেই তাঁহার বিশ্বাস জন্মে—এ দেশে সংস্কৃত ভাষার পুনরায় বহুল প্রচলন প্রয়োজন—কারণ, হিন্দুর সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত জানিবার উপায় নাই এবং সেই সংস্কৃতির স্বরূপ না জানিলে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, দেশের উন্নতির জন্য দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী জ্ঞান প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত করিতে হইবে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হিবর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ফলে (৮ই মার্চ্চ) যে বিবরণ স্বীয় দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে রাধাকান্তের বৈশিষ্ট্য সুপ্রকাশ। প্রথমে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা। হিবর লিখেন, রাধাকান্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার যান, রৌপ্যের ডাণ্ডা (আসা প্রভৃতি) ও পরিচারকবর্গ—এ সকলের তুলনা হয় না। দ্বিতীয়—রাধাকান্তের গুণের কথা। হিবর লিখিয়াছিলেন, এই যুবক সুন্দর, ইঁহার ব্যবহার মনোরম, ইনি ভাল ইংরেজী বলেন এবং বহু ইংরেজী পুস্তক—বিশেষ ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ করিয়াছেন। ইনি ইংরেজদিগের সহিত বিশেষ ভাবে মিলামিশা করেন এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধনকল্পে অর্থ ও অধ্যবসায় ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি স্কুল বুক সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক এবং স্বয়ং বাঙ্গালায় কয়খানি প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয়—ইঁহার রক্ষণশীলতার কথা। এ বিষয়ে হিবর রাধাকান্তের মতবিরোধী। হিবর বলেন—স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ইনি অত্যন্ত রক্ষণশীল—বর্ত্তমান কালের ধনী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনি নাকি রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে আন্তরিক। যখন লর্ড হেষ্টিংসকে বিদায়কালে সম্বর্দ্ধিত করা হয়, তখন রাধাকান্ত মানপত্রে লিখিতে চাহিয়াছিলেন—লর্ড হেষ্টিংস যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন নাই, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। তবে সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

হিবর লিখিয়াছিলেন, রাধাকান্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বিরত নহেন এবং স্বীয় ধর্ম্মমত সমর্থনের চেষ্টাও করেন। রাধাকান্ত বলেন, য়ুরোপীয়রা ও কতকগুলি হীন ভারতীয় হিন্দু ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনেক হিন্দুপ্রথার আধ্যাত্মিক কারণ আছে। দেখা যাইতেছে, শেষোক্ত বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতের পূর্ব্বগামী।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পরে যখন সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট হিন্দু কলেজ স্থাপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন রাধাকান্ত সে কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলেজের ছাত্রদিগকে যে "সার্টিফিকেট" প্রদান করা হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের স্বাক্ষর ছিল—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, এ. ট্রয়র, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আর হেলিফেক্স, জে সি সি সাদার্ণণ্ড ও ডেভিড হেয়ার।

প্রায় ৩৪ বৎসর রাধাকান্ত সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন।

যখন কলিকাতায় স্কুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক হিন্দু পুত্রদিগকে তাহার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তক পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে দিতে দ্বিধাবিচলিত ছিলেন—আশঙ্কা ছিল, সে সকল পুস্তকে হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল করিবার চেষ্টা থাকিবে। ঐ অকারণ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য রাধাকান্তকে সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক করা হয়। তিনি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি সাধনের সুযোগ গ্রহণ করেন। রাধাকান্তের পরামর্শে সোসাইটীর পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" নামক পুস্তিকা রচনা করেন—তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে স্বয়ং প্রবন্ধ লিখিলে, বহু হিন্দুর সে বিষয়ে আগ্রহ জন্মে। সেই সময়ে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের অন্যতম নেতা বেথুন সেই জন্য রাধাকান্তকে ঐ কার্য্যে পথিপ্রদর্শক বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রাধাকান্ত প্রতিপন্ন করেন, হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ নহে। এ দেশে বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য রাধাকান্ত স্মরণীয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম নীতিকথা ও ইংরেজী পুস্তকের অনুকরণে বানান পুস্তক (Spelling Book) প্রচলিত করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। সে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি সাধন ও বাছাই মেধাবী ছাত্রদিগকে শিক্ষক হইবার পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা প্রদান। যে ২৪ জন সদস্য লইয়া সমিতি গঠিত হয়, তাহার ১৬ জন য়ুরোপীয় ও ৮ জন ভারতীয়। ডেভিড হেয়ার ইহার য়ুরোপীয় ও রাধাকান্ত ভারতীয় সম্পাদক হয়েন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমিতি ৩ ভাগে বিভাগ করা হয়—

(১) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন।
(২) পাঠশালার উন্নতি সাধন।
(৩) উপযুক্ত ছাত্রদিগকে ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদান।

প্রথম বৎসরের শেষে প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। সোসাইটী আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে ২টি "নর্ম্মাল" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে বেতন প্রদানে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পুত্ররাও বিনাব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিত। ঠনঠনিয়া পল্লীর ও চাঁপাতলা পল্লীর বিদ্যালয় দুইটিই বিশেষ সাফল্য লাভ করে। প্রথমটিতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিভাগ ও দ্বিতীয়টিতে কেবল ইংরেজী বিভাগ ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়দ্বয় সম্মিলিত হইয়া ডেভিড হেয়ারের স্কুলে পরিণত হয়।

রাধাকান্ত বিদ্যালয়গুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন—পরিদর্শনের ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহারই গৃহে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইত।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কার্য্যের জন্য বেথন যে রাধাকান্তকে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে পথিপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত নহে।

সমসাময়িক সমাজে সর্ব্বজনসমাদৃত হইলেও রাধাকান্ত অজাতশত্রু হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শ্রীরামপুর মহকুমার মনোহরপুর গ্রামে একটি দাঙ্গা হইলে

বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীর প্ররোচনায় রাধাকান্তের নামে দাঙ্গায় সাহায্য করার অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহের নিকটস্থ একটি গৃহে আটক থাকেন। যদিও সে অপরাধে জামিন দেওয়া যায়, তথাপি নিম্ন আদালত তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিতে অস্বীকার করায় নেজামত আদালতে আবেদন করিয়া তাঁহাকে জামিনে মুক্তি লাভ করিতে হয়। জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা বিচার জন্য দায়রা আদালতে প্রেরণ করেন এবং মামলার বিচার জন্য নিযুক্ত বিচারক রবার্টস টরেন রাধাকান্তের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। তিনি অব্যাহতি লাভ করিলে বাঙ্গালার তৎকালীন ডেপুটী-গভর্ণর হার্ব্বার্ট ম্যাডক ১৪ই জানুয়ারী (১৮৪৯ খৃ:) তাঁহাকে লিখেন :—

"You have had my sympathy in your late misfortune, and I wish to congratulate you on the honourable acquittal which you have received."

য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, এই পত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কথিত আছে, এই মামলা দেখিতে এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে, শ্রীরামপুরে কলাপাত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল।

রাধাকান্ত বিদ্যা-চর্চ্চায় ও বিদ্যা-বিস্তারে আগ্রহশীল হইলেও রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই তিনি উহার সভাপতি নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বও করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে লাখেরাজ জমী বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়—প্রায় ৮ হাজার লোক সমবেত হইলে টাউন হলে স্থানাভাবহেতু অনেককে বাহিরে ময়দানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, তখন রাজনীতির যে রূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমানের মত নহে। বিশেষ রাধাকান্ত যে পরিবারের লোক সে পরিবারের ঐশ্বর্য্য ও সামাজিক সম্মান সবই ইংরেজের প্রসাদে। ঐশ্বর্য্যের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। সামাজিক সম্মান ঐ ঐশ্বর্য্যের অনুচর হইয়াছিল। তিনি কুলীন ছিলেন না। মৌলিক নবকৃষ্ণ ধনী ও প্রভাবশালী হইয়া খানাকুলের রামানন্দ সর্ব্বাধিকারীর কন্যার সহিত পুত্র রাজকৃষ্ণের এবং বহু অর্থ ব্যয়ে প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতি বংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্যার সহিত বালক পৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দিয়া—বহু অর্থ বিনিময়ে রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতিত্ব ক্রয় করেন। তদবধি শোভাবাজারের মৌলিক দেব উপাধিধারীরা কেবল কুলীনে কন্যা সম্প্রদান ও কুলীন-কন্যাকে বধূ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; পরন্তু কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম বিবাহ যথারীতি কুলীন-কন্যার সহিত সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া স্বগৃহে রাখিবার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা "আভরস" নামে অভিহিত। সেই নিন্দনীয় প্রথা এখন সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে।

তখন এ দেশের লোক মুসলমান নবাবদিগের অনেকের অত্যাচারে ধন ও মান নিরাপদ মনে করিতে পারিতেন না। বাঙ্গালায়—বর্গীর হাঙ্গামা হইতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা নবাবদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যোগ দিয়া বাঙ্গালীকে বিব্রত করিয়াছিল। ইংরেজের শাসনে প্রদেশ সে অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করায় লোক ইংরেজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—ইংরেজ-শাসনের শোষণ তখনও বিশেষরূপ অনুভব করিতে পারে নাই। সেই কারণে এবং ইংরেজের নিকট কৃতজ্ঞতাহেতু রাধাকান্ত ইংরেজরাজের ভক্ত ছিলেন। তখন যে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, তাহা "নিবেদন ও আবেদন" মাত্র। ঈশ্বর গুপ্তও রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন :—

"তুমি, মা, কল্পতরু :
আমরা সব পোষা গরু—
খাব শুধু খোল বিচিলি ঘাস।
আমরা ভূষী পেলেই খুশী হ'ব—
ঘুঁসী খেলে বাঁচব না"—ইত্যাদি।

সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের জয়ে ও দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় রাধাকান্ত—নবকৃষ্ণের অনুকরণে—ইংরেজদিগকে লইয়া উৎসব করিয়াছিলেন। একটি উৎসবের কার্য্যক্রম হইতে একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Programme
of the
Grand Display of Fireworks
To be given at the residence of
The
Rajah Radhakant Deb Bahadoor
at
Sobha Bazar
On the evening of the 22nd and 23rd of
October, 1860
To celebrate the restoration of peace
in India.

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে রাজা ও বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পরে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) যখন ভারত সরকার নূতন উপাধি প্রবর্ত্তন করেন, তখন রাধাকান্তই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম "কে, সি, এস, আই" হয়েন। তখন তিনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন।

রাধাকান্তের বিরাট ও অমর কীর্ত্তি "শব্দকল্পদ্রুম"। প্রাচীন সংস্কৃতে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ অভিধানের শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া ইংরেজী শব্দকোষের পদ্ধতিতে রচিত এই অভিনব শব্দকোষ রচনা করিয়া রাধাকান্ত সমগ্র সভ্য জগতের শিক্ষিত সমাজকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেন ও স্বয়ং অক্ষয় যশ: অর্জ্জন করেন। ইহাতে হিন্দুদিগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্মসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, পৌরাণিক উপাখ্যান, ব্রত-কর্ম্মাদি এবং সঙ্গীত, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগে তিনি

এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা মুদ্রিত করিবার জন্ত তাঁহাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল এবং তিনি যে নূতন প্রকারের অক্ষর ঢালাই করাইয়াছিলেন, তাহা বহুদিন "রাজার হরপ" নামে অভিহিত হইত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহার শেষ খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রায় ৪০ বৎসর কালের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাধাকান্ত এই গ্রন্থ শেষ করেন। গ্রন্থখানি য়ুরোপে ও আমেরিকান পণ্ডিত সমাজেও প্রেরিত হইলে অসাধারণ আদর লাভ করে। পণ্ডিত সমাজের প্রতিষ্ঠান-সমূহ নানা ভাবে রাধাকান্তকে সম্মানিত করেন—রাশিয়ার ইম্পিরিয়াল একাডেমী, বের্লিনের (জার্ম্মাণী) রয়াল একাডেমী, ভিয়েনার কাইশারলেচেল একাডেমী, প্যারিসের (ফ্রান্স) এশিয়াটিক সোসাইটী প্রভৃতি তাঁহাকে সদস্য মনোনীত করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন। রাশিয়ার সম্রাট নিকোলাশ ও ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিশেষ স্বর্ণপদক উপহার দেন এবং ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক পদকের সঙ্গে ব্যবহার্য্য যে হার উপহার দেন, তাহার প্রত্যেক আঁকড়ীতে "FVII" লিখিত ছিল। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে তাঁহার এই কীর্ত্তি উপযুক্ত সম্মান লাভ করে। এইরূপ সম্মান লাভ সর্ব্বকালেই দুর্ল্লভ।

রাধাকান্তের এই সাহিত্য-কীর্ত্তির জন্ত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর এ দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন—(রাজা) প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (রাজা) সত্যশরণ ঘোষাল, হীরালাল শীল, (রাজা) রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (রাজা) দিগম্বর মিত্র, গোপালনাথ ঠাকুর, (মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (রাজা) রাজেন্দ্র মল্লিক, (রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, নেপালের মহারাজার প্রতিনিধি হরি-ভক্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, (পাদ্রী) জেমস লং (সার) এসলী ইডেন, হাকিম মীর্জ্জা আলী প্রভৃতি। দেখা যায়, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা রাধাকান্তকে তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির জন্ত সম্বর্দ্ধিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই চেষ্টায় যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিষয়ে তাঁহাকে লিখিত পত্রের উত্তরে রাধাকান্ত সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।—

"It serves as a key to the critical study of the lergest femily of languages , it has formed a new era in philosophy ; it has opened the dark vistas of antiquity, and contributed to the establishment of great ethnographical facts."

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১১শে এপ্রিল বৃন্দাবনে রাধাকান্তের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ১৪ই মে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতেও এইরূপ সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলেই রাধাকান্তের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে সভায় কেবল এক বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল—কি ভাবে তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইলে সঙ্গত হয়। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারকল্পে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হইলে রাধাকান্তের কার্য্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

শেষে স্থির হয়, সংগৃহীত অর্থ প্রথমে রাধাকান্তের একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে। মোট সংগৃহীত ৫,০৬৫ টাকা ব্যয়ের হিসাব এইরূপ :—

টাকা আদায়ের ব্যয়	...	১৫৬৲ টাকা
বিজ্ঞাপনের ব্যয়	...	২১৬৲ "
ছাপা খরচ	...	৩১৲ " ৪ আনা
ডাক খরচ	...	১৮৲ " ১৫ আনা
অন্যান্য ব্যয়	...	৩৮৲ " ১ আনা
		৬ পয়সা

মর্ম্মরের আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্ত তৈলচিত্রের ব্যয় নির্ব্বাহান্তে যে অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রতি বৎসর বি, এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে যে পরীক্ষার্থী প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে পুরস্কার প্রদান জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়কে প্রদান করা হয়।

স্মৃতিসভায় সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিদেশী রাজশক্তির সাহায্যে সমাজে কোন সংস্কার প্রবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ চেষ্টার ও বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সে জন্ত সংস্কারকামীরা তাঁহার নিন্দা করিতেন এবং মনে করিতেন, তিনি বুঝিতে চাহেন নাই যে, কালবশে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য এবং নবকৃষ্ণ ও গোপীমোহন যে সমাজে প্রাধান্ত করিয়া গিয়াছেন, সে সমাজ সভ্যতায় অনগ্রসর। রাজেন্দ্রলাল সংস্কার-বাদীদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস দিয়া বলেন :—

"He was no enemy to real reforme, * * * I can fully appreciate—I yield to none in a proper appreciation of liberality of sentiment—but 1 cannot underatand the liberality of those who, in the fervour of their own liberality, would be the most intolerant of oppressors of those who may happen to differ from them in opinion."

রাধাকান্ত ইংরেজীতে পণ্ডিত ছিলেন। হিবরের উক্তির উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। রিকার্ডস যে কয় জন ভারতীয়ের ইংরেজী রচনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দেশবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, হিন্দুরা প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, অধ্যয়ন ফলে, আয়ত্ত করিতেছেন—এ সময় ভারত শাসনকার্য্যে তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা না করিলে—ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—রাধাকান্ত তাঁহাদিগের অন্যতম। ইংরেজদিগের সহিত তিনি নানা কার্য্য একযোগে করিতেন—তিনি

ইংরেজরাজের ভক্ত ছিলেন এবং এ দেশে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, পিতৃপুরুষরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথই হিন্দুর গ্রহণযোগ্য—পূর্ব্বপুরুষগণের নির্দ্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেন না। সেই জন্যই তৎকালে সমাজে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতেছিল—যে পরিবর্ত্তন অনেক ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতায় আত্মপ্রকাশ করিত—তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য ইংলণ্ডের কোন সংবাদপত্রের মতে তিনি "Roman Catholic among Hindus" ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার রক্ষণশীলতা যে আন্তরিক ছিল, তাহাতে কেহই কখন সন্দেহ পোষণ করিতে পারেন নাই। সেই আন্তরিকতার জন্যই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। এক দিন—অভ্যাসানুসারে প্রত্যূষে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতে তিনি, স্নান না করিয়াই, গাড়ী আনাইয়া সুখচরে গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে গমন করেন—বৃন্দাবনে যাইবেন। সুখচরে অসুস্থ হইয়া কয় দিন থাকিয়া তথা হইতেই তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন—আর গৃহে ফিরেন নাই। যাত্রার সময় তিনি প্রিয় দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুকে তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে যাত্রার কারণ পত্রে লিখিয়া জানাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্নানার্থ আসিয়া নিজগৃহে যাহা দর্শন করেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন, তিনি হিন্দু আচারে যে নিষ্ঠা রক্ষা করিতে প্রয়াসী তাঁহার গৃহেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে—সুতরাং তিনি তখনও সমাজের নেতৃরূপে সেই নিষ্ঠা রক্ষা করিতে বলিলে তাহা ভণ্ডামী হইবে—সেই জন্য তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

তখন সমাজে যে নূতন ভাব প্রবেশ করিতেছিল, তাহা দীনবন্ধু তাঁহার "সধবার একাদশী" নাটকে রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবারের তরুণ পুত্র "অটল টল্‌টল্ করছেন" চিত্রে—দেখাইয়াছেন।

বৃন্দাবনে গমনে রাধাকান্ত যেমন বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, তথায়ও তেমনই চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কোন বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাঁহার এক পুত্র তাঁহার নির্দ্দেশ লইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ভৃত্য নবীন প্রভুকে সে সংবাদ দিলে রাধাকান্ত বলিয়াছিলেন, তিনি যখন সংসার-ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তখন আর বৈষয়িক ব্যাপারে মনোযোগ দিবেন না—সুতরাং পুত্র যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভৃত্যকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, সে যেন আগন্তুককে সযত্নে আহারাদি করাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে বলে; কারণ, সন্ধ্যায় তিনি গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন দর্শন করিতে মন্দিরে যাইবেন—পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না হয়।

তিনি বৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বে যে কয় দিন সুখচরে গঙ্গাতীরস্থ গৃহে ছিলেন, সেই কয় দিন বহু লোক তথায় যাইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। তিনি তখন কাহাকেও তাঁহার গমনের কারণ জানান নাই; যাইবার সময় দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণকে তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে ময়ূর হরিণ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত—ইংরেজ, বিশেষ ইংরেজ সৈনিক শিকারীরা সে সকল শিকার করিত। ব্রজমণ্ডলে এইরূপ জীবহত্যা হিন্দুর পক্ষে বেদনাদায়ক। রাধাকান্ত সে বিষয় সরকারকে জানাইলে সরকার ব্রজমণ্ডলে শিকার নিষিদ্ধ করেন।

তিনি মনুর সেই মতই মানিতেন—

"যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে।"

সেই জন্য যখন তাঁহাকে কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রদান জন্য ইংরেজ সরকার কলিকাতায় দরবারে আসিতে আমন্ত্রণ করিলেন, তখন রাধাকান্ত যাহা করিলেন, তাহা তাঁহার মতনিষ্ঠার ও দৃঢ়তার পরিচায়ক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি রাজভক্ত ছিলেন। রাজ্ঞীর প্রতিনিধি বড়লাট যখন তাঁহাকে রাজদত্ত সম্মান গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা দুষ্কর হইল। কিন্তু দুষ্কর হইলেও তিনি বৃন্দাবনবাসী হইয়া ইহকালীন কোন কাজের জন্য ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। কারণ, ভক্তের সঙ্কল্প—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে সরকারও বিব্রত হইলেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রদত্ত উপাধি তাঁহাকে দিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের জন্য বহু দেশের নৃপতিদিগের প্রেরিত সম্মান-চিহ্নও প্রদেয়। কি করা যায়? শেষে উভয় পক্ষ পণ্ডিতদিগের মতানুসারে স্থির করিলেন, আগ্রা (অগ্রবন) ব্রজমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত—রাধাকান্ত তথায় যাইলে ব্রজত্যাগ করা হইবে না। সরকার আগ্রায় দরবার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিদেশী সরকারও রাধাকান্তকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়।

জ্ঞানবৃদ্ধ রাধাকান্ত যখন দরবার মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, তখন বড়লাট জন লরেন্স তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সামন্ত নৃপতিবৃন্দ ও দরবারে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন। প্রদত্ত সম্মান-চিহ্ন সমূহ স্বাভাবিক বিনয় সহকারে গ্রহণ করিয়া রাধাকান্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পরে তিনি এক বৎসর জীবিত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে হয়—

"Nothing in his life
Became him like the leaving it."

বৃন্দাবনে যাইয়া রাধাকান্ত বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিয়া ইষ্টচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বীয় শব সংকারের সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া পুরোহিতকে সে বিষয় জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া এক জন সুপণ্ডিতকে তথায় নিজ পৌরোহিত্যে মনোনীত করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বীয় শবদাহের ইন্ধনরূপে ব্যবহার জন্য বহু শুষ্ক তুলসীগুল্ম সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। টেনিসন বলিয়াছিলেন—

"I hope to see my Pilot face to face
When I have crost the bar"

তিনি সেই জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

রাধাকান্ত আপনার মৃত্যু যে আসন্ন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয় দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র

আনন্দকৃষ্ণকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন; কারণ, তাঁহার বিকার আরম্ভ হইয়াছে, বিকারই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। তিনি বৃন্দাবনে গমনাবধি ভৃত্য নবীন প্রতিদিন আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিত, কি আহার্য্য প্রস্তুত করা হইবে, তখন তিনি বলিতেন, "যাহা ইচ্ছা কর"। কিন্তু পত্র লিখিবার দিন তিনি বলেন, "কচুরী করিও"। তাহাই তিনি বিকারের লক্ষণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুতই ছিলেন; জানিতেন—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

তাঁহার মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ তৎকালীন 'ফ্রাইডে রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত হয়—

মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সর্দ্দি হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে শরীরে ভার অনুভূত হওয়ায় তিনি কিছুই আহার করেন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যথারীতি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পূজার ঘরে গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার এক বৈবাহিক—(পুত্রবধূর পিতা) আসিয়া বলেন, "আজ আপনি কেমন আছেন? ঔষধ খাইলে হয় না?" রাধাকান্ত তাহাতে বলেন, "ঔষধে রোগ আরোগ্য হয়—কিন্তু মৃত্যুরোধ হয় না। যদি আপনার কাছে পারলৌকিক কল্যাণের কোন ঔষধ থাকে, তবে তাহা আমাকে প্রদান করুন।" ঐরূপ ভাবে আর কয়টি কথা বলিয়া তিনি পূজার্চ্চনায় মনোনিবেশ করেন। মালা জপ করিয়া তিনি ভৃত্য নবীনকে বলেন, তাঁহার দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছে, সে পান জন্য দুগ্ধ আনয়ন করুক। নবীন দুগ্ধ আনিলে তিনি তাহা পান করিয়া জপের মালা হস্তে লইয়া বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়া আর একটু দুগ্ধ আনিতে বলিলেন। সে বার দুগ্ধ পান করিতে কষ্ট অনুভব করিয়া তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "আজ আমার মৃত্যু হইবে। সুতরাং আর দ্বিতলে থাকা উচিত নহে। পুরোহিত মহাশয়কে আসিতে বলিয়া পাঠাও।" পুরোহিত উপস্থিত হইলে রাধাকান্ত তাঁহাকে স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার পরে আরও কয়টি কথা বলেন। তাহার পরে তিনি ভৃত্য নবীনকে বলেন, তাঁহার জীবনান্ত হইলে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি তাহারও সঙ্ক্ষেপে পুনরুক্তি করেন—মৃত্যুর পরে দেহ ধৌত করিয়া নববস্ত্র পরিহিত করিয়া তাহাতে গন্ধমাল্য ও পুষ্প দিতে হইবে। বৈষ্ণব কীর্ত্তনকারীদিগের হরিনাম কীর্ত্তন সহকারে শব যমুনার তীরে লইতে হইবে। তথায় দেহ পুনরায় স্নান করাইয়া পুরোহিতকে যেরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। চিতা যেন দেহাপেক্ষা দীর্ঘ হয় এবং শবদাহ জন্য তুলসীকাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন কাষ্ঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত না হয়, চিতার উপর চারিটি বংশদণ্ডে এমন ভাবে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইতে হইবে যে, অগ্নিশিখা তাহা দগ্ধ করিতে না পারে। জীবিত কালে তিনি যে ভাবে উপবেশন করিতেন, চিতায় শব সেই ভাবে রাখিয়া পুরোহিতকে প্রদত্ত নির্দ্দেশানুসারে শবদাহ করিতে হইবে। দেহের অবশেষ যখন প্রায় এক সের থাকিবে, তখন ঐ অংশ লইয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ মৎস্যদিগকে আহারার্থ দিবে, এক ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে এবং তৃতীয় ভাগ বৃন্দাবনের মৃত্তিকাতলে এমন ভাবে প্রোথিত করিতে হইবে যে, কোন জীব তাহা তুলিয়া লইতে না পারে। শবদাহান্তে সকলে নীরবে গৃহে ফিরিবে। সে দিন গৃহে রন্ধন হইবে না—কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্যত্র ভোজন করিবে। দশম দিবসে যমুনায় দশপিণ্ড দিবে ও বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইবে। তাহার পর সকলে বাঙ্গালায় ফিরিতে পারেন।

এই সব কথা বলিয়া রাধাকান্ত যখন গৃহের নিম্নতলে গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বৈবাহিক ও অন্য কয় জন ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি স্বাভাবিক শিষ্টাচার সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের দ্বিতল হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি তুলসীকুঞ্জে ধূলি (রজ) শয্যায়—তুলসীমূলে শয়ন করিলেন এবং মস্তকের নিকটে শালগ্রামশিলা স্থাপন করাইয়া কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল—রাধাকান্তের জীবনান্ত হইল। মৃতদেহের মুখমণ্ডলে প্রশান্ত হাস্য। (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ—১৯শে এপ্রিল।)

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে যে লেখক রক্ষণশীলতার জন্য রাধাকান্তকে নিন্দা করিয়াছিলেন, তিনিও লিখিয়াছেন—রাধাকান্তের জীবন-কথা—"তিনি জ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞান-বিস্তার করিয়া গিয়াছেন"—(He went on cultivating and disseminating knowledge). রাধাকান্তের রচিত কয়খানি পুস্তকের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। তিনি বৃন্দাবনে বাসকালে কতকগুলি "পদ" রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি "রাধাকান্ত পদাবলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষে' লিখিত হয়—এক্ষণে ঐ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।

রাধাকান্ত বিদেশেও পণ্ডিতদিগকে প্রয়োজনে সাহায্য দিতে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। জার্ম্মাণীর পণ্ডিত ডক্টর এস, সুজ (Schutg) অর্থাভাবে তাঁহার সংস্কৃত পুস্তক-সংগ্রহ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ডক্টর রোয়ার সে বিষয় রাধাকান্তকে জানাইলে তিনি তখনই ৪ শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ অর্থ পাইয়া ডক্টর সুজ লিখিয়াছিলেন—"May Heaven protect you and grent you health and happiness: may the Great Author of the world give me an opportunity of proving that I am not unworthy of your kindness."

তাঁহার পিতা অন্যায় করিয়া "সাতু বাবু" (আশুতোষ দেব) দিগের কোন জমী লইয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া রাধাকান্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা প্রকৃত অধিকারীদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

রাজনীতিতে রাধাকান্ত যে উগ্রপন্থী ছিলেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু টাউন হলে এক সভায় বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ ইংরেজ শাসনের সংস্কার চাহিয়া বক্তৃতা করিলে তিনি রামগোপালকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, যে দেশে তাঁহার মত লোক আছেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

রাধাকান্তের রক্ষণশীলতা তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের বিরোধী করিলেও কেহই তাঁহার আন্তরিকতায় সন্দেহ করেন নাই, সকলে মনে করিতেন— "E'en his failings lean'd on virtue's side."

চালাক চোর

(মিশরের রূপকথা)
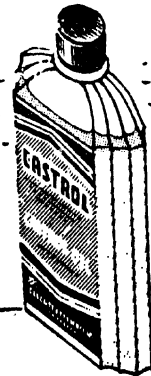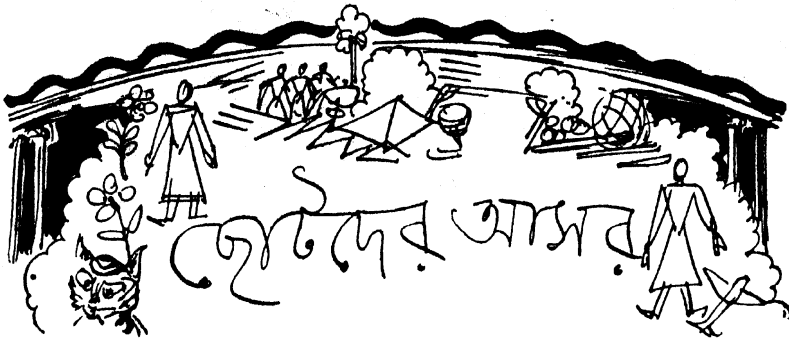
ইন্দিরা দেবী

বুড়ো মিস্ত্রির খুব অসুখ হলো, মনে হলো আর বাঁচবে না—হলোও তাই—ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিল। বুড়ো তখন তার দুই ছেলেকে ডাকলো, বললে: আমি তো আর বাঁচবো না, এখন তোমরা শোনো, রাজার সমস্ত ধন-রত্ন যেখানে আছে সে কেবল আমিই জানি—কারণ ঐ ঘর আমিই তৈরী করেছি আর আমি ছাড়া ওর লুকানো পথ কেউ জানে না, মরবার সময় এসেছে তাই বলছি, তোমরা যেন কাউকে আর বলো না। এই কথা বলে বুড়ো ছেলেদের খুব কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে কি বলে দিল।

তার পর এক দিন শোনা গেল বুড়ো মারা গেছে।

তার পর দু'ভাই এক দিন অন্ধকার রাতে প্রাসাদের সেই জায়গায় গিয়ে মস্ত পাথরের ইট সরিয়ে যা দেখলো তাতে আশ্চর্য্য না হয়ে পারলো না। প্রচুর ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্যের আলোতে চোখ খোলা যায় না। দুই ভাই যা পারলো নিয়ে আবার ঢুকবার লুকোনো পথটি পাথরের ইট লাগিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে এলো।

দুই ভাই মাঝে মাঝে এই রকম করতো—যখনই তাদের প্রয়োজন হতো। ক্রমশঃ রাজা বুঝতে পারলেন তাঁর যা ধন-রত্নের প্রাচুর্য্য তা যেন ক্রমশঃ কমে আসছে। তার পর ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন সত্যিই তাই! কিন্তু কে নেবে? নেবার তো উপায় নেই, যে একমাত্র লোক জানতো, যে তৈরী করেছিল সে তো মারা গেছে, আর তো কেউ এ লুকোনো পথ জানে না। কিন্তু রাজার ভাবনা-চিন্তাকে ছাপিয়েও চুরি হতে লাগলো। তখন রাজা সেই লুকোনো প্রবেশ-পথে পাহারা বসালেন—যাতে চুরি না হয় আর চুরি করতে এলে চোর যেন ধরা পড়ে।

আবার কিছু দিন পরে যখন দুই ভাই এলো—এক জন ভিতরে ঢুকছে অপর জন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বড় ভাই বুঝতে পারলো—সে ধরা পড়েছে, প্রহরীরা সেই লুকোনো পথের কাছেই ছিল। বড় ভাই তখনি বুঝতে পারলো—এ যাত্রা আর নিষ্কৃতি নেই,—সে তখনি বাইরে দাঁড়ানো ছোট ভাইএর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে: কোনো উপায় নেই, আজ ধরা পড়েছি। কিন্তু দু'জনে ধরা দিয়ে তো কোনও লাভ নেই, তুমি এক কাজ করো—আমার মাথাটা কেটে নিয়ে এখনি পালাও।

ভাববার তো আর সময় নেই,—ছোট ভাই দেখলে এ ছাড়া আর উপায় কি আছে,—তাই তখনি বড় ভায়ের মাথাটা কেটে নিয়ে—গভীর অন্ধকারের ভিতর গা-ঢাকা দিল।

প্রহরীরা যখন চোর ধরে খবর দিল, তখন সবাই দেখলো মুণ্ডহীন একটা দেহ। রাজা বললেন: তাহলে তো একলা কেউ চুরি করছে না, আরো লোক আছে এ সঙ্গে,—এখন খোঁজ করো এই মাথাটা কোথায়।

তার পর রাজা বললেন—একটা জায়গায় এই দেহটাকে ঝুলিয়ে রাখো, রাজ্যের লোক এসে দেখুক। যাদের নিজেদের লোক হবে নিশ্চয় তারা দুঃখ-বেদনায় অধীর হয়ে পড়বে—আর তখন এ চুরির পিছনে আর কারা আছে তা ধরা শক্ত হবে না।

রাজার আদেশ মত রাজবাড়ীর বাইরে একটা খোলা জায়গায় সেই মুণ্ডহীন দেহটা ঝুলিয়ে রাখা হলো।

এই যে ভাই দু'জন ছিল এদের মা এই খবর পেলো। রাগে-দুঃখে মা অস্থির হয়ে পড়লো। একে ছেলে মারা গেছে, তার উপর ছেলের দেহটাকে নিয়ে এই ভাবে হাজার লোকের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে—এ কষ্ট কোন্ মার প্রাণে সহ্য হয়!

মায়ের মনের দুঃখ-কষ্ট ছোট ছেলেকে বিচলিত করলো—সে মাকে বললে: তুমি কিছু ভেবো না, ঐ দেহটা আমি এনে দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করছি।

ছোট ভাই এক দল গাধার পিঠে অনেক রকম রঙীন জলের বোতল চাপিয়ে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করলো। এই সব রঙীন জলগুলোর গুণ এত তীব্র ছিল যে না খেলেও বেশী গন্ধ নাকে গেলে নেশা ধরে যায়—একে বলে মদ। সন্ধ্যা বেলায় প্রহরী-ঘেরা সেই জায়গায় পৌঁছে সে আগে দেখে নিলো যে, ঠিক জায়গায় এসেছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিকই এসেছে, ঐ তো দূরে তার দাদার মুণ্ডহীন দেহটা ঝুলছে।

একটা লোককে এক দল গাধায় পিঠে বোঝা চাপিয়ে আসতে দেখে প্রথমে তো প্রহরীরা তেড়ে উঠলো। এর মধ্যে ছোট ভাই করেছে কি—কিছু বোতলের মুখ খুলে দিয়েছে, আর তা থেকে সেই রঙীন জল পড়ে তার গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

ছোট ভাই বিনয় করে বললে: তোমরা রাগ করো না ভাই, আমার এই জিনিসগুলোর অবস্থা দেখো—এখানে একটু অপেক্ষা করতে দাও, আমি এগুলোর ব্যবস্থা করে চলে যাচ্ছি।

ছোট ভাইএর বিনয়-নম্র ব্যবহারে প্রহরীদের মন নরম হয়ে গেল। ক্রমশঃ গল্প জমে উঠলো আর ছোট ভাই তাদের পেট ভরে

রঙীন জল খাওয়ালো। সেই জল খেয়ে তো তাদের খুব নেশা হলো, খাওয়াটা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল বলে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। চালাক ছোট ভাই তখন তার দাদার দেহটা নিয়ে সটান মায়ের কাছে গিয়ে উঠলো। মা'র মনের কষ্ট কিছুটা কমলো, এবং ছেলের সংকার করে, ছোট ছেলের উপর খুব খুসী হলো।

রাজার কাছে সংবাদ পৌছলো—ঝোলান মৃতদেহটাও চুরি হয়ে গেছে, তখন তো রাজা রেগে আগুন হয়ে উঠলেন—'কি কাণ্ড এ সব! আমার রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে এই ধূর্ত্ত চোরকে ধরে দিতে পারে!'

কিন্তু রাজার আদেশ ও প্রচণ্ড রাগ সবই নিষ্ফল হলো। কেউ চোর ধরবার জন্য সাহস করলো না, এত চালাকীর কাছে কে পারবে—যে মরা মানুষকে নিয়ে পালিয়ে যায়!

কেউ যখন এগিয়ে এলো না সাহস করে—তখন রাজকন্যা বললে: আমি চোর ধরে দেবো।

রাজকন্যার খুব সাহসী ও বুদ্ধিমতী বলে খ্যাতি ছিল। রাজা বললেন: বেশ তাই হোক—রাজকন্যাই যাক—চোর ধরার চেষ্টা করুক।

ছদ্মবেশে রাজকন্যা বহু জনের সঙ্গে আলাপ করলো, কত জায়গা ঘুরলো। অনেক দিন পরে হঠাৎ তার এই দুষ্টু ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। রাজকন্যার প্রথম আলাপেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল—তাই তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করে ফেললে।

এক দিন রাজকন্যা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বললে: জানো, আমি ঠিক করেছি যে খুব চালাক তাকে আমি বিয়ে করবো।

ছোট ভাই হাসলো, বললে তাই নাকি? আসলে ওর ইচ্ছা হচ্ছিল রাজকন্যা ওকে বিয়ে করুক।

রাজকন্যা তখন বললে: আচ্ছা, তুমি জীবনে কি কি খুব চালাক বা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ, তার গল্প শুনতে আমার খুব ইচ্ছা করে।

রাজকন্যা এমন ভাবে বললে যে ছোট ভাই আর কিছু লুকিয়ে রাখতে পারলো না, ভাইএর মুণ্ড কেটে আনা আর তার দেহ চুরির গল্প ইনিয়ে-বিনিয়ে সব বলে ফেললে।

রাজকন্যা শুনতে শুনতে খুব খুসী হয়ে উঠছিল—কেন না, সে চোর ধরতে পেরেছে। এ কী কম আনন্দের কথা! রাজকন্যা তার হাত ধরে বলে ফেললে: তবে তো তোমায় ধরেছি। কিন্তু ছোট ভাই আরো চালাক—সে যে তার মরা ভাইএর একখানা হাত কাপড়ের তলায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে কথা তো আর কেউ জানতো না, সময়-অসময় সেটাই সে কাজে লাগাত। রাজকন্যাও আগে ভাবতে পারেনি যে কি সে ধরেছে—তাই যখন দেখলে ছোট ভাই খুব দ্রুত ছুটে পালাচ্ছে তখন অবাক হলো—ওমা! এ যে অন্য একটা হাত!

ধরেও ধরতে না পেরে রাজকুমারীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল—তখন রাজার কাছে গিয়ে রাজকন্যা সব বললে। রাজা তো ছোট ভাইয়ের ধূর্ত্ত-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আর কিছুই বলতে পারলেন না, তবে খুব খুসী হয়ে ঘোষণা করলেন যে ছোট ভাইকে পুরস্কার দেবেন।

যথাসময়ে ছোট ভাই রাজার কাছে এলো। রাজা তাকে অনেক ধন-রত্ন পুরস্কার দিলেন। তার সঙ্গে আর কি দিলেন বলো তো?

হাঁ, সেই ফুটফুটে রাজকন্যার সঙ্গে—বুদ্ধিমান ছোট ভাইএর বিয়ে হয়ে গেল।

ওমা, হবে না—কি যে বল? রাজকন্যা তো বলেই বসলো ও হলো আমার বন্ধু আর ওর কত বুদ্ধি, ওকে আমি বিয়ে করবোই।

তার পর আর কি—দু'জনে মনের সুখে রাজত্ব আর ঘরকন্না করতে লাগলো।

কবি শ্রীমধুসূদন

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

মহাকবি শ্রীমধুসূদন আজ বিস্মৃত হয়েছেন,—এ কথা দুঃখের হলেও সবচেয়ে মর্মান্তিক সত্য। পাঠ্য পুস্তকের সীমান্ত পেরিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের মনের রাজ্যে তাঁর বীর পদধ্বনি বড়ই ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী মধুসূদনের দুর্ভাগ্য ও বাঙ্গালী মনের সঙ্কীর্ণতা। যুগ পরিবর্ত্তনে রুচির পরিবর্ত্তন আসবেই, কিন্তু যুগের দোহাই দিয়ে যা অবিনশ্বর ও ভাস্বর তার অস্বীকৃতি হাস্যকর।

উচ্চাভিলাষ ছিল মধুসূদনের গর্ব, লক্ষ্য ছিল তাঁর পাশ্চাত্য কবিদের সমকক্ষতা অর্জ্জন করা। উদাহরণ 'ক্যাপটিভ লেডি'। কলম্বাসের মতই তিনি করেছেন আর এক মহাদেশ আবিষ্কার, সে মহাদেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আর চিন্তাধারার। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মনের তিনিই জন্মদাতা।

উনবিংশ শতাব্দির ইতিহাস এক রেনেসাঁসের ইতিহাস। এই যুগেরই একটি স্ফুলিঙ্গ মধুসূদন। কাব্যের ধারায় মধুসূদন এনেছেন বিপ্লব। কিন্তু এ বিপ্লব 'আমি ধূমকেতু—উল্কা' জাতীয় নয়, বিপ্লব টেকনিকে আর ষ্টাইলে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নায়ক মেঘনাদের বিদ্রোহ যেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আর চিন্তাধারার বিদ্রোহ; প্রাচীন জরাজীর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বংস যার লক্ষ্য।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের চিরস্থায়ী দান—চতুর্দ্দশপদী কবিতা। মিত্রাক্ষরা ভাষা তাঁকে বড়ই পীড়া দেয়, তাই বুঝি কবি বলেন,—

—"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি। বড় ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি ওঠে রাগে।

*   *   *   *

চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে!"

ইউরোপকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। সে যুগের ইতিহাসে এ এক চরম দুঃসাহসী অভিযান। 'প্র. পা. বি'র ভাষায়,—"তাঁহার পূর্বে যে প্রভাব বিদেশী সাহিত্যের ও অনভ্যস্ত টেকনিকের উত্তমাশা অন্তরীপের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্ষীণ ভাবে মাত্র আসিয়া পৌঁছিত, ব্ল্যাকভার্সের সুয়েজ খাল কাটিয়া তাহার পথ তিনি প্রশস্ত ও দ্রুততর করিয়া দিলেন।" এর জন্যই সে যুগে মড়া-কান্না উঠল,—গেল গেল—সব গেল! কবিতা সরস্বতীকে কোট-প্যাণ্টালুন

পরিয়েছেন বলে যাঁরা মধুসূদনের সমালোচনা করেন, তাঁরা এটুকু ভুলে যান, কোট-প্যান্টালুনের নীচে আর এক পোষাক আছে যা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না, সেটি বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ী। সোজা কথায়, "তিনি ইউরোপের নানা কারুকার্য্যখচিত ফ্রেমে ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন।"

প্রতিভা যাচাই করার মত প্রচুর মাল-মশলা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক পাঠক তাঁকে ভুলল কেন?—এ প্রশ্নের জবাব মনে হয় কয়েকটি কথায়—রসগ্রাহী মনের অভাবে। তাই আগামী দিনের পাঠক যদি শ্রীমধুসূদনের কাব্য-মূল্য বিচার করে, সেদিনই তাঁর সকরুণ প্রার্থনা 'রেখো মা দাসেরে মনে,···' সার্থক হয়ে উঠবে।

গপ্পো নয়

সুভাষ সমাজদার

প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা।

বিশাল একটা আম-বাগানের ধারেই ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠে হাজার হাজার সৈন্যের ছাউনী পড়েছে। সৈন্যদের ছাউনীর পরেই একটা বিরাট উঁচু আর লম্বা মাটির দেয়াল। সেই দেয়ালের ওপারে তাদের রাজার ছাউনী। রাজাও স্বয়ং এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। আজকের রাতটা ফর্সা হলেই কাল সকালে ঐ মাঠে যুদ্ধ হবে।

গভীর নিশুতি রাত্রি। সারা আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। থেকে থেকে কড়-কড়-কড়াৎ করে মেঘ ডাকছে। উগ্র সাদা আলোয় চারি দিক ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেনাপতিদের তাঁবুতে কোন সাড়াশব্দ নেই। তাঁরা সব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম নেই রাজার চোখে। গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তাঁর মুখে।

কাল সকালের যুদ্ধে হার-জিতের ওপরে তাঁর ভাগ্য, সারা দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। দূরে আম বাগানের ভেতর থেকে একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। ঘুমে রাজার চোখ দু'টো বোধ হয় একটু জড়িয়ে এসেছিল। এমন সময় সুযোগ বুঝে রাজার সামনে থেকে তাঁর গড়গড়াটা কে টুক্ করে সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। রাজা তাড়াতাড়ি চোরের পিছু পিছু ছুটে বাইরে এলেন। কিন্তু রাত্রির ঘন থকথকে অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁর বাবুর্চি-খানসামাদের তাঁবুতে গিয়ে দেখলেন, তারাও কেউ নেই। কে কোথায় পালিয়ে গেছে তাঁকে ছেড়ে। তখন তিনি সেই জমাট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বললেন—হায়, যুদ্ধে হেরে যাওয়ার আগেই সবাই তাকে ছেড়ে পালিয়েছে—

কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন্ রাজা এই কথা বলেছিলেন জান?

ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধের আগের রাত্রে পলাশীর মাঠে দাঁড়িয়ে বাংলা দেশের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা এই কথা বলেছিলেন।

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

পাতিহাঁস ও কোলা ব্যাঙ্

পাতিহাঁস কইলো হেসে "চলেছি ভাই হাস্‌পাতালে।
এখন কেন লোভ দেখিয়ে পথের মাঝে হাত পাতালে?
চলি ভাই, দাও গো ছুটি,
খেয়েছি চা-পাঁউরুটি,
তার ওপর কেকের কুচি
খেতে কি হয় রে রুচি?
প্যাঁক্ প্যাঁক্ গান গেয়ে যাই একা তাই দাদরা তালে।
চলেছি ভাই হাস্‌পাতালে।"
কোলা ব্যাঙ ফুলিয়ে গলা কুয়োর ধারে খোলাখুলি
টেঁকুর তুলে বললে "ওরে, করবি কে আয় কোলাকুলি!
হঠাৎ যদি বাদলা ঝরে
কেমন করে ফিরবি ঘরে?
পথেই তখন মরবি কেঁদে,
তাই তো বলি সেধে সেধে:
আয় রে চুপে আমার কূপে, থাকুক পড়ে ঝোলাঝুলি।
আয় রে করি কোলাকুলি।"

হিম রাতের গান

হিম রাতে সিম খেতে হিমসিম খাই রে!
জলপাই পাই যদি, জল কোথা পাই রে?
বেগুনের গুণ কত না খেলে কি বুঝবি?
খোসা খুলে বেদানার দানা তবু খুঁজবি।
জামরুল খেতে যদি ভীমরুল কামড়ায়
টের পাবি কি তফাৎ আমে আর আমড়ায়,
মাঝে মাঝে হয় তো বা মনে হবে সন্দ
গাঁদা ফুলে ভাসে বুঝি গোলাপের গন্ধ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মৃৎশিল্পী শ্রীরমেশ পাল নির্ম্মিত বিভিন্ন বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। মূর্ত্তি তিনটিতে শিল্পীর শিল্প-বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ায় মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদের জন্ত শিল্পী স্বয়ং চিত্র তিনখানি মনোনীত করেছেন।

তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দশ

“অসম্ভব! না, একেবারেই সম্ভব নয়!”

ৎবরোস্কী একখানি চিঠি নিয়ে মোদরুল্লোর ঘরে এসে ঢোকে, চিঠি পড়ছে, আর মাথা নাড়ছে।

তার দিকে শান্ত মুখে তাকায় মোদরুল্লো।

ৎবরো বলে—“কিন্তু এ ত' আর আকাশ মাথায় ভেঙে পড়েনি, বরং এক হিসাবে বলা যেতে পারে—জোর বরাৎ।”

মোদরুর মুখখানি আরো কালো হয়ে গেল। ৎবরোসকী চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে বলে—

“পড়ে দেখ, তোমাকে ত' রোমে যেতে হবে।”

“ক্ষেপেছ,—আমি রোমে যাচ্ছি আর কি!”

“না হে, সত্যি তোমাকে যেতে হবে, এই দেখ।”

চিঠিখানি লিখেছেন পিকাসো—'ব্যালে রুসে'র সঙ্গে এখন তিনি ইতালীতে আছেন,—ওদের জন্য দৃশ্যপট আঁকছেন। দিয়াঘিলেফ একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছেন, সেইজন্য পিকাসোর কয়েকটি ক্যান্‌ভাসের প্রয়োজন। দিয়াঘিলেফ এই নৃত্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ডাইরেক্টর। নৃত্যশিল্পীরা যাই হোক, কিছু সংখ্যক নবীন চিত্রশিল্পী আর গাইয়ে-বাজিয়েদের নিয়ে প্রতি বছর তিনি সারা য়ুরোপকে মাতিয়ে তোলেন। পিকাসো লিখেছেন—“আমার মঁ রুজের সেই ছোট্ট বাসা থেকে চারখানি ক্যান্‌ভাস কাকে আর বিশ্বাস করে আনতে বলব, বন্ধুদের মধ্যে সততায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মোদরু ভিন্ন কে আর আছে?” রেজিষ্টার্ড পত্রযোগে চাবিও সেদিনই এসে পৌঁছবে, আর মোদরু যদি এই দায়িত্বটুকু গ্রহণ করে তাহলে ব্যালের পৃষ্ঠপোষক রু ত লা ভিকটুরীর ম্যুয়েল তাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দেবেন। আর দিয়াঘিলেফ মোদরুকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে ম্যুয়েল ব্যালের পরিচ্ছদপূর্ণ ছুটি থলে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন, সে ছুটি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

“রোম যেতে হবে!”

“হ্যাঁ—আর পিকাসো তোমাকে আজ রাতেই রওনা হতে বলেছেন। তাড়াতাড়ি পাসপোর্টের ব্যবস্থার জন্য রোমের ফরাসী কন্‌সলের কাছ থেকে দুখানি চিঠিও সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। যাক্—আমি ওসব ব্যবস্থা করছি, আর থলেও জোগাড় করছি।”

“না”—মোদরু বলে ওঠে।

“তুমি যেতে চাও না—? কেন, হারিকট-রুজের জন্য বুঝি?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু তোমরা দুজনেই ত' যেতে পারো, পাঁচশো ফ্রাঁতে থার্ড ক্লাসে যাওয়া যাবে। এই সূত্রে দুজনেই রোমটাও দেখে আসবে।”

হারিকট-রুজের চোখ দুটি আনন্দে নৃত্য করছে।

“ঠিক জানো তুমি?”

“আমি এক মিনিটের ভেতর সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। দাঁড়াও, আগে টাকার জোগাড় করি।”

“বেশ, তাই করো। আমি আর হারিকট 'মঁ রুজে' গিয়ে পিকাসোর আঁকা ক্যান্‌ভাসগুলি নিয়ে আসবো।”

মাদাম ৎবরোসকী সেঁয়ুই-এর পায়েস তৈরী করে নিয়ে ঘরে এলেন। শরীর ভালো থাকলে এটি তাঁর প্রতিদিন প্রভাতের নিত্যকর্মের অন্তর্গত। আহার-কালে এই আসন্ন ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা না করার জন্য সবাই সচেষ্ট।

ৎবরোসকী বলে ওঠে—“জানো, মোদরু, রু বোনাপার্টে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল, সে কথা মনে আছে? আমি তখন একমনে রোমের ফটোই দেখছিলাম, পামফিলি ভিলার ফটো। সাইপ্রেস ঝাউ গাছের সারের ভিতর থেকে সেন্ট পিটারের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। দুমিনিট আগে রুটিওলা যে হাঁকিয়ে দিয়েছে, রুটি দিতে চায়নি, সে কথাও ভুলে গিছলাম।···সেই পামফিলি ভিলা এখন তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে।”

হারিকট-রুজ বলে ওঠে—“আর ভ্যাটিকান, চ্যাপেল—সে সবও দেখতে পাবে—”

“আর র‍্যা ফা য়ে ল।”

চাবি এসে গেল, মোদরু তাড়াতাড়ি চাবিটা ধরে নেয়—বলে—“জলদি চলো, কুইক্!”

নীল আকাশ প্রখর সূর্যালোকে উজ্জ্বল,—লঘু সাদা মেঘ আকাশে মৃদু গতিতে ভেসে যাচ্ছে।

এ্যাভিন্যু ত অরলিন্সের পথে ওরা স্কুলের ছেলেমেয়ের মত দৌড়ে চলেছে। রু ভিক্টর হিউগোতে একটা বাংলোর সামনে এসে ওরা দাঁড়াল,—জানলাগুলি সব বন্ধ।

“ওরা মনে করবে আমরা হয়ত চোর!”

ওপরে, নীচে, আসবাবহীন সব ঘরগুলিতেই অজস্র ক্যানভাস, মেঝের ওপর জড়ো করে রাখা, দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি রাখা, আর সেল্‌ফে সাজানো আছে প্রচুর ক্ষুদ্রাকৃতি আফ্রিকার মূর্তি।

"কোন্ ক্যান্‌ভাসগুলি আমরা নেব? উনি ত' কিছুই লেখেননি—"

জানলা না খুলেই সেই প্রয়াদ্ধকার ঘরটিতে ওরা পিকাসোর আঁকা ছবিগুলি দেখতে থাকে।

পিকাসোর গোড়ার জীবনে আঁকা ছবিগুলি মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখে মোদক। অদ্ভুত রঙ ও অপূর্ব ব্যঞ্জনায় আঁকা কিষাণের ছবি, এই ছবির মধ্যে এমনই দৃঢ়তা আছে যে, মোদকের মতে এর মধ্যে পিকাসোর পরবর্ত্তী কালের অবনতির কোনও আভাস নেই। পিকাসোর অঙ্কন-রীতি বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত হয়েছে, সেই সব কাল বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা: লুতরেক্ পিরিয়ড', "রেড", "ব্লু", "ম্যভ্" পিরিয়ড প্রভৃতি। এই সব কালের মধ্যে "শিল্পের মুক্তি" নামক কালটির উল্লেখ নেই। সেই কালেই ত' পিকাসো পরিচিত পারিপ্রেক্ষিতের তুচ্ছতা উপলব্ধি করে নূতন পথ, নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন?

যে-সব ছবিতে পিকাসোর কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া উদ্দাম হয়ে উড়ে চলেছে, সেই সব উৎকট অতি-প্রাকৃত ছবিগুলি হারিকট-রুজ আপনমনে দেখছে।

"এইটে নাও, এটা নিয়ে চলো।"

মোদক বলে ওঠে—"নাঃ, ইতালীয়ানরা এই সর্বপ্রথম পিকাসোর ছবি দেখবে, এমন চারখানি ছবি নির্বাচন করতে হবে যার মধ্যে পিকাসোর অঙ্কন-রীতির বিবর্ত্তন বিচার করা সম্ভব। পিকাসোর বলা উচিত ছিল কোন্ কোন্ ছবি নিয়ে যেতে হবে, কি বলো?"

প্রাচীনতম যুগের একখানি ছবি বাছা হ'ল; একটি ছবি "ব্লু" পিরিয়ডের, আরও দুখানি অন্য কালের ছবি, একটি "বিদূষকে"র ছবি, আর একটি টেবলের উপর রাখা গীটারের। টেবলটার ভারসাম্য বোধগম্য না হলেও অলঙ্ঘনীয়।

ওরা রু বারার দিকে চললো। প্লাস্ দ্যু লিয়ন-দে বেলফোরের মোড়ে এসে মোদক হারিকটকে বলে: "আচ্ছা যদি রোমে আমাদের বিয়েটা সেরে নিই?"

সবিস্ময়ে হারিকট বলে—"বিয়ে কেন? কেন এমনি কি আমাকে তুমি ভালোবাসতে পারো না?"

"না,—বিয়ে হলে তুমি আমার স্ত্রী হবে, আমার প্রকৃত সহধর্মিণী। দেখো আমরা হলাম শিল্পী, এই ছবি আঁকার জন্য আমরা উপহসিত, লাঞ্ছিত, যারা আমরা কি চাই, কি গড়তে চাই বোঝে না, তারাই আমাদের কুশপুত্তলিকা দাহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেইখানেই আমাদের বিদ্রোহের অবসান। শিল্পী হিসাবে আমাদের কর্তব্য শিল্প-সংক্রান্ত সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কিন্তু সমাজের মধ্যে পাঁচ জনের এক জন হয়ে থেকে, আমরা দুজনে, অর্থাৎ তুমি আর আমি তিন-চার হাজার বছরের প্রাচীন সামাজিক কুসংস্কার ধ্বংস করতে পারবো না। এ সব নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাবো না। বিবাহ সম্পর্কে কি করা যায়, আমরা কি করবো, সেই কথাই ভাবা যাক্। কিন্তু আমাদের বিয়েটা হয়েই যাক্। তাহলে অন্ততঃ সাধারণে যে সব কাদা আমাদের গায়ে ছুঁড়বে, সেটা ততটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে না। এ ত' অতি সহজ ব্যাপার—আমাদের শিল্পকর্মে আমরা যদি এতটুকু দৌর্বল্য প্রকাশ করতে না চাই, এক লাইনও যদি না ছাড়ি, সামাজিক জীবনে অন্ততঃ এইটুকু সুবিধা সমাজকে দেওয়া যাক্। তার পর ভেবে দেখ—"

হারিকট ওর দিকে তাকায়।

"রোমের উজ্জ্বল নীল আকাশের নীচে যদি আমাদের সন্তান-সম্ভাবনা হয়,—মহৎ শিল্পের চিরন্তন ধারায় অভিষিক্ত আমাদের কোলে আসবে নবজাতক—"

—"সেই অ না গ ত পু রু ষ।—ও মোদক! হয়ত আমাদের এই সন্তানই সেই ভবিষ্যতের মানুষ যার কথা তুমি সেই রাতে বলেছিলে, সেই যে রাতে আমি তোমার সঙ্গ নিলাম। আর তার জন্য—! কিন্তু ওহে স্বপ্নবিলাসী, রোমে গিয়ে বিয়ে করবে,—এ কি এক দিনের ব্যাপার! অবশ্য যদি সুন্দরতর মিলন আমাদের কাম্য না হয়—"

"সুন্দরতর মিলন?"

"হাঁ, তাই! জীবিত শিল্পীদের মধ্যে প্রধানতমদের আমরা দেখতে যাচ্ছি, যে বিধাতাকে আমরা স্বীকার করি না, তাঁর পুরোহিতের কথার চাইতে যাঁর কথা আমাদের কাছে নির্দেশ, যে মানুষটিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তিনি যদি মনে করেন, তিনি যদি—"

ৎবরোসকী এসে হাজির হ'ল। পকেট থেকে পাঁচশো ফ্রাঁর নোট বার করল।

মোদক বলল, "যতক্ষণ না ট্রেনে উঠছি ততক্ষণ তোমার কাছেই রাখো।"

"আমার স্ত্রী এমব্যাসীতে গেছেন। তোমার পুঁটলি সব ষ্টেশনে পৌছে গেছে। কি গরম ভাই!"

"কিন্তু মোদক, আমি শেষটা তোমাকে লজ্জায় ফেলব না কি?"

হারিকট-রুজের জামার কোমরের দিকটা সেলাই করা ছিল, সেই আমেরিকান মেয়েদের পার্টির রাত্রে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, তার ওপর সেলাই করায় বিশ্রী দেখাচ্ছে। নাক আর গালের ওপর বেশ ছড়ে আছে এখনও। কৃত্রিম উদ্ভিড়ালের টুপীটারও স্থানে-স্থানে শাদা বেরিয়ে পড়েছে।

মোদক কথার জবাব দেয় না। তাকে ভালো করে দেখে হারিকট-রুজ। বলল—"এখনও দুপুর হয়নি—লাঞ্চ খাওয়ার আগেই আমি তোমার সার্টগুলো কেচে দেব, তাড়াতাড়ি রোদে শুকিয়ে যাবেখ'ন।"

ৎবরো বললে—"আমরা তোমাকে একটা জুতো কিনে দেব।"

"কি দিয়ে কিনবে?"

ভয়ে-ভয়ে পকেটটা দেখায় ৎবরোসকী।

"ওই টাকা আমাদের নয়, যাওয়ার আগেই কি সব টাকাটা খরচ করে ফেলব নাকি?"

"এর কিছুটা ত' তোমার। তবে জুতোরও দাম অনেক। আমি একটা মতলব বলি, তুমি আমারটা নাও, আমি বরং একজোড়া নতুন সাণ্ডাল কিনে নিই। কেমন? রাগ কোরো না। আমি তোমাকে জুতো জোড়া ধার দিচ্ছি বই ত' নয়।"

মোদকরো রাজী হয়। রু ভ লা গেইটে একটি দোকানে বসে

জুতা বিনিময় সম্পূর্ণ হ'ল—২বয়ো চটি জুতা এমন কি নস্য রঙের একজোড়া মোজাও কিনল।

মোদক অতঃপর বলে ওঠে—

"আমি একটু বাবুয়ানা করতে চাই,—কিছু দিন ধরেই দোকানের জানলায় এই বস্তুটি খুঁজছিলাম।"

ওরা সকলে মিলে 'জরি-ফিতাওলা'র দোকানে চল্ল,—সেখান থেকে মোদক এক জোড়া শাদা 'কফ' (সার্টের হাতা) কিনল। দোকানদার এক জোড়া মোষের সিঙের বোতাম বিনামূল্যে দিল। মোদক খুব খুসী। ওরা শীর্ণ হাত দুটির আঙুল রোদে তুলে ধরে, যেন ঝক্ঝকে চীনামাটির পাত্র থেকে গোলাপী ফুল বেরিয়ে এসেছে।

"দেখছো কি চমৎকার! জ্যাকেটটার বোতাম এঁটে দেব, সবাই মনে করবে সোনালি গেঞ্জী পরেছি।"

ওরা খেতে বসেছে—দরজায় ধাক্কা দিয়ে কিস্লিঙের প্রবেশ। ওরা তাকে আহারে আমন্ত্রণ জানায়। বেচারী একটি টেলিগ্রাম দেখালো। পোলাণ্ডে পিতার মৃত্যুশয্যায় ওর ডাক পড়েছে।

সে বললে—"তোমাদের কাছে কিছু টাকা হবে,—কি করে যাই বলো ত?"

মোদকের মুখখানি শাদা হয়ে গেল, খালি গায়ে বসেছিল, সমগ্র অঙ্গ যেন শাদা হয়ে গেছে,—ভিজা সার্টটা রৌদ্রে শুকাতে দেওয়া হয়েছে, সেটি ঝুলছে দড়িতে, মোদকের গাটি তার চেয়ে শাদা।

তার দিকে তাকিয়ে আগ্রহ ভরে কিস্লিঙ বলে ওঠে—"কি রে! আছে কিছু?"

মৃতের মত শাদা হয়ে ম্লান গলায় মোদক বললে—"না।"

হায় রে! স্বেচ্ছায় রোম যাত্রা বন্ধ রেখে কিস্লিঙের পোলাণ্ড যাওয়ার খরচ ও দিত, কিন্তু এই টাকা কার? এ টাকা ত' ওর নয়! রোম যাত্রা বন্ধ করলে এখনই পিকাসোকে পাঁচশো ফ্রাঁ ফেরৎ দিতে হবে।

সে আবার বলে—"না ভাই, নেই।"

কিস্লিঙ চলে গেল।

আহারের পর হারিকট মোদককে বলে—"দেখো, আমারও কয়েকটা জিনিষ কেনা প্রয়োজন। আমি অবশ্য—"

রৌদ্রের তাপে মোদকলোর সার্ট শুকিয়ে গিছল,—সে সার্টটা গায়ে দিয়ে হারিকট-কজকে নিয়ে নীচে নামল,—হারিকট-কজ 'কাসেলুসো'র দোকানের সামনে দাঁড়ালো।

জলরঙের একটা ছোটো বাক্স দেখিয়ে বলল—"ঐটে আমার চাই—"কতই বা দাম হবে—পাচ ফ্রাঁর বেশী নয়।"

মোদক সেটা কিনল, সেই সঙ্গে স্কেচ করার জন্য একটা পকেট স্কেচ প্যাড, আর দুটি ব্রাস।

"এই নিয়েই আমি রোম বিজয় করে ফিরব,—যে রোম দেখবো সেই রোমকে সঙ্গে নিয়ে আসবো।"

পথে আবার কিস্লিঙের সঙ্গে দেখা। সে বলল, "টাকা পেয়েছি ভাই,—লিবিয়ণ ধার দিয়েছে।"

লিবিয়ণ লা রোতন্দের স্বত্বাধিকারী। তিনি সবাইকে জানেন, সব খরিদ্দার তাঁর পরিচিত, কফির সঙ্গে কে এক খণ্ড ক্রেসেণ্ট রোল নিয়েছে তা জানা থাকলেও তার দাম নিতে ভুলে যান। কারণ তিনি জানেন ওর দেবার সামর্থ্য নেই। ধনী আমেরিকান আর সুইডিসরা আছে কি জন্য? এটা অবশ্য লিবিয়ণ মনকে প্রবোধ দেয়, কারণ সে তাদেরও ধার দেয়। যুদ্ধের সময় ওর সিন্দুক পাসপোর্টে বোঝাই হয়ে গেছল, পাসপোর্ট বাঁধা রেখে সবাই টাকা নিয়ে গেছে। এতে অবশ্য ওর কোনো দিন তেমন ক্ষতিও হয়নি।

কিস্লিঙ কিন্তু কয়েক হাজার ফ্রাঁ ধার চেয়েছে, প্রথমটা দিতেই চায়নি লিবিয়ণ, তার পর যখন দেখল চিত্রকর চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে তখন তাকে ডাকল, চিরদিনই তাই করে লিবিয়ণ।

বললে—"শোনো বুড়ো ভাই,—তুমি কি মনে করেছ এখান থেকে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা নিয়ে চলে যাবে? সে হচ্ছে না,—যাও, ক্যাসিয়ারের কাছে এইটে নিয়ে যাও,—গিন্নী আসার আগেই পালাও,—অন্য কোনো কাফেতে যেন মদ খেয়ে টাকাটা উড়িয়ে দিও না।"

মোদকলো প্রশ্ন করে—"ক'টার গাড়িতে যাচ্ছো?"

"পাসপোর্ট পেলেই বেরিয়ে পড়ব।"

মোদক হারিকটকে বললে—"তুমি একটু ওপরে যাও,—আমি কিস্লিঙের সঙ্গে দুটো কথা সেরে নিই।"

কিস্লিঙের হাতটা জড়িয়ে ধরে মোদকলো।

"শোনো—"

এমন সময় আর এক জন শিল্পী বলে ওঠে—"হ্যালো!"

কিসলিঙ বলে—"ওর কথায় কান দিয়ো না,—ও ফুলের ছবি আঁকে, সূক্ষ্ম রসের ছবি—পেনটিং যেন নাটক নয়,—প্রকৃত রঙের সঙ্গে যেন সর্বদাই লড়াই করতে হয় না।"

মোদকল্লো বলে—"তুমি তোমার মুমূর্ষু মাকে দেখতে যাচ্ছো, কিন্তু ভগবানের দোহাই, তাঁর সঙ্গে যেন ছবি সম্বন্ধে কোনও কথা বলো না—আমরা···ছবি বুঝেছি। কিন্তু ওঁরা···এ সব বোঝেন না। কেন তোমাকে এ সব বলছি শোনো। অনেক দিন আগে এক রাত্রে জুরার এক অজ পল্লীগ্রামে বাবার মৃত্যুশয্যায় আমার ডাক পড়লো। তিনি একটা খামারে মজুর ছিলেন, সেই ভাবেই মানুষ। আমাকে ভালোবাসতেন, তেমনটি আর কেউ ভালোবাসবে না কোনো দিন—তিনি আমার বাবা—আমাকে ত' দু বাহু বাড়ায়ে বুকে টেনে নিলেন। বললেন···

'খোকা—, আমার সোনা,—এসেছিস বাবা,—ঠিক সময়েই এসেছিস।' বাবার গলার আওয়াজ বসে গিছল, আমাকে বুকে টেনে নিয়ে হাঁপাচ্ছেন, ঠিক যেমন পশুমাতা তার শাবককে নিয়ে হাঁফায় তেমনই হাঁফাচ্ছেন।

'বাবা, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে, তোমার ভবিষ্যতের জন্যই আমার ভাবনা।'

'কেন বাবা,—আমি ভালোই কাজ করছি—' বললাম আমি।

'তার পর আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলাম: তাঁকে স্বমতে আনার জন্যে জোরালো সব কথা,—কিছু মিথ্যাও বললাম, বললাম আমার ভবিষ্যৎ একেবারে আমার হাতে এসে গেছে, নিরাপদ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এ কথা বলেছিলাম যাতে তিনি শান্তিতে চোখ বুজাতে পারেন। উনি কিন্তু আমার মুখের দিকে সংশয়-মণ্ডিত দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—আমি যদি পুরোহিতের কাজ নিতাম তাহ'লেও খুসী হতেন, আমার মেজাজ চড়ে গেল;—শিল্প যে আমাদের কাছে কত পবিত্র, কত মহৎ, পরম ধর্ম, তা বোঝালাম, স্বর্গরাজ্য ত' আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু স্বর্গরাজ্য আমরাই গড়ছি আর ভাঙছি। ওঁর দিকে তাকালাম, প্রায় গায়ে ধাক্কা দিই আর কি—দেখলাম ইতিমধ্যেই তিনি কখন মারা গিয়েছেন। আমার কোন কথাটিতে তাঁর মৃত্যু হ'ল বুঝতে পারলাম না।'

'কয়েক জন অপরিচিতের সাহায্যে তাঁকে পরদিন কবরস্থ করলাম। ছোট্ট একটা কবর-স্থানে নিয়ে গেলাম লতা-পাতায় ঘেরা যেন সত্য কুঞ্জবন।'

'তাই বলছি তোমার মা যদি কিছু বলেন, একটু বুঝে-সুঝে দুটো মিথ্যা কথাই না হয় বোলো!" [ক্রমশঃ।

হোয়ো না কৃপণ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তবু বলি এই ভালো
অনাবৃত আশাহীন এই কালো রাত।
কী বরাত
করেছে যে হিমানীর ভগ্নাংশ চাঁদের
যেখানে রাতের
ওঠে নাভিশ্বাস—
তবু তুমি চাও আজ জীবনের অনন্ত আশ্বাস।

নিজেকে প্রকাশ করে ভয়ে আর ভয়ে
যেন এক গলিপথে চলো ফিরে।—ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়ে
যখন থাকবে না কিছু—বাঁচবার ভালোবাসবার—
কিংবা কোনো জ্যোতিহীন মৃত-তারকার
শেষবার কুড়িয়ে ধমনিটা
বিষাক্ত সাপের মণিটা
নাগালের মধ্যে পেয়ে তবুও ভাববে:
হয়তো ছোবল মারবে।

তাই বলি এই ভালো
পাওয়া আর না-পাওয়ার স্বাদ। অন্ধকার যদি কালো
তবু পিঠে রয়েছে বোঝাটা
যেখানে জীবন-জন্ম বজ্র-গিঁটে আঁটা।

অনেক শিরার মাঝে জীবনের দিগন্ত-প্রবাহ
বায় ছুটে নিয়ে এক প্রবল আগ্রহ।
সেখানে সময় নেই হিসেব কষার
ভালো আর মন্দ আর গুপ্ত অভিসার।

হে জীবন

লবকুমার বসু

ক্রিকেট

প্রতি বছর এ সময়টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা। ক্রিকেট, টেনিস, পোলো প্রভৃতি খেলার মাঠগুলি সরগরম হয়ে থাকে। দলে দলে দেখা যায় লোকে চলেছে এ সব খেলা দেখতে। এ বছর রজত জয়ন্তী দলের সঙ্গে বাংলা ও ভারতীয় দলের খেলা কলকাতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। সে বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্ব্বে বিদেশাগত দলটির সফরের অন্যান্য খেলা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

বোম্বাই টেষ্টে প্রশংসাজনক ভাবে খেলার পর নাগপুরে ভারতীয় একাদশের খেলায় জুবিলী দল আবার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। চার উইকেটে তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এর আগে আমেদাবাদেও অনুরূপ ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হন। প্রথম ইনিংসে জুবিলী দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় আশানুরূপ খেলা দেখতে না পারলেও ওরেলের শতাধিক রাণ ও সিম্‌সনের ব্যাটিং-সাফল্যের 'গুণে' তাঁরা ৩০১ রাণ তুলতে সক্ষম হন। তার পর ভারতীয় ৩৫৪ রাণ করে এবং ৪৪৫ রাণে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ধানবাদের বোলিং-নৈপুণ্যের ফলে জুবিলী দলের ব্যাটসম্যানদের বিপর্যস্ত হতে হয়। মাত্র ১৮১ রাণে তাঁদের সকল উইকেটগুলি পড়ে যায়। মাত্র ৪২ রাণ দিয়ে ৬টি উইকেট লাভ করেন ধানবাদে। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ১৩৭ রাণ করে এবং তাঁদের জয়লাভ হয়। এর পর জামসেদপুরে বিহার প্রদেশপাল একাদশের বিরুদ্ধে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। স্থানীয় দলের খেলোয়াড়গণ প্রথম ইনিংসে খুব অল্প সংখ্যক রাণে আউট হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষতার পরিচয় দেন এবং খেলাটি 'ড্র' হয়।

এর পর ভারতের বিরুদ্ধে একটি টেষ্ট খেলায় এবং অন্যান্য আরও দুইটি খেলায় জুবিলী দল উপর্য্যুপরি জয়লাভ করে। ভারত সফরে তাঁদের প্রথম সাফল্য লাভ ঘটে জোড়হাটে আসাম প্রদেশপাল একাদশের বিরুদ্ধে। ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেষ্ট উইকেট-কীপার পিবের শতাধিক রাণ এবং মিউলিম্যান, লাক্সটন প্রভৃতির ব্যাটিং-সাফল্যে সফরকারী দল মাত্র ৭টি উইকেট হারিয়ে ৩১৩ রাণ তোলে ও ডিক্লেয়ার করে দেয়। স্থানীয় দলের মাত্র ১২১ রাণে সকল উইকেটের পতন ঘটে এবং তারা 'ফলো অন্' করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে স্থানীয় দলকে ১৫১ রাণে আউট করে দিয়ে জুবিলী দল এক ইনিংস ও ১২১ রাণে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়।

বাংলা দলের সঙ্গে খেলাতেও জুবিলী দল ইনিংসের ব্যবধানে জয়লাভ করে। চার-পাঁচ জন টেষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত বাংলা দলের এরূপ পরাজয় সকলকেই আশ্চর্য্য করে দেয়। অবশ্য রামাধীনের বোলিং-নৈপুণ্যের ফলেই এ জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বাংলা দল বেশ ভাল ভাবে খেলে ২১৭ রাণ করে। এর উত্তরে জুবিলী দল ৪৩৪ রাণ তোলে। ব্যারিক ও লাক্সটন উভয়েই শতাধিক রাণ করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে রামাধীনের বোলিং-এর বিরুদ্ধে বাংলা দলের খেলোয়াড়েরা শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হন। মাত্র ৭৭ রাণ ক'রে সকলে আউট হয়ে যান। বিস্মিত দর্শকেরা দেখল, জুবিলী দল এক ইনিংস ও ৮০ রাণে জয়লাভ করল। সর্বসমেত মাত্র ১১ রাণ দিয়ে ১০টি উইকেট লাভ করলেন রামাধীন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ সফরে যে সময়ে রামাধীনের প্রকৃত ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ পেল, সেই সময় তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল। বাংলা দলের সঙ্গে খেলা শেষ করেই ওরেল এবং রামাধীন উভয়েই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফররত ইংলণ্ড দলের সঙ্গে খেলবার জন্যে দেশে ফিরে গেলেন। তাঁদের জায়গা নিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় ওয়াটকিন্স এবং অষ্ট্রেলিয়ার 'ক্রিক বোলার' আইভারসন্। ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেষ্ট খেলায় তাঁরা যোগদান করলেন। ওয়াটকিন্স এর আগেই হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে এম, সি, সি দলের সঙ্গে ভারত সফর করে গেছেন। তবে আইভারসনের এই প্রথম ভারতে আগমন। তাঁর বল দেওয়ার বিশেষত্বের কথা সকলেই জানেন। সাধারণতঃ বোলিংএর সময় যে ভাবে বলটিকে ধরা হয় তিনি সে ভাবে ধরেন না; বুড়ো আঙুল ও সেকেণ্ড ফিঙ্গারের সাহায্যে বলটিকে ধরেন। এই জন্যেই তিনি ক্রিক বোলার নামে পরিচিত হয়েছেন। শোনা যায়, টেবিল টেনিস খেলার কালে এ ধরণের বল ধরায় থেকেই তিনি এ অভ্যাস পেয়েছেন। ক্রিকেটে বিরুদ্ধ দলের ব্যাটসম্যানদের পক্ষে এটি মারাত্মক। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার হয়ে টেষ্ট খেলেন ব্রাউন পরিচালিত এম, সি, সি, দলের বিরুদ্ধে। বয়স তখন ৩৪। বোলিংএ তিনি অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখান। এর পর কিন্তু তিনি আর কোন টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি।

কলকাতায় টেষ্ট প্রভৃতি খেলা নিয়ে সি, এ, বি, এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায় সৌভাগ্যক্রমে সময় মত তা মিটে যাওয়ায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইডেন গার্ডেনেই জুবিলী দলের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা দলের সঙ্গে খেলার পর ভারতের বিরুদ্ধে জুবিলী দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ শুরু হয়। সম্প্রতি আসাম ও বাংলা দলকে

পরাজিত করে এবং বোম্বাই টেষ্টেও আশানুরূপ খেলে জুবিলী দলের খেলোয়াড়দের মনে যে কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল তা নিঃসন্দেহ। তার ওপর প্রখ্যাত বোলার আইভারসনের যোগদানও ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের চিন্তিত করে তোলে।

তৃতীয় টেষ্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হেম অধিকারী। টসে জয়লাভ করে ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে। আইভারসনের স্পিন বোলিং-এর বিপক্ষে ঠিক মত পা ফেলতে না পারায় এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ওপর আইভারসন কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আগে থেকেই বিস্তৃত করায় ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটল। এ সময় উম্রিগড় কিন্তু অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতের মানরক্ষা করেন। ২৩৮ রাণে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হল। এর পর গুপ্তের বোলিং-চাতুর্য্যে জুবিলী দলের ইনিংসও মাত্র ২৪৫ রাণে শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের আইভারসনের বোলিং বেশ বিপদগ্রস্ত করে। মাত্র ৩০ রাণে তাঁদের পাঁচ জন নির্ভরশীল ব্যাটসম্যানের উইকেটের পতন হয়। রামচাঁদ এ সময় অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে খেলে এ বিপর্যয়ের গতি কিছুটা রোধ করেন এবং নিজেও শতাধিক রাণ করবার গৌরব অর্জ্জন করেন। ১১০ রাণে ভারতের ইনিংস শেষ হয়। খেলার চতুর্থ দিনে জুবিলী দল খেলতে নামলে ভারতীয় বোলারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন স্বল্প রাণ দিয়ে তাঁদের সকল উইকেটগুলির পতন ঘটাবার। কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ৬৫ রাণে চারটি উইকেট পড়ে গেলেও মার্শাল ও ওয়াটকিন্স দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে প্রয়োজনীয় রাণ তোলেন এবং জুবিলী দল ছয় উইকেটে জয়লাভ করে।

ভারত :—২৩৮ (উম্রিগড় ১১২, জি, এস, রামচাঁদ ৫৫ ; আর বেরী ৬১ রাণে ৪টি, জ্যাক্ আইভারসন ৭৮ রাণে ৪টি) এবং ১১০ (রামচাঁদ ১১১ ; আইভারসন ৪৭ রাণে ৬টি, লোডার ৪৪ রাণে ৩টি)

জুবিলী দল :—২৪৫ (মিউলিম্যান ৭৫, এমেট ৩১, গুপ্তে ১৫ রাণে ৬টি, গুলাম আমেদ ৬৪ রাণে ৩টি) এবং ৪ উইকেটে ১৮৭ (মার্শাল নট আউট ৮৮, ওয়াটকিন্স নট আউট ৫৫)।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে জুবিলী দল ভারতের কাছে পরাজিত হয়। মাদ্রাজ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এ খেলা। গুলাম আমেদের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও পঞ্চাশ রাণে জয়লাভ করে। এ খেলায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল গুলাম আমেদ ও গুপ্তের বোলিং-নৈপুণ্য। মাত্র ১৩ রাণ দিয়ে ১২টি উইকেটের পতন ঘটান গুলাম আমেদ। দুর্দ্দান্ত গুগলী বোলার গুপ্তের স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধেও জুবিলী দলের খেলোয়াড়রা যেন অসহায় বোধ করলেন। চতুর্থ দিনে শেষের দিকে তাঁরই বলে এল, বি, ডব্লু, হয়ে আউট হয়ে যান রয় মার্শাল। ভারতীয় দলের জয়লাভের পক্ষে এ-ও কম সাহায্য করেনি। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যাট করে শতাধিক রাণ তোলেন পঙ্কজ রায়। রামচাঁদের ব্যাটিং-সাফল্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৪ রাণের জন্তে তিনি সেঞ্চুরী করতে পারেননি। এ ছাড়া ভারতীয় দলের কেনী, কৃপাল সিং প্রভৃতির খেলাও সুন্দর হয়েছিল। জুবিলী দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং সকলকেই নিরাশ করে। বোলিংএও তাঁদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। শারীরিক কারণে লোডার এবং আইভারসন দু'টি ভাল বোলারের সাহায্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। তবে মিউলিম্যান যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা 'কাল খেলেন ও শতাধিক রাণ তুলে তাঁদের মান রক্ষা করেন। এ খেলায় তাঁর অপূর্ব্ব ফিল্ডিংএর কথাও সকলের মনে থাকবে।

প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ন' উইকেটে ৪৪০ রাণ তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয়। পঙ্কজ রায় ১৪১, রামচাঁদ ৯৬ এবং কেনী ৬৫ রাণ করেন। তার পর জুবিলী দল খেলতে নামে। প্রথম ব্যাট করতে আসেন ইংলণ্ডের খেলোয়াড় সি, বার্ণেট। মাত্র ছ'টি রাণ করে গুপ্তের এক গুগলী বলে তিনি আউট হয়ে যান, দ্বিতীয় দিনে শেষ আধ ঘণ্টায়। তৃতীয় দিনের খেলা একা মিউলিম্যানই জমিয়ে তোলেন। অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে গুলাম আমেদ ও গুপ্তের বলের সম্মুখীন হয়ে ৯৯ রাণ করলেন। বিদেশাগত দলের মার্শাল, এস্কিচ, ওয়াটকিন্স প্রভৃতি অনেকেই ঐদিন আউট হয়ে যান। অধিনায়ক বার্ণেট এবং বেরীও যথাক্রমে ৬ ও ০ রাণ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে যান। চতুর্থ দিনে মিউলিম্যান ১২৪ রাণ তুলে দলের রাণ-সংখ্যা যথেষ্ট এগিয়ে দেন। ৬টি চার মারেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুবিলী দল 'ফলো অন্' এড়াতে পারল না। তাদের প্রথম ইনিংস ২২২ রাণে শেষ হয়। ২১৮ রাণে পিছিয়ে থাকায় ঐ চতুর্থ দিনেই তারা দ্বিতীয় বার ব্যাট করতে বাধ্য হল। কিন্তু কেমন যেন হতাশার ভাব তাদের ভেতর এসে গিয়েছিল। মনে হয়, গুলাম আমেদ তার জন্তে অনেকখানি দায়ী। তাঁর দুর্দ্ধর্ষ বোলিং সত্যই ভীত করেছিল জুবিলী দলের খেলোয়াড়দের। দ্বিতীয় বারের খেলা মাদ্রাজের ক্রীড়ামোদীদের আরো নিরাশ করল। বার্ণেট খেলতে নেমে অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাচ আউট হলেন। প্রথম ইনিংসে ছবির মত খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জ্জন ক'রে দ্বিতীয় খেলায় মাত্র ১ রাণে গুলাম আমেদের বলে আউট হলেন মিউলিম্যান। ওয়াটকিন্সই এ ইনিংসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাণ তোলেন, ৪৪। এস্কিচ, রয় মার্শাল আউট হয়ে গেলেন চতুর্থ দিনেই। পঞ্চম দিনে ওয়াটকিন্সের খেলা দেখে অনেকেই আশা করেছিলেন হয়ত বিদেশাগত দল শেষ পর্য্যন্ত ড্র করতেও সমর্থ হবে। কিন্তু গুলাম আমেদের হাতে তিনিও পার পেলেন না। এ খেলায় মাত্র ৪২টি রাণ দিয়ে ৭টি উইকেট নিলেন গুলাম আমেদ, এবং ভারতীয় দলের জয়লাভ যে তাঁর জন্তেই সম্ভব হয়েছিল এ কথা বলা ভুল হবে না। শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১৬৮ রাণ করে জুবিলী দলের খেলা শেষ হয়। গুলাম আমেদ এই প্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়কের গুরুভার বহন করেন এবং তা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এ যথেষ্টই প্রশংসনীয়। ফলাফল :—

ভারত :—৯ উইকেটে ৪৪০ ও ডিক্লেয়ার (পঙ্কজ রায় ১৪১, রামচাঁদ ৯৬, কেনী ৬৫)

জুবিলী দল :—২২২ (মিউলিম্যান ১২৪ ; গুলাম আমেদ ৫১ রাণে ৫টি, গুপ্তে ১৬ রাণে ৪টি) এবং ১৬৮ (ওয়াটকিন্স ৪৪, মার্শাল ৩৬ ; গুলাম আমেদ ৪২ রাণে ৭টি, গুপ্তে ১২ রাণে ৩টি)

॥ 'কেনা-কাটা' — 'কেনা-কাটা' — 'কেনা-কাটা' — 'কেনা-কাটা' — 'কেনা-কাটা' — 'কেনা-কাটা' ॥

ব্যবসায়ীদের প্রতি একটি নিবেদন

চাঁদ সদাগরের দেশ এই বাঙলা।

কত যুগ আগে কত সদাগর বাঙলা থেকে দেশ-বিদেশে গিয়েছিল। বাঙলার পণ্যবাহী বাণিজ্যপোত, পৃথিবীর এমন কোন বন্দর নেই যেখানে তার অবাধ যাতায়াত ছিল না। তেমনি কত দেশ-দেশান্তর থেকে কত জাতি তাদের পণ্য-সম্ভার উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে বাঙলা দেশের বাজারে। আমাদের এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আজও আছে পূর্ব্বের মতই অব্যাহত।

দোকানদার আর ক্যানভাসারের কথা সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলের নামে নকল চালিয়ে দেওয়ার অন্যায় নিয়মের আশ্রয় অনেকেই গ্রহণ করে। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মোহে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করতেও দেখা যায়। অথচ বিজ্ঞাপিত বস্তুর সঙ্গে কত সময়ে আসল বস্তুর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে 'কি কিনবো' আর 'কি কিনবো না' তার হিসাব-নিকাশ করা জনসাধারণের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। দোকানদার ও ক্যানভাসারের কথায় বিশ্বাস করতেই হয়। কিন্তু উপায় কি এই অসুবিধা দূরীকরণের? কে চিনিয়ে দেবে, কোন্‌টি আসল ও কোন্‌টি নকল? কোন্‌টি কাজের, কোন্‌টি অকাজের? কি ভাল আর কি মন্দ?

মাসিক বসুমতী বাঙালী ক্রেতার এই দুর্ব্বহ সমস্যা দূরীকরণের জন্য 'কেনা-কাটা' নামে এক বিশেষ সচিত্র বিভাগের ব্যবস্থা করেছে। বর্ত্তমানে মাত্র এই ব্যবস্থার প্রস্তুতি চলেছে। আসল ও নকলের প্রভেদ যাঁরা চেনেন বা বোঝেন, এমন বিশেষজ্ঞরা এই বিভাগে সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবেন সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা ও ভঙ্গিমায়। বহু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই এই সৎ চেষ্টায় সহযোগিতা দেখিয়েছেন।

আপনার পণ্যের পরিচয়, আলোকচিত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনি কি নিম্নের ঠিকানায় পাঠিয়েছেন?

আপনি যে-কোন ব্যবসার অধিকারী হোন, আপনি পাঠাতে পারেন আপনার বিক্রীত পণ্যের আলোক-চিত্র, সংক্ষিপ্ত পণ্য-পরিচয়, প্রধান এজেন্ট ও বিক্রেতাদের নাম এবং পণ্যবস্তুর সঠিক মূল্য। বাঙলা দেশের দেশী ও বিদেশী ব্যবসা পরিচালকদিগকে সত্বর হ'তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

● "কেনা-কাটা" : মাসিক বসুমতী : কলিকাতা - ১২ ●

ভূমিকাহীন বাঙলা ছায়াছবি

ছায়াচিত্রের অভিধানে আর নটনাট্যমঞ্চের অভিধানে একটি শব্দ আছে, যে শব্দটি আমি আপনি এবং আরও অনেকে কথায় কথায় ব্যবহার করি। ছায়াচিত্র আর নাট্যামোদীদের সে-কথাটি দিবারাত্রি বলতে শোনা যায়। এমন কি, সেই কথাটিকে কেন্দ্র ক'রে দিনের ষ্টুডিও-কাজ ও রাত্রির স্বপ্ন দেখেন বাঙালী ছায়া-পরিচালক ও রঙ্গ পরিচালকের দল। কথাটি আর কিছুই নয়, "ভূমিকা"।

পাঠক-পাঠিকা ভাবছেন, কথাটি এমন আর কি। কে না জানে? অন্ততঃ যারা বাইসকোপ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এ জগতে ভূমিকাই তো যত কিছু!

তথাপি আমরা বলবো, আমাদের বক্তব্যটা কেউ অনুধাবনই করতে পারলেন না। কে কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে বললে, যে-'ভূমিকা' বোঝায় আমরা তদর্থে ধরছিই না। আমরা বলতে চাইছি ভূমিকা, অর্থাৎ Introduction.

এখন যদি প্রশ্ন ক'রে বসেন,—Introduction মানে কি? আমরা নাচার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ খুলে দেখতে উপদেশ দেবো, প্রথম ভাগেও বোধ হয় কয়েক লাইনের 'সামান্য 'ভূমিকা' আছে।

এত কথা বলছি এই জন্য যে, সাম্প্রতিক বাঙলা ছায়াছবির অনেকগুলি ছবিতে দেখতে পেলাম, ছবির কোন Introduction নেই, কোন আরম্ভ নেই। নাম-ভূমিকায় কত আকর্ষণীয় সতী সাবিত্রীদের দেখানো যায় এই চেষ্টায় উদ্যোগী হ'লেই শুধু হয় না, ছবির ভূমিকার জন্যেও সমান দৃষ্টি দিতে হয়। তবুও এখনও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, ছবির ভূমিকার 'লিপি' যখন দিচ্ছে তখন সে আবার কোন্ ভূমিকা? আমাদের ভাষায় না বলে গুরুদেবের ভাষায় বলবো,—"আরম্ভের আগেও একটি আরম্ভ আছে, যেমন প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকাতে হয়।"—যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ।

'শ্যামলী' নাটক কেন কৃতকার্য্য হ'ল?

যাঁরা এক দিন আমাদের 'মহানিশা,' 'বাঙলার মেয়ে,' 'পতিব্রতা,' 'পি-W-ডি' নাটক রঙ্গমঞ্চে দেখিয়েছিলেন, তাঁরা তিন জন আবার একত্রে মিলিত হয়েছেন। তাঁরা তিন জন ছিলেন, এখন আরেক জন এক হয়ে পুরো চার হয়েছেন। যামিনী মিত্র, শিশির মল্লিক, সতু সেন এবং সলিল মিত্র। কলকাতার শহরে হাতীবাগান-কর্ণওয়ালিশ জংশনে সুসংস্কৃত "ষ্টার" নাট্যমঞ্চের ফটকে প্রতি হপ্তায় রাত্রির পর রাত্রি প্লাষ্টিকের "হাউস ফুল" লটকাতে দেখে এই চার জনের নাম স্মরণ না করে পারা যায় না। বাঙলা নাটকের যখন লেখক জন্মাচ্ছে না, কলকাতায় থিয়েটারগুলি যখন প্রায় অধিকাংশই বন্ধ হওয়ার উপক্রম করেছিল, ঠিক সেই অশুভ মুহূর্ত্তে এই চার জনের পুনরাবির্ভাব হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস 'শ্যামলী'কে নাট্যান্তরিত করেছেন প্রায় ছায়াছবির টেকনিকে, দেবনারায়ণ গুপ্ত। 'শ্যামলী' বাঙালী সমাজের প্রতিচ্ছবি! নাট্যকার গুপ্ত শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেছেন একাধিক, এবং এই জন্যই হয়তো তিনি বাঙালীর সামাজিক রূপের নাটক ফোটাতে সিদ্ধহস্ত। সতু সেন লাইট মাষ্টার!

শ্যামলী নাটকের কৃতকার্য্যতার পেছনে আছে বিরাট এক team-work, অর্থাৎ সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অবকাশ ও সুযোগ পেলে বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী দক্ষতা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রযোজক, পরিচালক, স্বত্বাধিকারী, নাট্যকার প্রভৃতির সুষ্ঠ সমন্বয় হ'লে তবেই কি থিয়েটারের ফটকে রাতের পর রাত 'হাউস ফুল' ঝোলাতে দেখা যায় না?

শ্রীযামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক বোবা মেয়েটির যথার্থ অভিনয়ের শিক্ষার জন্য "কলিকাতা মূক ও বধির" বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাহায্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছেন, অনেকেই এই কথাটি জানেন না।

একটি ছবি, একটা হপ্তা, কেন?

আমাদের ছায়াচিত্র-জগতে বর্ত্তমানে মাত্র একটি ছবির প্রযোজক ও পরিচালকের সংখ্যাই সমধিক। একটি মাত্র ছবি তোলার পর আর দেখা যায় না এই সব ব্যক্তিদের। কোথা থেকে এঁরা দেখা দেন আর কোথায় অন্তর্হিত হন, কেউ বলতে পারবেন না। যাঁরা কস্মিন্ কালে ছায়াচিত্র ও ষ্টুডিওর কাজকর্ম্ম জানেন না, অভিনয় কাকে বলে জানেন না, আলোকচিত্র কেমন ক'রে ও কোথা থেকে তুলতে হয় জানেন না, চিত্রনাট্যের অ, আ, ক, খ কখনও শিক্ষা করেননি, সেই তাঁদের কথা বলছি। ঠিক উল্কার মত হঠাৎ দেখা দেওয়া ও সহসা পতন এই সব "ওয়ান্ পিক্চার প্রোডিউসার"দের বৈশিষ্ট্য। কিছুই জানেন না এঁরা, তবে জানেন শুধু কয়েক জন নটীদের নাম, ধাম। ছবি তৈরী করা এই জাতীয় প্রযোজকদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, দু'-চার জন নামজাদা মহিলা অভিনেত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করা বা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে অভিনেত্রীদের সঙ্গলাভই এঁদের একমাত্র কাম্য।

নটীদের কাছে ঘেঁষতে হ'লে সরাসরি আবেদন-নিবেদন করা যায় না। সুতরাং ছায়াচিত্রের নামে বা মধ্য দিয়ে নটীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। একটি মাত্র ছবি তুলতে নেমে যদি

অধরাদের ধরবার ফন্দী-ফিকির খুঁজে পাওয়া যায়, তখন আর চিন্তা কি ? যাদের ট্রামে-বাসে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এবং বিড়ি ফুঁকতে দেখা যায় তারাই একটি ছবি তুলতে নেমে রাতারাতি মটর গাড়ীর মালিক হয়ে পড়ে এবং হাতে ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন নিয়ে চলাফেরা করেন। কলকাতার ষ্টুডিওগুলিতে এদের সংখ্যাই সমধিক। অথচ বাঙালী-জাতি কিছুতেই ভেবে পায় না, অধিকাংশ ছবি এক হপ্তার বেশী কেন চলছে না ?

একটি মাত্র ছবির মালিকদের ছবির মেয়াদ যে এক হপ্তা হবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

'মুলা রুজ' সম্পর্কে দর্শকদের বিভ্রান্তি

কলকাতায় সম্প্রতি "মুলা রুজ" ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়ে গেল। এই রঙীন চিত্রটি বিদেশে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে এই জন্য যে, ছবিটি কোন সত্যিকার রাজা বা পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে গঠন করা হয়নি। পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসী শিল্পী তুলু লুতরেকের দুঃখময় জীবনীকে ভিত্তি করে চিত্রটি তৈয়ারী হয়। চিত্রটি সম্পর্কে বাঙালী দর্শকদের মধ্যে দেখলাম, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দর্শকদের অনেকেই জানেন না, তুলু লুত্রেক নামে এক অদ্ভুত প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। শিল্পী সিঁড়ি থেকে তিন বার প'ড়ে গিয়েছিলেন। শিশুকালে যখন প্রথম পতন হয় তারই আঘাতে শিল্পীর পা দু'টি বিকল হয়ে যায় এবং আকৃতিতে দোষ থেকে যায়। বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য মনের মানুষ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে শিল্পী প্যারিতে বসবাস করতে যান, নির্জ্জনে ও নিরালায়। সেখানে শিল্পীর অন্য কোন কাজ নেই, সন্ধ্যা হ'লেই প্যারির এক বিখ্যাত হোটেল "মুলা রুজ" গিয়ে বসেন। অন্য কিছু খান না, শুধু বোতলের পর বোতল কুঁইয়া পান করেন। হাতে থাকে পেন্সিল ও কাগজ। হোটেলের নর্ত্তকীরা ক্যান্ ক্যান্ ব্যালে নৃত্য করে আর লুত্রেক একের পর এক স্কেচ্ করে যান। বলতে ভুলেছি, শিল্পী ছিলেন ধনীর নন্দন। অর্থাভাব আদপেই ছিল না।

মনের মানুষকে পাননি শিল্পী, কিন্তু আরও অনেক অপ্রত্যাশিতাদের তিনি পেয়েছেন। শিল্পীর প্রতিভা এবং অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক ললনাই শিল্পীর সঙ্গ চেয়েছিল। "মুলা রুজ" হোটেলের বিজ্ঞপ্তির ছবি এঁকে রাতারাতি খ্যাতিলাভ করলেন লুত্রেক। কিন্তু খ্যাতির প্রতি লোভ নেই তাঁর। প্রদর্শনীর ছবি কত উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়ে গেল। লুভরে তাঁর ছবির স্থান হ'ল! লুতরেক কুঁইয়া পান করে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন, কিছুই জানতেন না। জানতে চাইতেন না। প্যারিতে এক রমণীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শিল্পীর। সেও শেষ পর্য্যন্ত বেঁকে বসলো। দুঃখ পেলেন লুত্রেক। নেশাচ্ছন্ন হয়ে ও নেশার ঘোরে বিছানা থেকে উঠে ডাকাডাকি করতে গিয়ে আবার তাঁর

পতন হ'ল সিঁড়িতে। সেই পতনেই শিল্পীর মৃত্যু হ'ল। জগতের প্রতি বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে লুত্‌রেক চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

প্রথম প্রেমিকাকে না পেয়ে এবং নিজের পায়ের গতি চিরদিনের মত বন্ধ হওয়ার দুঃখেই কি না জানি না, লুতরেক সারা জীবনে ছবি এঁকেছেন নারীদের, এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার।

আশা করি, এখন থেকে বাঙালী দর্শক "মুলা রুজ" সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর উক্তি ক'রে আর লজ্জা দেবেন না।

উদয়শঙ্করের মহৎ প্রচেষ্টা ফলবতী !

এক কালে, উদয়শঙ্কর যখন তাঁর সুসজ্জিত দলবলকে নিয়ে কলকাতার ন্যু এম্পায়ারে নাচতেন, তখন পর্য্যন্ত শঙ্কর সাধারণ বাঙালী জাতির কাছে ছিলেন অদৃশ্য। তখন ইংরেজদের আমল। ন্যু এম্পায়ার, ফার্ষ্ট এম্পায়ারের ধারে-কাছে ঘেঁসবার সুযোগ এবং সাহস পেত না বাঙালী গণ-সাধারণ। শঙ্কর পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে নাচ দেখাননি। কিন্তু সাধারণ বাঙালী শঙ্করের ছবি কাগজে দেখেই তৃপ্তি পেয়েছে, টিকিটের চড়া দামের কারণে শঙ্করের নাচ দেখতে এগোয়নি। দিন কখনও কারও সমান যায় না। আমাদের দেশের মানুষের ট্যাঁকে পয়সা ছিল না এতো কাল, এখন দেশের বহু গুণী ও জ্ঞানী শিল্পীর পকেটের অবস্থাও তথৈব চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলবল বজায় রাখতে হ'লে, নাচের পেশা ও নেশা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে যে নাচ দেখাতে হ'লে এক হাজার টাকা খরচা হ'ত, এখন সেই অনুপাতে খরচা লাগে হাজার হাজার টাকার।

শঙ্করের অর্থের প্রয়োজন। বিদেশে যাওয়া-আসার ঝুঁকিও তিনি এখন আর বোধ করি সামলাতে চান না। আগে একা ছিলেন এখন শঙ্করের সংসার প্রতিপালন করতে হয়; স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পালন করতে হয়। এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সাধারণ বাঙালী তাঁকে যথার্থ সম্মান ও অর্থ দেয় কিনা তার হিসাব-নিকাশ করতে হয় একবার। শঙ্কর কলকাতার গণ্ডী পেরিয়ে মফঃস্বল বাঙলায় নৃত্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন নামমাত্র প্রবেশ-মূল্যে। পূর্ব্বের নৃত্যসমূহ দেখালেও দরিদ্র ও মফঃস্বলবাসী বাঙালী নারী-পুরুষ শঙ্করের নাচ দেখতে চায়; বাঙালীর গৌরব শঙ্করকে দেখতে চায়। এবং অত্যন্ত সুখের কথা যে, বাঙালী দরিদ্র হ'লেও যথাসাধ্য দিচ্ছে শঙ্করকে। আমরা তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টায় তাঁকে অভিনন্দিত করছি।

টিকিটের অগ্নিমূল্যের কথা ভেবে শঙ্করের চেষ্টাকে "মহৎ" বলছি। মফঃস্বলবাসীদের জন্য তিনি নামমাত্র মূল্য ধার্য্য করেছেন।

টকির টুকিটাকি

মুক্তি-প্রতীক্ষায় ছবির তালিকা খুব দীর্ঘ নয় এবার। শ্রীসুখেন্দু দত্তের প্রযোজনায় এস, বি, পিকচার্সের ভক্তিমূলক ছবি 'মা অন্নপূর্ণা' আসছেন কলকাতায় মাসের শেষ নাগাদ। পরিচালনা করেছেন হরি ভঞ্জ। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ভারতী দেবী, কমল মিত্র, দেবযানী, বীরেন চট্টো, মিহির, পদ্মা, নৃপতি, রঞ্জিত রায় ইত্যাদি। তার পর 'মহামিলন' চিত্র-সাথীর পরিচালনায় অগ্নিযুগের কাহিনী নিয়ে গ'ড়ে ওঠা ছবি। অভিনয় করছেন বিপিন, ছায়া, ৺মনোরঞ্জন, গণেশ দত্ত প্রভৃতি। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রম-উর্বশী' দিন গুণছে। শ্রীসাধনা বসুর নৃত্য এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হবে মনে হয়, পরিচালক মধু বসু। রূপায়নে রয়েছেন ছন্দা দেবী, সাধনা বসু, পদ্মা দেবী, নীলিমা দাস, জয়শ্রী সেন, বাণী গাঙ্গুলী, বীরেন চ্যাটার্জী, উৎপল দত্ত, ভানু বন্দ্যো প্রভৃতি অনেকেই। শ্রীমতী পিকচার্সের 'নববিধানে'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত মুভী পিকচার্স লিঃ-এর প্রথম ছবি 'বারবেলা' শেষ হয়ে এলো বলে। মোহিনী চৌধুরীর ছবির নাম শেষ অবধি স্থির হল 'সাধনা'। ছবিটি সমাপ্তির পথে। দেবকী বসুর 'কবি' হিন্দীতে তোলা হচ্ছে। ইষ্টার্ণ ষ্টুডিও চারুচন্দ্রের 'চোরকাঁটা' সেলুলয়েডে দেখাবেন স্থির করেছেন। হীরেন্দ্রনারায়ণের 'মুমূর্ষু পৃথিবী' ছবি হয়ে দেখা দেবে জানা গেল।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

৬

প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী মলিনা দেবী

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার চিত্র ও নাট্য-জগতে যে কয় জন মহিলা শিল্পী অভিনয়-কুশলতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, শ্রীমতী মলিনা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতমা অগ্রণী। সাংসারিক বন্ধনের ভেতর থেকেও একটা শিল্প-প্রতিভা কি ভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে নিঃসন্দেহে তিনি তার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নিষ্ঠা, শ্রম ও অধ্যবসায় তাঁকে বিজয়িনীর গৌরব এনে দিয়েছে—চিত্র ও নাট্যজগতে আজ তিনি স্বনামধন্যা। তাঁর কাছে ছায়াচিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবো এই ভেবে এক দিন যাত্রা করলুম তাঁর গৃহাভিমুখে। সাক্ষাৎ আলোচনার মধ্য দিয়ে যা জান্‌তে পারলুম তা সত্যিই মূল্যবান। আগামী দিনে যাঁরা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা চান তাঁদের কাছে এবং সেই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে এ তথ্যসমূহ ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব থেকেই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

ভবানীপুরে শ্রীমতী মলিনা দেবীর বাসভবনে আমি যেদিন গেলুম সেদিন ছিল ২৮শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার। সকাল বেলা কার্ড পাঠাতেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর বসবার ঘরে। অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাকে তিনি এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীমতী মলিনা দেবী প্রথমে বললেন, টকিতে নিউ থিয়েটার্স-এর 'চিরকুমার সভা'রই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। নির্ব্বাক্ যুগে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চিত্রে ছোট রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় আমি অবতীর্ণ হই। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি আমার পক্ষে এ বলা শক্ত। নানা চরিত্রে আমি অভিনয় করে থাকি। যখন যে ভূমিকাতেই আমি রূপ দি সেটিই আমার ভাল লাগে। তবে যে চরিত্রগুলি স্নেহসিক্ত মাতৃত্বপূর্ণ ও করুণরসসিক্ত সে চরিত্রে রূপদানে আমার আনন্দ বেশী।

চলচ্চিত্র ও মঞ্চজগতে আমি কেন যোগ দি, এর প্রথম প্রেরণা কি ভাবে আসে একথা যদি জিজ্ঞেস করেন, তবে

চারদিকের হাতাহাতির মধ্যে—হাতে হাত মেলাবার ছবি

দেখেও যেমন সুখ—দেখিয়েও তেমনি তৃপ্তি!

শুক্রবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে চলিতেছে :

উত্তরা • পূরবী • উজ্জলা

এবং অন্যান্য সিনেমায়

আমি বলবো—যখন অভিনয় আরম্ভ করি তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৮ বৎসর। অভিনয়-জগতে আসবো কি না আসবো বুঝবার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না। আর্থিক কারণেই আমার এ লাইনে আসা। এ দুর্ভাগা দেশে মেয়ের বিবাহ একটা কঠিন সমস্যা—বিশেষ করে যেখানে অর্থের সংস্থান নেই। বাপ-মা যখন দেখলেন আমার ভেতর অভিনয়-শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে এ লাইনে প্রেরণা দিলেন। নতুবা তখনকার দিনের আর দশটি মেয়ের মত আমারও হয়তো বাল্য বয়সেই বিয়ে হ'তে পারতো।

আবেগ-জড়িত কণ্ঠে শ্রীমতী মলিনা দেবী বলতে থাকেন, বছর ১৪ থেকে মেয়েদের জীবনে যখন পরিবর্ত্তন আসে আমি তখন হয়তো সংসারে প্রবেশ করতে পারতুম কিন্তু এমন প্রেরণা এলো, অভিনেত্রী-জীবন বরণ করে নিলুম সংসার করার চাইতে। এর জন্তে সমাজের কঠোর শাসন এসেছিল আমার উপর, সাময়িক ভাবে নির্য্যাতিতও হতে হ'য়েছিল আমায় কিন্তু উপায় ছিল না। আমার দু'টি ছোট বোনের দিকে চেয়ে—বাপ-মা'র আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিকে তাকিয়ে সব কিছু মেনে নিতে হ'লো মাথা পেতে। ব'লতে কি, অন্ততঃ বোন দু'টিকে পাত্রস্থ করতেই হবে এ ভাবনা থেকেই আমি অভিনেত্রী-জীবন বেছে নিই। সমাজের ব্যবস্থা কি বলবো, যখন আমি স্কুলে প'ড়তুম তখন থিয়েটারে নৃত্যের জন্তে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কলকাতায় সেদিনে আমাদের আত্মীয়-স্বজন খুব বেশী ছিল না। কিন্তু যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আমার এ অভিনেত্রী-জীবন গ্রহণ পছন্দ করেননি। আমার

শ্রীমতী মলিনা দেবী

বাপ-মা'কেও এ জন্ত অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে, আমার তো কথাই নাই, এ হ'লো আমার জীবনের গোড়ার কথা।

আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি? আমার এ ছোট্ট প্রশ্নটির উত্তর দিতে যেয়ে শ্রীমতী মলিনা দেবী নিঃসঙ্কোচে বলেন, আমি সাংসারিক জীবন যাপন করি।

আমার বিশেষ কি হবি (Hobby) আছে কিম্বা মোটামুটি আমার কি ভাল লাগে না লাগে এ সব কথার যদি উত্তর দিতে হয় তা হ'লে আমি বলবো, আমার রান্না করা-একটা হবি। ষ্টুডিয়ো-মহলে অনেকে রান্নার জন্তে আমাকে দ্রৌপদী বলতেও শুনেছি। ওদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি আমার খুব ভাল লাগে এবং ছেলেবেলা থেকেই এ আমি করে আসছি। নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ নিজেই আমি গুছিয়ে রাখি। ষ্টুডিয়োতে অভিনয়কালেও নিজের পোষাক না হ'লে আমার ভাল লাগে না। "হবি"ই বলেন আর যাই বলেন এ পর্য্যন্ত আমি ষ্টুডিয়োর পোষাক ব্যবহার করিনি। এক কালে খেলা ভাল লাগতো—এর ভেতর ফুটবল ও টেনিসের নাম করতে পারি।

তিনি এখানেই থামলেন না। নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রতেই আবার বললেন—আমি পুঁথি-পুস্তক বলতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বই পড়তে ভালবাসি। মহাপুরুষদের জীবনীও আমার ভাল লাগে। "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" এ ধরণের বই আমার বিশেষ প্রিয়। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাও কিছু কিছু পড়ি। শিশুদের মৌচাক আমার ভাল লাগে। গল্প ও কবিতা লেখবার এক কালে অভ্যাস ছিল। "আমোদ" বলে একটা পত্রিকায় ছোটবেলায় পূর্ণিমা দেবী ছদ্মনামে আমার রচিত কতকগুলো গান বেরিয়েছিল। গানের "প্যারোডি" লিখতে আমার ভাল লাগতো এবং লিখেছিও অনেক। সমস্ত কাজকর্ম্ম করে লেখা আর হয়ে উঠে না আজকাল।

প্রশ্ন করলুম আমি—পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হ'লো—আমার নিজের কথা ব'লতে পারি, ফিকে রংএর কাপড় যেমন গেরুয়া, ভায়লেট ইত্যাদি আমার ভাল লাগে। খুব সাদাসিধে ধরণের পোষাকই আমি পছন্দ করি।

এর পর আরম্ভ হলো আমাদের মধ্যে চলচ্চিত্র ও অভিনয়-শিল্প সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমি জানতে চাইলুম—তাঁর কাছে চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? উত্তর দিলেন মলিনা দেবী ধীর ভাবে—এ লাইনে যাঁরা যোগ দেবেন তাঁদের প্রথমত নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা বোঝবার মত বুদ্ধি, সাহিত্যবোধ, অভিনয় ক'রবার মত কণ্ঠস্বর, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা একান্ত আবশুক।

ভাল ছবি তৈরী করতে হ'লে কি করা প্রয়োজন? এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি? আমার এই প্রশ্ন শুনে শ্রীমতী মলিনা দেবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন—এটাই আমাদের দেশের বিরাট সমস্যা। ছবি ভাল করতে হলে প্রথমে চাই ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পর সে গল্পের উপযোগী প্রতিটি চরিত্র বা ভূমিকার জন্ত ভাল শিল্পীর প্রয়োজন। শুধু এ'তেই যে ভাল ছবি হ'তে পারে, তা নয়, একখানা বইকে সার্থক করে তুলতে হলে যতগুলো

বিভাগ রয়েছে সব কয়টি সুদক্ষ হওয়া দরকার। সর্ব্বোপরি প্রয়োজন অর্থের।

চলচ্চিত্রে অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার প্রসঙ্গে মলিনা দেবী বলেন—এক কথায় বলতে হ'লে এ শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ব্বশ্রেণীর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এতে যোগদান করা উচিত। প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-সম্পদ যদি থাকে, দর্শকদের প্রাণ জয় করবার মত দক্ষতার যদি অভাব না হয় তা হ'লে যে কোন পরিবারের যে কেউ হোক তাঁর এ লাইনে আসতে বাধা নেই।

এ ভাবে আলোচনা যখন কিছুক্ষণ অগ্রসর হয়ে চললো, তখন আমি ছেদ টেনে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত আয়ের কথা একটু বলতে অনুরোধ করলুম। কিছুটা ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে তিনি বললেন, মাসে আমার কি আয়, না বলাই ভাল। যুদ্ধের সময়ের কথা ছেড়ে দিন, সাধারণ সময়ে এটা এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। এক জন বড় কেরাণীর মতই বলতে গেলে আমাদের গড়পড়তা আয়। প্রায় ২০ বৎসরের উপর এ লাইনে এসেছি। এক সময় ৬ শত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাওয়া গেছে।

প্রথম "চিরকুমার সভায়" অভিনয় করে দেড় শত টাকা পেয়েছিলাম, মনে আছে। তবে "রামের সুমতি" ছবিতে অবতীর্ণ হয়ে ১০।১১ হাজার টাকা আয় করেছি।

প্রতিকারের উপায়

শ্রীরমেন চৌধুরী

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা এই ছায়াচিত্র-শিল্প সম্বন্ধে সেদিন কোনো ধনী বন্ধুর সংগে আলোচনা হচ্ছিলো। ইনি ব্যবসাদার কিন্তু বাজার বড় মন্দা চলেছে, তাই পরামর্শ চান আর কোন্ কারবার করা যায়। ফিল্মের কথা বলতেই যেন ভূত দেখে উঠলেন তিনি। কানে হাত চাপা দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। আশ্বস্ত করে জানালুম আমি মোটেই তাঁকে ছবির হাটে মাথা মুড়োতে বলিনি। শুধু জানতে চেয়েছি, এ ব্যবসাও আছে, একে যদি ঠিক মতো নাড়া-চাড়া করা যায় তাহ'লে হলিউডের মতো এখানেও চঞ্চলা কমলা অচঞ্চলা হয়ে ধরা দিতে পারেন।—বন্ধুটি কালবিলম্ব না করে সরে পড়লেন।

অর্থাৎ আমাদের দেশে ফিল্মের এমনই সুনাম যে অধিকাংশ লোকই এই ভদ্রলোকের মতো নাম শুনেই মূর্চ্ছা যান। কেউ কেউ বলেন এ নাকি পাহাড়ে স্বাস্থ্য, চড়চড়িয়ে বেশ খানিকটা রক্ত-মাংস বেড়ে যায় changer-এর শরীরে; যেই পাহাড় থেকে নামা গেল মাটিতে, দেখা গেল ভোজবাজীর মতো সব চাকচিক্য দু'দিনে উধাও হয়েছে। তার মানে, যদিই বা এক-আধখানা ছবিতে পয়সা পাওয়া গেল, অদূর ভবিষ্যতে দেখা যায় যেনো জলের টানে ঘরো জলও বেরিয়ে গেছে! কেন এমন হয় সে কথা আগের বারে জানিয়েছি। হাতের কাছে যা পেলুম তাই নিয়ে নেমে পড়লুম, শেষে গলা-ধাক্কা খেয়ে দেশময় বলে বেড়ালুম, 'আরে ছিঃ! এ আবার ব্যবসা নাকি!'

এই রকম দুর্নাম চিরদিনই থাকবে যদি না আমরা আমাদের মারাত্মক ভুল সংশোধন করে নিই। কাঠামো না হলে মূর্ত্তি গড়া যেমন সম্ভব নয়, গল্প বিনে ছবিও তেমনি তৈরি করা বুদ্ধিহীনতা। সতেজ গল্প, সহজ সরল গল্প হওয়া চাই-ই। হয়তো জিগগেস করবেন, কি জাতের গল্প? সেখানে দেখতে হবে কতো রকম গল্প হতে পারে। গল্পের মোটামুটি এই ক'টি ধরণ হতে পারে—(১) পৌরাণিক (২) ক্ল্যাসিক (৩) ঐতিহাসিক (৪) সামাজিক (৫) হাস্য-রসাত্মক (৬) কাল্পনিক (৭) ডকুমেণ্টারী ও এডুকেশনাল (৮) বৈজ্ঞানিক। এই ক'টি ধরণের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর পালা মাঝে বহু দিন বন্ধ ছিলো, আজ বছর খানেক ধরে হঠাৎ যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো সংক্রামিত হয়েছে এ প্রযোজকের ঘরে ও প্রযোজকের ঘরে। সস্তায় কি করে কাজ সারা যাবে এটাও মাথায় আছে, তাই বেশির ভাগ জায়গাতেই এমন চীজ হয়ে উঠছে ছবিগুলি যে, লজ্জা বোধ করতে হয়। এর পর আসে ক্ল্যাসিক—এই বিভাগীয় গল্প আমাদের জাতীয় সম্পদ। মহামনীষীদের বহু সাধনার ধনগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে কি ভাবেই না ছিনিমিনি খেলি আমরা! কোনো কোনো পরিচালকের ধৃষ্টতা এতো দূর গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে, ইচ্ছে হয় আইনের আশ্রয় নিয়ে তাঁদের হঠকারিতার সাজা দিই। ঐতিহাসিক ছবি তোলার মতো মনোবৃত্তি বাঙলায় নেই, কয়েকটা জায়গায় যা হয়েছে তা 'অন্ধ কর্ত্তৃক হলাকর্ষণ' সমতুল্য! সামাজিক গল্প ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিনিয়তই উঠছে, যে যেমন পারছে বাঁ হাতে উল্টো কলমে লিখে চলেছে। যেহেতু মাতৃভাষা, সেই জন্যে কোনো রকম বাধা-নিষেধের বালাই নেই। আগেকার দিনে ভট্চাযিয়র ছেলের কোনো কিছু না হলে পুরুত হওয়ার বিধান ছিলো, এখনকার বাঙালীর ছেলের হয়েছে সেই রকম লেখক হওয়া। বর্ণজ্ঞান হয়নি, কুছ পরোয়া নেই, লিখে যাও গল্প কবিতা গান! কতোই তো সঞ্চয় করা আছে বরণীয় গতায়ু সাহিত্যরথীদের অমূল্য সম্ভার, কে আর কি করছে সে সব রত্ন অপহরণকারীদের? কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউই আসল আর্ট শিখতে পারছে না। যে কয়েক জন প্রকৃত সাহিত্যিক গল্প লিখছেন, তাঁরাও বুঝতে পারছেন না কোন্ পথ অবলম্বন করবেন। এমনই সবার উদ্ভট চিন্তা, তাদের সৃষ্টি করা কোনো কাহিনীর চরিত্রকেই আমাদের সমগোত্রীয় বলে বুঝতে পারা যায় না। তা যদি পারা যেত তাহলে সে ছবি পয়সা পেতই। শরৎচন্দ্রের কথা স্বতঃই মনে পড়ে, সেই মরমী সাহিত্যিক কতো সহজেই না সব চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন। হালফিল 'যোগ-বিয়োগ' ছবিটিতে আমরা বহু দিনের অভাব দূর হতে দেখেছি। এই ধরণের (তার মানে অবিকল এই রকমটি নয়) জনগণ-বন্দিত গল্প শ'য়ে শ'য়ে দরকার।

হাস্যরসাত্মক ছবি ইদানিং পর পর উঠছে, কিন্তু তাতে দর্শকরা হাসেন খুব কম, হাসে শত্রুপক্ষ। অতি জঘন্য বস্তি-মার্কা পরিবেশ ঢুকিয়ে ইতরেমির পরাকাষ্ঠার নাম হয়েছে হাসির হর্‌রা! নিদারুণ নৈতিক অধঃপতন, আর তাতে রয়েছে সরকারী অনুমোদন, ছাপ দেয়া হচ্ছে বড় করে "U" সেন্সার থেকে। কাল্পনিক কাহিনীর বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়! ডকুমেণ্টারী ও এডুকেশনাল ছবি সরকারের দপ্তর থেকে আজকাল বেশ ভালো ভাবে উঠছে, এটা আশার কথা। এ ছাড়া অন্য কেউ সে প্রচেষ্টা করলে অর্থের দিক থেকে মার খাওয়া স্থির-নিশ্চিন্ত। শেষ বেশ বৈজ্ঞানিক ছবির কথা আলোচনার প্রয়োজন নেই, এ বিভাগে প্রচেষ্টা হয়েছে খুবই কম।

বাঙলা ভাষা সম্পর্কে শ্রীনেহেরু

ভারতের প্রধান মন্ত্রী যে পুরাপুরি সাহিত্যিক, তার পরিচয় নেহেরু আর একবার দিলেন কল্যাণীর কংগ্রেসী অধিবেশনে। বাঙলা ও বাঙালীর প্রতি ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত যারা ব্যবহার করে, বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসী অধিবেশনে তারাই গাধার মত চীৎকার করে উঠেছিল। কি বিচিত্র দেশ এই বাঙলা! একজন অতুল ঘোষ যখন ভাষা-আন্দোলনের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছেন তখন আরেক অতুল্য ঘোষের দল রাজেন্দ্রপ্রসাদদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদের লোভে লালায়িত হয়ে লালা উদ্গারণ করছেন জনসেবকরূপে। নেহেরু জাত সাহিত্যিক, রাজনৈতিক আদপেই নয়। তাই তিনি রাজনীতির নীতি ভুলে গিয়ে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং যে বাঙলা জানে না তাকে অধিবেশন থেকে দূর হয়ে যেতে বলেছেন। আরও বলেছেন, 'বাঙলা ভাষাও অন্যান্য ভাষার মতই একটি ভাষা।' প্রধান মন্ত্রী যখন বলছেন তখন 'সিংহ' জাতীয় বিহারীরা পর্যন্ত লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য। এই সব দেখে-শুনে আমরা আবার বলছি, নেহেরু রাজনীতিতে অবতীর্ণ না হয়ে যদি সাহিত্য নিয়েই থাকতেন, তা হ'লে ভারত-ভাগ্যবিধাতাদের কি ক্ষতি হ'ত কে জানে, দেশবাসীর প্রভূত লাভ হ'ত। অন্ততঃ অর্দ্ধেক বাঙলা কাণা আর খোঁড়াদের খোঁয়াড়ে আশ্রয়লাভ করতো না, ভারতও কমনওয়েলথের নাগপাশে আবদ্ধ হ'ত না।

সুখের বিষয়, সেই মহালগ্ন প্রায় আসন্ন, যখন সুবিধাবাদী ও পতিতমনোবৃত্তিদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হবে। দিগন্তে সেই আশার আলো আমরা দেখতে পেয়েছি। গৌড়বঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠার শপথ কারা যেন গ্রহণ করেছে?

সাহিত্যের 'সেল্‌সম্যান' চাই

সংবাদপত্রের 'কর্মখালি' স্তম্ভে আজকাল একটি 'কর্মই' খুব বেশী পরিমাণে 'খালি' থাকে দেখা যায়। কর্মটি হচ্ছে সেল্‌সম্যানের কর্ম, ক্যানভাসারের কর্ম। বৌদিদি-মার্কা কুমকুম, তরল আলতা থেকে বাতের মহৌষধ, হাঁপানির বড়ি, অলিগলির গ্যারাজ-ঘরের হরেক রকমের কেমিক্যাল কোম্পানীর বিচিত্র প্রোডাক্টস, পেটেন্ট ওষুধ, জীবনবীমার পলিসি, কোম্পানীর শেয়ার, মেশিন ও তার পার্টস্ ইত্যাদি সকল রকম পদার্থের জন্য "বিশ্বস্ত, সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও সুদর্শন" সেল্‌সম্যান আবশ্যক হয়। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই তার সুদীর্ঘ তালিকাটি আমাদের নজরে পড়ে। কেবল একটি পদার্থের জন্য এই দুনিয়ার বাজারে কোন 'ক্যানভাসার' বা ভ্রাম্যমান সেল্‌সম্যানের প্রয়োজন হয় না দেখা যায়। সেই পদার্থটির নাম 'পুস্তক'। কথাটা হয়ত গোড়াতেই ভুল বলা হ'ল ব'লে অনেকে অভিযোগ করবেন। 'পুস্তক' নামক পদার্থেরও ক্যানভাসার আছে, কিন্তু এক বিশেষ শ্রেণীর পুস্তকের। তার নাম "পাঠ্য পুস্তক"। ইংরেজীতে যাকে 'টেক্সট বুক' বলে। ইংরেজী 'টেক্সট বুকের' বাংলা তর্জমা কে "পাঠ্য পুস্তক" করেছিলেন জানি না। যিনিই করুন, তাঁর ক্রিয়ার ফলে অন্যান্য সকল শ্রেণীর পুস্তক 'অপাঠ্য পুস্তক' পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। বাস্তবিকই এই সব পুস্তকের প্রতি "অপাঠ্য" পুস্তকের মতনই ব্যবহার করা হয়। তথাকথিত 'পাঠ্যপুস্তকের' জন্য প্রকাশকরা ক্যানভাসার নিয়োগ ক'রে যে ভাবে পাঠকদের বাজার তোলপাড় করেন, তার শতাংশের একাংশও যদি তাঁরা বাকি সব 'অপাঠ্য' পুস্তকের জন্য করতেন, তাহ'লে তাতে প্রকাশকদের উপকার হ'ত, সাহিত্যিকের উপকার হ'ত এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি হ'ত। অধিকাংশ প্রকাশকই প্রায়ই অভিযোগ করেন যে বাংলা দেশে সাহিত্য-পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা এক হাজার, দু' হাজার, বড় জোর তিন হাজারের বেশী নেই। তাই যদি হয়, এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও, তাহ'লে বলতে হবে যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন সাংস্কৃতিক মূল্য নেই। যে কোন সুপাঠ্য বাংলা বই আজ যদি বাংলা দেশে অন্ততঃ পাঁচ হাজার না বিক্রী হয় প্রথম মুদ্রণে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে কোথাও মারাত্মক গলদ্ আছে। গলদ্ গোড়াতেই রয়েছে। সব-কিছুর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যগ্রন্থের পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা তৈরীর জন্য কোন রকম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত পুস্তক ব্যবসায়ীরা বিশেষ করেছেন ব'লে জানা নেই। পাঠকরা নিজেদের গুণে, নিজেদের চেষ্টায় বই কেনেন। এ রকম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের সংখ্যা বাংলা দেশে সুশিক্ষার প্রসারের ফলে বেড়েছে বলেই আজ ব্যবসায়ীরা তথাকথিত 'পাঠ্য পুস্তক' ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য-পুস্তক প্রকাশ ক'রেও আগের চেয়ে অনেক বেশী লাভবান হচ্ছেন এবং সাহিত্যিক-লেখকরাও উপকৃত হ'চ্ছেন। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ পাঠকদের সৌজন্যে, তাতে অন্য কারও কৃতিত্ব নেই। গতানুগতিক ভাবে কাগজে সমালোচনা করা এবং সাময়িক পত্রিকায় কিছু বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া যেন বই সম্বন্ধে আর কিছু করার নেই, এই রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে ব্যবসায়ীদের। এই ধারণার যত দিন না পরিবর্তন হবে, যত দিন না ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ক্রেতা-পাঠকের কাছে নতুন নতুন গ্রন্থের 'বার্তা' নানা কৌশলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন, বই-কেনায় অনভ্যস্ত পাঠককে 'ক্রেতা ও পাঠক' করতে পারবেন, মহানগরীর বাইরের অসংখ্য পাঠকদের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি দেবেন, তত দিন বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। বাংলার বাইরেও যে বিশাল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছেন, তাঁদের দিকেই বা আমরা কতটুকু দৃষ্টি দিয়েছি! পাঠকদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে আরও প্রসারিত করতে হ'লে পাঠকদের ঘরে ঘরে যেতে হবে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আস্থাবান হ'তে হবে। তার জন্য এক শ্রেণীর ভাল 'সেল্‌সম্যান'

তৈরী করতে হবে,—সাহিত্যের সেলস্‌ম্যান। শিক্ষিত বাঙালী যুবক—যাঁরা কেমিক্যাল, ওষুধ পত্তর, শেয়ার বা পলিশি ক্যানভাস করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই সাহিত্যের ক্যান্‌ভাসিং ভাল ভাবেই করতে পারবেন এবং অর্থও যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবেন। এখন দরকার প্রকাশকদের পক্ষ থেকে 'ইনিশিয়েটিভের' বা উদ্‌যোগের। আমাদের দেশে উদ্‌যোগী ও চিন্তাশীল প্রকাশক বর্তমানে অনেকেই আছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি উদ্‌যোগী হয়ে পথপ্রদর্শক হন; তাহ'লে হয়ত বাংলা সাহিত্যের মরা-গাঙ্গে আবার জোয়ার আসতে পারে,—অভাবনীয় জোয়ার"!

বাঙালী প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন

বাঙলা দেশে প্রকাশকদের সংখ্যা যত বেশী, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তত নয়—এ আমাদের আশা ও আনন্দের সংবাদ। হালে গজিয়ে-ওঠা প্রকাশকদের কথা জানি না, কলকাতা তথা বাঙলার অধিকাংশ সাহিত্য-প্রকাশকদের প্রত্যেকেরই কিছু কম-বেশী নির্দ্দিষ্ট বিক্রয় আছেই। এই সব প্রকাশক যে-কোন বই ছাপলেই তার কিছু সংখ্যা নিজেরা বিক্রী করতে সক্ষম। অধিক চাহিদা হ'লে তখনই অন্য বিক্রেতার কথা ওঠে। অর্থাৎ কমিশন পদ্ধতির অন্যান্য বিক্রেতাও কিছু সংখ্যা বিক্রী করেন। এই পদ্ধতিতে যে-কোন বইয়ের এগারো শো সংখ্যা বিক্রী করা আজকের দিনে আর এমন বেশী কথা নয়। এই রীতিতেই বইয়ের ব্যবসাটা বর্ত্তমানে চলছে।

প্রকাশকগণই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। সর্ব্ব দেশেই এই নিয়মের প্রচলন। বাঙালী প্রকাশকরা না থাকলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুর্দশা কি হ'ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং আজে-বাজে সাময়িক পত্র হঠাৎ পাততাড়ি গোটালে আমাদের যত না ক্ষতি হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয় কোন বইয়ের দোকানে তালা পড়লে। অদূর ভবিষ্যতেও যাতে তালা না পড়ে সে জন্যও আমাদের দুশ্চিন্তা আছে। কেন আছে তাই বলছি:

(১) অধিকাংশ প্রকাশকদের কোন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নেই। প্রকাশিত বই নিজেরা বেছে নেন না। লেখকের লেখা মাত্রেই কি সাহিত্য হতে পারে?

(২) অধিকাংশ প্রকাশক তাঁদের সেই আদিম বইগুলির শুধু পুনর্মুদ্রণই ক'রে চলেছেন। নতুন বই প্রকাশ করছেন না।

(৩) কয়েক জন লেখক প্রকাশক হওয়ায় তাঁদের প্রকাশ বিভাগে অন্য কোন লেখকের বইয়ের যথাযোগ্য কদর ও সম্মান মিলছে না।

(৪) অধিকাংশ প্রকাশক একসঙ্গে সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে থাকেন। এই ধরণের প্রকাশকদের প্রধান ব্যবসা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ; সাহিত্যের বই প্রকাশ তাঁদের কাছে যেন অকিঞ্চিৎকর।

(৫) অধিকাংশ প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন যে-রীতিতে ছাপা হয় সে-রকম রীতি কোন সভ্য দেশেই নেই—বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপন যেন গাদার মড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ব্যবসা করতে নেমে পুরাপুরি ব্যবসা করাই ভাল। এবং

আরও ভাল হয় ভবিষ্যতের কথা মনে করে যদি এখন থেকে সজাগ হওয়া যায়। আর তা না হ'লে সাহিত্য এবং প্রকাশক, দুয়ের ভবিষ্যৎই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশ বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকাশ বিভাগ আছে। কেউ জানেন ? এই বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে ছাপিয়ে ও বাঁধিয়ে বই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই বাবদে কত টাকা লাভ-লোকশান হয় তার হিসাব জানতে আমরা উৎসুক নই, কিন্তু বিভাগটি দিন দিন যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে দস্তুরমত শঙ্কিত হই। প্রথমতঃ, বিভাগটির পরিচালনায় সম্পূর্ণ দৃষ্টি নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাঁদের প্রতি পরিচালনার ভার তাঁরা নিশ্চয়ই 'পাবলিশিং' কাকে বলে তার মর্মকথা জানেন না। অথচ ঠিক-ঠিক পরিচালিত হলে এই বিভাগটি যে কতটা অর্থকরী হতে পারে সে-কথা ভাবলেও আমাদের আনন্দ হয়। নবাগত 'ভাইস' কতটা দৃষ্টি দেন, দেখা যাক্।

সরকার ও সাহিত্য

জাতীয় সরকার সৎসাহিত্যের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে এবং বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিধানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে এ কথা অনস্বীকার্য। জাতীয় সরকার যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার-ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে এই মহৎ কার্য সুসিদ্ধ হবে সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের কম্যুনিটি প্রোজেক্ট ব্যবস্থায় প্রতি ছয়টি গ্রামের জন্য একটি করে পাঠাগার স্থাপিত হবে। গ্রন্থাগার-সংখ্যা যত বাড়বে সাহিত্যের প্রচারও ততই বাড়বে সন্দেহ নেই।

* * * *

কেন্দ্রীয় সরকার যে সাহিত্য একাডেমি গঠন করেছেন তার সদস্যদের মধ্যে বাংলা দেশ থেকে আছেন রাজশেখর বসু এবং অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রাদেশিক প্রতিনিধি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই সংস্থার সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালিনী।

* * * *

সম্প্রতি শিক্ষা-দপ্তরের হুমায়ুন কবীর সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিভিন্ন দলের সাহিত্যিকরা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা করেন, পরে তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এই দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শোনা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ হাজার টাকার দুটি পুরস্কার সাহিত্যের জন্য দেবেন। পুরস্কার দুটির মর্যাদা রবীন্দ্র পুরস্কারের মত। হুমায়ুন কবীর সাহেব বাংলা গল্প-গ্রন্থের একটা সুনির্বাচিত ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। জানা গেছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী লীলা রায় ও সুধীরচন্দ্র সরকার সম্ভবতঃ এই নির্বাচনকার্যে সহায়তা করবেন।

বাংলা গল্প আজ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে, এবং প্রতিযোগিতায় যে-কোনো দেশের সাহিত্যে সম্মানিত স্থান পাবে, সুতরাং গল্প নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

সেনেট হলে কবি-সম্মিলন

এ মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেনেট হলে অনুষ্ঠিত কবি-সম্মিলন। ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী এই দু'দিনব্যাপী উৎসবে অসংখ্য শ্রোতা প্রায় ষাট জন আধুনিক কবির কবিতা কবিদের স্বমুখে শুনেছেন। কবিতা সম্পর্কে দেশবাসীর যে আগ্রহের অভাব নেই এতদ্দ্বারা সেই কথাই প্রমাণিত হ'ল। কিছু কাল পূর্বে 'আরো কবিতা পড়ুন' এই আন্দোলন হয়েছিল এবং রসিকজনের সমর্থন লাভ করেছিল। অনেক দিন আগে মোসলেম ইনষ্টিট্যুটে এই রকম এক কবি-সম্মেলন হয়েছিল, তখন কাজী নজরুল ছিলেন এক জন উদ্যোক্তা। পশ্চিমাঞ্চলে 'মুসায়েরা' অনুষ্ঠানে যে সব কবি যোগদান করেন, সামাজিক জীবনে তাঁদের স্থান নীচের তলায় হলেও, তাঁরা এই সভায় বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকেন, এমন কি টাঙ্গাওলারাও সেই সভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। আমরা এই জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের শুভ প্রচেষ্টা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। তবে এই সব অনুষ্ঠানে কোনোরূপ শ্রেণী-বিভাগ না করে স্বীকৃত কবি মাত্রকেই আমন্ত্রণ জানানো উচিত। বিশেষতঃ যাঁদের একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের কবিতা শোনা এবং চোখে দেখার আগ্রহও কাব্য-রসিকদের থাকাই স্বাভাবিক। এই সূত্রে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে কবিতা প্রচার ও কবি-পরিচিতির ব্যবস্থা অধিকতর সার্থকতা লাভ করত।

আমরা আশা করি, শীঘ্রই আবার অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে।

দেশী শার্লক হোমস্

বিখ্যাত লেখক ও পরলোকতাত্ত্বিক সার আর্থার কোনান ডয়েলের পুত্র মিঃ ডেনিস কোনান ডয়েল সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু শুধু যে প্রখ্যাত ফৌজদারী আইনজীবী, তা নয়, অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণা ও অনুরাগ ভারতের বাইরেও খ্যাতি লাভ করেছে। কোনান ডয়েলের অমর রচনা সার্লক হোমস্ সম্বন্ধে ডাঃ কাটজুর বিশেষ জ্ঞান আছে। মিঃ ডেনিস কোনান ডয়েলের মতে ডাঃ কাটজুর এই কৃতিত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। ভারতবাসীর কাছে সুসংবাদ সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি আছে, বিদেশীর হাততালি না পাওয়া গেলে কোনো প্রতিভাই স্বীকৃত হয় না, রবীন্দ্রনাথেরও হয়নি। এত দিনে ডাঃ কাটজুর স্বদেশে হয়ত সমাদর হবে।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডাঃ কাটজু যখন বঙ্গদেশে রাজ্যপাল ছিলেন তখন শারদীয়া সংখ্যার পত্রিকাগুলিতে তাঁর অপরাধতত্ত্বের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রশংসিতও হয়েছে।

বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দু'খানি বিশেষ গ্রন্থ

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেসন অফ সায়েন্স-এর তরফ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সমর সেন বিজ্ঞান-বিষয়ক

একখানি বিরাট গবেষণামূলক গ্রন্থ সম্পাদনা করছেন। আপাততঃ গ্রন্থখানির নাম 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' হবে বলেই স্থির হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় এরূপ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয়নিই বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থ-প্রকাশে কিছু অর্থ সাহায্য দান করেছেন প্রতিষ্ঠানকে। গ্রন্থখানির দাম হবে ১০৲ টাকা।

• • • •

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'বিজ্ঞান-ভারতী' নাম দিয়ে আর একখানি সচিত্র বিশেষ ধরণের বিজ্ঞান-বিষয়ক অভিধান প্রকাশ করছেন। গ্রন্থখানি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী সাধারণ ব্যক্তির বিশেষ উপকার সাধন করবে।

একখানি মর্ম্মান্তিক চিঠি

চিঠিখানি সাহিত্য সম্পর্কেই এবং নানা দিক বিবেচনা করে আমরা এটিকে মর্ম্মান্তিক চিঠি হিসাবেই উল্লেখ করলাম। গত ২১শে মাঘের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এই চিঠিখানি প্রকাশিত হয়. কিন্তু এ-সম্বন্ধে সাধারণের আরো বেশী অবহিত হওয়া প্রয়োজনবোধে এই পত্রখানি আমরা পুনরায় এখানে হুবহু প্রকাশ না ক'রে পারলাম না।

'জনৈকা মাতা' এই চিঠিখানি লিখেছেন এবং চিঠিখানির নাম দেওয়া হয়েছে 'জ্ঞান লাভ?'

চিঠিখানি এইরূপ:

"মহাশয়,

সেদিন আমার মেয়ে তাহার স্কুল-পাঠ্য একখানি বই আমাকে দেখিতে দিল, বই-এর নাম জ্ঞান-দীপিকা. প্রণেতা জনৈক বি. এ, বি. টি শিক্ষক। বইটির স্মরণীয় নাম ও সাল অধ্যায়ে ৭ (?) পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন— যদুনাথ সরকারের জন্ম ১৮৭০ সাল ও মৃত্যু ১৯৪১! শ্রদ্ধেয় যদুনাথের জন্ম ১৮৭০ সালে বটে, কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য, তিনি সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন! প্রবাদ আছে, মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে তাঁহার আয়ু দীর্ঘ হয়; শ্রদ্ধেয় যদুনাথের ক্ষেত্রেও এই প্রবাদ সত্য হউক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

২৩ পৃষ্ঠা—১৯৩৯ ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, থানা ত্রিপুরা!

৬৫ পৃষ্ঠা—ভারতবর্ষের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ইণ্ডিয়া হইয়াছে।

৭৫ পৃষ্ঠা—Blue Book কি?—গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যে সব আইন বই প্রকাশিত হয় তাহার মলাটের রঙ হয় নীল। সে জন্ত ব্লু-বুক নাম হয়েছে।

৭৯ পৃষ্ঠা—গেজ কি? দুটি পাটি রেলের ব্যবধানকে Gauge বলে⋯। Gauge মাপ বোঝায়, ইহার সহিত Broad, Narrow ইত্যাদি যোগ করিলে তবে রেলের পাটি বোঝায়। ধাতুর চাদর, স্ক্রু, তার প্রভৃতিও Gauge দিয়ে মাপ করা হয়।

৮৭ পৃষ্ঠা—ছায়াচিত্রের আবিষ্কারক কে?—আমেরিকাবাসী আলভা এডিসন (১৮৮৭)।

৯৯ পৃষ্ঠা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর⋯তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় গীতাঞ্জলী নাম নিয়ে।

এই ক্ষুদ্র বইখানিতে অসংখ্য তথ্য ভুল, বানান ভুল, উচ্চারণ ভুল, ছাপার ভুল আছে। এরূপ জ্ঞান-দীপিকা নিবাইয়া দেওয়া উচিত নয় কি?

দেখিতেছি, আমাদের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বইগুলি একবার পড়িয়াও দেখেন না। ইতি—জনৈকা মাতা।"

গলায় দড়ি বি. এ, বি. টি শিক্ষকের! তা ছাড়া যিনি এমন বই লিখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত পরিবেশন করতে সাহস করেন, তাঁর সত্যিই যদি কোন ডিগ্রী থাকে তা'হলে তা কেড়ে নেওয়া উচিত।

প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য বই

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও দেশবাসীদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যে যত বেশী বই ছাপা হয় প্রাচ্যের কোন দেশে তত হয় না। মাত্র ইংলণ্ডের প্রকাশকরাই এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক বই ছাপেন। সম্প্রতি যে সকল বই বেরিয়েছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখা বই The men who ruled India. (vol 1) The founders. গ্রন্থটি লিখেছেন ফিলিপ উডরাফ। এই বইয়ে ভারতবর্ষ যারা শাসন করেছে তাদের ইতিহাস আছে। প্রথম খণ্ডটি শুধু মাত্র প্রতিষ্ঠাতাদের ইতিহাস। প্রকাশ করেছেন জোনাথন কেপ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ছাপলেন The Vicroyalty of Lord Ripon, লেখকের নাম এস, গোপাল। লর্ড রিপন ভারতবর্ষে ছিলেন ইং ১৮৮০ থেকে '৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তখনকার ইতিবৃত্ত। প্রকাশক আর্থার বার্কার দুটি মূল্যবান বই প্রকাশ করলেন; The Indus Civilisation এবং Oriental splendour. অর্থাৎ যথাক্রমে 'সিন্ধুর সভ্যতা' ও 'প্রাচ্যের বৈভব'। বই দু'খানির লেখক যথাক্রমে স্তর মটিমার হুইলার ও হার্বার্ট ফ্যান থ্যল্। সিন্ধুর সভ্যতায় লেখক হরাপ্পা ও মাহেনজোদড়োর (২৫০০—১৫০০ খৃ: পূর্ব্ব) যুগ অঙ্কিত করেছেন। এ বইটিতে চব্বিশখানি মূল্যবান ছবি আছে। প্রাচ্যের বৈভব গ্রন্থে প্রাচ্যের পুরানো গল্পের অনুবাদ আছে। ডেরেক ভারচয়েল মুদ্রিত করেছেন রাজা হাতীশিংএর লেখা A view of China, অর্থাৎ 'চীনের একটি দৃশ্য'; লেখক প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সম্পর্কে জামাতা। সাম্যবাদ ও সাম্যবাদী চীনকে যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করেছেন লেখক। গ্যাবারবোথাশ প্রকাশক ছেপেছেন An Asiatic Romance, অর্থে 'একটি এশীয় রোমান্স'। লেখক সি এইচ, সৌসন। তিন জন ইউরোপীয়ের এশিয়ার অভিজ্ঞতা বইটির বিষয়বস্তু।

চকোলেট-মার্কা বই

বাঙলা বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট বর্ত্তমানে অনেক বেশী উন্নতি করেছে। পুস্তক প্রকাশে পারিপাট্য প্রথম যে সকল প্রকাশক দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'উদ্বোধন' ও 'বিশ্বভারতী'র নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রকাশকগণ এখন প্রকাশ-পরিকল্পনায় অভিনবত্ব দেখালেও আধুনিক বাঙলা বইয়ের অধিকাংশ বই লজেন্স-টফি-চকোলেট-মার্কা হয়েই বাজারে বেরুচ্ছে। কোন বইয়ের কি রকম প্রচ্ছদ হবে, তার ভার লেখক বা প্রকাশক কেউই নেন না। বেতনভোগী শিল্পীরা তাঁদের খুশী মত যা হয় একটা আঁকছেন আর সেই 'যা-হয়'কে সাদরে ছেপে বাজারে দেওয়া হচ্ছে। দূর থেকে দেখার জন্ত, বা শো-কেশে সাজিয়ে রাখতে

'চকোলেট-কভার' বই চমৎকার। কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, বইগুলি দেখলে শিশু-সাহিত্যের বই ব'লে ভ্রম হয়!

উজ্জ্বল রঙ, সাইনবোর্ডের অক্ষরের মত লেটারিং এবং সেই সঙ্গে নারীসুলভ আলপনার রেখায় পরিপূর্ণ করলেই যে খুব উঁচু দরের শিল্পরুচির পরিচয় দেওয়া হয় তা আমাদের মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, প্রকাশ-শিল্প সংযত হওয়াই উচিত। দুঃখের বিষয়, মাত্র দু'-এক জন শিল্পী ব্যতীত অপরাপর শিল্পীরা এই সংযমের মাত্রা ক্রমেই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আসল কথা, তাঁদের কোন কাজে চিন্তাশীলতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক বছরের মধ্যে যে ক'জন শিল্পী মামুলী পথ ত্যাগ ক'রে সংযম, শিল্পজ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, খালেদ চৌধুরী, অজিত গুপ্ত ও রঘুনাথ গোস্বামীর নাম করবার মত। দেখে-শুনে মনে হয়, বেশীর ভাগ লেখক ও প্রকাশকদের শিল্পদৃষ্টির অভাব আছে। এবং এ ক্ষেত্রে প্রচ্ছদচিত্রকরের খেয়াল-খুশীর 'পরে তাই তাঁদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা। খাদ্যদ্রব্য ও পাঠ্যবস্তু উভয়েই আমাদের দেহ ও মনকে জীইয়ে রাখে। কিন্তু বই এবং চকোলেট এক জাতীয় খাদ্য নয়।

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের আত্মজীবনী

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের নাম বঙ্গদেশে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করতে হয়, অথচ মাত্র পনের বছরেই তিনি বিস্মৃতপ্রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনের জর্জ দি ফিফথ চেয়ারটির নামকরণ করেছেন 'ব্রজেন্দ্র শীল চেয়ার', আর তাঁর স্মৃতিরক্ষা তহবিলে উঠেছে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৪৫০ টাকা। সবচেয়ে দুঃখের কথা, আচার্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত আত্মজীবনী আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়নি উদ্যোগী প্রকাশকের অভাবে। ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজে ডাঃ সরোজ দাস এই কথা বলেছেন আচার্যদেবের স্মৃতি-সভায়। এই আত্মজীবনীতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে যা প্রকাশিত হলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে, সেইটাই নাকি গ্রন্থটি চেপে রাখার অন্যতম কারণ। বাংলা দেশের অসংখ্য প্রকাশকদের মধ্যে কেউ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসুন না, এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে, মহৎ কর্ম ও ব্যবসা দুই একত্রে হবে।

বার্ণাড শ ও ওয়েলস

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেছে যে, জর্ডানের কর্তৃপক্ষ বার্ণাড শ-কৃত সেণ্ট জোয়ান নাটক আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করেছেন, উক্ত নাটকে নাকি মুসলিম ধর্ম ও পয়গম্বরের সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি আছে। ইতিপূর্বে পাকিস্থানে এচ জি ওয়েলসের—"হিস্‌ট্রি অফ দি ওয়ার্লর্ড" অনুরূপ কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যিকের মৃত্যু

সম্প্রতি কয়েক জন সাহিত্যসেবীর মৃত্যু ঘটেছে। আজীবন সাহিত্য-সাধনা করলেও তাঁদের কথা সংবাদপত্রে সমধিক আলোচিত হয়নি। তাঁদের নাম—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, কবি শাহদৎ হোসেন, এলাহাবাদের শচীন্দ্র মজুমদার আর 'উদয়ন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক অনিলকুমার দে। এঁরা বঙ্গ-ভারতীর সুসন্তান, আমরা তাঁদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

গত বছরের ক'খানি শ্রেষ্ঠ বই

বিগত ইংরাজী বছরে বৈদেশিক সাহিত্যে যে ক'খানি উপন্যাস সর্বাধিক বিক্রী হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। ড্যানিস্ উপন্যাস-রচয়িত্রী শ্রীমতী আনেমারী সেলিনকোর "ডিসাইরী", লয়েড ডাগলাসের "দি রোব", টমাস কসটেনের "দি সিলভার চ্যালিস", জেমস জোনসের "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি"। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে "দি রোব" ও "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি" সম্প্রতি ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হয়ে ভারতে প্রদর্শিত হচ্ছে। তাছাড়া জোনসের "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি" ১,৫০০,০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়েছে, ৭৫ সেণ্ট দামে। একাশী বছর বয়সে বারট্রাণ্ড রাসেল ছোট গল্প লিখেছেন। তাঁর "সেটান ইন দি সুবার্বস্" নামক গল্প-গ্রন্থে পাঁচটি চমৎকার অলৌকিক কাহিনী আছে। এই গ্রন্থটিও সমধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ক্রিকেট খেলার বিষয়ে অপূর্ব্ব বাঙলা বই

বাঙালী প্রকাশকরা মনে করেন, সাহিত্য-প্রকাশ অর্থে গল্প উপন্যাসের পুস্তকাকারে প্রকাশকেই বোঝায়। অন্য কোন গ্রন্থ-প্রকাশ তাঁদের কাছে যেন বোঝারই সামিল। গল্পের বই নয়, উপন্যাস প্রকাশেই শুধু তাঁদের আগ্রহ, হয়তো পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী পক্ষপাতপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশে তাঁদের বাধ্য হ'তে হয়। তবুও প্রকাশকরাই দেশে দেশে পাঠক-পাঠিকা সৃষ্টি করেন। যদিও পাঠকদের মধ্যে সকলেই উপন্যাস চায় না। ভিন বয়সের, ভিন রুচির পাঠক-পাঠিকা আছে, যাঁরা উপন্যাসের ধারে কিংবা কাছেও ঘেঁসতে চান না। এই সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি বাঙলার প্রকাশকদের দৃষ্টিই নেই। আশ্চর্য্য!

নিউ এজ পাবলিশার্স যে পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করেছেন সেটি অন্যান্য প্রকাশকদের পক্ষেও গ্রহণীয়। প্রকাশক দু'খানি বই প্রকাশ করলেন—'খেলার রাজা ক্রিকেট' ও 'মজার খেলা ক্রিকেট'। লেখক মাসিক বসুমতীর অতি পরিচিত যাযাবর বা শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থদ্বয় সচিত্র। লেখক সর্ব্বসাধারণের জন্য সহজ-বোধ্য ভাষা ও টেকনিকে ক্রিকেটের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিবেশন করেছেন। ক্রীড়ামোদী বাঙালী মাত্রেই বই দু'খানি সাদরে গ্রহণ করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? তার ওপর বাঙলা তথা ভারতের ক্রিকেট-জগতে যখন বিশিষ্ট অবদান আছে তখন বই দু'খানির অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় তর্জমা হওয়ারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমাদের সবচেয়ে যা ভাল লেগেছে, তা হচ্ছে, লেখকের বৈজ্ঞানিক-সম্মত লেখার ধরণ-করণ। এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশে লেখক এবং প্রকাশক দু'পক্ষই অগ্রণী হয়ে রইলেন।

ফুটপাতের বই ও বইয়ের দোকান

প্যারি শহরের ফুটপাতে হাতে-আঁকা ছবি বিক্রী হয়, যাঁরা প্যারি দেখেছেন তাঁরাই জানেন। কলকাতা শহরের ফুটপাতে বই বিক্রী হয়, যাঁরা কলেজ ষ্ট্রীট দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে ও পথের দু'ধারের ফুটপাতে যথাক্রমে সাজিয়ে ও ঢেলে বিক্রী করা হয় বই। লাখ টাকার দুষ্প্রাপ্য বই থেকে এক টাকায় চারখানি বইও বিক্রী হয়। ক্রেতাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি অনেককেই। দুঃস্থ

ও অভাবী ছাত্রছাত্রীও যেমন আছেন, তেমনি আছেন বহু বিখ্যাত অধ্যাপক, গবেষক ও সম্পাদক। বইয়ের মধ্যে দাম হিসাবে নয়, জাত হিসাবে বাছাবাছি করলে দেখা যায় স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক, আইন ও ভেষজশাস্ত্রীয় বই, ধর্ম্মগ্রন্থ, পদাবলী এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে আধুনিক সাহিত্যিকদের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কাব্যপুস্তক।

সাজানো-গোছানো নতুন বইয়ের দোকানও থাক, ফুটপাতের বিক্রয়-কেন্দ্রও থাক। আলমারী, বুক-কেশেও বই থাক, পথে-ঘাটেও বই ছড়াছড়ি থাক। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার হোক যেন-তেন-প্রকারেণ। সুসজ্জিত পুস্তকবিপণির সংখ্যা বাঙলার শহরে ও গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে, কিন্তু বইকে মুড়ি-মিছরীর মত এক দরে পথে-ঘাটে ঢেলে বিক্রয়ের কেন্দ্র শুধু কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট এবং ভবানীপুরের দু'-এক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো। এই ফেলে বিক্রীর ব্যবসাটি প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কলকাতা শহরের অন্যান্য অঞ্চল শুধু নয়, বাঙলার গ্রামের হাটে-বাজারে এই ধরণের অল্পমূল্যে বই বিক্রয়ের দোকান করা হোক। দরিদ্র বঙ্গদেশবাসীর বহু উপকারী এই ব্যবসাটি অত্যন্ত লাভজনক। বহু শিক্ষিত বেকার বাঙালী সামান্য কিছু অর্থ ঢালতে পারলেই এই ব্যবসায় নিশ্চিত লাভ করতে সক্ষম হবেন। বইয়ের দোকানের কথা শিকেয় তুলে রাখছি। দেখতে পাচ্ছেন না, কলকাতা শহরের সাজানো-গোছানো কোন দোকানই তেমন চলছে না, যেমন চলছে ফুটপাতের ষ্টল? এর কারণ জানতে চাইলে অর্থনীতির আলোচনা ফাঁদতে হয়।

বেতার সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিক্ষা চাই?

বেতার-কেন্দ্র মানেই যে সেখানে গান-বাজনার আসর ও দৈনন্দিন খবরাখবরের আলোচনা চলবে তার কোন মানে নেই। গান-বাজনাও চলবে, দৈনিক খবর, হারানো প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশের ঘোষণাও চলবে, এবং যাতে এই সকল আড্ডা ও আসর একঘেঁয়ে হয়ে না যায় তাই এদের ফাঁকে-ফাঁকে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও চলবে। কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শেষোক্ত ধরণের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানগুলির বিষয় এবং বক্তা সম্পর্কে আমাদের মতামত গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। কিন্তু কথকদের সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস পাইনি এই জন্য যে, কথকদের মধ্যে অধিকাংশই সুসাহিত্যিক, সুকবি, সুনাট্যকার ও সুপ্রাবন্ধিক এবং সকলে না হ'লেও কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্যে সুপরিচিত। তদুপরি মাসিক বসুমতীর লেখক ও বন্ধু। এখন কথা হচ্ছে, সুসাহিত্যিক হ'লেই কি বেতারে সুবক্তা হতে পারেন? তা কখনও সম্ভব নয়। কলম জোরালো হ'লেই যে কণ্ঠস্বরটাও জোরালো হ'তে হবে, এমন ধারণা করাও অন্যায়। তার পর জন্মগত উচ্চারণের দোষ কিংবা গুণ তো আছেই। জন্ম যাঁর মৈমনসিংহে তাঁর কথা মেদিনীপুরের লোক মন দিয়ে শুনলেও বুঝতে পারবেন না সহসা। তা হ'লে বলতে হয়, কথকের কথকতার ভাষা হওয়া চাই সর্ব্বজনীন, অর্থাৎ সকল বাঙালী যাতে শুনে বুঝতে পারে। এই মিডিয়াম-স্বরূপ ভাষাটি যে কোথাকার এবং কি ধরণের হবে, সেটি সাময় গবেষণাসাপেক্ষ।

তার পর সু-অধ্যাপক হ'লেই যে বেতার বক্তৃতায় কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন এমন কোন বিধিবদ্ধ আইন নেই। বিভালয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা যে বেতার-শ্রোতাদের কাণে শ্রুতিমধুর হ'তে পারে না, এ কথাটি যে-কোন শিক্ষিতই স্বীকার করবেন। কলকাতা বেতার-কেন্দ্র খুঁজে খুঁজে কয়েক জন অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাংবাদিককে বের ক'রে তাঁদের বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। এঁদের অনুষ্ঠানের মধ্যে কণ্ঠস্বর এবং বক্তব্য বিষয়ের চমৎকার সমন্বয় দেখিয়েছেন মাত্র কয়েক জন। অন্যান্যগণ, বলতে বাধা নেই, বলতে-কইতে পারলেন না তেমনটি। কবি-সম্মেলনের কাজটা রেডিওর সীমায় পড়ে না, টেলিভিশনের সীমানায় পড়ে। বর্দ্ধমানের কোগ্রাম থেকে কুমুদরঞ্জন এলেন কলকাতা বেতারে, অথচ কেউ দেখতেই পেলো না কবিকে! কবিদের মধ্যে অজিত দত্তর কণ্ঠ অপূর্ব্ব বেতারযোগ্য। কয়েক জন কবি আবৃত্তি কাকে বলে, শিক্ষা করেননি কদাপি।

আসল কথা, শিক্ষা করার প্রয়োজন। যে-কেউ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিন, কথকতা করুন, তাতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া বা কথকতা করার পূর্ব্বে যথাপথে শিক্ষা করুন বেতারের জন্য উপযোগী ভাষণ রচনার, কথকতার জন্য তৈরী করুন কণ্ঠকে ঐ যথাপথেই।

যথাপথটি কি? আছে, প্রচুর আছে। সস্তা দামের কত শত বই আছে! 'কেমন ক'রে বেতার ভাষণ দিতে হয়' এবং 'কি বিষয়ের ভাষণ বেতারযোগ্য হয়' বিষয়গুলির ওপর কত বিলেতী আর মার্কিণ বই আছে বইয়ের বাজারে! বিভায় কুলায় তো পড়ুন। শিক্ষা করুন। অর্থ উপার্জ্জন করুন। শ্রোতৃমণ্ডলীও পরিতৃপ্ত হোন।

—স্বীকার—

গত সংখ্যায় প্রকাশিত গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গুলের চিত্রটি প্রকৃতপক্ষে গাঙ্গুবাঈয়ের নয়, হীরাবাঈ বরোদকরের। এই সংখ্যায় প্রকাশিত আলি আকবর খাঁয়ের স্বাক্ষরিত চিত্রটি, শ্রীমোহন ঘোষাল কর্ত্তৃক গৃহীত

শ্রীরামপুর, বনফুলসাহিত্য-সমিতিতে কবি শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সম্বর্দ্ধনার চিত্র

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোরিয়া যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ—

ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর ১৪ই জানুয়ারী (১৯৫৪) তারিখে ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯-২০শে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির পর হইতে ২২ হাজারেরও অধিক চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তথা মার্কিণ সর্ব্বাধিনায়কের হাতে অর্পণ করা আরম্ভ হয় এবং ২০শে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে সমস্ত বন্দীকে অর্পণ করা শেষ হয়। এই ২২ হাজার চীনা এবং উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ব্বাধিনায়কের হাতে অর্পণ করিতে লাগিয়াছে মাত্র ১৬ ঘণ্টা সময়। চারি মাস পূর্ব্বে এই সকল বন্দীকে ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর হাতে অর্পণ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ব্বাধিনায়কের লাগিয়াছিল ১৪ দিন। ২২শে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির পর ১০ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। কার্য্যতঃ উহার তিন দিন পূর্ব্বেই বন্দীদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ব্বাধিনায়কের হাতে অর্পণ করা আরম্ভ হয়। এবং দুই দিন পূর্ব্বে বন্দীদিগকে অর্পণের কাজ সমাপ্ত হয়। ১৪ই জানুয়ারী নিরপেক্ষ কমিশনের চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল থিমায়া বলেন যে, যুদ্ধবন্দীরা যুদ্ধবন্দিরূপেই, অসামরিক ব্যক্তিরূপে নয়, আটককারী কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত হইবে। তিনি উভয় পক্ষের কমাণ্ডকেই বন্দীদিগকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পক্ষ তাঁহাদের আটক বন্দীদিগকে গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। যুদ্ধবন্দীদিগকে নিরপেক্ষ কমিশনের হেফাজাতে রাখার সময় বর্দ্ধিত করা সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পক্ষ এবং কম্যুনিষ্ট পক্ষ একমত না হওয়ায় নিরপেক্ষ কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে লেঃ জেঃ থিমায়াকেই বন্দীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। তিনি কেন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে যুদ্ধবিরতির সর্ত্তাবলী কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাহিয়াছিল যে, যুদ্ধবন্দীদিগকে অসামরিক বন্দিরূপে মুক্তি দেওয়া হউক। কিন্তু ভারতের পক্ষে তাহা করা সম্ভব ছিল না। একমাত্র ব্যাখ্যা কার্য্যের দ্বারাই নিরপেক্ষ কমিশন তাহাদিগকে অসামরিক ব্যক্তিরূপে মুক্তি দিতে পারিতেন। তাহাদিগকে অসামরিক ব্যক্তিরূপে মুক্তি দিতে আর পারিত রাজনৈতিক সম্মেলন। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস ১৯শে জানুয়ারী তারিখেই ঘোষণা করেন যে, চীনা এবং উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীরা ২২শে জানুয়ারী ঠিক মধ্যরাত্রে অসামরিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। যুদ্ধবন্দীদের ষ্টেটাসের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার জাতিপুঞ্জ তথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই, গত ২১শে জানুয়ারী নিরপেক্ষ কমিশনের অধিবেশনে ঐরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া অধিক সংখ্যক ভোটে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুইজারল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কের প্রতিনিধিরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধবন্দীদিগকে যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ডের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে তখন এইরূপ প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নাই। তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ডার জেনারেল হাল ঘোষণা করেন যে, ২২শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রের পরই এই সকল যুদ্ধবন্দী স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে গণ্য করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদিগকে চিয়াং কাইশেকের এবং দক্ষিণ-কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী বন্দীদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ডের হাতে অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৪ হাজার চীনা যুদ্ধবন্দীদিগকে ফরমোসায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

যুদ্ধবন্দী-পর্ব্ব এই ভাবেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোরিয়ায় শান্তি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কোরিয়া সমস্যার ফ্রন্ট হইতে নূতন কোন সংবাদ আর পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু অতঃপর কোরিয়া সমস্যা কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহা অবশ্য বলা কঠিন। কোরিয়া সমস্যার আলোচনার জন্য ২২শে জানুয়ারীর পূর্ব্বেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯৫৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার জন্য ভারত যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্যই ভারতের প্রস্তাবের অনুকূলে পর্য্যাপ্ত সমর্থন পাওয়া যায় নাই। বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয়ের সম্মেলনের ফলাফল দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব বলিয়া সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা অ-সাময়িক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা কঠিন। কোন না কোন সময়ে সাধারণ পরিষদে কোরিয়া সমস্যা আলোচিত না হইয়া অবশ্যই পারিবে না। কিন্তু যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহা করিতে চায় তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণ পরিষদে উহা লইয়া আলোচনা হওয়া মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ পছন্দ করেন না।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ সিংম্যান রী ২৭ হাজার চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। অতঃপর চুক্তি

অনুযায়ী বন্দীদের নিকট ব্যাখ্যা-কার্য্যের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা-কার্য্য ব্যাহত করা হইয়াছে এবং ১০ দিনের মধ্যে মাত্র ১০ দিন ব্যাখ্যা-কার্য্য করা সম্ভব হইয়াছে। নব্বই দিন পূর্ণ হওয়ায় যে ২২ হাজার চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ডের হাতে অর্পণ করিয়াছেন তাহাদিগকে অসামরিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই ভাবে প্রায় ৪৮ হাজার চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে চিয়াং কাইশেকের এবং ডাঃ সিংম্যান রীর সৈন্যবাহিনীর জন্য পাওয়া গিয়াছে। কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা গত ডিসেম্বর (১৯৫৩) মাসে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত আর আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন সত্যই হইবে কি না তাহাতেই গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। সমস্তই সম্পাদিত হইতেছে নির্ব্বিঘ্নে। তাই বলিয়া কোরিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক নহে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যর্থ করিয়া দিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে। ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীও ভারতে ফিরিয়া আসিতেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট রচিত হওয়ার পর নিরপেক্ষ কমিশনও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে, উহার অস্তিত্ব আর থাকিবে না। কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনও আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে কোরিয়ায় রহিল কি? রহিল শুধু যে-কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং যুযুধান উভয় পক্ষের সৈন্যদল। অতঃপর কোরিয়ায় আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে কি?

যুদ্ধবন্দীদিগকে প্রত্যর্পণের সময় কম্যুনিষ্টরা একটা গুরুতর সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল। সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ সিংম্যান রী যে হুমকী দিয়াছেন তাহাকে শূন্যগর্ভ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি হুমকী দিয়াছেন যে, যদি বসন্ত কালের মধ্যে কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন কোরিয়া সমস্যার সমাধান করিতে না পারে, তাহা হইলে তিনি কোরিয়ার অসামরিক অঞ্চলটি দখল করিয়া লইবেন। এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার উত্তরে উত্তর-কোরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে এবং উহা এখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ডের দখলে। এই অঞ্চলের কর্ত্তৃত্বভার জেঃ হালের উপর ন্যস্ত। দক্ষিণ-কোরীয় বাহিনী অবশ্য তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে রহিয়াছে। দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নিরাপত্তা চুক্তি হইয়াছে তাহা হইতে এই অঞ্চলটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এই অঞ্চলটি দখল করা সিংম্যান রীর পক্ষে কঠিন হইবে না। হয়ত এই অঞ্চলটি দখল করিতে ডাঃ রীকে সুযোগ দিবার জন্যই রাজনৈতিক সম্মেলন হওয়ার কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। অবস্থা যেরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত অসামরিক অঞ্চলে নিযুক্ত দক্ষিণ-কোরীয় বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকা গুটাইয়া দক্ষিণ-কোরিয়ার পতাকা উড়াইলেই ঐ অঞ্চলে ডাঃ রীর দখল প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অপরোক্ষ না হইলেও পরোক্ষ অনুমোদন ছাড়া ডাঃ রী এই কার্য্য করিতে অবশ্যই সাহস করিবে না। কিন্তু ২৬ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথাও আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। ডাঃ রী যদি ঐ অঞ্চল দখল করেন, তাহা হইলে যুদ্ধবিরতি চুক্তির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং তাঁহার ঐ কার্য্যের ফলে আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠার সম্ভাবনা দেখা দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে যে-উদ্দেশ্যে কোরিয়া-যুদ্ধে নামিয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই জন্যই কি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবার ছল খোঁজা হইতেছে? মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কংগ্রেসের নিকট বাণীতে (৭ই জানুয়ারী ১৯৫৪) বলিয়াছেন, "In the Far East we retain our vital interest in Korea, We have negotiated with the Republic of Korea a mutual security pact which develops our security system for the Pacific. We are prepared to meet any renewal of aggression in Korea." তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। কোরিয়া-যুদ্ধে প্রথম আক্রমণকারী কে তাহা জানিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। গায়ের জোরে উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ডাঃ সিংম্যান রী উক্ত অ-সামরিক অঞ্চল দখল করা উপলক্ষে যদি আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে আবার উত্তর-কোরিয়াকেই আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে। কিন্তু যুদ্ধকে একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেও উহার পরিণাম বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। ১১৫০

সালে কোরিয়া-যুদ্ধকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের উপক্রমণিকা বলিয়াই সকলে মনে করিয়াছিল। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই। বোধ হয় পশ্চিমী শক্তিবর্গ এখনও তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের জন্ম প্রস্তুতি শেষ করিতে পারে নাই বলিয়াই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম এখনও আরম্ভ হয় নাই।

বার্লিন-সম্মেলন—

গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৫৪) বার্লিনে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ ইডেন, মঃ বিদো, মঃ মলোটভ এবং মিঃ ডালেস যে সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন, আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার সময় তাহা অতীতের ঘটনায় পরিণত হইবে কি না তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। যদিও এই সম্মেলন সাফল্য লাভ করা সম্পর্কে ভরসা করিবার মত কিছুই এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না, তথাপি উহার ব্যর্থতাকে ক্রুততর করা হইবে, ইহাও মনে করা কঠিন। কিন্তু এই বার্লিন-সম্মেলন অতীতের বার্লিন সম্মেলনের কথাও স্মরণ না করাইয়া দিয়া পারে না। ১৮৭৮ সালের বার্লিন কংগ্রেস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই সম্মেলনের মূলেও ছিল রুশ-তুর্কী যুদ্ধের (১৮৭৭-৭৮) ফলে রাশিয়ার প্রাধান্ত বৃদ্ধিতে বৃটেন এবং অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর আশঙ্কা। এই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী রাশিয়াকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তুরস্ক ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে রাশিয়ার সহিত এক সন্ধি করে। এই সন্ধি সান্ ষ্টেফানো (San Stefano) সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধি যে রাশিয়ার এক বিপুল জয় তাহাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। রাশিয়ার এই জয়লাভের ফলে ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের অতি সামান্তই অবশিষ্ট রহিল। প্যারী চুক্তির অস্তিত্বও আর রহিল না এবং বলকানে তাহার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। বলকানে রাশিয়ার প্রতিপত্তির আশঙ্কায় অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী বিচলিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ড ভাবিল, তাহার নৌশক্তি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ রাশিয়া ও বুলগেরিয়া ছাড়া আর কেহই সান্ ষ্টেফানো সন্ধিতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ইউরোপের অন্তান্ত দেশ বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল রাশিয়া যাহাতে তাহার বিজয়ের ফল ভোগ করিতে না পারে তাহার জন্ত। রাশিয়া দানিয়ুব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ড রাশিয়ার জারের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিল যে, রাশিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল বা দার্দ্দনালিস প্রণালী দখল করিবে না এবং মিশরে ও সুয়েজ খালে বৃটিশ স্বার্থ মানিয়া চলিবে। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাসেই তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ডারবী রাশিয়াকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, ১৮৫৬ এবং ১৮৭১ সালের সন্ধিতে যাহারা পক্ষ ছিল তাহাদের সম্মতি ব্যতীত রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত কোন সন্ধিই ন্তায়সঙ্গত হইবে না। সান্ ষ্টেফানো সন্ধিতে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড বেকনফিল্ড (ডিজরালি) রাশিয়াকে সংযত করিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। অষ্ট্রীয়াও উক্ত সন্ধির পরিবর্ত্তনের জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং একটি ইউরোপীয় সম্মেলনের জন্ত প্রস্তাব করিল। ডিজরালি তাহাতে রাজী হইলেন, কিন্তু দাবী করিলেন রুশ-তুর্কী চুক্তির সমস্ত বিষয়ই এই সম্মেলনে আলোচনা করিতে হইবে। রাশিয়া স্বাভাবিকই এই প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া পারে নাই। ডিজরালি হুমকী দিলেন যে, তিনি ১৭ হাজার ভারতীয় সৈন্তকে মাল্টায় সমাবেশ করিবার জন্ত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা অবশ্য হুমকী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু রাশিয়ার সৈন্তবল তখন অনেক ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অর্থেরও বিশেষ টানা-টানি। রুশ-জার্ম্মান মৈত্রী একটা ছিল বটে কিন্তু বিসমার্ক অষ্ট্রীয়ার সহিত একটা মিটমাট করিতে এবং জার্ম্মানীকে মধ্য-ইউরোপের একটা প্রধান শক্তিতে পরিণত করিতে উন্মত্ত। কাজেই রাশিয়াকে বাধ্য হইয়া সান ষ্টেফানো সন্ধি পরিবর্ত্তনের জন্ত ইউরোপীয় সম্মেলনে রাজী হইতে হইল। ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই বার্লিন কংগ্রেস নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

পটস্ডাম সম্মেলনকেও বার্লিন সম্মেলন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে যদিও উহা ঠিক বার্লিন সহরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে সাধারণ শত্রু হিটলারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী স্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় প্রথমে তেহরাণে তার পর ইয়াল্টায় বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া এই রাষ্ট্রত্রয়ের রাষ্ট্রপ্রধানদের যে-সম্মেলন হয় জার্ম্মানীর পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত পটসডাম সম্মেলন তাহারই পূর্ণ পরিণতি। আবার রাশিয়ার সহিত বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর বিরোধেরও সূত্রপাত এই পটস্ডাম সম্মেলনেই হইয়াছে, এ কথা বলিলেও খুব বেশী ভুল বলা হয় না। বস্তুতঃ পটস্ডাম সম্মেলনের পর হইতে বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে এবং কার্য্যক্ষেত্রে এই বিরোধের প্রথম অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে। যুদ্ধকালীন মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা ১৯৪৭ সালেও চলিয়াছিল। কিন্তু পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের নিউ ইয়র্ক, মস্কো এবং লণ্ডন অধিবেশনের ভিতর দিয়া মৈত্রীর পরিবর্ত্তে বিভেদ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের ব্যর্থতাকে বিভেদ সম্পূর্ণ হওয়ার কারণ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনাকেই যদি বিভেদের পূর্ণ রূপ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় লণ্ডন সম্মেলনের অনেক পূর্ব্বেই এই বিভেদ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ্চ মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে-নীতি ঘোষণা করেন তাহাই 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' নামে পরিচিত। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে, যে-সকল স্বাধীন জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা বাহিরের চাপের সম্মুখে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগকে সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। ইহার পর ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ্জ সি মার্শাল হারবার্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতায় ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। উহারই পরিণাম মার্শাল-পরিকল্পনা। মার্শাল-পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্তই যে লণ্ডন সম্মেলনকে ব্যর্থ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মার্শাল-পরিকল্পনা ইউরোপকে পরস্পরবিরোধী দুইটি শিবিরে বিভক্ত করিয়াছে। লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতার মধ্যে এই বিভাগের

কাজ পাকা করা হইয়াছে। বাকী ছিল শুধু জার্মানীকে বিভক্ত করা। তাহাও সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় নাই। লণ্ডনে ছয় সপ্তাহব্যাপী যে ষড়্রাষ্ট্র সম্মেলন ১৯৪৮ সালের ১লা জুন সমাপ্ত হয় তাহাতে বৃটিশ, মার্কিণ এবং ফরাসী-অধিকৃত পশ্চিম-জার্ম্মানীর তিনটি অঞ্চলের জন্য একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং পশ্চিম-জার্ম্মানী দখলীকৃত থাকা অবস্থার অবসান হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেই সৃষ্ট হয় বার্লিন-সঙ্কট। উহা সাময়িক ভাবে ধামা চাপা পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু লণ্ডনে ষড় রাষ্ট্র সম্মেলনে পশ্চিম-জার্ম্মানীর জন্য স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত এবং ঐ অঞ্চলের জন্য নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বার্লিন-সঙ্কট আবার গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ১২ই মে ১০ মাস ১৮ দিন পরে বার্লিন অবরোধের অবসান হয়। কিন্তু অতঃপর সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) মাসে পশ্চিম-জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া পর অক্টোবর মাসে (১৯৪৯) পূর্ব্ব-জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়া জার্ম্মানী বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। জার্ম্মানীর বিভাগ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে প্যারীতে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই সম্মেলনে মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ৭ই মার্চ্চ (১৯৪৯) ওয়াশিংটনে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া অনুমোদিত হয়। নয় মাস আলোচনার পর এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে মার্কিণ সিনেটের বৈদেশিক নীতি কমিটির সভাপতিরূপে সিনেটর ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্থায়ী এবং কার্য্যকরী স্বাবলম্বন এবং পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে রচিত আঞ্চলিক ও অন্তর্বিধ সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেন তাহা হইতেই আটলাণ্টিক চুক্তির উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মার্শাল-পরিকল্পনার পরিণতিকে পূর্ণ রূপ দিবার জন্যই যে এই প্রস্তাব করা হয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। উক্ত প্রস্তাব মার্কিণ সিনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ৮ই জুলাই হইতে (১৯৪৮) আটলাণ্টিক চুক্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ হয়। অতঃপর পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা লণ্ডনে ত্রয়ী সম্মেলন। ১৯৫০ সালের মে মাসে বৃহৎ পররাষ্ট্রসচিবত্রয়ের মধ্যে যে সম্মেলন হয় তাহাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের জন্য রাশিয়ার সহিত নূতন কোন আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকা ফ্রণ্টে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হন। এই সম্মেলনে ব্যাপক এবং বিপুল সামরিক প্রস্তুতির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ইহার পরেই ১৯৫০ সালের জুন মাসের শেষ ভাগে কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অক্টোবর মাসে (১৯৫০) প্রাগে রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে জার্ম্মান সমস্যা সমাধানের জন্য চারি দফা সম্বলিত এক পরিকল্পনা গঠিত হয় এবং ৪ঠা নবেম্বর (১৯৫০) জার্ম্মান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে চতুঃশক্তি সম্মেলনে সমবেত হইবার জন্য রাশিয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এক পত্র দেয়। ঐ পত্রের উত্তরে পশ্চিমী শক্তিবর্গ জানান যে, পটসডাম চুক্তির ভিত্তিতে শুধু জার্ম্মান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ হইবে না; কারণ ঐ চুক্তির কোন সার্থকতা আর এখন নাই। তাঁহারা আরও দাবী করেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করিতে হইবে। পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের এই দাবীর উত্তরে রাশিয়া জানায় (২রা জানুয়ারী ১৯৫১) যে, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জার্ম্মান-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। তবে জার্ম্মান-সমস্যা সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাও আলোচনা করিতে রাশিয়া রাজী আছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ রাশিয়ার উক্ত প্রস্তাবকে দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ৫ই মার্চ্চ (১৯৫১) প্যারীতে সহকারী পররাষ্ট্র সচিবদের এক সম্মেলন আরম্ভ হয়। কিন্তু তের সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনার পরেও কোন সর্ব্বসম্মত কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার সমাধানের জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়া সরাসরি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে বলা হয় যে, সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় মঃ গ্রমিকোর নিকট যে তিনটি বিকল্প কর্ম্মসূচী পেশ করিয়াছেন ঐগুলির দ্বিতীয়টিতে সর্ব্বসম্মত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে এবং উহারই ভিত্তিতে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই কর্ম্মসূচীতে পাঁচটি বিষয় আছে। কিন্তু আটলাণ্টিক চুক্তি ও বিভিন্ন দেশে যে-সকল মার্কিণ ঘাঁটি আছে সেগুলিও ঐ কর্ম্মসূচীতে সন্নিবেশিত করিতে দাবী করিবার ফলে গুরুতর মতভেদ হয়। উহার পরবর্ত্তী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বানের প্রয়াসের কথা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। গত ১১ই মে (১৯৫৩) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে-ধরণের সম্মেলন চাহিয়াছিলেন তাহা পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন নয়। আলোচ্য বার্লিন সম্মেলনের মূল নিহিত রহিয়াছে পটসডাম সম্মেলনের মধ্যেই। এই পটসডাম সম্মেলনেই সন্ধিপত্রাদি রচনার দায়িত্ব পররাষ্ট্র-সচিবদের হস্তে অর্পিত হয় এবং জার্ম্মানীতে চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয়। পটসডাম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন সার্থকতাই যদি আর না থাকিত তাহা হইলে

বার্লিন সম্মেলনেরও কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরিণতিস্বরূপ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার যে প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বিলোপের জন্যই মার্শাল-পরিকল্পনা, উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু ইহার ফলে জার্ম্মানীই শুধু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই, সমগ্র ইউরোপই শুধু দ্বিধা বিভক্ত হয় নাই, সমগ্র পৃথিবীই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মানীকে পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া আবশ্যক। ইহাতে ইউরোপে রাশিয়ার প্রাধান্য অন্ততঃ কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু বার্লিন সম্মেলনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইহা আশা করা কঠিন।

ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের সমস্যা—

বার্লিন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ মলোটভ তিন দফা সমন্বিত যে কার্য্য-সূচী পেশ করেন তাহাতে প্রথমেই আন্তর্জ্জাতিক মন-কষাকষি হ্রাস করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীন সহ বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব পঞ্চকের এক সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় যথাক্রমে জার্ম্মান-সমস্যা এবং অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি-সর্ত্ত রচনা স্থান পায়। মার্কিণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেস রাশিয়ার প্রস্তাবিত কার্য্যসূচী কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া সম্পর্কেই প্রথম আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই বৃহত্তর সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা সম্ভব হইবে। মিঃ ডালেস শুধু রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কম্যুনিষ্ট চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী চৌ-এন-লাইকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে 'Liquidator of Millions' বলিয়া অভিহিত করেন। দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষি বা ঠাণ্ডা যুদ্ধই যে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়ার সমস্যা সমাধানের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে মিঃ ডালেস তাহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। স্বীকার করিলে তাঁহার চলে না, মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতিই ব্যর্থ হইয়া যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধের যে আয়োজন করিয়াছে পশ্চিম-জার্ম্মানী গঠন তাহারই একটা অংশ মাত্র। এই আয়োজনের মধ্যে সমগ্র জার্ম্মানীকে পাওয়াই তাহার লক্ষ্য। প্রাগ সম্মেলনের পর রাশিয়া যখন জার্ম্মান সমস্যা সমাধানের জন্য পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিল তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ ঠাণ্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করিবার দাবী করিয়াছিলেন। আলোচ্য বার্লিন সম্মেলনে তাঁহারা রাশিয়ার সেই দাবীই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বার্লিন সম্মেলনে ২৮শে জানুয়ারী মঃ মলোটভ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সময়োচিত হইয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে। ১৯৫২ সালে যে-নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহার কাজ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিতে সামরিক আয়োজনের খরচ যোগাইতে যাইয়া জনসাধারণকে অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু সমর আয়োজনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর অর্থসঙ্কট দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। সমর আয়োজন সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তাহার বেকার সমস্যা বাড়িয়া চলিতেছে। ২১শে জানুয়ারী ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ বিদো প্রস্তাব করেন যে, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং মিঃ ডালেস প্রস্তাব করেন যে, কর্ম্মসূচীর দ্বিতীয় দফা জার্ম্মানী সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করা হউক। মঃ মলোটভ ইহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। অতঃপর ৩০শে জানুয়ারী মঃ মলোটভ যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম-জার্ম্মানীর সম্মেলনে যোগদানের প্রস্তাব করেন তখন কার্য্যতঃ একরূপ অচল অবস্থারই সৃষ্টি হয়। ঐ দিনই বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ ইডেন জার্ম্মান-সমস্যা সমাধানের জন্য এক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। মিঃ ডালেস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। মিঃ ইডেনের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া নিখিল জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা আছে এবং এই নিখিল জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম ও পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মঃ মলোটভ বলেন যে, এই পরিকল্পনায় সাধারণ নির্ব্বাচন স্বাধীন ভাবে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম-জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যদি নিখিল জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের উপর বর্ত্তে তবে এই গবর্ণমেণ্টকে বন্ ও প্যারী চুক্তি মানিয়া চলিতে হইবে। ইহার অর্থ সমগ্র জার্ম্মানী পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতঃপর ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে মঃ মলোটভ ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মানী গঠনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে দখলকার শক্তিবর্গের সমস্ত সশস্ত্রবাহিনী অপসারিত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে জার্ম্মানীতে যে সকল বৈদেশিক ঘাঁটি আছে, সেগুলিরও বিলোপ করিতে হইবে। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে সকল দেশ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধেই কোন কোয়ালিশন বা সামরিক মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। মিঃ ডালেস রাশিয়ার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দুই সপ্তাহব্যাপী প্রকাশ্য অধিবেশনের পর ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয় এক গোপন অধিবেশনে সমবেত হন। এই গোপন অধিবেশনেও মিঃ ডালেস চীনের সহিত আলোচনা করার প্রস্তাব পুনরায় অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর ১০ই ফেব্রুয়ারী মঃ মলোটভ ইউরোপের যৌথ নিরাপত্তার জন্য এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ইউরোপের সকল দেশই সন্ধি-চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবেন এবং ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মানী গঠন সাপেক্ষে তাঁহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম-জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট-দ্বয়ের সহিত ৫০ বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন। এই চুক্তির মূলনীতি বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা রাষ্ট্র-জোট গঠন নিবারণ এবং ইউরোপের সকল রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ইউরোপে একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গড়িয়া তোলাই এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইন্দোচীন—

ইন্দোচীনে যুদ্ধ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৫৪) প্রথম হইতেই লাওসের রাজধানী লুয়াং প্রবাং দখলের জন্য ভিয়েটমিনদের প্রবল আক্রমণ চলিয়াছে, সেই সঙ্গে কাম্বোডিয়াতে চলিতেছে ছোটখাটো অভিযান। এই আক্রমণের পরিণাম কি হইবে, ভিয়েটমিনরা লুয়াং প্রবাং দখল করিতে পারিবে কিনা, অথবা শেষ পর্য্যন্ত গত এপ্রিল মাসের (১৯৫৩) লাওস অভিযানের মত উহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে কিনা, তাহা বলা কঠিন। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত ভিয়েটমিন বাহিনী লুয়াং প্রবাং-এর কাছাকাছি আসিয়া পড়িবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার পর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) মার্কিণ দেশরক্ষা-সচিব মিঃ উইলসন সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "I think a military victory for France would be both possible and probable." অর্থাৎ মিঃ উইলসন ইন্দোচীনে ফ্রান্সের সামরিক বিজয় সম্ভবপর বলিয়াই মনে করেন। এইরূপ আশা ইন্দোচীনের আট বৎসরের যুদ্ধ কালের মধ্যে এই নূতন প্রকাশ করা হয় নাই। এই সে দিনও গত জানুয়ারী (১৯৫৪) মাসে ইন্দোচীনের এসোসিয়েটেড রাষ্ট্রত্রয়ের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফরাসী মন্ত্রী M. Henri Letourneau বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী জাতীয় পরিষদ যদি এই নিশ্চিত আশ্বাস দেন যে, এসোসিয়েটেড রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত ফ্রান্স ইন্দোচীন ছাড়িয়া যাইবে না, তাহা হইলে ইন্দোচীনের যুদ্ধ দেড় বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে। তাঁহার এইরূপ আশাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করার কারণ কি তাহা অনুমান করা হয়ত খুব কঠিন নয়।

গত বড়দিনের সময় ভিয়েটমিনদের যে-আক্রমণ সুরু হইয়াছিল তাহা তেমন গুরুতর আকার কিছুই ধারণ করে নাই। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় M. Henri Letourneau দেড় বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আশা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ আক্রমণের সময় মার্কিণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেস বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে বড়দিনের অভিযানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৩) ইন্দোচীনে ফরাসী কমাণ্ডার জেনারেল Henri Navarre ভিয়েটমিনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করায় অনেকের মনেই যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াস্থ বৃটিশ কমিশনার জেনারেল মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড গত নবেম্বর (১৯৫৩) মাসে বলিয়াছিলেন যে, দুই হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স ইন্দোচীনে চূড়ান্ত জয়লাভ করিবে। এইরূপ আশা করিবার কারণ হয়ত মার্কিণ সাহায্য। কিন্তু মার্কিণ-সাহায্য সত্ত্বেও ইন্দোচীনে ফ্রান্স একটুকুও নূতন স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ভিয়েটমিনদের শক্তির মূলে কম্যুনিষ্ট চীনের সাহায্য রহিয়াছে, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন যে ভিয়েটমিনদিগকে সত্যই সাহায্য দিয়া থাকে তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর যদি স্বীকার করা যায় যে, কম্যুনিষ্ট চীন সত্যই ভিয়েটমিনকে সাহায্য দিতেছে তাহা হইলেও সে-সাহায্যের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ইন্দোচীনের জন্য ফ্রান্সকে বহু গুণ বেশী সাহায্য দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইতেছে না। অতঃপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের জন্য ইন্দোচীনের যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন।

ইন্দোচীনে দুই শত মার্কিণ টেক্‌নেশিয়ান প্রেরিত হইয়াছে। ডেমোক্রাট সিনেটর ষ্টেনিস্ বলিয়াছেন যে, ইহা ইন্দোচীনের যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পরিণত হইতে পারে। এই মন্তব্যের উত্তর দিতে যাইয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনের সর্ব্বাত্মক যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ট্র্যাজেডি আর কিছুই হইতেই পারে না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িত হইয়া না পড়ে সেই ভাবে ফ্রান্সকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এশিয়াবাসীর সহিত এশিয়াবাসীর লড়াইয়ের নীতি তিনি যদি কার্য্যকরী করেন তবে ইন্দোচীনে মার্কিণ সৈন্য অবশ্যই প্রেরিত হইবে না। তবে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হওয়ায় কয়েক ডিভিশন দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্য ইন্দোচীনে প্রেরিত হওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। বিশেষতঃ প্রায় পঞ্চাশ হাজার চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীও চিয়াং কাইশেক ও ডাঃ রীর পক্ষে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকেও ইন্দোচীনে প্রেরিত হইতে পারে। হয়ত কোরিয়ার মত প্রত্যক্ষ ভাবে আমেরিকা ইন্দোচীনের যুদ্ধে নাও নামিতে পারে, কিন্তু ইন্দোচীন দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুম্ভ-কুরুক্ষেত্র

"দুর্ঘটনার সূত্রপাত নাকি আতঙ্কজনিত হুড়াহুড়ির ফলে হইয়াছে। কিন্তু কেন আতঙ্ক ও হুড়াহুড়ি দেখা দিল তাহা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই, এ সম্বন্ধে মতভেদও দেখা যাইতেছে। সরকারী বিবরণে বলা হইয়াছে, ইহার কারণ অজ্ঞাত। পি টি আই বলিতেছেন, নাগা সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল চালানোয় লোকে ভয় পাইয়াছিল। ইউ পি আই-এর মতে, স্বেচ্ছাসেবকরা এক সময় জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। কারণ যাহাই হউক, এই সম্বন্ধে অবিলম্বে নিরপেক্ষ বেসরকারী তদন্ত প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সরকারী তদন্তের দ্বারা সত্য ঘটনা বাহির হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে না। এই ব্যাপারকে চূণকাম করিয়া চাপা দিবার কোনরূপ চেষ্টা লোকে বরদাস্ত করিবে না। একমাত্র নিরপেক্ষ বেসরকারী তদন্তই প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে এবং আমরা সেইরূপ তদন্তই দাবী করিতেছি।" —দৈনিক বসুমতী।

বাঙলার শিক্ষা ও শিক্ষক

"পৃথিবীর কোন দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্র-পরিচালকেরা সমগ্র ভাবেই ইহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন এবং শিক্ষার জন্য ও শিক্ষকদের জন্য যাহা কিছু ব্যয়ের ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়, তাহার দায়িত্ব লইয়া থাকেন। এ দেশেও সরকারপক্ষকে সেই দায়িত্ব লইতে হইবে। সকল স্কুলের পরিচালন-ভার লইতে যে অর্থাভাবের কথা তাঁহারা তুলিতেছেন কার্যতঃ সেরূপ অর্থাভাব ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না, ঘটা উচিত নহে। বেসরকারী স্কুল পরিচালনা সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ শুনা যায়, তাহার মধ্যে আছে এক দিকে অর্থের অপব্যয় ও অপপ্রয়োগ এবং অপর দিকে শিক্ষকগণকে সঙ্গত বেতনাদি না দেওয়া। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অর্থের অপব্যয় ও অপপ্রয়োগ যদি নিবারিত হয় তাহা হইলে স্কুলের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এখন যাহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন, পরিচালন-ভার লইবার পর ব্যয় তাহা অপেক্ষা খুব বেশী বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই ব্যবস্থায় কেবল যে শিক্ষকদের প্রয়োজন ও দাবী মিটিবে তাহাই নহে, শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র এবং অভিভাবকগণও প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হইবেন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

মন্ত্রী যদি পদদলিত হতেন!

"কিন্তু ঈশ্বর না করুন, যদি এক জন মন্ত্রী পায়ের তলায় চাপা পড়িয়া মারা যাইতেন, তাহা হইলে কি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী সেদিন এত নিশ্চিন্ত মনে চা-পান করিতে পারিতেন? কিম্বা এই প্রকার হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা যদি বৃটিশ আমলে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে কি আজিকার সরকারী নেতারা খদ্দরের টুপি মাথায় এবং চোস্ত হিন্দী ভাষায় ইংরাজ সরকারের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িতেন না? ভাগ্যে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী সরকারের তত্ত্বাবধানে এই "নারী ও শিশুমেধ যজ্ঞ" ঘটিয়াছে, তাই না আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ধর্মের ও গভর্ণমেণ্টের মুখরক্ষা করিতে পারিতেছি। আসলে মানুষের দোষে এবং গভর্ণমেণ্টের যথোচিত সুব্যবস্থার অভাবে ও দীর্ঘকালের পুরাতন প্রথার প্রতি ভক্তির আতিশয্যে এই সমস্ত অমানুষিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। অবশ্য তদন্ত কমিটি পুরাতন প্রথা ও ভক্তির দিকটা অনুসন্ধান করিতে যাইবেন না। অথচ পুরাতন প্রথার প্রতি বাড়াবাড়ি করিবার জন্য কত জীবন যে ইতিপূর্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গভর্ণমেণ্ট কুম্ভমেলার দুর্বিপাকের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন, করুন —কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর ফিরিয়া আসিবে না এবং শোকার্ত অনাথ পরিবারগুলি কোন পার্থিব সান্ত্বনা পাইবে না। যদি কুম্ভমেলার শিক্ষা হইতে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সাবধান হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য উচিত ধর্ম ও প্রথা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রবর্তন করা, জনগণকে আত্মসচেতন হইতে নির্দেশ দেওয়া —কেবল উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের বন্দনা নহে!" —যুগান্তর।

ভারতে মার্কিণ গুপ্তচর

"এক দিকে মার্কিণ যুদ্ধবাজরা ভারতের সীমান্তে যুদ্ধঘাঁটি গাড়িবার আয়োজন করিয়াছে, অপর দিকে মহামান্য ভারত সরকারের উদার আমন্ত্রণে এখনও মার্কিণ চররা নানা ছদ্মবেশে ভারতে প্রবেশ করিতেছে। ভারত সরকারকে সাধারণ শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য মার্কিণ "বিশেষজ্ঞ" জনৈক মিঃ পল, এইচ আপলবি আসিয়া গত শুক্রবার দমদম বিমান-ঘাঁটিতে অবতীর্ণ হন। এই মার্কিণ "বিশেষজ্ঞ" মহোদয়ের "উপদেশ"এর জন্য মোটা হাতে দক্ষিণা দিতে হইবে তাহা জানা কথা। সে কথা না হয় আপাততঃ ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু ঘরের দুয়ারে মার্কিণ যুদ্ধওয়ালারা যে বিপদ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার পরও মার্কিণ মুলুক হইতে এই ধরণের "বিশেষজ্ঞ" আমদানির মানে কি? এই সকল ভদ্রলোকেরা যে পঞ্চমবাহিনীর কাজ করিবে না তাহারই বা গ্যারাণ্টি কোথায়? তাহা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী বিশেষজ্ঞদের পদাশ্রিত না হইয়া কংগ্রেসী কর্তারা বরং এইবার একটু জনসাধারণের নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করুন। ইহাতে বরং নিজেদের উপকার হইবে, দেশের নিরাপত্তাও বিপন্ন হইবে না।" —স্বাধীনতা।

পদদলিত শিশুদের কাটলেট ?

"এলাহাবাদের লাটভবনের ভোজসভা এবং পণ্ডিত পন্থের সাফাই সমগ্র বিশ্বের চোখে ভারতবর্ষকে ছোট করিয়াছে। ভোজসভায় গরীবের জীবনের প্রতি যে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছে, পণ্ডিত পন্থের বিবৃতিতে শাসনকার্য্যে যে অসহায় অযোগ্যতা ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে শুধু নিন্দনীয় বা গণতন্ত্রের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত করিলে চলিবে না, এই দুইটি ইঁহাদের উদগ্র লোভ এবং রাষ্ট্র পরিচালনে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচায়ক। পণ্ডিত পন্থের কথা সত্য হইলেও উহা মারাত্মক। জনসাধারণ এবং শাসনযন্ত্রের সকল কর্মচারী হইতে তাহারা কত দূরে সরিয়া গিয়াছেন ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। তিন মাইল দূরের এত বড় ঘটনা জানাইবার একটি লোকও ছিল না! আনন্দ-ভবনে বসিয়া নেহরুও খবরটা পান নাই! দেশের নায়কদের উপর যখন দেশবাসীর শ্রদ্ধা টলিয়া যায়, তার পরেও যখন তাঁহারা পুলিশ ও মিলিটারীর জোরে গদী আঁকড়িয়া থাকিতে চাহেন, তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবসান ঘটে, দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। লোকে আজ বলিতেছে,—পদদলিত বাচ্চাগুলার কাটলেট করিয়া যে ইঁহাদের টেবিলে দেয় নাই এই তো ভাগ্য! আমরা অনেক বার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস বেশী দিন উপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। উত্তর-প্রদেশের গবর্ণর মুন্সীজী প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্বর্দ্ধনায় বলিয়াছেন,—দশম শতাব্দীতে রাজা মহীপাল কুম্ভমেলায় আসিয়াছিলেন, আর আজ বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কুম্ভস্নান করিলেন। মুন্সীজী খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বোম্বাইয়ের ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাগার ভারতীয় বিদ্যা-ভবনের তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁর তো জানা উচিত কুম্ভস্নানের পর রাজা মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন এবং পলাইয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারাও কি তবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই রাজপুতানার পিলানীতে ঘাঁটি সুদৃঢ় করিতেছেন?"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

যন্ত্রের যন্ত্রণা!

"কল্যাণীর প্রদর্শনীতে এবার বেশ একটু নতুনত্ব পাওয়া গেল। দুটি বিভিন্নমুখী সত্তা—যন্ত্র আর কুটীর-শিল্পের একত্র মিলন ঘটেছে সেখানে। এক দিকে বিজ্ঞানের গতিশীলতা, অন্য দিকে কুটীর-শিল্পের স্নিগ্ধ সজীবতা। প্রথমটি যন্ত্র-শিল্পের জীবন্ত প্রতীক, আধুনিক নাগরিক জীবনের চঞ্চলতা সেখানে। পরেরটিতে সর্ব্বোদয়ে নানাবিধ উপকরণ—যন্ত্রের যন্ত্রণা (!) নেই সেখানে। কল্যাণী কংগ্রেসে কিন্তু এই প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে যন্ত্র-শিল্পের প্রদর্শনী হ'ল।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

সীমানা কমিশনে বাঙলার দাবী

"অবশেষে বহু-বাঞ্ছিত সীমানা কমিশন গঠিত হইয়াছে। সৈয়দ ফজল আলি, সর্দ্দার পান্নিকার ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ইহার সদস্য। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন, যে সব রাজ্য সীমানা লইয়া আন্দোলন করিতেছে, তাহাদের কাহাকেও কমিশনের সদস্য-পদে লওয়া হইবে না। যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়কে লওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে সৈয়দ ফজল আলি বিহারী মুসলমান। বিহারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি গায়ের জোরে বিহারে রাখার জন্য বিহারীদের আন্দোলন পাকিস্থান আন্দোলনকেও বোধ হয় ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ-হেন বিহারের এক জন অধিবাসী কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিবেন তাহাই প্রশ্ন। সেকুলার পণ্ডিত নেহরু যদি মনে করেন, যেহেতু ফজল আলি মুসলমান সেই জন্য তাঁহার কোন রাজ্যগত 'এ্যাফিনিটি' নাই তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। সর্দ্দার পান্নিকার কংগ্রেস দলেই বহু দিন ধরিয়া আছেন এবং কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের বিশ্বাসভাজন। কাজেই রাজেন্দ্র-প্রসাদ গ্রুপের মতামত আমল না দিয়া তাঁহার পক্ষে মত প্রকাশ সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ! পণ্ডিত কুঞ্জরু নিরপেক্ষতার দিক দিয়া সকলেরই আস্থাভাজন হইতে পারেন, কিন্তু একা তিনি কি করিবেন? বাংলার দাবী সম্পর্কে সীমানা কমিশনের নিকট কতটা সুবিচার পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে লোকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ উঠিয়াছে।"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)।

সরকারী প্রচার বিভাগের প্রতি

"সঙ্ঘশক্তির কার্য্যকারিতার নিদর্শন এ দেশে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারাই প্রদর্শিত। অধুনা বহু বহু সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়া দেশকে অতি-মন্থিত সাগর-সম্ভূত হলাহলের মারাত্মক স্বাদ দিতে বসিয়াছে। সর্ব্বজনীন কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাম্যবাদ ও ন্যায়নীতির অনুকূলে কোনও সঙ্ঘের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হইলে ক্ষোভ বা অশান্তির কোনও কারণ থাকে না কিন্তু আজকাল সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ, তাহা রাজনৈতিকই হউক বা সামাজিকই হউক, তৎসম্পাদনে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রই সময়ে সময়ে তাণ্ডব চলিতে থাকায় দেশের ও ত্বরিত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব অপসারণের অনন্ত প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য। আশা করি, এতৎ সম্পর্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে দেশপ্রাণ জননেতাগণ বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। দমন-নীতির দ্বারা এই সকল বিরুদ্ধবাদী সঙ্ঘ দমিত হইবে বলিয়া আশা করা কঠিন। মুষ্টিমেয় সঙ্ঘনেতাদের প্রভাব হইতে সাধারণ মানুষ যাহাতে থাকিতে পারেন সরকারী প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রচার পরিচালনা দ্বারা সদুদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব কি না ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনন্তর দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে সমাজ হইতে যে বিবেকের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা। জন-মনে বিবেক জাগ্রত না হইলে নৈতিক অধঃপতন হইতে মুক্তির আশা কোথায়?" —কান্দী-বান্ধব।

আমলা গমস্তাগণের কি হইবে?

"পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদের যে সকল অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বাধিক ভয়াবহ হইতেছে নূতন বেকার সৃজন। জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে এবং ইহারা সকলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। জমিদারী উচ্ছেদ হইলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিরাট অংশটি নূতন ভাবে বেকার হইবে। এই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত। চাকুরী হিসাবে ইহাদের কার্য্যকাল জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত। কয়েকটি বৃহৎ জমিদারী সেরেস্তায় সরকারী দপ্তরখানার পদ্ধতিতে কার্য্য পরিচালনা হয়, সে ক্ষেত্রেও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে চাকুরীর মেয়াদ কর্ম্মচারীর সামর্থ্য-কাল পর্য্যন্ত। অসমর্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য পেনসন গ্র্যাচুইটি প্রভৃতির ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জমিদারী-কার্য্যে যোগ্যতা আছে। নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষার মান না দেখিয়া যোগ্যতার পরিচয়ে ইহাদের অনেককেই কার্য্যে গ্রহণযোগ্য। যাঁহারা জমিদারী বিভাগে কার্য্য পাইবেন না তাঁহাদের কি হইবে? জমিদারী বিলোপকে সামাজিক ঝড় বলা যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড়ের ধ্বংসলীলা যেমন বৃহৎ মহীরুহের উপরই বর্ষিত হয়, তৃণাদি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অক্ষত থাকে, এই সামাজিক ঝড়ের ধ্বংসলীলা মহীরুহকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তৃণাদি ধ্বংসেই উদ্যোগী। জমিদারী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিপুল অংশটির দায়িত্বও সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।" —দৃষ্টি (বর্দ্ধমান)

চাষ ও চাষীর সর্ব্বনাশ

"জেলায় নানান অঞ্চল হইতে আমাদের নিকট যে সংবাদ আসিতেছে তাহাতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার বিগত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনীত সর্ব্বনাশা সংশোধনী প্রস্তাবের কুফল ব্যাপক আকারে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যস্বত্ব সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাবে আতঙ্কিত হইয়া বহু মধ্যবিত্ত ও বড় চাষী ব্যাপক ভাবে ভাগচাষীদের হাত হইতে জমি ছাড়াইয়া লইতেছেন। ইহাতে ভাগচাষী, মধ্যবিত্ত ও সমগ্র দেশের চাষবাসের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। মধ্যবিত্ত চাষ করিয়া কোন মতেই লাভবান হইতে পারেন না, পারিলে আগে জমি ভাগে দিতে যাইতেন না। কাজেই, হয় তাঁহাদিগকে জমি ফেলিয়া রাখিতে হইবে, নয় হাল-বলদ কিনিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। ফলে, দেশে চাষ-আবাদের বিপর্য্যয় হইয়া ফসল কম হইবে—মজুতদার চোরাকারবারীরা দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিবে। সরকারী প্রস্তাবে ভাগচাষীর কোনই সুবিধা দেওয়া হয় নাই অথচ মধ্যবিত্তকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সংশোধনী প্রস্তাবের আসল দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য হইল: (১) যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তাহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতেছে তাহাদের মধ্যে বিভেদ আনা ও ভাঙ্গন আনা, (২) গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি জাগি রাখিয়া ছলে-বলে ক্যানেল কর, সেস প্রভৃতি বৃদ্ধি করা। জনসাধারণ এই সমস্ত করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে যাহাতে দাঁড়াইতে না পারে তাহারই উদ্দেশ্যে এই বিভেদকারী সংশোধনী আবির্ভাব হইয়াছে।" —নতুন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

রেভিন্যু এস, ডি, ও আফিসের কাণ্ডকারখানা

"ঘাটশীলা থানায় ভাদুড়ি গ্রামের কয়েক জন আদিবাসী সেই গ্রামে জমি বন্দোবস্ত লইবার জন্য রেভিন্যু এস, ডি, ও অফিসে দরখাস্ত করেন। রেভিন্যু এস, ডি, ও অফিস হইতে প্রথমে কর্ম্মচারী মহাশয় ও পরে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তদন্ত করিলেন ও উভয়েই তদন্তের সময় উক্ত প্রজাদের জমি পাওয়াইয়া দিবার জন্য কিছু দক্ষিণা আদায় করেন। অতঃপর পেয়াদা মহাশয় নোটীশ জারী করিতে যাইয়া কিছু প্রণামী আদায় করিলেন। তাহার পর কিতাডি গ্রামের কিছু অনাদিবাসী প্রজা আবার ঐ জমির জন্য দরখাস্ত করিলেন। এখন রেভিন্যু এস, ডি, ও অফিসের কর্ম্মচারীরা ঐ জমির জন্য কে কত বেশী টাকা দিবেন ইহা লইয়া দর-কষাকষি করিতেছেন। জমিদারী উচ্ছেদের পর বিহার সরকার কি এই ভাবে প্রজাপীড়ন করিয়া দেশবাসীর সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছেন? না, তাঁহারা এই ভাবে গ্রামে গ্রামে আদিবাসী ও অনাদিবাসী প্রজাদের লড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন? ধলভূমে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়া প্রজাদের সত্য সত্যই স্বর্গসুখ লাভ হইয়াছে।" —নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

গণ-প্রতিবাদ ভাল, তবে—

সাধারণতন্ত্র দিবসে এবারে স্থানীয় বাজার বন্ধ ছিল বলিয়া দোকানে-দোকানে পতাকা উত্তোলন দেখা যায় নাই। তেমনি গণ-প্রতিবাদ দিবসের জন-সভাতেও প্রচুর লোকসমাগম হয় নাই। গণ-প্রতিবাদ যাঁহারা করেন, তাঁহারা বক্তৃতার সময় ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবান্তর প্রায়ই বলিয়া থাকেন। এবং সোজা জানাইয়া দেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের কোনও উপকার হয় নাই। কথাটি গরম গরম শুনাইলেও খুব সত্য কথা যে নয়, তাহা চক্ষুষ্মান্ দেশবাসী মাত্রেই জানেন। কাজেই প্রকাশ্য বক্তৃতা

দান কালে যে সব কথা বলা হয়, সভায় সমবেত জনতা তাহা ঠিক মত বুঝিতে পারে কিনা তাহা বলা শক্ত। বরং বলা উচিত, পাঁচ বছরে আমরা পঞ্চাশ বছর আগাইতে চাহিয়াছিলাম, কথা-কাটাকাটির মধ্যে কত বছর আগাইয়াছি তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। গণ-প্রতিবাদ ভাল, তবে তাহার মধ্যে সত্যকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা কাহারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

প্রতিঘাত আসিবেই আসিবে

"বিহারের এই আর্ত্তনাদের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। অন্যায় করিয়া বাংলা ও উড়িষ্যার বহু স্থান দখল করিয়া লইয়া অন্য প্রদেশবাসীর উপর অত্যাচারের ষ্টিম-রোলার চালাইতেছে। পুরুলিয়াতে টুসুর গানের জন্য পুলিশ জুলুম উগ্র ভাবে দেখা দিয়াছে। কেন না, বিহার সরকারের ধারণা ইহার ফলে হিন্দীর আধিপত্য কমিয়া যাইতেছে। এদিকে আবার উত্তর-বিহারের অধিবাসীরা পৃথক্ মিথিলা প্রদেশ গঠনের দাবী তুলিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য কল্যাণী যাইবার পথে বিহার সরকারের নির্দ্দেশে আসানসোলে পশ্চিম-বঙ্গ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিহারের মসনদে যে সব বাদশাহ শাসকের দল বসিয়া আছেন, ঘরে-বাইরের এই সব ন্যায়-সঙ্গত দাবীতে তাঁহাদের সুখ-স্বপ্ন কাটিয়া যাইতেছে এবং তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। এই আতঙ্কের ফলে তাঁহারা ভদ্রতা ও শালীনতার সীমারেখা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু বৃথা এ প্রয়াস। সত্য প্রকাশ হইবেই। মিথ্যার মায়াজালে শ্রীকৃষ্ণ সিং এণ্ড কোম্পানী তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। কেবল লাঠি দিয়া মহিষ দখল করা যাইবে না। অন্য প্রদেশের অন্যায় করিয়া দখল স্থান সমূহ ছাড়িয়া দিতেই হইবে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

টু দি জেনারেল ম্যানেজার, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

"সম্প্রতি মেদিনীপুর-খড়গপুর যাত্রীসঙ্ঘের পক্ষ হইতে সহর মেদিনীপুর ও খড়্গপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহি-করা একটি অভিযোগ-মূলক দরখাস্ত ইষ্টার্ণ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। দরখাস্তের বিবরণ—সকালে খড়্গপুর হইতে হাওড়াগামী মাদ্রাজ মেল ও বিকালের হাওড়া হইতে খড়্গপুরগামী মাদ্রাজ মেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বরাবর যাতায়াতের সুবিধা পাইতেছিল, কিন্তু গত বৎসরাধিক কাল হইতে এই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট আর দেওয়া হইতেছে না। অথচ বোম্বে মেলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে বাধা নাই। মাদ্রাজ মেলের এই আভিজাত্য এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য! ইহাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলিকাতা যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হইয়াছে। বিশেষতঃ সকালের দিকে মেদিনীপুরে ৭-১০ মিঃ-এর ২য় মেদিনীপুর প্যাসেঞ্জারের পর সাধারণের জন্য খড়্গপুর হইতে ১২টার এদিকে আর কোন ট্রেণ নাই। সুতরাং রেল কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ মাদ্রাজ মেলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পুনঃ-প্রবর্ত্তন অথবা ঐরূপ একটি ট্রেন চালু করা অত্যাবশ্যক।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

সংস্কৃতজ্ঞা বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

শ্রীমতী বাণী চক্রবর্ত্তী ১৯৫২ সালে সংস্কৃত অনার্স সহ প্রাইভেট ছাত্রীরূপে বি-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট জুবিলি বৃত্তি পান। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পুরস্কার রাধাকান্ত স্বর্ণপদক, পদ্মাবতী স্বর্ণপদক, শান্তমণি রৌপ্যপদক, প্রমীলা মেমোরিয়াল রৌপ্যপদক, প্রসন্নময়ী দেবী প্রাইজ পাইয়াছেন। তিনি শুধু তাঁহার সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন নাই, পরন্তু ঐ বৎসরে সমস্ত মহিলাদের মধ্যেও শীর্ষস্থান লাভ করিয়া পুরস্কৃতা হন। অল্প বয়স হইতেই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁহার বাড়ীর টোল এবং বংশানুক্রমিক সংস্কৃত-চর্চ্চা।

শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অগ্নিযুগের বরেণ্য বিপ্লবী নেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গত বৃহস্পতিবার ১৪ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের যুগ হইতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বাঙলা দেশের প্রায় সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন এবং জীবনের প্রায় চব্বিশ বৎসর তিনি মান্দালয়, রেঙ্গুন, আলিপুর প্রভৃতি কারাগারে বন্দী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বিপ্লব-পন্থা ত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী ১৯৩৭-৩৮ সালে কংগ্রেসের প্রকাশ্য রাজনীতিতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের জন্য তাঁহার আত্মত্যাগ তাঁহার দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। আমরা পরলোকগতের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

গত ২৪শে জানুয়ারী রবিবার চকদীঘির (বর্দ্ধমান) রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার চকদীঘির বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও চিন্তানায়ক শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি ১১-৫০ মিনিটে দেরাদুনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ন্যাশান্যাল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মার্ক্সীয় দর্শনবিদ্ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরায় যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, স্পেন, চীন, তুরস্ক ও ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল নাম ছিল "নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য"। ১৯০৩ সাল হইতেই তিনি বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি মেক্সিকোতে বিশ্বের প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন এবং মেক্সিকোর বিপ্লবে অসামান্য সাফল্য লাভ করেন। মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

[চায়ের আসরে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমতী এলেন রায়। চিত্রটি অপ্রকাশিত। পদ্মাবতী মিত্রের সৌজন্যে চিত্রটি প্রাপ্ত]

বিশিষ্ট ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জামাতা ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রে লণ্ডনের এক হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে তিনি রাজকীয় কৃষি-কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পল্লী অর্থনীতির অধ্যাপকও ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্যতম কংগ্রেস-সদস্যা রাণী অশ্রুমতী দেবী তাঁহার জলপাইগুড়িস্থ ভবনে ৫৭ বৎসর বয়সে গত ৪ঠা জানুয়ারী শেষ রাত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাণী অশ্রুমতী দেবী অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রাক্তন মন্ত্রী পরলোকগত রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের সহধর্ম্মিণী।

কলিকাতার বিখ্যাত লৌহ-ব্যবসায়ী মেসার্স জানকীদাস সিউনারায়ণের ওয়ার্কিং পার্টনার ননীগোপাল সাহা গত ৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার দোকানে কর্ম্ম-রত অবস্থায় ৪৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যু-কালে তিনি স্ত্রী এক পুত্র এক কন্যা ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা রাখিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীভবতোষ ঘটক, লক্ষ্মীপ্রসাদ কাজরিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার বাসভবনে গিয়া শোক-সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মঞ্চ ও ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২৮শে ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি দুই ঘটিকায় পাতিপুকুর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৫৪ বৎসর।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এডভোকেট ও বার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল ৭৫ বৎসর বয়সে গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি ৩-১৭ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ১ নং কুইন্‌স পার্কস্থিত বাসভবনে গত ২৭শে জানুয়ারী রাত্রি ৮-৫০ মিনিটের সময়ে স্বল্পকাল রোগভোগের পর পর-লোক গমন করেন। তিনি ৺জগদিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের কন্যা ও সুপরিচিতা শিল্পী শ্রীযুক্তা সুনয়নীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কলি-কাতা হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র-শিল্পী শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী গত ২রা জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ভবানীপুর বকুল-বাগান রোড়স্থ বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬০ (স্থাপিত ১৩২১) ৩২শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মার যত রূপ দেখেছি, তাঁর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে অনুপম—তার তুলনা নাই!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মা! তোমার খৃষ্টান ভক্তেরা কিরূপে তোমায় ডাকে আমি দেখবো!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সাধনা না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ,—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থটুকু ল'তে হয়—যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠির কথা আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখছে তার মুখের কথা অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না—অনেক তফাৎ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বললাম, —আমি মুখ্যু, তুমি আমাকে জানিয়ে দাও। পুরাণ তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন। কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে, তারপর কত হাসি। খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হলো। তারপর কথা!—কথা কয়েছে। তিন দিন ধ'রে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্রে—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দ্যাখ না আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? ওদেশে ধান মাপে, রামে রাম, রামে রাম, এই সব বল্‌তে বল্‌তে। এক জন মাপে আর ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় পেছনে আর এক জন রাশ ঠেলে দ্যায়। তার কর্ম্ম ঐ—ফুরোলেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যে কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি পেছন থেকে তাঁর জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দ্যান। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।

জীবন-কাহিনীর কয়েকটি পাতা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আমার ঝড়ো জীবনের ছিন্ন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বাতাসে ওড়া কুড়ানো পাতাগুলি দিয়ে লহরের পর লহর গাঁথা চলছে গত পূজা সংখ্যা বসুমতী থেকে মাসিক বসুমতীর পাতায় পাতায়। হু হু করে কাল-স্রোতের টানে জীবনের গোণা দিনগুলি আসছে ফুরিয়ে। দেশবাসীকে অবশিষ্ট জীবনের আরও কতটুকু অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে যেতে পারবো জানি না। মানুষের জীবন-কথা বড় মধুর, সে অরূপ অনন্তের খবর দেয়, কল্পলোকের রস-মাধুরী উজাড় করে এনে ঢেলে দেয় রূপের রেখায় রেখায় ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গে। সু ও কু-এর বালাই মুছে ফেলে সেই জীবনকাব্য জীবন-শিল্পীর সম চোখে দেখতে শিখলে সুন্দর কুৎসিত ভীষণ-মধুর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবই হয়ে ওঠে একই অমৃতে ডোবানো তূলিতে আঁকা পরমের আলেখ্য।

আন্দামান থেকে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে দেশে ফিরে মহারাজা জাহাজ থেকে দেশের মাটিতে বার বছর পরে পা দিয়ে আমি, উপেন, হেমদা, অবিনাশ সকলে পথের ধূলি তুলে পরম প্রেমে শ্রদ্ধায় মাথায় দিতে আরম্ভ করলাম। বন্দীদশায় জেলের ভ্যানে, আদালতে, কারাকক্ষে আকুল আবেগে বন্দী ছেলেরা এই মাটিরই স্তব গাইতো—

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে রেখো সদা জ্ঞান।

বার বৎসর পর সেই মাটিতে পা দিয়ে আনন্দ আর ধরে রাখা যায় না। তার পর আমরা কয়জন মিলে দেশবন্ধুর বাড়ীতে যাত্রা করলাম, আপাতত: সেখানে আশ্রয় নেবার জন্ম। গিয়ে দেখা গেল তিনি বাড়ী নাই, মামলার ডাকে বাহিরে গেছেন। তাঁর বাড়ীতে খবর যায় নি—এ কোন্ ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দল আজ কলির দাতাকর্ণের দ্বারে হানা দিয়েছে। "সাহেব বাড়ী নেই" বলে ভৃত্যরা আমাদের ফিরিয়ে দিল। এর জন্ম তারা দেশবন্ধুর কাছে পরে তীব্র ভর্ৎসনা পেয়েছিল, আমরা তাঁর দ্বার থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার ক্ষোভ তাঁর প্রাণে বড় কঠিন হয়ে বেজেছিল।

তার পর তাঁর নারায়ণের ভার গ্রহণ ও ক্রমে সাপ্তাহিক "বিজলী"র জন্ম-কাহিনী। কবিরাজ সত্যব্রত সেন স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে ডেকে তিন হাজার টাকা আমাকে না দিলে এবং অন্য এক বন্ধুর এক হাজার টাকা ঋণ দানের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধু কুমার অরুণ সিংহের চেরী প্রেস বিনা মূল্যে না পেলে অতবড় সমাজ গঠনের দীপ্ত রাগিণী বিজলীর পাতায় পাতায় বাজানো সম্ভব হ'তো না। আগেই বলেছি তখন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের যুগ আরম্ভ হয়েছে, বিজলী করেছে এই তামস সাত্বিক মেরুদণ্ড ভাঙা নৈতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান।

প্রথম পর্য্যায়ে বিজলী প্রকাশিত হয় কখন তার সঠিক সাল তারিখ নারায়ণ ও বিজলীর ফাইল ঘেঁটে আবিষ্কার করতে হবে। বিজলীর আদি পর্ব্বের কাগজগুলি বা ফাইল আমাদের কারও কাছে নাই, অবিনাশ যে বিজলীর ম্যানেজার হয়ে কাগজটি প্রকাশ করেছিল মোহনলাল ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে বা আমাসুন্দরী দেবীর বাটী থেকে তার কাছেই এর কোন সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নাই। অগত্যা এ সংখ্যায় বিজলীর দ্বিতীয় পর্ব্বের পরিচয় দিয়ে কাহিনী আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছি। এই পর্ব্বের সব সংখ্যা বাঁধানো আমারই কাছে কীটদষ্ট দশায় কোন গতিকে রক্ষা পেয়েছে। তাকেই মূলধন করে আমার "জীবনকাহিনীর কয়েকটি পাতা"র এই অংশ আরম্ভ করছি। ১৩৩১ সালের ৪ঠা বৈশাখের প্রথম সংখ্যায় ছিল "বিজলী কি চায়" বলে তার অন্তরের ও আদর্শের পরিচয়। তার সামান্য কিছু তারই কথায় উদ্‌ধৃত করি—* *

"বিজলীর আলো মুক্তির আলো, সে বলতে আসছে মুক্তির কথা, শুধু রাজনীতিক মুক্তি নয় কিন্তু ধর্ম্মের মুক্তি, সমাজের মুক্তি, কালচার ও সভ্যতার মুক্তি, শিল্প-কলা অর্থনীতির মুক্তি—সব দিক দিয়ে সারা জীবনের মুক্তি। পাশ্চাত্যের কম্যুনিজম্ যে সত্য নিয়ে আজ প্রাচ্যের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে ভারতের ধারায় বলা ও রূপান্তর করা বিজলীর কাজ—class war নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কলহ নয়, কিন্তু নারীর পা থেকে সমাজের দেওয়া শাস্ত্রের রচা হাজার বাঁধন খুলে নেওয়া, ছত্রিশ জাতে ভাগ করা এই জাতির এবং অপাঙ্‌ক্তেয়ের শূদ্রের বুক থেকে দেবকীর বুকের পাষাণ সরিয়ে নেওয়া, রাজনীতি-পাগল দেশকে জীবনের পূর্ণ সুর আর একবার ধরিয়ে দেওয়া, এই দলভাঙা ও party spiritএর দেশকে দলের মন ছাড়িয়ে উঠতে শেখানো, এই সব কিছুতে শ্রদ্ধা হারানো দেশকে নূতন শ্রদ্ধা ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের আগুনে দীপ্ত করা, এই মোড়লীর লোভে পদমর্য্যাদার লোভে তুচ্ছ টাকার লোভে পুঁটলী কাড়াকাড়ির দেশকে আর একবার আপনাকে ভুলতে শেখানো—এই হচ্ছে বিজলীর কাজ।"

"* * নারীর শিক্ষা-দীক্ষার, নারীর মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের সুবিধাটুকুর দুয়ারে অবধি আজও কড়া পাহারা রয়েছে, বাংলার তীর্থে তীর্থে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে গুরু পুরোহিত মহান্তের আসনে আসনে আজও ধর্ম্মের ব্যবসায়ী আজও দোকান খুলে বসে আছে, অথচ আমরা মুক্তি চাই!"

বিজলীর অগ্নিময় লেখা সে যে কত বড় দু:সাহসিক চেষ্টা তখনকার দুর্দ্দিনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর আশীষ বাণীতে শ্রীবাসন্তী দেবী লিখেছিলেন—"কাজলঘন অন্ধকারে আজ বিজলীর আলোক পথ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হৌক, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।"

বাসন্তী দেবী।

বিজলী প্রথম পুন: প্রকাশিত হয় ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার। সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারের পথে, তিনিও এই আকাশের ঘন মেঘের মেয়ে বিজলীর জন্ম আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনা রেখে যান। তিনি লিখেছিলেন,—

বারীনদা'

আমি আজ কারাগারের পথে; চলে যাবার আগে আপনি আমার আপনার বিজলীর জন্ম শুভ কামনা রেখে যেতে বলেছেন। আমি তরুণের স্বপ্নে বলেছি—বাঙালীকেই নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে, বাঙালীর আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর ভারতের রাজনীতিক জাগরণ এসেছে। কিন্তু নব ভারতের সৃষ্টি শুধু রাজনীতি দিয়েই

হবে না; ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কলায়, অর্থনীতিতে, বাণিজ্যে সব দিকেই নতুন আলো চাই। এ সব ক্ষেত্রে আমাদের দেশ জগৎকে নতুন কিছু দেবে। সেই বাণী সেই আলো বিজলীর পুণ্য দীপ্তিতে দেশ লাভ করুক—এই আমার শুভ কামনা। ইতি

সুভাষচন্দ্র বসু।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীকে আজকার তরুণ বাংলা ভুলে গেছে। সেই মনস্বিনী মেয়েও কবিতায় বিজলীকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁর কবিতাটি বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

বিজলী

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

অসীম ললাটপটে
আমি এঁকে দিয়ে যাই অগ্নির লিপিকা,
দৈবের অন্তর লীন হোমানল শিখা—
মহাকাল বার্ত্তা যার রটে,
যুগে যুগে প্রদীপ্ত জীবনে
মুক্ত শ্বাস ঈশানী পবনে।
শুধু ক্ষণপ্রভা নহি,
বাণী মম স্বয়ংপ্রভা, স্বয়ম্ভূ নিমেষে,
বহ্নি-পূত বর্ণলেখা দেব প্রত্যাদেশে
যুগ হতে যুগান্তরে বহি।
চিরন্তন অন্তর গৌরবে
বজ্র সম জাগ্রত যে রবে'।

এই আকাশের বিজলীশিখাকে কবি নজরুল ইসলামও আহ্বান করিয়াছিলেন কবিতায়—

"এস গো বিজলী শিখা,
প্রলয়েশ-মেঘ জটাতলে হয়ে সাগ্নিক ললাটিকা!"

কত যে নবীন প্রবীন শক্তিধর মনীষী এই আকাশ-দুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করে লিপি পাঠিয়েছিলেন, সব উদ্ধৃত করতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যায়। শ্রীলীলাময় রায় লিখেছিলেন—

বারীনদা'।

আপনি অসময়ে দুঃসাহসী হয়েছেন। বিজলীকে এ যাত্রা বাঁচানো শক্ত হবে। দেশের লোক পলিটিক্স ছাড়া কিছু চাইবে না এবং বেচারারা নিষ্ক্রিয় ভাবে এতদিন কাটিয়েছে, পলিটিক্সে গা ঢেলে দিয়ে লাভ আছে। কোন রকম একটা কর্ম্ম তাদের চাই, তা' না হলে তাদের প্যারালিসিস ঘটবে। দিন, দিন, একটু সাঁতার কাটতে দিন, দোহাই আপনার। আপনি তাদের নিরুৎসাহ করবেন না। তবে সেই যে যথেষ্ট নয়, এ কথা বলতে পারেন উঁচু গলায়। আরও অসংখ্য কাজ করবার অসংখ্য কর্ম্মী চাই। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি চাই, বিশ্বের বড় বড় ভাবুকদের দলে কদ্ধে পাবার মত ভাবুক চাই; সঙ্গীতকার, চিত্রকর, বাস্তুশিল্পী, সওদাগর, উদ্ভাবক, ভূ-পর্য্যটক ইত্যাদি অসংখ্য মানুষ এসে দেশজননীকে অসংখ্যভুজা করুন। শত শত নূতন শিল্প জেলায় জেলায় মাথা তুলুক। খালি চরকাতে স্বরাজ হতেও হয়তো পারে কিন্তু বৈচিত্র্য হবে না। ইতি—

লীলাময় রায়।

বিজলীশিখাকে আবাহন করে কবি নজরুল যা' লিখেছিল তা' এক উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। বাণীর বরপুত্র যুগ্ম হিন্দু-মুসলিম বাংলার মহাকবি ও বীর-কবির সাধা বীণা থেকে যে সুর ঝরে সেই সুর সাক্ষাৎ মহাসরস্বতীর তন্ত্রীচ্যুত-রাগিণী। নজরুল লিখেছিল—

স্বাগতম্।

(নজরুল ইসলাম)

ঘনাইয়া এলো ঘনঘটা ঘোর আবার গগন ঘিরে,
তামসী নিশার অসুরযাত্রীরা দিবসে বেড়ায় ফিরে।
দেউলে প্রদীপ গিয়াছে নিভিয়া ঝটিকার ফুঁয়ে কবে
এলায়ে বনানী-কুন্তল ধরা কাঁদিছে আর্ত্ত রবে।
ঘর্ঘরি রথ পিষিছে আকাশ দেব বজ্রাহত
নিভায়ে আলোক লুকায় শূন্যে গ্রহ তারাদল যত।
ভীত অসহায় মানব ফুকারে 'আলো আলো আলো' বলি
ও কোন চপল চরণ চপলা-ইঙ্গিত উঠে ঝলি?
অন্ধকারের বুক চিরে চলে আলোর দিশারী মেয়ে
ঝড়ের দমকে হাসিয়া চমকে আবার চলে সে ধেয়ে!
অন্ধকারের অঞ্চলতলে অনির্ব্বাণ হে শিখা,
ঘন দুর্দ্দিনে তোমারে দেখেছি, পড়েছি অগ্নিশিখা!
আগুনে লিখিয়া পরিচয় তব, দূর রহস্যলোকে,
লুকাল কখন—ঝলিছে সে আলো আজও আমাদের চোখে।
ঘন মেঘ ঘেরা অকাল নিশীথে অন্ধ আকাশ তলে,
তোমার প্রদীপ জ্বলে যেন তব তড়িৎ প্রবাহ চলে।
তোমার হাতের দীপ্ত বহ্নি চাবুকের জ্বালা খেয়ে,
অন্ধকারের জীব যত যেন দিকে দিকে যায় ধেয়ে।
এস গো বিজলী শিখা,
প্রলয়েশ-মেঘ জটাতলে হয়ে সাগ্নিক ললাটিকা।

পুনঃ প্রকাশিত বিজলীর পরিচয়পত্র আর কত দিব? নূতন বাংলার সকল মনীষী ও স্রষ্টাদের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বিজলীর প্রকাশ ব্যর্থ হবার নয়, হয়ও নাই। কয়েক বৎসর ধরে নবীন বাংলার জীবনের পাথেয় ও প্রাণের আগুনে যোগান দিয়েছে বিজলী। বীরবল, প্রবোধ সান্যাল, শৈলজানন্দ প্রভৃতি অনেক প্রথিতযশা কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক আমার বিজলীতেই হাত পাকিয়েছিলেন। নব পর্য্যায় বিজলীকে বীরবল আশীর্ব্বাদী পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্র পোকায় কাটা জীর্ণ অবস্থায় উদ্ধার করেছি। কীটদষ্ট সেই দলিল তেমনি ছিন্ন দশায় ছাপিয়ে দিচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তির জন্য।

* * মীপেষু—

বিজলী পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত করতে উদ্যত হয়েছ, এ কথা শুনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, যে, তোমার এ প্রয়াস সফল হোক। বিজলীর প্রতি আমার বিশেষ একটু মায়া আছে। যাকে বলে Journalism সে বিদ্যা আমি বিজলীর সাহায্যেই * * * আমার মতে আমি কলম ধরে অবধি যা লিখে আসছি * * * * Journalism মাত্র। যদি তাই হয় তাহ'লেও বিজলীতেই * * প্রথমে Journalism-এর চেষ্টা করি; এবং প্রধানতঃ বিজলীর * * * বীরবল বাংলার পাঠক * * পরিচিত হন।

* * * আমার বিশ্বাস মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আমাদের কারও জানা নেই, * * আবার বাঁচাতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার * * * যুগে যুগে মানব সমাজের মনের ধাত বদলে যায়। যে * * * সময়ে পাঠকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই * * * আর এক সময়ে পাঠকের একই কাণ দিয়ে ঢুকে আর এক কাণ * * * সুতরাং * * নাম দিয়ে নতুন্‌ কাগজ বার করবার ভিতর একটু বিপদ আছে। কারণ তার অন্তরে যদি পুরানো মনোভাব থাকে তা' হলে হয়তো সে নতুন পাঠকের মনে ধরবে না, আর যদি তা'তে থাকে শুধু চলতি মাল তাহ'লে পুরাণো নামের কোন সার্থকতা থাকে না। বিজলীর গায়ে আর কিছু না থাক কিঞ্চিৎ চমক থাকা চাই। আর এ যুগ আলোর যুগ, না, ধ্বনির যুগ এই তো হয়েছে মুস্কিল। তবে আশীর্ব্বাদ করি নূতন বিজলী তার স্বধর্ম্ম হারাবে না।

বীরবল।

নবপর্য্যায় বিজলীরও অভিযান ছিল প্রধানতঃ গান্ধীবাদের নির্বীর্য্য নিষেধাত্মক নীতির বিরুদ্ধে এবং তার সঙ্গে বাঙালীর জীবনের যত সব দুর্ব্বলতা ও সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে। মহাত্মাজী নিজে ছিলেন অহিংসা ও সত্যাগ্রহের অকুতোভয় যোদ্ধা, কিন্তু তাঁর নিষেধাত্মক নীতির নামাবলী পরে তখনকার বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর অনুবর্ত্তীদের ছদ্মবেশে অনেকে সস্তায় পলিটিক্স করবার সুবিধা-সুযোগ গ্রহণ করেছিল। আমাদের অস্ত্র নাই, সশস্ত্র বিপ্লবের সাহস নাই, তাই অহিংসার পথে চলি, মহাত্মাজীর অনুকরণে চরকা ঘুরাই, খদ্দর পরে রাজনৈতিক ভদ্র সাজি, এই ছিল তাঁর পলিটিক্সবাজ অনুবর্ত্তী ও অনুকরণকারীদের পেশা। মহাত্মা গান্ধী তাঁদের এ কপটতা ও ভীরুতা বিলক্ষণ বুঝতেন তাই তিনি নিজেকেই একা অসহযোগ ও অহিংসার মন্ত্রসাধক বলে বার বার প্রচার করেছেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি তাঁর সঙ্গে পত্রে আমার চলতো ভাবের আদান-প্রদান। মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে জানতে চাইতেন, আমি কি করছি। স্ব-মতের বিরুদ্ধ-বাদীদের উপর এত শ্রদ্ধা এত উদার সহমর্ম্মিতা মহাত্মাজী ছাড়া আর কারও মাঝে আমি দেখি নাই। আমার "ভারত কোন পথে?" বা Wounded Humanity (আহত মানবতা) প্রধানতঃ গান্ধীবাদের বিরুদ্ধেই করেছিল যুক্তিপূর্ণ জেহাদ ঘোষণা। আমার নানা সংবাদপত্রে ও বিজলীতে লিখিত লেখাগুলি সংগ্রহ করে এই পুস্তকখানি পরিবর্দ্ধিত আকারে ছাপা হয়। শ্রী বি আর সেন এই পুস্তক মুদ্রণের অর্থ সার রাজেন মুখার্জ্জির কাছ থেকে সংগ্রহ করে দেন। Wounded Humanity পড়ে ১৯৩৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মহাত্মাজী আমাকে লেখেন,—

"Dear friend, I have glanced thro' your book. It has proved a severe disappointment, you have lost yourself in the excellance of your language. You have missed the spirit of non-co-operation and civil disobedience—you have glorified our errors, our vice has become virtue in your estimation. I may not argue with you. Time will show us the true way. What does it matter so long as we pursue the path that seems to us to be right?

Yours sincerely

17.12.34. M. K. Gandhi.

পাঠক-পাঠিকার সম্যক্‌ উপলব্ধির জন্ত এই পত্রখানির অনুবাদ দিলাম—,প্রিয় বন্ধু, আমি আপনার বইটি মোটামুটি পড়েছি। এখানি আমার কাছে কঠিন নৈরাশ্যের আঘাত এনেছে। আপনার ভাষার ঔৎকর্ষে আপনি নিজেকে ফেলেছেন হারিয়ে এবং আপনি অসহযোগ ও আইন অমান্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণাটি ধরতে পারেন নাই। আমাদের ভুল-ক্রটিকে আপনি মহত্বের পরিচ্ছদে ঢেকে দেখিয়েছেন, আপনার ধারণায় আমাদের পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুণ্য। আপনার সঙ্গে আমি হয়তো বাদানুবাদে মাতবো না। সময়ই দেখাবে কোন্‌টি সত্য পথ। যে পর্য্যন্ত আমাদের ধারণানুসারে খাঁটি পথটি অনুসরণ করে চলি সে পর্য্যন্ত কি আসে যায়?

আপনার

এম্‌ কে গান্ধী।

Wounded Humanityর ভাষা ছিল অনুপম; শ্রীরবীন্দ্র-নাথ ভূমিকায় এই বইখানির প্রতিপাদ্য বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এর যুক্তি ও আলোচনার ধারা ছিল অকাট্য। বইখানি ভূপেন্দ্র এভিনিউ শ্যামবাজার ঠিকানায় "অমিয় লাইব্রেরী"তে এখনও পাওয়া যায়,—আমার কাছেও কীটদষ্ট অবস্থায় কিছু কপি আছে। আজ ভারতের খণ্ডিত দীর্ণ স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধীর আততায়ীর হাতে শোচনীয় আত্মবলির পর কালপুরুষ অসহযোগ ও মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত পন্থা সম্পর্কে একরূপ রায় দিয়েই ফেলেছেন। আজও কিন্তু নেহরুজীর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির ধারায় গান্ধীবাদের নিস্ফল প্রেরণা এখনও বেঁচে আছে এবং এই আন্তর্জাতিক দুর্য্যোগে পাক-ভারত সম্পর্ককে বিষাক্ত আত্মঘাতী করে রেখেছে। আমার "ভারত কোন্‌ পথে"র প্রতিপাদ্য সত্য এখনই বিচার ও পরখ করে দেখার উপযুক্ত সময়। মানুষ একা বা দু'-চার জন ভুল করে,—খাঁটি পথ বলে বিপথেও যদি যায় তাতে বিশেষ কিছু এসে-যায় না; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীনেহরুর ন্যায় কেন্দ্রী পুরুষের ক্রটি-বিচ্যুতি একটা বিরাট দেশ ও জাতির ভাগ্যকে বিপন্ন ও বিপথগামী করলে তা'তে যে বিলক্ষণ এসে-যায়। যিনি যত বড়ই নেতা হোন, যত বড় আদর্শবাদী মানুষই হোন, ছত্রিশ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একটা অপ্রযোজ্য অবাস্তব সত্যের আজগুবি পরীক্ষা সে দিক দিয়ে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ক্রূর বহিঃশত্রুর হানার মুখে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ বা গৌরাঙ্গ দেব এসে সমগ্র জাতিকে—বোধিদ্রুমের মূলে ধ্যানে সমাহিত হতে বা পরা প্রেমে গলে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে যদি উপদেশ দেন তা' হলে সে সর্ব্বনাশা অতি-আদর্শবাদী পুরুষকে জাতির মঙ্গলের জন্ত উম্মাদাশ্রমে রাখা কর্ত্তব্য নয় কি? বহু দিক দিয়ে জগদ্বরেণ্য মহাত্মাজীর রাজনীতিতে অহিংসার অপপ্রয়োগের সেই ব্যাধি শ্রীনেহরুর মাধ্যমে এখনও ভারতের ভাগ্যে দুর্দ্দান্ত শনিগ্রহের কাজ করছে। এই ভ্রান্তির পরিণাম কত দূর ভয়াবহ হবে, কে জানে? ১৯৩৯ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে আমাকে লিখিত

মহাত্মাজীর পত্র এইখানে উল্লেখযোগ্য। তখন মহাত্মাজীর রাজনৈতিক জীবনে এক সন্ধিক্ষণ। পঞ্চনদে তরুণ দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আন্দোলন পরিচালনা করছে। আমি সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব করে যে পত্র গান্ধীজীকে লিখি তার উত্তরে লিখিত ২০. ১২. ৩১ সালের এই পত্র। আমি তাঁকে জানাই,—"আপনার চরকাকে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি নিবারণের উপায় বলে আমার বিশ্বাস না থাকলেও আপনার অহিংসাকে আমি উচ্চ পারমার্থিক সত্য ও আদর্শ বলে মানি। অতএব আমার সহযোগিতা এই দুর্দ্দিনে আমি দিতে চাই,—আপনার সহকর্ম্মিরূপে আমাকে গ্রহণ করুন।"

এই প্রস্তাবের উত্তরে মহাত্মাজী একটি পোষ্টকার্ডে লেখেন,—"Dear Barin, The difference about the Charka is not immaterial. My hole life is wound up with it. If you can not support it you can not whole heartedly support non-violence, and of what use am I without non-violence ?

Yours sincerely
M. K. Gandhi.

"প্রিয় বারীন, চরকা সম্বন্ধে মতের অনৈক্য তুচ্ছ নহে। আমার সমস্ত জীবন চরকারই সঙ্গে জড়িত। তুমি যদি চরকাকে সমর্থন না করতে পার তাহ'লে পূর্ণভাবে অহিংসাকেও সমর্থন করতে পারবে না। অহিংসা ব্যতিরেকে আমারই বা মূল্য কি ?

তোমার অকপট
এম্. কে, গান্ধী।

বা'লায় বিজলীর ও ডন্ অব ইণ্ডিয়ার দলের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর গান্ধীবাদীদের মতের সংগ্রাম এক কুরুক্ষেত্র মহারণ। এই নিঃশব্দ ও শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে আবদ্ধ সংগ্রামের খবর আজ দেশ রাখে না, সেদিন গান্ধীবাদের দিগ্বিজয়ের পথে বিজলী অন্তর্ঘাতী মাইন পুঁতে রেখে সেই একপেশো পথটিকে দুর্গম করে দিয়েছিল। বিজলীরই জন্ম গান্ধীবাদ বাংলায় গোড়া গাঁথতে পারে নাই। ১৯৩০ সাল এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় দফায় পুনঃপ্রকাশিত বিজলীর এই পূর্ণ মুক্তির অভিযান একপেশো গান্ধী নীতির বিরুদ্ধে। তার পর তিন বৎসর পরে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে আমার "ভারতের উষা"—Dawn of India আত্মপ্রকাশ করে ভারতের রাজনীতিতে বন্ধ্যা অসহযোগের ধারার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসভায় বিধান সভায় সক্রিয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সহ প্রবেশের আদর্শ নিয়ে। "জীবনের চৌমাথায়" "On the crossroad of her destiny" এই শীর্ষক—আত্মপরিচয় নিয়ে Dawn of India-র প্রথম প্রকাশ। তার কিছু উদ্ধৃতি এইখানে প্রয়োজন—

"India is on the crossroad of her destiny again. The great wave of Non-co-operation has subsided, giving place to a lull before another surge gathers force and swells out of her deep sea of life. The time has come when no creed of mere negation and un-accomodating rigidity can be any more fruitful. The national movement must be again made plastic and pliable enough to accomodate itself to the changed circumstances."

"ভারত আজ আবার তার ভাগ্যের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। অসহযোগের উত্তাল তরঙ্গ গিয়েছে নেমে, এসেছে এক বিরাম,—যত'দিন না ভারতের জীবনের গভীর সমুদ্র থেকে নূতন তরঙ্গ শক্তি সংগ্রহ করে উত্তাল হয়ে জাগে। সময় এসেছে যখন কোন নিছক নেতিবাচক অসহযোগের অনমনীয় নীতি আর কার্য্যকরী হতে পারে না। আবার জাতীয় আন্দোলনকে করে নিতে হবে নমনীয় যাতে পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে সে আন্দোলন খাপ খাইয়ে চলতে পারে।"

"Every movement has its limited span of life...its birth, adolescence, fullness of youth, decay and death. Leaders like Surendra Nath, Tilak, Aurobind, Chitta Ranjan and Mahatma Gandhi are by themselves nothing. Each is a stride—a step forward in the eternal march of the Time-spirit, the Yuga-Devata. Leaders come and go, movement succeeds movement but India's destiny goes on fulfilling itself."

"প্রত্যেক আন্দোলনের আছে সীমাবদ্ধ পরমায়ু কাল—তার জন্ম, কৌমার্য্য, পূর্ণ যৌবন কাল, ক্ষয় ও মৃত্যু। সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতারা আসলে কিছুই নয়। প্রত্যেকে তারা এক একটি পদক্ষেপ, যুগদেবতার অগ্রগতির এক একটি ধাপ বা অগ্রগতি। নেতারা আসে-যায়, আন্দোলনের পর আন্দোলন জাগে, এইরূপে চলে ভারতের ভাগ্যের পূর্ণ থেকে পূর্ণতর পরিণতি।"

আমাকে উপলক্ষ করে Dawn of Indiaর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় আশীষ ও অনুমোদন ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু মনীষী ও নেতার। তখনকার অন্ধ গান্ধী-ভক্তির যুগে কাউন্সিল প্রবেশের কথা মুখে উচ্চারণ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মঘাতী হবার সাহস সাধারণ নেতাদের মধ্যে দুর্ল্লভ ছিল। ১৯৩৩ সালের ১০ই জুলাই আমার Dawn of Indiaকে আশীর্ব্বাদ করে আজিকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'শ্রীবিধানচন্দ্র রায় যে বাণী পাঠান তা' এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

MESSAGE.

The situation round us seems to be so disappointing and the horizon so dark that any talk of the "Dawn of India" might easily be taken to be a mad man's ramblings in a "fools paradise." One can take hope however from the common saying—"The night is darkest before the Dawn." May the Dawn of India appear in full glory over this benighted country and light the path it has to tread in the near future. My best wishes to Barindra Kumar Ghose who now comes as the herald of Dawn."

"আমাদের চারিদিকে পরিস্থিতি এমন নৈরাশ্যজনক এবং আকাশ এমনি কৃষ্ণান্ধকার যে "ভারতের উষা"র কোন কথা মূঢ়ের বৈকুণ্ঠে পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। মানুষ কিন্তু এই জন-প্রবাদের মধ্যে আশার সন্ধান পাইতে পারে যে, উষার পূর্ব্বাহ্নেই রাত্রি থাকে সর্ব্বাপেক্ষা তমাবৃত। এই অভিশপ্ত দেশে "ভারতের উষা" পূর্ণ মহিমায় উঠুক এবং আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রা-পথ করুক আলোকিত। উষার অগ্রদূতরূপে যিনি কাজে নামিয়াছেন সেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রতি জানাই আমার অন্তরের শুভেচ্ছা।"

ডন্ অব ইণ্ডিয়ার প্রকাশককে অভিনন্দন করে শুভেচ্ছার বাণী পাঠিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, তৎকালীন পৌর-সভার মেয়র শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীএম আর জয়াকর, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীন্দ্র বসু, শ্রীমৃণালকান্তি বসু, শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী—এমনই অনেকে। বিধাতা আমাকে আমার জীবনসংগ্রামের যুগে যুগে দিয়েছিলেন সুদূরের লক্ষ্যে জনমতের বিরুদ্ধে অগ্রগতির পতাকাটি তুলে ধরবার ভার। সুদূর ও দুর্গম আমাকে চিরদিনই হাতছানী দিয়ে ডেকে গিয়েছে। জীবনে তাই বৃদ্ধ বয়স অবধি আসেনি ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থসঙ্গতি। আজ আবার এই কংগ্রেসী প্রজাতন্ত্রে আমি ও আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা কোথায়ও স্থান পাই নাই, না রাষ্ট্রে, না সুখসমৃদ্ধি পদমর্য্যাদায়। বিপ্লব, ঝঞ্ঝা, ধ্বংস, প্রলয়ের অগ্রদূত বলে সকলেই আমাকে ভয় করে পাশ কাটিয়ে চলেন। এই অবশ্যম্ভাবী ভাগ্য সৃষ্টিতে অভিযোগের কিছু নাই, ইহাই আমার ছিল বিধাতা-দত্ত কণ্টক মুকুট ও যীশু খৃষ্টের বহনের ক্রুশ। দেশসেবা ও জনকল্যাণের পুরস্কার অন্তরেরই আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ।

এমনই দুর্দ্দমনীয় সুদূর ও দুর্গমের হাতছানী এখনও আমায় ডাক দেয়। এখন সে বলে—"মানুষের মন অধোগামী হয়ে গেছে। আবার এস কর্ম্মক্ষেত্রে, গড় এক অপূর্ব্ব রাষ্ট্রের ভাগবত ভিত্তি। দেখাও ভারতকে ও বিশ্বকে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় স্রোতধারা যে রাজনীতি তারই মাঝে নরনারায়ণের প্রকাশ ও জাগরণ। যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি এলে ঐখানেই জীবন-দেবতা মূর্ত্ত হন। আমি জানি এই অবশ্যম্ভাবী দীপ্ত যুগ আসছে, অনেক ধ্বংস গ্লানি ও বেদনার মধ্যে এই দুষ্ট-বিনাশকারী ধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতা ঠাকুর জাগবেন। তার আভাস অনেক সাধকের ও মণ্ডলেশ্বরের মাঝে জাগাতে তাঁরা সকলেই ভাবছেন, তাঁরাই ভগবানের আদেশ ও শক্তি নিয়ে এসেছেন—'জগৎ ত্রাণায়'। সে হচ্ছে সূর্য্যোদয়ের সূচক আলোর বর্ণাভিরাম খেলা, আসল ভাস্বর নবসূর্য্য নয়। শ্রীঅরবিন্দ মানব মনে প্রাণে দেহে যে দিব্য রূপান্তরের সাধনা করে গেছেন তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ হবে সেই অনাগত দীপ্ত যুগে সারা ভারত ও বিশ্ব জুড়ে।

দুর্য্যোধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভারতের ছিলে—বিশ্বের হলে—এ যুগে দুর্য্যোধন—
যেইখানে তুমি, সেথায় দুঃশাসন।
চারিদিকে শুধু তোমারি অভ্যুদয়,
অতি-অভিমান হয়ে আছে অক্ষয়,
সূচ্যগ্র সে ভূমি না দিবার রয়েছে কঠিন পণ।

কুক্কুর লয়ে স্বর্গে গেলেন ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির
শকুনি লইয়া তুমি রয়ে গেলে বীর।
তোমারি সমান-ধর্ম্মা ও অনুচর—
গদাকেই ভাবি' সর্ব্বশক্তিধর,
করিতেছে এই বসুন্ধরাকে অতিষ্ঠ, অস্থির।

তারাও লয়েছে নারায়ণী সেনা নারায়ণে বাদ দিয়া
—আত্মতৃপ্ত দর্পদৃপ্ত হিয়া।
ধন জন আর অস্ত্র অপরিমেয়—
স্পর্শিতে দেহ স্পর্দ্ধা রাখে না কেহ,
কন্দুক ক্রীড়া করিছে তাহারা জাতির জীবন নিয়া!

তোমারি মতন করিছে তারাও জীব-জগতের হানি
বৃদ্ধি করিছে দুখ, লাঞ্ছনা গ্লানি।
ধরাকে করিতে চাহিছে 'জতুগৃহ'
ধ্বংস দগ্ধ-কর্ম্ম তাদের প্রিয়,
দণ্ডে আনিছে শ্রীভগবানের রোষ-বহ্নি যে টানি।

সকল ছাড়িয়া আঁকড়ি রয়েছে তারাও মৃত্তিকাকে,
ধর্ম্মের সাথে সংযোগ নাহি রাখে।
দেখায় শান্তি তরে সবে তৎপর,
ফন্দীর হলো সন্ধি নামান্তর,
অনাগত এক কুরুক্ষেত্র—অজ্ঞাতে তারা ডাকে।

এ যুগদ্বন্দ্বে পার্থ কিম্বা পার্থ-সারথি নাই,
এ যজ্ঞে কই যোগেশ্বরের ঠাঁই?
যাঁর তৃপ্তিতে জগৎ তৃপ্ত হয়,
তাঁর তৃপ্তির কথাই কেহ না কয়,
মাঝে মাঝে শুধু ভূষুণ্ডিদের কর্কশ সাড়া পাই।

লোককে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা কাজ
যাদের,—তারাই ন্যায়াধীশ হলো আজ।
বর্ণে বর্ণে আনি বিষ-বিদ্বেষ—
চক্রেতে টানি সকল জাতি ও দেশ,
সপ্তরথীর ব্যূহ রচিতেছে শান্ত বসুধা-মাঝ।

ভাবি কোথা যাবে? আর কি করিবে? এ সব দুর্য্যোধন,
কোথা তাহাদের সে হ্রদ দ্বৈপায়ন?
মাটি লয়ে খাঁটি যাহাদের কারবার,
তাহার ঊর্দ্ধে ভাবে না কি আছে আর,
সদর্পে শুধু করিয়া ফিরিছে গদার আস্ফালন।

কি দেখে পড়ব?

পরিমল গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যে বা সাময়িক পত্রে পঠনীয় কোন্ ধরনের লেখা থাকবে বা বাংলায় পাঠ্য কি আছে এ বিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে বলেছেন মাসিক বসুমতী-সম্পাদক।

ত্রিশ বছর আগে হলে এ আলোচনা খুব সহজেই করা যেত, কিন্তু ইতিমধ্যে ভাল হোক মন্দ হোক, বাংলা সাহিত্য গল্প-উপন্যাসে, জীবনী সাহিত্যে, ভ্রমণ-কাহিনীতে, সমালোচনা সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে এবং বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক সাহিত্যে এত সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে এখন কারও আর সাধ্য নেই যে পঠনীয় বা পঠনযোগ্য বইগুলোর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করে।

বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে বাংলার সাহিত্য-দিগন্ত হঠাৎ অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অবশ্য গুণের দিক দিয়ে বা উপযুক্ততার দিক দিয়ে সব বই যে খুব উৎকর্ষ লাভ করেছে তা বলা যায় না। তার কারণ নিজস্ব গবেষণা-বিষয়ক বই, যা একমাত্র ইতিহাস বা ভাষা বা শিল্প বা সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ আছে, শুধু সেইগুলোই (মৌলিক গবেষণাজাত হেতু) অন্যান্য প্রবন্ধ পুস্তকের অপেক্ষা মূল্যবান বেশি, কারণ অন্যান্য অনেক বিষয়েই আমাদের নিজস্ব গবেষণামূলক কোনো কৃতিত্ব নেই, এবং যদি বা থাকে, যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বই লেখেন না, অথবা যদি লিখে থাকেন তা নিতান্তই নগণ্য। বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই এখনও আমাদের কাছে অগম্য হয়েই আছে, যাঁরা শিশুদের নামে অথবা সাধারণ ভাবে লিখেছেন তাঁদের অনেকেই অনধিকারী, অথবা যাঁরা নির্ভরযোগ্য বই লিখেছেন তাঁরা বিদেশী বই থেকে সঙ্কলন ক'রে লিখেছেন।

বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ এদিকে প্রশংসাযোগ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তবু সে সব বই আকারে ক্ষীণ এবং যথেষ্ট প্রচারের ব্যবস্থা হয়নি বলেই মনে হয়।

কেবলমাত্র সঙ্কলন ক'রে যাঁরা লেখেন তাঁদের বই নির্ভরযোগ্য হলেও কৌলীন্যে খাটো। বাংলাদেশে গবেষণা-বিজ্ঞানী আছেন অনেক, তাঁরা যদি গল্পের ভঙ্গিতে নিজ নিজ বিষয়ের সর্বজনপাঠ্য বই লেখেন তা হলে দেশের উপকার হবে। ইংরেজী ভাষায় এ রকম অনেক বই আছে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রগতি কত দূর হল, চরম সত্য জানার পথে কত দূর অগ্রসর হওয়া গেল, বিজ্ঞানের পথে অগ্রগতির আপাত-সীমারেখা কোথায়, এ সব জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সব আলোচনামূলক কোনো প্রামাণ্য বই নেই।

মোটামুটি ভাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রের বিশ্বরহস্য সম্পর্কে বিস্ময়ের অভাবে বই লেখা হচ্ছে না। ব্যাপক অর্থে সবারই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরা সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় একমাত্র তাঁরাই দিয়েছেন বেশি, এবং তাঁদের বই-ই বেশি নির্ভরযোগ্য।

আমাদের ইতিহাস-বোধ প্রায় পুরোপুরিই জেগেছে, কিন্তু ভূগোল-বোধ কিছুমাত্র জেগেছে বলে বোধ হয় না। ইংরেজী ভাষায় অন্তত দু'খানা ভূগোল-বিষয়ক সাময়িক পত্র আছে—ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন ও জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন। প্রথমখানা আমেরিকার, দ্বিতীয়খানা ইংল্যাণ্ডের। এই দু'খানা ম্যাগাজিনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানবিক ভূগোল সম্পর্কে ঐ সব দেশের মনোযোগ কি হয়ে উঠেছে। এই সব কাগজে একটি লেখাও শুধু পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্যও। এর পটভূমিতে দেখা যাবে তাদের ভৌগোলিক কৌতূহল। পৃথিবীর (এবং আকাশের) ভূগোল তো তারাই রচনা করে চলেছে। আমাদের কি দান আছে ভূগোলে? যে ভূগোল স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় তার কোনোটাই আমাদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ নয়। এ দেশে যে ভূগোল লেখা হয় তা ওদের লেখা ও ছবি থেকে নিয়ে।

ভূগোল সম্পর্কে এত বলছি এই জন্য যে একমাত্র এথনোলজির ছাত্র ভিন্ন আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তথ্য সংগ্রহের প্রেরণা নিয়ে কেউ কোথায়ও ভ্রমণ করেন না, বা এমন ভ্রমণ-কথা লেখেন না যা কোনো স্থান সম্পর্কে প্রামাণ্য বইরূপে গণ্য হতে পারে, যা দেশে বা বিদেশে সর্বত্র আদৃত হতে পারে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে চেষ্টা হয়েছে তা দুর্বলের চেষ্টা, তার মধ্যে সার বিশেষ কিছু নেই। একমাত্র 'কালপেঁচা' এ বিষয়ে প্রথম বলে মনে হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষকেরাই যদি সাহিত্য রচনা করতে পারতেন তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের—অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় হল্ডেন যেমন করেছেন, হাক্সলি যেমন করেছেন, জেমস জীনস যেমন করেছেন তেমন বই আমাদের দেশে কোথায়? আমাদের দেশে জগদীশচন্দ্র বাংলা গদ্যের ওস্তাদ ছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে পারতেন, কিন্তু করেননি। "অব্যক্ত" নামক বইতে কাব্যের প্রাধান্য বেশি। প্রফুল্লচন্দ্র পারতেন, করেননি। তিনি ইংরেজীতে রসায়নের ইতিহাস লিখেছেন এবং শেক্সপীয়ারের নাটক নিয়ে উৎকৃষ্ট গবেষণা করেছেন শেষ বয়সে। বিজ্ঞান হিসাবে রসায়ন, বিশ্ববস্তু গঠনে যে বিস্ময় মনে জাগায়, তিনি সেই বিস্ময় সঞ্চার করতে পারতেন সাধারণ পাঠকের মনে, সাধারণের পাঠ্য রসায়ন সাহিত্য রচনা ক'রে। বিজ্ঞানের প্রগতি সম্পর্কে তাঁর সময়ের সব দিকের কথা লিখতে পারতেন, কিন্তু তিনি লিখলেন শেক্সপীয়ারের সৌন্দর্য—এবং কবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিশ্ব-পরিচয়। পাখী, বিশেষ ক'রে বাংলার পাখী সম্পর্কে, জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে, গাছপালা সম্পর্কে, ঘরে ঘরে পড়বার মতো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনো বই আছে বলে জানি না।

ইংরেজী কোনো বইয়ের দোকানের তালিকা দেখলে আমাদের জ্ঞানের এবং বিভিন্ন সাহিত্যের দৈন্য দেখে লজ্জায় মাথা নিচু হয়।

যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের মধ্যে কারও কারও বই লেখার যদি বাসনা হয় তবে তা যে স্কুল বা কলেজপাঠ্য বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এ কথা বলা বাহুল্য। নিজ নিজ বিষয়ে তাঁরা সৃষ্টির রোমাঞ্চকর বিস্ময় অনুভব করেন না, পাঁচ জনকে ডেকে তাঁদের সেই বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন না, এটি মর্মান্তিক ভাবেই বেদনাদায়ক।

আকাশ-রহস্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোনো বই নেই, বিবর্তন সম্পর্কে কোনো বই নেই। আমি সব সময়েই সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উপযুক্ত বইয়ের কথাই বলছি।

এই জাতীয় সহজপাঠ্য বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে আমাদের। অবশ্য সব বই-ই প্রকৃত অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির লেখা এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই।

চাই এই জন্য যে আমাদের দেশে গল্প সব চেয়ে বেশি লেখা হয়—অতএব যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের এ সব বিষয় কিছু কিছু জানার প্রয়োজন আছে, কাহিনীতে বাস্তবতা এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। যখন দেখি উত্তাপ মাপা হচ্ছে ব্যারোমিটার দিয়ে, শিকার করা বাঘটা দশ হাত দীর্ঘ, ডাক্তার মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সর্দির জীবাণু দেখছে, নাইট্রোজেন যৌগিক পদার্থ, কিংবা যখন পড়ি, নাম না-জানা পাখী, নাম না-জানা গাছ, তখনই মনে হয় এ সব বিষয়ে সহজপাঠ্য বাংলা বই থাকলে গল্প-লেখকেরা লাভবান হতে পারতেন।

সাময়িক পত্রে এই সব বিষয়ে প্রবন্ধ নিয়মিত লিখিয়ে নেওয়া উচিত অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। এ সবই সাময়িক পত্রের বিষয়। ম্যাগাজিন মাত্রেরই উচিত নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে পাঠককে কৌতূহলী ক'রে তোলা।

বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশ মিলিয়ে একখানা বড় জীবনীকোষ অবিলম্বে ছাপা হওয়া উচিত। রেফারেন্স বই বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। মাসিক বসুমতীতে বাঙালী লেখকদের জীবনীকোষ সঙ্কলিত হচ্ছে, এর সঙ্গে সকল বিভাগের লোকেরই (দেশী ও বিদেশী) ক্রমশ ছাপা হলে ভাল হয়।

বিশেষ কোনো একটি বিষয়ের পত্রিকা বাংলা দেশে চলে না, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠকেরা উদাসীন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় তাই অনেক মনোহর বিষয়ের সঙ্গে মিশেল দিয়ে চালাতে হয়। অনেক গল্প'ও ছবির মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞান সবই চলে, স্বতন্ত্র ভাবে চলে না। ১৭৩১ সনে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক ম্যাগাজিনের জন্ম—তার নাম ছিল জেন্টলম্যানস্ ম্যাগাজিন। সেই নামই আমাদের দেশের বড় ম্যাগাজিনগুলোর দেওয়া চলে, অর্থাৎ আমাদের দেশে ম্যাগাজিন চালাতে হলে সবগুলোই হওয়া চাই জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন। শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি পৃথক ভাবে ভদ্রলোকে পড়ে না। গল্প উপন্যাসের সঙ্গে কোনো রকমে চালিয়ে দিতে হয়।

যে ভাবেই হোক, মাসিকপত্রই আমাদের দেশে পাঠক তৈরি করছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে। গল্প পড়ার জন্য মাসিকপত্র কিনে সে সঙ্গে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক প্রবন্ধও দু'-চারটে পড়তে হয় বৈ কি। মাসিকপত্র সে জন্য এমন রচনা চায় যা পড়তে আরাম লাগে। বিষয়বস্তু যত অপরিচিতই হোক, সে বিষয়ে গল্পের ভঙ্গিতে কিছু আলোচনা অবশ্যই করা যায়। রচনা মনোনয়নের সময় সে জন্য স্টাইল এবং ভাষার সরসতা, সরলতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ইংরেজী ভাষায় সায়েন্স ডাইজেষ্ট নামক একখানা সঙ্কলন মাসিক আছে, তাতে বিজ্ঞানের সব বিভাগ নিয়েই ভাল ভাল প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করা হয়। অথচ সবাই তা পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে। কাজেই পাঠককে যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করাতে হলে গল্পের মতো সহজ ভাষাতেই তা করা উচিত। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে—যে-কোনো বিষয়েই হোক—সে সম্পর্কে মাসিকপত্রেই প্রথম পরিচয়জনিত আলোচনা থাকা উচিত। এতে পাঠকের কৌতূহল বাড়বে, এতে বাংলা ভাষায় ভবিষ্যতে নানা বিষয়ের বই প্রকাশ করার পথ পরিষ্কার হবে।

যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের পক্ষে এখন আর আগের মতো একই স্থানকালে একই ধরণের চরিত্রে আবদ্ধ থাকা চলছে না—বিভিন্ন কর্ম বিভাগের চরিত্র আমদানি না করলে গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমান জগৎ সম্পর্কে তাঁদের কিছু নির্ভুল প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। লেখকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত না হলে তাঁর সৃষ্টিও বিচিত্র হতে পারে না, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসীমায় একই ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষেতের উর্বরা-শক্তি স্বভাবতই কমে আসে। তখন নিজেকেই অবিরাম অনুকরণ করতে হয়। মনস্তত্ত্ব যা ফোটানো যায় তা সেন্টিমেন্টের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, নতুন নতুন পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না, তা ভিন্ন একটি চরিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে শুধু সহানুভূতি নয়, জ্ঞানও থাকা চাই। অথচ আমাদের লেখকদের দৃষ্টিশক্তি আছে, মানুষকে দেখেছেন, চিনেছেন, চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় নিপুণতার অভাব নেই, শুধু বৈচিত্র্যের অভাব।

ছোট গল্প মাসিকপত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। দু'-তিনটি নিয়মিত থাকা চাই-ই। প্রথম শ্রেণীর গল্প পাওয়া কঠিন। এ সমস্যা দেখছি ইংল্যাণ্ডেও। জ্যাক ট্রেভর ষ্টোরি লিখছেন (জন ও' লণ্ডনস উইকলী, ১-১-৫৪) যত গল্প আসে তার অর্ধেকই এমন ভঙ্গিতে লেখা যা অনেক দিন বাতিল হয়ে গেছে, একঘেয়ে হয়ে গেছে।

কিন্তু উপায় তো নেই। তা ভিন্ন মাসিকপত্রের গল্পে অনেক সময় যে অপরিণত হাতের পরিচয় থাকে তাও এক দিক দিয়ে উপভোগ করা যায়। ছেলেমি ভাল লাগে অনেক সময়। সেই জন্যই সম্ভবত বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এ. সি. ওয়র্ড বলেছেন Man cannot live by masterpieces alone.

মাসিকপত্রে শিকার-কাহিনী পড়তে আমার ভাল লাগে, অন্তত পড়তে চাই, কিন্তু বড়ই অভাব। মৃত বাঘের ঘাড়ে পা তুলে ষ্টুডিওতে তোলা শিকারীর ছবি এখন অচল। শিকার সম্পর্কে নানা দিক থেকে অবশ্য লেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত শিকার-কাহিনী রচনার একটি আদর্শ আছে। সে হচ্ছে এই যে শিকার সম্পর্কে, বন-জঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞানেরও পরিচয় তাতে থাকবে, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাদে তথ্য অংশ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। তথ্য বাদ দিয়ে নিজের কৃতিত্ব বা বাহাদুরি বাড়িয়ে বলার অভ্যাস বর্জনীয়, প্রকৃত শিকারী কখনো তা করবেন না। অকারণ

রোমান্টিক হবার দরকারই করে না, যদিও ভদ্র এবং ক্ষমতাশালী শিকারীর লেখায় কিছু পরিমাণ স্বগতোক্তি বা দার্শনিকতা—এমন কি আত্মিক উপলব্ধির প্রকাশও অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শিকার-কাহিনী প্রামাণ্য দলিল হবে আগে, অন্য সব পরে। অতিশয়োক্তি বা নিহত জন্তুর আকার বাড়িয়ে বলার ইচ্ছা যেন আদৌ না হয়। শিকারীর মনোভাব এর বিপরীত। অপ্রয়োজনে শিকারের সঙ্গে শিকারীর বা তাঁর পরিবার-সুদ্ধ লোকের ছবি ছাপা সুরুচির পরিচয় নয়। এ বিষয়ে করবেটের কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ বা রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা আদর্শ বলা যেতে পারে। শিকারী অশিকারী সবারই এই চমৎকার বই দুখানি পড়া উচিত।

গল্পের কথা আগেই বলেছি। মাসিকপত্রের অধিকাংশ রচনাতেই যথাসম্ভব গল্পেরই স্বাদ থাকা দরকার। তা নইলে কেউ পড়তে চায় না। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রেও নানা জাতি আছে। ডিটেকটিভ গল্প অনেকে পড়তে ভালবাসে। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমাদের ডিটেক্‌টিভ গল্প অধিকাংশই নিচু স্তরের—একেবারে অবাস্তব এবং হাস্যকর। অথচ আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প ইংরেজীতে এক অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করেছে। নামে ডিটেকটিভ গল্প, কিন্তু অনেকগুলি জীবন্ত চরিত্র একসঙ্গে, এমন ধৈর্যের সঙ্গে, এমন সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে আড়াইশ' পৃষ্ঠার এক একখানি বই লেখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। চরিত্র-সৃষ্টিতে, প্লটের বাঁধুনিতে, সব রকম স্তরের লোককে রক্ত-মাংসের মানুষ ক'রে গড়ে তোলাতে, অনিবার্য লজিক এবং ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণে, কাহিনীগুলি সত্যই বিস্ময়কর। পড়ে মনে হয়, আমাদের দেশের আধুনিক বড় গল্প-লেখকেরা অনেকেই শুধু চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়েও এর কাছাকাছি আসতে পারেননি। এ জাতীয় গল্পে অবশ্য সাধারণ ভাবে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই (যদিও কোনো কোনো কাহিনীতে তাও আছে) কিন্তু তবু এ কথা মানতেই হবে যে, এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বহু নির্ভুল তথ্যপূর্ণ গল্পেও ওঁরাই চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, আমরা শুধু ওঁদের ব্যর্থ, অক্ষম অনুকরণ করছি।

মাসিকপত্রে সমালোচনা বিভাগের উপর আরও জোর দেওয়া দরকার। শুধু পুস্তক সমালোচনা নয়, সকল গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ের সমালোচনা দরকার। দায়িত্বপূর্ণ এবং ব্যালান্সড সমালোচনা। ইংরেজী সাময়িক সাহিত্যপত্রে পরিচয় পেয়েছি পুস্তক সমালোচনা বিভাগের দায়িত্ববোধের। সমালোচকেরা অবশ্য এ জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন, তাঁদের সমালোচনা পড়ে যেমন তৃপ্তি হয় তেমনি শিক্ষাও হয়। একখানা বইয়ের যথাস্থান নির্দেশ এবং মূল্য নিরূপণে তাঁদের যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়, পড়ে শ্রদ্ধা হয়।

থিয়েটার, সিনেমা এবং রেডিও সমালোচনা নিয়মিত হওয়া দরকার—বিশেষ ক'রে থিয়েটার। অনেকের ধারণা সমালোচনা মানেই গাল দেওয়া। গাল দেওয়ার প্রশ্নই নেই, যদি না গাল খাবার জন্য কেউ প্রস্তুত হয়েই আসরে নামেন। আসল কথা দায়িত্বপূর্ণ সমালোচনায় ব্যক্তিগত কিছু নেই, তার চেহারাই আলাদা। সমালোচনার উদ্দেশ্য সমালোচিতকে শত্রুতে পরিণত করা নয়, তাকে নিজের সুযুক্তিপূর্ণ মতে দীক্ষিত করা। যা সমালোচনায় অযোগ্য এমন কোনো বিশেষ বিষয়ে নীরব থাকা ভাল, অথবা দু'কথায় সেরে দেওয়া ভাল, সংক্ষেপে বলে দেওয়া ভাল। কিন্তু সব সময়েই দায়িত্বপূর্ণ উক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। দায়িত্ব জ্ঞান যাঁর আছে একমাত্র তিনিই সমালোচক হবার উপযুক্ত। কারণ তিনিই কথার ওজন রাখতে পারবেন। যে রচনা বা সৃষ্টিতে শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তাতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি থাকে তবে তাকে মূল লক্ষ্য থেকে বড় ক'রে তোলা উচিত নয়, অথচ সাধারণত তাই হয়ে থাকে।

থিয়েটারের সমালোচনা বর্তমানে নেই বললেই চলে, অথচ থিয়েটার বাঙালীর সংস্কৃতির বড় অঙ্গ। সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালী আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে থিয়েটারের দান অস্বীকার করা মানে আত্ম-ইতিহাস অস্বীকার করা। থিয়েটারের কোনো প্রচলিত নাটক সমালোচনার কথাই বলছি না, থিয়েটার সংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনার কথা বলছি। এ দেশে থিয়েটারের উন্নতি আরও কি ভাবে হতে পারে, ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় কি ভাবে থিয়েটার চলছে, তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা, আমাদের দেশে যাতে অনেকটা সেই অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া দরকার। নাট্য সমালোচনা ইংরেজীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে অনেক দিন থেকেই। সে দেশে নাট্য সমালোচনার সঙ্কলন গ্রন্থ একাধিক প্রকাশিত হয়েছে। সে সব বই মূল্যবান। আমাদের দেশে কোথায় সমালোচনা? কোথায় নাট্য সমালোচনা সাহিত্য? এখনও এর একটা আরম্ভ দেখতে চাই মাসিকপত্রে।

রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচনারও স্থান আছে মাসিকপত্রে। এইখানে সবচেয়ে বেশি দরকার নিরপেক্ষ এবং আবেগহীন হওয়া। কংগ্রেস আমাদের দেশের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অতএব তার দায়িত্বপূর্ণ সমালোচনা প্রয়োজন। কংগ্রেস সম্পূর্ণ জনপ্রিয় হতে পারছে না কেন তার কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার। কংগ্রেস জনসাধারণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এটি সর্বজনসম্মত সত্য। কংগ্রেসের লোক জনসাধারণের বিপদকালে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না, এ অভিযোগ সবার মুখে। কংগ্রেসকে তাই এ বিষয়ে নিত্য সচেতন করার দরকার আছে। সমালোচনা তাই কংগ্রেসের এই নিষ্ক্রিয়তাকে দূর করার কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার।

মাসিকপত্রে কৌতুক রচনা বা ব্যঙ্গ রচনার স্থান আছে, কিন্তু নিয়মিত হাস্যরস সৃষ্টি কোনো একা লোকের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। সব খবরের কাগজেই রসাত্মক প্যারাগ্রাফের ফীচার আছে, কিন্তু তার মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি নিয়মিত হওয়া সম্ভব নয়, মাঝে মাঝে হয়। সেদিন বসুমতীর 'বাঁকা চোখে'র একটি প্যারাগ্রাফ চমকপ্রদ মনে হয়েছে। লেখক বলেছেন, মানুষ কুকুরকে কামড়াচ্ছে যদি কোথায়ও দেখেন তবে মনে করবেন না সেটা সংবাদ-সৃষ্টির জন্য, আসলে সেটি খাদ্য অভিযানের ব্যাপার। এই জাতীয় হিউমার মনে রাখবার মতো। এ রকম মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, সব সময় নয়। এক জন ইংরেজ কৌতুক-লেখক বলেছেন, অনেক কৌতুক লেখা হয়, কিন্তু সবগুলো জমে না, এবং জমে না বলেই ভালগুলোকে আমরা উপভোগ করতে পারি। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এ. সি. ওয়ার্ড বলেছেন—Since newspapers began to feature deli-

berately amusing writing.... laughter has become professionalized....It is possible to be funny once a day or once a week, but could anyone guarantee HUMOUR at regular short intervals?

তাই নিয়মিত হাস্যরসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্যই কঠিন। মনে হয়, বিভিন্ন লেখকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ বা কৌতুক রচনা লিখিয়ে নিলে ভাল হয়।

স্মৃতিকথা লেখায় উৎসাহিত করা দরকার, নানা বিভাগের লোককে। স্মৃতিকথা সাহিত্যিকেরাই যে বেশি লেখেন তার কারণ লেখা তাঁদের সহজে আসে। যাঁরা লেখা অভ্যাস করেননি তাঁরা লিখতে সঙ্কুচিত হন। সে জন্য রিপোর্টিং-এর কাজে যাঁরা পাকা তাঁদের নিযুক্ত করা উচিত অন্যান্য বিভাগের প্রবীণ কর্মীদের কাছ থেকে স্মৃতিকথা সংগ্রহের কাজে। সামরিক বিভাগের কোনো কর্মীরই কোনো স্মৃতিকথা বাংলা ভাষায় সম্ভবত নেই, এক প্রথম মহাযুদ্ধের বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের মনবাহাদুর সিং-এর বাংলা বইখানা ছাড়া।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা উচিত এই যে, আমাদের দেশের নবীন লেখকদের বিদেশী সাময়িকপত্র কতকগুলো নিয়মিত পড়া উচিত। তাতে তাঁরা দু'দিক দিয়ে লাভবান হবেন। প্রথমত, জানতে পারবেন ইংরেজী ভাষায় অনেক লেখক আছেন এবং লেখার টেকনীক তাঁদের সকলেরই আয়ত্ত। এ জিনিস সত্যই দেখা উচিত এবং এ নিয়ে চিন্তা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এগুলো নিয়মিত পড়লে ভাল লেখার ইচ্ছা আপনা থেকেই আসবে। যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে সমালোচনা লিখতে চান বা সমালোচনা পড়ে কোন্ জাতীয় লেখা ইংরেজী ভাষায় প্রশংসা পায় তা জানতে চান, তাঁদের অন্তত টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট, নিউ ষ্টেটসম্যান অ্যাণ্ড দি নেশান, এবং জন ও' লণ্ডনস উইকলী—এই তিনখানা সাপ্তাহিক কাগজ নিয়মিত পড়া উচিত। প্রথম পাঠকদের শেষোক্ত কাগজখানা বেশি উপযোগী হবে।

পড়লে দেখতে পাবেন ইংরেজ লেখকেরা কত সরল ভাষায় এবং সবচেয়ে বড় কথা, কত সংযত ভাষায় কেমন চমৎকার সমালোচনা বা আলোচনা লেখেন। তা ভিন্ন এতে ওদেশের গ্রন্থ-জগতের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটবে, সেটিও কম লাভ নয়। গল্প-উপন্যাস হোক বা যে-কোনো বিষয়ের বই হোক, কোন্ আদর্শ, কোন্ মান, ইংরেজদের দেশে মান্য হয় তা বোঝা যাবে। তাঁরা টেষ্টিমোনিয়াল লেখেন না, সমালোচনা লেখেন, অন্তত লিখতে আন্তরিক চেষ্টা করেন। একটা নতুন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায় এই সব পড়লে। আমাদের চিন্তাধারাই অত উঁচুতে ওঠেনি মনে হবে। ভাষা, ব্যাকরণ, বানান—কোনো দিকেই ইংরেজ লেখকদের অরাজকতা নেই, লেখার টেকনীক সর্বাঙ্গসুন্দর।

এই কথাটা আমাদের নবীন লেখকদের বার বার ভেবে দেখা উচিত। কোনো বিষয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা অনেকেরই আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত লেখার টেকনীক আয়ত্ত না হচ্ছে ততক্ষণ যেমন-তেমন বানানে বা ভুল শব্দ প্রয়োগে তা প্রকাশ করলেই তাকে সাহিত্য বলে মানা যায় না। কোনো রকমে প্লটটা খাড়া করলেই গল্প বা উপন্যাস হয় না। ফুটবল খেলোয়াড় খেলার রীতি অমান্য ক'রে, প্রতিপক্ষের লোকদের লাথি মেরে চিৎ ক'রে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গিয়ে যদি গোল দেন তা হলে তা যেমন ফুটবল খেলা বলে কেউ মানবে না, লেখার বেলাতেও তাই।

লেখার টেকনীক ব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল। ব্যাকরণ শিখতেই হবে লেখক হতে হলে। বানান বা শব্দের ব্যবহার যান্ত্রিক কৌশলের পর্যায়ে আনা দরকার, কারণ ওর মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি বা ষ্টাইলের প্রশ্ন নেই। তৎসম শব্দ লেখার একই নিয়ম। আবেগ প্রকাশে বা ষ্টাইলের খাতিরে শব্দবিন্যাস বদলানো যায়, বর্ণবিন্যাস যায় না। আবেগজনিত বানান নামক কোনো বস্তু নেই।

লেখার এগুলি হচ্ছে প্রথম সর্ত। এই সর্ত না মানলে অন্য দেশে অন্তত লেখক হওয়া যায় না।

ইষ্টদেবের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

অর্থদায়ে কন্যাদায়ে দৈন্য ব্যাধি বন্যাদায়ে
শতেকের পদে পুষ্প ঢালি',
পুষ্প ত ফুরায়ে যায় কি দিব তোমার পায়?
ডালি মোর হ'য়ে যায় খালি।
তোমারি সবুর সয় তাদেরে পূজিতে হয়,
পূজা পেতে তারা যে অধীর।
ফুটে না ক ফুল আর, হেমন্তে সম্বল সার
শুধু ভরে নয়নে শিশির।

দারার ছিন্ন-মুণ্ড ও আরংজীব

(অপ্রকাশিত)

স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার

[মৃত্যুর প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি কবিতাটির মাত্র কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই, তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে কবি কবিতা-লেখা এক রকম ত্যাগ করিয়াছিলেন—কবি বলিতেন, "কবিতা আর আমার আসে না।" বঁড়িশায় বাস কালে শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার নামে একজন বি, এ, পরীক্ষার্থী তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতেন, সে সময় তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি পড়াইতে পড়াইতে মনে হয় 'আলমগীর' চরিত্র কিছুমাত্র ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে কবিতাটি হঠাৎ লিখিয়া ফেলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক কবিতাটি সংগৃহীত]

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদসংলগ্ন শাহী-বুরুজ
কাল—প্রত্যুষ।

(ফজরের নামাজ-শেষে অতিশয় অস্থিরভাবে নিভৃত-নির্জ্জন কক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে)

আরংজীব

দারা-সুলেমান-মোরাদ-শিপা'র! তার পর?—তার পর?
তবু ছুটি নাই, কতদিনে মোর ঘটিবে যে অবসর!
জানি, ওই হোথা চলে যে ভিখারী পথে পথে ভিখ মাগি'—
ওরও আরামের আছে অবসর, রাতে ও রবে না জাগি'।
সেও মরে যদি, কবরে তাহার দু' ফোঁটা আঁখির জল
হয়তো ঝরিবে—ফুরাবে না তার এটুকু সম্বল।
মানুষের সাথে মানুষের রীতি পালিবে না হেন জন
কোথা দুনিয়ায়? পিশাচেরও আছে মমতার প্রয়োজন।
সেই মমতায় করিয়াছি জয়! চাহি না দুনিয়াদারি—
কাফের-মুলুকে করিবারে চাই খোদার আদেশ জারি।
স্নেহ-ভালবাসা—ফুলা-কলিজার রক্তের কারখানা
নাহি চাই প্রভু! বান্দারে কভু করিও না মস্তানা
তোমার নিমক-হারামী শরাবে; মাটির পেয়ালাখান
খোসবু'তে ভরি' শয়তান যেন করে নাকো বেইমান।
ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি রাজনীতি;
রমণীর রূপ হারাম করেছি,—ফকিরের যেই রীতি
ধরিয়াছি তাই; জগৎ জানিবে, বাদশা আলমগীর
দুনিয়াদারির খাতির করেনি,—খোদার দুয়ারে শির
বাঁধা রেখেছিল; চেয়েছিল সে যে আল্লারই নিজ-হাতে
তুলে দিতে এই রাজ্যের ভার—আপনারে সেই সাথে।
দাও বল দাও! যে-বলে একদা ইব্রাহিমের বুক
নিজ সন্তানে জবে' করিবারে কাঁপে নাই এতটুক!
আমি কেহ নই—বান্দা তোমারি, ওগো মহা-মহীয়ান্!
সত্যের তরে বাঁধিয়াছি বুক, তব বলে বলীয়ান্।

(হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করিয়া)

সেদিন শহরে রাজপথে সেই দেখিয়া দারার হাল
কেঁদেছিল যারা—জানোয়ার যত, কুত্তা-ভেড়ীর পাল!—
জানে কি তাহারা, কে তারে মারিল ফতেবাদ-সামুগড়ে—
নিমেষে মিলালো কাফেরের সেনা কার কটাক্ষ-ঝড়ে!
তখন ভাগিছে মহাভয়ে মোর সিপাহী গোলন্দাজ,
শয়তান ছুটে আসিতেছে রুখে'—উদ্যত যেন বাজ!
পাহাড়ের মত উঁচু হাওদায় বসেছে দম্ভভরে,
শাদা মেঘ যেন—সিংহলী হাতী ঘন হুঙ্কার করে।
দাঁড়াইনু একা; মোর হাতী পাছে ভয় পেয়ে হটে' যায়,
হুকুম করিনু জিঞ্জির বেঁধে দিতে তার চারি পা'য়।
নমাজের বেলা হয়েছে তখন, তুরিতে নামিনু ভুঁয়ে—
আল্লার নামে শেজ্‌দা করিনু বার বার মাথা নুয়ে।
উঠিনু যখন, স্বপ্নের মত ময়দান দেখি সাফ,
শুধু সে মাথার উপরে জ্বলিছে কার আঁখি-আফ্‌তাব!
খোদার হুকুম পাইনু সেদিন, বুঝিনু এ কার কাজ,
কেন, কেবা দিল—নিজ হাতে তুলি' আমার মাথায় তাজ।
দারা-দুষমণ আল্লার সে যে, হিন্দু-কেরেস্তান!
কাফেরের রাজা! তবু নাম তার এখনো মুসলমান!
জোহর-নমাজ শেষ ক'রে আজ শোকর করিব তাঁয়—
রুটি-জল তার বন্ধ করেছি তাঁহারি এ দুনিয়ায়।

(আবার পায়চারী সুরু করিয়া)

এখনো এলো না! এত দেরী কেন? ঘটেনি তো কিছু পথে?
কে তারে বাঁচাবে?—বিচার হয়েছে খাঁটি শরীয়ত্-মতে।
সবচেয়ে পাকা জল্লাদ যেই তারে পাঠায়েছি আমি—

(পদশব্দ শুনিয়া)

ওই আসিতেছে!—হঠাৎ কি হ'ল? কপাল ওঠে যে ঘামি!
নাজের! নাজের!

(থাঞ্চায়-ঢাকা ছিন্নমুণ্ড লইয়া নাজির খাঁর প্রবেশ)

নাজির খাঁ

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এইবার খুশী হও!

(আবরণ উন্মোচন করিল)

আরংজীব

এ কার মুণ্ড!—আরে বেতমিজ! বে-অকুফ! বেইমান!
একি করেছিস! হুঁশ নেই তোর—নিয়েছিস্ কার জান্!
দারার মুণ্ড!—ধূলায়-রক্তে কে মাখালো এই কাদা?
ভেঙে গেছে নাক, ছেঁড়া দাড়ি-চুল, চোখ দুটা শুধু শাদা!
দাঁতে আর ঠোঁটে একি কাটাকাটি!—ঘসেছিলি বুঝি ভুঁয়ে?
রক্তের ফেনা দুই গাল বেয়ে পড়িয়াছে চুঁয়ে চুঁয়ে!
একবারও তোর হ'ল নাকি মনে মুণ্ড কাটিলি যবে,
সে যে দিল্লীর বাদশার ছেলে! আমারেও তুই তবে

তাহার হুকুমে করিতিস্ বুঝি এমনই বে-ইজ্জত ?
তোর কাছে তবে রাজমুণ্ডের কিছু নাই কিম্মৎ !
শাহজাদা দারা—হায়, হায়, তুই এতবড় জল্লাদ !—
কুত্তার মত মারিলি তাহারে ?—ওরে ও হারামজাদ্ !

নাজির খাঁ

সারা দুনিয়ার মালিক, আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি—
দুইয়েরি কসম, করিনি কসুর !—দুয়েরেই আমি চিনি।
জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই, আমারও ইমান আছে।
হালাল হারাম দুই যদি এক হইত আমার কাছে,—
যদি সে নিমকহারামির ভয় না রহিত এতটুক,
তোমার হুকুমে পাষাণে বাঁধিতে পারিতাম এই বুক !
খোদা রহমান্,—তাঁরো রহমতে আর দাবি নাই মোর
দাঁড়াব সমুখে হাঁটু-জোড় করি—হারায়েছি সেই জোর।
তামিল করেছি হুকুম তোমারি—তোমারে করেছি ভয়,—
খোদার বান্দা বেইমান বটে, তোমার বান্দা নয়।
দারা শাহজাদা—শিরায় তাহার তোমারি রক্ত বহে,
শির নেওয়া তার অপরাধ নয়—বেইজ্জত সে নহে !
কাটা-মুণ্ডটা ছুড়ে' ছিঁড়ে গেছে, লাগিয়াছে ধুলামাটি,
তাই দেখে বুক বিদরে তোমার (বুকখানা বড় খাঁটি !),
শুধু ফাটিবে না আমারি এ বুক, মানুষ নহি তো—অসি !
তবু সে তোমার মুঠিতেই বাঁধা, কেন কর তা'র দোষী ?

(আরংজীবের ক্রোধ বাড়িতেছে দেখিয়া)

গোস্তাখি মাফ কর খোদাবন্দ ! ভাবিনি এ কথা আগে,
ভেবেছিনু এই মুণ্ডের লাগি' প্রভু মোর রাত জাগে।
ধুয়ে সাফ ক'রে আনিতে সময় যেটুকু লাগিত, সেও
পলকে প্রহর হ'ত যে তোমার—মোর চেয়ে জানে কেহ ?
তবু দেরী হ'ল, ক্ষমা চাই তারি—আর যাহা অপরাধ
তার লাগি' গালি দিও না আমারে, আমি যে গো জল্লাদ !
মুণ্ডটা দেখো ভালো করে চেয়ে—নহে ওকি শা'জাদার ?
ভুল করিনি তো ? ক'রে থাকি যদি চাহিব না মাফ তার।

আরংজীব

জবান দেখি যে বড় বে-দুরস্ত—হয়েছিস্ দেওআনা ?
মুণ্ড কাহার শুনিতে চাহি না—ধুইলেই যাবে জানা।
তুই জল্লাদ, আমি চাই তোর কাজের কৈফিয়ৎ—
দারা শাহজাদা—তার মুণ্ডের করিলি বে-ইজ্জত !

নাজির খাঁ

সে কৈফিয়ৎ চেয়ো না তুমিও, বান্দারে দয়া কর—
ভুলিবারে দাও, বুক যে আবার কেঁপে ওঠে থর-থর।
আল্লার চোখ পারিনি ঢাকিতে—ঢেকেছিনু মোর চোখ,
সে চোখ খুলিতে বোলো না, বোলো না—গোস্তাখি মাফ্ হোক !

আরংজীব

আরে বুজরুক্ ! বুজরুকি রাখ ! কথার জবাব চাই—
আমি চেয়েছিনু শিরটাই শুধু, এ তো আমি চাহি নাই।

নাজির খাঁ

হারে জল্লাদ ! আল্লা, মানুষ—কাহারে করিস্ ভয় ?
দিল্ সাথে তোর একি দিল্লাগি—এখনও শরম হয় ?
কাহারে ভুলাবি ওরে ও মূর্খ ! জল্লাদপনা তোর
সাধ মিটায়েছে কাল রাতে, সে কি মানিবি না খুন-চোর !
ছুরীর ফলকে ঝলকে-ঝলক রক্তের ফোয়ারায়
অট্টহাসির তুফান তুলেছি—খোদা চেয়েছিল ঠায় !
জানিতে চাহ কি, জাহাঁপনা, এই নফরের কেরামতি ?—
রহিবে না রোষ—দেখিবে যখন এতটুকু গাফিলতি
করেনি বান্দা ; গোনা হ'য়ে থাকে মনিব সহিবে কেন ?
আলমগীরের নফর আমি যে, সে কথা ভুলিনে যেন।

(একটু থামিয়া)

আলোয় আকাশ উঠেছে ভরিয়া, আমি যে আঁধার চাই ?
রাত্রির তারা সেও সহিবে না—সেটুকুও রোশ নাই।
বন্ধ করিনু ঝরোকা কপাট, তুমি শুধু চেয়ে থাকো,
ঐ আঁখি দুটা—উহারি আলোকে ভয় আর পাব নাকো।
বন্দীশালায় দারার কক্ষে প্রবেশ করিনু যবে,
এমনি আঁধার, স্তব্ধ রাত্রি, দুই পহরই সে হবে।
এক কোণে শুধু মিটিমিটি জ্বলে ক্ষুদ্র দীপের শিখা,
তাহারি আলোকে দারা লিখিতেছে কি জানি কিসের লিখা।
এক পাশে তার ছেঁড়া কাঁথা'পরে শুয়ে আছে শিপাহার,
আমারে দেখিয়া বুঝিল তখনি—সে কি তার চীৎকার !
সিপাহী দু'জন হাত-পা বাঁধিয়া বাহিরে লইল তারে,
ফিরিয়া চাহিতে হেরিনু কী মুখ !—আঁকা সে কি হাহাকারে!
হাহা, হাহা, হাহা ধ্বনি শুনি, তবু মুখে নাই কোন রব,
কি দেখিতে কি যে দেখিলাম সেই ! ঘুরে গেল মতলব।
এয়্ খোদা ! ওকি মানুষের মুখ !—দেয়ালের মত শাদা !
চেয়ে আছে, তবু চাহনি কোথায় ? এই দারা, শাহজাদা !
সহসা শুনিনু, কে যেন কোথায় ডেকে বলে "সাবধান !
রক্ত উহাতে কিছু নাই আর, হ'য়ে গেছে কোরবান—
আল্লার ছুরী জবেহ করেছে—বকৃরিও সব-সেরা !
বদ্‌নসীবের সব লাঞ্ছনা—খুন সে কলিজা-ছেঁড়া—
নিঃশেষ করে' নিয়েছে নিঙাড়ি' ; আর কেহ ওর পরে
এত সহিবে না, ও যে সহিয়াছে সব মানুষের তরে।"
শুধু একবার—

আরংজীব

এ জবান তুই শিখেছিস্ কোন্‌খানে ?
জিবখানা টেনে ছিঁড়ে ফেল্ তোর ! যা' বলিলি তার মানে
বুঝেছিস নিজে ? না-পাক্ ! হারাম !—তুই না মুসলমান !—
দারারে আল্লা সবার বদলে লইয়াছে কোরবান্ !
হেন কথা তুই শিখিলি কোথায়—খাঁটি এ কেরেস্তানী ?
দারা নিজে বুঝি দিয়ে গেছে তোরে তার সেই বেইমানী ?
ফের যদি তুই আমার সমুখে করিবি বদ্‌জবান,
নিজ হাতে এই তলোয়ারে আমি নিব তোর গর্দ্দান।

নাজির খাঁ

দোহাই তোমার, আলা-হজরত ! মাফ কর গোস্তাখী,
কি বলিতে কি যে বলে' ফেলি আমি, বুঝি না কো, চেয়ে থাকি।
সে সময়ে তবে বুকের ভিতরে শয়তান নিশ্চয়
করেছিল বাসা—বুঝিনু, সে মুখ দারার কখনো নয় !

ঝাপটে তখনি বাত্তিটা নিবায়ু, হেরিনু অন্ধকারে
জ্বলে ওই আঁখি—আগুনের কোঁটা !—নিবাতে নারিনু তারে।
এক লাফে ধরি' গর্দ্দান শেষে ঠাহর মেলে না আর—
জড়াইয়া যায় দাড়ি আর চুলে কণ্ঠনালীর হাড়।
হঠাৎ কেমনে খঞ্জরখানা হাত হ'তে গেল ছুটে',
হাতাড়িতে গিয়ে আর একখানা আসিল আমার মুঠে।
ছোরা নয়—ছুরী, কলম কাটিতে দারা রেখেছিল বুঝি,
তাই দিয়ে জোরে গর্দ্দানে টান দিনু শেষে সোজাসুজি।
বসিল না তবু, পিছলিয়া আসে, মুখ ঘসে যায় ভুঁয়ে,—
একটি আওয়াজ করিল না তবু, ঘাড় গেছে ভেঙে নুয়ে।
খুনের ফিন্‌কি সারা দেহময়, কণ্ঠ হয়েছে ফুটা,
তবু সাড়া নাই, শুধু দেহখানা যেন সে লোহার খুঁটা !
কলম-কাটা সে ভোঁতা ছুরীখানা হানিতেছি বার বার—
আর সে বাহিরে ছেলেটার সে কি বুক-ফাটা চীৎকার !
তারি মাঝে, যেন পাগলের মত হাঁটু দিয়ে তার বুকে
মাথাটা ছিঁড়িতে মেঝের উপরে কতবার গেল ঠুকে'।
হাতে করে' নিয়ে ছুটে বাহিরিতে দেখি সে আরেক বাধা,
ঘরের দুয়ারে ছেলেটা লুটায়—বেহোঁশ, হাত-পা-বাঁধা।
ভাবিনু তাহারো যাতনা জুড়াই—হুকুম ছিল না জানি,
খুন-মাখা হাত ছাড়িবে না তবু করিতে মেহেরবানি।
কাটা-মুণ্ডটা ফেলিনু মাটিতে—চাহি' লয়ে তরবার
তুলিনু যেমনি, চোখ মেলে পুন চাহিল যে শিপাহার।
তলোয়ার ফেলে, মুণ্ডটা শুধু চুলের মুঠিতে ধরি',
পলাইয়া এনু ; ছেলেটারে তারা রাখিল বন্ধ করি'
সেই ঘরে, যেথা দারার দেহটা রক্তে ভাসিয়া আছে,
পুত্র পিতার ধড়খানা ল'য়ে বাকি রাত জাগিয়াছে !
সারাপথ আর ভাবি নাই কিছু ; তবুও ভুলিনি, প্রভু !
তুমি জেগে আছ, ঐ দু'টা চোখে পলক পড়েনি কভু।
দারা শাহজাদা—তার ইজ্জত রাখিতে পারিনি বটে,
তোমার হুকুম তামিল করেছি, কহিনু তা' অকপটে।

আরংজীব

বুঝিলাম, যত বেইমান তুই, কে-অকুফ তার বেশি,
শয়তান সাথে লড়াই করিয়া, জিতেছিলি শেষাশেষি।
ঘুচেছে তো ভয়, এইবার তবে খুলে দে জানলাগুলা,
ওটারে এখনি সাফ করে' আন্‌, মুছায়ে ময়লা ধুলা।
ঢাকা দিবি এই জরীর কাপড়ে, করিবি না তাড়াতাড়ি,
দেখিস, এবার ঠিক থাকে যেন ও মুখের চুল-দাড়ি।

(মুণ্ড লইয়া নাজিরের প্রস্থান)

(জানু পাতিয়া)

বান্দা তোমার বুজদিল্ নয়—তুমি জানো, তুমি জানো !
দিল্ যদি টলে এতটুকু, তবে বজ্র তাহাতে হানো।
দারা দুষমণ্, আমারও—কেন না, তোমারি সে দুষমণ,
কাফেরের সাথে কেরেস্তানিতে সঁপেছিল প্রাণমন।
তোমার আদেশ—শ্রেষ্ঠ সে বাণী—কোরাণের তৌহিদ
বরবাদ করে' বুত পরস্তি করিবারে তার জিদ।
সেই দারা চায় তখ্‌ত-তাউস ! ইস্‌লামে করি' নাশ
আকবর-শাহা চেয়েছিল যাহা—পুরাইত সেই আশ।
ভাবিতেও সে যে শিহরিয়া উঠি ; মন বলে, না-না—না-না !
বাদশাহী নয়—তোমারি হাতের পেয়েছি এ পরোয়ানা,
হিন্দুস্থানে কাফেরের ডেরা বিলকুল ভাঙা চাই !—
তখ্‌তে বসিয়া মোগলেরা কেহ সেই কথা ভাবে নাই।
আমি করিয়াছি জীবনের সার-মন্ত্র, 'লা-ইল্লাহা',
সে যে 'লা-শরীফ'—আর কিছু তরে করি যদি 'আহা, আহা' !
তবে সেই 'এক'—সেই 'আহদে'র খেলাপ হবে যে তায়,—
নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে' আসা মদিনায় !
হোক্ ভাই, হোক্ পুত্র কি পিতা, তোমা চেয়ে কেবা প্রিয় ?—
ছুরী দিয়ে তুমি কলিজায় মোর সেই কথা লিখে দিও !
খোদার বান্দা নহে যেই জন, এনসান্ তারে কহে ?
সে যে জানোয়ার, বৃথাই সে জন মানুষের দেহ বহে ?
সাপ, বাঘ, আর ক্ষ্যাপা শিয়ালেরে মারিতে কে করে শোক্ ?
মানুষের রূপ ধরে যদি তারা, আরো সে যে ভয়ানক !
দারা বেইমান, কাফেরের রাজা !—হিন্দু, কেরেস্তান !
আমি মারি নাই, তোমারি গজবে হারায়েছে তার প্রাণ।
তবু আফশোস নাই যদি ছাড়ে, দিলটারে ছিঁড়ে নাও !
নাও ছিঁড়ে নাও, মারো শয়তানে, বান্দারে বল দাও !

(পদশব্দ শুনিয়া পূর্ব্বের ভাবধারণ—নাজিরের পুনঃপ্রবেশ)

ঐখানে রাখ, ঝালর-ঝুলানো রূপার কুর্সী 'পরে ;
খুলে দে কাফন,—কুর্ণিশ কর। ফের বেয়াদবি করে।...
সেই মুখই বটে, তবু সোবে হয়, যায় নাকো ঠিক চেনা ;
দেখি চোখ দু'টা,—বুজে আছে কেন ? ভালো করে খুলে দে না !
থাক্, থাক্ ! তুই ছুঁস্ না উহারে—সরে' দাঁড়া কুক্কুর !
তোর কাজ শেষ—এখনো এখানে !

(তরবারি খুলিয়া)

তবুও হ'লি না দূর !

নাজির খাঁ

বান্দা হাজির রবে যে হুজুর ! এখনো বলনি তুমি,
দারারই মুণ্ড আনিয়াছি কিনা ; তার পর মাটি চুমি
শেষ কুর্নিশ করিব তোমারে, তার আগে ছুটি নাই।

আরংজীব

ঠিক্, ঠিক্। তুই হুঁশিয়ার বটে—ইনামটাও যে চাই !

(তরবারির মুখ দিয়া দারার দুই চোখ একে একে খুলিয়া দেখার পর)

আছে বটে, আছে !—সাদার উপরে ছোট সেই কালো দাগ।

নাজির খাঁ

(কুর্নিশ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে)

এবার চলিনু, গরিবের 'পরে আর করিও না রাগ।
চাহি না ইনাম, তোমাকেই দিনু দিল্লীর ঐ তখ্‌ত্—
এই জল্লাদ—এই নাজিরের নজরানা।

আরংজীব

(দারার ছিন্নমুণ্ডের পানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া)

বদবখ্‌ত !

[শেষ]

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের দান

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে, ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাস এবং বাঙ্গলায় তার প্রচার সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সঙ্গীত-শিল্পিগণ কর্ত্তৃক ইহার বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলা দেশের মধ্যে বিষ্ণুপুরে এবং পরে কলিকাতায় সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের 'সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে' এবং কলিকাতার 'সঙ্গীত-সমাজে' তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বাঙলায় সঙ্গীত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। তৎকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পিগণ, ভাবের দিক থেকে যেমন সঙ্গীতের এক নবযুগ এনেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি প্রসিদ্ধ গীত রচয়িতাদের উচ্চাঙ্গ সুরে তালে গঠিত গান বাঙ্গলার সঙ্গীত-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল। নব সৃষ্টির উন্মেষ জাগিয়েছিল গীতিকার ও সুরকারের প্রাণে। সঙ্গীতের মূলকে অবিকৃত করে এই নব সৃষ্টি তখন সমগ্র ভারতকে চমৎকৃত করেছিল। তাই কি না 'বিষ্ণুপুর', ছোট দিল্লী এবং সমগ্র বাঙ্গলা 'গানের দেশ' বলে অভিহিত হত।

ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বলতে যা বুঝি, তার চরমোৎকর্ষ হয়েছিল উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ মোগল রাজত্বের সময়। সেই সঙ্গীতের স্রোতই বাঙ্গলায় বয়ে এসেছিল। এই সঙ্গীত, শিক্ষা ও প্রচারে বাঙ্গলা পশ্চিমের কাছে ঋণী। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পশ্চিমের বহু শ্রেষ্ঠ গুণী, বাঙ্গলায় এসে তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন। শিক্ষাদানে তাঁরা কার্পণ্য করেন নি। বাঙ্গালীর মেধা ও প্রতিভা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। তখনকার দিনে ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ গুণী বাঙ্গলাকে সঙ্গীত প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে মেনে নিয়েছিলেন।

বাঙ্গালী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন পশ্চিমের ওস্তাদগণের নিকট। কিন্তু তাঁরা দীক্ষিত হয়েছিলেন নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও ভাবপ্রবণতায়। যেখানে গুরুর শিক্ষার হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়, সেখানে শিক্ষার পূর্ণতা নয়—অসমাপ্তি। শিক্ষার সার্থকতা তখন—যখন অন্তর অনুভূতি নিবেদিত হয় নবরূপে, নবকল্পনায়। শিক্ষা চরিতার্থ হয় নব সৃষ্টিতে। বাঙ্গলায় সঙ্গীত শিক্ষা ও প্রচার সার্থক হয়েছিল, কারণ বাঙ্গলার কৃতী শিল্পিগণ সঙ্গীতের মধ্যে এনেছিলেন ভাবপ্রবণতা ও তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন সাহিত্যে। এই সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে যোগাযোগ বাঙ্গালীর এক অতুলনীয় সৃষ্টি। প্রায় আড়াই শ' বৎসর পূর্ব্বের কথা—রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) বাঙ্গলা গান রচনা করে গেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। শোরী ও গুলাম নবী রচিত পাঞ্জাবী ভাষার টপ্পার অনুকরণে তিনি বাঙ্গলা গান রচনা করেন।

বাঙ্গলায় টপ্পা গান এই প্রথম। ভাষার লালিত্য, ভাবের পূর্ণতা ও সুর-সৌন্দর্য্যে এই গানগুলি বাঙ্গলা সঙ্গীতের উজ্জ্বল রত্ন। নিধু বাবুর রচনার মধ্যে টপ্পা অঙ্গের গানই বেশী, কিন্তু খ্যাল ঠুমরীর অনুকরণেও অনেক গান আছে। বাগেশ্রী, শোহিনী, ইমন কল্যাণ, মালকোশ, বসন্ত বাহার প্রভৃতি রাগের গানগুলি তার প্রমাণ। 'বসন্ত-বাহার' বসন্ত ঋতুর সুর। নিধু বাবু রচিত একটি 'বসন্ত-বাহারে'র গান প্রদত্ত হ'ল।

"বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল,
সব প্রফুল্ল-ফুল কানন,
মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তায়,
পিক করে কুহু কুহু, মধুকর আনন্দিত
সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন"।

* * * *

আবার তিনি গেয়েছেন সুমধুর টপ্পার ঢংয়ে—

"নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে
আমার যে মন প্রাণ সঁপেছি তোমারে"

* * * *

পাঞ্জাবী টপ্পা ভেঙ্গে তিনি দিয়েছেন তাঁর সুললিত ভাষা

"সে বিনে যাতনা দুখ জানাইব কারে
অন্তরের দুখ যত রহিল মম অন্তরে"

* * * *

গুলাম্ নবী ও শোরী রচিত মূল টপ্পা গানের ভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কিন্তু নিধু বাবুর সুললিত ভাষা ও ভাবের সহিত তার কোন অংশেই তুলনা হয় না। নিধু বাবুর প্রায় সমসাময়িক দেওয়ান অকিঞ্চনের রচিত অনেক গান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-পর্য্যায়ভুক্ত।

অধিকাংশই শ্যামাসঙ্গীত ও খ্যালের সুরে ও তালে গীত হত। নিধু বাবু জন্মগ্রহণ করেন ১১৪৮ সালে। এর পর এক শতাব্দীর মধ্যেই শ্রীধর কথক রচিত দেবদেবী বিষয়ক ও প্রণয়-সঙ্গীত, বাঙ্গলার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তুলে। তাঁর হিন্দী খ্যাল ভাঙ্গা একটি গান প্রদত্ত হল :—

"অপরূপ দেখ ললিতে,
নব যোগীর বেশে কে গো এসে ছলিতে।
বাঘাম্বর শিঙ্গে ধরে, সদা রাধার নাম করে,
হেন মনে অভিলাষ—যোগিনী হ'তে।
ভস্মাঙ্গে ভুজঙ্গ-হার! শিরে শোভে জটাভার,
হেরি কুঞ্জের দ্বারে ব'সে নারি চিনিতে।"

আবার সুমধুর সিন্ধুরাগে ও মধ্যমান তালে, টপ্পার অনুকরণে রচনা করেছেন, তাঁর বিখ্যাত প্রণয়-সঙ্গীত

"মরমে মরম যাতনা, ভালবাসার অযতনে
একা যে এ কাজে মজে
বাজের অধিক বাজে প্রাণে"

সাধক কবি কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সুরে ও তালে গাওয়া হত। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ রচিত গান প্রচলিত রামপ্রসাদী সুরে গীত হলেও তার অনেকগুলি গান খ্যাল ও টপ্পার ঢং সংগীত হয়। দাশরথি রায়, রাধামোহন সেন প্রভৃতি রচিত বাঙ্গলা গান এক সময় বাঙ্গলায় সঙ্গীতশিল্পিগণ কর্ত্তৃক বড় বড় সঙ্গীত-আসরে গীত হত। এ যুগে আরও কত গীতিকার নানা প্রকার প্রচলিত ঢংয়ের অনুকরণে গান লিখে গেছেন—তার মধ্যে বেশীর ভাগই বিলুপ্ত।

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন বাঙ্গলা সঙ্গীতের এক স্মরণীয় যুগ। যুগ-মানব মহাত্মা রামমোহন এই সঙ্গীতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভায়' যে সকল সঙ্গীত হত, তা পুরাপুরি হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়ালের ন্যায়। তাঁর রচিত গানগুলি বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই একসঙ্গে সে গান গাইতে পারেন। আর একটি বিশেষত্ব তাঁর গানে এই যে, ধ্রুপদ সঙ্গীতের পূর্ণ রূপ তাতে বর্ত্তমান। ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনায় এই সকল গান মৃদঙ্গ ও তাম্বুরা যোগে গীত হ'য়ে থাকে। মহাত্মা রামমোহনের 'ব্রাহ্মসভায়' সেকালের এক প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক গোলাম আব্বাস সঙ্গত করতেন। রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্রগণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেছেন। উপনিষদের বাণী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হয়েছে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে। ব্রহ্ম-সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনার সময় বাঙ্গলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একাধিপত্য ছিল। বাঙ্গলা দেশে তখন ভারতপ্রসিদ্ধ গুণী থাকতেন এবং বাঙ্গলা দেশের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ভারতীয় সঙ্গীতকে নানা ভাবে শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন। বাঙ্গলার সুর ও কথার ভাবের বন্যা সমস্ত ভারতকেই প্লাবিত করেছিল। সঙ্গীতের মূল আদর্শ—ভাবপ্রবণতা এবং ইহার সৃষ্টি বাঙ্গলা দেশে। বাঙ্গলা 'গান'কে বরণ করলেন আত্মনিবেদন রূপে, আত্মপ্রকাশের জন্য নয়। এই প্রকাশভঙ্গীর যথেচ্ছাচারিতা অনেক সময় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শকে খর্ব্ব করেছিল এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়। বাণীকে কত রূপে বিকৃত করা সম্ভব, নানারূপ কসরতি, বেকসরতি তান দিয়ে এবং গায়ক ও বাদকের মধ্যে 'লয়ের লড়াই' যেটা প্রায় হাতাহাতির সমতুল্য—এরূপ ওস্তাদের অভাব ছিল না এবং এখনও যে অভাব আছে তা' বলা যায় না। সেকালের বাঙ্গলায় স্বনামধন্য সঙ্গীত-শিল্পিগণ ছিলেন ভাবের উপাসক। তাঁরা বর্জ্জন করলেন, বিকৃত রূপকে—যে অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য গানের সৌন্দর্য্য হানিকারক, তাও তাঁরা বর্জ্জন করলেন এবং গ্রহণ করলেন যা' অন্তরকে স্পর্শ করে ও যা' আত্মনিবেদনের অনুকূল, সঙ্গীতের শাশ্বত রূপের তাঁরা উপাসক হলেন। সঙ্গীতের এই সনাতন আদর্শই বাঙ্গলার কবিগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ গুণী আসতেন। তাঁরা সকলেই ধ্রুপদ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের প্রভাব এসেছিল মহর্ষির পুত্রগণের উপর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আনলেন বাঙ্গলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে যুগান্তর। স্বনামধন্য যদু ভট্টের রচিত হিন্দী গান ছিল, তাঁর হিন্দী-ভাঙ্গা গানের অন্যতম আদর্শ। যদিও তিনি হরিদাস স্বামী, তানসেন, বৈজু, নায়কগোপাল থেকে আরম্ভ করে বেতিয়ার নওলকিশোর ও আনন্দকিশোর প্রভৃতি রচিত গানের অনুকরণে বাঙ্গলা গান লিখেছেন। কবিগুরু নিজেই বলেছেন যে, যদু ভট্টের রচনার মধ্যে কথা, সুর ও ছন্দের এমন একটা সমন্বয় ছিল, যা' তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। হরিদাস স্বামী রচিত গান—"নাচত ত্রিভঙ্গন" অনুকরণে তিনি রচনা করলেন "বিপুল তরঙ্গ রে"। তানসেন রচিত "নাদ নগর বসায়ে"

ধ্রুপদের নকলে তাঁর বিখ্যাত গান লিখলেন "প্রভাতে বিমল আনন্দে"। শাক্ত কবি নওলকিশোর রচিত 'এ রাত্তিয়া মেরো' ধ্রুপদের অনুকরণে "এ ভারতে রাখো নিত্য,' আনন্দকিশোর রচিত 'তুয়া চরণ কমল পর' খ্যাল গানের অনুকরণে 'তব অমল পরশ রস' এবং যদু ভট্টের বিখ্যাত বাহার রাগের ধ্রুপদ "আজু বহত সুগন্ধ পবন' অনুকরণে 'আজি বহিছে বসন্ত পবন' গান লিখলেন। কয়েকটি উদাহরণ মাত্র দিলাম। কত শত গান লিখেছেন তিনি পুরাণ ও তাঁর সমসাময়িক গায়ক কবিদের অনুকরণে। বহু জটিল ও অপ্রচলিত রাগও তাঁর রচিত গানে সন্নিবেশিত আছে। যথা বিভিন্ন শ্রেণীর কানড়া, তোড়ি, সারঙ্গ, মারু-কেদার প্রভৃতি। তানসেনের বংশধর, বাহাদুর সেন প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতধারার আদর্শ বিষ্ণুপুর ঘরানা সঙ্গীতজ্ঞগণ রক্ষা করেছিলেন। এই ঘরানার রাগরাগিণী কোন অংশে অবিকৃত হয়নি। এই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-ধারাই কবির আদর্শ ছিল। সেই জন্য তাঁর রচিত আশাবরী রাগের গানে কোমল ঋষভ এবং 'পূরবী'তে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার আছে। স্বর কিংবা স্বর-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন শাস্ত্রের নিয়মের ধার ধারে না। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের সুবিধা ও মত জাহির করার উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। বাঙ্গলায় প্রচলিত খাঁটি 'বসন্তের' স্থান অধিকার করেছে "পরজ বসন্ত"। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মতকেও অনুমোদন করেন বাঙ্গলায় অধিকাংশ শিল্পিগণ। 'বসন্ত' রাগ যা বহু কাল হ'তে চলে আসছে এবং সে রাগরূপ বাঙ্গলার বাহির থেকেই আমদানী, সেটা হঠাৎ কিরূপে পরিবর্ত্তন হল এবং সমর্থিত হল, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, গুরুপ্রসাদ প্রভৃতি গুণিগণ শুদ্ধ 'বসন্তই' শিখিয়ে গেছেন

বাঙ্গলায়। রাগরাগিণীকে পরিবর্ত্তন বা বিকৃত করা সঙ্গীতের উন্নতির পক্ষে প্রতিকূল বলে আমার ধারণা। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত রাগরাগিণীর অবিকৃত ও মধুর রূপ রবীন্দ্রনাথের রচিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর-সংযোজনার প্রধান অবলম্বন স্থল। কবির মনে রেখাপাত করেছিল সেই সুললিত সুর। সেই জন্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনায় কবি ঐ মতকে রক্ষা করে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ধ্রুপদ খ্যাল ও ঠুমরীর গায়কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে আসছে। কবিগুরুর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দুন, তান ও নানাবিধ অলঙ্কারযোগে পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ও পিতৃব্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীতে যথোপযোগী অলঙ্কার প্রয়োগ বিষয়ে ইঁহারাই প্রধান পথ-প্রদর্শক। কবিগুরু কর্ত্তৃক ইঁহাদের গান উচ্চ-প্রশংসিত ও সমর্থিত হয়েছে।

বাঙ্গলার সঙ্গীত সংস্কৃতিকে তার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। সঙ্গীত ক্ষেত্রে বাঙ্গলার দান অপরিসীম। এ দানের তুলনা সমগ্র ভারতে মেলে না। ইহাকে সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত-পর্য্যায়ভুক্ত করতে আমরা কুণ্ঠিত কেন? বাঙ্গলার রত্নকে উদ্ধার করা ও জগৎ সমক্ষে তার মহিমা প্রকাশ করার ভার ত' বাঙ্গালীর। জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সঙ্গীতে। সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দরকার; যা'তে বাঙ্গালার সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশরূপে স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা সঙ্গীতের কর্ণধার তাঁরা এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 'রাগপ্রধান' বা অন্য কোনরূপে আখ্যায়িত হতে পারে না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হলেই উচ্চাঙ্গ এবং বাঙ্গলার সঙ্গীত হলেই 'রাগ-প্রধান' এই পার্থক্যের মূল কারণ কি? যে সঙ্গীতে রাগভাব প্রধান তাহাই ত' রাগপ্রধান। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগই প্রধান। অথচ বাঙ্গলার সঙ্গীতকে যেন একটু নীচু স্তরে রাখবার জন্যই অভিধান খুঁজে এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় যে সকল বড় বড় জলসা হয় তাতেও কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কোন স্থান ছিল না। কিছুদিন হ'ল কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। শ্রোতৃবর্গের রুচির পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন এবং তদনুযায়ী এ বৎসর রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরূপের পরিচয় ও তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সময়-সাপেক্ষ। এই সব জলসায় অনেক সময় নিরর্থক ব্যয় হয়। বাঙ্গলার সঙ্গীতের আলোচনা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্মেলনে যেখানে সর্ব্ব-ভারতীয় সঙ্গীত-প্রতিনিধি সম্মিলিত হন সেখানে নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া আবশ্যক। এরূপ কয়েকটি সম্মেলনে আমার উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবার সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতের বিশিষ্ট কলাবিদ্ ও সঙ্গীত-প্রতিনিধিগণ উচ্চাঙ্গ সুরের ও ভাবের রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে চমৎকৃত হয়েছেন। তাঁরা আমাকে বলেছেন, বাঙ্গলার নিজস্ব এরূপ সঙ্গীত আছে, তা তাঁদের ধারণা ছিল না। বাঙ্গলা ভাষা ভাল না বুঝলেও, সুর, ছন্দ ভাবের সামান্য আভাস তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। এমন কি, কয়েক জন আমার নিকট গানের ভাবার্থও শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদেরই inferiorily complexয়ের (নিকৃষ্টতা বোধ) জন্য বাঙ্গলার সঙ্গীত তার যোগ্য স্থান পায় নাই। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীতের মর্য্যাদা শুধু বাঙ্গলায় কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও হওয়া উচিত। এ জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রচার ও সঠিক পরিবেশন। অনেক সময় যথারীতি পরিবেশন অভাবে এই সঙ্গীত হৃদয়গ্রাহী হয় না। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচারক যাঁরা হবেন তাঁদের শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত সর্ব্ব-ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গীভূত হবে; এবং সমগ্র ভারতেই বাঙ্গলার এই অতুল কীর্ত্তির জয়গান ঘোষিত হবে। সে দিন আগত ঐ।

চোখ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

তোমার স্তব্ধ সজল চোখের সিরিকের পাতা খুলে
অন্ধকারের অঞ্জনটুকু এঁকে দিয়ে গেল মেঘ
স্বপ্নের ঢেউ ছল-ছল করে অলস দেহের তটে
উষ্ণ ছোঁয়ায় রক্তের মাঝে ওঠে ঝর্ণার বেগ।
ঘন কালো রাত নির্জন পথ সবুজ শিরীষ-বন
তোমার চোখের ঘুম কোথা আজ—শুধু কান্তির জাগরণ।

আম-কাঁটালের ছায়ায় এখানে কতো স্বরলিপি লেখা,
প্রস্তর আর অরণ্য-যুগের শিলীভূত ইতিহাস
মমির মতন ঘুমায় এখানে, মোমের আলোর মত
চুপি চুপি জলে শেষ রজনীর ঘুম-পাওয়া নীলাকাশ।
কাজলের রেখা মুছে মুছে গেছে নিথর চোখের জলে
আলোয়া এখনো কান পেতে আছে তোমার শয্যাতলে।

হে বন্ধু, আজ হিসাব দেবে কি এখানে সকাল বেলা
কোন্ ফসলের আঁটি তুলে দিলে কাল সারা রাত ধ'রে
কি দিয়েছ তুমি ক্ষুব্ধ চোখের ছোট সিরিকের গানে
ঘাসে ঘাসে কেন সন্ধ্যার সুর এমন শুভ্র ভোরে!
তোমার প্রেমের মুঠো মুঠো আলো ছড়াল মাটির পথে
সে আলোর চিঠি ফিরে যায় কেন আমার উঠান হ'তে?

আজি প্রাতে উঠে তোমার চোখের স্বপ্নের পাতা খুলে
হঠাৎ জেনেছি আমার মৃত্যু কালো কালি দিয়ে লেখা
রাত ভোর হ'লে শয্যা যখন এলোমেলো ইতিহাস
সেখানে তখন তুমি মুছে গেছ, আমি শুধু সেই একা।
তোমার চোখের অরণ্য ছায়া বাইরের দ্বার টেনে
প্রথম প্রেমের এক মুঠো আলো তবু সে দিয়েছে এনে।

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আচ্ছা মা, মাটীর ঠাকুর কি জ্যান্ত হয় না ?—অভিমানের সুরে মাকে শুধালেন বালক বামাচরণ।

বালকের মুখে এ কথা শুনে জননী রাজকুমারী দেবী চুপ করে থাকেন ; সিদ্ধ বশিষ্ঠের বংশের সন্তান এঁরা ; স্বামী সর্বানন্দ 'তারা', 'তারা' বলেই আধ-পাগল ; দারিদ্র্যের তাড়না এ সংসারে ; ঘরে চাল বাড়ন্ত ; সদানন্দ সর্বানন্দ শুনে বেহালায় সুর দেন,—

'মন, তারানামে তার স্বরে তারে কেন ডাক না,
উদারা মুদারা তারা হয়ে তারায় আত্মহারা
তারায় তারা দেখে তারা সাথে মিশে যাও না।'

সেই সর্বানন্দের বড় ছেলে বামাচরণ ; মাটীর ঠাকুর গড়ে, পুজো করে বনফুলে ; গাছের ডাঁসা পেয়ারা কচুপাতায় সাজিয়ে প্রাণ ভরে ডাকে : 'ঠাকুর, কথা কও, কথা কও ; পেয়ারা খাও।'

কত ডাকাডাকি কত সাধাসাধি, তবুও ঠাকুরের দয়া হয় না। মাকে আবার শুধোয় : 'বল না মা, কি করলে ঠাকুর জ্যান্ত হয় ?' তাঁর কণ্ঠে যেন করুণ আর্তনাদ ; রাজকুমারী মনে মনে তারা-মাকে স্মরণ করলেন : 'মা, আমার পাগলা ছেলেকেও তুমি পাগল ক'রে দিলে ? আমার সংসার যে অচল হয়ে পড়বে মা !' তার পর ছেলের চিবুক স্পর্শ করে বললেন, 'বাবা, ঠাকুর সব সময়েই জ্যান্ত, তাঁকে প্রাণ ভরে ডাকলেই কথা শুনেন।'

ছেলের আগ্রহ আর ভক্তি আরও বেড়ে যায় ; মা বললেন, 'প্রাণ ভরে ডাকলে ঠাকুর সব কথা শুনে, তবে আমার কথা শুনবে না কেন ?' বালক মাটীর কালীকে জ্যান্ত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে, পেয়ারার টুকরো ঠাকুরের মুখে গুঁজে দিয়ে, 'নে মা, খা মা' বলে কাকুতি মিনতি করে, হাসে, কাঁদে, চোখের জলে ভাসে ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। প্রমাদ গণলেন মা ; ছেলে যে উঠে না ; বেলা ব'য়ে যায়। বার বার ডাকলেন মা, 'বামা, ভাত খাবি আয়।' কিন্তু কে কার কথা শুনে ! 'কই, তুমি বললে, ঠাকুর কথা শুনে !' গদগদ কণ্ঠে বলে বামাচরণ ; হাত-পা ছুড়ে কাঁদে। দাওয়ায় বসে সর্বানন্দ হাসেন আর উচ্চ স্বরে ডাকেন, 'জয় তারা, জয় তারা।'

তারাপীঠের তারা মা সর্বানন্দের হৃদয়ে যে আত্মচৈতন্যের বীজ অঙ্কুরিত করেছেন, বালক বামাচরণে তারই সংক্রমণ ; বালক মত্ত হয়ে যায় ; তন্ময় হয়ে বসে থাকে দেবস্থান দেখলে ; কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুতের ছটা যেন কার হাসি ! নড়ে না, চড়ে না ; স্থির, নিস্পন্দ, বিভোর ভোলানাথ—শিব ; চোখে ধারা, হাসে, কাঁদে। পাড়ার লোকে বলে 'ক্ষ্যাপা'।

বীরভূমের তারাপীঠ : গাঁয়ের নাম তারাপুর। কুলু কুলু নাদে এক পাশে চলেছে দ্বারকা নদ ; তারই তীরে মন্দিরে বিরাজিতা দেবী তারা ;—'প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে' : দেবী ঘোরা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, খর্বাকৃতি, লম্বোদরা ও ভীমা। প্রবাদ আছে, এই দেবী ঋষি বশিষ্ঠের আরাধিতা। বীরাচারী তান্ত্রিক মতের প্রবর্তক এই বশিষ্ঠ ইনিই রঘুবংশে কুলগুরু, রামায়ণে আছে যাঁর কথা। বিশ্বামিত্রের শত অত্যাচারেও যিনি ছিলেন নির্বিকার। দেবীর মন্দিরের পাশেই চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির। নাটোর-লক্ষ্মীরাণীর ব্যবস্থাপনায় তখন তারাপীঠ পরিচালিত ; মুসলমান জমিদার আসাদুল্লার কবল থেকে অন্য মৌজার বিনিময়ে রাণী তারাপুর উদ্ধার করেছেন। তিনিই করেছেন নিত্যপূজার ব্যবস্থা।

তারাপীঠের সংলগ্ন মহাশ্মশান : প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে ভয়াল বুনো-গাছের এবড়ো-খেবড়ো সমাবেশ : বুনো জাম আর

● তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

ঝাওড়ায় গাছ ; ঝোপ-ঝাপ ; কোন কোন জায়গায় সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করতে পারে না ;—ঘোর অন্ধকার ! ছায়াপুত্রের অগ্রজ ধর্ম্মরাজের বীভৎস মালগুদাম ; চারি দিকে ছড়ান মানুষের মাথা আর কঙ্কাল, অবশ্য মরা মানুষ। মড়া ফেলে যায় শ্মশানে, শিয়াল আর কুকুরে ক'রে টানাটানি মারামারি ছিন্ন মৃতদেহ নিয়ে, মনের সুখে বিচরণ করে শকুনির পাল। শ্মশানের পাশেই বিরাট এক শিমুল গাছ : শ্বেত শাল্মলীবৃক্ষ ; লোকে বলে কল্পবৃক্ষ। তারই মূলে মণিপীঠ, বশিষ্ঠকৃত পঞ্চমুণ্ডীর আসনে দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তি। আসে কত আউল, বাউল, যোগী ও সন্ন্যাসী। কেউ মাথে ভস্ম ; কারো কপাল সিঁদূরে রক্তরাঙা, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল, মুখে তারা-নাম।

তারাপুরের পাশেই আটলা গ্রাম। সেখানেই বাস করেন সর্বানন্দ চাটুজ্জে ; পত্নী রাজকুমারী। নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; ভোলানাথের মতই সদানন্দ। অভাব-অনটন কিছুতেই তাঁর মুখের হাসি মুছে দিতে পারত না ; ছেলেবেলা থেকেই তিনি রামপ্রসাদী গানে বিভোর থাকতেন। তাই পিতা রামানন্দের দেওয়া সর্বানন্দ নাম তাঁর সার্থক হয়েছিল। সংসার তাঁর ছোট ছিল না, চারটি কন্যা ও দুইটি পুত্রের তিনি জনক। প্রথমা কন্যা জয়কালী বালবিধবা, দ্বিতীয় পুত্র বামাচরণ ; তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবী, চতুর্থ সন্তান কন্যা দ্রবময়ী, পঞ্চম কন্যা সুন্দরী, ষষ্ঠ সন্তান পুত্র, নাম রামচন্দ্র।

১২৪৪ সালের শিবচতুর্দ্দশী : দেবী রাজকুমারী পূর্ণগর্ভা ; বেদনায় কাতর ; সর্বানন্দ বেহালায় তান ধরেছেন,—

"ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন রূপ কাল হলো।"

এদিকে শিবপ্রতিম সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। প্রথম পুত্রের জন্ম ; শিবচতুর্দ্দশীর ঘোরা রজনী ভেদ ক'রে অদূরে তারাপীঠের চন্দ্রচূড় মন্দিরে ধ্বনি উঠে—হর হর, বম্ বম্। তার সঙ্গে শিয়াল-কুকুরের বীভৎস কোলাহল ; চাটুজ্জে-বাড়ীতে বেজে ওঠে মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি। সর্বানন্দ হাঁকেন—তারা, তারা—জয় তারা !

সাধক বামদেবের জন্মভূমি আটলাগ্রাম

সামান্য ক্ষেত-খামার ও জমি-জমা ; অতি কষ্টে চলত সংসার। এর উপর পূজা-পাঠের প্রণামীতে কোনরূপে চলে যেত ; তার উপর বিধাতা বাদ সাধলেন ; এক রত্তি সুন্দরী মেয়ে সর্বানন্দের হ'ল বিধবা, শাস্ত্র জানেন সর্বানন্দ ; বিদ্যাসাগরের যুগ তখন ; বিধবা কন্যার তিনি দিবেন বিয়ে। সমাজপতিরা বেঁকে দাঁড়াল ; তারা ত আর বিদ্যাসাগর নহে ? শাস্ত্রের নজীর তাদের কাছে তুচ্ছ ; গ্রামের আচারই তাদের কাছে বড়, কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র এবং চাণক্য-বচনই যাদের বেদ-বেদাঙ্গ তারাই সমাজের শাসক। কচি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেন রাজকুমারী ! স্বামীকে বলেন, 'পাড়ায় যে আমাদের ঠেকো করে দেবে ?' হেসে উত্তর দেন সর্বানন্দ, 'সবাই যাকে ঠেকো করে, ত্যাগ করে, তারা মা তাকে কোল দেন ; ভয় কি ? তাঁর নাম নিয়ে পাড়ি দেব।'

ম্লান মুখে অন্তরের ব্যথা চেপে রাজকুমারী বলেন, 'কুলে যে কালি পড়বে।'

'পড়ুক কালি ; তাতে ভয় করি না, আমার পিছনে কলুষ-নাশিনী কালী আছেন।'

সর্বানন্দ দৃঢ়চেতা, টলবার ছেলে তিনি নন ; বিধবা মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু সমাজের বিচারে হলেন একঘরে ; চক্রীর চক্রান্তে ক্ষেত-খামারেরও কিছু ক্ষতি হ'ল। ঠাকুরের কথায়, 'লাজ, মন, ভয়,' এই তিনটেই ছিল তাঁর করতলগত। এমন বাপের ছেলে বামাচরণ ; তিনি বলতেন,—'আমার যুগ্যিমস্তর বাবা !'

* * * *

অভিমানের সুরে বলেন রাজকুমারী, 'ওগো, ছেলে যে বড় হয়েছে ; একটু লেখাপড়া না শিখলে যে পুজো-পাঠও করতে পারবে না। তোমার গান-বাজনায়ও পেট ভরবে না ; তাই আমি ছেলেদের কাল পাঠশালায় পাঠাব মনে করেছি।' কিন্তু সর্বানন্দ কি বুঝে তখন গান ধরলেন,—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

পরের দিন মাতা দুই ছেলে বামাচরণ ও রামচন্দ্রকে পাঠালেন গুরুগৃহে পাঠশালায় ; কাণে গোঁজা কঞ্চির কলম, ডান বগলে তালের পাতা, হাতে বাংলা কালির দোয়াত ; আর বাম বগলে তালপাতার চাটাই। এই ছিল তখনকার রেওয়াজ। সঙ্গে চলল, পুরাতন ভাগচাষী কিষাণদা'। অনেকটা দূর যেতে হবে, চিলা নদীর ধার দিয়ে ; পথে বড় এক বট গাছ ; তার তলায় প্রস্তর-শিলা ধর্মরাজমূর্ত্তি। ক্ষ্যাপা বামাকে আর পায় কে ? 'আমি ধর্ম্মরাজ পুজো করবো।' ছেলের আবদার শুনে কিষাণ হতভম্ব হ'ল। কি করে সে ! বনের ফুলে তখন পুজো সুরু হয়ে গেছে, 'ঠাকুর নাও, কথা বল !' এক রকম জোর ক'রে বামাকে কিষাণ কাঁধে তুলে নিয়ে চলল পাঠশালার দিকে। কিন্তু ঐ যে তারা-মায়ের মন্দির দেখা যাচ্ছে ! ক্ষ্যাপা দু'হাত ছুড়ে লাফিয়ে পড়ল, 'মা, মা, তারা, তারা !' লুটোপুটি খায় বামাচরণ মাঠের ধূলায়। কিষাণের চোখে আসে জল ; বালক রামচন্দ্র দাদার ভাবে হয় বিভোর !

পাঠশালা বসে গেছে ; পণ্ডিত মশায়ের নাকের ডগায় দড়ি-বাঁধা চশমা ; একটা চৌকীর উপর বেত হাতে বসে আছেন। আশে-পাশে শিশুরা তারস্বরে একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ···বলে পাঠ আওড়াচ্ছে ; কেউ বা তালপাতে গভীর মনোযোগে লিখছে ; কেউ বা লিখতে লিখতে 'হাতে কালি, মুখে কালি, মেঘে ঢাকা' শিশুমাসীর মত বিরাজ করছে। কেউ বা হাঁটু গেড়ে শাস্তি ভোগ করছে।

'এত বেলায় নিয়ে এ'লে? এ রকম করে কি লেখাপড়া শিখবে?' তার পর আরম্ভ হ'ল পরীক্ষা। রামচন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন গুরু, 'কি হে ছোড়া, শতকিয়া জান? বর্ণপরিচয় হয়েছে?' সে একেবারে শিশু ; শুধু ঘাড় নেড়ে বললে, 'জানিনে।' এবার বামার পালা ; গম্ভীর স্বরে গুরুমশাই শুধোলেন, 'বর্ণপরিচয় হয়েছে? লিখতে জান?' সহাস্যে ক্ষ্যাপা বলল, 'ভালই জানি।' গুরু উত্তর শুনে একটু কুপিত হ'লেন—'লেখ, দেখি! পাততাড়িতে মনের আনন্দে ক্ষ্যাপা লিখে যায়, 'জয় তারা, জয় তারা'।

* * * *

'তারা-বিদ্যা মহাবিদ্যা' বলেন সর্বানন্দ, "আর সব অবিদ্যা, সংসারে দাসখত লিখেছো, তার থেকে মুক্তি পেতে হ'লে তারা-মাকে ডাকতে হবে ; বিষয়ের দাস না হয়ে তারা-মায়ের দাস হ'লে দাসত্বের বাঁধন খুলে যাবে, অন্নের ভাবনা কি বাবা! মায়ের ছেলে কি উপোস থাকে?" এই হ'ল সর্বানন্দের শিক্ষা।

বামাচরণের কাণ্ড দেখে গুরুমশাই হতাশ ভাবে বলেন, 'তারা-পাগলের বংশ, তা এ সব ছেলের আর কি হবে?' ক্ষ্যাপা হাসে প্রশান্ত হাসি ; মূর্ত্তিমতী নীল-সরস্বতী তাঁর চোখের সামনে ভাসছে ; 'তিনি বাক্‌শক্তি দান করেন বলে তাঁর নাম নীল-সরস্বতী ;' সন্তানকে সংসারপাশ মুক্ত করেন, তাই তিনি তারা ; উগ্র আপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাই তিনি উগ্রতারা ; ঋষি বশিষ্ঠ-আরাধিতা সর্ববিদ্যার ফলদাত্রী, জয়ার্থীর জয়দায়িনী, বিষের বিষক্ষয়-কারিণী ; তিনি মৃত্যুহারিণী :—'মালিনী সর্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়কাঙ্ক্ষিনাম্। বিষক্ষয়করী বিদ্যা অমৃতত্বপ্রদায়িনী।' কানে ভেসে আসে পিতার প্রসন্ন অভয়-বাণী!

পাঠশালার আকর্ষণ বেশি ছিল না ; যত ছিল পথের টান। পথে আছেন বটমূলে ধর্ম্মরাজ ; মহাকালের মত দাঁড়িয়ে আছে মহাবট ; তার শাখা-প্রশাখা যেন কোন দিগ্‌দিগন্তে মিশে গেছে : তার প্রসারিত মহাবাহু যেন আহ্বান করে দিক্‌হারা ক্লান্ত পথিককে : সংসারতাপদগ্ধ পথিক পায় পরম আশ্রয় ধর্ম্মরাজের কোলে। নানা রঙের বনফুল ; মুঠো মুঠো ক'রে বালক অঞ্জলি দেয় তাঁর পাদমূলে। অদূরে দেখা যায় তারা-মায়ের মন্দিরচূড়া! বালক কাঁদে ; 'মা, মা' ব'লে পাগল হয়, দু'চোখে জলের ধারা ঝরে ; নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে, বুড়ো কিষাণ ভাবে 'একি হল? এত ভাব, এত ভক্তি, এত আনন্দ এই একরত্তি বালকের? কে এই বালক!' তার মনে হয়, কোন ঠাকুর এসে সর্বানন্দের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। এরি পিঠে কোন কোন দিন ঝালাপালা হয়ে সে বসিয়ে দিয়েছে পাচনবাড়ি! ছয় বছরের শিশু রামচন্দ্র দাদার কাণ্ড দেখে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ; তারও চোখে আসে জল ; দাদার এ কি হ'ল!

* * * *

দরিদ্র এই পরিবার। পাঠশালেই হয় শিক্ষার পরিসমাপ্তি ; বাবার কাছে সুরু হয় আসল শিক্ষা ;—রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, কথা-উপকথা আর পুরাণের কথকতা। সুগায়ক তিনি ; বেহালার সুর যেন কথা বলে ; রামপ্রসাদের গান তাঁর বেদমন্ত্র। ছেলেদের সেই মন্ত্রে হ'ল দীক্ষা : কোন দিন কৃষ্ণ-বলরাম, কোন দিন বা রাম-লক্ষ্মণ সাজিয়ে তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে ভাব-ভক্তি-বিলাসে মাতোয়ারা করে দেন। ছেলেরা হবে 'তারা'-মায়ের দাস, মানুষের দাস নয় ; ব্রাহ্মণ্যতেজে দীপ্ত এই সর্বানন্দ ; তাঁর আদর্শ—'না দিব চরণে হাত, না খাইব উচ্ছিষ্ট ভাত।' সর্বানন্দ বেহালায় সুর দেন ; দুইটি বালকের কণ্ঠে দীপ্ত হ'য়ে উঠে জগজ্জয়ী মানবতার সুর :—

"এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি।
নাইক জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি, মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥"

* * * *

তারা-মায়ের আঙ্গিনায় রামের বনবাস অভিনয়। দুইটি বালক,—বামাচরণ ও রামচন্দ্র করছে অভিনয় ;—রাম আর লক্ষ্মণ। গেরুয়া বসনে কি সুন্দর মানিয়েছে ; গলায় বনফুলের হার। অপূর্ব তাঁদের কণ্ঠস্বর ; অযোধ্যায় রামচন্দ্রের যজ্ঞসভায় যেন লব-কুশের গান। ইতর-ভদ্র লোক জড় হয়েছে অনেক। সর্বানন্দের বেহালার সুর করুণ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে : রামের কণ্ঠে বিদায়-বাণী :

'মা গো আমি যাই,
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আবার আসিব ফিরে,
জনম জনম ভরে তুমি থাক হৃদি 'পরে
অন্তে যেন পা-দু'খানি দেখিবারে পাই।'

বালক রাম কা'কে সম্বোধন করছে! গান গাহে আর মুহুর্মুহু মন্দিরে মায়ের দিকে তাকায় ; তার দু'চোখে অঝোর ধারা! প্রত্যালীঢ়পদা ভীষণা পাষাণীরও যেন হৃদয় বিগলিত হয়েছে! জনমণ্ডলীর ভুল হয়—এ কি দেবীর চোখেও জলধারা ; পুত্রবিরহ-কাতরা অযোধ্যার রাজমহিষী কৌশল্যা কি তবে দেবীরূপে বিরাজিতা! সকলেরই চোখে জল। শুধু গুঞ্জন উঠে, মা, মা, মা! অযোধ্যা-বাসী রামকে যেন বিদায় দিচ্ছে, ছুটে আসে জোয়ারের মত আশে-পাশের লোক, রামের বনবাস শুনতে বা দেখ্‌তে! 'ওরে দেখবি আয়, আমাদের ক্ষ্যাপা ঠাকুর আজ রাম সেজেছে!' বাউরি, হাড়ি ও বাগ্‌দি ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ীতে করে ঠাসাঠাসি। এ কি ; রামের চোখে পলক পড়ে না, গলার স্বর শুনা যায় না! নিস্পন্দ দেহ হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল! জ্ঞান আর হয় না। লোকে নানা জল্পনা-কল্পনা করে, অজ্ঞ তারা ; ভীত হয় ; তবে কি তারা-মায়ের ভর হয়েছে! কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস বয় না, এ কি! সর্বানন্দ ধীর, স্থির ; তিনি বেহালায় মৃদু সুরে গাহেন তারা-নাম।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, রাজকুমারীর কানে খবর গেল। ছুটে এলেন দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে ; এলোমেলো বেশ-বাস মায়ের ;

মৃতপ্রায় ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন পাগলিনী মা ; কানে দিলেন তার তারা-নাম : জয় তারা, জয় তারা ! অল্পক্ষণ পরেই ছেলে চোখ চাইলে মায়ের কোলে ! এ রকম ক'রে সুরু হ'ল তাঁর যাত্রা !

* * * *

এইরূপ অভিনয় চলে ; প্রায়ই সর্বানন্দকে যেতে হয় তারাপীঠে ছেলে দুটিকে নিয়ে। ক্ষ্যাপা বামার কি আগ্রহ সেই পাষাণী মূর্তিকে দেখার ! আজ ক্ষ্যাপা কৃষ্ণ সেজেছে :

"প্রেমের ছলনা ঠাকুর নাহি সাজে,
মজালি গোপিনীকুলে মজিলি নিজে।
উদয়-অস্ত দিবানিশি, নিয়ে হাতে মোহন বাঁশি,
রাধে বলে বাজে বাঁশি, প্রেমেরই সুর।
তোমার ছলনে ভুলি, রাধার কুলেতে কালি
কালী হয়ে কৃষ্ণ তুমি মজালে সবারে।"

হঠাৎ গান থেমে গেল ! বামা মহাশ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। বেহালা থামিয়ে চললেন পিতা সর্বানন্দ। এই শ্মশানই ছিল বশিষ্ঠের সিদ্ধপীঠ : তাঁর সম্বন্ধে আছে অনেক কাহিনী। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ কামাখ্যায় শুদ্ধাচারে বহুযুগ তারাদেবীর সাধনা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি ; তাই পিতৃদত্ত তারাবীজকে অভিসম্পাত করেন যে, এই বীজে কেউ কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। তখন দৈববাণী হ'ল, 'বৎস তুমি আমার উপাসনার আচার জান না বলে সিদ্ধিলাভ করতে পার নি ; মহাচীনে যাও, সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দন তোমায় শিক্ষা দেবেন।' সেখানে গিয়ে বশিষ্ঠ আরও মর্মাহত হলেন : মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চমকারই তারা-উপাসনার অঙ্গ। কিন্তু বুদ্ধরূপী জনার্দনের শিক্ষায় তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেল। পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, কর্ম-অকর্মের ভেদাভেদ-রহিত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ জ্ঞানের আভাস তিনি পেলেন ! মানবের ব্রহ্মরন্ধ্রে কল্পিত সহস্রদল পদ্মের অজস্র মধুধারা ক্ষরিত হচ্ছে : সাধক সে ধারা পান ক'রে বিভোর হ'ন ; তা-ই মন্ত্রধারা ! তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদের জ্ঞান লাভ করে বশিষ্ঠ ধন্য হ'লেন : গুরুর উপদেশে ফিরে এলেন দ্বারকাতীরে : শ্বেত-শিমুল বৃক্ষতলে হয় তাঁর সিদ্ধি। এই কি সেই কল্পবৃক্ষ, রামপ্রসাদের কথা ভেসে উঠল সুরে :

"কালী-কল্পতরুমূলে, আয় মন বেড়াতে যাবি।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।"

বশিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা—মনে পড়ে সব তারাবিদ্যায় সিদ্ধ ঋষিগণের নাম। ফলফুলে পরিপূর্ণ সেই শ্বেতশাল্মলী, ক্ষ্যাপা তন্ময় হয়ে দেখে ! পুত্রের আগ্রহ দেখে পিতা তার একটি শাখা ভেঙ্গে দিলেন পুত্রের হাতে। সর্বানন্দের কুটির-প্রাঙ্গণে ক্ষ্যাপা সেই শাখা রোপণ করল : তাঁর ভক্তি-বারিতে সেই শাখা প্রাণবন্ত হয়ে ক্ষ্যাপাকে সর্বকর্মত্যাগী দণ্ডধারী ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগল !

অভিনয় আর চলে না। বামাচরণের মতিগতি দেখে দেবলীলা-অভিনয়ে সর্বানন্দ নিরস্ত হ'লেন। সামান্য জোতজমায় অন্নের অভাব ছিল না ; তার উপর আর কিছুই চাইতেন না তিনি ; সর্বানন্দ ঠাকুরকে সকলেই শিবের মতন মান্তি করে ; দাতার দানও তিনি গ্রহণ করেন না ; দীর্ঘায়ত বিরাট পুরুষ সর্বানন্দের পায়ের খড়মের শব্দ দীন-দুঃখীর প্রাণে বলসঞ্চার করে ; সমাজপতি, অত্যাচারী ধনবানদের বুকের স্পন্দন স্তব্ধ করে দেয়। এমনি ছিল তাঁর প্রভাব। রাজকুমারীর দুঃখ, এমন শিবের মত স্বামী থাকতেও ছেলে দু'টি মানুষ হ'ল না ; স্বামীর সে-দিকে খেয়ালই নেই ; মানুষ হওয়ার অর্থ যে দু'জনের কাছে সম্পূর্ণ উল্টো !

সর্বানন্দের দিন ফুরিয়ে এ'ল ! তিনি তা' বুঝতে পেরেছেন। বামাকে কাছ-ছাড়া করতে চান না। গভীর নিশিতে উঠোনে সর্বানন্দ পায়চারি করেন ; আর তারা-মায়ের নাম করেন—জয় তারা, জয় তারা ! রাজকুমারী ভাবেন, এ কি হল ! স্বামীরও কি মাথা খারাপ হ'ল ! রোগ নাই, তবুও সোয়াস্তি নাই। সর্বানন্দের মুখের হাসি ম্লান হ'য়ে এসেছে ; তিনি প্রায়ই আনমনা হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। বাবার ইঙ্গিতে ক্ষ্যাপা গান ধরে,—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে স'পে দিয়ে মা
ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।"

সত্যি এক দিন কালের ফাঁসি কেটে যায় ! সর্বানন্দ অভ্যাস মত 'তারা' 'তারা' ব'লে চোখ বুজেন ; চাটুজ্জে-গৃহে হাহাকার উঠে : অনাথ শিশু কয়টিকে নিয়ে রাজকুমারী চোখের জলে ভাসেন। বামাচরণের বয়স তখন সতেরো কি আঠারো। রামচন্দ্র তখন নিতান্ত বালক—শিশু ! বামাচরণ প্রথমে বিচলিত হয়ে উঠল। তারামন্ত্রের গুরু তাঁর বাবার বেহালাটি পাশে পড়ে ; আজ তাতে সুরের অভয়বাণী রচনা করবে কে ? পঞ্চভূতে দেহের পঞ্চভূত মিশে গেল ! মহাবায়ুতে প্রাণবায়ু হ'ল লীন। পিতার শিক্ষা :—মায়ার কোল থেকে মানুষ চলে যায় মহামায়ার কোলে !

[ক্রমশঃ।

—তাজমহলের বৃত্তান্ত—

যমুনাতীরে আগ্রা নগরে তাজমহল অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু তাজমহলের বিস্তারিত বিবরণ অনেকেই হয়তো জানেন না। ১৮ ফিট উচ্চ ও ৩১৩ ফিট শ্বেতমর্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের ওপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট উচ্চ একেকটি অতি সুন্দর ও অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। শ্বেতমর্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি-মন্দির আছে। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট বিস্তৃত ও ৮০ ফিট উচ্চ একটি সুবৃহৎ গম্বুজ আছে। এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গম্বুজাকৃতি ২৬ ফিট ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ আছে। এই গৃহাভ্যন্তরে যাতায়াতের পথ আছে। তৎকালে বর্তমান কাল অপেক্ষা মাল-মসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হ'লেও তাজমহলের জন্ত সর্বসমেত ব্যয় হয় ৩১৭৪৮০২৪ টাকা। পুরা ৩০ বছর ধ'রে অনবরত পরিশ্রমে এই মহাকার্য্য সমাধা হয়।

শ্রীমতী লতিকা ঘোষ

(ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা)

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ দেশের নারীরা আজ-কাল পুরুষদের থেকে পিছিয়ে নয় কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বেও এমন ছিল যখন এঁরা ততখানি এগিয়ে আসেন নি কিম্বা আসতে পারতেন না। এমন এক যুগেও এ বাঙ্গালার মাটীতে যে কয় জন মহিলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সংগঠনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী লতিকা ঘোষ নিঃসন্দেহে অন্যতমা, এক চমৎকার পরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। তৎকালীন বাঙ্গালার বিখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গত মনোমোহন ঘোষ তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেব। অপর দিকে ঋষি অরবিন্দ, মহাবিপ্লবী শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ (বসুমতী-সম্পাদক) প্রমুখ তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃব্য। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে এদিক থেকে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। সুখের বিষয়, এ স্বাভাবিকতা তাঁর জীবনে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত হয় নাই।

শ্রীমতী ঘোষের ছোটবেলা কাটে তাঁদের কলকাতার ইলিয়ট রোডের বাড়ীতে। সেখানে এক বিরাট লাইব্রেরী ছিল তাঁর পিতৃদেবের এবং সে লাইব্রেরীতে ইংরেজী, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থরাজির সমাবেশ ছিল বেশী। তাঁর পিতৃদেবের অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানলিপ্সা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার নিশ্চিত প্রেরণা জোগায়। প্রথমে তিনি ও তাঁর ভগিনী "প্রাট মেমোরিয়াল গার্ল'স্ স্কুলে" পড়াশুনা আরম্ভ করেন। মিডলটন রো'র লরেটো কনভেণ্ট থেকে ইংরেজী অনার্স'এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তার পর তাঁর পিতৃদেব তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাঁর মায়ের কঠিন অসুখের জন্য তাঁর যাওয়া তখনই হ'লো না। ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে যখন তাঁর অক্সফোর্ড যাওয়া স্থির হ'লো সে সময়ে দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সে বছরই আগষ্ট মাসে তিনি রওনা হ'লেন বিলেতে; উদ্দেশ্য দু'টো—প্রথম অক্সফোর্ডে তাঁর শিক্ষা, দ্বিতীয় তাঁর পিতৃদেবের ইংরেজী ভাষায় রচিত কবিতাবলীর সঙ্কলন প্রকাশ। দু'টি সঙ্কল্পই তাঁর সিদ্ধ হ'লো। তিনি নিজে অক্সফোর্ড থেকে "বি, লিট" উপাধি এবং শিক্ষার ডিপ্লোমা অর্জ্জন করলেন। অপর দিকে পিতৃদেবের কবিতা সঙ্কলনও প্রকাশ করলেন, যোগ্যতা সহকারে যার ভূমিকা লিখলেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি লরেন্স বায়নিয়ন (Lawrence Binyon)

বিলেত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমতী ঘোষ জাতীয় সেবা ও নারী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখনকার মত স্থির করেছিলেন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করবেন না। স্বর্গতঃ গুরুসদয় দত্তের প্রেরণায় তিনি সরোজনলিনী নারী শিক্ষাকেন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং নারী-সমাজের কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের মহিলা-সংগঠক সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে নার্সেস ট্রেণিং বিভাগ নতুন ভাবে সংগঠন করেন। তার পর তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিশনে অধ্যক্ষারূপে। তিনি এ বিদ্যায়তনটির উন্নতি সাধন করেন এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম পান। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় তাঁর পক্ষে সেখানে টিঁকে থাকা সম্ভব হলো না। তৎকালীন বিদেশী সরকারের কোপদৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো এবং আদেশ জারী হ'লো যদি তিনি অধ্যক্ষা হিসেবে বহাল থাকেন তবে এ বিদ্যায়তনে সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। অগত্যা এ মহিলা বিদ্যায়তনটিকে বাঁচিয়ে রাখবার খাতিরে তিনি নিজেই পদত্যাগ করলেন এবং পুনরায় সমাজসেবা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

সমাজসেবা ও নারী জাগরণের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীমতী ঘোষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রধান সংগঠক বলতে গেলে ছিলেন তিনিই। এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন নেতাজীর জননী স্বয়ং, সহ-সভানেত্রী ছিলেন জননেতা শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু এবং সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী ঘোষ নিজে। এ সংস্থার মারফত তিনি কলিকাতা তথা বাঙ্গালার নারী জাতিকে প্রগতির পথে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যান এবং জাতীয়তার নতুন আদর্শে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন। সাইমন কমিশন বর্জ্জন আন্দোলনে বাঙ্গালী নারীসমাজ যে এগিয়ে এসেছিল তার মূলে শ্রীমতী ঘোষের অবদান কম নয়।

১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমতী ঘোষ কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন কয়েক বারই। ১৯২৮ সালের কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সংগঠনে তাঁর

শ্রীমতী লতিকা ঘোষ

নেতৃত্ব ছিল অনেকখানি। তিনি বঙ্গীয় নারী শিক্ষা-লীগ, নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলন, নিখিল বঙ্গ যুবসমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেও কাজ করেছেন। এই ভাবে কাজ করতে করতে শিক্ষাব্রতী জীবনের উপর আবার তাঁর ঝোঁক পড়লো। উত্তর প্রদেশে সে সময়ে সবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ডাক পড়লো মোরাদাবাদে গোকুলদাস মহিলা কলেজের অধ্যক্ষারূপে। সেখানকার দায়িত্ব সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করছিলেন এমন সময় আবার তাঁকে ফিরে আসতে হ'লো কলকাতায়। কাজ গ্রহণ করলেন বেথুন কলেজে। আজ অবধি তিনি শিক্ষাব্রতীর সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা।

শ্রীমতী ঘোষের আর একটি জীবন হচ্ছে তাঁর একনিষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য সাধনা। বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি তিনি রচনা করেছেন ও করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর মৌলিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

কি সাহিত্যসেবায় কি শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রীমতী ঘোষের উৎসাহ ও উত্তম এখনও অটুট আছে। তাঁর ভিতরে যে প্রতিভা আছে তার অনেকখানি বিকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, আরও দেখতে পাবো, এ আশাও আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।

ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

[ভারতের শ্রেষ্ঠ শিশু-চিকিৎসক]

নিষ্ঠা, উত্তম ও অধ্যবসায় মানুষকে কতখানি বড় করে তুলতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু-চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী। তখনও তিনি অল্পবয়স্ক যুবক —পরবর্তী জীবনের প্রতিষ্ঠা তখন ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি সকল বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে পাথেয় হিসেবে মাত্র পাঁচ টাকা মূলধন নিয়ে। বিদেশ যাত্রার যখন পাসপোর্ট মিললো না তখন তিনি গ্রহণ করলেন জাহাজের চাকুরী। তবু যেতে হবে, পড়তে হবে, বড় হ'তে হবে—দুর্বার সঙ্কল্প, সেই সঙ্গে আসল যেটি মূলধন ছিল সেটি অপরাজেয় মনোবল। ফিরে এলেন তিনি স্বদেশে সঙ্কল্পে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে। সে দিনকার যুবক

ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

ক্ষীরোদচন্দ্রই আজ ভারতের চিকিৎসা-জগতে ডাঃ কে, সি চৌধুরী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ডাঃ চৌধুরীর প্রারম্ভিক জীবন ছিল যেন একটা বিপ্লব। ভেবেছিলেন প্রথমে তিনি বড় একজন ইঞ্জিনীয়ার হবেন। শিশু বয়স থেকেই দেখাও গেছলো এদিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ। ঘড়ি খোলা, ইলেক্‌ট্রিক্যাল জিনিষপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা, এদের গঠন-পদ্ধতি নিয়ে আপন মনে গবেষণা করা—এ সব ছিল তাঁর নিত্যকার কাজের অঙ্গ। কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় কলকাতার কলেজে আই, এস সি'তে যখন ভর্ত্তি হলেন তখন তাঁর চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটা ওলট-পালট হ'য়ে গেল। যিনি হবেন বড় ইঞ্জিনীয়ার, প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক হওয়ার জন্য তাঁর ভেতর জাগলো সহসা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। ইঞ্জিনীয়ার হলে চাকুরী নিতে হবে তাই, ইঞ্জিনীয়ার হওয়া নয়, নিজের স্বাধীন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, উদ্ভাসিত করবার জন্য হতে চললেন তিনি বড় চিকিৎসক।

১৯১৪ থেকে ১৬ সাল পর্য্যন্ত মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জের স্কুলে চলে তাঁর পড়াশুনা। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হল, কারণ তাঁর উপর সে বয়সেই ছিল পুলিশের নেক নজর। তিনি অনুশীলন পার্টির সহিত যুক্ত ছিলেন, নিয়মিত ডন বৈঠক ও গীতাপাঠ অভ্যাস ছিল। পুলিশের চোখে এটা ভাল লাগেনি, তাই তারা তাঁর পিছনে লাগলো। পড়াশুনা করতেই হ'বে তাই কিশোরগঞ্জ থেকে একেবারে চলে এলেন কলকাতায়। ভর্ত্তি হলেন এথেনিয়ান ইনষ্টিটিউসনে। ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু হ'লো। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে ভর্ত্তি হলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ১৯২৬ সালে তিনি এম, বি, ডিগ্রি লাভ করেন। তখনই তিনি স্থির করলেন ফ্রান্সে যাবার—"ব্যাকট্রলজি" পড়বেন বলে। কিন্তু যাওয়া হ'লো না। কলকাতা পুলিশ তাঁকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করলো। অগত্যা তিনি তখনকার মত স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চললো খাদ্য সম্পর্কে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। এ গবেষণা করতে যেয়েই শিশু-চিকিৎসার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বিদেশে তাঁকে যেতেই হবে, শিশুচিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ না হ'লে তাঁর সাধনা সম্পন্ন হবে না। এবার আর পাসপোর্টের জন্য আবেদন-নিবেদন নয়,

বেশ মাথা খাটিয়ে জাহাজের একটা চাকুরী নিয়ে নিলেন। তাঁকে আর আটকিয়ে রাখবে কে? ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে চললেন সুদূর নিউইয়র্কে। সেখানে যেয়ে জাহাজের চাকরী রেখেই অবসর সময়ে প্রায় ৬ সপ্তাহ কাল ঘুরে বেড়ালেন বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, বলটিমো এবং নিউইয়র্কের বড় বড় শিশু-চিকিৎসার কেন্দ্রগুলিতে।

ডাঃ চৌধুরী জীবনের মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ খুঁজে পেল। সাক্ষাৎ হলো তাঁর বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু-চিকিৎসক আমেরিকার ডাঃ ইমেট হল্টের সঙ্গে। তাঁরই পরামর্শে তিনি (ডাঃ চৌধুরী) ভিয়েনায় যেয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিশু-চিকিৎসক অধ্যাপক ভনপির কোয়েটের নিকট শিক্ষালাভের মনস্থ করলেন। ইংলণ্ডে এসে ছেড়ে দিলেন জাহাজের চাকুরী। করলেন পাসপোর্ট ভিয়েনায় যাবার। ভিয়েনায় দেড় বৎসর পড়াশুনা করবার পর ডেভিসি একাডেমী থেকে বৃত্তি পেয়ে জার্ম্মাণীতে যান। সেখানেও দেড় বৎসর কাল শিশু-চিকিৎসা নিয়ে গবেষণাদি করেন এবং আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়ান। তার পর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর স্বদেশে ১৯৩২ সালে।

ডাঃ চৌধুরীকে শিশু-চিকিৎসকরূপে কলকাতায় আমরা দেখতে পাই ১৯৩২ সালেই। তখন বাঙ্গালায় কেন, ভারতেও শিশু-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ব'লতে বিশেষ কেউ ছিলেন না। ১৯৩৩ সালে বকুলবাগান ষ্ট্রীটে প্রথম যখন রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তখন তাঁর উপরেই পড়লো শিশুবিভাগ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব। তার পর ১৯৩৫ সালে সার নীলরতন সরকার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে। ১৯৪৮ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রধান শিশু-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ৩।৪ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। ১৯৫২ সালে অনিবার্য্য কারণে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই থেকেই চলেছে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁর শিশু-চিকিৎসা। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে ভারতের সর্ব্বপ্রথম শিশু-হাসপাতাল; এর জন্য তিনি দান করেছেন তাঁর স্বোপার্জ্জিত দেড় লক্ষাধিক টাকা। হাসপাতালটি গড়ে উঠলে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার, শিশু-চিকিৎসার জন্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি (এক্সরে সেটসহ) এ'তে দেবেন বলেও তাঁর সঙ্কল্প রয়েছে।

শিশু-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাঃ চৌধুরীর নাম আজ সর্ব্বত্র সুবিদিত। ১৯৩৩ সাল থেকে তিনি একখানি শিশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন এবং এর ভেতর দিয়ে বহু মূল্যবান তথ্য, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা পরিবেশন করে সমাজ ও জাতির অপরিসীম কল্যাণ করে যাচ্ছেন। আন্তর্জ্জাতিক শিশু-চিকিৎসক-সম্মেলনে তিনি কয়েক বারই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিয়েছেন—যার ফলে বিদেশে বাঙ্গালা তথা ভারতের মর্য্যাদা বেড়েছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন ফেলো এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সিণ্ডিকেটের অন্যতম সদস্য। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৫২ বৎসর—যুবজনোচিত মনোবল ও প্রেরণা এখনও তাঁর অটুট ভাবে বিদ্যমান। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আত্মচেষ্টায় উন্নতির যে উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, আগামী দিনের ছাত্র ও যুবকদের এ থেকে অনেক কিছু শিখবার, জানবার ও প্রেরণা পাবার থাকবে। শিশু-চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাঃ চৌধুরীর অসামান্য অবদানের জন্য বাঙ্গালীর গৌরব করবার অধিকার থাকবে চিরদিন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক)

যে মানুষের ভিতর সত্যিকারের 'প্রতিভা রয়েছে তাঁর অগ্রগতি-পথ অবরুদ্ধ করা চলে না। কোন না কোন পথে সে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটবেই। কলকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের বর্ত্তমান সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনদর্শনের দিকে তাকালে এ সত্যটিই পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। সংসারের আবর্ত্ত ছেড়ে সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করলেও দর্শন ও সঙ্গীতে তাঁর যে প্রতিভা জনসমাজের সম্মুখ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারেননি। নানা ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য তিনি আজ বাঙ্গালা তথা ভারতে স্বনামধন্য।

হুগলী জেলার বিখ্যাত প্রসাদপুর গ্রাম যেখানে পঞ্চানন্দ ভৈরব দেবতার মন্দির রয়েছে সে গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জন্ম হয়। তখনকার তাঁর নাম ছিল শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার সিটি কলেজে এসে ভর্ত্তি হন আই, এ ক্লাসে। সে সময় বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্বর্গত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছিলেন এ কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজে পড়তে পড়তেই তিনি সন্ন্যাস-জীবনে আকৃষ্ট হন এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৭ সালে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যোগদান করেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস ব্রত উভয়ই গ্রহণ করেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

এই ভাবে একটি নতুন জীবনের হয় সূত্রপাত—শ্রী পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন হলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, দীক্ষাগুরুর নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে থাকেন। কাশীতে যেয়েও তিনি ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্তদর্শন ও উপনিষদ পাঠ করেন বিখ্যাত

দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট। কাশীতে অধ্যয়ন কালে স্বামিজী ধীরাজ সঙ্গীত-চর্চ্চার প্রতিও বিশেষ মনোনিবেশ করেন। সেখানে তাঁর ধ্রুপদ গান শিক্ষা আরম্ভ হ'লো কাশীর বিখ্যাত ধ্রুপদী স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আজ সঙ্গীত-সমাজে তিনি যে এতখানি গুণি-মানী, তার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের ঐতিহ্য। তাঁর পিতামহ, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলেই সঙ্গীতবিদ্যা ও শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

গৃহে সঙ্গীত অভ্যাসের পর কিছু কাল তিনি স্বর্গীয় অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর সুযোগ্য শিষ্য হাওড়া শিবপুরের অন্ধ নিকুঞ্জবিহারী দত্তের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। ১৩২৭ সালের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যোগদানের পর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রেরণায় তিনি সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদচর্চ্চা করেন কিছু কাল।

কাশীতে সঙ্গীত শিক্ষা সমাপ্ত করে ক'লকাতায় এসে তিনি "খেয়াল" শিক্ষা আরম্ভ করেন বাঙ্গালার বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট। এ ছাড়া অনেক গুণী ও শিল্পীর সংস্পর্শে তিনি আসেন। বিদ্যাশিক্ষার আকুল আগ্রহ তাঁকে তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা ও সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনায় চিরদিনই নিযুক্ত করে রেখেছে। তাঁর নিজের কথায়—এখনও আমি দর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র। চিরদিন ছাত্রজীবনই কাম্য, কেন না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "দেখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"। শিক্ষা-জীবনই মানুষের জীবনে একটি বড় জিনিষ। শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করা মানেই অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা।

সঙ্গীত-জগতে তাঁর অবদান অসামান্য, এ শাস্ত্র ও তত্ত্বের বহু জটিল সমস্যা তিনি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তুলনামূলক (Comparative) ও শাস্ত্রমূলক আলোচনার পক্ষপাতী। ঐতিহাসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত আলোচনা করতে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট। গতানুগতিক ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় আলোচনা মেনে নিলেও পরিবর্ত্তনশীল সমাজের রুচি অনুযায়ী রাগ-রূপে যে বিবর্ত্তন আসে সে মতে বর্ত্তমান কালের উপযোগী রাগ-রূপকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলেও প্রাচীন রূপের সঙ্গে তুলনা করতেই তিনি আগ্রহশীল। সঙ্গীতকে স্বামিজী সাধনারূপে গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গীত যাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত হয় এ চেষ্টায় তিনি আজও পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর।

কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত-পাঠ্য-তালিকা নির্দ্ধারণ কমিটির তিনি এক জন সদস্য। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম-উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্যও তিনি। তাঁর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

স্বামিজী দর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন ও করছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ "বাংলা ধ্রুপদমালা," "রাগ ও রূপ" "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" (বৈদিক যুগ) প্রভৃতি সঙ্গীত-জগতে এক একটি অমূল্য অবদান। সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি গবেষণা করে চলেছেন। বর্ত্তমানে তিনি দুরূহ গ্রন্থ "ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস" রচনায় নিযুক্ত। ৮।৯ খণ্ডে এই গ্রন্থটি সম্পন্ন করা যাবে বলে তিনি আশা করছেন।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হলে সঙ্গীত-জগতে স্বামিজী একটি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবেন। এ আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

সাহিত্যব্রতী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

(এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারী)

১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত বাংলা পুস্তক প্রকাশনের স্বর্ণযুগ বলা চলে—যে যুগের ধারা আজও অবধি প্রবহমান। এ যুগেরই অন্যতম বিরাট স্তম্ভ হিসেবে যিনি বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তিনি হলেন স্বনামধন্য প্রকাশক ও সাহিত্যিক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের স্মৃতি-বিজড়িত বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এম, সি সরকার এণ্ড সন্স এর পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। এ প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে তাঁর প্রাণস্বরূপ। তাঁর নিজের কথায় পুস্তক প্রকাশন জিনিষটা আমি নিছক একটা 'কারবার' হিসেবে কখনই দেখিনে। এটা একটা এমন স্থান যেখান থেকে দেশের চার দিকে শিক্ষা ও কৃষ্টির আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমি এ'কে আঁকড়ে রেখেছি, ভালবেসে আসছি এ'কে প্রাণের মত।

১৮৯৪ সালে বহরমপুরে আগামী দিনের যিনি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপে দেখা দেবেন, তাঁর জন্ম হয়। পিতা পরলোকগত এম, সি, সরকার বিচার বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ জন্যে বাল্যকালে তাঁকে পিতার সঙ্গে বাঙ্গালা ও বিহারের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় এবং বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষালাভ করতে হয়। পরে ১৯০৭ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করেন তিনি ভবানীপুর এল, এম, এস ইনষ্টিটিউশন থেকে। কলেজীয় পড়া ও ল'পড়া কলকাতাতেই সম্পন্ন হয়।

শ্রীসরকারের সাহিত্য-জীবন গড়ে উঠে বাঙ্গালার বহু প্রথিত-যশা সাহিত্য-মহারথীর সংস্পর্শে। তাঁর প্রথম সাহিত্যচর্চ্চা সুরু হয় ১৯০৭ সালে, বাইরে থেকে কলকাতায় পড়াশুনার জন্যে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি নিজেই বলেছেন-"১৯০৭ সালে কলকাতায় পড়তে এসেই আমি বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী ছোট ছোট কাগজে লেখা পাঠাতে সুরু করি। প্রথম লেখা আমার প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী'তে; সম্পাদিকা আমার লেখা পেয়ে ডেকে পাঠান। বলতে কি, স্বর্ণকুমারী দেবীর সেদিনকার উৎসাহ ও প্রেরণাই আমার সাহিত্যিক জীবন গড়ে তোলবার মূল উৎস।"

তার পর শ্রীসরকার ক্রমে কুমুদিনী বসু সম্পাদিত "সুপ্রভাত পত্রিকা," ফণীন্দ্রনাথ পালের সম্পাদিত "যমুনা", সুধাকৃষ্ণ বাগচী-সম্পাদিত "জাহ্নবী", পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সান্নিধ্যে যান এবং ও'তে তাঁর মূল্যবান রচনাবলী প্রকাশ পেতে থাকে। এ সময়ে বাঙ্গালার খ্যাতনামা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে জমে উঠে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 'যমুনা'তে তখন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যুগান্তকারী গল্পগুলো যেমন রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, একে একে প্রকাশ হচ্ছে। শরৎ বাবুর এ গল্পগুলোতে তিনি এতই আকৃষ্ট হন যে তিনি শরৎ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনের আবেগ প্রকাশ করেন। শরৎ বাবু তখনই তাঁর হাতে ছ'খানা বইএর পাণ্ডুলিপি দিলেন প্রকাশনার জন্য। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন প্রথম সাক্ষাতে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে তা কোন দিন ম্লান হয়নি। শরৎ বাবুর প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে তাঁর (শ্রীসরকার) প্রয়াসের অভাব ঘটে নি কোন কালে।

"ভারতবর্ষ"-সম্পাদক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে শ্রীসরকারের ঘনিষ্ঠতাও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাহিত্য ক্ষেত্রে সুধীর বাবুর আজ যে প্রতিষ্ঠা, তার মূলে পণ্ডিত অমূল্যচরণের প্রেরণা রয়েছে অনেকখানি। তাঁর দুই সাহিত্যিক বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "ভারতীর" সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রতে হয়। সে সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটি সত্যিকারের সাহিত্য-আসর গড়ে উঠে, যে আসরে নিয়মিত আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শিল্পী চারু রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় এবং সেই'সঙ্গে শ্রীসরকার নিজেও। এ সাহিত্য-আসরে মাঝে মাঝে আসতেন প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন বাকচী, মোহিতলাল মজুমদার, ভারতীর ঐ আসরে সুধীর বাবু প্রত্যেক সাহিত্যরথীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং সকলেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

শ্রীসরকারের সুসম্পাদিত শিশু-মাসিক "মৌচাকের" জন্মের গোড়ায়ও রয়েছে ভারতীর সাহিত্য-আসর। এ আসরে বসেই সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর মাথায় শিশুদের জন্যে একখানি উপযুক্ত মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা জাগে। সে কল্পনা কাজে পরিণত হ'লো ১৩২৪ সালে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে এমন কোন নামকরা সাহিত্যিক নেই যাঁর লেখা "মৌচাক" পায় নি। মৌচাকের লেখক-তালিকায় ভারতীর, কল্লোল যুগ থেকে সমসাময়িক যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকার নাম পাওয়া যাবে। এটা মৌচাকের পক্ষে যেমন শ্লাঘার বিষয় তেমনি এ সরকারের অসামান্য দক্ষতা, অপূর্ব্ব কৃতিত্ব ও আকর্ষণী ক্ষমতার পরিচয়।

১৯১০ সালে এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স পুস্তক প্রকাশনী সংস্থাটি যখন স্থাপিত হয় তখন এ'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আইন-বই প্রকাশ করা। কলেজীয় শিক্ষার সমাপ্তির পর শ্রীসরকার যখন এর পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তখন এ সংস্থাটি ভারতের মধ্যে একটি নাম-করা আইন-পুস্তক প্রকাশনী ছিল। সুধীর বাবু আইন বিষয়ের মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের গণ্ডী সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন না, একে বাঙ্গালার একটি প্রধান সাহিত্য-প্রচারকেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে আপ্রাণ উদ্যোগী হলেন। সেদিনের তাঁর সঙ্কল্প ও সাধনা যে সার্থক ও জয়যুক্ত হয়েছে তার সাক্ষ্য আজিকার বিপুলায়তন সাহিত্য-প্রকাশন কেন্দ্র "এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স।"

এ প্রতিষ্ঠান মারফত তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো বটেই, স্যার যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করেছেন বা করছেন।

আজ প্রায় দীর্ঘ ৩৬ বৎসর যাবৎ শ্রীসরকার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে চলেছেন তাঁর নিজ হাতে-গড়া এ সাহিত্যপ্রচার কেন্দ্রের। এখানে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখ সুধিবৃন্দের সমাবেশ একটা বিচিত্র ব্যাপার। এখান থেকেই এক কালে "নাচঘর" পত্রিকার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এখানেই শ্রীসরকারের কাজের শেষ নয় "মৌচাকে"র সঙ্গে আজ বাইশ বছর ধরে তিনি "হিন্দুস্থান ইয়ার বুক" নামে একখানি মূল্যবান বর্ষপঞ্জী ও সাধারণ জ্ঞানের বই সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে শিশু-সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কেন্দ্রীয় ফিল্‌ম্ সেন্সার বোর্ডের ক'লকাতা শাখার তিনি এক জন সদস্য। সম্প্রতি ভারত সরকার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রচারের জন্যে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ক'রেছেন তিনি সে কমিটিরও এক জন সভ্য।

—সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা ভাবে শ্রীসরকার স্বীয় প্রতিভার ও কর্ম্মক্ষমতার যে ছাপ রেখে যাচ্ছেন দিনের পর দিন, পরবর্ত্তী যুগে উদ্যমশীল মানুষের কাছে এ হ'য়ে থাকবে অবিস্মরণীয় প্রেরণার বস্তু। তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী এখনও অনেক কিছু পেতে পারে, এ বিশ্বাস আমরা রাখবো।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী সংগৃহীত)

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সূর্প—কুলা, শস্যাদির পরিষ্কারক পাত্র।
সূর্য্য—রবি, দিবাকর, দিনপতি, আদিত্য।
সূর্য্যকান্ত—সূর্য্যমণি, মণিবিশেষ।
সূর্য্যেন্দুসঙ্গম—অমাবস্যা, দর্শ।
সৃজন—সৃষ্টি করণ, উৎপাদন গঠন।
সৃষ্টি—উৎপত্তি, উদ্ভব, জগৎ রচনা।
সৃষ্টিকর্ত্তা—স্রষ্টা, পরমেশ্বর, পরমাত্মা।
সে—বুদ্ধিস্থিত পদার্থ, ঐ, তৎ।
সেঁতান—সেঁৎসেঁতে, দলদলিয়া, আর্দ্র।
সেক—সেচন, ভিজান, জলবর্ষণ, ছিটান।
সেকন—তাতান, স্বিন্নকরণ, সিজন।
সেকরা—স্বর্ণকার, সোনার, হেমকর।
সেগুন—খরপত্র, রাজাতুলসী বৃক্ষ।
সেতু—সাঁকো, জাঙ্গাল,
সেথা—সেখানে, তথায়, সেস্থানে;
সেথুয়া—সহপথিক, একসঙ্গী, পথদর্শক।
সেনা—সৈন্য, পৃতনা, সৈনিক, যোদ্ধা।
সেনানী—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ।
সেনাপতি—প্রধান সেনা, সৈন্যাধ্যক্ষ।
সেবক—পরিচারক, উপাসক, ভৃত্য।
সেবা—পরিচর্য্যা, শ্ববৃত্তি, উপাসনা।
সৈনিক—সেনা সম্বন্ধীয়, সেনারক্ষক।
সোজা—সরল, ঋজু, অবক্র, সহজ।
সোনা—স্বর্ণ, সুবর্ণ, কাঞ্চন।
সোদর—সহোদর, একমাতৃজাত ভ্রাতা।
সোপান—সিঁড়ি, পইঠা, প্রস্তাব, অনুষ্ঠান।
সোম—চন্দ্র, দ্বিতীয় গ্রহ, দ্বিতীয় বার।
সোরা—যবক্ষার, লবণবিশেষ।
সোহাগ—বাৎসল্য, স্নেহপ্রকাশ, আসক্তি।
সোহাগা—খাগা, টঙ্ক, উপধাতু-বিশেষ।
সোহাগিনী—সুভগা, আদরিণী, প্রেয়সী।
সৌগন্ধ্য—সৌরভ, সুগন্ধ, সুবাস।
সৌচিক—সূচিজীবী, সূচিকর্ম্মকারী।
সৌজন্য—সুজনতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা।
সৌবিদ—ষণ্ড, ক্লীব, অন্তঃপুররক্ষক।
সৌভাগ্য—শুভদৃষ্ট, সুকপাল।
সৌম্য—চান্দ্র, সুন্দর, মনোজ্ঞ, বুধগ্রহ।
সৌর—সূর্য্য সম্বন্ধীয়, সূর্য্যের উপাসক।
সৌর্য্য—পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি, বিদ্যাবত্তা।
সৌহার্দ্দ—সৌহৃদ্য, প্রণয়, বন্ধুতা, মৈত্র।
স্কন্ধ—কাঁধ, ভুজাশিরঃ, প্রকরণ, অধ্যায়।
স্তন—কুচ, পয়োধর, উরোজভব।
স্তনবৃন্ত—স্তনাগ্র, চুচুক।
স্তব—স্তুতি, স্তোত্র, প্রশংসা, গুণানুবাদ।
স্তাবক—স্তুতিকারক, স্তোতা, গুণগায়ক।
স্তিমিত—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, ভিজা, তুষ্ণীক।
স্তুতিবাদ—মিথ্যা প্রশংসা, স্তববাক্য।
স্তূপ—রাশি, সঞ্চয়, সমূহ, ঢিবি।
স্তোক—অল্প, সূক্ষ্ম, জলবিন্দু।
স্ত্রী—নারী, ভার্য্যা, পত্নী, দারা।
স্ত্রীধর্ম্ম—স্ত্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, রজঃ, ঋতু।
স্ত্রীসংসর্গ—স্ত্রীসঙ্গ, রতিক্রিয়া।
স্ত্রৈণ—স্ত্রীবাধ্য, স্ত্রীবৎ, ভার্য্যাধীন।
স্থপতি—গৃহনির্ম্মাতা, রাজ, থই, ঘরামী।
স্থবির—বৃদ্ধ, প্রাচীন, স্থির, শক্ত, দৃঢ়।
স্থল—স্থান, ভূমি, পাত্র, পদ, ঠাঁই।
স্থলচর—ভূমিচর, ভূচর, হস্ত্যাদি পশু।
স্থাণু—শাখাহীন বৃক্ষ, স্তম্ভ, শঙ্কু।
স্থাবর—অচল, স্থায়ী, ভূম্যাদি ধন।
স্থায়ী—স্থিতিশীল, নিত্য, অবিনাশ্য।
স্থিতি—সত্তা, বিদ্যমানতা, থাকা, বাস।
স্থির—নিশ্চল, ধীর, নিশ্চয়, নিত্য, শান্ত।
স্থূল—পীন, পুষ্ট, মোটা, অসূক্ষ্ম।
স্নাত—কৃতস্নান, অবগাহিত, জলসিক্ত।
স্নান—অবগাহনাদি অষ্ট প্রকার।
স্নায়ু—শিরা, মাংসপেশী, উপাস্থি।
স্নিগ্ধ—শীতল, চিক্কণ, প্রিয়, জলীয়।
স্নুষা—পুত্রবধূ, পুত্রের পত্নী।
স্নেহ—মমত্ব, প্রেম, প্রিয়তা।
স্নেহদ্রব্য—দ্রবদ্রব্য, তৈল-ঘৃতাদি।
স্পন্দ—চৈতন্য, আন্দোলন, কম্পন।
স্পর্দ্ধা—আস্পর্দ্ধা, আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার।
স্পর্শ—ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়, ছোঁয়া।
স্পষ্ট—ব্যক্ত, প্রকাশিত, অগুপ্ত, স্ফুট।
স্পৃশ্য—স্পর্শনযোগ্য, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
স্পৃহা—উৎকট ইচ্ছা, আশা, বাসনা।
স্ফট—সর্পফণা, ফট্‌কিরি।
স্ফটিক—শুক্লবর্ণ প্রস্তর, স্ফটিকারী।
স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, ফিন্‌কি।
স্ফূর্ত্তি—উৎসাহ, প্রফুল্লতা, প্রকাশ।
স্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া, ক্ষতবিশেষ।
স্মর—কন্দর্প, কামদেব, মদন, মনসিজ।
স্মরণ—পূর্ব্বানুভূতের জ্ঞান, স্মৃতি।
স্মরণীয়—স্মর্ত্তব্য, স্মার্য্য, স্মরণযোগ্য।
স্মারক—মেধাবী, স্মরণকারী, স্মৃতিযুক্ত।
স্মার্ত্ত—স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত।
স্মৃতি—ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অটোগ্রাফ্

(অপ্রকাশিত)

[শ্রীমতী রেণুকা গুহ সংগৃহীত]
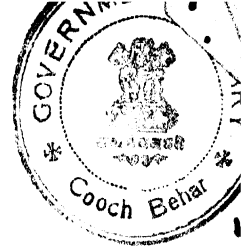
প্রত্যেক মহিলার সাংসারিক কাজ উপেক্ষা করা উচিত নয়। সময়ের সদ্ব্যবহার জানিলে একজন ৩।৪ গুণ কাজ করিতে পারে, ইহা মনে রাখিয়া কাজ-কর্ম্ম করিবে।

১১।১১।৩৫ —শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ক্ষণেকের জন্য দেখা, কিন্তু তার জন্য দুঃখ নাই। তার মধ্যেই হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেছে—সুতরাং তার মধ্যেই পেয়েছি আনন্দ।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
৮।৬।৩১

জাতির বর্ত্তমান দুর্দিনে মেয়েদের কর্ত্তব্য সংঘবদ্ধ হওয়া। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, মেয়েরা জাতির রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে মেয়েদের সাহসী হইতে হইবে; প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করিতে হইবে।

—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, মহারাজা।
২৪শে আশ্বিন, ১৩৫৪

সৌন্দর্য্যের বাসা

বৈজ্ঞানিক বলে "তার বাস
সুসম্বদ্ধ দেহের গঠনে,"
দার্শনিক বলে "তাহা নয়,
নিশ্চয় সে মানবের মনে"।
কবি কহে "অত নাহি বুঝি,
কথা কই খেয়ালের ঝোঁকে—
দরিদ্রের ধ্রুব এ বিশ্বাস,
সৌন্দর্য্য সে প্রেমিকের চোখে"।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
১২।১১।৩৫

আজিকার দিনটি চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আপনাদের প্রাণঢালা আদর অভ্যর্থনা যত্ন পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীশ্রীভগবান আপনাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকুন এবং আপনাদের উন্নত ভাব সকলে শিখিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

—গায়ত্রী দেবী

১লা মার্চ্চ ১৯৩৫
বেদান্ত সোসাইটি, বোষ্টন, আমেরিকা।

অত বোঝা পড়ায় কাজ নেই মা,
বোঝ সোজা, চল সোজা।

—শ্রীজলধর সেন

১১শে কার্ত্তিক, ১৩৪২

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শে আদর্শবতী হয়ে শত সহস্র নর-নারীকে সত্যের ও শান্তির সন্ধান দিয়ে কৃতকৃতার্থ হউন ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি

—শ্রীসম্বুদ্ধানন্দ

প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বম্বে ৪।৭।৪৭

রয় না কিছুই এই ধরাতে
এ কথাটা জানি
হাতের লেখা খাতার পাতে
দিলেম তবু বাণী

২২।১১।৩৫ —শ্রীনরেন্দ্র দেব

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

—শ্রীরাধারাণী দেবী

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২,

প্রাণ যখন ভাবে পূর্ণ হয় তখন সে ভাষা খুঁজে পায় না; আমিও তাই আজ কথায় কিছুই বোলতে চাই না। এই যে আদর্শ গৃহ, এই যে গৃহস্থ ও গৃহিণী এঁদের জীবনের আলো থেকে আরো শত শত আলো জ্বলে উঠে শত শত গৃহ আলোকিত করুক, এই আমার প্রার্থনা। তোমাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতার ভিতর দিয়ে ভগবানের যে আশীর্ব্বাদ আমার জীবনে বয়ে এসেছে, তাকে মাথায় রেখে কৃতজ্ঞ অন্তরে আজকার মত বিদায় নিচ্ছি।

তোমাদের চারুদি।

১লা মার্চ্চ, ১৯৩৫
আনন্দ আশ্রম, ঢাকা। —চারুশীলা দেবী

দামোদর নদীর এপারে বসে মনে হল
ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।
পঞ্চকোট পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে
ভাবছি সৌন্দর্য্য মনের না বনের।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৮।৮।৫৩

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৬

লীন-করণ

শ্রীভরত।— "পতাকাঞ্জলি বক্ষঃস্থং প্রসারিতশিরোধরম্।
নিহঞ্চিতাংসকূটং চ তল্লীনং করণং স্মৃতম্।" (sl: 66)

অনুবাদ:—'পতাকা' মুদ্রায়—হাত দুটিতে অঞ্জলি রচনা করে বক্ষের কাছে রাখতে হবে; প্রসারিত রইবে গ্রীবা; অংসকূট নিহঞ্চিত করতে হবে। একেই বলে "লীন-করণ"।

* * * *

ভারতনট।—করণটি অতি-সহজ। সকলেরই অনুরোধ রক্ষা করা হচ্ছে, বা সকলকেই অনুরোধ করা হচ্ছে—এই বোঝাবার উদ্দেশ্যে "লীন"-করণের প্রয়োজন ঘটে।

পতাকাঞ্জলি:—'পতাক'-হস্ত সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি (শ্লোক ৬৫ দ্রষ্টব্য:)। সেই পতাক-হস্ত দুটির সংশ্লেষে অঞ্জলি-রচনা করে অনুরোধের ভঙ্গিটি আনতে হবে। এই অঞ্জলি-রচনায় যেন পদ্মের পাপড়ি-বিরচনের আভাস না ভেসে আসে। লৌকিক অঞ্জলি প্রায়ই তান্ত্রিকমতে পদ্মকোশের মত হয়; কিন্তু এই অঞ্জলিটি রচনা করতে হবে হস্ত-দুটিকে উদ্ধমণ্ডলিত করবার পর। এইটিই এর বিশিষ্টতা। এই হ'ল "পতাকাঞ্জলি"।

"পতাকাঞ্জলি সম্বন্ধে শ্রীভরত বলেছেন:

"পতাকাভ্যাং তু হস্তাভ্যাং সংশ্লেষাদঞ্জলিঃ স্মৃতঃ।
দেবতানাং গুরূণাং চ মিত্রাণাং চাভিবাদনে।
স্থানান্তস্তু পুনস্ত্রীণি বক্ষো বক্ত্রং শিরস্তথা।
দেবতানাং শিরঃস্থস্তু গুরূণামাস্যসংস্থিতঃ।
বক্ষঃস্থশ্চৈব মিত্রাণাং স্ত্রীণাং অনিয়তো ভবেৎ।"
(ভঃ নাঃ শাঃ ৯।১২৮, ১২৯, ১৩০)

দেবতাদের অভিবাদন করবার সময় ললাটের উর্দ্ধে তুলতে হয় পতাকাঞ্জলি, গুরুদের অভিবাদনে মুখমণ্ডলের সামনে আনতে হয় পতাকাঞ্জলি এবং মিত্রদের বেলায় বক্ষঃস্থ করতে হয় এটিকে। স্ত্রীদের অভিবাদন করতে হলে কিন্তু এই নিয়মের বেনিয়ম ঘটানো চলে।

অভিনয়দর্পণের (১৭৬) এবং সঙ্গীতরত্নাকরের (৭।১৮৬-১৯৭) শ্লোকগুলির মধ্যে নূতন কিছু নেই। "আর করতে না পেরে ছার করেছেন"—তাঁরা। শ্রীভরতের "মিত্র" শব্দটিকে বদলিয়ে "বিপ্র" করে দিয়েছেন। কেন যে তাঁরা এই কাণ্ড করেছেন, আমার বোধগম্য হল না।

"নিহঞ্চিতাংসকূটম্":—"অংসকূট" শব্দটি বুঝতে, কষ্ট পাবার কিছু নেই। 'Hump of the shoulders'। যাকে বলে, কাঁধের উপরকার ঝুঁট। এই muscleটিকে ডাক্তারি মতে বলা হয় Levator anguli Scapule।

"নিহঞ্চিত"—শব্দটি বড় সমস্যাস্থল।" নিকুঞ্চিত" বা "নিহঞ্চিত" যে একই পদার্থ—এই কথাই বলেছেন মাদ্রাজের শ্রীনারায়ণ নাইডু। শ্রীঅভিনবগুপ্তের টীকায় যে পাঠভেদ রয়েছে, তিনি সেটিকে অবহেলা করেছেন। বাক্যজঞ্জাল সৃষ্টি না কোরে, এই সম্বন্ধে শ্রীভরতের মূলসূত্রগুলিই আমাদের এখন দেখে নেওয়া ভালো। যথা:—

"উৎক্ষিপ্তাংসাবসক্তং বং কুঞ্চিতভ্রূলতং মনাক্।
নিহঞ্চিতং তু বিজ্ঞেয়ং স্ত্রীণামেতৎ প্রযোজয়েৎ।
গর্বে পানে বিলাসে চ বিব্বোকে কিলকিঞ্চিতে।
মোট্টায়িতে কুট্টমিতে স্তম্ভে মানে নিহঞ্চিতম্।"
(ভঃ নাঃ শাঃ ৮।৩২, ৩৩)

লীন-করণ

অর্থাৎ :—শিরোভাগের ত্রয়োদশবিধ কর্মের মধ্যে "নিহঞ্চিত" অন্যতম। (ভঃ নাঃ শাঃ ৮।১১ ।

"নিহঞ্চিত"—শিরঃক্রিয়াটি স্ত্রীলোকের পক্ষেই প্রযোজনা বিধেয়। উন্মুখ হয়ে উঠল শিরোদেশ, প্রাংশু হ'য়ে কী যেন দেখল দিব্যযোগ। এই ভঙ্গিটিতে দেখবে, ফুলে ওঠে অংসকূট।

এই নিহঞ্চন কোথায় কোথায় প্রয়োগ করে স্ত্রীবৃন্দ? নীচে গেঁথে দিচ্ছি তালিকা।

(১) যখন গর্বে ফাটছে, তখন—

(২) পান করে যখন হৃষ্ট হচ্ছে, তখন—

(৩) বিলাসে যখন আনন্দিত, তখন—

(৪) বিব্বোকে ; অর্থাৎ রমণীদের শৃঙ্গারভাবজা ক্রিয়ায়,

(৫) কিলকিঞ্চিতে ; অর্থাৎ :—শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে গর্ব, অভিমান, কান্না, হাসি, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধের সঙ্করীকরণে,

(৬) মোট্টায়িতে ; অর্থাৎ :—কান্তের স্মরণে বা বার্ত্তালাভ ক'রে, কান্তকে কাছে পাবার যে অভিলাষ হয় হৃদয়ে, সেই ভাবের প্রকাশনকে বলে মোট্টায়িত ;—সেই অবস্থায়—

(৭) কুট্টমিতে ; অর্থাৎ :—নায়কের সংস্পর্শে মনের তুষ্টি লাভ হোলেও, ছল ক'রে "আঃ, কি করছ, অমন কোরো না" ইত্যাদি বোঝাবার জন্যে কেশ-স্তন-অধর-কর ও মস্তকের যে সঞ্চালন তাকে বলে 'কুট্টমিত' ;—সেই অবস্থায়—

(৮) স্তম্ভে ; অর্থাৎ জড়ীভাবে বা নিষ্প্রতিভতায়—

(৯) মানে ; অর্থাৎ 'আমিই পূজ্য'—এই বুদ্ধি নিয়ে মান করে যখন গুমরোচ্ছে, তখন—।

এখন "লীন"—শব্দটির অর্থ-সংস্কার ক'রে দিলেই সমাপ্ত হয়ে যায় এই "লীন-করণ"টির ব্যাকরণ-ভাগ।

লী-ধাতু—to cling or press closely ; to stick or adhere to ; to melt ; to liquify। ক্ত-প্রত্যয় করলেই নিষ্পন্ন হল 'লীন'—শব্দ। এই শব্দটি থেকেই আমরা শ্লিষ্ট হওয়া, গলে-যাওয়ার একটা মধুরূপ পাচ্ছি। তাই নয় কি?

এখন এইগুলিকে মিলিয়ে নৃত্য-চিত্র-রূপ দিলেই আমরা দেখতে পাব করণটিকে।

উদ্ধমণ্ডলিত ক'রে হাত দুটিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বুকের কাছে পতাকাঞ্জলি করে রাখো তোমার হাত। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাটিকে প্রসারিত (elongate) করে দাও। দেখবে আপনা হ'তেই তোমার দুটি কাঁধ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে আর ফুলে উঠছে কাঁধের উপরকার পেশী। অনুরোধ করতে হ'লে যেমন সাধারণতঃ বিনয়ে এবং সৌজন্যে সঙ্কুচিত এবং শ্লিষ্ট (pressed) হয়ে যায় দেহ, তেমনি করে তোমার অঙ্গসঞ্চালনে ফুটিয়ে তোলো সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমনত একখানি প্রীতি-প্রদেয় ভাব। চরণের সংস্থানটিকেও শ্লিষ্ট করতে ভুলো না। এক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশক হবে জোড়া-পা।

[ক্রমশঃ।

— বিশেষ বিজ্ঞপ্তি —

বর্তমান সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য দুটি বিশেষ লেখার প্রকাশ স্থগিত হ'তে দেখে অনেকেই হয়তো হকচকিয়ে যাবেন। লেখা দু'টি যথাক্রমে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের "আত্ম-স্মৃতি"। এই প্রসঙ্গে মাসিক বসুমতীর বক্তব্য আগামী সংখ্যায় পেশ করবো। পাঠক-পাঠিকা অধৈর্য্য হবেন না।

— ভ্রম সংশোধন —

গত সংখ্যার পত্রগুচ্ছে হান্স এ্যাণ্ডারসনের লেখা বেশ কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত করা হয়, যার শেষাংশ এই সংখ্যাতে শেষ হয়েছে। গত সংখ্যায় হান্স এ্যাণ্ডারসনের পরিচয়-লিপিতে একটি মারাত্মক ভুল থেকে যায় এবং যখন আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে। 'এ্যালাইস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' নামটি যুক্ত হওয়ায় যত কিছু বিপত্তি হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, উক্ত পত্রসমূহ এ যাবৎ শুধু বাঙলায় নয়, মূল ইংরাজীতেও অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পত্রসমূহ শ্রীশুভেন্দু ঘোষ অনুবাদ করেছেন।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু
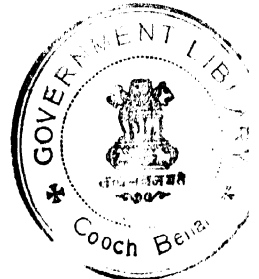
গৌরাঙ্গ মাষ্টার মশায় সেকালে আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ছেলেরা বলাবলি করত, গৌরাঙ্গ নয়—গণ্ডার মাষ্টার। উঃ, কি পিটুনিটাই দিতেন! শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মতন ভুবনের যাবতীয় জনপদ তাঁর ঠোঁটের আগায়। দেয়ালে ম্যাপ টাঙানো—মুখের কথার রেশ না মেলাতে ম্যাপের উপর দেশ দেখাতে হবে। ঈশ্বরকে শাপশাপান্ত করতাম মনে মনে—এত বড় ভুবন কেন গড়লে প্রভু, কেন এত সর্বরকমারি জায়গা? একমাত্র উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে, গ্রাম-বালকগুলোকে গৌরাঙ্গ মাষ্টারের বেত খাওয়ানো। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

তারপর উচু ক্লাসে উঠে গৌরাঙ্গের বেতের দাগ অঙ্গ থেকে মেলালো—ভূগোল তৎপূর্বেই বেমালুম মিলিয়ে গেছে মন থেকে। সে এক দুঃস্বপ্ন! শত শত শুকনো নাম, আর সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। অনেক দিন অবধি আৎকে উঠেছি পুরাণো কথা মনে ভেবে।

সেই নামগুলো মানুষের মূর্তি হয়ে আজকে এক ঘরে জমেছে। ভুবন অতি ছোট—বাল্যের কামনা পূরল এত দিনে। পাহাড়-সমুদ্র ব্যবধানের দেশভুঁইরা মিলে মিশে দিব্যি যেন এক সংসার রচনা করেছে। সারির মাথায় মাথায়, দেখ, নানান দেশের নামের ফলক আঁটা, আর সেই সঙ্গে ছোট এক এক পতাকা। কনফারেন্সের চেয়ে বিরতিগুলোই বেশি আরামের। ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর খানিক ক্ষণের ছুটি। নিন, দেহমন চাঙ্গা করে আসুন। পিছনের লাউঞ্জে এবং আরও পিছনে এদিক-ওদিকের ঘরগুলোর আঙুর, কলা, আপেল, কেক, সাতুই, কফি চা মিনারলচ-ওয়াটার—কত আর বলি! নিজের হাতে যত দফায় যেমন খুশি তুলে নিন। দোভাষি ছেলেমেয়েগুলো ঘুরছে পরস্পরের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। কোন কিছুর অকুলান দেখলে—হয়তো বা গেলাস পাচ্ছেন না অরেঞ্জেড ঢেলে নেবার, কিম্বা কাপগুলোয় চা ঢেলে থেয়ে গেছে—ছুটে জোগাড় করে এনে হাতে দেবে। শীতের স্নিগ্ধ রোদে তারপর ঘুরে ঘুরে বেড়ান প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে। বেড়ানো কি বলছি—আক্রমণ, ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে একে অন্যের উপর। কোন জায়গার মশায় আপনি? আমি ইকুয়েডরের। আমি এল স্যালভেডরের। পেরু থেকে আসছি আমি। আমি পানামা থেকে। আমার নিবাস ইরাক।···আপনার আমার মতোই দু-হাত দু-চোখ-বিশিষ্ট মানুষ সকলে (বিশ্বাস করছেন তো পাঠক?)—হো-হো করে হাসে মজাদার কথায়, মেয়েগুলো বাহার করে মন ভোলায়, প্রশংসা-বাণীতে গলে পড়ে। এর মধ্যে সাধ্য কি আপনি আলতো হয়ে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন! আরে ছো:—এরই নাম দুনিয়া, এরাই সব দুনিয়ার মানুষ! ভাবনা কিসের তবে, কোন মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারিনে? দুনিয়া তবে তো আমারই! কনফারেন্সের ব্যাপারে গিয়েছিলাম বটে—কিন্তু সত্যি বলছি, শুধুমাত্র বক্তৃতার কচকচানি হলে ফিরে এসে জাঁক করে এই রকম আসরে বসতাম না আপনাদের নিয়ে। উঁচু প্লাটফরমে উঠলেই বক্তা আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেন—কি এদেশে, কি সেদেশে। সে আর নতুন কি? কনফারেন্সের কথা রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা বলুন গে আমি যে ওরই মধ্যে ভুবনের সঙ্গেও যৎকিঞ্চিৎ মোলাকাত সেরে এসেছি, ঐ এক আনন্দ নানান রকম সুর ভেঁজে আপনাদের শোনাই।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা। দিন তিনেক তো কেটে গেল, থামবার গতিক দেখিনে। পুরো দশ দিন চলবে নাকি এমনি। দু-বেলা হচ্ছে, তাতে কুলোবে না—শুনি, রাত্রেও বসতে হবে মাঝে মাঝে। ওরে বাবা, ইস্কুলের ছেলে-মেয়ে বানিয়ে ফেলেছে আমাদের। আরও মুশকিল, প্রাজ্ঞ প্রবীণ সকলে—তিলেক মাত্র চাপল্য দেখানো চলবে না। পাকাচুল ব্রেজিলের ব্যক্তিটি দৈবাৎ হাই তুলে ফেলেছেন—চারিদিক তাকিয়ে ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসলেন আবার। পরম মনোযোগে বক্তৃতা শুনছেন—উঁহু, ভূমিকম্প জলস্তম্ভ দাবানল যাই ঘটুক না কেন আর তিনি মুখ ফেরাচ্ছেন না মঞ্চের দিক থেকে।

ভারি এক কাণ্ড হল সেদিন। এক বিদেশিনী পড়ে যাচ্ছিলেন শুনতে শুনতে। মাটিতেই পড়তেন, পাশের মানুষ ধরে ফেলল। বক্তৃতা অতি প্রখর তখন ওদিকে। ক্লান্ত মুদিত-চক্ষু মহিলা—নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে! এত লোক বাদ দিয়ে বক্তৃতার বাণ বিঁধল এসে অবলা জনকে! চাপা উদ্বেগ চতুর্দিকে সকলের মুখে, ক'জনে কর্তাদের খবর দিতে ছুটলেন। জাঁদরেল এক ডাক্তার আমাদের মধ্যে—উঠে গিয়ে তিনি নাড়ি টিপে দেখেন। ও-তরফের নার্স-ডাক্তার ষ্ট্রেচার ফার্ষ্টএডের বাহিনী এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমাদের ডাক্তার হাঁকিয়ে দেন, উঁহু কদাপি নয়। হল কি ডক্তোর সাহেব, নাড়ানাড়ির ধকলও সইবে না এ অবস্থায়? বরফ দেওয়া হোক তবে, আর কিছু অষুধপত্তোর? কিছু নয়, কিছু নয়। রোগিণীকে সাবধানে বসানো হয়েছে চেয়ারের উপর, ঘাড় এলিয়ে পড়েছে। আহা রে, কি সর্বনাশ বিদেশবিভুঁয়ে এসে! কিন্তু কঠিন-প্রাণ ডাক্তার সাহেব—ওদের দলবল সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ব্যাধিটা তখন মালুম হল—নিদ্রাকর্ষণ। ক্লিমুনির মাত্রাধিক্য ঘটেছিল—তার পরে হৈ-চৈয়ের মধ্যে অমনি অবস্থায় নিঃসাড় নিশ্চেতন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? ঘুম ভেঙে গিয়েও মূর্ছিত হয়ে থাকেন মানের দায়ে। ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে ব্যাপারটা পরে ফাঁস করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে।

ছবি তুলছে ক্ষণে ক্ষণে—স্থির অস্থির, উভয় রকমের। আমাদের মধ্যে দু'-জন এই তালেই আছেন শুধু। ক্যামেরা কখন কোন দিকে তাক করছে, তদনুযায়ী ঘাড় বাড়িয়ে দিচ্ছেন—কোন ছবি ফসকে না যায়। আসন ছেড়ে কেউ হয়তো বাইরে গেছেন, কিম্বা বক্তারূপে মঞ্চের উপর উঠেছেন—সেই সব খালি জায়গার কখনো এটায় কখনো ওটায় গিয়ে বসলেন ছবি স্পষ্ট ওঠে যাতে। আরে, ঐ দেখুন—বিশিষ্ট এক ব্যক্তি পড়ায় মগ্ন হয়ে গেছেন টেবিলের খোপে সকলের নজরের আড়ালে বই রেখে। ইস্কুলের ছেলের উপমাটা দিব্যি লাগসই হয়েছে তবে তো!

হাতে আমার কলম—ইতি-উতি চেয়ে অপর সকলের দোষ টুকে যাচ্ছি। নিজেও পরমহংস নই, এই থেকে মালুম। আজে-বাজে এতেক কাহিনী লিখে যাচ্ছ? লেখক মশাই, এই কি সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ? মানি সেটা। কিন্তু কাঁহাতক এইপ্রকার জবানের পর জবান শোনা যায়? আর গরজও নেই। একটু পরেই টাইপ-করা বক্তৃতার কাপি টেবিলে দিয়ে যাবে। এবং কাল দশটার আগেই বক্তা এবং অনুষ্ঠানের রকমারি ছবি সহ ইংরেজি, রুশ, স্প্যানিশ ও চীনা চারটে ভাষায় ছাপা বুলেটিন।

বিপদ হয়েছে, হলের ভিতরে যতক্ষণ আছি মাথা থেকে হেড-ফোন নামাবার জো নেই। সকলে তাকাতাকি করবে। দেখ, দেখ, মানুষটা কি দুর্জন—শুনছে না, কনফারেন্স ফাঁকি দিচ্ছে। তিনিই মহাজন, যিনি ধরা পড়েন না; ধরা পড়লে গোল্লায় গেলেন। দু-কান জুড়ে অবিরত ভ্যানর-ভ্যানর—মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তার পরে ভারি এক বুদ্ধি এসে গেল—আহা, কি চমৎকার! সুইসবোর্ডে ফালতু যে তিনটে ফুটো আছে, তারই একটায় প্লাগ ঢুকিয়ে দাও। ব্যস নিশ্চিন্ত—একেবারে নির্বাধ শান্তি। নিরুপদ্রবে তীরবেগে কলম চালাও এবার। সকলের চোখে চোখে সম্ভ্রম—হাঁ, খাটনি খাটছেন বটে লেখকটি, বক্তৃতার কমাটুকুও ছাড়ছেন না।

ডাক্তার ফরিদি আমার ডাইনে। লক্ষ্ণৌয়ে বসতি, ভারি দরের ডাক্তার, ডিগ্রির অন্ত নেই। আগের বছর আন্তর্জাতিক চিকিৎসক-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন। প্রতি দেশ থেকে দু-জন করে প্রতিনিধি—ভারতের দু-জনের মধ্যে তিনি একটি। তারপর তামাম আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিন-চার মাস ধরে। এবারে এই নতুন-চীনে। রসিক মানুষ—ফিসফিসিয়ে ফষ্টিনষ্টি চলে প্রায়ই আমাদের। বলেন, পৃথিবী বেড়ানো মোটামুটি শেষ হল এই বারেরটা দিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আমার লেখা।

বই শেষ করে যাচ্ছেন বুঝি সঙ্গে সঙ্গে?

আজ্ঞে না, শুধু মাত্র দাগা বুলানো। আর আজকের এই হৃদয়গুলোর উত্তাপও যদি একটু লিখে নিতে পারি। দেশে ফিরে অনেক রাতে কলম নিয়ে বসব। মন তখন পিছিয়ে এই দিনে পৌঁছুবে লেখাগুলো ধরে ধরে।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভাষায় লিখবেন বই? ইংরেজি—ইংরেজি কিন্তু। নইলে আমাদের বঞ্চনা করা হবে।

বইয়ের নামে কৌতূহল অনেকেরই। পিছনের সারি থেকে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উঁকি দিচ্ছেন, দেখি কি লিখলেন? হাত ঢাকা দিই। দেখাবার মতন কি কিছু? এই খড়কুটোয় উপর মাটি লেপে মূর্তি বানাই, তার পরে দেখবেন।

বাইরে যখন মাঠে ঘুরছি, হাতছানি দিয়ে একজনে ডাকলেন। শুনুন, উত্তম চেয়ার-টেবিল, অফুরন্ত সময়, দেদার লিখে যান। আমি এক কায়দা বাতলে দিচ্ছি—

কানের কাছে মুখ এনে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কায়দাটা বাতলে দিলেন। আমি হেসে বললাম, ফালতু ফুটোয় প্লাগ ঢোকানো—এই কর্মই চালাচ্ছি মশায় কয়েকটা দিন—

বলেন কি, ওটা তো আমারই মাথায় এলো—

দায়ে পড়ে অনেকেরই মাথা খুলছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন।

ডক্টর কিচলু উঠলে উৎকর্ণ হলাম। এখানে ফাঁকি দিলে হবে না। সাংস্কৃতিক লেনদেন নিয়ে বলছেন। আমার মনের কথাগুলো তাঁর মুখে ই অবিকল পাচ্ছি।

ইউরোপে নানান দেশ। কিন্তু সাংস্কৃতিক লেনদেন তাদের মধ্যে বরাবরই চলেছে। এখনই একটু থমকে যাচ্ছে লড়াইয়ের আলাদা আলাদা ঘাঁটি বানাবার দরুন। এশিয়ায় আমরা বহু পুরানো কাল থেকে এক—মাঝখানটায় কেবল ছন্নছাড়া হয়ে ছিলাম, বিদেশিরা যখন ঘাড়ে চেপে বসল। তাদের সংস্কৃতি বয়ে এনে চাপান দিল আমাদের উপর।

প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের তাবৎ জাতি জমায়েত হয়েছেন এখানে। দক্ষিণ-আমেরিকা ফিলিপাইন নিউজিল্যাণ্ড—এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কম। প্রীতির বাহু বিস্তার করো এদের দিকে—সমস্যা একই সকলের। সংস্কৃতি মানে আর এখন ধর্ম ও দর্শন নয়, সাহিত্য ও শিল্প নয়—সামগ্রিক জীবন-রীতি। তারই বিস্তারে গোটা দুনিয়া এক হয়ে যাবে, শান্তি আসবে।

এগিয়ে আসুন লেখক-শিল্পীরা, এদেশে-ওদেশে যাতায়াত ও মেলামেশা করুন। আসুন সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজ-কর্মী, অভিনেতা—সকলেই। চাষী-কারিগর চিনে ফেলুন পরস্পরকে। খেলুড়ের দল খেলাধুলা করুন এদেশে বিদেশে। বাচ্চাদের মধ্যেও প্রসার হোক ঐক্য-চেতনা—খেলনা-পুতুলের লেনদেন চলুক। এদেশের পড়ুয়ারা চলে যাবেন ঐ সব দেশে; ওদেশ থেকে আসবেন এখানে। বিদেশে পড়াশুনোর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। এক্জিবিসন হবে; সভা হবে ভুবনের তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে। সিনেমা নাটক নাচগানের পালটাপালটি হবে। ভাষা শিখতে হবে এদেশের ওদেশের—বইপত্তোর তর্জমা হয়ে ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। বড় বড় ওস্তাদ গুণীজ্ঞানীদের স্মৃতিতে আন্তর্জাতিক উৎসব হবে•••

৪ঠা অক্টোবর, সকালবেলা সভারোহণ করলেন—ইউ• এস• এ•, নিকারগুয়া, কলম্বিয়া, সিরিয়া ও ইস্রায়েল। বিকালে জাপান, মেক্সিকো, হন্দুরাস, সাইপ্রাস, এল স্যালভেডর। কমিশন গড়া হল একুনে আট দফা—জাপানের সমস্যা, কোরিয়ার সমস্যা, সাংস্কৃতিক লেনদেন, আর্থিক সম্পর্ক, জাতীয় স্বাধীনতা, পাঁচ শক্তির শান্তি-চুক্তি, নারীর অধিকার ও শিশু-মঙ্গল, বিভিন্ন ঘোষণায় মুসাবিদা। কমিশনের মুরুব্বিরা এই আট ব্যাপারে কর্তব্য বাতলে দেবেন; ওঁদের তৈরি প্রস্তাব মূল-সম্মেলনে উঠবে।

উঁহু, আমায় কেন ভাই? এই সব বড় বড় ব্যাপারের আমি কি বুঝি? রেহাই হল না। সাহিত্যিক মানুষ, গায়ে

সংস্কৃতির গন্ধ—টেনেটুনে তাই সাংস্কৃতিক কমিশনে ঢুকিয়ে দিল আমায়।

নিমন্ত্রণ। সকালবেলা কনফারেন্স করছি, সেক্রেটারিচমূর এক জন স্লিপ পাঠিয়ে খবর জানালেন। কয়েকজন চৈনিক পণ্ডিতের বাঞ্ছা হয়েছে—আমাদের পাঁচ জনকে ভোজ খাওয়াবেন—ডক্টর কিচলু, সর্দার পৃথ্বী সিং, অধ্যাপক উপাধ্যায়, কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেসেরি এবং এই অধম। উদ্যোক্তা মহাশয়দের পাণ্ডিত্যে খাদ নেই, তা এই মহৎ ইচ্ছা থেকে মালুম। অধিবেশনের পর হোটেলে নয়—সোজা চলে যাবো তাঁদের সঙ্গে। আহারাদি অন্তে পুনশ্চ এইখানে হাজির করে দেবেন বৈকালিক সভাশোভন বাবদে। হোটেলে গড়ানো আজকে কপালে নেই।

আর একটু হাঙ্গামা—দাঁড়িয়ে যান হলের বাইরে এইখানটায়। গোটা ভারতীয় দল নিয়ে ফোটো তোলা হচ্ছে। ঝানু ব্যক্তিরা তক্কে তক্কে ছিলেন—কিন্তু জুত হল না, রমেশচন্দ্র জায়গা ঠিক করে দিচ্ছেন। বলেছি তো—পয়লা সারির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিচলু সাহেবের পাশেই আমি। আরে দূর—তাই হয় কখনো? রবিশঙ্কর মহারাজ আর ডক্টর জ্ঞানচাঁদকে মাঝে ঢুকিয়ে নিলাম। সে ছবি দেখেছেন আপনারা।

তারপর সকলে মিলে নিমন্ত্রণ খেতে চললাম দু-খানা গাড়ি নিয়ে। তা-বড় তা-বড় পণ্ডিত—অতএব বিস্তর ভাল কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি। এই পিকিনের কথাই ধরুন। অতি-পুরাণো শহর—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—গোটা দুই-তিন রাস্তা মাত্র আঁকাবাঁকা; আর সমস্ত সোজাসুজি চলে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় কাটাকাটি সঠিক সমকোণে। প্লান করে শহর বানিয়েছে সেই প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারেরা। চওড়া চওড়া রাস্তা ছিল তখন। তার একটা প্রমাণ, এখন নতুন আমলে ছোট রাস্তাগুলো বড় করা হচ্ছে। দু-পাশের বাড়ি ভেঙে ফেলে খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচে পুরাণো পয়ঃপ্রণালী বেরিয়ে পড়ছে। অনেক রকম বিপর্যয় ঘটেছে পিকিনের উপর দিয়ে, চেহারা পালটেছে অনেক বার। কালে-কালে মানুষ রাস্তা গ্রাস করে তার উপরে ঘরবাড়ি তুলেছিল।

উঁচু ঘর বানানোর জো ছিল না সে আমলে। আপনার আমার ঘর রাজবাড়ি ছাড়িয়ে মাথা তুলবে, এ কেমন কথা? যতদূর খুশি ছড়িয়ে ঘরবাড়ি করুন, কিন্তু উপর দিকে নয়। ছ-সাত তলা যে অট্টালিকা দেখছেন, নিতান্তই হাল আমলের এগুলো।

আরে—ঘুরে ফিরে গাড়ি আবার পিকিন হোটেলের কাছে। হোটেল ছাড়িয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল। তার পরে আরো খানিক গিয়ে থামল এক বাড়ির দরজায়।

রেস্তোরা। পুরাণো বাড়ি—চেহারা চমকদার নয়। খানা-পিনার জায়গা, বাইরে থেকে মালুম হয় না। রসিক অধ্যাপক চেন হান-সেং নিমন্ত্রকদের একজন। আর আছেন চেং চেন টোল নামে ভারি এক জাঁদরেল পণ্ডিত।

তা নেমন্তন্ন করে রেস্তোরায় কেন মশায়? বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন?

এই রেওয়াজ। কি কি পদ ভারতীয়েরা তারিফ করেন, আগে থাকতে বলে গিয়েছিলাম; এরা সেই মতো আয়োজন করেছে। বাড়িতে এসব হয় না।

ঘরগুলো আধ-অন্ধকার, ঘিঞ্জি মতন। চেং বললেন, এই বাড়ি থেকে চীনা গৃহস্থবাড়ির আন্দাজ নিন। ঐ হল উঠোন, এইগুলো শোবার-ঘর, ওখানে ওঠা-বসা হত। একজনের বসতবাড়ি এটা। জাপানিরা পিকিন দখল করল; তাদের এক দল গৃহস্থ তাড়িয়ে এখানে আস্তানা গাড়ে। মালিকেরা ফৌত। কোথায় গেল, কি হল—সেটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এমন বিস্তর ঘটেছে। মানুষ শেষটা তাই মরীয়া হয়ে উঠল একেবারে। কম্যুনিষ্টদের মুক্তি-সৈন্য ধেয়ে আসছে পিকিনমুখো; কুয়োমিনটাং নানা রকম গুজব ছড়াচ্ছে—মানুষ নয়, ভূতপ্রেত দত্যিদানো হল বেটারা। লোকে তবু ভয় পায় না একটুও। যা-ই ঘটুক, জাপানিরা যে কাণ্ড করে গেছে তার বেশি তো নয়! ভাগ্য ভাল মশায় যে আপনাদের ভারত কখনো জাপানের তাঁবে থাকে নি।

এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছি। নানা রকম তুকতাক, অদ্ভুত ধরণের বিচিহ্ন দেয়ালে। শয়তানকে ভয় দেখাত এই সব করে। দেশময় কুসংস্কার ছড়ানো ছিল—পুরাণো জাতের যেমন হয়ে থাকে। রেলগাড়ির যখন চলন হল, রেলের পাটি-মাইলের পর মাইল উপড়ে দিয়েছিল শয়তানের রোষ প্রশমনের জন্য।

তবে আভিজাত্য ও জাতিভেদ বলে কিছু ছিল না কোন কালে। গরিব-ধনী মূর্খ-বিদ্বান সবই ছিল, জাত হিসাবে ইনি মোটা উনি খাটো এমন বিধান চলে নি। বুদ্ধিজীবী, চাষী, শিল্পী ও সৈন্য—চতুর্বর্ণের সমাজ। আপনি গুণ দেখিয়ে এ বর্ণ থেকে ও বর্ণে স্বচ্ছন্দে প্রোমোশান নিয়ে যান, কেউ রুখতে পারবে না। তৃতীয় শতক থেকে নাকি এই নিয়ম চালু।

আর নয়—আসুন,এবারে খাওয়া-দাওয়া। ভাগ্যবশে এমন সঙ্গ পেয়ে গেছি, খাদ্যে রুচি নেই—জ্ঞানীগুণীদের মুখের বাক্যই গোগ্রাসে গিলছি। টুকে নিচ্ছি একটু-আধটু খাতায়।

নিজ দেশকে ওরা বলে চুং-কো (মাঝের দেশ)—চীন নয়। জাতটা ধরেই ঠাণ্ডা মেজাজের। দু জনে মারামারি হচ্ছে—তাই দেখে বলত, ভারি বোকা তো! যুক্তি-তর্কে হারিয়ে দাও, গায়ের উপর খোঁচাখুঁচি কেন? সেই চীনকে কত কাল ধরে কি বিষম লড়াই করতে হল! লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নয়, নিজেদের ভদ্র চরিত্র ও চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। হীনবল ও প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় গেরিলা-যুদ্ধে জাপানিদের উত্যক্ত করে তুলল। কি রকম অভদ্র বিবেচনা করুন—যুদ্ধের নিয়মকানুন পালবে না, পরনে ইউনিফর্ম নেই, পাহাড়-জঙ্গল রাস্তা-সাঁকোর আড়ালে আবডালে থেকে নোটিশ না দিয়ে আঘাত হানবে। তা যেমন মুগুর তেমনি কুকুর হবে তো—জাপানিরাও এক একটা অঞ্চল ধরে বিলকুল সাবাড় করতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

পৃথিবী ও দেবী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি, তখনও আমরা আমাদের দেশকে অকাতরে এবং গর্বভরে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। আমাদের ছেলেবেলাকার একটি অতি প্রচলিত শ্লেষ ছিল, আমাদের জন্মভূমির 'মাটি' শুধু 'মাটি' নয়, সে আমাদের 'মা-টি'। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়-সঙ্গীত রচনা করিয়া মাতাকে বন্দনা করিতে আহ্বান জানাইলেন, আমরা জানি সেই মা এক দিকে 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি, আবার অন্য দিকে সেই বঙ্গভূমিই 'দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গা'— আমরা তাঁহারই 'প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। কিন্তু সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা একটি ভূ-খণ্ডই আবার মন্দিরের দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার সঙ্গে একেবারে এক হইয়া গেল কি করিয়া? আশ্চর্য এই, বিশেষ করিয়া খোঁচাইয়া না তুলিলে এ প্রশ্নটা সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; আমাদের নিকটে ইহা একটি সহজ সিদ্ধান্ত— সহজাত বিশ্বাস। শুধু কি বঙ্কিমচন্দ্রই দেশকে দেবীর সঙ্গে অভেদ করিয়া দিয়াছিলেন? উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ ঘটিতেছিল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যদি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক করিয়া দেখিয়াছেন। আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া একান্ত স্পষ্ট কতগুলি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে গান দিলেন,—

> চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
> জয় মা ভারত, জয় মা কালী।

'জয় মা ভারতে'র সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে 'জয় মা কালী' আসিয়া জুটিলেন কেন? এখানে ভারতমাতাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য বলদায়িনী কালীমাতার নিকটেও জয় প্রার্থনা করা হইতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সবটুকু কথা বলা হইল এরূপ বলা যায় না; কবির মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালীমাতা কোথায় একেবারে এক হইয়া যুক্ত হইয়া রহিয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতায় তিনি যখন বলিলেন,—

> "জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
> হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
> জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ!
> জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
> ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
> গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

তখন ইহাকে শুধু কবির কল্পনার আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না, ইহার ভিতরে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালীর দেশাত্মবোধ এবং ধর্মবোধের যে একটা অনায়াস মিশ্রণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। সরলা দেবীর 'বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি' এই প্রসিদ্ধ গানটির ভিতরে দেখিতে পাই, বলা হইয়াছে, 'যুগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি,' শস্য-শ্যামলা মা ভারতবর্ষের সহসা আবার 'কমল-বরণী' হইয়া উঠিবার তাৎপর্য কি? তাহার পরেই আবার দেখিতে পাই,—

> আবার তোমায় দেখিব জননি সুখে দশদিক্-পালিনি!
> অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালিনি!

এই 'খর্পর-করবালিনী' বিশেষণটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অবশ্য বিশুদ্ধ দেশের দিক হইতেও এই বিশেষণের ব্যাখ্যা চলে, সে কথা অস্বীকার না করিয়াও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, দেশ সম্বন্ধে এই 'খর্পর-করবালিনী' বিশেষণ প্রয়োগের সংস্কৃতিগত বা ঐতিহ্যগত একটা বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে।

স্বদেশী যুগের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক চারণ-কবি মুকুন্দদাসের একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, গানটি একটি প্রসিদ্ধ স্বদেশী সঙ্গীত।

> জাগো গো, জাগো জননি,
> তুই না জাগিলে শ্যামা
> কেহ জাগিবে না মা,
> তুই না নাচালে কারো
> নাচিবে না ধমনী।
> ডেকে ডেকে হলেম সারা
> কেউ তো সাড়া দিল না মা,
> খুঁজে দেখলেম কত প্রাণ
> কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
> তুই না কাঁদালে প্রাণ
> কাঁদিবে না কারো প্রাণ,
> না কাঁদিলে সবার প্রাণ
> পোহাবে কি রজনী?
> দয়াময়ী নাম ধরিস্
> দয়া কি মা আছে তোর,
> দয়া থাকলে মরে কি আজ
> ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
> মরি তাতে ক্ষতি নাই,
> বাসনা মা দেখে যাই—
> ভারতেরি ভাগ্যাকাশে
> স্বাধীনতা-দিনমণি।

গানটিকে আমি তৎকালীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একটি প্রতিচ্ছবি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। বহু দিনের ঐতিহ্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া আগত একটি সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাজিক মানস উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিয়াছে। দেশ এবং

শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা আলো-আঁধারি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের সহিত একটি ধর্মপ্রেরণা যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত আর বেশি বাড়াইয়া লাভ নাই। মোটের উপরে দেখিতে পাইলাম, আমাদের স্বদেশপ্রেমের লক্ষ্য যে দেশ এবং আমাদের অধ্যাত্ম প্রেমভক্তির লক্ষ্য যে দেবী তাঁহারা উভয়ে বাঙালী-মানসের ভিতরে একটা সহজ অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের একটা জাতিগত মানস প্রবণতা। এই-জাতীয় জাতিগত-মানস-প্রবণতা কখনও এক দিনে গড়িয়া ওঠে না, ইহার পশ্চাতে আমাদের বহুযুগপ্রবহিত একটি ঐতিহ্যের ধারা রহিয়াছে। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যধারাটিই আমরা এখানে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি সেখান্ হইতেই পৃথিবীকে আমরা দেবীরূপে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার আবিষ্কৃত সভ্যতাকে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ পণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য-সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাক্-আর্য-সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যে আমরা অনেকগুলি পাথরের স্ত্রীমূর্তি পাই। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই স্ত্রীমূর্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতগুলি মূর্তি মাতৃদেবী-মূর্তি এবং ইহারাই আমাদের পরবর্তী কালের অনেক মাতৃদেবী-মূর্তির প্রাক্-রূপ। পণ্ডিতগণ আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মূর্তির অনেক মূর্তিই হইল মাতা পৃথিবীর মূর্তি। শস্যোৎপাদিনী পৃথিবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীন কাল হইতে পূজিতা। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়দেশ হইতে একটি বৃক্ষ বাহির হইয়াছে; অন্ততঃ এই মূর্তিটি যে পৃথিবীরই মাতৃমূর্তি সে সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতই নিঃসন্দেহ।

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পৃথিবী-দেবী-মূর্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে এই পৃথিবী-দেবী-মূর্তি শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য এ কথা বলা যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বহু দেশেই মাতৃদেবীতে বিশ্বাস দেখিতে পাই, আর এই মাতৃদেবী সর্বত্র না হইলেও বহু স্থলেই হইলেন পৃথিবী-দেবী। প্রাচীন মেক্সিকোর যিনি মাতৃদেবী তিনি মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবী, তিনিই আবার পৃথিবী-দেবীও ছিলেন; তাঁহাকে অনেক সময় সম্বোধন করা হইত 'Tlalli Ilalli' বলিয়া,—ইহার অর্থ 'পৃথিবীর মর্ম।' প্রাচীন লেখক ট্যাসিটাস্ বলিয়াছেন, "Nearly all the Germans unite in worshipping Nerthus, that is to say, Mother Earth". (১)—অর্থাৎ প্রাচীন জার্মাণগণ নের্থাস্ দেবীর পূজায় সমবেত হইত, এই দেবী ছিলেন মাতা পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীক্ মাতৃদেবী 'রী' (Rhea) পৃথিবী-দেবী ছিলেন; রোম্যান দেবী সিবিলিও (Cybele) মূলতঃ পৃথিবী-দেবীই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসিগণের পূজিতা বহু দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ইহার অনেক দেবীও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শক্তির প্রতীক মাতা পৃথিবী।

(১) The great Mothers Vol III, by Briffault.

বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর মাতৃদেবীরূপে বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ। অবশ্য একটি জিনিস সেখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি; মাতা পৃথিবী ঋক্‌বেদে স্বতন্ত্র ভাবে কদাচিৎ স্তুতা হইয়াছেন, যেখানেই তিনি মাতারূপে স্তুতা তাহার প্রায় সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পিতা 'দ্যৌ'র সহিত একসঙ্গে দেখিতে পাই। এই দ্যাবা-পৃথিবীর স্তোত্র ঋক্‌বেদে বহু স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পিতা 'দ্যৌ'র সহিত একসঙ্গে স্তুতা হইলেও পৃথিবী এই স্তবের মধ্যে তাঁহার মাতৃত্বের এবং দেবীত্বের মহিমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বৈদিক ঋষিগণ প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতারূপেই পৃথিবীর স্তব করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বলিয়াছেন,—'মাতা পৃথিবী মহীয়ং'—বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা (১।১৬৪।৩৩)।

অন্যত্র দেখিতে পাই—

> ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
> পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
> নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
> দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।
>
> *   *   *   *
>
> ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
> অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
> পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
> পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ। (১।১৮৫। ২,১০)

'পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবি, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।···আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তু দ্বারা পালন করুন।' (রঃ দঃ)

অন্যত্র ঋষি বলিয়াছেন, 'মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ', 'মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' বহু সূক্তে দেখিতে পাই, পিতা দ্যৌর সহিত মাতা পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রচুর শস্য দান করেন, প্রচুর অন্ন এবং ধন দান করেন। তাঁহারা যেন আমাদের সকল পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন, আমাদিগকে যেন সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, শৌর্য বীর্য, সন্তান এবং দীর্ঘায়ু দান করেন, তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ করিবার সময় এই দ্যাবা-পৃথিবীর নিকট হইতে আশীর্বাণী প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ঋষিকবিগণ যে পৃথিবী মাতার সন্তান বলিয়া সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন সেই পৃথিবী মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকারের বাৎসল্য, সুকোমল স্নেহ, চিত্তের ঔদার্য এবং অসীম ক্ষমাগুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা ইহা বৈদিক কবিগণের নিছক কবি-কল্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বৈদিক কবিগণের একটা ধর্মবোধও প্রচ্ছন্ন ছিল,—পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রূপবৈচিত্র্য এবং

প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রূপ,—সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে লুক্কায়িত অনন্ত প্রাণশক্তি—নিরন্তর অসংখ্যরূপে তাহার প্রকাশ—এই সকল একত্রিত হইয়া মুগ্ধ কবিগণের চিত্তে একটা বিস্ময়-জনিত শ্রদ্ধা জাগিয়া তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর দেবীমূর্তি। এই জন্যই বেদের ঋষি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নমস্কারই হইল শ্রেষ্ঠ বস্তু, আমি তাই নমস্কার করি এই পিতা দ্যৌ এবং মাতা পৃথিবীকে, এই নমস্কারের দ্বারাই দ্যৌ এবং পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে। (ঋক্‌, ৬।৫১।৮)।

ঋক্‌ বেদের কতগুলি স্যুক্তে দেখিতে পাই, দ্যৌ-রূপ পিতার বর্ষাই হইল রেতঃ, সেই বর্ষা-সিঞ্চনেই মাতা পৃথিবী তাঁহার গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের শস্য। বহু প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ভিতরেই আমরা দ্যৌ-পিতা এবং পৃথিবী-মাতার বিশ্বাসের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতার আদিযুগ হইতেই আমরা প্রায় একটি ধর্মবিশ্বাসরূপে এই ধারণা বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই যে, বর্ষার ভিতর দিয়া দ্যৌ-পিতা মাতা পৃথিবীকে গর্ভদান করেন।(২)

বেদের এই দ্যাবা-পৃথিবী রূপ পিতা-মাতার পরিকল্পনার আর এক দিক হইতে আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে পারি। সৃষ্টির ভিতরে এই যে একটি সর্বজনীন পিতা-মাতার পরিকল্পনা দেখিতে পারিলাম, ইহা পরবর্তী কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শক্তির পরিকল্পনাকে জাগাইয়া দিয়াছে। বেদের দ্যাবা-পৃথিবী রূপ পিতামাতার পরিকল্পনার ভিতরেই শিব-শক্তির দার্শনিক তত্ত্বের আভাস রহিয়াছে এমনতর কথা বলিলে অবশ্য একটু বেশি বলা হইল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে একটি 'জগতঃ পিতরৌ'-র কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না।

ঋক্‌-বেদের ভিতরে পৃথিবীর মাতৃরূপের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে-সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণবিকশিতা মহিমময়ী মূর্তি দেখিতে পাইলাম অথর্ববেদের 'পৃথিবী-স্যুক্তে'র মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে,—

সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; সেই পৃথিবী যাহা কিছু ভূত—যাহা কিছু ভব্য—সকলের অধীশ্বরী (পত্নী)—সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুক। এই পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা—কত গমনশীলতা—কত সমতল,—নানা বীর্য, কত ওষধি (১২।১।২); ইহার ভিতরে আছে সমুদ্র—আছে সিন্ধু—আছে জল—আছে অন্ন—আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচঞ্চল হইয়াছে তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত—যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূর্বকালে নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে, ২২।১।৫); এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা; বসুন্ধরা—ইহাই প্রতিষ্ঠাস্থল; ইহা স্বুবর্ণবক্ষা, যাহা কিছু চলমান তাহাদের নিবেসিনী; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে; ইন্দ্র তাহার ঋষভ—এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ্‌ দান করুক।(৩) এই পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত্ত রহিয়াছে (যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্‌ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১।৮)। এই পৃথিবীর উপরে জলধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে—সেই ভূমি আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১।৯)। এই ভূমি আমাদিগকে সেই ভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে পুত্রকে (স নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে-পয়ঃ)। হে পৃথিবি, যাহা তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে—তাহাতেই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদিগকে পবিত্র কর—হে মাতৃ ভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান।(৪) বিশ্বের প্রসবিত্রী—ওষধিগণের মাতা এবং ভূমি এই পৃথিবী, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী—শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী—এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব। যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি যে গন্ধ বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে,—যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ ভোগ করে,—সেই গন্ধের দ্বারা হে পৃথিবি, তুমি আমাকে সুরভি করিয়া তোল, কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।(৫) তোমার যে গন্ধ পুষ্করে (নীলোৎপলে) প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল—অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছিল), হে পৃথিবি, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরভিত কর,—আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।(৬) এই পৃথিবীতে আছে শিলা, আছে ভূমি, আছে প্রস্তর—আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষ সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার (১২।১।২৬)। হে পৃথিবি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির-বসন্ত—এই তোমার সুনিয়ত ঋতুগুলি—এই তোমার দিন-রাত্রি—ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক। যাহাতে অন্ন—যাহাতে ব্রীহিযব,—যাহার এই পঞ্চমানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষাপুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার (১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য তোমার ভূমিতে যে সভা, যে সমাবেশ—আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বলিব (১২।১।৫৬)

(২) "······male divinity appears, sometimes descending from the sky. Male divinity is sometimes a sky-power fertilising Mother Earth."—Encyclopaedia of Riligion and Ethics—by Hastings.

(৩) বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥
(১২।১।৬)

(৪) যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
অসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥

(৫) যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।

(৬) যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।

যাহা বলিব তাহা মধুময় বলিব ; যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় করিবে ; হে মাতা পৃথিবি, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সহিত, হে কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর।

অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তির চমৎকার বর্ণনা পাইলাম, পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এই ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতীয় সাহিত্যের ভিতরে আমরা পৃথিবীর যে মাতৃমূর্তি দেখিতে পাই, সেখানে কবি-কল্পনার সহিত একটি দৃঢ়মূল সহজ বিশ্বাস মিশ্রিত হইয়া এই মাতৃমূর্তিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার মানস-কন্যা সীতাকে ধরণী-দুহিতা করিয়া পৃথিবীর মৃণ্ময়ী মূর্তিকে অপূর্ব চিন্ময়ীত্ব দান করিয়াছেন। সীতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একটা আলঙ্কারিক বর্ণনামাত্র নহে ; বাল্মীকির নিকটে ইহা একটা সত্যবিশ্বাস এবং সেই সত্যবিশ্বাসই ধরণীর মাতৃমূর্তিকে তাঁহার সাহিত্যে বাস্তবতা দান করিয়াছে। সীতা যেদিন ধরণী-মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকট আসিয়াছিল, তখন দেখিতে পাই—

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ ॥

সীতার সর্বদেহে তখনও ক্ষেত্রের ধূলি মাখা ছিল ; সে ধূলি কিরূপ? পদ্মরেণুর মতন এবং তাহা শুভ। মা যেমন স্নেহের কন্যাকে নিজের নিকট হইতে অন্যত্র পাঠাইবার সময়ে শুভ পদ্মরেণু তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া সাজাইয়া দেন পৃথিবী মাও সীতাকে সেই ভাবে ধূলি-রেণু দ্বারা সাজাইয়া মানুষের ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সীতা নিজেও বনের ঋষিপত্নীগণের নিকটে নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী' তাহাকে দেখিয়া জনকরাজা একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সীতা আবার যেদিন অসহশোকে দগ্ধ হইয়া ধরিত্রী মায়ের কাছে আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন,—'তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি'—সেদিন মাতা ধরিত্রীও ব্যাকুল হইয়া কন্যার দুঃখে দ্বিধাহত বুকে সীতাকে আবার টানিয়া লইয়াছিলেন। সীতার উপাখ্যান কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তাহা বলা শক্ত, কিন্তু বাল্মীকি ধরিত্রীকে মাতৃমূর্তিতে যে মানুষের প্রাণের কাছে একান্ত করিয়া আনিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতরে মিথ্যা নাই কিছুই—সে জীবন্ত সত্য।

বাল্মীকি মুনির এই বিশ্বাস ও বিশ্বাসজনিত কবিকৃতির প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই মহাকবি কালিদাসের ভিতরেও। 'রঘুবংশে'র মধ্যে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নির্বাসিতা করিবার রাজাজ্ঞা জানাইয়া দিল তখন,—

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম ॥

আকস্মিক ভাবে বাতাহত হইয়া পেলব লতা যেমন তাহার সকল কুসুমের আভরণ ছড়াইয়া ফেলিয়া নিজের মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়ে সীতাও তেমনই আকস্মিক দুঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসুমসম অলঙ্কাররাজি চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়িয়া দেহ জুড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কন্যার এই গভীর বেদনায় মা ধরিত্রী কি ভাবে সাড়া দিলেন?

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা-
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব-
মত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥

সহসা ময়ূর নৃত্যত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল পুষ্পত্যাগ করিল, হরিণ অর্ধকবলিত কুশঘাস ফেলিয়া দিল ; এমনই করিয়াই সমস্ত বনভূমিতে সীতার বেদনায় ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবীর এই সজীব মাতৃমূর্তি ভারতীয় কবিমনে আধুনিক যুগেও ম্লান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'মাটির ডাক' এবং 'পত্রপুটে'র পৃথিবী-সম্বন্ধীয় কবিতার সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই এ-কথার সাক্ষ্য দিবেন। শুধু উচ্ছ্বাসে আবেগে নয়, ধীর শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিয়াছে কবিচিত্ত ধরণীর এই মাতৃমূর্তির পদপ্রান্তে,—তাই দেখি, বিদায়ের সুর বাজিয়াছে যখন কবির চিত্তে তখন তিনি বলিতেছেন,—

হে উদাসীন পৃথিবি,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মল পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

এই ত গেল কাব্যধারার কথা। অন্য দিক হইতে যদি বিচার করি তবে দেখিতে পাই, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।৩।৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। কতগুলি পরবর্তী কালের উপনিষদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীকে শস্য ও সম্পদের দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সহিত এক করিয়া দেখা হইয়াছে। নারায়ণোপনিষদে দেখিতে পাই, এই মৃত্তিকার পৃথিবীকেই দেবী বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রী—শ্রী বা লক্ষ্মীরূপেই তিনি স্তুতা এবং অর্চিতা। এখানে পৃথিবীর স্তবে দেখিতে পাই,—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে ॥
ভূমির্ধেনুর্ধরণী লোকধারিণী ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ॥
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা ॥
মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে ॥
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্ ॥

নারায়ণোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করি না, কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, পৃথিবীর দেবীমূর্তি ক্রমাগত কি শ্রদ্ধা-ভক্তির আস্পদ হইয়া উঠিতেছিল।

পুরাণাদিতে ধরা লক্ষ্মীরই অপর নাম। বহু স্থানে আবার

পৃথিবীকে মহাশক্তি বা মহাদেবীরই একটি বিশেষ রূপ বলিয়া বর্ণিত দেখি। পৃথিবী আবার ভূ-শক্তি নামে বিষ্ণু-শক্তিরূপে খ্যাতা। আমরা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে যত বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ মূর্তিতেই বিষ্ণুর উভয় পার্শ্বে তাঁহার দুই শক্তির অবস্থান দেখিতে পাই, ইঁহারা হইলেন শ্রী এবং ভূ; কোথাও কোথাও আমরা তিনটি দেবীমূর্তি দেখিতে পাই, ইঁহারা হইলেন শ্রী, ভূ এবং নীলা। বিষ্ণুমূর্তির এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা বৈদিক সূর্যরূপী বিষ্ণুর একটা আভাস পাই শ্রী এবং ভূ-শক্তি বোধ হয় এখানে পৃথিবীরই সম্পদ-শক্তি এবং প্রজনন-শক্তির পরিচয় বহন করে।

পৃথিবী দেবীকে আবার আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সহিতই এক করিয়া দেখা হইয়াছে। আমরা আমাদের মহাদেবী বা মহাশক্তিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর সহিত অভিন্ন করিয়া তাঁহার উৎপত্তি বা বিকাশের নানারূপ ঔপাখ্যানিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি দেবীর পূজাবিধি লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহার পৃথিবী-রূপের অনেক পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর মধ্যেও ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পৃথিবী-রূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মহীস্বরূপেও দেবী নিজেই স্থিতা।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।

এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবীর প্রকাশ ব্যতীত যখন কোথাও আর কিছুই নাই তখন পৃথিবী-স্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রণিধানযোগ্য উল্লেখ রহিয়াছে; দেবী বলিয়াছেন,—

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽ সংখ্যেয়ষট্পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।

"যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি করিবে তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট (ভ্রমরসদৃশ) রূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে বধ করিব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।" কিন্তু চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নিহিত আছে। পৃথিবীই ভ্রামরী, এই জন্যেই বোধ হয় দেবী ভগবতীও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে দেখিতে পাই, মাতা পৃথিবী নানা ভাবে মধুর সহিত যুক্ত; পৃথিবী মধুমতী, মধুব্রতা, মধুদুঘা—তিনি মধুময়ী। এইরূপে মধুর সহিত যোগের ফলে সম্ভবতঃ পৃথিবীকে ভ্রামরী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'সরঘা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; 'সরঘা' শব্দের অর্থ মধুমক্ষিকা। এই ভাবেই পৃথিবী ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার পৃথিবীর সহিত অভিন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন।

চণ্ডীতে আবার আমরা দেখিতে পাই,—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।

"হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাক-সমূহের দ্বারা যত দিন না বৃষ্টি হয় তত দিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিপালন করিব; এই জন্য আমি শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাতি লাভ করিব।" শাক শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শস্য দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা। এই শাকম্ভরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা' বা 'অন্নপূর্ণা' রূপে।

পৃথিবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানা ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। দুর্গাপূজা মুখ্যতঃ বাঙলা দেশের পূজা, এবং এই পূজা শারদীয়া পূজা বলিয়া খ্যাত। আমরা শরৎকালে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য কর্তৃক দুর্গার পূজার উপাখ্যানের সহিত যুক্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবীর বোধনের সহিত আমাদের দুর্গাপূজাকে যুক্ত করিয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং কাঠক-সংহিতায় আবার দেখিতে পাই এই অম্বিকাকেই 'শরৎ' বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ অম্বিকা)। এই শরৎ-রূপিণী অম্বিকার পূজাই হইল শারদীয়া পূজা। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শরৎকাল হইতেই বাঙলা দেশের শস্যঋতুর আরম্ভ; দেবীপূজার আরম্ভও তাই শরৎ-কালে। আমাদের শস্য-ঋতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দেখিত পাইব, এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলা দেশে সর্ব প্রকারের দেবী-পূজার কাল; শারদীয়া অম্বিকা পূজা দ্বারা দেবীপূজার আরম্ভ; তার পরে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজায় বাৎসরিক দেবীপূজার শেষ।

দুর্গা-পূজার ভিতরেও দেখিতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল কি? দেবী সেখানে বিল্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার পরেই দেখি, দেবীর স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং পূজা হইল নব-পত্রিকায়। এই নব-পত্রিকা কি? একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধিয়া যে শস্য-বধূ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নব-পত্রিকা। এই শস্য-বধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধ হয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তী কালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নব-পত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপূজাবিধিতে দেখিতে পাই; রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন ব্রহ্মাণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

হইলেন লক্ষ্মী। নব-পত্রিকার শস্যসমূহের দেবীর সহিত যোগের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; দেবী হরিদ্রাবর্ণা বলিয়া হরিদ্রার দেবীত্ব, তিনি জয়রূপিণী বলিয়া জয়ন্তী, মানদায়িনী বলিয়া মানের সহিত তাঁহার যোগ, বিল্ব শঙ্করপ্রিয় বলিয়া দেবীর স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছে, দেবী শোকরহিতা বলিয়া অশোকে তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়িনীরূপে দেবী ধান্যরূপা, দেবী অসুর বিনাশকালে দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় রক্তদন্তবিশিষ্টা হইয়া রক্তদন্তিকা নামে খ্যাতা—এই জন্য দাড়িম্বেও দেবীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্যদেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গা-পূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিলিয়া আছে।

উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যাইবে, আমাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে প্রাচীনতম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবী কি করিয়া প্রাণময়ী এবং চিন্ময়ী দেবীরূপে আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এই বুদ্ধি এবং বিশ্বাস আজ আর আমাদের মনে শুধু নয়, আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিলিয়া রহিয়াছে; প্রথমেই তাই আমি বলিয়াছি, ইহা আমাদের কাছে একটা সামাজিক উত্তরাধিকার; দেশকে তাই আমরা আজও জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক—মাতা বলিয়া বন্দনা করি—পৃথিবীকে জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী বলিয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জানাই প্রণতি।

তানসেন মিঞা কে ছিলেন ?

"বিবিধ সঙ্গীত" এবং "সঙ্গীতসার" নামক গ্রন্থ-রচয়িতা তানসেন মিঞার জন্ম—১৫৪১ খৃঃ, ১৫৩ সাল, গোয়ালিয়র নগরে। এবং ১৫৯৫ খৃঃ, ১০০২ সাল, আগ্রা সহরে দেহত্যাগ করেন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কোন মুসলমান যুবতীর প্রণয়ে প'ড়ে তানসেন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শৈশবাবস্থায় তানসেন বৃন্দাবননিবাসী হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর গোয়ালিয়রের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ মহম্মদ দৌলত খাঁর নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শের খাঁর পুত্র দৌলত খাঁর সহিত তানসেনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ৯৭০ সালে (১৫৬৩ খৃঃ) ইনি সম্রাট আকবর বাদশাহের দরবারে গায়ক নিযুক্ত হন। বাদশাহ তাঁর গানে মোহিত হয়ে দুই লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার এবং তানসেন উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ইনি এই নামেই পরিচিত। পূর্ব্ব বা প্রকৃত নাম—রামতনু পাঁড়ে।

তানসেনের সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ অধিকার ছিল। সঙ্গীত সাধনায় তিনি যোগযুক্ত হয়ে ব্রহ্ম উপাসনার সুদুর্লভ ও বহু আয়াস-সাধ্য যোগ-সাধনায় ফললাভ করেছিলেন—তিনি এই মহাভাবে অনুক্ষণ মগ্ন থাকতেন।

তানসেন সঙ্গীত-বিদ্যায় প্রথমতঃ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। হিন্দী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত এই মিশ্র ভাষায় তানসেন বহু সংখ্যক কঠিন রাগের গান রচনা করেছিলেন। "সঙ্গীতসার" নামক গ্রন্থও তানসেনের রচনা। তানসেনের সঙ্গীত-আলাপ-বিষয়ক বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

হ্যান্স এণ্ডারসেন ও লিভিংষ্টোন-কন্যার পত্রাবলী

[শেষাংশ]

তিন মাস পরে আনা মেরির চিঠি এল :—

"উল্‌ভা কুটীর, হ্যামিলটন
২৩শে নভেম্বর, ১৮৭২

প্রিয়তম এইচ, এণ্ডারসেন,

অনেক দিন আগেই তোমাকে চিঠি দিতাম, আর যে সবুজ পাথরটা হারিয়েছ তার জায়গায় আর একটা পাঠাতাম; কিন্তু মোটেই সময় করে উঠতে পারিনি। প্রথমত, আমার দাদা টমাস্ প্লুরিসিতে খুব ভুগল, আজ এই এগারো সপ্তাহ—আজ প্রথম একতলায় নামতে পেরেছে। তার পর, মিঃ ষ্ট্যান্‌লি এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন হ্যামিলটনের প্রোভোষ্টের সঙ্গে দু'-এক দিন থাকবে বলে—এখানে বক্তৃতা করার জন্যেও বটে। হ্যামিল্টন সহরের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হল। বক্তৃতা-মঞ্চের উপর আমার দিদি আগ্নেস, আমার এক পিসিমা আর আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। খুব হর্ষধ্বনি হল। তিনি আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, এখান থেকে টাউন হলের ভোজ-সভায় গেলেন। সন্ধ্যা বেলায় তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বক্তৃতা দিলেন। পরের দিন আমরা তাঁকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম, তার পর তিনি চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে আমার ভারি দুঃখ হল—তাঁকে খুব ভাল লাগে আমার।

আইওনায় থাকতে আমাদের এক জন হাইল্যাণ্ড আত্মীয় আমাকে গোটা একটা সভারেন্ দেন। আগ্নেস, টমাস, অস্‌ওয়েল আর আমি মিঃ ষ্ট্যান্‌লির জন্যে একটা সোনার লকেট কিনি—সেটার উপর তাঁর নামের আদ্যক্ষরগুলো খোদাই করিয়ে নিই। বাবাকে খুঁজে বার করেছেন বলে ঐ লকেটের মধ্যে এক দিকে বাবার ছবি অন্য দিকে তাঁর চার ছেলে-মেয়ের ছবি দেওয়া আছে। লকেটটার জন্যে আমি দিয়েছি দশ শিলিং। শুনেছি, দেনমার্কে ভয়ানক প্লাবন হয়ে গিয়েছে; তাই বাকি দশ শিলিং 'রিলিফে'র জন্যে পাঠালাম। এটা যাতে ঠিক মত ঐ কাজের জন্যে দেওয়া হয়, দেখবে দয়া করে।

এখন জার্মাণ ভাষা শিখছি। খুব মজা লাগছে। যদি সময় করতে পারো, চিঠি দেবে; খুব খুশি হব। এখন চিঠি শেষ করি। ইতি—

তোমার স্নেহমুগ্ধ ছোট বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন্।

পুঃ হ্যান্স এণ্ডারসেন, আমি তোমাকে খুব—খুব ভালবাসি।"

এণ্ডারসেন এ চিঠি পান ১৩ই ডিসেম্বর। তখন তিনি অসুস্থ। যা হোক্ বড়দিনের আগে তিনি উত্তর দিলেন—সে চিঠির স্বাক্ষরটা শুধু এণ্ডারসেনের হাতের—

"কোপেনহাগেন
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭২

ছোট বন্ধুটি আমার,

সাত সপ্তাহের উপর হল অসুখে ভুগলাম। এখনো ঠিক সেরে উঠিনি। রাজবাড়ীর লোক থেকে দরিদ্রতম লোকের সমবেদনা পেয়েছি। আমাদের দয়ালু ও সদাশয় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার—ইনি তোমাদের অমায়িক প্রিন্সেস্ অব ওয়েলসের ভাই—দেখা করতে এসেছিলেন। অনেকে সমবেদনা জানিয়েছেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। পড়তে শ্রান্তি বোধ হয়; লেখা নিষিদ্ধ। আমার এক বন্ধুর কাছে এ চিঠির কথাগুলো বলে যাচ্ছি, তিনি লিখে নিচ্ছেন। আবার ছোট বন্ধুটির চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এবার সবুজ পাথরটা পেয়েছি, যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সাগরের বিপদ থেকে বাঁচা যাবে এখন। তোমার চিঠিটাই কিন্তু আমার সব চেয়ে প্রিয়—যাতে তুমি বাড়ীর খবর দিয়েছ, মিঃ ষ্ট্যান্‌লির হ্যামিলটন আসার খবর দিয়েছ। মেরির বাবা, মেরি আর তার ভাইবোনের ছবি আঁকা লকেট করিয়ে মিঃ ষ্ট্যানলিকে দেওয়াতে খুব স্বাভাবিক আর সুস্থ হৃদয়-ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মিঃ ষ্ট্যানলি নিশ্চয়ই শিশুদের এই উপহারের মূল্য বুঝেছেন। কিন্তু আমার শিশু-বন্ধুটি আমার স্বদেশ দেনমার্কের বন্যার্তদের দুঃখের কথা ভেবে তার উপহারস্বরূপ পাওয়া অর্থের অর্ধেকটা পাঠিয়ে দিয়েছে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। বেঁচে থাকো, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করো। তোমার বাবা শীঘ্রি এসে তোমার ছোট লাল ঠোঁট দু'টোতে চুমু দেন—এই কামনা করি। আধ-সভারেন্‌টা এক্ষুনি 'বন্যা কমিটী'র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার এই দানের কথা আমার কাছ থেকে শুনে আমার বন্ধুরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন, দেশের প্রায় সমস্ত খবরের কাগজে এটার উল্লেখ হয়েছে। কাজেই, মেরি যখন তার বাবাকে নিয়ে আমাদের উত্তর দেশগুলো বেড়াতে এসে আমাদের আশা পূর্ণ করবে, তখন তার ও তার বাবার অনেক বন্ধু জুটে যাবে। মেরির এই দানের কথা প্রথম যে কাগজে বের হয় সেটা পাঠালাম। আমার একটা ভাল ছবিও পাঠাচ্ছি। এ দুটোই বোধ করি চিঠির সঙ্গে একই সময় পৌঁছবে। চিঠিটায় রইল লিভিংষ্টোন্, বার্ণস্ আর ওয়াল্টার স্কটের সুন্দর দেশে মেরি আর তার যারা প্রিয়জন আছে তাদের নিকট আমার বড়দিনের আন্তরিক অভিনন্দন ও নববর্ষের জন্য শুভেচ্ছা। শীঘ্রি চিঠি দিলে অনুগৃহীত হব।

প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে দস্তখৎ দিচ্ছি।

হ্যান্স ক্রিষ্টিয়ান্ এণ্ডারসেন।"

চিঠি পাবা মাত্র মেরি উত্তর দিল :—

"২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৭২

প্রিয়তম হান্স এণ্ডারসেন,

তোমার চিঠি পেয়ে এতো খুশি হলাম। খবরের কাগজ আর ফটোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি অসুস্থ হয়েছ জেনে বড়ই দুঃখিত হলাম, আশা করি শীঘ্রি সেরে উঠবে। দাদা বলছে, সে তোমার দুঃখ বোঝে—এই ষোল সপ্তাহ পরে সে আজ একতলায় নেমে প্রাতরাশ খেয়েছে। সোমবারে সে মিশর যাত্রা করবে। এই চিঠির প্রথম পাতায় যে ছবি আছে তাতে আমাদের দেশের উঁচু অঞ্চলের নমুনা পাবে। উত্তর আর্গাইলের কেন্দ্র ওবান্ বলে যে ছোট সহর আছে, এটা তার কাছে।

তোমাকে 'নাবিক সিন্দবাদ' বলে একটা মূক অভিনয় দেখতে যাওয়ার কথা লিখেছিলাম, মনে আছে? গত বৃহস্পতিবারে আর একটা দেখে এসেছি। এটার নাম 'ব্লু বিয়ার্ড'। এটা একেবারে অপূর্ব। এত চমৎকার কিছু থাকতে পারে, আমি ভাবি নি। রূপান্তর দৃশ্যটা দেখালে সমুদ্রের তলায়। অভিনয়ের পর্দা যখন উঠল, আমরা তখন যেন জলের নীচে। কী সুন্দর সুন্দর ঝিনুক মুক্তোর মত ঝকমক্ করছে; সুন্দর সুন্দর সামুদ্রিক উদ্ভিদের মধ্যে গোলাপের মত কী যেন দেখা গেল। কেবলই দৃশ্য বদলাচ্ছিল। বড় বড় ঢেউ উঠছে, ভেনাস দেবীর জন্ম হচ্ছে। তিনি সমুদ্রের বুক থেকে উঠলেন, ঠিক মোমের মত—সর্বাঙ্গে জল ঝরছে। কি সুন্দর! এ ত' পরীর মত, এ ত' অপ্রাকৃত, যেন ছুঁলেই পড়ে যাবে।

দেনমার্কের আর্তদের জন্যে আমার সামান্য দানে তুমি খুশি হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হলাম। বেশী দিতে পারলে আমার মন ভরতো। মিঃ ষ্টানলির লকেটে দিদির, দাদাদের আর আমার যে ছবিটা দেওয়া হয়েছে তার একটা কপি পাবার চেষ্টা করছি। পেলে তোমাকে পরের চিঠিতে পাঠিয়ে দেব।

এখন, তোমাকে ভালবাসা ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আর শীঘ্রি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে এই কামনা করে বিদায় চাইছি। ইতি—

তোমার স্নেহমুগ্ধ বন্ধু
আনা মেরি লিভিংষ্টোন্।

পুনশ্চ—ছুটির মধ্যে তোমার চিঠি আসায় খুব আনন্দ হয়েছিল; নইলে তো তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারতাম না। ইস্কুল খুললে সময় হয়ে ওঠে না। আচ্ছা, বিদায়!"

বৎসরাধিক কাল চিঠিপত্র বন্ধ। এ-সময়টায় এণ্ডারসেন প্রায়ই অসুখে ভুগেছেন, আর বার বার ডাঃ লিভিংষ্টোনের মৃত্যুর গুজব রটেছে। কিন্তু তাঁর আত্মীয়রা সে-কথা বিশ্বাস করেন নি। অনেক দিন পরে মেরি যে চিঠি লিখল, তা থেকে এ-কথা বোঝা যায়—

"উল্ভা কুটীর, হ্যামিলটন
২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৪

প্রিয়তম হান্স এণ্ডারসেন,

শেষবার যখন চিঠি দিয়েছিলে, লিখেছিলে তুমি অসুস্থ। কত বার ভেবেছি তুমি কেমন আছ খবর নিই। আগেই লিখতাম, কিন্তু অনেক পাঠ অভ্যাস করতে হয়—সকাল নটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত আটকা থাকি। তাই সময় পাই নি।

বাবা এখনও দেশে ফেরেন নি, আর মিঃ ষ্ট্যান্লি যেসব চিঠি এনেছিলেন তার পর আর কোনো খবর পাই নি।

গত বছরের শেষ দিকে আমাদের বড় একটা বিয়োগ ঘটল, কাকা চার্লস্ লিভিংষ্টোন মারা গেলেন। তিনি আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে জাহাজে মারা যান—সমুদ্রেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আমরা সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতাম। আমি তাঁকে বাবার চেয়েও বেশী জানতাম, বাবাকে তো খুব কমই দেখেছি। ছুটি পেলেই তিনি আমাদের কাছে এসে থাকতেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন।

এই শীতকালে বড়দিনের ছুটিটা বড় আনন্দে কেটেছে। ওয়েষ্ট মোরলণ্ডের কেণ্ডাল বলে একটা জায়গায় এক পরিবারে ছিলাম। খুব ভাল লোক তারা। ক্রিষ্টমাসের দিন সন্ধ্যা বেলায় একটা দলে ছিলাম—প্রায় সারা রাত্রি স্তব গান করেছি আমরা। তার পর, নববর্ষের মুখে রাত্রি পৌণে বারো থেকে বারোটা পর্য্যন্ত ঘণ্টাগুলো কাপড় চাপা দিয়ে বাজানো হল। বারোটা থেকে সওয়া বারোটা পর্য্যন্ত ঘণ্টাগুলো একযোগে কলধ্বনি করল। চাপা ঘণ্টা বাজিয়ে পুরানো বছরকে বিদায় দেওয়া হল, আর খোলা ঘণ্টা বাজিয়ে নতুন বর্ষকে বরণ করে নেওয়া হল।

আমি এখনো আশা রাখি, বাবা এলে কোপেনহাগেন বেড়াতে যাব। খুব মজা হবে—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

সময় করে নিয়ে যদি আমায় চিঠি দিতে পার খুব খুশি হই। এখন বিদায়, আমার ও আমার পিসিমাদের প্রীতি জেনো। ইতি

তোমার স্নেহময়ী বান্ধবী
আনা মেরি লিভিংষ্টোন্।

পুনশ্চ—হের ষ্ট্রিডার বলে এক জার্মাণের কাছ থেকে জার্মাণ ভাষা শিখেছি। পাঠ বেশ এগোচ্ছে।"

এ চিঠি পাওয়ার কয়েক দিন পরেই এণ্ডারসেন উত্তর দেন :—

"কোপেনহাগেন,
১৭ই ফেব্রুয়ারী, '৭৪

বালিকা-বন্ধু,

তোমার ২৫ জানুয়ারী লেখা ও ডাকে-দেওয়া চিঠি পেয়ে কী আনন্দই পেলাম। আমি তখন তোমার কথাই ভাবছিলাম, মনটা খারাপ ছিল, কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আশা ও আনন্দে বুক ভরে গেল। ছেলেমানুষ হলেও তুমি তো জানো, যা-কিছু থাকে তাই বিশ্বাস করা ঠিক নয়, অনেক সময় খবর ভুলও হয়। একাধিক বার বেরুলো, বিখ্যাত লিভিংষ্টোন আফ্রিকায় মারা গেছেন, অথচ ভগবানের অপার অনুগ্রহ, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। ২৫শে জানুয়ারীর আগে দেনমার্কের কাগজগুলোয় তাঁর খবর বেরিয়েছিল, আর আমি তথা সমগ্র দিনেমার জাতি এ ভেবে দুঃখ করছিলাম যে, মানব জাতির জন্যে পরিশ্রম-শেষে ঠিক তিনি যখন স্বদেশ ও স্বজনদের মধ্যে ফিরে আসছেন তখনি তাঁর ডাক পড়ল। ঠিক ঐ সময় চিঠি এল, তাতে তুমি লিখেছ, তিনি দেশে ফিরছেন এবং সম্ভবতঃ তোমাকে নিয়ে তিনি কোপেনহাগেন বেড়াতে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের খবর কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল আর আবার আমার আশা হল, তিনি বেঁচে আছেন, আবার তাঁর সন্তানেরা, তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে দেখতে পাবে। সে-আশা

এখনও করছি। তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে, লিখবার আছে, কিন্তু আজ তোমার বাবার সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় আমার মন অভিভূত হয়ে আছে। শীঘ্রি চিঠি দিও, সে চিঠিতে যেন সুখবর থাকে। আজকের এ চিঠিটা এক জন বন্ধু লিখে দিচ্ছেন, এখনও আমার লিখতে বেশ কষ্ট হয়। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। যে ফটো পাঠিয়েছিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। আগে যে শিশুর ছবি পাঠিয়েছিলে, তার পর কত বড় হয়েছে।

আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও; বাড়ীর সকলের ও তোমার পিসিমাদের জানিও। অন্তরতম সমব্যথা ও স্নেহ জ্ঞাপন পূর্ব্বক। ইতি

হান্স ক্রিষ্টিয়ান্ এণ্ডারসেন।"

এ চিঠি মেরির হাতে পৌঁছিবার আগেই, সে তার বাবার মৃত্যু-সংবাদ পায়। ১৮ই এপ্রিল, ১৮৭৪, ডাঃ লিভিংষ্টোনকে ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবিতে সমাধি দেওয়া হয়। এর মাস পাঁচেক পরে মেরির শেষ চিঠি আসে:

"উলভা কুটীর, হ্যামিলটন
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪

প্রিয় হ্যান্স এণ্ডারসেন,

তোমার শেষ চিঠি পাওয়ার পর কত বার তোমার কথা মনে হয়েছে, কত বার তোমাকে চিঠি লিখবার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু হয়ে ওঠে নি। এ বছর আমাদের যে মহা বিয়োগ হয়ে গেছে, সে খবর কাগজে দেখে থাকবে। আমি এতো আশা করেছিলাম, তোমাকে দেখবার জন্যে বাবা আমাকে দেনমার্কে নিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে যে-সব জায়গা যাব ভেবেছিলাম, সে-কোথাও না গিয়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে তাঁর কবর দেওয়া দেখতে যেতে হল। আমার দুই পিসিমা, দাদারা আর দিদিও সেখানে গিয়েছিল। তাঁর শবাধারের উপর দেবার জন্যে আমরা অবিমিশ্র সাদা ফুলের একগাছি করে মালা নিয়েছিলাম। বেলা একটায় শোভাযাত্রা এবিতে ঢুকল, আর শবাধারটা মখমলের উপর রাখা হল। সাদা রেশমের কিনারা দেওয়া মখমলের চাদর দিয়ে চার দিক ঢাকা হল; শবাধারের উপরটা সাদা মালা আর পাম্ গাছের পাতায় ঢেকে গেল। শোভাযাত্রা আসার সময় অর্গানে সুন্দর বাজনা বাজছিল। আমরা তখন গান গাইলাম "হে বেথেলের দেব..." ইত্যাদি।

তার পর কবর পর্য্যন্ত বাবার জন্যে সারি তৈরী হল। শবাধারের ঠিক পরেই ছিলেন দাদু (ডাঃ মফাট্) আর আমার দাদারা—টমাস্ আর অস্ওয়েল। তার পরের সারিতে আমরা দুই বোন, আমাদের পিছনে আমার পিসিমারা, তার পর আত্মীয়রা। কবরটা কালো কাপড়ে মোড়া ছিল, তার মধ্যে শবাধারটা বসানো হলে আমার দিদি আয়েসা আর আমি শবাধারের উপর মালা রাখলাম, তার পর আমার পিসিমারা তাঁদের মালা দিলেন। দক্ষিণ ইংলণ্ড থেকে যে পিসি এসেছিলেন তিনি ভায়োলেট আর প্রিমরোজ ফুলের মালা দিলেন—ঐ ফুলগুলো যে-গলিতে ফুটেছিল সে-গলিতে আমার বাবা বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। আমরা সারি দিয়ে কবরের চার পাশে দাঁড়ালাম। তার পর একটা স্তব গান হল,—"তাঁহার দেহ শান্তিতে সমাধিস্থ হইল" এ হল তার প্রথম কলি। তার পর ডীন সাহেব অন্ত্যেষ্টিকালীন প্রার্থনা করলেন। সব শেষ হল। এবিতে ভীড় হয়েছিল, ভার্জারেরা বললেন, প্রিন্স কন্সর্ট মরার পর এত লোক সেখানে তাঁরা দেখেন নি। পরের রবিবারে এবিতে বাবার আত্মার শুভ কামনা করে আর একটা প্রার্থনা প্রচারিত হল। বাবার কবরের কাছে যে-ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম তার একটা ছবি তোমাকে পাঠাচ্ছি। এইবার প্রথম লণ্ডন দেখলাম।

তোমার অসুখের খবর পেয়ে খুব বেশী দুঃখিত হয়েছিলাম, আশা করি এখন কিছু ভাল আছ। যদি পার, চিঠি দিও। দিলে আমি খুব আনন্দিত হব। আমার দাদা আবার মিশরে ফিরে গিয়েছে।

আসছে সপ্তাহে আমি একটা বোর্ডিং ইস্কুলে যাচ্ছি, এ হবে আমার একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

বাবার শেষকৃত্য সম্বন্ধে লিখবার সময় তোমাকে লিখতে ভুলেছি, আমাদের শ্রদ্ধেয়া রাজ্ঞী একগাছা খুব সুন্দর সাদা মালা পাঠিয়েছিলেন, আর তাঁর আর প্রিন্স অব ওয়েলসের গাড়ী এবিতে এসেছিল।

যা জানি সব তোমাকে বলা হল। ভালবাসা জানবে। ইতি

আনা মেরি লিভিংষ্টোন।"

এইখানেই এণ্ডারসেন ও মেরির পত্র আদান-প্রদান শেষ হয়। এণ্ডারসেনের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হতে থাকে আর দশ মাস পরে তিনি মারা যান।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত

১

প্রীতিভাজনেষু,—

সত্য ঠিক নিজে যেমন (by itself) সেরূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্যথারূপে প্রকাশ পাইলেও আপনি তাহাকে—অন্যথা প্রকাশিত সত্যকেও—সত্য বলিতে চান। শঙ্করাচার্য্যও তাহাকে বলেন প্রাতিভাসিক সত্য, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নের ছাতি জাগ্রত কালের ছাতিরই স্বাপ্নিক প্রকাশ—তেমনি phenomenal জগৎ সকলের মতেই Noumenal সৎপদার্থেরই phenomenal appearance —Kant বলেন, আপনিও বলেন, শঙ্করাচার্য্যও বলেন—Phenomena-Noumenaরই Phenomena। শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, প্রতিভাসিক সত্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন সত্য নাই; i. e. independent, আর সেই জন্য প্রাতিভাসিক সত্যকে তিনি বলেন—সৎও বটে, অসৎও বটে তাহা সদসদাত্মক। ইহাতে মূল দাঁড়াইতেছে—আপনার মতেও যেমন প্রাতিভাসিক সত্য (phenomenal সত্য) কতক অংশে সত্য—শঙ্করাচার্য্যের মতেও মায়িক জগৎ কতক অংশে সত্য, তবে মিছামিছি কথা কাটা-কাটি এবং বাক্-বিতণ্ডা কেন? আমি চক্ষে ঝাপসা দেখি বলিয়া এইরূপ এলোমেলো ভাবে লিখিলাম—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি আমার কথাটা তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই তাই অত বাহুল্য লিখিয়াছেন।

আমার কথাটা হচ্ছে এই—বেদান্ত যাহাকে বলেন মায়া, Kant যাহাকে বলেন Necessary illusion, নব্যেরা যাহাকে

বলেন, Untruth which always clings to all Relative truths like জোঁক, Dream truth ইত্যাদি।

সবই জিনিষ এক—শব্দ নানা। আমি যদি বলি যে, "তুমি যদি আমাকে 'মিথ্যাবাদী' বলিতে তাহা আমার গায়ে লাগিত না; কিন্তু তুমি যে আমাকে liar বলিলে এটা আমার প্রাণে সহিতেছে না"—তেমনি আমাকে Kantএর ভাষায় illusionবাদী বলতে চাও বলো, নব্য ভাষায় Relativityবাদী বলতে চাও বলো, তাহাতে আমি ঘাড় পাতিয়া দিব, কিন্তু মায়াবাদী বলিলে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেছ মনে করিব।

প্রকৃত কথা এই, যে-কোনো একটা বস্তু দেখিলেই তাহাকে আমাদের মনে হয় solid-reality—জীবের এইরূপ unavoidable ভ্রমের নাম অবিদ্যা এবং মায়া তা ছাড়া আর কিছুই নহে।

অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রীতিভাজনেষু,

আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যাকে নিভৃত গুহা-গহ্বর হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া জনাকীর্ণ নগর-পল্লীতে তাহার নূতন প্রতিষ্ঠা কার্য্যে আপনার মতন সুপণ্ডিত, সহৃদয় ও সদাশয় ব্যক্তিকে সহায় পাইয়া আমি যে কি আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে আমি এখন ঝাপসা ঝাপসা দেখি—আর বেজায় গরম পড়িয়াছে বলিয়া হাতের কলমও ভাল সরিতেছে না; এই জন্ত আর বেশী ভূমিকায় কালাতিপাত না করিয়া আপনার প্রথম প্রশ্নটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম; অবশিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর আর গোটা চারি পত্রে যথাক্রমে দিব।

প্রথম প্রশ্ন। "গীতার যে সকল স্থানে সাংখ্য কথাটির প্রয়োগ আছে তাহা কি সাংখ্য শাস্ত্র নামে কোন চিন্তা-প্রণালী বা তত্ত্বজ্ঞানের একটি শাখাকে নির্দ্দেশ করে, না কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনের কথা এ সকল স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে?"

উত্তর। সাংখ্য যে পদার্থটি কি তাহা গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্যে মোটের উপর এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃষ্টাঃ
অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ব্যাপার সাক্ষীভূতো
নিত্যোগুণ বিলক্ষণ আত্মা ইতি চিন্তনং সাংখ্যযোগঃ।

ইহার বাংলা,—

"এই যে সত্ত্বরজস্তমোগুণ এগুলা দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়, আমি এই সকল দৃশ্য পদার্থ হইতে পৃথক আর তাহাদের ব্যাপার সকলের সাক্ষীরূপ নিত্য এবং নিগুর্ণ আত্মা—এইরূপ চিন্তনের নাম সাংখ্য যোগ।"

ত্রিগুণ যে পদার্থটি কি তাহা পত্রে বেশী বাহুল্যরূপে বলা অপেক্ষা যো-সো করিয়া সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করাই এখানে সুবিধা বোধ করিতেছি।

Motion এবং Matter যে physical scienceএর মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং তাহাই যে জ্ঞেয় প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব এ কথা পাশ্চাত্য Scientistদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে এই motion ও matter ছাড়া, চঞ্চলতা ও জড়তা ছাড়া—'প্রকাশ' নামক যে আর একটি পদার্থ আছে তাহাকেও জ্ঞেয় প্রকৃতির অঙ্গের সামিল করিয়া ধরা আবশ্যক। কেন না motionই বলো বা matterই বলো কিছুই কিছু না, যদি না তাহা কাহারও নিকটেই প্রকাশ পায়, আর সেই জন্য দৃশ্য বস্তু মাত্রই matter (জড়তা), motion (চলতা) এবং তাহাদের প্রকাশ্যতা বা প্রকাশ (Kantএর ভাষায় Synthetic unity) এই তিনের সমবায়ই জ্ঞেয় প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব। তিনের একটি ছাড়িয়া আর দুইটি থাকিতে পারে না। 'প্রকাশ' শব্দে এখানে প্রকাশযোগ্যতা (বস্তুর প্রকাশযোগ্যতা = সত্ত্বগুণ, চলতা = রজোগুণ, প্রকাশের অযোগ্যতা = তমোগুণ) সাংখ্যের মতে প্রকৃতির সেই প্রকাশযোগ্য অংশে—সত্ত্বাংশে নিগুর্ণ আত্মা সম্বন্ধ যুক্ত হইলে সেই সত্ত্বগুণরূপী objective প্রকাশ subjective প্রকাশের রূপ ধারণ করে। আমাদের নিদ্রাকালে যেমন আমাদের বিনাকর্তৃত্বে আপনা-আপনি (automatically) চলিতে থাকে, জাগ্রত অবস্থাতেও সাধারণতঃ তাহা সেইরূপ automatically চলিতে থাকে কিন্তু আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তীব্রবেগেই চলুক আর মৃদু ভাবেই চলুক—Conservation of energy এবং তাহারই অঙ্গীভূত Conservation of matter বলিয়া যে একটা Scienceএর গোড়ার principle আছে তাহার প্রসাদাৎ—তাহার (অর্থাৎ সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের) অন্তর্ভুক্ত বায়বীয় matter এবং motionএর মোট quantity কোনকালেই পরিবর্ত্তিত হয় না; এমন কি আমাদের automatically প্রবৃত্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে ইচ্ছার বলপ্রয়োগ করিয়া তাহার বেগ কমাই বাড়াই, তাহা হইলেও তাহার (অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ physical phenomenonএর) মোট quantity (অর্থাৎ বায়বীয় matter এবং motionএর মোট quantity) একটুও (ইচ্ছারূপ subjective phenomenonএর সহিত সংযোগের গুণে) বাড়ে-কমে না। এটা যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জাগ্রত কালে কখনও বা consciousness, কখনও বা sub-consciousness এবং নিদ্রাকালে শুধুই কেবল Sub-consciousness অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে—আর sub-consciousness যখন consciousnessএরই ন্যূনতম মাত্রা বই নূতন কোন পদার্থ নহে, তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস matter (জড়তা), motion (চলতা) এবং consciousnessএ প্রকাশ-যোগ্যতা—এই তিনের সমবায়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যে অংশে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের motion বৃদ্ধি হয় সেই অংশে তাহার জড়তা এবং প্রকাশযোগ্যতা কমিয়া যায় (যে অংশে kinetic ভাবের বৃদ্ধি হয় সেই অংশে potential ভাব কমিয়া যায় and vice versa)। যে অংশে জড়তা বৃদ্ধি হয় সেই অংশে তাহার চলতা এবং প্রকাশযোগ্যতা কমিয়া যায়, যে অংশে তাহা প্রকাশযোগ্য হয় সেই অংশে উহার জড়তা ও চলতার সামঞ্জস্য ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে যে, জ্ঞেয় প্রকৃতির গোড়ার উপাদান শুদ্ধ কেবল দুইটি মাত্র নহে—তমোগুণ ও রজোগুণ মাত্র নহে; পরন্তু প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুতে, জড়তা, চলতা এবং প্রকাশযোগ্যতা এই তিনটি element ন্যূনাধিক পরিমাণে

আবির্ভূত হয়। সকল বস্তুতেই তিন গুণই একসঙ্গে থাকে তবে কি? না কোনটি বা বেশী ছুটিয়া বাহির হয়—কোনোটি বা চাপা দেওয়া থাকে—কোনোটি বা অর্দ্ধস্ফুট ভাব ধারণ করে। যেমন electricityতে motion ছুটিয়া বাহির হয় perceptibility, প্রকাশযোগ্যতা এবং জড়তা চাপা দেওয়া থাকে; আলোকে প্রকাশযোগ্যতা ফুটিয়া বাহির হয়, motion এবং জড়তা সামঞ্জস্য ভাব ধারণ করে; মৃৎপিণ্ডের ভিতর জড়তা ফুটিয়া বাহির হয়—প্রকাশযোগ্যতা ও চলতা চাপা দেওয়া থাকে। matter—তমোগুণ, motion—রজোগুণ, প্রকাশযোগ্যতা—সত্বগুণ, আর সমস্ত প্রকৃতি এই তিনের সমবেত কার্য্যকারিতার উপরে ভর করিয়া পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যে বিকশিত এবং কারণে বিলীন হইয়া পুরুষের ভোগ মোক্ষ সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে—এই কথাটি সাংখ্যদর্শনের মুখ্য মন্তব্য কথা, কাপিল-সাংখ্যেরই বা পাতঞ্জল-সাংখ্যেরই বা কী আর উপনিষদ সাংখ্যেরই বা কী—যেখানে যে কোন সাংখ্যের উল্লেখ আছে সেইখানেই ত্রিগুণের ঐ ব্যাপারটি তাহার সার-সর্ব্বস্ব।

এইখানেই এ যাত্রা ইতি করিলাম। আপনার প্রথম প্রশ্ন ও আর আর প্রশ্নের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে—তাহা পরবর্ত্তী পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বর্ত্তমান প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধীয় লিখিত এবং লিখিতব্য পত্রগুলি যদি কাহাকেও দিয়া নকল করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন তবে বাধিত হইব।

অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালী হিন্দুর উপাধি কত?

[শ্রীকান্তিকুমার অধিকারী সংগৃহীত]

অধিকারী, অজয়, আঙ্গা, উকিল, আইস্, আইচ, আঢ্য, নন্দী, খাসখিল আনক, আতর্থী, আর্য্য, আচার্য্য-চৌধুরী, আচার্য্য, ইন্দ্র, ঋষি, গুঁই, চৌধুরী, কর, কৈবর্ত্তদাস, কুণ্ডু, কুম্ভকার, কাঞ্জিব্বি, কাঞ্জিলাল, কালী, কর্ম্মকার, করেলিয়া, কায়েজি, কাঁসারি, কাহালি, কারকুন, কাননগু, করালি, কাপালী কাঞ্জিলা, করঞ্জরী, কোইল, কাঁঠাল কামার, কংসবণিক, গমক, কয়াল, গায়েন, গোস্বামী, গোহেল, গড়গড়ি, গোয়ালা, গোয়াল, গিরি, গুই-চৌধুরী, গুহ-ঠাকুরতা, গুহ, গুপ্ত, গন্ধবণিক, গাইন, গোপ, গুড়, গুন, গৈরিক খাঁ, খাস্তাগীর, চন্দ, চংদার, চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্র, চামার, চতুর্ম্মুখ, চতুষ্পাঠী, চাকি, চাকলাদার, জালিয়াদাস, জোতদার, জানা, জোয়ার্দ্দার, ঘটক, ঘোড়া, ঘাটমাঝি, ঘোষ, ঘোষাল, জ্যোতি, জুগী, ঝম্পটি, ঠগ, তরোয়াল, ঠাটারি, ঠাকুর, ঢুলি, ত্রিপাঠী, তালুকদার, ঢোল, ঢেঁকি, তলপাত্র, ত্রিবেদী, তরফদার, খাঁ, দে, দত্ত, দাস, দেব, দেববর্ম্মণ, দেবনাথ, দাসগুপ্ত, দাম, দেব-শর্ম্মন দালাল, দীক্ষিত, দে-সরকার, ধাংগড়, দফাদার, দাগী, দস্তিদার, নন্দন, নিয়োগী, নাগ, নমশূদ্র, ধর, নাই, নাহার, নাথ, নাট্য, নরসুন্দর, পোয়েল, পত্রনবীস, পোদ, পোদ্দার, পুরকায়স্থ, পণ্ডিত, পাণ্ডা, পাটীবর, পাল-চৌধুরী, প্রামাণিক, পৈ, পাঠক, পালোধী, পালিত, পাঁজা, পাতিয়া, বসাক, পাল, পুততুণ্ড, পাইন, পঞ্চানন, ফণী, বসুরায়, বারুই, বর্ম্মণ, বোস, বসু, বন্দ্যোপাধ্যায়, বারিক, বড়াল, বৈদ্যরাজ, বিদ্যাভূষণ, বণিক, বোয়াল, বাররি, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়েন, বাগচি, বিশি, বাগদি, বাগ, বিশ্বাস, বক্সী, বেড়া, বেদ, বাচস্পতি, বেজ, বাউরী, ভুট, ভট্টাচার্য্য, ভুঁইয়া, ভাদুড়ী, ভায়া, ভর, ভাস্কর, ভল্ল, ভুঁইমালি, ভুঞমালী, ভৌমিক, ভাঁট, ভট্টশালী, মাইতি, মুরমু, মিশ্র, মান্না, ভাণ্ডারী, মোদক, মোড়ল, মালী, মিস্ত্রি, মহুরি, মহলা-নবীশ, মোহন্ত, মাঝী, মুকুটমণি, মালাকর, মাহিষ্য, মুখোপাধ্যায়, মানি, মাণিক্য, মুখুটি, মিত্র, মৌলিক, মজুমদার, মল্লিক, মৈত্র, মুনসী, মুদি, মনদার, রায়, রায়চৌধুরী, রাহা, মশক, রাজগুরু, রক্ষিত, রুদ্র, রজক, রবিদাস, রাজমিস্ত্রি, শীল, শাঁখারী, শীলভদ্র, শ্রীমানি, শ্রেষ্ঠী, লাহিড়ী, শর্ম্মা, বড়ুয়া, বল, লাহা, শীকদার, লৌহ, লেখক, সুর, সোম, সরকার, সেন, সান্যাল, সিংহ, সামন্ত, সরস্বতী, সাহাভৌমিক, সিমলাই, হাজরা, সমাজপতি, সিদ্ধান্ত, সরখেল, সাহা, সমাদ্দার, শুকুল, সাধু, সেনগুপ্ত, হাতী, স্বর্ণকার, হালুইদার, হালদার, হোম, হাজারি, হুন, হাওয়ালদার, হোড়, সর্ব্বাধিকারী, দপ্তরি, দেওয়ান, পত্রী, হকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, সরদার, জাঠী, বাস্তকর, খাঁ, বর্দ্ধন ও ওঝা।

ডি. এচ. লরেন্স

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এর পরের সপ্তাহে মোরেলের মেজাজ প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

অন্যান্য খনি-মজুরদের মত মোরেলও ওষুধ-বিষুধের খুব ভক্ত ছিল। আর বললে আশ্চর্য্য শোনাবে, ওষুধের দাম সে নিজে থেকেই দিত।

মাঝে মাঝে সে বলত, 'ওগো, আজ আমাকে এক শিশি আরক এনে দিও ত'—আর শোন, বাড়িতে একটা পাঁচন-টাচন জাল দেবার ব্যবস্থা করলেও বা মন্দ কি?'

সেদিন মিসেস মোরেল তার জন্যে এক শিশি আরক কিনে আনতেন। যে কোন অসুখের প্রথম অবস্থায় এ আরক ছিল তার একান্ত সাধের জিনিস। আর সে নিজেই নানা ওষুধ-বিষুধ দিয়ে তেতো চা তৈরি করে নিত। নানা রকমের শুকনো লতাপাতা পোঁটলা করে সে তুলে রাখত। তাই দিয়ে তৈরি হ'ত তার পাঁচন। আরাম ক'রে সেই পাঁচন সে পান করত।

কিন্তু সেবার বড়ি কিম্বা আরক, এমন কি তার সমস্ত লতাপাতাতেও তার মাথাধরার রোগ সারল না। বিশ্রী এক মাথাব্যথা এসে তাকে জ্বালিয়ে তুলেছিল। মাথার মধ্যে জ্বালা অনুভব করতে করতে তার মেজাজও খারাপ হয়ে উঠেছিল। সেই যে সে জেরির সঙ্গে নটিংহাম-এ যাবার পথে খোলা মাঠে শুয়ে ঘুমিয়েছিল, সেদিন থেকেই তার শরীর আর ভালো যায় নি। তার পর মদ খেয়ে আর হল্লা করে অসুখটাকে সে আরও চাগিয়ে তুলেছিল। এবার সত্যি সত্যিই সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেবার ভার সমস্ত এসে পড়ল মিসেস মোরেলের উপর। এমন বদ-মেজাজি রুগী নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়ে গেলেন তিনি। তবু, যতই তাঁর দোষ থাক না কেন, মিসেস মোরেল কখনই চাইতেন না যে তার মৃত্যু হয়। এ যে শুধু মোরেলের উপার্জ্জনের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হ'ত বলে তা নয়। তাঁর মনের একটা অংশে এখনো মোরেলের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ রয়ে গিয়েছিল। নিজের জন্যেই তিনি তাকে কামনা করতেন।

প্রতিবেশীরা যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাঁকে। কোন কোন দিন ছেলে-মেয়েদের খাবার ভার তারাই নিয়েছে; নীচের ঘরের কাজকর্ম্ম সব তারাই সেরে রেখেছে, কখনো বা তাদের মধ্যে কেউ ছোট বাচ্চাটাকে সারাদিন নিয়ে রেখেছে তাদের কাছে। তবু বিপত্তির আর সীমা ছিল না। প্রতিবেশীরা রোজ এসে কিছু সাহায্য করতে পারে নি। যেদিন তারা আসতে পারে নি, সেদিন তাঁকে এক হাতে শিশুর আর রুগ্ন স্বামীর সেবা করতে হয়েছে, কাপড় ধোয়া, রান্না ইত্যাদি সব কিছু কাজই নিজের হাতে করে নিতে হয়েছে। খাটুনিতে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছে, তবু সংসারের দাবি পালন করতে তিনি ত্রুটি করেন নি।

আর টাকা-পয়সার টানাটানিও গেছে যথেষ্ট, কোন রকমে খরচটা চলে গেছে মাত্র। মজুরদের সমিতি থেকে সপ্তাহে সতেরো শিলিং করে পেয়েছেন, তাছাড়া বার্কার এবং তার সঙ্গের মজুরটি প্রতি শুক্রবারে তাদের রোজগারের একটা অংশ মোরেলের স্ত্রীর জন্য আলাদা করে রেখে দিয়ে গেছে। প্রতিবেশীরাও কেউ বা পথ্য দিয়ে, কেউ বা ডিম দিয়ে, কিম্বা রোগীর দরকারের অন্য খুঁটিনাটি জিনিস দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দুঃসময়ে তাদের সাহায্য না পেলে বাধ্য হয়েই ধার করতে হ'ত মিসেস মোরেলকে। আর ধারের পরিমাণও বড়ো সামান্য হ'ত না। সে দেনা শুধতে গিয়ে তাঁর প্রাণান্ত হ'ত।

কয়েক সপ্তাহ সেবার এমনি করেই কাটল। মোরেলের জীবনের আশা ছিল না বললেই চলে, তবু ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার দেহের গড়ন ছিল খুব মজবুত, একবার ভালোর দিকে গেলে সে খুব তাড়াতাড়িই সেরে উঠতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে নীচে নেমে যাবার মত শক্তি সে ফিরে পেল। অসুখের সময় স্ত্রীর যত্ন পেয়ে সে একটু আদুরে হয়ে উঠেছিল। এখনও সে চাইত' যেন সেই যত্ন, সেই সেবার অবসান না ঘটে। কখনো কখনো মাথায় হাত রেখে, মুখ বেঁকিয়ে সে ভান করত যেন আগের সেই ব্যথা আবার সুরু হয়েছে। কিন্তু মিসেস মোরেলকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ ছিল না। প্রথম প্রথম তার ভান দেখে তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। কিন্তু পরে তাকে তিনি ধমকে উঠতে লাগলেন। বললেন, 'দেখো, অমন আদুরে গোপাল হয়ে উঠো না!'

তাঁর কথায় মোরেল যদিও একটু আঘাত পেত, তবু অসুখের ভান করতে সে ছাড়ত না।

—'আমাকে কচি খুকিটি পাও নি!' মিসেস মোরেল সংক্ষেপে বলতেন। তখন মোরেলের রাগ হয়ে যেত, ছোট ছেলের মত বিড়-বিড় করে সে কি যেন সব গালাগাল করত। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলত—আগের করুণ ভঙ্গী ত্যাগ করে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠত।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও এই সময়টা ছিল শান্তির, কিছুদিনের জন্যে শান্তি ফিরে এসেছিল বাড়িটাতে। মিসেস মোরেলও তার উপর একটু সদয় হয়ে উঠেছিলেন, আর সে ত' তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল শিশুর মতই, এবং মনে মনে এতে সে আনন্দই লাভ করত।···মিসেস মোরেল তার উপর সদয় হয়ে উঠেছিলেন শুধু

তখনই যখন ধীরে ধীরে তাঁর প্রেম তার দিক থেকে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কেউই এ জিনিসটা টের পান নি। এতদিন পর্যন্ত, দু'পক্ষে যত-কিছুই ঘটে থাক না কেন, সে ছিল তাঁর স্বামী এবং মনের মানুষ। নিজের জন্যে সে যা করেছে, তাঁর জন্যেও মোটামুটি ততটুকু করবার চেষ্টা সে করেছে, এ ধারণা এতদিন অবধি ছিল মিসেস মোরেলের মনে। তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল তারই উপর। তাঁর ভালবাসার স্রোতে যখন ভাঁটা ধরল, তার পরও অনেকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, কিন্তু ভাঁটার টানেই তিনি বরাবর ভেসে গিয়েছেন।

কিন্তু এই তৃতীয় সন্তানটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেম যেন আপনা-আপনি স্বামীর দিক থেকে সরে এল। আগে নিজের অজ্ঞাতসারেও যে আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন, এবার ঘটল তার নিঃশেষ অবসান। তাঁর মনে শুধু নিস্তরঙ্গতা, স্বামীর কাছ থেকে অনেক দূরে এসে যেন তিনি দাঁড়ালেন। এবার স্বামীর প্রতি কোন অনুরাগই আর অনুভব হ'ল না তাঁর। ক্রমশঃ আরো বেশী দূরে সরে গিয়ে নিজের জীবনকে তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনলেন তিনি। সে যেন আর তাঁর আত্মার আত্মীয় নয়, জীবনের একটা অপ্রধান ঘটনা মাত্র। সে কি করেছে, এ নিয়ে আর তাঁর কোন ভাবনা রইল না। তাকে ছেড়ে দিলেন তার নিজের হাতে।

মোরেলের জীবন হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াল। আগামী দিনের জন্যে তার ভাবনা হ'ল, যেমন শরৎকাল এলেই হয় শীতের জন্যে ভাবনা। করুণ, বিনম্র চিত্তে সে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেছে। দুঃখ হয়তো হবে তার, কিন্তু ত্যাগ সে করবেই, তার জন্যে শোক প্রকাশ করবে না কোনদিন। স্বামীকে ত্যাগ করে ভালবাসা আর প্রাণের সন্ধানে সে যাবে সন্তানদের কাছে। এবার থেকে স্বামী তার কাছে নিষ্প্রয়োজন, শস্যের খোসার মতই তার দাম তাঁর কাছে ফুরিয়ে গেছে। অনেক পুরুষমানুষকেই প্রেমের আসন ছেড়ে দিতে হয় নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে, মোরেলেরও তাই হ'ল। ভাগ্যলিপি বলেই একে সে মেনে নেবার চেষ্টা করলে।

মোরেল যখন ধীরে ধীরে সেরে উঠছিল, তখন তাদের দু'জনের মধ্যে পরস্পরের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও দু'পক্ষই চেষ্টা করছিল যেন আবার তারা সেই তাদের বিয়ের পরের দিনগুলোর মত কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে। মোরেল বাড়ীতেই বসে থাকত। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে মিসেস মোরেল তাঁর সেলাই নিয়ে বসতেন। সেলাইয়ের কাজ মিসেস মোরেল সব নিজের হাতেই করে নিতেন। মোরেলের শার্ট, ছেলেমেয়েদের জামা সবই তাঁকে নিজে করতে হ'ত। এই সময়টাতে মোরেল আস্তে আস্তে খবরের কাগজ থেকে তাঁকে পড়ে শোনাত—সে যেখানে আটকে পড়ত, সেখানে মিসেস মোরেল অনেকটা আন্দাজ করে কথাটা তাকে বলে দিতেন। মোরেল তার নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়ে কথাটাকে উচ্চারণ করত।

দু'জনে যখন চুপচাপ বসে থাকত, তখন তাদের সেই নীরব মুহূর্তগুলোকে ভারী অদ্ভুত লাগত। এদিকে মিসেস মোরেল সেলাই করে চলেছেন, তাঁর ছুঁচ ফোটাবার মৃদু শব্দ; ওদিকে মোরেল ধূমপান করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়ছে, কখনো বা আগুনের চিমনির ভিতর থুতু ফেলছে সে, চিমনির মধ্যে থেকে একটা খসখস্ শব্দ উঠছে। মিসেস মোরেল তখন মনে মনে ভাবতেন, উইলিয়মের কথা। এর মধ্যেই সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তাদের ক্লাসে যত ছেলে পড়ে তাদের সবার উপরে সে। মাষ্টার বলতেন সারা ইস্কুলে অমন চটপটে ছেলে আর নেই। মিসেস মোরেল বসে বসে ভাবতেন, কবে সে বড় হয়ে উঠবে, সুস্থ, সবল যুবক—তার দিকে চেয়ে তাঁর অন্ধকার ভুবন আবার আলোকিত হয়ে উঠবে।

আর মোরেল তখন একা একা বসে অস্বস্তিবোধ করতে থাকত। ফাঁকা মনে সে বসে থাকত, নেহাৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই কোথায় যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সে অনুভব করত, তার স্ত্রী তার কাছে আর নেই, সে সরে গেছে দূরে। কী যেন এক শূন্যতা গ্রাস করত তাকে—তার অন্তরের মধ্যেই যেন এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মনে মনে সে অস্থির হয়ে উঠত, ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পেত না। এই অস্বস্তির আবহ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠত আর ধীরে ধীরে তার নিজের অস্বস্তি সঞ্চারিত হ'ত তার স্ত্রীর মনে। কিছুক্ষণ দু'জনে মুখোমুখি থাকবার পর দু'জনেই কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, যেন এই দূষিত আবহের মধ্যে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তখন মোরেল গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ত আর তার স্ত্রী নিজের নিঃসঙ্গতার মধ্যেই নিজের আনন্দের উপকরণ সন্ধান করে বেড়াতেন—কখনো কাজ করে, কখনো ভাবনা ভেবে, কখনো বা শুধু বেঁচে থাকার মধ্যেই তিনি উপভোগের উপাদান খুঁজে পেতেন।

কিন্তু এর মধ্যেই আর একটি সন্তানের আগমন-বার্ত্তা এসে পৌঁছে গেল। এই দু'টি স্বামি-স্ত্রী যাঁরা ক্রমশই সরে যাচ্ছিলেন দূরে, দু'দিনের জন্যে তাঁদের মধ্যে যেটুকু শান্তি, যেটুকু প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল, তারই ফল এই সন্তান। পল্-এর বয়স তখন সতেরো মাস। চেহারা মোটাসোটা, কিন্তু রঙ পাণ্ডুর; শান্ত, নীল চোখ দুটি অবনত আর ভ্রূ-দুটি যেন ঈষৎ সঙ্কুচিত। তার পরের সন্তানটিও হ'ল ছেলে—সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। শিশুটির সম্ভাবনা জানতে পেরেই মিসেস মোরেল ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন,—সে ব্যথার খানিকটা আর্থিক অসুবিধার কথা ভেবে, খানিকটা স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেমের অভাব ঘটেছিল বলে। কিন্তু শিশুটির জন্যে তাঁর ব্যথা ছিল না।

এ ছেলেটির নাম রাখা হ'ল আর্থার। ভারী মিষ্টি চেহারা, সোনালী চুলের রাশি সারা মাথায়। প্রথম থেকেই সে বাপের খুব ভক্ত হয়ে পড়ল। মিসেস মোরেল দেখে খুশিই হলেন যে এ ছেলেটি অন্ততঃ বাপকে ভালবাসতে শিখেছে। বাপের আসবার সাড়া পেলেই সে হাত তুলে আনন্দে চীৎকার করতে থাকত। আর তখন মোরেলের মেজাজ যদি ভাল থাকত তা'হলে সেও জবাব দিত, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার গলা ছেড়ে সে বলত: 'কী হয়েছে আমার সোনা—এই ত' আমি যাচ্ছি।' তাড়াতাড়ি খনির ময়লা জামাটা খুলে রাখত সে, আর মিসেস মোরেল শিশুটিকে একটা চাদরে জড়িয়ে তুলে দিতেন বাপের কোলে।

তার পর বাপের কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে তিনি বলতেন,

'ওমা, কী মূর্ত্তি হয়েছে দেখো না ? বাপের চুমু খেয়ে আর আদরে সর্বাঙ্গ যে ওর কালির দাগে ভরে গেছে !···দেখে-শুনে মোরেল শুধু আনন্দে হাসতে থাকত। বলত, 'ওটাও একটা বাচ্চা খনি-মজুর, একটু বড় হয়ে উঠুক না !' আজকাল মিসেস মোরেলের জীবনে এইটুকুই শুধু আনন্দের সময়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিয়েই স্বামীকে তিনি অনুভব করতেন নিজের হৃদয়ে। এর চেয়ে বড়ো আর কোন আনন্দ তাঁর ভাগ্যে ছিল না।

এদিকে উইলিয়ম দিন দিন বড়ো হয়ে উঠছে। দিন দিন বলিষ্ঠ আর কর্ম্মঠ হয়ে উঠছে সে। পল্ বেচারী চিরদিনই ক্ষীণকায় এবং শান্ত প্রকৃতির, মায়ের আঁচল ধরে থাকাই তার অভ্যেস, সে যেন তার মায়ের ছায়া মাত্র। এমনিতে সে বেশ চটপটে, বেশ কৌতূহলী, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন মনমরা হয়ে থাকে, তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মা এসে দেখতে পান, সোফার উপর উবু হয়ে পড়ে সে কাঁদছে—অথচ তার বয়স তখন তিন কিম্বা চার।

অবাক্ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে রে তোর ?'

পল্ কোন জবাব দেয় না।

মিসেস মোরেলের রাগ ধরে যায়, চড়া গলায় প্রশ্ন করেন, 'বলবি নি, কী হ'ল !'

—'আমি জানি নি।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পল উত্তর দেয়।

তখন মা তাকে বোঝান, আদর করেন, মজার মজার কথা বলেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। অধীর হয়ে ওঠেন তিনি, কি করবেন ভেবে পান না। মোরেল চিরকালের গোঁয়ার, সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, চীৎকার ক'রে বলে, 'ও যদি না চুপ করে, তবে ওকে আমি মারতে মারতে খুন করে ফেলব।'

মা শান্ত স্বরে বলেন, 'না, তোমাকে ওসব কিছু করতে হবে না।' বলে ছেলেকে নিয়ে তিনি বাইরে চলে যান। বাইরের উঠানে একটা ছোট চেয়ারে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও, এবারে কাঁদো যত খুশি।'

তখন হয়ত রুবার্ব গাছের পাতায় পাতায় একটা প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুগ্ধ চোখে তার দিকে দেখতে দেখতে ছেলের কান্না থেমে যায়; কিম্বা হয়ত কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। এ ধরণের ব্যাপার যে প্রায়ই ঘটে তা নয়, তবু মায়ের মন অশুভ আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে ওঠে: অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে একটু পৃথক্ করে একটু আলাদা ভাবে ওকে রাখতে চান তিনি।

এক দিন সকাল বেলা মিসেস মোরেল উপর তলা থেকে নীচের গলিটার দিকে চেয়েছিলেন। রোজ সকালে যে লোকটা রুটি তৈরি করবার 'ঈষ্ট' দিয়ে যায়, আজ সে এখনো আসে নি। হঠাৎ শুনতে পেলেন, নীচে থেকে কে যেন তাঁকে ডাকছে। এ সেই রোগা, বেঁটে মতো মিসেস অ্যান্টনি, তাঁর পরনে ভেলভেটের বাদামী রঙের জামা।

—'শুনছ, মিসেস মোরেল, তোমার উইলিয়মের কথা কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

—'তাই নাকি ? কেন, কী করেছে সে ?'

—'যে ছেলে অন্য ছেলেকে ধরে তার পোষাক ছিঁড়ে দেয় তাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার, কি বলো ?'

—'কিন্তু তোমার অ্যালফ্রেড আর আমার উইলিয়ম ওরা ত' একই বয়সী !'

—'সে ত' বুঝলুম, একবয়সী নয় হ'ল, কিন্তু তাই বলে সে তার কলার ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে, এ ত' কোন কাজের কথা নয় !'

—'কি জানো, ছেলেদের মারধোর আমি করি না, আর যদিও বা করি, তবু আগে তাদের কিছু বলবার আছে কিনা সেটা জেনে নিয়ে।'

—'তাই ত' বলি, শাসন পেলে কি আর ছেলেমেয়ে অমন হয়। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই শুধু শুধু ইচ্ছে করে একটা ছেলের কলার টেনে ছিঁড়ে নেওয়া, সাহস ত' কম নয় !'

—'শুধু শুধু ইচ্ছে করে সে এ কাজ করে নি, এ আমি নিশ্চয় জানি।'

—'তবে আমি মিছে কথা বলছি, অ্যাঁ ?' মিসেস অ্যান্টনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

মিসেস মোরেল আর কথা না বাড়িয়ে সরে গেলেন, বাইরের দরজাটা দিলেন বন্ধ করে। তাঁর হাতে ছিল একটা মগ, মগটাসুদ্ধ তাঁর হাত তখন কাঁপছিল।

মিসেস অ্যান্টনি তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে তখন বলছিল, 'রসো, তোমার কর্ত্তাকে বলে তবে ছাড়ছি !'···

দুপুর বেলা খাবার সময় উইলিয়ম যখন খাওয়া সেরে আবার বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছিল (উইলিয়মের বয়স এখন এগারো), মা বললেন,—

—'তুমি অ্যালফ্রেড অ্যান্টনির কলার টেনে ছিঁড়েছ কেন ?'

—'কখন আমি তার কলার ছিঁড়লুম !'

—'কখন আমি জানি না, কিন্তু তার মা বলছিলেন, তুমি তার কলার টেনে ছিঁড়েছ।'

—'বা রে, সেই কলারের কথা, কেন, তার কলার ত' ছেঁড়াই ছিল।'

—'তুমি সেটা আরো বেশী করে ছিঁড়ে দিয়েছ।'

—'ও, খেলতে খেলতে সে আমার গুলতি নিয়ে দৌড় দিল কেন ? আমি তার পেছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরলুম, তাতেও সে যখন ছুটে পালাতে চাইলে তখনই তার কলার ছিঁড়ে গেল। নইলে আমি আমার গুলতি পেতুম কি করে ?'

—'কিন্তু, তুমি জানো ওর কলার ছেঁড়বার তোমার কোন অধিকার নেই।'

—'তুমি কিছু বোঝ না মা,' উইলিয়ম বললে, 'কলার আমি ছিঁড়তে চেয়েছিলুম কিনা—ওটা একটা রবারের কলার, ও আগেই ছেঁড়া ছিল যে।'

—'কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাকে আরও সাবধান হতে হবে। মনে কর এক দিন কেউ তোমার কলার ছিঁড়ে দিল আর তুমি তাই নিয়ে বাড়ি এলে, তখন আমার সেটা খুব ভাল লাগবে না।'

—'সে যা হয় হবে। আমি ত' আর ইচ্ছে করে করি নি !' বকুনি খেয়ে সে বেশ দুঃখিত হয়েছিল।

—'না, ইচ্ছে করে তুমি কর নি, কিন্তু আর একটু সাবধান হয়ো এখন থেকে।'

মায়ের কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে উইলিয়ম খুশি হয়ে ছুটে পালাল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খিটিমিটি মিসেস মোরেলের চিরদিনের অপছন্দ, তিনি ভাবলেন মিসেস অ্যান্টনিকে সব কথা বুঝিয়ে বললেই মিটে যাবে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

রায় দেবার পর বিচারক-মণ্ডলী কক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই জনশূন্য আদালতে একটা ব্যাপ্তিহীন শূন্যতা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল।

জেলারের কাছে মিনতি করে লরী একটি বারের জন্তে স্বামি-স্ত্রীকে মুখোমুখী করে দিলেন।

গিলোটিনে স্বামীর মৃত্যু-দণ্ডাদেশ শোনার পরই লুসির সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে গিয়েছিল, স্বামীর সান্নিধ্যে এসে দাঁড়াতেই তার কোমল চিত্ত আর স্থির থাকতে পারল না। সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল বেদনার্ত রমণী।

জেলারের পিছু-পিছু অদৃশ্য হয়ে গেল কারান্তরালে ডার্নে। তখন এক অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন কার্টন। তার দুটি চক্ষুতে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। নিশ্চিত বিজয়ের গোপন উচ্ছাসে সে-দুটি চক্ষু উজ্জ্বল, দেখলেন লরী।

—'অনুমতি করেন ত লুসিকে আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসতে পারি। ওর ভার আর কখনো আমি বইব না।'

তাই করলে কার্টন। মূর্চ্ছিতা মেয়েটির পাশে বসলেন ডাক্তার আর লরী। ড্রাইভারের পাশে বসলেন কার্টন।

বাড়ীর গেটে আর একবার তাকে হাতের পালঙ্কে তুলে নিলেন কার্টন। অন্ধকার সদর পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে কত ভাল লাগল, এই পাথরের উপর দিয়ে এই মেয়েটি কত বার আসা-যাওয়া করেছে।

উপরে কোমল শয্যায় তাকে সযত্নে শুইয়ে দিলেন কার্টন। ছোট লুসি তাকে দেখে ছুটে এল। কান্নাভরা খুসী কণ্ঠে বললে—'আপনি এসেছেন মিঃ কার্টন। বাঁচলাম আমরা।'

কার্টন তাকে কোলে তুলে নিলেন। পরম আদরে আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে কানে কানে বললেন—'ভয় কি মা! তুমি যাতে খুসী হও তাই হবে।'

সে কথার গভীর অর্থ বুঝলে না ছোট লুসি, কিন্তু সেই আশ্বাসে তার কচি মুখ আনন্দে ভরে উঠল।

পথের অন্ধকার কোণে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কার্টন। চিত্ত-প্রদীপের আলোয় দেখতে চাইলেন আগামী দু'-এক দিনে তার জীবনে কি অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটবে। কী এক অনিবার্যতার দিকে ছুটে চলেছেন তিনি সানন্দে, সাগ্রহে।

তবে তাই হোক, ভাবলেন কার্টন। ওরা জানুক যে এই সহরেই আমার মত এক জন লোক বাস করছে এই দুর্যোগ কালে।

কৃতসংকল্প হয়ে কার্টন সেণ্ট আঁতোয়ারের দিকে পা বাড়ালেন। ডফর্জের মদের দোকানেই গিয়ে উঠবেন তিনি। সেই যথার্থ স্থান।

গত কাল রাত্রি থেকে এক প্রকার নিরাহারেই আছেন তিনি। তার মত সুরাসক্ত লোকও কাল রাত থেকে প্রায় মদ্য পান করেননি। এ ভালই হোল, ছন্নছাড়া জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে কোন আচ্ছন্ন ভাব নেই তার চেতনালোকে।

পথের পাশের একটি দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সযত্নে বেশ-বাস ও বিপর্যস্ত কেশ বিন্যস্ত করে নিলেন কার্টন। তার পর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলেন ডফর্জের মদের দোকানে।

মাদাম ও ডফর্জ ভিন্ন আর একটি যে রমণী কাউণ্টারের পাশে গল্প করছিল সে তাদেরই বিপ্লবসঙ্গিনী। অন্য খরিদ্দার ছিল না কেউ।

মদের অর্ডার দিয়ে কার্টন বসতেই মাদাম তার দিকে এগিয়ে এল, এক-জাহাজ বিস্ময় তার চোখে।

—'হুবহু চার্লস ডার্নের মত দেখতে। আপনি কি ইংরেজ?'

মদের পাত্রে চুমুক দিয়ে রসনায় একটা তৃপ্তির শব্দ করে কার্টন সে কথায় সায় দিলেন।

মাদাম এসে বসল তার স্বামীর পাশে। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো মন থেকে।

ডফর্জও এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে কম অভিভূত হয়নি। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে—'তোমার মনে ঐ মানুষটির কথা নিশিদিন আসা-যাওয়া করছে। ভয় কি, শেষ বারের মত কাল ত তাকে দেখতে পাবে।'

—'ওদের বংশ যত দিন না নির্বংশ হচ্ছে তত দিন আমার স্বস্তি নেই—আত্মার তৃপ্তি নেই। বাস্তিলের সেই অন্ধকার ঘর থেকে যেদিন ডাক্তার ম্যানেটের হাতের লেখা সেই রক্তমাখা দলিল আমরা নিয়ে এসে পড়েছি—সেদিন থেকেই আমার মৃত্যুর খাতায় ওদের নাম লিখে রেখেছি। সেদিনও আমি এমনি করে বুক চাপড়ে মরেছিলাম। কিন্তু কেন তা শুধু জানে আমার স্বামী। আর কেউ নয়।'

ভৈরবীর মত মাদামের ভয়াল দৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল সঙ্গিনী। আর অন্যমনস্কতার ভান করে শুনছিলেন কার্টন।

—'সেদিনই ওঁকে আমি বলেছিলাম। সমুদ্র-তীরের জেলে-পরিবারে যে মেয়েটি মানুষ হয়েছিল সে আর কেউ নয়, সে আমি, এই অভাগিনী মাদাম ডফর্জ। আমার বাবাকে ওরা তিলে তিলে হত্যা করেছিল। আমারই ভাইকে করেছিল খুন। ওদের লাম্পট্যের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরেছে আমার সতী সাধ্বী দিদি। চার্লস ডার্নের বাবা জ্যাঠা আমাদের মত সহস্র পরিবারের সর্বনাশ করেছে। মৃত্যুই ওদের শাস্তি। ওদের রক্তে পথের ধুলো লাল না হলে আমার মনের আগুন নিববে না। কিছুতে না।'

নিঃশব্দে কার্টন দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন। প্রথম উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে।

মন উধাও পাখা মেলে দিয়েছে। জীবনে কোন দিন এত প্রেরণা ছিল না কাজে, এত মধুময় বোধ হয়নি বেঁচে থাকা।

লরীর ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত গভীর হয়ে এলে লরী ফিরে এলেন। শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় গেছেন ডাক্তার ম্যানেট। যদি কোন রকমে বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন ঘটে, যদি মুক্তি পায় তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জামাতা। ডার্নে না বাঁচলে তাঁর লুসি মা বাঁচবে না। কি নিয়ে তবে বাঁচবেন বৃদ্ধ?

তার নিজের পাসপোর্টটি লরীর হাতে সমর্পণ করে কার্টন তাকে মিনতি করলেন যে প্রথম সুযোগেই তিনি যেন লুসি ও ডাক্তার ম্যানেটকে নিয়ে ফ্রান্স ত্যাগ করে চলে যাবার ব্যবস্থা করেন। টিকটিকি বারসাদের কাছে শুনেছেন ডফর্জরা জেনেছে যে লুসি তার স্বামীর সঙ্গে সংকেতে কথা কইত জেলের সামনের পথ থেকে।

ওরা কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। লুসি, তার মেয়ে, ডাক্তার ম্যানেট—সকলকে তারা খুন করবে। বিপ্লবের শত্রু জেনে কাউকে তারা মার্জনা করবে না।

—'ভয় করবেন না মিঃ লরী। ঈশ্বরের করুণায় আপনি তাদের নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দিতে পারবেন।'

—'বৃদ্ধ হয়েছি। তবু আমি চেষ্টার কার্পণ্য করব না মিঃ কার্টন। আপনি নিশ্চিন্ত হন।'

—'তবে ব্যবস্থা সব পাকা করে রাখবেন মিঃ লরী। লুসিকে বলবেন যে তার স্বামীর ইচ্ছাতেই তাদের পলায়নের আয়োজন করা হয়েছে। শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে বুদ্ধিমতী সে আপনার কথার যুক্তি বুঝবে। আর একটি কথা মিঃ লরী, যখন যে ভাবে আমি এসে পৌঁছই দয়া করে আপনার গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দেবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না। বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে আপনিই সব কথার উত্তর দেবেন। কোন শঙ্কা রাখবেন না মনে মিঃ লরী—বাঁচা-মরার জুয়ায় বাজী ধরেছি আমরা—দান আমাদের ফেলতেই হবে।'

বাইরে নির্জন প্রাঙ্গণে অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। চারি দিক নিঝুম নিঃশব্দ। শুধু উপরের একটি ঘরের বাতায়নে আলোর রেখা পড়েছে। সেখানে একটি মূর্ছিতা মেয়ের কোমল পাণ্ডুর মুখের স্মৃতিতে মুহূর্তে সজল হয়ে এল কার্টনের চোখ। প্রাণের গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটি বিদায়-বাণী উচ্চারণ করে ছায়ার মত সরে গেলেন কার্টন।

১২

পথের রক্তের দাগ শুকোবার আগেই আবার রক্তস্রোতে ভেসে যায় মেদিনী। দিনের পর দিন রক্ত-সমুদ্রে নব নব তরঙ্গোচ্ছাস ওঠে। রূপ-যৌবন ধন-দৌলত আভিজাত্য কিছুতেই প্রাণের পরিত্রাণ নেই। গিলোটিনের খড়্গের প্রাণ নেই, তাই তার মমতাও নেই।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় নির্জন কারাকক্ষে পাদচারণা করতে করতে হাজারো চিন্তায় ডার্নের চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যার বেদনা-নীল মুখ দুটির স্মৃতি তখনো ফুলের সুবাসের মত জড়িয়ে ছিল। নিদারুণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাদের কথা চিন্তা করে তার চিত্তে সুখ ছিল না।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহর অতীত হচ্ছে। এমনি বেলা একটার ঘড়ি বাজল। তিনটের সময় তার ডাক পড়বে গিলোটিনের কাছে। জীবন-মৃত্যুর মোহনায় দাঁড়িয়ে চার্লস ডার্নে অস্থির চিত্তে সেই অনিবার্যতার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

চিত্ত-সমুদ্র মন্থনে উঠে আসছে কত স্মৃতি। তার বাল্য কৈশোর যৌবনের কত দুঃখ-সুখের চিত্র। চলচ্ছবির মত মনের ভূমিকায় দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটছে। ডাক্তার ম্যানেটের সঙ্গে পরিচয়। লুসির সান্নিধ্য। তাকে ঘিরে তার নতুন জীবনের সূচনা। নিভৃত সুখী সংসারে তার প্রতিষ্ঠা। লরীর সজাগ অভিভাবকত্ব। সিডনী কার্টনের কথা তার মনেও পড়ল না।

তারই দরজায় চাবী ঘোরানোর শব্দে চকিত হয়ে ডার্নে উৎকর্ণ হয়ে রইল। তবে কি তার সময় হয়ে এল।

—'আমি ভেতরে যাব না। আপনি যান।'

বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দ্বার খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই জনশূন্য আধা-অন্ধকার কক্ষে যে মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে ডার্নের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সিডনী কার্টন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বন্দীকে সংকেত করলেন।

—'আপনি এ অবস্থায় এখানে? এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর?' যেন প্রেত মূর্তি দেখছে এই ভাবে ডার্নে কম্পিত পায়ে সরে দাঁড়াতেই, কার্টন তার দুটি হাত নিজের সবল মুঠিতে ধরে নিলেন।

—'অপচয় করার মত সময় আমার হাতে নেই। শুনুন, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। যা বলি শুনুন, কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না।'

ডার্নের বিস্ফারিত দৃষ্টিপাত অবজ্ঞা ক'রে কার্টন তাকে আদেশের সুরে বললেন—'পায়ের জুতো খুলে আমার এই জুতোটি পরে ফেলুন। দেরী করবেন না। এই নিন আমার জুতো।'

—'কেন এ পাগলামি করছেন মিঃ কার্টন! এ ভাবে পালাতে আমি পারব না। আমি মরবই—আপনারও সমূহ বিপদ ঘটবে। আমাকে বাঁচাতে কেন আপনি মরতে এসেছেন?'

—'মরতে আমি তোমায় দেব না ভাই। মরব আমি নিজে। এসো, দেরী করো না—জামা পোষাক বদলে নাও আমার সঙ্গে। আমি তোমার চুলটা ঠিক করে দি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত ডার্নেকে শিশুর মত আপন হাতে সাজিয়ে দিলেন কার্টন। মৃত্যুপথযাত্রী বন্দীর কোন অসহায় প্রতিরোধই কার্যকরী হোল না তাঁর কাছে।

সে কাজ সারা হলে বললেন—'ভয় কি ভাই! এই নাও কাগজ কলম, যা বলছি লিখে ফেলতে এই কাগজে। নাও, দেরী করো না। সময় বড় কম আমাদের হাতে।'

—'কাকে কি লিখব?'

—'কাউকে উদ্দেশ করে নয়। লিখে ফেল ভাই যা বলি।'

মাথা নীচু করে ডার্নে লিখতে সুরু করল কার্টনের কথা মত। কিন্তু তখুনি সে মাথা তুললে—'কিসের গন্ধ আসছে নাকে—আমার শরীর কেমন করছে যেন।'

—'কিছু না'—বলে কার্টন তার মুখের আরো কাছে হাত নিয়ে আসতেই বন্দী এক ঝলকে শরীর ঝাঁকিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই কার্টনের বজ্রবন্ধনে বাঁধা পড়ল তার শরীর। এক হাতে ডার্নের নাক চেপে ধরে কার্টন তাকে অবলীলাক্রমে সংজ্ঞাহীন করে ধরাশায়ী করে দিলেন।

মহৎ আত্মবলিদানের দ্বিতীয় পর্যায়ে সফল আনন্দে কার্টনের মুখে অপূর্ব মাধুরী ফুটে উঠল।

তড়িৎগতিতে বন্দীর সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে নিলেন কার্টন। তার পর শান্ত কণ্ঠে ডাকলেন—'ভেতরে এস।'

বরসাদ আসতেই কার্টন বললেন—'একে নিয়ে বাইরে যাবার আর কোন অসুবিধা হবে?'

—'যদি আপনি কথা রাখেন?'

—'ভয় নেই। গিলোটিন অবধি আমি সত্যনিষ্ঠ থাকব। কিন্তু আর দেরী নয়। সিডনী কার্টনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।'

—'কার্টন ? কী বলছেন আপনি ?'

—'ঐ ত কার্টন। যখন নিয়ে এসেছিলে আমায় জেলের অভ্যন্তরে, আমি ছিলাম দুর্বল, এখন আমার শরীর আরো ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত্যুযাত্রী প্রিয়জনের সাক্ষাৎ করে স্নায়ু একেবারে তচনচ হয়ে গেছে। এমন ত হামেশাই হয় তোমাদের জেলে। যাও, সাবধানে ওকে বাইরে নিয়ে যাও। ওর জীবনের সঙ্গে তোমার প্রাণও সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা সে কথা ভুলো না। আর লরীর সঙ্গে দেখা করে যা বলে দিয়েছি সবিস্তারে সব জানাবে। বাকী তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। যাও যাও, দেরী করো না।'

দু'জন প্রহরীর সাহায্যে ডার্নেকে নিয়ে বিদায় হোল বরসাদ। রুদ্ধ দ্বারের পিছন থেকে কান পেতে শুনলেন বন্দী কার্টন পদচারণার ক্ষীণায়মান শব্দ। কোথাও কোন অস্বস্তিকর আওয়াজ তার কানে এল না দেখে শান্ত চিত্তে মহা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন কার্টন।

তিনটের ঘড়িতে ঘা পড়ার আগেই মৃত্যুর মিছিলে যখন ডাক পড়ল চার্লস ডার্নের তখন লরীর তত্ত্বাবধানে আধ তন্দ্রাচ্ছন্ন ডার্নে, সকন্যা লুসি আর ডাক্তার ম্যানেট প্যারিসের সীমান্ত পেরিয়ে গেছে।

সিডনী কার্টনের পাসপোর্টে যাচ্ছে ডার্নে মৃত্যুর মহল পেরিয়ে আর এক নব জীবনের দেশে উত্তীর্ণ হয়ে।

বিপ্লবের প্রহরীরা নিয়ে গেল কার্টনকে গিলোটিনের খড়্গে বলি দিতে।

সে রাত্রে সারা প্যারিসের লোক কানাকানি করলে যে কোন বন্দীর মুখে অমন শান্ত জ্যোতি আজ অবধি কেউ দেখেনি। মৃত্যু-ভয়ের লেশ মাত্র নেই নয়নে-বদনে। ভিতরের একটা অব্যক্ত আনন্দ প্রশান্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সেই প্রসন্নতায়।

অনুচ্চারিত তার বিদায়-বাণী শুনেছিল নিরবধি কাল আর বিপুল পৃথিবী।

ভালোয়-মন্দোয় মেশানো তোমাদের সবাইকে আজ দেখতে পাচ্ছি। ঐ তুমি বরসাদ, ডিফর্জ। ঐ ত সারি দিয়ে বসে আছে বিচারক আর জুরীরা। মাটীর কাছাকাছি থেকে উঠে এসেছ তোমরা নতুন শাসকের দল। তোমাদের হাতে অত্যাচারের নূতন হাতিয়ার। কিন্তু এ'দিনও থাকবে না। আর এক অবলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তোমরা।

তার পর সেই অতীতের কবর থেকে জেগে উঠবে এক নূতন পৃথিবীতে নূতন মানব-সমাজ। দীর্ঘকালের ঝড়-ঝাপটার সংঘাত পেরিয়ে অনেক জয়-পরাজয়ের গৌরব-গ্লানি উত্তীর্ণ হয়ে তারা এক নূতন কালকে সৃষ্টি করবে। এমনি করে কাল থেকে কালান্তরে ভবিষ্যৎ প্রায়শ্চিত্ত করবে অতীতের—গত যুগের গ্লানি নিশ্চিহ্ন করে মুছে নেবে আগামী যুগ।

সুখী হোক তারা, যাদের জন্যে আমার এই তুচ্ছ আত্মবলিদান। সুখী হোক লুসি। তার কোলে যে শিশু তার মধ্যে আমার নাম বেঁচে থাকবে। মিঃ লরী, ডাক্তার ম্যানেট তাদের অকৃপণ আশীর্বাদ করুন ভগবান।

ওদের প্রাণের মন্দিরে একটি আসন রইল আমার। বৎসরে বৎসরে এই দিনটিকে নীরব অশ্রুজলে ভিজিয়ে দেবে যে নারী, তাকে আমি ভুলতে পারিনি। সেও আমায় ভুলতে পারবে না। আয়ুর দীর্ঘ পথশেষে এক দিন স্বামি-স্ত্রী ওরাও দু'জনে মাটীর নীচে চির-বিশ্রাম পাবে। তবু জানি যত দিন বাঁচবে ওদের চিত্ত-প্রদীপে আমার স্মৃতির আরতি চলবে।

আজ যা করছি, জীবনে এত-বড় কিছু করিনি কখনো। বিশ্রামে যে এত অমৃত তা আগে কখনো জানিনি।

তিনি বলেছেন—আমিই জীবন, আমিই পুনরুজ্জীবন। আমাতে যে চিত্ত স্থাপনা করেছে, মৃত্যু পার হয়ে সে জেগে উঠবে জ্যোতির্লোকে। আমাতে যার আশ্রয় যার আস্থা মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। [সমাপ্ত]

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

হাসি

জসিম উদ্দীন

মেরু-কুহেলীর দূর তমসার ছায়,
হেরিলাম নবোদিতা অস্ফুট উষায়।
গৌরী গিরির শৃঙ্গে প্রথম প্রভাতে,
জবা-কুসুমের দ্যুতি ফেলে মেঘ-পাতে।
প্রথম শিশির-ফোটা কুমুদিনী গায়,
ঝলমল করিতেছে রঙের দোলায়।
শিবের তপস্যা-তুষ্ট পার্ব্বতীর মুখে
ঈষৎ খুসীর আভা ফুটে ওঠে সুখে।
মন্দাকিনী ধারা বেয়ে সোনার কমল,
ভাসিয়া ডুবিছে জলে তুলিয়া কল্লোল।
তেমনি তোমার রাঙা হাসিমুখখানি,
কোন সে সুদূর হ'তে স্বপ্ন-জাল আনি;
ছড়ায়ে জড়ায়ে দিল সকল আকাশ,
অন্তরীক্ষ যন্ত্রে তার বাজিছে উচ্ছাস।
এ হাসি ভাষায় যদি দিত আজ ধরা,
নাচিত কথার মঞ্চে সুরের অপ্সরা।
এ হাসি টুকিয়া নিতে যদি পারিতাম,
গুলি' কত উষা সাঁঝ শেষ করিতাম।
এ হাসি মোমের বাতি আলাইয়া সাধ,
শিরির কবরে জাগি হইয়া ফরহাদ।
হৃদয় লুবান হয়ে জলে তারি সনে,
কে জানিত এত সুখ আপন দহনে।
কস্তুরী মৃগের সম আমার হৃদয়,
আপন সুগন্ধে মাতি ঘোরে বিশ্বময়।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

ত্রিংশ অধ্যায়

তিরোভাব

১৯০১ সালের নবেম্বরে নিবেদিতা বেলুড়ে পৌঁছলেন। মঠের দুয়ারে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্ম স্বামীজি এবার নাই। যদিও অতটা প্রত্যাশা ছিল না,—তবুও স্বামীজিকে না দেখে নিবেদিতা একটা ধাক্কা খেলেন। গাড়ি-বারান্দার নীচে দু'-এক জন সাধু দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন। 'স্বামীজি কেমন আছেন? আমায় নিয়ে চলুন তাঁর কাছে'—নিবেদিতা এইটুকু বলতেই তাঁদের চোখ জলে ভরে উঠল।

সন্ন্যাসীরা জানতেন সব শেষ হয়ে আসছে, তবু প্রতিদিন তাঁদের নতুন করে আশা জাগে। আটত্রিশ বছরের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে স্বামীজি যুঝে চলেছেন। মাসের পর মাস তাঁর ভাবগতিক দেখছেন সাধুরা। কখনও বহুমূত্র আর হাঁপানীতে কাবু হয়ে পড়েন, কখনও এমন উদগ্র কর্মব্যস্ততায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে অতি উৎসাহী কর্মীরাও ঘাবড়ে যান। আবার শিশুর মত সরল-চিত্তে ডাক্তারদের বিধি-ব্যবস্থাও মেনে নেন। যেমন প্রশান্ত মনে মালা জপেন তেমন প্রশান্তিতেই রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁর কাছে মৃত্যু তো কেবল 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,' তেমনি করে ভাঙা শরীরটাকে ছেড়ে যাওয়া।

স্বামীজির ঘরখানা বেশ বড়, হাওয়া চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ঘরে দুটি বড়-বড় জানলা, বারান্দার দিকে পাল্লা খোলা। স্বামীজির বিছানা ঘিরে লাল-টালি-বিছানো মেঝেতে দর্শনার্থীরা এসে বসেন।

নিবেদিতার এই প্রত্যাবর্তন স্বামীজির পক্ষে একটা বিজয়-গৌরব যেন।···স্বেচ্ছায় ও-মেয়ে ভারতের জন্ম কাজ করতে এসেছে। ওর স্বচ্ছ দৃষ্টির আলো কী যে ভালো লাগে।···সত্য-স্বরূপকে আপন অন্তরে খুঁজে পেয়েছেন নিবেদিতা, বিবেকানন্দ তাঁকেই দেখেন নিবেদিতার দৃষ্টিচ্ছায়ে। তাই তিনি আসতেই নিজের পাশে সসম্মানে তাঁকে ঠাঁই দেন।

স্বামী সদানন্দ মঠেই ফিরে এসেছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নিবেদিতার উল্লাসের সীমা থাকে না। অল্পবয়সী ব্রহ্মচারীরা নিবেদিতার চার পাশে ভিড় জমান, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ খোঁজেন প্রত্যেকে—একটু যদি তাঁর কাজে লাগেন। ওঁদের পুলকদীপ্ত উৎসাহের সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা নিজেকে যাচাই করবার সুযোগ পেলেন—অন্তরে-অন্তরে পরিপূর্ণ রূপান্তর তাঁর ঘটেছে কি না?

'এখন আমি যন্ত্র মাত্র। এইটি হওয়ার জন্ম চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। নতুন নামকরণ হ'ল যেদিন সেই দিন বেলুড় মঠে আমার অধ্যাত্মশিক্ষার পাঠ শুরু হয়েছিল··· এখন বুঝতে পেরেছি, স্বামীজি এমন এক জনের প্রত্যাশায় ছিলেন যার মাঝে নিজের মনের সব শক্তি সব ভাবনা উজাড় করে ঢেলে দিতে পারেন। আহা! আমার স্বভাব এমন নীরন্ধ্র কঠিন যেন কখনও না হয়, তাঁর ভালোয় এক কণাও যেন ফিরিয়ে না দিই! রিজলি ম্যানরে আমার শিক্ষানবীশি-পর্ব শেষ হ'ল, আমায় জগতের কাজে পাঠালেন স্বামীজি। তার পর এল এক কুয়াসা-মলিন রাত্রির আঁধার। দুটি বৎসর অন্তরাত্মা তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল, গুরুকৃপায় সে-আঁধার বিদীর্ণ করে আজ জ্বলে উঠেছি। এখন সদা-সচেতন একটা অবস্থা। জীবনের একমাত্র অর্থ আমার কাছে মুক্তি। তা যদি না পাই, মৃত্যু ঢের ভালো···যদি একটা মূঢ় আতঙ্কে শ্বাসরোধ হয়ে যায়, যা শ্রেষ্ঠ বা মহত্তম নয় তাকেই বেছে নিতে অসৎবুদ্ধি প্ররোচিত করে আমায়, আমি শরণ নেব শিবসুন্দরের—জানি অন্যায়ের পায়ে মাথা নিচু করবার আগে আমায় মরণ-হানা হানবেন তিনি।' (১৮।২।১৯০২ ও ২৬।৭।১৯০৪এর চিঠি হতে)।

ফিরে আসবার পর প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ নিবেদিতার অনিশ্চয়তায় কাটে। এ দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে আবার নতুন করে যোগস্থাপন করতে হচ্ছে, স্বয়ং স্বামীজি তাঁর দিশারী।

এ-কাজ শুরু করতে হলে আমেরিকান কন্‌সাল্ প্যাটারসনদের সঙ্গে শহরে থাকাটা অপরিহার্য্য। ওঁদের ওখানে থেকে বাগবাজার অঞ্চলে একটা বাড়ি খুঁজে নিতে হবে। মিস্ ম্যাকলয়েডের আসবার প্রতীক্ষায় আছে সবাই। তিনি আসবার আগেই বিদ্যালয়টি খুলতে চান নিবেদিতা। সেবার শীতকালে কলকাতা লোকে লোকারণ্য। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হবে। দেশীয় অঞ্চলগুলিতে জনতা অসম্ভব চঞ্চল হয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায়, হিন্দু-বাড়ির ভিতর-আঙিনায় সভার জায়গা হচ্ছে। ছাত্রেরা এক এক দলের হয়ে গলাবাজি করছে, নেতাদের আশে-পাশে ভিড় জমাচ্ছে। বড়-বড় চৌমাথাগুলিতে দেশী পুলিশ ছড়ি হাতে ঘোড়সোওয়ার হয়ে বহু কষ্টে পথচারীদের নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিভিন্ন প্রদেশ হতে জাতীয় মহাসভার সদস্যেরা এসেছেন। স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে অনেকে বেলুড়ে আসতেন। বড়-বড় বহু নেতার সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ। এঁদের মধ্যে গান্ধীজি ছিলেন। মহাসভার কর্মী হিসাবে নয়, সাধারণ ভাবেই সেবার অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। স্বামীজিকে ভারতীয় নেতারা বলতেন—'দেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী'। তাঁর কাছে ঠিক কী যে তাঁরা চাইতে আসতেন নিজেরাই বুঝতেন না,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে

দেখা করে যখন ফিরে যেতেন তখন সকলেই অল্প-বিস্তর বদলে গেছেন মনে-মনে। তাঁর উদ্দীপ্ত প্রেরণা সকলেরই চিত্ত জয় করত। এমন মানুষের দেখা পেলে সবার মনেই অবিস্মরণীয় ছাপ পড়ে যায় একটা! স্বামীজি দেখতেন, এঁদের অস্ফুট জীবন অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন—তিনি তাঁদের প্রণোদিত করতেন সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে। তাঁরা যে সব সমস্যার কথা তুলতেন, স্বামীজি তা নিয়ে এমন ভাবে সরাসরি আলোচনা করতেন যাতে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। কোন পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূর্তিমন্ত বেদান্ত, জাতীয় জীবন সম্বন্ধে তেমনি সহজাত জ্ঞান স্বামী বিবেকানন্দের। এক দিন তিলক বলছিলেন, তাঁর পিছনে আছে সমস্ত মারাঠারা আর সুরেন্দ্রনাথের পিছনে বাঙালীরা। 'কিন্তু জন-সাধারণের কোথায় স্থান?' স্বামীজি শুধান। 'ধর্মে আঘাত না দিয়ে জনসাধারণের উন্নয়নই হল সকল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। জনশিক্ষায় তোমাদের টাকা খরচ করি।'···'মানুষ তৈরী কর, মানুষ তৈরী করাই আমার কাজ'—এই একটি কথায় শ্রোতাদের মনে বহু সার্থক কল্পনার বীজ ছড়িয়ে দিতেন তিনি। যত দিন কলকাতায় ছিলেন মহাসভার প্রতিনিধিরা বিকালটা এই সন্ন্যাসীর কাছেই কাটাতেন। এই বিশালবুদ্ধি মহাপুরুষকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটা ঘরোয়া জাতীয় মহাসভার পত্তন হল যেন।

স্বামীজির কাছে আরেকটি রুচিকর আলোচনার বিষয় হল, 'এই গোঁড়া হিন্দুরা প্রাচীন ঋষিদের মুখ চেয়ে কেবল তাঁদের প্রবর্তিত আচার-বিচারগুলোই মানে অথচ মানুষের মাঝে তার ভাইয়ের মাঝে নারায়ণকে দেখতে চায় না—এর চেয়ে নিদারুণ অপরাধ আর কিছু আছে কি?' এ প্রসঙ্গ তুলতে স্বামীজির কখনও শ্রান্তি আসত না। যখন উদারতা আর মৈত্রীর কথা তুলতেন, তাঁর মুখে সে যেন জীবন্ত অধ্যাত্ম-সাধনার রূপ নিত। এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে বলে যেতেন তিনি।

এ সব আলোচনার প্রত্যেকটিতে নিবেদিতা হাজির থাকতেন। অনেক সময় স্বামীজি তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে বাংলা কথাবার্তায় ছেদ দিয়ে ইংরেজীতে জানতে চাইতেন, নিবেদিতার মত কি। স্বামীজি শ্রান্ত হয়ে পড়লে কখনও বা ওঁর হয়ে নিবেদিতাই কথাবার্তা চালাতেন। সাধুদের মধ্যে অনেকেই এবং নিবেদিতাও এই সব আগন্তুকদের বাড়িতে সদাসর্বদা যাতায়াত করতেন। এই ভাবে তাঁদের সঙ্গে সবার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে মিস ম্যাকলয়েড জাপান থেকে এসে পড়লেন। সঙ্গে দুই জাপানী বন্ধু, প্রিস্ট ওডা আর কাকুসো ওকাকুরা। জাপানে একটা ধর্মসভার আয়োজন চলছে, স্বামীজিকে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করতে এসেছেন ওঁরা। স্বামীজি নিজের অসুস্থতার কথা একবারও ভাবলেন না, স্বত-উচ্ছল উৎসাহে এই বৌদ্ধ অতিথিদের বিপুল অভ্যর্থনা জানালেন। এই শেষ বার বুদ্ধগয়ায় যাবার জন্য ভিক্ষু ওডার মত লোকের সাহচর্যই চেয়েছিলেন, প্রতীক্ষায় ছিলেন বোধিদ্রুমমূলে যাবেন তাঁর সঙ্গে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে ধূলোয় লুটিয়ে, আপনাকে নিবেদন করে দেবেন করুণাঘনতার বুদ্ধের পায়। জন্ম-মুহূর্তে জননী তাঁকে সঁপে দিয়েছিলেন বিশ্বনাথের চরণে, তাই কাশীতেও পূজা দেবেন বিবেকানন্দ। গঙ্গায় স্নান করে চিতাভস্ম লেপন করবেন ললাটে।

ওকাকুরা আর মিস ম্যাকলয়েডও ওঁদের সঙ্গে চললেন। এই জাপানী আগন্তুকটির নাম সবার মুখে-মুখে। বিদগ্ধ এবং বহুজ্ঞ মানুষটি বড়দরের শিল্পী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। কলা-শিল্পের বিশুদ্ধিতে তাঁর অনুরাগ, আবার মস্ত বড় দেশনেতাও তিনি। স্বদেশে 'প্রত্নমন্দির সংস্কার সমিতি'র প্রধান পাণ্ডা ওকাকুরা,—সেই হিসাবেই স্বামীজিকে দর্শন করতে এসেছেন। অনেক বড়-বড় পদে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু বলা বাহুল্য; ওকাকুরা তা প্রত্যাখ্যান করে আত্মমর্যাদা বজায় রেখেছেন। স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে খ্যাতি লাভ করার চেয়ে এক দল শিল্পী নিয়ে বনভূমিতে একখানি পর্ণকুটিরে আশ্রমবাসীর মত অনাড়ম্বর জীবন কাটানোই তিনি পছন্দ করেন বেশী। প্রতীচ্যের জড়বাদে তাঁর স্বদেশ যে বিপন্ন তা এই মানুষটি সেদিন বুঝেছিলেন। অকুতোভয়ে সেই জড়শক্তির বিরুদ্ধে তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছিলেন ওকাকুরা। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আগেই অনেকের সঙ্গে তাঁর সুচিরস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বন্ধুরা দীর্ঘ দিন ওঁকে কলকাতায় আটকে রেখেছিলেন।

তীর্থভ্রমণ কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হল। কিন্তু স্বামীজি ফিরে এলেন ভাঙা শরীর নিয়ে। নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয় এমনি অবস্থা, দু'চোখ রক্ত-রাঙা। পাহাড়ের হাওয়া এর একমাত্র ওষুধ। নিবেদিতা আর জন কয় সাধুর সঙ্গে স্বামীজি চললেন মায়াবতীতে। কিন্তু অসুখটা এখানে আসার পর যেন কাল হয়ে দেখা দিল, ওর বিরুদ্ধে যোঝা তিনি ছেড়ে দিলেন। কখনও প্রশান্ত আনন্দে সময় কাটে, কখনও অসহ্য বিরক্তিতে মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়—স্বামীজির এই দোলাচল অবস্থায় পরম মমতায় নিবেদিতা তাঁকে চোখে-চোখে রাখেন। লেখেন, 'উনি এত অসুস্থ যে এখন যেন-তেন-প্রকারেণ সব সময় ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমার কাজ নাই। এ সময় সত্যি-মিথ্যার চুলচেরা বিচার করলে বা যুক্তির গরমিল হল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। যেমন করেই হ'ক যা আমার এবং অন্যের কাছে একান্ত অন্তরের বস্তু, তাঁকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে তো!'

রোগ-যাতনার পাষাণ-কারায় গুরু বন্দী আছেন, ওদিকে তাঁর কাজ দিনে-দিনে সার্থক প্রচারে ছড়িয়ে পড়ছে। সব রকমেই নিবেদিতা হলেন এ দুয়ের যোগসূত্র। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্ত এক সময় দিনে সতেরো ঘণ্টাও তাঁকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁর কর্মক্ষেত্র বিধি-বিধানের গণ্ডি দিয়ে ছ'কে দেওয়াতে নিবেদিতা পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিলেন। তাঁর লেখনীর স্বাধীনতা নাই যেখানে—সেখানে তো কাজ ভাল হবে না। নিবেদিতার মন থমকে গেল এতে। (১৯০২এর ১৫ই মে ও ১৫ই জুনের চিঠি)

স্বামীজি বেলুড়ে ফিরে এলেন। পুরাতন কর্মসঙ্গীরা তাঁর মুখ দেখে বুঝলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। বিবেকানন্দকে তাঁরা ঘিরে রইলেন আকুল হয়ে; এর আগে এতটা যেন কাছে আসতেন না কেউ। দিন-রাত সবাই চোখে-চোখে রাখেন স্বামীজিকে। কিন্তু ঘরে বসেই অদম্য উৎসাহে মঠের দৈনন্দিন জীবন আর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন স্বামীজি। দিনে একবার খাওয়া, রাত্রে সামান্য জলযোগ আর বিকালে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে ক্লাস করা—এই হুকুম জারী হল সবার

পরে। মঠের দিনচর্যা কঠোরতর হয়ে উঠল। কোনও বিধান কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হলে তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হত। সাধুদের গাঢ় ধ্যান-তন্ময়তার শিক্ষা দিতে নিজে স্বামীজি রাত তিনটার আগেই উঠে ধ্যানে বসেন। তিনি আসন ছেড়ে না ওঠা পর্যন্ত কেউ ওঠে না। মঠে স্বামীজির পোষা কয়েকটি জীব আছে—একটা হরিণ, একটা সারস, একটা ছাগল আর একটা কুকুর। গঙ্গার পারে যখনই বেড়াতে যান, ওদের খাওয়ানোর তদ্বির করেন।

রোগে কাবু হয়ে পড়লেও কঠোর সংযম মেনে চলেন স্বামীজি। দীর্ঘ সময় ধ্যানমগ্ন থাকেন। সন্ন্যাসীরা জমায়েৎ হন চার পাশে, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও বসেন চোখ বুজে। একটা অপরোক্ষ অনুভব পাওয়ার তীব্র কামনা তাঁকে পেয়ে বসে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ-রক্ষা করবার কিছু দিন আগে তাঁর গুরুর যে উপলব্ধি হয়েছিল কাশীপুরের বাগানে, তার কথা কিছুতেই নিবেদিতা ভুলতে পারেন না। স্বামীজি বলতেন, '…তার পর সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করতে বসে দেহবোধ হারিয়ে ফেললাম। দেখছি, সব শূন্য…, একেবারে ফাঁকা…চন্দ্র-সূর্য দেশ-কাল মহাব্যোম সবই যেন এক হয়ে গেল, তার পর কোন্ সুদূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু অসীমতার একটা সূক্ষ্ম রেশ অনুভবে জেগে ছিল, যার সূত্র ধরে আবার এই ব্যবহারের জগতে ফিরে এলাম। পাশে বসে ঠাকুর তখন আমায় বোঝাচ্ছিলেন, "যদি দিন-রাত এমনি থাকিস, মায়ের কাজ হবে না যে…যেদিন তোর কাজ শেষ হবে সেদিন আবার এ-অবস্থা ফিরে আসবে…"

এবার কি সেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতে চলেছেন স্বামীজি, দেরি নাই আর? নিবেদিতার ভয় হয়, একটু শব্দ হলেই হয়তো আবার দেহাত্মবোধের রাজ্যে ফিরে আসতে হবে ওঁর। শিষ্যদের অনেককেই সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করে নিবেদিতার, এই প্রশান্তির মাঝেও ওদের কেউ-কেউ নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ওঁকে ব্যতিব্যস্ত করছে। এক-এক সময় জলভরা চোখে বিবেকানন্দ বলে উঠতেন, 'কেন আমায় ডাকলে? আমি সাড়া দিতে পারি নে…আমি যে মহাসঙ্গমের পথে পা বাড়িয়েছি।'

নিবেদিতা তাঁর কাছে কখনও দাবি রাখেন নি, এমন কি যে কাজে হাত দিয়েছেন তার জন্য সম্মতি আদায়ও করতে চান নি। তাই বুঝি যাওয়ার আগে আচার্য তাকেই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজারে সম্প্রতি একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। ২৮শে জুন নিবেদিতা সে-বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন, দেখেন দু'জন সাধুকে নিয়ে স্বামীজি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। 'গুরু মহারাজ কী জয়' বলে নিবেদিতা তাঁর ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজি একলাই বাড়িতে ঢোকেন। খিলানের থাম, ঘরের মেঝে, মাটির দেয়াল আর উঠানের ডুমুর গাছ—সব কিছু হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখেন। তার পর যান দোতলায়, মেঝেতে একখানি মৃগচর্ম পাতা ছিল, বসে পড়েন তাতেই। এই অজিনাসনটিতে বসে নিজে ধ্যান করতেন, মাত্র ক'দিন হল নিবেদিতাকে দিয়ে দিয়েছেন।

শেষকালে বললেন, 'বাড়িটা ভাল লাগল, তোমার কাজের উপযুক্তই হয়েছে। শিশুর মাঝে যে-ভগবান আছেন, তাঁর অর্চনা করতে ভুলো না কখনও। ক্ষুদ্র কীটের মাঝেও যে ব্রহ্মবস্তু লুকিয়ে আছেন।' ছাত্রীদের জন্য নিবেদিতা মাটির খেলনা যোগাড় করে রেখেছিলেন, কথা বলতে-বলতে সেইগুলো নিয়ে খেলা করেন স্বামীজি। একটা ম্যাজিক লণ্ঠন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর ক্যামেরাও আছে দেখতে পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

'কাল সকালে বেলুড়ে এসো, আমার ইচ্ছা তোমার কাজের ছকটা মঠের সাধুদের বুঝিয়ে দেবে।' এতটা নিবেদিতা কখনও আশা করেন নি। স্বামীজি চলে যাচ্ছেন, এমন সময় নিবেদিতা সসঙ্কোচে থেমে-থেমে বলেন, 'স্বামীজি, বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হবে যেদিন, আপনি এসে আশীর্বাদ করে যাবেন?' গুরু হেসে এমন-একটা ভাব করলেন যার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না। আগে নিবেদিতা যেমন স্নিগ্ধ সুরে তাঁকে কথা বলতে শুনেছেন, সেই সুরে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সব সময় তোমায় আশীর্বাদ করছি যে!' (১৯০২এর ৭ই আগস্টের একখানা চিঠি হতে)

পরদিন স্বামীজি যেন একেবারে বদলে গেছেন মনে হল। শারীরিক কষ্ট একটুও নাই এমন ভাব দেখালেন। সাধুরা জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সামনে নিবেদিতাকে ওঁর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করতে হল। সারা সকালটা, রোদের তেজ না পড়া পর্যন্ত ওঁদের আলাপ চলল। নতুন ব্রহ্মচারীরা নিবেদিতাকে সব সময় বুঝে উঠতে পারে না আন্দাজ ক'রে স্বামীজি স্বচ্ছন্দে নিবেদিতার বহুমুখী ভাব ওদের বুঝিয়ে দেন। তাঁরই মত নিবেদিতার মধ্যেও যুগপৎ বহু ব্যক্তিত্বের সমাহার ঘটেছে মনে হত, অথচ ব্যক্তিত্ব নানামুখী হলেও তাঁর হৃদয় আর বুদ্ধি কিন্তু একমুখী। সেদিন নিবেদিতা চলে আসবার আগে দু'-দুবার স্বামীজি ওঁর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। নিবেদিতার চিত্ত প্রশান্ত হয়ে ওঠে, স্বামীজি যে ওঁকে বুঝেছেন তার নিশ্চিত আশ্বাস পান। সপ্তাহ কয়েক আগে ওঁকে তিনি লিখেছিলেন, 'স্নেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আধার হও। স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হ'ন। তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুল শক্তির উদ্বোধন …আর সেই সঙ্গে অসীম শান্তিও…

'শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সত্যের প্রেরণায় আমায় যেমন চালিয়ে নিয়েছেন, তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন…না, তার চাইতেও হাজার গুণে সার্থক করুন তোমায়।' (অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত চিঠি)

এর পরের দিনগুলো ভারী কষ্টের। গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে, বেহাল হয়ে যায় শরীর-মন। সুচিরপ্রত্যাশিত বর্ষা আর নামে না। এক ফোঁটা বাতাস নাই, কেবল ধুলো ওড়ে আকাশে, একটা ভাপসা গুমটে আবহাওয়া ভারী হয়ে থাকে।

ঘরে বন্দী হয়ে নিবেদিতা কাজ করে চলেন। কুয়ার ধারে বসে কাকগুলো কা-কা করে। বাড়িটায় শব্দ বলতে শুধু চাকরটার পায়ের খস্ খস্। স্বামীজি এ-বাড়িতে দেখা করে যাওয়ার চার দিন পরে নিবেদিতার ভয়ানক ইচ্ছা হল গুরুকে আবার একবার দেখে আসেন।

জানেন আজকে তাঁর যাওয়ার কথা নয়, তবু বেলুড়ে রওনা হলেন। সেদিন বুধবার আর একাদশী, হিন্দুর হরিবাসর আর উপবাসের দিন। মঠের শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ স্বাভাবিক লাগে নিবেদিতার। একটা খোলা জানলা দিয়ে সেতারের ধ্বনি আর

অধ্যাপক শাস্ত্রী মশায়ের কণ্ঠস্বর এই দু-ধরনের শব্দ শুধু কানে আসে। বাগানের একটা মালী মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

নিবেদিতার আসবার খবর পেয়েই স্বামীজি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। এদিকে স্বামীজির সামনে আসতেই নিবেদিতা বুঝতে পারলেন কেন তিনি এলেন। স্বামীজির যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাকুলতায় নিবেদিতার নারীহৃদয় দুলে ওঠে, অন্তরাত্মা আর্তিতে লুটিয়ে পড়ে মানুষ-গুরুর পায়ে···বিচ্ছেদের লগ্ন বুঝি এল! স্বামীজিও সব বুঝতে পারেন। এই শেষ দেখা দেখতে এসেছেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন বিবেকানন্দ—ভাত, তরকারি, ফল আর দই। নিবেদিতা বাধা দেন, তবুও স্বামীজি দাঁড়িয়ে তদারক করেন খুশী-মনে। খুব দিলদরিয়া মেজাজে ছিলেন সেদিন, অথচ হাবভাব যেন বেশ অর্থপূর্ণ। একটা গম্ভীর অন্তরঙ্গতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তারই মধ্যে পুরনো দিনের নানা সুখস্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছেন। খাওয়া হলে নিবেদিতা উঠতে যাচ্ছেন, এক জন ব্রহ্মচারী ঘটিভরা জল আর একখানা তোয়ালে নিয়ে এল। স্বামীজি তার হাত থেকে সে-সব কেড়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে আস্তে-আস্তে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। তার পর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন, মুখে একটিও কথা নাই। কি করবেন নিবেদিতা ভেবে পান না, স্খলিত-কণ্ঠে বলেন, 'স্বামীজি, আমারই তো আপনাকে এ-সব করার কথা, আপনার নয়।' সন্ন্যাসীর মুখে স্মিত হাস্যের ঝিলিক খেলে যায়; মৃদু গুঞ্জনে বলেন, 'যীশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।' 'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষের দিনে···'—একটা আতঙ্কের হিমে কথাগুলো গলায় যেন জমে ওঠে। নিবেদিতা চোখ বোজেন। স্বামীজি আশীর্বাদ করেন; তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা বাড়ি ফেরেন। বুকের মধ্যে কৃপণের ধনের মত বয়ে নিয়ে যান অক্ষুব্ধ শান্তির সঞ্চয়। কত যে তার দাম, এখনও তার যাচাই হয় নি। পরদিন সকাল পর্যন্ত এমনি ভাবেই কাটে। সকালে এক জন সাধু স্বামীজির কাছ থেকে একখানা তাজা পাঁউরুটি নিয়ে এলেন, নিবেদিতার জন্য ওখানি নিজে তৈরী করেছেন। এদেশে পাঁউরুটি? রুটিটা নিতে গিয়ে সাধুটির ধরন-ধারন কেমন যেন নতুন ঠেকে নিবেদিতার: পুরোহিত যেমন প্রসাদ বিতরণ করে তেমনি ভাবে সাধু রুটিখানা তুলে ধরেছেন তাঁর সামনে। তখন নিবেদিতার নজরে পড়ে, রুটিখানি কাটা···প্রসাদ! গুরু তাঁকে ভাগ দিচ্ছেন ঠাকুর-ভোগের। রুটিখানা কপালে ছোঁয়ান নিবেদিতা। 'স্বামীজির মানসকন্যা হয়ে আজ ধন্য আমি!'

রোদে ঝলমল উঠনে একবার চোখ বুলান নিবেদিতা। বিকাল বেলায় বুকের বোঝা নামানোর একটা দুর্দম ইচ্ছা জাগে। ছাদে চলে যান। একটু আওতা বেছে নিয়ে ঈশান কোণের দিকে মুখ করে ধ্যানে বসেন। আঁধার নিবিড় হয়ে আসে, তবে মোহিনী মায়া কাটানো অসম্ভব। আকাশে চাঁদ নাই, কালোয় কালো মহাকালীর পূজার লগ্ন বুঝি। হাওয়ায়-হাওয়ায় তালের সারি মাথা দোলায়।

ধ্যানে বসে স্বামীজিকে চোখাচোখি দেখতে চান,—কিন্তু শিষ্যরা রয়েছে, চার দিকে তাদের উদ্বেগ আর আশঙ্কা যেন পরদার মত ঢেকে রেখেছে তাঁকে। অধীর হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। হঠাৎ সব ভাবনা যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল, উড়ে গেল জগদ্‌গুরু শংকরের পায়ে—তার পর সব শূন্য। নিবেদিতা যেন একই কালে একটা স্বচ্ছ আভা, শব্দ, স্পর্শ, প্রাণ সব···তার পর সবই যেন ফিকে হয়ে আসে। নিঃশব্দে প্রহর গড়িয়ে যায়, এক আত্মহারা আনন্দে ডুবে থাকেন নিবেদিতা, বুঝতে পারেন যে-শক্তি পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে, তা তাঁর নিজের নয়। যখন সম্বিৎ ফিরে পান, দেখেন চোখের জলে মুখ ভেসে গেছে। বুঝতে পারেন তাঁর অন্তরীক্ষে একটা বৃহৎ কিছুর আবির্ভাব ঘটল এবার, তার মূলে আছে গুরুকৃপা। উল্লাসে মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে নিবেদিতার। (১৯০২এর ৭ই আগষ্টের চিঠি)

পরদিন তখনও ভোর হয়নি। একটা চিঠি হাতে কে যেন তাঁর দুয়ারে ঘা দিল। চিঠি খুলে পড়লেন, 'নিবেদিতা, সব শেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামীজি ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে।' চিঠিতে স্বাক্ষর—'সদানন্দ'। ৪ঠা জুলাই ১৯০২। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণতিথি।

চোখের সামনে অক্ষরগুলো নাচতে থাকে। কাল রাতে দুর্জয়-প্রাণ ধূর্জটি কি এই মরণের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন? বাড়ির ভিতর একটা গুমরানো কান্না শুনে নিবেদিতা পেছন ফিরে তাকান। চাকরটা ব্যাপার বুঝতে পেরে কাঁদছে।

চিঠি নিয়ে এসেছে যে, নিবেদিতা তারই সঙ্গে বেলুড়ে চললেন। ও-অঞ্চলে তখন খবর ছড়িয়ে গেছে। দলে-দলে লোক একই মুখে ছুটেছে।

মঠে ঢুকেই চলে যান স্বামীজির ঘরে। জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ, ঘরটা খুব অন্ধকার। গুরুর গেরুয়া পরা দেহখানি মেঝেতে মাদুরে শোয়ানো, হলদে ফুলে ঢাকা।

নিবেদিতা বসে পড়েন সেখানে। সিল্কের গেরুয়া পাগড়ী বাঁধা মাথায়, মাথাটি তুলে নেন কোলে। তার পরে একখানা তালপাতার পাখা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর বড় আদরের ধন সেই মুখে বাতাস করতে থাকেন।

শোকের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না; নিবেদিতার সব দুঃখ যেন ফুরিয়ে গেছে। কেবল মনে পড়তে থাকে, স্বামীজি অমরনাথে তাঁকে কি বলেছিলেন, 'মহেশ্বর বর দিয়েছেন আমায়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে আমার মৃত্যু হবে না—ইচ্ছামৃত্যুর বর।' যথার্থ সন্ন্যাসীর মত চলে গেলেন তিনি, ভাঙা শরীরটা অবহেলায় ত্যাগ করলেন। আর কিছু তো বাকী রাখেন নি!

অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনে নিবেদিতা মাথাটি আবার পুষ্প-উপাধানে নামিয়ে রাখলেন। কয়েক জন সন্ন্যাসী ঘরে ঢোকেন। এক জন বর্ণনা দিলেন, শেষ দিনটি কি ভাবে কেটেছে। খুব ভোর থাকতেই স্বামীজি সাধুদের নিয়ে ঠাকুর-ঘরে গিয়েছিলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়েছিলেন, জপের মালা ফেরানও হয় নি। স্বামীজির ধ্যানের প্রগাঢ়তায় সবাই যেন সেদিন স্তব্ধ হয়ে যান। অনেকে দেখলেন একটা জ্যোতির্মণ্ডল যেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সমাধিস্থ বিবেকানন্দকে ঠিক দেবাদিদেব শংকরের

মঠের পুব দিকে প্রকাণ্ড বেল গাছতলায় বাহকেরা এসে থামে। স্বামীজি নিজে গঙ্গার ঢালু পাড়ে একটি জায়গা দেখিয়ে রেখেছিলেন। সেইখানে সাজানো হয় চিতা। পাটকাঠির মশাল জ্বালিয়ে প্রথমে নিবেদিতা, তার পর সাধুরা সবাই মিলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন।

একটু দূরে গিয়ে একটা গাছতলায় নিবেদিতা বসে পড়েন। মরণ-সমারোহের মাঝে অবিনশ্বর আত্মার জয়োচ্চারণ করেছেন দু'-দু'বার, 'জয় জয় গুরু মহারাজ কী জয়।' কিন্তু যখন চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে সব দিকে, মৃত্যুর সর্বনাশা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে নিবেদিতাকে,—কাপড়ে মুখ ঢাকেন তিনি। 'স্বামীজি, এ জীবনের সব কাজ নিয়ত যেন তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে—আমার নয়। হর! হর! শিব! শিব!'

শেষ পর্যন্ত ওইখানে নিবেদিতা বসে থাকেন। একটা বাতাস ওঠে, ছাইগুলো হাওয়ায় ভাসতে থাকে। গেরুয়া কাপড়ের একটা টুকরো ওঁর কোলে এসে পড়ে, স্বামীজির পোষাকের ঝলসে-যাওয়া একটা ফালি। ধীরে-ধীরে চিতা নিবে আসে, হঠাৎ দূরের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায় নিবেদিতার—য়ুম, ধীরা মাতা, আচার্য বোস। গর্ভধারিণী মায়ের মুখও চোখে ভেসে ওঠে। মাকে মনে-মনে ডাকেন; তাঁর হাত দু'খানির স্নিগ্ধ স্পর্শেই শুধু এ-দুঃখ জুড়িয়ে যেতে পারে! অনুগত বন্ধু সদানন্দ ওঁর কাছে এসেছেন। কতক্ষণ উনি কাছে বসে রয়েছেন? তিনি কাছে আছেন জেনে নিবেদিতার ভালো লাগল। নিজেকে শক্ত করে বাঁধেন তিনি। 'তাঁর কর্মগৌরবের প্রমাণ দেওয়ার জন্ম এক জন করেও বেঁচে থাকা দরকার। তাঁর বোঝা তাঁরই হয়ে বইতে চাই আমি, আর কিছু চাই না। যদি নিয়তির বিপাকে পথভ্রষ্টও হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই থাকতে চেয়েছি চিরকাল···' (২০শে মে ১৯০৩এর চিঠি)

সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রগুঞ্জন চারি দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা বলেন, 'সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা উপাসনা করছেন, কিন্তু আমার সময় কই। আমায় বিশ্বাস করে একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন তিনি। আমার কেবল কাজ করা আর দেখে যাওয়া।' চলতে চলতে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।'

একটু দূরে থেকে স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার পিছু-পিছু চলেন। তাঁর চোখে অশ্রুর ধারা।

মত্ত অপরূপ লাগছিল দেখতে। অর্ধোন্মীল দৃষ্টিতে জগৎকে কি স্বপ্নের ঘোরে দেখছেন তখন? সন্ন্যাসীরা শুধু অস্ফুটে ওঙ্কার উচ্চারণ করে চলেন, একতান উপাসনায় অন্তর ভরে ওঠে, আনন্দে বিহ্বল স্বামীজি হঠাৎ তাঁর প্রিয় গানখানি গাইতে শুরু করেন—

> মা কি আমার কালো রে
>
> কালো রূপে দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে।

ব্রহ্মানন্দের গলার স্বর চিনতে পারেন নিবেদিতা। তিনি বলছেন, 'কিছু দিন ধরেই স্বামীজির মুখে একটি অবিচল করুণার ভাব ফুটে উঠছিল। ঠাকুরের সঙ্গে ভাবের এমন মিল যে ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই যেন সাহস হত না।'

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। নিবেদিতা বুঝলেন এবার শেষকৃত্য করবার আয়োজন হবে। উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল আকাশে, যেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলল শ্বেত-পক্ষ বিহঙ্গমেরা। এবার সময় হল। নোঙর খুলে ঘাটের নৌকো ভাসিয়ে দিতে হবে,—তীরে দাঁড়িয়ে দেখ, জ্যোতিঃ পারাবারে উধাও হয়ে ভেসে গেল তার শেষ চিহ্ন। নিবেদিতা হাজার বার নিজেকে শুধান, পরের জন্ম নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকেও কেন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের। হে ভগবান, কেন?

বাইরের পালঙ্কের 'পরে স্বামীজির দেহ—লোকের ভিড় জমে উঠেছে সেখানে। অনাবরণ মুখখানি। আচার্য বিবেকানন্দ আজ ঘুমিয়ে পড়েছেন···কী তরুণ লাগছে তাঁকে দেখতে! চল্লিশও তো হয়নি। বুকে হাত বেঁধে সাধুরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; সকলেরই মাথা নেড়া।

বিদায়পর্ব সংক্ষেপে শেষ হল। এক জন ব্রহ্মচারী আলতা দিয়ে মলমলের উপর স্বামীজির পায়ের ছাপ নিলেন। পঞ্চপ্রদীপে আরতির শিখা জ্বলে উঠল, উচ্চারিত হল পুণ্য-মন্ত্র, পুড়ল কর্পূর আর ধূপ। বুকফাটা আর্তনাদে বার বার বেজে ওঠে শঙ্খ, গুমরিয়ে কাঁদে শুধু ওরাই। অনুষ্ঠান শেষে, সন্ন্যাসীরা নমস্কার করেন, ভক্তেরা তিন বার দণ্ডবৎ প্রণাম জানান। গতপ্রাণ সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করেন আর সকলে।

এর পর শোভাযাত্রা। সাধু ব্রহ্মচারীরা স্বামীজির দেহ কাঁধে নিয়ে চলেন, শোকোচ্ছ্বাসে ঘনঘন ধ্বনি ওঠে 'জয় গুরু মহারাজ কী জয়!' জনতা প্রতিধ্বনি তোলে। নেতাকে হারিয়ে যারা চোখের জল ফেলছিল, তাদের অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসে সে-ধ্বনি মিলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড শেষ

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

—কবি কৃত্তিবাসের জন্ম কবে হয়?—

রামায়ণের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, 'শিবরামের যুদ্ধ,' 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' 'যোগাদ্যার বন্দনা' প্রভৃতি রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মকাল সম্বন্ধে নানা জন নানা মত প্রচার করেছেন। (১) ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৩৩৫ খৃঃ, (২) ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে ১৩১০ খৃঃ, (৩) প্রাচ্যবিদ্যার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ১৪০৮-১৪২০ খৃঃ মধ্যে এবং (৪) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৪০ খৃঃ বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মকাল এখনও অনির্দিষ্ট আছে। সঠিক দিনটি ধার্য্য হওয়া উচিত। কিন্তু কে ধার্য্য করবেন বর্ত্তমান বাঙ্গলায়?

"অলঙ্কারে রুচি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয়"

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে ফোন-এভিনু, ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জে: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ফোন:- পিকে ৪৪১১

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অপরাজেয় কথাশিল্পী। জন্ম—১৮৭৬ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে পিতৃমাতুলালয়ে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারি কলিকাতা পার্ক নার্সি হোমে। পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতা—ভুবনমোহিনী দেবী। শিক্ষা—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা (ভাগলপুর, ১৮৮৭), হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, প্রবেশিকা (টি, এন, জুবিলী স্কুল, ভাগলপুর ১৮৯৪), এফ-এ শ্রেণীতে কিছুকাল পাঠ (ঐ, ১৮৯৫)। ভাগলপুরে সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা ও অভিনয়াদি (১৮৯৬—৯৯)। কর্ম—বনেলী এষ্টেটে চাকুরী (১৮৯৯), নিরুদ্দেশ ও দেশভ্রমণ। পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর বর্মা যাত্রা (১৯০৩), কর্ম—মৌলমিন পিগুতে ও রেঙ্গুনে ডি, এ, জি-র অফিসে (১৯০৫—১৯১৬)। কুন্তলীন পুরস্কার লাভ (১৯০৩)। সাময়িকপত্রে প্রথম মুদ্রিত রচনা 'বড়দিদি' (ভারতী, ১৩১০)। এই সময় হইতে ধারাবাহিক ভাবে সাহিত্য রচনা ও সাময়িকপত্রে প্রকাশ। জগত্তারিণী স্বুবর্ণপদক লাভ (১৯২৩); ডি-লিট উপাধি লাভ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬)। বহু সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব। গ্রন্থ—বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজ বৌ (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (১৯১৫), পল্লীসমাজ (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত, ১ম (১৯১৭), ২য় (১৯১৮), ৩য় (১৯২৭), ৪র্থ (১৯৩৩), দেবদাস (১৯১৭), নিষ্কৃতি (গল্প, ১৯১৭), কাশীনাথ (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), স্বামী (১৯১৮), দত্তা (১৯১৮), ছবি (১৯২০), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২৭), নারীর মূল্য (১৯২৩), দেনা পাওনা (১৩৩০); নববিধান (১৯২৪), হরিলক্ষ্মী (গ, ১৯২৬), পথের দাবী (১৯২৬), ষোড়শী (নাট্যরূপ ১৯২৭), রমা (১৯২৮), তরুণের বিদ্রোহ (সন্দর্ভ, ১৯২৯), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), স্বদেশ ও সাহিত্য (সন্দর্ভ, ১৯৩২), অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গ, ১৯৩৪), বিরাজ-বৌ (না, ১৯৩৪), বিজয়া (না, ১৯৩৪), বিপ্রদাস (১৯৩৫), শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ (মৃত্যুর পরে, ১৩৪৪), ছেলেবেলার গল্প (১৯৩৮), শুভদা (১৯৩৮), শেষের পরিচয় (১৯৩৯)। যুগ্ম-সম্পাদক—যমুনা (মাসিক, ১৯১৪), রূপ ও রঙ্গ (সাপ্তাহিক, ১৯২৪)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বারুণী, যৌতুক, বৈরাগ্যের পথে, অভিমানিনী।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—শান্তিজল, জয়-পতাকা, চাঁদমুখ। সম্পাদক—গল্পলহরী (মাসিক, ১৩৩৮)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ। সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৩৩১-১৩৩৫)।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—শিক্ষা পরিচয় (১২৯৬-১৩০২), ধর্ম ও কর্ম (১৩০৯)।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—ময়মনসিংহের খালিয়াজুড়ী। গ্রন্থ—গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ভারতপ্রসঙ্গ।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী—বাঙালী সাধক। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায় বেগমপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৭ খৃঃ কাশীধামে। বি-এ। ইনি বহু স্থান পর্যটন করেন ও সাধকরূপে পরিচিত হন। বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি ইঁহার শিষ্য। গ্রন্থ—দেবীযুদ্ধ; বর্ণশিক্ষা, ৩ ভাগ, অধ্যাপন, জার্মান উচ্চশিক্ষা, বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট।

শরৎচন্দ্র দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ভারত চিকিৎসক (মাসিক, ১২৮৪)

শরৎচন্দ্র দাস, রায় বাহাদুর—প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৪৯ খৃঃ ১৮ই জুলাই চট্টগ্রামে। মৃত্যু—১৯১৭ খৃঃ ৫ই জানুয়ারি। শিক্ষা—চট্টগ্রাম, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী কলেজ। কর্ম—ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক; তিব্বতী ভাষায় অভিজ্ঞ। সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্বে পারদর্শী। সিকিমে ভ্রমণ (লর্ড মেকলের সহিত, ১৮৮৪), চীনদেশ পিকিংএ ভ্রমণ (১৮৮৫), তিব্বত লাসা সহরে ভ্রমণ (১৮৭৯, ১৮৮১) ও জাপান ভ্রমণ (১৯১৫)। নানা তথ্য সংগ্রহ। তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদক, বাঙলা সরকার (১৮৮১-১৯০৪), সি-আই-ই (১৮৮১), রায় বাহাদুর উপাধি লাভ (১৮৯৬)। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক পুরস্কৃত (১৮৮৭)। প্রতিষ্ঠাতা—Buddhist Text Society (১৮৯২)। গ্রন্থ—তিব্বত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (১৮৯৯), বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, ৪ ভাগ, Indian Pandits in the Land of Snow (কলি, ১৮৯৩), An Introduction to the Grammer of the Tibetian Language (দার্জিলিং, (১৯১৫), Journey to Llassa & Central Tibet (লণ্ডন, (১৯০২), A Tibetian English Dictionary with Sanskrit Synonyms (কলি, ১৯০২), History of the Rise, Progress & Downfall of Buddhism in India.

শরৎচন্দ্র দাস—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ— পারস্য উপন্যাস, মধুমালতী, সরোজবালা, জেনানা-রহস্য।

শরৎচন্দ্র দেব—শিল্পী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৫ বঙ্গ ২রা কার্ত্তিক হরিনাভি গ্রামে। মৃত্যু—হরিনাভি গ্রামে। পিতা—নন্দলাল দেব। শিক্ষা—গ্রাম্য পাঠশালা, হরিনাভি ইংরেজি বিদ্যালয় (১২৭২), প্রবেশিকা (১২৮২), এফ-এ (মেট্রোপলিট্যান ও সংস্কৃত কলেজ)। সংস্কৃত চর্চা ও নাটকাভিনয়, ড্রয়িং শিক্ষা, (গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, ১২৯৪), জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন (ঢাকায়) কবিরাজী শিক্ষা (ঢাকা), ফটোগ্রাফী শিক্ষা। কর্ম—ঢাকা কলেজের ড্রয়িং শিক্ষক, কলিকাতা নর্মাল স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইনি পৌরাণিক অভিধান সংগ্রহ করেন এবং রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের যত্নে ও সহায়তায় 'ভারতকোষ' নামে প্রকাশিত হয় (১২৮৭—১২৯৯)। ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে 'জ্যোতির্বিশারদ' উপাধি, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'কবিরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রকাশক—শিল্প পুষ্পাঞ্জলী (মাসিক, ১২৯২)। ইনি তৎকালীন সাময়িক

পত্রে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থ—হরিলীলামৃত সিন্ধু, বিজন চিন্তা, প্রণয় প্রতিমা, জয়দ্রথ বধ, সাধক সংহার, চিনের কলসী, শান্তি কুটীর, জ্যোতিষ-কল্পতরু।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত—সাময়িকপত্রসেবী ও কবি। ইনি সুরসিক ও সাহিত্যিক মহলে 'দা'ঠাকুর' নামে পরিচিত। মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারেন। কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ হাস্য-রসাত্মক গানও রচনা করেন। সম্পাদক—বিদূষক (সাপ্তাহিক, ১৩২১)।

শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য—দেশব্রতী। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামে। প্রথম জীবনে বিপ্লবী পরে হুগলী জেলা কমিটির সম্পাদক। গ্রন্থ—গান্ধীস্মরণে (সংকলন গ্রন্থ)।

শরৎচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। সরকারী কর্মচারী। গ্রন্থ—Notes on the Cal. Zoological Gardens (বোম্বাই, ১৯০৭)।

শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। উড়িষ্যা প্রবাসী। 'উৎকল সবুজ সাহিত্যে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু গল্প ও কবিতা রচনা। সম্পাদক—উৎকল সমবায় সমিতির মুখপত্র।

শরৎচন্দ্র রায়—জাতিতত্ত্ববিদ্। সরকারী কর্মচারী। গ্রন্থ—The Birhors (রাঁচী, ১৯১৫), The mundas and their country (ঐ, ১৯২১), The Oraons of Chota Nagpur (ঐ, ১৯১৫), Oraon Religion & Customs (ঐ, ১৯২৮), Principles & Methods of Physical Anthropology (পাটনা, ১৯২০)।

শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬২ খৃঃ (১৮ই শ্রাবণ) নবদ্বীপে। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ ৩১এ চৈত্র (১৯১৬ খৃঃ) পিতা—পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। কর্ম—অধ্যাপনা, সিটি কলেজ, প্রধান পণ্ডিত, দার্জিলিং হাই স্কুল, হিন্দু স্কুল। বাল্যাবধি সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ। বঙ্গদেশের বহু স্থানে তর্কবিচারে জয়লাভ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—রামানুজচরিত, দক্ষিণা-পথ ভ্রমণ, শঙ্করাচার্য চরিত।

শরদিন্দু মিত্র ভক্তিবিনোদ—সাময়িকপত্রসেবী—হরিভরসা (যশোহর, ১৩১২)।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। বাল্য ও কৈশোর—মুঙ্গেরে। শিক্ষা—কলিকাতা। আইন পরীক্ষায় পাশ। আইন ব্যবসায়। বর্তমানে ছায়াচিত্র-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—ছায়া-পথিক, ঝিন্দের বন্দী, শাদা পৃথিবী, বিষকন্যা, ব্যোমকেশের গল্প, ব্যোমকেশের ডায়েরী, ব্যোমকেশের কাহিনী, যুগে যুগে, কালিদাস (নাটক), পথ বেঁধে দিল, বন্ধু (নাটক), কাঁচা মিঠে (গ), বিষের ধোঁয়া, দুর্গ-রহস্য।

শরাকত আলি সৈয়দ—মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হজরত মহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্মোপদেশ।

শশধর তর্কচূড়ামণি—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—ফরিদপুর জেলার প্রাণপুর গ্রামে। মৃত্যু—বহরমপুরে। পিতা—হলধর বিদ্যামণি। শিক্ষা—কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র। কর্ম—সভাপণ্ডিত, কাশিমবাজারের জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সভায়। হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। গ্রন্থ—ধর্মব্যাখ্যা, ভবৌষধ, দুর্গোৎসব-পঞ্চক (ভক্তিসুধা-লহরী), সাধন-প্রদীপ, চূড়ামণি-দর্শন (অপ্র)।

শশধর দত্ত—ঔপন্যাসিক। জন্ম—হুগলী জেলায় হরাদিত্য গ্রামে। মৃত্যু—১৯৫২ খৃঃ হরাদিত্য গ্রামে। গ্রন্থ—ঘি ও আগুন, স্বর্গাদপি গরীয়সী, আগুন ও মেয়ে, শ্রীকান্তের শেষ পর্ব, শেষ উত্তর। এতদ্ব্যতীত বহু রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

শশধর রায়—কবি ও লেখক। জন্ম—পাবনা জেলার তলট গ্রামে। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট। গ্রন্থ—রাঘববিজয় (কাব্য), ত্রিদিববিজয় (ঐ), উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, পরবশতা, প্রতিমা পূজা, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, বঙ্গদর্পণ, শান্তিশতক, মানব-সমাজ।

শশাঙ্কমোহন সেন—কবি ও গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এল। কর্ম—আইন ব্যবসায়, সদরঘাট, চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—বঙ্গবাণী, সাবিত্রী, স্বর্গে ও মর্তে, সিন্ধুসঙ্গীত, শৈলসঙ্গীত।

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বাঁকুড়ালক্ষ্মী (ত্রৈমাসিক, ১৩২১)।

শশিকান্ত ভট্টাচার্য—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কল্যাণী (১৩২০)।

শশিকুমার নিয়োগী—সাময়িকপত্রসেবী। এম-এ, বি-এল। যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিস্রোতা (মাসিক, জলপাইগুড়ি, ১৩০৭)।

শশিকুমার সেন—চিকিৎসক। চক্ষু চিকিৎসায় পারদর্শী। গ্রন্থ—দম্পতি।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বরাহ-নগর পাক্ষিক সমাচার (১৮৭৩), ভারত শ্রমজীবী (মাসিক,)।

শশিভূষণ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আশ্রম (১৩৩০-৩৪)।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগরে। গ্রন্থ—সরল ফলিত পঞ্জিকা, ফরাসী ও বাংলা অভিধান।

শশিভূষণ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। এম-এ। সম্পাদক—কামনা (মাসিক, ১২৯৮), সেবক (মাসিক, ঢাকা, ১২৯৮)। গ্রন্থ—বস্তুশিক্ষা (১৮৬৮)।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১১ খৃঃ বরিশাল জেলায় চন্দ্রহার গ্রামে। পিতা—কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। শিক্ষা—বাল্যে গ্রাম্য স্কুলে, এম-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ (১৯৩৭), পি-এইচ-ডি (১৯৩৯)। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক (১৯৩৫); বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৮)। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, বাঙলা সাহিত্যের এক দিক (রচনা-সাহিত্য), সাহিত্যের স্বরূপ, শিল্পলিপি, ত্রয়ী, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, উপমা কালিদাসস্য; কবিতা—এপারে ও পারে, সীতা; কথিকা—নিশাঠাকুরের কবচা, ছুটির দিনে মেঘের গল্প; নাটক—রাজকন্যার ঝাঁপি, দিনান্তের আগুন; উপন্যাস—বিদ্রোহিণী, জঙ্গলা মাঠের ফসল; Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature, An Introduction [to Tantric Buddhism,

শশিভূষণ নন্দী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৯ বঙ্গ ৬ই আশ্বিন পদ্মানদী তীরবর্তী রসুলপুর গ্রামে। মৃত্যু—১২৯৯ বঙ্গ ১২ অগ্রহায়ণ খিদিরপুর মুন্সিগঞ্জে। পিতা—জগন্নাথ নন্দী। শিক্ষা—ভবানীপুর ইংরেজি বিদ্যালয়। কর্ম—নাজির, আলিপুর মুন্সেফ কোর্ট। লালা দ্বারকাপ্রসাদ রায় এষ্টেটের ম্যানেজার (১২৯১—১২৯৪)। পশ্চিম অঞ্চলে বাস। উর্দু ও নাগরী ভাষা শিক্ষা, অবসর সময়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন। খিদিরপুর নবীনচন্দ্র আঢ্য এষ্টেটের ম্যানেজার (১২৯৪—১২৯৯)। প্রতিষ্ঠাতা—ফরিদপুর আর্য কায়স্থ সমিতি (১২৯৬), খিদিরপুর কায়স্থ সমিতি (১২৯৭), ধর্মনিগম (মাসিক পত্র, ১২৯৪)। গ্রন্থ—কায়স্থ পুরাণ, ১ম (১২৮৫), ২য় (১২৮৮), মিশ্রকারিকার বঙ্গানুবাদ (ধ্রুবানন্দ মিশ্র, ১২৯৬)। সম্পাদক—ধর্মনিগম (১২৯৪)।

শশিভূষণ বসু—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ধর্মবন্ধু (পাক্ষিক, ১২৮৮), রবি (১২৯৬—৯৭)।

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—পল্লীবাসী (পাক্ষিক, কালনা, ১৩০৪, বৈশাখ)।

শশিভূষণ বিদ্যারত্ন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্পাদক (দৈনিক বসুমতী ১৩২১)।

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ (আনু)। মৃত্যু—১৩৫৪ ২৩এ আশ্বিন। শিক্ষকতা—কেশব একাডেমী; বেঙ্গল একাডেমী, রেঙ্গুন। প্রতিষ্ঠাতা—বেঙ্গল একাডেমী, রেঙ্গুন। গ্রন্থ—জীবনী কোষ, ৭ ভাগ।

শশিভূষণ বিশ্বাস—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ভারত শ্রমজীবী (মাসিক, অগ্রহায়ণ ১২৯২)।

শশিভূষণ ভট্টাচার্য—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—স্বাবলম্বী (১৩৩১—৩২)।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৫৪ খৃঃ (আনু) চন্দননগরে। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ ১১এ মার্চ কর্মাটাড়। কর্ম—এলাহাবাদ। পরিচালনা ও সম্পাদনা—বিশ্বদূত (সাপ্তাহিক, কালিঘাট, অগ্রজ পশুপতি মুখোপাধ্যায় সহ), প্রয়াগদূত (সংবাদপত্র, এলাহাবাদ), প্রভাতী (দৈনিক, কলিকাতা), Bearer (সাপ্তাহিক, ফরাসডাঙ্গা), National Guardian (সাপ্তাহিক)।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—দিল্লীকা লাড্ডু (মাসিক, ১২৮৯)।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অনাথবন্ধু (১৩২৩-৪)।

শশিভূষণ মোদক—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—যশোহর প্রবাহ (মাসিক, ১৮৮৩)।

শশিভূষণ রায়—সাহিত্যসেবী। উড়িষ্যা-প্রবাসী। পিতা—কবি রাধানাথ রায়। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক। উৎকল-সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। গ্রন্থ—উৎকল ঋতুচিত্র।

শশিভূষণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কর্মক্ষেত্র, হিতকথা, অশোক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ।

শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গ ২২এ অগ্রহায়ণ চট্টগ্রামের অন্তর্বর্তী বরমা গ্রামে। পিতা—আনন্দমণি চৌধুরী। অধ্যাপক—মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—গ্রহযোগ-রত্নাবলী, বাস্তুরত্নাবলী। অশৌচনির্ণয়, জ্যোতিস্তত্ত্বের সংস্কৃত টীকা, সান্দ্রামঞ্জরী (সং-টীকা), হোরারত্ন মহার্ণব (অপ্র)।

শশিভূষণ হোম চৌধুরী—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—পূর্ণিমা (১৩৩৪-৩৬))।

শাক্যসিংহ সেন—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সৎসঙ্গী (১৩২৭-৮)।

শান্তা দেবী (নাগ)—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ (আনু) কলিকাতা। পিতা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী—ডক্টর কালিদাস নাগ। বাল্যকাল এলাহাবাদে। শিক্ষা—এলাহাবাদ, প্রবেশিকা (কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়, বৃত্তিলাভ), এফ-এ (বেথুন কলেজ, বৃত্তিলাভ), বি-এ। পদ্মাবতী স্বর্ণপদক প্রাপ্তা, ভুবনেশ্বরী পদক লাভ। ছাত্রী অবস্থা হইতে সাহিত্য-রচনা। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ (স্বামিসহ)। ইঁহার বহু গল্প ইংরেজি, ফরাসী ও ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত, চিত্রশিল্পী হিসাবেও খ্যাতি আছে। গ্রন্থ—হিন্দুস্থানী উপকথা (Folktales of Hindusthan by Sris Chandra Basu—অনুবাদ সীতা দেবী সহ), উদ্যানলতা (উপন্যাস, সীতা দেবী সহ), উষসী (প্রথম গল্পের বই), চিরন্তনী (উপন্যাস), স্মৃতির সৌরভ (অনুবাদ), জীবন দোলা (উ), অলখ ঝোরা (উ), দুহিতা (উ), সিঁথির সিন্দুর (গ), বধুবরণ (গ), পথের দেখা, দেয়ালের আড়াল, হুক্কাহুয়া (শি), ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা (জীবনী)। যুগ্ম সম্পাদিকা—বঙ্গলক্ষ্মী (১৩৫৫)। সম্পাদিকা—উৎসব (১৩৪৫, মাঘ), সহ-সম্পাদিকা—প্রবাসী (মাসিক)।

শান্তিদেব—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয়।

শান্তি পাল—বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ ও কবি। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ ৩রা মাঘ কলিকাতা শিমুলিয়া অঞ্চলে। পিতা—ডাক্তার সুরেশচন্দ্র পাল। মাতা—গিরিবালা দাসী। পিতামহ—বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ পাল। শিক্ষা—সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী। সন্তরণ প্রতিযোগিতা (১৯১৪), ভারতীয় অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা (১৯২১)। কর্ম—রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে ষ্টোর কীপার, সন্তরণ-শিক্ষক। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—ফ্রেণ্ডস পোলো ক্লাব (১৯১৩), সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব (১৯১৭), স্কুল অফ ফিজিক্যাল ক্লাব, শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব, পলস্ বক্সিং ইনষ্টিটিসন প্রভৃতি। অবসর সময়ে সাহিত্য সেবা। গ্রন্থ—(কাব্য) ছায়া, পথচারী, ছন্দোবীণা, খেয়া পারে, অসি ও বাঁশী, গাঁয়ের গান, জলতরঙ্গ; সন্তরণ সম্বন্ধীয়—সন্তরণ-পরিচয়, সন্তরণ-বিজ্ঞান, সাঁতারুর গল্প।

শান্তিময়ী সেন—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদক—গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪, আশ্বিন)।

শালিকনাথ মিশ্র—মীমাংসা-গ্রন্থকার। জন্ম—৮-৯ শতাব্দী গৌড় দেশে। কেহ কেহ বঙ্গবাসীও বলেন। গ্রন্থ—প্রকরণ-পঞ্চিকা, ঋজু বিমলা, দীপশিখা।

[ক্রমশঃ।

ইন্দ্রনাথ
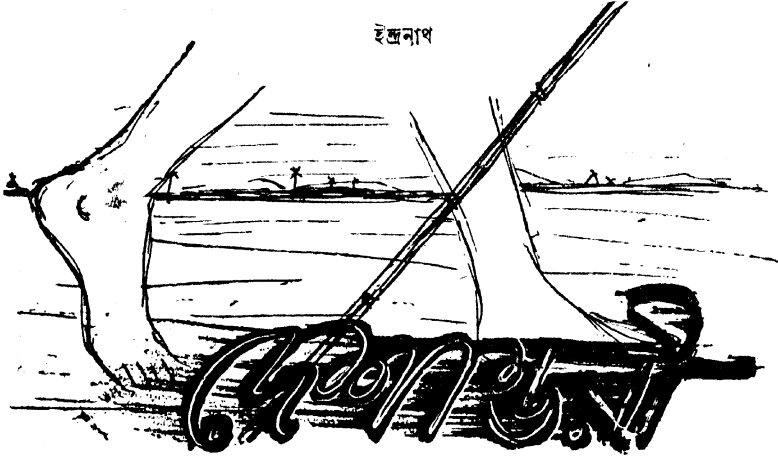
আমেরিকা

য়োরোপেরই উপাদানে তৈরি বর্তমান আমেরিকা, এই নতুন জাতির বয়স দু'শো বছরেরও কম, কিন্তু এরই মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্বের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। তা দেখা যায় ওদের ভাষায়, পোশাকে, কিছুটা ছোটখাটো রীতিনীতিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কি এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হয় না যে বিদেশী পর্যটকের চোখে য়োরোপের তুলনায় আমেরিকার নতুনত্ব এশিয়ার তুলনায় য়োরোপের নতুনত্বের কম নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে জীবনযাত্রা আজ অল্প-বিস্তর কঠিনতর। কিন্তু উত্তর-আমেরিকার জাতীয় সমৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের আগে পাশ্চাত্য জগতের নেতা ছিল ইংলণ্ড, আজ তার আর্থিক মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে এবং আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত সেই আসনে। যে আমেরিকাকে আগে আন্তর্জাতিক কাজকলাপের মধ্যে সহজে আনা যেত না আজ জাতিসম্মেলনে তারই প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া আছে উত্তর-আমেরিকার ভৌগোলিক বিশালতা—এক রাত্রি ট্রেনে কাটালেই নতুন দেশে আসা যায় না সেখানে। এই সব কারণেও ১৯৫২ সালের আমেরিকা দেখা য়োরোপ-ভ্রমণের পুনরাবৃত্তি নয় মোটেই।

নবাগতের চোখে আমেরিকার প্রাথমিক ছবিটা কল্পনা করা যাক। জাহাজ থেকে নেমে সে ঢুকল সংলগ্ন রেস্তর াঁতে। চার আনা দিয়ে একখানা খবরের কাগজ কিনে বসেছে, পরিবেশিকা এসে রেখে গেল কাগজের গ্লাসে তুষার-শীতল জল, কাগজের রুমাল আর খাদ্যতালিকা। ওর অঙ্গ-সৌরভ, ফ্যাশান-দুরস্ত পোশাক, নাইলনের মোজা ইত্যাদির থেকে চোখ সরিয়ে খাদ্য-তালিকায়

রকেফেলার সেণ্টারের বহির্দৃশ্য, নিউ ইয়র্ক

মনোযোগ দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নানা রকম ফলের রস। প্রধান ভোজ্যের মধ্যে বিবিধ সামুদ্রিক প্রাণীর বিশিষ্ট স্থান, কিন্তু সনাতন য়োরোপীয় খাদ্যও আছে। পরিবেশিকা ফিরে এলে তারই থেকে কিছু বেছে দিয়ে আগন্তুক খবর-কাগজের পাতা উল্টে গেল। বিশেষ করে চোখে পড়ল রং-বেরঙের comic strips, পাতার পর পাতায় কত নায়ক-নায়িকার রোমাঞ্চকর বা হাস্যকর অভিজ্ঞতার কাহিনী ছবি দিয়ে একটু একটু করে রোজ বলা। খবর-কাগজের ওজনও অবাক করল, এতগুলি পাতা যুদ্ধের আগেও কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

খেতে খেতে পারিপার্শ্বিক নতুনত্বগুলি সকৌতূহলে লক্ষ্য করল সে। এক দিকে অর্ধবৃত্তাকার টেবিল ঘিরে উঁচু টুল মেঝের সঙ্গে গাঁথা, তাতে বসে কেউ খাচ্ছে কফি, কেউ বা প্রকাণ্ড রঙিন আইসক্রম, কেউ কোকা কোলা বা ঐ জাতীয় কোনো 'মৃদু পানীয়'। টেবিলের ওপারে কফির ভাণ্ড, রুটির ফালি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক চুলায় চাপানোই আছে, তাছাড়া নানাবিধ চকচকে ক্রোমিয়াম-মণ্ডিত যন্ত্র—কারো থেকে বার হয় ফলের রস, কেউ দেয় আইস-ক্রীমের ঝরণা। এক ব্যক্তি এক গ্লাস বরফ দেওয়া চা নিয়ে খবর-কাগজের কমিক পাতা খুলে ধরল।

খাওয়া শেষ করে দামের দিকে চেয়ে একটু চমক লাগল। এক পাত্র কফির দামই আট আনা! বাইরে এসে জুতো পালিশ করাতে দিতে হল পাঁচ সিকে এবং তার সঙ্গে আট আনা বকশিশ। ঘরের খোঁজে হোটেলে টেলিফোন করতে গেল আট আনা।

ট্যাক্সি চড়ে হোটেলের দিকে যেতে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অনেক জাতের লোক চোখে পড়ল। পোশাকেরও কত রকম বৈচিত্র্য, অথচ কেউ কারো দিকে চেয়েও দেখছে না। আর এ দেশে এত নিগ্রো ছিল কে জানত!

হোটেলে পৌঁছে চৌদ্দ তলায় তার ঘরে (ভাড়া দৈনিক পঁচিশ টাকা—থাওয়া বাদে) যখন সে ঢুকল তখন এই এক ঘণ্টার নতুন অভিজ্ঞতায় সে অল্প-বিস্তর মুহ্যমান।

উত্তর-আমেরিকার দেশ দেখার প্রধান রোমাঞ্চ ওদের অভিনব রীতিনীতি, জীবনযাত্রায় ধারা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে; য়োরোপ এশিয়ার মত এখানে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় নেই পদে পদে। দেখবার যা আছে তা প্রায় আনকোরা নতুন—তাদের বিশেষত্ব বয়সের মর্যাদায় নয়, বরং নতুন যৌবনের গর্বে। নতুন দেশ গড়ে তোলার সুবিধা এই যে অন্যের দেখে শেখা যায়, ভুল শোধরানো যায়; এদের শহরের নক্শায় সেই শিক্ষা চোখে পড়ে। নেই য়োরোপের মত আঁকাবাঁকা বা ঢালু পাথর বসানো সরু রাস্তা (যার অবশ্য আছে নিজস্ব মোহ), এখানে সোজা সোজা জ্যামিতিক রাজপথ, সংখ্যা বা বর্ণমালা দিয়ে তাদের নামকরণ, যথা 'এ ষ্ট্রীট' বা '১ম অ্যাভিনিউ'। উত্তর-দক্ষিণে যদি হয় অ্যাভিনিউ তবে পুর্ব-পশ্চিমে হয়তো ষ্ট্রীট; এক দিকে যদি হয় ১, ২, ৩ তবে তার আড়াআড়ি এ, বি, সি। রাস্তাগুলি সমান্তরাল হওয়াতে দুই মোড়ের মধ্যে বাড়ির সংখ্যা মোটামুটি একই (ওরা এইটুকুকে বলে এক ব্লক)। সুতরাং বেশী খোঁজাখুঁজি না করে যে কোনো ঠিকানার হদিস মেলে। যথা, যদি চাও ১০০ নং ৭ম অ্যাভিনিউ এবং যদি এক এক ব্লকে দশটি করে বাড়ী থাকে, তবে ৭ম অ্যাভিনিউর বাসে অথবা সুড়ঙ্গ ট্রেনে চড়ে ১০ম ষ্ট্রীট ষ্টেশনে নামতে হবে। দুনিয়ার সেরা পরিকল্পিত শহর বোধ হয় ওআশিংটন, আড়াআড়ি রাস্তার মধ্যে এখানে আবার কোনাকুনি প্রশস্ত রাজপথ থাকাতে চলাফেরার সুবিধা আরো বেড়েছে। এ শহর ব্যবসার ক্ষেত্র নয়, এখানে সবাই ব্যস্ত সরকারী কাজে। বিবিধ স্থাপত্যধারায় তৈরি সরকারী দপ্তরখানাগুলি দেখবার মত। পুণ্যাত্মা আমেরিকানদের স্মৃতিমন্দির, কংগ্রেস, প্রেসিডেণ্ট ভবন ইত্যাদির পারস্পরিক অবস্থিতি ও দূরত্বে সযত্ন পরিকল্পনা সহজেই চোখে পড়ে।

লিংকন মেমরিয়াল অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত দেখতে, সামনে সুদীর্ঘ দীঘির জলে দূর থেকে তার প্রতিবিম্ব অতি মনোরম দেখায়। প্রশস্ত সোপানে অনেকখানি উঠেই এব্রাহাম লিংকনের মূর্তি, প্রস্তরফলকে খচিত তার প্রসিদ্ধ বাণী। সিঁড়ির উপর দাঁড়ালে উল্টো দিকে দূরে চোখে পড়ে ক্যাপিটল বা কংগ্রেসগৃহ, মাঝ-পথে এক সুউচ্চ স্তম্ভ, উপরটা তার পেনসিলের মত কাটা—ওআশিংটন মনুমেণ্ট। ছুটির দিনে সারি বেঁধে লোক দাঁড়ায় লিফ্ট দিয়ে উপরে উঠবার জন্য, সেখানে উঠে চার পাশের চারটি জানলা দিয়ে সমস্ত শহর দেখা যায় ছবির মত। জেফার্সন স্মৃতিমন্দিরের স্থাপত্য আবার অন্য রকম, গম্বুজের মত ছাত। কংগ্রেস-গৃহে গাইড আছে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য, কিছুক্ষণ বসে সদস্যদের বক্তৃতাও শোনা যায়। এর সংলগ্ন পুস্তকালয় জগৎবিখ্যাত, পুঁথির সংখ্যা আর গবেষণার সুবিধার জন্য। ভিতরে পাঠকের সুখ-সুবিধার এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও দেখিনি।

প্রেসিডেণ্ট-গৃহ বা হোআইট হাউসের দরজা সপ্তাহে একদিন খোলা হয় কিছুক্ষণ সাধারণের জন্য। সারি বেঁধে লোক ঢোকে, কয়েকটা ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরের নাম নীল কক্ষ, লাল কক্ষ ইত্যাদি, এক একটায় এক এক রঙের প্রাধান্য আসবাবে সজ্জায়। দিনের কাজ বা প্রহর অনুসারে তাদের ব্যবহার। আড়ম্বর বা জাঁকজমক বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না, শুধু এক খাবার-ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলটা ছাড়া।

এ শহরে দেখবার জিনিসের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। বহির্দৃশ্যের মতই মনোরম এ গৃহের ভিতরের ব্যবস্থা। তাই, যদিও এই প্রদর্শনী য়োরোপীয় কলাভবনের তুলনায় ঐশ্বর্যে খাটো তবু সহজে সে দাগ রাখে মনে। দর্শকের সুখ-সুবিধার প্রতি এতখানি নজর য়োরোপে কোথাও দেখিনি। যাঁরা এই ধরণের প্রদর্শনী সমনোযোগে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা জানেন কাজটা শরীরের পক্ষে কতখানি ক্লান্তিকর। এ গৃহের হাওয়া নিয়মন ব্যবস্থা (air conditioning) শুধু যে দর্শকের শ্রম হরণ করে তাই না, ছবিগুলিও রাখে ভাল। ঘরে ঘরে প্রশস্ত সুকোমল আসন—বিশেষত বড় বা প্রসিদ্ধ ছবির সামনে। উপর থেকে সূর্যালোক ঢুকবার এমন ব্যবস্থা যাতে ছবির গুণ বিকশিত হয় পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে যে ছবির সঙ্গে তার নাম আর শিল্পীর নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা। এতে পয়সা দিয়ে তালিকা কিনতে হয় না কিন্তু আরো বড় সুবিধা এই যে বই খুঁজে খুঁজে ছবির তথ্য উদ্ধার করার অনাবশ্যক ক্লান্তি এড়ানো যায়। তালিকা বিক্রির বাড়তি আয়টুকু হয়তো এদের না হলেও চলে কিন্তু এ

ব্যবস্থার আরেকটা কারণ আমার মনে হয় এই যে, এরা পুরাতনের সংস্কার থেকে অনেক বেশী মুক্ত য়োরোপের তুলনায়, যা কিছু শ্রম লাঘব করে তাই সহজে গ্রহণ করে এই নতুন দেশ। প্রদর্শনী যে দেখতে আসে সাধারণত তার আরেক সমস্যা কোথায় আরম্ভ করবে এবং কোন পথে চলবে। এখানে এক একটা যুগধারা অনুসারে ঘরগুলি সাজানো এবং চলার নিয়ম বাঁধা। বিনামূল্যে প্রাপ্য এক পুস্তিকা আরো সাহায্য করে বিশ্বশিল্পের ক্রমপরিণতি বুঝতে। বিখ্যাত গুলবেংকিয়ান সম্পত্তির অনেক বহুমূল্য ছবি এই গৃহে রক্ষিত। বিশেষ করে চোখে পড়ে ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পী এডুআর্ড মানে অঙ্কিত প্রসিদ্ধ ছবি Boy blowing bubbles এবং Boy with cherries।

এই প্রসঙ্গে এই শহরের Smithsonian Institution এবং Corcoran Galleryর প্রদর্শনীর নামও করা যেতে পারে। প্রথমটি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিখ্যাত, দ্বিতীয় গৃহে চিত্রে ভাস্কর্যে আধুনিক মার্কিণ ধারার অনেক নিদর্শন দেখা যায়।

জুলাই মাসের চার তারিখ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। বিশেষ করে রাজধানীতে সেদিন নানা রকম উৎসব হয়, তার মধ্যে সন্ধ্যার পরে আলোর খেলা নাকি খুবই সুন্দর, রঙের ফোয়ারায় আকাশ ভরে যায়। ঘটনাচক্রে ওআশিংটনে ছিলাম সেদিন, সন্ধ্যার আগে ওআশিংটন মনুমেণ্টের নিচে পৌঁছে দেখি তারই মধ্যে ভীড় বেশ জমেছে; কম্বল, চাদর, খবর-কাগজ বিছিয়ে মাঠে বসে গেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—অনেকে খাবার নিয়ে এসেছে বাড়ীর থেকে। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটি লোক আমার সঙ্গে আলাপ করলে, তার প্রথম প্রশ্ন আমি কলকাতার লোক কিনা। কোএকার সম্প্রদায়ের কর্মী সে, যুদ্ধের আগে চীনে অনেক দিন ছিল, তার পর যুদ্ধের সময় কিছুদিন বাংলাদেশে—মেদিনীপুরের বন্যায় সাহায্যের জন্য। দু'জনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি এমন সময় জানা গেল বৃষ্টির আশঙ্কায় বাজির খেলা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরদিন সকালে আমাকে শহর ছাড়তে হল।

আমেরিকার হৃদযন্ত্র অবশ্য নিউ ইয়র্ক, যদিও দেশের প্রায় বাইরে দ্বীপের উপর তার স্থান। ম্যানহাটান, ব্রংক্স, লং আইল্যাণ্ড, কুইন্স, ব্রুকলিন এই সব এলাকায় ভাগ করা এ বিশাল শহর। বোধ হয় পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী, সব রকম জাতির লোকের বাস এখানে, মানুষের কার্যকলাপেও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। দক্ষিণ-পশ্চিমে ম্যানহাটান অঞ্চলই শহরের প্রধান অঙ্গ ও কর্মক্ষেত্র। উত্তরে সম্ভ্রান্ত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতীর আসন, একেবারে দক্ষিণে ওআল ষ্ট্রীটে লক্ষ্মীর রাজত্ব। মাঝখানে ব্রড্ওএ ও ফিফথ অ্যাভিনিউর রঙ্গালয় আর বিপণিশ্রেণী জগৎবিখ্যাত।

শহরের মধ্যে আরেকটি ক্ষুদ্র শহর যেন রকেফেলার সম্পত্তি, এর বিশাল আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে না পাওয়া যায় এমন জিনিস নেই। সবচেয়ে চমকপ্রদ এর রেডিও সিটি মিউজিক হল—বোধ হয় পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়। ভিতরে এক দিক থেকে আরেক দিক প্রায় ধু ধু করে, মঞ্চের উপর এত লোক একত্র ধরে যে গুণে ওঠা যায় না। এখানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে মঞ্চের বিবিধ অনুষ্ঠানও থাকে—নাচ, গান, হাসির নক্শা, সার্কাসের খেলা, ম্যাজিক। উত্তর-আমেরিকায় সিনেমা টিকিটের দাম অবশ্য ঘর ভেদে এবং প্রহর ভেদে বদলায়, কিন্তু যে কোনো এক গৃহে সাধারণত অগ্রপশ্চাতে একই দাম; এ ঘরে কিন্তু তা নয় এবং সকালের দিকেও নিম্নতম প্রবেশমূল্য প্রায় ছ টাকা, যত বেলা পড়ে তত আরো বাড়তে থাকে।

'সব চেয়ে বড়'র এই দেশে আরেকটির উল্লেখ এখানেই করা উচিত—আকাশচুম্বী এম্পায়ার ষ্টেট অট্টালিকা। ১০২ তলার এই বাড়ি ১৪৭২ ফুট উঁচু, লিফ্‌ট দিয়ে ছাতে উঠবার জন্য দিতে হয় দু'ডলারের মত, সেখানে টের পাওয়া যায় যে বাতাসের তাপ কম। নিচের দৃশ্য অনেকটা এরোপ্লেন থেকে দেখার মত,—রাস্তাগুলি যে কতখানি সরল ও সমান্তরাল তা স্পষ্ট দেখা যায়, লোকজন পিঁপড়ের চেয়েও ছোট, গাড়িগুলি যেন চলছে খুব ধীরে। ম্যানহাটানের দুই দিকে হাডসন ও ঈষ্ট্ নদী পরিষ্কার দেখা যায়, বাঁ পাশে বন্দরে অতলান্তিকের বিশাল জাহাজ সব পাশাপাশি সাজানো, ডান তীরে জাতিসংঘের নতুন প্রাসাদই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তারপর লং অ্যাইল্যাণ্ড ও ব্রুকলিন এবং তাদের জুড়ে অনেক সেতু।

জাতিসংঘের সাধারণ সভার (General Assembly) গৃহ তখনো সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু প্রধান দপ্তরখানায় ঢোকা গেল। কাচে মোড়া দেশলাই বাক্সের মত এই প্রাসাদে প্রায় চল্লিশ তলা জুড়ে জাতিসংঘের আপিশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিজস্ব ঘর আছে। যার যেমন দরকার ঘরে ঘরে বাতাসের তাপ সেই রকম নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ মণ্ডলীগুলির অধিবেশনের জন্য কয়েকটি সভাঘর আছে, নরোএ এবং য়োরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ তার এক একটি সাজিয়েছে নিজ নিজ জাতীয় ছন্দে। প্রকাণ্ড কাচের জানলার বাইরে নদী বয়ে যাচ্ছে, ভিতরে সভাপতির দু'পাশে অর্ধবৃত্তাকারে বসেন সদস্যরা, তাদের মুখোমুখি প্রথমে সাংবাদিকদের

রোদ্যাঁ মিউজিয়াম, ফিলাডেলফিয়া, মূর্তির নাম "চুম্বন"

তার পরে সাধারণ দর্শকের আসন ধাপে ধাপে উঠে গেছে। ছোট ছোট খুপরির মধ্যে সুদক্ষ ভাষাবিদরা বক্তৃতা অনুবাদ করে চলেছে বক্তার মুখ দিয়ে কথা বার হতে না হতে। প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে সংলগ্ন যন্ত্র কানে লাগিয়ে এবং ইচ্ছামত বোতাম ঘুরিয়ে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, রুশ বা চৈনিক ভাষায় একই বক্তৃতা শোনা যায়।

নিউ ইয়র্কের আশেপাশে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ, তারই একটাতে অধিষ্ঠিতা প্রসিদ্ধ লিবার্টি প্রতিমূর্তি, অতলান্তিকের জাহাজকে হাত তুলে ইনিই প্রথম সম্ভাষণ করেন। শহর থেকে খেয়াতরীতে করে ওর কাছাকাছি গিয়ে দেখলে ভদ্রমহিলার চেহারার লালিত্য যেন কমে যায় অনেকখানি। ধাতুর তৈরি এই বিশাল মূর্তি ফ্রান্স উপহার দিয়েছে আমেরিকাকে। ভিতরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পা ব্যথা হয়ে যায়, পুরস্কার স্বরূপ মাথার কাছে জানলা দিয়ে দেখা যায় বাইরের দৃশ্য, কিন্তু দাঁড়াবার জায়গা নেই, সুতরাং পিছনের লোকের ঠেলায় নেমে আসতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

ছুটির দিনে দক্ষিণে কোনি আইল্যাণ্ডেও সমুদ্রলোভীদের ভীড়। গ্রীষ্মকাল হলে তো লোকে লোকারণ্য। সকলে অবশ্য জলে নামে না, এমন কি বালিও ছোঁয় না, কারণ জায়গাটা আসলে প্রকাণ্ড এক প্রমোদ-মেলা—বোধ হয় দুনিয়ার 'সব চেয়ে বড়'! গড়িয়ে নামার লৌহপথ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে অতিকায় জন্তুর কঙ্কালের মত, এবং এই ধরণের শারীরিক রোমাঞ্চ ছাড়া বিবিধ জুয়ার খেলা, সার্কাস ইত্যাদি তো আছেই।

নিউ ইয়র্কের নাড়ি টাইম্‌স স্কোয়ার, তার আসল চেহারাটা দেখা যায় সন্ধ্যার পরে। লোকের ভীড় ও চাঞ্চল্য, বিজ্ঞাপনের কর্কশ রঙিন আলো এসব মিলে চোখ ঝলসে দেয়, কিছুক্ষণ পরে যেন মাথা ঘুরতে থাকে। আশেপাশে যে অসংখ্য সিনেমা থিয়েটার তারই কোনো একটার মধ্যে ঢুকে পড়লে তবে যেন একটু শান্তি।

কিন্তু চোখ ধাঁধানো দ্রষ্টব্যের বাইরেও নিউ ইয়র্কের আরেকটা দিক আছে উপভোগ করার মত। সবচেয়ে আগে মনে পড়ছে এদের যাদুঘরের হাইডেন প্ল্যানেটেরিয়াম। এখানে সাধারণের জন্য রোজ অত্যন্ত উপভোগ্য বক্তৃতা থাকে জ্যোতির্লোকের এক একটা বিষয় সম্বন্ধে। দলে দলে লোক আসে দেখতে আর শুনতে। প্রথমে এক ঘরে অশরীরী এক স্বর ঘূর্ণমান মডেলের সাহায্যে সৌরজগৎ তারা নীহারিকা সম্বন্ধে আকাশের এক সম্যক পরিচয় দেয়, তারপর উপরের তলায় ঘর অন্ধকার করে আরম্ভ হয় আসল অনুষ্ঠান। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশকে এনে ফেলা হয় ঘরের ছাতে, একই যন্ত্র এত নিপুণ ও সুন্দরভাবে জ্যোতির্লোকের বহু বিভিন্ন ঘটনা প্রতিফলিত করে যে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্ত, তারার চলাফেরা এসব তো আছেই,—একবার দর্শকদের যখন চাঁদের দেশে নিয়ে যাওয়া হল, রকেটের গবাক্ষে দেখা গেল পৃথিবী আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, অন্যদিকে চাঁদ আসছে এগিয়ে; রকেট যখন নামল চাঁদে দিগন্ত পর্যন্ত সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

পাশেই যাদুঘরের প্রধান বাড়িটা দেখে শেষ করতে দিন কেটে যায়। বিশেষ করে নজরে পড়ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু ডাইনোসরাসের কঙ্কাল।

চিত্র ও ভাস্কর্যের দুটি গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম এবং আধুনিক ধারার জন্য মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট।

আর একটি জায়গা খুব ভাল লাগল, যদিও সেখানে দর্শকের ভীড় নেই। ম্যানহাটানের উত্তরে ফোর্ডহাম পল্লীতে এডগার অ্যালান পো-র কুটির। তখনকার দিনে বাড়িটা ছিল কিছু দূরে, পরে এখানে এনে তার সংস্কার করা হয়। সবুজ একটুখানি জমির মধ্যে গাছের ছায়ায় সাদা এক কাঠের বাড়ি, এখানে ১৮৪৬ সালে পো আসে বাস করতে স্ত্রী আর স্ত্রীর মাকে নিয়ে। সরু এক-ফালি বারান্দার পরে বাড়ির প্রধান ঘর, সেখানে তার রকিং চেয়ার রয়েছে এখনো। পাশে ছোট্ট শোবার ঘরের প্রায় সবটা জুড়ে কাঠের খাট; এই শয্যায় স্ত্রী ভার্জিনিয়া মারা যায় এক বছর যেতে না যেতে। উপরের তলায় ঢালু ছাতের নিচে দুটি ছোট্ট খুপরি। এই গৃহে পো পেতেছিল তার অতি দরিদ্র কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুচারু সংসার, এইখানে শেষ হয়েছে তার বিষণ্ণ আশ্চর্য জীবন। নিজের অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প কবিতা ঐ তিন বছরের মধ্যে লিখেছিল সে।

মিউজিয়াম প্রসঙ্গে আর দুটি ঘরের কথা মনে পড়ছে বিশেষ করে। ফিলাডেলফিয়া শহরের নিরিবিলি অংশে গাছের ছায়ায় এক ছোট বাড়িতে আছে বিখ্যাত ভাস্কর রোদাঁ (Rodin) নির্মিত বহু মূর্তি। মিউজিয়াম দেখা এই রকম নির্জনেই হওয়া উচিত, শহরের গোলমালের মধ্যে বা অনেক দর্শকের ভীড়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় করতে আসি অতীতের আড়াল থেকে তাদের কথা ভাল শোনা যায় না। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই অবশ্য নকল, কিন্তু ঐ শিল্পীর কারুকাজ একসঙ্গে এতগুলি আর কোথাও দেখিনি।

বষ্টন শহরে নদীর ওপারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যাদুঘরে কাচের কাজের অত্যন্ত আশ্চর্য এক প্রদর্শনী আছে। গাছপালা ফলফুল কীটপতঙ্গের এমন সুন্দর অনুকরণ যে ভাল করে পরীক্ষা করেও ধরা যায় না যে তা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। শুনেছি এই দক্ষতা আয়ত্ত করেছিল শহরের একটিমাত্র পরিবার, এখন কেউ নেই আর বেঁচে।

বষ্টন শহর আমেরিকার উত্তর-পূবে নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি। এইখানে এই দেশের গোড়াপত্তনের যুগে ইংরেজদের আদি উপনিবেশ, সেই কারণে এখানে ইংরেজী ছাপ এখনো কিছু আছে এদের ঘরবাড়ীতে এবং আদবকায়দায়; সম্ভ্রমের ভেদবিচারে এবং নিয়ম-নিষ্ঠায় এরা রক্ষণশীল। জলবায়ুতে অবশ্য ইংলণ্ডের সঙ্গে মিল কিছু দেখা গেল না, জুনমাসের দুপুরে তখন ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম পড়ল। শীতের দিনেও অবশ্য ঠাণ্ডা ও বরফপাত অনেক বেশী। ইংলণ্ড ও য়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় শীতগ্রীষ্মের এই প্রখরতা মোটামুটি উত্তর-আমেরিকার সর্বত্রই বিদ্যমান, এক বোধ হয় পশ্চিম উপকূলের কোনো কোনো জায়গা ছাড়া।

একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এই শহরের বিখ্যাত লাইব্রেরির কাছে এসেছি, কিছুটা বিশ্রামের আশায় কিছুটা কৌতূহলে ভিতরে ঢুকেছি এমন সময় কানের কাছে কে বলল "সেলাম আলেকুম"। ফিরে তাকিয়ে যার সহাস্য মুখ চোখে পড়ল নিজের পরিচয়ে সে তার নাম বললে 'চাক'—ভাল নামটা জানানো বোধ হয় দরকারই বোধ করলে না। জানা গেল যুবকটি রাজনীতি ও সমাজনীতির খুব উৎসাহী অ্যামেচার পণ্ডিত, যদিও স্পষ্টই ভুল করেছে আমার দেশটা

(এইখানে বলে রাখি আমাকে মুসলমান বলে এ পর্যন্ত আর কেউ ভুল করেনি)। আমাকে সে টেনে নিয়ে গেল এক কোণে ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে এবং দেশের হয়ে দু'কথা বলতে। আমেরিকা সত্যিই নিস্বার্থ হয়ে সাহায্য করতে চায় অথচ আমরা (এবং অন্য সকলেও) কেন সন্দেহ করি তাদের? বললাম কোনো দেশের সাধারণ লোককে খবর-কাগজ পড়ে জানা যায় না—এটা তাদের দেশে এসেও যেমন আমি উপলব্ধি করেছি তাকেও তেমনি যেতে হবে ভারতে সত্যি করে বুঝতে হলে। চাককে মনে থাকবে অনেক দিন—অন্যান্য দেশে আধ ঘণ্টা মাত্র আলাপ হয়েছে যাদের সঙ্গে তাদের যখন ভুলে যাব তখনো।

'দেশ দেখা' সারতে সারতে যখন মানুষের সঙ্গে চেনা হয়, রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তখন আরম্ভ হয় দেশ জানা। প্রথম দর্শনে যা বিস্ময়, কৌতুক বা বিদ্বেষ উদ্রেক করে ক্রমে তার চেহারা বদলায়, কেন এরা আমাদের মত বা আর কারো মত না হয়ে এইরকম তার উপলব্ধি আসে। একদিকে আচার ব্যবহার দৃশ্যপটে বাইরের বৈচিত্র্য, অন্যদিকে জাতি দেশ নির্বিশেষে মনুষ্য-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যের সাক্ষাৎ—এর কোনটা যে দেশভ্রমণের অধিকতর বড় রোমাঞ্চ তা বলা কঠিন।

খাবার ও রান্নার প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ফরাসী বা ইটালীয় খাদ্যের মত স্বাদ এরা সৃষ্টি করতে পারে না, রান্নার ললিতকলা এরাও জানে না। কিন্তু তা বলে ইংলণ্ডের মত দলানো আলু এবং বাঁধাকপি সিদ্ধ এদেশে সব্জির রাজা বলে গণ্য নয়। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারও এদের অফুরন্ত, তাতে অন্যদিকের ক্ষতি অনেকখানি পূরণ হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ার লোক এখানে এসে ঘর বেঁধেছে, সুতরাং প্রায় সব দেশের রেস্তরাঁই পাওয়া যায় অন্তত বড় শহরগুলিতে। চীনের লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় ছড়িয়েছে—সঙ্গে এনেছে ধোবার ব্যবসা আর অপূর্ব পাচকী কৌশল। এদেরও পাড়ায় পাড়ায় চীনে রেস্তরাঁ। চৈনিক পাক সর্বদেশে আদৃত—অনেকের মতে তা মনুষ্যজীবনের সামান্য কয়েকটি প্রকৃত আনন্দের অন্যতম—কিন্তু তার মধ্যেও দেশে দেশে কিছু ভেদাভেদ চোখে পড়ে। এদেশে ওরা প্রথমেই টেবিলে দিয়ে যায় এক কেৎলি সবুজ চা আর ছোট্ট হাতলবিহীন পেয়ালা। জলের বদলে এই দিয়ে অনেকে তৃষ্ণা মেটায় আহারের শেষ পর্যন্ত। কেৎলি খালি হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়। ভারতীয় রেস্তরাঁ নিউ ইয়র্কে গোটা কয়েক আছে—নিগ্রো পল্লীতে নোয়াখালির এক ভদ্রলোক চালাচ্ছেন এক দোকান, নিগ্রো স্ত্রী আর পুত্রকন্যা নিয়ে। ওখানে যাওয়া হত প্রায়ই কারণ মাত্র এক ডলারে মুরগীর ঝোল আর ভাত পাওয়া যেত। ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়াতেন, বহুদিনের না-দেখা দেশের কথা শুনবার লোভে।

আমেরিকানদের সর্বব্যাপী নিয়ম-শৈথিল্য আহারের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে। কেউ প্রাতরাশ খাচ্ছে ভারি করে ইংরেজী মতে ডিম বেকন দিয়ে, আবার কেউ কন্টিনেন্টাল য়োরোপীয়দেরও হার মানিয়ে খালি এক পাত্র কফি গিলে যাচ্ছে কাজে। সদামুক্তদ্বার দোকানে যখন খুশি যে-কোনো খাবার মেলে, বিলেতের মত লাঞ্চ টি ডিনারের সময় ভাগ করা নেই। রাত এগারোটায় কেউ যদি কর্নফ্লেক খায়, লোকে তাকিয়ে দেখবে না তার দিকে।

রকমারি ফলের রস—সদ্যনিষ্কাশিত বা টিন-সংরক্ষিত—এদের আহারের বড় অঙ্গ। ভিটামিনের অনেকখানি ওখান থেকে আসে। সকাল বেলা প্রথমেই এক গ্লাস কনকনে ঠাণ্ডা রস গেলার সঙ্গে ঘুমের জড়তা সব যেন পালায় মুহূর্তে, রসনা প্রস্তুত হয় আহারের প্রতি। তুষার-শীতল মৃদু পানীয়ের প্রতি এদের টান অবশ্য জগৎ-বিখ্যাত, য়োরোপীয় কন্টিনেন্টে যেমন মদ মদিরার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (কিন্তু কোকা কোলার আক্রমণে আজ নাকি ফ্রান্স ইটালির সুরা-শিল্প মৃতপ্রায়; ওদের কমিউনিস্টরা লড়ে চলেছে ডলার সাম্রাজ্যবাদের এই নিদর্শনকে দেশ থেকে তাড়াতে।) অনেক মনিহারী বা ওষুধের দোকানের এক কোণে আছে সোডা ফাউণ্টেন, ওরা যাকে বলে ড্রাগস্টোর এই সেই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া সিনেমায় বা রেলস্টেশনে যন্ত্রের বোতাম টিপে পাওয়া যায় নানা রকমের পানীয়, কোথাও কোথাও গরম চা এবং কফি—চিনি দুধ দিয়ে বা না দিয়ে। আপিশ গৃহে, পার্কে এবং সাধারণের আনাগোনার অন্যান্য স্থানে পানীয় জলের ফোয়ারা-যন্ত্র এদের এক পরম উপভোগ্য উদ্ভাবনা। এই ঠাণ্ডা জলে শুধু যে দেহ জুড়ায় তাই না, গ্লাসের ভাবনা নেই, অপরের গ্লাসে মুখ লাগাবার প্রয়োজন নেই। এই কারণেই ভাল লাগে কাগজের গ্লাস, রুমাল, তোয়ালে যা একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া যায়। অনেক স্থানে হাত মোছার জন্য কাগজের তোয়ালেও বাতিল করা হয়েছে; ভিজে হাত এক যন্ত্রের মধ্যে ঢোকালে গরম হাওয়া বইতে শুরু করে এবং জল শুকিয়ে দেয়। [ক্রমশঃ।

ট্রেন

ভেরা পানোভা

চিঠি

পূম্স্ক, থেকে ফেরার পথে ট্রেনের গতি ক্রমশঃই মন্থর হোতে লাগল। বেশীর ভাগ যানবাহনেরই গতি এখন পশ্চিম দিকে। যুদ্ধের রসদবাহী ট্রেনগুলিকে পথ করে দেওয়ার প্রয়োজন সবার আগে। পার্মএতে হসপিটাল ট্রেন আটকে রইলো পুরো আট দিন ধরে।

আর ট্রেনের লোকগুলি···তাদের অবস্থা হোলো শোচনীয়, এই দীর্ঘ যাত্রাপথ, একটিও রোগী কি আহত নেই তাই কাজহীন অলস দিনগুলি যেন কাটতেই চায় না, কিন্তু শুধুই কি তাই? এই অলস অবকাশে মনের মধ্যে যে ভীড় করে এগিয়ে আসে পরিচিত প্রিয় মুখগুলি, ভেসে ওঠে ফেলে আসা ঘরখানি···

কোথায় এখন তারা? কি অবস্থায় আছে সব? ডাক্তার বেলভ সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোয়ে ওঠেন। এক বছর হোয়ে গেলো চিঠি লিখেছেন, পরে ওমৃস্ক থেকে একটি পার্শেলও পাঠিয়েছেন কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি অক্ষরও এসে পৌছয়নি লেনিনগ্রাদ থেকে।

হয়ত আসেনি চিঠি। হয়ত কেন? নিশ্চয়ই এসেছে, সব চিঠিগুলি আছে 'ভি'এর চিঠির বাক্সে। কিন্তু ট্রেনটা কখন পৌছবে 'ভি'তে?

দানিলভ ভাবে, এক জনকে 'পাঠাতে হবে ডাকটা আনবার জন্যে। ভলান্টিয়ারদের অনেকেই তো এখানের বাসিন্দা—তার মানেই তারা এখানে একবার থেমে বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসতে পারে। দানিলভ নিজেই তো পারলে খুসী হোয়েই যায় কিন্তু···নাঃ, লেনাই তো আছে—ওই ঠিক পারবে।

"—একেবারে বিদ্যুৎগতিতে—যাবে আর আসবে"—লেনাকে বোঝাতে থাকে—"তুমি কেন্দ্রীয় অফিসেই জানতে পাবে কোথায় এসে আমাদের পাবে। শোনো, প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেষ্টা কোর না—মালগাড়ীগুলোই তোমাকে তাড়াতাড়ি পৌছে দেবে···এ ট্রেন থেকে ও ট্রেনে একটু লাফালাফি করতে হবে আর কি···আর সেটাতে তুমি তো আমার চেয়ে কিছু কম যাও না।"

লেনার হাতে দু'-তিন পাউণ্ড ওজনের ছোট্ট একটি পুলিন্দা এনে দিলে দানিলভ—ওপরে একটা ঠিকানা লেখা।

—"আর শোনো, এইটা আমার বাড়ীতে পৌছে দিও। ছেলেটার কাজে লাগবে—বড় হচ্ছে তো—"

চেষ্টাসত্ত্বেও কৃত্রিম ভ্রূকুটীর আড়ালে ফুটে ওঠে হাসির রেখা—"হ্যাঁ, আর দেখেও এসো কেমন আছে ছেলেটা,···আমার স্ত্রী চিঠি লেখে বটে, কিন্তু তার মাথামুণ্ডু কিছুই যদি বোঝা যায়···"

ব্যাগ-ভর্ত্তি চিঠি-পত্তর নিয়ে লেনা প্রথম মালগাড়ীটাতেই চলে গেলো। লেনা যাবার পর থেকে হসপিটাল ট্রেনে দিনগুলি যেন আরও মন্থর আরও ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠলো। আর ভারাক্রান্ত হোলো জুলিয়ার মন। দুশ্চিন্তা···দুশ্চিন্তা···সুপ্রাগভ কি যাবে, না যাবে না? কিন্তু ওর মনটা নেচে উঠলো। যখন সুপ্রাগভ নিজেই এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি তোমার সঙ্গে আসতে পারি?"

সোজাসুজি তাকেই প্রশ্ন করাটা সত্যিই অভিনব নয় কি? অল্গা মিখেলোভ্না‌কে নয়, এমন কি ফাইনাকেও নয়, ও মেয়ে তো যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আছে—।

কিন্তু একসঙ্গে বেড়াবার সময় জুলিয়ার ভারী অপ্রস্তুত লাগলো, কেমন অস্বস্তিও বটে। সবার সামনে ঠিক তারই সঙ্গে বেড়ানো—যাকে ও ভালোবাসে! না না, কেমন লজ্জা এসে রাঙিয়ে তোলে ওর মন, ও তো অভ্যস্ত নয়—ভাগ্যে ফাইনা আরও কতকগুলি নার্সকে সঙ্গে নিয়ে এসে জুটে গেলো ওদের সঙ্গে। সারাক্ষণ ফাইনাই যা কিছু কথা চালালো। পিছনে মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে ওর সেই পরিচিত ভঙ্গীতে হেসে উঠলো বার বার! জুলিয়া নীরব, ওর কেবলি মনে হোতে লাগলো—'ও কি পারতো·অমন করে হাসিতে উছলে উঠতে? পারতো অমন কথার জাল বুনতে? ওর কথা বলার ধরণ গম্ভীর, উপদেশপূর্ণ—হয়ত তাই ছেলেরা এড়িয়ে যেতো। হ্যাঁ, ছেলেরা পছন্দ করে অমনধারা প্রাণপ্রাচুর্য্যে ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠা মেয়ে, অমন দ্বিধাহীন সরস কৌতুক, অমন লীলায়িত ছন্দে মাথা হেলিয়ে হাসির ঢেউয়ে ভেঙে পড়া—'অমন ধাঁচে তৈরী হোতে পারিনি তার জন্যে আমি কি-ই বা কোরতে পারি'—জুলিয়ার বিজ্ঞ মন বোঝাতো। কিন্তু ফাইনার উপস্থিতিটা হঠাৎ অমন তিক্ত মনে হয় কেন?

বনের কাছাকাছি এসে নার্সেরা যে যার পথে চলে গেলো মাশরুম (ব্যাঙের ছাতা) খুঁজতে। ফাইনা, সুপ্রাগভ আর জুলিয়া রইলো আলাদা। এক জায়গায় অনেক ব্যাঙের ছাতা দেখে ফাইনা চেঁচিয়ে সুপ্রাগভকে ডাকলো ওকে সাহায্য করতে। একটা ফার গাছে হেলান দিয়ে সুপ্রাগভ এতক্ষণ একটা হাতে পাকানো সিগারেট খাচ্ছিল—জুলিয়ার চোখে এই মুহূর্ত্তে ও যেন আরও আকর্ষণীয় হোয়ে উঠলো—আর ওর চোখে ভাসছিলো ফাইনার উচ্ছলতা—এমন সময় জুলিয়ার চোখে চোখ পড়াতে মৃদু হেসে বললে—"মেয়েটি বেশ হাসিখুসী, তাই না?"

জুলিয়ার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো, যাক্, ফাইনাতে মুগ্ধ হয়নি তাহলে, ওকে বিদ্রূপ করছে। আর হসপিটাল ট্রেনে এটা তো সবাই জানে যে সব মেয়েদের মধ্যে সুপ্রাগভ জুলিয়াকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। ছাড়বার পাত্রী নয় ফাইনা, এগিয়ে এসে সুপ্রাগভের হাত ধরে, কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়, তার পর টেনে নিয়ে চলে—তেমনি ঘেঁষে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে···জুলিয়া পিছনে পিছনে চলে, আপন মনে হাসতে হাসতে। ফাইনার উপস্থিতিতে আর বিরক্তি আসছে না, উল্টে সুপ্রাগভের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকুই স্পষ্ট হোয়ে উঠছে—দু'-একটি·ইঙ্গিতে, হাসিতে যার অর্থ শুধু ওরা দু'জনেই বোঝে···

কিন্তু শুভক্ষণগুলি স্থায়ী হোতে চায় না বেশী—ওদের বালতীগুলি শীগগিরই ভরে গেলো। এবারও কিন্তু ফাইনাই বাঁচালে,
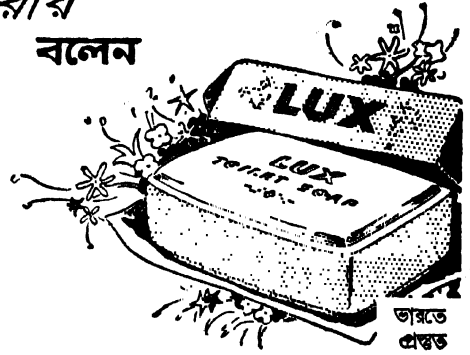
বললে বনের চার ধারে এই খোলা হাওয়ায় প্রাণ বাঁচবে, ট্রেনের সেই বন্ধ গুমোট কামরার ভিতর সাত তাড়াতাড়ি ঢোকবার কোনো দরকার নেই। বনের ধারে এসে নরম ঘাসের উপর, বেশ একটি মনোরম ভঙ্গীতে এলিয়ে পড়লো, পিছনে বনের গাছগুলির কালো ছায়ার পটভূমিকায় কেমন করে আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, ফাইনা তা' ভালোই জানে। জুলিয়া আর সুপ্রাগভ তার পাশে সংযত ভদ্রভাবে বসে রইলো।

—"ডাক্তার"—অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে ফাইনা বলে উঠলো—"বলো তো তুমি কি সব সময়ই এমন আধমরা, নির্জীব হোয়ে থাক?"

সুপ্রাগভ না-বোঝার ভান করলে। তার পর জিজ্ঞাসা করলে, —"তার মানে কি? আধমরা হোতে যাবো কেন?"—আড় চোখে জুলিয়ার দিকে চেয়ে আবার বললে—"আমি তো নিজেকে রীতিমত প্রাণ-চঞ্চল বলে মনে করি—"

—"তোমার মন তোমাকে ঠকায় তাহলে—"

সুপ্রাগভ নীরব। ফাইনা আরও একটু অলস ভঙ্গীতে বলে ওঠে,—"আচ্ছা ডাক্তার, কখনও প্রেমে পড়েছো?"

—"কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার?"

—"অদ্ভুত হোচ্ছো তুমি নিজে। আমাদের সময় চল্লিশ বছরের অবিবাহিত পুরুষ মেলাই ভার ছিলো। যাকেই দেখো, সবাই বিবাহিত। বিশ বছরের ছেলেগুলো অবধি—কেউ বিয়ে করেছে, কেউ বিয়ে করতে চলেছে, এমন কি কিছু না হোক ভাবী পত্নীটি স্থির করা আছে। আচ্ছা, তোমার কোনো ভাবী স্ত্রী আছে নাকি?"

—"আমি তো আর বিশ বছরের ছেলে-ছোকরা নই"—সুপ্রাগভের স্বরে কৌতুক।

—"না না, চলবে না"—আবদেরে ছেলেমানুষী ভঙ্গীতে ঘাসের উপর এক পাক ঘুরে মাথা ঝাঁকিয়ে ফাইনা বলে ওঠে—"ওই বলে তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো।"

জুলিয়া এদের কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কি চমৎকার আকাশটা—নীলও নয়, সোনা-ঢালাও নয়—অনেক দূরে কেমন যেন ছায়াময় রঙ,···কোমল মায়ায় ভরা আলো··· 'আমি সুখী' জুলিয়ার মন যেন অপরূপ অনুভূতিতে ভরে ওঠে··· একটি ক্ষীণ আশা যেন বুকের মধ্যে জেগে ওঠে···আগামী পূর্ণতার আভাস নিয়ে···

চির-পরিচিত পথ ধরে লেনা চলে। ট্রাম বন্ধ হোয়ে গিয়ে ভারী বিশ্রী লাগে। কি যেন হোয়েছে লাইনে। লেনার মন চাইছে যত শীগ্‌গির পারে কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দাশ্তার চিঠিখানি পেতে।

এতক্ষণে এসে এভিনিউতে পৌঁছালো, পথের দু'ধারে বড় বড় এল্‌ম্ গাছ—কি সুন্দর শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। এইবার এভিনিউ পার হোয়ে পাশের রাস্তাটা ধরলেই বাড়ীটা পড়বে। ঠিক কোণের বাড়ীর পরেরটা—ছাই রঙের তিনতলা বাড়ী···ওর ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বর্গের আশ্রয়। এসে পৌঁছালো বাড়ীর সামনে, কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে শেষ অবধি ঢুকলো না। আগে ও ডাকটা নিয়ে আসবে তার পর নিশ্চিন্ত মনে আসবে···।

কেন্দ্রীয় অফিস থেকে রাশীকৃত চিঠি, প্রায় দু'ডজন পার্শ্বেল আর খবরের কাগজ দিলে। লেনা সব কিছুই একটা ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললে—এটুকু সময়ের মধ্যেই আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় সব কয়টা চিঠির উপরই চোখ বুলিয়ে নিলে—ওর নামে একখানিও নেই। ধুলো-ভরা ঘরখানাতেই একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়লো লেনা। দেখতে লাগলো এবার একটি একটি করে চিঠিগুলি—এই একখানা দানিলভের, বেশ বোঝা যায় ওর স্ত্রীই লিখেছে। লেনিনগ্রাদ থেকে বেলভেরও রয়েছে। আর নাস্তার নামে তো খান তিনেক···একটা ওর ভাবী স্বামী নিশ্চয়ই···বগাচফ ত্রিশখানা চিঠি পেয়েছে—উঃ! আর পায়নি কে? সবাই পেয়েছে, কম-বেশী প্রত্যেকের নামেই এসেছে—'শুধু আমি পাইনি'। লেনা আবার চিঠিগুলো ব্যাগে পুরে ফেলে বাড়ীর পথে চলে—কে জানে হয়ত ওখানেই এসেছে চিঠি। প্রতিবেশীদের কাছেও একবার খোঁজ নিতে হবে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি ভেঙে লেনা তিনতলায় পৌঁছালো—এতটুকু হাঁফিয়ে উঠলো না।

না, প্রতিবেশীদের কাছেও কোনো চিঠি নেই,—তাদের তো নেই কিছুই, জ্বালানি কাঠ নেই, পেট্রল নেই, সাবান নেই, সূতোটুকুও নেই। বৃদ্ধাদের দল এসে লেনাকে ঘিরে দাঁড়াল আর অভাবের কাহিনী সুরু করলে। অল্পবয়সী 'প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে লেগে আছে। ওদের এড়িয়ে লেনা উপরে নিজের ঘরখানির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ মনে হোলো ও যেন বড় ক্লান্ত, আর যেন বইতে পারছে না শরীরটা—পুরো তিন দিন জামা-কাপড় ছাড়তে পায়নি, আর এক মুহূর্ত্তের বিশ্রামও পায়নি। ঘরখানা খোলে। ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিলো তেমনিই রয়েছে পড়ে। শুধু সবার উপর পড়েছে পুরু ধূলার আস্তরণ। সাদা পর্দ্দাগুলি বিবর্ণ হলদে হোয়ে গেছে। আর ছাইদানীতে পড়ে আছে আধ-খাওয়া একটা সিগারেট। দাশ্তার সিগারেট···

কি ক্লান্তি···কি অসহ্য ক্লান্তিতে ভরে এলো সারা দেহ। জুতোটা খুলে লেনা লুটিয়ে পড়ে সোফাটার উপর। শিথিল হোয়ে যায় সারা দেহ···কিন্তু চিঠি? কেন এলো না? উঁহু, দুর্ভাবনা হোচ্ছে না একটু···দাশ্তা তো বেঁচেই আছে···তাকে যে থাকতেই হবে। এই তো সারা ঘর ভরে আছে ওর প্রিয় সিগারেটের গন্ধটা··· কত চেনা কত পরিচিত,···মধুর আবেশে ভরে ওঠে লেনার মন। মরতে পারে শুধু তারাই, যাদের জীবনে ফাটল ধরেছে···সেই ফাটলের ছিদ্রপথেই তো আসে মৃত্যু-দূত। কিন্তু দাশ্তার আর তার মিলিত জীবনে···কোথাও তো নেই এতটুকু ফাঁক···ফাঁকির অবকাশ··· মৃত্যু আসবে কোন পথে? দাশ্তা—দাশ্তা—দাশ্তা···লেনার জীবনের চরম পূর্ণতা দাশ্তাকে পাওয়া···আজও তো জীবন পূর্ণ বিকাশের পথে···কার সাধ্য রুদ্ধ করে সেই গতি। দাশ্তা—মৃত? অসম্ভব—দুনিয়ায় সবার জীবনে মৃত্যু এলেও দাশ্তার জীবনে তার আগমন ঘটবে না—কিছুতেই না।

লেনার নিমীলিত চোখ দুটিতে ভাসে দাশ্তার মুখ—এগিয়ে আসে···আরও এগিয়ে আসে সেই মুখ···স্বপ্নলোকে প্রিয়-পরশনে কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠোঁট দুখানি···

পুরো দুটি ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙে লেনার—বেশ তাজা মনে হয় এতক্ষণে—একটুও আর ক্লান্তি লাগছে না। এইবার উঠে পড়ে ঘরের সংস্কার সাধনে লেগে যায়। নামিয়ে ফেলে জানলার ময়লা পর্দ্দাগুলো, ঝাড়ন দিয়ে সাফ করে ধুলোর আস্তরণ, ধুয়ে ফেলে ঘরের

মেঝেটা···এতক্ষণে যেন একটু ছিমছাম পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে—কোথাও আর এতটুকু ধূলো এতটুকু আবর্জনার লেশ নেই···শুধু আছে ছাইদানীতে রাখা দাদ্ধার অর্দ্ধসমাপ্ত সিগারেটটুকু···

প্রতিবেশিনী ঠাকুমাটি এতক্ষণ রান্নাঘরে কি যেন করছিলো। লেনাকে দেখেই চট করে ইলেকট্রিক ষ্টোভের প্লাগটা খুলে ফেলে। অপ্রস্তুত লজ্জার ভাবটা কাটাতে অস্ফুট স্বরে অভিযোগ জানায় যে ইলেকট্রিক অবধি বেশী খরচ করতে পারা যাবে না নিয়ম হওয়াতে কী অসুবিধায় পড়তে হোয়েছে। লেনা বোঝে তাড়াতাড়ি এক টুকরো মাংসের কেক আর চিনি-দেওয়া এক পেয়ালা চা এগিয়ে দেয় ঠাকুমার দিকে। কি পরিতৃপ্তির সঙ্গেই না খায়···খেতে খেতে অভিযোগ করে, নাতিটা সব চিনিটা খেয়ে ফ্যালে, একেই তো বরাদ্দ মিষ্টির পরিমাণ কতটুকু—তাও যদি একটু রাখা যায় নাতিটার জ্বালায়···

লেনা ভাবে, সুখে আছি আমরাই, কিন্তু নাগরিক জীবনে কি সঙ্কীর্ণতাই না এসেছে।

লেনা স্নান করে ফেলে—সমস্ত শরীর-মন যেন জুড়িয়ে গেলো, নরম ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে শোবার ঘরটায় এসে দাঁড়ায়—আয়নার বুকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে ওঠে···এ তো সেই হারিয়ে-ফেলা দিনগুলির লেনা। ইউনিফর্ম ছেড়ে ঘরোয়া কাপড়ে কত দিন পর নিজেকে দেখতে কি যে ভালো লাগে। ঐ তো চোখের কোণে ঝিকমিকিয়ে ওঠে দুষ্টুমিভরা মিষ্টি হাসির বিদ্যুৎ। হাল্কা পোষাকে আবার যেন মুক্তি পেলো প্রতি ভংগীতে লাবণ্যের হিল্লোল। ঐ তো সেই লেনা···চলার পথে পথিকের মুগ্ধ দৃষ্টির উপহার যার সঙ্গে যেত। 'রক্তিম অধরে ফুটে ওঠে রহস্য-মধুর হাসি—'এই তো আমরা' মনে মনে ভাবে লেনা, 'কি বিচিত্র উপাদানেই না সৃষ্টি! যা খুসী হোতে পারি, যখন যেমন ইচ্ছে'···আরে! কাত্যার কাছে তো খোঁজ করা হয়নি চিঠি এসেছে কি না—মুহূর্ত্তে কেটে যায় আবেশ-বিহ্বলতা, খুলে ফ্যালে ড্রেসিং-গাউনটা। আশা আর সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে মন। কে জানে কাত্যার কাছেই যে আসবে তার ঠিক কি? বিশেষ করে দাদ্ধা তো কাত্যাকে একটুও পছন্দ করতো না, বলতো, ভূয়ো আভিজাত্যের মুখোশপরা বোকা মেয়ে···তবু, তবু লেনার মনে হয় যদিই এসে থাকে কাত্যার ঠিকানায়—যেমন করে হোক খোঁজ ওকে করতেই হবে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য জায়গায়।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে কাত্যা এসে দাঁড়ায় লেনার সামনে—ওর স্বামী সেই ম্যাণ্ডোলিন বাজানো, লেনাকে প্রেমপত্র লেখা ছেলেটি, যুদ্ধে মারা গেছে—মাত্র দু'মাস হোলো খবর এসেছে কাত্যার কাছে···

চকিতে লেনার মনে পড়ে যায় সেই 'প্রেমপত্রের কথা'—কিন্তু কাত্যার আজকের শোকটাও আন্তরিক, তার তীব্রতাও কিছু কম নয়। কাত্যা জানায় কেমন করে ওকে অফিসাররা ধীরে ধীরে এই নিদারুণ খবরটা শোনাবার জন্যে প্রস্তুত করতে থাকে। খবরটা বলার আগেই ও বুঝতে পারে, আর সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞান হোয়ে পড়ে, তখন ওরা তাড়াতাড়ি জল দিতে থাকে ওর চোখে-মুখে। আজও চলেছে সেই অসহ্য বিয়োগ-যন্ত্রণা, এই বিচ্ছেদের দুঃখ কোনো দিন শেষ হবে না—এ চিতার আগুন বুঝি কোনো দিনই নিববে না। কাত্যার সদাপ্রফুল্ল মুখখানি চোখের জলে ভাসতে থাকে।

—"দাদ্ধার কোনো চিঠি এসেছে এখানে?"—লেনা জিজ্ঞাসা করে।

—"সর্ব্বনাশ নেই কোথায়? সব জায়গায় আছে"—কাত্যার মায়ের গলা শোনা যায় দরজার আড়ালে—"শুধু কি আমাদেরই নাকি? সবার সর্ব্বনাশ হবে—সবার হবে সর্ব্বনাশ, কাউকে ছেড়ে যাবে না—"

কোনো চিঠিই আসেনি এখানেও।

সন্ধ্যায় লেনা গেলো দানিলভের বাড়ীর খোঁজে। শহরতলীতে বাড়ীখানা। উঠোনের সামনে ফটকটা বন্ধই ছিলো। চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। জানলা থেকে মৃদু আলোর আভাস আসছিলো—লেনা গিয়ে জানলায় টোকা দেয়। খুলে যায় জানলাটা, পর্দ্দাটা সরে যেতে চোখে পড়ে একটা অতি সাধারণ মুখ—শালেতে ঢাকা মাথাটা এগিয়ে আসে জানলার ধারে—দানিলভের স্ত্রী।

—"ইভান ইগোবিচের কাছ থেকে একটা প্যাকেট এনেছি।"

—"ভগবান্"—অস্ফুট আওয়াজ করে দানিলভের স্ত্রী।

লেনাকে উঠান পেরিয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসে ওর ঘরে। সেলাই-কলের পাশে একটা টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে—চেয়ার আর সোফার উপর স্তূপীকৃত বোনার পশম আর খাকী রঙের কাপড়। সোফাটার এক কোণে একটা বাচ্ছা ছেলে এক বাণ্ডিল পশমের গোলার উপর মাথা রেখে কেমন কুঁকড়ে একটা অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে ঘুমাচ্ছে।

—"এইখানে বোসো"—দানিলভের স্ত্রীর স্বরে তখনও কেমন জড়তা—"তুমিও বুঝি ঐ ট্রেনেরই?" একটা ছুঁচ নিজেরই ব্লাউসে বার বার করে বিঁধতে আর খুলতে খুলতে প্রশ্ন করে—"কেমন আছে সে? ভালো তো?"

—"হ্যাঁ ভালোই আছে—"

—"আচ্ছা, কবে শেষ হবে সে সম্বন্ধে কিছু ও বলেছে নাকি?"

লেনা বুঝতে পারে না প্রশ্নটা—"কিসের শেষ হবে?"

—"কেন যুদ্ধের? বাবাঃ, লোকের যথেষ্ট আশ মিটেছে।"

লেনা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। এই দানিলভের স্ত্রী? লেনা কিন্তু কল্পনায় একে ভেবেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

—"না, কিছুই বলেনি। সেই বা জানবে কোথা থেকে? এই যে এই প্যাকেট পাঠিয়েছে"—

—"আবার চিনি?"—খুলতে খুলতে দানিলভ-গিন্নী বলে চলে—"কি দরকার ছিল বাপু, নিজে না খেয়ে পাঠানোর, ভাণ্ডারে অনেক আছে। ওকে বোলো আমাদের জন্য যেন একটুও দুশ্চিন্তা না করে, আমাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, ওর নিজের কি কিছু কম দুর্ভোগ যাচ্ছে, এর উপর আর আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না।···"

লেনা ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে দেখে এবার প্রসঙ্গান্তরে যায়, —"ও ঘুমাচ্ছে। সময়ই পাইনি ওর জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দিতে—দেখছো তো কাজ নিয়েই আছি—বাড়ীতেও কাজ নিয়ে আসি।

এ সব সৈন্যদের জন্যে তৈরী করছি—বাড়ীতে করাই সুবিধা—ছেলেটাকে নার্সারীতে রাখতে ইচ্ছে করে না—বাড়ীতে তো তবু সারাক্ষণ দেখতে পারবো, ওখানে ওরা পেট ভরে খেতে দেয় কিনা জানি না। বাড়ীতে কাজ করি, তাই শ্রমিকের বরাদ্দ রেশনটাও তো পাই, ভালোই হয়। ওঃ, একটু দাঁড়াও, সামোভারটা জ্বালি···"

লেনা বাধা দিতে যায়। কোনো প্রয়োজন নেই এখন চা খাবার।

—"না, না, তা কি হয়? সে কি আমি পারি? তুমি দানিলভের খবর নিয়ে এসেছ আর তোমাকে আমি চাটুকুও খাওয়াবো না, সে কি হয়?"—

এই বলে দানিলভের স্ত্রী রান্নাঘরে চলে যায়। কাঠগুলোকে টুকরো করতে করতে এ-ঘরে উঁকি মেরে আবার বলে,—"এখন সব ঠিক হোয়ে গেছে—বাঁচা গেছে। কিন্তু যখন প্রথম রেশন চালু করা হয়, আমি তো দিশাহারা হোয়ে গিয়েছিলাম, ভাস্কাকে নিয়ে চালাবো কি করে দু'বেলা? কিন্তু এখন দেখছি সবই অভ্যাস—বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে। তাই বলে কি দানিলভকে আমি কিছু জানাই? সে বেচারা সাহায্য করবেই বা কোথা থেকে? একবার যখন এসেছিলো তখন তো নিজের চোখেই সব দেখে গেছে।···হ্যাঁ, ভালো কথা, দেশে-গাঁয়ে তো দু'-চার জন আত্মীয়-স্বজন আছে, তারাও ভাস্কার জন্যে দইটা, মাখমটা মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মারকুলেভও সাহায্য করে, তাছাড়া ট্রাষ্টের ডিরেক্টর তো গত বসন্তকালে কিছু কাঠ দিয়েছিলেন, এবারও দেবেন বলেছেন···তুমি কিন্তু এগুলো সব বোলো দানিলভকে, ভুলে যাবে না তো? লক্ষ্মীটি, মনে করে বোলো আমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই···ও যেন না ভাবে···"

—"আচ্ছা, তুমি নিজেই কেন চিঠি লিখে দাও না?"—লেনা জিজ্ঞাসা করে।

"হায় রে কপাল! আমার হাতের লেখা···তাছাড়া কাজ-কর্ম্মে একটুও সময় পাই না—"

রান্নাঘরে বসে ওরা চা আর আলু-সেদ্ধ খেলো। টেবিলের উপর একটা অয়েলক্লথ পাতা। সমস্ত বাড়ীখানাই বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। লেনার মনে হোলো এটা দানিলভের বাড়ীতেই আশা করা যায়। একটা কাচের বাটিতে লেনার আনা চিনিগুলো ঢালতে ঢালতে একটু অপ্রস্তুত ভাবে দানিলভের স্ত্রী বলে ওঠে—"অনেক দিন মাখনটা পাওয়া যায়নি—তাছাড়া এ মাসের রেশনটাও এখনও বিলি হয় নি—"

লেনা ভাবে, সত্যিই আজ ঘরে ঘরে দারুণ কঠিন দিন শুরু হোয়েছে।

—"আমি ভাস্কাটাকেও কাজ শেখাচ্ছি। ভগবান না করুন, যদিই হঠাৎ কিছু হয়, আমরা তো একেবারে একলা পড়বো, তখন যাতে ও যে কোনো কাজই করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করা ভালো—"

লেনার বিস্ময় শুধু বেড়েই চলে—কি আশ্চর্য্য! দানিলভ এখনও ওর স্ত্রীকে জানায়নি যে ট্রেনটা আর যুদ্ধ-সীমান্তে থাকছে না—এও কি সম্ভব?

—"আমরা তো যুদ্ধ-সীমানাতে আর যাই না; আমরা নিরাপদ এলাকাতেই আছি, ভাবনা নেই—"

—"কিন্তু একটা কিছু ঘটতে কতক্ষণ?—" ওর স্ত্রী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে—"এখন তো যুদ্ধের সময়—বোমা তো যেখানে-সেখানেই পড়তে পারে···"

ওর চিন্তাগ্রস্ত মুখটা ক্লান্ত অথচ কঠিন দেখায়, যেন যে-কোনো দুঃসংবাদ এখনি শুনতে প্রস্তুত।

আর লেনা ভাবে, ওরা কেমন করে একসঙ্গে থাকে? দানিলভের সঙ্গে ওর স্ত্রীর মেলে কোন্‌খানটায়? কি কথা ওরা বলে? উঃ, কি অসহ্য অবস্থা—দাস্তা আর লেনা?···ঈশ,, ওদের মত একটুও নয়···কোথাওই নয়···

পরদিন বাকী কাজগুলি সেরে লেনা 'হসপিটাল ট্রেন'কে ধরতে গেলো। কেন্দ্রীয় অফিস থেকেই ওকে নির্দ্দেশ দেওয়া হোয়েছিলো কোথায় যেতে হবে। 'জেড' জংশনে দাঁড়িয়েছিলো ট্রেনটা। ষ্টেশনটা একেবারে ভীড়ে ভর্ত্তি—যত ট্রেন, তত সৈন্য, তত জিনিষপত্র। ট্রেনের ভিতরটারও নিঃশ্বাস ফেলার জো নেই। ডাঃ বেলভ প্লাটফর্মে পায়চারী করছিলেন—পায়ের চাপে মাটীর উপর কয়লাগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মুরগীদের খাঁচাটার কাছে একটা মোরগও সমানে ডেকে চলেছে—প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে এক দল লাল ফৌজ, এক জন কুলী অবধি ঠেলাটা এক পাশে রেখে ট্রেনে উঁকি মারতে লাগলো। কস্ত্রামিন কাছেই দাঁড়িয়েছিল, মুখটা রাগে লাল—লাল ফৌজের দল হাসতে সুরু করলে। এক জন বলে উঠলো—"মোরগটা পারলে ট্রেনের তলা থেকেও ডাকবে। তেজী মন্দ বটে, হটবার পাত্র নয়—" সবাই হেসে ওঠলো। আর এক জন তরমুজের বিচি ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লে,—"তাহলে মুরগীর পিছুনেই চলেছে ফৌজের দল কি বলো?" ডাঃ বেলভ এগিয়ে এলেন। তখনও লাল ফৌজের দল হেসে গড়াচ্ছিল।

—"দেখছেন কমরেড, এদের কাণ্ডখানা একবার দেখছেন তো?"—কস্ত্রামিন অভিযোগ করে।

—"তাতে কি হোয়েছে, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়—"

—"একদিন কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে···"

—"পাগল! এস আমার কামরায়, কথা আছে"—ডাক্তার বেলভ নিয়ে যান ওকে।

যেতে যেতে দেখেন সুপ্রোগভ আট নম্বর গাড়ীর ছাদের উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে—মাথায় একটা গোল টুপি আর পরনে খাটো পাজামা। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আইয়ার কর্ম্মরত নিরাভরণ হাত দুটি দেখা যায়—শোনা যায় আলুর খোসা ছাড়ানোর যন্ত্রটার শব্দ—আর সোবোলের গলা।

—"কোনো মানে হয় একই মাপে রেশন বরাদ্দ থাকার—অগরোদিন্‌কোভা নেই যখন এক জনের তো কমে যাবে, তাছাড়া নিযভেটস্কিরও তো কোলাইটিস—তাহলে দু'জন"···' জীবনের একখানি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমাদের এই ট্রেনটি' চল্‌তে চল্‌তে ডাক্তার ভাবেন। মনে পড়ে প্রথম বারের যাত্রার কথা। যে কামরাটাতে এসে দাঁড়ালেন, বোমার ঘায়ে সেটা জ্বলে-পুড়ে ভেঙ্গে একেবারে নষ্ট হোয়ে গিয়েছিলো, আর আজ কিনা সেই গাড়ীতেই

মুরগীরাও ডিমে তা দিচ্ছে। 'এই তো স্বাভাবিক, এই-ই তো ভালো' ক্লান্ত মনে ডাক্তার ভাবেন—ভাবতে চেষ্টা করেন। লেনা যাওয়ার পর থেকে ওঁর দুশ্চিন্তা যেন আরও বেড়ে গেছে। যে সব যুক্তি এত দিন সামনে খাড়া করে মনকে প্রবোধ দিয়েছেন আজ সেগুলিকে নেহাৎ ছেলেমানুষী মনে হয়। যদি ওর পাঠানো পার্শেলটা লেনিনগ্রাদে পৌঁছেও থাকে, তবুও ক'টা দিন চলতে পারে তাইতে?···এক মাস বড় জোর···তারপর···? আর ক'দিনের মধ্যেই তো জানতে পারবেন সবই। একটা চিঠিও যদি এসে থাকে—উঃ, বুকের ভিতরটাও কেমন করে ওঠে ভাবতে··· সোনেচকার লেখা, প্রতিটি অক্ষরের টানও যে তাঁর মুখস্থ! বেশী নয়, একটা চিঠি···না, না, একটাই বা কেন? একতাড়া চিঠি··· উঃ, যদি একটাই না হয় আসে তারা আছে···বেঁচে আছে শুধু এই খবরটা নিয়ে···

গত বছরের জুলাইএর সেই দিনটার মতই গরম দিনটা আজ। তবে এটা লেনিনগ্রাদও নয় আর প্রতিটি লাইনে ট্রেনের তত ভীড়ও নেই···আর তাই বুঝি ধূসর পোষাক-পরা সোনেচকার সেই চির-পরিচিত চলার ভঙ্গীটিও চোখে পড়ে না।

ডাঃ বেলভ দানিলভের কাছে যান খোঁজ নিতে লেনা কবে আসবে—শুনলেন এখনও আট দিন পরে। আট দিন? নাঃ, দশ দিন ধরে রাখাই ভালো, একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। নোট-বইতে দশটা পর পর তারিখে রঙীন পেন্সিলের দাগ আঁকা রইলো।

একটা জরুরী তার এসেছে, অনেকগুলি আহতকে যত শীগগির সম্ভব হসপিটাল ট্রেনে তুলে নিতে হবে। যত দূর সম্ভব দ্রুতগতিতে চলেছে তাই ট্রেনটা। সন্ধ্যাবেলা। ডাক্তার বেলভ নোটবইএর পাতা ওল্টালেন···সাত দিন হোলো, এখনও তিন দিন বাকী ডাক আসতে। দরজায় করাঘাতের শব্দ···কন্দ্রামিন।

—"বোসো বোসো",—ডাক্তার বললেন—"বলো, খোলাখুলি ভাবেই কথা বলো, যেমন মানুষ সাধারণ ভাবে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলে—"

কন্দ্রামিন বসে পড়ে।

—"এবার বলো কি তোমার অভিযোগ?"

—"কমরেড কমাণ্ডাণ্ট, আপনি তো আর ছেলেমানুষ ন'ন, আমার অবস্থায় যে-কোনো লোকই রাগের জ্বালায় পাগল হবে। আমি কি স্বেচ্ছাসেবক হোয়ে যুদ্ধে নাম দিয়েছিলাম মুরগীর ছানা চরাবো বলে? এটা 'হসপিটাল ট্রেন' আমার ধারণা আমাদের কাজও যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে···"

—"আহা, তা' বটে, তবে বুঝলে কিনা মুরগীর ডিমগুলো তো আহতদের পক্ষে খুবই উপকারী, খুবই স্বাস্থ্যকর"—ডাক্তারের মুখে সরল কৌতুকের আভাস—"তবে বুঝলে কিনা, সবাই বলে চাষবাসের ব্যাপারে তুমি খুব পাকা লোক,···তোমার এক রকম নেশাই ছিলো বলতে গেলে···"

কন্দ্রামিন ঘাড় নাড়ে।

—"ঠিক কথা। ছোট্টো থেকেই চাষের কাজে আমি পাকা। বাড়ীতে ছাগলও পুষেছি—কিন্তু সেখানে এক রকম আর এখানে তো আর এক রকম ব্যাপার। না, শুয়োরগুলো তো রয়েছে ট্রেনে, তাতে তো আমার আপত্তি নেই···লগেজ-ভ্যানে আছে চুপচাপ পড়ে···কেউ দেখতেও পায় না···কিন্তু নিকুচি করেছে ঐ মুরগীর ছানাগুলোর···কিলবিল করছে সারাক্ষণ···কার চোখ এড়াবে?"

—"আহা, কন্দ্রামিন চটো কেন? এ সব তুচ্ছ ব্যাপার বুঝলে কিনা—এমন দিন আসবে যখন ওগুলো সাদা সস দিয়ে তোফা আরামে খেতে পারা যাবে···"

হঠাৎ শোনা গেল একটা চীৎকার চেঁচামেচি গোলমালের শব্দ—অনেক লোকের দ্রুত যাওয়া-আসার শব্দ। কন্দ্রামিন উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি,—"দেখে আসি ব্যাপারটা কি হোলো।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও তো শীগগির"—ডাক্তারও ব্যস্ত হোয়ে উঠেছেন।

—"কমরেড কমাণ্ডাণ্ট! ডাক এসে গেছে!"

আধ-খোলা দরজায় দেখা যায় দানিলভের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা।

—"লেনিনগ্রাদ থেকে আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে—"

—"কই কই, দাও···আমার হাতে দাও"—প্রবল উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে যায় ডাক্তারের, প্রসারিত হাতখানি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে দানিলভ যে চিঠিটা পেলো—সেটা একখানি ছোট্টো নীরস চিঠি। তাতে শুধু জানানো ছিলো—কমরেড, তুমি যে কাজে আছো সেখানেই থাকো, আর কাজের দিকে নজর রেখো, কারণ একদিন কাজের কৈফিয়ৎ দেবার দিন আসবে······

দানিলভের মুখটা অল্প লাল হোলো। যত্ন করে চিঠিটা মুড়ে বুকপকেটে পার্টির সভ্য-কার্ডের সঙ্গে রেখে দিলে।······আর একখানি চিঠি স্ত্রীর কাছ থেকে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলে—ক'ই বা পড়বার আছে, সবাই ভালো আছে, আত্মীয়-বন্ধুরা শুভেচ্ছা জানিয়েছে······যাক্ গে, লেনা ওকে ঢের বেশী খবর দিতে পারবে। সত্যি চমৎকার মেয়ে······কী ক্ষিপ্র লঘুগতি, কেমন অনায়াসে এ-ট্রেন থেকে ও-ট্রেন চলে গেল—নাঃ, এবার দেখা যাক্ কে কে চিঠি পেলে—কি রকম খবর সব এলো। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দেখলে জুলিয়া সুপ্রাগভ আর ফাইনা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে—ফাইনা সুপ্রাগভের কাঁধে হাত রেখে বলছে। দানিলভের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ-গম্ভীর স্বরে সুপ্রাগভ জানালে—"খারাপ খবরই এসেছে আমার, মা মারা গেছেন—"

দানিলভ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলে। ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না যে-লোকটাকে ও আন্তরিক ভাবে অপছন্দ করে, তার বিপদের কথায় কি ভাবে সমবেদনা জানানো উচিত। ওর ভদ্র মনটা বলে ওঠে কিছু একটা বলা উচিত।

—"কত বয়স হোয়েছিল?"

—"আটাত্তর পার হোয়েছিলো···"

—"ওঃ, অনেক বয়স হোয়েছিলো তো?" বলতে বলতে এগিয়ে যায় দানিলভ ডাক্তার বেলভের ঘরের দিকে। কি খবর তিনি পেলেন দেখা যাক্।

ডাঃ বেলভ একটা ডিভানের উপর বসে, সেই যেটার উপর একদিন সোনেচকার সঙ্গে পাশাপাশি বসেছিলেন। দানিলভ ঢুকেই যেন পাথর হোয়ে গেল—কী আশ্চর্য, দশ মিনিট আগে যে লোকটাকে চিঠি পাবার আনন্দে অত উত্তেজিত হোয়ে উঠতে দেখা

গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে তার এ কী পরিবর্তন! কি অসহায় আর্ত্ত বিবর্ণ মুখ! চোখ বসে গেছে, গাল দুটো ঝুলে গেছে। যেন এতটুকু জীবনের আভাস অবধি নেই!

টেবিলের উপর খোলা চিঠিখানা পড়ে আছে দেখে দানিলভ সেটা তুলে নিয়ে পড়লে। ডাক্তার বেলভ ওর মুখের দিকে বোবার চোখে চাইলেন। দানিলভ বসে পড়লো ডাক্তারের পাশে—ওর মুখে এলো না একটি কথাও। হঠাৎ সজোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কী যেন বলতে গেলেন ডাক্তার—জলে ভাসতে লাগলো চোখ দুটো, আর অসহায়ের মত হাত দুটো শূন্যে বাড়িয়ে কী যেন ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে কাঁপতে কাঁপতে ঝুলে পড়লো।

—"উঃ, তুমি ভাবতে পারছো না—ভাবতে পারছো না······"

ডাক্তার বলতে চাইছিলেন দানিলভ ভাবতেই পারবে না সোনেচকা আর লায়লা কত বড় কত অসাধারণ ছিলো—ওরা যেন স্বর্গের দেবী ছিলো; মাটীর পৃথিবীর মালিন্যের অনেক ওপরে··· আর, আর ডাক্তারের কাছে ওরা কি ছিলো···ওঁর মনের কতটা জুড়ে ওরা ছিলো সে কি বুঝবে দানিলভ?···কিন্তু কোনো কথা বলার ক্ষমতাই রইলো না। দুই হাতে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ ডাক্তার—শুধু ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো চওড়া কাঁধের পেশীগুলো। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঝরতে লাগলো অজস্র ধারায় চোখের জল।

দানিলভ কথা বলতে পারলে না, স্থির-গম্ভীর হোয়ে বসে রইলো। ওর মুখটাও বিবর্ণ হোয়ে গিয়েছিলো শুধু চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিলো। ডাক্তার ক্রমেই অধৈর্য্য হোয়ে পড়ছেন দেখে দানিলভ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ফাইনাকে ডেকে বলে দিলে ওঁকে ব্রোমাইড দিয়ে ঘুম পাড়াও। যতক্ষণ না সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন দানিলভ আর ফাইনা কাছে রইলো। কিন্তু ঘর থেকে বেরোতেই ফাইনা হঠাৎ কেঁদে ফেললে। কান্নাভেজা গলায় বার বার শুধু বলতে লাগলো—"আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও যদি ওঁকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারতাম!"

—"আর আমি"—দানিলভ বললে,—"আমার কি ইচ্ছে করছে জানো? যে শয়তানরা আমাদের এই সর্ব্বনাশ করছে তাদের একটাকে অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে দুই হাতে টিপে মেরে ফেলতে!"

সেই রাতে আবার ট্রেনেতে আহতদের ওঠানো হোলো। কিন্তু ডাক্তারকে কেউ আর জাগালে না। দানিলভ আগেই বলে দিয়েছিল কমাণ্ডাণ্ট অসুস্থ···যা-কিছু সই-সাবুদের দরকার সে সব করবে সে আর সুপ্রাগভ। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই সে ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দেওয়া সুরু করলে। ডাক্তারকে স্নান করতে অনুরোধ করলে,—নানান কাজে বার বার ডাকতেও সুরু করলে। ডাক্তার বুঝলেন দানিলভ কি চায়। ওভারলটা পরে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে প্রতিদিনের মত।

কামরার পর কামরা ঘুরে ঘুরে চলেছেন ডাক্তার—প্রতিটি পদক্ষেপ অসংলগ্ন। সবার মুখের দিকেই কেমন এক ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইতে থাকেন—কি যেন খুঁজতে থাকেন। ফাইনা আর স্মির্নোভা সব সময় থাকে পাশে পাশে, পড়ে শোনায় প্রতিটি রোগীর ইতিহাস। ডাক্তার শুনতে থাকেন, রোগীকে দেখতে থাকেন সেই একই ব্যাকুল আগ্রহে। ওঁর ভয় হয় পাছে কিছু ভুল করে বসেন, পাছে কিছু বুঝতে ভুল করেন। মনে হয় বুঝি সব ভুলে গেছেন কেমন করে রোগী দেখতে হয়, চিকিৎসা করতে হয়, চিন্তা করতে হয়··· বুঝি পড়তেও ভুলে গেছেন। পৃথিবীটা কেমন যেন নিষ্প্রভ, বিস্বাদ, মৃতের মত লাগছে···পৃথিবীতে আছে নাকি রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ?··· সত্যিই তো কেমন করে সেই দুনিয়া একই রকম থাকবে যদি সেখানে সোনেচকা আর লায়লাই না রইলো?···

কিন্তু ক্রমেই ঘুরতে ঘুরতে, রোগের বিবরণ শুনতে শুনতে ডাক্তারের চিন্তাধারাটা স্থির হোয়ে উঠলো,—ক্রমেই বোধগম্য হোতে লাগলো রোগী আর রোগ—কর্ত্তব্য আর দায়িত্ব। কাজের ব্যস্ততার মধ্যে আবার যেন ফিরে এলো পুরোনো পৃথিবী—আবার যেন খুঁজে পেলেন নিজেকে।

সোনেচকা আর লায়লাকে হারিয়েও পৃথিবীটা তেমনি একই ভাবে চলেছে? উঃ, এ কি কল্পনা করা যায়···কি দুঃসহ, কি অসহ্য এ চিন্তা···অথচ কত নিরুপায় মনে হয় নিজেকে। ওঃ মনে পড়েছে···বিশ নম্বর রোগীকে দেখতে যাবার কথা বলে গেল না দানিলভ?

বিশ নম্বর আহতটির চেহারা বেশ বলিষ্ঠ, বয়স প্রায় ত্রিশ, কোঁকড়ানো চুল, টকটকে গোলাপী রঙ। সার্টটা খুলে, বিছানার চাদরটা তুলে শুয়ে আছে—কি সুগোল কাঁধের গড়ন, ঠিক মেয়েদের মত। নাম লুটোখিন—পায়ের ক্ষত সামান্য, আসলে জখম হোয়েছে ব্রেন। ডাক্তার বিবরণ শুনলেন লুটোখিন, ইভান মিরোনোভিচের।

—"কিছু কষ্ট হচ্ছে?"

—"হ্যাঁ, সব সময়ই আমার ভীষণ গরম হয়—" লুটোখিন জানায়—"হাসপাতালে ওরা আমায় খুব স্নান করাতো, স্নান করালেই আমি ভালো থাকি, নইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে··· সারাক্ষণ জ্বলে যায়।"

তার পরই গোঙাতে সুরু করলো, কখনও চীৎকার করে, কখনও নাটুকে ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চোখ দুটো লাল করে ফেললে।

—"উঃ, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না—"

—"কিন্তু আমাদের তো শুয়ে স্নানের জন্যে বাথটব নেই, ঝরণা কলের ব্যবস্থা আছে অবশ্য। ভালো করে না হলেও স্নান হবে তোমার···"

—"কী হবে ছাই শুনি ঐ ঝরণা কলে?" লুটোখিন খিঁচিয়ে ওঠে—"আমি শুয়ে স্নান করবো। টবের জলে যতক্ষণ ইচ্ছে শুয়ে থাকবো—"

সমানে চেঁচাতে লাগলো লুটোখিন। পরীক্ষায় দেখা গেলো অল্প একটু ব্লাডপ্রেসার আছে ওর। অন্য রিপোর্টগুলো ফাইনা যা দিলে তা স্বাভাবিকই। খিদেও আছে, পেটও ভালো।

—"তবে আর কি, শোনো লুটোখিন, এমন কিছু সাংঘাতিক তোমার হয়নি। যে ক'টা দিন ট্রেনে আছো একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো। হাসপাতালে গেলে সেখানে ভালো স্নানের ব্যবস্থা পাবে—আর গরমে কষ্ট পাবে না—"

ডাক্তারের কথা শুনে লুটোখিন রেগে ক্ষেপে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি সুরু করে দিলে।

—"আরে চুপ চুপ, ট্রেনেতে মেয়েরা রয়েছে যে"—ডাক্তার এগিয়ে যান।

লুটোখিন আবার চীৎকার করে উঠলো—"কোথায় পালাচ্ছো, আগে একটা স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও—"

—"বিশ নম্বর আহতের জন্যে ঐ ঝরণা কলেই স্নানের বন্দোবস্ত করে দাও স্মির্ণোভা"—ফাইনা শুধু বলে উঠলো,—"ওর জন্যে কিছুই আর করবার নেই।"

স্নানের ব্যবস্থা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোয়ে গেলো। কিন্তু যখন স্মির্ণোভা ওকে নিতে এলো, তখন মনে হোলো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের এক জন আহত সৈনিক বললে,—"ঝিমোচ্ছে, যেই তোমরা চলে গেলে অমনি ঐ রকম চুপ করে নিঃঝুম হোয়ে পড়লো। ওকে এখন অমনিই থাকতে দাও। ওর উপর বেশী মনোযোগ না দিলেই ও ভালো থাকবে—"

লুটোখিন বালিসে মুখ গুঁজে পড়েছিলো। এক ধার থেকে চেরীর মত টুকটুকে কানের পাতা, আর ঘন গোলাপী গালের একটুখানি দেখা যাচ্ছিল। "ঘুমোক একটু নিশ্চিন্ত হোয়ে" বলে স্মির্ণোভাও চলে গেলো।

কিন্তু পরে যখন খাবার সময় সবাই খেতে বসেছে, তখন ফাইনা হঠাৎ ছুটে এলো ব্যস্ত-বিস্মিত মুখে। এসেই ডাক্তার বেলভকে জানালে লুটোখিন মারা গেছে।

মস্তিষ্কের অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলেই গেছে।

'হসপিটাল ট্রেনে' এই প্রথম মৃত্যু ঘটল। অবশ্য স্কোভে সেই পেটের ক্ষত নিয়ে যে মেয়েটিকে আনা হোয়েছিলো তার কথা বাদ দিলে। কারণ তাকে আনার সময়ই তো সে মরতে বসেছিলো।

লুটোখিনের মৃত্যুটা সবার মনেই কেমন একটা হতাশার ভাব এনে দিলে। সবারই কেমন অপরাধী মনে হোতে লাগলো নিজেকে—অথচ প্রকৃত দোষ তো কারোই নয়।

—"যাই হোক্ না কেন"—ডাক্তার বেলভ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—"আমার মনে হয়, ওকে এই অবস্থায় ট্রেনে পাঠানোই অন্যায় হোয়েছে। ব্রেনেতে আঘাত লেগেছিলো, ট্রেনের ঝাঁকুনীতে সেটা তো ভীষণ ক্ষতিকর। কিন্তু ভাগ্য! গত দু'সপ্তাহের মধ্যে ওর কোনো কষ্ট হয়নি, সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠছিলো বলেই না ওরা পাঠালে। কিংবা হয়ত আমারি দোষ···"

কি একটা আত্মগ্লানি যন্ত্রণা দিতে লাগলো ডাক্তারের বিষণ্ণ সন্ত ব্যথাতুর মনকে। যদিও ডাক্তার ভালো করেই জানতেন এ সব রোগ সহজে চেনা যায় না—ভীষণ জটিল, যে-কোনো মুহূর্তে বাঁকা দিকে যায়···তবু···

"কে জানে হয়ত ওর বাড়ীতে একটি অল্পবয়সী বউ আছে, ছেলে-মেয়েরা আছে···বউ···ছেলে-মেয়ে···আর আজ তারা অনাথ হোলো! কেন···? কেন···? না, এক জন অথর্ব্ব, বৃদ্ধ ডাক্তার ভালো করে তার রোগীকেও দেখতে পারেনি বলে। কিন্তু কেন এমন হবে? আমার বিপদ হোয়েছে, আমার নিজের শোক-দুঃখের জন্যে অন্যের এমন ভাবে সর্ব্বনাশ হবে? কেন লুটোখিনের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা তাঁর যন্ত্রণা-কাতর মনের অবহেলায় আজ অনাথ হোলো? ছিঃ ছিঃ, যদি কোনো শাস্তি থাকে এর··· আমি এগিয়ে যাবো···স্বীকার করবো আমার অপরাধ, প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত আমার···আমি কি না একটা লোকের জীবন নষ্ট করলাম, আকার নিজের দুঃখের জন্যে! ওরা সবাই অবশ্য বলবে আমার দোষ নেই এতে, এটা হোলো আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু, উঃ, আমার নিজের মনের কাছেও যদি আমি সত্যিই বলতে পারতাম আমি প্রকৃত দোষী নই···কি শান্তিই না পেতাম। আর এ কী যন্ত্রণা, এ কী অশান্তি আমার···

টেবিলের উপর দুই হাতে মাথা রেখে ডাক্তার বসে। সামনে একটা কাগজ চাপা দেওয়া একখানি চিঠি—এক জন পুরানো বন্ধু জানিয়েছেন ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাদের উপর প্রথম বোমাবর্ষণেই সোনেচকা আর লায়লার মৃত্যু হোয়েছে······।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

পায়রা

শ্রীঅবিনাশ রায়

আমার পোষা পায়রাগুলি খুঁটে খুঁটে খায় দানা
ছোট্ট শরীরে তুলোর মতন পালক-মোড়া ডানা
আদিম কালের সন্ধানী চোখে অস্তলাস্ত আলো
সকাল-সন্ধ্যা বেঁচে থাকবার উদগ্র নিশানা
জলদ-ঠোঁটে অবিকল নাচের ফিনিক্ ছড়ালো।

আমার পোষা পায়রা যখন উড়ে আকাশের গায়
হাওয়ার তারে মীড়-মূর্চ্ছনা নিখাদ-পাখায়
খিলি মেঘের মলাট ছিঁড়ে নীলের সাগরে মিশে—
যাযাবরী-চোখে দৃষ্টি চলে না। শরীরে কান্না পায়
পোষা পায়রার কাঁপা বুক নড়ে পাঁচিলের কার্নিসে।

আমার পোষা পায়রাগুলি একে একে আসে উড়ে
গুমোট ঘরের কাঠের আবাসে সময়ের আলো ঘুরে'
আকাশের যত নীল আছে সব রোদ্দুর মেখে ডানা
পায়রা যদি হতাম আমি এক। নরম ফুরফুরে
দেহের কামনা আমার শরীরে নড়ে। রাত্রিতে রাতকানা।
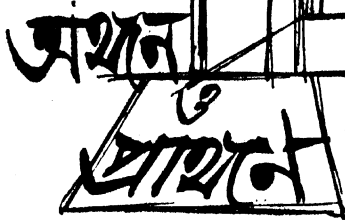
সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ঋতু-মাসের কয়েকটি বিশেষ দিনেই নারী তার স্বামীকে বিশেষ ভাবে পেতে চায় এবং এই সময়টা তাঁর ঋতু-মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে এসে থাকে। শ্রীমতী মেরী ষ্টোপস্ এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে এই দিনগুলো বের করতে সমর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি ঋতু-মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে নারীর স্বামীকে কাছে পাবার কারণটিও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই দিনগুলো বের করারও নূতন এবং সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মেয়েরা যদি নিয়মিত ভাবে তাঁদের শরীরে উত্তাপ নেন তাহলে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। ঋতু সুরু হবার সময় থেকে প্রাত্যহিক উত্তাপ একটু কমে যাবে। এই কমতি চলবে ঋতু সুরু হবার পর ১০।১২ দিন পর্যন্ত। এই সময় এক দিন দেখা যাবে যে উত্তাপ হঠাৎ আরও কমে গেছে এবং এর ২।১ দিন পরে দেখা যাবে যে উত্তাপ বেশ বেড়ে গেছে এবং ঋতু-মাসের প্রথম দিককার শারীরিক উত্তাপকেও ছাড়িয়ে গেছে—এই অবস্থা চলতে থাকবে ঋতু-মাসের শেষ পর্যন্ত। ঋতু-মাসের ১০।১২ দিনের সময় ঐ যে উত্তাপ কমে যায় দেখা গেছে, ঐ সময়ই ডিম্বকোষ প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে এবং ঐ সময় সহবাস করলে সন্তানের জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তাপ কমে যাওয়ার (১০।১২ দিনের সময়) এক দিন আগেও যদি সহবাস করা যায় তাহলেও সন্তানের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, পুং-বীজ নারীদেহের ভিতর ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে ঋতু-মাসের ১০ দিনের পর থেকে শরীরের উত্তাপ বেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সহবাস না করলে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। তবে বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে ২।১ দিনের তফাৎ হতে পারে; কারণ সব নারীর ঋতু-মাস সমান দিনে পূর্ণ হয় না। উল্লিখিত কয়েকটি দিন সহবাস না করে ঋতু-মাসের আর যে-কোন দিন সহবাস করলে সন্তানের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে না—তবে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে ঋতু-মাসের প্রথম ৩।৪ দিন সহবাস না করা বাঞ্ছনীয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার খরচ নেই, কোন কৃত্রিমতা নেই এবং এই প্রথা সম্পূর্ণ ভাবে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত।

আপনি যদি সুন্দরী হন…

ব্রায়েন জে হেয়স্

মনে করুন আপনি অসামান্যা সুন্দরী। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শুধু ওই একটি কারণেই ইতিহাসে আপনার নাম টোকা রইলো এটা একটু দৃষ্টিকটু নয় কি? আপনি যাঁর কথাই বলুন না কেন, তিনি ট্রয়ের হেলেনই হোন আর ক্লিওপেট্রাই হন, জিজ্ঞাসা করা যদি সম্ভব হোত তো নিশ্চয়ই জানা যেত শুধু এই একটি মাত্র কারণেই অমর হয়ে থাকা তাঁরা কেউ-ই পছন্দ করছেন না।

এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক, বিয়ের আগে অবধি জোরপাল্লায় অন্ততঃ ত্রিশটি গ্রীক রাজপুত্রকে তিনি হাতে করে নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন, কিন্তু এ কথায় একটু সন্দেহ থাকা খুবই স্বাভাবিক যে ট্রয়ে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘ দশ বছর আটক কয়েদীর জীবন যাপন করাটা তাঁর পক্ষে খুবই আনন্দের হয়েছে কি না?

কিন্তু সত্যি কথা বলতে হেলেনের কতটুকুই বা আমরা মনে করে রেখেছি? কতটুকু মনে করে রেখেছি তার শেষ বয়সের দুঃখ-কষ্টের? শুধু মনে করে রেখেছি হেলেন নামে এক জন অসামান্যা সুন্দরী মহিলা ছিলেন। কিন্তু মনে করে রেখেছি কি শেষ অবধি তাঁর মত অসামান্যা সুন্দরী মহিলারও শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটল গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে-রাখা কালে?

তবু আমরা শুধু মনে করে রেখেছি, তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। যদিও 'ইলিয়াড' গ্রন্থে তাঁর সৌন্দর্য্যের পুরোপুরি বর্ণনা নেই, ইঙ্গিত আছে মাত্র, বলা আছে, "ট্রোজানদের দোষ দিতে পারি না, কারণ হেলেন অত্যন্ত সুন্দরী, দেখলে তাঁকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলে ভ্রম হবে।"

মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, হেলেন দেখতে কেমন ছিলেন? কেমন দেখতে ছিলেন ক্লিওপেট্রা? আমাদের জানবার কোন উপায় নেই এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশই জানতে খুব উৎসাহীও নই।

ক্লিওপেট্রার, যদি শেক্সপীয়রের কথাই মেনে নিতে হয়, তবে সৌন্দর্য্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু জিনিষ ছিল যার জন্য তাঁর সৌন্দর্য্য এত খ্যাত। তাঁর ছিল অপূর্ব সুষমা আর অসামান্য বাক্‌পটুতা। সর্বোপরি ছিল একটা চমক, যাকে ইংরাজীতে বলতে পারি চার্ম, আর সেইটিই ছিল তাঁর সব চেয়ে আকর্ষণ। কিন্তু এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি ছিলেন রাজ্যের রাণী, কবি আর ঐতিহাসিকেরা তাঁর কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অতিরঞ্জন করেছেনই। তাই সব-কিছু থেকেই কিছুটা আমাদের বাদ দিয়ে নিতে হবে।

রাজকীয় পরিবেশের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ আমার নেই, তাই গতায়াতও কম, কিন্তু ওরই মধ্যে মনে পড়ছে রাণী Eugenieর কথা। এক চায়ের আসরে দেখেছিলাম বৃদ্ধাকে, সবিস্তারে বর্ণনা করছেন, এত বেশী বয়সেও চশমা ছাড়াই তিনি বেশ পড়াশোনা করতে পারেন।

আরও এক জনের কথা মনে আসছে—তিনি রাণী আলেকজান্দ্রা। আমার মাকে বোঝাচ্ছেন এক ভোজসভায় যে ছোট হলেও আমাকে আর একখানা চকোলেট-কেক দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের সম্পর্কে স্মৃতি খুব স্বচ্ছ নয় কিন্তু মিসেস ল্যাংট্রি—যাঁকে হাইড পার্কে একটি বার মাত্র চোখের দেখা দেখবার জন্য লোকের ভীড় জমতো, হায়! তাঁকে যদি আমি দেখতে পেতাম কিংবা আরও পেছিয়ে গিয়ে Duchess of Leinster যিনি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মারা যান, যখন তাঁর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি শিখরচুম্বী তখনকার তাঁকে যদি দেখা সম্ভব হত কোনও প্রকারে আজ।

আজ যাঁর কথা ভাবলেও রোমাঞ্চ জাগে সেই Comtesse de Castiglione, সৌন্দর্য্যের খ্যাতি কমে এলে যাঁকে তাঁর স্তাবকের দল কখনও দেখেনি দিনের আলোয় তাঁর অন্ধকার ড্রইং-রুমের বাইরে। মাথা মোটা, সুন্দরী মেয়েরা অধিকাংশ অবশ্য তাই হয়, মাদাম Recamierএর কথা এবার আমার মনে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনাও মাথায় ঘুরছে সুন্দরী মেয়েরা বেশীর ভাগই কেন গবেট হয়?

আপনার নাক যদি বাঁশীর মত টিকালো হয় তো আপনার মাথায় গোবর পোরা থাকলেও কিছু এসে-যাবে না। আবার

এমনও দেখা যায়, কোন কোন সুন্দরী মেয়ে তাদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানী। বেশ সাজগোজ করা সুন্দরী মেয়ে অথবা আলুলায়িত কেশ অযত্ন-বৰ্দ্ধিত রুক্ষ কোন সুন্দরী মেয়ের মধ্যে আপনি কোন্‌টি পছন্দ করবেন ?

শেষেরটি যদি আপনার পছন্দ হয় তো দু'টি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ছে। একবার Serilleতে একটি জিপসী মেয়ে দেখেছিলাম, হরিণীর মত চঞ্চলা অথচ অপূর্ব সুষমামণ্ডিত রূপ আর হাইড পার্কে অসহায় ভাবে বসে থাকা আর একটি মেয়ে, ছেঁড়া জুতো পায়ে, লাল রঙের একটা স্কার্ফ গায়ে, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী।

এ স্মৃতি দু'টো প্রায় ভুলে যেতে বসেছি, কিন্তু সদ্য সদ্য মনে পড়ছে আর একটি মেয়ের কথা। পাড়াগাঁয়ে এক নাচের আসরে তার সঙ্গে দেখা। বয়স আমারই সমান, আঠারো। ধানের পাকা শীষের মত গায়ের রঙ।

সে এসেছিল। রাতে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকে গেলে আস্তে আস্তে কপাট ঠেলে আমি যে ঘরে শুয়েছিলাম সে ঘরে এসেছিল। উজ্জ্বল ফায়ারপ্লেসটির সামনে মেজের ওপর সে বসেছিল। স্বীকার করতে কোনও আপত্তি নেই, জীবনে এত রূপ আমি কখনো দেখিনি। রাত্রিবাস তার অঙ্গে, সোনালী চুলে রূপালী ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভা যেন ছিটকে ছিটকে আসছিল, নীল আয়ত চোখ, যার তুলনা নেই। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য তার গায়ের ধানী রঙ। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন কেউ এক জন আলোকবর্ত্তিকা হাতে ঘরে এসেছে। যদি তার মাথায় গোবর পোরা থাকে, থাকুক গে।

সৌন্দর্য্য কি, আমি তার ব্যাখ্যা করতে বসিনি, কেউ কি তা পেরেছে ? মেয়েটি কতখানি লম্বা, গায়ের রঙ গোলাপী না দুধে-আলতায়, চতুরা না চপলা বলেই কি আপনি বোঝাতে পারবেন যে মেয়েটি সুন্দরী ? এ সব-কিছুর উপরেও অনেক কিছু আছে যা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা, জাতিগত বৈষম্যের কথা, আরও কত কি ? সৌন্দর্য্যের প্রভেদ থাকতে পারে কালের পার্থক্যেও। মাদাম Recamierএর সঙ্গে হেলেন বা ক্লিওপেট্রাকে তুলনা করা যাবে না। বলি দ্বীপের এক জন নর্ত্তকীর সঙ্গে তুলনা করা চলবে না হাইড পার্কের এক জন রমণীর। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলতে পারি, সৌন্দর্য্যের অনেকখানিই হোল 'চার্ম'।

কিন্তু এই 'চার্ম' কি ? সৌন্দর্য্যের মত এর ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। মোটামুটি বলতে পারি এটা সহজাত। অন্তরের অন্তস্তল হতে এর জন্ম। সৌন্দর্য্যের এ রক্ষাকবচ।

সব চেয়ে 'চার্মিং' মেয়ে যা আমার নজরে পড়েছে, তিনি হলেন এ্যালেন টেরী। দু'-এক বার তাঁকে দেখেছি এবং আমার তরুণ মনে দাগ রেখে যাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তাঁকে সুন্দরী বললে কমিয়ে বলা হবে। তিনি ছিলেন যাদুকরী, আরও ভাল ভাবে বলতে পারি মোহময়ী। খুব উৎকৃষ্ট কোন কবিতায় বা গানে যেমন মাদকতা আছে তেমনি মাদকতা আছে এ্যালেন টেরীর সৌন্দর্য্যে।

এই মাদকতাই বোধ হয় 'চার্ম'। এ না হলে কোন সুন্দরী মেয়ের প্রতি আপনি ফিরে তাকাবেন না, দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যাবেন, পাশের বন্ধুকে বড় জোর বলবেন, 'মেয়েটি দেখতে বেশ,' যেমন কোন দিন কোন যাদুঘরে কোনও এক মোনালিসার ছবি দেখে আপনি বলেছেন।

সব চেয়ে শেষে আমার বক্তব্য, বেশী সৌন্দর্য্য নিয়ে জন্মানোটাই যেন ভাল নয়। তা রক্ষার জন্য আপনাকে খাটতে হবে দিন-রাত। কি গভীর পরিতাপের, হেলেন আর ক্লিওপেট্রার অনেক অনেক নীচে ইতিহাসের লিষ্টে আপনার নাম লেখা থাকবে এবং লেখা থাকবে শুধু এই জন্যেই। সত্যিই সৌন্দর্য্য নিয়ে পৃথিবীতে আসা এক ভয়ানক দায়িত্ব, এবং আপনি যদি সুন্দরী হোন তো সে দায়িত্ব আপনাকে বইতেই হবে !

অনুবাদিকা—মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দময়ী মা

(অবশিষ্টাংশ)

নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

"আপনার ত ঠাণ্ডা-গরম ভেদাভেদ নেই। একটা জলন্ত কয়লা যদি আপনার পায়ের ওপর পড়ে, আপনার কি কষ্টবোধ হবে না ?" "দিয়ে দেখ না কেন ?" জবাব এল অমনি।

এরই ক'দিন পরে। লোম পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন ? এক জন রান্নাঘরে উঁকি দিলে। নির্ম্মলা উনুন থেকে জলন্ত কয়লা উঠিয়ে পায়ের ওপর রেখেছেন।

"দেখলাম কেমন লাগে। কিন্তু সত্যি বলছি, একটুও কিছু বুঝলাম না। এ ত খেলা ছাড়া কিছুই নয়। অঙ্গারটি কি করছে, মহানন্দে তাই দেখছিলাম। প্রথমে দেখলাম লোমগুলো পুড়ে গেল, চামড়া পুড়তে লাগল, গন্ধ বের হল। পরে জলন্ত কয়লাটি তার কাজ করে নিবে গেল।"

ঢাকা শহরের পাশে শাহবাগ নামে এক প্রকাণ্ড বাগানের কাছাকাছি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে এঁকে একদিন খুব হাসি-খুশী দেখে জ্যোতিষ রায় প্রস্তাব করলেন 'আনন্দময়ী মা' নাম রাখা হোক। সেই থেকে ভারতবর্ষময় সবাই নির্ম্মলাকে তাই বলেই জানে।

রমণীমোহন খেয়ে-দেয়ে অফিসে যেতেন। ফিরে আসলে তাঁর জন্যে হাত-মুখ ধোওয়ার জল-গামছা ঠিকঠাক করে নির্ম্মলা জপে বসতেন। উঠতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। সন্ধ্যে হলে সন্ধ্যে দিয়ে, লক্ষ্মীর আসন ঠিক করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে রান্না করতে যেতেন। রান্না করে স্বামীর পান,-তামাক সেজেগুজে রাখতেন। রমণীমোহন, যখন খাওয়া সেরে বিশ্রাম করছেন, ইনি তখন সারা দিনের রান্না-বাড়া, বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, পতিসেবা প্রভৃতি সেরেসুরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে একান্তে আপনমনে গিয়ে বসলেন শোবার ঘরের কোণে মাটিতে। বাড়া ভাত পড়ে থাকত। রাতের পর রাত শেষ হয়ে যেত। শরীরে কোন ক্লান্তি বা বিষণ্ণতা আসত না। এই সময় অনেক রকমের আসন, মুদ্রা, পুজো প্রভৃতি আপনা থেকে তাঁর দ্বারা হয়ে যেতে আরম্ভ হয়। রমণীমোহন চৌকির ওপর মশারির ভেতর থেকে আশ্চর্য হয়ে কত দিন এই সব দেখেছেন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নির্মলা বসে বসে নাম করছেন। হয়ত আনন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আনন্দ না পেলে ছাড়বেনও না। ভাবছেন, 'শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাক। ঠাকুরের নাম করতে করতে শরীরের যা কিছু হোক। নাম করতে করতেই ত হবে।' হয়ত এক ভাবে বসে থাকতে গিয়ে পায়ে ব্যথা কি ঝিঁঝিঁ ধরল। গ্রাহ্য করছে কে!

প্রথম প্রথম রাত্তিরে শোবার সময় ঠাকুরের নাম করতেন। তারপর দুপুরেও ঘরের দরজা বন্ধ করে।

নির্মলার সাধনার কোন এক সময় সম্বন্ধে অমূল্য দত্তগুপ্ত লিখেছেন, "মা বলতেন, নাম আমার আপনা হতেই হত। করতে আমার চেষ্টা করতে হত না। ভিতরে ভিতরে সর্বদাই নাম চলতে থাকত। যদি কখনও কাউকে কাজের কথা বলতে হত, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাম আবার চলতে থাকত।"

নির্মলা কারো কাছে দীক্ষা নেননি। ইংরিজী ১৯২২ সালের জুলাই বা তার কাছাকাছি কোন সময় তাঁর দীক্ষা 'আপসে' হয়ে গেল। তখন তাঁর বয়েস ছাব্বিশ। তারপর পাঁচ মাস ধরে অসংখ্য আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা শরীর দিয়ে কে যেন করিয়ে নিলে। এর আগেও এই সব কিছু কিছু হয়েছিল। দীক্ষার পর মুখ দিয়ে প্রণব-মন্ত্র বের হল। আর তার সঙ্গে কত রকমের স্তোত্র। বৈদিক ভাষায় রচিত নানা রকম স্তোত্র অনর্গল তুবড়ির মত বেরিয়ে আসত। এক সময় এমনই কয়েকটি স্তোত্র যখন বলে যাচ্ছিলেন, কয়েক জন আগ্রহ করে অনেক কষ্টে তা লিখে রেখেছিলেন। তার কিছু কিছু ছাপা হয়েছে।

সাধনার যত রকমের অবস্থা হতে পারে সকলই তাঁর শরীরে প্রকাশ পেয়েছিল, এ কথা তাঁর কাছ থেকে অনেক সময়ে শুনতে পাওয়া যেত।

অষ্টগ্রামে এক জন ধর্মের বই পড়ে শোনাতে গেছেন। একটু পরে যিনি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন কোন কথা তাঁর (নির্মলার) কানে যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে নির্মলা বলেছিলেন, "কেউ কোন সাধুর জীবনী বা ভাগবত ইত্যাদি শুনাতে আসলে একটু শুনতে না শুনতেই ভাবটা এমন পরিবর্তন হয়ে যেত যে শুনবার মত অবস্থা থাকত না। এর মধ্যে কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব বিন্দুমাত্রও নেই। শরীরেই এরূপ একটা পরিবর্তন হয়ে যেত।"

এই অষ্টগ্রামেই গগন সাধুর (রায়ের) কীর্তন হয়েছিল। শোনা যায় তাঁর ভগবদ্‌ভাব সেই সময়েই প্রথম লোকের কাছে ধরা পড়ে। তখন তাঁর বয়েস সতের কি আঠার। এর পর প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২১ সাল হতেই এই স্ত্রীলোকটির জীবনের অদ্ভুতত্ব লোকের কাছে ধরা পড়তে আরম্ভ হল। তখন তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংএ বাজিতপুরে।

ঢাকার নবাব বাগানের ট্রাষ্টী রায় বাহাদুর যোগেশ ঘোষ। তাঁর ছোট জামাই ভূদেব বোস বাজিতপুর নবাব ষ্টেটের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মেয়ের অসুখ। কল্যাণার্থে বাড়ীতে কীর্তন। তাঁর স্ত্রীর বন্ধু ও পড়শী নির্মলাকে ডেকে আনলেন। কীর্তন যাই আরম্ভ হওয়া নির্মলার শরীর কেমন করছে। ভূদেব বাবু ত বিরক্ত— এ কেমনতর? কীর্তন শুনলেই শরীর কেমন করে, হিষ্টিরিয়া নাকি?

যে ঘরে সাধন করতেন নির্মলা, সেই ঘরের চার দিকে হাত দুই পর্যন্ত জায়গা রোজ আয়নার মত পরিষ্কার করে রাখতেন। তিনি বলেছেন, (এই সময়) "কখন কখন আমার শরীর হতে এমন জ্যোতির ছটা উদ্গত হত তদ্দ্বারা যেন চার দিক জ্যোতির্ময় হয়ে পড়ত। সেই জ্যোতি যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে এমন মনে হত।" কাপড়ে গা ঢেকে নিরিবিলিতে লোকের চোখের আড়ালে পড়ে থাকতেন। তাঁর দৃষ্টিতে লোকে আত্মহারা হয়ে যেত, পা ছুঁয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। যে জায়গায় বসতেন বা শুতেন সেই জায়গা আগুনের মত গরম হয়ে থাকত।

কেউ কেউ লুকিয়ে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ফেলেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তা কেউ ধরতে পারত না। কেউ মনে করত এ সব ভূতুড়ে। কেউ ভাবত রোগ। যে যার বুদ্ধিমত ওঝা বা ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিত। দু'-এক জন ওঝাও যে না এসেছিল তা নয়। কিন্তু কেউ-ই কিছু সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

সকলেই যে ভূতে পেয়েছে মনে করতেন তা নয়। ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী বলেছিলেন, "এ সব খুব উচ্চ অবস্থা। ব্যারাম নয়।" কিন্তু আশ্চর্য ভূতে পাওয়া লোকটি। তিনি ত ভাল-মন্দ কাউকেই কিছু বলছেন না। কেউ ত জিজ্ঞেসও করছে না, করবার দরকারও মনে করছে না।

এদিকে চার ধারে বেশ রটে গেল, বিধুমুখীর মেয়েটা ভাল হলে হবে কি, ভূতে পেয়েই সর্বনাশ করছে। মেয়ে এ সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন, "বাজিতপুরে এই অবস্থা হওয়ার পুর্বে আমাকে সকলেই খুব ভালবাসত, সর্বদাই আমার কাছে আসত। কিন্তু এই অবস্থা আরম্ভ হলে আমাকে ভূতে পেয়েছে ভেবে সকলে আসা বন্ধ করল। ভালই হল, আমিও একান্ত পেয়ে আপনমনে বসে থাকতাম।"

নির্মলা একবার বলেছিলেন কোন এক নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্দিষ্ট সময়ে রমণীর দীক্ষা হবে। রমণী তা ব্যর্থ করে দিতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হল। নির্ধারিত সময়ে রমণী-মোহনকে তাঁর কাছে আসতেই হল। নির্মলার মুখ থেকে বেরোল বীজমন্ত্র, রমণী তা জপ করতে নির্দেশ পেলেন।

একবার মৌন হয়ে গেলেন, প্রায় তিন বছর ধরে। শুধু মাঝে মাঝে একটা গোল গণ্ডী চার পাশে কেটে স্তোত্র বলে গিয়ে কথা বলতেন কিছু কিছু। মৌনাবস্থায় অল্পাহারের নানা নিয়মে চলতে লাগলেন। এই সময়ে সাত মাস ধরে তাঁর মাসিক ঋতু বন্ধ ছিল, তার পর কিছু কাল আবার হয়ে সাতাশ-আটাশ বছর থেকে একেবারে বন্ধ।

বহু দিন ধরে সামান্য সামান্য খাওয়া চললেও ঘর-সংসারের কাজে তাঁকে একটু শ্রান্ত বা অবসন্ন দেখা যায়নি। পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত সংসার। ঝি-চাকর রাখার রেওয়াজও ছিল না, রাখবার অবস্থাও নয়। কাজেই সব কাজ নিজেদেরই করতে হত। পরে আস্তে আস্তে সব কাজ যেন আপনা থেকেই ছেড়ে যেতে লাগল।

এই মহিলার জীবনে দেখা যায়, সংসারকে কখনও নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দেননি, সংসারই বরং যখন ছাড়বার এঁকে ছেড়ে দিয়েছে। আর কোন কর্তব্যে অবহেলা করে আরাম-বিরাম, এমন কি ভগবৎ-সাধনা করতেও কেউ কখন তাঁকে দেখেনি।

রমণীমোহনের ভগিনীপতি কালীপ্রসন্ন কুশারী বলতেন, "আপনি কথা বলতে বলতে কোথায় চলে যান বলতে পারেন? পরিষ্কার

বোঝা যায় আপনি এখানে ছিলেন না। কি রকম ভাব হয়, বলুন ত ?" নির্মলা মৃদু হেসে জবাব দিতেন, "যে চিনি না খেয়েছে তাকে কি ঠিক ঠিক বুঝান যায় চিনি কেমন মিষ্টি ?"

সেই সময় ভাবে ভরপুর নির্মলার মুখ দিয়ে কথা বড় একটা বেরুত না। শুধু কেউ বলালে বলতেন—"মেশিন আর কি ? তোমরা যতটুকু চালিয়ে নাও চলে, আবার বন্ধ হয়ে যায়।" হয়ত পায়খানায় গিয়েছেন, বহুক্ষণেও ফিরছেন না। গিয়ে ধাক্কা দিতে চমকে উঠে হেসে বলছেন, "ভুলেই গিয়েছিলাম।"

অপরিচ্ছন্নতা মোটে দেখতে পারতেন না। ঘরদোর সব নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন। আবার আমসত্ত্ব প্রভৃতি আচারও বেশ করতে পারতেন। রান্নাতেও হাত ছিল। চপ, কাটলেট কত করে খাইয়েছেন। তাঁর হাতের তৈরী লেস, বেত, কার্পেটের কাজ সুন্দর ছিল। চরকার সুতো কেটে কাপড় তৈরীও করেছেন।

এক সময় আনন্দময়ী মা সকলকে প্রণাম করতেন, এমন কি কুকুর-বেড়ালকেও। তাঁর মা বলে দিয়েছিলেন, পায়ে লাগলেই প্রণাম করতে হয়। বিছানায় ওঠবার সময় তাই বিছানাকে, মাটিতে নামতে গিয়ে মাটিকে, সব কিছুকেই এই ভাবে। আবার এক সময় কাকেও প্রণাম করতেও পারতেন না, কারওটা নিতেনও না। বলছেন, "কাকে প্রণাম করব ? কেই বা প্রণাম করবে ?" আবার কখন পায়ে কেউ হাত দিলেই তার পায়ের কাছে মাথা নুয়ে পড়ত।

রমণীমোহন বলে দিয়েছিলেন, কোন পুরুষের মুখের দিকে চাইতে নেই। বাপ-ভাইএর মুখের দিকে চাওয়াও নির্মলার বন্ধ হয়ে গেল। একবার তার জ্যেঠতুত ভাই পান খেতে চান। তাঁর দু'হাত জোড়া, নির্মলাকে মুখে দিয়ে দিতে বলছেন। কিন্তু মুখের দিকে ত চাওয়া চলবে না। নির্মলার শরীর কাঁপছে। শেষে হঠাৎ শুধু মুখের ভেতরের দিকে দৃষ্টি রেখে পানটা ফেলে দিয়েই এক ছুট।

ভাসুর বলে দিয়েছিলেন স্নান করে রান্না করতে হবে। মাঘ মাস, বাসি জল। দিব্যি রোজ স্নান করে রান্না করতে লেগে যেতেন মুখটি বুঁজে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হতে আনন্দময়ী মা নিজে হাতে করে খেতে পারেন না। হাতের তা বলে যে কোন রোগ আছে তা নয়। "আমি ত ইচ্ছে করে কিছু করি না। এক দিন খেতে বসেছি। দেখি ভাত মুখে দিতে পারি না। হাত মুখে উঠছে না। নীচে নেমে যাচ্ছে। নিজের ইচ্ছাশক্তি এর মধ্যে একটুও নেই। যেমন রোগী মাথা ঘুরে হঠাৎ পড়ে যায়, নিজের ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে কিছুই থাকে না, এও প্রায় তাই। তবে বিশেষ এই যে, এ জন্য কোন দুঃখ হয় না বা অন্য কোনরূপ ইচ্ছাও জাগে না। যা হয়ে যায় দেখে যাচ্ছি। তখন হতেই বুঝলাম হাতে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।"

এক দিন এক কুকুর ভাত খাচ্ছে, সেখানে কাঁদ-কাঁদ ভাবে 'আমি খাব,' 'আমি খাব' বলতে লাগলেন। ঐ ভাবে বাধা পেলে ছেলে-মানুষের মত মাটিতে পড়ে অনেক সময় কাটিয়ে দিতেন। শেষে মা এক দিন নিজেই বললেন "মানুষ ত্যাগের চেষ্টা করে, আমার কিন্তু সবই বিপরীত ; আমি যাতে ত্যাগ না হয় তার ব্যবস্থা করি। তোমরা স্মরণ করে রোজ তিনটি ভাত আমায় খাওয়াবে, তা না হলে হাতে না খাওয়ার মত ভাত খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।"

মুসলমান মেয়েরা ঘাটে চাল ধুচ্ছে। আনন্দময়ী মা ঘাটের কাছে নৌকোয়। বলছেন, "বড় খিদে পেয়েছে, ভাত দিবে ?" তারা যেই বলেছে, এস, অমনি নৌকো থেকে নেমে তাদের পেছনে পেছনে বা বাড়ালেন। সকলে ভাবছে, এ কি অনাছিষ্টি, এ কি রঙ্গ। কিন্তু রা-টি নেই মুখে কারুর। মুসলমান মেয়েলোকটির বাড়ীর দরজায় পৌঁছুতেই সে কেমন থমকে গেল, "আমার রান্না কি তুমি খাবে ?" "কেন খাব না ? দেখতে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। তোমার শরীর কাটলে রক্ত বের হয়, আমারও হয়। তবে কেন খাব না ?" মেয়েলোকটি ভড়কে গেছে, "না, তুমি যাও।" তার সঙ্গিনী বলছে, "তুই ভয় পাস কেন ? বল না, চল। ওরা খাবে না, শুধু মুখে বলছে।" আনন্দময়ী মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেই চলেছেন, "কেন খাব না ? দিলেই খাব।"

একবার এমন হল যে নৌকোয় উঠতে পারতেন না। উঠলেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতেন। বলেছেন, "জল এমন ভাবে আমাকে আকর্ষণ করত যেন শরীরটা জলের সঙ্গে মিলে যেতে চাইত, কোন পার্থক্যবোধ হ'ত না।

আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারতেন না। বলতেন, "শরীরটা শূন্যে আকর্ষণ করে। বাতাস যেমন শূন্যের ভিতর মিলিয়ে আছে, শরীরটা সেই ভাবে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।

তখন আর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তাই সিঁড়িতে পা দিতে পারি না।"

স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত চাপা স্বভাবের নির্মলার মুখ দিয়ে তাঁর নিজের সম্বন্ধে উঁচু কথা এক-আধ সময়ে বেরিয়ে যেত প্রায় অজান্তেই। তার পরই আরম্ভ হ'ত তাঁর আকুল কান্না, শরীর যেত এলিয়ে, অসাড় অবশ হয়ে। বলেছেন, "এই শরীরটার এই সব ভাবের কথা বলা ত দূরের কথা, কেউ বলছে শুনলেও শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ত। কিছু বুঝি প্রকাশ হ'ল এই ভাবতেই কেমন হয়ে যেত, তাই গোপনে কত কি হয়ে গেছে কেউ জানে নি।"

সাধন তখন হয়ে গেছে

১১৩৮ সালের শেষের দিক। কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে বাগানে। বেলা আড়াইটে।

এক ভদ্রলোক—মা, দেশের কাজে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

আনন্দময়ী মা—বাস্তবিক সেবার ভাব জাগলে সেই পথ দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যায়। [ফিরে (নেতাজী) সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি] আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করছ, কেন করছ?

সুভাষ (ধীর ভাবে)—আনন্দ পাই।

মা—আচ্ছা, এই যে আনন্দ, এটা নিত্য আনন্দ, না, খণ্ড আনন্দ?

সুভাষ—তা ত বলতে পারি না।

মা (হেসে)—এই কাজের সঙ্গে সেই কাজটিও একটু কোরো বাবা! যদিও তোমরা বলতে পার, এই কাজ ত নিজের জন্যে করছি না, সকলের উপকারের জন্যে করছি। কিন্তু আমি বলব,—তোমরা যা বলাছ তাই বলছি, আমি ত লেখাপড়া কিছু জানি না, তবে বলা হয় যে, সবই নিজের জন্য। সকলেই সেই এক অখণ্ড আনন্দই চাইছে। কেন চায়? না, সেই রসটা আমাদের জানা আছে বলেই ত আমরা আবার চাইছি। তবে তোমরা বলতে পার যে 'এই সব করে কি হবে?' কিন্তু বলা হয় যে বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায়, নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তার দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার স্বভাবতঃই হয়ে যায়। যেমন এম্, এ, বি, এ, পাশ করে প্রফেসাররা কত মূর্খকে বিদ্বান্ করে দিচ্ছে। (হেসে) বাবা, তুমি ত কত জায়গায় বক্তৃতা দেও, এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।

সুভাষ—আমি কি শোনাতে এসেছি? আমি এসেছি শুনতে।

মা (হেসে)—তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?

সুভাষ—চেষ্টা করব।

মা—শুধু বাইরের দিকে লক্ষ্য রেখ না বাবা, একটু ভিতরের দিকেও লক্ষ্য কোরো; তোমার ত শক্তি আছে।

সুভাষ—আপনি কত দিন এখানে আছেন?

মা—আমার কিছুই ঠিক নেই। এ দেহটা কিছু দিন যাবৎ ভাল যাচ্ছে না। হরিদ্বার থেকে এখানে আসবার পূর্বে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে কি যেন গুনতিতে বেড়ে গেছে, কাজেই কোথাও যাওয়া হতে পারে না। পরে একটু কমলে এখানে আসা হল। এখান থেকে ঢাকা যাওয়ার কথা হচ্ছে, কিন্তু আবার নাকি সেই সব বেড়ে গেছে। কাজেই অপেক্ষা করছি। এরা কৃপা করে এই দেহটাকে স্নেহ করে কি না, তাই এ দেহের সমস্ত ভার এদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

[সমাপ্ত]

ঝড়

অণিমা মুখোপাধ্যায়

বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান ঝড় আসে ঐ ধেয়ে
মরণ-খেলায় মাতল ঈশান আনমনে গান গেয়ে।
রুদ্র আঁখি বহ্নিতলে
বিশ্বগ্রাসী অগ্নি জ্বলে
তাথৈ ঐ নাচের তালে বিশ্ব-ভুবন ছেয়ে
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান ঝড় আসে ঐ ধেয়ে।

নিবিড় আঁধার ছাইল আবার ধরার বক্ষ-মাঝ
ধূলার মাঝেই রচল তোমার মরণ-ছোঁয়া তাজ।
ক্ষিপ্ত রোষ পদ-ভরে
কাঁপে বিশ্ব চরাচরে
ভাঙ্গ নির্মম করে এই ত তব কাজ
নিবিড় আঁধার ছাইল আবার ধরার বক্ষ-মাঝ

জীবন মরণ শয়ন স্বপন হয়েছে এক আজ
কালের বুকেতে নবীন তপন নূতনের দিল সাজ।
রক্ত-রাঙা মুখ 'পরে
চূর্ণ জটা উড়ে পড়ে
দৃপ্ত চণ্ড পদভরে শ্মশান-মাঝে সাজ
জীবন-মরণ শয়ন-স্বপন হয়েছে এক আজ।

কাঁপল আকাশ নিথর বাতাস নেহারি কালকূট
ভুবন ভরিয়া নাচিছে পিশাচ খুলিছে জটাজুট।
রঙ্গ ভরে ক্রীড়া ছলে
জন্ম-মৃত্যু তালে তালে
সুর তব গেয়ে চলে ত্যজিয়া সব সুখ
কাঁপল আকাশ নিথর বাতাস নেহারি কালকূট।

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসু-খের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতি-দিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 245-X53 BG
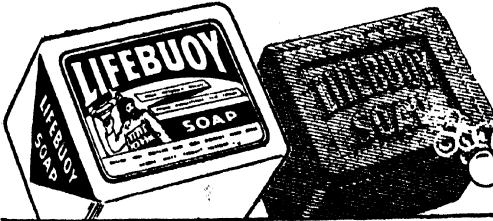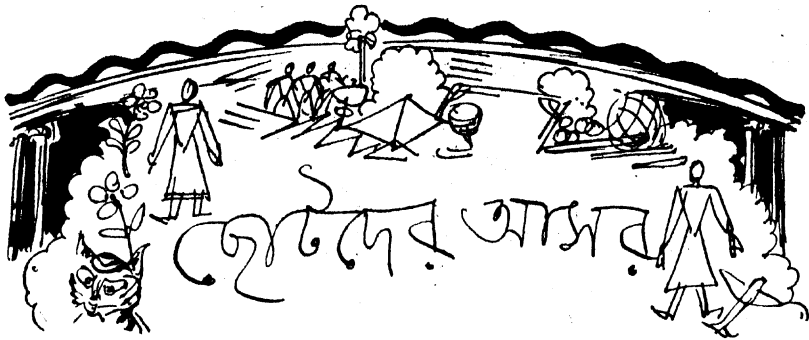
অবসর বিনোদনে সঙ্গীত

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের জীবন দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত—কাজ আর অবসর। কাজ করি আমরা কর্তব্যের তাগিদে, কর্মের প্রতি সহজ প্রীতির টানে; আর, অবসর ভোগ করি কর্মের পুরস্কার, শ্রমের সফল হিসাবে। কাজ আর অবসর পরস্পর অঙ্গাঙ্গী, শুধু তা-ই নয়, ও দুটি বস্তু একে অপরের পরিপূরক। নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করলে তবেই আমরা অবসর যাপনের বিমল আনন্দের অধিকারী হই। আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরের বিরাম চিহ্ন না থাকলে এমন যে অবশ্যকরণীয় কর্তব্য কর্ম তা-ও অত্যন্ত নীরস ও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। অবসর হল কাজের সঞ্জীবক, শক্তির প্রেরণার উৎস। অবসর না হলে মানুষ বাঁচে না।

তোমরা যারা কিশোর-কিশোরী বালক-বালিকা, তাদের জীবনেও এই কাজ আর অবসর প্রত্যহ পালা করে আসে। তোমাদের কাজ হল মনোযোগ সহকারে বিদ্যার্জন—স্কুলে এবং গৃহে নিয়মিত ভাবে পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যার্জনের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। আর অবসর হল খেলাধূলা, ভ্রমণ, স্কুলপাঠ্যের বাইরে নানা রকম শিক্ষণীয় আর মজার মজার বই পড়া, বিচিত্র ধরণের 'হবি' বা আমোদ জনক শখ নিয়ে মেতে থাকা, এমনি আরও কত কী। এ সব বিষয়ের কোন কোনটি নিয়ে ইতিপূর্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করেছেন, তার কিছু কিছু তোমরা পড়ে থাকতে পারো। আজ আমি তোমাদের সামনে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলব, অবসর যাপনে যার মূল্য অত্যন্ত বেশী। বিশেষ, তোমাদের কিশোর-কিশোরীদের নিকট বিষয়টির আকর্ষণের তুলনা হয় না। জিনিষটি যেমন উপাদেয় তেমনি আনন্দপ্রদ। অবসরের মুহূর্তগুলিকে সার্থকতায় ভরে তুলতে এ জিনিষের তুল্য বুঝি আর কিছু নেই।

নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ আমি কী সম্বন্ধে বলব। কেন না, এ আর কে না জানে যে অবসর বিনোদনে সঙ্গীতচর্চার তুল্য আনন্দের বস্তু আর নেই। সঙ্গীত অসীম আনন্দের খনি। একবার এর গহনে ভালো করে ডুব দিতে পারলে জগতে আর কিছুই বুঝি তেমন করে মনে ধরে না। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, 'গানাৎ পরতরং ন হি।' অর্থাৎ গান শ্রেষ্ঠ আনন্দ, গানের পরে আর কিছু নেই। সঙ্গীতকে নানা কারণে শিল্পের সেরা বলা হয়। তার ভিতর দুটি কারণ অতি প্রত্যক্ষ। প্রথমতঃ, সঙ্গীতে বিশেষ কোন উপকরণ বা আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। তোমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর যদি সুমিষ্ট আর সুরেলা হয় তবে আর কিছু চাই না, ঐ সঙ্গীতের উপর নির্ভর করেই তুমি সঙ্গীতের জগতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারো। ছবি আঁকতে হলে রঙ-তুলির দরকার হয়, সাহিত্যচর্চা করতে গেলে অনেক দিনের চেষ্টায় প্রথমে ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়, অন্যান্য শিল্পের বেলায় অন্যান্য ধরণের উপকরণ চাই। কিন্তু সঙ্গীত-সাধনার বেলায় তোমার ভগবদ্দত্ত কণ্ঠস্বর থাকাটাই যথেষ্ট। ও বস্তুর প্রসাদে তুমি কত সহজে আর কত অবাধেই না নিজেকে সুর-তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে পারো। অবশ্য যন্ত্র-সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক হয়, তবে সেটাও বাইরের উপকরণ মাত্র। সর্বাগ্রে চাই সুরবোধ। তা না হলে কণ্ঠ-সঙ্গীত বল যন্ত্র-সঙ্গীত বল, কোনটাই হবার নয়। তোমাদের মধ্যে যাদের সুরবোধ আছে তারা একটু পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে, সঙ্গীতের আবেদনে সাড়া দেবার জন্য বাহ্যিক উপকরণাদির প্রয়োজন সামান্য, ভিতরে যদি সুর থাকে তবে আপনা থেকেই তোমার মন গুন-গুন করে উঠবে।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গীতের আবেদন সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, শিশু-বৃদ্ধ-যুবা—সকলকেই সঙ্গীতের বিমল আনন্দে মাতোয়ারা করে তোলা যায়। সঙ্গীতের মূল কথা হচ্ছে ছন্দ। আমাদের সকলেরই মধ্যে অল্প-বিস্তর ছন্দের বোধ নিহিত। সামঞ্জস্যে আর ঐক্যে আমাদের মন সহজ তৃপ্তি পায়। সঙ্গীত আমাদের এই স্বাভাবিক ঐক্য বা ছন্দোবোধের তন্ত্রীতে গিয়ে ঘা দেয়, আর তাইতেই আমাদের মন সঙ্গীতের রসে ভরে ওঠে। কাজেই সঙ্গীতের চর্চায় তুমি যে শুধু নিজেই আনন্দ লাভ করতে পারো তা-ই নয়, অপরকেও সমান আনন্দ দিতে পারো। খতিয়ে দেখলে বোধ করি বলা যায়, সঙ্গীতের দ্বারা নিজের চাইতেও অপরকে অধিক আনন্দ দান করা সম্ভব। আর যাতে অপরের আনন্দ, একাধিক ব্যক্তির আনন্দ, তার তুল্য সুখের শখ আর শখের সুখ কী আছে!

সুতরাং সঙ্গীতচর্চা হচ্ছে এমন একটি অবসর বিনোদনের প্রক্রিয়া যার ফল আপনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বহুর মধ্যে তার আনন্দ সম্প্রসারিত। অন্যান্য শখ—যা তোমাদের মন হরণ করে—তাদের পরিসর কম-বেশী সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সঙ্গীতের প্রভাব দূরপ্রসারী ও বহু-ব্যাপক। আর কোন কারণে যদি না-ও হয় এই কারণে অন্ততঃ, অবসর যাপনের উপায় হিসাবে সঙ্গীতের উপর তোমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের দেশের অভিভাবক-শ্রেণীর মধ্যে একটা ধারণা ছিল, সঙ্গীতের সঙ্গে শিক্ষার যোগ নেই, ও-বস্তুটি বরং বিদ্যার্জনের প্রতিকূল। কিন্তু এটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। শিক্ষাবিদ্‌দের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পুঁথিগত শিক্ষাই শিক্ষার একমাত্র বিষয় নয়, ছেলেমেয়েদের সব দিক দিয়ে মানুষ করে তুলতে হলে বইয়ের পড়া ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ের শিক্ষা তাদের দেওয়া দরকার। সঙ্গীত এই শিক্ষা সমূহের অন্যতম। পূর্বেই বলেছি, সঙ্গীত আমাদের মধ্যে ছন্দোবোধের উন্মেষের সহায়ক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ছন্দ বা ব্যালান্স-এর শিক্ষা যে কতো বড়ো শিক্ষা তা তোমরা আর একটু বড় হলে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারবে। সর্বাঙ্গীন শিক্ষার একটা বড় দিক হল সৌন্দর্য্যানুভূতির শিক্ষা, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির শিক্ষা। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি অমনি হয় না, তার জন্যে অনুশীলন ও প্রযত্ন দরকার। সঙ্গীত এই ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। সঙ্গীতের দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি সুকুমার হয়, রুচি পরিমার্জিত হয়। সঙ্গীত আমাদের আনন্দে দীক্ষিত করে। আর আনন্দ বল, রুচি বল, চিত্তবৃত্তির সৌকুমার্য্য বল, সবই সৌন্দর্য্যানুভূতির সহায়ক। সঙ্গীতের শিক্ষায় এক দিকে যেমন তোমরা প্রচুর আনন্দ আহরণ করতে পারো, তেমনি অন্য দিকে তোমাদের ব্যক্তিত্বেরও অনেকখানি উন্মেষ ঘটাতে পারো। উত্তর-জীবনে প্রকৃত কর্মক্ষম ও সুখী মানুষ হতে হলে সঙ্গীতকে তুমি তোমার শিক্ষার আয়োজন থেকে কিছুতেই বাদ দিতে পারো না।

এই কারণে দেখতে পাই, আধুনিক শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা সঙ্গীতকে বিশেষ ভাবেই শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আজ-কাল ছেলেমেয়েদের কারিকুলামের ভিতর সঙ্গীত একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়স্বরূপ গণ্য হচ্ছে। তোমরা সকলেই জানো, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি প্রধান মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। কবিগুরুর প্রবর্তিত সেই ধারা তথায় আজও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য বিদ্যালয়েও এই আদর্শ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। বালক-বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এতে যে উন্নততর ফল পাওয়া যাচ্ছে তা না বললেও চলে। কেন না, সঙ্গীত তো শুধু অবসর যাপনই নয়, অবসর যাপনের ছলে আনন্দ-স্নান, সমগ্র চেতনাকে সুরের বন্যায় প্লাবিত করে তোলা। কবি সুরকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আগুনই বটে। মনের সমস্ত রকমের খাদ-ময়লা পুড়িয়ে দিতে সুরের তুল্য কার্যকরী বস্তু আর নেই। যে বালক বা বালিকার জীবনে সুরের স্পর্শ লাগেনি তার শিক্ষা অনেকখানি অপূর্ণ রয়েছে, এ কথা অনায়াসে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-ব্যবস্থায় সঙ্গীতের স্থান' বিষয়টিকে ইংরাজী বাংলা একাধিক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও বিবৃত করেছেন। তোমরা ফাঁক পেলে সে-সব লেখা পড়বে, এই আশা করতে পারি।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের নানা রকম ভেদ আছে।—উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীত বা ক্লাসিকাল সঙ্গীত (যথা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, প্রভৃতি), পুরাতন ধারার বাংলা গান, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ বা কাজী নজরুল ইসলামের গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান ও গীত, বাউল ভাটিয়ালি ঝুমুর প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত, গজল, ভজন, কীর্তন, ইত্যাদি। তোমরা যে যার রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী এদের এক বা একাধিক শাখায় আত্মনিয়োগ করে অবসর কালকে সার্থক করে তুলতে পারো। তবে যে-শাখার গানেরই চর্চা কর না কেন, শিক্ষার ভিত্তিকে পাকা করে তোলবার জন্য কিছু পরিমাণ স্বরের সাধনা আবশ্যক। এর সঙ্গে যদি রাগরাগিণীর জ্ঞান কতক আয়ত্ত করতে পারো তবে তো সোনায় সোহাগা।

এইরূপ যন্ত্র-সঙ্গীতেরও নানা রকমারি আছে। সেতার, বেহালা, এস্রাজ, সুরবাহার, স্বরোদ, বাঁশী, গীটার, ম্যাণ্ডোলিন, ব্যাঞ্জো, তবলা, পাখোয়াজ, ঢোলক, খোল প্রভৃতি বিচিত্র দেশী-বিদেশী বাদ্য। এ ক্ষেত্রেও ঝোঁক এবং রুচি অনুযায়ী নির্বাচন করণীয়।

খামখেয়ালী ছড়া

অজিতকুমার বসু

তারা গোণা

হোঁদারাম হালদার একগুঁয়ে, ভারী একগুঁয়ে।
আকাশের তারা গোণে সারা রাত
খোলা ছাতে চিৎপাত
শুয়ে শুয়ে শুয়ে।

সারা রাত শুধু তারা গোণে গোণে গোণে;
ঘুম নামে যেই তার দু'চোখের কোণে কোণে কোণে
নাকে গুঁজে দেয় কড়া নস্য,
হাঁচি হাঁচে দীর্ঘ বা হ্রস্ব,
সে হাঁচির খোঁচা লেগে　ঘুম যায় ভেগে ভেগে,
মহাখুশী হোঁদারাম মনে মনে মনে—
আকাশের তারা শুধু গোণে আর গোণে গোণে গোণে।"

গোণা সারা না হতেই সারা হয় রাত,
তারাগুলো কোথায় পালায়।
হোঁদারাম জ্বালাতন ভোরের জ্বালায়।
ফের রাতে হোঁদারাম সুরু থেকে ফের তারা গোণে,
ঘুম নামে ফের তার দু'চোখের কোণে কোণে কোণে,
নাকে গুঁজে দেয় ফের নস্য,
হাঁচে ফের দীর্ঘ বা হ্রস্ব
সে হাঁচির খোঁচা লেগে　ঘুম ফের যায় ভেগে,
হোঁদারাম খুশী হয়ে মনে মনে মনে
আকাশের তারা ফের গোণে আর গোণে গোণে গোণে।

গোণা না ফুরাতে হায় আবার ফুরায়ে যায় রাত,
তারাগুলো আবার পালায়—
হোঁদারাম বার বার জ্বালাতন ভোরের জ্বালায়!
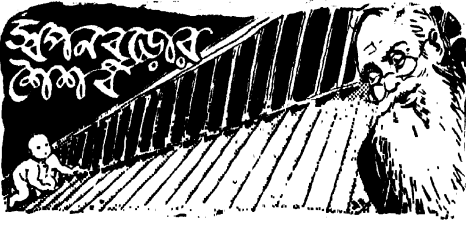
শ্রীঅখিল নিয়োগী

এ কোন্ পটে আঁকা—কী রঙের কেমন ছবি ?
যত দূরে চলে যাই তত জোরালো—তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে !

সেই আমার শৈশবের ছবি। তারই কথা বলব আজ সঙ্গোপনে। শহরের কল-কোলাহলে কতটুকুই বা এর মূল্য ?

তবু গাঁয়ের কথা শুনতে যাদের ভালো লাগে···সেই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে আসবে ; তাদের উৎসুক মুখ, ব্যগ্র চোখ আমি আমার মনের আয়নায় দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

আমার চার পাশ দিয়ে ঘিরে বসল তারা। কত তাদের প্রশ্ন, কত তাদের জিজ্ঞাসা। বুক-ভরা কৌতূহল নিয়ে তারা শুনতে চায় আমার শৈশবের কাহিনী। আজকের দিনের ছেলেমেয়ে যারা তাদের শৈশবের সঙ্গে কিন্তু আদপেই মিলবে না ! সব ঘটনা যে সন-তারিখ মিলিয়ে লেখা হবে তাও বলা যায় না। যে ছবি মনের পটে ভেসে উঠবে তারই কথা বলব আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের কাছে।

রাজধানী কলকাতার চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে অনেকখানি দূরে—একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে।

এখানে পৌঁছুতে হলে আজকের দিনেও সব রকম যান-বাহনে চড়তে হয়। ট্রেন, ষ্টীমার, নৌকো···তার পর পায়ে-চলা পথ !

সেইখানে মিলবে আমার ছেলেবেলাকার নিরালা, সবুজ ঘোমটা-ঢাকা খাল-বিল বহুল লাজুক গ্রামটি !

আজকের দিনে ভারতবর্ষের ম্যাপে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আছে সে লুকিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে ! ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার ভেতর সাকরাইল নামে একটি নীরব নিঝুম গ্রাম—যার পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ আর চম্‌চমের জন্যে আজও প্রবাসী সন্তানদের রসনা লালা সিক্ত হয়ে ওঠে।

—শরীর খারাপ হয়েছে ? যাও না, মাস খানেক দেশে কাটিয়ে এসো। মাছ, দুধ, ঘী পেটে পড়লেই রোগ-বালাই পালিয়ে যেতে পথ পাবে না !

এই ছিল তখনকার দিনের চলতি বিধান !

আমার শৈশব-রঙ্গমঞ্চের পট যখন প্রথম উত্তোলিত হল—দেখা গেল কয়েকটি মানুষ আমাকে একান্ত ভাবে নিবিড় করে ঘিরে বসে আছে। তাদের চোখের আয়নায় পড়েছে আমার মুখের ছায়া, তাদের বাদ দিয়ে শিশুকালকে যেন কিছুতেই ভাবতে পারিনে। আমার ছেলেবেলাকার কোন ছবিই তাদের বাদ দিয়ে আঁকা হয় নি। যবার মনে যে তাদের ছবি আমার শৈশবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেবো সে সাধ্যি আমার নেই। তাদের যদি বাদ দিই ত' আমিও মুছে যাই।

তখনকার দিনে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিয়ে হত। আমার নিজের বাড়ী পুব পাড়ায় আর মামাবাড়ী পশ্চিম পাড়ায়।

আমি কিন্তু জন্মেছি মামাবাড়ীতে, মানুষ হয়েছি মামাবাড়ীতে, বস্তুত আমার ছেলেবেলাকার যা কিছু গল্প সব ওই মামাবাড়ীকে কেন্দ্র করেই।

আমার যখন এক মাস বয়েস তখন বাবা মারা যান। কিন্তু মামাবাড়ীর অতি আদরে বাবার অভাব কোনো কালেই বুঝতে পারি নি।

আমরা দুই ভাই। দাদা আমার চাইতে তিন চার বছরের বড়ো।

ছেলেবেলার সব চাইতে বেশী আদর যার কাছ থেকে পেয়েছি—তিনি হচ্ছেন আমার দিদিমা। আমাদের দুটি ভাইকে তিনি যেন ডানার আড়ালে অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন। তাঁর জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা দুই ফোঁটা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে আমরা দুটি ভাই যেন দুটি হালকা ফুল হয়ে তাঁর বুকে ফুটে উঠেছিলাম। পাছে সেই ফুল দুটির দল অকালে ঝরে যায় তাই তাঁর আশঙ্কার সীমা ছিল না ! সেই জন্যে অতি বেশী আদর পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আমাদের দেশের দিদিমারা সাধারণত নাতিদের একটু বেশী আদরে-আবদারে রাখেন, কিন্তু আমাদের দুটি ভাইয়ের ক্ষেত্রে সেই স্নেহ একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল,—পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়েছিল বললেও বেশী করে বাড়িয়ে বলা হয় না !

আজও যেন চোখের ওপর ভাসছে দিদিমার পাতলা ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘ দেহটি। একাদশীর পারণের পর কাঁচা মুগ-ভেজা, সাবুদানা-মাখা নারকেল কোরা, ছানা, ঘরের তৈরী সন্দেশ নিয়ে আমায় পেছু ডাকছেন আর আমি খেলার নেশায় পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, ছুটোছুটি করছি—কিছুতেই তাঁকে ধরা দিতে চাইছি নে !

আমার মা দিদিমার একমাত্র মেয়ে আর মামা একমাত্র ছেলে। এঁদের দু'জনকে নিয়েই তাঁর সংসার। মেয়ের অকাল বৈধব্যে দিদিমা সারাটা জীবন অতি মনমরা হয়ে দুঃখে কাটিয়েছেন। অথচ তখনকার দিনে মামাবাড়ী ও আমাদের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভালো ছিল। ভালো পাত্র আর ভালো সম্পত্তি দেখেই দিদিমার আগ্রহেই এ বিয়ে নাকি হয়েছিল। কিন্তু তার এই করুণ আর অশ্রুসজল পরিণতিতে দিদিমার দুঃখের সীমা ছিল না !

দুটি পাড়া নিয়ে আমাদের গ্রাম।

পুব পাড়া আর পশ্চিম পাড়া।

পুব পাড়ায় আমাদের বাড়ী—মুন্সীবাড়ী বললে সবাই চেনে।

এককালে নাকি সমারোহ আর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। গ্রাম দেশে আজও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মুন্সীবাড়ীর টাকায় ছ্যাতলা পড়ে যায় বলে—ছাদে রদ্দুরে শুকোতে দেয়া হত। এখনো লোকে বিশ্বাস করে মুন্সীবাড়ীতে কোথায়ও না কোথায় গুপ্তধন লুকোনো আছে। বড় হয়ে দাদাকে দেখেছি এখানে-ওখানে-সেখানে সেই গুপ্তধনের জন্যে খুঁড়তে—।

কাশীধামের মুন্সীঘাট নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাই নির্ম্মাণ

করেছিলেন এ কথাও শুনেছি। ঢাকা শহরে আমাদের বারোয়ারী গৃহ এখনো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে।

যাক্ সে সব কথা। এখন ছেলেবেলার কথাই বলি।

আমরা যখন খুব ছোট তখন দেখেছি—মুন্সীবাড়ীতে বাঁধা ষ্টেজ। গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ প্রায়ই সেখানে থিয়েটার করতেন। এ ছাড়া যাত্রা, সার্কাস, অনেক কিছু নাকি হত।

এদিকে ছোটদের লোভ ছিল দুর্নিবার। কিন্তু আমাদের মামাবাড়ী ছিল অতি রক্ষণশীল পরিবার। সেই জন্যে আমরা ছেলেবেলায় এই সব আমোদ-প্রমোদ দেখতে অনুমতি পেতাম না।

দাদামশাইকে যদিও আমরা দেখি নি তবু বড় হয়ে জান্তে পেরেছি যে তিনি কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্মে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি, তবু সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনা নিয়ে সারা জীবন তিনি গ্রামে বাস করে গেছেন। তখনকার দিনে ওই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকেই তিনি রীতিমত ডায়েরী 'লিখতেন। বড় হয়ে সেই ডায়েরী পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার জন্মের সন-তারিখ জান্তে পেরেছি দাদামশায়ের এই ডায়েরী থেকে। তখনকার দিনে গ্রাম দেশে আনন্দনাথ সেনের নাম করলে—লোকে সত্যের অবতার বলেই জান্তো। এই দাদামশায়ের একমাত্র ছেলে—শ্রীযদুনাথ সেন আমার মামা বড় হয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন কল্‌কাতায় স্বর্গত শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছ থেকে।

এইটুকু বেশ মনে আছে—ছেলেবেলায় দিদিমা কিছুতেই আমাদের নিজেদের বাড়ীতে যেতে দিতেন না—পাছে আমরা থিয়েটার দেখে আর যাত্রা শুনে বখে যাই। সেই প্রলোভনকে যাতে আমরা জয় করতে পারি সেজন্যে দিদিমার আদরের মাত্রা কেবলি বেড়ে যেত। উদারা থেকে মুদারা—মুদারা থেকে তারায় গিয়ে পৌছুতো। তবু এক পাড়ায় যাত্রার ঢোল বাজলে কিম্বা থিয়েটারের কনসার্ট সুরু হলে আর এক পাড়ায় গিয়ে তার রেশ পৌছুতো। শিশুমন উন্মুখ হয়ে থাকতো অজানাকে জানবার জন্যে—অচেনাকে দেখবার জন্যে। কী সে বস্তু—যা পাড়ার সব ছেলেমেয়ে দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমাদের পক্ষে তা একেবারে যবনিকার আড়ালে ঢাকা!

দিদিমা আমাকে উসখুস করতে দেখলেই ছড়া কাটতেন—

"খায় দায় পাখিটি
বনের দিকে আঁখিটি!"

আমি মনে-মনে অনেক সময় দুটি বস্তুকে একসঙ্গে মিশিয়ে উপভোগ করবার চেষ্টা করতাম। সত্যি, মামাবাড়ীর আদর আর বাড়ীর আনন্দ—এই দুটিকে যদি একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা চলত ত' না জানি কি মজার ব্যাপারই হত!

যাদের কোলে কোলে আমি মানুষ হয়েছি—তার ভেতর মা সব চাইতে কম কথা কইত।

সকলের বেশী আবদার আর জুলুম যার ওপর আমার চলত তার নাম হচ্ছে দাদি মাসি। মায়ের বোন মাসি নয়, বাড়ীর ঝি। পুকুরের পাড়ে তার ঘর। কিন্তু হলে হবে কি—তখনকার দিনে এই নিয়ম ছিল যে, ঝি-চাকরদের মাসি-পিসি-মামা-খুড়ো বলে ডাকা হত। যে ঝি ঘরের কাজ করত—তাকে বলা হত—"ঘরের কাম-করুণী", আর যে বাইরের কাজ করত, এঁটোশালা থেকে নিয়ে বাসন মাজত—তাকে বলা হত—"বাইরের কাম-করুণী"। কিন্তু আমরা তাদের জানতাম—দাদি মাসি আর হরি পিশি বলে। ছেলেবেলায় কোনো দিন এতটুকু মনে হয়নি যে, তারা আমাদের সত্যিকারের মাসি-পিশি নয়। এমনি ছিল তখনকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা।

আত্মারাম ঠাকুরের কথাই কি ভুলতে পারি?

উড়িষ্যা দেশের পাচক ব্রাহ্মণ, কিন্তু বাঙলা দেশের এই গণ্ড-গ্রামে বাস করে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। মামাবাড়ীর রান্না-ঘরের সমস্ত দায়িত্ব ছিল এই আত্মারাম ঠাকুরের ওপর। জীবনে বহু দেশে বহু রান্না খেয়েছি, কিন্তু আত্মারাম ঠাকুরের হাতের 'পাতুরী' যে খেয়েছে—কোনো দিনই তার স্বাদ সে ভুলতে পারবে না।

সন্ধ্যে হলেই আমার দু'চোখ ঘুমে ঢুলে আসত—তখন দিদিমা আমাকে পাঠিয়ে দিতেন রান্নাঘরে—এই আত্মারাম ঠাকুরের কাছে। এত মজাদার, আর অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প বলতে পারত এই আত্মারাম ঠাকুর যে ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! লম্বা কালো কুচকুচে মানুষটি, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা—সেই চুলের মধ্যে আবার একটু কোঁকড়া ভাব! ক্রমাগত বৈটে থেকে পান খাচ্ছে—আর অনর্গল গল্প বলে যাচ্ছে। তখনকার দিনে খুব বড় বড় কাঠের পিঁড়ি থাকতো রান্নাঘরে। সাধারণতঃ কাঁটাল কাঠ দিয়ে তৈরী হত এই পিঁড়ি। এই রকম একটা বিরাট পিঁড়ির ওপর আত্মারাম ঠাকুর আমায় বসিয়ে দিত। আমার শরীরের তুলনায় পিঁড়িটির আকার এত বড় যে গুটিসুটি মেরে দিব্যি তার ওপর শুয়ে থাকা যায়।

কাঠের লম্বা একটা পিলসুজ—তাকে বলা হত গাছা। এই গাছার ওপর থাকত একটি কুপি। আত্মারাম ঠাকুর আমায় গল্প বলত আর ছুটে ছুটে গিয়ে ডালে ফোঁড়ন দিত, কিম্বা কড়াই থেকে তরকারী নামাতো অথবা ভাতের মাড় গালত। তার এই ছুটোছুটির সময় গাছার ওপরকার কুপির আলোতে বাঁশের বেড়ার ওপর তার নানা রকম ছায়া পড়ত—আমার মনে হত একটা রাক্ষস কিম্বা দানব যেন রাজপুত্রের খোঁজ পেয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে আত্মারাম ঠাকুরকে আমায় আদপেই ভয় করত না। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় নানা গল্পের এই কথকটিকে না পেলে আমার মনটা উস্‌খুস্ করে উঠত।

আত্মারামের গল্পের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত।

বাঘের গল্প, শেয়ালের গল্প, চোরের গল্প, রাজপুত্র-রাজকন্যা-তেপান্তরের মাঠের গল্প, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প···আদ্যিকালের বৈদ্যিবুড়ির গল্প···বলে যেন আর শেষ করা যায় না।

আত্মারাম ঠাকুরকে কোনো দিন বলতে শুনি নি—আজ আর কোন গল্প মনে পড়ছে না! গ্রামোফোনে দম দিয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড চাপিয়ে দিলেই যেমন খেয়াল-খুশী মতো গান শোনা যায়—আমাদের আত্মারাম ঠাকুর ছিল তেমনি। সন্ধ্যেবেলা গল্পের কথা বলবার যেটুকু অপেক্ষা! আর সত্যি কথা বলতে কি—গল্প বলে প্রচুর আনন্দ পেতো এই মানুষটি! গল্প যে বলে—আর গল্প যে শোনে—দুটি মানুষই যখন তৃপ্ত হয় তখুনি হয় কাহিনী বলা সার্থক।

এই আত্মারাম ঠাকুরই বোধ করি সঙ্গোপনে আমার মনে গল্পের বীজ বপন করে দিয়েছিল। সেই কথা অনেক সময় বসে ভাবি। এত ভালো রান্না আর এমন সুন্দর গল্প বলার এই রকম অদ্ভুত মিল আমার চোখে সচরাচর আর পড়ে নি।

খাটুতেও পারত এই আত্মারাম একেবারে দানবের মতো। যজ্ঞিবাড়ীর কাজে সে একাই একশ! মামাবাড়ীতে যখন বিরাট বিরাট নেমন্তন্নের আসর বস্‌তো—দেখেছি আত্মারাম ঠাকুর একা কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারত! এই পোলাওএর প্রকাণ্ড হাঁড়ি নাড়ছে, এই ছুটোছুটি করে আর দশটা বামুন-ঠাকুরকে খাটাচ্ছে—আবার পর মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে কি রকম আকারের মাছ কুটতে হবে তার নির্দ্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু এই দানবীয় পরিশ্রমের আগের দিন রাত্তিরে চাই গাঁজার পয়সা। নইলে তাকে দিয়ে কাজ করানো এক রকম অসম্ভব ছিল।

এই উৎকলের আত্মারাম ঠাকুর আমার ছেলেবেলাকার অনেকখানি যায়গা জুড়ে আছে। ঠাকুর আমাকে ভালবাসতোও খুব। কত যে কোলে-পিঠে উঠেছি, চুল ধরে টেনেছি,—না খাওয়ার জন্যে বায়না করেছি সে কথা এখন বসে ভাবতে ভারী মজা লাগে!

আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা খাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি করে, আবদার করে—আর আমি বায়না ধরতাম না-খাওয়ার জন্যে। একদিকে দিদিমার আদর, আর একদিকে আত্মারাম ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি। এড়িয়ে যাবার যো কি ছিল? [ক্রমশঃ।

স্বর্গদ্বারে আলেকজাণ্ডার

[প্রাচীন ইস্রাইলের গল্প]

ইন্দিরা দেবী

ম্যাসিডন-সম্রাট বিজয়ী আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—এই নামের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় কাহিনীও তোমাদের অজানা নয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে আজ তারই একটি তোমাদের বলি শোন।

অনেক দেশ ভ্রমণ করতে করতে সম্রাট আলেকজাণ্ডার এক অপূর্ব্ব মনোরম স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মাখা এই জায়গাটি তাঁকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলো। রূপোর পাতের মত স্বচ্ছ ক্ষীণতোয়া নদীটি বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনি করে, তার তীরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শান্ত নিবিড় নিস্তব্ধতা তাঁকে যেন নতুন পরিবেশ এনে দিল। মনে হলো এই পরিবেশ, এই শান্ত প্রকৃতির নিস্তব্ধতা যেন তাঁকে বলছে : পৃথিবীর নানা দুঃখ, দৈন্য, কুটিলতা ছেড়ে এখানে এই সুখ-শান্তিপূর্ণ স্থানেই চলে এসো। তোমাদের পৃথিবীতে অপরাধ আর অপরাধীর ধ্বংসলীলা রক্তক্ষয় হানাহানি—মানুষের বড় হবার আকাঙ্ক্ষায় শুধু এই চিহ্নই থেকে গেছে। দেখ তো ভালো করে এই শান্ত কোমল প্রকৃতির দিকে চেয়ে—পৃথিবীর সেই দুঃখময় পরিস্থিতি কি এর চেয়ে ভালো?

সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মনে হলো—সত্যি কথাই—এই পরিবেশ ফেলে যেন কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। চারি দিকের স্বর্গীয় শোভায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

অনেক দূর এসে আলেকজাণ্ডারের মনে হলো তাঁর ক্ষিধে পেয়েছে। সত্যি, অনেক পথ তিনি অতিক্রম করেছেন, ক্ষিধে পাওয়ারই কথা। নদীর ধারে এক জায়গায় বসে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে কিছু খাবার ছিল। এমন সব জায়গায় যেতে হতো যে ইচ্ছা করলেই খাবার-দাবার পাবার কোনো উপায় ছিল না। কাজেই কিছু খাবার সঙ্গে থাকার প্রয়োজন হতো। কিন্তু সেদিন বিশেষ কিছুই ছিল না—কেবল কিছু জারক মাছ। ছোট-বড় অনেক কাঁচা মাছকে আচারের মত তৈরী করা হতো, এই সব খাবার সময়-অসময়ে কাজে লাগতো। আলেকজাণ্ডার নদীর ধারে বসে সেই মাছ বার করলেন, খাবার আগে তাঁর কি মনে হলো—নদীর জলে তিনি মাছগুলি ধুয়ে নিয়ে খেলেন।

কি আশ্চর্য্য! মাছগুলির স্বাদ বদলে গেছে। জারক মাছের মত তো আর নেই—এক অপূর্ব্ব ও চমৎকার স্বাদ হয়েছে মাছগুলোতে—এই নদীর জল লেগে। অনেক ভাবলেন আলেকজাণ্ডার,—এই নদী, এই সুমিষ্ট জল কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে এর উৎপত্তি? অনেকক্ষণ ভাবলেন তিনি, তার পর ভাবলেন এর উৎপত্তি-স্থল তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে। আবার এগিয়ে চললেন আলেকজাণ্ডার! চলতে চলতে পথ আর যেন ফুরোয় না—অবশেষে সম্রাট এসে দাঁড়ালেন এক মস্ত গুহার সামনে। বিরাট গুহার দরজা কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ গুহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আলেকজাণ্ডার দরজায় করাঘাত করলেন। কোনও উত্তর নেই।

একবার, দু'বার, তিনবার।

এবার ভিতর থেকে উত্তর এলো : কে? কি চাই?

আলেকজাণ্ডার উত্তর দিলেন : আমি ম্যাসিডনের বিশ্ববিজয়ী পরাক্রমশালী সম্রাট আলেকজাণ্ডার।

গুহার প্রকাণ্ড দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল—কিন্তু পূর্ব্বেকার সেই কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল : এটা হলো ন্যায়বিচার ও শান্তির রাজ্য, যারা নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করতে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে মারামারি হানাহানি করে—এ জায়গা তাদের জন্য নয়। তুমি যাও, মন থেকে যখন রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধে হানাহানি—এ সব বন্ধ করতে পারবে, অন্যের অপহরণের চেষ্টা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে, নিজের মনের উদারতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে—তখন এইখানে আসবার সময় হবে। এখন নয়।

সম্রাট এ রকম কথা কখনও শোনেননি—মনটা যেন কেমন হয়ে গেল—একটু ভেবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ জায়গার নাম কি?

উত্তর এলো : স্বর্গরাজ্য।

—বেশ, আমি যদি ঢুকবার অধিকারী না হয়ে থাকি—তাহলে এখান থেকে এমন কিছু চিহ্ন আমি নিয়ে যেতে চাই, যা আমার এখানে আসার সাক্ষী হয়ে থাকবে। আমি যে এখানে এসেছিলাম, আমি যে বিজয়ী সম্রাট—সেটা তার চিহ্ন হয়ে থাকবে।

আবার সেই কণ্ঠস্বরে হাসির শব্দ শোনা গেল : আচ্ছা, এই নাও—এর ভিতর যা আছে তা তোমাকে জ্ঞান দেবে। দিগ্‌বিজয়ী হয়ে তুমি যা জ্ঞান ও শিক্ষা আহরণ করেছ—তার চেয়ে শত সহস্র গুণ শিক্ষা ও জ্ঞান তুমি পাবে।

আলেকজাণ্ডারের হাতে একটা কৌটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সম্রাট ফিরে এলেন তাঁর প্রাসাদে।

তার পর সভায় পাত্র মিত্র গুণী জ্ঞানী পণ্ডিতদের মাঝখানে এসে তিনি সব কথা বললেন এবং এর ভিতর কি আছে এবং তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষার কি থাকতে পারে—এই কথা পরীক্ষা করার জন্ত কৌটাটি খোলা হলো।

তার ভিতরে একটি মরা মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সম্রাট রাগ করে কৌটাটি ছুঁড়ে বাগানের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন: এই মরার মাথা আমার জ্ঞান ও শিক্ষার বাহক হবে? এই আমি স্বর্গরাজ্য থেকে এনেছি? পৃথিবীর বিজয়ী সম্রাটের এই উপহার!

আলেকজাণ্ডারের সভায় এক জন পণ্ডিত ছিলেন—তিনি উঠে বললেন: সম্রাট! আমি কিছু বলতে চাই। আপনার ভুল হচ্ছে, আপনি যে উপহার পেয়েছেন তাকে এত সহজ করে দেখলে তো হবে না—একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দরকার। আপনি যদি আমার কথা শোনেন তাহলে দয়া করে এক কাজ করুন—জিনিসের ওজন হিসেবে তার মূল্য বিচার হয়—আপনি সোনা দিয়ে এর মূল্য নির্দ্ধারণ করুন।

সম্রাট পণ্ডিতের কথায় সম্মত হলেন এবং তাঁরই আদেশে দাঁড়িপাল্লা ও সোনা নিয়ে তখনি ওজনের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটা মরার মাথা—শুকনো হাড়, চোখের ভিতর কিছুই নেই—শুধু ছ'টো গর্ত্ত, যা দেখলে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই একটা সামান্ত জিনিস এক দিকে, অন্ত দিকে প্রচুর সোনা—কিছুতেই ওজন সমান হয় না। যত সোনা দেওয়া যায় কিছুতেই অপর দিকে মরার মাথাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না।

বিস্ময়ে সম্রাট স্তব্ধ, সভাশুদ্ধ লোক নির্ব্বাক্‌!

—কি আশ্চর্য্য, স্বর্গরাজ্য থেকে আমি কি উপহার আনলুম যা এত সোনার ওজনেও সমান হচ্ছে না?

—হ্যাঁ তাই সম্রাট—পণ্ডিত বললেন।

—তাহলে কি করা যায়?

ঐ মাথার যে ছ'টো চোখ আছে—ঐ চোখের গর্ত্ত ছ'টো মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে দিন—তার পর ওজন করুন।

সম্রাটের আদেশে তখুনি মাটি দিয়ে মরার মাথার সেই চোখের গর্ত্ত ছ'টো বন্ধ করে দেওয়া হলো।

—এইবার ওজন করুন সম্রাট—পণ্ডিত বললেন।

আশ্চর্য্য হয়ে সকলে দেখলেন সোনার ওজন আর মাথার খুলির ওজন অনেক বেশী হয়ে গেছে।

পণ্ডিত বললেন: চোখের দৃষ্টিতেই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা। সেই দৃষ্টি যখন বন্ধ হয় তখন এই পৃথিবী-জয়ের বাসনাই বলুন আর অন্তের অপহরণ করে, হানাহানি করে নিজে পাওয়ার লোভ এই সবই শেষ হয়। তা না হলে এ আকাঙ্ক্ষা দুনিবার হয়ে থাকে। আপনি যে স্বর্গের দরজা থেকে ফিরে এসেছেন তার কারণও এই। চোখ দিয়েই সবাই দেখে আর তার আকাঙ্ক্ষাও হয়—কিন্তু চোখ বন্ধ হলেই আর কিছু থাকে না।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

আটত্রিশ

দীনেশ সেন ও মথুরানাথ ছাড়া সবাই বাঁচল। একজন হাকিম আর একজন হুকুম-তামিলকারী নিখোঁজ হল বটে দুনিয়ার হিসাব থেকে কিন্তু তারা মরে গিয়েও নেমকের মহিমা ভুলল না। রইল মামলা হয়ে ইংরেজের পক্ষে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের খাতায় বেঁচে। এদের পরিবারের জন্য কেন ভাতা পেন্সনের ব্যবস্থা করবে না দয়ালু সরকার! কিছু দিনের মধ্যেই হুলিয়া জারি হল। যে দিবাকরকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে পাঁচশ' টাকা।

দিবাকরকে ধরে নিয়ে গেল যে অবস্থায়, তা মুক্তার কাছে যত দুঃ অসহনীয়ই হক না কেন, তবু তাকে সামলাতে হয়। বল সঞ্চয় করতে হয় মনে। এখন তার করণীয় কাজ বাড়ল বই কমল না। ক্ষেত্র হল প্রসারিত। কিছু বলে যায়নি তার গোঁসাই, কিন্তু রেখে গেছে যেন এক পাল সন্তান-সন্ততি—তারা নিতান্ত অসহায়। মুক্তা কল্পনায় মা হয়। স্নেহ-শীকরে সিক্ত হতে থাকে তার মন-কমলের দলগুলি। ঐ নিরাশ্রয় সর্বহারাদের বাঁচাতে হবে, জোটাতে হবে ক্ষুধার অন্ন, মাথা গোজার ঠাঁই।

আকাশে মেঘ ছিল। সে ধীরে ধীরে নাও বেয়ে এল কনকদের ঘাটে। দিবাকরের জন্য বাড়া ভাতের থালাটা সে ডুবিয়ে তুলল ঘাটের কোল থেকে। তুচ্ছ করে দূরে ছড়িয়ে দিল না ভাত—এখানে থাকলে হয়ত মাছে অন্তত খাবে।

মুক্তা বাড়ীর ভিতরে ঢুকল। সকলেই সজাগ, অথচ কেউ কোন প্রশ্ন করল না। জ্বালল না প্রদীপ পর্যন্ত।

জীবন এবং আলাম বারান্দায় শুয়েছিল। মুক্তা গিয়ে অনুমানে কনকের বিছানায় ঢুকল।

বাইরে আকাশ ভেঙে ঝড়। জীবন ও আলাম অগত্যা ঘরে এসে দোর ভেজাল।

দিবাকর হয়ত সেই মুহূর্তেই জানালা গলে পালাল।

আলাম বলে, 'বড় মুশকিল সব আসান হইল—ধুইয়া-মুইছ্যা যাইবে পাপের বাদশাদারী। কম পাপ জমে নাই দুনিয়ায়।'

মুক্তা জিজ্ঞাসা করে, 'কার পাপ জমছে ভাইজান—আমাগো?'

'না বুইন দিদি, রাজার পাপে প্রেজা কান্দে—বাপের দেনায় নিলামে ওঠে ছাওয়ালের জমি জ্যাত।'

এমনি দুটি-একটি মাত্র কথা হয়। ঝড় বইতে থাকে দুর্বার বেগে। দূর ও নিকটের গাছপালা মড়মড় করে। মাঝে মাঝে খাড়া ঝিলকিতে যেমন আকাশের বুকটা চিরে যায়, তেমনি শতধা হতে থাকে এই ক'টি প্রাণীর অন্তর গৃহহীন সর্বহারাদের অবস্থা স্মরণ করে।

তবু আলাম বলে, 'জীবন ভাই, অস্থির হইয়া লাভ নাই। বিপদে বিবেক ভরসা। ঝড়ে বড় গাছ যত ভাঙে, সে হিসাবে ছোট গাছ মরে না। সকাল হউক, দেইখ্যো তার নজির।'

কথাটা তেমন যুক্তিসংগত ও সহানুভূতিপূর্ণ বলে কারুর তখন মনে হয় না। কিন্তু ভোর বেলা সবাই বাইরে এসে দেখে যে উঠানের বড় আম গাছটা উলটে গেছে, আর যেন হাসছে চারা ফুল গাছ ক'টি যারা এত দিন বাড়তে পারেনি ঐ বড়টার জ্বালায়।

এত দুঃখের মধ্যেও মুক্তা একটু না হেসে পারে না। 'তুমি এ-সব কি কইর্যা বোঝলা ভাইজান?'

যুবক আলাম পরম ধার্মিক অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মত ঊর্ধ্বাকাশের দিকে হাত বাড়ায়। ইংগিত, সে বোঝার কে, খোদা তাকে বোঝায়।

শীতের বাতাসে খানখান করে কেটে উড়িয়ে নিয়ে চলল মেঘ। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। গত রাত্রে যে এমন লণ্ডভণ্ড হয়েছে সৃষ্টি, তা কিছুতেই বোঝা যেত না গাছপালার দিকে না চাইলে।

ওরা সবাই মিলে সেই সব বাড়ীর খোঁজ নিতে চলল, সে সব টিলার বাসিন্দাদের ঘর কেটে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত বড় ঝড় মাথার ওপর দিয়ে গেছে তবু তারা কেউ ভদ্রাসনের চৌহদ্দি ত্যাগ করেনি। পুলিশ যাওয়ার সংগে সংগেই আবার এসে দখল করে বসেছে।

মুক্তা আলামকে একান্তে ডেকে বলল, জীবনেরে লইয়া এট্টু গঞ্জে যাও তুমি।'

'ক্যান?' একটা সন্দেহের সুর ফুটে ওঠে ঐ ছোট প্রশ্নটার সংগে।

মুক্তা বুঝিয়ে বলল, এদের বিধ্বস্ত জীবন কেন্দ্রীভূত করতে কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন এবং তা একেবারে সামান্য নয়। যত দিন স্থায়ী কোনও বন্দোবস্ত না হবে, তত দিন একটা সাময়িক সাহায্য দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। 'ভাইজান, তোমাগো গোঁসাইর তো ছিল ওরাই জীবন।'

মুক্তার মুখের দিকে চেয়ে, আলাম আর প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। নায়ে এসে মুক্তা তার গয়নার পোঁটলাটি আলামের হাতে দেয়। কেবল একখানা গয়না সে দেয় না, তার সখের রূপোর ঘেঁটুটি।

মুক্তা টিলায় টিলায় ঘোরে, যায় বাড়ী বাড়ী। এত বড় বিপদের মধ্যে সবাই আছে, তবু তারা দিবাকরের জন্য অস্থির। প্রশ্ন করে, 'এখন কি করবা গোঁসাইর জন্য বিহিত?'

'তোমরা পুরুষ—পুরুষেরা সামনে থাকতে জবাব দিমু আমি?'

কথাটা সংগত, অতএব সবাই নীরব থাকে।

মুক্তা প্রবোধ দিতে লাগল বুড়োদের। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই হবে। ছোট ছেলে মেয়ে আর না খেয়ে মরবে না।

কেষ্ট মহাজন সত্যিই বুঝি 'কাক-বচন' জ্যোতিষ জানত।

সে সংগোপনে থেকে সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করল। এবং একটুও দেরী না করে, গেল আলাম ও জীবনের পিছু পিছু গঞ্জে। কথাবার্তা চালাল ফাঁড়ির পুলিশের সংগে। তারা হৈচৈ করে আটক করল গয়নাগুলো ডাকাতির বামাল সন্দেহে। মানুষ দুটোকে ইচ্ছা করেই ধরল না—আবার কে জ্বালা বাড়ায় ডাইরী-পত্র-খতিয়ানের। চালানও তো দিতে হবে জেলায়। তার চাইতে চেষ্টা করে দেখবে যদি বিনা লেখাপড়িতে আত্মসাৎ করা যায়। অবশ্য কেষ্টর সংগে যোগসাযোগে।

গঞ্জ থেকে ফেরার পথে কেষ্ট একটু দমে গেল। সে আসছিল ভিন্ন পথে একটু ঘুরে। দেখল যে কতগুলো লোক জমা হয়েছে একটা চরে। ব্যাপার কি?

গত রাত্রির ঝড়ে একখানা নাকি নৌকা ডুবেছে। দুটো লাস

মাত্র তিন
ঘণ্টার মধ্যে
অসম্ভব সম্ভব
হোলো !

পাওয়া গেছে নিকটেই। একজন এই এলাকার বড় দারোগা, অপর ব্যক্তি দীনেশ হাকিম। ভিন্ন থানার একখানা পুলিশের নৌকা নাকি যাচ্ছিল এই পথ ধরে। তারা লাস এবং নাও তুলে নিয়ে গেছে।

কেষ্ট জিজ্ঞাসা করে, 'বলি, লাস পাইছে কয়ডা ?'

কে জানি উত্তর দেয়, 'মাত্তর দুইডা।'

কেষ্ট না জানা সত্বেও জবাব দেয়, 'না না, আরও একটা ছিল, হাতে হাত কড়ি, কোমরে দড়ি বান্ধা আসামী। এই তোমাগো দিবাকর গোঁসাই।'

একটি ছেলে জবাব দেয় যে দিবাকরকে নাকি দেখেছে সে রূপসী নদীর বাঁকে—এই ভোর বেলা।

কেষ্ট একটু বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে উত্তর দিয়ে হেসে ওঠে, 'দেখেছে ঠিকই, তবে জ্যাতা (জীবন্ত) নয়, মরা।—ভূত দেখছ বাপু, ভূত।'

ছেলেটি অবাক হয়ে থাকে।

কেষ্ট গাঁয়ে গিয়ে কি বলবে তাই মনে মনে মকসো করতে করতে সারা রাস্তা নাও বেয়ে এলো। প্রথমটা যে যতখানি দমে গিয়েছিল, শেষটায় তার ততখানি স্ফূর্তিতে শিষ দিতে ইচ্ছা করছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেছে। মুক্তা অস্থির হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। এমন সময় এল আলাম ও জীবন পিঠে কতগুলি ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের পিঠের প্রদাহের চাইতেও মর্ম-দাহ যেন হয়েছে অনেক বেশি। তারই প্রতিফলন হয়েছে ওদের মুখে ও চোখে।

সামান্য কথাবার্তার পর সমস্তই বুঝল মুক্তা। সে আর অপেক্ষা না করে ওদের নিয়ে নামল নায়ে। যে সব বাড়ী উৎপীড়ন হয়নি সেই সব বাড়ী গেল। প্রতি ঘর থেকে মুষ্টিভিক্ষা তুলল।

মুক্তা একটা টিলায় উঠে, বড় ছুটো হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল খিঁচুড়ি। ডাকা মাত্র পংগপালের মত ছুটে এল ছেলে-মেয়ের দল। তাদের হাতে থালা বাসন জলের ঘটি। মা ও বাপেরাও এলো। তারা দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। পেট অবশ্য তাদেরও পুড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা তো আর করতে পারে না হৈচৈ।

তখনও কড়ি ফুট দেখা দেয়নি হাঁড়ির মুখে, মুক্তা বুদ্ধিমতী স্নেহশীলা জননীর মত আশ্বাস দেয়, 'হইল আর কি।'

কান্নাকাটি বন্ধ করে ওরাও থালা-বাটি বাজিয়ে গান জুড়ে দেয় —'হইল আর কি।'

ছেলে-মেয়েদের খাওয়া হয়ে যায়, বৃদ্ধদেরও শেষ হয় অল্প সময়ের মধ্যে। কোন তাড়াহুড়া নেই, তাই বয়স্ক তাড়াতাড়িই এত বড় একটা যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

মুক্তা নিজের রিক্ত শ্রীর দিকে চাইতেই হঠাৎ তার হৃদয়টা উদ্বেল হয়ে ওঠে। কোন কাজেই তো লাগল না অলংকারগুলি! সজ্জা ভাগ্যে টিকল না ছটি দিনের বেশী। যে দেখার সে গেল অকালে চলে। করতে গেল পরহিতার্থে ব্যয়, তাও হল নিষ্ফল।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে কেষ্ট বাড়ী ফিরে দিবাকরের মৃত্যু-সংবাদটা রটিয়ে দেয় বেশ ফলাও করে।••• ফলে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সন্ধ্যার একটু পরেই তার বাড়ীর পাশের বুড়ো শানদার তাকে এসে ধরে নিয়ে যায় রক্তপিপাসু বাঘের মত গলায় গামছা দিয়ে। বাপ-বেটায় মিলে টেনে নিয়ে চলে হিড়হিড় করে।

কেষ্ট বহু কষ্টে প্রশ্ন করে, 'কোথায়, এ কি কোথায় নেও আমারে ?'

'গাঁওপঞ্চাইতের বিচারে। চুপ যেটা চুপ।'•••

কুয়াশাশূন্য শীতের আকাশ ওপরে চকচক করছে। নীচে হিমেল হাওয়া যেন তীক্ষ্ণ ছুরি চালাচ্ছে। তা উপেক্ষা করে ছুটে আসছে ডোঙা ডিঙি একটা টিলার দিকে। সকলেই সব জানে। আজ একটা বিশেষ দিন। তাই মানুষ ভেঙে পড়ে চার দিক থেকে। রাত্রি হয় প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।

সভা বসে দিবাকরদের বাড়ীর টিলায় এক পোড়ো ভিটার জংগলের আবডালে। একটা মশাল জ্বলে কেষ্টর মুখের সুমুখে। পঞ্চাইৎ হয় গ্রামের পাঁচ জন বৃদ্ধ। তার মধ্যে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও আছে, সে হচ্ছে হাতেমের মা। বিচার-শালিসীতে তার রায় এক জন জজের তুল্য।

ভাঙা-চুরা স্ত্রী-পুরুষ ফরিয়াদীর দল দাঁড়ায় গিয়ে এক পাশে। অনায়াসে একটা আর্জি দাখিল করতে পারে মুক্তা, কিন্তু কেন জানি সে তা করে না।

কারুর দাঁত ভেঙেছে, কারুর হালের গরু ছিনিয়ে নিয়েছে, কেউ কেউ বা বিনা কারণে খেয়েছে সবুট পায়ের লাথি। অধিকাংশ মানুষই হয়েছে গৃহহীন। অভিযোগ উপস্থিত হয় হাজার রকম।

মশাল জ্বলতে থাকে কখনও বা দাউ দাউ করে, কখনও বা একটু ঢিমিয়ে।

এই স্বল্পবস্ত্র মানুষগুলো, এত বড় শীতের রাত্রেও ঘেমে ওঠে জবানবন্দী দিতে দিতে। অসংখ্য উৎপীড়নের কাহিনীতে যেন কলুষিত হয়ে ওঠে আবহাওয়াটা। দিবাকরের কথাটাও বলে অনেকে।

অবশেষে আসে একখানা রক্তাক্ত ধূলি-মলিন ছিন্ন শাড়ী। ভগ্নীর হয়ে ভাই-ই উপস্থিত করে সাক্ষ্য। সকলে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

ঈষৎ কেঁপে ওঠে কেষ্ট।

যে ভগ্নীর পক্ষ থেকে নালিশ জানাতে এসেছে, সে বোবা, অব্যক্ত জ্বালায় ও ব্যথায় গুমরে ওঠে। জগতের যত ধর্ষিতা ও উৎপীড়িতা নারীর আবেদন যেন মাথা কুটতে থাকে ওর বুকে।

অবস্থা দেখে মুক্তা এগিয়ে আসে, ভাষা দেয়, 'দেখ দেখ দশ দিকের ভাইরা, দেখ সঙিন বন্দুকের কীর্ত্তি। সভ্য মানুষ এমন অসভ্য হয় ক্যামনে ? এর কি কোন বিচার নাই ?'

পঞ্চাইতেরা সমস্বরে বলে ওঠে, 'আছে আছে—গাঁও পঞ্চাইতের কাছে ফাঁকি নাই কোন কিছুর। তুমি সুস্থ হও মুক্তা।'

যে অভিযোগ মুক্তার মর্মে ছিল তাও যেন আশ্বস্ত হল ঐ কথাগুলোতে। মুক্তা এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

হাতেমের মা জিজ্ঞাসা করে, 'এর জন্য দায়ী কেডা মহাজন ?'

কূটকৌশলী কেষ্ট জবাব দেয়, 'আমি না।'

দ্বিতীয় এক পঞ্চাইৎ জিজ্ঞাসা করে, 'তবে কেডা ?'

কেষ্ট কয়লার মত একটু হেসে বলে, 'ভাইব্যা দেখ ভাই প্রসন্ন—আমি নিরপরাধ।'

তৃতীয় পঞ্চাইৎ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'মসকরা নয়, সত্য কও কেষ্ট—স্বীকার কর দোষটা, তুমিই যত নষ্টের মূল।'

কেষ্ট আবার বলে, 'ভাইব্যা দেখ উচিত মত মাথা খেলাইয়া, অপরাধী নয় কেষ্ট।'

একটা গুঞ্জন ওঠে। মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে পঞ্চাইতেরা।

অবশেষে হাতেমের মা বলে যে কেষ্টর কথাই সত্য।

কেমন? কেমন? চতুর্দিক্‌ থেকে অব্যক্ত প্রশ্ন ওঠে রাশি রাশি। এত বড় অপরাধী পাবে খালাস! জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কেউ এগিয়ে আসে পংক্তি ছাড়িয়ে। কারুর দেখায় চোখ দুটো রাঙা!

আলাম বলে, 'সবুর, চুপ কর ভাই-বুইনেরা। নানীর কথা আছে বহুৎ—এ তো হইল অশ্বত্থমা হত, ইতি গজের মত।'

আবার যে যার স্থানে গিয়ে বসে পড়ে, অথবা দাঁড়িয়ে থাকে দুরু দুরু বক্ষে। ঘটনাটা বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে।

'আসল আসামী কেষ্ট নয়—কেষ্ট কইছে সত্য। সজিন আর সরকারই এর জন্ম দায়ী বেশি।' নানী সুর বদলে বলে, 'কিন্তু সব আসামীর সেরা আসামী, যে ঘর ভাঙে, যে গাঙ কাইট্যা কুমীর আনে উঠানে। কেষ্ট, হিন্দুর শাস্তরে বিভীষণ আর আমাগো হাদিসে (শাস্ত্রে) দুশমন।' বৃদ্ধা চুপ করে।

অনেকে বলে যে কেষ্টর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ওকে দেশ থেকে বিদায় করে দেওয়া হক।

আলাম অধীর হয়ে ওঠে। 'বিচার তো হইয়া গেছে, এখন রাখো তোমরা চ্যাংড়ামি। ঘোল ঢালা আর পানি ঢালা একই কথা—টাউক্যা মাথায় পিছলাইয়া যায় সবই। একবার গোঁসাই ওনারে রেহাই দেছে, ফল ফলছে তার উলটা—পাইলটা আইস্যা উনিই আবার দংশন করছে মগজে।'

বুড়ো শানদার বলে, 'বাপ রে বাপ, এ এক কেউটে সাপ, এর স্থান নাই মুনিষ্যের সোমাজে।' তার পর সে ছেলেকে ডাকে এবং বলে যে বিচার হয়েছে চমৎকার এখন ব্যবস্থা যা করার তা ওরাই করবে বাপ বেটায় আপন হাতে।

পরদিন ভোর না হতেই কেষ্ট একেবারে 'গুম' (নিখোঁজ) হয়ে যায় ভূতের মত।

উনচল্লিশ

একটা অপ্রিয় কাজ করলে যেমন অস্বস্তিতে ভরে থাকে মন তেমনি অবস্থায় কাটে দুটো দিন। কিন্তু যারা কাজের লোক তারা বসে থাকতে পারে না। জীবন যায় চালের সংস্থান করতে। কনক মন বসাতে বাধ্য হয় রান্না-বান্নায়।

মুক্তার মন সঠিক কিছুতে বসে না। সে ব্যাকুল অন্তরে বসে থাকে কার যেন প্রতীক্ষায়। কার কণ্ঠস্বর যেন পরিজনদের কণ্ঠে শুনে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। অনেকের মত সেও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি কেষ্টর কথা। তবে একটা রাত মাত্র ছিল আচ্ছন্ন হয়ে। তার পর ভেবেছে, ভাবতে ভাবতে স্থির অনুভব করেছে যে দিবাকর এখনও জীবিত, তাই সন্নত হয়ে থাকে তার মন।

সেদিন শেষ রাত্রে কে যেন ডাকল, 'মুক্তামালা, মুক্তামালা, সজাগ আছ নি?'

এ কি কথা, এ কি অভিযোগ! তার জাগ্রত নেই কোন অংগ! শুধু কি আজ? নিত্যই তো সে জেগে কাটায় রাত।

দোর খুলে মুক্তা বেরিয়ে পড়ে।

সুমুখেই দিবাকর। তুষার-শীতল তার হাত দুখানা—হয়ত সমস্ত দেহই তার অমনি ঠাণ্ডা প্রচণ্ড শীতে।

দিবাকর বলে, 'ক্ষান্ত হও মুক্তা, আমার অশৌচ।'

অর্থ—এ কথার তাৎপর্য কি? মুক্তা কি স্বপ্ন দেখছে? সে সজোরে একটা চিমটি কাটে নিজের হাতে। না—সে জাগ্রত, সজ্ঞান।

কনক বাতি জ্বালায়। জীবন বেরিয়ে আসে হুঁকো কলকী ও তাওয়া নিয়ে। আলাম এসে সেলাম জানায়, 'গোঁসাই তবিয়ৎ (শরীর) শরিফ ভাল তো?'

জীবন তামাক সেজে দেয়। হুঁকো রেখে হাতেই তামাক খায় দিবাকর। 'আমার অশৌচ জীবন।'

দিবাকর আনুপূর্বিক ঝড়ের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করে। ওরা নির্বাক্‌ হয়ে শোনে। 'পুলিশ তো নাই নিকটে?'

জীবন উত্তর দেয়, 'যত দূর জানি, নাই।'

দিবাকর বলে, 'আইবে শীগগিরই।' তাকে পালিয়ে পালিয়েই কিছু দিন কাটাতে হবে। জীবন্ত রাখতে হবে বিপ্লবকে। কিন্তু সে মাঝখানে একটা কাজ করে যেতে চায়, তাই দেশে এসেছে। যাবে আগামী কাল ভোর না হতেই। জীবন ও আলাম, দীনেশ হাকিম ও মথুরানাথ দারোগার সংবাদ নিয়ে দিবাকরের সংগে আলোচনা করে। হঠাৎ দিবাকর জিজ্ঞাসা করে, 'ও কি, তোর গয়নাগুলো কই মুক্তা?'

দিবাকর আবার কিসে কি মন্তব্য করে, সেই জন্ম কনক গয়নার বিবরণটা আপাতত চেপে যায়। 'ও তো বিবাগী হইছে।'

একটু স্মিত মুখে দিবাকর প্রশ্ন করে, 'সত্য নাকি মুক্তা?'

মুক্তা একটু হাসে—তৃপ্তি যেন উপচে পড়ে তার দুটি দশন-পংক্তি বেয়ে।

দিবাকর কেষ্টর কথা শুনল। শুনে মন্তব্য করল যে তার এ পরিণাম যে হবে সে তা জানত। এ অসম্ভব কিছু নয়।

এইবার দিবাকর নিকটের দু'চার জন প্রতিবেশীকে ডেকে আনতে বলে জীবনকে। দিবাকর কত দিনের জন্ম যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে তা কে জানে! আবার চলে যাওয়ার আগে সে একটা নীতি কথা শিখিয়ে দিয়ে যেতে চায়।

শত্রু এখনও মরেনি। শত্রু মরেছে—এ কথায় যে বিশ্বাস করে হাল ছেড়ে বসে থাকে সে নিতান্ত মূর্খ।

'কাটা বাঁশের গোড়া দিয়া হাজারটা ক্যাকড়া জন্মে—মইর‍্যাও মরে না মূল। তাই নির্মূল করতে হইবে ঝাড়। সে এক মহাযজ্ঞ—অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য, কালে-ভদ্রে তিথি-নক্ষত্রর আশ-পাশের অবস্থায় ঘটে। তার আগে আমি একটা শ্রাদ্ধ করতে চাই—যে শত্তুর মরছে ডুইব্যা, তার কুশপুত্তল পোড়াইয়্যা। তারা তো আমাগো কম খোঁচায় নাই।'

অল্প কিছু লোক সমবেত হয়। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয় সম্ভব মত। একটা উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় চার দিকে। আনুষ্ঠানিক ভাবে সবই সংগ্রহ করে দিবাকর। বলে 'সাপ মাইর‍্যা ল্যাজে বিষ রাখবা না, দাহ করবা নিয়ম মত। আগুন নেভছে কইলেই বিশ্বাস করবা না, পরীক্ষা করবা ভাল মত।'

আলাম মুসলমান হলেও কাঠকুটো এগিয়ে দেয়। সাহায্য করে চিতা প্রস্তুত করতে। মনে হয় এ কাজে সেও যেন দিবাকরের সমান অংশীদার। আগুন জ্বলে দাউ-দাউ করে।

শত্রু মরেছে, শত্রুর শব দাহ হচ্ছে—শেষোক্ত ঘটনাটা অলীক কিন্তু প্রতীক ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণের। জনতা সাগ্রহে চেয়ে থাকে। সমস্তই তাদের সত্য বলে মনে হয়। তারা হরিধ্বনি দেয় সহসা। দিবাকর বলে 'করলা কি? পুলিশ, পুলিশ যে আছে ওতে ওতে। 'ভাই সবেরা করলা কি! এখনও পালাও তাড়াতাড়ি।'

বলতে বলতেই দূর থেকে একটা বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। একটা বুলেট এসে পড়ে আলামের বুকে।···

ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় জনতা।

দিবাকর বলে, 'ধর ধর মুক্তা—আলামেরে নায়ে তোল। ধর শক্ত কইর‍্যা।'

মুক্তা স্বপ্নাবিষ্টের মত এগিয়ে যায়।

এলেম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্বে, এই কথা কটিই কেবল বলে যায়, 'যে মাটির লাইগ্যা যতটুকুই লইড়্যা থাকি, সেই মাটিই জানি শেষকালে পাই। সেলাম গোঁসাই সেলাম।' তার পর সে অতিকষ্টে গানের দুটি পংক্তি সুর করে আবৃত্তি করে—

'(গোঁসাই) আগুন জ্বালায় কে?
ইংরাজে, ইংরাজে, ইঙ্গরাজে।···'

চল্লিশ

পিতার মৃত্যু সংবাদে কুন্তলা যতখানি মুষড়ে পড়েছিল ততখানিই তার চিত্ত দৃঢ় হয়ে উঠল অল্প সময়ের মধ্যে। এ তো অনিবার্য পরিণাম। শত দুঃখ হলেও একে স্বীকার না করে উপায় নেই—গ্রহণ করতে হবে সহজ ভাবেই।

যতীন দাস হেডমাষ্টার এসে দেখল যে, একটি যেন শোকের ছন্দ—প্রতিমা দুঃখের।

'এখন কি করতে চান দেবী?'

'কলকাতা যাব।'

'এমন এক জন লোক চলে গেলেন যে আমারই সর্বনাশ হল সব চেয়ে বেশি। উঃ, কি ক্ষতি!' সমবেদনা জানাতে এসে যতীন দাস নিজের মর্মবেদনাই জানায় সমধিক। 'ইস্কুলটির কাঠামো থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা কিছু দাঁড়িয়েছিল, সকলই তাঁরই আশীর্বাদ ও তীক্ষ্নবুদ্ধি। উঃ, কি ভীষণ ক্ষতি!'

কুন্তলা বিরক্ত হয়। কিন্তু এই লোকটি ছাড়া এমন কেউ তার সাহায্যকারী নেই, যার ওপর কিছুটা নির্ভর করা চলে। এক স্থান থেকে তো অন্য এক স্থানে কায়েমী ভাবে উঠে যাওয়া অনায়াসসাধ্য নয়। বুঝ-ব্যবস্থা গোছ-গাছ করতে হবে কত রকম।

চাকর এসে চা দিয়ে যায়। দুজন বসে বসে চা খায়। যতীন দাস বলে নানা কথা।

'দিবাকরও কি মারা গেছে মাষ্টার মশাই?'

'না না—এতক্ষণ বসে শুনলেন কি? মাঝিরা জেলায় গিয়ে এজাহার দিয়েছে যে দিবাকর নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। ঝড়ে কেউ মরেনি।'

'এ অসম্ভব! হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি থাকতে কি কেউ সাহস পায় নাও ডুবিয়ে দিয়ে নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনতে?'

'তা পায়—ও তো মানুষ নয় পশু!'

'হতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে পশুরাজ।'

কুন্তলার মনে পড়ে দিবাকরের দেহের দীর্ঘ ছন্দ—মনে পড়ে তার ঘাড় ঘুরিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ভংগী। মনে পড়ে তার অব্যর্থ যুক্তির সন্ধান—'ওরা জীবন দেবে, তবু 'বলন' দেবে না।'

'বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, আবার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাজা—আবার সমস্ত রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ, যাঁর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। তিনি চুপ করে অন্যায় সহ্য করার পাত্র নন। দেশে দেশে ইস্তাহার পাঠিয়েছেন যে, যে দিবাকরকে জীবিত অথবা মৃত ধরে এনে দিতে পারবে, সে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার পাবে।'

'এ কথা কি দিবাকর জানে?'

'পশুর কি দেবী বর্ণজ্ঞান আছে? সে কি ইস্তাহার পড়তে জানে?'

কুন্তলা একেবারে নীরব হয়ে যায়।

যতীন দাস নানা কথা বলতে থাকে। নানা কথার শেষ কথা 'উঃ, কি ভীষণ ক্ষতি, আমার সাধের গড়া ইস্কুলটি···।'

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে যতীন দাস উঠল। কুন্তলা বলে দিল যে সন্ধ্যার পর একবার আসতে।

একে শীতের রাত্রি, তাতে আর কোন স্বার্থসিদ্ধির আশা নেই, তাই পরহিতব্রতী যতীন মাষ্টার আমতা আমতা করতে লাগল, সন্ধ্যার পর না এসে, কাল অতি প্রত্যূষে যদি।—'

'না মাষ্টার মশাই, সন্ধ্যার পরই একবার আসবেন। আশা করি এর মধ্যেই আপনি···'

খোঁচা দিতে হয় না—তার আগেই যতীন দাস সম্মত হয়।

কথা মত সন্ধ্যার পরই এসে যতীন দাস হাজির হয়।

কুন্তলা বলে, 'মাষ্টার মশাই আপনার সংসারে কাম্য কি?'

হঠাৎ এত-বড় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যতীন দাস ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

'তাড়াতাড়ি বলুন, সময় নেই—আমার কণ্ঠের এই হীরার মালা, না পাঠশালা, যেখানে থেকে এ জীবনটা খুইয়েও এমন একছড়া মালা গড়াবার কস্মিন কালেও মুরদ হবে না? কি চাই?'

'মা লক্ষ্মী, হীরার মালা, হীরার মালা।'

'তবে তাড়াতাড়ি। একখানা ডিঙি নাও কেরায়া করে নিয়ে আসুন, যাব বিলগাঁ।'

আধো আলো আধো অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে নাও। কুন্তলা কিছুক্ষণ বাদে নৌকার গলুইতে এসে দাঁড়ায়।

'দেবী, আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না।'

'না, চলুন মাষ্টার মশাই ছইর ভিতর যাই!' কুন্তলা ভিতরে গিয়ে বসল।

'আর কত দূর মাঝি?'

যতীন দাসের প্রশ্নে মাঝি আশ্চর্য হয়ে জবাব দিল, 'এই এখনই!'

'আপনি একটু বিশ্রাম করুন, এখনও ঢের দূর।' বলেই যতীন দাস লেপ মুড়ি দিল। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বাইরে।

নৌকা এগিয়ে চলে মাঝির বৈঠার তালে তালে।

কুন্তলা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও বার বার এলো খোপা সম্বরণ করে—ভুল করেও জিভ দিয়ে ভিজায় না বিশুষ্ক রঙিন ঠোঁট দুটি ফিকে হওয়ার ভয়ে।

দলদাম ঠেলেও মাঝি ছলছল করে বেয়ে চলেছে নাও। দ্বিগুণ ভাড়ার আশায় এত রাত্রেও দশ গুণ খাটছে। এমনি খেলতে খেলতে মাঝি এগিয়ে চলেছে নানা ঝোপ-ঝাপি বিপদসংকুল ধাঁধাঁ পথ ডাইনে-বাঁয়ে রেখে।

চিন্তা করে মাঝি এক স্থানে নাও রাখে। এখান থেকে একটু কাদা ও জল ভেঙে হেঁটে গেলে বিলগাঁ অতি নিকটে। নতুবা এই কুয়াশায় কতক্ষণে যে পৌঁছান যায় তার ঠিক নেই। পথভ্রান্তিও অসম্ভব নয়। যাত্রী দুজনাকে ডেকে তুলে মাঝি সব বুঝিয়ে বলে।

খুব একটা গরম দামী কোট গায় দিয়ে জুতো পায় ধড়মড় করে বেরিয়ে আসে কুন্তলা। হাতে তার ছোট্ট একটা সৌখিন টর্চ। এ কি—এত কুয়াশা! স্বাভাবিক বিঘ্ন নয়, অস্বাভাবিক আবহাওয়া! দুর্লঙ্ঘ্য নয়, তবু হঠাৎ যেন ঠিকে ভুল হয়। টর্চ জ্বালিয়ে সে তখনি যেন মাঝিকে চিনতে পারে না। বহু দূরে শোনা যায় শীতার্ত নিঃসংগ কুকুরের চীৎকার। নিকটে কুয়াশায় ঠাণ্ডা ঘাসগুল্মের ওপর পোকা-মাকড়ের বিশ্রী ঘ্যানঘ্যানানি।

'ওর গালে ওটা কি মাষ্টার মশাই? ঐ মাঝির—'

মাঝি গালে হাত দিল। দিয়ে কি যেন একটা টেনে তুলল। রক্ত খেয়ে বেশ পুষ্ট হয়েছে জীবটা।

যতীন দাস বলল, 'একটা জোঁক।'

সর্বনাশ! কুন্তলার সর্ব শরীর রি-রি করে উঠল ঘৃণায়।

'এখন নামুন দেবী, এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে।'

'এই জল এবং কাদায়?'

'জুতায় লাগবে? খুলে ফেলুন না!'

'না না কিছুতেই আমি তা পারবো না। প্রাণ গেলেও না। তার চেয়ে বরঞ্চ রাতারাতিই ফিরে চলুন, কেউ টের পাবে না।'

যতীন দাস মনে মনে হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিল। হায়, হায়, হীরার মালা তার আর ভাগ্যে জুটল না।

একচল্লিশ

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা।

দুটো ঘটনা একই রাত্রে আকস্মিক ভাবে ঘটেছে।

দিবাকর মুক্তার সাহায্যে আলামকে নিয়ে নায়ে উঠল। তর-তর করে ঠেলে চলল নাও। পিছনে মিলিটারী পুলিশের টর্চ জ্বলছে। ওরা আর বেশি সময় উন্মুক্ত বিলে থাকতে সাহস পায় না। একটু দূরে, এই গোটা দশেক টিলার ওপাশে যেন মোটর-বোটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হয়ত পুলিশের বড় কর্তা কেউ সংগে এসেছে।

'ওরা আলামের জন্ম নিশ্চয় তন্ন-তন্ন করবে আমাগো বাড়ী। তার আগেই পাড়ি দিতে হইবে গোর দিয়া। ভাইজান আমার ছিল বিদুরের মত মধুর। মুক্তা, মনে পড়ে কুরুক্ষেত্রের কথা,—চাইর দিকে অস্তরের ঝনঝনি, মধ্যে মধ্যে অমৃত ফলের মত মিষ্ট অতি মধুর বাণী।'

'ক্যান পড়বে না গোঁসাই? এ যুদ্ধও তো সেই ধর্ম যুদ্ধ—মেদিনীর লাইগ্যা লড়াই। ক্যাবল দুঃখের কথা আমাগো মত অভাজন রইল, চইল্যা গেল বিদুর ভাই।'

যেখানে এই কিছুদিন পূর্বে লুকিয়েছিল দিবাকর, সেই জংলা চরের দিকে ওরা নৌকা বেয়ে চলল। মনে আশংকা, পদে পদে ভয়, তবু দুর্জয় তেজে বৈঠায় টান দিচ্ছে দিবাকর।

'হাল ঠিক রাখিস্ মুক্তা—গলুই যেন ঘোরে না।'

'ভয় নাই তোমার—তুমি টান দাও বৈঠায় চক্ষু বুইজ্যা।'

দু'জনে আর কথা বলে না, নৌকা চলে সোজা পথে। জলচর পাখীরা সচকিতে তন্দ্রা ভেঙে সরে যায়। মাঝে মাঝে কলরব আসে কানে। দিবাকর পিছন ফিরে লক্ষ্য করে, কেউ কি অনুসরণ করেছে তাদের? তারার আলোতে ঠিক কিছু বোঝা যায় না—খানিকটা পরিষ্কার, খানিকটা আঁধার। কিছুক্ষণ চলার পর এল কুয়াশা নেমে—সেই কুয়াশা, যা ভিজা তুলার মত দেখতে।

'গোঁসাই এখন?'

'আন্দাজে সোজা চাইপ্যা রাখ বৈঠা।'

'কুয়াশা যে ভীষণ।'

'ও কুয়াশা থাকবে না—স্থির হইয়া থাক একটু কাল। হাল জানি ঘোরে না।'

আবার চলতে লাগল নাও। দিবাকরের উপদেশ মত বৈঠা চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকে মুক্তা।

পিছনে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে, কিন্তু সঠিক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অবশেষে ওরা এসে নির্দিষ্ট স্থানে থামে। দ্রুত দিবাকর নেমে যায়। ক্ষিপ্র হাতে বৈঠা দিয়ে নরম চরের বুকে কবর খোঁড়ে দিবাকর।

মুক্তা কোলে নিয়ে বসে রয়েছে আলামের দেহ নৌকায়।

কোন মতে কবর প্রস্তুত হল। দু'জনে আবার ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে এল আলামকে।

রীতিমত ব্যথিত কণ্ঠে দিবাকর বুকে হাত রেখে ধীরে ধীরে বলে, 'হে মেহেরবান খোদা, তুমি আইজ এই আমাগো দুই জনারে ক্ষমা কইর আলাম ভাইরে মাটি দিলাম বইল্যা। ও খাঁটি সোনা, শত্তুরের হাতে যাইতে দিতে পারি না।'

মুক্তা কাঁদে না, একটা ফুল গাছ এনে রুয়ে দেয় কবরের কাঁচা মাটির ওপর।

'ওটা কি মুক্তা?'

'হাসনাহানার ঝাড়—বছর ফেরতে না ফেরতে ফুল ফোটবে, চিনা (চিহ্ন) রইল বিদুর ভাইর।'

'হয় মুক্তা—চিনাই বটে, দারুণ চিনা—এ দাগ মোছবে না কোনও কালে।'

বাইরে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু অন্ধকার রয়েছে শুধু চরের জংগলে। যত দ্রুতই এ সব কাজ করে থাকুক দু'জন মিলে তবু দেরী হয়ে গেল অনেক। অতি সন্তর্পণে ওরা পা ফেলে চললেও শব্দ হল শুকনা ডাল-পালায়। ডেকে উঠল পাখীরা।

'গোঁসাই, এখন তাড়াতাড়ি চল।' মুক্তা এসে হাত ধরল দিবাকরের।

'চল মুক্তা চল—সত্যই আর দেরি করা ভাল না।'

ওরা শিশির-ভিজা পথে বিলের দিকে এগিয়ে এল।

ভোর হতে না হতেই নির্বিচারে ফায়ারিং চলল···

সতর্ক হওয়ার পূর্বেই অলক্ষ্য থেকে একটা গুলী এসে বিলগাঁর মর্মে বিঁধল—কাত হয়ে পড়ল দিবাকর সেই জমি ও জলের সংগম স্থলে, যা ছিল ওর প্রাণ।

মুক্তা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল দিবাকরকে। দিবাকর কথা বলতে পারছে না।

'কি করুম আমি এখন গোঁসাই, কি করুম?'

ইংগিতে চুপ করতে বলে দিবাকর। সে ওর মধ্যেই একটু হাসতে চেষ্টা করে। অবশেষে ধীরে ধীরে উপদেশ দেয়, 'রাহু গেরাস করে চন্দ্রমা, কিন্তু তা হজম করতে পারে না—ওরা যত গুলীই চালাউক, সব গেরামবাসী আর মরবে না। তুই তাগো পাশে থাকিস···মুক্তা, তুই আমাগো মান রাখিস।'

দিবাকর চুপ করে। গুলীটা লেগেছে এসে তার দক্ষিণ বাহুতে।

মুক্তা জল আনতে ছোটে। জল নিয়ে আসে গামছা ভিজিয়ে। ধুয়ে-মুছে বেঁধে দেবে ক্ষত স্থানটা।

ছায়ামূর্তির মত পুলিশেরা তিন দিক থেকে এসে ঘিরে ধরে।

'ঐ তো আসামী!'

কোথায় আসামী? চতুর্থ দিক দিয়ে জংগলের মধ্যে সরে পড়ে দিবাকর।

তার পর তন্ন-তন্ন করে খোঁজ চলে। হয়রান হয়ে পুলিশের দল।

মেঘের ফাঁকে শীতের সূর্য উঁকি মারে যেন স্মিত মুখে।

[সমাপ্ত]

যুগাবতার

দিলীপকুমার পুরকায়স্থ

গংগার তীরে যুগ যুগ ধরি'
কতই তীর্থ উঠিয়াছে গড়ি'
অসীমের পথে কতই কণ্ঠে কতই গান
তাহারি মাঝারে তোমার কণ্ঠে নতুন তান,—

"তটিনী যেমন সাগরে ছুটেছে
মানুষ তেমনি মায়েরে চেয়েছে
সন্ধান মার মিলেছে হেথায় নানান্ পথে
মিছে কিছু নয় সকলি সত্য যে যার মতে!

সৃষ্টির মাঝে জগৎমাতার কতই খেলা
সূর্য্যের আলো, চাঁদের কিরণ, তারার মেলা,
তারি তলে কেন মিছে ভেদাভেদ গণ্ডগোল
হিংসার হাসি ভ্রূকুটি-কুটিল কলহ-রোল!

খুলে দাও দ্বার জীবনের পথে আসুক আলো'
হৃদয়-কমল ফুটিয়া নাশুক রাতের কালো
সেই বিকাশেই জননীর পূজা সাংগ হয়
জীবের মাঝারে সত্য ও শিবের অভ্যুদয়!

মায়ের অসীম অম্বর-তলে
যতেক সূর্য্য শশী তারা জ্বলে
তেমনি তোমরা ফুটেছ হেথা ওগো মানব
ভুলো ভেদাভেদ ভুলে যাও আজি দ্বন্দ্ব সব!

জগৎ-মাঝারে জগন্মাতার লীলা অপার
তোমার জীবনে হাসি ও অশ্রু খেলা তাঁহার
তারি মাঝে মার পূজার দেউল গড়িয়া তোলো
তোমরা তাঁহারি জ্যোতির কণা কভু না ভুলো।"—

দক্ষিণেশ্বরে উঠিল যে গান জীবন-মন্ত্র
বিশ্ববাসীরে দানিল তাহাই নূতন তন্ত্র
'পঞ্চবটী'র হোমানল আজো আলো ছড়ায়
শাশ্বত বাণী!—দিকে দিকে তাহা প্রাণ জাগায়!

শবাসনে বসি সাধনা তব যুগের তরে
বহির্মুখীন জাতির মনটি ফিরালো ঘরে
কর্ণে তাহার জপিলে যে কত শিব শিব
সংজ্ঞা লভিয়া উঠিল জাগিয়া সুপ্ত জীব!

দেশ-বিদেশের সকল সাধন
নিজের মাঝারে করেছ চয়ন
সংগম হেথা হয়েছে অতীত-বর্তমান
সমন্বয়ের মহান্ প্রতীক মূর্তমান!

সর্বযুগের সিদ্ধির হাসি আননে তব
প্রাণে গানে দিল দুর্বার গতি মন্ত্র নব
ভারতের বাণী মুক্তি লভিল সাগর-পার
যুগের যজ্ঞ-পুরোহিত তুমি প্রেমাবতার!

হৃদয়-অনলে সৃষ্টি করিলে যুগের গুরু
জগৎ-মাঝারে জয়ের যাত্রা হইল সুরু
দৃপ্ত কেশরী বীর্য্য ছড়ায় মন্ত্রে তব
কম্বু কণ্ঠে ধ্বনিল বাণী কি অভিনব!

সিংহ তোমার চরণে লুটালো
গরজনে তাঁর বিশ্ব কাঁপালো
হুঙ্কারে তাঁর নবীন গীতা উঠিল রণি'
তোমারি স্পর্শে বিবেক-বাণী তুলিল ধ্বনি!

কি আশ্চর্য্য প্রাণদ মন্ত্র কণ্ঠে তোমার
প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে বন্দনার
মোহাচ্ছন্ন জাগিয়া উঠিছে তোমার স্মরি
যুগের দেবতা সর্বযুগে তোমায় বরি'!

[এই উপন্যাসটির কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রয়োজন। বাঙলা দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সহশিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে ইতিপূর্ব্বে বহু সাহিত্যিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। এই জাতীয় প্রকাশিত রচনার মধ্যে অধিকাংশই লিখিত হয়েছিল মাত্র কল্পনার ভিত্তিতে, যে কারণে সহশিক্ষার প্রকৃত ও সাহিত্যিক পরিচয় এখনও হয়তো অলিখিত আছে। এই নাতিবৃহৎ উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকা কলকাতা শহরের কলেজের ছাত্রছাত্রী।

আত্মগোপনকারী লেখক বয়সে প্রবীণ ও অভিজ্ঞতার জারক রসে জর্জ্জর। কথ্য বা চলতি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করে লেখক বয়সোচিত বনেদী সাধু ভাষায় সমগ্র উপন্যাসটি লিখেছেন, যদিও পড়তে কোথাও দুর্ব্বোধ্য মনে হবে না। বয়োবৃদ্ধ লেখকের রচনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অনুচিত; মাসিক বসুমতীর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাই উপন্যাসটির গুণগ্রাহী হোন, আমাদের এই ইচ্ছা।

—সম্পাদক]

অপরাজিতা ও পরাজিতা

শ্রীদীপঙ্কর

১

কলেজটি যে গৃহে অবস্থিত তাহার বৈশিষ্ট্য, প্রায় সমস্ত দিন তাহা যেমন ছাত্রছাত্রীদিগের কলরবে মুখরিত থাকে, তেমনই কলেজের কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধতায় অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ধারণ করে। সময় সময় কলরবের মাত্রাধিক্য হয় এবং কোন কোন অধ্যাপক তাহাতে বিরক্তি অনুভব করিলেও কলেজের বৃদ্ধ অধ্যাপক—য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজক—হাসিয়া বলেন, Boys love noise—তরুণরা কলরব ভালবাসে। যে দিন অপরাজিতা প্রথম কলেজে আসিল, সে দিন কলেজে নূতন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হইতেছে; সুতরাং লোকসংখ্যাও অধিক, কলরবও তেমনই অধিক। কিন্তু তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সহসা কলরব বন্ধ হইয়া গেল—সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল—কেহ বা চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল, শিষ্টতার সংস্কার রক্ষা করিল, কেহ বা সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না—মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার আবির্ভাব যেন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত। সে রূপসী—কিন্তু রূপেই তাহার বৈশিষ্ট্য শেষ হয় নাই; তাহার নিঃসঙ্কোচ ভাব—সাধারণ বলা যায় না। কাহারও কাহারও রূপ লজ্জানম্রতায় মধুর হয়, সে রূপ পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের মত; আবার কাহারও কাহারও রূপ নিঃসঙ্কোচতায় দীপ্ত হয়, সে রূপ মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের আলোকের মত। অপরাজিতার রূপ মধ্যাহ্ন-রবিকরের সহিত অথবা স্থির-সৌদামিনীর দীপ্তির সহিত তুলনা করিতে হয়। আবার তাহার বেশও উল্লেখযোগ্য। গাঢ় বর্ণের বেশ যে তাহার বর্ণের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন তাহা বুঝিয়াই যেন সে সেইরূপ বর্ণের বেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। অপরিচিত জনতায় কিছুমাত্র অভিভূত না হইয়া সে কলেজের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যে কক্ষে নূতন ছাত্রছাত্রীরা আবেদন ও প্রাবেশিক দিয়া প্রবেশপত্র লইয়া আসিতেছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হইল—এ কে? কোথা হইতে আসিল—ইত্যাদি।

সে যখন আফিস-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গী—পিতাকে বলিল, "তুমি যাও"—তখন সে আবার ছাত্রছাত্রীদিগের লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িল। সেই সময়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তরুণকুমার কলেজ-প্রাঙ্গণ পার হইতেছিল। সে স্বভাবতঃ গম্ভীর—সুদর্শন—অধ্যয়নে অনুরাগী ও নম্রস্বভাব।

অপরাজিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রথম শ্রেণী কোথায় অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দেবেন?"

অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে তরুণকুমার মুখ তুলিয়া প্রশ্নকারিণীর দিকে চাহিল—কিন্তু তাহার দৃষ্টি নত করিতে সামান্য বিলম্ব হইল। সেই বিলম্বে সে আপনাকে বিব্রত অনুভব করিল এবং বলিল, "চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তরুণকুমার শুনিতে পাইল, ছাত্ররা কৌতুক-সহকারে বলাবলি করিতেছে, "শেষে 'দার্শনিককেই' জিজ্ঞাসা করলে?"

আর এক জন বলিল, "দেখ, দার্শনিকেরও 'সিভ্যালরী' আছে।"

তরুণকুমার অগ্রসর হইল। অপরাজিতা তাহার অনুসরণ করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তরুণকুমার মুখ না তুলিয়াই দক্ষিণ দিকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিল, "এই ঘর।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া অপরাজিতা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তরুণকুমার আপনার শ্রেণীর ঘরে চলিয়া গেল।

ছাত্র ও ছাত্রীরা তখনও নবাগতার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিল।

অপরাজিতা যে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাতে তখন বহু ছাত্র ও কয় জন ছাত্রী সমবেত হইয়াছে। তাহার আগমন তাহাদিগের মধ্যেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। অপরাজিতা ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিল এবং শিক্ষকের বসিবার মঞ্চের সম্মুখেই যে বেঞ্চে আর কেহ ছিল না, যাইয়া তাহাতে বসিল।

জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ও সংসারের ভাবনার তাপ অনুভূত হইবার পূর্ব্বে মানুষের মনে যে সরসতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই, বসন্তে লতায় কুসুম-বিকাশের মত, নানারূপ অনাবিল চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্য তরুণ-তরুণীরা সতীর্থদিগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের "নামকরণ" করে—যথা—যে স্থূলকায় ও গৌরবর্ণ, সে "টোম্যাটো", যে দীর্ঘায়তম সে "প্লুটো" ইত্যাদি। সেইরূপ তরুণকুমারের নামকরণ হইয়াছিল—"দার্শনিক"। তাহার কারণ, সে স্বভাবতঃ যেন গম্ভীর ও চিন্তাশীল। তরুণকুমার অধ্যাপকদিগের প্রিয়পাত্র ছিল—অধ্যয়নে তাহার মনোযোগ পরীক্ষায় তাহার সাফল্যে সপ্রকাশ হইয়াছিল। তাহার ব্যবহারে কেহ ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিত না। কিন্তু কেহ তাহার কোন কার্য্যে তাহার বয়োসুলভ চাপল্য দেখে নাই। যেন সে অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকারই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিল। ছাত্রগণ তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, অধ্যাপকগণ তাহাকে ভালবাসিতেন, তাহার পল্লীবাসীরা তাহার প্রশংসা করিত; অনূঢ়া কন্যাদিগের অভিভাবকরা তাহাকে কন্যা সমর্পণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তরুণকুমারের পরিচয় অনেকেই অবগত ছিলেন। নদীয়া জিলায় তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল—তাঁহারা তথায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির ও স্নানের ঘাট আজও সেই প্রসিদ্ধির স্মৃতি বহন করিতেছে। তাহার প্রপিতামহ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্যহেতু "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" মনে করিয়া সপরিবারে বর্দ্ধমানে বাস করিতে গিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক ব্যবসাগত—তথায় তাঁহার পিতা কোন বন্ধুকে ব্যবসার জন্য সাহায্য করিতে যাইয়া কিছু ভূসম্পত্তি ও একখানি গৃহের অধিকারী হইয়াছিলেন। বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে তিনি বন্ধুর ব্যবসা পরিচালিত করিতে থাকেন এবং ক্ষতির পর ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভগ্নহৃদয়ে যখন দেহরক্ষা করেন, তখন তাঁহার বিধবা পত্নী আশ্রয় হিসাবে স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তথায় বাস যে অসুখেরই কারণ, তাহা তাঁহার পুত্রদ্বয় অল্পদিনেই উপলব্ধি করেন। কারণ, যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল, তিনিই তখন তথায় "প্রবল পক্ষ" এবং যে এক বার আপনার স্থান ত্যাগ করে, সে আর সহজে তাহা অধিকার করিতে পারে না—আর সকলে তাহার তথায় প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ মনে করে। বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম তখন হতশ্রী; যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ম্যালেরিয়ার জন্যও বটে, সহরের নানা সুবিধার আকর্ষণেও বটে; পল্লীর সামাজিক জীবনে তখন কল্পনাতীত দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—জীবনযাত্রায় আন্তরিকতার স্থানে কৃত্রিমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জন যখন গ্রামে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইতে লাগিল এবং গ্রামে থাকিয়া পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা বা অর্থার্জ্জনের কোন সুবিধা হয় না দেখা গেল, তখন মাতা কলিকাতায় তাঁহার পিতাকে অবস্থা জানাইলে তিনি কন্যাকে ও দৌহিত্রদ্বয়কে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বাদশ মন্দিরে দেবতাকে প্রণাম করিয়া শরৎসুন্দরী গ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যে রোগে পুত্রদ্বয়ের এক জন জীর্ণ হইয়াছিল—কলিকাতায় চিকিৎসাও তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। মাতা পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পিতা দৌহিত্রের পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা করিতে যাইয়া দেখিলেন, সে কাজ মোকর্দ্দমা-সাপেক্ষ এবং সময়সাধ্য। তিনি সে বিষয়ে সব ব্যবস্থা শেষ না করিতেই যখন পরলোকগত হইলেন, তখন তাঁহার মধ্যম পুত্র উকীল পিতার নির্দ্দেশে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে যখন মামলার পর মামলার শেষ হইল, তখন দেখা গেল, বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অতি সামান্যই পাওয়া গেল—গ্রামের সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করা না করা সমান। তত দিনে তরুণকুমারের পিতামহ মাতুলের চেষ্টায় একটি চাকরী পাইয়াছিলেন এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে "যেমন তেমন চাকরী ঘী ভাত"—হিসাবে তাহার আয়েই পরিবার প্রতিপালন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর কৃপা যত থাকুক বা না থাকুক ষষ্ঠীর কৃপা তাঁহার প্রতি অকাতরে বর্ষিত হইয়াছিল—পরিবার তিন কন্যায় ও তাহার পরে আর তিন পুত্রে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। চাকরীর আয়ে সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় নির্ব্বাহ করা যখন কষ্টসাধ্য হইতে অসাধ্য হইয়া উঠে তখন তিনি তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তির সহিত একটি ছোট ব্যবসা—চাকরীর পরে "অতিরিক্ত" বা "উপরি" হিসাবে করিতে থাকেন। পিতার ব্যবসাপ্রিয়তা, বোধ হয়, তিনি কৌলিক হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে ব্যবসাই তাঁহার আয়ের প্রধান উপায় হয়। তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে এক জন চাকরী লইয়া মধ্য-ভারতে গিয়াছিলেন, এক জন সেই ভ্রাতার কর্ম্মস্থলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতেন, তৃতীয় অনুকূলচন্দ্র ভগিনীপতির পৈত্রিক ব্যবসায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই ভগিনীপতির সহিত তাঁহার "পরিবর্ত্ত" হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি ভগিনীপতির ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিবর্ত্তবাদের নিয়মে অনুকূলচন্দ্রের ব্যবসা-বুদ্ধি ব্যবহারে শাণিত অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল এবং সেই জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ভারতবর্ষে জাপানী বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার "সাবধানের বিনাশ নাই" মনে করিয়া অজস্র অর্থব্যয়ে বিমানঘাঁটি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইতে ও কর্মচারীরা তাহার সুযোগে লাভবান হইতে থাকেন, সেই সময় অনুকূলচন্দ্র ভগিনীপতির সহিত একযোগে ও স্বতন্ত্র ভাবে ঠিকাদারের কাজ করিয়া অপ্রত্যাশিতরূপ অর্থশালী হইয়া উঠেন। তিনি সেই সময় কার্য্য-ব্যপদেশে এক বার পূর্ব্বপুরুষের বাসগ্রামের কাছে যাইয়া কৌতূহলবশে গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির ভগ্নদশা দেখিয়া তিনি নিজব্যয়ে সেগুলির সংস্কার-সাধন করেন। গ্রামের লোকের সহিত সেই সূত্রে তাঁহার যে ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহার ফলে তিনি তথায়—নদীতীরে একখানি
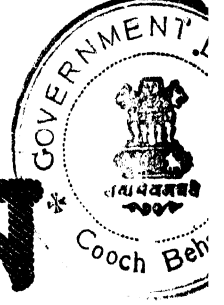
"'HAZELINE' SNOW"

(TRADE MARK)

"'হেজলিন' স্নো" (ট্রেড মার্ক)

প্রচুর নকল 'স্নো' বাজারে চলছে। এই জন্য জনসাধারণ যাতে না ঠকেন সেজন্য আমাদের তৈরি "'HAZELINE' SNOW" TRADE MARK "'হেজলিন' স্নো" ট্রেড মার্ক-এর শিশির ঢাকনার ওপর অ্যালু ক্যাপসুল অর্থাৎ রূপালী অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো থাকে।

কেনার সময় অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাত জড়ানো আছে কিনা দেখে নেবেন।

শিশির উপরের দিকে নীল রঙের এই চিহ্নটিও দেখে নেবেন।

বারোজ ওয়েলকাম

অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই

"'HAZELINE' SNOW" "'হেজলিন' স্নো" লণ্ডনের দি ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশন লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে কেবল বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-ই এই কথাটি ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছেন। এরা ছাড়া যদি অন্য কেউ এই ট্রেড মার্ক ব্যবহার করেন কিংবা অন্য জিনিস "'HAZELINE' SNOW" TRADE MARK "'হেজলিন' স্নো" ট্রেড মার্ক নাম দিয়ে উৎপাদন করেন, অথবা ব্যবসা করেন, কিংবা বিক্রি অথবা বিক্রির চেষ্টা করেন তবে তিনি আইনত দণ্ডনীয় হবেন।

গৃহও নির্ম্মাণ করান। কলিকাতায় তিনি তাঁহার আর্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন; মনে করিয়াছিলেন, যদি কখন ব্যবসার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারেন, তবে মধ্যে মধ্যে গ্রামের গৃহে যাইয়া শান্তি সম্ভোগ করিয়া আসিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর—অনেক সময়—হয় আর। নূতন গৃহে আসিবার পরেই তিনি তাঁহার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমার বিবাহ দেন। তখনও ব্যবসায় লাভের জোয়ারে ভাঁটার টান ধরে নাই। তিনি যখন দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন মাত্র কয় দিনের অসুস্থতায়, তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। একমাত্র পুত্র তরুণকুমার তখন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—কেবল উত্তীর্ণই হয় নাই উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া অনুকূলচন্দ্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাঁহার আশার সৌধ অতর্কিত ঘটনার ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি ব্যবসায় আর পূর্ব্ববৎ মনোযোগ দিতে বিরত হইলেন—সে মনোযোগের আর প্রয়োজনও ছিল না; কারণ, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছিল—কাজের বন্যার জল যেমন দ্রুত আসিয়াছিল প্রায় তেমনই দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছিল; আর তাঁহার দুই ভাগিনেয় তাঁহারই নিকট শিক্ষা পাইয়া কার্য্যে অসাধারণ পটুত্ব লাভ করিয়াছিল—কাযের ভার তাহাদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। উপদেশ ও পরিদর্শন তিনি ও তাঁহার ভগিনীপতি পূর্ব্ববৎ করিতে থাকেন। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের পরে পুত্র তরুণকুমারই পিতার স্নেহের অবলম্বন ও মনোযোগের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। আর তিনি যে ভগিনীর স্বামীর সহিত একযোগে ব্যবসা করিতেছিলেন সেই ভগিনী চিত্রলেখা বিপত্নীক ভ্রাতার সংসারের সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শদাত্রী হইলেন। তিনি তরুণকুমারকে শৈশবাবধি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

তদবধি পিতাপুত্রে সম্বন্ধ এমন হইতে লাগিল যে, পিতা যেমন পুত্রের উপর সমস্ত স্নেহ ঢালিলেন, পুত্র তেমনই পিতার সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত ভাবে বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিল। পত্নীর মৃত্যুর দুই তিন মাস পরে যখন—প্রধানতঃ ভগিনীর চেষ্টায়—অনুকূলচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তখন হইতে পিসীমা চিত্রলেখাও সর্ব্বদা তরুণকুমারকে উপদেশ দিতেন—সে যেন পিতার উপযুক্ত অবলম্বন হয়। সেই উপদেশ উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা সাগরিকাকে পিসীমা কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার স্বামি-গৃহের অসম্মতিতে তাহা হয় নাই। দ্বিতীয়া কন্যা দীপশিখার বিবাহের অল্প দিন পরেই তাহার স্বামী মধ্যপ্রদেশে চাকরী পাইয়াছিল—দীপশিখাকে সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়াছিল।

মাতার সতর্ক দৃষ্টির অভাব হইলেও পিসীমা—গৃহিণীর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, সাগরিকা যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ; তাহার মানসিক অবসাদ তাহার মুখে ও চক্ষুতেও যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি সে বিষয় ভ্রাতার সহিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আপনার অনুমান সত্য কি না তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্নেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল; তাহার প্রধান কারণ, সে-ও সহানুভূতি লাভ করিতে উন্মুখ হইয়াছিল—মনের বেদনা আর গোপন রাখিতে পারিতেছিল না।

প্রকাশ পাইল, শ্বশুরালয় সাগরিকার পক্ষে কেবল কারাগারই হয় নাই, তথায় তাহাকে সর্ব্বদা শত্রুপুরীতে বাস করিতে হইত। বিবাহের মধ্যে কতকটা জুয়াখেলার ভাবের স্থান থাকে—কিন্তু তাহা যে স্থানে কষ্টকর হয়, সেই স্থানে তাহা সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। চিত্রলেখার নিকট যখন প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল অর্থাৎ তাঁহার স্নেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সাগরিকা তাহার দুর্দ্দশার স্বরূপ প্রকাশ করিল, তখন চিত্রলেখা সে কথা প্রথমে স্বামীর সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি যেমন তাঁহার স্বামীর, একাধারে, গৃহিণী ও সচিব ছিলেন, তাঁহার স্বামীও তেমনই সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে চাহিতেন। স্বামী সব শুনিলেন—বলিতে বলিতে স্ত্রী যখন অশ্রুবর্ষণ করিলেন, তখন স্বামীর চক্ষুও অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অমন মেয়ের কপালে এই দুঃখ! আমরা যে অনেক বেছে ওর বিয়ে দিয়াছিলাম!" চিত্রলেখা বলিলেন, "মা-মরা মেয়ে!"

তাহার পরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে অনুকূলচন্দ্রের গৃহে যাইয়া সে বিষয়ের আলোচনা করিলেন। অনুকূলচন্দ্র সব শুনিয়া কিছুক্ষণ যেন অতর্কিত আঘাতে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর কথা ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "ওর মা ভাগ্যবতী—তাঁকে এ বেদনা ভোগ করতে হয় নাই।" চন্দ্রলেখা বলিলেন, "সে ছিল ফুলের মত কোমল—সে এ ব্যথা সহ্য করতে পারত না।"

সে কথা কত সত্য, তাহা উপস্থিত সকলেই জানিতেন।

একটু চিন্তা করিয়া অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "সে-ই ত কথা—এ যে উগরাবারও নহে, ফুকরাবারও নহে।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "আর তরুণকেও ত কথাটা বল্‌তে হ'বে?"

ভগিনীপতি বলিলেন, "বল্‌বে? ওর পরীক্ষার ত বেশী দেরী নাই।"

"বল্‌তেই হ'বে। এখন না বললে, পরে যখন জানবে তখন ওর মনে অভিমান হ'বে, আমরা জানাই নাই। আর ও যে আমাদের পরামর্শে সন্দেহ করবে, তা' আমি মানি।"

"ভাল।"

২

সেই দিন রাত্রিকালে অনুকূলচন্দ্র পুত্রকে সাগরিকার সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শুনিয়া তরুণকুমার তখন কিছু বলিল না।

অনুকূলচন্দ্রের অভ্যাস ছিল, তিনি দিনের পরিশ্রমের পরে রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত অল্প রাত্রিতেই আহারান্তে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেন ও ঘুমাইয়া পড়িতেন—রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে উঠিয়া ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজ করিতেন—কারণ, দেহ ও মন যখন বিশ্রামে সতেজ হয়, তখন কাজ ভাল হয়। সেই অভ্যাস তরুণকুমারেরও হইয়াছিল। সে ঐ সময় শয্যাত্যাগ করিয়া অধ্যয়নে

—অজিতকুমার মিত্র

ব ন ভো জ ন

—দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী

(প্রথম পুরস্কার)

—কুমারী রেখা সেনগুপ্তা

—গোবিন্দলাল দাস

বনভোজন

(তৃতীয় পুরস্কার)

—বিভূতিভূষণ রায়
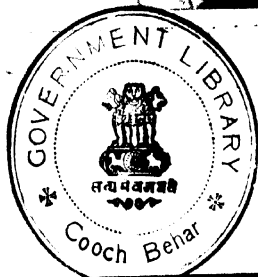
—প্রতিযোগিতা—

চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতা

বিষয়

প্রবাসী বাঙালী

২২শে চৈত্র ছবি পাঠানোর শেষ দিন

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতা

বিষয়

মুখাকৃতি

(দ্বিতীয় পুরস্কার) বনভোজন —নির্মলকুমার দত্ত

পুনর্বাসন দপ্তরের দ্বারে —শচীন্দ্রনাথ দাশ

বনফুল —পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

[মাসিক বসুমতীর মূল্য বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি অন্যত্র দ্রষ্টব্য]

বনভোজন

—[illegible]

যথাসময়ে উঠিয়া অনুকূলচন্দ্র দেখিলেন, পুত্র পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, রাত্রিতে তাহার সুনিদ্রা হয় নাই।

প্রভাতে তরুণকুমার পিতাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দিদিকে আন্‌বার কি হ'বে?"

অনুকূলচন্দ্র বুঝিলেন, পুত্র সাগরিকার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তোমার পিসীমা'র সঙ্গে কাল সেই কথার আলোচনাই আমরা করেছি; কি করা কর্ত্তব্য, স্থির ক'রে উঠতে পারি নাই।"

"কিন্তু স্থির করতে হ'লে ত দিদির সঙ্গেই আলোচনা করতে হ'বে; কারণ, তা'র মতই জানা প্রয়োজন।"

পিতা পুত্রের উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিলেন; বলিলেন, "তা' বটে। দেখি আজ চিত্রলেখাদের সঙ্গে পরামর্শ করি।"

তরুণকুমার বলিল, "আমি এখনই পিসীমা'র কাছে যাচ্ছি।"

"তোমার কলেজ নাই?"

"না। আজ ছুটী। আর ছুটী না থাকলেও—এ কাজটাই বড়।"

পুত্র চিত্রলেখার গৃহে গেল।

তাহাকে দেখিয়া পিসীমা' কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে পিসীমা'কে প্রণাম করিয়া বলিল, "পিসীমা, দিদিকে আন্‌বার কি ব্যবস্থা করবেন, তাই জান্‌তে এলাম।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তুই যে ব্যস্ত হবি তা' আমরা বুঝেছি। সেই জন্যই দাদা তোকে ও-কথা বলবেন শুনে উনি বলেছিলেন, তোর পরীক্ষার যে বেশী বিলম্ব নাই।"

পিসীমা'র কাছে আসিবার পূর্ব্বেই তরুণকুমার তাঁহার স্বামী সমীরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার পিসীমা'র কাছে যাও। আমি যাচ্ছি।" তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিত্রলেখা স্বামীকে বলিলেন, "তরুণ জিজ্ঞাসা করছে, সাগরিকাকে আনবার কি ব্যবস্থা করবে?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলাম। কারণ, তা'র সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ত কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে না। জামাই কি করবে, সে বল্‌তে পারবে।"

"আমি যা' বুঝেছি, তাতে দোষ জামাইয়েরও কম নহে। কথায় বলে, 'খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে'—খোঁটারই জোর নাই। নহিলে এমন হয় না।"

"আমি ভাবতাম, শ্বশুরবাড়ীতে বৌয়ের উপর অত্যাচার—সে দিন আর নাই। কিন্তু এ কি?"

"জান না—'স্বভাব যায় ম'লে'? বরং সেকালে—বড় পরিবারে কেহ না কেহ বউটার প্রতি স্নেহশীলা হ'তেন—এখন আর সে সম্ভাবনাও থাকে না।"

"তা' হ'লে কি করবে?"

তরুণকুমার বলিল, "আপনি চলুন, তা'কে নিয়ে আসি।"

চিত্রলেখা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তরুণের যাবার প্রয়োজন কি? তুমিই যাও—মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

তরুণকুমার বলিল, "শুধু দিদিই আসুন—তা'র পরে, সব শুনে আপনি যাকে হয় ডাকবেন।"

"ভাল, তোর কথাই থাক।"

তরুণকুমার পিসীমা'কে বলিল, "চলুন, আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "না। তুই গেলে তোকে বাড়ীতে নামতেই হ'বে। যদিও তোর মাথা ঠাণ্ডা তবুও বয়স কম—তুই বিচলিত হয়েছিস্, যদি কোন কারণে ধৈর্য্য হারাস, তবে বিপদ ঘটবে।"

তরুণকুমার প্রতিবাদ করিল না; সে জানিত, সমীরচন্দ্র তাহাদিগের কল্যাণই চাহেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি পিসীমা একাই যা'বেন?"

সমীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ। বিশ্বাস কর, উনি একাই এক শ'। লোককে নাকে দড়ী দিয়ে ঘুরাতে পারেন।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কা'কে নাকে দড়ী দিয়ে [illegible]"

"কেন—আমাকে।"

"ছেলের কাছে কি যে বল!"

"ছেলে পুত্তলিকা নহে যে, 'চক্ষু আছে দেখিতে পায় না'—আর আমার পক্ষে—'সত্যং ব্রূয়াৎ'। অসত্য বলা কর্ত্তব্য নহে।"

"খুব হয়েছে। এখন বল, আমি সেখানে গিয়ে কি বলব।"

"সে কি আমাকে ব'লে দিতে হ'বে! সাগরিকার শ্বশুরকে যিনি নাকে দড়ী দিয়ে ঘুরান, তাঁকে একটু তোষামোদ ক'রে—মেয়েটাকে নিয়ে আসবে। বলবে, বাড়ীতে তা'র ভাইকে আর বাবাকে খেতে বলেছ, সে-ও খা'বে। ওদের খেতে বল, তা' হ'লেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'—সত্য কথা বলা হ'বে।"

"জামাইকেও কি ও-বেলা আস্‌তে বলব?"

"না। আগে আমরা অবস্থাটা বুঝি; তা'র পর নিদান বুঝে বিধান।"

তাহাই স্থির হইল।

অনুকূলচন্দ্রের মোটরযানে তরুণকুমার আসিয়াছিল। সেই গাড়ীতেই চিত্রলেখা সাগরিকার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন। তিনি যখনই তথায় যাইতেন, এক থালা সন্দেশ লইয়া যাইতেন। এ বারও এসে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি স্বামীর ইংরেজী কথা মানিতেন—কাহারও মন জয় করিতে হইলে, তাহাকে আহারে তুষ্ট করা প্রয়োজন।

তরুণকুমার পিসীমা'র আগমন প্রতীক্ষায় থাকিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তুই বাড়ী যা'। তোর বাবা নিশ্চয়ই ভাবছে। তোর পরীক্ষারও দেরী নাই। যদি মন স্থির করতে পারিস, পড়বি।"

তরুণকুমার চলিয়া গেল।

সমীরচন্দ্র আপনা-আপনি বলিলেন, "ছেলেটা বড় চঞ্চল হয়েছে—হ'বারই কথা।" তিনি স্ত্রীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনায় তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং সে বুদ্ধি-বিবেচনা যে তাঁহার শিক্ষায় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিলেও কখন বলিতেন না। তিনি আশা করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী যে উপায়েই হউক কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন—সাগরিকাকে আনিবেন। কিন্তু তাহার পরে—অবস্থা বুঝিয়া কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

তরুণকুমার ফিরিয়া যাইয়া নিশ্চয়ই পিতাকে সব কথা

বলিয়াছে। অনুকূলচন্দ্র কিরূপ উৎকণ্ঠা সহকারে ভগিনীর চেষ্টার ফলের প্রতীক্ষা করিবেন, তাহা সমীরচন্দ্র অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। স্নেহ যে স্থানে প্রবল—উৎকণ্ঠাও তথায় তীব্র।

সমীরচন্দ্র রাস্তার দিকে তাঁহার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ব্যবসাসংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ টেবলের উপর ছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে এক পুত্র সেগুলি তাঁহার পরীক্ষার জন্য রাখিয়া গিয়াছিল। সে এক বার ঘরে আসিল, যদি পিতা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তিনি তখনও কাগজগুলি নাড়েন নাই দেখিয়া ফিরিয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিল, "বাবা, তরুণ আজ সকালে এসেছিল কেন?"

[illegible] বলিলেন, "পরে শুনিস্।"

"[illegible] ত?"

"মন্দের ভাল, অর্থাৎ কা'রও অসুখ করে নাই।"

সমীরচন্দ্র পুত্রকন্যার কাছেও রঙ্গবাঙ্গমধুর ভাবে কথা বলিতেন। পুত্রকন্যারা জানিত, পিতা তাহাদিগের নিকট কোন প্রকাশযোগ্য বিষয় গোপন রাখেন না।

সমীরচন্দ্র ব্যবসাসংক্রান্ত কাগজগুলি দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন—কখন চিত্রলেখা ফিরিয়া আইসেন। কাগজ দেখিতে দেখিতে তাঁহার একটি বিষয় জানা প্রয়োজন মনে হইল; তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "বড় দাদাবাবু কি মেজ দাদাবাবু—এক জনকে আসতে বল।" ছেলেরা তাঁহাকে তাহাদিগকে ডাকিবার জন্য, টেবলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল। তিনি তাহা করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "জানি, বিজ্ঞান যে সাহায্য দেয়, তা গ্রহণ না ক'রে বর্জ্জন করা সুবুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু কি জান, যে জিনিষ বা ব্যবস্থা পুরাতন ও পরিচিত, তা'র প্রতি কেমন একটা মায়া থাকে; তা'র দাম কম নহে। সেই জন্যই আমি বাবার ঘড়ী ব্যবহার করি—হাতঘড়ী ব্যবহার করি না; বাবা আমার পাঠের সময় যে অভিধান কিনে দিয়েছিলেন, তা' এখনও ব্যবহার করি। তোদের যদি মনে হয়, বাবা ডাকলেই বিলম্ব না ক'রে আসবি, তবে সেজন্য না হয়, বাবার কাছে কাছেই থাকিস্।"

পিতা ডাকিলে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম উভয় পুত্রই, জয়দেব ও রণদেব, আসিয়া উপস্থিত হইল। সমীরচন্দ্র কাগজে লিখিত একটি অঙ্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রণদেব তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিল। তাহার উত্তর শেষ হইতে না হইতে গৃহ হইতে অদূরে মোটরযানের শিঙ্গার ধ্বনি শুনা গেল। সমীরচন্দ্র জয়দেবকে বলিলেন, "দেখ ত, তোর মা'র সঙ্গে সাগরিকা এসেছে কি না?"

জয়দেব চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই মাতার ও সাগরিকার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল।

সাগরিকা আসিয়া সমীরচন্দ্রকে প্রণাম করিল। চিত্রলেখা স্বামীকে বলিলেন, "দাদার গাড়ী ফিরে যা'ক?"

সমীরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাগরিকা ত যা'বে না?"

"কি করতে যাবে? তুমি দাদাকে আর তরুণকে লিখে দাও—আসতে হ'বে।"

"তথাস্ত" বলিয়া সমীরচন্দ্র পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, ব্যবসা এখন মাথায় থাকুক—আগে তোদের মা'র হুকুম তামিল করি—তোদের মামাকে পত্র লিখি।"

তিনি একখানি কাগজে পত্র লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহা লইয়া যানচালককে বাড়ীতে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিলেন—পত্রখানি তাহার প্রভুকে দিতে হইবে।

পুত্রদ্বয়কে সমীরচন্দ্র বলিলেন, অবশিষ্ট কাগজগুলি তিনি দেখিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

পুত্রদ্বয় চলিয়া গেল।

সমীরচন্দ্র সাগরিকাকে বলিলেন, "বস, মা।—দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?"

সাগরিকা বসিবার উদ্যোগ করিলে চিত্রলেখা বলিলেন, "আমার সব কাজ বাকি। আমি যাই—"

বাধা দিয়া সমীরচন্দ্র বলিলেন, "দেখলে ত আমি কাজের ভার ছেলেদের ছেড়ে দিয়াছি। তুমি বৌমা'দের সংসারের ভার দিতে পার না?"

"তোমার ভার দেওয়া ত—'সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাটিটি আমার'—ঐ ত ছেলেদের কি বলছিলে।"

"ও কিছু নহে—আমি দেখি জানলে ওরা সাবধান হয়, এই জন্য।"

"বড় বৌমা কাজের ধারা বুঝে নিয়েছে। কোলে কচি ছেলে—আমিই বেশী খাটতে দিই না। মেজ এখনও শিক্ষানবিশ—নিজের বিবেচনায় কাজ করতে পারে না। ওরা ভার নিলে ত আমি নিষ্কৃতি পাই।"

"যেন বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'র না? আর যদি একান্তই তা' কর, বাড়ীতেই তা' ক'র।"

"সাগরিকা তোমার কাছে থাকবে? না—আমার সঙ্গে যাবে?"

"তুমি কি বল?"

"তোমার ত এখনও ব্যবসার কাগজপত্র দেখতে বাকি। ওকে আমি নিয়ে যাই।"

"আচ্ছা।"

সাগরিকাকে লইয়া চিত্রলেখা চলিয়া যাইলেন। স্নেহশীল সংসারী সমীরচন্দ্র ব্যবসায়ী সমীরচন্দ্র হইয়া আবার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তরুণকুমার পিসীমার বাড়ীতে আসিয়া দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আহারান্তে বাড়ীতে চলিয়া গেল। অনুকূলচন্দ্র তথায় রহিলেন।

চিত্রলেখা স্নেহস্নিগ্ধ সহানুভূতি সহকারে কথায় কথায় শ্বশুরালয়ে সাগরিকা যে দুর্ব্ব্যবহার ভোগ করিয়াছে, তাহা জানিয়া লইয়াছিলেন। সে দুর্ব্ব্যবহারের আরম্ভ তাহার বিবাহের কয় মাস পর হইতেই হয় এবং তাহার মূলে তাহার পিতার নিকট হইতে অর্থ ও অলঙ্কার আদায় করা। বাস্তবিক সেই উপায়েই তাহার স্বামীর এক ভগিনীর বিবাহের সব ব্যয় সংগৃহীত হইয়াছিল। সেইরূপ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল এবং তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছিল। সে দুর্ব্ব্যবহার যত দিন প্রত্যক্ষ ভাবে স্বামীর নিকট হইতে সে পায় নাই, তত দিন সে তাহার দুর্ব্বিষহতা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল, স্বামীও

তাহাতে সম্মতি আছে, তখনই তাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল—তখন হইতেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

কিরূপ ধৈর্য্য সহকারে সাগরিকা দীর্ঘকাল সেই দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়াছে, তবুও আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইয়া পিতাকে বিব্রত করে নাই—কেবল মনে করিয়াছে যাহার মা নাই তাহার অদৃষ্টে ত দুঃখই থাকিবে—তাহা বুঝিয়া চিত্রলেখা বার বার অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহার মাতার জন্ত শোকে তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

অপরাহ্ণে তরুণকুমার যখন পিসীমা'র বাড়ীতে আসিল, তখন অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র সকল কথা শুনিয়াছেন। সকলেই কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিতেছেন; ভাবিয়া কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না।

তরুণকুমার আসিয়া দেখিল, সকলের মুখ চিন্তাগম্ভীর। সে সাগরিকাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—বিষণ্ণ ও চিন্তিত। সে পিতার নিকট সংক্ষেপে সকল কথা শুনিল; প্রথমেই বলিল "দিদিকে আর সে ইতরদের বাড়ীতে পাঠান হবে না।"

অনুকূলচন্দ্রেরও তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কারণ, সংস্কার অনেক সময় আমাদিগের মতকে কলুষিত—এমন কি বিবেচনাকেও প্রভাবিত করে। তিনি বলিলেন, "ওর মা বেঁচে থাকলে, বোধ হয়, এই কথাই বলতেন।"

তরুণকুমার সংস্কারের অধিক প্রভাব তখনও অনুভব করে নাই; সে বলিল, "মা নাই; সেই জন্তই আপনাকে আর আমাকে দিদির সম্বন্ধে মা'র কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে। জানি, সে কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে পালন করতে পারব না; কিন্তু পালন করবার সঙ্কল্পচ্যুত হ'ব না।"

সকলেই তরুণকুমারের দৃঢ়তায় বিস্মিত হইলেন।

তরুণকুমার সাগরিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারবে না?"

সাগরিকা কোন উত্তর দিল না। তাহার মনে তখন তুমুল সংগ্রাম—সমুদ্রে ঝড়ের মত মনে হইতেছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া তরুণকুমার কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা থাকলে তিনিও আমার এই কথাই বলতেন; তুমি কি তাঁ'র কথায় 'না'—বলতে পারতে?"

তখন সাগরিকার চক্ষুতে বহু চেষ্টায় রুদ্ধ অশ্রু আর রোধ করা সম্ভব হইল না। বহু চেষ্টায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল, "ভাইএর কথায় বিশ্বাস করব না, সে দুর্ভাগ্য যেন আমার—কা'রও না হয়।"

তরুণকুমার চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, মা আমাদের ভার ত আপনারেই দিয়া গেছেন। আপনি কি দিদিকে আবার সেই বাড়ীতে পাঠা'তে পারবেন?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "ইচ্ছা ত হয় না; কিন্তু—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই তরুণকুমার বলিল,

"যা' ভাববার পরে ভাববেন, এখন কথা—দিদি সে বাড়ীতে যা'বে না। আমি কিছুতেই দিদিকে সে বাড়ীতে যেতে দিব না। তা'তে আপনারা আমাকে দূর ক'রে দেন, সে'ও ভাল।"

চিত্রলেখা তরুণকুমারকে বুকে টানিয়া লইলেন; বলিলেন, "তোকে দূর ক'রে দেব!" তাঁহার অশ্রু তরুণকুমারের উপর বর্ষিত হইল—সে আশীর্ব্বাদ।

৩

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "সে'ই ভাল। ও আজ থাকুক। আমরা কি কর্ত্তব্য তা' ভেবে দেখি।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কিন্তু তা'দের এতটা সংবাদ দিতে হয়।"

তরুণকুমার বলিল, "কেন পিসীমা?"

"আমি বলতে এক কথায় সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়াছে—সে ভদ্রতা করেছে।"

"ভাল, আমিই কাল সকালে যা'ব; বলে আসব, দিদি এখন যা'বে না।"

সাগরিকা একটু ব্যস্ত ভাবে বলিল, "না—তুমি যেও না।"

তরুণকুমার বলিল, "ভয় পাচ্ছ, দিদি! আমি কিন্তু ভয় করি না। প্রথম কথা, যা'রা অন্যায় করে, তা'রাই কাপুরুষ হয়—ভয় ওরাই পাবেন। দ্বিতীয়—তুমি জান, বাবা আমাকে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ পড়িয়েছেন, অহিংসা আর নির্বৈর বড় কথা কিন্তু গৃহীর জন্য নহে! গৃহীর ধর্ম্ম, কেউ গালে এক চড় মারলে, তাকে দশ চড় ফিরিয়ে দিতে হয়।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "কি সর্বনাশ! যদি কোন দিন কোন কারণে তোকে মারি, তুই কি আমাকে দশ ঘা' মারবি নাকি?"

তরুণকুমার বলিল, "আপনি যে মারবেন, তা' ত মনেও করতে পারি না, পিসেমশাই।"

শেষে স্থির হইল, পরদিন সাগরিকার শ্বশুরালয়ে সংবাদ দেওয়া হইবে—সে এখন তথায় যাইবে না।

তরুণকুমার বলিল, "কিন্তু আমি সে সংবাদ দিতে যা'ব।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "বেহাইন ত একবার বলেছিলেন, তাঁ'র ছোট মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে কেমন হয়!"

তরুণকুমার মুখ নত করিল; তাহার পরে বলিল, "দিদি কি আজ বাড়ী যা'বে না?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "না। আজ'ও আমার কাছেই থাকুক।"

কি করা হইবে, অনুকূলচন্দ্র, সমীরচন্দ্র এবং চিত্রলেখা ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তরুণকুমার স্থির করিল—সাগরিকা শ্বশুরবাড়ী যাইবে না।

পরদিন বেলা প্রায় ৮টার সময় তরুণকুমার ভগিনীর শ্বশুর উমাদাস বাবুর বাড়ীতে সংবাদ দিতে গেল, সাগরিকা এখন পিত্রালয় হইতে আসিবে না। তাহাকে যে পূর্ব্বদিন তথায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় নাই, সে জন্য কোনরূপ আপত্তি না পাইয়া চিত্রলেখা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহারা রুষ্ট হইয়াছেন।

উমাদাস বাবুর গৃহের সম্মুখে যাইয়া তরুণকুমার যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। পাড়ায় একটা চাপা উত্তেজনার ভাব; উমাদাস বাবুর বাড়ীর সম্মুখে কয়টি জানালা ভাঙ্গা—বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ—কয় জন কনষ্টেবল সে বাড়ী রক্ষা করিতেছে! তাহার এক জন সতীর্থ তরুণকুমারকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—তাহার গৃহ উমাদাস বাবুর গৃহের অদূরে। তাহার আহ্বানে তরুণকুমার গাড়ী থামাইয়া নামিল। সে তাহাকে তাহার গৃহে আসিতে আহ্বান করিল।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তরুণকুমার সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দ্রনাথ, ব্যাপার কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। জান ত পুলিস রামধনুর মত—ঝড়ের পরে দেখা দেয়; সেই জন্য এখন ওখানে পুলিসের আবির্ভাব—পাহারা, কিন্তু তুমি কি মনে ক'রে?"

"ঐ বাড়ীতে যে আমার দিদির বিয়ে হয়েছে।"

"কোন্ বৌ?"

"বড়।"

"ও বাড়ী যমালয়। অবশ্য বৌদের পক্ষে। তোমরা কেবলই টাকা দাও, সেই জন্য তোমার দিদিকে খুন ক'রে নাই।' আর একটি পরশু বাপের বাড়ী গিয়ে সেখানে আত্মহত্যা করেছে।"

"বল কি?"

"তোমরা কি কিছু জান না?"

"না।"

"আশ্চর্য্য সহগুণ তোমার দিদির!"

"কি বল ত?"

"দাসদাসীদের কাছে পাড়ায় আমরা অনেক কথাই শুনতে পাই। ওদের সাবধান ক'রে দেওয়াও হয়েছিল। কাল আমরা যখন মেজ বৌটির আত্মহত্যার সংবাদ পেলাম, তখন পাড়ার ব্রতীসঙ্ঘের ক'জন যুবক তা'র বাপের বাড়ীতে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শব দাহ করাও হয়ে গেছে। বাড়ীর লোক তখন শোকে মুহ্যমান। তাঁ'দের পুলিসে সংবাদ দিতে বলা হ'ল। তাঁ'রা বললেন, তা'তে ত আর তাঁ'দের মেয়ে ফিরবে না—ম'রে তা'র হাড় জুড়িয়েছে। যুবকরা যখন ফিরে এল তখন রাত্রি ১২টা বেজে গেছে। তা'রা তখন ঐ বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে গালাগালি করতে লাগল। বাড়ীর লোক তা'দের ভয় দেখাল—পুলিস ডাকবে। একটা জানালা ভেঙ্গে ক' জন বাড়ীতে ঢুকে—প্রথমে টেলিফোনের তার কেটে দিল—তা'র পর সম্মুখের দরজা খুলে দিল। তখন খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুবকরা বাড়ীর পুরুষদের প্রহার ক'রে খানিকটা রাগ মিটা'ল। রাত্রিতে পাড়ায় কেহ ঘুমোতে পারে নাই। কোন্ সূত্রে জানি না সংবাদ পেয়ে সকালে পুলিস এসেছে। আমরাও ব্রতীসঙ্ঘের যুবকদের সরিয়ে দিয়েছি।"

ইন্দ্রনাথের ভ্রাতা সুরনাথ বলিল, "বাড়ীর গিন্নীটা কি পাজি!"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আর কর্ত্তারা বুঝি দেবতা? ওরা সহ্য করে কেন? আর যা'রা স্ত্রীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা করতে পারে না, তা'রা বিয়েই বা করে কেন?"

তরুণকুমার এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া সব শুনিতেছিল; এ বার বলিল, "ঠিক বলেছ।"

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি কোথায়?"

"কাল এখান থেকে গেছেন।"

"ভালই হয়েছে।"

সুরনাথ বলিল, "আমরা এদের এ পাড়ায় বাস অসম্ভব করব।"

তরুণকুমার এই সব শুনিয়া আর উমাদাস বাবুর গৃহে না যাইয়া

সমীরচন্দ্রের গৃহে গেল এবং ঝড়ের মত সে গৃহে প্রবেশ করিয়া চিত্রলেখার নিকটে যাইয়া বলিল, "পিসীমা, কাল যে দিদিকে আনা হয়েছে, সে যে কি ভাল হয়েছে, তা' কি বলব !"

চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তরুণ ?"

তরুণকুমার তখন যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিল, যাহা শুনিয়াছিল তাহা বলিল।

শুনিয়া চিত্রলেখা বলিলেন, "বলিস কি !"

তরুণকুমার বলিল, "পিসীমা, সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও অতিক্রম করে।"

"তাই ত দেখছি।"

চিত্রলেখা স্বামীকে সকল কথা বলিবার জন্য গমন করিলেন। যা'র মৃত্যু-সংবাদে সাগরিকা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, সে একাধিক বার বলিয়াছিল বটে, সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না ; কিন্তু সে সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিল !

স্ত্রীর নিকট সব কথা শুনিয়া সমীরচন্দ্র আসিয়া তরুণকুমারকে বলিলেন, "তোর বাবাকে সব কথা ব'লে আমাকে একবার টেলিফোন করতে বলিস, তরুণ।"

তরুণকুমার যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কি আজ যাবে ?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তুইও বুঝেছিস, তোর পিসীমা অগাধ সমুদ্র ?"

"কেন ?"

"নহিলে কেন মনে করবি, তাঁ'র কাছে থেকে তোর দিদি জলে পড়েছে ?"

তরুণকুমার আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন মধ্যাহ্নের পরেই অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র উমাদাস বাবুর গৃহে গমন করিলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধই ছিল—সম্মুখে দুই জন কনষ্টেবল টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। তাঁহাদিগের গাড়ী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহারা কাহাকে চাহেন ? তাঁহারা গৃহস্বামীর কুটুম্ব বলিলে তাহারা ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। দ্বার মুক্ত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। কারণ, যুবকদিগের আক্রমণের প্রথম বেগ সহ্য করিতে যাইয়া দ্বারবান যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল ; গৃহের দাসদাসীদিগের অধিকাংশই ভয়ে—"প্রাণ থাকিলে চাকরীর অভাব হইবে না" মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, যাহারা ছিল, তাহারাও সহজে সাহস করিয়া দ্বার মুক্ত করিতে আসিতে দ্বিধানুভব করিতেছিল।

শেষে দ্বার মুক্ত হইলে আগন্তুকদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে দ্বিতলে উপনীত হইলে ভৃত্য বলিল, "কর্ত্তাবাবুকে সংবাদ দিয়া আসি।" সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদিগকে উমাদাসের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। তখন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উমাদাস-গৃহিণীর "বিনাইয়া নানা ছাঁদে" ক্রন্দন শুনা গেল, "ওগো আমার কি হ'ল গো। আমার সোনার পিত্তিমা বিসর্জন গেল—আর পাড়ার লোকের এই অত্যাচার ! এ যে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা"—ইত্যাদি।

সমীরচন্দ্র কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে উমাদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড্ড কি লেগেছে ?"

শয্যা হইতে উমাদাস বলিলেন, "ওদের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে, না ওরা মানীর মান রাখে ?"

তাহার পরে তিনি বলিলেন, "এই ত ব্যাপার ! পুলিস্ যদি বা এল—কেবল টাকা আর টাকা ! আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ব'লে গেল, 'আমরা না হয় দু'জন পাহারাওয়ালা দিলাম। কিন্তু ছেলেদের যে ভাব দেখছি, তা'তে কি আপনি আর এ পাড়ায় বাস করতে পারবেন ? দেখুন কি ব্যাপার।"

"আমরাও তাই শুনছি।"

"কা'র কাছে শুনলেন ?"

"সকালে তরুণ সংবাদ দিতে এসেছিল, সাগরিকা এখন আসবে না। সে-ই পাড়ায় এ কথা শুনে গেছে—ছেলেরা বলেছে, আপনাদের পাড়া-ছাড়া ক'রে তবে ছাড়বে।"

ভীত ভাবে গৃহিণী পার্শ্বের কক্ষ হইতে বলিলেন, "কি হবে ?"

"দেখুন, যদি ক্রমে ছেলেদের রাগ কমে। নহিলে বড় বিপদ। দু'জন পাহারাওয়ালা—ওরা কি-ই বা করতে পারে—ক'জন লোকের মহড়া নিতে পারে ? আর ওদের বশ করতেই বা কতক্ষণ—'কড়িতে বাঘের দুধ মিলে'—সে ত জানেন।"

উমাদাস বলিলেন, "এখন উপায় ?"

"আমার মনে হয়, গহনা টাকা যথাসম্ভব সরিয়ে রাখুন।"

"কোথায় রাখব ?"

"সাগরিকার গহনার বাক্স, যদি বলেন, আমরা নিয়ে যাচ্ছি; আর সব পুলিস সঙ্গে ক'রে গিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে আসুন।"

উমাদাস পুত্রদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ লোকনাথ লজ্জায়—শ্বশুরের ও পিসশ্বশুরের আগমন-সংবাদ পাইয়াও—তাঁহাদিগের নিকটে আসে নাই। এখন পিতার আহ্বানে সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আঘাত এক পদে অধিক হইয়াছিল—সে পা একটু টানিয়া চলিতেছিল।

পুত্র আসিলে উমাদাস তাহাকে সমীরচন্দ্রের প্রস্তাব জানাইয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, সে-ই ভাল—নহিলে ধনে-প্রাণে মারা যেতে হ'বে। তোমার মা'কে গহনার বাক্সগুলা দিতে বল।"

লোকনাথ চলিয়া গেল।

উমাদাস বৈবাহিকদ্বয়কে বলিলেন, "আপনারাই লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে যান।"

"অত টাকার গহনা ! পাড়ার ছেলেদের বিশ্বাস কি ? বরং আমরা পুলিসকে সংবাদ দিয়ে যাই—এক জন বা দু'জন এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ক। আমরা কেবল সাগরিকার গহনার বাক্স নিয়ে যাই—যদি বাক্স প্রতি ভাড়া দিতে হয়, কিছু কম হ'বে।'

"যা' ভাল হয় করুন।"

কিছুক্ষণ পরে সমীরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বৌটি আত্মহত্যা করেছে, তা'র মৃত্যু-ব্যাপার তদন্ত করতে পুলিস আসেনি ত ?"

"না।"—তিনি ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসবে না কি ?"

"নিশ্চয়ই আসবে। কারণ, পাড়ার ছেলেরা ত পুলিসে সংবাদ দিয়াছে।"

"যদি আসে ?"

"টানাটানি করবে—হয়ত সকলকেই থানা আর ঘর করতে হ'বে। মেয়েদেরও যে-নিষ্কৃতি দিবে না, সে-ই ত বিশেষ ভাবনা।"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে গৃহিণীর ভীত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "ওগো—কি সর্ব্বনাশ! আমি আজই কাশী চ'লে যাই।"

সমীরচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে কাজ বৃথা হ'বে। আমাদের শাস্ত্রের কথা, কাশী 'শিবের ত্রিশূলোপরিস্থিত,' কিন্তু কাশীও যে ইংরেজের রাজ্যে—বরং ভয়, সেখান হ'তে পুলিস ধ'রে আনবে, আর বলবে দোষী না হ'লে কি কেহ পলায় ?"

গৃহিণী ভয়ার্ত্ত ভাবে বলিলেন, "তবে কি হ'বে ?"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "তা-ই ত ভাবছি। আপাততঃ বিপদে ভগবানকে ডাকুন; আর স্থির করুন, ভবিষ্যতে কখন পরের মেয়ের উপর অন্যায় ব্যবহার করবেন না।"

উমাদাস বলিলেন, "সত্যই কি পাড়া ছাড়তে হ'বে ?"

"দেখুন—ছেলেদের রাগ হয়ত খড়ের আগুনের মত দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে থপ্‌ ক'রে নিবে যা'বে। যদি তা' না হয়, তবেই বিপদ।"

"তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

"অপেক্ষা ক'রে কি হয় দেখা। আর যা'ব বললেই বা যা'বেন কোথায় ? বাড়ী পাওয়া—এই সব জিনিষপত্র সমান, এ ত আর মুখের কথায় হয় না। বিশেষ—মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে—বৌটির আত্মহত্যার জন্ত পুলিসের তদন্তের ভয়; হয়ত বলবে, আত্মহত্যা নয়, হত্যা।"

এবার পার্শ্বের কক্ষ হইতে গৃহিণীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, "আমি বিষ খেয়ে মরব।"

সমীরচন্দ্র মনে মনে বলিলেন, "তাহা হইলে ত পাপ যায়; মুখে বলিলেন, "বিপদের উপর আবার বিপদ আনবেন না। সে আবার হাসপাতালে নিয়ে যা'বে—মরলেও নিস্তার নাই, মড়া কাটবে—ডোমকে দিয়ে মড়া পুড়া'বে।"

তাহার পরে সমীরচন্দ্র উমাদাসকে বলিলেন, "আমরা এখন যাচ্ছি। সাবধানে থাকবেন।"

তিনি বুঝিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে—সকলে বিশেষরূপ ভয় পাইয়াছেন। তিনি সাগরিকাকে পাঠাইবার কোন কথাই বলিলেন না।

লোকনাথ সাগরিকার অলঙ্কারের বাক্স পূর্ব্বেই আনিয়াছিল। সমীরচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "এই গহনার বাক্স ?"

লোকনাথ "হাঁ" বলিলে তিনি সেটি লইয়া অনুকূলচন্দ্রকে বলিলেন, "চল, এখন যাই।"

সমীরচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র গহনার বাক্স লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। লোকনাথ সঙ্গে আসিয়াছিল। লোকনাথকে সমীরচন্দ্র তিরস্কারের ভাবে বলিলেন, "লিখাপড়া শিখেছ—ভদ্র সমাজে মিশে থাক; মানুষ হ'তে পারনি!"

গাড়ী কিছু দূর অগ্রসর হইলে অনুকূলচন্দ্র সমীরচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি গহনার কথা ভুল নি ?"

"ভুলব ? সেই জন্যই ত অত ভয় দেখা'লাম।"

"এঁদের সঙ্গে ব্যাঙ্কে যা'বার কথা কি পুলিসকে ব'লে যা'বে ?"

"বাড়ী থেকে টেলিফোনে ব'লে দিব। কে আবার থানায় যা'বে ?"

"আমি কেবলই ভাবছি, কি ভাগ্য যে, চিত্রলেখা কাল এসে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে।"

উভয়ে সমীরচন্দ্রের গৃহে আসিলে সমীরচন্দ্র স্ত্রীর নিকট সাগরিকার অলঙ্কারের বাক্সটি রাখিয়া সাগরিকাকে ও বাক্সটি দেখাইয়া বলিলেন—"তোমার সর্ব্বস্ব ত এনেছ—এখন এই নাও তোমার ধন। এখন যথাসর্ব্বস্ব বুঝে পেলে ত ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কেন, রশিদ দিতে হ'বে না কি ?"

"তোমার বেহানের কীর্ত্তির পরে আর তোমাদের বিশ্বাস কি ?"

[ক্রমশঃ।

শীতের রাতে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

শীত থরথর রাত্রি।
মিট-মিটে তারা জ্বলজ্বল্ করে,
কালো শাড়ির চুমকি চিকন,
আকাশের বুকে অলকাতিলকা।
শীত থরথর রাত্রি।
ঝিরঝিরে হাওয়া
আসে ঝাউ-বন-ঝাড় পেরিয়ে
হাড়গুলো করে সিড় সিড়,
শীত থরথর রাত্রি।
টুক্‌রো কথার ভিড় জমে যায়
ভিন্ন মনের প্রেম কথায়,
হারানো কোন সাথীর ব্যথা
বাজে যেন বুকের ভিতর।
স্বপ্ন-সুখের সুর ধরে পাই
মগ্ন-মনের অন্তলোকে।

চুম্বনে ঐ—চিকমিকি সুখ,
রক্তিমা ঠোঁটের প্রেয়সী-হাসি
গভীর গোপনে চুপচাপ
হিমহিম ঠাণ্ডা নেশায়।
ঘুমঘুম্ প্রিয়-প্রেমে
মনের মধ্যে মন-মজানো—
মধুর ভাবি ভাবনা ভরা
শীতের রাতে—রোমাঞ্চকর স্বপ্ন।
তারার ঝিলিক চিকমিকি চিক,
কন্‌কনানির ঠাণ্ডা হাওয়া,
সোনালী প্রেমের লেফাফা-আঁটা—
শীত থরথর রাত্রি।
স্বপ্ন-মদির,
শীত থরথর রাত্রি।

GOVERNMENT

রহস্য

বাসব ঠাকুর

এক 'স্কুল-ফ্রেণ্ডের বাড়ীর ভাড়াটে কর্ম্মযোগী রায় নিজের বৈঠকখানায় যে আড্ডাটা জমিয়ে তুলেছিল ব্যায়ামগীর, সঙ্গীতবিদ্‌ ও সাহিত্যিকদের নিয়ে, স্কুল-ফ্রেণ্ডটির মারফৎ সেই আড্ডার সঙ্গে হোল আমার যোগাযোগ। এক দিন সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ গল্প-গুজবে কাটাবার পর বাড়ীর দিকে রওনা হব বলে উঠি-উঠি করছি এমন সময় কবি শ্রীকুমার সরকারের সঙ্গে ঘরে ঢুকল একটি লোক। ওখানে এ্যাসট্রের বালাই ছিল না তাই শেষ ক'টা টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললুম, "অনেক দিন পর কবির সঙ্গে দেখা হল! আপনার নতুন লেখার সমালোচনাটা পড়লুম এবার 'রবিবারের চিঠি'তে। যে যাই বলুক আপনার কবিতাটা কিন্তু আমার ভাল লেগেছে।" কবির বদলে তাঁর সঙ্গীটি বলে উঠল, "আমারও সেই মত, অমন একটা বিশ্বের উপেক্ষিত বস্তু ড্রেন তাকে নিয়ে কবিতা লিখে উনি একটা খুব নতুন জিনিষের সৃষ্টি করেছেন।" কবি
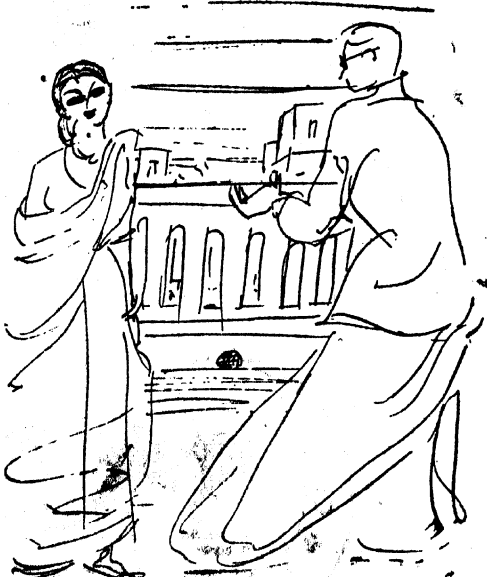
নিজের কাব্যের প্রশংসায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে সলজ্জ ভাবে তক্তপোষের এক পাশে গিয়ে বসলেন, তাঁর পরনের কাপড়গুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া, চেহারায় ক্লান্তিমাখা দেখে দুঃখ হল। হায়, এই ত আমাদের দেশে কাব্যের কদর!

আমি ততক্ষণে সবার কাছে বিদায় নিয়ে দরজার গোড়ায় গিয়ে পড়েছিলুম, পথে নেমে বাস্‌-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে একবার ফিরতেই দেখি কয়েক গজ দূরেই আসছে সেই লোকটি কবির সঙ্গে আড্ডায় ঢুকতে দেখেছিলুম যাকে। আমাকে ফিরে চাইতে দেখে সে আমায় আস্তে চলতে ইঙ্গিত করে কাছে এসে জিগেস্‌ করলে, "কোথায় যাবেন?" বললুম, "বাড়ীর দিকে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোয়।"

—"চলুন, আমাকেও ঐ দিকেই যেতে হ'বে। আপনার সঙ্গেই যাই।...দাঁড়ালেন কেন, বাসের জন্য বুঝি? তার চেয়ে চলুন না, এইটুকুই ত পথ, হেঁটে-হেঁটেই যাওয়া যাক্‌" বলে সিগারেট-কেসটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

তখনও আমাদের পরিচয় হয়নি কিন্তু লোকটির সেই সহজ হৃদ্যতার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, একটা সিগারেট না নিয়ে পারলুম না। ফাল্গুন মাস, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, বাসের ভীড়ে ঠেলাঠেলির চেয়ে হেঁটে যাওয়া সত্যিই ভাল। আর এমন দিনে পথে পথে ঘোরার মধ্যে একটা আনন্দও আছে, তাই সেই প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে গেলাম।

লোকটির বয়স বেশী নয়, ছিপছিপে শরীর, মাথায় কোঁকড়া চুল, গায়ের রংটা ফরসা কিন্তু চেহারায় যতই সৌন্দর্য্যের জাজ্বল্য থাকুক চোখের মধ্যে একটা গভীর ঔদাসীন্য। চলতে চলতে বললুম, "আড্ডার মধ্যে বোধ হয় আমাদের পরিচয়টা হয়নি। আমার নাম বাসব ঠাকুর, পেশা হ'ল কখনো ছবি আঁকা, কখনো মূর্ত্তি গড়া আর কখনও লেখা। আপনার?"

—"রবু বলেই বেশীর ভাগ লোকে আমাকে জানে, পুরো নাম রবীন মুখার্জ্জি, আপনার কাজের মধ্যে যে-গুলোর উল্লেখ করলেন সেগুলোর প্রতি আমারও এক দিন বিশেষ অনুরাগ ছিল কিন্তু এখন আর নেই। রাস্তায়-ঘাটে, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোটাকে যদি একটা পেশা বলা চলে তবে তাই হচ্ছে আজ আমার কাজ।"

রবীন মুখার্জ্জি! নামটা যেন মনে হল আগে কোথায় দেখেছি। অধুনা বিলুপ্ত সাপ্তাহিক দুন্দুভিতেই হবে বোধ হয়। ঐ নামে লেখা একটা কবিতা মনে হল যেন পড়েছিলুম তাই জিগেস্‌ করলুম, সেটা ওঁর লেখা কিনা! একটু হেসে ও বললে, "হ্যাঁ, ওটা আমারই লেখা কিন্তু সে ত বহু দিন আগের কথা, আর আমার লেখা জীবনে মাত্র দুটো কি তিনটে ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, তাই আপনি যে মনে রেখেছেন এইটাই আশ্চর্য্য!"

বললুম, "লেখাটার মধ্যে বেশ একটা গভীরতা লক্ষ্য করেছিলুম এবং এটাও আমার মনে হয়েছিল যে লেখকের নামটা আগে কোথাও দেখিনি। কবিতাটা পড়লে আরও মনে হয় কবি তাঁর নিজের হতাশ জীবনের একটা ছবি যেন কলম দিয়ে এঁকেছেন এবং লেখাটা এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে আপন-মনে আমি বহুবার ওটা আবৃত্তি করেছি তাই আজও সেটা আমার মুখস্থ আছে, শুনতে চান?" বলে কবিতাটা আওড়ে চললুম—

"বেদনায় বুকভার সিরাজী সহে না আর
সাকীও চাহে না তার নয়ন তুলি
কখন গিয়াছে ভেঙ্গে পেয়ালাগুলি"—ইত্যাদি।

কথায় কথায় বিডন স্কোয়ারে এসে পড়েছিল। রবীন মুখার্জ্জি পার্কের একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বললে, "একটু বসে নেওয়া যাক্, কি বলেন?" বেঞ্চিতে বসে আবার বললুম, "যদিও আজই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা তবু বলতে সাহস করছি জীবনে বোধ হয় আপনি কোন এক রহস্যময় ট্রাজেডির মধ্যে পড়ে ঘুরে বেড়ানোটাই পেশা করে নিয়েছেন। ঠিক্ করে বলুন ত তাই কিনা?"

রবীন মুখার্জ্জি এবার যেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে উঠল, বললে—"দেখুন, আমাদের এই পরিচয় হওয়াটা মনে হয় যেন একেবারে কপালের লেখা, কারণ কিছুক্ষণ আগে ট্রামে যেতে যেতে একটা মদের দোকানের সামনে কয়েক জন লোকের হাতে কবি শ্রীকুমারের লাঞ্ছনা দেখে ওঁকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নেমে পড়ি। শুনলুম, তারা নাকি পাবে কবির কাছ থেকে কিছু টাকা এবং সেটা যদি না পায় তাহলে জামা-কাপড়গুলো কেড়ে নিয়ে কবিকে উলঙ্গ করে তারা আজ পথে ছেড়ে দেবে, এই ঠিক করেছে। বেশী টাকার ব্যাপার নয়, তাই নিজের কাছে যা ছিল তার থেকে চুকিয়ে দিলাম তাদের পাওনা; তার পর ঐ আড্ডা পর্য্যন্ত কবিকে শুধু পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম, যেখানে হোল আপনার সঙ্গে দেখা। তখনই আমার মনে হয়েছিল যে এই একটি লোক যার কাছে আমি সহানুভূতি ও সমবেদনা হয়ত পাব।"

বললুম—"আর যদি কোন রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাও।"

সে বললে—"ধন্যবাদ! সাহায্যের দরকার হবে না, তবে আপনি ঠিক ধরেছেন সত্যিই একটা রহস্যময় ঘটনার পর থেকে বদলে গেছে আমার জীবনের ধারা। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুই জানে না। আর যে এ রহস্যের সমাধান করতে পারে, সে যে কোথায় তা কে জানে! আজ রাত্রেই কোলকাতা ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। জিনিষপত্রগুলো সকাল থেকে হাওড়া ষ্টেশনের ক্লোক-রুমেই রাখা আছে। যাবার আগে হোল আপনার সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত পরিচয় এবং আপনার এই সহানুভূতি ও কৌতূহল দেখে মনে হচ্ছে বলে যেতে হবে আপনাকে আমার এই জীবনের কাহিনী—যেটা আজ অবধি আর কাউকেই বলিনি।"

আমি সাগ্রহে শুনতে লাগলাম, রবীন বলে চলল—"আমরাও জোড়াসাঁকোর লোক, হয়ত আপনাদের বাড়ীর খুব কাছেই আমাদের বাড়ী। এক পাশে থাকি আমরা আর পুব দিক্‌টায় আলাদা ক'খানা ঘর দেওয়া হয় ভাড়া। ছাদটাও মাঝখানে একটা সাত ফুট পাঁচিল দিয়ে ভাড়াটেদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছি ভাড়া দেওয়া দিকটায় রয়েছেন ডক্টর দাশ। ছোট্ট তাঁদের সংসার, স্বামী স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে মিতা। মিতার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ প্রায় এক বছরের। ঐ ছিল আমার চেয়ে বড়। ছোট থেকে আমরা একসঙ্গেই খেলা-ধূলো করতাম। আমাদের জমি-জায়গা বেশীর ভাগ ছিল কটক ডিষ্ট্রিক্টে। আর ভায়েদের মধ্যে বয়সে ছোট হওয়ায় বারো বছর অবধি হাপ্‌ টিকিটে হ'ত বলে বাবার সঙ্গে সব সময়েই বিদেশে যেতাম আমি এবং বড় হয়েও অভ্যাস বশতঃ সেই নিয়মটাই ছিল বজায়। সেবার কিছু কাল বিদেশে কাটিয়ে কোলকাতায় ফিরেছি, তখন ১৬ কি' ১৭ হবে আমার বয়স, কিন্তু ঐ বয়সেই মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যা আমার কম ছিল না কিছু। কারণ সে সময় চেহারাটা নাকি ছিল আমার খুব সুন্দর (আমি মনে মনে ভাবলুম এখনও তার চেহারাটা সুন্দরই বলা যায়) ঐ চেহারা যে মেয়েদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? তার উপর বড় লোক বলে আমাদের একটা খ্যাতিও ছিল, এ ছাড়া বাবার বুইক মোটরটা বেশীর ভাগ আমিই ব্যবহার করতাম। পড়বার ঘরটা আমার ছিল ছাতের উপর। জিনিষপত্র ওখানে সব পড়ে থাকত ছত্রাকার হয়ে। কোন মেয়ে হয়ত লিখেছে কিছু গোপন চিঠি তাও পড়ে থাকত কখনও টেবিলের উপর। আমাদের বাড়ীতে মিতার এবং ওদের বাড়ীতে আমার সব সময়েই ছিল অবারিত দ্বার। এক দিন সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর কি একটা কাজে গিয়ে দেখি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে মিতা, দরজাটা খোলাই রেখে গেছলুম ভুলে। ভয় হোল ও আমার চিঠি-ফিটি পড়ে ফেলেনি ত! বিশেষতঃ সিপ্রাকে লেখা চিঠিটাও সামনেই পড়ে ছিল। ও যদি পড়ে থাকে তা হলে আমার অনেক কথাই ওর কাছে আর গোপন থাকবে না। এই সব ভেবে একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললুম,—"মিতা যে! কি মনে করে?"

ও বললে,—"কেন? কিছু না মনে করে কি আসতে নেই?"

বললুম—"না না, তা কেন, তবে কিছু মনে করেই একবার না হয় এলে?" বলে আমি হাসলুম। কিন্তু তখনও আমার ভয়টা সম্পূর্ণ কাটেনি। কেবল মনে হচ্ছিল চিঠিটা পড়ে থাকলে না জানি ও কি ভাবছে।

ও বললে—"না এমনিই এসেছিলুম। শুনলুম তুমি ফিরে এসেছ

তাই।" আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল একটা নিম গাছ, তারই আড়ালে সূর্য্যটা কিছুক্ষণ হ'ল অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাই পশ্চিম দিকের আকাশটা তখনও হয়েছিল আবীরের মত লাল, আর সেই আলোয় মিতার ফরসা মুখখানা তখন হয়ে উঠেছিল রক্তকরবীর মতই রাঙা। মিতা আমার ছোটবেলার খেলার সাথী; তবু তখন বয়সটা আমার এমন যে, ছোটবেলার খেলার সাথী হলেও তার সৌন্দর্য্য ও যৌবনটা আমার নজর এড়ায় না।

ছাতের এক পাশে রাখা বেঞ্চিটা দেখিয়ে বললুম—"বোস না।" কিন্তু না বসে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলে—"মাসীমার কাছে শুনলুম এবার নাকি কটক থেকে ভুবনেশ্বর আর কোণারকেও গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে ওখানকার মন্দিরের কারুকার্য্য সব।"

বললুম—"খুব সুন্দর দেখবার মত, এবার পুজোর সময় তোমাদেরও পুরীতে যাবার কথা, যাচ্ছ নাকি?"

সে বললে—"জানি না, বাবা মা যাবেন কিনা। আমি ঠিক করেছি কেউ না গেলে আমি এবার একাই যাব।" তার পর কি যেন মনে করে হঠাৎ ও বললে—"আমি এখুনি আসছি, তুমি এখানেই থাকবে ত?" বললুম—"হাঁ। কিছুক্ষণ ত আছিই।"

—একটা জিনিষ ভুলে এসেছি বলে মিতা যেন একটু তৎপরতার সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল নিজেদের বাড়ীর দিকে।

ও যেতেই তাড়াতাড়ি আমি ঢুকলুম ছাতের ঘরে এবং টেবিলটার ওপর নজর পড়তে দেখি, সিপ্রার চিঠিটা সেখানে নেই। তক্ষুনি নীচে গিয়ে চাকরদের জিগ্যেস্ করলুম আমার ঘরে তারা কেউ গিয়েছিল কি না, কিন্তু তারা কেউই স্বীকার করলে না যে উপরে গিয়েছিল। অনেক জেরা করে জানতে পারলুম, একটু আগে উপরে গিয়েছিলেন শুধু বাবা—যদি ঐ চিঠিটা পড়ে থাকেন—

কিন্তু মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ভাবলাম ওটাকে আমার লেখা একটা গল্পের অংশ বলেও ত চালানো যায়, তাই সাহসে নির্ভর করে সোজাই বাবার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলুম,—আমার ঘরের টেবিল থেকে একটা হাপ্ ফিনিস্ড্ লেখা উনি নিয়ে এসেছেন কি না, উনি বললেন, "কই না ত," তবে ঘরটা বাইরে থেকে উনি দেখেছেন এবং জিনিষপত্রগুলো অমন নোঙরা করে রাখার জন্ত বেশ একটু ধমক খেতে হ'ল। এখন বাকী রইল একমাত্র মিতা, যাকে একটু আগেই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। তাই দৌড়ে আবার ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে জিগ্যেস্ করলুম, "মিতা কোথায়?" তিনি বললেন—"বোধ হয় ছাতে বেড়াচ্ছে।" ছাতে গিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে সোজাই বললুম—"চিঠিটা দাও।"

ও একটু থতমত খেয়ে বললে—"কিসের চিঠি? আমি কোথেকে পাব?" বললুম—"তুমি ছাড়া আমার ঘরে আর ত কেউ যায় নি! আর নিশ্চয় ওটা তুমি নিয়েছ।"

এবার ও যেন একটু রাগের সুরেই বললে—"আমি যখন যাচ্ছিলুম ঠিক সেই সময় তোমার বাবাই ত নেমেই আসছিলেন, আর কেউ যায়নি মানে—তাছাড়া খুঁজে দেখ ঐ ঘরেই হয়ত কোথায় আছে।"

"এর পর কি যে বলি ভেবে পাচ্ছিলুম না। এমন সময় হঠাৎ ওর বুকের দিকে নজর পড়তেই মনে হ'ল যেন ওর জ্যাকেটের তলায় কিছু একটা ও লুকিয়ে রেখেছে, খুব সম্ভব আমি যা খুঁজছি তাই। মেয়েদের এ একটা খুব সাধারণ অভ্যেস!

বললুম—"আচ্ছা তোমার জ্যাকেটের তলায় কি লুকিয়ে রেখেছ বল ত?" নিজের কানেই কথাটা কেমন যেন ঠেকল, তবে দেখলুম ওর চোখে এবার একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কিন্তু ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—"তোমার সাহস ত কম নয়, মেয়েদের জ্যাকেটের তলায় যে কি লুকোন থাকে, এ সব জিগ্যেস কর অন্ত মেয়েদের।"

অপ্রস্তুত হয়ে বললুম,—"না না অন্ত কিছু ভেবে বলিনি, মনে হচ্ছে চিঠিটা তুমি ওখানে লুকিয়ে রেখেছ।"

এবার ও হেসে ফেললে, এবং লক্ষ্য করলুম পালাবার মতলবে আস্তে আস্তে ও সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধরে ফেললুম। ও আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল এবং সেই ছোট-খাট যুদ্ধের মধ্যে বেরিয়ে এল সিপ্রাকে লেখা আমার সেই চিঠিটা। দুজনেই লজ্জিত হয়ে চেয়ে রইলুম পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত। তার পর শাড়ীর আঁচলটা জ্যাকেটের উপর ভাল করে টেনে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ও বললে—"আমার একটা কথা রাখবে?"

বললুম—"কি কথা তার উপর নির্ভর করে।" সে বললে—"আমি যে চিঠিটা নিয়েছিলুম এ কথা কাউকে বল না।"

বললুম—"আচ্ছা! তাহলে তুমিও কাউকে বল না যা পড়েছ।"

ও বললে—"আচ্ছা বলব না।"

তার পর আর যেটুকু সময় ওদের ছাতে ওর সঙ্গে ছিলুম তারি মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা এক নতুন আকার ধারণ করেছিল। মাতাল-করা চাঁদের আলোয় অভিভূত হয়ে তারি মধ্যে পুরন্দরকে বলে ফেলেছিলুম আমি তোমায় ভালোবাসি। ফেরবার সময় ও বললে—"আজ রাতে আবার এস, এগারটার পর।"

বললুম "অত রাতে কি করে আসি, তখন তোমাদের সদর দরজাও বন্ধ থাকে।"

সে বললে—"সদর দরজা যদি বন্ধ থাকে তো ঐ পাঁচিলটি ডিঙিয়ে এসো, যেমন করে ঘুঁড়ি ধরতে কত বার এসেছো।"

ভয় পেয়ে বললুম—"কিন্তু তোমার বাবা, মা কেউ যদি দেখে ফেলেন?"

ও বললে—"ভয় নেই, কেউ দেখতে আসবে না, ১১ টার সময় ঘুমের ঘোরে ওঁরা একদম অন্ত জগতে। তাছাড়া আমি আসবার সময় বাইরে থেকে ওঁদের শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবো। প্রমিস করো আসবে, না হলে এখন তোমায় যেতে দেবো না।"

তাকে অনেক বুঝিয়েও না পেরে শেষে প্রমিস করতেই হ'ল।

* * * *

পুজার সময় মাস খানেকের জন্ত ওরা পুরীতে গিয়েছিল। সিপ্রাকে নিয়ে সেই সময় এত মেতে উঠেছিলাম যে অন্ত কারুর কথা মনেই হ'ত না। সিপ্রা কলকাতার আধুনিক সমাজের এক নাম-করা মেয়ে। মুখের শ্যামবর্ণটি পাউডার ও রুজ দিয়ে ঢেকে, ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগিয়ে শাড়ি ও ব্লাউজের মাঝে সরু কোমরটি দেখিয়ে পুরুষদের হাতের মুঠোয় আনার কায়দাটি খব ভালো করেই

তার জানা ছিল। সিপ্রার স্বামী বিনয় মিত্র যেখানে কাজ করেন সেই কোম্পানীর টাকায় কি একটা কাজ শিখতে বিলেতে গিয়েছিলেন তখন। তাই আমার সঙ্গে সময় কাটানোয় ওর পক্ষে কোনই অসুবিধে ছিল না।

দেখতে দেখতে দু'-একটা মাস কখন বেরিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। সেদিন সিপ্রাকে নিয়ে মেট্রোয় ম্যাটিনিতে যাবো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটি আঁচড়াচ্ছিলুম, বুঝতে পারিনি মিতা এসে কখন যে পাশে দাঁড়িয়েছে। ফিরে দাঁড়াতেই নত হয়ে আমার পা ছুঁয়ে এমন ভাবে ও প্রণাম করলে যে মনে হ'ল আমরা যেন কোন গৃহস্থ পরিবারের স্বামি-স্ত্রী। অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করলুম "কেমন আছো?"

"ভালো আছি। তুমি?"

বললুম "ভালো, পুরীতে কি রকম লাগলো?"

"ভালো লাগেনি বিশেষ। কারণ, কলকাতায় ফিরে আসার জন্য সব সময় ইচ্ছে হ'ত। তুমি কি আমার কথা কখনো ভাবতে?"

আড়াইটা বেজে গিয়েছিল, সিপ্রাকে তার বাড়ী থেকে তুলে নেবার কথা, দেরী হয়ে যাচ্ছিল তাই একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম।

একটা কিছু বলতে হয় তাই বললাম, "হ্যাঁ প্রায় ভাবতাম।"

ও বললে "একটা কথা বলবো?"

বললুম "বলো"

"তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

ঠাট্টার ছলে হেসে বললুম, "তুমি যদি রাজি হও তো নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করবো।

"ও কথা কেন বলছো, আমি তো মনে করি সেই দিন ছাতের উপর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ত আর দ্বিতীয় কারুর কথা এ জীবনে ভাবতেও পারবো না?"

ওর কথায় ঠাট্টার লেশ মাত্র নেই, বুঝলাম হঠাৎ সব-কিছুই কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে উঠছে। তাই বললুম "কিন্তু জানো তো আমাদের বিয়ে হওয়া কত শক্ত, দাদার এখনো বিয়ে হয়নি? আর তা ছাড়া তোমরা যদি আমাদের স্বজাতি হতে তা হলেও কথা ছিল। জানো তো আমার বাবাকে, এ বিয়েতে তিনি কখনোই রাজি হবেন না।"

ও বলে, "কিন্তু আমাকে তোমায় যে বিয়ে করতেই হবে ওঁদের যদি অমত হয় তা হলেও। কারণ…"

ওর কথা শেষ হবার আগেই সন্দেহে মনটা ভরে উঠলো। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম "এমন কিছু হয়নি তো যার জন্য এখনই বিয়ে না করলে উপায় নেই?"

ও বলল, "হ্যাঁ তাই হয়েছে…পাঁচ মাস"…

আমার মনে হ'ল, যেন পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা আস্তে আস্তে কোথায় সরে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, "বিয়ে ছাড়া আর কোন উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা কি যায় না?"

ও হতাশ ভাবে উত্তর দিলে, "আর কি করা যায়?"

বললুম "দেখ আমার একজন ডাক্তার-বন্ধু আছে, সে হয়ত এ যাত্রা আমাদের উদ্ধার করতে পারে।

ও বললে—"ঐ ভাবে আমি তো এর সমাধান চাই না, আমি নিজেও ডাক্তারের মেয়ে, তা হলে তো এ অবস্থা যাতে না হয় তাও করতে পারতুম গোড়া থেকে, কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে আমি যে কোন ব্যবধান চাইনি, তোমার সন্তানের মা হতেই তো আমি চেয়েছিলুম।"

আমার সব বুদ্ধি যেন হারিয়ে গিয়েছিল, কি করা যায়, কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, "আমায় একটু ভেবে দেখার সময় দাও, কাল বলবো কি করতে পারি।"

এমন সময় বেয়ারা মাধব জানিয়ে গেল দেরি দেখে সিপ্রা ফোন করছে। তাই তাড়াতাড়ি নিচে যেতে হ'ল। মিতাও চলে গেল নিজেদের বাড়ী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লক্ষ্য করলাম, আগের চেয়ে ও যেন আরো কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। তখন আর সিনেমা দেখার মতন মনের অবস্থা ছিল না, সেদিন সন্ধ্যার সমস্ত পরিকল্পিত আনন্দই তখন নষ্ট হয়ে গেছে। তাই একটা কাজের অজুহাতে যেতে না পারার জন্য সিপ্রার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়।

পরের দিন মিতা যখন এলো, আগেই ভেবে রেখেছিলুম তাই বলতে আমার বাধলো না। "দেখ মিতা, কয়েক রাতের উন্মাদনায় যে ভুল আমরা করেছি তার জন্য সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করা কি উচিত? আমার যতই ইচ্ছে থাক বাবা-মার যে এ বিয়েতে মত হবে না তা তো তুমি বোঝো। যদিও ধর্মের ধার আমি ধারিনে, পৈতেটা যে কবে ফেলে দিয়েছি তারও ঠিক নেই। তবু যতই আমরা আধুনিক হই না কেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কোন দিন বোধ হয় বিয়ে আমাদের হয়নি। তোমরা হচ্ছো বদ্যি, তার উপর দাদার এখনো বিয়ে হয়নি, এ অবস্থায় আমাদের বিয়েটা হওয়া যে কত অসম্ভব তা তো বুঝতেই পারছো, তাই ভেবে স্থির করেছি, আমার সেই ডাক্তার বন্ধুর কাছেই চল তোমায় নিয়ে যাই। ভয়ের কিছুই নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু তুমি তো আমায় ভালোবাসো। নাই বা হ'ল তোমার বাবা-মার মত? আমাদের বাড়ীর কারুর নিশ্চয় অমত হবে না, তা ছাড়া আমার যা গয়না আছে দরকার হলে তা সব বিক্রী করে অনেক টাকা হতে পারে, তাই নিয়ে তুমি আর আমি অন্য

কোথাও চলে যেতে পারি ; ঐ টাকা দিয়ে তুমি একটা কিছু ব্যবসা আরম্ভ করলে আমাদের বেশ চলে যাবে।

বাধা দিয়ে বললুম—"কিন্তু ব্যবসায় আমার কি অভিজ্ঞতা আছে? টাকাটা দু দিনে শেষ হয়েও যেতে পারে, তখন কি হবে একবার ভেবে দেখ। ও রকম রিস্ক নেওয়া নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে। অমন কি করা যায়?"

তা হলে তুমি আমায় চাও না, আসল কথাটা হচ্ছে তাই। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আর কার জন্ত যে তাও আমি জানি। তোমরা পুরুষ, নিজের সন্তানকে নিজে হাতে নষ্ট করতে দ্বিধা বোধ না করতে পারো কিন্তু মেয়েদের কাছে ওটা অত সহজ নয়। যাই হ'ক, তোমাকে আমার বিষয় আর ভাবতে হবে না, তুমি যে কত বড় কাপুরুষ আর স্বার্থপর, তা আজ বুঝলাম। আচ্ছা বিদায়।

আমি কিছু বলবার আগেই ঝড়ের মতন বেগে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর মিতার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। সত্যি বলতে কি, ঐ ঘটনার পর ওদের বাড়ীর দিকে যেতেও আমার ভয় হ'ত। এর মাস খানেক পরে ওর বাবা প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে রিটায়ার করলেন, তার কারণ, ওনার না কি ষ্ট্রোক হয়েছিল। হাই ব্লাডপ্রেসার, তাই কাশীতে বোনের কাছে শেষ ক'টা দিন কাটাতে চান। তার পর এক দিন আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম ওনাদের সমস্ত মালপত্র একটা লরিতে করে হাওড়ার দিকে চলেছে। আর শুনলুম, তার একটু আগেই ট্যাক্সিতে ওনারা সকলে হয়ে গেছেন রওনা।

কোন রকম দুঃখ হওয়া দূরে থাক, আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। দুশ্চিন্তার নিদ্রাহীনতা আস্তে আস্তে কেটে গেল। কয়েক দিন পর এলো আমাদের বাড়ীর ঐ দিকটায় নতুন এক ভাড়াটে।

আরও কয়েক মাস পরের কথা। সিপ্রার স্বামী এখনো ফেরেন নি এবং খবর এসেছে আরও এক বছর ইউরোপেই তাঁকে থাকতে হবে। সিপ্রা তার দিনগুলো একা একা নষ্ট করবার মতন মেয়েই নয়। ইতিমধ্যে সিপ্রার সঙ্গী বলে চার দিকে আমার নামটা বেশ রটে গিয়েছিল আর সেই সঙ্গে বাজারে হয়ে যায় প্রচুর দেনা। সিপ্রার সঙ্গে মোটরে ঘোরা চাই। হাত-খরচের জন্ত যা টাকা পাই তাতে একা আমার খরচও কুলোয় না তো তার উপর একজন মেয়েকে নিয়ে প্রায়ই ফারপোয় অথবা সিনেমায় যাওয়া ধার না নিলে কি করে চলে? তবে ওর মতন এক নাম-করা মেয়ে যে শুধু আমাকেই ভালবাসে এইটা মনে করলে বেশ একটু গর্ব অনুভব হ'ত। সিপ্রার মতন মেয়ে যে আমার মতন একটা অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ ছেলেকে নিয়ে শুধু মজা দেখতেও পারে ঐ সন্দেহটা কখনো জাগেনি আমার মনে। প্রত্যেক রবিবারেই কোন না কোন অজুহাতে সিপ্রা নিজেকে লুকিয়ে রাখতো আমার কাছ থেকে। ওর বাড়ীতেও সে দিন পাওয়া যেত না ওকে। এমনি এক রবিবারে সন্ধ্যার সময় একা-একা ভালো লাগছিল না, তাই লেকের দক্ষিণ দিকে এক নির্জন যায়গায় গাড়িটা পার্ক করে পায়চারি করছিলাম ঘাসের উপরে। এমন সময় নজরে পড়লো একটি অজ্ঞাত লোকের বুকের উপর মাথা রেখে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে সিপ্রা। পা টিপে টিপে ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই শোনা গেল, সিপ্রা সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলছে "আর ক'মাস পরেই বিনয় এসে পড়বে ইউরোপ থেকে, বিনয়ের মতন হাঁদা লোকের সঙ্গে কাটিয়ে সমস্ত জীবনটা আমি কখনই নষ্ট করতে পারব না। শীগ্‌গির আমায় কোথাও নিয়ে চলো অপরেশ! চুপ করে রইলে যে? ঐ ছোট ছেলেটার সঙ্গে মোটরে করে এখানে-ওখানে সময় কাটাতে যাই বলে 'জেলাস' হয়েছো বুঝি?"···

আর শোনবার মতন মনের অবস্থা ছিল না, তাই চুপে চুপে সেখান থেকে বাড়ী ফিরি। আমি যে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনেছি তা ওরা জানতেও পারেনি।

পরের দিন সকালের ডাকে দেখি একটা চিঠি এসেছে। টিকিটের উপর এলাহাবাদের ছাপ। মিতার হাতের লেখাটা চিনতে দেরি হল না। উদ্বিগ্ন চিত্তে তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে যা পড়লুম তাই আমার জীবনের এই পরিবর্তনের কারণ। আজও সেই চিঠিটা সব সময়েই আমার পকেটে থাকে বলে রবিন একটি ভাঁজ-করা কাগজ তার জামার বুকপকেট থেকে বের করে আমায় পড়তে দিলে।

অন্তের বান্ধবীর লেখা চিঠি পড়তে আমার সংকোচ হলেও কৌতূহল তখন এতই বেড়ে গেছে যে সে চিঠিটা ওর হাত থেকে নিয়ে সোজা পড়তে সুরু করে দিলাম।···সম্বোধনের বেশি আড়ম্বর ছিল না তাতে ; লেখা ছিল—"রবু, এই ক'টি কথা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য মনে করি, তাই লিখছি এই চিঠি। সেদিন আমার অবস্থার কথা তোমাকে বলবার পর যখন দেখলাম আমাকে বিয়ে করবার মত কোন ইচ্ছাই তোমার নেই তখন বুঝতে পারলুম নিজের ভুল। এর কিছু পরেই মা'র কাছে ব্যাপারটা আর লুকিয়ে রাখা গেল না, তিনি এক দিন সবই জানতে পারলেন এবং তিনিই বললেন সেটা বাবাকে। যা শুনে বাবার হ'ল ষ্ট্রোক্। কিন্তু তবু তোমার সঙ্গে এর যে কোন যোগ থাকতে পারে এ কথা আমি কাউকেই বলিনি। এমন এক জনের নাম দিয়েছি যে, সে রকম কোন লোকই নেই। এই ঘটনার একটু পরেই তাঁরা স্থির করলেন বেনারস যাওয়া—মাসির কাছে দিন কতক থাকার জন্ত। কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম তার আসল কারণ কি। বাবা নিজের হাতেই হয়তো সেই পাপ ক্রিয়ায় সহায়তা করতেন যা তুমি চেয়েছিলে তোমার এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে করাতে। তাই তাঁকে সেই মহাপাপের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ত ট্রেনে সবাই যখন ঘুমিয়েছিল সেই সময় রাত্রির অন্ধকারে আমি চুপ-চাপ নেমে পড়ি এক ছোট ষ্টেশনে। তার পর পৌঁছাই এসে এলাহাবাদে। এখানে আজ এক মাস হল তোমার একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। ঠিক তোমার মতন মুখ চোখ, এমন কি মাথার চুলগুলোও তোমার মতই কোঁকড়া। এখানকার হাসপাতালের যে সব ডাক্তার আমায় এটেণ্ড করতেন তাঁদের মধ্যে দু'-একজন আমায় বিয়ে করতে চাইছেন কিন্তু বিয়ে আমার এ জীবনে আর হবে না। কারণ, পুরুষদের প্রেমকে আজ আর আমি বিশ্বাস করি না। তাদের আজ আমি ঘৃণা করি। তোমার সন্তানের জন্ত ভেবো না। আমি হচ্ছি তার মা। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার নিজের ওপর এটুকু বিশ্বাস আছে যে, তাকে মানুষ করে তুলতে আমি পারবো। আর পাছে সে তার বাপের চরিত্রটাই নিজের আদর্শ করে নেয় এই ভয়েই

বাপের সংস্পর্শে কোন দিন তাকে আসতে আমি দেবো না। এ চিঠি যখন তোমার কাছে পৌঁছবে, যেন তখন আমি এলাহাবাদ ছেড়ে গেছি। কোথায় তা বলবো না। নিজের ছেলেকে দাবী করতে অথবা অন্ত কোন কারণে কখনো আমায় খুঁজে বের করবার চেষ্টা তুমি কোরো না। কারণ, খুঁজে আমায় কখনো তুমি পাবে না। বিদায়—ইতি—মিত্রা।"

চিঠিটা পড়া শেষ করে রবিনের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে সে বললে—সেই থেকে আজ ১৫ বছর খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকে। এলাহাবাদের সমস্ত হাসপাতালে খুঁজেছি কিন্তু ও নামের কারুর খবরই তারা দিতে পারেনি। ঐ ধরণের কত মেয়ে আসছে যাচ্ছে সেখানকার মেটার্নিটি ওয়ার্ডে। ও নিজের নাম বদলে অন্ত নামে হাসপাতালে এসেছিল কি না কে জানে। এলাহাবাদে অনেক খুঁজে বার করেছিলুম ওর এক স্কুলের মেয়ে-বন্ধুকে, যার বিয়ে হয়েছিল এলাহাবাদে। কিন্তু কোন খবরই বার করতে পারিনি তার কাছ থেকে। হয়তো সবই সে জানে কিন্তু বলেনি সে আমায় কিছু। একবার ছোটনাগপুরের এক ছোট্ট হিল-ষ্টেশনে আমাদেরই একটি বাড়িতে একাকী কাটাতে গিয়েছিলাম ক'টা দিন। এক নির্জন দুপুরে বসেছিলাম জানালার কাছে, সামনেই রেলওয়ে ষ্টেশন। গোমো প্যাসেঞ্জারের একটা কামরায় মনে হল ঠিক তার মতন কে একজন বসে আছে। বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে ষ্টেশনে যেতে যেতে ট্রেন দিল ছেড়ে। তার পর ওই লাইনে প্রত্যেক ষ্টেশনেই কিছু দিন করে কাটিয়ে খোঁজ নিলাম কিন্তু কোনই সুবিধে হ'ল না। অবশেষে সাহসে নির্ভর করে গেলুম বেনারসে তার বাপ-মার কাছে। আসল ব্যাপারটা তাঁদের কাছ থেকে শোনবার জন্ত, কিন্তু প্রথমেই তাঁরা জানিয়ে দিলেন কলকাতা থেকে আসবার সময় মিত্রা ট্রেণেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বেনারসে পৌঁছবার আগেই সে ইহলোক ত্যাগ করে যায়। এর পর যা-কিছু বলতে এসেছিলুম তার আর কিছুই বলা হল না। তাই তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম সে বারের মতন।"

কে বলবে সত্যই সে ইহলোক ত্যাগ করে গেছে না এই পৃথিবীর জনারণ্যে আমারই সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোথাও সে আজও আত্মগোপন করে আছে! কে জানে কোন দিন তার সন্ধান পাবো কি না! ১৪।১৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের দেখলে কেবলই মনে হয় আমার নিজের ছেলেটিও হয়তো এমনি বড় হয়ে উঠেছে। কে বলবে তাকে আজ কেমন দেখতে! এর মধ্যে আরও কত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি তবু দূর হয়নি মনের চাঞ্চল্য। তার পর সুদূর দক্ষিণ-ভারতে গিয়ে রামনা মহর্ষির কাছে কিছু কাল কাটিয়ে শুধু সান্ত্বনাই পাইনি আজ আরও উপলব্ধি করেছি এই সংসারের অনিত্যতা।

রবিন নিজের রিষ্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে লাফিয়ে ওঠে। "কথা বলতে বলতে কি তাড়াতাড়ি সময় গেছে চলে, বিদায় বাসব বাবু, আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার মত সামান্ত ভদ্রতাটুকু রক্ষা করতে গেলেও ট্রেনটা মিস্ করতে হয়, ক্ষমা করবেন।"

রাস্তায় একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে রবিন এক লাফে তাতে উঠে পড়ে। ট্যাক্সি আবার ছুটতে সুরু করে হাওড়ার দিকে। দূর থেকে আর একবার শুনতে পাই রবিনের কণ্ঠস্বর "বিদায় বাসব বাবু।"

মর্যাদার প্রশ্ন

সমারসেট মম

(ছোট গল্প)

কয়েক বছর আগে 'স্বর্ণযুগে স্পেন' সম্বন্ধে একখানা বই লেখবার সময় আমি ক্যালডেরনের নাটকগুলো আবার নতুন করে পড়েছিলাম। অন্যান্য নাটকের সঙ্গে "এল মেডিকো ডি সু অনরা" অর্থাৎ "মহামান্যের চিকিৎসক" নামক নাটকটিও পড়বার সুযোগ হয়েছিল। বড় নিষ্ঠুর কাহিনী। পড়তে পড়তে আতঙ্ক ধরে যায়। কিন্তু নাটকটা আবার পাঠ করে অনেক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। অভূতপূর্ব বিস্ময়স্মৃতি হিসাবে সেই ঘটনা আজও গাঁথা আছে আমার মনে।

তখন আমার বয়স কম। "কর্পাস ক্রিষ্টির ভোজ" উৎসব দেখবার জন্ম গিয়েছিলাম সেভিলে। সেটা গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়। সরু সরু রাস্তার মাথায় বড় বড় চাঁদোয়া। তার ছায়া মনোরম বটে, তবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সূর্যের তেজ অতি নির্মম। সকালে জমকালো চিত্তাকর্ষক শোভাযাত্রা দেখলাম। পবিত্র দেবতাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় দর্শকরা হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং পুরো ইউনিফর্ম-পরা সিভিল গার্ডরা স্বর্গীয় রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ম সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো।

বিকেলে ষণ্ডযুদ্ধদর্শনকামী জনতার ভিড়ে মিশে গেলাম। দর্জি মেয়ে এবং সিগারেটওয়ালীরা কালো কেশে রাঙা ফুলের ... সেজেছে। তাদের সঙ্গী যুবকদেরই বা সাজ-গোজের কি বাহার! সেটা ঠিক স্পেন-মার্কিণ যুদ্ধের অনতিকাল পরের ঘটনা। লোকে তখনও সূচীকাজ-করা ছোট জামা, চামড়ার সঙ্গে আঁটো-সাটো ট্রাউজার, দীর্ঘ-প্রান্ত চ্যাপ্টা মাথা টুপি পরে। ভাড়াটে কশা ঘোড়ার সওয়াররা মাঝে মাঝে ভিড়টাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘোড়ার চেহারা দেখলে মনেও হয় না যে, অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে। নয়নাভিরাম সাজ-পোষাকের গর্ব্বে গর্ব্বিত অশ্বারোহী জনতার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা বিনিময় করছিল। ষণ্ডযুদ্ধ-অনুরাগীদের ভিড়ে ঠাসা জীর্ণ ভাঙ্গা-চোরা গাড়ী-ঘোড়ার লম্বা লাইন লেগেছে।

আমি একটু আগেই গিয়েছিলাম। মানুষে মানুষে মল্লভূমি কেমন আস্তে আস্তে ভরে উঠছে তা দেখতে আমার বেশ মজা লাগছিল। উন্মুক্ত সূর্যের নীচে সস্তা দামের আসনগুলো আগেই ভরে গিয়েছিল এবং অসংখ্য নর-নারী যখন হাতের পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন তখন সেই অসংখ্য হাত-পাখায় প্রজাপতির পক্ষ সঞ্চালনের মত বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। আমি বসেছিলাম ছায়ায়। সেখানে আসনগুলো ভরছিল আস্তে আস্তে কিন্তু লড়াই আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে সেখানেও এত বেশী ভীড় হল যে আসন খালি পাওয়াই মুস্কিল। হঠাৎ একটি লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম হাসি হেসে একটু বসবার জায়গা চাইলেন। তিনি ভাল করে বসবার পর আমি আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি ইংরাজী সাজ-পোষাকে সজ্জিত এবং দেখতেও ভদ্রলোকের মত। তাঁর হাত দুটোও সুন্দর, ছোট কিন্তু দৃঢ়। পাতলা লম্বা লম্বা আঙুল। অভাব শুধু একটি সিগারেটের। নিজের সিগারেটের কেস বার করে ভাবলাম ওঁকে একটা দিলে ভদ্রতাই হবে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি গ্রহণ করলেন সিগারেটটা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি বিদেশী। তাই ধন্যবাদ জানালেন ফরাসী ভাষায়।

: আপনি কি ইংরাজ?—প্রশ্ন করলেন তিনি।

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: সে কি মশাই, এই গরমে এখনও পালান নি যে?

বললাম আমি এসেছি "ফিষ্ট অফ দি কপাস ক্রিষ্টি" দেখতে।

: তা তো বটেই। সেভিলে আসবার একটা উপলক্ষ তো থাকবেই।

তার পর বিশাল জনসমাবেশ সম্বন্ধে আমি দুই-একটি আকস্মিক মন্তব্য করলাম।

: কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে, স্পেন তার উপনিবেশের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে আজ কতদূর বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তার অতীত গৌরব শুধু নামে এসে পর্যবসিত হয়েছে।

: এখনও অনেক বাকী।

: সূর্যের কিরণ, নীল আকাশ আর ভবিষ্যৎ।

এমন আবেগ বিহীন সুরে তিনি কথা বললেন, যেন তার পতিত দেশের দুর্ভাগ্যে তিনি মোটেই বিচলিত নন। কি উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম। সময় কাটতে লাগল। বক্সের আসনগুলোও ভরে উঠল। লাল-কালো জরি-ফিতের কাজ-করা অঙ্গাবরণে সজ্জিত মহিলারা সেখানে বসে তাঁদের সামনে ম্যানিলা শাল বিছিয়ে উজ্জ্বল বহু বর্ণে বিচিত্র ঝালরের রূপ দিলেন। সেখানে যখন বিশেষ বিশেষ সুন্দরীর আবির্ভাব হচ্ছিল তখন চারি দিক থেকে হর্ষমুখর স্বাগত সম্ভাষণ শোনা যাচ্ছিল আর সুন্দরীরাও অপ্রতিভ না হয়ে সহাস্যে মাথা নুইয়ে গ্রহণ করছিলেন সেই সম্ভাষণ। অবশেষে ষণ্ডযুদ্ধের প্রেসিডেণ্ট প্রবেশ করলেন। ব্যাণ্ড বাজল। সোনা-রূপোর কাজ-করা সাটিনের পোষাকে ঝকমকে বাহাদুররা গর্বোন্নত শিরে সার বেঁধে ঢুকল মল্লভূমিতে। এক মিনিট বাদেই একটি কালো ষাঁড় সিং নেড়ে এসে হানা দিল।

লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় আত্মমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গী একেবারে শান্ত ধীর হয়ে বসে আছেন। যখন এক বাহাদুর পড়ে গিয়েও অলৌকিক ভাবে ক্রোধান্ধ পশুর শিঙের গুঁতো থেকে বেঁচে গেল তখন সহস্র সহস্র দর্শক দম বন্ধ করে যে যার আসনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গী অবিচলিত অনড়। ষাঁড়টা নিহত হল। খচ্চররা টেনে নিয়ে গেল তার বিরাট শব। আমি ক্লান্ত ভাবে ঝিমিয়ে পড়লাম।

: আপনি ষাঁড়ের লড়াই পছন্দ করেন?—তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন: অধিকাংশ ইংরাজই পছন্দ করে কিন্তু লক্ষ্য করেছি, নিজের দেশে তারা ষাঁড়ের লড়াই সম্বন্ধে অনেক বিরূপ কথা বলে।

: যাতে ঘৃণা এবং আতঙ্কের উদ্রেক হয় তা কি কেউ পছন্দ করে? ষাঁড়ের লড়াই দেখতে এসে প্রত্যেক বার শপথ করে যাই যে আর দেখব না, কিন্তু আবার আসি।

: অপরের বিপদে আনন্দ লাভ করা আমাদের এক বিচিত্র রিপু। হয়ত মানুষের পক্ষে এ-ই স্বাভাবিক। রোমানদের ছিল মল্লযুদ্ধ আর আধুনিকদের মেলোড্রামা। পীড়ন এবং রক্তপাতে মানুষের আনন্দ সহজাত।

আমি সরাসরি জবাব দিলাম না।

: স্পেনে মানুষের জীবনের মূল্য যে এত কম তার কারণ এই ষাঁড়ের লড়াই বলেই কি আপনার মনে হয় না ?

: আপনার কি ধারণা জীবনের মূল্য খুব বেশী ?—প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমি তড়িতে তাকিয়ে দেখলাম তাঁকে, কারণ তাঁর কথায় যে ব্যঙ্গের সুর ছিল সেটা কারও কান এড়াবে না। দেখলাম তাঁর চোখ দুটিও বিদ্রূপে ভরা। একটু চঞ্চল হলাম, কারণ হঠাৎ উনি যেন আমার মধ্যে তারুণ্যের অনুভূতি সঞ্চার করেছেন। তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হলাম। আগে তাঁর সৌহার্দ্যমাখা বড় বড় নরম চোখ দেখে অমায়িক ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এখন তাঁর মুখে যে অপ্রাকৃত গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে সেটা অসুখী মানুষের লক্ষণ। আমি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। সেদিন আর বেশী কথা হল না। শেষ ষাঁড়টি নিহত হবার পর সবাই যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি আমার করমর্দন করে বললেন : আশা করি আবার দেখা হবে।—নিছক ভদ্রতার কথা। কাজেই সম্ভবত কেউ-ই ভাবেনি যে আমাদের মধ্যে আদৌ আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে দু'-তিন দিন বাদে আবার আমাদের দেখা হয়েছিল। সেই অপরাহ্নে ডিউক অফ আকাবার প্রাসাদ দেখতে আমি সেভিলের এক অচেনা মহল্লায় ঢুকে পড়েছিলাম। শুনেছিলাম সেখানে চমৎকার একটা বাগিচা, আর একটি কক্ষে গ্রানাডার পতনের আগে ধৃত মুরদের তৈরী একটি জমকালো সিলিং (ছাদ) আছে। সেখানে প্রবেশ করা সহজ নয় কিন্তু দেখবার আগ্রহ আমার খুব বেশী। ভাবলাম, এই গরমের দিনে বহিরাগত পরিব্রাজকরা কেউ যখন এখানে নেই তখন দুই তিন পিসেটা দিলেই আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে পারে। ভারপ্রাপ্ত লোকটি আমায় বলল, প্রাসাদের সংস্কার করা হচ্ছে এবং ডিউকের প্রতিনিধির লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন বহিরাগতকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সুতরাং কি আর করি, আলকাজারের রাজকীয় বাগিচা, নিষ্ঠুর ডন পেড্রোর প্রাচীন প্রাসাদ দেখতে গেলাম। স্পেনবাসীদের মনে পেড্রোর স্মৃতি আজও জীবন্ত হয়ে আছে। সাইপ্রেস আর কমলা বাগানের মধ্যে বেশ ভালই লাগছিল। হাতে ছিল বই—ক্যালডেরনের এক খণ্ড। সেখানে বসে পড়লাম কিছুক্ষণ। তার পর ইতস্তত: ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সেভিলের পুরোনো অংশের রাস্তাগুলো সরু সরু এবং ঘোরালো-প্যাঁচালো। চন্দ্রাতপের নীচে সেই রাস্তায় এলোমেলো পদচারণা করতে ভালই লাগে, তবে পথ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়। আমিও পথ হারালাম। যখন বুঝলাম যে, কোন্ দিকে যেতে হবে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই, ঠিক সেই সময় দেখলাম এক ভদ্রলোক আমার দিকেই হেঁটে আসছেন। চিনলাম, এঁর সঙ্গেই ষাঁড়ের লড়াইয়ের ময়দানে আলাপ হয়েছিল। তাঁকে থামিয়ে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করতেই তিনিও আমাকে চিনলেন।

মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন : কিছুতেই পথ খুঁজে পাবেন না আপনি। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে পথ চিনিয়ে দিচ্ছি, যাতে আর না ভুল হয়।

আমি আপত্তি করলাম কিন্তু তিনি শুনলেন না। বললেন যে তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না।

: তাহলে এখনও যাননি আপনি !— প্রশ্ন করলেন তিনি।

: আগামী কাল চলে যাব। এই মাত্র ডিউক অফ আকাবার প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম। সেই মুরদের তৈরী সিলিংটা দেখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঢুকতে পেলাম না।

: আরবী চারুকলায় আপনার আগ্রহ আছে নাকি ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ আছে। শুনেছি সিলিংটা নাকি সেভিলের সেরা জিনিষের মধ্যে অন্যতম।

: আমার মনে হয়, ঠিক অমনি সিলিং আমি আপনাকে একটা দেখাতে পারি।

: কোথায় ?

মুহূর্তের জন্য তিনি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি একটা কি ! আমাকে যদি অদ্ভুত কিছু ভেবে থাকেন তাহলে এ-ও বোঝা গেল যে তিনি একটা সন্তোষ জনক সিদ্ধান্তেও এসেছেন।

: যদি সময় থাকে তাহলে দশ মিনিটের মধ্যে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

তাঁকে সর্বান্ত:করণে ধন্যবাদ জানিয়ে পুরোনো পথেই আবার পদক্ষেপ করলাম। কথাবার্তা বলতে বলতে দাঁড়ালাম এসে একটা বড় বাড়ীর সামনে। বাড়ীটা পাণ্ডুর নীল রঙের। দেখতে আরবী ধরণে তৈরী একটা বন্দিশালার মত। রাস্তার উপরের
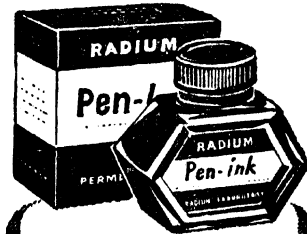
জানলাগুলো ভীষণ ভাবে অবরুদ্ধ। সেভিলের অনেক বাড়ীতেই এমনটা দেখেছি। আমার গাইড গেটের কাছে গিয়ে হাতে তালি বাজাতেই একটা চাকর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল এবং একটি তার টানল।

: কার বাড়ী এটা?

: আমার।

: বিস্মিত হলাম, কারণ আমি জানতাম স্পেনীয়রা উগ্র আগ্রহে তাদের গোপনতা রক্ষা করে এবং অপরিচিত লোকদের নিজের বাড়ী ঢোকাতে চায় না।

ভারী লোহার গেটটা দুলতে দুলতে উন্মুক্ত হল। আমরা ঢুকে পড়লাম প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে সরু পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নিজেকে একটা বিমুগ্ধ মালঞ্চের মধ্যে আবিষ্কার করলাম। বাড়ীর মত উঁচু দেওয়াল তিন দিকে। কালপ্রবাহে ক্ষয়িষ্ণু দেওয়ালের পুরোনো লাল ইটগুলো গোলাপাস্তীর্ণ। তাদের প্রতিটি ইঞ্চি সুগন্ধ আতিশয্যের আবরণে ঢাকা। মালঞ্চে বিশৃঙ্খল গাছ-গাছালির বিপুল সমারোহ! মনে হয় যেন মালঞ্চের মালাকররা প্রকৃতির অদম্য উচ্ছ্বাস প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আকাশ ছোঁয়ার উদগ্র কামনায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পামের সারি, কালো কমলা গাছ, ফুলের ডালি সাজানো নাম-না-জানা অসংখ্য বৃক্ষ। আর খালি গোলাপ, গোলাপ আর গোলাপ। চতুর্থ দেওয়ালটি একটি খিলেন-করা মুরিস অলিন্দ। প্রচুর নক্সার কাজ করা ঘোড়ার খুরের মত বাঁকানো খিলান। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে জমকালো সিলিংটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটা প্রায় আলকাজারেরই মতন। বরং সেটা প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে বসাতে তার অনেক মনোমুগ্ধকারিতাই নষ্ট হয়েছে কিন্তু এটার তা হয়নি। অতি সুন্দর হাল্কা নরম রঙের কাজ। সত্যিই দুর্মূল্য বস্তুবিশেষ।

: বিশ্বাস করুন, ডিউকের প্রাসাদ দেখতে পেলেন না বলে আপনার দুঃখ করার কিছু রইল না। তা ছাড়া একথাও আপনি বলতে পারবেন যে, আপনি এমন একটা জিনিষ দেখেছেন যা কোন বিদেশী কখনও দেখতে পায়নি।

: সে আপনারই কৃপা। সেজন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গর্বভরে তিনি একবার নিজের দিকে তাকালেন এবং তাঁর সেই গর্বিত ভাবটা আমার সহানুভূতিই আকর্ষণ করল।

: নিষ্ঠুর ডন পেড্রোর আমলে আমারই এক পূর্বপুরুষ এটা বানিয়েছিলেন। এই সিলিংএর নীচে আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বসে স্বয়ং রাজাও হয়ত কত বার পান-ভোজন ফুর্তি করে গেছেন।

আমি হাতের বইটা এগিয়ে ধরলাম।

: এইমাত্র একটা নাটক পড়ছিলাম যার মধ্যে ডন পেড্রোও একটি চরিত্র।

: কি বই?

বইটা তাঁকে দিতেই তিনি নামটা তাকিয়ে দেখলেন। আমি চারি দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। বললাম: অবশ্য এটার সৌন্দর্য বেড়েছে এই বিস্ময়কর মালঞ্চের জন্য। সমস্ত পরিবেশে একটা অবিশ্বাস্য রকমের রোমান্টিক প্রভাব ফেলেছে।—আমার উৎসাহ দেখে ভদ্রলোক যে খুশী হয়েছেন তা বুঝলাম। তিনি হাসলেন। সে হাসি যে কত গুরুগম্ভীর তা আগেই দেখেছি। তাঁর স্বাভাবিক বিষণ্ণ ভাবটাও সে হাসিতে মোছে না।

: কয়েক মিনিট বসে একটা সিগারেট খেয়ে যান না।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমারও তাই ইচ্ছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ঢুকলাম মালঞ্চের মধ্যে। আলকাজারের মালঞ্চে মুরিস টালির তৈরী যে রকম বেঞ্চি আছে, ঠিক তেমনি একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট একজন মহিলাকে ক্যানভাসে সূচীর কাজ করতে দেখলাম। তিনিও চকিতে চোখ তুলে দেখলেন। অপরিচিত লোক দেখে থত-মত খেয়ে আমার সঙ্গীর দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকালেন।

: আসুন পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী।—বললেন আমার সঙ্গী।

মহিলাটি গম্ভীর ভাবে মাথা নোয়ালেন। অদ্ভুত রূপসী। দীপ্তিময় দুটি চোখ, খাড়া নাক, কোমল দুটি নাসারন্ধ্র এবং পাণ্ডুর মসৃণ ত্বক্। অধিকাংশ স্পেনীয় নারীর মত তাঁর প্রচুর ঘন কালো চুলের রাশি চওড়া শাদা সিঁথি দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত। মুখে একটিও রেখা পড়েনি এবং বয়স কোন মতেই তিরিশের বেশী নয়।

আমি বললাম: সুন্দর মালঞ্চ আপনাদের, সেনোরা।—তিনি নিস্পৃহ ভাবে তাকালেন।

: সত্যিই বড় চমৎকার!

আমি হঠাৎ বিব্রত বোধ করলাম। তাঁর কাছ থেকে আদর-আপ্যায়ন আশা করিনি এবং আমার এই গায়ে-পড়ে আলাপ জমাতে যাওয়ার ব্যাপারটাকে যদি তিনি উৎপাত বলে মনে করে থাকেন, সেজন্যও তাঁকে দোষ দিতে পারি না। ভদ্রমহিলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এটা কোন সক্রিয় বিরূপতা নয়। সুন্দরী তরুণী বলে অসম্ভব মনে হলেও আমি অনুভব করলাম তার মধ্যে কোন জিনিষটা যেন প্রাণহীন।

: তোমরা এখানে বসবে কি?—তিনি তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন করলেন।

: তোমার অনুমতি পেলে কয়েক মিনিট বসতে পারি।

: আমি তোমাদের বিরক্ত করব না।

তিনি তাঁর সিল্ক এবং ক্যানভাস হাতে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন দেখলাম, সাধারণ স্পেনীয় মহিলাদের চেয়েও তিনি লম্বা বেশী। আবার তিনি আমার দিকে মাথা নোয়ালেন কিন্তু তার মুখে হাসি নেই। রাজকীয় স্থৈর্য্যের সঙ্গে গজেন্দ্র-গমনে চলে গেলেন। তখনকার দিনে আমি একটু বাচাল ছিলাম এবং বেশ মনে পড়ে, মনে মনে বলেছিলাম যে এমন মহিলার সঙ্গে হ্যাবলামি করার কথা চিন্তাও করা যায় না। বহু বর্ণে বিচিত্র বেঞ্চিতে বসে আমি গৃহস্বামীকে সিগারেট এবং দেশলাই দিলাম। আমার ক্যালডেরণের খণ্ডটা তখনও তাঁর হাতে ছিল এবং তিনি নিস্পৃহ ভাবে তার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

: কোন্ নাটকটা পড়ছিলেন?

: এল মেডিকো ডি সু অনরা। (মহামান্যের চিকিৎসক) আমার দিকে তাকালেন তিনি এবং মনে হল তার বড় বড় চোখে আমি অপ্রাকৃত প্রভা দেখতে পেলাম।

: পড়ে কি মনে হ'ল ?

: বীভৎস বিরক্তিকর। আসল কারণটা অবশ্য এই যে, এর বিষয়বস্তু আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

: কোন্ বিষয়বস্তু ?

: মানমর্যাদা আভিজাত্যের প্রশ্ন এবং এই ধরণের জিনিষগুলো। এখানে বলে রাখা ভাল যে, স্পেনীয় নাটকের বেশীর ভাগের বিষয়বস্তুরই প্রধান উৎস মানমর্যাদা আভিজাত্যের প্রশ্ন। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করা তো অভিজাত পুরুষের সংহিতা বটেই ; এমন কি স্ত্রীর নির্দোষিতা সত্ত্বেও যদি তার আচার-ব্যবহারে কুৎসা-কেলেঙ্কারী রটবার কারণ থাকে, তাহলে তাকেও হনন করা সেই সংহিতা-সম্মত। বিশেষ করে এই নাটকটায় ইচ্ছাকৃত স্ত্রী-হত্যার যে কাহিনী পড়েছি, তেমন ভীষণ কাহিনী আর কখনও পড়িনি। মহামান্যের চিকিৎসক নিজের স্ত্রীকে নির্দোষ জেনেও শুধু শিষ্টতার খাতিরে তার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল।

আমার বন্ধু বললেন : এটা স্পেনীয় রক্তের গুণ, বিদেশীরা পছন্দ করুক আর নাই করুক।

: কি যে বলেন, ক্যালডেরণের সময়ের পর গুয়াডালকুইভির উপর দিয়ে অনেক জল গলে গেছে। অমন ঘটনা এখনও ঘটে সে কথা বলবেন না।

: বরং সেই কথাই বলব। এখনও কোন স্বামী অমন হীন এবং অপমান জনক অবস্থায় পড়লে দোষীকে হত্যা করে নিজের আত্মসম্মান পুনরর্জন করে।

উত্তর দিলাম না। মনে হলো উনি একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন। আমি মনে মনে বললাম খুব হয়েছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন।

: ডন পেড্রো আগুরিয়ার নাম শুনেছেন কখনও ?

: না।

: স্পেনের ইতিহাসে নামটা অজ্ঞাত নয়। তাঁর এক পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্ব কালে স্পেনের এ্যাডমিরাল ছিলেন এবং আর একজন ছিলেন রাজা চতুর্থ ফিলিপের প্রাণের বন্ধু। রাজার আদেশে ভেলাসকুয়েজ তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত: করলেন আমার বন্ধু। গল্প সুরু করবার আগে অনেকক্ষণ ধরে বিচারের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ফিলিপদের আমলে আগুরিয়ারা ছিলেন ধনী কিন্তু আমার বন্ধু ডন পেড্রো পিতার উত্তরাধিকারী হবার আগেই তাদের অবস্থা পড়ে এসেছে। কিন্তু তবু তিনি গরীব ছিলেন না। করডোভা এবং আগুইলারের মধ্যে তাদের সম্পত্তি ছিল এবং সেভিলে তাদের বাড়ীটায় অন্তত প্রাচীন জাঁক-জমকের চিহ্নটুকু দেখতে পাওয়া যেত। যখন সর্বস্ব হারানো কাউণ্ট অফ আকাবার কন্যা সোলেদাদের সঙ্গে তার বিয়ের পাকা দেখা হল তখন সেভিলের ক্ষুদ্র জগত বিস্ময়ে অবাক হয়েছিল। কারণ সোলেদাদের পরিবার মান-মর্যাদায় উঁচু হলেও তার বাবা ছিলেন পাকা ইতর। দেনায় তিনি একেবারে ডুবেছিলেন এবং নিজেকে চালাবার জন্য যে সব চালাকির আশ্রয় নিতেন তাও মোটেই শোভন নয়। কিন্তু সোলেদাদ বড় সুন্দরী এবং ডন পেড্রো তার প্রেমে পাগল।

: বিয়ে হয়ে গেল। যে প্রচণ্ড আবেগে পেড্রো তাকে ভালবাসলেন তা বোধ হয় শুধু স্পেনীয়দের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু বিহ্বল হয়ে দেখলেন যে সোলেদাদ তাকে ভালবাসে না। নম্র কোমল সোলেদাদ পত্নী এবং গৃহিণী হিসাবে চমৎকার। পেড্রোর প্রতি সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। পেড্রো ভাবলেন, কোলে শিশু এলে ওর পরিবর্ত্তন হবে কিন্তু শিশু আসার পরও কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। গোড়া থেকেই দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান পেড্রো অনুভব করেছিল সেটা বজায় রইল। বড় দুঃখ তাঁর। অবশেষে মনে মনে ভাবলেন সোলেদাদের চরিত্র এত মহৎ এবং প্রকৃতি এত সূক্ষ্ম যে পার্থিব কামনায় ধরা দিতে চায় না। এই ভেবে তিনি আশা ত্যাগ করলেন যে সে তাঁর এত উর্দ্ধে যে মানবিক প্রেম সেখানে পৌঁছোয় না।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে নিজের আসনে নড়ে-চড়ে বসলাম। ভাবলাম স্পেনীয়রা বড় বেশী অলঙ্কার দিয়ে কথা বলে। ভদ্রলোক তার গল্প বলে চললেন : "আপনি জানেন সেভিলের অপেরা হাউস ইষ্টারের পর মাত্র ছয় সপ্তাহের জন্য খোলা হয়। সেভিলবাসীরা ইউরোপীয় সঙ্গীতে আদৌ আগ্রহশীল নয়। গান শোনার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই আমরা অপেরায় যাই বেশী। অন্যান্যদের মত আগুরিয়াদেরও একটা বক্স ছিল এবং উদ্বোধনী রাত্রে তারা সেখানে উপস্থিত থাকত। সারা দিন কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও স্পেনীয়দের সব কাজে বিলম্ব করার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী প্রথম অঙ্কের শেষাশেষি গিয়ে অপেরায় পৌঁছালো পেড্রো-দম্পতি। ইণ্টারভ্যালের সময় সোলেদাদের বাবা কাউণ্ট অফ আকাবা গোলন্দাজ বাহিনীর এক তরুণ অফিসারকে নিয়ে তাদের বক্সে এলেন। ডন পেড্রো আগে কখনও এই অফিসারকে দেখেনি। কিন্তু সোলেদাদ তাকে ভাল করেই চেনে বলে বোঝা গেল। কাউণ্ট বললেন, "এই যে পিপি আলভারেজ। সম্প্রতি কিউবা থেকে ফিরেছে এবং আমিই ওকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জোর করে ধরে এনেছি।"

: সোলেদাদ হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। তার পর নবাগতকে পরিচয় করিয়ে দিল স্বামীর সঙ্গে, "কারমোনার এটর্নীর ছেলে পিপি। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করতাম।" কারমোনা সেভিলের কাছেই একটা ছোট সহর এবং এখানকার পাওনাদারদের তাড়নায় কাউণ্ট সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যে সম্পত্তি তিনি উড়িয়েছিলেন, তার মধ্যে শুধু সেই বাড়ীটাই তার তখনও টিকে ছিল। ডন পেড্রোর অনুগ্রহে তিনি তখন সেভিলে বাস করছিলেন। কিন্তু ডন পেড্রো তাকে পছন্দ করতেন না এবং নতুন অফিসারের দিকে অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে তিনি মাথা নোয়ালেন। অনুমানে বুঝলেন যে তাঁর বাবা, এই এটর্নী এবং কাউণ্ট এই তিনজন মিলে এমন সব লেন-দেনে জড়িত ছিলেন যাতে মোটেই সুনাম বাড়ে না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজের বক্স ছেড়ে উল্টো দিকের বক্সে বসা তার আত্মীয়া ডাচেস অফ সাণ্টাগুয়াডের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। কয়েক দিন বাদে পিপির সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হল ক্লাবে এবং সেখানে দু'জনের মধ্যে আলাপও হল কিছুক্ষণ। বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখলেন যে পিপি বেশ

আমুদে লোক। কিউবা অভিযানের সাফল্যে সে মাতোয়ারা এবং সরস ভাবে সেই সব কাহিনীই শোনায়।

: ইষ্টারের পর ছয় সপ্তাহের বিরাট মেলাই হচ্ছে সেভিলের সব চেয়ে আনন্দমুখর সময়। দুনিয়ার লোক তখন একের পর এক উৎসবে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবে মত্ত হয়। সৎ প্রকৃতি এবং উঁচু মন পিপির তখন দারুণ খাতির এবং আগুরিয়াদের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। ডন পেড্রো দেখলেন পিপি সোলেদাদের মনে স্ফূর্তি জাগায়। পিপির সাক্ষাতে সে আরও লাস্যময়ী হয়ে ওঠে। তার কলহাস্য পেড্রোকে আনন্দ দেয় বটে তবে এ হাসি আগে তিনি কদাচিৎ শুনেছেন। অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মত মেলায় ডন পেড্রোরও একটা অস্থায়ী শিবির ছিল। সেখানে সারা-রাত্রি নাচ-গান খানাপিনা হত। পিপি ছিল সমস্ত পার্টির প্রাণ।

: এক রাত্রে ডন পেড্রো ডাচেস অফ সাণ্টাগুয়াডরের সঙ্গে দ্বৈত নৃত্য নাচবার সময় দেখতে পেলেন সোলেদাদ পিপি আলভারেজের সঙ্গে নাচতে নাচতে তাদের অতিক্রম করে গেল। ডাচেস বললেন, "আজ সন্ধ্যায় সোলেদাদকে অপরূপ দেখাচ্ছে।"

"এবং খুশীও বটে।"—পেড্রো যোগ করলেন।

"একথা কি সত্যি যে পিপির সঙ্গে ওর বিয়ের পাকা দেখা হয়েছিল ?"

"উঁহু।"—পেড্রো জবাব দিলেন।

: কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি চমকে উঠলেন। তিনি জানতেন, সোলেদাদ এবং পিপি ছেলেবেলায় খেলার সাথী ছিল কিন্তু একথা তাঁর মনে হয়নি যে দু'জনের মধ্যে আরও কিছু ঘটে থাকতে পারে। কাউণ্ট অফ আকাবা ইতর হলেও ভদ্রবংশের সন্তান। তিনি যে মফঃস্বলের কোন এটর্নীর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন একথা ভাবাই যায় না। বাড়ী ফিরে পেড্রো স্ত্রীর কাছে গিয়ে ডাচেসের সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা প্রকাশ করলেন।

"কিন্তু পিপির সঙ্গে সত্যিই আমার বিয়ের পাকা দেখা হয়েছিল।"—বলল সোলেদাদ।

"সে কথা আমায় কখনও বলোনি কেন ?"

"সে সব কবে ধুয়ে-মুছে গেছে। ও গেল কিউবায়। আবার ওর দেখা পাব সে আশা ছিল না।"

"তোমাদের সেই পাকা দেখার কথা অনেক লোকই জানে নিশ্চয়ই ?"

"তা তো বটেই। তাতে আর হয়েছে কি !"

"অনেক কিছু। ও ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে তোমার পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে তোলা উচিত হয়নি।"

"অর্থাৎ আমায় তুমি বিশ্বাস করোনা।"

"মোটেই তা নয়। তোমার উপর পুরো বিশ্বাস রাখি। তা সত্ত্বেও আমি চাই যে তুমি ওকে এড়িয়ে চল।"

"যদি রাজি না হই ?"

"তাহলে আমি তাকে খুন করব।"

: তারা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার পর পেড্রোর সামনে মাথা হেঁট করে সোলেদাদ চলে গেল নিজের কামরায়। পেড্রোর বুক দিয়ে ফেটে পড়ল একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস। ভাবতে লাগলেন সোলেদাদ কি এখনও পিপিকে ভালবাসে এবং সেই জন্যই কি তাঁকে ভালবাসতে পারেনি ? কিন্তু তিনি হীন ঈর্ষার শিকার হতে চান না। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেন। না : সেখানে গোলন্দাজ বাহিনীর তরুণ অফিসারটির জন্য এতটুকু ঘৃণা জমে নি। বরং তিনি তাকে পছন্দই করেন। এটা তো প্রেম ঘৃণার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন মান-মর্যাদার।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে তিনি ক্লাবে ঢুকতেই হঠাৎ সবাই চুপ হয়ে গেল এবং যারা সেখানে বসে গল্প করছিল তারা অদ্ভুত ভাবে তার দিকে কটাক্ষপাত করছিল। তাহলে কি তাকে নিয়েই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী চলছিল ? কথাটা মনে হতেই তিনি কেঁপে উঠলেন।

: মেলা শেষের দিন এগিয়ে আসছিল। ঠিক ছিল মেলা শেষ হলেই আগুরিয়ারা করডোভায় যাবে। সেখানে ডন পেড্রোর একটা সম্পত্তি ছিল এবং সেই সম্পত্তি মাঝে মাঝে দেখাশোনার প্রয়োজন হত। সেভিলের হৈ-হুল্লোড়ের পর ডন পেড্রো গ্রাম্য জীবনের প্রশান্তি কামনা করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে পিপি সম্পর্কীয় আলোচনার পর দিন সোলেদাদ শরীর খারাপ বলে বাড়ীর বার হল না। পরের দিনও তাই। ডন পেড্রো সকালে-বিকালে স্ত্রীর কামরায় গিয়ে তার সঙ্গে আজে-বাজে কথা কয়ে সময় কাটালেন। কিন্তু তৃতীয় দিন পেড্রোর আত্মীয়া কনচিটা ডি সাণ্টাগুয়াডর এক বলনাচের আয়োজন করলেন। বছরের আমোদ-প্রমোদের শেষ দিন। কাজেই সকলেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে সেখানে। সোলেদাদ বলল, তার শরীর খারাপ এবং সে বলনাচের আসরে যেতে পারবে না।

"সেদিন রাত্রে যা বলেছিলাম তাই শুনেই কি যেতে অনিচ্ছা ?" প্রশ্ন করলেন ডন পেড্রো।

"তুমি যা বলেছ ভেবে দেখেছি। তোমার আদেশ অযৌক্তিক কিন্তু আমি তা মেনে চলব। পিপির সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদের একমাত্র পথ হচ্ছে যেখানে যেখানে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে সেখানে সেখানে না যাওয়া। তাই বোধ হয় ভাল।"

: তার কমনীয় মুখের উপর দিয়ে একটা বেদনার তরঙ্গ বয়ে গেল।

"তুমি কি এখনও ওকে ভালবাস ?"

"বাসি।"

: মনস্তাপে একেবারে শীতল হয়ে গেলেন ডন পেড্রো।

"তাহলে আমায় বিয়ে করলে কেন ?"

"পিপি কিউবায় চলে গেল। কবে ফিরবে কেউ জানত না। আদৌ ফেরে কিনা তাও ছিল সন্দেহ। বাবা তোমায় বিয়ে করতে বললেন।"

"তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই কি ?"

"তার চেয়েও খারাপ কিছু থেকে বাঁচাবার জন্য।"

"তোমার জন্য আমি দুঃখ বোধ করি।"

"তুমি আমায় অনেক অনুগ্রহ করেছ। আমিও আমার সব শক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাই তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

"পিপি কি ভালবাসে তোমায় ?"

: মাথা নেড়ে বিষাদের হাসি হাসল সে।

"পুরুষের ব্যাপারই আলাদা। পিপি বয়সে তরুণ। হাসি-খুশীতে সে এত বেশী মশগুল যে কাউকে বেশীদিন ভালবাসতে পারে না। নাঃ তার কাছে আমি নিছক একজন বান্ধবী যার সঙ্গে সে ছেলেবেলায় খেলাধূলো এবং কৈশোরে প্রেমালাপ করেছে। আমার প্রতি তার এক কালের ভালবাসা নিয়ে এখন সে হাসাহাসিও করতে পারে।"

: পেড্রো তার হাত চেপে ধরলেন এবং তার উপর চুমু খেয়ে বিদায় নিলেন। বলনাচের আসরে গেলেন একা। সোলেদাদের অসুস্থতার সংবাদে তার বন্ধুরা দুঃখিত হলেন। যথাযোগ্য সহানুভূতি জানিয়ে তারা মেতে উঠলেন সন্ধ্যার আনন্দ-উৎসবে। ডন পেড্রো তাস খেলার ঘরে ঢুকে এক টেবলের সামনে একটা খালি আসনে বসে জুয়া খেলে কপাল জোরে মোটা টাকা পিটে ফেললেন।

: এক খেলোয়াড় হাসতে হাসতে জানতে চাইল, এই সন্ধ্যায় সোলেদাদ কোথায় ? ডন পেড্রো দেখলেন আরও একজন উৎসুক ভাবে তার দিকে কটাক্ষপাত করছে কিন্তু তিনি হেসে জবাব দিলেন যে, সোলেদাদ নিরাপদে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার পর একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটল। কয়েক জন যুবক কামরায় ঢুকে গোলন্দাজ বাহিনীর এক অফিসারকে ডেকে প্রশ্ন করল, পিপি কোথায় ?

"এখানে নেই ?" —বললে অফিসারটি।

"না।"

: একটা অস্বাভাবিক মৌন নেমে এলো কামরার মধ্যে। মনের ভাব যাতে মুখে না প্রকাশ পায় সেজন্য ডন পেড্রো তার সমস্ত আত্মসংযম সংহত করলেন। এই চিন্তাই তার মনকে আচ্ছন্ন করল যে পিপি আছে সোলেদাদের কাছে এবং টেবলের অন্যান্য লোকেরাও তাই সন্দেহ করেছে। ওঃ, কি লজ্জা! কি অপমান! অন্যায় তিনি করবেন না। খেলা ভাঙার পর তিনি বলনাচের আসরে ফিরে এলেন। আত্মীয়ার কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে তো কথাই হল না। এস পাশের কামরায় একটু বসা যাক।"

"যাতে তুমি খুশী হও।"

: কামরাটা খালি ছিল।

"পিপি আলভারেজ কোথায় আছে আজ রাতে ?"—কথায় কথায় নিস্পৃহ ভাবে প্রশ্ন করলেন পেড্রো।

"বলতে পারি না।"

"তোমরা কি তাকে আশা করোনি ?"

"তা অবশ্য করেছিলাম।"

: সেও হাসছিল পেড্রোর মত কিন্তু পেড্রো দেখলেন সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। পেড্রো নিস্পৃহতার মুখোস খুলে ফেললেন এবং কামরায় আর কেউ না থাকা সত্ত্বেও গলা নামিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

"কনচিটা, দয়া করে সত্যি কথাটা বল। ওরা কি বলাবলি করছে যে পিপি সোলেদাদের প্রেমিক ?"

"পেড্রো, এ কি অবিশ্বাস্য প্রশ্ন তোমার ?"

: কিন্তু পেড্রো তার চোখে ত্রাস এবং মুখের উপর হাতের আকস্মিক সহজাত বিক্ষেপ দেখেছেন।

"উত্তর পেয়েছি।"

: তিনি উঠে বিদায় নিলেন। বাড়ী গিয়ে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রীর কামরায় আলো জ্বলছে। উপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোন জবাব নেই। দরজায় করাঘাত চলতে লাগল। বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখলেন, যে সুচী কাজটায় সোলেদাদ অনেক সময় ব্যয় করেছে, এত রাত্রেও সেইটা নিয়েই বসেছে সে।

"এত রাত্তিরে বসে কাজ করছ কেন?"

"ঘুমও হল না, পড়াও হল না। তাই ভাবলাম কাজ করলে মনটা ছাড়া পাবে।"

: পেড্রো বসলেন না।

"সোলেদাদ, তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি। শুনে ব্যথা পাবে। সাহস সঞ্চয় করো। পিপি আজ রাত্রে কনচিটার আসরে যায় নি।"

"তাতে আমার কি?"

"দুর্ভাগ্যের বিষয় তুমিও আজ সেখানে যাওনি। বলনাচের আসরে সবাই ভেবেছে তোমরা একত্রে ছিলে।"

"অসম্ভব।"

"আমি জানি, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। তুমি নিজেই গেট খুলে তাকে বার করে দিয়ে থাকতে পার অথবা সকলের অলক্ষ্যে তুমিও বেরিয়ে যেতে পার।"

"কিন্তু তুমি কি তা বিশ্বাস কর?"

"না। তোমার মত আমিও বলি এটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু পিপি ছিল কোথায়?"

"আমি কি জানি, আর কি করেই বা জানব?"

"এটা ভারী আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে বছরের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টিতে সে এলো না।

সোলেদাদ এক মিনিট নীরব রইল।

"তোমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধে আলাপ হবার পর সেই রাত্রেই আমি তাকে লিখে জানিয়েছিলাম যে এই অবস্থায় ভবিষ্যতে আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। যে কারণে আমি বলনাচের আসরে যাইনি, সেই কারণেই হয়ত সেও যায়নি।"

: কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইল তারা। পেড্রো মাটির দিকে তাকালেন কিন্তু অনুভব করলেন যে তার চোখ দুটো নিজের উপরই নিবদ্ধ। আগেই বলা উচিত ছিল, ডন পেড্রোর একটা গুণ তাকে তার সঙ্গীদের চেয়ে উঁচু আসনে বসিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোষও ছিল একটা। এ্যাণ্ডালুসিয়ায় বন্দুক চালনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সে কথা সকলেই জানত এবং একমাত্র সাহসী লোক ছাড়া কেউ তাকে চটাতে সাহস পেত না। কয়েকদিন আগে সেভিলের বাইরে গুয়াডালকুইভারের তীরে টাবলাডায় পায়রা শিকারের প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং ডন পেড্রো তাতে সকলকে হারিয়ে দেন। অন্যদিকে লক্ষ্যভেদের ক্ষেত্রে পিপি মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। সকলেই তাকে দুয়ো দিয়েছিল। তরুণ গোলন্দাজ অফিসারটি সেটা কৌতুকের মনোভাবেই গ্রহণ করে। সে বলে যে তার অস্ত্র হচ্ছে কামান।

: সোলেদাদ প্রশ্ন করল "কি করবে তুমি?"

"তুমি জান, আমি কেবল একটি কাজই করতে পারি।"

: সোলেদাদ বুঝল। কিন্তু সে তাঁর কথাটাকে তরল করে তুলতে চেষ্টা করল।

"তুমি বড় ছেলে মানুষ। আমরা তো আর ষোড়শ শতাব্দীতে বাস করছি না।"

"জানি। সেই জন্যই তোমার কাছে বলতে এসেছি যে পিপিকে যদি আমি চ্যালেঞ্জ করি তাহলে খুন করব। কিন্তু আমি তা চাই না। যদি সে তার কমিশন ত্যাগ করে স্পেন থেকে বিদায় নেয় তাহলে আমি কিছু করব না।"

"তা সে করবে কেমন করে? যাবেই বা কোথায়?"

"দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্য ফেরাতে পারে।"

"তুমি কি চাও যে আমি গিয়ে তার কাছে একথা বলি?"

"যদি তুমি তাকে ভালোবাস।"

"আমি তাকে এত ভালবাসি যে কাপুরুষের মত পলায়নের পরামর্শ দিতে পারব না। অসম্মানের জীবন সে সইবে কেমন করে?"

: ডন পেড্রো হাসলেন।

"কারমোনার এটর্নীর ছেলে পিপি আলভারেজ মান-সম্মান দিয়ে করবে কি?"

: সোলেদাদ জবাব দিল না কিন্তু পেড্রো দেখল, স্বামীর প্রতি কি তীব্র ঘৃণা জমে উঠেছে তার চোখে। সেই দৃষ্টি পেড্রোর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। কারণ সে আগের মতই উগ্র আবেগে সোলেদাদকে ভালবাসত।

: পর দিন পেড্রো ক্লাবে গিয়ে একদল লোকের সঙ্গে জানলার ধারে বসে বাইরের লোকজনের চলাফেরা দেখতে লাগল। পিপিও ছিল সেখানে। বিগত নৈশ পার্টির গাল-গল্প চলছিল নিজেদের মধ্যে।

: একজন প্রশ্ন করল, "পিপি কোথায় ছিলে হে কাল?"

"মার শরীর খারাপ। তাই কারমোনায় যেতে হয়েছিল।" জবাব দিল পিপি, "আমি ভয়ানক দুঃখিত কিন্তু সম্ভবত না এসে ভালই হয়েছে। ডন পেড্রোর দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনলাম কাল আপনার কপাল খুলে গিয়েছিল এবং সকলের টাকা জিতে নিয়েছেন?"

"আমাদের কবে প্রতিশোধ নিতে দেবে হে পেড্রিটো?" প্রশ্ন করল আর একজন।

"সেজন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়।" জবাব দিলেন পেড্রো, "আমি করডোভায় যাচ্ছি। আমার এটর্নী আমার কতুর করে ছাড়ল। জানি সব এটর্নীই চোর তবু বোকার মত ভেবেছিলাম এই লোকটা বোধ হয় সৎ।"

: মনে হল তিনি খুব হাল্কা ভাবে কথা বলছেন এবং ঠিক তেমনি হালকা ভাবে পিপি তার কথার প্রতিবাদ করল।

"আমার মনে হয় আপনি বাড়িয়ে বলছেন, পেড্রিটো। ভুলবেন না, আমার বাবাও এটর্নী এবং তিনি অন্তত সৎ।"

"আমি এক মিনিটের জন্যও সে কথা বিশ্বাস করি না।" ডন

পেড্রো হাসলেন, "আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আপনার বাবাও মস্ত চোর।"

: এই অপমান এত অপ্রত্যাশিত ও অকারণ যে মুহূর্তের জন্ত পিপি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল। অন্তরাও হঠাৎ হতচকিত এবং গম্ভীর হয়ে উঠল।

"এ কথার অর্থ কি, পেড্রিটো ?"

"যা বলেছি ঠিক তাই।"

"মিথ্যা কথা এবং আপনি নিজেও জানেন যে ও কথা মিথ্যা। আপনি এক্ষুনি আপনার উক্তি প্রত্যাহার করুন।"

: ডন পেড্রো হাসল।

"কিছুতেই প্রত্যাহার করব না। আপনার বাবা চোর এবং বদমায়েস।"

: যা করবার তাই করল পিপি। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খোলা হাতেই ডন পেড্রোর মুখে আঘাত করল। পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। পর দিন পর্তুগাল সীমান্তে সাক্ষাৎ হল দু'টি মানুষের। এটর্নীর ছেলে পিপি আলভারেজ বুকে বুলেট নিয়ে ভদ্রলোকের মত মারা গেল।

এমন একটা আকস্মিকতার ভঙ্গি নিয়ে গল্পটা শেষ করলেন ভদ্রলোক যে প্রথমে আমি ব্যাপারটা অনুধাবনই করতে পারিনি। যখন করলাম তখন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছি।

বললাম : বর্বর কাণ্ড। এ একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন। আমার বন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

: আপনি বোকার মত কথা বলছেন বন্ধু। সে অবস্থায় যা করা চলত, ডন পেড্রো তাই করেছিল।

পর দিন সেভিল ছেড়ে এলাম। যিনি উপরের অদ্ভুত কাহিনীটা শুনিয়েছিলেন, আজও পর্যন্ত তার নামটা আবিষ্কার করতে পারিনি। অনেকবার আমার মনে হয়েছে, তাঁর বাড়ীতে শ্বেত অলকগুচ্ছ এবং পাণ্ডুর মুখ যে ভদ্র মহিলাকে দেখেছিলাম তিনিই হয়ত অসুখী সোলেদাদ।

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ

একটি চাষীর মেয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

কিন্তু এইটুকুর বেশী গোবিন্দের খবর আর কিছুই সে বলতে পারে না।

হাঙ্গামা হয়েছে, ধড়পাকড় চলেছে, অনেকের সঙ্গে গোবিন্দও জেলে গেছে, এর বেশী আর কোন খবর তার নাকি জানা নেই !

দিব্যি চেহারা। ফর্সা রং, ডাগর চোখ, শান্ত-সৌম্য মুখ। গেঁয়ো ধরণে কদম-ছাঁটা চুল, গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই, কিন্তু খালি গায়ে চাপানো সহরের ভদ্র ছাঁটের পাঞ্জাবী।

পাঞ্জাবীর পাতলা কাপড়ের তলায় মোটা পৈতেটা চোখে পড়ে।

গিরি কোমর বেঁধে জেরা সুরু করে দেয়। বলে, আপনি কেমনধারা মানুষ বাবু ? ঘরে বয়ে এসে খবর দিলেন ধরে নিয়েছে, আর কিছু জানেন না ! নামটা শুনি ? কোন্ গাঁয়ে ঘর ?

সে একটু হেসে বলে, নাম শুনে কি করবে বল ? আমার নাম প্রমথ ভট্টাচার্য্য—বাড়ী তোমাদের পাশের গাঁয়ে—নওপাড়ায়। কত কাদা ঠেলে হেঁটে এসেছি দেখছ না ?

সত্যিই তার প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। গিরি যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। মানুষটা এসে যে দাওয়ার সামনে উঠানের কাদায় দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে সেটা যেন তার খেয়াল হয়।

কাদা ঠেলে হেঁটে গিয়ে গোলোকের বাইরের ইঁদারা থেকে ঘড়া ভরে খাবার জল এনেছিল, তাড়াতাড়ি সেই ঘড়া এনে সে বলে, দাওয়ায় উঠে আসেন ঠাকুর মশায়—পা ধুইয়ে দেব।

প্রমথ বিব্রত ভাবে বলে, কেন বাছা এ সব সুরু করছ ? খবরটা শুধু জানাতে এসেছিলাম, আমি এবার বিদায় নেব।

গিরি বলে, তা কি হয় ঠাকুর মশায় ? বাড়ী বয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবেন ? পা ধুইয়ে দিই, দাওয়ায় উঠে বসুন।

প্রমথ একটু হেঁকে বলে, কি লাভ হবে বল ত ? ঘড়ার জলটুকু শুধু নষ্ট হবে। আবার কাদায় পা ডুবিয়েই তো ফিরে যেতে হবে আমার ? তার চেয়ে পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসছি—কি বলার আছে বল।

পাঞ্জাবীটা উঁচু করে প্রমথ খাঁজকাটা ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে। গিরি গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে।

প্রমথ বলে, নাম-ধাম তো বললাম—চুপ করে আছ কেন ?

গিরি হাঁড়িমুখে বলে, এ কি তামাসা ? এ ধাঁধাঁর মানে তো বুঝিনে মোরা। গোবিন্দকে ধরেছে বলতে এলেন এত পথ কাদা ঠেলে, আর কিছুই জানা নেই ! কেন ধরল, কোথায় ধরল, কি বিত্তান্ত—

প্রমথ ধীরে ধীরে বলে, ধাঁধাঁ কিছুই নয়। তিন চার হাত ঘুরে খবরটা আমার কাছে পৌঁছেচে—কারখানায় হাঙ্গামা হয়েছে এর বেশী ব্যাপার আমিও কিছুই জানি না। আমায় শুধু বলা হয়েছে তোমাদের খবর দিতে যে, গোবিন্দ নামে এক জন লোক আটক হয়েছে।

প্রমথ একটু হাসে। ব্যাপার কিছুই জানি না বুঝি না বলেই তো কাদা ঠেলে নিজেকে আসতে হল ? নইলে অন্ত কাউকে পাঠিয়ে দিতাম। কি ব্যাপার কে জানে, বেশী জানাজানি হয়ে দরকার নেই ভেবে আমি নিজেই এলাম।

: খবর দিয়েছে কে ? আপনার কেন এত গরজ খবর দেবার ?

: আমায় যে বলেছে, তাকে তুমি চিনবে না বাছা ! তাকেও আবার দায়টা দিয়েছে আরেক জন। এত গোলমেলে ঠেকছে কেন ব্যাপারটা ?

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে প্রমথ এক টুকরো কাগজ বার করে বলে, ক'হাত ঘুরে কাগজটা আমার কাছে এসে ঠেকেছে। এতে শুধু লেখা যে গোবরহাটার গোবর্দ্ধন মালিকের বাড়ীতে রেবতী দাসীকে জানাতে হবে, গোবিন্দ আটক হয়েছে। তোমাদের মধ্যে রেবতী কে বাছা ?

রেবতীর দিকে চেয়ে গিরি বলে, এ মেয়েটার সাথে গোবিন্দের বিয়ে হবে ঠিক ছিল।

প্রমথ বলে, অ। তাই খবরটা জানানো এমন জরুরী বলা হয়েছে !

প্রমথ চলে গেলে গিরি রেগে নাক সিঁটকে বলে, সব বজ্জাতি বুদ্ধি। এ্যাতকাল ধরে নি, কুথাও কিছু নেই, বিয়ের দু'দিন আগে ধরে নিয়ে জেলে পুরেছে। পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কম্মো নেই, ঠিক বিয়ার আগে ওকে ধরার-জন্ম ওৎ পেতে ছিল। হাড়ে হাড়ে চালাকি !

আবার বলে, ধরেছে কিনা ভগমান জানে। চাদ্দিকে ধরপাকড়, একটা খবর দিলেই হল—মোকেও পাকড়েছে গো, বিয়ে হবে না কো, মোর কোন ঘাট নেই। তুই তো রইলি হাতের পাঁচ, ওদিকে কোথা ফুর্তি করছে।

রেবতী ঠোঁট উল্টে বলে, আহা, যেন ধরতে পারে না কো। কারখানায় গোলমাল চলছে বলছিল না ?

বলতে বলতে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বলে, টের পেয়েছি ব্যাপার। ফুর্তিতে মন চন-চন করছিল—কি করি করি। দু'চারটে স্যাঙাতকে বলতে গিয়েছিল ব্যাপার, বান ডিঙিয়ে বিয়েতে আসতে হবে। গিয়ে ফুর্তির চোটে এগিয়ে গেছে হাঙ্গামার ব্যাপারে, হিসেব নিকেশ বাদ পড়েছে—ওমনি ধরেছে খপ করে।

গিরি বলে, ও বাবা ! বিয়ে গেল বাতিল হয়ে তবু তুই দেখি ভাবের ঘোরে গদ গদ !

রেবতী মুখ বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বলে, না গো মামী, ভাগ্নীটা তোর বড্ড বোকা মেয়ে। একেবারে হাড় চাষাড়ে বোকা। একবার কি খেয়াল হল জিগ্গেস করি কলে কাজ কি করে, কি জন্মে গণ্ডগোল ? কে জানে, মরেও গিয়ে থাকতে পারে।

না, রেবতীর বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই। তাকে পাওয়ার জন্ম যে পাগল, তার মামা-মামীরা বন্যার মধ্যেও জোর করে বিয়েটা ঘটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করায় হাতে যে স্বর্গ পেয়েছে—সে কখনো স্বেচ্ছায় এ-রকম করে ?

আপশোষে ফেটে যেতে চায় রেবতীর বুক। কিসের কল, কলে তার কি খাটুনি, কি নিয়ে কেন হাঙ্গামা এসব যদি খুঁটিয়ে জেনে রাখত, যদি একবার খেয়াল হত যে হঠাৎ হাতে স্বর্গ পাওয়ার উত্তেজনায় মানুষটা হয় তো দু'টো দিন সবুর করার কথা ভুলে গিয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে পারে, আজ কি এমন অন্ধকারে হাতড়াতে হতভাগ্যের এই অদ্ভুত খেলার মানে বোঝার জন্ম !

হয়ত সে সাবধান করেও দিতে পারত, সামলে নিতে পারত গোবিন্দকে।

শরীরটা খারাপ ছিল গিরির। গভীর রাত্রে গোবর্দ্ধন ডাকতে এলে এমন ভাবে খ্যাকখেঁকিয়ে উঠে তাকে খেদিয়ে দেয় যে, মামার জন্ম মমতা বোধ করে রেবতী।

গিরি ছটফট করতে থাকলে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে নিজের আপশোষের কথাগুলি জানায়।

গিরি তাকে আদর করে চুমো খেয়ে বলে, আঃ, মরণ তোর ! কলে-খাটা মানুষকে চিনলি নে ? কত ভাবছে তোর জন্মে, বিয়ে হয়েছে কি না হয়েছে তার জন্মে ! কলের কাজ, গুরু-পুরুত মানতে পারে না, বার-ক্ষণ মানতে পারে না—কলে-খাটার অহঙ্কারে ফেটে পড়ে যায়। মোর এক ভাই কলে খাটত জানিস ? মায়ের পেটের ভাই !

: মায়ের পেটের ভাই ? কলে খাটত ?

: তবে কি ? সবাই হৈ-চৈ করে বারণ করেছিল, কারো কথা শোনে নি। তার শুধু এক কথা—পরের ক্ষেতে কেন খাটব, কলে খেটে মজুর হব। সংসারটা সামলেছিল দু'বছর। কিন্তু হলে কি হবে, চাষার ছেলে তো, বেনিয়মের কল তো ? বাপ দাদা গুরু-ঠাকুর কারো কথা শুনলে না, কোন নিয়ম মানলে না, তিনটে বছর জিদ চালিয়ে ঘরে ফিরল, তিন মাস রক্ত-বমি করে শেষ হয়ে গেল—যাঃ।

অনেকক্ষণ গিরির আলিঙ্গনে চুপ করে থেকে রেবতী ধীরে ধীরে ডাকে, মামী ঘুমিয়েছিস্ নাকি ?

গিরি বলে, পোড়া চোখে ঘুম কি আছে রে ?

রেবতী মিষ্টি সুরে বলে, যা না মামী মামার কাছে—মামা এমন করে সেধে গেল ?

গিরি তার গালে চিমটি কেটে চুমো খেয়ে বলে, তুই সত্যিকারের চাষীর মেয়ে নোস্। মামা তোর জেগে আছে ভাবছিস ?

একটা কথা খেয়াল করে নিজেকে বড়ই বোকা-হাবা মনে হয় রেবতীর। গিরি শুধু এলোমেলো জেরাই করে গেল প্রমথকে, গোবিন্দের খবর সে আর কিছুই কেন জানে না, তার অজুহাতটাই শুধু জানা গেল। খেয়াল করে সে যদি আরও বিস্তারিত খবর জানিয়ে দেবার জন্ম প্রমথকে অনুরোধ করত !

যে ভাবেই হোক, তার মারফতেই গোবিন্দের সংবাদটা এসেছে—ওভাবে অন্যান্য খবর জানিয়ে সে অনায়াসেই দিতে পারে নিশ্চয় !

মামা মামীকে বলতে লজ্জা করে।

নওপাড়া বেশী দূরে নয়। নিজেই সে চলে যাবে এক ফাঁকে ! একা যাওয়া অবশ্য উচিত হবে না তার পক্ষে, এত ভাব জমে থাকলেও গিরিই হয় তো তাকে ঝাঁটা-পেটা করবে—কিন্তু অত ভাবলে কি তার চলবে, এত ভয় করলে ? বাইরে চোখ পেতে রেখে রেবতী ভাবে, নানা চিন্তা তোলপাড় করে তার মনে।

মামাবাড়ী এসে নওপাড়ার মেলায় কয়েক বার গিয়েছে, পথ চিনে গাঁয়ে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে খুঁজে বার করতে হবে প্রমথের বাড়ী।

বাইরে চোখ পেতে দাওয়ার খুঁটি ধরে রেবতী দাঁড়িয়ে থাকে, গিরি টেরও পায় না তার মনে কি দুঃসাহসিক চিন্তায় তোলপাড় চলেছে।

তখন নদীর দিক থেকে ছেলে-কোলে এলোকেশীকে আসতে দেখা যায়। বন্যা নামার ক'দিন আগে কঠিন রোগ হয়ে ক্ষণিকে

সদরের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল—সঙ্গে গিয়েছিল এলোকেশী। বাড়ীতে আছে শুধু বুড়ী শাশুড়ী।

ছেলে কোলে সে একলা ফিরছে!

রেবতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করে, খবর কি বোন?

এলোকেশী বলে, খবর জানতেই তো এলাম গো! ঢলে গাঁ ভেসে গেছে শুনলাম—তা করব কি? আসবার তো উপায় ছিল না কো—সাঁতার কেটে আসতে হত। জল কমেছে খবর পেয়ে দেখতে এলাম শাউড়ী মাগী বেঁচে আছে না ভেসে গেছে।

: একলা এলে? সোয়ামী কেমন আছে?

: হাসপাতালে আছে। ছাড়া পেতে দেরী আছে, তবে বেঁচে যাবে এ যাত্রা। ভাগ্যি খগেন বাবু ছিল, নয় তো ঠাঁই মিলতো না হাসপাতালে। দেবতার মত মানুষটা।

কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে আসে এলোকেশীর।

রেবতী ভাবে, সদরে কুটুমবাড়ী থেকে এলোকেশী একলা গাঁয়ে এল শাশুড়ীর খবর নিতে, আর বিশেষ দরকারে পাশের গাঁ থেকে একবার ঘুরে আসতে তার এত ভয় ভাবনা? রেবতী আর ঘরেও ঢোকে না, সোজা রওনা দেয় নওপাড়ার দিকে।

বেশী মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, পুরুষকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় না, দু'বার পথ চলতি দু'জন মেয়েছেলের কাছে খোঁজ করেই রেবতী প্রমথের বাড়ীর হদিস পেয়ে যায়।

খড়ের চালার বড় বড় বাড়ী। প্রমথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, রেবতী প্রণাম করতে সে একটু আশ্চর্য্য হয়েই তার দিকে তাকায়।

এখন তার বেশ অন্য রকম। পরনে থান-ধুতি, কাঁধে উড়ানি, টিকিতে ফুল বাঁধা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে পূজার ফুল-পাতার পাত্র।

রেবতীও তার বেশ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিন কল্পনাও করা যায় নি যে প্রমথ পূজারী ব্রাহ্মণ।

: আমায় চিনলেন না? কাল যে খবর দিতে গেছলেন গোবরহাটায়—

: চিনেছি—চিনেছি। কি ব্যাপার বল তো?

মাথা নীচু করে রেখে লজ্জায় জড়িয়ে জড়িয়ে রেবতী বলে, যার খবর দিয়েছিলেন, তার অন্য খবরগুলি জানিয়ে দিন—

প্রমথ হেসে বলে, বটে! তোমার বাপের নাম কি গা বাছা? গোবর্দ্ধন তোমার কে হয়?

রেবতী নিজের পরিচয় দেয়, সলাজ ভাবে বলে, ওই যে সাপে-কাটা এক জনকে বাঁচিয়ে ছিল একটা মেয়ে?—আমি সেই রেবতী।

: বটে! গোবিন্দ বুঝি সেই সাপে-কাটা মানুষ? এসো তো বোন, ঘরে এসে একটু বসে দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

পা ধুয়ে রেবতী বড় ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে, একেলে পাড়ের রঙীন শাড়ী আর সায়া-ব্লাউজ-পরা একটি বৌ রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কে গো?

প্রমথ বলে, এ আমাদের সেই রেবতী গো।

বৌটি হাসিমুখে রেবতীর বিবরণ শোনে আর রেবতী ভেবে পায় না তাকে কি করে এই পূজারী বামুনটির বৌ ভাবৰে!

গত কালের ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা লোকটির বৌ বরং ভাবা যায় কিন্তু এরকম একেলে ফ্যাসানের বেশভূষা কি করে খাপ খায় এই বেশধারী প্রমথের সঙ্গে!

রেবতীকে নৈবিদ্যের সন্দেশ কলা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই তারা জিজ্ঞাসা করে, তারপর হাসিমুখে প্রমথ বলে, পরশু নাগাদ গোবিন্দের খবর পাবে, কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। তোমাদের বিয়েতে আমায় পুরুত করতে হবে।

রেবতী একটু হাসে।

প্রমথ বলে, বাজে পুরুত ভেবো না আমায়—বি-এ পাশ পুরুত আমি।

: বি-এ পাশ!

: কি তবে? পাশ করে তিন চার বছর চেষ্টা করেও চাকরী পেলাম না, দুত্তেরি বলে দেশে এসে বাপের ব্যবসা ধরলাম। চাষবাস করে, পুরুতগিরি করে চালিয়ে দিচ্ছি।

প্রমথ হাসে, একলা ফিরে যেতে পারবে তো?

: একলাই তো এলাম।

পরশু গোবিন্দের সব খবর পাওয়া যাবে। ফিরবার সময় হাঁটতে হাঁটতে রেবতী ভাবে, কিন্তু কেন? তাকেই কেন এভাবে গোবিন্দের খবর পাবার ব্যবস্থা করতে হবে—তার কি কেউ নেই?

সাহস করে বেরিয়ে পড়ে অবশ্য ভালই হয়েছে, এলোমেলো ভয় করে চললে যে সংসারে অনেক কিছুই হয় না, এটা ভাল করে টের পেয়েছে, প্রমথদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুসীও হয়েছে।

কিন্তু এ কি রকম উদ্ভট ব্যবহার তার বাপ-দাদার? একবার তার খবর নেয় না, একটা তাকে খবরও দেয় না।

গোবিন্দের উপরেই ছিল তার বাপ-ভাইকে সব জানাবার এবং বুঝিয়ে তাদের রাজী করাবার ভার। এরকম নমো নমো করে মামা-মামী তার বিয়ে চুকিয়ে দিচ্ছে বলে কি সবাই চটে গিয়ে তার খবর নেওয়া বন্ধ করেছে?

কিন্তু এভাবে বিয়ে হওয়া যদি পছন্দ না-ই হয়, গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে দিতে যদি আপত্তিই থাকে—একবার এসে তার মামা-মামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ব্যবস্থা পাল্টে দেবার কিম্বা বিয়ে বাতিল করার চেষ্টা না করে শুধু চটেমটে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে?

গোবিন্দ কি তবে ওদের কিছু জানায় নি? পাছে ওরা গোলমাল করে, কোন রকম বাধা পড়ে, এই ভেবে চুপ করে ছিল—বিয়েটা চুকে যাবার পর জানাবে মতলব করেছিল।

কে জানে কি ব্যাপার!

ঘরে গিরি রাগ করেনি দেখে রেবতী সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

বার কয়েক মাথা নেড়ে মুখভঙ্গি করে গিরি শুধু বলে, সত্যিকারের বেহায়া ছিলি বটে তুই। সাধে কি বাপ-ভাইকে মামা-বাড়ীতে খেদিয়ে দিতে হয়!

: গাঁয়ে একটু ঘুরে এলে বেহায়া হয় নাকি?

: বকিস নে বেশী—গাঁয়ে একটু ঘুরতে গেছলেন! আমি যেন আর খবর পাইনি কোথায় গিয়েছিলি। প্রাণেশ দেখে এসে বলে যায়নি মোকে?

তাই বটে—রেবতীর খেয়ালও ছিল না যে, নওপাড়ায় তার মেসোর বাড়ী। তার মাসী পটল তুলেছে অনেক কাল, মেসো আবার বিয়ে করেছে, বহুকাল আত্মীয়তা নেই, যাতায়াত নেই।

গিরি আর কিছু বলে না। রেবতীও চুপ করে থাকে! কিন্তু কতক্ষণ আর গিরি কৌতূহল চেপে রাখবে? প্রায় নরম সুরেই সে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুরমশায় কি বলল রে?

: পরশু সব খবর জানিয়ে দেবেন। ঠাকুরমশায় বি. এ পাশ, জানো?

: কি পাশ তা কে জানে, কলকাতায় অনেক দূর পড়েছে শুনিছি। নাম শুনেই চিনেছিলাম। বাপ করত যজমানি, ছেলেকে হাকিম করার সাধ ছিল। [ক্রমশঃ।

রাত্রে

রুবি সরকার

তুমি তো ঘুমিয়ে পড়েছ এখন আমার আসে না ঘুম
শুয়ে শুয়ে একা জেগে থাকি তাই রাত্রি কি নিঝুম!
সারা দিন আজ কেটেছে কখন রাখিনি কো খোঁজ কোনো
সারা রাত আজ কি ভাবে কাটাবো সেই কথা বলি শোনো।
চাঁদের আলোয় ভরে গেছে ঘর আমার জানালা খোলা
রূপোলী নেশায় অস্থির মন চোখেতে রঙের দোলা।
মেঘের ভেলায় মন ভেসে যায় কোন দিকে জানো না কি?
তোমার স্বপ্ন আজ বুঝি মোর গভীর করেছে আঁখি।
তোমার কথাই সারা রাত ভাবি চোখে তো আসে না ঘুম
তুমি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছ রাত্রি যে নিঝুম!

এগারো

উভয়ে ট্রেনে চড়ে বস্‌লো। শহরতলীটুকু পার হতেই দু'জনে কিউবিষ্টের দৃষ্টিকোণে দৃশ্যপট বিচার সুরু করলো। ২বরৌসকী পথে যাওয়ার জন্য তিন-চার জনের উপযোগী লাঞ্চ সঙ্গে দিয়েছিল, ভাতের মণ্ড, কিছু আপেল, রুটি আর হ্যাম, হাতব্যাগ এই সব মালে ভর্তি, রোমে ওরা তিন-চার দিন থাকবে। আপাততঃ এই কথা কিন্তু কেউ ভাবছে না। ছবি সম্পর্কে ভীষণ তর্ক চলেছে, সে ছবি বিশ্ব-শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা, রেলের কামরার জানলার ফ্রেমে আঁটা, নিয়তই পরিবর্তনশীল, এই আছে এই নেই।

হারিকট রুজ বলে—"দেখো, আমাদের পথই ঠিক, এই টেলিগ্রাফের খুঁটি, ওধারকার কেবিনটা, পথের পাশে ঐ সীমানা-চিহ্ন, এক নজরেই বিষয়বস্তুর ত্রিবিধ রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত নেই, অথচ ধরণটা কিউবিষ্ট, যেন একের ভিতর চার।"

"তবে সব সময় ত' আর মানুষ ট্রেনে বসে কাটায় না!"

"সে কথা ঠিক, কিন্তু জানো ত', চিন্তা কত দ্রুত পায়ে হাঁটে?"

আমাদের ছবির চারদিকটাই আঁকতে হবে, কিউবের ছ'টা কোণ, আবার আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুও আছে।"

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

"এখন ত' সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিছুই নেই কোথাও,—সব সমতল আর সমভূম।"

"কথাটি সত্য,—কিন্তু আমরা জানি—"

"কতটুকু জানি,—যা স্বচক্ষে দেখতে পাই, প্রাকৃতিক বর্ণমণ্ডল, এই পপলার গাছ, আজকের এই রাত আর সর্বগ্রাসী ছায়া-ঢাকা প্রান্তর।"

"না, আমরা যে এই ভাবেই দেখি তার কারণ প্রাকৃতিক বর্ণমণ্ডল আমাদের এই ভাবেই দেখতে শিখিয়েছে, চোখ এইতেই অভ্যস্ত, কিন্তু আমাদের চিত্র-শিল্পীরা যখন মানুষের চোখের দৃষ্টিকে নতুন ধারায় দীক্ষিত করবে, তখন এই সব দৃশ্যপট বা বিষয়বস্তু তারা আমাদের ছবির ভেতরই দেখতে পাবে।"

"আমাদের ছবি অতীতের স্থাপত্যকলার নিদর্শনের মত হয়ে থাকবে, সেই সপ্তদশ শতাব্দীর 'রোকোকো' শিল্পের মত। আগামী বিশ বছর ছবি দেখার এই একমাত্র প্রথাই 'সত্য' হয়ে থাকবে।"

"মোদক্ক, তোমার হ'ল কি?"

"আমাদের আর্টের জন্য প্রয়োজন নিদারুণ আত্মত্যাগের, ব্যক্তিত্বও বিসর্জন দিতে হবে। মনোহর রেখায়, বিচিত্র রঙে সুন্দর ছবি আঁকার বাসনা আমারও হয়—অথচ এই কিউবের চাপে হিমসিম্ খাচ্ছি। যতই কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করি বোঝা ততই আমার ভারী ওঠে। সব বিশ্রী হয়ে যায়।"

"কিন্তু মোদক্ক, কিউবই হচ্ছে প্রকৃত ফর্ম, সার্থক ভঙ্গিমা।"

"জানো, মন তা স্বীকার করলেও আমার প্রকৃতি তা গ্রহণ করতে চায় না।"

—পিকাসো অঙ্কিত

"কি বলছ তুমি? যাঁরা শক্তিমান তাঁরা নতুন কিছু না দেখলে ত' বিচলিত হ'ন না, অবশ্য স্বকৃত নূতনত্বে চঞ্চলতা আসতে পারে। যখন ছোটো ছিলে, ভালো-মন্দের বিচার-শক্তি ছিল না, তখন কি সুন্দর বলে যা কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলে? তুমিই ত' যে সব চিত্র শিল্পী নতুনত্ব পছন্দ করেন না, তাদের সঙ্গে তুলনা করেছিলে ওপেরার বনেদি দর্শকদের সঙ্গে। তারা নাকি 'পরিচিত চঙ'-ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করেন না। তাদের ক্ষমতা থাকলে নতুন সৃষ্টি এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত। যে-সৌন্দর্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আমাদের কালের মানুষ যে সৌন্দর্যের সন্ধানে ঘুরে মরছে,—যাদের বিশ্বাস যে এই সৌন্দর্যটুকু এক দিন ধরা পড়বে—'আমাদের সকল আবিষ্কারকে একসূত্রে বেঁধে উজ্জ্বল আলোকমালায় সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করবে',—মোদক, আজ তুমিই আমাদের সেই অভিযাত্রী দলের নেতা। পুরাতন অভীপ্সাকে চাপা দাও,—প্রগতির দিকে এগিয়ে চলো—এই ট্রেনের গতির মতই দ্রুত তার গতিবেগ, যদি চমৎকার ইঞ্জিন না হ'তে পারি—অন্ততঃ রেল লাইনটাও বিছাতে পারব ত', বাঁধ তৈরী করতে পারব, খাদ থেকে কয়লা তুলতে পারব—দাও বইটা দাও।"

সেই অনাগত বিধাতা—অল্প বয়সে মৃত্যুও যদি হয় তবু সেই বিরাটত্বে মিশে যেতে হবে। তবে তুমি যা বলেছ, আমরা এখনও অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছি,—। এই নাও, বই নাও।"

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সহযাত্রীরা অনেকেই ডাইনিং কারে চলে গেছেন, বা বারন্দায় ধূমপান করতে গেছেন। শুধু একজন শীর্ণদেহ বৃদ্ধ পুরোহিত এক পাশে বসে ঢুলছেন।

হারিকট রুজ মোদককে বই পড়ে শোনায়, এই একখানি মাত্র বই ৎবরৌসকো বিক্রী করেন নি। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বইখানিও সে প্যাক্ করে দিয়েছে, বইটির নাম—*From the Great Classics to the Great Cubists.*

সেভেরিণি, গ্লেইজেস্, মেৎসিন্গার প্রভৃতির শীতল আলংকারিক বাণী এবং অ্যাপোলিনিয়োর আর সালমনের জ্বালাময়ী রচনা পাঠ করে শোনাচ্ছিল হারিকট রুজ:

"ছবিতে যদি কমলা রং না থাকে তাহলে দর্শকের চোখে শুধু কমলা রঙই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। এই নিয়মানুসারেই আমরা বল্‌বো,—অতি ধীরগতিতে এই সব নিয়ম আমরা আবিষ্কার করছি। এখনই, সত্য কথা বলতে কি, আমাদের রূপকল্পে আট থেকে দশ রকম প্রকারভেদ আনা যায়—আরো কিছু করার অর্থ অনুমান এবং আন্দাজ—সেই পন্থা কিন্তু নিয়মানুগ নয়, আইন মাফিক এবং নিয়মানুবর্তিতা……

মোদক বাধা দিয়ে বলে ওঠে—

"আইন, নিয়ম! এর মধ্যে আবার নিয়মের বিধি-নিষেধ!"

"বাঃ এ ত' হ'তেই হবে, কিউবিজম মানেই ডিসিপ্‌লিন, নিয়ম মেনেই পদে পদে চল্‌তে হবে!"

"কে তোমাকে বলেছে ডিসিপ্‌লিন আর্ট? কারো মুখ চেয়ে কি শিল্প সৃষ্টি হয়? শোনো, ওদের কথাই শোনো, যাট পাতা বীজগণিত না কষে, রঙ আর প্রতিটি কোণ ওজন না করে যারা ব্রাস ধরে ছবি আঁকতে পারে না তাদের কথাই শোনো। তার কলও দেখ: কি নিষ্প্রভ হতো! ডুরেরের আঁকা 'মেলান কোলিয়া' ছবিটার কথা মনে পড়ছে, তারা আঁকতে গিয়ে গভীর হতাশায় হাতের কম্পাস মাটিতে ফেলে দিয়েছে।"

"কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের মাধ্যমেই ত' নক্ষত্রলোকের সন্ধান পাওয়া যায়।"

"সত্যি কথা, আবার এ কথাও সত্য অঙ্কশাস্ত্র সৌন্দর্য, রসানুভূতি, স্বপ্ন, আনন্দ সব ভেঙে দেয়"—

"না, বরং অঙ্ক পথে আনন্দ বাড়িয়ে তোলে, নতুন সৌন্দর্য নতুন স্বপ্ন সৃষ্টি করে—সে স্বপ্ন আরো বিরাট, আরো ব্যাপক।"

"কিন্তু পরিমিত।—কেবল মাপ-জোক, আর হিসেব-নিকেশ, আটশো পাতার ঐ বইটিতে কেবল এই সব! যে সব মানুষের ছবি আঁকাই ধর্ম তাঁরাই ইনিয়ে-বিনিয়ে অত কথা লিখেছেন। যে পাতাই খোলো ব্রাস না দিয়ে হাতে কম্পাস তুলে দেবে। এত সব বাঁধাধরা পথ ছেড়ে আমি বরং একটু সহজাত-বুদ্ধির কদর বুঝি,—ভুল-ভ্রান্তি যাই থাক এত বিধি-নিষেধের চাইতে, এত সব যান্ত্রিক কাণ্ড-কারখানার চেয়ে সে ঢের ভালো।"

"পিকাসোর সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলার সাহস হবে তোমার?"

"পিকাসোই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এক লাইনও না লিখে, শুধু ছবি এঁকে গেছেন।"

"মোদক ছেড়ে দিলে চল্‌বে না,—তুমি-আমি সবাই শুধু বেদী গড়তে বসেছি,—কাজটায় অবশ্য তেমন খ্যাতি নেই। হাতের কম্পাস ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু এই ত' আমাদের কাজ,—সেই 'অনাগত বিধাতা'র জন্যই ত' বেদী রচনা করতে হবে,—অন্ধকারে তিনিই ত' মশাল জেলে পথের সন্ধান দেবেন।"

সেই পুরোহিত সহযাত্রীটি উজ্জ্বল চোখ মেলে সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে এই বিচিত্র আলাপ-আলোচনা শুনছিলেন।

অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন: "আপনারা রোমে যাচ্ছেন? আমিও রোমে যাচ্ছি,—এ আমার পরমানন্দ, সেণ্ট লুই ত ফ্রাঙ্কে মঁসিয়ে গুলিয়ার্ড স্বয়ং আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন। তার পর আমাকে সেণ্ট পিটারে নিয়ে যাবেন, তার পর অবশ্য পরের ট্রেনেই আমাকে ফিরতে হবে। আমার বেশী সময় হাতে নেই। তবু আমার অসীম আনন্দ, স্বয়ং মঁসিয়ে আসছেন,—আমাদের হোলি ফাদারের—"

"আপনি মুজিয়মে যাবেন না—?"

"ও সব আমার ভালো লাগে না। শুনেছি অবশ্য সেখানে দু'চারটে দেখবার জিনিষ আছে। তা, আপনারা বুঝি অভিনয় করেন?"

মোদক বলে—"আমরা শিল্পী, ছবি আঁকি।"

"আর সেই বিষয়েই এতক্ষণ আপনারা এত ভক্তি ভরে আলোচনা করেছিলেন,—এই বিশ্বাস,—মাফ করবেন, অনেকটা পৌত্তলিক পেগানদের মত। আমি ত' ভাবতেই পারি না এতখানি ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে সেই পরম পুরুষ ছাড়া আর কারো কথা চিন্তা করা যায়।···মাফ করবেন, সহযাত্রীর কথায় যেন অপরাধ নেবেন না। যদিও কৌতূহল মহাপাপ, তবু জানতে ইচ্ছা হয়—

"উদ্দেশ্য যাই হোক, বিশ্বাস বড় জিনিষ, এই বিশ্বাসের বশেই যুদ্ধ, আবিষ্কার, প্রগতি—কত কিছু ঘটছে সংসারে—। আর সংশয়, সংশয় ও সন্দেহ ত' আছেই, সে ছাড়া কোনো বড় দরের বিশ্বাসই দাঁড়াতে পারতো না—"

এই ভাবেই আলোচনা চলল, সেই প্রায়ান্ধকার ট্রেনের কামরায় মঁসিয়ে গ্যুলিয়ার্ড দর্শনার্থী এই পুরোহিত আর ব্যালে রুসের নর্তকীদের জন্ম কিছু ব্যালের ঘাঘরা আর বিখ্যাত শিল্পীর কয়েকখানি ছবি নিয়ে ওরাও চলেছে সমান উৎসাহে—সামনেই রোম—

দারিদ্র্য আর আশা নিয়ে যে অনাগত দিনের জন্ম ওরা সংগ্রাম করছে, সেই সংঘাতের অবসান হবে কি রোমে ?

আশা ও বিস্ময়ে সচকিত হয়ে, কম্পিত হৃদয়ে সকলে রোমের পথে এগিয়ে চলেছে।

বারো

ওরা যখন পৌঁছল, দিয়াঘিলেপের ফ্লোরেনটাইন ভ্যালেট বেপ্পো অভ্যর্থনা জানাবার জন্ম ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলো। ওদের কাছ থেকে সেই ব্যালের পোষাকের পুঁটলিগুলি সে আগেই সংগ্রহ করে নিয়েছে।

সূর্যের তেজ প্রচণ্ড, ক্লান্ত হলেও উভয়ের তরুণ প্রাণ আনন্দে ভরপুর।

মোদানোয় তুষার-প্লাবনের মধ্যে ওদের ঘুম ভেঙেছে, সারা সকালটা জানলার ধারে বসে কাটিয়েছে, নতুন কি দেখা যায় তারই দিকে সজাগ দৃষ্টি। মিলানে মর্মর গির্জাঘর, ও পিসায় হেলান তোরণ দেখেছে,—পিসার তোরণটা কারখানার চিমনির পটভূমিতে মাতালের মত দেখাচ্ছিল।

ইতালীর অসংখ্য ছোট ছোট ষ্টেশনগুলির একটিতে ফলের ষ্টল থেকে কিছু ফল আর 'চিয়ান্টি' মদ্য কিনেছিল, সেই লাল মদ বোতলে মুখ রেখেই নিঃশেষে পান করেছে, ওদের শিরায় শোণিতে তাই শিহরণ জেগেছে।

ষ্টেশনের সামনেই এক পুরাতন ছ্যাকরা গাড়িতে তুললো বেপ্পো—পিয়াজা দেল টারমের পথে গাড়ি চলেছে। পিয়াজা বেশ প্রকাণ্ড বাগান,—একদিকে মিউসিও দেল-টারম, অপর দিকে শাদা শাদা থামের বাহার, মধ্যে ছোট্ট ফুলের বাগান—তার ভিতর একটি ফোয়ারা, সূর্যালোকে সেই জলকণা ভেসে বেড়াচ্ছে—। রোদের উত্তাপে সবাই বেশ উত্তপ্ত। পথ, পথচারী, এমন কি গাড়ির চামড়ার সেই প্রাচীন গদিটাও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বেপ্পো ওদের সামনের আসনে বসে আছে।

"আমরা ক্যাজিওনেলের পথ ধরে যাব। রোমের এই পথটাই চমৎকার!"

পথের দুধারে বিরাট বাড়িগুলির দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে, নতুন এবং চমৎকার লাগে, সূর্যালোকে সেগুলি আরো শাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু ওরা ঠকবে না,—এই কি রোম নয়, অন্ততঃ যে রোম দেখার আশা করে ওরা এসেছে সে রোম নয়। কুইরিনাল বাগানের নীচেকার সুড়ঙ্গ পথে এসে ওরা পৌঁছল। সুড়ঙ্গ-গাত্রের শাদা এনামেলের গায়ে অসংখ্য বিজ্ঞাপনপত্র আঁটা রয়েছে, উজ্জ্বল আলোয় সেগুলি উদ্ভাসিত। গাড়িগুলি ঘণ্টা বাজিয়ে ভীষণ আওয়াজ সৃষ্টি করছে।

হারিকট-রুজ আনন্দ-মনে বলে ওঠে—"নর্ডস্যুড টানেল।"

"ঠিক আছে, এই রোমই আমার ভালো লাগে,—জীবন্ত রোম, আজকের এই জাগ্রত রোম।"

বেপ্পো বলল: "আমরা কিন্তু পুরাতন রোমের পথেই যাচ্ছি। কারণ তোমাদের কাছে দুই সমান, আমরা সোজাসুজি মঁসিয়ে দিয়াঘিলেপের ওখানে যাচ্ছি না, ক্যাসপানায় একজন চিত্রশিল্পী আছেন, তাঁর কাছে আগে যাব। লোকটা ফিউচারিষ্ট, ভবিষ্যদ্বাদী। কর্তা ওঁকে কয়েকটা সেট আঁকতে দিয়েছিলেন।

গাড়িটা একটা আঁকা-বাঁকা পথে চলছিল, পথের দু-পাশের বাড়িগুলোর রঙ সুবর্ণ-গৈরিক। পীতাভ পাথরের রঙ,—এই পাথরেই প্রাচীন শহর গড়ে উঠেছিল।

মোদক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হারিকট রুজ তাকে বলল:—

"মোদক, এই সেই তোমার প্রিয় রঙ। সব রকমই রয়েছে, দেয়ালের গায়ে সব রঙই মিশে রয়েছে, রোদ লেগে পথ-ঘাটও যেন ঐ রঙেই রঞ্জিত হয়ে আছে!"

পথটা বিচিত্র,—কোনো ফুটপাথ নেই, বাঁকের পর বাঁক নিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে গেছে। চড়াই আর উৎরাই। এধারে ওধারে ফলের দোকান। কিন্তু প্রতিটি পথের নতুন রূপ···

এক মধুর-বিস্ময়। একেবারে পথের ওপরেই এক গির্জাঘর, ফুলের মালা, কাগজের পতাকা, লাল পাথরের দেবমূর্তি ; কোথাও ফোয়ারা পথের ওপরই জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাচীন স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আর এই সব বাড়ি-ঘরের মাঝে এমনই এক বিচিত্র নীল আকাশ,—যা শুধু সুবর্ণ-গৈরিক রঙের সঙ্গেই মানায়,—।

মোদক আর হারিকট মাঝে মাঝে গাড়িতেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। রোম! ওরা রোমে এসেছে! যাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে তাদের চাইতেও অনেক বেশী অধিকার ওদের এই সব সৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখবার। কি অপ্রত্যাশিত, অথচ কি অদ্ভুত!

শহরতলীতে যেমন বস্তি দেখা যায় তেমনই এক বস্তির ধারে এসে গাড়ি থামল। বেপ্পোর পিছু পিছু ওরাও একটা ছাউনির ভেতর ঢুকে পড়ে। একটা নোঙরা ছোকরা সেখানে ঘুমাচ্ছিল। বেপ্পো তাকে টেনে তুলল:

"Dove e' Despero?"

ছোকরা দৌড়ল, ভাইকে ডেকে আনতে গেল।

এরা দু'জনে পরস্পর সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। এই ছাউনির কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে বিভিন্ন বর্ণের অসংখ্য কার্ডবোর্ডের চাকতি। প্রায় হাজার দুয়েক হবে।

বেপ্পো বুঝিয়ে দেয়—"এই সেট মঁসিয়ে দিয়াঘিলেফ ওকে আঁকতে দিয়েছিলেন। উনি শুধু কার্টুন এঁকে দিতে বলেছিলেন। কয়েক শো লায়ার (মুদ্রা) আগাম হাতে পেয়ে এই বেচারার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। ওর ধারণা হ'ল ঐ জন্ম টাকাতেই সে সব ব্যবস্থা করতে পারবে। এদিকে আরও

বায়না চাওয়ার সাহস নেই, এখন মুস্কিল হয়েছে ওর কাজ এত বাকী যে এর কিছুই আমরা কাজে লাগাতে পারবো না।

ডেস্পেরো এল,—বেচারার এমনই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা যে মোদরুও কখনও অমন অবস্থায় পড়েনি। বেপ্লোকে একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানায়। তৎক্ষণাৎ সুরু হল ইতালীয় ভাষায় ভীষণ তর্কাতর্কি, সেই সূত্রে শিল্পী বেচারা মাটিতে গড়াগড়ি খেল, কাঁদল, পাগলের মত একটু দৌড়ালো আবার ফিরে এসে বেপ্লোর সুবুদ্ধিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে। বেপ্লো শুধু কাঁধ নেড়ে রাগ করে বলে সে মঁসিয়ে দিয়াখিলেপের হুকুমের চাকর মাত্র।

মোদরুল্লো বুঝতে পারে, বেচারী সারা রাত অন্ধকারে ছটফট করেছে, জ্বরও হয়েছে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ তার অনেক দিন বন্ধ হয়েছে, নিদ্রাও বন্ধ, পাছে এইখানেই মরে পড়ে থাকে এই ভয়ে প্রতিবেশীরা ওকে তুলে নিয়ে গেছে।

ডেস্পেরো তার শুখনো খড়ি ওঠা গাত্রচর্ম বেপ্লোকে দেখায়। এই কাজের জন্য সারা রোমে তার দেনা হয়েছে। দিয়াখিলেফ এখন ওকে পথে না বসান। বেপ্লো জবাবে শুধু বলল, 'সেটগুলো নির্দেশ মত আঁকোনি কেন বাপু?"

"উনি নিজেই জানেন শিল্পীরা কি।—ছবি আঁকার সময় এই রকম কল্পনাই আমার মনে এসেছে।"

"কিন্তু ষ্টেজের পক্ষে এ যে একেবারে অচল! যাই হোক্ নর্তকীদের ত' নড়ে-চড়ে বেড়াতে হবে, তারপর প্রয়োজন মত আলোও ফেলতে হবে।"

"তাতে আমার কি? আমি শিল্পী! আমি শুধু আমার শিল্পী-মানসের কাছে মাথা নত করতে পারি।"

মোদরুল্লোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বেপ্লো বলে: "এই ভদ্রলোকও এক জন শিল্পী।"

ডেস্পেরো মোদরুকে জড়িয়ে ধরে। মোদরু এতক্ষণ সজল চক্ষে তার কথা শুনছিল। ডেস্পেরো তার শিল্পতত্ত্ব মোদরুকে বোঝায়। তার ধারণানুসারে সব কিছুরই সুরু জ্যোতির্মণ্ডলে (Sphere) আবার সেইখানেই তাকে ফিরতে হবে। পৃথিবী, বিশ্বজগৎ, মানুষের দৃষ্টি সবই ত' এই জ্যোতির্মণ্ডল? আর চিন্তাও সেই জ্যোতির্মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত—আলো, উত্তেজনা, অনুভূতি প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক বস্তুও তাই?"

কয়েক হাজার কার্ডবোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে ডেস্পেরো বলে—"এই সব চাকৃতি হ'ল আনন্দ, আলোক, নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতীক্। আর ছোটগুলো, আমার ধারণায়, মানব-মনের অনুভূতি ও চেতনার প্রতীক্। ওর সামনে নর্তকী সঙ্গীতের কি প্রয়োজন? গভীর স্তব্ধতার মধ্যে ঘণ্টাখানেক এই রঙীন চাকৃতি দেখালেই দর্শকরা ব্যালে নৃত্য দেখে আনন্দ-মুখর হয়ে উঠবে,—এত উৎকৃষ্ট ব্যালে কোনো দিন কেউ দেখাতে পারেনি।"

বিবর্ণ, ছাতাধরা, ও অতিরিক্ত উত্তাপ ও আর্দ্রতায় কুঞ্চিত সেই কার্ডবোর্ডের চাকৃতির গুণ বর্ণনা শেষ হ'ল।

লোকটা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করছিল, নিজের বক্তব্য বিষয় জোরালো করার জন্য রঙ-মাখানো বোর্ডও ঠুকছিল।

মোদরুল্লো ভাবে "হায় রে আমার ইতালীয় সহযাত্রী, সারা পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই অদৃষ্ট সেই একসূত্রে বাঁধা,—সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্ শিল্পীরা যেটুকু ভাবে সেটা তাদের অন্তরেরই অভিব্যক্তি।"

বেপ্লো তার সরু ছড়িটা দিয়ে পেটেন্ট লেদারের জুতোর অগ্রভাগ অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে আঘাত করছিল।

গাড়িতে উঠে মোদরুল্লো বলে, "আমি দিয়াখিলেফকে ওর কথা বলব।"

বেপ্লো বলে ওঠে—"খবরদার, অমন কর্ম্ম করবেন না—প্রথমতঃ এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জানানোই আমার উচিত ছিল না, আর দ্বিতীয়তঃ একথা শুনে উনি ক্ষেপে যাবেন। এই পাগলাটাকে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন, তখন কর্তা যেমনটি চেয়েছিলেন সেই মত কাজ করবে বলেছিল, তার পর বলে কিনা ওর শিল্পি-সত্তার নির্দেশে অন্য রকম করতেই সে বাধ্য। ও আসার আগে আর একজন ফিউচারিষ্ট শিল্পী বাল্লাকে নিয়ে এক কেলেঙ্কারী হয়েছিল, সে আবার অদ্ভুত ধরণের নেকটাই পরে। বাল্লা এসে বলল, ষ্ট্রাভিনসকির "Feu d' artifice"-এর জন্য ও কয়েকটা চমৎকার সেট করে দেবে, তবে ওর হাতেই সব ছেড়ে দিতে হবে। দিয়াখিলেফ ভাবলেন এই শিল্পী সর্বপ্রথম একটা শক্তিমান মৌলিকত্ব প্রবর্তন করেছে, ছবির ভেতর একটা গতিবেগ এনেছে, নিশ্চয়ই সে এমন কিছু আঁকবে—যার ঘূর্ণমান জ্যোতি, দর্শকের মনে গতিবেগের ইঙ্গিত এনে দেবে। বল্লা সে সব কিছুই করলো না, তিনটি রঙীন পিরামিড এঁকে ছেড়ে দিল,—।

এই হ'ল 'কর্সো' আর ওর নাম 'টয়লেট'।

বেপ্লো যেটিকে 'টয়লেট' বলল সেটি ভিকটর ইমান্যুয়েলের মর্মর বিজয়স্তম্ভ। শহরের এই অংশে মনুমেণ্টটি তেমন বেমানান লাগল না মোদরুর। 'কর্সো' যে কোনো বড় শহরের বাণিজ্য অঞ্চলের বড় রাস্তার মত, তাই সেই মধ্যাহ্নে সে পথে প্রচুর ভীড়। প্রাচীন গাড়িটা রোমানদের অতিক্রম করে চলে, মাঝে মাঝে মনে হয় পথের ওপরই যে সব কাফে মুক্ত আকাশের নীচে কারবার সুরু করেছে তাদের ওপর গিয়ে পড়বে। সেই সব হোটেলে খরিদ্দাররা সংবাদপত্র হাতে নিয়ে সে দিনের মূল সংবাদ নিয়ে আলোচনা করছে।

—ক'টা বিরাট চকমিলান বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল, রেনেসাঁর ধরণে শ্বেত পাথরে গাঁথা বাড়ি, এই বাড়িতেই রাশিয়ান নৃত্যগোষ্ঠীর ডাইরেকটর দিয়াঘিলেফ থাকেন।

মোদরু বেপ্লোকে প্রশ্ন করে—"পিকাসো আছেন নাকি?"

"লাঞ্চের সময় হয়ত আসবেন, এক দিন আসেন, এক দিন হয়ত এলেন না।"

"কখন আমার আসা উচিত?"

"লাঞ্চের জন্য? কেন আমাদের ত' দেরী হয়নি।"

হারিকট-রুজের দিকে তাকিয়ে মোদরু বলে ওঠে—"আহা!"

সে বলল…"তাহলে পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

"আপনিও লাঞ্চে আসুন না!—দশ বারো জনের ব্যবস্থা করা থাকে অথচ পাঁচ ছ'জনের বেশী লোক হয় না।"

তৎক্ষণাৎ হারিকট-রুজ বলে ওঠে—"না-না।" নিজের পোষাক আর নিমন্ত্রণের স্থানটা বিবেচনা করেই হয়ত এই কথা বলে।

"তাহ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, দু'জনে একত্র যাওয়া যাবে।"

হারিকট বলে—"না, তুমি ওদের সঙ্গেই লাঞ্চ খাবে,—তুমি নিমন্ত্রিত। তাছাড়া তোমাকে ওঁর সঙ্গে, মানে পিকাসোর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি ত' আমাকে ফাউ হিসাবে এনেছ, ওদের জানা উচিত নয় যে আমিও সঙ্গে এসেছি। তুমি যাও, আমাদের প্রয়োজনেই তোমার যাওয়া উচিত,—কারণ কাল যে সব কথা বলছিলে, তার পর ওঁর কথায় তোমার ব্যাধিও সেরে যেতে পারে। আর আমার ত' ভাতের মণ্ড আছে, কিছু ফল-টল কিনে নেব কথা দিচ্ছি। তুমি যাও মোদক, নইলে আমি এনেছি বলে আমার মনে দুঃখ হবে। আমি একটু বরং হেঁটে বেড়াই—সে চমৎকার হবে, রোমের পথে পথে বেড়াব! আমি ঐ ফোয়ারার ধারে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবো। তার পর সন্ধ্যাবেলা আমার আবিষ্কার তোমাকে দেখাব, সেই বেশ হবে।" [ক্রমশঃ।

অনুবাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়

ফাল্‌গুন

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

ফাল্গুন না কি ? আহা সেই ফাল্গুন!
আবার শাখায় মৌমাছি গুন্-গুন্!
দস্যু আষাঢ় কোথায় দ্বীপান্তর!
শিকারী শীতের শূন্য পূর্ণ তূণ!
পাতা-ঝরা পথ। সেই পাতা-ঝরা পথে—
কে কিশোরী আসে মুখে তার গুন্-গুন্‌······
কে রূপসী আসে! নূপুর ঝুমুর ঝন!
অবাক সকালে বিছানায় জেগে দেখি :
দিকে আর দিকে গুন্-গুন্ গুন্-গুন্!
আকাশে আকাশে ফুলের রঙ যে লাগলো
বনে আর মনে কিসের ঢেউ যে জাগলো
আমার জীবনে রঙ যে জাগছে এ কি!
মনে ফাল্গুন—বাতায়নে ফাল্গুন!

আজব বাংলা! বাংলার পথ-ঘাট!
নদ-নদী বন অমল শ্যামল মাঠ
মাঠে ম ঠে আর মনে মনে ফাল্গুন
হঠাৎ কখন এসেই হেসেই খুন!
কাজ ভুলে যায় বাংলার নর-নারী!
কাজ ভুলে গিয়ে মনে মনে গুন্-গুন্!

আজব বাংলা! বাংলার নর-নারী।
ভালোবাসে; কভু ভালোবাসা কেড়ে নেয়।
কভু গান গড়ে। কভু গান ভেঙে দেয়!
কখনো শিল্পী; কখনও জল্লাদ।
কভু সন্ন্যাসী! কভু ভোগী সংসারী—
তবুও কখন আল্‌গোছে চুপ করে
মনের কপাট দ্বারের কপাট ধরে
কাঁপায় ঝাঁকায় মাতায় বারংবার
পথে যেতে যেতে পথিক কখন তার
মন অগোচরে মনে মনে গুন্-গুন্!
অবাক বাংলা! বাংলার ফাল্গুন!

বর্গী এসেছে কবে গেছে খেয়ে ধান
তাতার তুর্কী তুলেছে ধনুর্বাণ—
কে রাখে হিসাব! কে সে সব মনে রাখে?
বাংলা দেশের উদাসী মাঠের বাঁকে
উদাসী মানুষ দেখেছে কেবল রঙ,
রঙ, আর রঙ, পাখ্-পাখালীর ঝাঁকে
মেঘনা যমুনা পদ্মার বাঁকে বাঁকে!

কত ফাল্গুন! আহা কত ফাল্গুন—
সাতটি বছর বয়ে গেলো জাহানারা!
এখনো কি তুমি আয়নায় মুখ দেখো?
এখনো ফাল্গুনে বাজে না কি গুন্ গুন্
পুরানো গানের নূপুর ঝুমুর ঝুন্?

লোভে-হিংসায় বিবাদ-বিসংবাদে—
সারাটি বছর জলে মরি পুড়ে মরি!
তবুও ফাগুন জানালার শিক ধরে
হঠাৎ কখন চুপে চুপে চুপ করে :
অবাক সকালে কু···কু···কুহু কুহু···
এই এসে গেছি : বলে যে বারংবার!
রক্তে রক্তে তারি সুর মুহু মুহু!
কাজ ভুলে যাই। মনে মনে গুন্-গুন্—
মনের শাখায় মৌমাছি গুন্-গুন্—

অবাক বাংলা! এসে গেছে ফাল্গুন!

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

দিল্লী ও আগ্রা—(৫)

এইবার দুর্গ ত্যাগ ক'রে আবার শহরে ফিরে যাই, কারণ দিল্লী শহরের দু'টি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি।* তার মধ্যে একটি হ'ল জুম্মা মসজিদ (১)। শহরের মধ্যে একটি উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মসজিদটিকে দূর থেকে অদ্ভুত দেখায়। টিলার উপরটা আগেই সমতল ক'রে নেওয়া হয়েছিল এবং তার আশপাশের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে স্কোয়ারের মতন করা হয়েছিল। এইখানে চারটি বড় বড় রাস্তা এসে চারদিক থেকে মিলিত হয়েছে, মসজিদের ঠিক চারদিকে। মসজিদের প্রধান ফটকের ঠিক সামনে একটি; পিছনদিকে একটি; দু'পাশের দু'টি ফটকের সামনে আর দু'টি রাস্তা। তিন দিকের তিনটি ফটকে উঠতে হ'লে পঁচিশ থেকে ত্রিশটি ক'রে সিঁড়ি পার হ'তে হয়। পিছন দিকটি একেবারে টিলার সঙ্গে লাগানো, যেন একসঙ্গে গেঁথে তোলা। তিনটি ফটকই শ্বেতপাথরের তৈরী, দেখতে অতি সুন্দর এবং তার দরজাগুলিতে তামার পাত বসানো। প্রধান ফটকটি অন্যান্য ফটকের তুলনায় অনেক বেশী জমকালো দেখতে এবং তার উপর ছোট ছোট শাদা মিনার আছে অনেক। দেখতে অপূর্ব দেখায়। মসজিদের পিছনে তিনটি বড় বড় গম্বুজ আছে, তার মধ্যে মাঝখানের গম্বুজটি সবচেয়ে বড় ও উঁচু। গম্বুজগুলিও শ্বেতপাথরের তৈরী। প্রধান ফটক ও তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানটি উন্মুক্ত। প্রচণ্ড গরমের জন্য এই উন্মুক্ততার প্রয়োজন আছে। বড় বড় শ্বেতপাথরের চাঁই বসানো মাঝখানে। আমি স্বীকার করি যে মসজিদটি স্থাপত্যবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী নিখুঁতভাবে তৈরী হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু রুচিসম্মত নয় এমন কিছু ত্রুটি নেই মসজিদের গড়নের মধ্যে কোথাও। প্রত্যেকটি অংশ তার নিখুঁতভাবে তৈরী। সমতা ও সামঞ্জস্যবোধ তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। আমি অন্ততঃ মনে করি যে এই মসজিদের মতন যদি কোন গির্জা থাকত প্যারিসে তাহ'লে স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে তা সকলের কাছে প্রশংসা অর্জন করত। গম্বুজ আর মিনারগুলি কেবল শ্বেতপাথরের তৈরী। এ ছাড়া বাকি অংশ লাল বেলেপাথরের।

সম্রাট প্রতি শুক্রবার মসজিদে যান প্রার্থনা করতে। আমাদের যেমন রবিবার, মুসলমানদের তেমনি শুক্রবার। যে রাস্তা দিয়ে তিনি মসজিদে যান, সেই রাস্তায় জল ছিটানো হয় আগে থেকে, ধুলো ও উত্তাপ দুইই কমানোর জন্যে। দুর্গের ফটকের কাছ থেকে মসজিদের ফটক পর্যন্ত রাস্তার দু'দিকে সারবন্দী হয়ে বন্দুকধারী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচ-ছয় জন অশ্বারোহী সামনে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যায় এবং তারা অনেকটা এগিয়ে থাকে সামনে, পাছে তাদের চলার পথের ধুলো সম্রাটের বিরক্তির কারণ হয়। এইভাবে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলে, সম্রাট মসজিদের পথে যাত্রা করেন। হয় সুসজ্জিত হাতির পিঠে চড়ে তিনি যান, আর তা না হলে আটজন বাহকের স্কন্ধে সিংহাসনে চ'ড়ে যান। নানারকমের রঙ-বেরঙের কাপড়, বনাত ইত্যাদি দিয়ে হাতির হাওদা ও সিংহাসন সাজানো থাকে। সম্রাটের অনুগমন করেন একদল ওমরাহ, কেউ ঘোড়ায় চ'ড়ে, কেউ বা পাল্‌কীতে চ'ড়ে। ওমরাহদের সঙ্গে অনেক মনসবদারদেরও দেখা যায়। অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সময় যেরকম জমকালো শোভাযাত্রা হয়, মসজিদে প্রার্থনা করতে যাবার সময় ঠিক সেরকম কিছু না হলেও, যা হয় তাও কম রাজকীয় নয়।

জুম্মা মসজিদের পর উল্লেখযোগ্য হ'ল দিল্লীর বেগম সরাই। সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগমসাহেবা এই সরাইটি তৈরী করেছিলেন বলে এর নাম বেগমসরাই। শুধু বেগমসাহেবা নন, ওমরাহরাও এইভাবে শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করতেন। বেগম সরাই অনেকটা খোলা স্কোয়ারের মতন, চারিদিকে তোরণ-পথ। তোরণগুলি রাজপ্রাসাদের তোরণের মতন, কেবল পৃথকভাবে পার্টিশন দেওয়া। ভিতরে ছোট ছোট কামরা আছে অনেক। ধনী পারসী, উজবেক ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বিশ্রামের স্থান

* "দিল্লী ও আগ্রা" সম্বন্ধে চিঠির এই বাকি অংশটুকুতে বার্নিয়ের জুম্মা মসজিদ, বেগম সরাই ও আগ্রার তাজমহলের বর্ণনা দিয়েছেন। মোগলযুগের শেষে ভারতবর্ষে খৃষ্টানধর্মের ক্রমবিস্তারের কাহিনীটুকু ছাড়া, এই অংশে মূল্যবান সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ বিশেষ কিছু নেই; সেইজন্য এই অংশটুকু মধ্যে মধ্যে মর্মানুবাদ করেছি। খৃষ্টান পাদরীদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বার্নিয়েরের বক্তব্য অবশ্য যথাযথ অনুবাদ করেছি।—(অনুবাদক)

(১) জুম্মা মসজিদ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন এবং ছয় বছরে নির্মাণের কাজ শেষ হয়। মসজিদ্ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন বলেছেন—"It is one of the few mosques either in India or elsewhere, that is designed to produce a pleasing effect externally"—(History of Indian and Eastern Architecture, 2nd Ed. vol 11, 318).

এই সরাই। কামরা খুলে তাঁরা সরাইয়ে স্বচ্ছন্দে নিরাপদে থাকতে পারেন, কারণ রাতে প্রধান ফটকটি বন্ধ ক'রে দিলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। চমৎকার ব্যবস্থা অতিথিদের জন্ত। প্যারিসে যদি এই ধরনের সরাই কয়েকটা থাকত তাহলে বাইরের যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হ'ত না। তাঁরা প্যারিসে এসে প্রথমে কয়েকদিন এই সরাইয়ে থেকে ধীরে সুস্থে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

দিল্লীর লোকজন

দিল্লীর বিবরণ শেষ করার আগে আরও দু'-একটি প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে চাই। আমি জানি, এই প্রশ্ন হয়ত আপনার মনে জাগবে। দিল্লীর লোকসংখ্যা কত, এবং তার মধ্যে ভদ্রশ্রেণীর সংখ্যাই বা কত? ফ্রান্সের রাজধানীর সঙ্গে তার তুলনা হয় কি না? প্যারিসের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যেন তিন-চারটি শহরের সমাবেশ হয়েছে একসঙ্গে। তার আগাগোড়া অট্টালিকা ও লোকজনে পরিপূর্ণ। গাড়ী-ঘোড়ার অন্ত নেই যেন। কিন্তু সেই অনুপাতে খোলা জায়গা, স্কোয়ার, বাগান-বাগিচা ইত্যাদি নেই। দেখলে মনে হয় প্যারিস যেন পৃথিবীর নার্সারী এবং ভাবা যায় না যে দিল্লীর লোকসংখ্যা প্যারিসের সমান। আবার দিল্লী শহরের বিশাল আয়তন এবং অসংখ্য দোকান-পাটের কথা ভাবলে অন্যরকম মনে হয়। তার সঙ্গে দিল্লীর লোকসংখ্যার কথা ভাবলেও অবাক না হয়ে পারা যায় না। আমীর-ওমরাহরা ছাড়াও দিল্লী শহরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য ও বহু দাসদাসী থাকে, তাঁদের প্রভুরা থাকেন। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কোঠায় বাস করে, স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে। এমন কোন গৃহ নেই যা স্ত্রীপুত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ নয়। বাইরের গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন একটু ক'মে যায়, যখন লোকজন রাস্তায় চলাফেরা করার জন্য বেরিয়ে আসে, তখনও দিল্লীর পথের দৃশ্য দেখে মনে হয় না যে দিল্লীর লোকসংখ্যা কম। গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় রাস্তায় বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও, লোকের ভিড়ে প্রায় পথ চলা যায় না। সুতরাং লোকসংখ্যার দিক থেকে দিল্লী ও প্যারিসের তুলনামূলক আলোচনা করার আগে এ সব কথা বিবেচনা করা উচিত। বিবেচনা করলে মনে হয় যে প্যারিসের সমান লোকসংখ্যা না হ'লেও, দিল্লীর লোকসংখ্যা প্যারিসের চেয়ে বেশী কম নয়।

অবস্থাপন্ন ও ভদ্রশ্রেণীর লোকের কথা ধরলে অবশ্য অন্যরকম মত প্রকাশ করতে হয়। প্যারিসে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশী। প্যারিসের প্রতি দশ জন লোকের মধ্যে অন্ততঃ সাত আট জন ভদ্রবেশী, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয়, মোটামুটি অবস্থাপন্ন। কিন্তু দিল্লী শহরে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। প্রতি দশ জনের মধ্যে সাত আট জন দরিদ্র ও জীর্ণবেশী, আর দু'-এক জন মাত্র ভদ্রবেশী। এই সব দরিদ্র লোক শহরে আসে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরীর লোভে। অবশ্য আমি নিজে যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং সাধারণতঃ যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা অধিকাংশই অবস্থাপন্ন। খুব মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ তাঁরা ব্যবহার করেন এবং সব সময় খুব ফিটফাট থাকেন। আমীর-ওমরাহ, রাজা-রাজড়া ও মনসবদাররা যখন আমখাসে বা অন্য কোন সময় রাজদরবারে যাবার জন্য সমবেত হন দুর্গের সামনে, তখন সত্যিই উপভোগ করার মতন দৃশ্য হয়। মনসবদাররা চারিদিক থেকে ঘোড়ায় ক'রে দৌড়ে আসেন, চার জন ক'রে ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এবং প্রভুদের জন্য পথ পরিষ্কার করতে থাকেন। তার পর ওমরাহ ও রাজারা কেউ ঘোড়ার পিঠে কেউ বা হাতির পিঠে চ'ড়ে দরবার অভিমুখে যাত্রা করেন। অধিকাংশই অবশ্য ছয় বেহারার সুসজ্জিত পাল্‌কিতে চ'ড়ে যান, মকমলের গদিতে হেলান দিয়ে বসে, পান চিবুতে চিবুতে। পান খাওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল মুখের সুগন্ধ ছড়ানো এবং ঠোঁট দু'টি টুকটুকে লাল করা। আমিরী ভঙ্গীতে পাল্‌কিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে ওমরাহ ও রাজারা সুগন্ধি পান চিবুতে থাকেন এবং পালকির সঙ্গে একজন ভৃত্য দৌড়তে থাকে পিকদান নিয়ে। পোর্সেলীন বা রূপোর পিকদান। ওমরাহ ও রাজারা পিকদানে পিক ফেলতে ফেলতে যান। পালকির একদিকে এইভাবে পিকদান-হাতে ভৃত্য দৌড়তে থাকে, আর একদিকে আরও দু'জন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা নিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে ও ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যায়। তিন-চার জন নোকর পাল্‌কির সামনে দৌড়তে থাকে পথের লোক-জন ও জন্তু-জানোয়ার হটাতে হটাতে এবং কয়েকজন বাছাই-করা দুরন্ত অশ্বারোহী পালকির পিছনে ছুটতে থাকে।

দিল্লীর পাশের অঞ্চলগুলি খুব উর্বর ব'লে মনে হয়। নানারকমের ফসল উৎপন্ন হয় এইসব অঞ্চলে। চিনি, নীল, চাল, তিন-চার রকমের দাল প্রচুর পরিমাণে হয়। দিল্লী শহর থেকে কয়েকমাইল দূরে আর একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে, কুতবউদ্দীনের নামের সঙ্গে জড়িত। আর একদিকে, কয়েক মাইল দূরে সম্রাটের বাগানবাড়ী, নাম "শালিমার"(২) দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ভাল শহর নেই। সমস্ত পথটা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর, দেখবার মতন কোথাও কিছু নেই। কেবল মথুরা শহরটি উল্লেখযোগ্য, কারণ এই প্রাচীন শহরটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর দেবালয়, পান্থশালা ইত্যাদি আছে। এছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ সারবন্দী ক'রে বসানো, পথচারীর ছায়ার জন্য। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে এই সব গাছ রোপণ করা হয়েছিল। এক ক্রোশ অন্তর একটি ক'রে উঁচু মিনার, পথের নির্দেশক বা নিশানারূপে নির্মিত। এগুলিকে 'ক্রোশ-মিনার' বলা হয়।(৩) পথের মধ্যে মধ্যে কুয়ো আছে, পথিকের পিপাসা নিবারণের জন্য এবং গাছপালায় জলসেচনের জন্য।

আগ্রার কথা

দিল্লী শহরের যে বর্ণনা করেছি তাই থেকে আগ্রা শহর সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করতে পারবেন। যমুনার তীরে শহরের অবস্থান

(২। "শালিমার" উদ্যান সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে, ১৬৩২ সালে রচিত হয়। কাত্রু (catrou) বলেন যে উদ্যানের পরিকল্পনাটি নাকি একজন ভেনীসিয়ান তৈরী করেছিলেন।

(৩) প্রায় ১৬৮টি এই রকম ক্রোশ-মিনারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ১০৫টি হ'ল রাজপুতানায়। দিল্লীর কাছাকাছি ক্রোশ-মিনার কয়েকটি মেপে দেখা গেছে যে তাদের দূরত্ব প্রায় ২ মাইল, ৪ ফার্লং, ১৫৮ গজের মতন।

সম্বন্ধে, রাজপ্রাসাদ ও দুর্গাদি সম্বন্ধে এবং বড় বড় অট্টালিকা সম্বন্ধে। কিন্তু আগ্রা শহর দিল্লীর চাইতেও প্রাচীন শহর, সম্রাট আকবর বাদ্‌শাহের রাজত্বকালে তৈরী। সেইজন্য আগ্রার প্রাচীন নাম ছিল আকবরাবাদ। দিল্লীর চাইতে অনেক বড় শহর, আমীর-ওমরাহ রাজা-রাজড়াদের বাড়ীঘরও অনেক বেশী। পাকাবাড়ী, ইটপাথরের বাড়ীর সংখ্যা দিল্লীর চাইতে আগ্রায় বেশী, ক্যারাভান-সরাইয়ের সংখ্যাও বেশী। দু'টি বিখ্যাত কীর্তিস্তম্ভের জন্য আগ্রার এত খ্যাতি। আগ্রার রাস্তাঘাট অবশ্য দিল্লীর মতন সুপরিকল্পিত নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র চার-পাঁচটি রাস্তা মোটামুটি সুন্দর, ঘরবাড়ীও মন্দ নয়। তা ছাড়া বাকি সব রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ, ঘিনৃজি ও আঁকাবাঁকা যে বলা যায় না। দিল্লীর তুলনায় এই দিক দিয়ে আগ্রাকে অনেকটা মফঃস্বল শহরের মতন মনে হয়। আমীর-ওমরাহ, রাজা-রাজড়াদের ঘরবাড়ী অনেকটা বাগান-বাড়ীর মতন উদ্যান-পরিবেষ্টিত। তার মধ্যে ধনী হিন্দু বেনিয়ান ও ব্যবসায়ীদের বাড়ীগুলি ঠিক প্রাচীন দুর্গের মতন দেখায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে বিচার করলে আগ্রা শহর দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশী মনোরম মনে হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সবুজের সমারোহ যে কত মনোমুগ্ধকর তা বর্ণনা করা যায় না। ফ্রান্সে বা প্যারিসে যে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাব আছে তা নয়।

আগ্রার পাদ্‌রী সাহেব

আগ্রা শহরে জেস্যুইটদের একটি গির্জা আছে। একটি প্রতিষ্ঠানও আছে পৃথক বাড়ীতে, তাকে "কলেজ" বলা হয়। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি খৃষ্টান পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এখানে খৃষ্টানধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোথা থেকে কি ভাবে এই খৃষ্টান-পরিবারগুলি এখানে জুটল তা জানি না। এইটুকু জানি যে জেস্যুইটদের আর্থিক দানের লোভেই তারা এখানে এসেছে এবং তার উপর নির্ভর করেই তারা বসবাস করছে। এই পাদরী সাহেবরা আকবর বাদশাহের আমলে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন এখানে। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি ছিল যখন খুব বেশী তখন সম্রাট আকবর এই ধর্মযাজকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। সম্রাট আকবর এই পাদরীদের একটা বাৎসরিক আয়েরই যে ব্যবস্থা করে-ছিলেন শুধু তাই নয়, আগ্রায় ও লাহোরে তাঁদের গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। জেস্যুইট পাদরীরা অবশ্য আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আরও বেশী সহযোগিতা ও সমর্থন পান। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাজাহানের কাছ থেকে তাঁরা পান প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা। সম্রাট শাজাহান পাদরী সাহেবদের ভাতা বন্ধ ক'রে দেন এবং নানাদিক থেকে অত্যাচার ক'রে তাঁদের নির্মূল করার চেষ্টা করেন। তিনি লাহোর ও আগ্রার গির্জাগুলি ধ্বংস করে ফেলেন। আগ্রার একটি বিখ্যাত গির্জার চূড়ো পর্যন্ত তিনি ধূলিসাৎ করে দেন। এক সময় এই গির্জার ঘড়ির শব্দ সারা আগ্রা শহরে শোনা যেত।

জাহাঙ্গীরের খৃষ্টান-প্রীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে পাদ্‌রী সাহেবরা এক রকম নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে হিন্দুস্থানে খৃষ্টানধর্মের অগ্রগতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে জাহাঙ্গীরের মোটেই ধর্ম-গোঁড়ামি ছিল না এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও কোরাণের ধার তিনি বিশেষ ধারতেন না। খৃষ্টানধর্মের প্রতি তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর দু'জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষা নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, এমন কি মির্জাকেও সম্মতি দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি, কারণ তাঁর মতে মির্জা খৃষ্টান পিতামাতার সন্তান। মির্জার মা ছিল আর্মেনিয়ান এবং তাকে হারেমে আনা হয়েছিল সম্রাটের ইচ্ছানুক্রমেই।

জেস্যুইটরা বলেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের খৃষ্টান-প্রীতি এত প্রবল ছিল যে তিনি দরবারের সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ ইয়োরোপীয় ধরণে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসরও হয়েছিলেন এবং পোষাকও তৈরী করিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন ইয়োরোপীয় পোষাকে সেজেগুজে সম্রাট নিজে তাঁর একজন প্রিয়তর ওমরাহকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে নতুন পোষাকে তাঁকে কেমন মানিয়েছে। ওমরাহ তার এমন জবাব দেন যে সম্রাট সেইদিন থেকে ইয়োরোপীয় পোষাকে দরবারে যাবার সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এত লজ্জা পান তিনি সমস্ত ব্যাপারটার জন্য যে শেষ পর্যন্ত ওমরাহদের কাছে বলতে বাধ্য হন যে তিনি এমনি কৌতুক করছিলেন মাত্র।(৪)

জেস্যুইট সাহেবরা এমন কথাও বলেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি তাঁর মৃত্যুশয্যায় খৃষ্টানরূপে মরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং সেইজন্য তিনি খৃষ্টান যাজকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা বা বাণী বাইরে প্রকাশ করা হয়নি। অনেকে বলেন, এ কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। জাহাঙ্গীর কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি কোন প্রগাঢ় আস্থা বা শ্রদ্ধা নিয়ে মরেন নি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল, কতকটা তাঁর পিতা আকবর বাদশাহের মতন যে তিনি পয়গম্বরের মতন নূতন কোন ধর্ম প্রবর্তন ক'রে মরবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আমাকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বলেছিলেন। এই ভদ্রলোকের পিতা ছিলেন

---

(৪) এই কাহিনীর অন্যরকম বিবরণ দিয়েছেন কাত্রু (Catrou)। তিনি লিখেছেন: জাহাঙ্গীর কোরানের বিধি-নিষেধে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, বিশেষ ক'রে পানাহারের ব্যাপারে। আহার্যের মধ্যে কয়েকটি জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা কোরাণে নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধে ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট একদিন জিজ্ঞাসা করেন: "এমন কোন্ ধর্ম আছে দুনিয়ায় যাতে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই?" সকলে বলেন যে খৃষ্টান ধর্মে এ রকম কোন নিষেধ নেই। সম্রাট বলেন: "তাহ'লে আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের খৃষ্টান হওয়া উচিত।" এই কথা ব'লে সম্রাট দরজীদের ডাকতে হুকুম দিলেন এবং বললেন যে এখনই আমাদের যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ খৃষ্টান পোষাকে রূপান্তরিত করা হোক। মোল্লা-মৌলবীরা সম্রাটের কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভয়ে তাঁরা দিশাহারা হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কি করা যায় কিছুই ভেবে পেলেন না। অবশেষে তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন যে কোরাণ শরীফের বিধিনিষেধ সম্রাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সবসময়। সম্রাট কোন অন্যায় করতে পারেন না আল্লার কাছে। অতএব সম্রাটের পানাহারের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

জাহাঙ্গীরের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কাহিনীটি এই: একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যপানে বিভোর হয়ে কয়েকজন বিচক্ষণ মোল্লা ও একজন খৃষ্টান পাদরী সাহেবকে ডেকে পাঠান। পাদরী সাহেবকে তিনি "ফাদার আতশ" ব'লে ডাকতেন। 'আতশ' অর্থে আগুন। পাদরী সাহেবের মেজাজ খুব গরম ছিল ব'লে তিনি তাঁর এই নাম রেখেছিলেন। ফাদার আতশ এসে প্রথমে ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন, মহম্মদের বিরুদ্ধে যা খুশী উক্তি করেন এবং নিজের খৃষ্টানধর্ম ও যীশুখৃষ্টের স্বপক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর আদ্যোপান্ত শুনে সিদ্ধান্ত করেন যে ধর্ম নিয়ে পাদরী ও মোল্লার এই বাক্‌যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তিনি হুকুম দিলেন: "একটা গর্ত খোঁড়া হোক মাটিতে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। ফাদার আতশ তাঁর বাইবেল হাতে ক'রে, এবং মোল্লা তাঁর কোরাণ হাতে ক'রে সেই আগুনের কুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দেবেন। আগুন যাঁকে দগ্ধ করতে পারবে না, আমি তাঁর ধর্মে দীক্ষা নেব।" সম্রাটের অগ্নি-পরীক্ষার আহ্বানে ফাদার আতশ সন্তুষ্টচিত্তে রাজী হলেন, কিন্তু মোল্লা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তখন সম্রাট উভয়েরই অবস্থা দেখে করুণার হাসি হেসে তাঁদের মুক্তি দিলেন।(৫)

কাহিনীটি যাই হোক, সত্য বা মিথ্যা, তাতে কিছু যায়-আসে না। একথা ঠিক যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জেসুইটদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল দরবারে এবং সম্রাটও তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। সুতরাং পাদরী সাহেবরা যদি মনে ক'রে থাকেন যে হিন্দুস্থানে খৃষ্টানধর্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হিন্দুস্থানে যেসব ঘটনা ঘটেছে (দারার সঙ্গে পাদরী বুসে'র সম্পর্কের ঘটনা ছাড়া) তাতে মনে হয় না যে খৃষ্টানধর্মের এরকম সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কোন সার্থকতা আছে। যাই হোক, পাদরী সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গতঃ ব'লে ফেলেছি। যখন ব'লে ফেলেছি তখন এ-সম্বন্ধে আরও দু'চারটে দরকারী কথা এখানে আমি বলতে চাই।

খৃষ্টান ও ইসলামধর্ম

ধর্মপ্রচারের এই পরিকল্পনা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। যে পাদরী সাহেবরা ধর্মপ্রচারের মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁরা যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য, তাও স্বীকার করি। বিশেষ ক'রে কাপুচিন ও জেসুইটরা এত শান্ত ও সংযত ভাবে ধর্ম কথা বলেন যে তাঁদের শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না। তাঁদের বক্তৃতাদির মধ্যে বিদ্বেষের কোন ঝাঁঝ নেই। ক্যাথলিক, গ্রীক, আর্মেনিয়ান, নেষ্টরিয়ান, জেকোবিন প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদের প্রতি এই যাজকদের মনোভাব অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তাঁরা সত্যই পীড়িত ও ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে পারেন ধর্মের বাণী শুনিয়ে এবং তাঁদের নিজেদের বিদ্যা ও চারিত্রিক গুণের জোরে তাঁরা অজ্ঞ ম্লেচ্ছদের নানারকম কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কথা স্মরণ করাতে পারেন। কিন্তু সকলের চরিত্র যে এরকম প্রশংসনীয় এবং পাদরী সাহেব মাত্রই যে শ্রদ্ধার যোগ্য তাও নয়। অনেকের স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং যাজক-সম্প্রদায়ের উচিত তাঁদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ধর্মপ্রচারকের ছাপ মেরে তাঁদের বাইরে পাঠানো কোনমতেই উচিত নয়। খৃষ্টানধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তাঁরা কোনরকম সাহায্য তো করেনই না, উপরন্তু ধর্মকে কলঙ্কিত করেন। অবশ্য সকলেই যে এরকম অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির তা আমি বলছি না। যাজকতার বিরোধীও আমি নই। বরং আমি তার সমর্থক। ধর্মপ্রচারকের প্রয়োজন আছে, আমি স্বীকার করি। পৃথিবীর সর্বত্র যে ধর্মপ্রচারক পাঠানো দরকার, খৃষ্টান ধর্মের প্রসারের জন্য, তাও আমি স্বীকার করি। অবশ্য খৃষ্ট ও তাঁর ভক্তদের যুগ কেটে গেছে অনেক দিন। এখন আর সেই সরল বিশ্বাসের যুগ আর নেই। একথাও মনে রাখা দরকার। তখন ধর্মপ্রচার করা ও মানুষকে ধর্মে দীক্ষিত করা যতটা সহজ ছিল, এখন আর ততটা সহজ নেই। আধুনিক যুগে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘকাল ধ'রে আমি ম্লেচ্ছদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে জড়িত, কিন্তু তবু তাদের প্রতি আমার সে'রকম কোন আস্থা নেই। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মুসলমানধর্মীদের সম্পর্কে আমার কোন আশা-ভরসা বিশেষ নেই। প্রাচ্যাঞ্চলের নানাস্থানে আমি ঘুরেছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি যে হিন্দুদের যদিও বা ধর্মান্তরিত করা সম্ভবপর দু'চারজনকে, মুসলমানদের করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দশ বছরের মধ্যে যদি একজন মুসলমানকে খৃষ্টান করা সম্ভব হয়, তাহ'লে জানবেন যথেষ্ট হয়েছে। মুসলমানরা যে খৃষ্টানদের বা খৃষ্টানধর্মকে শ্রদ্ধা করে না তা নয়। যীশুখৃষ্টের নাম তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। তারা যীশুর দেবত্বেও অবিশ্বাস করে না। কিন্তু তাহ'লেও একথা কল্পনাও করবেন না যে তারা তাদের নিজেদের ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম কোনদিন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। প্রাণ থাকতে তা করবে না। তবু খৃষ্টানধর্ম প্রচারকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা উচিত। মহান্ কাজে তাঁদের উৎসাহিত করাও উচিত। প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়ানদেরই উচিত এই সব প্রচারকদের ব্যয়ভার বহন করা। অজ্ঞদেশের জনসাধারণের স্কন্ধে সে-ভার চাপানো উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে প্রচারকদের অর্থসাহায্য করা উচিত এবং অর্থের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করা ঠিক নয়, কারণ অর্থাভাবেও অনেক সময় পাদরীরা হীন কাজ করতে বাধ্য হন। সুতরাং প্রত্যেক খৃষ্টান রাষ্ট্রের কর্তব্য, ধর্মপ্রচারকদের মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করা।

---

(৫) কাফ্রু বলেন যে ফাদার আতশের আসল নাম নাকি ফাদার জোসেফ দ্যা'কস্তা। তিনিই নাকি সম্রাটের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে রাজী হয়েছিলেন। ফাদার দ্যা-কস্তা বলেছিলেন: "আগুন জ্বালানো হোক এবং ঐই আগুনের মধ্যে ইসলাম-ধর্মের ধারক ও বাহক মোল্লা কোরাণ হাতে ক'রে ঝাঁপ দিন, আর খৃষ্টান ধর্মের প্রতিভূরূপে আমি বাইবেল হাতে ক'রে ঝাঁপ দিই। তার পর দেখা যাক, ঈশ্বর কার পক্ষে রায় দেন এবং যীশু ও মহম্মদের মধ্যে কে বড় বলে ঘোষণা করেন।" ফাদারের কথা শুনে সম্রাট মোল্লার দিকে ফিরে চাইলেন। চেয়ে দেখলেন মোল্লা ভয়ে কাঁপছেন। তখন সম্রাটের করুণা হ'ল এবং পরীক্ষার দরকার নেই বললেন। সেইদিন থেকে ফাদার জোসেফকে সম্রাট জাহাঙ্গীর "ফাদার আতশ" বা "ফাদার আগুন" বলে ডাকতেন।

মুসলমান বা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি না, সাধারণ মুসলমানদের উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব কতখানি। ধর্মের প্রতি মুসলমানদের গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্মত্ততা যে কত তীব্র তা বাস্তবিকই খৃষ্টানদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত। কারণ খৃষ্টানধর্মে অন্ধ উন্মত্ততার বিশেষ কোন স্থান নেই বা প্রকাশের সুযোগ নেই। আমার নিজের ধারণা—মুসলমান ধর্মের ভিত্তি মারাত্মক ও ভয়াবহ। অস্ত্রবলের জোরে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেমন, তেমনি সেই অস্ত্রের জোরেই তার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। সহনশীলতা বা উদারতার কোন স্থান নেই তার মধ্যে। খৃষ্টানদের উচিত কৌশলে মুসলমানদের ধর্মগোড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করা। চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত দেখে আমরা শিখতে পারি এবং জাহাঙ্গীরের জীবন থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। পাদরী সাহেবদের আরও একটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। গির্জার মধ্যে দেবতার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টানরা যে লঘুচিত্ততার পরিচয় দেন, তা নিন্দনীয়। মসজিদে আল্লার কাছে প্রার্থনা করার সময় মুসলমানরা একটিবারও ঘাড় পর্যন্ত বেঁকায় না। তাদের একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা অনুকরণযোগ্য।

ডাচ্ বণিকদের কথা

ডাচদের একটি কুঠি আছে আগ্রায়। প্রায় চার পাঁচ জন লোক থাকে কুঠিতে। আগে শহরে ডাচ বণিকরা আগ্রা শহরে কাপড়, ছোট বড় আয়না, নানারকমের সোণা-রূপোর কাজ করা ফিতা, লোহা-লক্কড় ইত্যাদির ব্যবসা করত। তাছাড়া আগ্রার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে তারা নীল কিনত এবং সেই নীলের ব্যবসা করত। কাপড়ের ব্যবসাতেও তাদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। জালালপুর ও লক্ষ্ণৌ শহর থেকে তারা কাপড় কিনত। প্রতি বছর তারা লক্ষ্ণৌতে কয়েকজন ফ্যাক্টর বা কর্মচারী পাঠাত কাপড় কেনা-কাটার জন্য। এখন মনে হয় এই ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের অবস্থা তেমন ভাল নয়। আর্মেনিয়ান বণিকদের প্রতিযোগিতার জন্য এবং আগ্রা থেকে সুরাটের দূরত্বের জন্য ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিয়েছে। পথে ক্যারাভানের নানারকম দুর্গতি ঘটে এবং বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্গম রাস্তা ও পাহাড়-পর্বত এড়িয়ে যাবার জন্য তারা গোয়ালিয়র থেকে বহরমপুরের সোজা পথ ধ'রে যায় না। তার বদলে আমেদাবাদ দিয়ে ঘুরে বিভিন্ন রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হত। তবে যত অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি থাকুক না কেন, আমার মনে হয় না যে ডাচ বণিকরা ইংরেজ কুঠিয়ালদের মতন আগ্রার কুঠি ছেড়ে চ'লে যাবে। এখনও ডাচরা ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা পায় এবং দরবার-সংশ্লিষ্ট লোকজনদের অনুনয়-বিনয় ক'রে, বাংলা-দেশে, পাটনা, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাদের বাণিজ্যকুঠি পরিচালনার সুযোগ তৈরী ক'রে নেয়। প্রাদেশিক শাসকদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে তার প্রতিকার করারও সুবিধা হয় তাদের।

আগ্রার তাজমহল

এইবার আগ্রার দু'টি প্রধান কীর্তিস্তম্ভের কথা উল্লেখ ক'রে "দিল্লী ও আগ্রা" সম্বন্ধে এই চিঠি শেষ করব। আগ্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হ'ল এই স্তম্ভ দুটি। একটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরী আকবর বাদশাহের স্মৃতিস্তম্ভ। আর একটি সম্রাট শাজাহানের তৈরী বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ "তাজমহল"। আকবর বাদশাহের সমাধি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলব না, কারণ তার যা সৌন্দর্য তা তাজমহলের মধ্যে আরও চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।*

তাজমহল বাস্তবিকই বিস্ময়কর কীর্তি। হয়ত বলবেন যে আমার রুচি অনেকটা ভারতীয় ধরনের হয়ে গেছে, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকার জন্য। কিন্তু তা নয় আমি গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখেছি যে মিশরীয় পিরামিড আগ্রার তাজমহলের তুলনায় এমন কিছু আশ্চর্য কীর্তির নিদর্শন নয়। মিশরের পিরামিডের কথা অনেক শুনেছি এবং দু' দু'বার নিজে চোখে দেখেও যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ পাইনি, একথা স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই। নিরাকার পাথরের স্তূপ ছাড়া মিশরীয় পিরামিড আমার কাছে আর কিছু মনে হয়নি। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটা কিমাকার কিছু গ'ড়ে তুললেই বিস্ময়কর কীর্তি হয় না। তার মধ্যে মানুষের কল্পনা বা কারিগরির নিদর্শন কিছু নেই, কিন্তু আগ্রার তাজমহলের মধ্যে তা আছে।

[ক্রমশঃ।

---

* তাজমহলের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ের, প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী। তার সম্পূর্ণ অনুবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই এখানে, কারণ 'তাজমহলের' রূপবর্ণনা এদেশের পাঠকরা অনেক পড়েছেন। তাই চিঠির এই অংশটুকু থেকে বার্নিয়েরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের (তাজমহল সম্বন্ধে) অনুবাদ ক'রে বাকি অংশটুকু বাদ দিয়েছি।—অনুবাদক

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে উড়িষ্যার কোনারক, সূর্য্য-মন্দিরস্থিত একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। যুগল-মিলন মূর্ত্তির আলোকচিত্র শ্রীমদন বসু কর্ত্তৃক গৃহীত।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

সুরু হলো দংষ্ট্রাঘাত এবং এক সময় তা শেষও হয়ে গেল। তালাবন্ধ দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম শান্তি মুখার্জ্জী আর আমি। না, চোখ বুজিনি, কথা কইনি, নিঃশ্বাসও ফেলিনি বুঝি! ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্ত্তির মতো। বেত মারবার বিশেষ কায়দা আছে একটি। দু'হাত দীর্ঘ শক্ত বেত, একেবারে নতুন যে আঘাত করবে, সে ফুটবলের ব্যাকের মতো পেছন দিকে হটে গেল দশ-বারো হাত, তার পর বেতখানা বাগিয়ে একবারে না এসে দু'পা এগিয়ে এসে আধখানা ঘুরপাক খেল, তার পর ছুটে এসে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত হানলো সেই অনাবৃত নিতম্বের ওপর। অমনি বড় জমাদার গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, এক।

এমনি ত্রিশ বার। আঘাত হানার ভার নেয় সাধারণ কয়েদীরাই, এর জন্য এরা পায় তামাকপাতা, পায় বিড়ি আর মাস খানেকের রেমিশন অর্থাৎ দণ্ডমকুব। প্রত্যেকটি আঘাত কেটে যাওয়া চাই, নইলে আঘাতকারীরই উল্টে সাজা হয়ে যায়। এ জন্যই ব্যবস্থা আছে তিন জন জল্লাদের, প্রত্যেকে দশ ঘা' করে মারবে। পরিশ্রান্ত হয়ে যাতে আঘাতের ভীষণতা এতটুকুও না কমে যায়, তাই এই সুষ্ঠ ব্যবস্থা!

প্রথম প্রথম চীৎকার শুনতে পেলাম ভুপেন বাবুর, দেখলাম হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা, দেখলাম সর্ব্বশরীরে প্রবলতম আকুঞ্চন······তার পর জমাদারের কণ্ঠে যখন পনেরো ঘোষিত হলো, তখন দেখলাম স্পন্দন থেমে গেছে, মাথা ঝুলে পড়েছে, নিতম্ব বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালো রক্ত···তার পর এক সময় ষ্ট্রেচারে করে আমাদের সম্মুখ দিয়েই নিয়ে গেল ভুপেন বাবুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ। ঠাওর করতে পারলাম না তাতে প্রাণ আছে কি না।

তেমনি বুঝতেই পারলাম না যে, এই দশ মিনিট আমরাও বেঁচে ছিলাম কি না। কোনো রাজনৈতিক বন্দীকেই সেদিন সকালে ঘরের বাইরে আসতে দেয়া হয়নি, এমন কি রাজবন্দীদেরও দরজায় তালা ছিল।

কিন্তু ছুটে পালাইনি এই দৃশ্য দেখে, পলক ফেলিনি। দশটি চক্ষু মেলে এর সবখানি বীভৎসতা অন্তরে টেনে নিলাম। প্রত্যেকটি বেতের আঘাত আমাদেরও মনে রক্ত ঝরিয়ে দিল। শুধু আমাদের নয়, যেখানে যত বিপ্লবী আছেন, তাঁদের শরীরেও কেটে কেটে বসে গেল সেই বিষাক্ত চুম্বন। ক্ষুদিরাম-কানাইলালের চিতাভস্মেও বুঝি চাঞ্চল্য দেখা দিল!······অত্যাচারকে আবাহন জানাই আমরা, অভ্যর্থনা জানাই জার-কে, লুই-কে, মাইকেল ও ডায়ারকে। এদের নৃশংসতার আঘাতেই তো যুগে-যুগে আহত সরীসৃপের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছে বিপ্লবের কাল-ফণা! তাই তো জন্ম লাভ করেছেন লেনিন, জেগে উঠেছেন রব্‌স্‌পিয়ার, ফাঁসীর মঞ্চে জীবন-তীর্থ সৃষ্টি করে গেছেন ভারতের অগণিত বিপ্লবী!

তাঁদের দু'কস্‌ বেয়ে ঝরে-পড়া রক্তকণিকা দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মূর্ত্তিমান বিপ্লব—ভারতের নেতাজী!······

সারা দিনে কিছুই কথা খুঁজে পেলাম না আমরা। কিংবা কথা কওয়ার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলাম! প্রতিদিন দুপুরের প্র্যাণ্ড হোটেলীয় খাদ্য নিয়ে বেশ রসালো সমালোচনা চালাতাম কিছুক্ষণ। ডালে নেই নুণ, তরকারীতে নেই মসলা। ভাতে আছে কাঁকর, মাছের ঝোলে আছে বালি। এমনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার খানা!

আজ কিন্তু গোগ্রাসে গিলে ফেললাম সব। ভেতরটা কি খালি হয়ে গেছে একেবারে? স্বাদবোধ কি শেষ হয়ে গেছে!······

এর দু'দিন পরই আমাদেরই ঘরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। রিয়াজউদ্দীন ফরিদপুরের মুসলমান, ডাকাতি মামলায় পাঁচ বৎসর সাজা হয়েছে। বেঁটে, কম কথা কয়। মনে হয় নিরীহ, গোবেচারা। কিন্তু তার পেটে-পেটে এত কে জানতো!

একদিন সন্ধ্যেবেলা শান্তি মুখার্জ্জী গোপনে আমায় জানালো যে, তার কম্বলের ভাঁজে একখানা তীক্ষ্ণধার লোহার পাত পেয়েছে সে। কোনো কথা প্রকাশ না করে গোপনে তদন্ত করা হলো এবং অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের জবানবন্দীতে জানা গেল যে, এই অপকর্ম্ম রিয়াজই করেছে। পঞ্চম বাহিনীর লোকের মতো ধরিয়ে দিয়ে কিছু সুবিধে আদায় করাই শালার মতলব। সুতরাং—

পরদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর সবার সম্মুখেই শান্তি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ক্ষুরের কথা। প্রথমটা বেমালুম অস্বীকার করে বসলো সে। তার পর জেরায় খানিকটে কাবু হয়ে পড়লো. অবশেষে হুমকিতে স্বীকার করলো অপরাধ, বললো সে কোন্ মেটের পরামর্শে এই কাজ করেছে। আর যায় কোথা, শান্তি প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে বসলো তার থুঁতনিতে। ব্যাটা কোনো রকমে টাল সামলে নিতেই শান্তি আরও কয়েকটি ছেড়ে দিল পর-পর। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রিয়াজউদ্দীন। তার পর হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। আমিও তার অভ্যর্থনা জানালাম প্রচণ্ড এক লাথি মেরে তার মুখে। তার পর সুরু হলো মার। সাধারণ কয়েদীরা দু'চার ঘা মেরে আমাদের দু'জনের মারের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো নিশ্চেষ্ট দর্শক হয়ে। চড়, কিল, ঘুসি ও লাথির চোটে এক সময় রিয়াজ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো। আমাদের মাথায় তখন খুন চেপে গেলেও একেবারে খুনী হয়ে উঠিনি আমরা। তাই, শান্তি ও আমি দু'জনে শালাকে শূন্যে তুলে নিয়ে জলের ট্যাঙ্কটার মধ্যে তার মাথাটা ডুবিয়ে ধরলাম। ওর সংজ্ঞা ফিরে এল। তার পর সুরু হলো আবার।

কিন্তু আশ্চর্য্য যে, লোকটা একটুও চীৎকার করলো না এবং যখন আধ-মরা করে তাকে ফেলে দিলাম, শান্তি তখন শেষ লাথিটা মেরে বলে উঠলো: নে শালা, বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ কর্। অন্ততঃ ছ'মাস এবার থাকতে হবে হাসপাতালে।

অপরাধী রিয়াজউদ্দীন কোনো নালিশ জানালো না কারুর কাছে। পরদিনই ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল থালা-বাটি ও কম্বল নিয়ে সিপাইয়ের পেছনে পেছনে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই গেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে। কিন্তু সেদিনই বিকেলে সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদেরই ইয়ার্ডের সম্মুখের প্রাঙ্গণে এক দল কয়েদীর দ্বিতীয় সারির শেষে দাঁড়িয়ে আছে সেই বেঁটে ফরিদপুরের মুসলমান রিয়াজউদ্দীন। মুসলমানের হাড় বামনের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শুধু রিয়াজউদ্দীনই যে চলে গেল, তা নয়, আমাকেও বদলী করা হলো ছ'নম্বরে। ভাবলাম, সুবিধেই হলো, এবার রবীর কাছ থেকে লেবং-এর ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যাবে। কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্ত মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু স্থায়ী হলো না তা বেশীক্ষণ। একটু পরই আবার এল সিপাইরা। রবীকে যেতে হবে চল্লিশ ডিগ্রিতে। লেবং ঘটনায় রবী যে স্বীকারোক্তি করেছিল, সবাই জানে তা। তাই আই-বির পরামর্শ মত রবীকে অন্তান্ত সবার কাছ থেকে যতখানি সম্ভব পৃথক্ করে রাখা হতো। আজ এই প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে রবীকে নিয়ে যাওয়া হলো একেবারে চল্লিশ ডিগ্রির রাজনৈতিক বন্দীদের কলোনীতে। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে ওকে মিশতে দেয়াকে আরও বেশী বিপজ্জনক মনে করা হয়েছে!

মাস তিনেক পর এক দিন সকাল বেলায় অকস্মাৎ মাণিকগঞ্জের বিভূতি বাবু দৌড়ে আমার কক্ষে এসে বলে গেলেন: দ্বিজেন বাবু, আপনি খালাস।

খালাস!—বলে কী?···বুঝলাম এটা বিভূতি বাবুর কষ্ট-কল্পনা। লোকটা বছর তিনেক ধরে জেলের ঘাস খাচ্ছে, তাই মুক্তির জন্ত হয়ে উঠেছে লালায়িত! মুক্তির কথা উচ্চারণেও আনন্দ পায়।

আমার শরীর তখন ভালো নয়, হাসপাতালের অধীনে আছি। অর্থাৎ সরু লাল ষ্ট্রাইপওয়ালা পায়জামা পরেছি, যার ঝুল নেমেছে ঠিক হাঁটুর নীচে অবধি। আমার খাদ্য আসে হাসপাতাল থেকে, ওষুধও।

জিজ্ঞেস করলাম: কী করে জানলেন?

সোৎসাহে জবাব দিলেন তিনি: বাঃ, খালাসী মেট যে বলে গেল আপনাকে থালা-কম্বল নিয়ে রেডি থাকতে। সে ঘুরে আসছে।

রেডি আর কী থাকবো? থান চারেক কম্বল আর থালা ও বাটি, এই তো আমার সংসার। বগলদাবা করেই এই সংসার নিয়ে চলাফেরা করা যায় গন্ধমাদনের মতো! কিন্তু খালাস যে নয়, তা বেশ বুঝতে পারলাম।

একটু পরই মেট ফিরে এসে হাঁক দিল: কোথায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী কোথায়? আসেন, আসেন, শীগ্‌গির কইরা আসেন।

বিভূতি বাবু ছোঁ মেরে তার হাতের স্লিপখানা কেড়ে নিলেন, বলে উঠলেন: এই দেখুন, লেখা আছে For release। দেখলাম আমার নামের নীচে লেখা আছে খগেন চাটার্জ্জী আর বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জীর নাম।

অসুস্থ শরীরে বেরিয়ে এলাম। চল্লিশ ডিগ্রির সম্মুখ দিয়ে আসবার সময় বন্দীরা একেবারে ঘিরে ধরলেন। অসংখ্য প্রশ্ন, জবাব দেবার সময় পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলীপুর সেনট্রাল জেলে, সেখান থেকে সোজা আন্দামান। আন্দামান তখন আবার খোলা হয়েছে। পাঁচ বছর বা তার বেশী যাদের মেয়াদ, তাদের আন্দামান প্রেরণের নীতি গ্রহণ করেছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। তাই ক'জন এগিয়ে এসে সহাস্তে করমর্দ্দন করে বলে দিলেন: যান, আমরাও পরে আসছি।

ইয়ার্ডের বাইরে এসে মেট আমায় নিয়ে চললো গুদামের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম: সত্যিই খালাস, না কলকাতা চালান?

মেট জবাব দিল: তা কইতে পারি না। তবে অফিসে যাইতে হবে।

গুদামের দিকে যাচ্ছি কেন?

আপনার নিজের জামা-জুতা পরতে অবে যে!

গুদামে এসে পৌছতেই বিপদ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমায়: দ্বিজেনদা', সত্যিই আমরা খালাস পেয়েছি। খগেন, আপনি আর আমি। হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে, জানেন না? অনাথ আর রণুদা'কে ছাড়েনি।

পোষাক পরিবর্ত্তন করে পরলাম নিজেদের ধুতি ও জামা। তার পর তিন জন এসে হাজির হলাম অফিসে। দেখি, সেখানে কাগজপত্র নিয়ে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত অপেক্ষা করছেন স্বয়ং বিভূতি সাহা। আমাদের দেখেই নিঃশব্দে হাসলেন একেবারে বত্রিশটি সাদা ধবধবে দন্ত বিকশিত করে। ঠিক তেমনি চোখ দু'টি ছোট হয়ে এল। বললেন: Congratulations, দ্বিজেনবাবু, Congratula-tions। সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত আপনিই জয়লাভ করলেন। আমাদের সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম: মানে?

মহা বিস্ময়ে বললেন তিনি: সে কি, কিছুই জানেন না আপনি? আজ যে সাত দিন হয়ে গেল হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে। কেন, ষ্টেটসম্যানে বেরিয়েছে তো বেশ বড় বড় হরফে, দেখেন নি?

বললাম: ষ্টেটসম্যান তো দেয়া হয় না আমাদের।

আমাদের দেখে ও কথোপকথন শুনে টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলেন রেজাক সাহেব। জিজ্ঞেস করলেন: কি ব্যাপার দ্বিজেন বাবু?

এইবার সুযোগ পেলাম বলবার: বুঝলেন না রেজাক সাহেব, বিভূতি বাবু মনে করেছিলেন মুন্সীগঞ্জের ভবেশ রায়ই হচ্ছেন আমাদের জেলে আটকে রাখবার একমাত্র মালিক। কিন্তু বাবারও তো বাবা আছে, সে কথা ওঁদের মনে ছিল না। বলেছিলেন নাগপাশ আর পাশুপত একেবারে রেডি, ছাড়লেই হয়। আমিও বলেছিলাম, আমার বর্ম্মও খাঁটি ইস্পাতে তৈরী। কুস্তির প্রথম রাউণ্ডে অবশ্য আমায় প্রায় কাবু করে ফেলেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও শেষ রাউণ্ডে একেবারে চিৎ হয়ে পড়েছে আই-বির দল। তাই না বিভূতি বাবু?

সেই চোখ-ঢাকা হাসি! বললেন: তবে শুধু খোলস্ বদলানো হবে।

অর্থাৎ আবার রাজবন্দী, এই ত? তা হোক্!—বলে একটু গম্ভীর হয়ে বললাম: কিন্তু পরাজিত হলেন তো। পূর্ব্বেই বলেছিলাম, দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে রাজবন্দী করে রাখতে পারেন সারাজীবন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে আটকে রাখতে পারবেন না। আমায় ধরবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এবার স্বীকার করেন তো?

আবার সেই নিরুত্তর, নিঃশব্দ হাসি!···

বিপদভঞ্জনকে মুক্তি দেওয়া হলো সর্ত্তাধীনে আর খগেন ও আমায় রাজবন্দীর তকমা এঁটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো রাজবন্দীদের ইয়ার্ডে। পূর্ব্বে এটা ছিল জেনানা ফাটক, এখন জেনানাদের অন্তত্র সরিয়ে

নিয়ে একে রূপান্তরিত করা হয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডে। সংখ্যায় খুব বেশী নয়, জন ত্রিশেক। দু'টি লম্বা হল-এর মতো ঘর, তার মধ্যেই সারি সারি শয্যা। একসঙ্গে এতগুলো লোক থাকায় সুবিধে ছিল, রাত্রে ঘরে তালাবন্ধ হয়ে থাকার পরও আমাদের নানা রকম আলোচনা, পড়া, ক্লাশ ও খেলা চলতো।

এসেই আমি সিপাই মারফৎ একখানি পত্র পাঠালাম রঙ্গলালের কাছে। বন্দী হলেও আমি এখন আবার রাজবন্দী, সরকারী অফিসের পিতলের চাকতি-লাগানো পোষাক-পরা পিওনের মতো। পিওনের মধ্যে এরা কুলীন, হাঁক-ডাক বেশী। তেমনি বন্দীদের মধ্যে রাজবন্দী। রঙ্গলালকে লিখে পাঠালাম: "আইনের মার-প্যাঁচে আমি মুক্তি পেলাম সত্য, কিন্তু নিজের ভ্রম সংশোধনের জন্ম স্বেচ্ছায় দীর্ঘ কারাবাস বরণ করে নিয়ে তুমি যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। দাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলে তুমি, তোমার পণ রক্ষা হলো। কিন্তু তোমার দীর্ঘ কারাদণ্ডের বিনিময়ে যে মুক্তি ক্রয় করলাম, তাতে পুরো আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না।"

চিঠির জবাব পেলাম সিপাইয়ের মুখে। হিন্দী ও বাংলা মিশিয়ে সে যা বললো, তার মর্ম্মার্থ এই যে, "আপনার মুক্তিই ছিল তার কাম্য, তাই সে খুব খুশী হয়েছে। নিজের জন্ম সে ভাবে না।"

তার পরই একখানা দরখাস্ত করলাম মুন্সীগঞ্জের সেই বিখ্যাত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপী মহকুমা-হাকিম ভবেশ রায়ের কাছে। দরখাস্তখানার প্রতিপাদ্য বিষয় ও কিছু ভাষার প্রাখর্য্য আজও আমার মনে পড়ে।

"সবিনয়ে নিবেদন,

যথাবিহিত সম্মানের সহিত জানাইতেছি যে, আশা করি মহামান্ত হাইকোর্টের রায় আপনার গোচরীভূত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম আপনার দীর্ঘ রায়ে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও আমাদের জবানবন্দী বিবেচনা করিয়া ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং কোর্ট ইনস্পেক্টার যে আবেগময় ভাষায় সওয়াল করিয়াছিলেন, সেই জ্বালাময়ী ভাষাতেই আমাকে সাধ্যমত সর্ব্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বৃটিশ সরকারের প্রতি আপনার দাসসুলভ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন একেবারে বেহায়ার মতো!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনারও বাবা আছেন এবং সকল বাবাই আপনার মতো পুলিশের তাঁবেদার নন। তাই আপনার ন্যায় বিচার সেখানে ফাঁসিয়া গিয়াছে।"

জেলর সুধীর মুখার্জ্জী সেলাম দিলেন আমায়। বললেন: অবশ্য আমি আপনার পত্র পাঠিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু এতে শেষ কালে Contempt of court হয়ে যাবে না তো?

এখন আমার কদর অত্যন্ত বেশী। যে সুধীর মুখার্জ্জী দু'দিন পূর্ব্বেও কয়েদী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং বহু সাধ্য-সাধনার পর নাসিকা উঁচু করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন চরম তাচ্ছিল্যভরে মেরী এ্যান্টিওনেটের মতো, এখন তিনি যেন আমার শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর পায়ে যাতে কাঁটাটি না বিঁধতে পারে, সেজন্ত যেন সর্ব্বদাই বিছিয়ে রেখেছেন নিজের কোমল বুক!······

বললাম হেসে: ডাকাতি মামলায় হয়েছিল সাত বৎসর, আদালত অবমাননার দায়ে না হয় হবে সাত দিন জেল। তিন মাস তো আপনাদের ফার্ষ্ট ক্লাস গরুর খাদ্য হজম করলাম, না-হয় আর সাত দিন গলাধঃকরণ করবো সেই মোগলাই খানা!—পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এর জবাবে ভবেশ রায় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো পাঠিয়ে দিলেন তাঁর নিজের দীর্ঘ রায়ের এক খণ্ড ও হাইকোর্টের রায়ের এক খণ্ড অনুলিপি। না চাহিতে দান!···রীতিমত পয়সা ব্যয় করে যা সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, তাই এসে গেল আপ্‌সে। ভালোই হলো।

সবাই মিলে দুটোই মিলিয়ে পড়া গেল। ময়মনসিংহের নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গালপোড়া নামে যিনি খ্যাত) পড়তে লাগলেন আর আমরা তা উপভোগ করতে লাগলাম। দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভবেশ রায়ের রায়। মনে হয়, কোর্ট ইনস্পেক্টারের দীর্ঘ সওয়াল পুরোটাই ভদ্রলোক শর্ট হ্যাণ্ডে টুকে নিয়েছিলেন!···আর হাইকোর্টের বিচারপতি কানলিফ ও হেণ্ডারসনের রায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র ফুলসক্যাপের এক-চতুর্থাংশ। অন্যান্য কথার পর লিখেছেন:

The learned Magistrate could not even frame the charges. The Approver's statement is misleading. Hence, the principal accused Dwijen Ganguly should be set at liberty at once along with···ইত্যাদি ইত্যাদি।

পান্নালাল মিত্র বলে উঠলেন: ভবেশ রায় একেবারে His master's voice ছেড়েছেন!

ময়মনসিংহের কমিউনিষ্ট মণী সিং বললেন: আসুন, ওঁকে একখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠাই আমরা। এমনি সারগর্ভ রায়···

সবাই হেসে উঠলো।

হাইকোর্টে আমাদের মামলা চালিয়েছিলেন ব্যারিষ্টার সন্তোষ বসু ও এ্যাডভোকেট সুধাংশুভূষণ সেন।

১১৩৬ সালের জুন মাস। বেশ গরম পড়লেও আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হলো না। রাত্রে বিরাট বিরাট পাটবিহীন জানালা-পথে বেশ হাওয়া খেলতো, আর আমরা খেলতাম তাস, পাশা, ক্যারম, মাজাং প্রভৃতি।

হঠাৎ এক দিন দেয়ালের বাইরে শহরের রাস্তায় প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল, ঠিক দুপুরবেলায়। মাঝে মাঝে পট্‌কার শব্দ। আশঙ্কা হলো ঢাকা শহরে আবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগে গেল বুঝি! সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম, সিপাইদের মধ্যেও বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে, দু'-এক জন ছুটোছুটিও সুরু করে দিয়েছে।

একটু পরই এক জন সিপাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সংবাদ দিয়ে গেল: রাজ মিল গিয়া!—বলেই আবার হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরেই জানতে পারলাম, ভাওয়াল মামলার রায় বেরিয়েছে। বিচারপতি পান্নালাল বসু বাদীকেই ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে ঘোষণা করেছেন। তাই এই শোভাযাত্রা, বাজী পোড়ানো, হল্লা ও সিপাইদের মধ্যে অফুরন্ত উল্লাস ও উচ্ছ্বাস!···

পান্নালাল বললেন : আপনার কানুলিফ-হেণ্ডারসনের মতোই পান্নালালের যুগান্তকারী রায়।—হবে না কেন, ও যে পান্নালাল। শুধু মিত্র নয়, বন্ধু।

সবাই হেসে উঠলাম।

এই জুন মাসেরই মাঝামাঝি একখানা দরখাস্ত পাঠালাম আমার চিরদিনের শত্রু ঢাকা আই-বির কর্তা গ্র্যাসবি সাহেবের কাছে। লিখলাম : দয়া করে অবিনাশ দারোগাকে পাঠিয়ে দেবেন। গোপনে কিছু কথা আছে আমার। সত্বর।

গোপনতা নিয়ে যাদের কারবার, গোপন কথার সংবাদ পেলেই স্বভাবতঃই তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেঙ্গার্স-এ বিজয়ী 'লাকি ডগের' মতো! কী কোহিনূর যেন কুড়িয়ে পেল এরা! কোন্ আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে!···

সাত দিনের মধ্যেই এসে হাজির অবিনাশ দারোগা।

নমস্কার, নমস্কার দ্বিজেন বাবু! আরে মশাই, ও আমি আগেই জানতাম। সাত বৎসর যে আমরাই কল্পনা করিনি। ভবেশ রায়ের কাণ্ড!

বললাম : There are many things Horatio···

বললেন : বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! ও আমি আগেই জানতাম। —আসুন, সুপারের ঘরেই বসি আমরা। অফিসে লোকজন গিজ্ গিজ করছে। ওখানে কাজের কথা হয় কখনো?

সুপারের ঘরে এলাম। দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো! অবিনাশ বলতে লাগলেন : ও আমি আগেই জানতাম। আপনার মতো জুয়েল কেন শুধোশুধি জেলে পচবেন বলুন তো? দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে সামনে।—ছিলাম মশাই ছুটিতে, প্রিভিলেজ লিভ, পাওনা ছুটি। অকস্মাৎ সাহেবের টেলীগ্রাম গিয়ে হাজির, চলে এসো। চলে এলাম। সাহেব বললেন, যাও, দ্বিজেন বাবু তোমায় ডেকেছেন। কী গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে।—কী কথা, তা আমিও জানি। বিশ্বাস করুন দ্বিজেন বাবু, I feel for you—

বললাম : আমিও আপনার জন্ম ফিল্ করছি অবিনাশ বাবু!—

ও আমি আগেই জানতাম। বলে খুক্‌খুক করে হাসতে লাগলেন অবিনাশ। বললাম : সবই দেখছি আপনি জানতেন সাজাহান নাটকের জয়সিংহের মতো!

অবিনাশের হাসির শব্দ উচ্চ গ্রামে উঠলো : হা, হা, হা, শিক্ষিত ব্যক্তি আপনি, সব কথাতেই বেশ উপমা দিতে পারেন! সাজাহান নাটকের জয়সিংহ—বলে আবার সেই গর্দ্দভের হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন : কী হবে মশাই, ছুটো ভাঙা রিভলভার নাড়াচাড়া করে? ও দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল না। যেন ছেলের হাতের মোয়া আর কি!

আবার সেই উল্লুকের হাসি : এই পাগলামো যে একেবারে নিরর্থক স্রেফ ইয়ারকি, যাক্, অবশেষে আপনিও তা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে যে এক দিন পারবেন, ও আমি আগেই জানতাম—

গম্ভীর হয়ে এবার বললাম : কিন্তু একটা সংবাদ জানতেন না অবিনাশ বাবু যে, বিপ্লবীদের যে একখানা ব্ল্যাক-বুক আছে না—জানেন তো, আপনার নাম উঠে গেছে তাতে—

অকস্মাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল! হাসি উবে গেল অবিনাশের, হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে বলির পাঁঠার মতো! বলতে লাগলাম : অবশ্য আই-বির কাউকেই বিপ্লবীরা দোস্ত মনে করেন না কখনো। তবে তাই বলে সবারই নাম ব্ল্যাক-বুকে তোলা হয় না। নিশ্চিত কোন চার্জ্জ কারুর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে তবেই লাল কালি দিয়ে তার নাম চিহ্নিত হয়ে যায়। আপনার বিচার হয়েছে, আর সে বিচারে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরাধী! কেন আমি কী করেছি? অবিনাশের হাঁ আরও একটু বড় হ'য়ে উঠলো, দৃষ্টি ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে নিষ্পলক! তৎক্ষণাৎ বললাম : আপনি অনিল দাসকে টর্‌চার করে মার্ডার করেছেন! আপনি মার্ডারার!

বলেন কি, আমি!—তারপর তোতলার মতো ঠেকে-ঠেকে একই কথা বার বার উচ্চারণ করে অজস্র অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ও শৃগালের যুক্তির অবতারণা করে, একেবারে কিছুই জানিনে বলে অবশেষে অবিনাশ যখন তাঁর দীর্ঘ সওয়াল শেষ করে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন স্পষ্ট দেখলাম তাঁর কপালে অজস্র স্বেদবিন্দু চক্‌চক্ করছে।

মৃদু হেসে বললাম : এই মাত্র বলছিলেন না যে, সবই জানেন আপনি এবং আগেই জানতে পারেন। আর এই দুঃসংবাদটি রাখেন না কে, এবার আপনিই হচ্ছেন বিপ্লবীদের টারগেট? অনিল দাসকে আপনি হত্যা করেছেন নৃশংসের মতো, তাই ব্ল্যাক-বুকে আপনার নাম এবার সবার ওপরে উঠেছে by order of merit—এই ছুটি সংবাদ প্রত্যেক বন্দিশিবিরে ও জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জেলের বাইরেও যে তা যথাস্থানে যেতে পারেনি, তা মনেও স্থান দেবেন না। সুতরাং—কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অনাবশ্যক খাটো করে বললাম : একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন অবিনাশ বাবু! ঢাকা শহরের গলিগুলো বড্ড অপরিসর ও নোঙরা, তার পর ধারেই বয়ে চলেছে বুড়ীগঙ্গা নদী। এক খানা আঠারো ইঞ্চি ছোরা নিঃশব্দে আপনার পেটের মধ্যে চালিয়ে দিলেই গলগল করে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। তার পর একখানা ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে এনে লাসটা নদীতে ছেড়ে দিলেই—ব্যস, কাজ সাফা। মাছগুলোর বেশ কিছু দিনের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারবেন—

অবিনাশ দারোগা বেঁচে আছেন কি না, বোঝা গেল না। পাথরের মতো চেয়ে রয়েছেন তিনি। সে দৃষ্টি শূন্য। মনে হলো সত্যিই তার পেটে আঠারো ইঞ্চি একখানা ছোরা চালিয়ে দেয়া হয়েছে!···

মনে মনে হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলাম : এই সংবাদটুকু দেবার জন্যই আপনাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার প্রিভিলেজ লীভটা মাঠে মারা গেল। আহা!—সত্যিই আপনাকে আমার বন্ধু মনে করি অবিনাশ বাবু! তাই শুভানুধ্যায়ীর মতো সময় থাকতে সাবধান করে দিলাম।—আচ্ছা, এবার চলি!

কিন্তু আই-বি-পুঙ্গব অবিনাশ তখন মৃত। বোধ হয় পচনও সুরু হয়ে গেছে সেই বাসি মড়ার!···

গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলাম নন্দের রাজসভা থেকে চাণক্যের মতো!

* * * *

এরও অনেক দিন পর দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানায় যখন বড় দারোগা পূর্ণ বড়ালের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছি, ঠিক সেই সময় ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসের এক সকাল বেলায় এল আমার সর্ত্তবিহীন মুক্তির আদেশ।

মুক্তি!···বার বার উচ্চারণ করলাম মনে মনে। মুক্তি! মুক্তি!···দীর্ঘ ছয় বৎসর চার মাস পর আবার পেলাম ফিরে স্বাধীনতা। বন্দিত্বের শৃঙ্খল পরেছিলাম সেই একুশ বছর বয়সে আর তা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম যখন, তখন আমি সাতাশ পেরিয়ে গেছি। জীবনের মূল্যবান কতকগুলি বৎসর পেছনে ফেলে এলাম। মাকে হারিয়েছি, বাবাকে হারিয়েছি, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি তাঁদের কত-না আশা ও কত-না কল্পনা! দ্বিজেন বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, হাইকোর্টের প্রশস্ত হল্ তার সওয়ালের অগ্নিগর্ভ ভাষণে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল হবে!···

বাবা-মার, আত্মীয়-জনের, বন্ধুদের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের, পাড়া-প্রতিবেশীর সমস্ত আশা ও ভরসা কালা পাহাড়ের মতো একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে প্রায় আটাশ বৎসর বয়সে যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আর যাই হোক, সেই পুরাতন দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে আর অন্তরে খুঁজে পেলাম না।

—স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সার্জ্জেণ্ট, বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী, বি-ভি বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্ম্মী, আই-বি পুলিশের ভীতি দ্বিজেন গাঙ্গুলীর তখন মৃত্যু হয়েছে!

চৈত্র-দিনের ঝরাপাতার পথে দিনগুলি মোর কোথায় গেল···

সমাপ্ত

ফাগুন-দিনের গান

শ্রীশান্তি পাল

ফাগুন এলো ফাগ ছিটিয়ে, ঘোমটা খোলে ফুল-বো'য়ে,
বোল্ ধ'রেছে আমের শীষে ভোম্‌রা পালায় মৌ ল'য়ে।
শুক্‌নো পাতা প'ড়ছে খসে ঝরঝরিয়ে পথ ছেয়ে,
হাল্‌কা হাওয়া ঝিরঝিরিয়ে গোপন গীতি যায় গেয়ে।

রূপোর ঝিলিক্ লাগল চোখে, দিগঙ্গনা সাত-রঙা,
কোন্ রূপসী আকাশ-কোলে আঁক্‌ছে মেঘের আল্পনা!
রূপের জ্যোতি উপ্‌ছে পড়ে শিথিল তনু ঢলঢলে,
সব্‌জে ঘাসের দোব্‌জাখানি আওতাতে তা'র ঝল্‌মলে।

সোনায় গোলা, রূপোয় গোলা, ছড়িয়ে আলোর পিচকারি,
কে দিল রে ধরার বুকে মালঞ্চে প্রাণ সঞ্চারি?
যৌবনেরি জোয়ার লেগে সজীব হ'ল গাছপালা,
দোপাটি আর কৃষ্ণচূড়ার প'ড়ছে শাড়ি বন-বালা।

নয়ন-তারা নয়ন মেলে গোলাপ রেণুর রং করে,
মলয় এসে আল্‌তো ছুঁলেই টুপটুপিয়ে রস ঝরে।
চাঁপার বনে জাগল সাড়া, বাকস বিছায় শ্বেতপাটী,
কমলা রং-এ ফুট কেটে ওই উঠ্‌ল ফুটে ফুল ঝাঁটি।

কুন্দ কাপাস কপোলে তা'র হলদে-ফিকে রং মেখে,
ফিক্‌ফিকিয়ে হাস্‌ছে কেবল কঞ্চিগুঁড়োর পাশ থেকে।
কল্‌মী-কলি জল ছেড়ে দে' ললাটে লাল টিপ পরে,
টগর বো'য়ে রগড় ক'রে হুম্‌ড়ি খেয়ে পায় ধরে।

সোঁদাল লতা পরায় ঝাঁপা ঘেটুর চুলে শুঁড় দিয়ে,
রাম শালিকে ঝিমোয় ব'সে কচি তালের রস পিয়ে।
কোকিল ডাকে কণ্ঠ চিরে, মাতিয়ে তোলে দশ পাড়া,
তিলে-ঘুঘুর মাত্‌লামিতে সবাই হ'ল ঘর ছাড়া।

উল্লসে ওঠে ছাতার, টুনি, চুমরে ওঠে বুলবুলি,
শিমুল পলাশ রংমশালে জ্বালায় আঁধার ঘুলঘুলি।
মৌমাছিরা ভিড় পাকিয়ে হামলা দিল ফুল-বনে,
টাট্‌কা মধু লুট্‌তে তারা চৌদিকে ধায় গুঞ্জনে।

পরজাপতি লাট খেয়ে সব ঘুরছে পিছে জোট বেঁধে,
হাওয়ার তালে তাল দিতে গে' পাখায় পাখা যায় বেধে।
চৈতালী বায় লাগল গায়ে মন যে হ'ল বৈরাগী,
গৈরিকে দাগ কাট্‌ল বুকে হাঁপিয়ে ওঠে কা'র লাগি?

নাগাল পেলে মারব তারে মৌরী ফুলের বাণ ছুঁড়ে,—
গৌরী জিরের টিপ পরিয়ে আঁক্‌ব চুমা গাল জুড়ে।
আল্‌তা-রাঙা পাত্‌লা ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসি হাস্‌বে সে;
টাট্‌কা দুধের ননীর মত বুক দে' ভাল বাস্‌বে যে।

ফাগুন এলো ফাগ ছড়িয়ে বন-পরীরা সাজল গো!
তোমরা কি কেউ জান তাদের নূপুর কোথায় বাজল গো!

ভোলানাথ চন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন দত্ত তাঁহার ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ উপহার দিলে এক জন ইংরেজ তাঁহার রচনার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি যদি তাঁহার প্রতিভা মাতৃভাষার সম্পদ-বিধানে প্রযুক্ত করেন, তবেই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্তকে বাঙ্গালা রচনায় প্ররোচিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্য শশীচন্দ্র দত্ত ও স্বজন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইংরেজীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু স্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষা যত দিন থাকিবে তত দিন মধুসূদনের রচনা সমাদৃত থাকিবে। মধুসূদন সমালোচকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, তিনি "মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে" পাইয়াছিলেন—তাহার পূর্ব্বে "অবরেণ্যে বরি" কালক্ষয় মাত্র করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রও উপদেশ অবজ্ঞা করেন নাই।

ও দিকে তরু দত্তের ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ ও মৌলিক রচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া সমালোচক গস্ মন্তব্য করিয়াছিলেন বটে—

"When the history of the literature of our country comes to be written, there is sure to be a page in it dedicated to this fragile exotic blossom of song"—কিন্তু তাঁহার সে মন্তব্যও সার্থক হয় নাই।

বাঙ্গালী সুলেখকদিগের মধ্যে শশীচন্দ্র দত্ত, লালবিহারী দে প্রভৃতি যাঁহারা কেবল ইংরেজীতে গদ্য ও পদ্য রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াও আজ বিস্মৃতপ্রায়, ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। যেন মাতৃভাষার অভিসম্পাত তাঁহাদিগের রচনা বিস্মৃতির অতলতলে অবলুপ্ত করিয়াছে। অথচ তাঁহাদিগের প্রতিভা সেই সকল রচনা কেবল উপভোগ্যই নহে—জ্ঞাতব্য বহু উপকরণেও সজ্জিত করিয়া গিয়াছে, অনুশীলনতীক্ষ্ণ রচনাকৌশল সে সকল উপকরণ সমধিক মূল্যবান করিয়া গিয়াছে।

ভোলানাথের প্রতিভা কেবল রসরচনায় নহে, পরন্তু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে ও বিচারে, অর্থনীতিক দূরদর্শিতায়, বর্ণনায় ও জীবনী-রচনায় অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছে। অন্ততঃ দুইটি কারণে ভোলানাথ স্মরণীয় থাকিবার কথা—

(১) তিনিই সর্ব্বপ্রথম—গণিতবিজ্ঞানের সাহায্যে—প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, "অন্ধকূপ হত্যা"-বিবরণ হলওয়েলের "রচা কথা"। এই সিদ্ধান্তে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও বিহারীলাল সরকার তাঁহার বহু পরবর্ত্তী। যদি ভোলানাথের রচনা আদৃত থাকিত, তবে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জ্জনও ঐ মিথ্যা বিবরণ সত্য করিবার জন্য হলওয়েল-প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভ নিশ্চিহ্ন হইবার পরে, তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধানুভব করিতেন, সন্দেহ নাই।

(২) তিনিই এ দেশে শিল্পের সর্ব্বনাশ ও ফলে দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির প্রতীকারে প্রথম ইংলণ্ডের পণ্য বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখনও আয়ার্লণ্ডে "বয়কট" শব্দ রচিত হয় নাই। রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরেজী রচনায় প্রশংসা-বিরত হইলেও অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার অর্থনীতিক ইতিহাসে এ দেশের শিল্পনাশে ইংরেজের কার্য্য বিবৃত না হইলে, লোকের মন বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু যে "বয়কটের" প্রতিশব্দ হিসাবে বাল গঙ্গাধর তিলক "বহিষ্কার" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ভব হইবার (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ) অন্ততঃ ৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে ভোলানাথ স্বদেশী শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের উপায়রূপে বলিয়াছিলেন—"কোনরূপ দৈহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির কোনরূপ বিরোধিতা না করিয়া, আইনের কোনরূপ সাহায্য-ভিক্ষা না করিয়া (শিল্পে) আমাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের করায়ত্ত। আমাদিগের চরম দুর্দ্দশার প্রতীকারের একমাত্র উপায়—নৈতিক বিরোধিতা অবলম্বন—কোনরূপ অপরাধ নহে। আসুন আমরা সেই অব্যর্থ অস্ত্র ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হই—ইংলণ্ডের পণ্য আমরা ব্যবহার করিব না।"

স্বাবলম্বনের দ্বারা শিল্পরক্ষার প্রস্তাব প্রথম ভোলানাথ করিয়াছিলেন।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নদীর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু যে সকল সমৃদ্ধ বন্দরের ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছে, সপ্তগ্রাম সে সকলের অন্যতম। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সম্প্রদায় তথা হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, ব্যবসায়ী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় সে সকলের

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়ী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় প্রথমে চুঁচুড়ায় ও পরে, তথা হইতে, কলিকাতার ভাগ্যোদয়-সূচনা লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায়—নিমতলা পল্লীতে ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) ১০ই আশ্বিন, মাতুলালয়ে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা-মাতার প্রথম সন্তান—তিনি প্রসূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; তাঁহার মাতা ব্রহ্মময়ীর বয়স তখন পঞ্চদশবর্ষ মাত্র। তাঁহার মাতুল-পরিবারে ব্রহ্মময়ীই প্রথম বিধবা হ'ন ও পিতার মৃত্যুর পর ভোলানাথ প্রসূত হ'ন—এই দুর্ভাগ্যহেতু সে পরিবারের অনেকে, কুসংস্কার-বশে, প্রাতঃকালে ব্রহ্মময়ীর মুখদর্শন অশুভদ্যোতক মনে করিতেন এবং কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে গৃহসংলগ্ন একটি ভবনে বাসের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। ইহাতে কেবল যে মাতা ও পুত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দৃঢ়তর হইয়াছিল, তাহাই নহে—দীর্ঘ অবসর যাপনের উপায়রূপে মাতা নানা পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করেন। পুত্র তাঁহার নিকট রামায়ণ-মহাভারতের পুণ্য কথা শ্রবণ করিয়া জাতির ইতিহাসে শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। মাতা পুত্রের চরিত্র গঠনে ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। ভোলানাথ বলিয়াছেন, তিনি সর্ব্ববিষয়েই মাতার নিকট ঋণী।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে পল্লীর পাঠশালায় শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইয়া ভোলানাথ ম্যাকে নামক এক জন বিদেশীর নিমতলা পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে (গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়) প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজ তখন বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় ভোলানাথ যে সকল বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই দেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে ভোলানাথ সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়া শিক্ষক-দিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে ভোলানাথ যখন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বিবাহ করিয়া মাতুলালয় হইতে যাইয়া স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতাইয়া বসিয়াছেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি ব্যবসায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে প্রবেশ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাঙ্কের অন্যতম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায়। ভোলানাথ তাহার পূর্ব্বেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া—জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের সহিত একযোগে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাউয়ার্থ হার্ডম্যান কোম্পানীর কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেন্টের পদ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত কার্য্যে তাঁহাকে যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছিল এবং তাহাতেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (হিন্দুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত) পরিকল্পিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় ভোলানাথ সর্ব্বস্বান্ত হ'ন। তদবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভোলানাথ সাহিত্য-সাধনায় সান্ত্বনা ও শান্তি লাভে আত্মনিয়োগ করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন, (৩রা আষাঢ়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) পরলোকগমন করেন।

ভোলানাথের সকল রচনাই ইংরেজীতে।

প্রথম ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের পক্ষে ইংরেজীতে মত-প্রকাশের চেষ্টা করা স্বাভাবিক ছিল। তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে ইংরেজী সাহিত্য সমুদ্রেরই মত বিস্তৃত—সাগরেরই মত "হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ, দুরন্ত রাগদ্বেষঈর্ষাদি বাত্যাসন্তাড়িত"—তাহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা, মধুর নীলিমা, অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, জ্যোতিঃ, ছায়া—এ সব সাহিত্য-সংসারে দুর্লভ। তাহার তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্য উপেক্ষণীয়। বাঙ্গালা কবিতার গতিকে রাজনারায়ণ বসু গঙ্গার গতির সহিত উপমা দিয়াছেন—বাঙ্গালা কবিতা "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত", ও "মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বক্র ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরমরমণীয় সৌন্দর্য্যে" ভূষিত; কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেশকে পুণ্যভূমিতে পরিণতকারী, কাশীরামের মহাভারত কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী; রামেশ্বরের ও রামপ্রসাদের রচনা শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ; ভারত-চন্দ্রের রচনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিকীর্ত্তনকারী। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতা তখনও সবল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় নাই। আর বাঙ্গালা গদ্য তখনও পথিনির্দ্ধারণে অক্ষম। এক দিকে "সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের" দুর্ব্বোধ্য ভাষা—আর এক দিকে বিদ্রোহী টেকচাঁদের প্রচলিত কথ্য ভাষা। তাহা বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা সংস্কৃত হইলেও যাঁহার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে তাহা আনন্দে উচ্ছসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, করুণায় বিগলিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘৃণায় বিকুঞ্চিত, বেদনায় উদ্বেলিত হইয়াছিল সেই বঙ্কিমচন্দ্রের তখন কেবল আবির্ভাব হইয়াছে—তিনি ইংরেজী রচনার পথে পদার্পণ করিয়াই ভুল বুঝিয়া সে পথ ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের সম্ভাবনা তখনও ইংরেজী-শিক্ষিত সকল বাঙ্গালী বুঝিতে পারেন নাই, ভাবিতে পারেন নাই:—

দিবস বিকাশে যবে পুরবের গবাক্ষে কেবল
প্রবেশিয়া রবিকর কক্ষমধ্য করে না উজ্জ্বল;
সম্মুখে উদিত রবি অতি ধীরে পুরব গগনে—
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, হাসে ধরা কনক-কিরণে।

কি যত্নে তাঁহারা ইংরেজী রচনার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের রচনা-সাফল্যে সপ্রকাশ। কিন্তু ভোলানাথ প্রমুখ বাঙ্গালীর ইংরেজী রচনায় রচনা-নৈপুণ্যই লক্ষ্য করিবার একমাত্র বিষয় নহে। সে সকলে যে দূরদর্শিতার, বিশ্লেষণ-শক্তির, সত্য-নির্দ্ধারণের ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সকল যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনে ও উন্নতি সাধনে প্রযুক্ত হইত, তবে যে বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পকাল মধ্যে অসাধারণ শক্তি, সৌন্দর্য্য ও বিস্তার লাভ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দুর্ভাগ্য, এই সকল প্রতিভাবান বাঙ্গালী ভাষা ও সাহিত্য গঠনের যে কার্য্য ইচ্ছা করিলে করিতে পারিতেন, তাহাতে আত্মনিয়োগ করেন নাই। সেই জন্যই বহু দিন ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় অবজ্ঞার ভাবে বলিতেন—বাঙ্গালা স্ত্রীলোকের পাঠ্য। কিন্তু সেই নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষায় জ্ঞানালোক বিস্তার তাঁহাদিগেরই কেহ কেহ

করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যে 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) প্রচার করেন, তাহার প্রথম সংখ্যায় লিখিত ছিল :—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

বহু দিন পরে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) অরবিন্দ ঐরূপ মন্তব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive…"

ভোলানাথের মাতামহী বাঙ্গালা ব্যতীত সংস্কৃতও শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তাঁহার মাতা বাঙ্গালার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন।

ভোলানাথ বর্ণনায় চিত্রাঙ্কনপটু ছিলেন। যে দিল্লী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্তমণিশিখাবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তর-নির্ম্মিত মিনার গুম্বজ বুরুজ, ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে" তাহার সৌন্দর্য্য ও ইতিহাস তিনি যেমন যত্নসহকারে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যশোহর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কপোতাক্ষীকূলে শর্করা-শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র কোটচাঁদপুর গ্রামের ও তাহার কিম্বদন্তীর বর্ণনা তিনি তেমনই নৈপুণ্য সহকারে করিয়াছেন। এই কোটচাঁদপুর চলিত কথায় এইরূপে বর্ণিত :—

"মুচি, মাছি, গুড়,—
তিনে চাঁদপুর।"

ভোলানাথের গ্রন্থে বাঙ্গালার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—এক বার ধলেশ্বরী নদীর এক নির্জ্জন তীরে দেখা গেল, এক ধীবর কতকগুলি মৎস্য আহরণ করিয়াছে। সে—প্রত্যেকটি প্রায় আধ সের ওজনের—৪০টি মাছ অর্দ্ধ পয়সায় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল। সঙ্গে আধলা না থাকায় ভোলানাথ তাহাকে একটি পয়সা দিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে লোকের অবস্থার আভাস ইহাতে পাওয়া যায়।

ভোলানাথ কিরূপ ভাবে বর্ণনার সহিত গবেষণার সম্মিলন করিতেন, তাহা "অন্ধকূপ হত্যা" সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি হলওয়েল তাঁহার প্রদত্ত "অন্ধকূপের" যে মাপ ও তাহাতে বন্দী লোকের যে সংখ্যা দিয়াছেন এবং যাহা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন—তাহার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—দাড়িম্ব ফলের মধ্যে বীজ যেরূপ ঘনবিন্যস্ত সেরূপ করিলেও ঐ স্থানে অত লোক বদ্ধ করা অসম্ভব। ভোলানাথের পূর্ব্বে কেহই এই বিষয় গণিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষা করেন নাই।

যিনি অসাধারণ নিষ্ঠা সহকারে ভোলানাথের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, সেই মন্মথনাথ ঘোষ যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"এই গ্রন্থের (ভ্রমণ-বৃত্তান্তের) একটি বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক তথ্য, কিম্বদন্তী, আখ্যায়িকা ও দেশাচারসমূহের এরূপ নিপুণ ও ভাবময় সমাবেশ ইহার পূর্ব্বে বা ইহার পরে ভারত সম্বন্ধীয় কোনও লেখকের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কেহ বা অতীতের গর্ভ হইতে ভারতের প্রামাণিক সূক্ষ্ম ইতিহাস সঙ্কলনে গভীর গবেষণা, অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; কেহ বা এ দেশীয় সামাজিক বা ধর্ম্মগত জীবনের অনুশীলনে ও বিশ্লেষণে ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের নিদর্শন দিয়াছেন। কিন্তু বহির্ভারতের যুগান্তকারী বিপর্য্যয়সমূহের চিত্তগ্রাহী আলোকচিত্রের সহিত অন্তর্ভারতের প্রাণমজ্জার সন্নিবেশে ভোলানাথ যে অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই অপূর্ব্ব রহিবে। কল্পনার মোহিনী শক্তিবলে গ্রন্থকার বাস্তবিক ভারতের অন্তরতর জীবনী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

সত্যসন্ধান-স্পৃহার সহিত দেশবাৎসল্যের সম্মিলন ও দূরদর্শন-ক্ষমতা এই সাফল্যের কারণ। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থায় আলোচনায় আমরা ইহার পূর্ণ পরিচয় পাই।

দেশপরিভ্রমণ কালে ভোলানাথ দেশবাসীর অবস্থা, দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য, দেশের শিল্প-নাশ, দেশে বিদেশী পণ্যের প্রচলন বৃদ্ধি—এ সকল লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন ও প্রতীকারোপায় চিন্তা করিতেছিলেন।

ইংরেজ কিরূপে ভারত শোষণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লর্ড রথারমিয়ার বলিয়াছিলেন—ইংরেজের প্রত্যেক নর-নারীর আয়ের ১৫ টাকার ৩ টাকা অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত। ডীন ইঞ্জে বলিয়াছেন, ভারত হইতে লুণ্ঠিত অর্থই ইংলণ্ডের আর্থিক উন্নতির ও ইংরেজের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কারণ।

কিন্তু ইংরেজরা যেমন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহারাই শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যের দ্বারা ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, তেমনই কোন কোন ভারতীয়ও সেই মত প্রচার করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মল্লিক ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ "বাঙ্গালার বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রকাশ করেন। কৃষ্ণমোহন ভারত সরকারের দপ্তরে চাকরী করিয়াছিলেন এবং ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মতিলাল শীলের দক্ষিণহস্ত-রূপে কাজ করিতেন। তাঁহার পুস্তক ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের প্ররোচনায় ও মতিলাল শীলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না—অর্থাৎ তাহা ইংরেজের "প্রচার" কি না, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রতিপাদ্য—ভারতের বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

ভোলানাথ এই মত খণ্ডন করিয়া ধারাবাহিকরূপে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র লেখক কে তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি, যে পত্রে উহা প্রকাশিত হয় তাহার, সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন—

"The article on commerce I read with avidity. Is Bholanath Chandra the writer ?"

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার মনীষি-সমাজ ভোলানাথের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাহার আদর করিতেন।

"প্রবন্ধের প্রথমেই ভোলানাথ বলেন, ইংরেজ সরকারের রিপোর্টে বলা হয়, দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তাহা সত্য নহে ; কারণ—বাণিজ্যলব্ধ লাভের অধিকাংশ বিদেশে যাইতেছে এবং দেশবাসী দিন দিন অধিক দরিদ্র হইতেছে। বাণিজ্য বিষয়ে সরকারের অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যুরোপীয় বণিকরা অর্থার্জ্জনের জন্যই এ দেশে আসিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারা যে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। এ দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু রচনা থাকিলেও শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে রচনার অভাব। সেই অবস্থায় কৃষ্ণমোহন যে ৭০ বৎসর বয়সে তিন খণ্ড পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সে জন্য তিনি প্রশংসার্হ। এই কথা বলিয়া ভোলানাথ মন্তব্য করেন—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনিও যথার্থ অবস্থা সম্যক্ বিবৃত করেন নাই এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিমূলক। "রেশম, নীল, চা প্রভৃতির বাণিজ্যের তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বাণিজ্যে কাহারা লাভবান ও কাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা তাঁহার বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় না। (অর্থাৎ এই সকল পণ্যের বাণিজ্যে যুরোপীয়রা যে ভারতীয়দিগের ক্ষতি করিয়া আপনারা লাভবান হইতেছেন, তাহা বলা হয় নাই।) রেশমের রপ্তানী বৃদ্ধিতে (অর্থাৎ রেশমী কাপড় বয়ন না করিয়া রেশম রপ্তানীতে) ভারতবাসীর আনন্দিত হওয়া উচিত কি দুঃখিত হওয়া সঙ্গত, তাহা বুঝা যায় না। ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো হইতে সুলভে সূতী কাপড়ের আমদানী যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তজ্জন্য কৃষ্ণমোহন ইংরেজদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাতে দেশের তন্তুবায়গণ যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। বস্তুতঃ, কৃষ্ণমোহন তাঁহার কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছেন (অর্থাৎ একদেশদর্শিতা হেতু প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করেন নাই)। দেশীয় শিল্পের কিরূপ উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা দেশীয় রাজনীতিকদিগের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণমোহনের এ বিষয়ে ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অবিলম্বে ভারতের বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।"

ভোলানাথের বহু দিন পরে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন—দেশের অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষাও ভয়াবহ ; কারণ, অর্থনীতিক পরবশ্যতার বিষ জাতির শক্তি পঙ্গু করে। আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেও অর্থাৎ ভোলানাথের মন্তব্যের ৩২ বৎসর পরেও বাঙ্গালীদিগকে কংগ্রেসে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন সমর্থক প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল এবং পরবৎসরও কংগ্রেসে তাহার বিরোধীর অভাব হয় নাই।

ভোলানাথ দুঃখ করিয়াছিলেন, ভারতীয় বণিক্ বা জাহাজের অধিকারী নাই বলিলেই হয়, দেশী বীমা কোম্পানী নাই, বিদেশী ব্যবসা কেন্দ্রে ভারতীয় প্রতিনিধি নাই—অথচ এই সকল ব্যতীত দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি সম্ভব নহে।

তিনি বলিয়াছেন—দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন জন্য বিদেশী মূলধন প্রয়োগ না করিয়া দেশেই মূলধন সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য ; (ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত) অবাধ বাণিজ্যনীতি বর্জ্জন করিয়া সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে ; বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা দেশে শিল্প-পরিচালন করা উচিত ; শিল্পশিক্ষাদান জন্য বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা, জাহাজ নির্ম্মাণ ও ভারতীয় জাহাজে ভারতীয় পণ্য য়ুরোপে ও আমেরিকায় প্রেরণ—এ সকলের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য।

এ সকল উক্তি বিবেচনা করিলে ভোলানাথকে ভারতীয় অর্থনীতিক স্বাধীনতার প্রথম প্রচারক বলিতে হয়।

দেশীয় সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভোলানাথের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ এখন সম্ভ্রমলাভ করিয়াছে। এই সকল পত্রের উক্তিতে যে পুরুষোচিত স্বাধীনতার সুর ধ্বনিত হয়—শ্রদ্ধা ও মনোযোগ লাভ করিবার জন্য জাতির পক্ষে—তাহা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তথাপি বিশৃঙ্খলাহেতু ইহাদিগের কাজ ব্যর্থ হয়। ইহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে কাজ করে এবং ইহাদিগের আক্রমণও ধারাবাহিক নহে। জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে হইলে এই সকল পত্রকে নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বন করিয়া—নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমসাময়িক মতের প্রচারক না হইয়া, সমসাময়িক জনরবের প্রতিধ্বনি করিয়া উদ্যমের অপব্যবহার না করিয়া যাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্যে অবহিত হওয়াই এই সকল সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য। কার্য্যকরী জ্ঞানবিস্তার করা ইহাদিগের কর্ত্তব্য। ইহাদিগের কাজ—কৃষক ও শ্রমিক-সম্প্রদায়কে তাহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবী করিতে ও পুরাতন ব্যবসা অবলম্বন করিতে বলা। সংবাদপত্রে তাহাদিগের প্রকৃত স্বার্থ সমর্থন করিতে হইবে। সংবাদপত্রের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগের যে তন্দ্রা বিদেশী শাসকদিগের কার্য্যফল তাহা দূর করার জন্য ভোলানাথ উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, দেশীয় শিল্পের অঙ্গ ভঙ্গ করা হইয়াছে—তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, দেশীয় ব্যাঙ্ক ও কোম্পানী স্থাপনের, দেশীয় বণিকসঙ্ঘ গঠনের জন্য লোককে অবহিত হইতে বলা ভারতীয় সংবাদপত্র-সমূহের কর্ত্তব্য। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া লোককে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিতে বলা, ত্যাগস্বীকার ও দেশপ্রেমের অনুশীলন যে প্রয়োজন তাহা ঘোষণা করা দেশীয় সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য।

"They should sedulously strive for the subversion of the policy which, in addition to our political slavery, has steeped the country also in an industrial slavery."

যে অর্থনীতিক পরবশ্যতার অভিশাপ ভারতবাসীকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মোচন যে স্বাবলম্বন ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা দেশবাসীকে মুক্তিমন্ত্রের সন্ধান দিয়াছিলেন, ভোলানাথ তাঁহাদিগেরই এক জন। বিশেষ বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের উপদেশ তিনিই সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন।

ইংরেজ কিরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া এ দেশের সমৃদ্ধ শিল্প-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং এ দেশের বয়নশিল্পের বিনাশ সম্পর্কে উইলশন তাহার উল্লেখও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ দেশের নৌনির্ম্মাণ-শিল্পের ও আরও বহু শিল্পের ইতিহাসও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ। ভোলানাথ যে সাহসে শাসক-সম্প্রদায়ের দেশের পণ্য বর্জ্জন করিবার জন্য স্বদেশীয়দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সাহস বহু দিন পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল। সে কথা আমরা কংগ্রেসে বাঙ্গালার বিলাতী পণ্য বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার ব্যাপারে উল্লেখ করিয়াছি। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সে প্রস্তাব প্রথম বাঙ্গালী ভোলানাথ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত ভোলানাথ অকুণ্ঠ কণ্ঠে দেশের লোকের সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ অপবাদের প্রতিবাদ করিতেন। হিন্দুরা বিদেশ-গমন-পরাঙ্মুখ এই প্রচলিত বিশ্বাস যে বিচারসহ নহে, তাহাও ভোলানাথ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে জন্য, বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক প্রমাণ পুঞ্জীভূত করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘনের বিরোধিতা করায় ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠানুভব করেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়ম উইলশন হাণ্টার ভোলানাথের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক রচনা সম্পর্কে ভোলানাথের সাহায্য গ্রহণও করিয়াছিলেন। হয়ত ভোলানাথের রচনাই তাঁহাকে বাঙ্গালীর সমুদ্রলঙ্ঘন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল :—

"Such voyages were associated chiefly with the Buddhist era, and became alike hateful to the Brahmans and impracticable to a deltaic people whose harbours became high and dry by the land-making rivers and the receding sea. Religious pejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the ocean."

বাঙ্গালীর প্রতিভার সর্ব্বতোমুখিতায় ভোলানাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, কেবল সুযোগ ও শিক্ষার অভাবেই ভারতীয়দিগের বাণিজ্যবিষয়ক ও সামরিক প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইতে পারিতেছে না—সুযোগ ও শিক্ষা পাইলেই তাহারা সামরিক কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। আজ এ কথা আর প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভোলানাথের সময়ে ছিল। ভারতীয়-দিগের মধ্যে বাঙ্গালী—ইংরেজের মতে—অসামরিক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় চন্দননগরের যে ৩০ জন বাঙ্গালী ফরাসী সেনাদলে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সুযোগ পাইয়া গোলন্দাজের কার্য্যেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আর তাহারও পূর্ব্বে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যুক্তপ্রদেশে মুন্সেফ বাঙ্গালী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করায় ইংরেজের নিকট "যোদ্ধা মুন্সেফ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

দেশ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিসমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ হয় এবং দেশবাসী স্বায়ত্ত-শাসনশীল হয়, ইহাই দেশপ্রেমিক ভোলানাথের কাম্য ছিল। সেই জন্যই তিনি পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের ও কালোপযোগী প্রথা-প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সে বিষয়ে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন ভারতে ইংরেজের আর্থিক নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তাহা "at first prohibitive, next aggressive, then suppressive it has at last become repressive" তেমনই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাতে ভোলানাথের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

বার্দ্ধক্যও ভোলানাথের সাহিত্যিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। বয়স যখন ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তখন, অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি দিগম্বর মিত্রের জীবন-চরিত রচনার ভার গ্রহণ করিয়া ২ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য :—

"এ দেশে একাল পর্য্যন্ত, যতগুলি জীবনবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই শীর্ষস্থানে এই গ্রন্থ সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল সমাবেশে এবং লিপিনৈপুণ্যে, উপস্থিত আলোচ্য গ্রন্থ, আমাদের এই শ্রেণীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা যতগুলি গ্রন্থ আছে—আমরা জানি, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। * * রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন তাঁহার সময়ের প্রায় ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। জীবনীলেখক সে ইতিহাস প্রস্ফুট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সে চেষ্টা সাধারণতঃ সফলও হইয়াছে।"

বিদেশী শাসকগণের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে যে জাতীয় শিক্ষালাভ সম্ভব নহে, তাহা বুঝিয়া ভোলানাথ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিরাট দানে যে আমাদিগের দেশে স্বাধীন জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হইয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয়। আরও এক বার সেরূপ সুযোগ আমরা হারাইয়াছিলাম। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। আইনগত কারণে তাঁহার উইল অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ভোলানাথের সময়ে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান তীব্রতা লাভ না করিলেও শিক্ষিতদিগের কাজের অভাব অনুভূত হইতেছিল। তাহা যে হইবে, তাহা উইলিয়ম উইলশন হাণ্টারও অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে যাহারা শৃঙ্খলা-বর্জ্জিত, সন্তোষহীন ও ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা লাভ করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারা কি করিবে? তাহার উত্তর ভোলানাথ দিয়াছিলেন—পরবর্ত্তীরা শিল্পে আত্মনিয়োগ করিলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পপতিদিগের মত বিপুল অর্থলাভ করিতে পারিবেন। বয়কটের স্থানে তিনি যে "নৈতিক বিরোধিতা" ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা যে অমোঘ অস্ত্র সে বিশ্বাস তাঁহার ছিল।

দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কয় বৎসর মাত্র পরে (১৯১০ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে) ভোলানাথের মৃত্যু হয়। তখনও তিনি অক্লান্ত ভাবে সাহিত্যসেবা করিতেছিলেন এবং তিনি যে সকল প্রস্তাব রচনার আয়োজন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, সে সকলের তালিকা দেখিলে তাঁহার পরিকল্পিত কর্ম্মের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বুঝিতে পারা যায়—

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস

(২) জগৎ শেঠ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(৩) রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত

(৪) মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—শিবাজী, নানক, রাণা সঙ্গ, প্রতাপাদিত্য, ভারতচন্দ্র—ইত্যাদি

(৫) ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস

(৬) ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নের ও প্রথম দুই খণ্ডের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। সুতরাং ইংরেজীতে যাহাকে বলে "died in harness" অর্থাৎ কাজ করিতে করিতে মৃত হইয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে তাহাই বলা যায়।

দেশীয় ও বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে লোককে সাহিত্যিক ব্যাপারে সাহায্য দান সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত ভোলানাথের মতভেদ ছিল। ভোলানাথ ইংরেজ হাণ্টারকেও সাহিত্যিক সাহায্য দানে দ্বিধানুভব করেন নাই; কিন্তু হাণ্টার উড়িষ্যা সম্বন্ধে পুস্তক রচনাকালে উপকরণের জন্য রাজেন্দ্রলালের সাহায্যপ্রার্থী হইলে রাজেন্দ্রলাল সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল বলিতেন, দেশীয়দিগের শ্রমলব্ধ উপকরণ লইয়া বিদেশীরা প্রশংসা লাভ করিবেন, ইহা অসঙ্গত মনে করা দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্রলালকে যেরূপ সংগ্রাম করিয়া বিদেশী পণ্ডিতদিগের বিরোধিতা প্রহত করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ মত পোষণ করা বিস্ময়কর নহে। কানিংহাম ও ফার্গাশন, বিশেষ ফার্গাশন, যেরূপ অশিষ্ট ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা নিন্দার্হ। ভোলানাথও বিদেশী লেখকদিগের ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত অসঙ্গত আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। কানিংহাম তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। কিন্তু ভোলানাথ রাজেন্দ্রলালের মত যোদ্ধৃপ্রকৃতি ছিলেন না। সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলীর' উক্তি—

"ভোলানাথ পূর্ব্বযুগের আদর্শ বাঙ্গালী ছিলেন—মিষ্টভাষী, নম্রস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি—আদর্শে ও আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যিক। তিনি শান্তির পরিবেশে—সর্ব্ববিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া কেবল নির্ব্বিরোধে আপনার কাজ করিতে ভালবাসিতেন।"

ভোলানাথের স্বদেশপ্রীতি তাঁহাকে দেশের উন্নতির বিরোধী শাসন-পদ্ধতি, শিল্পনীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি—এ সকলের তীব্র প্রতিবাদে প্ররোচিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কুত্রাপি ধৈর্য্যচ্যুত হ'ন নাই। তিনি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া মত প্রকাশ করিতেন না; প্রমাণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া মন্তব্য করিতেন না; কোথাও স্বদেশপ্রীতি বিস্মৃত হ'ন নাই। তিনি বিদেশীর ভাষাই রচনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ভাষায় তাঁহার অধিকার তাঁহার রচনানৈপুণ্যে সাহায্যই করিয়াছিল। 'এডুকেশন গেজেট' তাঁহার রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা "বিখ্যাত কলাবতের গাহনার 'করতোপের'মত গৌরবান্বিত।" কিন্তু ভোলানাথের রচনার গৌরব, ভাষার ঝঙ্কারে, উপমান অলঙ্কারে নহে—তাহার গৌরব তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞানপরিচয়ে ও স্বদেশপ্রীতির সৌরভে। সেই গৌরব তাঁহাকে বাঙ্গালীর নিকট—কেবল বাঙ্গালীর নিকটেই নহে—বরণীয় করিয়া রাখিবে এবং ভবিষ্যৎ লেখকরা তাঁহার রচনা উপকরণের অক্ষয় ও মূল্যবান খনিরূপে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইবেন, তাঁহাকে সাদরে স্মরণ রাখিবেন—"রাথে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

ডেসডিমনার মৃত্যু

শান্তিকুমার ঘোষ

শেষ বার তাকে চুম্বন করে কম্পিত কালো মূর:
উজ্জ্বল মুখে স্বর্গের আলো বিভ্রম আনে মনে,—
উপহার নয়—শেষ দান আজ—দণ্ড সে মৃত্যুর!

তপ্ত পরশে ভেঙে গেল ঘুম—চোখের পাপড়ি খোলে।
নাই ছায়া নাই—কোনো গ্লানি নাই—অম্লান এ কি ফুল!
ডেসডিমনার বড়ো বড়ো চোখ সরোবর সম দোলে।

মুক্তায় গাঁথা দীর্ঘ বেণী সে জুড়ে আছে উপাধান,
দেহ-সৌরভে পাগল করেছে—বেদনায় দিশাহারা:
আমারই আঘাতে হৃদয় আমার হয়ে যাবে খান্ খান্!

উদ্দাম হাওয়া গর্জ্জন করে সাগরের বুকে বুকে—
ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলছে—পৌরুষে হানে বাজ!
জীবনের মত বিদায় দিয়েছে ওথেলোর সুখ-দুখে।

কঠিন নিয়তি করুণ শিয়রে—মৃত্যুর মত ক্রূর
উলঙ্গ ছায়া পড়েছে দেয়ালে—ছায়া সে দীর্ঘতর:
ফুৎকারে বাতি চকিতে নিবাল' কম্পিত কালো মূর।

CASTROL

ইয়োলো রোজ

বারি দেবী

প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। উড স্ট্রীটে রণজিৎ মিত্র ওরফে রেণ মিটারের বাড়ীতে এলেন এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট অশোক ব্যানার্জ্জি। সঙ্গে তাঁর দু' বছরের শিশু কন্যা। রেণ মিটারের ফরাসী পত্নী মিসেস্ রোজালিয়া মিটার বাসন্তী রংএর ফ্রক-পরা ফুলের মত মেয়েটিকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে, নাচের ভঙ্গিতে দুটো পাক্ খেয়ে সোল্লাসে বলে ওঠেন, হাউ বিউটি-ফুল এ ইয়োলো রোজ!

রেণ মিটার আবাল্য বন্ধুকে সাদর সম্ভাষণে বসালেন তাঁর সুসজ্জিত ড্রইং-রুমে। ওঁদের বছর পাঁচেকের পুত্র পল্লব মেয়েটিকে তার মায়ের কোলে দেখে ভারি খুসি হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ কে মামী? তার মা বলেন, তোমার একটি বাহবোন ইয়োলো রোজ!

ওঁদের দুই বন্ধুর আজ দেখা হোল প্রায় দশ বছর পরে! রেণ মিটার বাঙালী ক্রিশ্চান। এলাহাবাদেই বাল্যকাল ও ছাত্রাবস্থা কেটেছে তাঁর। পরে জার্ম্মাণে যান ডাক্তারী পড়বার জন্য, সেখান থেকে সসম্মানে ডিক্রি নিয়ে ফিরে আসবার সময় ফরাসিনীকে বিবাহ করে সঙ্গে নিয়ে এসে এখন বাস করছেন তাঁর উড স্ট্রীটের বাড়ীতে।

সম্প্রতি তিনি চিঠি পান অশোক বাবুর কাছ থেকে—তাঁর জন্য এখানে একটি বাড়ী ঠিক করে দেবার জন্য। তাঁর স্ত্রী কয়েক মাস হল মারা গেছেন একটি শিশু কন্যা রেখে; এখানে তাঁর মোটে মন স্থির হচ্ছে না, সে জন্য কলকাতাতে প্র্যাক্‌টিস্ করবেন। তাঁর কথা মত রেণ মিটার বাড়ী ঠিক করেছেন, তাঁরই কম্পাউণ্ডের ভিতর তাঁর একখানি বাড়ী ভাড়া দিতেন, সম্প্রতি সেটি খালি আছে।

পরদিন অশোক বাবু কন্যাকে নিয়ে সেই বাড়ীতে চলে গেলেন। সংসার সাজাবার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না তাঁর; কাজেই মিসেস্ মিটার, গেলেন বাড়ী-ঘর গোছ করে সাজিয়ে দিতে। খানাপিনার তদারক করা, মেয়েটির আয়া ঠিক মত যত্ন নিচ্ছে কি না, সে সব দেখা নিত্য-নিয়মিত কাজ হয়ে উঠলো তাঁর!

দিন, মাস, ক্রমে বছরের পর বছর কেটে গেল; ছোট্ট মেয়েটি কিশোরীর ধাপে এসে পৌঁছেছে! পল্লব ওরফে পলের ডাক শুনে সে-ও মিসেস্ মিটারকে ডাকে মামী বলে! মিসেস্ মিটারের গভীর স্নেহচ্ছায়ায় দুটি শিশুতরু ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে! তাঁর দেওয়া ইয়োলো রোজ নামটির তলায় অশোক বাবুর মেয়ের বাসন্তিকা নামটা চাপা পড়ে ক্রমে মিলিয়ে গেছে।

অশোক বাবুর পরম কৃতজ্ঞভরা হৃদয় থেকে গভীর শ্রদ্ধা উছলে পড়ে ঐ মহীয়সী মহিলাটির উদ্দেশে। মাতৃহারা শিশু কন্যাটিকে নিয়ে তিনি মহা দুর্ভাবনায় কত দিন-রাত কাটিয়েছেন,—কেমন করে তিনি এই ফুলটিকে বাঁচিয়ে তুলবেন? এ সম্বন্ধে যে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাঁর। ভগবান বুঝি তাঁর অন্তরের ডাক শুনেছিলেন, তাই···তাঁর শিশু কন্যার জন্যে এই মহিলার অন্তরে স্বর্গীয় মাতৃস্নেহ সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

মিসেস্ মিটারের কন্যার শূন্য স্থান পূরণ করেছিল ইয়োলো রোজ! তিনি নিজ হাতে দুটি শিশু, পল্ আর ইয়োলোকে নিজের মনোমত উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে দেখতেন, স্বহস্তে ওদের আহার করাতেন। তার পর ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে ওদেরই জন্য নিত্য-নতুন ফ্যাসনের পোষাক তৈরী করে তার ওপর কারুকার্য্য করতে বসতেন।

বিকেল বেলা কম্পাউণ্ডে ওদের খেলায় নিজে যোগ দিতেন। আশে-পাশের বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তিনি রকমারি খেলায় ওদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী আর মিঃ মিটার লনে বসে পরম কৌতুক ভরে উপভোগ করতেন মিসেস্ মিটারের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের উল্লাসভরা ক্রীড়া-কৌতুক!

এদের ছুটি পরিবারের আনন্দোজ্জ্বল ভাগ্যাকাশে হঠাৎ দেখা দিল এক খণ্ড কালো ঝড়ের মেঘ। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র তিন দিনের জ্বরে রেণ মিটার মারা গেলেন।

পরম ধৈর্য্যশীলা রমণী মিসেস্ মিটার, পল্ আর ইয়োলোকে তাঁর শোকদগ্ধ বুকে জড়িয়ে নিয়ে নীরবে কয়েক দিন কাটালেন। তার পর আবার ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যের ছকে পা ফেলে চলতে লাগলেন। শুধু ফিরে পেলেন না তাঁর পূর্ব্বেকার শিশুসুলভ চাপল্য। অশোক ব্যানার্জ্জির জীবনে আবার এলো সাথিহারার মহাশূন্যতা!

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। ইয়োলো আর পল্ কলেজে পড়ে! মিসেস্ মিটার ওদের শেখান চিত্রাঙ্কন, তাঁর বড় আদরের ভায়োলিনটা আবার নিয়ে বসেন ওদের শেখাবার জন্ম। অবসর সময়ে চলে ওদের কাব্যচর্চ্চা! শেলি, বায়রণ, মিল্টন, তার সঙ্গে বিশ্বকবির কাব্যে ওদের পড়ার ঘরটি গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে!

সেদিন সন্ধ্যায় লনের ফুল-ভরা ঝোপের পাশে আনমনা ভাবে দাঁড়িয়েছিল ইয়োলো! মনটা তার ভালো নেই! এত কাল পরে কোথা থেকে এসেছে তার ভারিক্কি ধরণের এক মামা আর মামী। আর খিটখিটে বুড়ি একটা, সে না কি তার দিদিমা! অবশ্য ওদের বাড়ীতে তাঁরা ওঠেন নি ম্লেচ্ছ কারবার বলে। আগে কার্য্যোপলক্ষে থাকতেন হায়দ্রাবাদে। এত দিনে অবসর মিলেছে, তাই এসেছেন ওর খোঁজ-খবর করতে।

দিদিমা বাড়ীতে পা দিয়েই ওকে জড়িয়ে ধরে মৃতা কন্যার নাম ধরে খুব খানিকটা কেঁদে নিলেন। ইয়োলো অবাক হয়ে দেখছিল নতুন উপসর্গগুলোকে! অমন ডাকছাড়া কান্নাও সে এর আগে শোনেনি!

মিসেস্ মিটার এসেছিলেন ওঁদের আগমন-বার্ত্তা পেয়ে; তিনিও ব্যাপার দেখে কি বলবেন স্থির করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে দিদিমা বললেন, ও আবার কে?

ইয়োলো মৃদু স্বরে জবাব দেয়—মামী।

—মামী? কার মামী রে? তোর মামী তো মাত্র একটি, এই তো তোর মামী! তিনি তাঁর পুত্রবধূর দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করেন!

অশোক বাবু সুগম্ভীর স্বরে জবাব দেন,—উনি আমার বন্ধু-পত্নী এবং ইয়োলোর প্রকৃত উনিই মা। আপনার কন্যা শুধু ওর গর্ভধারিণী মাত্র। তাঁর অসমাপ্ত মাতৃকাজগুলো উনিই সম্পাদন করেছেন। ওঁর অসীম মমতা ও স্নেহ না পেলে হয় তো ইয়োলোকে বাঁচানো সম্ভব হত না!

দিদিমা অপ্রসন্ন ভাবে মুখ ফিরিয়ে কপালে হাত দিয়ে বলেন,—বরাত আমার, সোনার চাঁদ মেয়ে দেখলে না তার মাকে, পরে পরে মানুষ হচ্ছে।

ইয়োলো দিদিমার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে ছুটে যায় মিসেস্ মিটারের দিকে, তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে। চুপি চুপি বলে,—চলো মামী, বড্ড ক্ষিদে লেগেছে, খেতে দাও।

মিসেস্ মিটার কন্যা সহ নিজের বাড়ীতে যাবার জন্ম পা বাড়ালেন।

ইয়োলোর মামা সঞ্জয় বাবু প্রশ্ন করেন ভগিনীপতিকে… ও কি ওঁর বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করে না কি? থাকে বুঝি ওখানেই?

অশোক বাবু সংক্ষেপে জবাব দেন—হ্যাঁ।

আরও ক'দিন পরে সঞ্জয় বাবু বলেন,…বুঝেছো ব্যানার্জ্জী! গড়েহাটায় আমি একখানি বাড়ী দেখেছি; বাড়ীটা দু'ভাগে ভাগ করা; তুমি আর আমি দু'জনে মিলে যদি বাড়ীটা কিনে ফেলি তবে উভয় পক্ষেরই বেশ সুবিধা হয়! আর… সারা জীবন তো কাটালে ভাড়াটে বাড়ীতে; এবারে নিজের বাড়ীতে একটু আরাম কর।

অশোক বাবু হেসে বলেন,—এখানে তাঁর আরামের কিছুমাত্র অভাব নেই। বরং অন্যত্র গেলে মেয়েটি যেতে চাইবে না তার মাকে ছেড়ে।

বিস্মিত ভাবে বলেন সঞ্জয় বাবু—আরে সেই জন্মই তো… তোমার যাওয়া দরকার। সমাজ বলে একটা জিনিষ… এর পরে মেয়েটির ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়া মুস্কিল… পক্ষে যে!

অশোক বাবু নীরব থাকেন, বোধ হয় কি…

শাশুড়ী বলেন—মেয়েকে যে একেবারে ফিরিঙ্গি… বাবা! আমাদের সমাজে মেলা-মেশা না করলে ভা… পাবে কি করে?

এক দিন হঠাৎ মামা এসে হাজির হলেন, ইয়ো… যাবেন! বাবার অনুরোধে তাকে যেতেই হলো।…

দিদিমা শাড়ী ও ব্লাউস নিয়ে এলেন,—আদর করে ব… ও খৃষ্টানি পোষাক খুলে ফেল তো দিদি, লোকে দেখলে… করবে; বড় হয়েছো কিনা।

তার পর নিজের মত সাজিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, সগর্ব্বে বলেন, এইবার কেমন মানালো দেখো তো? এমন সুন্দর প্রতিমার মত মেয়ের গায়ে কি বাপ এক টুকরো সোনাও দেয়নি গা? আহা! মা থাকলে কি এই হালে থাকতো?—আঁচলে চোখ মোছেন দিদিমা।

ইয়োলো অবাক হয়ে শুনছে কথাগুলো। হঠাৎ তার কি এমন দুঃখের দশা দেখলো এরা যে শোক উথলে পড়ছে?

সে বলে, আমি তো বেশ ভালোই আছি; আমার জন্যে আপনারা এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? বুঝতে পারি না।

—আহা, ছেলেমানুষ তুমি কি আর বোঝো দিদি? তার পর নিচু গলায় বলেন, তারপর, বাপ তো তোমার ঐ মেম মাগীটাকে নিয়ে ভুলে আছেন; তোমার দিকে কি লক্ষ্য আছে তাঁর? কিন্তু আমরা তো তা সইবো না, এত দিন দূরে ছিলাম, কিছু টের পাইনি, এখন যখন চোখের সামনে সব দেখছি, তখন শীগ্‌গিরই এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি।

ইয়োলো হাঁ করে চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে—তার পর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় ; বলে—আমাকে এখুনি দিয়ে আসুন বাবার কাছে ! আর আমার মামীর আর বাবার সম্বন্ধে অমন কথা কখনও বলবেন না,···বলতে বলতে সে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ! ওর মামীমা পিছন পিছন ছুটে যায় ওকে আটকাবার জন্য।

মামা ধমক দেন দিদিমাকে···করলে কি ? কোথায় ভালো কথায় বুঝিয়ে ওদের বার করে নিয়ে আসবে ; না মেয়েটাকে দিলে চটিয়ে ? এখন তোমার জামাই সব শুনে যদি বিগড়ে বসে, তাহলে মাথায় থাকবে আমার বাড়ী কেনা।

দিদিমা গজ-গজ করতে থাকেন,—তা কি জানি বাপু, ভালো বলতে গেলাম মন্দ হোল, নাকে-কানে খৎ, আর কিছু বলছিনি ! বাবা মেয়ে নয় তো যেন বিছু।

মামা মামী অনেক বুঝিয়ে ইয়োলোকে নিয়ে আসেন ! মামা সখেদে বলেন,—ওঁর কথায় কি রাগ করে মা ? শোক পেয়ে ওঁর মাথার ঠিক নেই।

তার পর চলে ভাগনীর আদরের ঘটা ! রকমারি উৎকৃষ্ট তরকারী আট-দশটি বাটিতে সাজানো, লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস ···মামীমা যত রকম জানেন সব আজ রেঁধেছেন !

···ত্রে অশোক বাবুরও নেমন্তন্ন এখানে ! মেঝের ওপর প্রথম ···নে বসে খেতে ইয়োলোর ভারি অসুবিধা সত্ত্বেও, কেমন ···লাগছিলো, হাতে করে খাওয়ায় অনভ্যস্ত ; সেজন্য প্রায় তিমিড় যাচ্ছিলো খাদ্যগুলো ! দু'হাতে সে খেতে থাকে ; ওরকে ··· হয়ে চেয়ে ভাবেন, মেয়েটা বাঁদর নাকি ? মানুষে এ্যাডভোকেট অশোক খায় ? মা গো ছিঃ এঁটো করলে ! মামীমা বেশ মিটারের ফর্সা নিজে বসলেন ভাত মেখে ওকে খাওয়াতে—হাসতে ফ্রক-পরা ফুলের ;—রান্নাগুলো কেমন হয়েছে বলো তো ? সব রেঁধেছি নাচের ভঙ্গিতে।

ফুল এ ইয়োলো ভুলে গেছে কিছুক্ষণ আগের কথা,···অল্প হেসে বলে,—বেশ ভালো হয়েছে, এর আগে এ রকমের রান্না আমি সুসজ্জিতছিনি কি না।

তার ··· রাত্রে অশোক বাবু এসে কন্যাকে দেখে অবাক হয়ে যান ! ··· সোনালী রুক্ষ চুলগুলো তার তৈলসিক্ত ও বেণী করে ঘুরিয়ে খোঁপা বাঁধা, তাতে শোভা পাচ্ছে কটকী কাজের রূপোর ফুল ! হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার ! জর্জেট শাড়ী ও ব্লাউস-পরা ইয়োলোকে দেখে দপ্ করে মনে জ্বলে উঠলো আরেকখানা ছবি, সেটি তাঁর কুড়ি বছর আগে হারানো পত্নীর চেহারা।

মেয়েকে আদর করে বললেন···আরে !···তোকে যে চিন্তে পারছি না ইলু ! কত বড় দেখাচ্ছে শাড়ী পরে !

তাঁর শ্বশ্রু মাতা এক গাল হেসে বলেন, দেখো তো বাবা, কেমন মানিয়েছে ? যেন কুমোরটুলির গড়া লক্ষ্মী-প্রতিমা। এবারে মা-লক্ষ্মীর পাশে নারায়ণ এনে প্রতিষ্ঠা কর বাবা, মরবার আগে দেখে চক্ষু সার্থক করি।

ইয়োলো লজ্জায় দৌড়ে পালায় মামীমার কাছে।

অশোক বাবু বলেন—হ্যাঁ, বিয়ের কথা তো আমার মনেই আসেনি। তবে আজ দেখে মনে হচ্ছে ইলু বড় হয়েছে।

দীর্ঘ আঠারো বছর পরে দেশী পরিবেশটা তাঁর মন্দ লাগছিলো না। বিশেষ করে খেতে বসে, দেশী রান্নাগুলো ভারি ভালো লাগলো, আর বার বার মনে করিয়ে দিল, ইলুর মায়ের কথা, তাঁর এলাহাবাদের বাড়ীর কথা।

রাত্রে মেয়েকে নিয়ে ফেরবার সময় তিনি কথা দিয়ে এলেন বাড়ী কিনবেন।

বাড়ী ফিরে ইয়োলো শাড়ী, ব্লাউস টেনে খুলে ফেলে বড় রকমের একটা স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করে। তার পর মামার তৈরী-করা ফ্রকটি পরে ছুটে গিয়ে রোজালিনের গলা জড়িয়ে ধরে পরম শান্তিতে তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে আস্তে আস্তে বলে,—মামী, তুমি খেয়েছো ? আমার খাবার কই ? দাও।

রোজালিন হেসে বলেন,—পাগলী মেয়ে, মামার বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এলে, আবার খাবে কেমন করে ?

অভিমান ভরে বলে ইয়োলো,—বা রে ! তুমি কাছে না বসলে আমার খাওয়া হয় বুঝি ? আমি মোটে খেতে পারিনি, কই দাও আমার খাবার।

সজল চোখে বলেন রোজালিন,—আমি জানি রে। তোর খাওয়া ভালো হয়নি, তার পর ওকে নিয়ে গিয়ে খাবার-ঘরে প্রবেশ করেন,—দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসেন। পলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে অবাক হয়ে বলে—এ কি ! ইয়োলো ? তুমি আবার খাচ্ছ যে ?

ইয়োলো কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে,—বেশ করছি। মামীর সঙ্গে তুমি একলাই খাবে না কি ? আমার ভাগটা আমি খাচ্ছি।

রোজালিন বিষাদ-ভরা কণ্ঠে বলেন,—আর ক'দিন খাবে মা আমার সঙ্গে ? তোমার আপন জনেরা এসেছেন, তাঁরাই এবারে তোমার ভার নেবেন।

খাওয়া থামিয়ে ব্যথাভরা চোখে ইয়োলো চেয়ে থাকে মামীর দিকে। ক'দিন যে চিন্তা কাঁটার মত ফুটছিল তার অন্তরের অন্তস্তলে, আজ হঠাৎ রোজালিন নিজের অজ্ঞাতে সেইখানেই আঘাত করলেন। ইয়োলার দুটি গাল বেয়ে দর-দর করে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো, সে টেবলে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

রোজালিন প্রথমে ভারি অপরাধী বোধ করলেন নিজেকে। পল্ বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে। কিছু বলার দরকার, কিন্তু বলতে পারে না।

রোজালিন গভীর স্নেহে ইয়োলোকে কোলে টেনে নেন, তার পর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন,—ছিঃ, মা ! বড় হয়েছো, কাঁদে না, আমাদের জীবনের পথ চলার যখন যা নির্দেশ আসবে তাকে যে মেনে নিতেই হবে। সকল অবস্থায় সকল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিই হল আমাদের পরম শিক্ষার বিষয়। সে শিক্ষা তোমাদের আমি দিয়েছি মা ! যদি কখনও তোমাকে হারাতে হয়, সেদিনের নির্মম বেদনার বোঝা যেমন নীরবে আমাকে বহন করতে হবে, তেমনি তোমাকেও পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে গ্রহণ যে করতেই হবে।

রোজালিনের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে। উদ্গত অশ্রুধারাকে গোপন করবার জন্য পল্ উঠে গেল জানলার ধারে।

পরদিন সন্ধ্যায় যখন লনে, ফুলে-ভরা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ইয়োলো ভাবছিল তার জীবনের অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়ের কথা, হঠাৎ পিছন থেকে পল্ এসে ওর কাঁধে একটি হাত রাখে, তার পর আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলে—

The world is a garden
Where a graceful plant grows,
I am its leaves and
You a yellow rose.

হাসি মুখে ইয়োলো ফিরে দাঁড়ায়। বলে তার পর ?

When my eye's forever close
You adore me with your petals,
O my yellow rose.

কি চমৎকার! খুসি-ভরা গলায় বলে ইয়োলো। কার লেখা পল্ ?

—আগে বলছি না, তুমি মনে কর তো কার লেখা ?

খানিকটা ভেবে ইয়োলো বলে—বায়রণ অথবা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ?

পরিপূর্ণ নজরে ওর পানে চেয়ে পল্ বলে,—বায়রণ, শেলি, কীট্স্, কেউ নয়। কেউ নয়। এটা হচ্ছে পল্ মিটারের মনের কথা, এবারে বলো, কেমন লাগলো তোমার ?

—কি চমৎকার! দু'চোখ-ভরা বিস্ময় নিয়ে বলে ইয়োলো! গাছগুলোর গা ঘেঁসে লনে বসে থাকে দুজনে।

আকাশে তখন কৃষ্ণাষ্টমীর বাঁকা চাঁদ সুদীর্ঘ পাইনগাছের আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। আবছা চাঁদের আলোয় গাছের দীর্ঘ ছায়াগুলো দুলে দুলে উঠছে। ওরা নীরব হয়ে শুনছিল, অদূরে বারান্দায় রোজালিন ভায়োলিন বাজাচ্ছিলেন। তার করুণ রাগিণী দুটি তরুণ-হৃদয়ের তন্ত্রীতে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনার সুর জাগিয়ে তুলেছে।

ইয়োলো বলে, এ সুরটা জ্যেঠামশায়ের বড় প্রিয় ছিল!

—হ্যাঁ। মামী'র কাছে আমি যখন শিখেছিলেম, তখন তিনিও তাই বলেছিলেন আমাকে। পল্ জবাব দেয়।

বায়ুহিল্লোলে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসে ভায়োলিনের বিষাদ-ভরা সুর! পল্ মৃদু স্বরে বলে,—যখন তুমি চলে যাবে আমাদের ছেড়ে, তখন কি আমাদের ভুলে যাবে ইয়োলো ?

ইয়োলো জবাব দেয় না, চাঁদের আলোয় তার জলভরা চোখ দুটি চক্-চক করতে থাকে—তার পর ওর হাতখানি হঠাৎ চেপে ধরে আর্ত্ত স্বরে বলে ওঠে,—আমি যাবো না, পল, আমাকে তুমি যেতে দিও না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেতে তাকে হোল। সে-দিনের প্রতিশ্রুতির সুযোগ সঞ্জয় বাবু ছাড়েননি, অবিলম্বে বাড়ী বায়না ও কেনার পালা সাঙ্গ করে একটা শুভ দিন স্থির করেছেন গৃহপ্রবেশের।

দীর্ঘ আঠারো বছর পরে অশোক ব্যানার্জ্জি যখন বিদায় নিতে গেলেন রোজালিনের কাছে, তখন তাঁর অশান্ত হৃদয় বার বার প্রশ্ন করেছিল, ভালো হোলো কি ? দুর্দ্দিনের বন্ধু! কন্যার জীবনদাত্রী, অসময়ে তাঁকে ত্যাগ করা ঘোরতর অন্যায় নয় কি ?—কি অসুবিধা ছিল তাঁর ?

ইয়োলো মামীর গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট বালিকার মত অঝোরে কাঁদতে থাকে। রোজালিন প্রাণ ভরে আদর করেন তাকে, যেমন ছোট্ট মেয়েটিকে আগে করতেন; তার পর সস্নেহে চুম্বন করে বলেন,—পরম করুণাময় পিতা যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখো! সর্ব্বদা প্রার্থনা কোরো মা, শান্তি পাবে!

অশোক বাবু গভীর শ্রদ্ধাভরে বলেন,—আপনার ও আমার স্বর্গীয় বন্ধুর উপকার আমি জীবনে ভুলবো না, মিসেস্ মিটার! দুঃখ এই যে, তার প্রতিদানে আমি কিছু করতে পারিনি! আমার সকল ত্রুটি আশা করি মার্জ্জনা করবেন! ইয়োলো আপনারই রইলো, যদি মাঝে মাঝে ওকে দেখে আসেন, তবে ও অনেকটা সান্ত্বনা পাবে! আর পল্ তুমিও রোজ একবার করে যদি আসো; ইয়োলো যে তোমাদের ছেড়ে কখনও কোথাও থাকেনি! ওর জন্যই বড় ভাবনা হয়!

রোজালিন একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন,—সব ঠিক হয়ে যাবে মিঃ ব্যানার্জ্জি! আর উপকারের কথা তুলবেন না, মানুষের কর্ত্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছি মাত্র! কতটা সফল হয়েছি জানি না। হ্যাঁ, আমাদের সর্ব্বদাই পাবেন আপনি! প্রয়োজন হলে ডাকতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না!

অশোক বাবুর মোটর ধীরে ধীরে কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে ফটক পার হয়ে চলে গেল! একটা দমকা বাতাস এক রাশ দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে ওঁদের শূন্য বাড়ীর ঘরগুলোর মাঝে যেন কা'কে অন্বেষণ করে চলে গেল। সে দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল পল্। যেন একটা মহাশূন্যতা পক্ষবিস্তার করে গ্রাস করতে আসছে তাকে।

হলদে ফ্রক-পরা একমাথা সোনালী চুলওলা ছোট্ট মেয়েটি, তার পর ধীরে ধীরে নানা রূপের মাঝে তার বিবর্ত্তন,—একে একে—সিনেমার ছবির মত ভেসে বেড়াতে লাগলো রোজালিনের মনের পর্দ্দায়।

চরম বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে স্মৃতির পাতা পর পর উল্টে চলেছেন তিনি।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড় সুরু হয়েছে। শত বিরহীর দীর্ঘশ্বাসের মত প্রমত্ত বায়ু হা! হা! শব্দে আছড়ে পড়তে লাগলো। মসীলিপ্ত গগনের বুকে খেলে গেল বজ্রের ভ্রূকুটি। নটরাজের তাণ্ডব নর্ত্তন ভয়াল ভ্রূকুটির সঙ্গে আরম্ভ হলো ব্যথাতুরা পরমা প্রকৃতির অশান্ত রোদন। বন্ধ কাচের শার্শি বেয়ে ঝর-ঝর করে অবিশ্রান্ত জলধারা ঝরে পড়ছে। ঘরে দু'টি প্রাণী মাতা ও পুত্র যেন কোন্ মহাধ্যানে সমাহিত! বাইরের মহা দুর্য্যোগলীলা ঘরের গভীর নীরবতাকে আরও মাহিমান্বিত করে তুলেছিলো।

গড়িয়াহাটার নতুন বাড়ীতে তখন বাস্তুপূজার শেষে সঞ্জয় বাবুর বন্ধু-বান্ধব তাঁর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী গুলজার করে তুলেছেন। গান-বাজনা—খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লার মাঝে; অশোক বাবু যেন নিজেকে সমর্পণ করতে পারছেন না, নীরব দর্শকের মত সোফায় তিনি চুপ করে বসেছিলেন। দীর্ঘ আঠারো বছর তাঁর কেটেছে নির্জ্জন শান্ত পরিবেশের মাঝে; হঠাৎ এতটা হৈ-চৈ! যেন বিব্রত করে তুলেছে তাঁকে।

ইয়োলোও তার বাবার গা ঘেঁসে চুপ করে বসেছিলো। মনটি তার উধাও হয়ে উড়ে গেছে সেই শান্তিপূর্ণ আবাল্য-পরিচিত প্রিয় গৃহকোণে। যেখানে আছে তার মামী, তার একমাত্র প্রিয়জন বন্ধু পল্ মিটার। বন্ধ নিশ্বাসের ভারে মাঝে মাঝে তার অন্তরটা দুঃসহ ভারী লাগছিলো, চোখ দুটি থমথমে আরক্তিম।

দুটি সংসার-অনভিজ্ঞ প্রাণী হারিয়েছে তাদের হৃদয়ের সাম্য ভাব এবং হয়তো তা আর ফিরে পাবে না এ জীবনে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

"সংসার চলছে না কি বলো-? সেই জন্যেই তো 'ইকনমিক লিভিং'এর ওপর এই বইটা লিখছি!"

বাঙলা ভাষাভাষীর পায়ে শেকল ?

বাঙলার সীমানায় ভাষা আন্দোলন টুসু গানের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় বিহার সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং জাতি, বয়স ও নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই সংবাদ বর্ত্তমানে কারও আর অজানা নেই। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকের কঠোর দণ্ড হয়েছে এবং অনেকে বিচারাধীন আছে। টুসু গান ধর্ম্মসঙ্গীত হিসাবেই লোকসাহিত্যে চির-বিখ্যাত।. সেই ধর্ম্মসঙ্গীতকে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করায় বিহার সরকারের এই অত্যাচার, উপদ্রব ও দমন নীতি প্রকট হয়ে উঠেছে। বঙ্গসীমানাবাসিগণ টুসুর গানে ভাষা আন্দোলন জড়িত করেছেন কেন, তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন ?

বর্ত্তমান বাঙলায় অতিশিক্ষিত ব্যক্তিরা বঙ্গভাষার প্রচার বা প্রসারের কথা আদৌ চিন্তা করেন না। বিখ্যাত অধ্যাপক, সুপরিচিত ভাষাবিদ, শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকরা সরকারী পদ্মপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সরকারী কমিটির মেম্বর, বিধান সভায় চাকরী এবং রাইটার্স বিল্ডিঙে গমনাগমনের সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের মুখে কুলুপ আঁটতে হয়েছে। বাঙলা দেশের তথাকথিত সর্ব্বাধিক প্রচারসংখ্যার সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ পর্য্যন্ত সরকারী খাতায় নাম দস্তখৎ ক'রে বাপ-পিতামোর অতি কষ্টের কাগজগুলোর পর্য্যন্ত দফা রফা করেছেন। আমাদের মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার কাছে যাঁরা মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মাথার ওপর আছে যণ্ডমার্কা বিহারীবাবু, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পণ্ডিত, কানে-কালা আইন-সচিব। এদের সমুখে মাথা তোলে দিল্লীলোলুপ বাঙালীর সে মাথা আর নেই। সুতরাং বিহার সরকারের অসহ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাধ্য ও সাহস কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? এদিকে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি নামে আমাদের যে মরা-প্রতিষ্ঠানটি আছে তার কর্ম্মকর্ত্তা জ্যোতিষ ঘোষ নিজেই বেসামাল। কোন আন্দোলনের স্বপ্ন তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি। দেখতে পাবেনও না। এ ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীর ধর্ম্মসঙ্গীত আশ্রয় ভিন্ন গতি কোথায় ?

বাঙলা দেশের অতিশিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন জাত হারিয়ে দিল্লীর মসনদের দিকে তাকিয়ে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন তখন অসহায় বাঙালী জনসাধারণ সক্রিয় অংশ গ্রহণে ব্রতী হয়েছে। এবং বিহার সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের ঠ্যালায় প'ড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই। বিহার সরকার আন্দোলনকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে জেলের দরজা এবং শাস্তি দিয়েছে সশ্রম কারাবাস। ইংরেজদের মত কড়া ও জবর জাতও প্রথমে কত শত বাঙালীকে জেলে পচিয়েছিল আর ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল! কারাশৃঙ্খলের ঝনন-ঝনন শব্দ বাঙালীর কাণে যে অতি পরিচিত। সে শৃঙ্খল বাঙালী ছিন্ন করেছে সহিংস প্রতিরোধে। এ শেকল ছিঁড়তেও বাঙালী সক্ষম হবে। সে শুভদিনের বেশী দেরী নেই।

আত্মহত্যা কি পাপ ?

সংস্কৃত এক পঙ্‌ক্তি পড়তে পারেন না, অথচ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এমন অনেক ব্যক্তি বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিকালে সংস্কৃতের প্রভাব ছিল পুরামাত্রায়। দেবভাষার তর্জ্জমা থেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি লাভ হয়েছে, এ কথা আর লিখে জানাবার প্রয়োজন নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম দিকে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকার্য্যে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কবি। তদানীন্তন সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানতেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য।

দুঃখের কথা, আধুনিকতম সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতের কোন যোগই নেই। বৈদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের নানাবিধ বইয়ের তর্জ্জমাকার্য্য চলেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বইও অনূদিত হচ্ছে এবং কয়েক জন তথাকথিত ও ব্যর্থ অনুবাদক এই বাবদে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও করছেন। বিদেশী মতবাদ প্রচারের স্বার্থগত তাগিদে বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক কত অনুবাদ-প্রকাশক রাতারাতি বাড়ী ও গাড়ী করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি দৃকপাত করতে দেখছি না কাকেও, এটি পরিতাপের বিষয়। কলকাতা শহরে সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মতই একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেটি সাধারণের প্রদত্ত অর্থে গঠিত ও পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মসূচী কি কেউ জানতেও পারে না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক ঘুষ খাইয়ে এম, এ পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করলে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে যারা ব্যস্ত থাকে, কিংবা কর্ত্তৃত্ব করবার সুযোগ পেয়ে অর্থ লুণ্ঠন করাই যেখানে কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, সেই ধরণের চপলমতি পরিষদের কাছে অবশ্য অধিক আশা করা বৃথা। তবে ভবিষ্যৎ বাঙলায় যাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সত্যকার পণ্য করতে চান তাঁদের কাছে নিবেদন করছি, বিদেশী সাহিত্যের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সংস্কৃতকে বাতিল করলে দেশবাসীও নির্ঘাৎ তাঁদের একদিন বাদ দিয়ে দেবে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ যদি স্বেচ্ছায় বিষপান করতে চায়, তা হ'লে অবশ্য কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না।

শরৎ-বিভূতিভূষণের স্মৃতিরক্ষাকল্পে

বাঙলা দেশে কোন একজন গুণী, জ্ঞানী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অশরীরী আত্মাকে কেন্দ্র ক'রে কয়েক জন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বেশ কিছু লাভ করবার জন্ম সচেষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, মৃতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রগাঢ় নিষ্ঠাই বুঝি এই ব্যক্তিদের মধ্যে বিরাজমান; মৃতের শোকে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। একটা কিছু'মেমোরিয়াল' মৃতের স্মৃতিতে গঠিত না হ'লে যেন তাদের আহার ও নিদ্রার অবকাশ থাকে না।

শরৎচন্দ্র আর বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ছে আমাদের। 'পথের দাবী' ও 'পথের পাচালী'র লেখক—এই দু'জনকে জীইয়ে রাখতে কত জনের কত না উত্তম! ভাবটা এই, যেন উক্ত লেখকদ্বয় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার মত অমর সৃষ্টি আদপেই করতে পারেননি। সাধারণের টাকায় রচিত মেমোরিয়ালের অধিকাংশ সৌধ, মন্দির বা স্মৃতিস্থান শেষ পর্য্যন্ত যদিও আপনি দেখবেন শৃগাল ও কুকুরের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে, মৃতের নামের ফলক থেকে মুছে গেছে মৃতব্যক্তির খোদিত নাম। তবুও উদ্যোগীরা কিছুতেই পেছপাও নয়। শরৎ- বিভূতিভূষণের নামের সঙ্গে নিজেদের নাম ব্যবহার করবার লোভ তাদের অফুরন্ত। কিন্তু এই Hired mourners বা ভাড়াটে-কাঁদুনেদের চিনতে পারে, সাধ্য কার আছে? সকল কিছু দেখে শুনে ও শরৎ-বিভূতি-ভূষণের বিধবা পত্নীদের কথা স্মরণ ক'রে কয়েকটি জ্ঞাতব্য সাধারণের কাছে আমরা পেশ করছি, যেগুলির প্রতি এ্যাডভোকেট জেনারেলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে আমরা বাধিত হব।

(১) শরৎ-বিভূতিভূষণের প্রকাশকগণ প্রতিটি সংস্করণের জন্ম কি কোন লিখিত চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের পুস্তক প্রকাশ করে চলেছেন, না মৌখিক চুক্তির ভিত্তিহীন আশ্রয় গ্রহণ করেছেন?

(২) শরৎ বিভূতিভূষণের বিধবা পত্নীদের সম্মতি লাভ করেছেন কি প্রকাশকরা? লিখিত সম্মতি?

(৩) সহায়হীন ও অনাথা বিধবাদের প্রাপ্য অর্থ কি নিয়মে দেওয়া হয়ে থাকে? যাঁদের বইয়ের বছরে একেকটি সংস্করণ হয়ে থাকে, তাঁদের সহধর্ম্মিণীরা অসুখী ও অতৃপ্ত কেন?

যাঁরা জীবদ্দশায় লেখকদের শোষণ করলেন এবং মৃত্যুর পরেও ক'রে চলেছেন, তাদের রাতারাতি লেখকদের মেমোরিয়ালের জন্ম টাকা তুলতে উত্তমশীল হ'তে দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। স্মৃতিসৌধের নামে শিয়াল কুকুরের বাসা তৈরীর জন্ম যাঁদের চিন্তাকুল দেখি, তারা কে বা কারা? সাধু সাবধান!

বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলন

'বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি' এই কথাটি দিয়ে ভূমিকা করে বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলনের যে আবেদন নিবেদন কিছুকাল আগে সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবতঃ পাঠক-সাধারণ সে কথা বিস্মৃত হননি। সেই সংবাদের সঙ্গে পরে একথাও প্রকাশিত হয় যে, উদ্যোক্তারা ডাঃ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং ডাঃ রায় যথোচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্প্রতি সেই সংস্কৃতি-সম্মেলন মহাসমারোহে মহম্মদ আলি পার্কে বহুমূল্য প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হ'ল এবং সম্মেলনে বঙ্গ সংস্কৃতির আর কোনো বিভাগ তেমন প্রাধান্ত না পেলেও মার্গসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতের ভূরিভোজের আয়োজন হয়েছিল। দিনের পর দিন পশ্চিম ও পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন শিল্পীরা এসে প্রায় ফাঁকা আসরে কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে হয়ত উন্নততর ব্যবস্থাও হবে। তবু একটা প্রশ্ন মনে জাগে,—এই বহুমূল্য আসরের বিরাট ব্যয়ভার বহন করলেন কোন্ মহানুভব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান? নিশ্চয়ই চাঁদার সাহায্যে এমন কাণ্ড সম্ভব হয় না। এমন কি, মহৎ উদ্দেশ্যে রাজভবনে 'তারকা-প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা করতেও অনেক খরচ লাগে। শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কিছুটা ব্যয়ভার বহন করেছেন। তা যদি হয়, তাহ'লে সে কথা গোপন রাখার প্রয়োজন কি, প্রকাশ হলেই ত' দেশবাসী আনন্দিত হ'ত। সরকার জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়ক হলে দেশের মঙ্গল হয়, একথা শিশুরাও জানে। দুষ্টলোকে বলে সরকার দানটা গোপনে কোনো কোনো নির্বাচিত এবং মনোমত পক্ষকেই দান করেছেন সেই কারণেই এত চুপি-সাড়ে সব ব্যবস্থা সারতে হয়েছে। উদ্যোক্তারা সারা দেশ থেকে নানাবিধ রত্ন আহরণ করে এনেছিলেন বটে কিন্তু সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রমের অভাবে এবং সম্ভবতঃ দ্রুত ব্যবস্থাপনার ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের চিত্ত-বিনোদনে সহায়ক না হয়ে পীড়াদায়ক হয়েছিল, আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী জাতি নিশ্চয়ই—এইবার আত্মসচেতন হয়ে উঠবে।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্ম যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন আছে স্বল্পখ্যাত কর্তৃপক্ষদের প্রচেষ্টায় তার অভাবই পরিলক্ষিত হ'ল। বার বার স্বামীজীর সেই উক্তিটাই মনে পড়ল "চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য্য-সম্পন্ন করা যায় না।"

পরীরা যেখানে ভয় পায়—

কথায় বলে 'পরীরা যেখানে ভয় পায় মূর্খেরা সেখানে দৌড়ে যায়'। ইদানীং দু-চার জন ভুঁই-ফোঁড় সমালোচকের দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা দেখে এবং পাণ্ডিত্যের বহর দেখে এই কথাই মনে জাগে। ২২শে ফাল্গুন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় অস্কার ওয়াইলডের বিখ্যাত নাটিকা 'সালোমে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞ সমালোচক লিখেছেন—"ওয়াইল্ডের কথাই ছিল, দেখতে হবে বইটি "goodly written or badly written' ইত্যাদি, ওয়াইল্ড কিন্তু বলেছেন: "Books are well written, or badly written. . That is all." ওয়াইল্ড যদি 'goodly' লিখতেন তাহলে আর পৃথিবীখ্যাত সাহিত্যিক না হয়ে সংবাদপত্র অফিসের বিজ্ঞাপন বিভাগের কেরাণী হতেন। তার পর বিজ্ঞ সমালোচক লিখেছেন: "জানি এই গ্রন্থের অনুবাদ করা কঠিন, খুবই কঠিন (এত কঠিন যে ওয়াইলড নিজের মাতৃভাষা ইংরাজীতে একে কুলাতে পারবেন না এই সন্দেহে লীলা-চঞ্চল, পেলব, কাব্য কোমল ফরাসী ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন)" ইত্যাদি। সমালোচনায় কল্পনার অবকাশ নেই। সমালোচক-প্রবরের যদি Arthur Ransom রচিত "Oscar Wilde" নামক সমালোচনা গ্রন্থ পড়া থাকত তাহলে এই গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় লেখার কারণ জানতে পারতেন। গণ্ডূষ জলের শফরীর মত অল্প বিদ্যার পুঁজি নিয়ে এই জাতীয় গ্রন্থের আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হত।

পূর্ব্ববঙ্গ ও বাঙলা সাহিত্য

ভাগের মা বাঙলার পূর্ব প্রান্তের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। ছেড়ে আসা গ্রাম বা ফেলে আসা গ্রামের জন্য দিনকতক বাঙালীকে সোরগোল তুলতে দেখা গেল খবরের কাগজে হিড়িকে। কোথায় কোন্ কাগজের বার্ত্তা-সম্পাদক পূর্ব বাঙলার পালিয়ে আসা মানুষ, তাই বুঝি তাঁর সংবাদ বিতরণে বাস্তুহারাদের প্রতি কুম্ভীর-কান্নার সুর ধরা যায়! তাঁর চোখে পূর্ব-বাঙলার মজা নদীর কাছে কোথায় লাগে কোন্নগর, চন্দননগরের গঙ্গার তীর! তবুও বলবো, আমরা যে কারণেই হোক বাঙলার ছিন্নাঙ্গকে ভুলতে বসেছি। বাঙলার যেটুকু অঙ্গ হাতে এসেছে, তাকে কামড়া-কামড়ি করতেই ব্যস্ত থাকতে দেখেছি বাঙলার সংস্কৃতির যত ধ্বজাধারীদের।

রাজনৈতিক কচকচির ঊর্দ্ধে থেকেই বলছি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ব-বাঙলার দান অসামান্য। হিন্দুদের বাদ দিয়ে শুধু মুসলমান গবেষক, সাহিত্যিক ও কবিদের তালিকা করলে একখানা বেশ দস্তুরমত মোটা ক্যাটালগ বানানো যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পূর্ব্বতন সংখ্যাগুলি ও পরিষদের পুস্তক-তালিকা উলটে পালটে দেখলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হবে। বাঙলা ভাষার জন্য মৃত্যু বরণের সাম্প্রতিক ঘটনা পূর্ব-বাঙলাকে চিরস্মরণীয় করেছে। এখনও ঠিক পূর্ব্বের মতই বাঙলা ভাষার প্রতি সমান আসক্তি আছে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের।

পূর্ব-বাঙলার অসংখ্য মৃত কবি ও সাহিত্যিকের রচনা প্রথম প্রকাশের পর আর পুনর্মুদ্রিত হ'ল না। পূর্ব-বাঙলার লুপ্ত সাহিত্য পুনরুদ্ধারের কাজ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদেরই। পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার এ দিকটায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টি দিন, এই আমাদের অনুরোধ।

বিজ্ঞাপন দিন, আরও বিজ্ঞাপন দিন

বাজারে বই বিক্রী করতে হ'লে উৎকৃষ্টতম বই ছাপলেই যে সে-বই হাজারে হাজারে বিক্রী হয়ে যাবে, তেমনটি আশা করা বৃথা। স্বয়ং ভগবানের লেখা বই হ'লেও বিনা বিজ্ঞাপনে বিক্রী করুক দেখি, কোন প্রকাশক পারেন? বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে প্রসঙ্গ তুলতে উপরিউক্ত কথাগুলি মনে এলো, তাই না লিখে পারলাম না। দেশ-বিদেশের কাগজে হরেক রকম বইয়ের বিজ্ঞাপনের মধ্যে 'বাইবেল', 'ডাস ক্যাপিটাল', এবং গীতা ও উপনিষদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিনা বিজ্ঞাপনে দশকর্ম্ম ভাণ্ডার চালানো যায়, বইয়ের ব্যবসা বিজ্ঞাপন ব্যতীত অচল। কলকতা তথা বাঙলা দেশের অধিকাংশ প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন! কোন্ বইয়ের যে কোথায় এবং কি ধরণের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে সমীচীন হবে এবং ব্যবসাগত লাভ হবে তার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন।

বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখবেন, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বোঝা যায় না কোনটি কোন লেখকের বই। বইটি গল্প না উপন্যাস। ধর্মগ্রন্থ না যৌনশাস্ত্র? প্রবন্ধ না কবিতা? পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫ না ২৫০? বইটি কি সচিত্র? বইটি নবজাতক না পুনর্মুদ্রিত? ছাপাখানার 'রুল' বেষ্টিত বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে এ সকল কিছু জানতে পারবেন, সে সাধ্য আপনার নেই। আর তা নেই বলেই আপনি হরদম গোলমালে পড়বেন। বইটি রবীন্দ্র-নাথের না রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী না প্রেমেন্দ্র মিত্রের, সুবোধ বসু না সুবোধ ঘোষের, তারাশঙ্কর না অন্নদাশঙ্করের, সজনীকান্ত না সুকান্তর? শুধু যথাযোগ্য বিজ্ঞাপনের অভাবে যে কত সুসাহিত্যিকের অপমৃত্যু বা অকালমৃত্যু হয়েছে আমাদের বাঙলায়, তার হিসাব কষেছেন কোন দিন?

আশার কথা, ছাপাখানার রুলবেষ্টিত বিজ্ঞাপনের মধ্যেও সামান্য কয়েকটি বাঙালী প্রকাশকের বিজ্ঞাপন-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, যথা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বিশ্বভারতী, উদ্বোধন, সিগনেট প্রেস, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব এবং বেঙ্গল পাবলিশার্স। বিজ্ঞাপন দিলে বিনা কারণে অর্থব্যয় হয়, এই ধারণা যাঁদের মজ্জাগত তাঁদের কাছে আমাদের বক্তব্য অরণ্যে রোদনেরই সামিল, তা আমরা জানি।

বাঙালীর বদনাম

ইলসট্রেটেড উইকলী অব ইণ্ডিয়ার আইরিশ সম্পাদক মিঃ সি, আর, মানডি সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছিলেন। কলিকাতা তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি, সরস্বতী পূজা, শিক্ষক ধর্ম্মঘট ইত্যাদি সম্পর্কে বাঁকা-চোখে অনেক কিছু দেখে ড্রেণ ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট হিসাবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ইলসট্রেটেড উইকলীতে নানা-কথা, তন্মধ্যে লিখেছেন, বাঙালীরা কেন এত বক্তৃতা শোনে: সম্পাদক লিখেছেন·········

"It transpired that the reason why lectures are so well patronised in the city is because the average Bengali has so many children and is so hen-pecked that he seeks sanctuary in the lecture hall for a brief spell in the evenings"·····

এত দিনে মছলিখোর বাঙালীর আর একটি বিশেষণ লাভ হ'ল। মেয়েদের অবশ্য তেমন রাগ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু পুরুষরা নিশ্চয়ই আহত হবেন। সম্পাদক মহাশয় আরো লিখেছেন বাংলা দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা কম, কারণ সেই অবস্থা দাঁড়ালে বাঙালীরা নাকি কম্যুনিষ্ট হয়। বাংলার বাইরে এই ধরণের অপপ্রচার আরো চলে, কিন্তু প্রতিবাদ কই?

লাইব্রেরীতে বই চুরি

বই চুরির প্রবণতা অনেক শিক্ষিত ধনবান এবং জ্ঞানবান ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। পড়তে নিয়ে বই ফেরত দেন না এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু লাইব্রেরী যা সাধারণের সম্পত্তি, যেখানে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সযত্নে গবেষকদের উপকারার্থে রক্ষিত হয়, সেই সকল স্থান হইতেও সম্প্রতি বহুল পরিমাণে বই চুরির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 'অর্থবানে বই কেনে ভাগ্যবানে পড়ে' এমনি একটা কথার চল আছে, কিন্তু এখানে সম্প্রতি যে সব চুরির খবর শোনা গেছে তা পড়ার জন্য নয় বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যও নয়, স্রেফ বিক্রয়ের জন্য। কলকাতায় পুরাতন বইয়ের বাজার সে কারণ বেশ উন্নতি লাভ করেছে, হালে। বহু দুষ্প্রাপ্য বই ভদ্রসন্তানরা লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে সুযোগ-সুবিধা মত চুরি ক'রে এনে বাইরে পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। কয়েকটি

লাইব্রেরীর কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বই কলেজ স্কোয়ারে ফুটপাথের দোকান থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এ সম্বন্ধে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আমরা যেমন সচেতন হতে বলি, তেমনি এই সব বই-চোরদেরও এমন গর্হিত কাজ থেকে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করি।

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ প্রকাশিত চিত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্ট সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান ভলুম প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিশেষ কমিটী কার্য্যও আরম্ভ করেছেন। এই ভলুমগুলির মূল্য কিরূপ হবে এখনও স্থির হয়নি। প্রথম খণ্ডটি ভারতের বিখ্যাত অজন্তা গুহার চিত্রসম্পদ নিয়ে প্রকাশিত হবে আগামী এপ্রিল মাসেই। বৃহৎ আকারে এবং বহু ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রের আকর্ষণে এই খণ্ডটি পৃথিবীর শিল্পী ও শিল্পামোদীদের কাছে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সমাদর লাভ করবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

বেঁচে থেকেও লিখছেন না যাঁরা—

কয়েক জন প্রতিভাবান লেখক তাঁদের লেখা কেন যে স্থগিত রেখেছেন সে রহস্যের কিনারা খুঁজে পাইনি আমরা। লেখার অভ্যাস বজায় না রাখলে লেখার অভ্যাসটি বজায় থাকে না। বাঙলা সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেও কি এই কথাটি প্রযোজ্য? অনভ্যাসের দরুণ কিনা জানি না বেশ কয়েক জন কৃতী ও গুণী সাহিত্যিককে লেখনী পরিহার করতে দেখে আমরা মর্ম্মাহত হয়ে আছি। 'রমলা'র লেখক মণীন্দ্রলাল বসু, 'পথে প্রবাসের'র লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়, 'সুশান্ত সা'র লেখক নীরোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, গল্পলেখক যুবনাশ্ব, আশীষ গুপ্ত, কবি সমর সেন এবং আরও যেন কে কে সাহিত্য-জগৎ থেকে এক রকম বিদায়ই নিয়েছেন। কিন্তু এই বিদায় নেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে, কেউ বলতে পারেন?

লেখা পড়ে লেখকের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

লেখা প'ড়ে লেখকের সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়, লেখক কেমন ধারার মানুষ? লেখার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কি সম্পর্ক থাকে জানি না, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই দেখা যায়, লেখা পড়ার পর লিখিত নায়কের সঙ্গে লেখকের জীবনকে ধরে টানাটানি করবার চেষ্টা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও কৃষ্ণচরিত রচনা করেছেন, মাইকেল রামায়ণের পটভূমিকায় মহাকাব্য সৃষ্টি করেছেন, এ কারণে বঙ্কিম ও মাইকেলকে যদি রামায়ণের নায়কের মত পবিত্র চরিত্র মনে করতে হয় তা হ'লেই তো সেরেছে! শরৎচন্দ্র ভবঘুরে ছিলেন ব'লে তাঁর জীবনে রাজলক্ষ্মী নামে কোন নারীর যোগ ছিল কিনা, এমন প্রশ্নও কাকেও কাকেও করতে শোনা যায়। বুদ্ধদেব বসু প্রেমের গল্প লিখেছেন, এজন্য তাঁকেও অনেকে মনে করে যে তিনিও মস্ত বড় একজন প্রেমিক! তাঁর রুক্ষ মেজাজ দেখলে এ কল্পনা কে করবে, তা একমাত্র কবি অজিত দত্ত বলতে পারেন। বেশী কথার প্রয়োজন নেই, 'বেদে' আর 'প্রাচীর ও প্রান্তর' যিনি লিখলেন তিনিই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ লিখছেন। আজীবন কবিকে নাকানি চোবানি খাইয়ে কবির মৃত্যুর পর সজনীকান্ত '২৫শে বৈশাখে'র মত অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করলেন।

লেখা পড়ে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবার বদ অভ্যাসটি ত্যাগ করা প্রয়োজন। বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কত আজগুবি কথাই না শোনা যায় লোক-মুখে! লেখকদের বিষয়ে অলীক ধারণা সকলেরই থাকে এবং এটি থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে লিখিত চরিত্রের সঙ্গে লেখককে সমগোত্রে স্থান দেওয়া আদপেই যুক্তিযুক্ত নয়।

লেখকদের দক্ষিণা

লেখকদের দক্ষিণার কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই। কোন কালে তা হওয়াও সম্ভব নয়। উচ্চ শ্রেণীর লেখকরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর লেখকদের চেয়ে বর্দ্ধিত হারে যে চিরকালই দক্ষিণা পাবেন তাতে আর সন্দেহ নেই। এ কেবল মাত্র সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রেই নয়, প্রকাশকরাও গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যাপারেও রয়েলটি সম্বন্ধে এই তারতম্য করে থাকেন এবং লেখকরাও তা স্বীকার করে নেন সুস্থ মনে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এ সম্বন্ধে নয়, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখনও এমন অনেক কাগজ আছে যাঁরা লেখকদের কাছে বিনা মূল্যে লেখা চান বা লেখা ছেপে কোন সম্মান মূল্য দিতে নারাজ হন। কাগজের জন্য, ছাপার জন্য, ছবির জন্য এবং বাঁধাইয়ের জন্য তাঁরা যখন ব্যয় ভার বহন করেন, তখন যাঁদের রচনা নিয়ে পত্রিকার প্রকাশ তাঁদের দক্ষিণার কথা কেন যে তাঁরা চিন্তা করেন না এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা!

এ সম্বন্ধে বহু প্রথম শ্রেণীর মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিও কটাক্ষপাত করা যায়। কবিতার জন্যও অনেকে আবার টাকা দিতে চান না। কেন, কবিতা কি সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভুক্ত নয়? আমাদের মনে হয়, যে সকল কাগজের পরিকল্পনার মধ্যে সাহিত্যিকদের পারিশ্রমিকের কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের অস্তিত্ব বজায় না রাখাই ভালো। এর ফলে, সম্ভবতঃ অন্যান্য কাগজগুলি বেশী বিক্রিত হয়ে সাহিত্যিকদের প্রতি বেশী সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবে।

কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ

সম্প্রতি 'কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ' পুনর্গঠিত হয়েছে। সংঘ থাকলে তা যে মধ্যে মধ্যে পুনর্গঠিত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও 'কংগ্রেস সাহিত্য' সংঘ' কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। 'প্রগতি সাহিত্য-'পবিত্র সাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে সংঘ হ'তে পারে, তার অর্থও বোঝা যায়, কিন্তু 'কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ' যে কি বস্তু তা বাস্তবিকই বোঝা কঠিন। প্রজা সোস্তালিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক বা কমিউনিষ্ট পার্টি কাউকে তো এখনও পার্টির নামে সাহিত্য-সংঘ গড়ে তুলতে দেখিনি! পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যদেশেও এ-রকম পার্টির নামে 'সাহিত্য-সংঘ' আছে কি না জানি না। বাংলা দেশ সাহিত্যিকদের দেশ বলে কি এখানে সাহিত্যের নামে সবই সম্ভবপর?

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত হয়েছেন কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের সভাপতি। আমরা যতদূর জানি, অতুল বাবুকে দলমতনির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা করেন এবং তিনি নিজেও সভা-সমিতিতে সভাপতির ভাষণে বহু বার সাহিত্যে দলগত আদর্শ বা নীতির বিরুদ্ধে তাঁর

অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যে নীতি বা আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেকের মতভেদ থাকলেও, তিনি একজন বিশুদ্ধ সাহিত্যের অধিবক্তা। তিনি কি ক'রে 'কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের' সভাপতি হলেন, এ-প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে। মুশকিল হ'ল 'প্রগতি সাহিত্যিকদের,' কারণ তাঁদেরও অনেক সাহিত্য-সভার সভাপতি হয়েছেন অতুল বাবু। সম্প্রতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অতুল বাবুর সভাপতিত্বের একটা যুগ এসেছে দেখা যায়। সে-কাজ অতুল বাবু অনেক ভাল ভাবে করতে পারেন, কোন বিশেষ দলের সঙ্গে জড়িত না থেকে। অন্তত: আমাদের তাই ধারণা। কিন্তু তিনি যে সাহিত্য-সংঘের সভাপতি হয়েছেন তার নাম ও নীতির ব্যাখ্যা কি তিনি নিজেই করতে পারেন? সবিনয়ে ও সশ্রদ্ধ ভাবে আমরা অতুল বাবুকে জিজ্ঞাসা করছি।

পুনর্মুদ্রণ ও সংকলন-গ্রন্থ

সম্প্রতি বাংলা দেশে প্রকাশকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং আগের চেয়ে প্রকাশকরা অনেক বেশী তাঁদের ব্যবসার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। থিয়েটারের নাটক, রোমাঞ্চকর বই, প্রেমের উপন্যাস ইত্যাদি নিয়ে, তার সঙ্গে কিছু ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ মিশিয়ে এত কাল যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে এসেছেন, তাঁদের যুগ অবশ্য এখনও অস্তাচলে যায়নি। আরও বেশ কিছু দিন তাঁরা ব্যবসা চালাতে পারবেন মনে হয়। কিন্তু তবু, এ কথা সত্য নয় যে, পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঠকগোষ্ঠী আজও আছেন। পাঠকগোষ্ঠীর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তাঁদের রুচি নীতি ও আদর্শ বদলাচ্ছে। হয়ত ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে, কিন্তু বদলানোটাই সব চেয়ে বড় ঐতিহাসিক সত্য। দশ বছর আগেকার পাঠকও আজ নেই। ভাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি-গ্রন্থের চাহিদা ক্রমেই যে বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকাশকরাও অনেকে তাঁদের ব্যবসায়ের সাংস্কৃতিক কৌলীন্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন এবং কলেজ ষ্ট্রীটের ব্যবসা যে বড়বাজার বা চাঁদনী বা চীনাবাজারের ব্যবসা নয়, তাও তাঁরা উপলব্ধি করছেন। সুতরাং ভাল ভাল বাংলা বইও প্রকাশিত হচ্ছে। এই অবস্থায়, আমাদের মনে হয়, যদি কোন প্রকাশক কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই পুনর্মুদ্রণ করেন এবং পুরাতন পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত ও লুপ্ত অনেক মূল্যবান রচনার সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যের একটা অভাব এবং এক শ্রেণীর পাঠকদের একটা চাহিদাও মিটতে পারে। আপাততঃ আমাদের এখনই যা দু'-চারখানা বইয়ের কথা মনে পড়েছে, এখানে তার উল্লেখ করছি।

প্রথমেই 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত, বাংলায় অনূদিত পুরাণগুলির কথা মনে পড়ছে। পুরাণগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, অথচ ক্রমবর্ধমান অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে তার চাহিদা আগের চেয়ে বাড়ছে। বড় বড় পুরাণগুলি পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, যেমন—অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি। কিছু কিছু প্রাচীন, একেবারে দুষ্প্রাপ্য তন্ত্রগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, নতুন টীকা ও বাংলা অনুবাদ-সহ। জীবন-চরিতের মধ্যে বিদ্যাসাগর যে অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী লিখেছিলেন সেটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ছাপা উচিত। "মধু-স্মৃতি" গ্রন্থও খুব মূল্যবান। বিপিনবিহারী গুপ্তের "পুরাতন প্রসঙ্গ" ১৩২০ সালে ছাপা হ'লেও আজ পাওয়া যায় না। সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ বইখানিতে আছে, পুনর্মুদ্রণ করলে ভাল হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ইতিহাস অনেক দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, পুনরায় ছাপা উচিত, নতুন উপকরণ-সহ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "ভারতচন্দ্রের জীবনী" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপা প্রয়োজন। "বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ" যা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছে (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি), সেগুলি থেকে একটি মূল্যবান পুথির বিবরণ-গ্রন্থ এক খণ্ডে সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করলে খুব ভাল হয়। এ-বইয়ের চাহিদা হবে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নীলকান্ত সরস্বতী, কাশীনাথ তর্কবাগীশ, রামপ্রাণ গুপ্ত, বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ, শঙ্কর ভট্ট প্রভৃতির 'বাংলার ব্রতকথার' উপর যে কয়েকখানি বই আছে, তাই থেকে উপকরণ নিয়ে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ "বাংলার ব্রত" সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ যদি কেউ প্রকাশ করেন তাহ'লে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বাংলার কবিয়ালদের গানের সংকলন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ও কবিগানের ঐতিহাসিক ভূমিকাসহ প্রকাশ করলে তার যথেষ্ট চাহিদা হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের "ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত", রসিকলাল গুপ্তের "মহারাজ রাজবল্লভ সেন", বিপিনবিহারী মিত্রের "মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত" ইত্যাদি গ্রন্থ সুসম্পাদিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হ'লে তার ঐতিহাসিক মূল্য হবে। এই ধরণের আরও অনেক বই সম্পাদনা ক'রে, সংকলন ক'রে পুনর্মুদ্রণ করা যায়। প্রতি মাসে "সাহিত্য-পরিচয়ে" আমরা কিছু কিছু ক'রে তার তালিকা দেব।

কলকাতা বেতারে বাঙলা আলোচনা

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত, নাটক, কমিক ছাড়াও সংস্কৃতিমূলক প্রচুর অনুষ্ঠান হয়, যেগুলি বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। গত কয়েক মাস ধ'রে কলকাতা-কেন্দ্র বেশ কয়েকটি মূল্যবান আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে আসছেন, যেজন্য পূর্ববর্তন সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম। সম্প্রতি দেখছি, বেতার-জগতে এই ধরণের অনুষ্ঠানের কোন নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, বক্তাদের নাম তো দূরের কথা। বাঙালী শ্রোতৃবৃন্দ একেই গান-প্রিয় ও নাট্যামোদী। বাঙলা আলোচনার নাম শুনলে তাঁরা রেডিও বন্ধ ক'রে দেন। এমন অবস্থায় বিশেষ এবং আকর্ষণীয় আলোচনার ব্যবস্থা ক'রেও যদি ঠিক ঠিক পরিবেশনের অভাবে সে-আলোচনা অশ্রুত থেকে যায়, তা হ'লে ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল্য রইলো কি?

'বেতার-জগৎ' পত্রিকা ষ্টেশন ডিরেকটর স্বয়ং নিশ্চয়ই দেখেন না। দেখবার জন্য নিশ্চয়ই আছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মী। বেতার-জগতের ভুল ত্রুটি ধরবার অবকাশ এখানে নেই। তবুও দিনের পর দিন শুধু "বাঙলা আলোচনা" ছাপিয়ে গেলে যে অত্যন্ত ভুল করা হবে সে-কথাটি যেন রেডিও কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেন একবার। আলোচনার ও আলোচনাকারীদের নাম শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। অন্যথায় শুধু আলোচনা বললে বাঙলা আলোচনা কোন দিন জনপ্রিয় হবে না। গাইয়ে, বাজিয়ে, গীতিকার, প্রযোজক, নাট্যকারদের নাম ছাপা হবে, আর আলোচ্য বস্তু ও আলোচনাকারীদের নামের বেলায় এ অবিচার কেন বেতার-জগতের?

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পাক-মার্কিণ সামরিক আঁতাত—

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের কথা গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) ওয়াশিংটনে ঘোষণা করার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নাই। বহু বাদ-প্রতিবাদ এবং পরস্পরবিরোধী বিবৃতি সত্বেও পাকিস্তানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। এমন কি ইতিপূর্ব্বে মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাকিস্তানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, ইহা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বাকী ছিল বোধ হয় শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তি সম্পাদন। উহারই উপক্রমণিকা হিসাবেই ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) তারিখে তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে এক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উহার তিন দিন পরে ২২শে ফেব্রুয়ারী পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়াছেন। উহারই তিন দিন পরে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করেন, পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের কথা। অতিক্রত যে এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহার মূলে সুদীর্ঘ আলোচনার ইতিহাস থাকাই স্বাভাবিক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য চাওয়ার অভিপ্রায় এবং পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার স্ফুরণ কবে হইয়াছে তাহা অনুমান করা হয়ত সহজ নয়। কিন্তু ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, খাজা নাজিমুদ্দিনকে অপসারিত করিয়া আমেরিকাস্থিত পাক রাষ্ট্রদূত মিঃ মহম্মদ আলীকে যখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী করা হইল তখন পাকিস্তানকে মার্কিণ সাহায্য দেওয়ার কথাবার্ত্তা দানা বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিঃ ডুলেসের সফরের সময় এই আলোচনা যে পাকিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ নিক্সনের সফরের সময়ই সর্ব্বপ্রথম কথাটি প্রকাশ পায়।

যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল না, যে-কোন সময়ই যে-সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহাই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন। যাহা ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিত ভাবে আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। পাকিস্তানকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য দিবার পরিণাম কি ভাবে দেখা দিবে তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বেই অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নিকট মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার যে ব্যক্তিগত পত্র দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যে-দিন ওয়াশিংটনে পাকিস্তানকে মার্কিণ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন, সেই দিনই ভারতস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ এলেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর হাতে তাঁহার নিকট লিখিত প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের পত্র এবং ওয়াশিংটনে প্রদত্ত তাঁহার বিবৃতির এক খণ্ড নকল প্রদান করেন। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাবে ভারতে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়াই যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নেহরুজীর নিকট ব্যক্তিগত পত্র দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্রে ভারতের আশঙ্কা দূর করিবার জন্ত আশ্বাসই শুধু দেওয়া হয় নাই, ভারতও আরজী পেশ করিলে মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক ও টেক্‌নিক্যাল সাহায্য দিতেছে তাহা দেওয়াও যে অব্যাহত থাকিবে তাহাও প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ঐ পত্রে জানাইয়াছেন। মার্কিণ অর্থনৈতিক ও টেক্‌নিক্যাল সাহায্য গ্রহণের ফলেই ভারত যে অনেকখানি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার উপর মার্কিণ সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিলে ভারতের স্বাধীনতার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিলে ভারতকে প্রত্যক্ষ ভাবে রুশ-মার্কিণ ঠাণ্ডাযুদ্ধে মার্কিণ পক্ষকে তো অবলম্বন করিতে হইবেই, ভাবী তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামেও তাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। পাকিস্তানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দেওয়ায় পাক-ভারত 'বিরোধের' তীব্রতা যেটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারত-মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহা হ্রাস পাইবে, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। বরং মার্কিণ সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারত সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাসে পতিত হইলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করিতে বলিবেন ভারতের তাহাতেই রাজী না হইয়া গত্যন্তর থাকিবে না।

পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্ত প্রথমে পাক-তুরস্ক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, মোসলেম জগৎকে শক্তিশালী করিবার জন্ত ইহা একটি বাস্তব ও বড় রকমের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫১ সালের ২৬শে জুলাই তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে এক মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান চুক্তি

দ্বারা উহাকে আরও ব্যাপকতর করা হইয়াছে। এই চুক্তি এক দিকে যেমন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিবার উপায়-স্বরূপ হইয়াছে, তেমনি পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের প্রথম সোপান-স্বরূপে পরিণত হইবে এবং মধ্যপ্রাচ্য রক্ষাব্যবস্থা সংযুক্ত হইবে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সহিত। ইতিপূর্ব্বেই ইউরোপে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির লহর গড়িয়া উঠিয়াছে। অতঃপর তুরস্ক হইতে পাকিস্তান পর্য্যন্ত মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির লহর গড়িয়া উঠিলে উভয় লহর একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকিবে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের ঘোষণায় অবশ্য পাকিস্তানে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কোন কথা নাই। পাক-প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর অবশ্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতে দেওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতে দেওয়া হইলেই যে সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ গত বৎসর মিঃ ডুলেস এক বিবৃতিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। পর্য্যাপ্ত মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাইলে পাকিস্থান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতে ইচ্ছুক, এই মর্ম্মে একটি সংবাদও নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাক-মার্কিণ সামরিক আঁতাতের পরিণাম এক দিকে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র এবং আর দিকে ভারত এই দুই দিক হইতেই বিবেচনা করা আবশ্যক। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম তথা রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে—পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান তাহারই একটি অঙ্গমাত্র। এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লেলাইয়া দেওয়ার যে নীতি প্রেঃ আইসেনহাওয়ার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হিসেবেই পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে উহার পরিণামে এসিয়াবাসীর সহিতই এসিয়াবাসীকে লড়াই করিতে হইবে। ভারতের দিক হইতে উহার পরিণামের কথা আমরা চিন্তা না করিয়া পারি না। পাক-প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী পাকিস্তানকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "A momentous step forward has been taken towards strengthening the Muslim world." মার্কিণ অস্ত্র-সাহায্য দ্বারা মিঃ মহম্মদ আলীর মনে আবার ইসলামের বিজয় অভিমান স্ফূর্ত্তি করিয়া সমগ্র এশিয়ায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করিবার কল্পনা আছে কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। তিনি মার্কিণ সামরিক সাহায্য প্রাপ্তিকে 'A glorious chapter in Pakistan's history' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পাক-প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ আহমদ বোখারী বলিয়াছেন যে, মার্কিণ অস্ত্র দ্বারা ভারত ও চীনের দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা নিবারণ করা সম্ভব হইবে। কিন্তু মিঃ মহম্মদ আলী নিজে বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ সামরিক সাহায্য কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কাজ সহজ করিয়া দিবে। তিনি ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা যাইবার পথে দিল্লীর পালাম বিমান-ঘাঁটিতে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন উহার তাৎপর্য্য কি তাহা সাংবাদিকরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তর প্রশ্নটির মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে-দিন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) প্রাতে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে পাকিস্তানকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয় সেই দিন প্রাতেই পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ঢাকা যাইবার পথে দিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কানাডার প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য উক্ত বিমান-ঘাঁটিতে গিয়াছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে আকস্মিক ভাবে দেখা হইয়া যায়। পাকিস্তানকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য দানের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার দিন প্রাতে তাঁহার দিল্লীর বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, But the very fact that I am here on the very day military aid has been announeed proves our bonafides." তাঁহার এই উক্তি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। এই কাকতালীয় ন্যায়ের তাৎপর্য্য কি, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর ভারত নিরপেক্ষ থাকে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি এই নিরপেক্ষতা বিপজ্জনক মনে করিয়া দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে ইরাণের মত যুদ্ধ-চলা পর্য্যন্ত ভারত দখল করিয়া রাখাই সঙ্গত মনে করে, তাহা হইলে কি হইবে? মার্কিণ সৈন্যসহ পাকিস্তানী সৈন্যও কি ভারত দখল করিয়া বসিবে না? কত কাল পরে এই দখলকারী সৈন্য স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে তাহার নিশ্চয়তা আছে কি? তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরিণামও অবশ্য অনিশ্চিত।

মিশরে পট-পরিবর্ত্তন—

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) পর্য্যন্ত তিন দিনে মিশরে যাহা ঘটিয়া গেল এক দিকে তাহা যেমন নাটকীয় ঘটনাবলীর মতই চমকপ্রদ, আর এক দিকে তেমনি উহার কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য। জেনারেল মহম্মদ নাজিবের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মিশরের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করা এবং লেঃ কর্ণেল জামাল আব্দল নাসের কর্ত্তৃক সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণের অর্থ হয়ত সামরিক শাসিত দেশের পক্ষে বিস্ময়কর না-ও হইতে পারে। কিন্তু পদত্যাগের পর জেঃ নাজিবকে স্বগৃহে আটক রাখার মূলে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ থাকা সম্ভব। ঐ দিনই মিশরের জাতীয় পরিচালন সচিব মেজর সালেহ সালেম নাজিবকে পদচ্যুত করার বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন, "নাজিবকে আমরা হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারিতাম। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবন নাশ না করার সিদ্ধান্তই করিয়াছি।" এতখানি ঘটিবার পর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী জেঃ নাজিবকে পুনরায় প্রেসিডেণ্টের পদে বহাল করা হয়, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পদ তিনি ফিরিয়া পান নাই। নাজিবের পতনের পর লেঃ কর্ণেল নাসের প্রধান মন্ত্রী হন এবং নাজিবের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় পরও তিনি

সেই পদেই বহাল রহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নাজীবের পতনের পরই মিশরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা অনুমান করা কঠিন। বৃটেনের সরকারী মহল নাকি নাজিবের পদত্যাগে বিস্মিত হন নাই। মিঃ বিভান এবং পার্লামেণ্টের আরও কয়েক জন সদস্য যখন মিশর ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন সর্দ্দার পানিকারের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই জেঃ নাজিবের পতন ঘটিবে। এই জন্যই নাকি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন সুয়েজ খাল সংক্রান্ত ইঙ্গ-মিশর আলোচনার জন্য নূতন কোন নির্দ্দেশ দেন নাই।

লেঃ কর্ণেল নাসের এবং জেঃ নাজিবের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য কাড়াকাড়িই এই নাটকীয় ঘটনাবলীর কারণ কি না, লোকের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকই জাগিতে পারে। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে যে রক্তপাতহীন প্রাসাদ-বিপ্লবের ফলে রাজা ফারুক বিতাড়িত হন তাহাতে বাহির হইতে আমরা নাজিবকেই নেতৃত্ব করিতে দেখিতে পাই এবং বিপ্লবের পরে তিনিই বহির্জ্জগতের দৃষ্টিতে মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার উপরেও যে কেহ বা কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, ভিতরের খবর জানা না থাকিলে তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। ১৯৫২ সালের জুলাইয়ের বিপ্লবের মূলে ছিল বিপ্লবী পরিষদ (Revolutionary Council) এবং উহার গঠনের মূলে ছিলেন লেঃ কর্ণেল নাসের। তিনি-ই বিপ্লবের মুখপাত্র হিসাবে জেঃ নাজিবকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। বিপ্লবের পর জেঃ নাজিবকেই ক্ষমতার আসনে বসান হইল, কিন্তু তাঁহার পিছনে সত্যিকার ক্ষমতা রহিলেন লেঃ কর্ণেল নাসের এবং বিপ্লবী জেঃ নাজিব বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি ছিলেন বটে, কিন্তু একজন সাধারণ সদস্য অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা একটুকুও বেশী ছিল না। নাজিব বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়া জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিশ্ববাসীর সম্মুখে তিনি মিশরের ত্রাতা বলিয়া প্রতিভাত হইলেন আর অন্তরালে থাকিয়া নাসের বিপ্লবী পরিষদের মারফৎ দেশশাসন করিতে লাগিলেন। মনে হইতে পারে, নাসের আর অন্তরালে থাকিতে চান না, তিনি প্রকাশ্যেই মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে চাহেন, ইহাই মিশরের এই নাটকীয় ঘটনাবলীর কারণ। কিন্তু মিশরের আভ্যন্তরীণ সংবাদ জানিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা জানেন, বিপ্লবী পরিষদের সহিত নাজিবের একটা মতবিরোধ চলিতেছিল। তিনি বিপ্লবী পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার, মন্ত্রী-নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের পদোন্নতি, বরখাস্ত ও বদলী করিবার অধিকার দাবী করিতেছিলেন। তিনি জেনারেল ছিলেন; কাজেই সৈন্য বাহিনীতে তাঁহার অনুগামী লোক অবশ্যই কিছু আছে। তাছাড়া তিনি জনপ্রিয়তাও অর্জ্জন করিয়াছেন। এই অবস্থায় সর্ব্বময় ক্ষমতা দাবী করা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। হয়ত বিপ্লবী পরিষদের পরিবর্ত্তে তাঁহার ব্যক্তিগত এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফলেই এই নাটকীয় ঘটনাবলী ঘটিয়াছে। কিন্তু অন্য কারণও উপেক্ষার বিষয় নয়।

মধ্যপ্রাচীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইঙ্গ-মার্কিণ ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া ইরাণে ডাঃ মোসাদ্দেকের পতনের মধ্যে আমরা

দেখিয়াছি। মিশরের এই ঘটনাবলীতে উহার প্রতিক্রিয়া কি ভাবে হইয়াছে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। সুয়েজখাল সম্পর্কে ইঙ্গ-মিশর আলোচনা এক অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে উহার অগ্রগতি একটুও সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু মিশরের জনৈক মন্ত্রী বৃটিশের সহিত অসহযোগিতারও হুমকী দিয়াছেন। কিন্তু আলোচনা যে স্তরে আসিয়া অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রধান মতভেদ দাঁড়াইয়াছে 'reactivation'এর প্রশ্ন লইয়া। অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় বৃটিশ সৈন্য স্বতঃই পুনরায় খাল অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে? যদি মিশর ও আরব লীগের অন্তর্গত কোন দেশ আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অমনি বৃটিশ সৈন্য পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ইরাণ ও তুরস্ক আক্রান্ত হইলে অবিলম্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে, ইহা মানিতে মিশরের আপত্তি নাই। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন দেশকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিলে বৃটিশ সৈন্য স্বতঃই পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিবে, এই সর্ত্ত মানিতেই মিশরের আপত্তি। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কাজেই মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র যখনই চাহিবে তখনি বৃটিশ সৈন্যের পুনঃ-প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে। ইন্দোচীনের যুদ্ধকেও সুয়েজ অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য রাখিবার অজুহাতে পরিণত করা যাইতে পারে। কয়েক দিন পূর্ব্বে মিশরের পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাও ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। সুয়েজখাল সম্পর্কে মিশরের দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মিশর বৃটিশ ও তাহার পশ্চিমী মিত্র শক্তিবর্গের সহিত অসহযোগিতা করিবে এবং পৃথিবী যে দুইটি শক্তি-শিবিরে বিভক্ত তাহাও স্বীকার করা হইবে না। জেঃ নাজিব পাকিস্তানকে মার্কিণ সামরিক সাহায্য দানের প্রস্তাবও সমর্থন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ইরাক পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষেই থাকিবে এবং তাহার রক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য চাহিবে। তুরস্কের সহিত ইরাকের এক মৈত্রী-চুক্তি ১৯৪৭ সালে অনুমোদিত হইয়াছে। উহাকে ব্যাপক করিয়া পাক-তুরস্ক চুক্তির অনুরূপ একটি চুক্তি হওয়া এবং ইরাকের মার্কিণ সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মিশরের এই নাটকীয় পট পরিবর্ত্তনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইবে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, মিশরে যেরূপ ঘন-ঘন পট পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। ৭ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী নাসের প্রেসিডেন্ট নাজিবের স্থলে মিশরের সামরিক গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সামরিক আইন অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ৮ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, জেঃ মহম্মদ নাজিব পুনরায় মিশরের প্রধান মন্ত্রী এবং বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দাবীই বিরোধের প্রধান কারণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ এবং এই বিরোধের ফলেই নাসের নাজিবকে অপসারিত করিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ৮ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশিত সিদ্ধান্তের ফলে নাসের প্রধান মন্ত্রী এবং বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারিত হইলেন। সুতরাং ২৫শে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল মিশরে পুনরায় সেই অবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর আর কোন পট পরিবর্ত্তন হইবে কি না তাহা কে জানে? নাসের এখনও মিশরের সামরিক গবর্ণরের পদে আছেন কিনা তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

সিরিয়ায় ৫ম সামরিক অভ্যুত্থান—

মিশরে পট-পরিবর্ত্তনের সম-সময়ে সিরিয়ায় যে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট শিসাক্লি পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত হইলেন গত পাঁচ বৎসরের সিরিয়ায় তাহা পঞ্চম সামরিক অভ্যুত্থান। এক ১৯৪৯ সালেই নয় মাসের মধ্যে তিনটি অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই সকল অভ্যুত্থানের ফলে গবর্ণমেন্টের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লইয়া এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার স্থান আমরা পাইব না। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শিসাক্লি ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতা দখল করেন এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। অভ্যুত্থানের ফলে শিসাক্লি অপসারিত হইলেও প্রেসিডেন্টের পদ লইয়া বিদ্রোহীদের দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে বিরোধের অবসান হইয়া হাসেম এল আতাসী সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সিরিয়ার তৃতীয় সামরিক অভ্যুত্থানও শিসাক্লির (তৎকালে কর্ণেল) নেতৃত্বেই ঘটিয়াছিল এবং ঐ সময় হাসেম এল আতাসীই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১৯৪৯ সালের ৩০শে মার্চ্চ কর্ণেল (পরে জেনারেল) হুসেনী জাইম সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন। দেশ স্বৈরতন্ত্র এবং অরাজকতার পথে অগ্রসর হইতেছে এই অভিযোগই ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ। ক্ষমতা দখল করিয়া হুসেনী জাইম সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর ১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট কর্ণেল (পরে জেনারেল) শামী হেন্নাউই ক্ষমতা দখল করেন। তিনি শাসনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট গঠনের আশ্বাসই শুধু দেন নাই, উহা কার্য্যে পরিণত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার অভ্যুত্থানের তিন দিন পরেই হাসেম এল আতাসী প্রেসিডেন্ট হন এবং নবেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গণ-পরিষদও গঠিত হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টি ইরাক এবং সম্ভব হইলে জর্ডানের সহিত মিলিত হইয়া বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের পক্ষপাতী, এই অভিযোগে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পরেই শিসাক্লির নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং তিনি ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর পিপলস্ পার্টির সহিত শিসাক্লির একটা রফা নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু এই রফা নিষ্পত্তি দীর্ঘকাল টিকে নাই। এই সময়ের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর যে-সকল পরিবর্ত্তন তাহা উল্লেখ করিবার স্থান এখানে নাই। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী হাসান এল হাকিম মধ্যপ্রাচী রক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া বিবৃতি দেওয়ায় অবস্থা চরমে উঠে এবং ৮ই নবেম্বর (১৯৫১) তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর প্রায় তিন সপ্তাহ মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের পর দোয়লবী নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইহার পরই শিসাক্লির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা দখল করে।

এবারের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে শিসাক্লির পতন হইল। কিন্তু এই সামরিক অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মনে হয়, যাঁহারা বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের পক্ষপাতী তাঁহারাই এবার ক্ষমতা পাইলেন। মিশর অবশ্য বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের বিরোধী। কিন্তু ইরাক যদি মার্কিণ সামরিক সাহায্য পায়, তাহা হইলে মধ্য প্রাচ্যে তথা সিরিয়ায় নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। এখন যাঁহারা ক্ষমতা হাতে পাইলেন তাঁহারা এই অবস্থার অনুকূল হইবেন কি না তাহাও বলা কঠিন। পিপলস্ পার্টি নাকি মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক নহেন। তা ছাড়া জেবেলড্রুজ অঞ্চলে উপজাতীয়দের বিদ্রোহের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা কতদিন টিঁকিবে তাহাও বলা কঠিন।

পুয়েরটো রিকো—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন পৃথিবীর বহু সংখ্যক দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বিপুল ভাবে সামরিক সাহায্য দিতেছে সেই সময় ১লা মার্চ্চ (১৯৫৪) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা হইতে পুয়েরটো রিকোর স্বাধীনতার দাবী মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদে পিস্তলের গুলীর মুখে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সাংবাদিকদের নিকট উপবিষ্ট দুই জন পুরুষ এবং এক জন নারী হঠাৎ পুয়েরটো রিকোর স্বাধীনতা দাবী করিয়া উপর হইতে গুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুলী বর্ষণের ফলে প্রতিনিধি পরিষদের পাঁচ জন সদস্য আহত হন। তন্মধ্যে দুই জন গুরুতর আহত হইয়াছেন। আততায়ীরা ধরা পড়িয়াছে এবং বিচারে উপযুক্ত দণ্ডও তাহারা পাইবে। কিন্তু পুয়েরটো রিকোর স্বাধীনতার দাবী তাহাতে পুরণ হইবে না। ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে পুয়েরটো রিকোর কয়েক জন জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকেও হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ফ্লোরিডা উপকূল হইতে প্রায় হাজার মাইল দূর পুয়েরটো রিকো অবস্থিত। উহা একটি মার্কিণ উপনিবেশ। প্রতিনিধি পরিষদে উক্ত গুলী বর্ষণের পর মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস এক বিবৃতিতে জানান যে, পুয়েরটোরিকানরা স্বেচ্ছায় তাহাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক মর্য্যাদা গ্রহণ করিয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পুয়েরটোরিকানরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিলে তিনি উহার জন্য কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিবেন। পুয়েরটোরিকানদের কাছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা এতই মিষ্ট লাগিয়াছে যে, তাহারা স্বাধীনতা চায় না, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে কি? পুয়েরটো রিকোর কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত জাতীয়-বাদীরাই শুধু স্বাধীনতার দাবীদার একথা বলিলেই কি সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে?

১৮৯৮ সালের স্পেনিশ-আমেরিকান যুদ্ধের ফলে পুয়েরটোরিকো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসে। একথা সত্য যে, ১৯১৭ সালে উহার অধিবাসীদিগকে মার্কিণ নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে তাহারা নিজেরাই গবর্ণর নিযুক্ত করিতেছে। ১৯৫২ সালে একটি শাসনতন্ত্রও রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। তবু পুয়েরটোরিকো যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যত দিন আমেরিকার অধীনে থাকিবে তত দিন আমেরিকার চাপে অধিকাংশ পুয়েরটোরিকানই স্বাধীনতা চাহিবে না। স্বাধীনতা দাবী করিবে শুধু অল্পসংখ্যক লোক।

বার্লিন হইতে জেনেভা—

বার্লিন সম্মেলন গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) সমাপ্ত হইয়াছে। এই সম্মেলন সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া কেহ আশা করিয়া থাকিলে তিনি অবশ্যই নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের মৌলিক পার্থক্যের কথা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সম্মেলন সফল হওয়ার আশা করা সম্ভব ছিল না। অষ্ট্রীয়া সমস্যার সমাধান হয় নাই শুধু জার্ম্মাণ সমস্যার সমাধান হইল না বলিয়া। মঃ মলোটভ দাবী করেন যে, জার্ম্মাণীর সহিত শান্তি চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ায় দখলকার সৈন্য অবস্থান করিবে। তিনি ইহাও দাবী করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে যাহারা জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না। কিন্তু জার্ম্মাণীর সমস্যা সমাধান হইল না কেন? অবশ্য রাশিয়াকেই ইহার জন্য দায়ী করা হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহা স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী স্বাধীন ভাবে যাহার সহিত ইচ্ছা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে। ইহার অর্থ যে, ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণীর উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থায় যোগদান, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা রাশিয়ার নাই ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। রাশিয়া তাহার মৃত্যুবাণ নির্ম্মাণে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিবে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহা আশা করিয়া থাকিলে তাঁহারা অবশ্যই নিরাশ হইয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জোটের মধ্যে গ্রহণ করিতে বৃহৎ পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের অভিপ্রায়ই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

বার্লিন সম্মেলনের ফল একেবারেই কিছু হয় নাই, তাহা হয়ত বলা যায় না। কারণ, কোরিয়া ও ইন্দোচীন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৬শে এপ্রিল (১৯৫৪) জেনেভায় একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতে বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় রাজী হইয়াছেন। রাশিয়া চাহিয়াছিল, আন্তর্জ্জাতিক মন-কষাকষি হ্রাস করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীনসহ বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-পঞ্চকের এক সম্মেলন হয়। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিত্রয় তাহাতে রাজী হন নাই। অবশেষে কোরিয়া ও ইন্দোচীন সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে তাঁহারা রাজী হইয়াছেন তাহাতে কম্যুনিষ্ট চীন অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু কোরিয়া-যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রও থাকিবে।

জেনেভা সম্মেলনে কোরিয়া ও ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান হইবে কি না, এখানে তাহা লইয়া সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। জেনেভা সম্মেলনে আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গত ২২শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রস্তাব আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী Mr. Laniel গত ৫ই মার্চ্চ (১৯৫৪) ফরাসী জাতীয় পরিষদে ইন্দোচীন সম্পর্কে বিতর্কের সময় বলিয়াছেন যে, লাওস ও কাম্বোডিয়া হইতে ভিয়েটমীন সৈন্যবাহিনী সরাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হইতে পারে না।

'সব জড়িয়ে' সমালোচনা ?

ছায়াছবি, নাটক ও বেতারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা বাঙলা দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, চা, কেক ও প্যাস্ট্রি খাইয়ে যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অপূর্ব্ব সমালোচনা যে-কোন বাংলা কাগজে ছাপানো যায়। টাকা খরচা করলে তো কথাই নেই। সমালোচকের বাপ-ভাই কিংবা সহোদরা যদি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তা হ'লে সমালোচকের অকারণ ও অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ষিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি! বাঙলা সমালোচনার এ সকল ত্রুটি পত্রিকা-কর্ত্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও কোন ফল হয় না, কারণ অধিকাংশ পত্রিকা-পরিচালকের সাংস্কৃতিক জ্ঞান অত্যন্ত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। পরিচালকের কলম চলে না, অথচ কাগজ চালাতে হবে। সুতরাং তথাকথিত সমালোচকের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

এই ধরণের সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁরা কে বা কারা? কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, অশিক্ষিত পত্রিকা-পরিচালকের কাছে এই সমালোচক নয় বিধাতা কিংবা এই ধরণের একজন কেউ। সমালোচনা কা'কে বলে যে জানে না, তাকে যদি ভগবান জ্ঞানে পূজা করা হয়, তা হলে আর কার কি বলবার থাকতে পারে? সমালোচক ডিক্টেটরী কায়দায় ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বললেও আসল সত্য উদ্ঘাটনের মত বিদ্যা পত্রিকা-কর্ত্তৃপক্ষের পেটে আদপেই নেই। সমালোচনার নামে সমালোচক অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, নিজের বাপ বা ভাইকে আরও সুযোগ দেওয়ার জন্য শালিসী করেন এবং সব শেষে বলেন, সব জড়িয়ে অনুষ্ঠানটি আমাদের হয় ভাল লেগেছে বা মন্দ লেগেছে। এই ভাল ও মন্দ লাগার পেছনে আছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। 'সব জড়িয়ে' কথাটি এতই হাস্যকর যে, কথাটির ব্যবহার মাত্রেই ধরা যায় ক্রিটিক বা সমালোচকের দৌড় কত দূর!

বিংশ শতাব্দীতেও মূর্খ পত্রিকা-পরিচালক ও 'হামবাগ' সমালোচককে বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে দেখে আমাদের হাসি পায় এবং সেটা দুঃখেরই হাসি।

সাধনা বসুর নৃত্যশিক্ষালয়

সংবাদপত্রে প্রকাশ: শ্রীমতী সাধনা বসু দক্ষিণ-কলকাতায় গড়িয়াহাটার কাছাকাছি কোথায় নৃত্যশিক্ষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন এবং স্বয়ং নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ক'রেছেন। সাধনা বসুকে আমরা এত কাল দেখেছি ছায়াছবিতে কিংবা বিশেষ কোন নাচের জলসায়—সাধারণ রঙ্গালয়ে যা প্রদর্শিত হয়েছে। নৃত্য-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় সাধনাকে অগ্রসর হ'তে দেখে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমরা মোটেই বিস্মিত হইনি।

বিদেশে যাঁরা অভিনয় করেন, নাচেন বা ছায়াছবিতে অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে এমন অনেক বিখ্যাত শিল্পী আছেন, যাঁরা অবসর সময়ে নিজের অর্জ্জিত বিদ্যা সাধারণকে বিতরণ করেন এবং এই বাবদে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। কেউ কেউ সাময়িক পত্রে লেখেন এবং মোটা অঙ্ক লাভ করেন। কেউ কেউ অন্যান্য কাজেও লিপ্ত থাকেন বা কোথাও চাকরী করেন। যাদের অভাব মেটে না তারা তো করেই, এমন কি যাদের প্রচুর আছে তারাও করে।

সাধনার দুঃসময়ে কেউ তাকে সাহায্য করলো না, খোঁজও করলো না সে জীবিত না মৃত! দুর্দ্দিনের দুঃখকে ঘোচাতে সাধনা বসু নৃত্যশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন—এটা যেমন দুঃখের তেমনি আনন্দেরও কথা। নর্ত্তকী সাধনাকে কে অস্বীকার করবে?

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী নাট্যানুষ্ঠান

কলকাতা বেতার-কেন্দ্র সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী নাটকানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রে বঙ্গদেশবাসীর যথেষ্ট আস্থাভাজন হয়েছেন। নাটক নির্ব্বাচনও হয়েছে চমৎকার, কেন না, বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ। একেক দিন একেক বিষয়ের নাটক অভিনীত হয়েছে। এই পরীক্ষায় বেতার কতটা কৃতকার্য্য হয়েছে তার প্রমাণ এখনই মিলবে না, ভবিষ্যতে মিলবে। কারণ, এই ধরণের 'এক্সপেরিমেণ্ট' হয়েছে এই প্রথম এবং ভবিষ্যতে আরও হবে তেমন আশাও আমরা করতে পারি। সুতরাং পরীক্ষা-কার্য্য চালু হ'তে না হ'তে একান্ত মূর্খের মত উদ্দেশ্যমূলক প্রশংসা বা নিন্দা করা অনুচিত।

গত কয়েক বছরে আমাদের ধারণা হয়েছিল, কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে নিশ্চয়ই আছেন একেক জন গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। আর তা যদি না থাকবে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধ'রে বেতারের কয়েক জন অজ্ঞ, অপোগণ্ড ও অশিক্ষিত শিল্পী বেতার-নাটককে ধ'রে ধ'রে মাঠে মারবে কেন? কলকাতা কেন্দ্রের সেই অহীন্দ্র চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যদের ঝোলে ডালে অম্বলে পরিবেশন করা হয়। ভাবটা এই, যেন বাঙালী তার সাত পুরুষে অভিনয় কখনও দেখেনি বা শোনেনি। সুখের কথা, সপ্তাহব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের শিল্পীদের মধ্যে বেতারের বেতনভুক অহীন্দ্র চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যদের খুব বেশী পাত্তা দেওয়া হয়নি এবং বোধ করি সেজন্যই এই অনুষ্ঠান-সমূহ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তদুপরি নাটকরচনাকার হিসাবেও বেতারের বাণীর বরপুত্রগণ ততটা আধিপত্য লাভ করতে পারেননি। তবে কি বুঝতে হবে যে,

'প্রোগ্রাম ডিরেক্টরগণ' এত দিনে চিনতে পেরেছেন, বেতনভুক শিল্পীদের মধ্যে সত্যিই একজনও অহীন্দ্র বা মনোরঞ্জনে নেই এবং নাট্যকারদের মধ্যে নেই একজনও গিরিশ ঘোষ বা যোগেশ চৌধুরী ?

বেতারে অভিনীত নাট্যসমূহের মধ্যে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'ভক্ত রঘুনাথ' ও 'জীবন-জুয়া'। এ দু'টি অনুষ্ঠানের প্রযোজনাও হয়েছে অপূর্ব্ব। নাট্য-রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ের একত্র সমন্বয় হওয়ায় নাটক দু'টি সর্ব্বজনভোগ্য হয়ে উঠেছিল। নাটক রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয় প্রভৃতিতে যাঁরা কৃতিত্ব ও দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, বিমান ঘোষ, অতুল মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রঞ্জিত রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ছবি বিশ্বাস এবং অনুভা গুপ্তা ও নীলিমা সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি নাটকের আবহ-সঙ্গীত ও পার্শ্ব-চরিত্রের অভিনয়ও হয়েছে অপূর্ব্ব !

এখানে বলা প্রয়োজন, যারা অজ্ঞ, অশিক্ষিত বা অপটু তাদের চাকরী দিয়ে পোষণ করলে তারা জুতা সেলাইয়ের কাজটি হয়তো কোন ক্রমে চালিয়ে নিতে পারে, চণ্ডীপাঠ করতে পারে না। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের প্রোগ্রাম-ডিরেক্টরগণ বেতারের পেশাদার শিল্পীদের কা'কেও কা'কেও যে ক্রমে ক্রমে চিনতে পারছেন, এটা মস্ত আশার কথা।

পেশাদার অভিনেত্রী ও রুচিবাগীশদের সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের মত

"দেখ, যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলেন, তাঁদের আমি একটা কথা বলতে চাই। যা হোক ত্যাগ করুন আর যাই করুন, এই বেশ্যা আর মূর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে। তাদের ত্যাগ করা কিম্বা ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার ? যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য কোনও অবতার পুরুষই
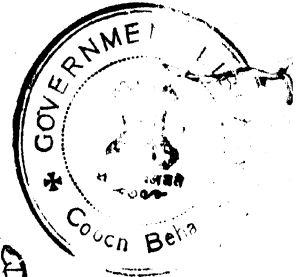
এদের ত্যাগ বা ঘৃণা করতে শেখান নি—তাঁরা এদের জীবন উন্নত ক'রে দিয়েছিলেন। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ করবার দম্ভ করি না, কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটি নূতন পথে চালিত কচ্চি—যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্র ভাবে জীবন কাটাতে পারে, উচ্চ চিন্তা করতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্ত লোককে প্রলোভিত করতে ক্ষান্ত থাকবে। আমি তো তাঁদের অর্থার্জ্জনের একটা সুগম পথ খুলে দিয়েছি—অভিনয় করতে এরা উচ্চ চিন্তা উচ্চভাবের আবৃত্তি ও অভিব্যক্তি করে, কিন্তু বলতে পার এই সব রুচিবাগীশরা এদের সংস্কার করবার কি চেষ্টা করেছেন ?"

"ছেলে-বেলা এঁরা বেশ্যা ও বদমায়েস গুণ্ডাকে ভিন্ন চ'খে দেখে এসেছেন ও ঘৃণা করতে শিখেছেন। এঁদের মনে সত্য সত্য এই রকম একটা ধারণা দৃঢ় হয়ে আছে যে, যারা বেশ্যা ও গুণ্ডার সংস্রবে আসে—তারা জাহান্নামে যায়। এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিছে, তা নয়। বাস্তবিকই বেশ্যার কুহকে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বেশ্যার কুটিল চাউনিতে অনেক যুবক বিপথগামী হয়েছে, এই সব সত্য কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ে নাটক দেখার নাম তো বেশ্যার সংস্রবে আসা নয়? রঙ্গালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আছে—রঙ্গমঞ্চে কোনওরূপ অভদ্র বা অসভ্য ব্যবহারে শাসন আছে এবং যারা অভিনয় করে তারা নিজ নিজ চরিত্র play করতেই ব্যস্ত—তারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করতেই চেষ্টিত,—রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ করবার অবসর তাদের কোথায়? ভাল নাটক অভিনীত না হ'লে অন্ত কথা। তবে আমার মনে হয় যে, বেশ্যা ও গুণ্ডা আমাদের সমাজের একটি বিষম সমস্যা। এদের শুধু ঘৃণা ও উপেক্ষা করলে চলবে না। এরা এক দিকে পিশাচ পিশাচী, আবার অন্ত দিকে চালিত হ'লে এদের দ্বারা সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে। থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান ছাড়া এদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?"

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

টকির টুকিটাকি

চিত্রসাথীর 'মণি আর মাণিক'—কাহিনী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ভারতী, সুচিত্রা, দর্শনা, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। বি, এস প্রোডাকসান্সের ছবি 'দস্যু মোহন'—শ্রেষ্ঠাংশে কমল মিত্র, নমিতা চট্টো, মলিনা প্রভৃতি।

ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের আখ্যায়িকা অবলম্বনে 'সাদা কালো' ছবিখানি আগতপ্রায়—বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন শিশির মিত্র, শিপ্রা, গুরুদাস, প্রীতিধারা প্রভৃতি। কমলা পিকচার্সের ছবি 'মদনমোহন' প্রধান ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, মলিনা, সবিতা চট্টো, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। রাজলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রথম ছবি 'অভিশাপ' চিত্রনাট্য ও সংলাপ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, শোভা সেন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস প্রভৃতি। ইন্দ্রা প্রোডাকসান্সের প্রথম নিবেদন 'নীল শাড়ী'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভূমিকায় আছেন, মিতা চ্যাটার্জ্জী, নবগোপাল লাহিড়ী, অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যো, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা প্রভৃতি। আজ প্রোডাকসান্সের 'টুলি'র সুটিং শেষ হোয়ে গেছে। প্লেব্যাক গেয়েছেন যুথিকা রায়, ধনঞ্জয়, হেমন্ত মুখো, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, সুচিত্রা সেন, পাহাড়ী সান্যাল, মালা সিংহ প্রভৃতি। 'অঙ্কুশ' ছবিখানি মুক্তিপথে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন, অভি ভট্টাচার্য্য, মঞ্জু দে, অনুভা, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বোড়শী' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত-প্রায়। প্রধান ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, দীপ্তি রায়, কমল মিত্র, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। ফিল্মগিল্ডের আগত-প্রায় চিত্র 'নাগরিক'এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ৺প্রভা দেবী, শোভা সেন, কালী বন্দ্যো, অজিত বন্দ্যো, বুলবুল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

গলদ কোথায়

শ্রীরমেন চৌধুরী

খুব বেশি দূর এগিয়ে দরকার নেই, হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে নজীর। গত তিন মাসের হিসাব খতিয়ে দেখলেই ধারণাটা স্পষ্ট হবে। এই তিন মাসের মধ্যে কম করে দশখানা বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ক'টির ভাগে 'সিকে ছিঁড়েছে' বলতে পারেন? পারবেন না, কারণ, প্রকৃত পক্ষে একটি ছবিই যা অকাতরে অর্থ আহরণ করে নিয়েছে ও নিচ্ছে এবং আরো কিছু দিন নেবে। অবিশ্যি সেটি স্রেফ ধাপ্পাবাজির জোরে আর সস্তা ভাব-প্রবণতার মৌতাত দিয়ে জনসাধারণকে কাবু করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই ছবিটিকে চিনতে পারছেন, নতুন করে তার নাম এখানে উল্লেখ করলুম না। সে ছবি ছাড়া আর কারুর নামই বলতে পারছি না এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত! কাজেই চোখ বুজে সবাই স্বীকার করবেন কাঠামো ঠিক না থাকায় মূর্তি গড়া সম্ভব হোলো না। এবং এই কারণে না হোক কয়েক লক্ষ টাকার হোলো সলিল-সমাধি।

জনৈক প্রযোজক দুঃখ করছিলেন, কি ভুল করেই না ছবি তোলার কারবার তিনি শুরু করেছিলেন! এ তো ছবি তোলা নয়, পটল তোলার জোগাড়! একদা মান্ধাতার আমলে তাঁর একটি ছবি অজস্র টাকা পাইয়ে দিয়েছিলো, কাজেই মধুলোভী মক্ষিকার মতো নির্ব্বিবাদে ঘুরতে লাগলেন মধুর কলসীর চারি পাশে। জ্ঞান যখন হোলো তখন আর পথ নেই। কোন্ অজ্ঞাত ক্ষণে ডানাটি মৌমাছির আটকে গেছে, ছাড়াবার সাধ্য নেই!

হেসে বললুম, মন্দ কি, এ মরণে তো আনন্দ আছে—এ তো 'মধুর মরণ'।

কিন্তু হাসি আমার মিলিয়ে গেল যখন শুনলাম তাঁর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা। 'ডিক্টেটারের (এটা তাঁর কথা, বোধ হয় আরো কেউ কেউ এটাকে মেনে নেবেন অবিশ্যি যাঁরা বড়বাজারে চলতি বড়বাজারের ছাপ-মারা ডিরেক্টার গ্রহণ করেছেন!) খাম-খেয়ালিতে তিনি উপস্থিত বায়ুরোগাক্রান্ত! বুক ধড়ফড় ইত্যাদি লেগেই আছে।...একটু দম নিয়ে বললেন, 'আরে মশাই, আমার ইচ্ছে ছিলো এবার একটা মাইথলজি তুলবো, কিন্তু হতে দিলে না ওই ডিক্টেটার! বলে, দেখুন না এবার কি করি!'

পৌরাণিক কাহিনীর নির্ব্বাচন যে করবার সুযোগ পাননি, সেজন্তে তাঁকে ধন্তবাদ দিলুম। মানুষের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা এই ধরণের ছবি তোলে তারা তো যে কোনো কাজই করছে

পারে। হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে এদের কেউ কেউ ভুলেও দেবালয়-মুখো হয় না, কিন্তু পয়সা রোজগারের ফাঁদ পাততে দেব-দেবীর কাহিনীর ছবি করতে এক পায়ে খাড়া! বলিহারি মনোবৃত্তি! কাজেই ও ধরণের ছবি না করতে পাওয়ার জন্যে যেন মোটেই দুঃখ না করেন।

এঁর মুখে শুনলাম, তাঁর কিছু দিন আগেকার ব্যর্থতার কাহিনী। কি করে একটা সুন্দর গল্পকে অবলীলায় হত্যা করেছিলেন পরিচালক মশাই! এবারও যে গল্পের প্রতি সুবিচার হবে, এমন তাঁর মনে হচ্ছে না। খুব খাঁটি কথা! আমরা যতোই চেঁচাই না কেন গল্প গল্প করে, বহু সম্ভাবনাপূর্ণ গল্প-পরিচালক বা চিত্রনাট্যকারের অক্ষমতায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সোজা ভাবে সহজ কথাটাকে গুছিয়ে বলতে যেন এঁদের মহা আপত্তি; কি করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দুর্বোধ্য করে কাহিনীকে কাহিল করে ফেলবেন, চলে তারই প্রতিযোগিতা। এর সুদূরপ্রসারী পরিণতির জ্বালা ভোগ করতে হয় না নগদ মূল্য আদায়কারী কর্মিবৃন্দকে; সবটাই অস্থিমজ্জা দিয়ে আকর্ষণ করে নেন বেচারী ভাগ্যহত প্রযোজক। কাজেই ভালো গল্প খুঁজে-পেতে জোগাড় করলেই হবে না, সে গল্পকে কি করে চিত্তগ্রাহী করে পরিবেশন করা চলবে তার জন্তে আপ্রাণ খাটতে হবে। সামান্ত গল্পও চিত্রনাট্যের কল্যাণে অসামান্ত হতে পারে, তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে একাধিক পেয়েছি। আজকের সঙ্কটের সময় প্রযোজকের পয়সা অযথা অপচয় করে এই ব্যবসায়ের ঘোর অকল্যাণ না ডেকে আনাই সমীচীন। এই কথাটা আর একবার সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

৭

জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীজহর গাঙ্গুলী

যাঁর কথা বলছি তিনি বলতে গেলে সকলের কাছেই পরিচিত স্বনামধন্য শ্রীজহর গাঙ্গুলী। ২৮ বছর ধরে ইনি লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে আনন্দ বিলিয়ে যাচ্ছেন আপনার অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়ে। চিত্র ও মঞ্চজগতে ইনি যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেছেন সেটি কম সৌভাগ্যের নয়! এবার ভাবলুম আমার প্রশ্নমালা তাঁর কাছে নিয়ে ধরবো। তাঁর অভিজ্ঞতা সাধারণের নিকট, বিশেষ ভাবে নবাগত শিল্পীদের কাছে জানবার ও শিখবার মত হ'বে, সে জন্তই এ প্রয়াস।

প্রশ্নমালা হাতে নিয়ে শ্রীজহর গাঙ্গুলী তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গীতে বলতে থাকেন—সর্বপ্রথম নির্বাক ছবি "গীতা" এবং সবাক যুগে "চাঁদ সদাগর" এ চিত্রাভিনেতা হিসেবে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। "বন্দী" ও "সমাপিকায়" অভিনয় ক'রে আমার সব চেয়ে তৃপ্তি লেগেছে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি প্রথম শিল্পী হিসেবে মঞ্চে অবতীর্ণ হই, তার পর আমি চলচ্চিত্র-জগতে, স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষের কাছে অভিনেতা হওয়ার প্রথম প্রেরণা পাই। তিনিই আমাকে এ'লাইনে নিয়ে আসেন। প্রথমে আমি অপেশাদার (এ্যামেচার) অভিনেতা হিসেবে অবতরণ করি।

এ'বলেই শ্রীগাঙ্গুলী একটু থামলেন। প্রশ্ন ক'রলুম "আমি—চলচ্চিত্রে যোগদানে তাঁর কখনও ব্যক্তিগণ প্রশ্ন বা আপত্তি ছি[illegible] কি না? আপত্তি মোটেই ছিল না—সাফ জবাব দিলেন তিনি। তিনি এ-ও বললেন, ছবিতে আত্মপ্রকাশে তাঁর সামাজিক [illegible] পারিবারিক জীবনে কিছুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—আজ-কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিন্দী পড়ি! বেলা ১১টা নাগাদ ষ্টুডিওতে বেরিয়ে যাই। ষ্টুডিওর পর যে দিন থিয়েটার থাকে না সে দিন খেলার মাঠে ধাওয়া করি। আমার একমাত্র নেশাই হচ্ছে খেলা। এ না হলে আমার মনে হয় কোন কাজই যেন সারা দিনে করা হ'লো না। ১৯৫১ থেকে '৫৩ পর্য্যন্ত আমি মোহন বাগান ক্লাবের হকির সেক্রেটারী ছিলুম। আমার সম্পাদক থাক[illegible] কালীন একমাত্র ভারতীয় টিম হকিতে অপরাজেয় থাকবার গৌরব পেয়েছে এবং একই সঙ্গে বাইটন কাপ ও হকি লীগ কাপ লাভ ক'রেছে। হকিটা ব'লতে গেলে ভারতীয়দের একমাত্র জাতীয় খেলা। সে জন্তেই আমি একে এত ভালবাসি।

এর পর আমার আরও কয়টি প্রশ্ন রইলো তাঁর কাছে। তিনি উত্তর দিয়ে চললেন একে একে। পুঁথি-পুস্তক পড়া সম্পর্কে তিনি বললেন, আমি "ডিটেক্‌টিভ" শ্রেণীর বই পড়তেই সব চেয়ে ভালবাসি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভেতর "মাসিক বসুমতী", এবং অন্যান্য কয়েকটি কাগজ পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমি ব'লতে পারি, শ্রীগাঙ্গুলী ব[illegible] চলেন, আমি বাঙ্গালী সুতরাং বাঙ্গালী সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পোষাক আমি পছন্দ করি। বাঙ্গালীর ভেতর যাঁরা মনে করেন নিজেদের পোষাক না পরে সাহেবী পোষাকে আভিজাত্য বাড়বে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন, আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি বেশ আগ্রহ সহকারে। তিনি বললেন, চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে প্রথমে চাই কণ্ঠ এ[illegible] আমার ধারণা চলচ্চিত্রে যোগ দানের পূর্ব্বে যদি মঞ্চে যোগদান করা যায় তা হ'লে ভাল, কণ্ঠ সে ক্ষেত্রে তৈরী হয়ে যেতে পারে। অভিনয়ের যে ত্রুটী চলচ্চিত্রে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায় [illegible] মঞ্চে তার সুযোগ রয়েছে অনেকখানি। সে জন্তেই চলচ্চিত্রে যোগদানের পূর্ব্বে মঞ্চে যোগদানের কথা তুললুম। [illegible] শিল্পী হ'তে গেলে আর যা যা থাকা দরকার তার ভেতর আসে চেহারা, অভিনয়-শিক্ষার ধৈর্য্য এ-সব। ধৈর্য্যের কথা যা বললুম আমি নিজে তার পরীক্ষা দিয়ে আসছি। প্রথম অভিনয় করতে এসে মাত্র ১৫টি টাকা পেতুম মাসে। সে চলল, কয়েক বছর সমানেই, তার পর হ'লো ৪০৲ টাকা মাইনে। কিন্তু তখন ধৈর্য্য হারালুম না। এখন ধৈর্য্য জিনিষটা বড় একটা দেখি না এখনকার দিনে যেন বড় হবার চেষ্টা নেই, নিষ্ঠাও নেই। আমি বলছিলুম ভাল ছবির জন্ত প্রয়োজন হচ্ছে ছবির সঙ্গে যারা থাকবে যেমন পরিচালক অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরা-ম্যান, এবং সর্ব্বোপরি ছবির পেছনে যাঁর টাকা কাজ করবে, এ সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সহযোগিতা ও সু-সম্পর্ক রক্ষা।

প্রশ্ন করলুম—চলচ্চিত্রে বাঙালী বিশেষ করে অভিজা[illegible]

পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? উত্তর হ'লো, এ-লাইনে তাঁরাই আসবেন এবং আসতে বাধাও নেই যাঁরা বুঝবেন এ'তে যোগদান করলে জীবনে উন্নতি হ'বে। বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলতে হয় তাঁদের চেহারা, বাচনভঙ্গী যদি ঠিক থাকে তবে তাঁরা অনায়াসেই আসতে পারেন। যাঁদের সেটা নেই তাঁদের এদিকে এসে সময় নষ্ট করা কোন কাজের কথা নয়। ছেলেদের সম্পর্কেও এ একই কথা বলতে হয়। চেহারা ও বাচনভঙ্গী সুষ্ঠু না থাকলে এ-লাইনে আসার কারোরই দরকার নেই।

ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলে শ্রীগাঙ্গুলী নিঃসঙ্কোচে বললেন, যুদ্ধের বাজারে একখানি ছবিতে আট হাজার টাকাও পেয়েছি। সাধারণ সময়ে সব চেয়ে কম যেটা পেয়েছি সে হচ্ছে একটি ছবিতে দুই শত টাকা। এ পর্য্যন্ত মোট কত রোজগার করেছি না করেছি সে প্রসঙ্গ নাই তুললুম, ইনকাম ট্যাক্সের কর্ত্তৃপক্ষই হয়তো এর নির্ভুল হিসেব দিতে পারবেন।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন করতেই শ্রীগাঙ্গুলী নিঃসঙ্কোচে বলতে থাকেন, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান আগে খুবই নিম্নে ছিল এখন মনে হয় এর স্থান অনেকটা উঁচুতে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উঁচুতে উঠবে। আগে বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করতেন, হয়তো এখন করেন না।

এ ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা চললো আমাদের ভেতর। তার পর শ্রীগাঙ্গুলী বলতে থাকলেন, তাঁর প্রথম জীবনের কথা। কলেজ ছাড়বার পর কিছু কাল আমি কেরাণীর জীবন যাপন করেছি। তার পর মিত্র থিয়েটারে যোগদান করি ১১২৬ সালে। থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে বেঙ্গল টেলিফোনেও দু'বছর কাটাই। তার পর এসে যোগ দিই ষ্টার থিয়েটারে। সে ১১৩০ সালের কথা। ভবিষ্যৎ জীবনে কি যে করবো তা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। আর দু-তিন বছর হয়তো এ ভাবে চালিয়ে যাবো, তার পর অবসর গ্রহণ করতে চাই।

[সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিসভায় যোগদানকারী সাহিত্যিকগণ]

হাওড়া ষ্টেশনে ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ঘাটশীলার সভায় যোগদানকারী সাহিত্যিকবৃন্দ। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি। ধমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্র।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে দেখতেই উভয়ের মানস-পটের যবনিকা সরে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো বহু দিনকার পূর্ব্বেকার ভুলে-যাওয়া একটি করুণ কাহিনী। যে-কোনও কারণেই হউক, এই বাল্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীর মিলন ঘটেনি। নিয়তির ইঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে এ ক'বছরে তারা পরস্পর হতে বহু দূরে চলে এসেছে। তাদের উভয়ের ধ্যান, ধারণা ও সংস্কার আজ বিপরীতমুখী। এ জন্য দায়ী কে, তা তারা আজ ভাবেও না। কারণ, কোনও দিন তাদের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ হবে তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

সহসা সম্বিৎহারা হয়ে নটী নারী বীণা দেবী ষ্টেজের উপরই লুটিয়ে পড়লো, কারণ নটী নারী আর যাই হোক, সে ছিল নারী। মেয়েরা তাদের ব্যথা কখনও ভুলে না, তা তারা চেপে রাখে মাত্র। কিন্তু আর্টিষ্ট ভদ্রলোক নারী নন, তিনি ছিলেন পুরুষ, পুরুষোচিত অহমিকার সাহায্যে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে ঘৃণায় তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিলেন মাত্র। এদিকে বেগতিক বুঝে একজন ছুটে এসে ষ্টেজের ড্রপটি তাড়াতাড়ি ফেলে দিলে। অপর কয় জন সুরু করলে নটী নারীর মুখে জলসিঞ্চন, রেষারেষি ও কাড়াকাড়ি করে তারা তার শুশ্রূষা সুরু করে দিলে; কারণ, তারা জানতো এমন সুযোগ তাদের জীবনে আর কোনও দিনই আসবে না।

এইরূপ এক অঘটন ঘটবে তা উপস্থিত নর-নারীদের কেউ কল্পনাও করেনি। হতভম্ব হয়ে তারা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটাছুটি করতে সুরু করে দিলে, ইতিমধ্যে কেমন করে ইলেকটিকের মেইন ফিউস হয়ে হলটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দ্দিকে শুনা যায় শুধু দুপাদুপ ধুপাধুপ শব্দ আর নর-নারীর সমবেত কণ্ঠের কলরব। দিশেহারা হয়ে সকলে ভিড় করে সারা হলটায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুযোগে আর্টিষ্ট ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তর-তর করে নীচের ফুটপাতে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার থেকে এতোক্ষণে আলোয় এসে ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ফুটপাতের ধারেই তাঁর অষ্টিন গাড়ীখানা দাঁড়-করানো ছিলো। ত্বরিত গতিতে তিনি ড্রাইভারের সিটে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা লক্ষ্য পড়লো গাড়ী-বারাণ্ডার নীচের ফুটপাতে। ঐ বারাণ্ডার একটি মোটা থাম আড়াল করে ছিন্ন বাস পরে দাঁড়িয়েছিল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ভিখারিণী। এমন সুন্দর নাক, চোখ, মুখ ও গঠনসহ নিটোল চেহারার মেয়ে ইতিপূর্ব্বে আর্টিষ্টের চোখে পড়েনি। এইরূপ একটি মডেলের সন্ধানেই তিনি এই নৈশ ক্লাবে হানা দিয়েছিলেন।

গাড়ী হতে নেমে এসে আর্টিষ্ট ভদ্রলোক মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু তাকে দেখে ভিক্ষারতা মেয়েটির চোখের পলক মাত্রও পড়লো না। অবাক্-হয়ে আর্টিষ্ট ভদ্রলোক আরও একটু মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। এই ভিক্ষারতা মেয়েটি ছিল আমাদেরই অপহৃতা খুকুরাণী। অন্য দিনের মত এই দিনও রাত্রে গুণ্ডারা তাকে ভিক্ষার্থে এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

'ভারি সুন্দর তো আপনি?' আর্টিষ্ট ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ী কোথায় আপনার?' 'আপনি বুঝি দেখতে পান' নিম্ন স্বরে খুকুরাণী বললো, 'কিন্তু কেন? ভিক্ষে দেবেন! জানি না আপনি কে? তবুও এই ভিক্ষে চাইছি যদি পারেন তো আমাকে এখান হতে উদ্ধার করুন। যদি কাছে গাড়ী থাকে এখুনি তাতে আমাকে তুলেই ষ্টার্ট দিয়ে দিন। আমার অপহারক গুণ্ডারা কাছেই পাহারা দিচ্ছে। চোখের নিমেষে আমাকে নিয়ে আপনাকে অন্তর্ধান হতে হবে। কিন্তু যদি তা না পারেন তো চলে যান। মিছামিছি নিজের বিপদ আর ডেকে আনবেন না।'

খুকুরাণীর কথায় আর্টিষ্ট ভদ্রলোকের প্রকৃত বিষয় বুঝে নিতে বাকি থাকেনি। তিনি ডান হাতে খুকুরাণীকে ঠেলে গাড়ীর ভিতর তুলে দিয়ে নিমিষে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে শোঁ-শোঁ করে উধাও হয়ে গেলেন। ওপারের ফুটপাতে খুকুরাণীর হেপাজতী দুই জন পাহারাদার কোকেন-দেওয়া পান চিবুতে চিবুতে তখনও পর্য্যন্ত গল্প করছিল। আর একটু পরেই ট্যাক্সী করে খুকুরাণীকে নিয়ে তাদের আড্ডাস্থানে ফিরে যাবার কথা। এমন সময় সহসা অপর ফুটপাতে দৃষ্টি মেলে তারা দেখল, খুকুরাণী সেখানে নেই এবং সম্মুখ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা সবুজ রঙের অষ্টিন কার। তাড়াতাড়ি তারাও দূরের অপেক্ষমান একটি ট্যাক্সীতে উঠে পড়ে তার চালককে নির্দ্দেশ দিলে—'চালাও ভাই রহমন খু-উব জোরে। ঐ পাখী পাইলে যাচ্ছে। না হলে সর্দ্দারের হাতে সব্বারই পেরাণ যাবে।'

পাহারাদার দস্যুদ্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাদের তাঁবেদার ট্যাক্সী-চালক দ্রুত বেগে গাড়ীখানি চালিয়ে দিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে সেইখানে অপর এক অঘটন ঘটে গেল। 'রঞ্জত রঞ্জত, শোন, একটিবার; তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে। এতো দিন তোমার জন্যেই' ইত্যাদি, বলে অপরের অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করতে করতে নটী সুন্দরী ইরা দেবী ছুটে এসে একেবারে ঐ ট্যাক্সীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ঐ নটী নারীর পিছন পিছন আরও একটি ধনী ভদ্রলোক 'কোথায় যাও, কোথায় যাও, পাগল হলে না কি?' ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করতে করতে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। এই ধনী ভদ্রলোকটি ছিলেন আমাদেরই রাজা প্রাণধন মল্লিক। নটী নারীর পিছন-পিছন অপর সকলের সঙ্গে তিনিও ক্লাব-হল থেকে বার হয়ে এসেছিলেন। ট্যাক্সী-চালক কোনও রকমে বামে হেলে নটী নারীটিকে বাঁচালেও ধনী রাজা প্রাণধন বাবুকে বাঁচাতে পারলে না। ট্যাক্সীখানি রাজা সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে

তার উরুর উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও উহার চালক পালাতে পারলো না। কারণ, ইতিমধ্যেই সশস্ত্র শাস্ত্রী সহ থানা-লরীতে তন্দ্রা দেবীকে নিয়ে-খুকুরাণীর সন্ধানে প্রণব বাবুও সেইখানে এসে পৌঁছে গিয়েছেন, কিন্তু পাহারাদার দস্যুদ্বয় এতো সহজে ধরা পড়ার পাত্র ছিল না। নিমেষে সুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষের মধ্যে গুলী-বিনিময়; গুড় গুড় গুড়ুম্। রাজা প্রাণধন বাবু ও নটী নারীটির সহিত নৈশ ক্লাবের আরও বহু ভদ্রলোক ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছিলেন। এক্ষণে বিপদ বুঝে তারা তখনও পর্য্যন্ত অক্ষতদেহা নটী নারী ইরা দেবীকে একরকম জোর করেই টেনে তুলে তাদের নৈশ ক্লাবে ফিরে গেল। মাঝ-রাস্তার উপর পড়ে রইল শুধু রক্তারক্তি ছিন্নভিন্ন ও ভগ্ন-উরু অচৈতন্য রাজা প্রাণধন বাবু। পরিচিত-পরিচিতাদের মধ্যে সাহস করে কেউই রাজাসাহেবের কাছে পর্য্যন্ত যেতে সাহসী হলো না, কেবলমাত্র তন্দ্রা দেবী পুলিশের লরী হতে নেমে এসে তাঁকে এই অবস্থায় দেখে আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে অট্টহাসি হেসে উঠলো,.হা হা হা! তার সেই বিকট অট্টহাসি বন্দুকের গুলীর মুহুর্মুহু আওয়াজও যেন স্তিমিত হয়ে গেল। নৈশ ক্লাবের মেম্বাররা দূর হতে সেই নৃত্যরতা পাগলিনীকে দেখে ও তার হাসি শুনে ভয়ে তাদের জানালার খড়খড়ি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলে।

সুন্দর বাগিচার মধ্যে একটি ছোট দ্বিতল বাড়ী। উপরে একটি সুদৃশ্য ঘরে ষ্টুডিওর মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে আর্টিষ্ট মিলন বাবু—সম্মুখের ইজেলের উপর ন্যস্ত একটি পটের ছবির উপর রঙ চড়াচ্ছিলেন। অসম্পূর্ণ ছবিটির পার্শ্বে একটি গোল টুলে বসে খুকুরাণী তখনও পর্য্যন্ত আপন অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আর্টিষ্ট ভদ্রলোকের কিন্তু সেই দিকে একটুও খেয়াল নেই। আপন মনে বারেক খুকুরাণীর প্রতি বারেক পটের ছবির প্রতি তাকিয়ে দেখে আপন মনে ছবি আঁকছেন। সহসা আর্টিষ্ট মিলন বাবু দেখতে পেলেন খুকুরাণীর মুখের সহিত তার প্রতিচ্ছবির যেন আর মিল নেই। জীবনের পথে পিছুতে পিছুতে খুকুরাণী এতোক্ষণে এমন এক স্থানে এসে পৌঁছেছে যেখানকার সহিত তার বর্তমানের জীবনের সামঞ্জস্য না থাকারই কথা। অবাক হয়ে চিত্রকর খুকুরাণীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতোক্ষণ কি ভাবছিলেন বলুন তো? নিশ্চয়ই কোনও পুরানো দিনের কথা আপনি ভাবছেন। আমি কিন্তু কোনও দিনই ও-সব কথা আপনার নিকট হতে জানতে চাইব না। দয়া করে যদি এখোনকার এই বাস্তব জীবনে আপনি একটুখানি ফিরে আসেন তাহলে ছবিখানি এখুনি আমি শেষ করতে পারি।'

কিন্তু তা আপনার শুনা উচিত, ম্লান হাসি হেসে খুকুরাণী উত্তর করলে, 'আমি এতোক্ষণ ভাবছিলাম আমার আগের জীবনেরই কথা। জীবনে এমন চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়ে এসেছি যার একটির সঙ্গে অপরটির একটুও সম্বন্ধ নেই। শৈশবে ছিলাম আমি এক জন গৃহস্থবাড়ীর মেয়ে, পরে এসে পড়লাম আমি এমন এক স্থানে যার কথা শুনলে ঘৃণায় আপনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এর পর আমি অপহৃতা হয়ে এসে পড়লাম এর চেয়ে বহু গুণে খারাপ এক গুণ্ডার আড্ডায়। কতো দিন সেখানে থেকে আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতাম, তা চিন্তা করতে এখোনও আমি শিউরে উঠি। কিন্তু পরিশেষে আপনি আমাকে ঐ নরক হতে উদ্ধার করে আনলেন এক মহানুভব চিত্রশিল্পীর আবাসে, কিন্তু এমন আমার ভাগ্য যে চক্ষু দিয়ে তা দেখবারও আজ আমার ক্ষমতা নেই। জানি আমার মত একটি অন্ধ মেয়ে আপনার ভারস্বরূপ, কিন্তু তবু কয়েক দিন নিরাপত্তার জন্য আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই। এতো দিনে আমি বুঝেছি যে এই গুণ্ডাদের দমন করা প্রণব বা নরেন বাবুর মতো রাজকর্মচারীদেরও সাধ্যাতীত। কিন্তু আমার মত এক জন মেয়েকে সকল কথা জেনে-শুনে আপনি রাখবেন কি না তা জানি না। তবু আমার জীবনের একটি—'

আর্টিষ্ট মিলন বাবু এতোক্ষণ পর্য্যন্ত ধীর ভাবে খুকুরাণীর কথা শুনে যাচ্ছিল। এইবার কি ভেবে তিনি রঙের তুলি-হাতে পাশের ঘরে চলে গেলেন। খুকুরাণী কিন্তু তার বিগত দিনের ঘৃণিত জীবনের কথা এক মনে বলেই চলেছে। চক্ষুর অভাবে সে জানতেই পারলো না যে তার এই কাহিনী শুনবার মত এক জন প্রাণীও সেখানে উপস্থিত নেই। আর্টিষ্ট মিলন বাবু যখন ফিরে এলেন তখন খুকুরাণীর প্রতিটি কথা বলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর্টিষ্ট দুই কাপ চা হাতে ষ্টুডিও-ঘরে ফিরে এসেছিল। একটি চায়ের কাপ খুকুরাণীর হাতে সসম্মানে তুলে দিয়ে উহার অপর কাপটি হাতে স্বস্থানে ফিরে এসে আর্টিষ্ট মিলন বাবু বললেন, 'শুনুন, আমি ঠিক করেছি, এই বাড়ীটি আপনার নামে আমি লিখে দেবো। এর নীচের তলায় যে কয় জন ভাড়াটে আছে, তাদের দেয় ভাড়াতে আপনার বাকি জীবন চলে যাবে। মনে করেছিলাম এই বাড়ীর আয় হতে আমি একটা শিল্পাশ্রম করবো, কিন্তু সেই পরিকল্পনা আমি এখোন ত্যাগ করলাম। তবে এতে যে আমার কোনও স্বার্থ নেই, তা আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

এতো কথা শুনার পরও আর্টিষ্ট এইরূপ এক প্রস্তাব করবে তা খুকুরাণীর কল্পনার বাইরে ছিল। খুকুরাণী কি ভেবে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, 'দেখুন, তাহ'লে আপনিও আমায় ভুল বুঝেছেন। কারুর কোনও স্বার্থে ধরা দিতে আমি আর একটি দিনের জন্যও রাজী নই। কিসের জন্য আপনি এতো স্বার্থ ত্যাগ করতে চান?'

খুকুরাণীর মাথাটা চিন্তায় চিন্তায় বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সহসা কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ী খেয়ে সেই বস্তুটিকেই খুকুরাণী জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'এঁ্যা এটা কি?'

'ওটা'! আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর করলেন, 'ওটা একটা মানুষের কঙ্কাল, একদিন তোমার মতনই সুন্দর একটি মেয়ে ছিল। নিখুঁত ভাবে ছবি আঁকার জন্য আমি ওকে এখানে রেখেছি। আজ ঐ নর-কঙ্কাল তোমাকে সাবধান করে দিলে, যাতে তুমি এই বাড়ী ত্যাগ করে অন্য কোথায় না যাও। বহিঃপৃথিবীতে এই কঙ্কাল ছাড়া আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই'।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইতিহাস কলঙ্কিত হইবে

"ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের মান সম্বন্ধে বিদেশী সাংবাদিকরা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কর্ত্তাদের কাছে নির্ভীক সাংবাদিকতাই আজ মস্ত বড় অপরাধ-বিশেষ। ক্ষমতার আসনে বসিয়া তাঁহারা এমনি অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন যে, কোন রকম সমালোচনা তাঁহারা বরদাস্ত করিতে চাহেন না। সংবাদপত্রগুলি একান্ত অনুগতের মত সরকারী নীতির জয়ধ্বনি যদি না করে, সরকার কর্ত্তাদের গুণগানে যদি পঞ্চমুখ হইয়া না ওঠে, তাহা হইলেই তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন। সংবাদপত্র এক দিকে যেমন জনমত গঠন করে, অন্য দিকে তেমনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্গে এই জনমতকে বিচার করিতে গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ শুধু যে অনিচ্ছুক তাহাই নয়, তাঁহারা অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে সংবাদপত্রের মুণ্ডপাত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন। কলিকাতায় গত ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় ইহাই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট মুখে সংবাদপত্রের সহযোগিতা চাহেন; কিন্তু কার্য্যকালে প্রেস আইনের মত আইন চালু করিয়া হুমকী দিয়া সংবাদপত্রের বশ্যতা আদায় করিতেই তাঁহারা বেশী উদ্‌গ্রীব। ডাঃ কাটজুর সমস্ত বক্তৃতা এই বিকৃত মনোভাবেরই পরিচায়ক। লোকসভায় জনৈক সদস্য বিলটি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ডাঃ কাটজু তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একথা সত্য যে, আজ মেজরিটির জোরে এই ধরণের কুৎসিত আইন সরকারী কর্ত্তারা পাশ করাইয়া লইতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তাহাতে ভারতে গণতন্ত্রের ইতিহাসই কলঙ্কিত হইবে। সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার পথও ইহাতে প্রশস্ত হইবে না।" —দৈনিক বসুমতী

কলিকাতায় বিভিন্নদেশী ভিক্ষুক

"কিছু দিন হইল কলিকাতা সহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চলের ভিক্ষুক কেন হঠাৎ এই ভাবে প্রচুর সংখ্যায় কলিকাতায় আসিয়া জুটিল? ইহা ধারণা করা অযৌক্তিক নহে যে, ভিক্ষুক-ব্যবসায়ীদিগের দ্বারাই এই সকল ভিক্ষুকবাহিনী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে হেন পথের মোড় নাই, যেখানে এই সকল অবাঙ্গালী ভিক্ষুকের সমাবেশ দেখা যায় না। বাজারে, দোকানের সম্মুখে, বাস ও ট্রামের ষ্টপে এবং পার্কে, সর্বত্র ভিক্ষুক নর-নারী ও শিশুর ভিক্ষাকার্য্য পথচারী জনসাধারণের পক্ষে দুঃসহ উপদ্রবের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি আছে, তেমনি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও আছে। জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়া এই সব ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের সহিত জনতার সংস্পর্শ নিতান্তই আশঙ্কার বিষয়। এই সব ভিক্ষাজীবীদিগের মধ্যে আবার অপরাধপ্রবণ লোকও আছে। শিশু-ভিখারীও প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। মুখে ভাষা ফুটে নাই, এইরূপ অল্প-বয়সের শিশু উলঙ্গ দেহ লইয়া রোদে বৃষ্টিতে পয়সা ভিক্ষা করিতেছে, এইরূপ বেদনাকর দৃশ্য সহরের সর্বত্র দেখা যায়। প্রশ্ন হইল, কলিকাতা সহর কি নিখিল ভারত ভিক্ষুক-সমাবেশের একটি কেন্দ্রে পরিণত হইয়া থাকিবে? এই ব্যাপারে পুলিশের কোন দৃষ্টি অথবা সতর্কতা আদৌ আছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা সহরে ভারতের সর্বত্র হইতে হাজারে হাজারে ভিক্ষুকের আমদানী দেখিয়া মনে হয়, এক শ্রেণীর মহাজন ইহার পিছনে রহিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই মহাজনেরা পুলিশের নিকট হইতে কোন বাধা না পাইয়া স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় বৃদ্ধিও করিতেছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পরীক্ষার শিক্ষা

"স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার এই কেলেঙ্কারি শিক্ষা-পর্ষদের কর্তৃপক্ষের একক কৃতিত্ব নয়; ইণ্টারমিডিয়েট, বি এ, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং —শিক্ষার সর্বস্তরে আজ একের পর এক বিভ্রাট সৃষ্টি হইতেছে। সাধারণ জীবন হইতে সংযোগহীন ও সহানুভূতিহীন, বিবেকহীন এবং দুর্নীতিপরায়ণ এক শ্রেণীর আমলার কুক্ষিগত থাকিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা যে সমূহ সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাই আজ একটি পরীক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া কুৎসিত ব্যাধির আকারে আরেক বার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-সমাজ জীবন ধারণের দাবী করিতে গিয়া লাঠি ও গুলীর সম্মুখীন হন, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার কর্ম্মকর্ত্তাগণ অনুসন্ধান কমিশনের হাত এড়াইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের কেলেঙ্কারির রেকর্ড রাতারাতি জ্বালাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে এবং তাহারই পুরস্কারস্বরূপ সেই কর্ম্মকর্ত্তারা সরকার কর্তৃক নূতন পদে অভিষিক্ত হন; সেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য বাংলার শিক্ষাকে এই বিবেকহীন চক্রের হাত হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে আজ সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। আজ দেশের শিক্ষার সহিত শিক্ষক-সমাজের ও অভিভাবক-সমাজের এবং ছাত্র-সমাজের যে পরিমাণে সম্পর্ক স্থাপিত হইবে সেই পরিমাণে এই সংকট দূরীভূত হইবে। ছাত্রদের শিক্ষার সহিত, ছাত্রদের মঙ্গলের সহিত যাঁহাদের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত আজ সেই শিক্ষক-সমাজ ও অভিভাবক-সমাজকে অগ্রসর হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রের এই কায়েমী চক্রকে ভাঙিতে হইবে। শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান সংকটকে প্রতিরোধ করিবার জন্য এই পথেই অগ্রসর হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।"

—স্বাধীনতা

যুগান্তরের মিথ্যা প্রচার

"কলিকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শিলংস্থ প্রতিনিধি 'শিলংএর চিঠি' লিখিতে গিয়া প্রস্তাবিত আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের উপর এত বিরূপ হইলেন কেন বুঝিলাম না। তিনি এই সম্মেলনের নাম ও উদ্দেশ্য অহেতুক বিকৃত করিয়া অসমীয়া-ত্রিপুরী-মণিপুরী বাঙালী ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন আখ্যা দিয়া ইহাকে তরুণ-তরুণীদের বিচিত্রানুষ্ঠানরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 'শিলংএর চিঠি' লেখক তাহার এই উদ্ভট সংবাদের উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানিতে পারি কি?—আমরা আশা করি, অবিলম্বে ইহার যথাযথ সংশোধন করা হইবে।" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

যুগান্তরের মিথ্যা প্রচার

"'যুগান্তরে' প্রকাশিত গত ১১শে জুলাই ১৯৫৩ সালের একটি সংবাদের কিছুটা উল্লেখ করা যাইতেছে। সংবাদটি ১৫ই জুলাই সংক্রান্ত। হুগলী সহরের বিবরণীতে যাহা আছে তাহা আংশিক সত্য। সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত নয়, বেলা বারোটা পর্য্যন্ত হরতাল প্রতিপালিত হয় এবং বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই উপস্থিত ছিল। আরো মারাত্মক হইয়াছে বিবরণীর শেষাংশ: এমন কি গৌরহরি হরিজন বিদ্যালয় (কংগ্রেস পরিচালিত) হইতেও ছাত্রগণ বাহির হইয়া গিয়া হরতালে যোগদান করে।— কথাটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে। তাঁহারা এই জঘন্য মিথ্যার প্রতিবাদ করিতেও ঘৃণা বোধ করেন এবং আমাদেরও নিবৃত্ত করেন!" —প্রবাহ (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী)

নেতাজী সুভাষ বসুর দ্বীপান্তর?

"কুখ্যাত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে নামকরণ করিবার জন্য দেশনেতাগণ দরদী চিত্তে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। এক সময় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বীপান্তরিত (বিতাড়িত) হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার চিরস্মরণীয় পুণ্যনামের অম্লান ও অক্ষয় স্মৃতিটিকেও কালাপানি পারে দ্বীপান্তরিত (নির্ব্বাসিত) করিবার ইহা একটি মস্ত ফিকির যদি বলা হয় তবে ভুল বলা হইবে কি? কল্যাণীর নাম 'সুভাষনগর' অথবা 'নেতাজীগড়' রাখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত না বরং নেতাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইত।" —সমাজ (মেদিনীপুর)।

প্রণাম করিব

"মানভূম নেতাবিহীন নয়। মানভূম ভারতের বুকে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। মানভূমের মাথা গোবরপূর্ণ নয়। মানভূমকে কখন নীরব থাকিতে হইবে এবং কখন মুখর হইতে হইবে, কখন বরফের ন্যায় শীতল থাকিতে হইবে আবার কখন ব্রহ্মার মত জ্বলিয়া উঠিতে হইবে তাহা সে ভাল করিয়াই জানে; জানে না কেবল পরের মুখে ঝাল খাইতে। কত টেলার, চার্চ্চার এবং পাঠান বাহিনীকে সে ইচ্ছা করিলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত কিন্তু করে নাই; বরং তাহাদের সেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া যে ক্ষমা এবং ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে তাহা অনেক গান্ধী-নীতিকেই অতিক্রম করে। যাঁহারা মানভূমবাসীকে মানভূঁইয়া এবং পাঞ্চাওয়ালা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, মানভূম তাঁহাদের করুণাই করিয়াছে। মানভূমের জীবন এবং মাতৃভাষা লইয়া যে ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে তাহার প্রতিকারের ঔষধ সে জানা সত্ত্বেও কেহ যদি উপযাচক হইয়া ঔষধ বিধান করিতে আসেন তবে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া আসন দিব না যম বলিয়া প্রণাম করিব।" —সংগঠন (মানভূম)।

দূর করিয়া দাও

"দি রোব" সিনেমার যে বিজ্ঞাপন বহুল-প্রচারিত জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি সারমেয় সভ্যতা—কুক্কুরের কালচার বর্ত্তমান মানবতার দ্বারা অঙ্গীকৃত হইতেছে। মুঠা মুঠা টাকা পাইয়া আধুনিক সংবাদপত্র-সমূহ দেশের নৈতিকতাকে অধঃপাতে পাঠাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। এই ঘরের শত্রু বিভীষণদের মাথা ন্যাড়া করিয়া ঘোল ঢালিয়া রাষ্ট্রগণ্ডী হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।" —আর্য্য (বর্দ্ধমান)।

তাঁত-সপ্তাহ

"নিখিল ভারত তাঁত-সপ্তাহ চলিতেছে। তাঁতের উন্নতির নামে কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসাইয়া কোটি কোটি টাকা উঠিতেছে, টাকাটা খরচ করিতে হইবে। কলিকাতা সহরে বিরাট পোষ্টার

আঁটিয়া তাঁতের উন্নতি যদি হইত তবে অনেক আগেই হইতে পারিত। তবে এই সুযোগে কয়েকটি ভাগ্যবান পোষ্টার ছাপিয়া কিছু পয়সা করিতে পারিবে। তাঁত ফাণ্ডের টাকায় কাজ গুছাইবার চেষ্টায় যাঁহারা মন দিয়াছেন ডেপুটি মন্ত্রী চিত্ত রায় তাঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে চালাক। মধুর গন্ধ পাইবামাত্র তিনি কুটীরশিল্পের ডেপুটি মন্ত্রিত্বটিও সমবায়ের সঙ্গে জুড়িয়া নিয়াছেন। ডেপুটি মন্ত্রীদের ফাইল দেখার হুকুম নাই, ইনি সেটি কায়দা করিয়া নিয়াছেন। এবার একটি চাল চালিয়াছেন। তাঁত শিল্পে উৎসাহ দানের জন্য আটটি দল করিয়াছেন, তাহাদের মোতায়েন করিয়াছেন নিজের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের আশে-পাশে। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি তাঁতের অসল কেন্দ্রগুলির ধারে-কাছে পাত্তা মিলিতেছে না। গামছা-বোনা তাঁতে কাপড় বুনাইলে খরচ বেশী পড়িবে, অতএব সাবসিডি দাও, সেই কাপড় বেচিতে হইলে কম দামে বেচিতে হইবে, অতএব আবার সাবসিডি দাও—গাছেরও খাও, তলারও কুড়াও এমন কায়দা করিতে না পারিলে আর চিত্ত রায়ের মাহাত্ম্য রইল কোথায়? —যুগবাণী (কলিকাতা)।

আসন্ন ট্যাক্সের বোঝা

"সম্প্রতি জয়নগর-মজিলপুরে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য এ্যাসেসমেণ্ট শেষ হইয়া নূতন হারে ধার্য্য ট্যাক্সের পরোয়ানা দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাইতেছে। সমগ্র বাংলা দেশের সঙ্গে আমাদের এই গ্রামটির অধিবাসিগণেরও জীবন যাপনের মান নিম্নগামী হইতেছে। আয়বৃদ্ধির কোনো সুযোগ ঘটে নাই এবং শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকারসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে তো কমে নাই বরং বাড়িয়া চলিতেছে। কাজেই সাধারণ মানুষ যে ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাতে আশার বিন্দুমাত্রও আলোকরশ্মি নাই। তাহার উপর জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে ট্যাক্স প্রবর্ত্তন ও বৃদ্ধির কামাই নাই।"—বন্ধু (২৪ পরগণা)

জঙ্গীপুর প্রদর্শনীর শিক্ষা

"জঙ্গীপুর কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর সমাপ্তি-উৎসব গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সম্পন্ন হইয়াছে। ঘটনাচক্রে প্রদর্শনী এবার শিক্ষক-সংগ্রামের প্রথম দিন হইতেই সুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় ছাত্র-সংগ্রামের মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক দিক দিয়া প্রদর্শনীটি দীর্ঘ দিন মানুষের স্মরণপথে বিদ্যমান থাকিবে। লোকশিক্ষাই যদি প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে স্থানীয় প্রদর্শনী গত কয়েক বৎসর যে ভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে আমরা গভীর নৈরাশ্য বোধ করিতেছি। মহকুমার বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মচারী ও "সিডিউলভুক্ত" মুষ্টিমেয় কয়েক জন অনুগ্রহভাজন বেসরকারী ভদ্রলোকের সমন্বয়ে গঠিত জনসাধারণের সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগসূত্রবিচ্ছিন্ন এই প্রদর্শনী কমিটির উদ্ভাবনী শক্তির বার্থতা লক্ষ্য করিয়া প্রতি বৎসর জনসাধারণের অর্থের বিপুল অপচয়ে আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। আমাদের অঞ্চলে এই ধরণের ছোটখাট প্রদর্শনী মারফত অবশ্য আমরা বেশী কিছু আশা করিতে পারি না। এই সব ক্ষেত্রে সারা বাংলার বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তুর সমাবেশ হইবে এ প্রত্যাশা আমাদের না থাকিলেও অন্ততঃ এই মহকুমার শিল্প ও কৃষিজাত বিভিন্ন দ্রব্যের সমাবেশ নিশ্চয়ই আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু যখন দেখি মহকুমার সুপ্রাচীন

শিল্পগুলি, যথা—কাংস্য, কম্বল, তাঁত, লাক্ষা, বেত ও মৃৎশিল্প প্রভৃতি অন্যান্য লোকশিল্প ও সঙ্গীত মহকুমার জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট এই সব প্রদর্শনীতে স্থানচ্যুত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত তখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে এ দোষ কাহার—প্রদর্শনীর, না প্রদর্শনী-পরিচালকদের?" —ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

ইহা কি সত্য ?

"ইহা কি সত্য যে, জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকনককান্তি মিত্র বড়াগ্রামে অস্থায়ী সিনেমা প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স পাইয়াছেন? ইহা কি সত্য যে, অন্য একজন আবেদনকারীর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে এই জন্য মনোনীত করিয়াছেন? ইহা কি সত্য যে, সেই আবেদনকারীর আবেদনের স্বপক্ষে পুলিশ রিপোর্ট ও সার্কেল অফিসারের রিপোর্ট ভাল থাকা সত্ত্বেও তাহার দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে ইহার আভ্যন্তরীণ রহস্য জনসাধারণ জানিতে পারে কি?" —বীরভূমবার্ত্তা।

সৈয়দ আহম্মদ আলীর গৃহ

"সম্পূর্ণ হিসাব পড়িলেই দেখা যাইবে যে, ইউনিয়নের বিল্ডিং ফাণ্ডের টাকা দিয়া সভাপতি সাহেব যে নিজস্ব বাড়ী উঠাইয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। শুধু ইহাই নহে, স্থানীয় নিঃস্বার্থ দেশসেবকেরা দলবদ্ধ ভাবে এবং সুসংগঠিত উপায়ে সরল শ্রমিকদের অর্থ লইয়া কি ভাবে ছিনিমিনি খেলিয়াছেন তাহা সহজে বুঝা যায়। ইউনিয়নের নিয়মাবলী অনুসারে হাজার হাজার টাকা ব্যাঙ্কে বা পোষ্ট অফিসে গচ্ছিত না রাখিয়া সভাপতির নিকট গচ্ছিত রাখার কি যুক্তি থাকিতে পারে? ইউনিয়ন অফিস করার অর্থ লইয়া সভাপতি মহাশয় নিজস্ব বাড়ী তৈরীর কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বর্দ্ধিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রমিকদের বোকা বানাইবার জন্যে বুদ্ধিজীবী আলী সাহেব শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া অসন্তোষের গতি যতই ফিরাইবার চেষ্টা করুন না কেন, শ্রমিকেরা তাঁহার আসল রূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে।"

—মজদুর (ধুবড়ী)

ভেজাল রোধ করুন

"দীর্ঘ সাত বৎসরে কংগ্রেস কয়েক শত আইন ও অর্ডিনেন্স প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু ফুড, এডালটারেশন অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ সম্পর্কিত আইনের বহু-বিঘোষিত ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভেজালকারীর ফাঁসি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা দূরের কথা কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও করেন নাই। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ ধরা পড়িলে অপরাধীর কয়েক শত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা মাত্র। এ আইন সংশোধন করা হয় নাই কেন? এতদিন ছিল লোকের কিছুটা ধর্ম্মভয়। কংগ্রেসী রাজ্যে বড় বড় নেতারা ধর্ম্মকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলিয়া প্রচার করার ফলে ধর্ম্মের কথা মানুষ লজ্জার বস্তু বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। অপর দিকে নীতিবাগীশের দল নীতিহীন আচরণের চরম দণ্ডের ব্যবস্থাও করেন নাই। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, অসাধু কারবারী, ভেজাল ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা অসৎ উপায়ে বহু অর্থ অর্জনকারীকেই সমাদরে উচ্চ স্থানে বসান হইতেছে। এখন পতিতার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই আর সতীনারীর পরিধেয় বস্ত্র জোটে না। —বীরভূমবাণী।

শিক্ষার মর্য্যাদা চাই

"শিক্ষালাভ করিলেই চাকুরী মিলিবে ইহার নিশ্চয়তা কেহই আর রতেছেন না। উচ্চশিক্ষিত, মাঝারি রকমের শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত সকলেই একাকার হইয়া বেকার-জীবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শিক্ষার জৌলুষ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় শিক্ষার মান বাড়িতেছে না কমিতেছে, তাহা আর তর্কের বিষয় নয়। অবস্থা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। দেশকে গড়িতে হইলে, দেশের সত্যিকার রূপ দিতে হইলে, দেশের জনসাধারণের সত্যিকার শিক্ষার প্রতি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ, ত্রুটি ও বিচ্যুতি দ্রুত দূর করিয়া সারা দেশকে শিক্ষায় উজ্জ্বল করিয়া তোলা প্রয়োজন। ছাপার হরফ পাঠ ও লেখাতেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যত্ব বোধের চেতনা যদি শিক্ষা না দিতে পারে তবে সে শিক্ষা সর্ব্বথা ব্যর্থ। শিক্ষার ব্যর্থতা জোড়াতালি দিয়া ঢাকা যায় না। আজ সেই ব্যর্থতাই ব্যবহারিক জীবনে প্রকট ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মতুষ্টি, স্বার্থপরতা, নীচতার নির্লজ্জ প্রকাশ দেখা যায় না এমন স্তর সাধারণ জীবনযাত্রাতেও আজ বিরল। ইহা মঙ্গলের কথা নহে। শিক্ষার মর্য্যাদা ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে সমস্তই অসার হইয়া যাইবে।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মেলন

"একটা কথা না বলিয়া পারি না যে যাঁহারাই এই অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করুন না কেন, তাঁহারা বোধ হয় তৎকালে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মেলন বর্দ্ধমান জেলাতেই আহূত হইয়াছে—কেবলমাত্র বর্দ্ধমান সহরেই নহে—এবং এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব জেলার সমগ্র কংগ্রেস-কর্ম্মীর, একমাত্র বর্দ্ধমান সহরের কংগ্রেস-কর্ম্মীরই নহে। কেবল নিজেরাই "কেষ্ট বিষ্টু" না সাজিয়া অন্ততঃ এই ব্যাপারের জন্য কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল মহকুমার উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস-অনুরাগী ব্যক্তি ও কর্ম্মীদিগকে অভ্যর্থনা সমিতিতে অধিক সংখ্যায় গ্রহণ করিলে দেখিতেও শোভন হইত এবং ফলও নিঃসন্দেহে ভাল হইত। কেবল Hewers of wood and drawers of waterএর বেলাতেই সহযোগিতার কথা বলিতে আসিলে লোকের ভাল লাগিবে কেন? বর্দ্ধমান সহরের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ আমাদের এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবেন।" —বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

পুলিশের দৃষ্টি নাই !

"কাঁথিতে হাটের দিন রাস্তা বাজারের মোড়ে অস্বাভাবিক ভিড় হয়। আর হাটের সময় ঐ মোড়ে কয়েকটি ট্রাক, রিক্সা, সোডাজলের গাড়ী, গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া পথ অবরোধ করে, যানবাহন চলাচল দূরের কথা, পথচারীরাও চলিতে পারে না। কাঁথি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ বহু বার করা হইলেও ইহার আজ পর্য্যন্ত কোন সুরাহা হয় নাই। ইহার সুব্যবস্থা কি হইতে পারে না? আমরা মাননীয় মহকুমা শাসকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—নীহার (কাঁথি)।

লক্ষ্ণৌয়ের হস্তীযুদ্ধ

—ডবলিউ ড্যানিয়েল, আর, এ অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
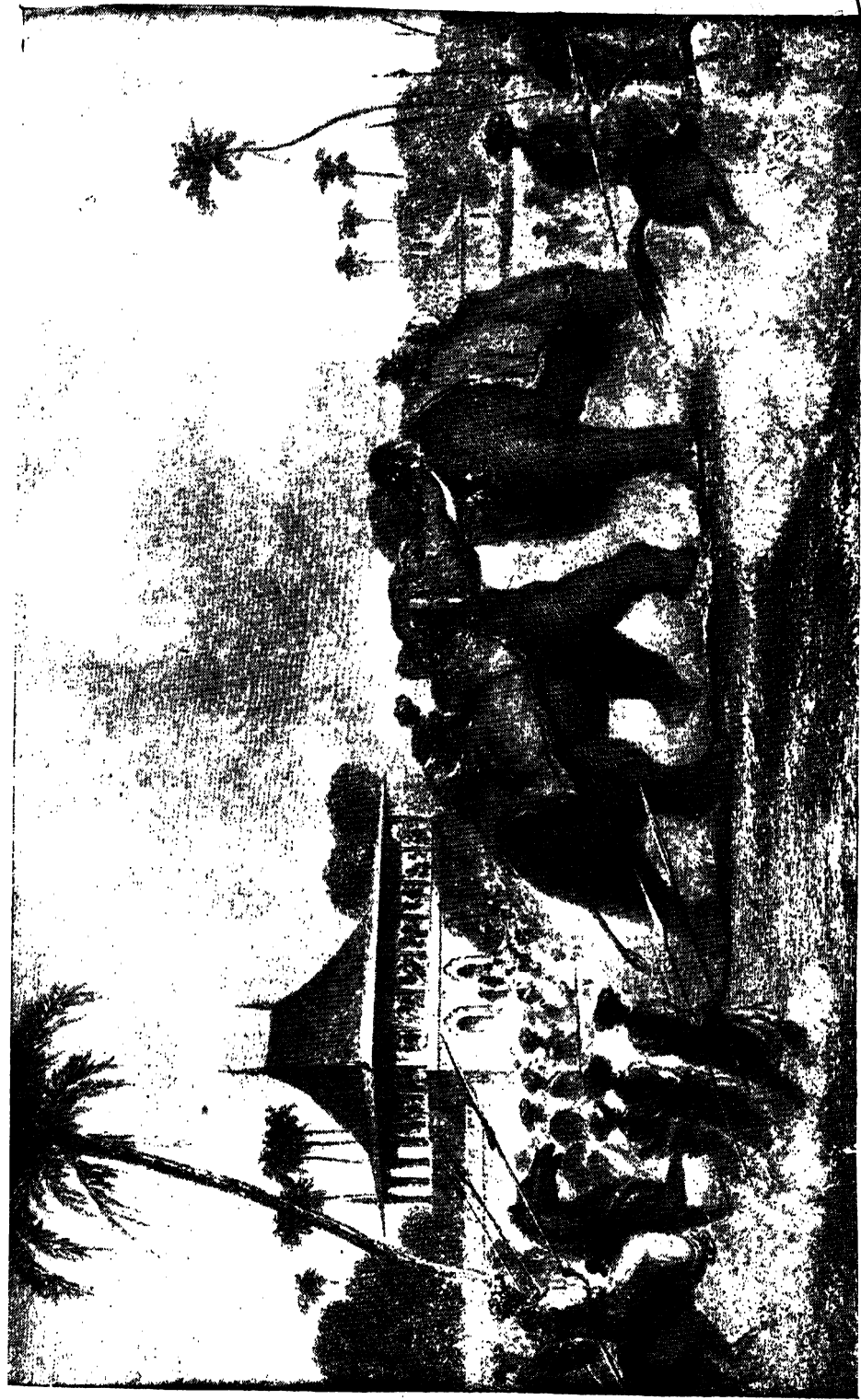
দ্বিতীয় খণ্ড | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৬০ | (স্থাপিত ১৩২১) | ৩২শ বর্ষ

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা, আমাকে সেই ছবি দেখাতে পারো?

শ্রীম। যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মা, সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান সকলেই বলে, আমার ধর্ম্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে! তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছান যায়। মা, খৃষ্টানরা গির্জ্জাতে তোমাকে কি ক'রে ডাকে, একবার দেখিও। কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী ঘরে যদি ঢুকতে না দেয়? তবে গির্জ্জার দোর গোড়া থেকে দেখিও।

প্রতিবেশী। মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয়?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্টলোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন।

প্রতিবেশী। তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে! লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগবে না? সেজোবাবু বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অসুখ হ'ল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়ীতে ভোগ রাঁধবার সময় অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হ'লে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখো না, হনুমান ক্রোধ ক'রে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়লো, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগলো, পাছে সীতার কিছু হয়।

প্রতিবেশী। গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন করে পাব?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যে সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চ'ড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে, সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে? 'ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা' এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি, যেমন করাও, তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।
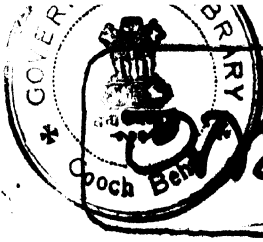
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আমাদের ধর্মকর্ম আজ এক বিচিত্র অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেরই ইহার উপর তেমন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই। আচার-অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই সত্য, তবে তাহার মধ্যে তেমন আন্তরিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবন্দনা, নিয়মিত পূজা-পাঠ প্রভৃতির প্রচলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে—অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই আজ ইহা সীমাবদ্ধ। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের আংশিক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানই এখন অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের একমাত্র নিদর্শন। তবে ইহার মূলে কতটা সামাজিক প্রথা পরিত্যাগে অনিচ্ছা ও ভীতি এবং কতটা ধর্মবোধ, তাহা বিচারের বিষয়। দোল-দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা আজ প্রধানত উৎসবমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে—উৎসবের আড়ম্বরে ধর্মভাব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানের ভার সাধারণত পুরোহিতের উপরই দেওয়া হয়—অথচ পুরোহিতের যোগ্যতা বিচারের দিকে কোন লক্ষ্য রাখা হয় না। এদিকে যাঁহারা পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী, তাঁহাদের অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রে বা সংস্কৃত ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন নহেন। ফলে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ ধর্মকার্যের বিধি-বিধানের তাৎপর্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ—ধর্মকার্যে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলির অর্থগ্রহণে অসমর্থ। যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্মকার্যের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখেন না। তাহা ছাড়া, অনেক কার্যেই যে সব বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতাভিজ্ঞের পক্ষেও সেগুলি দুর্বোধ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের পঠন-পাঠনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই সব মন্ত্র আলোচনার বিশেষ স্থান নাই। বস্তুতঃ, হিন্দুর ধর্ম-কর্মের স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝিবার বা বুঝাইবার কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা নাই। একাধিক গ্রন্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেগুলি প্রায়শই আধুনিক কাল ও রুচির উপযোগী নহে। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ লবণাক্ত অতল সমুদ্রের মধ্যে যে রত্নরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, সমুদ্র দেখিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আমাদের সমাজ ও জীবনের আদর্শ কি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে—বর্তমান কালের পক্ষে সেই আদর্শের মূল্য ও উপযোগিতা কতটা, ধর্মকার্যের বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রচারবিমুখতা আমাদের ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য হইলেও ব্যাখ্যার স্থান তাহাতে আছে। তাই মন্ত্রব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে রহস্যের সন্ধান পাইব, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পক্ষে তাহা উপেক্ষণীয় নয়।

ধর্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। তবে ভগবৎপ্রীতি সম্পাদন এবং ভগবদনুগ্রহে সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষকে ধর্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত করে। তাই আমাদের ধর্মকার্যের আধ্যাত্মিক দিকের মত সামাজিক দিকও লক্ষ্য করিবার মত। আধ্যাত্মিক দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও আত্মোপলব্ধির সহায়তা হইয়া থাকে—দেবপূজায়, বিশেষ করিয়া সাত্ত্বিক আরাধনায়, উপাস্য-উপাসকের অদ্বৈত ভাবনার বিধান আছে। আমাদের দেবপূজা ব্রহ্মোপাসনার রূপান্তর—আমরা দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানি—তাই সাধারণ কথায় আমরা বলি তারা ব্রহ্মময়ী। আমরা বিশ্বাস করি, যে যে নামে বা যে ভাবেই পূজা করুক না কেন, সকলেরই লক্ষ্য—এক পরমেশ্বর। সমস্ত জলধারা যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত—সমস্ত মানবের উপাসনা-পদ্ধতি তেমনই একই লক্ষ্যের অভিমুখী—নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। পরম দেবতার শরণাপন্ন হইয়া আমরা বলি—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

হে হৃষীকেশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ—তুমি আমাদের যেমন ভাবে চালাও, আমরা সেই ভাবেই চলি।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

হে পরমেশ্বর, তোমার নিকট আমি নিজেকে উৎসর্গ করিতেছি—কারণ তুমিই একমাত্র গতি—আশ্রয়। আমার কি আছে? আমি কি দিয়া তোমার পূজা করিব?

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনম্।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্যন্ত আমি যাহা কিছু করি, হে জগন্মাতঃ, তাহা যেন তোমারই পূজারূপে গণ্য হয়।

সামাজিক মানুষ হিসাবে দেবতার নিকট আমাদের কাম্য—ধন জন সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ-বিলাস। আমরা প্রার্থনা করি—বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

আমাদের কল্যাণ কর, আমাদের বিপুল ঐশ্বর্য দান কর। আমাদের রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমাদের শত্রু ধ্বংস কর।

কিন্তু কেবল নিজের মঙ্গল নয়—সমাজ, দেশ ও বিশ্বের মঙ্গলও আমাদের প্রার্থনার বিষয়। বৈদিক ঋষি সমস্ত জগতের শান্তি কামনা করিয়া বলিয়াছেন—

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্ম চাই সর্বশ্রেণীর মানুষ, পশুপক্ষী, তরুলতার উন্নতি ও পরিপুষ্টি—সকলের কর্মনিষ্ঠা ও যথোচিত ব্যবহার। তাই বেদের প্রার্থনা—

আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্ আরাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধিমহারথো জায়তাম্ দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়া অনড়ান্ আশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণুরথেষ্ঠা সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্, নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যোন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাম্, যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।

হে ব্রহ্মন্, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ যজ্ঞাধ্যয়নশীল—ক্ষত্রিয় বীর অস্ত্রনিপুণ শত্রুভেদী মহারথ—ধেনু দুগ্ধদাত্রী—বৃষ বাহক—অশ্ব শীঘ্রগামী—রমণী সুন্দর দেহধারিণী—যুবক জয়শীল বীর—রথারোহী ও সভার উপযুক্ত হউক। আমাদের কামনানুসারে মেঘ বর্ষণ করুক—ওষধি ফলবতী হউক—আমাদের যোগক্ষেম প্রতিষ্ঠিত হউক।

চণ্ডীতে সর্বজগতের জন্ম দেবীর প্রসন্নতা কামনা করা হইয়াছে :—

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

আশ্রিতের দুঃখহারিণি দেবি প্রসন্ন হও—সমস্ত জগতের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্ন হইয়া সমস্ত বিশ্বকে রক্ষা কর—তুমি চরাচরের অধীশ্বরী।

বৌদ্ধদের প্রার্থনায় পরিচিত অপরিচিত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকলের সুখ কামনা করা হইয়াছে—

দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতো বা সম্ভবেসী বা সবে সত্তা ভবন্তু সুচিতত্তা।

দৃষ্ট অদৃষ্ট দূরবর্তী নিকটবর্তী ভূত ভবিষ্যৎ সকল প্রাণী সুখী হউক।

সকল মঙ্গলকর্মে স্পষ্ট ভাবে সমগ্র দেশের কল্যাণ কামনা করা হয় :—

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো বিদ্বাংসঃ সন্তু নির্ভয়াঃ।
ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ।
স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীপাঃ।
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।

যথাকালে মেঘ বর্ষণ করুক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, এই দেশ ক্ষোভশূন্য হউক, পণ্ডিতেরা নির্ভয় হউন। সকলে সুখী ও নিরাময় হউন, সকলে মঙ্গলদর্শী হউন, কেহ যেন দুঃখভাগী না হন। প্রজাদের মঙ্গল হউক, রাজারা ন্যায়পথে পৃথিবী পালন করুন, গোব্রাহ্মণের শুভ হউক, সমস্ত ভুবন সুখী হউক।

ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি গঠিত—ব্যক্তি লইয়া সমাজ। ব্যক্তির উপর সমাজের সুখসমৃদ্ধি নির্ভর করে। তবে সকলেই সম ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে না। তাই চাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার আগ্রহ। স্বার্থপর লোক লইয়া গঠিত সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না। আমাদের ধর্মানুষ্ঠানে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। কেবল নিজের সুখ লইয়া যে ব্যস্ত সে নিন্দনীয়। বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন—'কেবলাদ্যো ভবতি কেবলাদী'—যে কেবল নিজেই ভোজন করে সে পরম পাপী। তাই আমাদের প্রার্থনা :—

ধনং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচি স্ম কঞ্চন।

আমাদের প্রচুর ধন হউক—আমরা যেন অতিথি লাভ করি। আমাদের কাছে প্রার্থী আসুক—আমাদের যেন কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে হয় না।

দেশের বেশী লোক যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে—পরের দানের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে দেশের অমঙ্গল ঘনাইয়া আসে—জনসাধারণের কর্মপ্রচেষ্টা মন্দীভূত হয়। আমাদের দেশে যে এ বিপদ দেখা দেয় নাই, এমন নহে। আমাদের ধর্মানুষ্ঠানে দানের প্রাধান্য এক দল কর্মহীন লোককে প্রশ্রয় দিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এই বৈশিষ্ট্যই আবার দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায় এই দানের সাহায্যেই দীর্ঘকাল পঠন-পাঠনের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অবলীলাক্রমে দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। দাতা যেমন উপযুক্ত পাত্রকে দান করিয়া কৃতার্থ হইতেন—গ্রহীতাও সেইরূপ সৎ পাত্রের নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতেন—অসৎ-প্রতিগ্রহ নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল। দান হিসাবে সকল বস্তুও গ্রহণীয় ছিল না। এই সব বিধি-নিষেধ এখন পর্যন্ত সমাজে কিছু কিছু প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার প্রণালীর পরিবর্তন হইয়াছে—সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখন আর মানুষের দানের সে সামর্থ্য নাই—সে আগ্রহও নাই—দানের যোগ্য পাত্রেরও যে তেমন সম্ভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় ধর্মানুষ্ঠানে দান প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই কার্পণ্য দেখা দিয়াছে। যেখানে দানের বিশেষ বিধান আছে এরূপ অনেক স্থলে পুরোহিতের সঙ্গে দরকষাকষি ও রফা করিয়া কোন রকমে কার্যোদ্ধার হইতেছে। যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করিয়া ক্লেশমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যয়বহুল ক্রিয়াকর্ম সহজে সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পুরোহিত আর কর্মকর্তার হিতৈষী বলিয়া বিবেচিত হন না—পুরোহিতের সহিত গৃহস্থের অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক তিরোহিত-প্রায়—তাহার স্থলে এখন কঠোর ব্যাবসায়িক সম্বন্ধ

গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক দোষ-ত্রুটিও প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। গৃহস্থ 'বিত্তশাঠ্য' করিতেছেন, অর্থাভাবের মিথ্যা অজুহাতে কর্মসংক্ষেপের চেষ্টা করিতেছেন—পুরোহিতও জ্ঞানত অজ্ঞানত কাজে ফাঁকি দিতেছেন বা দিতে বাধ্য হইতেছেন।

এরূপ অবস্থার যথাসম্ভব প্রতীকার অতি সত্বর অবশ্যকর্তব্য। ধর্মানুষ্ঠান একেবারে বর্জন করা—প্রাচীন রীতিনীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা সম্ভবপর বা সঙ্গত নহে। সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও অনুষ্ঠানগুলি সমাজের পক্ষে নানা দিক দিয়া বিশেষ দরকারী সন্দেহ নাই। তাই ইহাদের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাদিগকে সমাজের অধিকতর হিতসাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। সম্ভব মত সময়োচিত কিছু কিছু পরিবর্তন মাঝে মাঝে দরকার হইবে। বস্তুতঃ, সেরূপ পরিবর্তন ধীরে ধীরে যে না হইতেছে এমন নহে, যুগে যুগে এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। তাই আজ আমাদের অনুষ্ঠানে বেদ পুরাণ তন্ত্র লোকাচারের অপূর্ব মিশ্রণ সম্ভবপর হইয়াছে। কালে কালে অনেক প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে—নূতন প্রথা তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, পূর্বেকার দশবিধ বা ততোধিক সংস্কার এখন প্রকৃত পক্ষে দুইটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে—গুরুগৃহে দীর্ঘ দিন অবস্থান, বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে অনুষ্ঠেয় সমাবর্তন আজ উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইতেছে—পূর্বে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অক্রোধন শৌচপর ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইত, এখন তাহার প্রতিনিধি কুশময় ব্রাহ্মণের দ্বারা কার্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রাচীন কালের যাগযজ্ঞের ব্যক্তিগত উৎসবের আড়ম্বরের স্থানে আজ সর্বজনীন পূজার জাঁকজমক দেখা দিয়াছে। সময়োপযোগী আরও কিছু কিছু অদল-বদল করার দরকার আছে—কালে কালে যে সব অসঙ্গতি আসিয়া জুটিয়াছে তাহাদেরও সংশোধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আজ রঘুনন্দন নাই—স্মৃতির পণ্ডিতেরা আছেন—ব্রাহ্মণ-মহাসভা আছেন—বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের কর্তৃপক্ষেরা আছেন। আজ সকলের এ বিষয়ে সমবেত ভাবে চিন্তা করা দরকার—একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। সর্বসম্মত ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন, সন্দেহ নাই—পরিবর্তনের প্রস্তাবেই অনেকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন, এ কথাও ঠিক। কিন্তু তথাপি নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

পরিবর্তন কিছু হউক বা না হউক, ধর্মানুষ্ঠানের রহস্য ও পূর্ণ বিবরণ সাধারণের সহজলভ্য করিতে হইবে। নানা স্থানে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বিবিধ ব্রতপূজা-পার্বণাদি অনুষ্ঠানের পূর্ণ পরিচয় জনসাধারণ পাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নাই। পুরোহিত কাজ করিয়া যান—যাহার কাজ করিতেছেন সে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। বিবাহে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করান—বর-কন্যা, বরকর্তা, কন্যাকর্তা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোহিত কেহই তাহার অর্থ বুঝেন না—না বুঝিয়াই প্রত্যেকে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যান। অথচ আগ্রহ থাকিলেই যে সহজ ভাবে অর্থ বুঝা যাইবে এমন সুষ্ঠু উপায়ও নাই। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত লোকের সংখ্যা খুব বেশি নহে। তবে আগ্রহের সঞ্চার করা যে কঠিন বা অসম্ভব তাহাও মনে হয় না। দেবীপক্ষের প্রারম্ভে রেডিও কর্তৃপক্ষ দেবীর উদ্বোধন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাহা ত কম জনপ্রিয় নয়—গ্রামোফোন রেকর্ডের চণ্ডীপাঠও লোকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে মনে হয়। প্রচারের এই সমস্ত আধুনিক উপায় ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে আরও ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হইলে অধিকতর সুফল লাভের আশা করা যায়। বস্তুতঃ, স্তোত্রাদি পাঠ, ধর্মকার্যের বিবরণ বা মন্ত্রব্যাখ্যার রেকর্ড পাওয়া গেলে সর্বজনীন পূজার উৎসবে মাইক্রোফোনে অকারণ সিনেমা-সঙ্গীত শুনাইবার প্রয়োজন হয় না। আশানুরূপ রেকর্ড প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত স্থানবিশেষে বক্তা ব্যাখ্যাতা বা পাঠকের সাহায্যও কাজে লাগান যাইতে পারে—মঠে মন্দিরে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ ও তাৎপর্য প্রচারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোথাও কোথাও মন্দির-গাত্রে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্ত্র ও শাস্ত্রীয় বচন অনুবাদের সহিত উৎকীর্ণ বা অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সহিত ইহাদের পরিচয় সাধনের যে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সর্বত্র অনুকরণ করার যোগ্য।

এজন্য বিশেষ ধরণের পুস্তক রচনার প্রয়োজন হইবে। স্কুল-কলেজে পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যেও অসাম্প্রদায়িক অনেক বিষয়ের সমাবেশ করা যাইতে পারে। মোটের উপর যে কোন উপায়েই হউক, প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ সাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া স্থূল বিষয়গুলির কথা বলিতে হইবে—যে সমস্ত বিষয় সাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে, সেগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফলে জনসাধারণ বুঝিয়া-শুনিয়া ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি নিজ রুচি অনুসারে শ্রদ্ধাবান্ বা বীতশ্রদ্ধ হইতে পারিবে। এই ভাবে যদি কিছু লোকের মধ্যেও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়—কিছু অসঙ্গতি যদি দূরীভূত হয়, তবে তাহাতেই সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে। জ্ঞানলব্ধ শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা অজ্ঞতা-প্রসূত শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার তুলনায় অনেক উচ্চস্তরের বস্তু।

ধর্ম্মের বিশ্লেষণ কি ?

"অহিংসালক্ষণো ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা।"

—মহাভারতম্

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

—শ্রীভাগবতম্

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ কর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরম্।"

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডম্

শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচার

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম হোল স্বাভাবিক ধর্ম। ধর্মটি খুব মাধুর্যময়। এর ভজন-পদ্ধতি অতি অপূর্ব। বৈষ্ণবগণের রসাস্বাদ-স্বরূপ এক সুখের প্রস্রবণ আছে, যা অপর কারো মধ্যে নেই। সেই রসে আকৃষ্ট হোয়ে তখনকার কালে অনেক শাক্ত বৈষ্ণব হোতে লাগলেন।

তখন শাক্ত-ব্রাহ্মণে আর ভক্ত-বৈষ্ণবে ছিল দারুণ বিরোধ ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সময়কারই কথা। তখন বৈষ্ণবেরা যত দিন দুর্বল ছিলেন, শাক্তেরা তাঁদের করুণা করতেন—এঁদের দিকে লক্ষ্যই করতেন না। কিন্তু বৈষ্ণবেরা ক্রমশঃ প্রবল হোতে লাগলেন, আর শাক্তেরা তাঁদের জব্দ করবার জন্য যত রকমের পথ আছে, ক্রমে ক্রমে তা অবলম্বন করতে লাগলেন। কায়স্থ ও বৈদ্যেরা থেকে গেলেন শাক্তদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সংগে। দল হোল দু'টো। বৈষ্ণবদের সংগে রইলেন অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য আর সমস্ত নবশাখ। আর শাক্তদের সংগে থাকলেন প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত কায়স্থ আর সমস্ত বৈদ্য। বৈষ্ণবেরা ভক্ত ও সাধু। তাঁরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের দ্বারাই তাঁদের প্রকৃতি গঠিত। তাঁরা বিরুদ্ধ দলের সংগে পারবেন কেন? বৈষ্ণবেরা অনেক রকমে প্রপীড়িত হোতে লাগলেন।

কিন্তু এ ভাবটা বেশী দিন রইলো না। দল ক্রমেই বাড়তে লাগলো। দেশে ক্রমে দুটি দল পৃথক্ হোল, আর শ্রীগৌরাঙ্গের দল প্রবল হোয়ে উঠতে লাগলো। এঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এসে প্রবেশ করতে লাগলেন। তখন এঁদের আগেকার মতো তাচ্ছিল্য করা বা ঘৃণা করা সম্ভব হোল না। পরিবর্তন হোতে লাগলো অদ্ভুত। বৈষ্ণবেরা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদের "ঠাকুর" উপাধি কেড়ে নিয়ে হোলেন "বৈষ্ণব ঠাকুর"। পদে আছে, যথা—

আজ মোরে কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর,
তোমা বিনা গতি নাই, ইত্যাদি—।

ঝড়ু হোলেন ভূঁয়ে মালী, অস্পৃশ্য। ভক্তির বলে তিনি হোলেন ঝড়ু ঠাকুর। বড় বড় ভক্তেরা তাঁর প্রসাদ পেতে লাগলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন, শাক্তদের খুব কষ্ট হোল। রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, তাঁর বয়স অল্প, অল্প বয়সেই তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হোয়েছেন। রামচন্দ্র গঙ্গার ঘাটে গেছেন স্নান করতে। পণ্ডিতেরা গিয়ে ধরলেন তাঁকে। পণ্ডিতেরা বলছেন,—'কবিরাজ, শেষটায় তুমি হোলে বৈষ্ণব! গেলে শেষে কৃষ্ণপূজা করতে—শিবকে ছেড়ে? এ কি রকম করলে? জান না কি, তোমার কৃষ্ণ করেন শিবের পূজা?' রামচন্দ্র উত্তর করছেন,—'রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্র, বৃক প্রভৃতি অসুরগণের কথা জানো তো? তারা মহাদেবের ভক্ত ছিল, ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। এঁদের ভক্ত হোয়েও কিন্তু তারা এঁদের প্রিয় হোতে পারেনি, আর হরিরও প্রিয় হয় নি। কাজেই তারা হোয়েছিল জগদ্বৈরী। আর প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তেরা হরিকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে জগৎপূজ্য হোয়ে গেছেন। অতএব কৃষ্ণভজনা করাই শ্রেয়ঃ।'

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম চরমে উঠলো। এ ধর্ম হোল রসাশ্রিত ধর্ম। এতে আছে চৌষট্টি রস। যারা এই রসের আস্বাদ পেয়েছে তাদের আর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবধর্মের সম্পূর্ণ জয়লাভ হোল। এ হোল প্রেমের মত, ভক্তির মত, যে ভক্ত সেই পূজ্য।

অনেক ব্রাহ্মণ নিজেদের স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব হোতে লাগলেন। বলরাম মিশ্র গোঁড়া ব্রাহ্মণ, আর নরোত্তম ঠাকুর হোলেন কায়স্থ। বলরাম মিশ্র গিয়ে ভক্ত নরোত্তমের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিলেন। এতে সমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হোল। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনিও গিয়ে ভক্ত নরোত্তমের কাছে মন্ত্র নিলেন। মন্ত্র নেওয়ার পর তাঁর উপর আর তাঁর স্ত্রী ও কন্যার উপর মহা উৎপীড়ন চললো সমাজের। এঁরা এমন কাজ কেন করলেন? এমন পথে কেন গেলেন? তার কারণ, শেষ ভালই ভাল; পরকালের ভালই হোল সত্যই ভাল। তাঁরা দেখলেন, যদিও তাঁরা ব্রাহ্মণ—তবু তাঁরা পতিত আর অসিদ্ধ। তাঁরা সিদ্ধির পথে এলেন, রসের পথে এলেন, এসে ধন্য হোলেন।

এই রকম ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মমত দৃঢ় ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করলে। আর এতে যে লোকের মহাকল্যাণ সাধিত হোতে লাগলো, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলি। এটি অবশ্য অনেক পরের কথা। জয়পুর রাজ্যের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হোয়ে উঠলেন। তিনি নিজের পৃথক্ এক মত স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। বিচারে পশ্চিম দেশের মহা মহা পণ্ডিতেরা সব হেরে যেতে লাগলেন। কিন্তু এতে জয়পুরের মহারাজা সন্তুষ্ট না হোয়ে তাঁকে বঙ্গদেশে পাঠালেন। পথে তিনি প্রয়াগ আর কাশীর পণ্ডিতদের পরাভব করে শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হোলেন। কৃষ্ণদেব এসেই বললেন,—"জয়পত্র দাও"! "জয়পত্র" কিসের? আগে বিচার হোক্—বিচারে স্থির হোক, তবে তো!

বিচারসভার আয়োজন হোল। তখনকার নবাব জাফর খাঁর যত্নে প্রকাণ্ড এক সভা বসলো। সেই সভায় কৃষ্ণদেব হেরে গেলেন রাধামোহন ঠাকুরের কাছে। রাধামোহন ঠাকুর হোলেন আচার্য প্রভুর প্রপৌত্র, একজন সুবিখ্যাত পদকর্তা ও পদসংগ্রাহক। এই অতি বৃহৎ সভায় শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা ইত্যাদি স্থানের গোস্বামিগণ উপস্থিত হোলেন, আর রাধামোহন ঠাকুর বিচার করলেন।

জ্ঞান ও ধর্মের মূলে আছে বৈষ্ণবধর্ম। যাগ-যজ্ঞে তাঁকে পাওয়া যায় না। প্রেম আর ভক্তি দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। প্রেম আর ভক্তিই হোল সত্য বস্তু। একজন বৈষ্ণব প্রশ্ন করলেন,—কর্ম ও ভগবান, এর ভেতর কে বড়? কর্ম বড়, না ভগবান বড়? যদি বলো কর্মফল এড়াবার সাধ্য কারো নেই, তবে ভগবান কেউ নন, তিনি আমাদের ভাল-মন্দ করতে পারেন না, কর্মই আমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাহলেই এলো নাস্তিকতা। ভক্ত বৈষ্ণব বলেন,—ভগবানই বড়, কর্ম তিনি ইচ্ছামাত্রই ধ্বংস করতে পারেন।

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভাগলপুর—দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়, ১৮৮৭ সাল।

[স্কুলের ছাত্র বালক শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি টিফিনে স্কুলের হাতায় বসে গল্প করছেন।]

যোগেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ রে শরৎ, আজ কি করে ৪টার আগে পালান যায় বল দেখি?

শরৎচন্দ্র। ছুটি নিয়ে যা।

মহেন। অক্ষয় পণ্ডিতের কাছে ছুটি? ছুটি দেবারই ছেলে বটে অক্ষয় পণ্ডিত।

মণীন্দ্রনাথ। শরৎ, তুই মাথা থেকে একটা মতলব বের কর না। রোজ রোজ ৪টে পর্য্যন্ত স্কুলে আটকে থাকা যায় না।

শরৎচন্দ্র। এক কাজ কর। অফিসের ঘড়ি অক্ষয় পণ্ডিত প্রত্যেক সোমবার দম দেয়। তোরা যদি কোন গতিকে ঘড়ির বড় কাঁটাটা ঘুরিয়ে ৩টের সময় সাড়ে তিনটে করে দিতে পারিস, তাহলে আধ ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু খুব সাবধান, যোগেন পণ্ডিত যেন টের না পায়।

বালক যোগেন। ঠিক তিনটের সময় অফিস-ঘরে যাব। তখন অফিসে কেউ থাকে না। সকলেই ক্লাসে থাকে।

শরৎচন্দ্র। কিন্তু ঘড়ির নাগাল পাবি কি করে?

মহেন। আমাদের যোগীন খুব জোয়ান আছে। যোগীন যদি আমায় কাঁধে করতে পারে, আমি ওর কাঁধে বসে ঠিক কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে পারি।

[তিনটের সময় মহেন অফিস-ঘরে দেখে এল—কেউ নেই। তার পর যোগীনের কাঁধে বসে মহেন ঘড়ির কাঁটা ৩৷৹টা করে দিয়ে এল। তার পর ঘড়িতে ৪টা বাজলে স্কুল ছুটি হয়ে গেল।]

হেড মাষ্টার অম্বিকাচরণ বাড়ী গিয়ে দেখলেন যে তখনও ৪টা বাজেনি। তিনি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন না। তার পরদিনও আগে আগে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। অথচ অক্ষয় পণ্ডিত ১১টায় স্কুলে এসে ঘড়ি ঠিক করে মিলিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপার কিছু বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে স্কুলের সেক্রেটারী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলের হেড মাষ্টার অম্বিকাচরণের কাছে আগে ছুটি হওয়ার জন্য কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন।

হেড মাষ্টার অম্বিকাচরণ। (পরদিন স্কুলে এসে) অক্ষয়, একি ব্যাপার হে? রোজ রোজ ঘড়ি বিগড়ে যায় কি করে? তুমি ত নিয়মিত ভাবে প্রতি সোমবার ঘড়িতে দম দাও। এখন সেক্রেটারীকে কি কৈফিয়ৎ দিই বল ত?

অক্ষয় পণ্ডিত। কি জানি কিছু ত বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, একদিন দাঁড়ান দেখি, কি ব্যাপার! তার পর কৈফিয়ৎ দেবেন।

সেদিন অক্ষয় পণ্ডিত বাইরে থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে ঘড়ির উপর নজর রাখলেন। তিনটের সময় দেখেন—একটা ছেলে আর একটার কাঁধে বসে অফিস-ঘরে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তবে রে—বলে তিনি ছুটলেন তাদের পেছনে। তারা দৌড়ে কে কোথায় পালিয়ে গেল। ক্লাসে গেলেন—সেখানেও যোগেন পণ্ডিতের মার-মূর্ত্তি দেখে সব ছেলে দুদ্দাড় করে বাইরে পালিয়ে গেল। কেবল নিরীহ ভাল মানুষটির মত শরৎ নির্ভয়ে ক্লাসে বসে রইল—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—এক মনে অঙ্ক কষচে।

অক্ষয় পণ্ডিত। তবে রে বদমায়েস!

শরৎ। আমি এক মনে অঙ্ক কষছিলাম পণ্ডিত মশাই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। আমি কিচ্ছু জানিনে।

অক্ষয় পণ্ডিত। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ত অঙ্ক কষছিলি দেখলাম। কিন্তু ও বদমায়েসরা গেল কোথায়? আজ ওদেরই এক দিন কি আমারই এক দিন!

ভাগলপুর—গাঙ্গুলী-বাড়ী

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল

মতিলাল। (একখানি বই পড়িতে পড়িতে) বাংলায় কি সব ছাই বই লেখে—তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। কি রকম করে যে শেষ করে কি বলব। দেখি, আমিই লিখব একখানা বই ভাল করে। দেখি দোয়াত-কলম কোথায়? দোয়াতে ত কালি নেই। কলমটার আবার নিব নেই। দূর ছাই কাগজও নেই। থাকগে। (পকেট বাজিয়ে দেখলেন) পয়সাও নেই যে একটু তামাক কিনে আনি। এই মিষ্ট্রিস অফ দি কোর্ট অফ লণ্ডন—এই খানাই পড়ি। ইংরিজি বইগুলোর তবু মাথামুণ্ডু আছে। বেশ লেখে—যেমনি বর্ণনা—তেমনি ঘটনা। বাংলা বইগুলো এই রকম লিখতে পারে না কেন?

(ইংরিজি বইয়ের ভেতর ডুবে গেলেন।)

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ—(ডান হাতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ও বাঁ হাতে হুঁকা)

—এই নাও খাও। (হুঁকাটিতে কলিকাটি বসাইয়া ডান হাতে আগাইয়া দিলেন)

মতিলাল। (কৃতজ্ঞ-প্রসন্ন দৃষ্টিতে) হ্যাগা, কি করে জানলে তামাক খেতে আমার এত ইচ্ছে হয়েছিল?

ভুবনমোহিনী। (ছোট ছোট চোখে আদরে মিটি-মিটি করে) ও আমরা কেমন আপনিই যেন বুঝতে পারি।

মতিলাল। (তামাকের ধূমে চারি দিক ভরে গেল) হ্যাগা, একটা আলো দেবে?

ভুবনমোহিনী। সারা দিনই ত ঐ ছাই মাথামুণ্ডু পড়লে। এখন যাও না একটু বেড়িয়ে এস। তার পর তোমাকে ন-কাকার কাছ থেকে নতুন বঙ্গদর্শনখানা এনে দেব।

মতিলাল। নতুন বঙ্গদর্শন এসেছে? আচ্ছা এনে রেখ।

[মতিলালের প্রস্থান।

(কিশোর বালক শরৎচন্দ্রের প্রবেশ)

ভুবনমোহিনী। তোর হাতে আবার কি বই রে শরৎ?

শরৎ। এখানা হরিদাসের গুপ্ত কথা।

ভুবনমোহিনী। এ ত তোর পড়ার বই নয়। একজনকে

ছাড়িয়ে বেড়াতে পাঠালাম। আবার তুই এই সব হতচ্ছাড়া বই নিয়ে এলি? কোথায় পেলি এ বই?

শরৎ। বাবার ড্রয়ারের মধ্যে ছিল। আমি পড়িনি মা! একটু দেখছিলাম।

ভুবনমোহিনী। তোর বাংলা বাজে বই পড়তে হবে না। একটু পড়ার বই নিয়ে বস দিকি। ওঁর বই ঘরে রেখে দিয়ে আয়। ও-সব বই পড়িসনে বাবা! একজন এই করে জীবনটা নষ্ট করলে। আবার তুইও ধরলি? বাংলা বই পড়ে তোদের কি হবে বলতে পারিস?

শরৎ। হবে আর কি মা! ভাল লাগে তাই পড়ি।

[প্রস্থান।

ভাগলপুর—কুসুমকামিনীর গৃহ

সন্ধ্যার পর কুসুমকামিনী (শরৎচন্দ্রের মাসীমা) প্রদীপের সামনে বসিয়া 'বঙ্গদর্শন' পড়িতেছেন। শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কিশোর বালকেরা শুনিতেছে। শরৎচন্দ্র উবুড় হইয়া শুইয়া দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া দুই হাতে মুখ রাখিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন।

কুসুমকামিনী—(বঙ্গদর্শন হইতে)

"নবকুমার কাপালিকের আহ্বানে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাদবর্ত্তী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎ-প্রাচীর-বিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সৈকতে লইয়া চলিলেন। এমন সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পালাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদ নির্গমন হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল—"কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিলেন না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মনুষ্যঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন—"হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল—"পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন "কেন?"

কাপালিক কহিল—"বধার্থ।"

শরৎচন্দ্র। মাসীমা—নবকুমারকে কাপালিক কেটে ফেলবে?

কুসুমকামিনী। কি করে বলব বাবা? এ মাসের বঙ্গদর্শনে এইখানে শেষ করেছে। আবার আসচে মাসে দেখা যাবে কি হয়।

শরৎচন্দ্র। কেটে বোধ হয় ফেলবে না, না মাসীমা? কেটে ফেললে ত মরেই গেল। বই ত শেষ হয়ে গেল।

কুসুমকামিনী। বোধ হয় কেটে ফেলবে না। ঐ মেয়েটা—ওই কপালকুণ্ডলা বোধ হয় ওকে বাঁচাবে।

শরৎচন্দ্র। জান মাসীমা—একটা গল্পে পড়েছিলাম—থিসিউসকে মিনোটারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এরিএড্‌নি—শেষে থিসিউস এরিএডনিকে নিয়ে জাহাজে করে দেশে পালিয়ে গেল—সেখানে তাদের বিয়ে হ'ল। কেমন মিষ্টি করে গল্পটা শেষ হ'ল বল ত মাসীমা? এই বইতেও বোধ হয় সেই রকম কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে যদি কাপালিকের হাত থেকে বাঁচাতে পারে তবে তাদেরও বিয়ে হবে দেখো তুমি। নইলে আর বই কি হ'ল!

কুসুমকামিনী। জানিস শরৎ! এই বই যিনি লিখেছেন—তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কাঁঠালপাড়ায় আমার বাপের বাড়ীর কাছেই তাঁদের বাড়ী। আমি ছেলেবেলায় বিয়ের আগে তাঁদের বাড়ী যেতাম। তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। সুন্দর চেহারা, আর কি বাবু যে কি বলব!

শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র কি সুন্দর বই লিখেছেন দুর্গেশনন্দিনী। আর তার কাছে কি, ছাই 'ভবানী পাঠক', 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' বল ত মাসীমা!

কুসুমকামিনী। ঠিক বলেছিস শরৎ। বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ে আর অন্য বই পড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এ সব বই ত আমাদের গোঁড়াদের বাড়ীতে সামনে দিয়ে ঢোকবার উপায় নেই। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে এই বঙ্গদর্শন পড়ি—পাছে বাড়ীর লোকে টের পায়।

[প্রস্থান।

ভাগলপুর—পড়বার ঘর

রাত্রি ৮টা-৯টা

কেদারনাথ বারান্দায় নেয়ারের খাটে ঘুমিয়ে পড়েছেন। চণ্ডীমণ্ডপে মণি, শরৎ, দেবেন প্রভৃতি কিশোর বালকেরা রেড়ীর তেলের প্রদীপের চারি দিক ঘিরে পড়তে বসেছে। ফরাস বিছানায় ধপধপে সাদা ফর্সা চাদর পাতা। পিলসুজের উপর টল্‌টল্ করছে এক-প্রদীপ তেল। তাতে গোটা দুই সলতে লাগিয়ে উজ্জ্বল করে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে পড়ছে।

দেবেন। পি এস এল এ এম্—পস্‌লাম। পি এস এল এ এম—পস্‌লাম।

মণি। বল পিসলুম।

দেবেন। পি, এস, এল, এ, এম—পিসলুম। পি, এস, এল, এ, এম—পিসলুম।

এমন সময় সেই ঘরে উড়ে এল দুটো চামচিকে। ছেলেদের মাথার ওপর উড়তে লাগল পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্য। চামচিকে দুটোকে মারবার জন্য ছেলেদের হাত নিসপিস করতে লাগল। বিশেষ মণি-শরতের।

দেবেনের পড়ার অভ্যাস ছিল—লম্বা হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের ওপর গাল রেখে পড়ার পূর্ণ ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ ঘুমোন।

মাথার ওপর চামচিকে উড়তেই মামা-ভাগ্নে—মণি ও শরৎ—দুটি দু'জনে চাঁচা বাকারি বাইরে থেকে নিয়ে এসে ঘোরাতে লাগল। চামচিকে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল আর একজনের

বিনিদ্রা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘুমহীন রাত।
পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর
সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভ, ওফির,
মরুর বালুকা লুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর,
অন্ধকারে আজো তার ঢেউ,
অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদ
উপবাসী চোখের পাতায়।

হিমেল মরুর ঘুম তুহিন-শীতল,
ডোবা জাহাজের ঘুম অতল গহন,—
আমি নিদ্রাহীন।
বিস্ফারিত কোটি চোখে আকাশের শাণিত জিজ্ঞাসা
করিছে জর্জ্জর,
ধরণীর আশ্বাসের অরণ্য-মর্ম্মর
—তাও স্তব্ধ।
চেতনা-সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াশা
না জানিতে অমনি মিলায়।

চিন্তাব্যগ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মত।
স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি:
অবিরাম অশ্বখুর-ধ্বনি
কাল প্রহরীর,
—কত দূর হতে আসে
নিবায়ে নিবায়ে,
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ
কত পথ মুছে মুছে।

চিরমৌন হিমরাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে
সে দুঃসহ ধ্বনি হতে কোথা পরিত্রাণ,
ঘুম কই?

ঝাকারি প্রদীপে লেগে নিমেষে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল। প্রদীপ গেল উল্টে, আলো গেল নিবে। আর সাদা ফর্সা চাদরের ওপর রেড়ীর তেলের ঢেউ খেলে গেল। ঘুমন্ত দেবেনের কিন্তু ঘুম ভাঙল না। মণি ও শরৎ নিঃশব্দে এখান থেকে পালিয়ে এক ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসে গেল।

এদিকে ছেলেদের ছুটোপুটিতে কেদারনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চীৎকার করলেন—মুশাই, মুশাই?

মুশাই (চাকর)—জী—

কেদারনাথ। বাত্তি কেঁও বুত গিয়া?

মুশাই দেশলাই জেলে দেখল—না আছে মণি, না আছে শরৎ—শুধু দেবেন গভীর ঘুমে মগ্ন।

মুশাই। মন্নি-শরৎ তো খানে গিয়া—দেবীন বাত্তি গিরায় দিয়া।

কেদারনাথ উঠে এসে দেখলেন—সেই ধব্‌ধবে ফরাসের ওপর রেড়ীর তেলের ঢেউ খেলছে—আর প্রদীপ দেবেনের পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে আছে।

কেদারনাথ। মুশাই, চৌকা বাত্তি লাগাও।

দেবেনকে কান ধরে তুলে দিয়ে বললেন—লে যাও আস্তাবলমে।

দেবেন আস্তাবলে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগল। ঘোড়ার চিঁহিহি—আর পা-ঠোকা শুনতে লাগল।

মণি শরৎ বুদ্ধি করে খেতে বসে সে দিনের মত অপরাধ করেও বেঁচে গেল। আর নিরপরাধ দেবেন?*

---

* শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র এই দৃশ্যকেই কল্পনার তুলিতে রং দিয়া আঁকিয়াছেন। এইটুকুই মাত্র সত্য ঘটনা। বাকি সব শরৎচন্দ্রের কল্পনা।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো সাত

মনোমোহন মিত্তিরও ঈশ্বর মানে না। মেসো রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বন্ধু বলতে রাম দত্ত, আরেক মেসোর ছেলে। সমপন্থী নাস্তিবাদী।

ব্রাহ্মসমাজের আওতায় এসেছে দুজনে। অথচ কেশব সেনই দক্ষিণেশ্বরে কোন এক সাধুর কথা লিখেছে কাগজে। কেশব যখন লিখেছে তখন উড়িয়ে দেওয়া যায়-না। চল দেখে আসি।

নাস্তিকে-নাস্তিকে মাসতুতো ভাই। এল দুজন দক্ষিণেশ্বরে। রাম দত্ত তখন ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে চাকরি করে, আর মনোমোহন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চল্লিশ টাকার কেরানি।

এসে দেখে ঠাকুরের দরজা বন্ধ। অবিশ্বাস নিয়ে এসেছে, বন্ধ তো থাকবেই। শরণাগতি নিয়ে আসত, খোলা পেত। শরণাগতি কি সহজে আসে?

'ওরে হৃদে, মস্ত এক ডাক্তার এসেছে।' ঠাকুর ডাকলেন হৃদয়কে: 'তোর কি ভাগ্যি! নাড়ী দেখাবি তো এবেলা দেখিয়ে নে।'

হৃদয় তখুনি বাড়িয়ে দিল হাত। রাম দত্তও দিব্যি পরীক্ষা করল।

কিন্তু হৃদয়ের হাত দেখে কি হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পা কই?

ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে মনোমোহন, বিশ্বাসের পর্বত ভেদ করে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝরিণী, ইচ্ছে হল পা দুখানি টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

কিন্তু, কেন কে জানে, সেদিন পা দুখানি গুটিয়ে নিলেন ঠাকুর।

অভিমানে ফুলে উঠল মনোমোহন। বললে, 'বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন। শিগগির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয় সকল ভক্তের সাধ মেটাব বলে রাখছি।'

তাড়াতাড়ি পা বার করে দিলেন ঠাকুর।

প্রার্থনায় না পাই, অভিমান করে নেব। নেব ছল করে জোর করে কৌশল করে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার উদ্যোগ করছে, মাসি এসে বাধা দিল। বললে, যাস নে ওখানে।

মাসির বাড়িতে থাকে তাঁর কথার অমান্য করা যায় না, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে না গিয়েই বা থাকা যায় কি করে। রাম দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল তাই চুপি-চুপি।

গিয়ে দেখে ঠাকুরের মুখ ভার। কি হল?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার মাসি তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় মাসির কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে!'

আরেক দিন দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে, বাধা দিল স্ত্রী। বললে, 'মেয়েটার অসুখ, যেয়ো না বাড়ি ছেড়ে।'

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ডাক যে ত্রৈলোক্যাকর্ষী বংশীর ডাক। স্ত্রীর কথা তাই কানে তুলল না। এবার আর সঙ্গে নিল না রামকে। কৃতকর্মের ফল সে নিজেই বহন করবে বলে একা গেল।

গিয়ে দেখে ঠাকুর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার স্ত্রী তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয়, বউয়ের কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে।'

আসা বন্ধ করল না মনোমোহন। আর, থেকে-থেকে সঙ্গে আছে রাম দত্ত।

দুই নিরীহ গৃহস্থ কিন্তু আসলে দুই বিরাট আবিষ্কর্তা। মনোমোহন আবিষ্কার করল রাখালকে, রাম দত্ত নরেনকে। শুধু সন্ধান দিল না, ধরে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। প্রতীক্ষিত বারুদের কাছে দুই উড়ন্ত বহ্নিকণা।

মনোমোহন, মহিমাচরণ আর মাষ্টার বসে আছেন। মনোমোহনের দিকে চেয়ে বলছেন ঠাকুর, 'সব রাম

দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, কিন্তু আমি দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।'

'তবে আপনি যেমন বলেন, আপো নারায়ণ—জলই নারায়ণ, তেমনি।' বললে মনোমোহন, 'জল কোথাও খাওয়া যায়, কোথাও বা মাত্র মুখে দেওয়া চলে, কোথাও বা শুধু বাসন মাজা।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তিনি ছাড়া কিছু নেই। জীব-জগৎ সব তিনি।'

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব তুমি। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সব তুমি। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সব তুমি। তুমিই ভোক্তা-ভোজ্য, আধার-আধেয়। তুমিই অখণ্ড-মণ্ডলাকার।

হাটখোলার সুরেশ দত্ত নাগমশায়ের বন্ধু। ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ়ীভূত। ঠাকুরকে একবার ভোগ দেবে, নতুনবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়েছে গাড়ি করে। নিজে চলেছে পায় হেঁটে, দইয়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে। গাড়িতে দিলে ঝাঁকুনিতে দই পাছে চলকে যায়, তাই এই ক্লেশসাধন। ভোগের দই, ভ্রষ্ট হতে পারবে না। তেমনি আমিও অভঙ্গ থাকব।

তেইশ নম্বর সিমলে স্ট্রিট মনোমোহনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসেছেন বৈঠকখানায়। বলছেন, 'যে অকিঞ্চন যে দীন তারই ভক্তি ঈশ্বরের সব চেয়ে প্রিয়। খোলমাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধনের কত ধন কত ঐশ্বর্য, তার বাড়ি ঠাকুর গেলেন না। গেলেন বিদুরের বাড়ি।'

পরামর্শের জন্যে বিদুরকে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র। কত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে, কিছুই সুফল আনল না। জতুগৃহে দগ্ধ হল না। দ্যূতক্রীড়ায় হেরে গেল, দ্রৌপদীর বেশাভিমর্ষ হল, বনবাস-সত্য-পালন করে ফিরে এল পাণ্ডবেরা। রাজ্যভাগ দাবি করল। কৃষ্ণ এসেছিল অনুনয় করতে, ফিরিয়ে দেওয়া হল। এখন বিদুরের কি মত ?

বিদুর বললে, 'মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে দিন তার রাজ্যভাগ। অশিব দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন।

আর যায় কোথা ! এ দাসীপুত্রকে কে ডেকে আনল এখানে ? যার অন্নে পুষ্ট তারই সে বিরুদ্ধতা করছে ? শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রেখে একে এখুনি তাড়িয়ে দাও পুরী থেকে। গর্জে উঠল দুর্যোধন।

এও ভগবানেরই লীলা। দ্বারদেশে ধনুর্বাণ রেখে বেরিয়ে পড়ল বিদুর। পরিধানে কম্বল, ধূলিরুক্ষ কেশপাশ, বেরিয়ে পড়ল তীর্থোদ্দেশে। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।' সর্বাবস্থায় যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক। এত মধুর নিজের পর্যন্ত মনোহরণ করেন, নিজেকে নিজেই চান আলিঙ্গন করতে।

যে আকাঙ্ক্ষা অভাব থেকে জাগে তা দূষণস্বরূপ। আর যে আকাঙ্ক্ষা স্বভাব থেকে জাগে তা ভূষণস্বরূপ। ঈশ্বরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদন। যত খান তত চান। কাউকে ছাড়েন না, যার থেকে যতটুকু পান নিংড়ে-নিংড়ে নেন। শ্রেষ্ঠকে পেলেও কনিষ্ঠকে ছাড়েন না, উত্তমকে পেলেও ছাড়েন না অধমকে। তিনি আর কারু বশীভূত নন শুধু ভক্তের বশীভূত। আর কারুতে বৎসল নন শুধু ভক্তে বৎসল।

'বৎসের পিছে যেমন গাভী যায় তেমনি ভক্তের পিছে ভগবান যান।' বললেন ঠাকুর।

কথক প্রহ্লাদচরিত বলছে। হিরণ্যকশিপু যেমন নিন্দা করছে হরির, তেমনি নির্যাতন করছে প্রহ্লাদকে। তবু প্রহ্লাদের বিচ্যুতি নেই। হরিকে প্রার্থনা করছে, হে হরি, বাবাকে সুমতি দাও। আর আমাকে ? আমাকে দাও অবিসংবাদিনী ভক্তি।

ঠাকুর কাঁদছেন। পাশে বসে বিজয়, মনোমোহন, সুরেন্দ্র। বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আহা, ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নাম করো, ভক্তি হবে। দেখ না শিবনাথের কি ভক্তি ! যেন রসে-ফেলা ছানাবড়া !'

পরে আবার যখন এলেন মনোমোহনের বাড়ি, ঈশান মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর।

ঈশান বলছে, 'সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হয় না ?'

'সবাই কেন ত্যাগ করবে ? যাকে দিয়ে করাবার তাকে দিয়ে করাবেন। জোর করে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে ? মর্কট বৈরাগ্য কি বৈরাগ্য ?' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন।

সেই যে বিধবার ছেলে, মা সুতো কেটে খায়, একটু কাজ পেয়েছিল সে কাজ চলে গিয়েছে। বেকার হয়ে বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরল, কাশীবাসী হল। কিছুদিন পরে মাকে চিঠি লিখলে। মা, আমার একটি চাকরি হয়েছে, দশ টাকা মাইনে। ওই মাইনে থেকেই সোনার আংটি কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের বাসনা যাবে কোথায় ?

দ্বিতীয়বার, প্রাঙ্গণে বসেছেন। কেশব এসে প্রণাম করল। গৃহস্থ ভক্তেরা চার দিকে ব'সে।

সংসারে কর্ম বড় কঠিন।' বলছেন ঠাকুর, 'বন্-বন্ করে যদি ঘোরো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই। ঘুরবে কিন্তু পড়বে না। কর্ম করো চুটিয়ে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না।'

'বড় কঠিন।' কে একজন বললে। 'তবে উপায় কি?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। ছুতোরের মেয়ে একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে মুষলের দিকে।'

অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। কাঁদতে-কাঁদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে। ডাকতে-ডাকতে ভালোবাসা। চলতে-চলতে পথ পাওয়া। প্রদীপ জ্বালতে-জ্বালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠা!

হোক কঠিন। কঠিন বলেও যদি নিবৃত্ত না হও তবেই তো কৃপা করবেন। যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারাই তো বীর ভক্ত। মাথায় বিশ মণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। যখনই ভগবান দেখবেন এই বীরত্বের কৃতিত্ব তখনই কৃপাস্পর্শে তাকে তিনি মর্যাদা দেবেন। আর তাঁর কৃপাস্পর্শে সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

'ভক্তি লাভ করে কর্ম করো।' বলছেন ঠাকুর, 'শুধু কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আটা লাগবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আটা লাগবে না।'

নিজে একজন খুব বড় ভক্ত মনে মনে ঘোরতর স্পর্ধা মনোমোহনের। এ একরকম ভক্তির অহমিকা। কিন্তু ঠাকুর তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন।

একদিন বললেন সকলের সামনে, 'সুরেশের ভক্তিই সকলের চেয়ে বেশি।'

মনোমোহনের অভিমানে ঘা লাগল। ভাবল, তবে আর ঠাকুরের কাছে গিয়ে লাভ কি। ছাড়ল দক্ষিণেশ্বর। রবিবার-রবিবার বৈঠক বসত সেখানে, তারও চৌকাঠ মাড়াল না।

কি হল হে তোমার বন্ধুর? আর আসে না কেন? ভালো আছে তো? রাম দত্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

রাম দত্ত কিছুই জানে না। খোঁজ নিয়ে জানল ভালোই আছে। তবে যাও না কেন? আমার খুশি।

ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠালেন। মনোমোহন তা গ্রাহ্য করল না। বললে, 'আমাকে তাঁর কি দরকার! তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন। আমি তাঁর কে!'

অভিমানের কথা! আমার যখন ভক্তি নেই তখন আমাকে আবার ডাকা কেন!

বারে-বারে লোক পাঠাতে লাগলেন ঠাকুর, আর বারে-বারেই তাদের ফিরিয়ে দিলে। বিরক্ত হয়ে মনোমোহন কোন্নগরে চলে গেল, সেখান থেকেই আফিস করতে লাগল, যাতে ঠাকুরের লোক তাকে ধরতে না পায়। ঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। কোন্নগর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। একদিন পাঠিয়ে দিলেন খোদ রাখালকে।

রাখালকে ফিরে যেতে দিল না মনোমোহন। সঙ্গের লোকটিকে বলে দিল, 'ঠাকুরকে গিয়ে বোলো, ভক্তিহীনকে ডেকে লাভ কি! আগে ভক্তি-টক্তি হোক, তার পর যাব একদিন।'

ক্রোধে পুড়তে লাগল মনোমোহন। বিপরীত আচরণ করছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঠাকুরকে ভুলতে পারছে না। মন বসছে না আফিসের কাজে, থেকে-থেকেই ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। যাঁকে পরিহার করতে চাইছে সর্বক্ষণ তারই উপর অভিনিবেশ!

যেমন কংসের অবস্থা। পান-ভোজন, ভ্রমণ-শয়ন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব সময়েই দেখছে চক্রধারীকে। কেশাকর্ষণ করে উচ্চ মঞ্চ থেকে ফেলছেন নিচে তখনো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অপলক চোখে। দেখতে-দেখতে তাঁরই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে।

তেমনি মনোমোহনেরও সব সময়ে মনোমোহন-দর্শন। বৈমুখ্যের জন্যে সব সময়েই অভিমুখিতা। বৈরূপ্যের জন্যে সব সময়েই সারূপ্য। যাকে সরিয়ে দিতে চাই বারে-বারে তারই কাছটিতে গিয়ে বসা। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তাকেই জড়িয়ে ধরা।

অশান্ত মনে দিন কাটছে মনোমোহনের। একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়েছে, দেখল সামনে একখানি নৌকো। তাতে বলরাম বোস ব'সে। বলরামকে দেখে নমস্কার করল মনোমোহন। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার! সকালেই ভক্তদর্শন।'

কথার সুরে কি সেই পুরোনো অভিমানের ঝাঁজ রয়েছে লুকিয়ে?

হাসিমুখে বলরাম বললে, 'শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ এসেছেন।'

কে, ঠাকুর? কোথায় তিনি?

নৌকোর দিকে ফের চোখ পড়ল। কোথায়? ও তো নিরঞ্জন।

হ্যাঁ, নিরঞ্জনই তো। নিরঞ্জন বললে, 'আপনি যান না কেন দক্ষিণেশ্বর? আপনি যান না বলে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে এসেছেন আপনার কাছে।'

এসেছেন? কোথায় তিনি? ঐ যে নিরঞ্জনের পাশটিতে বসে আছেন লুকিয়ে।

ওরে, না এসে কি পারি? তুই যে সর্বক্ষণ আমাকে ডাকছিস। তুই যে আমাকে দূরে রাখছিস ঐ তো তোর আমাকে কাছে ডাকা। ঠেলে দিচ্ছিস বারে-বারে ঐ তো তোর আমাকে কাছে টানা। আমাকে তুই আর বসে থাকতে দিলি কই?

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। জলের মধ্যেই মনোমোহন ছুটল তাঁর দিকে। জলের মধ্যেই প্রায় টলে পড়ে—ধরে ফেলল নিরঞ্জন। টেনে তুলল তাকে নৌকোয়। ঠাকুরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

আমি তোমাকে চাইনি, কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি আমাকে চেয়েছ। আমি তোমাকে পিছনে ফেলে পালাতে চেয়েছি, কিন্তু, আশ্চর্য, সামনেই আবার তুমি দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেয়েছি, তুমি নিজেই কখন ধরা দিয়েছ। তোমাকে চাই না, এ কথা বললেও তুমি ছাড়ো না। তোমার কাছে না গেলেও তুমি আস। না ডাকলেও খুঁজে বার করো। বারে-বারে হেরে গিয়ে জয়ী হও। তোমার সঙ্গে পারি এমন সাধ্য কি!

একশো আট

রসিকের কথা মনে আছে? সেই রসিক মেথর? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার?

পঞ্চবটীর কাছটায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঠাকুর যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে। পিছনে গাড়ুহাতে রামলাল।

ঠাকুরকে দেখে সরে গেল রসিক। কে জানে যদি অশুচি ধূলির দূষিত স্পর্শ তাঁর পায়ে লাগে।

ফেরবার সময় সরল না। কোমরের গামছাখানি খুলে গলায় জড়ালে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসিমুখে শুধোলেন, 'কি রে রসিক, ভালো আছিস তো?'

'বাবা, আমরা হীন জাত, হীন কর্ম করি, আমাদের আবার ভালো কি!' হাত জোড় করে বললে রসিক।

মথুরবাবু ছাড়া আর কেউ বাবা বলতে পায়নি এতদিন। মথুরবাবুর পরে এই আবার রসিক মেথর। তার বাবা-ডাক মেনে নিলেন সস্নেহে। কিন্তু সতেজে বলে উঠলেন, 'হীন জাত কি! তোর ভেতরে যে নারায়ণ আছেন। নিজেকে জানতে পাচ্ছিস না তাই হীন মনে করছিস—'

'কিন্তু কর্ম তো হীন।'

'কি বলিস! কর্ম কি কখনো হীন হয়?' ঠাকুর আবার বললেন তেজী গলায়: 'এইখানে মায়ের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, কত সাধুসজ্জন আসছে-যাচ্ছে, তাঁদের পায়ের ধূলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঝাঁট দিয়ে সেই ধূলো তুই তোর পায়ে মাখছিস! কত পবিত্র কর্ম। কত ভাগ্যে এ সব মেলে বল্ দেখি।'

রসিক যেন আশ্বস্ত হল। বললে, 'বাবা, আমি মুখখু, তোমার সঙ্গে তো কথায় পারব না। কে বা পারবে তোমার সঙ্গে? শুধু একটা কথা তোমাকে জিগগেস করি। বাবা, আমার গতিমুক্তি হবে তো?'

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, যেতে-যেতে বললেন, 'হবে, হবে। বাড়ির উঠোনে তুলসী-কানন করে সন্ধেবেলায় হরিনাম করবি, কোনো ভয় নেই।'

এ যেন স্থির হয়ে ঠিক বললেন না। কে জানে হয়তো বা স্তোক দিয়ে গেলেন। রসিক পিছু নিল। প্রলুব্ধের মত জিগগেস করলে, 'বাবা, সত্যি আমার গতিমুক্তি হবে?'

এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন ঠাকুর। বললেন, 'হবে হবে হবে। শেষ সময়ে হবে।'

ঠাকুরের অপ্রকট হবার পর দু বছর কেটে গেছে। একদিন কাজে রসিক না এসে এসেছে তার স্ত্রী। রামলাল জিগগেস করলে, 'কি রে রসকে এল না কেন?'

'বাবাঠাকুর, তার খুব জ্বর।'

পরদিন আবার রসিকের স্ত্রী এলে রামলাল কুশল-প্রশ্ন করল। রসিকের স্ত্রী বললে, 'ভালো নয়। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ভালো ডাক্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু এমনি জেদ, ওষুধ কিছুতেই খাবে না। আমাকে বললে ঠাকুরবাড়ি থেকে চন্নামৃত নিয়ে আয়। চন্নামৃতই আমার ওষুধ।'

রামলাল চরণামৃত দিল। কালকে আবার কেমন থাকে না জানি।

মেথরপাড়ার মোড়ল এই বুড়ো রসিক। কাঁচড়াপাড়ার কর্তাভজার দল থেকে দীক্ষা নিয়েছে।

তুলসী-মালা জপ করে। ঠাকুরের কথা শুনে বাড়ির আঙিনায় কানন করেছে তুলসীর। মেথরদের সব ছেলে-বুড়ো নিয়ে রোজ সন্ধেবেলা কীর্তন করে। হরিনামের তুফান তোলে।

ভর দুপুরবেলা সেদিন হঠাৎ স্ত্রীকে হুকুমজারি করলে, 'আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চলো।'

সে কি কথা? স্ত্রী তো স্তম্ভিত!

'ছেলেদের ডাকো। আমার এখন শরীর যাবে।'

'তুমি তো এখন দিব্যি ভালো আছ—' স্ত্রী প্রতিবাদ করল।

'যা বলছি তাই শোনো। ছেলেদের ডাকো। তুলসীতলায় মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দাও আমাকে।'

একবার জেদ ধরলে কিছুতেই টলানো যায় না। ছেলেরা জোয়ান, রোজগেরে। বাপের কথায় ছুটে এল। ধরাধরি করে বের করে শুইয়ে দিল তুলসী-তলায়। খাড়া রোদের মধ্যে।

'আমার জপের মালা নিয়ে আয়।' বললে রসিক। স্বাভাবিক সুস্থ কণ্ঠস্বর।

জপ করতে-করতে হঠাৎ যেন কি দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ চোখে। সমস্ত রৌদ্রে যিনি ছায়াময় ও সমস্ত ছায়ায় যিনি জ্যোতির্ময় তিনি যেন দাঁড়িয়েছেন সামনে। তৃপ্তির একটি সচেতন লাবণ্য ফুটে উঠল মুখমণ্ডলে। বললে, 'কি বাবা এয়েছ? তাই বলি, এয়েছ? আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর!'

টান-টান শ্বাস কিছু হল না। বলতে-বলতে গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে গান শোনাতে আসে ঠাকুরকে। কী সুস্বন সে গান! যে শোনে সেই মজে।

'আহা, নীলকণ্ঠের গান কী চমৎকার!' বলছেন শ্রীমা: 'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।'

তাঁর ঘরে মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছেন ঠাকুর। দীননাথ খাজাঞ্চিও দর্শন করতে এসেছে। পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকল নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ না সুধাকণ্ঠ।

তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'আমি ভালো আছি।'

সেই ভালোটিই তো চাই। নীলকণ্ঠ যুক্তকরে বললে, 'আমায়ও ভালো করুন। এই সংসারে পড়ে রয়েছি।'

'পাঁচজনের জন্যে তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।'

পাঁচজনের সেবাতেই তো ঈশ্বরপূজা। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে পূজা নিচ্ছেন। কাজ যেমন হোক, পূজা ঠিকই হচ্ছে। বলো এ তাঁর সংসার। যাদের সেবা করছি তারা তাঁরই প্রতিনিধি।

'তুমি যাত্রাটি করেছ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায় যাবেন?'

ঠিকই তো। আমাকে দিয়ে কতগুলো লোকের ভরণপোষণ হচ্ছে। এ দিয়েই আমি ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছি। যাকে দিয়ে তিনি যা করাবেন তাতেই তাঁর তুষ্টি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

'তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খুশি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।' আবার বলছেন রামকৃষ্ণ, 'গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'যেকালে তাঁর নাম করতে তোমার চোখ জলে ভেসে যায় সেকালে আর তোমার ভাবনা কি? তাঁর উপরে তোমার যে ভালোবাসা এসেছে।'

শুধু ঐটিই তো মন্ত্র। ভালো হও আর ভালো-বাসো। ভালো হতে পারলেই ভালোবাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে।

'তোমার ও গানটি বেশ। শ্যামাপদে আশনদীর তীরে বাস।' বলছেন ঠাকুর, 'পদে যদি নির্ভর থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলবার বললাম, এখন হাকিমের হাত।'

সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে কীর্তন করে এসেছে নীলকণ্ঠ। সেখানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। তবু আবার এসেছে বিকেলে। শত কথাবার্তার মধ্যেও এই অনুরাগের অঙ্গীকারটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। শেষকালে বললেন, 'তুমি সকালে এত গাইলে। আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু 'অনারারি'।'

'কি বলেন!' নীলকণ্ঠ অভিভূতের মত বললে, 'আমি এখান থেকে অমূল্য রতন নিয়ে যাব।'

'সে অমূল্য রতন নিজের কাছে। না হলে

তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান অত মধুর। জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মানুষ, যার চৈতন্য হয়েছে সে মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁসের দলে।'

মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে হরিবাবু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। ছোট খাটটিতে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। ওরা এসে মেঝের উপর প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর মশারির বাইরে এলেন। বললেন, 'কে বা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি! যাই বলো তিনি ধ্যান করালেই তবে হবে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো তোমার সাধ্য কি।'

'ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' হরিবাবুর দিকে ইসারা করল মাষ্টার: 'এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে, প্রায় এগারো বছর।'

'তুমি কি কর গা?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হরিবাবুর হয়ে মাষ্টারই বললে, 'একরকম কিছুই করেন না। তবে বাপ-মা ভাই-ভগ্নীর সেবা করেন।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে কি গো, তুমি যে সেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। না সংসারী না হরিভক্ত। এ কেমনতরো কথা?'

বাড়িতে একরকম পুরুষ থাকে জানো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে কেবল ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায় আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে কুমড়ো কেটে দেওয়া। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই বড়ঠাকুরকে ডেকে আনায়। বলে কুমড়োটাকে দুখান করে দিন। বড়ঠাকুর তাই করে দেয় খুশি হয়ে। তার ঐ পর্যন্ত পৌরুষ। তাই তার নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর।

'আমি বলি তুমি এও কর ওও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করে যাও।'

শুধু কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্যে, রাখতে হবে সেই একটি চেতনার উজ্জ্বলতা। ফলের জন্যে লাভের জন্যে জয়ের জন্যে কাজ করছি না, কাজ করছি তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে। আফিসের বড়বাবু তো চাকরি দেননি, চাকরি দিয়েছেন ঈশ্বর। তাই আফিসের বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে আমার সুখ কই? সেই সর্বতশ্চক্ষু ঈশ্বরকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তাঁর কাজ তিনি বুঝে নেবেন, আমি শুধু করে যাই। যে পার্টে নামিয়েছেন অভিনয় করে যাই নিখুঁত করে। বাহবা পাই না পাই কিছু এসে-যায় না। তাঁর দেওয়া পার্টটি তো করলাম জীবন ভ'রে—এই আমার সন্তোষ। আমি না হলে তাঁর এই বৃহৎ নাটক যে সম্পূর্ণ হত না, তাই আমার পার্টে তাঁরও তৃপ্তি।

কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ পরিশুদ্ধ হবে।

ঐ দেখ না, সেদিন শ্রীরাম মল্লিক এসেছিল, তাকে ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ঠাকুরের খুব ভাব ছিল ছেলেবেলায়। একে-অন্যের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ত। এত গলায়-গলায় ভাব, লোকে বলত এদের ভিতর একজন মেয়ে হলে এদের বিয়ে হয়ে যেত। তাকে এখন দেখবার জন্যে ঠাকুরের খুব আগ্রহ। কতবার লোক পাঠিয়েছেন তার জন্যে তার ঠিক নেই।

একদিন এসে উপস্থিত শ্রীরাম। ছেলেপিলে হয়নি; একটি ভাইপো মানুষ করেছিল সেটি মরে গেছে। কেঁদে আকুল হল ভাইপোর জন্যে। কিন্তু শোকাগ্নিতে পুড়েও পবিত্র হয়নি দেহ।

'ছুঁতে পারলাম না।' বললেন ঠাকুর, 'দেখলাম তাতে আর কিছু নেই।'

সংসারে থাকব না তো যাব কোথায়? যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসারই রামের অযোধ্যা। গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর রাম বললে, আমি সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাকে অনেক বোঝালো, রাম নিবৃত্ত হল না। তখন বশিষ্ঠকে পাঠাল দশরথ। বশিষ্ঠ দেখলে রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বশিষ্ঠ রামকে বললে, আগে আমার সঙ্গে বিচার করো, তোমার জ্ঞানের বহরটা একবার দেখি, তারপর যেথা ইচ্ছা চলে যেও। রাম বললে, বেশ, বলুন, কিসের বিচার? তখন বশিষ্ঠ বললে, আচ্ছা বলো, সংসার কি ঈশ্বরছাড়া? যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তুমি এ দণ্ডে তা ত্যাগ করো। রাম দেখল, ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত কিছু সত্য হয়ে রয়েছে। তখন সে নিবৃত্ত হল।

'সংসারে রেখেছেন তা কী করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো।' বললেন ঠাকুর: 'সংসারেই থাকো আর অরণ্যেই থাকো ঈশ্বর শুধু মনটি দেখেন।'

কলঙ্কসাগরে ভাসো কলঙ্ক না লাগে গায়।

[ক্রমশঃ।

মৃতের সহিত সাক্ষাৎ !

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[এই ঘটনার লেখক বাঙলা দেশের সংবাদপত্র-জগতে সুপরিচিত, যদিও তিনি এক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক। বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজী লেখায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙলা ভাষার চর্চা ত্যাগ করেন। লেখক সম্প্রতি কিছু কাল বাঙলা সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অবসর মুহূর্ত্ত অতিবাহনের সময়ে লেখক অলৌকিক ঘটনা এবং শীকার-কাহিনী বাঙলা ভাষায় লিখছেন। আমাদের পাঠক-পাঠিকা বিখ্যাত এক ইংরেজী কাগজের সম্পাদকের বাঙলা লেখা পাঠে পরিতৃপ্ত হবেন, সে আশা আছে।—স]

সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেটার সত্যকার তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারি নাই। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা যে শুধু সত্য তাহাই নহে, আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এত দিন বাদে এত খুঁটিনাটি কথা আমার মনে রহিল কি করিয়া। তাহার কৈফিয়ৎ ইহাই যে, আমি এই ঘটনাটি বহু বার আমার অন্তরঙ্গদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল দিল্লীতে, কুইন রোডস্থ করোনেশন হোটেলে। ইহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে ইহার কিছুদিন আগেকার কথা জানা আবশ্যক,—তাহা বলিতেছি :—

সেদিন সরস্বতীপূজার ভাসান। তখন আমাদের নূতন পত্রিকার বাড়ী নির্ম্মিত হয় নাই। আমরা তখন ২নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জির লেনে থাকি। আমাদের বাড়ীর বাগানে সেই দিন বিকালে আমরা কয় জনে ব্যাড্‌মিনটন খেলিতেছিলাম। আমার ছোট দাদা (আমার ঠিক উপরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সেইখানে বেড়াইতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের খেলা দেখিতেছিলেন। আমি দেখিতেছিলাম যে, ছোড় দাদার মুখ বড়ই বিষণ্ণ, যেন কি চিন্তা করিতেছেন। দু-এক বার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে ছোড় দাদা আমাকে এক পাশে ডাকিয়া অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "দেখ্, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তুই তোর ছোট-বৌদিকে ও ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা কর্‌বি তো ?" আমি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম ও ছোড়দাদার মন হইতে ঐরূপ ভাব দূর করিবার জন্ত বলিলাম, "কি পাগলের মত যা-তা বক্‌ছো—তুমি হঠাৎ মরতে গেলে কেন, আর আমারই বা তোমার ফ্যামিলিকে দেখবার কি দরকার হোল ?"

আমার কাছে বকুনি খাইয়া ছোড়দা তখন চুপ করিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার আমাকে বলিলেন, "তুই রাগ কর্‌ছিস্ কেন ? মরা-বাঁচার কথা কে বল্‌তে পারে ? আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়, তুই ওদের দেখবি তো ?" আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "না, দেখিব না। তোমার মত পাগলের সঙ্গে আমি বকিতে পারি না।"—এই বলিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া যাইলাম। নিজের মনকে বুঝাইলাম যে, ছোড়দাদাকে ঐরূপ বলিয়া আমি ভালই করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনের দুর্ব্বলতা ও বিষণ্ণতা কাটিয়া যাইবে। হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই যে, নিজের জন্ত কি শেল প্রস্তুত করিতেছি।

সরস্বতীর বিসর্জ্জন দিয়া রাত্রে আহারের পর অতি ক্লান্ত হইয়া সবে মাত্র ঘুমাইয়াছি, এমন সময় আমার দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দরজা খুলিয়া শুনিলাম যে, ছোড়দাদার হঠাৎ অত্যন্ত হাঁপানি হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি যাতনায় ছটফট করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ডাক্তার! আর সহ্য করতে পাচ্ছি না!" তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনা হইল এবং তিনি আসিয়াই মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন দিলেন। হায়, তখনও যদি ছোড়দাদাকে আমার মনের কথা বলিতাম! কিন্তু তখনও তো বুঝি নাই আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে? ইন্‌জেকসনের পর ছোড়দা বলিলেন "আঃ, কি আরাম"! এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন। তার পরদিন সকালে কিছু বেলাতে শুনিলাম যে, ছোড়দাদা তখনও ঘুমাইতেছেন। আমরা ভাবিলাম ইহা মর্ফিয়ার ফল—তখনও আমাদের মনে কোন আশঙ্কা জাগে নাই। তাহার পর যখন অনেক বেলাতেও ছোড়দাদার ঘুম ভাঙ্গিল না তখন আমরা ডাক্তার আনিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু করিবার ছিল না—আমার স্নেহময় ছোড়দাদা তখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আর জাগিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

বলিতে হইবে কি, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ভ্রাতৃ-বিয়োগের অপেক্ষা আরও বড় আঘাত আমার হৃদয়কে মথিত করিতে লাগিল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের হৃদয়কে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেন ছোড়দাদাকে সত্য কথা বলিলাম না! কেন তাঁহাকে বলিলাম না যে, আমি তোমার সংসার দেখিব—দেখিব—দেখিব। কিন্তু তখন কে আমার কথা শুনিবে?

ইহার পর হইতে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই অনুতাপে দগ্ধ হইত। বার বার ছোড়দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাম, "সেদিন ব্যাড্‌মিনটনের মাঠে আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি।" কিন্তু কিছুমাত্র শান্তি পাইতাম না, মন সর্ব্বদাই অবর্ণনীয় ব্যথায় ভরিয়া থাকিত।

ইহার অতি অল্প দিন পরেই আমাকে কোন বিশেষ কাজে দিল্লী যাইতে হয়। দিল্লীতে বিকালে পৌঁছিয়া করোনেশন হোটেলে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া আমার রাত্রের খাবার আনিতে আদেশ করিলাম। হোটেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, তখনও খাবার প্রস্তুত হইতে সামান্ত কিছু বিলম্ব আছে। সময় কাটাইবার জন্ত আমি একখানি বই লইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

একটুখানি পরে মনে হইল, যেন আমার শরীরটি অত্যন্ত হাল্কা বোধ হইতেছে। ক্রমে বোধ হইল, যেন আমি আমার বিছানার উপর শূন্তে ভাসিতেছি। একটু একটু করিয়া আমার দেহ শূন্তে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে আরম্ভ করিল। আমার মাথার নিকট যে জানালা খোলা ছিল তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইলাম এবং ক্রমে

ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম—আমার যে এই অবস্থা হইয়াছে এবং আমি যে কিছু অস্বাভাবিক করিতেছি তাহা আমার মনে হইল না। শূন্তে ভাসিয়া চলা যেন আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি অতি আরামে ও সহজ ভাবে যাইতে লাগিলাম।

খানিকটা ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক দিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার চার পাশের আলোকোজ্জ্বল অবস্থা অস্পষ্ট হইতে লাগিল। একটু পরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কোথা দিয়া যাইতেছি এবং কোথায় আমার গন্তব্য স্থান কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রমে ক্রমে আমার আশ-পাশে আবার অস্পষ্ট আলোক ফুটিতে লাগিল; যেন তৃতীয়া কিম্বা চতুর্থীর চাঁদের আলো। ক্রমে আরো একটু স্পষ্ট হইলে আকাশে বহু তারা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে চাঁদের আলো বাড়িতে লাগিল, যেন চাঁদ পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আমি দেখিলাম এক সুরম্য বন-পথে অগ্রসর হইতেছি। নির্জ্জন প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত ও বন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে চাঁদের আলো আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আরো সৌন্দর্য্যময় হইতে লাগিল। চার দিকে ফুল ফুটিয়া আছে, ফুলের সুগন্ধে আকাশ-বাতাস ভরিয়া আছে। সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা হয় না। আমার প্রাণ-মন আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু কোন জন-মানব দেখিলাম না।

একটু পরেই এক নির্জ্জন প্রান্তরে একটিমাত্র সাদা বাড়ী দেখিলাম। সেখানে আর কোন বাড়ী-ঘর নাই বা সেখানে কোন গ্রাম আছে বলিয়া বোধ হইল না। বাড়ীটি উঁচু ও ছাদের ওপর একটি চিলে কোঠা দেখিলাম। আমি শূন্তে ভাসিতে ভাসিতে ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ছাদে অবতরণ করিলাম। সমস্ত ছাদ পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত, কেবল একাংশে সেই চিলে কোঠার ছায়া পড়িয়াছে। দেখিলাম, সেই ছায়াতে ছাদের পাঁচিলে হাত রাখিয়া আমার ছোড়দাদা দাঁড়াইয়া আছেন।

ছোড়দাদাকে দেখিয়া বিহ্যুতের মত আমার হৃদয়ে একটিমাত্র কথার উদয় হইল যে, এই তো ছোড়দাদাকে পাইয়াছি—এখুনি কেন তাঁহাকে আমার মনের কথা বলি না? আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলাম, "ছোড়দাদা, ছোড়দাদা, আমি আগে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখা-শুনা করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ছোড়দাদা আমার দিকে ফিরিলেন ও হাসিলেন। সে হাসি যে কত করুণ তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি বলিলেন, "ওরে, তা কি আমি জানি না ভাই?" পর মুহূর্ত্তেই ছোড়দাদা কেমন যেন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "যা, এখুনি ফিরে যা, আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিস্ না।" ছোড়দাদা এ কথা বলিবা মাত্র আমার দেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল; আমি আর দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না। আমার দেহ ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া শূন্তে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল। ফিরিবার পথ বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ যে পথ দিয়া গিয়াছিলাম সেই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সেই ফুলবন, ফুলের গন্ধ, নির্জ্জন প্রান্তর, নদ, নদী, পর্ব্বত। এবং গভীর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চাঁদের আলো যাইবার সময় যেরূপ কম-বেশী হইয়াছিল, ফিরিবার সময় উল্টা ভাবে, সেই রূপই দেখিলাম। সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিতে হইল এবং অবশেষে হোটেলে জানালা-পথে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

সবে মাত্র বিছানায় শুইয়াছি, এমন সময় আমি শুনিলাম "এ সাব্, আপকা খানা লায়া"—হোটেলের চাকর বলিতেছে।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আমার গমন ও প্রত্যাগমনে কত সময় লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। বোধ হয় মিনিট কয়েক হইতে পারে। ইহা কিরূপে হইল, কেন হইল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই।

ষ্ট্র্যাণ্ডে—চন্দননগর

বাসন্তী দত্ত

আহা কত প্রাণ জলেছে এখানে
জমেছে পথের ধুলা
এখানে বেজেছে কত নূপুরের
শিহরিত নিক্কণ
তোমার চোখের ভস্মাভ শিরা
রক্তের ঋণ শুধেছে
তবু প্রণামীটা বাদ পড়ে গেছে :
ঝরা ফুলে শেষ গ্রন্থি।

ওপারে তোমার রোশনাই
আর এপারে করুণ কান্না
বার বার তবু শাসন মেনেছে
ঝিলমিল স্রোতে হার তো :

এবারে স্তব্ধ সববেই জেনো
দম্ভ তো নয় সাত্বিক
ভাঙা দেয়ালের ফাটলে ফাটলে
সরীসৃপের জিহ্বা
বিষাক্ত রস-প্লাবনেতে আজ
ভাঙবেই শেষ ভিত্তি :

প্রণাম তোমার দধীচি-জীবন,
উত্তাল গণবন্যা! *

* চন্দননগর, ষ্ট্র্যাণ্ডে ডুপ্লের মূর্তির স্থানে শহীদ কানাইলাল দত্তর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হোয়েছে।

ডক্টর সুশীলকুমার দে

[সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক]

মানুষের জীবন সেখানেই সফল ও সুন্দর যেখানে তার চরম সিদ্ধি ঘটে। আর এ সফল জীবন যার হলো অর্থাৎ সঙ্কল্পকে যিনি আত্মশক্তি ও সাধনায় বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলেন, তিনিই সর্ব্বজনবরেণ্য। এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী হয়তো নেই, কিন্তু যেখানেই এঁদের ন্যায় মহামনীষীর সাক্ষাৎ মেলে সেখানে মস্তক আপনিই না নুইয়ে পারে না। কারণ, এরূপ একটি মাত্র মানুষকে অবলম্বন করেই সেখানকার সমাজ, সেখানকার সব কিছু আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠে এবং সে ঔজ্জ্বল্য ক্ষণস্থায়ী কখনই নয়, চিরকাল অপরিম্লান অবস্থায় থাকে ও সেই সকল মহামানবের কীর্ত্তি ও গৌরব-গাথা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এমন একটি সার্থক ও সুন্দর জীবন হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক পণ্ডিত, আদর্শ শিক্ষাবিদ্, সমাজহিতব্রতী ছাত্রবন্ধু দার্শনিক ডাঃ সুশীলকুমার দে। সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে অনেক দিন কিন্তু বাণীর এ বরপুত্র আত্মতৃপ্তি নিয়ে বসে থাকেননি। জীবনের প্রান্তসীমার কাছাকাছি পৌছেও তিনি অক্লান্ত ও নিরলস ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের উন্মাদনায় সাধনা করে চলেছেন। আগামী দিনের প্রতিষ্ঠাকামী ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের কাছে তিনি নিঃসন্দেহে নিষ্ঠা, কর্ম্ম ও উদ্যমের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

ডাঃ সুশীলকুমারের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৯০ সালে। তাঁর পিতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র দে ছিলেন তৎকালীন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। সুশীলকুমারের বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে যে গভীর অনুরাগ ও অগাধ পাণ্ডিত্য তার মূলে রয়েছে তাঁর পূজ্যপাদ পিতামহ বিশেষ করে পিতা সতীশচন্দ্রের প্রভাব। তাঁর নিজের কথায়—বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই। এ আকর্ষণ আমি লাভ করি আমার পিতামহের কাছ থেকে, বিশেষ করে আমার পিতার কাছ থেকে। আমার প্রতিটি রচনা আমার পিতা সযত্নে দেখে এবং সংশোধন করে দিয়েছেন—এ কথা জানিয়ে আমি বিশেষ গর্ব্ব বোধ করছি।

ডাঃ দের ছাত্রজীবনের সূত্রপাত হয় কটকে। সেখানকার র্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এন্‌ট্রান্স পাস করেন ১৯০৫ সালে। তারপর তিনি চলে আসেন কল্‌কাতায়, পড়াশুনো আরম্ভ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ-তে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র ছিল তাঁর অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয়। ১৯১১ সালে তিনি এম, এ, পাস করলেন—সে-ও ইংরেজীতে এবং প্রথম শ্রেণীতে। পরবর্ত্তী বৎসরেই বি, এল, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

ডাঃ সুশীলকুমার প্রথমে ইংরেজী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এটা হলো ১৯১২ সালের কথা। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার। কখনও কখনও তিনি ভারতীয় ভাষার ও সংস্কৃতের লেকচারারের পদও অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৩ সালে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ঢাকায় চলে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর রীডার নিযুক্ত হন। পরে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই সংস্কৃতের রীডার হন এবং সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন।

জ্ঞানপিপাসা ডাঃ দের এতই প্রবল ছিল যে, তিনি শুধু মামুলি অধ্যাপনার ভেতরেই নিজকে আবদ্ধ করে রাখেননি—গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে পর্য্যন্ত গমন করেন। লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজে অধ্যয়ন ও গবেষণার পর তিনি ডি, লিট্ উপাধি লাভ করেন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে। জার্ম্মাণীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পদ্ধতি এবং মূল পাঠের সমালোচনা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন তিনি কিছু কাল।

ডাঃ সুশীলকুমারের অনুসন্ধিৎসু ও গবেষক মন এখানেই শান্ত হ'লো না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন অধ্যাপনা করছেন তখনই পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দিকে বিশেষ ঝোঁক যায়। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যে অজস্র হস্তলিখিত পুঁথি ও রচনা অনাদৃত ভাবে পড়েছিল সেগুলো তিনি সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। এ ব্যাপারে তিনি পুরাতত্ত্ব গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব্বাচার্য্য মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে

বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে, যাতে ফুটে উঠেছে তাঁর অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও মনীষার দীপ্তি। গবেষণা ও অধ্যাপনার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি অসংখ্য মৌলিক কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর সব কয়টি কাব্যগ্রন্থই সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে, এটা তাঁর কাব্য-প্রতিভারই পরিচায়ক। ১৯৪৯ সালে পুণায় ডেকান কলেজ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ঐতিহাসিক ভিত্তিতে একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার জন্ত তাঁকে সাদর আহ্বান জানান। তাঁরই সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও পরামর্শ নিয়ে এর কাজ চলতে থাকে।

ডা: দে বর্ত্তমানে কলকাতায় অবসর জীবন যাপন করলেও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারের সঙ্গে তিনি একান্ত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃত কলেজ গবেষণা বিভাগ সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কমিটি গঠন করেন প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন তাঁর চেয়ারম্যান। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত কলেজ গবেষণা বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন। তিনি এখনও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের পরীক্ষক।

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার]

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডা: জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি বলেন—ছেলেবেলায় আমি একজন প্রবাসী বাঙালী ছিলুম। আমার পূজ্যপাদ পিতা স্বর্গত রামচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ও অভ্র ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে আমি ঘুরে বেড়াতুম, রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরতুম শুনতুম বাঘ ডাকছে। এ সব কারণে প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম থেকে একটা নিবিড় সম্পর্ক আমার গড়ে ওঠে। পিতার সঙ্গে আমি প্রায়ই তাঁর অভ্রখনিতে প্রবেশ করতুম। তখন থেকেই বৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্ত আমার সঙ্কল্প জাগে। গাছপালা, পথ, পাহাড়-পর্ব্বত সব আমার চারি দিকে ছড়িয়ে ছিল। এ সব দেখে শুনে আমার মন প্রকৃতির মাঝে ডুবে থাকতে চায়। উকিল, ডাক্তার না হ'য়ে আমি বৈজ্ঞানিক হবো এ সঙ্কল্প ক্রমেই দৃঢ়তর হ'লো।

১৮৯৪ সালে বঙ্গজননীর সুসন্তান ডা: জ্ঞানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন বাঙ্গালার পুরুলিয়া সহরে। ১৯০৩ সালে তিনি গিরিডির স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। স্কুলে পড়ার সময়েই সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাস করে তিনি চলে এলেন কলকাতায়, ভর্ত্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এস, সি শ্রেণীতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। তিনি প্রথমেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিতে পড়েন। আচার্য্য রায় সে সময় ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তেই তিনি যখন জানতে পারলেন যে জ্ঞানচন্দ্র ছোটনাগপুর থেকে এসেছেন, শুনেই আচার্য্য রায় হাসতে হাসতে বললেন—ও জঙ্গলী ছেলে, জঙ্গল থেকে এসেছে। এ কথাটির ভেতরে আচার্য্য রায়ের স্নেহাশীর্ব্বাদ সে দিন বর্ষিত হ'য়েছিল আগামী দিনের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর উপর। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মহৎ ও জ্ঞানলিপ্সু জীবনের সান্নিধ্যে এসেই জ্ঞানচন্দ্রের এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হ'য়েছিল।

ডা: শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

১৯১৫ সালে ডা: ঘোষ রসায়ন-শাস্ত্রে এম, এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে এ শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তাঁর মত অধিক নম্বর আর কেউ পাননি। পরীক্ষার ফল তখনও বের হয়নি, সার আশুতোষ তাঁর গুণবত্তার পরিচয় জেনে তাঁকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে এবং এম, এস-সি ক্লাসে অধ্যাপনা করবার জন্তে নিয়োগ-পত্র দিয়ে দিলেন তখনি। প্রায় ৪ বৎসর কাল তিনি কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করেন। এ সময় লবণাক্ত জলের গুণাবলী সম্পর্কে বহু মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন এবং দেশে-বিদেশে এগুলি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

১৯১৮ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং তার কিছু কাল পরেই ডি, এস-সি উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৯ সালে তিনি যাত্রা করলেন ইংলণ্ডে তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করবার মানসে। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রে বৎসরাধিক কাল গবেষণা-কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। তিনি সেখানে লবণাক্ত জলের গুণাবলী সম্পর্কিত তাঁর মতবাদ (Ghoshe's Law of Salt Solution) প্রমাণ করে দেন সমগ্র বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞান গবেষণার খাতিরে তিনি সে সময় বার্লিনও ঘুরে আসেন।

বিলেত থেকে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করে ডা: জ্ঞানচন্দ্র স্বদেশে ফিরলেন ১৯২১সালে। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার হ'য়ে আসেন সার ফিলিফ হার্টন। তাঁর সঙ্গে ডা: ঘোষের পূর্ব্বেই যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ডা: ঘোষ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে তিনি তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদর আহ্বান জানালেন রসায়ন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্তে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা-মন্দিরে তিনি জড় পদার্থের উপর আলোকরশ্মির প্রভাব বিষয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগটি তাঁর নিজের হাতেরই অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বিজ্ঞানী ডাঃ ঘোষের অপূর্ব্ব মনীষার সন্ধান পেয়ে দেশ-বিদেশের নানা স্থান থেকে বক্তৃতা করবার জন্ত তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে। ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আহ্বান করেন অধরচন্দ্র মুখার্জ্জী স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানের জন্ত। উদ্ভিদ্-শরীরে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিরূপে আলোক সংযোগে শ্বেতসারে পরিণত হয় এ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা লাভ করে। ১৯৩৯ সালে তিনি বাঙ্গালোরস্থ ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে নানা ভাবে ইন্‌ষ্টিটিউটের অগ্রগতি ও সাফল্যের সহায়তা করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে উক্ত কয় বৎসরের মধ্যে বহু ছোট-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৯৪৭ সালে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে ডাঃ ঘোষের আহ্বান এলো দিল্লী থেকে। যুদ্ধকালে বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান-মন্দিরের ডিরেক্টার হিসেবে তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়োগ করার জন্ত ভারত সরকার তাঁকে করলেন সরাসরি শিল্প দপ্তরের ডিরেক্টার জেনারেল। এর পূর্ব্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে ন্তাশনাল প্লানিং কমিটির (জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি) গঠন করেন, তিনি ছিলেন তার অন্ততম সদস্য। শুধু সদস্য থাকাই নয়, কমিটির শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট।

১৯৫০ সালে ডাঃ ঘোষ ৫৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ ক'রলেন কিন্তু তাঁকে তখনই অবসর গ্রহণ করতে দেওয়া হ'লো না। ভারত সরকার তাঁর কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতার জন্ত তাঁকে খড়গপুরে স্থাপিত সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের (ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ টেক্‌নলজি) ডিরেক্টার নিযুক্ত করলেন। এ মহাবিদ্যালয় তাঁর বলিষ্ঠ পরিচালনাধীনে দ্রুত প্রসার লাভ করে।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প উপদেষ্টা বোর্ডের তিনি অন্ততম সদস্য। "ইণ্টার ন্তাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর এণ্ড এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি"র সভ্য হিসাবে তাঁকে প্রায়ই বিদেশ সফর করতে হয়। খড়গপুর থেকে সরকার সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে আসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে। ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্ত একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি হোক, দেশবাসীর এই একান্ত কামনা।

সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

টেলিফোনের সাহায্যে আগে থেকেই স্থির করা ছিল দেখা করবার সময়, তারিখ ও স্থান। তারপর সেই পরিকল্পিত দিনে, যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলুম নির্দিষ্ট স্থানে। সদরের পরেই খানিকটা বাঁধানো উঠোন পেরিয়েই দেখা গেল একটি লোককে—তার হাতে আমার visiting cardখানি দিতেই একটি আড়ম্বরহীন অথচ সুসজ্জিত বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরেই দেখা দিলেন আমার অভীষ্ট ব্যক্তি— জ্ঞান বাবু। জ্ঞান ঘোষ। ভারতের সঙ্গীত-জগতের অন্ততম উজ্জ্বলতম তারকা শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। প্রথম সাক্ষাতেই প্রাথমিক মামুলী সম্ভাষণাদি ও কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমি জানালুম আমার আগমনের হেতু। গোঁফের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল,— কি ছাপবেন? ছাপবার মত কি আছে?—আছে বৈ কি, আর তা আছে বলেই আপনার কাছে আসবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আবার সেই হাসির রেখা—একটু থেমেই শুরু করলেন তাঁর কথা, তাঁর পিতৃ-পিতামহের কথা, তাঁর সাধনার কথা, তাঁর দৃষ্টির কথা,—এক ঘণ্টা কাল তাঁর কাছ থেকে যেগুলি শুনলুম তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়—

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসায়ী হিসেবে ডোয়ার্কিন-এর নাম সুপ্রচারিত। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ৺দ্বারকানাথ ঘোষ ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশের ঠাকুর্দা। আজ কাল সর্বত্র যে হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়, এই হারমোনিয়াম দ্বারকানাথই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। বেতারের বাল্যকালে যে তিনজন ভারতীয় বেতার ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁদের দু'জন ছিলেন বোম্বাইয়ের অধিবাসী ও একজন ছিলেন বাঙালী। ইনিই ৺কিরণচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশের বাবা। কোলকাতা শহরেই উনিশ শ' নয় সালের মে মাসে—বাঙলা পুত-পবিত্র পঁচিশে বৈশাখ তেরশ' ষোল সালে জ্ঞানপ্রকাশের জন্ম। ডোয়ার্কিন য্যাণ্ড সনএর মত খ্যাতিমান বাদ্যযন্ত্র প্রতিষ্ঠান নিজেদের—অনেক সময় দোকানের অনেক যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম বাড়ীতে থাকত। খেলার ছলে ছোটবেলায় সেইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই মনের ভিতর অজান্তে বাসা বেঁধে ওঠে সঙ্গীত-সাধনার আকাঙ্ক্ষা। তা ছাড়া বাড়ীটিও ছিল সাঙ্গীতিক পরিবেশে পুষ্ট, সমস্ত বাড়ীর মধ্যেই ছিল সঙ্গীতের কদর। এই আবহাওয়াও বালক জ্ঞানপ্রকাশকে অনুপ্রাণিত করে গভীর ভাবে। আবার এই অবস্থার ভিতর দিয়ে পড়াশুনোও চলছে। ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ, পালিতে হলেন প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯২৯)। স্কুল-জীবনে ছবি আঁকারও বেশ একটা সখ ছিল, তবে তার চেয়ে খেলাধূলার দিকেই আকর্ষণ ছিল বেশী। পালিতে এম এ. দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু চোখের অসুখের জন্তে চিকিৎসকের বিধান অনুযায়ী শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে উঠল না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোও হোল ছাড়তে। পড়াশুনো বন্ধ হোল কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হোল জীবনের যাত্রাপথ। এবার সঙ্গীতকে পুরোপুরি ভাবে জীবনে গ্রহণ করলেন জ্ঞানপ্রকাশ। তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ ছোটবেলাতেই শুরু হয়েছিল

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

দীনু হাজরার ঘরে। ১৯৩৩ থেকে আজ পর্য্যন্ত সম্মানের শিখরদেশে আরোহণ করেও তাঁর শিক্ষার বিরাম নেই। তিনি তবলা শিখেছেন রাওয়ালপিণ্ডির ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ, জয়পুরের পং জয়লাল, ওস্তাদ আজিম খাঁ, ওস্তাদ মুসিদ খাঁর কাছে। খোল শিখেছেন ৺ডাঃ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর কাছে। কণ্ঠ-সঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছেন ওস্তাদ মেহেদি হোসেন, ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (ঠুংরী, ধ্রুপদ ও খেয়াল), ওস্তাদ সগীর খাঁ, (ঠুংরী) ও ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে (ধ্রুপদ ও খেয়াল)। সঙ্গতও করছেন বহু ওস্তাদের সঙ্গে, যেমন—কৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলি, আমীর খাঁ, কেশরবাঈ প্রভৃতি। রেকর্ডও রয়েছে। ভারতবর্ষীয় রেকর্ডে গানের মধ্যে গীটারের সংযোগ জ্ঞানপ্রকাশই প্রথম করেন। জীবনে শুধুমাত্র সঙ্গীত চর্চাই করেননি, সঙ্গীতের সঙ্গে আরো অনেক কিছু চর্চা করেছেন—শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গেই হকি-ক্রিকেট-ফুটবলও খেলেছেন—ঘোড়ার পিঠেও চড়েছেন—আবার সেই সময়েই ঘরে বসে বেহালার বুকের উপর ছড়ির পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। বিলিয়ার্ডেও কম সখ ছিল না। প্রবন্ধাদি এখনও মাঝে-মিশেলে লিখে থাকেন। অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে ইংরিজি ও বাঙলা দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রিয়পাঠ্য তো বটেই, তা ছাড়া হিন্দী কাব্য-সাহিত্যেও যথেষ্ট দখল আছে। শুধু বাঙলাতেই গান লেখেননি, হিন্দী গানও অনেক লিখেছেন। তিনি ভালবেসেছেন সঙ্গীতকে, ভালবেসেছেন নিজে শিখতে, অপরকে শেখাতে, তাই বোধ হয় তিনি সঙ্গীতকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেননি, এক দিক দিয়ে যেমন সব কিছুর ভিতরেই সঙ্গীতের বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন, আবার আর এক দিয়ে তাকে সব কিছুর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন পবিত্র করে, তার স্বর্গীয়তাকে সাংসারিক চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে টেনে এনে তাকে এতটুকু ম্লান করেননি। কয়েকটি খ্যাতিমান সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ইনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। যেমন—"ঝঙ্কার"এর প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীর কার্য্য-নির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য, Artists' Association (বর্তমানে এর কোন অস্তিত্ব নেই) এর সম্পাদক প্রভৃতি। All India Radioর যখন Indian Broadcasting Company নাম ছিল তখন থেকে ইনি রেডিওর সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন সঙ্গীত-পূজারীদের মধ্যে গোলাম হোসেন ও আমীর খাঁর গান, রবিশঙ্কর ও বিলায়েত খাঁর সেতার, আলি আকবর ও রাধিকামোহনের স্বরোদ প্রভৃতি জ্ঞানপ্রকাশের মনে যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

সবার শেষে জিজ্ঞাসা করি সঙ্গীত ও জাতি বা সঙ্গীত ও মানুষ সম্বন্ধে আপনার মত কি ?—

একটুখানিক ভেবে জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দেন—সঙ্গীত সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ অঙ্গ, সংস্কৃতির মধ্যেই জাতির পরিচয়, সঙ্গীতের ভিতরেই জাতির আত্মপ্রকাশ।

শ্রীমতী রেণুকা রায়

[পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য এবং পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী]

সমাজ ও জাতির সেবায় যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন তাঁরা নিশ্চয়ই সাধারণের পর্য্যায়ে পড়েন না। নারীই হোন আর পুরুষই হোন, তাঁরা সর্ব্ববরেণ্য—সত্যিকারের দরদী প্রাণ ব'লতে তাঁদেরই বোঝায়। বাঙ্গালা দেশে এখনও যে কয় জন সমাজসেবী, দুর্গতপ্রাণ মহিলা কর্ম্মী রয়েছেন শ্রীমতী রেণুকা রায় তাঁদের অন্যতমা। শৈশব থেকে আজ অবধি তিনি নিরলস ভাবে মানবসেবার কঠিন ব্রত সাগ্রহে পালন করে চলেছেন। নিরাসক্ত মন নিয়ে সেবা ও কর্ম্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহসা মেলে না। এদিক্ থেকে শ্রীমতী রায় শুধু বাঙ্গালার নয়, সমগ্র ভারতেরই গৌরবস্থল।
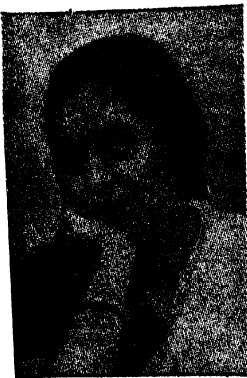
রেণুকা রায়

শ্রীমতী রায়ের সাফল্যময় জীবনের সূচনা ও অগ্রগতি সবই একটা অসাধারণ ব্যাপার। চমৎকার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর জন্ম হয় ১৯০৫ সালে ক'লকাতায়। পিতা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম সদস্য শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মায়ের দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁর 'দাদামশাই' (মায়ের মাতুল)। তাঁর জীবনারম্ভের দিনগুলিতে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার দাবী তখন চরম পর্য্যায়ে ওঠে। এ সকলের প্রভাব পরোক্ষে যে তাঁর উপর পড়ে থাকবে পরবর্ত্তী জীবন পর্য্যালোচনা করলেই তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সবে-সাত বছর যখন তাঁর বয়স তখনই তিনি মা-বাবার সঙ্গে বিলাত যান এবং সেখানেই তাঁর প্রারম্ভিক পড়াশুনো সুরু হ'লো। বছর খানেক পরেই তাঁকে ফিরে আসতে হলো ক'লকাতায়, ভর্ত্তি হলেন তিনি এখানকার লরেটো বিদ্যালয়ে। লরেটো বিদ্যালয়ে তিনি যখন পড়ছেন তখনই তাঁর প্রাণে জাতীয়তার প্রেরণা জাগে। বিদেশী প্রভাব ও ভাবধারা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তিনি বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়ে একটি পৃথক্ গোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন। বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনে সেখানে কোন সুযোগ ছিল না বলে পিতার পরামর্শে তিনি সেখান থেকে চলে এসে ভর্ত্তি হলেন ডায়সেশন স্কুলে। এ বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কৃতিত্বের সঙ্গে।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার—তাঁর সান্নিধ্যলাভ শ্রীমতী রায়ের জীবনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করে। এ সান্নিধ্য প্রথমে লাভ করবার সুযোগ হয় তাঁর দাদা মহাশয় দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনের ক'লকাতাস্থ বাসভবনে। সে সময় তিনি ডায়সেশন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী—বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর। তিনি তখনই গান্ধীজীর ভেতরে একজন অনন্যসাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর নিঃস্বার্থ দেশসেবার আদর্শ শ্রীমতী রায়কেও এগিয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড উত্তম যোগালো। তাই দেখা গেল, গান্ধীজী যখন অল্প কাল পরেই ক'লকাতারই একটি মহিলা সভায় দেশের কাজে সহায়তার জন্ত মেয়েদের কাছে তাঁদের অলঙ্কারাদির দাবী করলেন, সকলের আগে তিনিই নিজের সমগ্র আভরণ গান্ধীজীর হস্তে সসম্ভ্রমে অর্পণ করলেন। এ ঘটনা থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপিত হ'য়ে যায়।

উচ্চশিক্ষা লাভের তাগিদে শ্রীমতী রায় তিন বৎসরের অধিক কাল বিলেতে অবস্থান করেছিলেন। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে তিনি বি, এস-সি পড়েন এবং পরে লণ্ডন বিশ্ববিত্তালয় থেকে ইকনমিক্সে ডিগ্রি লাভ করেন। বিলেতে থাকাকালীন পাশ্চাত্য জগতের কয়েক জন মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেরল্ড ল্যাস্কি, লুই স্মিথ, জর্জ বানার্ড শ এঁরাও। সে সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ নির্ব্বাচন চলছিল। শ্রীমতী রায়ের কর্ম্মী মন চুপ করে থাকতে পারলে না। তখনকার রক্ষণশীল দলের যাঁরা বিরোধী তিনি তাঁদের প্রকাশ্যে সমর্থন জানালেন এবং তাঁদের পক্ষে নির্ব্বাচনী অভিযানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন। ১৯২৫ সালে ফিরে এলেন তিনি ভারতে, বিলেতের পড়াশুনো শেষ করে।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্ত আহ্বান জানান। সরকারী আওতার মধ্য থেকে সমাজসেবা, দুর্গত জনসেবার কতটা সুযোগ থাকবে বা মিলবে এই ভেবে প্রথমটায় তিনি ইতস্ততঃ করেছিলেন। তারপর উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন-দপ্তরের দায়িত্ব তাঁর উপর থাকবে জেনে তিনি মন্ত্রিসভায় যোগদানে রাজী হ'লেন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার ভেতরও তিনি যথাসাধ্য উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে আপন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

এত কাজের ভেতরও শ্রীমতী রায়ের একটি জীবন রয়েছে সে হ'লো সাহিত্যিক জীবন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বরাবর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় আই, সি, এস শ্রীমতী রায়ের সুযোগ্য স্বামী। তাঁদের মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটে বিলেতে শ্রীমতী রায় যখন পড়াশুনো করছেন। ১৯২৫ সালে তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীমতী রায়ের এখনও জনকল্যাণ কাজে অফুরন্ত উৎসাহ ও উত্তম রয়েছে।

(মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

বাস্তুহারা

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সহরতলীর একান্ত এক কোণে
শত বেদে ঐ বাঁধিয়াছে ঘর শত,
জীর্ণ বসনে কঠিন দিবস গোণে,
দারিদ্র্য-ঋণ-ভারে তারা অবনত।

বিশুষ্ক মুখে নাহি হাসি উজ্জ্বল,
রোগের শোকের হেরি সেথা শত জয়,
বুকের কান্না লুটিয়া বুকের বল
জ্যান্ত-মৃতের দেয় এ কি পরিচয়!

তাদের জীবনে অগ্নির নাহি শেষ
চির অশান্তি-বহ্নি-শিখার তলে,
চিরকাল রচি' জ্বালাময়ী পরিবেশ
অঙ্গার ধরি' মানে ক্ষয় পলে পলে।

ওপারেতে স্বাচ্ছন্দ্য-জীবনে শুধু
গীত-বাত্তাদি চলে নিতি অনিবার,
এপারের বেদে-পল্লী-পরাণে ধূ-ধূ,
ভ্রূক্ষেপ নাহি—নাহি কোন প্রতিকার।

মানুষের মাঝে মানুষের ক্রন্দন
নিশি-দিন ফোটে না জানি এমনি কত,
জীবনে ধ্বংস নেচে চলে অনুখন,—
নেবে আর জ্বলে আলেয়া আলোর মত।

ও-পারে শান্তি,—এ-পারের এক কোণে
নীরবে ভুগিছে দুর্ভোগে আজো তারা,
মানুষ এরাও নিত্য দেহে ও মনে,
সৃষ্ট এরাও, তবু নাহি কারো সাড়া?

ওদিকে বা কোন্ বেদেদেরই সন্তান
ক্ষুৎ-পিপাসায় ঘুরিয়া পথের পাশে
দৈব-চক্রে বাসেতে খোয়াল প্রাণ,
বিশ্রাম নিল চির জীবনের তরে।

বেদের তনয়ে ঘৃণায় কেহ না টানে,
স্পর্শ করে না—ব্যস্তও নহে তত,
সহরের পথ—জনতার মাঝখানে
এ যেন হেলার বস্তু ধূলির মত।

হাসিবার যারা হাসিল একটুখানি,
দেখিবার যারা দেখে নিল চোখ ভ'রে
কাঁদিবার যারা কাঁদিল সে ক'টি প্রাণী,
অশ্রু ঝরাল দুইটি নয়ন প'রে।

এর ইতিহাস কত যে বেদনাময়
অনটন আর পীড়নে সর্ব্বনাশী,
পরের ব্যথায় আজো কী জগৎ হায়!
হাসিতে শিখিবে নিষ্ঠুরতায় হাসি?

নাচ গান বাজনা

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচয়িতা নেই

বাঙলা রেকর্ডের মধ্যে একটি শ্রেণীবিন্যাস আছে, অন্ততঃ আমরা তাই মনে করি। প্রতি বছরে বাঙলায় যত রেকর্ড বাজারে বিক্রীর জন্ম প্রবর্ত্তন করা হয় তাদের ভাগ করলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—

(১) সঙ্গীত
(২) যন্ত্র সঙ্গীত
(৩) কাব্য সঙ্গীত
(৪) আবৃত্তি
(৫) নাটক কিংবা নাটিকা
(৬) হাস্য-কৌতুক

প্রথমতঃ, সঙ্গীত কত প্রকারের রেকর্ড হয় এই প্রশ্ন করলেই দেখা যাবে যে, শুধু মাত্র সঙ্গীত-শ্রেণীর রেকর্ডের মধ্যেই আছে উচ্চাঙ্গ বা রাগপ্রধান, পদাবলী, ভাটিয়ালী, গীত, আধুনিক এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ছায়াছবির গান। বাঙলা রেকর্ডের বাজারে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রচলন তেমন হয়নি আজও। ভীষ্মদেব ও জ্ঞান গোঁসাইয়ের রেকর্ডের পর তেমন কোন গায়ককে রেকর্ডের জন্ম উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত গাইতে শোনা গেল না। তারাপদ চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যদিও আছেন বাঙলার সঙ্গীত-জগতে এবং প্রত্যয় ক'রে বলা যায় আরও বহু উচ্চ জাতের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতগায়ক বা গায়িকাও আছেন, যাঁদের আমরা অনেকেই চিনি না। সম্প্রতি রেডিও, সঙ্গীত-সম্মেলন ও রেকর্ডের দৌলতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মীরা চট্টোপাধ্যায়ের নামও ছড়িয়ে পড়েছে যথেষ্ট।

অথও বাঙলা রেকর্ডের সর্ব্বাধুনিক তালিকায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সংখ্যা একান্তই নগণ্য।—আমরা মনে করি, গায়ক বা গায়িকার অভাব আমাদের নেই, উপযুক্ত ও গুণী বাজকারের সংখ্যাও প্রচুর, অভাব শুধু বোধ হয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচয়িতার। গায়ক, গায়িকা ও বাজিয়ে আছে, নেই শুধু যোগ্য 'কম্পোজার'। সত্যি কথা বলতে কি, বাঙলা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রবীন্দ্রোত্তর যুগে কোন কবিই লিখলেন না। কিন্তু আমরা যদি বলি, বাঙলা ভাষায় রচিত বহু বহু রাগপ্রধান গান আছে (যাদের চলন নেই শুধু আমাদের অজ্ঞতার দোষে) এবং যে গুলির প্রচলন সামান্ত চেষ্টাতেই করা যায়। বাঙলা দেশের অতি বিখ্যাত ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল গানগুলি আমরা স্রেফ ভুলতে বসেছি, অত্যন্ত দুঃখের কথা। আজকের দিনে, বাঙালী গায়ক-গায়িকা ভিন্-প্রদেশী ভাষায় রাগপ্রধান গান শুনিয়ে শুনিয়েই কি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে বাঙলার সঙ্গীত-জগৎ থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেননি?

বাঙলা দেশের রেকর্ড-ব্যবসায়িগণ বাঙলায় তার স্বকীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতমালাকে উদ্ধার করতে পারেন এবং বঙ্গজাতিকে পুনরায় তার ঘরোয়া গান শুনিয়ে বাঙলা দেশের সঙ্গীত-পিপাসুদের যেমন তৃপ্তি দিতে পারেন, তেমনি বহু উপবাসক্লিষ্ট রাগপ্রধান গায়ক-গায়িকাদেরও বাঁচাতে পারেন।

সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মান লাভঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত

নয়া দিল্লীর লালকেল্লায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ "এই বৎসরের" চারি জন সঙ্গীতজ্ঞকে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং চার জনকে সঙ্গীত সাধক একাডেমির ফেলোরূপে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করেন। রাষ্ট্রপতি একখানি শাল, বালা ও একখণ্ড কাগজ উপহার দেন। নিম্নোক্ত চারি জন সঙ্গীতজ্ঞ উপহার পান:—হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীত—দেওয়াসের ওস্তাদ রজব আলী খান, হিন্দুস্থানী যন্ত্র-সঙ্গীত—ওস্তাদ আমেদ খান থিরাকওয়া। কর্ণাটক যন্ত্র সঙ্গীত—ওস্তাদ আমেদ খান থিরাকওয়া, কর্ণাটক কণ্ঠসঙ্গীত—মহীশূরের শ্রীবাসু দেবাচার, কর্ণাটক যন্ত্র-সঙ্গীত—কোয়েম্বাটুরের শ্রীপল্লদাম সঞ্জীব রাও (বংশীবাদক)। শ্রীবাসু দেবাচার বার্দ্ধক্যবশতঃ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পারায়, তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নোক্ত চারজন শিল্পীকে একাডেমির ফেলোশিপ দ্বারা সম্মানিত করা হয়:—মাথাইয়ের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান—হিন্দুস্থানী স্বরোদ বাদক, গোয়ালিয়রের ওস্তাদ হাফিজ আলী খান—হিন্দুস্থানী স্বরোদ বাদক, শ্রীআর্যকুদি রামানুজ আয়েঙ্গার—কর্ণাটক কণ্ঠসঙ্গীত, শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর—নাট্য ও ফিল্ম অভিনেতা।

পুরানো গানের রেকর্ড আবার চাই

গান কি কখনও পুরানো হয়? কেউ বলবেন হয় না, কেউ বলবেন হয়। বাদানুবাদ না জানিয়ে সহজেই বলা যায়, গানের মত গান কখনও পুরানো হয় না, সে-গান চিরনূতন। প্রসঙ্গটা উত্থাপন করছি এই জন্ম যে কলকাতার অধিকাংশ রেকর্ডের বিজ্ঞাপনে শুধু দেখতে পাই সদ্য-প্রকাশিত রেকর্ড ও গানের তালিকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্বে যেন গান কখনও রেকর্ড হয়নি, এই প্রথম হচ্ছে। অথচ প্রায় প্রত্যেক রেকর্ড-ব্যবসায়ীরই আছে এমন বহু পুরানো গানের রেকর্ড, যাদের কোন দিন দেশবাসী ভুলবে না। ভুলতে পারে না। এখানে ব'লে দেওয়া প্রয়োজন, আমরা রেকর্ডের বিজ্ঞাপনের প্রতি কোন রকম কটাক্ষপাত করছি না। পাঠক-পাঠিকার শুভেচ্ছায় মাসিক বসুমতী রেকর্ডের বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত নয়।

পুরানো বাঙলা গান, একদা যাদের প্রচলন হয়েছিল রেকর্ডের মাহাত্ম্যেই, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের পুনঃপ্রবর্ত্তন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষ যে যে গান শুনে অতীতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল সেই সেই গান শুনতে পেয়ে আজকের বাঙলা ও বাঙালী যে খুশী হবে না, কে বলেছে? রেকর্ড-ব্যবসায়ীদের প্রচারিত রেকর্ডের তালিকা-পুস্তিকা দেশবাসীর হাতে পৌঁছয় না

কোন দিনই। পুরানো গানের রেকর্ড যথাযথ বিজ্ঞাপনের অভাবে পুরানো নাম ধারণ করে। কিন্তু গানের মত গান কখনও পুরানো হয় না, সে-কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। বিখ্যাত ও সুমধুর পুরানো গানের রেকর্ডের মূল্য নতুন রেকর্ডের মূল্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস করে বাজারে প্রচলিত করলে বাঙালী তার বহু লুপ্তরত্ন উদ্ধার করতে পারবে সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। রেকর্ড-ব্যবসায়িগণ এ বিষয়ে দৃষ্টিদান করলে বাঙালীর যথেষ্ট উপকার হবে। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড-ব্যবসায়ীদেরও যে হবে না তাও নয়।

রেকর্ড পরিচয়

এ মাসে হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের যে কয়খানি রেকর্ড বেরিয়েছে তার মধ্যে ৪ খানি রেকর্ডে আটখানি আধুনিক গান, গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—"তোমারে ভুলিতে" ও "বোঝ না কেন," (এন ৮২৬০৫); অখিলবন্ধু ঘোষ—"শিপ্রা নদীর" ও "পিয়াল শাখে" (এন ৮২৬০৬); যূথিকা রায়—"আলোর পিছনে" ও "কোথায় হারান" (এন ৮২৬০৭); রমা দেবী—"জ্যোৎস্না হাসে" ও "স্বপ্ন দেখার" (এন ৮২৬০৮)। আব্বাসউদ্দীন—"আরে ও ভাটিয়াল" ও "ঘর বাড়ী ছাড়িলাম"—দু'খানি পল্লীগীতি গেয়েছেন (এন ১১৭৪১)। এ ছাড়া আছে দু'খানি ফিল্মের রেকর্ড—'ময়লা কাগজে'র—"তোমার ফাগুনে" ও "ও পাখী" (এন ৭৬০০৭); "রিক্সাওয়ালা"র "রামজী তেরী" ও "নাইয়া পর" (এন ৭৬০০৬)।

কলম্বিয়া আধুনিক গানের দু'খানি রেকর্ড পরিবেশন করেছেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—"তোমার মাঝে" ও "কে যায়" (জি ই ২৪৭১৭); গৌরীকেদার ভট্টাচার্য—"এলো বাদল" ও "কান্ত আমার" (জি ই ২৪৭১৮); রাধারাণীর কীর্তন—"অনেক আশায়" ও "বঁধু হে সকলে" (জি ই ২৪৭১৯); সুমিত্রা দাশগুপ্তের ভজন—"বেদনার বেদীতলে" ও "গোঠের রাখাল" (জি ই ২৪৭২০); অমর সিং জয়সালের ক্লারিওনেটে—"বুট পালিশ" ফিল্মের গানের সুর (জি ই ২৫৮১৯); একখানি নৃত্যসঙ্গীতের অর্কেষ্ট্রা—(জি ই ২৫৮২০); "আজ সন্ধ্যায়" ছবির—"না জানিয়ে" ও "মেঘে মেঘে" ও "জীবন-মরণ" ও "আর উদাস" (জি ই ৩০২৭৪ ও ৩০২৭৫); "অদৃশ্য মানুষ" ছবির—"চল মোরা ভেসে" ও "আরও একটু (জি ই ৩০২৭৬)।

সাঙ্গীতিক

দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দরবারী কানাড়া, নায়েকী কানাড়া, বিহঙ্গড়া ও বাহার রাগের তাঁহাদের আলাপ, ধ্রুপদ, ধামার, গাহিয়া সমগ্র ভারতের বেতার শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। তানসেন প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতধারার ইঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রাগ-আলাপ বিস্তার মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা তাঁহাদের সঙ্গীতকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছিল। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের মৃদঙ্গবাদক শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী তাঁহাদের সহিত মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়াছিলেন। ৪ঠা এপ্রিল, সন্ধ্যায় নিউ দিল্লী কালীবাড়ীতে দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজ সঙ্গীতনায়ক মহাশয় ও রমেশচন্দ্রকে অভিনন্দন দান করেন।

গত ২৭শে মার্চ্চ শনিবার ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীটে প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য মুরারিমোহন গুপ্তের ৫০তম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী, শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোড়ই, শ্রীপবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মুরারিমোহনের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান শিষ্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথের আজীবন মৃদঙ্গ শিক্ষাদানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী, দীননাথ স্মৃতিসঙ্ঘ, চোরবাগান শান্তিসঙ্ঘ, মধ্য কলিকাতা ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়, পটলডাঙ্গা শান্তিসঙ্ঘ ও ঝামাপুকুর অবৈতনিক নাট্য সমিতির পক্ষ হইতে স্বর্গীয় মুরারিমোহনের প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করা হয়। ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর আলেখ্য প্রতিষ্ঠা

গত ২০শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যায় ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনীতে ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে সঙ্গীত-শিল্পী জয়কৃষ্ণ সান্যালের পরিচালনায় এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীত-সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীপ্রাণজীবন শেঠ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। গোঁসাইজীর অন্যতম প্রবীণতম শিষ্য শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল স্বয়ং এই প্রতিকৃতির এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।
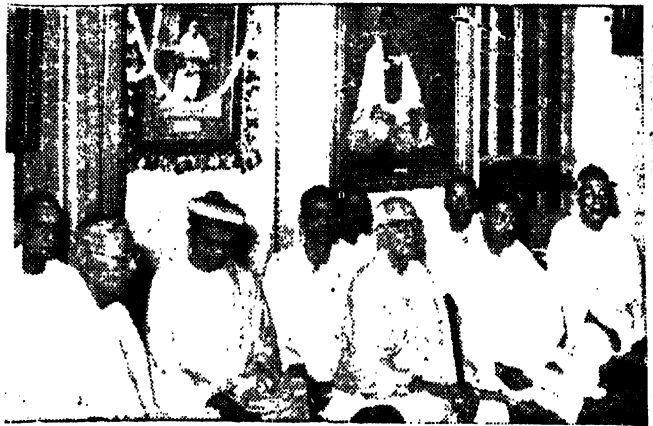
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর আলেখ্য প্রতিষ্ঠা উৎসবের চিত্র

সমুদ্র-সৈকতে —জন বাকল্যাণ্ড রাইট অঙ্কিত

পুষ্পরাশি —রাউল ডুফী অঙ্কিত

উদয়ভানু

[কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর থেকে সপ্তর্ষির উপাসনাধন্য সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁওয়ের বাসুদেবপুর পর্য্যন্ত এই কাহিনীর বিস্তার। নবাবী আমলের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের সে কি দুরবস্থা! বন্য-পশু ও মানুষের পাশাপাশি বসতি, শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের অন্ধকার! বাঙালী সেই দুর্দ্দিনে তবুও আত্মরক্ষা করেছিল কোন ক্রমে। ফেলে আসা অতীতের সেই বিস্মৃত ইতিহাস, বাঙালীর সেই দুঃখ-সুখের আসল রূপ আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন আত্মগোপনকারী লেখক। এই উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে প্রথমেই লেখক জানিয়ে রাখতে চান, 'বর্ণনা মাত্রই কাল্পনিক।' লেখকের দক্ষতা পাঠক-পাঠিকার আত্মতৃপ্তিতে নির্ভরশীল। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা বাঙলার এই অতীত কাহিনীর বাছ-বিছারে প্রবৃত্ত হোন, আমরা বিরত থাকি।—স]

কার পাল্কী? কোথায় চলেছে?

এক মহল থেকে আরেক মহলে চলেছে।

যেন এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাচ্ছে। কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। ঘর, দালান আর উঠানের সীমাসংখ্যা নেই। যেন গোলকধাঁধা। পর্দা ও জাফরির লজ্জাবরণ যেখানে-সেখানে। ঘরে দালানে কড়িকাঠের নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ। বড্ড বেমানান হয়, কিন্তু উপায় কি! কড়িকাঠের কাঠে আবার উইয়ের বাসা; যেন অদৃশ্য কোন্ দেশের মানচিত্র আঁকা রয়েছে। মহলের পর মহল, অন্দরের পথ যেন শেষ হ'তেই চায় না। কোন্ মহল, কার মহল বোঝা দায়। অসংখ্য ঘর, তাই ঘরের দরজার মাথায় নম্বর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। পেতলের ইংরেজী নম্বর। এক, দুই, তিন—

রাজা বাহাদুরের ঘরে শুধু নম্বর নেই। মহলের নাম রাজমহল। রাজার ঘর রাজঘর, তার আবার তকমা কি? শয়ন-ঘর, বৈঠকখানা, ষ্টাডি-রুম, সবই আছে। কিন্তু কোন ঘরেই নম্বর নেই।

সদর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কোন্ দিক থেকে হঠাৎ ভেসে আসে। অস্ফুট শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হয়। পাল্কী-বেহারাদের পথ চলার ডাক। একটা বিরাটকায় ও সুদৃশ্য পাল্কী বহন ক'রে আনছে দু'দল শক্তিশালী মানুষ। এক মহল থেকে অন্য মহলে চলেছে। দর-দালানের আলো-আঁধারে মিশকালো পাল্কী-বেহারাদের দেহের রৌপ্যালঙ্কার চাকচিক্য তুলছে।

কার পাল্কী? কোথায় চলেছে?

পৃথিবীতে এমন কেউ নেই ঐ পাল্কীর পথ রোধ করে। সমুখে যদি কেউ পড়ে, তার আর রেহাই নেই। পায়ের তলায় পিষে যাবে। পদদলিত হয়ে যাবে। যদিও আজ পর্য্যন্ত তেমন একটা দুর্ঘটনা কোন দিন ঘটলো না। পাল্কী-বেহারার সাবধানী ধ্বনি শুনলেই পথ ছেড়ে দেয় সকলে। গঙ্গার জোয়ার আসছে যেন দ্রুততম গতিতে।

কার পাল্কী? কোথায় চললো?

দূরে পাল্কী আসছে দেখে অন্দরের এক প্রায়-অন্ধকার ঘরের জানলা থেকে আচমকা দৌড় দিলো এক নারীমূর্ত্তি। ছায়ার মত স'রে গেল যেন। এক পলকে বিদ্যুৎশিখার মত দেখা যায় এক নারীমূর্ত্তি। তার রুক্ষ আলুলায়িত কেশ, পরিধানে ঘন লালপাড় কোরা সুতিবস্ত্র। অপস্রিয়মানার অঙ্গাবরণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শুভ্র। আকৃতি নাতিস্থূল ও নাতিকৃশ। দোহারা।

পাল্কী-বেহারার দল যেন কলে দম দিয়ে এসেছে।

দাঁড়ায় না এক দণ্ড। দমও নেয় না। গতি মন্দ করে না। গন্তব্যে না পৌঁছে যেন দম ফেলবে না। অবিরাম ঘাম ঝরছে তাদের কালো কপাল থেকে। দালান উঠান ঘর—যেতে-আসতে দম বেরিয়ে যায়। উঁচু-নীচু সিঁড়ি-সোপান ওঠা-নামা করতে হয়।

কিন্তু কার পাল্কী? কোথায় চললো হনহনিয়ে?

কানাঘুষায় জানাজানি হয়ে গেছে। সদর থেকে অন্দরে র'টে গেছে ইতিমধ্যেই, রাজমাতা আসছেন। রাজমাতার

নক্সা-কাটা, কারুকার্য্যময় ও নানা রঙে বিচিত্র পাল্কী। বহন ক'রে চ'লেছে জনা বারো মানুষ। জাতিতে সাঁওতাল তারা। সেই ভোর থাকতে যাত্রা করেছিল পাল্কী। তখন শুকতারা জ্বলছিল পূর্ব্বাকাশে।

পাল্কীর আবার পোষাক! লাল শালুর আবরণ। লজ্জাবরণ। পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ে যদি! পূজাহ্নিক যতক্ষণ না সমাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ কোন নীচ জাতের মুখদর্শন করবেন না রাজমাতা।

সকালের কাঁচা-মিঠে রৌদ্র ছড়িয়েছে দিকে দিকে।

নিস্তেজ সোনালী রৌদ্রালোকে রাত্রির ক্লান্তি মুছে গেছে সবে মাত্র। অন্ধকারের নীরবতা নেই এখন আর, প্রকৃতির আলো দেখে কাক-পক্ষী ডাকাডাকি করছে। তন্দ্রাহারা শহরের মুখে বুঝি বাক্ ফুটেছে এতক্ষণে। দূরাগত শব্দে মনুষ্যকণ্ঠের কলধ্বনি। ঘুম ভেঙ্গেছে শহর কলকাতার। গ্রীষ্মদিনের কলকাতার। ঘরে ঘরে কলরোল শুরু হয়েছে।

রাজমাতার মহলেও কলধ্বনি শুরু হয়েছিল।

সম্পর্কের আত্মীয়া আর বৃত্তিভোগী দাসীদের কণ্ঠধ্বনি এখানে-সেখানে। রাজমাতার পাল্কী-বেহারাদের সশব্দ নিশানা শোনা মাত্র যে যার মুখ বন্ধ ক'রেছে। মধ্যপথে কথা থামিয়েছে কেউ। কেউ হাসি থামিয়ে স্রেফ গম্ভীর হয়ে গেছে। মুখে যেন কুলুপ এঁটেছে হঠাৎ। চকিতের মধ্যে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে মহলটা।

বেহারার দল যথাস্থানে পৌঁছে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো পাল্কীখানা। ভারী ওজনের পাল্কী, ক' মণ ওজন কে জানে! রাজমাতার মহলের দ্বারপথে পাল্কী নামিয়ে দিয়ে ঐ কালা আদমীর দল হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চললো নিজেদের আস্তানায়। এতটা পথ অতিক্রম ক'রে যথাস্থানে পাল্কী নামিয়েও এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে জিরোবার অবকাশ নেই। তাদের উপস্থিতিতে রাজমাতা কদাপি পাল্কীর ঘেরাটোপ খুলতে দেবেন না। কোথাকার কে, তাদের চোখে দেখা দেন কখনও রাজমাতা বিলাসবাসিনী?

পাল্কী-বেহারার দল জাতিতে সাঁওতাল। কোল কিম্বা ভিল। ভারতের আদিম অধিবাসী। তাই বুঝি তাদের চোখে-মুখে সেই আদিকালের অজ্ঞতা। পেশীবহুল বলশালী শরীর, তবুও কেমন ভীত ও বিনম্র। কা'কে যেন ভয়!

ওরা অদৃশ্য হ'তেই দাসীদের আবির্ভাব হয়।

বিলাসবাসিনীর পাল্কীর ঢাকা খুললো অতি সন্তর্পণে। লাল শালুর লজ্জাবরণ উন্মোচিত ক'রলো। পাল্কীর এক পাশের পাল্লা ঠেলে সরিয়ে দিলো। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর চেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে। অনড় অটল হয়ে তিনি ব'সে আছেন পাল্কীর অভ্যন্তরে। মুদিতচক্ষু। নীরব, নিস্পন্দ।

—মা ঠাকরুণ, পাল্কী মহলের দুয়োরে নামিয়েছে।

দাসীদের একজন বললে ভয়ে ভয়ে। নাতিউচ্চ কণ্ঠে।

তবুও সাড়া নেই। অন্য এক জগতে চলে গেছেন রাজমাতা। জপের মালা যেমনকার তেমনি ধরা আছে হাতে। ১০৮ রুদ্রাক্ষের মালা।

—হুজুরণী, নামতে আজ্ঞা হোক। পাল্কী যে পৌঁছে গেছে অন্দরে। সভয়ে সন্ত্রাসে আবার কথা বললে দাসী।

ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করেন বিলাসবাসিনী। সুদীর্ঘ রক্তবর্ণ চক্ষু। বললেন,—পা ধোয়ার জল এনেছে?

—হাঁ গো হাঁ। হাত দুটো ভেরে গেল জলের কলসী ধ'রে থেকে! আপনি নামো দেখি এখন।

দাসী কথা বলে অধৈর্য্য হয়ে। হাতে তার জলপাত্র। পরিপূর্ণ গঙ্গোদক কলসীতে।

—অজাত কুজাত কেউ নেই তো এখানে? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন রাজমাতা।

দাসী বললে,—না গো না। কে আবার থাকতে যাবে এখানে! আমিই শুধু আছি। আমি তো আর বেজাত নয়।

বিলাসবাসিনীর দেহ স্থূল। মেদবহুল। নড়তে চড়তেই দশ ঘণ্টা। অতি কষ্টে নিজের দেহকে টেনে-হিঁচড়ে ঠেলে পাল্কীর বাইরে বের করলেন। কলসীর জল উজাড় করে দেয় দাসী। বিলাসবাসিনীর পায়ে।

দাসী ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছে। রাজমাতার সেবায় লেগেছে। নয় তো জাতে সে ব্রাহ্মণ। দেশে একদা অকাল হওয়ায় স্বামি-পুত্র-কন্যাকে হারিয়েছে। কবে কোন্ সালে মড়ক হয়েছিল তার শ্বশুরকুলের দেশে। সে-সময়ে মৃত্যু বরণ করেছে তার যত নিকটতম আত্মজন। শোকসন্তপ্ত মনে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছে রাজমাতার কাছে। বৃত্তি বা বেতন নেই,—খাওয়া, পরা আর বাসস্থান পেয়ে বর্ত্তে গেছে যেন দাসী।

গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে ফিরেছেন বিলাসবাসিনী। কর্দ্দমাক্ত পায়ে। পূর্ণ এক কলসী জলেও গঙ্গামাটি বুঝি বা ধুয়ে যায় না। রাজমাতা বললেন,—দাসী, আর এক কলসী জল নে আয় শীঘ্রি। পায়ের কাদা যেমনকার তেমনিই যে রইলো!

সকালের এক ফালি কাঁচা-মিঠে রৌদ্রালোক বিলাসবাসিনীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছে। মুর্শিদাবাদের রেশমী থান জ্যোৎস্না-আলোর মতই থেকে থেকে জৌলুষ তুলছে। কপালে তাঁর শ্বেত-চন্দনের শুষ্ক চিহ্ন। রাজমাতার সদ্যঃস্নাত আকৃতিতে যেন এক পবিত্রতার আভা! শ্বেত-চন্দনের সঙ্গে অঙ্গের শুভ্র বর্ণের পার্থক্য ধরা যায় না শীঘ্র। এক হয়ে গেছে যেন শ্বেত-চন্দন ও গাত্রবর্ণে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আর এক কলসী গঙ্গাবারি এনে হাজির করলো দাসী। হাঁপাতে হাঁপাতে এলো। যন্ত্রচালিতের মত কলসীর জল নিঃশেষ করে দিলো রাজমাতার পদদ্বয়ে। রাজমাতার মহলের প্রবেশ-পথের বিস্তীর্ণ উঠানটা জলে ভেসে গেল যেন। ভিজে-পায়েই চললেন বিলাসবাসিনী। জ্যোড়া

জোড়া পদচিহ্ন পড়লো তাঁর পেছনে। ভিজে-পায়ের ছাপ। সহসা কা'কে দেখলেন অদূরে। গতি মন্দ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনুগামিনী দাসীর উদ্দেশে বললেন,—ব্রজবালা, ও এখানে কেন মরতে? ওকে এখন যেতে বল এখান থেকে।

দূরে এক দ্বারের মুখে দাঁড়িয়েছিল সেই শুভ্র নারীমূর্ত্তি।

আলুলায়িত রুক্ষ কেশের বোঝা তার পৃষ্ঠে। পরিধানে কোরা লালপাড় সূতিবস্ত্র। দণ্ডায়মানা ঐ নারীর অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা। কিন্তু অশ্রু-সজল চোখ। যেন অস্পৃশ্যা, তাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগোতে সাহসী হচ্ছে না।

দাসীর নাম ব্রজবালা। দাসী বললে নির্দয় কণ্ঠে—তুমি এখন এখান থেকে বিদেয় হও দেখি বাছা! জপ-আহ্নিক হোক আগে রাজমায়ের। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ হোক। তার পর এসো।

ব্রজবালা দাসী। দাসীর মুখে বিদায় হয়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ শুনে শাড়ীর অঞ্চলে চোখের প্রান্ত মুছলো ঐ দীর্ঘ এবং সুকেশী রমণী। সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করলো সেই স্থান। ঠিক ছায়ার মতই সরে গেল যেন!

—মন্দিরে যাবো দাসী। আজ মন্দিরে গিয়েই আহ্নিক শেষ করবো। পূজো করবো। ফুলের সাজি আর গঙ্গাজলের ঘটিটা আনতে যা দেরী।

চলতে চলতে, মন্থর গতিতে চলতে চলতে কথা বললেন বিলাসবাসিনী। কথা বললেন দীপ্ত কণ্ঠে। অন্দর মহলে প্রতিধ্বনি শ্রুত হ'ল তাঁর সজোর কথার।

মন্দিরে আছেন অষ্টধাতুর গৃহদেবী। মা পতিতপাবনী।

মা নাকি জাগ্রতা। স্বপ্ন দেন, স্বপ্নে কথা বলেন। পতিতপাবনীর মন্দির আকাশ স্পর্শ ক'রেছে। মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়ায় পেতলের ত্রিশূল। সূর্য্যালোকের পরশ পেয়ে ঐ ত্রিশূলও যেন জাগ্রত হয়। স্বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত করে। আকাশকে শাসায় যেন।

গত কাল নির্জ্জলা উপবাস করেছিলেন রাজমাতা। একাদশীর উপবাস। মা পতিতপাবনীর পায়ে ফুল না চাপিয়ে জলগ্রহণ করবেন না। আগে মায়ের চরণামৃত মুখে দেবেন, তারপর অন্য কিছু।

অন্দরের সকলে যেন তটস্থ হয়ে আছে।

যতক্ষণ না মিছরির জলটুকু পান করছেন রাজমাতা, ততক্ষণ কারও রা কাড়বার উপায় নেই।

—ব্রজ! ব্রজবালা!

চলতে চলতে হঠাৎ কথা বললেন বিলাসবাসিনী।

—মা ঠাকরুণ, ডাকলে?

হঠাৎ ডাক শুনেছে ব্রজ। হুজুরণীর হঠাৎ আবার কি মনে পড়লো কে জানে! ব্রজবালা এগিয়ে যায় বিলাসবাসিনীর কাছে। বলে,—কিছু বলবেন আপনি?

ইতি-উতি তাকালেন রাজমাতা।

দেখলেন হয়তো কেউ সেখানে আছে না নেই। কথার সুর নামিয়ে বললেন,—একটি বার খোঁজ নে দেখি। যা, তুই-ই যা। সদর থেকে জেনে আয় সাতগাঁ থেকে লোক এসেছে কি না।

কথা শুনে ব্রজবালার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন হ'ল। মুখের কথা খসালেই হ'ল? বলতে কতক্ষণ? কিন্তু সে কি এখানে? কত দূর, কতটা পথ? কতগুলো মহল পেরিয়ে তবে যেতে হয় সদরে! ব্রজবালা কথা বলে শুষ্ককণ্ঠে,—তা আপনি যখন বলছো, যাই।

বিলাসবাসিনীর গতি রুদ্ধ হয় না।

দরদালান ধ'রে এগিয়ে চলেছেন তিনি। জলের ঘটি আর ফুলের সাজি আনতে চলেছেন নিজের মহল থেকে। অন্য কেউ স্পর্শ করে তা তিনি চান না। মহলের লাগোয়া পূজার ঘর আছে রাজমাতার। মন্দিরে সকল সময়ে যাওয়া-আসার সুবিধা হয় না, তাই পৃথক্ ঠাকুর-ঘর।

—এ্যাতটা পথ মিছেই যাবো হুজুরণী, তা আমি আগেই বলে দিয়ে যাচ্ছি। ব্রজবালা আবার কথা বললে। বললে,—তোমার সাতগাঁ থেকে লোক আর আসবে না। আসতে দেবে না তারা।

রাজমাতা ঝলসে উঠলেন যেন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—দাসী, তোকে যা বলছি তুই শোন্। এই মুহূর্ত্তে যা।

মুখের কথা খসাতে কতক্ষণ!

কিন্তু সদর কি এখানে? অন্দর আর সদরের মধ্যে আরও কতগুলো মহল। কত সিঁড়ি! কত দালান আর উঠান! পথের দৈর্ঘ্য চিন্তা ক'রে ভীত হয় ব্রজবালা, তবুও যখন রাজমাতার আদেশ, লঙ্ঘন করবে সাধ্যি কার?

ব্রজবালা চললো। পথের কষ্ট, মনের কষ্ট বুকে চেপে চললো তৎক্ষণাৎ।

বিলাসবাসিনী শুধু বললেন,—তুই ফিরলে তবে মন্দিরে যাবো আমি। বেলা কাবার ক'রে এসো না যেন।

ব্রজবালা নিরুত্তর। সে তখন গমনোদ্যত।

দেহের বাস ঠিক-ঠাক করতে করতে এগিয়েছে বিপরীত মুখে। বিরক্তির সঙ্গে চাপা গলায় কি যেন বকছে বিড়-বিড়। বলছে,—সাতগাঁ থেকে লোক আর এয়েছে! সূয্যি তা হ'লে পশ্চিমে উঠবে!

—সাতগাঁ থেকে লোক আর আসবে না। আসতে দেবে না তারা।

দাসীর মুখে এই কথাগুলি শুনে বিলাসবাসিনীর আপাদ-মস্তক জ্ব'লে গেছে বুঝি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন মনে মনে। চলতে চলতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজমাতা। দুঃখের শ্বাস ফেললেন।

—মা পতিতপাবনী, দয়া কর মা!

স্বগত করলেন রাজমাতা। বক্ষ মথিত ক'রে কথাগুলি উচ্চারিত হ'ল। রাজমাতার মনশ্চক্ষে পতিতপাবনীর সদাহাস্যময়ী মূর্তির সিন্দূর ও অলক্তকশোভিত পদযুগল। ঘন-লাল চেলী।

—তোমার পায়ে ঠাঁই দাও মা!

আবার স্বগত করলেন রাজমাতা। ততক্ষণে তিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর পূজার ঘরের সমুখে। ঘরের দ্বার রুদ্ধ। শেকল খুলে ঘরে প্রবেশ করতেই কি দেখে শিউরে উঠলেন বিলাসবাসিনী। তাঁর মুখাবয়বে ফুটে উঠলো ভীতিকাতরতা। বললেন,—যাঃ, দুধটুকু সব খেয়ে ফেললে তোমরা! এখন উপায়? কি দিয়ে পুজো করি এখন?

যাদের উদ্দেশে বিলাসবাসিনী কথাগুলি বলেন তারা বাক্‌হীন।

বাক্‌শক্তি নেই তাদের। চলৎশক্তি আছে। রাজমাতার কথা শুনেই কি না কে জানে, তারা দুগ্ধপানে বিরত হয়। দুগ্ধপূর্ণ তাম্রপাত্র প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক পূজানুষ্ঠানের মধ্যে নিত্য শিবপূজাও করেন বিলাসবাসিনী। শিবপূজার নিমিত্তে কাঁচা দুধের প্রয়োজন হয়। সেই দুধ শুধু মাত্র উচ্ছিষ্ট হয়নি, নিঃশেষিত হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন বিলাসবাসিনী। তার পর মিনতির সুরে বললেন,—যাও, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এখন আমার ঘর খালি করে দাও। আমি যে পুজোর জোগাড় ক'রবো।

মানুষের ভাষাও কি বুঝতে পারে তারা? কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গমনোদ্যত হয়। একে একে ঘরের নালীতে প্রবেশ করে। তাদের বিদ্যুৎ-গতি। মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে পূজাঘরে প্রবেশ করেন রাজমাতা।

কক্ষমধ্যে ছিল এক-জোড়া সাপ। বাস্তুসর্প।

বিলাসবাসিনী যত কাল এসেছেন তত কাল দেখছেন ঐ সর্পযুগলকে। ঐ সাপ আর সাপিনীকে।

ওদের হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, দংশনের স্পৃহাও নেই। গৃহের অন্যান্য মানুষের মতই বসবাস করছে এই বাস্তুগৃহে। লাজুক-লতার মত কোথায় লুকিয়ে থাকে সহসা দেখতে পায় না কেউ। দেখলে চেনা যায় না, ধরা যায় না, কে সাপ আর কে সাপিনী। আকৃতি এবং প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। একত্রে থাকে, একত্রে ঘোরাফেরা করে।

—হুজুরণী, দেবো শেষ ক'রে ও দু'টোকে?

ব্রজবালা নয়। অন্য একজন কথা বলে। রাজমাতার পদাশ্রিতা জনৈকা ব্রাহ্মণী। বিলাসবাসিনীর পরিচারিকাদের অন্যতমা। বললে,—বল'তো ইটিয়ে মেরে ফেলি। নয়তো নাটির ঘায়ে—

রাজমাতা জিব কাটলেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন সবিস্ময়ে, —সে কি কথা! ছিঃ, এমন কথা মুখে এনো না কোন দিন। ওরা যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! মা মনসার বাহন যে ওরা! বাস্তুলক্ষ্মী!

—আপনার ঐ এক কথা! কোন্ দিন কা'কে দংশায় তার ঠিক নেই!

বিলাসবাসিনীর মুখাবয়বে ঈষৎ ক্রোধের আভাষ ফুটে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—তুই আজকের মানুষ। আর আমি ওদের দু'টিকে দেখছি যদ্দিন এই রাজবাড়ীতে এয়েছি। তুই কি জানবি?

পরিচারিকার মুখে আর কথা জোগায় না। চুপ করে যায়।

পূজার ঘরে প্রবেশ ক'রে তৈজসপত্র নাড়াচাড়া করতে থাকেন রাজমাতা। খোঁজাখুঁজি করেন সাজি আর জলপাত্র। ঘটি, পুষ্পপাত্র। ব্রজবালা গেছে সদর থেকে খোঁজ আনতে, ফিরে এসে কি বলে কে জানে! প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছেন বিলাসবাসিনী। দ্বারের বাইরে পরিচারিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন,—যাও দেখি বাছা, কাঁচা দুধ পোয়াটাক নিয়ে এসো গোয়াল থেকে। রাখালকে বল দু'য়ে দেবে'খন।

পরিচারিকা সদ্য-আগতা। মাত্র কয়েক মাস আগে আশ্রয় পেয়েছে রাজমাতার কাছে। অল্প বয়স, সধবা। স্বামিপরিত্যক্তা। হুগলী জেলার দিলআকাশ গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ী। স্বামী তার যাত্রার দলের শ্রীকৃষ্ণ। যাত্রা করে, পালা গায়। দিনের বেলায় গাঁজা টেনে বেহুঁশ হয়ে থাকে। নেশা ছুটে গেলে মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ তখন আসল মানুষে রূপান্তরিত হয়। কারণে অকারণে মার-ধর করে তার অবলা স্ত্রীকে।

গাল-মন্দ আর মার-ধরের ভয়েই সে পালিয়ে বেঁচেছে।

দিলআকাশ থেকে কলকাতার শহরে পালিয়ে এসেছে। রাজমাতা আশ্রয় দিয়েছেন তাকে।

নতুন মানুষ। গোলকধাঁধার মতই মনে হয় এই রাজ-বাটীকে। থাকোবালার চোখে ধরা পড়ে না ঘর-দেউড়ি, দর-দালান আর এতগুলো মহল।

পরিচারিকা বললে,—আপনি অন্য কাউকে পাঠাও। আমি গোয়ালে যাবোনি।

বিলাসবাসিনী বললেন,—কেন? যাবে না কেন শুনি?

পরিচারিকা ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় কেমন। বলে, —আপনার রাখালটি নোক ভাল নয়। গোয়ালে যেতে আমার ডর নাগে।

দুই চক্ষু মুদিত করলেন বিলাসবাসিনী। পাষাণমূর্তির মত স্থির হয়ে গেলেন। বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না কিয়ৎক্ষণের মত। কয়েক মুহূর্ত অতীত হ'লে বললেন,—আচ্ছা, তুমি এখন এসো। কাজে যাও নিজের। গোয়ালে তোমাকে যেতে হবে না। ব্রজকে পাঠিয়ে দাও।

—ঐ যে আসছে ব্রজদিদি। বললে, পরিচারিকা।

রাজমাতা আদেশের সুরে বললেন,—তুমি তোমার কাজে যাও। ব্রজর সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

পূজাঘরের বাতায়ন ভেদ করে এক ফালি রোদ পড়েছিল বিলাসবাসিনীর উর্দ্ধাঙ্গে। পরিচারিকার নজরে পড়ে রাজমায়ের গম্ভীর বদন। আয়ত রক্তবর্ণ আঁখিতে ক্রুদ্ধদৃষ্টি। আর এক পল সেখানে থাকতে সাহসী হয় না পরিচারিকা। শব্দহীন পদক্ষেপে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে পূজাঘরের দ্বারপথ।

ব্রজবালা আসছে জেনে হাতের কাজ বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বিলাসবাসিনী। কি বলবে ব্রজবালা কে জানে? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন,—সাতগাঁর লোক এসেছে রে?

ব্রজবালা পথশ্রমে ক্লান্ত। কতটা পথ গেছে। এসেছে।

স্থির থাকতে পারেন না বিলাসবাসিনী। আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—কি রে কথা ক'স না কেন? সাতগাঁ থেকে লোক—

ব্রজবালা বললে,—গরীবের কথা বাসি না হ'লে তো মিষ্টি হয় না! আমাকে মিথ্যে মিথ্যেই দৌড় করালে আপনি। সাতগাঁ থেকে কেউ আজ আসেনি।

বিলাসবাসিনী আবার কেমন যেন পাষাণমূর্ত্তির আকার ধারণ করলেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ। অসহ্য এক অন্তর্জ্বালায় যেন বুকটা দগ্ধ হ'য়ে যায়। রক্তবর্ণ চোখের প্রান্ত সকালের রৌদ্রে কিনা কে জানে, চাকচিক্য তুললো। পরিধানের গরদের অঞ্চল ধ'রেছিলেন যেন বজ্র-মুষ্টিতে। হাত থেকে আঁচলটা খ'সে পড়লো বিলাসবাসিনীর। দু' চোখের কোল জলসিক্ত হয়ে উঠলো কি! ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে বিলাসবাসিনীর?

কোথায় সাতগাঁ? কে আছে সেখানে?

বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল সপ্তগ্রামে? সপ্তর্ষির তপস্যাক্ষেত্র সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে আছেন বিলাসবাসিনীর একমাত্র কন্যা। বাসুদেবপুরের জমিদার কৃষ্ণরামের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর কত আদরের মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর। সেই বিন্ধ্যবাসিনী আছে সাতগাঁয়ের বাসুদেবপুরের জমিদারগৃহের এক নির্জ্জন কক্ষে বন্দিনী হয়ে। কৃষ্ণরাম বন্দী ক'রে রেখেছে রাজকন্যাকে! বিন্ধ্যবাসিনীকে! বিলাসবাসিনীর বিন্দুকে!

পূজাঘরে পুনঃপ্রবেশ করলেন রাজমাতা।

আঁচলে চোখ দু'টিকে মুছলেন। পুনরায় জলসিক্ত হয়ে উঠলো চক্ষুপ্রান্ত। অশ্রুবন্যা বইলো যেন!

—মা পতিতপাবনী, মুখ তুলে তাকাও মা!

স্বগত করলেন বিলাসবাসিনী। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে। পূজার জোগাড় করতে আর মন চাইলো না। পূজাঘরের শ্বেত-প্রস্তরের মেঝেয় ব'সে পড়লেন নিরাশ মনে।

বাসুদেবপুরের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়—নামটি মনে উদিত হ'লেই রাজমাতা বিলাসবাসিনী পর্য্যন্ত আঁৎকে ওঠেন। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার কৃষ্ণরামের দাপটে বাসুদেবপুরের বাসিন্দাগণ ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে আছে। দয়ামায়াহীন, কুক্রিয়াসক্ত ও দুরাচারী কৃষ্ণরামের বিবিধ লোমহর্ষণ কুকীর্ত্তির জন্য সমগ্র বাসুদেবপুর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। তবুও কৃষ্ণরাম রায়ের জমিদারীর চৌহদ্দি বাসুদেবপুর নয়। সেথান থেকে অনেক দূরে—আরামবাগ মহকুমার গড় মান্দারণে। সংকীর্ণকায়, স্বচ্ছ-সলিল আমোদর নদের তীরে। কাঁটাজী থেকে রাধাবল্লভপুর পর্য্যন্ত কৃষ্ণরামের জমিদারীর সীমানা। কৃষ্ণরামের প্রজাবৃন্দের অধিকাংশই মুসলমান। তদুপরি জমিদার কৃষ্ণরাম শোনা যায়, অত্যন্ত প্রজানুরঞ্জন।

পৈ পৈ ক'রে নিষেধ ক'রেছিলেন বিলাসবাসিনী।

কৃষ্ণরামের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু স্বর্গত রাজা, তাঁর স্বামী, সে কথায় কর্ণপাত করেননি। রাজা কৌলীন্য ভঙ্গের ভয়ে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় হাত-পা বেঁধেই জলে ফেলেছিলেন আপন কন্যাকে!

—আমার বিন্দুকে মুক্তি দাও মা! তার মৃত্যু দাও, আমি প্রার্থনা জানাই তোমাকে। অস্ফুট শব্দে কাতর মিনতি জানাতে থাকেন রাজমাতা। বলেন,—আমার মেয়ে বন্দিনী হয়ে থাকবে মা? তুমি থাকতে এ আমাকে চোখে দেখতে হবে?

মা পতিতপাবনীকে উদ্দেশ্য করেই বোধ করি কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

—চোখে দেখতে হবে কেন? প্রতিকার করবে আপনি।

ঘরের বাইরে ছিল ব্রজবালা। রাজমায়ের করুণ আবেদন হয়তো তার কানেও পৌঁছয়। নেহাৎ যেন অসহ্য হ'তেই ব্রজবালা বলে,—চোখে দেখবে কেন? পতিকার করবে। রাজা বাহাদুর থাকতে তোমার ভাবনা কি?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিলাসবাসিনী।

কিয়ৎক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন ধীরে ধীরে,—কালীর কম্ম নয় ব্রজ, আমার কাশী যদি রাজা হ'ত দেখতিস, এ্যাদ্দিনে একটা লড়াই বাধিয়ে তুলতো কেষ্টরামের সঙ্গে।

জ্যেষ্ঠ কালীশঙ্কর, কনিষ্ঠ কাশীশঙ্কর।

রাজমাতা বিলাসবাসিনীর দুই পুত্র। একমাত্র কন্যা ঐ বিন্ধ্যবাসিনী।

ব্রজবালা তবুও বললে,—আপনি না হয় একবার ব'লেই দেখো না। যতই হোক তিনিই রাজা। জেলার মান-সম্মানই বেশী!

দুঃখের ক্ষীণ হাসি হাসলেন রাজমাতা।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখা যায় বিস্তীর্ণ শুভ্রাকাশ। নতুন প্রভাতের সূর্য্যালোকে সমুজ্জল। আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন বিলাসবাসিনী। কলকাতার আকাশে কাক-চিল। আকাশে চোখ রেখেই কথা বলেন। রাজমাতা বলেন,—শুধু নামে রাজা হ'লেই হয় না ব্রজ! মাথায় মুকুট

চাপালেই রাজা হওয়া যায়। খেতাব থাকলে কি হবে। রাজা হয়েও যে একটা সামান্তি জমিদারকে শায়েস্তা করতে পারে না, সে আবার কেমন ধারার রাজা? তার চেয়ে মরুক আমার বিন্দু!

—বালাই ষাট! বললে ব্রজবালা।—কি যে বল' সাত-সকালে! এখন জপ-আহ্নিক সেরে নাও দেখি। দেখতে দেখতে বেলা বয়ে যাচ্ছে উদিকে। মুখে আগে জল দাও। সাতগাঁ থেকে লোক ফিরতে কত সময় লাগে তা জানো? সে কি হেথায়? কা'কে পাঠিয়েছ শুনি?

রাজমাতা বললেন,—কেন, জগমোহন লেঠেলকে পাঠিয়েছি।

ক্ষণেক ভেবে ব্রজবালা বলে,—বিথা সময় নষ্ট করবে সে মানুষও জগমোহন নয়। পথ কি সামান্তি? ক'দিনের পথ!

—জগমোহনকে শুধু-হাতে পাঠাইনি ব্রজ! কেমন রুক্ষকণ্ঠে বললেন বিলাসবাসিনী,—পাথেয় খরচা দিয়েছি। জগমোহন রণ্-পায়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমি যেতে দিইনি। নৌকা-ভাড়া দিয়েছি যাতায়াতের। হুগলী নদী ধ'রে যাবে আসবে। এখন আমার কপাল আর আমার বিন্দুর ভাগ্যি!

কথার শেষে পুনরায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ব্রজবালা খুশীর সুরে বলে,—তবে আর ভাবনার কি আছে? জগমোহনকে যখন আপনি পাঠিয়েছ তখন নিশ্চিন্ত থাকো, জগমোহন ঠিক খোঁজ এনে দেবে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—খোঁজ না হয় আনবে জগমোহন, কিন্তু আমার বিন্দুকে কি কেড়ে আনতে পারবে? কথা বলতে বলতে টেনে টেনে নিশ্বাস নেন রাজমাতা। বলেন,—ব্রজ, চটপট যা, পোয়াটাক দুধ এনে দে। শিবপূজার দুধটুকু সব শাঁখ-শাঁখিনীতে খেয়ে গেছে।

শাঁখ, শাঁখিনী। শঙ্খ ও শঙ্খিনী।

বাস্তুসাপ দু'টির মনুষ্যদত্ত নাম! এই নামকরণ করেছিলেন স্বর্গত রাজা। বিলাসবাসিনীও তাই তার স্বামীর প্রদত্ত নাম দু'টিতেই ডাকেন। সর্প শব্দ উচ্চারণ করেন না। সর্পনাম উচ্চারণ করলে মা মনসার কোপ হয়।

বেলা কত বয়ে গেল! পূজা শেষ হ'ল না এখনও!

বিলাসবাসিনী যতই চেষ্টা করেন যাতে বন্দিনী কন্যার মুখখানি মানসপটে উদিত না হয়, তত যেন বিন্ধ্যবাসিনীর চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মন ও মস্তিষ্ক।

জগমোহন পৌঁছালো কি না কে জানে!

দূর-পাল্লার নৌকায় যাত্রা করেছিল জগমোহন।

কলকাতার বাগ্‌বাজারের ঘাট থেকে হুগলীর তীরে বংশবাটির ঘাটে পৌঁছতে হয়েছে জগমোহনকে। হুগলী নদীর তীর থেকে যেতে হবে সপ্তগ্রামে। জলে নয়, স্থলে। দুর্গম পথ। শ্বাপদসঙ্কুল, জঙ্গলাকীর্ণ ভয়াবহ পথ। শুধু পশু নয়—দস্যু, তস্কর ও ডাকাতের ভয়ও আছে। সর্বস্ব অপহরণের ভয় আছে। দুর্বিপাকে প'ড়ে প্রাণঘাতের আশঙ্কাও আছে।

কলকাতার বাগবাজারের ঘাট থেকে টানা নৌকা যায়নি। মাঝপথে কত বার থেমেছে। কত ঘাটে কত যাত্রী নামিয়েছে। দিন গত হয়েছে, রাত্রিও গত হয়েছে।

দিনে হাল চলে, রাত্রে হাল চলে না। যাত্রিবাহী নৌকা, জলদস্যুর আক্রমণের ত্রাসে রাত্রে কোন ঘাটে ভিড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হয় ততক্ষণ নৌকায় রাত্রি যাপন করতে হয়েছে।

নয়তো জগমোহনের পৌঁছতে এতটা বিলম্ব হ'ত না।

পুরা এক দিন আর একটা পুরা রাত নৌকাতেই যে কেটে গেল। গজেন্দ্রগামিনীর মত অত্যন্ত ধীরগতিতে এসেছিল নৌকা। কত যাত্রী ছিল নৌকায়! কত জাতের যাত্রী! নামলো কত ঘাটে!

বাগবাজারের ঘাট থেকে বালীখালের ঘাটে নৌকা ভিড়েছিল প্রথমে। বালী থেকে রিষড়ার ঘাটে। রিষড়া থেকে শেওড়াফুলীর ঘাট। সেখান থেকে ভদ্রেশ্বরের ঘাট ছুঁয়ে হুগলী-ঘাটে ভিড়লো অতি কষ্টে।

হুগলীর ঘাট থেকে ফেরী-নৌকায় বংশবাটি পৌঁছেচে জগমোহন। নৌকা বদল করতে হয়েছে তাকে। বংশবাটি পৌঁছতে পৌঁছতে দিন শেষ হয়ে গেছে। তখন নদীর তীর অন্ধকারে প্রায় সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। গঙ্গার মধ্যস্থল থেকে বংশবাটি গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীতীরবর্ত্তী কয়েকটি গহনা নৌকার ছইয়ের অভ্যন্তরে শুধু তৈল-প্রদীপ জ্বলছে! মুক্ত বাতাসে অগ্নিশিখা কম্পমান হয়ে ওঠে কখনও। প্রদীপ নিবু-নিবু হয়। ঘনান্ধকারে সেই আলোকবিন্দু সমূহ বহুদূর-স্থিত আকাশের নক্ষত্ররাজির মতই প্রতিভাত হয়।

কোথায় ঘাট? কোথায় গ্রাম?

অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন। আকাশ, প্রান্তর ও নদীকূল সর্ব্বত্র নৈঃশব্দ। কেবল অবিরল কল্লোলিতা গঙ্গানদীর কুলু-কুলু ধ্বনি। আর কদাচিৎ বন্যপশুর চীৎকার। জগমোহনের মত দুর্দান্ত লাঠিয়ালও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কোথায় ঘাট? কোথায় বংশবাটি গ্রাম? নদীকূলে ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষাদির সমাবেশে কিছুই যে দৃষ্টিপথে পড়ে না। রাত্রির নিবিড় আঁধারে বনজঙ্গল কৃষ্ণকায় হয়ে আছে। কোথায় গ্রাম? কোথায় বা গ্রামে যাওয়ার পথ?

বন্য-বরাহ ও বন্য-শৃগালের আহ্বান-রবে মুখরিত রাত্রি! মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। রাত্রিচর পক্ষীদের তীব্র ও কর্কশ কণ্ঠ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। পশু ও পক্ষীর মিলিত রবের প্রতিধ্বনি ভেসে যায় মুক্ত হাওয়ায়। জগমোহনের মত বলশালী মানুষও ভীতিকাতর হয়।

এখন উপায়? নৌকার মাঝিরা যদি রাত্রিটুকু নৌকাতে অতিবাহিত করতে দেয়, তবেই রক্ষা। [illegible]

বিষধর ভুজঙ্গ বা শ্বাপদের দংশন অবশ্যম্ভাবী, যার পরিণাম মৃত্যু বৈ অন্য কিছুই নয়। মনে মনে তখন প্রমাদ গণে লেঠেল জগমোহন। এই নিদারুণ অন্ধকারে লাঠি চালনারই বা মূল্য কি? অন্ধকারে লাঠিকে কে ডরায়?

বংশবাটির গঙ্গার তীর থেকে সপ্তগ্রাম মাত্র দেড় ক্রোশ।

সাতগাঁয়ে যাবে জগমোহন! সাতগাঁয়ের বাসুদেবপুরের জমিদারগৃহে, রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীর আলয়ে যাবে। কিন্তু আকাশে যতক্ষণ না আলো ফুটছে ততক্ষণ নদীতীরস্থ বনজঙ্গল ভেদ করা এক কঠিন ও দুরূহ কাজ।

নৌকা বংশবাটির ঘাটে ভিড়তেই জগমোহন তার মনোবাসনা মাঝির সর্দ্দারের কাছে পেশ করলো। শ্রম-ক্লান্ত সর্দ্দার শুভ্র ও পক্ব-কেশ শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি চালনা করে আর শোনে জগমোহনের বক্তব্য। শেষে কি মনে হওয়ায় আপত্তি জানায় না। নৌকার ভাড়ার সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ বেশী দেওয়ার ইচ্ছায় আপত্তি না থাকলে জগমোহন নৌকায় রাত্রি যাপন করতে পারে, এরূপ মত প্রকাশ করে মাঝি-সর্দ্দার। জগমোহনও রাজী হয়। তখন উপায় কি?

মাটির শিব। হাতে-গড়া।

পূজায় ব'সেও রেহাই নেই যেন। শিবের মাথায় সচন্দন বিল্বপত্র চাপিয়ে চুপচাপ ব'সেছিলেন বিলাসবাসিনী। শিব-মন্ত্র ভুলে গেলেন নাকি রাজমাতা! পূজায় ব'সে মধ্যপথে এমন স্তব্ধ হয়ে আছেন কেন? মুখাকৃতিতে ভয় ও উদ্বেগের ছায়া ফুটেছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। বিলাসবাসিনীর মন ক্ষণে ক্ষণে ছুটে চলেছে সেই সাতগাঁয়ে, যেখানে রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী বন্দিনী হয়ে আছেন। জগমোহন পৌঁছালো কি না কে জানে!

—হুজুরণী? পুজো শেষ হয়েছে আপনার? হঠাৎ কার ডাক শুনে চমকে ওঠেন যেন রাজমাতা।

ডাকছে কে! কেনই বা ডাকছে! সাতগাঁ থেকে ফিরলো নাকি জগমোহন লাঠিয়াল!

আবার ডাকলো ব্রজবালা,—হুজুরণী, কত বেলা আর করবে?

বিলাসবাসিনী পুজায় ব'সেছেন, মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন কথা কইবেন না এখন। আহ্বানে সাড়া দেন না, দৃষ্টি সম্প্রসারিত ক'রে দেখেন একটি বার।

ব্রজবালা বললে,—রাজা যে অপিক্ষা করছেন আপনার জন্যি! হাত চালিয়ে নাও, কত বেলা করবে? মুখে জল দেবে না? রাজা যে ওদিকে অপিক্ষা করছেন!

রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

বিলাসবাসিনীর মন্ত্রোচ্চারণের গতি বর্দ্ধিত হয়। অজ্ঞাতে বেলা ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কত! পূজা শেষ ক'রে আবার যেতে হবে রাজমহলে। রাজা বাহাদুরের সমুখে গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে রাজমাতাকে। দর্শন দিতে হবে। একটি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যক্রিয়া পালন করবেন রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর—রাজমাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন রাজা বাহাদুর। জননীর পদধূলি গ্রহণ করবেন পরম ভক্তি-সহকারে।

শিবের মাথায় আর বেছে-বেছে ফুল চাপানোর সময় নেই। এত ফুল আর বিল্বপত্র, কে বাছে!

রাশি রাশি গন্ধপুষ্প মুঠোয় ভ'রে তুলে দেন বিলাস-বাসিনী। অধিক বিলম্ব হ'লে রাজা বাহাদুরের প্রাতরাশের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। দ্রুত হাত চলে রাজমাতার, দ্রুত মন্ত্র বলেন। পূজায় যেন মন নেই আজ। মন্ত্র ভুল হয়ে যায় বার বার। পূজা-পদ্ধতিরও কোন ঠিক থাকে না। রাজা বাহাদুর প্রতীক্ষায় বসে আছেন, মাতৃদর্শন করবেন। এতক্ষণে জগমোহন সাতগাঁয়ে পৌঁছালো কি না কে জানে!

বন-পথ দুর্গম। গভীর জঙ্গল ভেদ ক'রে সেই পথ অতিক্রম করতে হবে। আকাশের সূর্য্যালোকের চিহ্ন নেই, প্রায়ান্ধকার পথ।

বংশবাটির গঙ্গাতীর থেকে বাসুদেবপুর দেড় ক্রোশের পথ। সর্প ও শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু, তস্কর বা ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও কম নয়। বহু প্রতীক্ষায় দিবালোকের দেখা পেয়ে মনে মনে বল সঞ্চয় করেছিল জগমোহন। কোঁচড়ে-বাঁধা আহার্য্য থেকে দু' মুঠো চিঁড়ে ও যৎসামান্য গুড় কোন প্রকারে গলাধঃকরণ ক'রে ঐ কূলপ্লাবী গঙ্গার জল আঁচলা ভ'রে পান করেছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের শেষে দুর্গা ও কালীর নাম আওড়াতে আওড়াতে বাসুদেবপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রেছিল জগমোহন। রাজমাতা স্বয়ং যখন আজ্ঞা করেছেন!

যাত্রার পূর্ব্বে হাতের লাঠি মাথায় স্পর্শ করতে হয়।

বিপদ-আপদের ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিপত্তারিণীকে স্মরণ করতে হয়! জগমোহনের হাতে বৃহৎ বাঁশের লাঠি। সেই লাঠি বিস্তার করতে করতে জগমোহন পথ অতিক্রম করছিল। ভীষণ দ্রুতবেগে। বিদ্যুৎ-বেগে!

লাঠির এক প্রান্ত মৃত্তিকায়। অন্য প্রান্ত জগমোহনের হস্তে। লাঠিতে সমস্ত শরীরের ভর চাপিয়ে লাফ দিতে দিতে জগমোহন পথ চলেছিল তড়িৎবেগে। তখন জগমোহনের নাগাল পায় সাধ্য কার?

ভারতের বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

জন্ম : ২৫এ বৈশাখ, বাংলা ১২৬৮ সাল, রাত্রি ৪টা ১ মিঃ, সোমবার (৬ই মে ১৮৬১ খৃঃ); মৃত্যু : ১৩৪৮ সালের ২২এ শ্রাবণ, ঝুলন পুর্ণিমা, দিবা ১২টা ১০ মিঃ (৭ই আগষ্ট, ১১৪১ (খৃঃ) । বিংশোত্তরী বুধের দশায় জন্ম ; বুধের ভোগ্য বর্ষাদি ১১।৩।২০ ; শনির দশায়, শনির অন্তর্দশায় মৃত্যু । জন্মকুণ্ডলীপরিচয় :—গুরুর ক্ষেত্র মীন লগ্নে জন্ম ; রেবতী নক্ষত্র, মীনরাশি । তাঁহার লগ্ন ও দশম স্থানের অধিপতি বৃহস্পতি এবং পঞ্চম স্থানের অধিপতি চন্দ্রের মধ্যে ক্ষেত্র-বিনিময় হইয়াছে : বৃহস্পতি তুঙ্গক্ষেত্রে থাকিয়া জাতকের ভাগ্য, আয় ও দেহভাবে চন্দ্রের উপর পূর্ণদৃষ্টি দান করিতেছেন । দ্বিতীয় ও নবম স্থানের (পরাক্রম, বাক্ ও ভাগ্য) অধিপতি মঙ্গলের সঙ্গে তৃতীয় (পরাক্রম) ও অষ্টম (মৃত্যু ও আয়ু) স্থানের অধিপতি শুক্রের ক্ষেত্রবিনিময় যোগ হইয়াছে ; শুক্র দ্বিতীয়ে এবং মঙ্গল তৃতীয়ে আছেন : [জন্ম-সময়ের সন্দিগ্ধতার জন্য অতি সামান্য কয়েক মুহূর্ত্ত সময়ের ব্যবধানে মঙ্গলের অবস্থান চতুর্থে ধরিলে বুধের সঙ্গে মঙ্গলের ক্ষেত্রবিনিময় যোগ হয়] চতুর্থ (বিদ্যা, সৌখ্য, মাতা) ও সপ্তম (জায়া, সৌখ্য, বাণিজ্য) স্থানের অধিপতি বুধ দ্বিতীয়ে রবি ও শুক্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন ; রবি ষষ্ঠপতি (রিপু ও রোগ); দ্বিতীয়ে তিনি তুঙ্গী । চতুর্থে ক্রূরগ্রহ কেতু ; ষষ্ঠে একাদশ ও দ্বাদশস্থানের (আয় ও ব্যয়) অধিপতি শনি বক্রীভাবে অবস্থিত ; দশমে কর্ম্মভাবে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কারক রাহু ।

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—এই তিনের শুভ প্রভাবে হয় বাণীর উদ্বোধন । মনের কারক চন্দ্র ; চন্দ্রই হৃদয় ও অনুভূতি । বৃহস্পতি প্রজ্ঞাশক্তি ; শুক্র উদ্ভাবনী প্রতিভা ;—পার্থিব রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের উপলব্ধি বা উপভোগের মন্ত্র দেন শুক্র ; তিনিই মনকে করেন রূপ-রসের মায়ায় আকর্ষণ ; তিনি সৃষ্টি করেন আসঙ্গ-লিপ্সা ; তিনি ঘটান মিলন । বুধ বালক,—ছাত্র ; বোধনশক্তির কারক এই বুধ । যাহা কিছু দেখেন, যাহা কিছু শুনেন, তারই সংগ্রহে বা ধারণে বুধের তৃপ্তি । তার উপরে আছেন রবি ; রবি পিতা—আত্মা ; আত্মা বা প্রাণ না থাকিলে দেহ বা মনের অস্তিত্ব কোথায় ? রবি প্রাণশক্তি দান করেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মকুণ্ডলীর বিনিময়যোগ ও সহাবস্থান-সম্বন্ধগুলি অপূর্ব্ব । শুক্রের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাম রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পৃথিবীকে উপভোগ করে, কিন্তু তারও ধরা-ছোঁওয়ার বাহিরে ইন্দ্রিয়াতীত যে দ্যুলোক রহিয়াছে, প্রজ্ঞামন্ত্রে দীক্ষাদাতা বৃহস্পতির দীক্ষায় এই পৃথিবীর মানুষ সেই লোকের সন্ধান পায় ভাবদৃষ্টিতে ; সাধক সেই করুণা প্রভাবে সমাহিত হয় অন্তর্দেবতার সঙ্গে ; কবিকে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের ভাবলোকের সন্ধান দেয় বৃহস্পতি । মনোজগতের কর্ত্তা চন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলোকের কর্ত্তা বৃহস্পতির ক্ষেত্র-বিনিময় যোগে ইহা হইয়াছে : পঞ্চমভাব মনোজগৎ আর লগ্নভাব দেহ-জগৎ,—প্রাণ ও আত্মা । তার উপর পড়িয়াছে গুরুর স্নেহদৃষ্টি । অমৃতের ভাণ্ড এই মনোজগতে চন্দ্রেই লুক্কায়িত আছে ; চন্দ্রের সঙ্গেই পার্থিব জীবের বিরাট সম্পর্ক ; চন্দ্রই সুখ ও দুঃখের অনুভূতি দান করেন ; মন আছে বলিয়াই রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু আমাদের অভিভূত বা বিচলিত করে ; মনের বহিঃক্রিয়ায়ই চলিতেছে জগতের লীলা ; চন্দ্রই মায়া, মমতা, মাতা, মায়া ও মহামায়া । এই মহামায়ার গভীরতম গুহাহৃদি-মধ্যে সংসার-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত দেবতাদের অমৃত লুক্কায়িত ; চন্দ্রের বহিঃস্তরগুলি ভেদ করিয়া পার্থিব অনুভূতির বাহিরে যাইতে হইলে চাই দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্র । আত্মান্বেষী সাধক যাঁহারা, তাঁহারাই এই মন্ত্রের সাধনায় সংসার-মোহ ত্যাগ করেন ; কবি যাঁহারা, ভাবুক যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে গুরুর প্রভাব অলক্ষিতে কাজ করে ; স্বপ্নাবেশে তাঁহাদের এক ভাবরাজ্যে লইয়া যায় ; শুক্র ও গুরু ; তাঁহার বিচরণ-পরিধি পার্থিব আনন্দের মধ্যে টানিয়া আনে ভাবলোকের মানুষকে । চন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রভাবে রবীন্দ্র এই শক্তির অধিকারী হইয়াছেন ; ইহা তাঁহাকে ঋষিত্ব দান করিয়াছে । সহস্র বন্ধন মাঝে তিনি মুক্তির আলো দেখিয়াছেন ; অজানার নূপুরধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন ; কবির পাশে বসিয়া জ্ঞানাতীত পরমপ্রিয় বীণাধ্বনিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে ; কবি জীবন-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । দ্বিতীয়ে বাক্‌স্থানে রবি, বুধ ও শুক্রের মিলনে তেজোদ্দীপ্ত সুরলহরী তাঁহার কণ্ঠকে করিয়াছে মহীয়ান্ ; সহজাত শক্তি তাঁহাকে গুরুর আসনে বসাইয়াছে : তাঁহার বাক্‌বিভূতি ও রচনাশৈলী বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছে ; দ্বিতীয়, চতুর্থ ও দশমের গ্রহ-সন্নিবেশ পার্থিব-পরিধিতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে ; জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণ ঐ ভাবগুলিই বিচারে পাওয়া যায় ।

সব চেয়ে বড় রহস্য রবীন্দ্রনাথের গতানুগতিক শিক্ষাধারার বৈচিত্র্য ; দশাবিচারে দেখা যায়, বুধ, কেতু ও শুক্রের পর পর দশাগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধাদানকারী বন্ধনধর্ম্মী সকল শিক্ষায়ই ব্যর্থতা আনিয়াছে ; ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রহ দশাপতি হিসাবে দোষযুক্ত । কিন্তু তাঁহার দীপ্ত প্রতিভাকে ইহা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই ; যোগজ ফলই প্রধান হইয়া তাঁহার অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করিয়াছে ; সেই রশ্মিজাল কেতু ও শুক্রের দশাকালেই দশ দিশি সমুজ্জ্বল করিয়াছে । ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাবে যে অঙ্গের রোগ নির্দ্দেশ করে, ঐ ভাবদ্বয় ও ভাবপতি গ্রহপীড়িত থাকায় শনির প্রভাবেই তাঁহার পার্থিবলীলা শেষ হইয়াছে । তাঁহার কোষ্ঠীতে বহু সৌভাগ্যযোগ রহিয়াছে :

সূর্য্যাহ্ণভচরো বহুভৃত্যধনো বন্ধুনামাশ্রয়ঃ ।
নৃপপূজ্যো ভুনক্তি ভোগান্ ভার্জ্জাম ।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্র

(অপ্রকাশিত)

[ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সহিত শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা যে কত গভীর ছিল এই পত্রখানি তাহার প্রমাণ। উভয়ের মধ্যেই বাঙালা তথা বাঙালীকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ রাজনারায়ণের পরামর্শ ও উপদেশের উপর নির্ভর করিতেন। বরোদার তৎকালীন গায়কোয়াড় বাঙালীদের সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহার পরিচয়ও এই পত্রে মিলিবে।]

হিজ হাইনেস দি গায়কোয়াস' ক্যাম্প
নীলগিরি
১২ই জুন, ১৮৯০

প্রিয় দাদু,

গত ছয় মাস আমার নিকট হইতে কোনও পত্রাদি না পাইয়া আপনি নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমার সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নাই, কিন্তু আমার কলমের হইয়াছিল কুম্ভকর্ণের নিদ্রা—অসংখ্য পত্রাঘাত, কর্ত্তব্য বা বিবেকের আহ্বান কিছুই এ নিদ্রা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আমার পত্রলেখার ব্যাপারে নীরবতা ঘটে এবং সাধারণতঃ কিছুকাল অনভ্যস্ত কার্য্যকলাপের পরেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বিবেক যাহা করিতে পারে নাই, নীলগিরির শীত ও ঠাণ্ডা বাতাস তাহা করিয়াছে। বিশেষ প্রেরণাদায়ক না হইলেও মন্দের ভাল—আমি নূতন করিয়া পত্র লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার লিখিবার প্রেরণা ও শক্তি ফিরিয়া পাইলেও গায়কোয়াড় আমাকে সময় দিবেন না। সকালে তাঁহার বাংলোয় কাজ করিতে হইবে, অপরাহ্নে নিজের পড়াশুনা, অজীর্ণ ও উদরাময়ের জন্য বাধ্য হইয়া সন্ধ্যায় ছয় হইতে আট মাইল ভ্রমণ এবং রাত্রিতে এত বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়ি যে, খাইয়াই শুইয়া পড়িতে হয়। যদিও এখন গায়কোয়াড়ের প্রয়োজনেই এই পত্র লিখিতেছি, তবুও আমি এর মধ্যে আধ ঘণ্টা আন্দাজ সময় লইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিব।

আপনার নিকট একটি বিষয় জানিতে চাহি। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কি প্রধান মন্ত্রীর পদ লইয়া বরোদা আসিতে রাজী হইবেন? যদি তিনি রাজী না হন তাহা হইলে প্রয়োজনীয় শক্তি, দেশভক্তি, সততা ও রাজনীতিজ্ঞান-সম্পন্ন কোনও ব্যক্তির নাম আপনার জানা আছে কি? শ্রীযুক্ত দত্তকে আমরা কেন চাই, তাহা দুই-এক দিনের মধ্যেই জানাইব। কারণ জানাইতে হইলে বরোদার সাম্প্রতিক ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ দিতে হয়। কিন্তু তাহা এই সংক্ষিপ্ত পত্রে কুলাইবে না। তবে এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গায়কোয়াড় কতকগুলি বড় বড় ও সুদূর-প্রসারী সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন এবং হয়ত রেসিডেন্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা কার্য্যকরী করিতে হইবে। সেইজন্য এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি সকল বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া কাজ চালাইতে সক্ষম হইবেন। আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষের প্রয়োজন, যিনি মহান ও সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গায়কোয়াড়কে সাহায্য করিতে পারিবেন, যিনি ধীর ও অটল ভাবে রেসিডেন্টের বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার মত শক্তিসম্পন্ন হইবেন, যিনি বড় বড় পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন ও কার্য্যকরী করিবার উপযোগী উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রগতিবাদী রাজনীতিজ্ঞ হইবেন এবং যিনি রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ নিবারণে গায়কোয়াড়কে সাহায্য করিতে পারিবার জন্য তীক্ষ্ণ কূটনীতিজ্ঞ হইবেন। ইহা ছাড়া তাঁহার লেখাপড়ার কাজে বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার; কারণ রেসিডেন্টের সহিত লেখালেখি করা সহজ কাজ নয়। আমাদের মনে হয় শ্রীদত্ত এইরূপ একজন লোক, অন্ততঃ পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁহার ভিতরেই এই সব গুণ সর্ব্বাধিক মাত্রায় আছে। একমাত্র অসুবিধা এই যে, তিনি বৃটিশ সার্ভিসের লোক। কিন্তু তিনি যদি আসা স্থির করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বৃটিশ সরকারের নিন্দা-প্রশংসার ধার ধারিবেন না, সাহসের সহিত গায়কোয়াড়ের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। মহারাজা তাঁহাকে প্রথমে মাসে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি যদি বৃটিশ সার্ভিস ত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে অনুরূপ পেন্সন দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হয়—আমার মনে হয় ইহা ঠিকই—যে, শ্রীযুত দত্তের মত ব্যক্তি বরোদার দেওয়ানের অসুবিধাজনক পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার খ্যাতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও স্বদেশ-ত্যাগ করিতে হয়ত রাজী হইবেন না। আমরা কয়েকজনে স্থির করিয়াছি যে, বরোদাকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নত করিয়া ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত করিব—ইহা আমাদের জীবনপণ সঙ্কল্প। এই কার্য্য সাধনের জন্য আমার বর্ণনামত একজন দেওয়ান দরকার—তা তিনি বোম্বাই হইতেই আসুন আর পঞ্জাব, মাদ্রাজ বা বাংলা হইতেই আসুন; কিন্তু আধুনিক ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা মহান রাজনৈতিক প্রচেষ্টার গৌরব বাংলা অর্জ্জন করুক ইহাই আমার কাম্য। বোম্বাই-এ একমাত্র জাষ্টিস রানাড়ে আছেন। কিন্তু তিনি চান সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে; গায়কোয়াড়কে তাঁহার হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু রাজ্য ও পূর্ব্বপুরুষের ঐতিহ্যের দিকে চাহিয়া গায়কোয়াড় তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না। মহীশূরে

দুই-একজন আছেন, কিন্তু গায়কোয়াড়ের বাংলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে এবং যোগ্য লোক পাইলে তিনি বাঙ্গালী দেওয়ানের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। এইজন্য তাঁহার কথামত আমি আপনাকে বেসরকারীভাবে পত্র দিয়া জানিতে চাই যে, শ্রীযুত দত্ত আসিতে রাজী হইবেন কি না। বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। এই পত্রের প্রতিটি শব্দকে গোপনীয় বলিয়া মনে করিবেন। সংবাদপত্রে যেন এ বিষয়ে কিছুই প্রকাশ না পায়। কারণ, বরোদায় যদি জানাজানি হইয়া যায় যে, গায়কোয়াড় একজন নূতন দেওয়ান খুঁজিতেছেন এবং তাও আবার বাংলা হইতে—তাহা হইলে অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে এবং তাঁহার নিকট আমার যে মূল্য আছে তাহা নষ্ট হইবে। আপনি যদি শ্রীযুত দত্তকে পত্র লেখা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই লিখিবেন এবং তাঁহাকে ইহা গোপন রাখিতে বলিবেন।

শ্রীযুত দত্ত আসিতে চাহিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে দৈবাৎ তিনি যদি রাজী হইয়া যান এই আশায় লিখিতেছি। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, অর্থাৎ তিনি যদি না আসেন তাহা হইলে এমন কোন বাঙ্গালীর নাম কি আপনি করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি যাঁহার মধ্যে আছে। তাঁহার একটু খ্যাতি থাকা দরকার, কারণ রেসিডেন্সীকে টেক্কা দিতে হইবে। যদি তাও না থাকে, তবে খ্যাতি ছাড়া অন্যান্য সকল গুণের অধিকারী ব্যক্তি হইলেও চলিবে। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের মত লোক হইলে চলিবে না। কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকিলেই হইবে না, খাঁটি লোক হওয়া দরকার। এ বিষয়ে এখন আর কোনও কথা নয়।

সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবেন এবং সরোকে বলিবেন যে, ইচ্ছার চেয়ে ক্ষমতার অভাবেই আমি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই এবং এই অবিবেকী আচরণের জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। যদি আমি সময় পাই তবে আমি তাহাকে, যোগীন মামাকে ও মনুকে চিঠি লিখিব। তাড়াতাড়ি চিঠি লেখার জন্য মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের নাতি
অরবিন্দ ঘোষ

মেজর জেমস রেনেল-এর পত্র

(বাঙলায় অপ্রকাশিত)

[মুর্শিদাবাদস্থ কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভিন্যুর অফিসের পুরানো নথি-পত্রের মধ্যে মেজর রেনেলের একটি চিঠি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯১০ সালে সেই চিঠির সূত্র ধরে অনুসন্ধানের ফলে তাঁর আরও দু'খানি চিঠি খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ চিঠি দু'টি ১৭৭১ সালের তদানীন্তন কন্ট্রোলার কাউন্সিল অব রেভিন্যুর প্রধান কর্মকর্তাকে লিখিত। এই পত্রে তৎকালীন ফকির সম্প্রদায় সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটিত আছে।]

স্যামুয়েল মিডিলটন,
প্রধান কর্মকর্তা,
রাজস্ব হিসাব পরীক্ষা অফিস,
মুর্শিদাবাদ

বেলুচি,
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১

মহাশয়,

একটা সংবাদ আপনাকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করি এই যে, দেশের এই অংশে এক বিরাট ফকির সম্প্রদায় বিভিন্ন সহর হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। গত কাল তাহারা এ স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে লুচিনপুরে গিয়াছিল এবং গঙ্গা দারোগার নিকট হইতে দু'শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পুচারিয়া জেলা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য যে কর্মচারীকে পাঠাই তাহার হিসাব হইতে অনুমান হয় ফকির দলে সংখ্যায় প্রায় এক সহস্র জন এবং তাহারা উপযুক্তরূপে অস্ত্র-সজ্জিত। তাহারা পশ্চিম প্রদেশাগত এবং দিনাজপুর ও গোরাঘাটের অভিযান তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে।

যেহেতু এ অঞ্চলে কোন সেনাবাহিনী নাই সেহেতু তাহারা সমস্ত প্রধান সহর লুণ্ঠন না করা পর্যন্ত অভিযান চালাইয়া যাইবে। তাহাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি এবং আমার ধারণা উহারা রাজসাহী ও গোরাঘাট অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আপনি যাহাতে এই সব দুষ্কর্মাদের বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠাইতে পারেন সেই আশায় এই চিঠির সঙ্গে এ অঞ্চলের রাস্তাঘাটের এক খসড়া মানচিত্র পাঠাইতেছি। এই স্থানটি নদ নদী ও নালা দ্বারা এমন ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড যে বন্দুকধারীদের চলাচল নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হইবে না।

ভবদীয়
ইতি
জেমস রেনেল।

শ্রীগঞ্জ
১লা মার্চ, ১৭৭১

মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৪ তারিখ হইতে আমি লেঃ টেলর-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছি এবং হোয়া নাহ জেলা অভিমুখে পশ্চাদপসরণকারী ফকির দলের পথ অনুসরণ করিতেছি। তাহারা যে অসুস্থ হইতেছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। রংপুর সেনাদলের অধিনায়ক লেঃ ফুলথাম গোরাঘাট ও গোবিনগঞ্জ-এর রাস্তা ধরিয়া অসতর্ক ভাবে তাহাদের তাঁবু আক্রমণ করেন এবং গত ২৫শে তারিখে প্রাতঃকালে বেশ একটি খণ্ডযুদ্ধের পর তাহাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন। তাঁবুর সমস্ত জিনিস-পত্তর হস্তগত হইয়াছে এবং তাহাদের কয়েক জনও উপস্থিত আমাদের হাতে বন্দী। ফকির দলের নেতা অশ্বারোহণে মস্তানগড়ে পালাইয়া গিয়া তাহার দলের ১৫ শত নিরস্ত্র ও আহত সহচরদের সহিত মিলিত হইয়াছে। বাকী আড়াই হাজার সহচরদের এরূপ ভাবে ছত্রভঙ্গ করা হইয়াছে যে, তাহারা কোথাও দুই জন একত্র হইতে পারে নাই। এ অবস্থায় সেনা লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ অসম্ভব। তাহারা পলায়নমুখে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে এবং গ্রামবাসী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেকে নিহত হয়।

দলপতিকে ধরিবার জন্য আমি মাস্তান গমন করিয়াছিলাম এবং স্থানটি শূন্য দেখি। পরে খবর পাইলাম যে, সে অল্পসংখ্যক সহচর লইয়া পূর্ণিয়ার দিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই কারণে আমি জিমতদারকে চার-পাঁচ দিনের জন্য তাহার পথ অনুসরণ করিবার নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জিমতদার সাফল্যলাভ করিবে। কারণ রোগগ্রস্ত মুন জেনোর পক্ষে অত দ্রুত গমন সম্ভব নয়।

অভিযানের পথে যে সমস্ত রসদ আমরা পাইয়াছি তাহা লে: ফুল্থাম অধিকৃত জিনিসগুলির সহিত মুর্শিদাবাদে পাঠানো হইবে। এই জিনিসগুলিতে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ফকিরগণের পুনরায় সংঘবদ্ধ হইয়া দুষ্কর্ম করার আশংকা থাকায় আমি লে: টেলরকে এইখানে ৪৫ জন সিপাই লইয়া থাকিবার নির্দেশ দিয়াছি। আমার সেনাদল এই বাহিনী এবং জিমতদারের বাহিনী লইয়াই গঠিত। অপর বাহিনী আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী ৪ দিন ছুটিভোগের পর সহরে ফিরিবে।

দিনাজপুর এবং পুর্ণিয়ার তত্ত্বাবধায়ককে এ বিষয়ে জানাইয়া পত্র দিয়াছি যাহাতে তাহারা এই প্রদেশের মধ্য দিয়া পলায়নপর যে কোন দলকে বাধা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যেহেতু মুন জেন মোরামপুরের অধিবাসী, আমার ধারণা, সে এই দেশেই ফিরিবার চেষ্টা করিবে।

লে: ফুল্থামের অধীন সিপাইদের সহিত মি: গ্রোসের অসদ্ভাব হওয়ায় আমি ঐ কর্মচারীকে রংপুরে ফিরিবার নির্দেশ দিয়াছি।

এই সঙ্গে লে: ফুল্থামের ব্যবহারের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তাঁহার সাহসিকতা ও দৃঢ়তা এই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ; সুতরাং সেনা পরিচালনা ক্ষমতা লে: টেলর-এর উপর ন্যস্ত করিয়া আমি আমার পূর্ব কর্মে ফিরিয়া যাইতেছি।

মস্তানগড়ের পাহাড় অঞ্চল এবং দীঘিটি পরীক্ষা করিয়া আমি কর্তব্যবোধে জানাইতেছি, এ স্থানটি স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং যে কোন সময় যে কোন শক্তিশালী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। কারণ পাহাড় অঞ্চল দুর্গম—ঘন জঙ্গলবেষ্টিত এবং ফকিরদের দিকে একটি নৌবন্দর আছে। দীঘিটি ফকিরদের দলবদ্ধ হইবার গোপন ঘাঁটি এবং ডিসেম্বর মাসে এইখানে যে মেলা হয় তাহাতে ইহারা সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে এবং পরে ২ সহস্র ফকির দলবদ্ধ ভাবে বাহির হয়। গত বৎসর প্রধানত: এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল।

ভবদীয়
জেমস রেনেল

[এই চিঠিখানি প্রধান কর্মকর্তা বোর্ডের সভায় ৭ই মার্চ, ১৭৭১ সালে পেশ করেন।]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৪শে মে তারিখের পত্রে আপনার প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আপনি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন আর সেই সঙ্গে গীতাপাঠের ইংরাজী অনুবাদ যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম। গীতা পাঠের গোড়ার অংশের অনুবাদটি মোটের উপর আমার খুব ভাল লাগিয়াছে কিন্তু তাহা একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া যদি কোন এক বা একাধিক স্থান পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিবার আবশ্যক মনে হয়, তবে উহাকে সেইরূপ করিয়া গড়িয়া প্রস্তুত করিয়া আগে আপনার দৃষ্টি জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি ; ইহা করিতে যদি একটু বিলম্ব হয় তবে মার্জ্জনা করিবেন।

সাংখ্যকারিকা প্রভৃতি প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে সাংখ্যদর্শনের সমগ্র মতটা যেরূপ পরিপাটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া দাঁড় করানো হইয়াছে তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে, (bonafide) কাপিল সাংখ্য একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটি বিনা তর্কে শিরোধার্য্য করিয়া আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, গীতার সাংখ্য, কাপিল সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য—এ তিনের ভিতর বিশেষ কোন রকম মতভেদ নাই। এইটিই এখানে সবিশেষ বিবেচ্য যে, কপিল মুনি একথা বলেন নাই যে "ঈশ্বর নাই," বলিয়াছেন কেবল—"ঈশ্বর অসিদ্ধ" অর্থাৎ কোন প্রকার প্রমাণের গম্য নহেন।

সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রেত নিরীশ্বর শব্দের অর্থ যদি হইত—ঈশ্বর নাই, তাহা হইলে এইরূপ বলা শোভা পাইত যে কাপিল সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য পরস্পরের-বিরোধী। একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যদি বলেন যে, Gravitation এর মূলে Electricity'র কার্য্যকারিতা আছে, আর একজন যদি বলেন যে, তাহা যে আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে শুদ্ধ এই বাদাবাদের উপর ভর করিয়া এ কথা বলা উচিত হয় না যে, উভয়ের মত পরস্পরের বিরোধী, তেমনি পাতঞ্জলি বলিতেছেন, "প্রকৃতির মূলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে" এবং কপিল বলিতেছেন যে, "তাহার কোন প্রমাণ নাই।" শুদ্ধ কেবল এই দুটা কথার উপর ভর করিয়া বলা উচিত হয় না যে, কাপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল সাংখ্য পরস্পরের বিরোধী ; কেন না প্রকৃতি-পুরুষ এবং উভয়ের মধ্যগত সংযোগ-বিয়োগ জনিত ভোগ-মুক্তি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই কাপিল সাংখ্যের ও পাতঞ্জল সাংখ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ মিল রহিয়াছে, কেবল পাতঞ্জল সাংখ্যে প্রকৃতির মূলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের কথাটি অধিকন্তু জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

আমি বলিতে চাই যে, এই মর্ত্ত্য জীবনেই যাহাতে অস্থায়ী ক্ষণিক সুখ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সাধক মুক্তির অর্থাৎ Perfect freedom-এর রাজ্যে উত্থিত হইয়া সদানন্দ চিত্তে অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন তাহাই আমাদের দেশীয় সকল দর্শনশাস্ত্রের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। তাহার মধ্যে পাতঞ্জল শাস্ত্রের প্রণালী একরূপ, কাপিল সাংখ্যের প্রণালী একরূপ এবং শাঙ্কর বেদান্তের প্রণালী একরূপ—তিন প্রণালী তিন রূপ। ঐ তিন প্রণালীর মধ্যে Form-এর প্রভেদ ভিন্ন মর্ম্মান্তিক কোন প্রকার ভেদ আমি স্বীকার করি না। এ বিষয়ে গীতার সহিত আমি একবাক্য। গীতাকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বালকেরাই সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে প্রভেদ দেখে। সাংখ্য মতে প্রকৃতিকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলেই প্রকৃতিজাত ক্ষণিক সুখদুঃখের প্রতি সাধকের বিতৃষ্ণা জন্মে—বিতৃষ্ণা জন্মিলেই সাধক প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করেন আর সেই সঙ্গে জ্ঞানে বুঝিতে পারেন যে, "আমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র"—তাহা হইলে সাধকের মনোবৃত্তি বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর সেই গতিকে সাধক ক্ষণিক সুখ-দুঃখের আক্রমণ হইতে মুক্তি

মাত্র করিয়া—স্বাধীনতায় অটল শান্তি অন্তরে অনুভব করিয়া—সদানন্দ ভাব ধারণ করেন। যোগশাস্ত্র বলেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সাধক জীবন-মুক্তি লাভ করেন। সাংখ্য এবং যোগ উভয়েরই মতে চিত্তবৃত্তিকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই সাধকের পরমপুরুষার্থ। সাংখ্য বলিতেছে প্রকৃতিকে ভাল করে জানা চাই—প্রকৃতিকে ভালরূপে জানিলেই তাহার উপর বিরাগ উপস্থিত হইবে; যোগশাস্ত্রও অবিকল তাহাই বলে এবং সেই সঙ্গে অধিকন্তু বলে যে, তাহার (অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানলাভের) প্রধান উপায় ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরেতে ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম সমর্পণ করিলে সাধক অনাসক্ত, অপরাজিত এবং সদানন্দ চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য সকল বিধিমতে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন; এবং তাহারই নাম জীবন-মুক্তি। মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্য—কপিল সাংখ্য, এবং যোগ—পাতঞ্জল যোগ। কিন্তু সাংখ্য এবং যোগ উভয়েরই গোড়ার উপাদান (মাল-মসলা) উপনিষদের মধ্যে ছড়ানো রহিয়াছে; এই উপনিষদের সাংখ্য ছাড়া মূল কাপিল সাংখ্য যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। শাঙ্কর বেদান্ত এবং কাপিল সাংখ্যের মধ্যে প্রভেদ যে কিরূপ তাহা ভগবদ্ গীতার ১৮ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে শাঙ্কর ভাষ্যে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এইরূপ—

মূল শ্লোক

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবৎ শৃণু তান্যপি।

শাঙ্কর ভাষ্য

প্রোচ্যতে—কথ্যতে; গুণসংখ্যানে—কাপিল শাস্ত্রে।
তদপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রং গুণভোক্তৃ বিষয়ে
প্রমাণং এব—পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যেত।

ইহার বাংলা

গুণসংখ্যান কিনা কাপিল শাস্ত্র গুণভোক্তৃ বিষয়েই প্রমাণ—কেবল পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে তাহার প্রমাণ বিরুদ্ধ। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবহারত (অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে) পুরুষ যে ত্রিগুণাত্মক ভোক্তা এ বিষয়ে শঙ্কর এবং কাপিলের মধ্যে মূলেই মতভেদ নাই। মতভেদ কেবল এইখানটিতে যে, সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর হইতে সমূলে স্বতন্ত্র, শাঙ্কর বেদান্তের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পরমার্থতঃ (inreality) প্রভেদ নাই, যেহেতু পরমার্থতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা। বেদান্তের মতে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একই; সুতরাং বেদান্তশাস্ত্রের মতানুসারে সাধক যদি শমদমাদি দ্বারা চিত্ত শোধন করিয়া জীবেশ্বরের ঐক্য সম্যক্‌জ্ঞানে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন, আর সেই শুভযোগে সাধকের আত্মা পরমাত্মাতে অথবা, যাহা একই কথা, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই চরম অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য বলি যে, শাঙ্কর বেদান্ত পাতঞ্জল সাংখ্যের শত্রু নহে পরন্তু পরম সহায়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পাতঞ্জল সাংখ্য কাপিল সাংখ্যের পরম সহায়, এক্ষণে দেখাইলাম শাঙ্কর বেদান্ত পাতঞ্জলের পরম সহায়। সাংখ্য এবং বেদান্তের মর্ম্মস্থানীয় ঐক্যের সহিত আমি যে ঝিনুকের উপমা দিয়া তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য এইরূপ—একটা ঝিনুককে যদি দ্রষ্টা সম্মুখে টেবিলের উপরে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার উপরে খোলাটার concave পৃষ্ঠ নীচে পড়ে এবং নীচের খোলাটার concave পৃষ্ঠ উপরে পড়ে; এই অর্থে ঝিনুকের দুই কপাট পরস্পরের বিপরীতমুখী। একই ঝিনুকের দুই কপাট যেমন পরস্পরের বিপরীতমুখী, তেমনি বলা যাইতে পারে যে, একই সত্যের subjective side এবং objective side পরস্পরের বিপরীতমুখী। সাংখ্য যাহাকে objective ভাবে দেখিয়া প্রকৃতি বলেন, বেদান্ত তাহাকেই subjective ভাবে দেখিয়া ঐশীশক্তি বলেন; কাজেই আমি দুইয়ের মধ্যে—কেবল পর্য্যালোকের দৃষ্টিভেদ ছাড়া আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। ফল কথা এই যে, আমাদের দেশের দার্শনিক ইতিহাসকে শুদ্ধ কেবল ইতিহাস ভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে এক প্রকার অনধিকার চর্চ্চা। এই জটিল পুরাতন পথের খ্যাতনামা অনুসন্ধানকর্ত্তারা কেবল দুই-চারিটি ঐতিহাসিক milestone অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং শুদ্ধ কেবল তাহারই উপর ভর করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাহা স্থির করিয়াছেন—আমার মনে হয় যে, তাহার অধিকাংশই অন্ধকারে ঢ্যালা নিক্ষেপ। যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের পণ্ডিত মহলে সর্ব্ববাদিসম্মত সেই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত-গুলিকেই আমি আমার আলোচনা ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছি—অন্য সকল অন্ধকেরে ইতিহাস-তত্ত্বকে আমি প্রশ্রয় দিতে নিতান্তই নারাজ। আমার 'গীতাপাঠ' পুস্তকে প্রধান একটি সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্বকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—সেটি হচ্ছে ত্রিগুণ-তত্ত্ব। Conservation and transformation of forces যেমন Physical science-এর সর্ব্বপ্রধান গোড়ার তত্ত্ব, আমি তেমনি মনে করি যে, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্য্যদিগের আবিষ্কৃত ত্রিগুণ-তত্ত্ব Physical এবং metaphysical সমস্ত Science এরই গোড়ার তত্ত্ব। এবং সেই গোড়ার তত্ত্বটি আমাদের দেশের সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত। আমার গীতাপাঠ প্রবন্ধে আমাদের দেশের এই পুরাতন বহুমূল্য আবিষ্কারটিকে লোকের চক্ষে বিধিমত ফুটাইয়া তোলা আমি সব চেয়ে বেশী আবশ্যক মনে করিয়া তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি বিবরণ যাহার অধিকাংশই বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের স্ব স্ব কপোলকল্পিত—সে সকল অন্ধকেরে বিষয়গুলিকে আমি মূলেই ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করি নাই—সাহসও করি না।

আমার শরীর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অপটু হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ চক্ষু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; তাহা হইবারই কথা—যেহেতু আমার বয়স বিগত ফাল্গুন মাসে ৮২তে পদনিক্ষেপ করিয়াছে। আমার সাহায্যে আপনি যেরূপ সদয়ভাবে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে রাশি রাশি ধন্যবাদ দিয়া এইখানেই আজিকার মত ক্ষান্ত হইলাম।

গুণানুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অটোগ্রাফ্

(অপ্রকাশিত)

[শ্রীমতী সুধীরা বসু সংগৃহীত]

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ
জীবনের গিয়েছে গৌরব
এখন যা কিছু সব ফাঁকি
মরিতে ঝরিতে সব বাকী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৬০, —শিশিরকুমার ভাদুড়ী

খাতায় তোমার লিখব কি যে ভাবছি আমি তাই—
সত্যি এবং মিষ্টি কথা, দুই যে হওয়া চাই!
নয় ত', শুধু এক লাইনে একটি ছোট কথা,
থাক্‌বে তাতে যেম্‌নি সে জ্ঞান তেম্‌নি গভীরতা!
দেখ, তোমার মোহিত কাকা নেহাৎ বোকা মানুষ
চিরটা কাল কাটিয়ে দিলে উড়িয়ে ভাবের ফানুস।
এমন লোকের কোন্ কথাটা লাগ্‌বে তোমার কাজে—
কি উপদেশ দেবো তোমায়? দেওয়া আমার সাজে?
তবু আমার একটি আশা, একটি যে সাধ হয়—
বলব শুধু তোমার কাণে, আর কাউকে নয়।

সদ্য-ফোটা কুঁড়ির মত এই যে তোমার প্রাণ
কান্না-হাসির শিশির-আলোয় এমন কম্পমান,
একটুখানি চিহ্ন কোথাও নেই ক' ধূলিকণার,
বুদ্ধিটুকু—শুভ্র ভাতি শরৎ-জ্যোছনার,—
এ সব দেখে একটি কথাই তাই ত ভাবি আমি,
সেই কথাটাই আমার মনে সবার চেয়ে দামী—
প্রাণের তোমার বয়স না হয়, মনের বয়স হোক্,
তোমার তরেই এই যে আমার আশীর্ব্বাদী শ্লোক।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৫ —শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জগৎ সুখী হউক!

৩০শে চৈত্র, ১৩৩৫ —শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আশীর্ব্বাদ

And unto thee the heavenly Gods make flow
Whate'er of happiness thy mind forecast,
Husband and home and spirit-union fast!
Since nought is lovelier on the earth than this,
When in the house one-minded to the last
Dwell man and wife—a pain to foes, I wis,
And joy to friends—but most themselves know
their own bliss.

(—Odyssey, VI, 11. 180-185
Trans by P. S, Worsley)
Suniti Kumar Chatterji
13th. April, 1929

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩০শে চৈত্র, ১৩৩৫

ভালবাসাই মূল্যবান।

২২শে কার্ত্তিক ১৩৫৬ —"বনফুল"

মানুষের জীবনের আনন্দের অনেকখানিই আশা, কল্পনা, স্বপ্ন, চিন্তা দিয়ে গড়া। এ সব সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে পড়াশুনার প্রয়োজন হয়। গভীর ভাবে পড়াশুনা নানা বিষয়ে। নানা দেশের চিন্তাশীল, কল্পনা-কুশল মনের কোন না কোন দিনের আনন্দ-মুহূর্ত্তের কাহিনী লেখা আছে তাঁদের লেখা বইয়ের পাতায়। আমাদের মনে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অনাস্বাদিত কল্পনায় আশার ঢেউ তুলে দিতে পারে এ শক্তি ও সব লেখার ভেতরে আছে। একটা মশালের আলো থেকে আর একটা মশাল জ্বালা। আনন্দের এ অবস্থা যে উপকরণের উপর নির্ভর করে না, এটাই জানতে হবে প্রথম। এই শিক্ষাটা জীবনের প্রবেশদ্বারের বড় ছাড়পত্র। সামান্য সামান্য জিনিষ থেকে আমাদের মনে গভীর আনন্দ আসবার পথ উন্মুক্ত আছে সব সময়। পরিপূর্ণ মানসিক অবস্থা বুঝে আত্মার একটি বাতায়নদ্বার—যা দিয়ে বৃহত্তর জীবনের ঐশ্বর্য্য আমাদের লাভ হয়।

বদ্ধতাই পাপ, বদ্ধতাই মৃত্যু। তাকে বর্জ্জন করতে শিখবে।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল।

এই না জীবন, মানব-জীবন,
ফুল-ফোটা ফুল-ঝরা !
সমুখে হাস্য, পিছনে অশ্রু,
শয্যা-শায়িনী জরা !

১৬ই মাঘ, '৩৭, —শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য বাক্য বলবে। ধর্ম্ম আচরণ করবে। বিহিত অধ্যয়ন থেকে ভ্রষ্ট হয়ো না। সুসন্তান-জননী হয়ে বংশধারা উজ্জ্বল করো। সত্য থেকে স্খলিত হয়ো না। ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না। নিজের অধ্যয়ন ও জ্ঞান-চর্চ্চা থেকে বিরত হয়ো না। যা মঙ্গল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সিদ্ধি থেকে পৃথক্ হয়ো না। দেবকার্য্য ও পিতৃপিতামহের সেবা থেকে বিরত হয়ো না। যা নির্দ্দোষ অনিন্দনীয় কর্ম্ম তারই সেবা করবে তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নয়। দান করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, অশ্রদ্ধায় নয়। সুন্দর ভাবে কুণ্ঠার সহিত লজ্জার ও ভয়ের সহিত সচেতন ভাবে দান করবে।

১লা আগষ্ট, ১৯২৯ —চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর তোমার সুন্দর হউক—

১৫।২।৩৬ —প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

জীবনের যাহা তুচ্ছ যাহা অমঙ্গল
রেখে দাও আমাদের তরে সে সকল
আমাদের পুণ্যভাগ আমাদের শুভ
লও সাথে আমাদের যাহা সত্য ধ্রুব !

আশীর্ব্বাদক

২৪শে মাঘ, ১৩৩৫ —শ্রীসুশীলকুমার দে

—তোমায় খাতায় রঙ্গীন পাতায়
রইল আমার একটু লেখা
মনের মেলায় অলস খেলায়
বালুর বেলায় স্মৃতির রেখা !

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ —শ্রীনরেন্দ্র দেব

অনেক কথা বলিয়া শেষে ভাবিয়া দেখি মনে
সত্য যাহা মনের মাঝে কাঁদিছে সঙ্গোপনে।

৭।৩।৫৪, —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে আলোক চলে নভপথ উজ্জ্বলি
তারে ধরে আছে ধরণীর পথধূলি,
এ কি বিস্ময় ! এ কি !
কণিকার হাতে বিরাট বেঁধেছে রাখী !

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৬ —শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মা গো, তোমার স্মরণ-খাতায়
দিইনি আঁচড় যথাকালে,
যৌবনের ফসল পাতায় পাতায়
ফল্‌ত যখন ডালে ডালে।
ক্লান্ত পায়ে সন্ধ্যা নামে
আঁধার দেখি ডাইনে বামে
ভাবনা ওঠে পাকা মাথায়
ছিঁড়তে হবে মায়াজালে
কাট্‌তে আঁচড় তোমার খাতায়
ডাক এল যে হেন কালে।
সেদিন আশার ঢের ভরসার
দিতাম বাণী ছন্দে সুরে,
আজকে বীণার ছিঁড়েছে তার
কান্না বাজে চিত্ত জুড়ে।
যা গেছে তা ফিরবে না রে
মন কাঁদে সেই হাহাকারে—
যারা ছিল খুব আপনার
গেছে—কেউ বা যাচ্ছে দূরে।
মা গো, তোমার স্মরণ-খাতার
পাতায় লিখি তাই বেসুরে॥

৮।৩।৫৪ —শ্রীসজনীকান্ত দাস

আজি যারা তব প্রীতি-মূল
যদি কোন দিন বেদনা-বিলীন
আমাতে তাদের ভাঙে ভুল
জেনো জেনো তবে ফিরে এলে
আমার হিয়ার খোলা রবে দ্বার
বুকে তুলে লবো বাহু মেলে।"

১৫।২।৩৬ —শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

স্মের—উপহাস, ঈষদ্‌হাস্য, অল্পহাস্য।
স্যন্দন—ক্ষরণ, স্রব, গলন, রথ, স্রাব, ক্ষরণ।
স্যানা—নিপুণ, প্রাজ্ঞ, চতুর, জ্ঞানবান।
স্যূতি—সূচিকর্ম্ম, সীবন, সন্ততি, সন্তান।
স্রষ্টা—সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, পরমেশ্বর।
স্রোতঃ—জলপ্রবাহ, জলের বেগ।
স্রোতস্বতী—নদী, বেগবতী, সরিৎ।
স্ব—বিত্ত, অর্থ, আত্মসম্পর্কীয়।
স্বকীয়—আত্ম, স্বীয়, আত্মসম্বন্ধীয়।
স্বকর্ম্ম—নিজকার্য্য, আত্মকর্ম্ম, স্বকার্য্য।
স্বগণ—স্বপক্ষ, আত্মীয়, পক্ষপাতী, স্বজন।
স্বগত—আত্মগত, নিজমাত্র, গোপনে।
স্বচ্ছ—নির্ম্মল, পরিষ্কার, শ্বেত, নিষ্কলঙ্ক।
স্বচ্ছপত্র—অভ্র, ধাতু দ্রব্যবিশেষ।
স্বচ্ছল—বিতরণশীল, দাতা, ব্যয়ী।
স্বজাতি—আত্মজাতি, নিজবর্ণ।
স্বজ্ঞান—আত্মবোধ, নিজবোধ, নিজবুদ্ধি।
স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ, পৃথক্, ভিন্ন।
স্বত্ব—দান-বিক্রয়াদির ক্ষমতা, স্বামিত্ব।
স্বদেশী—একদেশস্থ, নিজ দেশজ।
স্বধর্ম্ম—স্বজাতীয় ধর্ম্ম, নিজ ধর্ম্ম, স্বভাব।
স্বনাম—এক নাম, আত্মনাম, নিজনাম।
স্বপ্ন—নিদ্রাকালীন অদ্ভুতানুভব।
স্বভাব—নিসর্গ, স্বরূপ, চরিত্র, ধারা।
স্বয়ং—আপনি, নিজে, আপনা হইতে।
স্বয়ংসিদ্ধ—আত্মগুণে খ্যাত, স্বক্ষমতাসিদ্ধ।
স্বয়ংকৃত—আত্মকৃত, নিজকৃত, স্বরচিত।
স্বয়ম্বরা—স্বমনোনীত বর-বিবাহকারিণী।
স্বয়ম্ভু—যে আপনা হইতে হয়, ব্রহ্মা।
স্বর—সুর, অ আ ইত্যাদি ষোড়শ বর্ণ।
স্বরভঙ্গ—কণ্ঠভঙ্গ, স্বরবদ্ধ, কণ্ঠাবরোধ।
স্বরূপ—তুল্য, সদৃশ, প্রতিনিধি, যাথার্থ্য।
স্বর্গ—স্বর্লোক, পারলৌকিক, সুখস্থান।
স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, হেম, কনক, সোনা।
স্বর্ণকার—স্বর্ণকৃৎ, সেকরা।
স্বল্প—অত্যল্প, কিঞ্চিৎ, যৎকিঞ্চিৎ।
স্বসা—স্বস্, ভগিনী, সহোদরা।
স্বস্তি—মঙ্গল, শুভ, স্বীকার, তথাস্তু।
স্বাক্ষর—স্বহস্তলিপি, নিজহস্তাক্ষর।
স্বাধীন—আত্মবশ, স্বতন্ত্র, স্ববশ, স্বপ্রভু।
স্বাধ্যায়—জপ, অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন।
স্বান্ত—মনঃ, চেতঃ, হৃদয়, মানস।
স্বামী—প্রভু, পতি, কর্ত্তা, অধিকারী।
স্বার্জিত—স্বোপার্জিত, স্বয়ংপ্রাপ্ত, স্বলব্ধ।
স্বার্থ—আত্মকার্য্য, স্বপ্রয়োজন, স্বধন।
স্বাস্থ্য—উপশম, সুস্থতা, প্রতীকার।
স্বীকার—অঙ্গীকার, সম্মতি, প্রতিজ্ঞা।
স্বীয়া—পতিব্রতা, সাধ্বী, স্বকীয়া।
স্বেদ—ঘর্ম্ম, ঘাম, উত্তাপ, ভাপ।
স্বৈরিণী—অসাধ্বী, বেশ্যা, স্বাধীনা।
হওন—উপজন, জন্মান, বর্ত্তন, ঘটন।
হংস—হাঁস, বরট, মরাল।
হংসক—মল, স্ত্রীলোকের পদাভরণ।
হট্ট—হাট, ক্রয়বিক্রয় স্থান, পণ্যবীথিকা।
হট্টবিলাসিনী—বেশ্যা, কুলটা, গণিকা।
হঠ—দৌরাত্ম্য, উপদ্রব, বলাৎকার।
হঠন—হারণ, পরাভূত হওন, পিছন।
হঠাৎ—অকস্মাৎ, দৈবাৎ, সহসা।
হড্ড—হাড়, অস্থি, নীচ, তুচ্ছ, অধম।
হণ্ডিকা—হণ্ডী, হাঁড়ী, পাকপাত্র, স্থালী।
হত—আঘাতে মৃত, নষ্ট, মারা, সংহারিত।
হতপর—অধার্ম্মিক, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট।
হতপ্রায়—মৃতকল্প, নষ্টপ্রায়।
হতভাগ্য—হতভাগা, দুষ্কপালিয়া।
হতাদর—অসম্মান, অবজ্ঞা, অসম্ভ্রম।
হতাশ—ভরসাহীন, নিরাশ্বাস, ভগ্নাশ।
হতিয়ার—হাতিয়ার, হস্তদোহার, অস্ত্র খড়্গাদি।
হত্যা—বধ, অপঘাত, হনন।
হনু—চোয়াল, গণ্ডের অধোভাগ।
হনুমান—কৃষ্ণমুখ বানর, পবননন্দন।
হন্তা—বধকর্ত্তা, ঘাতক, সংহারক, নাশক।
হন্যা—ক্ষিপ্ত কুকুরাদি, কামড়ানিয়া।
হবন—হোম করণ, অগ্নিতে ঘৃতাদি দান।
হবিঃ—ঘৃত, ঘি, আজ্য, হোমের দ্রব্য।
হরি—বিষ্ণুর এক নাম, সিংহ, ঘোটক।
হরিণ—মৃগ, এণ, কুরঙ্গ, শারঙ্গ, ঋষ্য।
হরিণবাটী—কারাগার, বন্দিশালা।
হরিন্মণি—মরকত, অশ্মগর্ভ, চুণি।
হরিৎ—পত্রাদির বন, পলাশ, শাক।
হরিতাল—উপধাতু-বিশেষ, গোদন্ত।

হরিদ্রা—হলুদ, কন্দ বিশেষ, পীতবর্ণ।
হর্ত্তা—হরণকর্ত্তা, চোর, তস্কর, নাশকর্ত্তা।
হর্ত্তাকর্ত্তা—সৃষ্টি এবং প্রলয়কর্ত্তা।
হর্ম্মণ—জৃম্ভন, জৃম্ভা করণ, হাই তোলন।
হর্ম্ম্য—ইষ্টকাদি রচিত গৃহ, অট্টালিকা।
হর্ষ—আনন্দ, আহ্লাদ, প্রমোদ, প্রীতি।
হর্ষবিষাদ—হর্ষাবস্থাতে দুঃখ, সুখে দুঃখ।
হল—লাঙ্গল, 'ক খ গাদি চৌত্রিশ বর্ণ।
হলাহল—কালকূট, বিষ, তীব্র গরল।
হস্ত—কর, পাণি, ভুজ।
হস্তগত—লব্ধ, প্রাপ্ত, আয়ত্ত, বশীভূত।
হস্তিদন্ত—গজবিষাণ, ভিত্তিবদ্ধ, প্রেক।
হস্তিপক—হস্তিপাল, গজরক্ষক, মাহুত।
হস্তী—হাতী, গজ, করী, দ্বিপ, কুঞ্জর।
হাঁক—ডাক, ফুকরা, উচ্চৈঃস্বর, চীৎকার।
হাঁকন—ডাকন, আহ্বান, সম্বোধন।
হাঁচন—ক্ষুৎকরণ, ছিঁকন।
হাঁটু—অষ্ঠীবৎ, জানুর গ্রন্থিস্থান।
হাঁপ—নিশ্বাসের দ্রুতগতি, কষ্টশ্বাস।
হাঁপানি—শ্বাসকাস, রোগবিশেষ।
হাতকড়ি—হস্তশৃঙ্খল, হস্তবন্ধনী, বেড়ী।
হাতা—দর্ব্বী, উড়খী, খন্তাকা, থাবা।
হাতাহাতি—হস্তযুদ্ধ, ধরাধরি, কিলাকিলি।
হাতুড়িয়া—কুচিকিৎসক, মূর্খচিকিৎসক।
হানা—বন্যা, জলপ্লাবন, জলগণ্ড, ক্ষতি।
হানি—অপচয়, ক্ষতি, হ্রাস, নাশ।
হাব—বিলাস, লীলা কামসূচক অঙ্গভঙ্গী।
হাবা—স্থূলবুদ্ধি, অবোধ, জড়প্রায়।
হায়ন—বৎসর, অব্দ, বর্ষ, সম্বৎসর।
হার—স্বর্ণময় মালা, স্রক্, কণ্ঠাভরণ।
হাল—হল, লাঙ্গল, চাস, খেতি।
হালা—সুরা, মদ্য গরল, বিষ, ক্ষার।
হালি—হাইল, নৌকার কর্ণ।
হাস—হাস্য, হাসি, হর্ষজন্য মুখপ্রসার।
হা হতোঽস্মি—খেদোক্তি, হাহাকার, অত্যন্ত বিষাদ।
হিং—হিঙ্গু, জতুক, ঔষধি দ্রব্যবিশেষ।
হিংসা—অপকার, অনিষ্টচিন্তা, বধ।
হিঁয়ালি—প্রহেলিকা, গূঢ়ার্থক প্রশ্ন।
হিক্কা—হেঁচকী, উদ্গারবিশেষ।
হিঙ্গুলী—বার্ত্তাকী বৃক্ষ, বেগুন।
হিচকন—হিক্কাকরণ, হেঁচকীকরণ।
হিজড়া—নপুংসক, ক্লীব, শণ্ড, পণ্ড।
হিত—মঙ্গল, উপকার, শুভ, প্রিয়।
হিতৈষী—হিতকারী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।
হিতোপদেশ—নীতিশাস্ত্র-বিশেষ।
হিম—নীহার, শিশির, শীত, শীতল।
হিমাগম—শীতকাল, হৈমন্তিক কাল।
হিমানী—হিঁমাল, নীহার, হিমসমূহ।
হিমালয়—হিমাদ্রি, পর্ব্বত-বিশেষ।
হিয়া—হৃদয়, অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন।
হিরণ্ময়—স্বর্ণাত্মক, স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত।
হিল্লোল—তরঙ্গ, জলসংসর্গি বায়ু।
হীন—রহিত, নীচ, তুচ্ছার্থবোধক শব্দ।
হীনাঙ্গ—অঙ্গরহিত, বিকলাঙ্গ, খঞ্জাদি।
হীরক—হীর, হীরা, রত্নবিশেষ।
হুড়ুকা—অর্গল, খিল, দ্বাররোধক দণ্ড।
হুত—হোমে নিযুক্ত, উৎসৃষ্ট, ঘৃতাদি।
হুতাশন—হুতাশ, হুতভুক্, অগ্নি।
হুল—শুণ্ডা, আল, আগা, সূক্ষ্মাগ্র।
হুলস্থুল—গণ্ডগোল, গোলমাল।
হৃৎ—হৃদ, হৃদয়, অন্তঃকরণ, মন, চিত্ত।
হৃদয়ঙ্গম—মনোগত, মর্ম্মগ, সঙ্গত।
হৃদ্য—প্রিয়, বৎসল, মনোরম, মনোজ্ঞ।
হৃষ্টপুষ্ট—স্থূলকায়, মোটা, পীন।
হেঁট—অবনত, নম্রকায়, ঝোঁকা, নামিত।
হেতু—কারণ, বীজ, মূল, নিমিত্ত, জন্য।
হেতুক—নিমিত্তক, জন্যে, মূলক, কারণ।
হেমন্ত—শীতকাল, হিমাগম।
হেলা—অবজ্ঞা, স্বরস্তেচ্ছা, অনায়াস।
হৈমন্তিক—হেমন্তে উৎপন্ন, শীতোদ্ভূত।
হোতা—হোমকর্ত্তা, হোমী, পুরোহিত।
হোলী—ফল্গুৎসব, হোলাকা, দোলযাত্রা।
হ্রদ—বৃহৎ অকৃত্রিম জলাশয়।
হ্রস্ব—অদীর্ঘ, খর্ব্ব, খাট, ক্ষুদ্র, নীচ।
হ্রী—লজ্জা, লাজ, ত্রপা, ব্রীড়া।

সমাপ্ত

গাও নাম

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম
দয়ার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র লেখা
—এস্ বালা (বাঁকুড়া)
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

প্রবাসী বাঙালী

আমার কোলে —মণিকান্ত গুহ (মানভূম)

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ —ব্রহ্মা শর্মা (মুর্শিদাবাদ)

প্রবাসিনী —অর্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

পাঞ্জাবে সরস্বতীপূজা।

—লতিকা সেন (পাঞ্জাব)
(তৃতীয় পুরস্কার)

প্রবাসী বাঙালী

পত্র লেখা

—ক্ষুদিরাম মাইতি (২৪ পরগণা)

প্রবাসযাত্রায় উদয়শঙ্কর —অজিত মিশ্র (বাঁকুড়া)
(প্রথম পুরস্কার)

—প্রতিযোগতা—

বৈশাখ মাস

বিষয়

মুখাকৃতি

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ মাস

বিষয়

যান-বাহন

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে জ্যৈষ্ঠ

●

প্র বা সী বা ঙা লী

জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের রায় বাহাদুর এল, সি, বসু
—স্বপন বসু (মধুপুর)

বিদেশিনী —বিজয় ঘোষ (হাওড়া)
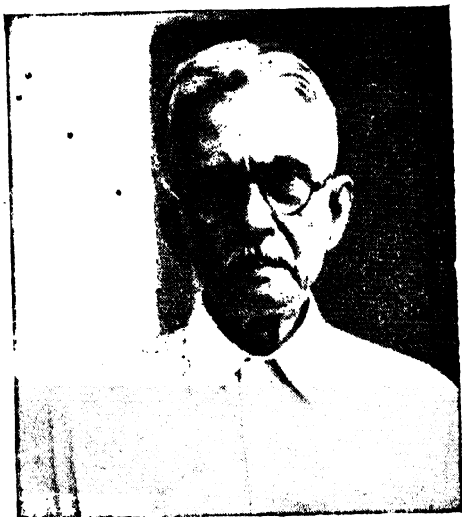
আর্য্য-রাষ্ট্রে উপনিষদের প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়া

শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য

উপনিষদের দর্শন দেহকে বাদ দিয়ে আত্মাকে সার বস্তু বলে ঘোষণা করল। দেহকে বাদ দিতে বললেই তো বাদ দেওয়া যায় না? দার্শনিকেরও খাওয়া-দাওয়ার দরকার আছে। কিছু দিন না খেয়ে থাকলে প্রাণ-জ্ঞান সবই অস্থির হয়ে পড়ে। আবার দেহের পেছনে ছুটলেও ইহাকে মনের মত করে রাখা যায় না। দেহের নাশ একদিন না একদিন হবেই। মানুষ উত্তেজনার বশে মরিয়া হ'তে পারে বটে কিন্তু সে ঠাণ্ডা-মাথায় যখন বিচার করে তখন মৃত্যুর পর বিরাট শূন্যের কথা ভেবে শিউরে না উঠে পারে না। অমর হয়ে থাকার ইচ্ছা মানুষের মনে গাঁথা রয়েছে। মানুষের এ দুর্ব্বলতা স্বভাবের দান। মানুষের দেহ অতি প্রিয় হলেও দেহ নিয়ে সে মজে থাকতে পারে না। দেহটা যেন মেয়ের মত অতি প্রিয় হলেও পরের ঘরে পাঠিয়ে পর করে দিতে হবে। মানুষের এই সসেমিরে অবস্থায় যদি সে শোনে যে সে অমর তাহ'লে সে-কথায় কান পেতে দিতে বাধ্য হয়। জড়বাদ দেহকে যত বড় আসনই দিক না কেন, দেহের সুখের যত-কিছু আসবাব পত্র যোগাড় করে দিক না কেন, তাহলেও মনের মর্মে গাঁথা কাঁটাটি তুলতে পারে না। মরণটাকে নিয়ে যদি একটু ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে ছোট ছেলের ভূতের ভয়ের চেয়ে মৃত্যুর ভয় সাধারণ লোকের কম নয়। মরণের নেশা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে বটে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক মনে হয় না, মরণের ওষুধ নিয়ে যদি কেউ হাঁক্ দেয়, তা পাবার জন্য মানুষের মনে আগ্রহ জন্মান স্বাভাবিক। সাধারণ লোকসমাজে আত্মার কথা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। এ মতটা না নিলে যেন মানুষ সভ্য বলে গণ্যই হয় না। আত্মাকে মেনে নিলে দেহকে তুচ্ছ করে দেখতে হবে। দেহ তো আর আত্মার কিছু নয় বাইরের খোলসের মত। এ থাকলে বা গেলে আত্মার কিছু যায়-আসে না। উপনিষদের যুগে সব মানুষ কি সন্ন্যাসী হয়ে গেল? চাষীরা লাঙ্গল ফেলে ধ্যানে বসেছিল কি? পুরোহিতেরা সোঽহং চিন্তায় আত্মহারা হয়েছিল কি? রাজারা রাজ্য ছেড়ে ধনদৌলত বিলিয়ে দিয়ে আত্মাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়লেন কি? মায়েরা রুগ্ন ছেলেকে ফেলে রেখে আত্মার খোঁজে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কি? শিল্পীরা শিল্পে ইস্তফা দিয়ে অনন্ত আত্মায় মনটাকে মিশিয়ে দিলেন কি? দু-দশজন লোক হয়ত আত্মার ডাকে সাড়া দিলেন। কিন্তু বাকী লোক আত্মার ব্যাখ্যানে মুখে যতই তুবড়ি ফোটান না কেন দেহের সুখ-সুবিধার কথা না ভেবে থাকতে পারলেন না; গীতায় যুদ্ধে মদৎ দেখার জন্য আত্মাকে টেনে আনা হলো। চাষীকে চাষ করাবার জন্য আত্মার অধোগতির কথা শোনান হলো। আত্মার সদ্গতির জন্য নানা ক্রিয়াকর্মের কথা প্রচার করা হলো। জীবনের নানা স্তরের কাজের উপযোগী করে আত্মবাদকে সমাজ হজম করে ফেললে। আত্মবাদে খাদ দিতে দিতে এমন করে ফেলা হলো যে আত্মা শুধু কথার কথা হয়ে দাঁড়ালো। চোর ও জুয়াচোর সাধু-সন্ন্যাসীর সংগে সমান তালে আত্মাকে সামনে রেখে চলতে লাগলো। আত্মা মেনে এমন কাজ করা হতে লাগলো যা দেহসর্বস্বও করতে ভয় পায়। পেটুক বলে 'দেখ, আত্মা অমর, মরলেই তো দেহ পাবে কিন্তু পরের বাড়ীর ফলার মেলা ভার—' তাই পরের বাড়ী ভোজ জুটলে শরীরের দিকে ভুলেও তাকাবে না। এই জন্যেই বোধ হয় পরকীয়া তত্ত্বে, মেতে যাওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হলো। খুন করাও ডাকাতের পক্ষে সম্ভব হলো, কেন না আত্মাকে তো আর মারা যায় না—আর দেহটা তো কিছুই নয়! যাগযজ্ঞও জেঁকে বসল। পশুবধের ঘটাটা আরও বেড়ে উঠলো আত্মবাদের অভয় ছায়ায়। আত্মবাদ যেন এ যুগের গান্ধীটুপি। এ টুপিটা মাথায় থাকলে নির্ভাবনায় সব-কিছু করা যায়; শুধু মুখে দু-চার বার অহিংসা ও সত্যের কথা বলতে হবে এবং ভারতের মহান্ ঐতিহ্যের কথা বলে হা-হুতাশ করতে হবে। এ যুগের চোরাকারবারীরা যেমন ভারতের গৌরবান্বিত ঐতিহ্যের গলাবাজী করে ব্যবসা জমাচ্ছে তেমনি ভাবে সে কালের বাস্তুঘুঘুরা আত্মা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আপনাদের সব নোংরামি ঢাকবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। যেটা খাঁটি সোনা সেটাও স্থানবিশেষে অচল হয়। আবার মেকি টাকাও গিনির চেয়ে চড়া দামে কোন্ কোন বাজারে চলে। মেকিকে সাচ্চা বলে চালাতে হলে তাতে কোন খাঁটি জিনিসের রঙ ধরাতে হবে। কাচের টুকরোর চটক থাকলে হীরে বলে চলে। আর গিল্টির কাজ ভাল হলে পেতলও খাঁটি সোনা বলে আদর পায়। আত্মবাদের রঙ ধরিয়ে সে যুগের ধুরন্ধরেরা তাদের মতলব হাসিল করেছিল। সাধারণ লোক ভাবলে, আত্মা পেতে হলে ধাপে ধাপে উঠতে হয়—লাফিয়ে তাকে নাগাল পাওয়া যায় না। ছোট বড় সব কাজের মধ্যেই লোকে আত্মা পাওয়ার সিঁড়ি দেখতে লাগল। সমাজ ও রাষ্ট্রের আতঙ্ক কেটে গেল। মানুষ খুসী মনে আরও আরও খাটতে লাগল; কেন না, তাড়াতাড়ি গেলেই তো একটা ধাপ পেরিয়ে যাওয়া যাবে। আত্মবাদ সমাজকে অচল করার পরিবর্ত্তে বেশী মুখর ও সচল করে তুলল। গরল যেমন সুচিকিৎসকের হাতে অমৃত হয় তেমনি পাকা লোকের হাতে পড়ে আত্মবাদ কর্মবাদের দমের চাবি হলো। আসলে কিন্তু দেহাত্মবাদ নূতন পোষাক পরে বেশ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। সব যুগেই সত্যকে বলি দেওয়া হয়। সে যুগেও জাঁক করে সত্যকে বলি দেওয়া হলো, অথচ প্রকাশ পেলো যে ভারতের সমাজ আধ্যাত্মিক হয়ে গেল। আবর্জনার স্তুপ চন্দনের স্তূপে পরিণত হলো। ভণ্ডামির আসন হলো উঁচু ধাপে।

এখন দেখা যাক, বনে ঋষিদের সমাজে আত্মবাদের ফলাফল কি ঘটেছিল। এই তপোবনে আমরা বহু ঋষির কথা শুনি যাঁরা আত্মাকে দেখেছিলেন। এঁদের বলা হয় জীবন্মুক্ত। এঁদের দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। দেহের প্রতি মমতা নেই। শরীর আছে—কিছু খাবার না দিলে সেটা থাকে না, তাই যৎসামান্য কিছু খাবার দেওয়া। কোন নিয়ম নেই। সারা দুনিয়ার প্রাণিমাত্রই তার কাছে নিজের মত আপন। তৃণগুচ্ছ থেকে সুরু করে মানুষ পর্য্যন্ত সবাই সমান। কোথাও ভেদ নেই, ছোট-বড় নেই। কেউ প্রিয় কেউ'বা শত্রু—এ ধরণের ইতর-বিশেষ

নেই। সংসারীর যে ভালবাসা অর্থাৎ স্বার্থের হিসাব-নিকাশ করে ভালবাসা, সে ভালবাসা ছিল তাঁদের অজানা। এ ভালবাসা অন্য ধরণের। এতে প্রতি দিনের প্রত্যাশা নেই। এ ভালবাসা দেহকে কেন্দ্র করে নয়। আপনাকে পাওয়ার এ ভালবাসা। এ যেন 'X Ray' (এক্সরে) এর আলো দেহকে ভেদ করে আত্মাকে পাওয়া সবার ভেতরে। এখানে জ্ঞান ও প্রেম এক হয়ে গেছে। এমন উঁচু ধাপে ঋষিদের মধ্যেও বেশী ওঠেননি বটে কিন্তু তা'হলেও এমন যে একটা ধাপ আছে তা অস্বীকার করা কঠিন; কারণ, এঁদের জীবনই হলো জীবন্ত সাক্ষী। এমন আদর্শ চোখের সামনে দেখলে তপোবনের লোকেরা যে সংসারের মানুষ থেকে ভিন্ন হবে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু যে পিছল পথে নিত্য লড়াই করে এ ধাপে উঠতে হয় তাতে পদে পদে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাই ঋষি-সমাজেও নানা ধাপের লোক দেখা যায়। এ ধাপের একটু নীচুতে নামলেই আমরা দেখি, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বেশ স্থান দখল করে বসে রয়েছে। তাদের হুকুমদারী চলেছে আমাদের ওপর। কিন্তু এ সমাজের লোকেদের ওপর এদের প্রভাব কম। এঁদের সত্যের প্রতি আসল টান। প্রাণ-মান যাবে তবু সত্যকে ছাড়বে না। তাই বালক জাবালি সরাসরি বলে দিলেন যে তাঁর বাবা কে, তা তিনি জানেন না। তাই ঋষিরা বিনা দ্বিধা'য় বলেছেন যে বিবাহ প্রথা আগে ছিল না। মাকে এক জন জোর করে রমণ করতে নিয়ে যাচ্ছে তা বলতেও জিভ আটকে যায়নি। সামান্য একটু উপকার পেলে হাজার অপকার করলেও ক্ষমা করা ছিল এঁদের ধর্ম। কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই। পরিচারিকাকেও আত্মজ্ঞান দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। এঁরা বিবাহ করতেন—সন্তানের জন্মও দিতেন বটে কিন্তু এঁরা কামের পূজারি হননি। দেহ রাখার চেষ্টা এঁরা করতেন বটে কিন্তু দেহটা এঁদের সব হয়ে ওঠেনি। ইন্দ্রিয়সুখকে এঁরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। মনের উপর কড়া নজর দিতেন। নানা কঠোর অভ্যাসকে বরণ করে নেওয়ার ফলে আরাম বা বিলাস এখানে বাসা বাঁধতে পারে নি। সন্তান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ঋষি-সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এই ব্যবস্থা একটু ইঙ্গিতে বলে যে কাম অশরীরী বলেই বোধ হয় ঋষি-মনের গোপন কোণে থাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। কুঁড়ে ঘরে বাস, উড়িধানের চালের ভাত—শাক আর ফুল তরকারী—রাতে ফল-মূল খাওয়া—গাছের বল্কল পরনে। জীবজন্তু গাছপালা পশুপাখী প্রভৃতি সকলের প্রতিই প্রাণঢালা ভালবাসা। তাদের দরকারের দিকে নজর—তাদের আব্দার সহ্য করা। এখানে বৈরাগ্যের রুক্ষতা নেই, আছে প্রেমের সরসতা। প্রাণিমাত্রই যেন আশ্রমের সন্তান; সকলই প্রতিপাল্য। প্রকৃতি এখানে শত্রু নয়—আপনারই স্বজন। হিংস্র জন্তুও যেন এখানে এসে নূতন জগতের আলো দেখে—আপনার সহজাত ক্রূর বৃত্তিগুলি যেন লজ্জা পেয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। ঋষিদের আবার কর্ত্তব্যবোধ অতি সজাগ। সূর্য্য ওঠার আগেই ধর্ম্মের ডাকে তাঁরা ছুটেছেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ছেলেরা ছোট-বড় সব কাজেই অভ্যস্ত। তারা বেদও পাঠ করে আবার শুকনো কাঠও জোগাড় করে। গুরুর ছোট-বড় ফাইফরমাসও খাটে। মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সকলকে ভালবাসতে শিখেছে। তাদের খেলার সাথী হচ্ছে পশু-সন্তান, চারা গাছ, লতাগুল্ম প্রভৃতি। এরাও পড়াশুনো করে বটে, কিন্তু বিলাসকে রাখে দূরে ঠেলে। ঋষি-গৃহিণীরা সেবাকেই ধর্ম্মের সার বলে নিয়েছিলেন। তাদের ভালবাসায় জোয়ার-ভাঁটা ছিল না—পক্ষপাতিত্ব ছিল না। বনের ঋষিরা আলাদা সমাজ যে কেন করেছিলেন তার উত্তর তাঁদের জীবন। এ সমাজে আত্মবাদ ফুটে উঠবে না তো আর কোথায় উঠবে!

এ সমাজের চরম উন্নতিই হলো এ সমাজের কাল। বেদের যুগে শহর বা শহরের কাছাকাছি গ্রাম ছেড়ে এঁরা চলে আসেন বহুদূরে বনের ভেতরে। শহর ও গ্রামের সংখ্যা যত বেড়ে চললো এঁদের দূরত্বও তত কমতে লাগলো। ক্রমে এঁদের দর্শনের ঢেউ যখন গিয়ে আছড়ে পড়লো শহরে ও গ্রামে তখন সেখান থেকে দলে দলে ছাত্র ও দর্শক আসতে লাগল। এঁদের বিদ্যা, জ্ঞান, চরিত্র ও জীবনযাত্রার প্রণালী দেখে সবাই এঁদের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা নেবার জন্য ব্যস্ত হলো। রাজারা বড় বড় যাগযজ্ঞে এঁদের বরণ করতে সুরু করলেন। পুরোহিতেরা তাতে সায় দিতে বাধ্য হলেন। সমাজের ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এসে এখানে পাঠ নিয়ে ধন্য হতে লাগলো। বৃদ্ধেরা শান্তির আশায় এখানে এসে বাসা বাঁধলেন। কেউ কেউ স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। আর দর্শকদের আনাগোনার তো কথাই নেই। এ রকম তপোবন তো আর একটা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। সেগুলি পূর্বে ছিল এক একটি দ্বীপের মত। হয়ত তপোবনগুলির মধ্যে ঋষিদের নিজেদের যাতায়াত ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ততটা পরিচয় ছিল না। তবে রাজাদের জানা ছিল অন্য কারণে। অনার্য্যেরা এসে বনের আর্যাদের হটিয়ে দিয়ে গুপ্ত দুর্গ স্থাপন না করে। বেদের ঋষিরা রাজাদের কাছে খুব সম্মান যে পাচ্ছেন তার বিবরণ আমরা পাই না। কোন ঋষি হয়ত মোটা দক্ষিণা পেয়েছেন। কেউ বা রথ কেউ বা নারী পেয়েছেন। এখন কিন্তু ঋষিদের সম্মান একেবারে অন্য ধরণের। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন সাগরের জলরাশিতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি কারই ঋষি-সমাজ শহর ও গ্রামের লোকেদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ঋষি-সমাজ ও অন্য সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল সে ব্যবধান ধীরে লোপ পেতে লাগল। কোন কোন ঋষি রাজার ঘরে তো জামাই হলেন। কেউ বা মেয়ে বিয়ে করলেন। কেউ বা আবার হাজার হাজার সোনার জিনিস দক্ষিণা পেলেন। কেউ বা অনেক জমি পেলেন। কোন কোন রাজা আবার ঋষি-সমাজের মেয়ে বিয়ে করলেন। এমন কি কোন কোন রাজা এসে ঋষি-সমাজে হামলাও করলেন। মেলা-মেশার ফলে ঋষিরাও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করতে শিখলেন। শান্ত আশ্রমে রুদ্রভাব এসে বাসা বাঁধল। এরই ফলে পরশুরামের জন্ম এই সমাজে সম্ভব হল। কোন কোন ঋষি রাজাদের পুরোহিতও হলেন। এর ফলে ঋষি-সমাজের অধঃপতন হলো। ঋষিদের আদর্শ ছড়িয়ে পড়লো বটে কিন্তু তা' রক্ষার ভার পড়লো জনসাধারণের উপর। কাম লোভ প্রভৃতি সভ্যতার চির-শত্রুগুলি মানব-মনের নিত্য সহচর। তারা ঋষি-সমাজে কোণ-ঠাসা হয়েছিল। এখন তারা সুযোগ পেয়ে আত্মবাদকে বিকৃত করতে চেষ্টা করল। বিকৃত আত্মবাদের পরিচয়

আমরা আগেই দেখিয়েছি। এখন যে পটভূমিকাতে আত্মবাদ আরও বিকৃত হ'তে পারে তার কথাও এখানে কিছু আলোচনা করলাম।

উপনিষদের দর্শন ধ্রুব-তারার মত এখনও অনেক লোককে পথ দেখিয়ে থাকে। তাই নানা ভাবে বার বার এই দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখন আমরা বিচার করে দেখব, এই দর্শনের বলই বা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায় এবং এই দর্শন বর্তমান সমাজে অচল না এখনও এর দরকার আছে। যে সমাজে এ দর্শনের জন্ম ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল, সে সমাজের সংগে সম্পর্ক রেখে এ বিষয়ে বিচার করতে হবে। ঋষিরা রাষ্ট্রের আবহাওয়ার বাইরে চলে গিয়ে সমাজ গড়েছিলেন সত্য কিন্তু তাহলেও আর্য্য-রাষ্ট্র তাঁদের নিরাপত্তার দিকে বেশ নজর রেখেছিল। আমরা রামায়ণে দেখি, অনার্য্যেরা অত্রির স্থাপিত সমাজে এসে উৎপাত আরম্ভ করেছে। বিশ্বামিত্র মারীচ ও সুবাহুর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে অযোধ্যায় হাজির হয়েছেন প্রতিকারের আশায়। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনার্য্যদের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপের চেষ্টার কথা রূপকের মাধ্যমে বলা হয়েছে। পূর্ব্বোক্ত কারণে অনার্য্যদের আর্য্যদের সঙ্গে বিরোধ করা স্বাভাবিক। এ সব বিবেচনা করলে কেন আর্য্য-সমাজ যে সে সময় অহিংসার দ্বারা রক্ষাকবচ তৈরী করেছিল তা মনে করবার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই ঋষি-সমাজকেও আর্য্যরাষ্ট্রের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় আর্য্যদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনার্য্যদের প্রতি সুবিচার যদি না হয়েও থাকে তাহলে তা নিয়ে ঋষিরা যে আন্দোলন করেন নি তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ঋষি-সমাজ রাজনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নি। সমাজনীতি সম্বন্ধে দু-এক কথা অবান্তর ভাবে এসেছে। যাঁরা সংসারের সব ভোগ-সুখকে অসার বলেছেন তাঁদের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?

ঋষি-সমাজের সত্যই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন কিন্তু সব ঋষির পক্ষে কি সেই লক্ষ্যে পৌছান বা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল? নচিকেতার বা শুনঃশেফের পিতার মত অনেক ঋষি যে ছিলেন তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। ক'জন স্ত্রীলোক ব্রহ্মলাভের জন্য সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন? যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের আঙুলে গোণা যায়। ঋষিসমাজে কত লোক ছিলেন আর কত লোক যে পাকাপাকি সন্ন্যাসী হয়ে আত্মা জেনেছিলেন তার সংখ্যা হিসাব-নিকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবুও একথা জোর করে বলা চলে, আত্মদর্শনে অধিকারী অতি অল্পই ছিলেন। ঋষিদের বিবাহ হত, ছেলেমেয়েরও জন্ম হত। গৃহী অবস্থায় আত্মবাদ গ্রহণ কি হতে পারে? আমাদের যদি পাকা জ্ঞান হয় যে আত্মা দেহ নয়, তাহলে সংসারের কোন কাজ করা চলে না। আত্মার স্ত্রীই বা কে আর ছেলেই বা কে? এক কথায় ঋষিদের দর্শন তাঁদের সমাজে পুরামাত্রায় চললে সমাজ অচল হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। প্রবৃত্তির পথে গেলে আত্মা পাওয়া যায় না অথচ নিবৃত্তির পথ একচেটে হতে পারে নাই, অথচ প্রবৃত্তির পথ আর নিবৃত্তির পথের মাঝখানে সাগরের ব্যবধান কোন বাঁধ বা পুল করা অসম্ভব। চারটে আশ্রম সাজালেই সমস্যার সমাধান হয় না—এর মধ্যে শৃঙ্খলা-সৃষ্টি করা কঠিন। প্রথম তিনটে আশ্রমকে ভুল বুঝেও মেনে নিতে হয়। ভুল করে চলব এবং ভুল বুঝেও বুঝব না। আর যখন ঠিক্ঠাক্ ভুল বুঝব তখন ছেড়ে অন্য পথে যাব। একথা বলা ছাড়া আর কিছু কি বলা চলে? আর এক কথা বলা চলে যে ধীরে ধীরে ছাড়ার পথে এগিয়ে যেতে হবে। সব শেষে শুধু আত্মাকে ধরে আর সব ছেড়ে ফেলতে হবে।

এই যে দুটো পথের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে চুলচেরা বিচার না করেও আমরা বলতে পারি যে, এ দর্শনের আদর্শে আর্য্যদের সারা রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ম-কানুন গড়ে উঠে নি। আর্য্য-রাষ্ট্রে যে ভাবে শহর গড়ে উঠেছিল তা' গড়ে উঠতো না যদি রাজারা এই দর্শনের ডাকে সাড়া দিতেন। সমাজ-জীবনে বহুবিবাহের প্রথা মোটেই চলত না যদি ক্রমনিবৃত্তির পথে আর্য্যেরা চলতেন। কেনা গোলাম রাখা বা বেগার খাটান বা শূদ্রদের মালিকানি স্বত্ব বাতিল করা প্রভৃতি কয়েকটি অতি বদ প্রথা চালু ছিল। কৈ এর বিরুদ্ধে আত্মবাদীদের একটা কথাও আমরা বলতে দেখি না? দর্শন যদি বলে সকলের আত্মা এক বা একজাতীয়, তাহ'লে সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যের ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু তা না পড়ার কারণ কি? ঋষিরা কর্মবাদ চুপচাপ মেনে নিলেন যদিও তা আত্মাকে স্পর্শ করে না, কেন না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি বলায় বিপদ আছে। কর্মবাদ নিয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। এখন শুধু একটু খেই ধরে যাচ্ছি। ঋষিদের নিজেদের এমন কোন সমাজনীতি আমরা পাই না, যা তাঁদের দর্শনের সংগে বেশ খাপ খায়। তাঁদের সমাজেও আমরা পরিচারিকার দেখা পাই। আর এই পরিচারিকারা বেশীর ভাগই শূদ্রদের ঘরের মেয়ে। আমরা একথা বলে শেষ করতে পারি যে, সমাজজীবনে এঁদের দর্শন ভাল ভাবে কাজ করে নি। আত্মসাধনার দিক দিয়ে বিচার করলে বেশ দেখা যায় যে ঋষিসমাজ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল ঋষি আত্মসাধনায় রত। এঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন পুরোপুরি। আর এক দল এত উঁচু ধাপে উঠতে পারেন নি। তাঁরা নিয়েছেন বেদের কর্মপথ। ঈশোপনিষদে এই দুই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সময়ে আর এক দল শুধু দেবতার আরাধনা করতেন। তাঁদের নিন্দার কথাও শোনা যায়। ঋষি-সমাজের কর্মসাধনা একটু অন্য ধরণের ছিল। এ পথে কর্মের অনুষ্ঠান ও দেবতার আরাধনার পূর্ণ মিলনে নূতন জীবন পেয়েছিল। এ যেন গঙ্গা-যমুনার সংগম। দ্রব্যের স্বল্পতা পূর্ণ করা হলো অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তিরত্ন দিয়ে। বাহিরকে অন্তর্মুখী করবার অদ্ভুত প্রয়াস। এই ধর্মজীবন কিন্তু কর্ম ও আরাধনার সমন্বয়কে বজায় রাখতে পারে না। বাইরের দিকে ঝোঁক পড়লে বৈদিক নিয়মতান্ত্রিক কর্মবাদ মাথা চাড়া দিয়ে আবার উঠবে। আর অন্তরের দিকে বেশী ঝোঁক পড়লে দেবতার আরাধনার ক্রিয়া পদ্ধতিকে গ্রাস করে ফেলবে। তার পর আত্মার ধ্যানেও আর সুখ পাওয়া যাবে না। সার্কাসের মেয়েরা যেমন দুটো উঁচু থামের আগায় বাঁধা দড়ির উপরে কিছু না ধরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ায় তেমনি ভাবে সমাজের সমস্ত লোক কি সমন্বয়ের অতি সরু সুতোর উপরে সারা-জীবন চলতে পারে? সমাজের শাসন যতই কঠোর হোক না কেন, লোকের পা পিছলে যাওয়াটাই প্রকৃতির নিয়ম। এরই ফলে ঋষিসমাজেও দলাদলি মানুষের মনের গতির নিয়মেই হয়েছিল।

এই মতভেদের ধাক্কা গিয়ে পৌছাল উঁচু ধাপেও। মইএর

তলার ধাপ কাঁপলে উঁচু ধাপ রেহাই পায় না। পুকুরের কিনারায় এক ঢিল মারলে ঢেউ শুধু কিনারাতেই হয় না। সেটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা পুকুরটাতে। ঠিক এমন ভাবেই ভাবসাগরে ঢেউ উঠলো। সেই ঢেউ গিয়ে আত্ম-সমাধি-নিস্তব্ধ অন্তরের সাগরকে চঞ্চল করে তুললো। ছুটো উপায়ে এই ঢেউ যাতে উপরতলায় ঢেউ সৃষ্টি না করে তার ব্যবস্থা করা হলো।

প্রথম উপায় হলো আত্মদর্শনের আরও সুন্দর ব্যাখ্যা। এঁরা দেবতার আরাধনাকে স্বীকার করে নিলেন এবং দেখালেন এই পথের শেষ গন্তব্য কোথায়। এ নিয়ে গিয়ে হাজির করে ঈশ্বরে, এই ঈশ্বর এমন একটা অবস্থা যে অবস্থায় আত্মা একেবারে প্রকৃতির যোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি এর নাম দেওয়া হল কার্য্যব্রহ্ম। এই নামের ভিতর দিয়ে দেখান হল যে খাঁটি ব্রহ্ম এই ঈশ্বরের মূলভিত্তি। এঁর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। ইঁদের লক্ষ্য অনন্ত তাঁরা ঈশ্বরের স্তরে এসে পৌঁছে সীমার মধ্যেই আটকে থাকবেন। তাঁদের দৃষ্টির যে বিশালতা ও ব্যাপকতা তা এই গন্তব্যে পৌঁছে সার্থক হতে পারে না। চিন্তার জগতের শঙ্কা কেটে গেল বটে কিন্তু আর একটা দিক্ আছে, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা। মানুষ আপনাকে হারিয়ে অনন্ত হতে চায় না। যতই যুক্তি নিজেকে মুছে ফেলার পক্ষে থাকুক না কেন, মানুষ সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে নিজে থাকতে চায় আর নিজের প্রিয়তমকে পেতে চায়। সংসারে আছে নানা বাধা। তাই সে নির্জ্জন খুঁজে বেড়ায়। নির্জ্জন স্থান খুঁজে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অভিসারে যেমন বাহির হয় স্বভাব-ভীরু নারী তেমনই সংসারের বাধা এড়িয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অভিসারে বাহির হয় সাধক। তার ভয় নেই, লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই। সে প্রিয়তমের নিকটে চিরকালের জন্য থাকতে চায়। বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। তাঁর চাই অমৃতস্পর্শ। জগতের প্রিয় বা প্রিয়া চিরকালের মত তার অতৃপ্ত হৃদয়কে তৃপ্তি দিতে পারে না। কামের যাত্রী দূরের টিকিট কিনে ভক্তির যাত্রী হয়। জন্ম-মৃত্যু দিয়ে ঘেরা নরনারীর জন্য ব্যাকুলতা হলে বলে কাম, কেন না সেখানে দেহের উপর নজরটা বড় বেশী। আর যখন দেহটাকে বাদ দিয়ে টান থাকে তখন বলা হয় প্রেম। আর এই প্রেমের পাত্র বদলে যায় অর্থাৎ ছোট-খাট কাজের গণ্ডীর বাইরের কোন বস্তুর উপর যদি এই টানটি প্রবল বেগে এক-টানা বয়ে যায় তখন এইটাই হয় ভক্তি। এই ভক্তি যদি অবিরাম গতিতে বয়ে যায় তাহ'লে সমাধি হওয়াটা আর কঠিন কিছুই নয়। এ যে সরস পথ। যত এগিয়ে যায় রস তত জমে ওঠে। প্রাণ যত অধীর হয় হাসি-কান্না পাল্লা করে এসে মনকে ততই মাতিয়ে তোলে। যাওয়ার পথে ভয়ও থাকে না, বিরক্তিও আসে না। একে নীচুর ধাপ বলে সরিয়ে দেওয়া যায় না। এই পথের পথিকেরা নূতন দর্শন সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে জীবকে আর জড়-জগৎকে নূতন করে দেখলেন। এর ফলে দ্বৈতবাদ বেশ পাকা ভিত্তিতে দাঁড়াবার জায়গা পেলো। অদ্বৈত আত্মবাদ চিন্তাজগতে যা-কিছু বিরোধিতা করুক না কেন, তা এসে হৃদয়জগতে পৌঁছাতে পারল না। আত্মপথের যাত্রীর হয়ত যাত্রাপথের শেষে সুখ আছে, কিন্তু মধ্যপথ মরুভূমি সৃষ্টি করার পথ। কিছুই নেই, কিছুই নেই, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। বলবানের এই পথ। এই জন্যেই উপনিষদ বলেছেন যে, 'বলহীন আত্মাকে পেতে পারেন না।' নির্জ্জনতার ভয় করলে চলবে না। নিঃসঙ্গতায় বিরক্তি এলে চলবে না। চলার পথে পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দেবার কেউ নেই—উল্টো পথে গেলে পথ দেখাবার লোক নেই—ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে জাগাবার কেউ নেই। নিজেই গুরু—নিজেই শিষ্য—নিজেই বন্ধু—নিজেই সহযাত্রী। কাঁদাতেও আমি কাঁদতেও আমি—হাসাতেও আমি হাসতেও আমি—সাহস দিতেও আমি, ভয় পেতেও আমি। এমন কঠিন পথে চলা ত সহজ নয়! চলতে চলতে পোক্ত হলে চলা হয়ত কঠিন নয়; কিন্তু গোড়াপত্তন করা যায় কেমন করে? বিশেষ করে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে বাদ না দিয়ে শুধু একটু মোড় ঘুরিয়ে নূতন পথ দেখান যেতে পারে সেখানে; প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইএর ভাল হাতিয়ার না থাকলে লোককে ডাকা কঠিন নয় কি? শুধু তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে যুক্তিগুলো পাখীপড়া করলেই কি এই শক্তপথে যাওয়ার জন্যে লোক তৈয়ার হতে পারে? তাই শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদে যোগের কথা ফলাও করে বলা হয়েছে। যোগ একটি মানসিক ব্যায়াম। মনটাকে যে ছাঁচে ইচ্ছে সে ছাঁচে নিয়ে যাওয়ার কৌশলমাত্র। মনটাকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসল রাস্তায় ফেলতে হবে। রাস্তায় গেলে যুক্তির ঠেলায় আপনিই এগিয়ে চলবে মন। শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে অনন্ত ব্রহ্ম সাগরে তলিয়ে যাবে। যোগ-ব্যায়াম কিন্তু কোন দলের একচেটে সম্পত্তি নয়। এর সাহায্যে দ্বৈতবাদেও পৌঁছান যায়। উপনিষদের দর্শন শঙ্কর যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, শুধুই যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন তা গায়ের জোরে বলা যায় না। ঋষি-সমাজে যে শুধু ফাটল ধরেছিল তা নয়—দর্শনেও ফাটল ধরেছিল।

এখন ঋষি-সমাজের কথা আবার আলোচনা করা যাক। কেন না, দর্শন জগতের মতান্তর এই সমাজ নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঋষি-সমাজ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। এক গৃহীর সমাজ আর এক সন্ন্যাসীর সমাজ। সন্ন্যাসীরা গৃহীদের চিন্তার গুরু ও পূজার পাত্র। তাঁরাই এঁদের জীবনের আদর্শ। অদ্বৈতবাদ এঁদের ত্যাগী করতে পারে, গৃহ থেকে বাইরে ডেকে আনতে পারে আর যত দিন সংসার ছাড়ান না হয় তত দিন বিবেকের ধিক্কার শোনাতে পারে। কিন্তু প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মনে কখনই গৃহীর ধর্ম্ম পালন করতে দেয় না। যে সমন্বয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে সে পথেও ভাবী আত্মার সাধক যেতে পারে না। পূর্ব্বজীবন ভুল বলে যদি শিখে আসে তাহলে সেই পূর্ব্বজীবনে আস্থা রেখে সন্তুষ্ট হওয়া যায় কি? বর্ত্তমান কালে অদ্বৈতবাদীদের মঠ স্থাপন আমার কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হয়। এতে আসল জীবন নেই, আছে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ।

কিন্তু অপর দিকের দার্শনিক মতবাদ অর্থাৎ ভক্তিবাদ বা কর্ম্মবাদ যদি গৃহী-ঋষি-সমাজে আপন আদর্শ ছড়িয়ে দেয় তাহলে গৃহীর জীবন সংসারে খুব মত্ত না হয়েও শ্রীধারণ করতে পারে। আর আত্মবাদের প্রচণ্ড উত্তাপকে ভক্তির শীতল ছায়ায় বা কর্ম্মের অন্ধকারে গৃহীরা গা-সওয়া করে নিতে পারেন। গৃহী-ঋষিদের অনেকেই সন্ন্যাসীদের শুধু ভক্তি দেখিয়ে সেবা করেই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় গৃহী ঋষি-সমাজ আবার রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আবহাওয়ায় ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

দেশান্তরী

ইন্দ্রনাথ
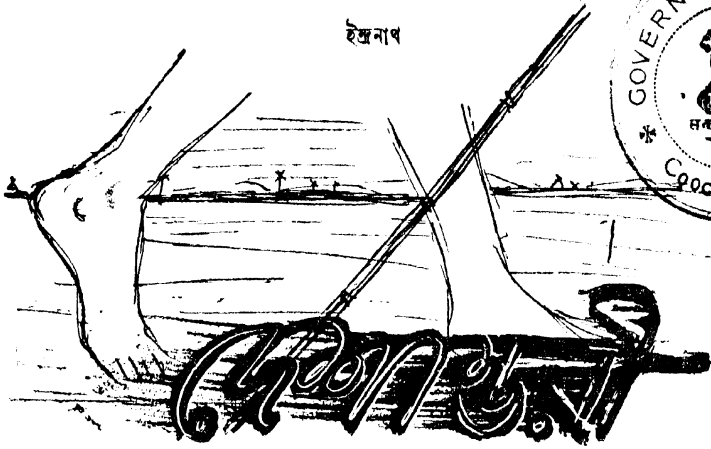
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমেরিকানদের ভাষা ও পোশাকের অভিনবত্বের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে হলিউডের খাতিরে। টাই বা বুশ-শার্টের উপর ফুলের নক্সা দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইংলণ্ডে স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও টাই ও কোট পরে ক্লাসে যায়, এখানে গেঞ্জি বা টি-শার্ট সম্পূর্ণ রীতিসম্মত।

আমার এক বন্ধু বলতেন, টি-শার্ট এবং গাঢ় নীল জীনের পাতলুন আমেরিকার জাতীয় পরিচ্ছদ। এই পোশাক আমাদের গরিব এবং গরম দেশের সমাজেও হয়তো সম্পূর্ণ ভদ্রতাসম্মত বলে গণ্য হবে না, যদিও এদের রকমারি সূক্ষ্ম হ্রস্ব কামিজ, গলাখোলা শার্ট ইত্যাদি উষ্ণ-গ্রীষ্মেরই ফল। জুন জুলাই মাসে এদের দোকান-ঘরের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে সনাতনের কড়া শাসনকে তুচ্ছ করে এরা বুদ্ধিমানের মত দৈহিক আরামকেই প্রথম স্থান দিয়েছে—অবশ্য তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টায় রঙের মাত্রা এক এক সময় বেশী উগ্র হয়ে পড়ে।

আমেরিকার শিল্প-নীতি mass production দরজীর ব্যবসাতেও ঢুকেছে। ব্যক্তিবিশেষের মাপের প্রতি নজর দিতে হলে মজুরি পড়বে অনেক বেশী (মনে রাখতে হবে যে দরজীর মজুরদেরও চাই টেলিভিশন), তাই কয়েকটি বাঁধা মাপ অনুসারে কোট পাতলুন তৈরি হয়ে আসে কারখানা থেকে; কোটের কবজি আর পাতলুনের গোড়ালির কাছে শেলাই থাকে খোলা, খরিদ্দারের পছন্দ হলে ঐ জায়গাগুলি দরকার মত কেটে শেলাই করে দেয় দোকানদার। একটু আধটু এদিক ওদিক হলে কিছু এসে-যায় না; কারণ এদের ফ্যাসান ঢিলেমি বরদাস্ত করে বেশী য়োরোপের তুলনায়। আর যাই হক, বকলস বোতামের পরিবর্তে এদের রীতি অনুসারে বেল্ট ও জীপ দিয়ে পাতলুন পরা অনেক সহজ। এদের শার্টের গঠন আমার মনে হয় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা পরতেও সহজ এবং দেখতেও ভাল,—অন্তত কড়া কলারের ফাঁস ও আলাদা কলারের দাসত্ব যে এরা দূর করেছে এটা যাদের টাই পরতে হয় তাদের পক্ষে এক মস্ত বড় নিষ্কৃতি।

পোশাকের যেমন বাঁধন কম এদের কথার উচ্চারণও আঁটসাঁট নয় মোটে। শব্দগুলি কখনো বেঁকে বা তুমড়ে গেছে, কেউ যেন তাদের ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে এদিকে ওদিকে, কারো স্বর শুনলে সন্দেহ হয় কথাগুলি বুঝি নাসিকা-নির্গত। ভাষার প্রতি যাদের দরদ আছে তাদের পক্ষে এক এক সময় রীতিমত পীড়াদায়ক। এদের কাছে 'অবশ্য ঐ উচ্চারণই যথার্থ। একদা এক মহিলা কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ইংরেজী কথা-বার্তা বুঝতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হয়?" আমি বললাম, "না, দেশে ইংরেজ রাজত্ব থাকায় ছোট কাল থেকে ওটা আমাকে শিখতে হয়েছিল।" পরম আত্মবিশ্বাসে তিনি বললেন, "তাই, তা না হলে ইংরেজদের কথা সহজে বুঝতে পারতে না—এমন অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলে ওরা!" শুনে এমন চমকে গেলাম যে কিছুই বলতে পারলাম না, মুখে হাসি পর্য্যন্ত এল না। পরে ইংরেজ

লিবার্টি মূর্ত্তি

এডগার আলান পোয়ের গৃহ, নিউ ইয়র্ক

বন্ধুদের কাছে গল্পটা বলেছি, সবাই উপভোগ করেছে, কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছে যা এখানে ছাপা চলবে না। যাই হোক, বানানকে অনেক জায়গায় সহজ করে এরা কিন্তু ইংরেজী ভাষার উপকার করেছে।

আমেরিকা সম্বন্ধে বিশ্বের দু'টি প্রধান কৌতূহলের বিষয় ওদের জীবনযাত্রার মান (Standard of living) ও বর্ণভেদ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা পরে করব, প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জিনিস-পত্রের দামের, যার ইঙ্গিত আগে কিছু দিয়েছি। ট্রাম (এদেশে তার নাম street car) বা বাসের ভাড়া আট আনা, কোনো কোনো শহরে বারো আনা। (দূরত্ব অনুসারে ভাড়া বাড়ে না, একই পয়সায় যেখানে খুশি যাওয়া চলে। এই সহজ নিয়মের ফলে গাড়ীতে কণ্ডাক্টার রাখবার দরকার করে না, তাকে মাইনে দিতে হলে ভাড়া নিশ্চয় আরো বেড়ে যেত)। খাবারের দাম কম নয়, অথচ হোটেলে রেস্তরাঁয় এত নষ্ট হয় যে, দেখে শুধু আমাদের নয় য়োরোপীয়দেরও মন কাঁদে। এদের যাবতীয় খরচের (cost of living index) মধ্যে টেলিভিশনেরও স্থান আছে, নিউ ইয়র্কের দরিদ্র পল্লীতেও বহু কুটিরের ছাতে তার এরিয়াল চোখে পড়ে। আমার জনৈক বন্ধু এক নিগ্রো বাস-চালকের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন, তারও ছিল টেলিভিশন। টেলিফোন ও রেফ্রিজারেটার আছে দরোয়ান বা চাকরাণীর ঘরেও। আমেরিকান রান্নাঘরের শ্রমহারী যন্ত্র-সম্ভার বিশ্বের গৃহিণীদের ঈর্ষার বস্তু। বৈদ্যুতিক কাপড়-কাচা যন্ত্রও আজকাল অনেক জায়গায় বাড়ী তৈরির সময়ই টেলিফোনের মত বসানো হয়। প্রতি তিন জনের এক জন গাড়ীর মালিক এবং এ দেশে ছোট গাড়ী বড় একটা দেখা যায় না। এদেশেই সম্ভব আকাশের নিচে মেঠো সিনেমা, যেখানে গাড়িতে বসে দেখতে হয় ছবি। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের অনেকের আছে শহরের অদূরে ছোট কটেজ, শনি রবিবারে বেড়াতে যাবার জন্য। প্রত্যেক বাড়ির নিচে আছে শীতের দিনে ঘর গরমের ব্যবস্থা; ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন যে হয় না শুধু তাই নয়, বাড়ির সর্বত্র সমান ভাবে এবং ঠিক দরকার মত গরম থাকে। অবশ্য সুইডেন প্রমুখ য়োরোপের কোনো কোনো দেশেও এই ব্যবস্থা আছে ঘরে ঘরে, তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মানও প্রায় আমেরিকার সমান।

জিনিসের ও চলাফেরার খরচের থেকে বোঝা যায় যে কারখানার মজুর বা ট্রাম-বাসের ড্রাইভারের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত উঁচু—অন্যান্য দেশে যা বিলাস তা তার প্রয়োজন। অন্য দেশের লোকের তুলনায় তার হয়তো পয়সা বেশী জমে না, কিন্তু খরচের ফলে আরামের প্রতিদানটা বেশী। এদের রেলগাড়িতে দুটি শ্রেণী; কোচ বা সাধারণ শ্রেণীও হাওয়া-নিয়ন্ত্রিত, তার ফলে শুধু যে গরমের কষ্ট দূর হয় তাই নয়, চাকার শব্দ কানে লাগে না, ধুলো ঢুকতে পারে না, সিগারেটের ধোঁয়া জমে না। য়োরোপের সাধারণ যাত্রী হয়তো বলবে এত আরামের দরকার নেই, এসব বাদ দিয়ে বরং ভাড়া কমাও। আমেরিকার কোচ-যাত্রী ভাড়া কমাতে চাইবে নিশ্চয়, কিন্তু সুখ-সুবিধার বিসর্জনে নয়। এইখানেই প্রকাশ পায় তার জীবনযাত্রার মান।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, রেলগাড়ির উপরের শ্রেণীটা তাহলে কী? পুলমান শ্রেণীর আসনে গদি বেশী পুরু, তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশী, মেঝেতে ভারি কার্পেট, প্রকাণ্ড বড় কলঘর প্রকাণ্ড আয়না দিয়ে সাজানো, ইত্যাদি তো আছেই, কিন্তু সব চেয়ে বড় সুবিধা যে এই শ্রেণীতে ছাড়া শোবার জায়গা মেলে না। অবশ্য তার জন্য পয়সা লাগে আলাদা। শোবার ব্যবস্থাও রকমারি—প্রথমে ডর্মিটরি, যারা আরো নিরিবিলিতে ঘুমোতে চায় তাদের জন্য বেডরুম; ছোট্ট একটু কামরার মধ্যে দুটি কোমল উষ্ণ শয্যা এবং প্রয়োজনের সব কিছু উপকরণ—থার্মস্-বোতলে বরফ-জল পর্যন্ত। বোতাম টিপলে সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো কাণ্ডাক্টার এসে হাজির। যারা এতেও তুষ্ট নয়, তাদের জন্য আছে আরো বড় ঘর এবং সংলগ্ন নিজস্ব ড্রয়িং-রুম।

কোচশ্রেণীতে আসনগুলি ট্রাম-বাসের মত পাশাপাশি সাজানো, কিন্তু সেগুলিকে এরোপ্লেনের চেয়ারের মত কাত করা যায় অনেকখানি এবং ভাল গদি থাকাতে একেবারে বসে কাটাতে হয় না রাত। ট্রেনের রেস্তরাঁতে খাবারের দাম বড় বেশী, সাধারণ ডিনার প্রায় তিন ডলার, কিন্তু ফিরিওলারা কামরায় ঘোরাফেরা করে স্যাণ্ডুইচ, হট ডগ (সসেজ ও সর্ষের ঝাল দিয়ে তৈরিবিশিষ্ট আমেরিকান খাদ্য) কাগজের বোতলে দুধ ও ফলের রস ইত্যাদি নিয়ে, সুতরাং কম খরচেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তি করা চলে। বরফ-জল অবশ্য বিনা পয়সায় পাওয়া যায় সব গাড়িতে।

এ সব তথ্যের অর্থ এই নয় যে দারিদ্র্য নেই এদেশে। প্রতি বড় শহরেই আছে বিস্তীর্ণ বস্তি। উদ্দেশ্যহীন বেকার লোক পার্কে রাত কাটায়, রেল-ষ্টেশনে বসে ঝিমোয়। ভিক্ষুক যে দেখা যায় না তা নয়, তবে তাদের ভিক্ষার মাত্রাটাও বোধ হয় উঁচু। মনে আছে, একদিন সকালে নিউ ইয়র্কে ওয়াই-এম-সি-এ রেস্তরাঁতে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছি, সামনে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে আছে। একটি লোক খেয়ে বেরিয়ে যাবার পথে আমার কাছে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে একটি সিগারেট দিতে পারি কি না। এই রেস্তরাঁর চেয়ে সস্তা জায়গা অন্যত্র আছে, তথাপি সে এখানে এসেছে খেতে; জীবন ধারণের জন্য ধূমপান অপরিহার্য নয়, তবু ভরা পেটে একটি সিগারেট তার না হলে চলে না। এই ভিক্ষুক কখনো যে-সে ভিক্ষুক নয়!

অবাধ উদ্যোগ আর স্বাধীন ব্যবসার তীর্থক্ষেত্র আমেরিকা, কোনো রকম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সরকারী নিয়ম-শাসনের তারা পরিপন্থী। তার ফলে নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিসেরও দাম বেশী এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত গরিবদের কষ্ট হতে বাধ্য। ওষুধ ও চিকিৎসার খরচ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ওষুধকে সুদৃশ্য শিশিতে ভরে ছাপার অক্ষরে নাম লিখে ভাল করে কাগজে মুড়তে হয়তো মজুরিই বেশী পড়ে যায় তার আসল দামের চেয়ে। সেই কারণেই এখানে ধোবা যখন শার্ট কেচে তার সর্বাঙ্গে পিন এঁটে পিজবোর্ডের খোলস পরিয়ে সবশুদ্ধ সেলোফেনে ভরে ফেরত দেয় তখন তার জন্য দিতে হয় প্রায় দেড় টাকা।

এত স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ফলে এদের সুখ-শান্তি বেড়েছে কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে—এ দেশের লোকের মনেও। একটি ছোট পরিবারের কথা মনে পড়ে,—স্বামী এঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী এবং তাদের শিশু এই নিয়ে সংসার। কর্তা-গৃহিণীর বয়স কম,

দেহে যথেষ্ট শক্তি, দু'জনেই বেশ খেটে ভাল উপার্জন করে। ছেলেকে দেখাশুনা করবার জন্ম একটি ঝি আছে। মা দুঃখ করে বললে ছুটির দিন ছাড়া ছেলের সঙ্গে ভাল করে আলাপই হয় না।

তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই তো হয়, এত টাকা না হলেও তো চলে!

হ্যাঁ চলে, বেশ আরামেই সংসার চলে বাপের উপার্জনে; কিন্তু এর চেয়ে বড় একটা রেফ্রিজারেটার হলে তাদের ভাল হয়—আর, কিছু দিন আগে নতুন ছাঁদের একটা কাপড়-কাচা যন্ত্র দেখেছে, চাকরি ছেড়ে দিলে সে সব শীগ্‌গির আর হবে না। তাছাড়া বাড়িতে বসে থাকতেও ভাল লাগে না তার। কাজের দিনের কথা ছেড়ে দাও, ছুটির দিন তো তারা সবাই এক সঙ্গে কাটায় হৈ হৈ করে, বেড়াতে চলে যায় গাড়ি নিয়ে।

জিনিসের পিছনে এই ছোটার অবশ্য শেষ নেই। পাশের বাড়িতে দশ ইঞ্চির টেলিভিশন কিনেছে, আমাদের চাই বারো ইঞ্চি; জোন্‌স কিনলে নতুন শেভ্রোলে, সুতরাং স্মিথের মনে হবে পুরনো গাড়িটা বেচে দিয়ে একটা ক্যাডিলাক আনতে না পারলে মান থাকে না। শুনেছি যাদের টেলিভিশনের পয়সা নেই তাদের কেউ কেউ শুধু একটা এরিয়াল বসিয়ে রাখে ছাতের উপর,—প্রতিবেশীরা ভিতরে এসে দেখতে চাইলে কি করে জানি না! পৃথিবীর লোকে কটাক্ষে বলে আমেরিকানরা খালি টাকাই চিনেছে (হয়তো এর মধ্যে কিছুটা ঈর্ষাও আছে)। এরা বলে টাকাটাই আসল নয়, উদ্যোগ আর অধ্যবসায় বড় কথা। সব দেশেই অধিকাংশ লোকে টাকা পেলে আর কিছু যে চায় না এ কথা কে অস্বীকার করবে? আমার মনে হয় না আমেরিকানদের সংসারে সুখ কম অন্য দেশের তুলনায়।

এই প্রসঙ্গে কালচারের কথা ওঠে। কালচার যদি হয় শুধু জুতোর পালিশ আর মৌখিক ধন্যবাদ তাহলে এরা অন্য কোনো জাতির চেয়ে ছোট নয়। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি বলতে যদি বুঝি সেই সব জিনিস যার সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজন শারীরিক সুখ-সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, যদি বুঝি সেই সব সৃষ্টি যা আসে মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার তাগিদে, তবে এরা অনেক পিছনে পড়ে আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য ইত্যাদিতে এদের দান অপেক্ষাকৃত কম, যদিও মৌলিকতার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। এরা বলে আমরা নতুন জাত, এখনো ঐতিহ্য গড়ে উঠবার সময় হয়নি।

জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ যখন হয়েছে কোনো জাতির তখনি তার শিল্পসৃষ্টি ও উপভোগ বেড়েছে। কিন্তু দরিদ্র য়োরোপের তুলনায় আমেরিকায় শিল্পের সেই মর্যাদা নেই, সে জন্যই কালচারের খোঁটা শুনতে হয় ওদের। ইটালিতে সাধারণ লোকের অপেরা দেখতে যাওয়া আমেরিকায় সিনেমা দেখার মত স্বাভাবিক। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে সাধারণ আমেরিকানের অবসর বিনোদনে ক্রমশই বাড়ছে শারীরিক উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য—এদের ভাষায় having a good time অথবা hahing fun। এর মধ্যে খেলা-ধূলা ও স্বাস্থ্যকর কার্যকলাপের অনেকখানি স্থান আছে সত্য, কিন্তু তার তুলনায় মননশীলতা বড়ই অনাদৃত। আমেরিকান রেডিও ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক লঘু,—সিংহল বেতারের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা তার আংশিক আন্দাজ করতে পারবে। আমেরিকার রেডিও শ্রোতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলে হাসি-ঠাট্টা করে, তা মন্দ লাগে না, কিন্তু ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপন এক এক সময় অত্যন্ত পীড়া দেয়, তা ছাড়া সস্তা নাচ-গানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুপাক বিষয় এত বিরল যে মনে হয় সে দিকে বুঝি এদের রুচি নেই।

আমেরিকায় বর্ণভেদ এবং বিশেষ করে নিগ্রো-সমস্যা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে। বাইরের জগতের কাছে এই প্রশ্নের সন্তোষ জনক জবাব দেওয়া এদের সব চেয়ে বড় সমস্যা। একথা সত্য যে, দক্ষিণ অঞ্চলের কোনো কোনো প্রদেশে নিগ্রোদের পৃথক্‌ করে রাখা হয়েছে আইন করে; তাদের জন্ম আলাদা স্কুল, ট্রেনে আলাদা গাড়ি—এমন কি টিকিটঘরও ভিন্ন। নিগ্রোদের অধিকাংশই এখনো শ্রমিক। কোনো কোনো জায়গায় আইন না থাকলেও হোটেলে ক্লাবে তাদের প্রবেশ নিয়ে গোলমাল হয়ে থাকে। লিঞ্চিং-এর খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়। গত মহাযুদ্ধের ফলে সেনাবাহিনীতে নিগ্রো পার্থক্য অনেকটা কমে গেছে; সম্প্রতি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রহণ করেছে—কেউ স্বেচ্ছায় কেউ আইনের নির্দেশে। ওয়াশিংটনের বেশী দক্ষিণে আমার যাওয়া হয়নি কিন্তু ঐ শহরেও খানিকটা জাতিভেদ আছে বলে শুনেছিলাম। আমাকে কোনো অসম্মান সইতে হয়নি বা চোখেও কিছু পড়ে নি। শ্বেতাঙ্গের ট্যাক্সিতে নিগ্রো সওয়ার, রেস্তরাঁতে নিগ্রোর সেবায় শ্বেতাঙ্গ পরিবেশিকা সেখানেও দেখেছি, যেমন চোখে পড়েছে উত্তরের প্রদেশগুলিতে। অবশ্য নিউ ইয়র্ক, বষ্টন এবং আরো অনেক সহরে তারা বাস করে পৃথক্‌ পল্লীতে, সে সব এলাকায় শ্বেতাঙ্গ প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু কাজের সময় তারা মিশে

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের মর্মরমূর্তি

যায় শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে সমস্ত সহরে, আপিসে কলেজে হোটেলে রেলগাড়িতে। কোন রকম ভয় বা সংকোচ চোখে পড়ে না তাদের চলাফেরায়।

অপাঙ্‌ক্তেয়-বর্ণের সঙ্গে একত্র কাজ করা আর একত্র বাস করার মধ্যে বোধ হয় শ্বেতাঙ্গের চোখে অনেকখানি পার্থক্য। মনে পড়ে এক গল্প যা নিয়ে সংবাদপত্রে কিছু দিন বেশ হৈ-চৈ চলেছিল। চীন দেশে কমিউনিষ্ট শাসন আসার পরে প্রাক্তন সেনাদলের এক অফিসার আমেরিকায় পালিয়ে আসে। শিক্ষিত যুবক সে, রাজনীতিও ঠিক আছে, সুতরাং কাজ পেতে তার দেরি হল না সাউথউড নামে এক জায়গায়। বিপদ হল বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে।" প্রতিবেশীরা বেনামী চিঠি এবং অন্যান্য উপায়ে তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সে পাড়ায় থাকা চলবে না। ছেলেটি উঠে যেতে রাজী নয়,—লিংকন ওআশিংটনের দেশে এ কখনো সম্ভব হতে পারে না! আমেরিকায় উচিত বিচার আর সমান অধিকার সম্বন্ধে কলেজে যা পড়েছে তার কথা বলে, শুভার্থী যারা ছিল তারা বলে বই আর বাস্তব এক জিনিস নয়। তবু সে মানতে রাজী নয়,—অল্প কয়েকটি অশিক্ষিত সংকীর্ণমনা লোক তাকে যেতে বললেই সে যাবে না, ভোট নিয়ে এর মীমাংসা হওয়া উচিত। ভোটের ফলে ভীষণ হার হল তার। কিন্তু যাবার আগে প্রতিবেশীরা বিশেষ যত্নে এ-কথাটা বুঝিয়ে দিল তাকে যে, ব্যক্তিগত ভাবে তার প্রতি তাদের কোনো আপত্তি নেই, শুধু ভয় যে non-Caucasian অশ্বেতাঙ্গ এখানে থাকলে পাড়ায় জমির দাম ভয়ানক কমে যাবে।...এই কারণেই নিগ্রোদের বানাতে হয় হার্লেম শহরে শহরে।

এই ঘটনাটি নিয়ে বিতর্ক চলেছিল, ভোট হয়েছিল, তাই অনেকে জানতে পেরেছে। নীরব চোখের জলে অনেক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় সন্দেহ নেই। শুধু যে নিগ্রো বা এশিয়ার লোক নিয়ে তা নয়; দক্ষিণ বা পূর্ব-য়োরোপের লোক যারা এদেশে এসে বাসা বেঁধেছে তাদের পক্ষেও এদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশে যাওয়া ইংরেজ বা জার্মানের চেয়ে বেশী কঠিন। এমন কি, সরকারী নিয়মেও বিদেশী আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ভাগ করা আছে দেশ অনুসারে। এ ছাড়া ইহুদীদের দুর্গতি তো আছেই, কিন্তু তা আছে পাশ্চাত্যে প্রায় সর্বত্র।

এই যে গায়ের রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বর্ণ দিয়ে মনুষ্যত্ব বিচার এ অবশ্য নির্বোধ সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। কিছু দিন আগে ইউনেস্‌কো-র উদ্যোগে এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জাতি বা বর্ণ অনুসারে মানুষের ক্ষমতা বা উৎকর্ষের কোনো রকম তারতম্য করা যায় না। কিন্তু অজ্ঞতা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে তথ্য যে প্রায়ই অত্যন্ত দুর্বল তার প্রমাণ সব দেশে সব ঘরেই অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে। কালোর তুলনায় ধলার প্রতি মানুষের আকর্ষণ তেমনি এক সংস্কার—কনে পছন্দ করার সময়ও আমরা তা প্রকাশ করি। অনেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবে যাকে দেখতে ভাল সে লোকটাও ভাল, যে কালো সে হীন—বিপদ আরম্ভ হয় সেখানেই। অবশ্য মনুষ্য-চরিত্রের পরিবর্তন আসে শিক্ষার প্রসার আর সমাজের অমোঘ অবস্থা বিন্যাসের ফলে। আজ নিউইয়র্কে নিগ্রো যতখানি সাম্য পেয়েছে নিশ্চয় দাসত্বের দিনে তা ছিল না। এত গাঢ় কালো রঙের এতগুলি লোক যে শ্বেতাঙ্গের ভীড়ে এমন সহজ ভাবে চলাফেরা করছে এটা জানতে পারা আমেরিকা ভ্রমণের অন্যতম প্রধান এবং প্রসন্ন বিস্ময়। যারা আমেরিকার দুর্নাম করে বর্ণভেদ নিয়ে, তাদের সমাজে সমস্যাটা এত বড় হয়ে দেখা দেয়নি কখনো, দিলে সেখানে নিউ ইয়র্কও আজ হত কি না কে জানে!

যে গৃহকর্ত্রী ঘর-ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছে সে যদি দরজা খুলে কালো চেহারা দেখে হঠাৎ চমকে যায়, বলে ঘর আর খালি নেই, তবে সে মানুষটা যে খুব মন্দ তা নয়, সেখানে তার জন্মগত সংস্কারই প্রকাশ পাচ্ছে। পাশ্চাত্যবাসী প্রাচ্যদেশীয়দের পক্ষে এ খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম মাথা গরম হত, এখন দুঃখও বড় একটা হবে না। একদা ক্যানাডার এক সিনেমা-ক্লাবের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে একটি মহিলা নির্দেশপত্র বিলি করতে করতে আমাকে বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। একটু পরে পাশের ভদ্রলোকটি সবিনয়ে তার কাগজটি আমাকে এগিয়ে দিলেন। কাগজ নেওয়া ও দেওয়ার মধ্যে তার ভাবে এতখানি সংকোচ ছিল যে অনুভব করলাম ব্যাপারটা তাকে আঘাত করেছে আমাকে না করলেও; এবং এই জিনিসটা আমার মনে দাগ কাটল অনেক বেশী ঐ ভদ্রমহিলার ব্যবহারের থেকে। আর যাই হক, দেশে দেশে লোকের ব্যবহারে আতিথ্য আর খাতিরই প্রায় সর্বদা চোখে পড়ে।

আমেরিকায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান বলতে এরা এখনো বোঝে আমেরিকার আদিম অধিবাসী, সুতরাং নিজের পরিচয়ে আমাদের বলতে হয় 'ভারতের লোক'; 'আমি ইণ্ডিয়ান' না বলে বলা দরকার 'ইণ্ডিয়ার থেকে এসেছি'। সাড়ে চারশো বছর আগে কলম্বাস যে ভুল করেছিল আজো এরা তারই সূত্র ধরে চলেছে। এখনো অনেক সংবাদপত্রে ভারতীয়রা, সাধারণ ভাবে 'হিন্দু' নামে অভিহিত।

যে আমেরিকা লক্ষ লক্ষ বিদেশী উদ্‌বাস্তুকে আশ্রয় দিয়ে ভাই বানিয়ে নিচ্ছে, যে আমেরিকা দেশে দেশে ঢেলে দিয়েছে অফুরন্ত ডলারের স্রোত, সেই দেশকে কেন বাইরের অধিকাংশ লোকে পছন্দ করে না, কেন সন্দেহ করে কেবলই, বর্তমান কালের এ এক অতি রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন! এদের মধ্যে এ নিয়ে রাগ বিরক্তি দুঃখ এবং নিছক বুঝতে না পারার সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব। যাদের জন্য এত করে তারাই চায় না দেখে অনেকের মন বিষিয়ে গেছে, অনেকেরই জিজ্ঞাসা এর হেতু সম্বন্ধে।

আমার মনে হয়েছে হেতু একটা নয়, অনেক। এবং তাদের প্রায় সবগুলিরই উদ্ভব সমষ্টির থেকে, ব্যক্তির থেকে নয়। ব্যক্তি-বিশেষের সংস্পর্শ মুগ্ধ করে; সন্দেহ ও অসদ্ভাবের জন্ম সরকারী রাজনীতি, সংবাদপত্র ও বেতারের সুর থেকে, কিছুটা এদের জাতিগত রুচির থেকে।

একটা প্রবাদ আছে যে, অপকার ভোলা সহজ কিন্তু উপকার ক্ষমা করা যায় না। তাই ভিক্ষার বিনিময়ে ভালবাসা পাওয়া যায় না, বড় জোর মেলে কৃতজ্ঞতা, কখনো বা ঘৃণা। যে সব দেশ পেটের দায়ে আমেরিকার কাছে হাত পাতে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি নিশ্চয় কিছুটা বিদ্যমান। কিন্তু এতে আমেরিকা খুশী হবে এমনও আশা করা চলে না। এদের বিরক্তি কখনো অজ্ঞ

স্কেচ
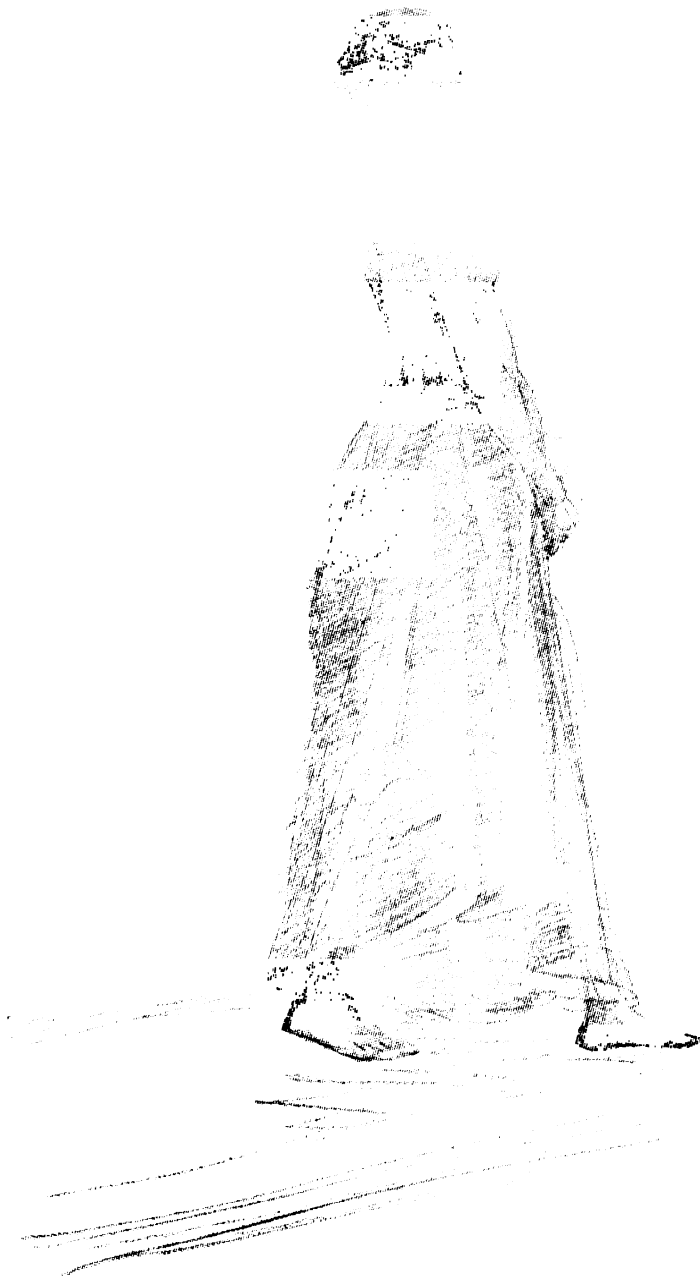
—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

মাসিক বসুমতী

।। চৈত্র, ১৩৬০ ।।

কারণেও বাড়ে। কংগ্রেস যখন ভারতে গম পাঠানো মঞ্জুর করলে তখন দু'-এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে এ কথা সত্যি কিনা যে আমাদের দেশে মানুষের খাবারে জন্তু-জানোয়ারে ভাগ বসায়? ষাঁড় বা বানরের জন্ম পৃথিবীর ওপারে খাবার পাঠাবার বিশেষ ঠেকা নেই এমন কথা কেউ মনে করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যেখানে নরেরই মন পাওয়া যায় না সেখানে বানরের সেবায় কী লাভ!

কালচারের প্রসঙ্গ আগে আলোচনা করেছি। এদের লঘুতা এবং আর্থিক মোহের প্রতি কটাক্ষ করেও অনেকে এ জাতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। যে জাতি বিশ্বকে দিয়েছে শুধু কোকা কোলা আর কমিক তার এখনো বয়স হয়নি, ভাবটা এই। এই কমিক ছবির প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দেখে বিস্ময় কাটিতে চায় না। প্রতি বছর কমিকের বই যা ছাপা হয় ওজনে তা এক সঙ্গে আর সমস্ত বিষয়ের বইকে হার মানাবে। এবং শুধু শিশুরাই নয়, বয়স্করাও দুনিয়া ভুলে যায় সংবাদপত্রের কমিক-পৃষ্ঠা খুলে। শুনেছি তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা খবর পড়বার সময় পান না। কমিকের প্রসিদ্ধ চরিত্র L'il Abner এত কাল ছিল অবিবাহিত, হঠাৎ এক দিন কাগজে দেখা গেল সে সংসারী হয়েছে। দেখতে দেখতে দেশ দু ভাগ হয়ে গেল সমর্থনে আর প্রতিবাদে; জনমতের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে আনন্দ আর শোকের বন্যা বয়ে চলল দিনের পর দিন। যদি কাগজে সেদিন থাকত কোথাও আণবিক বোমাপাতের খবর তাহলেও এত লোকের মন এমন চঞ্চল হত কি না সন্দেহ। দেখে-শুনে মনে হয়, এত বড় বাস্তব জগতটার সুখ-দুঃখের চেয়ে L'il Abner-এর ঘরোয়া ব্যাপারে আমেরিকানদের গরজ বেশী! কমিক আজ এখানে প্রকাণ্ড ব্যবসা—শুধু খবর কাগজে নয়, বই বেতার টেলিভিশন এবং সিনেমায় পর্যন্ত। তা ছাড়া জামা কাপড় এবং ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসেও তা বিস্তৃত হয়েছে, বিদেশে ডালপালা ছড়াচ্ছে। কমিক-শিল্পীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেন, দেশে তাদের খুব আদর।

বিদেশীয় বিদ্বেষের আরেকটা বড় কারণ এদের পররাষ্ট্রনীতি। চরম দক্ষিণপন্থা আশ্রয় করে একেবারে অনড় ও একরোখা হয়ে বসে থাকা এবং বিপক্ষকে সব কিছুর জন্য দোষী করা, গালাগালি করা, অনেকের বিচারে এতে বিশ্বশান্তির আশা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। নতুন চীনকে না মানা এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকা বলে শুধু স্বাধীন দেশ হওয়াই যথেষ্ট নয়, 'উপযুক্ত' হতে হবে। অনেকেই বোঝে না যে তাহলে সেই কারণেই রুশ বা যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গেও রাজনৈতিক আড়ি করে না কেন সে, অথবা জাতিসংঘ থেকে তাদেরও নিষ্ক্রান্ত করা হয় না কেন?

আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রায়ই দেখা যায় যে, সমষ্টির স্বার্থের চেয়ে কোনো নেতা বা ব্যক্তিবিশেষের সম্ভ্রমের প্রশ্নই যেন বড় হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারেও আমেরিকার দান কম নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি বলেন যে, তিনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন কিন্তু তাকে আসতে হবে এদেশে, তবে জগতের লোক ভাবতে পারে যে এই সামান্য কারণে তাদের সুখ-শান্তির পথে কাঁটা পড়বে এটা অন্যায় এবং অনুচিত। তার পর আমেরিকার নেতারা কংগ্রেসের সদস্যরা বিদেশ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বেশ অপমানকর উক্তি করে থাকেন। য়োরোপ এশিয়ার কথা ছেড়েই দিলাম, কিছু দিন আগে এক কংগ্রেসম্যান বিল প্রস্তাব করেছিলেন যে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঋণের পরিবর্তে ক্যানাডাকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হক। পরে সাংবাদিক-মহলে তিনি বললেন ক্যানাডা যে স্বাধীন দেশ তা তার জানা ছিল না। এর ফলে 'সুহৃদ প্রতিবেশী' ক্যানাডাও দিনের পর দিন সংবাদপত্রে ও বেতারে যা সব মন্তব্য করেছে এবং সাধারণ লোকের কথায় যা ঝাল প্রকাশ পেয়েছে তা প্রত্যক্ষ দেখে জগতের অন্তরের কথা ভাবতেও শিহরণ হয়।

প্রপাগাণ্ডার পিছনে কিছুটা মনস্তত্ত্ববোধ থাকা দরকার। লৌহপর্দার দু'দিক থেকেই আজ যে প্রপাগাণ্ডার ঝড় বয়ে চলেছে তার ঘূর্ণিতে পড়ে সাধারণ লোকের মাথা ঠিক রাখা কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো উক্তি হজম করা দুরূহ। যে সব আমেরিকানকে কমিউনিষ্টরা এযাবৎ গুপ্তচর বলে বন্দী করেছে তাদের সবাই যদি নির্দোষ হয় তবে একথা মানা প্রায় দরকার হয়ে পড়ে যে আমেরিকার গুপ্তচর নেই! অথচ চলচ্চিত্রে এবং বইপত্রে বহু আমেরিকান বীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে যারা শত্রুর দেশে গিয়ে গোপনে তাদের সব ষড়যন্ত্র নষ্ট করলে। তারপর, কমিউনিষ্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে যারা মাঝে মাঝে আমেরিকায় আশ্রয় ভিক্ষা করে তাদের অনেকে হয়তো অত্যাচারের ভয়েই দেশ ছেড়েছে, কিন্তু এও হতে পারে যে কখনো কখনো ঐ অজুহাত আমেরিকায় ঢুকবার 'শর্টকাট'। এই প্রাচুর্য্যের দেশ লোভ জাগায় অনেকের, কিন্তু সাধারণ উপায়ে ঢোকার দরজাটা সরু, অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনেক দিন।

আমেরিকার অভিযোগ যে কমিউনিষ্ট দেশে চলাফেরা অনেক বাধা। অথচ বিদেশী পর্যটকের পক্ষে আমেরিকার প্রবেশপত্র পাওয়া এখন বেশ কষ্ট ও সময়-সাপেক্ষ এক নতুন আইনের ফলে। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কখন কোন জায়গায় বাস করেছে আগন্তুককে তার তারিখ ও ঠিকানা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় মিথ্যা শপথের দায়ে পড়বে না এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি খুব কম লোকেরই আছে। এছাড়া সব আঙুলের ছাপ—একযোগে এবং পৃথক—দিতে হয়েছিল আমাকে দুই কিস্তিতে। অনেক রকম দলিলপত্র দাখিল করার পর, প্রায় এক ডজন স্বাক্ষর ও স্বদেশ বিদেশে নানা অনুসন্ধানের পর ভিসা পাবার যখন সময় হল প্রায় দেড় মাস বাদে, তখন হাত তুলে শপথ করতে হল ঈশ্বরের নামে যে মিথ্যা বলিনি কিছু, যদিও কাগজে-কলমে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আগেই। এ-সব যদি প্রয়োজন হয় আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য তবে রুশও বলতে পারে সেই কথা—এবং তাদের শত্রু যে আমেরিকার চেয়ে বেশী তা আমেরিকা নিজেই স্বীকার করবে।

কমিউনিজমের গন্ধ বা সন্দেহ কোনো দিন যাদের গায়ে লেগেছে তাদের প্রবেশ নিষেধ এদেশে অল্পদিনের জন্যও। এ দলে আছেন অনেক বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী, যাদের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক ছিল না রাজনীতির। এই শ্রেণীর আমেরিকানরাও বিদেশে যাবার ছাড়পত্র পান না। সেনেটার ম্যাকার্থির উদ্যোগে এদের সংখ্যাও

ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেরাণী শিল্পী শিক্ষক যাজক আজ সবাই তটস্থ জুজুর ভয়ে। বিদেশে আমেরিকার মানহানির সব চেয়ে বড় কারণ সেনেটার ম্যাকার্থি একা।

রাজনীতিতে কথা ও কাজের তারতম্যও প্রায়ই চোখে পড়ে এদেশে। আমেরিকা যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তা এশিয়া ও আফ্রিকা বহু দিন ধরে শুনে আসছে। অথচ জাতিসংঘের ভোটে সে সর্বদা ইংলণ্ড ফ্রান্স হল্যাণ্ডের দলে,—কারণ এর পরিবর্তে হয়তো চীনের নির্বাসন ব্যাপারে ঐ বন্ধুদের ভোট দরকার। অবশ্য power politics-এর কাছে নীতির পরাজয় পৃথিবীর অন্যত্রও প্রায়ই চোখে পড়ে।

আমেরিকান রাষ্ট্রসংবিধানের এক নীতি প্রায়ই শোনা যায় বক্তৃতায় বেতারে, পড়া যায় বইয়ে সংবাদপত্রে যে সব মানুষ সমান হয়ে জন্মায়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিভাগে (Ecosoc) এক আলোচনা শুনছিলাম একদিন, ঐ নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলে আজ আমেরিকার সমাজ সোভিয়েটের তুলনায় এত শ্রেয়: একথা বললেন আমেরিকার সদস্য। তার অল্পদিন আগে রিপাবলিকান পার্টির অধিবেশন হয়ে গেছে প্রেসিডেণ্ট প্রতিযোগিতার সদস্য নির্বাচনের জন্য। সেই সভায় একটি প্রস্তাব আনা হয় যে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সব লোকের জীবিকার অধিকার ও সুযোগ সমান হওয়া উচিত—সোজা কথায় চাকরিতে লোক নেওয়ার সময় একমাত্র কর্মক্ষমতাই বিবেচ্য। প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয়নি।

মনে পড়ে, জাতিসংঘের সেই সভায় দেশের বাসব্যবস্থা ও খাদ্যমানের উন্নতি। প্রমাণ-স্বরূপ আমেরিকার প্রতিনিধি এ-ও বলেছিলেন যে ক্ষয়রোগে মৃত্যু কমে গেছে। সেই দিনই সকালে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এক খবরে বলা হয়েছিল যে এটা ঘটেছে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ফলে; ক্ষয়রোগের আক্রমণ কমেনি—আরোগ্যের সংখ্যা বেড়েছে অথবা রোগীর আয়ু প্রলম্বিত হয়েছে মাত্র। বলা বাহুল্য, এতে প্রমাণ হয় না যে সাধারণ স্বাস্থ্য বা স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির উন্নতি হয়েছে। নতুন ওষুধের ফলে এখন ক্ষয়রোগে মৃত্যু সব দেশেই কম আগের চেয়ে।

আর বাড়িয়ে লাভ নেই, এ সব দোষ অন্যান্য দেশেও আছে, কিন্তু কম মাত্রায়। ভাবলে দুঃখ হয় যে, প্রধানত রাজনীতির চক্রান্তে বিদেশে আমেরিকা-বিদ্বেষ গড়ে ওঠে, সাধারণ লোক সম্বন্ধে এমন ধারণা প্রসারিত হয় যার অধিকাংশই মিথ্যা। আমেরিকায় আমার সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা এই সত্যের আবিষ্কার যে আতিথ্য, বন্ধুত্ব, ঔদার্য এবং অন্তর্নিহিত সাম্যবোধে এরা কোনো জাতির খাটো নয় বরং অনেকের বড়। সাধারণ লোকের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য আশঙ্কা করেছিলাম প্রসন্ন-বিস্ময়ে দেখলাম তার চিহ্ন নেই। মানুষ সর্বত্রই প্রায় এক, কিন্তু দূর থেকে কত সহজেই ভুল ধারণা জন্মায় বিদেশ সম্বন্ধে!

যে জিনিসটা এদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় তা হল পরস্পরের প্রতি এদের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সাম্য ও মানবিকতাবোধ। এক রেস্তরাঁয় মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, সেখানে সকালে যে লোকটি বাসন ধোয়ার কাজ করত বিকালে সে সেজেগুজে আসত বেড়াতে। দোকানের মালিকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কফি খেত, হাসি গল্প করত, কোনো কোনো সন্ধ্যায় এক সঙ্গে বেড়াতে যেত তারা। এটা উত্তর-আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও সম্ভব বলে আমি জানি না। ইংলণ্ডে ও য়োরোপেও ছোট-বড়র মধ্যে আমাদের মত অধিকার ভেদাভেদ নেই কিন্তু সেখানেও পারস্পরিক ব্যক্তিগত ব্যবহারে জড়তা বেশী আমেরিকার চেয়ে। বয়সের আর মর্যাদার ব্যবধান ডিঙিয়ে এরা অনায়াসে নাম ধরে ডাকে, দিলখোলা আলাপ করে—এদের সামাজিকতা সহজ ও স্বাভাবিক। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

হৃদয়ে আমার

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
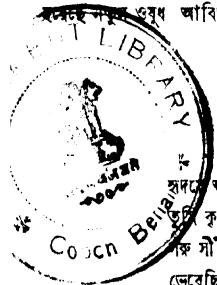
হৃদয়ে আমার জ্বালা—ধূধূ বালিয়াড়ি,
তুমি কৃশাঙ্গী রূপালি জলের রেখা
বঙ্কু সাঁথি-পথে ঘুরে ঘুরে এই বাঁকে
ভেবেছিলে পাবে বন্ধুজনের দেখা;
আমি ধু-ধূ বালি সূর্যের শরাহত
মরুর জ্বালায় জ্বলে যাই অবিরত।

পরস্পরের হবে মন জানাজানি
হেন অবসর মেলে না সারা জীবন,
অপরাহ্ণের তন্দ্রালু আবছায়ে
তুমি খোঁজ দুটি প্রেমিক বাহুর কোণ;
ভয় হয় পাছে তৃষ্ণার গণ্ডূষে
ক্ষীণ প্রাণ-ধারা পান করে নিই শুষে
তাই দূরে থাকি, বুকে ব্যথা রাখি পুষে
অন্তরে করি তোমার উজ্জীবন।

পরস্পরের হবে মন জানাজানি
হেন অবসর মেলে না সারা জীবন।

ভয় হয় পাছে আমার বুকের জ্বালা
শুকায় তোমার বরণ-ডালার ফুল;
ভয় হয় পাছে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া
অকালেই করে তোমায় ছিন্নমূল!

কণ্ঠে তোমার মিলনোৎসুক বাহু
যত কাঁপে তত সরে যাই উদ্বায়ু,
বুক ঠেলে ওঠে তপ্ত ঘূর্ণি-বায়ু
আকাশে ছড়ায় মরীচিকা হাহাকার;
হে নদী রূপালি, আমি ধূ-ধূ বালি,
তোমার আমার সময় হয় না আর!
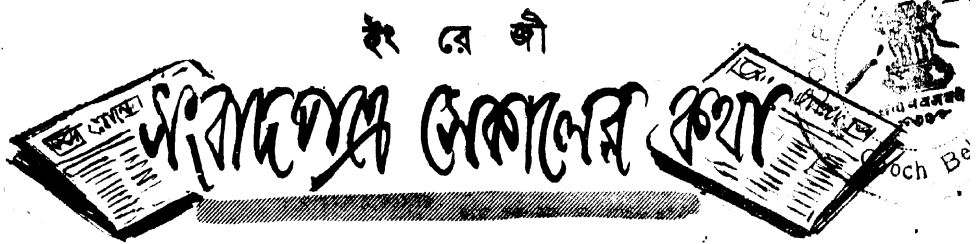
সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

ঢাকার মসলিন

এক শতাব্দী পূর্বেও মনোহর সূতী বস্ত্র উৎপাদনে ঢাকা নগরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীতে কেহ ছিল না। সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত করবার জন্য বিশদ শ্রমবিভাগের আয়োজন ছিল। মসলিন প্রস্তুতের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের নিপুণতা ছিল অত্যন্ত উচ্চ স্তরের; বিশেষ করে অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটতে খুবই দক্ষতার প্রয়োজন হতো, যুবতী মেয়েরা প্রত্যূষে মাঠের শিশির শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তকলীতে সূতা কাটত; কারণ সূতা এত সূক্ষ্ম ছিল যে সূর্য উঠলে হাত দেওয়া যেত না। সূতা কত সূক্ষ্ম হতো তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এক রত্তি তুলা থেকে আশী হাত লম্বা সূতা তৈরি হতো। সূক্ষ্ম সূতার যে ওজন তার দেড় গুণ বিশুদ্ধ রূপা দিলে সূতা কিনতে পাওয়া যেত। রিফুকারদেরও খুব দক্ষতা ছিল; মসলিন থেকে একটি আস্ত সূতা খুলে তার চেয়ে সরু সূতা অনায়াসে ভরে রাখতে পারত। অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূতার জন্য যে সব তুলার ব্যবহার করা হতো তাদের চাষ ছিল ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সোনারগাঁর তুলা। এ সব কার্পাসের আঁশ এত ছোট যে মানুষের আশ্চর্য দু'খানি হাত ছাড়া অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যেই মসলিনের জন্য সূতা কাটা সম্ভব ছিল না। সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন দিল্লীর রাজপরিবারের বাৎসরিক নতুন পোষাক তৈরী করতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেত।

১৭৫৭ সালে বৃটিশ শক্তি বাঙলা দেশ আক্রমণ করে এবং এই সুন্দর ও দুর্ভাগা দেশের শাসনভার ইংরেজ কোম্পানী অধিকার করে; কোম্পানীর কুঠিগুলি ধীরে ধীরে বাঙলা দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য হস্তগত করতে থাকে। বাঙালীদের প্রতি যে বীভৎস নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে তা বৃটেনের নামে দুরপনেয় কালিমা লেপন করেছে। ঢাকার তাঁতীদের যে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে অন্য কোনো শ্রেণীর লোকেরই তা করতে হয়নি। দলপতিদের বেছে বেছে ধরে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখত, কখনো বা পা উপরে বেঁধে মাথা নিচে ঝুলিয়ে রাখা হতো; এমনি নানা ধরণের নিষ্ঠুর অত্যাচার চলত তাদের উপর। তার পর জোর করে এদের দিয়ে স্বীকারোক্তি সই করানো হতো এই বলে যে উৎপীড়নটা বেশ ভালো লেগেছে এবং তারাই অনুরোধ করেছে অত্যাচার করবার জন্য! এই অত্যাচারের ফলে ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকরা ঢাকার কুঠি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলো; তাঁতীরাও ঢাকা শহর ছেড়ে আশ্রয় নিল অন্য প্রদেশে। বস্ত্র বয়নের দক্ষতা গোপন করে তারা চাষ আরম্ভ করল। যারা ঢাকা থেকে পালাতে পারেনি তারা কোম্পানীর কুঠির ক্রীতদাস হয়ে পড়ল; কুঠির সাহেবরা এমন বর্বরোচিত অত্যাচার করত যে কোম্পানীর কাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক তাঁতী আঙুল কেটে ফেলত। ১৭৯৩ সালের আইন নিয়ে যদিও গর্ব করা হয়, এবং যদিও তা প্রয়োজনীয়, তথাপি এই আইন কোম্পানীর হাত থেকে তাঁতীদের সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেনি। আইনের সাহায্যে অত্যাচারকে প্রবঞ্চনামূলক দাদনের নামে চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্লীর উদার বাণিজ্য নীতির ফলে কাপড়ের ব্যবসায়ে বাঙলায় কোম্পানীর একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটল। কোম্পানীর একাধিপত্য থেকে বাণিজ্য মুক্তি লাভ করবার ফলে ঢাকার অবশিষ্ট তাঁতীরা রক্ষা পেয়েছে। ১৮০১ সালের পূর্বে কোম্পানী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঢাকার মসলিনের জন্য মিলিত ভাবে পঁচিশ লক্ষ টাকারও অধিক অগ্রিম দাদন দিয়েছে বলে অনুমান করা হয়; কিন্তু ঐ বছর দাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে; কোম্পানী দিয়েছে ৫,৯৫,৯০০৲ টাকা; এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ৫,৬০,২০০৲ টাকা; মোট ১১,৫৬,১০০৲ টাকা। ১৮১৩ সালে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা ২,০৫,৯৫০৲ টাকার অধিক অগ্রিম দেয়নি, কোম্পানীর দাদনের পরিমাণও এর চেয়ে খুব বেশী ছিল না। ১৮১৭ সালে কোম্পানী'র কুঠি উঠে যাওয়ায় তাঁতীদের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। ১৮২০ সালে ঢাকার এক জন অধিবাসী চীন থেকে বিশেষ অর্ডার পেয়ে দশ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া দু'খণ্ড মসলিন দু'শ টাকায় কিনেছিলেন। মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে দশ তোলা। ১৮২২ সালে ঐ লোকই অনুরূপ দ্বিতীয় অর্ডার পান। যারা প্রথম বার মসলিন দিয়েছিল এর মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়েছে, এবং কোথাও সেরূপ মসলিন না পাওয়ায় চীনের অর্ডার বাতিল হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে মসলিন তৈরীর কুশলতা বৃটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্য নীতির ফলে লোপ পেয়ে গেছে। মোটা সূতী কাপড় অবশ্য এখনো উৎপন্ন হয়। তবে বিলাতী কাপড়ের মূল্য যেরূপ সস্তা তাতে মনে হয় দেশীয় বস্ত্র-শিল্প শীগ্‌গির উঠে যাওয়া অসম্ভব নয়।

গত কয়েক বছর যাবৎ ঢাকার কাষ্টম হাউসের মধ্যে দিয়ে যে-সব কাপড় বাইরে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই মোটা। এ সব কাপড়ের মূল্য ১৮২৩-২৪ সালে ছিল ১৪, ৪২, ১০১, টাকা; এবং ১৮২৯-৩০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১, ৬১, ১৫২৲ টাকা। সিল্ক এবং বুটিদার কাপড়ের মূল্যও কমে আসছে। কিন্তু এদেশের সূতার

রপ্তানী বাড়ছে দেখা যায়। ১৮১৩ সালে মাত্র ৪,৪৮০, টাকার সূতা রপ্তানী করা হয়েছিল; ১৮২১-২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১,৩১১৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৮২৯-৩০ সালে এই অঙ্ক আবার হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২১,৪৭৫৲ টাকা।

বর্তমান সময় ঢাকায় মসলিন উৎপন্ন করতে যে ব্যয় হয় তার এক-চতুর্থাংশ মূল্যে বৃটিশ মসলিন সেই শহরেই বিক্রয় করা হয়। এখন ঢাকায় বিলাতী সূতা দিয়ে মলমল তৈরী করা হয় এবং তার মূল্য স্থানীয় সূতায় নির্মিত মলমলের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

—আলেকজাণ্ডার্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড কলোনিয়েল ম্যাগাজিন; ১ম খণ্ড, ৫৪শ সংখ্যা

কলকাতার সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা

সংবাদপত্র অথবা সাময়িকপত্রের নাম	প্রচার-সংখ্যা
বেঙ্গল হরকারু	৭২৬
বেঙ্গল ক্রণিকল	২০৮
বেঙ্গল হেরাল্ড	২৪২
লিটারারী গেজেট	৩৩৮
কোয়ার্টার্লি ম্যাগাজিন এণ্ড রিভিয়্যু	২০০
বেঙ্গল আর্মি লিষ্ট	২৫০
বেঙ্গল অ্যান্নুয়েল	৩৫০
বেঙ্গল ডাইরেক্টরী, অ্যালমানাক, ইঃ	১২০০
	৩৫১৪

এদের জন্য মোট ব্যয় ১,০০,৭৮৮৲ টাকা

সংবাদপত্র অথবা সাময়িকপত্রের নাম	প্রচার-সংখ্যা
ইণ্ডিয়া গেজেট (দৈনিক)	৩৭৩
ইণ্ডিয়া গেজেট (সপ্তাহে তিনবার সংস্করণ)	১৯৫
ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণাল	৬৩
ক্যালকাটা ডাইরেক্টরী	১২০০
	১৮৩১

এদের জন্য মোট ব্যয় ৫৩,৫৯২৲ টাকা

সংবাদপত্র অথবা সাময়িকপত্রের নাম	প্রচার-সংখ্যা
ক্যালকাটা কুরিয়ার (দৈনিক)	১৭৫
ক্যালকাটা কুরিয়ার (অর্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ)	২২৫
গভর্ণমেণ্ট অফিসিয়েল গেজেট	৩০০
	৭০০

এদের জন্য মোট ব্যয় ৫১,৩০০৲ টাকা

সংবাদপত্র অথবা সাময়িকপত্রের নাম	প্রচার-সংখ্যা
জন বুল	৩০৬
ওরিয়েণ্টাল অবজার্ভার	২৩০
স্পোর্টিং ম্যাগাজিন	২৭০
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড সার্ভিস জার্ণাল	১৩০
	৯৮৬

এদের জন্য মোট ব্যয় ৩৩,১৫৬৲ টাকা

সংবাদপত্র অথবা সাময়িকপত্রের নাম	প্রচার-সংখ্যা
ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার	২০০
ফিলানথ্রপিষ্ট	৯২
রিফর্মার	৪০০
জ্ঞানান্বেষণ	১০০
এনকোয়ারার	২০০
সমাচার-দর্পণ	২৫০
কৃশ্চিয়ান ইন্‌টেলিজেন্সার	২৫০
কৃশ্চিয়ান অবজার্ভার	৩৮০
জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি	২০০
	২,২৬২

এদের জন্য মোট ব্যয় ৩৫,৩৬০৲ টাকা

সর্ব মোট ২,৭৪,৩৬৬ টাকা ব্যয় করে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার ৯০৫৩ কপি প্রচারিত হয়।

দৈনিক পত্রিকা ও তাদের সপ্তাহে তিন বার প্রকাশ-সংখ্যা

	দৈনিকের প্রচার-সংখ্যা	সপ্তাহে তিন বার প্রচার-সংখ্যা	মোট
হরকারু এবং ক্রণিকল	৭২৬	২০৮	৯৩৪
ইণ্ডিয়া গেজেট	৩৭৩	১৯৫	৫৬৮
ক্যালকাটা কুরিয়ার	১৭৫	২২২	৩৯৭
জন বুল	৩০৬	—	৩০৬
মোট —	১৫৮০	৬২৫	২২০৫

নিম্নলিখিত তালিকা থেকে দেখা যাবে সমাজের কোন্ শ্রেণী দৈনিক ও তাহার অন্যান্য সংস্করণের কত কাগজ ক্রয় করে:

	বেসামরিক	সামরিক	চিকিৎসক	ব্যবসায়ী	আইনজীবী	পাদ্রী	বিবিধ	বিতরণ ও বিনিময়
হরকারু ও ক্রণিকল	১৩৬	৩০৮	৫১	২০৬	২৪	৩	১৫৪	৫২
ইণ্ডিয়া গেজেট	১০৩	১২৩	৪০	৭৯	—	৫	১৭২	৪৬
ক্যালকাটা কুরিয়ার	৬৯	১২২	১৫	১২১	—	১১	৪	৫৫
জন বুল	১০৪	৮১	৯	—	১৩	১৪	৬০	২৫
	৪১২	৬৩৪	১১৫	৪০৬	৩৭	৩৩	৩৯০	১৭৮

সর্ব মোট — ২,২০৫।

—আলেকজাণ্ডার্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ৭ম খণ্ড, ৪১শ সংখ্যা (১৮৩৪)।

কলকাতায় নতুন বাজার

টিরেটা বাজারের দক্ষিণে অবস্থিত পরলোকগত জোসেফ বারেটোর সম্পত্তি মৃতের ট্রাষ্টীদের ইচ্ছানুসারে মেসার্স জেঙ্কিন্স, লো এণ্ড কোং কর্তৃক নীলামে বিক্রয় করা হয়েছে। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সম্পত্তি ৫১,০০০ টাকায় ক্রয় করেছেন। পূর্বে এই সম্পত্তির মূল্য দেড় লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার প্রধান প্রধান সওদাগরী কুঠিগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরূপ সামান্ত মূল্যে বিক্রয় করতে হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে দ্বারকানাথ ঐ জায়গার উপরে নতুন বাড়ী তুলে এমন সুন্দর ও সুসজ্জিত বাজার প্রতিষ্ঠা করবেন যে ইংলণ্ডের ন্যায় অভিজাত সম্প্রদায় নিজেরাই এখানে এসে বাজার করতে পারবেন। দ্বারকানাথকে এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকা ব্যয় করতে হলেও শেষ পর্যন্ত অন্যান্য বাজার অবহেলিত হবে এবং তাঁর প্রচুর লাভ হবে।

—আলেকজাণ্ডার্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন
সপ্তম খণ্ড, ৪৩শ সংখ্যা, ১৮৩৪।

হিন্দু থিয়েটার সমিতি

গত ১লা এপ্রিল হিন্দু থিয়েটার সমিতির (Hiudu Theatrical Association) সভ্যদের এক সভা বাবু নবকিষেণ সিং-এর বাড়ীতে আহুত হয়েছিল। হিন্দু থিয়েটারকে কি উপায়ে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায় তা আলোচনা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। সভায় একজন সভ্য প্রস্তাব করেন যে হিন্দু থিয়েটারকে স্থায়িত্ব দান করবার জন্য চৌরঙ্গী থিয়েটারে দু'তিনটি অভিনয়ের আয়োজন করা হোক; দর্শনীর অর্থ দিয়ে হিন্দু থিয়েটারের জন্য বাড়ী তৈরী করা হবে। যদি দর্শনীর টাকা যথেষ্ট না হয় তাহ'লে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সভ্যদের নিকট একশ' টাকার শেয়ার বিক্রয় করা যেতে পারে। এই প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। পরবর্তী অভিনয় চৌরঙ্গী থিয়েটারে হবে। এই অভিনয়ের জন্য "মাধব মাহাত্ম্য" নামে একটি সংস্কৃত নাটক নির্ব্বাচিত হয়েছে এবং নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এর পর একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুসারে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে সমিতির কোন সভ্য সন্তোষজনক কারণ না দেখিয়ে নাটকে তার জন্য নির্দিষ্ট পার্ট অভিনয় করতে অস্বীকৃত হলে সমিতির তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে।

—হরকরু, ৬ই এপ্রিল। আলেকজাণ্ডার্স ম্যাগাজিন, ৪র্থ খণ্ড, ২৪শ সংখ্যায় (১৮৩২) উদ্‌ধৃত।

দেশীয় ভাষায় নতুন বই

মহারাজা কালীকিষেণ বাহাদুর সম্প্রতি সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণীর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। "বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী" হিন্দু দর্শন বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। মূল শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এই গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। দেশীয় লোকদের নিকট এই পুস্তকের বেশ প্রসিদ্ধি আছে। অনুবাদ বিশেষ দক্ষতার সহিত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থগুলি অপেক্ষা বর্তমান অনুবাদটি অনেক উন্নত। মহারাজা যে এই ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তা দেখে আমরা সন্তোষ লাভ করেছি। আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে তিনি বৃহৎ দর্শন গ্রন্থ অনুবাদ করবার মতো অবসর পাবেন। ইংরেজরা য়ুরোপের বিজ্ঞান সাধনাকে এদেশের লোকদের নিকট পৌছে দিচ্ছেন; দেশীয় লোকদের কর্তব্য হিন্দু দর্শনের গ্রন্থগুলির ইংরেজী অনুবাদ আমাদের সামনে উপস্থিত করা। আলোচ্য অনুবাদটি এ ধরণের প্রথম গ্রন্থ; আমরা আশা করি এরূপ অনুবাদ পরে আরো প্রকাশিত হবে। এই পরিকল্পনা সফল করতে হলে মহারাজার ন্যায় প্রতিভাবান ও সম্পত্তিশালী তরুণদের সহায়তা প্রয়োজন।

বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক অমরকোষ নামক সংস্কৃত অভিধানের একটি সংস্করণ সদ্য মুদ্রিত করেছেন। এই অভিধানে প্রত্যেকটি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকের প্রায় চারশ' পৃষ্ঠা; যাঁরা নির্ভরযোগ্য অভিধান চান তাঁদের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী। বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের নির্দেশে রামোদয় বিদ্যালঙ্কার অভিধানটি সংকলন করেছেন।

আমরা সংবাদ পেয়েছি যে তিনি এখন অত্যন্ত কঠিন সংস্কৃত ভাষায় রচিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ অনুবাদে ব্যাপৃত আছেন। অনুবাদ সমাপ্ত হলেই ছাপতে দেওয়া হবে।

অমরকোষের শুধু মূল শ্লোকগুলি নিয়ে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র সংস্করণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা মাত্র ১১৫।

সমাচার-দর্পণের সম্পাদক ইংরেজদের প্রথম ভারত আগমন থেকে আরম্ভ করে লর্ড হেষ্টিংসের কার্যকাল সমাপ্তি পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলন ও বাঙলায় অনুবাদ করে ১লা জানুয়ারী শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস অকটে-ভো আকারের দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং প্রতি খণ্ডে প্রায় চারশ' পৃষ্ঠা।

—আলেকজাণ্ডার্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন, ৪র্থ খণ্ড (১৮৩২)

সঙ্গীত

"মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,"

—রবীন্দ্রনাথ

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।"

—রবীন্দ্রনাথ

মাণিক ভট্টাচার্য্য

পূর্ববঙ্গের একটি নগরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা হইতেছিল। যিনি পড়াইতেছিলেন তিনি পূর্ববঙ্গেরই লোক। যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে পূর্ববঙ্গের নাম লোপ পাইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষকের মুখ আজ ম্লান ও গম্ভীর। কণ্ঠ শান্ত ও করুণ।

শিক্ষক বলিলেন—"আমি আজ ক্রীতদাস প্রথা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব। যে ইউরোপ আজ উচ্চ সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত, একদা সেখানকার প্রায় সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। এমন কি, তারা যে মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল সেখানেও এই হীন ক্রীতদাস প্রথার পূর্ণ প্রচলন ছিল। এই ক্রীতদাস প্রথার নামে সেই সব দেশে মানুষ মানুষকে যে অপমান করেছিল তার শতাংশের একাংশও আমাদের দেশে কুখ্যাতি অস্পৃশ্যতার নামে হয়নি। মানুষ গরু-বাছুর ও ইট-কাঠের পর্য্যায়ে নেমে এসেছিল। বাজারে আলু, বেগুন, চাল-দালের মত সে সময়ে মানুষ কেনা-বেচা চলত। পুরুষের শক্তি ও বয়স এবং নারীর রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের উপর তাদের মূল্য নির্ভর করত। কে কিনবে, কত মূল্যে কিনবে, কোন দেশে তারা যাবে বা কি ভাবে তারা থাকবে এ সব জানবার তাদের কোন অধিকার ছিল না—যেমন গরুর থাকে না, ছাগলের থাকে না, ইট-কাঠ ও চূণ-সুরকির থাকে না। তাদের যদি এক বেলা খেতে দেওয়া হত, একদিন অন্তর খেতে দেওয়া হত, না খেতে দেওয়া হত, তাদের তাতে কিছু বলবার থাকত না। তাদের যদি কেবল কাঁকর-মেশানো গম চিবিয়ে খেতে দেওয়া হত, তারা যদি মাত্র শাকের শক্ত ডাঁটি খাদ্য বলে পেত—তাই তাদের নীরবে মেনে নিতে হত। ফল ব'লে ফলের খোসা, শস্য ব'লে শস্যের ভুষি বা ডিম ব'লে ডিমের বহিরাবরণ তাদের খেতে দিলে তাদের কিছুই বলবার অধিকার ছিল না। শাসন সম্বন্ধে তাদের প্রভুরা একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল। তারা ছিল তাদের প্রভুদের সম্পত্তি-বিশেষ যা বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে তাদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। আজ তুমি নরেনের সম্পত্তি কাল তুমি হয়ে গেলে নজরুলের জায়দাদ। তোমার তাতে কোন কথা বলবার নেই, তুমি তার জন্য কোন আপত্তি করতে পারবে না, কোন বাধা দিতে পারবে না। দিলে তোমার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারবে। এই সব দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তুমি যদি কোনখানে পালিয়ে যাও, তোমায় যেমন করে হোক ধরে বেঁধে আনা হবে এবং তোমাকে যত খুসি শাস্তি দেওয়া হবে। সে শাসনে তুমি যদি মরে যাও তো তুমি বেঁচে গেলে।"

এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব ব্যবস্থা এখন তো আর নেই?"

শিক্ষক সে ছাত্রটির পানে ক্লান্ত-করুণ দৃষ্টি মেলে বলিলেন—"কে বললে সে সব ব্যবস্থা এখন আর নেই? সেই হীন, নীচ, স্বার্থান্ধ প্রথা এখন কেবল স্থান পরিবর্ত্তন করেছে। একদা যে প্রথা কেবল ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার কোন কোন দেশকে কলুষিত করেছিল আজ সে ভারতকে আশ্রয় করেছে।"

ছাত্রেরা একটু বিস্মিত হইয়া শিক্ষকের পানে চাহিল।

শিক্ষক ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিয়া স্তব্ধ হইয়া আপনাকে কিঞ্চিৎ শান্ত ও সংযত করিয়া লইলেন। পরে চক্ষু খুলিয়া উদাস-করুণ দৃষ্টি মেলিয়া গাঢ়-কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমাদের এই দেশকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষেরা চিরদিন বাংলা দেশ বলে এসেছি। যেমন এক গ্রামের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম

থাকে, যথা—পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া, উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া বা বামুনপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদি, তেমনি আমাদের এই অংশ ছিল পূর্ববঙ্গ, অপর অংশের নাম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। এই উভয় অংশের হিন্দুদের ধর্ম ছিল এক, মুসলমানদের ধর্ম ছিল এক—কোন পক্ষেরই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না, ভাষা ছিল এক, সাহিত্য ছিল এক, সমাজ-বন্ধন, কুলগত প্রথা সব ছিল এক। বৃটিশের বলিষ্ঠ শাসনের যুগে একে রাজনৈতিক গণ্ডীতে পৃথক্ করবার চেষ্টা হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। তারই ফলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল—যে অমিত তেজে বালক-বৃদ্ধ, নর-নারী বাক্যে ও কার্য্যে প্রতিবাদ করতে সুরু করেছিল তা মনে হলেও আজ রোমাঞ্চ হয় ও চোখে জল আসে। সে সব কথা আজ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু সব বৃথা হল। ঐ সব দেশের পুরাতন ক্রীতদাসত্ব নূতন যুগের ভারতবর্ষে নেমে এল। আমি এই ক্রীতদাসত্ব কোন্ বিষয় লক্ষ্য করে বলছি তোমরা হয়ত এখনও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারনি। সারা পূর্ববঙ্গকে এক মুহূর্ত্তে পাকিস্তানের অন্তর্গত করে দেওয়া হল। এতগুলি প্রাণী—পণ্ডিত-মূর্খ, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বালক-বৃদ্ধ, নর-নারী সবাইকে এক মুহূর্ত্তে অপর এক স্বার্থান্ধ কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন জাতির চক্রান্তে শান্তির রম্য স্থান হতে অশান্তির দাবানলে ফেলে দেওয়া হ'ল। একবার তাদের জিজ্ঞাসাও করা হ'ল না তারাও পরিবর্ত্তন চায় কি না—অন্ততঃ তারা এই এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে চায় কি না। ক্রীতদাসদের স্থান বা প্রভু পরিবর্ত্তনে কোন কিছুই বলবার থাকত না, তাদের মতও নেওয়া হ'ত না। এ ক্ষেত্রেও তা হ'ল না। এমনি করে সোনার বাংলাকে শ্মশান করা হল। ক্রীতদাসত্বের সঙ্গে এর আর প্রভেদ কোথায় রইল? এত দিনকার ঐতিহ্যের আবেষ্টন, এত দিনকার প্রীতির বন্ধন, এত দিনকার সংহতির শক্তি, এত দিনকার অনুপ্রেরণার মন্ত্র বলে যে সুমধুর সভ্যতা রচিত হয়েছিল—যে মনোহর মণিদীপ্ত সুরম্য হর্ম্য গড়ে উঠেছিল একটা স্বার্থ-প্রণোদিত মুখের কথায়, একটা প্রাণহীন কাপুরুষোচিত সমর্থনে সে সব ভেঙ্গে চূরে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এক গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুর স্বার্থসর্বস্ব যাদুকর জাতির মন্ত্র বলে এই সুজলা-সুফলা-সুশীতলা বিরাট দেশের এক অংশ দৈত্যবাহিত হয়ে এক কল্পিত অধিকারীর অধিকারে অগ্নিতপ্ত রক্তাক্ত দেহে চলে এল; আর এক অংশ রইল পঙ্গু, ক্ষীণ, বলহীন, ছিন্নভিন্ন রক্তাপ্লুত দেহে সেই কর্ত্তিত পরহস্তগত তাঁর সেই খণ্ডীকৃত দেশের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে! আমরা জানলাম না, তোমরা জানলে না, তারা জানলে না—আমাদের কাউকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা হল না অথচ আমরা বিক্রীত হয়ে গেলাম। এর মত অধম ক্রীতদাস আর কোথায় আছে? এর মত হীন দাসত্ব প্রথা আর কোথাও কেউ কল্পনা করতে পারে? তাই বলছিলাম ক্রীতদাস প্রথা স্থান পরিবর্ত্তন করেছে মাত্র—লুপ্ত হয়নি। তাই ভয় হয়, এই ব্যবস্থায় কোন পক্ষের কোন কল্যাণ হবে না; এই কূটনীতি ছিন্ন দেহের প্রবাহিত রক্তস্রোতে সারা পৃথিবীর সভ্যতা ভেসে যাবে—এত দিনকার দীপ্ত আলোক ঘোর ঝঞ্ঝায় নির্বাপিত হবে—জল-স্থল-অন্তরীক্ষ দৈত্য-দানবের লীলাভূমি হয়ে উঠবে। প্রবঞ্চনা, স্বার্থ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ভীরুতা দিয়ে যার ভিত্তি গঠিত হয়েছে সে অট্টালিকার বহিরবয়ব ও শীর্ষ যত উচ্চই উঠুক, তাতে যত কারুকার্য্যই থাক—তা কখনও স্থায়ী হবে না। কালের এতটুকু অঙ্গুলী হেলনে সে বিরাট কিন্তু ব্যর্থ রচনা খণ্ড খণ্ড হয়ে কোথায় যে ছিটকে পড়বে তার কোন সন্ধান থাকবে না। আর এই কোটি কোটি নর-নারী যাদের চক্রান্তে, যাদের অপচেষ্টায় এক দিনে ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে—এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেশের দুই দিক থেকে যারা দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বইয়েছে, যারা রক্তের নদী ছুটিয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি কল্পনা করবারও সময় বিধাতা আজও দেখা দেননি। সারা বাংলার একদিকের 'কোথায় যাই' ও অন্য দিকের 'ঠাঁই নাই' রব আজ গভীর আর্ত্তনাদে রূপান্তরিত হয়ে যাঁর পদপ্রান্তে ছুটে চলেছে কবে তাঁর হৃদয় এই পশুবৎ আচরিত বিংশ শতাব্দীর ক্রীতদাসদিগের দুঃখে বিগলিত হবে সেই আশায় যষ্টিতে ভর দিয়ে আজও তোমাদের মুখের পানে চেয়ে রয়েছি।"

আরও কি বলিবার জন্য তাঁহার ওষ্ঠ দুটি দুই-একবার কাঁপিয়া স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল। কেবল তাঁহার দীপ্ত চক্ষু দুটি হইতে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল তাঁহার ম্লান গণ্ডস্থল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ছাত্র দল উন্মুখ হইয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহাদের গুরুর সজল চক্ষু ও ম্রিয়মাণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল!

ইয়োলো রোজ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারি দেবী

আরও এক সপ্তাহ পরে।

রবিবারে অশোক বাবু কন্যাকে নিয়ে পলকে ও তার জননীকে নিমন্ত্রণ করতে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন;—এত দিন বাড়ীর হাঙ্গামায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় যেতে পারেন নি।

হঠাৎ পেলেন একখানি টেলিগ্রাম,—এসেছে বোম্বাই থেকে। মিসেস্ মিটার জানিয়েছেন, তিনি গত কাল বোম্বাই-এ পৌঁছেছেন; তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সামনের সপ্তাহে বিলেতে রওনা হবেন পল, সেখানে ডাক্তারি পড়বে, আসবার সময় অত্যন্ত সময়াভাব বশতঃ দেখা করে আসতে পারেন নি, সেজন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত, ত্রুটি মার্জ্জনা চেয়েছেন। ইয়োলোকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন।

স্তম্ভিত ভাবে টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অশোক ব্যানার্জ্জি। ইয়োলো ভীত ভাবে বলে, বাবা, কোথা থেকে এলো টেলিগ্রাম? তিনি সেখানি ইয়োলোর হাতে দিয়ে

ক্লান্ত ভাবে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়লেন। বিদ্রোহী অন্তর তাঁর অট্টহাস্য করে বলে উঠলো, কেমন! হয়েছে তো?

ইয়োলো টেলিগ্রামখানি পড়লো; তার পর ধীরে বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, বাবার বুকের ওপর মুখ গুঁজে কান্না-ভরা গলায় বলে,—বাবা!

অশোক বাবু নীরবে ওর মাথাটি চেপে ধরলেন নিজের অশান্ত বক্ষের ওপর।

বছর ঘুরে গেলো, অসহ্য দিনগুলো ক্রমে ইয়োলোর সহ্য হয়ে গেলো! বিলেত থেকে রোজালিন্ মাঝে মাঝে চিঠি দেন, ইয়োলো দেয় তার জবাব! কিন্তু পলের একখানি চিঠিও সে পায় নি। দারুণ অভিমান পুঞ্জীভূত মেঘের মত তার অন্তরে ঘনিয়ে ওঠে।

এই সময় হঠাৎ মামা ওর বিয়ের কথা প্রায়ই বাবাকে মনে করিয়ে দিতে থাকেন। অশোক বাবু বলেন, তোমরা খোঁজ করো। সুন্দরী শিক্ষিতা সম্পত্তিযুক্তা কন্যার উপযুক্ত পাত্র পেতে দেরী হয় না। পাত্রটি বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার। বাড়ী-ঘর-গাড়ী ইত্যাদি সবই আছে।

ইয়োলোকে অশোক বাবু একবার গোপনে জিজ্ঞাসা করেন; তোমার মত আছে তো মা, এ বিয়েতে?

ইয়োলো একবার কাতর দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলে,—এত তাড়াতাড়ির কি ছিল বাবা? মামী ফিরে এলে তার পর······

অশোক বাবু বলেন, তাঁর তো ফেরবার কোনো স্থিরতা নেই মা! আর আমি তাঁকে জানাবো, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। তোমার বিয়ে, আর তিনি কখনও না এসে থাকতে পারেন? তা ছাড়া আমারও শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,···তোমার বিয়েটা দিলে আমারও তোমার জন্য ভাবনার কোনো কারণ আর থাকে না···

ইয়োলো নত মুখে বলে, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন মাথায় পেতে নেব! আমার নিজের কোনো পৃথক্ মতামত নেই বাবা!

অশোক বাবু রোজালিনকে পত্রে সব জানিয়ে তাঁর মতামত চাইলেন, তাঁকে শুভ কাজে যোগ দেবার জন্য বারংবার বিনীত অনুরোধ জানালেন। জবাব এলো,···পল্ সংক্ষেপে জানিয়েছে; প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল মা ব্লাডপেশারে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা গেছেন! মৃত্যুকালে বারংবার ইয়োলোকে খুঁজেছেন।···

বিয়ে অবশ্য বন্ধ রইলো না। যথোচিত সমারোহের মাঝেই বিয়ে হয়ে গেল। মাতৃবিয়োগের দুঃসহ যাতনা বুকে নিয়ে ইয়োলো প্রবেশ করলো তার নতুন জীবনে! মায়ের হাতের হীরের ব্রেসলেট, নিজের আঙুলের নীলার আংটি পল্ পাঠিয়েছিলো ইয়োলোর বিয়েতে প্রীতি-উপহার। সংসার-অনভিজ্ঞা বাঙালী-সমাজে চলতে অনভ্যস্ত ইয়োলো,···স্বামীর ঘরে প্রতি পদে হোঁচট খেতে থাকে! শাশুড়ী-ননদের বিদ্রূপ বাক্যগুলো সব সময় সে বুঝতে পারে না।··· শাশুড়ী অপ্রসন্ন মুখে বলেন,···মেম মাগী শুধু খৃষ্টানীপণাই শিখিয়েছে, এখন একে শোধরাতে দেখছি রীতিমত বেগ পেতে হবে!

স্বামী অজয় গাঙ্গুলী অবশ্য কোনো ত্রুটি ধরেন না, তিনি চান নাইট ক্লাবে তাঁর শাঁসালো বন্ধু দলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অবাধ মেলা-মেশা করুক, এতে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে পরম সহায়তা করা হবে। যখন বিলিতি পরিবেশের মাঝে প্রতিপালিতা স্ত্রী তাঁর, তখন এ সুযোগটুকু কেন সে পাবে না?

ইয়োলো হাঁপিয়ে ওঠে! নাইট ক্লাবের বীভৎসতা দেখে সে শিউরে ওঠে; স্বামীর অনবরত মদ্যপান ও বহুরূপিণী নারীদের সঙ্গে উল্লাস নৃত্য দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়! যখন সে বুঝলো তাকেও ঐ নারীদের মত সৌখিন বিলাসিনী হতে হবে, তখন সে ঘোরতর আপত্তি জানায়!

অজয় প্রথমে অনুনয়-বিনয় পরে ক্রোধ আর ভীতি প্রদর্শন দ্বারা নিজের কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু সব কৌশল তার ব্যর্থ হয়।

নিদারুণ ক্রোধ শেষে বিদ্বেষে পরিণত হয়। মা-বোনেদের সঙ্গে সে-ও আরম্ভ করে বাছা-বাছা বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করতে। কিন্তু ইয়োলো সঙ্কল্পে অটল; নীরবে সহ্য করে সব কিছু! সময় সময় আর্ত্তস্বরে ডেকে বলে, মামী! তুমি কোথায়? আমাকে একটু আলো দাও! আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও!

পল্, তুমি কি নিষ্ঠুর! একবারও কি মনে পড়ে না আমার কথা? এত কি অপরাধ ছিলো আমার?

দু'বছর পরে তার কোলে এলো একটি ফুলের মত মেয়ে। তার আঁধার জীবনে এলো এক ঝলক চাঁদের আলো! ইয়োলো তার মেয়ের নাম রাখলো রোজালিন!

দীর্ঘ সাত বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল!···অশোক বাবু হঠাৎ করোনারি থাম্বোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন খবর পেয়েই ইয়োলো রোজাকে নিয়ে চলে আসে পিত্রালয়ে।

হার্ট-স্পেশালিষ্ট কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন,··· অজয় তার বন্ধুদের পরামর্শে বিখ্যাত হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার মিত্রকে কল্ দিলো।

যথা সময়ে তিনি রোগী দেখতে এসে রীতিমত চমকে ওঠেন, পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করে অচৈতন্য রোগীকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রপসন লিখে চলে যান। ইয়োলো পাশের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলো ডাক্তারের দিকে; ডাক্তারও এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিপাত করেছিলেন, সে দৃষ্টি পূর্ব্বের মতই উজ্জ্বল ও মমতাপূর্ণ। পরে অজয়ের কাছে ডাক্তারের নাম জিজ্ঞাসা করে ইয়োলো।

অজয় শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে, হঠাৎ ডাক্তারের এমন সৌভাগ্য উদয়ের কারণ কি? কত রথী মহারথীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কই কারুর সম্বন্ধে তো এমন উৎসাহ দেখিনি? ইনি হচ্ছেন এখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার পল্লব মিত্র!

এ যাত্রা অশোক বাবু সামলে ওঠেন, কিন্তু চলে-ফিরে বেড়ানো আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হোলো না। তাঁর জ্ঞান ফেরবার পর ডাক্তার মিত্রকে দেখে স্থির দৃষ্টিতে প্রথমে চেয়ে থাকেন! যেন কোন্ হারানো কাহিনী মনে আনবার চেষ্টা করেন,—কিন্তু মনে পড়ে না, পরম ক্লান্তি ভরে চোখ বোজেন, চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু জমে ওঠে!

ইয়োলো ডাক্তারের সামনে আসে না, দূর থেকে স্থির দৃষ্টি

মেলে শুধু চেয়ে থাকে। ডাক্তারও উঠে চলে যাবার সময় একবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তার পর নীরবে চলে যান।

সে দিন অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন থাকায় অজয় আসতে পারে নি। যথা সময়ে ডাক্তার মিত্র এলেন। আজ অশোক বাবুর পাশে নতমস্তকে বসেছিল ইয়োলো। অদূরে রোজা খেলা করছিল।

ডাক্তার নিয়ম মত রোগীর কুশল-প্রশ্ন করেন। অশোক বাবু ক্ষীণ স্বরে বলেন, আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনাকে কি এর আগে আমি কোথাও দেখেছি? বড্ড চেনা লাগে, কিন্তু মনে করতে পারি না•••

ডাক্তার শান্ত কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ কাকাবাবু! আমি আপনাদের পল্! কিন্তু আপনি কথা বল্‌বেন না, আমি বলছি আপনি শুনুন। লণ্ডনে মা মারা যাবার পর আমি ফ্রান্সে চলে যাই; সেখান থেকে পড়া শেষ করে দু' বছর হল ফিরেছি কলকাতায়। অনেক বার মনে করেছি দেখা করবো আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু কেন যে পারি নি তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না। আমার সে সঙ্কোচ জনিত অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন কাকাবাবু!

ইয়োলো জলভরা চোখ দুটি তুলে একবার পলের দিকে চেয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। অশোক বাবুরও চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। একখানি শীর্ণ কম্পিত হাত তুলে পলের একখানি হাত টেনে নেন নিজের বুকের ওপর। হাতখানি বুকে চেপে ধরে, চোখ বুজে কতক্ষণ নীরবে থাকেন•••তার পর•••ভগ্ন স্বরে ধীরে ধীরে বলেন,•••পল ডার্লিং! তোমাকে মনে মনে অনেক দিন আমি খুঁজেছি; ঈশ্বর তোমাকে আজ এনে দিয়েছেন। আমি তোমার মায়ের কাছে এবং তোমার কাছে পরম অপরাধী! তোমাদের জিনিষ ইয়োলোকে আমি জোর করে তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে কি ভুল যে করেছিলাম বাবা! প্রতি মুহূর্ত্তে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি! এ হতভাগ্যকে পারো তো ক্ষমা কোরো বাবা!

দর-দর ধারে অশ্রুধারা তাঁর চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। ইয়োলো ব্যস্ত ভাবে রুমাল দিয়ে বাবার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে,—বাবা! এ কি করছেন? শান্ত হোন্!

আচ্ছা পল, তুমি তো এখন আগের বাড়ীতেই আছো না? তোমার বৌ ছেলে-মেয়ে আর কে আছে সেখানে?

পল মৃদু হেসে বলে,•••বিয়ে এখনও করিনি! হ্যাঁ সেই বাড়ীতেই আছি আমি, কাকাবাবু! ও-সব কথা বলে দুঃখ দেবেন না আমাকে;•••কোনো ঘটনার ওপর মানুষের হাত নেই, অদৃশ্য হস্তেই আমাদের চলার পথ নির্দ্ধারিত হচ্ছে; একথা শুনেছি আমার মায়ের কাছে।•••

আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, এ ঘটনা নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না! এতে আপনার অসুখ কমতে দেরী হবে! আপনি সুস্থ হলে পর ইয়োলোকে নিয়ে একদিন যাবেন, আমি তো আপনাদের সেই পলই আছি, এবং চিরকাল থাকবো।

ইয়োলো হাসতে হাসতে বলে,—শুধু আমাদের নেমন্তন্ন করলে পল? রোজার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বলে,•••একে বাদ দিলে?

পল রোজাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বলে,•••বাঃ, কি সুন্দর! ঠিক তুমি যেমন ছিলে ছোটবেলায়। একে দেখে মার কথা মনে পড়ছে, তিনি থাকলে একে দেখে কত খুসী হতেন! তার পর রোজাকে আদর করতে করতে বলে, তোমার নেমন্তন্ন প্রতিদিনের জন্য রইলো। তোমার নামটা কি মা?

কচি গলায় সে বলে রোজালিন•••

পল চমকে ওঠে। ওঃ, তাহলে সত্যিই তুমি আমার মা দেখছি! বাড়ীটা বড্ড খালি, এলোমেলো হয়ে আছে, চলো না, তোমার সব, তুমি দেখবে চলো! রোজা ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, ওর অবস্থা দেখে সকলে হেসে ওঠে। ঘরের গুমোট ভাবটা হাসির হাওয়ায় দূর হয়ে যায়।

কখন অজয় এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে দরজায় ওরা জানতে পারেনি! অজয় খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলো ডাক্তারের আত্মীয়তা দেখে! এবারে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলে;••• ব্যাপার কি? ডাক্তারবাবু কি পরিচিত আপনাদের?

ডাক্তারই জবাব দেন•••হ্যাঁ মিঃ গাঙ্গুলি! উনি আমার কাকাবাবু! একজন মায়ের কাছেই আমি আর ইয়োলো প্রতিপালিত হয়েছিলাম। তারপর আমরা লণ্ডনে চলে যাই! সাত বছর পরে আবার দেখা হ'ল! আপনার সঙ্গেও স্থাপিত হল একটি ভারি মিষ্টি সম্পর্ক।

অজয় গম্ভীর ভাবে বলে,•••খুসি হলাম!

ডাক্তার চলে যাবার পরে ইয়োলোকে বলে সে, আমি হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের ভারি অসুবিধা ঘটালাম, না-?

ইয়োলো বিস্ময় ভরে বলে, কেন? অজয় দপ্ করে জ্বলে ওঠে, শ্লেষভরা গলায় বলে, সব আমি শুনেছি তোমার মামা-মামীর কাছে। আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কোরো না! ন্যাকামি আমি সহ্য করতে পারি না!

ইয়োলো বিস্ফারিত নেত্রে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে; তার পর দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, কি শুনেছো তুমি? কি জানতে চাও তুমি? এর আগেই জানতে চাইলে জানাতাম নিশ্চয়ই। কারণ না জানাবার মত কোনো কারণ ছিলো না, বা নেই! পল আমার আবাল্য সঙ্গী-বন্ধু! একাধারে সবই! ওর মা-ই আমাকে মাতৃসমান প্রতিপালন করেছিলেন, এর মধ্যে লুকোবার কি থাকতে পারে? তা আমার ধারণায় আসে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলে অজয়। তাই দীর্ঘ বিরহের পর আজ উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেঙে পড়ছিলে! ন্যায়, অন্যায় তোমার ধারণায় আসবে কি করে? তবে মনে রেখো, এটা তোমার খৃষ্টান-সমাজ নয়!

হ্যাঁ এটা যে উন্নত খৃষ্ট-সমাজ নয়, সে কথা তোমরা বার বার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছো। এ সমাজের ভণ্ডামি ও কদর্য্যতাকে আমি ঘৃণা করি।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ইয়োলো সবেগে সে ঘর ছেড়ে চলে যায় তার বাবার কাছে।

পরদিন সন্ধ্যায় একজন ভদ্রলোক ইয়োলোর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। চাকর তাঁকে ড্রইংরুমে বসিয়ে ইয়োলোকে খবর দিতেই ইয়োলো তাড়াতাড়ি গেল সেখানে। ভদ্রলোক জানালেন, গত কাল এখান থেকে ফেরবার পথে ভীষণ মোটর-এ্যাক্সিডেণ্টে ডাক্তার মিত্র সাংঘাতিক আহত হয়েছেন।

হসপিটালে আছেন! সে জন্ম আপনাদের খবর দিয়ে গেলাম, এখন তাঁর আসা তো আর সম্ভব হবে না!

চোখের সামনে যেন পৃথিবীটা দুলে উঠলো. ইয়োলো পাশের চেয়ারের হাতলটা ধরে। তারপর বলে, আপনি এক মিনিট দাঁড়ান—

সে ছুটে যায় ওপরে। পুরোনো বয়কে বাবার কাছে রেখে বলে.—বাবা, আমি একবার গাড়ী নিয়ে বেরুচ্ছি! এখুনি ফিরে আসবো।···

তার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে সে যায় হাসপাতালে···

জ্ঞান এখন সম্পূর্ণ ফিরেছে, বুকে বড্ড চোট লেগেছে বটে, তবে মারাত্মক কিছু নয়; ডাক্তাররা অভিমত প্রকাশ করেন। কপাল ফেটে যাওয়াতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বুকও ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে।

ব্যাকুল স্বরে ইয়োলো বলে,—পল্! কেমন আছো এখন?

পল্ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলে,—তুমি এসেছো ইয়োলো! তেমন কিছু হয়নি আমার। এখন অনেকটা ভালো বোধ করছি! কাকাবাবু কেমন আছেন?

ইয়োলো মাথা নাড়ে, তিনি ভালো আছেন, তাঁকে তোমার খবর দিই নি, তার পর ধীরে ধীরে পলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়! বলে. এবারে তুমি রোগী, সে জন্ম কথা বলা নিষেধ তোমার। একটিও কথা নয়! ঘুমোও···

পল্ মৃদু হেসে শান্ত ভাবে চোখ বোজে!

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে আসে ইয়োলো। বাবাকে জানায় পলের কথা। বলে, একটুও চিন্তিত হবেন না তাঁর জন্ম, তিনি ভালো আছেন!

অজয় শোনে, অ্যাক্সিডেণ্টের কথা,···বিরক্ত ভাবে বলে. ভারি মুস্কিল তো, তার হাতে চিকিৎসা চলছে, এখন আবার ডাকি কাকে?

অশোক বাবু বলেন, এখন তো আমি ভালো আছি বাবা! সে সুস্থ হলে প'র আবার চিকিৎসা চলবে।

দিন পনেরোর পর···পল্ হসপিটাল থেকে ফিরে যায়! তার পরে এলো অশোক বাবুকে দেখতে!

অশোক বাবু ভারি খুসি হয়ে বলেন, এসো বাবা! কি ভাবনাই হয়েছিলো তোমার জন্মে! যাক্, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছো তো?

পল্ হেসে বলে.—হাঁা অন্য কোনো উপসর্গ নেই, তবে বুকটায় মাঝে মাঝে ব্যথা দেখা দেয়, সে জন্ম একটা এক্সরে করাবো ঠিক করেছি!

এক্সরে করে কোনো দোষ পাওয়া গেল না, কিন্তু ব্যথা ক্রমশঃ ঘন ঘন দেখা দিতে লাগলো, অবশেষে একদিন মাথা ঘুরে বাড়ীতে পল্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়! দূরসম্পর্কীয়া পিসি থাকতেন ওর কাছে! তিনি ছুটে আসেন, তখন নাক-মুখ দিয়ে কয়েক ঝলক রক্ত উঠে কার্পেটটা লাল রংএ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার আসে।··· জ্ঞানও হয়, কিন্তু একেবারে শয্যায় শায়িত অবস্থায় বিশ্রাম নিতে হয় তাকে!

ক'দিন হয়ে গেলো, পল্ আর আসে না! ইয়োলো শঙ্কিত ভাবে বলে,—বাবা! আজ একবার যাই; পল্ কেন আসছে না,···

অশোক বাবু বলেন, হাঁা, মা! যাও, তবে···মনে হয় অজয় এতে বিরক্ত হতে পারে! ইয়োলো জবাব দেয় না. বাবার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। এখন নিঃসঙ্গ, ভারমুক্ত, উজ্জ্বল মন তার;··· কোনো অবস্থাকেই ভয় সে আর করবে না স্থির করেছে।

সুদীর্ঘ আট বছর পরে চির-পরিচিত প্রিয় ভবনের সামনে গাড়ী থামিয়ে নেমে এলো সে। বাড়ীর অবস্থা দেখে চম্কে ওঠে। কোথায় সে সুসজ্জিত ল'ন? আগাছায় ভরা চারি দিক! তারি মাঝে অসংখ্য গোলাপ গাছে ফুটেছে, রাশি রাশি হলদে গোলাপ! ব্যথাভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে চারি দিক?

কতক্ষণ কেটে গেছে; হঠাৎ কানে ভেসে এলো, ভায়োলিনের করুণ সুর! অতি-পরিচিত সুর কে বাজাচ্ছে? মামী? না-না, মামী তো নেই, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় বাড়ীর ভেতর! ঘরে বিছানায় বসে পল্ বাজাচ্ছিলো ভায়োলিন! দূরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইয়োলো, শোনে তার চির-পরিচিত প্রিয় সুর! চোখের সামনে ভেসে ওঠে মামীর হাসিমাখা মুখখানি! এই বারান্দার ঐ কোণে ঐ শূন্য চেয়ারটায় বসে ভায়োলিন্ বাজাতেন তিনি! আর ওরা তখন লনে বসে গল্প করতো! কোথা গেল সে আনন্দমুখর দিনগুলো? আর বাজাতে পারে না, ক্লান্ত ভাবে পাশের টেবিলটায় ভায়োলিন্‌টা রেখে মুখ ফেরাতে গিয়ে চমকে ওঠে পল্! কে বসে মায়ের শূন্য চেয়ারটিতে? পলের ডাকে ইয়োলোর চমক ভাঙে! সে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় পলের শয্যা-পাশে। মৃদু কণ্ঠে বলে,—আমি—আমি এসেছি পল্।

পল্ একখানি হাত বাড়িয়ে ওর করস্পর্শ করে বলে,—আমি জানি! তুমি আসবে ইয়োলো! বসো এইখানে!

—ইয়োলো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে পলের শয্যা পাশে!

—নিঃশব্দতার মাঝে কয়েকটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয়ে যায়!

—ইয়োলো বিষন্ন কণ্ঠে বলে,······তোমার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন পল? শরীর কি আবার অসুস্থ হোল?

ম্লান হাসি হেসে বলে পল্···হাঁা! ক'দিন আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, খানিকটা রক্তও খরচ হয়ে গেছে,···ও কিছু না, তুমি এসেছ এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার পর একটু দম নিয়ে বলে,—জানো ইয়োলো, যে দিন তোমরা চলে গেলে, তার পর মা আর এ বাড়ীতে টিঁকতে পারলেন না, কি ভয়াবহ অস্থিরতা দেখেছি তাঁর! কখনও বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেখিনি, সেই বাড়ী তাঁর কাছে কি বিভীষিকা না হয়ে উঠেছিলো! বম্বে চলে গেলাম আমরা, তার পর পাশপোর্ট নিয়ে লণ্ডনে গেলাম! সেখানে কি করলেন জানো? বাড়ীর সামনের ছোট্ট জমিতে অজস্র হলদে গোলাপ গাছ লাগালেন! আর তারই ফুলগুলো দিয়ে রোজ সাজিয়ে দিতেন তোমার ছবিখানি! সেই গাছের কলমচারা করে এনে আমিও সাজিয়েছি আমার বাগান! তোমাকে আমরা হারাইনি ইয়োলো রোজ!

ইয়োলো দু'হাতে মুখ ঢাকে:—আর্ত্ত কণ্ঠে বলে,—মামীর আর তোমার সকল দুঃখের কারণ আমি পল্—এ কি আমার অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস!

পল্ সস্নেহে ওর হাত দুটি চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বলে… কে বললে তুমি আমাদের দুঃখ দিয়েছো ইয়োলো? তুমি যে আমাদের অন্তর পূর্ণ করে রেখেছো, তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে তোমার মূল্য যে ঠিক উপলব্ধি করতে পারতাম না! বাইরের জগতে তোমাকে হারিয়ে অন্তর্লোকে আরো নিবিড় করে পেয়েছি তোমার স্পর্শ। আজ আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই!

আরো কয়েক মাস কেটে গেছে। পলের শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নার্শ দুজন রয়েছে, ইয়োলো প্রতিদিন আসে সকাল ও সন্ধ্যায়। অজয়ের ক্রোধ, সম্পর্ক ছেদ করার ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি কোনোটাই তার এ যাওয়া-আসাকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। অবশেষে সে তার শেষ মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো, রোজাকে নিয়ে গেলো নিজের বাড়ীতে! শ্বশুরালয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখলো না তার।

রোজার জন্য অন্তরে দারুণ বেদনা বোধ করলেও ধৈর্য্য হারালো না ইয়োলো। নিজের নির্ব্বাচিত পথে চল্লো তার অকুণ্ঠিত পদক্ষেপ!

অশোক বাবুও কয়েক দিন ইয়োলোর কাঁধে ভর দিয়ে এসে দেখে গেলেন পল্‌কে!

সেদিন পল্ বললো—কাকাবাবু! আমার দানপত্রটা একবার আপনি দেখুন! আপনিও একজন ট্রাষ্টি হবেন তার।

অশোক বাবু দানপত্র দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান! মায়ের ইচ্ছা অনুসারে এই বাড়ীখানি ও দু লক্ষ টাকা ইয়োলোকে দেওয়া হলো, আর পাশেরখানি হবে মায়ের নামে হাসপাতাল ও বাকী দশ লক্ষ টাকায় ঐ হাসপাতালটি চলবে। একটি সর্ত্ত! এ বাড়ীর হলদে গোলাপ গাছগুলো যেন নষ্ট না হয়, চিরদিন যেন ঐ ভাবে রাশি রাশি হল্‌দে গোলাপে বাড়ী সজ্জিত থাকে।

উদ্‌গত অশ্রুধারা নীরবে রুমালে মুছতে থাকেন অশোক ব্যানার্জ্জি।

ইয়োলো ক'দিন আর বাড়ী যায়নি! ডাক্তাররা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছেন রোগীর ওপর!

কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে, গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। সারা দিনই যেন কেটে যায় একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে। হঠাৎ মাঝে মাঝে চমকে উঠে পল, চোখ চেয়ে কি যেন খোঁজে, শয্যাপার্শ্বে ইয়োলোকে দেখে আবার শান্ত ভাবে চোখ বোঁজে।

আজ সকাল থেকে কেটে গেছে সে আচ্ছন্ন ভাব, চোখের চাউনি পরিষ্কার।

ডাক্তাররা দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন,—রোগীর আজকের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ!

পল্ ক্ষীণ স্বরে ডাকে ইয়োলো! মাই ইয়োলো রোজ!

ইয়োলো ছুটে এসে বসে ওর পাশে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এই যে আমি পল্, বলো কি বলবে। আজ অনেকটা ভালো আছ না?

পল মাথা হেলিয়ে বলে, হ্যাঁ বড় ভালো লাগছে আজ। কি স্বপ্ন দেখছিলাম জানো, সেই যে তুমি ঐ ফুলগাছের ঝোপের পাশে দাঁড়িয়েছিলে পিছন ফিরে। আর আমি তোমাকে শোনাচ্ছিলাম আমার প্রথম কবিতা—সেই দৃশ্যটা দেখছিলাম। সেই কবিতাটি মনে আছে? একবার শোনাবে আমাকে?

ইয়োলো আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে……কবিতাটি!

পল্ ওর একখানি হাত চেপে ধরে মিনতিভরা কণ্ঠে বলে, যদি…যদি আমি মরে যাই, এই কবিতাটি আমার সমাধিফলকে লিখে দিও; ইয়োলো, বলো দেবে তো? আর ঐ গাছের হলদে গোলাপগুচ্ছ দিও আমার সমাধি-ভূমিতে ছড়িয়ে—মনে থাকবে তো আমার শেষ অনুরোধ?

ইয়োলো অবনত মস্তকে নির্ব্বাক্ হয়ে বসে থাকে। তার দুটি গাল বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে। পল সস্নেহে ওর হাতে-ধরা হাতখানা চেপে ধরে নিজের বুকে। তার পর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ইয়োলোর অশ্রুপ্লাবিত মুখপানে।

খানিকক্ষণ পরে পল্ ডাকে, ইয়োলো! বড় ব্যথা লাগলো কি আমার কথায়?…কিন্তু উপায় নেই, আর হয়তো বলা হবে না। কত, কত যে কথা ছিলো বলবার, কিছু বলা হল না, এই সুদীর্ঘ আট বছরের সঞ্চিত সে কথার বোঝা বহন করে হয়তো আমায় চলে যেতে হবে।

একটা মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করে চোখ বোঁজে সে।

ইয়োলো আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে, তুমি ভালো হয়ে ওঠো পল্! আবার শুনবো তোমার সব কথা। আর আমিও বলবো আমার না-বলা কথাগুলো। আমি যে সে কথা বলবার জন্তে এত কাল প্রতীক্ষা করছি তোমার। তুমি কি না শুনেই চলে যাবে?

পরম শান্তির আনন্দে পলের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। …মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার অনন্তকাল……অনন্ত জীবন উন্মুখ হয়ে রইলো তোমার কথা শোনবার জন্ত!

সারা দিন বেশ ভালো ভাবে কেটে যায়!

শুক্লা একাদশীর চাঁদ দেখা দিলো নভোমণ্ডলে। আলো-ঝলমলে মধুর সন্ধ্যাকাল। উতলা পুবের বাতাসে, ভেসে আসছে গোলাপের মৃদু বাস! শয্যাপাশের খোলা জানলা দিয়ে। আলোর বন্যা এসে পলের শুভ্র শয্যা প্লাবিত করে দিয়েছে।

অল্পক্ষণ আগে ডাক্তাররা রোগীর সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট দিয়ে বিদায় নিয়েছেন!

পল ধীর কণ্ঠে বলে……একবার ভায়োলিনটা বাজাবে ইয়োলো? সেই…সেই সুরটা, যেটা মামী খুব ভালোবাসতেন, বাজাও না? বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।

ইয়োলো নিয়ে আসে ভায়োলিন! ওর শয্যার পাশে সোফা টেনে নিয়ে বসে! ওর দিকে চেয়ে হেসে বলে বাজাচ্ছি। তবে অনেক দিনের অনভ্যাস, ভুল হলে বলে দিও কিন্তু!…

পল হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে বলে, দাঁড়াও আর একটি কাজ বাকী আছে! আলোটা দাও নিবিয়ে! আর বাবার ঐ রূপোর বাতিদানটায় জ্বেলে দাও কয়েকটা মোমবাতি! ঐ দুয়ারে বাতি আছে!

ইয়োলো বিস্ময় ভরে একবার চেয়ে দেখে ওর দিকে, তার পর নিঃশব্দে পালন করে ওর আদেশ! আলো-নেবা ঘরে চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল দেখায়! এক কোণে বাতির শিখাগুলো বায়ু-হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে ওঠে!

ইয়োলো ভায়োলিন বাজাতে সুরু করে। অপূর্ব্ব ভাবময় সুরলহরীর মাঝে যেন দুটি প্রাণী ডুবে যায়। ক্রমে সে সুর ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যের অসীম দিগন্ত পানে। ছায়াপথ বেয়ে যেন কারা নেমে আসছে? তাদের অতীন্দ্রিয় পরশ ওদের প্রতি স্নায়ুতন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছে অলৌকিক শিহরণ! আত্মবিস্মৃত ভাবে ইয়োলো বাজিয়ে চলেছে ভায়োলিন, দুটি অন্তরের বেদনা-সঞ্চিত হাহাকার যেন ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে ঐ সুর-মূর্চ্ছনার মাঝে।

বাজনা থেমে গেলো, চারি দিকে ছড়ানো রইলো সুরের পরশ! ভায়োলিন নামিয়ে রেখে ইয়োলো বলে, পল! কেমন লাগলো বললে না?

পল জবাব দেয় না!

শঙ্কিত ভাবে উঠে এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গায়ে হাত দিয়ে ব্যাকুল ভাবে ইয়োলো ডাকে, পল! মাই ডিয়ারেষ্ট!

পল তখন কার মহা ডাকে মহাশূন্যের পথে ছুটে চলেছে; কে দেবে ইয়োলোর ডাকে সাড়া?...

* * * *

এ ঘটনার পর কেটে গেলো আরো কত বছর!

সমাধি-ভূমির পাশের পথে মাঝে মাঝে কোনো কৌতূহলী পথিক থমকে দাঁড়ায় শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যাকালে। পরম বিস্ময়ে দেখে······সর্ব্বাঙ্গ কালো ওড়নায় আবৃত করে কে এক রমণী চলেছে, সমাধিভূমির ভেতরে! তার এক হাতে সোনালী রঙের গোলাপগুচ্ছ, অপর হাতে কম্পমান দীপশিখা। কোন হৃদয়বান পথিক অথবা কবি বা শিল্পীর নজর আকৃষ্ট করে ঐ সমাধিভূমির মাঝে একটি শ্বেতমর্ম্মর সমাধি। গোলাপলতায় সমাধিটি আবৃত। তাতে ফুটে আছে রাশি রাশি হলদে গোলাপ, একটি শ্বেতপ্রস্তর-ফলকে খোদিত করা একটি কবিতা—

The World is a garden, where a graceful plant grows
I am its leaves, and you a yellow rose,
When my eyes for ever close.
You adore me with your petals,
O my yellow rose.

[শেষ]

—আপনার দূরদৃষ্টি এখনো বেশ ভালই দেখছি!'

—সুশীল চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

রূপান্তর

রাণু ভৌমিক
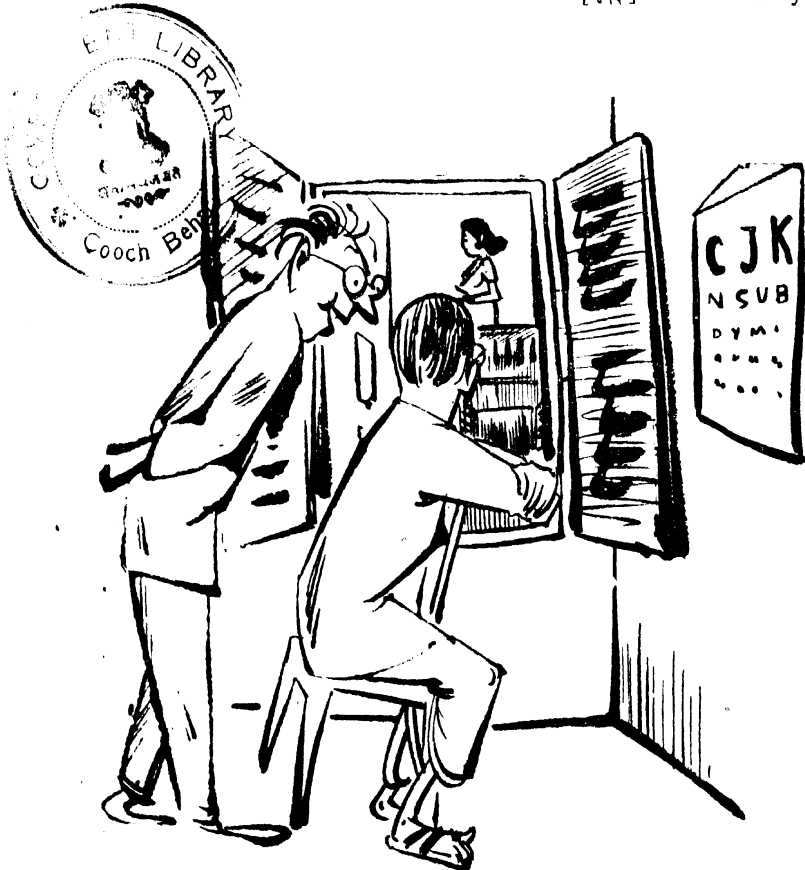
ট্রেন চলছে। ওর গতির আবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তর্কও উদ্দাম হয়ে উঠছে। আলোচনা চলছিল আধুনিকতম এক ঔপন্যাসিকের নবতম উপন্যাস নিয়ে।

"ভাষা-ভাব, সবই ভাল হয়েছে।" সমীর রায় দেবার মত কণ্ঠে বললো—"কিন্তু, উনি যা বলেছেন তা আমি মেনে নিতে পারি না।"

"কেন?" আমি বললুম।

"সত্যিকারের যে প্রেম তা কখনও ঘৃণায় রূপান্তরিত হতে পারে না। প্রতিঘাত পেলে তা আরও গভীরতর মধুরতর হয়ে ওঠে। আখকে নিংড়ালেই রস বের হয়।"

"সব উপমা সব জায়গায় খাটে না।" আমি বললুম "কিন্তু বাস্তববাদের ওপর ভিত্তি করেই যদি আদর্শকে রূপায়িত করতে হয় তবে•••"

কথা শেষ করতে পারলুম না। কোণের নীরব ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন। লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা—চোখে কালো ঢাকা চশমা। পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির সোজা হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ। প্রথম গাড়ীতে ওঠার পরই তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এখন আবার সবাই তাঁর দিকে তাকালুম।

"কথায় বাধা দিলুম বলে বিরক্ত হবেন না আপনার কথাটাই আমি সাপোর্ট করছি। আশা করি, আসন্ন শীতের এই মনোরম সন্ধ্যায় একটি কাহিনী আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে। কাহিনীটি শিকারের গল্পের মত মার্কামারা গল্প নহে, সত্য ঘটনা। সত্যই সত্য ঘটনা।"

"ভূমিকা ছেড়ে গল্পটি বলুন।" উনি হাসলেন। "হ্যাঃ, এ গল্পেরও উর্দ্ধ, অধ! কিছুই নেই শুধু মধ্যদেশ হৃদয়ের খেলা—ভাব, ভাষা, ভঙ্গী কিছুই যোগ করছি না। হুবহু বলে যাচ্ছি—যেন গল্পটাই আপনারা পড়ছেন।"

•••রমা ভাবছিল—রাত্রি-দিন তার কাছে এক হয়ে গেছে—সব নিঃশব্দ নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। ভাবনার সূতোর যেন আর শেষ নেই, যতই টানছে বাড়ছে দ্রৌপদীর শাড়ীর মত! ঘুরে-ফিরে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে—transformaken রূপান্তর—মানে কি। এই যে সামনের এই সবুজ গাছ ফুলের গয়নায় দেহ সাজিয়ে অনন্ত-যৌবনা অভিসারিকার মত অপেক্ষা করছে কালের কঠিন চক্রে ঘুরে ঘুরে, এ নাকি পরিণত হবে কঠিন নীরস পাথরে—রূপ, রস, গন্ধ সজীবতার ছিটাফোঁটাও এতে থাকবে না। তেমনি করেই কি রমার ভালবাসা আজ তীব্র ঘৃণার রূপ নিয়েছে! যাতে বিন্দুমাত্র আঘাতের সম্ভাবনায় সমস্ত মন, প্রাণ শিউরে উঠতো—আজ তাকে—মনে পড়েছে সেই প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা; প্রথম দিনের পরিচয় এমনি মধুর হয়—সেই গান, সেই আসর—যখন বিভোর হয়ে শুনছিল রমা—সুরের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা তাকে নিয়ে গিয়েছিল এ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অপূর্ব্ব মায়ালোকে—একটি শতদল যেন প্রস্ফুটিত হয়ে সৌরভ ছড়িয়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে গুটিয়ে নিচ্ছে। 'চল সখী যমুনাকে তীর'—মাত্র এই একটি লাইন। যমুনার তীরে চল—কোন যমুনা—মন-যমুনা—গভীর নীল স্নিগ্ধ সেই জল, প্রেমই যার ধারা, যার তীর ঘিরে কত প্রণয়ের স্মৃতি—তাতে অবগাহন করলেই কি মনের সকল খেদ মিটে যা.ব? প্রশান্তিময় নূতন জীবন লাভ হবে? কি সুন্দর গলার কাজ—সমস্ত বিশ্বভুবন যেন মুঠোর মাঝে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। শুনতে শুনতে খেয়াল ছিল না কত রাত্রি। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে চমক ভাঙলো রাত্রি ১টা—ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সে কি করে যাবে? দূর ত কম নয়! কোথায় টালিগঞ্জ আর কোথায় ভবানীপুর, মনের ভাবনা বোধ হয় ফুটে বেরিয়েছিল একটি অস্ফুট উক্তিতে; নইলে পাশের ভদ্রলোক চমকে উঠবেন কেন?

একটু দ্বিধা ভরেই বললেন তিনি "আমাকে কিছু বলছেন?"

"আপনাকে? না"—

তার পর একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলল, "আপনাকে কেন বলতে যাব, আপনাকে আমি মোটেই চিনি না।"

"চেনেন না! আপনাকে কিন্তু আমি চিনি।"

"কি করে, এত কিছু বিশ্ব-বিখ্যাতা আমি নই।"

"তা অবশ্য এখন বিচার্য্য নয়, তবে আপনার পরিচয় নিতে আমাকে বিশ্বের দরবারে ছুটতে হয় নি। কাছাকাছি থেকে পেয়েছি। আপনার বাবা আমার মামার বন্ধু এবং আমরা কাছাকাছি থাকি।"

"কিন্তু কই, আমি ত জানতুম না?"

"ঐ জন্যেই ত কবি বলে গেছেন—'আমরা সৌন্দর্য্যের সন্ধানে বহু দূরে যাই; বৃথা সময় নষ্ট করি; কিন্তু, আমাদের খুবই কাছে যে সামান্য অথচ অসামান্য সুন্দর অনাদৃত ভাবে পড়ে আছে তা'র খোঁজ রাখি না'।"

ষ্টেজে নূতন গায়কের গান সুরু হয়ে গেছে; কিন্তু সে দিকে তা'দের মন নেই। গান নয় প্রাণ—টানছে মনকে; গীতিকাব্য নয় জীবন-কাব্যের সুরু।

"ভাবছিলুম কি করে যা'ব! ভালই হোল, আপনার সঙ্গে দেখা হোল। চলুন।"—বললো রমা।

"এত শীগ্‌গির?"

"শীগ্‌গির মানে, বলতে গেলে দেরী হয়ে গেছে—এবার আর একটা গান ধরলে রাত্রি তিনটা হবে।"

দু'জনে পাশাপাশি বাইরে বেরুলো—অখিল ভট্টাচার্য্যের ভাগিনেয় তাপস চক্রবর্ত্তীকে এখন রমা চিনেছে। তাদের বাড়ী থেকে দুটো বাড়ী পেরিয়েই ওরা থাকে। ফর্সা রং, চোখে চশমা—তাপস নিজের চেহারা সম্বন্ধে বেশ গর্ব্বিত। চাকুরীও ভাল করে; কাজেই পাড়ার বেকার-সঙ্ঘে তার পদার্পণ ঘটে না। যুবকদের ঈর্ষার, যুবতীদের কামনার এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নেহের পাত্র সে।

বাইরে বেরিয়ে কোন যান-বাহনের দর্শন মিললো না। অগত্যা বিপদের দিনে সঙ্গী অকৃত্রিম চরণ-যুগলের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কি?

কলকাতার রূপ যেন একমাত্র গভীর রাত্রিতেই উপলব্ধি করা যায়। চঞ্চল শিশু—এই কাঁদছে, এই হাসছে, ভাঙছে, গড়ছে; তার ক্ষণে ক্ষণে নব নব মূর্ত্তি! শুধু যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে স্বপ্নের ঘোরে মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরা হাসি, তখনই তার রূপ ফুটে ওঠে। এ যেন রূপার কাঠির পরশে নিদ্রিতা রাজকন্যা। চমক ভাঙ্গলো তাপসের কথায় "একটা Taxi করি।"

"না, না," রমা বলল।

অবাক হয়ে তাপস তাকালো তার দিকে—তবে কি সারা রাত হেঁটে যাবেন?"

চুপ করে রইলো রমা—সত্যিই সারা রাত হাঁটা কিছু সম্ভব নয়—কানে ভেসে এলো তাপস বলছে "এত সঙ্কোচটা কিসের শুনি? আচ্ছা, ভাড়াটা না হয় আপনি অর্দ্ধেক দিয়ে দেবেন" ভাবখানা এমন যেন ভাড়ার জন্যই রমা আপত্তি করছে।

গাড়ী থেকে নামবার আগেই ব্যাগটা খুলে রমা বললো "কত হয়েছে?"

একটু ব্যস্ত ভাবে চোখ টিপে তাপস ড্রাইভারকে দেখিয়ে বললো "পরে দেবেন।"

গাড়ী থেকে নেমে একটু হেঁটে তারা বাড়ীর সামনে এলো—রমা ফের টাকা বার করবার চেষ্টা করলে—তাপস হাসতে হাসতে বললো "আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি ত। একটা মেয়ের কাছ থেকে অর্দ্ধেক ভাড়া নিলে লোকে আমায় কি বলবে বলুন দেখি? ঋণী না থাকতে চান ত' একটা কাজ করুন—আমাকে এক দিন চা খাইয়ে দিন। জানেন ত, কথায় বলে পেটুক বামুন।"

ঠিক হলো, পরদিন শনিবার বিকেলে তাপস রমাদের বাড়ীতে চা খাবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাপস ওদের বাড়ীতে এলো ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবী—বেশ দেখাচ্ছিল তাকে—রমাদের বাড়ীতে বেশী লোক নেই—রমা, ওর বাবা আর একটা চাকর। রমার বাবা রাত্রি ১০টার আগে ফেরেন না—কাজেই সন্ধ্যের সময় বাড়ী অনেকটা ফাঁকা। চা খেতে খেতে তাপস বললো, "বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক কলকাতায় এসেছেন—শুনেছেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ:"

"চলুন, কাল শুনে আসা যাক।"

চুপ করে ওর দিকে তাকাল রমা। মুখে ফুটে উঠলো যে চিহ্ন তার উত্তর-স্বরূপই বললো তাপস—"আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি—বেশ ত' ভাববেন না হয় একাই যাচ্ছেন।"

পরদিন হলের সামনে স্যুটপরা তাপসকে রমা চিনতেই পারে নি—রোগা আর কাল লাগছিল তাকে—হয়ত অফিস থেকে সোজা চলে এসেছে বলে। অন্যমনস্ক ভাবে সে তাকিয়ে ছিল একটি অর্দ্ধনগ্ন বিলাতী মেমের ছবির দিকে। রমা কাছে যেয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে না?"

"না, মেয়েদের ৬টা মানেই ৬—৩০, কাজেই সে হিসেবে একটু আগে এসেছেন—এখন মাত্র ৬—২৫।"

"মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার বেশ জ্ঞান আছে দেখছি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সবই থিওরিটিকাল—এই যা।"

সুমধুর সঙ্গীত—তার চেয়েও বড় প্রেমের চিরন্তন ইতিহাস, তাই সঙ্গীতের সুর তাদের কানে ঢুকলো বিন্তু, মনে দাগ কাটলো না। তাপসের বাবা-মা কেউ নেই শুনে ব্যথায় রমার মন ভরে উঠলো। কেউ না থাকলে কি রকম লাগে—রমার যদি কেউ না থাকতো। আলো জ্বলে উঠলো, যে যার পার্শ্ববর্ত্তিনীদের নিয়ে বেরিয়ে এলো—সামান্য তিন ঘণ্টা কি এ যেন অনন্ত যুগ, একটা বিপুল পরিবর্ত্তন তার মাঝে এসেছে, একটা ভূমিকম্প, যেন সব ওলট-পালট করে দিল; যেখানে ছিল ধূসর মরু সেখানে এখন শস্যশ্যামল প্রান্তর।

সামনেই গাড়ী পেয়ে তাপস ডাকলো। রমা কিছু আপত্তি করবার আগেই দরজা খুলে ড্রাইভার ডাকছে "আইয়ে"—রাস্তার লোকের সামনে কিছু বলাটা অশোভন অথচ তার একটুও ইচ্ছে ছিল না গাড়ীতে আসবার, এই কথাগুলিই মনে মনে পর্য্যালোচনা করছিল। চমকে উঠলো বাইরে তাকিয়ে—"এ কি, এ ত তাদের পরিচিত রাস্তা নয়—ট্যাক্সিটা রেড রোড দিয়ে ঘুরে ডাঙ্গার দিকে চলছে—"

"আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন?"—একটু ভীতিমিশ্রিত বিরক্ত সুরে রমা বললো—

তাপস নীরবে ওকে লক্ষ্য করছিল "ভয় নেই, ইলোপ করবো না, বড্ড গরম, তাই একটু ঘুরে যাচ্ছি।"

"আমার—আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না ট্যাক্সিতে আসবার।"

"কেন?"

"কি দরকার? শুধু শুধু কতগুলি টাকা খরচ।"

"দরকার! হ্যাঁ, দরকার একটু ছিল বই কি!" গোপন হাসিতে আভাসিত হয়ে উঠেছিল তাপসের মুখ।

"কি ?"—অবাক হয়ে রমা বলতে পেরেছিল শুধু।

"এই"—বলে তাপস ওকে······

রমার দেহের শিরা-উপশিরা হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো আগুনের মত। এ আগুনে দীপ্তি নেই, শুধু দাহ।

রমা দু'হাতে ওকে ঠেলতে লাগলো—ছাড়াতে চাইলো নিজেকে প্রাণপণে, লজ্জা, সঙ্কোচ, বিরক্তি, রাগে তার মন পরিপূর্ণ—তা সত্য, কিন্তু, তার সঙ্গে আর একটি ভাবও মিলে আছে অনাস্বাদিত আনন্দের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য।

একটু পরে তাপস নিজেই তাকে ছেড়ে দিল—কোণে গিয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে রমা বললো "কেন? কেন আপনি এ-রকম করলেন ?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"ভালবাসি! আপনাদের ভালবাসা রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে দেখছি, কুড়িয়ে নিলেই হলো। আপনিও তা'হলে ঐ সব খারাপ ছেলেদের মত।"

"আমি তোমাকে বিয়ে করবো, রমা! তুমি বিশ্বাস কর, আমার এ ভালবাসা মিথ্যা নয়।"

বিশ্বাস না করে উপায় নেই—একটু সন্দেহের বীজ উঁকি মারছে সত্য, এত শীঘ্র কি করে হয়—কিন্তু নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানেও কি এই একই ইতিহাস লেখা নেই! কোন পরশমণির ছোঁয়ায় তার সমস্ত মন সোনা হয়ে গেছে—একটু ·পরশ·যদি তার জীবনকে এত পরিবর্ত্তন করে দিতে পেরে থাকে, তবে তাপসের জীবনেই বা তা সত্য হবে না কেন ?

এই ভাবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো তাদের প্রেম—প্রদোষের স্নিগ্ধ হাওয়ায় গঙ্গার তীর, সন্ধ্যার নিবিড়তায় গাছের নীচে, ব্যারাকপুর রোড ধরে গতির আবেগে উচ্ছ্বসিত গাড়ী, শুভ্র শয্যা···

শয্যা—একটু শিউরে উঠলো রমা—শয্যা কথাটা যেন বড় নতুন বলে ঠেকেছিল সেদিন—শয্যা—সে ত' শুধু শয়নের উপকরণ নয়—আরও অনেক কিছু অনুভূতির আধার সে। সে রাত্রির একটা মাদকতা ছিল—চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন মোহময় বাদল রাত্রি। ঘরে শুধু তারা দুজন ছিল, কোথা দিয়ে কি হলো রমা জানে না—শুধু সে অনুভব করলো আনন্দ-বেদনাময় পথে কৌমার্য্যের সমাধি-উৎসব। সমাধি কিন্তু উৎসব—মৃত্যুর পথে জীবনের জয়যাত্রা।

কিছু দিন এই ভাবেই চললো—আসক্তি-আগুনের মত—তাতে যতই আহুতি দেবে ততই সে লক্-লক্ করে সর্ব্বগ্রাসী জিহ্বা প্রসারিত করবে। তার পর রমা যে কথাটা তার মনকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তা প্রকাশ করে বললো—বিয়ে করবার কথা, উত্তরে তাপস যা বললো তার এক বিন্দুও রমা বুঝতে পারলো না—ভাব থেকে এইটুকু বুঝলো যে তাপসের পক্ষে এখন বিয়ে করা অসম্ভব। একটুখানি ভাবলো রমা—তার পর বললো, "তাহলে, আমাদের সম্পর্কের এখানেই পরিসমাপ্তি হোক ?"

"কেন ?"

"তুমি নিশ্চয়ই ভাবনি যে আমি সারা জীবন তোমার সঙ্গে অবৈধ প্রণয় চালিয়ে যাব।"

"না তা ভাবিনি—"

একটু ইতস্ততঃ করে তাপস বলেছিল "কিন্তু—"

"এর ভেতর আর কোন 'কিন্তু' নেই"—দৃঢ় স্বরে উত্তর করেছিল রমা।

সেদিন তাপস চলে গিয়েছিল—তবে দু' দিন পরেই দরজায় আবার সেই পুরোনো ঠক্-ঠক্ শব্দ। "রমা, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, কাজেই তার জন্য যা করতে হয়, করবো—প্রয়োজন হলে বিয়েও।—"

কথাটা শুনে হয়ত পুলকিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা রমা হতে পারে নি। ভালবাসাটা এমন কিছু অপরাধ নয়, যার জন্য শাস্তিস্বরূপ বিয়ে করতে হবে। বিয়ে প্রেমের স্বাভাবিক এবং সুস্থ পরিণতি।

"মনে হচ্ছে।" একটু গম্ভীর ভাবেই তাপস বলেছিল "আমাকে তুমি সরিয়ে দিতে চাও ?"

এবার নীরব থাকার পালা রমার এবং নীরবই সে ছিল, যত দিন না—হ্যাঁ, যত দিন না শেষের সেদিন এলো।···হঠাৎ, মৃদু আলাপ আর ঝঙ্কার ভেসে এলো পাশের ঘর থেকে, এক নব-বিবাহিত দম্পতি ওখানে বাসা নিয়েছেন—মনে পড়লো তাপসের কথা—সে বলতো "দেহটা বীণা, প্রেমিক বীণাকার। সেই বীণার ঝঙ্কারে শুধু বীণাকারই যে তৃপ্ত হয় তাই না, জগৎও মুগ্ধ হয়।"

"জগৎ কি করে জানবে কোন্ অন্ধকার কোণে বসে কে বীণা বাজাচ্ছে ?"

"তার সৌরভ চাপা থাকে না। আর এই জন্যই এই নিয়ে এত কাব্য, এত গান, এত কবিতা, এত ছবি। দেহকে কেউ অস্বীকার করেন নি। দেহ হচ্ছে পরম আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আধার।"

"আমিও ঠিক ঐ কথাই বলছিলুম"—রমা বলে "কিন্তু কখন কল্যাণ থেকে অকল্যাণ সুরু হবে, পুণ্য থেকেই জন্ম নেবে পাপ তা কি করে জানব? স্থানবিশেষে যা স্বর্গীয় আবার তাই নারকীয়। এর মধ্যে সীমারেখা খুঁজে পাওয়া কঠিন।"

আজ নিজের এই প্রশ্নের জবাব নিজেই পেয়েছে সে এই অন্ধকার ঘরে বসে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কল্যাণ-অকল্যাণ, প্রেম-ঘৃণা—সবই রাত্রি-দিনের মত একই জিনিষের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সে দিন সে নিজেই ডাকিয়ে এনেছিল তাপসকে।

"তোমার দোষেই হল"—একটু চমকে তাপস বলেছিল—"আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

"দোষ আমার খানিকটা ঠিকই—তার দায়িত্বও আমি নিচ্ছি। তোমারটুকু তুমি ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করো না। দায়িত্ব, মানে বিয়ে—কিন্তু, সে ত অসম্ভব!"

"অসম্ভব!" অবাক হয়ে রমা বলেছিল "কিন্তু কেন ?"

"কারণ, এটা অসবর্ণ বিয়ে! তাছাড়া মামা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।"

"আশ্চর্য্য! এত দিন পর এ কথা বলতে তোমার বাধছে না ?"

"রমা, অবুঝ হয়ো না। আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। কিন্তু, প্রেম এক জিনিষ বিয়ে আর। একটি একান্ত ভাবে মনোধর্মী, অপরটি সমাজের। এ দুইকে মেলান শক্ত।"

"কিন্তু, মনের দাবী কি সমাজের দাবীর চেয়ে বড় নয়? তাছাড়া এ রীতিমতো হত্যা। একটা নিষ্পাপ কুঁড়ি প্রস্ফুটিত

এবার আশায় আমাদের মুখ পানে চেয়ে আছে—তাকে তুমি কি করতে চাও? তাপস, আমি নিজেকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম, তবু কেন তুমি ভালবাসার ভাণ করে আমার চরম সর্ব্বনাশ করলে?"

"রমা, ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা! ক্ষমা আমার মনের কোথা দিয়েও নাই। তুমি আমার মনকে পাথর করে দিয়েছ, এই ক্ষমাহীন আগুনের অভিশাপ তোমাকে সারা জীবন দগ্ধ করবে"—বলতে বলতে সে সামনের গরম চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছিল—শুধু এই মনে আছে—আর কিছু মনে নাই।······

···এক মিনিট নীরব নিস্তব্ধতা। পরে সকলে একসঙ্গে কলরব করে উঠলো। স্রেফ্ বাজে, গাঁজা ইত্যাদি নানারূপ মন্তব্য। আমিও বললুম "এ নিছক গল্প" কোন উত্তর দিলেন না তিনি। শুধু, এক মিনিট তাকিয়ে চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেললেন। একটি গলিত বীভৎস চোখ তার লোমগুলি, চার পাশের ত্বক যেন কিসে পুড়ে গেছে। পাশের সুন্দর বড় চোখটি, ডাষ্টবিনের পাশে ফুলবাগানের মত বীভৎসতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সকলের মুখ থেকেই একসঙ্গে একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরিয়ে বাতাসে মিশে গেল। চার-জোড়া চোখ অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলো একটি চোখের দিকে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ কেছিলেন ?

জন্ম ১২১৬ সাল ২২শে শ্রাবণ, শনিবার (৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খৃঃ) খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮০ সাল ২৭শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ) কলিকাতা হেদুয়ার বাটীতে পরলোক গমন করেন। কাশীপ্রসাদের পিতামহ মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ, পূর্ব্বনিবাস হাওড়ার অন্তর্গত পৈতাল নাম গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করিতেন। এখানে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-কুঠীর দেওয়ান বা খাজাঞ্চী ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২০৫ সালে এই কার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠাইয়া দিলে তিনি কলিকাতা শ্যামবাজারে আসিয়া একটি বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তুলসীরামের দুই পুত্র—১ম শিবপ্রসাদ, ২য় ভবানীপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদের দুই পত্নী; প্রথমা পত্নীর গর্ভে খিদিরপুরে কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কুলীন কায়স্থ এবং কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত জমীদার। কাশীপ্রসাদ মাতৃগর্ভ হইতে সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং তদবধি দ্বাদশবর্ষ কাল পর্য্যন্ত মাতামহাশ্রয়ে অবস্থান করিতেন। ফলে, তিনি কিছু বেশী আদুরে হইয়া পড়িলেন, লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ দিলেন না। এমন কি, এই দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় পর্য্যন্ত তিনি কেবল বর্ণপরিচয় মাত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। মাতামহ রামনারায়ণ, এই নিমিত্ত জামাতাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দুকলেজে একেবারে তিন শত টাকা জমা দেওয়াইলেন। এইরূপে কাশীপ্রসাদ ১৮২১ খৃঃ ৮ই অক্টোবর তারিখে হিন্দুকলেজে ৭ম শ্রেণীতে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইলেন। অকাতর পরিশ্রমে ও অসাধারণ মেধাশক্তি গুণে, কাশীপ্রসাদ ৩ বৎসর মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কাশীপ্রসাদ হিন্দু কলেজে সর্ব্বসমেত ৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৩টী সুবর্ণপদক, ৫টী রৌপ্যপদক, ৩৫০ খানি পুস্তক এবং নগদ ৬০০্ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় (১৮২৭ খৃঃ শেষভাগে) অধ্যাপক H. H. Wilson সাহেবের প্ররোচনায় কাশীপ্রসাদ, 'The young poet's first attempt' নামক কবিতা এবং James Mill রচিত সুবৃহৎ ভারত ইতিহাসের প্রথম চারি অধ্যায়ের সমালোচনা করিয়া 'A short review of James Mill's History of British India' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটি এত যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল যে, ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে Asiatic Society's Journalএ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বালক কাশীপ্রসাদের পক্ষে কম সম্মানের কথা নহে।

কাশীপ্রসাদ, তৎকালীন হিন্দুকলেজের সুবিখ্যাত কাপ্তেন রিচার্ডসন্, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ভারত-হিতৈষী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই কাশীপ্রসাদের অসাধারণ ধী-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং বালক কাশীপ্রসাদও ইঁহাদিগকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন। ছাত্র কাশীপ্রসাদের কোন সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ডেভিড হেয়ার বলিয়াছিলেন—

The spiritual sermon which Babu Kasi Prosad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrilling, eloquent and soul-stirring sermon from any Hindu, not even from any Christian preacher of Calcutta.

কাশীপ্রসাদ, বঙ্গভাষায় প্রায় ৩০০ শত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতগুলি প্রায় অধিকাংশই আদিরসঘটিত এব পরকীয়া প্রেম বিষয়ক। সঙ্গীতগুলি নিধু বাবুর গানের ন্যায় সুমধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর বিষয়ক গীতগুলিও কবির প্রগাঢ় ভক্তির

অমিয়া সেন

রাতের অদৃশ্য ঘড়িতে তিনটা বাজতে না বাজতেই ফেরী-ওয়ালাদের পাড়ায় রাত শেষ হয়ে যায়। পাখী-ডাকা ভোর নয়, ফেরীর জিনিষপত্র গুছিয়ে লোক্যাল ষ্টেশনে যাবার প্রভাত ডাক দেয় ওদের। এরা প্রায় কেউ-ই জাত-ফেরীওয়ালা নয়, অবস্থা-বিপাকে অনন্যোপায় হ'য়ে তানসেন, ডালমুট শরণাপন্ন হয়েছে। একদিনে সবাই এই জীবিকা নেয় নি। অনেক অন্ধকার গলিপথে আনাগোনা করে, জীবন-সমুদ্রের ঢেউয়ে অনেক নাকানি-চোপানি খেয়ে এই পথ ধরেছে। এতে তবু দু'বেলা না হলেও এক বেলা আধ-পেট খাওয়া কোন মতে চলে।

জীবনের তাগিদে মধ্য রাত্রে কলরব জাগে এই পাড়াটিতে। শহর কলকাতার প্রায় বাইরের এই সব জায়গা এত দিন ভরা ছিল খানা-ডোবা আর আগাছায়। সে সব খানা-ডোবা বুজিয়ে আগাছা পরিষ্কার ক'রে বর্তমানে এখানে পতিত জমি জুড়ে বসেছে গৃহচ্যুত শরণার্থীর দল। নতুন আগাছা। ছোট ছোট ছিটে-বেড়ার সারি সারি ঘর। নশ্বর জীবনের ভঙ্গুর আশ্রয়কেন্দ্র।

সময়ের ঘড়িতে সেই রাত তিনটা বুঝি বাজল।···ছোট ছোট ছিটে-বেড়ার ঘরগুলির ভিতর থেকে মেয়েরা জেগে উঠল ব্যস্তসমস্ত হয়ে। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চুক্ চুক্—মায়ের বুকের দুধ খাবার সুখটুকু ছুটে যাওয়ায় তারস্বরে কেঁদে উঠল শিশুর দল।

মুড়ি মটর ভুট্টা ভাজার খোলা চড়েছে অনেকগুলো, শুক্‌নো কাঠ জ্বল্‌ছে দাউ-দাউ করে···

—অমি—ও অমি,—কুমু পিসী উনুনে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে চ্যাচাতে লেগেছে।

রাধানাথের বউ শান্তি খোলায় ভুট্টা ঢালতে ঢালতে বলে, ওর ঘুম কি একবার ডাকে ভাঙবে না কি, যা ঘুম-কাতুরে!

চালুনে করে ভাজা মুড়ি ঢালতে ঢালতে মতি দাসের প্রৌঢ়া বিধবা বোন অন্নদা বললে, আহা, কপালের ফের, বাপ-মার অত আদরের মেয়ে, আজ দেখ এই কচি বয়সে পেটের দায়ে কি করতে হচ্ছে—

ও-পাশে বসে মুখ নীচু ক'রে চানাচুরের ঠোঙ্গা গুনে গুনে সাজিয়ে রাখছিল হেমন্তের বৌ রত্না। কলেজে-পড়া তরুণী। ঠোঙ্গা গুনছে আর মাঝে মাঝে কান পেতে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছে···। হেমন্তের কাতরানি···দুটি ছেলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল এখানে। বড়টি শহরের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল।···ছ'বছরের ছেলে কোন খোঁজই পাওয়া গেল না আর। হেমন্ত কেমন যেন হ'য়ে গেছে সেই থেকে। পাগলের মত ফেরীর বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত। বিক্রীর দিকে তেমন মন নেই, উৎসুক দৃষ্টি মেলে খুঁজে বেড়ায় শুধু তার হারানো ছেলেকে।

বাড়ী ফিরেও ঘুমের মধ্যে সারা রাত কাতরায়··· পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে কখনো,—ধর—ধর রত্না, ঐ যে খোকা—রত্নাকেই তাই শক্ত হ'তে হয়েছে, স্বামীকে বোঝায়, "এ-রকম করছ কেন, দেখ না চারি দিকে তাকিয়ে, কত জনের কত হারিয়েছে···"
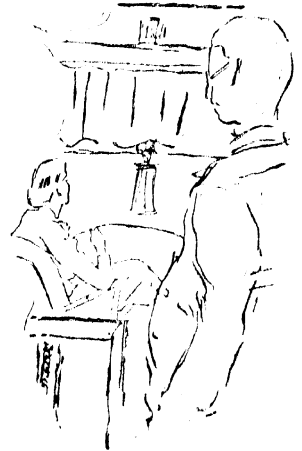
বুদ্ধিমতী রত্না। অশ্রু-সমুদ্রের ঢেউ যুক্তির বাঁধ দিয়ে ঠেকাতে চায়, অন্নদার কথা শুনে আস্তে—সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস ফেলল। হয়ত মনে পড়লো নিজের হারানো সন্তানটির কথা···মনে পড়লো পূর্ব্ব-বাংলার সেই মফঃস্বল টাউনে নিজের ছোট স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন সংসারটির কথা···পাড়ার, কখনো বে-পাড়ার যে সব বক্ ঝকে স্কুলের মেয়েগুলি তার কাছে পড়া বুঝতে, সেলাই শিখতে আসত, তাদের কথা।

তাদেরি মধ্যে একটি পরিচিত মুখ এইখানে ঐ ছিটে-বেড়ার আড়ালে শুয়ে আছে। এখন সে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায় না, হাত ভরে ফার্ষ্ট হবার প্রাইজ আনে না, বাপ-মার আনন্দ আর গর্ব্বের কারণ হয়ে লঘু পায়ে সংসারে বিচরণ করে না।

—সে এই আমি—বাবা-মার আদরের অনু।

চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোরী মেয়েটির চোখে সে দিনের সেই স্বপ্নালু ভবিষ্যতের ছায়ামাত্রও বুঝি আজ ভাসে না।···

—তোমরা সব উঠে পড়েছ বৌদি?

অনু এসে দাঁড়াল। পরনে একটা ময়লা শাড়ী, দু'হাতে দু'গাছা কাঁচের চুড়ি। একরাশ কালো চুল অযত্নে অবহেলায় হাতখোঁপা ক'রে পিছনে বাঁধা।

পরম মমতা ভরে রত্না মুখ তুলে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখখানির দিকে একবার তাকাল। বললে, না উঠে উপায়? তোকে না হয় পাড়াশুদ্ধ লোক জাগাতে আসবে, আমাকে আর কে ডাকবে বল?

অপ্রতিভ অনু দু'হাতে চোখ কচলে বললে, সত্যি বৌদি, কিছুতেই আমার ঘুম ভাঙ্গে না।

—ভাবনার কথা। নে, এখন মুখে-চোখে জল দিয়ে বেণুর জিনিষপত্তরগুলি গুছিয়ে দে—

বেণু, অনুর ভাই।

গত ১৯৫০-এর দাঙ্গায় ওরা বাবা-মাকে হারিয়েছে। তিনটি ভাই-বোন পাড়া-পড়শীদের সাহায্যে পালিয়ে এসেছিল এখানে। সব চেয়ে ছোটটি মারা গেল অনাহারে অচিকিৎসায়। তখনও বেণু ফেরীওয়ালার কাজ শুরু করেনি, এক কথায় বেকার ছিল সে। এবং তার একমাত্র কারণও ছিল তার বয়েস। দু'বছর আগে ওরা যখন এখানে আসে, তখন বেণুর বয়স ছিল নয়। আজ সে কতকটা সাবালক, রোজগার করে সংসার চালায়। এগারো বছর বয়েস দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট বই কি!

চিড়ে-মুড়ি ভাজতে অনু পারে না। শরণার্থী শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রে আলতা সিঁদুর সাবান তৈরি করতে শিখেছে সে। তাই দিয়ে সাজিয়ে দেয় বেণুর ফেরীর ঝুড়ি।

সব চেয়ে কষ্ট লাগে ওর শেষ রাত্রির কাঁচা ঘুম থেকে বেণুকে টেনে তুলতে। ভাইয়ের ক্লান্ত শীর্ণ কচি মুখখানি দেখলে অনুর বুকের মধ্যে যেন হু-হু ক'রে ওঠে। তখন মনে হয়, এ পাপ পৃথিবী হতে পালিয়ে যায় সে বেণুকে নিয়ে এমন কোনখানে, যেখানে খিদে-তেষ্টা নেই, বেণুকে আর পেটের দায়ে ফেরী ক'রে বেড়াতে হবে না। কিন্তু কিশোরী মেয়ের কল্পনার মতই তেমন স্বর্গলোক মর্ত্ত্যে অলীক। বেণুর ঘুমে-জড়ানো কাতর চোখের চাউনি মাকে মনে পড়িয়ে দেয়, আর জলে চোখ ভরে আসে। তবুও, আস্তে আস্তে অনিচ্ছুক গলায় ডাকে অনু, "বেণু ভাই ওঠো, ষ্টেশনে যাবে না আজ?—"

সকাল পাঁচটার আগেই পাড়া খালি ক'রে বেরিয়ে যায় পুরুষেরা। ফিরবে আবার সেই সন্ধ্যায়। ফিরতি-পথে চাল ডাল আনাজ যে যা পারে নিয়ে আসবে। তখন কোটা-বাটা রান্না-বান্নার ধুম। অতি সামান্য উপকরণ, কিন্তু তাই দিয়েই যেন উৎসব সুরু হয় রাত্রে।

একটা দিনের কষ্টকর অবসানের শেষে প্রিয়জন ফিরে আসে ক্ষুধার অন্ন নিয়ে। যে অন্নের সম্ভাবনা সারা দিন থাকে অনিশ্চিত। জিনিষ বিক্রী হবে, তবেই জুটবে খাওয়া। তাই ওদের এই শাকান্নের ভোজও একটা মস্ত-বড় মিলনান্ত উৎসব! খাওয়ার আনন্দ, বাপ ভাই স্বামী ঘরে ফিরে আসার আনন্দ!

দুপুরে তাই রান্না-বান্নার পাট তেমন একটা থাকে না। বাসি ভাত রুটী যা থাকে তাই দিয়ে বা দুটো মুড়ি চিবিয়েই সবাই কাটিয়ে দেয় দিনটি।

ঘর-কন্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেয়ে-বৌরা এই সময়টি কিছু বাড়তি রোজগারও করে। কাঁথা সেলাই থেকে উল, ক্রুশের বোনা, আচার, বড়ি তৈরি করে দেওয়া ইত্যাদি। স্থানীয় লোকদের ফরমায়েসী কাজ।

অনু একটা উলের বোনা নিয়ে বসেছিল।—ছোট বাচ্চার গায়ের একটা বেনিয়ান। বুনে দিলে আট আনা মজুরী মিলবে। বসেছিল, কিন্তু বুনছিল না। অনির্দ্দেশ্য ভাবে চেয়েছিল আকাশের দিকে।······

আকাশটা আজ কেমন মেঘ-থম্-থম্। কতখানি বেলা হল, এখনো রোদ উঠল না।

কুমু পিসী ওদিকে এক রাশ বড়ির ডাল ভিজিয়েছে। ডাল বাটছে আর অবিরাম গালাগালি দিচ্ছে মুখপোড়া ভগবানকে। কি উপায় হবে তার রোদ না উঠলে, সব ডাল নষ্ট হয়ে যাবে। গরীবের পয়সা আর পরিশ্রম, কিছুরই যেন মূল্য নেই হতভাগা ভগবানটার কাছে···ইত্যাদি।—একটানা প্রলাপ।···অনুর কিন্তু ওদিকে কান নেই। আকাশে মেঘের আঁচল ধরে ধরে তার মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে—মাদারীপুর টাউনের একান্তে একখানি সুন্দর ছোট্ট লাল বাড়ীর সামনে। তার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ী,—বাবা-মা-ভরা আনন্দময় বাড়ী, তিন ভাই-বোনের হাসি কান্না-উচ্ছলিত—দাপাদাপি-মুখরিত বাড়ী। কাল রাত্রে অনু সেইখানে গিয়েছিল স্বপ্নে। সেই স্বপ্নের কথাই ভাবছিল সে।

স্বপ্নে দেখেছে, যেন মাদারীপুরে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গেছে তারা। ছুটাছুটি করে সে আর বেণু মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছেন। ভাবখানা যেন,—"কেমন লুকিয়ে ছিলাম আমরা, আর দুষ্টুমি করবে?"—

মাকে পাওয়া গেল ঘাটের পথে। স্নান সেরে কাঁখে কলসী নিয়ে ···মাকে বড্ড বেশী ক'রে মনে পড়ছে আজ, আর কিছুই ভালো লাগছে না অনুর।

কেমন যেন কান্না পাচ্ছে, নতুন রকম একটি কষ্টের সঙ্গে মনে হচ্ছে, মাদারীপুরের সেই স্বপ্নের মত সুন্দর লাল বাড়ীতে আর কোন দিন ফিরে যাবে না তারা, মাকে আর কোন দিন জড়িয়ে ধরবে না, সন্ধ্যায় মাদুর পেতে হ্যারিকেনের আলোতে বাবার কাছে বসে

আর কোন দিন স্কুলের পড়া শিখবে না,···আর···আর বেণুর কাঁধের ফেরীর ঝোলা কোন দিন বুঝি নামবে না···

আঁচলে মুখ ঢেকে হু-হু ক'রে কাঁদে অনু,···কোল থেকে উলের বলটি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে শ্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে আচ্ছন্নের মত শুয়ে পড়ে মাটিতে আঁচল পেতে।

সকাল বেলার বিষণ্ণ আকাশে আরো ঘনতর হ'য়েছে মেঘের চাপ, সূর্য্য ওঠার আশা নেই।

বেলা তখন পৌনে দশটা।

* * * *

এই সময়টা লোক্যাল ট্রেনগুলোতে বড় ভীড়। ডেলী প্যাসেঞ্জার আসে গাড়ী-ভর্ত্তি হয়ে। ঐ ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে ক'রে গাড়ীর এ কামরা হ'তে ও কামরায় যাতায়াত করতে বেণুর যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

···মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। অনেক দিন কাটা হয়নি, ঘাড় অবধি নেমেছে। রোগা রোগা চেহারায় ঢল ঢলে সুন্দর মুখখানি দেখলে মায়া লাগে। গলায় তেমন জোর নেই, বড় বড় ড্যাব-ড্যাবে দু'টি চোখ মেলে তরল আলতার শিশিটি তুলে সকলের মুখের দিকে তাকায় আর মিষ্টি-করুণ সুরে বলে, নেবেন বাবু, খুব ভালো আলতা—

আলতা ভালোর জন্য না হোক, ওর ঐ মুখ আর চাউনীর জন্য অনেকে দরকার না থাকলেও কিনে নেন এটা-সেটা। সেদিন ভীড় যেন অন্য দিনের চেয়েও বেশী।

বেণু প্রাণপণে ঠেলে-ঠুলে অন্য কামরায় যাবে ব'লে গাড়ীর দরজার কাছে এলো। ততক্ষণে ট্রেন ছুটতে সুরু ক'রেছে···বেণুও মরিয়া হ'য়ে ঝুলে পড়ল হ্যাণ্ডেল ধরে।

তাড়াতাড়ি অন্য কামরাগুলোয় তার যেতেই হবে। আজ এখন পর্য্যন্ত একটাও বিক্রী হয়নি তার। দ্রুত পরিশ্রমে আর উৎকণ্ঠায় মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, তবু তাড়াতাড়ি করছে বেণু···

কিন্তু কি হল!—হঠাৎ কার হাতের ধাক্কায় তার ছোট মুঠিখানি আলগা হ'য়ে খসে এলো গাড়ীর গা থেকে—একটা অন্ধ গাইয়ে ভিখিরী···

—দিদি রে,—

বেণুর গলায় তেমন জোর নেই। তাই অন্য কেউ-শুনতে পাবার আগেই কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত সে খসে পড়লো শূন্যে—শূন্য থেকে গাড়ীর তলায়।

* * * গাড়ী যখন থামল, তখন তার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ছিটকে পড়েছে চার দিকে।······ফেরীর ডিউটি শেষ হ'ল এগারো বছরের জীবনে।

* * * *

—"অমন করছ কেন, মনে করো না তোমার খোকাও ফেরী করতে গেছে বেণুর মতো—"

মেঘ-মেঘ দিনের চাঁদ-না-ওঠা সেই সন্ধ্যায় সেদিনও রত্না সান্ত্বনা দিচ্ছিল হেমন্তকে। আর পাশের ঘরে বসে তাই শুনতে পেয়ে অনু বিবর্ণ হ'য়ে ভাবছিল, যদি খোকার মত বেণুও আর ফিরে না আসে!

চৈত্রের গান

আনন্দ বাগচী

মীনাক্ষীর স্বপ্ন:
আকাশে চৈত্রের চোখ, জানালায় মাধবীলতার
স্নেহ, আর ঘড়ি-কণ্ঠ অদূর গীর্জার মৃতধ্বনি,
ভাঙা-কবরের গান, মাঝে মাঝে এলোচুল-হাওয়া
ফুলদানী ছুঁয়ে যায়; ঘনপাতা বইয়ের ভিতর
দুচোখ ডুবিয়ে তুমি সামুদ্রিক ঝিনুকের মত
রামধনুকের ঘুমে অচেতন।

মৃদু রাত বাড়ে···
পাশের বাড়িতে গান, গ্রামোফন, কাচের হাসির
ধারালো এক-আধ টুকরো বেঁধে কি মনের কোনখানে,
কিংবা কোন পত্র-লেখা-দুপুরের দুরন্ত স্মৃতির
রঙ্‌ধরা সুখ। কোন নিষিদ্ধ কান্নার কলি ঠোঁটে
রাত্রির রেলিঙে শ্রান্ত বুক রাখো, নীচে রসা রোড
মানুষের ধূর্তছায়া ধূসর ক্লান্তির আলেয়ায়
মিশে যায় রাত্রির মতন।

পাতাঝরা ক্লান্তির গান:
তোমার বইয়ের রাত শেষ, শোধ। তোমার সকাল
প্রমত্ত পলাশ নয়, ঘড়ির কাঁটায় বিঁধে আছে,
তোমার নির্জন শাড়ি ছিঁড়ে গেছে জীবিকা-থাবায়।
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনের ভিড়ে ডুবে যেতে,
আত্মার নিস্তব্ধ হাসি নিয়ে ম্লান মোমের মতন
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনের ক্লান্তি ফিরে পেতে।

৪

চিত্রলেখার গৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া সাগরিকা তিন দিনে পিতার বসিবার ঘরের পুরাতন শ্রী ফিরাইতে ব্যস্ত ছিল। স্ত্রীলোকের নিপুণ হস্তের স্পর্শ ব্যতীত সে শ্রী থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্যবোধ স্ত্রীলোকের প্রকৃতিগত; পুরুষের পক্ষে তাহা অনুশীলনসাধ্য।

আজ সকালে সে ভ্রাতার বসিবার ঘর আক্রমণ করিয়াছিল। সে সে কাজ আরম্ভ করিলেই তরুণকুমার বলিয়াছিল, "দিদি, আমার ঘরের 'সংস্কার' করার কোন প্রয়োজন নাই।"

সাগরিকা বলিয়াছিল, "আছে কি না, তা' আমার কাজ শেষ হ'লে বুঝিয়ে দিব।"

"তখন ত কাজ হয়েই যা'বে; বুঝে আর কি লাভ হ'বে?"

"লাভ—তোমার বিয়ের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করা।"

"কি সর্ব্বনাশ!"

"মা বলতেন, যে বাড়ীতে গৃহিণী না থাকে, সে বাড়ী

শ্রীদীপঙ্কর

দরজা-জানালাহীন ঘরের মত; আর যে বাড়ীতে শিশুর কণ্ঠস্বর শুনা যায় না, সে বাড়ী মরুভূমি।"

"তা' হ'লে আমাদের বাড়ী উভয়ই!"

"বাবার ঘরের অবস্থা কি হয়েছিল, তা' ত তোমাকে দেখিয়ে দিয়াছি।"

"কিন্তু আমার ঘরটা না হয় যা' আছে, তা'-ই থাকুক।"

"না। তুমি ভয় পেও না—দেখবে তোমার ব্যবহারের জিনিষ যে-স্থানে রাখ, সেই স্থানেই থাকবে—কেবল সব পরিষ্কার হ'বে।"

"ভাল; আমি হতাশ ভাবেই বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করলাম।"

ভৃত্যের অভাব না থাকিলেও ক্রমে ক্রমে পিতার ঘরে কিরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা এতদিন তরুণকুমার বুঝিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সাগরিকার কাজের পরে বুঝিতে পারিয়াছে। বিশৃঙ্খলা ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল—সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহা তিন দিনেই শৃঙ্খলাকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছে। চিত্রলেখা যখনই ভ্রাতার গৃহে আসিতেন, তখনই ভৃত্যদিগকে উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু ভৃত্যরা সে সব উপদেশ পালন করিত না বা পালন করিবার যোগ্যতা ও শিক্ষা না থাকায় যথাযথ ভাবে পালন করিতে পারিত না।

সাগরিকা ভ্রাতার ঘরটির 'সংস্কারে' মনোনিবেশ করিল।

তরুণকুমার পাঠ শেষ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক যে দিন সে শ্বশুরালয়ে সাগরিকার দুরবস্থার বিষয় জানিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার ভাবনার যেন শেষ ছিল না। সমাজ-জীবনে যে সকল ত্রুটি প্রবল হইয়াছে, আবর্জ্জনা বর্দ্ধিত হইয়াছে—সে সকল সম্বন্ধে আজ কর্ত্তব্য কি? স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি তরুণকুমার আরও গম্ভীর ভাবে অভিভূত হইয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইলে সে বিভিন্ন দেশসমূহের সামাজিক গতি ও প্রকৃতির বিষয় অধ্যয়ন করিয়া সে সকলের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিবে।

তরুণকুমারের চিন্তিত ভাব চিত্রলেখা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, ভগিনীর অবস্থা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। সে কথা তিনি স্বামীকেও বলিয়াছিলেন। শুনিয়া সমীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ওর মা'র মৃত্যুর পর হ'তেই ও গম্ভীর হয়েছে—এবার দিদির ব্যাপারে বিচলিত হ'বার কথা। এ ব্যাপারটা যে আমাদেরও বিচলিত ক'রে তুলছে। কি হ'বে, বুঝতে পারছি না। অনুকূলও তা-ই বলে।"

তাহার পর সমীরচন্দ্র স্ত্রীকে বলেন, "কলেজে ছেলেরা তরুণের কি নামকরণ করেছে জান?"

"না।"

"তারা ওকে 'দার্শনিক' বলে।"

চিত্রলেখা হাসিলেন।

সাগরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তরুণকুমারের চিন্তা এক পথে প্রবাহিত হইয়াছিল; আর অনুকূলচন্দ্র, চিত্রলেখা ও সমীরচন্দ্র আর এক দিক ভাবিতেছিলেন। অনুকূলচন্দ্র প্রভৃতির চিন্তা পরিচিত খাতে প্রবাহিত হইতেছিল—কি উপায়ে সাগরিকার গার্হস্থ্য জীবন সুখময় করা যায়। উমাদাসের পরিবারের ব্যবহার তাঁহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল; কিন্তু সেই পরিবারেই

সাগরিকার স্থান। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন, কি উপায়ে সে পরিবারের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা যায়? তাঁহারা সে পরিবারের সংবাদ লইতেছিলেন। পল্লীর তরুণরা সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ—প্রধানতঃ ভৃত্যদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া—দিতেছিল। সে সকল অবগত হইয়া তাঁহারা ভাবিতেছিলেন—সে পরিবারের অবস্থা-ব্যবস্থা যে দুষ্ট মনোভাবের ফল, তাহার পরিবর্ত্তন কি সম্ভব হইবে? অর্থাৎ স্বভাবের কি পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে? পল্লীর তরুণরা সত্য সত্যই মনে করিয়াছিল, তাহারা পল্লীতে সেরূপ পরিবারের অবস্থিতি চাহে না। সেই জন্য উমাদাস বাবুর পরিবারকে সর্ব্বদাই "একঘরে" ভাবে—ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হইত। তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন কি না, তাহাও ভাবিতেছিলেন। পুলিসের রক্ষিত অবস্থায় কত দিন বাস করা যায়?

তরুণকুমারের চিন্তার ধারা অন্য দিকে যাইতেছিল। মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে সে চিন্তা করিতেছিল। ব্যক্তি হইতে তাহার চিন্তা সমগ্র সমাজের দিকে যাইতেছিল।

সাগরিকা ভাবিতেছিল, সে কি করিবে?

এক দিন তরুণকুমার সাগরিকাকে বলিল, "দিদি, তুমি কি কেবল বাড়ীর সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর ক'রেই সময় কাটা'বে?" সে যে সমাজের সঞ্চিত আবর্জ্জনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, সাগরিকা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে বলিল, "সময় কাটা'তে ত হ'বে। আর বাড়ীটি মা যেমন রেখেছিলেন, তেমনই রাখাও কি ভাল নহে?"

"নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু সময় কাটা'বার কি অন্য উপায় নাই?"

"আছে। কেন—যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?"

"তুমি পড়।"

"সে ত ভালই।"

সেই দিনই তরুণকুমার সে কথা পিতাকে বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া দিদির জন্য কয়খানি পুস্তক কিনিয়া আনিল।

সব শুনিয়া চিত্রলেখা বলিলেন, "সময় কাটা'বার জন্যও বটে, আর মনের জন্যও বটে, পুস্তকের মত সুসঙ্গী আর নাই। কিন্তু এতে ত সমস্যার সমাধান হ'বে না। এ ত কেবল সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "সে-ও ত মন্দের ভাল। সেই হিসাবেই আমি তরুণের ব্যবস্থার সমর্থন করি।"

"তুমি কি এক বার জামাইকে ডেকে তা'কে বুঝাবার চেষ্টা করবে?"

"কেবল বুঝাবার কেন—বুঝবার চেষ্টাও করতে হ'বে। কি বুঝব—সেই ভয়েই কাজে অগ্রসর হ'তে পারছি না—যে দিন যায়, সে দিনই ভাল।"

"কিন্তু তা'তে ত শেষ হ'বে না?"

"না।"

"তবে?"

"সেই কথাই ভাবছি। শুনছি, ওরা পাড়া ছাড়াই স্থির করছে। এইবার যদি যে যা'র ব্যবস্থা স্বতন্ত্র করে।"

"সে আশা দুরাশা ব'লেই আমার মনে হয়।"

"আমি কিন্তু সেই প্রস্তাবই করব।"

"দেখ।"

এদিকে সাগরিকা সোৎসাহে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল। সত্যই পুস্তকের মত সুসঙ্গী আর নাই। অধ্যয়ন সম্বন্ধে সে ভ্রাতার নিকট সকল সাহায্য পাইতে লাগিল।

এই সময় অনুকূলচন্দ্র দ্বিতীয়া কন্যা দীপশিখার শ্বশুরের এক পত্র পাইলেন। তিনি চাকরী করিতেন,' অবসর গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক কখন এক পুত্রের কাছে, কখন বা অন্যের কাছে থাকিতেন; আর সময় সময় এলাহাবাদে থাকিতেন—তথায় তিনি যে বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ আপনাদিগের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ভাড়া দিয়াছিলেন। তিনি পত্রে জানাইয়াছিলেন, দীপশিখা সন্তানসম্ভবা সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার পুত্র—দীপশিখার স্বামী সুধীরের নিকটে যাইতেছেন; তথায় যাইয়া পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন—হয় পুত্রবধূকে লইয়া এলাহাবাদে আসিবেন, নচেৎ তিনি ও তাঁহার পত্নী তাহার নিকটেই থাকিবেন।

পত্র পাইয়া অনুকূলচন্দ্র সংবাদ ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে জানাইলে চিত্রলেখা বলিলেন, "সে হ'বে না—তা'কে আনতে হ'বে।"

তাহার পরেই তিনি বলিলেন, "যেখানে তা'রা আছে, সেখানেও যেমন এলাহাবাদেও তেমনই গরম অধিক। আর শ্বশুর-শাশুড়ী যত ভালই কেন হ'ন না—তাঁ'রা বার মাস কাছে থাকেন না; কাজেই তা'কে আনতেই হ'বে। আমি বেহানকে লিখে দিচ্ছি।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "লিখে দাও। আমি অনেক সময় মানুষে মানুষে প্রভেদের কথায় ভাবি—সাগরিকার শ্বশুর-শাশুড়ী আর দীপশিখার শ্বশুর-শাশুড়ী!"

কেবল সমীরচন্দ্রের সংসারেই নহে—অনুকূলচন্দ্রের পত্নী বিয়োগের পর হইতে তাঁহার সংসারেও চিত্রলেখার মতেই কাজ হইত—ভ্রাতার পত্নী জীবিতা থাকিতে তিনিও সকল বিষয়ে চিত্রলেখার সহিত পরামর্শ করিতেন; উভয়ের ঘনিষ্ঠতা অতি নিবিড় ছিল।

যথাসময়ে চিত্রলেখা তাঁহার পত্রের উত্তর পাইলেন এবং উত্তর পাইয়া বলিলেন, তিনিই দীপশিখাকে আনিতে যাইবেন। অনুকূলচন্দ্রের যাওয়া হইবে না—কারণ, সাগরিকা পিতৃগৃহে রহিয়াছে এবং তরুণকুমারের পরীক্ষারও অধিক বিলম্ব নাই। কাজেই সমীরচন্দ্রকেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে।

শুনিয়া সমীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "কেন—তুমি কি একা যেতে পার না?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "খুব পারি।"

"তবে আবার আমাকে যেতে বলছ কেন?"

"দু' কারণে—প্রথম, এখানে থাকলে তুমি যে আমার সংসারের কোন উপকারে লাগবে—বৌমাদের কোন সাহায্য হ'বে—এমন আশা নাই; দ্বিতীয়, তোমাদের বিশ্বাস, আমরা একা যেতে পারি না—সেই ভুল বিশ্বাসের গর্ব্বে তোমাদের বঞ্চিত ক'রে যখন আমাদের কোন লাভ নাই, তখন তোমাদের বঞ্চিত করি কেন?"

"আমি যা'ব না।"

"কি করবে ?"

"বিশ্রাম করব।"

"সে হ'তে পারে না। যে ঘোড়া খাটে, তা'র না খাটলে বাত হয়।"

সকলেই হাসিলেন।

চিত্রলেখা স্বামীকে বলিলেন, "দেখ ত পথে দেখবার কোন স্থান আছে কি না। থাকলে যা'বার সময় দেখে যা'ব।"

"তীর্থস্থান ?"

"সে ত ভালই।"

"যা'বে ভাইঝীকে আনতে—আবার পথে কেন ?"

"রথ দেখা আর কলা বেচা যদি এক যাত্রায় হয়, সে ত লাভই।"

"আচ্ছা দেখে বলব।"

তাহার পরে যাত্রার আয়োজনের বিষয় আলোচিত হইল। চিত্রলেখা বলিলেন, তিনি বধূদিগকে সংসারের ভার বুঝাইয়া দিবেন।

শুনিয়া সমীরচন্দ্র বলিলেন, "এসে আবার ভার কেড়ে নেবে না ত ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তেমন ভাগ্য কি হ'বে? এই ত দীপশিখা আসছে—তা'র জন্য সকলকেই ব্যস্ত থাকতে হ'বে। তবে এ বার সে কাজে সাহায্য করবার লোক আছে—সাগরিকা।"

সমীরচন্দ্র বলিলেন, "ওর শ্বশুরবাড়ীর সংবাদ একবার নিতে হবে।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "সংবাদ ত ভাল মনে হয় না। পাড়ার লোকের সঙ্গে এদের ব্যবহার আবার অপ্রীতিকর হয়েছে।"

বাস্তবিক পল্লীর তরুণরা উমাদাসের পরিবারকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। পুলিস-প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় উমাদাস উদ্বৃত হইয়াছিলেন। তরুণদিগের চেষ্টায় তাঁহাদিগের পক্ষে পরিচারক বা পরিচারিকা প্রাপ্তি দুঃসাধ্য হইয়াছিল এবং তরুণরা উমাদাসের আত্মহত্যাকারিণী পুত্রবধূর ব্যাপার সম্বন্ধে পুলিসকে অনুসন্ধানে প্ররোচিত করিবার চেষ্টায় বিরত হয় নাই।

সেই সকল কারণে উমাদাসের গৃহ হইতে সাগরিকাকে লইয়া যাইবার কথা আর বলা হয় নাই বটে, কিন্তু অনুকূলচন্দ্র, চিত্রলেখা ও সমীরচন্দ্র সর্ব্বদাই ভবিষ্যতে কি হইবে সে সম্বন্ধে চিন্তিত থাকিতেন—যদি ও যখন বিভ্রাট হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য হইবে? অনুকূলচন্দ্র ও সমীরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে উমাদাসের গৃহে গমন করিতেন এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে করিতেন—পল্লী ত্যাগ ব্যতীত সে পরিবারের গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহার পরে কি হইবে? সকলেই উৎকণ্ঠা সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন—জামাতা লোকনাথ কোন কথাই বলিতেছিল না। সে কি করিতে চাহে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

তরুণকুমার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, সে দিদিকে সে গৃহে যাইতে দিবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার ধারণা যে খুব সুস্পষ্ট ছিল, এমন বলা যায় না। কারণ, সংস্কার ও সামাজিক প্রথা যে আমাদিগের জীবনে কত প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার হয় নাই। সে আর একটি বিষয় তাহার বিচারের সীমামধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই—সাগরিকার মনোভাব। অথচ তাহাই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

তরুণকুমার যাহা বিবেচনা করে নাই, তাহাই কিন্তু চিত্রলেখার সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয় হইয়াছিল এবং তাহাই তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত করিতেছিল। জামাতার সম্বন্ধে সাগরিকার মনোভাব কি এবং জামাতাকে পরিবর্ত্তিত ও তাহার সংস্কার করা যায় কি না, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, সাগরিকা যদি স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে না পারে, তবে সে তাহাকে ভালবাসিলেও সে ভালবাসা স্থায়ী হইবে না। সুতরাং স্বামীর সম্বন্ধে—তাহার পরিবারের ব্যবহারে তাহার যে ধারণা জন্মিয়াছে, সে ধারণার পরিবর্ত্তনই প্রয়োজন। তাহার উপায় কি? তিনি সমীরচন্দ্রের সহিত সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি লক্ষ্য করিতেন, সাগরিকা পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি বুঝিতেন, সে কেবল তাহার চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা। কিন্তু চিত্রলেখা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না—যেন অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পাইতেছিলেন না।

এই অবস্থায় তাঁহাকে দীপশিখাকে আনিতে যাইতে হইল। তিনি মনে করিলেন, দীপশিখা আসিলে সাগরিকার কাজ বাড়িবে এবং সে সেই কাজে আপনার চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের আর একটি সুযোগ লাভ করিবে।

বাস্তবিক তাহাই হইল। চিত্রলেখা যখন দীপশিখাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন সাগরিকা যেন নূতন কাজের আগ্রহে নূতন প্রফুল্লতা লাভ করিল।

চিত্রলেখা তাহাও লক্ষ্য করিলেন এবং লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, জামাতার সম্বন্ধে কি করা যায়, তাহাই প্রধান বিবেচ্য।

তরুণকুমার আসন্ন পরীক্ষার পাঠ লইয়া ব্যস্ত ছিল—দিদি যখন দীপশিখাকে লইয়া ব্যস্ত হইল, তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অধ্যয়নে অধিক মনোযোগ দিল।

৫

"ও কে ?"

"এই কলেজের ছাত্রী।"

"কোন্ শ্রেণীর ?"

"প্রথম।"

"নাম কি ?"

"অপরাজিতা।"

"নামটি যে ভাল নয়, এমন বলতে পারি না, তবে অগ্নিশিখা হ'লে আরও ভাল হ'ত।"

কলেজের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ছাত্রছাত্রীদিগের যে উত্তেজিত জনতা ছিল, তাহারই দুই জন ছাত্রে এই প্রশ্নোত্তর হইল। তাহাদিগের লক্ষ্য—অপরাজিতা।

সেদিন কলিকাতার রাজপথে রাজনীতিক ব্যাপার লইয়া যে শোভাযাত্রা যাইতেছিল, পুলিস তাহার উপর লাঠি চালাইয়াছিল ও "টিয়ার গ্যাস" ছাড়িয়াছিল। তাহারই প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট। সংবাদ সকল কলেজে প্রেরিত হইয়াছে এবং ছাত্রসঙ্ঘ হইতে ধর্ম্মঘট করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই নির্দ্দেশানুসারে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাপকদিগের উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ধর্ম্মঘটের কারণ ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য কলেজের প্রবেশদ্বারে

সভা। তথায় একখানি বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া অপরাজিতা বক্তৃতা করিতেছিল। তাহার পূর্ব্বে এক জন ছাত্র ধর্ম্মঘটের কারণ বিবৃত করিয়া বক্তৃতা শেষে বলিয়াছিল—"মনে রাখবেন, শোভাযাত্রায় স্ত্রীলোকরাও ছিলেন; বর্ব্বর পুলিস তাঁ'দের উপরেও লাঠি চালিয়েছে, গ্যাস ছেড়েছে। মনে রাখবেন, যে সরকারের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী অপরাধ, সে সরকারের শাসন মেনে লওয়া দাসত্ব।"

অপরাজিতা তাহার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে বেঞ্চে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার উদ্বোধনী উক্তি,—"আপনারা মনে করবেন না, আমরা স্ত্রীলোক ব'লে কোন বিশেষ ব্যবহার দাবী করছি—এসব ব্যাপার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ, এতে যেমন সকলের অধিকার সমান, তেমনই সকলেই সমান ব্যবহার পেতে প্রস্তুত। পুরুষ বা স্ত্রীলোক—সকলের উপর অত্যাচারই অত্যাচার; বর্ব্বরতার প্রকৃতি ভেদ হয় না। আমরা স্বতন্ত্র ব্যবহার চাহি না—আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবী করি।"

তাহার পরে একখানি সংবাদপত্র দেখাইয়া অপরাজিতা বলিল, "এই পত্রে এক জন পুরুষ—যদিও তিনি ছদ্মনামে পত্র লিখেছেন 'সুব্রত'—তবুও পত্রের মধ্যে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি পুরুষ— লিখেছেন, এ দেশে স্ত্রীলোকরা আপনারা আপনাদের অধিকার ত্যাগ করেই দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হয়েছেন।"

তরুণকুমার কলেজের পুস্তকাগার হইতে একখানি পুস্তক লইয়া গিয়াছিল—সেখানি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য আসিয়াছিল। দ্বারে জনতার জন্য সে কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে নাই—জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। অপরাজিতা যে পত্রের উল্লেখ করিল, তাহার কথায় তাহার হাসি পাইল। পত্রখানি তাহারই লিখিত। সাগরিকার বিষয় ভাবিয়া সে ঐ মত প্রকাশ করিয়া পত্রখানি কোন সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিল। তাহাতে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অধিকার-বিচার ছিল।

তরুণকুমার দেখিল, উত্তেজনায় অপরাজিতার মুখে রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—বোধ হয়, তাহার গাঢ় রক্তবর্ণের বস্ত্রের জন্য তাহা আরও রক্তিম দেখাইতেছে! ছাত্র-ছাত্রীরা যেন মুগ্ধ হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছিল।

সেই সময় তরুণকুমার জনতার এক পাশ দিয়া কলেজ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। এক জন বলিল, "কোথায় যা'বেন?"

তরুণকুমার উত্তর দিল, "বইখানা নিয়ে গিয়াছিলাম—আজ ফিরিয়ে দিবার দিন; তাই দিতে এসেছি।"

অপরাজিতার দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে বলিল, "আপনি কি জানেন না, আমরা আজ ধর্মঘট ঘোষণা করেছি?"

তরুণকুমার বলিল, "দেখছি বটে।"

অপরাজিতা বলিল, "তবে?"

"বইখানা আজ ফিরিয়ে দিবার কথা; তাই এসেছি।"

"দেখলাম ত, আপনি মোটর গাড়ীতে এসেছেন; কাল আসতে ত বিশেষ অসুবিধা হ'ত না!"

সে যে হাঁটিয়া না আসিয়া মোটর যানে আসিয়াছিল, তাহাই অপরাজিতার নিকট "অপরাধ" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কি না, তাহা তরুণকুমার বুঝিতে পারিল না। তাহার একবার মনে হইল, সে বলে, পুস্তক প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করাই সঙ্গত। কিন্তু সে বুঝিল, ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ভাবে উত্তেজিত, তখন যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। সেই জন্য সে আর সে কথা বলিল না; গৃহে ফিরিবার জন্য গাড়ীর দিকে চলিল। সে শুনিতে পাইল, এক জন ছাত্র বলিল, "তরুণ বাবু—দার্শনিক লোক, উনি কিন্তু কখন আমাদের কোন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন নাই। লোকটি কথার মর্য্যাদা রাখতে বিশেষ আগ্রহশীল—তা'ই, আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় না জেনে বই দিতে এসেছিলেন।" উত্তরে অপরাজিতা বলিল, "তা' হ'তে পারে; কিন্তু মানুষের কর্ত্তব্য অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তিত হয়।"

গাড়ীতে বসিয়া তরুণকুমার একবার জনতার দিকে চাহিল। তখন অপরাজিতা বেঞ্চ হইতে অবতরণ করিতেছে—মুখে বিজয়গর্ব্ব সপ্রকাশ।

তরুণকুমার লজ্জিত বা দুঃখিত হইল না। সে যে সে দিন পুস্তক প্রত্যর্পণ করিতে যাইয়া কোন অপরাধ করে নাই সেই বিশ্বাসহেতু সে লজ্জানুভব করিল না; আর তাহার গমনের কারণ না বুঝিয়া অপরাজিতা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহার জন্য সে দুঃখানুভবও করিল না। কেবল অপরাজিতার সাহস ও দৃপ্ত ভাব তাহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিল।

তরুণকুমার গৃহে ফিরিলে দীপশিখা বলিল, "কি দাদা, গেলে আর এলে?"

তরুণকুমার হাসিয়া বলিল, "অগ্নিশিখার ভয়ে।"

"সে কি?"

তরুণকুমার ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল, "যে ছাত্রীটি বক্তৃতা করিতেছিল, এক জন ছাত্র তাহার সম্বন্ধে বলেছিল, তা'র নাম অগ্নিশিখা হ'লে আরও ভাল হ'ত। দীপশিখা তা'র কাছে ক্ষীণ।"

দীপশিখা ও সাগরিকা উভয়েই হাসিল।

সাগরিকা বলিল, "তোমার গায়ে অগ্নিশিখার আঁচ লাগেনি ত?"

দীপশিখা বলিল, "আমার মেয়েটিকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।"

"কেন?"

"দাদার বর্ণনা শুনে।"

তরুণকুমার বলিল, "সব চেয়ে মজার কথা এই যে, আমারই একটা লিখার উল্লেখ করেছিল।"

"সে কি, দাদা?"

তরুণকুমার তখন সে কথা বলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "দিদির অবস্থা দেখে এ কথা আমার মনে হয়েছে।"

সাগরিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তুমি যে ভাবে অধিকার ত্যাগ করে এসেছ, তা' কখনই সমর্থন করা যায় না। তোমার জা'টি ত আরও ভয়ানক!"

"আমরা কি করতে পারতাম, তখন?"

"কেন, তোমরা কি অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারতে না?"

"লাঠালাঠি করতাম?"

"সে-ও ভাল। কিন্তু তুমি যে একটি দিনও আমাদের কোন কথা জানতে দেও নাই, সে-ই কি ভাল করেছ? অন্যায় আর

অত্যাচার যে করে সে যেমন অমানুষ, যা'রা বিনাপ্রতিবাদে সহ্য করে, তারাও তেমনই নিন্দনীয়।"

"অবস্থাভেদে—বিশেষ মনের অবস্থাভেদে মানুষের ব্যবহার-ভেদ হয়, তরুণ! এমনও হ'তে পারে যে, তোমার অগ্নিশিখাও নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে—আপনার তাপে কেবল আপনি পুড়ে ম'রে।"

"সে কেন হ'বে?"

"মানুষের মনের গতি বিচিত্র!"

সেক্সপীয়র বলেছেন বটে, দার্শনিকও কল্পনা করতে পারেন না, পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে; কিন্তু, দিদি, তুমি যা' বলছ, তা' তা'র চেয়েও বিস্ময়কর।"

"কিন্তু কেন মানুষের মনের গতি অমন হ'বে?"

সাগরিকা মনে মনে বলিল, "অগ্নিশিখার তাপ যদি তোমাকে স্পর্শ করিত, তবে তুমি তাহা বুঝিতে পারিতে—তাহা না হইলে বুঝিতে পারিবে না।" মুখে সে বলিল, "সে কথা আর কেন, তরুণ?"

দীপশিখা বলিল, "দাদা, অগ্নিশিখা কে?"

তরুণকুমার বলিল, "তা ত জানি না। সে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী; প্রথম যে-দিন কলেজে এসেছিল, সে-দিন, তা'কে কোথায় যেতে হ'বে, সে কথা আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল!"

"কেন?"

"আমি তখন কলেজে প্রবেশ করেছিলাম।"

"তা'র পরে?"

"আর ত কিছুই জানি না।"

"সে-দিন কি তা'কে অগ্নিশিখা মনে হয়েছিল?"

"না। যদি আগুন থেকে থাকে, তবে তা' ছাই ঢাকা ছিল।" —বলিয়া তরুণকুমার হাসিল।

তাহার পরে তরুণকুমার বলিল, "বইখানা আজ ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল; হ'ল না।"

তরুণকুমার আপনার পাঠ-কক্ষে চলিয়া গেল। অগ্নিশিখার কথা তাহার আলোচনার বিষয় হইল। সে যে তাহারই যুক্তির পথ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে তরুণকুমার মনে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সে সে-দিনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিল এবং তাহাতে পূর্ব্বপত্রের যুক্তি আরও বিশদরূপে বিবৃত করিল। প্রবন্ধ শেষ করিয়া সে তাহা প্রকাশ জন্য সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিল।

সাগরিকা কেন যে শ্বশুরালয়ে তাহার দুর্দ্দশার বিষয় প্রকাশ করে নাই, তাহা তরুণকুমারের নিকট রহস্য বলিয়া মনে হইত। সে রহস্য সে ভেদ করিতে পারে নাই; কিন্তু সে বিষয় সে বহু বার চিন্তা করিয়াছে। যে চাবিতে সে রহস্যের রুদ্ধদ্বার খুলিতে পারা যায়, সে চাবির সন্ধান সে পায় নাই। আজও পাইল না। শ্বশুরালয়ে সাগরিকার দুর্দ্দশা সে তাহার মাতার আত্মহত্যায় অনুমান করিতে পারিয়াছিল—সেই জন্য আরও বিস্মিত হইয়াছিল।

যে-দিন কলেজে ধর্ম্মঘট, সে-দিন—অন্য দিনেরই মত—চিত্রলেখা যখন ভ্রাতৃগৃহে আসিলেন, তখন দীপশিখা তাঁহাকে তরুণকুমারের অভিজ্ঞতার বিষয় যেমন শুনিয়াছিল তেমনই জানাইল। শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তরুণ বুঝি খুব লজ্জা পেয়েছে?"

সাগরিকা বলিল "না।"

"ওর পরীক্ষাটা হয়ে যা'ক; আমি ওর বিয়ে দিয়ে দিব। দাদাকেও বলেছি। বাড়ীতে গৃহিণী নইলে কি চলে?"

"যা' বলেছ, পিসীমা। বাড়ীর অবস্থা কি হয়েছিল, তা ত' দেখেছ!"

দীপশিখা বলিল, "অগ্নিশিখার কথা শুনে বুঝি তুমি ভাবছ, পিসীমা, পাছে ছেলে আগুন নিয়ে খেলা করে?"

"ভাবা কি অন্যায়?"

"দাদার যে সব প্রবন্ধ কাগজে বা'র হচ্ছে, তা'তে মনে হয়, ঐ অগ্নিশিখার মত মেয়েই দাদার পসন্দ হ'বে।"

"কেন রে?"

"দাদা লিখছে, মেয়েদের স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করাই সঙ্গত।"

সাগরিকা বলিল, "অর্থাৎ স্বামী আর স্ত্রী যে যা'র অধিকারের লাঠি ঘুরালে ভাল হয়।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কেন স্বামী আর স্ত্রী দু'জনই যদি সংসার সুখের করবার অধিকার স্বীকার ক'রে পরস্পরকে সাহায্য করে—তবেই ত ভাল হয়।"

তাহার পরে তিনি সাগরিকাকে বলিলেন, "আর তোর মত মেয়ে যদি আপনার সব অধিকার বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারে সব সহ্য করে, তবে ত কথাই নাই।"

দীপশিখা বলিল, "তা'তেই ত দাদার আপত্তি।"

সাগরিকা বলিল, "অশান্তি বাড়িয়ে কি লাভ?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "তোর আবার বাড়াবাড়ি। কিছুতেই প্রতিবাদ করব না স্থির করলে অত্যাচারীকেই যা' ইচ্ছা করবার সুযোগ দেওয়া হয়।"

তাহার পরে চিত্রলেখা সাগরিকাকে বলিলেন, সমীরচন্দ্র সেই দিন তাহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, স্থির করিয়াছেন—বাধ্য হইয়াই স্থির করিয়াছেন। তাহার মধ্যম দেবর কি একটা চাকরীর বা কাযের সন্ধানে ব্রহ্মে গিয়াছে। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী আপাততঃ তাঁহাদিগের মধুপুরের বাড়ীতে যাইবেন। ছোট ছেলে মহীনাথকে সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন। লোকনাথ তাহাকে বারাণসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইতে বলিতেছে। লোকনাথ কলিকাতায় থাকিবে—কারণ, ব্যবসা দেখিতে হইবে। সে তাহাদিগের পুরাতন বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পল্লীতে বাড়ী ভাড়া করিবে—যত দিন সুবিধা মত বাড়ী না পায়, কোন ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া থাকিবে। সমীরচন্দ্র পরামর্শ দিয়াছেন—উমাদাস তাঁহার সম্পত্তি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন পুত্রকে এক এক ভাগ দিয়া আপনি—আপনার ও স্ত্রীর জন্য—এক ভাগ রাখুন; ব্যবসা যে চালাইবে, সে লাভের অর্দ্ধাংশ পাইবে—অপরার্দ্ধ এখন তাঁহার—তাঁহার অন্তে তাঁহার স্ত্রীর এবং তাহার পরে অন্য দুই পুত্রের। উমাদাসের তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন—কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলে আর কি থাকিবে? জানাই আছে—

"ইল্লৎ যায় ধুলে,
স্বভাব যায় ম'লে।"

সাগরিকা মনোযোগ সহকারে সে কথা শুনিল—কোন কথা বলিল না। সে ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল, তাহা কে বলিবে?

চিত্রলেখা বলিলেন, "উমাদাসকে, বোধ হয়, সমীরচন্দ্রের পরামর্শ ই গ্রহণ করিতে হইবে।"

সেই সময় তরুণকুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; চিত্রলেখাকে দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, কতক্ষণ এসেছেন?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "কিছুক্ষণ হ'ল, বাবা! শুনলাম, তুমি পড়ছ, তা'ই আর তোমার ঘরে যাই নাই।"

"পরীক্ষার দিন ত এগিয়ে আসছে।"

তাহার পরে সে বলিল, "পিসীমা, আজ বাবার 'দেশ' থেকে লোক এসেছেন—কত ফল এনেছেন!"

"তা'ই ত ভাগ নিতে এসেছি। বাবার 'দেশ' বুঝি তোর দেশ নহে?"

"মোটে যাওয়া হয় না—সেই জন্যই ত বলি, 'বাবার দেশ'।"

চিত্রলেখা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; পুরাতন স্মৃতি তাঁহাকে পীড়িত করিল। তিনি বলিলেন, "দাদা সেখানে বাড়ী করেছিলেন, অনেক আশা ক'রে। কিন্তু তোর মা চ'লে যা'বার পরে আর সে দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেন না।" তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

তরুণকুমার বলিল, "আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে এক বার চলুন না, পিসীমা?"

"যা'ব। কিন্তু দীপশিখা ত এখন যেতে পারবে না?"

দীপশিখা বলিল, "আমাকে ফেলে তোমরা যেতে পারবে না।"

"তা' কি কখন পারি?"

চিত্রলেখা সাগরিকাকে বলিলেন, "চল দেখি, কি এল।" তিনি তরুণকুমারকে বলিলেন, "দেখ ব্যাপার—ফলগুলার কি করা হ'বে—সে'ও পিসীমা যতক্ষণে আসবে, ততক্ষণে হ'বে। কেন তোরা ঠিক করতে পারিস না?"

"সে কি হয়, পিসীমা?"

"সেই জন্যই ত মনে করছি, বাড়ীতে গৃহিণী এনে আমরা বিদায় নেব।"

"তা'র মানে?"

"তা'র মানে—তোমার বিয়ে দিতে হ'বে।"

"সর্ব্বনাশ!"

"সর্ব্বনাশ কি?—সর্ব্বরক্ষা।"

৬

দেখিতে দেখিতে চারি মাস অতিবাহিত হইল। এই কয় মাসে অনুকূলচন্দ্রের পরিবারে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। তরুণকুমারের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল; পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হইলেও সে যে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না—সেইজন্য সে পরবর্ত্তী পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর সে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা দেশে ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠ করিতেছিল—যে রুশিয়ার রাজতন্ত্র শাসনের উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে যেমন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তেমনই, পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত হইয়াছে, সেই বর্ত্তমান রুশিয়ার সামাজিক পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিতেছিল। রুশিয়ার পুরাতন সমাজের সহিত তাহার নূতন সমাজের প্রভেদ এবং য়ুরোপের ও ভারতের ব্যবস্থার সহিত রুশিয়ার ব্যবস্থার তুলনা তাহার মনে নানা প্রশ্নের উদ্ভব করিতে লাগিল—নানা সংশয়ের স্থান করিতে লাগিল। সেই সকল বিষয়ে সে নানা পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

এই সময়ের মধ্যে দীপশিখার একটি কন্যা প্রসূত হইল। অনুকূলচন্দ্রের পরিবারের পক্ষে ঘটনাটির গুরুত্ব অসাধারণ। তাঁহার বাসগৃহে—সে-ই প্রথম শিশুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। দীপশিখা তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাহার জন্মের পরে তাঁহার বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহাকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল—গৃহ যাঁহার কল্পনানুসারে পরিকল্পিত হইয়াছিল—তিনি দীর্ঘকাল তাহাতে বাস করেন নাই; কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের নিকট তাহা তাঁহার স্মৃতিতে পূর্ণ। সাগরিকার সন্তান হয় নাই এবং তাহার জন্য অনুকূলচন্দ্রের চিন্তার অবধি ছিল না। তাহার সম্বন্ধে কি করা যায়, সে সম্বন্ধে তিনি যেমন স্বয়ং চিন্তা করিতেন, তেমনই সমীরচন্দ্রের ও চিত্রলেখার সহিত পরামর্শ করিতেন।

দীপশিখার স্বামী সুধীরকুমার কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে একবার দীপশিখাকে দেখিতে আসিয়াছিল—সে বার সে দুই দিনের অধিক থাকিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহারই মধ্যে তরুণকুমার যেমন তাহার প্রতি সে তেমনই তরুণকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। উভয়ের আকর্ষণসূত্র—সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন। তরুণকুমার যেমন সে ইতিহাস মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া নানা সমস্যার সমাধানোপায় সন্ধান করিতেছিল, সুধীরকুমার তেমনই বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহা বিবেচনা করিতেছিল। পরস্পরের আলোচনায় উভয়েই উপকৃত হইয়াছিল। এ বার সুধীরকুমার পক্ষকালের ছুটী লইয়া আসিয়াছিল। উভয়ে প্রতিদিন আলোচনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত। বিজ্ঞান ও দর্শন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

সুধীরকুমারের পিতা বাঙ্গালার বাহিরেই কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সেই জন্য বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের সহিত প্রকৃত পরিচয়ের অবসর সুধীর পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সামাজিক জীবন ও সেই জীবনে নারীর ও পুরুষের স্থান লক্ষ্য করিবার প্রয়োজনবোধে সুধীরকুমারই প্রস্তাব করিল, তাহারা অনুকূলচন্দ্রের পৈত্রিক গ্রামে শিবধামে যাইয়া দুই দিন যাপন করিয়া আসিলে কেমন হয়? তরুণকুমার বলিল, "এ যে কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান! আমি আগেই পিসীমাকে সে কথা বলেছি।" তখন যাত্রার আয়োজন হইল। চিত্রলেখা বলিলেন, তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে যাইবেন—নহিলে তাহাদিগের বড় অসুবিধা হইবে। তিনি সাগরিকাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু দীপশিখাকে বলিলেন, "কচি ছেলে" লইয়া তাহার যাওয়া হইবে না। অর্থের অভাব না থাকিলে ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হয় না, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যরা পূর্ব্বে চলিয়া যাইয়া সব আয়োজন করিল এবং তাহার পরে তরুণকুমার, সুধীরকুমার ও সাগরিকাকে লইয়া চিত্রলেখা যাত্রা

করিয়া যথাসময়ে শিবধামে উপনীত হইলেন দীপশিখা যাইতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত হইলে সুধীরকুমার তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিল, সে যখন তাহাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে আসিবে, তখন তাহাকে শিবধাম দেখাইয়া লইয়া যাইবে। সে তাহার সেই প্রতিশ্রুতিতে চিত্রলেখার সম্মতি লইয়া তাহা দীপশিখাকে জানাইয়া দিল।

শিবধামে উপনীত হইয়া সুধীরকুমারের কি আনন্দ! সে বলিল, "এ যে—বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার মা—

'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

এই সব গ্রাম আজ পরিত্যক্ত!"

তরুণকুমার বলিল, "তা'র কারণ অনেক। কারণগুলি দূর না করলে প্রতীকার হ'বে না।"

যে স্থানে অনুকূলচন্দ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা নদীর কূলে—গ্রাম হইতে অল্প দূরে। গ্রাম ও নদী উভয়ের মধ্যে যে পথ তাহার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বিরাট বটবৃক্ষ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাহার বিস্তৃত শাখাগুলি হইতে বহু মূল নামিয়া আসিয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে—তাহার ঘন-পল্লব শাখায় রুত পাখীর পার্ল'মেণ্ট বসে। শালিখের দল যেমন, সবুজ ঘুঘুর দল তেমনই তথায় পক্কফল আহার করে আর কলরবে স্থানটি মুখর করে। কাঠবিড়ালরা শাখায় শাখায় ছুটাছুটি করে। গ্রামের প্রথা হিন্দুদিগের বিবাহের পরে বর-বধূকে একবার দ্বাদশ শিবমন্দিরে প্রণাম করান হয় এবং প্রণামান্তে গৃহে ফিরিবার সময় একবার এই বটবৃক্ষের মূলে অল্পক্ষণের জন্য উপবেশন করান হয়।

যাইয়া তরুণকুমারের ও সুধীরকুমারের কয় দিন গ্রামে থাকিবার ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু চিত্রলেখা দুই দিনের অধিক থাকিতে দিলেন না—পাছে কেহ অসুস্থ হয়। অগত্যা সকলকে দুই দিন তথায় বাসের পরে ফিরিতে হইল। কিন্তু সুধীরকুমার মনে করিল সে নূতন জগতের সন্ধান পাইল। সে যে দীপশিখাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই, সে জন্য সে দুঃখিত হইল। তাহারা ফিরিয়া আসিলে দীপশিখা যখন স্বামীকে বলিল, "একা দেখে এলে ত? কেমন দেখলে?"—তখন সুধীরকুমার বলিল, "একা দেখে তৃপ্তি হয় না, দীপশিখা! তবে দেখলাম, তোমারই মত—স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর—বুঝলাম বাঙ্গালীর মেয়ে কেন এমন!" দীপশিখার মনের কোণে যে অভিমান শরতের লঘু মেঘের মত দেখা দিয়াছিল, তাহা স্বামীর কথার বাতাসে সরিয়া গেল।

দীপশিখার কন্যা জন্মগ্রহণের সংবাদে তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহারা কোন হোটেলে থাকিবেন, প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার গৃহেই আসিতে হইল। তবে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক সময় সমীরচন্দ্রের গৃহেই কাটাইতে হইত। শিবধামের কথা শুনিয়া তাঁহারা তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—অনুকূলচন্দ্র সে ব্যবস্থা করিলেন। অবশ্য চিত্রলেখাকে যাইতে হইবে। শ্বশুর ও শাশুড়ী দীপশিখাকে বলিলেন, "যা'বে না কি?" দীপশিখা জানিত, সুধীরকুমার তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সে তাহাকে তথায় লইয়া যাইবে—সেই জন্য সে বলিল, "পিসীমা যে ভয় পা'ন।" শুনিয়া তাহার শাশুড়ী বলিলেন, "আমরা যখন তোমার পিসীমা'র অতিথি, তখন তাঁ'র কথা অমান্য করতে পারি না।" অনুকূলচন্দ্র যাইলেন না—সমীরচন্দ্র সঙ্গে যাইলেন।

শিবধাম হইতে ফিরিয়া দীপশিখার শ্বশুর-শাশুড়ী যাত্রার আয়োজন করিবার পূর্ব্বে যখন দীপশিখার তাহার স্বামীর কাছে যাইবার বিষয় আলোচনা করিলেন, তখন চিত্রলেখা বলিলেন, তাঁহারা যদি কিছু দিন সুধীরের কাছে যাইয়া থাকেন, তবে ভাল হয়; কারণ, ছেলেটিকে দেখিতে হইবে। তাহাতে দীপশিখার শাশুড়ী বলেন, "বেহান, যাঁ'দের আপনাদের সংসার করতে দিয়েছি, তা'দের কাজে হস্তক্ষেপ করা যায় না। বরং বৌমা আরও দু'মাস আপনার কাছে থেকে যা'ন। সেই প্রস্তাব সুধীরের কাছে করুন। আমরা ছেলেদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করি না। কালের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

চিত্রলেখা একটু বিস্মিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন "তা'-ই কি?"

তিনি বলিলেন, "তা হয়েছে। তবে আপনি যে ভাবে আপনার বৌদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তা'তে তা' বুঝতে পারেন না এবং আপনারা দীপশিখাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তা'তে আমারও তা' বুঝবার কথা নহে। কিন্তু পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর আপনার বেহাই বলেন, যে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য তা'কে স্বীকার করাই সঙ্গত, তা'কে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা—অকারণ অশান্তির সৃষ্টি করা।"

চিত্রলেখাকে বিস্মিত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার যে অভিজ্ঞতা, সে নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম। চারি দিকে দেখুন, নিয়মের ব্যতিক্রম করতে গিয়ে, কত পরিবারে কি অশান্তি। কিন্তু ছেলেমেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তা'রা যখন চাহে, তখন তা'দের কাছে যেতে হয় তা'তে তা'দেরও আনন্দ বাপ-মা'রও আনন্দ।"

বৈবাহিক ও বৈবাহিকার সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবের কারণ কি চিত্রলেখা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং বুঝিয়া তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল।

দীপশিখার শ্বশুর ও শাশুড়ী চলিয়া যাইলে তরুণকুমার বলিল, তাঁহারা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সুবুদ্ধির কাজ; কারণ, তাঁহারা মানুষের মনের স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে ক্রমবিকাশের পক্ষপাতী।

দীপশিখার শাশুড়ী এক দিন চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি কেন সাগরিকার স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না? চিত্রলেখা বলিয়াছিলেন, তাহাদিগের কতকগুলি হাঙ্গামায় সে ব্যস্ত। শুনিয়া তিনি আর কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু চিত্রলেখার মনে হইয়াছিল, তাঁহার উত্তরে প্রশ্নকারিণীর সন্দেহের অবসান হয় নাই।

বাস্তবিক সাগরিকার সম্বন্ধে চিত্রলেখার, অনুকূলচন্দ্রের ও সমীরচন্দ্রের চিন্তার অবধি ছিল না। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী বাধ্য হইয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিতেছিলেন। কিন্তু যে অনিচ্ছায় কোন কায করে, সে তাহার মতের স্থায়ী পরিবর্ত্তন করে না। উমাদাস তাঁহার বাসের বাড়ী ভাড়া দিয়া যাইবেন, স্থির করিতেছিলেন। বাড়ী নানা গৃহসজ্জায় সজ্জিত। সে সকলের কি হইবে? গৃহসজ্জা

যত দিন ব্যবহৃত হয়, তত দিনই তাহার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনেই সার্থকতা। তাহার পরে তাহা আবর্জ্জনা। সে সব কয়টি ঘরে রাখিয়া ঘর বন্ধ করিয়া যাওয়া হইবে। সমীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তাহাতে সে সব কেবল নষ্ট হইবে। কিন্তু উমাদাসের গৃহিণী সে সব রাখিতেই চাহিয়াছেন ; বোধ হয়, তাঁহার আশা ছিল, আবার সেই গৃহে ফিরিয়া আসিবেন—ইচ্ছা আশার মূল। মহীনাথকে তাহার মাতা সঙ্গে মধুপুরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হইয়া লোকনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যাইবার সঙ্কল্পই করিয়াছিল।

দীপশিখার শ্বশুর ও শাশুড়ী চলিয়া যাইবার কয় দিন পরে দেখা গেল, অনুকূলচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে—পথের অপর দিকে অবস্থিত যে বাড়ীটির ভাড়াটিয়া কয় দিন পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন—তাহার সামান্য সংস্কার হইতেছিল—তাহাতে নূতন ভাড়াটিয়া আসিলেন। প্রথমে কয় জন লোক লইয়া একজন আসিয়া ঘরগুলির ঝাড়-পোঁছ করাইলেন, তাহার পরে আসবাবপত্র আসিতে লাগিল, তাহার পরে এক দিন গৃহে নূতন ভাড়াটিয়ারা আসিলেন। সে গৃহে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদিগের পরিবারের কর্ত্তা কয় দিন পরে—রবিবারে সকালে আসিলে ভৃত্য আসিয়া অনুকূলচন্দ্রকে সংবাদ দিল, এক জন ভদ্রলোক সাক্ষাৎপ্রার্থী। তরুণকুমার তখন পিতার নিকটে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। অনুকূলচন্দ্র ভৃত্যকে বলিলেন—আগন্তুককে আসিতে বলুক। ভৃত্য চলিয়া গেল।

অপরিচিত আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুকূলচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, তিনি পথের অপর পার্শ্বস্থ গৃহে আসিয়াছেন—তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিলেন।

অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "বিরক্ত কি? আপনি পাড়ায় এসেছেন ; আমার সঙ্গে যে পরিচয় করতে এসেছেন, এ ত আমার ভাগ্য।"

তাহার পরে অনুকূলচন্দ্রের প্রশ্নে আগন্তুক স্বীয় পরিচয় দেন—তিনি কোন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক—রসায়ন তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়। তিনি পূর্ব্বে বিহারে কোন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, এখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি বলিয়া যাইলেন, যদি অনুকূলচন্দ্র আপত্তি না করেন, তবে তাঁহার স্ত্রী এক দিন আসিয়া তাঁহার পরিবারের মহিলাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া যাইবেন।

অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "তিনি বিপত্নীক—গৃহে তিনি ও তাঁহার পুত্রই থাকেন; কেবল তাঁহার কন্যাদ্বয় বর্ত্তমানে আসিয়াছেন।"

আগন্তুক তরুণকুমারকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনিই কি আপনার ছেলে?"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ।"

"কি করেন?"

"এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছে।"

"কোন্ কলেজ হ'তে?"

কলেজের নাম শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "ঐ কলেজেই আমার মেয়েটি ভর্ত্তি হয়েছে।"

তাহার পর আগন্তুক বিদায় লইলেন—যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

অনুকূলচন্দ্র বলিলেন, "সে কি কথা?"

পিতার ইঙ্গিতে তরুণকুমার আগন্তুকের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত গেল। সে যাইবার সময় সংবাদপত্র রাখিয়া টেবলে রক্ষিত একখানি পুস্তক লইয়াছিল। আগন্তুক দেখিলেন, তাহা 'সাম্যবাদ' সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ যুরোপীয় লেখকের রচনা। তিনি বলিলেন, "তাঁহার কন্যা কয়দিন পূর্ব্বে কলেজের পুস্তক-সংগ্রহ হইতে ঐ পুস্তক আনিয়াছিল—যে কাগজে উহার কতকগুলি উক্তি লিখিয়া লইয়াছিল, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সে জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছে—বহিখানি আবার আনিতে গিয়াছিল, পায় নাই—অন্য কোন ছাত্র বা অধ্যাপক লইয়া গিয়াছেন।"

ততক্ষণে উভয়ে পথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

তরুণকুমার বলিল, "আমি কাল বহিখানি এনেছি। বহিখানির মধ্যে কাগজে কতকগুলি উক্তি লিখিত ছিল। সেগুলি, বোধ হয়, আমার টেবলে আছে। যদি থাকে আমি পাঠিয়ে দিব।"

অধ্যাপক বাড়ীতে না যাইয়া কোন বন্ধুর গৃহোদ্দেশে গমন করিলেন।

তরুণকুমার ফিরিয়া আসিয়া তাহার অধ্যয়ন-কক্ষে গেল। সে পুস্তকখানির মধ্যে যে কাগজ পাইয়াছিল, তাহা তাহার টেবলে একটি কাগজচাপা চাপা দেওয়া ছিল। কাগজচাপাটি শ্বেত পাতরের—দুইটি ফুল, একটি প্রস্ফুটিত, একটি প্রস্ফুটোন্মুখ।

তরুণকুমার কাগজগুলি লইয়া ভাঁজ করিয়া একটি খামে পুরিল—তাহার পরে এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিল—সম্মুখের বাড়ীতে যে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে দিতে হইবে; তিনি বোধ হয়, বাড়ীতে নাই—যদি না থাকেন, তবে তাঁহার কন্যাকে দিবার জন্য ভৃত্যকে দিয়া আসিতে হইবে।

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া শূন্য খামখানি তরুণকুমারকে দিল। তাহাতে লিখিত—"আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। কাগজ পাইয়া উপকৃত হইলাম।"

তরুণকুমার তখন সেই পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিল।

খামখানি তরুণকুমারের টেবলের উপর রহিল। [ক্রমশঃ।

প্রতিমার পরিণতি

শ্রীকালিদাস রায়

দেবীর প্রতিমাটিরে বিসর্জ্জি দীঘির নীরে
অশ্রু মুছি সবে ফিরে যায়।
প্রতিমার মাটি গলে দীঘির গভীর জলে
পঙ্ক হ'য়ে পঙ্কজ ফুটায়।

সেই পঙ্কজের 'পরে দেবতা বিরাজ করে
কবি তাই হেরে বারো মাস।
গুঞ্জনের মন্ত্র পড়ে অলি নিত্য পূজা করে
উড়ে আসে ধূপের সুবাস।

ডি. এচ. লরেন্স

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মোরেল যখন খনি থেকে ফিরল, তখন তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল তার মেজাজ খুব খারাপ। রান্নাঘরে ঢুকে সে চার পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল, কয়েক মিনিট তার মুখে কোন কথা নেই। তার পর 'উইলিয়ম কোথায়?' সে প্রশ্ন করল।

'কেন? উইলিয়মকে কেন? কী হয়েছে?' মিসেস্ মোরেল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সব ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

'দাঁড়াও, আগে ওকে একবার পাই, তা হলেই বুঝবে,' মোরেল তার খনির বোতলটা সশব্দে রান্নাঘরের টেবিলের উপর রাখল।

'ও, মিসেস অ্যানটনি বুঝি তোমার কাছে গিয়ে লাগিয়েছে, তার ছেলের কলার ছেঁড়ার কথা!' মিসেস মোরেল খানিকটা বিদ্রূপ করে বললেন।

'কে লাগিয়েছে সে কথা পরে হবে,' মোরেল বললে, 'বদমাসটাকে একবার হাতে পাই ত' ওর হাড় গুঁড়ো করে ছাড়ব!'

'কিন্তু এ তোমার ভারী বদ অভ্যেস। কোথাকার কোন হাড়-জ্বালানে ডাইনি এসে তোমার ছেলে-মেয়েদের নামে যা-খুশি তাই লাগাবে, আর তুমি তাই শুনে লাফিয়ে উঠবে, এ তোমার অন্যায়।'

'আমি ওকে শিক্ষা দেব,' মোরেল গর্জে উঠল, 'ও আমার ছেলে কি অন্য কার ছেলে তাতে কিছু এসে-যায় না। কিন্তু ও যে ওর খুশিমত লোকের পোশাক ছিঁড়ে বেড়াবে, এ আমি সহ্য করব না।'

'পোশাক ছিঁড়ে বেড়াবে!' মিসেস মোরেল প্রতিধ্বনি করে বললেন, 'ও তাই করেছে নাকি? অ্যালফ্রেড ওর গুলতি নিয়ে পালিয়েছিল, ও গিয়েছিল তাকে ধরতে, হঠাৎ কলারে লেগে ছিঁড়ে যায়—তা ওটা ওরকম পালাতে গেল কেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি—আমি সব জানি,' মোরেল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বলল।

—'হ্যাঁ গো, বলার আগেই তুমি সব জেনে বসে আছ!' মিসেস মোরেলও রেগে গিয়ে জবাব দিলেন।

এবার মোরেল কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসল। চীৎকার করে বললে, 'খবরদার! আমার কী কাজ তা আমি জানি।'

—'সেই ত' সন্দেহ,' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন, 'নইলে কে এক মাগী বড়-গলা করে বলে গেছে আর তুমি তাই শুনে ছুটেছ নিজের ছেলেকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে।'

'জানি,' মোরেল আবার বললে, 'আমি সব জানি।'

আর কথা না বাড়িয়ে সে বসে পড়ে মনে মনে রাগতে লাগল। এমন সময় উইলিয়ম এল দৌড়ে, বললে, 'চা হ'ল, মা?'

—'শুধু চা কেন, আরও অনেক কিছু তৈরি রয়েছে তোমার জন্যে', মোরেল চড়া-গলায় চীৎকার করে উঠল।

—'একটু চুপ করো না,' মিসেস মোরেল ধমক দিয়ে উঠলেন, 'লোকে তোমাকে দেখে হাসবে।'

—'আমাকে দেখে নয়, ওর দশাটা দেখে লোকে হাসবে। দাঁড়াও একবার।' মোরেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ বিস্ফারিত করে ছেলের দিকে চাইতে লাগল বার বার।

উইলিয়ম তার বয়েসের তুলনায় মাথায় বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিল। তবু মনে মনে ভারী দুর্বল ছিল সে। তার মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে দিশাহারা হয়ে সে বাপের দিকে ফ্যাল ফ্যাল হয়ে চেয়ে রইল।

মোরেল প্রায় উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল, 'আজ ওর হাড় মাস আলাদা করে তবে ছাড়ব।'

—'দাঁড়াও,' মিসেস মোরেল রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওই মেয়ে-মানুষটা তোমার কাছে গিয়ে নালিশ করেছে বলেই তুমি ছেলের গায়ে হাত তুলবে, সে হবে না।'

—'হবে না?' মোরেল গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'হবে না মানে?' চোখ বড় বড় করে সে ছেলের দিকে তেড়ে গেল। মিসেস মোরেল ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন বাপ আর ছেলের মাঝখানে, হাতের মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে গেলেন।—'খবরদার বলছি!' চীৎকার করে বললেন তিনি।

মোরেল মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। চড়া গলায় বললে, 'কী?'

মিসেস মোরেল ছেলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যা, বেরো বাড়ি থেকে!'

যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেলে তাঁর কথা শুনে পাশ ফিরেই বাইরের দিকে ছুটে পালাল। মোরেল ছুটে গেল তার পেছনে, কিন্তু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে। অগত্যা ফিরে এল মোরেল, ক্রোধের তীব্রতায় তার কয়লামাখা মুখ তখন একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিকে মিসেস মোরেলও তখন রাগের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছেন। গলায় জোর এনে তিনি বললেন, 'সাহস কত তোমার! ছেলের গায়ে হাত তোলা!...একবার দেখতে হাত তুললে, সারা জন্ম তার জন্যে দুঃখু করতে হ'ত না?' তাঁর কথাগুলো ঝম-ঝম করে ঘরের মধ্যে যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মোরেল তার স্ত্রীকে ভয় করত। রাগে তার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে এলেও, সে চুপ-চাপ গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।...

ছেলেমেয়েরা যখন একটু বড় হয়ে উঠল, তাদের দেখাশোনা করবার যখন আর বিশেষ দরকার রইল না, তখন মিসেস মোরেল এক মহিলা-সঙ্ঘের সভ্য হলেন। মহিলা-সঙ্ঘ বলতে মেয়েদের একটা ছোট সমিতি, সমবায়-বিপণির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সেটা। প্রতি সোমবার রাত্রে সমবায়-বিপণির দোতলার লম্বা হলঘরটায় সমিতির অধিবেশন বসত। সমবায়-প্রথা থেকে তাঁরা কি ধরণের সুবিধা পাচ্ছেন, ইত্যাদি সামাজিক প্রশ্ন নিয়েই চলত তাঁদের আলোচনা। কখনও কখনও মিসেস মোরেল কোন প্রবন্ধ লিখে নিয়ে সমিতির সামনে পড়ে শোনাতেন। ছেলে-মেয়েরা তাদের মাকে বাড়ির কাজকর্ম্মে ব্যস্ত দেখতেই অভ্যস্ত ছিল; তারা যখন দেখত মা বসে বসে তাড়াতাড়ি কি যেন লিখে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে ভাবছেন, কখনও বা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন, আবার শুরু করছেন লিখতে, তখন ভারী তাদের অদ্ভুত লাগত। তখন মাকে তাদের মনে হ'ত অনেক বড়, তাদের গভীর শ্রদ্ধা জাগত তাঁকে দেখে। মহিলা-সঙ্ঘকেও তারা মনে-প্রাণে ভালবাসত। অন্ত ব্যাপারে তাদের আপত্তি দেখা গেলেও, তাদের মা যে সঙ্ঘে যান এতে তাদের মোটেই আপত্তি ছিল না। এর কিছুটা মা সঙ্ঘকে ভালবাসতেন বলেও যেমন, তেমনি খানিকটা ছিল সঙ্ঘ থেকে তাদের কিছু-কিছু বখশিস্ মিলত বলেও।...কিন্তু বাড়ির কর্ত্তারা অনেকেই এই সঙ্ঘকে দেখতে পারতেন না। তাঁরা দেখতেন গিন্নীরা বড় বেশী স্বাধীন হয়ে উঠছেন, সেই জন্যে তাঁরা সঙ্ঘের নাম দিয়েছিলেন, 'বোলচালের দোকান'। এ কথা খুবই সত্য যে, সঙ্ঘের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের সংসার, গৃহ আর জীবনকে ছোট করে দেখা তাঁদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জীবনের নতুন একটা মান খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা, নতুন কোন অর্থ সাধারণ খনি-মজুরের জীবনে যা একান্ত বেমানান আর অদ্ভুত। তা ছাড়া, সোমবার রাত্রিবেলা মিসেস মোরেল অনেক রকম খবর নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, অনেক গল্প বলতেন তাদের, সেই জন্যে উইলিয়ম যাতে তখন বাড়ি থাকে, অন্ত ছেলে-মেয়েরা তা চাইত।

উইলিয়মের বয়স যখন তেরো, তখন মা সমবায়-বিপণির কার্য্যালয়ে একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন তাকে। উইলিয়ম বুদ্ধিমান এবং সাধু প্রকৃতির ছেলে, তার চেহারা সাদাসিধে ধরণের, কিন্তু চোখ-দু'টিতে খাঁটি নরওয়ের লোকেদের মত গভীর নীল রঙ।

—'তুমি ওকে ভদ্দর-লোক বলতে চাইছ, টুলে বসে লেখাপড়া করে ও কত রোজগার করবে শুনি?' মোরেল একদিন জিজ্ঞেস করল।

—'কত রোজগার করবে তাতে কিছু এসে-যায় না।' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন।

—'না, এসে-যায় না! বলি, ও যদি আমার সঙ্গে খনিতে যায়, তা'হলে গোড়া থেকেই হপ্তায় দশ শিলিং করে পেতে পারে। তা ত' নয়, টুলে বসে কোমর ভেঙে হপ্তায় মোটে ছ'শিলিং,—তুমি নিজে যা বোঝ তাই ভালো!'

—'আমি বলছি ও খনিতে যাবে না,' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন, 'ব্যস্, তার পর আর কোন কথা আছে?'

—'কেন, আমার পক্ষে যদি খনির কাজ ভাল হয়ে থাকে, তবে ওর পক্ষে কেন ভাল হবে না শুনি?'

—'তোমার মা তোমাকে বার বছর বয়সে খনির নিচে নামতে দিয়েছিলেন বলে আমিও আমার ছেলেকে তাই করব, এ কোন কথা নয়।'

—'বার বছর কি বলছ? তারও অনেক আগে।' মোরেল বললে।

—'সে যাই হোক না কেন।' জবাব দিলেন মিসেস মোরেল।

ছেলের জন্যে মিসেস মোরেল গর্ব্ব অনুভব করতেন। সে নৈশ-বিদ্যালয়ে গিয়ে শর্টহ্যাণ্ড লেখা শিখছিল, ষোল বছর বয়সে সে এ অঞ্চলে যত শর্টহ্যাণ্ড লিখিয়ে আর কেরাণী আছে, একজন বাদে তাদের আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। তার পর সে নিজেই নৈশ বিদ্যালয়ে শেখাতে আরম্ভ করল।...কিন্তু তার স্বভাবে ছিল আবেগ আর উগ্রতা, কেবল নিজের সততা এবং অল্প বয়সের জন্যেই তার কোন ক্ষতি হতে পারেনি।

লোকে যা করে, যা কিছু প্রশংসার যোগ্য, উইলিয়ম তার সব কিছুতেই দেখলে নিজের কৃতিত্ব। দৌড়ে সে ছিল ওস্তাদ, বাতাসের আগে সে ছুটতে পারত। বারো বছর বয়সে দৌড়ের প্রথম পুরস্কার পেল সে—কাচের একটা দোয়াতদান, দেখতে ঠিক একটা নেহাই-এর (anvil) মত। রান্নাঘরের টেবিলে সযত্নে সেটাকে রেখে দেওয়া হ'ল—মিসেস মোরেল-এর কত গর্ব্ব আর আনন্দের বস্তু এটি! তাঁর জন্যেই দৌড়ের কষ্টটুকু স্বীকার করেছে ছেলে, দৌড়ের প্রথম পুরস্কার নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, 'এই দেখ মা!' এ ত' তাঁরই গর্ব্ব, তাঁর প্রথম যথার্থ সম্মান। সে দিন মিসেস মোরেল নিজেকে রাজরাণীর মত মহিমান্বিতা মনে করেছিলেন, গৌরবের উচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

—'কি সুন্দর!' চিত্তের সমস্ত আবেগ তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই দুটি কথায়। তখন থেকে উইলিয়মের মনে জাগল বড় হবার অভিলাষ। তার টাকা-পয়সা সব-কিছু সে এনে দিত মাকে। যখন সে সপ্তাহে চোদ্দ শিলিং করে পেত, তখন মা নিজের হাত-খরচের জন্যে তাকে দু' শিলিং করে ফিরিয়ে দিতেন। উইলিয়ম এই নিয়েই খুশি, এইটুকুতেই সে বড় লোক, কেন না, মদ খাওয়ার অভ্যেস সে কোন দিনও করেনি। বেষ্টউড-এর যারা সেরা লোক, উইলিয়ম সময় কাটাত তাঁদেরই সঙ্গে। এই ছোট শহরটিতে ধর্ম্মযাজকরাই অবশ্য ছিল সবার সেরা অভিজাত। এর পর হলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী আর সবার শেষে খনি-মজুরের দল। উইলিয়ম তার সঙ্গী খুঁজে নিল রাসায়নিক, স্কুলমাষ্টার কিম্বা ব্যবসায়ীদের ছেলেদের মধ্যে থেকে। শহরের গুণী কারিগররা যে ক্লাবে যান, উইলিয়ম সেখানে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলত। তাছাড়া সে নাচতও—এটা অবশ্য তার মায়ের বিনা অনুমতিতেই। বেষ্টউড্-এর জীবনে যতটুকু উপভোগ করা সম্ভব, সবটুকুই সে উপভোগ করেছিল। চার্চ্চ ষ্ট্রীট, যেখানে ছ'পেনি করে হপ-শাকের সরবৎ বিক্রি হয়, সেখান থেকে শুরু করে খেলাধূলা, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি সব কিছুতেই তার উৎসাহ ছিল।

পল অবাক হয়ে শুনত উইলিয়মের সব গল্প; নানা জাতের ফুলের মত সুন্দরী মেয়েদের বর্ণনা শুনে তার চমক লেগে যেত। কিন্তু উইলিয়মের মনে এই মেয়েদের স্থান ছিল

বোঁটা-ছেঁড়া ফুলের মত, অল্প দিনের মধ্যেই তার স্মৃতি থেকে তারা ঝরে পড়ত।

মাঝে মাঝে কোন সুন্দরী বহ্নিশিখা তার খেয়ালী পলাতক প্রেমিকের সন্ধানে বাড়ি পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হ'ত। মিসেস মোরেল দরজা খুলে দেখতেন অচেনা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, অমনি তাঁর মনে সন্দেহ জাগত।

অতি বিনীত ভাবে মেয়েটি হয়ত বলত, 'মিষ্টার মোরেল কি বাড়ি আছেন?'

—'হ্যাঁ, আমার স্বামী বাড়ি আছেন।' মিসেস মোরেল বলতেন তার জবাবে।

—'ন্না, 'মানে—অর্থাৎ,' মেয়েটি অতি কষ্টে আমতা-আমতা করে বলত, 'মানে, ছোট মিষ্টার মোরেল কি বাড়ি আছেন?'

—'ছোট মোরেল ত' কয়েকটিই আছে। তাদের মধ্যে কোনটিকে তোমার চাই?' মিসেস মোরেলের এই ঠাট্টা শুনে মেয়েটির কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠত, মুখে কথা ফুটত না। কোন রকমে সে বুঝিয়ে বলতে যেত,—

—'আমি, মানে, মিষ্টার মোরেলের সঙ্গে 'রিপলি'তে আমার দেখা হয়েছিল।'

—'ও, মানে, নাচের জলসায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখ বাছা, নাচের জলসায় যে-সব মেয়েদের সঙ্গে আমার ছেলের দেখা হয়, তাদের আমি পছন্দ করি না।···আর সে এখন বাড়িতেও নেই।'···

এই ধরণের ঘটনার পর উইলিয়ম যখন বাড়ি ফিরত, তখন মায়ের উপর রাগ হতে থাকত তার, কেন তিনি মেয়েটিকে অমন রূঢ় ভাবে ফিরিয়ে দিলেন।···সাধারণতঃ সে আপন-ভোলা ধরণের লোক, যদিও তার চোখে ছিল আগ্রহের তীব্রতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটত, মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করত, কখনও বা খেয়ালের বশে মাথার টুপিটা ঠেলে দিত পেছনের দিকে। আজ সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ। এসেই মাথায় টুপিটা সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে হাতটা তার শক্ত চোয়ালের নিচে রেখে মায়ের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস মোরেল দেখতে ছোট মানুষটি, তাঁর চুল কপালের উপর থেকে সোজা পেছন দিকে ফেরানো। তাঁর হাব-ভাবে শান্ত দৃঢ়তার ছাপ; হৃদয়ের অপরিমেয় উষ্ণতা সহজেই ধরা পড়ে। আজ ছেলের রাগত-ভাব দেখে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হলেন।

ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, কাল কোন মহিলা কি আমায় খুঁজে গিয়েছিল?'

—'মহিলা-টহিলা জানি না বাপু। হ্যাঁ, তবে একটি মেয়ে এসেছিল বটে।'

—'তুমি আমাকে বল নি কেন তবে?'

—'ভুলে গিয়েছিলুম···তাই।'

ছেলের মুখ একটু ভার হ'ল।

—'খুব সুন্দর একটি মেয়ে তো?—দেখতে ঠিক ভদ্রমহিলার মতো?'

—'আমি তার দিকে চেয়ে দেখি নি।'

—'তার বড়ো বড়ো কটা রঙের চোখ?'

—'বলছি তো, আমি দেখি নি! আর শোন বাপু, তোমার ওই মেয়েদের বলে দিও তারা তোমার পেছনে দৌড়তে চায় তো অন্ততঃ তোমার মায়ের কাছে এসে যেন তোমার খোঁজ না করে।···কী সব বেহায়া, বিদঘুটে মেয়েই না তুমি গিয়ে জুটিয়েছ তোমার নাচের জলসায়!'

—'কিন্তু মা, আমি জানি ও খুব ভাল মেয়ে।'

—'হ্যাঁ, আর আমিও জানি সে মোটেই ভাল মেয়ে নয়।'

এইখানেই কথা-কাটাকাটি শেষ হ'ত।···নাচের ব্যাপার নিয়ে মা আর ছেলেতে বেশ কিছু মনান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। এর উপর উইলিয়ম যখন একদিন বললে যে, সে পাশের শহরে নাচের জলসায় যোগ দিতে যাবে, সেদিন ব্যাপার চরমে উঠল। পাশের ওই শহরটার রীতিমত দুর্নাম ছিল। সেখানে নাচের জলসায় অদ্ভুত পোশাকে সেজে নাচবার কথা, উইলিয়ম নিজে পরবে পাহাড়িয়া লোকেদের পোশাক। এ ধরণের একটা পোশাক ছিল তার এক বন্ধুর, উইলিয়মের গায়ে লাগল সেটা. উইলিয়ম সেটা চেয়ে আনবার ব্যবস্থা করল। পাহাড়িয়া পোশাকটা যেদিন বাড়িতে এসে পৌছল, মিসেস মোরেল মুখ ভার করে সেটা নিলেন, না খুলেই রেখে দিলেন ভিতরে।

উইলিয়ম বাড়ি এসে বললে, 'আমার পোশাকটা এসেছে?'

'সামনের ঘরে একটা মোড়কে রয়েছে।'

উইলিয়ম দৌড়ে গিয়ে মোড়ক খুলে পোশাকটা বের করে আনলে।

—'পোশাকটা গায়ে দিলে আমাকে কেমন দেখাবে বল দেখি?' মুগ্ধ হয়ে পোশাকটা দেখিয়ে সে মাকে প্রশ্ন করলে।

—'তুমি জানো, তোমাকে ওই পোশাক-পরা অবস্থায় ভাবতেও আমি চাই না।'

নাচের দিন সন্ধ্যাবেলা উইলিয়ম বাড়ি এলো পোশাকটা পরে নিতে। মিসেস মোরেল তাঁর কোট আর টুপি পরে বাইরে যাচ্ছিলেন।

—'তুমি আমাকে দেখতে যাবে না, মা?' উইলিয়ম জিজ্ঞেস করল।

—'না', মা জবাব দিলেন, 'তোমাকে দেখবার ইচ্ছে আমার নেই।'

তাঁর মুখ পাণ্ডুর, কঠিন নিস্তব্ধতা পরিব্যাপ্ত তাঁর সমস্ত মুখে। মনে মনে তাঁর শঙ্কা জাগছিল, ছেলেও না বাপের মতো বিপথে চলে যায়। মায়ের দিকে চেয়ে ছেলেও এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল, উদ্বেগ আর আশঙ্কায় তার হৃদয় ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু তার পরই পাহাড়িয়া পোশাকটির দিকে চোখ পড়তে সে সব কিছু ভুলে গেল। মায়ের বিরক্তির কথা আর মনে রইল না, তাড়াতাড়ি সে পোশাকটা তুলে নিল মনের আনন্দে। মিসেস মোরেল তাঁর কাজে বেরিয়ে গেলেন।···

উইলিয়মের বয়স যখন উনিশ, তখন সমবায়-কার্য্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে নটিংহাম-এ গিয়ে নতুন চাকরি নিলো। আগের আঠারো শিলিং-এর জায়গায় এখানে তার মাইনে হ'ল সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং। একে যথেষ্ট উন্নতিই বলা চলে।

উইলিয়মের বাবা-মার গর্ব্বের আর সীমা রইল না। সবার মুখেই উইলিয়মের প্রশংসা। মনে হতে লাগল, সে খুব তাড়াতাড়িই জীবনে উন্নতি করবে। মিসেস মোরেল আশা করতে লাগলেন বড় ছেলের সাহায্যে ছোট ছেলে-দু'টিকে মানুষ করে তুলবেন। অ্যানি তখন পড়াশোনা করছিল, তার উদ্দেশ্য শিক্ষয়িত্রী হওয়া। পলও বেশ চালাক, তারও লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি দেখা যাচ্ছিল। সে তার ধর্ম্মপিতার কাছ থেকে ফরাসী আর জার্ম্মান ভাষা শিখছিল। সেই ধর্ম্মযাজকটি এখনো মিসেস মোরেলের পরম বন্ধু ছিলেন। বাকী রইল আর্থার। সে দেখতে সুন্দর, সবার আদর পেয়ে পেয়ে ভারী আদুরে হয়ে উঠেছিল; তবু তখনো সে বোর্ড-স্কুলের ছাত্র, তাকে নটিংহামের বড়ো ইস্কুলে পাঠাবার জন্যে একটা বৃত্তি সংগ্রহ করবার কথা হচ্ছিল।

উইলিয়ম তার নটিংহামের চাকরিতে রইল পুরো এক বছর। এই সময়টাতে সে খুবই পড়াশুনা করত, ক্রমশই সে গম্ভীর এবং চিন্তাশীল হয়ে উঠছিল। মনে হ'ত কী এক অব্যক্ত বেদনা তার হৃদয়কে সারা ক্ষণ পীড়া দিচ্ছে। তবু সে আগের মতই নাচের জলসায় কিম্বা নৌবিহারে যোগ দিত। মদ সে খেত না, ছেলে-মেয়েদের সবাই এ বিষয়ে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফিরত, তার পর আরও অনেক রাত্রি অবধি সে বসে বসে বই পড়ত। তার মা তাকে বার বার সাবধান করে দিতেন, উপদেশের ছলে জানাতেন মিনতি। বলতেন, 'নাচের জলসায় যাবে তো যাও। কিন্তু বাবা, তুমি সারা দিন অফিসের খাটুনি খেটে, তার পর আবার নাচ-গান করবে, তার উপর বাড়ি ফিরে এসে বইয়ে মুখ গুঁজে বসবে, এ তো সহ্য হবে না? মানুষের শরীরে এ সয় না। যা হয় একটা করতে হবে,—হয় নাচ-গানই করবে, নয় তো ল্যাটিনই শিখবে। দুটো একসঙ্গে করতে যেও না।'···

এর পর উইলিয়ম কাজ পেল লণ্ডনে। বছরে এক শো কুড়ি পাউণ্ড বেতন, শুনেও অবাক লাগে। মা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

চিঠিটা পড়তে পড়তে উইলিয়মের চোখ ঝক্‌মক করে উঠল। বললে, 'সামনের সোমবারেই আমাকে যেতে লিখেছে মা!' কথাটা শুনেই মিসেস মোরেলের মনে হল তাঁর বুকের মধ্যে সব'কিছু যেন ফাঁকা হয়ে গেল। উইলিয়ম চিঠি থেকে পড়ল, 'বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমাদের জানাবেন আপনি কাজ নিতে রাজী আছেন কি না। —ইতি।'—জানো মা, ওরা আমাকে বছরে এক শো কুড়ি পাউণ্ড দিতে রাজী। চাকরি দেবার আগে একবার আমাকে দেখেও নেবে না। তখনই আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা যে আমার হবেই! একবার ভেবে দেখ মা, তোমার ছেলে লণ্ডনে! আর এখন থেকে বছরে তোমাকে কোন না কুড়ি পাউণ্ড আমি দিতে পারব। এবার থেকে আমাদের আর টাকার অভাব রইল না!'

—'না, তা রইল না।' মা বিষণ্ণ হয়ে বললেন।

উইলিয়ম কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার সাফল্যে মা যতটা খুশি হয়েছেন, তার আসন্ন বিদায়ের ব্যথা তারও চেয়ে বেশী হয়ে তাঁর বুকে বাজছে। যাবার দিন যতই ঘনিয়ে এল, ততই মায়ের মন দুঃখে সঙ্কুচিত হয়ে এলো, অন্ধ-নৈরাশ্যে পূর্ণ হ'ল তাঁর সমস্ত হৃদয়। এ যে তাঁর সুতীব্র ভালবাসা ছেলের জন্যে,—শুধু তাই নয়, তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তাকে নিয়ে। বলতে গেলে, ছেলেই তার সমস্ত জীবন। তার জন্যে কাজ করতে গেলে তাঁর ভাল লাগে; তার পেয়ালায় একটু চা ঢেলে দেওয়া কিম্বা তার জামার কলার ইস্তিরি করে দেবার মধ্যেই কত আনন্দ তাঁর। ইস্তিরি-করা কলার নিয়ে ছেলের গর্ব্ব দেখে সুখে তাঁর বুক ভরে যায়। এদিকে ধোবাখানা নেই। নিজের ছোট ইস্তিরি করবার যন্ত্রটি নিয়ে তিনি কলারটার উপর চালাতেন, নিজের বাহুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ঝকঝকে ক'রে তুলতেন জিনিসটাকে। এবার এইটুকু আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হলেন তিনি; ছেলের জন্যে কাজ করবার সুখটুকুও তাঁর সইল না। ছেলে বিদেশে যাবে, মিসেস মোরেলের মনে হ'ল যেন তাঁর অন্তর থেকেও বাইরে চলে যাবে সে। তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ সে রেখে গেল না। এই তাঁর দুঃখ, এই তাঁর ব্যথা। নিজেকে নিঃশেষে ছিনিয়ে নিয়ে সে নিষ্ঠুর চলে গেল।

যাবার কয়েক দিন আগে উইলিয়ম তার কুড়ি বছরের জীবনে যতগুলো প্রেমপত্র পেয়েছিল সব পুড়িয়ে ফেললে। রান্নাঘরের দেরাজের উপর একটা ফাইলে সেগুলো ঝোলান থাকত। অনেক চিঠি থেকে অংশ-বিশেষ পড়ে সে শুনিয়েছিল মাকে। আর কতকগুলো মা নিজেই পড়েছিলেন। বেশীর ভাগ চিঠিই হালকা ধরণের।

শনিবার সকালে উইলিয়ম বললে, 'আয় পল্, চিঠিগুলো বেছে ফেলি। সুন্দর পাখী আর ফুলওয়ালা চিঠিগুলো তুই নিস্।'

মিসেস মোরেল শনিবারের কাজ-কর্ম্ম শুক্রবারেই সেরে রেখে ছিলেন। শনিবার ছেলের ছুটির দিন, এখানে থাকতে এই তার শেষ ছুটি। চালের পিঠে উইলিয়ম ভালবাসত, মা তার সঙ্গে দেবার জন্যে সেই পিঠে তৈরি করছিলেন। উইলিয়ম বুঝতেও পারেনি, মার আজ কত কষ্টের দিন।

ফাইল থেকে প্রথম চিঠিটা সে উঠিয়ে নিলো। নীল রঙের কাগজ উপরে সবুজ আর লাল রঙের ফুলের চারা। উইলিয়ম চিঠিটাকে শুঁকলো।

'চমৎকার গন্ধ! দেখ শুঁকে', চিঠিটা সে ধরল পল-এর নাকের কাছে।

পল শ্বাস টেনে নিয়ে বললে, 'হুঁ।—এটা কিসের গন্ধ? দেখো মা, শুঁকে।'

মা নিজের ছোট সরু নাকটি চিঠিখানার উপর নামিয়ে আনলেন। গন্ধ নিয়ে বললেন, 'দেখ তোরা। আমার ওই বাজে জিনিসের গন্ধ শুঁকবার সময় নেই।'

উইলিয়ম বললে, 'এই যে মেয়েটি, ওর বাবা ভয়ঙ্কর বড় লোক। টাকা-পয়সার অন্ত নেই। আমি ফরাসী ভাষা জানি বলে, ও আমাকে ডাকে 'লাফায়েৎ' ব'লে।' (তার পর সে চিঠিটা থেকে পড়ে চলল)—'কাজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমাকে মাফ করছি।'—সে আমাকে মাফ করছে মজা দেখ না।—'আমি মাকে আজ সকালে বলেছি তোমার কথা, তিনি খুবই খুশি হবেন তুমি যদি রবিবার চা খেতে আস, তবে বাবার অনুমতিও তিনি নেবেন। আমি পরে তোমাকে জানাব ঘটনার পরিণতি। তবে যদি তুমি'—

মিসেস মোরেল মাঝখানে থেমে বললেন, 'আমি পরে তোমাকে জানাব, কথাটার পর কি ?'

—'ঘটনার পরিণতি,' উইলিয়ম আবার পড়ল সে জায়গাটা।

—'ওরে বাব্বা,' মিসেস মোরেল ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম মেয়েটি ভালো লেখাপড়া জানে।'

উইলিয়ম একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এ মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে অন্য চিঠিগুলো থেকে পড়ে শোনাতে লাগল। পল্-এর ভাগ্যে মিলল ফুলের চারা-আঁকা চিঠিখানা।···চিঠিগুলো শুনতে শুনতে মা কখনো আনন্দ বোধ করতে লাগলেন, কখনও বা কষ্ট হতে লাগল তাঁর—মনে মনে ছেলের জন্যে আশঙ্কার আর সীমা রইল না। বললেন, 'শোন বাপু, মেয়েগুলোর আর যাই হোক বুদ্ধি আছে। তারা জানে তোমাকে তারা একটু তোষামোদ করবে, কিম্বা তোমার প্রশংসা শুনিয়ে দু'টি কথা বলবে, আর তুমিও অমনি এগিয়ে যাবে তাদের কাছে। পোষা কুকুরের মাথা চুলকে দিলে তারা যেমন আরও আদর পাবার জন্যে মুখ বাড়িয়ে দেয়, অনেকটা তেমনি আর কি!'

—'না, মা, না।' উইলিয়ম বলল তার জবাবে, 'ওরা যতই না আমার মাথা চুলকে দিক, ওদের হয়ে গেলে আমি সোজা হেঁটে চলে আসি।'

—'কিন্তু একদিন দেখবে গলায় ফাঁসি পড়েছে, শত টানলেও সে ফাঁস আর ছিঁড়বে না।'

—'রেখে দাও মা! আমি ওদের সবার সঙ্গেই পাল্লা দিতে জানি, ওরা যেন নিজেদের অত বড় মনে না করে।'

—'তুমি হয়ত নিজেকেই বড়ো মনে করছ।' মা ধীরে জবাব দিলেন।

শীগ্‌গিরই ঘরময় ছেঁড়া কাগজের স্তূপ জমে উঠল ; এতদিনকার সঞ্চিত সৌরভময় চিঠিগুলোর এই পরিণতি! এর মধ্যে পল-এর লাভ হ'ল ত্রিশ-চল্লিশখানা সুন্দর কাগজ—তাদের কোনটাতে আঁকা পাখী, কোনটাতে ফুল, কোনটাতে বা লতাগুচ্ছ। আর উইলিয়ম যাত্রা করল লণ্ডনের পথে, হয়ত সেখানে নতুন আর এক গোছা প্রেমের চিঠি সঞ্চয় করে তোলবার জন্যে। তার জীবনে আরম্ভ হ'ল নতুন আর এক অধ্যায়। [ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য।

—'ভবিষ্যৎ সঙ্গীন। খেলার মাঠের রেফারী কিম্বা পরীক্ষার গার্ড হ'তে হবে।'

—[illegible] চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত
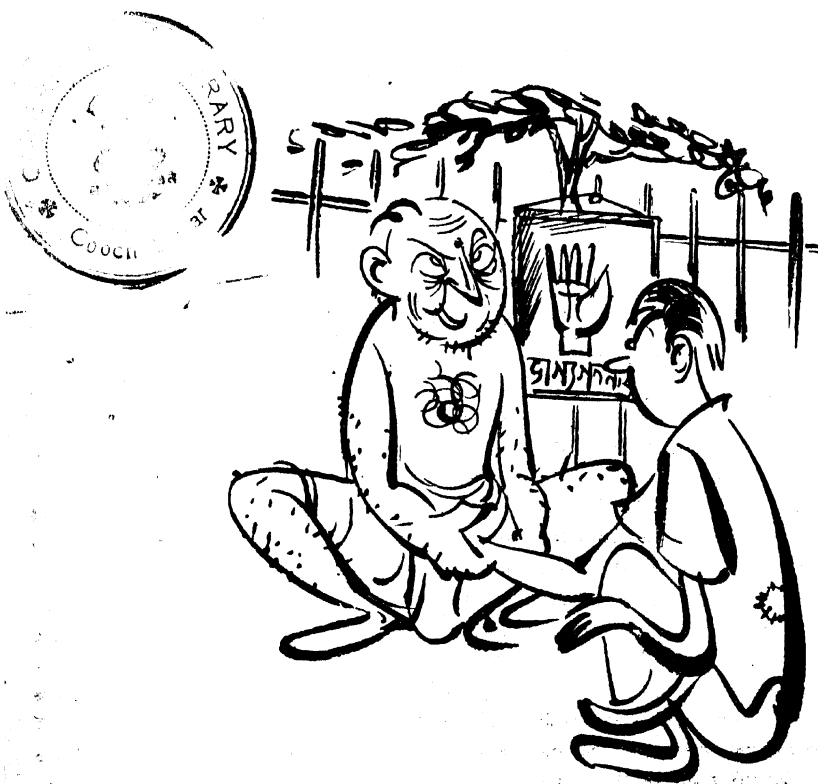
সে যুগের ভারতীয় তাস

সুধা বসু

প্রাচীন ভারতের তাস খেলার ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অস্পষ্ট; ইহার গোড়ার কথা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে নানা আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গিয়েছে যে, আমাদের দেশে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ শতক কি ৮ শতক থেকে দেশীয় তাস খেলার নিজস্ব একটা রীতি ছিল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের তাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে উহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতকে মল্ল রাজাদের সময়ে প্রচলিত হয়েছিল। ঐ যুগের পূর্ব্বেকার ভারতীয় তাস সম্বন্ধে আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্ত্তী যুগের তাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় মুঘলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মচরিতে। বাবরনামায় আছে যে, ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের এক রাত্রে বাবর যখন সদলবলে আগ্রা থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন মীর আলীকে ওটায় শাহ্‌ হাসানের কাছে পাঠানো হয়। বাবর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শাহ্‌ হাসান তাস খেলা খুব পছন্দ করতেন বলে তাঁর জন্য বাবরকে এক সেট ভারতীয় তাস পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। বাবর ঐ দিন মীর আলীর মারফতে তাঁকে এক সেট তাস পাঠিয়েছিলেন। মুঘল আমলের তাসের নাম হল "গঞ্জিফা"। আইন-ই-আকবরীতেও গঞ্জিফা তাসের উল্লেখ আছে। সেখানে আছে যে সম্রাট আকবর পূর্ব্ব-প্রচলিত ১৪৪ খানা গঞ্জিফা দিয়ে খেলার রীতিকে সহজ সরল করে ১৬ খানা দিয়ে খেলবার নিয়ম করেছিলেন। এখনও ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে প্রাচীন রীতির দেশীয় তাসের প্রচলন আছে, সেখানে ১৬ থেকে ১৪৪ পর্য্যন্ত নানা স্তরের 'সেট্' নিয়ে খেলা হয়। মুঘল যুগের পূর্ব্বেকার কোন ইতিহাস বা সাহিত্যে তাস খেলার স্পষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিছু পরবর্ত্তী কালের দুইখানি সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থে "গঞ্জিফা খেলন" নামে কবিতা আছে। উহাতে এই খেলাকে পারস্যদেশীয় বলা হয়েছে। ইহাদের রচনাকাল সঠিক জানা যায় নি। অনেকের ধারণা, "গঞ্জিফা" শব্দটি পারসীক এবং বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ৮ শতকে যে তাসের প্রচলন ছিল তাহাকে মুঘল রীতিতে পরিবর্ত্তিত করেই "গঞ্জিফা" নামটি দেওয়া হয়েছিল। কারণ, ভারতবর্ষের অন্যান্য সব জায়গায় যে সকল প্রাচীন তাস পাওয়া গিয়েছে অথবা এখনও প্রচলিত আছে, সেই সব তাসের মধ্যে সংখ্যা, চিত্রিত বিষয়বস্তু, প্রতীক-চিহ্ন ও উহার আকৃতিতে বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মোগলাই তাস যে একটু স্বতন্ত্র রীতিতে প্রস্তুত হত, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভারতীয় প্রাচীন তাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, উহা আকারে সবই গোলাকৃতি। আয়তন সাধারণতঃ ১½" থেকে ২½" ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ যুক্ত। এর মধ্যে বিষ্ণুপুরের তাসের আয়তন সব চেয়ে বেশী (৪" ইঞ্চির উপরে ব্যাসার্দ্ধ যুক্ত)। রাজপুতানায় এক প্রকার পুরানো তাস পাওয়া গিয়েছে যা আয়তনে মাত্র একটি আঙুলির মত। তাসের সংখ্যানুসারে বিভিন্ন ধরণের 'সেট্' থাকে। সব চেয়ে ছোট সেটে থাকে ১৬ খানা তাস; তার পরে ১২০ খানা; সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা হল ১৪৪। ১২ খানা তাস দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে খেলা হয়। নানা মনোরম বর্ণে সুচিত্রিত হয়ে তাসগুলি চিত্রশিল্পের মর্য্যাদা পাওয়ার যোগ্য। অঙ্কিত বিষয়ের মধ্যে প্রাচীন তাসে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্ত্তির প্রাধান্য ভারতের সর্ব্বত্রই ছিল। অবতার মূর্ত্তির এক একটিকে বিশেষ ভাবে অঙ্কন করে রাজা, মন্ত্রী বা রাজা-রাণী রূপে ব্যবহার করা হয়। বিলাতী তাসের মত সাহেব বিবি গোলাম দেশীয় তাসে নাই; তবে প্রতীক-চিহ্ন এক হইতে দশ পর্য্যন্ত দশ খানা তাসে থাকে। প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া হয় অবতারের আয়ুধ বা হাতের অস্ত্র দিয়ে। রাজার সঙ্গে রাণী বা মন্ত্রীর পার্থক্য দেখানোর জন্য একই অবতার মূর্ত্তিকে দুই ভাবে রূপ দেওয়া হয়। যেটিকে রাজা বলে ধরা হবে, তাকে একটি রথের মধ্যে বা একটি সুশোভিত আসনে বসিয়ে দেওয়া হবে। কোন কোন সময় পাশে দুই-এক জন পরিচারকও রাখা হয়। আর রাণী বা মন্ত্রীকে সাধারণ ভাবে দাঁড়ান অবস্থায় দেখানো হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব অঞ্চলেই দশাবতার মূর্ত্তিযুক্ত তাসের প্রচলন ছিল।

মুঘল তাসে দশাবতারের চিত্র বড় পাওয়া যায় না। আকৃতিও নানা রকম দেখা যায়। চতুষ্কোণ তাসও প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। কতকগুলি আবার ঠিক চৌকো নয়, একটু লম্বা ধরণের। মোগলাই তাসের চিত্র-মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আছে। বিভিন্ন ভঙ্গীযুক্ত মানুষের মূর্ত্তি, নানা রকম পশুর পিঠে মানুষ, বিচিত্র সব গাছ, ফুল পাতার নক্সা ও দৃশ্য চিত্র। বিষয়বস্তুর চরিত্র ও আসল অর্থ বুঝা খুব কঠিন; কারণ সম্পূর্ণ একটি 'সেট' বড় পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যেও সঙ্গতির খুব অভাব। মুঘল তাসের কোণে এবং বর্ডারে যে সব আলঙ্কারিক নক্সা পাওয়া যায় তাহা মুঘল চিত্রেরই যেন প্রতিধ্বনি। মুঘল তাসের অঙ্কন-পদ্ধতি ঐ যুগের চিত্রের মতই রং-এ রেখায় সমৃদ্ধ ও মনোযোগ সহকারে অঙ্কিত সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে ভরপুর। মুঘল তাসের চিত্র সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরীতে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। দশাবতার চিত্র ও উহার প্রতীক-চিহ্নের মত গঞ্জিফা তাসে যে সব চিত্র ও প্রতীকের ব্যবহার হত—তার বিশেষ পরিচয় আইন ই-আকবরীর তালিকাটিতে পাওয়া যায়। যেমন অশ্বপতি; তাহার প্রতীক হল ঘোড়া; গজপতি—হাতী; নরপতি—পদাতিক সৈন্য; গড়পতি—দুর্গ; ধনপতি—মুদ্রাপূর্ণ কলসী; দলপতি—সশস্ত্র যোদ্ধা; নৌপতি—জাহাজ বা নৌকা; স্ত্রীপতি—নারীমূর্ত্তি; সুরপতি—দেবমূর্ত্তি; অসুরপতি—দৈত্য বা দানব; বনপতি—বন্য জন্তু; অহিপতি—সাপ। উল্লিখিত নরপতি, গজপতি চিত্রযুক্ত তাসগুলি সম্ভবতঃ প্রধান—আর উহাদের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হত হাতী ঘোড়া ইত্যাদির চিত্র এক থেকে দশ পর্য্যন্ত।

মুঘল আমলে রূপার উপরে সোনার কাজ করে ও হাতীর দাঁত দিয়ে এক প্রকার তাস তৈরী হত। এই সব তাসের চিত্রগুলি বিশেষ

দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন তাস

যত্ন সহকারে ও উন্নত ধরণে আঁকা হত বলে উহাকে বলা হত। "দরবারী কলম"; আর সাধারণ ভাবে কাগজে ও মোটা কাপড় আঠা দিয়ে জুড়ে যে তাস তৈরী হত তাকে বলা হত "বাজার কলম"। রাজপুতানা ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশেও রূপা ও হাতীর দাঁতের তাসের প্রচলন ছিল এবং দরবারী রীতি ও সাধারণ রীতির নাম অজ্ঞাত ছিল না। উঁচুদরের তাসকে যত্ন করে রাখবার জন্য সুন্দর সব কাঠের ও হাতীর দাঁতের বাক্স তৈরী করা হত এবং নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও মনোরম চিত্র দিয়ে উহাকে আকর্ষণীয় করে তোলা হত। মুঘল ও রাজপুত চিত্রের মধ্যে যেমন নানা ভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনি তাস-শিল্পের ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম হয়নি। সাধারণ দশাবতার 'সেট' ছাড়া রাজস্থানে গঞ্জিফার মত আরও বিচিত্র বিষয় আঁকা হত। গোল তাসের সঙ্গে রাজপুতানার চৌকো তাসের প্রচলনও ছিল। জয়পুর পুঁথিখানায় এই ধরণের কিছু প্রাচীন তাস আছে, যাতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সব দরবারের চিত্র—রাজা, মীর, উজির ও নানা নক্সা দেখা যায়। গঞ্জিফা তাসের অশ্বপতি, গজপতি প্রভৃতিরই ঐ সব রাজস্থানী সংস্করণ বলে মনে হয়। রাজপুতানার তাসের মানুষ, পশুপক্ষী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপকে

ও তুলি-কলমের প্রয়োগ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যকে সহজেই ঐ অঞ্চলের বলে ধরা যায়।

ভারতের নিজস্ব তাসের নির্ম্মাণশালার অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এ দেশের সর্ব্বত্রই, অর্থাৎ পাঞ্জাব থেকে কোচিন ও গুজরাট থেকে বাংলা উড়িষ্যা—সব জায়গায়ই তাস প্রস্তুত হত। তবে তাসের ওস্তাদ কারিগর ছিল বিশেষ কয়েকটি স্থানে। যেমন অমৃতসর, জয়পুর, উত্তর প্রদেশের ফতেপুর জিলা, বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর, উড়িষ্যার সর্ব্বত্র, দক্ষিণ ভারতের কাডাপ্পা, কোঙ্কণ দেশের সওন্তবাদী এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদে। বর্ত্তমানে উড়িষ্যা ছাড়া আর কোথাও দেশীয় পদ্ধতিতে তাস খেলার প্রচলন আছে কি না সঠিক জানা যায় না। শোনা যায়, রাজপুতানা ও কোঙ্কণ দেশে ক্ষীণ ভাবে তাস প্রস্তুতের চেষ্টা এখনও চলে। তবে উড়িষ্যায় বিলাতী তাসের পাশে পাশে দেশীয় তাস সমভাবেই প্রায় চলছে।

তবে পুরানো তাসের মত বিষয়-বস্তুর প্রাচুর্য্য ও বর্ণের সমারোহ ও রচনা-কৌশলের সমৃদ্ধি আর নাই। খৃষ্টীয় ১৬ শতক থেকে ভারতে বিলাতী তাসের আমদানী স্রুরু হলে ক্রমশঃ দেশীয় তাস এবং মোগলাই গঞ্জিফা স্থানচ্যুত হতে আরম্ভ করে। এর প্রধান কারণ মনে হয় যন্ত্র ছাপানো বিলাতী তাস সস্তা দরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—সংখ্যায় কম এবং খেলার রীতিও অনেকটা সহজ সরল। কিন্তু ভারতের তাস হাতে তৈরী ও সুনিপুণ ভাবে সুচিত্রিত বলে মজুরী ও মূল্য বেশী—বাজারে আমদানীও হয় কম। সংখ্যাধিক্য ও চিত্র-বিচিত্র থাকায় খেলার রীতিও অনেকাংশে জটিল। এছাড়া পরাধীন জীবনের আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে জীবন-যাত্রার প্রতি অঙ্গ-অবয়বের আকৃতি যখন বদলে গেল, তখন ক্রীড়া-কৌতুকের ক্ষেত্রটিও বাদ পড়েনি। বিলাতী তাসের স্রোত এসে দেশীয় তাসকে ভাসিয়ে স্থানচ্যুত ও মর্য্যাদাহীন করে দিলে। কিন্তু ইউরোপের নানা যাদুঘর ও সংগ্রহশালায় তারা খুব সমাদরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আজ সুপ্রাচীন তাসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অনুশীলন করতে হলে ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতির দারস্থ হতে হয়। ভারতবর্ষের কয়েকটি সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কিছু কিছু প্রাচীন ভাল তাস আছে।

প্রাচীন ভারতের তাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিভিন্ন অঞ্চলের তাসের চিত্রের পরিকল্পনা ও রচনা-রীতিতে একটা আঞ্চলিক বিশিষ্টতার ছাপ দেখা যায়। দশাবতার সেটের তাসে এক এক প্রদেশে এক এক নিয়মে অবতার রূপকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন বুদ্ধ অবতারকে উড়িষ্যা ও বিষ্ণুপুরে দেওয়া হত পঞ্চম স্থান; জয়পুর ও দাক্ষিণাত্যে পেত নবম স্থান; আবার দক্ষিণ-ভারতে কাডাপ্পায় বুদ্ধকে চিত্র না করে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেওয়া হত। মহীশূরের কতকগুলি পুরাণো তাসে নানা রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। যেমন—দেবীর চামুণ্ডা ও মহিষমর্দ্দিনী রূপ; বিষ্ণুর অনন্তশায়ী ও বটপত্রশায়ী রূপ; শিবের দক্ষিণা মূর্ত্তি ও হরিহর মূর্ত্তি। এছাড়া স্কন্দ, গরুড়, মন্মথ, হনুমানের পিঠে রামচন্দ্র, 'নাগকল' ও দুই মাথা যুক্ত ঈগল অর্থাৎ গোণ্ডভেরুণ্ড, যাহা মহীশূরের রাজকীয় প্রতীক—তাহাও অঙ্কন করা হত। মহীশূরের তাসও গোলাকার। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ও রামায়ণের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বীর ও চরিত্রগুলির রূপ-চিত্র দক্ষিণ-ভারত ও উড়িষ্যার নানা অংশের তাসে স্থান পেয়েছিল। বর্ত্তমানে দশাবতার তাসের প্রচলনই উড়িষ্যায় বিশেষ করে পুরী অঞ্চলে বেশী দেখা যায়। গঞ্জাম অঞ্চলে রাজা-রাণী অথবা রাজা-মন্ত্রী সেটের প্রচলন বেশী। রাজাকে হাতীর পিঠে ও মন্ত্রীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে স্বাতন্ত্র্য বোঝান হয়। রাণী বলে আলাদা কোন নারী-মূর্ত্তি থাকে না। ঘোড়ার পিঠে আসীন নর মূর্ত্তিকেই রাণী বলা হয়। গঞ্জামের তাস আকারে সামান্য বড়।

বর্ত্তমানে ভারতের আর কোথাও হাতে-তৈরী তাস দিয়ে খেলা প্রচলিত না থাকলেও—উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে এখনও উহার প্রচলন আছে। বিলাতী তাস ও দেশীয় তাস দুই-ই চলছে। বিষ্ণুপুরে তাস প্রস্তুতের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। যদিও উড়িষ্যার তাসের সেই সৌরভ ও মাধুর্য্য আর নাই—তথাপি শিল্পটি একেবারে মরে যায়নি। তাস প্রস্তুত করে এমন শিল্পী এখনও দুই-চার জন পাওয়া যায়। সম্প্রতি জনৈক উড়িয়া চিত্রকরের কাছ থেকে তাস সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা বর্ণনা করেই আলোচনা শেষ করব।

আজ-কালও উড়িষ্যায় ৯৬ থেকে ১৪৪ খানা পর্য্যন্ত তাস দিয়ে বিভিন্ন 'সেট' তৈরী হয়ে থাকে। দশাবতার সেটের চাহিদাই বেশী। এই সেটে তাস থাকে ১২০ খানা। প্রতীক-চিহ্নকে বলা হয় 'হরফ'। এক-একটি অবতার-মূর্ত্তিকে দুইখানি তাসে চিত্র করে একটিকে রথের মধ্যে বসিয়ে বলা হয় রাজা; অন্যটিকে সাধারণ ভাবে অঙ্কন করে বলা হয় মন্ত্রী। বাকী ১০০ খানাকে ১০ ভাগে ভাগ করে এক থেকে দশ পর্য্যন্ত প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত করা হয় অবতার মূর্ত্তির হাতের সব আয়ুধ দিয়ে। যেমন মৎস্য-অবতারের প্রতীক মাছ। ছোট একটি মাছের চিত্রকে প্রতীক-রূপে ব্যবহার করা হবে। কূর্ম্ম অবতারের জন্য কচ্ছপ; বরাহের শঙ্খ; নরসিংহের চক্র; বামনের গাড়ু; পরশুরামের কুঠার; রামের তীর; বলরামের গদা; বুদ্ধের পদ্ম ও কল্কির খড়্গ।

যখন ১৪৪ খানা তাস দিয়ে সেট তৈরী করার প্রয়োজন হয়—তখন দশাবতার সেটের ১২০ খানা তাসের সঙ্গেই আরও ২৪ খানা তাস জুড়ে—চার খানি তাসে আঁকা হয় দুই খানি করে কার্ত্তিক ও গণেশের মূর্ত্তি। বাকী ২০ খানাতে প্রতীকরূপে অঙ্কিত হয় কার্ত্তিকের ময়ূর ও গণেশের মূষিকের চিত্র।

উড়িষ্যায় ৯৬ খানা তাসের সেট একটা নতুন চালে তৈরী হয়। আটটি বিভিন্ন রং দিয়ে তাস প্রস্তুত করে তার উপরে একই ধরণের রাজা রাণী বা রাজা মন্ত্রী আঁকা হয়। রাজা মন্ত্রীর তাসের যে রং থাকবে—প্রতীক তাসের রং ঐ গ্রুপের ঠিক সেই রকম হবে। বর্ণের বিভিন্নতা লক্ষ্য করতে হবে তাসের গায়ের রংএ অর্থাৎ চিত্রিত মূর্ত্তির পৃষ্ঠপট বা ব্যাক গ্রাউণ্ডে। বর্ণের বিভাগ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট প্রতীক-চিহ্ন আছে। যেমন কাল রংএর তাস হলে প্রতীক হবে চাঁদ; অলক্ত রংয়ে 'সমসের' (তরবারি); গেরুয়ার ফুল; সাদায় গোলাপ; সবুজে 'চেঙ্গ' অর্থাৎ একটি বিশেষ নক্সা; নীল রংয়ে সূর্য্য হলদে রংয়ে 'কুমাচ' (একটি নক্সা); লাল রংয়ে 'বরাত' (নক্সা)।

উল্লিখিত আট রংয়ের সেটে রাজা রাণী বা রাজা মন্ত্রীর মূর্ত্তি শিল্পীর ইচ্ছানুসারে রূপায়িত করে থাকেন। কোন সময় কৃষ্ণ রাজা

রাধা মন্ত্রী ; কোন সময় বলরাম রাজা, কৃষ্ণ মন্ত্রী। গঞ্জামে থাকে হাতীর পিঠে রাজা ; ঘোড়ার পিঠে মন্ত্রী। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী নিয়েও প্রাচীন কালের চিত্র রচনা হত। রাধাকৃষ্ণের মিলিত লীলাচিত্রও উড়িষ্যার পুরানো তাসে প্রচুর দেখা যায়। চাহিদার অভাবে ও উড়িষ্যার চিত্র-রীতি দুর্ব্বল হওয়ার ফলে তাসের চিত্রও পূর্ব্বেকার মত মনোরম হয় না। সূক্ষ্ম কলমে দীর্ঘ সময় দিয়ে নানা জটিল বিষয়ের চিত্র রূপায়িত করলে যে পারিশ্রমিক শিল্পীর প্রাপ্য হওয়া উচিত—সেই মূল্য দিয়ে তাস কেনবার লোক আজ আর নাই। বিলাতী তাসের দাম এর চেয়ে অনেক কম। এই জন্যই উড়িষ্যার পটুয়ারা এখন আর জটিল ও পরিশ্রম-বহুল চিত্র দিয়ে তাসকে সুশোভিত করেন না। দশাবতার মূর্ত্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সরল ও সাদাসিধে ভাবে করা হয়। পুরানো তাসের উল্টো পিঠেও নানা নক্সা আঁকা হত। কিন্তু আজ-কাল শুধু রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাসের প্রথম কাঠামো হয় পুরানো মোটা কাপড় ও মোটা কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে। তার পরে ঘন রংএর প্রলেপ বার বার দিয়ে উহাকে আরও মোটা ও শক্ত করে তোলা হয়। চিত্র আঁকা হলে আবার গমের আঠা বা অন্য কোন উজ্জ্বল পদার্থ দিয়ে একটা প্রলেপ দেওয়া হয় তাসকে চক্‌চকে করার জন্য। শেষ প্রলেপটির আর একটি প্রয়োজন হল যে উহাতে খেলার সময় হাতের ঘষায় রং উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

উড়িয়া ভাষায় তাসের নাম 'সার'। দেশীয় তাসের খেলা খুব জটিল বলে এবং উহাতে খুব বুদ্ধির প্রয়োজন বলে উড়িষ্যাবাসীরা উহাকে বলে "আদালত বিচার"। বিলাতী তাসের মত চার জন লোক নিয়েই দেশীয় তাসের খেলা চলে।

উড়িষ্যায় পুরানো চালের তাস খেলা বেঁচে থাকলেও—কোন্ যুগে উহার প্রথম পত্তন হয়, কি এর ইতিহাস, অতি প্রাচীন কালে ইহা কি অবস্থায় ছিল, তা কিছুই জানা যায় না। সুপ্রাচীন যে সব তাস সংগ্রহশালা ইত্যাদিতে আছে—তাহার বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা ও খেলার রীতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান উড়িষ্যাবাসীরা কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেন না। প্রাচীন শিল্পি-গোষ্ঠীর যাঁরা বংশধর—তাঁরাও অর্থাভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পথ না পেয়ে অন্য পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। ফলে উড়িষ্যার চিত্রশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাস-শিল্পটিও মৃতপ্রায়।

অবসর সময়কে আনন্দে কাটানো খেলার একটা উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। ভারতীয় আদর্শে ঐ সময়েও দেবতাকে মানুষ ভুলে না যায়—তারই আভাস যেন চিত্রিত তাসের মধ্যে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখার পরোক্ষ চেষ্টার মধ্যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করার যে সুযোগটি রয়েছে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়।

উড়িষ্যার প্রাচীন তাসের উজ্জ্বল বর্ণের সমারোহ, নরনারী মূর্ত্তির ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ভঙ্গী, সূক্ষ্ম তুলির মোলায়েম প্রয়োগে রচিত কোমল রেখার সমাহারে তাসের চিত্রগুলি পটচিত্রের সমান মর্য্যাদা পাওয়ার যোগ্য। তাস চিত্রের মূর্ত্তি, জামা, পোষাক, অলঙ্কারাদি ও দেহ-ভঙ্গী—সব উড়িষ্যার মামুলী চালের। ছোট ছোট তাসের মূর্ত্তিগুলি আরও ছোট। কিন্তু শিল্পীর রচনা-কৌশলে উহার মধ্যে যে ভাবটি ফুটে উঠত—তা হত অত্যন্ত বিরাট ও গভীর। জোরালো ও জীবন্ত ভাবই হল উড়িষ্যার চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্য। তাস চিত্রণেও পটুয়ারা উহা পরিবেশনে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু কালের গতিতে সবই আজ লুপ্তপ্রায়। শুধু দশাবতার নামটি নিয়ে আছে মাত্র প্রাচীন তাসের স্মৃতি।

পারাবত

প্রভাকর মাঝি

মেঘের মিনার বেয়ে উড়ে যায়, উড়ে যায় শ্বেত পারাবত,
মাখমের মতো তার লঘু পাখনায় ভাসে নরম ইসারা।
সাদা নৌকার মতো পাল তুলে যেতে যেতে নীলে হয় হারা,
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় বুঝি নীল-গগনের সেই মহা ছায়া-পথ।

পারাবত উড়ে যায় মাটীর পৃথিবী ছাড়ি ঢের-ঢের দূরে
অনেক অরণ্য ছাড়ি, অনেক পাহাড় নদী মাঠ ছাড়ি ধায়।
রাঙা-রোদ সোনা ঢালে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলি নরম ডানায়,
পারাবত উড়ে যায়, গলানো মোমের মতো প্রাণের পুলকটুকু ঝরে।

কোথা যায়? কেন যায়? ঘর-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া শ্বেত পারাবত,
রামধনুকের দেশে ঢুলু-ঢুলু-চোখে-জাগা মেয়েটির পাশে?
লাল নীল স্বপনেরা যেথা সবে চুপি-চুপি ভিড় করে আসে,
যেথাকার বনে ফুটে তারাফুল, হাসে গায় বসন্ত-শরৎ?

কবির হৃদয়ে জাগে নব ছন্দ, দুরু-দুরু আগ্নেয় আবেগ,
পারাবত উড়ে যায়, পারাবত ছুটে যায়, তার সাথে ছুটে নদী-মেঘ।

—(আকাশ-বাণীর সৌজন্যে)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

'কিন্তু', ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্থানে ফিরে এসে খুকুরাণী উত্তর করলো, 'আমার মত একজন অন্ধ মেয়ে আপনার কি কাযে লাগবে? বরং কোনও সরকারী আশ্রমে আমাকে আপনি রেখে আসুন। এছাড়া আরও একটা কথা, আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনার মত আমারও কোলকাতায় একটি বাড়ী আছে। এই দুইটি বাড়ীই আপনি আপনার শিল্পচর্চার স্কুলে দান করতে পারবেন। আপনার ব্যাবহারে আমি মুগ্ধ, তাই এই প্রস্তাব করলাম।'

'এই তো আপনি মুস্কিল করেন।' আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর করলেন, 'না না তা কখনও হতে পারে না। আপনার বাড়ী সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করতে হলে যে আপনার পূর্ব্বজীবন আমাদের উভয়ের মধ্যে এসে পড়বে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আপনার পুরাতন জীবনের কথা শুনবো বা জানবো না। আপনার পূর্ব্বের জীবনের কাহিনী শুনলেই আপনাকে সেইখানে বা অন্য কোথায়ও যে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, এতো বড়ো ক্ষতি স্বীকার করে নিতে মন আমার আদপেই চায় না। পৃথিবীতে আজ আমিও একা ও নিঃসহায়। সবই কিছু আমার আছে অথচ কিছুই নেই। এ ছাড়া আমি স্থীর ধীর জানি, অন্ধ মেয়ে বলে সেখানকার লোকেরা আপনাকে একটা ভার মনে করবে, কিন্তু আমি তা কোনও দিনও মনে করবো না, কারণ, চক্ষুষ্মানদেরই আমি এড়িয়ে চলতে চাই। যে ভার আমি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেবো তা কোনও দিনও আমি নামিয়ে দেবো না। আপনি কি আমায় সত্যই বিশ্বাস করতে পারবেন?'

'কিন্তু' খুকুরাণী উত্তর করলো, 'প্রতিদানে আমি আপনাকে কি দেবো। আপনি সব দেবেন, কিন্তু কিছুই নেবেন না। এরকম মানুষ জীবনে আমি এই প্রথম দেখলাম। আপনি আমাকে সত্যই সুন্দরী মনে করেন। কিন্তু ওটা চোখের নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়। হতে পারে আর্টিষ্টের চোখ এবং সাধারণ মানুষের চোখ এক নয়। কিন্তু মাত্র এইটুকুর জন্য এতো স্বার্থ ত্যাগ আপনি কেন করবেন?'

'না না, শুধু তাই নয় একটু এগিয়ে এসো' আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর করলে, 'আপনার মুখের অনুকরণে যে প্রথম ছবিটি এঁকেছি, শেষ মুহূর্ত্তে তা এক্সিবিশনে পাঠিয়েছিলাম। বিচারকদের মতে সেইটিই হয়েছে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি। আমি সেই দিনই বুঝেছি আপনিই জীবনে আমাকে পথ দেখাতে পারেন। এছাড়া আপনার ভার গ্রহণ করবার আমার আরও একটি কারণ আছে। আপনার চোখ থাকলে দেখতে পেতেন দেওয়ালে টাঙানো অপূর্ব্ব একটি ছবি। প্রথমে ওটা ছিল পটে-আঁকা ছোট একটি মেয়ের প্রতিকৃতি। একদিন আমার খেয়াল হলো ওতে বয়সের রেখা সন্নিবেশ করবো। এমনি ভাবে বয়সের রেখা চড়াতে চড়াতে ঐ মূর্ত্তি হতে বেরিয়ে এলো এমন এক মূর্ত্তি যার সঙ্গে আপনার বর্ত্তমান চেহারার একটুও অমিল নেই। আজ হতে বিশ বছর পূর্ব্বে এক কলঙ্ক জনক কাহিনীর মধ্যে ঐ ছোট মেয়েটি নিখোঁজ হয়ে যায়। তখন আমিও ছিলাম ছোট, তবে তার চেয়ে অনেক বড়ো। আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলে সে হতো আপনার সমবয়সী এক মেয়ে। এই জন্যই সেই দিন ফুটপাতে সহসা আপনাকে দেখে আমি আচম্বিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। ঐ ছবিটি আমাদের উভয়ের সকল দুর্ব্বলতা দূর করে আমাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক করে রাখবে। কিন্তু আমি স্বার্থপরের মতন চিরকাল আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে এখানে ধরে রাখবো না। আমার এই মাত্র অনুরোধ, চক্ষু ফিরে না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার আশ্রয়েই থাকুন। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে যথোচিত চিকিৎসা আপনার জন্য আমি ব্যবস্থা করেছি। একটু পরে ডাক্তার বাবু অপর আর এক বড়ো ডাক্তারকে নিয়ে এখানে আসবেন। যদি তারা অপারগ হন তাহলে আপনাকে আমি ভিয়েনা শহরে নিয়ে যাবো। ডাক্তাররা বলছে সহসা একটা দারুণ আঘাত পেলে দৃষ্টিশক্তি আপনি পুনরায় ফিরে পেতে পারেন। কিন্তু এই আঘাত আমি আপনাকে দিই কি করে?'

'বেশ গল্প করে করে আপনি অন্ধ মানুষদের ভুলিয়ে রাখতে পারেন তো?' খুকুরাণী ম্লান হেসে উত্তর করলো, 'একবার অন্ধ হয়ে গেলে আর কি কেউ ভালো হয়! জীবনে যা পাপ করেছি তারই জন্য ঈশ্বর আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। আপনি কি ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি উল্টে দিতে পারবেন? যদি পাপের ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু পুণ্যও অর্জ্জন করে থাকি, তা'হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আচ্ছা, আপনি কি শুনেছেন যে কোনও অন্ধ পুনরায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে?'

'কেন শুনবো না', উৎসাহিত হয়ে আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর করলেন, 'আমার বাবাই ছিলেন একজন শহরের বড়ো চোখের ডাক্তার। তাঁর কাছে শুনেছি, একজন প্রৌঢ় মুসলমানের চোখ পরীক্ষা করে তিনি বলেছিলেন যে স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা না হলে তার দৃষ্টিশক্তি এ জীবনে ফিরবে না। এর দশ বৎসরে পরে ঐ ব্যক্তি বাবার সঙ্গে দেখা করে জানায় যে খোদার দয়ায় সে তার পূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। ঐ ব্যক্তি আরও জানায় যে একদিন 'আগুন আগুন' শব্দ শুনে ভয়ে ঘর হতে বেরিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পায় পাশের একটা ঘর দাউ দাউ করে জলছে। আমার বিশ্বাস তুমিও তোমার দৃষ্টিশক্তি ওইরূপ এক অঘটন ব্যতিরেকেই একদিন না একদিন ফিরে পাবে।'

'আপনার বাবা ছিলেন, এক জন চোখের ডাক্তার:' ম্লান হাসি হেসে খুকুরাণী উত্তর করলে, 'শুনেছি আমার বাবাও ছিলেন চোখের ডাক্তার; কিন্তু তাই বলে কি আমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পাবো? উঃ! যে একদিন দেখতে পেতো সে যদি দেখতে না পায় তা'হলে কি কষ্ট!'

'পতঙ্গ ও মানুষ একই পৃথিবীতে বাস করলেও পতঙ্গের পৃথিবী ও মানুষের পৃথিবীতে প্রভেদ আছে। পৃথিবী একটি হলেও অন্ধদের পৃথিবী ও চক্ষুষ্মানের পৃথিবী বিভিন্ন। খুকুরাণী আজ যে জগতে বাস করে সেই জগতে পূর্ব্ব-পরিচিতদের প্রয়োজন নাই। তাই আজ সে পিছনে ফেলে আসা মানুষদের ভুলে যেতে চায়। কিন্তু তবুও কৌতূহল জাগে, সেখানকার মানুষরা এখোন কি করছে তা জানতে?' একটু কিন্তু-কিন্তু করে খুকুরাণী জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আপনি খবরের কাগচ পড়েন না?'

'তা পড়ি বই কি?' আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর দিলেন, 'পড়ি বলেই তো বিপদে পড়েছি। ভেবে-চিন্তে কূল পাচ্ছি না এখন কি করবো। এই তো কাগচখানা এখনও এখানে রয়েছে। খু-উব ঘটা করে এতে বার হয়েছে, সেইদিনকার ঘটনা। যতো কিছু প্রশংসা তা পেয়েছেন নগর পুলিশের প্রণব বাবু। তিনি নাকি জীবন তুচ্ছ করে গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করেছেন। আবার দুঃখও করা হয়েছে এই বলে যে অপহৃতা নারীকে এখনও উদ্ধার করা গেল না। এদিকে আমিই যে আপনাকে উদ্ধার করলাম তা কেউ জানলোও না। এখোন এই কয় দিন ভাবছি যে কি করা যায়'। এদিকে আপনিও যে কেন আত্মগোপন করে থাকতে চান তা'ও বুঝছি না।'

খুকুরাণীর মুখে কোনও উত্তর এলো না। তার চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে হলো। যার কোনও উল্লেখযোগ্য আত্ম-পরিচয় নেই, তার আত্মগোপনের সার্থকতা কি? চোখ না থাকায় আর্টিষ্ট বন্ধুর মনের ভাব বুঝতে পারা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এইটুকু সে বুঝেছিল যে সে নিজে ক্ষয়-ক্ষতির বাইরে। কেবলমাত্র তার চিন্তা এই, কতো দিন এই আপনভোলা লোকটি তাকে আশ্রয় দেবে এবং তার কাছ হতে এইরূপ আশ্রয় সে নেবেই বা কেন? হঠাৎ খুকুরাণীর চিন্তার ধারা ছিন্ন করে বন্ধ দরজার ওপার থেকে আওয়াজ এলো খট্-খট। সন্ত্রস্ত হয়ে খুকুরাণী ভাবলো এই বুঝি দলবল সহ তার সন্ধানে প্রণব বাবু এসে পড়লেন। কিন্তু আজ যে তার কাছে কারুরই আর প্রয়োজন নেই।

খট খট আওয়াজ শুনে আর্টিষ্ট মিলন বাবু উঠে পড়ে দরজা খুলে দিতেই এক নারীমূর্ত্তি বিনা অনুমতিতেই ঘরে ঢুকে পড়লো। বিব্রত হয়ে গৃহকর্ত্তা মিলন বাবু পিছিয়ে এসে বললেন, 'কি চাও তুমি, কেন এসেছো? যখন তোমাকে আমি চেয়েছিলাম, তখন তুমি আসনি। এখোন তোমাকে আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে।'

এই নারীমূর্ত্তিটি আর কেউই নয়। সে ছিল শহরের বিখ্যাত নটী নারী রীনা। এইদিন এক উন্মাদনা নিয়েই সে এখানে এসেছে। পূর্ব্ব-স্মৃতি তাকে পাগলই করে তুলেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুকুরাণীর দিকে তাকিয়ে দেখে উদাত্ত স্বরে সে উত্তর করলো, 'এতো দিন তুমি আমাকে চেয়েছিলে বলে আমি আসিনি, কিন্তু আজ তুমি আমাকে চাও না বলে আমি এসেছি। আমি এখানে আদ্যোপান্ত সব খবর নিয়েই এসেছি। তুমি কি বলতে চাও যে আমি ঐ ভিখারিণী মেয়েটার চেয়েও অধম? তুমি কি বলতে চাও ঐ একমাত্র সতীসাধ্বী?—'

'কোনও কথা আমি শুনতে চাই না তোমার' দুয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আর্টিষ্ট ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো, 'আমার রুচি আমার, তোমার রুচি তোমার। এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। কোনটি কাচ আর কোনটি হীরে তা আমি চিনি।' 'হাঁ, যাচ্ছি ও যাবোই' এখানে থাকতে আমি আসি নি, ততোধিক ক্রুদ্ধস্বরে নটী নারী রীনা উত্তর করলে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে। থানাদার প্রণব বাবুকে আমি খবর দিয়ে এখানে এসেছি। পুলিশের হাতে না যাও, গুণ্ডাদের হাতে যাবে। ওদের দল এখনও নিঃশেষ হয়নি জেনো। তাদের আমি চিনি। তারা নিকটেই আছে। আমাকে অপমান করবার তোমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। নিচে রোলস গাড়ীতে যে রাজাবাহাদুর বসে আছেন তিনি রাজা প্রণধন বাবুর চেয়ে বহু গুণে ধনী। তাঁর সঙ্গে আজ হতে সাত দিনের মধ্যে আমার বিবাহ। তোমার কাছ হতে আমার চিঠির শেষ জবাব পেয়েই এই বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি। আজ আমি তোমাকে আমার বিয়েতে একজন অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম মাত্র। এই নাও নিমন্ত্রণ-পত্র, চললাম আমি। যদি পুলিশ ও গুণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পাও, তা হলে যেও—'

'এ জন্যে আমি প্রস্তুত আছি রীণা! তার কারণ আমি জানি যে নারী একদিন সৎ ছিল, সে খারাপ হলে তার শেষ নেই', শান্তস্বরে মিলন বাবু উত্তর দিলেন, 'যাবার আগে শুধু এইটুকু জেনে যাও, আমি একটুকুও বদলাই নি। পূর্ব্বেকার রীণার প্রতি আমি আজও অনুরক্ত, তার স্থান কোন দিনই কেউ পুরণ করবে না। শুধু তার স্মৃতি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো। তোমার মধ্যে আমার সেই রীণাকে আমি খুঁজে পেলাম না, তাই। যে মেয়েটিকে এখানে দেখলে হতে পারে সে এক বাহিরের নারী, কিংবা সে আমার মায় পেটেরই বোন। তার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ ব্যবহার কিরূপ হবে, সে সম্বন্ধে তোমাকে কোনও নিশ্চয়তা না দিয়েই এই কথা বলছি। এখোন যাও, বেরও। বাবা যেমন মা'কে কোনও দিনই ক্ষমা করেন নি, আমিও তেমনি তোমাকে কোন দিনই ক্ষমা করবো না। তুমি হচ্ছো বাবার দ্বিতীয় বারের ভুলের ফুল, কে জানতো বাবার ভুলের যতো বোঝা আমাকে ঘাড়ে করে বেড়াতে হবে? যাও, চলে যাও—'

নটী নারী ঘর ছেড়ে চলে গেলে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে আর্টিষ্ট মিলন বাবু দুয়ারের কপাট দুইটি বন্ধ করে স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন খুকুরাণী সেখানে উপস্থিত নেই। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এ-ঘর ও ঘর খোঁজাখুঁজি করে বারাণ্ডায় এসে তিনি দেখলেন, পিছনের ঘুরানো সিঁড়ি ব'য়ে খুকুরাণী তর তর করে রাস্তার দিকে নেমে চলেছে। খুকুরাণীর পিছন পিছন নামতে নামতে আর্টিষ্ট মিলন বাবু চীৎকার করে বললেন, 'কোথায় যান, কোথায় যান। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কাছে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আমার জীবনের সব কথা না শুনে আপনি কিছুতেই এথান হতে যেতে পাবেন না। ভুলে যাবেন না আপনি এথোন একজন অন্ধ মেয়ে।'

আর্টিষ্ট মিলন বাবুর কোনও কথাই থুকুরাণীর কানে পৌঁছুলো না। সে ততক্ষণে রাস্তায় নেমে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। এইরূপ অবস্থায় অন্ধ মানুষের রাস্তায় ছুটাছুটি করার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতেও বিলম্ব হয় নি। থুকুরাণীকে আর্টিষ্ট মিলন বাবু ছুটে এসে উদ্ধার করবার পূর্ব্বেই সে একটি চলন্ত লরীতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো। কিন্তু এই লরীটি ছিল পুলিশের লরী এবং উহার চালক ছিল প্রণব বাবু নিজে। নটী নারীর নিকট হতে খবর পেয়ে শাস্ত্রী বোঝাই লরীটি নিজেই চালিয়ে তিনি থুকুর সন্ধানে আসছিলেন। এইরূপ একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে তা তাঁর ধারণারও বাইরে ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি নেমে এসে দেখলেন আহত নারীটি আর কেউ নয়, সেই অপহৃতা নারী থুকুরাণী।

লরীর ধাক্কা খেয়ে থুকুরাণী তার মস্তকে দারুণ আঘাত পেয়েছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে প্রণব বাবু রাস্তার উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়া মাত্র, থুকু উপর দিকে চেয়ে প্রথমেই প্রণব বাবুকে দেখতে পেলো। এইবার সহসা তার মনে পড়লো, উপকারী বন্ধু আর্টিষ্ট মিলন বাবুর সান্ত্বনা-বাণী; "ডাক্তাররা বলেছে যে একটা দারুণ আঘাত পেলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারে।" থুকুরাণী যে দিকেই চেয়ে দেখে, সেখানেই দেখতে পায় মানুষ, মানুষ আর মানুষ। কিন্তু বারে বারে চেষ্টা করেও যাকে সে দেখতে চায় তাকে খুঁজে পায় না। সহসা একটি ভদ্রলোক তার কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে তা প্রণব বাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলো, 'এইটে দিয়ে ওর মাথাটা এখুনি বেঁধে দিন, আমি এ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করে আসি।'

'তার আর দরকার হবে না', কাপড়ের টুকরা দিয়ে থুকুর মাথাটা বেঁধে দিতে দিতে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, আমার এই লরী করেই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। এবং এর পর কম্পিত স্বরে তিনি থুকুরাণীকে উদ্দেশ করে বললেন 'তা'হলে ওরা তোমাকে অন্ধ করে দেয় নি। সম্ভব হলে তোমাকে আমি নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতাম, কিন্তু—'

'তার আর দরকার হবে না প্রণবদা', অতি কষ্টে কণ্ঠে স্বর এনে থুকুরাণী উত্তর দিলে, 'আমি হাসপাতালে যাবো না, কাউর বাড়ীতেও যাবো না। আমি আজ এই জগতে নূতন করে আলো দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমাকে ঐ সামনের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুন।' 'তার মানে?' বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'ও বাড়ীতে কে আছে? ওথানে জানো তোমাকে উদ্ধার করতে কতো কষ্ট করেছি আমরা?'

'উদ্ধার করা আর আশ্রয় দেওয়া এক কথা নয়, প্রণবদা' থুকুরাণী উঠে বসে ম্লান হাসি হেসে প্রত্যুত্তর করলে, 'তোমার কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। তোমরা শুধু আমার উপকার করো নি শহরের সকলেরই উপকার করেছো। কিন্তু যা অনুচিত তার বাইরে তুমি তো যেতে পারো না। আমি সকলের আদর্শ ও ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রেখে এমন এক স্থান বেছে নিতে চাই, যেখানে থাকলে কাউর অসুবিধা বা ক্ষতি হবে না, আমি এথোন স্থির করেছি ঐ বাড়ীটার দ্বিতলের ষ্টুডিওতে বসে শুধু আঁকবো ও শিখবো। বাহিরের জগতের সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ আমি রাখবো না। পূর্ব্বকালের পর্দ্দানসীন মেয়েদের জীবনই এথোন আমার কাম্য। বাইরের আলো আমার আর যেন সহ্য হচ্ছে না, শান্তিতে থাকতে হলে তা থেকে দূরে থাকতেই হবে।'

'কি বলছো তুমি থুকু, আমি তো কিছু বুঝছি না। তোমার এথোন আশু চিকিৎসার দরকার, তা সত্বেও তোমার ইচ্ছামত আমি তোমাকে ঐ বাড়ীটাতেই পৌঁছে দিচ্ছি', প্রণব বাবু উত্তরে বললেন, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে না? আরও একটা কথা বাড়ীটা তোমার কোন আত্মীয়ের, তাও তো আমার জানা দরকার, কারণ দস্যুদের মামলা এখনও আমার হাতে। তোমাকেও যে তাতে সাক্ষী দিতে হবে'। 'তা আপনি আপনার কর্ত্তব্য করবেন বৈ কি? আমার কিন্তু আর কাউর উপর ক্ষোভ নেই', থুকুরাণী প্রত্যুত্তরে বললো, 'দুঃখ যদি না করেন তা'হলে একটা কথা বলে রাখি। আমার সঙ্গে প্রণব দা, আপনার যদি দেখা করতেই হয় তাহলে আজ হতে দশ বছর পরে তা করবেন। একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আপনিই এই প্রস্তাব করেছিলেন, মনে আছে তো? আমি এথোন অতি ক্লান্ত, আপনারা ঐথানে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যান।'

পুলিশের লরীতেই আয়োডিন, তুলা ও ব্যাণ্ডেজ সহ ফা'ষ্ট এইড বাক্সো ছিল। প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি থুকুরাণীর মস্তকে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মুখ তুলতেই দেখতে পেলেন আর্টিষ্ট মিলন বাবু থুকুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। থুকুর সংটুকু দৃষ্টি মাত্র ঐ আর্টিষ্টের দিকেই নিবদ্ধ। প্রণব বাবুর মনে পড়লো, কোথায় যেন ভদ্রলোককে দেখেছেন। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই আর্টিষ্ট মিলন বাবু বললেন, 'চিনতে পাচ্ছেন প্রণব বাবু আমাকে? একবার বাবা বেঁচে থাকতে আপনার কাছে গিছলাম; আমার নিখোঁজ মা-বোনকে খুঁজে বার করবার শেষ চেষ্টা করতে। তা' আপনারা তো তাদের কোন সন্ধানই দিতে পারলেন না। ইতিমধ্যে বাবাও মারা গেলেন, তাই তার পর আর যাইনি।'

'ওঃ, মনে পড়েছে বটে,' প্রণব বাবু উত্তর দিলেন, 'আপনার বোনের ছোট বেলাকার একটা ফটো নিয়ে গিয়েছিলেন? আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে আখুন, এথোন বলুন তো, একে পেলেন কোথায়? সামনের ঐ বাড়ীটা তা'হলে আপনাদের, এ তা'হলে এ' ক'দিন আপনার ওখানে ছিল?'

'আজ্ঞে হাঁ, তাই,' তবে ফ্যাসাদে ফেলবেন না, 'আর্টিষ্ট মিলন বাবু উত্তর করলেন, কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে ওঁকে ওখানে রাখিনি। থানায় গিয়ে পরে সব কথা বলবো, মামলা সংক্রান্ত সকল বিষয় কাগজেও পড়েছি। আমিও বরং আপনাদের একজন সাক্ষী হবো আখুন। কিন্তু এথোন এঁকে আমার ওখানেই নিয়ে যাই, আঘাত গুরুতর না হলেও ওঁর আশু শুশ্রূষা প্রয়োজন। দরকার হলে একজন ডাক্তার ওঁর জন্যে ডেকে আনবো।'

থুকুকে হাত ধরে তুলে আর্টিষ্ট তাকে দ্রুত তার নিজ বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে, প্রণব বাবু 'বিকেলে আসবো' বলে থানায় ফিরে গেলেন। থুকুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার ইচ্ছা

প্রণব-বাবুর ছিল না। এ ছাড়া থানায় ফিরে সংবাদটি তখুনি নরেন বাবুকে জানাবার প্রয়োজন ছিল।

আর্টিষ্টের ষ্টুডিও-ঘরে ফিরে আসা মাত্র চক্ষুষ্মান্ খুকুরাণীর লক্ষ্য পড়লো, দেওয়ালে টাঙানো একটি নারীর বৃহৎ তৈল-চিত্রের প্রতি। ঠক্‌-ঠক্ করে কেঁপে উঠে খুকুরাণী রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে ঐ ফটোটা কার? এ্যাঁ! ও কি দেখছি?' আর্টিষ্ট স্থির নেত্রে ফটোটির প্রতি চোখ মেলে ভাবলো, কি-ই বা সে উত্তর দেবে। তার পর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে তিনি উত্তর করলেন, 'ওটা আমারই হতভাগিনী মায়ের ছবি। আমার স্বর্গগত পিতার অফুরন্ত ভালবাসাও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। বিশ বছর আগে আমার তিন বছর বয়সের বোনটিকে নিয়ে কোথায় যে তিনি চলে গেলেন! মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত বাবা বহু অর্থ ব্যয় করেছেন তাদের খুঁজে বার করতে। শেষ নিশ্বাস ফেলবার সময়ও তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমাকে নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন, ওরে অন্ততঃ মেয়েটাকে খুঁজে বার করে ফিরিয়ে আনিস, সে যে আমারই রক্ত দিয়ে গড়া—'

খুকু আর স্থির থাকতে পারলো না। এইরূপ একটা ফটো তারও পরিত্যক্ত বাটীতে আজও পর্য্যন্ত টাঙানো আছে। এই ফটোর নিচে মেঝের ওপর শুয়ে 'ওগো তুমি ক্ষমা করো, ওগো তুমি ক্ষমা করো। ওরে খোকা তোকে যে শেষবারকার মতও একবার দেখতে পেলাম না' ইত্যাদি বলতে বলতে এই মাত্র কয় বছর পূর্ব্বে মা' তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সেই কাল রাত্রে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁর আত্মোপান্ত বংশপরিচয়ও খুকুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।' কিন্তু খুকু তার সেই একটি মাত্র ভাই-এর সংবাদ নিতে এতো দিন সাহসী হয়নি। তার দাদা যে এতো ভালো এতো মহৎ হতে পারে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। খুকু এইবার দিক্‌-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আর্টিষ্ট মিলন বাবুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, দাদা দাদা, তুমি, কিন্তু আমি যে—

আর্টিষ্ট মিলন বাবুর এই সম্পর্কে যে সন্দেহ জাগেনি তা নয়। কিন্তু তিনি এই অমূলক সন্দেহকে মরীচিকারই সামিল মনে করেছেন। আশঙ্কা ও আশা একত্রে এই ক'দিন তার মন তোলপাড় করেছে, বারে বারে তার মনে হয়েছে, 'কে এই মেয়েটা, কেন তাকে আনলুম, এমন মায়াই বা এর উপর আসে কেন'। দুই-একবার তাঁর এ-ও মনে হয়েছে যে 'এ সে হলেও ক্ষতি নেই এবং এ সে না হলেও ক্ষতি নেই।' কথাটা চিন্তা করা মাত্র তিনি ক্ষোভে ঘৃণায় শিউরে উঠলেন এবং তার পর অতর্কিতে তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো, কে? খুকু? এর পর তিনি দুই হাতে ছোট বোনটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ভর্ৎসনার করে বলে উঠলেন, 'এই খুকু, খবরদার কাঁদবি না। ঐ দেখ, ঐখানে মার আর ঐখানে বাবার ফটো, ওরে এইটেই হচ্ছে আমাদের সেই পৈতৃক বাড়ী। ঐ দেখ সেই বড়ো বারাণ্ডাটা, যেখানে তোতে-আমাতে ছোটবেলায় খেলা করতাম।'

মেছুয়া থানায় সরগরম ভাব আজ আর নেই। গাছ হতে শুকনো পাতা দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়েছে। শত্রুমিত্র সকলেরই মনে যেন একটা অস্বস্তির চিহ্ন। এই থানার বড়বাবু নরেন বাবু আট মাসের লম্বা ছুটীতে বিলেত যাচ্ছেন। দস্যুদলের যে বিরাট গ্যাঙ্গকেস বিহারী বাবুকে রাজসাক্ষী করে গড়ে তোলা হয়েছে, তার একশ' আট জন আসামীর শেষ পরিণতি দেখবার জন্তেও তিনি আর কোলকাতায় থাকতে রাজী নন। মামলা গড়ে দেবার যা-কিছু কাজ তা তিনি শেষ করে দিয়েছেন। বাকি যা থাকবে তা আদালতে সুষ্ঠুভাবে মামলা পেশ করার কাজ। এই জন্ত উর্দ্ধতন অফসাররা তাকে আর আটকে রাখতে চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি সত্যই আজ পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ও অসুস্থ। এই দিন বেলা পাঁচটায় নূতন এক ইনেস্‌পেকটারকে থানার ভার বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর বিদায় নেবার কথা, কারণ প্রণব বাবুরও ছুটীর হুকুম ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। নরেন বাবু এতো নিবিষ্ট মনে তখনও পর্য্যন্ত মামলার বাকী কাজটুকু শেষ করেছিলেন যেন কোনও দিন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠবেন না। সহসা প্রণব বাবুকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে নরেন বাবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রণব, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো? তোমার ছুটী তো মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিয়ে কোথায় ঠিক হলো? তা এক রকম ভালো, ঘরে বৌ থাকলে বাইরের বাজে উৎপাত থাকে না।

'কিন্তু স্যার, সুখী হতে পারবো কি', প্রণব বাবু ম্লান হেসে প্রত্যুত্তর করলেন, 'জানি না কেন কিছুই ভাল লাগে না। এতো দিন জীবন পণ করে কাজ করছিলাম। আজ মনে হচ্ছে সেই যেন ভালো ছিল। আজ যেন সবই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এ ছাড়া আপনিও চলে যাচ্ছেন।'

'তুমি পণ্ডিত হয়ে এই কথা বলছো,' নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'পৃথিবীতে ধরে কাউকেই রাখা যায় না। যে যাবে তাকে যেতে দিতেই হবে। গাছ হতে পাতা যখন ঝরে পড়ে, তখন সেই গাছ প্রাণপণে চেষ্টা করে, সেই আধ-ঝরা পাতটা ধরে রাখবার জন্তে, কিন্তু ধরে রাখতে পারে কি, পারে না, তাকে তার বিদেয় দিতেই হয়। বিদেয় দিতে হয় অনুরূপ অপর আর একটি পাতার স্থান সঙ্কুলনের জন্ত। আমাকেও তাই আজ তোমাদেরও বিদেয় দিতে হবে। আমি এইখান হতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন বাবু এসে এইখানে বসবেন, পৃথিবী আজ যেমন চলছে কালও তা তেমনি চলবে। তুমি বিয়ে করে সুখী হবে কিনা জিজ্ঞেস করছিলে না? কিন্তু এর আমি কি উত্তর দেবো? বিয়ে করেও কেউ সুখী হয় নি, না করেও কেউ সুখী হয় নি। বিয়ে করে সমাজের যূপকাষ্ঠে সভ্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করে। তবে এতে স্বস্তি কিছুটা বোধ হয় পাওয়া গিয়ে থাকে।'

প্রণব বাবু ভাবছিলেন, নরেন বাবুর এই কথার তিনি কি উত্তর দিবেন। এমন সময় থার্ড অফসার কনক বাবু কতকগুলো কাগজপত্র নরেন বাবুর টেবিলের উপর রেখে উপদেশ চাইলো, 'তদন্ত শেষ করে ফেলেছি, স্যার, এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই না। বিবাহের বাসরে রাজা সাহেবের বন্ধুনীরা অনুরোধ জানায় যে তারা রাণী সাহেবার শেষ নাচ দেখবে। মদের ঝোঁকে রাজাসাহেব এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন, তা ছাড়া নটী রীণা দেবী ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর পর রীণা দেবী একটি লিমনকসের গেলাস হাতে নাচতে নাচতে তাতে চুমুক দেবা মাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বেশ বুঝা যায় রাণী-সাহেবা আত্মহত্যার জন্তে পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন।'

'ঠিক আছে, এতে গোলমাল আর কি!' কাগজগুলির উপর

যেখানেই তাঁরা মিলিত হন..

কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালকেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশতৈল **ক্যাষ্টরল**এর কথা আলোচনা করেন। নারী-সৌন্দর্য্যের যে দুর্ণিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যের মত জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।

ক্যাষ্টরল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন করে।

৫ ও ১০ আউন্স শিশিতে পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ—
কলিকাতা-২৯

হুকুমনামা লিখতে লিখতে নরেন বাবু বললেন, 'মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্ম চেরাই-ঘরে পাঠিয়ে দাও। এতে আর অসুবিধে কি আছে। ঘটনাটি ঔপন্যাসিকদের একটা খোরাক হতে পারে, কাগজওয়ালারা এই নিয়ে হৈ-চৈ করতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এ অকিঞ্চিৎকর।

ঘড়ীতে পাঁচটার ঘণ্টা বেজে উঠলো টং টং টং টং টং। নরেন বাবু মুখ তুলে দেখলেন, থানার নূতন বড়বাবু তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। চার্জ্জ দেবার ও নেবার ফর্মটি সই করে তা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নরেন বাবু প্রণব বাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললেন, 'তা হলে আমি আসি, কেমন ?' থানার প্রবেশ-পথে থানার প্রত্যেক অফসার এবং মামলার সাক্ষী-সাবুত তখনও পর্য্যন্ত ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। নরেন বাবু কাউর দিকে আর চেয়ে না দেখে বাইরের অপেক্ষমান ট্যাক্সীতে উঠে বসলেন। তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রটিকে নিয়ে আজই তার জাহাজে উঠবার কথা। মালপত্র যা-কিছু ইতিপূর্ব্বেই লরীযোগে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই হাতে চোখের জল মুছে প্রণব বাবু মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁরও আজ এই থানা ছেড়ে চলে যাবার কথা। ছুটির শেষে তিনি অন্য এক থানার ভার নিবেন। এ থানায় তিনিও আর ফিরবেন না। এঁদের এখানকার যা কিছু কায তা শেষ হয়ে গেল। এইবার তাঁদের বেছে নিতে হবে নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র। প্রণব বাবুকে সহসা জল আনতে দেখে বিরক্ত হয়ে নরেন বাবু ট্যাক্সির উপর হতে বলে উঠলেন, "ডোণ্ট বিই সেন্‌টিমেণ্টাল প্রণব, গো, ডু ইওর ওন্ ওয়ার্ক," এবং তার পর পিছনে না তাকিয়ে ট্যাক্সিচালককে হুকুম দিলেন, এই ড্রাইভার, চালাও। এর পর প্রণব বাবুও পিছন দিকে আর না তাকিয়ে থানা হতে বার হয়ে গেলেন।

কাহিনী আমি এইখানে শেষ করলেও কাহিনী এইখানে শেষ হয় নি। এর পরও বিশ বৎসর গত হয়েছে, কিন্তু খুকুর সঙ্গে প্রণব বাবুর একদিনও দেখা হয় নি। প্রণব বাবু ভেবেছিল, খুকু তাকে ডাকলে তবে তিনি তার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু কোনও দিনই খুকুরাণী একটি দিনের জন্ত তাঁকে ডাকে নি বা খবর পাঠিয়ে দেখা করতে চায় নি। তাই খুকুরাণীর জীবন প্রণব বাবুর কাছে এখনও পর্য্যন্ত দুর্বোধ্য। তবে প্রণব বাবু শুনেছেন যে পরে ভাই-এর চেষ্টায় সে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়তে পেয়েছে এবং একজন উদারচেতা ধনী শিল্পপতির সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছে। খুকুরাণী এখন পুত্রবতী সাধ্বী নারী, ইতিমধ্যে সে দু'বার য়ুরোপও ঘুরে এসেছে। হয় তো খুকুরাণী এই কাহিনীটি পড়ে ভাবছে, প্রণবদা' কেন অকারণে কয়েকটি অবান্তর ঘটনা তার দুঃখময় প্রথম জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, এ কি শুধু তৎকালীন অধস্তন পৃথিবীর চিত্র আঁকবার জন্তে ? এ' ছাড়া তার সেই দিনের প্রণবদা'র অবচেতন মনে কি রাগ করে তাকে অন্ধ করে দেবার বাসনাও এসেছিল না কি ? তা'না' হলে তাঁর এই কাহিনীতে তাকে খামকা অন্ধই বা তিনি করে দিলেন কেন ? কিংবা হয়তো সে ভাবছে যে সে প্রণব বাবুর যথেষ্ট উপকার করেছে, কিন্তু প্রত্যুপকারে বিশেষ কিছু পায় নি, এছাড়া যথেষ্ট সে দুঃখও পেয়েছে,. এখোন বাহিরের যেন কেহ তাকে আর বিরক্ত না করে। এই সম্পর্কে তৎকালীন গুণ্ডা-সমাজের সম্বন্ধেও কিছু বলবো, সেই সময়ই এসেছিল তাদের ভাঙ্গোন বা পড়তি দশা। এখোন তাদের আর চিহ্ন মাত্র নেই, বর্ত্তমান পরিবেশে তাদের আর স্থান কোথায় ? তাদের পুরাতন বস্তী-বাড়ীগুলি ভেঙে উঠেছে সুদৃশ্য অট্টালিকা, এখানে-ওখানে বার হয়েছে প্রশস্ত রাজপথ, এখোন তাদের কেহ মৃত, কেহ বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ কেহ বা বিতাড়িত ও অক্ষম, তাদের কাহিনী আজ গল্প মাত্র। তবুও খুকুর জীবন হতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে প্রতিকূল অবস্থায় যে নর বা নারী অসৎ হয়ে যায়, অনুকূল অবস্থায় পড়ে সেই নর বা নারীই হতে পারে সৎ বা সতী। জানি না, এই কাহিনী লিখে ইতিহাসের কয়েকটি পাতা অকারণে মলিন করা হলো কি না ! *

* কোনও ব্যক্তি সঙ্ঘটন বা সমাজকে উদ্দেশ্য করে এই কাহিনী লেখা হয় নি। আগাগোড়া ইহা কাল্পনিক মনে করলেই সুখী হবো।

শেষ

আমার প্রেম

(Burns এর "My love is like a red, red rose" কবিতার ভাবানুবাদ)

শ্রীঅমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এ প্রেম যেন—
শীতের প্রভাতে
শিশিরের কণা-মাথা
প্রস্ফুটিত রক্তিম গোলাপ।
আমার এ প্রেম যেন—
দেবলোক সংগীতের
মূর্চ্ছনার রেশ,
সুরের আবেশ।

তোমার তনুরে ঘেরি'
আছে যত সৌন্দর্য্যের কণা—
মোর মন-মন্দিরে
তিলে-তিলে গড়া ;
তত আমি ভালবাসি প্রিয়ে,
সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতা দিয়ে।

সাগর যদি শুকায়ে যায়
পাহাড় যায় গলে',
বৈশ্বানরের দারুণ আক্রোশে
ত্রিলোক যায় জ্বলে',
তবু প্রিয়ে, এমনি করেই বাসব তোমায় ভাল
সত্যি করে এই কথা যাই ব'লে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

করিডোরে কতগুলো পায়ের শব্দ শুনে সান্ত্বনা সেন হিসেবের খাতা বন্ধ করে ফেলে দরজার দিকে তাকালো। প্রথম মহিলার দর্শন মাত্রে দু'চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় উচ্ছাসে বলে উঠল, 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, আমি তারই লাগি পথ চেয়ে রই পথে যে জন ভাসায়।'

সমবেত হাসির শব্দে পুরুষ-কণ্ঠের সংমিশ্রণ কানে আসতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে সান্ত্বনা চোখ মেলে তাকালো। চার আঙুল জিব কেটে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তার পর। পুরুষ এক জন নয়, তিন জন। ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত, প্রফেসার রে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার নন্দী।

প্রিয় বান্ধবী মঞ্জুশ্রী দত্ত কল-কণ্ঠে বলে উঠল, আর বসে থাকতে হবে না, সর্বনাশের তেরস্পর্শ একেবারে ঘরের ভেতরে হাজির, এঁরা এবারে তোমাকে পথে ভাসাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছেন, অতএব তুমি স্যুটকেশ আর হোল্ডঅস্ গুছিয়ে প্রস্তুত হও।

মঞ্জুশ্রী রেডিও-আপিসে শুধু চাকরী করে না, প্লে'ও করে। অদূর ভবিষ্যতে চিত্র পরিবেশকের সুপারিশে কোনো ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাতারাতি যশস্বিনী হবার উচ্চ আশা মনে মনে পোষণ করছে। (নন্দীর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা শুধু এই জন্যে, নইলে আসল চোখ দু'টো তো তার দত্তগুপ্তকেই আঁকড়ে আছে)। সান্ত্বনার লজ্জাভিনয়টুকু নিখুঁত বলেই পীড়াদায়ক। জেনে-শুনেই অমনটা করল জানা কথা। কিন্তু ওতে প্রায় পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরবে সে-ও জানা কথাই।

স্মিত হাস্যে সান্ত্বনা আপ্যায়ন করল সকলকে, বসুন, বসুন—। ছদ্ম কোপে মঞ্জুশ্রীকে চোখ রাঙালো, তুমি ভারী যাচ্ছেতাই তো! এমন সব গণ্যমান্য অতিথি নিয়ে আসছ, বাইরে থেকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে আসতে হয়, আমি কি করে জানব—

চোখ টাটালেও মঞ্জুশ্রী বান্ধবীর গুণানুরাগিণী। সাদা কথায় অনুগ্রহ প্রত্যাশিনী। জবাব দিল, ওয়ার্নিং দিয়ে এমন লজ্জারক্ত দৃশ্য থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের বঞ্চিত করলে আমার নরকেও ঠাঁই হত না। ঠিক না মিঃ দত্তগুপ্ত? (হাস্যধ্বনি)।

দত্তগুপ্ত মাথা ঝাঁকালো. ঠিক—ইউ আয়ার কট্ ইন্ ইওর বেষ্ট্। কিন্তু এ সময়ে আপনাকে চড়াও করে বিরক্ত করলাম না তো? করছিলেন কি, হিসেব দেখছিলেন নিশ্চয়?

ছোট টেবিলে মার্কামারা মোটা লাল খাতাটার ওপর চোখ গেল সকলের। নন্দী বলল, 'রেষ্ট হাউস' আপনাকে আর এক মুহূর্ত 'রেষ্ট' দিলে না। এবার বিদ্রোহ। আমাদের আরজিটা আপনিই পেশ করুন মঞ্জুশ্রী দেবী।

আরজির সাফল্যের প্রতি মঞ্জুশ্রীর বেশ আগ্রহ আছে দেখা গেল। বলল পথে ভাসবার জন্য সান্ত্বনা পথ চেয়েই আছে এ আপনারা না ভুললেই হল। এর পরে আর কোনো অজুহাতে ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

প্রফেসার রে বাক্ নিঃসরণের সুযোগ পাচ্ছিল না। কলেজের মাষ্টার, দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সান্ত্বনার কাছ ঘেঁষা তার কর্ম নয়। অত বড় আশাও রাখে না। চাকুরে মেয়ে মঞ্জুশ্রীকে পেলেই সে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেতে পারে। এবারে উসখুস করে উঠল, রাইট। সেটা ভুললে কাব্যে উপেক্ষিতার মত হবে।

সঙ্গিদ্বয়ের ঠাণ্ডা চোখে চোখ পড়তে সে আবার চুপসে গেল। সান্ত্বনা এদের বক্তব্যটা সঠিক বুঝে উঠল না। বলল, কি ব্যাপার, ঘাবড়ে যাচ্ছি যে! আচ্ছা, পরে শুনব, আগে একটু চা হোক।

দত্তগুপ্ত লাফিয়ে উঠল, শুধু চা হবে মানে? চায়ের সঙ্গে অনেক কিছু হবে। কিন্তু এখানে কিচ্ছু হবে না। নিজেদের অমন জায়গা থাকতে এখানে চা খেতে যাব কেন! তা' ছাড়া, উই ওয়াণ্ট ইয়োর আনকন্ডিশনাল সারেণ্ডার। চলুন 'রেষ্ট হাউস'এ, সেখানে আমাদের আরজি নিয়ে আপনার সঙ্গে দস্তুরমত ফাইট চলবে।

সবার আগে মঞ্জুশ্রী সমর্থন-সূচক হাত তুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেরও হাত উঠল। এবং একে একে উঠেও দাঁড়াল সকলে। সান্ত্বনা মৃদু মৃদু হাসছে।—বেশ রাজি আছি, চলুন। কিন্তু এক সর্তে। আজ সবাই আপনারা অতিথি, 'রেষ্ট হাউস'এর বিল পাবেন না।

মঞ্জুশ্রী এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবে না। ধুপ করে আবার সে সোফায় বসে পড়ল।—আমি রাজি নই, তোমরা যাও তাহলে। বিজ্‌নেস্ ইজ বিজ্‌নেস্, সেটা তোমার বলে তুমি যা খুশী করতে পারো না। বিশেষ করে আমি যখন জানি কত বড়

নিয়ম-নিষ্ঠার ফলে 'রেষ্ট হাউস' আজ দাঁড়াবার মত দাঁড়িয়েছে। আজকের পার্স আমার—

চিত্র-পরিবেশক নন্দী উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, আমরাই কি দেব নাকি ওঁকে অমন অবিচার করতে, নিজেরা ব্যবসা করছি আর ব্যবসার মর্ম বুঝিনে? কিন্তু তা বলে আপনি কেন, এ নিয়ে দত্তগুপ্তর সঙ্গে আমার বরং হাতাহাতি হতে পারে।

দত্তগুপ্তও তেমনি সায় দিল, এক্‌জ্যাক্টলি সো, এবং আমার লোহা-পেটা শরীর, তুমিও মানে মানে এখান থেকেই হার স্বীকার করে নাও। চলুন, আর দেরী নয়, আসল কথাটাই এখনো বাকি।

মঞ্জুশ্রীই সহাস্য মুখে অগ্রবর্তিনী হল এবার। 'রেষ্ট হাউসে'র প্রতি এমনি অবিমিশ্র দরদে কর্ত্রীর মন কতটা ভিজল সেটা তার পক্ষে আঁচ করা শক্ত নয়। 'রেষ্ট হাউসে'র অংশীদার, অন্তথায় ওয়ার্কিং পার্টনার হতে পারাটা বর্তমানের চরম লক্ষ্য। অনেক দিন ধরেই এই আমন্ত্রণের প্রত্যাশায় আছে।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর মোটর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনার গাড়ি বার করবার দরকার নেই। নিজের ড্রাইভারকে যথাসময়ে তাকে ফিরিয়ে আনবার নির্দেশ দিয়ে সে তাঁদের একজনের গাড়িতে গিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হুজুরাণীকে সদলবলে আসতে দেখে কোট-প্যান্ট-পরা ম্যানেজার থেকে তকমা-পরা বেয়ারা-খানসামা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে পড়ল। 'রেষ্ট হাউসে'র মাইনে বেশী কিন্তু চাকরী যেতে সময় লাগে না। এতটুকু ত্রুটি ঘটলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়াই রীতি।

দোতলার বড় ক্যাবিনে সকলকে বসতে বলে সান্ত্বনা সেন এক নজরে চতুর্দিক দেখে নিল। ছুটির দিনে এরই মধ্যে ভিড় মন্দ হয়নি। এ-কোণ ও-কোণ থেকে দু'-চার জন মুখ-চেনা ধনীর দুলাল একটুখানি প্রসন্নতা বর্ষণের আশায় বার বার উৎসুক-নেত্রে তাকাতে লাগল। এবং বঞ্চিতও হল না। দূর থেকে পরিচয় সূচক কটাক্ষের উষ্ণ-পুলকে চায়ের স্বাদ বদলে গেল তাদের। নীচের ছোট ক্যাবিনগুলোর বেশীর ভাগই পরদা-টানা। ফাঁকে ফাঁকে যুগ্ম দয়িতের আভাস মেলে। মৃদু হাসি, মৃদু গুঞ্জরণ, আর মৃদু মৃদু ঠুন-ঠান। অদূরে একজন তরুণ লেখক বেপাড়ার সঙ্গী নিয়ে গল্পের প্লট সংগ্রহ করতে এসেছে। সঙ্গীর নির্বাক্ দৃষ্টি অনুধাবন করে মুচকি হেসে বলল, দেখো, কিন্তু চোখ দিও না।

—চোখ আপনি যাচ্ছে, মহিলা কে?

—ট্যান্টেলাস কাপ। গলা জলে ডুবলেও জলতেষ্টায় মারা যাবে।

কর্ত্রীর আগমনে কায়দা-দুরস্ত ম্যানেজাররা তাঁদের মোটা গদির চেয়ার ছেড়ে খদ্দেরের কাছে ঘুরে ঘুরে অমায়িক তদবির-তদারকে লেগে গেছেন। বেয়ারারা এরই মধ্যে নিজ এলাকার খালি টেবিলগুলোও একাধিক বার ঝাড়ামোছা করে ফেললে। সান্ত্বনা নিজের চেম্বারে প্রবেশ করল। কোনো কাজে নয়, এমনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ভেতরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

দত্তগুপ্ত সকলের মতামত নিয়ে মেনু পাস্ করে দিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে আহ্বান জানালো, আসুন—আমরা ভাবলুম আবার নীচে গিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।

সান্ত্বনা সেন উপবেশন করল। প্রফেসর রে' এবং মঞ্জুশ্রীর মাঝের চেয়ারটিতে। নন্দী বিরক্ত হল অধ্যাপকের ওপর, পাশের চেয়ারটিতে তার সরে যাওয়া উচিত ছিল। আর দত্তগুপ্ত ভাবল, মঞ্জুশ্রী ইচ্ছে করেই জায়গাটা ছেড়ে দিলে না। মাঝখান থেকে রে আড়ষ্ট হয়ে গেল একটু।

সান্ত্বনা বলল, নিন, এবার আপনাদের বক্তব্য শোনান।

মঞ্জুশ্রী সুরু করল, বক্তব্যটা তোমার কানে নীরস লাগবে কিন্তু।

দত্তগুপ্ত বলল, শুধু একঘেয়ে কাজের অপকারিতা সম্বন্ধে আগে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করে নিতে পারলে হত। ওহে রে', ওটা তোমার জুরিসডিকশান্, একবার দেখ না চেষ্টা করে, বাড়িতে তো হোমিওপ্যাথী দু'-চার ফোঁটা করো শুনেছি।

হাসতে চেষ্টা করে রে' আরো বেশী হাসালো সকলকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যাবিনের পরদা নড়ে উঠল। বড় বড় দুটো ট্রে হাতে দু'জন বেয়ারা পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সন্তর্পণে তারা টেবিলে খাবারের ডিস সাজিয়ে দিয়ে গেল। দত্তগুপ্ত জিভে একটা শব্দ করে সাড়ম্বরে বড় নিশ্বাস টেনে সবটা সুঘ্রাণ আস্বাদন করে ফেলল যেন।—আমাকে এখানেই একটা চাকরী দিন না সান্ত্বনা দেবী, সব ছেড়ে-ছুড়ে কাটলেট কামড়ে পড়ে থাকি।

হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

সান্ত্বনা জবাব দিল, ওই বাইরে থেকেই, একবার ভেতরে এলে আর পালাতে পথ পাবেন না। অতঃপর আহার সংযোগে নানা ভণিতার মধ্য দিয়ে এদের আসল সঙ্কল্পটার মর্মোদ্ধার করল সে। কথা আর কিছুই নয়, দিন-কতকের জন্যে সকলে মিলে প্লেজার ট্রিপে বেরুবে কোথাও। একঘেয়ে কাজের চাপে জীবন একেবারে দুর্বিবহ হয়ে উঠেছে নাকি।

দু' চোখ কপালে তুলে ফেললে সান্ত্বনা, কিন্তু আমি বেরোই কি করে!

দত্তগুপ্ত শক্ত হাতে হাল ধরলে, কেন আপনি কি একেবারে দাসখত লিখে দিয়েছেন 'রেষ্ট হাউসে'র কাছে যে দু' দণ্ড বিশ্রাম পাবেন না? আমার লোহা-লক্কড়-পেটা শরীর তাতেই হাঁপ ধরে গেল, আর আপনার তো—

কথাটা আর শেষ হল না। নন্দী মুখের মাংসখণ্ড জঠরে চালান করে আবেদনের সুতো ধরল।—মোটা মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার, কর্মচারী সব রেখেছেন, দরকার হলে ক'টা দিন তারা চালিয়ে নিতে পারবে না সেও তো ভালো কথা নয়! পারে কি না দেখার জন্যেই তো আপনার মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দেওয়া উচিত।

রে' এবং মঞ্জুশ্রীর কান খাড়া থাকলেও হাত এবং মুখের অবকাশ নেই। তবু সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে মঞ্জুশ্রী দত্ত। সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তিনী হল এবার। বলল, এ ভাবে সব ফেলে রেখে সান্ত্বনার পক্ষে যাওয়া অবশ্য শক্ত। বার ভূতের কারবার, কে কি করে বসে থাকবে ঠিক নেই। সুনাম একবার গেলে তো সব গেল••• কিন্তু এমন করে এঁরা যখন ধরেছেন তোমার যাওয়াই উচিত সান্ত্বনা। তা ছাড়া সত্যিই রেষ্টও দরকার। আমি তো আছিই,

যতটা পারি দেখাশুনা করব'খন দু'বেলা—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো দিন কতক।

সে যে যাচ্ছে না দলের সঙ্গে এটা শুধু সান্ত্বনা নয়, অন্য সকলেও এই প্রথম শুনল এবং বিস্মিত হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করে ফেলল, আপনি আছেন মানে?

মঞ্জুশ্রী অল্প হেসে ভ্রূ কোঁচকালো।—বা রে, আমার চাকরী আছে না? তা ছাড়া দু'জন গেলে চলে না শুনছেন তো।

সান্ত্বনা প্রথমে যতই আকাশ থেকে পড়ুক, সদলবলে দিন-কতক কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রলোভন একেবারে এড়াতে পারল না। 'রেষ্ট হাউস' ফেঁদে বসার পর থেকে কোথাও আর বেরুনো হয়ে ওঠেনি। মঞ্জুশ্রীর কথার জবাবে একটু ভেবে প্রায় স্বীকৃতির আভাস দিয়ে ফেলল। তোমাকে এই ঘানিতে লাগিয়ে দিয়ে আমি বুঝি ফূর্তি করতে বেরুবো, গেলে সবাই একসঙ্গেই যাব, এখানকার কাজ এরাই চালিয়ে নিতে পারবে, সে জন্যে নয়, কিন্তু, আচ্ছা—কোথায় যাবেন আপনারা?

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এমন কি রে-ও সানন্দে যোগ দিল তাতে। আর আসল উদ্দেশ্যই যখন ভেস্তে গেল, মঞ্জুশ্রী চাকরীর দায়িত্বের প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করাটাও সমীচীন বোধ করলে না। এবারে স্থান নির্বাচনের সমারোহ। নন্দী প্রস্তাব করলে, অজন্তা, এলোরা পর্যন্ত টার্গেট করে নিয়ে চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

শুনে রে'র মুখ শুকালো সবার আগে। তার ধারণা ছিল, প্লেজার ট্রিপ বলতে হাজারিবাগ, রাঁচী, নয় তো ভুবনেশ্বর, পুরী। এবং এও ভেবে রেখেছে, কপাল ঠুকে জমানো টাকা নিঃশেষ করে মঞ্জুশ্রীর খরচার ভারও সবটা বহন করে দেখবে কপাল ফেরে কি না। কিন্তু এ যে তার নিজেরই যাওয়া দায় হয়ে উঠল! ও দিকে মঞ্জুশ্রীরও একই অবস্থা।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত অজন্তা এলোরা এক কথায় নাকচ করে দিলে। ওসব কাব্য আমার ভাল লাগবে না। তার থেকে চলো গোয়ালিয়র, ঝাঁসি—একেবারে ইতিহাসের খট্‌খটে মরুভূমি। একটু কষ্ট করলে জয়পুরও সেরে আসা যায়।

ফুটন্ত তেলের কড়া আর জ্বলন্ত আগুন—দুই-ই সমান। রে' এবং মঞ্জুশ্রী নিস্পৃহ মুখে পুডিং নাড়াচাড়া করতে লাগল। সান্ত্বনা মনে মনে প্ল্যান ছকে ফেলেছে।···বেরুবেই যখন, সেই লোকটার কালো মুখ আরো কালি করে দিয়ে আসা যাক না কেন? মনে হতেই একটা নারীসুলভ কৌতূহলও সুপরিস্ফুট হল মুখে। বলল, এরকম বেড়ানোর নাম বুঝি বিশ্রাম! ওতে আমি নেই, তার থেকে বরং লক্ষ্ণৌ চলুন, বেশ ভালো যায়গা।

বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হল। আলোচনায় দেখা গেল, লক্ষ্ণৌ সত্যিই ভালো জায়গা, বেশ নিরিবিলি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভালো হোটেল আছে, ইত্যাদি। প্রফেসর রে' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, নিজের খরচাটা চালিয়ে সঙ্গী তো হতে পারবেই। মঞ্জুশ্রীরও খুব নাগালের বাইরে মনে হল না। শুধু যাতায়াত এবং হোটেলখরচা। দেখা-শুনা বেড়ানো চা রেস্তরাঁর আনুসঙ্গিক ব্যয়-ভার সঙ্গীরাই কাড়াকাড়ি করে ভাগ-বাটারা করে নেবে জানা কথা।

যে কালো মুখ কালি করে দেবার আগ্রহে সান্ত্বনা সেন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাওয়া স্থির করে ফেললে সে দিকে এগুতে হলে পাঠক-জনকে কাহিনীর গোড়ার দিকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে হবে। সেই কালো মুখ, অর্থাৎ, শিবদাস সেন ওর দিদির দূর সম্পর্কের দেওর হত। কিন্তু দাদার শালীর সঙ্গে দিদির দেওরের যে সহজাত রোমান্সের সম্ভাবনা ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পারে, তার ধার-পাশ দিয়েও এরা যায়নি। একই বাড়ীতে অনেক দিন কাটিয়েছে, তবু না। তার 'দু'টো' কারণ। প্রথমত, অমন চাষাড়ে গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষের সঙ্গে রোমান্স হয় না। দূর-সম্পর্কের দাদার আশ্রয়ে থেকে লোকটা যুদ্ধের আপিসে সামান্য কেরাণীগিরি করে দেশে নিজের বিধবা মা-বোনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করত কোন রকমে। দ্বিতীয়, সান্ত্বনা সেনের টাকার ওজন না থাকুক নিজের রূপের ওজনটুকু সম্বন্ধে সে ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সচেতন। সেটা ওর দোষ নয়, আর পাঁচ জনে এমন করেছে। যখন ফ্রক পরত, পাড়া-প্রতিবেশী বলত, ফুটফুটে মেয়ে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরে হেঁটে ইস্কুলে যাবার সময়ে রোজ ক'টা ছেলেকে টেনে আনছে মেয়ে-ইস্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত, সকৌতুকে সেটা খেয়াল করত। কলেজে ছাত্র এবং তরুণ প্রফেসারদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েও কোন রকমে ঘষে-মেজে আই-এ টা পাশ করে ফেললে। কিন্তু স্তাবক-পরিকীর্ণ হয়ে আর এগুনো গেল না। পর পর দু' বার বি-এ ফেল করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিলে।

মোটামুটি ঘরে-বরে বিয়ে করতে রাজি হলে তার আত্মীয়-পরিজন অনায়াসে সে ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সান্ত্বনা আমল দিলে না। কারণ, সে রকম যোগাযোগ থাকলে ওই রূপের জোয়ারে দু'-চার জন আই, এ, এস; আই, পি, এস অন্তত হাবুডুবু খেত, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে। যখন হল না, কাজ নেই বিয়েতে। চাকরীর চেষ্টা করবে বলে দিদিকে চিঠি লিখে ছোট সহর কানা করে সে চলে এলো আজব সহর কলকাতায়। দিদি বললেন, ভালো করেছিস, এখনি হাঁড়ি ঠেলতে যাবি কেন, তার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানও অত সহজ নয়। দরখাস্তর মধ্যে তো আর রূপের কথা লেখা যায় না। বি-এ ফেল মেয়ের দরখাস্ত বেশীর ভাগই ওয়েষ্ট পেপার বাস্‌কেট-এ সমাধি লাভ করছিল। শিবদাস সেন প্রস্তাব করল, কেরাণীগিরি করতে রাজি থাকে তো তাদের আপিসে চেষ্টা করে দেখতে পারে। যুদ্ধের আপিসে কেরাণীর মাইনেও খারাপ নয়।

অভিমানাহত দৃষ্টিবাণে সান্ত্বনা বিদ্ধ করতে চাইলে তাকে।—বেশ! এত দিন পরে বুঝি এই কথা! কোন সম্রাজ্ঞীগিরিটা জুটছে যে কেরাণীগিরি করব না?

শিবদাস জবাব দিলে, আমাদের আপিসে সম্রাজ্ঞীগিরিও করছেন কেউ কেউ, জায়গাটা খুব ভালো না বলেই এত দিন বলিনি।

সান্ত্বনার আগ্রহ চতুর্গুণ হল। ছদ্ম কোপে বলল, ঠাট্টা রাখুন, আমার বলে প্রাণান্ত অবস্থা—আপনি আজই চেষ্টা করুন।

ইণ্টারভিউর দু'দিনের মধ্যে সান্ত্বনার চাকরী হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরল। পাঁচমিশালি নবীন অফিসারদের সমাবেশ সেখানে। বছর না যেতে তাদের মোটরে যাতায়াত,

বিলিতি রেস্তরাঁয় অবকাশ বিনোদন এবং সিনেমা দেখাটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দিদির আশ্রয় ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ আলাদা ঘর নিয়েছে।

শিবদাসের গাত্রদাহ সকল সময় চাপা থাকে না। বলে, বেশ আছেন!

সান্ত্বনা হাসে। জবাব দেয়, বেশ তো আছি—।

কিন্তু সত্যিই সান্ত্বনা বেশ নেই। অন্তের গাড়িতে চড়ে সুখ কতটুকু? তাতে করে চাকরীতে বড় জোর বছরে এক-আধটা 'লিফ্ট' পেতে পারে। পেয়েছেও। কিন্তু তার বাসনার সাম্রাজ্যে ওটুকু উন্নতির কানাকড়িও দাম নেই।

যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। সান্ত্বনার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে একদিন হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোকপাত হয়ে গেল! ওপর-ওয়ালাদের সঙ্গে বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে আগে শুধু সকৌতুকে লক্ষ্য করত, সেখানকার আবহাওয়া খানিকক্ষণের জন্তে বদলে যায়; প্রবেশ-পথে চার দিক থেকে সোজা বাঁকা-চোরা কটাক্ষ ছাড়াও মনে হত ক্যাবিন থেকে তার নিষ্ক্রমণের প্রতীক্ষায়ও অনেকে বসে থাকে শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখবে বলেই। এই থেকেই হঠাৎ এক দিন ভিতরে ভিতরে একটা সঙ্কল্পের সূত্রপাত দেখা দিল।

তার পর দু'-চার দিন সে একা এল রেস্তরাঁয়। পরদা-ঘেরা ক্যাবিনে প্রবেশ না করে সোজা গিয়ে বসল বাইরের খোলা টেবিলে। দু'-এক পেয়ালা চায়ের অবকাশে অন্তমনস্কের মত সময় কাটালো অনেকক্ষণ করে। আসল চোখ দু'টো তার ঠিকই সজাগ আছে। খদ্দের আসছে স্বাভাবিক হারেই, বেরুচ্ছে কম।···ওই কোণের টেবিলের চার জন চা দিয়ে সুরু করেছিল, এখন খাবারের অর্ডার দিচ্ছে। সামনের দু'-তিনটে লোকের এক পেয়ালা চায়ে তৃষ্ণা মিটল না, আবার চা ফরমায়েস করল। দু'টো টেবিল পরের ওই অভিজাত তরুণ দলটি পরদা ঠেলে ক্যাবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন জানি ক্যাবিন পছন্দ হল না তাদের, বাইরেই বসেছে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, কিন্তু কি খাবে, সে জটলাই শেষ হচ্ছে না তাদের!

সান্ত্বনার ভাবনা ঘনীভূত হতে থাকল। এই প্রথম একজন যোগ্য সঙ্গীর অভাব অনুভব করল সে। শেষে আপিস-ফেরতা শিবদাসকেই একদিন সঙ্গে করে রেস্তরাঁয় ঢুকল। লোকটা সরল হলেও নির্বোধ নয়, তার ওপর কাঠগোঁয়ার। কাজে লাগাতে পারলে ভালই কাজে লাগে। দিদির বাড়ীতে ওকে অনেক বেগার খাটতে দেখেছে!

ভিড় ছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সান্ত্বনা এক সময় বলল, রেস্তরাঁগুলোয় কেমন বিক্রি দেখছেন···!

শিবদাস ঘাড় নাড়লে, বললে, কলকাতার ব্যাপার—।

—কি ছাইয়ের চাকরী করেন, এ-রকম একটা খুলে বসুন না?

শিবদাস ভাবল কথার কথা। বলল, এটাই বাকি আছে।

—কেন, পছন্দ হল না বুঝি?···অমন নিশ্চিন্ত কেরাণীগিরি করছেন, পছন্দ হবেই বা কি করে!

শিবদাস বিরক্ত হল। বলল, তত্ত্বকথা রেখে চা'টা খেয়ে ফেলুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এ-রকম একটা খুলে বসতে যে পুঁজি লাগে সেটা থাকলে কেরাণীগিরি করতাম না।

সান্ত্বনা কিছুক্ষণ চুপ-চাপ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। পরে এক নিঃশ্বাসে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে জবাব দিল, আপনার চোখ থাকলে তো পুঁজি চোখে পড়বে—।

বলা বাহুল্য, এবারে শিবদাস বিস্মিত হল। কিন্তু সান্ত্বনা ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

এর পরে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বড় কর্তাদের মোটরগাড়ি অথবা সিনেমা-রেস্তরাঁর আমন্ত্রণ যেন রাতারাতি জয় করে ফেললে সান্ত্বনা। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে শিবদাসকে টেনে তুলে তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো দিন দিদির বাড়ী যায়, কোনো দিন নিজের বোর্ডিংএ নিয়ে আসে তাকে, কোনো দিন বা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যতিক্রম দেখে সকলেই বিস্মিত, শিবদাস নিজেও। অফিসাররা ভাবেন, এ আবার কোন কুগ্রহ এসে উদয় হল! সহকর্মীরা ভাবেন, অমাবস্যা-নিন্দিত মূর্তিটির বরাত বটে!

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হল না। ওপরওয়ালার বিষদৃষ্টিতে পড়ল শিবদাস। কাজে ত্রুটি ঘটলেই খিটির-মিটির বাধতে লাগল। আর ইদানীং ত্রুটি ঘটছেও কাজে। তার ওপর শিবদাসও রগচটা, ফস্ করে দু'-এক কথা বলে বসত। ছুটির পরেও কাজ চাপানো হতে লাগল তার ওপর। কিন্তু সান্ত্বনা তাকে এক মিনিটও বেশী বসে থাকতে দেবে না। কাজ ধামাচাপা পড়ে থাকত পর দিনের জন্ম। গাড়িতে প্রতীক্ষারত ওপর-ওয়ালাকে দেখেও দেখে না সান্ত্বনা। শিবদাসের গা ঘেঁষে হেসে ডগমগিয়ে গল্প করতে করতে আপিস থেকে বেরিয়ে যায়।

যুদ্ধের আপিসের চাকরী। পেতেও সময় লাগত না, যেতেও না। একদিনের বাক্-বিতণ্ডা এবং সামান্ত বচসার পরে শিবদাস একটা নোটিশ পেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তার চাকরী গেছে। প্রথমেই সমস্ত রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল। তার পরে দেশে বিধবা মা-বোনের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল। সারা দিন বাড়ী বসে কাটিয়ে ছুটির সময় আস্তে আস্তে আপিসে এল। কিন্তু সসঙ্গিনী বড়কর্তার ঝকঝকে চাকাগুলো যেন তার হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

এর পরের ছুটির দিনে সান্ত্বনা নিজেই এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। নিরিবিলিতেই পেল তাকে। অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

শিবদাস জবাব দিলে না।

সান্ত্বনা আবার বলল, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, কিছু একটা করা দরকার।

শিবদাস জবাব দিল, ওপরে আপনার দিদি আছেন, সেখানে যান—নইলে কিছু একটা করে বসতেও পারি।

হুঁ, হুঁ—? সান্ত্বনা হেসে উঠল।

শিবদাসের গা জ্বলে যায়। বলল, ও-রকম হাসি আপনার সাহেবের জন্তে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে।···কিছু করবার আগে ওই লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাব, সে খবরটাও তাকে দিয়ে দিতে পারেন।

—দেব। সান্ত্বনার দু'চোখ স্থির সংবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ পরে বলল, তুমি একটি অপদার্থ, চাকরী খেয়েছে বেশ করেছে। পুরুষ মানুষ হয়ে কেরাণীগিরির শোকে অমন মাথা খারাপ করতে লজ্জা করে না?

শিবদাস হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

সান্ত্বনার কণ্ঠে স্থির আদেশের সুর ফুটে উঠল আবার।—যত দিন না তেমন রোজগার হচ্ছে, তোমার দেশের খরচা আমি চালাব। ব্যবসা করতে হবে। হাজার খানেক টাকা আমার জমেছে, আরো কিছু যোগাড়ের চেষ্টায় আছি। ছোট করে সুরু করাই ভালো—

শিবদাস হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—কি ব্যবসা, রেস্তরাঁ?

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে, তাই—। তুমি ঠিকঠাক মত একখানা ঘর দেখে নাও।

—তুমিও চাকরী ছাড়বে?

—বুদ্ধির বলিহারী! এক্ষুনি দু'জনেই চাকরী ছাড়লে চলবে কি করে? ব্যবসা দাঁড়াক, তোমার ওই চক্ষুশূল সাহেবের গালে চড় কষিয়ে চাকরী ছেড়ে আসব। কিন্তু অমন হাত-পা ছেড়ে বসে থাক যদি জীবনে আর মুখ দেখব না মনে থাকে যেন—!

সান্ত্বনা সেন প্রস্থান করল। বিমূঢ় নেত্রে সেদিকে চেয়ে বসে রইল শিবদাস সেন। মানুষটা গোঁয়ার এবং সরল হলেও নির্বোধ নয়, আগেই বলা হয়েছে। কেমন যেন মনে হতে লাগল, তার চাকরী যাওয়ার ব্যাপারে প্রকারান্তরে এই দেবীটির হাত আছে।

কিন্তু তবু হাত-পা ছেড়ে আর বসে থাকল না শিবদাস। এবং মুখ দেখাবার জন্যে না হোক, মুখ দেখবার তাগিদটুকুও ভিতরে ভিতরে অনস্বীকার্য। যুগ্ম জল্পনা-কল্পনা চলল। চলল ঘর-দেখা-দেখির পর্ব। শেষে ক্ষুদ্রাকৃতি 'রেষ্ট হাউসে'র পত্তন ঘটল এক দিন। ছোট ঘর, স্বল্প আসবাব-পত্র, স্বল্প বিধি-ব্যবস্থা। শুধু আশাটাই বড়।

শিবদাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আপিস-ফেরতা সান্ত্বনা সটান চলে আসে এখানে। কোনো দিন ছুটি নিয়ে আগেই আসে, কোনো দিন বা আপিস কামাই করে। ছুটির দিনে সারা ক্ষণ থাকে। বসে বসে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সব-কিছু। কিন্তু ঠিক যেন আশাপ্রদ হচ্ছে না।

আপিস থেকে টাকা ধার করে যতটা সম্ভব সাজ-সরঞ্জাম বাড়ালো, পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে দিল 'বয়' দু'টোর এবং খদ্দেরের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হল সে নিজেই।—আপন মনে বসে চা খাচ্ছে কলেজের তরুণ, তাকে গিয়ে বলল, শুধু চা খান কেন—ওতে লিভার ঠিক থাকে না, যখনি চা খাবেন আগে একটু কিছু মুখে দিয়ে নেবেন, আমার এখানে বলে বলছি না, সব জায়গাতেই। বয়! বাবু বিস্কুট-টিস্কুট কি নেবেন দেখো। কলেজের তরুণ খাবি খেতে খেতে বিস্কুট খেল। তার পর কাউকে বলল, পুডিং তার নিজের হাতের তৈরী, ব্যবসার ভেজাল নেই তাতে, কাউকে বা সহাস্যে জানালো তার চপ-কাটলেটের স্যাম্পেল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবার বাসনা আছে।

'রেষ্ট-হাউসে'র ভোল বদলাতে লাগল এবার। প্রথম ইস্কুল-কলেজের ছেলে-ছোকরার ভিড়। গুজব শুনে অনেকের অভিভাবক-স্থানীয়রা এলেন পরিদর্শন করতে। সেই ছেলেদের আসা খানিকটা বন্ধ হল বটে কিন্তু এঁদের অনেকে আটকে গেলেন। মেয়ে পরিচালিকার কথা শুনে শুভার্থিনী মেয়েরা আসতে লাগলেন দলে দলে। ফলে ছেলের সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়লই।

ছোট ঘর বড় হল। বড় ঘর আরো বড়। বিলিতি ফ্যাশান এবং বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সান্ত্বনা চাকরী ছেড়েছে। শিবদাসের চক্ষুশূল বড় কর্তার গালে চড় মেরে নয়, সেখানকার নানা পার্টিতে খানা সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

কিন্তু রেস্তরাঁর অতিথিদের প্রতি তার এ সপ্রগল্ভ অভ্যর্থনা শিবদাস ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারছে না। ফলাফল হাতে-নাতে দেখছে, তবু না। সান্ত্বনা সেটা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে, বিরক্ত হয় কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এক নন্দীর কল্যাণেই তো কত সিনেমার পরিচালক থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর আনাগোনা। জনাকীর্ণতা সৃজনের বীজাণু তারা, এ সত্যটা আর যেই ভুলুক সান্ত্বনা ভুলবে না। দত্তগুপ্তর মত ইঞ্জিনিয়ার, রে'র মত প্রফেসারেরও আনাগোনা দরকার রেষ্ট-হাউসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। তা' ছাড়া দত্তগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কতগুলো খেলার প্রতিষ্ঠানের, রে'র সঙ্গে কাল্‌চারাল এ্যাসোসিয়েশানের।

অতিথিদের প্রতি সান্ত্বনার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল শিবদাসকে সচেতন রাখবার জন্যেও। তাকে বিশ্বাস করে, ডান হাত বলে মনে করে এখনো। আগে অনেক দিন বিকেলে আপিস থেকে এসে দেখেছে তার তখনো পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। সেই সততার ফল এখন পাচ্ছে, চাইলে আরো বেশীও দিতে পারে সান্ত্বনা, আপত্তি নেই। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। কোনো কটাক্ষ বরদাস্ত করবার পাত্র নয়, আভাস মাত্রে সেটা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। তবু শিবদাস বলেই ফেলে, ভালো গোলকধাঁধা বানিয়েছ, একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ নেই।

সান্ত্বনা গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, একটা চোখ আমার দিকে না রেখে দু'টো চোখই নিজের কাজে দাওগে যাও, নইলে গোলকধাঁধা থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়তেও পারে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে জবাবের তীব্রতা নরম করে নেয়। তা ছাড়া শিবদাস সঠিক বোঝেওনি। তার এ ঈর্ষা কোন্ প্রত্যাশায় সেটা অবশ্য সান্ত্বনা ভালই জানে, আর সে ঈর্ষা রেষ্ট-হাউসের নিরঙ্কুশ সফলতার প্রধান অন্তরায়। তাই সেটা অসহ্য আরো বেশী।

শিবদাসকে বিয়ে করবার কথাটা কোনো দিনও মনে স্থান দেয়নি সান্ত্বনা। আজও না। যেটুকু অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য আগে ওকে দিয়েছে সে শুধু তাকে সক্রিয় এবং সচল রাখবার জন্য। এখন সে প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়েছে। তা ছাড়া বিয়ে আপাতত সে কাউকেই করতে রাজি নয়। সারা দেহে ভরা প্রাচুর্যের স্বাভাবিক তাড়নাটুকু অনুভব করে না এমন নয়। কিন্তু তবু না। কারণ ঈর্ষা বস্তুটা শুধু শিবদাসেরই একচেটে নয়, সবারই এক অবস্থা হবে। বয়েস বাড়ছে? বাড়ুক···। আরো টাকা হোক, প্রচুর টাকা, অগুণতি টাকা। তার পর যাকে হোক ডেকে নিলেই হবে।

কিন্তু বিধির ব্যবস্থা অন্য রকম। অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটা ক্রমশঃ শিবদাসের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে লাগল। সান্ত্বনার মধ্যেও সেটা প্রকাশ পেল অন্য ভাবে। কর্মচারীদের প্রতি সান্ত্বনা ব্যবহার খুব দরদী নয়। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে চাকরী যায়,

শিবদাস আসে ওদের হয়ে সুপারিশ করতে। ফল হয় না, উল্টে দুজনেরই বিক্ষোভ বাড়ে। এমনি একটা সামান্য উপলক্ষ্য নিয়েই মর্মান্তিক হেস্ত-নেস্ত হয়ে গেল এক দিন।

রেষ্ট-হাউসের প্রথম আমলের 'বয়' দু'টোর এক জনের জবাব হয়ে গেছে। অবশ্য অপরাধ তার কম নয়। এক দল অতি-আধুনিক খদ্দেরকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা এবং পরিবেশন করেও এক পয়সা বখশিষ না পেয়ে বেফাঁস কি যেন বলে ফেলেছিল।

কাজে জবাব হতে কান্নাকাটি জুড়ে দিল সে। তাতে যদি বা কাজ হত, সান্ত্বনা আরো বিগড়ে গেল শিবদাস সুপারিশ করতে আসায়। বলল, কোনো কথা শুনতে চাইনে, তুমি এবার থেকে ওদের আশকারা না দিলেই খুশী হব।

শিবদাসের রাগ চড়তে ওটুকুই যথেষ্ট। বসল তার মুখোমুখি। বলল, আর তুমিও কর্মচারীদের ওপর কথায় কথায় অমন দুর্ব্যবহার না করলে আমি খুশী হব। প্রথম থেকে আছে লোকটা, এক কথায় তাকে যেতে বললেই হল?

সান্ত্বনা কণ্ঠস্বর সংযত করল কোন প্রকারে। ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার জবাব দিল, তেমন কারণ ঘটলে প্রথম থেকে আছে এমন ওর থেকে আরো অনেক বড় কর্মচারীকেও যেতে হতে পারে।

শিবদাস হতবাক্।···তার মানে আমি?

—বুঝে নাও।

যা ঘটবার ওই সামান্য ক'টি কথাতেই ঘটে গেল। সমস্ত আশা-আশ্বাস এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মত বিচূর্ণ হয়ে গেল শিবদাসের। নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পরে একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

সান্ত্বনা মনে মনে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু এ-রকম একটা দিন আসবে সে জানত? আগে এসেছে, ভালই। ও চাইলে টাকা ছাড়া রেষ্ট-হাউসের কিছু অংশও তাকে লিখে দিত। কিন্তু মালিকানার সর্তে নয়, কর্ম-পরিচিতির সানুগ্রহ পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু ওতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না এ-ও সান্ত্বনা জানতই।

দিদির বাড়ী থেকে খবর পেয়েছে লোকটা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে উত্তর প্রদেশে। সেখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে হয়ত। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্যেই খুব পরিষ্কার করে শিবদাসকে একটা চিঠি লিখেছিল।—কোন্ সম্পর্ক নিয়ে পাশাপাশি তারা এখনো সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে রেষ্ট-হাউসের সঙ্গে, সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস-বিহীন বাস্তব সম্ভাবনা-সমন্বিত পত্র। সে চিঠি শিবদাস পেয়েছে। জবাব দেয়নি। তার চোখের আগুনে প্রতিটি ছত্র যেন পুড়িয়ে ঝলসে ফেলতে চেয়েছে। নির্মম ক্রূরতায় ওই নারী-দেহের হাড়-গোড় শুদ্ধ পিষে তাল-গোল করে ফেলতে পারলে জিঘাংসু মন শান্ত হত।

এবারে বর্তমানের কাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে। দত্তগুপ্ত-নন্দী-রে' এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতে আসা সাব্যস্ত করে কৌতুক বশেই হয়ত সান্ত্বনা এত দিন বাদে আবার শিবদাসকে চিঠি লিখল।—'লক্ষ্ণৌ বেড়াতে আসছে, পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।' কিন্তু সবটাই হয়ত কৌতুক নয়। ওকে ছাড়াও 'রেষ্ট-হাউস' বিপুল গতিতে চলতে পারে এটা যদি সে বুঝে থাকে তাহলে এখনো তার ফিরে আসার পথ খোলা আছে, সে উদার আভাসও সান্ত্বনা সাক্ষাতে দেবে। মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রেখেছে, ছোট ম্যানেজার রেখেছে, তবু তার কাজের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ এখনো সে ওকেই সকলের ওপরে প্রাধান্য দিতে রাজি আছে। নিজের উদারতা দেখে সান্ত্বনা নিজেই মনে মনে বিস্মিত হল, খুশী হল, তৃপ্ত হল। সে-চিঠিও পেল শিবদাস এবং আগের মতই মনে মনে সমস্ত নখ-দন্ত দিয়ে যেন বিদীর্ণ করে ফেলতে চাইল তাকে।

লক্ষ্ণৌ সহরে দ্বিতীয় দিনে হোটেলে সান্ত্বনার সঙ্গে আবার দেখা হল শিবদাসের। তিন বছর পরে দেখা। শিবদাসই এসেছে। সান্ত্বনা জানত আসবে। উৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করল, এসো এসো, আমি তো ভেবেছিলাম কালই আসবে। এলে না যে?

কাল আসেনি, আজই বা কেন এলো শিবদাস জানে না! এখানে সান্ত্বনা রেষ্ট-হাউসের কর্ত্রী নয়। হাস্যে-লাস্যে কৌতুকময়ী প্রিয় সখীটি যেন উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ও মূর্তি শিবদাস চেনে।

সান্ত্বনার প্রথম সঙ্কল্প সফল হল। মানুষটার কালো মুখ আরো কালো হয়েছে। অপাঙ্গে ভালো করে লক্ষ্য করে নিল একটু, পরে তেমনি কলকণ্ঠেই বলল, বোসো—চেহারার তো দিব্বি উন্নতি হয়েছে দেখছি, ডন-বৈঠক করছ না কি! সঙ্গীদের দিকে তাকালো, মিঃ দত্তগুপ্ত একে চিনলেন?

শুধু দত্তগুপ্ত নয়, বাকি সকলেও চিনেছে। সামান্য একজন পুরানো ম্যানেজারের প্রতি এতটা প্রীতি বর্ষণের তাৎপর্য কেউ বুঝল না। আহূত হয়ে দত্তগুপ্তও তেমনি পরিহাস-তরল কণ্ঠে বিস্ময় জ্ঞাপন করল।—আই সি! আপনার পুরানো ম্যানেজার তো—ব্যাট্ ইউ, পি, রাইস্ সিমস্ টু স্যুট্ হিম সো নাইস্! হি লুকস্ এ পা-ফেক্ট ডেভিল নাও!

শিবদাসের চোখ দু'টো স্বল্পক্ষণ পড়ে থাকে তার মুখের ওপর। বলল, রেষ্টুরেন্ট-এ ম্যানেজারি করলেও একটু-আধটু ইংরেজী বুঝি মশাই, ইউ, পি'র চালের কাছে বাংলার চাল ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়তে পারে।

ছন্দপতন ঘটল। সান্ত্বনার মুখেও শঙ্কার ছায়া নামল। এমন সামান্য লোকের মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় দত্তগুপ্ত। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

—হোয়াট্!

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শিবদাসও। দত্তগুপ্ত নীরবে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। পরে আবার চেয়ার নিল। বসল শিবদাসও।

নন্দী মনে মনে খুশী। লোহা-কঙ্কড়-পেটা শরীরের কথাটা মনে পড়ল বোধ হয়। মঞ্জুশ্রী এবং প্রফেসার রে' তখনো হতভম্ব। জের সামলাতে হল সান্ত্বনাকেই। অন্তত চেষ্টা করল সামলাতে। প্রথমে এক দফা হাসল খুব। অজস্র হাসি। সকলের, অন্তত, পুরুষের চোখ বিভ্রান্ত করবার মত হাসি। পরে বলল, কাউকে রাগতে দেখলেই আমার হাসি পায়।—সত্যি বলছি মিঃ দত্তগুপ্ত, ও একেবারে রাগের ডিপো, কিন্তু তাহলেও লোক বেশ ভালো, বেশ নয়, খুব ভালো—ত্যাই না?

শেষের প্রশ্নটা শিবদাসের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হতে আবহাওয়া ফিরল একটু। কিন্তু শিবদাস আবার উগ্র হয়ে উঠছে মনে মনে। খানিক বাদে শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'রেষ্ট-হাউস' চলছে ভালো?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে জবাব দিল, কই আর চলছে, লোকসান খেয়ে খেয়ে তো হয়রান হয়ে গেলাম।

এবারে মঞ্জুশ্রী সশব্দে হেসে উঠল। শিবদাস আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে আছ কত দিন ?

তার তুমি সম্বোধনটা সকলের মনেই একটু-আধটু বিস্ময় উদ্রেক করল। সান্ত্বনা দু'হাত উল্টে জবাব দিল, এঁরা জানেন।

—আচ্ছা, আবার দেখা হবে। কারো দিকে না চেয়ে বা কোন রকম অভিবাদন না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আবারও দেখা হল ঠিকই। পরদিনই। দলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরলও। কিন্তু কদাচিৎ কথা বলল। সেও সান্ত্বনা গায়ে পড়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে। তাকে কলকাতা ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প প্রথম দিনের সাক্ষাতেই প্রায় বাতিল করেছে, তাই অন্তরঙ্গতা প্রকাশে খুব কার্পণ্য করল না। কিন্তু এই খাপছাড়া লোকটা সঙ্গে থাকাতে দলের আধেক আনন্দই মাটি। এমন কি অস্বস্তি লাগছিল সান্ত্বনারও। লোকটার চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে যেন কি আছে !

পরদিনও সকালের দিকেই এলো শিবদাস। সঙ্গিনী এবং সঙ্গীরা ইচ্ছা করেই কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেল। সান্ত্বনা জানালো, মধ্যাহ্নে তারা যাচ্ছে 'ভুল ভুলাইয়া' দেখতে। গোলকধাঁধা—ভুল্ ভুলাইয়া—হঠাৎ কি মনে পড়তে হেসে ফেলল। নিজের অজ্ঞাতেই জিজ্ঞাসা করল, তুমিও আসছ না কি ?

—যেতে পারি। কিন্তু তোমার ও গোলক-ধাঁধার কাছে এ আর এমন কি !

—আমারটাই বা কি এমন ? সান্ত্বনার কণ্ঠেও পরিহাসের সুর বাজল, তুমি তো দিব্বি সুট করে বেরিয়ে আসতে পারলে।

শিবদাস চেয়ে আছে। অনাদরের নির্মম আঘাতে সকল আশা সকল আনন্দ ধূলিসাৎ করে এক দিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে যে নারী, তার এই মৌখিক আদরে সে আর বিচলিত হবে কতটুকু ? দেখছে চেয়ে চেয়ে। দেখছে 'রেষ্ট-হাউস'এর সেই স্বার্থচারিণী মালিককে। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদ যেমন স্থির দৃষ্টিতে লেহন করে কাছের অথচ নাগালের বাইরের শিকারকে।

···দেখছে। দেখছে আর ভাবছে কি। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। বলল, আচ্ছা সেখানে থাকব আমি।

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নিজের 'পরেই বিরক্ত হল সান্ত্বনা। কেন আবার আপ্যায়ন করতে গেল ছাই !

যথাসময়ে বড় ইমামবড়ার ফটকে প্রবেশ করল তারা। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। ওরই দোতলা থেকে পাঁচ তলা পর্যন্ত সেই রোমাঞ্চকর 'ভুল্ ভুলাইয়া' !

ইমামবড়ার সিঁড়ির কাছে আসতে সকলেরই চোখ গেল অদূরে ঘাসের ওপর শিবদাস শুয়ে আছে। তাদের দেখে ধীরে-সুস্থে উঠে এলো। একমাত্র সান্ত্বনা ছাড়া সকলেই বোধ হয় মনে মনে কটূক্তি করল। সান্ত্বনাও কোন সম্ভাষণ জানালো না।

সিঁড়ি ধরে উঠে প্রথমে বিশাল হল-ঘর। দু'-চার জন গাইড এগিয়ে আসছিল। কিন্তু অন্য দিক থেকে একজন বৃদ্ধ গাইডকে ইশারায় ডাকল শিবদাস। বলল, এই লোকটাই সব থেকে বেশী এক্সপার্ট। গাইড আ-ভূমি কুর্ণিশ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাদের নিয়ে হল-ঘরে প্রবেশ করে গাইড মুখ ছোটালো। ইতিহাস আর গল্পের চাটনি। এ ধরণের এত বড় হল-ঘর নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নবাব আসাফউদল্লার কীর্তি। বিরাট দুর্ভিক্ষ লেগেছিল দেশে। খেতে না পেয়ে মানুষ পিঁপড়ের মত মরছে। কিন্তু মোল্লা যাকে দেয় না কিছু তাকেও দেয় আসাফউদল্লা। নবাব হাজার হাজার লোক লাগালেন এই ইমারত গড়তে। বদলে তারা খেতে পাবে। কিন্তু এত লোকে একখানি ইমারত গড়তে ক'টি দিন আর লাগতে পারে! তার পর তো আবার সেই উপবাস। বিচিত্র ফন্দি আঁটলেন নবাব আসাফউদল্লা। দিনের বেলায় তারা যতটুকু গড়ে দিয়ে যায়, রাতের বেলায় নবাব-কর্মচারী সেটা ভেঙ্গে ফেলে। এই করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে অনিবার্য অনশনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করলেন দয়ার অবতার নবাব আসাফউদল্লা। দুর্ভিক্ষ দূর হতে তাদের নির্মাণ-কাজ শেষ হল।

চোস্ত উর্দুতে ইতিহাসের গল্প শুনে মশগুল হয়ে গেল সবাই। সব-কিছুর পিছনেই গাইড গল্প ফাঁদতে লাগল। সিংহাসন, সোনা-মোড়া আয়না, মোমের তাজিয়া, হাজার-পাতি ঝাড়—। তারা শুনছে, দেখছে। হঠাৎ মঞ্জুশ্রী বলল, ও মা! বেলা গড়িয়ে আসছে, ভুল-ভুলাইয়াতে উঠব কখন? পাঁচটার পরে তো আর উঠতেও দেবে না!

দেখা গেল গাইড বাংলা বোঝে। জানালো, সেটা নিয়ম বটে, তবে নিয়মের কড়াকড়ি হুজুর আর হুজুরাণী বিশেষে নির্ভর করে। তা'ছাড়া পাঁচটার দেরীও আছে, ঠিক দেখা হবে।

—অন্ধকার হয়ে যাবে না?

গাইড সেটা আর অস্বীকার করলে না। পায়ে পায়ে অগ্রসর হল সকলে। নন্দী জিজ্ঞাসা করল, ভুল-ভুলাইয়া কী?

—ভুল-ভুলাইয়া? গাইড সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখে গল্প সুরু করল আবার।—ভুল-ভুলাইয়া হল বিচিত্র রকমের এক গোলকধাঁধা। দোতলা থেকে বিপুল প্রাসাদ সৌধের ওই পাঁচ-তলা পর্যন্ত। বেগমদের সঙ্গে কোনো সুরসিক নবাব লুকোচুরি খেলত সেখানে। পরের নবাবেরা অবিশ্বাসিনী বেগমদের এখানে এনে ছেড়ে দিত। উপবাসে অনিদ্রায় দিনের পর দিন তারা আর্ত হাহাকারে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে বেড়াতো। পাগল হয়ে শেষকালে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করত তারা। ভুল-ভুলাইয়ার একটি মাত্র প্রবেশ-পথ এবং বেরুবার পথও ওই একটিই। কিন্তু একবার ঢুকলে খুঁজে আর সে পথ বার করা যায় না।

গল্প শুনে মঞ্জুশ্রীর গা ছম-ছম করে উঠলো। বলল, আমার ভয় করছে, শেষে যদি না বেরুতে পারি। সান্ত্বনারও কপাল ঠুকে আত্মহত্যার কাহিনী শুনে কেমন লাগছিল। তবু ঠাট্টা করল, না বেরুতে পারলে এঁদের মধ্যেও কেউ থেকে যাবেন, সুখে ঘর-কন্না কোরো। বক্র কটাক্ষপাতটা অধ্যাপকের উদ্দেশে।

কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিল দত্তগুপ্ত। বলল, হুঁঃ, যত সব আজগুবি গল্প। বেরুতে দেরী হতে পারে, তা'হলে একেবারে বেরুনো যাবে না না কি!

আভূমি নত হয়ে আবার কুর্নিশ করলে গাইড। বলল, বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়, বেরুতে পারলে পাঁচ তলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গর্দান দেবে সে, কিন্তু না পারলে হুজুর যেন খুশী হয়ে একখানা এক শ' টাকার নোট নেক্-নজর করেন।

এ রকম একটা বাজি ধরা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুনে সকলেরই কৌতূহল উদ্দীপিত হল আরো।

গাইডের পিছন পিছন ভুল-ভুলাইয়ার সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠল সকলে। বলল, এই এক সিঁড়ি মিললে তবে নেবে আসা যাবে, কিন্তু দেখা যাক মেলে কি না। এঁকে-বেঁকে নানা পথ ধরে সৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল সকলকে নিয়ে। ছোট-বড় অগুণতি সিঁড়ি এবং অজস্র সরু সরু পথের অভিযান। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ছে সব ঘুলিয়ে গেল। দোতলা থেকে তিন তলায় উঠেছে কখন তাও ঠাওর পেল না। অজস্র পথের জটিল সমারোহ আর অজস্র ওঠা-নামা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গাইডের লুকোচুরি খেলা। হঠাৎ একটা দেয়ালের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ডাকলে, আইয়ে। আবছা অন্ধকারে সকলে অনুসরণ করল, ও মা! কোথায় আইয়ে! এ-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ও-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—কিন্তু তার টিকিটি নেই। এ দিকে দলের মধ্যে হাসা-হাসি ছুটাছুটি পড়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে তারা। আশে-পাশে দূরে কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরছে সরু সরু কানা গলির মধ্যে। এ-ধার থেকে, ও-ধার থেকে তাদের হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাষাণপুরীতে। চকিতে কাউকে দেখা দেয় গাইড, ডাকে আইয়ে, পরক্ষণেই কোন্ পথ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, হদিস পায় না।

অন্ধকার হয়ে আসছে আরো। ফস্-ফস্ করে দেশলাই জ্বালা হচ্ছে বার বার। দত্তগুপ্তর হাঁপ ধরে গেল। এক দিক থেকে তার হাঁক শোনা গেল, গাইড! পরক্ষণে অবিকল তার কণ্ঠস্বর নকল করে দূর থেকে গাইড জবাব দিল, আইয়ে! আবার জমে উঠল। এ দিক থেকে নন্দী ডাকে, ও দিক থেকে মঞ্জুশ্রী, আর এক দিক থেকে রে'। সকলেরই কণ্ঠস্বর নকল করে প্রত্যুত্তর দেয় গাইড। একটু বাদে বেশ দূর থেকে সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল যেন। দত্তগুপ্ত আর মঞ্জুশ্রী তখন একত্র হয়েছে। মঞ্জুশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি সাজ্যাতিক লোকটা —ঠিক সান্ত্বনার গলা নকল করছে!

কিন্তু সে কণ্ঠস্বর নকল নয়। তাদের মধ্যেই কারো পদধ্বনি অনুসরণ করে সান্ত্বনাও ছিটকে পড়েছিল কোথা থেকে কোথায়। পথ হারিয়ে ফেলে পথ খোঁজার নেশায় সে-ও মেতেছিল। সত্যিই তো আর ভয়ের কিছু নেই। কত দূরে এসেছে, এত বার ওঠা-নামা করে কোন তলায় আছে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না, মজা লাগছিল বেশ।···একটা গাঢ় অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে পড়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণে মনুষ্যস্পর্শে থর-থর করে কেঁপে উঠল সে। সহসা কার দু'টো কঠিন বাহুর নির্মম নিষ্পেষণে দেহের হাড়গোড়-শুদ্ধ, যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তার। অস্ফুট

আর্তনাদ করে উঠল একবার। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা এক হিংস্র অধরগহ্বরেই বিলীন হল।···দ্রুত···দ্রুত···দ্রুত হারিয়ে ফেলছে সান্ত্বনা নিজেকে। হাল ছেড়ে দিল। হারিয়ে গেল।···অব্যক্ত যন্ত্রণা।···অব্যক্ত বিস্মৃতি!···নিশ্চেতন!···কল্লান্ত!

গাইডের উদ্দেশে দত্তগুপ্তর উত্তেজিত বকাবকি শুনে যেন এক যুগ বাদে চেতনা ফিরল সান্ত্বনার। অনেকগুলি পদধ্বনি। উর্দুভাষী গাইডের বিনম্র আকুতি, এক্ষুনি তল্লাস মিলে যাবে হুজুর, ঘাবড়িও না। দেয়াল ধরে ধরে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। দেহের সব বাঁধুনি যেন পৃথক্ হয়ে গেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল, সম্বৃত করল। পারছে না, তবুও।

তাকে আবিষ্কার করে সকলে কলকণ্ঠে চেঁচামেচি করে উঠল। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোতেও নিঃসাড় পাণ্ডুর মূর্তিটি চোখে পড়ল সকলের। ভাবল, ভয় পেয়েছে খুব। মঞ্জুশ্রী বলল, আধ ঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, একটা সাড়া দিলে না পর্যন্ত, ফিট হয়ে গেছলে না কি! হাত ধরল।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী গাইডকে ধরে সেখানেই মারে আর কি।

শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার তাড়ায় আর একজনের কথা অন্তত এদের কারো মনে নেই।···শিবদাস। বাইরে এসে দেখা গেল আবছা অন্ধকারে সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সান্ত্বনা কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা গাড়িতে উঠল।

···হোটেল। তার পর কলকাতা।

সান্ত্বনার পরিবর্তন দেখে সঙ্গী-সাথীরা অকূল পাথারে পড়ল। বিস্মিত হল, উদ্বিগ্ন হল, বেদনাহত হল তার অস্বাভাবিক ব্যবহারে। দিন যায়, মাস যায়, একটা ছুটো—। কিন্তু মুখে সেই দুরূহ গাম্ভীর্যের বর্ম আঁটা। রেষ্ট-হাউসে আসে, নিজের চেম্বারে বসে থাকে চুপ করে, অতিথি-অভ্যর্থনায় হাসিমুখে এগিয়ে আসে না আর, কর্মচারীদের সঙ্গেও কথা বলে না বড়-একটা। মাঝে মাঝে কামাইও করে। বেগতিক দেখে দত্তগুপ্ত বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। নন্দীও। কিন্তু ওর ভ্রূকুটিতে মুখ চুণ করে ফিরে গেছে।

শেষে একদিন মঞ্জুশ্রীকে নিজে থেকেই ডেকে এনে রেষ্ট-হাউসের কিছুটা অংশ লেখাপড়া করে দিল। দেখাশুনার সকল ভার অর্পণ করল তার ওপর। এত দিনের আশা। বিগলিত হয়ে মঞ্জুশ্রী জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলবে না?

সান্ত্বনা ক্ষুদ্র জবাব দিল, কিছু না।

হয়েছে যা, তার স্থূল দিকটার জন্যে সান্ত্বনার এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। টাকা আছে। টাকা থাকলে ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞানের যুগ। ব্যবস্থা এক রকম করেই রেখেছে। ইতিমধ্যেই নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু থাক না, তাড়া কি।···অন্ত পরিবর্তনটাই বিষম। ওই সম্ভাবনাটুকু একেবারে নির্মূল করে ফেলতে মন চাইছে না, এ সত্য নিজের কাছেও যে গোপন থাকছে না আর! তা'ছাড়া, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কল্পনায় যে মানুষ-দানবকে ফাঁসিতে লটকেছে দিনে ক'বার করে আর নির্মম আনন্দ উপভোগ করেছে তার তাজা দেহের ছটফটানি দেখে, তারই সেই পশু-শক্তিটা আজও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে আছে অক্টোপাসের মত। সেই অব্যক্ত যাতনা, আর অব্যক্ত বিস্মৃতি।

সব শেষে নিজের ওপরেই আগুন হয়ে উঠল সান্ত্বনা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর দেরী নয়। আর দুর্বলতাও নয়। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করল। টাকা নিল। মোটা টাকা লাগবে। মোটা টাকাই নিল। কিন্তু মোটরে বসে সমস্ত দেহ-মন যেন শিথিল হয়ে আসছে আবার। মনে হল, একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করতে চলেছে সে। হত্যা!···হত্যা বই কি! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ড্রাইভারকে যে দিকে যেতে আদেশ দিল সেটা হাওড়া ষ্টেশনের পথ।

···কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই ফিরল আবার। ফিরল একা। ফিরল ভুল-ভুলাইয়ার দেশ থেকে। বাসস্থান বদলে ফেলল সকলের অজ্ঞাতে। 'রেষ্ট-হাউস' চলে। মঞ্জুশ্রী চালায়। নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ঘিরে। সান্ত্বনা খবর রাখে না। সারা ক্ষণ দরজা বন্ধ তার ঘরের। সান্ত্বনা পথ হারিয়েছে। ভুল-ভুলাইয়ার একটি মাত্র পথ। সে পথের খোঁজ দেবে যে, সে নিখোঁজ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

'সাদা চুলের মেয়ে (White-haired Girl)' চীনা ছবিটা দেখেছেন ? দুনিয়ায় অমন নাকি দ্বিতীয় নেই। সেবারে ফিলম-উৎসবের সময় কলকাতায় এসেছিল। চীনে যাবার যদি মনন থাকে, তার আগে অতি-নিশ্চয় দেখে যাবেন ছবিটা। অনেকবার উঠবে ছবিটার কথা ; নানা রকম জেরার তালে পড়ে যাবেন। জবাব না পেলে ছেলেমেয়েগুলো অভিমানে মুখ ভার করবে। অতএব তৈরি জবাব নিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাগ্য বশে আমার দু-দুবার দেখা। চীনভূমিতে পা দিয়ে সেন-চুনের রেলগাড়ি থেকেই ঐ ছবির কথা। দেখেছ তুমি ? নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে—লাগতেই হবে।

লাগুক যেমনই, সভ্য সমাজে হেন অবস্থায় একটি মাত্র বিধি —হাসি মুখে হাঁ-হাঁ করে ঘাড় নেড়ে যাওয়া।

অপেরার পালা—পালাটার নামে মানুষজন ভেঙে পড়ে। সিনেমার ছবিতে গেঁথে ফেলার পর থেকে বড্ড জুত হয়েছে। অপেরার তোড়জোড় হামেশাই তো হয়ে ওঠে না—এখন সিনেমার টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে হলে গিয়ে বসুন। এমন একটা জিনিষ— শতবার দেখেও নাকি আশ মেটে না।

এমনিতরো উচ্ছ্বাস শুনি, আর স্ফূর্তিতে প্রাণ ডগমগ হয়ে ওঠে। তা হলে অন্তত সিনেমার ব্যাপারটায় আমরা অনেক বেশি লায়েক, অনেকদূর এগিয়ে আছি। তোমরা অপোগণ্ড শিশু সে তুলনায়। উন্নতি হোক তোমাদের, এগিয়ে এসো। তবে যতই করো, মুরুব্বির আসরে কলকেপ্রাপ্তির দেরি আছে অনেক। অনেক দেরি।

সিয়ারের ভূমিকায় ওয়াং কুন

দু-কথায় পালাটার একটু আঁচ দেবো নাকি ? বাসন্তী পরবের দিন ভারি ঝড়জল—তার মধ্যে ইয়াং বাড়ি আসছে। জমিদারের ভয়ে বেচারি হপ্তা ভোর পালিয়েছিল। আদরের মেয়ে সিয়ার—ভেবেছিল, তার সঙ্গে আজকের দিনটা চুপি চুপি উৎসব করে যাবে। হেন কালে জমিদারের লোক এসে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল। জবরদস্তিতে পড়ে ইয়াং জমিদারের কাছে মেয়ে বেচে দিয়ে এলো বাকি খাজনার দরুন।

ফিরতি পথে ইয়াং ঠাণ্ডায় বরফঝড়ের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হবু-স্বামী তা আর হবু-শাশুড়িকে নিয়ে সিয়ার ওদিকে ভোজ খাচ্ছে। এক বন্ধু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ইয়াংকে। তা সে সময়টা উজ্জ্বল মুখে মুক্তিবাহিনীর গল্প করছে—তারা আসছে, এসে পড়ল বলে, সকল দুঃখের অবসান হবে। ইয়াং জমিদার-বাড়ির ব্যাপার এ আসরে বলতে পারল না। গভীর রাতে দেখল, আনন্দ-প্রতিমা মেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। বিষ খেয়ে ইয়াং ব্যথা-বেদনার শেষ করল।

সকালবেলা তা এসেছে প্রিয়তমার কাছে—এসে দেখে এই কাণ্ড। সিয়ার জেগে উঠল। মরা বাপের জামার মধ্যে পাওয়া গেল সর্বনেশে দলিল। অনতিপরে জমিদারের দল এসে ধরে নিয়ে গেল সিয়ারকে।

জমিদারের মায়ের দাসী সে এখন। অত বড় বাড়ির মধ্যে মুখের দিকে তাকাবার শুধু একটি মানুষ—বুড়ি চাকরানি চ্যাং। তা এদিকে জমিদারের লোককে আচ্ছা করে ঠেঙানি দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ল। জেল হল। জেল থেকে পালিয়ে সে মুক্তি-বাহিনীতে ভিড়ল। সিয়ারকে খবর পাঠিয়ে গেছে, ফিরে আসবে সে দলবল নিয়ে—সিয়ার যেন অপেক্ষা করে তার জন্য।

তারপরে সেই ভয়ানক রাত্রি—জমিদারের ধর্ষিতা হল সিয়ার। বাপের মতন আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োবে, কিন্তু বুড়ি চ্যাং কিছুতে হতে দিল না।

জমিদারের বিয়ে হবে খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। সিয়ারকে অতএব বাড়ি থেকে চালান করে দিতে হয়। গণিকালয়ে—তা ছাড়া কোথায় ? টের পেয়ে সিয়ার ক্ষেপে গেল। তালা আটকে রাখল তাকে। চাবি চুরি করে চ্যাং দোর খুলে দিল। খোঁজ, খোঁজ— সিয়ারের খোঁজে জমিদারের দলবল তোলপাড় করছে চতুর্দিক। নদীর ধারে তার জুতো—অতএব জলে ডুবে মরেছে নিশ্চয় হতভাগী।

সিয়ার কিন্তু পালিয়ে আছে জঙ্গলে-ভরা দুর্গম পাহাড়ের গুহায়। সেই পাহাড়ে লাই-লাই মন্দির—লোকে পুজো দিয়ে যায়। পুজোর নৈবেদ্য আর বনের ফল খেয়ে থাকে সিয়ার। নুন খেতে পায় না, আর রোদও বড় একটা লাগে না গায়ে—চুল তাই সাদা হয়ে গেছে। চাষীরা কেউ কেউ দেখেছে তাকে—তারা বলে প্রেতিনী। জমিদার একদিন পুজো দিতে এসে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে গেল। দুর্যোগের মধ্যে সিয়ার যথারীতি নৈবেদ্য কুড়োতে গেল। ঐ ভয়াবহ মূর্তি দেখে আৎকে ওঠে জমিদার। সিয়ারও উন্মত্ত আক্রোশে ধেয়ে যায় তার দিকে।

জাপানির তাড়ায় কুয়োমিনটাং-দল দুড়দাড় পালাচ্ছে; মুক্তি-বাহিনী এসে দখল। সিয়ারের সেই হবু-বর তা হল বাহিনীর নায়ক। তারপর গাঁয়ে এসে পড়ে তা জমিদারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চাষীদের জাগিয়ে তুলছে। জমিদার ওদিকে ভয় ধরাচ্ছে প্রেতিনীর গল্প ছড়িয়ে। তা নিজেই ছুটল রহস্যের আস্কারা করতে। কত কাল পরে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তা আর সিয়ারের মিলন হল।

গণ-আদালতে বিচার। মেয়েটা গান গেয়ে গেয়ে বলছে—তার মধুর নিষ্পাপ জীবন কেমন করে ওরা পায়ে থেঁতলে দিয়েছে। জনতার ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ফেটে পড়ে শয়তানের দিকে। সে-ও গানের ভিতর দিয়ে।

গল্পটা হল এই। বাঁধুনি আহা-মরি নয়; বিশ্বাস করতে বাধে অনেক জায়গায়। আর, বক্তব্য ওরা সাদামাঠা ভাষায় বলে না, কেবলই গান। ছবি দেখে তারিপ করতে পারিনি, খোলাখুলি বলছি।

সেই 'সাদা-চুলের মেয়ে' আজ রাত্রে অপেরায় করবে। নানান দেশের সজ্জনেরা জুটেছেন—আয়োজনটা বিশেষ করে তাঁদেরই জন্যে। আমি যাবো না, গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছি। সেই যে শেয়াল-পণ্ডিতের কুমিরের বাচ্চা দেখানো। সবে-ধন একটিতে ঠেকেছে—সন্তানের খোঁজে যে কুমির আসে, গর্ত থেকে তুলে তুলে ঐ এক বাচ্চা দেখিয়ে দিচ্ছে। তোমাদেরও হয়েছে সেই ব্যাপার। এক পালা কতবার দেখব বাপু? কাজকর্ম না থাকে তো পড়ে পড়ে ঘুমুবো ঐ সময়টা।

তা কাজও জুটে গেল—যার চেয়ে ভাল কাজ আর হয় না, আড্ডা দেবার আমন্ত্রণ। সন্ধ্যাবেলা বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুচ্ছি। এমনি তাড়া, রমেশচন্দ্র সেইখানে এসে হাঁকডাক লাগিয়েছেন। হাত চালিয়ে নিন একটু—

অ্যানিসিমভের সঙ্গে সেদিনের মোলাকাতটা উপাদেয় হয়েছিল। চেহারায় জাঁদরেল হলে কি হয়, মানুষটি বড় ভালো। তাই বলেছিলাম, কোন একদিন নিরিবিলি একটু বসতে পারা যায় না? শুনেছি, বাংলার চর্চা হয় রাশিয়ায়, অনেকে বাংলা শিখছে; বাঙালি গিয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেছেন, গণ্ডায় গণ্ডায় সেখানে লোক জুটেছে রুশভাষায় তর্জমা করবার। এখানকার মতন বন্ধুজনের দুর্ভিক্ষ নয় সেখানে। এই সমস্ত শুনতে চাই একটু জমিয়ে বসে। সেদিন সপ্তরথী ব্যূহবেষ্টনে ঘিরে প্রশ্নবাণে ঘায়েল করবার তালে ছিলাম—এবারে হবে ধরণীর দুই প্রান্তবাসী কথাকারদ্বয়ের আজেবাজে গল্পগুজব। জ্ঞানান্বেষণের মহতী আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন তত্ত্বরসিক অতএব উৎকর্ণ হবেন না। রমেশচন্দ্রকে বলেছিলাম, এমনি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

তাই হয়েছে। এক্ষুণি। একা অ্যানিসিমভে হবে না, চাই পোপোভকেও। আমার ইংরেজি বাক্য যিনি অ্যানিসিমভকে সমঝে দেবেন, অ্যানিসিমভের রুশ ইংরেজিতে হাজির করবেন আমার কাছে। এখন যোগাযোগটা ঘটেছে—দু-জনে অপেক্ষায় আছেন। একটা জামা চড়িয়ে নিন তো গায়ে। ব্যাস, ব্যস—উঠে পড়ুন।

খানকয়েক বই হাতে করে গেলে কেমন হয়? বাংলা পড়ায় মানুষ আছে ওদের দেশে, অল্পসল্প বাংলা বইও আছে। সেই বাংলা তাকের উপর খুব সম্ভব অধমেরও গতর ছড়িয়ে থাকবার স্থান হয়েছে। বইগুলো হাতে নিয়ে অ্যানিসিমভ এই রকম ভরসা দিয়েছিলেন। দেখে আসবেন তো পাঠকসজ্জনদের কেউ যদি ওদিকে যান; দেখে এসে খবরটা দেবেন, প্রতিশ্রুতি রাখলেন কি না তিনি। কাঁকতালে সুদূর দেশে এই কায়দায় যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে! দেশে বিস্তর ঝামেলা—কেমন লিখছেন, সেটা বিবেচ্য নয়। পোঁ ধরে থাকবার সানাইওয়ালা আছে তো? আর কানে তালা-ধরানো ঢাকী? তাঁরা বহাল তবিয়তে থাকলে নামযশ ঠেকায় কেডা? লেখার পিছনে না খেটে খাটনিটা অতএব ঐ দিকে চালান করে বিস্তর হিমসিম খেতে হয়।

যাক গে, কথাটা কি হচ্ছিল? আমি আর রমেশচন্দ্র চললাম অ্যানিসিমভের ঘরে—ঐ পিকিন-হোটেলেরই পাঁচতলায়। হাজির করে দিয়ে রমেশচন্দ্র কেটে পড়লেন। বই ক'খানা টেবিলের উপর

পোপোভ (ডান থেকে দ্বিতীয়); লেখক (বাম থেকে দ্বিতীয়)

রেখে একটু ভূমিকা করি—টেগোরের বাংলা ভাষার আমি এক লেখক; রুশ-ভারতের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হচ্ছে, অধম কাঠবিড়ালি সেই ব্যাপারে মুঠোখানেক বালুর জোগান দিতে এসেছি।

কতবার যে ধন্যবাদ দিলেন অ্যানিসিমভ—পোপোভ তাই আবার তর্জমা করে বলছেন। পরম সমাদরে রেখে দেওয়া হবে আপনার বইগুলো, অনেক জনে বাংলা শিখছে, বই পেয়ে খুব খুশি হবে তারা। সামান্য দামের কয়েকটা বই—তাই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস! লজ্জায় সঙ্কোচে তাড়াতাড়ি একথা-ওকথায় চলে যাই।

দিব্যি গদিয়ান হয়ে বসা গেছে, খাসা জমেছে। পোপোভ ব্যস্ত হয়ে বলে, ইতি করা যাক এবারে। অপেরা আছে।

হাত নেড়ে বলি, যেতে দাও। ওরা তো ঐ এক পালা শিখে রেখেছে—এক কথা রোজ রোজ কাঁহাতক শোনা যায়?

না হে, দেখে খুশি হবে। আমি বলছি, ঠকবে না।

আমি না গেলেও, বোঝা যাচ্ছে, ওঁরা না দেখে ছাড়ছেন না। অনিচ্ছার সঙ্গে তাই উঠে পড়তে হল। না উঠে উপায় কি?

দেরি হয়ে গেছে, ঘরে যাবার সময় নেই। ওঁদেরই সঙ্গে বেরুলাম। লিফটে দাঁড়িয়েছি ভূতলে নামবার জন্য। গ্রহ এমনি, ছুটো লিফটই নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠানামা করছে। অনেকবার চেষ্টা করা গেল—তিন-তিনটে গতর কিছুতে সেঁধোনো যায় না ওর ভিতর। আরে, নেমে যাওয়া তো! সিঁড়ি ভাঙা যাক—কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়াব?

লনে বাস নেই, মানুষজনও দেখছি না ড্রইংরুমে। সকলে বেরিয়ে পড়েছে। পোপোভ বলে, আমাদের গাড়িতে চলো—

অগত্যা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, এক দোভাষি এলো ছুটতে ছুটতে। টিকিট আছে তো আপনার? টিকিট নইলে ঢুকতে দেবে না।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। টিকিট কেটে নাকি পিকিন শহরে অপেরা দেখতে হবে! কাজ নেই মশায়, নেমে যাচ্ছি—

কিন্তু তৎপূর্বেই মানুষটি টিকিট জুটিয়ে এনে হাতে গুঁজে দিলেন।

যতগুলো সিট আছে, তারই হিসাব মতন টিকিট। আপনার টিকিট রয়ে গেছে আপনাদের দলের সেক্রেটারির কাছে।

হলের ভিতর ঢুকলাম—তখন আলো নিভিয়ে দিয়েছে, কনসার্ট বাজছে। তারপরে এক সময় দেখি, দুর্যোগ নিশায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে থপথপ করে ক্লান্ত পায়ে এক চাষী চলেছে···

অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এসেছি নিতান্তই পোপোভের জেদে পড়ে। খাতা-কলম আনি নি—টুকবার কি আছে—ঘণ্টা কয়েকের অপব্যয় শুধুমাত্র। কিন্তু একটুখানি দেখেই ছটফটানি মনের মধ্যে। হারাতে দেওয়া হবে না এ বস্তু—কি করি, কি করি! প্রোগ্রাম দিয়েছে—ভাগ্যক্রমে তার পৃষ্ঠা চারেক সাদা। সন্তোষ খাঁ-এর কলমটা চেয়ে নিলাম। বাইরে-থেকে-আসা কয়েকটা দিনের মাত্র অতিথি আর নই তখন, মহাচীনের অজানা এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, মিলেমিশে গিয়েছি স্টেজের ঐ চরিত্রগুলোর সঙ্গে। অন্ধকারে আন্দাজি কলম ছুটেছে। এত দিনের পরে আজকে তার পাঠোদ্ধারে বসলাম।

স্টেজের তক্তার ছাউনির ঠিক নিচে বাজনার দল। সামনেই আমরা—তাদের কাজকর্ম পুরোপুরি নজরে আসছে। আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা নিচুতে তারা। গুণতিতে বত্রিশ। চরিত্র-গুলোর মনের ভাব টেনেটুনে বের করে নিয়ে আসছে বাজনায়। নিসর্গ পরিবেশ, এমন কি এক দৃশ্য থেকে ভিন্ন দৃশ্যে চলে যাওয়া—বাজনা যেন সুরের কথায় বলে বলে যাচ্ছে।

এমনি তো দেখি, অপচয় মানা—কাঁচি চালানোর দাপট সর্বক্ষেত্রে। ঝিকমিকে মেয়েগুলো একটু বাহারের পোশাক পরতে পায় না। কিন্তু অপেরায় এ কি কাণ্ড—দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করে বসে আছে। নাচের আসরেও দেখেছি এমনি দরাজ হাত। এ যেন হল—রুইমাছ যখন খাবে ঘিয়ে ভেজেই খাবে, সর্ষের তেলে নয়। অপেরা নাকি হাজার বছরের ঐতিহ্য টেনে আসছে। নিজেদের উপর দিয়েই যত কঞ্জুষপনা—বাপ-ঠাকুর্দার বস্তুর তিলেক অঙ্গহানি ঘটলে ও-জাত রক্ষে রাখে না।

কি দরের শিল্পী, সিনসিনারি থেকেই মালুম পাই। ভোঁতা নজরওয়ালাদের জন্য রঙচঙে সিন নয়। পর্দা খাটানো, তার এদিকে কুড়েঘরের চালের মতো করেছে—ঐটে হল চাষী ইয়াঙের বাড়ি। আবার একসময়ে দেখি, রংবেরঙের অনেক পর্দা—সামনে চেয়ার কতকগুলো। জমিদারের ঘর এটা। পয়সার সাশ্রয়? আজ্ঞে না—সাজপোশাকে আলোয় বাজনায় যে প্রকার বাহুল্যের ঘটা, তার মাঝে দু-দশটা থিয়েটারি কাটা-সিন ও উইংস বানানো এমন কিছু নয়। কিন্তু চিরকাল ধরে অপেরার এই ঢং চলে আসছে—তার থেকে এক চুল এদিক-ওদিক করবার জো নেই। আমাদের যাত্রাগান খানিকটা যেন এমনি—দর্শকের কল্পনার অবাধ প্রসার সেখানে। সামিয়ানা ও ঝুলানো-লণ্ঠনের নিচে এই রাজসভা বসল, পর মুহূর্তে ভয়াল অরণ্য—হিংস্র শ্বাপদকুল বিচরণ করছে। গেঁয়ো দর্শকেরা নিরক্ষর হোন, কিন্তু রসের স্রোতে অবাধে ভেসে বেড়ান, একটিবারও কোথাও ঠোক্কর খেতে হয় না। বরঞ্চ সিনে-আঁকা চ্যাপ্টা স্তম্ভ ও দেয়াল দেখেই রাজসভা মানতে রুচিবানের শরম লাগে।

ঘরবাড়ি এমনি। আর, পাহাড়-জঙ্গলের যে রচনা দেখাল, চক্ষে তাতে পলক পড়ে না। পর্দার আকাশ—চাঁদ-তারা ঝিকমিক করছে। ইতস্তত পাথর ছড়ানো। সরল সমুন্নত দেওদার একটি। চাঁদের আলোয় বিশাল পাহাড় তন্দ্রাচ্ছন্ন রয়েছে যেন।

আমাদের দু-দুজনের মধ্যে একটি ছেলে বা মেয়ে। অভিনয় বুঝিয়ে দেবার জন্য এসে বসেছে।···একা-একা কি বলছে হে লোকটা? আমার নাম হল ইয়াং পাই-লাও, পালিয়েছিলাম জমিদারের ভয়ে, বাড়ি ফিরছি। পালার গোড়ার দিকে নতুন চরিত্র স্টেজে ঢুকে আত্মপরিচয় দেবে, এই হল অপেরার রেওয়াজ। পথ চলছে—তখন ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে। বাজনায় ঝড় বয়াচ্ছে—বরফগুঁড়ির মতো সাদা সাদা কি ফেলছে উপর থেকে। চলেছে বটে লোকটা, কিন্তু পা দিয়ে তেমন নয়—অঙ্গভঙ্গিতে চলন বোঝাচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো বকবক করছে অজ্ঞজনদের বোঝাবার প্রয়াসে।

পালা জমে উঠলে বিরক্ত হয়ে তাড়া দিলাম, চুপ করো দিকি বাপু। ওদের বোঝানোয় ছন্দ কেটে যাচ্ছে যেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় হচ্ছে, মুখের কথা আর কতটুকু? কথা আদপে না হলেও ক্ষতি ছিল না।

পর্দা খাটিয়ে জমিদারের যে ঘর হয়েছে, এক বিশাল বাঘের ছবি তার মাঝামাঝি। বাজনা বাজছে ভয়াবহ রকমের—বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। বাঘের ছবি আর বাজনা থেকে আন্দাজ হচ্ছে—কি কাণ্ড ঘটবে রে এখুনি! সিয়ারের হাত ধরে জমিদার টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। পরক্ষণে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। বেশবাস বিশৃঙ্খল, চেহারাই পালটেছে এক লহমার ভিতর। মুখ দেখাবে না সে জনসমাজে। পালার গোড়ার দিকে হবু-বরের সঙ্গে সুখের আনন্দ-দীপ্তি দেখেছিলাম—কে বলবে সে আর এই একই মেয়ে। গান গাইছে—গানের মানে ক'জনই বা বুঝি—কিন্তু হলসুদ্ধ নরনারী কোঁতকোঁত করছে, চোখ মুছছে রুমালে। আর সামনে তীক্ষ্ণ নখ-দংষ্ট্রা রক্তদৃষ্টি সেই বাঘ। একই বাঘের ছবি—কিন্তু মনে হচ্ছে, বাঘটার চেহারা হিংস্রতর হয়েছে এখন।

জ্যোৎস্নাপ্রমত্ত রাত্রি—আলো ফেলে কি অপরূপ জ্যোৎস্না-বিস্তার! পর্দার আকাশে চাঁদ উঠেছে। রূপালি মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে—তার মাঝখানে, যেমন দেখে থাকেন, হাসছে পূর্ণচন্দ্র। তারপর ঘোর হয়ে আসে ধীরে ধীরে মেঘের রং। বিদ্যুৎ চমকায় একবার। কালো মেঘ কেটে কেটে বিদ্যুৎ আকাশময় ছুটোছুটি করছে। প্রবল ধারায় জল নামল। ষ্টেজের খুব কাছে আমরা—এত বৃষ্টি, কিন্তু জল পড়ছে না এক ফোঁটা কোন দিকে। অথচ সেই ছায়াচ্ছন্ন কালো পাহাড়, অন্ধকার আকাশ, মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-চমক, ঝরঝর জলের আওয়াজ—সমস্ত মিলে আমরা তাবৎ দর্শকজনও বিষম দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি, ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম বুঝি! পরের দিন বন্ধুদের বর্ণনা দিয়েছিলাম, অন্ধকার হলের মধ্যে বাঁ-হাত হাতড়ে আমি ছাতা খুঁজছি—ছাতা মেলে মাথায় ধরব···

দেখুন দেখুন, দাড়িওয়ালা লোকটা ঐ আত্মগোপন করছে। ষ্টেজের বাইরে গেল না, নড়লই না জায়গা থেকে। পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর অপর লোকগুলো ঠিক সামনে এসেও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দেখবে কি করে, পাঁচিলের এধারে সে, ওপাশে ওরা। পাঁচিল কিন্তু আপনি চোখে দেখছেন না। ষ্টেজের কিনারা থেকে খানিকটা অবধি পাঁচিল, তার পরেই হঠাৎ কেটে দেওয়া হয়েছে। পাঁচিলটা পুরোপুরি থাকলে এদের দু-পক্ষের মাঝ দিয়েই যেত। কিন্তু পাঁচিল থাকতে পারে না—পাঁচিল আটকে তাহলে ওদিককার লোকের অভিনয় দেখতে পেতেন না। পাঁচিলের অবস্থান অতএব আন্দাজ করে নিন। অপেরা দর্শকের চোখ-কান শুধু নয়, মনেরও কাজ রয়েছে দস্তুরমতো; দৃশ্যপটের ফাঁকগুলো মনে মনে পরিপূরণ করে নিতে হবে।

চরিত্রগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, অথচ সময়ক্ষেপ সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আলো এবং বাজনা বদল করে। দিন দুপুর কাটিয়ে দিয়ে এখন রাত দুপুরে এসেছি—বুঝতে একটুও আটকায় না। ঘুরন-মঞ্চ নয়, দৃশ্য-বদল তবু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হয়ে যাচ্ছে। একবার পর্দা একটুখানি আটকে গিয়েছিল—কত লোক ছুটোছুটি করে ভিতরে কাজ করছে, ওরে বাবা!
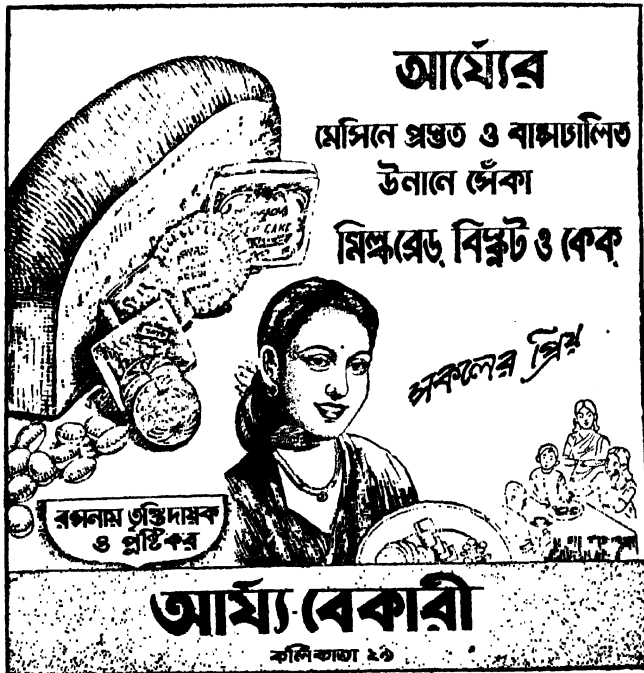
আর ঐ কনসার্ট। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মতন একটু একটু আলো প্রতিটি বাজনার সঙ্গে—স্বরলিপি দেখছে সেই আলোয়। ছায়ামূর্তি বাজনদারগুলো—ব্যাণ্ডমাষ্টার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে চালনা করছে। নাটকের চরম ভাবাবেগের সময় মানুষটি ক্ষেপে যাচ্ছে যেন। কণ্ঠ মিশিয়ে দিচ্ছে এক এক সময় বাজনার সঙ্গে। সেগুলো অর্থময় কথা কিম্বা জানিনে, কিন্তু অন্তর্লোক কাঁপিয়ে তোলে সুরঝঙ্কারে।

বিরামের সময় আলো জ্বলে উঠল। ব্যাণ্ডমাষ্টারের সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেকহ্যাণ্ড করি, তাজ্জব দেখালে বটে ভায়া। দেরি করে এসেছি, হলে তখন আলো ছিল না। এবারে চেয়ে চেয়ে দেখছি, সামনে পিছনে কে কোথায় বসল। কি আশ্চর্য, পিছন দিকে গোটা তিনেক সারির পরে—উঁহু, আমার চোখেরই ভুল···তাই কখনো হতে পারে? প্রায় একই প্যাটার্নের গোলালো মুখ চীনা মেয়েরা—তাঁদের একের জায়গায় অন্যকে ভেবে বসা বিচিত্র নয়। আমার কেশব জেঠার সাহেব দেখা আর কি—দশ-দশটা বছর শহরে কাটানোর পরেও এক সাহেব থেকে অন্য সাহেবের তফাৎ ধরতে পারতেন না। সুন-চিন-লিঙ অর্থাৎ সান-ইয়াৎ-সেনের স্ত্রী চুপচাপ আমাদের পিছন দিকে বসে—এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? নতুন-চীনে মাও-সে-তুঙের পরেই বলতে গেলে তাঁর পদ-মর্যাদা। সাজসজ্জা নেই এবম্বিধ বিশিষ্টার, দেহরক্ষীই বা কোন দিকে? তার পর দেখি, কো মো-জো মাও-তুন ইত্যাদি বাঘা বাঘা নেতারাও পিছন সারিতে গা এলিয়ে মজাসে পালা দেখছেন।

লাউঞ্জে গেলাম। বসে বসে ধকল হয়েছে তো! সেই কষ্ট নিরাকরণের ব্যবস্থা—যেমন সর্বক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দোভাষি মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে; অপেরা নিয়ে তাঁকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সিয়ারার পার্ঠ বলছে ওয়াং কুন নামে একটা মেয়ে—এমন আশ্চর্য অভিনয় কোথায় সে শিখল? দোভাষি গড়গড় করে বোঝাতে লেগে যায়। তারই মাঝখানে একবার বলে, একটু কমলার রস খান না।

খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করলাম, তোমরা এত ভালো কেন?

জবাব দিল, আমরা শান্তি ভালবাসি। শান্তির দূত তোমরা—এত ভালবাসি তাই তোমাদের।

কত রকমের প্রশ্ন—মাথামুণ্ড থাকে না অনেক সময়। ভাবতে গিয়ে আজ নিজেরই লজ্জা লাগছে। তারা কিন্তু হাসিমুখে জবাব দিয়ে গেছে। না বলতে পারলে লজ্জিত হাসি হাসে। না বুঝতে পারলে বলে, ইংরাজি আমি কম জানি। সর্বক্ষণ হাসিমুখ। হোটেলে পরিবেশন করে, সেই মেয়েগুলোই বা কি! শত শত লোকের হাজারো বায়নাক্কা—একে এ দাও, ওকে তা দাও। ছুটোছুটি করে কূল পায় না। হাসতে হাসতে ছোটে। হাসে তাদের চোখ-মুখ, হাসে গতিভঙ্গিমা।

এক কলেজি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে পারো—কেমন করে তোমায় রাগানো যায়?

আমি রাগব না।

কেন?

তোমরা বিদেশি, আমাদের অতিথি। তোমাদের কাছে কিছুতেই রাগতে পারি নে।

ওয়াং সিয়াও-মেই (Wang Hsiao Mei)-র কথাটা বলতে গিয়ে বলা হয় নি সেদিন। পিকিন সিনওয়াল-য়্যুনিভার্সিটির মেয়ে। বুদ্ধি প্রভৃতি কথায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তাকে বললাম, মেয়েরা যেন বেশি বুদ্ধিমান ছেলেদের চেয়ে?

একটি ছেলে তার পাশে—চেন-চি (Chen Che), সাংহাই-য়্যুনিভার্সিটিতে পড়ে। স্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ওয়াং বলে, ছেলেরা মেয়েদের মতোই বুদ্ধিমান।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বিনয় (modcsty)?

না, এটাই সত্য (fact)—

কথা পড়তে পায় না। সভ্য সংযত জবাব—যার মৃদু হাসি খেলছে মুখে। চেনের দিকে এক একবার সকৌতুকে তাকায়।

মাঝে মাঝে কিন্তু রাগ হয়ে যেতো দুরন্তপনায়। হিংসাও হতে পারে। জন্মাতে মাণিক, বছর পঞ্চাশ আগে, মজা টের পেয়ে যেতে! জন্ম থেকে লোহার জুতো এঁটে পা ছোট করে রাখত, কাঙারুর মতন থপথপ করে চলতে সেই পায়ে। বড় ঘরে বিয়ে হলে দু-শো পাঁচশো বউয়ের একজন; নিতান্ত গরিব-ঘর হল তো পাঁচ গণ্ডা সাত গণ্ডা। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ অন্ধকার মেয়ে জন্মানোর পর। আগাছা গোড়া থেকে সাফ করলে হাঙ্গামা কম—বাচ্চা মেয়েকে তাই জলে ডুবিয়ে মারত, গলা টিপে মারত।

আহা, আমাদের—এই পুরুষ মানুষদের কি সত্যযুগ ছিল সেকালে! সাত চড়ে মেয়েগুলোর রা কাড়বার জো ছিল না। দেশের প্রায় একই গতিক। তাই ওদের বলতাম, সব পুরাণো পুরুষজাত কি বোকা! তোমাদের পায়ের শিকল ভাঙলাম আমরাই তো। খোঁড়া পায়ে ঘর-উঠোন করতে, দেবতা হয়ে বসে রাতদিনের সেবা নিতাম। দিব্যি ছিলাম। আর এখন না কাণ্ড, শ্রীমতীরা উল্টে আমাদেরই না শিকলে বাঁধতে লেগে যাও।

১৯১২ অব্দ—তিন বন্ধন কেটে ফেলল ওরা। পয়লা নম্বর হল পুরুষের মাথার লম্বা টিকি। পুরাণো ছবিতে দেখেন নি? আরে মশায়, মাথার চুল হল বাপ-মায়ের সম্পত্তি। কোন হিসাবে সে বস্তু কাটা চলে, কেটে ফেললে গুনাহ হবে না? সমস্ত চুল রাখলে বড় ঝাঁকড়ামাকড়া হয়, তাই ওজনদার এক গোছা নমুনা রেখে দিত। মাতৃগর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে এসেছে, একেবারে সেই খাঁটিবস্তু। দুই নম্বর হল, ঐ যে বললাম—লোহার জুতো পরিয়ে মেয়ের পা ইঞ্চি পাঁচেকের ভিতরে রাখা। চলতে গিয়ে টলবে—রূপ ফেটে ফেটে পড়বে সেই চলনে। আর তিন নম্বর—কাউ-তাউ। উঠ-বোস করে এক মজার অভিবাদন-প্রথা।

কোথায় ছিলে সেদিন আনন্দময়ীরা—উল্লাসে বীর্যে কর্মিষ্ঠতায় নতুন-চীনের ছেলেদের যারা সমভাগিনী? ওয়াং বললে কি হবে—বেশি উজ্জ্বল যেন এরাই। ছেলেরা কাজ করে; এদের কাজ করা শুধু নয়, আনন্দের তুফান বইয়ে দেওয়া ঐ সঙ্গে। যত শক্ত কাজই হোক, গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মনে হবে।

ঘরগৃহস্থালীর চেহারা বিলকুল পালটেছে। আগেকার দিনের কর্তা মশায়, এবং পোষা মুরগি ও পোষা রমণীদল নয়। ঘর এখন আনন্দ-নিকেতন; নতুন কালের ছেলেমেয়েদের জন্মের সূতিকাগার। ভূমি-সংস্কারের পর মেয়েরাও জমির মালিক, পুরুষের সমান হকদার! তাদের সমাদর আর সম্মান তাবৎ চীনদেশ জুড়ে।

[ক্রমশঃ।

সাহিত্য-সাধক-মঞ্জুষা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
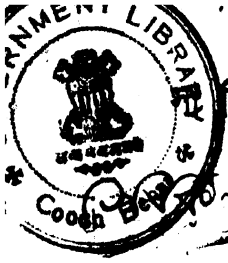
শাহাদাৎ হোসেন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৪ খৃঃ ২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমায় পণ্ডিতপোল নামক গ্রামে। ইনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—(কাব্য) মৃদঙ্গ, চিত্রকূট, কল্পলেখা, 'রূপছন্দা'; (উপ) পথের দেখা, রিক্তা; (নাটক) সরফরজ খাঁ, আনারকলি।

শামছুন নাহার—মহিলা সম্পাদিকা। যুগ্ম-সম্পাদিকা—বুলবুল (সাময়িক পত্র, ১৩৪০–৪৬)।

শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি—শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ চৈত্র নবদ্বীপের আমুলিয়া পাড়া। মৃত্যু—১৩৩০ বঙ্গ অগ্রহায়ণ কলিকাতা পার্ক সার্কাসে। পিতা—ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি। শিক্ষা—চতুষ্পাঠী। 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ (১২৯২ বঙ্গ, বঙ্গবিবুধ জননী সভা কর্তৃক), মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ (১৯২৮)। কর্ম—অধ্যাপনা, টোলে, বর্ধমানরাজের চতুষ্পাঠী, স্মৃতিশাস্ত্রে (১৯০৭), সংস্কৃত কলেজে (১৯২১), লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—অলঙ্কারদর্পণ, ভারতের দণ্ডনীতি।

শিপ্রা গুহ—মহিলা সম্পাদিকা। সম্পাদিকা—একাল (সাপ্তাহিক, ১৩৫৫)।

শিবকিঙ্কর ভট্টাচার্য—নাট্যকার। জন্ম—বর্ধমান জেলার খাটুন্দীগ্রামে। 'কাব্যব্যাকরণরত্ন' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—যুগাবতার, সোনার নৌকা।

শিবকৃষ্ণ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বঙ্গহিতাথিনী (সাপ্তাহিক, ১৮৬১, মে)।

শিবকৃষ্ণ মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—বসন্তলাল মিত্রের জীবনী। সম্পাদক—ধূমকেতু (সাপ্তাহিক, বৈশাখ, ১২৯৩)।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—তান্ত্রিক। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ নবদ্বীপ জেলার কুমারখালি গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ ২৫এ মার্চ কাশীধামে। তন্ত্রশাস্ত্রে অসাধারণ সুপণ্ডিত। গ্রন্থ—শৈবী গীতাবলী, ভগবতীতত্ব, তন্ত্রতত্ব, গঙ্গেশ, গীতাঞ্জলি, ২ ভাগ (কবিতা), রাসলীলা, ৪ ভাগ, দুর্গোৎসব, ২ ভাগ, মা, ৪ ভাগ, পীঠমালা, কর্তা ও মন, স্বভাব ও অভাব। সম্পাদক—শৈবী (মাসিক, কুমারখালি, ১৩০৩)।

শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নির্বাসিতার বিলাপ (১৮৬৮)।

শিবচন্দ্র মহারাজ—কবি। জন্ম—১৭৬৮ খৃঃ কৃষ্ণনগর রাজবংশে। মৃত্যু—১৭৯৮ খৃঃ। পিতা—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি লাভ (নবাব-কর্তৃক)। ইহার রাজত্ব সময় (১৭৮২—১৭৮৮) সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তিলাভ। গ্রন্থ—দেবীস্তুতি, সাধনমালা।

শিবচন্দ্র সার্বভৌম—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২৫৪ বঙ্গ ফাল্গুন ভট্টপল্লী। মৃত্যু—১৩২৬ বঙ্গ ২রা পৌষ। পিতা—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। গ্রন্থ—পাণ্ডবচরিত (সং-নাটক, ১২৭০ বঙ্গ), কুসুমাঞ্জলির টীকা।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—রাজশাহীর অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে। শ্রুতিধর হিসাবে ইঁহার খ্যাতি ছিল। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তপত্রিকা (সং), সুধাসিন্ধু (ঐ), বিধবাবিবাহখণ্ডন (বাংলা)।

শিবচন্দ্র সোম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—History of Orissa (১৮৬৭)।

শিবদয়াল ত্রিবেদী—সাময়িকপত্রসেবী। নিবাস—মৈমনসিংহ জেলায় চুচুঙ্গা দুর্গাপুর গ্রামে। সম্পাদক—আর্যপ্রদীপ (মাসিক, চুচুঙ্গা দুর্গাপুর, ১৮৮৫), আর্য্যপ্রভা (ঐ, ১৮৮৭)।

শিবনাথ বাচস্পতি—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন। নবদ্বীপাধিপতির টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থ—অষ্টকাবলী ১৮১৯ শক), স্মৃতি বিচারসারকৌমুদী (ঐ)।

শিবনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিরীষ ফুল।

শিবনাথ শাস্ত্রী—দেশপ্রেমিক, বক্তা ও ব্যঙ্গাত্মক কবি। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ ৩১এ জানুয়ারি হরিনাভিতে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯১৯ খৃঃ ৩০এ সেপ্টেম্বর। পিতা—হরানন্দ বিদ্যাসাগর। মাতা—গোলকমণি দেবী। পৈতৃক নিবাস ২৪-পরগণার মজিলপুর। শিক্ষা—মজিলপুর গ্রামের পাঠশালা ও আদর্শ বাংলা স্কুল, প্রবেশিকা (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ১৮৫৬), এফ-এ, এম-এ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১২৭৬)। কর্ম—শিক্ষকতা, ব্রহ্মানন্দের বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য, স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন। এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতিতে কবিতা প্রকাশ ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—নির্বাসিতের বিলাপ (কাব্য ১৮৬৬), মেজ বৌ (উপ, ১৮৭১), হিমাদ্রি কুসুম (কবিতা, ১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (কবিতা, ১৮৮৭), ছায়াময়ীর পরিণয় (রূপককাব্য ১৮৮৯), যুগান্তর (উপ, ১৮৯৫), নয়নতারা (ঐ, ১৮৯৯), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, আত্মচরিত, ধর্মজীবন, মাঘোৎসবের উপদেশ ও বক্তৃতা। সম্পাদক—মদ না গরল? (মাসিক, ১৮৭০), সোমপ্রকাশ (১৮৭৩), সমদর্শী (১৮৭৪—৭৭), সমালোচক (সাপ্তাহিক, ১২৮৪), তত্ত্বকৌমুদী (পাক্ষিক, ১২৮৫ বঙ্গ), মুকুল (শিশু মাসিক, ১২৯৫), সখা (১৮৮৫-৬), Indian messenger (১৮৮৩), Bengal Public Opinion, Brahma Public Opinion ; সম্পাদিত গ্রন্থ—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা।

শিবনারায়ণ ঘোষ—সঙ্গীত রচয়িতা। জন্ম—১৯শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলায় গগনেশ্বরে। গ্রন্থ—কৈবল্যসঙ্গীত, ২ খণ্ড।

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—কবি ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ উত্তরপাড়া বিখ্যাত জমিদার বংশে। মৃত্যু—১৮২০ খৃঃ। পিতামহ—প্রসিদ্ধ দানবীর জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ। লর্ড রোনাল্ডসের কাউন্সিলের সভ্য। গ্রন্থ—Early Poems (১৮৯৫), Joykissen Mukherjee an appreciation (১৯১৮)।

শিবনারায়ণ শিরোমণি—বৈয়াকরণ ও সুকবি। জন্ম—নবদ্বীপ। কর্ম—প্রধান পণ্ডিত, নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল। অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—সংস্কৃতকলিকা; সম্পাদিত গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ।

শিবনারায়ণ স্বামী পরমহংস—সন্ন্যাসী ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অমৃতসাগর ১ম (১৮২৫ শক), ভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৮২৩ শক), পরম কল্যাণগীতা (১৩২৭ বঙ্গ)।

শিবপদ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিমান আক্রমণ।

শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সাহিত্য-কল্পদ্রুম (মাসিক, ১২৯৬)।

শিবপ্রসাদ শর্মা—ছদ্মনাম। রাজা রামমোহন রায় এই নামে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন (রাজা রামমোহন রায় দ্রষ্টব্য)।

শিবরতন মিত্র—সাহিত্যসেবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ ১লা চৈত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত খয়রাশোল থানার অধীন বড়রা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ২০এ পৌষ, সিউড়ি, বীরভূমে। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। মাতা—নিত্যময়ী দাসী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৯১), আই-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি-এ (জেনারেল এসেমব্লিজ, ১৮৯৭, অনুত্তীর্ণ), আইন অধ্যয়ন। কলেজে অধ্যয়ন কালে বহু সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন। এই সময়ে ইনি ইংরেজি ও বাংলা সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। কর্ম—বীরভূম কালেক্টরীর হেড অ্যাসিষ্ট্যান্ট পদে। ইনি বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রতিষ্ঠাতা—রতন লাইব্রেরী। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক—বীরভূম সাহিত্য পরিষদ। বহু সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। গ্রন্থ—বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক (১৩১১), দূর্বা (১৩১৩), বর্ণমালা, ১ম (১৩১৩), হস্তলিপি লিখন প্রণালী (১৩১৫), শকুন্তলা (১৩১৬), সীতার বনবাস (১৩১৭), বিদ্যাসাগর (১৩১৭), প্রবন্ধরত্ন (১৩২১), রত্নহার (১৩২৩), রতন পাঠ (১৩২৩), সচিত্র আরব্য উপন্যাস (১৩২৩), গোপীচন্দ্র (১৩২৬), চিন্ময়ী (১৩২৬), প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১৩২৬), সাঁজের কথা (১৩২৭), ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩২৮), রত্নকণা (১৩২৮), সাগর-সুধা (১৩২৯), কুরঙ্গ (১৩২৯), আরব্য উপন্যাস, ১ম ও ২য় (১৩৩০), শিশুবোধ ভারত ইতিহাস (১৩৩০), মোহন সুধা (১৩৩০), অক্ষয় সুধা (১৩৩১), সাগরকণা (১৩৩১), ভারতকণা (ঐ), উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা (১৩৩৩), প্রসঙ্গকোরক (১৩৩৭), প্রসঙ্গকলিকা (১৩৩৭), প্রসঙ্গমুকুল (১৩৩৭), প্রসঙ্গমালিকা (ঐ), প্রসঙ্গ-চন্দ্রিকা (ঐ), ভারতকথা (১৩৩৭), প্রসঙ্গকুসুম (ঐ), কল্পলতা (ঐ), Types of Early Bengali Prose (১৩২৯), Easy Poems (১৩৩১), সাঁওতালি উপকথা, সাগর পারের ঢেউ। অপ্রকাশিত গ্রন্থ—লাউসেন, বঙ্গসাহিত্য, নিশির কথা, বিদ্যাপতি, বনের কথা। যুগ্ম সম্পাদক—মানসী (মাসিক)।

শিবরাম ঘোষ—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে। পিতা—রাজেন্দ্র ঘোষ। মাতা—রাধিকা দেবী। গ্রন্থ—একাদশী পাঁচালী (১০৬৩ বঙ্গ)।

শিবরাম চক্রবর্তী—রস-সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৬ বঙ্গ কলিকাতা। ছাত্রাবস্থায় অহিংসা আন্দোলনে যোগদান। বহু বার কারাবরণ। ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরস-প্রধান রচনা ইঁহার বৈশিষ্ট্য। শিশু-সাহিত্যে ইঁহার দান প্রচুর। গ্রন্থ—অথ বিবাহঘটিত, প্রেমের পথ ঘোরালো, হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি, পাত্রপাত্রী সংবাদ, প্রেমের বিচিত্র গতি, আজ ও আগামী কাল; এতদ্ব্যতীত শিশু-সাহিত্যে ইঁহার অবদান প্রচুর।

শিবরাম বাচস্পতি—ষড়্‌দর্শনবিদ্‌ পণ্ডিত। টীকাগ্রন্থ—মুক্তিবাদ (১৭৪২)।

শিবশঙ্কর মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ।

শিবসুন্দরী দেবী—মহিলা লেখিকা। জন্ম—১৮০৬ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ। পিতা—ঈশানচন্দ্র মুস্তফী। স্বামী—হরকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথম বাঙালী মহিলা লেখিকা। গ্রন্থ—তারাবতী (নাটক)।

শিশিরকণা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—আঁধারে আলো।

শিশিরকুমার ঘোষ, মহাত্মা—সংবাদপত্রসেবী ও দেশসেবক। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ যশোহর জেলায় মাগুরা গ্রামে (বর্তমান নাম—অমৃতবাজার)। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ ১০ই জানুয়ারি। পিতা—হরিনারায়ণ ঘোষ। বাল্যে পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য শিক্ষা। কিন্তু অধ্যবসায়ের গুণে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা। প্রজাবর্গের উপর নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা (১৮৬৮ খৃঃ মাগুরা, বাঙলা ভাষায়, সাপ্তাহিক), ইংরেজি ভাষায় পরিবর্তিত (১৮৭৯ খৃঃ)। ইনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও 'হিন্দু স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিন' পরিচালনা। নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। শেষ জীবনে বৈষ্ণবধর্ম আলোচনায় ও সাধনায় রত। গ্রন্থ—সর্পাঘাতের চিকিৎসা (১৮৬৮), সঙ্গীত শাস্ত্র (১৮৬৯), নয়শো রূপেয়া (প্রহসন, ১২৭৯ বঙ্গ), বাজারের লড়াই (ঐ, ১৮০০), শ্রীনরোত্তম-চরিত (১৮৯১), অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম (১৮৯২), ২য় (১৮৯৩), ৩য় (১৮৯৪), ৪র্থ (১৮৯৬), ৫ম (১৯০১), ৬ষ্ঠ (১৯১১), শ্রীকালাচাঁদ গীতা (কাব্য, ১৩০২), শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট (১৮৯৬), শ্রীনিমাই সন্ন্যাস (নাটক, ১৯০১), ব্রজপদ ভজনাবলী (সংগ্রহ, ১৯১৩), পদকল্পতরু (সংকলন, ১৮৯৭) ৩ খণ্ড, Snakes : Snakebite & their treatment (by a Hindu, ১৮৮১), Lord Gouranga or salvation for all, ১ম (১৮৯৭), ২য় (১৮৯৮), Indian Sketches (১৮৯৪), Picture of Indian Life (মাদ্রাজ, ১৯১৭, মৃত্যুর পরে)। সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা (বাংলা সাপ্তাহিক, ১৮৬৮), ঐ, (ইংরেজি বাংলা, ১৮৬৯), ঐ, (ইংরেজি সাপ্তাহিক, ১৮৭৮), ঐ, (দৈনিক, ১৮৯১), শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (পাক্ষিক ১৮৯০—৪০৫, চৈতন্যাব্দ ১লা চৈত্র), শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক, ১১০১—৪১৬ গৌরাব্দ), Hindu Spiritual Magazine (১৯০৬)।

শিশিরকুমার বসু—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—১৮৯৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর কলিকাতায়। সম্পাদক—সাপ্তাহিক শিশির (১৯২১-১৯২৫), সাপ্তাহিক ভগ্নদূত (১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা), দৈনিক ভগ্নদূত (১৯৩০-৩১)। গ্রন্থ—দাম্পত্যকলহে চৈব। সম্পাদিত গ্রন্থ—গান্ধীহত্যা কাহিনী।

শিশিরকুমার মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আমার দেশ (১৩২৭-৩৩), সচিত্র শিশির (সাপ্তাহিক, ১৩২৯-৩৪), বঙ্গসাহিত্য (১৩৩৪)।

শিশির সেন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১৩ খৃঃ নভেম্বর পাবনা জেলায়। শিক্ষা—বি-এ (আশুতোষ কলেজ), এম-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পর্যন্ত পাঠ। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য রচনা। প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী—আনন্দ পাবলিসার্স। গ্রন্থ—বিংশ শতাব্দী (উপন্যাস), আমি (ঐ), তখন ও এখন (গল্প)।

শিশির সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার ও অনুবাদক। জন্ম—১৯১৮ কলিকাতা। আদি বাস হুগলী জেলায় সোমড়াবাজার। পিতা—শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। শিক্ষা—এম-এসসি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। ছাত্রাবস্থা হইতেই নানা পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ (ভ্র), জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ভ্রা), সূর্যতপস্যা (উপ); দর্পিতা, লিলির প্রেম। অনুবাদ-গ্রন্থ (জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী সহ) গ্রেট হাঙ্গার, পাওয়ার অফ এলাই, কিসলিয়াকফ্।

শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস (১৩৩৩-৩৪), আদি আর্যভূমি (১৩৩৪)।

শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—মাদারিপুর। সম্পাদক—ধর্মজীবন (মাসিক, মাদারিপুর, ১৩০৬ বঙ্গ আষাঢ়)।

শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাম্যবাদ।

শুদ্ধানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমের নাম—সুধীর চক্রবর্তী। জন্ম—কলিকাতা। কলেজে অধ্যয়ন কালে বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। গ্রন্থ—বিবেকানন্দের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ। সম্পাদক—উদ্বোধন (মাসিক, ১৩৩৪-৩৯)।

শুভেন্দু মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্তমান ইউরোপ।

শূদ্রক—নাট্যকার। জন্ম—২-৩য় শতাব্দী। অনুমান করা হয় ইনি বিদিশার রাজা। গ্রন্থ—মৃচ্ছকটিকম্ (সং-নাটক)।

শূলপাণি—স্মার্তপণ্ডিত। জন্ম—১৩।১৪শ শতাব্দীতে অযোধ্যা নগরীতে। (কেহ কেহ বলেন বঙ্গদেশে)। গ্রন্থ—তিথিবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শ্রাদ্ধবিবেক, সম্বন্ধবিবেক, দুর্গোৎসববিবেক।

শেখ চান্দ—প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম—১৬শ শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গে (?)। পিতা—ফথে মোহাম্মদ। ইনি শাহ দৌলত নামক এক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। গ্রন্থ—রসুলবিজয় (১৬শ শতাব্দী)।

শেখর সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বারোভূতের হাট।

শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু ১৯৪১ খৃঃ, ১৭ই জানুয়ারী। মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র। গ্রন্থ—ভ্রাতৃবিলাপ।

শৈলজাকুমার ঘোষ—শিক্ষাব্রতী। শিক্ষক, লণ্ডন মিশনারী হাই স্কুল, মির্জাপুর। গ্রন্থ—কাশীচিত্র (হিন্দী)।

শৈল চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যাদের বিয়ে হ'ল, যাদের বিয়ে হবে, কার্টুন, কৌতুক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—কথাশিল্পী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০০ খৃঃ ৪ঠা মার্চ বর্ধমান জেলার অণ্ডালে। পিতা—ধরণীধর মুখোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস—রূপসীহর, বীরভূম। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যানুরাগী। প্রথম জীবনে কবিতা রচনা। নবম শ্রেণীতে পাঠের সময় প্রথম মহাযুদ্ধে চাকুরী গ্রহণ (১৯১৯), যুদ্ধের পর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ। প্রথম রচনা—কয়লাকুঠি। সাহিত্য-রচনার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রজগতে যোগদান (১৯৩২)। গ্রন্থ—কয়লাকুঠি, ঝড়ো হাওয়া, বধুবরণ, জোয়ার-ভাঁটা, মাটির ঘর, ষোল আনা, ছায়াছবি, রক্তলেখা, মাটির রাজা, পূর্ণচ্ছেদ, নরমেধ, বাণভাসি, নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী, অতসী, বাংলার মেয়ে, সাঁওতালী, অনাহুত, নন্দিনী (১৩৩৮), দিন-মজুর, খরস্রোতা, বহুবচন, উদ্বাস্তু, মারণ-মন্ত্র, লহ প্রণাম, অনিবার্য, রায় চৌধুরী (১৩৫৪), হে মহামরণ শোভাযাত্রা, অভিশাপ (১৩৪০), জীবননদীর তীরে, শুভদিন, পূর্বাপর, পৌষপার্বণ (১৩৩৮), ডাক্তার, হোমানল, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ক্রৌঞ্চমিথুন, রূপবতী, বিজয়িনী, গঙ্গা-যমুনা, সতী-অসতী, আকাশ-কুসুম, পাতালপুরী, অরুণোদয়, বিজয়া।

শৈলবালা ঘোষজায়া—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—নমিতা, শেখ আন্দু (১৩২৪), আড়াই চাল (১৩২৬), মঙ্গল ঘট, জন্ম অভিশপ্তা (১৩২৪), মনীষা, ইমানদার, অবাক, অভিশপ্ত সাধনা, শান্তি, বিপত্তি, বিনিময়, গঙ্গাপুত্র, বিভ্রাট, বিনীতাদি, বিনির্ণয়, মিষ্টি সরবৎ, মোহের প্রায়শ্চিত্ত, সই, থিয়েটার দেখা (১৩৪১)।

শৈলবালা দেবী—মহিলা সাহিত্যিকা। সম্পাদিকা—বিরহিণী (মাসিক, ১২৯৫)।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—গ্রন্থকার। জন্ম—শোভাবাজার রাজবংশে। গ্রন্থ—রামায়ণের কথা, Social Problem (১৯১৩), The Vedic Age (১৯১৯)।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতা সিমুলিয়া অঞ্চলে। পিতা—কবি অবতারচন্দ্র লাহা। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। সাম্প্রতিক কালে 'মেঘদূতে'র প্রথম ছন্দানুবাদক। 'রবিবাসরে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩৪২—৪৬), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৫৫—৬০)। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। সম্পাদক—ছোট গল্প, তত্ত্ব ও তন্ত্রী (মাসিক); সহ-সম্পাদক—প্রবাসী (১৯৩৬), Modern Review (১৯৩৬)।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বঙ্গ রঙ্গালয় (সাপ্তাহিক, ১৩৩৩), ইঙ্গিত (১৩৩৮)।

শৈলেন্দ্রনাথ বিশী—সাহিত্যিক। জন্ম—রাজশাহী জেলার জোয়াড়ী গ্রামে জমীদার বংশে। শিক্ষা—বি-এ (কাশী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ), বি-এস (ঐ, ১৯২১)। আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্টে (১৯২১—২৩)। বিদেশী লেখকদের কয়েকখানি বই তর্জমা করিয়া সাময়িকপত্রে প্রকাশ। অনুবাদ সাহিত্যে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রন্থ—চিত্তকথা (১৩৩২), নেতাজী (নাটক), বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন? সর্বোদয় সমাজ, একটি সবুজ পাতা (ছোট গল্প), নরনারী। এতদ্ব্যতীত বোলশেভিকবাদ (অনুবাদ—বার্টণ্ড রাসেলের থিওরী এণ্ড প্র্যাকটিস ও বোলসিভিজম্, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত)। সম্পাদক—জনসেবক (মাসিক, ১৯২৩)।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী লিজেল্‌ রেমঁ
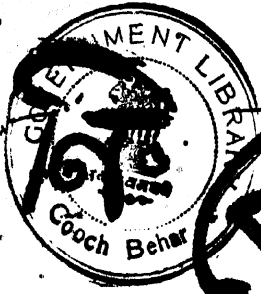
একত্রিংশ অধ্যায়

সাধনা—১৯০২

স্বামীজির অন্তর্ধানে নিবেদিতা দমে গেলেন না,—যে বিরাট কাজের ভার নিয়েছিলেন একটুও ইতস্ততঃ না করে নির্ভয়ে সে-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গুরু যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন এইবার তার সত্যিকার মূল্য বোঝা গেল। নিবেদিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন তিনি, তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন কর্মযোগিনী করে—অটল বিশ্বাসের বর্মে আবৃত হয়ে নিবেদিতা যেন মুক্তি-বাহিনীর এক জন হতে পারেন। যে অখণ্ডদৃষ্টিতে কর্তা, কর্তৃত্ব আর কর্মে কোনও বিভেদ নাই সেই দৃষ্টির অধিকার গুরু তাঁকে দিয়েছেন। যে মহাশক্তি একাধারে ইচ্ছা, ক্রিয়া আর জ্ঞানরূপিণী তাঁকে চিনতে শিখিয়ে গেছেন তিনি।

জীবনের এই বিশেষ পর্বে এসে এ-যাবৎ যে-সাধনা করেছেন সন্ন্যাসিনী তার আমূল খুঁটিয়ে দেখেন। অতীতের প্রতিটি অধ্যায় এবার নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিতে চোখে পড়ে। প্রথমে ব্যক্তিত্বের খোলসটা ছেড়ে ফেলতে শিখিয়েছিলেন গুরু। তার পর বাধ্য করেছেন আত্মসমর্পণে। সবার শেষে দিয়েছেন পরিপূর্ণ আত্ম-কর্তৃত্বের উপদেশ—জিতাত্মার আদর্শ। কাজটা সহজ ছিল না। অত্যন্ত স্নেহ করেছেন যেমন তেমনি তিরস্কারও করেছেন কঠোর ভাবে। আজ একা-একা নিজের দায়িত্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে গিয়ে নিবেদিতা টের পান কেন তাঁকে গড়ে-পিটে তুলতে স্বামীজি এত আয়াস স্বীকার করেছিলেন। এই ভারতবর্ষ, এই "ভারত-মাতা" নিবেদিতার ইষ্টদেবতা, তাঁর ভক্তি-ভালবাসার একমাত্র বস্তু। ওরই মাঝে জীবনের লক্ষ্য আর আনুগত্যের শান্তি তিনি খুঁজে পেলেন।

আর ইতস্ততঃ করলেন না নিবেদিতা। বেলুড়ের সন্ন্যাসি-প্রধান এবং গুরুভাইদের নিয়ে যা-কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে আগে-ভাগেই তা ভেবে নিয়ে নিবেদিতা এর মধ্যেই মনে-মনে সব দিক্ বিচার করে দেখেছেন। ভারতে ফিরে এসেই স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আত্মসত্তাকে চিনে নেবার জন্য কঠিন সংগ্রাম চলছে ভারতবর্ষে, নির্ভীক-চিত্তে নিবেদিতা তার অংশ নিলেন। নিজের কি হবে সে-কথা একটুও না ভেবে তাঁর যা-কিছু ছিল সব ঢেলে দিলেন তিনি। গুরু না থাকলেও কোন্ উৎস হতে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন তিনি, নিবেদিতা তার সন্ধান রাখেন। দিব্য জীবনের স্রোতে গা ঢেলে চলবেন তিনি।

গুরুদত্ত মতবাদ আর আদর্শ বুকে নিয়ে নিবেদিতা কাজে হাত দিলেন, অথচ এর পরিণাম সম্বন্ধে গুরুকে দায়ী করতে চাইলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের নিজের একটা দায় ছিল, জন-সেবা ও সাধন-তপস্যার সমন্বয়ে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁকে। নিবেদিতার দায় সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের,—তার আবার নানান দিক আছে। ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে হবে—এই সঙ্কল্পকে সে-দায় বহু দূরে ছাড়িয়ে গেল। গুরু যে অপরূপ পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখতেন নিবেদিতাকে তা জীবনে মূর্ত করে তুলতে হবে। এমন এক ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে হবে যে, ভারতে মেয়েরা তো বটেই তাছাড়া নীচ জাতি, মূর্খ, গরীব, অজ্ঞ, মুচি-মেথর সকলেই দেশ-মাতৃকার সন্তান বলে, তাঁর বুকের রক্ত বলে গণ্য হবে। স্বামীজি স্বপ্ন দেখেছেন, ভারতের সমাজ তাঁর 'শৈশবশয্যা, বার্ধক্যের বারাণসী।' তিনি বলেছেন, হৃদয়ে এই প্রার্থনা অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে: 'মা গো শক্তিস্বরূপিণী তুমি! আমার সব দুর্বলতা তুমি ঘুচিয়ে দাও, কাপুরুষতা দূর করে মানুষের মত মানুষ করে তোল আমায়।' (স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ)।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের 'গণ-জীবনে এবং শিক্ষিত সমাজে অদ্ভুত একটা প্রাণহীনতা' দেখা দিয়েছিল। (এম, কে, র‍্যাটক্লিফ, সোসাইটি রিভিউ, জুলাই ১৯১৩)। তা-সত্ত্বেও সর্বত্র যে নবজীবনের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হচ্ছে এ-ও বোঝা যাচ্ছিল। নিবেদিতা লিখলেন, 'মানুষগুলো এখনও যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। এমন কি যারা ওদের মাথার বোঝা নামাতে চায় তারাও যেন আরেক মিথ্যার সঙ্গে শক্ত করে ওদের বেঁধে দেয়। এখনও ঘুম ভাঙেনি ওদের, জানে না ওদের সুপ্তশক্তি কোন্ সিদ্ধির তপস্যায় নিয়োজিত হতে পারে। এই মাটি, আর এ-মাটির বুকে যা-কিছু জন্মেছে, এই দেবসেবা আর জীবে দয়ার বিরাট উত্তরাধিকার···মানুষকে দৃঢ়চরিত্র করবার এই-ই কি উপাদান নয়?' (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২এর চিঠি)।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াও ক্রমে-ক্রমে ফুটে উঠছিল। বাইরের এই নিষ্ক্রিয়তার আড়ালে শক্রর অধিকার ধূলিসাৎ করে দেবার উদ্দেশ্যে একটা গুপ্ত আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করল। সারা দেশে এই গুপ্ত সমিতির বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়ল। সমস্তটা ব্যাপার তখনও সুসংহত হয়ে ওঠেনি, তবু বীরের মত জীবন দেবে যারা, নিবেদিতাও তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন। তখনও ভাল করে এ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়নি, নেতা খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই।

দেশের বুদ্ধিজীবীদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার হয়েছিল। নিবেদিতা হলেন সেই সূত্র। এক দিকে নতুন উদ্দীপনার বিস্ফোরণ আর এক দিকে এতদিনকার ঔদাসীন্যকে ছাপিয়ে জনতার অসন্তুষ্ট গুঞ্জন—এ সবই পূর্বাভাস মাত্র। দেশজোড়া এই বিপ্লবের বানকে এক খাতে বইয়ে তাকে গঠনমূলক

কাজে লাগানোই হল নিবেদিতার দায়। সৃষ্টির যে প্রেরণা হতে বিপ্লব উৎসারিত হয়েছে তার সঙ্গে তাকে যুক্ত না করলে সুপ্রতিষ্ঠ হবে না এ-বিপ্লব। নিবেদিতা চেয়েছিলেন আত্মত্যাগে প্রস্তুত যারা তাদের অনুপ্রাণিত করতে, তাঁর ধর্মে ওদের দীক্ষিত করতে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বিশেষ একটা মুহূর্তে নিজেকে নিবেদিতা তফাৎ করে নিতেন। কর্মীদের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে চাইতেন এবলাই তারা এমন একটা কিছু গড়ে তুলুক, যা তাদের নিজের সৃষ্টি।

এমনি করে নিবেদিতা তাঁর গুরুর মতনই নিঃসঙ্গ হতে শিখেছিলেন। কঠোর সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁর—না তাঁর কাজকে, না তাঁর শক্তির বিচ্ছুরণকে—কিছুকেই 'আমার' বলে মনে করতেন না তিনি। অনাসক্ত হয়েও স্বভাবের স্নিগ্ধতাটুকু পরিহার করেননি কিন্তু,—তাই তাঁর 'পরে নির্ভর করত যারা, তাদের সব জ্বালা যেন সেই স্নেহস্পর্শে জুড়িয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর মানবপ্রেম অন্তরে ধারণ করে নিবেদিতা ওদের সান্ত্বনা দিতেন, এনে দিতেন হৃদয়-গলানো আনন্দ। এই-ই শুধু নয়। তিনি বলতেন 'ওই ভালবাসাটুকু ঢেলে দেওয়া ছাড়া স্বামীজি আর কিছুও যদি করতেন, তাহলে আজ পর্যন্ত বেঁচে থেকে গাছ-তলায় বসে গুরুগিরি করতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁর শক্তি তিনি আমায় দিয়ে গেছেন, যাতে এখনকার এ-কাজ আমি করতে পারি। কাজেই তাঁর মত আমিও লড়াই করে যাব। তিনি যেমন করে নিঃশেষ হয়ে গেছেন আমিও যেন তেমনি করে শেষ হয়ে যাই।

সব চেয়ে কঠিন সঙ্কটেও কোন দিন হাল ছেড়ে দেননি নিবেদিতা। বিধির বিধানের পাষাণ-ভিত্তিতে নোঙর করেছিলেন তিনি, তুফানের ঝাপটা যাতে সইতে পারেন। যারা সংশয় করত তাদের বলতেন, 'যে ভারতকে আমি আমার বলে বিশ্বাস করি, তোমরা কি বলতে চাও আসলে তার অস্তিত্বই নাই? হাতে-কলমে কিছু না করেও জাহাজের কাপ্তেন সব সময় উদ্দিষ্ট বন্দরের কথাই ভাবে। আমি যে বন্দরের দিকে ভারতকে নিয়ে চলেছি সে হল তার বিধিলিপির পূর্ণতা। আমার কম্পাসের কাঁটা দিন-রাত যে সেই পথের দিকেই ফিরে আছে।'

সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিভাবানদের হৃদয়ে নিবেদিতা প্রভাব বিস্তার করতেন সম্পূর্ণ আত্মসচেতন অথচ নিরভিমান এক যন্ত্রের মত। নদীর স্রোত যেমন 'পানচক্কী'কে ঘুরিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু কি পিষে গেল সেদিকে খেয়াল রাখে না, তিনিও তেমনি একটা শক্তি-স্রোতের মত বয়ে যেতেন। কলের মালিকের লাভ-ক্ষতিতে তাঁর দৃকপাত ছিল না। শেষ পরিণাম কি হবে শুধু তারই খেয়াল রাখতেন। কিন্তু সমাজের নিচের ধাপে, জনসাধারণের মাঝে এসে, মহত্ত্ব আর নীচতা, সাহস আর ভীরুতা—এমনি সব পরস্পরবিরোধী শক্তির মুখোমুখি নিবেদিতাকে দাঁড়াতে হয়। সেখানে তাঁর ধরণ-ধারণও বদলে যায়। তাঁর সঙ্গে কাজ করছে যারা, তাদের চরিত্র গঠনই নিবেদিতার প্রথম লক্ষ্য। আত্মত্যাগের যে প্রেরণাকে পরাধীনতায় তারা খুইয়েছে, সেইটি তাদের মনে ফিরিয়ে এনে দেন তিনি।

ভারতবর্ষের চিত্ত স্পর্শকাতর। এদেশের হিন্দু সংস্কার বশেই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে সব কিছু বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত। তারা ঈশ্বরশক্তিকে নারীমূর্তিতে স্ফুট দেখতে পায় সব সময়। কখনও গৃহে জননী তিনি, কখনও বা মন্দিরে দেবী। কিন্তু সর্বত্রই তিনি সৃষ্টির মূলাধার, তিনি বিশ্বযোনি; এই ভাবের সংস্পর্শে এসে, যেটুকু ব্যক্তিগত অহন্তা তখনও ছিল, তা-ও নিবেদিতা নিঃশেষে মুছে ফেললেন। সাধারণ্যে যে-সব ভাষণ দিতেন তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠত এটা। বলতেন, 'তোমাদের মানুষ হতে শেখার বলে আমি এসেছি। তোমাদের রামায়ণ-মহাভারতকে প্রত্যক্ষ করে তোল আজ। রামায়ণ একবার দেখা দিয়েই চলে গেছে, তার সমাজ মরে গেছে—এ তো সত্য নয়। আবার তোমাদের নিজের রামায়ণ নিজে রচনা কর—রূপকথায় নয়, দেশমাতৃকার সেবা করে, তাঁর কাজ করে।' (সোসিওলজিক্যাল রিভিউ, জুলাই, ১৯১৩)।

অথচ ধর্মাচার্য হয়ে না ওঠেন সেদিকে নিবেদিতার কড়া নজর থাকত। তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, 'এদেশের দীন হতে দীনতম যে সে-ও এ-বিষয়ে বেশী জানে আমার চেয়ে।' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তিনি ছিলেন লোকমাতা। আমাদের সময়, অর্থ এমন কি জীবনও আমরা দান করেছি কিন্তু আজও হৃদয়টি উজাড় করে দিতে পারিনি। এমন একান্ত সত্যরূপে, এত কাছে গিয়ে জনসাধারণকে জানবার সামর্থ্য আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি…'

(সোসিওলজিক্যাল রিভিউ, জুলাই, ১৯১৩)

মাসিক বসুমতীর মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে……………………২৪৲

ষাণ্মাসিক „ „ ……………………১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়)……২৲

ভারতে (ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲

ষাণ্মাসিক সডাক „ ……………৭৷৷০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে………১৷৫০

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ……১৭৷৷০

ষাণ্মাসিক „ „ „ ……৯৷৫০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ মাশুল সহ……১৷৫০

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

নিবেদিতার কাছে হিন্দু মাত্রেই তাঁর ভাই, কিংবা তার চেয়েও বেশী—ভারতমাতার সন্তান তারা। রাজনীতিতে অনেকে যখন তাঁকে গুরু বলে বরণ করত, নিবেদিতা আপত্তি করতেন না। ওতে কিছুই যায়-আসে না তাঁর। যে-উদ্দীপনা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাতে এমন একটা সম্বন্ধ গড়ে ওঠা অনিবার্য। এর সুযোগ নিয়ে নিজেকে এক নব ধর্মের 'শিবদূতী' করে তুলেছিলেন তিনি। বলতেন, 'ধর্ম হল সত্তার উপাদান, জীব আর জগতের সর্ব্বস্ব।' কথাটা ফোটাতে গিয়ে স্বামীজির ভাষ্যের আশ্রয় নিতেন: 'জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ মানতে বাধ্য হয় তার ধর্মকে তার পরিবারকে, যে-সমাজ তার আশ্রয় তাকে, যে-গ্রাম তাকে লালন করছে, যে দেশকে সে শ্রদ্ধা করে—তাদেরও। এদের জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত হয়। একটা আদর্শের স্বপ্নেই মানুষ বেঁচে থাকে। সুদূরের পিপাসার প্রাত্যহিকের গণ্ডী সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যায় এবং অবশেষে বহুর মাঝে একেকে সে উপলব্ধি করে। এই প্রয়াস, অন্তরের সমস্ত সংবেগ আর শক্তি নিয়ে প্রাণের এই উন্নয়নকেই বলি ধর্ম। ওরই গর্ভে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন রূপরূপে সংহত হয়ে আছে।'

এ নিয়ে নিবেদিতা স্বামীজিকে বহু প্রশ্ন করেছেন। দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের মতবাদ আর নিবেদিতার শিক্ষার মধ্যে যে ঐক্য তার মূল এইখানে। স্বামীজি বলেছিলেন, 'নতুন যুগ ভিতরের তাগিদেই মাথা তুলবে।' বিদেশের আমদানী জাতীয়তার আদর্শ আর ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের মাঝে ভাবনা ও উদ্দেশ্যের যে মৌল বিরোধ তার সম্বন্ধে নিবেদিতা সজাগ ছিলেন। এই কালান্তরের অধ্যায়ে উপনিষদের বীর্যের আদর্শ নিয়ে ধর্মকে লোকায়ত্ত করবার জন্য তার একটা নতুন ব্যাখ্যা নিবেদিতা দিতেন। বলতেন, 'প্রতীচ্যের কাছে "সভ্যতা" যে-বস্তু, ধর্ম আমাদের তাই, ওই হল জীবনের লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থকেই চরম মর্য্যাদা দেবার একটা প্রয়াস। স্বপ্রতিষ্ঠ ধর্মের কাজই তাই। এ কথাটা কোন মতেই ভুল না যে, ভারতবর্ষের ভিৎটা দাঁড়িয়ে আছে ওরই 'পরে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে ছাপিয়ে সবার সাথে যে পরিপূর্ণ একাত্মতা অনুভব করে, কুলধর্মকে যে বিশ্বধর্মে সম্প্রসারিত করতে পারে, ঈশ্বর তারই 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' আর একেই বলে ধর্ম।'

শুধু সাধনার মোহ ছেড়ে মানুষের প্রতি গভীর দরদে সমাজ-সেবায় সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়াটাই আধ্যাত্মিকতা, এই ছিল নিবেদিতার শিক্ষার নূতনত্ব। পারস্পরিক সহযোগিতা আর সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে নিতান্ত মামুলী ভাষায় ছোট-ছোট জোরালো প্রবন্ধ লিখতেন, পাঠকরা সুস্পষ্ট পথের দিশা পেতেন তাতে। 'ধর্মের ব্যাপারে সাধারণতঃ একজন ইউরোপীয়ান পণ্ডিতও যে ছেলে-মানুষী করেন তার তুলনায় একটি হিন্দু-চাষাকে দস্তুরমত বিদগ্ধ বলে মনে হয়। আবার পৌর অধিকারের ব্যাপারে একটি নগণ্য ইউরোপীয়ানও যা বিতর্কাতীত এবং অপরিহার্য বলে জানে এদেশের নেতৃস্থানীয় লোক বা রাজনীতিবিদ্‌দের তা চোখেই পড়ে না।'

(রিলিজিয়ন ও ধর্ম পৃঃ ৩১)

ভারতবর্ষে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলবার সমস্যাটা নিবেদিতা উপস্থিত করেন সবার সামনে। 'আধুনিক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করবার মত শক্তি কি হিন্দু ধর্ম রাখে? আমরা বলি, হাঁ। হিন্দুর সমস্ত অভ্যাস ও আচারের উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সার্বভৌম বিরাট বেদান্ত-দর্শন। যে-কোনও ধর্মানুষ্ঠান বা যে-কোনও সমাজ-সংগঠন পরিকল্পনার উপযোগিতা যাচাই হতে পারে ঐ দর্শন দিয়ে, তাদের সভ্যতার নজীরও মিলবে ঐখানে।'

ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞানকে অঙ্গীভূত করে ধর্মের এই নতুন আদর্শ এ দেশে সাদর অভ্যর্থনাই পেল, এ নিয়ে খুব আলোচনাও হতে লাগল। এ-ধরণের তর্ক-বিতর্কে নিবেদিতা উৎসাহ দিতেন, আপত্তি যা উঠত তার জবাব দিতেন। উদাসী শিবের স্তব্ধ পৌরুষ হতে উছলে পড়ছে ভৈরবী শক্তির উল্লাস, নিবেদিতার কাছে জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা এই রকম *। বলতেন, 'নিজেকে যে বিশ্বধর্মে দীক্ষিত করে সে শিবস্বরূপ, তার প্রভাব অসামান্য। সেইজন্য ব্যক্তিগত ভাবে অতি-কঠোর কতগুলো সংযম তাকে অভ্যাস করতে হয়, ওকে বলে চিত্তশুদ্ধির সাধনা।' প্রায়ই এ কথাগুলো বলতেন। হিন্দুর জন্য একটি মাত্র পথ—সে পথ ধর্মের। গীতার শেষ শ্লোকে এইটিই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে:

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

খুব উঁচু ভাব। ধর্ম স্বয়ংই যে 'জাতীয়তা'র শ্রেষ্ঠ প্রতীক, হিন্দুরা এটা তখনও ধারণা করে উঠতে পারেনি। স্বামীজিও এ নিয়ে কিছু বলেননি। তাই এ-ভাবকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা কঠিন কাজ। এ দেশের কোন্ ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবেদিতা খাপ খাওয়াবেন নিজেকে? মনের মধ্যে আবছা একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে, স্বামীজির প্রচারিত প্রয়োগসিদ্ধ জীবন্ত ধর্মকে জাতীয়তার আদর্শে রূপান্তরিত করতে হবে। ধীরে ধীরে এ রূপান্তর মূর্ত হয়ে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ হল। পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে হঠাৎ এই নবধর্ম গ্রাম নগর সমাজ সব-কিছুকে গ্রাস করল যেন। ব্যষ্টির লক্ষ্য সমষ্টির আদর্শ হয়ে উঠল। ধর্ম আর ভারতের 'জাতীয়তা'র অর্থ এক হয়ে গেল।

ভারতবর্ষ একটা "ন্যাশন!" চমক-লাগানো ভাবনা বটে! এ-ভাবনাকে জিইয়ে রাখতে হলে যে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ভারত কি তা করতে পারবে? স্বদেশের পূর্ণমহিমা প্রকট করতে, স্বাধীনতা অর্জন করতে যে-পরিমাণ ত্যাগ চাই, তা-ও? দেখতে দেখতে দেশমাতৃকা দিব্যস্বরূপা জগদ্ধাত্রী মূর্তি ধরলেন, সাগর তাঁর মেখলা, মালাবারের রাঙামাটি আর গঙ্গার ধূসর পলিতে, পাঞ্জাবের গেরুয়া বালি আর কাশ্মীরের শুভ্র তুষারে তাঁর বিচিত্র পরিচ্ছদ। মানুষের মন ভোলাতে মন্দিরে-মন্দিরে মা ষোড়শোপচারে পূজা নিতে লাগলেন। নিবেদিতা বললেন 'অজ্ঞেয় এক ব্রহ্মের দাস না হয়ে এস দেশমাতৃকার দাসত্ব করি আমরা। পূজাবেদির জায়গায় গড়ে তোল কলকারখানা আর বিশ্ববিদ্যালয়। দেবতাকে নৈবেদ্য না দিয়ে মানুষের সেবা কর। শিখিয়ে-পড়িয়ে তাদের মানুষ করে তোল। কর্মসন্ন্যাস যারা ঈশ্বরোপাসনায় আপনাকে উৎসর্গ না করে এস জ্ঞানার্জনের জন্য আমরা প্রাণপাত করি, মানুষের মনে সহযোগিতা আর সংগঠনের ভাব জাগিয়ে তোলবার জন্য লড়াই করে চলি। আমাদের গোঁড়ামী রূপান্তরিত হ'ক

* রিলিজিয়ন ও ধর্ম পৃঃ ১১৩

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ষোল

আমি তাকিয়েছিলাম দেওয়ালে টাংগানো পাশাপাশি অয়েল পেন্টিং দু'টোর দিকে।

সোমলতা আর বনলতা শিল্পী রণধীর চৌধুরীর দুই মেয়ে। টুইন্—যমজ বোন। এবং ওদেরই একজনের ছেলে শতদল। কিন্তু শতদল কার ছেলে বনলতা না সোমলতার! শশাঙ্ক চৌধুরীর ছেলে রণধীর চৌধুরী আর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী।

হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে আরো যেন তাঁর কিছু বলবার আছে কিন্তু তিনি যেন বলতে পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে কিরীটির দিকে তাকালাম। গভীর কোন চিন্তার মধ্যে যেন ও ডুবে আছে। হস্তধৃত জলন্ত সিগ্রেটটা নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। কোন একটা বিশেষ চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কিন্তু সেটা কি! হিরণ্ময়ী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কি এমন সে পেল চিন্তার খোরাক। শতদল-রহস্য-কাহিনীর কোন সূত্র কি সে খুঁজে পেল? একটু আগে রাস্তায় আসতে আসতে কিরীটি বলেছিল, অন্ধকারে সে আলো দেখতে পেয়েছে। মাত্র একটি জায়গায় সূত্র এসে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে পারলেই সব বোঝা যাবে। হিরণ্ময়ী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কি সেই সূত্রটিই ও খুঁজে পেল? আমি ত কই কিছুই এখনো ভেবে পাচ্ছি না। কেন শতদল বাবুর প্রাণের 'পরে এমনি বার বার প্রচেষ্টা হলো। আর কেই বা তাকে বার বার হত্যা করবার চেষ্টা করছে?

আচমকা কিরীটির কণ্ঠস্বরে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল।

'এইটুকুই কি আপনার বলবার ছিল হিরণ্ময়ী দেবী? আর কি কিছুই আপনার বলবার নেই?'—কিরীটির দু'চক্ষুর শানিত দৃষ্টি সম্মুখে উপবিষ্ট হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের 'পরে স্থির নিবদ্ধ।

'য়্যা!'—হিরণ্ময়ী যেন চমকে উঠলেন।

'আপনার কি বলবার আর কিছুই নেই?'

'না!'—ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো একটি মাত্র শব্দ।

'আপনি ত কই এখনো বললেন না আপনার স্বামী কবিতা দেবীর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন?'

'আমি যতদূর জানি আমার স্বামী এ দু'দিন মোটে বাড়ি থেকে বেরই হয়নি।'

'হাঁ। আপনার জানিত ভাবে বের হননি এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি যে গিয়েছিলেন এটাও ঠিক। কারণ দৈবক্রমে তাঁর হাতের আংটির পাথরটা সেখানে খসে পড়ে গিয়েই সেখানে যে তিনি গিয়েছিলেন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে হিরণ্ময়ী দেবী! এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করেও ত উপায় নেই। দৈবই যে প্রতিকূল!'

'কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমার স্বামীর শতদলকে হত্যা করবার কোন কারণই নেই এবং তিনি তা করবার চেষ্টাও করেননি।'

'আমি বিশ্বাস করি হিরণ্ময়ী দেবী, হরবিলাস বাবু সে কাজ করেননি কিন্তু তিনি যে শরৎ বাবুর বাসায় গিয়েছিলেন যে কোন কারণেই হোক সেটা আমার স্থির বিশ্বাস।—এবং অনুমান যদি আমার মিথ্যা না হয় ত হরবিলাস বাবু আপনার জ্ঞাতসারেই সেখানে গিয়েছিলেন!'

কিরীটির স্পষ্টাস্পষ্টি অভিযোগেও হিরণ্ময়ী দেবী নিঃশব্দে বসে রইলেন। কোন সাড়া দিলেন না।

'আমার কি বিশ্বাস জানেন হিরণ্ময়ী দেবী!'—কিরীটি আবার কথা বললে।

হিরণ্ময়ী কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

'দুতরূপেই মিঃ ঘোষ কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং সে কথা কবিতা দেবীর কাছ হ'তে বের করতে আমার বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু আমি চাই আপনিই সব কথা আমাকে খুলে বলুন!'

'আমি কিছু জানি না!'—হিরণ্ময়ী দেবীর সমস্ত মুখখানা যেন পাথরের মত কঠিন মনে হয়।

'তাহ'লে একান্ত দুঃখের সঙ্গেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এর পর আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর আমাদের দ্বিতীয় পথ থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি নিজের মুখেই ত একটু আগে বললেন যে, আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার প্রচেষ্টার ব্যাপারে নির্দোষ।'

'তা বলেছি। তবে তাঁকে ঘিরে যে সন্দেহ জমে উঠেছে সেটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে মুক্তি দেওয়াও ত সম্ভব নয়! আপনিই বলুন না?—শুনুন হিরণ্ময়ী দেবী! আমি জানি এ-সব কিছুর মূলে কে!'

বিদ্যুৎ চমকের মতই হিরণ্ময়ী কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন: 'আপনি! আপনি জানেন!'

'হাঁ। জানি।'

'তবে! তবে আপনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

'ব্যস্ত হবেন না। সময় হলে আপনা হতেই তাকে হাজতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

'কিন্তু—'

'আপনার কাছে আমি যা জানতে চাইছি বলুন!'

'কি বলবো?'

'বলুন কেন সেদিন আমাদের কাছে আপনি মিথ্যা বলেছিলেন যে, স্বর্গত রণধীর চৌধুরীর দ্বিতীয় মেয়েটির কথা আপনি কিছু জানেন না! সোমলতা আর বনলতা তাদের সমস্ত কথা এখনো আপনি বলেননি!—বলুন!'

'বনলতা আর সোমলতা দু'জনেই মারা গেছে!'

'শতদল বাবু কার ছেলে?'

'সোমার!'

'আর বনলতার স্বামীই বা কে? আর তার সন্তান ক'টি?'

'বনলতার স্বামীর নাম ডাঃ শ্যামাচরণ সরকার!'

হিরণ্ময়ী দেবী কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটির সমস্ত সত্তা যেন সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সজাগ হ'য়ে ওঠে। উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে: 'কি! কি বললেন?'

'ডাঃ শ্যামাচরণ সরকার!—বনলতার স্বামী!—'

'কোন্ শ্যামাচরণ সরকার?—অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাচরণ সরকার কি?—'

'হাঁ!—'

কিরীটির চোখে-মুখে ক্ষণপূর্বে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল সেটা যেন আবার নিবে এলো। সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে: 'তাহ'লে! তাহ'লে হরবিলাস বাবু কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন কেন?'

'আপনাকে ত আমি বললাম আমার স্বামী সেখানে যাননি। এবং কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নেই!—'

'তা হ'তে পারে না। simply absured! একেবারে অসম্ভব!—নিশ্চয়ই হরবিলাস বাবু কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং তিনি শতদল বাবুকে নার্সিং-হোমে ফুল ও মিষ্টি পাঠাতে বলেও এসেছিলেন এ-ও সত্যি। কিন্তু এইটাই বোঝা যাচ্ছে না কেন? কেন! কেন তিনি ও-কথা কবিতা দেবীকে বলতে গেলেন?—' তারপর একটু থেমে কতকটা আত্মগত ভাবেই বললে: আর! আমার অনুমান যদি মিথ্যা হয়—তাহ'লে—কিরীটি শেষের কথাগুলো খুব ধীরে যেন উচ্চারণ করল এবং পরক্ষণেই হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে: 'আপনার স্বামীর হাতের আংটিটা কত দিন ওঁর হাতে আছে বলতে পারেন?'

'তা দশ-বার বছর ত হবেই!—'

'বলতে পারেন আপনার স্বামীর হাতের আংটিটার পাথরটা যে তাঁর আংটিতেই আছে শেষ বারে আপনার নজরে পড়েছিল?—'

'সীতার মৃত্যুর আগের দিনও আংটির পাথরটা ঠিক ছিল যেন দেখেছি বলেই মনে হয়!—'

'তাহ'লে আর কি হবে। চল্ সুব্রত, ওঠা যাক!—' আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটি বললে।

কিরীটিই প্রথমে কক্ষ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় এবং আমিও উঠে দাঁড়াই।

আমাদের কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে হিরণ্ময়ী বলে ওঠেন: 'কিন্তু আমার স্বামী?'

কিরীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে: 'আংটির পাথরের ব্যাপারটা যতক্ষণ না মীমাংসিত হচ্ছে আপনার স্বামীকে হাজতে নজরবন্দী থাকতেই হবে হিরণ্ময়ী দেবী! আমি দুঃখিত।'

'বিনা দোষে আমার স্বামীকে হাজত বাস করতেই হবে?—'

'দোষের কথা ত এখানে নয়। সন্দেহ ক্রমে—'

অতঃপর হরবিলাসকে সঙ্গে নিয়েই আমরা নিরালা থেকে বের হ'য়ে এলাম। পথে বের হ'য়ে কিরীটির নির্দেশ ক্রমে দু'জন সেপাইয়ের হেফাজতে হরবিলাসকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে' কিরীটি ঘোষাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে: 'চলুন আর একবার শরৎ উকিলের বাসাটা ঘুরে যাওয়া যাক!'

'এখুনি?—বেলা অনেক হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে গেলে হতো না?—' প্রশ্নটা করলেন রসময় ঘোষাল থানা-অফিসার।

'না। শুভস্য শীঘ্রম্!—' কিরীটির কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

সহরের পথে চলতে চলতে আমি একটা কথা কিরীটিকে না স্মরণ করিয়ে দিয়ে পারলাম না। নিরালার উপরের ঘর যার তালা ভাঙ্গা ছিল সে ঘর দেখা হলো না।

কিরীটি মৃদু কণ্ঠে বললে: 'ব্যস্ততার কি আছে? দেখলেই হবে।'

বেলা তখন প্রায় একটা হবে।

মধ্যাহ্ন সূর্য মাথার উপরে প্রচণ্ড তাপ বর্ষণ করছে। কিরীটির দ্রুত পদবিক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল মনে মনে সে যেন বিশেষ কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হ'তে চলেছে। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, কিরীটি যখন কোন একটা জটিল ব্যাপারে মীমাংসার কাছাকাছি আসে তার চাল-চলন কথাবার্তা এমনি দ্রুত ও ক্ষিপ্র হ'য়ে ওঠে। তার অত্যন্ত ধীর-স্থির ভাব যেন সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

ঠিক দ্বিপ্রহরে ঐ দিনই দ্বিতীয় বার আবার আমাদের তাঁর ওখানে আসতে দেখে কবিতা দেবী বেশ যেন কিছুটা বিস্মিতই হন।

শরৎ বাবু বাসায় ছিলেন না। একটু আগে আদালতে বের হ'য়ে গিয়েছেন।

কবিতা দেবী আমাদের বসতে বললেন।

'আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হলো কবিতা দেবী—' কিরীটিই কথা শুরু করে।

'না। না—এর মধ্যে বিরক্তের আর কি আছে?—'

'ঘোষাল সাহেব হরবিলাস বাবুকে শতদল বাবুর হত্যা-প্রচেষ্টার ব্যাপারে এ্যারেষ্ট করেছেন কিছুক্ষণ আগে—'

'সে কি!—হরবিলাস বাবু?—'

'হাঁ! তবে তার মুক্তির ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনার evidenceএর উপরে—'

'আমার evidenceএর উপরে?—'

'হাঁ!—'

'কিন্তু আমি ত আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!—'

'হরবিলাস বাবু বলতে চান যে তিনি আপনার কাছে গত পরশু এসে শতদল বাবুকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাতে বলেননি।

অথচ ঘোষাল সাহেবের ধারণা তিনিই এসেছিলেন—।' কিরীটি জবাব দিল।

'কিন্তু আমি ত বলিনি যে হরবিলাস বাবু এসেছিলেন?—' একটা ঢোক গিলে কবিতা জবাব দেন।

'তিনি যদি না-ই এসে থাকবেন তাহ'লে তাঁর হাতের আংটির পাথরটা আজ সকালে আপনার এই ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া গেল-কি করে?—' কথাটা বললেন ঘোষাল।

'আংটির পাথর কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে এই ঘরে?—'

'হাঁ!—'

'কে পেয়েছেন?—'

'মিঃ রায়!—'

'সত্যি?—' কথাটা বলে কবিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

'হাঁ।—'

'কই দেখি সে পাথরটা?—'

কিরীটি একান্ত নির্বিকার ভাবেই যেন জামার পকেট হ'তে হাত ঢুকিয়ে প্রবাল পাথরটা বের করে কবিতার চোখের সামনে ধরল।

'আশ্চর্য! এই ত এটা ত আমার আংটির পাথরটা। কাল কখন আংটি থেকে পড়ে গিয়েছে খুঁজে পাচ্ছিলাম না!—'

'আপনার আংটির পাথর! কই আপনার আংটিটা কই?—'

'আংটি হ'তে পাথরটা পড়ে যাওয়ায় আংটিটা আজ সকালেই বাক্সে তুলে রেখেছি।—'

'দয়া করে আংটিটা আনবেন কি?—'

'নিশ্চয়ই—' কিরীটিকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় না দিয়ে কবিতা উঠে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাথরহীন একটা আংটি নিয়ে এল।

'এই দেখুন!—'

কিরীটি আংটিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আড় চোখে একবার কবিতার দিকে তাকিয়ে বললে: 'কিন্তু এ আংটিটা ত আপনার হাতের আঙুলে fit করবার কথা নয় কবিতা দেবী? এটা কার আংটি?'

'কেন! আমার!—'

'উহুঁ! কই পরুন ত—'

এবারে কবিতা দেবী যেন একটু বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। একটু বিহ্বল। হতচকিত।

'অবিশ্যি আংটিটা একটু আঙুলে আমার বড়ই হয়—'

'তাই ত বলছিলাম। সত্য করে বলুন ত আংটিটা কার?—'

'আমারই—'

'না! কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে আংটিটা দিয়েছেন! তাই নয় কি কবিতা দেবী!—'

'হাঁ—' নিম্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন কবিতা।

'কে! কে দিয়েছেন?—'

'ক্ষমা করবেন কিরীটি বাবু! ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত—'

'হুঁ!—'

অতঃপর কিরীটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে।

'পরশু কে আপনাকে এসে বলেছিলো শতদল বাবুকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাতে নার্সিং-হোমে!—'

'তাকে চিনি না। দেখিনি কখনো!'—

'দেখতে কেমন?—'

'বয়েস পঞ্চাশের নীচে হবে বলে মনে হয় না। মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল! একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছিল!—'

'নাম কিছু বলেনি?—'

'না! জিজ্ঞাসা করিনি!—'

'কোথা হ'তে আসছে তা বলেনি?—'

'হাঁ, বলেছিল নার্সিং-হোম থেকেই। সেখানেই নাকি কাজ করে!—'

'আচ্ছা কবিতা দেবী—বিখ্যাত সুইমার কুমারেশ সরকারের নাম শুনেছেন?—'

কিরীটির আচমকা বিষয়ান্তরে গিয়ে সম্পূর্ণ ঐ নতুন প্রশ্নে কবিতা প্রথমটা বোধ হয় একটু কেমন বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে এবং ক্ষণকাল কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়: 'নাম শুনেছি। কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই।'

কিরীটি এর পর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে: 'আচ্ছা তাহ'লে চলি। নমস্কার।—'

হোটেলে প্রত্যাগমন করে আহারাদির পর কিরীটি দেখলাম ঘরের মধ্যে একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে চোখ বুজলো।

আমি একটা বাংলা বই নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। সারা সকাল হাটাহাটির ক্লান্তিতে কখন দু'চোখের পাতা বুজে এসেছিল টের পাইনি।

ঘুম ভাঙ্গল একেবারে সন্ধ্যার দিকে। তাড়াতাড়ি শয্যার 'পরে উঠে বসতেই নজরে পড়ল কিরীটি নিঃশব্দ অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে। এবং হাতে তার শতদল বাবুর নিকট হ'তে চেয়ে নিয়ে-আসা রণধীরের চিত্রাঙ্কিত চিঠিটা।

'চা খেয়েছিস?—' প্রশ্ন করলাম।

'বাবাঃ! ঘুম ভাঙ্গল তোর!—'

'হাঁ! খুব ঘুমিয়েছি নাকি?—'

'না। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা!—চল্, চা খেয়ে একটু বেরুন যাক—'

আগে শয্যা হ'তে উঠে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালালাম। তারপর বেরিয়ে গিয়ে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে দেখি, চেয়ারটার উপরে উপবেশন করে সেই চিত্রাঙ্কিত হিজিবিজি-মার্কা চিঠিটা কিরীটি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে।

'ব্যাপার কি তোর বল্ ত কিরীটি! চিঠিটার মর্মোদ্ধারের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিস নাকি?—'

'মর্মোদ্ধার হ'য়ে গিয়েছে এবং 'নিরালা'র রহস্যের উপরেও কাল প্রত্যূষেই যবনিকা পাত—'

'সত্যি?—'

'হ্যাঁ!—'

চা পান করে দু'জনে হোটেল থেকে বের হলাম।

পথে নেমে কিরীটি বললে: চল্, একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঘোষাল সাহেব থানাতে ছিলেন না। কাছে-পিঠেই নাকি কোথায় এনকোয়ারীতে গিয়েছেন। এ. এস্. আই রামকিঙ্কর ওঝা ছিলেন। খস্‌খস্ করে কাগজ ও পেন দিয়ে একটা চিঠি লিখে চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে সেটা ওঝার হাতে দিয়ে আমরা থানা হ'তে বের হয়ে এলাম। বুঝতে পারছি কিরীটির বাইরের শান্ত ভাবটা একটা মুখোস মাত্র। ভিতরে তার যে ঝড় চলেছে সেটাকে সে চাপা দিতে পারছে না। এবং রহস্যের মীমাংসার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেচে বলেই নিজেকে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে বাইরে ধীর ও শান্ত থাকবার জন্ত।

শামুকের মত নিজেকে ও এখন গুটিয়ে রেখেছে। হাজার খোঁচাখুঁচি করলেও এখন ও মুখ খুলবে না। এ যেন ওর রহস্যের মীমাংসার শেষ চৌকাঠের সামনে এসে নিঃশব্দে শক্তি সঞ্চয় করা। ঘণ্টাখানেক প্রায় সমুদ্রের কিনারে কাটিয়ে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। এবং হোটেলে পৌঁছেই আমাকে কোন কথার অবকাশ মাত্র না দিয়ে কিরীটি দোতলার দিকে চলে গেল।

আমি দ্বিপ্রহরের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে চেয়ারে বসলাম।

উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম, হোটেলের ওয়েটারের ডাকে খেয়াল হলো।

'সার! আপনাদের খানা কি ঘরে দিয়ে যাবো!—'

'খানা! হ্যাঁ—নিয়ে এসো!—'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে নয়টা। আশ্চর্য! এখনো কিরীটি ফিরল না। উঠে ডাকতে যাবো কিরীটি এসে ঘরে প্রবেশ করল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?—'

'সমুদ্রের ধারে রাণু দেবীর সঙ্গে গল্প করছিলাম!—'

'এতক্ষণ ধরে কি এমন গল্প করছিলি?—'

'গল্প নয়, শুনছিলাম। এক প্রেমের জটিল উপাখ্যান!—'

'কার, রাণুর?—'

'হাঁ—তা নয় ত কি হিরণ্ময়ী দেবীর!—'

ওয়েটার ট্রেতে করে খানা সাজিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

খানা খাবার পর কিরীটি চেয়ারে শুয়ে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগ করল।

শয়নের জোগাড় করছি কিরীটির কথায় ফিরে তাকালাম: উহুঁ! এখন নয়।

'তার মানে?—'

'এখন একবার বেরুতে হবে!—'

'এত রাত্রে আবার কোথায় যাবি?—'

'নিরালায়—'

(আগামী মাসে সমাপ্য)

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাংবাদিক গার্ডিনার লিখিয়াছেন—বিখ্যাত সাংবাদিক আপনাকে নিশ্চিহ্ন করার মূল্যে সাফল্য অর্জ্জন করেন; তিনি তাঁহার সময়ের এবং সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিস্মৃত হ'ন—"He who browses on his glory while it is green does not garner it when it is ripe." সাহিত্যিক, কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতির সৃষ্টির গৌরব সকল কালের জন্য এবং সময় সময় কালজয়ী; কিন্তু সাংবাদিক যে সময়ের লোক সেই সময়ের জন্যই তাঁহার কাজ। সেই জন্যই যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে মাদ্রাজের সাংবাদিক পরমেশ্বরন্ পিল্লাই "ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক" অর্থাৎ প্রথম সফল ও খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় সাংবাদিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহার কৃতকর্ম্মের গৌরবও আজ অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে তিনি শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে কিরূপ প্রশংসিত ছিলেন তাহার প্রমাণ—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন ৩৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে পার্শী ফ্রামজী বোমানজীর লিখিত তাঁহার জীবনকথা (Lights and Shades of the 'East') পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকার তাঁহাকে শিক্ষিত ভারতীয়ের আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দিগের অনুকরণ জন্য হরিশচন্দ্রের কর্ম্ম-বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। তখনও বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলপথ রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং বোম্বাই নগরে নানা প্রদেশের সংবাদ-পত্রাদি পাওয়া যায় এমন পুস্তকাগারও ছিল না। সেই সকল কারণে লেখককে তাঁহার পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতেও সে কার্য্যে বিরত হ'ন নাই। হরিশচন্দ্রের কার্য্যে তাঁহার শ্রদ্ধাই তাহার কারণ। হরিশচন্দ্রের বিস্ময়কর জীবনকথা আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"যে বালক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া দারিদ্র্যহেতু বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অর্থার্জ্জনের চেষ্টায় যে স্থানেই গিয়াছিল তথায়ই উপহাস ও প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়া নিলামঘরে মাসিক দশ বা বার টাকা বেতনে নকলনবিশের কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল—সে-ই খ্যাতিসম্পন্ন জননেতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশে শোকোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছে। তিনি আজ জাতির স্মারক স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত—দেশবাসী বংশ-পরম্পরায় তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিবে।"

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখে) কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে মাতুলালয়ে হরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামধন দরিদ্র কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৌলীন্য প্রথা যত সদুদ্দেশ্যেই কেন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকুক না, তাহা নানারূপ বিকৃতিতে নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই জন্য চলিত কথায় কুলীনদিগকে বলা হইত:—

"তুই জাতকুলীনের ছেলে;
তো'কে গাল দিব কি ব'লে?"

কিন্তু হরিশচন্দ্র, হয়ত বার্ণার্ড শ যে কারণে ঐ প্রথার সমর্থন করিয়াছিলেন সেই কারণেই, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের পত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" তাঁহার পিতার কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে বংশগৌরবের গর্ব্ব বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা ছিলেন—"জাতির মধ্যে হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, কুলীনের মধ্যে ফুলিয়া মেল।" অর্থাৎ সকল দিকেই শ্রেষ্ঠ।

হরিশচন্দ্র, তাঁহার অগ্রজ হারাণচন্দ্রেরই মত, মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তিনি পল্লীস্থ পাঠশালায় প্রেরিত হ'ন এবং সাত বৎসর বয়সে স্থানীয় "ইউনিয়ন স্কুলে" প্রেরিত হইয়া তথায় ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে বালক হরিশচন্দ্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন, হরিশচন্দ্রের মাতুল-পরিবার একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না—হরিশচন্দ্র স্বাবলম্বনের কামনায় ও প্রেরণায় অল্পবয়সে অর্থার্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ছাত্রাবস্থায়—তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র তখন—এক মদমত্ত বিদেশী নাবিক লোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে তিনি সমবয়স্ক ছাত্রদিগের সহিত একযোগে তাহাকে এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, সে পলায়নপর হইয়াছিল।

হরিশচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনার বিবরণ রাজনারায়ণ বসু দিয়াছেন—

এক বার হরিশচন্দ্র ও তাঁহার এক বন্ধু রেলে যে কামরায় যাইতেছিলেন, তাহাতে এক জন (য়ুরোপীয়) সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। কর্ম্মচারীটি হরিশচন্দ্র যে বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন, তাহাতে বসিয়া সম্মুখের যে বেঞ্চে বন্ধু ছিলেন, তাহার দিকে এমন ভাবে পদ প্রসারিত করিয়াছিলেন যে পদ বন্ধুর দেহ প্রায় স্পর্শ করিতেছিল। হরিশচন্দ্র বন্ধুকে তাঁহার স্থানে আসিতে বলিয়া স্বয়ং তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে সামরিক কর্ম্মচারীর দিকে পদ প্রসারিত করেন যে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে সেই ব্যক্তিটি সে কামরা ত্যাগ করেন ও বলিতে বলিতে গমন করেন—"Let me be damned if I ever enter a railway carriage without a pair of pistols in my pocket."

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া হরিশচন্দ্র নানা স্থানে চাকরীর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইতে লাগিলেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিবৃত করিয়াছিলেন:—

একদিন হরিশচন্দ্রের গৃহে চাউলও ছিল না। দারুণ বর্ষণ—ছত্রের অভাবে তাঁহার পক্ষে বাহির হইয়া যাইয়া থালা বিক্রয়

করিয়া চাউল আনাও অসম্ভব। এমন সময় কোন জমীদারের মোক্তার আসিয়া তাঁহার দ্বারা একখানি দরখাস্ত লিখাইয়া লইলেন ও পারিশ্রমিক দুই টাকা দিলেন। বিপদের অবসান হইল।

অনন্যোপায় হইয়া বালক হরিশচন্দ্র এক নিলামওয়ালার চাকরী গ্রহণ করিলেন—মাসিক বেতন—দশ টাকা। তখনও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে, ঐ সামান্য বেতন হইতেও কিছু সঞ্চয় করিয়া তিনি অধ্যয়নের জন্য পুস্তক ক্রয় করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া সামরিক হিসাব বিভাগে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে কেরাণীর পদ লাভ করেন এবং সেই বিভাগে ক্রমে মাসিক চারি শত টাকা বেতন লাভ করেন। সেই অর্থ সম্বল করিয়াই তিনি অত্যাচারের ও অনাচারের বিরুদ্ধে, দেশবাসীর জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তখনও সরকারী চাকরীয়াদিগের পক্ষে রাজনীতিক কার্য্যে যোগদান নিষিদ্ধ হয় নাই। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সরকারী কর্ম্মচারীদিগের রাজনীতিক কার্য্যে যোগদানের বিরোধী ছিলেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ছোট লাট সার জন ক্যাম্পবেল সেরূপ কার্য্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, হরিশচন্দ্রের জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার চাকরীর বিরলপ্রাপ্ত অবসরে ৭৫ খণ্ড পুরাতন 'এডিনবরা রিভিউ' পত্র তিন বা চারি বার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আফিসের কাজ শেষ করিয়া প্রতিদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে যাইয়া দুই বা তিন ঘণ্টা কাল সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতেন। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন হরিশচন্দ্র অদম্য উৎসাহে অধ্যয়ন ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কেবল যে ইংরেজী ভাষায় ভাবপ্রকাশে দক্ষতা অর্জন করেন, তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে ও সাধারণ রাজনীতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বক্তৃতা ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। জ্ঞানার্জ্জনের আগ্রহে তিনি সময় সময় ডফের ভাবের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ভবানীপুর হইতে পদব্রজে হেদুয়া দীঘি পর্য্যন্ত আসিতেন। পণ্ডিত শম্ভুনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনার ফলে তিনি আইনজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়া আইনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভও করিয়াছিলেন।

তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিশু পুত্রের ও তাহার জননীর মৃত্যু হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে মদ্যপান প্রচলিত হইয়াছিল এবং হরিশচন্দ্র মদ্যপান করিতেন। যাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রথমে মুদ্রিত হইত সেই মধুসূদন রায় লিখিয়াছিলেন, প্রতি বৃহস্পতি রাত্রিতে হরিশচন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যালয়ে আসিয়া অনেক সময় প্রবন্ধ, সংবাদ, য়ুরোপীয় সংবাদ—সবই লিখিয়া শেষ করিতেন। সে সময় তিনি মদ্যপানে কার্য্যে উত্তেজনা সঞ্চয় করিতেন।

হরিশচন্দ্র প্রথমে কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' পত্রে ও সময় সময় 'ইংলিশম্যান' পত্রে লিখিতেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পুনরায় সনন্দ দানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হরিশচন্দ্রকেই তাহা লিখিবার ভার দিয়াছিলেন।

কলিকাতার বড়বাজার পল্লীস্থ মধুসূদন রায়ের কালাকার ষ্ট্রীটে, একটি ছাপাখানা ছিল। তিনি প্রথম 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। সিমলা ঘোষ-পরিবারের শ্রীনাথ, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় উহার সম্পাদন করিতে থাকেন এবং সে কাজে হরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তখন ভারতীয়-পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রের আদর ছিল না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন স্বাস্থ্যহানি হেতু কলিকাতা ত্যাগ করায় তাঁহার ছাপাখানা বিক্রীত হয় এবং কিছুদিন ভবানীপুরে সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার ছাপাখানায় পত্রখানি মুদ্রিত হয়। তখন হরিশচন্দ্রই 'হিন্দুপেট্রিয়টের' সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন। তিনি ভবানীপুর 'হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস' ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া তাহাতে পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্র তাহার কার্য্য পরিচালিত করিতেন।

তখন সাপ্তাহিক পত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' বার্ষিক মূল্য দশ টাকা মাত্র। কিন্তু তথাপি তাহার গ্রাহক-সংখ্যা শতাধিক হইবে না। সংবাদপত্রখানির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য উল্লেখযোগ্য ছিল না। পত্রখানির প্রকাশস্থান কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে স্থানান্তরিত, হওয়ায় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের সান্নিধ্য হেতু ভবানীপুরে তখন বহু বাঙ্গালী উকীল, আমলা প্রভৃতি বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পল্লী হইতে প্রচারিত পত্রের সমর্থন করিতে থাকায় 'পেট্রিয়টের' আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। তখন বাঙ্গালায় কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ব্যতীত 'হিন্দু পেট্রিয়টের' মত আর কোন ভারতীয়-চালিত পত্র ছিল না। বোম্বাইএ তখন ঐরূপ পত্র—'হিন্দু হার্বিঞ্জার'; মাদ্রাজে—'মাদ্রাজ রাইসিং সান'। তখন বাঙ্গালার বাহিরেও যে হরিশচন্দ্রের পত্রের আদর হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—পাদুকোটার রাজকার্য্য পরিচালক শসিয়া শাস্ত্রী 'পেট্রিয়টের' গ্রাহক ছিলেন। বোম্বাইএ পার্শী কর্তৃক হরিশচন্দ্রের জীবনীরচনায় বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হরিশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতা সহকারে পত্র পরিচালিত করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত কি না তাহা লইয়া যে আলোচনা হয়, তাহাতে হরিশচন্দ্র পুনর্ব্বিবাহের সমর্থন করায় রক্ষণশীল দল তাঁহার বিরোধী হ'ন। তিনি কিন্তু স্বীয় বিবেকবুদ্ধিবশেই কাজ করিতেন। সেই জন্য তিনি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিলেও হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। পাইকপাড়ার (কান্দীর) জমীদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'হিন্দু পেট্রিয়টকে' আর্থিক সাহায্য দিতে চাহিলে হরিশচন্দ্র প্রথমে তাহা গ্রহণে অসম্মত হইলেও—পরে—যখন অক্ষরগুলি পুরাতন হওয়ায় পত্রের ছাপা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন সে সাহায্য অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐ বদান্য পরিবার পরে 'ষ্টেটস্ম্যান'কে অর্থসাহায্য দিয়াছিলেন।

এই সময়ে হরিশচন্দ্র হিন্দুদিগের সভ্যতার সহিত য়ুরোপীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া হিন্দুসভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণ করেন।

হরিশচন্দ্র সুপ্রিম কোর্টের দুই জন প্রসিদ্ধ বিচারকের সরকার-প্রীতির নিন্দা করিতে যেমন দ্বিধানুভব করেন নাই, তেমনই বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর সামন্ত রাজ্যসম্বন্ধীয় নীতি যুক্তি-সহকারে আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সেই বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেমন নির্ভীকতার পরিচায়ক, তেমনই অকাট্য যুক্তিযুক্ত।

ইহার পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ এ দেশে ভূমিকম্পের মত সংঘটিত হয়। ইংরেজের শাসন এ দেশের লোকের সম্বন্ধে অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবল তাহাই নহে, সে শাসন যেমন ক্লাইবের জালিয়াতী, মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের লুণ্ঠনের দ্বারা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তেমনই দেশের লোকের চিরাগত অধিকার সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিনষ্ট করিয়াছিল। দেশে অসন্তোষের বিস্তার অনিবার্য্য হইয়াছিল। ইংরেজ শাসকরা মিথ্যা উক্তি করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। যে টোটা সিপাহীদিগকে দন্তে কাটিতে হইত, তাহা গো-শূকরের চর্ব্বিতে ভিজান হইত, অথচ বলা হইত, তাহা নহে! লর্ড রবার্টস স্বীকার করিয়াছেন—

Incredible disregard of the soldiers' religious prejudices was displayed...When the sepoys complained....they were solemnly assured by their officers that they (the cartridges) had been greased with a perfectly unobjectionable mixture!"

যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন ইংরেজরা অত্যাচারের দ্বারা বিদ্রোহীদিগকে পিষ্ট করিয়া বিদ্রোহ দলিত করিবার চেষ্টা করিলে, বড়লাট লর্ড ক্যানিং দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেও অসঙ্গত অত্যাচার-দ্যোতক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাহাতে তিনি ইংরেজদিগের বিরাগভাজন হন। হরিশচন্দ্র বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন না; কিন্তু তিনি জানিতেন, অত্যাচারের দ্বারা কখন অনাচারও দলিত করা যায় না। সেই জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন, সরকার যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন না করেন।

কলিকাতায় য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীরা ভয়ে বুদ্ধি হারাইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপীয় মহিলারা গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা জীবনে কখন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে নাই, তাহারাও আগ্নেয়াস্ত্র না লইয়া বাহির হইত না। হরিশচন্দ্র তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্বের পূর্ব্বে প্রস্তাব করা হয়, কোন ভারতীয় যেন আগ্নেয়াস্ত্র রাখিতে না পায়েন। হরিশচন্দ্র এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।

সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে ইংরেজরা যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা পৈশাচিক বলিলে অসঙ্গত হয় না। ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই এই কয় দিনে এলাহাবাদে প্রায় ৮ শত লোককে ফাঁসী দেওয়া হয়। গঙ্গার উভয় কূলে গ্রামবাসীদিগকে—অপরাধীদিগকেই নহে—নির্বিচারে নিহত করা হয়। গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করা হয়। হরিশচন্দ্র অসীম সাহসে এই সব অত্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বড়লাটকে দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাব বুঝাইয়া দেন। যখন শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', কলিকাতার 'ইংলিশম্যান,' বোম্বাই নগরের 'বম্বে গেজেট'—একযোগে ভারতীয়দিগের প্রতি অত্যাচারের সমর্থন ও সরকারকে অত্যাচারে প্ররোচিত করেন, তখন হরিশচন্দ্র একক তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের কার্য্যের অনিষ্টকারিতা ও বর্ব্বরতা বুঝাইয়া দিবার কাজ করিতে থাকেন। তিনি বাগ্মিবর বার্কের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন—"In all disputes between the people and their rulers the presumption is at least upon a par in favour of the people."

বড়লাট লর্ড ক্যানিং পরামর্শের জন্য হরিশচন্দ্রের পত্রের উপর কিরূপ নির্ভর করিতেন, একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—যে দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হইবে, সে দিন লাটভবন হইতে অশ্বারোহী ভৃত্য যাইয়া পত্রের জন্য হরিশচন্দ্রের দ্বারে অপেক্ষা করিত—পত্র প্রকাশমাত্র তাহা লর্ড ক্যানিংএর জন্য লইয়া যাইতে হইবে।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পিলাই বলিয়াছেন, বড়লাট লর্ড ক্যানিং যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ-সম্প্রদায়ের অসঙ্গত দাবী স্বীকার করেন নাই—ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকাংশে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ কার্য্যের জন্য—'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, তরবার অপেক্ষা লেখনী অধিক শক্তিশালী। এ ক্ষেত্রে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এক দিকে শক্তিশালী বিজেতা শাসক-সম্প্রদায়ের ও তাহাদিগের মধ্যে সামরিক নায়কগণ—আর এক দিকে সামান্য কেরাণী—'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক বাঙ্গালী হরিশচন্দ্র; এক দিকে শক্তিশালী সম্প্রদায়ের উগ্র প্রতিহিংসাপ্রিয়তা,—আর এক দিকে বাঙ্গালী সংবাদপত্র-সম্পাদকের যুক্তিসঙ্গত ন্যায়নিষ্ঠতা; এক দিকে তরবার—আর এক দিকে লেখনী। এক দিকে ক্রোধ,—আর এক দিকে যুক্তি। এই অবস্থায় লেখনীর জয় ন্যায়ের ও যুক্তির জয়। হরিশচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেমের বলে বলী হইয়া যুক্তির সাহায্যে দেখাইয়াছিলেন—ন্যায়নিষ্ঠাই জাতির উন্নতির কারণ—যে স্থানে অন্যায়াচরণশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথায় ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী হরিশচন্দ্র যে কাজ করেন তাহার জন্যই কেহ কেহ তাঁহাকে জাতির রক্ষাকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনিই প্রথম এ দেশে সংবাদপত্রের শক্তি প্রতিপন্ন করেন, সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য যে লোকের প্রকৃত স্বার্থের সংরক্ষণচেষ্টা তাহা বুঝাইয়া দেন।

কাহারও কাহারও মত এই যে, সিপাহী বিদ্রোহ কালে হরিশচন্দ্র সমগ্র ভারতবাসীর যে কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন, অত্যাচারী নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদিগের বিদ্রোহ কালে বাঙ্গালীর তদপেক্ষাও অধিক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় অনিবার্য্য, আর যে সরকারের

অলঙ্কারে শিল্প সৃষ্টি
……আধুনিকতার পরিচয়।
এই বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক নারীর
একান্ত কাম্য। আমাদের
প্রতিটি অলঙ্কার
শিল্প সৃষ্টির বৈচিত্র্যে
সমৃদ্ধ।
এম,
বি,
সরকার
এণ্ড সন্স
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীট জংসন)
ফোন • ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম • ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ
১৫৯।১বি রাসবিহারী এভেনিউ • পি. কে. ৪৪৬৬
প্রখ্যাত অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

নিকট প্রজা তাহার অধিকার দাবী করিতে পারে না, সে সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নীল উদ্ভিদ হইতে ভারতে প্রস্তুত করা হইত।

যেমন শর্করা—ইংরেজী "সুগার" ও ক্রমিজ ইংরেজী "ক্রমজম্" হইলেও নামে উৎপত্তিস্থানের পরিচয় দিতেছে, তেমনই নীলের ইংরেজী "ইণ্ডিগো" নামেই তাহার উৎপত্তিস্থান যে ভারতবর্ষ (ইণ্ডিয়া) তাহা সপ্রকাশ। রসায়নের গবেষণায় কৃত্রিম নীল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষই সর্ব্বত্র নীল রপ্তানী করিত। যখন নীল বিদ্রোহ হয় তখন ভারতবর্ষের কোন্ অংশে কত মণ নীল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইত তাহার তালিকা বিশ্লেষণ করিলে নীলের চাষে বাঙ্গালার স্থান কোথায়, তাহা বুঝা যাইবে—

স্থান			মণ
যুক্তপ্রদেশ	...	...	২১,৬৪৩
বিহার	...	...	৩২,৬১১
বাঙ্গালা	...	...	৪০,৭৬৩
অন্যান্য স্থান	...	...	১০,৯৮২
		মোট	১,০৬,০৮৭

ভারতে উৎপন্ন নীলের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইত—বাঙ্গালা হইতে যে নীল বিদেশে রপ্তানী হইত তাহার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। বাঙ্গালায় যে সকল স্থানে প্রজারা নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদে "হাত কাটিয়া ফেলিলেও নীলের চাষ করিব না" বলিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল, সে সকলের তালিকা ও উৎপন্ন নীলের পরিমাণ এইরূপ :—

জিলা			মণ
যশোহর	...	...	৮,৬৩৫
নদীয়া	...	...	৮,০২৩
মুর্শিদাবাদ	...	...	৪,১১২
রাজসাহী	...	...	৩,৫১২
মালদহ	...	...	২,৭৭৭
ফরিদপুর	...	...	১,৪৮৮
		মোট	২১,৩৪৭

ইংরেজ যে এ দেশে শাসনের সুযোগ লইয়া শোষণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এক কালে যেমন ভারতের রেশমী কাপড় য়ুরোপে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত, তেমনই ভারতের নীল য়ুরোপে বিক্রয় করিলে প্রভূত লাভ হয় দেখিয়া য়ুরোপীয়রা এ দেশে আসিয়া নীলের উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা এই "জল জঙ্গল আঁধার রাতের" দেশে পল্লীগ্রামেও গমন করে। সে সকল স্থানে তাহারা কিরূপ "রাজার হালে" বাস করিত, তাহা কৌতূহলী পাঠক কোলসওয়ার্দী গ্রাণ্ট নামক ইংরেজ লেখকের "বাঙ্গলার গ্রাম্য জীবন" সম্বন্ধীয় সচিত্র পুস্তক পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সেই "রাজার হালে" বাসের ব্যয় যে নীল বিক্রয়ের লাভের একাংশ হইতে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য—অবশিষ্ট লাভ অবশ্য ইংলণ্ডে যাইত। য়ুরোপীয় নীলকররা যে লাভের জন্য লোককে পীড়িত করিত তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা "রাজার জাতি"—সেই জন্য তাহারা অত্যাচারের অনেক সুযোগ লাভ করিত। রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীগোপাল পাল চৌধুরীকে যখন নীল কমিশনে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কেন নীলকরদিগকে জমা ইজারা দিয়াছেন, তখন তিনি উত্তর দেন—"তাহাদিগকে জমা ইজারা দানের প্রথম কারণ, আইনের অসামঞ্জস্য—নীলকররা দেশের লোকের সহিত সমান অধিকার সম্ভোগ করে বটে, কিন্তু সাধারণ আদালতে তাহাদিগের বিচার হয় না। যে অপরাধে জমীদারের কারাদণ্ড হয়, সেই অপরাধে য়ুরোপীয়ের জরিমানা মাত্র হয়। দ্বিতীয় কারণ, সরকারী কর্ম্মচারীরা, সাধারণতঃ, নীলকরদিগকে সাহায্য করিতে আগ্রহশীল। সেই জন্য আমরা, অপমানের ভয়ে, তাহাদিগের সহিত সম্পর্কে বিরত থাকি। তৃতীয়তঃ, আমরা জানি য়ুরোপীয়রা আমাদিগের অধীন 'প্রজা' হইলেও আদালতে জমীদারকে বিচারকের নিকট হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে আর য়ুরোপীয় তাঁহার কাছে বসিবার জন্য চেয়ার পাইবে।'

ইহাই যখন জমীদারের অবস্থা, তখন দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাহার ভাগ্যে প্রাপ্য—অত্যাচার ও উৎপীড়ন।

এই সকল অত্যাচারের ও উৎপীড়নের পরিচয় দীনবন্ধু মিত্রের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটকে পাওয়া যায়। ইহার ভূমিকায় নীলকরদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হয় :—

"এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ। তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক।"

ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে নীলকরদিগের কার্য্যের প্রশংসা করা হইত। সে সম্বন্ধে দীনবন্ধুর উক্তি :—

"দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে; তাহাতে অপর কোন লোক যেমন বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! * * * সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালোভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে, আশ্চর্য্য কি!"

ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বাকল্যাণ্ডও ইংরেজ-চালিত সংবাদ-পত্রে নীলকর সমর্থন স্বীকার করিয়াছেন :—

"When the quarrel between the raiyats of the indigo districts and the planters was running high, he espoused the cause of the former, depicting in vivid colours their grievances and sufferings. He thus braved the wrath of the whole planting interest, who had their advocates in the Press and in the non-official European community of Calcutta."

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে দেশ স্তম্ভিত হইলেও তাহার তিন বৎসর পরে বাঙ্গালার প্রজাসাধারণ নীলকরদিগের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালার নরনারী যে ভাবে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাই বহুদিন পরে এ দেশে রাজনীতিক ব্যাপারে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনরূপে দেখা দেয়। সেই সময়ে বাঙ্গালার প্রজাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে তৎকালীন ছোটলাট বড়লাটকে যে বিবৃতি প্রেরণ করেন, তাহার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ইহারা (প্রজারা) সকলেই শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সম্ভ্রমশীল, কিন্তু ইঁহাদিগের আন্তরিকতা অসাধারণ।...The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."

এই বিবৃতি পাঠ করিয়া বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন—"(এই ব্যাপারে) আমি সপ্তাহকাল যে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছি, দিল্লীর (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের) ব্যাপারের পরে সেরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, কোন নির্ব্বোধ নীলকর যদি ক্রোধবশে বা ভীত হইয়া একবার গুলী চালায়, তবে নিম্নবঙ্গে সমস্ত নীলকুঠীতে অগ্নিশিখা দেখা দিবে।"

হরিশচন্দ্র প্রজার পক্ষাবলম্বন করিয়া নীলকরদিগের ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রজার রক্ষকরূপে কাজ করিতে আরম্ভ করিলে যাঁহারা উপকরণ যোগাইয়া—সংবাদ দিয়া—তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন—দীনবন্ধু মিত্র, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (স্কুল ইনস্পেক্টর), গিরিশচন্দ্র বসু (দারোগা) ও মনোমোহন ঘোষ (তখন কৃষ্ণনগরে ছাত্র) প্রভৃতি। ইঁহারা নাম প্রকাশ না করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। লং প্রমুখ কয় জন খৃষ্টধর্ম্ম যাজক এমন কি কোন কোন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীও প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় লং কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অত্যাচারপীড়িত দরিদ্র মূক প্রজার কল্যাণকল্পে হরিশচন্দ্র অকাতরে অর্থ, উদ্যম, সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ৮ বৎসর কাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনায় তিনি, বোধ হয়, ১০ হাজার টাকারও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। সে অর্থ তাঁহার কষ্টার্জ্জিত বেতন হইতেই প্রদত্ত হওয়ায় তিনি দারিদ্র্য ভোগ করিতেছিলেন। তথাপি তিনি সর্ব্বপ্রকারে প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল প্রজাদিগের পক্ষে আবেদন লিখিতেন, সংবাদপত্রে তাহাদিগের পক্ষে সমর্থন করিতেন, তাহাই নহে; পরন্তু তাহারা কলিকাতায় আসিলে ভবানীপুরে তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইত—তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিত।

অতিশ্রমে হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি নির্ভীক হইলেও তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণের অভাব ছিল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পূর্ব্বে নীলকররা তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিল। তিনি দরিদ্র প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই অভিযোগের বিষয়। প্রজারা যে কোনরূপ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অক্ষম, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি 'টিক্র' স্বীকার করিলেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মতে দৃঢ় ছিলেন। তিনি জানিতেন, তিনি মাতা, পত্নী ও ভ্রাতার জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। তবুও তিনি সঙ্কল্পে অটল ছিলেন। নীলকররা মামলায় জয়লাভ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বাড়ী ক্রোক করে। উদারচেতা কালীপ্রসন্ন সিংহ অর্থ দিয়া গৃহটি রক্ষা করেন।

মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে দেশে শোকের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল। "ধীরাজের" গান গ্রামে গ্রামে লোকের বেদনা প্রকাশ করিত—

"নীল বাঁদরে সোণার বাঙ্গলা করলে এ বার
ছারে খার!
অসময়ে হরিশ ম'ল, লং-এর হ'ল কারাগার।
প্রজার এ বার প্রাণ বাঁচান ভার।"

কিন্তু হরিশচন্দ্র যুদ্ধে দেহপাত করিলেও জয়ীর গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় নীল চাষের অবস্থা সম্বন্ধে—প্রজাপক্ষের অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। হরিশচন্দ্র তাহাতে সাক্ষ্য দিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—প্রজা অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল,—অত্যাচারী নীলকরের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে রামগোপাল ঘোষ বলিয়াছিলেন, হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশবাসীর ও সরকারের কল্যাণ সাধন করিয়াছিল এবং তিনি সমস্ত জীবন দরিদ্রের মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী—'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"তিনি স্বমতে অবিচলিত কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দৃঢ় কিন্তু শিষ্ট, উদার, সাহসী ও দেশের কল্যাণকামী ছিলেন—presented a spectacle never before observed west of the Ural mountains—দেশবাসীকে তিনিই কবিতার আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিয়া রাজনীতিতে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে য়ুরোপীয়দিগের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিলেন।"

মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এতই বিনয়ী ও সরল-স্বভাব ছিলেন যে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতিও পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পরে তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা ভবানীপুরে যে পার্কের তাঁহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে, তথায় তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ স্তম্ভে লিখিত আছে, "তিনি অসামান্য সাহস, দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইলেও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন" এবং "উৎপীড়িত দীন-দরিদ্রের পিতৃস্বরূপ ছিলেন।" তাঁহার মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নিকট ন্যস্ত হয়। এসোসিয়েশন তাঁহাদিগের গৃহের নিম্নতলে একটি স্বচ্ছাদ্ধকার অংশ হরিশচন্দ্রের নামে পুস্তকাগার বলিয়া অভিহিত করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন!

ভারতে সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত জাতীয়তার প্রচার ও স্বায়ত্ত-শাসন অর্জ্জন বহুবিলম্বিত হইত সন্দেহ নাই। এ দেশে সেই শক্তির সন্ধান করিয়া যিনি সর্ব্বপ্রথম তাহা সুপ্রযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রথম উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সাংবাদিক—দেশহিতে সর্ব্বস্বসমর্পণকারী, দরিদ্রের বন্ধু, অত্যাচারীর আতঙ্ক—সকলের শ্রদ্ধাভাজন ভারতীয়—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয়াবহ দৃশ্য! চারি দিকে নরমুণ্ড আর কঙ্কাল! ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে নরকঙ্কালগুলি যেন উঁকিঝুঁকি মারছে; উঁচু নীচু লাল মাটির খাদ আর ঢিবি; শিয়াল, শকুনি আর কুকুর সে বীভৎসতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে, কোথাও বা কবরের ভিতর থেকে মড়া খুঁড়ে টেনে বের করেছে শিয়ালের দল; মড়া নিয়ে পড়ে গেছে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি! খ্যা-খ্যা-খ্যা,—হুঁক্কা-হুঁক্কা, ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ, ঘিঁ-ঘিঁ-ঘিঁ, কা-কা-কা—শিয়াল, কুকুর, শকুনি আর কাকের সম্মিলিত হট্টরোল! শকুনিরা মড়ার পেট থেকে নাড়ী টেনে কাড়াকাড়ি করছে; কাকেরা উড়ে লাফিয়ে চোখে মারছে ঠোক্কর, শিয়াল আর কুকুর হাত-পা নিয়ে করছে টানাটানি;—মহাশ্মশানের বুকে মহাকালের ছায়া-মূর্ত্তি যেন দেখা যাচ্ছে। তারই পাশে শান্ত স্রোতস্বতী দ্বারকা। শ্মশানের এখানে-সেখানে শ্যাওড়া আর শিমূলের বন। অজস্র লাল ফুল চিক্-চিক্ করে দুপুরের রোদে,—লোলজিহ্বা করালিনী কালী; তারা সহস্র জিহ্বা মেলে দেয় কিসের ইঙ্গিত?

● বামদেবের প্রধানতম সন্ন্যাসী শিষ্য ক্ষেপাশ্রী তারানাথ ব্রহ্মচারী (তারাক্ষ্যাপা)

এই মহাশ্মশানের বুকে বিচরণ করে বামাচরণ। সে আজ কাকে খোঁজে? দুপুরের খররৌদ্রে আলো-ছায়ার খেলায় এই শ্মশানের বীভৎসতা আরো ফুটে উঠে ভয়াবহ হ'য়ে। খিঃ-খিঃ-খিঃ, হিঃ-হিঃ-হিঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ—কারা তোলে এই ভয়াল সুর! ঝাপটা বাতাসে নরমুণ্ডগুলি যেন কথা কয়! কি যে বলে বোঝা যায় না। "আমার বাবা!—কই তিনি? শুনেছি, তারা-মায়ের ভক্তেরা অশরীরী হ'য়ে তারাপীঠেই থাকেন। আমার বাবা কি আমায় দেখতে পাচ্ছেন না?" এদিক ওদিক তাকিয়ে কত কি ভাবে বামাচরণ। "তবে কি ওই চিতানলে সবই শেষ?" উত্তর আসে কি এক অজানা পাখীর কণ্ঠে—'কেয়া-কা, কেয়া-কা, কেয়া-কা'। ক্ষ্যাপা বামা ভাবে,—'কে কার, কে কার, কে কার?' বনের ঝোপ থেকে উঁকি মেরে পালিয়ে যায় এক বুনো বেড়াল; মসী-কালো তার রঙ;—"মাওউ-মাওউ-মাওউ"—বামা ভাবে 'মা-ই সব, মা-ই সব, মা-ই সব।' হেসে উঠে বামা, এ কি, সে পাগল হ'য়ে গেল নাকি! তারাদেবীর মন্দিরের দিকে ফেরে বামাচরণ।

মা গো তারা ও শঙ্করী!
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রীজারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছ'টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।

রাস্তার আশে-পাশে নরমুণ্ডের ছড়াছড়ি; শিমূল গাছের তলায় সাধুদের কুটির; নরমুণ্ডের পাঁচিল, চালে নরমুণ্ড সারি সারি ঝুলান; কোথাও বা আবরণহীন উন্মুক্ত আকাশতলে নরমুণ্ডের গুহা সাজিয়ে রক্তচক্ষু সন্ন্যাসী বসে আছে; নর-কপালে মদ; তারা বলে কারণ-বারি। পঞ্চ 'ম'কারের প্রথম 'ম'কারের এরা ভক্ত। গাঁজার কলকেতে কেউ মারছে দম। সেই দমের টানে যেন ব্রহ্মতালু ভেদ করে ব্রহ্ম-বিদ্যা কটাক্ষে হেসে পলায়ন করছেন! ভয় জাগে এই কাণ্ড-কারখানা দেখে। এই কি তারা-মায়ের সাধনা? এরা কি সত্যিই সাধক? এরা কি মা-কে জানতে পেরেছে? দমে যায় ক্ষ্যাপার মন। ওদিকে দুপুরের ভোগারতি চলে মায়ের মন্দিরে। সে-যে রাজসিক ব্যাপার! ঢাক-ঢোল, কাঁসর আর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে; কান যেন ফেটে যায়। অদূরে শিয়াল-কুকুর আর কাক-শকুনির কিলরব। এক বিভোল সন্ন্যাসী রক্তচক্ষু উন্মীলন করে—কে যাও বাবা? বেশ গাইছ! তুমি কি ভৈরব? একটু

কারণ-বারি দিয়ে যাও বাবা ! ও বেটা আর কত খাবে ? আমরা তার ভক্ত ছেলেরা খেতে পাই নে, আর বেটা খায় রাজবাড়ীর রাজভোগ ! ওই পাথরের মূর্ত্তি কি খেতে পারে ? তার চেয়ে যারা খেতে পারে, তাদের দিলে উপকার হয়। ছেলের পেট ভরলেই মায়ের হয় খাওয়া—তারা, তারা !

বামাচরণ পাগলের কথা শোনে ; ভয় হয়, থমকে দাঁড়ায় ; আবার চলে। হতচকিতের মত তারা-মায়ের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়। মায়ের এ কি রূপ ! মুখে হাসি আর ধরে না ! মন্দিরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই কারা ? জ্যোতির্ম্ময় তাদের মূর্ত্তি ! এ কি, চার দিক্ থেকে আলোর ফোয়ারা ছুটেছে ; আকাশ থেকে এক-একটি করে আলোর বুদ্‌বুদ্ ভেঙ্গে নেমে আসছে এক-একটি মূর্ত্তি ! উধাও হয়ে যায়, ভোগের দ্রব্য। মা যেন তাদের খাইয়ে দিচ্ছেন ; স্নেহে বিগলিত সে এক অপূর্ব্ব মহিমময়ী মূর্ত্তি ! কপোলে-কপালে ঘামের ধারা ; পরিধানে তাঁর চওড়া লাল-পাড় শাড়ী। মাথার কাপড় কখন বা খুলে পড়েছে ; এর মুখে, তার মুখে তুলে দিচ্ছেন মাখা ভাতের অমৃত-গ্রাস। একি, তাঁর মা রাজকুমারী ? সে কি স্বপ্ন দেখছে ? বামাকেও তিনি খাইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু পাণ্ডা-পুরোহিতের দল কি কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না ? ছায়ামূর্ত্তিগুলির মাঝে কে ওই ? ওই যে বাবা ! সর্ব্বানন্দ। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। বামাকে সস্নেহে তিনি যেন কি বলছেন, "ভয় নাই বাবা, যার মা বিশ্বরাণী, তার ছেলে কি উপোস থাকে ?" বামা কি তবে পাগল হয়ে গেল ? তার কি মাথার ঠিক নেই ? শুধু সে ডাকে, 'বাবা, বাবা।' তার দম আটকে যায় ; ধপাস করে পড়ে যায় অসাড়-মূর্ত্তি কিশোর। তার কানে ভেসে আসে, "ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ; মরণে মানুষ মরে না, রূপ শুধু পালটায় ; আমি আছি তোদের দেখছি।"

সমবেত ভক্তেরা আর পাণ্ডা-পুরোহিতেরা হকচকিয়ে ওঠে। এ যে সর্ব্বানন্দের সেই ক্ষ্যাপা ছেলে ! বাবার শোকে কি একেবারে পাগল হ'য়ে গেল ? বাদ্যি-ভাণ্ড থেমে যায়। জল, জল, জল ! নগেন্-ঠাকুর মন্দিরের পুরোহিত, বামার মাথা সস্নেহে নিলেন কোলে তুলে। সদ্য-পিতৃহারা সন্তানের দুঃখে বিচলিত হ'ল তাঁর হৃদয়। "তারা, তারা, তারা-মা"—বার-'বার সেই যুবক ব্রাহ্মণ আকুল কণ্ঠে করেন দেবীকে আহ্বান ; বামা তখন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে ; ঘণ্টাখানেক কেটে গেল—বামাচরণ শোনে যেন তার পিতার কণ্ঠ :—

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছো বসে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে, কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত ॥

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসে ! "এ কি, নগেন্ কাকা ! আমি কোথা ?" নগেন্দ্রনাথ মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বামাচরণ উঠে বসে। বৈশাখের দুপুর, বাতাসে ছুটে আসে আগুনের হল্‌কা। 'তুমি বাবা, এই দুপুরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ ! তোমার মা হয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এখন বাড়ী যাও !' পুরোহিত সঙ্গে ছাত্রা হাতে একটি লোক দেন ; আর নূতন গামছায় কলাপাতায় মোড়া মায়ের প্রসাদ, ফলমূল আর কত কি। ক্ষ্যাপা চলে ; আনন্দে তার মন আজ বিভোর ; অনেক কিছু আজ সে দেখেছে বা জানতে পেরেছে। তার বাবা যে ছায়া বিস্তার করে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন তাকে পৌঁছে দিতে। তা হলে সবই সত্যি ? রূপ মিশে যায় অরূপের কোলে। অরূপই আবার রূপ হ'য়ে ধরা দেয় ধরার মায়ায়। মানুষ, পশু-পাখী, শিয়াল-কুকুর, গাছ-পালা, ফল ও ফুলের মধ্যে অরূপই রূপ ধরে করে লীলা। মহামায়ার কোলে হচ্ছে মহাকালের মহালীলা।

* * * *

"দিন-রাত চুপ করে অত কি ভাবিস্ বামা ? কাজ-কর্ম্ম দেখ ! ভাই-বোনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল ! সংসার যে তা না হলে চলে না।" কি কাজ-কর্ম্ম দেখবে বামা ! বর্ণপরিচয়ও যার ঠিক ঠিক হয় নাই ! ব্রাহ্মণের ছেলে মন্ত্র-তন্ত্রও জানে না। পূজা-পাঠের ত কথাই নাই ! কি করতে পারে সে ? চাষ-বাস কিংবা চাকুরী ? সামান্য দু'-পাঁচ বিঘা ধান-জমি, ভাগে চাষ হয় ; তাতে করে কি সংসার চলে ? যজমানের পূজাপাঠে যে কিছু ঘরে আসবে তারও উপায় নেই। কি কাজ,—কি চাকুরী করবে সে ?

তবুও মায়ের আদেশ ; এই মা-কেই সে তারা-মায়ের ভোগারতির সময়ে দেখেছে। থান-পরা সদ্যঃস্নাতা অন্নদা রাজকুমারীকে সে সেখানে দেখেছে, লালপেড়ে শাড়ীপরা অন্নদা—অন্নপূর্ণারূপে। বাৎসল্যে ছল-ছল তাঁর নয়নযুগল। অজস্র সন্তানকে তিনি নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। ভুল হয়,—এই মা কি সেই মা ? 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি জান না।' অরূপা নিরাকারা বিশ্বরূপা মা-ই যে রক্ত-মাংসের দেহে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করতে আসেন। জগতে কোন কিছুই মিথ্যে নয় ; মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা—সবই সত্য। জন্মও সত্য, মৃত্যুও সত্য।

মা, ভাই ও বোন—সবই সত্য। সংসার করতে হবে, তাও সত্য। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই সত্য। চাই ক্ষুধার অন্ন ; ভাই-বোনের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। মায়ের আদেশ ; তারা-মন্দিরের পাষাণী মূর্ত্তি সজীব হ'য়ে বামাকে বেঁধে-বেড়ে খাওয়াচ্ছেন ;

তারাপীঠের মন্দির

মায়ের কি কষ্ট! বামার জন্ম মা কাঁদে পা দিয়েছেন। এই জ্যান্ত মায়ের আদেশ কি অমান্য করা যায়? "মা, তুমি যে বল, তারা মা বড়-মা; তিনি সকলেরই মা; তিনি থাকতে কেউ উপোস করে থাকতে পারে না।" "হ্যাঁ, বাবা, সবই সত্যি, তিনিও চারি দিকে আমাদের খাবার ছড়িয়ে রেখেছেন; আমরা কি তা' কুড়িয়ে আন্‌তেও পারব না? তিনি একা কত করবেন।"

ঠিক্ কথা! একা মা কত করেন? সমস্ত বিশ্বজগৎই তাঁর সংসার। কত ছেলে-মেয়ে তাঁর; ওই পশু-পক্ষীগুলো পর্য্যন্ত তাঁর মুখ চেয়ে আছে; আহাঃ, আহাঃ! মায়ের আমার কত কষ্ট! সে কষ্ট লাঘব করতে হবে। অন্নপূর্ণা অন্ন ছড়িয়ে রেখেছেন; কুড়িয়ে নিতে হবে।

কাজের সন্ধানে চলে বামাচরণ; মুহুটী গ্রামের কালীবাড়ী; কোন এক রাজা বা জমিদার মন্দিরে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাইনে-করা আছেন এক পুরোহিত। তাঁরই হলেন সহকারী; কাজ হ'ল—ফুল তোলা আর ভোগ-রাঁধা। ঠাকুরের ভোগ রাঁধে বামাচরণ কিন্তু তার মন পড়ে থাকে মায়ের মন্দিরে। কার ভোগ কে রাঁধে? ভোগের অন্ন পুড়ে যায়; ব্যঞ্জনে পড়ে না নুণ; কোন দিন হয় নুণে খর। বামাচরণের হুঁস থাকে না, তাঁর গান শুনে পূজারি ছুটে আসে:—

"রান্না-বান্না মিছে রে মন, দেখ না অন্তর-অম্বরে।
কাল মেঘের উদয় দেখে মানস-শিখী বিহরে।"

"বামা, ও বামা! এ কি! ভাত যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!"—এমনি হয় দিনের পর দিন। ব্রাহ্মণের অন্তরে দয়া ছিল; শেষে স্থির হল, বামাচরণ শুধু ফুল তুলে আনবে; তার বদলে খাওয়া-পরা আর মাস গেলে পাঁচ সিকে মাহিনা। বামার অন্তর আনন্দে ভরে উঠল; এই ফুলের মাঝেই সে দেখে মায়ের হাসি; কে এক সুন্দর জুড়ে রয়েছেন এই আকাশ-বাতাস পৃথিবী ছেয়ে; তাঁকে ধরা যায় না। এত বড় তিনি! এত সুন্দর তিনি;—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য এত ছড়ানো যে, এই ছোট চোখ দুটি তাঁকে ধরতে পারে না; ফুলের মাঝে তাঁর আভাস মেলে;—কচি কচি হাসিমুখ! কিলবিল্ করে কত কথা যেন বলে। এই ফুলে হয় মায়ের বেশ-বাস। কাল মায়ের রাঙা পা-দুখানি আরো রাঙা হয়ে উঠে রক্তজবায়। জবার কি সৌভাগ্য!

"মায়ের পায়ে রক্তজবা দিব মুঠি-মুঠি।
চোখের ধারায় পড়বে চন্দন অন্ধ হবে দিঠি।"

এমনই একদিন বাগানে অজস্র জবা ফুলে রক্ত-সায়রের হয়েছে সৃষ্টি; বামার চোখ ঝলসে গেল; অসুরের রক্তসাগরে যেন ধেই-ধেই করে এক পাগলী মেয়ে নৃত্য করছে—সেই ফুল-সায়রের মাঝে। ভরাসাজি নিয়ে বামা আর গাছ থেকে নামতে পারে না। তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে! পূজারি কিন্তু অস্থির; কোন রকমে পূজো সেরে অন্য কাজে যেতে হবে; তাই এত তাড়া। পূজার আসনে বসে উঠে আসেন: "বামা, বামা, বামাচরণ!" কে দেবে সাড়া? "আরে বেটা, কোথা গেলি! শিগ গির ফুল নিয়ে আয়।" নাই, নাই, নাই;—বামাচরণের খোঁজে এসে মন্দিরের চাকর ঈশান দেখে বড় একটা জবাগাছে নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে বামাচরণ। সাড়া নাই, শব্দ নাই, জোর করে সন্তর্পণে বামাকে নামানো হল। কিন্তু বেহুঁস হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ। মন্দিরের পুরোহিত গেলেন আরো ক্ষেপে। জলের ঝাপটা বার বার দেওয়ায় এবার হুঁস হল।

বামার চৌদ্দ পুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রুতি-কর্কশ কটূক্তি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যেন-তেন-প্রকারে পুরোহিত কালীমায়ের পূজা সমাপন করলেন; আর এক জায়গায় পূজা করতে যেতে হবে; সেখানে মোটা পাওনা আছে। তিনি এগিয়ে চলেছেন; পিছন থেকে ডাকে বামা, "ঠাকুরমশাই, মায়ের যে ভোগ দিলেন না? আজ কি মা উপোস থাকবে?" "ভোগ না পিণ্ডি; বুঝলি, আমার পিণ্ডি! তা' তুই ধরে দিস, আমার দেরী হয়ে গেছে।"—উত্তর করলেন পুরোহিত। বামা দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে, "ভক্তিহীনের পূজোয় আমি ভোগ দিতে পারব না।" "কি বললি? দূর হ'য়ে যা, এখানে আর তোর স্থান হবে না।"—বামার দাসত্বের শৃঙ্খল খুলে গেল।

* * * *

"না বাবা, আর বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে কাজ নাই; ভালই হ'ল। এবার চাষ-বাস দেখ; তাতেই আমাদের চলে যাবে।" উত্তর করলেন রাজকুমারী। বামাচরণ এটা-সেটা কাজ-কর্ম্ম দেখে; কিষাণের জন্যে মাঠে মুড়ি-গুড় নিয়ে যায়; ছোট রামচন্দ্র ছয়-সাত বছরের বালক মাত্র। সে যায় পাঠশালায়। রাজকুমারীর দিন কোন রকমে চলে। বামা মাঠে চলেছে গুড়-মুড়ি নিয়ে; কিন্তু কোন কোন দিন আনমনে চলে যায় মন্দিরের পথে; তারা-মন্দিরের রাস্তায় ভিখারী বসে, তাদের হয় ভোজন মুড়ি-গুড়ে; কোন দিন বা কুকুরগুলিকে ছড়িয়ে দিতেন মুড়ি। বুড়ো কিষাণের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। বুড়ো রসিকতা করে বলত,—'মা তোর হাউড়ে বামা আমার খেতে দেয় না; মন্দিরের ওই কুকুরগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ পেতেছে।"

দিন আর চলে না; এমন সময় মাতুলের হল আবির্ভাব। সাঁইথিয়ার নবগ্রামে রাজকুমারীর পিত্রালয়। মাতুলের বেশ বর্দ্ধিষ্ণু সংসার। এত দিন খেয়াল হয়নি; বোন-ভাগনেরা কেমন আছে,—দেখতে এসেছেন মাতুল। "একি দিদি, এরা যে অমানুষ হ'য়ে উঠেছে! আমায় কেন এত দিন খবর দাওনি? আমি ছেলে দুটি:কে নিয়ে যাই; বামুনের ছেলে পূজো-পাঠ ক্রিয়াকর্ম্ম শিখলেই বেশ সংসার চালাতে পারবে।" দিদির অনুমতি পাওয়া গেল; ভাল ফসল হয় নাই; তার উপর ভাইয়ের আশ্বাসে রাজকুমারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। দুই ভাই হল মাতুলের অনুগামী।

মাতুলালয়ে পাটরাণী হচ্ছেন মাতুলানী; মাতুলও তাঁর ইঙ্গিতে চলেন, বামাচরণের উপর পড়ল গোচারণের ভার; গাই-গোরুতে সাত-আটটি জীব। খড় কাটা, জাব দেওয়া, গোয়াল নিকানো—এককথায় একটি চাকরের সমস্ত কাজের ভার পড়ল বামাচরণের উপর; আর বালক রামচন্দ্র খাটে মামীর ফাই-ফরমাশ। মাতুলের কর্ত্তব্য-মানদণ্ড মাতুলানী এই ভাবে হালকা করলেন। তার ওপর চলে কঠোর শাসন। "অমুকের ফসল নষ্ট করেছে গোরুতে, ওই জাব দেওয়া হয়নি!" এটা-সেটা নিত্য অভিযোগ। অর্দ্ধাহার আবার কোন কোন দিন অনাহারে কাটে বামাচরণের দিন।

গোরু চরানোতেই বামার বেশী আনন্দ; মাঠে পায় মুক্তির নিঃশ্বাস; ব্রজবালকেরা কৃষ্ণ সখাকে নিয়ে গোচারণ-লীলায় নেমে আসে বামার সম্মুখে; ভাবাবেশে বামাচরণ কোন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে; "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলে নৃত্য করে; অন্য রাখালেরা তার এই ভাব দেখে বিস্মিত হয়; সে ছুটে গিয়ে কা'কে যেন জড়িয়ে ধরে, "এই যে সখা, সুদাম; শ্রীদাম!" বাঁশি বাজানোর ভঙ্গী করে; তারা-ভাবে পাগল; পাগলের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীতে মাঠ-ঘাট ভরে উঠে:

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগৎজনমোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে,
শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তার হৃদয়বাসী।
কাল বরণ ব্রজের জীবন,
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী
বাঁশী ত্যজে করে অসি।

'হরিবোল, হরিবোল' ধ্বনিতে মাঠ কাঁপিয়ে ক্ষ্যাপা করে নৃত্য। মাটিতে যায় গড়াগড়ি!—কিন্তু ওদিকে গোরুগুলি চাষীদের ক্ষেতের ধান করেছে নষ্ট; চাষীরা আসে ধেয়ে; গোরুগুলি খায় বেদম প্রহার। তারা করে বামার চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার; বামার চেতনা আসে; 'ভাই, ওদের মেরো না; অবোলা জীব। আমার গায়ে বড় লাগে; আমারি দোষ।' চাষীরা আরো ক্ষেপে যায়, ভাবে ছেলেটা পাগল। মাতুল কিংবা মাতুলানীর হয় অসহ্য। বামা অনুজ রামচন্দ্রকে নিয়ে ফিরে এল আপন মায়ের কাছে!

* * * *

তারা-মায়ের মন্দিরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে বামা। "মা আমাদের কি হবে? কষ্টের কি শেষ হবে না মা!' তার কণ্ঠে 'মা-মা' শব্দে পাষাণমূর্ত্তি যেন স্পন্দিত হয়ে উঠে। করুণার ধারা যেন বহে যায় তাঁর ত্রি-নয়নে! মা—মা—মা! মা অর্থাৎ রসনা, জিহ্বা; রসনাই উচ্চারণ করে বাক্য; বাক্য রসনারই অংশ, যে তাকে ভক্ষণ করতে পারে, অর্থাৎ বাক্-সংযম করতে পারে, যেই যোগী পুরুষই মাংস-সাধক। 'মায়ের নামেই তা' সম্ভব হ'তে পারে।' বলতেন সর্ব্বানন্দ; তাই ডাকে মা—মা—মা!

তারাপুরের লোকেরা তারাপীঠের নামে ভয়ে, শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে হয় নত। তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা এনেছে এই পীঠের অলিখিত শাসন-বাণী। 'যাই করবে মাকে উৎসর্গ না করে করবে না' তান্ত্রিক গুরু মোক্ষদানন্দের এই আদেশ লঙ্ঘন করার সাহস কারো ছিল না; কিশোর বামাচরণ সেই মোক্ষদানন্দের করুণালাভ করল; সে অনেক কথা। কৌল বা তান্ত্রিক গুরু ছিলেন এই মোক্ষদানন্দ; তিনিই ছিলেন তখন তারাপীঠের গদীয়ান্।

আর একজন তান্ত্রিক সাধক ব্রজবাসী কৈলাসপতি বামাচরণের সাধন-পথের গুরু।

ব্রজবাসীর গলায় তুলসী-মালা, বাহুতে রুদ্রাক্ষ; হাতে ত্রিশূল ও নর-কপাল। সঙ্গে ভৈরবী-মূর্ত্তি এক নারী। এই সিদ্ধপুরুষ ইতস্ততঃ নরকঙ্কাল-বিক্ষিপ্ত প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপ্ত—এই মহাশ্মশানে এসে আসন নিলেন। তাঁকে দেখলেই সাধারণ লোক ভয়ে কাছে আসতে সাহসী হ'ত না। আমাদের ক্ষ্যাপার কিন্তু আনন্দ বেড়ে গেল; তাঁর সেবাতেই বামা পায় আনন্দ; গাঁজা সেজে দিচ্ছে; মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলে তাঁকে যত্নে আসনে শুইয়ে দিচ্ছে। ক্ষ্যাপার কাজ বেড়ে গেছে! ব্রজবাসীর সেবায়ই তার আনন্দ। তিনি খেতে বসলে শেয়াল-কুকুরও তাঁর পাত থেকে খাবার কেড়ে নিত; শেয়াল-কুকুরের উচ্ছিষ্টেও তাঁর অরুচি ছিল না। বামা সেই ব্রজবাসীরই উচ্ছিষ্ট মনের আনন্দে গ্রহণ করত। ব্রজবাসীকে লোকে ভাবত পিশাচ-সিদ্ধ; ভয়-ডর নেই, মহাশ্মশানে রাত দুপুরেও নির্ভয়ে বিচরণ করেন। আর সর্ব্বানন্দের বেটা বামাচরণ গেরস্তর ছেলে। সে-ও ঐ পিশাচ-সিদ্ধের ডাকিনী-মায়ায় পিশাচ হয়ে উঠেছে! মেলেচ্ছ, কুলাঙ্গার।

ভাবী গুরুর কাছে এই ভাবেই হয় বামাচরণের হাতেখড়ি। "কি ভাবিস্ বেটা, নিজেকে চেন, জগৎকে চেনা হবে! ওই শিয়াল-কুকুরগুলো এক-একটা সাধক। মায়ের কাছে কাছে থাকবে বলে কুকুর-শিয়াল হয়ে ঘুরছে। তা না হলে যে লোকে চিনে ফেলবে!" বামা বিস্ময়ে ভাবে; "মনে কর, এ গাঁয়েরই এক জনের ছেলে ছিলি তুই, মরে গিয়ে আবার আর এক জনের ঘরে এসেছিস্। তোর আগের রূপ থাকলে কি তোর আগের মা-বাপ, জন-পরিজন তোকে ছেড়ে দিত? তাই রূপ পালটাতে হয়।" অমনি কত কথা বলেন ব্রজবাসী। বামাচরণ গান ধরে:—

"মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।"

ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা—(১)

[ফ্রান্সের একজন দরিদ্র কবি জঁ্য শাপলাঁকে একখানি পত্রে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্ম, ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন। নিজের চোখে যা তিনি দেখেছিলেন এবং নিজের কানে যা শুনেছিলেন, তাই তিনি লিখেছিলেন বলে তার মূল্য আছে, বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের ছাত্রের কাছে।—অনুবাদক]

ফরাসী ও ভারতীয় সূর্যগ্রহণ

মঁশিয়ে,

জীবনে আমি দুটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি, যা কোনদিন ভুলতে পারব ব'লে মনে হয় না। তার মধ্যে একটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি ফ্রান্সে ১৬৫৪ সালে, আর একটি দেখেছি দিল্লীতে ১৬৬৬ সালে। প্রথম গ্রহণের সময় ফরাসী জনসাধারণের এমন বালকোচিত ধারণা ও বিশ্বাস, এমন সব যুক্তিহীন ও অর্থহীন আচরণ স্বচক্ষে দেখেছি, যা আমার মনে গেঁথে রয়েছে চিরদিনের মতন। এমন ভয়াবহ ভাবে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো তারা যে অনেকে গ্রহণ লাগার আগে ওষুধপত্র কিনে খেতে লাগলো আত্মরক্ষার জন্য। অনেকে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে বসে রইল সারাদিন বন্দী হয়ে। এমনভাবে তারা চারিদিক বন্ধ ক'রে ব'সে ছিল যাতে আলোর রশ্মি পর্যন্ত ঘরে না প্রবেশ করতে পারে। অন্ধকার কুঠরি খুঁজে তার মধ্যে ঢুকে বসে রইল অনেকে। দলে দলে হাজার হাজার লোক চলল গির্জার দিকে দেবতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য। কেউ কেউ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়—কি জানি কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে। অনেকে ভাবল পৃথিবীর ও মানুষের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে, গ্রহণ লাগলে পৃথিবীর ভিৎ পর্যন্ত কেঁপে উঠে হয়ত সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এইধরণের আজগুবী সব ধারণা ও বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশবাসীর। গ্যাসেণ্ডী, রোবারভাল ও অন্যান্য বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও গ্রহণ সম্পর্কে লোকের আতঙ্ক ও ভুল ধারণার সীমা ছিল না। বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছেন, গ্রহণ লাগলে কোন ভয়ের কারণ নেই, কারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের ভয় গেল না। কিছু মতলববাজ গণৎকার ও জ্যোতিষীর অপপ্রচার ও মিথ্যা কল্পনার ফলে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের ভাঙল না।

১৬৬৬ সালে হিন্দুস্থানে দিল্লী শহর থেকে যে সূর্যগ্রহণ আমি দেখেছি তার কথাও আমার বিশেষভাবে মনে আছে। গ্রহণ সম্পর্কে ঐ একই হাস্যকর ধারণা ও কুসংস্কার ভারতীয়দেরও আছে দেখলাম। যে সময় গ্রহণ লাগবার কথা, সেই সময় আমি আমার বাড়ীর উপরের একটি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যমুনার তীরেই আমার বাড়ী ছিল, সুতরাং সমস্ত দৃশ্যটি দেখবারও আমার সুযোগ হয়েছিল। দেখলাম যমুনার তীরে অসংখ্য লোকের ভিড় জমেছে। এককোমর জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে তারা, ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে, করজোড়ে, সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় যখন গ্রহণ লাগবে। গ্রহণ লাগলেই তারা জলে ডুব দিয়ে স্নান করবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রায় উলঙ্গ; পুরুষদের অধিকাংশের পরণে গামছা; বিবাহিতা ও ছয়সাত বছরের মেয়েদের পরণে শাড়ী। বড় বড় রাজা-মহারাজা ও ধনী লোকরা, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও জুয়েলাররা, সপরিবারে যমুনার তীরে এসে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। যমুনার জলে চারিদিকে পর্দা টাঙিয়ে জনতার চক্ষুর অন্তরালে তাঁদের পরিবারবর্গের স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। যে মুহূর্তে গ্রহণ লাগার সংবাদ রটল, অমনি যমুনার বক্ষ থেকে হাজার হাজার কণ্ঠের একটা সম্মিলিত ধ্বনি উঠলো এবং সকলে জলে ডুব দিতে লাগলো বার বার। ডুব দিয়ে তারা জলে দাঁড়িয়ে, হাতজোড় ক'রে সূর্যের দিকে চেয়ে বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করল এবং মধ্যে মধ্যে জলে হাত ডুবিয়ে সূর্যের দিকে জল ছিটাতে লাগলো। কখন মাথা হেঁট ক'রে, কখন হাত নেড়ে তারা কতরকম যে ভঙ্গী করতে আরম্ভ করল, তার ঠিক নেই। গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা এইভাবে অনবরত ডুব দিতে আর মন্ত্র পড়তে রইল। স্নান ক'রে উঠে এসে যমুনার জলে টাকা-পয়সা ছুঁড়তে থাকল এবং দান করতে লাগলো ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণরাও বেশ বুদ্ধিমান, দিনক্ষণ বুঝে দানের লোভে অনেকে এসে হাজির হয়েছিল সেখানে। স্নানান্তে সকলেই নতুন কাপড় প'রে পুরনো কাপড় ছেড়ে ফেলে দিল।

এইভাবে আমার ঘরের বারান্দা থেকে চোখের সামনে আমি যমুনার উপর গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। শুধু যমুনায় নয়, সিন্ধু থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এবং অন্যান্য নদনদীতে এইভাবে সমারোহে গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। থানেশ্বরের নদীতে প্রায় দেড়লক্ষ লোক জমা হয়েছিল গ্রহণের স্নান করার জন্য। তাদের ধারণা, গ্রহণের দিন নদীর জল অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পবিত্র হয় এবং তাতে স্নান করলে পুণ্যসঞ্চয়ও হয় বেশী।

মোগল বাদশাহ, মুসলমান হলেও, হিন্দুদের এইসব ধর্মকর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতেন না কখনও। কেবল এই জাতীয় কোন সামাজিক পার্বণের সময় বা উৎসব-অনুষ্ঠানের সময়, ব্রাহ্মণরা দেখেছি প্রায় লাখ খানেক টাকা নজর দেন বাদশাহকে, এবং বাদশাহ তার পরিবর্তে তাঁদের একটা হাতি আর কয়েকটা ভেট খেলাৎ দেন।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কেন হিন্দুস্থানের এই ধারণা এবং কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন, সেই কথা এইবার বলব।

হিন্দুরা বলেন, তাঁদের চারটি 'বেদ' আছে—পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ব্রাহ্মণের মাধ্যমে ভগবান এই বেদ প্রচার করেছেন জগতে। বেদে কথিত আছে নাকি যে, কোন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ দানবীয় দেবতা সূর্যের উপর ভর ক'রে তার জ্যোতি ম্লান ক'রে দেয় এবং তার জন্যই সূর্যগ্রহণ হয়। দানব গ্রাস ক'রে ফেলে সূর্য দেবতাকে। সূর্য মঙ্গলময়, করুণাময় দেবতা। তিনি জীবন দান করেন। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদিত অবস্থায় যখন সূর্যদেব যন্ত্রণা ভোগ করেন তখন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাঁকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া। প্রার্থনা ক'রে, পূজার্চনা ক'রে, দানধ্যান করেই একমাত্র তা করা সম্ভবপর। সূর্যগ্রহণের সময় এইজন্য এইসব কাজের গুরুত্ব বেশী এবং কাজ করলে পুণ্যার্জনও করা যায় বেশী। গ্রহণের সময় দান করলে যা পুণ্য হয়, অন্য সময় তার একশ'ভাগের একভাগও হয় না। এত যখন লাভ হয়, তখন কে তার সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়বে বলুন?*

মোটামুটি এই হ'ল হিন্দুস্থানের সূর্যগ্রহণ। এই গ্রহণ কি কখনও ভুলতে পারা যায়? লোকের এই কল্পনা, ধারণা ও বিচিত্র বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি আর কিছু মন্তব্য করতে অক্ষম। বাকিটা আপনি ভেবে নেবেন।

পুরীর জগন্নাথ

বঙ্গোপসাগরের কূলে জগন্নাথ দেবতার নামে একটি শহর আছে। জগন্নাথের মন্দিরও আছে সেখানে, বিখ্যাত মন্দির। প্রত্যেক বছর জগন্নাথের যে বিরাট উৎসব হয়, তা প্রায় আটনয়দিন ধ'রে চলতে থাকে। উৎসবের সময় হিন্দুস্থানের সমস্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, আগে যেমন হনুমানের মন্দিরে হ'ত এবং এখন হয় মক্কায়। শুনেছি, সমাগত লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। বিশাল একটি কাঠের রথ (বার্নিয়ের 'কাষ্ঠযন্ত্র' বলেছেন) তৈরী করা হয় এবং তাতে নানারকমের সব কিম্ভূতকিমাকার জীব ও মূর্তি বসানো থাকে—যেমন ভয়ংকর, তেমনি কদর্য। চোদ্দটি বা ষোলটি চাকার উপর রথটিকে বসানো হয়, যেমন কামানগাড়ীর উপর কামান বসানো হয় তেমনি। বসিয়ে প্রায় পঞ্চাশষাট জন লোক সেটা টানতে থাকে। জগন্নাথের মূর্তিটি মধ্যিখানে বসানো হয়, রীতিমত সাজিয়ে-গুজিয়ে এবং তাকে টানতে টানতে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

উৎসবের প্রথম দিনে যেদিন মন্দিরে জগন্নাথের দর্শনের জন্য দরজা খোলা হয়, সেদিন যাত্রীদের এমন প্রচণ্ড ভিড় হয় যে ভিড়ের চাপে যাত্রীদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং অনেকের মৃত্যু হয়। বহু দূর থেকে যাত্রীরা জগন্নাথ দর্শনের জন্য পায়ে হেঁটে আসে এবং পথের ক্লান্তিতে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ভিড়ের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না তাদের। যাদের মৃত্যু হয়, হাজার হাজার যাত্রীর কাছে তারা সবচেয়ে বেশী পুণ্যাত্মা হয়ে ওঠে এবং সকলেই তাদের সশরীরে স্বর্গযাত্রার জন্য 'ধন্য ধন্য' করে। অতঃপর যখন সেই জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর ক'রে চলতে থাকে তখন সমবেত দর্শক-যাত্রীদের মধ্যে এমন এক বিকট বন্য উন্মাদনার সঞ্চার হয় যে তার তাড়নায় অনেকে সেই চলন্ত রথের চাকার তলায় পথের উপর শুয়ে পড়ে এবং নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। দর্শকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সকলেই উচ্চকণ্ঠে বাহবা-ধ্বনি দিতে থাকে। এর চেয়ে মহত্তর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন আর কিছু নেই, তাদের মতো আত্মত্যাগী বীরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারলে তারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চ'লে যাবে এবং সেখানে দেবতা তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন ও পালন করবেন। সংসারের দুঃখ বা জ্বালা-যন্ত্রণা ব'লে কিছু থাকবে না। মহাসুখে তারা স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য

* বলা বাহুল্য, বার্নিয়েরের মতন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা এর চেয়ে সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম, দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ভুল হলেও, প্রণিধানযোগ্য। —অনুবাদক

প্রধানতঃ হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণরাই দায়ী। নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যই ব্রাহ্মণরা এই জাতীয় ধর্মকর্ম ও কুসংস্কারের প্রেরণা দিয়ে থাকেন। রথের সময় দেখেছি, একটি সুন্দরী মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে জগন্নাথের 'কনে' বলে পরিচয় দেওয়া হয় এবং জগন্নাথের পাশে বসিয়ে মহাসমারোহে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য মন্দিরে। সেখানে মেয়েটি জগন্নাথের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, জগন্নাথ ঠাকুর মেয়েটিকে ভার্যার মতন মনে করবেন এবং সেইভাবে তার সঙ্গে ব্যবহারও করবেন। মেয়েটিকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন এ-বছর কেমন যাবে, মঙ্গল হবে কি না ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তরের জন্য মুক্তহস্তে দানধ্যান করা হয়, মানত করা হয়। তার পরদিন রথ যখন ফিরে যায়, তখন পুরোহিত তাকে রাত্রে কাণে কাণে যা ব'লে দেয়, সেই সব কথা সে সাক্ষাৎ জগন্নাথের উক্তি মনে ক'রে দর্শকদের চেঁচিয়ে বলতে থাকে। দর্শকরাও মেয়েটির প্রত্যেকটি মুখের কথা বিশ্বাস করে।

জগন্নাথের রথের সামনে ও মন্দির-প্রাঙ্গণে বারাঙ্গনারা নানারকম দৃষ্টিকটু ভঙ্গী ক'রে নৃত্য করতে থাকে (বার্নিয়ের 'দেবদাসী নৃত্যে'র কথা বলছেন)। কেউ কোন আপত্তি করে না। এরকম অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি জগন্নাথধামে। 'বারাঙ্গনা' বলতে যা বোঝায়, তারা ঠিক তা নয়। হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক বা খৃষ্টানই হোক, কাউকেই তারা সংস্পর্শে আসতে দেয় না, এবং কারও কাছ থেকে তারা কোন টাকাপয়সা বা উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করে না। তারা মনে করে দেবতার উদ্দেশে তাদের জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা পুণ্যাত্মা সাধু ছাড়া তাদের ছায়া মাড়াবার পর্যন্ত অধিকার নেই কারও। ভালকথা, সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা তো বলাই হ'ল না। মন্দিরের সীমানার মধ্যে চারিদিকে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। সকলেই প্রায় নগ্ন অবস্থায় ব'সে থাকে, মাথায় বড় বড় জটা, মুখে দাড়ি, গায়ে ভস্ম মাখা।

সতীদাহ ও সহমরণ

সতীদাহ ও সহমরণ-প্রথা সম্বন্ধে অনেক পর্যটক অনেক কথা বলেছেন। নতুন কথা কিছু বলবার নেই। অনেকে অবশ্য সতীদাহের যথেষ্ট অতিরঞ্জিত বিবরণও দিয়েছেন। ক্রমেই সতীদাহের সংখ্যা কমে আসছে মনে হয় এবং আগের তুলনায় এখন অনেক ক'মে গেছে। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান বাদশাহরা নানাভাবে হিন্দুদের সহমরণপ্রথা নিবারণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখন কোনদিন তাঁরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেননি এবং প্রত্যক্ষভাবে বা বিধিনিষেধ জারী ক'রে সতীদাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। নানারকম কৌশলে তাঁরা এই অমানুষিক প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাদেশিক গবর্ণর বা সুবাদারের অনুমতি ছাড়া কেউ সহমরণ বরণ করতে পারবেন না ব'লে তাঁরা এক আদেশ জারী ক'রে দিয়েছিলেন। সহমরণের জন্য সুবাদারের অনুমতি নিতে হবে এবং তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। আবেদন করলে সুবাদার সহজে অনুমতি দিতেন না, নানাভাবে চেষ্টা করতেন আবেদনকারীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাঁচাবার জন্য। নানারকম যুক্তি দিয়ে, আশার কথা বলে, সুবাদার নিজে যখন ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি সহমরণপ্রার্থিনীকে অন্দরমহলে মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সুবাদারের পরিবারের মহিলারা তাঁকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে এবং বাইরে থেকে কোন প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে না বলে সুবাদারের বিশ্বাস হ'লে, তবে তিনি সহমরণের অনুমতি দিতেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও সহমৃতার সংখ্যা হিন্দুস্থানে খুব বেশী বলা চলে। বিশেষ ক'রে, প্রায়-স্বাধীন হিন্দু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। মুসলমান শাসকরা এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। হিন্দুরাজারা সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচরণ ব'লে মনে করেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যে অবাধে সতীদাহ চলতে থাকে। যতগুলি সতীদাহ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে আমি দেব না। কেবল দু'তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। প্রত্যেকটি সহমরণের সময় আমি নিজে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে দেখেছি। প্রথম এমন একটি সতীদাহের বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করব, যার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত ছিলাম। অর্থাৎ সহমরণপ্রার্থিনীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি কৃতকার্য হয়েছিলাম।

আগা দানেশমন্দ খাঁর একজন অন্যতম কেরাণী ছিলেন, নাম বেণীদাস। বেণীদাস আমারও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রায় দু' বছর ধ'রে কঠিন অসুখে ভুগে তিনি মারা গেলেন। আমি তাঁর চিকিৎসা করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী স্থির করলেন স্বামীর সহমৃতা হবেন। আগার কাছে বেণীদাসের আরও অনেক বন্ধুবান্ধব চাকরী করতেন। আগা খাঁ তাঁদের বললেন যে, কোনরকমে বেণীদাসের বিধবা পত্নীকে বুঝিয়ে সহমরণের সঙ্কল্প যাতে তিনি ত্যাগ করেন সেই চেষ্টা করতে। বেণীদাসের বন্ধু-বান্ধবরা আগার কথায় উৎসাহিত হয়ে চেষ্টা করলেন যথেষ্ট বেণী-দাস-পত্নীকে বোঝাতে। তাঁরা বললেন যে, সহমরণের সঙ্কল্প যে তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা খুবই সাধু সঙ্কল্প। পুণ্যাত্মা আদর্শ স্ত্রী ছাড়া এরকম সঙ্কল্প অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারেন না। এতে তাঁর কুলগৌরবও যে বাড়বে এবং তিনি নিজে দেবীর মতন পূজিত হবেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবু তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন কয়েকটা কথা ভেবে দেখতে। তিনি কয়েকটি সন্তানের জননী এবং তারা প্রায় সকলেই বয়সে শিশু। তাদের বুদ্ধি হয়নি, বড় হয়নি তারা। তাদের দেখবে কে? কে তাদের প্রতিপালন করবে? মা'য়ের চেয়ে বেশী কে তাদের স্নেহ করবে, পিতার অবর্তমানে? তাদের এরকম অনাথ ও অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়া উচিত কি? তারা তো কোন অপরাধ করেনি। কিছুই জানে না তারা, ধর্ম কি, পুণ্য কি? অন্ততঃ তাদের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর উচিত, সহমরণের সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করা। পতিপ্রেমের চেয়ে অসহায় সন্তানদের কল্যাণচিন্তা তাঁর কাছে এখন বড় হওয়া উচিত।

এত অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি, যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও কিছু ফল হ'ল না। বেণীদাসপত্নী সহমরণের সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন। অবশেষে শেষ চেষ্টা করার জন্য খাঁ সাহেব আমার

শরণাপন্ন হলেন এবং আমাকে ডেকে বললেন : "বানিয়ের সাহেব ! আপনি তো বেণীদাস কেরাণীবাবুর একজন পুরাতন বন্ধু। চিকিৎসার জন্ত দীর্ঘদিন তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে আপনি পরিচিত। আপনি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখুন কেরাণীবাবুর স্ত্রীকে বাঁচানো যায় কি না।" আমি রাজী হ'লাম এবং কেরাণী-বাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম। বাড়ী গিয়ে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। মৃত বেণীদাসকে ঘিরে সাত-আট জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও চার-পাঁচ জন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। সকলে মধ্যে মধ্যে প্রাণপণ চীৎকার ক'রে উঠছেন, একটা বীভৎস আর্তনাদের মতন, এবং সজোরে হাত চাপড়াচ্ছেন। মনে হ'ল যেন নরকে ভূতপ্রেতের রাজ্যে ঢুকেছি। মৃত-স্বামীর পায়ের কাছে বিধবা পত্নী ব'সে আছেন, চুল আলুথালু, মুখ শুকনো। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, আগুনের মতন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলছে যেন। ব্রাহ্মণরা যখন আর্তনাদ ক'রে উঠছেন বিকটভাবে তখন তিনিও তাদের সঙ্গে চীৎকার করছেন এবং তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে হাত চাপড়াচ্ছেন। হল্লা, চীৎকার ও চাপড়ানি যখন খানিকটা শান্ত হ'ল, তখন আমি হতভম্বের মতন তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে কেরাণী-বাবুর স্ত্রীকে ডেকে বললাম : "আগা খাঁ নিজে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন আপনাকে জানাতে যে তিনি আপনার দুই পুত্রের জন্ত দুই ক্রাউন ক'রে মাসিক ভাতা দেবার বন্দোবস্ত করবেন, যদি আপনি সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আপনি জানেন, আপনার ছেলেদের মানুষ করার জন্ত, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্ত, আপনার বেঁচে থাকা কত প্রয়োজন। আমরা ইচ্ছা করলে জোর ক'রে যে আপনার সহমরণ বন্ধ করতে পারি না তা নয়, স্বচ্ছন্দেই পারি। শুধু তাই নয়, যেসব পাষণ্ড মতলববাজ আপনাকে এইভাবে সহমরণের জন্ত প্ররোচিত করছে, তাদেরও কিভাবে শাস্তি দিতে হয়, তাও আমরা জানি। তা আমরা করতে চাই না। আপনার সুবুদ্ধির কাছেই আমরা আবেদন করতে চাই। আপনার আত্মীয়স্বজন সকলেই চান যে অন্ততঃ সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে আপনি বেঁচে থাকুন। আপনি সন্তানের জননী, সুতরাং নিঃসন্তান তরুণী বিধবাদের বেঁচে থেকে যেরকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপবাদ সহ্য করতে হয়, আপনাকে তা করতে হবে না।" এই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি বহুবার বললাম, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ থেকে কোন উত্তর শুনলাম না। মুখ বুজে তিনি সব শুনলেন। অবশেষে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন ; "আমাকে যদি সহমরণে বাধা দেওয়া হয়, তাহ'লে আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব।" আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম : "মনে হয়, আপনার স্কন্ধে কোন প্রেতাত্মা বা অপদেবতা ভর করেছে, তা না হ'লে এরকম কথা মা হয়ে আপনি কি ক'রে বলতে পারেন, কল্পনা করা যায় না। বেশ, তাই হোক তাহ'লে। কিন্তু তার আগে আপনার ছেলেদের কাছে ডাকুন এবং নিজের হাতে তাদের গলা কেটে আপনার স্বামীর চিতায় সমর্পণ ক'রে দিন। এ কাজ আপনাকে করতেই হবে। যদি না করেন, তা হ'লে তারা অনাহারে তিলে তিলে মরবে এবং এখুনই আমি খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে তাদের ভাতা নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা করব।" অত্যন্ত সংযত ও সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো আমি ব'লে ফেললাম। বেণীপত্নীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, কিছুটা কাজ হয়েছে কথায়। একটি কথাও আর তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ব'সে রইলেন। দেখলাম, ঘরের বৃদ্ধরা ও ব্রাহ্মণরা একে-একে চম্পট দিলেন ঘর থেকে। মুখের উপর তাঁদের ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব খুব স্পষ্ট। যাই হোক, আমি তারপর তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে রেখে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘরমুখো রওয়ানা হলাম। সন্ধ্যার সময় যখন খাঁ সাহেবের কাছে আমার প্রচেষ্টার ফলাফল জানাবার জন্ত যাচ্ছি, তখন পথে বেণীদাসের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি বললেন যে বেণীপত্নী সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন। নিশ্চিন্ত হলাম শুনে।

[ক্রমশঃ।

—'ভাবছিস কেন লো ! বিদেশী কাগজে কেমন আমাদের ছবি বেরুবে দেখিস !'

রবীন্দ্র-কাব্যে নারী

অপর্ণা সরকার

আবহমান-কাল হতে সাহিত্যে নারীর স্থান অক্ষয় হয়ে আছে। এই নারীর রূপের শিখায় পুড়ে গেছে ট্রয় নগরী, তার অশ্রুবন্যায় ভাসিয়ে গেছে সোনার লঙ্কা, তার অবমাননার প্রতিহিংসায় ধ্বংস হল কুরুবংশ, আবার তারই লোভের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ হল আদিম দম্পতির অন্তরের প্রশান্তি। যুগে যুগে সে ধরা দিয়েছে কবির কাব্যে। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় শোনা যায় তার মহিমময় কণ্ঠ আর গীতিকাব্যের কুঞ্জবনে ধ্বনিত হতে থাকে তার অস্ফুট গুঞ্জন, কোমল হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন। এই বিচিত্ররূপশালিনী নারীর পদতলে—

বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা। (চৈতালি)

সেই সনাতন নারীর বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে রবীন্দ্র-কাব্যে। ভাবের ঐশ্বর্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, কল্পনার বিশালতায় সে প্রকাশ অনেক সময়ে বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই বলতে হয়—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারী
আপন অন্তর হতে। (চৈতালি)

এক দিকে সে গড়েছে তাকে আপন মনের মাধুরিমা মিশিয়ে, আর এক দিকে উপলব্ধি করেছে তার কান্না-হাসি, আস্বাদন করেছে তার লীলা আপন মনের অনুভূতি দিয়ে।

নারীকে কবি দেখেছেন তার দুঃখ-বেদনার ইতিহাসের ধারায় ও সাংসারিক জীবনের আবেষ্টনীর মাঝে,—আর এক দিকে উদ্ঘাটন করেছেন তার অন্তরলোকের নিত্যস্বরূপ।

কবি তাঁর অপার সহানুভূতি ও গভীর সংবেদনশীল মন নিয়ে নারীর গোপন হৃদয়ের যবনিকা তুলে দেখেছেন তার ব্যথাতুর মর্ম্মস্থান, শুনেছেন তার রক্তাক্ত হৃদয়ের আর্তনাদ। দৈনন্দিন জীবনে যাদের আমরা দেখেও দেখি না কবির দৃষ্টি পড়েছে তাদেরই 'পরে। এর জন্য তাঁকে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতে হয়নি। বাংলা দেশেরই 'সাধারণ মেয়ে', যারা 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়', যারা 'বিকিয়ে যায় মরীচিকার দামে' তারাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে কবির সামনে। তাদেরই কবি আনলেন বিশ্বের প্রাঙ্গণে। সামান্য মেয়ের ব্যথা রূপান্তরিত হল সার্ব্বজনীন নারীর আকুতিতে। কবির সহমর্ম্মিতার স্পর্শে তাদের ব্যথা ঝরে পড়েছে ভাষায়। তাই তাঁর কাব্যে শুনি রূপহীনা নারীর ব্যাকুল ক্রন্দন—

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়ে কি দিয়ে। (মানসী)

রাজধানীর পাষাণ-কারার অন্তরালে থেকে যে বালিকা-বধূ ব্যাকুল ভাবে বলে উঠেছে—

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে······(মানসী)

কবি অসীম ধৈর্য্য ও গভীর সহানুভূতিতে তার ব্যথাতুর হৃদয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে সেই বালিকা-বধূর বিধুর বেদনা। তার কান্নার ঢেউ কবির হৃদয়-তটে আছড়ে পড়ে মুখর হয়ে উঠল—

কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস কেহ যদি আমায় বল্। (মানসী)

সংসারের ঘূর্ণাবর্তে নারীর শাশ্বত আত্মা মুক্তি কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার সেই বন্ধন-কাতর অন্তরাত্মার আর্তনাদ ধ্বনিত হল রবীন্দ্র-কাব্যে। সেখানে দেখি 'দশের ইচ্ছায় বোঝাই করা জীবনটা টেনে টেনে শেষে' বাইশ বছরের ভরা যৌবনেই মরণ-পথিক লক্ষ্মী বধূটি অন্তরের ব্যর্থতার বেদনা ব্যক্ত করেছে—"বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ···। এমনি নিরানন্দ হয়ে উঠেছিল বিছুরও তেইশটা বছর। তাই যখন অসুস্থতার জন্য সে প্রথম সংসার থেকে ছুটি পেল তখন সেইটাই হল তার জীবনের চরম আনন্দ। সে ছুটি কাজ থেকে ছুটি নয়, বন্ধন থেকে মুক্তি,—সীমা থেকে, গণ্ডী থেকে বাহির বিশ্বে আপনাকে সমর্পণের আনন্দ। অসীমের ডাক মানুষের মনের মধ্যে নাড়া দেয়। সেই ডাকে সাড়া দেওয়া, আপনাকে যুক্ত করা তার সঙ্গে—সেই ত মানুষের চরম চাওয়া, পরম পাওয়া। তাই ক্ষণকালের মুক্তির আনন্দের গভীরতায় তার মন বলে উঠেছিল—

এ জীবনের যা-কিছু আর তুলি
শেষ ছুটি মাস অনন্ত কাল মাথার রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সীঁথির পরে নিত্য সিঁদূর সম। (পলাতকা)

সমাজের নিষ্ঠুর নিপীড়নে নারীর হৃদয় নিয়ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে ওঠে। সংসারের পরিপূর্ণতার মাঝে বালবিধবার দুঃখ কবির মনকে ব্যথিত করে তুলছে। তাই ত শুনি তাঁর অভিযোগ—

তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে—
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে। (পলাতকা)

ধর্মের নামে আচারের এই হৃদয়হীনতাই তাঁর মনে বেশী বেজেছিল। 'মঞ্জুলা'র বাল্যপ্রেমের অস্ফুট মুকুল যে দিন যৌবনে প্রিয়তমের সহানুভূতি ও প্রেমের স্পর্শে স্তবকে স্তবকে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল সেদিন—

আপন ঘরের দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, 'পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো এবার মরণ হোক।' (পলাতকা)

তাই সেই রুদ্ধ কক্ষে আকুল ক্রন্দন কবির চোখ এড়ায়নি। তাই তিনি সমবেদনার এই বালবিধবার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে বেঁধে দিয়েছিলেন প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন-ডোরে।

নারীর প্রতি সহানুভূতিতে কবির মন দেশ-কালের গণ্ডী পেরিয়ে, জাতি-ধর্মের সীমানা লঙ্ঘন করে চলে গেছে মানবতার ভাবলোকে। নারীকে কবি দেখলেন তার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। ...হোক না সে সমাজচ্যুতা, হোক্ না সে পতিতা—তবু তার মনের গহনে বাস করছে সেই চিরন্তনী মানবী। সমাজ বা কর্মের মধ্যেই তার পরিচয় সীমায়িত নয়—মানুষ হিসাবেই সে কবির মনে রেখাপাত করেছে। তাই ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ব্রতচ্যুত করবার রাজাদেশ পেয়ে পতিতার চোখের জল বাধা মানে না, বাধা মানে না তার কণ্ঠ। তার গ্লানি, তার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা রূপায়িত হল কবির ছন্দে—

নাহি ক করম, লজ্জা শরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা ? (কাহিনী)

পৌরাণিক যুগের নারীর কথাই নয়, বর্তমানে ও কবে মহানগরীর কোন্ পথমাঝে দোকানীর শিশুপুত্রের মৃত্যু দর্শনে কোন্ বারাঙ্গনার হৃদয় কেঁদে উঠেছিল তার কথা অনেকে ভুলে গেলেও কবি ভোলেননি। তাঁর দৃষ্টিতেই আমরা দেখলাম সেই দৃশ্য—

ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা। (চৈতালি)

সাধারণী নারীর মাতৃহৃদয়ের আর্তি অসাধারণ হয়ে রইল কবির কাব্যে।

নারীর দুঃখ-বেদনা কবির স্পর্শকাতর মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীর ভাবে। বারে বারে তাঁর সমবেদনা ছুঁয়ে গেছে যাদের মনকে—

তারা সবাই সামান্ত মেয়ে
তারা ফরাসি জার্মান জানে না,
কাঁদতে জানে। (পুনশ্চ)

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এখানেই সীমাবদ্ধ হয়নি। নারীকে কবি দেখলেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে। তাই রবীন্দ্রকাব্যে তার নানা রূপ। কবির মানস-সরোবরে সে শুধু অশ্রুশতদলেই আসীন নয়। সে কেবল কাঁদতেই জানে না। জগতের পুরুষচিত্তে সে দিয়েছে সজ। তাই কবির বুকের মধ্যে বসে শাশ্বত পুরুষ বলে—

...নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে। (পত্রপুট)

এক দিকে তার প্রেমের ধারা ঘিরে ধরল প্রতিদিনের পাওয়া 'তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল অতি সাধারণ স্ত্রীস্বরূপকে'—

অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ। (পত্রপুট)

আর এক দিকে তার প্রেম জেলে রেখেছে 'চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা।' তাই কবি বলেন—

সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্প পল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপনলাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তা'র সেতারের দ্রুত ঝংকৃত সুর।
(পত্রপুট)

সেই সুরের যাদুস্পর্শে খুলে গেল কবির মনের দুয়ার। অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করলেন তাকে দুই রূপে। সে নারী যেন প্রকৃতিরই অংশ। তার মধ্যে রয়েছে ঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য : এক দিকে সে বর্ষা, আর এক দিকে সে বসন্ত। এক দিকে সে 'জলদান করে, ফলদান করে, নিবারণ করে তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেয় বিগলিত করে, দূর করে শুষ্কতা, ভরিয়ে দেয় অভাব।' আর এক দিকে দেখি 'গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় সেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব্ব দেহে মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।'

এমনি করে কবির সন্ধানী দৃষ্টি চলে গেছে নারীর অন্তরের অন্তস্তলে। অনুভূতির ব্যাপকতায় তার আন্তরলোকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন কবি তাঁর নিপুণ ভাষায়। নারীর মধ্যে যে দুই রূপ আছে তাকেই কাব্যে বিশ্লেষণ করলেন—

সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'। (বলাকা)

এই দুই নারীর আগমনে পূর্ণ হল বিশ্ব। সে নারী—

একজনা উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা-রাজ্যের নারী
স্বর্গের অপ্সরী। (বলাকা)

তার উচ্ছলিত যৌবনের মদির-বিহ্বলতায় 'বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়।' তার 'কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল।' তার অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-চরণ-আঘাতে—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল......(চিত্রা)

সেই নৃত্যের দোলনে কেঁপে উঠে স্থিতির আসন। 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' যৌবনের, সেই দুঃসহ মধুর নাচের মাতনে ভেঙ্গে পড়ে শান্তির বেদী, তার তালের তীব্র ঝঙ্কারে ডুবে যায় ওঙ্কার-ধ্বনি। "সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য্য।" সেই অনবগুণ্ঠিতা দেবলোকের অমৃতপান সভার সখী ধরা দেয় না মানুষের চিত্তলোকে। কামনা-রাজ্যের নারী সে—বিকশিত বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ, মাঝখানে

অতি লঘুভারে তার পাদপদ্ম ন্যস্ত। সে 'অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী।' এই অধরা স্বপ্ন-সঙ্গিনী আনে অতৃপ্তি। তাই তার সৌন্দর্য্যের মাঝে এত ক্রন্দন, এমন বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। মানুষকে শান্তি দেয় কে? সে—

> অঙ্গনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
> বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
> স্বর্গের ঈশ্বরী। (বলাকা)

"উর্ব্বশী আর লক্ষ্মী এরা মানুষের দুটি প্রবর্ত্তনার, প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্ব্বভূতের মূলে এই দুই প্রেরণা আছে। একটি শক্তি—সে ভিতরে যা' কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্ঘাটিত করে, এবং আর একটি শক্তি—সে অন্তর্নিহিত পরিপক্বতার মধ্যে সফলতার পর্য্যাপ্তি নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।" সে মানুষের উদ্ধত বাসনাকে—

> ফিরাইয়া আনে ধীরে
> জীবন মৃত্যুর
> পবিত্র সঙ্গম-তীর্থ-তীরে
> অনন্তের পূজার মন্দিরে। (বলাকা)

এই কল্যাণী নারীর স্তবগান গুঞ্জরিত হয়েছে রবীন্দ্র কাব্যে তার প্রশান্ত রূপের সামনে পুরুষের কামনা হয়েছে নত। তাই দূরে দাঁড়িয়ে সে বলে—'আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে'। তার স্থির অচঞ্চল লাবণীর মুগ্ধতায় অতনু ভুলেছে তার শর-সন্ধান। এই অপূর্ব্ব শ্রীময়ী নারী মদনকে ভস্মীভূত করেনি তার তৃতীয় নেত্রের অগ্নিদাহে। সুধাস্নিগ্ধ নয়নের প্রসন্নতায় জয় করেছে তাকে। সেই বিজয়িনী নারীর পদপ্রান্তে অনঙ্গদেবকে দেখি—

> জানু পাতি বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে,
> নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
> সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
> তূণ শূন্য করি। (চিত্রা)

সেই সৌন্দর্য্যস্বরূপিণী কল্যাণী নারীর অমৃত পরশে ধূলি-মলিনতা যায় মুছে, জীবন হয় শুচিস্নিগ্ধ। তারই আবাহনী কবির কণ্ঠে—

> তুমি এস, এস নারী,
> আন তব হেমঝারি
> ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন
> জোড়া দিয়ে দাও ভগ্নছিন্ন
> সুন্দর কর, সার্থক কর
> পুঞ্জিত আয়োজন। (উৎসর্গ)

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে নারী শুধুই গৃহের কল্যাণী নয়। পুরুষের এই ভক্তিনম্র হৃদয়ের পূজা গ্রহণেই সে তৃপ্ত নয়। তাই বিধাতার কাছে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার চায় সে। 'ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি' আনত মস্তকে পথপ্রান্তে জাগরণ তার কামনা নয়। 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন' আহরণেই সে পায় আপন সার্থকতা। কবির 'সবলা' নারী আপন সত্তায় বিকশিত হতে চায়। প্রতীক্ষিত লগ্নকে সে মৌন মিনতিতে মেদুর করে তোলে না। সে চায় পুরুষের সহচরী হতে। সেইখানেই তার পরিচয়।—

> পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
> নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
> মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
> আমার পাইবে তবে পরিচয়। (চিত্রাঙ্গদা)

আপনার পরিচয় সে আপনিই দেয়। সে ভীরু লতিকা নয়। নিরলস গৃহকোণে পুরুষের বাহু-বন্ধনের মাঝে নিবিড় শান্তির আশ্রয় তার কাম্য নয়। সে বিদ্রোহিণী তেজোদৃপ্তা। তার মঞ্জীরে মন্দাক্রান্তার সুর-মাধুর্য্য নেই। 'প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে চলে না কোমলকান্তা।' তার রক্তের মধ্যে 'জাগে রুদ্রবীণা।' সেই বীণার সুরে সুর মিলিয়ে সে বলে—

> যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
> আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী। (মহুয়া)

তার প্রেমের মধ্যে আছে মুক্তির গান। তাই সে সহজেই বলে—'আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,...।' সেই নারীকেই কবির পুরুষচিত্ত বলে—'সেবা কক্ষে করি না আহ্বান।' এই অমিততেজা নারীর প্রেমে সে পায় আশ্বাস, চায় প্রেরণা—

> তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা স্ফূর্তির নিশ্বাস,
> উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস। (মহুয়া)

'এ নারী নর্ম্ম-সহচরী নয়, কর্ম্ম-সহচরী। সে বিশ্রামের স্থান নয়, কর্ম্মের শক্তিদায়িনী, ভোগের সঙ্গিনী নয়, সে সংগ্রামে তূর্য্য-বাদিনী।' আজকের দিনে নারী কেবলমাত্র মৈত্রী-করুণার মূর্ত্তি নয়—পৃথিবীর যজ্ঞবেদিকায় যে দুঃখের হোমশিখা জ্বলছে, যে প্রাণের আহুতি চলেছে, তারই চতুর্দ্দিকে সে পুরুষের সপ্তপদী গমনের সহযাত্রিণী। 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু'র অজানা পথের সঙ্গিনী এই বীর্য্যসাধিকা নারীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দুঃখ-দহন-দীপ্ত পুরুষ বলে—

> আমরা দুজনে স্বর্গ খেলনা রচিব না ধরণীতে
> মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
> পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
> বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে। (মহুয়া)

"এই যে বীর্য্যের আহ্বান 'আবিরাবির্ম এধি,' এই যে নারীর অন্তরের জাগরণ ইহার মধ্যেই নারীর যথার্থ নারীত্ব।"

নারীর এই বিচিত্ররূপ কবিকে মুগ্ধ করেছে। এই বিচিত্ররূপশালিনী নারীকে ভালবেসেই কবির মনের দুয়ারের আগল গেল খুলে। সেই খণ্ড-প্রেমের মধ্যে কবি উপলব্ধি করলেন অন্তহীন প্রেমের অতলান্ত রহস্য। তারই স্বচ্ছ স্বীকৃতি প্রেমিক কবির প্রতি তাঁর জিজ্ঞাসায়—'হেরি কাহার নয়ান, রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।' মর্ত্ত্যনারীকে ভালবেসেই কবি পেলেন অমৃতের স্বাদ। আবার তারই মধ্যে দেখলেন নিখিল বিশ্বের লীলায়িত সৌন্দর্য্য। প্রিয়ার প্রেমের জ্যোতিতে অন্তরলোক হল আলোকিত। তারই প্রতিফলন আকাশের নীলিমায়, বনানীর শ্যামলিমায়, পাহাড়-পর্ব্বতের গৈরিক রুক্ষতায়। তারই প্রেমের সুরে ধরণীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বেজে উঠেছে

বিহ্বল রাগিণী ! নারীকে দেখলেন কবি প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত ।—

এই নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো ?
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ । (চৈতালি)

বন্ধনহীন আকাশের সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে তার দীপ্ত আননের প্রতিচ্ছবি ; ফোটা-ফুলের শুভ্রতায় তার হাসি, পল্লব-মর্ম্মরে, তরঙ্গ-দোলায় তার গানের হিল্লোল । বিশ্বের মাঝে নারীর হৃদয়ের স্পন্দন ; আবার সেই বিশ্ব ধরা দিল কবির মনে নারীরই ছায়ারূপে এসে । বিশ্বধরণীর সাথে মিতালী চল নারীর মাঝ দিয়ে—

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে । (চৈতালি)

শুধু তাই নয় । এক আপনাকে বিভক্ত করে হলেন দুই । পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা হল সুরু । সান্তের প্রেমে অনন্ত বিভোর । অনাদি কাল হতে চলেছে এই অন্তহীন লীলা । বিশ্বদেবতা ধরা দিলেন নারীর প্রেমে । তারই মাঝে দেখলেন আপনাকে—

নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম প্রতিরূপ (চৈতালি)

সীমার মাঝে অসীমের এই লীলা, অনন্তের এই অতলান্ত রহস্য নারীর সাহচার্য্যে উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হলেন কবি ।

পরিতৃপ্তিই পূর্ণতার বাহন । রবীন্দ্র-কাব্যে নারী তাই পূর্ণতার পরিচয় এনেছে । এই পূর্ণতার কাছে কবির অশান্ত হৃদয় চেয়েছে আশ্রয় । মায়ের স্নেহে, প্রিয়ার প্রেমে, সখীর প্রীতিতে নারী ভরে দিল কবির মন । ক্ষণিকের পাতার কুটিরে রইল তার চিরন্তনী স্বাক্ষর । আপনাকে নিঃস্ব করে, রিক্ত করে সে রচনা করেছে অসীম বিত্ত । কবির চিত্তলোকে তাই যুগে যুগে বাজে তার আগমনী । তাই কবি তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তারই কাছে নিবেদন করে বললেন—

আমার কাব্য-কুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খসে পড়ে ।
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে । (ক্ষণিকা)

খেলা

শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবী

ছেলে কোথায় গেল । এই ছিল এই নেই । কমলা চোখে অন্ধকার দেখে যেন । খোকনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । কোথায় গেল ? এই তো একটু আগেও বারান্দায় ব'সে খেলা করছিল । এখনও সেখানে পড়ে রয়েছে কমলার গায়ের ছেঁড়া ব্লাউজের টুকরো আর তার পরিত্যক্ত শাড়ীর লাল পাড় খানিকটা । একটা ভাঙ্গা লাঠি, ছেঁড়া কাগজ, আরও কত কি ! কমলার ছেলের খেলার সামগ্রী । বারান্দার ও-পাশটায় একেবারে ছড়িয়ে পড়ে আছে । কিন্তু খোকা তো নেই ? ধড়াস করে উঠলো কমলার বুকের ভেতরটা । "খোকন, খোকন রে—কোথায় আবার গেলি ? এই তো খেলছিলি বসে এখানে ?"

এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগলো কমলা । খোকনের খেলার জিনিষগুলো দেখে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠলো কমলার । এই সব বাজে জিনিষ নিয়ে খোকন তার খেলা করে । কতো ভাল ভাল খেলনা আলমারীতে ঠাসা । সেই সবুজ মোটরগাড়ীটা নেবার জন্ত মাঝে মাঝে খোকন কতই না বায়না ধরে । কমলা বের করে দেয়নি । ভেঙ্গে ফেলে যে বড্ড । আগে আগে তো দিতোই বের করে । আর খোকা ভেঙ্গেছেও যে কতো ভাল ভাল খেলনা তার কি কোন ঠিক আছে ? তাই না এখন গোটাকতক ভাল দামী খেলনা আলমারীতে বন্ধ করে রেখেছে ও । খোকনই তো বড় হ'য়ে খেলবে নিয়ে ? নাঃ, আজই সব বার করে দেবে খোকনকে । ওর জিনিষ, যা খুসী তাই করুক গে । "খোকা রে—ওরে খোকন !" খুঁজে বেড়াতে লাগলো কমলা ইদিক-সিদিক । এখান-সেখান ।

মাসখানেক হয়েছে খোকাকে নিয়ে কমলা বাপের বাড়ী এসেছে । আসবার সময় শাশুড়ী তাকে সাবধান করেছেন বার বার ;—"দেখো বৌমা, ছেলে নিয়ে তো যাচ্ছো, বাপের বাড়ী না গেলেই তো নয় ! ছেলের যেন কিছু না হয় । রোগা-টোগা করে এনো না যেন । তোমরা বাছা আজকালকার মেয়ে, স্বাধীন মতে চলতে না পেলেই মন খারাপ হয় । তা' যাচ্ছো যাও,—তাড়াতাড়ি ছেলে নিয়ে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ।"

কমলা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো । রুদ্ধনরতা মাকে বললে "ব্যস্তকণ্ঠে,—'মা, খোকা এসেছে এখানে ? কোথাও তো পাচ্ছি না খুঁজে ?'

মা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন । মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন অবাক হ'য়ে । বললেন,—"কেন, তোর কাছেই তো ছিলো ! কোথায় গেল ? তুই কি করছিলি ?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মা রান্নাঘরে শিকল তুলে । ছোট মেয়ে শিখাকে ডেকে বললেন,—"ওরে তপনদের বাড়ী একবার ভাখ, তো । খোকন গেছে কিনা তপনের সঙ্গে খেলতে । শিখা ছুটলো তপনদের বাড়ী যেদিকে, সেদিকে । মা কমলাকে বললেন, "বাড়ীর আশ-পাশটা তুমি একবার ভাল করে খুঁজে দেখ, কোথাও মাটি-কাদা নিয়ে খেলছে কিনা বসে ।"

মায়ের মুখের দিকে কুণ্ঠিত-কাতর দৃষ্টি মেলে কমলা বললে,—'তুমি দেখো মা, ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠ্ছে । আমি আর খোঁজাখুঁজি করতে পারছি না ।'

মেয়ের ছলো-ছলো চোখের দিকে চেয়ে মা আর কিছু বললেন না । উদ্বিগ্ন মুখে বাড়ী থেকে তিনিও বেরিয়ে গেলেন ।

কমলা গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলো । চোখ দুটো জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে ফেললো । চোখের জ্বালা একটু কমলো যেন । কিন্তু বুকের জ্বালা ! আঁচলের ঘন ঘন ঘর্ষণেই বোধ হয় লাল হয়ে গেছে তার মুখখানি । নাঃ, চোখ দুটো ভারি বিচ্ছিরি, এক-টুকুতেই কেবল জল আসে । অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে কমলা । কোথায় আর যাবে ? এখনি মা কোলে করে নিয়ে বাড়ী ঢুকবেন এখন ।

ঘর-বার করে কমলা । এ-ঘর থেকে ও-ঘরে । এ দুয়োর থেকে সে দুয়োরে । এক জানলা থেকে অন্ত জানলায় ।

বেশ কিছুটা বেশী বয়সেই দোলন কোলে এসেছে কমলার। প্রথমে তো সবাই ভেবেছিল ছেলে আর হবেই না তার। বিয়ের পর বেশ কিছু কাল অতীত হওয়ার পরে তবে তার ছেলে হয়েছে। সকলের নয়নমণি ছেলে। কমলা তো সব সময়ই চোখে-চোখে রাখে। চোখের আড়াল করতে চায় না। আজ আবার একি হ'ল? মা আর শিখা সেই যে খুঁজতে বেরোলো এখনও তো কই ফিরছে না? দেখবে নাকি কমলা একবার বেরিয়ে? বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো সে-ও। চোখ দুটো মুছে ফেললো কমলা আঁচলে, ঐ যে গাছতলায় কারা যেন খেলা করছে? খোকন নেই তো ওখানে? এগিয়ে গেল কমলা। বললে, হ্যাঁ রে, চাঁপা, দোলনকে দেখেছিস্?

"—না তো মাসীমা, দোলন তো আসেনি এদিকে!"

ফিরলো কমলা। এখানে-সেখানে, কত জায়গায় খুঁজে বেড়ালো। কোথাও নেই। কোথায় গেল ছেলেটা? আর তো হাঁটতেও পারে না কমলা। রোদ্দুরে মুখখানি লাল হ'য়ে উঠেছে তার। গায়ের ব্লাউজটা সপ্-সপ্ করছে ঘামে ভিজে। যাই হোক, চলতে চলতে ভাবলো মনে মনে, মা হয়তো এতক্ষণ খোকনকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। বাড়ীতেই ফিরে যাওয়া যাক্ বরঞ্চ!

ফিরে চললো কমলা দ্রুত গতিতে। বাড়ী ফিরে দেখলো, সদর দরজায় তখনও শিকল তোলা। শ্লথ হ'য়ে এলো গতি। শিকল খুললো অবশ হাতে। ভিতরে ঢুকলো শেষে। পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় একখানা কাপড় শুকুচ্ছিল রাত্তির থেকে। এক পাশটা তার ঝুলে পড়েছিল মাটিতে। ধপ্ করে সেখানেই বসে পড়লো কমলা। বাঁ হাত দিয়ে কাপড়খানা সরিয়ে দিতে গেল। ও মা গো! কমলার আয়ত চোখ দুটি বড় বড় হয়ে ওঠে হঠাৎ ঘোর বিস্ময়ে। আর খিল্-খিল্ হেসে দোলন মাকে জড়িয়ে ধরে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে কমলা। ছেলেটাকে বুকে তুলে নেয়।

ট্রেন

(ভেরা পানোভা)

(পূর্বানুবৃত্তি)

শান্তা বসু

১৯৪২ সালে শরৎকালে জার্মানরা স্তালিনগ্রাদ অবধি এগিয়ে এলো—এইবার সুরু হোলো সেই বিখ্যাত যুদ্ধ—পাঁচ মাস ধরে সারা দুনিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়েছিলো যার ফলাফলের দিকে।

প্রথমতঃ ভয় হোয়েছিলো এই বুঝি জার্মানরা ভল্গা পার হোয়ে চলে আসে—তারপর একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখা গেলো—নাও আসতে পারে। আরও পরে এলো দৃঢ় বিশ্বাস—নাঃ এ সীমানা আর অতিক্রম করতে হচ্ছে না ওদের, সোভিয়েটের লাল ফৌজ ওদের ক্রমাগত পশ্চিম দিকে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সোভিয়েট ভূমিকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়ে ওরা এগোচ্ছে।

ট্রেনেতে দানিলভ এখন দু'বার করে খবর শোনবার আর আলোচনা করার ব্যবস্থা করেছে—অবশ্য সব খবরের মূল কেন্দ্র হোলো স্তালিনগ্রাদ। প্রত্যেক কামরাতেই একটি বোর্ডে খবরের কাগজের কাটিং রাখার ব্যবস্থা হোয়েছে। প্রত্যেকেরই সমস্ত চিন্তা, আশা, পরিশ্রমের সার্থকতা ঘিরে আছে ঐ একটি নাম—স্তালিনগ্রাদ।

যারা যুদ্ধের কাজে যোগ দিতে সক্ষম তারা সবাই ট্রেন থেকে চলে গেছে। কিন্তু দানিলভের ডাক পড়েনি। দানিলভ কিন্তু চুপ করেই আছে—ও ভোলেনি পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস্ থেকে আসা চিঠিখানার কথা। মেয়েরা স্বেচ্ছা-বাহিনীতে যোগ দিতে সুরু করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই রাইফেল আর মেশিনগান চালানোতে ট্রেনিং নিচ্ছে। লেনাকে তাদের অগ্রবর্তিনী দেখে দানিলভ একটুও অবাক হয়নি। কিন্তু আবেদন পত্রের মধ্যে এক জায়গায় মোটা আইয়ার স্বাক্ষর দেখে ওর বিস্ময় চরমে উঠলো। নিজের অজ্ঞাতসারেই ও শিস দিয়ে উঠলো। মোটা আইয়া—একটা বছরও কাটেনি বোধ হয়, বোমার ভয়ে আধমরা হোয়ে একটা ছোট্টো গর্তে কোন মতে নিজেকে গুঁজে বসেছিলো...

কথা বলার চেয়ে দানিলভ কথা শুনতেই বেশী ভালোবাসতো। ট্রেনের লোকেরাও অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিলো কমিশনরের যখন-তখন নিঃশব্দে আসা, মিনিট দু'য়েক বসে কথাবার্তা শোনা তারপরই কেমন অস্বস্তিভরে চলে যাওয়াতে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে দানিলভের ঔৎসুক্য আর আগ্রহ বেড়েই চলছিলো।

একটা পশমের জামা খুলে পশমগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে বলের মত করছিলো জুলিয়া। এক সময় সুপ্রাগভের দিকে চেয়ে

বললে,—"যাই হোক, আমরা ওদের বাধা তো দিলাম। মনে আছে ক্ষোভের কথা? চোখের সামনে আমাদের ফৌজকে সেখানে পিছু হটতে দেখেছিলাম···হ্যাঁ,তুমিই প্রথম লক্ষ্য কর সেটা···কিন্তু এবার আর তা' হবে না। এবার আমরাই জিতবো। উঃ, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি কি কাণ্ডটাই সেখানে হচ্ছে,···রাস্তার পর রাস্তায়··· বাড়ীর পর বাড়ীতে···"

একটা হতাশার সুর যেন.ওর গলায়—ওর এতক্ষণ কি এখানে বসে থাকা উচিত স্তালিনগ্রাদে না থেকে?

কিন্তু ক্রাভট্‌সভের কথাগুলো সত্যিই শোনবার মত। সে নাস্তাকে বলে,—"সেই ডেভিড, সে তো প্রথমটায় মেষপালক ছিলো। শুধু তাই? যখন সে একটা একরত্তি ছেলে তখনি তো বিরাট দৈত্য গোলায়াথকে স্রেফ গুলতিতে পাথর ছুঁড়ে মেরেই ফেললো"।

—"কি বললে? গুল্···গুল্···কি?

—"মানে ঐ যাতে করে ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে না? সেই জন্যই তো জু'রা পরে ওকে তাদের জার করে।"

—"তাদের জা-র? জু'দেরও বুঝি জার ছিলো?"

—"হায় ভগবান! এ যে একেবারে আকাট মুখ্যু—ছুয়ে ছুয়ে চার ছাড়া আর কি কিছুই জান না তুমি?"

ক্রাভট্‌সভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু চুপ করে। আবার সুরু করে গল্প. "সেই হাজার বছর আগে ডেভিড্ যে সব কথা লিখে গেছে আজও মনটাকে তা' জাগিয়ে তোলে। সে লিখেছিলো, 'সত্যই তোমার একমাত্র অস্ত্র।' বুঝতে পারছো কথাটা? হাউইজার নয় সত্য—সত্যই হোলো অস্ত্র। কিন্তু তবুও গোলায়াথকে গুলতি দিয়েই মেরেছিলো—কিন্তু একই সময় বলতেও ছাড়েনি যে সত্যই একমাত্র অস্ত্র'। আর একসময় বলেছিলো 'শান্তিই একমাত্র'—মানে যুদ্ধ নয়, শান্তির ভিতরই আমরা সুখ পাবো। কিন্তু কি জানো যুদ্ধটাই হোলো সেই শান্তিকে পাবার রাস্তা···ওঃ হো, কার কাছেই বা এত বকবক করছি, তোমার তো মাথায় কিছুই ঢুকবে না···"

—"আমাদের ইস্কুলে একটা ছেলে গুলতি দিয়ে আর একটা ছেলের চোখ কানা করে দিয়েছিলো—" নাস্তার উক্তি শোনা যায় এতক্ষণে।

* * *

শীতের গোড়ার দিকটায় একবার 'হসপিটাল ট্রেন'টাকে মস্কোর কাছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হোলো। তখন খালিই যাচ্ছিলো ট্রেনটা, তাই দানিলভ সবাইকে সিনেমা যেতে ছুটি দিলো, নিজেও গেলো দেখতে। একটা শ্রমিকদের ছোট ক্লাবের সিনেমা হল। বেশীর ভাগই ছোটো ছেলেমেয়েদের দল—সারাক্ষণ চীৎকার, চেঁচামেচি, শীষ দেওয়া, বেড়াল ডাকা, জুতো ঘষা যা-কিছু দৌরাত্ম্য করবার নির্বিচারে করে যাচ্ছিল। দেখানো হচ্ছিল যুদ্ধ-সীমান্তের ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটি গল্প। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—ভালোবাসতো তারা পরস্পরকে আর সেই মিলিত ভালোবাসা ছিলো দেশকে ঘিরে। জীবন পণ করে তারা দেশকে বাঁচাবার জন্য লড়তে লাগলো। শেষ কালে কবলিত হোলো মেয়েটি, শত্রুপক্ষের অকথ্য অত্যাচারে ফ্যাসিস্ত জল্লাদের নৃশংসতায় প্রাণ দিলো শেষে। যদিও সবাই জানতো ছবির জার্মানরা সত্যিই জার্মান নয়, তবুও সমস্ত জিনষটাই তখন এত পরিচিত, ঘটনাগুলো এত স্বাভাবিক আর বাস্তব—দেশের জন্যে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন, শত্রুপক্ষের প্রতি নিবিড় ঘৃণা, জার্মানদের অত্যাচার—বিশেষ করে মেয়েটির আত্মত্যাগ এতই পরিচিত আর স্বাভাবিক ঘটনা যে প্রত্যেকেই অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরে উঠলো—ছেলে-মেয়েরা প্রাণপণ চীৎকার করে জার্মানদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে লাগলো। সিনেমা শেষ হোয়ে যেতে সবাই বেরিয়ে এলো—বাইরে তখন তুষারপাত চলছে। দানিলভ সবার সঙ্গ এড়াতে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে রইলো। নির্জন পথে একা চলতে কত কথা ওর মনে হোতে লাগলো।

কেউ সিনেমাই দেখুক, কি বই-ই পড়ুক—ভালোবাসার ঘটনা থাকবেই থাকবে। আচ্ছা মানুষের বাস্তব জীবনে প্রেম কি সত্যিই এত দূর প্রয়োজনীয়? কেন? ওর জীবনে কি সার্থকতা আসেনি—ওর প্রেমহীন জীবনে? প্রতিটি দিনই তো কাজের সাফল্যে ভরা, তবে?···তবু ওর জীবনেও প্রেমের পদক্ষেপ হোয়েছিলো বৈ কি··· কিন্তু সে প্রেম ক্ষণস্থায়ী, ভুলে ভরা···শুধু ভুল নয় কাঁটাতেও ভরা—না, সে কাঁটার ঘায়ে জর্জরিত হবার মুহূর্তে'ই সে প্রেম চলে গেছে—হার মানেনি সে।

এক্ষুণি সিনেমার পর্দায় যে ছেলেটিকে দেখলে, ওরই মত এক-দিন ছিলো দানিলভের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণটি। শুধু ছিলো না ওই ছেলেটির মত রূপ আর অমন দৃঢ় অনমনীয়তা। ভারী ভালো লাগে পুরানো দিনের পাতা ওল্টাতে—সব চেয়ে কামনীয় হোলো—তারুণ্য।···কিন্তু তার পর? না আজকের পরিণত বয়স্ক দানিলভ পঁচিশ বছর আগেকার সেই কিশোরটির জন্যে দায়ী নন। আজকের দানিলভের চুলে পাক ধরেছে, শিথিল হোয়েছে সেই দুর্দমনীয়তা।

কিন্তু সে দিনের সেই দুরন্ত অথচ স্বপ্নপ্রবণ এলোমেলো ছেলেটা! বরাতটাই ছিলো খারাপ ওর। কিন্তু দানিলভ কৃতজ্ঞ থাকবে সেই এলোমেলো ছন্নছাড়া ছেলেটার কাছে—তাই তো অমন তিক্ত-মধুর স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ।

সে ছিলো পনেরো বছরের দানিলভ। ওদের গ্রামে যুবসঙ্ঘ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও তার সভ্য হোলো। মনে পড়ে একদিন সহর থেকে রোগা মত একটি ছেলে এলো ডাকগাড়ীতে চড়ে। স্কুলবাড়ীতে সব ছেলে-মেয়েদের জড়ো করে অনেক কথা বলেছিলো উৎসাহ আর উত্তেজনায় ভরা···তারপর যারা সভ্য করতে চায় তাদের নাম সই করিয়েছিলো। মনে থাকার কথা নয়—তবু মনে পড়ে; কারণ অনেক ছেলেমেয়ের মায়েরা ততক্ষণে জানলা আর দরজা থেকে ডাকতে সুরু করেছিলো,—"মিশ্‌কা, তাড়া, বাড়ী এসো, কখন্ না চলে আসতে বলেছি!"

দানিলভের মনে একটু গর্ব্ব ছিলো বৈ কি—ওর মা ছিলেন না ওদের দলে। বাড়ী এসেই সরবে ঘোষণা করেছিলো—"আমি এখন যুবসঙ্ঘের সভ্য"—

—"যেমন ছিলে তেমনই চলে গেলে তো? নতুন সার্টটা পরে গেলে কি ক্ষতি হোতো? সহরে ছেলেটি কি ভাবলে বল তো?"

মা শুধু এই কথাই বলেছিলেন। সত্যি বলতে কি দানিলভের মা, বাবা কখনও ওর কোনো কাজেই প্রতিবাদ করেননি, একটি বার

ছাড়া। তাঁরা নিশ্চিন্তই ছিলেন যে তাঁদের স্থির, ভদ্র, শান্ত কঠিন কর্ত্তব্যপূর্ণ জীবনপালন ছেলের কাছে দৃষ্টান্ত হোয়ে থাকবে, সে কোনো দিনই এই ধারা থেকে চ্যুত হবে না। দানিলভের মনে পড়ে না কখন মা বাবাকে ঝগড়া করতে, কি অলস ভাবে দিন কাটাতে কি মাতলামি বা হল্লা করতে দেখেছে বলে। অদ্ভুত কর্ম্মনিষ্ঠ ওর মা-বাবা দু'জনেই। দানিলভও সেই ধারা রাখবার চেষ্টা করতো প্রাণপণে। দানিলভের মা ওকে রান্না, কাপড় কাচা, মোজা সেলাই সব শিখিয়েছিলেন। বলতেন, সৈনিক-জীবনে এ-সব কাজে লাগবে।

ছোট্ট বেলায় মা কত আদর করতেন, কিন্তু একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সব বন্ধ। দানিলভের মনে নেই কবে মা আদর করে চুমু খেয়েছেন—কিন্তু তবুও তাঁর স্মৃতি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

যুবসঙ্ঘের সভ্য—আনলো একটু একটু করে বিপ্লবকে—পুরানো চিন্তাধারা নতুনের মাঝে সংস্কৃত হোলো। কিন্তু জীবনে নতুনত্ব ছিলো না—প্রাত্যহিকতার বাঁধা সুরে চলছিলো একই গতিতে।

কিন্তু প্রথম এলো পরিবর্ত্তন—স্কুলের পুরানো শিক্ষয়িত্রী অবসর নেবার পর। নতুন শিক্ষয়িত্রী এলো—নাম 'ফাইনা'—অল্প বয়স, জোর কুড়ি, ভারী মিষ্টি দেখতে, একরাশ চুলের বিনুনী মাথার চার পাশ বেড় দিয়ে থাকতো—আরও যেন মিষ্টি লাগতো তাইতে।

ফাইনা এসেই চাইলে স্কুলের সঙ্গে লাগানো নতুন 'কটেজ'। গ্রাম-সোভিয়েট যখন ওর দাবীতে কান দিল না তখন সোজা জানালো জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে—ওর আবেদন মঞ্জুর হোলো। ওর নতুন বাড়ীখানিই শুধু নয় একটা ক্লাব খোলবারও আদেশ এলো। ফাইনা আসবার সময় দু'টো প্যাকিং কেস ভর্ত্তি বই এনেছিলো। সন্ধ্যাবেলা স্কুলে বসে চেঁচিয়ে পড়তো আর ছেলে-মেয়েরা শুনতো। ক্রমেই বড়রাও এসে ভিড়তে লাগলো—গ্রামের বৃদ্ধরাও বাদ গেলো না। মেয়েটির পড়ার ধরণটা ওদের ভারী ভালো লাগতো। রেড়ীর তেলের মৃদু আলোর তলায় ঝুঁকে ঝুঁকে ও পড়তো—নরম আলোয়ানে কাঁধটা ঢাকা শুধু দেখা যেত তন্ময় মুখখানি। পড়তে পড়তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো ও—গভীর আবেগে দীপ্ত উজ্জ্বল হোয়ে উঠতো ওর কোমল মুখটা—ঘন কালো পল্লবের ছায়ায় ঝিক্‌মিকিয়ে উঠতো চোখের তারা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির আবেশে উঁচু-নীচু পর্দ্দায় ওঠা-নামা করতো ওর স্বর—দুটি হাতের তালুতে মুখখানির ভার রাখা—কোনো বিশেষ জায়গায় শ্রোতাদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ওর গালের উপর চোখের জল মৃদু আলোয় চিক্‌চিক্ করতো ; কখনও টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়তো খোলা বই-এর পাতায়···

সেই প্রথম দানিলভের অনুভূতিতে সাড়া জাগলো—মানুষ এত সুন্দর, এত ঐশ্বর্য্যশালী হয়? চোখ যেন ফেরাতে পারতো না সেই মুখখানি থেকে। কি অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গী! ওর গলায় হাস্যরস যেন কৌতুকে উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে—করুণ কাহিনী যেন অশ্রুর বাঁধ ভেঙে দেয়!···কিন্তু কেন এমন হয়? মেয়েটি তো ওর চেয়েও বড়, কত পড়েছে, কত জ্ঞানসঞ্চয় করেছে, দানিলভ তো সে তুলনায় কিছুই জানে না। কিন্তু?···আসলে ও তো একই সাধারণ স্বাভাবিক মেয়ে, ওর সঙ্গে তফাৎ কোথায়? সেই তালি-লাগানো জুতো, ওর মায়ের মতই শাল গায়···তবে? বেশী পড়াশোনা? ···দানিলভও পড়বে, তাহলেই তো ওর মতই হোয়ে উঠবে।—দানিলভের মন গুঞ্জন করে ওঠে—'ময়ূরী'র মত তোমার দৃপ্ত ভঙ্গী, তোমার স্বর যেন অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনা···তোমার কথা যেন ছোটো ছোটো ঢেউয়ের কোমল তান···তোমার কালো বেণীর নীচে চাঁদের কিরণ···তোমার কপালে জ্বলে আকাশের তারা···রাজহংসী তুমি···আমার ধ্রুবতারা···।'

ফাইনা যুবসঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে বই দিতো, আর বই ফেরী করতেও বলতো। দানিলভ ঘুরতো বাড়ী বাড়ী, লোকেদের বই পড়তে বলতো। ফাইনা একবার একটা এ্যামেচার নাট্যসঙ্ঘ গড়লে—বইও নির্ব্বাচিত হোলো এক পুরানো কাহিনী নিয়ে। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রী নির্ব্বাচন নিয়েই হোলো গোলমাল। ছেলেদের সংখ্যা খুব কম ছিলো সেই দলে—কিন্তু মেয়েরা কিছুতেই রাজী নয় ছেলে সাজতে—অগত্যা ফাইনা নিজেই সাজালে এক অত্যাচারী, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনী বৃদ্ধ। কিন্তু লম্বা দাড়িতে বিশ্রী দেখাবে বলে ছোটো গোঁফ আর একটু দাড়ির আভাস আঁকলে ছিপি পুড়িয়ে—ফলে বৃদ্ধের বদলে ওকে দেখালো সুন্দর একটি তরুণ। এমন কি ওর বিধবা ক্রন্দনরতা মেয়ের ভূমিকাতে যে নেমেছে তার চেয়েও ওকে ছোটো দেখাতে লাগলো। সবার চেয়ে মিষ্টি আর সবার চেয়ে সুন্দর এই তরুণ অভিনেত্রী সব দর্শকের চিত্ত অধিকার করল—যতই অত্যাচারী, নিষ্ঠুরার ভূমিকা হোক না কেন···

অভিনয় সার্থক হোলো—দলও বাড়তে লাগলো। বাপ-মা

যখন দেখলে ছেলে-মেয়েরা ভদ্র ব্যবহার শিখছে, 'গোল্লায়' যাচ্ছে না, বরং মেয়েটির কাছে থেকে বই-টইও পড়ছে তখন তারা নিজেরাই আগ্রহ করে ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে লাগলো। তারা নিজেরাও দিনের কাজের শেষে ওখানে জড়ো হোতো। কিন্তু দানিলভ সকাল থেকেই ছটফট করতো···কিন্তু স্কুল কামাই করায় কি কৈফিয়ৎ আছে? দু'-একবার স্কুলের সময় পালিয়ে এসেছিলো। কিন্তু ফাইনা কঠোর ভাবে মানা করে দিয়েছিল। কিন্তু কি করবে দানিলভ? একটা ঘণ্টাও ফাইনাকে না দেখে থাকতে পারে না। কাজেও আর মন লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না শুধু ইচ্ছে করে ফাইনাকে দেখতে, ওর কথা শুনতে···ওর দিকে চেয়ে থাকতে।

ফাইনা সহরে গেলে ওর চোখের সব আলো যেন নিবে যেতো। অধীর আগ্রহে গুণতো সময়···ফিরে এলে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠতো ওর মুখ আনন্দে, সব কিছুই যেন নতুন করে সজীব হোয়ে উঠতো। ক্লাশের ছেলেরা ঠাট্টা করতো—'ভাস্কা প্রেমে পড়েছে।' ও কান দিত না। সে কি সম্ভব! ওরা কি জানে? ও ফাইনাকে শ্রদ্ধা করে তার মত হোতে চায়। প্রেমে? ও যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আঠারো বছরের ছেলে দানিলভ। সতেজ শালগাছের মত দীর্ঘ সুঠাম দেহ—বলিষ্ঠ বাহু, উজ্জ্বল রঙ, ফাইনার চেয়েও মাথায় বড়। কিন্তু নিজের সুস্থ-সবল-দেহটা যেন দানিলভের কাছে ভার মনে হোতে লাগলো।

হঠাৎ দানিলভের মা ওর বিয়ের জন্যে তাগাদা শুরু করলেন, সংসারের খাটুনী আর তাঁর সহ্য হোচ্ছে না, সম্ভবতঃ বাঁচবেন না-ও বেশী দিন, তাই সময় থাকতে ইভানের বিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী একটি বউকে বুঝিয়ে দিতে চান এতদিনের যত্নে গড়া সংসার। অবশ্য এখন বিয়েটা একটু তাড়াতাড়িই হয় কিন্তু ক্ষতি কি যদি মনের মত একটি মেয়েকে মনে ধরে···কিন্তু দানিলভের উদ্ধত উক্তি হঠাৎ মায়ের বাক্যস্রোতকে বাধা দেয়।

—"কার কথা ইঙ্গিত করছ শুনি?"

দানিলভ নিজেই জানে ভালো করে কার কথা—সে হোলো দুস্যা কাম্যাতকিনা—কলওলার মেয়ে। সবাই দানিলভকে ঠাট্টা করে এই বলে যে দুস্যা নাকি তার প্রেমে পাগল। মেয়েটার হঠাৎ বেছে বেছে তাকেই বা মনে ধরলো কেন? আর দু'বছরই হোক দশ বছরই হোক দুস্যাকেই বা ও বিয়ে করবে কেন?

মা ক্ষুব্ধ হোলো, ছেলের অমন রূঢ় ভাষায় আর "ইঙ্গিত" কথাটার জন্যে।—"ভগবান জানেন, ইঙ্গিত করা আমার স্বভাবে নেই। আমি শুধু বলতে চাই মেয়েটা দু'জনকে ফিরিয়ে দিয়েছে শুধু তোমার জন্যে,—যেমনি লক্ষ্মী তেমনি কাজের মেয়েটা"—

দানিলভ টুপীটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

—"যাচ্ছিস্ কোথায় শুনি? সেই মাষ্টারণীর কাছে?"—ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মায়ের কণ্ঠস্বর। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে শোনা যায়—"অনেক দুঃখ আছে বরাতে···"

হ্যাঁ, আপনা থেকেই পা দুটো যেন স্কুলের দিকেই ওকে টেনে নিয়ে চললো। সারা গ্রামটা শীতের সন্ধ্যায় মূর্চ্ছিতের মত পড়ে আছে কুয়াশায় ঢাকা। স্কুলের ঘরের জানলাটাতেও তো আলো নেই···রোজই তো আলো দেখা যায়, তবে কি ফাইনা নেই··· মুহূর্ত্তে ওর মনটা যেন মুচড়ে উঠলো। দেখা হোলো যুবসঙ্ঘের কয়েকটি সভ্যের সঙ্গে। ফিরছিলো ওরা। জানালে আজ শিক্ষয়িত্রী অসুস্থ, তাই পড়া বা রিহার্শাল কিছুই হবে না। দানিলভ চুপ করে শুনলে, তারপর এগিয়ে গেলো।···তার কাছেই। 'ওরা পিছন থেকে কী যেন বলে উঠলো, দানিলভের কানেও গেল না। ওর ঠোঁট দুখানি তখন থর-থর করে কাঁপছে।

নিঃশব্দে অন্ধকার তুষার-ঢাকা পথটা পেরিয়ে দরজা ঠেলে ও ভিতরে ঢুকলো। ফাইনা শুয়েছিলো খাটের দেওয়ালের দিকে মুখ করে। চমকে উঠলো, বললে—"কে, কে ওখানে?"

—"আমি"—ভাস্কা কোন৹মতে বললে।

—"ভাস্কা দানিলভ? কি ব্যাপার বল তো? আজ তো কোনো রিহার্শাল নেই—"

—"আমি জানি। আমি শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি"—

[ক্রমশঃ।

আমরা কামার

শ্রীশান্তি পাল

আমরা কামার নেই কো খামার
নেই কো ক্ষেতি ভাই,
হামর ছেনি হাঁপর আছে
আর আছে নেহাই।
আয় হাতুড়ি হাঁকাই আর কাতুরি চালাই!
আগুন নিয়ে আমরা খেলি,
আঁকুড় দিয়ে আগুন ঠেলি,
নরম-কড়া লোহার পিটে
কাল-কলা বানাই!
আয় হাতুড়ি হাঁকাই আর কাতুরি চালাই!
হেঁটোর 'পরে কাছুট এঁটে,
কয়লা কালি ময়লা ঘেঁটে,
গালাই ঝালাই মরচে ছাড়াই
চাটকিলে চোবাই।
আয় হাতুড়ি হাঁকাই আর কাতুরি চালাই!
চাঁদ-সুরুয আর তারা ছিঁড়ে,
ফুঁ দিয়ে তায় রাঙাই ফিরে,
যাঁতায় কষে বেনায় ঠুকে পাথরে সানাই।
আয় হাতুড়ি হাঁকাই আর কাতুরি চালাই!
পাক-সাঁড়াসে চেপে ধরি,
উকো ঘষে সমান করি,
মনের ভাটি জ্বালিয়ে রেখে—
ইস্পাতে ধরাই।
আয় হাতুড়ি হাঁকাই আর কাতুরি চালাই!

আর যে একটি মানুষের কাঁধে চেপে আমি এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতাম তার নাম কুইনামামা। মামার কোনো সম্পর্কিত ভাই নয়—আমাদের মামাবাড়ীর সরকারী বাজার সরকার। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মতো বেশ খানিকটা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-গোঁফ ছিল—আর সবাইকার মন জুগিয়ে চল্‌বার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই কুইনামামার। মামাবাড়ীর ছিল তিনটে হিস্যে—বড় তরফ, ছোট তরফ আর মেজ তরফ। এই মেজ তরফ হচ্ছে আমার মামাবাড়ী। কিন্তু এই কুইনামামা না হলে তিন তরফের কারো এক মুহূর্ত্ত চল্‌তো না। বিশেষ করে বাড়ীর গিন্নিরা এই কুইনামামাকে মনে করতেন অন্ধের নড়ির মতো। কার তরফে জামাই এসেছে পছন্দমত মাছ আন্‌তে হবে, কোন হিস্যায় পুজোর পালা—বেশী দুধ চাই, কোন্ বাড়ীর ছেলেপুলের কান্না থামাতে চাই কদমা আর ফেনী বাতাসা—সব কুইনার ওপর ভার। অনেকখানি যায়গা জুড়ে তিনটি তরফ…আর এই বাড়ীর বিভিন্ন সীমানা জুড়ে তিনটি পুকুর। সেই পুকুরে প্রচুর মাছ। তিনটি তরফে যেমন ঘুরে ঘুরে পুজোর পালা আস্‌তো—তেমনি কুইনামামার খাওয়াও চল্‌তো পালা হিসেবে এই তিন তরফে। আজও যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি—কুইনামামা রান্নাঘরে খেতে বসেছে—আর আমি আচমকা পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছি! বেচারী খেতে পারছে না—তবু আমাকে একটি কড়া কথা বল্‌ছে না, কিম্বা জোর করে পিঠের ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে না।

আমি তখন খুব ছোট।

হঠাৎ সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল—দেশের রাজা আসছে।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে—জাতীয় নেতা সুরেন ব্যানার্জ্জি টাঙ্গাইল শহরে যাচ্ছেন কি একটা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে। আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়েই যাবার রাস্তা। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই সড়ক দিয়ে যাবেন সুরেন ব্যানার্জ্জি। আশে-পাশের অনেকগুলি গ্রাম থেকে লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

তারা আর কিছু বোঝে না শুধু দেশের রাজা দেখার কামনা। অত লোক এক সঙ্গে ত' এর আগে দেখিনি। তাই ভারী ভয় পেয়ে গেলাম। কুইনামামা বললে, ভয় কি? আমার কাঁধে চাপিয়ে তোমায় দেশের রাজাকে দেখাই।

তাই হল।

একটি পুকুরের পাড়ে বেশ উঁচু যায়গায় দাঁড়িয়ে কুইনামামা আমাকে তার কাঁধের ওপর তুলে নিলে। শুধু রাশি রাশি নরমুণ্ড! কে যে দেশের রাজা তা কি আর ঠাহর করা গেল?

আমি শুধোলাম, হ্যাঁ কুইনামামা, রাজার মাথায় মুকুট কৈ? মুকুট ত' দেখতে পেলাম না!

হেসে কুইনামামা উত্তর দিলে, এ রাজার মুকুট থাকে না। দেশের লোকের রাজা কি না তাই দেশের লোকের মতই। আমার মতো দাড়ি দেখেছ ত?

অত দূর থেকে দাড়ি যে দেখেছি তাও মনে পড়ল না।

এই সময় গ্রামে খুব স্বদেশীর ধুম পড়ে গিয়েছিল—আবছা-আবছা মনে আছে। গ্রামের যুবকদল একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিল—সেখানে সবাই এক ওস্তাদের কাছে লাঠি খেলা শিখতো। মামাও প্রতিদিন বিকেলে এইখানে যেতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনা বেশ মনে আছে। মামা যেমন ঘুমে লাঠি খেলা শিখে বাড়ী ফিরেছেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে লাঠি ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন কতটুকুই বা বয়েস—কিন্তু ঘটনাটা মনে একেবারে ছাপ দিয়ে দিয়েছিল। সবাই মিলে এই রকম লাঠি চালিয়ে নাকি ইংরেজ তাড়াবে এই রকম কথাও বড়দের মুখে শুনেছিলাম।

গ্রামের যুবক সম্প্রদায় একজোট হয়ে স্বদেশী কাপড়ের দোকান দিয়েছিল। তাতে তাঁতের ধুতি, জোলাদের বোনা গামছা নাকি পাওয়া যেত। এ ছাড়া লাঠি খেলার আখড়া ত' পুরোদমেই চল্‌ছিল।

প্রথম যেদিন যাত্রা দেখেছিলাম তার কথাও বেশ মনে করতে পারি। আমাদেরই গ্রামে পূর্ণ সেন মশায়ের বাড়ী যাত্রা হচ্ছে। পালার নাম—কংসবধ। আমাদের মুখী-বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন—আমাদের ছেলেবেলায়। তাঁকে আমরা ঠাকুর্দ্দা বলে ডাক্‌তাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে এই ধারণা ছিল

শ্রীঅখিল নিয়োগী
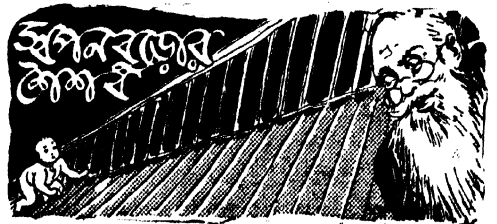
যে, উনি আমার নিজের ঠাকুর্দা। যে দিন আমার ভুলটা এক জন ভাঙিয়ে দিলে সে দিন আমার কি দুঃখ। রাগে আর মন-বেদনায় আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম।

যাক্—যাত্রার গল্পটা আগে শেষ করে নি।

তখনকার দিনে গ্রামে লোক গিস্‌গিস্ করত। প্রত্যেকটি বাড়ীতে এত মানুষ থাকত যে অন্ত বাড়ীর লোক নেমন্তন্ন করতে ভয় পেতো।

কোনো-না-কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রাগান, পাঁচালী, কবি-গান ইত্যাদি হত।

তেমনি কোনো একটা উপলক্ষে পূর্ণ বাবুর বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। আমি সেই ঠাকুর্দার কোলে চেপে মহা আনন্দে যাত্রা শুনছি। কানাই আর বলাই দুটি ছেলে যা চমৎকার সেজেছে! কালো কোঁকড়ানো চুল, কেমন ঝকমকে পোষাক, কথায়-কথায় গান গাইছে! যত দেখি চোখ যেন আর কিছুতেই ফেরাতে পারি নে!

কংস যখন এসে আসরে হাজির হল—তখন থেকে ভয় ঢুকলো মনে। সাংঘাতিক চেহারা, ভাঁটার মতো লাল দুটি চোখ কেবলি ঘোরাচ্ছে। হুঙ্কার দিয়ে সারা আসরটাকে যেন চষে ফেলছে! কানাই-বলাইর মতো এমন দুটি সুন্দর ছেলের ওপর ওর যে কেন এত রাগ, তাও ভালো করে বুঝতে পারলাম না।

সেই কানাই-বলাই এলো মথুরায়—কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। গুম্-গুম্ করে যুদ্ধের বাদ্যি বেজে উঠল। কংস চোখ-মুখ লাল করে আসরে এসে নাম্‌লো। তারপর বুনো মোষের মতো একেবারে এধার থেকে ওধার—ওধার থেকে সেধার ফোঁস-ফোঁস করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যাকে ধরবে—যেন একেবারে আস্তো চিবিয়ে খাবে এমনি মার মূর্ত্তি! ওই পুঁচকে দুটো ছেলে কানাই-বলাই··· তাদের বুঝি একদম পিষে মেরে ফেলবে। কংস কানাই-বলাইর দিকে আচম্‌কা ভাবে রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

ঠাকুর্দা আমাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চিকের আড়ালে আমার মা বসে যাত্রা শুনছিলেন সেইখানে আমায় পৌঁছে দেবেন—এই তাঁর ইচ্ছে। কোলে চেপে যেতে যেতে এক লহমায় পেছন ফিরে দেখে নিলাম যে কানাই-বলাই কংসের চুলের ঝুঁটি ধরে ফেলেছে।

কিন্তু আমার কান্না আর কিছুতেই থামে না! মায়ের কোলে বসেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম—বেশ মনে আছে।

ছেলেবেলায় আমি খুব স্বপ্ন দেখতাম। অবশ্য সব ছেলে-মেয়েই ছোটবেলায় সব আজগুবি স্বপ্ন দেখে থাকে। এক-এক দিন দেখতাম একটা বিরাট বাঘ আমাকে তাড়া করেছে। প্রাণপণে আমি ছুটছি। যতই এগুতে যাচ্ছি—কিছুতেই এক পা এগুতে পাচ্ছি না। পায়ে-পায়ে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। বাঘ আর আমার ভেতরকার দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে। হয়ত আমি আর চলতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল।

জেগে দেখি ঘামে বিছানা একেবারে ভিজে গেছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তেজনায় জেগে থাকতাম। চোখের পাতায় আর কিছুতেই ঘুম আসতে চাইত না! আর একদিন হয়ত স্বপ্ন দেখতাম—একটা একানড়ে ভূত আমাকে তুলে নিয়ে একেবারে তালগাছের মাথায় গিয়ে চড়েছে। নীচের দিকে তাকালে মাথা একেবারে ঘুরে যায়। হঠাৎ পা ফস্‌কে সেই তালগাছের মাথা থেকে পড়ে গেলাম—! সোঁ-সোঁ করে নীচের দিকে নেমে আসছি! চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে···নামছি—নামছি··· আরো নেমে যাচ্ছি! এক্ষুনি মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবো। আচম্‌কা ঘুম ভাঙতে দেখি—খাটের থেকে পড়ে গেছি! ঐ তালগাছের একানড়ে ভূতকে খুব ভয় করতাম আমি। তাই সন্ধ্যেবেলা তালগাছের তলা দিয়ে যাবার সময় গা ছম্-ছম্ করত।

আবার মজার মজার স্বপ্নও যে না দেখতাম তা নয়। স্বপ্ন দেখতাম, কোনো বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি—। কত রকম খাবারের আয়োজন হয়েছে। থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছে বাটিতে করে আমার চার দিকে। কিন্তু কি বিপদ! কিছুতেই খেয়ে শেষ করতে পারছি না! যত খাচ্ছি—পেটে ক্ষিদে থেকে যাচ্ছে।

এই সময় যদি ঘুম ভেঙে যেতো—তবে মনে-মনে দুঃখ থাকত—হায় হায়! এত খাবার হাতের সামনে পেয়েও শেষ করতে পারলাম না। ভারী একটা আপশোষ হত!

এক-এক দিন গভীর রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যেতো। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে শুনতে পেতাম—'ভুত-ভুতুম' পাখী ডাকছে! ভয়ে শরীর কাঠ হয়ে যেতো। বিছানায় পাশ ফেরবার ভরসা পর্য্যন্ত হত না।

পাশে মা কি কেউ শুয়ে আছে—তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকবার পর্য্যন্ত সাহস নেই! তারপর ওই অবস্থায় কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম···জানতেও পারতাম না!

ছেলেবেলাকার অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের কথা—বড় হয়েও ভুলতে পারিনি! এই বয়সেও হঠাৎ এক-এক দিন এমন স্বপ্ন দেখে বসি যে মনে হয়—এই স্বপ্ন ত' আমার চেনা। খুব ছোটবেলায় যেন এর সঙ্গে পরিচয় ছিল! তখন ভারী মজা লাগে।

বহু স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে আমি ছোটদের জন্মে গল্পও লিখেছি। তাতে অবশ্য স্বপ্ন আর গল্প মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের গাঁয়ে বহুরূপী আসতো—নানা রকমের সাজ দিয়ে। আজ-কাল বহুরূপীদের বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না! এই শিল্পীর দল আমাদের সামাজিক জীবন থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

বহুরূপী আসতো সাধু-সন্ন্যাসী সেজে—কখনো বাঘ-ভালুক সেজে, আবার কখনো বউ সেজে। গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে কলাটা-মূলোটা, চাল, পয়সা বেশ পেতো। কোনো কোনো বাড়ী থেকে নতুন আর পুরোনো ধুতিও আদায় করে নিতো।

বহুরূপী সাধারণতঃ আসতেন সন্ধ্যেবেলায়। আচম্‌কা সবাইকে অবাক করে দেবে—এই থাক্‌তো মতলব।

বহুরূপীর রকমারি সাজ-পোষাক দেখবার জন্মে আমাদের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োর উৎসাহের অবধি থাকত না। কবে বহুরূপী কি রকম সাজ দিয়ে আসবে তাই নিয়ে সকলের মধ্যে বাজি অবধি রাখা হত। কেউ কেউ আবার কল্পনা করতো—বহুরূপী ভাই, এই সেজে

আসতে হবে। কেউ বলতো গণৎকার, কেউ বলতো মা দুর্গা, কেউ বা মা লক্ষ্মী—কেউ বা ছিন্নমস্তা। বহুরূপী ত' সকলের অনুরোধ রাখতে পারত না। আর তা ছাড়া সব রকম সাজ-পোষাক তার ঝোলাতে থাকতও না। তবু সে গাঁয়ের লোকদের প্রাণপণ খুশী করবার চেষ্টা করত।

[ক্রমশঃ।

লেবুকন্যা

(তুরস্কের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

এক ছিল রাজা। রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই—যাকে বলে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া—লোকজন সেপাই শান্ত্রী একেবারে গম্-গম্ করছে। রাজা লোক, এ সব তো থাকবেই, এ ছাড়া রাজার বাড়ীর সামনে দুটো ঝরণা—সে ঝরণা কিন্তু জলের নয়—ভাবছো বুঝি পাগলা ঝোরার মত ঝর্-ঝর্ ঝরে জল পড়ছে? তা নয় মোটেই—একটা ঝরণা দিয়ে অনবরত তেল পড়ছে আর একটা দিয়ে সুন্দর মধু ঝরছে। তাহলে বুঝলে তো ঝরণা দুটো হলো তেলের আর মধুর।

একদিন রাজার ছেলে নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পেলো—একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দু'টো ঘড়া নিয়ে ঝরণা থেকে মধু আর তেল ভরছে। রাজপুত্রের খুব রাগ হলো—না বলাকওয়া একেবারে ঝরণার কাছে এসে কলসী ভরছে? রাজপুত্র তখনি তীর-ধনুক নিয়ে ছুঁড়লো এক তীর, আর সেই তীর গিয়ে লাগলো বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কলসীর গায়ে, কলসী ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল।

বুড়ী তখন রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে বললে: কি এমন দোষ করেছি বাবা যে আমার ক্ষতি করলে? হতে পারো তুমি রাজার ছেলে, তাই বলে বুড়ো মানুষের এমন ক্ষতি করবে? বেশ, আমিও বলছি, তুমি রাজার ছেলে হলেও লেবুকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

এই কথা বলেই বুড়ী চলে গেল।

বুড়ী তো চলে গেল কিন্তু সেই দিন থেকে রাজপুত্রের ভাবনার সীমা নেই। বুড়ী তাকে কি বলে গেল যে! যত দিন যায় রাজপুত্রের ভাবনা ততই বাড়ে। ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র শুকিয়ে উঠতে লাগলো।

রাজা তো রাজপুত্রের অবস্থা দেখে ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। বললেন: কি হয়েছে তোমার, দিন দিন চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

রাজপুত্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে সব কথা বললে।

রাজা বললেন: ও-সব ভেবে মন খারাপ করো না। কিছু নয়। কিন্তু বললে কি হবে—রাজপুত্রের মনে সুখ নেই! দিন দিন চিন্তা বেড়েই চলেছে।

অবশেষে রাণীমা রাজপুত্রকে ডেকে বললেন—তুমি দিন কতক কোথাও ঘুরে এসো, না হলে শরীর একেবারে ভেঙে যাবে।

রাজপুত্রও মনে মনে তাই চাইছিল—বেড়াতে যাওয়াই কথা নয়, আসলে হলো লেবুকন্যাকে খুঁজে পেতে হবে।

মা-বাবাকে প্রণাম করে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়লো। রাজপুত্র প্রাসাদ ছেড়ে আসার কয়েক দিন কেটে গেছে। অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার সঙ্গে এক সাধুর দেখা হলো।

রাজপুত্রকে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন: কেন তুমি রাজ্য ছেড়ে বেরিয়েছ? আর এদিকেই বা এসেছ কেন—এখানে তো কেউ বেড়াতে আসে না!

রাজপুত্র সাধুকে প্রণাম করে বললে—বেড়াতে আসেনি—সে লেবুকন্যার সন্ধানে এসেছে।

রাজপুত্রের জন্ম সাধুর খুব মমতা হলো—তাই বললেন: আচ্ছা এক কাজ করো—এই যে সামনে ঝরণা দেখছ, এই ঝরণার পিছন দিকে একটা চমৎকার গোলাপ-বাগান আছে কিন্তু বাগানটা কাঁটায় ভর্তি—তুমি সেখানে গিয়ে একটা গোলাপ তুলে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকে বলবে 'কি চমৎকার গোলাপ-বাগান!'—তার পরই দেখতে পাবে রূপার পাতের মত একটা ছোট নদী। নীচু হয়ে নদীর জল আঁজলা করে তুলে নিয়ে খাবে আর বলবে 'কি সুন্দর নদীর জল!'-এর পর একটা কুকুর আর একটা ঘোড়া দেখতে পাবে। কুকুরের সামনে এক বাণ্ডিল ঘাস আছে আর ঘোড়ার সামনে কিছু মাংস আছে। তুমি তাড়াতাড়ি সেটা বদলে দেবে—কুকুরের সামনে মাংসটা দিয়ে ঘোড়ার সামনে ঘাসগুলো দিয়ে দেবে। তারপর আরো এগিয়ে গিয়ে দেখতে পাবে দুটো গেট—তার একটা খোলা আর একটা বন্ধ। যে গেটটা খোলা আছে তুমি আগেই সেটা বন্ধ করে দিও আর বন্ধ গেটটা খুলে তুমি ভিতরে চলে যাবে—কিছুদূর গিয়েই একটা মস্ত বাগান দেখতে পাবে। সেটা হলো দৈত্যদের বাগান—এই বাগানেই তুমি লেবুগাছ পাবে। এই লেবুগাছে মাত্র তিনটে লেবু আছে, এই তিনটে লেবু ছিঁড়ে নিয়েই বাগান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসবে, তারপর যে জলাশয় দেখতে পাবে সেখানে দাঁড়িয়ে লেবু তিনটে কাটলেই প্রত্যেক লেবু থেকে একটা করে সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে আসবে আর 'জল জল' করে চেঁচিয়ে উঠবে, আর যদি তুমি জল না দাও তখনি তারা মারা যাবে।

রাজপুত্র সাধুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলে গেল। কিছুদূর যাবার পর সে সেই মস্ত গোলাপ-বাগান দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়েই বললে, 'কি চমৎকার গোলাপ-বাগান!' তারপর সাধুর নির্দেশ মত একটা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকে নদীর ধারে এসে আঁজলা করে জল পান করলো আর বললে, 'কি সুন্দর জল!' তারপর যথারীতি কুকুর ও ঘোড়াকে দেখতে পেয়ে মাংস আর ঘাস বদলে দিল—তারপর যেতে আরম্ভ করলো সেই দুটো গেটএর উদ্দেশ্যে। কিছুদূর গিয়েই সেই প্রকাণ্ড গেট দুটো দেখতে পেয়ে খোলা গেট বন্ধ করে আর বন্ধ গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

সাধুর সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, তাই রাজপুত্র আর দেরি করতে পারছে না যেন, খুব তাড়াতাড়ি সে সেই প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে ঢুকে লেবুগাছ থেকে তিনটে লেবু ছিঁড়ে নিয়েই দৌড়তে শুরু করলো। দৌড়ে না গেলে যদি দৈত্যোরা কেউ দেখতে পায় তাই।

কিন্তু দৈত্যের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল ঠিকই—গেট দুটোকে লক্ষ্য করে দৈত্য চীৎকার করে উঠলো—'ধরো ওকে, ওকে ধরো।'

খোলা গেট উত্তর দিল: এত কাল ধরে এখানে আমার দরজা খুলে বাস করছি, কেউ কখনও বন্ধ করতে সাহস করেনি, আমায় স্পর্শ করতে ভয় পেয়েছে আর ঐ লোকটা এসেই কিনা খোলা দরজা বন্ধ করে দিল—কি আশ্চর্য্য!

বন্ধ গেট তখনি উত্তর দিয়ে বললে: আরে ভাই আমারও তো সেই অবস্থা, বছরের পর বছর দরজা বন্ধ করে বসে আছি, কোনও দিন কেউ এসে এ গেট খুলে দেবে এ তো কখনও ভাবিনি, আর ঐ লোকটা এসে কিনা দরজা দু'টো খুলে দিল—আশ্চর্য্য বলে আশ্চর্য্য!

দৈত্য আবার গর্জ্জে উঠলো—কুকুর আর ঘোড়াকে বললে: শীগগির যাও, ধরো ওকে।

ঘোড়া সবিনয়ে বললে, আমি ওকে ধরতে পারবো না, আমার ক্ষুধার সময় আমাকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়েছে—তাই ও আমার বন্ধু, ওকে কিছুতেই ধরে আনবো না।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরও বলে উঠলো: আমাকে ও খাবার দিয়েছে আমিও ওকে কিছুতেই ধরতে পারবো না।

দৈত্য আরো গর্জ্জে উঠলো নদীকে লক্ষ্য করে: নদী, তুমি ওকে ডুবিয়ে নাও, ডুবিয়ে নাও।

নদী যেন মিষ্টি সুরে গান গেয়ে উঠলো: ও আমার জল পান করে বলেছে 'কি চমৎকার জল'—ওকে কি আমি ডুবিয়ে দিতে পারি? না, না, তা আমি পারবো না।

রাগে দৈত্য যেন ফেটে পড়ছে, শেষ বারের মত সে আর একবার আদেশ করলো গোলাপ-বাগানকে—যেখানে রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু বাগান উত্তর দিল: কেন আমি ওকে ধরতে যাবো? ও তো কোন অপকার করেনি। আমার কাঁটাকে ভয় না করেই গোলাপ তুলে গন্ধ শুঁকে বলেছে, কি সুগন্ধ এই গোলাপে। তোমার বাগান, কোনও দিন তুমি এখানে এসে ফুল তোলো কিম্বা বলো কি সুন্দর সুগন্ধ এই গোলাপের? আমাকে ওর ভাল লেগেছে, তাই আমি ওর কোনও ক্ষতি করবো না।

দৈত্য বেচারার অত রাগেও কোনও ফল হলো না। কেউ তার আদেশ মানলো না দেখে নিরুপায় হয়ে নিজেই রাজপুত্রের পিছনে দৌড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু নদী পার হবার সময় নদী দুষ্টুমী করে স্রোত এমন ভিন্ন-মুখে চালিয়ে দিল যে রাজপুত্র অনায়াসে পার হয়ে চলে গেল আর দৈত্য হাবুডুবু খেয়ে কোনও মতে তীরে উঠলো।

এদিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে রাজপুত্র ভাবলো অনেকখানি তো চলে এসেছি এবার লেবুগুলো কাটি।

যেই না ভাবা অমনি কাজ! একটা লেবু যেই কাটা অমনি তার ভিতর থেকে সুন্দরী একটা মেয়ে বেরিয়েই 'জল! জল!' বলে চীৎকার আরম্ভ করলে। কিন্তু জল দেওয়া নিয়েছিল

বলে রাজপুত্র তার চেষ্টাও করলে মা আর জল না পেয়ে মেয়েটি তখনি মারা গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্র অধৈর্য্য হয়ে উঠলো। আর একটা এখনি কাটবে মনে করেই তখনি অন্য আর একটা লেবু কাটতেই অমনি আগের মত ঘটনা আবার ঘটলো।

'জল জল' করে মেয়ে দুটি মারা গেল দেখে রাজপুত্রের ভারী দুঃখ হলো। চোখের সামনে জল না দিতে পারায় এমন কাণ্ড হলো! তাই রাজপুত্র সেখান থেকে উঠে নদীর ধারে গিয়ে আর একটা লেবু কাটলো। আবার আগের মত সেই ঘটনা ঘটলো। মেয়েটি 'জল জল' করে চীৎকার করতেই রাজপুত্র তাকে নদীতে নামিয়ে দিল। নদীর জলে নেমে মেয়েটি প্রাণ ভরে জল খেলো, তারপর ভালো করে স্নান করলো। তারপর সে যখন তীরে উঠে এলো রাজপুত্র অবাক হয়ে দেখতে লাগলো—চাঁদের মত আলো-করা এক মেয়ে যেন রাজপুত্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজপুত্র বললে: রাজকুমারী, আমি এখন আমার দেশে ফিরে যাই—সেখান থেকে সৈন্য-সামন্ত এনে তোমাকে ভাল করে আমাদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবো। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

লেবুকন্যা বললে: আচ্ছা আমি অপেক্ষা করছি, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। কিন্তু তোমায় একটা কথা বলি শোন, তুমি প্রাসাদে ফিরে গেলে তোমার বাবা-মাকে যখন প্রণাম করবে তখন তাঁরা যেন তোমায় আদর না করেন। কারণ যে মুহূর্ত্তে তাঁরা তোমায় আদর করবেন সেই মুহূর্ত্তে তুমি আমায় ভুলে যাবে। রাজপুত্র বললে: আচ্ছা, এ কথা আমি মনে করে রাখবো। তুমি অপেক্ষা কর এখানে, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।

রাজপুত্র কত দিন বাদে ফিরে এসেছে। সবাই ছুটে এলো, রাজা এলেন, রাণী এলেন—যে যেখানে ছিল সব খুশী মনে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। ছেলের মুখে হাসি, স্বাস্থ্য ভালো দেখে রাজা-রাণী আনন্দে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

ব্যস্। সেই মুহূর্ত্তেই রাজপুত্র লেবুকন্যার কথা ভুলে গেল।

এদিকে সেই নদীর ধারে সুন্দরী লেবুকন্যা একলা বসে ছিল—কিন্তু সন্ধ্যা হচ্ছে, তাছাড়া কতকক্ষণই বা নদীর ধারে থাকবে—তাই আস্তে আস্তে উঠে এসো—সামনেই দেখতে পেলো একটা পপ্‌লার গাছ। গাছটাকে দেখে লেবুকন্যা বললে: তুমি তোমার ডালপালা নামাও পপলার। সঙ্গে সঙ্গে পপলার গাছ ডালপালা সব শুদ্ধ নামিয়ে ঝুঁকে পড়লো, আর লেবুকন্যা একেবারে সব উঁচু ডালে তর-তর করে উঠে গিয়ে বসলো। যেখানে গিয়ে সে বসলো—সেখান থেকে তার সুন্দর মুখের ছায়া জলের উপর পড়তে লাগলো।

এদিকে হয়েছে কি—নদীর কাছাকাছি একটা বাড়ী ছিল, সে বাড়ীর যে ঝি সে হলো আরব দেশের মেয়ে। সেই ঝি জল নিতে এলো। নীচু হয়ে যেই জল ভরতে যাবে—দেখে, ও মা একি—কি সুন্দর এক মেয়ের ছায়া জলের উপর পড়েছে।

ঝি প্রথমে ভাবলো সে তার নিজের মুখই বুঝি দেখছে তাই ভাবলো: আমি এত সুন্দর দেখতে আর আমার মনিবরা আমায় ঝিয়ের কাজ করায়?

রাগে দুঃখে কলসী ভেঙ্গে ফেলে সে সোজা বাড়ীর দিকে চলে গেল।

বাড়ীর গিন্নীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠে বললে: আমি এই মাত্র নদীর জলে আমার ছায়া দেখেছি, আমি যে এত সুন্দর আমি তো জানতাম না—আমি ঝিয়ের কাজ আর করছি না।

গিন্নী বিদ্রূপ করে বললেন: তুমি সুন্দরী? এ কথা কে বলেছে? যাও যাও সেই নদীর ধারেই যাও—তবে নীচের দিকে তাকিও না, উপর দিকে দেখো।

ঝিও তেমনি—তখনি গর-গর করে বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে পপলার গাছের কাছে উপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো—গাছের শাখা-প্রশাখায় যেখানটা ছড়িয়ে পড়েছে সেই সব চেয়ে উঁচু জায়গাটাতে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বসে আছে।

ঝি তো আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে তোষামোদ করে বলে উঠলো: ওগো ও মেয়ে, কেমন করে তুমি গাছের উপরে উঠলে বল তো? তোমার কাছে আমাকেও নাও না গো!

লেবুকন্যা একলা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ছিল রাজপুত্রের কথা ভেবে, তাই মনে হলো একজন মেয়ে যদি তার সঙ্গী হয় তবুও তাকে একলা থাকতে হবে না, তাই সে পপলার গাছকে বললে: পপলার গাছ, তুমি ভাই একটু নীচু হয়ে ওকে তুলে নাও।

পপলার গাছ নীচু হতেই ঝি উঠে এলো একেবারে লেবুকন্যার কাছে। তারপর দু'জনে বসে গল্প করতে লাগলো। আসলে ঐ আরব মেয়ে ভয়ানক দুষ্ট আর হিংসুটে ছিল। লেবুকন্যা যখন

মনের সব কথা তাকে বললে—তখন সে সুযোগ খুঁজছিল কেমন করে সে রাণী হবে আর লেবুকন্তাকে বিদায় করে দেবে।

গল্প করতে করতে ঝি বললে: আচ্ছা তোমরা তো পরী, কত কি জানো—কিন্তু এ-সব কি করে হয়—তুমি কি করে এত শক্তি পাও?

নিরীহ লেবুকন্তা অত-শত জানে না, বললে: আমার সব শক্তি সব ক্ষমতা আমার মাথার চুলে যে কাঁটা আছে তার মধ্যে আছে, এটা যদি নষ্ট হয় আমি আর কিছু করতে পারবো না। আর কেউ যদি এটা তুলে নেয়—তখনি আমি পাখী হয়ে যাবো।

এ কথা শুনেই ঝি'র মনে একটা দুষ্টবুদ্ধি এলো। সে বললে: আচ্ছা রাজকন্তে, যদি আমি তোমার এই সুন্দর শাড়ী-জামা, দামী গয়না সব পরি, তাহলে আমি তোমার মত সুন্দর দেখতে হবো না? দেখো না ভাই একবার আমি ও-গুলো পরি।

লেবুকন্তা ভারী ভালো মেয়ে, তা ছাড়া এতে আর কি ক্ষতি আছে ভেবে সে তখনই তার সিল্কের পোষাক, দামী গয়না, গলার হীরার নেকলেস সব খুলে দিল আর ঝি সেগুলো পরে ওর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে দিল।

কিছুক্ষণ গল্প করে সে লেবুকন্তাকে বললে: তোমার চুল ভারী উস্কে গেছে, এসো আমি তোমার চুল বেঁধে দিই। লেবুকন্তা পিছন ফিরে মাথা নীচু করে দিল—আর ঝি গল্প করতে করতে চুল আঁচড়ে দিতে লাগলো—এমনি এক সময় চট করে সে লেবুকন্তার মাথা থেকে বাবুপিনটা তুলে নিল। যে মুহূর্তে পিনটা উঠিয়ে নেওয়া—আর লেবুকন্তা পাখী হয়ে উড়ে গেল। আর সেই ঝি ওর কাপড়-জামা পরে সেজেগুজে সেই গাছের উপর বসে রইল।

কয়েক দিন পরে লোকজন বাজনাবাদ্যি নিয়ে রাজপুত্র এসে উপস্থিত—হঠাৎ তার মনে পড়েছে লেবুকন্তাকে সে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে।

গাছের উপর থেকে বসে সব শুনতে পেলো সেই ঝি আর প্রস্তুত হয়ে রইল যাতে সে নিজেকে লেবুকন্তা বলে পরিচয় দিতে পারে।

রাজপুত্র তো তাকে দেখে অবাক্। অমন চাঁদের মত সুন্দর মেয়ে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না—সে তো এ নয়! আশ্চর্য্য হয়ে রাজপুত্র তাই জিজ্ঞাসা করলো: কি হয়েছে তোমার, চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে চেনা যায় না!

একেবারে কেঁদে ফেললে ঝি, তার পর বললে: আমায় রেখে তুমি চলে গেলে—ঝড়-জল রোদ মাথায় করে বসে আছি তো বসেই আছি, তুমি আর আসো না। চেহারা খারাপ কি, বেঁচে আছি এই অনেক! ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক তৈরী-করা কথা বলাতে রাজপুত্রও তাই বিশ্বাস করলো।

রাজপুত্র বৌ নিয়ে বাড়ী ঢুকেছে, রাজা-রাণীর কত আনন্দ কিন্তু বৌ দেখে সব অবাক! ও মা, এমন কুৎসিত বৌ নাকি রাজবধূ হলো? লজ্জায় ঘেন্নায় দুঃখে রাজা-রাণী আর বৌএর মুখ দেখলেন না। কিন্তু তাহলে কি হয়—রাজপুত্রের সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছে তখন সে রাজবধূ, তার সব দাবীই মানতে হবে।

এদিকে হয়েছে কি রাজপুত্র বাড়ী ফেরার দিন থেকে রাজার বাগানে একটা সাদা ধবধবে সুন্দর পাখী আসতে আরম্ভ করেছে। প্রতিদিনই পাখী মালীকে ডেকে ডেকে বলে যায়: মালী, ও মালী ভাই, শুনছো—রাজপুত্র যখন ঘুমুবে তার স্বপ্ন যেন সেই মধু আর তেলের ঝরণার স্বপ্ন হয়। ঐ আরব দেশের মেয়ে যখন ঘুমুবে তার স্বপ্ন যেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

এমনি রোজই হয়। একদিন রাজপুত্র বাগানে বেড়াতে বেড়াতে পাখীটার কথা শুনতে পেলো—আশ্চর্য্য হয়ে মালীকে ডেকে জানতে চাইলো—ঐ গাছটা থেকে একটা পাখী কি বলে গেল শুনেছ?

মালী ভয় পেয়ে রাজপুত্রকে সব কথা বললে।

রাজপুত্র বললে: পাখীটা আমাকে ধরে দাও।

মালী বললে: আবার আসুক, ধরবো ওটাকে।

পরের দিন আবার পাখীটা গাছের উপর যখন বসেছে মালীও হঠাৎ গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে। রাজপুত্র অমন একটা সুন্দর পাখী দেখে ভারী খুশী হয়ে বললে: একটা ভালো খাঁচায় একে রেখে আমার ঘরের সামনে ঝুলিয়ে রাখো—ও মিষ্টি সুরে গান করবে, আমি শুনবো। কিন্তু যখন সেই রাজবধূ-বেশী ঝি সেখানে এসে পাখীকে দেখলো তখন সব বুঝতে পেরে আবদার ধরলো—'এ পাখীর মাংস সে খাবে, কারণ এর মাংস খেতে খুব ভালো।'

রাজপুত্র বললে: বেশ তো, ঐ রকম পাখী নিয়ে আসবে তার মাংস খেও।

কিন্তু কিছুতেই না—সে ঐ পাখীটার মাংস খাবেই। অন্যায় আবদারে বিরক্ত হয়ে রাজপুত্র বললে: বেশ তাই হোক। পাখীটাকে যেখানে কাটা হলো তার দু'চার ফোঁটা রক্ত যে মাটিতে পড়েছিল সেখানে একটা সাইপ্রাস গাছ জন্মালো।

সব দেখেছে দুষ্টু ঝি, তাই তার নতুন করে আবদার আরম্ভ হলো ঐ সাইপ্রাস গাছের কাঠ তার চাই কারণ সেই কাঠ দিয়ে সে তার ছেলের জন্য দোলনা তৈরী করবে—আর অন্য কাঠ দিয়ে হবে না, ঐ কাঠ তার চাই।

তাই হলো, সাইপ্রাস গাছের কাঠ দিয়ে দোলনা তৈরী হলো। দোলনা তৈরীর সময় যে সব কাঠের টুকরো-টাকরা পড়েছিল সেগুলি নেবার জন্য এক গরীব বুড়ী এসে রাজপুত্রের কাছে অনুনয়-বিনয় করাতে রাজপুত্র সেগুলি তাকে দিয়ে দিলো।

বুড়ী সেগুলো বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেখে—চাল-ডালের যোগাড়ে গেল। আগুন জ্বালবার কাঠ পেয়েছে কিন্তু চাল-ডাল না হলে খাবে কি!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য—বুড়ী বাড়ী ফিরে দেখে যেখানে সে কাট-কুটোগুলো রেখে গিয়েছিল সেখানে তো সেগুলো নেই—এক চমৎকার সুন্দরী মেয়ে তার ঘর-দোর পরিষ্কার করে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে। বাড়ীটা যেন চেনা যায় না। শুধু কি তাই, কোথা থেকে কি যোগাড় করে সে বুড়ীর জন্য কিছু রান্নাও করে রেখেছে। বুড়ী তো বুঝতেই পাচ্ছে না এ তার বাড়ী কি না।

বুড়ী বললে, কে তুমি বলো তো? তুমি কি কোনও দেবতা না পরী?

লেবুকন্তা নত হয়ে বুড়ীকে প্রণাম করলো—তারপর তাকে আগাগোড়া সব কথা খুলে বললে।

বুড়ী তাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলো—বললে, 'তুমি আমার কাছে মেয়ের মত থাকো।' তারপর মেয়ে যা রান্না করে

রেখেছিল—দু'জনে বসে সেই সামান্ত জিনিস খুব আনন্দ করে খেলো।

এমনি করেই দিন যাচ্ছে।

একদিন হঠাৎ শোনা গেল রাজপুত্রের বড্ড অসুখ। রাজপুত্র নাকি কিছু খেতে পারে না—তার যে সুপ খাবার কথা—সে সুপ না কি কেউ রান্না করতে পারে না। কত জন কত রকম ভাবে রেঁধে দিয়েছে কিন্তু রাজপুত্র খেতে গিয়ে এক চামচের বেশী খেতে পারেনি।

লোকের মুখে মুখে এ কথা লেবুকন্তার কানে গিয়েও পৌছল।

লেবুকন্তা বুড়ীকে বললে: মা, আমি সুপ তৈরী করে দেবো, সেটা তুমি রাজপুত্রকে দিয়ে আসবে।

বুড়ী বললে: নিশ্চয়ই দিয়ে আসবো—তুমি তৈরী করো, লক্ষ্মী সোনা মেয়ে আমার!

লেবুকন্তা খুব ভালো করে সুপ তৈরী করলো—তার পর যে বাটিতে সুপ ঢেলে দিল—সেই বাটির মধ্যে সে সেই আংটিটা দিয়ে দিলো, যে আংটি রাজপুত্র তাকে নদীর ধারে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল।

রাজবাড়ীর প্রহরীরা কিছুতেই বুড়ীকে যেতে দেবে না—কিন্তু এ কথা রাজপুত্রের কানে আসতেই আদেশ দিল বুড়ীকে যেন ভিতরে আসতে দেওয়া হয়।

বুড়ী রাজপুত্রের কাছে এসে সুপটা দিয়ে বললে: তুমি খেয়ে দেখ—এ খুব ভালো সুপ।

রাজপুত্র অন্ত দিনের মত এক চামচ খেলো অনিচ্ছা করে কিন্তু এত ভালো লাগলো যে দু'বার তিন বার চার বার নিয়ে নিয়ে সব সুপটুকু খেয়ে ফেললে। সব শেষে সেই আংটিটা দেখেই রাজপুত্র সব বুঝতে পারলো। তখনি উঠে বসে সে বুড়ীকে নমস্কার করে বললে: মা, তোমার কি একটি মেয়ে আছে?

বুড়ী বললে। হ্যাঁ, আমার মেয়ে আছে রাজপুত্র, কিন্তু তুমি কি বলতে চাও?

রাজপুত্র বললে: কাল সন্ধ্যার সময় তাকে নিয়ে এসো এই জানলার নীচে। আমি উপর থেকে ঝুড়িভর্ত্তি করে অনেক সোনাদানা নামিয়ে দেবো, তুমি সেগুলো নিয়ে সেখানে তোমার মেয়েকে বসিয়ে দিলে আমি তুলে নেবো। আর সোনাগুলো পরে ইচ্ছা হলে তুমি তোমার মেয়েকে দিও।

—তাই হবে রাজপুত্র, তাই হবে—এই বলে বুড়ী বাড়ী চলে গেল।

পরের দিন যথারীতি বুড়ী লেবুকন্তাকে নিয়ে সেই জানলার নীচে এলো এবং রাজপুত্রের কথা মত সোনা নামিয়ে নিয়ে মেয়েকে বসিয়ে দিল।

রাজপুত্র রাজকন্তাকে পেয়ে আনন্দে মা-বাবা সবাইকে ডেকে সব কথা খুলে বললে।

রাজা-রাণী মনের মত এমন সুন্দর লক্ষ্মী বৌ পেয়ে ভয়ানক খুশী হলেন—সারা রাজ্যে ধুমধাম লেগে গেল।

হ্যাঁ, রাজা-রাণী রাজপুত্রের সঙ্গে লেবুকন্তার বিয়ে দিলেন যে—বুঝতে পাচ্ছ না?

তারপর তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলো। আর সেই দুই ঝিকে রাজা শাস্তি দিলেন, ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে পর্ব্বতের উপর টেনে নিয়ে যেতে যেতেই তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো।

মন্দ কাজের মন্দ ফল তো আছেই!

আরো তিনটি বোন

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

মংলী, পুঁটি, কিষ্টি
তিনটি আজব সৃষ্টি।
একটি বেজায় বদমেজাজে
কেবল বকে আজে-বাজে,
বলে—'কেন শীতকালেতে
হয় না রোদের বৃষ্টি?'
আর একটি সে পেটুক মেয়ে
সারাটি দিন বেড়ায় খেয়ে,
বাছে না সে ভালো মন্দ,
টক্, তেতো কি মিষ্টি।
একটি যেন রক্ষা কালী।
মুখ বেঁকিয়েই থাকে খালি;
মানুষ দেখলে ভেংচি কাটে,
মিট্‌মিটে তার দৃষ্টি!
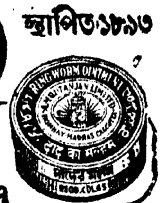
সবাক্ চিত্র যদি অস্পষ্ট ও শব্দহীন হয় ?

সিনেমা বা চলচ্চিত্রের প্রধান কথা শব্দ। কেউ কেউ এ কথা মেনে নেন না। তাঁরা বলেন, প্রথম কথা ছবি বা ফটোগ্রাফী। যে যাই বলুন, আমরা দু' দলের কথা মেনে নিয়েই বলছি, চলচ্চিত্রের মূলে আছে প্রধানতঃ দুটি বিষয়। যথা,—

(১) ছবি (photography)
(২) শব্দ (Sound)

বর্ত্তমান সবাক্-চিত্র-দুনিয়ায় শুধু মাত্র এই ছবি ও শব্দের পরীক্ষা চলেছে। ছবি আর শব্দকে কি ভাবে ও কি ধারায় যথার্থ কাজে লাগানো যায় তার জন্ত বিদেশের ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের সদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। সবাক্ ও সশব্দ চিত্র গ্রহণ করতে হ'লে আমাদের দেশে প্রথমেই যেমন নায়িকাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া হয়, অন্ত দেশে তেমনটি হয় না। কোন একটি চিত্র গ্রহণের কাজে বিদেশে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করা হয়, যে সত্যিকার ছবি তুলতে জানে তাকে, আর শব্দ সম্বন্ধে বিচক্ষণ শব্দযন্ত্রীকে। পরিচালক তাঁর ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিচক্ষণ আলোকচিত্র-শিল্পী ও শব্দযন্ত্রীদের ডাক পাঠান।

বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র ষ্টুডিওতে ফটোগ্রাফার এবং সাউণ্ড টেকনিশিয়ানদের না ডাকা হয় তা নয়। তবে ডাকলেই যারা ছুটতে ছুটতে চলে আসে তাদের না ডাকাই ভাল। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, কথাটা খাঁটি সত্য, কিন্তু ভাতের বদলে পয়সায় ছড়িয়ে যদি কাকের বদলে কোকিলকে ডাকা হয় ?

আমাদের বক্তব্য, 'ক্যামেরা' এবং 'সাউণ্ড'কে মূলধন ক'রে প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান এবং সাউণ্ড টেকনিশিয়ানদের সমন্বয় যদি না করা হয়, তা হ'লে সবাক্‌চিত্র গ্রহণের কাজে অগ্রসর না হওয়াই উচিত। বাঙলার অধিকাংশ পরিচালক কাহিনীর বিষয়বস্তু ও কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের জন্ত যতটা সময় অপব্যয় করেন, ছবি এবং শব্দের জন্ত যদি তার কিছু অংশ ব্যয় করতেন।

সাউণ্ড ষ্টুডিওতে ছবি তোলা হয়, অথচ সাউণ্ডের কোন effect বা কার্য্যকারিতাকে কাজে লাগানো হয় না, এটা দক্ষতার পরিচায়ক নয়। ছবি দেখিয়ে অর্থোপার্জ্জন করব, অথচ ছবি যদি ছবি হয়ে না ওঠে, সেটাও অজ্ঞতার পরিচয়।

এখানে একটি কথা ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়ে রাখি, বাঙলা দেশে ক্যামেরার অভাব না থাকলেও সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান যেমন বিরল, তেমনি ষ্টুডিওর সংখ্যা খুব কম না হ'লেও বাঙলা দেশে সাউণ্ড ষ্টুডিও আদপেই নেই। কথাটি শুনতে হাস্যকর হ'লেও অত্যন্ত পরিতাপের কথা। নয় কি ?

সিনেমা-কর্ম্মচারীদের অবিলম্বে বাঁচাতে হবে

কলকাতা তথা পশ্চিম-বাঙলার ষ্টুডিও ও প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়, বরং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। এই সকল ষ্টুডিও ও হাউসে আছেন অসংখ্য কর্ম্মী— যাঁদের অবস্থা বাঙলা ছবির চেয়ে অনেক বেশী সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কলকাতার একটি সংবাদপত্র এই কর্ম্মীদের অর্থাৎ বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এমপ্লয়ীজদের অবস্থার সঙ্গে আদিম যুগের বর্ব্বরতার তুলনা করেছেন। সম্প্রতি সিনেমা-কর্ম্মচারীদের সম্মিলিত সঙ্ঘ বিভিন্ন দাবীসহ কলকাতায় প্রতিবাদ-সভা মারফৎ কর্ম্মীদের দাবী-দাওয়া পেশ করেছেন। মাস কাবার হ'লে যথাসময়ে বেতন পাওয়া যায় না, পাওনা ছুটি ভোগ করা যায় না, প্রাপ্য ভাতার মুখও দেখতে পাওয়া যায় না।—অথচ ষ্টুডিও বা প্রেক্ষাগৃহগুলি যেমনকার তেমনি চলেছে—আশ্চর্য্যের কথা নয় ?

শুনলাম কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত কাগজ বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এই প্রতিবাদ-আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। আমরা বিজ্ঞাপনের পরোয়া করি না, যে জন্ত বলতে সাহস পাচ্ছি যে, বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এমপ্লয়ীজদের ক্ষুধার্ত্ত ও অর্থক্লিষ্ট রাখলে ষ্টুডিও ও হাউসগুলির ভিৎ ধ্বংসে যেতে বেশী দেরী হবে না। আমরা বাঙলার ষ্টুডিও ও সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের এই সামান্য কথাটি অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই।

বাঙলা সিনেমা-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার অভাব

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ করতে প্রয়াসী হয়েছি আজ, শাস্ত্রকার শাস্ত্রে সঙ্গীতকে ভাগাভাগি করে গেছেন কবে কোন্ কালে। যদিও ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারের দল তাঁদের দেওয়া তালিকায় বিশেষ এক ধরণের সঙ্গীতের নামোল্লেখ করতেই ভুলে মেরেছেন। হয়তো ভাবছেন, আমরা কে যে শাস্ত্রকারের ভুল ধরতে যাই ?

তবুও বলবো, রাগ-রাগিণীর তালিকায় মুনি-ঋষিরা "সিনেমা-সঙ্গীতে"র নামটা ভুলেও করেন নি, আধুনিক বাঙলা সঙ্গীত-জগতের বাঙলা তথা গোটা হিন্দুস্থানের তাবৎ সিনেমা-সঙ্গীত ব্যতীত অন্ত কোন বাঙলা গান সচরাচর পপুলার হয় না। দুঃখের কথা, গত দু'-এক বছরে তেমন কোন বাঙলা সিনেমা-সঙ্গীত নাম করলো না। নাম করলো শুধু সিনেমায় গাওয়া বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত। কারণ কি ?

গায়ক-গায়িকার অভাব নেই, বাদ্যকার যথেষ্ট রয়েছে, সঙ্গীত পরিচালকের সংখ্যাও কম নয়, তবুও গত ক' বছরে বাঙলা সিনেমায়

কোন নতুন গান বাঙালীকে চমৎকৃত করতে পারলো না কেন? আসল কথা গীতিকার নেই। সঙ্গীত-রাগকারের অভাব।

এ অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে সিনেমা এবং রেকর্ড উভয় ক্ষেত্রেই।

'শ্যামলী'র শততম অভিনয়-রজনী

যে যতই গলাবাজী করুন, কলকাতার রঙ্গালয়গুলি গত কয়েক বছরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ করেননি, যে জন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাঙলা গর্ব্বানুভব করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা অগণ্য, নাট্যমঞ্চের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় এবং প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারও কয়েক জন আছেন। তবুও কলকাতার অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চের দরজায় তালা পড়েছে। এই কারণে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বেকার বসে আছেন, মঞ্চগুলিতে আলো জ্বলে না, নাট্যকারের লেখা নাটক মঞ্চে রূপান্তরিত হয় না। নাট্যকলাকে দর্শনীয় করে তোলার জন্য পশ্চিম-বাঙলায় সকল কিছুই আছে, নেই শুধু টাকা এবং যোগ্য পরিচালক। কাগজের সমালোচনায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দোষ-ত্রুটি দর্শানো অসম্ভব নয়, রঙ্গমঞ্চের দোষ থাকলে তাও বলে দেওয়া যায় অকপটে, নাটক ভাল কিংবা মন্দ হয়েছে তারও আলোচনা চলে, কিন্তু অর্থ এবং যথার্থ পরিচালকের অভাবের জন্য সাময়িক পত্রে আমরা আবেদন করলে কি লাভ হতে পারে?

যাই হোক, সুসংস্কৃত ষ্টার রঙ্গমঞ্চের 'শ্যামলী' নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চের দুঃখ ও দৈন্যকে যৎকিঞ্চিৎ লাঘব করেছে। "পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্যকারের সুষ্ঠু সমন্বয়" হওয়ার ফলই 'শ্যামলী'র কৃতকার্য্যতা। সম্প্রতি 'শ্যামলী' নাটকের শততম অভিনয়-রজনী উপলক্ষে ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ একটি স্মারক উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। কোন নাটকের জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের অনুষ্ঠান কোন মঞ্চ-কর্তৃপক্ষ করেছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। ষ্টারের একমাত্র স্বত্বাধিকারী সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীসলিলকুমার মিত্র "শ্যামলী" নাটকের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার এবং মঞ্চের সকল নেপথ্য কর্ম্মীদের প্রত্যেককে মূল্যবান পুরস্কার দেন। নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতির ভাষণে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্য কয়েক-জনও বক্তৃতা দেন।

ষ্টারের আগামী আকর্ষণের নামটি জানতে অনেকেই উৎসুক আছেন। আমরাও ছিলাম। শুনেছিলাম 'মীরা বাঈ' নাটক মঞ্চস্থ হবে, তাই যথেষ্ট নিরাশ হয়েছিলাম এই ভেবে যে, 'শ্যামলী'র মত সর্ব্বশ্রেণীর দর্শক-সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাতে পারবে না মীরার ভজন বা মীরা বাঈ স্বয়ং। সুখের কথা, আমাদের এই আপত্তিতে একমত হয়েছেন পরিচালক শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্র। ষ্টারে অনতিবিলম্বে মঞ্চস্থ হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'। এই উপন্যাস নাট্যে রূপান্তরিত

করবেন 'নিশ্চয়ই শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ শ্রীগুপ্ত একাধিক করেছেন। 'শ্যামলীর' পরে সামাজিক নাটক হিসাবে 'পরিণীতা'কে গ্রহণ করেছেন ষ্টার রঙ্গমঞ্চ। 'পরিণীতা' নাটক নির্ব্বাচন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে নানা দিক্ দিয়ে। আশা করি, ষ্টারের এই শুভ-প্রচেষ্টা অবশ্যই সার্থক হবে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'নিমাই সন্ন্যাস'

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের অপেক্ষা নাটকের শ্রোতার সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। কলকাতা বেতারের নাটকানুষ্ঠানটিও বহু দিন যাবৎ একটি বিশেষ ধারা রক্ষা করে আসছে। বহু প্রথম শ্রেণীর নাটক বেতার মারফৎ শুনেছেন দেশের বহু লোক। বহু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কণ্ঠধ্বনি বেতারের কৃপায় শুনতে পেয়েছে দেশের দরিদ্রতম মানুষটি পর্য্যন্ত। কলকাতা বেতারের নাট্যানুষ্ঠানে বোধ করি এই জন্যই কোন্ পরীক্ষার (Experiment) অবকাশ থাকে না, শুধু নাটক রূপান্তরিত হয় বেতারী টেকনিকে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষে বিগত ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ রচিত 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি বেতারস্থ হয় কলকাতা কেন্দ্র থেকে। এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, জহর গঙ্গো, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, মলিনা দেবী ও সুচিত্রা সেন সহ আরও কয়েক জন সৌখীন অভিনেতা।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ঘটনাবহুল। মহাজ্ঞানী শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-প্রচারের পথে কত বাধা-বিপত্তি। তাঁর গৃহত্যাগ কত করুণ ও বেদনাদায়ক। চৈতন্যের নামগান কত মিষ্ট ও মধুর। নাটকের জীবন নাটকের ঘটনায় প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীচৈতন্যের ঘটনাবহুল জীবন তাই নাটকের পক্ষে এতটা উপযোগী, বাঙলা দেশের মঞ্চ, পর্দ্দা ও রেকর্ডে তাই চৈতন্যলীলা বহু পূর্ব্বেই দেখানো ও শোনানো হয়েছে। 'আকাশ-বাণী'ও বাদ থাকলো না। নিমাই সন্ন্যাস কলকাতা কেন্দ্রে যে ভাবে অনুষ্ঠিত হ'ল তাতে তাকে পরীক্ষামূলক (Experimental) বলতে বাধা নেই। এই অভিনয়ে প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের সম্মেলন হয়েছিল। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের কথা না তুললে বলতে পারি, এই পরীক্ষার যথার্থতা আছে। এখানে অনুষ্ঠানটি প্রধান, কোন্ খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দ অভিনয় করলো তা খুঁটিয়ে দেখবার কোন্ প্রয়োজন নেই। তবে মহাত্মা শিশির-কুমারের সেকেলে মঞ্চনাট্যটিকে এ যুগের উপযোগী করতে কেউ যদি মাথা ঘামাতেন! এবং রিহার্সাল যদি ঠিক মত হ'তে পারতো!

বাঙলা ছায়াছবিতে শিব নায়ক, দুর্গা নায়িকা

বাঙালী চিরকালই কি অনুকরণপ্রিয়? সমগ্র বাঙালী জাতির স্কন্ধে এই দোষটি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের জাতের কিছু অংশ অন্য দেশ কিংবা ভিন্ন জাতির সাজ-পোষাক, আদব-কায়দা এবং অন্যান্য গুণাগুণ বহু দিন যাবৎ অনুকরণ ক'রে আসছে। ফলে বাঙালী জাতির মধ্যে যতটা সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছে অন্য কোন প্রদেশবাসীর মধ্যে ততটা হয়নি। বলতে বাধা নেই, লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, কোন' কোন' বাঙালী সাজ-পোষাক কথা-বার্ত্তা, হাভ-ভাব রাতারাতি বদল ক'রে এক কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করেছেন। এত কাল জানতাম, বাঙালী অন্য কোন দেশ বা জাতির ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এক কালে বাঙালী ভোল পালটে ইংরাজ হয়েছিল, বর্ত্তমানে বাঙালীর মধ্যে কারও বা মার্কিণী ধরণ-করণ, কারও বা রুশীয় চিন্তাধারা।

বাঙালী বাঙালীকে অনুকরণ করে, কস্মিন্কালেও বাঙালীর এতটা স্বজাতপ্রীতি কেউ দেখতে পেয়েছেন? সম্প্রতি বাঙলার ছায়াচিত্র-জগতে এই অনুকরণপ্রিয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে। একই বিষয়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী চিত্ররূপান্তরের কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়ে উঠছেন। একজন যেই শিবের দক্ষযজ্ঞের পটভূমিকায় চিত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত হ'লেন, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠান শিবের পিছু পিছু ধাওয়া করলেন। শিব-ঠাকুর নেহাৎ আত্মভোলা তাই রক্ষা, নচেৎ অন্য কোন দেবতা হ'লে এই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে চাইতেন কি না সন্দেহ! যাই হোক, শিব এবং দুর্গাকে নায়ক-নায়িকা খাড়া করে কত জন কত ছবিই না দেখালেন হাল আমলে! ৫২ পীঠস্থানকে দেখতে পাওয়া গেল কত ছবিতে! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পটভূমির একটি ছবিও দর্শকমহলকে আকৃষ্ট করতে পারলো না। শোনা গেল, এই শিব-দুর্গার ছবিগুলি শহরে তেমন না চললেও মফঃস্বল বাঙলায় নাকি ভালই বিকিয়েছে। যদিও এই গ্রাম্য আকর্ষণে চিত্রনির্ম্মাতাদের কোন দক্ষতারই প্রমাণ মেলে না, গ্রাম্য বাঙালীর ছায়াছবির দক্ষপ্রীতির সেই মধ্যযুগীয় অজ্ঞতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং তাতে বাঙালী জাতির কিয়দংশ অশিক্ষায় কতটা দক্ষ তা-ও সপ্রমাণ হয়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও বর্ত্তমানে ধর্ম্মমূলক চিত্রগ্রহণের হিড়িক পড়েছে, সম্ভবতঃ সাম্যবাদকে প্রতিরোধের চেষ্টায়। বিদেশী ধর্ম্মমূলক ছবিগুলিও উৎরে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রচুর বিক্রী পাচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতা দর্শকশ্রেণীর কাছে। কারণ, ওদের ছবি ছবিতে পরিণত হয়। আমাদের ধর্ম্মমূলক চিত্রগুলি দেখলে কেন কি জানি যাত্রা দেখছি ব'লেই ভ্রম হয়। কিন্তু যাত্রা ও ছায়াচিত্রে পার্থক্য না রাখলে ছবি না দেখিয়ে যাত্রা দেখানোই ভাল। তার জন্য রূপালী পর্দ্দার প্রয়োজন নেই, মাচায়-বাঁধা 'এস্টেজ'ই যথেষ্ট!

ঘরমুখো বাঙালীর ষ্টুডিওমুখো পরিচালক ?

বাঙলা ছায়াছবির আদ্যোপান্ত ষ্টুডিওর ফ্লোরেই হয়, তা বোধ করি আমাদের দর্শকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। ছায়াচিত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা এক দৃষ্টেই বুঝে নেয় অধিকাংশ বাঙলা চিত্রে প্রদর্শিত পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী, পর্ণ কুটীর, রাজপ্রাসাদ, পাহাড়ের চূড়ো, মন্দির ও মসজিদের ছবির দৃশ্য কোথায় গৃহীত হয়েছে। কাগজের এবং মাটির মডেল এই সকল-কিছুর কাঠামো বা প্রতিমূর্ত্তি। তাও মডেল যে করলো তার জ্ঞান নেই গঠনাকৃতির। সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় অমুক ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য

অমুক পরিচালক সদলবলে অমুক স্থানে যাত্রা করেছেন। যদিও অধিকাংশ বাঙালা ছবি দেখলে এই প্রচারিত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা ব্যতীত উপায় নেই। বাঙলা ছবিতে ইদানীং বহির্দৃশ্য থাকে যৎকিঞ্চিৎ। ছবির আগাগোড়া বহির্দৃশ্য, তেমন ছবির কল্পনা বিদেশে ঘন ঘন কৃতকার্য্য হ'লেও আমাদের অনেকের কাছে বাতুলতা মাত্র।

বাঙলার প্রকৃতির একটি বিশেষ রূপ আছে। সেই বিশেষ রূপের চিত্ররূপান্তর ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে হয় বলেই সে-রূপ এত হাস্যকর হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের শিল্পকলায় যথার্থতা ক্ষুন্ন হ'লেই ছবি মাটি হয়ে যায়। বাঙলার অধিকাংশ ছবিতে দেখানো হয় সব কিছুই নকল। কাগজ আর মাটির মডেল। আমাদের পরিচালকদের সাবধান ক'রে দেওয়ার সময় সমুপস্থিত। ষ্টুডিওর ভেতরে ব'সে চিরটা কাল কাজ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতের বাঙলা ছবি কি দর্শনীয় হয়ে উঠতে পারবে! বর্ত্তমানে কোন রকমে অজ্ঞ দর্শকদের হতভম্ব ক'রে কোন রকমে চালিয়ে গেলেও নিকট-ভবিষ্যতে কি নিজেদের চালাতে পারবেন অন্ততঃ বাঙালী পরিচালক?

দিনের পর দিন ষ্টুডিওর ফ্লোরে ব'সে ছবি তৈরী করে যাওয়ার কি অর্থ (!) থাকতে পারে শস্যশ্যামলা ও নাতিশীতোষ্ণ বাঙলা দেশ হওয়া সত্বেও! ষ্টুডিওকে বিশ্বজগৎ মনে করলে বা জ্ঞান করলে কারই বা কি বলবার থাকতে পারে! যাই হোক্, শুধু ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে এখনও যে পরিচালক স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকতে চান, ভবিষ্যতে যে তাঁকে জোর ক'রে ষ্টুডিওর বাইরে বের করে দেওয়া হবে! এ দৃশ্য আমরা কল্পনা করতে পারি এখনই।

সঙ্গীত নাটক আকাদেমী

সম্প্রতি সঙ্গীত নাটক একাডেমীর উদ্যোগে দিল্লীতে একটি সঙ্গীত-সম্মেলন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ থেকে বিশিষ্ট গায়কদের আহ্বান জানানো হয় এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে কিন্তু বাঙলা দেশ থেকে ডাকা হয়নি একজনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে। এজন্য যদিও আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ নেই। দিল্লীর গানের দরবারে না গাইলেও বাঙালী শিল্পীরা মারা যাবে না নিশ্চয়ই। তবুও উক্ত একাডেমী সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত হওয়া সত্বেও কেন আমন্ত্রিত হ'লেন না কোন বাঙালী শিল্পী? এ প্রশ্ন যে কেউ করতে পারেন। আমরাও তাই করছি। বাঙালী জাতি সঙ্গীতপ্রিয় এবং নাট্যকে, যে-কারণে সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে বাঙালীকে অগ্রগণ্য বলা হয়। গত কয়েক যুগে বাঙলার সাহিত্য যেমন দান করেছে অসামান্য, তেমনই গান এবং নাটকের ক্ষেত্রে বাঙালীর দান অস্বীকার্য্য আদপেই নয়। বাঙলা দেশে যত প্রথম শ্রেণীর গায়ক এবং অভিনেতা আছেন অন্য কোন প্রদেশে তত নেই। এবং শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে ধ্যান এবং জ্ঞান বিবেচনা ক'রে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মত বাঙালীর সাঙ্গীতিক অগ্রগতি রোধ হয়েও যায়নি। নাটকের প্রসঙ্গ আর নাই তুললাম।

সুতরাং সঙ্গীত নাটক একাডেমীকে সর্ব্বভারতীয় বলতে আমরা দ্বিধা বোধ করছি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, এই একাডেমী সৃষ্টি করলো কে বা কারা? গঠনকারীদের বিভাগ দৌড়ই বা কতটা? টাকা যোগাচ্ছেই বা কে? একাডেমীর সঙ্গে দিল্লী সরকারের কি সম্পর্ক? এতটা গলাগলি কেন একাডেমীর সঙ্গে সরকারের?

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সরকারী দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের এক দল অজ্ঞ, অপোগণ্ড ও অকালকুষ্মাণ্ড কলারসিক মোকতে কিছু মেরে নেওয়ার জন্য দিকে দিকে জাল বিস্তার করেছে। শোনা যায়, বিশেষ এক ধরণের নারী তাদের ব্যবসা পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রথমেই পুলিশকে হাত ক'রে ফেলে, শিল্পক্ষেত্রেও এই জালিয়াতের দলকে সরকারের রুই-কাৎলা থেকে চুনো-পুঁটিকে পর্য্যন্ত হাতে রেখে নাচাতে দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গীত নাটক একাডেমীর মতই আরও বহু গালভরা নামের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান এখন প্রতিদিনই গজাবে এবং গজাচ্ছেও। সরকারী খাতায় নাম-লেখানো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ এই এই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠাদের মাথায় তুলে নাচলেও কসুর করবে না। ফল হবে এই যে অনভিজ্ঞদের দয়ায় সঙ্গীত, নাটক এবং একাডেমীর কোনটাই গ'ড়ে উঠবে না।

টকির টুকিটাকি

হিমালয়ান আর্ট প্রডিউসার্স বেশ বহাল তবিয়তে "মরণের পরে"র চিত্র তুলছেন। রূপায়নে আছেন ধীরাজ, উত্তমকুমার, শম্ভু মিত্র, বীরেন চট্টো, অজিত বন্দ্যো, সুচিত্রা সেন। "জয়দেব" ছবি তুলছেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান। অসিতবরণ, রবীন মজুমদার ও দেবযানী বিশিষ্ট ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন। মণি বর্ম্মার কাহিনী "সদানন্দের মেলা"র চিত্ররূপ তোলা নিয়ে পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত খুব ব্যস্ত আছেন। বিভিন্ন চরিত্রে নেমেছেন পাহাড়ী, ছবি, উত্তমকুমার, নৃপতি, সুচিত্রা, পদ্মা, বাণী গাঙ্গুলী, ভানু ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। "মৃণালিনী"র কাজ এগিয়ে চলেছে। রূপায়নে আছেন সন্ধ্যারাণী, অজিত বন্দ্যো, হরিধন, বিমান প্রভৃতি। প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় "দুর্লভ জনম" গঠনপথে। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন প্রণতি, সমর, সমীরকুমার ও শম্ভু মিত্র। অমর পিকচার্স "ভুল" চিত্রখানি নির্ভুল কোরে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। রূপায়নে আছেন ছবি, বিকাশ, শ্যাম লাহা, সাবিত্রী, সুদীপ্তা প্রভৃতি। এস, বি, এস, প্রোডাকশান্‌স্‌এর "এই সত্যি"র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে এল। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সত্য বন্দ্যো, অনুপকুমার, কবিতা রায়। শরৎচন্দ্রের "সতী"র চিত্ররূপ তুলছেন পরিচালক অমর মল্লিক। প্রধান চরিত্রে নেমেছেন ভারতী, ধীরাজ, অরুন্ধতী, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী। বঙ্গবাণী পিকচার্সের "সাবধান" চিত্রখানি সমাপ্তির পথে। রূপায়নে আছেন মলিনা, সাবিত্রী, সন্তোষ, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী। পরিচালক নরেশ মিত্র "অন্নপূর্ণার মন্দির"এর চিত্ররূপ তোলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সুচিত্রা, উত্তমকুমার, সাবিত্রী, মলিনা, শোভা সেন ও স্বয়ং পরিচালক।

সানরাইজ ফিল্মের "কল্যাণী" চিত্রে শোনা যাচ্ছে, অভিনব স্ত্রী-চরিত্রে নেমেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন, মঞ্জু, সাবিত্রী, ছবি, উত্তম, জহর (রায় ও গাঙ্গুলী)।

রুদ্ধকণ্ঠ বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্কট-মুহূর্ত্তে

গত দু' সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে বাঙলার সীমান্তে ভাষা-আন্দোলনের প্রতিবাদে বিহারী সরকারের চণ্ডনীতির আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসলোলুপ পশ্চিমবঙ্গীয় ধামাধরাদের সম্পর্কে দু'-চার কথা বলতে না বলতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী ভক্তদের টনক ন'ড়ে উঠেছে। কয়েক জন বাঙালী সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং কংগ্রেস-সম্পাদক অতুল্য ঘোষ একটা সভা ডেকে ফেলেছেন। কেউ কেউ এই সভায় নির্ভয়ে নিজ নিজ মতও প্রকাশ করেছেন। গদী হারানোর ভয়েই কিনা জানি না কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুল্য ঘোষ ভাষাভিত্তিক প্রদেশের স্বপক্ষে সই সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছেন। চতুর্দ্দিকে যখন বাঙালী জাতির মুখে বিহারী সরকারের নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার নিন্দা শোনা যাচ্ছে, তখন একটা লোক-দেখানো প্রতিবাদ না জানালেই চলে না। সুতরাং অতুল্য ঘোষের এতকাল পরে হারানো জ্ঞান বুঝি বা ফিরে এসেছে। কিন্তু বাঙালী জাত "প্রতিবাদ" "দাবীপূরণ" "স্বাক্ষর-সংগ্রহ" প্রভৃতি গালভরা কথাগুলিকে কদাচ বিশ্বাসই করে না। কেন না, আপোষে মীমাংসা চালনার সংশিক্ষাটি কংগ্রেস পেয়েছে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশজাতির শিক্ষাশিবিরে। প্রতিবাদ, দাবীপূরণ ও স্বাক্ষর সংগ্রহের অর্থই হচ্ছে কোন প্রকারে কালহরণ করা। অতুল্য ঘোষও সেই পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাই আমরা আদৌ আশ্বস্ত হ'তে পারছি না পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এই লোক-দেখানো প্রচেষ্টায়।

সম্প্রতি দিল্লীর কংগ্রেস সগর্ব্বে ঘোষণা করেছে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের গুরুভার কাজে কংগ্রেসীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে না। দেখা যাক, কংগ্রেস-পূজারী অতুল্য ঘোষের দল (!) দিল্লীর কংগ্রেসী হাইকমাণ্ডের কথা প্রতিপালন করেন, না বঙ্গদেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসেন এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে। শ্রীঘোষের দলকে এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে নিকট-ভবিষ্যতে যদি না বাঙলাকে বিহারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, এ কথা আমরা আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি।

সাহিত্যের সেলসম্যান চাই

(একটি চিঠি)

সবিনয় নিবেদন—

আমি আপনার বহুল প্রচারিত এবং অতি জনপ্রিয় মাসিক বসুমতীতে "সাহিত্যের সেলসম্যান" সম্বন্ধে আলোচনাটি দেখিলাম।

আপনার "আকাশ-পাতাল" বইখানা আমি মন দিয়া পড়িয়াছি। পরবর্ত্তীতে আপনার এই আলোচনাটি দেখিলাম তাহাতে আশান্বিত হইয়া এই পত্র লিখিতেছি আশা করি এ সম্বন্ধে আমাকে আপনার মহান ছায়াতলে ডাকিয়া লইবেন এবং যতদূর পারেন সাহায্য করিবেন। আমি বিগত ১৪ মাস ধরিয়া আপনি যেভাবে সাহিত্যের প্রচারের জন্যে আবেদন করিয়াছেন তাহা অগ্রেই করিতে আরম্ভ করিয়া একটি ছোট বাজার গড়িয়া তুলিয়াছি, আসামের চা-বাগানে আমার বাজার। বই দূরের কথা আপনাদের বিজ্ঞাপনও সেখানে খুব কম পৌঁছায় অর্থাৎ আপনাদের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক নূতন বাজার আমি গড়িয়া তুলিয়াছি এবং আজিকার এই দুরন্ত প্রাদেশিকতার দিনেও অসমীয়াদের কাছেও বাঙ্গালা বই বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালার পয়সা পাঠাইতেছি, এখন আমার মুস্কিল হইতেছে যে আমি আমার সমুচিত মূলধনের অভাবে চাহিদামত বই সরবরাহ করিতে পারিতেছি না, এবং এই ধরণের আরও কিছু অসুবিধার জন্য ব্যবসায়টিকে আরও জোর করিতে পারিতেছি না। এখন আমার নিবেদন এই যে আপনি যদি আমাকে কিছু প্রকাশকের সাথে ধারে ১০ দিনের সর্ত্তে বই পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহলে আমি প্রকাশকের বিনা দায়িত্বে তাঁদের বহু বিক্রয় করে দিতে পারি। অবশ্য আমার বাজার ছোট এখন, অতএব কোন প্রকাশকের বই আমি মোট মূল্য ১০০৲ শত টাকার বেশী ১ বারে লইতে পারিব না জানিবেন।

আমার সম্বন্ধে আপনাকে জানালাম এবং তাও জানালাম আপনার আলোচনার উত্তরে, জানবেন। যদি আপনি আমার সাথে মৌখিক আলোচনা কর্ত্তে চান এ সম্বন্ধে তবে এ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি আপনার সাথে আলোচনা কর্ত্তে পারি জানবেন, কারন ঐ সময়ে আমার কোলকাতায় যাবার সম্ভাবনা কিছু আছে আর আপনি যদি লেখেন তবে নিশ্চয়ই যাব জানবেন।

যদি দেখা করতে হয় তবে কোথায় এবং কখন দেখা কর্ত্তে হবে তা দয়া করে জানাবেন।

আর আপনার পত্র পেলে জানাব জানবেন।

নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

প্রাণতোষ ঘটক—

মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক

মাসিক বসুমতী

[আমরা পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-প্রকাশকদের দৃষ্টি পত্রলেখকের বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করছি।—স]

ডক্টর দের নানা নিবন্ধ

ডাঃ সুশীলকুমার দের সদ্য-প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থের নাম 'নানা নিবন্ধ'। ডাঃ সুশীলকুমারের বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক উনিশটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। দৈনিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী, শিক্ষা ও সংস্কৃত, সংস্কৃত ও বাংলা, রূপ ও রস, বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী সাহিত্য-পাঠক ও গবেষকের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। ডাঃ দে স্বয়ং একজন কল্পনাবিলাসী কবি ও কৃতবিদ্য অধ্যাপক। বাংলা ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সুপরিচিত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে এমন সুলিখিত নিবন্ধ ইদানীং কালে আর দেখা যায়নি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন রচনাবলীর মধ্যে—'চৈতন্ত-চরিতাখ্যায়িকা' নামক নিবন্ধটি নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এত সংক্ষেপে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখক যে ভাবে আলোচনা করেছেন তা প্রশংসনীয়। ডাঃ সুশীলকুমার দের 'নানা নিবন্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন 'মিত্র ও ঘোষ', শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা।

কুট্টনীমতম্

নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের প্রধান মন্ত্রী দামোদর গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় 'কুট্টনীমতম্' কাব্য রচনা করেন। এই জাতীয় যৌন বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের আর কোনও সমসাময়িক গ্রন্থ নেই। একটি চমৎকার শ্লেষাত্মক কাহিনী অবলম্বন করে দামোদর গুপ্ত সেকালের নর-নারীর যৌন-জীবনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। দামোদর গুপ্তের কাব্যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা যৌন বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ 'কুট্টনীমতমে'র প্রতিটি শ্লোকে ছড়ানো আছে। এতদিন এই গ্রন্থের কোনো বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়নি, অবশ্য ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থটির আংশিক অনুবাদ হয়েছে। এই গ্রন্থের অনুবাদক অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে টীকা ও টিপ্পনী-সংযোগে গ্রন্থটিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন। পাশ্চাত্য যৌনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে তুলনামূলক অনেক বিস্তারিত টিপ্পনী গ্রন্থটির সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। শ্লোকসূচী ও শব্দসূচী এই গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। মাত্র চার টাকায় এমন একখানি গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

পরমাপ্রকৃতি সারদামণি

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' সুরসিক সাহিত্য-পাঠক ও ভক্ত জনের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অচিন্ত্যকুমারের নূতনতম সাহিত্যকীর্তি 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি'। শ্রীশ্রীসারদামণির পুণ্য জীবনের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে ভক্ত লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মাতা সারদামণি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য একত্রে গ্রথিত করে সাহিত্যরসসমৃদ্ধ জীবন-কথায় রূপায়িত করেছেন অচিন্ত্যকুমার। ঠাকুর বলেছিলেন—

"তুমি আমার বিদ্যা, তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার মশাল জ্বালিয়ে। তুমি যে জ্ঞানদাত্রী। ত্বং শ্রীঃ ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ।" সেই বাঙালী মেয়ে সারদার জীবনী পরমাপ্রকৃতি। সেই সর্ববান্ধবরূপিণী জগন্মাতা, শশিরুচিকোমলা, কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা দেবী সারদামণির পবিত্র জীবনের বহুবিচিত্রিত কাহিনী ও তথ্য ভক্ত লেখক অচিন্ত্যকুমার এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটিতে অপূর্ব লিপিকুশলতায় সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটির প্রকাশক সিগনেট প্রেস এবং দাম চার টাকা।

যৌন মনোদর্শন

আর একখানি বই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশ করলেন বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। হ্যাবেলক এলিস এবং তাঁর "Studies in Psychology of Sex"—নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কে না জানে? সেই মহাগ্রন্থ এত দিনে বঙ্গানুবাদ করলেন অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়। মরিস, এল, আরনেষ্ট বলেছেন—"যৌনতত্ত্বের নিন্দিত অন্ধকারময় লোক হইতে কিরূপে এলিস জগদ্বরেণ্য হইয়া পুণ্যলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আবির্ভূত হইলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার বিস্ময়কর মন্তব্য তাঁহার স্বলিখিত ভূমিকায় পাওয়া যাইবে।" কথাটি সত্য। 'যৌন মনোদর্শন' গ্রন্থের বিচিত্র ইতিহাস ডাঃ হ্যাবেলক এলিসের ভূমিকায় বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ, মনোবিকলন চিকিৎসক, অপরাধতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে 'যৌন মনোদর্শন' অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আজ যৌন-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। হ্যাবেলক এলিস বলেছেন, "কামই জীবনের মূল কথা, কি ভাবে এই কামকে বোঝা যায় তা যত কাল না জানতে পারি তত কাল জীবনকে শ্রদ্ধাও করতে পারব না। যৌন সমস্যার উপর জাতিগত সমস্যা নির্ভর করছে।"

হ্যাবেলক এলিসের এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম ভাগ "লজ্জার ক্রম-বিকাশ" অনুবাদ করলেন অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়। এমন একটি জটিল গ্রন্থের এমন সুন্দর ও সহজবোধ্য অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জার্মাণ, ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয়, পোর্তুগীজ, জাপানী প্রভৃতি ভাষায় এই গ্রন্থ অনেক পূর্বে অনূদিত হয়েছে, ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম অনুবাদ। অনুবাদক বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তাই তাঁর অনুবাদ শুধু সাধারণ ভাষান্তর মাত্র হয়নি,—বহু তথ্য এবং তুলনামূলক টীকাও এই গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ ও সুনির্বাচিত গ্রন্থ সংগ্রহে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা অবশ্যই 'যৌন মনোদর্শন' গ্রন্থটি সংগ্রহ করবেন—গ্রন্থটির তিন টাকা দাম এক হিসাবে বেশ কম বলেই মনে হয়।

পূর্ববঙ্গ বাংলাসাহিত্য সম্মেলন

নিঃশব্দে পূর্ববঙ্গে যে বিপ্লব হয়ে গেছে, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানতঃ এই বিপ্লব হয়েছে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে। নিজের মাতৃভাষা 'বাংলা'র প্রতি পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের এই গভীর আন্তরিক মমতা ও ভালবাসার কাছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হিন্দুরা লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকবেন। পূর্ববঙ্গের কাছে আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার দিন এসেছে। বাংলা ভাষা নিয়ে মানভূমের আন্দোলনের প্রতি আমরা দু'-একটি জলো "অতুল্য"-বিবৃতি ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারিনি এবং বিহার সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে পারিনি। ক্লীবের মতন আমরা মাথা হেঁট ক'রে সব সহ্য করছি, অথচ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আমরা মনে করি যে আমরাই বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রধান ধারক ও বাহক'। পূর্ববঙ্গ আজ পশ্চিমবঙ্গের এই দম্ভের বেলুনটিকে চূর্ণ করে প্রমাণ করেছে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক হবার যোগ্যতা তাদের আমাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। এপ্রিলের শেষে পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ ও সাহিত্যিকরা একটি বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং সেই উপলক্ষে তাঁরা বাংলা ভাষায় লেখা ও ছাপা সমস্ত বইয়ের একটা বিরাট প্রদর্শনী করার চেষ্টা করছেন। তার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশক ও লেখকদের তাঁরা সহযোগিতা চেয়েছেন এবং সকলকে সম্মেলনে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন; সাহিত্য-সম্মেলনের এ-রকম বিরাট পরিকল্পনা বাংলা দেশে এর আগে কখনও হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ নির্বিশেষে বাংলা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যিক পূর্ব-পাকিস্তানের এই মহৎ প্রচেষ্টা সফল করার জন্ত আন্তরিক সহযোগিতা করবেন ব'লে আমরা বিশ্বাস করি এবং সম্মেলনে যোগদান করার চেষ্টা করবেন। বাংলা সাহিত্যের এই পুনর্জীবন লাভে প্রত্যেক বাঙালীর আশান্বিতও উৎসাহিত হওয়া উচিত।

কলকাতা কালচার

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাস কলকাতা। উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর প্রাচীন কলকাতার কাহিনী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরগুলির চাইতে কলকাতার গৌরবময় ঐতিহ্য কোনো অংশে কম নয়। ইদানীং কেউ কেউ সেই প্রাচীন কলকাতার লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধারে মনোনিবেশ করেছেন, এবং পুনরাবিষ্কারে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় 'কালপেঁচা'কে। কালপেঁচা এই ছদ্মনামে বিখ্যাত সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর অপূর্ব গবেষণার কিছু অংশ এই কলকাতা কালচারের মারফৎ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই রচনার প্রথম অংশ 'কালপেঁচার নক্সা' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এই সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কলকাতা কালচার', তৃতীয় গ্রন্থ 'কলকাতার ইতিহাস' প্রকাশিতব্য। লেখক কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ করে চারটি বিভিন্ন কালচারে ভাগ করেছেন—যথা সুতানুটি (উত্তর কলিকাতা) নবকৃষ্ণের তালুকদারী কালচার, কলিকাতা (মধ্য কলিকাতা), সুবর্ণবণিক ও শেঠ বসাকদের বণিক কালচার, গোবিন্দপুর (নিম্ন মধ্য কলিকাতা),—হাল আমলের ইংরাজী কালচার, ভবানীপুর-কালিঘাট (দক্ষিণ কলিকাতা)—হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তের কালচার। দীর্ঘকালের ব্যবধানে সব মিশিয়ে একাকার হয়ে গেছে। লেখক বাঙালীর ও বাঙলা সমাজ-জীবনের সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও মূল্যবান দলিলের সাহায্যে সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণামূলক তথ্য পাণ্ডিত্যের গুরুগম্ভীর জটিলতায় আবিল হয়ে ওঠেনি, কৃতী লেখকের বলিষ্ঠ কলমে সরস রম্য রচনায়

পরিণত হয়েছে। এমন সুন্দর ও সহজ ভাষায় রচিত ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে কমই আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক 'বিহার সাহিত্য ভবন,' ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা (৪)। দাম চার টাকা আট আনা।

রবীন্দ্র পুরস্কার

এ-বছরের রবীন্দ্র-পুরস্কার "পূর্ণকুম্ভের" লেখিকা শ্রীযুক্তা রাণী চন্দকে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনার মধ্যে "পূর্ণকুম্ভ" একটা নির্দিষ্ট স্থান দখল ক'রে নিয়েছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী পাঠকই 'পূর্ণকুম্ভের' প্রশংসা করবেন এবং শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের পুরস্কার-প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে কেউ দ্বিরুক্তি করবেন না। আমরা আরও খুশী হয়েছি এইজন্য যে, বাংলা দেশের একজন মহিলা লেখিকাকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এইজন্য শ্রীযুক্তা রাণী চন্দকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন নিশ্চয় জাগবে। প্রশ্নটা এই। ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনার নিদর্শনরূপে "পূর্ণকুম্ভের" লেখিকা ছাড়াও, সম্প্রতি বাংলা দেশে আরও কয়েক জন লেখক বিভিন্ন দিক থেকে আশ্চর্য শক্তির ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাঁরা শক্তিমান লেখক যে একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। তাঁদের নাম আমরা করতে চাই না, কারণ বাংলা দেশের পাঠকদের কাছে তাঁরা বিশেষ পরিচিত। তাঁদের কয়েক জনকে (অবশ্যই শ্রীযুক্তা রাণী চন্দসহ) রবীন্দ্র-পুরস্কার সমান ভাবে বণ্টন ক'রে দিলে, সাহিত্যের দিক থেকে অনেক বেশী সুবিচার করা হ'ত ব'লে আমাদের মনে হয়। কিন্তু যে ভাবে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে তাতে প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর সন্দেহ হবে যে বিচারকরা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই পক্ষপাতিত্ব লেখক-লেখিকার বিশেষ প্রতিষ্ঠানগত আনুগত্যের সঙ্গেও জড়িত। রবীন্দ্র-পুরস্কারের ঐতিহ্য যদি এই ভাবে তৈরী হয়, তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে তার কোন সম্মান বা মর্যাদা থাকবে ব'লে আমাদের মনে হয় না।

লীলা রায়ের "চ্যালেঞ্জিং ডিকেড"

সাহিত্যবিলাসীদের "P. E. N" নামক একটি সাহিত্যচক্রের দীর্ঘকাল ধ'রে অস্তিত্ব আছে, এ-কথা অনেকে না জানলেও, কেউ কেউ নিশ্চয় জানেন। হট্-কোল্ড ড্রিঙ্ক ও স্ন্যাক্সের সঙ্গে এই চক্রের বৈঠকে 'সাহিত্য' সম্পর্কে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা হয় এবং সেগুলি তাঁদের "বুলেটিনে" ছাপাও হয়। মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের গজদন্ত-মিনার থেকে ব'সে এঁরা সেকালের রাজা-বাদশাহের মতন কোন কোন সাহিত্যিককে "খিলাৎ"ও দেন। সম্প্রতি এই ধরণের খিলাৎ-প্রাপ্ত ১৩১ জন সাহিত্যিকের এক তালিকা ও পরিচয় সহ শ্রীযুক্তা লীলা রায় "A Challenging Decade" নামে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার সঙ্গে প্রধানতঃ অবাঙালী ও বিদেশীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য সাধু, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য আর অধিকার এক বস্তু নয়। যে গুরুদায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন শ্রীযুক্তা রায়, প্রথমতঃ তা করবার, মতন যোগ্যতা তাঁর সর্বাগ্রে অর্জন করা উচিত ছিল। তাঁর বই প'ড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের নাম বা রচনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় পর্যন্ত হয়নি। কেবল তাঁর আশ্রম পর্যন্ত যাঁদের নাম পৌঁছেছে অথবা বই, তাঁদের কথা বলেই তিনি 'চ্যালেঞ্জিং ডিকেডের' পরিচয় দিয়েছেন। কিছুদিন আগে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় ঠিক এই রকমের একটি কাণ্ড তিনি করেছিলেন এবং তার মধ্যেও কাণ্ডজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় আমরা পাইনি। শ্রীযুক্তা রায়ের হঠাৎ বিচারক হবার বাসনা এত উগ্র হ'ল কেন, আমরা জানি না।

লেখার দাম

এ দেশে লেখক এবং তার রচনার বিক্রয়মূল্য যে ভাবে কমছে তা অতি শঙ্কাজনক, কিন্তু বিদেশে লেখকের রচনার বিক্রয়-মূল্য বেড়ে চলেছে। কর্ণেল লিণ্ডবার্গের আত্মজীবনী The Spirit of St Louis ৩৫৭,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়েছে, এর পূর্বে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল Saturday Evening Post এ, তার জন্য লেখক পেয়েছেন ৩৫,০০০ পাউণ্ড। পল ব্রিকহীলের Reach for the sky গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হচ্ছে ১০০,০০০ কপি, প্রকাশক কলিনস্। আর সিনেমার জন্য লেখক পাঁচ অঙ্কের চেক্ আগেই পেয়েছেন। আমাদের দেশে ১১০০ খানি বই কাটলেই প্রকাশক আর লেখক বেলুনের মত স্ফীত হয়ে ওঠেন, তার কারণ আমরা অল্পেই খুশী।

১৩৬০ সালে প্রকাশিত বাংলা বই

১৩৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ এবং সুসাহিত্য সংগ্রাহকদের সুবিধার জন্য বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতীতে এক শতখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করা হবে। জনসাধারণকে খেয়াল-খুসী মত তালিকা দিয়ে বিভ্রান্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, নিরপেক্ষ তালিকা রচনায় রসিক পাঠক-সমাজের বিচারই শ্রেষ্ঠ নিরিখ। তাই মাসিক বসুমতীর লক্ষাধিক পাঠক-পাঠিকাকে তাঁদের নির্বাচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই তালিকা ২০শে বৈশাখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই।

যে সব গ্রন্থের নাম পাঠক-পাঠিকার তালিকায় সর্বাধিক উল্লিখিত হবে সেই গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা বৈশাখের বসুমতীতে প্রকাশিত হবে।

প্রগতি লেখক-সংঘ

বাংলা দেশে "প্রগতি লেখক-সংঘ" নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মতলার একটি নির্দিষ্ট স্থানে টিকে রয়েছে, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ধর্মতলার বাইরে অন্য কোন বটতলায় বা ছাতিমতলায় তাঁদের কোন কার্যকলাপ আছে কিনা জানা যায় না, মধ্যে মধ্যে চিরাচরিত সম্মেলনের অনুষ্ঠান ছাড়া। প্রথমে বছর পনের আগে এঁদের যখন উৎপত্তি হয়েছিল

কেউ কেউ এঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আশা পোষণ করেছিলেন মনে মনে। পরবর্তী কালে সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। আজ আর কোন লোকের, অন্ততঃ কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্যানুরাগীর কোন কৌতূহল নেই তাঁদের সম্বন্ধে। বাংলা সাহিত্যে সংঘগত ভাবে গত পনেরো বছরের মধ্যে তাঁরা সামান্য কিছু দান করারও চেষ্টা করেননি। অথচ গালভরা নাম আছে—"প্রগতি লেখক-সংঘ"। কাণা ছেলের নাম "পদ্মলোচন" আর কি! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল এই প্রগতি লেখকরা। কোন সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কাজকর্ম নেই, কর্মসূচী নেই, লক্ষ্য নেই, নীতি নেই (সঠিক নীতি), অথচ তম্বিগম্বি আছে, এবং যাঁরা কিছু কাজকর্ম করেন তাঁদের এক কথায় নস্যাৎ ক'রে দেবার মতন একটা নিউরটিক পৈশাচিক মনোভাব আছে। পাতিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া-বিদ্বেষী এই প্রগতি সাহিত্যিকরা সর্বক্ষেত্রে নিজেরাই নিকৃষ্ট পাতিবুর্জোয়াসুলভ দীনতা, স্বার্থপরতা ও দলাদলির পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং যেহেতু তাঁরা 'সাহিত্যিক কমরেড' সেই জন্য কেউ কারও প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি বা উন্নতি সহ্য করতে পারেন না। "পরনিন্দা" বা "স্ল্যাণ্ডারিং" হ'ল তাঁদের একমাত্র পেশা। সাহিত্যিক দৈন্য এই তথাকথিত প্রগতি লেখকদের যে কোন্ স্তরে পৌঁছেচে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের প্রধান মুখপত্র "পরিচয়" পত্রিকা থেকে। কদাচিৎ দু'-একটি ছাড়া, অধিকাংশই অপাঠ্য রচনা নিয়ে "পরিচয়" প্রকাশিত হয় প্রতি মাসে। তাও কলেবর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'চ্ছে। বোঝা যায়, মূলে ঘুণ ধরেছে। বাংলাদেশে আরও অনেক সাহিত্যিক-সংঘ ও প্রতিষ্ঠান আছে, সকলেরই কিছু কিছু অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রগতি লেখকদের কি আছে কেউ জানেন না। সাহিত্য পরিষৎ, এমন কি রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনষ্টিটিউটেরও কার্যকলাপ আছে, একটা ঐতিহ্য আছে, কিন্তু প্রগতি লেখক-সংঘের কেবল লম্বাচওড়া বুলি কপচানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। প্রগতি লেখকরা এ-সম্বন্ধে অবহিত হবেন আশা করি। মধ্যে মধ্যে তাঁরা যে আত্ম-সমালোচনা করেন, সেটাও প্রাণহীন ও পুঁথিগত। তাতে যে কোন কাজ হয় না, তা তাঁরা নিশ্চয় জানেন। আশা করি, আমাদের সমালোচনায় ক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁরা নিজেদের সাহিত্যিক দৈন্য ও ক্লৈব্য কাটিয়ে ওঠার জন্য সক্রিয় হবেন এবং সোভিয়েট ও চীনের সাহিত্যিকরা কি করছেন, তা নিয়ে অনর্থক মাথা না ঘামিয়ে, নিজেরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কতটুকু কি করতে পারেন তাই নিয়ে চিন্তা করবেন এবং কাজ করবেন। আলোচনা, সমালোচনা ও সম্মেলন কিছু কালের জন্য স্থগিত রেখে তাঁরা যদি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন, নিজের দেশের দিকে চেয়ে (মস্কো বা পিকিঙের দিকে চেয়ে নয়)—তাহ'লে তাঁদের মঙ্গল হবে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

বিখ্যাত লেখক শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর) সরকারী কাজে দীর্ঘদিনের জন্য সাগরপারে যাত্রা করেছেন। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম পাশ্চাত্য দেশে গমন, তাই আশা করা যায় তাঁর ভবিষ্যৎ রচনায় বিলাতী পটভূমির ছবি পাওয়া যাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের গিরিশচন্দ্র বক্তৃতা-মালার জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার। ইতিপূর্বে আর কোনও মহিলাকে বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ সম্মান দান করেননি। শ্রীযুক্তা সরকারের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ "হারানো অতীত"। 'যুগান্তর' পরিচালিত আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী আর বাণী রায়, দেবাচার্য আর চিত্তরঞ্জন দেব। বসুমতীর পরিচিত লেখক সাহিত্যিক পঞ্চানন ঘোষাল, এবং সাহিত্যিক বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ে অবৈতনিক বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষাল রচিত অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বিখ্যাত এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে বিশেষ শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর 'বিষাণ দা' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসিত। সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র বক্তৃতা দান করলেন। অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণৌ শহরের কুড়ি হাজার বাঙালী নাকি সম্মেলনটি সার্থক করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে শ্রীসজনীকান্ত দাসের "আত্ম-স্মৃতি" প্রকাশিত হবে না। এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রটি কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

॥ প্রাপ্তি-স্বীকার ॥

নিখরচায় জলযোগ—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা আট আনা।

পারাবত—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ১৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, মূল্য তিন টাকা।

ছায়াছবি—শ্রীঅমলা দেবী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩ হ্যারিসন রোড কলিকাতা, মূল্য দু'টাকা আট আনা।

কালচক্র—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ম্যানাসক্রপট্ ৬০।১বি বঙ্কিম মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৫, মূল্য তিন টাকা।

কামাখ্যা তীর্থ—শ্রীধরণীকান্ত দেবশর্ম্মা, পোঃ কামাখ্যা কামরূপ, আসাম, মূল্য এক টাকা।

এ জন্মের ইতিহাস—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টারলাইট পাবলিকেশন, ১১।এ চক্রবেড়ে লেন কলিকাতা-২০ মূল্য পাঁচ টাকা।

ছবিপড়া ২য় ভাগ—শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত ভেলিরবাগ ভবন, পি৩ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য এক টাকা বার আনা।

নাগরিক পরিচিতি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র সরকার বাণীপীঠ কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

ভাগবত ধর্ম—স্বামী ভূমানন্দ, কালিপুর আশ্রম পোঃ কামাখ্যা, আসাম, মূল্য দু টাকা।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকা—

গত ১লা মার্চ্চ (১৯৫৪) প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক ভাবে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে পৃথিবীব্যাপী গভীর ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। পরমাণু যুদ্ধের বিপদ ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে যে কিরূপ ভীষণ হইবে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হইতে তাহার ইঙ্গিত মাত্রই পাওয়া যায়। ১লা মার্চ্চের বিস্ফোরণের পর ২৬শে মার্চ্চ আর একটি বিস্ফোরণ ঘটান হয়। বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের (১৯৫৪) শেষার্দ্ধে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটান হইবে। প্রথমে ১লা মার্চ্চের বিস্ফোরণের বিভীষিকাময় ফলাফলের কথা কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। শুধু এইটুকুই মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, ২৮ জন আমেরিকাবাসী এবং ২৩৬ জন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী অপ্রত্যাশিত ভাবে তেজস্ক্রিয়তা (radiation) দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর সব কিছুই ভাল। কিন্তু জাপানের একটি মাছধরা জাহাজের নাবিকরা এবং তাহাদের ধৃত মাছগুলি যখন তেজস্ক্রিয় ভস্ম দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করে তখনই হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকাময় বিবরণ প্রথম জানিতে পারা যায়। এই মাছধরা জাপানী জাহাজটির নাম ফুকুরিয়ু মারু। ১লা মার্চ্চ তারিখে যখন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয় সেই সময় ঐ জাহাজ বিকিনি অতল হইতে হইতে ৭১ মাইল পূর্ব্ব-উত্তর পূর্ব্বে (east-north east) এবং নিষিদ্ধ এলাকা হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিল। জাহাজটি বন্দরে পৌঁছে ১৪ই মার্চ্চ তারিখে। তেজস্ক্রিয় ভস্মদ্বারা আক্রান্ত মাছগুলিকে অবিলম্বে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয় এবং আক্রান্ত নাবিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব করা হয় নাই। এই সংবাদ আমাদের দেশে প্রকাশিত হইতে আরও অনেক বিলম্ব হয়। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণের ফলে আতঙ্ক প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকার সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

হিরোশিমা ও নাগাসিকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণের পর পৃথিবী-ব্যাপী আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহার পর ১৯৪৬ সালে হাইড্রোজেন বোমার কথা আমরা প্রথম শুনিতে পাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিভাগের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ জন ম্যাকলয় ১৯৪৬ সালে বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দুই বৎসরের মধ্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিতে পারিবে। কিন্তু অতঃপর প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় নাই। ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসী সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারে যে, সোভিয়েট রাশিয়াও পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ-শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ছিল এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমাকেই পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু রাশিয়াও পরমাণু তৈয়ার নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই সংবাদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার মিত্রমহলে বিস্ময় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। রাশিয়ার পরমাণু বোমা তৈয়ারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিণ কংগ্রেসের পরমাণু শক্তি কমিটির সদস্য ডেমোক্রাট সিনেটর মিঃ এডুইন জনসন বলিয়াছিলেন, পরমাণু বোমা অপেক্ষাও হাজারগুণ শক্তিশালী 'সুপার' বোমা বা অতিবোমা নির্ম্মাণের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মিঃ জনসন বোধ হয় হাইড্রোজেন বোমাকেই 'সুপার' বোমা বা অতিবোমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। রাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হওয়াতেই যে হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ নূতন প্রেরণা লাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, ১৯৫০ সালের ৩১শে জানুয়ারী মার্কিণ প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশনকে হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ চালাইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পরমাণু শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্তোষজনক পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ চালাইয়া যাইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার পর প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী কাজ চলার সংবাদ যখন প্রকাশিত হয় সেই সময় ইহাও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রাশিয়াও হাইড্রোজেন বোমার বৈজ্ঞানিক থিওরী অবগত আছে। থিওরী জানা থাকিলেও রাশিয়া সত্যই হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিতে পারিবে, এইরূপ সম্ভাবনার উপর কেহই তেমন গুরুত্ব আরোপ করে নাই। ইহার পর প্রায় আড়াই বৎসর চলিয়া যাওয়ার পর ১৯৫৩ সালের ১০ই আগষ্ট সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, হাইড্রোজেন বোমাও আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়, উহার উৎপাদন-কৌশল সোভিয়েট রাশিয়াও আয়ত্ত করিয়াছে। ইহার চারি দিন পরেই সোভিয়েট রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইবার পূর্ব্বে

যুক্তরাষ্ট্র 'হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক কোন বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের কথা আমরা জানিতে পারি তাহা ঘটান হয় ১৯৫২ সালের নবেম্বর মাসে এনিওয়েটক অতলে (Eniwetok Atoll)। এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে তথ্যাদি গত ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) মাসের পূর্ব্বে প্রকাশ করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। উহাকে একটি 'হাইড্রোজেন ডিভাইসে'র (a hydrogen device) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এগুলাব (Egulab) নাম এক মাইল দৈর্ঘ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে এই হাইড্রোজেন ডিভাইসের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হয়। বিস্ফোরণের ফলে ঐ দ্বীপটি এমন ভাবে ধ্বংস হয় যে উহার চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট নাই, এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে এক মাইল ব্যাসবিশিষ্ট ৩৭৫ ফুট গভীর একটি গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই যদি একটি হাইড্রোজেন ডিভাইসের ধ্বংসশক্তি হয় তবে হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তি যে কিরূপ বিপুল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ১লা মার্চ্চের হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের পরিণাম হইতে উহার দানবীয় ধ্বংসশক্তি সন্ত্রাসজনক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিস্ফোরণ দেখিবার জন্য পরমাণুশক্তি কমিশনের সদস্যগণ এবং মার্কিণ কংগ্রেসের কয়েক জন সদস্যও গিয়াছিলেন। উহার ফল দেখিয়া শুধু মার্কিণ কংগ্রেসের অ-বৈজ্ঞানিক সদস্যরাই নহেন, পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী সদস্যরাও বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তি যে এত বেশী তাহা তাঁহারাও আগে অনুমান করিতে পারেন নাই। সন্ত্রাসময় বিভীষিকার একটা সীমা আছে, যে-সীমার মধ্যে মানুষ উহাকে কল্পনা করিতে পারে। হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকা এই সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বার্লিন সম্মেলনের পর জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্বে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর বিশেষ কোন তাৎপর্য্য আছে কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র যখন হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিয়াছে তখন তাহার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ কোন-না-কোন সময়ে অবশ্যই ঘটাইতে হইবে। তবে জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মত উপযুক্ত সময় আর যে কিছু হইতে পারে না সে-কথা মার্কিণ রাষ্ট্রনায়ক-গণ ভাল করিয়াই জানেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বারমুডা সম্মেলন যেদিন শেষ হয় সেই দিনই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার বিমানযোগে সরাসরি নিউইয়র্ক যাইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে পরমাণু যুদ্ধের আতঙ্ক এবং উহা দূরীভূত করিবার উপায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্ববাসীর মনে পরমাণু বোমার আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। আবার মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের অন্তর এই পরমাণু বোমার আতঙ্ক দূর করিবার জন্ম কেন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবশ্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। উক্ত বক্তৃতায় এই আতঙ্ক দূর করিবার জন্ম তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু-শক্তি এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহার পর ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) তিনি মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট এক বিশেষ বাণী প্রেরণ করিয়া ১৯৪৬ সালের ম্যাকমোহন পরমাণু শক্তি আইন এমন ভাবে সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতে মিত্র দেশগুলির সহিত পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদান করা চলিতে পারে এবং শিল্প ও গবেষণার জন্ম মিত্র দেশগুলিতে fissionable materials প্রেরণ করা চলিতে পারে। রাশিয়ারও পরমাণু বোমা আছে। হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করাও রাশিয়া শিখিয়াছে। এই অবস্থায় ভারসাম্যের পাল্লা যাহাতে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে সেই জন্ম পরমাণু শক্তি সম্পর্কে মিত্রশক্তিবর্গের সহযোগিতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যক। পরমাণু সংক্রান্ত তাহাদের সকলের সম্পদ ও শক্তি একত্রীভূত করা ব্যতীত আর কোন উপায় যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সী গঠনের যে প্রস্তাব করেন, এই প্রসঙ্গে সে-কথা মনে না পড়িয়া পারে না। মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট তিনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে শান্তির আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ার উক্ত বাণী প্রেরণের প্রায় সম-সময়ে মার্কিণ যুক্ত-কংগ্রেস পরমাণু শক্তি কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ডব্লু ষ্টার্লিং কোল ১৯৫২ সালে এনিওয়েটক অতলে (Eniwetok Atoll) যে-thermo-nuclear পরীক্ষা করা হইয়াছে সে সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এই বোমা যদি আধুনিক কোন সহরের উপর নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে তিন মাইল ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট এবং ৩০ বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। যদি ১০ টনের একটি মাত্র হাইড্রোজেন বোমা লোক-বহুল অঞ্চলে পতিত হয়, তাহা হইলে ১০ লক্ষ লোক নিহত হইবে এবং আহত হইবে আরও ১০ লক্ষ লোক। মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগের ক্যালি রিপোর্টে (Kelly Report) বলা হইয়াছে যে, একটি পরমাণু বোমার হানা যদি সাফল্যলাভ করে তবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইবে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ বিনষ্ট হইবে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, এণ্টি এয়ার ক্রাফটের যে-ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে, তাহাতে হানাদারদের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র ভূপাতিত করা যাইতে পারে। সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নয়, আক্রমণই রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। নিউইয়র্ক হইতে ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের সানুদেশে পরমাণু বোমা রক্ষাব্যূহ নির্ম্মাণের কথাও উহাতে বলা হইয়াছে। তা ছাড়া 'রাডার' এবং বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত ৩০০০ এম-পি-এইচ 'মিসিল-এর (missiles) কথাও যে বলা হয় নাই তাহাও নয়। কিন্তু উহা এত ব্যয়সাধ্য যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও ঐ ব্যয় সঙ্কুলান করা কঠিন বলিয়া জেনারেল রিজওয়ে মনে করেন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট এই বিশেষ বাণী প্রেরণের পর ১লা মার্চ্চ তারিখে হাইড্রোজেন বোমার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান হয়। এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে হাইড্রোজেন বোমার যে বিপুল ধ্বংসশক্তির পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে তাহাতে সমগ্র বিশ্ববাসীই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিস্ফোরণ ঘটানর পূর্ব্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিণ অ-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের পরিচালক (Administrator) মিঃ ভ্যাল পিটার্সন জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকার ৬৭টি বৃহত্তম সহরের উপর হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণ হইলে ১০ লক্ষ লোক মারা যাইবে এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক গুরুতর ভাবে আহত হইবে। কিন্তু ১লা মার্চ্চের বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করেন, ধ্বংসের পরিমাণ উহা অপেক্ষাও অনেক বেশী হইবে এবং দুই মাইলব্যাপী স্থানের সব কিছু ধ্বংস হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। হাইড্রোজেন বোমার সাংঘাতিক ধ্বংসশক্তি দেখিয়া পরমাণু শক্তি কমিশনের কর্ত্তারাই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন। জাপান, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মিত্রশক্তির মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিস্ফোরণে জাপানই বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং জাপান ও এশিয়ার দেশগুলিই অধিকতর পরিমাণে এই বিপদের সম্মুখীন। নিরীহ জাপানী ধীবরগণ তেজস্ক্রিয় ভস্ম দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। জাপ মৎস্য-শিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ পাউণ্ড। জাপানী মাছধরা জাহাজ 'ফুকুরিয়ু মারু'র কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ-সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইফ' পত্রিকায় একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি জাপানী মাছধরা জাহাজ ২২শে মার্চ্চ (১৯৫৪) তারিখে বিকিনি হইতে যথাক্রমে ৬৩০ এবং ১৮৫ মাইল দূরে রহিয়াছে বলিয়া বেতারে খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পর উক্ত জাহাজ দুইটির আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। জাপানের মৎস্য-শিল্প ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। সমুদ্রের মাছ এবং জল তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা সংক্রামিত হইয়া দীর্ঘকালের জন্য বিপজ্জনক হইয়া থাকিবে। ফলে জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। সারা জাপান নাবিক-ইউনিয়ন এই বিস্ফোরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। কিন্তু জাপানের ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ওগাটা জাপ পার্লামেন্টের উচ্চতন পরিষদের বাজেট কমিটিতে বলিয়াছেন যে, রাশিয়াও যখন অনুরূপ পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইতেছে তখন শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিতে বলা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার এই উক্তিতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার জাপ গবর্ণমেন্ট হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। এমন কি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল পর্য্যন্ত সুকৌশলে এইরূপ অনুরোধ করিবার দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। গত ৩০শে মার্চ্চ (১৯৫৪) বৃটিশ কমন্স সভায় এ সম্পর্কে যখন আলোচনা হয় তখন প্রাক্তন বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ ষ্ট্রাচি বলেন, 'হয়ত বৃটিশ বিমান-ঘাঁটি হইতেই বোমারু বিমান হাইড্রোজেন বোমা বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং ফলে সম্ভবতঃ এই দেশের প্রত্যেক নর-নারী ও বালক-বালিকার জীবন বিপদাপন্ন হইবে।' চার্চ্চিল এইরূপ আশঙ্কা

অস্বীকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "It would not be right or wise, to ask that they should be stopped." অর্থাৎ 'তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলা সঙ্গত বা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।' কেন হইবে না তাহার কারণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, "প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা যে পরীক্ষা চালাইতেছে তাহা একটি মিত্রশক্তির দেশরক্ষা নীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই মিত্রশক্তির বিপুল শক্তি এবং উদার সাহায্য ব্যতীত ইউরোপ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইবে।"

চার্চিলের উল্লিখিত উক্তি বৃটিশ নরনারীর মনের আশঙ্কা দূর করিতে পারে নাই। হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণের জন্ত প্রস্তাবে পার্লামেন্টের প্রায় শতাধিক সদস্য স্বাক্ষর করেন। গত ৫ই এপ্রিল (১৯৫৪) কমন্স সভায় এ-সম্পর্কে যে বিতর্ক হয় তাহাতে চার্চিল বলেন যে, হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ রাখিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস, "the hydrogen bomb-tests in the Pacific ocean increased the chances of world-peace than the chances of world-war." অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা পৃথিবীতে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির সম্ভাবনাই বেশী বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাসের তাৎপর্য্য কি ইহাই নয় যে, হাইড্রোজেন বোমার ভয়ে রাশিয়া অভিভূত হইয়া পড়িবে, ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর হইবে না? রাশিয়া ও প্রজাতন্ত্রী চীন ভাবী আক্রমণকারী, ইহাই তাঁহার এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা। তাঁহাদের এই ধারণার মূলে কোন সত্য আছে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু রাশিয়ার চারি দিকে যে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। পশ্চিম-ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থাও রাশিয়ার বিরুদ্ধেই। প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে রাশিয়া ও চীন সত্যই ভীত হইয়া উঠিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে প্রথম বিপদগ্রস্ত হইয়াছে মার্কিণ তাঁবেদার জাপান এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলিরও বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা ভীত হয় নাই, এ কথা বলা কঠিন। এক প্রকার রহস্যময় কৃষ্ণ ভস্ম নিউইয়র্কে পতিত হওয়ায় বেশ কিছু আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। হাইড্রোজেন বোমা দ্বারা আক্রান্ত হইলে কি ভাবে অতিক্রান্ত জনবহুল সহরগুলি হইতে লোকাপসারণ করিতে পারা যায় সে-সম্বন্ধে আগামী ২৬শে এপ্রিল (১৯৫৪) একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও আয়োজন করা হইয়াছে।

হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান বন্ধ রাখিবার জন্ত একমাত্র আবেদন জানাইয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। গত ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ব্যাপক ধ্বংসের ভয়াবহ অস্ত্রগুলির উৎপাদন ও মজুত করা সম্পর্ক বন্ধ করা সাপেক্ষে হাইড্রোজেন বোমা সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরীক্ষা বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুরোধে যে কোন ফল হইবে না, একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। মার্কিণ মিত্রশক্তিগুলির মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নয়। গত ৬ই এপ্রিলও একটি পরীক্ষা করা হইয়াছে। আর একটি পরীক্ষা হইবে এপ্রিলের তৃতীয় কি চতুর্থ সপ্তাহে। নূতন হাইড্রোজেন ও পরমাণু বোমা তৈয়ারীর জন্ত মার্কিণ প্রতিনিধি-পরিষদের এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটি ১০৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার অনুমোদন করিয়াছেন।

পরমাণু যুদ্ধের ফল কি হইবে তাহা এশিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের গুরুতর চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে পরমাণু বোমা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতেই বর্ষিত হইয়াছিল, জার্ম্মাণীতে বর্ষিত হয় নাই। হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগরে, আটলান্টিক মহাসাগরে নয়। ১৯৫২ সালের হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহ ফলের ছায়াচিত্রও গৃহীত হইয়াছে। এই ছায়াচিত্রের নাম রাখা হইয়াছে 'অপারেশন আইভি (operation Ivy)। এই ছায়াচিত্রও প্রকাশ্যে দেখানো হইবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইলে রাশিয়া না মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণ করিবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। হয়ত উহা সামরিক কৌশলের উপরেই নির্ভর করিবে। ক্ষুদ্র উত্তর-কোরিয়ার সহিত যুদ্ধেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী দিয়াছিল, একথাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির হইতেই যদি প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণ করা হয়, তবে পশ্চিম-রাশিয়ার শ্বেতকায়দের উপর বর্ষণ করা হইবে, ইহা মনে করা সম্ভব নয়। খুব-সম্ভব সাইবেরিয়া ও চীনের উপরেই বর্ষিত হইবে। এশিয়ার যে সকল দেশ এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষে যোগদান করিবে না, তাহাদের উপরেও হাইড্রোজেন বোমা বর্ষিত হইতে পারে। ইহার উপর হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে রেডিও একটিভিটির অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়ার কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। এশিয়ার মার্কিণ মিত্রদেশগুলিও এই তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহ পরিণাম হইতে বঞ্চিত হইবে না। চিয়াং কাইশেক ও সিংম্যান রী গোষ্ঠী যে বাদ যাইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা হইলে হাইড্রোজেন বোমার নিট ফল দাঁড়াইবে পৃথিবী ধ্বংস না হইলেও অশ্বেতকায়দের বিলোপ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি অশ্বেতকায়দের বিনাশ হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে থাকিবে শুধু শ্বেতকায় জাতি। কিছু সংখ্যক শ্বেতকায় লোকও যে বিনষ্ট হইবে না তাহা নয়। যুদ্ধে উহা অনিবার্য্য। হয়ত কিছু অশ্বেতকায় লোকও বাঁচিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে এ কথা বোধ হয় বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবী হইতে অশ্বেতকায়দের বিলোপ এবং সমগ্র পৃথিবীতে শ্বেতকায় জাতির প্রতিষ্ঠাই হইবে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণের পরিণাম। কবে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহাই শুধু অনুমান করা সম্ভব নয়।

ইন্দোচীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—

জেনেভা সম্মেলনের দিন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুদূর প্রাচ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ২৬শে এপ্রিল (১৯৫৪) এই

সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই সম্মেলনে প্রজাতন্ত্রী চীন যোগদান করিবে এবং ইন্দোচীন সমস্যা হইবে এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু সম্মেলন আরম্ভ হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে ইহা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ইন্দোচীন সমস্যার সমাধান যেন কিছুতেই না হইতে পারে, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এবং উহার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন চেষ্টাই বাকী রাখিতেছে না। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস গত ৩০শে মার্চ্চ (১৯৫৪) নিউইয়র্কে ওভারসীজ প্রেস ক্লাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্র..ন নীতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে দূরে থাকিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যে কোন উপায়েই (by whatever means) কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালু করা হউক না কেন, তাহা রোধ করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য তিনি 'স্বাধীন বিশ্বে' আহ্বান জানাইয়াছেন। ইহার পরদিনই অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ইন্দোচীন তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যুনিষ্ট অধিকারে আসিবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া উহা নিরোধের জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধের আহ্বান করিয়াছেন। সম্মিলিত প্রতিরোধের এই যে হুমকী দেওয়া হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্পর্কে চীনকে সতর্ক করিয়া দিয়া একটি পঞ্চশক্তি ঘোষণার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবে ফ্রান্স, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। এশিয়ার কয়েকটি দেশকে এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করিতে বলা হইবে, ইহাও সংবাদে প্রকাশ।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ইন্দোচীনের যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে তাহার জন্যও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না। গত ৫ই এপ্রিল মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র কমিটির জনৈক সদস্যের নিকট মিঃ ডালেস বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে তিয়েন বিয়েন ফু'র দুর্গের চারি দিকে ভিয়েটমিনদের এণ্টি এয়ার ক্রাফট্ কামান চীনা গোলন্দাজরা পরিচালনা করিতেছে। তিনি এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীন যদি ইন্দোচীনে সৈন্য প্রেরণ করে, তবে উহার প্রতিক্রিয়া শুধু ইন্দোচীনেই আবদ্ধ থাকিবে না। কিন্তু উল্লিখিত সংবাদ মিঃ ডালেস কোথায় পাইলেন? ফরাসী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাঁহারা এরূপ কোন সংবাদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেন নাই। ফ্রান্স শুধু অধিক সংখ্যায় বোমারু বিমান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট চাহিয়াছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, ফ্রান্স ইহা চায় না। মিঃ ডালেস আরও বলিয়াছেন যে, একজন চীনা কম্যুনিষ্ট জেনারেল ভিয়েটমিন কমাণ্ডারের সদর দপ্তরে অবস্থান করিতেছেন এবং ভিয়েটমিন সৈন্যের প্রত্যেক ডিভিসনে চীনা সামরিক উপদেষ্টা রহিয়াছে। তাছাড়া পাঁচ শত চীনা সামরিক ট্রাকও ইন্দোচীনে রহিয়াছে এবং চীন সামরিক লোকেরাই এই সকল ট্রাক পরিচালন করিয়া থাকেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দোচীনে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে নাই, এ কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট-চীন ভিয়েটমিনদিগকে সাহায্য করিতেছে, এ কথা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতেছে, এ কথা প্রত্যক্ষ সত্য। এই দুই সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য কি? পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির নিকট মিঃ ডালেস এই পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সাহায্য করিতেছে আর কম্যুনিষ্ট সেই আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার জন্য সাহায্য করিতেছে। কিন্তু ভিয়েটমিনরা যে ফ্রান্সের অধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে, মিঃ ডালেস তাহা উপলব্ধি করিবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের অধীন রাখিবার জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করিতেছে। পঞ্চশক্তি ঘোষণার খসড়া রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের হাতেও উহা অর্পণ করা হইয়াছে। কোন্ কোন্ এশিয়া রাষ্ট্র এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করিতে রাজী হইতে পারে তাহা অনুমান করা হয়ত খুব কঠিন নয়। ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, এবং পাকিস্তান এই ঘোষণা স্বাক্ষর করিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইন্দোচীন সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ডালেস ইউরোপে গিয়াছেন। এই আলোচনার ফলাফল তাঁহার আশানুরূপই হইয়াছে। কিন্তু জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থ করিবার আয়োজন যে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যর্থতার পরিণামে ইন্দোচীন দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধ উপলক্ষে যে কম্যুনিষ্ট-চীনের উপরেও আক্রমণ চলিবে, মিঃ ডালেস সে সম্পর্কেও জানাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই।

নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক—

গত ১ই এপ্রিল (১৯৫৪) হইতে নিউইয়র্কে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এই কমিশনের অধিবেশন বন্ধ রহিয়াছে। ৩রা এপ্রিল বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতি সত্বর এই কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হওয়ার জন্য যে প্রস্তাব করেন তাহারই ফলে এই বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে যে-গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই জন্য পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক আহ্বানের অনুরোধ করিয়াছেন, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসকারী শক্তি দেখিয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে অচল অবস্থার অবসানের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে তাহাই নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের এই বৈঠক আহ্বানের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, একথা অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পরই ভারতের পক্ষ হইতে হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে স্থিতাবস্থা চুক্তি-সম্পাদনের দাবী জানান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে,

পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তকরণ সাপেক্ষে উহা স্থগিত রাখিবার জন্ম নেহেরুজী যে চারি দফা প্রস্তাব করেন তাহাই বিবেচনা করিবার জন্ম এই অনুরোধ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ কেবট লজ নেহেরুজীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It is clearly entitled to respectfull attention. We sueggest this document be referred to the sub-committee and be eonsidered these." অর্থাৎ 'ইহা স্পষ্টই সম্মানের সহিত বিবেচনার যোগ্য। আমাদের প্রস্তাব এই যে, এই প্রস্তাবটি সাব-কমিটিতে উপস্থাপিত ও বিবেচিত হওয়া উচিত।' বৃটেনের পক্ষ হইতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং অস্ত্রহ্রাস করণের উপায় সম্পর্কে গোপনে আলোচনার জন্ম বৃহৎ চতুঃশক্তি ও কানাডাকে লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করার পর মিঃ লজ উল্লিখিত মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অস্ত্রহ্রাস এবং পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উদ্ভূত অচল অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলিকে বে-সরকারী ভাবে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া গত বৎসর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠকে উহাই হয়ত প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে, এবং নেহেরুজীর প্রস্তাব অনুযায়ী হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা সম্পর্কে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টিও আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু উহার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। সোভিয়েট রাশিয়া ভারত চীন ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব করিয়াছে। এই প্রস্তাব যে কার্য্যে পরিণত হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

এ পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমরা বহু বার আলোচনা করিয়াছি। আজ নূতন করিয়া এখানে সেগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট যে, পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শুধু পদ্ধতি লইয়াই নয়, উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। আজ রাশিয়ারও পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা আছে বলিয়া এই মৌলিক পার্থক্য সামান্ত পরিমাণেও হ্রাস পাইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাশিয়া অপেক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যায় পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা বেশী আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই অবস্থায় পরমাণু শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ এই নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অর্পিত হওয়া। কাজেই অস্ত্রহ্রাস ও পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা স্থগিত রাখার প্রস্তাবের ভাগ্যে কি হইবে, তাহাও বলা সহজ নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত হাইড্রোজেন বোমার যে পরীক্ষা করিয়াছে এবং এই নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক চলিতে থাকা পর্য্যন্ত আরও যে-সকল পরীক্ষা করিবে, তাহার পর আর পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। কাজেই স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন অর্থই আর থাকিবে না। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যও হয়ত ইতিমধ্যেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রিয়া

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে কত কথা অতীতের স্মৃতি
তব সাথে আমার এ-জীবনের প্রীতি।
দ্বার খুলি জীবনের চলি গেলে তুমি
ওগো ভাগ্যলক্ষী মোর, একা হেথা ভ্রমি
এ বিশ্ব-ভূবন-মাঝে।

অবসান কাল
কবে আসিবে সে মোর আলোকিয়া ভাল
পূর্ণ করি দিবে মোর মরণে মিলন
শুনিব তোমার বাণী তব আবাহন।
হে জীবনলক্ষি! মোর চলি গেলে যবে
সব শূন্য হ'ল মোর এ নিখিল ভবে,
প্রেম মোর ব্যর্থ হ'ল এ জীবনে প্রিয়া
যে প্রেম জাগিয়াছিল তোমারে বন্দিয়া;

এ-জীবন ব্যর্থ হ'ল এ বাবের মতো
চির-বিরহের বীণা বাজিছে গো যত
পূজামূর্ত্তি জাগে তব অপূর্ব আলোকে
আরতির দীপ আজি জ্বালিনু ভূলোকে
উজাড়ি উদ্দেশে তব প্রিয়া
অশ্রুর মালিকা গাঁথি দিনু সমর্পিয়া।
এ ধরণীপ্রান্ত হতে সেথা
জ্বলিছে সহস্র দীপ সপ্তবর্ণে উদ্ভাসিত যেথা

বিরাজিছ দেবি! মোর প্রতীক্ষার দেশে
মিলিব তোমারি সাথে এ-জীবন শেষে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

"বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের যে দাবী তাহা মাথা গুঁজিবার স্থানের জন্য নহে। মাথা গুঁজিবার স্থান হিসাবে বিহারের কোন অংশ দাবী করিলে বিহার তাহাতে রাজী হইবে কেন? বিহার ইহাও বলিতে পারে যে, মাথা গুঁজিবার স্থানের জন্য বিহারের কিছু অংশ যদি পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হয়, তবে আসাম ও উড়িষ্যারও কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া উচিত। শ্রীমহতাব আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে যে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান ঘটানো উভয় রাজ্যের নেতৃবৃন্দের উচিত। তাঁহার উপদেশটা ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি মাত্র এবং উহার মধ্যে বৃটিশ প্রভুদের নীতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বেকার-সমস্যার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া শ্রীমহতাব গোড়াতেই ভুল করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বাঙ্গালীর চাকুরীর দ্বার বন্ধ হওয়াই পশ্চিম-বাঙ্গালায় বেকার-সমস্যার কারণ নহে। পশ্চিমবঙ্গেও চাকুরীর দ্বার বাঙ্গালীর পক্ষে রুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার ইহা একটি কারণ বটে। তাহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে সকল কারণে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে। শ্রীমহতাব কি বেকার-সমস্যা, কি উদ্বাস্তু-সমস্যা—কোন সমস্যারই সমাধানের কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গিরণ করিয়া কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিজেদের অযোগ্যতা এবং অসামর্থ্যকে ঢাকিবার এই চেষ্টা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার মতই হাস্যকর! আসলে অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গেরও সেই সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র কোন সমস্যা নাই, তাহা আমরা বলি না। শ্রীমহতাব বলিয়াছেন, বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে বিদেশী সরকার বাঙ্গালীর মনোবল নষ্টের জন্য একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে। তাঁহার এই উক্তি আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু ভারতের কংগ্রেসী শাসকবর্গও সেই পরিকল্পনাই কার্য্যকরী করিয়া বাঙ্গালীর মনোবলের চিহ্নমাত্রও আর রাখিতে চাহিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের ইহাই নিজস্ব স্বতন্ত্র সমস্যা।" —দৈনিক বসুমতী।

সমাধান না সমস্যা?

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে প্রত্যেক প্রদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যাহাতে প্রাদেশিক মাতৃভাষায় দেওয়া হয়, সেই সঙ্গেই যাহাতে মাধ্যমিক স্তরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা ও অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে শেখানো হয়—আর কলেজী বা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে যাহাতে মাতৃভাষায় অথবা রাষ্ট্রভাষায় একই সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, সে বিষয়ে প্রতি রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। ওয়াকিং কমিটি বলেন, উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে হিন্দীকে রাতারাতি সারা ভারতে চালানো হইবে না—ধীরে সুস্থে ও ধাপে ধাপেই তাহা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ইংরেজীর ব্যবহার যথাসম্ভব বজায় থাকিবে—আর সর্বভারতীয় চাকুরীর জন্য মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজী, তিনের জ্ঞানই আবশ্যক হইবে। সিদ্ধান্তটি আপোষ-মীমাংসা হিসাবে অনন্য করিবার মতো, কিন্তু কার্যতঃ ইহার ফলে যে একযোগে তিনটি করিয়া ভাষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চাপিবে, ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহার সহিত আর একটা ক্ল্যাসিকাল ভাষা যোগ করার প্রস্তাবও অনেকে করেন। কাজেই সারা জীবন মানুষের ত দেখিতেছি ভাষা শিখিতেই কাটিয়া যাইবে—ভাষা অতিক্রম করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ে আর পৌঁছানোই হইবে না! সুতরাং ইহা সমাধান, না নূতন সমস্যা সৃষ্টি, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।" —যুগান্তর।

শুধু প্রস্তাব গ্রহণে কাজ হয় না

"সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাব যাহা হইয়াছে, তাহার সাময়িক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নাই। তবে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁহার উপসংহার-ভাষণে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সেই মর্মের একটা প্রস্তাব থাকিলে ভাল হইত। সে প্রস্তাব আত্মানুসন্ধান ও আত্মসংস্কারের প্রস্তাব, যে কথাটা পণ্ডিত নেহরু মধ্যে মধ্যেই কংগ্রেস-কর্মিগণকে শুনাইয়া থাকেন। কোন প্রস্তাব গ্রহণের সার্থকতা তখনই যখন উহা কার্যে পরিণত করার আগ্রহ রহিয়াছে। গান্ধীজী যে কংগ্রেসকে "প্রস্তাব গ্রহণকারী" প্রতিষ্ঠান হইতে "ক্রিয়াশীল" প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার আগ্রহ ও আন্তরিকতা। তাহাই জনসাধারণের মনে আস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে না পারিলে মাত্র প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা প্রতিষ্ঠান সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। আত্মপ্রচার যেমন করা হইবে—আত্মসমালোচনাও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে—দেখিতে হইবে আদর্শ হইতে ও জনজীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে প্রতিষ্ঠান যেন দূরে সরিয়া না যায়।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

চৌরঙ্গীর পাবক

"এত দিনে অতুল্য ঘোষের সোণার দোয়াত-কলম হইয়াছে। তাঁহার টেবিলে সোণা-বাঁধানো পার্কার ৫১-এর একটি সেট শোভা পাইতেছে। বাঙলার মুকুটহীন রাজাকে এই রাজকর কে দিল,

তাহা সর্ব্বসাধারণে জানিতে চাহিতে পারে। বাঙলা সরকারের কোন একটি কণ্ট্রাক্টর, যিনি অতীতে চোরাকারবারের অভিযোগে জেল খাটিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে সরকারী কর্ণধারদের ঔদার্য্যগুণে পুনরায় মোটা মোটা কণ্ট্রাক্ট পাইতেছেন, তিনি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এক ডেপুটি মন্ত্রীকে ঐটি উপহার দিয়াছিলেন। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হইয়া গেল, তখন ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয় হজম করিতে না পারিয়া কলমটি স্বীয়-প্রভুর পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। অতুল্য ঘোষ সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ। অন্যে যাহা হজম করিতে না পারে, অগ্নি বিনা ক্লেশে তাহা উদরসাৎ করিতে পারে বলিয়াই তাহার নাম পাবক।"
—যুগবাণী

শিক্ষা-দপ্তর কি করিতেছেন ?

"একেই বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যার মান নিম্নগামী, তদুপরি গোলমেলে প্রশ্নপত্রের জন্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেহ যদি মারমুখো হইয়া উঠে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এবারের পরীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্নপত্র রচয়িতাদের যেমন শোচনীয় অবহেলা দেখা গিয়াছে, তেমনি ছাত্রবৃন্দের মধ্যেও অছাত্রসুলভ লজ্জাজনক ব্যবহার সমগ্র বাংলা দেশের সুনাম কলঙ্কিত করিয়াছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এই অভাবনীয় ঘটনা দৃষ্টে বাঙালী মাত্রেই উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কখনও ঘটে নাই সেই প্রকার ঘটনা কেন ঘটিল, সে সম্বন্ধে মাত্র আলোচনাই নয়, তাহারও অধিক কিছু করার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষা-দপ্তর কি করিতেছেন আমরা অতঃপর তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।"
—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

কত ব্যজ্ঞানশূন্য রাণাঘাট পৌর-প্রতিষ্ঠান !

"রাণাঘাট পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য যেন দিনের পর দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে। রাস্তার উপর অনাবৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত বড় ক্ষতিকারক তাহা নিশ্চয়ই কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। রাণাঘাটের রাস্তায় প্রতিদিন এইরূপ ভাবে অনাবৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। পৌরপ্রতিষ্ঠানের কোন লোক ইহাতে কোন আপত্তি করে না। বিস্কুট, চানাচুর ভাজা, দৈ, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, বেগুনি, ফুলুরি ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক দ্রব্য, কত নাম করিব? সব চাইতে মজার, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার কেন, স্বয়ং চেয়ারম্যান যে দোকানে প্রতিদিন বসিয়া দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি আলোচনা করেন তাহারি সম্মুখে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা অনাবৃত অবস্থায় বিক্রয় হইতেছে! তাহার উপর প্রতিদিনে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ সের ওজনের রাস্তার দূষিত ধূলা-বালি জমিতেছে। চেয়ারম্যান নিজে ডাক্তার। ইহাতে মানুষের শরীরে কি ভাবে রোগের বীজাণু প্রবেশ করে তাহা তিনি বেশ ভাল ভাবে বোঝেন। অপরের কথা না হয় বাদ দিলাম।"
—সীমান্ত (রাণাঘাট)।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা ও কংগ্রেস

"শ্রীচৈৎরাম গীদোয়ানী লোকসভায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ দানের জন্য। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আইন করার প্রস্তাব শ্রীগীদোয়ানী করিয়াছিলেন। আইন করিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ জ্ঞান থাকা সদস্যের উচিত ছিল, পাশ্চাত্য দেশ যন্ত্র ব্যবহারে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ভারতে, বিশেষ পশ্চিমবাংলায় সে পন্থা প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা সংযম-শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনকেই জীবন ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়াছেন কিন্তু সে শিক্ষা কংগ্রেস সরকার সাত বৎসরেও প্রবর্ত্তন করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই।"
—বীরভূম-বাণী।

সিউড়ীতে বিজলী-বিভ্রাট

"গত ৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা হইতে সিউড়ী সহর অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকে। খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, মেসিন খারাপ হইয়াছে এবং তাহা মেরামত হইতেছে বলিয়াই সহর অন্ধকার। অথচ পূর্ব্ব হইতে মেসিন খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কোন নোটিশ প্রদত্ত হয় নাই। ফলে সাধারণের তো অসুবিধা হইয়াছেই—হাসপাতাল ইত্যাদির অবস্থাও বেদনাদায়ক। কোন্ স্পর্দ্ধাবলে কোম্পানী সহর যে অন্ধকার হইবে তাহা জানা সত্ত্বেও নোটিশ দেন নাই? এই স্পর্দ্ধার ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহা খর্ব্ব হওয়া উচিত। কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদি ব্যর্থ হওয়ায় সহরবাসীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং জানা গেল অনতিবিলম্বেই ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর মালিকের নিকট শত শত জনসাধারণের সহিযুক্ত এক নোটিশ প্রদত্ত হইতেছে যাহাতে সাধারণে এই মাস হইতে তাহাদের দেয় ইউনিট চার্জ্জ দিবে না বলিয়া জানাইবে এবং এই মাস হইতে তাহাদের ইলেক্‌ট্রিক সংযোগও ছাড়িয়া দিবে। আশা করি, ইহাতে কোম্পানীর অব্যবসাদারী মনোবৃত্তির উচিত শাস্তি হইবে। আমরা জনসাধারণের এই আন্দোলনের জয় কামনা করিতেছি এবং এই অপদার্থ অতিলোভী কোম্পানীর চুক্তিপত্র নাকচ করিয়া দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানাইতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় এম, এল, এ-কে বিষয়টি উপরে পেশ করিতে আবেদন জানাইতেছি।"
—বীরভূম-বা[illegible]

ভবিষ্যৎ মানচিত্রে ত্রিপুরা

"ত্রিপুরাবাসীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করিয়া ত্রিপুরার পক্ষে বিপজ্জনক এক প্রস্তাব কাছাড় জেলা হইতে গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। কাছাড় আর ত্রিপুরা এক নয়, ইহাই উপলব্ধি করিতে কাছাড়বাসীকে অনুরোধ করি। ত্রিপুরার শিল্প গড়িয়া উঠিবার বহু সম্ভাবনা বিদ্যমান। উপযুক্ত সড়ক ও রেল-লাইন স্থাপিত হইলেই ক্রমশঃ শিল্প গড়িয়া উঠিবে। ভূমি জরীপ ও Settlement হইলে পর এবং নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিলে ত্রিপুরার আয় যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িতে পারে। ত্রিপুরা কেবল সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যই নহে ইহার তিন দিক দিয়া বিদেশী রাষ্ট্র। অতএব ভৌগোলিক দিক দিয়াও ইহার গুরুত্ব কম নয়। ত্রিপুরা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে থাকা কেবল ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজন নয়, সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজন। এই সব বিবেচনা করিয়াই ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের

শাসনাধীনে রাখা হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে ভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ ইহাকে একটি জেলায় পরিণত করা। ত্রিপুরা একটি জেলায় পরিণত হইলে ইহা যে প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হইবে উহার প্রধান কার্য্যালয় হইতে বহু দূরে পড়িয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় আভ্যন্তরীণ বা বহির্গমনের রাস্তা নাই। অতএব জনসাধারণের পক্ষে প্রদেশের প্রধান কর্মস্থলে যোগাযোগ রাখিতে ভীষণ অসুবিধা হইতে বাধ্য। এতদ্ভিন্ন চাকুরী সংস্থান করাও শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে। ত্রিপুরা সরকারের কাজে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক কর্মচারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ারও সম্ভাবনা হইয়া পড়িবে। যে স্থলে একটি পরিপূর্ণ সরকারের অধীনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইলেও ত্রিপুরার সম্ভাব্য উন্নয়ন-কার্য্য মন্থর গতিতে চলিতেছে সেই স্থলে একজন জেলা-শাসকের অধীনে ত্রিপুরার উন্নয়ন-কার্য্য কি ভাবে হইবে, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। ত্রিপুরাবাসী কেহই কোনও প্রদেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি কামনা করে না। কিন্তু তথাপিও কোন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল অন্য প্রদেশের সঙ্গে ত্রিপুরাকে বিক্রয় করিয়া দিতে চেষ্টিত হইতে পারে বলিয়া আমরা ত্রিপুরাবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।"—সেবক (আগরতলা)।

জেলা সমাহর্ত্তাকে অনুরোধ

"কলিকাতা বা ঐ অঞ্চল হইতে আগত মালদহের যাত্রীদের রাজমহলে বিহার পুলিশ কর্ত্তৃক বাক্স-বিছানা প্রভৃতি মালপত্র খানা-তল্লাসীর ফলে অযথা হয়রানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রাজমহল-মানিকচকই মালদহের যাত্রীদের একমাত্র পথ। এই পথে যদি যাত্রীদের এই ভাবে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তবে মালদহবাসীর যাতায়াত করা নিতান্তই অসুবিধাজনক হইবে। এই অবস্থার অবসানের জন্য সাঁওতাল পরগণা জেলা-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পত্রালাপ করিতে আমাদের জেলা সমাহর্ত্তাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

—উদয়ন (মালদহ)।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

"আজ কোন মন্ত্রী অন্যায় করিলে, চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দেখাইলে বা স্বজনপোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা চলিবে না। ব্যক্তি হিসাবে তিনি যাহাই হউন মন্ত্রী হিসাবে তিনি সাধারণ মানুষের ঢের উর্দ্ধে। তিনি দেব-পদবাচ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও যদি কেহ ঘুষ লয় বলা চলিবে না। চুরি করিতে দেখিলেও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। যদি কাগজে কিছু লেখা হয়, সে কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হইবে। সম্পাদকের বিরুদ্ধে ঘুষখোর বা চোর কর্মচারীর মামলা করিতে কিছুই ব্যয় হইবে না। সরকারী অর্থে অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থেই সেই মামলা চলিবে। মোটা মোটা বেতনের সরকারী উকীল ব্যারিষ্টারেরা কর্মচারীর স্বপক্ষে সওয়াল জবাব করিবে। সকল মামলা-খরচই সরকার হইতে সাধারণের অর্থব্যয়ে চালান হইবে। একখানা কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে এমনি একটি মামলা খাড়া করিতে পারিলেই, সে কাগজের দফা ঠাণ্ডা; মামলা নিয়ে আদালত, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট অবধি গড়াইলে দুই-চারি বৎসর কাটিয়া যাইবে। এক কলম লেখার ঠেলা সম্পাদকের জীবনভোর সামলাইতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে—ভারত-বিধাতৃগণ গণতন্ত্রের দফা ঠাণ্ডা করিবার অমোঘ অস্ত্র আপাততঃ দুই বৎসর, তার পর কে জানে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর কিনা, সংবাদপত্রের মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখিলেন! সুতরাং চক্ষে অনাচার কদাচার দেখিয়াও "কাজ কি মোদের কথায়, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে" এই সর্ব্ববিপদনাশক পন্থা অবলম্বন ছাড়া সংবাদপত্রের অস্তিত্ব রাখার উপায় নাই। সরকারী অন্যায় ব্যাপারের সম্বন্ধে টুঁ করিবার উপায় থাকিল না; "বঙ্গবাসীর" স্বনামধন্য পঞ্চানন্দের মত বলিতে হইবে—

"সরকারী সব ট্যাংরা পুঁটি
এক একটি বাটখারা—
ওদের কথা বলব না ভাই
ওরা মোদের হাতছাড়া।"

—অজিপুর সংবাদ

ট্যাক্সের বোঝা

"এই দুঃসহ জীবনযাত্রারও প্রতি পদে করের বোঝা যেন আবর্ত্তন করিতেছে শৃঙ্খলের মত। প্রতিটি মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরই যেন করের শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফলে রুদ্ধশ্বাস মানুষও বাধ্য হইবে সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায়ে এই দুঃসহ জীবনযাত্রার অবসান করিয়া সুস্থ সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার পথে নামিয়া আসিতে। কারণ নির্ব্বাক হইয়া সহ্য করিবার দিন গিয়াছে। যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে পুঁজি খাটাইয়া বছরে পাঁচ শত কোটি টাকা মুনাফা করিয়া বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করিতেছে তাহাদের বিলাসিতার উপকরণদ্রব্য-সমূহের উপর করের শনির দৃষ্টি পড়ে না। যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের অপচেষ্টা নিবারণের কোনো প্রচেষ্টাও দেখা যায় না। অথচ এইদিকে দৃষ্টি পড়িলে সরকারের ভাণ্ডারে বহু অর্থ আসে। তাই দেখে, দারিদ্র্য ও অনশনপীড়িত রুদ্ধশ্বাস মানুষের কণ্ঠে ট্যাক্সের ফাঁস আরও দৃঢ় না করিয়া, সমাজের শোষকশ্রেণীর বঞ্চনার অর্থকে দেশবাসীর মঙ্গলের কাজে লাগাইতে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামকদের নিকট অনুরোধ করিব।"

—বন্ধু (মজিলপুর)।

কাঁথি সহরে হাট-বাজার-সমস্যা

"বর্ত্তমানে এই সহরে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঠিকমত বসত ঘরবাড়ী, পথ-ঘাট বা দোকান-পাট ও হাট-বাজারের ঠিক মত স্থান-সঙ্কুলান হইয়া উঠিতেছে না। সপ্তাহে রবিবার ও বৃহস্পতিবার দুই দিন যে হাট বসে, মনে হয় প্রতি হাটে লক্ষাধিক টাকা বিকিকিনি হয় সর্ব্বপ্রকারে। সে দুই দিন অত্যধিক ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমে প্রধান পথটি প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সাধারণের গমনাগমন বিঘ্নিত হয়। সাধারণত হাটের দিন ৩।৪ হাজার শাক-শব্জী বিক্রেতা বড় রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান পাতিয়া বসে, তদুপরি স্থায়ী দোকানদারেরা

আবার ঐ হাটবারের দিন ঐরূপ পথিপার্শ্বে দোকান বাড়াইয়া দেন। সে অবস্থায় মোটরাদি যাতায়াতের জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিশেষ যখন বিপরীতগামী মোটর পরস্পরকে ঐ পথে অতিক্রম করে। এ বিষয়ে কি পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ, কি ইউনিয়ন বোর্ড, কি জনসাধারণ সকলেই নির্ব্বিকার ও উদাসীন দর্শকের মত থাকেন, কারণ তাঁহারা সাময়িক ভাবে অসুবিধা অনুভব করেন মাত্র। ইহার প্রতিকার করা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা কেহই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না।" —নারায়ণ (কাঁথি)।

দান-ধর্ম্মে বিমুখতা

"আমাদের এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর দেশে দান-ধর্ম্মের খুবই সমাদর এবং নিঃশেষে দান দ্বারা এ দেশের ত্যাগের যে চূড়ান্ত নিদর্শন রহিয়াছে—পৃথিবীর অপর কোন দেশে এরূপ নাই। পুরাকালে রাজা, ধনী মহাজনগণ দেশের আর্ত্ত বিপন্নদের জন্য কতই না কিছু দান করিতেন! প্রজাদের মঙ্গলসাধনই ছিল রাজধর্ম্ম। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া পুরাকালের রাজারাজড়া ও ধনী মহাজনগণ প্রজাসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য বহু স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া ঘাট স্থাপন ও উহার পাড়ে বৃক্ষাদি রোপণ পূর্ব্বক সাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে প্রজা সাধারণের অশেষ উপকার হইত। তাঁহাদেরই দানে পল্লী অঞ্চলে বহু পুষ্করিণী পল্লীবাসিগণের জলকষ্টাদি নিবারণের সহায়স্বরূপ রহিয়াছে। অধুনা এই ত্যাগ-সর্ব্বস্ব দেশে পাশ্চাত্যের ভোগসর্ব্বস্ব বাদ যেন জুড়িয়া বসিয়াছে। তদানীন্তন যুগের দান-ধর্ম্ম লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বতন রাজারাজড়া বা জমিদারগণের উত্তরাধিকারিগণ আজ আর তত দান-ধর্ম্মের পক্ষপাতি নহেন। জনসাধারণের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের দাতব্য জলাশয়াদি সাধারণের অসুবিধা ঘটাইয়াও মুষ্টিমেয় লোককে পুনর্ব্বন্দোবস্ত দিতে আদৌ কার্পণ্য বোধ করিতেছেন না। অর্থের লোভই মানুষকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইহা কি পাশ্চাত্যের ভোগসর্ব্বস্ব বাদের দৃষ্টান্ত নহে?" —নীহার (কাঁথি)।

হিন্দী ভাষার মর্য্যাদা হানি

"মাদ্রাজের গভর্ণর হিন্দীপ্রধান যুক্তপ্রদেশনিবাসী শ্রীশ্রীপ্রকাশ পৃথিবীর মধ্যে হিন্দী ভাষা নিহত (murdered) ভাষা বলিয়া সেদিন যে উক্তি করিয়াছেন, আমরা গতবারের 'মুক্তি'তে বিবিধ প্রসঙ্গে তাহার কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, অহিন্দীভাষীরা ভাল করিয়া হিন্দী না শিখিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া ও ভুল হিন্দী বলিয়া হিন্দীকে নিহত করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"এমন কি, মহাত্মা গান্ধী যখন হিন্দী বলিতেন আমি কান বন্ধ করিয়া থাকিতাম।" পাণ্ডিত্যাভিমানী হিন্দীবিদের ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতা কল্পনা করা যায় না। মহাত্মাজী হিন্দীকে ভারতের অধিকাংশের কথ্যভাষা বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্য ইহাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে চমৎকার হিন্দী শিখিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর যাবৎ সর্ব্বভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি চেষ্টা না করিলে হিন্দী কখনই ভারত ইউনিয়নের সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইত না। সেই মহাত্মাজীও যদি ভাল হিন্দী শিখিতে ও বলিতে পারেন নাই এবং তিনি যে হিন্দী বলিতেন তাহা না শুনিবার জন্য হিন্দীবিদদের কান বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত—তাহা হইলে অহিন্দীভাষীরা হিন্দীকে নিজেদের রাষ্ট্রভাষা করিয়া হিন্দীবিদদের কানে খোঁচা দিবার অপবাদ লইবে কেন? বিশেষতঃ যখন ইহাদের মতে ভাল করিয়া হিন্দী না শিখা ও শুদ্ধভাবে হিন্দী উচ্চারণ না করা পর্য্যন্ত অহিন্দীভাষীদের হিন্দী বলার অধিকার নাই। অহিন্দীভাষীদের পাল্লায় পড়িয়া হিন্দী যখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য হিন্দীবিদদের এত প্রয়াসই বা কেন? শিশুরা ও বালক-বালিকারা অশুদ্ধ শব্দ ও অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে করিতেই ভাষা শিক্ষা করে ও পরবর্ত্তী কালে ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীপ্রকাশের মতাবলম্বী হিন্দীবিদদের মত অনুসারে শিশুদিগকে পরিচালিত করিলে তাহারা অচিরেই বোবা হইয়া যাইবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে ইহাকে সর্ব্বাগ্রে ইহার ব্যাকরণের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে—ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষা হইতে প্রচলিত সংবাদ ও বাক্যাংশ ইহাতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিদেশী যে সমস্ত কথা জনসাধারণের মধ্যে চলিত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে বর্জ্জন না করিয়া—তাহাদের স্থলে দুর্বোধ্য দুরূহ শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহার না করিয়া—সেই সব কথাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে হিন্দী কোনো কালেই রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিবে না।"

—মুক্তি (পুরুলিয়া)।

জেলা মোটর-অফিস

"মেদিনীপুর জেলার মোটরের যাবতীয় কাজকর্ম্মের জন্য মেদিনীপুরে কালেক্টরীতে মোটর ভিকিল অফিস আছে। এই অফিসটি আজ দীর্ঘকাল ধরে দুর্নীতি ও অরাজকতার এক আখড়া হয়ে আছে। পেট্রোল রেশনিংএর সময় এই অফিসের কেরাণীরা রোজগারের অঙ্কে মেদিনীপুরের যে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীকে হার মানিয়ে দিয়েছিলেন। রেশনিং উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্য্য কমে গেছে, কিন্তু কেরাণীচক্র ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টারের লাইসেন্স, পারমিট, পারমিটের রিনিউয়াল ফিটনেস ইত্যাদি ব্যাপারে ওঁরা দয়া করে একটা রেট বেঁধে দিয়েছেন। যে ঘুষ না দেবে তার নাকি কোন মতেই কাজ হবে না। কেন না, আমলাতান্ত্রিক যুগে ওঁদের অসন্তুষ্ট করে নাকি শাসন চলে না। তবে কোন গোলমেলে ব্যাপারে অথবা বিভিন্ন প্রতিযোগী মোটর কোম্পানীর কোন দরখাস্তে যদি হেড ক্লার্কের নোটের প্রয়োজন হয় তখন অবশ্য বাঁধা রেটে চলে না। এখানে মোটা টাকার লেন-দেন হয়। আমরা নূতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা পুলিশ-সুপারের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি। আজ মোটরের ব্যাপারে সমস্ত জেলা এই অফিসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই অফিসটি কলঙ্কমুক্ত হলে সারা জেলা জুড়ে শাসন-ব্যবস্থার সুনাম বেরিয়ে যাবে। আমরা জানতে পারলাম এই অফিসের সামান্য

কাজেও জনসাধারণকে তিন-চার দিন ফিরতে হয়, এটারও প্রতীকার হওয়া একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। অফিসের কেতা-কায়দা মানতে গিয়ে জনসাধারণের অসুবিধা ঘটাটা মোটেই সঙ্গত নয়।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

"এ বারের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসায়-মূলক বা অর্ধ-ব্যবসায়মূলক পরিকল্পনাগুলির পরিচালনায় গত কয়েক বৎসরের মতই কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ, দুগ্ধোৎপাদন, ষ্টেটবাস প্রভৃতি পরিকল্পনায় মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ টাকার উপরে! এই ক্ষতির অঙ্কে শোচনীয় দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে যে দুর্নীতির ঘুণ ধরিয়াছে এবং এই দুর্নীতি রাজ্যের আর্থিক কাঠামোকে ক্রমেই দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।' দুর্নীতির ফলে যে শুধু সরকারী ব্যয়ের অঙ্কই বাড়িতেছে তাহা নহে, আয়ের অঙ্কও কমিতেছে। এ বৎসর বিক্রয়কর বাবদ আয় ৮০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। যে সমস্ত রাঘব বোয়াল কর ফাঁকি দিবার কৌশলকে একটি সূক্ষ্ম শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, বিশেষতঃ মুখ্য মন্ত্রীর, মনোভাব যাঁহারা জানেন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে বিক্রয়কর বাবদ আয় কমিবার জন্ম শুধু দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থাই দায়ী নহে, ইহার জন্ম অনেক পরিমাণে দায়ী সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা। দেশের বেকার যুবকদিগের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া যাঁহাদের ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া শোনা যায়, তাঁহাদের বাজেটে বেকার-সমস্যা সমাধানের কোন পরিকল্পনার আভাস পাওয়া গেল না! কিছু-সংখ্যক বেকারকে 'মাষ্টারী' দেওয়া হইবে বলিয়া যে-আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল বেকার-সমস্যার সমাধানের একটা পরিকল্পনা বলিয়া ভুল করিবার মত বোকামি দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে আজ আর নাই। দেশের লোক এখন অন্ততঃ নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, সরকারের ভাঁওতায় তাহারা ভুলিবে না। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে আজও সহস্র সহস্র লোকের মাথা গুঁজিবার জায়গা নাই। যে জমিদারগণের স্বত্ব বিলোপের জন্ম সরকার আইন প্রণয়ন করিতেছেন বলিয়া বড়াই করিতেছেন, তাহাদেরই স্বার্থরক্ষার খাতিরে আজও রিফিউজী-কলোনীগুলি আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃত হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলির উন্নয়নের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সমস্যার—এবং সাধারণ ভাবে বেকার-সমস্যার—অনেকটা সমাধান হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সরকারের বাজেটে সেরূপ কোন পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। অবশ্য এরূপ কোন পরিকল্পনার আশা করাও ভুল, কারণ যে বৃহৎ শিল্পপতিদিগের স্বার্থের সহিত সরকারের স্বার্থ জড়িত তাঁহারা কুটির শিল্পের উন্নয়নের বিরোধী। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্ম যে ফিনান্স কর্পোরেশন সরকার গঠন করিয়াছেন, তাহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও সরকার বৃহৎ-শিল্পপতিদের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুত বি, এম, বিড়লাকে এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শিল্পপতিদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই—দেশের স্বার্থ বা বেকার যুবকদিগের স্বার্থের দিকে নহে—শিল্পোন্নয়নের কাজে অগ্রসর হইবেন। এ বৎসরের বাজেট পশ্চিমবঙ্গবাসীর হতাশাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে বোধ হয়, বেকার-সমস্যা-রূপ যে বিস্ফোরক পদার্থ সমাজের নিম্নস্তরে ক্রমেই জমিতেছে তাহার তাপমাত্রাও বাড়াইয়াছে।"

—জনমত (কলিকাতা)।

শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার শেষ রাত্রে বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার কয়েক মাস রোগভোগান্তে তাঁহার যতীন দাস রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ১৯০১ সালে এম-এ পাশ করিয়া সংস্কৃত কলেজে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইয়া আসেন। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। দার্শনিক বার্গস, জেন্টিলে, মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, সিলভাঁ লেভি প্রভৃতি মহেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের "দর্শন" শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন মহাসম্মেলনে তিনি সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "উপনিষদের আলো," "হিন্দু মিস্টিসিজম," "ইষ্টার্ণ লাইটস" প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনে তাঁহার গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। ডাঃ সরকারের পরলোক গমনে বাঙ্গালা দেশ একজন কৃতী সন্তানকে হারাইয়াছে। আমরা পরলোকগত মনীষীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

• • •

গত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতার বহুবাজার-নিবাসী স্বনামধন্য ৺শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পৌত্র ও ৺রাজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র অমরেন্দ্রনাথ দাস ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ১৩নং দাস লেনস্থ ভবনে অকস্মাৎ করোনারী থ্রমবোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সরল আন্তরিক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বেলুড় মঠের স্বামী বিরজানন্দের শিষ্য ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত